বঙ্গদর্শন।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত।

সপ্তম বৎসর।

১২৮৭ সাল।

কাঁটালপাড়া

বঙ্গদর্শনযন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৮১

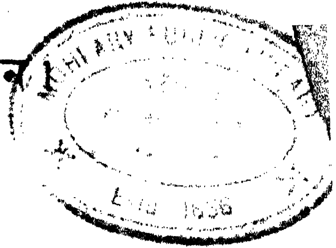
মূল্য, ৩ টাকা।
ডাকমাশুল ।৶

সূচিপত্র।



বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।



সপ্তম বৎসর।

ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম্ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব সূত্র।

যে অবধি ঈশ্বরের ন্যায় মনুষ্যও সাকার ও নিরাকার এই দুই বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে, সেই অবধি এক নূতন যুগোৎপত্তি হইয়াছে। ঈশ্বরের দ্বৈতবাদ আছে, মনুষ্যেরও তাহা ঘটিয়াছে। এই দ্বৈতবাদীরা বলেন, "তুমি আমি প্রত্যেকের ভিতর, আর একটি করিয়া তুমি আমি আছে। যেটী দেখা যায়, সেটী সাকার মনুষ্য, আবার তাহার ভিতর যেটী আছে, সেটী নিরাকার মনুষ্য। কেহ সেটীকে দেখিতে পায় না, সেটীও কোন কার্য্য করে না, অথচ সেটী আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।" শাস্ত্রকারেরা, ধর্ম্মযাজকেরা সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, মনুষ্যের ভিতর মনুষ্য আছে। তুমি জানিতেছ না, তুমি বুঝিতেছ না, তোমার ভিতর আর একজন আছে, তাহার নাম আত্মা।

দ্বৈতবাদীরা আরও বলেন যে, মৃত্যুর পর নিরাকার মনুষ্য প্রকাশ পায়; সেই নিরাকার অবস্থায় সুখ দুঃখ সকলই ভোগ করিতে হয়। আমি যদি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাই, উত্তম বস্ত্র পরিব, চন্দন মাখিব, পুষ্পহার গলায় দিব, সিংহাসনে বসিব, অপ্সরার গীতি শুনিব, আহার নিদ্রার ত কথাই নাই। তখন শরীর নাই থাকুক, এ সকল শারীরিক সুখভোগের কোন ব্যাঘাতই ঘটিবে না। আর যদি নরকে যাই—এই লেখার পর তাহাই সম্ভব—তাহা হইলে নানা বর্ণের অনন্ত অগ্নি আমার নিরাকার দেহকে দগ্ধ করিবে, আমি জ্বালায় যন্ত্রণায় চীৎকার করিব, ডাক্তার পাইব না, ঔষধ পাইব না, ফোস্কা গালিতে একটি আত্মীয়ও পাইব না। যদি স্বর্গে যাইতে

না পাই, আর নরকেও স্থান না হয়,— ইদানী শুনিতেছি, নরকে নাকি স্থানা-ভাব হইয়াছে, আমিও সেই ভরসায় কলম ধরিয়াছি—যদি স্বর্গে যাইতে না পাই, নরকেও স্থান না হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর আমি এইখানেই থাকিব, তখন দেহ থাকিবে না, কাজেই তোমরা আমায় দেখিলে প্রেত বলিয়া ভয় পাইবে।

এইরূপ আবার বস্ত্র, চন্দন, পুষ্প, সকলের আত্মা আছে, নতুবা তাহারা স্বর্গে যায় কিরূপে? যদি সেখানে তাঁতিরা গিয়া তাঁত বোনে, মালিরা গিয়া মালঞ্চ করে, তাহা হইলে সেখানে ঢাকাইধুতি, বেনারসি চেলি জন্মিলে জন্মিতে পারে; কিন্তু সেখানে যদি তাঁতি, মালি প্রভৃতি ইতরজাতিরা যাইতে না পায়, বা যাইয়া যদি তন্তুবয়ন করিতে না পায়, তাহা হইলে বস্ত্র কোথা হইতে আইসে? কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের এই পুরাতন বস্ত্রের আত্মারা স্বর্গে গিয়া ব্যবহৃত হয়। অতএব আত্মা যে কেবল আমাদের আছে, এমত নহে। কড়িগুলির আত্মা আছে, বৈতরণী পার হইবার নিমিত্ত যে কয়েক কড়া কড়ি আমরা পাইয়া থাকি, যদি তাহাদের আত্মা না থাকে, তাহা হইলে এরূপ কড়ি আমাদের সঙ্গে দিবার ফল কি? কড়ি সবায় পড়িয়া থাকে, এ অবস্থায় বুঝিতে হইবে কড়ির আত্মারা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায়, অন্ততঃ পারঘাট পর্য্যন্ত।

রহস্য এক্ষণে এই পর্য্যন্ত। আমরা বলিতেছিলাম যে, যে অবধি মনুষ্যা সম্বন্ধে দ্বৈতবাদ নষ্ট হইয়াছে, সেই অবধি নূতন কল্প আরম্ভ হইয়াছে। সেই অবধি প্রথম ধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহার পূর্ব্বাবধি ধর্ম্ম গঠিবার কি কিছুমাত্র উদ্যোগ ছিল। ভয় মনুষ্যের স্বভাবতঃ প্রবল—সেই ভয় হইতে দু এক দেবতার কল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল অগ্নি দেবতা, কেন না হাত পুড়ায় বায়ু দেবতা, কেন না ঘর ভাঙ্গে, বরু দেবতা, কেন না জলে ভাসায়, ইহাদে পূজা করা উচিত। তাহা হইলে সংসারযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে চলিবে। এইরূপে সামান্য মত ধর্ম্ম উদ্ভাবিত হইতেছিল স্বর্গ, নরক, আত্মা, পরমাত্মা, এ সক কথার সৃষ্টি তখন হয় নাই। কাজে ধর্ম্ম কেবল ঐহিকী ছিল। লোকে চরিত্রও তখন পৈশাচিকবৎ ছিল- ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্দম, জম্বুকের ন্যায় পা রক্তপ্রিয়, দয়া, দাক্ষিণ্য একেবারে বি হিত; এরূপ প্রকৃতি অগ্নি বায়ু দেবতা দ্বারা উদ্দীপ্ত ব্যতীত দমিত হইবা সম্ভাবনা হয় নাই।

তাহার পর মনুষ্যের ভিতর মনু আছে, এই অনুভব ভারতবর্ষে প্রথ উত্থাপন হইল। উত্থাপিত হইবামাত্র নূতন এক ধর্ম্ম স্বতঃ উপস্থিত হইল মৃত্যুর পর আত্মা জীবিত থাকে। এ

াগিল। ঢাকা ও বরিশালে যাহাদের ...মের বাগান ছিল, তাহারা নিজ নিজ ...গান বেচিয়া আবার কাপড় ও চাউল ...য়ার করিতে লাগিল। মালদহওয়া- ...রা দেখিল যে তাহারা ঢাকা, বরি- ...ল ও মালদহের লোককে পেট ভরিয়া ...ম ভক্ষণ করাইয়াও প্রতিবৎসরে ১৩ লক্ষ আম বাঁচাইতে পারে, ...ন তাহারা ভাবিল আম বৎসরে দুই ... বই পাওয়া যায় না; সম্বৎসর আম ...য়া যায় ইহার কোন উপায় হয় না ... ক্রমে বাহির হইল, যে,যদি আমের ... শুকাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ...ৎসর চলে। আর কাঁচা আম কাছা- ...ছি ৪।৫টি জেলা বইত দূরে পাঠান ...য় না শুকাইয়া রাখিলে আরো অনেক ...দেশে পাঠাইতে পারা যাইবে। ঢাকা ... বরিশাল হইতে চাউল কাপড়ের ...স্থান হইতেছে, অন্য জায়গা হইতে ...রও নানা জিনিস মিলিবে। ঢাকা ...রিশালের তাঁতী ও চাসা আবার বাড়ি- ...ছে, তাহারা অন্য অন্য জেলায় ...পন আপন কাপড় ও চাউল পাঠা- ...তে লাগিল। মালদহে আম শুকা- ...। আমস্বত্ব করা একটি নূতন আবি- ...য়া হইয়াছে; ইহাদের তাহার আর ...য়োজন নাই। এইরূপে স্বাধীন ...ণিজ্যদ্বারা এই লাভ হইল যে, যে ...দেশের লোক যাহা সুবিধামত প্রস্তুত ...রিতে পারে, সে তাহাই প্রস্তুত ...রিতে লাগিল তাহাতে পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইল। উৎপন্ন অধিক হইল। একটি নূতন আবিষ্ক্রিয়া হওয়াতে সম্বৎসর লোকে আমের স্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। আর এক জেলার কতকগুলি লোক, তিন জেলায় সর্ব্বদা যাতায়াত করার দরুণ ইহাদের বুদ্ধিশুদ্ধি হইল।

আমরা এতক্ষণ মনে করিতেছিলাম যে ব্যবসায়ের জন্য বরিশালে কাপড়ের কারবার উঠিয়া গেল, ঢাকায় চাউলের চাস উঠিয়া গেল ও মালদহ হইতে চুই উঠিয়া গেল। বাস্তবিক তাহা হয় না, জীবনধারণোপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু কখন একেবারে কোন বিস্তৃত ভূভাগ হইতে উঠিয়া যায় না। কিছু না কিছু পরিমাণে থাকিয়াই যায়। কিন্তু সে কথায় কোন আস্থা না করিয়া আমরা যেভাবে বলিয়া আসিতেছি সেই ভাবেই বলিয়া যাই।

মালদহে আম্র উদ্বৃত্ত হইল। বরিশালে ধান্য উদ্বৃত্ত হইল, ঢাকায় বস্ত্র উদ্বৃত্ত হইল। তখন এই তিন জায়গার লোক দেখিল এত জিনিস মিথ্যা অপচয় না করিয়া সমুদ্রের পারে বা হিন্দুস্থানের অভ্যন্তরভাগে এ সকল প্রেরণ করিলে অনেক জিনিস পাওয়া যাইবে, যাহাতে আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং তাহারা আপন আপন জিনিস লইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইতে আরম্ভ করিল। আরাকান বা উড়িষ্যায় যাইতে হইলে, বড় নৌকার প্রয়োজন সুতরাং বড় নৌকা প্রস্তুত

হইল, আরাকান হইতে নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য আনিতে লাগিল। আরাকানওয়ালারা শিল্পকার্য্য বিস্তৃত করিয়া চাউলাদির জন্য কিয়ৎপরিমাণে বরিশালের উপর নির্ভর করিতে লাগিল আর নূতন জিনিস আমস্বত্ত পাইতে লাগিল। দিনকতক আমস্বত্ত খাইয়া তাহাদের সক গেল যে আম খাইতে হইবে। অনেক চেষ্টার পর আম্র preserve করিবার উপায় উদ্ভাবন হইল, আরাকানের লোক ইচ্ছা করিলে এখন আমও খাইতে পাইল।

এইরূপে ক্রমশঃ বাণিজ্য বিস্তার হইলে ক্রমে লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয়, নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সস্তা হয়, নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইয়া জড় জগতের উপর মনুষ্যের আধিপত্য বৃদ্ধি হয়, মনুষ্যের পরিশ্রম কম হয়, বুদ্ধি ও কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, সমস্ত মানব জাতির সহিত সহানুভূতি করিতে শিখে, জগৎ শুদ্ধ ভাই ভাই হইয়া দাঁড়ায়।

যদি জগৎ শুদ্ধ লোক বরিশাল ঢাকা ও মালদহের মত সোজা বুঝে, তবে যে দেশে যাহা সহজে উৎপন্ন হইতে পারে সে দেশে তাহাই উৎপন্ন করা কর্ত্তব্য। সকল লোকে সকল জিনিস সস্তা পায়। জগতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় ও লোকের সাংসারিক দুঃখ কমিয়া যায়। ইংলণ্ডের টাকা অনেক, ইংলণ্ডের লোক খুব পরিশ্রম করিতে পারে, ইংলণ্ড সভ্য ইংলণ্ডে নানাবিধ কলের প্রথ সৃষ্টি। সুতরাং ইংলণ্ডের উচিত যে চা বাস একেবারে ত্যাগ করিয়া কে নানাবিধ শিল্পের অনুশীলন কর ফ্রান্সে উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষা জন্মে, উৎ রেশম তৈয়ারি হয়, অতএব ফ্রান্স উচিত পৃথিবীর সমস্ত দেশের মদ রেশমের কাপড় সরবরাহ করা। ইতাল লোক চিত্রকর্ম্মে অত্যন্তনিপুণ, ইতাল জল ও বায়ু এবং ইতালীর নির্ম্মেঘ প্র কার গগনমণ্ডল চিত্রকর্ম্মের অনেক সুবি করিয়া দেয়, অতএব ইতালীর উ কেবল চিত্রকর্ম্মে মনঃসংযোগ করা ভারতবর্ষ ও ইউনাইটেড ষ্টেটে অপর্য্যাপ্ত উর্ব্বরা ভূমি আছে, অতএব ইহাদের উচিত কেবল চাসবাস করা, রুশিয়ায় অপর্য্যাপ্ত অনুর্ব্বরা ভূমি আছে সেখানে অনেক পশু পালিত হইতে পারে, সুতরাং তাহাদের উচিত পশুপালনবৃত্তি অবলম্বন করা।

কিন্তু লোকের কেমন দুর্ব্বুদ্ধি, তাহারা মনে করে তাহারা যতই বেশী খরচ করিয়া আপন আপন দেশে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিবে ততই তাহাদের বাহাদুরী বেশী। ইংলণ্ডে অপর্য্যাপ্ত লবণ পাওয়া যায়, প্রস্তুত করিতে হয় না। ফ্রা শুল্ক বহনের খরচ দিলে সেখান হই অপর্য্যাপ্ত লবণ পাইতে পারে। কিন্তু কি ইংলণ্ডের লবণ ফ্রান্স পাইবে! কখন হইতে পারে না। ফ্রান্স প্রতি বৎ এক কোটী মুদ্রা ব্যয় করে লবণ প্র

করিয়া লইবে তথাপি নিতান্ত অল্প মূল্যে ইংলণ্ডের লবণ লইবে না। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ইংলণ্ডের লোক রা কেন ফ্রান্সে লবণ বেচিয়া আসে না? তাহা হইবার জো নাই। ইংলণ্ড হইতে লবণ গেলেই তাহার উপর এত ট্যাক্স দিতে হয় যে বেচিয়া লোকসান বই লাভ হয় না। মনে কর ফ্রান্সে লবণ তয়ারি করিতে মণ করা দুই টাকা খরচ হয় ও ইংলণ্ড হইতে আনিতে চারি আনা খরচ হয়। তাহাতে ফ্রান্সের গবর্ণমেন্ট আইন করিলেন, যে ইংলণ্ড হইতে লবণ আসিলে শতকরা সাড়ে সাত শত টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে। চারি আনার জিনিসে সাড়ে সাত সিকা ট্যাক্স। ইংলণ্ডের লবণের দাম ফ্রান্সে গিয়া হইল ২৷৵০ ইহার উপর ব্যবসায়দারদিগের মুনাফা আছে সুতরাং ফ্রান্সে ইংলণ্ডের লবণের দাম ফ্রান্সের লবণের দাম অপেক্ষা বেশী হইল; আর কেহ ইংলণ্ডের লবণ কিনিল না। এইরূপ নিজদেশে সব প্রকার শিল্পকর্ম্ম রক্ষার জন্য ট্যাক্স করার নাম, নাম Protection অথবা রক্ষাকর। ইংলণ্ড ভিন্ন পৃথিবীর তাবৎ দেশেই এইরূপ রক্ষা-কর প্রচলিত। অন্য দেশের জিনিস ইংলণ্ডে গেলে ট্যাক্স দিতে হয় না। কিন্তু ইংলণ্ডের জিনিস অন্য দেশে গেলেই ট্যাক্স দিতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইংলণ্ডের টাকা বেশী। এত বেশী যে ইংলণ্ড প্রায় প্রতিবৎসর খরচ খরচা বাদে ৯৭ কোটী টাকা বিদেশ হইতে সুদ পাইয়া থাকে। ইংলণ্ডের লোকের ব্যবসায় বুদ্ধি অতি উৎকৃষ্ট, ইংলণ্ডের লোকের এমন ক্ষমতা আছে, যে তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছুরী কাঁচি তুলার কাপড়, পাটের জিনিস, লোহার সবরকমের জিনিস, গরম কাপড়, ইকিং কতক কতক কাঠের জিনিসও দিতে পারে। কিন্তু রক্ষা করের জন্য অনেক দেশে ইংলণ্ডের দ্রব্যাদি যাইবার জো নাই। ইউনাইটেড ষ্টেট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে বিদেশ হইতে কোন জিনিস আসিতে দিবেন না। এমন কি কুমারের জিনিসের উপর শতকরা ৪০ টাকা রাক্ষকর বসাইয়াছেন। লেডি ফসেট ইউনাইটেড ষ্টেটের রক্ষা-কর সম্বন্ধীয় আহাম্মুকির এক সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন ইউনাইটেড ষ্টেটের লোক যে পোষাক পরে, তাহার সূতার উপর ট্যাক্স, কাপড়ের উপর ট্যাক্স, সজ্জাবের কাপড়ের উপর ট্যাক্স, বোতামের উপর ট্যাক্স; এইরূপে সমস্ত জামাটির নিয়মিত মূল্যের উপর শতকরা প্রায় ৫০ টাকা দিতে হয়। নিম্নে লেডি ফসেটের সেই প্যারাগ্রাফটি অনুবাদিত হইল।

"আমেরিকানেরা যে পোষাক পরিয়া থাকে তাহার উপর ট্যাক্সের তালিকা।
টুপি, টুপির রেশমে শতকরা ৬০ টাকা, ফিতার শতকরা ৬০ টাকা, যাহে যে আলপাকা থাকে তাহাতে শতকরা ৫০ অথবা ৩৫, [illegible] চামড়া ৩৫, মসলিন [illegible]

এক বর্গ গজে ৭, আটা শতকরা ২৩ টাকা; কোট—কাপড়ে শতকরা ৫৫ রেশমে ৬০, আলপাকা ৫০, বোতাম এক পাউণ্ডে ২০ সেণ্টব্রেড এক পাউণ্ড ৫০, সেণ্ট, গলাবন্ধে যে মকমল থাকে তাহাতে শতকরা ৬০ টাকা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই রক্ষা করের জন্য পৃথিবীর যে কত অনিষ্ট হইতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। প্রোফেসর ফসেট হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে শুল্ক লবণের রক্ষার জন্য ফ্রান্সকে প্রতি বৎসর ২ কোটী করিয়া টাকা লোকসান দিতে হয়, অর্থাৎ ইংলণ্ডের লবণে ও ফ্রান্সের লবণে দাম এত তফাৎ যে ফ্রান্সের লবণ কেনার দরুণ ঐ টাকা প্রজাদিগকে লবণের দামে, বেশী দিতে হয়।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে এই টাকা গবর্ণমেণ্ট পান সুতরাং রক্ষাকর একটি ট্যাক্স, প্রজাদিগের পকেট হইতে না আসিয়া বিদেশীয় বণিকদিগের পকেট হইতে আসে, বেশ ত। কিন্তু তাহা নহে। মনে কর ফ্রান্সে কোটী মণ লবণের দরকার, ফ্রান্সে ৭৫ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয়, প্রতি মণের পড়্‌তা বার আনা। ইংলণ্ড হইতে আসে ২৫ লক্ষ মণ এই ২৫ লক্ষ মণের উপর মনকরা ॥০ আট আনা ট্যাক্স বসিল। গবর্ণমেণ্টের সাড়ে বার লক্ষ টাকা আদায় ...দের দিতে হইল ...দিতে লাগ এত সস্তা

নয় যে আট আনা ট্যাক্স দিয়া ব
আনায় বিক্রয় করিতে পারে সুত
ইংলণ্ডের লবণ এক টাকা দুই আন
বিক্রয় হইল। কিন্তু লবণের বাজারে কত
১৶০ কতক ৸০ আনায় বিক্রয় হই
পারে না সবই বিক্রয় হইল ১৶০। সু
রাং ফ্রান্সের লোককে আপনা
৭৫ লক্ষ মণে মণকরা ছয় আনা দ
অধিক দিতে হইল। আবার যদি ট্য
না থাকিত তাহা হইলে হয় ত ইং
হইতেই কোটী মণ লবণ আসিয়া
আনায় বিক্রয় হইত। মণকরা অ
আনা অর্থাৎ ৫০ লক্ষ টাকা প্রতি বৎ
ফ্রান্সের লোককে লোকসান দি
হইল। গবর্ণমেণ্টে সাড়ে বার ল
আদায়ে প্রজাদের দিতে হইল ৫০ ল
লাভ হইল ফ্রান্সের জনকত ব্যবস
দারের, সমস্ত প্রজার নিকট হইতে
লক্ষ টাকা আদায় করিয়া কেন ব
কতক ব্যবসাদারকে বক্‌সিস দেও
হইল।

আমাদের দেশে যে সকল কর আ
তাহার মধ্যে কেহই রক্ষাকর নহে
কারণ বিদেশীয় দ্রব্য আমাদের দে
না আসুক, এ অভিপ্রায়ে কোন কর
স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু এমন অনে
জিনিস আছে যাহার কিয়দংশ দে
উৎপন্ন হয় ও কিয়দংশ বিদেশ হইতে
আসে। এরূপ অবস্থায় যে অংশ বি
দেশ হইতে আসে শুল্ক তাহার উপ
কর বসাইলে যে অংশ দেশে উৎ

হয় তাহার অনেক সুবিধা হয়। বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী তাহাতে কিছু কম হইবার সম্ভাবনা। এক বাজারে এক জিনিস দুই দরে বিক্রয় হয় না। বিদেশীয় জিনিস ট্যাক্স দেয়, সুতরাং তাহার দাম অধিক, দেশীয় জিনিস ট্যাক্স দেয় না, তাহার দাম কম। বাজারে দুই আসিয়া পড়িল, দেশীয় ও বিদেশীয় দুইয়েরই সমান দাম হইল। দেশীয় জিনিসে লাভ হইল বেশী, বিদেশীয় জিনিসে লাভ কম। দেশীয় সওদাগরেরা দাম শতকরা দশ টাকা কমাইয়া দিলেন, তাঁহাদের জিনিস বিক্রয় হইল, বিদেশীয় জিনিস কেহ লইল না। যদি কখন এমন হয় যে, দেশীয় জিনিস বাজারে নাই, তবেই বিদেশীয় জিনিস বিক্রয় হইবে; নচেৎ বিদেশীয়দিগকে লোকসান দিতে হইবে।

এরূপ অবস্থায় ওরূপ কর রক্ষাকর হইয়া উঠে; এই জন্যই ইংলণ্ডে দুই প্রকার বস্তুর উপর সমান ট্যাক্স বসান, ইংলণ্ডের মদ কতক দেশে, কতক বিদেশে জন্মে। দেশীয় মদের উপর একসাইস ও বিদেশীয় মদের উপর কষ্টম ডিউটি লওয়া হয়। অতএব ইংলণ্ডে রক্ষাকরের কোন কথাই নাই। আমাদের দেশে রক্ষাকর নাই। কিন্তু আমাদের দেশের কাপড় কতক দেশে তৈয়ারি হয়, কতক মাঞ্চেষ্টর হইতে আইসে। মাঞ্চেষ্টরের কাপড়ের উপর আমরা শতকরা পাঁচ টাকা টেক্স লই। এইটি থাকতঃ রক্ষাকরস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য মাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা গর্ণমেণ্টে জানায়। গবর্ণমেণ্ট ঐ করের কিয়দংশ উঠাইয়া দেন। অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ১৭কোটী টাকার বিদেশীয় কাপড় আমাদের দেশে আসে, তাহার কর হইতে পঁচাশি লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়, ঐ টাকায় বিশলক্ষ গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দেন। মাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের কথায় গবর্ণমেণ্টের এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ তাহা আমরা বলিতে চাহি না। কিন্তু এরূপ কর উঠাইয়া দেওয়া যে উচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ কর যে রক্ষা[illegible] বিশ্বাহা ফসেট সাহেব তাঁহার Free [illegible]ade and [illegible]tection নামক গ্রন্থে শেষ পারাগ্রাফে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উহা রক্ষাকর হইলেও তিনি উহা উঠাইয়া দেওয়ার বিরোধী, কারণ তিনি বলেন, গবর্ণমেণ্টের সময় ভাল নয়, উঠাইয়া দিলেই কোন নূতন কর লইতে হইবে সেটা বড় অত্যাচার হইবে। অতএব তাঁহার কথায় এই বুঝা যায় যে, গবর্ণমেণ্টের সময় হইলে শত কার্য্য ত্যাগ করিয়া আগে ইহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

আমরা উক্ত টেক্স উঠাইয়া দেওয়ার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী; কারণ উহাতে দেশীয় জিনিসের পর্য্যন্ত দর বাড়ান হয়। আর আমাদের মত এই যে, যে সকল দ্রব্য আবাল, বৃদ্ধ, ভদ্র, দরিদ্র সকলেরই

নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার মূল্য যাহাতে কমে, তাহা গবর্ণমেণ্টের দেখা নিতান্ত প্রয়োজন। এমন অবস্থায় যে কোন উপায়ে ঐ টেক্স উঠাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রজাসাধারণের হিতচিন্তা গবর্ণমেণ্টের কাজ। যেটি যাহাতে হয়, গবর্ণমেণ্টের সেইটি করা সকলের আগে। ঐ টেক্স উঠাইয়া দিলে ৮৫ লক্ষ টাকা দরিদ্রপ্রজাদের ঘরে ছড়াইয়া পড়িত সন্দেহ নাই। কারণ ধনীলোকে আজিও দেশীয় সূক্ষ্ম বস্ত্র (যাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক) ব্যবহার করিয়া থাকেন। ছড়াইয়া পড়িলে যে চাষালোকের সুবিধা হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ইংরেজি সম্বাদপত্রওয়ালারা ঐ টেক্স উঠাইয়া দিবার সময় বড়ই চীৎকার করেন, তাঁহারা বলেন এরূপ করিলে বোম্বায়ে যে সকল তুলাকল হইয়াছে, তাহার ক্ষতি হইবে। এটি সম্পূর্ণ ভ্রম কারণ বোম্বে যে সকল কল আছে, তাহারা ৮।১০ বৎসর কাজ চালাইতেছে। মাঞ্চেষ্টর অপেক্ষা তাহাদের অনেক সুবিধা। মাঞ্চেষ্টরকে এদেশ হইতে তুলা কিনিয়া বহনি খরচ করিয়া লইয়া যাইতে হয়; আবার বহনিখরচ করিয়া ফিরাইয়া দিয়া যাইতে হয়। ইংলণ্ডে মজুরি বড় অধিক, এখানে মজুরি বড় কম। ভারতবর্ষীয় বাজারে মাঞ্চেষ্টর অপেক্ষা দেশস্থ বোম্বেওয়ালাদের লাভও অধিক। বোম্বেওয়ালা ইংলণ্ড হইতে অল্প সুদে টাকা লইয়া এইখানে বসিয়া দুইবারকার বহনি বাঁচাইয়া, অল্প মজুরিতে যদি মাঞ্চেষ্টরকে ডরান, তবে তাঁহাদের ব্যবসায় না করাই ভাল।

মিল বলেন যে, যখন বিদেশে একটা কাজ অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে, দেশে সেই কাজটা আরম্ভ করিতে হইবে, তখন তাহাকে রক্ষা না করিলে, বিদেশীয়দিগের সঙ্গে যুঝিয়া উঠিতে পারিবে কেন? এরূপ করা ফসেট সাহেব যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না; কারণ তিনি বলেন, যাহাদিগকে একবার রক্ষা করা হয়, তাহারা চিরকাল "রক্ষাকর রক্ষাকর" বলিয়া চীৎকার করে, তাহারা আত্মনির্ভর শিখে না। আমরা ফসেটের যুক্তির সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না; কারণ রক্ষা করা না করা রক্ষিতদের কথানুসারে ত হইবে না, তাহার জন্য একটা গবর্ণমেণ্ট আছে, গবর্ণমেণ্ট নিজে যখন বুঝিবেন যে, রক্ষা আর উচিত নহে, তখন রক্ষা উঠাইয়া লইবে। অতএব প্রথম অবস্থায় মিলমতানুযায়ী হইয়া রক্ষা করা উচিত। এরূপ রক্ষা বোম্বেওয়ালারা ৮।১০ বৎসর পাইয়াছেন, এখন গবর্ণমেণ্ট যেমন বুঝিবেন তেমনি করিবেন, তাহাদের আর রক্ষা চাওয়া অন্যায়।

আমাদের দেশীয় লোকেরও টেক্স উঠিয়া গেলে সুবিধা বই অসুবিধা নাই, সুতরাং দেশীয় সম্বাদপত্রওয়ালারা

যে কেন উহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। তাঁহারা আজিও বোধ হয় গড্ডালিকা-প্রবাহবৎ অগ্রণীর পথানুসরণ করেন।

নৈষধ সমালোচন।

সেক্ষপীয়র মিল্টন প্রভৃতি অদ্বিতীয় কবিগণের কৃপায় ইংরেজি সাহিত্যভাণ্ডার অপর্য্যাপ্ত রত্নে পরিপূর্ণ। এই সকল রত্ন নিকৃষ্ট শ্রেণীর নহে, এক একটি এক একখানি কহিনূর। সামান্য রত্নের ত গণনা করা যায় না। শরৎকালের নৈশগগনের নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় রত্ন চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে রত্নের এত ছড়াছড়ি নাই বটে, কিন্তু কালিদাস ও ভবভূতির অনুগ্রহে কহিনূরের অভাব নাই, তবে সংখ্যায় অল্প। কিন্তু ইংরেজদিগের ভাণ্ডারে যেমন যে দরের রত্ন খুঁজিবে, তাহাই মিলিবে, আর্য্যগণের ভাণ্ডারে সেমনটি হইবে না; কহিনূরের নীচেই একেবারে ঘুঁটে। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি দুই একজনের পর প্রকৃত কবি আর আমাদের নজরে ঠেকে না। তবে কি আমাদের নজর কিছু উঁচু? তাহা নহে, বাস্তবিকই কবিনামের যোগ্য আর্য্যকবি অতি বিরল। কালিদাস প্রভৃতি যে দুই একজন আছেন; তাঁহাদেরও গ্রন্থ সেক্ষপীয়র ইত্যাদির ন্যায় সংখ্যায় অধিক নহে। আমাদের বিবেচনায় ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের অভাব, দ্বিতীয় ম্লেচ্ছ-কর্ত্তৃক বিলোপ। যে কারণেই হউক, ফলে আর্য্যগণের কবি ও কাব্য অতি অল্প। কুমার, রঘু, শকুন্তলা, মেঘদূত, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, রত্নাবলী প্রভৃতি কয়খানি কাব্য সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে এই প্রস্তাবে নৈষধের সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা উচিত যে, বঙ্গীয় যুবকেরা বিশ্বনিন্দক বলিয়া খ্যাত; আমরা অদ্যকার সমালোচনাদ্বারা অনেক আয়াসে উপার্জ্জিত এই নামে কলঙ্ক করিতে চাহি না।

বঙ্গদেশ বহুকাল হইতে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য সমধিক বিখ্যাত। বারাণসী, পুনা, তৈলঙ্গ প্রভৃতি নানা স্থান হইতে বৎসর বৎসর দলে দলে ছাত্র আসিয়া অদ্যাপি নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকে। ভিন্নদেশে বিশেষতঃ পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গীয় নৈয়ায়িকদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি এবং স্বদেশেও নৈয়ায়িকেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান পাইয়া থাকেন। ন্যায়শাস্ত্র যে সবিশেষ গৌরবের বস্তু তাহার এক প্রমাণ এই, এতদ্দেশীয় যাবতীয় উপাধিই (বিদ্যানিধি, শিরোমণি প্রভৃতি আজকালি আ-

তীত) ন্যায়শাস্ত্রঘটিত কোন না কোন শব্দ লইয়া রচিত; অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র না জানিলে কেহই পণ্ডিত নাম পাইবার যোগ্য নহেন। এবং নৈয়ায়িকদিগেরও এমন একটু অভিমান আছে যে, তাঁহাদের মত সূক্ষ্মবুদ্ধি অতি অল্প লোকের আছে। এ কথা কতদূর সত্য তাহা এস্থলে আমাদের বিবেচ্য নহে, আমরা প্রকৃত ঘটনা বর্ণন করিতেছিমাত্র। বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারী এই পণ্ডিতদিগের নিকট নৈষধের বড় আদর; নৈষধের প্রশংসা তাঁহাদের মুখে ধরে না। বাস্তবিকও তাঁহাদের প্রশংসা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। নৈষধ একজন কুশাগ্রবুদ্ধি নৈয়ায়িকের রচিত। যিনি যে বিষয়ের চর্চ্চা করেন, তাঁহার সেইটীই ভাল লাগে। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রব্যবসায়ীরা যে কিজন্য নৈষধকে উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণনা করেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধরিল না। ভট্টাচার্য্যমহলে নৈষধের এত আদর যে, ইহার প্রশংসার জন্য দুই তিনটী কবিতা চলিয়া গিয়াছে।* অথবা ভট্টাচার্য্যমহাশয়েরা যে এরূপ বলিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। কারণ তাঁহারা বলেন, "রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং।" ইঁহারা কাব্যের লক্ষণ কি, কি কি গুণ থাকিলে কোন গ্রন্থকে কাব্য বলা যায়, তাহা জানেন না। ইঁহাদের মতে যাহাতে নূতন নূতন ভাব ও অলৌকিক বর্ণনা আছে, তাহাই কাব্য। যদি এই কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে আরব্য উপন্যাসের রচয়িতার ন্যায় উৎকৃষ্ট লেখক কোন কালে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করে নাই। সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য। নৈষধকার কবি নহেন, একজন নৈয়ায়িক, সুতরাং এই উদ্দেশ্যে তাঁহার দৃষ্টি নাই। কতকগুলি অসার অসম্ভব বিষয় বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ পরিপূর্ণ করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব যে, নৈষধে কবিত্বশক্তির কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না; তবে ইহাতে লেখকের অসাধারণ ক্ষমতা ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বটে।

এই গ্রন্থের উপাখ্যানভাগ মহাভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে। নলদময়ন্তী, সাবিত্রীসত্যবান্ ও শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রণয় লইয়া বহু কবি বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন। কালিদাস ও শ্রীহর্ষ উভয়ে একই পুস্তক অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, সুতরাং উপাখ্যানভাগ লইয়া উভয়ের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে কে কিরূপ কবি। চিত্রকর আপণ হইতে রঙ্ কিনিয়া লইয়া সেইগুলি মিশাইয়া নূতন নূতন রঙ্ প্রস্তুত করে, এবং তাহাতে এরূপ সুন্দর ছবি আঁকে যে দেখিলে দর্শকের নয়ন জুড়ায়

* "উদিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ ক চ ভারবিঃ।"
"নৈষধে পদলালিত্যং।"

ও মন মুগ্ধ হইয়া যায়; সৎকবিও সেইরূপ কোন পুস্তক হইতে উপাখ্যান লইয়া নিজ কল্পনোচিত ঘটনার সহিত মিশাইয়া এমন অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করেন যে, অধ্যয়ন করিলে পাঠকের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। কালিদাস মহাভারত হইতে শকুন্তলার ইতিহাস লইয়া আপনি বুদ্ধিপ্রভাবে যে অপূর্ব্ব নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, আজি দুই হাজার বৎসর পরেও লোকে তাহা পাঠ করিয়া নিরুপম প্রীতি অনুভব করিতেছে। কিন্তু শ্রীহর্ষ সেই মহাভারত হইতে শকুন্তলা অপেক্ষা বরং অধিক মনোরম উপাখ্যান লইয়া যে কাব্যপ্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে প্রীতি দূরে যাউক, প্রত্যুত বিরক্তি জন্মে। মহাভারতের নলোপাখ্যান অতি মিষ্ট; নলদময়ন্তীর প্রণয় অতি মধুর ও পবিত্র; সে প্রেমে শরীরের সংশ্রব নাই, কেবল হৃদয়ই তাহার বিষয়; যখন নলরাজা কলির প্রভাবে বুদ্ধিভ্রংশহেতু নিজ জায়াকে একাকিনী বনমধ্যে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহার মনের ভাববর্ণনা পাঠ করিলে মহাভারতকারকে ঐশীশক্তিসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়, আবার তাহার কিঞ্চিৎ পরে স্বামীকর্ত্তৃক ত্যক্তা অসহায়া দময়ন্তীর বিলাপ পাঠ করিলে, কোন পাষাণহৃদয়ের নয়নদুটি হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গত না হয়? অনন্তর উভয়ের মিলন কি সুখের! ফলতঃ মহাভারতের নলদময়ন্তী এক অপূর্ব্ব পদার্থ। নৈষধকারের অঙ্কিত নলদময়ন্তীচিত্র ইহার ঠিক বিপরীত। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় নলদময়ন্তীর প্রণয় শরীরেই শেষ হইয়াছে; হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমরা সংস্কৃত পুস্তকাদিতে চক্ষুরাগের বর্ণনাই দেখিতে পাই কিন্তু নৈষধে আবার শ্রবণরাগ পাইলাম; লোকের মুখে ও হংসমুখে পরস্পরের রূপ ও গুণবর্ণনা শ্রবণ করিয়া নল ও দময়ন্তী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। শুধু তাহাই নহে,হঠাৎ এমনি উৎকট বিরহব্যাধি উপস্থিত হইল যে, তজ্জন্য চিকিৎসক আনা আবশ্যক হইয়াউঠিল। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, সিঁধেলচোর সিঁধকাটী গড়াইবার জন্য এককুলা কড়ি রাত্রিশেষে কামার শালে রাখিয়া আসে, প্রভাতে কামার তাহা দেখিয়া সঙ্কেৎ বুঝিয়া সিঁধকাটী গড়ে ও সন্ধ্যাকালে রাখিয়া চলিয়া যায়। সিঁধেলচোর আসিয়া তাহা লইয়া যায়। চোরে কামারে দেখা সাক্ষাৎ হয় না, অথচ মধ্যে মধ্যে সিঁধকাটি তৈয়ারি হয়। আমাদের নৈষধকারবর্ণিত প্রণয়ও ঠিক সেইরূপ। নায়ক নায়িকাতে দেখা শুনা নাই অথচ মধ্যে মধ্যে প্রেমবিরহ প্রভৃতি সকলি হইয়া গেল। কবিত্বশক্তিপ্রভাব! হে আধুনিক বঙ্গীয়লেখকসমাজ! কেন তোমরা বৃথা গরীববেচারা বাঙ্গালিদিগকে বিবাহপ্রথার জন্য অন্যায় নিন্দা কর, কেন বল বরকন্যার বিবাহ না হইয়া আজি

কালি বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার বিবাহ হয়। দেখ সেকালেও এরূপ চলিত ছিল। মোট কথা আমাদের বিবেচনায় নৈষধবর্ণিত প্রেম অপকৃষ্ট প্রেম। এদিকে যে করুণরস আর্য্যগণের হৃদয়কন্দরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, যাহা আর্য্য-কবির জনবিমোহনকারিণী ঐন্দ্রজাল-বিদ্যা, নৈষধে সেই করুণরসের একান্ত অভাব। যে অংশে এই শক্তি প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ অবকাশ ছিল, নৈয়ায়িক কবি উপাখ্যান ভাগের সেই অংশ পরি-ত্যাগ করিয়াছেন। নলকর্ত্তৃক দময়ন্তী ত্যাগের বিষয় নৈষধে বর্ণিত হয় নাই। বিবাহানন্তর কন্যার পতিগৃহাগমন পর্য্যন্ত ইহাতে বর্ণিত আছে। এবং এই কারণেই এতাদৃশ প্রকাণ্ড গ্রন্থে ঘটনাসংখ্যা অল্প হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ইহা পাঠ করিতে বিরক্তি জন্মিয়া যায়।

সময়ের গুণে সকলি হয়। সভাসন্দো-পাধ্যায় পণ্ডিতগণ যে সমস্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় নিজগ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়া অশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন, সে সকলও সময়ের ফল। কয়েক বৎসর ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের মস্তকে সেই ভাবগুলি আবির্ভূত হইতেছিল, একজন পণ্ডিত জন্মিয়া সেইগুলি পুস্তকাকারে বা অন্য প্রকারে প্রকাশ করিলেন মাত্র। ব্রাহ্মণগণের অত্যাচারে অধী-ভূত হইয়া, লোকে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বহুকাল হইতে মনে মনে উপায় চিন্তা করিতে-ছিল, শাক্যসিংহ জন্মিয়া তাহা সাধন করিলেন। তবে লুথর, বেকন, উইক্-ক্লিফ প্রভৃতির ন্যায় দুই একজন মহাত্মা সময়গুণকেও অতিক্রম করিয়া উঠেন সত্য; কিন্তু সেরূপ লোক জগতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যদি এই কথা সত্য হয়, তবে শ্রীহর্ষ যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, সেই সময়ের সমাজ রীতিসম্বন্ধে অতি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। নৈষধে এরূপ বর্ণনা অনেক আছে যাহা সুরুচির বিরুদ্ধ। স্থানে স্থানে স্ত্রীলোকদিগের উক্তিতেও এরূপ কদর্য্য-ভাব লিখিত হইয়াছে যে, তাহা ভদ্র-লোকের অপাঠ্য। ষোড়শ সর্গে দময়-ন্তীর সখীগণের পরিহাস বর্ণনা পাঠ করিলে, আমাদের কথা সঙ্গত কি না, পাঠক বুঝিতে পারিবেন। এই সকল বর্ণনা সমাজের হীনাবস্থার পরিচয় দিতেছে। বাস্তবিকও ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়, যে বঙ্গদেশে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইত না বলিয়া আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, শ্রীহর্ষ তাঁহাদের মধ্যে একজন। শ্রীহর্ষ যে বঙ্গীয় কবি তাহা তাঁহার পুস্তক পাঠে কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া যায়।*

* চতুর্দ্দশ সর্গে বর্ণিত আছে যে দময়ন্তী নলের সহিত বরণ করিলে পুর-সুন্দরীরা হুলুধ্বনি করিল।

সাধারণতঃ কাব্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথম, যাহাতে হৃদয়ের ভাবগুলি স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়, যাত প্রতিঘাত প্রদর্শন যাহার উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর কাব্যই উৎকৃষ্ট কাব্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যে স্বভাববর্ণনামাত্র থাকে, ইহাতে কোন একটি বস্তু লইয়া তাহার প্রকৃতি, কার্য্য ও তাহা হইতে কিরূপ উপদেশ পাওয়া যায়, এই সমুদায় বর্ণিত হয়। ইহা মধ্যম শ্রেণীর কাব্য। অনেকে বলেন, নৈষধকে এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহাদের মতে নৈষধ মধ্যমশ্রেণীর একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইহার বর্ণনাগুলি অতি চমৎকার; এরূপ নূতন নূতন ভাব আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

“ নৈবানলেভঃ পুরন্ধ্রীণাং মুক্তৈকলুলুধ্বনিরুচ্চচার।

বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কুত্রাপি বিবাহে উলু দিবার প্রথা নাই। পশ্চিমাঞ্চলে উলুর পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোক যে মঙ্গল গান করিয়া থাকে তাহাকে সংস্কৃতভাষায় ধবল কহে। পশ্চিমবাসী নৈষধের টীকাকার নারায়ণ লিখিয়াছেন।—“ বিবাহাদ্যুৎসবে স্ত্রীণাং ধবলাদিমঙ্গলগীতিবিশেষো গৌড়দেশে উলুলুরিত্যুচ্যতে।” নৈষধের অন্যান্য স্থল হইতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইহার লেখক বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। এই বিষয়ে বঙ্গদর্শনে একটি প্রস্তাব বাহির হয় তাহা দেখিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন যে শ্রীহর্ষ বঙ্গবাসী বটেন।

শ্রীহর্ষের বুদ্ধিবিষয়ক একটি গল্প প্রচলিত আছে। তাঁহাকে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন দেখিয়া তদীয় মাতুল সাহিত্যদর্পণকার মম্মট তাঁহার অতি বুদ্ধি কিছু কমাইবার জন্য তাঁহাকে মাষকলাই খাইতে উপদেশ দিলেন। ভাগিনেয় মাতুলের পরামর্শে এই উৎকট ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নিয়ত মাষকলাই খাইতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে একদিন হিতৈষী মামা আসিয়া দেখিলেন ভাগ্নে নিবিষ্টমনে মাষকলাই চিবাইতেছেন। দেখিয়া বলিলেন “বাপু হে কি হচ্চে?” ভাগিনেয় বলিলেন “অশেষ শেমুষীনাশনায় মষাম্যহর্নিশং।” মামা বলিলেন “হাঁ হইয়াছে, আর তোমায় মাষকলাই ভোজন করিতে হইবে না।” ভাগিনেয় তখন বুদ্ধি কমিয়া গিয়াছিল, মামার কথাটা সহজে উঠতে পারিলেন না। মামা তখন বুঝাইয়া দিলেন, “যদি তোমার পূর্ব্বের মত বুদ্ধির প্রখরতা থাকিত তাহা হইলে তুমি ‘অহর্নিশং’ না বলিয়া ‘অশেষতঃ’ বলিয়া অনুপ্রাস করিতে পারিতে।” ভাগিনে কিছু বিরক্ত হইয়া না গেলে বোধ করি আবার মাষকলাই খাইতে বসিতেন। মামা ভাগিনে সম্বন্ধে আর একটি গল্প আছে। শ্রীহর্ষ নৈষধ রচনা করিয়া কেমন হইয়াছে দেখিবার জন্য মামাকে দিলেন। মামা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন ‘বেশ বাপু, যদি বইখানি কিছু আগে লিখিতে তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হইত।’ ভাগ্নে কহিলেন “কিসে?” মামা কহিলেন “তাহা হইলে আমার দোষ পরিচ্ছেদের উদাহরণ খুঁজিতে হইত না।” সমালোচনাটী মন্দ করা হয় নাই। এই ঘটনাটী পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পূর্ব্বে কি পরে হইয়াছিল তাহা আমরা বিশেষ অবগত নহি।

আমরা নৈষধের দুই একটি বর্ণনার বিষয় এই স্থানে উল্লেখ করিব। সমুদায় উল্লেখ করিতে গেলে, পাঠকগণের বিরক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা। নৈষধ খুলিয়া প্রথমেই রূপবর্ণনা নজরে পড়ে; বিশেষ যুবা পাঠকগণের যুবতীর রূপবর্ণনা বড় ভাল লাগে। সুতরাং প্রথমে রূপবর্ণনাই আরম্ভ করা যাউক। শ্রীহর্ষ ও কালিদাস উভয়েই রূপবর্ণনা করিয়াছেন, ইহাদের উভয়ের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, নৈষধকার কিরূপ বর্ণনা করিতে সক্ষম।

নৈষধে দুই স্থানে নায়িকার রূপ বর্ণিত হইয়াছে, প্রথম, দ্বিতীয় সর্গে হংসমুখে, দ্বিতীয়, সপ্তম সর্গে নায়কমুখে। দ্বিতীয় সর্গে ২১টি এবং সপ্তম সর্গে ৮৮টি শ্লোকে কবি রূপবর্ণনা শেষ করিয়াছেন। স্বল্পবুদ্ধি কালিদাস রূপবর্ণনায় মোটে ১৬টির বেশী শ্লোক লিখিতে পারেন নাই। নৈয়ায়িকমহাশয়দিগের পরমাণুবৎ সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে এইটি শ্রীহর্ষের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে; একই বিষয় লইয়া কালিদাস ১৬টি বই কবিতা লিখিতে পারিলেন না; কিন্তু অসীমশক্তিসম্পন্ন শ্রীহর্ষ একেবারে শতিকা সারিয়া দিলেন; একি সামান্য শক্তির কর্ম! কিন্তু ভট্টাচার্য্যমহাশয়দিগের এইরূপ জ্ঞান নাই যে কবিত্ব ও বর্ণনাধিক্য (prolinity) পরস্পর বিষম অনুপাত (Inverse Ratio) বিশিষ্ট, কবিত্বশক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকে, বর্ণনাও তেমনি বাড়িতে থাকে; অকবির লিখিয়া আর আকাঙ্ক্ষা মিটে না, তিনি যতই লিখুন না কেন, তাঁহার বোধ হয় বুঝি আরও কিছু লিখিলে সম্পূর্ণ হইত, এখনও বাকি আছে। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, কতকগুলা রঙ ঢালিয়া দিলেই চিত্র সুন্দর হয় না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে জগতে সকলেই এক এক জন উৎকৃষ্ট চিত্রকর হইত। সুচিত্রকর যেখানে যতটুকু রঙ দরকার হয়, তাহা অপেক্ষা একটু বেশী দেন না। কাব্যসম্বন্ধে আবার সংক্ষেপই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, দুই একটি কথার ভিতর এত কবিত্ব থাকে যে, তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য; কবি ভিন্ন মিষ্টত্ব কেহই অনুভব করিতে পারেন না। কালিদাস "নৃত্যং ময়ূরাঃ শাদ্বলং মৃগাঃ প্রচারং" এই একটি কবিতায় বনমধ্যে নিস্তব্ধতার যে চমৎকার ও দীপ্যমান বর্ণনা করিয়াছেন, নৈষধকার লক্ষ লক্ষ কবিতা লিখিয়াও কোন স্থানে সেরূপ করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক সংক্ষেপ (Brevity) কবিত্বশক্তির একটি প্রধান লক্ষণ। যে "কি বীজয়ন্তি মং পিবন্তি ম্বো" বুঝিয়াছে সেই সংক্ষেপের মর্ম্ম জানিয়াছে। যা হা হউক এক্ষণে প্রকৃতমনুসরামঃ। কালিদাস পার্ব্বতীর নৈষধাজ বর্ণনা করিবার জন্য একটি কবিতা লিখিয়াছেন;—

"পুষ্পং প্রবালোপাহিতং যদি স্যাৎ মুক্তাফলম্বা স্ফুটবিদ্রুমস্থং।

তত্তোঽস্তুরূর্দ্ধা বিশদয্য তস্যা স্তান্নোষ্ঠ
পর্য্যান্তরুচঃ স্মিতস্য ॥"

শ্রীহর্ষও দময়ন্তীর স্মিতবর্ণনার্থ সেইরূপ এই কবিতাটী লিখিয়াছেন ;—

"যদি প্রসাদীকুরুতে সুধাংশোরেষা
সহস্রাংশমপি স্মিতস্য।
তৎ কৌমুদীনাং কুরুতে তমেব নির্ম্মক্তা
দেবঃ সকলং স্বজন্ম ॥"

প্রথম শ্লোকটি পাঠ করিবামাত্র কেমন একটু অভূতপূর্ব্ব আনন্দ মনোমধ্যে উদিত হয়; দ্বিতীয়টির প্রথমতঃ অর্থগ্রহই হয় না। পরে কথঞ্চিৎ অর্থগ্রহ হইলে ভাব কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; কবিত্বের ত কথাই নাই; কতকগুলি সংস্কৃত কথা ছন্দাকারে সাজান হইয়াছে এইমাত্র বোধ হয়। অন্যান্য স্থলেও এইরূপ। বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল। নগরাদি বর্ণন স্থলও এইরূপ ছন্দের আকারে সাজান সংস্কৃতমাত্র, ভাবের সম্পূর্ণ অভাব। রূপবর্ণনাস্থলে একরূপ এক বর্ণনা আছে তাহা পাঠ করিলে ইচ্ছা হয় যত শীঘ্র নৈষধ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে লোপ পায় ততই ভাল; ভারতচন্দ্রও এরূপ অশ্লীল বর্ণনা করিতে সাহস করেন নাই। অসম্ভব বর্ণনার দুই একটি উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিদর্ভনগরের বর্ণনার কালে কবি বলিতেছেন ;—

বৈদর্ভীকেলিশৈলে মরকতশিখরাদুত্থিতৈ
রংশুদর্ভৈ
র্ব্রহ্মাণ্ডাঘাত ভগ্নসাদজমদতয়াহ্রী ধৃতা
বাহুপদৈঃ।
কস্যানোত্তানগাত্রা দিবি সুরসুরভিস্তাস্য
দেশাগতাগ্রৈ
র্যদ্গোগ্রাসপ্রদান ব্রতসুকৃত মবিশ্রান্ত
মুজ্জৃম্ভতে স্ম ॥

এই শ্লোকটি পাঠ করিলে বোধ হয় উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশক্তি অপথে নিয়োজিত হইয়া এতাদৃশ বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। কোন উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য পচিয়া গেলে অধিক দুর্গন্ধ হইয়া থাকে, কোন সৎকুলজাত ব্যক্তি অন্যায় কর্ম্ম করিলে সমধিক নিন্দনীয় হইয়া থাকেন। নৈষধকারের উন্নতশ্রেণীর চিন্তাশক্তি, কিন্তু উহার সহিত কবিত্বশক্তি নাই, সুতরাং সেই চিন্তাশক্তি কাব্যে নিয়োজিত হইয়া এই হাস্যজনক ফল উৎপাদন করিয়াছে। হংসমুখে নলের কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া দময়ন্তী তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইলেন; এবং হংস প্রস্থান করিলে নলের বিচ্ছেদে একান্ত অধীরা হইয়া সখীকে কহিলেন ;—

কুরু করে গুরুমেকময়োঘনং বহিরিতো
মুকুরঞ্চ কুরুষ মে।
বিশতি তত্র যদৈব বিধুস্তদা সখি সুখাদহিতং জহি তং ক্রুতং ॥

এই কবিতাটি বিরহবেদনা প্রকাশের যত উপকারী হউক না হউক, হাস্যরসের বিশেষ অনুকূল। এবং ইহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কবি ইহা জানিতেন না, যে বস্তু যতদূরে থাকে, তাহার প্রতিবিম্বও ঠিক ততদূরে পড়ে। শ্রীহর্ষ স্থানে স্থানে একার্থক দুই বা

ততোধিক শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং সেগুলি যে প্রক্ষিপ্ত নহে তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। যে ব্যক্তি কবি বা যিনি কাব্য বুঝেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার আবশ্যক নাই যে ইহা কবিত্বশক্তি অভাবের অন্যতম প্রমাণ।

নৈষধকার যে এত বড় প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিলেন, তাহাতে কি তাঁহার কোন গুণই দেখিতে পাওয়া যায় না? সকলই কি অসার? জগতে কোন বস্তুই অমিশ্রিত নহে, কেবল দোষ বা কেবল গুণ কোথাও দেখা যায় না; নৈষধকারের পক্ষেই কি কেবল এই কথাটি বিপরীত হইল? তাহা নহে। ইহাতে অবশ্যই কোন না কোন গুণ আছে। আমরা এতক্ষণ কেবল নিন্দা করিয়াছি, এক্ষণে কিঞ্চিৎ প্রশংসা করিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করিব। আমরা যে নিন্দা করিয়াছি বলিয়া প্রশংসা করিব তাহা নহে; নৈষধকার যতটুকু প্রশংসা পাইবার যোগ্য, ততটুকু তাঁহাকে দিব। নৈষধের ভাষা অতি চমৎকার, দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, কোথাও একটু ময়লা নাই। পাঠ করিলেই মনে হয় ইহার ভিতর কত ভাবই আছে। ভাষা কোন স্থানেই গ্রাম্যতা দোষে দূষিত হয় নাই, সর্ব্বত্রই উন্নত ও মধুর। দোষের মধ্যে কিছু কঠিন, সহজে অর্থবোধ হয় না। আর যে পরিশ্রমে অর্থটুকু বাহির করিতে হয়, তাহার সম্পূর্ণ পুরস্কার হয় না, কারণ পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে ভাব অতি অল্প আছে। সেলি প্রভৃতির লেখাও অবিশদ, কিন্তু তাহাতে বস্তু থাকাতে পরিশ্রমের সাফল্য হয়, নৈষধে সেটুকু হয় না এই তফাৎ।

নলকর্তৃক ধৃত হংস জীবনে নিরাশ হইয়া যে বিলাপ করিয়াছে তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় নৈষধকার চেষ্টা করিলে বর্ত্তমান গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিতে পারিতেন। বাস্তবিক তাহাতে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি আছে।

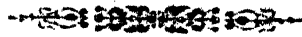
সপ্তদশ সর্গের মধ্যভাগে চার্ব্বাক মত বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশটী সমস্ত পুস্তকের মধ্যে উৎকৃষ্ট অংশ। ইহা শ্রীহর্ষের ক্ষমতা প্রকাশের প্রকৃত বিষয় এবং ইহাতে তিনি সম্যক্ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি চার্ব্বাক্‌দিগের মত এত বিশদরূপে ও এরূপ গাঢ়যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন যে তাহা খণ্ডন করা অতি দুষ্কর। দেবতারা যেরূপে তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে জানা যাইবে যে তাহা অপ্রমাণ করা অসাধ্য। এই মত পাঠ করিলে আরও বুঝা যায় যে তদানীন্তন সমাজ শুদ্ধ ইন্দ্রিয়সেবাকে পরম সুখ মনুষ্যজীবনের সার উদ্দেশ্য মনে করিত। Epicurean মত যেরূপ ক্রমে হীনদশায় উপস্থিত হইয়াছিল, চার্ব্বাক্ মতও এই সময়ে সেইরূপ শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণে নৈষধবর্ণিত নলরাজা একজন বিলাসী ইন্দ্রিয়াশক্ত ব্যক্তির ন্যায় হইয়াছেন। উৎকৃষ্ট হৃদয়ের গুণ তাঁহার কার্য্যে প্রকাশ পায় নাই।

শ্রীহর্ষের আর একটী প্রশংসার বিষয় এই যে তিনি অনুকরণ করেন নাই। ভালই হউক আর মন্দই হউক সকল ভাবই নিজের, অন্যের তাহাতে কোন স্বত্ব নাই। কল্পনার বলে নূতন ভাব সৃষ্টি করিতে গিয়া, অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিয়াছেন। মাঘ প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার চুরি নাই।

বঙ্গদর্শন।

সপ্তম বৎসর।

৭৪ সংখ্যা।



বঙ্গোন্নয়ন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালার বায়ু।

বাঙ্গালিরা যে পঞ্জাবী, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী ও অযোধ্যাবাসীদিগের অপেক্ষা দুর্ব্বল এ কথা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহাদের দৌর্ব্বল্যের কারণ কি?

কেহ কেহ বলেন যে, তাহাদের আহারের দোষে তাহাদের পুষ্টিবর্দ্ধন হয় না। কেহ কেহ বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক আচারের দোষ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের সকলের কথা যে অনেকদূর সঙ্গত ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহাদের এই ভ্রম যে, তাঁহারা অপ্রধান কারণকে প্রধান কারণ বলেন। বাঙ্গালার বায়ুই বাঙ্গালিদের দৌর্ব্বল্যের প্রধান কারণ। বেহারের গো, অশ্ব, মেষ ও ছাগ যাহা ভক্ষণ করে, বাঙ্গালার গবাদি তাহাই ভক্ষণ করে; তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহের নিয়ম নাই; তবে কেন বাঙ্গালার গবাদি বেহারের গবাদি অপেক্ষা দুর্ব্বল?*

* বাঙ্গালার ঘাসে জলভাগ অধিক আছে স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তাহাও বায়ুর দোষে। বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত পশুই দুর্ব্বল, কিন্তু শার্দ্দূল, গণ্ডার ও বন্যমহিষ অতিশয় বলবান্। ইহার কারণ কি বলা সুকঠিন। সুন্দরবনের জ্বরজবায়ুতে কি ব্যাঘ্রের কোন অনিষ্ট হয় না? ডাক্তার ফেয়ার বলেন যে, সুন্দরবনের ব্যাঘ্রের বল আফ্রিকার সিংহের বল অপেক্ষা ন্যূন নহে; বরং কিঞ্চিৎ অধিক হইবে; সুতরাং ব্যাঘ্রকে পশুরাজ বলা যাইতে পারে। ১৮৫৭ সনে ইংলণ্ডে একটী পিঞ্জরবদ্ধ সিংহের সহিত একটী ব্যাঘ্রের যুদ্ধ হয়, সিংহ হত হয়। (Darwin's Descent of Man & Sexual selection, 2nd edition, P. 521.) দুই একটি দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া ব্যাঘ্র সিংহ অপেক্ষা বলীয়ান্ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না; কারণ ইহা সম্ভব যে হত সিংহ ব্যাঘ্রাপেক্ষা অল্পবয়স্ক বা পীড়কাতর

বাঙ্গালা গ্রীষ্মপ্রধানদেশ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসের শুভ ফল এই যে সূর্য্যের প্রসাদে আহারের দ্রব্যাদি অনায়াসলব্ধ, অল্প বস্ত্রেই শরীররক্ষা হইতে পারে, শীত-নিবারণ জন্য মৃদঙ্গারাদির প্রয়োজন নাই বলিলেই হয়; অশুভফল এই যে সর্প ও শ্বাপদজন্তুর ভয় অধিক, এবং ওলাউঠা ও জ্বরের অধিক প্রাদুর্ভাব। তবে শীতপ্রধানদেশ অপেক্ষা কাশাদি ফুস্ফুসের রোগ অনেক কম।

অনেকানেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বায়ুর উষ্ণতা মানবপ্রকৃতির তেজস্বিতা-হ্রাসের যেমন কারণ বলেন, বস্তুতঃ তাহা তেমন প্রবল কারণ কি না সন্দেহ। আরবস্থানের বায়ু যেমন উষ্ণ, এমন উষ্ণবায়ু প্রায় কোন দেশেই নাই, অথচ আরবদের ন্যায় তেজস্বী জাতি বিরল।† উইলিয়ম ওয়েষ্ট গার্থ ও সামুয়েল্ মস্‌মান্, যাঁহারা অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনির বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে ঐ দেশে অদ্যাপি ওলাউঠারোগ প্রবেশ করিতে পারে নাই। অষ্ট্রেলিয়ার বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু গ্রীষ্মে তথাকার উপকূলেও তাপাংশ একশতের অধিক হয়।

তাপের সহিত অধিকপরিমাণে জলীয় পরমাণুর সংযোগ হইলে যেমন অনিষ্ট হয়, কেবল তাপে তেমন হয় না।

বাঙ্গালার বায়ু উত্তপ্ত বলিয়া দুষ্ট নহে, প্রচুর বাষ্পপূর্ণ বলিয়া দুষ্ট। এরূপ বায়ু বৃক্ষাদির পক্ষে ভাল; কিন্তু জীবজন্তুর পক্ষে ভাল নহে।

বাঙ্গালার ভূমি সাগরপৃষ্ঠ হইতে অত্যন্ন উন্নত। নীচদেশ গ্রীষ্মপ্রধান হইলে আর তাহার রক্ষা নাই। তথাকার বায়ু নিশ্চয়ই বাষ্পদুষ্ট এবং অস্বাস্থ্যকর হইবে। হলণ্ড শীতপ্রধানদেশ; এবং ওলন্দাজগণ ভূমি শুষ্ক করিতে অতিশয় যত্নশীল; তথাপি দেশ নীচ বলিয়া, তথাকার বায়ু বিলক্ষণ বাষ্পময়, এবং তথায় পালাজ্বর, কাশ ও বাতের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বস্থানেই জ্বর বিরাজমান রহিয়াছে, তবে

ছিল। তবে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য যে, কিরূপে বাঙ্গালার প্রায় সকল জীব দুর্ব্বল, কেবল ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও বন্যমহিষ প্রবল।

† আরবদের দিগ্বিজয়ের কথা সকলেই জানেন; তবে তাহাদের স্বদেশরক্ষা যেমন প্রশংসনীয়, দিগ্বিজয় তেমন প্রশংসনীয় নহে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মানি যে তিনদেশের দর্পে এক্ষণে পৃথিবী কম্পিতা, এই তিনদেশই শত্রুসৈনাকর্ত্তৃক পুরাকালে জিত হইয়াছিল; আরবস্থানের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই—Arabia has been celebrated from time immemorial as the seat of in dependence and pastoral simplicity, and it is perhaps the only country in the world which until it was lately overrun by the troops Mahomed Ali was never profaned by foreign conquest. *Account of Arabia by David Buchanan & William Platt.*

যেখানে অনেক বিল, যেখানকার নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ও যেখানকার জলপ্রণালী ভাল নহে, সেখানে কিছু অধিক; আর যেখানকার ভূমি কঙ্করময় বা বালুকাময় ও শুষ্ক ও যেখানকার জলপ্রণালী ভাল, সেখানে কিছু কম।

ভূতত্ত্ববেত্তারা বলিয়াছেন যে, যদিও সাধারণতঃ বরুণের কার্য্যে ভূমির অবনতি এবং অগ্নির কার্য্যে ভূমির উন্নতি হয়,তথাপি যেখানে অগ্নির কার্য্য প্রতীয়মান হয় না, সেখানেও ভূমির উন্নতি দেখা গিয়াছে। বথ্নিয়া উপসাগরের তট ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইয়াছে, তাহা পবন বা অগ্নির কার্য্য নহে। যদি ঈশ্বরপ্রসাদাৎ ঐ কারণে বঙ্গভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অধিকতর উন্নত হয়, তবেই দেশের মহামঙ্গল হইবে। মনুষ্যের আয়াসে অধিকদূর কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে জলনিঃসরণের উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিলে, যেখানে স্রোতস্বতী নদী আছে, তথাকার বিলের জল, খাল কাটিয়া নদীতে আনিতে পারিলে, এবং অন্য উপায়ে ভূমির আর্দ্রতার হ্রাস করিতে পারিলে কতক দূর কার্য্য হয়।

হুগলী ডানকুনীর জলা হইতে খাল কাটিয়া গবর্ণমেণ্ট যেমন প্রজাবর্গের উপকার করিয়াছেন, উত্তর বাঙ্গালার রেলওয়ে দ্বারা তত উপকার হইতেছে কি না সন্দেহ। যাত্রবর্গের সুবিধা ও বাণিজ্যের সুবিধা মঙ্গলময় বস্তু বটে; কিন্তু স্বাস্থ্যের নিকটে তাহা কিছুই নহে। ক্রমশঃ

শ্রীতা, প্র, চ।

তর্কপ্রণালী।

(THE SUBJECTIVE AND THE OBJECTIVE METHOD.)

দার্শনিক প্রবন্ধ দেখিলেই বঙ্গীয় পাঠক তাহাতে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি বলেন দর্শন ঢেঁকির কচ্‌কচি, দর্শনপাঠে কিছুমাত্র লাভ নাই ইত্যাদি। যদি দেখিতাম, যে বঙ্গীয় পাঠক দর্শনে উপেক্ষা করিয়া বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদিতে মনঃসংযোগ করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহার এ উপেক্ষা সহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু যিনি রামকান্তের বিবাহ, শ্যামকান্তের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অসার প্রবন্ধ পড়িয়া সময় সময়ব্যয় করেন, তাঁহার মুখে দর্শনের অসারতাসম্বন্ধে কোন কথা সহ্য করিতে পারি না। ফলতঃ বঙ্গীয় পাঠক কিজন্য দর্শনে উপেক্ষা করেন, তাহা আমরা জানি। তাঁহার অভিনিবেশ অতি অল্প, তাঁহার

শরীর দুর্ব্বল, মনও দুর্ব্বল। যে সকল প্রবন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র মনঃসংযোগের প্রয়োজন, যে সকল প্রবন্ধ অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় পাঠ করিতে পারা যায় না, তিনি সে সমস্ত পড়িতে নিতান্তই নারাজ। সুতরাং দর্শন কেন, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, গণিত প্রভৃতি যাহা কিছু চিন্তাবত্তার পরিচায়ক সে সমস্তই তাঁহার চক্ষুঃশূল।

গ্রাহক যেখানে যে প্রকারের, বিক্রেয় দ্রব্যও সেখানে সেই প্রকারের হইয়া থাকে। ইংরেজপটিতে গোস্ত মটন ইত্যাদি বিক্রয় হয়, বাঙ্গালিপটিতে বিক্রয় হয়, কচু, কলা, শাক,মূলা ইত্যাদি। যে দেশে পাঠক যেপ্রকারের, লেখকও সেই প্রকারের হইয়া থাকেন। এই জন্যই বাঙ্গালালেখকদের মধ্যে অসার অথচ মনোরঞ্জন প্রবন্ধ অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

সারগর্ভ তত্ত্বসমূহকে মনোহর আকারে উপস্থাপিত করিতে পারেন এরূপ প্রতিভাশালী লেখকের সংখ্যা অল্প। সুতরাং তত্ত্বশিক্ষা করিতে হইলে কিঞ্চিৎ কষ্টস্বীকার প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালিরা যে আজিও এ কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই, ইহা আমার বলিতে ইচ্ছা হয় না। ইচ্ছা হয় না বলিয়াই বঙ্গীয় পাঠকের উপর নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাঠরূপ কষ্টবিধান করিতে সাহসী হইলাম।

তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য প্রধানতঃ দুইটি প্রণালী কল্পিত হইয়াছে। একটির নাম দার্শনিক বা আনুমানিক প্রণালী,* অন্যটির নাম বৈজ্ঞানিক বা প্রত্যক্ষপ্রণালী। এই দুইটী প্রণালী কি, এই দুইটীর পরস্পরের সহিত কি সম্বন্ধ, ইহাদের মধ্যে কোনটী ঠিক্, কোনটী ভুল প্রভৃতি প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য মীমাংসা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। প্রথমে আমরা দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই প্রণালীদ্বয়ের অর্থ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মনে করুন একদিন চন্দ্রমণ্ডল হইতে দুইটি পুরুষ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা নানা বস্তু দেখিতে দেখিতে (পৃথিবীর সকল বস্তুই তাঁহাদের নিকট নূতন) এক ঘড়িওয়ালার দোকানে উপস্থিত হইলেন। ঘড়ি তাঁহাদের নিকট এক নূতন দ্রব্য। যদি এই দুই পুরুষের মধ্যে একজন দার্শনিক ও অন্যে বৈজ্ঞানিকপ্রণালী অবলম্বন করেন তাহা হইলে তাঁহারা কিরূপ তর্ক করিবেন, নিম্নে তাহা দর্শিত হইতেছে।

---

* Subjective method—আনুমানিক প্রণালী
or
Metaphysical method—দার্শনিক প্রণালী

Objective method—প্রত্যক্ষ প্রণালী
or
Scientific method—বৈজ্ঞানিক প্রণালী

দার্শনিকপ্রণালীর প্রযোক্তা (সংক্ষেপে আমরা ইহাকে দ বলিয়া উল্লেখ করিব) বলিবেন ঘড়িটি একপ্রকার জীব। উহার দুইটি কাঁটা তাঁহার নিকট দুইখানি হাত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ঘড়ির অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রটি তিনি উহার হৃৎকোষ বলিয়া মনে করিবেন। ঘড়ি-হইতে যে অনবরত টুকটাক্ শব্দ নিঃসৃত হয় তাহাকে তিনি উহার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। মধ্যে মধ্যে যে ঘড়ির টুং টাং শব্দ হয় সেইটী তিনি ইহার ক্রন্দনধ্বনি বলিয়া মনে করিবেন। এইরূপে, জীব বলিলে আমাদের মনে যে সকল ভাবের উদয় হয়, ঘড়িতে তাহাদের কতকগুলির সাদৃশ্য দেখিয়া তিনি উহাকে এক জীব বলিয়া অভিহিত করিবেন।†

কিন্তু যিনি বৈজ্ঞানিকপ্রণালীর প্রযোক্তা (আমরা ইহাকে সংক্ষেপে ব বলিয়া ডাকিব,) তিনি বলিবেন "হাঁ ইহা জীব বলিয়াই অনুমান হইতেছে। কিন্তু শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া থাকা অবিধেয়।" এই বলিয়া তিনি, আমরা যেরূপ সাবধানে জীবের শরীর স্পর্শ করি, সেই রূপে ঘড়ির শরীর স্পর্শ করিবেন। ইহাতে ঘড়ির কোন বৈলক্ষণ্য না দেখিতে পাইয়া তিনি এদিকে ওদিকে ঘুরাইবেন। পরে ইহা সাবধানে খুলিয়া ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কল, দড়ি ইত্যাদি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার বোধ হইবে যে ঘড়ি জীব নহে। উহা একপ্রকার কলমাত্র।

দ এবং ব এই উভয়ের মধ্যে কাহার মীমাংসা নির্ভুল? আমরা সকলেই জানি ঘড়ি একপ্রকার কল। সুতরাং এস্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নহে। কিন্তু অনেক স্থলে এইরূপ মীমাংসা করা অতীব দুরূহ হইয়া উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা নিম্নে একটী উদাহরণ বিবৃত করিতেছি।

প্রায় ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় প্লাঞ্চেট লইয়া বড় ধুমধাম হইয়াছিল। অনেকে বিশ্বাস করিতেন, এবং এখনও করেন, যে প্লাঞ্চেট ভূতের কাণ্ড। প্লাঞ্চেটে ভূত ভবিষ্যৎ জানা যায়। কাহার প্রপিতামহের নাম কি, কাহার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ কোন সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন প্রভৃতি প্রশ্ন প্লাঞ্চেটকে জিজ্ঞাসা করা হইত। কালেজের ছাত্র হইতে নিরক্ষর চাসা পর্য্যন্ত সকলেই প্লাঞ্চেটকে আপন আপন ভবিষ্যতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন। এই সকল ব্যক্তিরা দার্শনিক প্রণালীমতে তর্ক করিতেন। ভূত ভবিষ্যতের কথা জানিতে পারা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। প্লাঞ্চেট তাহা জানিতে

† একজন চাসা ঘড়ির মধ্যে একপ্রকার কীটের অবস্থিতি আশঙ্কা করিয়া ঘড়িটি মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতেও কীটের শব্দ থামিল না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া পদাঘাতে উহা চুরমার করিয়া ফেলে।

পারিতেছে; সুতরাং প্লাঞ্চেট ভূত বলিয়া সহজেই অনুমিত হইত।

কিন্তু যাঁহারা বৈজ্ঞানিকপ্রণালী অবলম্বন করিয়া তর্ক করিতেন, তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, প্লাঞ্চেটের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া তাঁহারা কোনরূপ মীমাংসা করিতেন না। তাঁহারা দেখিতেন, যে প্লাঞ্চেট এইরূপে নির্ম্মিত যে ইহার উপর অল্প চাপ পড়িলেই ইহার চাকা ঘুরিতে থাকে; তখন যাঁহারা প্লাঞ্চেট ধরিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনের ভাব সমস্ত তাঁহাদের অজ্ঞাতে উহা হইতে বাহির হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম প্লাঞ্চেট ধরিলে ব্রাহ্মধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া লেখা বাহির হয়। আবার হিন্দুতে প্লাঞ্চেট ধরিলে হিন্দুধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া লেখা বাহির হয়। আবার নিরক্ষর ব্যক্তি প্লাঞ্চেট ধরিলে কোন প্রকারের লেখাই বাহির হয় না। এই সকল দেখিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রযোক্তারা মীমাংসা করেন, যে প্লাঞ্চেটের নির্ম্মাণ-কৌশল আছে বটে, কিন্তু ইহা ভূত নহে।

এস্থলে দ ও ব ইহাদের মধ্যে কাহার মীমাংসা নির্ভুল ঠিক করিয়া বলা যায় না। অন্ততঃ এ বিষয়ে সাধারণের ঐকমত্য নাই। অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি আজিও প্রেততত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক, এক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইবে যে, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রণালীতে প্রভেদ কি। দার্শনিক প্রণালীতে কোন এক বস্তু দেখিয়া তদ্বিষয়ে অনুমান করিয়া লওয়া হয়, যাহাতে সেই অনুমানটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা হয়, কিন্তু অনুমানটী অনুমেয় বস্তুর সহিত মিলিল কি না তদ্বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করা হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বস্তু দেখিয়া যে অনুমানটি করা হয়, সেইটির সহিত বস্তুটী সম্পূর্ণরূপে মিলিল কি না, তাহা দেখা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যদি অনুমানটি বস্তুর সহিত সম্পূর্ণরূপে না মিলে, তাহা হইলে ঐ অনুমানটি ছাড়িয়া দিয়া অন্য একটি অনুমান প্রস্তুত করা হয়। এইরূপে যতক্ষণ না অনুমানটি বস্তুর সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলে ততক্ষণ কোনরূপ সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হয় না।

কোন এক বস্তু দেখিয়া তদ্বিষয়ে অনুমান করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। দার্শনিকপ্রণালী এই অনুমানটি পর্য্যন্ত যাইয়াই ক্ষান্ত হয়েন; তিনি ঐ অনুমানের অঙ্গপারিপাট্য সম্পাদন করেন। তিনি কখনই অনুমানের বাহিরে যান না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকপ্রণালী অনুমানটীকে বস্তুর সহিত বিশেষরূপে মিলাইয়া দেখেন। গণিতের আকারে প্রকাশ করিলে, এই প্রণালীকে দুইটি নিম্নলিখিতরূপে সজ্জিত করা যাইতে পারে।

দার্শনিকপ্রণালী = বস্তুর দর্শন + অনুমান

বৈজ্ঞানিকপ্রণালী = বস্তুর দর্শন + অনুমান + বস্তুর সহিত অনুমান মিলিল কি না তদ্বিষয়ক পরীক্ষা।

পৃথিবীর আদিকাল হইতে মনুষ্য অনুমানের প্রতি নির্ভর করিয়া আসিতেছে। কি অসভ্য অবস্থায়, কি সভ্য অবস্থায় সকল সময়েই মনুষ্য সকল কার্য্যেই অনুমানের আশ্রয় লইয়া আসিতেছে। যখন মনুষ্য অতি অসভ্য ছিল তখন পৃথিবীতে কর্ম্মক্ষমতার অধিকতর প্রয়োজন ছিল। চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড-শরীর, বিপুলতেজস্ক, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুর সহিত অনুক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইতেছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে, পর্ব্বত-গুহায়, বৃক্ষকোটরে আশ্রয় খুঁজিয়া লইতে হইতেছে। প্রতিদিন প্রতিদিনে আহারের সমস্ত সামগ্রী আহরণ করিতে হইতেছে। যখন জীবিতচেষ্টা (struggle for existence) এত প্রবল, তখন অনুমান অতি অপরিপক্করূপ হইত। মেঘ ডাকে কেন, মেঘের মধ্যে এক হাতী আছে সেই হুঙ্কার করিতেছে। ফুল ফুটে কেন, বনে এক বনদেবী আছেন, তিনি সমস্ত কলিকাগুলিকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেন। মনুষ্যের বিপদ হয় কেন, এক দেবতা আছেন, তিনি এই সকল বিপদে মনুষ্যকে ফেলিয়া থাকেন; এইরূপে সকল প্রশ্নের সমস্যা এক এক কথায় পাওয়া যাইত। যে সকল প্রশ্নের অনুমান খাড়া করিতে এক এক মহাপণ্ডিতের সমস্ত জীবন ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে, তখন এক কথায় সে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইত। অমুক জিনিস কেন ওরূপ হইল; একজন দেবতা উহা ওরূপ করিয়া দিয়াছেন।

যখন মনুষ্যের জীবিতচেষ্টা কিছু কমিল, যখন বন্যজন্তু সমস্ত মনুষ্যের বশবর্ত্তী হইল, যখন অসভ্য অবস্থার অনিশ্চিত জীবনের পরিবর্ত্তে মনুষ্যের জীবন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিততর হইল, তখন অনুমানের প্রকৃতিরও পরিবর্ত্ত হইল। পূর্ব্বে এক এক কথায় সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইত। এখনও তাহাই হইতে লাগিল; কিন্তু এখন অনুমানের সঙ্গে সঙ্গে অল্পে অল্পে প্রমাণের যোগ দেখা যাইতে লাগিল। এই সকল প্রমাণ অনেক সময়ে অতি বিচিত্র প্রণালীর হইত। একজন দার্শনিক বলিলেন, সংখ্যাই সমস্ত বস্তুর আদিকারণ, সকল বস্তুই হয় এক বা তদধিক সংখ্যার অন্তর্ভূত। কেহ বলিলেন, অগ্নিই সমস্ত বস্তুর আদি, কেন না অগ্নির নিজের দাহিকাশক্তি আছে। এইরূপে যাহার যে ইচ্ছা হইত, সে সেইরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করিত। ইহাতে এই ফল হইল, যে ক্রমে অনুমানের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

"অন্ধকারে ঢেলা ফেলার" মত এই সকল প্রমাণের মধ্যে কোন কোনটা কখনও সত্যও হইয়া পড়িত। কিন্তু

ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই অসার ও অযৌক্তিক হইত। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল; যেমন পথ পরিষ্কার না থাকিলে, নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায় না, ঠিকপথে গেলেও তাহা ঠিকপথ বলিয়া বোধ হয় না, সেইরূপ তর্কপ্রণালী অবিদিত থাকাতে তত্ত্বনির্ণয় সুদূরপরাহত হইয়া পড়িল।

এই সময়ের মধ্যে কত প্রকারের কত মত যে আবিষ্কৃত হইল তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে। যেমন বর্ষাকালে প্রান্তরোপরি একটির পর আর একটি বুদ্বুদ উত্থিত হয়, প্রত্যেক বুদ্বুদটি ইহার পূর্ব্ব বুদ্বুদ অপেক্ষা বৃহৎ ও উজ্জ্বল, কিন্তু সকলগুলিই কিয়ৎকালের মধ্যে জলরাশির সহিত মিশিয়া যায়, সেইরূপ একজন দার্শনিকের পর অন্য দার্শনিক আবির্ভূত হইতে লাগিলেন। আজি ব্রাউন সমস্ত জগৎকে স্বীয় মতে আনয়ন করিবার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমস্ত দর্শনের ভ্রম প্রতিপন্ন করিলেন। কালি হামিল্টন আসিয়া বলিলেন, ব্রাউন যাহা কিছু বলিয়াছেন সমস্তই ভ্রান্ত। পরশ্ব মিল আসিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, হামিল্টনের সমস্ত কথাই ভ্রান্ত। এইরূপে বৎসরে বৎসরে মাসে মাসে নূতন নূতন দর্শন বাহির হইতে লাগিল। জন্মকালে সকল দর্শনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু কিছুদিন পরেই আর একজন দার্শনিক আসিয়া প্রমাণ করিয়া দিতেন, যে পূর্ব্বের দর্শন সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। সুতরাং সহজেই লোকের মনে বিশ্বাস হইত যে দর্শন অপ্রয়োজনীয়। যাহাতে কোন বিষয়েরই মীমাংসা হয় না, তাহাতে লোকে কেন আদর করিবে?

মনুষ্য যতই সভ্যতার সোপানে আরূঢ় হইতে লাগিল, ততই তাহাদের চিন্তাপ্রণালী পরিবর্ত্তিত ও পরিশুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন আর যে সে প্রমাণ মনুষ্যের গ্রাহ্য হইত না। পূর্ব্বে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারিলেই তাহা অতি আদরের সহিত গৃহীত হইত। কিন্তু এক্ষণে প্রমাণের দোষ গুণ বিবেচিত হইতে লাগিল। কোন প্রমাণটি ভাল, কেন ভাল, অন্য অন্য প্রমাণের দোষ কি প্রভৃতি প্রশ্ন উত্থিত হইতে লাগিল। পরে যখন মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইল, যখন বিদ্যাশিক্ষা শুদ্ধ জনকতক লোকের মধ্যে শৃঙ্খলিত হইয়া রহিল না, যখন আপামর সাধারণেই বিদ্যার রসাস্বাদ ও আলোচনা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল, তখন প্রমাণ প্রয়োগের প্রণালীও উন্নততর হইতে লাগিল। এই সময়ে ইংলণ্ডে বেকন ও ফ্রান্সে ডেকার্ট (Des Cartes) জন্মগ্রহণ করিলেন।

ডেকার্ট প্রমাণের আবশ্যকতা বুঝিলেন। তাঁহার নিকটে সকল বস্তুরই প্রমাণের আবশ্যকতা আছে ইহা প্রতীয়মান হইল। জগদীশ্বর আছেন, মন

আছে, আমি আছি প্রভৃতি যে সকল প্রশ্নের তুমি আমি কোনই প্রমাণ দেখিতে পাই না, ডেকার্ট সেইগুলি নিয়মমত, রেখাগণিতের প্রতিজ্ঞার ন্যায় প্রমাণ করিয়া দিলেন। ডেকার্টের জগদীশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে প্রমাণটি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

জগদীশ্বর আছেন।

কারণ—জগদীশ্বরসম্বন্ধে যে ভাবটি আমাদের মনে আছে, সেইটি জগদীশ্বরই তথায় সেই প্রকারে রাখিয়াছেন।

যদি বল—ঐ ভাবটি আমি নিজেই আমার মনে রাখিয়াছি, তাহা হইলে ইচ্ছা করিয়া উহা বিনষ্ট করিতে পারি না কেন? যে ভাবটি আমি নিজে প্রস্তুত করিতে পারি সেই ভাবটি আমি নিজেই বিনষ্টও করিতে পারি।

সুতরাং—প্রমাণ হইল যে জগদীশ্বরের ভাবটি জগদীশ্বরই আমাদের মনে রাখিয়াছেন। কারণ পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইল, যে ঐ ভাবটী নিজে প্রস্তুত করি নাই।

সুতরাং—জগদীশ্বর আছেন।

এইরূপ প্রমাণ ঠিক হইল কি না আমরা সে বিষয়ের তর্ক করিতেছি না। আমরা শুদ্ধ দেখাইতেছি যে, ডেকার্ট প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা অতিসুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন। পূর্ব্বে জগদীশ্বর আছেন বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইয়া যাইত; কিন্তু এক্ষণে আর তাহা হইত না। এক্ষণে রেখাগণিতের ন্যায় প্রমাণপ্রয়োগ হইতে আরম্ভ হইল। প্রমাণ প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু মনই প্রমাণের সত্যাসত্যতার বিষয়ে একমাত্র বিচারকর্ত্তা রহিল। নক্ষত্রসকল বৃত্তাকারে ঘুরিয়া থাকে। কেন? আমরা মনে মনে জানিতে পারি যে বৃত্তই সম্পূর্ণ ক্ষেত্র। মন আরও বলে, যে জগদীশ্বরের কোন ক্রিয়া অসম্পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং নক্ষত্র বৃত্তাকারে ঘুরিয়া থাকে।

এইরূপে ডেকার্ট অন্য অন্য অনেক বিষয় প্রমাণ করিলেন। আমি আছি, কারণ আমার মন বলে যে যাহা কিছু চিন্তা করিতে পারে তাহাই আছে; আমি চিন্তা করিতে পারি, সুতরাং আমি আছি। প্রমেয় যাহাই হউক না কেন, বাহ্যজগতের কথাই হউক বা অন্তর্জ্জগতের কথাই হউক সকলস্থলেই মন একমাত্র বিচারকর্ত্তা। যে প্রশ্নই উত্থিত হউক না কেন, মন তদ্বিষয়ে বিচার করিয়া স্থির করিয়া দিবে। ফ্রান্সে ডেকার্ট এই মত প্রচার করিলেন। তাহার পর ইউরোপের অন্য অন্য দেশে তাঁহার এই মত প্রচলিত হইতে লাগিল। ডেকার্ট, মালব্রাঙ্ক, স্পিনোজা, লায়েবনিজ্ ফিক্টী, ক্যাণ্ট, সেলিং, হেগিল প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতেরা ডেকার্টের এই মত সম্প্রসারণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে জর্ম্মানিতে এই মত অতি প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল; এক্ষণে ইহা ফ্রান্সে অত্যন্ত আদরের সহিত গৃহীত হইতেছে। এই মতের প্রণালীকে

আমরা দার্শনিক প্রণালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

যখন ডেকার্ট ফ্রান্সে পূর্ব্বমত প্রচার করেন, তখন বেকন (Bacon) ইংলণ্ডে সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটি মত প্রচার করিতে লাগিলেন। বেকন বলিলেন মনের বিচার কোন কাজের নয়। বস্তু দেখিয়া শুদ্ধ মনে মনে বিচার করিলে বস্তুর তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারা যায় না। তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য বস্তুটি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। বস্তুটী স্বচক্ষে দেখিয়া, উহার সহিত ঐ প্রকারের অন্য পাঁচটী বস্তু মিলাইয়া তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইবে। যখন তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে, তখন আবার উহার সহিত বস্তুর সম্বন্ধ মিলাইয়া দেখিতে হইবে। তত্ত্বনির্ণয়কালে যাহা যাহা স্থির হয়, যদি বস্তুতে ঠিক সেইগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তবেই তত্ত্বের উপর নিঃসন্দিগ্ধরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যাইবে। মনে করুন, যেন স্থির করিতে হইবে যে ম্যালেরিয়ার কারণ কি? বেকন উপদেশ দিবেন, যে, যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়া হইয়াছে সেখানকার প্রধান খাদ্যসম্বন্ধে, জলনালীসম্বন্ধে, বৃক্ষসমূহের অবস্থানসম্বন্ধে, গৃহনির্ম্মাণের কৌশলসম্বন্ধে প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই অনুসন্ধানের পর যে কয়টী বিশেষ বিশেষ বিষয় সকল ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত দেশেই বিদ্যমান, সেই কয়টীর সহিত জ্বরের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না তাহা দেখিতে হইবে। তাহার পর দেখিতে হইবে ঐ সকল বিষয়সত্ত্বেও ম্যালেরিয়া হয় নাই এমন কোন দেশ আছে কি না। এইরূপ নানাবিধ অনুসন্ধানের পর জানিতে পারা যাইবে ম্যালেরিয়ার প্রকৃত কারণ কি। ডেকার্ট হইলে হয় ত সিদ্ধান্ত করিয়া দিতেন যে, যে দেশে পাপীর সংখ্যা অধিক, সেই দেশেই ম্যালেরিয়া হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া জগদীশ্বরের ক্রোধের পরিচায়ক। যে দেশে পাপী অধিক, সেই দেশেই ম্যালেরিয়া দ্বারা জগদীশ্বর পাপীদের দণ্ডবিধান করেন। বেকন যে প্রণালীটী প্রচলিত করিলেন, হবস্, লক্, হিউম্, মিল্, কম্‌টি, স্পেন্সার্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সেই মতের সম্প্রসারণ করিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাই এই প্রণালীর অনুসরণ করেন।

যতদিন দার্শনিকপ্রণালী প্রচলিত ছিল, ততদিন লোকে আপনার ক্ষমতা বুঝিতে পারিত না। তাহারা সকল তত্ত্বই আপনাদের আয়ত্ত বলিয়া মনে করিত। পৃথিবী আদিতে কি ছিল, শেষেই বা কি হইবে, পরকাল কি প্রকার, পাপ পুণ্যের বিচার কি প্রকার, পরমেশ্বর কি প্রকার, তাঁহার শাসনপ্রণালী কিরূপ প্রভৃতি সকল তত্ত্বই মনুষ্যের দ্বারা নির্ণীত হইত। মনুষ্যের কল্পনার গতি অপ্রতিহত। "উচ্চে, নীচে, গম্ভীরে, অম্বরে,

ভূমিগর্ভে, আকাশে” সর্ব্বত্রই কল্পনার নিকট সুগম্য। এবং যেখানে কল্পনা যাইতে পারে, মনুষ্য সেইখানেই যাইয়া তথাকার তত্ত্বনির্ণয় করিতে বসিত। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে দার্শনিক প্রণালীতে মনই একমাত্র বিচারকর্ত্তা। যেখানে মন বিচারক সেখানে সকল বিষয়ের মীমাংসা সহজেই হইতে পারে। কারণ মনের উপর কাহারও আপীল নাই। মন যাহা বলিয়া দিলেন, তাহাই শিরোধার্য্য করিতে হইবে। মন যাহা স্থির করিয়া দিলেন তাহাই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রচলিত হইল, তখন মনের আর ওরূপ ক্ষমতা রহিল না। মনের মীমাংসা কার্য্যের সহিত, ঘটনার সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইল। সুতরাং পূর্ব্বে যে সকল বিষয় মানববুদ্ধির সুগম্য ছিল বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে তাহাদের অনেকগুলি মানববুদ্ধির অগম্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। পরমেশ্বর কি, পরকাল কি, সেখানে পাপপুণ্যের বিচার কিরূপ প্রভৃতি প্রশ্ন একেবারেই মানবের অনুসন্ধেয় বিষয় হইতে দূরীকৃত করা হইল। যাহা কখন কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় নাই বা হইতে পারে না, এমন বিষয়সমস্তের উপর মনুষ্য আপনাকে নিয়োজিত করিতে চাহিল না। এই সকল কারণে বেকনের পর হইতে বিজ্ঞানচর্চ্চা বহুলরূপে প্রচলিত হইতে লাগিল। অন্য অন্য শাস্ত্রেরও লিখনপ্রণালী একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। দর্শন হইতে অবিজ্ঞেয় বস্তুসকলের মীমাংসা একেবারে উঠিয়া গেল। ইতিহাস ভিন্নপ্রণালীতে লিখিত হইতে আরম্ভ হইতে লাগিল। অর্থশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র প্রভৃতি কয়েকটি নূতন অথচ অত্যাবশ্যক শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল। নীতিসম্বন্ধীয় প্রশ্নসকল নূতন প্রকারে আলোচিত হইতে লাগিল। মনুষ্য অবিজ্ঞেয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ জ্ঞেয় বস্তুর প্রতি মনঃসংযোগ করিতে লাগিল।

বাহ্যজগতের পদার্থসমূহসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করা সহজ। ঘেঁটুপাতা সর্পদংশনের ঔষধ কি না জানিতে হইলে আমরা জন্তুকে সর্পদষ্ট করাইয়া তাহাকে ঘেঁটুপাতা সেবন করাইতে [illegible] চন্দ্রের সহিত জোয়ার ভাঁটার কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানিবার জন্য পূর্ণিমার দিন নদী বা সমুদ্রের জলবৃদ্ধির পরিমাণ স্থির করিতে পারি। কিন্তু অন্তর্জগতে কিরূপে বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা বুঝিতে পারা অপেক্ষাকৃত কঠিন। অন্তর্জগতের কোন ঘটনাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সেখানে কিরূপে বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রয়োগ করা যাইতে পারে? আমরা এতৎসম্বন্ধে দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

যেমন বাহ্যজগতের সকলবস্তুরই

বিজ্ঞানের দ্বারা মীমাংসা হয়, সেইরূপ অন্তর্জগতের সকলপ্রশ্নই দর্শনশাস্ত্র দ্বারা মীমাংসিত হইয়া থাকে। মন কি পদার্থ? ইহা দর্শনশাস্ত্রের প্রথম প্রশ্ন। যত দিন দার্শনিক প্রণালী প্রচলিত ছিল, ততদিন লোকে বলিত, মন একপ্রকার অদৃশ্য বস্তু। জীবাত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি পদার্থ যেসকল উপাদানে নির্ম্মিত,লোকে মনকেও সেই সেই উপাদানে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ করিত। তখন মনের সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রশ্ন উত্থাপিত হইত। কেহ বলিতেন মন মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত, কেহ বলিতেন মন হৃৎকোষে অবস্থিত, কেহ বলিতেন মন শরীরের সর্ব্বঅংশেই আছে, কেহ বলিতেন, মন শরীরের প্রত্যেক অংশে অবস্থিত ইত্যাদি। ফলতঃ মন যে শরীর হইতে এক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহাতে সকলেই বিশ্বাস করিতেন।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রচলিত হইল, তখন আর পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নসমূহের স্থল রহিল না। মনুষ্য মনকে এক স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতে স্বীকৃত হইল না। মনের মত কোন পদার্থই পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং স্থিরীকৃত হইল যে মন মস্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র। এই ক্রিয়াগুলি শারীরিক অন্য অন্য ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু যেমন শ্বাসপ্রক্ষেপ, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া ইন্দ্রিয়বিশেষের ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, মনও সেইরূপ শারীরিক ক্রিয়াবিশেষ বলিয়া গণ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কি কি উপায়ে আমাদের জ্ঞানলাভ হয় ইহাও দর্শনশাস্ত্রের এক অতি নিগূঢ় প্রশ্ন। সকলেই স্বীকার করেন, যে আমরা ইন্দ্রিয়হইতে আমাদের জ্ঞানের উপাদান প্রাপ্ত হই। যতদিন দার্শনিক প্রথা প্রবল ছিল, ততদিন ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ভিন্ন আর একপ্রকার জ্ঞানে মনুষ্য বিশ্বাস করিত। তাহারা বলিত যে মনের এক স্বাভাবিক জ্ঞানপ্রদায়িনী শক্তি আছে। আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, সকল বিষয়ের সমস্যা স্থির করিতে পারে না। সময় কি, স্থান কি, ঈশ্বর কি, আত্মা কি, প্রভৃতি কতকগুলি প্রশ্ন আছে যাহাতে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের কোন রূপ প্রয়োগ করা যায় না। ঐ সকল প্রশ্নের-নির্দ্ধারণ কালে আমরা মনের স্বাভাবিকী শক্তির নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রচলিত হইল, তখন আর মনের পূর্ব্বরূপ শক্তির প্রতি মনুষ্যের আস্থা রহিল না। তখন স্থিরীকৃত হইল, যে আমাদের সকল প্রকার জ্ঞানই ইন্দ্রিয়জ।

নীতিসম্বন্ধেও ঐরূপ মতের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইবে। যখন দার্শনিক প্রণালী প্রবল ছিল, তখন লোকে বিশ্বাস করিত যে জগদীশ্বর আমাদের মনে আমাদের জন্মকাল হইতেই হিতাহিত বিবেচনার ক্ষমতার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। কোন

কাজ দেখিবামাত্রই, উহা হিত কি অহিত, আমরা ঐ ক্ষমতাবলে বলিয়া দিতে পারি।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রচলিত হইল, তখন আর পূর্ব্বের মত ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতায় লোকের* বিশ্বাস রহিল না। তখন হিতাহিত বিবেচনার সম্বন্ধে অন্য অন্য কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতে লাগিল।

এইরূপে এক্ষণে ইউরোপের অধিকাংশ স্থলে সকল শাস্ত্রেই বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রযুক্ত হইতেছে। ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রেও বৈজ্ঞানিক প্রণালী বহুলপরিমাণে সন্নিবেশিত হইতেছে। আমরা সকল বিষয়েই ইউরোপের অনুকরণ করিয়া থাকি। ইউরোপের বৈজ্ঞানিকপ্রণালী কখন অনুকরণ করিতে শিখিব কি?

খাজনা কেন দিই ?

বহুকালাবধি লোকে খাজনা দিয়া আসিতেছে। শতপুরুষ ধরিয়া লোকের সংস্কার এই যে জমী লইলেই খাজনা দিতে হয়। বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি যে খাজনা ছাড়া জমী পাওয়া যায় না। ব্রহ্মোত্তর বা দেবোত্তর আদি যে সকল জমীর খাজনা দিতে হয় না তাহা আগে মালের জমী ছিল, কোন ভূম্যধিকারী দয়া করিয়া তাহার খাজনা দেওয়া রহিত করিয়া দিয়াছেন, অথবা খাজনা লন না এই পর্য্যন্ত। খাজনা লওয়াটাই নিয়ম, না লওয়াটা নিয়মবহির্ভূত। এইরূপ অনেক পুরুষ ধরিয়া দেখিয়া আসাতে সংস্কার এরূপ দাঁড়াইয়াছে, যে খাজনা লওয়া যেন প্রাকৃতিক নিয়ম। যেমন এক বস্তু আর এক বস্তুকে আকর্ষণ করে এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম, জমী লইলেই খাজনা দেওয়াও সেইরূপ। যখন খাজনা দেওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া সংস্কার দাঁড়াইয়াছে, তখন খাজনা কেন দিই, এরূপ প্রশ্ন লোকের মনে উদয় না হওয়াই সম্ভব। জমী লইব, যাহার জমী তাহাকে খাজনা দিব, ইহাতে আবার কেন কি? যেমন টাকা লইলে সুদ দিতে হয়, বাড়ী লইলে ভাড়া দিতে হয়, জমী লইলেও সেইরূপ খাজনা দিতে হয়। এর আবার কারণ জিজ্ঞাসা কেন?

* বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কথার সময় আমরা "লোকের" এই কথাটি "অধিকাংশ লোকের" স্থলের ব্যবহার করিয়াছি। দার্শনিক প্রণালীতে বিশ্বাস করেন, এখনও এরূপ লোক অনেক আছেন।

কারণ জিজ্ঞাসা করার হেতু আছে। তুমি টাকা রোজগার করিয়াছ, টাকা তোমার। তোমার টাকা আমি লইতে গেলে তোমার কিছু লাভ না থাকিলে তুমি দিবে কেন? তোমার বাড়ী তোমার নিজযত্নে প্রস্তুত, নিজে তাহার জন্য কত টাকা খরচ করিয়াছ, আমি তাহা ব্যবহার করিব, তোমার নিজের লাভ না থাকিলে তুমি দিবে কেন? তুমি বলিবে আমার জমী আমি তোমাকে দিব আমার লাভ না থাকিলে দিব কেন? কিন্তু কথা এই তোমার জমী হইল কিরূপে। তুমি বলিবে আমি কিনিয়াছি। কিন্তু জমী কার যে তুমি কিনিবে। তোমার জিনিস তুমি ইচ্ছামত নষ্ট করিতে পার, তোমার বাড়ী তুমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পার, তোমার টাকা তুমি সমুদ্রের অগাধ জলে ফেলিয়া দিতে পার, তোমার অঙ্গ তুমি লাঙ্গুলের দিকে বলিদান দিতে পার, কিন্তু তোমার জমী তুমি নষ্ট করিতে পার না। বাস্তবিকও তুমি জমী কেন নাই, তুমি কিনিয়াছ জমীব্যবহারের স্বত্ব। কিন্তু এই কথাটি বুঝিতে গেলে তাহার পূর্ব্বে অনেক কথা বলা চাই। অনেক গুলি প্রশ্নের মীমাংসা চাহি। আমরা আজি এই প্রস্তাবে চারিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

(১) জমী কার?

(২) কিরূপে জমীর উপর লোকের স্বত্ব দাঁড়াইয়াছে?

(৩) খাজনা কেন দিতে হয়?

(৪) খাজনা কত হওয়া উচিত? তাহার পর প্রসঙ্গক্রমে

(৫) যত হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা অধিক বা অল্প হয় কেন? এ প্রশ্নেরও মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

১। জমী কার?

আমরা যে গ্রহের পৃষ্ঠদেশে বাস করি তাহার পরিধি ১১০০০ ক্রোশ ও ব্যাস প্রায় ৩৫০০ ক্রোশ। এই ভূপৃষ্ঠের দুই ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল। স্থলভাগের কোথাও মরুভূমি, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও বন, কোথাও জল। অবশিষ্ট উর্ব্বর ভূমি এই উর্ব্বরভূমিখণ্ড হইতে আমাদের প্রাণধারণোপযোগী পদার্থের উৎপত্তি হয়। যে কেহ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারই জীবনধারণ প্রয়োজন সুতরাং জীবনধারণোপযোগী পদার্থ যাহাতে উৎপত্তি হয় তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার। জীবন বলিতে যে শুদ্ধ মনুষ্যেরই জীবন বুঝাইবে এমন কোন লেখা পড়া নাই। যাহার প্রাণ আছে যাহারই প্রাণধারণ করিতে হয় তাহারই পৃথিবীর জমীতে অধিকার। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ, কীটাণু প্রভৃতি সকলের পৃথিবীর জমীতে যে অধিকার, আমার তোমার ও মহারাজা গোপাল নগরেরও সেই অধিকার। প্রাণধারণোপযোগী পদার্থ এই পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইবে। প্রাণও সকলকে ধারণ করিতে হইবে, অতএব একজনকে ভূমি-

স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করাও যাহা তাহাকে মরিতে বলাও ঠিক তাই।

ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় পুত্রদিগের জন্য যেমন আকাশ হইতে ম্যানা বর্ষণ করিয়াছিলেন, এখন আর তাহা করেন না, এখন আমাদিগকে নিজপরিশ্রমে স্বহস্তে এই পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে আমাদের আহারসংগ্রহ করিতে হয়। জমী ভিন্ন আমাদের চলে না, অতএব জমী কাহারও নহে, উহাতে প্রাণী হইলেই স্বত্ব জন্মে।

এই সাধারণনিয়মের অনেক ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। অনেক হিংস্রজন্তু অপর জন্তুর মাংস আহার করিয়া জীবনধারণ করে। অনেক মনুষ্যও অর্দ্ধেক উদ্ভিজ্জ ও অর্দ্ধেক প্রাণিজ আহারে দেহপুষ্টি করেন। অনেক জাতি আছে তাহাদের মৎস্যই প্রধান আহার। মৎস্যের সঙ্গে জমীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই। এ সকল বিষয়ের তর্ক তুলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। তবে এই পর্যান্ত বলা যায় যে, পশুআহার যাঁহারা করেন, তাঁহারা অন্যায় করেন; তাঁহারা যে আর একজনের স্বত্বনাশ করেন, শুদ্ধ তাহাই নহে; তাহাদের জীবন পর্যান্ত নাশ করেন। তাঁহাদের মত যাহাই হউক, তাঁহারা যে জন্তুর মাংস ভক্ষণ করেন, সেও ত এই পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে আপনার দেহপোষক দ্রব্য সংগ্রহ করে। তবে ফলে একই দাঁড়াইল। সাক্ষাৎসম্বন্ধে না হইয়া পরম্পরাসম্বন্ধে মাংসাশীরাও এই পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করেন সুতরাং জমীতে তাঁহারও প্রয়োজন। এখন মাছের কথা। যাহারা মাছ খাইয়া বাঁচে তাহারা ত জমীর ধার ধারে না, কিন্তু জমীতে যেমন জলেও তেমনি সকলেরই সমান স্বত্ব। জমীরও যে জন্য খাজনা দিতে হয়, মৎস্যক্ষেত্রসমূহেও সেই প্রকার খাজনা দিতে হয়। সেই কারণে ও সেই পরিমাণে। প্রাচীনদেশসমূহেও এই নিয়ম ছিল যে জমী সবার, একজনের নহে। ইহুদীদের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, ৪৯ বৎসর অন্তর তাহাদের সমস্ত জমী অধিবাসীদিগকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। সকলে সমান ভাগ পাইত কি না বলিতে পারা যায় না; কিন্তু ভাগ হইত নিশ্চয়। উহাদের সংস্কার ছিল যে, কানানদেশ ঈশ্বর ইস্রেলের বংশকে স্বত্বত্যাগ করিয়া দান করিয়াছেন সুতরাং যে কেহ ইস্রেলের বংশ, কানানের জমীতে তাহার অংশ আছে। প্রাচীন রোমে রোমের অধিবাসী প্রেট্রিসিয়ানরা জমীর ভাগ পাইতেন, কারণ প্রথম অবস্থায় তাঁহারাই রোমের অধিবাসী ছিলেন। তাহার পর প্লিবিয়ানেরা যখন রোমের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইল, তখন তাহারাও জমীর ভাগ পাইতে লাগিল। প্রাচীন জর্ম্মানির সমস্ত জমী folkland অথবা জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। রাজা জাতির কর্ত্তা সুতরাং তিনি জাতীয় ভূমিরও কর্ত্তা। জাতীয় ভূমির

বন্দোবস্তের ভার রাজা ও মহাসভার উপর স্থাপিত। আমাদের নিজদেশে রাজা সমস্ত দেশের কর্ত্তা জমী তাঁহার, অর্থাৎ প্রজারা তাঁহার নিকট হইতে জমী লইবে, কেবল উৎপন্নের ছয়ভাগের এক ভাগ তাঁহাকে দিতে হইবে। এ নিয়ম অতি সুন্দর, ইহাতে রাজস্ব জমী হইতেই আদায় হইত, স্বতন্ত্র কর বসানর প্রয়োজন হইত না। জমী কাজে প্রজাসাধারণেরই ছিল : প্রজাসাধারণকে সাধারণকার্য্যের জন্য স্বোপার্জ্জিত শস্যের ষষ্ঠাংশ দিতে হইত। এখনও উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও অন্যান্য স্থানে এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। যেখানে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্দোবস্ত সেখানেই এই নিয়ম।

জমীতে যে কোন এক ব্যক্তির স্বত্ব হইবে না তাহার কারণ, কি ? অর্জ্জনই স্বত্বের একমাত্র কারণ, যে অর্জ্জন না করিল তাহার স্বত্ব কিসে ? কিন্তু ভূমি অর্জ্জন করা যায় না, কারণ ভূমির তুমি মালিক থাক আর নাই থাক, জমী যে জমী সেই থাকিবে। জমী কেহ উৎপন্ন করিতে পারে না, কেহ উহা নাশও করিতে পারে না। জমী ঈশ্বরদত্ত সুতরাং উহা অর্জ্জিত নহে উহাতে কাহারও স্বত্ব নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে জমী ব্যক্তিবিশেষের হইতে পারে না।

কিরূপে জমীর উপর লোকের স্বত্ব দাঁড়াইয়াছে ?

জমী কার, এ প্রশ্নের উত্তর হইল জমী কাহারও নহে, উহাতে জীবমাত্রেরই স্বত্ব আছে। তবে জমীদারের জমী আমার জমী, তোমার জমী কেমন করিয়া হইল ? জমীতে যদিও অর্জ্জনস্বত্ব না হইতে পারে, কিন্তু উহাতে ব্যবহারিক স্বত্ব উৎপন্ন হইতে কাহারও আপত্তি নাই। মনে কর আমি এক জঙ্গলের মধ্যে একখণ্ড ভূমি পরিষ্কার করিয়া তাহাতে চাস করিতে লাগিলাম। আমার উহাতে কোন স্বত্ব নাই, তুমি আমা অপেক্ষা বলবান্, কালি তুমি আমার গালে চড় মারিয়া আমার জমীখানি কাড়িয়া লইলে। যে শুনিবে সেই বলিবে এটি অত্যাচার হইল। কেন ? জমী আমার নয় সত্য কিন্তু আমি যে সেটি ব্যবহারের উপযোগী করিয়াছি সেটুকুতে আমার স্বত্ব আছে, আমি পরিশ্রম করিয়া সে জমীর জঙ্গল আবাদ করিয়াছি, তাহাতে সার দিয়াছি দুই তিনবার চাস দিয়া তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছি। জমী আমার না হইলেও আমি যে উহার উন্নতিসাধন করিয়াছি সেটি ত আমার, তাহাতে ত কোন সন্দেহ নাই। সেটুকু আমি ছাড়িব কেন ? ছাড়িতে গেলে তাহার ক্ষতিপূরণ চাই। এইরূপে অনেক জমীতে লোকের স্বত্ব জন্মিয়াছে। যত উপনিবেশ সর্ব্বত্র এই কারণে স্বত্ব। আমাদের দেশে যে গ্রামিকবৃন্দ আছেন তাঁহাদেরও এইরূপে জমীতে স্বত্ব হইয়াছে। ব্যবহারিক স্বত্ব পুরুষানুক্রমে চলা উচিত কি না সে বিষয়ে আমরা

কিছু বলিতে চাহি না। অনেক সময়ে রাজা বা রাজসভা কোন বিশিষ্ট উপকার করার জন্য কোন সেনাপতি, পণ্ডিত, চিকিৎসককে ভূমিদান করেন, ইংলণ্ডের বক্‌লাণ্ড, আমাদের জায়গীর ব্রহ্মোত্তর জমীতে এইরূপে স্বত্ব জন্মিয়াছে। প্রায় অধিকাংশ স্থলে দুর্ব্বল-জাতি কোন পরাক্রান্ত জাতিকর্তৃক পরাজিত হইলে শেষোক্ত জাতি পূর্ব্বোক্ত জাতির সমস্ত জমী দখল করিয়া লন। রোমধ্বংসের পর ইউরোপে সর্ব্বত্র এইরূপে বর্ব্বরজাতিগণ আপনাদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া আসে। এরূপে ভূমিতে স্বত্বস্থাপন যে ঘোরতর অত্যাচার তাহা কে অস্বীকার করিবে। বাঙ্গালায় যে জমীদারের জমী হইয়াছে ইহা কেবল সেকালের ইংরেজদিগের বুঝিবার ভুলে। যেরূপেই হউক যদিও জমীতে সকল প্রাণীর সমান অধিকার, আজি কালি পৃথিবীর প্রায় তাবৎ জমীই মনুষ্যনামক জাতির কতিপয়মাত্র লোকের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। তাঁহারা কিছু করুন আর নাই করুন জমী তাঁহাদের। উহা লইয়া তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। যে সকল লোক বা জীবজন্তু তাঁহাদের জমী হইতে উদরপূর্ত্তি করে, তাহারা তাঁহার অধীন, তাহাদের উপর তাঁহার ক্ষমতা অসীম। এরূপ অন্যায় অমিত ক্ষমতাপ্রকাশকে অত্যাচারই বল আর প্রাকৃতিক নিয়মই বল আর সমাজের নিয়মই বল।

অতএব জমীর উপর লোকের যে স্বত্ব দাঁড়াইয়াছে তাহা ব্যবহারে উপনিবেশ স্থাপনে ও প্রায় অধিকাংশ স্থলেই অত্যাচারে।

৩। খাজনা দিতে হয় কেন?

আবার সেই কথা, জমী যখন আর একজনের তখন তাহার জমী লইয়া ব্যবহার করিলেই খাজনা দিতে হইবে। এটি মোট কথা। যদি সকল জমী সমান উর্ব্বরা হইত তাহা হইলে খাজনা হইত কি? তাহা হইলে জোর করিয়া জমী দখল করিবার কোন কারণ থাকিত না, তাহা হইলে যে যে জমী পাইত, সে সেই জমী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিত। তুমি না হয় গঙ্গার ধারে জমী লইয়াছ, আমি না হয় দশহাত তফাতে লইব, এইমাত্র প্রভেদ। লাভ তোমারও যে রকম আমারও ঠিক সেই রকম, তবে তোমার উপর আমার অত্যাচার করার প্রয়োজন কি? কিন্তু বাস্তবিক ত তাহা নহে, জমীর গুণে অনেক প্রভেদ। আমার খানি খুব উর্ব্বরা, তোমার খানি পতিত বা কঙ্করময়; তোমার সুতরাং ইচ্ছা হইবে যে তুমি আমার জমীখানি পাও। তোমার জমীর দর কম হইবে আমার অধিক হইবে।

অন্যান্য ব্যবসায়ে যেমন জিনিসের খরচা ধরিয়া দাম হয় জমীর উৎপন্নে তেমন হয় না। মনে কর কাপড় বুনিতে হইবে, তুলা ছয় আনা, মেহয়ৎ ছয় আনা, কোর দেওয়া দু পয়সা ও অন্যান্য খরচ ১০।

কাপড় খানার খরচা হইল তের আনা তাহার ব্যবসায়ের মুনাফা আট পয়সা দিলাম, কাপড়ের দর হইল পনর আনা। এই দরে অধিকাংশ কাপড় বিক্রয় হইবে। শস্যাদির ত ঠিক একপে মূল্যনির্ণয় হয় না। তোমার জমী আমার জমী পাশা পাশি, তুমিও যে খরচ করিলে আমিও সেই খরচ করিলাম; তুমিও যেমন খাটিলে আমিও তেমনি খাটিলাম; তোমার উৎপন্ন হইল দশ মণি ধান আমার হইল ছ মণি। এই জন্য আদম স্মিথ বলেন যে অন্যান্য শিল্পে উৎপন্ন কিছুই হয় না, পৃথিবীর ধনবৃদ্ধি হয় না, কেবল কৃষিকর্ম্মেই ধনবৃদ্ধি হয়। কৃষিকর্ম্মে যে খরচ তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হয়। সেবার আর্য্যদর্শনে ইক্ষু নামক প্রবন্ধে প্রবন্ধলেখক দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ইক্ষুর চাষে প্রায় দ্বিগুণ লাভ হয়। এই লাভের অধিকারী কে হইবে? যে ভূম্যধিকারী সেই লাভেরও অধিকারী হইবে। যে সমাজে জমীদার ভূম্যধিকারী সে সমাজে জমীদারের লাভ, যে সমাজে রাজা ভূম্যধিকারী সেখানে রাজার লাভ, যে সমাজে প্রজা ভূম্যধিকারী সে সমাজে প্রজার লাভ। এই যে উৎপন্নের কমী বেশী এইই খাজনার কারণ। যদি সব জমী সমান হইত তাহা হইলে খাজনা হইত না। যদি সব জমী এমন হইত যে প্রজার শ্রম ও খরচা মাত্র উঠিত তাহা হইলে কেহই খাজনা দিতে পারিত না। যদি সব জমীতেই দ্বিগুণ লাভ হইত, তবে কাহার নিকট খাজনা আদায় হইত। যাহার নিকট আদায় করিতে যাইত, সেই ভাবিত অত্যাচার হইতেছে। সমাজের বন্দোবস্ত অন্যরূপ হইত। অতএব খাজনার কারণ জমীর গুণতারতম্য।

খাজনা কত হওয়া উচিত?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জমী সমান হইলে খাজনা হইত না। কেহই খাজনা দিত না। এখন প্রশ্ন এই যে যাহারা খাজনা দিবে তাহারা কত দিবে? যখন কতকগুলি লোক একটি গ্রামপত্তন করিল যে কয়খানি উর্ব্বরভূমি ছিল সব কয়খানি তাহারা দখল করিয়া লইল। কিন্তু সব উর্ব্বরভূমি ত সমান নয়। মনে কর দশখানি উর্ব্বর জমী আছে এক খানিতে দশ মণি দুইখানিতে সাড়ে নয় মণি তিন খানিতে নয় মণি ও চারি খানিতে আট মণি আর একখানিতে সাড়ে সাত মণি উৎপন্ন হয়। ইহার নীচের জমী আবাদ হয় না। যাহার জমীতে সাড়ে সাত মণি জন্মে তাহার যদি তাহাতে শ্রম ও খরচা না পোষাইত তবে সে কখন আবাদ করিত না। সুতরাং বুঝা গেল যে সাড়ে সাত মণি উঠিলেই চাষার খরচা উঠে। অতএব সাড়ে সাত মণির উপর যে জমীতে যত উৎপন্ন হয় সমুদয়ই সে জমীর খাজনা হইবে। যাহার উৎপন্ন দশ মণি যে আড়াই মণি দিলে তাহার লোকসান হইবে না। যাহার সাড়ে নয়মণি তা-

হার দুই সলি দিলে লোকসান হইবে না। অতএব যে সকল জমী চাস হয় তাহাদের মধ্যে যে জমী সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ তাহার উৎপন্ন উৎকৃষ্ট জমীর উৎপন্ন হইতে বাদ দিলে বাকি যা কিছু থাকে তাহার নাম খাজনা। বলিবে যে দেশে প্রজা ভূম্যধিকারী সে দেশে ত খাজনা দিতে হয় না। আমরা বলি সেখানে প্রজা খাজনা ও মুনাফা দুই পায়, অন্য জায়গায় মুনাফা পায় প্রজা, খাজনা পায় রাজা বা জমীদার।

এত হল শস্যানুযায়ী খাজনা। যেখানে খাজনা টাকায় দিতে হয় সেখানে ইহা অপেক্ষা একটু জটিলতা অধিক। মনে কর পূর্ব্বোক্ত গ্রামে আর দশ ঘর লোক বাড়িল, পাঁচ ঘর চাসা আর পাঁচ ঘর চাউল কিনিয়া খায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সে ভাল জমী আর নাই। নূতন চাসা যাহারা আসিল তাহারা যে জমী পাইল তাহাতে তিন খানিতে ছয়সলি ও দুই খানিতে পাঁচ সলি মাত্র। একেবারে সকল জমীর খাজনা বাড়িয়া গেল। যাহাতে দশসলি উৎপন্ন হইত তাহার খাজনা আগে ছিল আড়াই সলি, এখন হইল পাঁচ সলি, যাহার সাড়ে নয় সলি তাহার খাজনা আগে ছিল দুই সলি এখন হইল সাড়ে চার সলি, কেবল যাহার উৎপন্ন পাঁচ সলি সেই কোনমতে খরচা পোষায় বলিয়া তাহাকে খাজনা দিতে হয় না। এইরূপে পাঁচজন লোক বৃদ্ধি হওয়ায় খাজনা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গেল। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জমীই খাজনা দিবে না। তাহা অপেক্ষা যে ভূমির উৎপন্ন যত অধিক ততই তাহার খাজনা। আগে ছিল সাড়েসাতসলিওয়ালা জমী নিকৃষ্ট। এখন পাঁচসলিওয়ালা জমী সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছে সুতরাং ভাল জমীর খাজনা বাড়িয়া গিয়াছে।

আবার দেখ উর্ব্বর জমীতে খরচা কম। মনে কর দশ সলিওয়ালা জমীতে যে খরচা হয় সাড়ে সাত সলি ওয়ালাতেও সেই খরচা হয়। মনে কর দুই জায়গায়ই ৭॥ টাকা খরচ হয়। কিন্তু একের উৎপন্ন কম অপরের উৎপন্ন বেশী। সলিকরা ভাল জমির খরচা কম, মন্দ জমীর খরচা বেশী। ভাল জমীওয়ালা সস্তা দরে বিক্রয় করিতে পারে মন্দ জমীওয়ালা তত সস্তা দিতে পারে না। কিন্তু এক বাজারে এক সময়ে এক জিনিসের দুই দর হইতে পারে না [খুচরা জিনিসের যদিও হয় কিন্তু বড় কারবারে হয় না] সুতরাং সাড়ে সাত সলিওয়ালা যে দরে বিক্রয় করিবে দশ সলিওয়ালাকে সেই দরে বিক্রয় করিতে হইবে। দশসলিওয়ালা একে ত উৎপন্ন বেশী পায় তাহার উপর তাহার জিনিসের দাম ও তাহার খরচা অপেক্ষা অনেক অধিক। মনে কর সাতসলিওয়ালার সলিকরা দশ টাকা খরচা হইয়াছে, দশসলিওয়ালার সলিকরা সাড়ে সাতটাকামাত্র খরচা পড়িয়াছে; কিন্তু দুইজনকেই বিক্রয় করিতে হইল দশর টাকা সলি। ...

হইল ৭॥×১৫=১১২॥ অপরে হইল ১৫×১০=১৫০ খরচা দুজনেরই এক। যাহার ভূমি অধিকতর উর্ব্বরা তাহার উৎপন্ন বেশী খরচা কম, মুনাফা সুতরাং খুব বেশী।

এখন মনে কর পাঁচজন চাসা ও পাঁচ জন অপর লোক আসিয়া জুটিল। চাসারা আরও নিকৃষ্ট জমী চাস করিতে লাগিল। মনে কর সেই ৭৫ টাকাই খরচ হইতে লাগিল, উৎপন্ন হইল পাঁচ সলিমাত্র সলিকরা খরচা পনর টাকা হইল। নূতন লোক আসায় চাউলের দর বাড়িয়া গিয়াছে, প্রতি সলি এখন মনে কর বিশ টাকায় বিক্রয় হইল। পাঁচ-সলিওয়ালার ৭৫ টাকা খরচ ৫×২৫= ১২৫ টাকা আয় পঞ্চাশ টাকা মুনাফা। সাড়েসাতসলিওয়ার ৭৫ টাকা খরচ ৭॥×২৫=১৮৭॥ আয়, মুনাফা ১১২॥ টাকা। দশসলিওয়ালার খরচা ৭৫টাকা আয় ১০×২৫=২৫০ মুনাফা ১৭৫ টাকা। আগে ছিল ৭৫ টাকা এখন হইল ১৭৫ টাকা অথচ তিনি নিজে ইহার কিছু করেন নাই। ইহার মধ্যে পাঁচ-সলিওয়ালার যে ১২৫ তাহাতে সমুদয়ই খাজানা যাওয়া উচিত। অর্থাৎ চাসা আপনার খরচা মেহনত নায্য মুনাফা উঠাইয়া লইলে পর যা কিছু বাকি থাকিবে তাহাই খাজানা। সুতরাং যত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, নিকৃষ্ট জমী চাস হইতে আরম্ভ হইবে, ততই জমীর খাজানা বাড়িয়া যাইবে। যতই টাকা দেশে বাড়িবে লোকে অল্প মুনাফায় টাকা খাটাইবে; চাসার মুনাফা কমিয়া আসিবে জমীর খাজানা বাড়িয়া যাইবে। এই যে খাজানা ইহার নাম Economic Rent আমরা ইহাকে যথার্থ খাজনা কহিব। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যে খাজানা দিয়া থাকি, তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক জায়গায় কম ও অনেক জায়গায় বেশী। ইহা অপেক্ষা অধিক বা অল্প খাজানা কেন হয়?

আমরা খাজানাসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত কথা বলিয়া আসিলাম, তাহা অধিকাংশই রিকার্ডো নামক প্রসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রবিদের মত। তাঁহার মত যে প্রমাণ সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু তাঁহার মত ইংলণ্ড ভিন্ন অপর দেশে গৃহীত হয় না। ইংলণ্ড অর্থপ্রধানদেশ ভূমি-প্রধান নহে; ইংলণ্ডের লোক বেশ বুঝিতে পারেন যে, চাসা যে খরচ ও যে পরিশ্রম করিল তাহার উদ্ধার ও তাহার মুনাফায় তাহার স্বত্ব, এ সমুদয়ের অধিক যা কিছু তাহাতে তাহার স্বত্ব নাই। আমাদের দেশ ভূমিপ্রধান। চাসারা জানে তাহারা চাস করিয়া নিজের গুজরান করিয়া যদি উদ্বৃত্ত হয়, তবে জমীদার পাইবে। অতএব রিকার্ডোর মত যে সত্য তাহা আমাদের দেশীয় লোক-দিগকে বিশ্বাস করান অত্যন্ত কঠিন। আমাদের দেশের ত কথাই নাই; ফ্রান্সের লোকও রিকার্ডোর কথায় বিশ্বাস করেন না। রিকার্ডোর কথা শুনিলে

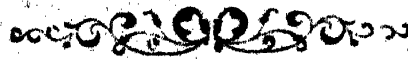
আমাদের দেশীয় লোক মনে করিবেন লেখক জমীদারের অথবা গবর্ণমেণ্টের স্বপক্ষতা করিয়া প্রজাবৃন্দের অনিষ্টের মূল করিতেছেন। কিন্তু আমরা তাহার কিছুই করিতেছি না যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস তাহাই লিখিতেছি।

লোকে জিজ্ঞাসা করিবেন যদি রিকার্ডোর মতই সত্য হয়, তবে খাজানা কোন দেশেই রিকার্ডোর মতানুযায়ী হয় না কেন? তাহার উত্তর এই ইংলণ্ডের খাজানা প্রায়ই রিকার্ডোর মতে গৃহীত হয়। ইংলণ্ডের জমীদার ফারমারকে জমী দিলেন। ফারমার দেখিল তাহার টাকা উঠিবে মুনাফাও উঠিবে সে জমী লইল। ইংলণ্ডের ফারমার ধনী, সে যদি চাস না করিত, তবে ব্যবসায় করিত, ইংলণ্ডে সাধারণ লোকের জমী নাই তাহারা ফারমারের মজুরদার। ইংলণ্ডে জমীর সম্পূর্ণ স্বত্ব জমীদারের, গবর্ণমেণ্টের বা প্রজাদের তাহাতে কোন স্বত্ব নাই। অন্য কোন দেশেই প্রায় সেরূপ নাই। আমাদের দেশের জমীতে (বাঙ্গালা ভিন্ন) গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও প্রজা সকলেরই স্বত্ব আছে ইহা অনেকে স্বীকার করেন। সুতরাং ভারতবর্ষে ঠিক রিকার্ডোর কথামত খাজানা হইতে পারে না। জমীদার উৎপন্নের অংশ পাইবেন গবর্ণমেণ্ট অংশ পাইবেন প্রজা অংশ পাইবে। প্রজা নিজের খরচ তুলিয়া লইয়া বাকি যেটা থাকিবে তাহার অংশ পাইবে। বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্ট নিজ অংশ জমীদারকে স্বত্বত্যাগ করিয়া দিয়াছেন—যখন দিয়াছিলেন তখন প্রজার স্বত্বের দিকেও বড় বিশেষ মনোযোগও করেন নাই। সুতরাং এই সময়ে জমীদারেরা প্রজার উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছেন এখন আবার প্রজার স্বত্বরাখাের জন্য বহুতর চেষ্টা হইতেছে, সুতরাং জমীদার প্রজার নিকট সমস্ত বাড়তি উৎপন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না। কারণ জমীতে এবং জমীর খাজানায় প্রজারও স্বত্ব আছে। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষে জমীর খাজানা অর্থাৎ জমীদারের প্রাপ্য রিকার্ডোর খাজানা অপেক্ষা অনেক কম হইবে, কারণ তাহার এক অংশ প্রজার নিজের।

ইতালীতে জমী জমীদার ও প্রজার ভাগে বিলি। আমাদের অল্প ব্রহ্মোত্তরভোগীরা যেমন ভাগে বিলি করেন, সেও ঠিক সেইরূপ, তবে আমাদের ব্রহ্মোত্তরভোগীরা মিয়াদি বন্দোবস্ত করেন, সুতরাং জমীতে প্রজার স্বত্ব জন্মাইতে না দিয়া অনেক সময়ে রিকার্ডোর মতানুযায়ী খাজানা আদায় করিয়া লন। ইতালীতে তাহা হয় না; ইতালীতে এই নিয়ম মেরায়স সলা জুলিয়স কায়সর প্রভৃতির সময় হইতে বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। এক এক জায়গায় সেই জমীদার ও সেই প্রজা ৩৪শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে প্রজাদেরও জমীতে স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। কোন

জায়গায় জমীদারের অর্দ্ধেক কোন জায়গায় জমীদারে দুই তৃতীয়াংশ। কিন্তু ইতালীর জমী এত ভাল যে তথাপি প্রজা আপনার খরচা ও মুনাফা পোষাইয়া খাজানার কিছু অংশ আত্মসাৎ করে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ফ্রান্স ও জর্ম্মনি প্রভৃতি স্থানে জমীই প্রজার সুতরাং সেখানকার খাজানা প্রজাই পায়।

যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল সর্ব্বত্র খাজনা রিকার্ডোর মতানুযায়ী খাজানা অপেক্ষা কম। কিন্তু আয়ার্লণ্ডের এমনি দুর্ভাগ্য যে, সেখানে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী খাজানা। প্রজায় দিতে পারে না, কিন্তু জমীদারের খাতায় তাহার নামে পাওনা লেখা থাকে। তাহার কারণ এই যে সেখানে প্রজার স্বত্ব লোপ হইয়াছে; জমীদার সর্ব্বে সর্ব্বা। লোক অনেক। জমী একখানি বন্দোবস্ত হইবার সময় হাজার হাজার লোক দরখাস্ত করে, যে সকলের অপেক্ষা অধিক দিতে পারিবে সেই জমী পাইবে। গরীবলোক ক্ষমতার অতিরিক্ত দিব বলিয়া স্বীকার করিয়া জমী লয়, দিতে পারে না, পুরুষানুক্রমে ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল ঋণভার বহন করে।



অভিজ্ঞান শকুন্তল।

১। ইহার নাটকত্ব।

দুর্ব্বাসার শাপ শকুন্তলার উপন্যাসের প্রধান ঘটনা। এই ঘটনা আছে বলিয়া শকুন্তলার উপন্যাস নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। নচেৎ উপন্যাস মাত্র হইত। বলা অনাবশ্যক যে উপন্যাস হইলেই নাটক হয় না। আরব্যউপন্যাসনামক গ্রন্থে সহস্রাধিক উপন্যাস আছে, কিন্তু আরব্য উপন্যাস নাটক নহে। যে উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যচরিত্রের আভ্যন্তরিক মূল প্রদর্শন করান তাহাকেই নাটকের উপন্যাস বলে। মনুষ্যচরিত্র দুই প্রকার। বাহ্যজগতেরদ্বারা অনুশাসিত হওয়া একপ্রকার চরিত্রের লক্ষণ; এবং বাহ্যজগৎকে শাসন করা আর এক প্রকার চরিত্রের লক্ষণ। দুইটি দরিদ্র ব্যক্তি হঠাৎ প্রভুত ধনরাশি প্রাপ্ত হইল, পাইয়া এক জন গর্ব্বিত হইয়া উঠিল; আর এক জন পূর্ব্বের ন্যায় বিনয়নম্র রহিল। দেখা যাইতেছে যে, বহির্জগতের ঘটনা একজনকে বিচলিত করিতে পারিল, আর একজনকে পারিল না; একজনের মন শক্তি এবং দৃঢ়তাসম্পন্ন, আর এক জনের মন তাহা নয়। একজন ধনের

দ্বারা শাসিত হইল, ধন আর একজনের দ্বারা শাসিত হইল। বাহ্যজগৎ একজনের মনকে রঞ্জিত করিল, আর একজনের মন বাহ্যজগৎকে রঞ্জিত করিল। এক জনের মন বাহ্যজগতের শক্তির বশীভূত; বাহ্যশক্তির শাসনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিতেছে। আর একজনের মন নিজশক্তির দ্বারা বাহ্যজগতের শক্তিকে হতবল এবং বশীভূত করিতেছে। সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। প্রথম নেপোলিয়ান সমবেত ইউরোপকর্ত্তৃক এল্বাদ্বীপে তাড়িত হইয়া পুনরায় সমবেত ইউরোপকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত এল্বাদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া সমরানল প্রজ্বালিত করিল। সিরাজ এবং নেপোলিয়ান উভয়েই আস্ফালনকারী। কিন্তু সিরাজের আস্ফালন শেষে ফকিরীতে পরিণত হইল। আবার মনে কর সেই কুরুক্ষেত্রের মহাসমর চলিতেছে। আজ শরগুরু দ্রোণাচার্য্য কৌরবসেনার অধিনায়ক। পাণ্ডবদিগের আর শ্রেয় নাই। বুঝি আজিকার যুদ্ধেই পাণ্ডবপক্ষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জনরব উঠিল যে, অশ্বত্থামা হত হইয়াছে। দ্রোণাচার্য্যের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথাটা ঠিক্ কি না? তিনি সত্যপ্রিয় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মপুত্রের ধর্ম্মনিষ্ঠা 'ইতি—গজস্বে' পরিণত হইল। শস্ত্রাচার্য্য শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর যাহা হইল ভারতবাসী এবং ভারতানুরাগী মাত্রেই জানেন। কি ভয়ানক আত্মহত্যা! যে মহাত্মা কখনও প্রবঞ্চনার কথা কহেন নাই, যিনি সত্যরাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত, যিনি সত্য এবং ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সত্যকেই অক্ষয়নিধি বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছেন, তিনিই কি না আজ চিরসংস্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঐশ্বর্য্যের লোভে সত্য-সংহার করিলেন! একেই বলে প্রকৃত আত্মহত্যা,—আত্মহত্যা দ্রোণের নহে যুধিষ্ঠিরের—একেই বলে বাহ্যশক্তিরদ্বারা অনুশাসিত হওয়া—বাহ্যশক্তিরদ্বারা নিধন প্রাপ্তি। নাটককার এই প্রকার আত্মহত্যা নিবারণ করেন। এমনস্থলে আত্মহত্যা না দেখাইয়া নাটককার আত্মগৌরব দেখাইয়া থাকেন; আত্মার পরাজয় না দেখাইয়া বিজয় দেখান। আবার সেই ভীষণ সমরক্ষেত্র মনে কর। ভারতের সাম্রাজ্য লইয়া ঘোর যুদ্ধ হইতেছে। যিনি সেই যুদ্ধে জয়ী হইবেন, তিনি ভারতে রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন; যিনি সেই যুদ্ধে বিজিত হইবেন তিনি যদি বাঁচিয়া থাকেন ত পথের ভিখারী হইয়া থাকিবেন। ব্যাপার বড় সহজ নয়; উদ্দেশ্যও বড় ক্ষুদ্র নয়—হয় রাজ্যভোগ, না হয় মুষ্টিভিক্ষা। ভয়ানক সমস্যা! এই সমস্যায় পড়িয়া কার মন অবিচলিত থাকে? একটি অক্ষর উচ্চারণ করিলে রাজ্যভোগ হয়; বারবৎসর বনবাস

বিস্মৃত হওয়া যায়; বৎসরব্যাপী অজ্ঞাতবাসের যন্ত্রণাভোগ সার্থক হয়; সতীসাধ্বী কুললক্ষ্মীর অপমানের প্রতিশোধ হয়। কিন্তু সেই অক্ষরটি উচ্চারণ করিলে সত্যের বিপর্য্যয় ঘটে। আর একটি অক্ষর উচ্চারণ করিলে রাজ্যলাভ না হইয়া পথের ভিখারী হইতে হয়; বারবৎসর বনবাস চিরবনবাসে পরিণত হয়; বৎসরব্যাপিনী যন্ত্রণা জীবনব্যাপিনী যন্ত্রণা হইয়া দাঁড়ায়; অসূর্য্যম্পশ্যার অসহ্য অপমান কুলের কলঙ্ক হইয়া থাকে। কিন্তু এই অক্ষরটি উচ্চারণ করিলে সত্যের জয় হয়, এবং সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখান হয়। সত্যপ্রিয় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি করিলেন? না না বলিয়া হাঁ বলিলেন! আর অমনি সমস্ত জগতের লোক ক্ষুব্ধহৃদয়ে বলিয়া উঠিল —না, এটা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের ন্যায় বলা হইল না, এবার যুধিষ্ঠিরের যুধিষ্ঠিরত্ব বিনষ্ট হইল। কিন্তু যুধিষ্ঠির যদি রাজ্যলোভ ত্যাগ করিয়া, বনবাস বিস্মৃত হইয়া, অজ্ঞাতবাসের যন্ত্রণায় দৃক্‌পাত না করিয়া, ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর অপমান হৃদয়াভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিয়া, কেবল সত্য এবং ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া 'না' বলিতেন, তাহা হইলেই বা কি হইত? তাহা হইলে কি সমস্ত জগৎ সহস্রমুখে তাঁহার প্রশংসা করিত না, এবং দেবতারাও কি তাঁহার কার্য্যের বীরত্ব দেখিয়া জগতের অদ্বিতীয় ধর্ম্মবীর বলিয়া তাঁহার পূজা করিতেন না? তাহা হইলে আমরা কি সমস্ত মহাভারতের হৃদয়হারিণী আখ্যায়িকা তুচ্ছবোধে দূরে নিক্ষেপ করিয়া শুধু এই বীরত্বপূর্ণ 'না' শব্দটী লইয়া মাতিয়া থাকিতাম না? তাহা হইলে কি এই একাক্ষরনির্ম্মিত 'না' শব্দে আমরা সহস্র আখ্যায়িকার মনোহারিত্ব অনুভব করিতাম না? কিন্তু কেনই বা করিতাম? করিতাম, তাহার কারণ এই। যুধিষ্ঠিরকে সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মপুত্র বলিয়া জানি, এবং দেখিয়া আসিয়াছি; এবং তাই বলিয়াই তাঁহাকে পূজা করিয়া আসিয়াছি। এখন দেখি সেই সত্যনিষ্ঠা ঘোর বিপদ্গ্রস্ত। এখন দেখি সেই সত্যনিষ্ঠার ভয়ানক পরীক্ষা উপস্থিত। এখন দেখি একদিকে সত্যনিষ্ঠা এবং সর্ব্বনাশ, আর একদিকে একটিমাত্র মিথ্যাকথা, কিন্তু সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য, এবং হৃদয়ভেদী অপমানের প্রতিশোধ। কি ভয়ানক পরীক্ষা! কি ভয়ানক হৃদয়যুদ্ধ! মনে করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, ভাবিয়া দিশাহারা হইতে হয়। এ পরীক্ষায় কয়জন উত্তীর্ণ হইতে পারে, এ যুদ্ধে কয়জনের জয়লাভ হয়? কিন্তু যদি দেখি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, একেবারে ধর্ম্ম এবং সর্ব্বনাশকে আলিঙ্গন দিতেছেন, তখন কি মনে হয় না যে মর্ত্ত্যেই স্বর্গরাজ্য উদ্ভাসিত হইয়াছে? তখন কি উন্নতমন আরো উন্নত হয় না? তখন কি মনুষ্যপ্রকৃতিকে দেবপ্রকৃতিবোধে হৃদয় আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠে

না? এবং সে আহ্লাদই বা কি রকম আহ্লাদ? গভীর, নির্ম্মল, উৎসাহপূর্ণ, বিশ্বাসদায়ী, শক্তিসঞ্চারী, আত্মার গৌরব এবং মহিমাবৃদ্ধিকারী। সহস্র আরব্যোপন্যাস পড়িলে যে আহ্লাদ হয় সে আহ্লাদ এ আহ্লাদের দিকেও যায় না, এ আহ্লাদের শতাংশের একাংশ-পরিমাণও হয় না। এত আহ্লাদ কেন হয়? না ধর্ম্ম বিপদগ্রস্ত হইয়া আপন মহিমা রক্ষা করিল বলিয়া। মহাকবি সেক্সপীয়রের একটি চরিত্র বুঝিয়া দেখ। প্রিয়বন্ধু বাসানিয়র উপকারার্থে উদারচেতা এণ্টোনিয় সাইলকের নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়া একখানি খত লিখিয়া দিলেন। তাহাতে এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন যে, যদি তিনমাসের মধ্যে স্তুদসহিত টাকা পরিশোধ করিতে না পারেন তবে সাইলক তাঁহার শরীর হইতে অর্দ্ধসের মাংস কাটিয়া লইবেন। এণ্টোনিয় জানিতেন যে, সেই সময়ের মধ্যে তাঁহার বাণিজ্যপোতগুলি ধনপূর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিবে এবং তিনি অক্লেশে টাকা পরিশোধ করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু ঘটিল কি? নিরূপিত সময়ের মধ্যে বাণিজ্যপোত ফিরিল না। এবং নিষ্ঠুর সাইলক অঙ্গীকৃত মাংসখণ্ড পাইবার প্রার্থনায় রাজদ্বারে অভিযোগ করিল। বিচার আরম্ভ হইল। তখন উন্নতমনা উদারচেতা, পরদুঃখকাতর, পরোপকারী এণ্টোনিয় কি করিলেন? তিনি তখন যে অবস্থায় পড়িয়াছেন তাহাতে মহোন্নত মনও অবনত হইয়া পড়ে; উদার চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া যায়; পরদুঃখকাতরতা নিজদুঃখকাতরতায় বিলুপ্ত হয়; হৃদয় ফাটিয়া যায়; মন কেন্দ্রবর্জ্জিত গ্রহের ন্যায় অপরিচিত পথে ছুটিয়া বেড়ায়। তাঁহার সেই বিপদসঙ্কুল অবস্থা দেখিয়া স্বয়ং বিচারপতিই শোকসংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ, যাঁহাদের উপকারার্থ তিনি আজ মৃত্যুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার নিষ্ঠুর ঋণদাতার চরণ ধরিয়া করুণা ভিক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তিনি কি করিলেন? তিনি স্থিরচিত্তে দৃঢ়তাপূর্ণ অন্তঃকরণে বিচারপতিকে বলিলেন—

"I have heard,
Your grace hath ta'en great pains to qualify
His rigorous course: but since he stands obdurate,
And that no lawful means can carry me
Out of his envy's reach, I do oppose
My patience to his fury; and am arm'd
To suffer with a quietness of spirit,
The very tyranny and rage of his."

এই কি সেই ঐশ্বর্য্যশালী, সুখশয্যাশায়ী, প্রিয়বন্ধুবেষ্টিত, সস্মিতমুখ, প্রেমপূর্ণ এণ্টোনিয়? তাঁহার কথা শুনিয়া

ত তাহাই বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক আজ তিনি কি? বাস্তবিক আজ তিনি পথের ভিখারী; আজ তাঁহার সেই অতুল ঐশ্বর্য্য স্বপ্নে দৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে; আজ তিনি তাঁহার প্রফুল্লতাময়, করুণাজ্যোতিবিভূষিত, প্রীতিপূর্ণ, হাস্যময় গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছেন! তবুও তাঁহার এই রকম কথা? পাঠক! তুমি যাহাই মনে কর, আমি এই দেবতুল্য, উন্নতমনা বণিকরাজকে মনুষ্য মনে করিতে পারি না—আমি তাঁহাকে দেবতা মনে করি! সামান্য মনুষ্য হইলে আজিকার বিপদে কি তাঁহাকে পরোপকারব্রতে দৃঢ়ব্রতী হইয়া জীবনবিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর দেখিতাম, না আপনাকে আপনি ভুলিয়া, জন্মাবচ্ছিন্ন সংস্কার হারাইয়া, উন্নতনন কুঞ্চিত করিয়া, জীবনলালসায় ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে দেখিতাম? পাঠক! ইহাকেই প্রকৃত নাটকরহস্য বলে। প্রকৃত নাটককার ধর্ম্মের অবতারণা করেন; তাহার শক্তি, সৌন্দর্য্য, মহত্ব সকলই পাঠককে মনোহারিণী তুলিকা দিয়া আঁকিয়া আঁকিয়া দেখান; সেই বিমুগ্ধকর চিত্রেরদ্বারা পাঠকের মন মাতাইয়া তুলেন; তুলিয়া আবার সেই চিত্রটিকে ভীষণান্ধকারে নিক্ষেপ করেন; সে অন্ধকারের এমনি গুণ যে তাহার মধ্যে ধর্ম্মের গুণ স্বভাবতই মলিন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, শক্তি বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, মহত্ব হীনত্বে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। এই ঘোর অবস্থাবিপর্য্যয় দেখিয়া পাঠকের মন আকুলিত হইয়া উঠে; প্রিয়বস্তুর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পাঠকের মন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠে; ধর্ম্ম নিজ মহত্ব রক্ষা করিতে বুঝি বা অপারগ হয় এই আশঙ্কায় পাঠকের হৃদয় বিলোড়িত হইতে থাকে। ক্রমে অন্ধকার সরিতে থাকে; দেখা যায় যে ধর্ম্মজ্যোতিঃ মলিন হয় নাই, যেমন উজ্জ্বল ছিল তেমনি উজ্জ্বল আছে; বাহ্যজগৎ অন্তর্জ্জগতে চিহ্নমাত্র অঙ্কিত করিতে পারে নাই; স্বার্থজ্ঞান মাথা তুলিতে পারে নাই, নিঃস্বার্থ তেজোময় ধর্ম্ম নিঃস্বার্থ তেজোময়ই রহিয়াছে। তখন পাঠকের মন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বুঝিয়া বর্দ্ধিতবল হয় এবং নির্ম্মল, পবিত্র, স্বর্গীয় আনন্দজ্যোতিতে ভাসিতে থাকে এবং হাসিতে থাকে। একেই আমি বলি নাটকের নাটকত্ব। সকল নাটকের কথা বলিতেছি না। নাটকের শ্রেণীবিশেষের কথা বলিতেছি। সেক্ষপীয়রের Merchant of Venice এবং কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের নাটকত্ব কোথায় দেখা যাউক।

নাটকখানির নাম সত্বেও আমার মতে অভিজ্ঞানশকুন্তল একখানি নায়কপ্রধান নাটক। শকুন্তলা বড় কম নন; কিন্তু দুষ্মন্তই অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রধান চরিত্র। দেখা যাউক এই দুষ্মন্ত কে।

কোন একটি মনুষ্যের মন এবং হৃদয় বুঝিতে হইলে অগ্রে তাহার শরীরখানি বুঝিয়া দেখিতে হয়। মন এবং শরীর, এ দুইয়ে অতি নিকটসম্বন্ধ। মনের চিত্র শরীরে আঁকা থাকে। অধিকন্তু যাহার যে রকম মানসিক ভাব এবং রুচি তাহার শারীরিক কার্য্যসকলও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নির্জ্জনচিন্তাপ্রিয়, তাহার দেহের স্থির, ক্লিষ্ট, এবং সঙ্কুচিত ভাব হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উদ্যমপূর্ণ এবং কার্য্যপ্রিয় তাহার দেহের সজীব, চঞ্চল, ঈষদুগ্র, এবং বলিষ্ঠ ভাব হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়সেবানুরক্ত তাহার দেহের কোমল, অসহিষ্ণু এবং আলুলায়িত ভাব হইয়া থাকে। কালিদাস দুষ্মন্তকে ইন্দ্রিয়শাসনাধীন করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু সেই চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরের এবং শারীরিক কার্য্যানুরাগেরও একখানি চিত্র আমাদিগকে দিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে দুষ্মন্তকে দেখিয়া তাঁহার সেনাপতি মনে মনে ভাবিতেছেন—

অনবরত ধনুর্জ্জ্যাস্ফালনক্রূরকর্ম্মা
রবিকিরণসহিষ্ণুঃ স্বেদলেশৈরভিন্নঃ।
অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি॥

দুষ্মন্ত রাজা—ভারতের অতুলমহিমাসম্পন্ন চন্দ্রবংশীয় রাজাগণের মধ্যে এক জন প্রশান্তনামা রাজা। তিনি রত্নগর্ভা ভারতভূমির অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। ঐশ্বর্য্যসুলভ বিলাসরাশি মনে করিলেই তাঁহার হইতে পারে; কিন্তু তিনি বিলাসবিদ্বেষী। তিনি বীরোচিতকার্য্যনিরত। তিনি শারীরিক সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জ্যাসম্পন্ন ধনুকহস্তে প্রচণ্ড রবিকিরণে বীরের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন। বিলাসমগ্নের ন্যায় তাঁহার দেহ জীবনপ্রভাহীন শিথিলগ্রন্থি নয়। গিরিচর হস্তীর ন্যায় সে দেহ কেবলমাত্র বলব্যঞ্জক। এই ছবিখানি দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, চিত্রিত ব্যক্তি অসার বিলাসপ্রিয় বা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। এ কি একজন জিতেন্দ্রিয় পুরুষকারপূর্ণ পুরুষের ছবি নয়? আবার শুধু তা নয়। যখন সেনাপতি দুষ্মন্তকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহার শারীরিক বীরত্বাদের এইরূপ প্রশংসা করিতেছেন, তখন দুষ্মন্তের মানসিক অবস্থা কি? শকুন্তলারত্ন দেখিয়া তখন তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেছেন, সেই পবিত্র রত্ন তাঁহার হইবে কি না। বিদূষক আমাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, তিনি পূর্ব্বরাত্রে নিমেষমাত্র নিদ্রালাভ করেন নাই। এবং আমরাও তাঁহাকে মুহূর্ত্তাগ্রে শয়নগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় দেখিয়াছি, তিনি মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছেন—এবং আসিয়া প্রিয় বিদূষকের নালিশটি শুনিয়াও শুনিতেছেন না। আবার সেই মুহূর্ত্তেই ত সেনাপতি আসিলেন; কিন্তু তিনি ত এই বিষম হৃদয়ব্যথায় চিহ্নমাত্রও দুষ্ম-

ন্তের শরীরে বা মুখাবয়বে দেখিতে পাইলেন না। তবে ত দুষ্মন্ত শুধু কর্ম্মবীর নন। তবে ত তিনি কর্ম্মবীর এবং চিত্তবীর দুইই। তিনি যে শুধু প্রচণ্ড রবিকিরণ সহ্য করিতে পারেন তা নয়; চিত্তসংযমও তাঁহার তেমনি অভ্যস্ত এবং স্বেচ্ছাধীন। ফলতঃ কালিদাস এই অদ্ভুত চিত্তসংযমের চিত্র অতিশয় জাজ্জ্বল্যমান করিয়া তুলিয়াছেন। পাঠক! আইস, একবার মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখি। শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া আশ্রমের তরুলতায় জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন এবং কত কি কথা কহিতেছেন। দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া দেখিতেছেন এবং মুগ্ধ হইতেছেন। সর্ব্বলোকপ্রিয় ভ্রমরটী শকুন্তলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়া, দুষ্মন্ত মনে মনে ভাবিতেছেন—

যতোযতঃ ষট্‌চরণোঽভিবর্ত্ততে
ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা।
বিবর্ত্তিতভ্রূরিয়মদ্য শিক্ষতে
ভয়াদকামাঽপি হি দৃষ্টিবিভ্রমম্‌॥
চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করং ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী॥

এ বড় সহজ ভাব নয়। যে ভাবে ভোর হইলে মানুষ চিত্তসংযমে প্রায়ই বিফলযত্ন হয়, এ সেই ভাব। দুষ্মন্ত এখন সেই ভাবে ভোর। কিন্তু এখনি তাঁহাকে সেই সখীত্রয়ের সম্মুখীন হইতে হইল, শুধু তাও নয়। তাঁদের সুধাসিক্ত অনুরোধে তাঁহাদের কাছে বসিতে হইল। এমন অবস্থায় পড়িলে সে রকম ভাব ভরিয়া উঠে, না কমিয়া যায়? প্রিয়ম্বদা বলুক দুষ্মন্তের কি হইয়াছে—

"হলা অনসূএ কোণু ক্‌খু এসো চুরন-
গাহগম্ভীরাকিদী
মহুরং আলবস্তো পহুত্তদাক্‌খিণ্ণং বিত্থা-
রেদি।

ইন্দ্রিয়সন্তপ্ত ব্যক্তির কি এই রকম প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যপরিপূর্ণ মুখভাব হইয়া থাকে? ধন্য দুষ্মন্তের চিত্তসংযম, ধন্য তাঁহার আত্মজয়! এখনও কিন্তু দেখিবার বাকি আছে। পাঠক! অভিজ্ঞান শকুন্তলের তৃতীয় অঙ্কটি মনে কর। শকুন্তলা অসহ্য জ্বালায় জ্বলিয়া যাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে সেই মহাপুরুষকে না পাইলে আমি জীবনান্ত করিব। দুষ্মন্ত অনলপূর্ণ মনে এই সকল দেখিতেছেন এবং শুনিতেছেন, এত যাতনার পর মিলন হইল। কিন্তু মিলনের সুখাস্বাদ করিবার উদ্যমমাত্রে গুরুজনসমাগমাশঙ্কায় শকুন্তলাকে স্থানান্তরিত হইতে হইল। তখন দুষ্মন্তের কি অবস্থা! তখন তিনি প্রজ্বলিতান্তঃকরণে প্রতিনিঃশ্বাসে অনল খাসিয়া ফেলিতেছেন। সহসা রাক্ষসপীড়িত তাপসগণের ভয়ার্ত্তরব শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়াই—"ভো ভো তপস্বিনো মা ভৈষ্ট মা ভৈষ্ট অয়মহমাগত এব—" এই আশ্বাসবাক্য স্থিরগম্ভীরস্বরে উচ্চারণ

করিতে করিতে রাক্ষসবধে নিষ্ক্রান্ত হই-লেন। যেন শকুন্তলার নামও শুনেন নাই! যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই! আশ্চর্য্য পুরুষ!

এই অদ্ভুত ঘটনাটি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দুষ্মন্তচরিত্রের প্রশস্ত-ভিত্তি, অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত গভী-রতা বুঝিতে পারা যায়। তখন বুঝিতে পারা যায় যে ধর্ম্মানুরাগ এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞানই সেই অলৌকিক চরিত্রের মূল-ভিত্তি এবং প্রধান উপাদান। তখন বুঝিতে পারা যায় যে ধর্ম্মপালন এবং কর্ত্তব্যসাধনের কাছে দুষ্মন্তের বিবেচনায় আর কিছুই কিছু নয়—তিনি নিজেও কিছু নয়, তাঁহার শকুন্তলাও কিছু নয়, তাঁহার নিজের কিছুই কিছু নয়। তাঁহার ধর্ম্ম-ভাব তাঁহার প্রতিনিঃশ্বাসে সুমিষ্ট মৃদুমন্দ মলয়বায়ুর ন্যায় নির্গত হয়। ঋষিগণের সংরক্ষার্থ মৃগানুসরণে নিবৃত্ত হইয়া দুষ্মন্ত মহর্ষি কণ্বের পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করি-তেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"অয়ে শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ
　　　　বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্যাকং।
অথবা ভবিতব্যানাং ভবন্তি দ্বারাণি
　　　　　　　　　সর্ব্বত্র।"

অয়ে শান্তমিদমাশ্রমপদং—তিনটি কি চারিটি বই কথা নয়; কিন্তু শুনিলে প্রাণটি জুড়াইয়া যায়! মনে হয় যেন আমরাই সেই শান্তিরাজ্যে প্রবেশ করি-তেছি। মনে হয় যেন সেই পবিত্র শান্তিময় তপস্যাশ্রম এবং দুষ্মন্তের প্রশস্ত মন একই পদার্থ! আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই সখী-ত্রয়কে দেখিলেন—তাঁহারা তাপসোপ-যোগী-বল্কল-পরিধানা—মণিমুক্তা-বিহীনা—মহামূল্যবস্ত্র এবং অঙ্গরাগবর্জ্জিতা। দুষ্মন্ত রাজা; ভারতের মণিমাণিক্য সক-লই তাঁহার; তাঁহার অন্তঃপুর মণিমাণি-ক্যের জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়। তিনি একবার মনে করিলেন, এ ঠিক্ হয় নাই। মনে করিয়াই আবার ভাবি-লেন—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাং॥
কঠিনমপি মৃগাক্ষ্যা বল্কলং কান্তরূপং
ন মনসি রুচিভঙ্গং স্বল্পমপ্যাদধাতি।
বিকচসরসিজায়াঃ স্তোকনির্ম্মুক্তকণ্ঠং
নিজমিব কমলিন্যাঃ কর্কশং বৃন্তজালং॥

কি মনোহর ভাব! কিবা সুরুচিসঙ্গত কল্পনা! কি ন্যায়পরায়ণ হৃদয়! সৌন্দর্য্য নিজেই সুন্দর—তাহার আবার পরিচ্ছদ পারিপাট্য কি? এ কথা কয়জনের মুখে শুনা যায়? এ কথা যে না বলে, সে সৌন্দর্য্যের অবমাননা করে। এ কথা যে বলে সে সৌন্দর্য্যের যাহা প্রাপ্য তাহা সৌন্দর্য্যকে দেয়; তাহারই রুচি যথার্থ ধর্ম্মমূলক; সেই সৌন্দর্য্যের সুন্দর রূপ ব্যবহার করিতে সক্ষম হয়। দুষ্মন্ত একজন হিন্দুরাজা; হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ ভক্তি। আশ্রমপ্রবেশকালে তাঁ-হার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইল এবং

তিনি কিন্তু বলিয়া তাহাতে ভবিতব্যতার কথা মনে করিলেন। পরক্ষণেই যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মতন শাস্ত্রভক্তের মনে সহজেই এমন ভাব জন্মিতে পারে যে বুঝি সেই ভবিতব্যতার সূত্রপাত হইতেছে। আবার শুধু দেখা নয়। যাহা শুনিলেন তাহাও সেই ভবিতব্যতার প্রতিপোষক। যাহা শুনিলেন তাহাতে বুঝিলেন যে শকুন্তলা তপস্বিনীর ন্যায় কাল কাটাইবেন না। তখন মনোধর্ম্ম* তাঁহার ধর্ম্মসংস্কারকে দৃঢ়ীভূত করিয়া তুলিল এবং ধর্ম্মসংস্কার মনোধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিতে লাগিল। তখন তাঁহার স্পৃহা জন্মিয়া ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল। কিন্তু সে স্পৃহা এখনও মিলনস্পৃহারূপে পরিস্ফুট হয় নাই। কেবল সৌন্দর্য্য বোধেই নিহিত রহিয়াছে। দুষ্মন্ত ভাবিতেছেন—

"অবিতথ মাহ প্রিয়ম্বদা। তথাহ্যস্যাঃ—
অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহু।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥

তার পরেই শ[illegible] শকুন্তলা [illegible] বৃক্ষাশ্রিতা কুসু[illegible] [illegible]টিকে দেখিয়া বলিতেছেন—

[illegible] রমণীও কথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কুসুমাভরণা [illegible] অবংপি বহু কলদাএ উজভোঅক্খমো সহআরো।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া গেল; রুচিতে রুচিতে মিলিয়া গেল; ভাবে ভাবে মিলিয়া গেল। কিন্তু একটি বিষয়ে মিল হইল না। শকুন্তলা সহকারলতাটীর আশ্রয়লাভের কথা বলিয়াছিলেন; দুষ্মন্ত শকুন্তলার সম্বন্ধে সেটী এখনও বলেন নাই এবং বলিতেও পারেন নাই। দুষ্ট প্রিয়ম্বদা সেই অভাবটি পুরাইয়া দিল। দুষ্মন্ত বুঝিলেন যে শকুন্তলা অভিলাষবতী হইয়াছেন। কিন্তু তিনি আহ্লাদে আটখানা না হইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভাবিতে লাগিলেন বুঝি শকুন্তলা কণ্বদুহিতা—ব্রাহ্মণী, তাঁহার সহিত শকুন্তলার মিলন হইতে পারিবেক না। যেমন অভিলাষ বলবতী হইয়া উঠিল অমনি ধার্ম্মিকের ধর্ম্মচিন্তা উদয় হইল। এইখানে সুচতুর মহাকবি জগদ্বিখ্যাত ভ্রমর-তাড়না ঘটনাটী সংযোজনা করিলেন। সে ঘটনাটীর অর্থ—শারীরিক মিলন, শারীরিক সম্ভোগ। অভিলাষীর মনকে মাতাইয়া তুলিতে হইলে ইহার অপেক্ষা সুরুচিসঙ্গত অথচ বলবৎ কৌশল অবলম্বন করা যায় কি না সন্দেহ। দুষ্মন্তের বিচলিত মন আরো বিচলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলার জাতি এবং উৎপত্তিবিষয়ক সন্দেহ আরো বলবৎ হইয়া উঠিতেছে। বোধ হয় দুষ্মন্তের ধর্ম্মানুরাগ এবং

* অনুরাগোৎপাদক বস্তু দেখিয়া মনে অনুরাগের সঞ্চার হওয়া অর্থে মনোধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিলাম।

আত্মসংযম শক্তি কম হইলে সেই দণ্ডেই পবিত্র তপস্যাশ্রম কলুষিত হইয়া যাইত। তার পর সকলের একত্রে বসিয়া কথোপকথন। তখন দুষ্মন্ত শকুন্তলার বৃত্তান্ত শুনিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে কণ্বের অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। জানিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভার মোচন হইয়া গিয়াছে। তিনি তখন সাহস পাইয়াছেন; তাঁহার হৃদয় বুঝিয়াছে যে—

আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্।

এমন সময় প্রিয়ম্বদার কথায় শকুন্তলা রাগ করিয়া, 'সব বলিয়া দিব' বলিয়া গৌতমীর কাছে যাইতে উদ্যত হইলেন। দুষ্মন্তের হৃদয় আকুলিত হইয়া শকুন্তলাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে বলিয়া যেন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই তখনি আবার সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—

অহো চেষ্টাপ্রতিরূপিণী কামিজনচিত্তবৃত্তিঃ।
অহং হি।
অনুযাস্যন্মুনিতনয়াং সহসা বিনয়েন
বারিতপ্রসরঃ।
স্বস্থানাদচলন্নপি গত্বেব পুনঃ প্রতি-
নিবৃত্তঃ।

দুষ্মন্ত শকুন্তলার মন বুঝিয়া থাকুন আর নাই থাকুন, শকুন্তলার উপর এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন অধিকার জন্মে নাই। তিনি গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার কে? যে রকম কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শকুন্তলাকে চক্ষের আড়াল করিতে ইচ্ছা হয় না বটে, কেন না দেখিয়া শুনিয়া হৃদয় ভয়ানক আবেগবান্ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে হৃদয় তাঁহার; শকুন্তলার ত নয়। দুষ্মন্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন—দুষ্মন্ত প্রকৃত উন্নতমনা—দুষ্মন্ত ধর্ম্মবীর। তাঁহার হৃদয়ের বল্গা তাঁহারই হাতে। সেই হৃদয়ের অশিষ্ট উদ্যম সেই হৃদয়েই নিঃশেষিত হইয়া গেল! পানথেকে চূণটুকুও খসিল না। ধন্য দুষ্মন্ত! ধন্য কালিদাস!

তার পর বিদূষকের সহিত কথা। সেকালের বিদূষক সেকালের রাজাদের 'ইয়ার'। রাজাদিগকে সর্ব্বদাই রাজঠাটে থাকিতে হইত; মনের কথা সকলের কাছে বলিতে পারিতেন না। কিন্তু বিদূষকের কাছে ঠাটভাট থাকিত না; প্রাণের কথা প্রাণ ভরিয়া বলিতেন। মাধব্য দুষ্মন্তকে যেন কিঞ্চিৎ জ্ঞান দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—

ভো জঙ্গমা তবস্সিকণ্ণআ অপত্তুত্থণীআ
তা কিং তাএ দিট্‌ঠআএ।

অমনি দুষ্মন্ত যেন বিষধরদংশিতের ন্যায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

মূর্খ!
নিবারিত নিমেষাভির্নেত্রপংক্তিভিরুন্মুখঃ।
নবামিন্দুকলাং লোকঃ কেন ভাবেন
পশ্যতি॥
ন চ পরিহার্য্যে বস্তুনি দুষ্মন্তস্য মনঃ
প্রবর্ত্ততে॥

তার পর রাজা পূর্ব্বদিনের সকল কথা মাধব্যকে বলিলেন। বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বল দেখি, মাধব্য, কি অছিলা করিয়া সেই আশ্রমে যাই। মাধব্য বলিলেন কেন, আমার প্রাপ্য ষষ্ঠাংশ চাই, এই বলিয়া যাও। দুষ্মন্ত ক্রুদ্ধগম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

মূর্খ! অন্যমেব ভাগধেয়মেতে তপস্বিনো
মে নির্ব্বপন্তি যো রত্নরাশীনপি বিহায়া-
ঽভিনন্দ্যতে। পশ্য—
যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম্।
তপঃ ষড়্ভাগমক্ষয্যং দদত্যারণ্যকা
হি নঃ॥

কি গম্ভীর, কি দুর্জ্জয় ধর্ম্মভাব! কি মনোহর ধর্ম্মানুরাগ! যে শকুন্তলার নিমিত্ত হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, সে শকুন্তলাও এই ধর্ম্মানুরাগের কাছে কিছুই নয়! শকুন্তলা যতই কেন প্রিয়া হউন না, তা বলিয়া কি তাঁহার জন্য পবিত্র ধর্ম্মের অবমাননা করিতে হইবেক? তা বলিয়া কি ধর্ম্মকে প্রেমের কুটিলকৌশলে পরিণত করিয়া সুখাস্পদ করিতে হইবেক? বিদূষকের কাছেও এ কথা বলিতে দুষ্মন্তের ঘৃণা হয়!

তার পর কয়েকজন তপস্বী আসিয়া দুষ্মন্তকে রাক্ষসকর্ত্তৃক আশ্রমপীড়ার সম্বাদ দিলেন। দুষ্মন্ত তাঁহাদিগকে অভয় দান করিয়া রথসজ্জা করিবার আজ্ঞা দিলেন; রথ সজ্জিত হইল। এমন সময়ে রাজধানী হইতে মাতৃআজ্ঞা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারই কল্যাণার্থ রাজমাতা ব্রত করিবেন, অতএব তাঁহাকে যাইতে হইবেক। দুষ্মন্ত সঙ্কটে পড়িলেন। ঋষিগণও যেমন মাননীয়, রাজমাতাও তেমনি মাননীয়া। "ইতস্তপস্বিনাং কার্য্যমিতো গুরুজনাজ্ঞা উভয়মনতিক্রমণীয়ং।" তিনি জানিতেন যে রাজমাতা মাধব্যকে বরাবর পুত্রবৎ ভালবাসেন। অতএব স্নেহ এবং ভক্তিপূর্ণ মনে মাধব্যকে রাজমাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কবি একটি কৌশলে তাঁহার আখ্যায়িকার একটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করিলেন এবং তাঁহার দুষ্মন্ত যে কাহারও প্রতি কর্ত্তব্যবিমুখ নন, তাহাও সুন্দররূপে দেখাইয়া দিলেন।

দুষ্মন্ত রাজা। কিন্তু কালিদাস কি তাঁহার রাজকার্য্যের কথা কিছুই বলেন নাই। সে কথাটি না জানিলে ত কিছুই জানা হইল না। তিনি মুনিঋষিকে সম্ভ্রম করিয়া থাকেন; পিতামাতার ন্যায় গুরুজনকে ভালবাসেন এবং সম্মান করেন; তিনি চিত্তসংযমে অজিতবল; ধর্ম্মসেবায় একাগ্রচিত্ত; প্রণয়ে বিশুদ্ধমনা; শত্রুনাশে অসীমবিক্রম; শরীরপালনে কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু তিনি রাজকার্য্যে কিরূপ? কালিদাস তাহাও আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যে প্রণালীতে বলিয়াছেন সেটি কি চমৎকার! কঞ্চুকী পার্ব্বতায়ন,অক্ষয়নামা নিবারমন্ত্রী তাহাদের ন্যায়, রাজসরকারে থাকিয়া বৃদ্ধ হইয়াছেন। যে যষ্টি যৌবনে কেবল তাঁহার উচ্চ পদবীর চিহ্নস্বরূপ ছিল,

সেই যষ্টি এখন তাঁহার অন্ধের নড়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যষ্টির সাহায্য ব্যতিরেকে এখন তিনি পদসঞ্চালনে অক্ষম। তিনি যে শুধু দুষ্মন্তকে দেখিতেছেন এমত নয়। দুষ্মন্তের পিতা, পিতামহ হয় ত প্রপিতামহকেও দেখিয়াছেন। দুষ্মন্ত তাঁহার কাছে 'কালিকার ছেলে' বই নয়। শার্ঙ্গরব প্রভৃতি রাজপ্রাসাদে আসিয়া রাজদর্শনের প্রার্থনা জানাইয়াছেন শুনিয়া বৃদ্ধ বহুদর্শী কঞ্চুকী ভাবিতেছেন—যে প্রজাবৎসল নরপতি রাজকার্য্যকরত পরিশ্রান্ত হইয়া এইমাত্র অবকাশলাভ করিলেন, আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে এখনি ঋষিকুমারদিগের আগমনসম্বাদ দিব। কি স্নেহ! পিতাও সন্তানের ক্লেশে এতদূর কাতরতা প্রকাশ করেন কি না সন্দেহ। দুষ্মন্তের প্রজাপালনকার্য্যানুরাগের ইহার অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু কবি ইহার অপেক্ষাও হৃদয়গ্রাহী প্রমাণ দিয়াছেন। বৃদ্ধ কঞ্চুকী একবারমাত্র স্নেহাকৃষ্ট হইয়া পরক্ষণেই সুদৃঢ়চিত্তে বলিতেছেন—

"অথবা কুতো বিশ্রামো লোকপালানাং।"

তিনি কি রকম রাজা যাঁহার কর্ম্মচারীর এত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—এত রাজনীতিপ্রিয়তা—এত সাহস ও দৃঢ়তাপূর্ণ মন? কঞ্চুকী, তুমি যথার্থই অনুপম রাজার অনুপম কর্ম্মচারী! বৃদ্ধবর! তুমি দুষ্মন্তকে 'কচি ছেলে' বলিয়া 'মাপ' করিবার লোক নহ। তুমি যখন দুষ্মন্তকে এত ভালবাস, তখন দুষ্মন্ত যথার্থই সমস্ত জগতের ভালবাসার পাত্র এবং পৃথিবীর রাজাদিগের আদর্শস্থল।

দুষ্মন্ত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শকুন্তলা দুর্ব্বাসাকর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইলেন। অবশিষ্ট আখ্যায়িকাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবেক। শাপোচ্চারণ হইতে অঙ্গুরীয়ক পুনঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত একভাগ; অঙ্গুরীয়ক পুনঃপ্রাপ্তি হইতে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনর্ম্মিলন পর্য্যন্ত আর একভাগ। কি জন্য এইরূপ ভাগ করিতে হইল, বুঝাইতেছি।

দুর্ব্বাসা বলিয়াছিলেন যে, দুষ্মন্তপ্রদত্ত নিদর্শনটি দেখিলে তাঁহার শকুন্তলাকে মনে পড়িবে, নতুবা মনে পড়িবে না। শকুন্তলা সেই নিদর্শনাঙ্গুরীয়ক হারাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু জানেন না যে হারাইয়াছেন। এ ঘটনার যে কি চমৎকার অর্থ তাহা পরে বলিব, এখন নয়। অঙ্গুরীয়ক হারাইয়া শকুন্তলা তাঁহার পবিত্র বিশ্বমনোমুগ্ধকারী রূপরাশি লইয়া দুষ্মন্তের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পাঠক! তোমাকে এইখানে একবার সেই বল্কলপরিধানা, কুসুমিতযৌবনা, পবিত্রনয়না, লতামৃগানুরাগিণী, আশ্রমবাসিনী তাপসবালার রূপরাশি মনে করিতে হইবেক। যে রূপরাশি দেখিয়া ধর্ম্মবীর দুষ্মন্ত সেদিন দুর্নিবারশরবিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই রূপরাশি একবার

মনে করিতে হইবেক। সেই রূপরাশি এখনও সেই দুষ্মন্তের নয়ন মন বিমুগ্ধ করিতেছে।

"অয়ে অত্র।
কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীর-
লাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডু
পত্রাণাম্॥"

তবে কেন তিনি এখন সেই রূপরাশি-সম্পন্না শকুন্তলাকে অস্পর্শনীয়া বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছেন? শাপপ্রভাবে তিনি শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু যে চক্ষু সেদিন শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার মনকে উন্মত্ত করিয়াছিল, আজও ত তাঁহার সেই চক্ষু, সেই মন রহিয়াছে। তবে কেন আজ শকুন্তলা তাঁহার কাছে কৌশলকুটিলা অস্পর্শনীয়া কলঙ্কিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন? কৈ, সেখানে আর যাহারা আছে তাহারা ত অবিচলিতচিত্ত নয়। প্রতীহারী শকুন্তলার অবগুণ্ঠনমুক্ত রূপরাশি দেখিয়া ভাবিতেছে—

অহো ধম্মাবেক্‌খিণো ভট্টিণো ঈদিসং
নাম সুহোবণদং ইত্থিআরঅণং
পেক্‌খিঅ কো অন্নো বিআরেদি।

দুষ্মন্তও সেই রূপরাশি দেখিয়া মুগ্ধ—

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যধ্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব নিশান্তে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন খলু সপদি ভোক্তুং নাপি শক্লোমি
মোক্তুম্।

তিনি মনে মনে অনেক ভাবিয়া দেখিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে হইল না যে শকুন্তলা তাঁহার। তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন কোমলতাময়ী শকুন্তলা চরণদলিত ফণিনীর ন্যায় বিষময় বাক্যে তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিলেন; তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ঋষিকুমারদ্বয় তাঁহার উপর শাপাগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঋষিকোপানল যে কি ভয়ানক পদার্থ দুষ্মন্ত তাহা বিলক্ষণ জানেন। তিনি নিজেই সেদিন মাধব্যকে বলিয়াছেন—

শমপ্রধানেষু তপোধনেষু
গূঢ়ং হি দাহাত্মক মস্তি তেজঃ।
স্পর্শানুকূলা অপি সূর্য্যকান্তা-
স্তে হন্য তেজোঽভিভবাদ্বমন্তি॥

আজ সেই গূঢ়দাহক অনল প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাকেই দগ্ধ করিতে আসিতেছে। কিন্তু আজ তিনি সে কোপানলকে ভয় করিতেছেন না। কেন, তিনি কি আর সে দুষ্মন্ত নন? তাঁহার চিরাভ্যস্ত গুরুজন-গতভীতিসম্ভ্রম সকলই কি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? তা নয়। সে সকলই তাঁহার আছে; কিন্তু গুরুজন আজ তাঁহাকে ধর্ম্মের বিপর্য্যয় করিতে বলিতেছেন। গুরুজন আজ তাঁহাকে পরস্ত্রী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মবীর; তিনি ভাবিতেছেন, যেখানে ধর্ম্মের বিপর্য্যয় সেখানে ভুবনমোহিনী রমণীও তুচ্ছ, অগ্নিপ্রভ মহা ঋষিও তুচ্ছ। কি ধর্ম্মানুরাগ! কি চিত্তসংযম! অতুল

রূপরাশি তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। লইলে, কেহই তাঁহার কিছু করিতে পারে না, কেহই তাঁহাকে কিছু বলিতে পারে না। দূষিতচিত্ত হইলে তিনিও লইতেন। প্রতীহারী যথার্থই বলিয়াছিল—

অম্মো ধম্মাবেক্খিণো ভট্টিণো ঈদিসং
নাম সুহোপণদং
ইত্থিআরঅণং পেক্খিঅ কো অন্নো
বিআরেদি।

দুষ্মন্তের প্রথম পরীক্ষা শেষ হইল। সে পরীক্ষায় তিনি জয়ী হইলেন। সেই জয়ে কালিদাসেরও জয়। কালিদাস ভারতের ব্রাহ্মণ। ভারতের ব্রাহ্মণ হইয়া তিনি দেখাইলেন যে ধর্ম্মের কাছে ভারতের ঋষিতপস্বীও কিছু নয়। কালিদাস, তুমি ভারতের ব্রাহ্মণ নও—তুমি জগতের ব্রাহ্মণ!

দুষ্মন্ত পুনরায় নিদর্শনাঙ্গুরীয়কটী দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার সকল কথা মনে পড়িল। তখন আর একপ্রকার পরীক্ষা আরম্ভ হইল; কিন্তু এ পরীক্ষাও বড় সহজ পরীক্ষা নয়। শকুন্তলার কথা মনে হইয়া তাঁহার মন অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। যে রকম নিষ্ঠুরভাবে তিনি শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া, তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার জীবন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিল। দিবারাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার শান্তি নাই। তিনি সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত চুলীর ন্যায় অনুতাপানলে সন্তপ্ত। তাঁহার স্বাভাবিক আমোদ আহ্লাদ আর তাঁহাকে ভাল লাগে না। তিনি বসন্তোৎসব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। রাজভক্ত রাজমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কঞ্চুকীর ন্যায় রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতিও যেন অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বৃদ্ধ কঞ্চুকী যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইতেছেন—

রম্যং দ্বেষ্টি যথাপুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং
সেব্যতে
শয্যোপান্তবিবর্ত্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব
ক্ষপাঃ।
দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়া-
বনম্রশ্চিরম্॥

ভাবিয়া ভাবিয়া দুষ্মন্তের শরীর কৃশ হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার গম্ভীর প্রভাময় মুখ শুকাইয়া গিয়াছে; তাঁহার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। দেখিলে মনে হয় দুষ্মন্ত আর সে দুষ্মন্ত নাই! সেই পবিত্র আশ্রমে দুষ্মন্ত যেমন তাঁহার শকুন্তলার যন্ত্রণাদগ্ধ দেহখানি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, আজ বৃদ্ধ কঞ্চুকী দুষ্মন্তের অনুতাপদগ্ধ দেহযষ্টি দেখিতে দেখিতে পুত্রবৎসল পিতার ন্যায় কাতর মনে ঠিক তেমনি বলিতেছেন—

প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধির্বামপ্রকোষ্ঠে
শ্লথং
বিভ্রৎকাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসো-
পরক্তাধরঃ।

চিন্তাজাগরণপ্রতাম্রনয়নস্তেজোগুণৈরাত্মনঃ
সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণোঽপি নালক্ষ্যতে ॥

এই শোচনীয় অবস্থায় আজ দুষ্মন্ত রাজোদ্যানে গভীর চিন্তানিমগ্ন। বৃদ্ধ কঞ্চুকী সকলই জানেন, সকলই বুঝেন। কিন্তু আজ পুরুবংশের দুর্দ্দিন দেখিয়া, অসংখ্য ভারতবাসীর দুর্দ্দিন দেখিয়া, ভয়াকুলিত-বাৎসল্যপূর্ণ মনে তিনি ভাবিতেছেন—বুঝি একটু 'খেলাধূলা' করিলে দুষ্মন্ত কিছু 'আনমন' হইবেন। এই মনে করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বিলাসভূমিতে যাইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। অশীতিবর্ষীয় পলিতকেশ কুলকর্ম্মচারীর মুখে এ রকম কথা শুনিলে, বিরহকাতর যুবা পুরুষের কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইবার কথা। বোধ হয় সেই জন্য বৃদ্ধ কঞ্চুকীকে কিছু না বলিয়া, দুষ্মন্ত বেত্রবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

বেত্রবতি! মদ্বচনাদমাত্যাপিশুনং ব্রূহি অদ্য চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিতমস্মাভির্ধর্ম্মাসন মধ্যাসিতুং যৎ প্রত্যবেক্ষিতমার্য্যেণ পৌরকার্য্যং তৎ পত্রমারোপ্য প্রস্থাপ্যতামিতি।

এত যাতনায়, এত সন্তাপেও দুষ্মন্ত রাজকার্য্য ভুলেন নাই। এত ক্লিষ্ট মনেও তাঁহার বিচারকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার ইচ্ছা কত বলবতী! এত অনলদগ্ধ হইয়াও দুষ্মন্ত অঙ্গারাবশেষ হন নাই!

তার পর সেই মনপ্রাণহারী চিত্র দর্শন চিত্র দেখিতে দেখিতে দুষ্মন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। চিত্রিত শকুন্তলাকে তাঁহার জীবনময়ী শকুন্তলা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চিত্রিত ভ্রমরটীকে সেই আশ্রমদৃষ্ট ভ্রমর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি আপনাকে আপনি ভুলিয়া গেলেন। তিনি স্থানজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন; তিনি কালজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে বেত্রবতী আসিয়া তাঁহাকে রাজকার্য্যের সম্বাদ দিলেন। অমনি, যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই, এইরূপ স্থিরগম্ভীর ভাবে তিনি কাগজপত্রগুলি পাঠ করিয়া প্রধানামাত্যের ভ্রমসংশোধন করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বিচার করিয়া দিলেন। শুধু তা নয়। সেই অপুত্রক মৃত বণিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব নিরূপণোপলক্ষে তিনি সমস্ত প্রজাগণের মঙ্গলার্থে স্নেহবান্ পিতার ন্যায় এই স্নেহপূর্ণ আজ্ঞা প্রচার করিলেন—

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্॥

আজ্ঞা লইয়া বেত্রবতী চলিয়া গেলেন। তখন দুষ্মন্তের অপুত্রকাবস্থা স্মরণ হইল। স্মরণ করিয়া তাঁহার মন পূর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিল। দুষ্মন্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং ধর্ম্মভীরু। তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের কথা মনে পড়িল। তাঁহাদের পবিত্রাত্মার শোচনীয় পরিণাম মনে হইল। তিনি যন্ত্রণাবিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছি-

ন্তের ন্যায় ভূতলশায়ী হইলেন! অসহ্য শকুন্তলাচিন্তাও সেই গিরিচরগজবৎ বলশার দেহস্তম্ভকে ভূতলশায়ী করিতে পারে নাই! এই পতনেই দুষ্মন্তের দুষ্মন্তত্ব দেদীপ্যমান!

মূর্চ্ছিতপ্রায় পড়িয়া আছেন, এমন সময় বিপদের ভয়ার্ত্তরব শ্রুত হইল। অমনি কর্ম্মবীর দুষ্মন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আর তাঁহার শকুন্তলাচিন্তা নাই। আর তাঁহার শকুন্তলাচিন্তাজনিত শারীরিক দুর্ব্বলতাও নাই। এখন তিনি যে দুষ্মন্ত সেই দুষ্মন্ত! বিপরীত বিক্রম সহকারে তিনি ধনুর্ব্বাণ সাপটিয়া লইলেন। নিমেষমধ্যে সকল কথা অবগত হইয়া দেবতাদিগের সাহায্যার্থ পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া অসুরনাশে শূন্যপথে উঠিলেন।

পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখ, এখন দুষ্মন্তের কি ভয়ানক অবস্থা। তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ। তিনি পরিণীতা ভার্য্যাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কি অবিচার, কি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহা তিনিই বুঝিতেছেন। তাহাতে আবার জানেন যে সেই নিরপরাধা এখন মর্ত্তলোকে নাই। আর যে কখন তাঁহাকে পাইবেন, সে আশাও এখন তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, এবং সেই জন্যই তিনি পিতৃপুরুষদিগের পরিণাম ভাবিয়া এত ব্যাকুল হইয়াছেন। এখন তিনি শুধু অনুতাপদগ্ধ নন। যে আশার বলে লোকে দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে, সে আশাও তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। মহাকবি মিল্টন নরকবর্ণন করিতে করিতে বলিয়াছেন যে সেখানে—

"Hope never comes that comes to all,
But torture without end."

এখন দুষ্মন্তের হৃদয়ও আশাশূন্য অনন্ত যন্ত্রণাগার! কিন্তু অসুরবধে আহূত হইবা মাত্র তিনি যেন সে সকলই ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গিয়া আগ্রহাতিশয়সহকারে যুদ্ধসজ্জা করিলেন। করিয়া বিদূষককে বলিলেন—

"বয়স্য অনতিক্রমণীয়া দিবস্পতেরাজ্ঞা
তদগচ্ছ পরিগতার্থং
কৃত্বা মদ্বচনাদমাত্যপিশুনং ব্রূহি।
ত্বন্মতিঃ কেবলা তাবৎ প্রতিপালয়তু
প্রজাঃ।
অধিজ্যমিদমন্যস্মিন্ কর্ম্মণি ব্যাপৃতং
ধনুঃ॥"

বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দুষ্মন্ত নিজের সুখ দুঃখ সকলই ভুলিতে পারেন কিন্তু যে কোটি কোটি হৃদয়ের সুখদুঃখ অনতিক্রমণীয় নিয়তির বলে তাঁহার হস্তে ন্যস্ত, তাহাদের সুখদুঃখ ভুলিতে তিনি নিতান্তই অক্ষম। মহাকবি দুষ্মন্তকে সামান্য মনুষ্যের ন্যায় মহাপরীক্ষায় প্রবিষ্ট করিয়া অতুলজ্যোতিঃ দেবতার ন্যায় উত্তীর্ণ করাইলেন! ইহাকেই বলে নাটকের নাটকত্ব। এই একরকম দেখা রহিল।

এত কাঁদি তবু কেন না জুড়ায় প্রাণ রে ?

১

এত কাঁদি তবু কেন না জুড়ায় প্রাণ রে ?
সেই মন সেই আশা,
আজো বুকে সে পিপাসা,
এ যাতনা তবে কিরে ফুরাবে না জীবনে?
জীবধর্ম্ম পরিহরি,
তাপসের ভাব ধরি,
দুখের জীবন মোর ফুরাবে কি রোদনে?
যথা বায়ু-অভিঘাত,
নিবিড় কানন-জাত,
বিশুষ্ক প্রসূন-দল ঝরায় রে বিজনে,
সাধের সঞ্চিত আশা,
বুকভরা ভালবাসা,
এ শুষ্ক জীবনে মোর ঝরিবে কি তেমনে?

২

কেঁদে যেন উঠে প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া,
জীবনের দুই তীর গেছে যেন ভাঙ্গিয়া;
ধূধূ করে চারিধার,
শূন্য যেন এ সংসার,
হাসি, খেলি সে যাতনা তবু উঠে জাগিয়া,
আশা নাই, তবু সে যে প্রাণে আছে মিশিয়া

৩

এ কি পুরুষের মন—সুখের নিলয়!
এ কি জীবনের ব্রত—জীবন আশ্রয়!
হেরি কুহকের ছায়া,
স্মরি স্বপনের মায়া,
শিশুর বাসনা-সম আশা উথলায়,
এতই দুর্ব্বল কিরে মানব-হৃদয়।

৪

সকলি বুঝেছি—তবু পারি না যে ভুলিতে,
জড়ান যাতনা চিতে নাহি পারি খুলিতে,
হৃদয়ে সে ছবি আঁকা,
নয়নে সে রূপ মাখা,
শয়নে, স্বপনে সে যে—ভাবনা, সে স্মৃতিতে;
এ পরাণে তার আশা পারি না যে ত্যজিতে

৫

দুখ পাই—পাব দুখ, তবু তারে ভাবিব,
আঁখি পোড়ে—পুড়ে যাক্, তবু তারে হেরিব
এই বিষাদের রাশি,
আমি বড় ভালবাসি,
এ জীবনে চিরদিন তারি দুখে কাঁদিব।
অন্তিমে তাহারি দুখে দু নয়ন মুদিব।

৬

এ ভাবে সংসারে থাকি হবে না সে সাধনা,
মায়া-মোহ-মহডোরে ভুলে যাব যাতনা;
উদাসীন-বেশ ধরি,
তারি ছবি বুকে করি,
পথে ঘাটে হাটে মাঠে গাহিব এ বেদনা,
গৃহ-কারাগারে থাকি সব না রে যন্ত্রণা।

৭

সাধের সংসার হেথা সকলি যে ছলনা,
আত্মপর ভালবাসা যদি স্বার্থ গণনা;
আমি ভাসি অশ্রুজলে,
লোকেতে পাগল বলে,
বুঝাইলে নাহি বুঝে মরমের যাতনা;
জগতে সমদুঃখী, দুঃখী হেথা পায় না।

৮

সে ধন পাবার নয়—সে আমার হবে না,
এ দুখ সবার নয়—এ জীবনো রবে না,
সে কদিন বেঁচে রই,
তারি দুখে কেঁদে লই,
মরিলে এ আশা তৃষ্ণা কিছুই ত রবে না,
এ ভগ্ন জীবনে আর অন্ত সাধো হবে না।

৯

কি সুক্ষণে মুগ্ধনেত্রে দেখেছিনু তাহারে,
কি কুক্ষণে ভালবাসা দিল না সে আমারে।
হায় লো বজ্রময়ী,
রমণী কি দয়াময়ী!
একটী আশ্বাসবাণী একটী আখরে,
এত যাতনায় নাহি ফুটিল অধরে!

১০

সেত নাহি দিল আশা—আমি কি তা ছাড়িব
সে বাসনা চিরদিন বুকভরে রাখিব।
করিব তাহারি ধ্যান,
গাহিব তাহারি গান,
দিয়াছি পরাণ তারে—তারি তরে রাখিব;
জন্মান্তরে দেখা হলে তারি হাতে সঁপিব।

১১

বিধাতঃ রে! এত রূপ কেন দিলি তাহারে?
এত সুধা কেন বিধে! গরলের মাঝারে?
সে না রমণীর মণি?
সেনা পীযূষের খনি?
(তবে)কেন সে অমিয়-সর পাষাণের প্রাকারে
বজ্রময় বক্ষ কেন চন্দ্রমার আকারে?

১২

আর মিছে তার আশে রহি পাপ ভুবনে,
এ ভবের খেলা-ধূলা ফুরাল এ জীবনে।
প্রণয়ের পুরস্কার,
থাকে যদি অভাগার,
এ রোদন পশে যদি বিধাতার শ্রবণে,?
জন্মান্তরে পাইব রে সে রমণী-রতনে।

দ্বিতীয়বার বিবাহ।

আমাদের এই প্রস্তাবটী দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, বিধবার বিবাহ, দ্বিতীয় মৃতপত্নীকব্যক্তির দারান্তরপরিগ্রহ। পত্নী জীবিতাসত্ত্বেও পুরুষের অন্যস্ত্রী গ্রহণ করা যে যুক্তিসঙ্গত নহে তাহা আজ কাল প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং এস্থলে সে বিষয়ে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। সর্ব্বপ্রথমে আমরা বিধবা-বিবাহসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

আজ কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধিকাংশেরই মত যে কোন্ কার্য্য ভাল, কোন্ কার্য্য মন্দ নির্ব্বাচন করিতে হইলে "ব্যবহারোপযোগিতার" অনুসরণ করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ তাহাতে সমাজের উপকার কিম্বা অপকার হয় তাহাই

দেখা উচিত। যে নিয়ম সমাজস্থ অধিকাংশ লোকের অধিক উপকারে আইসে, যাহাতে সাধারণের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয়, তাহাই সমাজমধ্যে প্রচলিত করা উচিত; ইহার বিপরীত হইলে তাহা প্রচলিত করা উচিত নহে এবং প্রচলিত থাকিলেও তাহা রহিত করা কর্ত্তব্য। অতএব বিধবাবিবাহ উচিত কি না স্থির করিতে হইলে দেখা উচিত ইহাতে সমাজের উপকার কিম্বা অপকার হয়, ইহা 'ব্যবহারোপযোগিতার' অনুসারী কি না?

আজি কালি বঙ্গদর্শনের কৃপায় ম্যালথসের নাম বোধ করি কোন পাঠকের অবিদিত নাই এবং মোটের উপর তাঁহার মতটা কি তাহাও অনেকের জানা আছে। তিনি বলেন লোকসংখ্যার আধিক্যই সমাজের দারিদ্র্যের মূল; যদি দারিদ্র্য দূর করিতে চাও, যদি সমাজ উন্নত করিতে ইচ্ছা থাকে, যদি দেশের দুর্ভিক্ষনিবারণের মানস থাকে তবে যাহাতে দেশের অধিবাসিগণের সংখ্যা কমে অগ্রে তাহার চেষ্টা কর। প্রাণিগণের প্রকৃতি এই, যে পরিমাণ আহারে তাহাদের পর্য্যাপ্ত হয় তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ তদপেক্ষা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন বলেন যদি জীব বা উদ্ভিদগণ যথেচ্ছ জন্মিতে পাইত তাহা হইলে কয়েকসহস্র বর্ষমধ্যে একজাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদ দ্বারা শত শত জগৎ আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। কেবল প্রাকৃতিক বৃদ্ধি নিয়মে এরূপ হইতে দেয় না। যে দেশের লোকের ব্যবহার বিশুদ্ধ, যে স্থানে খাদ্যদ্রব্য প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে দেশে বাল্যবিবাহের কোন প্রতিবন্ধক নাই, যে স্থানে ভ্রূণহত্যাদির দ্বারা মনুষ্যজাতির অকালে বিনাশ না হয়, অথবা যেখানে অনিয়ত পরিশ্রম বা অস্বাস্থ্যকর কার্য্যের দ্বারা অকালমৃত্যু না ঘটে সেখানকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এত শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে হয় যে শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গত ১৫০ শত বৎসর ধরিয়া আমেরিকার উত্তর প্রদেশে প্রত্যেক ২৫ বৎসরে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হইতেছে। কোন কোন স্থানে ১৫ বৎসর মধ্যে দ্বিগুণ হইতে দেখা যাইতেছে। সার উইলিয়ম পেটি বলেন যে দশবৎসরমধ্যেও অধিবাসিসংখ্যা দ্বিগুণ হইতেপারে।

যেমন মনুষ্যসংখ্যাও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় সেইরূপ দেশের উৎপন্নও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি যেরূপ, তাহাতে কৃষিকার্য্যের উপকরণ যেমনই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, সার যেমনই উত্তম হউক না কেন, খাদ্যসামগ্রীর বৃদ্ধি কখনই লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সমান হইতে পারিবে না। ম্যালথস্ স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্যসংখ্যা যদি ১, ২, ৪, ৮, ১৬ ইত্যাদি অঙ্কের পরিমাণে বৃদ্ধি হয় ধরা যায়, তাহা হইলে আহারদ্রব্য ১, ২, ৩, ৪, ৫ এই অঙ্কের পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। যখন

লোকবৃদ্ধি ৮ গুণ খাদ্যবৃদ্ধি ৪ গুণ, যখন লোকবৃদ্ধি ১৬ গুণ খাদ্য বৃদ্ধি ৫ গুণ। ইহাতে সহজেই উপলব্ধি হইতেছে যে অল্পদিনের মধ্যেই লোকসংখ্যা আহার-দ্রব্যের অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে, কাজেই দেশে দারিদ্র্য উপস্থিত হয়।

এক্ষণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবার যে কয়েকটী প্রতিবন্ধক আছে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। ১ম, উপযুক্ত অন্নাভাবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া সহস্র সহস্র মনুষ্যের মৃত্যু হইয়া থাকে অথবা উপযুক্ত আহারাভাবে পীড়া দ্বারা বহুলোকে প্রাণত্যাগ করে। ২য়, যুদ্ধ প্রভৃতি দ্বারা অনেক নরহত্যা হইয়া থাকে। ৩য় বিদেশে উপনিবেশ দ্বারা দেশের লোকসংখ্যা কমিতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারেন যেমন মনুষ্য জন্মিতেছে আবার তেমনি মরিতেছে তবে সংখ্যা কিরূপে বাড়িবে? বাস্তবিক জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু কম; ইংলণ্ডে যে বৎসর মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক, সে বৎসরেই জন্মমৃত্যুর অনুপাত ১২:১০ এবং ফ্রান্সে ১১½:১০। জমা অপেক্ষা খরচ কম হওয়ায় কাজে কাজেই বাকী পড়ে।

মনুষ্যসংখ্যা যত বর্দ্ধিত হইবে ততই দেশের দারিদ্র্য বাড়িবে এবং কাজেই আনুষঙ্গিক দুর্ভিক্ষাদি আসিয়া কতক লোকের প্রাণসংহার করিয়া আবার খাদ্যের পরিমাণ ও লোকসংখ্যা সমান করিয়া দিয়া যাইবে। পুনশ্চ যেমন লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া লোকের অন্নকষ্ট হইবে অমনি সকলেরই পুত্রোৎপাদনে স্পৃহা কমিয়া যাইবে। ইহাকেই ইংরেজিতে (Reaction) কহে। এদিকে ম্যালথসের বিপক্ষেরা বলেন যে লোকসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি হইবে তেমনি তাহারা পেটের দায়ে নূতন নূতন জমি আবাদ করিয়া আহারদ্রব্য বাড়াইবে; কাজেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা কোন ক্ষতি হইবে না। কোন একটি বিশেষ স্থান লইয়া বিবেচনা করিলে এই কথা যথার্থ হইতে পারে কিন্তু মোট ধরিলে ইহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে খাদ্যবৃদ্ধি কখনই লোকবৃদ্ধির সমান হইতে পারে না। মৃত মহাত্মা জন ষ্টুয়ার্ট মিলও ম্যাল্‌থসের মতের পোষকতা করেন। তৎপ্রদর্শিত যুক্তির পুনরুক্তি এ স্থলে প্রয়োজন করে না।

ইতিপূর্ব্বে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির যে কয়েকটি প্রতিবন্ধক উল্লেখ করা গিয়াছে তন্মধ্যে ২য় ও ৩য় টী আমাদের দেশে নাই এবং শীঘ্র যে হইবে তাহারও আশা নাই। তবে ১মটী অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ ও উপযুক্ত আহারাভাবে অকালমৃত্যু আছে এবং আজ কাল প্রায়ই ঘটিতেছে। যে কয়েকটি কারণ লোকবৃদ্ধির অনুকূল, আমাদের দেশে তাহার অনেক গুলি আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, কি উপায় অবলম্বন করিলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না হয়। নানা ব্যক্তি ইহার নানা উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে অকাতরে

বিবাহ বন্ধ করা সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত। অন্নাভাবে প্রাণসম পুত্রের মৃত্যু স্বচক্ষে দর্শন করা অপেক্ষা পুত্র না জন্মান যে অনেক সুখের, লোকবৃদ্ধিজনিত দুর্ভিক্ষে শত শত ব্যক্তির বিনাশ অপেক্ষা লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি না হইতে পায় এমত উপায় অবলম্বন করা যে উত্তম তাহা বোধ করি কোন বুদ্ধিমান্ লোককে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। তবে অনেকে বলেন যে আজন্মকৌমারব্রত অবলম্বন করিলে শরীর সুস্থ থাকে না, কিন্তু একটন বলেন যে কুমারীগণকে আজীবন সুস্থশরীরে থাকিতে দেখা গিয়াছে। চিরকাল অবিবাহিত থাকিলে যে কোন পীড়া জন্মে তাহা কোন কাজের কথা নহে। যাঁহারা আমাদের দেশের বিধবাগণকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন একটনের মত সত্য। সুতরাং দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে দেশে বহুল পরিমাণে বিবাহ বাড়িতে হইতে না পারে তাহার উপায় করা উচিত। আমাদের দেশীয় অনেক কৃতবিদ্য লোকের (কার্য্যে না হউক মুখে) আজ কাল এই মত দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা প্রায়ই পুরুষের অকাতরে বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। তথাপি তাঁহারা যে কিরূপে বিধবাবিবাহের পোষকতা করেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পুরুষের বিবাহ হইয়া কাজ নাই কিন্তু স্ত্রীলোকের বিবাহ বন্ধ করা হইবে না এ কোন্ যুক্তিশাস্ত্রের অনুসারিণী? যখন দেখা যাইতেছে যে, বিবাহ যত কমে ততই মঙ্গল, তখন যদি দেশাচারের কৃপায় কতকগুলি বিবাহ কমে তাহাতে ক্ষতি কি? কেন আমরা এই দেশাচারের উপকার গ্রহণ করিব না?

অনেকে বলেন বঙ্গবিধবাগণ চিরদুঃখিনী। তাহাদের কোন কার্য্যেই সুখ নাই, কোনপ্রকার আমোদে তাহারা মিশিতে পারে না, মনের দুঃখে তাহারা সর্ব্বদাই দুঃখিত। তাহাদিগকে আজন্ম এইরূপ কষ্টে রাখা অতিনৃশংসের কার্য্য, যাহার দয়া নাই, মায়া নাই, যে স্নেহ মমতা কাহাকে বলে জানে না, পরের দুঃখে যাহার মন গলিয়া না যায়, সেই এইরূপ নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে সমর্থ। কিন্তু বিধবাদিগের দুঃখ যে অসহ্য এমত আমাদের বোধ হয় না। যদি বাস্তবিক অসহ্য হয় অথচ তাহাতে সমাজের উপকার থাকে, তবে তাহা মোচন করিবার আবশ্যক কি? পাঁচজন বিধবার জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে, সমাজস্থ সহস্র সহস্র লোকের জন্য তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাওয়া উচিত, যিনি একজনের অঙ্গে সূচ ফোটা দেখিতে পারেন না, তিনি শত শত লোকের বলিদান কিরূপে দেখিবেন? যদি পাঁচজন বিধবার দুঃখ মোচন না করিলে নিষ্ঠুরতা হয়, তবে বিধবাবিবাহ চালাইয়া সমাজের সহস্র ব্যক্তির অপকার করা চণ্ডালতা; গোরু মেরে জুতা দান ধর্ম্ম নহে। বিধবা যদি দুশ্চরিত্রা হইবার আশঙ্কা থাকে বিবাহ

দিলেও সে আশঙ্কা একেবারে নির্ম্মূল হয় না। অনেক সধবাও দুশ্চরিত্রা হয়। আমরা নরম প্রকৃতির লোক, এইজন্য কেবল দয়া করিতে শিখিয়াছি, ন্যায়পরতার উগ্রমূর্ত্তি আমরা সহ্য করিতে পারি না। সুতরাং ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ অনুভবশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি। ইহাকেই স্পেন্সার সাহেব Emotional Bias অর্থাৎ আনুভাবিক পক্ষপাত বলিয়াছেন।

মনু প্রভৃতির পর বোধ হয় মিতাক্ষরার মত আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। তৎপরে জীমূতবাহন জন্মগ্রহণ করিয়া মিতাক্ষরাকে আমাদের দেশ হইতে বিদায় দেন। মিতাক্ষরামতে পিতা পুত্রোৎপত্তির পর নিজ ভূসম্পত্তি অন্যকে বিক্রয় করিতে পারেন না। তাহাতে যাহার কৌলিক কিঞ্চিৎ ছিল তাহার কতকটা খাবার সংস্থান থাকিত। পরে দায়ভাগকার জন্মিয়া দারিদ্র্য কিছু বাড়াইলেন। তিনি বলিলেন পিতা ইচ্ছা করিলে সম্পত্তি বিক্রয়াদি করিতে পারেন। তৎপরে ইংরেজবাহাদুর আবার গণ্ডোপরি বিস্ফোটক জন্মাইয়া দিলেন। তাঁহারা হিন্দুউইলের সৃষ্টি করিয়া দারিদ্র্যের পথ আরও মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহার উপর যদি পুনরায় আমরা অকাতরে বিবাহ প্রভৃতি করিতে থাকি, তবে বঙ্গদেশ একেবারে ছারখার হইয়া যাইবে। সুতরাং যে কোন উপায়ে আমাদের দেশে বিবাহ কমে তাহাই অবলম্বন করা উচিত।

একশ্রেণীর লোক আমাদের শাস্ত্রে কিছুই ভাল দেখিতে পান না; যত কেন উৎকৃষ্ট নিয়মাবলী তাঁহাদিগের সম্মুখে ধর না, তাঁহারা একটা না একটা দোষ অনুভব করিবেনই করিবেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা এই ধাতুর লোক ছিলেন। আর একশ্রেণীর লোক ইহাদিগের ঠিক্ বিপরীত। তাঁহারা অতিসামান্য বিষয়েও ঋষিদিগের বুদ্ধিপ্রভাব দেখিতে পান, সামান্য কথা হইতে নিগূঢ় তত্ত্ব টানিয়া বাহির করেন। পুষ্পকরথের নাম শুনিয়া তাঁহারা বলেন আমাদের বেলুন ছিল; ঋগ্বেদোক্ত "আপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ" কথা পাঠ করিয়া তাঁহারা বলেন আমাদের দেশে হাইড্রোপেথি ছিল। বলা বাহুল্য যে এই উভয় শ্রেণীর লোকই ভ্রান্ত। এক্ষণে এই শেষোক্ত শ্রেণীস্থ লোকেরা বলিতে পারেন যে, বিধবাবিবাহ পূর্ব্বে আমাদের দেশে যখন চলিত ছিল তখন ইহা অবশ্য সমাজের উপকারী। আমরাও ইঁহাদের কথায় অনুমোদন করি। হইতে পারে যে বিধবাবিবাহ প্রাচীনকালে প্রয়োজনীয় বোধ হওয়াতে চলিত হইয়াছিল, কিন্তু পরে সে প্রয়োজনটুকু আর না থাকাতে কাজেই ইহা রহিত করা উচিত হইয়া উঠিয়াছে। সময় ও অবস্থাভেদে কোন একটা নিয়ম হইতে উপকার অথবা অপকার হইতে পারে।

যখন আর্য্যগণ মধ্যএসিয়া হইতে আসিয়া পঞ্জাব অধিকার করিলেন, তখন তাঁহাদিগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম ছিল। অধিকৃত জাতির উপর আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন হইল। আধুনাতন ইউরোপে গমনাগমনের যেরূপ সুবিধা হইয়াছে, তখন মধ্যএসিয়ায় সেরূপ ছিল না বলিয়া আর্য্যগণের নিজ দেশ হইতে আমদানী করিবার কোন সুবিধা হয় নাই। এইজন্য তাঁহারা সন্তানোৎপাদনদ্বারা সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এই কারণেই অনুলোম প্রতিলোম উভয়বিধ বিবাহই প্রচলিত হইল এবং তাহার উপর যাহার যে স্ত্রীকে উপভোগ করিবার ইচ্ছা হইত তিনি তাহাকে (অন্যের স্ত্রী হইলেও) লইতে পারিবেন এইরূপ নিয়মও হইল। মহাভারতের আদিপর্ব্বে শ্বেতকেতুর গল্প যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের মতের যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। অনেকে বলিতে পারেন যে, সে কেবল গল্পমাত্র বাস্তবিক ঘটনা নহে। আমরাও ঐটিকে যে প্রকৃত ঘটনা বলিতেছি তাহা নহে, তবে ঐ প্রকার ঘটনার উল্লেখ থাকাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে তৎকালে ঐরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। শুদ্ধ আমাদের দেশে কেন পৃথিবীর অন্যান্যস্থলেও ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। স্পার্টাদেশের (helots) হেলটদিগের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানা যাইবে যে সেখানেও ঐরূপ নিয়ম এককালে চলিয়াছিল। যখন আর্য্যগণ দেখিলেন যে, তাঁহাদের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, তখন তাঁহারা ঐ কদর্য্য নিয়ম উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু অনুলোম বিবাহ এবং বিধবাবিবাহ আরও কিছুকাল চলিল। ক্রমেই খাদ্য অপেক্ষা ভোক্তার সংখ্যা অতিরিক্ত হইতে লাগিল দেখিয়া তাঁহারা উভয়বিধ প্রথাই উঠাইয়া দিলেন। এবং সেই অবধি তাহাই চলিয়া আসিতেছে। বিধবাবিবাহ কোন্ সময়ে আমাদের দেশে রহিত হয় তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা কঠিন। তবে ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে, দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা প্রণীত হইবার পূর্ব্বেই বিধবাবিবাহ আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। দায়ভাগকারীর মতে বন্ধ্যা বিধবাকন্যা পিতার বিষয়ভোগে অনধিকারিণী, কারণ তিনি নিজপুত্রেরদ্বারা পিতার শ্রাদ্ধাদিকরণে অসমর্থা। মিতাক্ষরার মতে যদিও তিনি পিতৃসম্পত্তিতে বঞ্চিত না হউন, তথাপি পুত্রবতী কন্যাসত্ত্বে তাঁহার অধিকার নাই। যদি বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই এরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইত না। বোধ হয় পরাশরের আবির্ভাবসময়ে বিধবাবিবাহ রহিত করিবার ইচ্ছা লোকের মনে উদিত হয় এবং সেই জন্যই তিনি নিজসংহিতায় লিখিয়াছেন যে "কলিকালে (অর্থাৎ আরও কিছুদিন পরে) বিধবাবিবাহ করিবে না।" তাঁ-

হার এরূপ লিখিবার অভিপ্রায় যে আর কিছুদিন পরে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হইবে না। দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস জন্য যে আইন করিতে হয়, তাহা আধুনিক ফ্রান্সের ঘটনাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। ম্যালথস্‌ অন পপুলেসন্‌ ও ফার্ষ্ট ফ্রুট অব ফিলসফি নামক দুইখানি পুস্তক পাঠ করিয়া ফ্রান্সদেশীয় লোক সন্তান উৎপাদনে এত শিথিলপ্রযত্ন হইল এবং কাজে কাজেই অধিবাসীর সংখ্যা এত কমিয়া গেল যে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের নজর পড়িল। ক্রমেই লোকসংখ্যা কমিতেছে দেখিয়া প্রায় একবৎসর গত হইল, গবর্ণমেণ্ট, যাহাতে লোকের সন্তান উৎপাদনে পুনরায় যত্ন হয় তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য কয়েকটি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে ঠিক ইহার বিপরীত। এলফিনষ্টোনকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে উল্লিখিত লোক-সংখ্যা গতবর্ষের সেন্সসের সহিত মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে অধিবাসিসংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে এবং বৎসর বৎসর যে দুর্ভিক্ষ হইতেছে তাহাতেই দেশের দারিদ্র্যের পরিচয় দিতেছে। সুতরাং লোকসংখ্যা যাহাতে কমে এরূপ কোন উপায় করিবার মুখ্য সময় উপস্থিত হইয়াছে। এ সময়ে যদি আমরা সমাজসংস্কারচ্ছলে বিধবাবিবাহ দিয়া লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইবার সুবিধা করিয়া দিই তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ বৎসরান্তর না হইয়া মাসে মাসে হইবে। অনেকে বলিতে পারেন যে, যেমন ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট লোকসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সেইরূপ আমাদের দেশেও হওয়া উচিত। আমরা বলি আমাদের সামাজিক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ কোন মতে উচিত নহে; আমরা নিজে আমাদের সমাজ-সংস্কার করিব, ইহাতে অন্যের মুখাপেক্ষা করিব কেন? ইচ্ছা করিয়া কেন নিজের যেটুকু স্বতন্ত্রতা আছে তাহা খোয়াইব?

এক্ষণে অনেকে বলিতে পারেন যে, হিন্দুগণ প্রাচীন নিয়মের একান্ত ভক্ত, প্রাণান্তেও তাঁহারা প্রাচীন নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন না। মনু প্রভৃতি কতকাল পূর্ব্বে যে নিয়ম করিয়া গিয়াছেন আজিও তাহা সকলে মান্য করিতেছে। "রেখামাত্র মপি ক্ষুণ্ণাদামনো বর্ত্মনঃ পরং, ন ব্যতীয়ুঃ প্রজা স্তস্য নিয়ন্তু র্নেমিবৃত্তয়ঃ" এই কথা কি আধুনিক কি প্রাচীন সকল হিন্দুতেই সমানরূপে খাটে। হিন্দুসমাজ স্থিতিশীল, ইহা চিরকালই একভাবে এক নিয়মে চলিতেছে। তবে বিধবাবিবাহ পূর্ব্বে ছিল এক্ষণে বন্ধ হইয়াছে, প্রতিলোম অনুলোম বিবাহ ছিল এক্ষণে নাই, এ কিরূপ কথা? আমরা বলি শুদ্ধ হিন্দুসমাজ কেন জগতের কোন সমাজই একেবারে স্থিতিশীল হইতে পারে না। তবে যে সমাজ অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহাকেই লোকে স্থিতিশীল

কহিয়া থাকে নতুবা একেবারে স্থাবর সমাজ হইতে পারে না। আর অধুনাতন আমেরিকা বা জাপানের ন্যায় যাহার অতি শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহাকে গতিশীল সমাজ কহে। সমাজ-পরিবর্ত্তন হইলেই নিয়মেরও পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হয়। হিন্দুশাস্ত্রের যে পরিবর্ত্তন নাই তাহা নহে। যদিও অদ্যাপি মনু প্রভৃতিকে সকলে মান্য করে বটে তথাপি তাঁহার সকল কথা আজ কাল চলে না। একজন টীকাকার একসময়ে আবির্ভূত হইয়া নিজ সময়ের সমাজের অবস্থানুসারে মনু প্রভৃতির অর্থ করিলেন এবং তৎকালে তাঁহার মত প্রচলিত হইল। অনন্তর অন্য একজন জন্মিয়া সমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় যেরূপ নিয়মের আবশ্যকতা বোধ করিলেন, মনুবাক্য হইতে সেরূপ অর্থ বাহির করিলেন। এইরূপে মূল এক থাকিলেও বিভিন্নপ্রকার টীকা দ্বারা সমাজের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রকার অভাব মোচন হইতেছে। সুতরাং হিন্দুদিগের নিয়ম যে চিরকালই এক আছে তাহা নহে। অন্যান্য দেশের ন্যায় ইহারও অবস্থাভেদে পরিবর্ত্তন হইতেছে; তবে পরিবর্ত্তনের স্বরূপ অন্যান্য দেশ হইতে বিভিন্ন। অন্যান্য দেশে মূলই বদলাইতেছে, এখানে মূল এক আছে কিন্তু তাহার অর্থ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং ফলে একই দাঁড়াইতেছে। অতএব দেখা গেল যে আর্য্যগণের সন্ততি বলিয়া আমরা লোকের নিকট বড়াই করি, যে আর্য্য আর্য্য করিয়া আমরা প্রত্যেক সভায় চীৎকার করি, সেই আর্য্যগণ সমাজরক্ষার জন্য যখন যেরূপ নিয়ম আবশ্যক বোধ করিতেন তখন সেই নিয়ম চালাইতেন। তবে আমরা কেন এই অত্যাবশ্যক বিষয়ে তাঁহাদের অনুকরণ না করি? শুদ্ধ বিদেশীয়দিগের নিকট সম্মান পাইবার জন্য আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচয় দিব কিন্তু কার্য্যে কোনরূপে তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিব না, এ অতি লজ্জার কথা। শুদ্ধ পিতার নামে কেহ বড় হইতে পারে না,—

"অনলে জনম বলে ভস্ম মান্য নয়।
হেয় নয় শুক্তিকাপ্রভব মুক্তাচয়।।"

কার্য্যে পিতার উপযুক্ত হওয়া চাই নতুবা সম্মানের বদলে এরূপ উপযুক্ত পিতার এমন অযোগ্য সন্তান এইরূপ নিন্দা রটিবে।

আমরা আধুনিক নব্য সমাজসংস্কারকদিগকে একটি কথা বলিতে চাহি। তাঁহারা মনে করেন আমাদের যাহা কিছু আছে সব উল্টাইয়া দিতে পারিলেই সমাজসংস্কার হইবে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদের মধ্যেও কতকগুলি অন্ততঃ ভাল আছে সে গুলি বজায় রাখিয়া যেগুলি মন্দ আছে তাহা বদলাইতে চেষ্টা করা উচিত।

এতক্ষণ উল্লিখিত প্রস্তাবের ১ম অংশ লইয়া বলা হইল এক্ষণে ২য় অংশ আ-

রম্ভ করা যাইতেছে। বিধবাবিবাহ রহিত হওয়ার প্রধান প্রতিবাদী সাম্যবাদিগণ। তাঁহারা বলেন, "সমাজমধ্যে পুরুষের পক্ষে এক নিয়ম স্ত্রীর পক্ষে আর এক, কিরূপ যুক্তি। প্রাকৃতিক নিয়মে স্ত্রীপুরুষ একই স্বভাবসম্পন্ন। কি ক্ষমতা, কি বুদ্ধি কোন বিষয়েই স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যূন নহে। তবে তাহারা পুরুষের সহিত সমান অধিকার কেন না পাইবে? যে সমাজ স্ত্রীপুরুষকে এক চক্ষে না দেখিবে সে সমাজ পক্ষপাতী, তাহার উন্নতি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। "গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ" যতদিন না হইবে ততদিন কোন সমাজের ভদ্রস্থতা নাই।" আমরা সাম্যবাদীদিগের মতে মত দিতে প্রস্তুত নহি; স্ত্রীলোক যে বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে পুরুষের সদৃশ একথা আমরা স্বীকার করি না, কারণ যদি তাহাই হইত তাহা হইলে অন্ততঃ পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে স্ত্রীলোকের পুরুষের সহিত সমান অধিকার দেখা যাইত এবং পশুপক্ষিগণের মধ্যেও যৌনতারতম্য থাকিত না। তবে স্ত্রীলোক ও পুরুষের অনুভবশক্তি যে একরূপ তাহাতে আমাদের মতভেদ নাই। ক্ষুধায় উভয়েই কাতর হয় আহার পাইলে উভয়েই আনন্দিত হয়। দুঃখে উভয়েই ম্রিয়মাণ হয় এবং সুখে উভয়েই প্রফুল্লচিত্ত হয়। বিবাহাদি করিতে উভয়ের ইচ্ছা সমান। তবে স্ত্রীলোকের পতিবিয়োগ হইলে পুনরায় বিবাহ হইবে না এবং পুরুষ নিত্য নূতন নূতন বিবাহ করিবে এ অতি অন্যায় ও অবিচার। এ অবিচার যাহাতে না হইতে পারে তাহা সাম্যবাদিগণের যেমন ইপ্সিত আমাদেরও সেইরূপ। বিবাহ বিষয়ে আমরাও স্ত্রীপুরুষের সাম্যসংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। 'যেমন পুরুষের দ্বিতীয় বার বিবাহ প্রচলিত আছে সেইরূপ স্ত্রীলোকেরও দ্বিতীয়বার বিবাহ আরম্ভ হউক' একথা আমরা বলি না। আমরা বলি 'যেমন বিধবার বিবাহ প্রচলিত নাই সেইরূপ পুরুষেরও দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধ হউক।' ইহাতে স্ত্রীপুরুষের সাম্য অবিকৃত রহিল, মধ্যে মধ্যে সমাজের যথেষ্ট উপকার হইল এবং ইহা দেশাচারের বিরুদ্ধ না হওয়ায় দলাদলিরও ভয় রহিল না।

পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধ করিলে আনুষঙ্গিক আর একটা এই লাভ হইবে যে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি দ্বিতীয়পক্ষের সংসার করিয়া স্ত্রৈণতাদোষে কাজের বাহির হইয়া যান তাহা আর হইতে পারিবে না।

পতি মরিলে স্ত্রী দুইবেলা আহারে বঞ্চিত, অলঙ্কারে বঞ্চিত, সংসারে বঞ্চিত, অতএব পতিকে সুস্থ রাখিবার জন্য হিন্দুস্ত্রীর যেমন বিশেষ যত্ন হয় অন্য জাতির একটা থাকে না বরং অকর্ম্মণ্য পতি মরিলে মনের মত পতি গ্রহণ করিতে পারিব সে দিন কবে হবে এরূপ বাসনা বিধবাবিবাহপ্রচলিত সমাজে স্ত্রীরত্নদের মধ্যে কখন

কথন সম্ভব কিন্তু আমাদের সামাজ্য সমাজে তাহার সম্ভব নাই এই জন্য হিন্দুপত্নী এত পতিভক্ত এত সংসারী। যদি পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধ করিলে আমরা আরও পত্নীভক্ত হই সংসারডোর আরও টানিয়া বাঁধি তাহাতে ক্ষতি কি?

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

হিন্দী ব্যাকরণ। শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী প্রণীত। কলিকাতা, বিডন যন্ত্র।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বিহার হইতে সোলিমান পর্ব্বতশ্রেণীর উপত্যকা পর্য্যন্ত এবং বিন্ধ্যাচল হইতে তেরাই পর্য্যন্ত এই ভাষা (হিন্দী) প্রচলিত। তদ্ভিন্ন কোহিস্থান হইতে আসাম এবং কাশ্মীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারত-ভূমিতে যত প্রকার মনুষ্য বাস করে, তাহারা সকলেই অধিক বা অল্প পরিমাণে হিন্দী ভাষা বুঝিতে সক্ষম। ইউরোপে ফেঞ্চ ভাষা যেরূপ, ভারতবর্ষে হিন্দীও সেইরূপ।" ঈদৃশ ভাষা শিক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য—বিশেষ বাঙ্গালীর। আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষায় স্নেহের কথা, ভক্তির কথা, ভালবাসার কথা, একরূপ পরিষ্কাররূপে চলে; কিন্তু ক্রোধের কথা হিন্দীতে হয়। বাঙ্গালীর ক্রোধ ছিল না, কাজেই ক্রোধের ভাষা হয় নাই; এক্ষণে একটু ক্রোধ বাড়িয়াছে, গরম মেজাইজ বাবুরা আতান্তরে পড়িয়াছেন। হিন্দী ব্যতীত তাঁহাদের ফুৎকার,চীৎকার প্রকাশ করিবার আর অন্য উপায় নাই। "নেকালো"-বাদীরা যদি একটু হিন্দী শিখিয়া তেড়া মেজাইজ দেখান, তাহা হইলে ভাল হয়। আমরা যে গ্রন্থের সমালোচনা করিতেছি, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় তাঁহারা অনেক পরিমাণে শুদ্ধ হিন্দীতে গালি দিতে শিখিবেন। বঙ্গীয় যুবকগণের হিন্দী শিখিবার সুবিধাজন্য এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। ইহার প্রারম্ভে "হিন্দীভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক একটি ভূমিকা আছে। পুস্তকখানি অধুনা প্রচলিত সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে বাঙ্গালায় লিখিত। গ্রন্থকার প্রথম শিক্ষার্থীদিগের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বৈয়াকরণিক বিষয়গুলি যথাযোগ্যস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস, পুস্তকখানি যে উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পাদনে বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইবে। যদি কখন বঙ্গীয় বিদ্যালয়ে হিন্দী পুস্তক পড়ান আরম্ভ হয়, এই গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকস্বরূপ নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালার বিদ্যালয়সমূহে ইংরেজি, সংস্কৃত প্রভৃতি যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তদ্রূপ হিন্দীও শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

বঙ্গদর্শন।

সপ্তম বৎসর।

৭৫ সংখ্যা।



বঙ্গীয় শঙ্করাচার্য্যের নালিশ।

ধনীর আর একটি নাম "বড়মানুষ।" বস্ত্রাদি যেরূপে হস্তদ্বারা পরিমিত হয়, সেইরূপে মনুষ্যও টাকার দ্বারা পরিমিত হইয়া থাকে। এই বস্ত্রখানি হাতে অল্প, অতএব ইহা ক্ষুদ্র; এই মনুষ্য টাকায় অল্প, অতএব এই ব্যক্তি ছোটলোক; আর এই মহোদয় টাকায় অধিক, অতএব বড়মানুষ—আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও বড়মানুষ। আমার আকার বড়, উদরও বড়, আমি জানিতাম আমি "বড়মানুষ;" কিন্তু হরি, বল, কেহই আমায় "বড়মানুষ" বলে না। আমি তাহাদের কতই বুঝাইয়া থাকি, কেহই বুঝে না। আবার দেখা যায় যে, যে ঋণ করে তাহাকে লোকে কখন কখন "বড়মানুষ" বলে; আবার যে ঋণ দেয়, হয়ত তাহাকে লোকে "বড়মানুষ" বলে না। তবে বোধ হয় কেবল টাকায় "বড়মানুষ" হয় না, বুঝি ব্যয় করিলে "বড়মানুষ" হয়।

আর যদি বল যাহার ভূমিসম্পত্তি আছে কেবল সেই বড়মানুষ; তবে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি, কেন না আমার টাকা না থাকুক, আমার ভূমিসম্পত্তি আছে; কেবল এই বাঙ্গালায় নহে, নানাদেশে আছে। তুমি হাসিতেছ, তোমার বিশ্বাস হয় না। ভাল; তদন্ত করিয়া দেখ।

আমি এইমাত্র যে পাত্রপূর্ণ দেবদুর্ল্লভ ও সদ্যঃ শ্বেতান্ন আহার-যজ্ঞে আহুতি দিয়া আসিয়াছি, আমার যদি ভূমি নাই, তবে তাহা আমি কোথায় পাইলাম। যে মৎস্যমুণ্ড আমার অঙ্গুলিস্পর্শসুখানুভব আকাঙ্ক্ষায় এইমাত্র অনিমিষলোচনে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল, যদি আমার পুষ্করিণী নাই, তবে আমি ঐ

মৎস্য কোথায় পাইলাম? এই যে কদলীছড়া প্রৌঢ়ার অঙ্গুলির ন্যায় পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপলকে আমায় ইঙ্গিত করিতেছে, আমার যদি বৃক্ষ নাই, তবে এই মর্কটমনোহর আমি কোথায় পাইলাম? এই যে পরিচ্ছদ সাগরের ন্যায় আমার উদর-সুমেরুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং তরঙ্গ তুলিয়া বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে, আবার মধ্যে মধ্যে তাহার ছিন্নভাগের শোভা দ্বীপ উপদ্বীপের ন্যায় দেখাইতেছে, যদি আমার ভূমি নাই, তবে এই বস্ত্রের কার্পাস কোথা হইতে আসিল?

তুমি বলিবে কার্পাস, বস্ত্র, কদলী, মৎস্য, তণ্ডুল, এ সকল আমি ক্রয় করিয়াছি। সত্য কথা, আমি মূল্য দিয়াছি, কিন্তু কিসের মূল্য? মজুরির মূল্য দিয়াছি, তাহা দাসদাসীর বেতনস্বরূপ। কিন্তু তণ্ডুল কি কার্পাসের মূল্য দিই নাই। কৃষকগণ কেবল ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, জলসেচন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে এবং তাহার পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ কিছু কিছু পাইয়া থাকে। চলিত কথায় সেই মূল্যকে ধান্যের মূল্য বলে। যে তোমাকে প্রত্যহ জলবিক্রয় করে, সে ব্যক্তি জলের সৃষ্টি করে নাই, জল তাহার নহে; সে ব্যক্তি কেবল নদী কি কূপ হইতে জল আনিয়া দেয়, তুমি তাহার পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া থাক। অথচ সে ব্যক্তি মনে করে "আমি জলের মূল্য পাইলাম" তুমিও বল, "আমি জলের মূল্য দিলাম।" সেইরূপ কৃষকেরা মনে করে, "আমি ধান্যের মূল্য পাইলাম," তুমিও বল, "আমি ধান্যের মূল্য দিলাম;" বস্তুতঃ তাহা নহে।

ধান্য কৃষকের নহে। সে ব্যক্তি পরিশ্রমদ্বারা ধান্যের উৎপাদন করিয়াছে, অতএব যে পর্য্যন্ত কৃষক সেই পরিশ্রমের মূল্য না পায়, সেই পর্য্যন্ত ধান্য তাহার নিকট জামীনস্বরূপ আবদ্ধ থাকে। ধান্য মহাজনেরও নহে; সে ব্যক্তি কৃষকের মজুরি অগ্রিম দিয়া ধান্য খালাস করিয়া আনিয়াছে এবং ধান্য হয় ত তণ্ডুল করিয়াছে অতএব যে পর্য্যন্ত মহাজন তাহার মূল্য না পায়, সে পর্য্যন্ত ধান্য জামীনস্বরূপ আপনার নিকট আবদ্ধ রাখে। শেষ, যে ব্যক্তি এই সকল মজুরির মূল্য দিয়া তণ্ডুল খালাস করিয়া আহার করে, তণ্ডুল তাহার; তাহার নিমিত্ত উৎপাদিত হইয়াছিল। তণ্ডুল যাহার, ভূমিও তাহার।

যাহার আহার প্রয়োজন, তাহার ভূমিরও প্রয়োজন। ঈশ্বর যাঁহাকে উদর দিয়াছেন, ঈশ্বর তাহাকে ভূমিও দিয়াছেন। যে কৌশলে জানিতেছি এই শরীরে আমার উদর আছে, সেই কৌশলে জানিতেছি এই পৃথিবীতে আমার ভূমি আছে। পৃথিবীর কোন্ অংশে আছে তাহা আমি জানি না, কোন "বড় লোকে"ও তাহা জানেন না। রাজারা রাজমন্দিরে বসিয়া আপন আপন ভূমির

কর পাইয়া থাকেন, আমিও হট্টমন্দিরে বা পরমন্দিরে বসিয়া আপনভূমির উপস্বত্ব পাইয়া থাকি। রাজারা কখন আপন ভূমি দেখেন নাই, আমিও কখন আমার ভূমি দেখি নাই। দেখি নাই, তাহার আর এক কারণ আছে; আমার ভূমির অংশ কখন চিহ্নিত হয় নাই। একান্নবর্ত্তী পরিবারের ন্যায় পৃথিবীর যাবতীয় উদরপরায়ণ ব্যক্তির সহিত আমি একত্রে এই পৃথিবীর সমুদয় ভূমি পৈতৃক বলিয়া এজমালিতে ভোগ করিতেছি। মার্কিন দেশের ভূমিতে যে কার্পাস উৎপন্ন হইতেছে প্রয়োজনমত আমি তাহার ভাগ পাইতেছি। কাবুল দেশের ভূমিতে যে আঙ্গুর, পেস্তা, বেদানা প্রভৃতি জন্মিতেছে, এখানে বসিয়া আমি তাহার ভাগ পাইতেছি। সর্ব্বদেশের ভূমিতে আমার অংশ আছে, এই জন্য সর্ব্বদেশের উৎপন্নের অংশ পাইয়া থাকি। হয় ত কোন কোন অঞ্চলের উৎপন্ন আমি লই না, অথবা লইতে পারি না, অর্থাৎ মজুরির মূল্য দিতে পারি না। মূল্য যদিও না দিতে পারি, এবং সেই জন্য আপন অংশ যদিও না লইতে পারি, তথাপি আমার স্বত্ব যায় নাই। এ স্বত্বের তামাদি হয় না। সমাজকর্ত্তৃক যে সকল স্বত্ব সৃষ্টি বা প্রদত্ত হইয়াছে, কেবল তাহারই তামাদি আছে।

এই পৃথিবীতে আমার অংশে কি পরিমাণ ভূমি আছে, তাহা আমি নিশ্চয় অনুভব করিতে পারি না। অনুভব করিতে হইলে প্রথমতঃ আমার ভাগীর সংখ্যা, অর্থাৎ মনুষ্যের সংখ্যা জানা আবশ্যক; কিন্তু তাহা আমি জানি না। বলিতে কি?—কালাশৌচ লইতে হইবে, এই ভয়ে জ্ঞাতির বার্ত্তা লই না। নিত্য কাঁদিতে হইবে বলিয়া মনুষ্যমধ্যে থাকি না। পাছে জ্ঞাতিবিরোধ হয়, এই ভয়ে পৈতৃকহিস্যা কখন চাই না। চাইব বা কাহার কাছে, কেবা আমার দাবী শুনিতে কর্ণপাত করিবে! রুষের রাজাকে যদি বলি, "ভাই আলেক্‌জন্দার, আমি তোমার জ্ঞাতি, পৈতৃকসম্পত্তিতে আমি তোমার তুল্যাংশী, তুমি কেন আমার বঞ্চনা করিয়া আমার সর্ব্বস্ব লইতেছ?" তাহার উত্তর ভয়ানক হইয়া পড়িবে। বঞ্চিত হিস্যাদারেরা তাহার উপর নালিশ করে এমন আদালত এ পর্য্যন্ত হয় নাই। আদালতস্থাপন না হইতে হইতেই একবার ফ্রান্সদেশে ভল্টেয়ার আর্জ্জী লিখিয়াছিলেন। তাহাতেই হিস্যাদারেরা মাতিয়া উঠিয়াছিল। বাদসার হিস্যাদার ফকির। মুসলমানেরা তাহাই উভয়কে সা বলেন। আমিও সেই জ্ঞাতিবাচক উপাধিতে দাবি রাখি।

তোমরা আমায় তুচ্ছ কর, আমার ভূমি নাই বল। জমীদারকে ভূম্যধিকারী বল। কিন্তু বিচার করিলে দেখিবে জমীদার কর্ম্মচারী মাত্র। ভূমি কে কর্ষণ করিবে, কতদিনের নিমিত্ত কর্ষণ করিবে, এই স্থির করা জমীদারের অধি-

কার; ভূমি কোন্ সময় কর্ষিত হইবে, তাহাতে কোন্ শস্য রোপিত হইবে, এই স্থির করা কৃষকের অধিকার; জমীদারের নিয়োজিত রামাকৃষক ভূমি-কর্ষণ করুক, অথবা শ্যামাকৃষকই ভূমি-কর্ষণ করুক কিম্বা রামার নিয়োজিত ধবল বলদ, অথবা শ্যামার নিয়োজিত শামল বলদ লাঙ্গল বহন করুক, তাহাতে ভূমির স্বামিত্ব জন্মে না। যে শস্য ভোগ করে, ভূমি তাহার। অতএব ভূমি আমার। তবে কেন লোকে আমায় ক্ষুদ্রলোক বলে? আমি বিচারপ্রার্থী।

বিচার না কর, আমি আর তোমাদের বাঙ্গালায় থাকিব না। তোমরা মুচিকে খয়ক বল, দাসকে দেব বল, আমায় কেন না বড়মানুষ বল?

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বঙ্গদেশী।

স্মৃতি কিম্বা হৃদ্‌পিণ্ড কর উৎপাটন।

প্রয়োগ।

রমণী!—প্রণয়!—অহো কি ঘোর-স্বপন।
ভাবনা!—যন্ত্রণা!—ধিক্ মূর্খতা কেমন।
কেন চিন্তা!—কার চিন্তা!—কিসের যন্ত্রণা?
কি সে নারী?—কেন তার এতই ভাবনা?
তৃপ্তি!—সুখ!—দুর্ব্বলের, পঙ্গুর প্রয়াস,
যুবার সাজে কি সেই ঘৃণিত বিলাস?
মনের মাহাত্ম্য কোথা—কোথা দৃঢ়-পণ?
স্মৃতি কিম্বা হৃদ্‌পিণ্ড কর উৎপাটন।

২

পাষাণ চাপিয়া ধর বক্ষের উপরে,
প্রেমমূর্ত্তি চূর্ণ হোক্ নিভৃত-অন্তরে।
ভালবাসা?—ভালবাসা—ছার ভালবাসা।
শুধু ক্ষোভ—শুধু ক্লেশ—মিটে না পিপাসা;
প্রতিদান নাহি তায়—অসহ্য-যাতনা,
দূর কর—হেন প্রেম করো না কামনা।
ক্ষীণপ্রাণা রমণীর তপস্যা, নিষ্ফল।
ভীরু!—মূর্খ!—নরচিত্ত এত কি দুর্ব্বল

৩

পাপ—পুণ্য—নীতি—সেত স্বদূর বিচার
ভেবে দেখ একবার গৌরব আত্মার।
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড, আর আত্মার সম্মান,
তুলাদণ্ডে সমভারে কর পরিমাণ;
সে গৌরব—জীবনের সে অমূল্য ধন—
রমণী পূঁজিতে আজ কর বিতরণ?
ধিক্ প্রাণে—আন শীঘ্র তীক্ষ্ণ-তরবার?
অসার-ঘৃণিত-চিত্ত করহ বিদার।

৪

"বৃথা ক্লেশ কেন পাও, দুরাশা তোমার,
কোথা ছিল সে সময় তীক্ষ্ণ-তরবার?
কেন না করিলে দীর্ণ হৃদয় আমার?
ঘৃণিত এ তীক্ষ্ণরাগ—অসার যবার।

রুদ্ধ কর বিধাতঃ! এ অতীত স্মরণ,
সে মূর্খতা—সে ভীরুতা—অসহ্য এখন।
কি পাপে, কি তাপে—হায় কোন প্রলোভনে,
সাশ্রুনেত্রে পড়েছিনু নারীর চরণে?

৫

শিক্ষা, দীক্ষা, ধন, মান, অমূল্য জীবন—
তুচ্ছ ভাবি যেই প্রেম করিনু সাধন,
অঙ্কুর-উদ্যমে, প্রেম-বারি-বিনা যার—
শুকা—আশাময়ী-লতা হৃদয়ে যুবার,
মনের বিপুল-বল, গভীর-আশ্বাস,
শান্তির বিমল-জ্যোতি—চিত্তের উল্লাস,
উপেক্ষিনু অবহেলে যাহার কারণ,
সে রমণী—সে রাক্ষসী—পাষাণী এমন!

বিরাম।

৬

এ নহে মনের ধর্ম্ম, এ নহে প্রণয়,
প্রেমিকের চিত্ত এত স্বার্থপর নয়;
না দিয়াছে, নাই দিল প্রেম-প্রতিদান?
তুমি সদা বাস ভাল, তোমারি সম্মান।
নিদানেতে নহে সুখ—সুখ ভাবনায়,
তৃপ্তিতে মনের তৃষা নিমেষে ফুরায়;
জ্বলুক এ তৃষানল হৃদয়কন্দরে,
সাবধানে রাখ যেন শিখা না উগরে।

৭

তুমি ত ভিখারি—তব কোথা অধিকার?
তোমার ঈপ্সিত-ধন আয়ত্তে তাহার।
ভিক্ষুকের কেন ক্রোধ—কেন অভিমান?
ভিক্ষুক ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র—তৃণের সমান,
পিপাসা নহে—এ পিপাসা দুরাশা তোমার,
এ সংসারে—এ জীবনে নহে পুরাবার;
তথাপি জ্বলুক এই মনের অনল,
এ প্রণয়ে রোদনই সুখদ কেবল।

প্রয়োগ।

৮

মূর্খ তুমি! কেন ক্রোধ? কেন অভিমান?
এখনো রয়েছে বক্ষ—চিরি দেখ প্রাণ।
কি দিয়াছি! কি চেয়েছি! কি ভিক্ষা আমার!
কোথা স্বার্থ, সে কি স্বার্থ, স্বার্থনাশ কার?
চরণ হৃদয়ে ধরে ধূলায় পড়িয়া,
কি ভিক্ষা চাহিয়াছিনু কাতরে কাঁদিয়া—
"দর্শন, স্পর্শন তব চাহিব না আর,
ভালবাসি বল শুধু মুখে একবার।"

৯

সহস্র-বৃশ্চিক-দন্ত অন্তরে তখন,
শিরে শিরে, মেদে মেদে, করিছে দংশন;
রাক্ষসী কি উত্তরিল, অহো হো! নিশ্বাসি,
ধিক্ মোরে, পুন তায় কহিনু জিজ্ঞাসি—
"চেয়ে দেখ—কি হয়েছি—নিকট মরণ,
ভালবাসি বল শুধু—বাঁচিবে জীবন।"
উত্তরিয়া "না" পাষাণী কহিল আবার,
"ইথে যদি মর তবে কি করিব আর।"

১০

বিস্ময়-স্তম্ভিত-চিত্তে পলেক রহিয়া,
মানবী কি দেবী ভাবি দেখিনু চাহিয়া,
উজ্জ্বল-নয়ন দুটি না রক্ত না সিত,
পূর্ণেন্দু-বিমল-আস্য না শুষ্ক না স্ফীত,
ক্রোধ-ক্ষোভ-চিন্তা-লেশ, করুণার কণা,
নাই তাহে বিন্দু মাত্র—যেন অন্যমনা;
আবরি নয়নদ্বয় কাঁদিয়া ফেলিনু,
মানবী কি দেবী তায় বুঝিতে নারিনু।

১১

মুছিয়া নয়ন পুনঃ দেখিনু যখন,
সেই দৃষ্টি—সেই আস্য—বসিয়া অমন,
চির পিপাসার সেই বদন-মণ্ডল,
সুধা-বিগলিত সেই নয়ন উজ্জ্বল,
সে প্রথম মিলনের ছবি করুণার,
স্নায়ু-ত্বকে তখনও বিদ্যমান তার,
সে মূর্ত্তিতে, এ হৃদয়!—নদীতে পাষাণ!
সহিল না প্রাণে—বেগে ত্যজিনু সে স্থান।

১২

দেখি নাই, শুনি নাই, তদবধি আর;
দেখিব না, শুনিব না—জীবনে আমার,
তবুও পরাণ কাঁদে কখন কখন,
লজ্জায় ঘৃণায় দুখে ক্ষিপ্ত হয় মন,
ফুরায়ে গিয়াছে সবি আমার জীবনে,
সুখের বাসনা আর নাহিক এ মনে,
দেখিতে বাসনা শুধু অন্তর তাহার,
কাঁদে কি না কাঁদে মোর দুখে একবার।

বিরাম।

১৩

সে কাঁদিবে কোন্ দুখে? কি দুখ তাহার?
মর কিম্বা বাঁচ তুমি, তায় কিবা তার?
তুমিই বাসিলে ভাল, সে কেন বাসিবে?
তুমিই দহিলে দুখে—সে কেন সহিবে?
তুমি বল মন-প্রাণ দিয়াছ তাহায়,
কেন দেও? কারে দেও? সে ত নাহি চায়!
কি ঘৃণা! কি লজ্জা! ছিছি,এই কি তোমার,
মনের মাহাত্ম্য আর গৌরব আত্মার?

১৪

কাব্য উপাখ্যান নয় এ তব জীবন,
নাট্যশালা নয় ইহা—প্রকৃত ভবন;
নও তুমি জগৎসিংহ—সে আয়েষা নয়,
কল্পিত-প্রণয়ে তবে কেন তৃষা হয়?
মন তার, প্রাণ তার, প্রণয়ো তাহার,
তাহার হৃদয়ে তব কোন অধিকার?
তব দুখে কভু তার কাঁদিবে না মন,
দুর্দ্দশা নিরখি তব হাসিবে সে জন।

প্রয়োগ।

১৫

সে কাঁদিবে কোন দুখে? এই কি সংসার!
দয়া-মায়া-সানুভূতি সবি কি মিছার?
সে নাহি কাঁদিবে যদি কে কাঁদিবে আর?
কার দুখে, কার তরে, এ দশা আমার?
কারে স্মরি দিবানিশি ঝরে এ নয়ন?
কার দুখে প্রতিপল আরাধি মরণ?
বজ্রাহত-তরু-প্রায় বিশুষ্ক-জীবন—
কার তরে আজো আছি করিয়া ধারণ?

১৬

সে কাঁদিবে কোন দুখে? অহো হো সংসার
নরনারী-পূর্ণ তুমি—তব এ আচার?
জীবন-যৌবন-সুখ, অঞ্জলি পুরিয়া—
নিত্য যে চরণে তার দিয়াছি ঢালিয়া।
তৃষিত-চাতক হতে হইয়া কাতর,
দেখিতেছি মুখ তার এ দীর্ঘ-বৎসর!
ক্রীতদাস হতে তার হয়ে অনুগত,
তুষিতে তাহার মন—সদাই নিরত।

১৭

এ পূজার কিছুই কি নাহি পুরস্কার?
মনেও স্নেহের বিন্দু হ'লনা তাহার?
এ হ'তে অধিক তৃষ্ণা ছিল না আমার,
কথায়ো করুণা নাহি ঝরিল তাহার?

রাজ্য নয়—ধন নয়—নহেত জীবন,
চেয়েছিনু করুণার একটী বচন,
স্নেহপূর্ণ তার সেই একটি বচনে,
প্রবাহিত মন্দাকিনী এ মরু-জীবনে।

১৮

এ তপস্যা—এ যন্ত্রণা—এত অনুরাগ,
পাষাণ-হৃদয়ে তার করিল না দাগ।
কি সে নারী?—চিত্ত তার মানবিক নয়!
এত কি পাষাণময় নারীর হৃদয়?
দেবী নয়—পাষাণী সে—অমরেরো মন,
তপস্যায়—সাধনায়—হয় উচাটন।
পাষাণী পূজিনু হায় এত দিন ধরে!
এই দুখ চিরদিন রহিবে অন্তরে।

বঙ্গ বৈজ্ঞানিক।

আজ কাল বাঙ্গালার পশ্চিমবিভাগে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের জন্য যে সকল বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা বালকগণের শিক্ষার পক্ষে কোন অংশে উপযোগী নহে। যে যে অংশ বুঝাইতে ৫।৬ পৃষ্ঠা লাগে সেই সেই অংশ এক প্যারগ্রাফে লিখিত হইয়াছে। বালকগণ এই সকল বিষয় কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মানসে শুকপক্ষীর ন্যায় কেবল কতকগুলা অভ্যাস করিতে বাধ্য হয়। অনেকে বলিবেন যে ঐ অভ্যস্তবিষয় পরে বালকগণের উপকারে আসিতে পারে কিন্তু বালকগণ এই সকল পুস্তক হইতে যাহা অভ্যস করে তাহার অধিকাংশই যদি ভুল হয় তাহা হইলে পরে উপকার হওয়া দূরে থাকুক অপকারের সম্ভাবনা। এই জন্য আমরা বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ প্রণীত পদার্থবিদ্যার সমালোচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছি।

মহেন্দ্র বাবু বিস্তর পড়িয়া শুনিয়া তাঁহার পুস্তকখানি ভাল করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে নিউটনের আকর্ষণবিষয়ক নিয়ম বুঝিতে পারেন নাই ইহা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। তিনি তাঁহার পদার্থবিদ্যার (অষ্টনাঙ্ক ২৭ এর পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন যে "তাবৎ বস্তুই নিক্ষিপ্ত হইলে ভূতলে পতিত হয় ইহা দেখিয়া আপাততঃ এরূপ বোধ হয় যে পৃথিবীই তাহাদিগকে আকর্ষণ করে, কিন্তু তাহারা পৃথিবীকে কি পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে ইহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক; ফলতঃ পৃথিবী তাহাদিগকে যেরূপ আকর্ষণ করে তাহারাও পৃথিবীকে এবং পরস্পরকে

সেইরূপ আকর্ষণ করে কিন্তু পৃথিবীর সামগ্রী পরিমাণ অধিক হওয়াতে তাহার আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত অনেক প্রবল।” আমরা আশ্চর্য্য হইলাম যে নিউটন কত মাথা ঘরাইয়া আকর্ষণ সংক্রান্ত যে নিয়ম বাহির করিলেন তাহার কি শেষে এই দাশা। নিউটনের আকর্ষণ-সম্বন্ধীয় নিয়ম বিষয়ে আমরা এইরূপ জানি যে একটি জড়পদার্থ অন্য জড়-পদার্থের প্রতি যেরূপ আকর্ষণশক্তি প্রকাশ করে শেষোক্ত পদার্থ প্রথম-টীকেও ঠিক সেই সমান বলে আকর্ষণ করে। দুইটি দ্রব্য পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণশক্তি প্রকাশ করে সেই আকর্ষণ-শক্তি সমান, নিশ্চয় সমান, তাহাদের পরিমাণ কখনও অসমান নহে। অর্থাৎ পৃথিবী একটি ফলকে যে বলে তাহার দিকে আকর্ষণ করে ফলটিও ঠিক সেই বলে পৃথিবীকে তাহার দিকে আকর্ষণ করে। ঘোড়া যে বলে গাড়িকে টানে গাড়িও সেই বলে ঘোড়াকে টানে। মহেন্দ্র বাবু এ নিয়ম জানেন কিন্তু নিয়মের কার্য্য ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই। তাহাই বলিয়াছেন “একের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত অনেক প্রবল” মহেন্দ্র বাবু যে বিষয় না বুঝিয়া বালকগণকে ভুল শিক্ষা দিতেছেন আমরা সেই বিষয় নিম্নলিখিতরূপে বুঝাইতে ইচ্ছা করি।

আপনি একখানি ঘোড়ার খোলা জলের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যে বল প্রকাশ করিবেন সেই বলে যদি একখানি নৌকা আকর্ষণ করেন তবে আকর্ষণের ক্রিয়া পূর্ব্ব-অপেক্ষা অনেক ন্যূন হইবে এবং সেই বলে যদি এক বৃহদাকার জাহাজ টানেন তবে আকর্ষণের ক্রিয়া এত অল্প হইবে যে কিছুই হয় ত দেখা যাইবে না। অর্থাৎ যদি দুইটি বস্তুর উপর সমান আকর্ষণশক্তি প্রকাশ করা যায় তবে যেটির পদার্থ-সমষ্টি* অপেক্ষাকৃত অধিক তাহার উপর আকর্ষণক্রিয়া অপেক্ষাকৃত ন্যূন হইবে। এস্থলে আকর্ষণের ক্রিয়ার ন্যূনাতিরেক হয় আকর্ষণের ন্যূনাতিরেক হয় না।

পৃথিবীর পদার্থসমষ্টির সহিত কোন দ্রব্যের পদার্থসমষ্টির তুলনা হয় না, সুতরাং পৃথিবী ও বৃক্ষচ্যুত ফল যখন ঠিক ভিন্নদিকে সমান বলে আকৃষ্ট হয় তখন ক্ষুদ্র ফলের উপর পৃথিবীর আকর্ষণক্রিয়া এবং পৃথিবীর উপর ফলের আকর্ষণের ক্রিয়ার সহিত তুলনা হইবে না অর্থাৎ আমরা দেখিব যে ফল ভূপতিত হইল কিন্তু পৃথিবী ফলের দিকে উঠিল না।

মহেন্দ্রবাবু যদি কোন ইংরেজি পুস্তক না পড়িয়া কেবলমাত্র বাবু অক্ষয়কুমার দত্তপ্রণীত পদার্থবিদ্যাখানি ভাল করিয়া পড়িতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ মহাভ্রমে ভ্রান্ত হইতেন না। অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন, “যেমন পৃথিবী নিকটস্থ

* আমরা ইংরেজি Mass শব্দের অর্থে সামগ্রী না লিখিয়া পদার্থসমষ্টি শব্দ ব্যবহার করিলাম।

সমস্ত বস্তুকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ তাহারাও যত ক্ষুদ্র হউক না কেন পৃথিবীর উপর আপন আপন আকর্ষণ-শক্তি প্রকাশ করে। তবে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী সমুদায় দ্রব্য পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র, এ নিমিত্ত তাহাদের আকর্ষণগুণের ক্রিয়া আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না।'

আকর্ষণবিষয়ে মহেন্দ্রবাবু যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সমস্তই ভুল। ৩৫ পৃষ্ঠায়, নির্ব্বাতস্থলে কি গুরু কি লঘু সকল বস্তুই একস্থান হইতে এক সময়ে ভূপতিত হয়, ইহার কারণ লিখিয়াছেন যে "সকল প্রকার দ্রব্যকেই পৃথিবী সমান বলে আকর্ষণ করে।" ইহাতে আমরা এই বুঝিতে পারি যে একখণ্ড লৌহ ও সেই পরিমিত সোলাকে পৃথিবী সমান বলে আকর্ষণ করে অর্থাৎ উভয়েরই ভার সমান। আশ্চর্য্য কথা বটে। পুনশ্চ "স্বর্ণের পরমাণু সকলকেও পৃথিবী যে বলে আকর্ষণ করে পালক ও কাগজের পরমাণু সকলকেও ঠিক সেই বলে আকর্ষণ করে" অর্থাৎ সকল শব্দের অর্থ যদি সমষ্টি না হয়, তবে স্বর্ণের (molecular weight) আণবিক ভার কাগজের আণবিক ভারের সহিত সমান। তবে ড্যাল্টন যাহা বলিয়াছেন তাহা বোধ হয় ভুল।

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াসম্বন্ধে মহেন্দ্র বাবু কি বুঝিয়াছেন দেখা যাউক। তিনি বলেন যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চাপ ও প্রতিচাপ সব সময়ে সমান। কিন্তু কোন কোন স্থানে মাত্র বটে। "৬৯ পৃষ্ঠায় যদি টেবিলের প্রতিচাপ হইতে দ্রব্যের চাপ অধিক হয় তাহা হইলে টেবিল ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া যাইবে।" কিন্তু চাপ যে কখনও প্রতিচাপ হইতে বেশী হয় ইহা নিউটন বলেন না। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে তাহা আমরা সময়ানুসারে বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিব।

আকর্ষণসংক্রান্ত নিয়ম যিনি বুঝিতে পারেন নাই তিনি স্থিতিবিজ্ঞান ও গতিবিজ্ঞানের বিষয় যাহা বুঝিয়াছেন, ও বুঝাইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। আমি প্রতিপরিচ্ছেদ লইয়া সমালোচনা করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রস্তাবের কলেবর বাড়িয়া যায় এই ভয়ে ক্ষান্ত হইলাম।

বায়ুবিজ্ঞানে ও বারিবিজ্ঞানে প্রথমে চাপ কাহাকে বলে এইটি ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। চাপ কাহাকে বলে ইহা যিনি ভাল করিয়া বুঝেন নাই, তিনি বারিবিজ্ঞান ও বায়ুবিজ্ঞানের কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। মহেন্দ্রবাবু বায়ুমানযন্ত্রের বিষয় যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তিনি বায়ুর ভার ও বায়ুর চাপ একই কথা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৯৪ পৃষ্ঠা) কিন্তু তাঁহার জানা উচিত ছিল চাপ, কেবল চাপ ব্যতীত ভার নহে এবং ভার শুদ্ধ ভার বই চাপ নহে। (presure is presure and weight is weight) কোন পাত্রস্থিত বাতাসের ওজন অন্য এক ক্ষুদ্রতর পাত্রমধ্যস্থ বাতাসের ওজনের সমান হইতে পারে, কিন্তু একের চাপ

অন্যের চাপের সহিত সমান নয়। বায়ুমানযন্ত্রে যে পারদ উঠে বায়ুর ভার তাহার কারণ নয়, বায়ুর চাপই তাহার কারণ; একটি মুখবন্ধ কাচপাত্রের অভ্যন্তরে যদি বায়ুমানযন্ত্র রাখা যায়, তাহা হইলে সেই যন্ত্রের পারদের উপর কিছু উপরিস্থ সমস্ত বাতাসের ভার পড়ে না, তথাপি পারদপাত্রের মুখ খোলা থাকিলে যতদূর উঠিত বন্ধ করিলেও ততদূর উঠিবে। যদি পাত্রের মধ্যস্থ বায়ু ঘনীভূত করা যায় তবে বায়ুমানযন্ত্রের মধ্যে পারদ আরও অধিক উঠিবে। কারণ বায়ুর চাপ বায়ুর ঘনত্বের উপর নির্ভর করে, ভারের উপর নির্ভর করে না। এইরূপ ভার ও চাপের একই অর্থ মনে করিয়া অনেকে অনেক গোলযোগ করেন। যেমন মহেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে "আমরা প্রায় ৩৭৫ মণ ভারে আক্রান্ত রহিয়াছি, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদিগকে কোনরূপ ভার সহ্য করিতে হইতেছে ইহা আমরা একবার ভ্রমেও মনে করি না।" মহেন্দ্র বাবুর পক্ষে ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বটে, কারণ তিনি ভার ও চাপের বিভিন্নতা কখনও মনে ভাবেন নাই, কিন্তু যিনি ভার ও চাপের বিভিন্নতা স্পষ্ট বুঝিয়াছেন তিনি এই বায়ুসাগরে মগ্ন হইয়াও কেন যে কিছু ভার সহ্য করেন না তাহা বিশেষ বুঝিয়াছেন। বাস্তবিক আমরা যখন মোট মাথায় করিয়া না বেড়াই তখন নিজের শরীরের ভার ভিন্ন কিছুই বহন করি না। বায়ুসাগরে ডুব দিয়া বেশী ভার বহন করা দূরে থাকুক বরং কম ভার বহন করি, কারণ বায়ুমধ্যে থাকিলে শরীরের যে ভার ও শরীরের আয়তনপরিমিত বায়ুর ভার যোগ করিলে নির্ব্বাতস্থলে শরীরের ভারের সমান হয়।

তরল পদার্থের কোন বিন্দুর উপর চাপ, presure at a point), চাপসমষ্টি (total presure) সংঘাত চাপ (resultant presure) প্রভৃতি ইহাদের প্রভেদ স্পষ্ট করিয়া না বুঝাইয়া দেওয়াতে এক চাপ কথা লইয়া পুস্তকমধ্যে অনেক ভ্রম ঘটিয়াছে।

মহেন্দ্র বাবু ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "তরল বস্তুর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্রই সমান উচ্চ।" ইহা পড়িয়া আমরা এই বুঝিতে পারি যে গঙ্গোত্রী ও সাগরসঙ্গমের জলপৃষ্ঠ সমান উচ্চে অবস্থিত। কলিকাতার গঙ্গার জলপৃষ্ঠ সাগরসঙ্গমের জলপৃষ্ঠ হইতে উচ্চ এই কথা কোন বালককে বলাতে সে উত্তর করে যে, তাও কি হয়, আমরা পদার্থবিদ্যায় পড়িয়াছি "জল উঁচু নিচু হইতে পারে না।" "তরল বস্তুর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্র সমান" ইহা লিখিবার সময় মহেন্দ্র বাবুর মনের ভাব এই যে তরল বস্তুর যখন সাম্যাবস্থা থাকে তখন তাহার পৃষ্ঠদেশ সমোচ্চ।

১২২ পৃষ্ঠা "সূর্য্যকিরণ বায়ুরাশির মধ্য দিয়া আসিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা বায়ুরাশির উষ্ণতার তাদৃশ বৃদ্ধি হয় না। পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে তেজ প্রতিফলিত পরিচালিত ও পরিবাহিত

হইয়া উহাকে উষ্ণ করে। এই নিমিত্ত বায়ুরাশির অধোদেশমাত্র উষ্ণ কিন্তু ঊর্দ্ধদেশ হিম।" পূর্ব্বপৃষ্ঠায় পরিবাহন কাহাকে বলে বুঝান আছে। যদি এক কড়া জল চুল্লীতে গরম করিতে বসাই, তবে নিম্নের জল প্রথমে গরম হইবে। গরম জল লঘু হওয়াতে উপরে উঠিবে এবং উপরের জল নীচে আসিয়া পুনরায় গরম হইবে এবং উপরে উঠিবে। এইরূপে তাপ প্রবাহিত হওয়ার নাম পরিবাহন। সুতরাং পরিবাহনদ্বারা যেরূপ এক কড়া জল সমস্ত সমান উষ্ণ হয় সেইরূপ সমস্ত বায়ু সমান উষ্ণ হইবারই কথা। অতএব উপরের বাতাস কেন শীতল সেই বিষয়ে যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার যুক্তি এই—সূর্য্যকিরণ দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় পরে পরিবাহন দ্বারা বায়ু উষ্ণ হয় কিন্তু পরিবাহন বশতঃ সমস্ত বায়ু সমান উষ্ণ হইবার কথা এইজন্য বায়ুরাশির অধোদেশ উষ্ণ ও ঊর্দ্ধদেশ হিম। যথেষ্ট বুঝিয়াছি। উপরের বায়ু কি কারণে শীতল তাহা আমরা এইস্থলে সংক্ষেপে বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমে কোন বায়ুনির্ঘাতনযন্ত্রের আবরণমধ্যস্থ বায়ুর চাপ কমাইয়া দিয়া যদি পরে বাহিরের বায়ু প্রবেশ করান যায়, তবে বায়ু প্রবেশকালে শীতল হইয়া পড়ে। এমন কি কোন কোন সময় বায়ু স্থায়িত জলীয় বাষ্প কুজ্ঝটিকার আকার ধারণ করে। ইহার কারণ এই যে বাহিরের বায়ুর পূর্ব্বে যে চাপ ছিল আবরণ-অভ্যন্তরে প্রবেশ কালে সেই চাপের হ্রাস হওয়াতে উহার আয়তন বৃদ্ধি হয়। এই আয়তনবৃদ্ধির সময় বায়ু চতুঃপার্শ্বস্থিত বায়ুর চাপের বিরুদ্ধে যে কার্য্য করিল কোন শক্তি দ্বারা সেই কার্য্য সমাধা হইল। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে আভ্যন্তরিক তেজের কিয়দংশ ক্ষয়িত হইয়া উক্ত কার্য্য সমাধা হইল সুতরাং বায়ু শীতল হইয়া পড়িল। আমরা জানি যে যত উপরে উঠা যায় বায়ুর চাপ তত কমিতে থাকে, সুতরাং ভূতলসন্নিকটস্থ বায়ু যখন উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠে, যত উপরে উঠে তত তাহার চাপ কমিতে থাকে; সুতরাং তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয় ও শীতল হইয়া পড়ে; কিন্তু এইরূপে শীতল হওয়াতে উহার ঘনত্বের বৃদ্ধি হয় না সুতরাং পুনরায় নামিয়া আসিয়া আবার উষ্ণ হয় না।*

মহেন্দ্র বাবু কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন বালকদিগকে বুঝান উচিত ছিল। যথা সামগ্রী (Mass) লম্ব (Vertical) সমতল (Level) ইত্যাদি। তিনি যখন ভুষার অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন (১২৩ পৃষ্ঠা ভুষা নামক যে বস্তুটির দ্বারা তেলকালি প্রস্তুত হয়) তখন ঐরূপ কথা গুলির অর্থ বুঝাইয়া দিলে অসঙ্গত হইত না। কারণ আমরা লম্ব অর্থে perpendicular

* এই অংশ অন্য সময়ে বঙ্গদর্শনে পরিষ্কার রূপে লিখিবার মানস রহিল।

সমতল অর্থে (plane superfices) বলিয়া বুঝি। জড়ের গুণের মধ্যে জড়ের অবিনশ্বরতা গুণটির উল্লেখ করিলে বোধ হয় বেশি ক্ষতি হইত না।

অধিক আর কি বলিব ইহাতে নাই এমন কিছুই নাই। ইহাতে অনুপ্রাস আছে, অলঙ্কার আছে, শব্দবিন্যাস আছে, কবিত্ব আছে, যথা (৯০ পৃষ্ঠা) "বায়ু না থাকিলে পর্ব্বতনন্দিনী সুস্বাদু সলিলশালিনী প্রবাহিনী স্রোতস্বিনীগণ কলকল রবে প্রবাহিত হইত না। বায়ু না থাকিলে কাদম্বিনীর ললাটদেশ সৌদামিনীরূপ সিঁথিতে সমুজ্জ্বলিত হইত না। ইহাতে স্ক্রু আছে, কপিকল আছে, দড়ি আছে, জলপাত্রও আছে। মোট "হিঁরা মুলিয়ুচ হ্যায়, প্রাড়বিবেক হ্যায়, পুষ্টছায়বি হ্যায়" সব শেষে প্রশংসাপত্র বিজ্ঞাপি।

মহেন্দ্র বাবু বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন বাঙ্গালায় বিজ্ঞানবিষয়ক সহজ বিষয় লইয়া কোন ভাল বই নাই বলিয়া তিনি এই ভাল বই লিখিতে প্রবৃত্ত হন।" কিন্তু অক্ষয় বাবু যেরূপ পরিষ্কাররূপে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহার পর মহেন্দ্রবাবুর ভাল বই একটু পরিষ্কার হইলে সুখী হওয়া যাইত। যে যে বিষয় তিনি ভালরূপ বুঝিয়াছেন তাহাই লিখিলে ভাল হইত।

যিনি এই সমালোচনার বিপক্ষে কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন তিনি এই বঙ্গদর্শনে প্রতিবাদ লিখিয়া সকলকে জানাইলে সন্তুষ্ট হইব।

শ্রীয, গো,

অভিজ্ঞান শকুন্তল।

২। দুষ্মন্ত—নাটকের চরিত্র।

অনেক প্রথম শ্রেণীর নাটকে দুই রকম নাটকত্ব থাকে। একরকম নাটকত্ব দৃশ্যমান—নাটকের আখ্যায়িকা পড়িয়া গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং বুঝিতে পারা যায়। আর একরকম নাটকত্ব অদৃশ্যমান—নাটক পড়িয়া গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় না এবং বুঝিতে পারা যায় না—বুঝিতে হইলে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। একরকম নাটকত্ব নাটকের গায়ে আঁকা থাকে—দেখিতে ইচ্ছা কর আর নাই কর, নাটক পড়িতে গেলে দেখিতেই হইবেক। আর একরকম নাটকত্ব নাটকের গায়ে আঁকা থাকে না—ইচ্ছা না করিলে দেখিতে পাওয়া যায় না—ইচ্ছা করিয়া যুক্তিদ্বারা টানিয়া বাহির করিতে হয়। সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নামক নাটক পড়িলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে যুবরাজ হ্যাম-

লেটের মন তাঁহার দুরাত্মা পিতৃব্যের সম্বন্ধে রোষপূর্ণ, ঘৃণাপূর্ণ, পিতৃহত্যার প্রতিশোধবাসনাপূর্ণ, কিন্তু প্রতিশোধ-সাধনে অদৃঢ়সঙ্কল্প—পিতৃব্যপ্রাণসংহারে অনিশ্চিতহস্ত। দেখিতে পাওয়া যায়, নাটকখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই দ্বিভাবাঙ্কিত। দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যুবরাজ হ্যাম-লেট পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিবার জন্য ভয়ানক আবেগবান্, কিন্তু প্রাণসংহার করেন করেন করিয়াও করিতে পারেন না। এইটি হ্যামলেট নাটকের দৃশ্যমান নাটকত্ব—নাটকখানি পড়িয়া গেলেই দেখিতে পাওয়া যায়—পড়িয়া গেলেই চোকে পড়ে। কিন্তু এই দৃশ্যমান নাটকত্বের মূলে একটি গূঢ় বা অদৃশ্যমান নাটকত্ব আছে—এই দ্বিভাবের মূলে একটি দ্বিভাবোৎপাদক মানবপ্রকৃতি আছে। যে বিশেষ মানসপ্রকৃতির বলে, যে বিশেষ মনোগঠনপ্রণালীর গুণে কার্য্য-ক্ষেত্রে ইচ্ছা এবং সঙ্কল্পের মধ্যে এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাই হ্যামলেট নাটকের গূঢ় বা অদৃশ্যমান নাটকত্ব। এই গূঢ় বা অদৃশ্যমান নাটকত্ব দৃশ্যমান নাটকত্বের কারণস্বরূপ। দৃশ্যমান নাট-কত্বের ন্যায় ইহাকে নাটকের গায়ে পরিষ্কাররূপে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায় না—গূঢ়নিহিত বলিয়া ইহাকে খুঁজিয়া পাতিয়া লইতে হয়। অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকেও ঠিক তাই। পূর্ব্বপ্রস্তাবে যে নাটকত্বের কথা বলিয়াছি তাহা দৃশ্যমান নাটকত্ব। এই দৃশ্যমান নাটকত্বের মূলে যে গূঢ় অদৃশ্যমান নাটকত্ব আছে এক্ষণে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

পূর্ব্বপ্রস্তাবে আমরা দুষ্মন্তসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার সারমর্ম্ম একবার বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে। দুষ্মন্ত কণ্বের তপোবনে প্রণয় করিতে বসিয়াছেন—একটি অসামান্যা রূপলাবণ্যসম্পন্না বালি-কার সহিত প্রণয় করিতে বসিয়াছেন। এই প্রণয় করিতে বসিয়া দুষ্মন্তের মহা-পরীক্ষা হইয়া গেল। এ কিসের প-রীক্ষা? এ কি দুষ্মন্তের প্রণয়ের পরীক্ষা? বোধ হয় অনেকে বলিবেন—হাঁ তাই। বোধ হয় অনেকে বলিবেন যে দুষ্মন্ত জনশূন্য তপোবনে একটি স্বল্পবয়স্কা, সরলমনা, রাজমাহাত্ম্যমুগ্ধা তাপসবালাকে দেখিয়া প্রণয় করিয়াছেন বলিয়া পাছে কেহ কিছু মনে করে সেইজন্য মহাকবি পরীক্ষাদ্বারা দেখাইলেন যে সে প্রণয় পবিত্র প্রণয়। এ কথার একটি উত্তর এই যে কালিদাসের ন্যায় প্রথমশ্রেণীর কবিগণ দূষিত প্রণয় লইয়া কখনও কাব্য বা নাটক লেখেন না।* দ্বিতীয়

* সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ সমালোচক Dr. Ulrici সেক্ষপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েট নামক নাটকসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন :—

"That the leading interest of this drama is centered in the loves of Romeo and Juliet, is clear even to a child. Still I cannot persuade

উত্তর এই যে জলসেচনকার্য্যনিরতা শকুন্তলাকে ব্রাহ্মণকন্যা মনে করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণসম্বন্ধে দুষ্মন্ত যেরূপ সন্দেহসংক্ষুব্ধ হন, তাহাতেই সপ্রমাণ যে দুষ্মন্ত দূষিতান্তঃকরণে শকুন্তলার সহিত প্রণয় করিতে বসেন নাই। তৃতীয় উত্তর এই যে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ করিয়া বিবাহের নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয়ক শকুন্তলাকে দিয়া যান। চতুর্থ উত্তর এই যে উপন্যাসের প্রারম্ভেই কবি দুষ্মন্তকে যেরূপ শান্ত এবং পবিত্র মূর্ত্তিতে দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রণয়ের পবিত্রতা সমর্থন করা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমরা এইটুকু স্বীকার করি যে এই পরীক্ষায় গাঢ় পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। মনুষ্য-হৃদয়ের প্রকৃতিপ্রকটন করা নাটকমাত্রেরই উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা এমন কথা বলিতে পারি না যে শুদ্ধ পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য মহাকবি দুষ্মন্তকে মহাপরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। সে প্রকৃতি বুঝাইতে হইলে নাটক লিখিতেই হইবেক, এমন কোন কথা নাই। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান কবি লংফেলোর Evangeline নামক ঔপন্যাসিক কাব্য এই কথার একটি প্রমাণ। আমরা জানি যে দুষ্মন্তের মহা-পরীক্ষা ভয়ানক যন্ত্রণাময়—আমরা জানি যে সেই পরীক্ষায় পড়িয়া দুষ্মন্ত অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিয়াছেন। কিন্তু পবিত্র-ভাবে প্রণয় করিয়া কোন্ নৈতিক নিয়মে যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়? অতএব পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি দেখাইবার জন্য যন্ত্রণা-ময় পরীক্ষা হইল, এ কথা মনে করা সমস্ত নীতিশাস্ত্রের, সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ।

তবে এ পরীক্ষা কিসের পরীক্ষা? প্রশ্নটী বড় গুরুতর। অতএব কিঞ্চিৎ বাহুল্যব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রথম প্রস্তাবে দুষ্মন্তের প্রণয়োপাখ্যান যে রকম বিবৃত করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দুষ্মন্তের প্রণয়ের সূত্রপাত হইতেই তাঁহার পরীক্ষার আরম্ভ। আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হৃদয় যন্ত্রণাময়। আমরা দেখিতে পাই দুষ্মন্ত প্রেমে উত্তে-জিত হইবামাত্রই প্রেমানুভবের সুখা-

myself that the meaning of the whole piece is exhausted in the deification and entombment of love, and that this idea constitutes the groundwork of the play. On the contrary, Shakspeare can scarcely have designed to deify love merely as an inexpressible feeling—an intoxicating passion. That were, indeed, an idolatry of which art could never be guilty, even though, like the African with his Fetish, it should destroy its idol with its own hand."

Dr. Ulrici প্রণীত Shakespeare's Dramatic Art নামক গ্রন্থের ১৭৫ পৃষ্ঠা।

স্বাদনে অক্ষম। আমরা দেখিতে পাই, যে দণ্ডে দুষ্মন্তের হৃদয় প্রেমবিহ্বল, সেই দণ্ডেই দুষ্মন্তের মন ধর্ম্মভয়ে ভীত। প্রেম কি? না শারীরিক বিকারযুক্ত হৃদয়ের ভাববিশেষ। প্রেম একটি passion। ধর্ম্মভয় জ্ঞানমূলক। সকলেই জানেন যে জ্ঞান এবং ভাব প্রায়ই পরস্পর বিরোধী। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা বলেন যে sensation and perception bear an inverse ratio to each other। রোমিও জুলিয়েটের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই প্রেমের পথে যে সকল কণ্টক আছে তাহা দেখিতে পান না। দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই প্রেমের পথে যে সকল কণ্টক থাকিতে পারে তাহা বুঝিয়া দেখেন। ইহাতেই এক রকম বুঝা যায় যে সেক্সপীয়রের নায়ক ভাবের শাসনে জ্ঞানভ্রষ্ট; কালিদাসের নায়ক ভাবের শাসনেও জ্ঞানের শাসনাধীন। ইহাতেই বুঝা যায় যে সেক্সপীয়রের নায়কের মনে তাঁহার ভাবের বিরোধী কিছুই নাই; কালিদাসের নায়কের মনে তাঁহার ভাবের বিরোধী জ্ঞান এবং জ্ঞানমূলক ধর্ম্মভয় আছে। তাই বলিতেছিলাম যে, দুষ্মন্তের প্রণয়ের সূত্রপাত হইতেই তাঁহার পরীক্ষার আরম্ভ। এইখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। সেক্সপীয়রের নায়কের প্রেমের বিঘ্ন, বাহ্যবস্তুসম্ভূত—মণ্টেগিউ এবং কেপুলেট বংশদ্বয়ের চিরশত্রুতাজনিত। কালিদাসের নায়কের প্রেমে বাহ্যকারণসম্ভূত বিঘ্ন কিছুই নাই। দুষ্মন্ত দেখিতেছেন, শকুন্তলার জন্মদুঃখিনী সুখদুঃখভাগিনী প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া,শকুন্তলার বিবাহের ঘটকালীতে নিযুক্ত। তিনি বুদ্ধিমান্—বুঝিতেছেন যে আশ্রমের অধিনায়িকা গৌতমী সব জানিয়াও ভান করিতেছেন যেন কিছুই জানেন না। তিনি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন যে স্বয়ং ভগবান্ কণ্ব কেবল উপযুক্ত পাত্রের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। বস্তুতই দুষ্মন্তের প্রেমের একমাত্র বিঘ্ন দুষ্মন্তের অন্তর্জগতের জ্ঞানমূলক ধর্ম্মভাব।

তার পর আমরা দেখিতে পাই যখনই দুষ্মন্ত শকুন্তলাভাবে ভোর তখনই মহাকবি তাঁহাকে সেই ভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থায় নিক্ষেপ করিতেছেন। আমরা দেখিতে পাই, যখন দুষ্মন্ত মোহাভিভূত, তখনই মহাকবি তাঁহাকে পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন। সকলেই জানেন যেখানে মোহাধিক্য সেইখানেই কার্য্যশক্তির নাশ—সেইখানেই মনুষ্য প্রায় উদ্যমহীন। একবারমাত্র শকুন্তলাকে দেখিয়া পুনরায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য দুষ্মন্ত লালায়িত হইয়াছেন। হইয়া ঋষিদিগের আহ্বানে পুনর্দর্শনাশায় উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময় রাজমাতার নিকট হইতে গৃহপ্রত্যাগমনের আজ্ঞা আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্থাৎ আত্মভাব এবং আত্মেতরভাবের সংঘর্ষ উপস্থিত। ইহার তাৎপর্য্য কি? বলা অনাবশ্যক যে শুধু

মাধব্যকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য কবি এইরূপ ঘটনাকৌশল অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু এটি বলা আবশ্যক যে এই আত্মভাব এবং আত্মেতরভাবের সংঘর্ষে, আত্মেতরভাবেরই জয় হইল। দুষ্মন্তের প্রেমশক্তির প্রবলতা প্রতিপন্ন না হইয়া তাঁহার মাতৃস্নেহের এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রবলতা প্রতিপন্ন হইল। তবে কেমন করিয়া বলিব যে দুষ্মন্তের পরীক্ষা তাঁহার প্রেমশক্তির পরীক্ষা?

আবার যখন দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পাইয়াও না পাইয়া প্রজ্জ্বলিতচুল্লীর ন্যায় প্রেমানল উদ্গার করিতেছেন, তখনই মহাকবি তাঁহাকে বিপন্নের আর্ত্তরব শ্রবণ করাইলেন। আবার সেই আত্মভাব এবং আত্মেতরভাবের সংঘর্ষ। এবং আবার সেই রকম আত্মভাবের লয় হইয়া আত্মেতরভাবের ঘোরতর উদ্রেক। আবার সেই রকম প্রেমশক্তির প্রবলতা চিত্রিত না হইয়া সামাজিক স্নেহের এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রবলতা চিত্রিত হইল।

আর বলিবার আবশ্যক নাই। পূর্ব্বপ্রস্তাবটী স্মরণ করিলেই অবশিষ্ট এবম্বিধ ঘটনাগুলির অর্থগুরুত্ব এবং ভাবগাম্ভীর্য্য অনুভূত হইবেক।

এখন বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে দুষ্মন্তের পরীক্ষা তাঁহার প্রেমশক্তির পরীক্ষা নয়, তাঁহার জ্ঞান এবং সৎপ্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মভাব এবং আত্মপরতার [illegible] তেজ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কে না জানে যে সেই বিষম চিত্রদর্শনের পর ভূপতিত বিহ্বলহৃদয় বিহ্বলজ্ঞান দুষ্মন্ত যখন বিপন্নের আর্ত্তনাদ শুনিয়া বীরবিক্রমে ধনুর্ব্বাণ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন তখন বোধ হইল যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিশিখা দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া উঠিল! তবে দুষ্মন্তের মনের সংঘর্ষ কিসের সংঘর্ষ হইতে পারে? আমাদের বোধ হয় এ সংঘর্ষ সেই মনের আত্মভাবের এবং আত্মেতর ভাবের সংঘর্ষ। আমাদের বোধ হয় এ সংঘর্ষ সেই মনের আত্মপরতার এবং সমাজপরতার সংঘর্ষ। আমাদের বোধ হয় এ সংঘর্ষ সেই মনের একঅংশের সহিত আর একঅংশের সংঘর্ষ। সেক্সপীয়রের সর্ব্বপ্রধান প্রেমতত্ত্বজ্ঞাপক নাটক, রোমিও এবং জুলিয়েট, এ রকমের নয়। রোমিওর মনের সংঘর্ষের কারণ দুইটি বংশের চিরশত্রুতা—বাহ্যজগৎমূলক। রোমিওতে, এক দিকে একটি রিপুময় মন, আর একদিকে বাহ্য বা জড়জগৎ। দুষ্মন্তে, মনের একদিকে একটি রিপুময়তা আর একদিকে বাকি সমস্ত মনটা। দুইটি পরীক্ষার প্রণালী দুই রকম। কোন্ প্রণালীটী উৎকৃষ্ট, পরে বলিব।

আমরা দেখিলাম যে দুষ্মন্ত একটি আত্মেতরভাব বা সামাজিকভাব-প্রধান-চরিত্র। আমরা দেখিলাম যেখানেই দুষ্মন্তের মনের আত্মভাবের এবং আত্মেতরভাবের সংঘর্ষ সেইখানেই তাঁহার

আভ্যন্তরভাব বিজয়ী। আমরা দেখিলাম, যেখানেই আত্মসম্ভোগ এবং সামাজিক ধর্ম্মের বিরোধ সেইখানেই দুষ্মন্তের সামাজিকধর্ম্ম প্রবলতর। এমন কেন হয়? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে, সেই সামাজিক ধর্ম্মভাবের প্রকৃতিটী বুঝিয়া দেখিতে হইবেক।

জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, মনুষ্যের সামাজিক প্রকৃতি দুইপ্রকার—একটি ভাবমূলক, আর একটি জ্ঞান বা যুক্তিমূলক। সামাজিক ধর্ম্মাধর্ম্ম—সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইলে জগতের কতকগুলি লোক নিজের যুক্তিশক্তিপ্রয়োগ না করিয়া পরের মতাবলম্বী হইয়া চলেন; আর কতকগুলি লোক পরের মতানুসরণ না করিয়া নিজের যুক্তিশক্তিপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। পরের মতানুসরণ করিয়া সংসারধর্ম্ম করা মোহের কার্য্য। সে মোহ শ্রদ্ধাতিশয়মূলক। ভারতে এ পর্য্যন্ত এই মোহমূলক সমাজপ্রণালী প্রচলিত রহিয়াছে। আমরা সকলেই জানি যে এই প্রাণিসঙ্কুল লোকসাগরতুল্য ভারতভূমিতে অতি পূর্ব্বকাল হইতে ব্রাহ্মণবাক্যই সামাজিক ধর্ম্মাধর্ম্মের একমাত্র সূত্র—একমাত্র নিয়ামক। এখানে ধর্ম্মাচার্য্য যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কোটি কোটি মানব তাহাকেই কার্য্যক্ষেত্রে ধর্ম্ম বলিয়া অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। এখানে ধর্ম্মাচার্য্য যাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কোটি, কোটি মানব তাহাকেই কার্য্যক্ষেত্রে অধর্ম্ম বলিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। উন্নতিশীল ইউরোপেও এই দৃশ্য দৃষ্ট হইয়াছে। দুই কি তিনশত বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত ইউরোপবাসী ভারতের প্রণালীতে সংসারধর্ম্ম করিত—রোমানক্যাথলিক পুরোহিতগণের বাক্যই সমস্ত ইউরোপে একমাত্র ধর্ম্মসূত্র, একমাত্র ধর্ম্মনিয়ামক ছিল। এখনও অর্দ্ধাধিক ইউরোপবাসীর মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত। এই মানবপ্রকৃতি রহস্যের মূল কি? আমাদের বোধ হয় ইহার একটি মূল মনুষ্যমনের একরকম স্বাভাবিক অলসপ্রিয়তা—অনুসন্ধান করিবার শ্রমকাতরতাজনিত ইচ্ছাশক্তি বা will power এর দুর্ব্বলতা। আর একটি মূল, চিরদৃষ্ট উৎকৃষ্টতার সম্বন্ধে মনুষ্যমনের শ্রদ্ধার ভাব। ভাল জিনিস প্রাচীন হইলে অনেকে স্বভাবতই তাহাতে সম্ভ্রমের সহিত আসক্ত হয়। সে আসক্তি একটি মোহের স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সে মোহে অর্দ্ধাধিক জগৎ মুগ্ধ। সে মোহ খণ্ডন করা একরকম অসাধ্য বলিলেই হয়। আর কতকগুলি লোক যুক্তিদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত মোহে মুগ্ধ নন। তাঁহারা প্রাচীন মত, প্রাচীন পদ্ধতি, প্রাচীন বস্তুকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজ বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। এটিও মনুষ্যমনের একটি স্বাভাবিক প্রকৃতি। এই প্রকৃ-

তির বলে ইউরোপে প্রটেষ্টাণ্ট বিপ্লব; ভারতে বুদ্ধদেবের সমাজসংস্কার। এই দুইটি মানবপ্রকৃতির কোনটিই পরিত্যজ্য নয়। কিন্তু দুইটি একত্রীভূত না হইলে সমাজের বিষম অমঙ্গল ঘটে। সমাজ হয় ভারতের ন্যায় জমাট বাঁধিয়া উন্নতিসাধনে এককালে অক্ষম হইয়া উঠে, নয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের ন্যায় অনন্তবিপ্লবাবর্ত্তে ঘুরিতে থাকে। মনুষ্যজাতির এই দুইটি প্রকৃতিরই আবশ্যক। এবং মনুষ্যজাতির ইতিহাসেও দেখা যায় যে মনুষ্যজাতি সততই এই দুইটি প্রকৃতির সামঞ্জস্যসাধনের দিকে ধাবমান। ইউরোপে এবং এশীয়ায় মধ্যে মধ্যে যে সকল ভয়ানক সমাজবিপ্লব এবং ধর্ম্মবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, সেই সকল বিপ্লব মনুষ্যজাতির এই স্বাভাবিক সামঞ্জস্যসাধনস্পৃহার বলবৎ সাক্ষী। কালিদাসের দুষ্মন্ত এই সামঞ্জস্যসাধনস্পৃহারূপ মানবপ্রকৃতির প্রতিকৃতি। দুষ্মন্তে এই সামঞ্জস্য সংসাধিত হইয়া গিয়াছে। সেইটি বুঝাইতেছি।

হিন্দুশাস্ত্রে দুষ্মন্তের অগাধ ভক্তি। তাঁহার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইল, তিনি ভাবিলেন—

"অয়ে শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ
বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্যকং।
অথবা ভবিতব্যানাং ভবন্তি দ্বারাণি
সর্ব্বত্র।"

এ ভক্তি বড় কম ভক্তি নয়। আমরা এ রকম ভক্তিকে কুসংস্কার বলি। আমরা এইরূপ বুঝি যে পৌরোহিত্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া জ্ঞানভ্রষ্ট না হইলে এ রকম ভক্তি মনে স্থান পায় না।

দুষ্মন্ত এমন বিশ্বাস করেন যে অন্যে যাগযজ্ঞ করিলে, তিনি তাহার ফলভাগী হইতে পারিবেন। তিনি বলেন— "অন্যমেব ভাগধেয়মেতে তপস্বিনো মে নির্ব্বপন্তি।"

দুষ্মন্ত প্রচলিতপ্রথার পক্ষপাতী। বৃদ্ধ কঞ্চুকীর কাছে শার্ঙ্গরব প্রভৃতির আগমনবার্ত্তা পাইয়া তিনি বলিতেছেন—

তেন হি বিজ্ঞাপ্যতাং মদ্বচনাদুপাধ্যায়ঃ সোমরাতঃ, অমুনাশ্রমবাসিনঃ শ্রৌতেন বিধিনা সৎকৃত্য স্বয়মেব প্রবেশয়িতুমর্হতীতি। অহমপি এতান্ তপস্বিদর্শনোচিতপ্রদেশে প্রতিপালয়ামি।

দুষ্মন্ত হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত কর্ম্মকাণ্ড মানিয়া থাকেন। তাঁহার গৃহে পবিত্র আহবনীয়াগ্নি সযত্নে রক্ষিত—

রাজা। উত্থায়। বেত্রবতি! অগ্নিশরণমার্গমাদেশয়।

দুষ্মন্ত মনে করেন যে ভারতের মুনিঋষিগণ দেবতুল্য। তিনি মুনিঋষিকে দেবতানির্ব্বিশেষে ভয় করেন, ভালবাসেন এবং সম্ভ্রম করেন। তিনি জানেন যে—

শমপ্রধানেষু তপোধনেষু গূঢ়ং হি দাহাত্মক মস্তি তেজঃ।
স্পর্শানুকূলা অপি সূর্য্যকান্তা স্তে হ্যন্য
তেজোঽভিভবাদ্বমন্তি॥

পাঠক বোধ হয় সকলেই জানেন

করিবেন যে, যে ব্যক্তির মনের বিশ্বাস এইরূপ, সে ব্যক্তি পৌরোহিত্যকুহকে অভিভূত। পাঠক বোধ হয় বলিবেন, যে ব্যক্তির মনের ভাব এই রকম, সে ব্যক্তি ইউরোপের 'মধ্যযুগের' ন্যায় পৌরোহিত্যপ্রধান যুগের লোক বই উন বিংশশতাব্দীর ন্যায় জ্ঞানপ্রধান যুগের লোক হইতে প্যারে না।

দুষ্মন্তের কাছে মুনিঋষির আজ্ঞা দেবাজ্ঞার ন্যায় মাননীয় এবং পালনীয়। তিনি মৃগয়ার খরতর ঔৎসুক্যে প্রধাবিত হইয়া ভয়কুণ্ঠিত পলায়নপর মৃগোপরি অব্যর্থ শর নিক্ষেপ করেন করেন, এমন সময় ঋষিদিগের নিষেধাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। অমনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার সেই আজানুলম্বিত উরুশোণিতোত্তেজিত বজ্রসারবাহু গুটাইয়া লইয়া তিনি সেই বীরহস্তোপযোগী শাণিত শর তূণীরের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।

ন খলুন ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়
মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে তুলরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক বত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতি লোলং
ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরা স্তে॥
তৎসাধু কৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্।
আর্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্তুমনাগসি॥

রাজা। সপ্রণামম্। এষ প্রতিসংহৃত এব। ইতি যথোক্তং করোতি।

"সপ্রণামম্। এষ প্রতিসংহৃত এব।" বলিতে গেলে, দুষ্মন্ত প্রায় প্রণাম করিতে করিতেই সেই দুর্দমনীয় শর শরাধারে ফেলিয়া দিলেন। মৃগয়োন্মত্ত বীরচূড়ামণি যেন একটা জঠরানলক্ষিপ্ত কেশরীর ন্যায় কোন একটা বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা আহত হইয়া নিমেষমধ্যে বিনষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল। শকুন্তলা নাটকের প্রতিশ্লোকেতে দুষ্মন্তচরিত্রের যেটি প্রধান লক্ষণ, অর্থাৎ বিরোধিভাবের অবিরোধে অবস্থান, সেটি প্রতিপন্ন। এমন নাটক কি আর হয়!

আর বিস্তার না করিয়া এক কথায় বলিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীর ১২০ কোটি মানবের মধ্যে এখনও ৭০ কোটি মানব যেমন পুরাতন প্রথার কাছে এবং পুরাতন প্রথার যাজকদিগের কাছে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মোহাভিভূত, কালিদাসের দুষ্মন্তও ঠিক্ তাই। কিন্তু তাই বলিয়া দুষ্মন্ত কি সেই ৭০ কোটি মানবের ন্যায় অন্তর্দৃষ্টিহীন? তাই বলিয়া দুষ্মন্ত কি সেই ৭০ কোটি মানবের ন্যায় নিজে ভাল মন্দ বিচার করিতে অক্ষম এবং অনিচ্ছুক—ধর্ম্মাচার্য্যেরা যা ভাল বলেন তাই ভাল মনে করেন, ধর্ম্মাচার্য্যেরা যা মন্দ বলেন তাই মন্দ মনে করেন? না, দুষ্মন্ত সে প্রকৃতির লোক নন। শার্ঙ্গরব তাঁহাকে বলিলেন যে পূজ্যপাদ মহা ঋষি কণ্ব তাঁহার সহিত শকুন্তলার পরিণয়কার্য্যের অনুমোদন করিয়া শকুন্তলাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, অত-

এব তাঁহাকে শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ কথা শুনিয়া তিনি কি বলিলেন? তিনি বলিলেন—

অয়ে। কিমিদমুপন্যস্তম্।

এ কি! মহর্ষি কণ্ব বলিয়াছেন যে তিনি শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে তাপসকুলসম্ভ্রমকারী, তাপসকুলপক্ষপাতী, তাপসকুলভীত, তাপসকুলরক্ষক দুষ্মন্তের কি এই উত্তর? আবার শুধু তাই? এই অসঙ্গত উত্তরটী শুনিয়া শার্ঙ্গরব ঈষৎ রোষান্বিত হইয়া বলিলেন—

কিং নাম কিমিদমুপন্যস্তমিতি। ননু ভবন্তএব সুতরাং লোকবৃত্তান্ত নিষ্ণাতাঃ।
সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং
জনোঽন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।
অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে
প্রিয়াঽপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ।

এ কথা শুনিয়া দুষ্মন্ত কি বলিলেন— তিনি বলিলেন,

কিমত্র ভবতী ময়া পরিণীতপূর্ব্বা।

এ ত সেই অগ্নিপ্রভ সনাতনধর্ম্মনিরত ঋষিকুমারকে এক রকম মিথ্যাবাদী বলা। শার্ঙ্গরব ভারতের একজন তেজস্বী ঋষিকুমার। মর্ম্মাহত হইয়া তিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা দুষ্মন্তকে শ্লেষপূর্ণবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিং কৃতকার্য্যদ্বেষোধর্ম্মং প্রতি বিমুখতোচিতা রাজ্ঞঃ?

দুষ্মন্ত উত্তর করিলেন—

কুতোঽয়মসংকল্পনাপ্রশ্নঃ?

ভারতের ঋষিতপস্বী প্রবঞ্চক? আজ দুষ্মন্ত তাও মনে করিতে সক্ষম! ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই—যেখানে ভারতের ঋষিতপস্বী সত্যের বিরোধী, কুনীতিশিক্ষক, ধর্ম্মের বিপর্য্যয় করিতে উদ্যত, সেখানে ঋষিকুলপক্ষপাতী, ঋষিকুলসম্ভ্রমকারী দুষ্মন্ত ঋষিবাক্যেও হতশ্রদ্ধ। ইহার অর্থ এই—যেখানে পবিত্র ঋষির বাক্য সনাতনসত্যের, অপরিবর্ত্তনীয় অনপলাপ্য নীতি এবং ধর্ম্মতত্ত্বের বিরোধী, সেখানে দুষ্মন্তের কাছে ঋষিপ্রদত্ত ব্যবস্থা অপরিগ্রহণীয়, নিজযুক্তিসঙ্গত নীতিতত্ত্বই অনুসরণীয়। কিন্তু দুষ্মন্ত ঋষিবাক্য অসত্য বুঝিয়াও ঋষিদিগের প্রতি কোপাবিষ্ট নন—ঋষিদিগের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ নন। শার্ঙ্গরব মিথ্যা কথা কহিতেছেন বুঝিয়াও দুষ্মন্ত বলিতেছেন—

ভো তপস্বিন্ চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণ মত্রভবত্যাঃ স্মরামি।
তৎকথমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণাং প্রত্যাত্মানং ক্ষেত্রিণমাশঙ্কমানঃ প্রতিপৎস্যে।

ঋষির মুখে অশ্রদ্ধেয় কথা শুনিয়াও দুষ্মন্ত ঋষিচরিত্রের পবিত্রতা মনে করিয়া এখনও ঋষির প্রতি আস্থাবান্—এখনও ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতেছেন, কথাটা সত্য কি না। মনুষ্যের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায়, যেখানে স্বাধীনচিন্তা সেইখানে প্রাচীন প্রথানুরাগী আচার্য্যকুলের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা—সেইখানে পূর্ব্বাপর-প্রচলিত প্রথার প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণাপূর্ণ

এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব। প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কাছে পোপের নাম Anti-Christ এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম শয়তানের ষড়যন্ত্র। বুদ্ধের কাছে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এবং বেদ-পুরাণমূলকধর্ম্ম পৌরোহিত্যদূষিত কুসংস্কারকুণ্ড। দুষ্মন্তে জগতের দুইটি সামাজিক মানবপ্রকৃতি একত্রীভূত; কিন্তু তাহাদের সংঘর্ষে কর্কশতা নাই—সমাজদগ্ধকারী অগ্নিশিখা উঠে না। এরূপ সংঘর্ষ অসম্ভব নয়। ইংলণ্ডের ১৬৮৮ সালের রাজবিপ্লবে ইহার সম্ভবতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এবং আধুনিক মনুষ্যসমাজও বিনাবিরোধে এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বিভাবাপন্ন মানবপ্রকৃতির সামঞ্জস্য সাধনের দিকে ধাবমান দেখা যাইতেছে। কোম্‌তের সমাজদর্শনের আবির্ভাব এই স্পৃহার প্রধান নিদর্শন। দুষ্মন্ত এই গূঢ় ঐতিহাসিক নিয়মের চিত্র। দুষ্মন্ত এই অদ্ভুত ঐতিহাসিক মানবপ্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি। দুষ্মন্ত সমগ্র ঐতিহাসিক মনুষ্যসমাজের গূঢ়ার্থবোধক চরিত্র। দুষ্মন্ত ভূতকাল এবং ভবিষ্যৎকাল—উভয়কালের সমষ্টি। দুষ্মন্ত সমস্ত মনুষ্যজাতির ইতিহাসলক্ষিত নিয়তির কবিকল্পিত প্রতিমা।* এত বড় চরিত্র জগতের আর কোন নাটকে আছে কি না সন্দেহ। কালিদাস বোধ হয় এত ভাবিয়া লেখেন নাই। কিন্তু কবির প্রতিভায় ভবিষ্যইতিহাসও নিহিত থাকে। কবি ভাবের চক্ষে মানবপ্রকৃতির অনন্ততত্ত্ব দেখিয়া থাকেন এবং প্রতিভার গুণে মনুষ্যচরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য্য অনুভব করেন। তবে কলিদাসের সম্বন্ধে একটা কথা বলা যাইতে পারে। তিনি বৌদ্ধবিপ্লবের পর জন্মগ্রহণ করেন।

দুষ্মন্ত প্রচলিতমত এবং প্রচলিতপ্রথার অনুরাগী অথচ স্বাধীনচিন্তাশীল। ইহার অর্থ কি? আমরা দেখাইয়াছি যে প্রচলিতপ্রথার প্রতি অনুরাগ মনুষ্যহৃদয়ের একটি মোহের স্বরূপ। মোহ অন্ধ—যাহাকে অধিকার করে তাহাকে কিছুই দেখিতে দেয় না। দুষ্মন্ত সেই মোহের বশবর্ত্তী হইয়াও স্বাধীন। ইহার অর্থ—দুষ্মন্ত অন্ধ হইয়াও অন্ধ নন। অর্থাৎ আবশ্যক হইলেই দুষ্মন্ত জ্ঞানেরদ্বারা মোহের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন—দৃষ্টিনাশকারিতা দেখিতে পান। কিন্তু শুধু তা হইলেই কি হয়? এমন লোক আছেন, যাঁহারা দুষ্প্রবৃত্তির প্রকৃতি বুঝিতে পারেন কিন্তু বুঝিয়াও দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। না পারিবার

* বোধ হয় প্রাচীনভারতে ঐতিহাসিক প্রণালীতে মানবপ্রকৃতি নিরূপণ করিবার রীতি ছিল না। কিন্তু তাহাতে কিছু আইসে যায় না। যে ব্যক্তি ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে সামাজিক চরিত্রের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তিনি যে ইতিহাস পাইলে সেই তত্ত্ব ঐতিহাসিক প্রণালীতেও বুঝিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন স্থলে সে ব্যক্তির মত ঐতিহাসিক প্রণালীতে বুঝাইলে কোন দোষ পড়ে না।

কারণ কি? একটি কারণ তাঁহাদের সৎপ্রবৃত্তির শক্তিহীনতা; আর একটি কারণ অভিভূতাবস্থা হইতে উত্থানশক্তির অভাব। মনের এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইতে হইলে চেষ্টা বা উদ্যমের (effort) আবশ্যক। যে অবস্থা পরিত্যাগ করা যায় সে অবস্থা যতই অভিভাবকারী হয়, তাহা অতিক্রম করিবার চেষ্টা ততই বলবৎ করা চাই। এই চেষ্টার মূল—ইচ্ছাশক্তি বা will power।

দুষ্মন্তের মুনিঋষির প্রতি প্রেম এবং শ্রদ্ধা যে রকম প্রবল দেখিয়াছি তাহাতে তাহাকে মোহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু মুনিঋষি অপেক্ষা ভাল জিনিসের প্রয়োজন হইলে, দুষ্মন্ত সহজেই সেই মোহ কাটিয়া ফেলিয়া সেই উৎকৃষ্টতর বস্তুটি লাভ করিবার চেষ্টা করেন। ইহার অর্থ এই যে দুষ্মন্ত সৎপ্রবৃত্তির আধার। তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর বলিয়া তিনি সহজেই মোহের অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারেন। বুঝিতে পারিলেই সৎপ্রবৃত্তি তাঁহার মনকে অধিকার করে। অধিকার করিলে পর তাঁহার আশ্চর্য্য ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে তিনি বিনা আয়াসে মোহমুগ্ধাবস্থা হইতে অভিলষিত উৎকৃষ্ট অবস্থায় গমন করিতে পারেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই —দুষ্মন্ত এই আশ্চর্য্য ইচ্ছাশক্তি কোথায় পাইলেন? এ প্রশ্নের প্রথম উত্তর এই যে, সকল লোকে যেমন আর আর মানসিক গুণগুলি সমান পরিমাণে পায় না, তেমনি তাহারা ইচ্ছাশক্তিও সমান পরিমাণে পায় না। দ্বিতীয় উত্তর এই যে মানসিকশক্তির মূলপরিমাণ যতই হউক না কেন, সে শক্তি যতই প্রয়োগ করা যায় ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দুষ্মন্ত রাজা। পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র রাজাদিগের নাট্যশালা; সেইখানেই তাঁহাদিগকে অভিনয় করিতে হয়। নানাপ্রকৃতির লোকের সহিত, নানামতাবলম্বী সম্প্রদায়ের সহিত, অসংখ্য পরস্পরবিরোধী সমস্যার সহিত, অসংখ্য অভাবনীয় সহসাসম্ভূত বিপদের সহিত তাঁহাদের সংশ্রব। এই সকল গোলমালের মধ্যে থাকিয়া, এই সকল গোলমালের মীমাংসা করিয়া, তড়িৎবৎ কার্য্য করিতে হয়। দীর্ঘসূত্রিতা জগতের কার্য্যক্ষেত্রে অনর্থের মূল। এমনস্থলে নিজের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে চলে না, অপ্রখরবুদ্ধি হইলে চলে না। দীর্ঘসূত্রী হইলে চলে না। পাঠক এখন সহজেই বুঝিবেন যে এইরূপ কর্ম্মক্ষেত্রেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের বেশী প্রয়োজন এবং সেইজন্য ইচ্ছাশক্তি বেশী আয়ত্ত এবং অভ্যস্ত হইয়া থাকে। নেপোলিয়ন, তালেরান, পামার্ষ্টন, ডিস্‌রেলি, বিস্‌মার্ক—এই সকল রাজা এবং রাজমন্ত্রিগণের অসীম ইচ্ছাশক্তির কথা কে না জানে? কঞ্চুকী পর্ব্বতায়নের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে দুষ্মন্ত আসমুদ্র ভারতবর্ষের সমস্ত রাজকার্য্য স্বয়ং করিয়া থাকেন। সে স্থলে দুষ্মন্তের ইচ্ছাশক্তি যদি অসীম বল এবং

অনায়াসপ্রয়োজ্য না হইবে তবে হইবে ক্কার? প্রথম প্রস্তাবে আমরা দুষ্মন্তের যে আশ্চর্য্য চিত্তসংযমের চিত্র তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছি, পাঠক বোধ হয় এখন সেই আশ্চর্য্য চিত্তসংযমের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। দুষ্মন্তের চিত্তসংযম শক্তি এত প্রবল কেন? না দুষ্মন্ত পুরুষ-প্রধানের ন্যায় জগতের প্রতি সদ্ভাবপূর্ণ হইয়া, প্রখরবুদ্ধির অধিকারী হইয়া পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করত ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত করিয়াছেন বলিয়া। এইটী দুষ্মন্তের মনোগঠনপ্রণালীর গূঢ় তত্ত্ব—গূঢ় নাটকত্ব।

শকুন্তলা নাটকের পঞ্চমাঙ্কবর্ণিত প্রত্যাখ্যান-দৃশ্যটী দেখিয়াই আমরা দুষ্মন্ত চরিত্রের গূঢ়তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সক্ষম। সে দৃশ্যটী দুষ্মন্তের সামাজিক জীবনপ্রণালীর উদাহরণস্বরূপ। কিন্তু সে দৃশ্যের হেতু দুর্ব্বাশার শাপ। তাই আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে দুর্ব্বাশার শাপ শকুন্তলার উপন্যাসের প্রধান ঘটনা এবং সেই ঘটনা আছে বলিয়াই শকুন্তলার উপন্যাস নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।



শিক্ষা।

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যনামক প্রস্তাবে দেখান হইয়াছিল, যে ভূমিষ্ঠ হইবার পর মনুষ্য সাতাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সমাজের ধার করিয়া খায়, তাহার পর এই ধার শোধ দেওয়া মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়। এই অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যদি সমাজের আরো কিছু উপকার করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ ধার করিয়া যাহা খাইয়াছ, তাহা ত শোধ দিবেই; শোধ দেওয়ার উপর আরো কিছু বাড়তি করা চাই।

যে সাতাইশ বৎসর আমরা ধার করিয়া খাই, সেই আমাদের শিক্ষার সময় ও দেহস্ফূর্ত্তির সময়। আমরা প্রতিভাশালী লোকের পক্ষে এ কথা বলিতেছি না। প্রতিভাশালী বা জিনিয়স বলিয়া এক একজন লোক আছেন আমরা স্বীকার করি। ইঁহাদের শরীর পুষ্ট না হইতে পারে, ইঁহাদের সকল মনোবৃত্তি সম্যক্ পরিচালিত না হইতে পারে, তথাপি ইঁহারা জগতের অনেক কাজ করিয়া যাইতে পারেন। শরীর অসুস্থ, মেজাজ খিট্‌খিটে, কুক্রিয়াসক্ত, অথচ তাঁহারা পৃথিবীতে অনেক বড় বড় কাজ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা এ প্রস্তাবে তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। প্রতিভাশালী লোকদিগকে আমরা ভক্তি করি ভয়ও করি। তাঁহাদের কার্য্যদ্বারা মনুষ্য-

সমাজের উপকার হয় বলিয়া ভক্তি করি। তাঁহারা নিজে নানা ক্লেশ স্বীকার করিয়াও বড় বড় কাজ করিতে পারেন বলিয়া বিস্মিত হই; কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টান্তে জগতে অনেক অনিষ্ট হয় বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে বড় ভয় করি। জিনিয়স দূর হইতে ভাল, কিন্তু নিকটে অতি ভয়ানক, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেকের ক্ষতি হয়। অতএব আমরা এ প্রস্তাবে জিনিয়সের নামও করিব না, যাহা মনুষ্যসাধারণের পক্ষে খাটে এইরূপ কথাই কহিব।

সাধারণমনুষ্যের পক্ষে শরীরটি সবল সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তাহার পর মনোবৃত্তিগুলিরও পুষ্টিসাধন প্রয়োজন। মনুষ্যের মনোবৃত্তি তিন প্রকারের--বুদ্ধিশক্তি, হৃদয়বৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তি বা কর্ম্মক্ষমতা। এই তিনেরই সাতাইশ বৎসরের মধ্যে পরিচালনা চাহি। মনুষ্য পৃথিবীতে পড়িয়া আপনার শিক্ষাবস্থা অতিক্রম করিয়া যাহাতে সকল দিকে চক্ষু রাখিতে পারে, সকল জিনিস বুঝিতে পারে, সকল প্রকার লোকের সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে ও সকলপ্রকার কার্য্য করিতে পারে, তাহার শিক্ষা এই সাতাইশ বৎসর বয়সের মধ্যে হওয়া চাই। শিক্ষা একমুখী হওয়া কিছু নহে, উহা বিশ্বতোমুখী হওয়া চাই। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা বামনাই শিক্ষা পাইত, ক্ষত্রিয়েরা রাজাই ও লড়াই শিক্ষা পাইত, ছুতোর ছুতোরি শিখিত। এক সময়ে ইউরোপেও ঠিক এইরূপ ছিল। এরূপ একমুখীশিক্ষার নিশ্চয় ফল অধীনতা, নির্ব্বুদ্ধিতা। একমুখীশিক্ষায় মানুষ তৈয়ারি হয় না কল তৈয়ারি হয়। যে কোন লোকের চারিদিকে নজর থাকে একমুখগণ সকলেই তাহার অধীন আপনা হইতেই হইয়া পড়ে। অতএব যাহাতে সকল দিকে নজর জন্মে, তাহার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। স্বীকার করি যে, মানুষের পক্ষে সকল বিষয় জানা নিতান্ত অসাধ্য, সকল কাজ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সকল বিষয়ে সুরুচি থাকা ও সকলের সহিত সমবেদনা থাকা একান্ত অসম্ভব। স্বীকার করি, মানুষের জ্ঞান ইচ্ছা ও হৃদয়বৃত্তি সকল চারিদিকে সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির নিয়মসমূহ লোহময় বেড়া দিয়া মনুষ্যকে বলিতেছে তুমি এই পর্য্যন্ত যাইও ইহার অধিক যাইবার ক্ষমতা তোমার নাই। এ সকল স্বীকার করি, তথাপি যতটুকু মনুষ্যে জানিতে পারে ততটুকু জানা ত প্রয়োজন। ততটুকু জানিতে যে কয়টি মনোবৃত্তি সতেজ ও সবল থাকা প্রয়োজন সে কয়টিকে ত সতেজ ও সবল রাখা চাই। এইটি শিক্ষার কার্য্য এইটি শিক্ষকের ভার, এইটির জন্য সমাজ দায়ী।

শরীর ও মনের যেরূপ নিকটসম্বন্ধ তাহাতে শরীরের উন্নতির প্রতি সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখা উচিত। মনুষ্যের শরীরও কলের মত। অধিক দিন শরীর না

চলিলে ইহাতেও মরিচা ধরে, এবং অধিক বলে অধিক খাটাইলে ইহারও কল বিগড়িয়া যায়, ঠিক সময়ে দম দিলে যেমন ঘড়ী অনেক দিন চলে সেইরূপ নিয়মিত শ্রমেও মনুষ্যশরীর অনেক দিন টিকে। যে কয়েক বৎসর পুত্রের ভরণপোষণ করিতে হয়, সেই কয়েক বৎসরে যাহাতে পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে পরিপুষ্ট হয় তদ্বিষয়ে পিতামাতার বিশেষ যত্ন থাকে অন্ততঃ সে বিষয়ে ইচ্ছা থাকে। কিন্তু অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত অথবা উদ্যোগ অভাবে অনেকে সন্তানের দেহপুষ্টিসম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটান। কেহ কেহ কেবল স্নেহপরবশ হইয়া তৎপক্ষে অনিষ্ট ঘটান। দৌড়িওনা পড়িয়া যাবে, শ্রম করিও না ক্লান্ত হবে, এ সকল স্নেহবাক্য কতদূর অনিষ্টকারী হইয়া পড়ে তাহার সমালোচনা এক্ষণে আমরা করিব না। মূলকথা শরীর পুষ্ট করা যে আবশ্যক তাহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। এই পুষ্টিশব্দে যে শুদ্ধ হস্তের বা শুদ্ধ পদের পুষ্টতা নয় সে বিষয়েও বোধ হয় কাহার অমত নাই। যে সকল লক্ষ্মীছাড়া লোক পুত্রের ভরণপোষণ ও পুষ্টিবর্দ্ধনবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া মালথসের শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারা ভিন্ন সকলেই পুত্রের শরীরপুষ্টিবিষয়ে মনোযোগী আছেন।

কিন্তু মানসিক পুষ্টিবিষয়ে এরূপ একমত নাই। কোন জাতি ধর্ম্মশিক্ষাদানই পিতামাতার কর্ত্তব্য মনে করেন। কোন জাতি পুত্র যাহাতে অন্ন করিয়া খাইয়া শীঘ্র পিতাকে অব্যাহতি দিতে পারে, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াই পিতার কর্ত্তব্য মনে করেন। কিন্তু আমরা বলি যেমন শরীরের সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি প্রয়োজন মনেরও সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি বাঞ্ছনীয়। শরীরের পক্ষে যেমন যাহার সর্ব্বশরীর সবল নহে সে ভাল বেহারা হইতে পারে না, ভাল মুটিয়া হইতে পারে না, ভাল দাঁড়ী হইতে পারে না, ভাল বাঁকী হইতে পারে না, মনের পক্ষেও সেইরূপ; যাহার মনোবৃত্তিসমূহ সম্যক্ পুষ্ট নহে, সে কখন ভাল উকীল হইতে পারে না, ভাল ডাক্তার হইতে পারে না, ভাল কবি হইতে পারে না, খুব উত্তম রূপে কোন কাজই করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া যাহার দেহ খুব পুষ্ট নয় সেকি বাঁকী দাঁড়ী হইতে পারে না? অবশ্যই পারে, কিন্তু তাহার ভাল হইবার সম্ভাবনা বড় অল্প থাকে। সেইরূপ যাহার মন সম্যক্ পুষ্ট নহে সেকি উকীল, ডাক্তার, কবি হইতে পারে না? অবশ্য পারে, কিন্তু ভাল হইবার সম্ভাবনা অল্প। একজন জোয়ান লোক ভাল বাঁকী হইয়াও যদি দরকার পড়ে সে অতি অল্পদিনের মধ্যে দাঁড়ীর কাজ, বেহারার কাজ বা যোগাড়ের কাজ অনায়াসে শিখিয়া লইতে পারে। কিন্তু একজন রোগা বাঁকী তাহা কখনই পারে না। তাহার বাঁকী হইবার মত শরীর বনিয়া গিয়াছে; তাহার আর কিছু হইবার যো নাই। আর কিছু হইতে গেলে

যে পদার্থটুকু থাকা চাই সেটুকু তাহার জন্মে নাই। বহির্জ্জগতে যেরূপ অন্তর্জ্জগতেও ঠিক সেইরূপ। যাহার শিক্ষা বিশ্বতোমুখী তাহার কোন একটি বিষয়ে ক্ষমতা অধিক হইলেও সে সকল কাজই মোটামুটি করিতে পারে। সংসার করিতে গেলে সকল কাজই যে মোটামুটি করা চাই বা জানা চাই, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। স্বাবলম্বন উন্নতির মূল। ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। সকল কাজ মোটামুটি করিতে শিখিলে স্বাবলম্বনপ্রবৃত্তির প্রকৃত উন্নতি করা হয়। আর এক কথা এই, অতি প্রাচীনকালে পণ্ডিত হইলেই লোকে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিত। সর্ব্বজ্ঞ ও অভ্রান্ত এক কথা নহে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞশব্দের অর্থ যতদূর বাড়ান যাইতে পারে অধুনাতন ভট্টাচার্য্যেরা বাড়াইয়া উহাকে অভ্রান্তসমপর্য্যায়ক করিয়া তুলিয়াছেন। ঋষিরা বা পণ্ডিতেরা যে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রথিত হইতেন ইহার কারণ কি? শুদ্ধ ঋষিরাই বা কেন! আরিষ্টটল প্রভৃতিও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন! ইহার কারণ তাঁহারা যে সমাজে বাস করিতেন সে সমাজে সাধারণলোকের মন অপুষ্ট ছিল আর তাঁহাদের মন সম্যক্ পুষ্ট ছিল অর্থাৎ মোটামুটি অনেক বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল, সুতরাং সামান্য লোকে আপনার সঙ্গে তুলনা করিয়া (তুলনার অমন সামগ্রী আর নাই) উঁহাদের সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া মনে করিত। বাস্তবিকও যখন সমাজের অভাব অল্প থাকে, সমাজের সেই প্রথম অবস্থায় দুই পাঁচজনলোক পুষ্টমনা থাকেন, তাঁহাদের দ্বারাই সামান্য সামান্য সমস্ত অভাব পূরণ হয়, সুতরাং সামান্য অভাব পূরণের জন্য মোটামুটি জ্ঞানে চলিত। এখনও সেইরূপ গৃহস্থের সামান্য সামান্য অভাবের জন্য গৃহপতির নিজের মোটামুটি সব জিনিস জানা চাই।

আর এক কথা। পুষ্টমনা ব্যক্তিগণের মধ্যে একমুখী শিক্ষা আরম্ভ হইলে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয় কিন্তু প্রথম নানা বিষয়ের শিক্ষা আবশ্যক; তাহার উপর একমুখী শিক্ষা হইলে উপকার হয় নতুবা একমুখী শিক্ষা অনিষ্টকারী। তাঁতির একমুখী শিক্ষা, এই জন্য তাহারা সংসারযাত্রায় এত অপটু যে তাহারা উপহাসের স্থল হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব আগে মোটামুটি শিক্ষা, তার পর একবিষয় শিক্ষার প্রয়োজন। আগে সব জিনিসের কিছু কিছু, তাহার পর এক বিষয়ের সবটা। এ বিষয়ে আর একটী কথা আছে। মানুষ জন্মিয়া উকীল হয়, উকীল হইয়া কেহ জন্মে না। সুতরাং আগে মানুষের শিক্ষা তাহার পর উকীলের শিক্ষা। মানুষের শিক্ষা অর্থে শরীর ও মনের সম্যক্ পুষ্টি, সকল বিষয়ে চিন্তা করিবার, ও হাত দিবার শক্তি। তাহার পর কোন একটা জিনিস সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা।

মানুষের মনকে যদি একটি পারাবার

ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সর্ব্বতোমুখীশিক্ষায় উহার সকল দ্বার মুক্ত করিয়া রাখে। এই অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চক্ষু-উন্মীলন করিলেই কত বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে অনেক জ্ঞানলাভ করা যায়; কিন্তু যাহার মনের সকল দ্বারগুলি খোলা নাই, যাহার মনোবৃত্তিসমূহ সম্যক্ পুষ্ট নহে, তাহার পক্ষে সমস্তই অন্ধকার। পরন্তু যাহার সেই দ্বারগুলি খোলা সে যে দিবানিশি জ্ঞানসঞ্চয় করিতে পারে তাহাই নহে,সে উহার ব্যবহারও করিতে পারে। মনে কর খোপগুলি খোলা। একটির নাম ব্যাকরণ, একটির নাম সাহিত্য, একটির নাম অলঙ্কার, একটির নাম বিজ্ঞান, একটির নাম হীট, একটির নাম লাইট ইত্যাদি। যখন যে জিনিসটি দেখিল সে তাহাকে তাহার আপন খোপে রাখিয়া দিল সুতরাং দরকার হইলে তাহাকে আর হাতড়াইতে হইল না। সে যেমন অনেক অধিক জিনিস দেখিতে পায়, তেমনি সেগুলিকে পরিষ্কার করিয়া সাজাইতে পারে এবং দরকারমত ব্যবহার করিতে পারে।

অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, সর্ব্বতোমুখীশিক্ষা থাকিলে প্রায়ই লোক চিন্তাই করিতে পারে; ভাবিতেই পারে, কাজ করিতে পারে না। তাহারই জন্য আমরা বলিতেছি সর্ব্বতোমুখী ও একমুখী দুইপ্রকার শিক্ষারই প্রয়োজন। জ্ঞান চারিদিক্ হইতে আসিবে এক বা দুইদিক্ দিয়া বাহির হইবে। নচেৎ সে জ্ঞানে জ্ঞানবানের লাভ হইতে পারে সমাজের লাভ নাই। উভয়প্রকার শিক্ষা হইলে মনকে লাটিমের সহিত তুলনা করা যায়। লাটিমের কাষ্ঠময়ভাগ সর্ব্বতোমুখীবিদ্যা ও লৌহময়ভাগ একমুখীবিদ্যা। সেই লৌহময়ভাগের উপর লাটিম যেমন ঘোরে আমাদের মতে উভয়প্রকারে শিক্ষিত লোকও সেইরূপ কাজ করিতে পারে।

যদি বিশ্বতোমুখীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একমুখীশিক্ষা থাকে তাহা হইলে যে বিষয়ে শিক্ষা তাহার অনেক উপকার হয়। যদি একজন প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষিত লোক কোন এক বিষয়ে লাগিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে বিষয়ে লাগিয়া থাকেন সে বিষয়ের অনেক উন্নতি হয়, নহিলে সে বিষয়ের উন্নতির উপায় নাই। শুদ্ধ মোটামুটি জ্ঞান থাকিলে কোন বিষয়ের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু তাই বলিয়া শুদ্ধ একমুখীবিদ্যায় বিষয়ের উন্নতি হয় না। মনে কর একজন দন্তচিকিৎসায় যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিল। সে অনেক দেখিল শুনিল, কিন্তু সে যদি শরীরের অন্য রোগসম্বন্ধে কিছু না শিখিয়া থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ভাল চিকিৎসক হইতে পারিবে না। মনে কর, দন্ত উঠে নাই এমত কোন পঞ্চমবৎসরের বালকের চিকিৎসা করিতে গেলে, বালকের চুলের প্রতি সে কখনই দৃষ্টিপাত করিবে

না, কেবল দন্তেরই চিকিৎসা আরম্ভ করিবে। যদি কেহ তাহাকে দেখাইয়া দেয় যে বালকের চুলও উঠে নাই, চিকিৎসক তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিবে না। যে কারণে কেশ উঠে নাই, সেই কারণে যে দন্তও উঠে নাই ইহা তাহার একেবারে অনুভবই হইবে না, কেশের সহিত দন্তের যে এরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা সে কোন মতে বুঝিতে পারিবে না। যদি আর একজন বহুদর্শী দন্ত-চিকিৎসকের লিখিবার ক্ষমতা না থাকে তবে তাহার দন্তচিকিৎসাজনিত অভিজ্ঞতা তাহারই জীবনাবধি শেষ হইয়া গেল। লিখিতে জানিতে হইলে সুতরাং অন্য অনেক বিষয়ে শিক্ষা আছে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

শুদ্ধ একমুখীশিক্ষার আর এক দোষ দেখাইব। আমাদের প্রাচীনকালে বৈদ্য বলিয়া স্বতন্ত্র জাতি ছিল না, কি স্বতন্ত্র প্রোফেশন ছিল না, ঋষিদিগের হস্তে যতদিন বৈদ্যশাস্ত্র ছিল, ততদিন শাস্ত্রের উন্নতি হইতেছিল। তাহার পর শুদ্ধ চিকিৎসা বৈদ্যদিগের ব্যবসায় হইল। বৈদ্যেরা পুত্রকে শুদ্ধ বৈদ্যক পড়াইতেন। ক্রমে শিক্ষা সংকীর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। কাজেই এই সময়ে সংগ্রহগ্রন্থ আরম্ভ হইল। অধিকাংশ লোকই সংগ্রহ গ্রন্থ পড়িয়াই বৈদ্য হইতে লাগিল। বৈদ্যশাস্ত্রের হীনাবস্থারও সূত্রপাত আরম্ভ হইতে লাগিল। প্রায়ই সংস্কৃত সংগ্রহগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অমুক ব্যক্তি দেখিলেন লোকের শক্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছে, ছাত্রেরা আর শাস্ত্রের সকল গ্রন্থ পড়িয়া উঠিতে পারে না এই জন্য তিনি তাহার সার-সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিলেন। লোকের শক্তির হ্রাস শব্দের অর্থ আর কিছুই নহে, সাধারণশিক্ষার সর্ব্বতোমুখীশিক্ষার অভাব। বিদ্যা সংগ্রহগ্রন্থমাত্রে যখন দাঁড়াইল, তখন সে বিদ্যার উন্নতি আর হইল না। সে বিদ্যাবান্ লোক সঙ্কীর্ণমনা হইতে লাগিল। সংগ্রহগ্রন্থকার সর্ব্বজ্ঞ হইলেন তাঁহার গ্রন্থের উপর সরুকাটা আরম্ভ হইল, ফাকি আরম্ভ হইল। বিষয়ে বিদ্যার গৌরব রহিল না, গ্রন্থে বিদ্যার গৌরব হইল। পাঠ লাগানই বাহাদুরী হইয়া দাঁড়াইল।

অতএব শিক্ষার জন্য ও শরীর পুষ্টির জন্য যে ২৭ বৎসর আছে তাহার মধ্যে এই দুইপ্রকার শিক্ষাই দেওয়া প্রয়োজন, প্রথম সর্ব্বতোমুখীশিক্ষা ২২।২৩ বৎসর পর্য্যন্ত, তাহার পর ৪।৫ বৎসর একমুখী-শিক্ষা। এরূপ শিক্ষিতলোক অনন্ত-শক্তির আধার হন, তাঁহাদের সংখ্যার যত বৃদ্ধি হয়, সমাজের শক্তির ততই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়।

বাঙ্গালার জ্বর।*

বাঙ্গালা যে দুর্দ্দশাপন্ন দেশ ইহা স্থির। দেশবৎসল বাঙ্গালিরা এবং দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ এই দুর্দ্দশার কারণ সর্ব্বদা আলোচনা করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, বাঙ্গালার চিরপরাধীনতাই এই দুর্দ্দশার কারণ। কেহ বলেন, বাঙ্গালার লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ইহার হেতু। কেহ বলেন, বাঙ্গালিদিগের শারীরিক এবং মানসিক দৌর্ব্বল্য জন্যই বাঙ্গালা দুর্দ্দশাপন্ন। কেহ বলেন, বাঙ্গালার কদর্য্য জলবায়ুই সকল অনর্থের মূল। ফলে এ দেশে যত অনিষ্ট লোকসমূহকে পীড়িত করে, তাহা গণিয়া সংখ্যা করা ভার। একে বহুপ্রজা—সহজে উৎপন্ন ধনে খাইতে কুলায় না; তাহাতে বিদেশে ধন চলিয়া যাইতেছে, শিল্পোপজীবীদের ব্যবসা মারা যাইতেছে, তাহার উপর সুশাসনে আরও প্রজাবৃদ্ধি হইতেছে। বিদেশী শিক্ষায় লোকের ধর্ম্মলোপ পাইতেছে, অথচ ধর্ম্মজনিত সামাজিক কুসংস্কার সকল লোপ পাইতেছে না, নূতন শিক্ষায় রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা সকল পরিস্ফুট হইতেছে, কিন্তু রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে না। আইনে হাত পা বাঁধা—মনোবৃত্তিসকলের স্ফূর্ত্তি নাই, পেটে খাইতে কুলায় না তবু টেক্স দিতে হইতেছে। তাহার উপর সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষ, সময়ে সময়ে জলপ্লাবন, বাত্যাবিপ্লব, প্রদেশে প্রদেশে সংক্রামক জ্বর। বাঙ্গালি দুঃখী, তাহার উপর রোগগ্রস্ত।

অন্যান্য সকল দুঃখের অপেক্ষা এই রোগদুঃখই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর—আর সকল দুঃখের মূল। রোগের জন্যই শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য; শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্যজন্যই চিরপরাধীনতা। তিন কারণেই দারিদ্র্য। আধুনিক দেশবৎসল বাঙ্গালিরা কেহ সামাজিক, কেহ রাজনৈতিক সংস্করণে উৎসাহশীল। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক অনর্থের মূল যে রোগ, তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য কাহাকে কোন কথা কহিতে শুনা যায় না।

ইহার কারণও আছে। রোগ জলবায়ুজনিত। দেশের জলবায়ুপরিবর্ত্তন করিবে কে? বাঙ্গালা নিম্নভূমি; ইহার মাটী ভিজে, অথচ রৌদ্র অতিশয় প্রখর। ভিজে মাটীতে প্রখর রৌদ্র লাগিলে ম্যালেরিয়ানামে বিষময় বাষ্পের সমুদ্ভব হয়। ম্যালেরিয়া হইতেই বাঙ্গালায়

* সরল জ্বরচিকিৎসা। প্রথম ভাগ। গৃহস্থ আর, পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্য। ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। মূল্য ২।০ টাকা।

সর্ব্বভুক্ জ্বর। অতএব বাঙ্গালার মাটী আরও উঁচু করিয়া না তুলিতে পারিলে, সূর্য্যের তেজ অপ্রখর করিতে না পারিলে, বাঙ্গালার জ্বর নিবারণ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিদ্যাসাগর বা কেশব সেন, সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা কৃষ্ণদাস পাল সকলে মিলিয়া ধরাধরি টানাটানি করিলেও বাঙ্গালার মাটী এক ইঞ্চ উঁচু হইবে না। আর সূর্য্যের তেজ কমান ত্রেতাযুগে যা হইয়াছিল, তা হইয়াছিল, আর বড় হইবার আশা নাই। সুতরাং প্রেট্রিয়টের দল, সেদিকে বড় ঘেঁসেন না।

দেশের নৈসর্গিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করা যায় না বটে, কিন্তু যেখানে ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কারণসকল বিশেষরূপে সমবেত সেখানে জলবায়ুর উৎকর্ষসাধন করা মনুষ্যের নিতান্ত অসাধ্য নহে। মাটী উঁচু করা যায় না বটে, কিন্তু তাহার জলনিকাষের সুপ্রণালী করা যাইতে পারে। জলনিকাষের সুপ্রণালী হইলেই ভূমির আর্দ্রতা কমিবে। আর্দ্রতা কমিলেই ম্যালেরিয়া কমিবে। স্থানীয় জলবায়ুর উৎকর্ষসাধনের এইরূপ অনেক উপায় আছে। কয়জন দেশবৎসল লোক, সেদিকে যত্ন করিয়া থাকেন। তাহার জন্য কয়টা আসোসিয়েসান, কয়টা সভা হইয়াছে? কয়টা জুরো বক্তৃতায় হাততালির বটা পড়িয়াছে? কয়খানা অগ্রাহ্য পাম্‌ফ্লেট ছাপা হইয়াছে? এ কথা লইয়া কালেজের ছেলে কয়বার জলপান খাইয়াছে? ঘোড়দৌড়ের চাঁদার কথা অনেক শুনা যায়, এ বিষয়ে কয়টাকা চাঁদা উঠিয়াছে? বরং এ বিষয়ে রাজপুরুষদিগকে কিছু প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহারা কখন কখন জোর করিয়া এ সকল কাজ করাইয়া থাকেন। দেশহিতৈষীরা তাহাতে সাহায্য করা দূরে থাকুক, বরং রাজপুরুষদিগকে গালি দিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট জোর করিয়া ডানকুনীর জলা সাফ করিলেন, আজ পর্য্যন্ত দেশহিতৈষীর দল সেজন্য গবর্ণমেণ্টকে গালি দিতেছেন।

একা জ্বরই বাঙ্গালার পরমশত্রু। দুর্ভিক্ষ, বাত্যা, জলপ্লাবন কালেভদ্রে কখন কোন প্রদেশকে পীড়িত করে। কিন্তু জ্বর প্রত্যহ প্রতি গৃহে গৃহে লোকধ্বংস করিতেছে। যাহাকে না মারিতেছে, তাহাকে নিস্তেজ, অকর্ম্মণ্য, অমানুষ, জীবনভারবহনে অসমর্থ করিয়া তুলিতেছে। এই পরমশত্রুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কি কোন উপায় নাই?

নিষ্কৃতির জন্য দ্বিবিধ উপায়। প্রথম যাহাতে জ্বর না হয়, অর্থাৎ নিবারণোপায়। দ্বিতীয় জ্বর হইলে যাহাতে আরোগ্যলাভ হয়, অর্থাৎ চিকিৎসা। নিবারণের সম্বন্ধে উপায় কিছু বলা গিয়াছে; যাহাতে স্থানীয় জলবায়ু স্বাস্থ্যকর হয়, তাহা করিতে হয়। এক্ষণে চিকিৎসাসম্বন্ধে কিছু বলিব।

নব্য দেশবৎসল বাঙ্গালিরা ইংরেজ

দিগকে যতই গালি দিন না কেন, ইং-রেজ হইতে এ দেশের যে কয়টি মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিব। ইংরেজ হইতে পাশ্চাত্য-বিদ্যা এ দেশে আসিয়াছে। ইংরেজ হইতে মুদ্রাযন্ত্র এ দেশে আসিয়াছে। স্বাধীনতা দেশবাৎসল্য প্রভৃতি মোহমন্ত্র ইংরেজ হইতেই আমরা শিখিয়াছি। আর ইংরেজ হইতে কুইনাইন এ দেশে আসিয়াছে। বাঙ্গালায় জ্বরচিকিৎসায় কুইনাইন একমাত্র ঔষধ। বাঙ্গালির পরমশত্রুনিধনে কুইনাইন আমাদের একমাত্র সহায়।

পাঠক বলিবেন কুইনাইন যে জ্বরের ঔষধ ইহা ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানে, ইহা বলিবার জন্য এত বড় একটা প্রবন্ধ কেন? প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে এই বলিতে হয়, যে কথাটা বস্তুতঃ আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কুইনাইন সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের অনেক কুসংস্কার আছে। অনেকে বলেন কুইনাইন খাইলেই জ্বর আটকাইয়া যায়। তাঁহাদের বিশ্বাস আছে, যে কুইনাইন না খাইলেই শীঘ্রই জ্বর ছাড়িত; এত ভুগিতে হইত না। এ কথা সত্য বটে যে, কুইনাইন না খাইলে এত ভুগিতে হয় না। কেন না রোগ ও রোগী শীঘ্রই একত্রে নিকাব পায়। আবার অনেকের বিশ্বাস আছে, যে এ দেশে এত কুইনাইন আসিয়াছে বলিয়া এখন এত জ্বর হয়। যখন কুইনাইন ছিল না তখন লোকের এত জ্বর হইত না। তাঁহাদের বিশ্বাসের স্থূলমর্ম্ম এই, যে কুইনাইন খাইলেই জ্বরের ধাত হইয়া যায়। অতএব কুইনাইন খাওয়া ভাল নয়। অনেকে এই সকল বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া, যথাসময়ে কুইনাইন ব্যবহার করেন না, নিতান্ত বিপন্ন না হইলে কুইনাইনে রাজি হন না। তার পর কুইনাইন ব্যবহার করিয়া আশু উপকার পাইলেই, কুইনাইন ছাড়িয়া দেন। সুতরাং কুইনাইন তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হয় না।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে, বহুতর লোক বাঙ্গালায় দেখা যায় যে কুইনাইন খায় আর জ্বরে ভোগে। ইহার এক কারণ অনেকে নির্দ্দেশ করেন যে, বাজারে যে কুইনাইন বিক্রয় হয়, সাধারণ লোক যাহা কিনিয়া খায় সে কুইনাইন ভাল নহে তাহারই দোষ। সে কথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সে কথা এখন আমরা ছাড়িয়া দিই। প্রধান কারণ চিকিৎসার দোষ, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত মাত্রায় এবং উপযুক্ত প্রণালীতে কুইনাইন সেবন না করিলে, উপযুক্ত ফল কেন ফলিবে?

চিকিৎসার দোষ দুই কারণে হয়। এক, চিকিৎসক সুচিকিৎসা না জানিলে, কাজে কাজেই চিকিৎসার দোষ ঘটিবে। দ্বিতীয় রোগী চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে কার্য্য না করিলে চিকিৎসার দোষ হ

টিবে। সর্ব্বত্র সুচিকিৎসক পাওয়া যায় না। যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে সুশিক্ষিত এবং সুদক্ষ বড় বড় নগরেই তাঁহাদিগকে পাওয়া যায়। সে সকল স্থান না হইলে তাঁহাদিগের উপযুক্ত পুরস্কার হয় না। দুর্গম পল্লীগ্রামসকলে, যে সকল স্থানে জ্বরের অধিক প্রাদুর্ভাব, সেই সকল স্থানে সুশিক্ষিত চিকিৎসক মিলে না। সে সকল স্থানে জ্বরের চিকিৎসা হাতুড়েদিগের হাতে। তাহারা কেবল দুই এক বৎসর কম্পাউণ্ডারি করিয়া কেহ তাহা নাও করিয়া, কেবল জীবিকানির্ব্বাহের উপায়ান্তর অভাবে ডাক্তার হইয়া বসে। তাহাদিগের হইতে, সুচিকিৎসা কখনই হইতে পারে না। দ্বিতীয় সুচিকিৎসক মিলিলেও গৃহস্থ নিজে কিছু চিকিৎসা না বুঝিলে, চিকিৎসার সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে না। চিকিৎসক কিছু, সর্ব্বক্ষণ সকল রোগীর শিওরে বসিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি কেবল উপদেশ দিয়া গিয়া থাকেন, গৃহস্থের মধ্যে কাহারও চিকিৎসাসম্বন্ধে কিছু বোধ শোধ না থাকিলে সে উপদেশমত সম্পূর্ণ কার্য্য হয় না। ডাক্তার বলিয়া গেলেন গায়ের তাত কম পড়িতে আরম্ভ হইলে কুইনাইন দিবে, তিনি চলিয়া গেলে গায়ের তাত কম পড়িতে আরম্ভ হইল—কিন্তু গৃহস্থ ভাবিল যে একেবারে গা না জুড়াইলে কুইনাইন দেওয়া হইবে না; জ্বর আটকাইয়া যাইবে। এদিকে রোগীর গা আর না জুড়াইয়া আবার জ্বর আসিল, কুইনাইন খাওয়া হইল না, চিকিৎসাও নিষ্ফল হইল। কোন রোগীর অজীর্ণ উপস্থিত হইলে, ডাক্তার ব্যবস্থা করিলেন, তুমি শীতল জলে মিশাইয়া এই ঔষধটি মধ্যে মধ্যে সেবন করিবে। ডাক্তার ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, রোগী বর্ষাকালের কর্দ্দমময় জলে মিশাইয়া ঔষধসেবন করিতেছে। এবং তাহার পেটের পীড়াও বাড়িয়াছে। আর একরোগী শিরঃপীড়ায় পীড়িত হইলে চিকিৎসক উপদেশ করিয়াছিলেন যে মাথায় জলপটী দিয়া সর্ব্বদা শীতল জলে ভিজাইতে থাকিবে, রোগী মাথায় সাতপুরু মোটা নেকড়া জড়াইয়া তাহাতে জল থাবড়াইতে লাগিল। সুতরাং মাথার যন্ত্রণা না কমিয়া বাড়িয়া উঠিল।

অতএব বাঙ্গালায় জ্বরের মহৌষধ আমাদের হাতে থাকিতেও দুইটি অজ্ঞানের জন্য বাঙ্গালাদেশ জ্বরে ধ্বংস পাইতেছে। প্রথম অভাব অধিকাংশ স্থানের চিকিৎসকেরা জ্বরের চিকিৎসা জানে না। দ্বিতীয় অভাব যেখানে সুচিকিৎসক আছে, সেখানে গৃহস্থেরা চিকিৎসকের উপদেশপালন করিতে জানে না। যিনি এই দুই অভাব দূর করিবেন, যিনি পল্লীগ্রামের হাতুড়েদিগকে জ্বরচিকিৎসা শিখাইবেন আর গৃহস্থদিগকে সেই চিকিৎসার মর্ম্ম বুঝাইতে শিখাইবেন তিনিই বাঙ্গালাদেশধ্বংসকারী জ্বরঙ্গপরাক্ষসকে পরাস্ত ও নিহত করিবেন। তাঁহাকে দেশহিতৈষী

মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান দিতে আমরা প্রস্তুত।

এই পুণ্যময় সংগ্রামে আমরা কেবল একজন বাঙ্গালিকে ধৃতাস্ত্র দেখিতে পাই। আমরা বলিয়াছি যে, বাঙ্গালার জ্বর হইতে দেশকে রক্ষা করিবার দ্বিবিধ উপায়। এক স্বাস্থ্যরক্ষা—বিজ্ঞানের নিয়মপালন। দ্বিতীয় সুচিকিৎসা। স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি স্বদেশীয়দিগকে শিখাইবার জন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কয়েক বৎসর হইল শরীরপালন নামে একখানি গ্রন্থপ্রণয়ন করেন। তাহা এ দেশে উত্তমরূপে প্রচলিত হইয়া দেশের বিস্তর মঙ্গলসাধন করিয়াছে। দ্বিতীয় উপায় সুচিকিৎসা। গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে জ্বরের সুচিকিৎসা প্রচলিত করিবার জন্য তিনি সম্প্রতি জ্বরচিকিৎসা নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। আমরা যে দুইটি অভাবের কথা বলিয়াছি এই দুইটি অভাবই এই গ্রন্থের দ্বারা পরিপুরিত হইতে পারিবে। এমন ভরসা কখনই করা যাইতে পারে না, যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রভাবে বাঙ্গালাদেশ হইতে জ্বর একেবারেই তিরোহিত হইবে। কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে এই গ্রন্থখানি কিম্বা এইরূপ কোন গ্রন্থ, বাঙ্গালায় গ্রামে গ্রামে প্রচারিত এবং গৃহে গৃহে অধীত হইলে দেশে যে জ্বরাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কমিবে, এখনকার অপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোক জ্বরে মরিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

এইরূপ গ্রন্থ বলিতেছি তাহার কারণ এই, যে এই গ্রন্থখানির কয়েকটী বিশেষ গুণ আছে। এরূপ গুণ না থাকিলে এ শ্রেণীর গ্রন্থেরদ্বারা ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। প্রথম গুণ এই যে ইহার রচনা অতিশয় সরল—যে ইচ্ছা সে পড়ুক না কেন, বুঝিবার কোন কষ্ট নাই। ইহার ভাষা ধাত্রীশিক্ষার ভাষার ন্যায় সহজ কথাবার্ত্তার ভাষা। কিন্তু ইহা ধাত্রীশিক্ষার ন্যায় কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হয় নাই। কেবল ভাষা সরল হইলেই যে রচনা সরল হইল এমন নহে। চিকিৎসাশাস্ত্রান্তর্গত দুরূহ তত্ত্বসকল কঠিন ও কালব্যাপী শিক্ষার আয়ত্ত, সেগুলি অশিক্ষিতকে শিখাইতে গেলে, কেবল সরল ভাষায় লিখিলে হইবে না। বুঝাইবার কৌশলও জানা চাই। যদুবাবু যে সে সকল কৌশলে অসাধারণ পটু ধাত্রীশিক্ষায় তাহার পরিচয় আছে। ধাত্রীশিক্ষা অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে জ্বরচিকিৎসা আরও পরিষ্কার। নিজে চিকিৎসা করিতে করিতে লেখক যাহা দেখিয়াছেন এমন অনেক উদাহরণ দিয়া স্বীয় উপদেশগুলি স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন।

গ্রন্থের দ্বিতীয় গুণ এই, যে,যে গৃহস্থের যেমন অবস্থা তাহার প্রতি তেমনি ব্যবস্থার আছে। অনেক সময়ে ডাক্তারেরা দরিদ্রের প্রতি এমন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, যে তাহা বড়মানুষেরই সাধ্য।

এবং পল্লীগ্রামে যে সকল সামগ্রীর হুকুম করেন, তাহা নগর নহিলে পাওয়া যায় না। সে সকল স্থানে যদুবাবু অনুকল্পগুলি বলিয়া দিয়াছেন।

তৃতীয়ও প্রধান গুণ এই, যে এখনকার প্রচলিত জ্বরচিকিৎসার মধ্যে যেটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থ যখন যদুবাবুর ন্যায় উৎকৃষ্ট চিকিৎসকের লিখিত, তখন সে কথা আমাদের বলাই বাহুল্য। অন্য চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত যশস্বী হইলে হইতে পারেন, কিন্তু এরূপ সুদক্ষ, সুবিজ্ঞ এবং কৃতকর্ম্মা চিকিৎসক অতি বিরল।

চতুর্থ। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। জ্বরপীড়িত ব্যক্তির এমন কোন অবস্থা নাই— জ্বরের এমন কোন উপসর্গ বা উপদ্রব নাই যে এই গ্রন্থে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই বা ব্যবস্থা করিবার সঙ্কল্প নাই। প্রথম ভাগে সকলগুলি শেষ হয় নাই।

এই প্রবন্ধ লিখনে আমাদিগের তিনটী উদ্দেশ্য। প্রথম বাঙ্গালার জ্বর, বাঙ্গালার প্রধান শত্রু; সেই শত্রুহস্ত হইতে দেশকে মুক্ত করার জন্য দেশহিতৈষিগণ, চেষ্টিত নাহন। তাঁহারা চেষ্টিত হউন তাঁহাদিগের কাছে এই প্রার্থনা করা। দ্বিতীয় কিবিধ উপায়ে এই শত্রু পরাস্ত হইতে পারে, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা। তৃতীয় যদুবাবুর এই গ্রন্থ খানি, সে রাক্ষসোদ্দেশে নিক্ষিপ্ত প্রথম শর বলিয়া, সাধারণের নিকট পরিচিত করা।

গ্রন্থখানি কিরূপ প্রাঞ্জল, ও ইহা যে সাধারণের ব্যবহার্য্য, এই পরিচয় আরও সুস্পষ্ট করিবার জন্য, আমরা উহা হইতে দুই পাত উদ্ধৃত করিলাম। যেটুকু উদ্ধৃত করিলাম সেটুকু যিনি পড়িবেন তাঁহারই উপকার হইবে। এইরূপ গ্রন্থের সকল স্থানে।

"এখন কুইনাইন খাওয়ার কথা বলি। এর আগেই বলিয়াছি যে, ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই রোগীকে কুইনাইন দিবে। নৈলে অনেক জায়গায় কুইনাইন খাওয়াইবার সময় পাওয়া যায় না। কুইনাইন খাওয়াইবার নিয়ম অনেকে অনেক রকম বলেন। কিন্তু আমি দেখিতেছি, ঘাম হইতে আরম্ভ হইলে ১০ গ্রেণ, আবার জ্বর আসিবার দুইঘণ্টা আন্দাজ আগে ১০ গ্রেণ, আর এর মধ্যে দুইঘণ্টা অন্তর দুই গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইলে ১০০র মধ্যে ৯৯ জায়গায় জ্বর আসা বন্ধ হয়। এ রকম নিয়মে কুইনাইন খাওয়াইলে চিকিৎসক কোনও জায়গায় অপ্রতিভ হইবেন না। মনে কর, আজ বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসিল সেই জ্বর রাত্রি ৮ টার সময় ছাড়িল অর্থাৎ যেমন ঘাম হইতে আরম্ভ হইল, অমনি ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। তার পর দুইঘণ্টা অন্তর, অর্থাৎ রাত্রি ১০ টার সময় একবার, ১২ টার সময় একবার, ২ টার সময় একবার, ৪ টার সময় একবার, দুই গ্রেণ করিয়া কুইনাইন খাওয়াইলে। ভোর ৬ টার সময়

অর্থাৎ আবার জ্বর আসিবার ২ ঘণ্টা আগে ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসিবার কথা, কিন্তু জ্বর আসিল না। রোগীর কান ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল। তিন ঘণ্টা রোগীকে কুইনাইন দিলে না। বেলা ১১ টার সময় ২ গ্রেণ কুইনাইন দিলে। বেলা ২ টার সময় আর দুই গ্রেণ দিলে। তার পর ৬ টার সময় একেবারে ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। যদি বল, ৬ টার সময় আবার ১০ গ্রেণ কুইনাইন দিবার দরকার কি? আমি অনেক জায়গায় দেখিয়াছি, যে সময় জ্বর আসিবার কথা, কুইনাইন খাওয়াইয়া যদি সে সময়ে জ্বর আসিতে না দেও, তবে তার ১২ ঘণ্টা পরে আবার জ্বর আসে। বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসিবার কথা, কুইনাইন খাওয়ান হইয়াছিল বলিয়া, সে সময় জ্বর আসিল না। রোগী মনে করিল আজ আর জ্বর আসিবে না। চিকিৎসকও তাই বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু রাত্রি ৮ টার সময় আবার জ্বর আসিল। চিকিৎসকের কাছে সংবাদ গেল। চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন, তাই ত, জ্বর আসিবার ত কথা নয়, তবে কেন এ রকম হইল? সেই জন্যে বলছি, যে সময় জ্বর আসিবার কথা, সে সময় জ্বর না আসিলে, তার দশ ঘণ্টা পরে দশ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দেওয়া ভাল। তার পর দেখিলে রাত্রি ৮ টার সময়ও জ্বর আসিল না। তখন নিশ্চিন্ত হইলে। রাত্রে রোগীকে আর কুইনাইন না দিলেও চলে। কিন্তু ভোর ৬ টার সময় আবার ১০ গ্রেণ কুইনাইন দেওয়া চাই। তার পর বেলা ৩ টা পর্যন্ত, দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ২ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন দিলে। ৬ টার সময় একবারে ৫ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। রাত্রি ১০ টার সময় ২ গ্রেণ দিলে। রাত্রে আর কুইনাইন দিবার দরকার নাই। তার পর ভোর ৬ টায় ৫ গ্রেণ কুইনাইন দেওয়া চাই।

মনে কর, সোমবার দিন বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসে, আর সেই জ্বর রাত্রি ৮ টার সময় ছাড়ে। তার পর ঐ নিয়মে কুইনাইন খাওয়াইয়া, বৃহস্পতিবারের ভোর পর্যন্ত জ্বর আসিতে দিলে না। এখন কি করিবে? কুইনাইন বন্ধ করিবে না, এখও জ্বর আসার আশঙ্কা করিয়া অল্প মাত্রায় দিনকতক কুইনাইন খাওয়াইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই আর দিনকতক কুইনাইন খাওয়ানই উচিত বলিয়া বোধ হইবে। কেন না, যে জ্বর রোজ আসে কুইনাইন খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পর, যদি আর কুইনাইন না খাওয়াও, তবে আট দিনের দিন আবার জ্বর আসে। এতেই লোকে বলে কুইনাইন খাইলে জ্বর আটকাইয়া যায়। শরীর থেকে জ্বর একবারে যায় না। ফল কিন্তু না নয়। এরকম ভাবাই লোকের ভুল। এই ভুলের জন্যেই সাধারণের কাছে, বিশেষ ইতর লোক-

দের মধ্যে, কুইনাইনের তত আদর নাই। জ্বরে জ্বরে খোলা করিয়া ফেলিতেছে, তবু জ্বর আটকাইবার ভয়ে, কুইনাইনের কাছেও যাইতেছে না। ইতর লোকদের মধ্যে সর্ব্বদাই এরূপ ঘটে। এর ফল এই যে, চারি আনার কুইনাইন আনিয়া খাইলে যে জ্বর সারিত, সেই জ্বরে জীবনটা নষ্ট নয়। এ দুঃখ কি রাখিবার জায়গা আছে! পাড়াগাঁয়ে লোকে ত এই জন্যেই জ্বরে এত মরে। তবেই দেখ, যে জ্বর রোজ আসে, কুইনাইন খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পর, আট দিন পর্য্যন্ত কুইনাইন খাওয়ান বড় দরকার। তবে জ্বর বন্ধ হওয়ার পর, দুই তিন দিন যে বাঁধাবাঁধি করিয়া কুইনাইন খাওয়াইতে হয়, তার পর তেমন করিবার দরকার নাই। বাঁধাবাঁধি করিয়া কুইনাইন খাওয়াইবার কথা এই মাত্র বলিয়াছি। রোজ সকালে ৫ গ্রেণ, আর সন্ধ্যার আগে তিন গ্রেণ খাইলেই হয়। আট দিন পর্য্যন্ত এই নিয়মে কুইনাইন খাওয়া চাই।”

উপসংহারে যিনি ধাত্রীশিক্ষা, শরীর পালন, এবং জ্বরচিকিৎসা প্রণয়ন করিয়া সাধারণ লোকের অশেষ হিতসাধন করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি।

মাধবীলতা।

১৩

যে নির্জ্জনমন্দিরে ব্রহ্মচারী বাস করিতেন, চন্দ্রালোকে তাহার গাম্ভীর্য্য বিশেষ বাড়িত। প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্যে প্রকাণ্ড মন্দির, সম্মুখে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, পিতম পাগলা যখনই রাত্রে দেখিত, তখনই বড় বিমর্ষ হইত। এ জগতে যে সে একা, তাহার যে আর কেহই নাই, এ কথা কেবল এই নির্জ্জন স্থানে আসিলেই তাহার মনে হইত। ইহা অসম্ভব নহে। স্থানমাহাত্ম্য অতি আশ্চর্য্য, এই জন্যই তীর্থ। ভয়, ভক্তি, বিলাস, বৈরাগ্য এ সকলই স্থানের গুণে আপনিই মনে উদয় হয়। এই জন্য অনেকে বলে স্থানানুযায়ী মনুষ্যের প্রকৃতি। বাঙ্গালায় পাহাড় পর্ব্বত কিছুই নাই, একখানি কঠিন প্রস্তরও নাই, বাঙ্গালায় যাহা কিছু আছে সকলই কোমল, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত কোমল; অল্প তাপে শুষ্ক হয়, অল্প রসে গলিয়া যায়, অল্প ভরে আহত হয়। আমরাও ঠিক সেইমত কোমল; তাহাই পূর্ব্বে চটি পরিতাম, ধীরে ধীরে পা ফেলিতাম, পাছে মৃত্তিকার অঙ্গে আঘাত করি।

আমরা এক্ষণে বিলাতি জুতা পরিতেছি, দম্ভ করিয়া পা ফেলিতেছি, কিন্তু তাহাই বলিয়া আমাদের প্রকৃতিপরিবর্ত্তন হয় নাই, আমরা যাহা ছিলাম তাহাই আছি। অনুকরণ-অনুরোধে মৃত্তিকায় জুতার পেরেক ফুটাইতেছি, কিন্তু পরে হয় ত বাঙ্গালার অঙ্গে জুতার দাগ দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিব। জুতায় বা মোজায় প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না, যদি কখন বাঙ্গালায় পর্ব্বত জন্মে, মৃত্তিকা কঠিন হয়, আমরাও কঠিন হইব; নতুবা যে জাতিই আসিয়া বাঙ্গালায় বাস করিবে, সেই জাতিই ক্রমে আমাদের ন্যায় কোমলস্বভাবই হইবে।

একদিন গভীর রাত্রে কালীয়দহের কূলে বিমর্ষভাবে পিতম একা বসিয়াছিল। অনেকক্ষণ চন্দ্র উঠিয়াছে। দূরে প্রান্তরকূলে ধুমরাশি মেঘবৎ জমিয়াছে, পিতম তাহাই দেখিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে অস্ফুটস্বরে আপনা আপনি কি বলিতেছিল, এমত সময় ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে আসিয়া বসিলেন। পিতম তাঁহাকে কোন কথার সম্ভাষণ করিল না, অন্যমনস্কে যাহা দেখিতেছিল, তাহাই দেখিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতম কেমন আছ? পিতম মুখ না ফিরাইয়া বলিল, ভাল আছি। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতম তোমার মনের অবস্থা কেমন? কোন উত্তর না দিয়া পিতম প্রান্তরকূলের ধুমরাশি অঙ্গুলিদ্বারা নির্দ্দেশ করিল।

ব্রহ্ম। কিন্তু লোকের বোধ হয় তোমার আর চিত্তবৈকল্য নাই। তুমি এক্ষণে আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছ।

এই শেষ কথায় পিতম পাগলা ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া বসিল, এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। সেই কাতর দৃষ্টি দেখিয়া ব্রহ্মচারী ব্যথিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতম কি জন্য তোমার এ ম্লানতা? সংসার আশ্রম যাহার নাই, কাতর হইবার তাহার ত কোন কারণই নাই, মায়াই দুঃখের হেতু।"

পিতম কোন উত্তর করিল না দেখিয়া ব্রহ্মচারী আবার বলিতে লাগিলেন "কি জন্য যে তোমার মনকষ্ট তাহা আমি জানি না কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি যে তোমার মনকষ্ট অতি গুরুতর। এ কষ্ট নূতন নহে, অতি পুরাতন বলিয়া বোধ হইতেছে—"

পিতমের শরীর চঞ্চল হইয়া উঠিল। পিতম উঠিয়া দাঁড়াইল, ব্রহ্মচারীকে কোন সম্ভাষণ না করিয়া চলিয়া গেল। ব্রহ্মচারী বসিয়া একদৃষ্টিতে পিতমের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পিতম দৃষ্টির বাহির হইলে উরু হইতে উরু নামাইয়া আপনা আপনি অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন "চমৎকার লোক নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এ বৃদ্ধ, অথচ যুবার মত ইহার সুখ দুঃখের অনুভব রহিয়াছে, না জানি অল্প বয়সে কতই ছিল।"

এই সময় আবার পিতম ফিরিয়া

আসিল। ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল "ক্ষুদ্র পক্ষীর দ্বারা মনুষ্যের কোন অনিষ্ট হয় কি না?"

ব্রহ্ম। কই তাহা আমি ত কিছু শুনি নাই।

পিতম। তবে কেন অনেক দূর হইতে একটি ক্ষুদ্র পক্ষী রাজবাটীতে আনীত হইতেছে?

ব্রহ্ম। সকলেই ত পাখী ভাল বাসে; রাজা ভাল পাখী দূর হইতে আনাইবেন ইহার আর আশ্চর্য্য কি?

পিতম। রাজা আনাইতেছেন না। রাজকুমারকে উপহার দিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তি বহু ব্যয় করিয়া আনাইতেছে, তাহাই আমার সন্দেহ হইয়াছে।

ব্রহ্ম। এ সন্দেহ তোমার অনর্থক।

পিতম। আচ্ছা, বলুন দেখি, লোকে ঘুঘুকে ভয় করে কেন? বাটীতে ঘুঘুচরা গালি কেন?

ব্রহ্ম। তাহা আমি বিশেষ জানি না।

পিতম। কিন্তু আমি অনুভব করিতে পারি।

ব্রহ্ম। কি অনুভব কর।

পিতম। কোন কোন পক্ষী সময়ে সময়ে বিষাক্ত হয়। একসময়ে বাঙ্গালায় হয় ত ঘুঘুপক্ষী বিষাক্ত হইয়াছিল; যে বাটীতে ঘুঘু বাস করিত সেই বাড়ীতেই মড়ক হইত, তাহাই হয় ত ঘুঘুর অপবাদ বাঙ্গালায় অদ্যাপি আছে। যে পাখী আসিতেছে, সে পাখী বিষাক্ত নিশ্চয়। আমি কল্য পাখীওয়ালা সাজিয়া রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিব। কল্য রাজকুমারের জন্মদিন, আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছে। আপনার হইয়াছে?

ব্রহ্ম। তোমায় কে নিমন্ত্রণ করিল?

পিতম। রাজাবাহাদুর খোদ। অন্যের নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করি না, বিশেষতঃ রাজবাটীতে—

ব্রহ্ম। কেন?

পিতম। কুটুম্ববাটীতে অন্যের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য।

ব্রহ্ম। রাজার সহিত তোমার কুটুম্বিতা কিরূপ?

পিতম। ব্রহ্মচারীর সহিত ব্রহ্মদৈত্যের কুটুম্বিতা যেরূপ, রাজার সহিত দরিদ্রের কুটুম্বিতা সেইরূপ। অর্থাৎ ঘটনামূলক।

ব্রহ্ম। পাগলামি আরম্ভ করিলে? কই পাগলামি করিতে গিয়া তুমি ত কখন রূঢ় হও না, আজ রূঢ় কথা বলিতে আরম্ভ করিলে কেন?

পিতম। অপরাধ লবেন না, বড় গায়ের জ্বালা হইয়াছে, তাহাই বলিতেছিলাম যে আপনি যেমন শীঘ্র ব্রহ্মদৈত্য হইবেন এই মূর্খ রাজা সেইরূপ শীঘ্র আমার মত দরিদ্র হইবেন। কল্য তাহার বীজরোপণ হইবে, আপনি একবার রাজবাটীতে যাবেন। রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাবেন, আমি নিমন্ত্রণ করিয়া গেলাম। আপনার দ্বারা রাজার কোন উপকার হবে না জানি, লোকের উপকার করা আপনাদের ধর্ম্ম-

বরুদ্ধ, পরোপকার গৃহীর ধর্ম্ম, আত্ম-উপকার উদাসীনের ধর্ম্ম, তথাপি মন বুঝে না, কি জানি যদি কিছু হয়।

ব্রহ্ম। রাজার কি বিপদ ?

পিতম। রাজার অপেক্ষা আমার বিপদ অধিক, কল্য বিস্তর আহার করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে নিদ্রা যাই।

এই বলিয়া পিতম কালীদহের একটি সোপান অবতরণ করিয়া শয়ন করিল।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, আইস পিতম মন্দিরে শয়ন করিবে চল।

পিত। ঘরের ভিতর শয়ন বড় বিপদ, ইট কাঠে আমার বড় ভয় হয়। আচ্ছা ব্রহ্মচারীঠাকুর, বলুন দেখি মানুষের আকৃতি আর প্রকৃতি কিরূপে সংশোধন হয়, বিশেষতঃ উদরের ভাগটা।

ব্রহ্ম। কিছু আহার করিবে ? বোধ হয় আজ কিছু জুটে নাই।

পিতম। ঠিক বলেছেন। কিন্তু কল্য পোষাইয়া লওয়া যাইবে, আজ আর কিছু নয়। কিন্তু গঠনের দোষ না গেলে—এই বলিয়া পিতম চুপ করিল।

ব্রহ্মচারী দেখিলেন যে পিতম ঘুমাইল, অতএব ধীরে ধীরে উঠিয়া নগরাভিমুখে গেলেন।

১৪

পরদিবস প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পর পিতম রাজবাটীর দিকে চলিল। দূর হইতে নহবৎ শুনিয়া ভাবিল, আমার বিলম্ব হইয়াছে, হয় ত উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। রাজপুরীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে সকল মন্দিরে রক্তপতাকা উড়িতেছে। ছাদের উপর শত শত শ্বেত কপোত বসিতেছে, উড়িতেছে, আবার বসিতেছে, আবার উড়িতেছে ; সূর্য্যকিরণে যেন আকাশে হীরা ছড়াইয়া পড়িতেছে। পিতম কতকদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, রাজদ্বারে বিস্তর লোক উপস্থিত হইয়াছে, নানাবিধ বাদ্যোদ্যম হইতেছে, নহবৎখানার বিলক্ষণ শোভা হইয়াছে, রৌপ্য নাগারার উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে। দশ বারটি হস্তী সুসজ্জীভূত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পিতম আসিয়া মহানন্দে তাহাদের প্রদক্ষিণ করিতে করিতে কত কথা কহিতে লাগিল। একটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, ছি ! মা ! তুমি কেন সিঁথি পরিয়াছ ? তোমার যে বয়স গিয়াছে। আর একটির পশ্চাতে গিয়া বলিল, কেন মা, তোমার চন্দ্রহার কই ? তৃতীয়কে বলিল, তুমি গলায় যে মালা পরিয়াছ, তাহা কয় নরী গণা যাইতেছে না। সালঙ্কারা যুবতীর ন্যায় মাথা তুলিয়া, বুক ফুলাইয়া দাঁড়াও, পাঁচনরী কি সাতনরী ভাল করে দেখাও। নতুবা পাড়ার মেয়ের কাছে তোমার মান থাকিবে না।

এই সময় দেওয়ানপুত্র নবকুমার

রাজবাটী প্রবেশ করিতেছিলেন, পিতমের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি পিতম! পাড়ার মেয়ের কাছে হাতীর মান কিসে?

পিতম। অলঙ্কারে—নচেৎ আর কিসে? আচ্ছা! বলুন দেখি, ধনীরা হাতীকে স্ত্রীর ন্যায় সাজায় কেন? আর একই জাতীয় অলঙ্কার পরায় কেন? স্ত্রীর কপালে সিঁথি হাতীর মাথায়ও সিঁথি। স্ত্রীর গালে অলকা তিলকা, হাতীর গালেও তাহাই। শিকল, শিকলি, ঘণ্টা আর কিঙ্কিণী এই প্রভেদ। আপনার চক্ষে হস্তিনী আর গৃহিণী কি এক রূপ বোধ হয়?

নবকুমার। বড় নয়, তবে গৃহিণী অন্দরের শোভা, আর হস্তিনী সদরের শোভা। বশতাপন্ন উভয়েই সমান, উভয়েই বন্দিনী।

পিতম। ঠিক বলেছেন, শিকলের রূপান্তর পায়ের মল। তাই ত ত্যাই ত! আমি চিরকাল মনে করিতাম এই অলঙ্কারের অর্থ কি? এখন তাহা বুঝিলাম। কিন্তু এই মল ক্রমে ক্রমে সরু হবে, তাহার পর ভাঙ্গিয়া যাবে ততদিনে হয় ত অনেক পুরুষ কেটে যাবে। কিন্তু মল ভাঙ্গিলে পুরুষের কপাল[টা]ও ভাঙ্গিবে।

নব। এত দূরদর্শিতা যদি তোমার আছে, তবে লোকে তোমায় পাগল বলে কেন?

পিতম। ভাল, বল দেখি, তুমি এমত চমৎকার সন্তান, তথাপি লোকে তোমায় কুসন্তান, পিতৃশত্রুর ধামাধরা বলে কেন?

নবকুমার আর কোন উত্তর না করিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। পিতম আবার ফিরিয়া হস্তীর নিকট গিয়া মহা আহ্লাদে নানা কথা কহিতে লাগিল। এমত সময় একবার চূড়াধন বাবু কর্ম্মান্তরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পিতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতীর সঙ্গে কি মিষ্টালাপ হইতেছে?"

পিতম। দেখুন দেখি বিধাতার অবিচার, হস্তীর এই প্রকাণ্ড শরীর, এই শক্তি, কিন্তু দেখুন ইহার চক্ষু কত ক্ষুদ্র। তাহাই বলিতেছিলাম ছি! মা! তোমার বড় ছোট নজর।

চূড়াধন। চক্ষু ছোট হউক, হস্তী পৃথিবীর সকল বস্তুই ত দেখিতে পায়, কিছু ত আটক হয় না। বিশেষতঃ যেরূপ উহারা স্বভাবতঃ সতর্ক তাহাতে বড়চক্ষুর আর বিশেষ প্রয়োজন নাই।

পিতম। হাজার বুদ্ধিমান্ হউক বা সতর্ক হউক, পশ্চাতের বিপদ কিছুই ত দেখিতে পায় না। তাহাই আমার বড় কষ্ট হয়।

চূড়াধন। তা তোমার এত কষ্ট হয় কেন?

পিতম। পরের বিপদে আমার বড় কষ্ট হয়, নিজের বিপদে বরং সাহস হয়, পাগলের লক্ষণই এই, ইহা বুঝিতে পারেন ত। (শেষ একটি হস্তিনীকে নির্দেশ

করিয়া) এই ভানুমতীর বিপদে আমার যেমন কষ্ট, রাজার বিপদে সেইরূপ কষ্ট, আবার আপনার বিপদেও প্রায় সেই রূপ। কিন্তু এই তিনজনেরই দৃষ্টির দোষ সমান। পশ্চাদৃষ্টি রাজার একেবারে নাই, কেন না তিনি সকলকে বিশ্বাস করেন; আপনারও তাহা নাই, কেন না আপনি নিজের বুদ্ধিকে বিশ্বাস করেন। স্ত্রীকে বিশ্বাস করিলে যেমন বিপদ, নিজ বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিলেও তাহাই ঘটিতে পারে। উভয়েই প্রলয়ঙ্করী, বিশেষতঃ দুশ্চরিত্রা হইলে। আপনার বুদ্ধি দুশ্চরিত্রা—ইতিপূর্ব্বে দুই একবার ধরা পড়িয়াছে, আজ একেবারে বেরিয়া যাবে।

চূড়াধনবাবু অতি তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, এমত সময় নবকুমার আসিয়া পশ্চাৎ হইতে বলিলেন, "কে বেরিয়া যাবে হে?"

পিতম। কেন? চূড়াধনবাবুর দুশ্চরিত্রা বুদ্ধি।

চূড়াধন। পাগলের কথায় কান দিলে সকল সময় কাজ চলে না, ফের।

উভয়েই আবার পুরীপ্রবেশ করিলেন। পিতম দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিতরের কোলাহল শুনিতে লাগিল। পর্ব্বতরুদ্ধ জলকল্লোলের ন্যায় তাহা অতি মধুর বলিয়া তাহার বোধ হইতে লাগিল। পিতম দ্বারে প্রবেশ করিলে, সেই কোলাহল আরও ঘোরতর ও মনোহর হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রাঙ্গণে আর সেরূপ কোলাহল বোধ হইল না। পিতম চমৎকৃত হইয়া পরীক্ষার্থ আবার ফিরিল, দ্বারে শব্দ অধিক, প্রাঙ্গণে শব্দ অল্প, পিতম ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। পিতমের যাতায়াত দেখিয়া দ্বারপালেরা নিষেধ করিল না। পাগলকে সকলেই শ্রদ্ধা করিত। একজন পিতমকে নিকটে ডাকিয়া আপন অদৃষ্ট গণনা করিতে বলিল। পিতম মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি বড় ব্যস্ত; শেষ একমুষ্টি সিদ্ধি বাহির করিয়া সকলকে কিছু কিছু দিয়া চলিয়া গেল। দ্বারপালেরা দেখিল, যে সেরূপ উৎকৃষ্ট সিদ্ধি তাহারা আর কখন চক্ষে দেখে নাই। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া পাগলাবাহাদুরের প্রশংসা করিতে লাগিল। যে অবধি পিতমের প্রতি রাজার অনুগ্রহ হইয়াছিল, সেই অবধি পিতমের প্রতি রাজভৃত্যদের বড় ভক্তি জন্মিয়াছিল। অনেকে পিতমকে সাধক মনে করিত, সাধক না হইলে রাজার এত যত্ন কেন হইবে। ভক্তিহেতু দ্বারবানেরা পিতমকে "পাগলাবাহাদুর" বলিত, অদ্য আশ্চর্য্য সিদ্ধি পাইয়া সে ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হইল। অনেকে ভাবিল, যে কৈলাসপুরীতে যে সিদ্ধির ব্যবহার হয়, সিদ্ধপুরুষ কোনরূপ যোগাড় করিয়া সেই সিদ্ধি আনিয়াছেন।

এক বৃদ্ধ চৌবে বলিল, "তাহা অসম্ভব নহে, যখন জাল সিদ্ধি মহাদেবের নিমিত্ত আসে, তখন নন্দী তাহার কিছু কিছু সিদ্ধপুরুষদের পাঠাইয়া দেন। বোধ

হয় পাগ্‌লাবাহাদুর হালফেল কিছু সংবাদ পাইয়া থাকিবেন। একবার এক খড় আজব ঘটনাক্রমে আমার পিতামহ কিছু পাইয়াছিলেন। তিনি তখন ছোকরা ছিলেন—বয়স জোর বিশবৎসর হইবে, তখন তাঁহার বিবাহ হয় নাই, বিরোধ করিয়া বিবেকী হন। প্রথমে হরিদ্বারে কিছুদিন থাকিয়া, পরে কেদারনাথ ডাহিন হাত রাখিয়া একেবারে কৈলাসের নীচে আসিয়া পৌঁছেন। তখন সূর্য্যদেব হেলিয়া পড়িয়াছিলেন। পিতামহ দূর হইতে কৈলাস দেখিতে লাগিলেন; একদিকে রুদ্রাক্ষবন, তিনি মেঘের কোলে সেই রুদ্রাক্ষবনের বাহার দেখিতেছিলেন, এমত সময় মহামায়া জগৎজননী গণপতিকে গদিতে লইয়া এক আশ্চর্য্য সিংহের উপর আসওয়ার হয়ে বনহইতে বাহির হইলেন। সে সিংহের যে দেমাক্ তাহা আর কি বলিব। তাহাতে আসওয়ার হয়ে ছোকরা গণপতি কতই খুসি, মার গদি হইতে হেলিয়া পড়িয়া সিংহের জটা ধরিয়া টানিবেন চেষ্টা করিতেছেন। সতর্ক সিংহ মাথা নামাইয়া চলিতেছে; মহামায়া বলিতেছেন, "ছি! বৎস, সিংহকে লাগিবে।" গণপতি আরও হেলিয়া পড়িয়া জটা ধরিবার উদ্যোগ করিতেছেন, সিংহ ভয় দেখাইবার নিমিত্ত হুঙ্কার ছাড়িল, কৈলাসপর্ব্বত অমনি কাঁপিয়া উঠিল; গণপতি আহ্লাদে নাচিয়া উঠিলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা ছুঁড়িতে লাগিলেন, সকল অলঙ্কার বাজিয়া উঠিল। গণেশজননী সন্তানের শুঁড় ধরিয়া মুখচুম্বন করিলেন। এদিকে কার্ত্তিকেয় মার সঙ্গে সিংহ চড়িতে পায়েন নাই বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছিলেন; ভৃঙ্গী সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল উঠিতে পারিল না, আর একজন গিয়া মহাদেবকে ডাকিয়া আনিল। পিতাকে সম্মুখে দেখিয়া কার্ত্তিকেয় আরও গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মহাদেব পূরা চক্ষুতে চাহিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আইস বৎস, আমরা দুইজনে বৃষবাহনে যাই। বৃষ কেমন মণিমাণিক্যে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সিংহের ত কোন অলঙ্কার নাই।" এই বলিয়া ষাঁড়ের শৃঙ্গের গায়ে ত্রিশূল হেলাইয়া রাখিয়া আস্তরণ ঝাড়িতে লাগিলেন। ছোক্‌রা কার্ত্তিকেয় মৃত্তিকা হইতে উঠিয়া বজ্রবেগে গিয়া বৃষকে এক ধাক্কা মারিলেন, তাহার সকল কিঙ্কিণী ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। বৃষ একটু হেলিল না, কেবল মস্তক নত করিয়া দিল। কার্ত্তিকেয় ষাঁড়ের কপাল হইতে হীরার ধুক্‌ধুকী ছিঁড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর একে একে বৃষের সকল অলঙ্কার ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। আমার পিতামহ তাহা কুড়াইতে লাগিলেন। অলঙ্কার ফুরাইলে কার্ত্তিকেয় দৌড়িয়া গিয়া ভৃঙ্গীর সম্মুখে যে সকল সিদ্ধির ছালা ছিল, তাহাও ফেলিয়া দিলেন, পিতামহ তাহাও কুড়াইয়া লই-

লেন। এই সময় দুইশত চুয়াড় লোক গিয়া পড়িল; আমার পিতামহের সহিত লড়াই করিল। এক এক তরবারের চোটে পিতামহ সকলকে টুটুকরা করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, শেষ উপর হইতে মহাদেবের ত্রিশূল আসিয়া মাথায় পড়িল, কাজেই পিতামহ মরিলেন। কার্ত্তিকেয় ত্রিশূল ফেলিয়া দিয়াছিলেন তাহাই মরিলেন, নতুবা তাঁহাকে মারা কাহারও সাধ্য ছিল না। চুয়াড়েরা অলঙ্কারগুলি লইল; কিন্তু ত্রিশূল আর সিদ্ধির গাঁটরী আমাদের বাটী পৌঁছাইয়া দিয়া গেল, অদ্যাপি আমাদের বাটীতে ঐ ত্রিশূল আছে নিত্য পূজা হয়। আর রামলীলার সময় ঐ সিদ্ধি আমরা ছুটি ছুটি খাই। সেই অবধি কেহ আর আমাদের বাটীর নিকট মোচ উঁচা করিয়া যাইতে পারে না। সেই অবধি এ পর্য্যন্ত দেখিতেছি, যে, আমাদের গোষ্ঠীর কেহ লড়াইয়ে হারেন নাই, কেবল দুই একজনমাত্র লড়াইয়ে মরিয়াছেন। আর সেই সময় ত্রিশূলের যে খোসবু পাইয়াছিলাম, অদ্যাপি ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে।”

এই সময় নবকুমার আর চূড়াধনবাবু একত্রে যাইতেছিলেন; উভয়েই গল্পের কতকাংশ শুনিয়াছিলেন, নবকুমার মাথা ফিরাইয়া বলিলেন, “চৌবে! ঝুট বাৎ।”

চৌবে রাগান্ধ হইয়া উত্তর করিল, “বাঙ্গালি আর হিন্দুস্থানী বহুৎ ফারাক। কিরূপে আমার কথা ঝুট হইল, আমার কি পিতামহ ছিলেন না? আমি তবে কি আকাশ হইতে পড়িয়াছি?”

নব। তুমি এইমাত্র বলিলে তোমার পিতামহের বয়স তখন বিশবৎসর হইবে, আবার বলিলে, তুমি সে সময় উপস্থিত ছিলে, ত্রিশূলের তৎকালিক সদ্গন্ধ তোমার স্মরণ আছে তাহা কিরূপে সম্ভব?

চৌবে। পশ্চিমদেশে তাহা সম্ভব। আপনাদের দেশে তাহা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমাদের দেশের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের দেশ বীরের দেশ, সেখানে সকলই সম্ভব।

নবকুমার হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। চৌবে ঠাকুর তাঁহার অনুপস্থিতিতে নানা আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং বাঙ্গালির চরিত্রসম্বন্ধে নানাপ্রকার গালি দিতে লাগিলেন। বলিলেন, আমাদের দেশে কহে;—

জি চাহে ত কর দুস্মনকে সাত দোস্তি।
মগর না করো কভু বাঙ্গালা মে বস্তি॥

১৫

রাজবাটীর প্রথমপ্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, দুই একজন এখানে সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। একদিকে অধ্যাপকেরা বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। তৎকালে কেবল স্মৃতিশাস্ত্রই প্রবল ছিল, ন্যায়শাস্ত্রের বাচালতা

বড় জন্মে নাই; এই জন্য শাস্ত্রালাপের চীৎকার বড় অধিক শুনা যাইতেছিল না। বিশেষতঃ রাজা তখন সভায় আইসেন নাই।

আর একদিকে শতাধিক ভাট, সেরেস্তাদার পেস্কারের ন্যায়, পাগড়ি মাথায়, বসিয়া আপন আপন প্রাপ্তির কথা কহিতেছিল, মধ্যে মধ্যে স্বর করিয়া একত্র রাজার গুণকীর্ত্তন করিতেছিল, আবার তৎক্ষণাৎ তাহা ছাড়িয়া আপন আপন ঘরের কথা কহিতেছিল।

রাজভৃত্যেরা নবাবী কায়দায় পরিচ্ছদ পরিয়া চারিদিকে বেড়াইতেছিল, সকলেই নম্র, সকলেই যোড়হস্ত, সকলের মুখেই সম্মানসূচকবাক্য। এক্ষণকার ভৃত্যেরা স্বাধীন হইয়াছে, মাথায় আর তাহাদের পাগড়ি বাঁধিতে হয় না, যোড়হস্তে আর কথা কহিতে হয় না। তখন নাপিত পর্য্যন্ত পাগড়ি বাঁধিত, দাড়ি ধরিবার পূর্ব্বে তাহারা প্রণাম করিত।

এক্ষণে প্রভুরাও স্বাধীন হইয়াছেন, তাঁহারা আপনইচ্ছামত পরিচ্ছদ পরিতে পারেন। অদ্য ধুতি, কল্য পায়জামা বা পেণ্টুলন; আজ বাঁকা সিঁথি, কাল সোজা সিঁথি; তাহার নিমিত্ত কাহাকেও এক্ষণে কৈফিয়ত দিতে হয় না। আহারও ইচ্ছানুরূপ, লোকের ভয়ে কিছুই বর্জ্জন করিতে হয় না। ব্যবহারেও তাহাই, লোকের ভয়ে কন্যাকে অপাত্রে দিতে হয় না। লোকের ভয়ে দীনদশাপন্ন হইয়া থাকিতে হয় না অথবা প্রথার ভয়ে পৈতৃক মূর্খতা রক্ষা করিতে হয় না।

বাঙ্গালা এক্ষণে আহারে স্বাধীন, ব্যবহারে স্বাধীন, শিক্ষায় স্বাধীন, ব্যবসায় স্বাধীন। বাঙ্গালা এক্ষণে যথার্থ স্বাধীন। এতদূর স্বাধীনতা বিলাতের কোথাও আছে কি না তাহা সন্দেহ। ইংরেজ রাজা বলিয়া যাঁহারা বাঙ্গালীকে পরাধীন বলেন, তাঁহাদের স্বাধীনতাজ্ঞান আর একরূপ।

পিতম ধীরে ধীরে রাজসভায় প্রবেশ করিল, অতি কুণ্ঠিতভাবে একপ্রান্তে গিয়া বসিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নতশিরে থাকিয়া মস্তক তুলিল, তখন ঈষৎ হাসি হাসি মুখে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য করে নাই। পিতম কতক নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু পিতমের মলিন বেশ, বিশেষতঃ তাহার ম্লানমুখ রাজভগিনী অনিমিক্‌লোচনে দেখিতেছিলেন। পিতম তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই। অন্তঃপুরবাসিনীরা অনেকে সভা দেখিবার নিমিত্ত চীকের পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছিলেন, সকলেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের দেখিতেছেন, তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন কেবল রাজভগিনী জ্যোৎস্নাবতী অনিমিক্‌লোচনে বৃদ্ধ পিতমের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার একজন পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরাণি! অমন করে কি দেখিতেছেন?"

জ্যোৎস্নাবতী। স্বপ্ন দেখিতেছি।

পরি। ঘুম কই যে স্বপ্ন দেখিবেন?

জ্যোৎ। আমি নিদ্রিত কি জাগরিত বুঝিতে পারিতেছি না।

পরিচারিকা প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া ক্ষান্ত হইল; যেদিকে জ্যোৎস্নাবতী চাহিয়া রহিয়াছিলেন, পরিচারিকা তাহা অনুসরণ করিয়া দেখিল, রাজভগিনী পিতম পাগলাকে দেখিতেছেন। কোন হেতু নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া আরও আশ্চর্য্য হইল। পিতমের রূপ আছে, না বয়স আছে, না অলৌকিক কিছু আছে যে তাহার প্রতি রাজভগিনীর দৃষ্টি পড়ে। জ্যোৎস্নাবতীরও বয়স হইয়াছে, বৃদ্ধা বলিলেই হয়, তবে এ ব্যবহার কেন? পরিচারিকা আপনা আপনি অনেক ভাবিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না।

জ্যোৎস্নাবতী অনেকক্ষণপরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতঙ্গিনি, তুই এই দুঃখী, এই দরিদ্রকে চিনিস?"

পরিচা। চিনি মা, ও পাগল।

জ্যোৎস্নাবতী। এর উপর আবার পাগল হইয়াছেন?

পরিচা। ও আজন্মপাগল। পথে পথে বেড়ায়, ভিক্ষা করে খায়, রাত্রে গাছতলায় পড়ে থাকে।

জ্যোৎস্নাবতী মুখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আবার তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুছিয়া চারিদিকে চাহিলেন। কেহ তাঁহার ক্রন্দন শুনে নাই, দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি তুই জানিস তবে বল দেখি, সকল কথা বল দেখি শুনি।"

পরিচা। আমি আর ত কিছুই জানি না, ওর নাম পিতম পাগলা এই জানি। এইখানে ঘুরে বেড়ায় এই দেখেছি।

জ্যোৎস্নাবতী। এত স্থান থাকিতে এখানে কেন? তাই বা কেন জিজ্ঞাসা করি।

পরিচা। ও কে মা, তবে, ওরে কি চেন, ওর বাড়ী কোথায়?

জ্যোৎস্না। পিতম! পিতম নাম কেন? দাদা কি এ কাঙ্গালকে দেখেছেন, কখন আলাপ করেছেন? তিনিও কি পিতম বলে কথা কন?

এই সময় বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল, রাজা আসিতেছেন বলিয়া সভাসদ্ সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। পিতমও উঠিল। রাজা আসিয়া প্রধান প্রধান সকলের সহিত দুই একটি কথা কহিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বসিবামাত্র ভাটেরা মনোহর স্বরে স্তবপাঠ করিতে লাগিল। এই অবকাশে রাজা ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। পিতমের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু রাজা কোন সম্ভাষণ করিলেন না দেখিয়া জ্যোৎস্নাবতী আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "তবে কি আমার ভ্রান্তি? না তা নয়; হয় ত দাদা চিনিতে পারেন নাই।"

পরিচারিকা বলিল, "ঠাকুরাণি, আপ-

নার ছুখানি পায়ে পড়ি, কে পিতুম বলুন না।"

জ্যোৎস্না। ইনি এখানে কতদিন এসেছেন?

পরি। অনেককাল, আমাদের ত জ্ঞান-ভোর দেখিতেছি, তা আমাদের বয়স ত অধিক নয়, কিন্তু সকলেই বলে পিতম অনেককাল অবধি এখানে আছে।

জ্যোৎ। তুমি কখন এই কাঙ্গালের সঙ্গে কথা কয়েছ?

পরি। না মা, আমার ভয় করে। কি জানি পাগল যদি কিছু বলে।

জ্যোৎ। এখানে অনেক দিন আ-ছেন? অথচ আমি তাহা জানিতে পারি নাই।

এই সময় আর একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল,"রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত রাণীঠাকুরাণী আপ-নাকে ডাকিতেছেন।" জ্যোৎস্নাবতী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

রাণীমহলে এক বিস্তৃত শয্যায় রাণী নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত পুত্রকে লইয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে আত্মীয় স্বজনেরা বসিয়া রাজকুমারের শুভব্যাখ্যা করিতেছে, সম্মুখে এক স্বর্ণপাত্রে ধান্য দূর্ব্বা প্রভৃতি আশীর্ব্বাদের উপকরণ রহিয়াছে। জ্যোৎস্নাবতী আসিবামাত্র রাণী বলিলেন, "তুমি আশীর্ব্বাদ না করিলে আর কেহ আশীর্ব্বাদ করিতে পারিতেছেন না। সকলের আশীর্ব্বাদ করা হইলে বাহিরে ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ করিবেন। রাজা সভায় গিয়াছেন।"

এই সময় চূড়াধন বাবুর স্ত্রী রাজভগি-নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি, আজি-কার দিনে তোমার চোখে জল পড়েছে কেন?" রাণী একবার জ্যোৎস্নাবতীর মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন। রাজভগিনী অপ্রতিভ হইয়া স্বর্ণথালহস্তে তুলিয়া রাজকুমারের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজকুমার তাঁহার অভিসন্ধি অনুভব করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল। জ্যোৎ-স্নাবতী ধান্যদূর্ব্বা হস্তে তুলিবামাত্র শিশু মাথা সরাইয়া লইল। পুটুর মা এক-জনকে চুপি চুপি বলিলেন, বরের গায়ে হরিদ্রা দিতে গেলে বর যেমন করে, রাজকুমার আজ ঠিক তাই করিতেছেন।

জ্যোৎস্নাবতী আশীর্ব্বাদ করিলে একে একে সকলেই ফুল লইয়া আসিলেন, রাজকুমার তাহা দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে ছাড়িল না, সকলেই মাথায় ফুল দিতে লাগিল। মাধবীলতা মার ক্রোড় হইতে নামিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া রাণীর নিকটে আসিল, একবার স্বর্ণপাত্রের দিকে চাহিল, আবার রাণীর মুখপ্রতি দেখিল। তাহার পর একটী ফুল কুড়াইয়া লইয়া রাজকুমারের নিকট সরিয়া গেল। ক্রমে ক্ষুদ্র হস্তখানি তুলিয়া ফুলটি ছাড়িয়া দিল। ফুলটি রাজকুমারের মাথা কি অঙ্গ স্পর্শ করিল না, শয্যায় পড়িয়া গেল। মাধবী আবার সেই ফুলটি

কুড়াইয়া লইয়া ক্ষুদ্র হাতখানি তুলিল। রাজকুমারের কানপর্য্যন্ত হাতখানি পৌঁছিল। সেবার ফুলটি ফেলিয়া দিয়া মাধবী ক্ষুদ্র অঙ্গুলিদ্বারা রাজকুমারের চুল স্পর্শ করিল। স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া রাণীর মুখপ্রতি চাহিল। রাণী আর একটি ভাল ফুল হাতে দিয়া বলিলেন, "কর, তুমিও আশীর্ব্বাদ কর তোমারই আশীর্ব্বাদ সত্যের।" এই কথায় রাজভগিনী একবার রাণীর দিকে চাহিলেন, এবার রাণী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। মাধবীলতা ফুলটি তুলিয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল, বামহস্তে দুই একটি তাহার পাপড়ি ছিঁড়িল, তাহার পর রাজকুমারের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। মাথা স্পর্শ হইল না বলিয়া সেইদিকে সরিয়া গেল। আবার হাত বাড়াইয়া দেখিল আবার সরিয়া গেল। শেষ মাথায় ফুল দেওয়া হইল। মাধবী আপনাকে কৃতকার্য্য দেখিয়া আহ্লাদে ছুটিয়া মার ক্রোড়ে গিয়া উঠিল। মাতা পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

এই সময় চূড়াধনবাবুর স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন যে, কই রাজভগিনী এর মধ্যে আবার কোথায় গেলেন। রাণী অমনি তীব্রদৃষ্টিতে চারিদিক দেখিলেন, তাহার পর পরিচারিকাদিগকে বলিলেন তোমরা কে, রাজকুমারকে রাজসভায় লইয়া যাইবে আইস। একজন তৎক্ষণাৎ আসিয়া রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইল, সকলে সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরের দ্বার পর্য্যন্ত চলিল, রাণী কতকদূর গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমে আর আর সকলেও ফিরিয়া আসিয়া রাজসভা দেখিবার জন্য রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

রাজকুমার সভাস্থ হইবামাত্র ব্রাহ্মণেরা সকলেই উঠিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। নহবৎ বাজিয়া উঠিল। রাজা স্বয়ং রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া বাহির হইলেন। রাজদ্বারে গিয়া দরিদ্রদিগকে অর্থদান করিবার আদেশ করিলেন। মহা কোলাহল হইয়া উঠিল। চারিদিকের বাদ্যোদ্যম ছাড়াইয়া দরিদ্রের চীৎকার উঠিল।

রাজসভার প্রায় অধিকাংশ লোকেই কাঙ্গালিবিদায় দেখিতে বাহির হইলেন, কেবল দশ বারজন অধ্যাপক একত্রে বসিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কিঞ্চিৎ দূরে পিতম পাগলা একা বসিয়া থাকিল। পূর্ব্বমত ম্লান ও অন্যমনস্ক। একজন ভাট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে এখানে? বাহিরে কাঙ্গালীবিদায় হইতেছে, এখানে বসিয়া কেন ঠকিতেছ। পিতম তাহার প্রতি চাহিল, কোন উত্তর করিল না। ক্ষণকালপরে নবকুমার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি পিতম, বাদ্য অপেক্ষা কিসের শব্দ অধিক?"

পিতম। শুনিতে ত পাইতেছেন।

নবকুমার। আচ্ছা, দরিদ্রের চীৎকার অপেক্ষা কিসের শব্দ অধিক?

পিতম। পুত্রশোকের।

একজন অধ্যাপক বলিলেন, "শুনিলে, পাগলা কি বলিতেছে। পাগলার যে জ্ঞান আছে আপনাদের তাহা নাই। আপনারা কোন্ বুদ্ধিতে আমাকে ধৈর্য্য হইতে বলিতেছেন। আমি অনেক সহ্য করিয়াছি। এখন সকল শুনিয়াছি আর কেন সহ্য করিব। এতকালের কষ্ট হইতে আজ মুক্ত হইব।"

এই সময় রাজা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও আসিল। রাজা আসিবামাত্র সেই অধৈর্য্য অধ্যাপক অগ্রসর হইয়া বলিল, "পুত্রকে আমার সমর্পণ করুন, এ সন্তান আমার।"

রাজা। আপনি কি চান?

অধ্যাপক। আমার পুত্র চাই।

রাজা। তোমার পুত্র কোথা?

অধ্যাপক। সে আপনার ক্রোড়ে। রাজক্রোড়ে আমার সোনার চাঁদ, একবার দিন বুকে করি। বোধ হয় আমার কথা বুঝিতে পারিতেছেন না। আমায় পাগল ভাবিতেছেন। আমি পাগল হইয়াছিলাম সত্য কথা, কেন হব না? আমার ঘরে ছেলে শুয়ে। প্রাতে সে ছেলে আর কোথাও নাই। পীড়া নয়, মাতৃক্রোড় হইতে ছেলে গেল। এতে কে না পাগল হয়! লোকে বলিল, ভৌতিক ব্যাপার; আবার কেহ বলিল, জাতহরণের কার্য্য, আমি তখন জানি না যে, রাজার কার্য্য। এখন প্রমাণ পাইয়াছি যে আমাদের মৃতবৎসা রাণী মৃতকন্যা প্রসব করিয়া এ হতভাগার কপাল পোড়াইয়াছেন। তাহা যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আমি সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলাম, এক্ষণে আমার হারাধন সমর্পণ করুন।

"এ কি ব্যাপার" বলিয়া রাজা পুত্রকে বুকের ভিতর করিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন। অধ্যাপক সঙ্গে সঙ্গে যাইবার উদ্যোগ করিলে, সকলে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা পাইলেন। কেহ কেহ তাঁহার হস্তধারণ করিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সকল অধর্ম্ম অপেক্ষা পুত্রহরণ অতি গুরুতর, অতএব সাবধান সাবধান, রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট।"

এই সময় দেওয়ান অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "মহাশয়কে পুত্রশোকাকুল দেখিতেছি, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, কে আপনার এই দুরবস্থার যন্ত্রণা বাড়াইয়াছে তাহা শুনি। কিরূপ প্রমাণের দ্বারা আপনার এ ভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছে তাহা বলিবেন চলুন।"

বঙ্গদর্শন।

সপ্তম বৎসর।

৭৬ সংখ্যা।



মিরন্দা ও কপালকুণ্ডলা।

অসামাজিক বলিলে এক্ষণে গালি বুঝায়, কিন্তু সমাজবিরহিত মানবচরিত্র সৃষ্টি করিতে সকলেই ব্যস্ত। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্ সে চিন্তায় হাস্য করিতে পারেন, কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বজাতির, সকল শাস্ত্র আমূল এই কল্পনায় পরিপূর্ণ। রুসো যখন সাম্যের দুন্দুভিনিনাদে বৈষম্যময় ফ্রান্সসমাজ আলোড়িত করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন,—সিদ্ধকামও হইয়াছিলেন। দেখা যায় জগতের শিক্ষাগুরু কবিসম্প্রদায়ের বিশেষ চেষ্টা, সমাজবিরহিত-অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যময়-চরিত্র-সৃষ্টি করা। তাহা গুণ কি দোষ এক্ষণে বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের মহাকবি কালিদাসের, প্রায় সকল কাব্যের ইহাই উদ্দেশ্য। তবে কথা এই, যে তাঁহার কাব্যে নিরবচ্ছিন্ন সমাজবিরহিত চরিত্র নাই;—একটু না একটু সমাজসম্পর্ক তিনি রাখিয়াছেন। কিন্তু একেবারে নিরবচ্ছিন্ন সমাজবিরহিতচিত্র দুইটি আছে;—এক মিরন্দা, দ্বিতীয় কপালকুণ্ডলা। এই দুই চরিত্র আজি আমাদের সমালোচ্য বিষয়।

বাস্তবিক, সমাজবিরহিতা, চমৎকারকারিণী, সারল্যপ্রতিমা মিরন্দাচরিত্র চিত্র করিবার জন্যই সেক্ষপীয়র Tempest নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য থাকিতে পারে; অন্য নৈতিকতত্ত্ব তাঁহার প্রতিপাদ্য হইতে পারে; কিন্তু নাটকের মূলগ্রন্থি, মেরুদণ্ড, এই মিরন্দার চিত্র। নীলিমাময় অনন্ত সাগরের বক্ষে বিজন ক্ষুদ্র দ্বীপ। তথায় কেবলমাত্র পিতৃসহবাসে, মিরন্দার সুকোমল হৃদয় বিকাশ পাইয়াছিল। সে পিতাও আবার অমানুষস্বভাব।—যাহা অলৌকিক, যাহা অন্যের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা, তাহাই তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বময় উপকরণ। যাহা সংসারের প্রধান স্বার্থ, প্রধান সন্মান, তাহাতেই তিনি

উপেক্ষা করিয়া, অতৃপ্তভাবে, অনুদিন শাস্ত্রালোচনায় রত ছিলেন। অন্যে যে উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে, মানুষের মন যে এত সংকীর্ণ, এত স্বার্থপর, তাহা তাঁহার অসীম বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইত না। তাই তিনি কন্যার সমক্ষে ভ্রাতার কুব্যবহার বর্ণনা করিতে করিতে ও যথাযোগ্য ভাবে তাঁহার দূষণীয়তা প্রমাণ করিতে পারিতেছেন না। এ চরিত্রও কিয়ৎপরিমাণে সমাজবিরহিত নয় ত কি? সুতরাং পিতার সামাজিক জ্ঞান, কন্যার মনবিনয়নবিষয়ে কোন সাহায্যই করে নাই। জড়প্রকৃতির ভীষণ তরঙ্গভঙ্গ, আর পিতার অলৌকিক কার্য্যকলাপ, মিরন্দার চরিত্রবিনয়নের প্রধান উপায়। তাহার উপর মিরন্দা পিতার নিকট সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং পিতার মোহনীয়, কমনীয় চরিত্রের বিকাশ তাঁহাতেও হইয়াছে। যখন পিতার রাজ্যনাশ, বনবাসের কথা শুনিয়া শোক দুঃখে মিরন্দার কোমল হৃদয় ফাটিতেছিল, মিরন্দা সস্নেহে পিতাকে বলিল,

"Alark, what trouble
Was I then to you!"

পিতা প্রসন্ন্যাবো আত্মদুঃখ বিস্মৃত হইয়া কন্যার স্নেহে অভিভূত হইলেন। বলিলেন,

"O! a cherubin
Thou wast, that did preserve me! Thou didst smile,
Infused with a fortitude from heaven
When I have deck'd the sea with drops full salt,
Under my burden groaned; which raised in me
An undergoing stomach, to bear up
Against what should ensue."

এই কোমলচরিত্র যে কতক উত্তরাধিকারনিয়মে, কতক বা আদর্শের বলে, মিরন্দার হৃদয় সংঘটন করিয়াছিল, তাহা বলিয়া দিতে হইবে না।

প্রবলবাত্যামথিত, অনন্ত নীল সাগরের তরঙ্গরাশির মধ্যে, অসহায়, মগ্নপ্রায় তরী দেখিয়া মিরন্দা ঘোর ব্যথিতা হইলেন। পরের দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি স্ত্রীজাতিভিন্ন আর কে দেখাইতে পারে? বিশেষ মিরন্দার কমনীয় চরিত্র কখনও আর কোন নিষ্ঠুরতার সংস্পর্শে আইসে নাই।—মিরন্দা যাহা নিত্য দেখিত, তাহার সকলই ত ঔদার্য্যময়, সকলই ত দয়ার, মহত্ত্বের আকর। এ অবস্থায় মিরন্দার কোমলপ্রকৃতি অলৌকিক কমনীয়তালাভ করিয়াছিল। মিরন্দা সেই মগ্নপ্রায় তরীর জন্য, তরীমধ্যস্থিত ব্যক্তির জন্য ব্যথিতা হইলেন। দয়ার উচ্ছ্বাসে, অশ্রুপূর্ণনয়নে, কাতর বচনে পিতার সাধনা করিতেছেন, "যদি পিতঃ, মন্ত্রবলে তুমি এই ভীষণ বাত্যা, এই তরঙ্গভঙ্গভীষণ সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়া থা

আমার মিনতি ইহা শান্ত করিয়া দাও। কাহাকেও দুঃখ পাইতে দেখিলে আমারও বড় দুঃখ হয়! অমন সুন্দর তরী!—নিশ্চয়ই উহার আরোহীরা মহৎ হইবে!—আহা, অমন তরীখানি, একেবারে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল! উহাদের রোদনধ্বনি আমার মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে। হায়, যদি আমার সাধ্য হইত, আমি সমুদ্রকে পৃথিবীর গর্ভে নিমগ্ন করিতাম।—তরীকে, আরোহীদিগকে বাঁচাইতাম!" ইহা শুনিয়া পিতা প্রস্‌পারো মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, "ভয় কি তোমার? শান্ত হও,—কিছুই ত হয় নাই। যাহা করিয়াছি, তাহা তোমারই মঙ্গলের জন্য।" তখন তিনি দীননেত্রা, মুগ্ধা সেই কন্যার সমক্ষে আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রতিকথা করুণাময়, পাষাণভেদী, মধুরিমাময়! মিরন্দা তাহাই একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিল। শুনিতেছিল, আর সরলা বালিকা, অকপটে আত্মসহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিল। শুনিতে শুনিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিল! সে কাহিনী শুনিলে কে না দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। কন্যাস্নেহে মুগ্ধ প্রস্‌পারো মানবহৃদয়ের মহান্ কাণ্ডারী;—তিনি মহান্ হৃদয়সাগরের মোহময় সকল আবর্ত্ত বুঝিতেন। তাই কন্যাকে অন্যমনস্কা করিবার চেষ্টা পাইলেন। প্রতিপদে তিনি তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমাজবাসীদের হৃদয় সর্ব্বত্রগামী;—বহু বিষয় সে হৃদয়ের আলোচ্য।—সুতরাং সমাজবিরহিতচরিত্রে একাগ্রতার আবির্ভাব অধিকতর। মিরন্দার তাহাই হইয়াছিল। বলিতেছিল "তোমার কাহিনীতে পিতঃ, বধিরেরো শ্রবণশক্তি হয়!" ফলতঃ এই মিরন্দাচিত্র সর্ব্বজ্ঞ কবির অপূর্ব্ব মোহময় সৃষ্টি! সেক্সপীয়র মিরন্দাকে পবিত্রতার প্রতিমা করিয়া গড়িয়াছেন। খুল্লতাতের নারকী ব্যবহারের কথা শুনিয়া মিরন্দা ব্যথিতা হইল, কিন্তু তবু সে মন পাপের ভাব ধারণ করিতে অক্ষম। অন্যের প্রতি পাপের আরোপ হইলেও তাহার অসহ্য! তাই বলিল, "তাই বলিয়া পিতামহীর মহত্ত্বে সন্দেহ করিলে পাপ হয়;—সুগর্ভে কুসন্তান ত জন্মে!" আবার যখন পিতৃমুখে মিরন্দা শুনিল যে গঞ্জালো নামক এক ব্যক্তি পিতার সেই মহা বিপদ্‌কালে কিছু উপকার করিয়াছিল, অমনি তাহার মহৎহৃদয় সকল ভুলিয়া কৃতজ্ঞতারসে গলিয়া গেল। বলিল, "একবার তাঁহাকে দেখিতে বড় সাধ করে!" পবিত্রতার এই প্রতিমা, সারল্যের এই মোহিনী ছবী, অনন্তকাল লোকমনোমোহন করিবে!

নেপল্‌স্ রাজকুমার ফার্দিনান্দকে নয়নগোচর করিবামাত্র, সরলা মিরন্দা বিমুগ্ধা হইল! এই ক্ষণে তাহার সমাজবিরহিতার ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। দেখিয়াই মিরন্দা রাজকুমারের প্রতি আসক্ত হইলেন;—অথচ নিজে তাহা অনু-

ভব করিতে পারিলেন না। প্রস্পারো বুঝিলেন ;—ভাবিলেন,

"It goes on I see.
As my soul prompts it."

গৃহস্থা কামিনীতে, আর সমাজবিরহিণী বনবাসিনীতে এই প্রভেদ। ব্রীড়াবিনত রক্তিমানন একের মাধুর্য্য ; তাহার নির্লজ্জভাব অন্যের কমনীয়তা! অনায়াসে, অকপটে নবযুবতী মিরন্দা, নবীনযুবক ফার্দিনান্দকে দেখিয়া দেবতা ভাবিয়া বলিল, "দেখ পিতঃ, ঐ দেবমূর্ত্তি দেখ! দেবমূর্ত্তিই ত বটে!—কি সৌম্য আকৃতি।" প্রস্পারো বুঝাইয়া বলিলেন যে "তাহা নহে। উহারও ক্ষুধা, তৃষ্ণা আছে, এও মানুষ। শোকে ম্রিয়মাণ হইয়াছে, নহিলে আরো সুন্দর দেখিতে!" মিরন্দা বলিল "আমার কাছে ঐ দেবতা!—আমি আর কখন এমন মহৎ দেখি নাই!"

ফার্দিনান্দ সেই বিজন দ্বীপে, লোকমোহিনী, অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যাহা মনে ভাবিলেন উচ্ছ্বাসে মুখেও তাহাই ব্যক্ত হইল। বলিলেন "বুঝিয়াছি, ইনিই এই দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ;—আর ঐ যে গীতিকালহরী শুনিলাম, উহারা ইহার সহচরী! ভাল দেবি, আমি আপনার অনুমতি গ্রহণ করিয়া এ দ্বীপে বাস করিলে ত হানি নাই? কিরূপে এখানে বাস করিব, তাহা আমায় উপদেশ করুন। আমার একটি প্রশ্ন আছে— আগেই তা বলিতাম! হে আশ্চর্য্যরূপিণি, আপনি কি আজিও কুমারী?" মিরন্দা আপনাকে দেবীনামে সম্মানিত হইতে দেখিয়া বলিল, "আমি ত আশ্চর্য্যরূপিণী নহি, আমি কুমারীই বটে!" মিরন্দা ও ফার্দিনান্দ উভয়ের প্রতিবাক্যে, প্রতিপদে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে প্রথমদর্শনেই তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়াছে। তাই প্রস্পারো ফার্দিনান্দের অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে ফার্দিনান্দের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিয়া মিরন্দা মর্ম্মে মরিয়া গেল। বলিল, "কেন পিতঃ, এমন কঠোর ব্যবহার করিতেছ? আমি জ্ঞানে এই তৃতীয় মানুষ দেখিলাম! প্রথম দেখিয়াই ইহার প্রতি আমার সহানুভূতি হইয়াছে। পিতা দয়া কর—আমার কথা শুন!" প্রস্পারো এই অনুরক্ত যুগলের প্রেমগাম্ভীর্য্য পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে, কৃত্রিমক্রোধভরে বলিলেন, "তুমি কাহার চরমাত্র! কেন তুমি আমার দ্বীপে পদার্পণ করিলে? আমাকে এই দ্বীপচ্যুত করিয়া ইহা অধিকার করিতে কি তোমার ইচ্ছা?" মিরন্দার হৃদয়ে এ তিরস্কার অসহনীয় হইল। আপনার হৃদয়ের পবিত্রতায়, বাঞ্ছিতের মঙ্গলোদ্দেশে বলিল "এমন মন্দিরে কি কখন পাপ বাস করিতে পারে? পাপের গৃহ যদি এমন সুন্দর হয়, তবে দেবতারাও তাহার প্রয়াসী হইবেন!" বুড়া প্রস্পারো মজা দেখিতে লাগিল,—বুড়ারা বুঝি যৌব-

নের লীলাতরঙ্গ স্মরণ করিয়া তরুণের প্রেমলহরী গণিতে ভালবাসে। বুড়া ফার্দিনান্দকে বলিল "তুমি শঠ—আমি তোমার হাত, পা বাঁধিব; সমুদ্রের লবণাক্ত জল তোমার পানীয় হইবে; তোমাকে কটুকষায় ফলমূল, অখাদ্য খাইতে দিব।" বীররাজকুমার ইহাতে ভয় পাইল না। ক্রোধে তরবারী নিষ্কাষিত করিয়া বলিল, "তাহা কখন হইবে না। দেখিব শত্রুর অঙ্গে কত বল।—তারপর বশ্যতার কথা।" মিরন্দা বড় ফাঁফরে পড়িল। বলিল, "না পিতঃ, ইহাকে এমন কঠিন পরীক্ষায় ফেলিও না। কই, ইহাতে আশঙ্কার কিছুই নাই—ইহার সবই ত কমনীয়!" কিছুতে না পারিয়া অনুরক্তা, চিন্তময়ী মিরন্দা পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ছি তাত, একটু দয়া কর! আমি উহার জামিন হইতেছি!" প্রস্পারো উপায়াস্তরে মিরন্দাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। "আর কিছু বলিও না। আর কিছু বলিলেই তিরস্কার করিব। কি! ছদ্মবেশী প্রবঞ্চকের জন্য তুমি অনুরোধ করিতেছ? ছি ছি! তুমি কি প্রেতমূর্ত্তি কালিবন আর এই তরুণ যুবককে দেখিয়াই স্থির করিলে যে যুবার সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না? নির্ব্বোধ! অধিকাংশ মানুষের কাছে এই যুবক কালিবনের মত। তাহারা ইহার তুলনায় ত দেবতা!" মিরন্দা তখন গদগদ বচনে, সজলনেত্রে অকপটে পিতাকে বলিল, "তবে আমার স্নেহাশয় বড় নীচ! এর চেয়ে সুন্দর কাহাকেও দেখিতে আমার ইচ্ছা হয় না!" প্রস্পারো কন্যার প্রণয়গাম্ভীর্য্যে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহারই পরাজয় হইল। সমাজবিরহিণী, ব্রীড়াবিচ্যুতা তরুণীর প্রণয়ভাব কেমন সরলভাবে বিকশিত হইতে পারে, সেক্সপীয়র তাহা কেমন সুন্দর চিত্র করিয়াছেন। কল্পনার এমন মোহময় কার্য্যক্ষেত্র আর হইতে পারে না; এমন সুন্দর চিত্রকরও বুঝি আর হয় না। ফলতঃ প্রস্পারো চিত্র কবির আত্মপ্রতিবিম্ব! প্রস্পারো দৈববলে জড়জগৎ মন্থন করিয়া,অন্তর্জাগতিকশক্তিসমূহ শাসন করিয়া আত্ম-অমানুষীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। স্বয়ং সেক্সপীয়রও ত তাহাই করেন!

প্রস্পারো বাস্তবিকই ফার্দিনান্দকে বিষম অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিলেন। তিনি আবার এই সুযোগে মিরন্দার অতলস্পর্শী প্রেমের পরিমাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নবীন, অলৌকিক প্রণয়ের চরমলীলাভঙ্গ দেখিতে সাধ করিলেন; কন্যাবৎসল, কন্যার ভাবী সুখ বর্ত্তমানে নয়নগোচর করিবেন স্থির করিলেন। দ্বীপের প্রান্তদেশে ফার্দিনান্দকে তিনি অগ্নিপরীক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছেন। রাজকুমারকে দারুণ আতপতাপে কাষ্ঠভার বহন করিতে বাধ্য করিয়াছেন। তার পর মিছামিছি কন্যাকে বলিয়াছেন যে তিনি তিনঘণ্টা কাল রীতিমত অধ্যয়নে নিবিষ্ট হইবেন—

মিরন্দা অন্যত্র যেন না যান! কিন্তু মিরন্দা আজ আর ইচ্ছা করিলেও পিতার বাধ্য হইতে পারিলেন না। কায অন্যায় হইল বুঝিলেন, কিন্তু বাঞ্ছিতকে দেখিবার বাসনা কোন বাধা মানিল না। রাজকুমার বিষম আতপতাপে কাষ্ঠভার বহন করিতে ছিলেন;—পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছেন, ললাটে স্বেদনির্গম হইতেছে। তাঁহার গৃহের অপরিমিত সুখরাশি অবশ্য মনে পড়িতেছিল;—পশুবৎ দাসগণের ভীষণ যাতনা বুঝি হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল। কিন্তু তবু মিরন্দার মোহিনীস্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছিল। সেই কথাই তিনি ভাবিতেছিলেন,—

"I mustremove some thousands of these logs and pile them up upon a sere injunction; my sweet mistress weeps when she sees me work and says such business had never like executor."

মিরন্দা যখন আসিলেন তখন ফার্দিনান্দ কঠোর শ্রমে রত। দেখিয়া মিরন্দার হৃদয় দুঃখে ফাটিতে লাগিল। বলিল "আহা! আর শ্রম করিও না। ঈশ্বর করুন বিদ্যুৎ আসিয়া সকল কাষ্ঠ পুড়াইয়া দিক। তাহা হইলে আর তোমায় শ্রম করিতে হইবে না। একটু বিশ্রাম কর।—তোমার বড় শ্রম হইয়াছে। এই কাষ্ঠভারের জ্ঞান থাকে ত ইহারা পুড়িবার সময় অশ্রুবর্ষণ করিবে —কেন না তোমায় ইহারা যাতনা দিয়াছে। পিতা এখন পাঠে নিবিষ্ট হইয়াছেন;—আমার মিনতি এই সময় একটু বিশ্রাম কর। তিন ঘণ্টা ত আর তাঁহার জন্য কোন আশঙ্কা নাই।" ফার্দিনান্দ বলিল, "হে মধুরভাষিণি! সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যে আমার সব কায শেষ করিতে হইবে!" মিরন্দা দেখিল ফার্দিনান্দ নিরস্ত হয় না। বলিল, "ভাল আমাকে দাও,—আমি এখন তোমার কাষ্ঠভার বহন করি!" ফার্দিনান্দ বলিল "না তাহা হইবে না! আমি বসিয়া থাকিব, আর তুমি এই অপমানের কায করিবে। আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তোমায় তাহা করিতে দিব না!" মিরন্দা ছাড়িল না; আবার বলিল, "এ আর অপমান কি? তুমি করিতে পারিয়াছ, আমি করিলে দোষ কি? আর, আমি তোমার চেয়ে অনায়াসে ইহা করিতে পারিব—কেন না আমি ইচ্ছায় করিব; তুমি অনিচ্ছায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমার কষ্ট কাযেই বেশী হইতেছে!" ফার্দিনান্দ মুগ্ধ হইয়া সেই সারল্যপ্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" মিরন্দা একেবারে বলিল, "আমার নাম মিরন্দা!" কিন্তু পিতার আজ্ঞালঙ্ঘন করা হইল, এ কথা পরক্ষণেই যখন মনে হইল, তখন বলিল "পিতঃ, এইবার তোমার আজ্ঞার অবহেলা করিলাম!" ফার্দিনান্দ বলিল "মিরন্দা! তুমি সংসারের সাররত্ন! আমি অনেক রমণী দেখিয়াছি, অনেকের কথা শুনিয়াছি,

অনেককে অনেক গুণের জন্য স্নেহ করিয়াছি ; কিন্তু তোমার মত সকলগুণে গুণবতী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কাহাকেও দেখি নাই ! তুমি বিধাতার মানসপ্রতিমা, তুমিই তাঁহার চরম সৃষ্টি !" মিরন্দা উত্তর করিল "আমি আর কোন রমণীকে চিনি না ; কোন স্ত্রীর মুখ আমার মনে নাই ; আপনার প্রতিবিম্ব যাহা দেখিতে পাই ! অন্য পুরুষও কাহাকে চিনি না ; কেবল পিতাকে দেখি, আর আজ তোমায় দেখিলাম। পৃথিবীর অন্যান্য লোকের কেমন মূর্ত্তি, তাহা ত আমি জানি না ! কিন্তু সে যাহা হউক তোমা-ভিন্ন আর কেহ আমার সহচর হইবে না—তোমার মত মূর্ত্তি আমি আর কল্পনায় ধারণ করিতে পারি না। কিন্তু আমি অন্যায় কায করিতেছি। পিতার আজ্ঞা যে লঙ্ঘন করিলাম !" ফার্দিনান্দ আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। আবার বলিল "মিরন্দা ! আমি রাজার কুমার ; কিন্তু তোমার জন্যই আজ আমি ধীরভাবে এই কাষ্ঠবহনের অপমান স্বীকার করিতেছি, তোমায় দেখিয়া অবধি আমি মুগ্ধ হইয়াছি ! মিরন্দা ! তোমার দাস হইতে বাসনা করি !" সরলা মিরন্দা রাজকুমারের সুসামাজিক, রাজদরবারোপযোগী প্রণয়সম্ভাষণ বড় বুঝিল না। যাহা বুঝিল, তাহাতেই জানিল রাজকুমার তাহাকে ভাল বাসেন।—বলিল, "তুমি কি আমায় ভাল বাস ?" তার পর ফার্দিনান্দের মুখে মর্ম্মভেদী প্রেমব্যক্তি শুনিয়া মিরন্দা অশ্রুমোচন করিল। এ আনন্দাশ্রু। বলিল "সুখের কথায় দুঃখ করি কেন ?—আমি নির্ব্বোধ।" ফার্দিনান্দ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল মিরন্দা, কাঁদ কেন ?" মিরন্দা বলিল, "আমি তোমার অনুপযুক্ত ! তোমায় যাহা দিতে চাই, তাহা দিতে ত সাহস হয় না ! লজ্জার ভাব মনে আসে কেন ? আমি কথা লুকাতে জানি না—মনের কথা স্পষ্ট বলিতেছি ! যদি বিবাহ কর, আজ হইতে আমি তোমার স্ত্রী হইলাম—যদি বিবাহ না কর, তোমার দাসী রহিব ! তোমার সহচরী হইতে যদি না পাই, দাসীও কি হইতে পাব না ?" মনোমিলন হইয়াছিল ; গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইল। আমরা সবিস্তারে এই সমাজবিরহিণীর সঙ্গে রাজকুমারের কথোপকথন বিবৃত করিলাম। মিরন্দাচরিত্রের বিশ্লেষণ ইহাতেই বোধ হয় হইয়াছে !

কপালকুণ্ডলার কবি সমাজবিরহিণীর চিত্র পাঠকের চক্ষে ধরিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃততঃ সেই চিত্রসৃষ্টি তাঁহার গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার গ্রন্থের উদ্দেশ্য অদৃষ্টগতির অবশ্যম্ভাবিতা-প্রদর্শন—যে অদৃষ্টগতি "ভৌতিক ও মানসিক নিয়মের ফল" তাহারই অবশ্যম্ভাবিতা-প্রদর্শন। সুতরাং কপালকুণ্ডলার চিত্র গ্রন্থের উপায়বিশেষমাত্র—উদ্দেশ্য নহে। উদ্দেশ্য হইলে বোধ হয় আমরা কপালকুণ্ডলার চরিত্র অধিকতর বিকশিত দেখিতাম। কিন্তু ইহা যে ভাবে

চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতেই সমাজবির হিতার সরল, অলৌকিকভাব স্ফুটতালাভ করিয়াছে, এক্ষণে আমরা তাহাই দেখাইব।

সমুদ্রতটে বসিয়া, প্রদোষে যখন নবকুমার জলধিশোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন, কখন বা নিজের নিরাশ্রয়ের ভীষণতা অনুভব করিয়া ব্যথিত হইতেছিলেন, "কপালকুণ্ডলার" সেই দৃশ্য পাঠক একবার মনোমন্দিরে অঙ্কিত করুন। "পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কালজলের উপর বসিল।" তখন নবকুমার আশ্রয়ানুসন্ধানে ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব্বমূর্ত্তি! তিনি এই প্রথম বনবাসিনী, অলৌকিকরূপরাশি কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেন। সেই প্রদোষে, সেই অনন্ত সমুদ্রের তটে, সেই মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া নবকুমার কত মোহিত হইয়াছিলেন তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনীশক্তি অনুভূত হয় না। নবকুমার অকস্মাৎ এইরূপ দুর্গমমধ্যে দৈবীমূর্ত্তি দেখিয়া নিস্পন্দশরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাক্যশক্তিরহিত হইল;—স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রমণীও স্পন্দহীন, অনিমিকলোচনে বিশালচক্ষুর স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। উভয়মধ্যে প্রভেদ এই, যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগপ্রকাশ হইতেছিল। * * অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"

দ্বিতীয়বার যখন নবকুমার কাপালিকসঙ্গে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কপালকুণ্ডলার কোমলকরস্পর্শ হইল। সেই আগুল্ফলম্বিত নিবিড়কেশরাশিধারিণী বন্যদেবীমূর্ত্তি!—পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দ, নিস্পন্দ! নবকুমার দেখিলেন, রমণী বাক্যস্ফূর্ত্তি নিষেধ করিতেছে। নিজমুখে অঙ্গুলিপ্রদান করিয়াছে। পরে উদাসীন শ্রবণাতিক্রান্ত হইলে রমণী মৃদুস্বরে কহিল, "কোথা যাইতেছ? যাইও না। ফিরিয়া যাও—পলায়ন কর।" আবার যখন কাপালিক নবকুমারকে সৈকতভূমিতে বধার্থ লইয়া চলিলেন, তখন কপালকুণ্ডলা তীরের তুল্য বেগে নবকুমারের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। গমনকালে তাঁহার কর্ণে বলিয়া গেল—"এখনও পলাও। নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?" কপালকুণ্ডলা কাপালিকের খড়্গ লুকাইত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। কাপালিক খড়্গানুসন্ধানে গিয়াছেন, এই অবকাশে কপালকুণ্ডলা লতাবদ্ধ, জীবনে মৃতপ্রায়, হতভাগ্য নবকুমারের পার্শ্বে আসিয়া দেখা দিলেন। নবকুমার নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন সেই মোহিনী কপালকুণ্ডলা।

তাঁহার করে খড়্গ ঝুলিতেছে। কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "যুবা! কথা কহিও না—খড়্গ আমারই কাছে—চুরী করিয়া রাখিয়াছি।" এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা অতিশীঘ্রহস্তে নবকুমারের লতাবন্ধন খড়্গদ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন। নিমেষমধ্যে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। কহিলেন, "পলায়ন কর, আমার পশ্চাৎ আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি।" নবকুমার কপালকুণ্ডলার সঙ্গে বেগে দৌড়িলেন। কিন্তু অন্ধকারে গমনের বড় বাধা জন্মিতে লাগিল। যুবতী একদিকে ধাবমানা হইলে, নবকুমার অন্যদিকে যান। রমণী কহিলেন, "আমার অঞ্চল ধর।" আমরা এতক্ষণ যাহা দেখাইলাম, তাহাতেই বুঝা গেল যে কপালকুণ্ডলার চরিত্র অতিকমনীয়, অতিউদার। তিনি পরোপকারের জন্য সব করিতে পারেন। কিন্তু সে কথা এখনও শেষ হয় নাই। আমরা পরে দেখাইব যে সমাজবিরহিত মানবচরিত্র যত নিঃস্বার্থ, যত দৃপ্ত হইতে পারে, সামাজিকতায় তাহা অসম্ভব।

কপালকুণ্ডলার অলৌকিক সারল্য তাঁহার জীবন। সামাজিকের সারল্য মধুর বটে, কিন্তু অসামাজিকের সরলতার যে মাধুর্য্য তাহা দেবতার বাঞ্ছনীয়। যখন অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকসন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নিষেধ করিলেন, নিষেধের অযোগ্য কারণ দর্শাইয়া উপদেশের গাম্ভীর্য্য বুঝাইয়া দিলেন, তখন কপালকুণ্ডলা বলিলেন, "না গিয়া কোথায় যাইব?" অধিকারী বলিলেন, "এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও।" প্রতিভাময়ী কপালকুণ্ডলা নীরব হইয়া রহিলেন। অধিকারী কহিলেন, "মা, কি ভাবিতেছ?"

"কপা। যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে যে, যুবতীর এরূপ যুবাপুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত। এখন যাইতে বল কেন?"

তখন উভয়ে উচিতাবধারণের জন্য করালকালীমূর্ত্তির নিকট গেলেন। উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। অধিকারীর সংস্পর্শে এবং প্রধানতঃ কাপালিকের আদর্শবলে, কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে গাঢ় ধর্ম্মভাব অঙ্কিত হইয়াছিল। তবে তিনি কাপালিকের ভীষণভাব, তাহার ঘৃণিতকার্য্যকলাপ সহিতে পারিতেন না। অধিকারীর সংস্পর্শে এ বিষয়ে তাঁহার অনেক উপকার হইত। তিনি নিতান্ত সরলা, কাপালিকের ভীষণ অভিসন্ধি ভেদ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি বলিলেন যে, "কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন।" অধিকারী বলিলেন, "কিজন্য প্রতিপালন করিয়াছেন তাহা জান না। স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ না করিলে যে তান্ত্রিক সিদ্ধ হয় না তাহা তুমি জান না। আমিও তন্ত্রাদি পাঠ করিয়াছি। মা

জগদম্বা জগতের মাতা। ইনি সতীর সতীত্ব—সতীপ্রধানা। ইনি সতীত্বনাশসংযুক্ত পূজা কখন গ্রহণ করেন না। এইজন্যই আমি মহাপুরুষের অনভিমত সাধিতেছি।" সুতরাং কাপালিকের আদর্শবলে হৃদয়ে যে কাঠিন্যসঞ্চারের কথা, অধিকারীর শিক্ষায় তাহা হইতে পায় নাই। কপালকুণ্ডলা কালিকায় অনন্তবিশ্বাসবতী—কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসে দূষণীয় কিছুই নাই।

"অধিকারী আচমন করিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটি অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র লইয়া মন্ত্রপূত করিলেন, এবং তাহা প্রতিমার পাদোপরি সংস্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে, অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন,

"মা, দেখ, দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন, বিল্বপত্র পড়ে নাই; যে মানস করিয়া অর্ঘ্য দিয়াছিলাম, তাহাতে অবশ্য মঙ্গল। তুমি এই পথিকের সঙ্গে সচ্ছন্দে গমন কর; আমি বিষয়ী লোকের রীতি, চরিত্র জানি। তুমি যদি গলগ্রহ হইয়া ইহার সঙ্গে যাও, তবে এ ব্যক্তি অপরিচিত যুবতী সঙ্গে লইয়া লোকালয়ে লজ্জা পাইবেক। তোমাকেও লোকে ঘৃণা করিবেক। তুমি বলিতেছ এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণসন্তান, গলাতেও যজ্ঞোপবীত দেখিতেছ। এ যদি তোমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যায়, তবে সকল মঙ্গল। নচেৎ আমিও তোমাকে ইহার সহিত যাইতে বলিতে পারি না।"

"বি—বা—হ!" এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, 'বিবাহের নাম ত তোমাদের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবেক?'

অধিকারী ঈষন্মাত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, 'বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান; এইজন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে। জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।' অধিকারী মনে করিলেন সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, সকলই বুঝিলেন। বলিলেন 'তাহাই হউক—বিবাহই হউক।'"

সমাজবিরহিত সারল্যের আরও একটি মোহিনীমূর্ত্তি! কপালকুণ্ডলার অঙ্গে স্বীয় অলঙ্কারসমূহের সমাবেশ সমাপ্ত করিয়া মতিবিবি বা পদ্মাবতী বলিয়াছিলেন "আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন। এ ফুল রাজোদ্যানেও ফুটে না।" সেই গহনার দশা কি হইল? পাঠিকা বলিবেন হয় ত যে "কপালকুণ্ডলার এই দোষ আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছি। গহনা যে পরকে বিলাইয়া দেয়, তার চেয়ে হাবা মেয়ে কি আর আছে? সমালোচকও তেমনি হাবা! নহিলে এ দোষকে গুণ বলিবে কেন?" সে কথা সত্য! যাহা হউক, "কপালকুণ্ডলা শিবিকাদ্বার খুলিয়া চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন; একজন ভিক্ষুক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভিক্ষা চাহিতে চাহিতে

পাঙ্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "আমার ত কিছু নাই, তোমাকে কি দিব?" ভিক্ষুক কপালকুণ্ডলার অঙ্গে যে দুই একখানা অলঙ্কার ছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "সে কি মা! তোমার গায়ে হীরা মুক্তা—তোমার কিছু নাই?" কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গহনা পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও?" ভিক্ষুক কিছু বিস্মিত হইল। ভিক্ষুকের আশা অপরিমিত। ক্ষণমাত্র পরে কহিল, "হই বই কি?" কপালকুণ্ডলা অকপট হৃদয়ে কৌটাসমেত সকল গহনাগুলিন ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। অঙ্গের অলঙ্কারগুলিও খুলিয়া দিলেন। ভিক্ষুক ক্ষণেক বিহ্বল হইয়া রহিল। দাস দাসী কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। ভিক্ষুকের বিহ্বলভাব ক্ষণিকমাত্র। তৎক্ষণই এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গহনা লইয়া পলায়ন করিল। কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন, ভিক্ষুক দৌড়িল কেন?" বলিয়াছি, এ চিত্র সমাজবিরহিত সারল্যের মোহিনীমূর্ত্তি! ফলতঃ এমন চিত্র সাহিত্যসংসারে অতি দুর্লভ। আর্ভিং সাহেব কলম্বসের জীবনচরিতে আমেরিকসমাজের প্রাথমিক অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন যে এ সমাজে বিবাদের প্রধান কারণের অভাব।—কেন না তোমার ও আমার এ উভয় স্বার্থময় বাক্যের অর্থ কেহ জানে না। কপালকুণ্ডলার সারল্য তদনুরূপ; সমাজে যে পবিত্রতা নাই কপালকুণ্ডলার তাহা আছে।

মিল্ বলিয়াছেন যে, যে সকল লোক সহজে মুগ্ধ হয়, যত্ন করিলে তাহাদিগকে সহজেই মহৎ করা যাইতে পারে। কথা সত্য যে, কপালকুণ্ডলার অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক আত্মবিসর্জ্জন দেখিয়া আমরা গ্রন্থশেষে মোহিত হই, তাঁহার চরিত্রের প্রধান উপকরণ এই মুগ্ধ ভাব (Sensitiveness) ও বটে! তিনি যখন তখনি মুগ্ধা! বিবাহের পর নবকুমারের সহিত যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা কালী প্রণামার্থ গেলেন। ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপাত্র হইতে একটি অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল। কপালকুণ্ডলা নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা। বিল্বদল প্রতিমাচরণচ্যুত হইল দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে গভীর ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা সহজে লুপ্ত হয় নাই। এই মুগ্ধভাববশতঃই তিনি অবরোধবাসিনী, কুলকামিনীগণের সাহচর্য্যে আসিয়াও বহুদিন পর্য্যন্ত যে সন্ন্যাসিনী সেই সন্ন্যাসিনীই ছিলেন। চিন্তাশীল পাঠক এইখানে একবার নবকুমারের প্রাসাদসৌধোপরি দণ্ডায়মানা রমণীযুগলের কথোপকথন স্মরণ করুন। শ্যামা বলিতেছিল, "তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না? একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কতদিন যোগিনী থাকিবে?"

মৃ। যখন এই ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না। পরশপাথরের স্পর্শে রাঙ্গও সোণা হয়। মেয়েমানুষেরও পরশপাথর আছে। সে পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাথর ছুঁয়েছিস্।

মৃণ্ময়ী কহিলেন, "ভাল, বুঝিলাম। পরশপাথর যেন ছুঁয়েছি, সোণা হলেম। চুল বাঁধিলাম; ভাল কাপড় পরিলাম; খোঁপায় ফুল দিলাম; সিঁথি ও চন্দ্রহার পরিলাম; কাণে দুল দুলিল; চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান, গুয়া, সোণার পুত্তলি পর্য্যন্ত হইল। মনেকর সকলই হইল। তাহা হইলে বা কি সুখ?" শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "আচ্ছা—তাই যদি না হইল; তবে শুনি দেখি তোমার সুখ কি?" মৃণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। বোধ করি সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" আবার বলিলেন, "যাহা বিধাতা করাইবেন; তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে তাহাই ঘটিবে।" কহিলেন, "যেদিন স্বামীর সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলাম। আমি মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম্ম করিতাম না। যদি কর্ম্মে শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাতদেশে আসিতে শঙ্কা হইতে লাগিল।—ভাল মন্দ জানিতে মার কাছে গেলাম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না—অতএব কপালে কি আছে জানি না।" তাই বলিতেছিলাম যে মুগ্ধভাবও কপালকুণ্ডলাচরিত্রের প্রধান উপকরণ বটে।

শ্যামাসুন্দরীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছিল—স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা এক্ষণে অনেকাংশে গৃহস্থকামিনীর ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য অসামাজিক মনোগতি, অসামাজিক চরিত্রগর্ব্ব অব্যাহত ছিল। সে তেজ দুর্দমনীয়—কিন্তু পবিত্রতাময়।

"কপালকুণ্ডলা কহিলেন, 'ঠাকুরঝাম,ই আর কতদিন এখানে থাকিবেন?'

শ্যামা কহিলেন, "কালি বিকালে চলিয়া যাইবে। আহা! আজি রাত্রে যদি ঔষধটি তুলিয়া রাখিতাম, তবু তারে বশ করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে পারিতাম। কালি রাত্রে বাহির হইয়াছিলাম বলিয়া লাথি, ঝাঁটা খাইলাম। আর আজি বাহির হইব কি প্রকারে?"

ক। দিনে তুলিলে হয় না?

শ্যা। দিনে তুলিলে ফলবে কেন? ঠিক দুই প্রহর রাত্রে এলোচুলে তুলিতে

হয়। তা ভাই, মনের সাধ মনেই রহিল।

ক। আচ্ছা, আমি ত আজি দিনে সে গাছ চিনে এয়েছি। আর যে বনে হয় তাও দেখে এয়েছি। তোমাকে আজি আর যেতে হবে না, আমি একা গিয়া ঔষধ তুলিয়া আনিব।

শ্যা। একদিন যা হইয়াছে তা হইয়াছে। রাত্রে তুমি আর বাহির হইও না।

ক। সে জন্য তুমি কেন চিন্তা কর? শুনেছ ত রাত্রে বেড়ান আমার ছেলেবেলা হইতে অভ্যাস। মনে ভেবে দেখ আমার সে অভ্যাস না থাকিলে তোমার সঙ্গে আমার কখন চাক্ষুষও হইত না।

শ্যা। সে ভয়ে বলি না। কিন্তু একা রাত্রে বনে বনে বেড়ান কি গৃহস্থের বউ ঝির ভাল। দুইজনে গিয়াও এত তিরস্কার খাইলাম, তুমি একাকিনী গেলে কি রক্ষা থাকিবে?

ক। ক্ষতিই কি? তুমিও কি মনে করিয়াছ যে আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?

শ্যা। আমি তা মনে করি না। কিন্তু মন্দলোকে মন্দ বল্‌বে।

ক। বলুক, আমি তাতে মন্দ হব না।

শ্যা। তা ত হবে না—কিন্তু তোমাকে কেহ কিছু মন্দ বলিলে আমাদের অন্তঃকরণে ক্লেশ হবে।

ক। এমত অন্যায় ক্লেশ হইতে দিও না।

শ্যা। তাও আমি পারিব। কিন্তু দাদাকে কেন অসুখী কর্‌বে?

কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর প্রতি নিজ স্নিগ্ধলোচনকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, 'ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।'"

পাঠকমহাশয় উদ্ধৃত অংশ পর্য্যালোচনা করিয়া কবির চিত্রকুশলতা বুঝিতে পারিবেন। গৃহস্থ কামিনী শ্যামাসুন্দরীর সমাজভীতি, মৃদুতার সহিত তিনি কপালকুণ্ডলার তেজস্বিতা ও দৃপ্ততার পার্থক্য কেমন সুকৌশলে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি যাহা দেখাইয়াছেন, আধুনিক দার্শনিকও তাহাই বলেন। সমাজভীতি সমাজনীতির মূলকারণ বটে, কিন্তু অসামাজিকের নীতি নিরপেক্ষিক—তাহাতে আপেক্ষিকতার নামমাত্র নাই। সুতরাং সার্ব্বভৌম মানবসমাজকে শিক্ষা দিবার জন্য কপালকুণ্ডলার ন্যায় চরিত্রসৃষ্টির প্রয়োজন। কেবল তাহাই নহে।—কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

কপালকুণ্ডলা সেই বিজন বনমধ্যে যে সকল শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা অসামাজিক। সুতরাং সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি বিপদে পড়িয়াছিলেন। প্রতিপদে তাঁহার প্রিয়তম,

আশৈশববাভ্যস্ত শিক্ষাগুলি সমাজসংস্পর্শে ব্যথিত হইতে লাগিল—কেন না সে সকলের ব্যবহারে সমাজের বিরুদ্ধাচরণ হয়। সুতরাং সকলেরই নিকট নিন্দাভাজন হইতে হয়। অন্যের কথা দূরে থাক, স্বয়ং নবকুমারও তাঁহার বন্যশিক্ষায় বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। কেন না তিনি সামাজিকমাত্র। "ইতিপূর্ব্বেই নবকুমার দেখিয়াছিলেন যে কপালকুণ্ডলা কোন কোন বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইয়াছেন। বিশেষ কপালকুণ্ডলা তাঁহার নিষেধসত্ত্বেও যেখানে সেখানে একাকিনী যাইতেন; যাহার তাহার সহিত যথেচ্ছা আচরণ করিতেন; অধিকন্তু তাঁহার বাক্যহেলন করিয়া নিশীথে একাকিনী বনভ্রমণ করিতেন।" যখন কপালকুণ্ডলার কবরীবন্ধনচ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণবেশীর লিপি ভূমিতলে পতিত হয়, নবকুমার তাহা দেখিয়াছিলেন। দেখিয়া, কপালকুণ্ডলার আচরণের সঙ্গে মিলাইয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, কপালকুণ্ডলা ব্যভিচারিণী হইয়াছে। অদূরদর্শী, সুসামাজিক নবকুমার কপালকুণ্ডলাচরিত্রের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যাঁহারা বলেন, স্ত্রীপুরুষের প্রেম সাম্যাত্মক নহে, তাঁহারা এ কথাটি মনে রাখিলে ভাল হয়।

যাহা বলিয়াছি, উদাহরণ দিয়া তাহা বুঝাইব। শ্যামাসুন্দরীর জন্য কপালকুণ্ডলা ঔষধের অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। "তখন রাত্রি প্রহরাতীত হইয়াছিল। নিশা সজ্যোৎস্না। নবকুমার বহিঃকক্ষায় বসিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলা যে বাহির হইয়া যাইতেছেন, তাহা গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন। তিনিও গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া মৃণ্ময়ীর হাত ধরিলেন। কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি ?"

নবকুমার কহিলেন "কোথা যাইতেছ ?"

নবকুমারের স্বরে তিরস্কারের সূচনা মাত্র ছিল না।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ চাহে, আমি ঔষধের সন্ধানে যাইতেছি।"

নবকুমার পূর্ব্ববৎ কোমলস্বরে কহিলেন, "ভাল; কালি ত একবার গিয়াছিলে ? আজি আবার কেন ?"

ক। "কালি খুঁজিয়া পাই নাই; আজি আবার খুঁজিব।" নবকুমার অতি মৃদুভাবে কহিলেন, "ভাল, দিনে খুঁজিলে ত হয় ?" নবকুমারের স্বর স্নেহপূর্ণ।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দিবসে ঔষধ ফলে না।"

ন। কাজই কি তোমার ঔষধ তল্লাসে ? আমাকে গাছের নাম বলিয়া দাও। আমি ঔষধি তুলিয়া আনিয়া দিব।

ক। আমি গাছ দেখিলে চিনিতে পারি, কিন্তু নাম জানি না। আর তুমি তুলিলে ফলিবে না। স্ত্রীলোকে এলো-

চুলে তুলিতে হয়। তুমি পরের উপকারের বিঘ্ন করিও না।

কপালকুণ্ডলা এই কথা অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন। নবকুমার আর আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, "চল আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

কপালকুণ্ডলা গর্ব্বিতবচনে কহিলেন, 'আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।'"

সমাজে আসিয়া বনবাসিনী কপালকুণ্ডলা সুখিনী হন নাই। তিনি ত বলিয়াছিলেন "বোধ করি সেই সমুদ্রতীরে বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" বিবাহিত জীবন সুখের জীবন হইতে পারে সামাজিকের পক্ষে;—কপালকুণ্ডলার ন্যায় বনবাসিনী সমাজবিরহিণী সে সুখভাগিনী নহে। কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিয়া নবকুমার যে সুখভোগ করিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলা স্বয়ং সে সুখের কপর্দ্দকভাগিনীও নহে। তাঁহার সুখ বনভ্রমণে, আর তাঁহার সুখ পরোপকারে। যে মাধবী স্নিগ্ধচন্দ্ররশ্মিময়ী যামিনীতে শ্যামাসুন্দরীর ঔষধানয়নার্থ তিনি বনমধ্যে গমন করিলেন, তখন ত তিনি গৃহস্থ কামিনী! কিন্তু বনভ্রমণের সুখ তিনি ছাড়িতে পারেন না। স্বামী রাগ করিলেন, তাহাতে কি এসে গেল? অনায়াসে কপালকুণ্ডলা স্বভাবসিদ্ধ চরিত্রের তেজস্বিতায় প্রফুল্লমনে বনভ্রমণে চলিলেন, প্রকৃতির মধুরিমাময় দৃশ্য দেখিয়া অনন্তচিন্তায় মগ্না হইলেন। অবাল্যের সেই সকল ক্রীড়াস্থল, বিমল রঙ্গস্থল তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ জাগিতে লাগিল। তখন কপালকুণ্ডলা আপনার বর্ত্তমান দশা ভুলিয়া বনবাসিনী সঙ্কোচশূন্যা—সেই কপালকুণ্ডলাই সাজিলেন। আবার যখন পদ্মাবতী আপনার নারকী অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কপালকুণ্ডলাকে বলিয়াছিল "তোমার প্রাণদান দিতেছি। তুমিও আমার জন্য কিছু কর।" তখন ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া অমানুষী কপালকুণ্ডলা পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলী দিল। পদ্মাবতীর জন্য নিজ স্বামী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে স্বীকৃত হইয়া বলিল, "তুমি যে আমার উপকার করিয়াছ কি না তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন, সম্পত্তি, দাসদাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালিহইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সম্বাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।" বিবাহে কপালকুণ্ডলা সুখী হয় নাই বলিয়াছি। তাহা একরূপ দেখাইয়াছি। আর একটি উদাহরণ দিতেছি। কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ জন্মিলে পাছে তাঁহার হৃদয় চিরানিবার্য্য বৃশ্চিকদংশনবৎ হয় এই আশঙ্কায় প্রেমময় নবকুমার একদিনের তরেও সন্দেহকে মনোমধ্যে স্থান দেন নাই। কিন্তু সন্দেহ কেন, যেদিন তাঁহার প্রতীতি

জন্মিয়াছিল। সেদিনও নবকুমার স্থির করিয়াছিলেন "তিনি কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না। কপালকুণ্ডলার দিগ্ধাসঘাতন প্রত্যক্ষীভূত করিবেন, তার পর এ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। কপাল-কুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না, আপনার প্রাণসংহার করিবেন। না করিয়া কি করিবেন? এ জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহিতে তাঁহার শক্তি হইবে না।" নবকুমারের প্রেম বড় গভীর সত্য কিন্তু তাহার প্রতি-দান হয় নাই। পদ্মাবতীর জন্য স্বামি-ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া কপাল-কুণ্ডলা যখন ভাবিয়াছিলেন তখন পৃথি-বীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিয়াছিলেন, —কোথাও কাহাকে তিনি দেখিতে পান নাই। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়াছিলেন তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পান নাই।

আমরা বিশদভাবে মিরন্দা ও কপাল-কুণ্ডলাচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছি। তুল-নার সমালোচন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। দুইটি সমাজবিরহিত চিত্র দুই বিভিন্নদেশীয় কবির লেখনীতে কেমন দাঁড়াইয়াছে, আমরা তাহাই দেখাইতে চাই।

যে নিয়মে জড়জগৎ শাসিত হইতেছে, অন্তর্জগতের নিয়মও তাহাই।—ভেদ কেবল প্রকারে, বিষয়ে নহে। যে নিয়মে সামাজিক জীবের গঠন, কবির চিত্রও সেই নিয়মের ফল। মানবচরিত্র দেশ ও কালের ফল, কবির চিত্রিত মানবচরিত্রও তাই। মিরন্দা ও কপালকুণ্ডলাচরিত্রও ঐ নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফল। মিরন্দা-চরিত্র এবং কপালকুণ্ডলাচরিত্রবিশ্লেষণ করিবার সময় আমরা ইহা একরূপ দেখাইয়াছি, এক্ষণে আরো স্পষ্টীকৃত করিতেছি। মিরন্দাচরিত্রে সমাজের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয় নাই; কপালকুণ্ডলাতেও তাহা হয় নাই কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী দৃশ্যসমূহ এবং প্রতিপালকগণের চরিত্রচ্ছায়া উভয়-চরিত্রেই পড়িয়াছে। মিরন্দা ও কপাল-কুণ্ডলা উভয়েরই দর্শনীয় পদার্থ অনন্ত নীলসমুদ্র—সুতরাং উভয়েই উন্নতচরিত্রা; এ সম্বন্ধে উভয়চরিত্রের সামঞ্জস্য আছে। দুই কবিই এ তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন। অন্তর্জ্জাগতিক আদর্শ মিরন্দার পিতা। আর কপালকুণ্ডলার? করুণাময়ী কালিকা। কাপালিক ও অধিকারী এ উভয়ের কেহই তাঁহার আদর্শ নহেন। তবে তাঁহার অমানুষী চরিত্রবিনয়নে উভয়ে-রই কিছু হাত আছে। এ সম্বন্ধে কাপালিকের ধর্ম্মান্ধতার কিয়দংশ মাত্র কপালকুণ্ডলার অভ্যস্ত হইয়াছিল—তা-হার ভীষণ কার্য্যকলাপের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। বরং সাধ্যমত, তাহার বিঘ্ন ঘটাইতেন। অধি-কারী কপালকুণ্ডলাকে যাহা শিখাইতেন তাহা মনুষ্যত্বপূর্ণ। কালিকায় অনন্ত দয়া, পবিত্রভাব তিনিই বালিকার হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। মিরন্দা পিতার কোমল হৃদয় পাইয়াছিলেন। উভয়চরিত্রের যে মানবত্বযুক্ত সারল্য,

মানবসমাজের জ্ঞানাভাব, তাহা সমাজবিরহিতার দৃপ্তফল।

মিরন্দার চিত্র যতদূর চিত্রিত হইয়াছে তাহাই পূর্ণ। বিবাহের পর দেশে গিয়া মিরন্দা কেমন “ঘরকন্না” করিয়াছিল, তাহা জানিতে আমাদের সাধ হয় না—কেন না মিরন্দার পূর্ণ চিত্র আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। যেখানে বিবাহবাসরে, মিরন্দার চিত্র পূর্ণ হইয়াছে, কপালকুণ্ডলার চিত্র সেইস্থান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে উভয় কবিরই কৌশল প্রমাণ করে। পিতা যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা সেই বিজন দ্বীপে, রাজকুমারের সমক্ষে যেমন পরিস্ফুট হওয়ার কথা, অন্যত্র তেমন নহে। আর কপালকুণ্ডলার অনবনমনীয় অথচ কমনীয় চরিত্রের প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র মনুষ্যসমাজ!—নহিলে তাহার গৌরব বুঝা যাইত না। আমরা প্রথমে দেখিয়াই মিরন্দাকে বেশ চিনিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে চিনিতে আমাদের দিন লাগিয়াছিল। উভয়েরই দয়ায়, উভয়েরই পবিত্র উন্নতভাবে মোহিত হইয়াছিলাম। উভয়েরই সারল্যের ছবি অনুদিন সংসারের আদর্শ রহিবে!

আর একটি কথা বলিলেই আমাদের এই সমালোচনা শেষ হয়। মিরন্দা যে ফার্দ্দিনান্দকে নয়নগোচর করিয়াই তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, ইহা অনেকেরই মতে উচ্চনীতির বিরুদ্ধ। বাস্তবিকও একেবারেই, গুণাগুণ বিচার না করিয়া কাহাতেও আসক্ত হওয়াতে পশুভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু মিরন্দার প্রেম সে প্রকৃতির নহে। যাঁহারা তাহার নিন্দাবাদ করেন তাঁহারা না বুঝিয়াই তাহা করেন। সেক্সপীয়র ভীষণ বাত্যার সৃষ্টি করিয়া প্রথমতঃ ফার্দ্দিনান্দের প্রতি মিরন্দার সহানুভূতি করিয়া দিলেন। তাহার উপর কমনীয়, দেবদুর্ল্লভ রূপের জ্যোতি! প্রেমসঞ্চারের এমন অনুকূল অবস্থা আর কি হইতে পারে? সেই বিজন দ্বীপে, সেই ঘটনাস্রোতে, সেইরূপ বহ্নিতে অবোধ মিরন্দাপতঙ্গ যে পড়িবে, তাহাতে কি সংশয় হয়?

বিজনবনদেশে, ভীষণ সুনীল সমুদ্রতটে, প্রদোষকালে নবকুমারও ঠিক এই অবস্থাসম্পন্ন! তাঁহার প্রণয়ের পরিণাম যাহাই হউক, তাঁহার অতলস্পর্শী গাম্ভীর্য্যের মূল সেই সময় হইতে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। আমরা স্থান, কাল, পাত্রের কার্য্যকারিতা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে অনেক তত্ত্ব সহসা বুঝিতে পারি!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।



মৎস্যদেশ।

এক্ষণে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে মৎস্যদেশ কোথায়? তাহা হইলে ইহার প্রকৃত উত্তরপ্রদানে সক্ষম এরূপ পণ্ডিত অতি অল্প। যদি মৎস্যদেশের অর্থ 'মৎস্যভোজীর দেশ' এইরূপ করা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশকে প্রাচীন মৎস্যদেশ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়।

কেহ বলেন, প্রাচীন মৎস্যদেশ মেদিনীপুর জেলার সমীপবর্ত্তী ছিল, কেহ বলেন ইহা মালদহের নিকট অবস্থিত ছিল; এই উভয় পক্ষই আপন আপন পক্ষসমর্থন করিবার জন্য নানাবিধ ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গাদি প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করেন। বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় "ভারতবর্ষের বিবরণ" নামক পুস্তকে বর্ত্তমান জয়পুরকে প্রাচীন মৎস্যদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আবার সে দিবস গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকৃত ভারতবর্ষের মানচিত্রে দেখিলাম; আধুনিক "বেরারকে" মৎস্যদেশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে;

ভারতবর্ষের বিভাগস্থলে মনু বলিয়াছেন—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যো র্যদন্তরম্
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকা
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশোবৈ ব্রহ্মবর্ত্তাদনন্তরম্॥"

পবিত্রজলা সরস্বতী এবং দৃষদ্বতীর মধ্যস্থিত দেবভূমিবৎ পবিত্র দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই ব্রহ্মাবর্ত্তের পরেই ব্রহ্মর্ষি দেশ, যাহার অন্তর্গত চারটি মাত্র প্রদেশ ছিল—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল, শূরসেন, এবং মৎস্য।

দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যাবসরে কুল্লুক ভট্ট বলেন "মৎস্যাদি শব্দা বহুবচনান্তা দেশবিশেষবাচকাঃ পাঞ্চালাঃ কান্যকুব্জদেশাঃ শূরসেনকাঃ মথুরাদেশাঃ" "মৎস্যাদিশব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হইলে দেশবিশেষের বাচক হয় পাঞ্চাল শব্দে কান্যকুব্জ দেশ, শূরসেন শব্দ মথুরা দেশের নামান্তর।" ইহাতে বোধ হইতেছে যে কুল্লুকভট্টের সময়েও যে ভারতীয় অনেক দেশের প্রাচীন নাম লুপ্ত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তা না হলে তিনি অবশ্য মৎস্যদেশের একটি আধুনিক নাম নির্দ্দেশ করিতেন। কেবল পাঞ্চাল ও শূরসেন এই দুই দেশের আধুনিক নাম দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। বিক্রমাদিত্যের সময়ও বোধ হয় মৎস্য, পাঞ্চাল, ইত্যাদির পুরাণ নাম লোপ পাইয়াছিল, নতুবা কালিদাস অবশ্য ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে ঐ সকল দেশের রাজাদিগকে উপস্থিত করিতেন। মেঘের রাস্তার মধ্যেও মৎস্য বা পাঞ্চালের উল্লেখ করেন নাই। সে যাহা হৌক উপরি উক্ত মনুর বচন দ্বারা ইহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে

মৎস্যদেশ কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী ছিল।

সভাপর্ব্বের দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়ে দেখা যায় যে, "মহাবীর ভীমসেন অল্পদিনের মধ্যে অনেক দেশ জয় করিয়া দশার্ণদেশে উপস্থিত হইলেন। তথাকার রাজা সুধর্ম্মা ভীমসেনের সহিত মহা যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু ভীম তাঁহাকে পরাজয় করিয়া পরিশেষে মৎস্য এবং মলদদিগকে জয় করিলেন। (ক)

উপরি উক্ত বাক্যদ্বারা অনুভব হয় যে মৎস্যদেশ দশার্ণ এবং মালদদেশের মধ্যবর্ত্তী বা সমীপবর্ত্তী ছিল। কিন্তু দশার্ণ এবং মালদদেশ কোথায় ছিল?

ভারতবর্ষের ভূচিত্রে দেখা যায় অনেক স্থল মাল বা মালয়া নামে বিখ্যাত। কোলাচল মল্লিনাথ মেঘদূতের ২৪ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন "মাল" শব্দে 'উচ্চভূমি' (table land) বুঝায়। "মাল" শব্দের অর্থ 'উচ্চভূমি' হইতে পারে, এবং মেঘদূতের শ্লোকে হয় ত এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু সংস্কৃত "মালদ" শব্দটীর প্রাকৃত ব্যাকরণানুসারে 'মালয়' এবং ক্রমে ভাষায় 'মালয়া' বা মাল হওয়াও বিচিত্র নয়। উইলফোর্ড সাহেব মেদিনীপুরের সমীপবর্ত্তী মাল ভূমকে 'মাল' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্লিনির মতে পঞ্জাবদেশীয় 'মালী' জাতীয় মনুষ্যদিগের বাসস্থানের নাম 'মাল'। এই মালী জাতীয় মনুষ্যেরা সেকেন্দর সা বা এলেক্জাণ্ডরের সহিত তুমুল যুদ্ধের অনুষ্ঠান করে। এতদতিরিক্ত বাঙ্গালাদেশে মালদহ 'মালদা' জিলা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

মেঘদূতের ১৫ শ্লোকে 'মাল' নামক স্থানের উল্লেখ আছে। উহার ব্যাখ্যাস্থলে উইলসন সাহেব বলেন যে, "মেঘের রাস্তা যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে বোধ হইতেছে যে এই মালদেশ ছত্রিশগড়ের উত্তর বিভাগের প্রধান নগর রতনপুরের সমীপবর্ত্তী কোন স্থান হইবে। কাপ্তেন বুণ্টও আপনার ভ্রমণবৃত্তান্তে এইরূপ লিখিয়াছেন; এবং অদ্যাপি রতনপুরের উত্তরে 'মালদ' নামক স্থান লক্ষিত হয়। টলোমীর ভূচিত্রে বিন্ধ্যাচলের নিকট 'মালিতা' নামক স্থান দৃষ্ট হয়, এবং উহার সহিত শ্লোকোক্ত 'মাল' নামক স্থানের ঐক্য আছে।"

অতএব মালদদেশ কোথা ছিল ইহা যদি স্থির হইল বোধ করা হয় তাহা হইলে দশার্ণদেশ সেই স্থানের সমীবর্ত্তী ছিল কি না দেখা আবশ্যক।

(ক) "বিজিত্যাল্পেন কালেন দশার্ণানজয়ৎ প্রভুঃ।
তত্র দশার্ণকো রাজা সুধর্ম্মা লোমহর্ষণং।
কৃতবান্ ভীমসেনেন মহদ্যুদ্ধং নিরায়ুধম্।
যুধ্যমানং বলাৎসঙ্খ্যে বিজিগ্যে পাণ্ডবর্ষভঃ।
ততো মৎস্যান্ মহাতেজা মালদাংশ্চমহাবলঃ ॥

উইলসন সাহেব মেঘদূতের ২৪ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে "দশার্ণদেশ কোথায় ছিল, এক্ষণে তাহার কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। মেজর উইলফোর্ড সাহেব পৌরাণিক নামের তালিকায় ইহাকে বিন্ধ্যাচলের সমীপবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার মতানুসারে টলোমীর দশারিন (Dasarine) দশার্ণ দেশ, যে আধুনিক ছত্রিশগড়ের কোন অংশ ছিল, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে, কারণ 'ছত্রিশগড়' এবং 'দশার্ণ' এই উভয় শব্দের প্রকৃতিগত অঙ্গাঙ্গিভাব লক্ষিত হয়; ছত্রিশগড় শব্দের যৌগিক অর্থ যাহাতে ছত্রিশটি দুর্গ আছে, ওদিকে দশ এবং ঋণ (দুর্গ এই দুইটী শব্দের অর্থ দশ দুর্গযুক্ত দেশ বুঝায় অতএব উহা ছত্রিশ দুর্গযুক্ত দেশের অন্তর্গত হইবার সম্ভাবনা।"

দশার্ণদেশ যদি ছত্রিশগড়ের অন্তর্গত হয় তাহা হইলে উইলসন সাহেবের পূর্ব্বোল্লিখিত কথামত দশার্ণদেশ রতনপুরের নিকট ছিল। আর দেখা যাইতেছে যে সেই স্থানেই মালদদেশও ছিল অতএব মৎস্যদেশও সেই স্থানের সমীপবর্ত্তী থাকা সম্ভব।

মহাভারতের বিরাটপর্ব্বে, পাণ্ডবেরা যখন কাম্যকবন হইতে বিরাটনগরে প্রবেশ করেন তাঁহাদের পথ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"উত্তরেণ দশার্ণাংস্তে পাঞ্চালান্ দক্ষিণেন চ
অন্তরেণ যকৃল্লোমান্ শূরসেনাংশ্চ পাণ্ডবাঃ
লুব্ধা ব্রুবাণা মৎস্যস্য বিষয়ং প্রাবিশন্ বনাৎ।

পাণ্ডবেরা দাশার্ণদেশের উত্তর দিয়া পাঞ্চাল দেশের দক্ষিণ দিয়া যকৃল্লোম এবং শূরসেনের মধ্য দিয়া আপনাদিগকে ব্যাধরূপে প্রসিদ্ধি করত মৎস্যদেশে প্রবেশ করিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে মৎস্যদেশ শূরসেন অর্থাৎ মথুরা দেশের পশ্চিমে ছিল।

মৎস্যদেশের আর একটি নাম বিরাট দেশ। এই বিরাট শব্দ প্রাকৃত ভাষায় "বিরাড়" এবং উহা হইতে দেশী ভাষায় 'বিরার' বা 'বেরার' হইয়া থাকিবে।

যখন কুরুগণ বিরাটরাজার গোহরণ করিবার অভিপ্রায়ে বিরাটনগর আক্রমণ করেন তখন এইরূপ বর্ণন করা হইয়াছে যে মৎস্যদেশ হস্তিনাপুরের আগ্নেয় কোণে অবস্থিত ছিল এবং হস্তিনাপুর হইতে সেখানে গমন করিতে দুইদিনের অধিক সময় লাগিত না। যথা

"তে স্ম গত্বা যথোদ্দিষ্টাং দিশং বহ্নের্মহীপতে।
সন্নদ্ধা রথিনঃ সর্ব্বে সপদাতা বলোৎকটাঃ
প্রতিবৈরং চিকীর্ষন্তো গোষু-গৃদ্ধা মহাবলাঃ
অপরে দিবসে সর্ব্বে রাজন্ সম্ভুয় কৌরবাঃ।
অষ্টম্যাং তেন্যগৃহ্ণন্ত গোকুলানি সহস্রশঃ।"

অদ্যাপি মিরাট জিলায় হাথনাপুর নামক স্থান বর্ত্তমান আছে ইহাই পূর্ব্বকালের হস্তিনাপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ। যদি

বাস্তবিক উহা হস্তিনাপুর হয় তা হলে অনায়াসে আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে মৎস্যদেশ দিল্লী এবং মথুরার মধ্যবর্ত্তী ছিল।

দিল্লী এবং আগরা রোডের ধারে গুর্গাঁর নিকট 'উপেলো' নামক একটি স্থান দৃষ্ট হয়। ইদানীং ভাষাতত্ত্ব বিদ্যার যেরূপ প্রাদুর্ভাব তাহাতে 'উপেলো' কথাটি যে সংস্কৃত 'উপপ্লবের' অপভ্রংশ ইহা নির্ব্বিরোধে স্বীকার্য্য। ভাল 'উপেলো' 'উপপ্লবের' অপভ্রংশ হৌক তাহাতে প্রকৃত বিষয়ের উপযোগিতা কি? ইহার উত্তরে আমরা বলিব উদ্যোগপর্ব্বে দৃষ্ট হয়—

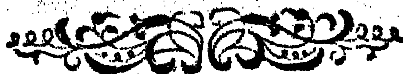
"উপপ্লবং সমাগত্য স্কন্ধাবারং প্রবিশ্যচ।
পাণ্ডবানথতান্ সর্ব্বান্ শল্যস্তত্র দদর্শ হ॥"

শল্য উপপ্লবনগরে গমন করিয়া স্কন্ধাবারের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সমুদয় পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিলেন। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন "উপপ্লবং বিরাটনগরস্থ প্রদেশবিশেষং" উপপ্লব বিরাটনগরের অংশবিশেষ। উপেলো যে প্রাচীন উপপ্লব ইহা তত্রত্য পণ্ডিতেরা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন।

এক্ষণে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন মহাভারতের অনেক স্থলে মৎস্যদেশ দশার্ণদেশের সমীপবর্ত্তী বলিয়া কথিত হইয়াছে। যদি ছত্রিশগড়ের কোন অংশ দশার্ণ হয় এবং মৎস্যদেশ মথুরার নিকট হয় তা হলে মহাভারতের সঙ্গতি কিরূপ? আমরা বলিব দশার্ণ কোথায় ইহা স্থির করিতে আমরা আপাততঃ কোন প্রমাণ হস্তগত করিতে পারি নাই সুতরাং উইলসন সাহেবকে নিরস্ত করিতে অক্ষম। তবে এ কথা অবশ্য বলিতে পারি যে যদি দশার্ণ শব্দের মৌলিক অর্থ দশগড় বলিয়া ইহাকে ছত্রিশগড়ের অংশবিশেষ বলা হয় তা হলে ঐ এক যুক্তিতে পঞ্চাননকে দশাননের অংশবিশেষ বলা যাইতে পারে!

যাহা হোক কালিদাসের দশার্ণ ছত্রিশ গড়ের নিকট হইলেও মহাভারতের দশার্ণ যে হিন্দুস্থানে মথুরার সমীপে ছিল সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অদ্যাপি হামিরপুর জিলায় দশার্ণা নামে একটি নদী দৃষ্ট হয়। মূলকথা প্রাচীনদেশ আমাদের বাঙ্গালা নহে। বিন্ধ্যাচলের উত্তরে যেস্থানে মৎস্যদেশ ছিল তাহা নিশ্চয় না হউক, কতকাংশে উল্লিখিত প্রমাণাদির দ্বারা অনুভব হইতে পারে।

জ, কে, ভ,



শঙ্করাচার্য্যের তিরস্কার।

এবার আপনার ছাপাখানার ভূতেদের উপর নালিশ। আমি গতসংখ্যক বঙ্গদর্শনে আমার নালিশে লিখিয়াছিলাম "তোমরা মুচিকে ঋষি বল দাসকে দেব বল, কেন না তবে আমায় বড়মানুষ বল।" আপনার ভূতেরা নিঃসঙ্কোচচিত্তে সেই ঋষি কাটিয়াছে। এক্ষণে বাঙ্গালায় প্রায়শ্চিত্ত উঠিয়া গিয়াছে, আর বড় পাপের ভয় নাই, যাহা কিছু ভয় কেবল পেনেলকোডের। কাজেই এ যাত্রা ঋষি কাটিয়া তাহারা পরিত্রাণ পাইল।

যদি তাহারা আমার ভ্রম হইয়াছে বুঝিয়া এই কাটাকাটি করিয়া থাকে, তবে তাহারা আমার সঙ্গে পূর্ব্ববাঙ্গালায় চলুক—স্থানে স্থানে দেখিবে, কত মহাপুরুষ শকুনী, গৃধিনী, কুক্কুরী প্রভৃতির সহিত মরাগরু লইয়া টানাটানি করিতেছে। জিজ্ঞাসা কর তাহাদের উপাধি কি, তাহারা অম্লানবদনে বলিবে "আমরা ঋষি।" তাহারা নিশ্চয়ই বাঙ্গালার ঋষি।

আবার পশ্চিম বাঙ্গালায় চলুক—দেখিবে, জেলেরা জাল হাতে মৎস্য শিকার করিতেছে, তাহাদের উপাধি জিজ্ঞাসা কর, তাহারা অম্লানবদনে বলিবে "আমরা পণ্ডিত।" বাঙ্গালার এইরূপ পণ্ডিত বটে তাহার আর সন্দেহ নাই।

যাহারা তোমাদের ভিটায় ঘুঘু চরায় তাহাদিগকে তোমরা মহাজন বল, তোমাদের যেমন ঋষি, যেমন পণ্ডিত, তেমন মহাজন। জিজ্ঞাসা করি কথার এরূপ বিপরীত অর্থ তোমাদের বাঙ্গালায় কোথা হইতে হইয়াছে?

কলিকাতায় গিয়া জিজ্ঞাসা কর এ কাহার বাটী, লোকে মুক্তকণ্ঠে উত্তর দিবে "দাসবাবুদের।" অথবা বলিবে "হলা দাসের পুত্র বলাই দেবের বাটী।" দাসের ঘরে দেব! অসম্ভব নহে; এক্ষণে অনেক দেব স্বর্গ ছাড়িয়া আসিতেছেন সেখানে আর স্থান হয় না। যে অবধি রেলওয়েদ্বারা প্রত্যেক তীর্থস্থান আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে, সেই অবধি স্বর্গে বড় ভীড় হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন স্বর্গ প্রস্তুত হয়, রেলওয়েরসঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম যে বাড়িবে এ অনুভব তখন হয় নাই; কাজে কাজেই স্বর্গের আয়তন উচিত মত করা হয় নাই, এখন কয়েকবৎসরের মধ্যে বিস্তর লোক স্বর্গে গিয়া পড়িয়াছে, তথায় সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, দুর্ভিক্ষ হইবার নিশ্চয় সম্ভাবনা হইয়াছে। এই শুনিয়া স্বয়ং নারায়ণ গিয়া বন্দোবস্তের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু করিতে পারেন নাই। রেলওয়ে বন্ধ না করিলে ত ধর্ম্মবন্ধ হয় না, রেলওয়ে আবার খ্রীষ্টানদের হাতে। নারায়ণ নিজে চক্রী, অনায়াসে খ্রীষ্টানেদের চক্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা

আপনাদের স্বর্গ নির্জ্জন রাখিতে চান, আর হিন্দুর স্বর্গে লোক ঠাসিতে চান। অতএব নারায়ণ তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া স্বর্গ বাড়াইতে হুকুম দিয়াছিলেন; কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা কি করিবেন, বজেটে টাকা নাই, তাতে আবার কয় ক্রোর টাকা গরমিল হইয়াছে, বিশেষতঃ কুবের ইস্তফা করেছে, কাজেই স্বর্গ আর বাড়ান হইল না; এদিকে খ্রীষ্টানেরা নিতান্ত ঈর্ষা।পরবর্শ হইয়া রেলওয়ে বাড়াইতে লাগিল, এক্ষণে স্বর্গে আর স্থান হয় না, কাজেই দেবতারা পলাইয়া যথা তথা জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন। দাসের ঘরে দেব, মুচির ঘরে ঋষি আসিয়া জন্মিতে লাগিল।

যাহা বলা হইল এইরূপ ঘটনা যদি বাস্তবিক না হয়, তবে তোমাদের দাসের ঘরে দেব আসিল কিরূপে,বুঝা যায় না। দাসেরা দেব, মুচিরা ঋষি, বাঙ্গালার এই প্রধান পরিচয়। ইহা শুনিলে তোমাদের সমাজসম্বন্ধে আর কোন কথাই জিজ্ঞাস্য থাকে না।

দেনাদারবাহাদুরেরা তোমাদের রাজা-বাহাদুর। মহাদেনাদার হইলে মহারাজ। যে বুদ্ধিতে মুচিকে ঋষি বল, দাসকে দেব বল, এখানেও দেখি সেই বুদ্ধি। রাজা শব্দ তোমরা কেন লইয়া এত উপহাস কর? বাস্তবিক কি তোমরা কেবল রহস্য করিবার নিমিত্ত এই সকল কথার কুপ্রয়োগ করিয়া থাক? তোমাদের মধ্যে কেহ ঋষি নাই, তাই কি মুচিকে ঋষি বল, তোমাদের দেবতা নাই, তাই কি দাসকে দেব বল? অথবা মুচিরাই তোমাদের চক্ষে হয় ত বাস্তবিক ঋষি, দাসেরা তোমাদের চক্ষে হয় ত বাস্তবিক দেব, তাহাই এ সকল ভ্রমাত্মক কথা প্রয়োগ করিয়া থাক, যদি তাহা না হয়, তবে পরামর্শ গ্রহণ কর; "রাজা" কথায় আপনা আপনি ঘৃণা জন্মাইও না, শেষ ঠকিতে হইবে। তোমাদের যেরূপ সামাজিক অবস্থা, তাহাতে বহুকাল অবধি রাজা আবশ্যক হইবে, অতএব এখনি রাজভক্তি ছাড়িও না। এই সকল ব্যক্তিকে রাজা বলিলে শীঘ্রই রাজা শব্দে ঘৃণা জন্মিয়া যাইবে। যাত্রাওয়ালা রাজা সাজিয়া যখন "বাৎ কহ দ্বারি" বলিয়া লোক হাসাইত, তখন সকলেই বুঝিত, যাত্রাওয়ালা কখন রাজা দেখে নাই। কিন্তু এক্ষণে দেনাদারবাহাদুরেরা রাজাস্বরূপ সর্ব্বত্র দেখা দিতেছেন। কাজেই লোকের রাজভক্তি ক্রমে কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। সামান্য লোকেরা কে বুঝিবে যে এ রাজা সে রাজা নয়; তাহারা বলিবে "রাজা নাম দিয়াছ আবার রাজা নয় কেন?" সতরঞ্চির রাজা, যাত্রাওয়ালার রাজা, তবে বল এ আবার কোন্ রাজা?

কেহ বলেন ইহারা দুর্ভিক্ষের রাজা, কেহ বলেন, চাঁদার রাজা, কেহ বলেন, "ভ্যাক্সান" রাজা। কেহ বলেন, লিবরপুলি রাজা। কেহ বলেন, রাজা রা-

জড়া। কেহ বলেন, বিলাতি জিনিসের মধ্যে এরাও এক জিনিস, অতএব ইহারা রাজার বিলাতি। যাহা হউক, এখনও সময় আছে। রাজা শব্দ এখনও উদ্ধার করা যায়, অতএব উদ্ধার কর। প্রয়োজন হয় ইংরেজেরা দুর্ভিক্ষবাহাদুরদিগকে লর্ড করুন। বিদ্যাসম্বন্ধে ইংরেজি উপাধি ত চলিয়াছে, বি, এ, এম, এ, এখন সকলে বুঝিয়াছে, লর্ড হলধর, লর্ড বলাইচাঁদ বলিলে সকলেই বুঝিবে, হলা, বলাও খুসী হইবে, বরং থ্যাঙ্ক (thank) দিবে।

এক সময় আমি দেখিয়াছিলাম, তোমাদের বাঙ্গালায় রাজার প্রয়োজন ছিল না। প্রত্যেক বাঙ্গালির স্বভাব এত সুন্দর ছিল যে মেজেষ্ট্রেটের কোন কার্য্য ছিল না। চুরি, ডাকাতি ছিল না, কেহ মিথ্যা বলিত না, কেহ বঞ্চনা করিত না। যদি হঠাৎ কেহ অপরাধী হইত, সে তৎক্ষণাৎ আপনার দণ্ড আপনি বিধান করিত, আইনব্যবসায়ীকে তৈলবাট দিয়া জিজ্ঞাসা করিত, আমার অপরাধের দণ্ড কি? ভট্টাচার্য্য শাস্ত্র খুলিয়া ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেন। তাহার নাম প্রায়শ্চিত্ত। সেই ব্যবস্থা অনুসারে যে কয়টাকা জরিমানা হইত, অপরাধী তাহা অতি প্রসন্নমনে সমাজে সমর্পণ করিত, সকল ঘরে ঘরে তাহা বাটিয়া দিয়া আসিত। তোমাদের যে এইরূপ ব্যবহার ছিল, এখনও বরং তাহার কিঞ্চিৎ চিহ্ন আছে। প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড যে কেবল কয়েক কাহন কড়ি ছিল এমত নহে, তুষানল পর্য্যন্ত ছিল, তুষানল অতি ভয়ানক ব্যাপার; ইহাও বাঙ্গালিরা স্বইচ্ছায় গ্রহণ করিত। এরূপ আত্মদণ্ড আর কোন্ জাতিতে বিধান করিতে পারে? তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ তাহা পারিত।

অপরাধী হইলে যাহারা আত্মদণ্ড করিতে পারিত, যাহারা তুষানল পর্য্যন্ত স্বীকার করিত, তাহাদের আর রাজার প্রয়োজন কি ছিল? যদি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সচ্চরিত্র হয়, অন্যের অনিষ্ট কোনরূপে না করে, তবে রাজার কেন আবশ্যক? তোমরা ভাবিতেছ আমি অসম্ভব কথা বলিতেছি? ইংরেজদিগের নিকট তোমরা এ কথা কখন শুন নাই তাহাই অসম্ভব ভাবিতেছ। ভাল, Social Statics পড়, বা সেই জাতীয় অন্য গ্রন্থ পড়, দেখিবে স্পষ্ট লেখা আছে যে সমাজ উন্নত হইলে আর গবর্ণমেণ্টের (Government) প্রয়োজন নাই। যদি অন্য দেশসম্বন্ধে ইহা সত্য হয় তবে বাঙ্গালার পক্ষে তাহা সত্য কেন না হইবে? সমাজঅনুসারে রাজশাসন; পৈশাচিকবৎ সমাজ হইলে কঠিন রাজশাসনের আবশ্যক, আর যদি দেবতুল্য সমাজ হয় তবে রাজশাসনের প্রয়োজন কি? দেবতুল্য সমাজ হইলে ত হইতে পারে, ব্যক্তি লইয়া সমাজ, অতএব ব্যক্তিরা যেরূপ, সমাজও ঠিক সেইরূপ হইবে। ব্যক্তিদের যে দোষ থাকিবে সমাজে তাও

ঠিক সেই দোষ থাকিবে। ব্যক্তিদের যে গুণ থাকিবে, সমাজেরও সেই গুণ ঘটিবে। ইংরেজদের মধ্যে একজন মহাবিজ্ঞব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, "The character of the aggregate is determined by the characters of the units." তিনি আর একস্থানে লিখিয়াছেন "given the nature of the units, and the nature of the aggregate they form is predetermined." কাজেই তোমরা নিজে দেবতার ন্যায় হইলে তোমাদের সমাজও দেবতুল্য হইবে। এক সময় বাঙ্গালায় তাহাই হইয়াছিল।

বিনা মসলায় ইষ্টকদ্বারা প্রাচীর গাঁথা যাইতে পারে, কিন্তু গোলাদ্বারা কখনই সেরূপ প্রাচীর গাঁথা যায় না, গোলার স্তূপ হইতে পারে, কিন্তু তাহাও গোলার প্রকৃতিমত হইবে, ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরের মত উর্দ্ধ অধঃ সমুদয় সমান পরিসর হইবে না। তাহাই বলিতেছিলাম, সমাজের প্রকৃতি ব্যক্তিগত। যাহারা তোমাদের লইয়া ভাল সমাজ গঠিতে চাহেন, তাঁহাদের ভুল; তোমাদের নিজের যে গুণ নাই সমাজে তাহা কোথা হইতে আসিবে? এক্ষণে চারিদিকে সাময়িকপত্রলেখকেরা সমাজসংস্কার লইয়া যে পলাবাজি করিতেছেন, তাহা অনর্থক। টেবলে বসিয়া খাইলে কিম্বা ধুতি চাদর ত্যাগ করিলে অথবা মথুরমণিকে মথুরমণি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলে সমাজসংস্কার হইবে না, আপন আপন স্বভাবের সংস্কার কর, সমাজের সংস্কার আপনিই হইবে। যতদিন তাহা না পার, ততদিন সমাজের উপর কোন কথা বলিতে সাহস করিও না। সমাজ কেহ ফরমাইস দিয়া আপনার ইচ্ছামত করিয়া লইতে পারে না, সমাজের পরিবর্ত্তন আপনিই হয়, যেরূপ ব্যক্তিগত সংস্কার হইতে থাকে, সেইরূপ সমাজেরও সংস্কার হইয়া পড়ে।

এত কোটি লোকের স্বভাবসংস্কার হঠাৎ একেবারে হয় না, হওয়াও সম্ভব নহে, যেরূপ ক্রমে ক্রমে তাহাদের চরিত্রসংস্কার হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও সেইরূপ সংস্কার আরম্ভ হইবে।

এখনও তোমরা মুচিকে ঋষি বল, দাসকে দেব বল, তোমাদের এখনও অনেক বাকি; প্রথমে মুচিকে মুচি বলিতে শিখ, জেলেকে জেলে বলিতে শিখ, দাসকে দাস বলিতে শিখ, তাহার পর অন্য কথা হইবে। অর্থাৎ যথার্থ নাম করিতে শিক্ষা কর। শিশুরা প্রথমে নাম শিখে, তোমরা এক্ষণে সমাজসম্বন্ধে শিশু, অতএব নাম শিখ। পরে যদি পার আপন আপন চরিত্র সংস্কার করিবার চেষ্টা পাও; "আমি একা পবিত্রচরিত্র হইলে কি হইবে?" মনে করিয়া হতাশ্বাস হইও না; একজনের চরিত্র ভাল হইলে সহস্র লোকের চরিত্র সহজেই উন্নত হইবে। অপালমতঃ ইতি।

শঙ্করাচার্য্য বঙ্গদেশী।

ভূতের জাতি।

ভূতের জাতি বলিলে কাহাদের বুঝায়, তাহা বাঙ্গালায় বড় বলিয়া দিতে হয় না; বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালিরা তাহা একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কাফ্রি ও অন্যান্য দেশে ভূতের জাতি সাহেবদের বলে।* মঙ্গোপার্ক আফ্রিকার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন তাঁহাকে দেখিয়া দুইজন কাফ্রি রুদ্ধশ্বাসে পলায়, প্রায় অর্দ্ধক্রোশ গিয়া আর দুই চারিজন স্বদেশীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের ভয় যায়। কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রিরা মঙ্গোপার্ক সাহেবকে যে ভূত মনে করিয়াছিল তাহা কেবল তাঁহার বর্ণের দোষে। কাফ্রিরা মনে করে মনুষ্যের কখন শ্বেতবর্ণ হইতে পারে না, শ্বেতবর্ণ ভূতের। অনেকস্থানে ভূত আর শ্বেতমনুষ্য উভয় অর্থে এক শব্দই প্রয়োগ হয়।

কেবল কাফ্রিরা কেন, দক্ষিণসমুদ্রের উপদ্বীপে যত কৃষ্ণবর্ণ জাতি বাস করে, সকলেরই বিশ্বাস মনুষ্য মরিয়া ভূত হয়, কিন্তু ভূত হইলে বর্ণ ভিন্ন আর কিছুরই পরিবর্ত্তন হয় না; মনুষ্য অবস্থায় যে আকার, যে প্রকার, যে বয়স ছিল, তাহা সকলই থাকে, কেবল বর্ণপরিবর্ত্তন হয়। সাহেবদের মধ্যে কাহাকে তাহারা দেখিলে, কাজেই মনে করে, এ ব্যক্তি পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে একজন ছিল, মরিয়া এই দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ভূত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ একজন মরিল, অমনি তাহারা নিশ্চয় বুঝিল যে, সাহেবদের মধ্যে একজন বাড়িল। সাহেবদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ইহা তাহারা অনেকে বিশ্বাস করে না। ভূত ত জন্মে না, তাহারা বলে মনুষ্য যে বয়সে মরে, প্রেতদশায় সেই বয়স প্রাপ্ত হয়। কাজেই সাহেবদের জন্ম হয় না। যদি তাহারা সাহেবদের শিশু দেখে তাহা হইলে মনে করে অবশ্য তাহাদের কাহার শিশু মরিয়াছিল। যুবাসাহেব দেখিলে সেইরূপ মনে করে যুবার ভূত।

একবার অষ্ট্রেলিয়া দেশে পুত্রশোকাকুলা একজন বৃদ্ধা (Sir George Grey) সর্ জর্জ গ্রেকে দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হয়, তাহার নিশ্চয় ধারণা হয় যে, তাহার মৃতপুত্র আসিয়াছে, অতএব সর্ জর্জকে বৃদ্ধা কতই আদর করিয়াছিল।

একবার টমসন সাহেবের মেমকে দেখিয়া অষ্ট্রেলিয়ার একাংশের আবালবৃদ্ধ সকলেই চিনিয়াছিল যে, কিছুদিন পূর্ব্বে মেমসাহেব তাহাদের মধ্যে একজন ছিল, তখন মনুষ্য ছিল, জীবিত ছিল, একণে বেচারা আর মনুষ্যও নাই, জীবিতও নাই, খাটি ভূত হইয়াছে। বাস্তবিক তাহারা মনে করিতে পারে যে শ্বেতকায়পুরুষেরা যদি ভূত না হবে, তবে

* Krumen call Europeans the Ghost-tribe—*Burton.*

তাহাদের এত ক্ষমতা, এত বৈভব কিরূপে হইল?

বন্যজাতিরা সাহেবদের কেন ভূত বলে, তাহার কারণ (Bonwick) বনউইক সাহেব এই অনুভব করেন যে, বন্যরা মৃতমনুষ্য আহারের পূর্ব্বে ছাল ছাড়াইবার সময় দেখে যে, তাহার ভিতর শাদা, অতএব শাদাই যে ভূতের বর্ণ ইহা তাহাদের নিশ্চয় বোধ হইয়া পড়ে।

আমাদের ভূতের শ্বেতবর্ণ কি কৃষ্ণবর্ণ তাহার নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু আমাদের মনুষ্য মরিলেই যে ভূত হয় ইহার নিশ্চয়তা আছে। তাহারা দৌরাত্ম্য করে, গাছ ভাঙ্গে, ছেলেপিলের ঘাড় ভাঙ্গে, তবে বন্যজাতির ভূতের ন্যায় তাহারা রীতিমত সংসার করে না, চাকুরিও করে না, বরং কিছু স্বাধীন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই যাইতে পারে। বোধ হয় কিছু অন্নাভাব, পয়সা কড়ির বড় সংস্থান থাকে না, মৎস্য তাহারা বড় ভালবাসে, অথচ তাহা সংগ্রহ করিতে পারে না; কেহ কোথায় মৎস্য লইয়া যাইতেছে দেখিলে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ "দৈনা দৈনা" বলিয়া ছুটিতে থাকে। তদ্ভিন্ন আমাদের ভূতের গঠন বড় সুন্দর নহে; ভাল ভাল লোকের মুখে শুনা যায়, তাহাদের পা দুখানি বাঁকা আর তাহাদের হাসি বড় বিকট; কিন্তু এ সকল বিষয়ে সাহেব ভূতের জিত আছে, সুগঠন আবার অর্থেরও অভাব নাই, তাহাই বন্যরা বলে যে মরিলে they will jump up white men with plenty of sixpence in their pockets (*Spencer*).

বিলাতিভূত এক্ষণে সকলদেশই ব্যাপিয়াছে, তাহাদের এক্ষণে জয়জয় কার। ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল মাত্র তাহাদের বর্ণ; কৃষ্ণবর্ণ অপকৃষ্টতার পরিচায়ক, কখনই কৃষ্ণবর্ণজাতি পৃথিবীতে প্রধান হয় নাই। যাহারা চিরকাল এ পৃথিবীতে জয়ী, তাহাদের মধ্যে কোন জাতিই কৃষ্ণবর্ণ ছিল না। মিশরদেশে যাঁহারা রাজ্যস্থাপন করিয়া কীর্ত্তিপতাকা তুলিয়া ছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন না, আফ্রিকাদেশে সকল জাতিই কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু মিশরবাসীদের বর্ণ সুন্দর ছিল। তাহাই তাঁহাদের এত প্রতিপত্তি হইয়াছিল। আর্য্যেরা সাবেক আমলের প্রধান ছিলেন, তাঁহারা সমুদয় ভারতবর্ষ ও ইউরোপ ব্যাপিয়া ছিলেন, সেই আর্য্যেরা শ্বেতবর্ণ ছিলেন। তাতারজাতিরা চীনরাজ্য জয় করিয়া তথায় বাস আরম্ভ করিয়াছে, তাতারীয়েরা কৃষ্ণবর্ণ নহে। কাফ্রিদের মধ্যে ডেকাজাতির বিষয়ে সুইনফোর্ড সাহেব বলেন যে তাহারা কৃষ্ণবর্ণ বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা পর্ব্বতে বাস করে, তাহারা বড় কাল নহে, ডেকাজাতির মধ্যে সেই পার্ব্বতীয়েরাই প্রধান।

লিবিংষ্টোন সাহেব বলেন যে, কেবল সূর্য্যের তাপে লোকে কাল হয় না, সূর্য্যের উত্তাপ আর ভিজেহাওয়া এই দুই

একত্রে মনুষ্যকে কাল করে।* আর অনেকে বলেন যে এই দুই একত্রে লোককে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ করে।

পৃথিবীর মধ্যে উত্তর আফ্রিকা, আরবস্থান, পারস্যদেশ, তিব্বৎ ও মগলদেশ প্রভৃতি সংলগ্ন দেশসমূহ ইংরেজি মানচিত্রে বৃষ্টিহীন rainless district, বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সকল দেশে বড় বৃষ্টি হয় না, ইহাদের হাওয়া কাজেই ভিজে নহে, তথাকার অধিবাসীরা কাজেই কৃষ্ণবর্ণ নহে। ইহারাই চিরকাল পৃথিবী জয় করিয়াছিল। আর্য্যেরাও এই অংশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ প্রথম জয় করেন, পরে তাঁহাদের বংশ ভারতবর্ষের সূর্য্যতাপে ও জলসম্পৃক্তবায়ু দ্বারা ক্রমে নিস্তেজ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়িলে আবার সেই বৃষ্টিহীন অঞ্চল হইতে বাবর শা প্রভৃতি আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করেন, তাহার পর বাবরের বংশাবলীরও সেই দশা হয়। এক্ষণে আর এক শ্বেতবর্ণজাতিরা আসিয়া ভারতজয় করিয়াছেন। আর্য্যদের যে বংশ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিলেন, তাঁহারা জলসম্পৃক্তবায়ুর দোষে নিস্তেজ হইয়া গেলেন কিন্তু তাঁহাদের যে বংশই উরোপে বাস করিয়াছিল, এক্ষণে সেই বংশ আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিল। সুবিধার মধ্যে ইংরেজেরা ভারতবর্ষে বাস করিলেন না, বাস করিলে তাঁহারাও আমাদের মত হইয়া যাইতেন, অন্তে আসিয়া আবার তাঁহাদের জয় করিত। যাঁহারাই ভারতজয় করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই অধঃপাতেগিয়াছিলেন; ইংরেজেরা সে বিপদের পথ ছাড়াইয়াছেন। ভারতবর্ষে ইংরেজবাস করিবার একবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কি কারণে তাহার অনুমোদন হইল না তাহা আমাদের এক্ষণে ঠিক স্মরণ নাই, কিন্তু বোধ হয় এ প্রস্তাব আবার হইবে।

অতিরিক্ত সূর্য্যতাপ আর তাহার সঙ্গে জলসম্পৃক্তবায়ু এই দুই আমাদের ভারতবর্ষের মূল দুর্ভাগ্য, বিশেষতঃ বাঙ্গালার পক্ষে। রাজপুতানা হইতে দক্ষিণ কতক দূর পর্য্যন্ত এই স্থানের বায়ু জলসম্পৃক্ত নহে, এইজন্য তথাকার অধিবাসীরা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মুসলমানেরা এই অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট বড় একটা প্রভুত্বলাভ করিতে পারেন নাই। অদ্যাপি ভারতের যাহা কিছু গৌরব আছে তাহা কেবল এই রাজপুতানা অঞ্চলসম্বন্ধে।

বাঙ্গালার উল্লেখ করিতে বড় কষ্ট হয়। সূর্য্যতাপ আর জলসম্পৃক্ত বায়ু বাঙ্গালায় যেরূপ ভয়ানক সেরূপ অন্যদেশের দুর্ভাগ্যে কোথাও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। চিরকালই এই কারণে বাঙ্গালা নিস্তেজ রহিয়াছে, চিরকালই হয় ত এইরূপ নিস্তেজ থাকিবে। মহাপরাক্রান্ত আর্য্যেরা আসিয়া বাস করিলেন, কয়েক পুরুষের মধ্যে নিস্তেজ হইয়া গেলেন।

* Miss. Trav. Page 78.

তাহার পর মোগল পাঠানেরা আসিয়া বাস করিল, তাহাদেরও সেই দশা হইল। যে কয়েকঘর পর্ত্তুগিস আসিয়া বাস করিয়াছে, তাহারাও মাটী হইয়া গিয়াছে। উপহাস করিয়া লোকে তাহাদের এক্ষণে মেটে ফিরিঙ্গি বলে।

বাঙ্গালার বায়ু কস্মিন্‌কালে যে সংশোধিত হইবে না এমত ঠিক বলা যায় না। দেখা যাইতেছে কোন কোন দেশের বায়ু কৌশলদ্বারা কতকাংশে সংশোধিত হইয়াছে। যেখানে অতিরিক্ত বৃষ্টি হইত, সেখানে জঙ্গল কাটায় বৃষ্টি কমিয়াছে। বাঙ্গালায় সেরূপ অরণ্য নাই, এখানে বৃষ্টির হেতু বোধ হয়,আসাম ও ভুটানের পর্ব্বতশ্রেণী। অতএব জঙ্গল কাটিলে বৃষ্টি কমিবে না, তবে পয়ঃপ্রণালী বিশেষমত নূতন করিতে পারিলে বোধ হয় বৃষ্টির দোষ অর্থাৎ ভিজেমাটী, কতক কমিতে পারে। মাটী ভিজে থাকিলে বায়ু ভিজে থাকিবার কতক সম্ভাবনা।

কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত খাল কাটাইবার প্রস্তাব হইয়া থাকে, কিন্তু বায়ু শুষ্ক রাখিবার নিমিত্ত ড্রেনেজ হওয়া উচিত। অন্ততঃ ড্রেনেজ দ্বারা বায়ু শুষ্ক হইতে পারে কি না তাহার মীমাংসা করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানবিৎদের একত্র করা উচিত। তাঁহারা একত্র হইয়া যদি কিছু স্থির করিতে না পারেন, তথাপি কি উপায়ে বাঙ্গালার জলসম্পৃক্তবায়ু নষ্ট হইতে পারে, তাহার একটা অনুভব হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে যতদিন আমাদের পরস্পর নিজের প্রণ চ্যত্ন না হইবে, ততদিন কোন ভরসা নাই। এক্ষণে ভাল মন্দ সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করা আমাদের অভ্যাস পাইয়াছে। সুশাসনের প্রধান দোষই এই। গবর্ণমেণ্টের উপর যত শ্রদ্ধা বাড়ে, আপনাদের চেষ্টা তত কমে। এক্ষণে আমরা আপনাদের মঙ্গলজন্য কোন চেষ্টা করি না, করিতে পারিওনা, মনে করি যদি আবশ্যক হয়, তবে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট তাহা অবশ্য করিবেন।

সুশাসনের নিমিত্ত যে আমরা অকর্ম্মণ্য হইতেছি তাহা গবর্ণমেণ্ট কতক বুঝিয়াছেন। কোন কোন বিষয়ে তাহার অন্যথা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যাহা আমাদের সম্বন্ধে বুঝিয়াছেন আমরা তাহা এখনও বুঝি নাই। আমাদের লেখা পড়া শিক্ষা হইতেছে, কিন্তু সামাজিকতা লোপ পাইতেছে; দেশের ইষ্টনিমিত্ত আমরা আর কোন কার্য্য করিতে পারি না, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যতদূর সামাজিক ছিলেন, আমরা আর ততদূর নহি। এক্ষণে আমাদের কেবল আপনাদের নিজের প্রতি দৃষ্টি। তাহার মূল কারণ, এক্ষণকার গৃহিণীরা স্বার্থপর হইয়াছেন। কিন্তু সেই স্বার্থপরতা অবলম্বন করিয়া যদি বলা যায় যে, বাঙ্গালার বায়ু শুষ্ক করিতে পারিলে তাঁহাদের সন্তানেরা সুন্দর হইবে তাহা হইলে কি হয় বলা যায় না।

মাধবীলতা।

১৬

ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া পরিচয় দিতে দিতে দেওয়ানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেওয়ানখানায় প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিজন ভট্টাচার্য্য; নবকুমার আর পিতম পাগলা গিয়া তথায় বসিল, দেওয়ান্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি?"

ব্রাহ্মণ। দশরথ শর্ম্মা, নিবাস এই নিকোথপাড়া। এক্ষণে পরিচয়ের কি প্রয়োজন? আমার পুত্র চুরি গিয়াছে আমি তাহার বিচার চাই, আমি কোথা ঘর করি, কোন্ শাস্ত্রব্যবসায়ী সে পরিচয়ের এ সময় নহে, আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করিতে আসি নাই; এক্ষণে রাজাকে বলিয়া আমার পুত্র আমায় সমর্পণ করুন। নতুবা আপনারা সকলেই ব্রহ্মকোপে পড়িবেন, আমি রামরাম বিদ্যালঙ্কারের পৌত্র, আমার অভিসম্পাত বৃথা হইবে না নিশ্চয় জানিবেন; ব্রহ্মশাপ অব্যর্থ।

দেওয়ান্। অভিসম্পাত এক্ষণে থাক, মূল বৃত্তান্ত কি বলুন।

দশরথ শর্ম্মা। বৃত্তান্ত কি আর বলিব, এ কথা কে না জানে, আপনার সন্তান যদি আর একজন লয়, ত বুকের ভিতর কি হয় বলুন দেখি?

দেওয়ান। আমি জিজ্ঞাসা করি রাজকুমারকে আপনার সন্তান বলিয়া কি হেতু সন্দেহ জন্মিয়াছে?

দশ। সন্দেহ! আবার সন্দেহ কি? নিশ্চয় আমার সন্তান। সন্তান চুরি গেলে তাহার পিতা কি জানিতে পারে না?

দেওয়ান্। তাহা সত্য, কিন্তু আপনার যে সন্তান চুরি গিয়াছিল, সেই সন্তান যে আমাদের রাজকুমার তাহা আপনি কিরূপে জানিতে পারিয়াছেন, এই কথা আমি শুনিতে চাই।

দশ। সে কথা ত পড়িয়া আছে। ব্রাহ্মণী দশমাস দশদিন সন্তান গর্ব্ভে ধরেন, তাহার পর ফাল্গুনমাসের ১৬ই তারিখে রাত্রি একপ্রহরের সময় এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন; আমি নিজে গিয়া ধাই ডাকি, সে রাত্রে কোনমতে ধাই পাই না, শেষ বালা বেদিনী নগদ একটাকা হাতের উপর লয়, তবে এসে নাড়ীচ্ছেদ করে। আমরা শেষ আহারান্তে মহা আহ্লাদিত অন্তঃকরণে বাটীর মধ্যে শয়ন করিলাম; আর প্রসূতি, নবকুমার, বালা বেদিনী বাহিরে সূতিকাগারে থাকিল। প্রাতে উঠিয়া শুনি, যে সন্তান চুরি গিয়াছে; ব্রাহ্মণী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সে ক্রন্দন কি সহ্য করা যায়! আমি বন, জঙ্গল সকল অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, প্রতিবাসীরা সকলেই দৌড়াদৌড়ি করিয়া

বেড়াইল, বালা বেদিনী ষষ্ঠীতলায় গিয়া দেখিয়া আসিল, কোন অনুসন্ধান হইল না। কত লোক কত কথা বলিতে লাগিল, কেহ বলিল, যে জাতুহারিণীর কার্য্য, কেহ বলিল যে, শৃগালের কার্য্য; আমি তখন জানিতাম না যে ইহা রাজার কার্য্য।

দেওয়ান্। রূঢ় বলিবেন না, রূঢ়বাক্যে কার্য্য উদ্ধার হয় না; যদি এরূপ আপনার ইচ্ছা ছিল, তাঁহা হইলে এখানে না আসিয়া আদালতে নালিশ উপস্থিত করিলে ভাল হইত।

এই সময় আর একজন অধ্যাপক বলিলেন "বাচস্পতি ভায়া শোকে কতকটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। যদি আমার প্রতি অনুমতি হয়, তাহা হইলে মূল কথা সংক্ষেপে নিবেদন করিতে সাহসী হই; আমি আদ্যোপান্ত সকল অবগত আছি, এবং অভয় দিলে তাহা বলিতে পারি। আপনি ধর্ম্মাধিকারস্বরূপ, আপনার নিকট যদি আমাদের মর্ম্মবেদনা বলিতে পাই, তাহা অপেক্ষা আমাদের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে।"

দেওয়ান্। ভাল, বৃত্তান্ত কি আপনিই বলুন।

অধ্যাপক। যেআজ্ঞা, বৃত্তান্ত এই, যে বাচস্পতি ভায়ার সন্তান হারাণের কথা সত্য, আমরা স্থির করি যে, সূতিকাগার হইতে শৃগালে সন্তান লইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ সেই দিবস গ্রামের প্রান্তে সদ্যপ্রসূত অর্দ্ধভুক্তসন্তানের দেহাবশিষ্ট পাওয়া যায়—

দশরথ। মিথ্যা কথা, কবে কোথায় কাহার দেহাবশিষ্ট দেখিয়াছিলে? তখনই আমি জানি, যে জ্ঞাতিশত্রু সঙ্গে থাকিলে সকল চেষ্টা বৃথা হইবে।

অধ্যাপক। বাচস্পতি ভায়া ক্ষান্ত হও, তোমার জ্ঞাতি আমি বটে, কিন্তু শত্রু নহি; তোমার বংশ থাকিলে আমি এক গণ্ডূষ জল পাইতে পারিব। আমি তোমার স্বাপক্ষ কথাই বলিতেছি। তুমি নিজে আপনার কথা বলিতে পার না, তাহাই আমি বলিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি।

দশ। কেন? আমি আপনার কথা আপনি বলিতে পারি না, তুমি নূতন টোল করিয়াছ বলিয়া মনে করিয়াছ আমা অপেক্ষা তুমি পণ্ডিত হইয়াছ? এ অহঙ্কার ভাল নহে, অধিক দিন থাকিবে না, "নাহঙ্কারাৎ পরোরিপুঃ।"

অধ্যাপক আর কোন উত্তর না করিয়া দেওয়ানমহাশয়কে বলিতে লাগিলেন "স্থূলকথা, বালা বেদিনী সন্তানটি রাসি ধাইকে দেয়, রাসি ধাই সেই সন্তান লইয়া রাণীর সূতিকাগারে রাখিয়া আইসে। সেই রাত্রে রাণী এক মৃতকন্যা প্রসব করিয়াছিলেন, অর্থলোভে রাসিধাই, আর পরিচারিকারা একপরামর্শী হইয়া এই কার্য্য করিয়াছিল। রাজা কিম্বা রাণী বোধ হয় ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুমাত্র জানেন না। এক্ষণে

নিরপেক্ষ হইয়া অনুসন্ধান করিলে, সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

দেওয়ান্। রাজা কিম্বা রাণী এ কথা জানেন না, অথচ আপনারা জানিয়াছেন এ বড় আশ্চর্য্য কথা। আপনারা কাহার নিকট শুনিয়াছেন?

অধ্যাপক। আমরা যাহার নিকট শুনিয়াছি তাহার নাম প্রকাশ্যে এক্ষণে বলিতে পারি না, যদি ব্রাহ্মণদের প্রতি আপনার এতই দয়া হয়, তবে তদন্ত করিবার সময় আমাদের স্মরণ করিবেন, আমরা আসিয়া তাহার নাম বলিয়া দিব, এক্ষণে বলিলে রাজপরিচারকেরা তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবে।

দেওয়ান্। এইমাত্র ত তাহাদের মধ্যে রামি ধাই, আর বালা বেদিনী এই দুইজনের নাম করিয়াছেন, বাকি লোকের নাম করিবার আর আপত্তি কি?

অধ্যাপক। বালা বেদিনী কয়েক মাস হইল লোকান্তরপ্রাপ্ত হইয়াছে। রামি ধাইয়ের কথা স্বতন্ত্র, উহারই প্রস্তাবমত এই কার্য্য হয়, কাজেই তাহাকে আর সতর্ক করিতে হইবে না; সে কখনই স্বীকার করিবে না যে তাহার অর্থলালসায় এই গরীব ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান হইয়াছে।

দেওয়ান্। ভাল কথা, সময়মত আমি আপনাদের সম্বাদ পাঠাইব। এক্ষণে সভায় চলুন।

এই সময় চূড়াধনবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পিতম পাগলা তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "আপনার অনুপস্থিতিতে এক আশ্চর্য্য মকদ্দমা হইতেছিল, এমন সময় আপনি কোথায় ছিলেন? মকদ্দমা শুনিলে আপনার কত আহ্লাদ হইত। প্রবাদ আছে বহুপূর্ব্বে এইরূপ আর এক মকদ্দমা হইয়া গিয়াছিল। একজন মুসলমানের একটি পুত্র আর দুই স্ত্রী ছিল। পুত্রটি দুইজনের গর্ব্ভে জন্মে নাই; কিন্তু উভয়েই সে দাবী করিত। সন্তানের পিতা স্বর্গলাভ করিলে পর একদিন দুই সপত্নীর মধ্যে মহাবিবাদ উপস্থিত হইলে উভয়ে কাজির নিকট উপস্থিত হইল। কাজির বিচার বড় কঠিন ছিল। যেখানে সকল সাক্ষীই মিথ্যাবাদী, সেখানে বিচারকার্য্য বড় কঠিন, প্রমাণ প্রয়োগের প্রথা ছিল না অথচ বিচার করিতে হইত। সপত্নীদের নালিশ শুনিয়া কাজি বড় বিপদগ্রস্ত হইলেন। উভয়েই শপথ করিয়া বলিল "সন্তান আমার।" সাক্ষী নাই, সাক্ষী লইবার রেওয়াজও নাই, লইলে উভয়পক্ষের কথাই প্রতিপন্ন হয়; কতকগুলি সাক্ষী বলিবে সন্তান বড়বিবির, আবার কতকগুলি বলিবে সন্তান ছোটবিবির; অতএব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজি শেষ এক তরবারি হস্তে বিবিদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আমি দেখিতেছি তোমাদের উভয়েরই নালিশ সত্য, সন্তান তোমাদের উভয়েরই গর্ব্ভে জন্মিয়াছে; এক্ষণে আমি উভয়কে সমান হিস্যা করিয়া দিতেছি, এই

বলিয়া সন্তানকে দুইখণ্ড করিবার নিমিত্ত কাজি তরবারি তুলিলেন। "সাত দোহাই তোমার" বলিয়া এক বিবি কাজির পাদমূলে আছড়াইয়া পড়িল, বলিল, "রক্ষা কর, আমি সন্তানের ভাগ চাই না, সন্তান সতীনীকে দাও।" সপত্নী তাহাতে আপত্তি করিল, যে "সন্তান যদি উভয়ের, তবে আমি ষোল-আনার ভার কেন বহিব। আমার হিস্যামত আমি লইব, অপরের হিস্যা লইয়া আমি কেন অনর্থক পাপগ্রস্ত হইব; অতএব সন্তানকে দুইখণ্ড করাই ভাল।" এইরূপ ঠিক মকদ্দমা দশরথ ঠাকুর বাধাইয়াছেন। রাজপুত্রকে লইয়া এই মকদ্দমা, দশরথ ঠাকুর একজন ফরিয়াদী। এই সময় আপনি কাজি হইয়া দাঁড়ান। দশরথ ঠাকুর বলুন কোন ভাগ লবেন; চূড়াধনবাবু, এ বিচারে নিরপেক্ষ হবেন, কাহারও মুখ চাবেন না, সমান ভাগ করে দিবেন।

দশরথ। এ পাগল এখানে কেমন করে আসিল? এর ত অগম্য স্থান নাই দেখি।

পিতম। ঠিক বলেছ ভায়া; আমার অগম্য স্থান নাই। পরশ রাত্রে যখন তোমায় শিবেরমন্দিরে লইয়া যায়, আমিও সেখানে গিয়াছিলাম। পাগলেরা বায়ুর অধীন। কাজেই বায়ুর সঙ্গে গতিবিধি, যেখানে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, সেইখানে বায়ুগ্রস্তের পথ পড়ে। আমায় পরীক্ষা করিয়া দেখ।

১৭

এই কথায় দেওয়ানজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতম! পূর্ব্বে আর কখন ত তোমায় রাজবাটীতে দেখি নাই।"

বাস্তবিক দেওয়ানমহাশয়ের কথা সত্য, পিতম কখন কাহার গৃহপ্রবেশ করে নাই; রাজা কতবার পিতমকে ডাকিয়াছেন, পিতম কখন যায় নাই, রাজসমভিব্যাহারে রাজদ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার পর হাসিয়া বিদায় লইয়াছে। অপর সকলে যাহারা পিতমকে ভালবাসিত, মধ্যে মধ্যে তাহারা আদর করিয়া পিতমকে আহারের নিমন্ত্রণ করিত, কিন্তু পিতম বাটীর সম্মুখে কোন বৃক্ষমূলে বসিয়া আহার করিত; কদাচ গৃহপ্রবেশ করিত না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, গৃহমধ্যে কাক যায় না। পিতম আহার করিতে বসিলে, সেখানে বিস্তর কাক জমিত, অর্দ্ধেক অন্ন পিতম তাহাদের বণ্টন করিয়া দিত; তাহার পর আহার করিতে বসিত। কাকেরা মহা দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিত, পিতম হাসিত, আবার অন্ন ফেলিয়া দিত, কাকেরা তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি করিত, পিতম কখন বিমর্ষভাবে, কখন আনন্দিতমনে তাহাদের বিরোধ দেখিত।

অনেকে ভাবিত কাকের খাতিরে পিতম গৃহে বসিয়া আহার করে না কিন্তু অন্যসময় পিতম গৃহপ্রবেশ করিত কি না, তাহা কেহ অনুধাবন করিয়া দেখিত না, দেওয়ানমহাশয় তাহ

দেখিয়াছিলেন, তাহাই তিনি বলিয়াছিলেন যে আর কখন ত তোমায় গৃহপ্রবেশ করিতে দেখি নাই। পিতম দেওয়ানের কথায় কিছু অপ্রতিভ হইয়া হঠাৎ বলিল, "ভুল হয়েছে, আমি তবে এক্ষণে চলিলাম।" অথচ পিতম না গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সময় চূড়াধনবাবু দশরথ বাচস্পতিকে বলিলেন যে, "যদি আপনার স্থিরবিশ্বাস হইয়াই থাকে, যে রাজকুমার আপনার সন্তান, তথাপি তাহা আপনার প্রকাশ করা উচিত হয় নাই। আপনি সন্তানকে বড় জোর একখানি টোল করিয়া দিতে পারিতেন; এখানে আপনার সন্তান নিশ্চয় রাজা হইবেন, আপনি কেন তাহার ব্যাঘাত দিতে বসিয়াছেন; আপনার এ মহাভাগ্য নষ্ট করিতে কে পরামর্শ দিয়াছে?" এই কথা শেষ করিয়া চূড়াধনবাবু একবার দেওয়ান্‌মহাশয়ের দিকে অতিগোপনে কটাক্ষ করিলেন। দেওয়ান্ তাহা দেখিতে পাইয়া, ওষ্ঠপ্রান্তে চকিতের ন্যায় একটু হাসি দেখাইয়া তাহার উত্তর দিলেন।

দশরথবাচস্পতি চূড়াধনবাবুকে বলিলেন, "আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা সকলই বুঝি; কিন্তু ব্রাহ্মণী তাহা বুঝেন না; তিনি বলেন, 'আমার সন্তান আমি লালনপালন করিব, যে সন্তান আমি বুকে করিতে না পাইলাম, সে সন্তান আমার সন্তান কেমন করে, সে সন্তান রাজাই হউক, আর দরিদ্রই হউক, তাহাতে আমার কি? সন্তান বুকে করিব তবে ত বুঝিব আমার সন্তান, আমার ক্রোড় কাঁদিবে, আর মুখে বলিব, পুত্র রাজা হচ্ছে!?'

চূড়াধন। আপনার ব্রাহ্মণী বড় স্বার্থপর, তিনি আপনার সুখ, আপনার তৃপ্তি বুঝিলেন, সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবিলেন না। কেমন যে সময় মন্দ পড়েছে, ক্রমে সকলেই স্বার্থপর হইয়া উঠিতেছে!

দশরথ। আপনার সন্তান বুকে করিলে অথবা আপনার সম্পত্তি ভোগ করিলে যদি লোকে স্বার্থপর হয়, তবে আর আমি কি বলিব; এক্ষণে আপনি আছেন, দেওয়ান্‌মহাশয়ও উপস্থিত, আপনারা উভয়ে পরামর্শ করে যাহাতে ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণের হয় তাহা করিয়া দিন, আমাকে যেন শূন্যক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে হয় না। আমি আসিবার সময় ব্রাহ্মণীকে বলিয়া আসিয়াছি যে, তাঁহার হারাধন আমি অদ্যই আনিয়া দিব। তিনি এতক্ষণ পথচেয়ে আছেন, আমি যদি খালি হাতে যাই, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন দেখি তাঁহার কত কষ্ট হবে। আপনারা ত সকলই বুঝিতে পারেন।

চূড়াধনবাবু। আপনার ব্রাহ্মণী কেবল একা স্বার্থপর নন, আপনি কেবল ব্রাহ্মণীর আহ্লাদ ভাবিতেছেন, কিন্তু রাজা কিম্বা রাণীর কষ্ট ত একবারও মনে আনিতেছেন না; তাঁহারা সন্তান

ত্যাগ করিবেন একি সহজ কথা! আর তাঁহারা সন্তানই বা ত্যাগ করিবেন কেন, আপনি কি কোন প্রমাণ দিয়াছেন, আপনি বলিলেন রাজকুমার আমার, আর অমনি রাজকুমার আপনার হইবে, অমনি তাঁহারা আপনার হাতে রাজকুমারকে আনিয়া দিবেন? আপনার কি প্রমাণ আছে বলুন।

দেওয়ানজি পূর্ব্বমত হাসিয়া বলিলেন যে, "সে সকল কথা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সকলে চলুন ব্রাহ্মণভোজন দেখা যাউক।" সকলে দেওয়ানমহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া গেলে পিতম তথায় একা দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণবিলম্বে মস্তক হইতে রুদ্রাক্ষমালা খুলিয়া দুই একবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, তাহার পর বসিয়া তাহা ছিঁড়িল, একটি একটি করিয়া তাহা গণিল, গণনা সমাপ্ত করিয়া গাঁথিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ পরে নবকুমার দেওয়ানখানায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইতেছে পিতম?"

পিতম। মালা গাঁথিতেছি?

নব। কাহার জন্য? আমি জানি রাধাই মালা গাঁথিতেন, কৃষ্ণও যে দেখি মালা গাঁথেন।

পিতম। মালা গাঁথা বড় ভাল, মনস্থির করিবার এমত উপায় আর নাই; সূচের নিমিত্ত সূত্রাগ্র সূক্ষ্ম করিতে হয়, দৃষ্টিও সূক্ষ্ম করিতে হয়, কর্ণও সূক্ষ্ম হইয়া যায়, সে সময় পক্ষীর চীৎকার ব্যতীত আর কোন শব্দ শুনা যায় না, পুষ্পের গন্ধ ভিন্ন আর কোন ঘ্রাণ পাওয়া যায় না, তখন দেহের সকল কপাট বন্ধ কেবল মন খোলা, মনকে তখন একা পাওয়া যায়। তাহাই যুবতীবেটিরা মালা গাঁথে, যোগীর ধ্যান আর যুবতীর মালা গাঁথা এক জিনিস। মকদ্দমার কথা সাঙ্গ হইয়াছে?

নবকুমার। না, এখনও তাহারা বসে আছে, কই পিতম তুমি আহার করিলে না?

পিতম। সত্য কথা, কল্য অবধি আহার হয় নাই, তবে আমি চলিলাম, কোন্ ঘরে ছবি আছে?

নব। খাসখানায়, কেন? ছবি খাবে?

পিতম। না, দেখিব, তুমি সকলের ছবি চেন?

নব। চিনি, কিন্তু তোমায় ত সে ঘরে যাইতে দিবে না, তথায় কেবল নিতান্ত আপনার জন যাইতে পায়।

পিতম। তথায় রাজমাতার ছবি আছে?

নব। আছে।

পিতম। আর কার আছে?

নব। আর অনেকের।

এই সময় দেওয়ান্ ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভট্টাচার্য্যেরা আসিল। দেওয়ান্ কতকটা বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, "আপনারা অনর্থক জেদ করিতেছেন। আপনার সাক্ষীদিগের নাম করিয়াছেন, এক্ষণে আমি তদন্ত করিতে পারিব। তদন্ত করিলে পর

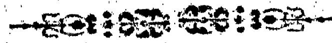
আপনারা আসিবেন, আমার কি রাজা-বাহাদুরের যাহা বলিবার থাকে তখন বলিব। এ সময় অনর্থক আপনারা কষ্টস্বীকার করিতেছেন। আর যদিই এই সকল লোকে বলে যে সন্তানটি আপনার, তাহা হইলেই বা কোন্ আপনি সন্তান পাইবেন? আপনারা প্রথমে কোম্পানির আদালতে গিয়া নালিশ করুন, তথা হইতে ডিক্রী ফয়সালা আনান, তাহার পর দেখা যাইবে। দুই-জন দাসীর কথায় যদি একজন রাজার বংশলোপ হইত, তাহা হইলে দিন রাত্রি হইত না। আপনি সে দিবসও আত্মীয়-দের নিকট বলিয়াছিলেন যে, আর কখন সূতিকাগার পাতালতায় বাঁধিব না। অতএব সে দিবস পর্য্যন্ত আপনি জানিতেন, যে বেড়ার দোষে আপনার সন্তান মরিয়াছে; আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন সূতিকাগারের পার্শ্বে জঙ্গলের ভিতর সন্তানের দেহাবশিষ্ট রহিয়াছে, আপনি স্বয়ং তাহার সৎকার করিয়াছিলেন, তাহা সকল ভুলিয়া এখন একেবারে ফিরিয়া বসিয়াছেন। যাহারা আপনাকে নাচাইয়াছে, তাহারা কেবল রাজার শত্রু নহে; আপনারও পরমশত্রু, অনর্থক আশাসঞ্চার করাইয়া আপনার এই মনস্তাপ বাড়াইয়াছে। অতএব বাটী যান, এ সকল কথা আর মনে স্থান দিবেন না।"

এই বলিয়া দেওয়ান্ আবার চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণেরা ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন, তাহার পর একজন বলিলেন, "চলুন সমুদয় প্রধান লোকের নিকট গিয়া পরামর্শ করি, আর কথায় কিছু হইবে না, সকলই ত শুনা গেল।"

সায়ংকাল পর্য্যন্ত পিতম দেওয়ান্-খানায় বসিয়াছিল, তাহার পর অতি সঙ্কুচিতভাবে নতশিরে বাহির হইল, পাছে তাহারে কেহ দেখিতে পায়, পিতম যেন প্রতিপদার্পণে এই আশঙ্কা করিয়া চলিতে লাগিল। দেখিতে পাইলে কেহ আহারের অনুরোধ করিবে এ আশঙ্কা পিতম একেবারে করে নাই; ধনবানের বাটীতে "দীয়তাং" না বলিলে, কেহ "ভুজ্যতাং" বলে না, এ কথা পিতম বিশেষরূপে জানিত; তথাপি পিতম যে কেন কুণ্ঠিতপদ, তাহা আপাততঃ অনুভব করা কঠিন।

পিতম রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। কাঙ্গালীদের শিশুরা পিতু পিতু, পিতুমণি বলিয়া আহ্লাদে কত ডাকিতে লাগিল, পিতম তাহাতে কর্ণপাতও করিল না; উচ্ছিষ্টপত্রাবশিষ্ট ত্যাগ করিয়া কুক্কুরগণ কতকদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল, পিতম তাহা ফিরিয়াও দেখিল না। শেষ এক নির্জ্জন দীর্ঘিকায় উপস্থিত হইয়া ব্যস্তভাবে জলে ঝাঁপ দিল, সর্ব্বাঙ্গ নিমজ্জন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত "আ!" বলিয়া এক চীৎকার করিল। তাহার পর জ্যোৎস্না পিতমের চক্ষে ফুটিল

উঠিল, তখন অর্দ্ধনিমজ্জিতশরীরে নিতম স্থিরভাবে চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। একবার আপনার কথা মনে হইল, তখন অস্ফুটস্বরে আপনা আপনি বলিল, "ভগবন্! আবার এ বিড়ম্বনা কেন? অন্ধকারে আর আলোক কেন?"



উপাসনাবিষয়ক তুলনা।

নিম্নলিখিত স্তোত্রদ্বয়ের একটি, ইংলণ্ডের সম্প্রদায়বিশেষের ব্যবহৃত স্তোত্রের অনুবাদমাত্র। ইহাদিগের উপাস্য পদার্থ মানব-দেবী। অর্থাৎ জগৎবিস্তীর্ণ ত্রিকালব্যাপী নরমণ্ডলীর অদ্বৈতভাব স্বীকারপূর্ব্বক তাহার সম্বন্ধ দেহকল্পনা করিয়া ইহারা মানবদেবী নামে উপাসনা করেন। মানবদেবী নারীমূর্ত্তি, ত্রিংশবর্ষীয়া প্রৌঢ়া, এবং অঙ্কদেশে আপন শিশু ধারণ করেন। অপর স্তোত্রটি কয়েকবৎসর পূর্ব্বে দুর্গোৎসব উপলক্ষে "সোমপ্রকাশ" পত্রে প্রকাশিত হয়। উহা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হয় এই অভিপ্রায়ে রচিত হইয়াছিল।

তান্ত্রিক মত অতি ঘৃণিত আচারে পূর্ণ হইলেও, উহা এক্ষণকার শাক্ত ও বৈষ্ণব এবং পূর্ব্বতন শৈব সৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চসম্প্রদায়েরই মান্য। তান্ত্রিকদিগের উপাস্য দেবতা, পাশ্চাত্যমতে যাহাকে পুত্তলি বলে, তাহার মধ্যে গণনীয় কি না, এই কথা বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু তন্ত্রপ্রণেতৃগণ যে কতকগুলি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোককে একত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে এখন যে বৈদিক ও তান্ত্রিক দীক্ষা একত্রিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বৈদিক দীক্ষা শূদ্রবর্ণের অনধিকৃত হইলেও তান্ত্রিক দীক্ষাতে সকল বর্ণেরই প্রায় তুল্যাধিকার। অপর, পাশ্চাত্যগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে মানিতে হয় যে তন্ত্রোক্ত কতকগুলি শক্তি, বৌদ্ধদিগের শেষাবস্থায় উপাস্য হইয়াছিল। নিরীশ্বরবাদীদিগের পারবর্ত্তিগণ ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার উদ্দেশে, বৈদিকমতের স্থাবর জঙ্গম ও গ্রহ নক্ষত্রের উপাসনাপরিত্যাগপূর্ব্বক, সময়, মৃত্যু, জন্ম, বিদ্যা, ধন, মঙ্গল, অমঙ্গল, বুদ্ধ ইত্যাদির আকার কল্পনা করিয়া দেবপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন,—আর তাঁহারা স্বহস্তে প্রতিমানির্ম্মাণ এবং মন্ত্রের দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন জড়পদার্থকে ঐশীশক্তিসম্পন্ন মনে করিতেন,—এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী সম্ভবপর তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন।

স্তোত্রদ্বয় একত্র সন্নিবেশিত করিবার

উদ্দেশ্য এই যে প্রাচীন হিন্দু তথা তান্ত্রিক মতের সহিত অভিনব পাশ্চাত্য মতের বৈষম্য কিছুমাত্র অপনীত হইতে পারে কি না, এতদ্বিষয়ক চিন্তার উদ্রেক হইবে। এতদুভয়ের সংযোগ অসাধ্য হইলে অস্মদ্দেশের নব্য প্রবীণ উভয়েরই মহাক্ষতি, লেখক এই সংস্কারের বশবর্ত্তী বটে। কিন্তু সংযোগকরণার্থে কি প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক, এবং কবে তাহা নির্দ্দেশ করিবার সময় হইবে এ সকল অতি দূরের কথা। তাহার আন্দোলন করাও অভিপ্রেত নহে।" দেখিতে পাওয়া যায়, পাশ্চাত্য মতসমগ্রকে নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করা অথবা পক্ষান্তরে শিখাধারী ব্রাহ্মণের আচরণমাত্রকে বিদ্রূপ করা এক্ষণকার চলিতপ্রথা। এই প্রণালীতে যে কখন নব্য এবং প্রবীণ-সম্প্রদায়ের মিল হইবে এ কথা সহসা মনে হয় না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বিনাশ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া, যাঁহারা ভাবিকালের নিমিত্ত চেষ্টাত্যাগপূর্ব্বক কেবল পিতৃপৈতামহিক বিধানানুসারে আত্মজীবনের পবিত্রতা লক্ষ্য করেন এবং যাঁহারা স্ব স্ব জ্ঞানানুযায়ী পবিত্রতা লাভের জন্য আত্মপ্রকৃতির পূর্ব্বতন অবস্থা উপেক্ষা করিয়া বিভিন্নপ্রকৃতি অর্জ্জনে ব্যগ্র হইয়াছেন—ইঁহাদিগের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত বাহুল্যরূপে প্রস্তাবিত মিলনের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন, কোন্ সম্প্রদায় প্রকৃষ্টরূপে হিন্দুসমাজের বিয়োগবৎসল, তাহার মীমাংসা প্রতিপক্ষের মুখে শুনিলে প্রতীতি জন্মিবার বিঘ্ন হয়। এই বিবেচনায় নিরপেক্ষভাব রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাদানুবাদের পরিবর্ত্তে কেবল স্তোত্রদ্বয় প্রকটিত হইল।

১। দুর্গাস্তব।

"দেবি, শক্তিরূপে! আমি তোমার ধ্যান করি। তোমার শক্তি সর্ব্বভূতে সকল সময়ে অনুভূত না হইলেও এই অসীম সংসার সেই বিশ্বব্যাপিনী শক্তিতে পরিপূর্ণ। তুমি যখন নিস্পন্দশবরূপ ধারণ করিয়া তপঃপরায়ণ ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলে, তখন তিনি,—মনুষ্যের জীবনই শক্তির একমাত্র পরিচায়ক, জীবননাশের সহিত এই দেহে শক্তির বিনাশ হইয়াছে,—ভাবিয়া ধ্যাতব্য পদার্থের উদ্দেশে মুখ ফিরাইলেন, অমনি সৃষ্টির এক নবীনমূর্ত্তির প্রভা তাঁহার মুখে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার এক নূতন মুখ প্রকাশ করিল। ব্রহ্মা দেখিলেন, কেবল নর নয়, সমস্ত জীবমণ্ডলী তোমার অসীম শক্তিতে দেদীপ্যমান। অনন্তর ব্রহ্মা, "এই শেষ" বুঝিয়া আবার মুখ ফিরাইলেন। তখন সমস্ত মহীরুহস্থিত শক্তির জ্যোতিঃ তাঁহার তৃতীয় মুখে আশ্রয়গ্রহণ করিল। ব্রহ্মা চতুর্থবার মুখ ফিরাইলেন, ফিরাইয়া দেখিলেন, এই অসীম সংসার, সমস্ত জড়জগৎও শক্তিতে পরিপূর্ণ। পরিশেষে গগনবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর শক্তিতে চুক্ত ব্রহ্মার মস্তকে পঞ্চমুখ প্রকাশ হইল;

ব্রহ্মা পরাভব স্বীকার করিলেন। বুঝিলেন, শক্তির সীমা নাই, আদি নাই, অন্ত নাই। সৃষ্টির আদিঅন্ত মানবের অপরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞেয়; সৃজনের আতিশয্যে প্রলয়ের সূচনা হয়; সৃষ্টিবিশেষমধ্যে শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে আবদ্ধ রাখিয়া অন্য স্রষ্টার অবরোধ করা কখনই সাধ্যায়ত্ত নহে। দেবি, অতঃপর তুমি পরীক্ষান্তরে ব্যাপৃত হইলে।

২। জ্ঞানমূর্ত্তি নারায়ণ ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন; ধ্যানে তোমার স্বরূপ, তোমার আদি, অথবা অন্ত কিছুই উপলব্ধ করিতে পারিলেন না। তোমাকে দেখিয়া বিষ্ণু যতক্ষণ সন্তুপ্ত হইলাম মনে না করিলেন, ততক্ষণ তাঁহার নূতন নূতন চক্ষু প্রকাশ হইতে লাগিল। সহস্রাক্ষ এখনও তোমায় দেখিতেছেন। কিন্তু তাহাতে তোমার তুষ্টিসাধন হইল না। ক্রিয়া না থাকিলে জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হয়। তাদৃশ জ্ঞান হইতে শক্তির উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। দেবি, তুমি মঙ্গলময় শিবেরই ভূষণ।

৩। দেবি মহেশ্বরি, তোমার শক্তি যোগ্যপাত্রে আশ্রয় করিয়াছে। শিবদুর্গে, তোমাদিগকে অভিন্নমূর্ত্তিতে চিন্তা করি। তুমি শক্তি, তিনি ক্রিয়া; তুমি স্নেহ, তিনি মঙ্গল। উভয়ের বিচ্ছেদ অসম্ভব। দেবি, তুমি শক্তিরূপে অচিন্ত্য; সংসারে তোমার অবধি দেখি না; সেই কারণে স্বয়ং ব্রহ্মা তোমা হইতে অবস্থিত হইয়াছেন। জ্ঞানবলে তোমার আদি অন্ত নির্ণয় হয় না; সেই কারণে তোমার ধ্যানে মগ্ন, নারায়ণও স্পন্দহীন, শয়ান আছেন। কেবল রুদ্রতেজে তোমার মায়া আশ্রয় করাতেই তুমি ত্রিগুণময়ী হইয়া সংসারকে মঙ্গলালয় করিতেছ। দয়াময়ি! প্রলয়কর্ত্তা মহাকাল তোমায় সঙ্গলাভ করিয়াই শিব নামের সফলতা করিয়াছেন।

৪। দেবি মায়াময়ি ঈশানসঙ্গতদেহে! তোমরা সর্ব্বাধারে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। আমরা যে দেহরক্ষার্থ দুর্নিবার স্বার্থচেষ্টাতে আসক্ত রহিয়াছি, সে তোমাদেরই মায়া। সৃষ্টিরক্ষার্থ জীবমিথুন যে মোহাচ্ছন্ন হয়, সেই তমোগুণবিকাশ তোমাদেরই কার্য্য। অন্যথা জগৎসংসার প্রাণিহীন হইত; অশেষ যন্ত্রণার আধার দেহ রক্ষা করিতে কেহই প্রবৃত্ত হইত না; বরং ভাবী যন্ত্রণার বিনাশার্থ সকলেই সন্তানোৎপাদনে বিরত হইত।

৫। দেবি শিবদেহবিলাসিনি! তোমরা রজোগুণেরও আধার। রুদ্রতেজে! তুমি জগতের অসুরবিনাশকারিণী। তোমাদের তমোগুণাশ্রয়পূর্ব্বক অসুরগণ নরধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে আবার তোমাদের রজোগুণবলেই সেই নৃশংসদিগের সংহারসাধন হয়।

৬। দেবি সংহাররূপিণি রজোগুণাশ্রয়ে! তুমি এক চক্ষে অসুরনাশ, অপর চক্ষে কমলার সৃষ্টি করিয়াছ। অসুরনাশিনি! লোকবিনাশোদ্যত মোহময় বুভুক্ষা তোমার অঙ্কুশাঘাতে বিনষ্ট হয়,

এবং সেই অসুরবুভুক্ষা তোমারই আদেশাধীন হইয়া তাবৎ লোককে ধনধান্য সঞ্চয়ে নিযুক্ত করে। তুমিই অসুরভয়বারিণী, তুমিই জগতের শস্যরূপিণী লক্ষ্মীর জননী। উভয়ত্র তুমিই দুর্গতিনাশিনী। দেবি, সেই কারণেই দুর্গা বলিয়া বিশ্বজনে তোমার শস্যাধিষ্ঠাত্রী শারদীমূর্ত্তির উপাসনা করে।

৭। দেবি, তোমার রজোগুণবলে লোকের আধিপত্যলাভবাসনা উত্তেজিত হয়। আবার তোমারই গুণান্তরসম্ভূত লোকরঞ্জনবাসনায় তাহার শমতা হয়। ভূপতিগণ তোমারই তমঃ ও রজোগুণপ্রভাবে একচ্ছত্রলাভপ্রয়াসী ও প্রজাপীড়নরত। কখন তাঁহারা লক্ষ্মীর সেবক, কখন অসুরনাশমন্ত্রে দীক্ষিত। দেবি, জগতের প্রভবিষ্ণুবর্গ তোমারই মায়াতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকরঞ্জন কামনাসহকারে নরবিনাশে বিরত হন।

৮। দুর্গে শিবসমন্বিতে, রজতকান্তিবিষ্ণুরূপিণী বাণী ও সুবর্ণাভব্রহ্মরূপিণী কমলা তোমাদিগেরই অঙ্গজ। ক্রিয়াপ্রবর্ত্তনার্থ তুমিই লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর ও সরস্বতীকে ব্রহ্মার আশ্রিত করিয়াছ। তাহাতেই এই জগৎ, মণ্ডলীবদ্ধ নরের আলয় হইয়াছে। তোমার স্থাপনাতেই ব্রহ্মবিষ্ণু একত্রীভূত হইয়াছেন। তুমিই জ্ঞানকে কমলার অধীন ও সৃষ্টিকে জ্ঞানাদেশবর্ত্তী করিয়াছ। শিবের মঙ্গল এবং শক্তির অনুষ্ঠান ব্যতীত কখনই এই সৃষ্টির স্থিতি হয় না।

৯। মাতস্ত্রিগুণাত্মিকে—তোমরাই সত্বগুণের মূর্ত্তি। তোমাদের রজোগুণ ও তমোগুণ, সত্বগুণেরই সোপানস্বরূপ। তুমি তমোগুণ ও রজোগুণময় কাম ও বুভুক্ষা সংযমিত করিয়া সংসার ও দাম্পত্যবিধি সংস্থাপন করিয়াছ; এবং রজোগুণাচ্ছন্ন সঙ্কর্ষীকে ধনধান্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর সেবায় মগ্ন রাখিয়াছ। দেবি, তুমিই দাম্পত্যের অধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতি। সেই অমল দাম্পত্য হইতে পরিবারমণ্ডলীতে সত্বগুণাশ্রয় নিষ্কাম প্রণয়, ভক্তি ও দয়ার উদয় হইয়াছে। দম্পতির প্রণয় পারিবারিকধর্ম্মের মূলীভূত। সরস্বতীর প্রসাদে এই পারিবারিক ধর্ম্ম প্রজামণ্ডলীতে আশ্রয় করে, এবং মাতৃভক্তি জগতের জননীস্বরূপা তোমাতেও বিন্যস্ত হয়। লক্ষ্মীর অনুগ্রহে মনুষ্যের মনঃস্থিত সদভিলাষ আকারপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণকে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করে। তোমার উদ্দিষ্ট ভক্তিও সেই সার্ব্বজনিকমঙ্গলানুষ্ঠানে দেদীপ্যমান হয়।

১০। মাতা, তাঁহার অংশভূত পিতা, তাঁহাদের পিতৃপিতামহ, পিতৃকুল, মাতৃকুল, বর্ত্তমান জনগণের আদিভূত অতীত কালের মানবমণ্ডলী, সকলেই পর পর আমাদিগের ভক্তিরসোদ্দীপক হইতেছেন। আমরা ভক্তিভাবে বর্ত্তমান সমৃদ্ধি ও কৃষিবাণিজ্য শিল্পাদির সৃষ্টিকর্ত্তা প্রাচীন মহাপুরুষদিগকে প্রণাম করি। এবং যে মহর্ষিগণ সরস্বতীর অনুগ্রহে

অমরত্বলাভ করিয়া নরান্তঃকরণের তিমির মোচন করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও নমস্কার করি। উভয় সম্প্রদায় পৃথিবীর যে অসীম, অপরিশোধনীয় উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হউক। শক্তি, মায়া ও জ্ঞান ক্রিয়াবিহীন হইলে ব্রহ্মার সৃষ্টি বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই কারণে বিষ্ণুরূপিণী জ্ঞানময়ী সরস্বতী ক্রিয়াস্বরূপ ব্রহ্মার দেহলগ্না হইয়াছেন। দেবি! তুমি নিশাময়, কৃষ্ণবর্ণ অতীতকালের কালীমূর্ত্তি লঙ্ঘনপূর্ব্বক দিবসমর নভোবর্ণ তারামূর্ত্তিতে ভাবী কালের তারণকার্য্যে মগ্ন। তুমি ত্রিকালব্যাপিনী—মহাকালপত্নী। পুরাকালব্যাপ্ত দেহচ্যুত অমরবৃন্দকে তোমাতেই বিলীন জ্ঞান করিয়া, সেই পুরাকালের ক্রম এবং তোমারই ভূষণস্বরূপ, জ্যোতির্ম্ময় মঙ্গলালয় ভাবী কালকে ধ্যান করি। দেবি! তোমার প্রসাদে প্রাচীনার্পিত ভক্তি ভাবী কাল উদ্দেশে দয়াতে পরিণত হউক।

১১। মায়াময়ি, তোমার বিধানানুসারে দাম্পত্যেও সত্ত্বগুণময় নিষ্কাম প্রেম সঙ্কপ্রবেশ হইতেছে; এবং তুমিই পিতাপুত্র সম্বন্ধহেতুক একদিকে নির্ম্মল ভক্তি এবং অন্যদিকে অকৃত্রিম স্নেহ প্রবর্ত্তিত করিতেছ; আবার সেই গৃহচর্চ্চিত ভক্তি এবং স্নেহ, পাত্রান্তরে বিস্তারপূর্ব্বক সর্ব্বজন সম্বন্ধে ঐকান্তিক বদান্যতার রূপধারণ করিতেছে। দেবি! তোমার প্রভাবে সর্ব্বত্র নিরবচ্ছিন্ন সত্ত্বগুণ বিস্তার প্রত্যাশা করি। দেবি! তুমিই প্রকৃতি, তুমিই মাতা, তুমিই কন্যা। তোমার প্রসাদে দাম্পত্যের অনুসরণে মানবমণ্ডলী প্রীতিপূর্ণ হউক। মাতৃভক্তির সীমা বিস্তৃত হইয়া পৃথিবীর অশেষোপকারক সমস্ত প্রাচীনবর্গে বিন্যস্ত হউক এবং স্নেহ আপনা হইতে এবং ভক্তির পূর্ণতা সাধনার্থ ভাবী মনুষ্যকুলের উপর সন্ততি স্নেহভাবে পরিণত হউক।

(সোমপ্রকাশ ৩রা আশ্বিন, ১২৮৩।)

২। মানবদেবীর স্তব।*

স্নেহ আমাদিগের নিদান, ব্যবস্থা—আদি,
উন্নতি—উদ্দেশ্য।

জীবন, পরের নিমিত্ত জ্ঞান করিও।
নিরন্তর ব্যক্তভাবে আচরণ করিও।

সেই পরমাশক্তি, মানবদেবী, যাঁহাকে আমরা, সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান করি; আমরাই যাঁহার সন্তান এবং সেবক, যাঁহা হইতে আমরা সর্ব্বস্ব আহরণ করি এবং যাঁহাকেই আবার সর্ব্বস্ব প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য রহিয়াছি, তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি।—

তোমার স্বরূপ জ্ঞানের উৎকর্ষ লাভার্থ আমাদিগের যত্ন হউক! যে তদ্দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠতররূপে, তোমাকে স্নেহ করিতে

* (Translated from Dr. Congreve's annual adress on the occasion of the festival of Humanity.

এবং তোমার সেবা করিতে, সক্ষম হই। এবং এই উদ্দেশে আমাদিগের প্রবৃত্তি সকলও উত্তরোত্তর নির্ম্মল, দৃঢ় এবং প্রগাঢ় হউক, চিন্তা—অপেক্ষাকৃত ব্যাপ্ত এবং প্রবল হউক, এবং কার্য্য—অধিকতর অবিচলিত ও সতেজ হউক! যে তাহাতে আমাদিগের সময়ে প্রত্যেকের স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে নরমণ্ডলীর পরিণাম কালকে অপেক্ষাকৃত সন্নিহিত করিতে পারি; —সেই পরিণামকাল, যখন তুমি সমস্ত লোকের বিদিত অবস্থাতে তোমার মহীয়সী ক্ষমতা অবলম্বন পূর্ব্বক বিরাজ করিবে। যখন এক্ষণকার বৈষম্যজনিত-বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী সকল এবং জাতিসমস্ত অর্থাৎ নরপরিবার-রূপ-দেহস্থিত সর্ব্বাঙ্গ সকলেই, তোমার অতীত অস্তিত্বের একত্বপ্রভাবে, তোমার আদেশাধীন—জীবন্তগণ মৃতবর্গের শাসনাধীন—স্বতঃ সংস্থাপিত হইবে। এবং যখন স্নেহও আন্তরিক পরিচয় দ্বারা পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া শান্তিপূর্ণ একতাসহকারে ইহারা সকলেই মনুষ্যের উন্নতিসাধন কার্য্যে যথাযোগ্যরূপে স্বস্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে, করিয়া ভাবী কাল প্রবেশ পূর্ব্বক উত্তরোত্তর নির্দ্দোষ অবস্থার অভিমুখে অগ্রগামী হইবে।

এই প্রণালীতে তোমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে এবং তোমার আবাসস্বরূপ এই সুন্দর পৃথিবীর ক্রমাধিকারী অসংখ্য নরবংশ এবং নরাশ্রিতগণের সার্ব্বজনিক মঙ্গলসাধন হইবে।

আমাদিগের জীবনযাত্রা এবং কার্য্য-সমগ্রকে সতেজ এবং উন্নত করণাশয়ে, তোমাতে বিমিশ্রিত হইয়া—তোমার অতীত এবং ভাবী কালের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া—এই মহৎ কামনাকে যেন নিরন্তর জ্ঞাননেত্রে ধারণ করি! তথাস্তু (amen)।

* * * *

সমাপ্তিকালীন স্তব।

পবিত্র মানবদেবি! তোমার জীবনের বিগতকাল আমাদিগের জন্য যে সমুদায় শুভ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সৌন্দর্য্য স্বরূপ যে প্রভূত ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছে; যে মহাজন-শ্রেণী—ত্বদীয় সাক্ষীরাশি—আমাদিগের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া, অভাবস্থলে, সান্ত্বনা, আশ্রয় এবং উপদেশ প্রদান করিতেছে; বিশেষতঃ তোমার অনুগ্রহে এখানে বাক্‌স্ফূর্ত্তি এবং স্বেচ্ছামত কার্য্যকরণ বিষয়ে আমরা যে পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছি—এই সকল শুভ লাভের জন্য তোমাকে যথা কর্ত্তব্য অশেষ ধন্যবাদ পূর্ব্বক আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, যে আমরা যেন এই সকল উপকারের অযোগ্য পাত্র না হই; বরং দিন দিন একাগ্রতা অথচ বিনয়পুরঃসর, সাহসপূর্ব্বক অথচ অন্যের প্রতি মমতাসহকারে তোমার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হই। এবং তোমার সহিত আন্তরিক আলাপ দ্বারা যে সকল অপূর্ব্ব শুভ সম্পন্ন হয় তৎসমু-

দ্বায় যেন আপনারা সাধন করিতে এবং অন্য কর্তৃক সাধনার্থ সাহায্য দান করিতে সক্ষম হই। ঐক্য (union), অদ্বয়ত্ব (unity), প্রবাহত্ব continuty)। তথাস্তু।

মানবদেবীতে বিশ্বাস, মানবদেবী-জনিত আশ্বাস এবং মানবদেবীর প্রতি মমতা তোমাদিগকে সান্ত্বনা এবং সহৃদয়তাশিক্ষা প্রদান করুক। তোমাদিগের স্ব স্ব মনে শান্তি প্রদান করুক, পরস্পরের সহিত শান্তিসাধন করুক—এখন করুক এবং চিরকাল করুক। তথাস্তু।

[মণ্ডলীবর্গের প্রতি উপদেশ।]

আমাদিগের ধর্ম্মাবলম্বিগণ—যে যেখানে মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া আছে কিম্বা অসংযুক্তভাবে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে—তাঁহাদের সহিত; এবং (পরস্পরের এক উদ্দেশ্য অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক শৃঙ্খলমধ্যে সর্ব্ব ক্ষুদ্রতর বিভেদ বিসর্জ্জিত করিয়া) অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণেরও সহিত—তাঁহারা একেশ্বরবাদী, বহু-ঈশ্বরবাদী কিম্বা জড়োপাসক হউন, বিচ্ছিন্নভাবে কিম্বা সম্প্রদায়বদ্ধ হইয়া থাকুন—সমগ্র নববংশের সহিত—(আবার এক মানবপ্রকৃতিরূপ শৃঙ্খলমধ্যে সর্ব্ব ক্ষুদ্রতর বিভেদ বিসর্জ্জন করিয়া), যত্রস্থ—যদবস্থাপন্ন মনুষ্যমাত্রের সহিত; এবং যে সমস্ত পশুবর্গ মনুষ্যের আত্মোন্নয়ন চেষ্টাতে এতকাল, এখনকারই ন্যায়, সহকারী এবং সহচর হইয়াছে; এই সকলেরও সহিত আমরা অদ্য মানবদেবীর পার্ব্বণ উপলক্ষে—জ্ঞানতঃ সহৃদয়তা বিলাসে বিলসিত হইতে আকিঞ্চন করি।

এই সহৃদয়তা যে কেবল আমাদিগের সমকালীন লোকসমূহে ন্যস্ত হইবে তাহা নহে; যে অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক লোকের জীবন দ্বারা, সমগ্র ভূতকাল সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতিও এই সহৃদয়তা বিস্তার করি। যে সংখ্যাতীত পুরুষপরম্পরার শ্রমার্জ্জিত ফল আমরা উত্তরাধিকার করিতেছি এবং পরিবর্দ্ধন পূর্ব্বক ভাবী পুরুষপরম্পরার নিমিত্ত রাখিয়া যাইতে অভিলাষ করি, তাঁহাদের নিকট লব্ধোপকার, আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে অদ্য পুনঃস্মরণ করিতেছি। আমরা মৃতবর্গের আধিপত্য স্বীকার করিতেছি।

[অনন্তর] আমাদিগের সর্ব্বজনের মাতৃস্বরূপ ও বাসগৃহ পৃথিবী—এবং তৎসমভিব্যাহারে সৌরজগতের জ্যোতিষ্কসঙ্কলিত ভুবনমণ্ডলহইতে লব্ধোপকার সকলেরও পুনঃস্মরণ করি। এই সঙ্গে এই সৌরজগতের আধারস্বরূপ ব্যোমস্থানেরও পুনঃস্মরণ করা আবশ্যক। ইহা চিরকাল মনুষ্যের উপকার করিয়াছে এবং যখন ইহা জ্ঞানতঃ সূক্ষ্মীকরণ ক্রিয়া (abstraction) বিষয়ক কল্পনার উপমান স্বরূপ হইয়া, যে সকল সর্ব্বাশ্রয়কারী বিধি (higherlaws) সমষ্টি হইতে মানবজীবনের নিয়তি সম্পন্ন হয়, সেই সকল বিধির আধারকে উপমেয়

করিবে, করিয়া তাদৃশ ভাবে আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তিবিষয়ক চরিত্র সংস্কারার্থ ব্যবহৃত হইবে, তখন এই ব্যোমস্থান জন্য উপকার অপেক্ষাকৃত পরিবর্দ্ধিত হইবে।

[পরিশেষে] বর্ত্তমান এবং ভূতকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ভবিষ্যৎ কাল পর্য্যন্ত যে অপ্রাপ্তজন্ম ভাবী পুরুষ-পরম্পরা আমাদিগের পরে, আমাদিগের অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী হইয়া এই পৃথিবীতে সমাগত হইবে, তাঁহাদিগের প্রতিও সহৃদয়তা বিস্তার করিতেছি। আমাদিগের ধর্ম্মপ্রণেতা, মানবদেবীর যে ধ্যান বিকাশ করিয়াছেন, দেবীর মহৎলক্ষণ—বিধিস্রোত (continuity) বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা ঐ ধ্যানের সম্যক উপলব্ধির নিমিত্ত এই ভাবী পুরুষপরম্পরার বিষয় নিরন্তর আমাদিগের মনে জাগরূক থাকা আবশ্যক। মানবদেবীর এই সর্ব্বপ্রধান পার্ব্বণউপলক্ষে তাঁহার পরিজ্ঞাত বা অজ্ঞাতনাম, সর্ব্বভৃত্যবর্গের স্মরণস্থলে, এবং তাঁহারা যে কর্ম্মফল উদ্ধার পূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্মরণস্থলে দেবীর প্রধানতম ভৃত্য অগস্ত্ কোম্‌তের স্মরণ এইস্থানেই সন্নিবেশ করা বিধেয়।

হে গুরুগণাগ্রণ্য! আমাদিগের বিরুদ্ধে তাচ্ছিল্য কিম্বা বৈরিতাপ্রযুক্ত যে সকল বিঘ্ন উৎক্ষিপ্ত হইবে, তোমার শিষ্যগণ যেন তোমার দৃষ্টান্ত দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, তোমার মতসমগ্র হইতে আশ্রয় লাভ করিয়া এবং তোমাকৃত কল্পনার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া সেই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। এবং যে মানবোন্নয়নব্রতে তোমার জীবন উৎসৃষ্ট হইয়াছিল, তোমার শিষ্যগণ এই বিপ্লব কালে যেন পুরস্কারাশ্বাস দ্বারা কলঙ্কিত অথবা প্রয়াসের বিফলতাহেতুক অবরুদ্ধ না হইয়া, মানবদেবীর উপাসনাবলে এবং এই উপাসনাতে মগ্ন থাকিয়া সেই মহাব্রত পালনে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

শ্রী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

হৃদয়-উদাস।

মন সদাই উদাস। অন্তরের অন্তরে সদাই প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতিক্ষণে, প্রতিদণ্ডে, প্রতিপলে, যেন কোন জিনিসের জন্য মন কেমন করে। মন হুহু করে; নিজ সুখের জন্য, মন একবারও ভাবে না, ভাবিতে চায় না, ভাবিতে ভুলিতে চায়! আর কিছুতেই সুখ নাই, কাজে কর্ম্মে সুখ নাই, ধনে সুখ নাই, যশে সুখ নাই, যে সকল চির-অভিলষিত যাহার জন্য এক একবার জীবন উৎসর্গ করিতে চাহিতাম, তাহাতে আর সুখ নাই। বড় হইবার আশা স্বাভাবিক, তাহাতেও সুখ দেখিতে পাই না। যে সকল গ্রন্থ পাঠে চিরকাল এত আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিয়াছি তাহা আর ভাল লাগে না। যে সকল কথায় এত আগ্রহ ছিল, তাহা বিষবৎ বোধ হয়। যাঁহাদের সংসর্গে পূর্ব্বে এত আমোদ হইত, তাঁহাদের সংসর্গ অরণ্যবাস হইতেও বিষম কষ্টকর বোধ হয়। যে সকল স্বভাবসৌন্দর্য্য পরমরমণীয় বোধে শত শতবার দেখিয়াও তৃপ্তি হয় নাই, সে সকলের সৌন্দর্য্য যেন হঠাৎ কমিয়া আসিয়াছে।

সদাই বোধ হয় জগৎ অরণ্যবিশেষ, ইহার মধ্যে আমি একটি সামান্য কীট। আমার মত শত শত কীট চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু তাহাদের কাছে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। একা ইহা অপেক্ষা ভাল। কিন্তু সে একা কেন? আমার মনের মত একটি মানুষ গড়িয়া তাহাকে মনসিংহাসনে বসাইয়া একা অতি গোপনে তাহার সঙ্গে মনের কথা কই। মনের কথা কি? আমি তাহাকে ভালবাসি সুতরাং আমি এখন বিজনপ্রিয় হইয়াছি। বিজনে আমার মনের মানুষ গড়া ভাল হয়। তাহার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়, অনেক কথা তাহার সঙ্গে কহিতে পারি। অনেকক্ষণ তাহার উপাসনা করিতে পারি। অনেকবার তাহার সুখ উৎপাদন ও দুঃখবিমোচন করিতে পারি। অনেকবার অতি গোপনে বিনা সর্ত্তে তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারি; অনেকবার তাহার সেই প্রেমময় ছবি দেখিতে পাই। তাহার হাস্যবদন দেখিয়া অনেকবার মনে সুখ পাই। আমি লোকের সংসর্গ ভালবাসি না; লোকে আপনার সুখে হাসে, আপনার দুঃখে কাঁদে, আপনার জন্য পরকে বিরক্ত করে, দেক্ করে, লোকে স্বার্থপর। আমার ইচ্ছা হয় অন্যের জন্য ভাবি, অন্যের জন্য কাজ করি। অন্যের যাহাতে তৃপ্তি হয়, তাহাই করি। অন্যের কাজে আত্মজীবন উৎসর্গ করি। অন্যকে ভালবাসি, আমি আমাকে ভালবাসিয়া সুখী হইতে পারি না। আমার আর লোক চাই। আমি ভালবাসিতে চাই। নিজে

খাইয়া, নিজে পরিয়া, আর তৃপ্তি হয় না; আর কাহাকেও ভাল করিয়া খাওয়াইতে পরাইতে ইচ্ছা করে। চাঁদের আলো বড় সুখের জিনিস, দেখিলে চক্ষুজুড়ায়, কিন্তু আমার বোধ হয় আমার সে দেখিল কই। দুজনে দেখিতাম ত বেশ হইত। ফুলগুলি বেশ, বেশ জিনিস; কেমন গন্ধ ভরভর করে, কেমন কোমল, কেমন গঠন, কেমন টাট্‌কা, কেমন সুখস্পর্শ, আমার বোধ হয়, এমন ফুলগুলি তুলিয়া তাহার গলায় মালা করিয়া দিলে কতই সুন্দর হইত। যখন কোন জিনিস দেখিয়া তৃপ্তি হয়, অমনি বোধ হয়, আমার মনের মানুষ আমার সঙ্গে থাকিলে দুজনে উপভোগ করিতাম। যখন কোন গ্রন্থ পাঠ করিয়া নয়নে অশ্রুজল উপস্থিত হয়, তখনি মনে হয়, আমার সঙ্গে কাঁদিবার লোক থাকিলে বড়ই আমোদ হইত। সুখে দুঃখে, আশায় হতাশায়, ভয়ের সময়, উৎসাহের দিনে, উৎসবে, ব্যসনে, ভ্রমণে আলস্যে কেবল বোধ হয়, আর একটি লোক থাকিলে ভাল হইত। কাজেকর্ম্মে একান্ত অন্যমনস্ক থাকিলেও যেন তাহার জন্য ঔৎসুক্যের একটি প্রবাহ ফল্গুনদীর ন্যায় অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে অথচ অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

কিন্তু সে মানুষটি কই। যাহার জন্য আমি ভাবিতে পারি, যাহাকে সিংহাসন দিয়া হৃদয়ের অধীশ্বর করিতে পারি, যাহাকে মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারি, যাহাকে দেখিলে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ আনন্দ প্রাপ্ত হই, যাহার কথায় কর্ণরন্ধ্র ভরিয়া যায়—একবার শুনিলে যাহার প্রতিধ্বনি চিরদিনের তরে কাণে লাগিয়া থাকে,—কখন অপনীত হয় না সে মানুষ কোথায় পাই। কেহ কি বলিয়া দিতে পার? কমলাকান্ত বলিবেন, চাঁদ ভালবাস, চাঁদের সঙ্গে বিবাহ কর, ফুলের বিবাহ দাও, ফুল ভালবাস, কিন্তু কমলাকান্ত আহাম্মক, নহিলে সে এমন কথা কেন কহিবে। আমি যে মানুষ ভালবাসিতে চাই। স্বভাবের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া থাকা যায় সত্য; কিন্তু সে কয়দিন? চাঁদ ভালবাসিয়া মন পরিস্কার হয় বটে, কিন্তু সে কয়দিন। একদিন দুইদিন। কি না হয় যখন মনে বড় কবিত্বের ঢেউ উঠিল বলিলাম স্বভাবই সুন্দর, কিন্তু স্বভাব কি আমার দুঃখে কখন দুঃখী হয়? একটা মনুষ্যের জীবন বড় লম্বা, শুধু স্বভাব ভালবাসিয়া কাটে না, আর কিছু চাই। মানুষ চাই, মনেরমতন মানুষ চাই। আমি তাহাকে চিনি, সে আমাকে চেনে। এমন মানুষ কোথায় পাই? আমার এ বিবাহে কে ঘটকালী করিবে? আমি কুল চাহি না, কোষ্ঠী চাহি না, গোত্র চাহিনা, পুরুষ চাহি না, পর্য্যায় চাহি না, দানসামগ্রী চাহি না। আমার এ বিবাহে দিন নাই, নক্ষত্র নাই, লগ্ন নাই, সম্বন্ধ হইলেই রাজযোটক হইবে। কাল অকাল দরকার নাই। পসন্দ

হইলেই যথেষ্ট— তৎক্ষণাৎ বিবাহ। কিন্তু ঘটক মিলে না, ঘটকে আর সব মিলাইতে পারে, কেবল মন মিলাইতে পারে না; আমার অমন ঘটকে কাম নাই।

আরসীতে মুখ দেখিতে যাও—আরসীর দোষে আপনার মুখ কখন লম্বা দেখিবে কখন সরু দেখিবে, কখন দেখিবে বাঁকা, কখন দেখিবে গোল, কখন দেখিবে থেবড়া, কখন দেখিবে চেপ্‌টা। মানুষের মনও তেমনি আরসীবিশেষ। মানুষের মন যদি ভাল হয় সবই ভাল দেখায়। সবই সুন্দর দেখায়। কখন কখন বড় সুখের সময় সব সুখময় বোধ হয়, স্বর্গের সঙ্গীত দূর হইতে কাণ জুড়াইয়া দেয়,জনকোলাহলপূর্ণ নির্ব্বাতপ্রদেশও কোকিলকলরবসঙ্কুল নন্দনবনের ন্যায় বোধ হয়। সকল মানুষের মুখেই স্বর্গীয়সৌন্দর্য্য দেখায়। আবার কখন বোধ হয় সব অন্ধকার, পৃথিবী রসাতলে যাইতেছে। সমস্ত জগৎ কাঁদিতেছে—মানুষের মুখ শূকরের মত, আমার মন এখন আপন লইয়াই ব্যস্ত, আপন মনের মানুষ গড়িতে ব্যস্ত, অপর সকল বিষয়েই নির্জীব, উৎসাহশূন্য। আমার কাছে জগতের অস্তিত্ব নাই যদিও আছে ত নির্জীব প্রাণশূন্য। নদীর জল চলিতেছে, স্বভাবের নিয়মে; তাহাতে চন্দ্রকলা নাচিতেছে, স্বভাবের নিয়মে; ফুল ফুটিতেছে, স্বভাবের নিয়মে; মানুষে গান গাহিতেছে, স্বভাবের নিয়মে; আমিও ভালবাসার জন্য পাগল হইয়াছি স্বভাবনিয়মে জীবন কোথাও নাই। কিন্তু এই ভুবন নির্জীব বোধ হয় কেন? বাস্তবিকও স্বভাব আজিও যেমন আছে কালিও তেমনি থাকিবে কালি তেমনিই ছিল ইতরবিশেষ কিছু হয় নাই হইবে না হইবার সম্ভাবনাও নাই তবে আজি নির্জীব বোধ হয় কেন। ফিলজফররা বলিতেন যাহা আমরা দেখিতে পাই না তাহা নাই, আরবের উপকূলভাগ নিরন্তর সুগন্ধে আমোদিত। কিন্তু তাহা ভোগ করিবার লোক নাই সুতরাং তাহা না থাকারই মধ্যে। জগতে জীবন আছে কিন্তু আমার মনে নাই। আমি যে আরসী দিয়া দেখি তাহার দোষে সবই নির্জীব বলিয়া বোধ হয়। আমার আরসীর দোষ কে সারিয়া দিবে? আমার কাষ্ঠপুত্তলীবৎ মৃণ্ময় দেবপ্রতিমাবৎ অন্তঃকরণে কে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে? এ প্রাণপ্রতিষ্ঠার পুরোহিত কোথায় মিলিবে? যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে জগৎ অবশ্য হাসিবে, নদীর জলে সুখের গান শুনিতে পাইব, পক্ষী গাইবে, প্রেমভরে। ঝিল্লী ডাকিবে রাগভরে। ফুল দুলিবে আলিঙ্গনের জন্য। কোকিল কুহু কুহু করিবে বিরহে। এ প্রাণ কে প্রতিষ্ঠা করিবে? কবে আবার এ প্রতিমা প্রাণ পাইয়া দুলিবে আর প্রকৃতি পুরোহিতপদত্ত ধূপধুনা গন্ধপুষ্প উপহার পাইয়া হাসিবে! বিসর্জ্জনের সময় দূরে, এখন প্রাণপ্রতিষ্ঠা কখন হইবে। আমার মনের আকাঙ্ক্ষা কি মিলিবে? মনের মানুষ প্রাণের প্রাণ কি মিলিবে?

যৌবনে-সন্ন্যাসী

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। ভারতসভার নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত; মূল্য ৵০ আনা মাত্র। মুদ্রাযন্ত্রের উপকারিতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস, ১৮৭৮ সালের ৯ আইনের বিবরণ এবং এই আইনজারি হওয়াতে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের কি কি অপকার হইতেছে, সংক্ষেপে তাহা লিখিবার উদ্দেশ্যে এ প্রস্তাব প্রকাশ হইয়াছে। রজনীবাবু যথেষ্ট পরিশ্রম স্বরা মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন; গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় হিকি নামক একজন সাহেব, হিকির গেজেট (Hicky's Gazettee) নামে একখানি সংবাদপত্র ১৭৮১ সালে প্রকাশ করেন; এইখানি ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র। ১৮১৮ সালে মিসিনারি সাহেবেরা শ্রীরামপুর হইতে সমাচারদর্পণ নামে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র বাহির করেন। এই সমাচার দর্পণই সমুদয় বাঙ্গালা সমাচারপত্রের আদি। তাহার পর সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ হয়। ১৮৩৫ সালে চিরস্মরণীয় মেটকাপ্ সাহেব মেকলি সাহেবের সহযোগে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দেন। ৪৫ বৎসর অবধি সেই স্বাধীনতা ছিল।

নয় আইন জারি হওয়াতে কি কি অপকার হইতেছে তাহা প্রস্তাব পাঠ করিয়া আমরা সমুদয় জানিতে পারিলাম না; পুস্তকখানি আমাদের অদৃষ্টক্রমে অসম্পূর্ণ। বোধ হয় তাহা দপ্তরীর দোষ। শেষভাগে লেখা আছে "সংবাদপত্রের মুখ একেবারে বন্ধ করিলে"—কি হয়?

চিকিৎসক (রোগ ও ঔষধ) শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় ভি, এল, সি, এস, ডি প্রণীত। হরিনাভী, মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "পুস্তকখানি হস্তে পড়িলেই নেটিব ডাক্তার প্রণীত বলিয়া, বোধ হয় অনেকেই অশ্রদ্ধা করিবেন; কিন্তু পুস্তকখানি ডাক্তার রবার্টস্ ট্যানার, ওয়ারিং, এলিসন, হ্যানও, জেনার, কার্বি, গ্রীনফিল্ড, রিজার, রিচার্ডসন, বিজলী, গুডিব চক্রবর্ত্তী, নর্ম্মান চিবার্স প্রভৃতি বিজ্ঞচিকিৎসকমণ্ডলীর অনুমোদিত চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বনে প্রণীত, তবে কোন কোন স্থলে আমার ১০ বৎসরের বহুদর্শিতায় যাহা উপাদেয় বিবেচনা হইয়াছে তাহাও উল্লেখিত হইয়াছে।"

পুস্তকখানি নেটিব ডাক্তারদের উপযোগী হইতে পারে কি না তাহা তাঁহারা আপনারা বিচার করিবেন বলিয়া গ্রন্থ হইতে একটী চিকিৎসাপ্রণালী উদ্ধৃত করা গেল।

"পানী বসন্ত। মৃদুবিরেচক, জ্বরকালীন লাবণিক ঔষধ, কুইনাইন, লঘুপথ্য ইত্যাদি।"

বঙ্গদর্শন।

সপ্তম বৎসর।

৭৭ সংখ্যা।

অভিজ্ঞানশকুন্তল।

৩। শকুন্তলা,—নাটকের চরিত্র।

আমরা দেখিয়াছি যে দুষ্মন্ত অসীম বলের অধিকারী। তাঁহার বাহুবল দেবতাদিগের কাছেও পরিচিত। কি মনুষ্যের শত্রু, কি দেবতার শত্রু, তিনি সকলেরই দমনকারী—সকলেরই বিজেতা। আমরা আরও দেখিয়াছি, সে [illegible] আলস্যবিদ্বেষী, শ্রমপ্রিয়, কষ্টসহিষ্ণু। তিনি দিবারাত্রি রাজকার্য্য করিয়া ক্লান্তি অনুভব করেন না—মধ্যাহ্ন-রবির বিশ্বদগ্ধকারী কিরণরাশি তাঁহার কাছে তেজোহীন—অসীমশ্রমসাধ্য কার্য্য হইলেও তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পরাঙ্মুখ নন—তাঁহার অতুল দেহবল গিরিচর হস্তীর ন্যায় প্রভুত্ব বলব্যঞ্জক। দুষ্মন্ত পুরুষপ্রধান—তাঁহার যে কয়টি গুণের উল্লেখ করিলাম, সে কয়টি পুরুষজাতির গুণ। রমণীরত্ন শকুন্তলা সে রকমের নয়। সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলা সেই পবিত্রসলিলা মালিনীনদীতীরস্থ পরমরমণীয় শান্তিরসপরিপ্লুত তপস্যাশ্রমের তরুলতায় জলসেচন করিতে আসিতেছেন। তিনটিবালিকা দেখিতে প্রায় এক রকম—বয়সে প্রায় একরকম—একত্রে প্রতিপালিতা—এক-মন, এক-প্রাণ, এক-আত্মা। একটি সখী শকুন্তলাকে বলিতেছেন—

হলা সউন্তলে তত্তোবি তাতকণ্ণস্স অস্সমরুক্খআ পিঅদরা ত্তি তক্কেমি, জেণ ণোমালিআ-কুসুম-পরিপেলবাবি তুমং এদাণং আলবাল পরিউরণে ণিউত্তা।

নবপ্রস্ফুটিত মল্লিকাফুল আর নবপ্রস্ফুটিত শকুন্তলাফুল একই বস্তু। এটিও যেমন সুন্দর ওটিও তেমনি সুন্দর। এটিও যেমন কোমল, ওটিও তেমনি কোমল। এটিও যেমন নরম, ওটিও তেমনি নরম। এটিও যেমন মধুরতাময়, ওটিও তেমনি মধুরতাময়। এটিও যেমন ক্ষুদ্র, ওটিও তেমনি ক্ষুদ্র। রমণীপুষ্প অনেক রকম আছে; কোনটি গোলাপ, কোনটি চাঁপা, কোনটি টগর, কোনটি

জবা, কোনটি ভায়লেট, কোনটি পদ্ম, কোনটী কর্ণিকার। এগুলির মধ্যে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ। কিন্তু সকলেরই একটি সাধারণ গুণ আছে—সকলেই পুষ্পজাতীয় কোমলতার অধিকারী। সকলেই যে বৃক্ষকাষ্ঠ বা লতারজ্জু অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই কাষ্ঠ এবং রজ্জু অপেক্ষা কোমল। নবপ্রস্ফুটিত মল্লিকাপুষ্প সেই কোমলতার প্রাণস্বরূপ। কেন না ইহা যেমন কোমল, তেমনি ক্ষুদ্র, তেমনি পাতলা এবং তেমনি ফুটফুটে। তাই অনসূয়া বলিতেছেন, যে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমের তরুলতাগুলিকে শকুন্তলা অপেক্ষা ভালবাসেন। কেন না, শকুন্তলার দেহখানি যে রকম কোমল, তাহাতে সেই তরুলতাগুলিতে জল দিয়া বেড়াইতে হইলে, তাহা অবশ্যই শ্রমক্লিষ্ট হইয়া পড়িবে। আর হইলও তাই। দুই তিনটিমাত্র বৃক্ষে জলসেচন করিয়াই শকুন্তলা যেন একেবারে আলুথালু হইয়া পড়িলেন এবং হাঁপাইয়া উঠিলেন।

স্রস্তাংসা বতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ
ঘটোৎক্ষেপণা
দদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ
প্রমাণাধিকঃ।
বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্মাম্ভসা
জালকং
বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্য্যাকুলা
মূর্দ্ধজাঃ॥

ক্ষুদ্র কলসের ভারে শকুন্তলার ক্ষুদ্র বাহুলতা এলাইয়া পড়িল; শ্রমাধিক্যবশতঃ তাঁহার ধমনীপ্রবাহিতশোণিতস্রোত খরতর হইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র লোহিতবর্ণ করপল্লবটীকে অধিকতর লোহিতবর্ণ করিয়া তুলিল; তাঁহার নিঃশ্বাস ঘনঘন পড়িতে লাগিল, এবং নবযৌবনোন্নত বক্ষ ঝটিকাবিক্ষিপ্তস্রোতস্বিনীর ন্যায় তরঙ্গিত হইয়া উঠিল; তাঁহার সুকোমল মুখখানি স্বেদবিন্দুতে পরিপূর্ণ হইল, এবং সেই স্বেদবিন্দুতে তাঁহার কর্ণের শিরীষ পুষ্পগুলি অতি সুকোমলভাবে জড়াইয়া গেল; তাঁহার কেশগুচ্ছ খসিয়া পড়িল; তাঁহার অলকাগুলি তাঁহার হস্তের অবরোধ না মানিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সামান্য শ্রমে শকুন্তলাপুষ্পটী যেন বৃন্তস্খলিত হইয়া পড়িল! যেন ক্ষুদ্র লজ্জাবতী লতাটী অঙ্গুলিস্পর্শানুভব করিতে না করিতেই সঙ্কুচিত হইয়া গেল! এইজন্যই দুষ্মন্ত বলিতেছিলেন যে শকুন্তলাকে তপশ্চর্য্যাক্লেশযুক্ত করিয়া মহর্ষি কণ্ব যেন নীলোৎপলপত্রের কোমলতম ধারের দ্বারা কঠিনতম শমীবৃক্ষচ্ছেদনরূপ অসাধ্যসাধনের প্রয়াস পাইতেছেন।

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্তপঃক্ষমং
সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥

আমরা সকলেই পদ্মের পাতা দেখিয়াছি—নীলজলে বড় বড় পদ্মপত্র ভাসিতে দেখিয়াছি। জল যে পাতার প্রাণ—সে পাতা যেন কি রকম জলীয়

শক্তিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যেন কি রকমে জল একটু ঘন হইয়া পাতা হইয়া গিয়াছে। সে পাতা কি কোমল! কোমলতাময়ী শকুন্তলা নখদ্বারা সেই পাতাতেই অক্ষর কাটিয়াছিলেন। সে পাতায় নখের আঘাত সহ্য হয় না। নখস্পর্শে সে পাতা যেন গলিয়া যায়। আবার সেই বড় পাতাটিকে আস্তে আস্তে মৃণাল হইতে ছিঁড়িয়া তোল, পাতাটি অমনি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সে পাতার আবার ধার কি গা? যদি কোমলতার ধার থাকে তবে সে পাতার ধার সেই ধার। যদি কোমলতার কোমলতা থাকে, তবে সে কোমলতার নাম 'নীলোৎপলপত্রের ধার।' শকুন্তলার কোমলতা সেই রকম কোমলতা। যদি সে কোমলতার অপেক্ষা বেশী কোমলতা জগতে থাকে, তবে তাহা মনুষ্যের কল্পনাতীত। এখন সেই কোমলতার সহিত দুষ্মন্তের বলিষ্ঠতার তুলনা করিয়া দেখিলে যথার্থই বোধ হইবে যে, দুষ্মন্ত যে কঠিন শমীবৃক্ষ এবং কোমল নীলোৎপলপত্রের কথা বলিয়াছেন, স্বয়ং দুষ্মন্তই সেই শমীবৃক্ষ এবং তাঁহার শকুন্তলাই সেই নীলোৎপলপত্র। জগতে শারীরিক গঠন এবং শারীরিক বলসম্বন্ধে পুরুষ এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে যথার্থই এত প্রভেদ। কর্ম্মের মূল শারীরিক বল এবং সেই জন্য জগতের কর্ম্মক্ষেত্র পুরুষের —রমণীর নয়। সামান্য জলসেচনশ্রমকাতরা শকুন্তলাকে দেখিয়া কে বলিবে যে ইনি পৃথিবীর ভয়ঙ্কর কর্ম্মক্ষেত্রে স্থান পাইবার যোগ্যা?

কিন্তু বলহীনা হইয়াও শকুন্তলা বলিষ্ঠা; কোমল হইয়াও শকুন্তলা কঠিনা; শ্রমকাতরা হইয়াও শকুন্তলা কষ্টসহিষ্ণু। আমরা দেখিয়াছি যে, একটি ক্ষুদ্র কলস বহন করিতে হইলে শকুন্তলা ভারাক্রান্তা বোধ করেন; আমরা দেখিয়াছি যে একটি ক্ষুদ্র কলস হইতে দুইটি কি চারিটি বৃক্ষমূলে জলসেচন করিয়া বেড়াইলেই শকুন্তলা আলুথালু হইয়া পড়েন। কিন্তু কোমলহৃদয়ে বিষম দুঃখভার ধারণ করিয়াও শকুন্তলা সুদীর্ঘ পথ হাঁটিতে শ্রান্তি অনুভব করেন না। হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকাস্থিত মহর্ষি কণ্বের আশ্রম হইতে হস্তিনাপুর বড় কমদূর নয়। সেই দূরপথ অরণ্যে পরিপূর্ণ। অরণ্যপথে গমনাগমন করা বিষম কষ্টসাধ্য। যেখানে অরণ্য নাই, সেখানে প্রচণ্ড রবি। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে রবিকিরণ নিতান্তই অসহনীয়। আশ্রম হইতে যাত্রাকালে শকুন্তলার বিলম্ব দেখিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে বলিতেছেন—

ভগবন্ দূরমধিরূঢ়ঃ সবিতা তত্ত্বরয়াত্র-
ভবতীম্।

সেই প্রিয় আশ্রমপদ পরিত্যাগ করিয়া শোকবিহ্বলা শকুন্তলা সেই প্রচণ্ড রবিকিরণে হস্তিনাপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কতই কষ্ট সহ্য করিলেন; করিয়া মধ্যাহ্নকালে দুষ্মন্তের রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই দুষ্মন্তের

বাক্যবাণ হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নাই—পথশ্রমের শ্রান্তিবিহ্বলতা নাই—আতপতাপিতার আরক্তিমতা নাই—দূরপথগমনের স্বেদবিন্দুমাত্র নাই। তখন তাঁহাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত কেবল এই মাত্র বলিলেন—

কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীর-
লাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডু-
পত্রাণাম্॥

আবার শকুন্তলা তখন মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা! রমণি! তুমি কোমলতমা হইয়াও কঠিনতমা; তুমি বলহীনা হইয়াও বলিষ্ঠা; তুমি শ্রমকাতরা হইয়াও বিষম কষ্টসহিষ্ণু! তুমিই সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য! একদিন জনকনন্দিনীও এই অদ্ভুত রহস্য দেখাইয়াছিলেন। নির্ব্বাসনাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রাম সীতার নিকট গিয়া বলিলেন—"প্রিয়ে! অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তথায় গিরিকন্দর-বিহারী সিংহ নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে, উহা নির্ঝর জলের পতনশব্দ মিশ্রিত হইয়া কর্ণকুহর বধির করিয়া তুলে। দুর্দান্ত হিংস্রজন্তু সকল উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, তাহারা সেই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে। নদীসকল নক্রকুম্ভীরসংকুল, নিতান্ত পঙ্কিল, উন্মত্ত মাতঙ্গেরাও সহজে পার হইতে পারে না। গমনপথে অনবরত কুক্কুটরব শ্রুতিগোচর হয় এবং উহা কণ্টকাকীর্ণ ও লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পানীয় জলও সর্ব্বত্র সুলভ নহে। সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিতপত্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়া ক্লান্তদেহে শয়ন এবং মিতাহারী হইয়া ভোজনকালে স্বয়ং পতিত ফলে ক্ষুধাশান্তি করিতে হয়। তথায় বায়ু সততই প্রবলবেগে বহিতেছে, কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টকবৃক্ষের শাখা সকল কম্পিত হইতেছে। রজনীতে ঘোরতর অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্রেক সর্ব্বক্ষণ হয়, আশঙ্কাও বিস্তর। তন্মধ্যে বিবিধাকার বহুসংখ্য সরীসৃপ আছে, তাহারা পথে সদর্পে ভ্রমণ করিতেছে। স্রোতের ন্যায় বক্রগতি নদী-গর্ভস্থ উরগেরা গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। বৃশ্চিক কীট এবং পতঙ্গ ও দংশ মশকের যন্ত্রণা সর্ব্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্লেশও বিস্তর, এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নহে। নিবারণ করি, তুমি তথায় যাইও না। বনবাস তোমায় সাজিবে না (১)।"

কিন্তু বনবাস তাঁহাকে সাজিয়াছিল কি না তাহা সকলেই জানেন। ইতিহাসেও আমরা এই রহস্য দেখিয়া থাকি। বিপদ্গ্রস্ত শিশুসন্তানের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য

(১) হেমচন্দ্র—অযোধ্যাকাণ্ড, ১৫৩—৫৪ পৃষ্ঠা। স্থানে স্থানে দুই এক পংক্তি ছাড়িয়া দিলাম।

জননী অনেক সময়ে পর্ব্বতাদি উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, অগ্নিরাশি তুচ্ছ করিয়াছেন, জলরাশি ভেদ করিয়াছেন। ভারতে রমণীবীরত্ব সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। অসূর্য্যম্পশ্যা কোমলাঙ্গী বীর-দর্পে পুরুষোত্তম যাইতেছেন, গয়া-কাশী যাইতেছেন, কামরূপ-বৈদ্যনাথ যাইতেছেন। এ রহস্যের অর্থ কি? আমাদের বোধ হয় ইহার অর্থ এই—পুরুষ, শরীরের বলে বলিষ্ঠ; রমণী হৃদয়ের বলে বলিষ্ঠা। পুরুষ সর্ব্বদাই কর্ম্মক্ষম; রমণী কেবল হৃদয়ের বেগে বেগবতী হইলেই কর্ম্মক্ষম। পুরুষ সর্ব্বক্ষণই জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন; রমণী কদাচিৎ কখন জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা দেন। কর্ম্মশীলতা পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, রমণীর অবস্থাসাপেক্ষ ধর্ম্ম। কিন্তু রমণী যখন সেই অবস্থায় পতিত হন, তখন তাঁহাতে এবং পুরুষেতে কোন প্রভেদ থাকে না—তখন কোমলতম নীলোৎপলপত্র কঠিনতম শমীবৃক্ষ হইয়া উঠে। স্ত্রীজাতি এই আশ্চর্য্য বৈপরীত্যের আধার বলিয়া জগতের প্রধান রহস্যমধ্যে পরিগণিত।

যে হৃদয়ের গুণে শকুন্তলা বলিষ্ঠা, আবার সেই হৃদয়ের গুণেই শকুন্তলা বলহীনা। যে হৃদয়ের গুণে শকুন্তলা কার্য্য করিতে সক্ষম, আবার সেই হৃদয়ের গুণেই শকুন্তলা কার্য্য করিতে অক্ষম। রমণীহৃদয়ের এই আশ্চর্য্য রহস্য মহাকবি কালিদাস যে প্রকারে দেখাইয়াছেন জগতের আর কোন কবি সে প্রকারে দেখান নাই। দুষ্মন্ত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক রীত্যনুসারে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু শকুন্তলা সকল কর্ম্ম ভুলিয়া—প্রিয়তমা প্রিয়ম্বদাকে ভুলিয়া—প্রিয়তমা অনসূয়াকে ভুলিয়া—আশ্রমের লতা মৃগগুলিকে ভুলিয়া—কেবল দুষ্মন্তকে ভাবিতেছেন। ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের ভিতর বামকরতলে গণ্ড স্থাপন করিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দভাবে দুষ্মন্তকে ভাবিতেছেন। এমন সময়ে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনপ্রতিম মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া ভয়ঙ্কর স্বরে 'অয়মহং ভো' বলিয়া সেই ক্ষুদ্র কুটীরস্থিতা ক্ষুদ্র বালিকার সম্মুখে আতিথ্যপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। সেই ভয়ঙ্কর স্বরে সমস্ত আশ্রমারণ্য যেন কাঁপিয়া উঠিল। অদূরে প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার ইষ্টদেবতার পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন, তাঁহারা যেন শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু দুষ্মন্তনিমগ্না প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিস্পন্দা শকুন্তলা নিস্পন্দভাবেই রহিলেন। তখন তিনি তাঁহাতে নাই; তখন তাঁহার কাছে বাহ্যজগৎ প্রলয়নিমগ্ন; মানবাত্মা যেমন পরমাত্মায় লীন হয়, তেমনি হৃদয়সর্ব্বস্ব শকুন্তলা তখন দুষ্মন্তহৃদয়ে লীন। তখন যদি এই পৃথিবী-গ্রহ-নক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ড ঘোররবে ছিন্নভিন্ন হইয়া মহাপ্রলয়ে নিমগ্ন হইত, তাহা হইলে দুষ্মন্তময়ী শকুন্তলা সেই

সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রলয়ে মিলাইয়া যাইতেন, জানিতেও পারিতেন না যে কি হইল! বজ্রগম্ভীর স্বরে দুর্ব্বাসা শাপ দিলেন—

আঃ কথমতিথিং মাং পরিভবসি।
বিচিন্তয়ন্তী য মনন্যমানসা
তপোনিধিং বেৎসি ন মা মুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥

এখনও সংজ্ঞা নাই! জীবিতা শকুন্তলা এখনও জীবনহীন! তাঁহার জীবন, জ্ঞান, দেহ, দৈহিকশক্তি—সকলই এখন তাঁহার অতলস্পর্শ হৃদয়ে বিলুপ্ত। সে হৃদয় যথার্থই অতলস্পর্শ। প্রেমানলসন্তাপিতা শকুন্তলা যখন প্রথম দুষ্মন্তের কথা বলেন, তখন প্রিয়ম্বদা বলিয়াছিলেন যে বেগবতী স্রোতস্বিনী মহাসাগরাভিমুখেই ছুটিয়া থাকে—সুকোমল মাধবীলতা চূতবৃক্ষকেই জড়াইয়া উঠে। দুষ্মন্ত নানাগুণে গুণবান্—তাঁহার চরিত্রের বিস্তার অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় অসীম বলিলেই হয়। শকুন্তলাচরিত্রের বিস্তার নাই। তাঁহাতে দুষ্মন্তের বাহুবল নাই, শস্ত্রনৈপুণ্য নাই, মৃগয়াদক্ষতা নাই, পাণ্ডিত্য নাই, উচ্চ বিচারশক্তি নাই, অপরিমেয় কর্ম্মশীলতা নাই, অপরিমেয় শ্রমশীলতা নাই, অপরিমেয় কার্য্যদক্ষতা নাই। তাঁহার থাকিবার মধ্যে এক হৃদয় আছে। কিন্তু সে হৃদয়ের গম্ভীরতা এবং অনন্ত সমুদ্রের গম্ভীরতা সমান। পুরুষ, গুণবিস্তারে সমুদ্রবৎ—রমণী, হৃদয়-গম্ভীরতায় সমুদ্রবৎ। পুরুষ ভালবাসার সামগ্রীকে রমণীর মত তত আত্মগত করিতে পারে না—তত আপনাতে মিশাইয়া লইতে পারে না—তত আত্মবিস্মৃত হইয়া, তত জগদ্বিস্মৃত হইয়া ভাবিতে পারে না। পুরুষ-হৃদয়ের গভীরতা কম। সেই জন্য পুরুষ বিরহে অস্থির হইয়া পড়ে। রমণীহৃদয়ের গভীরতা অপরিমেয়। সেই জন্য রমণী বিরহে হৃদয়-সর্ব্বস্ব, হৃদয়ময়ী হইয়া থাকে। দুষ্মন্তকে ভাবিতে ভাবিতে শকুন্তলা একেবারে জীবনহীন প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্পন্দহীনা। কিন্তু অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শনান্তর শকুন্তলাকে ভাবিতে ভাবিতে দুষ্মন্ত অধীর, অস্থির, অনেকটা গাম্ভীর্য্যভ্রষ্ট, উন্মত্তের ন্যায় প্রগল্‌ভ। শকুন্তলার হৃদয় অনন্তাধার—যতই কেন দুঃখ হউক না সে হৃদয়কে ছাপাইয়া উঠিয়া দেহ বা জ্ঞানকে সংক্ষুব্ধ করিতে পারে না, কারণ হৃদয়ের তুলনায় শকুন্তলার দেহ এবং জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। দুষ্মন্তের হৃদয় পরিমিতাধার,—ভাবনা একটু বেশী হইলেই সে হৃদয়কে ছাড়াইয়া উঠিয়া শরীরকে অস্থির করিয়া তুলে, জ্ঞানকে বিহ্বল করিয়া ফেলে। হৃদয়ের মোহে রমণী বাহ্যজগৎ ভুলিয়া যান, পুরুষ ভুলিয়া যান না। শকুন্তলা সেই ভয়ঙ্কর "অয়মহং ভোঃ" শুনিতে পাইলেন না—সেই ভয়ঙ্কর শাপ শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু দুষ্মন্ত বিহ্বল-হৃদয়, বিহ্বল-জ্ঞান, এবং মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াও বিপন্নের ভয়ার্ত্তরব শ্রবণমাত্র বীরবিক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দুষ্মন্তকে শোক-

বিহ্বল দেখিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত মাতলি মাধব্যকে ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দুষ্মন্ত মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মাধব্যং প্রতি ভবতা কিমেবং প্রযুক্তম্।' মাতলি উত্তর করিলেন—

'তদপি কথ্যতে কিঞ্চিন্নিমিত্তাদপি মনঃসন্তাপাদায়ুষ্মান্ ময়া বিক্লবো দৃষ্টঃ পশ্চাৎ কোপয়িতুমায়ুষ্মন্তং তথা কৃতবানস্মি।'

মাতলি সিদ্ধকাম হইলেন। শোকবিহ্বল দুষ্মন্তের কাছে বাহ্যজগৎ প্রবল হইল। নিমেষমধ্যে দুষ্মন্তের শোকবিহ্বলতা কর্ম্মশীলতায় পরিণত হইল। কিন্তু হৃদয়মুগ্ধা শকুন্তলা ভয়ঙ্কর দুর্ব্বাসাসত্বেও হৃদয়মুগ্ধাই রহিলেন। বিলুপ্ত বাহ্যজগৎ বিলুপ্তই রহিল। হৃদয়ময়ীর নিশ্চেষ্টতা নিশ্চেষ্টতাই রহিল। যে হৃদয়ের গুণে রমণী চেষ্টাশীলা সেই হৃদয়ের গুণেই রমণী নিশ্চেষ্টা। হৃদয়ই রমণীচরিত্রের প্রধান ভিত্তি এবং প্রধান উপাদান। হৃদয়ের গুণেই স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি হইতে ভিন্ন। কালিদাসের শকুন্তলা সেই রমণীহৃদয়রহস্যের উজ্জ্বলতম প্রতিমা। এবং সেই প্রতিমা পুরুষচরিত্রের তুলনায় উজ্জ্বলতম অপেক্ষা উজ্জ্বল। এমন তুলনামূলক নারীহৃদয়প্রতিমা জগতের আর কোন নাটকে নাই।

এখন জিজ্ঞাসা এই, প্রিয়বস্তুর বিরহ রমণীহৃদয়ে এত লাগে কেন, পুরুষহৃদয়ে এত লাগে না কেন? দুষ্মন্ত ত শকুন্তলাকে রাখিয়া রাজধানীতে গিয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া শকুন্তলা এমন হইলেন কেন। আমাদের বোধ হয় ইহার কারণ এই,—পুরুষ প্রিয়বস্তুকে শুধু হৃদয়ে রাখিয়াই অনেকপরিমাণে সন্তুষ্ট; রমণী তা নয়। রমণী প্রিয়বস্তুকে চোকে চোকে রাখিতে চায়। পুরুষ প্রিয়বস্তুর কল্পনাতে সন্তুষ্ট; রমণী খোদ প্রিয়বস্তু ব্যতিরেকে সন্তুষ্ট নন। ১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের Nineteenth Century তে অধ্যাপক মেলক A Dialogue on Human Happiness নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। একটি পুরুষ আর একটী রমণী কথোপকথন করিতেছেন। রমণী সতেজে বলিতেছেন—"Heavens! do you know so little as to think that were a man in love really, he could endure to be absent, without necessity, a day from the woman he was in love with? No: he is never happy when away from her." সম্ভাবিত পুরুষ ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, এবং বলিলেন যে ইহাকে যদি প্রণয় বলে তবে যেন প্রণয়ের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ না থাকে। রমণীহৃদয় শুধু হৃদয়ে ভর করিয়া থাকিতে পারে না। রমণী হৃদয়ের বস্তুকে সর্ব্বদাই চোকের উপর রাখিতে চাহেন। সেই নিমিত্ত যখন হৃদয়ের বস্তু চোকের

অন্তরালে থাকে, তখন রমণী আপন হৃদয়ের ভিতর লুকাইয়া কল্পনার বলে অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলেন, এবং সেই কল্পনাসম্ভূত বস্তুতে প্রকৃত বস্তু বোধে মিশাইয়া থাকেন। রমণী বাহ্য অবলম্বন ব্যতিরেকে থাকিতে পারেন না। পুরুষের মন অনেক পরিমাণে সেই মনসাপেক্ষ; কিন্তু রমণীহৃদয় বাহ্যজগৎসাপেক্ষ। এবং সেই নিমিত্তই বাহ্যজগতের অভাবে রমণী তাঁহার আশ্চর্য্য হৃদয়াভ্যন্তরে আশ্চর্য্যতম বাহ্যজগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সে আশ্চর্য্য বাহ্যজগতের কাছে প্রকৃত বাহ্যজগৎ অস্তিত্বহীন। পুরুষজাতির মধ্যে উচ্চশ্রেণীর কবি ভিন্ন আর কেহ সেরকম আশ্চর্য্য বাহ্যজগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না। রমণীমণ্ডলে সকলেই উচ্চশ্রেণীর কবি। দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন এবং ইতিহাসেও দেখা যায় যে যেখানে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ জগৎ, সেখানে বাহ্যজগৎ বিলুপ্ত। যে যোগীর মনে পরমাত্মা প্রত্যক্ষ, সে যোগীর নয়নে বাহ্যজগৎ অপ্রত্যক্ষ—অস্তিত্বহীন। যে শকুন্তলার চক্ষে সম্মুখস্থ বাহ্যজগৎ অপ্রত্যক্ষ, সেই শকুন্তলার হৃদয়ে দূরবর্ত্তী দুষ্মন্ত প্রত্যক্ষ। রমণী প্রত্যক্ষপ্রিয়, প্রত্যক্ষানুরাগী, প্রত্যক্ষাপেক্ষী এবং সেই জন্য শোকে এবং বিরহে রমণী এত অন্তর্লীনতাপ্রিয়। কালিদাস ভিন্ন আর কোন কবি এই নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝান নাই। পর্ণকুটীরে দুষ্মন্তনিমগ্না শকুন্তলা,—এটি উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার অক্ষয়, অনন্তমহিমাপূর্ণ, উৎকৃষ্টতম কীর্ত্তি। এ কবি যাঁহাদের, তাঁহারা যথার্থই জগতে স্পর্দ্ধাক্ষম।

আমরা শকুন্তলার যে মূর্ত্তিটী দেখিলাম সেটি স্ত্রীজাতির অন্তর্লীন মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিতে স্ত্রীজাতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিহিত। সে মূর্ত্তি দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, বিস্মিত হইতে হয়, ভীত হইতে হয়। এই আশ্চর্য্য অন্তর্লীনতা ভাবপ্রখরতার ফল। এত ভাবপ্রখরতা (Intensity of feeling) আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এত ভাবপ্রখরতাপূর্ণ অস্তিত্ব আমাদিগকে প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বোধ হয় যে, যে মুহূর্ত্তকালের জন্য বাহ্যজগৎ দেখিয়াছে এবং বাহ্যজগতে বাস করিয়াছে সে কখন এত অন্তর্নিমগ্ন হইতে পারে না, এত অন্তর্লীনতাপ্রাপ্ত হয় না। এই ভাবপ্রখরতাপূর্ণ অন্তর্লীনতা দেখিয়া আমরা ভীত হই। আমাদের বোধ হয় যে যাহার এত ভাবপ্রখরতা সে যদি শকুন্তলার ন্যায় ভাল হয়, তবে পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা ভাল জিনিস আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু যদি সেক্ষপীয়রচিত্রিত লেডিমেকবেথের ন্যায় মন্দ হয়, তবে পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা মন্দ জিনিস আর কিছুই হইতে পারে না। এবং জগতের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, পুরুষ যতই ভাল হউক না, ভাল স্ত্রীর মতন ভাল হইতে পারে না—এবং যতই মন্দ হউক না, মন্দ স্ত্রীর মতন

মন্দ হইতে পারে না। এই ভাবপ্রথরতাপূর্ণ অন্তর্লীনতা দেখিয়া আমরা বিস্মিতও হই। আমাদের বোধ হয় যেন একখানা প্রকাণ্ড হিমশিলাখণ্ড অনন্তকাল গিরিকন্দরাবদ্ধ রহিয়াছে—কখন গলে নাই, কখন গলিতে পারিবেও না। কিন্তু রমণীহৃদয় রহস্যময়। আবদ্ধ হিমশিলাখণ্ড যেমন গলে, আবদ্ধ রমণীহৃদয়ও তেমনি গলে। এবং হিমশিলা গলিয়া যেমন তরু, লতা, প্রস্তর সকলই ভাসাইয়া লইয়া যায়, রমণীহৃদয় গলিলেও তেমনি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, কোমলহৃদয়, কঠিনহৃদয় সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়। কথাটি সত্য কি না, অভিজ্ঞানশকুন্তলের বিদায় দৃশ্যটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। সে দৃশ্যের ন্যায় কোমল, হৃদয়াপহারী, কবিতাময়, মানবপ্রকৃতিপ্রকাশক জিনিস আমরা আর কোথাও দেখি নাই। কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম :—

গৌতমী। বৎসে! স্বজনবৎ স্নেহপূর্ণ তপোবনদেবতারা তোমায় গমনে অনুমতি করিতেছেন। ইহাদিগকে প্রণাম কর।

শকুন্তলা। (প্রণাম পূর্ব্বক কয়েক পদ গিয়া জনান্তিকে) সখি প্রিয়ম্বদে, আমি যদিও আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তথাপি আশ্রমপরিত্যাগে আমার পা উঠিতেছে না।

প্রিয়ম্বদা। তুমিই যে কেবল তপোবনপরিত্যাগে কাতর হইয়াছ তাহা নহে, তপোবনও তোমার বিরহকাল উপস্থিত দেখিয়া কাতর হইতেছে। মৃগদিগের মুখের কুশগ্রাস পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং লতাসকল পাণ্ডুপত্র মোচনচ্ছলে যেন অশ্রুপাত করিতেছে।

শকু। (স্মরণ করিয়া) পিতঃ! লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে সম্ভাষণ করি।

কণ্ব। জানি সেই লতার উপর তোমার সোদরস্নেহ আছে। এই সে দক্ষিণপার্শ্বে আছে।

শকু। বনজ্যোৎস্নে! তুমি সহকারের সহিত সমাগত হইলেও দূরপ্রসারিত শাখাবাহু দ্বারা আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর। আমি আজ অবধি তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি।

ক। আমি তোমার জন্য অগ্রে যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম তুমি স্বগুণে সেই আত্মসদৃশ স্বামী পাইয়াছ। আর এই নবমল্লিকা সহকারবৃক্ষের সহিত মিলিয়াছে। এক্ষণে তোমার ও ইহার জন্য আমার দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে। এইস্থান দিয়া চল।

শকু। (সখীদ্বয়ের প্রতি) সখি, আমি এই লতাটিকে তোমাদের দুজনের হাতে সঁপিয়া দিলাম।

সখী। আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে?

ক। অনসূয়ে কাঁদিও না, তোমরাই ত এখন শকুন্তলাকে প্রবোধ দিবে।

(সকলেই যাইতেছে)

শকু। এই উটজচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগী যখন ভালয় ভালয় প্রসব হইবে তখন তোমরা আমার নিকট লোক পাঠাইও। সে গিয়া আমাকে এই প্রিয়সম্বাদ দিবে।

ক। না, আমরা ইহা ভুলিব না।

শকু। (গতিব্যাঘাত দেখিয়া) কে আমার বস্ত্র আটকাইতেছে? (দেখিবার নিমিত্ত মুখ ফিরাইল)

ক। বৎসে! যাহার মুখ কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে তুমি ক্ষতশোধক ইঙ্গুদীতৈল-সেক করিতে, তুমি যাহাকে শ্যামাক ধান্যমুষ্টি দিয়া পোষণ করিয়াছ, সেই তোমার কৃতকপুত্র মৃগ তোমার অনুসরণ করিতেছে।

শকু। বৎস! আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি, তুমি কেন আমার অনুসরণ কর। তোমার জননী তোমায় প্রসব করিয়াই মরিয়া যায়, তুমি সেই জননীব্যতীত আমার যত্নে এত বড়টি হইয়াছ। এখন আমি আবার চলিলাম। এখন পিতাই তোমার ভাবনা ভাবিবেন। যাও ফের। (রোদন করিতে করিতে প্রস্থান)

ক। বাষ্প তোমার উন্নতপক্ষ্মযুক্ত নেত্রদ্বয়ের দর্শনব্যাপার নিরোধ করিতেছে। এই ভূমিভাগ উন্নতানত। বাষ্পাবরোধ হেতু ইহা সম্যক্ লক্ষিত না হওয়াতে তোমার পদস্খলন হইতেছে।

শার্ঙ্গরব। ভগবন্ শুনা যায় যে নদী বা সরোবর পর্য্যন্ত স্নিগ্ধব্যক্তিকে অনুগমন করা কর্ত্তব্য। এই অদূরে সরোবরতীর। যা বলিবার থাকে এখানে বলিয়া ফিরুন।

ক। ভাল, আইস আমরা এই ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় লই।

(সকলের উপবেশন)

ক। বহুমানাস্পদ দুষ্মন্তের নিকট বলিতে পারা যায় এমন কি কথা বলিয়া দিব। (চিন্তা)

শকু। সখি, দেখ, চক্রবাক্ নলিনীপত্রের অন্তরালে আছে। চক্রবাকী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সকাতরে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু আমি এতাবৎকাল আর্য্যপুত্রকে না দেখিয়া আছি। আমি দুষ্কর কার্য্য করিতেছি।

অনসূয়া। সখি, এমন কথা বলিও না। এই চক্রবাকীও প্রিয়ব্যতীত দীর্ঘতরা রজনীযাপন করিয়া থাকে। আশা অতি গুরুতর বিরহদুঃখও সহনীয় করিয়া দেয়।

ক। শার্ঙ্গরব, তুমি শকুন্তলাকে সম্মুখে রাখিয়া আমার বাক্যক্রমে সেই রাজাকে এইরূপ বলিবে।

শার্ঙ্গ। মহাশয় আজ্ঞা করুন।

ক। আমরা তপোধন, আমাদিগকে চিন্তা করিয়া, তোমার উচ্চবংশকে চিন্তা করিয়া, আর সুহৃৎস্বজনেরা যাহা কোন রূপে ঘটাইয়া দেয় নাই, শকুন্তলার সেই স্নেহপ্রবৃত্তি চিন্তা করিয়া তুমি ভার্য্যাগণের মধ্যে সমান আদরে ইহাঁকে দেখিবে। ভাগ্যে থাকে ইহা অপেক্ষা

অধিক হইবে, বধূবন্ধুগণের তাহা বলা উচিত হয় না।

শার্ঙ্গ। মহাশয়ের কথা গ্রহণ করিলাম।

ক। বৎসে! এখন তোমাকে কিছু উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। আমরা বনবাসী হইলেও লৌকিক ব্যাপার বুঝিয়া থাকি।

শার্ঙ্গ। বুদ্ধিমান্ লোকের কিছুই অজ্ঞাত থাকিতে পারে না।

ক। তুমি এ স্থান হইতে ভর্ত্তৃকুলে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিও, সপত্নীগণের প্রতি প্রিয়সখীবৎ ব্যবহার করিও, অপমানিত হইলেও পতির প্রতিকূলচারিণী হইও না, পরিচারকদিগের উপর অধিক অনুকূল হইও, এবং সৌভাগ্যকালে গর্ব্বিত হইও না। যুবতীরা এইরূপেই গৃহিণীপদ পায়। আর যাহারা ইহার বিপরীতাচরণ করে, তাহারা পতিকুলের যাতনাস্বরূপ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে গৌতমীই বা কি বলেন?

গৌ। বধূর প্রতি এইই উপদেশ। বাছা, এই সকল মনে রাখিও।

ক। বৎসে! তুমি আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর।

শকু। পিতঃ! প্রিয়ম্বদা প্রভৃতি সখীরা কি এ স্থান হইতেই ফিরিয়া যাইবে?

ক। বৎসে! প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়ারও বিবাহ দিতে হইবে। তথায় যাওয়া ইহাদের উচিত হয় না। গৌতমী তোমার সহিত যাইবেন।

শকু। (পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) আমি এখন তোমার অঙ্কচ্যুত হইয়া কিরূপে চন্দনবৃক্ষচ্ছিন্ন চন্দনশাখার ন্যায় বাঁচিয়া থাকিব?

ক। বৎসে! তুমি কেন এইরূপ কাতর হইতেছ। তুমি মহাকুলোৎপন্ন পতির স্পৃহণীয় গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার ঐশ্বর্য্যসম্ভারে দুর্ব্বহ গৃহকার্য্যে প্রতিক্ষণ ব্যস্ত থাকিব এবং পূর্ব্বদিক্ যেমন সূর্য্যকে প্রসব করে সেইরূপ অচিরাৎ এক পবিত্র পুত্র প্রসব করিয়া আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিতে পারিবে না।

শকু। (পিতৃচরণে প্রণাম করিলেন)

ক। আমার যাহা সংকল্প তোমার তাহাই হউক।

শকু। (সখীদিগের সন্নিহিত হইয়া) সখি, তোমরা দুজনে এককালেই আমায় আলিঙ্গন কর।

সখীদ্বয়। (আলিঙ্গন করিয়া) সখি, যদি সেই রাজা তোমায় চিনিতে না পারেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে এই তাঁহারই নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি দেখাইও।

শকু। আমি তোমাদের এই কথায় ভীত হইলাম।

সখীদ্বয়। ভয় পাইও না, স্নেহ অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

শার্ঙ্গ। বেলা দ্বিতীয় প্রহর, তোমরা সত্বর হও।

শকু। (আশ্রমাভিমুখী হইয়া) পিতঃ কবে আবার তপোবন দেখিব।

ক। শুন, তুমি বহুকাল যাবৎ এই সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী হইয়া, পুত্রকে নিষ্কণ্টকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুত্রন্যস্তপ্রজারক্ষণভার ভর্ত্তার সহিত এই শান্ত আশ্রমে পুনর্ব্বার বাস করিবে।

গৌ। বাছা, গমনকাল অতীত হইতেছে, পিতাকে ফিরাইয়া দাও। অথবা শকুন্তলা অনেকক্ষণ ধরিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিবে, তুমিই ফিরিয়া যাও।

ক। বৎসে! তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে।

শকু। (পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার শরীর তপশ্চর্য্যায় পীড়িত, অতএব আমার জন্য আর অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না।

ক। (দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক) বৎসে! তুমি পর্ণশালার দ্বারদেশে যে পুঁড়িধান্যের পূজোপহার দিয়াছিলে, তাহা হইতে এখন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। আমি যখন তা দেখ্‌ব তখন কিরূপে আমার শোকসম্বরণ হইবে!

(শকুন্তলা সহযাত্রিগণের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

আশ্রমপালিতা আশ্রমপ্রিয়া তাপসবালা চিরকালের জন্য আশ্রমত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। শকুন্তলা সেই পবিত্র আশ্রমের প্রাণস্বরূপ। তাঁহাকে গমনোদ্যতা দেখিয়া শকুন্তলা-পালিতা আশ্রমটী যেন শোকবিহ্বল হইয়া উঠিল। "মৃগযুগের মুখের কুশগ্রাস পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং লতাসকল পাণ্ডুপত্রমোচনচ্ছলে যেন অশ্রুপাত করিতেছে।" যাহাকে বাসস্থান হইতে বিদায় দিতে হইলে, সমস্ত বাসস্থানটী বিরহকাতর বলিয়া অনুভব হয়, সে যথার্থ ই সেই বাসস্থানের প্রাণ! আজ প্রিয়ম্বদা প্রভৃতির বোধ হইতেছে যে, পশু পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীর শান্তিময় আশ্রয়স্থল সেই পবিত্র আশ্রমটী প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে। আশ্রমপ্রাণা শকুন্তলাও যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছেন। তিনি যেদিকে চাহিতেছেন, সেইদিকেই তাঁহার স্বহস্তপ্রতিপালিত, তাঁহার সুমধুর স্নেহপরিপুষ্ট তরু, লতা, মৃগ, মৃগীসকল বিমর্ষভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কয়েক পদ গমন করিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। ব্যাকুলিতান্তঃকরণে বলিয়া উঠিলেন—'পিতঃ! লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে সম্ভাষণ করি।' পিতা জানিতেন যে তাঁহার আশ্রমের সকল পদার্থই তাঁহার শকুন্তলার প্রাণ এবং তাঁহার শকুন্তলা তাঁহার আশ্রমের সকল পদার্থের প্রাণ। তিনি বলিলেন—'আমি সেই লতার উপর তোমার সোদরস্নেহ আছে। এই যে দক্ষিণপার্শ্বে রহিয়াছে।' অমনি শকুন্তলা বিদীর্ণহৃদয়ে বলিলেন—'বনজ্যোৎস্নে! তুমি সহকারের সহিত সমাগত হইলেও দূরপ্রসারিত শাখাবাহুদ্বারা আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর, আমি আজ অবধি তোমার

ছাড়িয়া যাইতেছি!' পাঠক জানেন যে নবমল্লিকাটীকে শকুন্তলা বড়ই ভাল-বাসিতেন। জলসেচনকালে নবমল্লিকা-টীকে দেখিয়াই তিনি কল্পনাপূর্ণ স্নেহোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন—

হলা রমণীও্যা কৃখু কালো ইমস্স পা-দবমিহুণস্স রদিঅরো সম্বুত্তো জেণ ণব কুসুমজোব্বণা ণোমালিআ অঅং পি বদ্ধফলদাএ উঅভোঅক্খমো সহআরো॥

তাই আজ শকুন্তলা তাহাকে শুধু সম্ভাষণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। রমণীরত্ন রমণীরত্নের ন্যায় সখীদ্বয়কে বলিলেন—' সখি! আমি এই লতা টিকে তোমাদের দুজনের হাতে সঁপিয়া দিলাম!' সখীদ্বয় আকুলিতপ্রাণে বলিয়া ফেলিলেন—' আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে?' আমরাও যদি তখন সেখানে থাকিতাম তাহা হইলে প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার ন্যায় বিগলিতহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে বলিয়া ফেলিতাম—' আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে?' তার পর সকলে অগ্রসর হইতে লাগি-লেন। শকুন্তলার প্রাণ আরো ব্যাকু-লিত হইতে লাগিল। তাঁহার গর্ভমন্থরা মৃগীটীকে দেখিতে পাইলেন। পাইয়া স্নেহপূর্ণা বিগলিতপ্রাণা জননীর ন্যায় বলিলেন—' এই উটজচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগী যখন ভালয় ভালয় প্রসব হইবে, তখন তোমরা আমার নিকট লোক পাঠাইও, সে গিয়া আমাকে এই প্রিয়সম্বাদ দিবে।' আহা! ক্ষুদ্রবালিকার হৃদয় কতই ভালবাসিতে পারে, কত ভাবনাই ভাবিতে পারে! সে হৃদয় আজ কত যাতনাই সহ্য করিতেছে! পরক্ষণেই আবার কি যেন তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ হইতে গতিরোধ করিতে লাগিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, যে মৃগটীর মুখ কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে তিনি সযত্নে ক্ষতশোধক ইঙ্গুদীতৈলসেক করিতেন এবং যাহাকে শ্যামাকধান্যমুষ্টি দিয়া পোষণ করিয়াছেন সেই পুত্রাধিক-প্রিয় মৃগটী মুখাগ্র দ্বারা তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে! স্নেহময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন। বনপশু যাহার স্নেহে মুগ্ধ, যাহার বিরহে আকুলিতপ্রাণ, তাহার ক্রন্দন দেখিলে সমস্ত বিশ্বহৃদয় কাঁদিয়া উঠে—ফাটিয়া যায়—গলিয়া বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাইয়াও যাওয়া হইতেছে না দেখিয়া শার্ঙ্গরব বলিলেন—' ভগবন্, শুনা যায় যে নদী বা সরোবর পর্য্যন্ত প্রিয়ব্যক্তিকে অনু-গমন করা কর্ত্তব্য। এই অদূরে সরোবরতীর, যা বলিবার থাকে এখানে বলিয়া ফিরুন।' তখন সকলে বটবৃক্ষ-চ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিলে পর মহর্ষি কণ্ব দুষ্মন্তকে যাহা বলিবার তাহা শার্ঙ্গরবকে বলিয়া দিলেন, শকুন্তলাকে যাহা বলিবার তাহা শকুন্ত-লাকে বলিলেন। বলিয়া শকুন্তলাকে বলিলেন—' বৎসে! তুমি আমাকে এবং সখীদিগকে আলিঙ্গন কর।' শকুন্তলা

জানিতেন যে কণ্ব তাঁহার সমভিব্যাহারী হইবেন না। কিন্তু প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়াকে ফেলিয়া যাইতে হইবে, তাহা তিনি মনেও ভাবেন নাই। এখন সহসা বুঝিলেন যে তাও তাঁহাকে করিতে হইবে। বুঝিয়া কাতরতম অপেক্ষা কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—পিতঃ প্রিয়ম্বদা প্রভৃতি সখীরা কি এস্থান হইতে ফিরিয়া যাইবেন? উত্তর প্রতিকূল হইল। কিন্তু সুশীলতমা শকুন্তলা বর্দ্ধিতযন্ত্রণা চাপিয়া রাখিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া বিহ্বলহৃদয়ে পিতাকে আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া সখীদ্বয়ের কাছে গিয়া বলিলেন, সখি! তোমরা দুজনে এককালেই আমায় আলিঙ্গন কর! তিনহৃদয়ে একহৃদয়, একটির পর আর একটি ভাল লাগিবে কেন? তিনটি সন্তপ্তহৃদয় এক হইয়া গেল! তাই দেখিয়া সমস্ত বিশ্বহৃদয় সেই আশ্চর্য্য হৃদয়কুণ্ডে গলিয়া পড়িল! সমস্ত বিশ্বমণ্ডল হৃদয়ময় হইয়া সংক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় উদ্বেলিত হইতে লাগিল! হৃদয়ময়ি শকুন্তলে, যেখানে তুমি সেখানে হৃদয় ভিন্ন আর কিছুই থাকিতে পারে না। তোমার কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মন্ত্রমুগ্ধ! যাওয়া ত আর হয় না। শার্ঙ্গরব বলিয়া দিলেন যে প্রখররবি মধ্যগগনে উঠিয়াছেন। তখন যেন চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া, একান্তই যাইতে হইবে বুঝিয়া, আশ্রমের দিকে একবার শেষদৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতিপরিমিত যন্ত্রণাকাতরস্বরে শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন—'পিতঃ কবে আবার তপোবন দেখিব!' কাতরহৃদয়ের শেষ নিশ্বাস—সংসারত্যাগীর শেষ মায়ার ক্রন্দন—জলমগ্নপ্রায় দুর্ভাগার শেষ চীৎকার—সংসারে ইহার অপেক্ষা যন্ত্রণা আর নাই। এ যন্ত্রণা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়, জীবাত্মা শিহরিয়া উঠে! কথাটি কণ্বের হৃদয়ে বাজিল। তিনি অনেক কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তখন গৌতমী ব্যাঘাত বুঝিয়া বলিলেন—'বাছা! গমনকাল অতীত হইতেছে, পিতাকে ফিরাইয়া দেও। অথবা শকুন্তলা অনেকক্ষণ ধরিয়া পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিবে, তুমিই ফিরিয়া যাও।' জ্ঞানময় তাপসপ্রধান হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। সহসা যেন জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন—'বৎসে! তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে।' ধর্ম্মানুরাগিণী তাপসবালা পিতার তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে শুনিয়া আপনার সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার কোমলহৃদয় বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তিনি পিতাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—'তোমার শরীর তপশ্চর্য্যায় পীড়িত; অতএব আমার জন্য আর অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না।' তাপসপ্রধান দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন—'বৎসে! তুমি পর্ণশালার দ্বারদেশে যে খুঁড়িধানের পূজোপহার দিয়াছিলে তাহা হইতে এখন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে।'

আমি যখন তা দেখ্‌ব, তখন কিরূপে আমার শোকসম্বরণ হইবে!' বিগলিত-হৃদয়া ক্ষুদ্রবালিকা এখন দৃঢ়মনা হইয়া সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন; দৃঢ়মনা পুরুষবর এখন বিগলিতহৃদয়া ক্ষুদ্রবালিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ধন্য রমণীহৃদয়! সে হৃদয়ের কাছে জগতের ইন্দ্রতুল্য পুরুষও অবনত; জগতের তাপসকুলাচার্য্যও বিজিত! সে হৃদয় অতিমাত্র কোমল হইয়াও অতিমাত্র দৃঢ়! এ রহস্য কে বুঝাইবে! তার পর সহযাত্রিগণের সহিত শকুন্তলা নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কাশ্যপাশ্রম প্রাণহীন হইল! হিমালয়প্রদেশের বন-জ্যোৎস্না ডুবিল! যে কৌশলে মহাকবি এই চমৎকার বিদায়-দৃশ্যের করুণরসোদ্দীপকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা মহাকবি সেক্সপীয়রপ্রদর্শিত এণ্টনীর বক্তৃতা-রচনা-কৌশল অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

শকুন্তলা স্নেহময়ী। কিন্তু সে স্নেহের একটি প্রণালী আছে। পুরুষের স্নেহ সে প্রণালীর অনুগামী নয়। কণ্ব আশ্রমের তরুলতা মৃগ প্রভৃতি সকলকেই ভালবাসেন। আমরা অনসূয়ার মুখে শুনিয়াছি যে তিনিই শকুন্তলাকে জলসেচনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। দুষ্মন্ত তাঁহার সমস্ত সাম্রাজ্যের প্রজাদিগকে ভালবাসেন। মৃতবণিকের উত্তরাধিকারিত্ব নিরূপণোপলক্ষে তিনি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন—

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন
বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি
ঘুষ্যতাম্‌॥

কে কোথায় কবে বন্ধুহীন হইবে, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু যেই যখন বন্ধুহীন হইবে, দুষ্মন্ত তাহার বন্ধুস্থানীয় হইবেন। এ স্নেহের পাত্রবিশেষ নাই। এ স্নেহ-প্রকাশের জন্য পাত্রবিশেষ দেখিবার প্রয়োজন নাই, পাত্রবিশেষ নিকটে রাখিবার প্রয়োজন নাই। এ স্নেহ শ্রেণীগত, পাত্রবিশেষনিহিত নয়। কষ্ট না দেখিতে পাইলেও এ স্নেহের বিকাশ আছে। আর এ স্নেহ পরেরদ্বারা কার্য্য করিয়াই পরিতুষ্ট হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতি-প্রতিম শকুন্তলার স্নেহ এ জাতীয় নয়। সে স্নেহের পাত্র কল্পনায় থাকে না, নয়নপথের বহির্ভূত থাকে না। সে স্নেহের পাত্র কে? সে স্নেহের পাত্র শকুন্তলা যে আশ্রমে বাস করেন সেই আশ্রমের তরুলতা, সেই আশ্রমের মৃগ-পক্ষী, সেই আশ্রমের স্ত্রীপুরুষ। সে স্নেহের অবয়ব কিরূপ? বলিতে গেলে সে স্নেহ সাকার। শকুন্তলার কাছে আশ্রমের তরুলতাগুলি ভাই ভগিনী, মৃগ মৃগীগুলি পুত্রকন্যা, পুষ্পগুলি চন্দ্র সূর্য্য। তিনি কোন লতাটীকে বন-জ্যোৎস্না বলিয়া ডাকেন, কোন লতা-টীকে না জানি আর কি বলিয়া ডাকেন। পুরুষের স্নেহ এ পদ্ধতির নয়। বলিতে গেলে সে স্নেহ নিরাকার। আর শকু-

স্তলা যাহাকে স্নেহ করেন, তাঁহাকে কি রকমে স্নেহ করেন? তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহাদের আশ্রমের একটি মৃগী একটি বৎস প্রসব করিয়াই মরিয়া যায়। তিনি সেই মৃগশাবকটীর জননীস্বরূপ হইয়া তাহাকে ক্ষুধাতে খাদ্য খাওয়াইয়া, তৃষ্ণায় জলপান করাইয়া, রোগে শুশ্রূষা করিয়া বড় করিয়াছিলেন। তিনি যখন জলসেচন করিতে যান, তখন তাঁহার বোধ হয় যে আতপতাপিতা তরুলতাগুলি তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। মহর্ষি কণ্ব বলেন—

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মা-
স্বসিক্তেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন
যা পল্লবম্।
আদৌ বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা
ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনু-
জ্ঞায়তাম্॥

এখানে স্ত্রীজাতির আর একরকম কষ্টসহিষ্ণুতা দেখা যাইতেছে। পুরুষের শারীরিক ক্লেশ দেখিতে পাওয়া যায়; রমণীর শারীরিক ক্লেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। দূরপথগমন, রৌদ্রে ভ্রমণ, অবিশ্রান্ত হস্তপদসঞ্চালন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ কার্য্যে পুরুষের শারীরিক কষ্টসহিষ্ণুতার প্রকাশ। ক্ষুধায় উপবাস, তৃষ্ণায় পিপাসাক্লেশভোগ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় রমণীর কষ্টসহিষ্ণুতা। দুইপ্রকার কষ্টসহিষ্ণুতার মধ্যে রমণীর কষ্টসহিষ্ণুতাই গুরুতর। উত্তমরূপে পানাহার করিয়া কষ্টসাধ্য কার্য্য করা অপেক্ষা পানাহার না করিয়া কষ্টসাধ্য কার্য্য করা অধিক ক্লেশকর। কিন্তু পুরুষাপেক্ষা কষ্টসহিষ্ণু হইয়াও রমণীর কষ্ট অপ্রকাশ। যে কষ্টে জগৎ রক্ষিত হয়, সে কষ্ট জগৎ দেখিতে পায় না। রমণীর প্রকৃত বীরত্ব, রমণীর প্রকৃত মহত্ত্ব নিভৃতে নিস্তব্ধভাবে জগতের মহৎ কার্য্যসাধনে নিয়ত নিযুক্ত। কিন্তু খুঁজিয়া পাড়িয়া না দেখিলে জগৎ সে বীরত্ব এবং সে মহত্ত্ব দেখিতে পায় না। সে মহত্ত্ব যেন অনন্তকাল খুঁজিয়া পাড়িয়াই লইতে হয়। রমণীরত্ন যেন অনন্তকাল নিভৃতই থাকে! সে রত্ন জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে আনিলে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ, নিষ্ফল, ‘মেকো' হইয়া পড়িবে। জনষ্টুয়ার্ট মিলের মত অবলম্বন করিয়া কেহ যেন পৃথিবীকে মায়াশূন্য, হৃদয়শূন্য, ধাত্রীশূন্য, জননীশূন্য না করেন।

একবার একটি মৃগশাবক তাহার জননীকে দেখিতে না পাইয়া কাতরভাবে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিয়া প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে বলিলেন,

অণসূএ অহ এসো ইদো দিণ্ণদিট্ঠী উস্সুও মিঅপোদও মাদরং অণ্ণেসদি এহি সংজোএম ণং।

* এই বলিয়া সেই মৃগশাবকটীকে তাহার মার কাছে দিতে গেলেন। শকুন্তলাও এইরূপ করেন।

এখন বুঝা যাইতেছে যে, রমণীর

অন্তর্লীনতাও যেমন প্রগাঢ়, বাহ্যবিলীনতাও তেমনি প্রগাঢ়। রমণী যেমন বাহ্যজগৎ ভুলিয়া আপনাতে মিশিতে পারেন, তেমনি আপনাকে ভুলিয়া বাহ্যজগতেও মিশিতে পারেন। স্নেহময়ী রমণী স্নেহের বস্তু পাইলে স্বয়ং তাহার শুশ্রূষা করেন, স্বয়ং তাহাকে লালন-পালন করেন, স্বয়ং তাহাতে মিশিয়া যান। পুরুষের স্নেহ বস্তুবিশেষন্যস্ত নয়; পুরুষ রমণীর ন্যায় স্নেহের বস্তুকে 'কোলে পিঠে' করিয়া রাখেন না; স্নেহের বস্তুর জন্য নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যান না, রাত্রিকে দিবা করেন না, দিবাকে রাত্রি করেন না; স্নেহের বস্তুতে লীন হন না। পুরুষের স্নেহ মনে মনে থাকে; রমণীর স্নেহ বস্তুতে থাকে। পুরুষের স্নেহ abstract নিহিত; রমণীর স্নেহ concrete নিহিত। পুরুষের স্নেহ অন্তর্জগৎনিবদ্ধ; রমণীর স্নেহ বাহ্যজগৎলিপ্ত। এই নিমিত্তই রমণীকে জগদ্ধাত্রী বলে। এই নিমিত্তই রমণী শিশুর ধাত্রী, রোগীর চিকিৎসক, আতুরের বন্ধু, জগতের পালয়িত্রী। এই নিমিত্তই ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল (Florence Nightingale;) এই নিমিত্তই কৃপাময়ী-ভগিনীসম্প্রদায় (sisters of mercy)। পূর্ব্বেও দেখিয়াছি এখনও দেখিতেছি, রমণীহৃদয় সাকারপ্রিয়, জড়ানুরক্ত। সেইজন্য রমণীমণ্ডলে পৌত্তলিকধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রবল। সেইজন্য ১৭৯৩ সালের ফরাসিবিপ্লবে ফরাসীদার্শনিকেরা মাদাম রোলেনের শিষ্য হইয়া বিপ্লবের পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। হৃদয়ের অতি উৎকৃষ্টভাব সকল স্ত্রীজাতির মনে শুধু ভাবরূপে থাকে না; বস্তুবিশেষের সহিত সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে। রমণীর আধ্যাত্মিকতা জড়জগৎজড়িত এবং জড়জগৎসাপেক্ষ। এই নিমিত্ত রমণীর স্নেহ সর্ব্বদাই কার্য্যে পরিণত হয়। জগতে 'সেণ্টিমেণ্টাল' রমণী নাই বলিলেই হয়।

কালিদাসের শকুন্তলা সেক্ষপীয়রের পোর্শিয়া, রোজালিন্দ কি ইজাবেলার ন্যায় প্রখরবুদ্ধি নন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় তিনি সামান্য হিসাবে বুদ্ধিমতী। তিনি পোর্শিয়ার ন্যায় নৈয়ায়িক নন, ইজাবেলার ন্যায় নীতিশাস্ত্রবেত্তাও নন। আমাদের বোধ হয় যে তাঁহার বয়সে এবং তাঁহার অবস্থাতে সেরকম হইলে ভালও হইত না। আমাদের আরও বোধ হয় যে কালিদাস শকুন্তলাকে সাধারণ স্ত্রীজাতির আদর্শরূপে চিত্রিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে হৃদয়প্রধান করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির মধ্যে দুই চারিটী জ্ঞানপ্রধান থাকে বটে। কিন্তু সে দুই চারিটী স্ত্রীপ্রকৃতির নিয়মবহির্ভূত। জ্ঞানপ্রধান হইতে হইলে রমণীকে প্রায়ই রমণীপদ এবং রমণীধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়। মিস্ মার্টিনো তাঁহার স্বরচিত জীবনীতে বলিয়াছেন যে, রমণী যদি পণ্ডিতা হইতে চান তবে তিনি যেন সংসারাশ্রম প্রবেশ না করেন।

আর যেখানে রমণী সংসারাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া পণ্ডিতা হইবার উদ্দেশে যাবজ্জীবন শাস্ত্রচর্চ্চা করেন, সেখানেও রমণীকে বড় একটা পূর্ণমনোরথ দেখা যায় না*।

কিন্তু শকুন্তলার স্ত্রীরত্নোপযোগী বুদ্ধি যাহা আছে তাহা ঠিক পুরুষের বুদ্ধির মতন নয়। পুরুষের বুদ্ধি বিচারশক্তিমূলক। শকুন্তলার বুদ্ধি সে রকমের নয়। আশ্রমের নিভৃতপ্রদেশে দুষ্মন্ত যখন তাঁহার হস্ত ধরিবার উপক্রম করেন তখন তিনি বারম্বার তাঁহাকে এই বলিয়া নিষেধ করেন যে, স্বজন এবং গুরুজনের সম্মতি ব্যতীত আমি আত্মসমর্পণে অক্ষম। জ্ঞানপ্রধান দুষ্মন্ত যুক্তিদ্বারা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন যে, গুরুজনকে না জানাইয়াও তিনি আত্মসমর্পণ করিতে পারেন। ক্ষুদ্রবুদ্ধি শকুন্তলা সে যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন না, খণ্ডন করিবার চেষ্টাও করিলেন না, তথাপি গুরুজনের নাম করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন। যিনি অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িয়াছেন তিনি জানেন যে জ্ঞানপ্রধান দুষ্মন্ত ঠিক মীমাংসা করেন নাই; ক্ষুদ্রবুদ্ধি শকুন্তলা ঠিক মীমাংসা করিয়াছিলেন। এ রহস্যের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই,—দুষ্মন্ত বিচারশক্তি সহকারে ঐতিহাসিক প্রথা ধরিয়া মীমাংসা করিয়াছিলেন; শকুন্তলা উন্নতমনা ধর্ম্মানুরাগিণী রমণীরত্নের নৈসর্গিক সৎপ্রবৃত্তির বলে মীমাংসা করিয়াছিলেন। দুষ্মন্তের মীমাংসা বিচারশক্তিমূলক; শকুন্তলার মীমাংসা উন্নতহৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র। অনেক প্রধান প্রধান ইয়ুরোপীয় দার্শনিক এখন বলিয়া থাকেন যে, পুরুষের জ্ঞান বিচারমূলক; রমণীর জ্ঞান রমণীহৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের 'লিবর্টি' নামক প্রবন্ধের ভূমিকায় এই কথা একরকম স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। কালিদাসের শকুন্তলা এই কথার একটি প্রমাণ।

শকুন্তলাচরিত্রের সমালোচনায় আমরা যাহা যাহা পাইলাম তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

১। পুরুষের শরীর বলিষ্ঠ; রমণীর শরীর কোমল—রমণীর শরীর নাই বলিলেই হয়।

২। পুরুষ শারীরিক বলে কষ্টসহিষ্ণু; রমণী হৃদয়ের বলে কষ্টসহিষ্ণু। কষ্টসহিষ্ণুতায় রমণী পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৩। কর্ম্মশীলতা পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, রমণীর হৃদয়ের অবস্থাসাপেক্ষ ধর্ম্ম।

৪। পুরুষ জ্ঞানে এবং শারীরিক বলে রমণীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; রমণী হৃদয়ের বলে পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষচরিত্র বিস্তারগুণবিশিষ্ট; রমণীচরিত্র গম্ভীরতা-

* অহিফেনসেবক শ্রীশ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় অহিফেনের নেশায় স্ত্রীজাতির বুদ্ধিকে নারিকেলের মালার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি সে মালা কখন আধখানার বেশী দেখেন নাই

গুণবিশিষ্ট। পুরুষের অন্তর্লীনতা এবং বাহ্যবিলীনতা কম; রমণীর অন্তর্লীনতা এবং বাহ্যবিলীনতা অপরিমেয়।

৫। রমণীর আধ্যাত্মিকতা পুরুষের আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু পুরুষের আধ্যাত্মিকতা অনেকটা স্বাধীন; রমণীর আধ্যাত্মিকতা সম্পূর্ণরূপে জড়জগৎসাপেক্ষ।

৬। পুরুষের বুদ্ধি বিচারশক্তির ফল; রমণীর বুদ্ধি হৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র।

৭। রমণী বৈপরীত্যের আধার—কোমল হইয়াও কঠিন, দুর্ব্বল হইয়াও বলিষ্ঠা, শ্রমকাতর হইয়াও কষ্টসহিষ্ণু, নরম হইয়াও দৃঢ়, বুদ্ধিমতী হইয়াও বিচারশক্তিহীন, আধ্যাত্মিক হইয়াও জড়জগৎসাপেক্ষ। জগতে রমণীর ন্যায় রহস্য আর নাই।

স্ত্রীপ্রকৃতির এত উজ্জ্বল, প্রশস্ত এবং প্রগাঢ় চিত্র কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল ভিন্ন আর কোন নাটকে নাই। একটি সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া এত বড় ছবিও অন্য কোন কবি তুলিতে পারেন নাই। জগতের নাটককারদিগের মধ্যে কালিদাস অদ্বিতীয় শিল্পী। শিল্প-প্রতিভায় সেক্সপীয়রও তাঁহার সমকক্ষ নন।

কালেজীশিক্ষা।

আমরা কালেজে যে শিক্ষা পাই সে শিক্ষা কোন কাজেরই নহে। উহা না একমুখীশিক্ষা না সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা। উহা যে একমুখীশিক্ষা নহে তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ উহাতে আমাদের কোন বিষয়েই সম্পূর্ণ শিক্ষা দেয় না। উহা সর্ব্বতোমুখী শিক্ষাও নহে। কারণ উহাতে শারীরিক শিক্ষার নামও নাই, যাহাতে হৃদয়বৃত্তির উন্নতি হয় উহাতে তাহার কিছুই নাই, যাহাতে ইচ্ছাশক্তি বা কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি হয় তাহাও উহাতে নাই। উহাতে আছে শুদ্ধ কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা তাহাও উচ্চতর বৃত্তিসমূহের নহে। প্রধানতঃ কেবল স্মরণশক্তির উন্নতির দিকেই অধিক দৃষ্টি।

সত্য বটে এক্ষণে সর্ব্বত্র জিম্নাসিয়ম হইয়াছে কিন্তু তাহার উন্নতি নাই। কর্ত্তৃপক্ষের তাহাতে দৃষ্টি নাই। সত্য বটে স্কুলে কাব্যপাঠ হয় কিন্তু তাহা হৃদয়বৃত্তিসমূহের পরিচালনার জন্য নহে শুদ্ধ ভাষাশিক্ষার জন্য। আর বই পড়িয়া যে হৃদয়বৃত্তির পরিচালনা সেও বিড়ম্বনা মাত্র। ইচ্ছা বা কর্ম্মক্ষমতার মধ্যে আমাদের থাকে পাশকরা সুতরাং তাহা ভিন্ন অন্যবিষয়ে আমাদের কর্ম্মক্ষমতা বড় একটা নাই।

যাহা একটু আমরা কালেজে শিখি

তাহাও শিখিবার উপায়ও ভাল নহে। আমরা সব শিখি বই পড়িয়া। বিধাতা যেন আমাদের চক্ষুনামক একমাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন অপর-ইন্দ্রিয় যেন কোন কাজেই আসে না। যে সকল জিনিস ঘরের দ্বারে আছে তা-হাও আমরা কেতাব পড়িয়া শিখিতে যাই। দেখিয়া ও শুনিয়া আমরা কিছুই শিখি না। যে জিনিস একবার দেখিলে তৎক্ষণাৎ শিখিব এবং জন্মে ভুলিতে পারিব না, সেই জিনিস আমাদের কেতাবে পড়িয়া তিনমাসে বুঝিতে হইবে ও মুখস্থ-করিয়া পরীক্ষা পর্য্যন্ত মনে রাখিতে হইবে। শিখিতে আমোদ হয় এমন করিয়া কোন শাস্ত্র বা কোন বিষয়ই শিখান হয় না। তাহার উপর যদি আবার মাষ্টারে যত্ন করিয়া বুঝাইয়া দেন তাহা হইলেও হয়। তাহা না হইয়া মাষ্টারগণ (একে ত ডাওনিসি-য়সের বংশ) তাহাতে আবার ইংরেজী পড়িয়া রুক্ষমেজাজ হইয়াছে। সাহেব প্রোফেসরদিগের ত কথাই নাই। অনেকে বলেন তুমি বুঝ আর নাই বুঝ আমার নাম বাহির হইয়া গিয়াছে, আ-মার মাসিক বেতন বাড়িবে বই কমিবে না।

যদি নিজভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেকটা সহজে হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন অতি দূরবর্ত্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটি মোটামুটী শিখিতে রোজ চারি ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আটদশ বৎসর লাগে। ভাষা শিক্ষাটা অথচ কিছুই নহে, ভাষাশিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিস শিখিবার উপায়—উহাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র—সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময়ব্যয় ও এত পরিশ্রম। তবুও কি সে ভাষা বুঝা যায়? তাহার যো কি! বাঙ্গালা হইলে এই কেতাবী জিনিসই আমরা কত অধিক পরিমাণে শিখিতাম। ইংরেজীতে আ-মরা কখন কথা কহি না। এখন আমরা ইংরেজীতে চিঠিপত্রও বড় লিখি না অথচ আমাদের জ্ঞান-উপার্জ্জনের এক মাত্র দ্বার ইংরেজী। ইংরেজী আমাদের রাজভাষা। যাঁহারা ইংরেজের সংসর্গে আসিবেন তাঁহাদের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন। তাই বলিয়া ছয় কোটী ছয়ষট্টি লক্ষ লোক ইংরেজী পড়িয়া মরিবে কেন? বলিবে, ইংরেজ যখন রাজা, সক-লেই কোন না কোন সময়ে ইংরেজের সংসর্গে আসিবেন। স্বীকার। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কর ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরেজীতে অঙ্ক কসিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়া ইংরেজী শিখ না কেন? ইংরেজী দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন? আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরেজিমুখে শিখিতে হয়।

যেরূপ চলিতেছে ইহাতে জ্ঞান অল্প হয়

ইংরেজি শিক্ষা অল্প হয় আর পরিশ্রম অনন্ত করিতে হয়। আর শিক্ষিতদিগের সহিত অশিক্ষিতের মনোমিল থাকে না; শিক্ষিতগণ যেন একটি নূতন জাতি হইয়া দাঁড়ান। অত্যন্ত অধিকপরিমাণে শ্রম করিয়া অতি অল্প জ্ঞানলাভ হয়।

যাও বা শিখি তাহাও শিখিবার জন্য শিখি না; জ্ঞানঅর্জ্জনের জন্য শিখি না। শিখি এক্জামিন পাশ করিবার জন্য। আচ্ছা করিয়া পড়ি; যেমন প্রশ্ন দিক, ঠকাইতে পারিবে না এ জন্য পড়ি না, কেমন প্রশ্ন দিবে বাছিয়া বাছিয়া তাহাই পড়ি, অনেক সময়ে মাষ্টার মহাশয়েরাও তাহাই পড়ান। ইহার এক ফল এই যে যখন এক্জামিন নাই তখন পড়ি না, এক্জামিনের সময় রাত দিন পড়ি। লাভ এই হয় কতকগুলা গুরুপাক জিনিস উদরস্থ হয়, সব হজম হয় না। রাতজেগে যাহা পাঠ করা গেল, তাহা মাসখানেকের মধ্যে ভুলিয়া যাই।

অতএব লেখা পড়ার যে উদ্দেশ্য —মনোবৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি—তাহা একেবারেই হয় না। যে চিন্তাশক্তিবলে শিক্ষিতদিগের দ্বারা সমাজের উপকার হইবে তাহা হয় না। চিন্তা করিবার শক্তি নাই অথচ জ্ঞান আমি বড় বুঝি, ইহার অনেক দোষ, কালেজী শিক্ষায় সে দোষগুলি সমুদয়ই ঘটে। যদিও চিন্তাশক্তি দুইচারিজনের জন্মে তাহাও শূন্যের উপরে। যদি একরূপ হইত, তবে এইরূপ ফল হইত। কিন্তু চিন্তা abstractএর উপর। যাহা আছে তাহার উপর নহে। যাহাই হউক, তবুও চিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হইলেই সেটি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা ত হয় না।

অতএব কালেজী শিক্ষায় চিন্তাশক্তি উত্তেজিত হয় না, উহা শুদ্ধ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য, এজন্য উহাতে জ্ঞান-অর্জ্জন হয় না। জ্ঞান-অর্জ্জন একটু আধটু হইলেও ইংরেজীমুখে অর্জ্জন করিতে হয় বলিয়া সেই একটুকুতেই অনেক শ্রম লাগে, যাহা শিখি তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তিও দুই পাঁচটার মাত্র চালনা হয়, হৃদয়বৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তির কিছুই হয় না। কোন একটি বিষয়ও সম্পূর্ণরূপ শিক্ষা হয় না; অতএব উহাদ্বারা পরিণামে যে করিয়া খাইবে তাহাও হয় না। কালেজে না একমুখী শিক্ষা হয়, না সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা হয়।

কালেজের ছেলেরা প্রায় পিতামাতা স্বজন প্রভৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাসায় অথবা হিন্দু-হষ্টেলে বাস করে, সুতরাং সমাজে থাকিলে ও বাড়ীতে থাকিলে যে সকল মনোবৃত্তি পুষ্ট হয় তাহার কিছুই হয় না, স্নেহ, মমতা, বিশেষ ভক্তি একেবারেই থাকে না। বাড়ী বা সমাজে যে সকল অভিজ্ঞতালাভ হয়, ইহাদের তাহার কিছুই হয় না। অন্য লোকে কিসে মনে ব্যথা পাইবে, তাহা একেবারেই জ্ঞান থাকে না; অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তিসমূহের

কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি হয় না। শুদ্ধ যদি বাপ মা বা গুরুজনের চোকে, চোকে থাকিত, তাহা হইলেই এ সকল লাভগুলি অবশ্যই হইত। সংসারে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে অনেক কষ্টে এই সকলগুলি শিখিতে হয়। অনেকে হয় ত অনেক জিনিস একেবারেই শিখিতে পারে না। অশিক্ষিতের সহিত সমবেদনা প্রায়ই থাকে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতএব কালেজীশিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা নহে। প্রথম, কালেজে যাহা শিক্ষা হওয়া উচিত, তাহাই আমাদের কালেজে অল্প শিক্ষা হয়। সকল শাস্ত্রের কিছু কিছু পড়ান একেবারেই হয় না। কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম হয়। একজন কর্ত্তার খেয়াল হইল, জরীপবিদ্যা পড়ান আরম্ভ হইল, কিন্তু ভূগোলবিদ্যা উঠিয়া গেল। ভূগোল পড়িলে দেশীয় কুসংস্কার যত শীঘ্র অপনীত হয় এত আর কিছুতেই হয় না। সেই ভূগোল উঠিয়া গেল। আর একজন বলিলেন, ছয় বিষয়ে পরীক্ষা ছেলেরা পারিবে কেন? পাঁচ কর। আর একজন বলিলেন, পাঁচেও বেশী হয় তিন কর। সুতরাং সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হয় না। শুদ্ধ কেতাব পড়িয়া শিখিতে হইলে ছয়টা বিষয় শিক্ষা কঠিন হয় বটে, কিন্তু যদি এক এক বিষয়ে উৎকৃষ্ট অধ্যাপকের নিকট সেই সেই বিষয় শিক্ষা হয় ও কতক দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে পারে তবে অনেক জিনিস অল্পে শিক্ষা হইতে পারে।

কালেজী শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইলে, উহার সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্য শিক্ষা চাই, সামাজিক শিক্ষা চাই। প্রাক্‌টিকল শিক্ষা চাই, হাতে হাতীয়ারে অনেক কাজ করা চাই। ঠেকিয়া শিখা চাই, প্রোফেশন শিক্ষা চাই।

আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে আমাদের দেশীয় ভদ্রসন্তানগণ যে শিক্ষা পাইত, সে শিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা। কালেজী শিক্ষার সহিত তুলনা করিলে কেতাবী জিনিস তাহারা কিছুই শিখিত না। তাহারা না ভূগোল শিখিত, না ইতিহাস জানিত, না বিজ্ঞান জানিত, না গণিত জানিত। কেতাবী বিষয়ে তাহাদের শিক্ষা অল্প থাকিলেও তাহারা অন্যান্য সকল বিষয়ে অল্প পরিশ্রমে আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক শিখিত। কেমন করিয়া নম্র বিনীত হইতে হয়, গুরুজনের প্রতি ভক্তি করিতে হয়, কেমন করিয়া অল্প সময়, শ্রম ও অর্থব্যয়ে সুন্দররূপে সংসার চালাইতে হয়, গৃহস্থালী করিতে হয়, তাহা সুন্দররূপে শিখিত। পিতার সহিত সে সর্ব্বত্র ফিরিত, সকল জিনিস দেখিত, সকল সমাজে যাইত, সে যেন জন্মিয়া অবধি মানুষ হইবার জন্য এপ্রেণ্টিস্ বা শিক্ষানবীশ থাকিত। এখনকার মত সংসার হইতে, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অরণ্যবাস করিতে হইত না। যদিও কেতাবী শিক্ষা অল্প হইত, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষিত লোকের সংসর্গে আসিয়া

সে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আপনা আপনি শিখিত। মোটামুটি সে অনেক বিষয় জানিত। সেকালে জ্ঞানের উন্নতি ছিল না। জ্ঞানসীমা এত বর্দ্ধিত হয় নাই, সুতরাং প্রাচীনকালে অর্থাৎ সমাজের প্রথম অবস্থায় যেমন মোটামুটি বিদ্যা ছিল তখনও ঠিক তেমনি ছিল; আর সেই মোটামুটি জিনিস অধিকাংশ ভদ্রসন্তান জানিত ও শিখিত। এখনকার ছেলে যদি লেখা পড়া করিতে গেল অমনি বাপ মা বলিয়া বসেন "রাম আমার সংসারের কোন কাজই করিবে না, এ কর্ম্ম আমার রামকে করিতে দিও না, রামের সময় নষ্ট হবে।" রাম শুদ্ধ লেখা পড়া করিয়াই সময় কাটাইলেন। যখন কালেজ হইতে বাহির হইলেন, একটী গাছবানর বাহির হইলেন। যদি ভাল চাকরী পাইলেন, কি মেলা টাকা রোজকার করিলেন এক রকম চলিয়া গেল, নহিলে দাঁড়িয়ে সর্ব্বনাশ। সমাজে গেলেন যদি, যেখানে দশজন লোক আছে সেখানে গেলেন যদি, একপাশে বসিয়া রহিলেন। জানেন না কেমন করিয়া লোকের সঙ্গে মিশিতে হয়, মিশিতে পারিলেন না। লোকে জানিল রামাটা লেখা পড়া শিখিলে কি হয়, বড় অহঙ্কারী নরলোকের সঙ্গে কথাই কহেন না। আমরা রামকে বেশ জানি, রামের অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই, শুদ্ধ শিক্ষার দোষে বেচারার নিন্দা হইল।

কালেজী শিক্ষার দোষপ্রদর্শন অনেক করা গেল। কালেজী শিক্ষার অনেক উৎকৃষ্ট গুণ আছে বলিয়াই আমরা উহার দোষপ্রদর্শনে এত যত্নবান্ হইয়াছি। আমাদের দেশীয় কালেজী শিক্ষার প্রধান গুণ এই যে উহাতে স্বাধীনচিন্তাশক্তি উদ্রেকের যেমন সুবিধা এমন আর কিছুতেই নাই। সামাজিক অত্যাচারে, সাংসারিক (পিতৃমাতৃকৃত) অত্যাচারে, শিক্ষকদিগের অত্যাচারে চিন্তাশক্তির শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না; আমাদের কালেজে এ তিনের একটিও নাই। আমাদের কালেজের ছাত্রগণের কুসংস্কার যত অল্প এত আর বোধ হয় কোথাও নাই। কিন্তু কালেজী শিক্ষার গুণকীর্ত্তন আমাদের আবশ্যক নাই, উহার শত দোষসত্ত্বেও আমরা উহাকে ভালবাসি ও আমরা এরূপ সুন্দর শিক্ষা পাইয়াছি বলিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। এবং এইরূপ মনে করি বলিয়াই অদ্য উহার দোষকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা হউক আমাদের সংস্কার এই যে আর দুই সময়ে দুই জাতির অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষা হইয়াছিল, সেই দুইটির সম্যক্ বর্ণনা করিয়া তাহাদের দোষগুণ নির্ব্বাচন করিব। পাঠকগণ দেখিবেন কালেজী শিক্ষার কত উন্নতি হইলে উহা সম্পূর্ণ শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। কালেজীশিক্ষার যদি দোষসকল অন্তর্হিত হয় তবে ইহাই পৃথিবীর সকল জাতীয়শিক্ষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে।

আমরা যে দুইটি শিক্ষার কথা বলিতেছিলাম তাহার একটি ভারতবর্ষের আর একটি গ্রীসের। একটি ব্রাহ্মণদিগের আর একটি এথিনীয়দিগের। একটীতে ব্রাহ্মণ তৈয়ারি হইত আর একটিতে সিটিজেন তৈয়ারি হইত। একটির ফল সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতে ব্রাহ্মণজাতির চিরপ্রাধান্য আর একটির ফল গ্রীক্ আর্টস্, গ্রীকসাহিত্য, গ্রীকচিন্তার চিরপ্রভুত্ব। দুই জাতিই জগতের প্রথম ও প্রধান শিক্ষক, উভয়ের শিক্ষা হইতেই অমৃতময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগণ হয় ১৮ না হয় ২৭ না হয় ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত গুরুকুলে বাস করিতেন। তৎকালপ্রচলিত যাবতীয় শাস্ত্রই তাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন। বেদ বেদান্ত দর্শন সাহিত্য, ব্যাকরণ চিকিৎসা তাঁহারা এ সমস্তই কেতাব হইতে শিখিতেন। গুরু তাঁহাদিগকে শিখাইতেন, গুরু ও শিষ্যে পিতাপুত্র সম্বন্ধ। একজন ভাল বাসিয়া শিখাইবার জন্য যত্ন করিত আর একজন ভক্তি করিয়া শিখিবার জন্য যত্ন করিত। শিক্ষা উত্তম হইত। শিষ্য গৃহস্থালিতে গুরুর সহায়তা করিতেন সুতরাং পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে যে শিক্ষা হওয়া অসম্ভব সে শিক্ষা অতি সহজেই হইত। গুরু তাহাদিগকে লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় কিরূপে সংসারের কার্য্য করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিতেন। স্নেহমমতা তাঁহারা গুরুকুলে অনেক শিখিতেন। গুরু তাঁহাদিগকে সমাজে যাইতে শিখাইতেন, গুরু যেখানে যাইতেন শিষ্য তাঁহার সঙ্গে থাকিতই থাকিত। শিষ্যকে অনেক শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত। কিন্তু শিষ্যের গৃহস্থজীবনে যা কিছু আবশ্যক হইত গুরু সমস্ত শিখাইতেন, কেমন করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিতে হয়, যাগ যজ্ঞ করিতে হয়, বিচার করিতে হয়, মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয়, ব্যবস্থা দিতে হয় এই ৩৬ বৎসর মধ্যে তাহারা সব শিখিত। তাহারা প্রাক্‌টিকেল ও থিয়োরেটিকেল দুইরকমই শিখিত। বাহির হইয়া যখন এরূপ একটি শিক্ষিতব্রাহ্মণ সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তিনি সমাজের মূর্ত্তিমান্ শক্তিস্বরূপ হইলেন। বড় বড় রাজারা তাঁহার তোষামোদ করিতে লাগিলেন। যিনি তাঁহাকে আপন রাজ্যে স্থাপন করিতে পারিলেন তিনিই মনে করিলেন আমার রাজ্য ধন্য হইল। তাঁহাকে সকলে অগ্নির সহিত তুলনা করিত, কারণ অগ্নির যেমন তেজঃ তাঁহারও তেমনি। অগ্নি যেমন সর্ব্বভুক্ তিনিও তেমনি সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যার আধার, অনন্তশক্তির আধার। আমরা এখানহইতে বেশ দেখিতে পাইতেছি তাঁহার শিক্ষার অনেক দোষ ছিল। তাঁহার শিক্ষা অনেকটা প্রোফেসনাল, তিনি ব্রাহ্মণের যাহা দরকার তাহাই শিখিতেন। মানুষের যাহা দরকার

তাহা ত শিখিতেন না, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক কুসংস্কার তাঁহার থাকিয়াই যাইত। ব্রাহ্মণের শিক্ষার মধ্যে পুরোহিতের শিক্ষা অনেক থাকিত। পুরোহিতশিক্ষায় কলাশিক্ষা একেবারে হইত না, সুরুচি (টেষ্ট) বলিয়া যে জিনিস তাহার তাঁহারা সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মণ নৃত্য গীতাদি শিখিলে পতিত হইতেন। তাঁহার শিক্ষার এত দোষসত্বেও তাঁহার ব্রাহ্মণের শিক্ষা সম্পূর্ণই হইত। আগে সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা তাহার পর একমুখী শিক্ষা না হইয়া, একমুখী শিক্ষার জন্য যতদূর প্রয়োজন, সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা ততদূর পাইত।

গ্রীকেরা কেতাব পড়িয়া অতি অল্প শিখিত। কথাবার্ত্তা নাট্যশালা, সভাগৃহ প্রভৃতি হইতে তাহাদের শিক্ষা হইত। হৃদয়বৃত্তির পরিচালনা তাহাদের সম্পূর্ণরূপ হইত। তাহাদের মত উৎকৃষ্ট রুচি আর কোন জাতির কি আছে? তাহাদের নাটক, তাহাদের কাব্য, তাহাদের ভাস্করকার্য্য, তাহাদের রুচিশিক্ষার উৎকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। শারীরিক শিক্ষা তাহাদের মত আর কাহারও হইত না, তাহাদের মেলায় পারিতোষিক দেওয়া হইত সেই পারিতোষিক পাইত বলিয়া সকলেই ব্যায়াম করিত, শরীরের সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি গ্রীকদিগের যেমন হইত এমন কি আর কখন কোন জাতির হইয়াছে? তাহাদের মধ্যে শারীরিক দোষবিশিষ্ট অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ অতি অল্প ছিল। সৌন্দর্য্য তাহাদের প্রায় সকলেরই ছিল। বিশ্রীলোক কাণা খোঁড়া কুৎসিত তাহাদের দেশে হইতেই পারিত না। তাহারা সকলপ্রকার শিক্ষার জন্য প্রাইজ দিত; হেরোডোটস্ ইতিহাস লিখিয়া পড়িলেন, পারিতোষিক পাইলেন, যে, যে কোন কাজই করুক না, যদি তাহাতে সাধারণ লোকের সন্তোষ হইল অমনি প্রাইজ। এত উৎসাহে গ্রীকদিগের যে সর্ব্বাঙ্গীণসুন্দর শিক্ষা হইবে আশ্চর্য্য কি! বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা গ্রীসে যত হইয়াছিল, এত আর কোন জাতির হয় নাই; সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনের যে শুদ্ধ সূত্রপাত হইয়াছিল এমন নহে, অনেক উন্নতিও গ্রীসে হইয়াছিল। কর্ম্মক্ষমতা গ্রীকদিগের মত আর কাহার ছিল? দুই পাঁচজন লোকের প্রতিজ্ঞায় যেখানে পারস্যরাজ্যের অক্ষৌহিণী সূর্য্যকরস্পৃষ্ট নীহারবৎ দ্রবীভূত হইয়া গেল, তাহাদের মত কার্য্যক্ষমতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কাহার? বাস্তবিক গ্রীকবিশেষ এথিনীয়দিগের মত সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা আর কোন জাতির কখন হয় নাই। কিন্তু এত উৎকৃষ্ট শিক্ষা তাহারা বিনাপরিশ্রমে লাভ করিত। শুদ্ধ বিনাপরিশ্রমেই বলি কেন তাহারা আমোদ করিয়া শিখিত। ইশ্চাইলিস সফোক্লিস তাহাদের শিক্ষা দিত। তাহারা শুদ্ধ আমোদের জন্য থিয়েটারে আসিত অথচ কিছু না কিছু শিখিয়া যাইত। আবার নাগরিকদিগকে রাজ্যের সমস্ত কার্য্য করিতে হইত, তাহাতে তাহা-

দের প্রাক্টিকাল শিক্ষাও অনেক হইত। নাগরিকগণ বিচার করিতে শিখিত, যুদ্ধ করিতে শিখিত, মন্ত্রিসভায় পরামর্শ দিতে শিখিত অথচ কাজ করিতেছি বলিয়া কাহারও গায়ে লাগিত না।

ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষা ধর্ম্মপ্রধান, গ্রীকদিগের সৌন্দর্য্যপ্রধান। সুতরাং গ্রীকদিগের শিক্ষা ক্রমে ছড়াইয়া সমস্ত নাগরিকগণমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; ব্রাহ্মণদিগের উচ্চতর শিক্ষা গুটাইয়া ক্রমে অল্পসংখ্যকমাত্র লোকে ন্যস্ত হইয়াছিল। গ্রীকেরা ইচ্ছা না থাকিলেও আপনি শিখিতে বাধ্য হইত, ব্রাহ্মণেরা অনেক যত্ন ও শ্রম করিয়া শিখিত।

আমাদের কালেজী শিক্ষা এ দুইয়ের কোনটীরই মত নহে। কিন্তু দোষ সংশোধন করিয়া লইলে ইহা হইতে গ্রীকদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর শিক্ষা হইতে পারে। কারণ আমাদের শিক্ষায় স্বাধীন চিন্তার বড় শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। গ্রীকদিগের কুসংস্কারাপন্ন নাগরিকগণের দোষে তাহা কখনই হইতে পারিত না। যেখানে সক্রেতিসকে নাস্তিক ও দেবদ্বেষী বলিয়া বধ করিল, তাহাদের চিন্তাশক্তি আধুনিক বাঙ্গালি শিক্ষিত যুবকদিগের মত উন্নতরূপিণী ছিল কেমন করিয়া বলিতে পারি।



শশ-ধর।

স্থান—গৃহ-চূড়; সময়—গভীর-নিশি।

১

পার না কি শশ-ধর, ঢালিতে কিরণ—
এই দগধ-পরাণে?
অনন্ত-আকাশ-তল, অনন্ত এ ভূমণ্ডল,
কর নিত্য আলোকিত কিরণ প্রদানে,
পার না কি এক বিন্দু ঢালিতে এ প্রাণে?

২

নিরেট, নির্ম্মম ওই প্রকৃতির বুকে—
কেন এতই আদর?
ও কি আশা করেছিল, কিবা আশা না পূরিল?
পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ উহার অন্তর;
ও কি জানে চন্দ্রালোক কত স্নিগ্ধ-কর।

৩

শশ-ধর,
প্রকৃতির শূন্য-বক্ষ শুধুই দেখিলে—
এ অনন্ত-কাল ধরে!
দেখ দেখি একবার, ভগ্ন-বক্ষ অন্তাগার,
কি আছে লুকান এই প্রাণের ভিতরে,
কত সুধা শুক এই পঞ্জরে পঞ্জরে!

৪

দুখী-মানবের মন এই স্নিগ্ধালোকে—
শশি দেখ একবার;
গগনের কক্ষে কক্ষে, অনন্ত-সাগর-বক্ষে,
হেরিয়াছ কি নক্ষত্র, কি রতন হার—
দেখ দেখি হতাশের হৃদয়-ভাণ্ডার।

৫

কত পৃথ্বী, কত বিশ্ব হয়েছে বিনষ্ট—
এই প্রাণের ভিতরে!
কত তারা কক্ষ-চ্যুত! কত রত্ন ভস্মাবৃত!—
আঁধারে পড়িয়া আছে কন্দরে কন্দরে;
কত নদী—কত সিন্ধু—শুষ্ক কলেবরে!

৬

হেন বক্ষ ছাড়ি তবে কেন শশ-ধর—
শূন্যে ঢালিছ কিরণ?
যাহার বুকের মাঝে, নিরাশার বজ্র বাজে,
কর তার বুক ভরি কৌমুদী ক্ষরণ;
সে বুঝিবে কি মধুর তোমার কিরণ।

৭

কি মধুর বেশে শশি কিরণে তোমার—
আজ সজ্জিত ভুবন!
উর্দ্ধে নীল-নভস্থল, নিম্নে পৃথ্বী-বক্ষঃ-স্থল,
ভাসিতেছে শুক্লালোকে স্বপ্নের মতন।
পার না কি ও আলোকে ভাসাতে জীবন?

৮

শূন্য মরুভূমি ওই সু-দূর-প্রান্তর,
তাও—শোভিছে কেমন!—
বালুকায় বালুকায়, চন্দ্র-কর-প্রতিভায়,
কি বর্ণ—কি মূর্ত্তি, মরি করেছে ধারণ!
পার না কি ওই বর্ণে রঞ্জিতে জীবন?

৯

প্রাসাদের মূলে ওই "পদ্ম" সরোবর—
আজ কত মনোহর!
পূর্ণ-বক্ষ জ্যোৎস্না-ময়, নক্ষত্রের সর-প্রায়,
শোভিতেছে শান্ত-ভাবে—সলিল নিথর;
ওই শান্তি, দগ্ধ-চিত্তে কতই সুন্দর!

১০

নিশা-নাথ,
এত শান্তি, এত সুধা, কেন অকারণ—
ঢাল ওই সরোবরে?
শীতল-হৃদয় তার, কেন স্নিগ্ধ কর আর,
নাহিক বিষের জ্বালা উহার অন্তরে,
বৃথা জ্যোৎস্না ঢাল তাহে এমন আদরে।

১১

অহো!
এই পূর্ণিমায় হেন প্রাসাদের চূড়ে—
আজ কত শত নরে,
খুলিয়া হৃদয়-দ্বার, দেখিতেছে অনিবার,
কত স্মৃতি—কত স্বপ্ন—উন্মত্ত-অন্তরে,
উথলিয়া জীবনের নিরুদ্ধ-সাগরে।

১২

আর আমার মন,
সেই পূর্ণিমায় সেই প্রাসাদ-শিখরে—
আমি কি দেখি এখন!
নেত্রে ঝরে অশ্রু-ধার, বুকে ঢাকা অন্ধকার,
দগ্ধ আশা—দগ্ধ স্মৃতি—তাপে দগ্ধ মন;
স্তূপাকার-ভস্ম-রাশি আমার জীবন!

১৩

শশধর,
কত দগ্ধ-হর্ম্ম্য-পথ কর আলোকিত—
তব মধুর-কিরণে;
বিনষ্ট-পম্পেয়র* বক্ষে, দগ্ধ-গৃহে কক্ষে কক্ষে,
ঢালিয়াছ এই শান্তি পীযূষ-ক্ষরণে,
কেন নাহি ঢাল তবে এ দগ্ধ-জীবনে?

* Disinterred remains of the ancient city of Pompeii.

পাতিয়া দিয়াছি বক্ষ কিরণে তোমার—
চিত্তে ঢাল একবার ;
ছড়ায়ে জ্যোছনা-রাশি, কর
আলোকিত—হাসি,
আঁধার, আঁধার-ময়-জীবন আমার ;
ভাঙ্গা-ঘরে চাঁদ-আলো দেখি একবার।

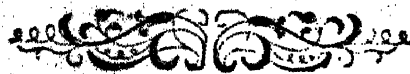
১৫

পারিবে না ? বুঝিয়াছি, জ্যোৎস্নায়
এ প্রাণ—
কভু হাসিবে না আর ;
তবে যদি মর্ম্ম-স্থলে, সেই ক্ষীণ-শিখা জ্বলে,
জ্বলে উঠে কোন মতে আলোক তাহার,
ত্রিদিব-পূর্ণিমা হৃদে হইবে সঞ্চার।

১৬

দুরাশা!—যে ক্ষীণালোক হয়ে ক্ষীণ-তর—
ক্রমে হতেছে নির্ব্বাণ,
আজ কোন্ পুণ্য-বলে, সে শিখা উঠিবে জ্বলে,
কে করিবে তৈল-সেক—কার হেন প্রাণ?
যে করিবে—সে যে সেই কঠিন-পাষাণ!

শ্রীঈঃ—



মাধবীলতা।

১৮

সায়ংকাল অতীত হইলে পর কিঞ্চিৎ বিলম্বে রাজা বহির্ব্বাটীতে পুনরাগমন করিলেন। দেওয়ানের সমভিব্যাহারে নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতকগুলি ভট্টাচার্য্য আমার কুমারকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছিলেন কেন? আমি তাঁহাদের ভাব ঠিক বুঝিতে পারি নাই, ব্যাপারখানা কি? সত্য সত্যই কি তাঁহারা আমার ক্রোড় হইতে আমার সন্তান কাড়িয়া লইতে গিয়াছিলেন?"

দেও। একপ্রকার তাহাই বটে, দশরথ নামে একজন ভট্টাচার্য্য মনে করিয়াছেন যে, রাজকুমার তাঁহার সন্তান, তাহাই তিনি মহারাজের নিকট সন্তান চাহিয়াছিলেন।

রাজা। বোধ হয় ভট্টাচার্য্যমহাশয়েরা দিবসেই চক্রে বসিয়াছিলেন। তাহার পর, তাঁহারা কিরূপে ক্ষান্ত হইলেন?

দেও। ক্ষান্ত তাঁহারা এখনও সম্পূর্ণরূপে হন নাই, বোধ হয় তাঁহারা এই দাবি আবার মধ্যে মধ্যে করিতে আসিবেন; কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছি।

রাজা। তবে কি তাঁহাদের সত্য সত্যই এই ধারণা?

দেওয়ান্ এই সময় সংক্ষেপে ব্রাহ্মণদের সমুদয় কথার পরিচয় দিলেন। রাজা দুই একবার সজোরে নস্য টানিলেন। প্রকাশ্যে চিন্তা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল; তিনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন,

ব্রাহ্মণ—অধ্যাপক—শাস্ত্রব্যবসায়ী—এক জন নয়, দুইজন নয়, অনেকগুলি—সকলেই ত পাগল নহে—আমার সঙ্গে তাঁহাদের কাহার ত শত্রুতা নাই—তাঁহারা কেন মিথ্যা বলিবেন? অবশ্য তাঁহাদের কথার কোন বিশেষ হেতু থাকিতে পারে—তাঁহারা বলিয়াছেন, "রাণীর দুইজন সখী এ কথা জানে," সখীরা ত আমার লোক, ব্রাহ্মণেরা যখন তাহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়াছেন, তখন বুঝা যাইতেছে যে, ইহার মূল কিছু আছে। যাহাই হউক, আমার ভগিনীও এ কথার অবশ্য কিছু জানেন, আমার ভগিনী—রাজভগিনী, কখন তিনি মিথ্যা বলিবেন না, তাঁহার স্বামী জীবিত থাকিলে, তিনিও আজ মহারাণী—এক্ষণে কাঙ্গালিনী—কিছুতেই দুঃখ নাই—সকল সময়েই হাসিমুখ, অথচ একটু ম্লান—জ্যোৎস্নাবতী ঠিক নাম, গম্ভীর অথচ আলোকময়—কিন্তু একটু ম্লান—তাঁহার ম্লানতা আর ঘুচিবে না। আজ জ্যোৎস্নাবতী চক্ষের জল ফেলেছেন, হয় ত মনে কি ব্যথা পাইয়াছেন—রাণী বলেন জ্যোৎস্নাবতী আজ চোখের জল ফেলিয়া অমঙ্গল করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির মন।—

এই বলিয়া রাজা সশব্দে আবার নস্য-গ্রহণ করিলেন। দেওয়ান্‌মহাশয় বলিলেন:—

"আমি মনে করিয়াছিলাম, এ বিষয়ের কোন তদন্ত আবশ্যক হইবে না। আমার স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল যে, কোন রাজশত্রু এই কথা রটাইয়াছে। দশরথ ভট্টাচার্য্য কতকটা সাদা লোক, রটনার কৌশল বুঝিতে না পারিয়া রাজসমক্ষে আসিতে সাহস করিয়াছেন।"

রাজা। তা বটে, কিন্তু কথাটা এই যে রাজভগিনী সাক্ষী, তিনি ত রাজ-শত্রুর দলে নহেন। তাঁহার কথা আমি কখন অবিশ্বাস করিতে পারি না।

দেও। রাজভগিনী ত সাক্ষী নহেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। রাজভগিনী এ কথা অবশ্য জানেন এই অনুভব আপনিই করিতেছেন।

রাজা। তা সত্য, তাঁহাকে এ কথা অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। কিন্তু পরের সন্তান পিণ্ড দিলে আমার পিতৃ-পুরুষ গ্রহণ করিবেন না; তবে এমন সন্তান লইয়া কেবল অধর্ম্মাচরণ করিবার ফল কি?

দেওয়ান। এখনও ত স্থির হয় নাই যে রাজকুমার দশরথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র, যদি তাহা মহারাজের প্রতীতি জন্মে, তখন কর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাইবে। কিন্তু এই সময় রাজশত্রুরা মহারাজের অভিপ্রায় জানিতে পারিলে,নানা ব্যাঘাত ঘটাইবে।

রাজা। না,আমি কোন কথাই এখন বলিতেছি না; রাজভগিনীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, তাঁহাকেও কোন কথা এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিব না; তিনি বোধ হয়, কোন রূপ মনোব্যথা পাইয়াছেন।

জ্যোৎস্নাবতী বাস্তবিক সে দিবস বড় মনের কষ্টে ছিলেন, তাঁহার প্রতি রাণীর মনোভঙ্গ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। উৎসবের দিনে জ্যোৎস্নাবতী চক্ষের জল ফেলিয়াছেন,বলিয়া রাণীর প্রথম বিরক্তি জন্মে; তাহার পর রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় জ্যোৎস্নাবতীকে খুঁজিয়া আনিতে হইয়াছিল বলিয়া রাণীর চিত্তবিকার আরও অধিক হয়, শেষ রাণী যখন সভাদর্শনে গিয়াছিলেন, সকল স্ত্রীলোকই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কেবল জ্যোৎস্নাবতী উঠেন নাই; রাণীকে সম্মান করা দূরে থাক, একবার ফিরিয়াও চাহেন নাই; এই তাচ্ছিল্য রাণীর অসহ্য বোধ হইয়াছিল, এমন কি তিনি আর সেখানে তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া শয়নমন্দিরে আসিয়া শয়ন করিলেন।

দশরথ দেবশর্ম্মা গোপনে যে দুইজন দাসীর নাম করিয়াছিলেন, তাহারা রাণীর সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকিত, রাণীর মনের গতি বিশেষ বুঝিত, অতএব রাণীর সঙ্গে সঙ্গে শয়নাগারে আসিয়া বাজমহক্ষে ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্যোৎস্নাবতীর স্বাপক্ষে দুই একটি কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দেখিল, রাণীর রাগ বরং তাহাতে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কাজেই দাসীরা ক্রমে ক্রমে সুর ফিরাইল, সাবধানে জ্যোৎস্নাবতীর দুই একটি নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল; এমন সময় অপর একজন পরিচারিকা অতি ব্যস্ত হইয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী কোথায়? বিষম বিপদ্ উপস্থিত; অনেকতক লোক রাজকুমারকে লইয়া পলাইতেছিল।" "রাজা কোথা!" বলিয়া রাণী বাঘিনীবৎ সদর্পে উঠিলেন। পরিচারিকা বলিল, "রাজকুমারকে বুকে করিয়া তিনি অন্তঃপুরে আসিতেছেন।" রাণী শিথিলোদ্যম হইয়া আবার পর্য্যঙ্কে বসিলেন। পরিচারিকা চলিয়া গেল।

যে দুইজন দাসী রাণীকে ব্যজন করিতেছিল, একজন বলিল, "আমরা তা আগেই জানি, রাজভগিনীর মহলে রাম না হতে রামায়ণ হয়ে গিয়াছে। আজ ছেলে কাড়িয়া লইতে আসিবে পরামর্শ হয়েছিল, আমরা তাহা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম।"

রাণী। কি শুনেছিলি?

প্রথম দাসী। আমাদের সে সকল কথা বলিতে সাহস হয় না।

দ্বিতীয় দাসী। আমাদের বলা ভালও হয় না, আমরা যেমন লোক সেইরূপ থাকাই ভাল, আমাদের কথায় রাজঘরে মনান্তর হইলে আমাদের সে কলঙ্ক রাখিবার স্থান হবে না।

রাণী। আমি সকল কথা শুনিতে চাই, আমার লোক হয়ে, আমার বিরুদ্ধের কথা যে গোপন করিবে, আমার বাটীতে তার স্থান হবে না।

প্রথম দাসী। আমাদের উভয় সঙ্কট, তা আর ভয় করিলে কি হবে, রাগ করিবেন না; একদিন আমরা দুইজনে রাজভগিনীর মহলে গিয়া শুনিয়াছিলাম

যে এতদিনের পর রাজবংশে পিণ্ডলোপ হলো। যে ছেলে আমরা লালনপালন করিতেছি, সে ছেলে নাকি কোন্ বামুনদের। প্রসবের সময় যখন আপনি মূর্চ্ছা যান, তখন নাকি রাজভগিনী মরা মেয়ে ভূমিষ্ঠা দেখে, কাঁদিতে কাঁদিতে আপন মহলে চলে যান, তাহার পর আমরা না কি কোন ধাইকে দিয়ে সেই মরা মেয়ে কোন্ বামুনদের আঁতুড়ে রেখে, তাদের নাকি ছেলে আপনার আঁতুড়ে এনে দিই। আবার নাকি টাকার লোভে আমরা এ কাজ করেছিলাম; চোথখাগিরা বলে কি, রাজপুত্র হলে বড় ঘটা হবে, অনেক দান ধ্যান হবে, তাই নাকি আমরা দুজনে পরামর্শ করে ছেলে বদল করেছিলাম।

রাণী। তোরা রাজভগিনীর মুখে এ কথা শুনেছিলি?

প্র, দা। না, তাঁর মুখে কেন? আমাদের কি এত সাহস হয় যে আমরা সে কথা বলিতে পারি। আর পাঁচজনে এ কথা বলিতেছিল, তবে তিনি সেখানে বসে ছিলেন। তা তাঁর বলা কাজেই হল বই কি, তিনি ত বলিলেন না যে একথা মিথ্যা।

রাণী তৎক্ষণাৎ সিংহীর ন্যায় ফুলিয়া উঠিলেন। মাথা বাঁকাইয়া প্রথম দাসীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। দুর্দ্দম রাগহেতু কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "তোমরা একজন যাও, জ্যোৎস্নাবতীকে বল গিয়া, যে যত দিন তিনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তত দিন তাঁর এ বাটীতে থাকা ভাল দেখাইয়াছিল।"

প্রথম দাসী চলিয়া গেল। কয়েক পদ গেলে আবার রাণী তাহাকে ফিরাইয়া বলিলেন, "জ্যোৎস্নাবতীকে ডাকিয়া তাঁহার নিজের মহলে লইয়া গিয়া এই কথা বলিবে। আমার মহলে এ কথা বলিবে না।"

দাসী বিনীতভাবে জ্যোৎস্নাবতীকে ডাকিয়া তাঁহার মহলে লইয়া গেল। তাঁহার পাদমূলে বসিয়া দুই একবার চক্ষের জল মুছিল, তাহার পর বলিল, "রাণীঠাকুরাণীর কি হয়েছে, সকলকেই কটুবাক্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন দিন যায় না যে অনর্থক দুই একবার আমরা তিরস্কার না খাই—"

জ্যোৎ। তাই বলে তোমরা কিছু মনে কর না, তিনি স্বাভাবিকই একটু রাগী, রাগটা পীড়ার মধ্যে, রাগ যার আছে তার উপর দয়া হয়। যদি স্ত্রীলোকে রাগ করে কথা কয়, তাহা হইলে বড় কুৎসিত দেখায়, স্ত্রীলোকের রাগ শুনিলে আমার বড় লজ্জা হয়। গল্প আছে যে, সত্যভামা একবার রাগ করে একজনকে গালি দিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ একখানি দর্পণ লইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন, সত্যভামা আপনার রাগভরা মুখ দেখে বড় লজ্জিত হলেন, আর সেই অবধি কখন তিনি

রাগ করে কথা কহেন নাই। রাগ হলে চুপ করে থাকিতেন।

দাসী। তা যাহাই হউক, আমাদের উপর রাগ করে যাহাই বলুন, আমরা সকলই সহ্য করি, কিন্তু এখন যে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন।

"কেন, আবার কার উপর রাগ করে কি বলেছেন?" এই কথাটি জ্যোৎস্নাবতী কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল।

দাসী। তা আপনি ত বুঝেছেন।

জ্যোৎ। তা হোক্, রাণী আমার উপর জন্ম জন্ম রাগ করুন।

দাসী। তিনি রাগ করে বলিলেন যে—

জ্যোৎ। যাহাই বলুন, সে কথা আমায় আর শুনাইবার আবশ্যক কি?

দাসী। আবশ্যক আছে বই কি, তিনি যে সে কথা শুনাইবার জন্ত আমায় পাঠালেন।

জ্যোৎ। তুমি বল গে "বলে এসেছি, তাহা শুনে অনাথিনী জ্যোৎস্নাবতী অনেক কেঁদেছেন," তাহা হইলেই ত রাণীর তৃপ্তি হবে?

দাসী। না, তিনি বলেছেন আপনাকে এখান হতে চলে যেতে, না গেলে তাঁহার তৃপ্তি হবে না।

দাসী এই বলিয়া চলিয়া গেল, যাইবার সময় জ্যোৎস্নাবতীর প্রতি আর ফিরিয়া চাইতে পারিল না।

১৯

সেই দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় জ্যোৎস্নাবতী ছাদের উপর শয়ন করিয়া চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আছেন, নিকটে তাঁহার পরিচারিকা মাতঙ্গিনী বসিয়া আছে, মধ্যে মধ্যে বলিতেছে, "রাত্রি অধিক হয়েছে ঘরের ভিতর চলুন।" জ্যোৎস্নাবতী বাক্যদ্বারা কোন উত্তর না দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বা অঞ্চলে মুখ মুছিয়া উত্তর দিতেছেন। যখনই মাতঙ্গিনী কথা কহিতেছে, তখনই জ্যোৎস্নাবতী এইরূপ করিতেছেন; মুখে কথা নাই, চক্ষে জল নাই বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় স্থিরভাবে আছেন।

অনেকক্ষণ পরে জ্যোৎস্নাবতীর চক্ষে জল আসিল। পূর্ণিমার রাত্রি মেঘাবৃত হইলে ম্লানজ্যোৎস্না দেখিয়া যেমন কখন কখন প্রাণ কাঁদে, জ্যোৎস্নাবতীর ম্লানমুখে চক্ষের জল দেখিয়া সেইরূপ মাতঙ্গিনী কাঁদিল। মাতঙ্গিনী হয় ত ভাবিল, জ্যোৎস্নাবতীর মনোবেদনা বাড়িল। মাতঙ্গিনী অল্পবয়স্কা; বুঝিল না, যে যখন বিষম ঝড় বহিতে থাকে তখন এক ফোঁটাও জল পড়ে না—ঝড় থামিলেই জল হয়। জ্যোৎস্নাবতীর হৃদয়ে যতক্ষণ ঝড় বহিতেছিল, ততক্ষণ চক্ষে জল আইসে নাই; ঝড় মন্দীভূত হইল, আর চক্ষে জল আসিল।

মাতঙ্গিনীর ঘন ঘন নিশ্বাস শুনিয়া জ্যোৎস্নাবতী তাহার মুখপ্রতি ফিরিয়া চাহিলেন, শেষ উঠিয়া তাহার চক্ষের

জল মুছিয়া দিলেন। জ্যোৎস্নাবতী স্নেহময়ী—সকলকেই ভালবাসিতেন, সকলকেই স্নেহ করিতেন, বিশেষতঃ আবার দুঃখীদিগকে; যে নিজে দুঃখী, সেই কেবল অন্যের দুঃখ বুঝিতে পারে। মাতঙ্গিনী পিতৃমাতৃহীনা, আশ্রয়হীনা, বিধবা, বিশেষতঃ সে মাতৃসম্বোধন করিত বলিয়া জ্যোৎস্নাবতী তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

মাতঙ্গিনীর চক্ষের জল মুছিয়া জ্যোৎস্নাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতি! তুই কাঁদিস্ কেন?"

মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, "এখন আপনি তবে কোথায় যাবেন?"

জ্যোৎস্না। আমার আর এ জগতে স্থান কোথা?

মাত। কেন—আপনার শ্বশুরবাড়ী? শুনিয়াছিলাম আপনার শ্বশুর রাজা ছিলেন, আপনি কেন সেইখানে যান্ না। আপনার সঙ্গে ত সম্বন্ধ ঘুচে নাই।

জ্যোৎস্না। ঘুচে গেছে বৈ কি, আর এখন কি সম্বন্ধ! শ্বশুরবাড়ীর কথা মনে করিতে বড় কষ্ট হয়।

এই বলিয়া জ্যোৎস্নাবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। মাতঙ্গিনী আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। শেষে জ্যোৎস্নাবতী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সে শ্বশুরবাড়ীর কথা মনে করিব না কেনই বা বলি। দিবানিশি যে সেই কথাই আমার জপ, সেই কথাই লয়ে আমার সুখ, সেই কথাই লয়ে আমার দুঃখ। আজ আবার যে আদ্যন্ত সে সকল কথাই মনে পড়িতেছে।"

মাত। আপনার শ্বশুরবাড়ীর কি কথা মা? আমি কোন কথা কখন শুনি নাই।

জ্যোৎ। হল্‌দির জাঙ্গাল দেখেছ?

মাত। দেখেছি—সেই জাঙ্গাল দিয়ে আমার মামার বাড়ী গিয়াছিলাম।

জ্যোৎ। তার ধারের গাছগুলি কত বড় হয়েছে?

মাত। সে সব খুব বড় হয়েছে। বটগাছ থেকে ঝুরি নেমে অনেকদূর অবধি অন্ধকার হয়ে আছে।

জ্যোৎ। সে জাঙ্গাল দিয়ে লোকজন চলে?

মাত। বড় নয়—কখন কেহ যায়। কেহ যায় না বলিয়া তাহার মাঝখানে বড় জঙ্গল হয়েছে।

জ্যোৎ। তবে ঠিক আমার অদৃষ্টের মত হয়েছে।

মাত। কেন মা?

জ্যোৎ। সেই জাঙ্গাল আমার বিয়ের সময় হয়। সেই জাঙ্গাল দিয়ে আমার শ্বশুর বিয়ে দিতে এসেছিলেন।

মাত। বিয়ের পর আপনি শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলেন?

জ্যোৎ। তা ত যেতে হয়। সেখানে গিয়ে ষোল বৎসর থাকি; তার পর

চিরদুঃখিনী হয়ে এখানে আবার ফিরে আসি।

জ্যোৎস্নাবতী এই বলিয়া চক্ষের জল মুছিলেন।

মাত। তা—এতদিনের মধ্যে এঁরা আপনাকে আর আনেন নাই কেন?

জ্যোৎ। এ সকল রাজকায়দা। আমার তেমন বিপদের সময় বড় ইচ্ছা হয়েছিল, একবার এখানে এসে কাঁদি। আমি তখন সতের বৎসরের। বিপদের কি জানি। সংসারের কি জানি,কপালের কথাই বা কি জানি।

মাত। কেন মা, কি হয়েছিল।

জ্যোৎ। কি হয়েছিল তার কোন্‌খানটা বলিব, যখন তাঁর বয়স ২২ বৎসর তখন সেই সর্ব্বনাশ হয়, তার পূর্ব্বে আমি কত সুখে ছিলাম; ভাবিতাম পৃথিবীর সুখই বুঝি এইরূপ, এ সুখ থাকে কি যায়, সকলের কপালে ঘটে কি না ঘটে, তাহা একবারও মনে ভাবিতাম না, আপনার সুখে আপনি ডুবে থাকিতাম, তাঁর যত্নে অন্ধ হয়ে থাকিতাম। এজগতে কাহারও যে কষ্ট আছে তাহা একেবারে জানিতাম না, তাঁরে আদর করিতাম তাতে সুখ,আবার তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করিতাম তাতেও সুখ। তাঁরও সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু কি তাঁর দুর্বুদ্ধি হয়েছিল আমায় লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি শিখিতে কত আপত্তি করিতাম, পায়ে ধরে পর্য্যন্ত বলিতাম যে "আমাদের লেখা পড়া শিখিতে নাই, শিখিলে অদৃষ্ট মন্দ হয়।" তিনি তাহা কিছুই শুনিতেন না, আমার সকল কথা হাসিয়া কাটাইতেন, বলিতেন, "স্ত্রী রামায়ণ পড়িলে যদি স্বামী মরে, ত এমন স্বামী মরাই ভাল।" এ কথায় বড় ব্যথা পাইতাম। চোখের জল মুছিয়া পড়িতে বসিতাম। তিনি আমাকে পড়াইয়া পাখী পড়াইতে যাইতেন; হাসিয়া বলিতেন, "এটিও তোমার মতন—খাঁচায় থাকে, জানে না যে কেন এ খাঁচা, কেন আপনার এতরূপ, কেন এত মিষ্টস্বর, কেন বা ঐ সূর্য্য, কেন বা ঐ চন্দ্র, কেন বা এ পৃথিবী, কেন বা এ জগৎ।" আমি হাসিয়া বলিতাম, "বল, এ দুটীর মধ্যে কারে ভালবাস।" এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেই হাসিয়া পলাইতেন, তাঁর হাসি কি আর ভুলিতে পারিব? পাখীটিও তাঁর হাসি বুঝিত, তাঁর হাসি শুনিলে সুখে সে কত কথাই কহিত, আমি ভাবিতাম যে আমা অপেক্ষা বুঝি পাখী তাঁরে বেশী আদর করিল। আমার মধ্যে মধ্যে হিংসা হইত,আমি তখন আর কার হিংসা করিব? তিনি চলিয়া গেলে তাঁর হাসি কি কথা না শুনিতে পাইলে পাখীটি নীরবে থাকিত, আমি রাগ করে তার খাঁচা ধরে কত গালি দিতাম, পাখী একবার এ কাণ একবার ও কাণ ফিরাইয়া আমার গালি শুনিত, কোন উত্তর দিত না, একবার একবার লাফাইয়া আমার আঙ্গুল ঠোকরাইত. আমি আবার গালি

দিতাম; তিনি ঘরে আসিলে তাঁর সাক্ষাতেও গালি দিতাম, বলিতাম, "ও আমার সতীন।" তিনি হাসিয়া উঠিতেন, পোড়া পাখী সে হাসি শুনিবামাত্র আবার আপনার সুর ধরিত। কত কথা কহিত, তিনিও যেন তার সকল কথা বুঝিতেন, সেই মত তাহার সঙ্গে আমোদ করিতেন। আমি রাগ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, তখন বুঝিতাম না যে তাঁরে পাখীটি পর্য্যন্ত সকলে ভালবাসে। উঠানে বাহির হইলে তাঁহাকে পায়রায় আসিয়া ঘেরিত, যে তাঁর শরীরে বসিতে না পাইত, সে তাঁরে বেড়িয়া উড়িত, তিনি মুখ তুলিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেন, ঊর্দ্ধমুখখানি কত সুন্দর দেখাত।

রাজবাটীতে যত হাতী ছিল, সকলে তাঁরে চিনিত, ভালবাসিত। তাঁর স্নানের সময় পুষ্করিণীতে সকলগুলি আসিত; তাঁরে লইয়া জলে কতই খেলা করিত। শুঁড়ে বসাইয়া কেহ তাঁরে জলে নামাইত, আর সকলে সেই সময় শুঁড় দিয়া তাঁর গায়ে জল ছিটাইত। এক একদিন পুষ্করিণীর ধারে যখন জলচৌকিতে বসিয়া তিনি তৈল মাখিতেন সেই সময় কোন হাতী হয় ত জল হইতে ধীরে ধীরে শুঁড়ের আগা বাড়াইয়া তাঁর শরীর স্পর্শ করিত, তাঁর অঙ্গস্পর্শ না করিলে যেন সে আর থাকিতে পারে না। জলে নামিতে দেরি হচ্চেছে বলে কোন দুরন্ত হাতী হয় ত জল-চৌকি ধরিয়া টানিত, তিনি হাসিয়া গালি দিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন, জলের ভিতর লুকাইতেন, আর সকল হাতীরা তাঁরে খুঁজিয়া বেড়াইত, আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে জানেলায় বসিয়া থাকিতাম, তার পর তিনি একদিকে ভাসিয়া উঠিলে সকল হাতী সেই দিকে গিয়া পড়িত। শেষ তিনি সকল হাতীর শুঁড়ে এক একবার করিয়া দাঁড়াইলে তাহাদের তৃপ্তি হইত। তাহার পর স্নান হইলে একটা হাতী শুঁড় দিয়া ছাতি ধরে বরাবর তাঁকে দরজা পর্য্যন্ত দিয়া যাইত।

স্নানের পর পূজা করিতে বসিতেন। তখন তাঁর কি আশ্চর্য্য মূর্ত্তি হইত, মুখ দেখে বোধ হইত, যেন এ পৃথিবীতে আর তাঁর কোন সংস্পর্শ নাই। যখন চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেন, সম্মুখের দেবতারা তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। লোকে বলিত, দেবতারা তাঁর সঙ্গে কথা কহিতেন। তা হবে, আশ্চর্য্য কি! তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে দেবতাদের ইচ্ছা হতে পারে, মানুষের মধ্যে তাঁর মত পবিত্র আর কে ছিল? যার নিকট বসে আহার করিতেন, কোন কোন দিন আহারের পর যার কোলে মাথা রাখিয়া একটু শয়ন করিতেন, তখন তাঁহার মুখখানি শিশুর মত কোমল হইত যেন আদর-ভরা।

তার পর বিষয়কার্য্য দেখিতে যাইতেন, যে পর্য্যন্ত তিনি কাছারিবাটীতে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত দেওয়ানের ভয় হইয়াছিল।

তাঁকে সকলেই ভালবাসিত, কেবল দেওয়ান্ বিষ দেখিত ; সেই দেওয়ানই আমার কাল হয়েছিল ; কিন্তু তিনি থাকিতে দেওয়ান্ কিছু করিতে পারে নাই।

তাঁর সকলই গুণ ছিল, কেবল এক দোষের নিমিত্ত সকলেই তাঁর নিন্দা করিত ; তিনি চেষ্টা করে বিপদ আনিতেন। বিপদ্ না ঘটে এই সকলের চেষ্টা, কিন্তু তাঁর চেষ্টা ছিল কিসে বিপদ হবে। আমি তাঁরে কত বলিতাম, তিনি কিছুই শুনিতেন না, হাসিয়া বলিতেন, "অনেকে মধ্যে মধ্যে পা না টেপাইলে কষ্ট পায়, আমারও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে বিপদে না পড়িলে বড় কষ্ট হয়।" আমি অবাক্ হয়ে শুনিতাম। একবার কোন্ দেশে কাছারী দেখিতে গিয়াছিলেন, বাটী আসিতে পথে শুনিলেন যে, দূরে এক পুষ্করিণীতীরে ডাকাতেরা বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে, পূর্ব্বদিন একজন ভদ্রলোকের কন্যা পাল্কী করে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিল, এমন সময় ডাকাতেরা তাহাদের সকলকে মেরে ফেলেছে। শুনে সঙ্গীরা বলিল, ওপথে যাওয়া হবে না, শুনে তিনি বলিলেন, ঐ পথেই যেতে হবে। এই বলে বৌ সেজে পাল্কীতে উঠিয়া সঙ্গীদের ফেলে চলিয়া গেলেন, সাত আট জন ডাকাতকে ধরে বাটী আনিলেন, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে লাঠালাঠি করিবার সময় একজন ডাকাত খুন হয়। সেই অবধি আমার কপাল ভাঙ্গে, কেমন তাঁর ধারণা হয় যে তাঁর লাঠিতেই ডাকাত মরেছে, অথচ সে সময় তাঁর হাতে লাঠি একেবারে ছিল না। যার লাঠিতে মরিয়াছিল সে আপনি স্বীকার করেছিল, বখশীসও পেয়েছিল তথাপি তাঁহার সন্দেহ ঘুচিল না।

প্রথমে তিনি পূজা ছাড়িলেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, আমি এখন অশুচি—দেবতারা আর আমার পূজা লবেন না। তার পর ক্রমে ক্রমে অন্যমনস্ক হইতে লাগিলেন, এক একবার বলিতেন, প্রায়শ্চিত্ত করিব, অন্যের জন্য মরিলেই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না, কেবল বুঝিতাম সে মুখে আর হাসি নাই। শেষ একদিন বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন যে পথে একটা দুরন্ত ছেলে ইট হাতে করে একজন পাগলকে বলিতেছে, "আমি তোরে মারিব।" পাগল ভয়ে হাঁ করিয়া কাঁদিতেছে, যতবার বালক বলিতেছে, "এই মারি" ততবার পাগল কাঁদিয়া উঠিতেছে ; এই দেখে তিনি কেমন ব্যাকুল হলেন, হয় ত ভয় পেলেন, তিনিও যেন ভয়ে কাঁদিয়া উঠেন, তাঁর এইরূপ বোধ হলো, কিন্তু বাড়ী এসে তাহা আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমি বলিলাম, "পাগলের কান্না দেখে তুমি ভয় পেয়েছ কেন, তুমি ক্ষেপেছ নাকি?" অমনি তিনি আমার মুখ চাপিয়া বলিলেন, "ও

কথা কেন বলিলে? আমার ভয় করিতেছে; তবে কি সত্যই,—" এই বলিয়া আমার হাত ছিনিয়া পলাইলেন।

আমার নিকট হইতে পলাইয়া মার নিকটে গেলেন, দুই হাতে মার পায়ের ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে বলিলেন "মা, আমার পীড়া হয়েছে, তোমার চরণরেণু মাখিলেই আমি ভাল হব।" মা এই কথায় কাঁদিয়া উঠিলেন, কান্না দেখিয়া আমার ভয় পেয়ে বলিলেন, "তবে সত্যই।" অমনি সেইখান হইতে পলাইলেন, একবার আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন, পিতা ভাবিলেন, অসময়ে এ প্রণাম কেন? কিন্তু তিনি কোন কথা না বলে চলে গেলেন।

রাত্রে আর তাঁকে কেহই খুঁজিয়া পাইল না। সেই দিন অবধি রাজবাড়ী শূন্য হলো।

চারিদিন পরে একজন জেলে আসিয়া সম্বাদ দিল যে রাজপুত্রকে পাওয়া গিয়াছে। শুনিবামাত্র রাজবাড়ীর সকলে জেলের সঙ্গে ছুটিল, গ্রামের লোকও পালে পালে গেল। আমি একা বসে মনে মনে করিতে লাগিলাম যে, এবারে তাঁরে পেলে আর তিলার্দ্ধের জন্য ছেড়ে দিব না; একবার তাঁরে দেখিতে পেলে হয়। অনেকক্ষণ পরে আবার পালে পালে লোক ফিরে আসিতে লাগিল, রাজবাটীরও লোক সকল ফিরে আসিল; কিন্তু তাঁর আসার কথা কেহ বলে না। আমি ছটফট করিতে লাগিলাম, শেষ রাজমহলে কান্নার গোল উঠিল, আমি তখনও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু কেমন একটা আতঙ্ক হলো, আমি গিয়া লুকায়ে রহিলাম, আপনি লুকালে ত কুসম্বাদ লুকান থাকে না; ক্রমে শুনিলাম, নদীতীরে তাঁর দেহের সংকার আরম্ভ হয়েছে, জেলে জাল ফেলিতে গিয়ে তাঁর দেহ পাইয়াছিল, তাই রাজবাটীতে খবর দিতে এসেছিল, কেহ তার কথা প্রথম বুঝিতে পারে নাই শেষ নদীরধারে গিয়া বুঝিতে পারিল। তার পর আমার কি হলো আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যখন উঠে বসিতে পারিলাম, তখন একদিন শ্রাদ্ধের কথা আমার কাণে গেল, আমার যে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে তখন কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম। সর্ব্বনাশের কথা আমার আগে সকলেই বুঝেছিল, পোড়া আমি কেবল বুঝিতে পারি নাই। পায়রা আর সেরূপ গোলমাল করে না, কার্ণিসের নীচে চুপ করে বসে থাকে। একদিন স্নানের সময় জানেলায় বসে পুষ্করিণীর ধারে তাঁর শ্বেতপাথরের জলচৌকিখানি দেখিতেছিলাম, এমন সময় একটি হাতী দৌড়িয়া সেইখানে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে কত লোক ছিল, কিন্তু হাতীর কাছে কেহই আসিল না। লোকে ভেবেছিল হাতী ক্ষেপেছে; কিন্তু হাতীটি ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তিনি এই হাতীটিকে বড় ভাল বাসিতেন, এই হাতীটিই তাঁরে তাকী

ধরিত, এই হাতীটিই এক একদিন শুয়ে থাকিত, আর তিনি তার পেটে ঠেস দিয়ে বসে বাঁশী বাজাতেন। হাতীটি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ঘাটে দাঁড়ায়ে এদিক ওদিক ফিরে ঘুরে দেখিতে লাগিল, আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম তাঁরে খুঁজিতেছে, এক-বার তাঁরে চীৎকার করে ডাকিল, শেষ জলে নামিল, মনে করিল, তিনি জলের ভিতর কোথাও লুকায়ে আছেন, কত-ব'র ডুব দিল, কতবার মাথা তুলে চারিদিকে দেখিতে লাগিল। আবার জল হতে উঠে জলচৌকির নিকট দাঁড়াল, জলচৌকি সরাইয়া দেখিল। হাতী কি চায়, কি খুঁজিতেছে, মাহুত তা বুঝিল, কাছে এসে গা চাপড়ে বলিল, "আর কেন খোঁজ? সে ধন হারিয়ে গেছে।" হাতী সে কথা কিছুই শুনিল না, দাঁড়ায়ে রহিল, একজনের হাতে একটি ছাতী ছিল শুঁড় দিয়া তাহা কাড়িয়া লইল, জলচৌকির উপর ক্ষণেক তাহা ধরিয়া রহিল, তার পর যেন তাঁরে স্নান করাইয়া বাড়ী আনিতেছে এই ভাবে ছাতী ধরে দরজা পর্য্যন্ত আসিল; এই দেখে মাহুত কেঁদে উঠিল। জানেলা থেকে আমার দাসীরা সকলে উঠাইয়া নিয়ে গেল।

তার পর শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ করিতে আমায় লয়ে গেল, আয়োজন দেখে তা বুঝিতে পারিলাম। আমি প্রথমে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরে আসিলাম, আর কোন মতে গেলাম না। শেষ আমার শ্বশুর নিজে এসে একবার কাঁদিতে লাগিলেন, একবার সাধিতে লাগিলেন। আমি তখন আর কি করি, মিছে করে বলিলাম যে, "তিনি ত মরেন নাই, তিনি আবার ফিরে আসিবেন। জেলের কথা শুনে যে দেহের সৎকার করা হয়েছে, সে দেহ ত তাঁর নহে। যারা দেখিতে গিয়েছিল তারা কেবল কাপড় দেখে চিনেছিল; কিন্তু অন্য লোকে কেহ যদি তাঁর কাপড় পরে থাকে?"

এই কথা শুনে আমার শ্বশুর অবাক্ হয়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর বলি-লেন, "সত্য কথা, আমি কেন এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। আমার চাঁদ বেঁচে আছে। আবার আসিবে ঠিক কথা। আমি দেওয়ান্‌কে বলি গিয়ে।

কিন্তু পাষণ্ড দেওয়ান্ তাঁর সকল কথা উল্টাইয়া দিল। আবার শ্বশুর এসে জেদ করে ধরিলেন যে "শ্রাদ্ধ করিতে হবে, নতুবা তাঁর গতি হবে না, প্রেত অবস্থায় কত কষ্ট পাবেন।" আমি আর কি করি; শ্রাদ্ধ করিলাম।

মাতঙ্গিনী। আপনার শাশুড়ি কিছু বলিলেন না, আপনি তাঁর কোন কথাই ত বলিতেছেন না।

জ্যোৎ। তিনি বৃথা মানুষ ছিলেন, কখন কখন তাঁর জ্ঞান থাকিত না। আমার বিবাহের পর বরাবর দেখেছি বেশ সহজ লোক ছিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন যে, তাঁর সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে

তিনি কথাও কহিলেন না, একদিন কাঁদিলেনও না, আমি কাঁদিলে বলিতেন, আমার ছেলের অকল্যাণ হবে। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, রোজ আমার কপালে সিন্দুর পরায়ে যেতেন। কিন্তু অধিক দিন বাঁচিলেন না। আমার শ্বশুর দিনকতক শোক করিলেন, তার পর ক্রমে ক্রমে পুত্রশোক পর্য্যন্ত ভুলে গেলেন; বুড়ালোকের শোক কত দিন থাকে?

মাতঙ্গিনী। শোক নাকি আবার বুড়া যুবার পৃথক্!

জ্যোৎ। বিস্তর পৃথক্। তা আমার শ্বশুর হতে দেখেছি। একবৎসর না যাইতেই তিনি পোষ্যপুত্র লইলেন। একদিনের জন্যও আপন পুত্রকে স্মরণ করিলেন না। তার পর আর এক কাণ্ড হয়ে গেল, যার অদৃষ্ট মন্দ তার যন্ত্রণা পদে পদে, বিধাতা যেন তারে একবার মেরে তৃপ্তি হন না।

আমি বিধবা হবার দশবৎসরের পর একদিন বৈকালে পাঁচজনে একত্রে বসে আছি, এমন সময় আমার শাশুড়ির একজন দাসী ছুটে এসে বলিল, "আবার যে কি শুনিতে পাই।" শাশুড়ির মরণের পর অবধি দাসী আর রাজবাড়ীতে থাকিত না; কখন কখন আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। আমি তারে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি কথা শুনিতে পাও?" সে বলিল, "এবার সত্য সত্যই নাকি রাজকুমার ফিরে এসেছেন, তিনি কাঞ্চনবাগে বসে আছেন বাপকে খবর পাঠায়েছেন, রাজামহাশয় সেখানে এই গেলেন।"

এই সময় আর একজন দৌড়াদৌড়ি এসে বলিল, "আমি এই তাঁরে স্বচক্ষে দেখে এলাম, বড় কাল হয়ে গেছেন; প্রথমেই আমার সঙ্গে দেখা, আমি কাঞ্চনবাগের পুকুরে জল আনিতে গিয়া দেখি ঘাটে একজন সন্ন্যাসী বসে আছে। কে আর বল সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে চায়, আমি কলসী হাতে জলে নামছি এমন সময় সন্ন্যাসী আমায় ডেকে বলিলেন 'কাদম্বিনি আমায় তোমরা চিনিতে পার?' আমি অবাক্ হয়ে তাঁর মুখ দেখিতে লাগিলাম, মনে হতে লাগিল ঠিক যেন আমাদের রাজকুমারের মত, কিন্তু তিনি ত নাই। তার পর তিনি আমার মনের কথা বুঝিতে পেরে হাসিমুখে বলিলেন, 'তবে আমায় আর বুঝি চেনা যায় না।' সে হাসি দেখিবামাত্র আর আমার সন্দেহ রহিল না; আমি কাঁদিয়া উঠিলাম, গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করে যোড় হাতে বলিলাম, আর এখানে কেন? তিনি বলিলেন, 'আমার বিলম্ব আছে;' আমি বলিলাম যে, তবে এই সময় বৌ-রাণীকে খবর দিই গে, তিনি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলিলেন, 'তিনি নাকি এখন বড় বিজ্ঞ হয়েছেন? বিজ্ঞবতীকে একবার জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে কোন্ বিজ্ঞতার দরুণ

তিনি জীবিত স্বামীর শ্রাদ্ধ করেছেন।" তা আমি আর কোন কথার উত্তর না করে ঘাটের উপর কলসী রেখে একেবারে ছুটে এসেছি; বাড়ীও যাই নাই।"

এই সম্বাদের পর আমার মহলে আহ্লাদের ঢেউ উঠে গেল, চারিদিকে সকলে ছুটাছুটি করে বাড়ী পরিষ্কার করিতে লাগিল। আমি নির্জ্জনে গিয়ে কাঁদিতে লাগিলাম, কেন কাঁদিলাম তাহা জানি না, অনেকক্ষণ ধরে কাঁদিলাম। তার পর সেখানে দাসীরা আমার চুল বাঁধিতে গেল, আমি বারণ করিলাম না, তার পর তাহারা যখন আমায় অলঙ্কার পরায়, তখন আমি বলিলাম; যে এখন রাখ তিনি এসে আমায় আপনি পরাইয়া দিবেন, দাসীরা বলিল, "সে কি কথা! তিনি কি এসে আপনার এই বিধবার বেশ দেখিবেন?" আমি কোন কথা বলিলাম না। দাসীরা গহনা পরাইল। পরে তিনি এসে প্রথমে আমায় কি বলিবেন আমি তাঁকে কি বলিব এই কথাই মনে মনে কেবল ভাবিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হলো, তখনও তিনি এলেন না, মনে করিলাম বাপের কাছে এই দশবৎসরের কষ্টের কথা পরিচয় দিতেছেন; তার পর রাত্রি এক প্রহর হলে আমি একজনকে বলিলাম যে, তোমরা একজন রাজমহলে যাও সম্বাদ কি জানিয়া আইস। সে বলিল যাবার উপায় নাই, দরজা বন্ধ; সেওয়ানের হুকুমমত দরওয়ানেরা দরজায় চাবি দিয়াছে; যারা রাজপুত্রের সম্বাদ এনেছিল, তারাও বাড়ী যাইতে পায় নাই। আমার বড় সন্দেহ হলো, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সমস্ত রাত আমরা সকলে বসে রহিলাম, কোন সম্বাদ পেলাম না, দরজাও কেহ খুলে দিল না। সে দিন গেল, তার পর দিন গেল, এইরূপে আটদিন গেল দরজার চাবি কেহ খুলে দিল না। এই আসেন এই আসেন মনে করে মানুষ কয়দিন বসে থাকিতে পারে! ক্রমে আমার শরীর অবসন্ন হয়ে পড়িল, আমি অজ্ঞান হলেম, জ্বরবিকার বলে আমার চিকিৎসা আরম্ভ হলো, আমি কয়দিন অজ্ঞান ছিলাম তা জানি না, যখন আমার জ্ঞান হলো, তখন আমার কিছুই মনে ছিল না, ক্রমে ক্রমে সকল কথা মনে হলো, আমি শয্যায় পড়ে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম, কেহই আমায় কিছু বলিত না; জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহসও হইত না; একদিন আমি সাহস করে জিজ্ঞাসা করিলাম, যাহা শুনিলাম, তাতে আর এ প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা হলো না। দুর্ভাগীর প্রাণ কি বাহির হয়? সেই আমি আজও বেঁচে আছি।

মাতঙ্গিনী। আপনি কি শুনিলেন?

জ্যোৎ। যে দিন তিনি ফিরে এলেন, ফাল্গুনবাগ হতে পিতাকে একখানি পত্র লিখিলেন, পত্র পাইবামাত্র রাজা ফাল্গুনবাগে ছুটিলেন, সেখানে

গিয়া পুত্রকে বুকে করে কত কাঁদিলেন, তার পর যখন আমার খাশুড়ীর মরণের কথা হতেছিল, তখন দেওয়ান্‌মহাশয় কাঞ্চনবাগে গেলেন; কিন্তু তিনি রাজপুত্রকে চিনিতে পারিলেন না। রাজা স্বয়ং চিনিয়াছেন, দেওয়ান্ চিনিতে পারুন বা না পারুন, তাহাতে আর কি ক্ষতি? রাজা বলিলেন, "এখন তবে বাড়ী চল;" রাজপুত্র রাজার সঙ্গে উঠিতেছিলেন, এমত সময় দেওয়ান্ বলিলেন, "একটা কথা আছে, ভ্রমক্রমে শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে, এক্ষণে বাটী যাইবার পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্যদের নিকট ব্যবস্থা লওয়া আবশ্যক; যদি তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সেটা করা চাই।" রাজা বলিলেন, "এ কথা সঙ্গত বটে, আমি এখনই বাটী গিয়া ভট্টাচার্য্যদের ডাকাইতেছি।"

রাজা বাটী গেলে রাজপুত্রের সেবার নিমিত্ত কয়েকজন চাকর কাঞ্চনবাগে আসিল, তাহারা সকলেই নূতন লোক, রাজপুত্র তাহাদের কাহাকেও চেনেন না, তাহারাও কেহ রাজপুত্রকে চেনে না। রাজপুত্র তাহাদিগকে পুরাতন চাকরদের সম্বাদ একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা বলিল, "পুরাতন চাকর আর রাজসরকারে কেহই নাই।" রাজপুত্র কিছু আশ্চর্য্য হলেন, কিছুই হেতু অনুভব করিতে পারিলেন না।

পরদিবস প্রাতে পেস্কার আসিয়া রাজপুত্রকে বলিল, "যদি আপনাকে রাজপুত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে একটা প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক; ভট্টাচার্য্যেরা এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন; তাহার উদ্যোগ করিতে দুই একদিন বিলম্ব হইবে, অতএব যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, সে পর্য্যন্ত আপনি এই কাঞ্চনবাগে থাকিবেন। যাহাতে আপনার কোন কষ্ট না হয়, তাহার নিমিত্ত রাজাবাহাদুর আমাকে পাঠাইয়াছেন।" এই কথায় রাজপুত্র কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "(যদি রাজপুত্র বলিয়া আপনাকে গ্রহণ করা হয়) এ কথা বলিতে কে তোমায় শিখাইয়া দিয়াছেন?" পেস্কার বলিল, "রাজাবাহাদুর নিজে, তিনি যেমন বলিতে বলিয়াছেন, আমি ঠিক সেইরূপ নিবেদন করিয়াছি।"

রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ পিতাকে একখানি পত্র লিখিয়া একজন চাকরের হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই মুহূর্ত্তে রাজবাটী যাও, পত্রখানি রাজাবাহাদুরের হাতে দিবে, অন্যথা না হয়।" চাকর "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় হইল; পরে অনেক বিলম্বে উত্তর আনিল। উত্তরখানি দেওয়ান্ মহাশয়ের স্বহস্তের লেখা; কিন্তু তাহার শিরোভাগে রাজার দস্তখত ছিল। রাজপুত্র পত্রখানি দুই তিনবার পড়িলেন, তাহার প্রথমভাগে স্নেহপূর্ণ বাক্য, শেষভাগে বিপরীত কথা। রাজপুত্রের বড় সন্দেহ হইল; কিন্তু সে দিবস আর কিছু বলিলেন না। রাত্রে তাঁহার মনে হইল যে, তিনি দুই দিবস আসিয়া-

ছেন, গ্রামবাসীরা এ সম্বাদ অবশ্য পাইয়াছে; অথচ কেহ এপর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিতে আসিল না, ইহার তাৎপর্য্য কি? সকলেই ত তাঁহাকে ভাল বাসিত। পরদিবস একজন চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদের চেন।" সে উত্তর করিল, "আমি কাহাকেও চিনি না।" রাজপুত্র বলিলেন, "কোন পুরাতন আমলাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।" সে উত্তর করিল, "পুরাতন আমলা কেহই আর রাজবাটীতে নাই।" রাজপুত্র আশ্চর্য্য হইলেন—সাবেক কোন চাকর নাই, দরওয়ান নাই, আমলাও নাই, তাৎপর্য্য কি!

পরদিন প্রাতে রাজার নিজ হাতের এক পত্র পৌঁছিল; তাহাতে লিখিত ছিল, "নগরবাসীদের মধ্যে রাষ্ট্র যে তুমি রাজপুত্র নহ, কোথাকার একজন বৈষ্ণবের সন্তান, আমার দুর্ভাগ্য শুনিয়া আমায় প্রতারণা করিতে আসিয়াছ; যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার চেষ্টা বৃথা; তোমার এখানে থাকাও বৃথা। আর যদি তুমি সত্যই আমার পুত্র হও, তাহা হইলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে যে, এই অবস্থায় তোমায় গ্রহণ করিলে লোকের বিশ্বাস জন্মিবে, যে আমি বৈষ্ণবের সন্তান গ্রহণ করিয়াছি। যদি আমার পৌত্র হয়, লোকে তাহাকে বৈষ্ণবের পুত্র বলিবে, এ কলঙ্ক হইলে আমরা কেহই সুখী হব না; অতএব তুমি নিজেই বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে। আমার বিবেচনার উপর নির্ভর করিও না; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তাহাতে পুত্রশোকাকুল, এ সময় সকলেই আমায় প্রতারণা করিতে পারে, তাহা না হইলে সে দিবস তুমি 'পুত্র' বলিয়া পরিচয় দিবামাত্র আমি তোমায় কেন বুকে করিয়া কাঁদিলাম? কিছুই দেখিলাম না, শুনিলাম না, কোন তদন্তও করিলাম না; আমি তখন একেবারে ভাবিলাম না যে, যে সন্তান মরিয়াছে, যাহার দেহ দাহ করাইয়াছি, যাহার শ্রাদ্ধ করাইয়াছি, সে সন্তান আবার কিরূপে ফিরে আসিবে? অতএব তুমি আর কোন চেষ্টা করিও না, এ পত্রের উত্তর আমি চাই না, উত্তর দিলে সে পত্র আমার নিকট পৌঁছিবে না; আমার সহিত সাক্ষাৎ করাও বৃথা, তাহার চেষ্টা করিলেও সাক্ষাৎ হইবে না; বরং তাহাতে তোমার ক্ষতি হইবে।"

রাজপুত্র পত্র পাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া বৈঠকখানা হইতে বাহির হইলেন; পেস্কার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছেন?" রাজপুত্র বলিলেন, "রাজবাটী।" পেস্কার বলিল, "যাইতে নিষেধ।" রাজপুত্র তাহা গ্রাহ্য না করিয়া চলিয়া গেলেন। পেস্কার তৎক্ষণাৎ একজন ঘোড়সওয়ার রাজবাটীতে পাঠাইয়া দিলেন; রাজপুত্র সেখানে আসিয়া দেখিলেন, রাজদ্বারের

সম্মুখে কয়েকজন বলিষ্ঠ সিপাহী যেন তাঁহারই নিমিত্ত দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চান?" রাজপুত্র বলিলেন, "রাজদর্শন।" সিপাহী উত্তর করিল, "নিষেধ আছে।" তথাপি রাজপুত্র অগ্রসর হইলেন, সিপাহী পথরোধ করিল, রাজপুত্র তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া রাজবাটী প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইলেন, তখন আর সকল সিপাহী আসিয়া তাঁহাকে শৃগাল কুক্কুরের মত ধরিল, তিনি প্রথমে রাগে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; সিপাহীরা তাঁহার হাত পা বাঁধিল, শেষ তিনি বলিলেন, "আর প্রয়োজন নাই, এখন আমি বুঝেছি।" সিপাহীরা ক্ষান্ত হইল। তিনি আপনার দ্বারে আপনার চাকরের হাতে বাঁধা পড়িলেন, সেইখানে পিতা বসে, ফিরেও চাহিলেন না। অদৃষ্ট মন্দ হলে পিতাও শত্রু হয়।

সিপাহীরা তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল। পথে বিস্তর লোক জমিল; সকলেই "জালরাজা" বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল, কেহ কেহ গায়ে ধুলা দিতে লাগিল। রাজপুত্র আর মুখ তুলিলেন না।

আটদিনের পর আমার মহলের দরজা খুলে দিলে আমার দাসীরা গিয়া সম্বাদ আনিল; প্রথমেই সকল কথা জানিতে পারি নাই; ক্রমে জানিলাম। তখন আমি নিজে রাজমহলে গিয়া শ্বশুরের পায়ে কাঁদিয়া পড়িলাম। তিনি বলিলেন, "যাহা শুনিয়াছ সকল মিথ্যা। একজন দুষ্টলোক জাল সেজে এসেছিল, আমি তারে বাঁধিয়া দেশছাড়া করে দিয়াছি।" আমি বলিলাম, "আপনি তাঁকে নিজে চিনেছিলেন, তাঁরে পেয়ে কত কেঁদেছিলেন, তবে এরূপ কেন করিলেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি চিনিলে কি হয়, আমি বৃদ্ধ, আমার ভ্রম হতে পারে; কিন্তু দেওয়ান্ তাঁরে বাল্যকালাবধি দেখে আসিতেছে, দেওয়ানের ভুল হবার ত কোন কথা নহে। যখন দেওয়ান্ বলিল "এ ব্যক্তি রাজপুত্র নহে" তখন অবশ্যই আমার সন্দেহ হইতে পারে।"

আমি বলিলাম দেওয়ান্ তাঁকে নিশ্চয়ই চিনেছিলেন, কেবল আপনাকে তাহা বলেন নাই। আপনি কি ভুলে গেছেন যে দেওয়ানের পুত্রকে আপনি পোষ্যপুত্র লয়েছেন? আপনার পুত্র ফিরে আসিলে দেওয়ানের অবশ্য ক্ষতি আছে, কাজেই দেওয়ান্ মহাশয় আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়াছিলেন।

এই কথায় শ্বশুরমহাশয় অন্যমনস্ক হইলেন; ক্ষণবিলম্বে বলিলেন, "এমন হবে না; এত অধর্ম্ম আচরণ দেওয়ান্ কখনই করিবে না। আমি তারে চিরকাল প্রতিপালন করেছি, তার কত উপকার করেছি, আমার সে নিতান্ত অনুগত, সে কখন এমন অধর্ম্মাচরণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এসেছিল, তার আকার অবয়ব কতকটা আমার ছেলের সঙ্গে

মিলেছিল" বটে, কিন্তু বর্ণ সে নয়, মুখের সে হাসি নয়, শরীর তেমন নরম নয়, আবার কতকগুলা দাড়ি আছে। তবে এরে দেখিলে তারে মনে পড়ে বটে। কাজেই দেওয়ানের কোন দোষ ছিল না। —কিন্তু আমার এক কথা আছে, দেওয়ানের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে যখন প্রথম আমার সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন আমি তাহারে বলিয়াছিলাম 'আর একবার আমি নিজে গিয়া সন্দেহভঞ্জন করে আসি।' কিন্তু দেওয়ানই তাহার বাধা দিয়াছিল।"

আমি সময় পাইয়া বলিলাম, "প্রথম সন্দেহও বোধ হয় দেওয়ান্ মহাশয়ই উত্থাপন করে থাকিবেন।" রাজা ভাবিয়া বলিলেন, "তাও সত্য, কিন্তু গ্রামশুদ্ধ লোক তাহাকে জালরাজা বলেছে, কেহই ত চিনিতে পারে নাই। সকলেই ত তারে দেখেছে।"

আমি উত্তর করিলাম, "গ্রামের কেহই ত তাঁকে দেখে নাই। কাঞ্চনবাগে কাহারও যাবার হুকুম ছিল না, দেওয়ান্ মহাশয় নিজের লোক তথায় রাখিয়াছিলেন, কাহাকেও তথায় যাইতে দেন নাই; যদি কেহ যাইতে পাইত, তাহা হইলে সকলেই তাঁরে চিনিত। তিনি যখন এসে পুষ্করিণীর ধারে বসেছিলেন, তখন কাদম্বিনী তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনেছিল। তিনি ত তখন তার কাছে "রাজপুত্র" বলে পরিচয় দেন নাই, তখন কাহারও কাছে নিজের পরিচয় দেন নাই, আপনাকেও তখন পত্র লেখেন নাই; কাদম্বিনী যেমন দেখিবা মাত্র তাঁকে চিনেছিল, দেখিলে আর সকলেও সেইমত চিনিত। আর কেহই না চিনুক, আপনি ত তাঁকে চিনেছিলেন। তবে যে লোকে জালরাজা বলে গোলযোগ করেছিল তাহা তাহাদের দোষ নয়; দেওয়ান মহাশয় লোকের কাছে যেমন পরিচয় দিয়াছিলেন, লোকও তেমনি বলাবলি করেছিল। কেহ ত কাঞ্চনবাগে প্রবেশ করিতে পায় নাই।"

রাজা অনেকক্ষণ অবধি নীরবে রহিলেন, তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিন আমায় এ সকল কথা বল নাই কেন?" আমি বলিলাম, "দেওয়ান্‌মহাশয় আমায় মহলে আটদিন চাবি বন্ধ করে রাখিয়াছিলেন, কাজেই আমি কোন কথা বলিয়া পাঠাইতে পারি নাই।"

আমার শ্বশুর বলিলেন, "এখন দেওয়ানের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলাম, আমায় বৃদ্ধ পাইয়া আমার এই দুর্গতি করেছে, আমার সোণার চাঁদকে তাড়াইয়াছে। যাবার বেলা ছেলে আমার কত ব্যথা পেয়ে গেছে; আমায় না জানি কি ভাবিয়া গিয়াছে। আমি কি নরাধম। আমি এখনই তারে খুঁজিতে চারিদিকে লোক পাঠাইব।"

আমি বলিলাম, "এক্ষণে লোক পাঠান বৃথা, তাঁকে অনুসন্ধান করে এমন লোক আপনার আর একটিও নাই।

যাহারা আপনার লোক ছিল, তাহারা সকলেই একে একে ছেড়ে গিয়াছে; এখন যাহারা আছে, তাহারা কি আমলা, কি চাকর, কি সিপাহী, সকলেই দেওয়ানের লোক, দেওয়ানের ইচ্ছা না থাকিলে তারা কখনই অনুসন্ধান করিবে না।” রাজা বলিলেন, “বটে, আমার এমন অবস্থা করেছে! আমি এখনই দেওয়ানকে তাড়াইব।” এই বলিয়া মহা রাগত হয়ে বাহিরে গেলেন, আমিও আমার মহলে আসিলাম। রাজা তখনই দেওয়ান্‌কে বরখাস্ত করিয়া রাজবাটী হইতে চলিয়া যাইতে অনুমতি পাঠাইলেন। দেওয়ান্ রাজাজ্ঞা শুনিয়া প্রথমে ঈষৎ হাসিল, তার পর মুখ ভার করে যোড়হাতে রাজসভায় গিয়া এক-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “দাসের কি অপরাধ হয়েছে?” তাহার নম্রতা দেখে রাজার কিঞ্চিৎ রাগ কমিল। রাজা বলিলেন, “তুমি ষড়যন্ত্র করে রাজপুত্রকে তাড়াইয়াছ, অতএব তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার বাটী হইতে যাও। যদি রাজ-পুত্রকে তল্লাস করে পুনরায় আনিতে পার, তবেই আমার এখানে আবার তোমার স্থান হবে; নতুবা এই পর্য্যন্ত।” দেওয়ান্ রাজার পা ধরিয়া বলিল, “ক্ষমা করুন, আমার কোন অপরাধ নাই; আমি কোন ষড়যন্ত্র জানি না, তাহা হইলে অনেক কাল অবশ্য ধরা পড়িতাম। আমি বালককাল অবধি এই রাজসরকারে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি। আমি নিতান্ত অনুগত বলে সামান্য মুহুরীর পদ হইতে ক্রমে ক্রমে দেওয়ানের পদ পেয়েছি, এতদিন কখন ত আমার কলঙ্ক ছিল না। বোধ হয় এতদিনের পর আমি নষ্টচন্দ্র দেখে থাকিব, অথবা এতদিনের পর আমার কেহ শত্রু জুটে থাকিবে, নতুবা জানত আমি কোন অপরাধ করি নাই।” রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আমার পুত্রবধুর দরজায় চাবি দিয়াছিলে কেন?” দেওয়ান্ তখন বুঝিল, যে আমার দ্বারা এই কাণ্ড হইয়াছে। দেওয়ান তখন যোড়হস্তে বলিল, “নির্জ্জন হইলে সে সকল কথা নিবেদন করিতে পারি।” রাজা নির্জ্জনে গেলে দেওয়ান বলিল, “সকল কথা আপনার সাক্ষাতে বলা উচিত নয়, কিন্তু কি করি বলিতে হই-তেছে। রাজবধুর চরিত্রসম্বন্ধে মহাশয় অবশ্য এত দিন কিছু শুনিয়া থাকিবেন, সে সকল কথা আমার বলা ভাল হয় না। সম্প্রতি তিনি নিজে পত্র লিখিয়া এই জালরাজাকে আনাইয়াছিলেন; তত্র ঘরে এই জন্যই স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শিখায় না। আমি বিবেচনা করিলাম, যদি দুইজনে এই সময় চিঠি লেখালিখি চলে, তাহা হইলে শেষ ভয়ানক কলঙ্ক রটিবে; তাহাই আমি আপনাকে না জানাইয়া পত্রযাতায়াতের পথ বন্ধ করি-য়াছিলাম। বিশেষতঃ কাদম্বিনীনামে একজন স্ত্রীলোক মধ্যবর্ত্তিনী জুটিয়া ছিল। জালরাজা আসিয়াই তাহার দ্বারা প্রথম পত্র পাঠান, আমি সময়ে সন্ধান

পাইয়া অন্দরের দরজার চাবি দিয়াছিলাম। কাদম্বিনী ফিরিয়া যাইতে পায় নাই, কাজেই পত্রও চালাচালি হয় নাই। চাবি না দিলে বোধ হয় জালরাজার সঙ্গে তিনি চলিয়া যাইতেন, কেন না শেষ যখন জালরাজা দেখিলেন যে, তাঁহার শঠতা ধরা পড়েছে, তখন পেস্কারকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলেন, "আমার ধনসম্পত্তি কিছুরই আর কাজ নাই, আমার স্ত্রীকে দিলেই আমি চলিয়া যাই। তিনি আমার সঙ্গে যাইতে সম্মত আছেন।"

রাজা পেস্কারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় পেস্কারও তাহাই বলিল। আমি সেইদিন হইতে আর শ্বশুরবাটীতে স্থান পাইলাম না; তৎক্ষণাৎ দরজায় পাল্কী আসিল। বিদায়ের সময় শ্বশুরকে প্রণাম করিব বলিয়া এত জানাইলাম, শ্বশুর তাতে একেবারে কাণ দিলেন না; শেষ বলিয়া পাঠাইলেন, যে তিনি দুশ্চরিত্রার মুখদর্শন করেন না; আমি কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কীতে উঠিলাম। সেই অবধি আমার শ্বশুরবাড়ীর সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছে।

মাতঙ্গিনী। আপনার কি বরদাস্ত।

জ্যোৎ। অভাগীর, বরদাস্ত চিরকালই আছে; যাহারা ভাগ্যবতী সুখের কোলে নিদ্রা যায়, তারাই একটুতে কাতর হয়। যাহার অদৃষ্ট মন্দ, তাহার বরদাস্ত আপনিই হয়।

মাতঙ্গিনী। যিনি এসেছিলেন, তিনি সত্যই কি রাজপুত্র?

জ্যোৎ। আমি তাঁরে ত তখন দেখি নাই। কাদম্বিনী দেখেছিল; সে কেনই বা মিথ্যা করে বলিবে?

মাতঙ্গিনী। তবে আপনি ত বিধবা নন?

জ্যোৎ। তিনি বেঁচে আছেন, আমি তাঁরে দেখেছি।



মালাচন্দন।

ইংরেজি কেতার সম্মান বাঙ্গালিরা বড় বুঝেন না, শীঘ্র বুঝিবেন এমনও বোধ হয় না। ইংলণ্ড ও বাঙ্গালা পরস্পর যেরূপ দূর, পরস্পরের ব্যবহারও সেইরূপ দূর। আমরা হাততালি দিয়া উপহাস করি, ইংরেজেরা হাততালি দিয়া "বাহবা" দেন। বৈপরীত্য বড় সামান্য নয়। আমাদের চক্ষে নতশির, নিম্নদৃষ্টি নম্রতার লক্ষণ, সাহেবদের চক্ষে তাহা অপরাধের অকাট্য প্রমাণ; তাঁহারা ভাবেন, 'যখন এই ব্যক্তি মুখ তুলিয়া চাহিল না, তখন ইহার বিরুদ্ধে আর প্রমাণের বাকি কি?' উভয় জাতির মনের গতি স্বতন্ত্র, এই জন্য ইংরেজেরা আমা-

দিগকে এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলেন না, আমরাও ইংরেজদের বুঝিলাম না। গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপকার এবং উৎসাহের নিমিত্ত কতই কৌশল করিতেছেন, কিন্তু আমরা কেবল এই জন্যই তাহার অধিকাংশ বুঝিতে পারি না, তাহার অনেকগুলি গ্রহণ করি না। ফেলারাম বিশ্বাস "ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া" হইলেন, তাঁহার ভ্রাতা খেলারাম তাহা কিছুই বুঝিল না। ফেলারাম যদি নিজগ্রামে গেলেন, তথায় কেহই তাঁহার নূতন সম্মান অনুভব করিতে পারিল না; ফেলারাম কাজেই সুখী হইলেন না। "ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া" হওয়া অপেক্ষা ফেলারাম যদি কোথায়ও মালাচন্দন পাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি অধিক সুখী হইতেন; কেননা সে সম্মান লোকে দেখিতে পায়, আত্মীয়স্বজনে বুঝিতে পারে। যে শ্রেষ্ঠ, যে সর্ব্বপ্রধান, কেবল সেই মালাচন্দন পায়; যখন শত শত লোক একত্র সমবেত হয়, তখন সর্ব্বসম্মুখে সর্ব্বপ্রধানকে মালাচন্দন দিয়া সম্মান করা হয়। ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে লোকে এইরূপে সর্ব্বপ্রধানকে সর্ব্বদা সম্মান করিয়া থাকে। সেখানে ফেলারাম শর্ম্মা—ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া—বসিয়া থাকুন, লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও করিবে না; মালাচন্দন দিবার সময় তাঁহার দিকে কেহ চাহিয়াও দেখিবে না। তবে সমাজে "ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়ার" সম্মান কই ?

এই জন্য বলি গুণবানের মান প্রচার করিবার জন্য যে বিলাতী পদ্ধতি ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় ভাল খাটিতেছে না। নামের পরে নাইট কম্পানিয়ান প্রভৃতি সেকেলে কথা যুড়িয়া দেওয়া হইতেছে, কিন্তু সে যোড়া দেওয়া কয়টা লোক দেখিতে পাইতেছে কিম্বা জানিতে বা বুঝিতে পারিতেছে ?

"ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" বা ভারতনক্ষত্র যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন হয় ত জানেন, যে তাঁহাদের কিরণে ভারতের কোন অংশই আলোকময় হয় না, ভারতের অনেক লোকই তাঁহাদের আলোক দেখিতে পায় না। তাহাই তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিবেচনা করেন, যে লোকের উচিত, "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" বলিয়া তাঁহাদের মালাচন্দন দেয়, অন্ততঃ গবর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে কোন হুকুম দেন। পূর্ব্বকালের মালাচন্দন যে দেখিয়াছে, সেই জানে যে গুণের কিরূপ সমাদর এ দেশে সর্ব্বদা করা হইত; কাজেই ভারতনক্ষত্রের মনে মালাচন্দনের জন্য লোভ হইতে পারে।

কিন্তু মালাচন্দনের আর গৌরব নাই। যে অবধি বাঙ্গালির দুরদৃষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, সেই অবধি ভালমন্দ বিচার করিবার আর আমাদের শক্তি নাই। কাহাকে পূজা করি, কাহাকে সম্মান করি, কাহাকে আদর্শ করি, এ সকলের আর কিছুই ঠিকানা নাই। বোধ হয় সম্মানোপযোগী লোক বাঙ্গালায় থাকিলে

বাঙ্গালার দুর্দ্দশা আরম্ভ হইত না। সম্মানোপযোগী লোক গিয়াছে কিন্তু তাঁহাদের বংশ আছে, কাজেই বংশপূজা আরম্ভ হইয়াছে, কুলীনের বংশোদ্ভব বলিয়া অনেক 'জন্তু' মালাচন্দন পাইতেছে, ফল আরও মন্দ দাঁড়াইয়াছে। ভাল আরম্ভ হইলে যেমন ক্রমেই আরও ভাল হইতে থাকে, মন্দ সম্বন্ধেও সেইরূপ; একবার মন্দ আরম্ভ হইলে ক্রমে সেই মন্দই বাড়িতে থাকে; স্বভাবের নিয়মই এই। যখন জন্তুবৎ সামান্য ব্যক্তিরা কুলগৌরবে পূজা হইল, তখন বাঙ্গালার রুচি আরও মন্দ হইতে লাগিল; ব্যক্তিগত গুণ আর সমাজে লক্ষ্য হইল না, উৎসাহ পাইল না, বাঙ্গালার আর টান ফিরিল না।

এক্ষণে এই ভুলের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে; কেহ কেহ বলিতেছেন, কেবল কুলপূজা করা ভুল। তাঁহাদের বলিবার তাৎপর্য্য যে, যে পর্য্যন্ত বঙ্গসমাজে ব্যক্তিগতগুণের জন্য মালাচন্দন আরম্ভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শনির দশা ঘুচিবে না। কুলপূজা এক কারণে ভাল, কিন্তু শত কারণে মন্দ। সৎকুলে সৎ জন্মিবার সম্ভাবনা সত্য; কিন্তু যেখানে স্পষ্ট বিপরীত ফল দেখা গিয়াছে, সেখানে আর কুলপূজা কেন?

কুলকিরণ অনেক প্রকারে বিকীর্ণ হইয়া থাকে, সেই কিরণে 'বুনিয়াদী' 'আধুনিক' এই সকল বিচারের জন্ম। কেহ ভাবেন, 'আমার পূর্ব্বপুরুষ প্রথম সৃষ্টি হয়, আর সকলের পূর্ব্বপুরুষ পরে সৃষ্টি হইয়াছে; তাই আমি বুনিয়াদী।' আবার কেহ ভাবেন, তাঁহারও যে বুনিয়াদ, রামাবাগদীরও সেই বুনিয়াদ। যদি তাঁহার অপেক্ষা রামাবাগদীর বিশেষ গুণ থাকে, তবে রামাবাগদী তাঁহার নিকট মালাচন্দন পাইতে পারে। এইরূপ বিবেচনা বাঙ্গালায় ক্রমেই বিস্তার হইতেছে, কাজেই "ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার" এক সময় মালাচন্দন পাইবার সম্ভাবনাও বাড়িতেছে।

যিনিই যাহাই বলুন, বোধ হয় মালাচন্দনের রীতি উঠিয়া যাওয়া ভাল নহে। যদি বিচার করিয়া মালাচন্দন দেওয়া হয়, তাহা হইলে উন্নতিই সম্ভব।



বঙ্গদর্শন।

সপ্তম বৎসর।

৭৮ সংখ্যা।



মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত।

শ্রীদর্পনারায়ণ পুতিতুণ্ড প্রণীত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুচিরাম গুড়মহাশয় এই জগৎ পবিত্র করিবার জন্য, কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহা লেখে না। ইতিহাস এরূপ অনেকপ্রকার বদমাইসি করিয়া থাকে। এ দেশে ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, নচেৎ উচিত ব্যবস্থা করা যাইত।

যশোদা দেবীর গর্ভে সাফলরাম গুড়ের ঔরসে তাঁহার জন্ম। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; কেন না উচ্চবংশের কথা কিছুই বলিতে পারা গেল না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তিনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব। গুড় শুনিয়া কেহ মনে না করেন যে তিনি মিষ্টবিশেষ হইতে জন্মিয়াছিলেন।

সাফলরাম গুড় কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিবাস সাধুভাষায় মোহনপল্লী অপর ভাষায় মোনাপাড়া। মোহনপল্লী ওরফে মোনাপাড়ায় কেবল ঘরকতক কৈবর্ত্তের বাস। গুড়মহাশয় এক ব্রাহ্মণ—যেমন এক চন্দ্র রজনী আলোকময়ী করেন, যেমন এক বিষ্ণুই পুরুষোত্তম, যেমন এক বার্ত্তাকুদগ্ধ গুড় মহাশয়ের অন্নরাশির উপর শোভা করিতেন, তেমনি সাফলরাম একা মোহনপল্লী উজ্জ্বল করিতেন। শ্রাদ্ধশান্তিতে কাঁচা কদলী আতপ তণ্ডুল এবং দক্ষিণা, ষষ্ঠী মাকালের পূজায় অন্নপ্রাশনাদিতে নারিকেল নাড়ু, ছোলা, কলা আদি তাঁহার লাভ হইত। সুতরাং যাজনক্রিয়ায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। তাঁহারই ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া মুচিরাম শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলেন।

জন্মগ্রহণের পর মুচিরাম দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। দেখিয়া যশোদা, সেটা বালকের অসাধারণ পৌরুষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, অতিশয় গর্ব্বা-

ম্বিতা হইলেন। যথাকালে মুচিরামের অন্নপ্রাশন হইল। নামকরণ হইল মুচিরাম, এত নগেন্দ্র গজেন্দ্র চন্দ্রভূষণ বিধুভূষণ থাকিতে তাঁহার মুচিরাম নাম হইল কেন তাহা আমি সবিশেষ জানি না, তবে দুষ্টলোকে বলিত যে, যশোদা দেবীর যৌবনকালে কোন কালো কোলো কোঁকড়া চুল নধরশরীর মুচিরাম দাসনামা কৈবর্ত্তপুত্র তাঁহার নয়নপথের পথিক হইয়াছিল, সেই অবধি মুচিরাম নামটি যশোদার কাণে মিষ্ট লাগিত।

যাহাই হউক যশোদা নাম রাখিলেন মুচিরাম। নাম পাইয়া মুচিরামশর্ম্মা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে মা, "বাবা" "দু" "দে" ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখিলেন। তাঁহার অসাধারণধীশক্তির বলে মিছাকান্নায় এক বৎসর পার হইতে না হইতেই সুপণ্ডিত হইলেন। তিনবৎসর যাইতে না যাইতেই গুরুভোজনে দোষ উপস্থিত হইল এবং পাঁচবৎসর যাইতে না যাইতেই মহামতি মুচিরাম মাকে শিক্ উচ্চারণ করিতে এবং বাপকে শালা বলিতে শিখিলেন। যশোদা কাঁদিয়া বলিতেন, এমন গুণের ছেলে বাঁচ্‌লে হয়।

পাঁচবৎসরে সাফলরাম গুরুমহাশয় কিছু গোলে পড়িলেন। যশোদা ঠাকুরাণীর সাধ, পাঁচবৎসরে পুত্রের হাতে খড়ি হয়। সর্ব্বনাশ! সাফলরামের ত্রিসপ্তপুরুষের মধ্যে সে কাজ হয় নাই। মাগী বলে কি? যেদিন কথা পড়িল, সেদিন সাফলরামের নিদ্রা হইল না।

যমুনার জল উজান বহিতে পারে, তবু গৃহিণীর বাক্য নড়িতে পারে না। সুতরাং সাফলরাম হাতে খড়ির উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনক্রোশের মধ্যে পাঠশালা বা গুরুমহাশয় নাই। কে লেখা পড়া শিখাইবে? সাফলরাম বিষণ্ণবদনে বিনীতভাবে যশোদা দেবীর শ্রীপাদপদ্মে এই সম্বাদ সুনিবেদিত হইলেন। যশোদা বলিলেন, "ভাল তুমি কেন আপনিই হাতে খড়ি দিয়া ক, খ, শিখাও না।" সাফলরাম একটু ম্লান হইয়া বলিলেন, "হাঁ তা আমি পারি, তবে কি জান শিষ্যসেবক যজমানের জালায়—আজি কি রান্না হইল।" শুনিবামাত্র যশোদা দেবীর মনে পড়িল আজি কৈবর্ত্তেরা পাতিলেবু দিয়া গিয়াছে। বলিলেন, "অধঃপেতে মিন্সে—" এই বলিয়া পতিপুত্রপ্রাণা যশোদা দেবী বিষণ্ণমনে সজলনয়নে পাতিলেবু দিয়া পান্তা ভাত খাইতে বসিলেন।

অগত্যা মুচিরাম অন্যান্য বিদ্যা অভ্যাসে সানুরাগ হইলেন। অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে—"পরা অপরাচ"—গাছে ওঠা, জলে ডোবা, এবং সন্দেশ চুরি। কৈবর্ত্ত যজমানদিগের কল্যাণে গুড়ের ঘরে সন্দেশের অভাব নাই। নারিকেলসন্দেশ এবং অন্যান্য যে সকল জাতীয় সন্দেশের সঙ্গে ছানার সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, যাহা সর্ব্বদা

মুচিরামের ঘরে থাকিত, সে সকল মুচিরামের বিদ্যাভ্যাসের কারণ হইল। কৈবর্ত্তের ছেলেদের সঙ্গে মুচিরামের প্রত্যহ একটি নূতন কোন্দল হইত—শুনা গিয়াছে কৈবর্ত্তদিগের ঘরেও খাবার চুরি যাইত।

নবম বৎসরে মুচিরামের উপনয়ন হইল। তার পর সাফলরাম এক বৎসর প্রিয়তম পুত্রকে সন্ধ্যা আহ্নিক শিখাইলেন। একবৎসরে মুচিরাম সন্ধ্যা আহ্নিক শিখিয়াছিলেন কি না আমরা জানি না। কেন না প্রমাণাভাব। তার পর মুচিরাম কখন সন্ধ্যা আহ্নিক করেন নাই।

তার পর একদিন সাফলরাম গুড় অকস্মাৎ ওলাউঠারোগে প্রাণত্যাগ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যশোদার আর দিন যায় না। যজমানদিগের পৌরোহিত্য কে করে? কৈবর্ত্তেরা আর একঘর বামন আনিল। যশোদা অন্নকষ্টে—ধান ভানিতে আরম্ভ করিলেন।

যখন মুচিরামের বয়স দশবৎসর, কৈবর্ত্তেরা চাঁদা করিয়া একটা বারোইয়ারি পূজা করিল। যাত্রা দিবার জন্ত বারোইয়ারি; কৈবর্ত্তেরা শস্তা দরে হারাণ অধিকারীকে তিনদিনের জন্য বায়না করিয়া আনিয়া, কলাগাছের উপর সরা জ্বালিয়া, তিনরাত্রি যাত্রা শুনিল। মুচিরাম এই প্রথম যাত্রা শুনিল। যাত্রার গান, যাত্রার গল্প অনেক শুনিয়াছিল—কিন্তু একটা আস্ত যাত্রা, এই প্রথম শুনিল; চূড়া ধড়া ঠেঙ্গা লাঠিসহিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এই প্রথম দেখিল। আহ্লাদ উছলিয়া উঠিল। নিশ্চিত সম্বাদ রাখি, যে পরদিন মুচিরাম, গালাগালি মারামারি বা চুরি বা মাতাকে প্রহার, এ সকলের কিছুই করে নাই।

মুচিরামের একটা গুণ ছিল, মুচিরাম সুকণ্ঠ। প্রথমদিন যাত্রা শুনিয়া বহুযত্নে একটা গানের মোহাড়াটা শিখিয়াছিল। পরদিন প্রভাত হইতে মাঠে মাঠে সেই গান গাইয়া ফিরিতে লাগিল। দৈবাৎ হারাণ অধিকারী লোটা হাতে, পুষ্করিণীতে হস্তমুখপ্রক্ষালনাদির অনুরোধে যাইতেছিলেন—প্রভাতবায়ুপরিচালিত হইয়া মুচিরামের সুস্বর অধিকারীমহাশয়ের কাণের ভিতর গেল। কাণে যাইতে যাইতে মনের ভিতর গেল—মনের ভিতর গিয়া, কল্পনার সাহায্যে, টাকার সিন্দুকের ভিতরও প্রবেশ করিল। অধিকারীমহাশয়ের নিকট গলার আওয়াজ, টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। সে দোষে অধিকারীমহাশয় একা দোষী নহেন—জিজ্ঞাসা করিলে অনেক উকীলমহাশয়েরা ইহার কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারিবেন। তাঁহাদের কাছেও

গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। উকীলবাবুদেরই বা দোষ কি—Glorious British Constitution!—হায়! গলাবাজি সার!

অধিকারীমহাশয়—মানুষের সঙ্গে প্রেম করেন না—ব্রিটিষ পার্লিমেণ্টের মত এবঞ্চ কুরঙ্গিণীসদৃশ মনুষ্যকণ্ঠেই মুগ্ধ—অতএব তিনি হাত নাড়িয়া মুচিরামকে ডাকিলেন। মুচিরাম আসিল। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,

"তুমি আমার যাত্রার দলে থাকিবে?"

মুচিরাম আহ্লাদে আটখানা। মাকে জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখিল না—তখনই সঙ্গে যায়। কিন্তু অধিকারী মনে করিল যে, পরের ছেলে না বলিয়া লইয়া যাওয়া কিছু নয়। অতএব মুচিরামকে সঙ্গে করিয়া তাহার মার নিকট গেল।

শুনিয়া যশোদা বড় কাঁদা কাটা আরম্ভ করিল—সবে একটি ছেলে—আর কেহ নাই—কি প্রকারে ছাড়িয়া দিবে? এদিকে আবার অন্ন জুটে না—যদি একটা খাবার উপায় হইতেছে—কেমন করিয়াই বা না বলেন? বিধাতা কি আর এমন সুযোগ করিয়া দিবেন? আমি না দেখিতে পাই তবু ত মুচিরাম ভাল খাইবে, ভাল পরিবে! যশোদা যাত্রাওয়ালার দুঃখ জানিত না। অগত্যা পাঁচটাকা মাসিক বেতন রফা করিয়া যশোদা মুচিরামকে হারাণ অধিকারীর হস্তে সমর্পণ করিল। তার পর আছাড়িয়া পড়িয়া স্বামীর জন্য কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুচিরাম অল্পদিনেই দেখিল যে যাত্রাওয়ালার জীবন সুখের নয়। যাত্রাওয়ালা কেবল কোকিলের মত গান করিয়া ডালে ডালে মুকুলভোজন করিয়া বেড়ায় না। অল্পদিনে মুচিরামের শরীর শীর্ণ হইল। এ গ্রাম ও গ্রাম ছুটাছুটি করিতে করিতে সকল দিন আহার হয় না; রাত্রি জাগিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত; চুলের ভারে মাথায় উকুনে ঘা করিল; গায়ে খড়ি উড়িতে লাগিল; অধিকারীর কাণমলায় কাণমলায় দুই কাণে ঘা হইল। শুধু তাই নয়; অধিকারীমহাশয়ের পা টিপিতে হয়, তাঁকে বাতাস করিতে হয়, তামাক সাজিতে হয়, আরও অনেক রকম দাসত্ব করিতে হয়। অল্প দিনেই মুচিরামের সোণার মেঘ বাষ্পরাশিতে পরিণত হইল।

মুচিরামের আরও দুর্ভাগ্য এই যে, বুদ্ধিটা বড় তীক্ষ্ণ নহে। গীতের তাল যে, পুষ্করিণীতীরস্থ দীর্ঘবৃক্ষে ফলে না, ইহা বুঝিতে তাঁহার বহুকাল গেল। ফলে তালিমের সময়ে তালের কথা পড়িলে, মুচিরাম অন্যমনস্ক হইত—মনে পড়িত, মা কেমন তালের বড়া করে!—মুচিরামের চক্ষু দিয়া এবং রসনা দিয়া জল বহিয়া যাইত।

আবার গান মুখস্থ করা আরও দায় —কিছুতেই মুখস্থ হইত না—কাণমলায় কাণমলায় কাণ রাঙ্গা হইয়া গেল। সুতরাং আসরে গায়িবার সময়ে পিছন হইতে তাঁহাকে বলিয়া দিতে হইত। তাহাতে মধ্যে মধ্যে বড় গোল বাঁধিত —সকল সময়ে ঠিক শুনিতে বা বুঝিতে পারিত না। একদিন পিছন হইতে বলিয়া দিতেছে—

"নীরদকুন্তলা—লোচনচঞ্চলা
দধতি সুন্দররূপং"

মুচিরাম গায়িল—"নীরদ কুন্তলা—" থামিল—আবার পিছন হইতে বলিল, "লোচনচঞ্চলা"—মুচিরাম ভাবিয়া চিন্তিয়া গায়িল "লুচি চিনি ছোলা।" পিছন হইতে বলিয়া দিল "দধতি সুন্দর রূপং"—মুচিরাম না বুঝিয়া গায়িল "দধিতে সন্দেশ রূপং।" সেদিন আর গায়িতে পাইল না।

মুচিরামকে কৃষ্ণ সাজিতে হইত—কিন্তু কৃষ্ণের বক্তব্য সকল তাহাকে পিছন হইতে বলিয়া দিতে হইত—কেবল "আ—বা—আ—বা ধবলী" টি মুখস্থ ছিল। একদিন মানভঞ্জন যাত্রা হইতেছে—পিছন হইতে মুচিরামকে বক্তৃতা শিখাইয়া দিতেছে। কৃষ্ণকে বলিতে হইবে "মানময়ি রাধে! একবার বদন তুলে কথা কও।" মুচিরাম সবটা শুনিতে না পাইয়া কতকদূর বলিল, "মানময়ি রাধে একবার বদন তুলে—" সেই সময়ে বেহালাওয়ালা মৃদঙ্গীর হাতে তামাকের কল্কে দিয়া বলিতেছিল "গুড়ুক খাও—" শুনিয়া মুচিরাম বলিল "রাধে—একবার বদন তুলে—গুড়ুক খাও।" হাসির চোটে যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

মুচিরাম প্রথমে বুঝিতে পারিল না—হাসি কিসের,—যাত্রা ভাঙ্গিল কেন? কিন্তু যখন দেখিল অধিকারী সাজঘরে আসিয়া একগাছা বাঁক সাপটিয়া ধরিয়া, তাহার দিকে ধাবমান হইলেন, তখন মুচিরাম হঠাৎ বুঝিল, যে এই বাঁক তাঁহার পৃষ্ঠদেশে অবতীর্ণ হইবার কিছু গুরুতর সম্ভাবনা—অতএব কথিত পৃষ্ঠদেশ স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া আশু প্রয়োজন। এই ভাবিয়া মুচিরাম অকস্মাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৈশ অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

অধিকারীমহাশয় বাঁকহস্তে তৎপশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মুচিরামকে না দেখিতে পাইয়া, তাহার ও তাহার পিতা পিতামহ মাতা ও ভগিনীর নানাবিধ অযশ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মুচিরামও এক বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া অস্ফুটস্বরে অধিকারীমহাশয়ের পিতৃমাতৃসম্বন্ধে তদ্রূপ অপবাদ রটনা করিতে লাগিল। অধিকারী মুচিরামের সন্ধান না পাইয়া সাজঘরে গিয়া, বেশত্যাগ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। দেখিয়া মুচিরাম বৃক্ষচ্ছায়া ত্যাগ করিয়া, রুদ্ধদ্বারসমীপে দাঁড়াইয়া অধিকারীকে নানাবিধ অবক্তব্য কদর্য্য ভাষায় মনে মনে

সম্বোধন করিতে লাগিল ; এবং উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উত্থিত করিয়া তাহাকে কদলী ভোজনের অনুমতি করিল। তৎপরে রুদ্ধকবাটকে, বা কবাটের অন্তরালস্থিত অধিকারীর বদনচন্দ্রকে একটি লাথি দেখাইয়া, মুচিরাম ঠাকুরবাড়ীর মন্দিরের রোয়াকে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

প্রভাতে উঠিয়া অধিকারীমহাশয় গ্রামান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শুনিলেন মুচিরাম আইসে নাই —কেহ কেহ বলিল তাহাকে খুঁজিয়া আনিব? অধিকারীমহাশয় গালি দিয়া বলিলেন, "জুট্‌তে হয়, আপনি জুট্‌বে, এখন আমি খুঁজে বেড়াতে পারিনে।" দয়ালুচিত্ত বেহালাওয়ালা বলিল, "ছেলেমানুষ—যদি নাই জুট্‌তে পারে —আমি খুঁজে আনিব।" অধিকারী ধমকাইলেন—মনে মনে ইচ্ছা মুচিরামের হাত হইতে উদ্ধার পান, এবং সেই সঙ্গে তাহার পাওনা টাকাগুলি ফাকি দেন। বেহালাওয়ালা ভাবিল— মুচিরাম কোনরূপে জুটিবে। আর কিছু বলিল না।

যাত্রার দল চলিয়া গেল—মুচিরাম জুটিল না। রাত্রিজাগরণ—দেবালয়বরণ্ডে সে অকাতরে নিদ্রা দিতেছিল। উঠিয়া দল চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন বুদ্ধি নাই যে অধিকারী কোন পথে গিয়াছে, সন্ধান করিয়া সেই পথে যায়। কেবল কাঁদিতে লাগিল। পূজারিবামন অনুগ্রহ করিয়া বেলা তিনপ্রহরে দুইটি ঠাকুরের প্রসাদ খাইতে দিল। খাইয়া, মুচিরাম কান্নার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিল। যত রাত্রি নিকট হইতে লাগিল, তত ভাবিতে লাগিল—আমি কেন পলাইলাম! আমি কেন দাঁড়াইয়া মার খাইলাম না!

দ্বিজ দর্পনারায়ণ বলে, এবার যখন বাঁক উঠিতে দেখিবে, পিঠ পাতিয়া দিও। তোমার গোষ্ঠীর বাপচৌদ্দপুরুষ, বুড়া সেনরাজার আমল হইতে কেবল পিঠ পাতিয়া দিয়াই আসিতেছে। তুমি পলাইবে কোথায়? এ সুসভ্যজাতের অধিকারীরা মুচিরাম দেখিলে বাঁকপেটাই করিয়া থাকে—মুচিরামেরা পিঠ পাতিয়াই দেয়। কেহ পলায় না— রাখাল ছাড়া কি গোরু থাকিতে পারে হে বাপু? ঘাস জলের প্রয়োজন হইলেই, তোমার যখন রাখাল ভিন্ন উপায় নাই তখন পাঁচনবাড়িকে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া গোজন্ম সার্থক কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঈশানবাবু একজন সৎকুলোদ্ভূত কায়স্থ। অতি ক্ষুদ্র লোক—কেন না বেতন এক শত টাকা মাত্র—কোন জেলার ফৌজদারী আপিসের হেড কেরাণী! বাঙ্গালাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়—কে কত বড় বাঁদর তার লেজ মাপিয়া ঠিক করিতে হয়। এমন অধঃ-

পতন আর কখন কোন দেশের হয় নাই। বন্দী, চরণশৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া বড়াই করে।

ঈশানবাবু ক্ষুদ্র ব্যক্তি—ল্যাজ খাটো, বানরত্বে খাটো—কিন্তু মনুষ্যত্বে নহে। যে গ্রামে হারাণ অধিকারী এই অপূর্ব্ব মানভঞ্জন যাত্রা করিয়াছিলেন, ঈশান বাবুর সেই গ্রামে বাস। যাত্রাটা যে সময়ে হইয়াছিল, সে সময়ে তিনি ছুটি লইয়া বাড়ীতে ছিলেন। যাত্রার ব্যাপার তিনি কিছু জানিতেন কি না বলিতে পারি না; যাত্রার পরদিন সন্ধ্যাকালে তিনি পথে বেড়াইতেছিলেন, দেখিলেন, একটি ছেলে—শুষ্কশরীর, দীর্ঘকেশ—অনুভবে যাত্রার দলের ছেলে—পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে!

ঈশানবাবু ছেলেটির হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কাঁদ্‌ছিস কেন বাবা?" ছেলে কথা কয় না। ঈশানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি কে?"

ছেলে বলিল, "আমি মুচিরাম।"

ঈশা। তুমি কাদের ছেলে?

মুচি। বামনদের।

ঈশা। কোন্ বামনদের?

মুচি। আমি গুড়েদের ছেলে।

ঈশা। তোমার বাড়ী কোথায়?

মুচি। আমাদের বাড়ী মোনাপাড়া।

ঈশা। সে কোথা?

তা ত মুচিরামের বিদ্যার মধ্যে নহে। যাই হৌক, ঈশানবাবু অল্পসময়ে মুচিরামের দুর্ঘটনা বুঝিয়া লইলেন। "তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব" এই বলিয়া মুচিরামকে আপনার বাড়ী লইয়া গেলেন; মুচিরাম হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। ঈশানবাবু তাহার আহারাদি ও অবস্থিতির উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিন্তু মোনাপাড়ার ত কোন ঠিকানা হইল না। সুতরাং মুচিরাম ঈশানবাবুর গৃহে বাস করিতে লাগিল। সেখানে আহার পরিচ্ছদের ব্যবস্থা উত্তম, এবং কাণমলার অত্যন্তাভাব, দেখিয়া মুচিরামও বাড়ীর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইল না।

এদিকে ঈশানবাবুর ছুটী ফুরাইল—সপরিবারে কর্ম্মস্থানে যাইবেন। অগত্যা মুচিরামও সঙ্গে চলিল। কর্ম্মস্থানে গিয়াও ঈশান মোনাপাড়ার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা মুচিরাম তাঁহার গলায় পড়িল। মুচিরামও, যেখানে আহারের ব্যবস্থা উত্তম, সেখানে গলায় পড়িতে নারাজ নহে—তবে ঈশানবাবুর একটা ব্যবস্থা মুচিরামের বড় ভাল লাগিল না। ঈশানবাবু বলিলেন, "বাপু, যদি গলায় পড়িলে তবে একটু লেখা পড়া শিখিতে হইবে।" ঈশানবাবু তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে মুচিরামের মা অনেক দিন হইতে ছেলের কোন সম্বাদ না পাইয়া

পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর কাঁদাকাটি করিয়া বেড়াইয়া শেষ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রুগ্ন হইল। রুগ্ন হইয়া মরিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এদিকে, যশোদানন্দন শ্রীশ্রীমুচিরাম শর্ম্মা—ঈশানমন্দিরে সুবিরাজমান—সম্পূর্ণরূপে মাতৃবিস্মৃত। যদি কখন মাকে মনে পড়িত তবে সে আহারের সময়—ঈশানবাবুর ঘরের প্রফুল্লমল্লিকাসন্নিভ সিদ্ধান্ন, দানাদার গব্যঘৃত, সুগন্ধি ঝোলে নিমগ্ন রোহিতমৎস্য, পৃথিবীর ন্যায় নিটোল গোলাকার সদ্যভর্জ্জিত লুচির রাশি—এই সকল পাতে পাইলে মুচিরাম মনে করিতেন, "মা বেটী কি ছাই-ই আমাকে খাওয়াইত!" সে সময়ে মাকে মনে পড়িত—অন্য সময়ে নহে।

মুচিরামের পাঠশালার লেখা পড়া সমাপ্ত হইল—অর্থাৎ গুরুমহাশয় বলিল, সমাপ্ত হইয়াছে। মুচিরামের কোন গুণ ছিল না এমত বলি না; তাহা হইলে এ ইতিহাস লিখিতে আমি প্রবৃত্ত হইতাম না। মুচিরামের কণ্ঠস্বর ভাল ছিল বলিয়াছি—গুণ নম্বর এক। গুণ নম্বর দুই, তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হইল। আর কিছু হইল না। ঈশান বাবু মুচিরামকে ইংরেজি স্কুলে পাঠাইলেন।

মুচিরাম, ধেড়ে ছেলে, স্কুলে ঢুকিয়া বড় বিপদগ্রস্ত হইল। মাষ্টরেরা তামাসা করে, ছোট ছোট ছেলেরা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসে। মুচিরাম রাগ করে কিন্তু পড়ে না। সুতরাং মাষ্টরেরা হারাণ অধিকারীর পথে গেলেন। আবার কাণমলায় কাণমলায় মুচিরামের কাণ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। প্রথমে কাণমলা, তার পর বেত্রাঘাত মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত, কীলাঘাত, এবং ঘুসাঘাত। ঈশান বাবুর ঘরের তপ্তলুচির জোরে মুচিরাম নির্ব্বিবাদে সব হজম করিল।

এইরূপে মুচিরাম, তপ্তলুচি ও বেত খাইয়া, স্কুলে পাঁচ সাত বৎসর কাটাইল। কিছু হইল না। ঈশানবাবু তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ঈশানবাবুর দয়ার শেষ নাই—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি—মুচিরামের হাতের লেখাও ভাল—ঈশানবাবু মুচিরামের একটি দশ টাকার মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন "ঘুস ঘাঁস লইও না বাপু, তা হলে তাড়াইয়া দিব।" মুচিরাম শর্ম্মা প্রথম দিনেই একটা হুকুমের চোরাও নকল দিয়া আটগণ্ডা পয়সা হাত করিলেন, এবং সন্ধ্যার অল্পকাল পরেই, তাহা প্রতিবাসিনী কুলটাবিশেষের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিলেন।

এদিকে ঈশানবাবুও প্রাচীন হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ইহার পরেই পেন্সন লইয়া স্বকর্ম্ম হইতে অবসর হই-

লেন এবং মুচিরামকে পৃথক্ বাসা করিয়া দিয়া, সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। মুচিরাম ঈশানবাবুকে একটু ভয় করিত—এক্ষণে তাহার পোয়া বারো পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পোয়া বারো—মুচিরাম জেলা লুঠিতে লাগিল। প্রথমে লোকের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুইচারি আনা লইত। তার পর দাঁও শিখিল। ফেলু সেখের ধানগুলি জমীদার জোর করিয়া কাটিয়া লইতে উদ্যত, সাহেব দয়া করিয়া পুলিষকে হুকুম দিলেন, ফেলুর সম্পত্তি রক্ষা করিবে। সাহেব হুকুম দিলেন, কিন্তু পুলিষের নামে পরওয়ানাখানি লেখা আর হয় না। পরওয়ানা লেখা মুচিরামের হাত। পরওয়ানা যাইতে যাইতে ধান থাকে না; ফেলু মুচিরামকে একটাকা, দুই টাকা, তিনটাকা, চারিটাকা, ক্রমে পাঁচটাকা স্বীকার করিল—তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা বাহির হইল। তখন মাজিষ্ট্রেটেরা স্বহস্তে জোবানবন্দী লইতেন না —এক এক কোণে বসিয়া এক একজন মুহুরি ফিস্ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, আর যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিত। সাক্ষীরা একরকম বলিত, মুচিরাম আর একরকম জোবানবন্দী লিখিতেন, মোকদ্দমা বুঝিয়া ফি সাক্ষপ্রতি চারিআনা, আটআনা, একটাকা পাইতেন। মোকদ্দমা বুঝিয়া মুচি দাঁও মারিতেন; অধিক টাকা পাইলে সব উল্টা লিখিতেন। এইরূপে নানা প্রকার ফিকির ফন্দীতে মুচিরাম অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন—তিনি একা নহে, সকলেই করিত—তবে মুচি কিছু অধিক নির্লজ্জ —কখন কখন লোকের টেঁক হইতে টাকা কাড়িয়া লইত।

যাই হৌক, মুচি শীঘ্রই বড়মানুষ হইয়া উঠিল—কোন্ মুচি না হয়?—অচিরাৎ সেই অকুতনাম্নী প্রতিবাসিনী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইল। মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, আফিঙ্গ—যাহার নাম ক-করিতে আছে, এবং যাহার নাম করিতে নাই—সকলই মুচিবাবুর গৃহকে অহর্নিশি আলোক ও ধূমময় করিতে লাগিল। মুচিরামেরও চেহারা ফিরিতে লাগিল—গালে মাস লাগিল—হাড় ঢাকিয়া আসিল—বর্ণ জাপান লেদার ছাড়িয়া দিল্লীর নাগরায় পৌঁছিল। পরিচ্ছদের বৈচিত্র জন্মিতে লাগিল—শাদা, কালো, নীল, জরদা, রাঙ্গা, গোলাপী প্রভৃতি নানা বর্ণের বস্ত্রে মুচিরাম সর্ব্বদা রঞ্জিত। রাত্রি দিন মাথায় তেড়িকাটা, অধরে তাম্বুলের রাগ—এবং কণ্ঠে নিধুর টপ্পা। সুতরাং মুচিরামের পোয়া বারো।

দোষের মধ্যে সাহেব বড় খিট্খিট্ করে। মুচিরাম একে ঘোরতর বোকা, কোন কর্ম্মই ভাল করিয়া করিতে পারিত না, তাহাতে আবার দুর্জ্জয় লোভ —সকল তাতে মুচিরাম গালি খাইত!

সাহেবটাও বড় বদরাগী—অনেক সময়ে মুচিরামকে কাগজ পত্র ছুড়িয়া মারিত। কখন খাইতে খাইতে সাহেব "রিপোর্ট" শুনিতেছে—সে সময়ে মুচিরামকে রুটি বিসকট ছুড়িয়া মারিত। সাহেবের ভিতরে ভিতরে হৃদয়ে দয়া ছিল।—নচেৎ মুচিরামের চাকরী অধিককাল টিকিত না।

সৌভাগ্যক্রমে সে সাহেব বদলি হইয়া গেল—আর একজন আসিল। ইংলণ্ড হইতে আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণজন্য যে সকল রাজপুরুষ প্রেরিত হয়েন অনেকেই সুবুদ্ধি ও সুপণ্ডিত বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একজন অতি নির্ব্বোধ ব্যক্তি উচ্চবেতন পাইবার জন্য প্রেরিত হইয়া থাকেন। এই সাহেবটি তাহারই একজন।

এই নূতন সাহেবটির নাম Gronger ham—লিখিবার সময়ে লোকে লিখিত গ্রেঙ্গারহ্যাম—বলিবার সময়ে বলিত গঙ্গারাম সাহেব। গঙ্গারাম সাহেব মোকদ্দমা করিতে গিয়া, কেবল ডিস্‌মিশ করিতেন। ইহাতে দুইটি সুবিধা ছিল—এক, এক ছত্র রায় লিখিলেই হইত, দ্বিতীয় আপীল নাই। অন্যান্য সকল কর্ম্মের ভার সেরেস্তাদার এবং হেড কেরাণীর উপর ছিল। যতদিন সাহেব ঐ জেলায় ছিলেন, একদিনের জন্য একখানি চিঠি স্বহস্তে মুশাবিদা করেন নাই—হেড কেরাণী সব করিত।

সাহেব প্রথম আসিয়া, মুচিরামের কালোকোলো নধর সুচিক্কণ শরীরটি দেখিয়া, এবং তাহার আভূমিপ্রণত ডবল সেলাম দেখিয়া একেবারে সিদ্ধান্ত করিলেন, যে আপিসের মধ্যে এই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক। সে বিশ্বাস তাঁহার কিছুতেই গেল না। যাইবারও কোন কারণ ছিল না—কেন না কাজ কর্ম্মের তিনি খবর রাখিতেন না। একদিন আপিসের মীর মুন্সী, মিরজা গোলাম সর্ফদর খাঁ সাহেব, দুনিয়াদারি নামাফিক মনে করিয়া ফৌত করিলেন। সাহেব, পরদিনেই মুচিরামকে ডাকিয়া তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। মীর মুন্সীর বেতন কুড়িটাকা—কিন্তু বেতনে কি করে? পদটি রুধিরে পরিপ্লুত। অজরামরবৎপ্রাজ্ঞ মুচিরাম শর্ম্মা রুধিরসঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

দোষ কি? অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যার্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। দুইটা একজনে পারে না—দিওজিনিস্ হইতে দর্পনারায়ণ পুতিতুণ্ড পর্য্যন্ত কেহ পারিল না। মুচিরাম বিদ্যাচিন্তা করিতে সক্ষম নহেন—কোষ্ঠীতে লেখে নাই—অতএব বিষ্ণুশর্ম্মার উপদেশানুসারে মৃত্যুভয়রহিত হইয়া অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত। যদি সেই "হিতোপদেশ" গুলি অধীত হইবার যোগ্য হয়—যদি সে গ্রন্থ এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও পূজার যোগ্য হয়—তবে মুচিরামও প্রাজ্ঞ। আর এ দেশের সকল সকল মুচিই প্রাজ্ঞ।

বিষ্ণুশর্ম্মা ভারতবর্ষে মাকিয়াবেলি—

চাণক্য ভারতের রোশকুকেল। যাহারা এইরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ে বালকদিগকে পড়াইবার নিয়ম করিয়াছে, দর্পনারায়ণ তাহাদিগকে পাইলে বেত্রাঘাত করিতে ইচ্ছুক আছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মুচিরাম দুইতিন বৎসর মীর মুন্সীগিরি করিল—তার পর কালেক্টরীর পেস্কারি খালি হইল। পেস্কারিতে বেতন পঞ্চাশ টাকা—আর উপার্জ্জনের ত কথাই নাই। মুচিরাম ভাবিল, কপাল ঠুকিয়া একখানা দরখাস্ত করিব।

তখন কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি হইত। সেখানে সে সময়ে হোম নামা এক সাহেব কালেক্টর ছিলেন। হোমসাহেবের মেজাজ মরজি কিছু বেতর। মুচিরামের আর কোন বুদ্ধি ছিল না—কিন্তু সাহেবের মেজাজ বুঝা বুদ্ধিটা ছিল; প্রায় বানরগোষ্ঠীর সে বুদ্ধি থাকে।

দর্পনারায়ণ শুনে কে বানর? যে মেজাজ বুঝে, না যাহার মেজাজ বুঝিতে হয়? যে কলা খায়, না যে কদলী প্রলোভন দেখায়?

মুচিরাম একখানি ইংরেজী দরখাস্ত লিখাইয়া লইল—মুচিরামের নিজবিদ্যা দরখাস্ত পর্য্যন্ত কুলায় না। যে দরখাস্ত লিখিল, মুচিরাম তাহাকে বলিয়া দিলেন, "দেখিও যেন ভাল ইংরেজি না হয়। আর যা হৌক না হৌক, দরখাস্তের ভিতর যেন গোটা কুড়ি "মাই লার্ড" আর "ইওর লার্ডশিপ" থাকে। লিপিকার সেই রকম দরখাস্ত লিখিয়া দিল। তখন, শ্রীমুচিরাম বেশভূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার চারখানির ঢিলা পায়জামা পরিত্যাগ করিয়া, থানের ধুতি শ্রীঅঙ্গে পরিধান করিলেন; চুড়িদার আস্তীন আল্লাকার চাপকান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বুকফাঁক বন্ধকওয়ালা ঢিলে আস্তীন লাংক্লাথের চাপকান গ্রহণ করিলেন। লাটুদার পাগড়ি ফেলিয়া দিয়া, স্বহস্তে মাথায় বিঁড়া জড়াইলেন; এবং চাঁদনির আমদানি নূতন চক্‌চকে জুতা ত্যাগ করিয়া চটিতে চারুচরণদ্বয় মণ্ডন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে গঙ্গারাম সাহেবকে হরিয়েক রকম সেলাম করিয়া, কাঁদো কাঁদো মুখ করিয়া, একখান সুপারিস চিঠি বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ চিঠি, দরখাস্ত ও বিহিত সজ্জাসহিত সেই শ্রীমুচিরামচন্দ্র, যথায় হোমসাহেব এজলাষে বসিয়া দুনিয়া জলুস করিতেছিলেন, তথায় গিয়া দর্শন দিলেন।

উচ্চটঙ্গে, রেল দেওয়া পিঁজরের ভিতর, হোমসাহেব এজলাষ করিতেছেন। চারিদিকে অনেক মাথায় পাগড়ি ও বসিয়াছে—লোকে কথা কহিলেই চাপরাশী বাবাজিউরা দাড়ি ঘুরাইয়া গালি দিতেছেন—সাহেব নখ কামড়াইতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে পার্শ্বস্থ কুক্কুরটিকে কোলে টানিয়া লইতেছেন। এক ফোঁটা গুড় পড়িলে যেমন সহস্র সহস্র

পিপীলিকা তাহা বেষ্টন করে, খালি চাকরীটির মালিক হোমসাহেবকে তেমনি উমেদওয়ার ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহেব উমেদওয়ারদিগের দরখাস্ত শুনিতেছেন। অনেক বড় বড় ইংরেজিনবীশ আসিয়াছেন—সেকেলে কেঁদো কেঁদো স্কলার্শিপ হোল্ডর। সাহেব তাহাদিগকে এক এক কথায় বিদায় করিলেন। "I dare say you are well up in Shakspeare and Milton and Bacon and so forth. Unfortunately we don't want quotations from Shakspeare and Milton and Bacon in the office. So you can go, Baboo." অনেকে শামলা মাথায় দিয়া, চেন ঝুলাইয়া, পরিপাটী বেশ করিয়া আসিয়াছিলেন; সাহেব দৃষ্টিমাত্র তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। "You are very rich I see; I want a poor man who will work for his bread. You can go." শামলা চেনের দল, অভিমন্যুসম্মুখে কুরুসৈন্যের ন্যায় বিমুখ হইতে লাগিল। বাকি রহিল মুচিরাম, এবং তাঁহার সমকক্ষ জনকয়—বানর। সাহেব মুচিরামের দরখাস্ত পড়িলেন—হাসিয়া বলিলেন,

"Why do you call me, my Lord? I am not a Lord."

মুচিরাম যোড়হাতে হিন্দীতে বলিল,

"বান্দা কো মালুম থা কি হুজুর লার্ড ঘরানা হৈঁয়।"

এখন হোমসাহেবের সঙ্গে একটা লার্ড হোমের দূরসম্বন্ধ ছিল; সেই জন্য তাঁহার মনে বংশমর্য্যাদা সর্ব্বদা জাগরুক ছিল। মুচিরামের উত্তর শুনিয়া আবার হাসিয়া বলিলেন,

"হো সকতা; লার্ড ঘরানা হো সক্‌তা; লার্ড ঘরনা হোনে সে হি লার্ড হোতা নেহি।"

সকলেই বুঝিল,যে মুচিরাম কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছে। মুচিরাম যোড়হাতে প্রত্যুত্তর করিল,

"বান্দা লোক কে ওয়াস্তে হুজুর লার্ড হৈঁয়।"

সাহেব মুচিরামকে আর দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাকেই পেস্কারিতে বহাল করিলেন।

Struggle for existence! Survival of the Fittest! মুচির দলই এ পৃথিবীতে চিরজয়ী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মুচিরাম বাবু—এখন তিনি একটা ভারি রকম বাবু, এখন তাঁহাকে শুধু মুচিরাম বলা যাইতে পারে না—মুচিরাম বাবু পেস্কারি পাইয়া বড় ফাঁফরে পড়িলেন। বিদ্যাবুদ্ধিতে পেস্কারি পর্য্যন্ত কুলায় না—কাজ চলে কি প্রকারে? "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"—মুচিরামবাবুর বোঝা বাহিত হইল। ভজগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে একজন

তাইদনবীশ সেই কালেক্টরী আপিসে থাকে। ভজগোবিন্দ বারবৎসর তাইদ নবীশ আছে। সে বুদ্ধিমান্, কর্ম্মঠ কালেক্টরীর সকল কর্ম্ম কাজ বারবৎসর ধরিয়া শিখিয়াছে। কিন্তু মুরুব্বি নাই—ভাগ্য নাই—এ পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই। তাহার বাসাখরচ চলে না। মুচিরাম তাহাকে অবলম্বন করিলেন। আপনার বাসায় লইয়া গিয়া রাখিলেন। ভজগোবিন্দ মুচিরামের বাসায় থাকে, খায় পরে, গৃহকর্ম্মের সহায়তা করে, রাত্রি কালে বাবুর ঘরে বাহিরে মোসাহেবী করে এবং আপিসের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিয়া দেয়। মুচিরাম তাহাকে টাকাটা সিকেটা দেওয়াইয়া দেন। ভজগোবিন্দের সাহায্যে মুচিরামের কর্ম্ম কাজ মাহেশের রথের মত গড়গড় করিয়া চলিল। হোম সাহেব অনেক প্রশংসা করিতেন। বিশেষ মুচিরাম বিশুদ্ধপ্রণালীতে সেলাম করিত, এবং "মাই লার্ড" এবং "ইয়র আনর" কিছুতেই ছাড়িত না।

মুচিরামবাবুর উপার্জ্জনের আর সীমা রহিল না। হাতে অনেক টাকা জমিয়া গেল। ভজগোবিন্দ বলিল, টাকা ফেলিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই—তালুক মুলুক করুন। মুচিরাম সম্মত হইলেন, কিন্তু যে যে জেলায় কর্ম্ম করে সে জেলায় বিষয় খরিদ নিষেধ। ভজগোবিন্দ বলিল যে বেনামীতে কিনুন। কাহার বেনামীতে? ভজগোবিন্দের ইচ্ছা ভজগোবিন্দের নামেই বিষয় খরিদ হয়, কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারিল না। এ দিকে মুচিরাম কাহারও বাসায় গল্প শুনিয়া আসিলেন, যে স্ত্রীর অপেক্ষা আত্মীয় কেহ নাই। কথাটায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল কি না জানি না—কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন যে স্ত্রীর নামে বিষয় করাই বেনামীর শ্রেষ্ঠ। এই এখানকার দেবোত্তর। আগে লোকে বিষয় করিত ঠাকুরের নামে—এখন বিষয় করিতে হয় ঠাকুরুণের নামে। উভয় স্থলেই বিষয়কর্ত্তা "সেবাইৎ" মাত্র—পরম ভক্ত—পাদপদ্মে বিক্রীত। এই রূপ রাধাকান্ত জিউর স্থানে রাধামণি, শ্যামসুন্দরের স্থানে শ্যামাসুন্দরী দেবী মালিক হওয়ায় ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে জানি না—তবে একটা কথা বুঝা যায়। আগে মন্দিরে গেলেই সেবাইৎকে খাইতে হইত চরণতুলসী—এখন খাইতে হয় চরণ—পাপমুখে কি বলিব?

স্ত্রীর বেনামীতে বিষয় করা শ্রেয়ঃ ইহা মুচিরাম বুঝিলেন কিন্তু এই সম্বন্ধে একটা সামান্য রকম বিঘ্ন উপস্থিত হইল—মুচিরামের স্ত্রী নাই। এপর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ করা হয় নাই—অনুকল্পের অভাব ছিল না। কিন্তু এস্থলে অনুকল্প চলিবে কি না তদ্বিষয়ে পেস্কার মহাশয় কিছু সন্দিহান হইলেন। ভজগোবিন্দের সঙ্গে কিছু বিচার হইল—কিন্তু ভজগোবিন্দ একপ্রকার বুঝাইয়া দিল যে এ স্থলে অনুকল্প চলিবে না। অতএব

মুচিরাম দারগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কোন কুল পবিত্র করিবেন, তাহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে ভজগোবিন্দ জানাইল যে তাঁহার একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে—ভজগোবিন্দের পিতৃকুল উজ্জ্বল করায় ক্ষতি নাই। অতএব মুচিরাম একদিন সন্ধ্যার পর শুভলগ্নে মাথায় টোপর দিয়া, হাতে সূতা বাঁধিয়া, এবং পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ভদ্রকালী নাম্নী, ভজগোবিন্দের সহোদরাকে সৌভাগ্যশালিনী করিলেন। তাহার পর হইতে ভদ্রকালীর নামে অনেক জমীদারী পত্তনী খরিদ হইতে লাগিল। ভদ্রকালী হঠাৎ জেলার মধ্যে একজন প্রধানা ভূম্যধিকারিণী হইয়া দাঁড়াইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ভদ্রকালীর দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়—মুচিরামের এমনই অদৃষ্ট—বিবাহের পর দুই বৎসরের মধ্যেই ভদ্রকালী চৌদ্দ বৎসরের হইল। চৌদ্দবৎসরের হইয়াই ভদ্রকালী ভজগোবিন্দের একটি চাকরির জন্য মুচিরামের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল সুতরাং মুচিরাম চেষ্টা চরিত্র করিয়া ভজগোবিন্দের একটি মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন।

ইহাতে মুচিরাম কিছু বিপন্ন হইলেন। এক্ষণে ভজগোবিন্দের নিজের কাজ হইল—সে মনোযোগ দিয়া নিজের কাজ করে মুচিরামের কাজ করিয়া দিবার তাহার তত অবকাশ থাকে না। ভজগোবিন্দ সুপাত্র—শীঘ্রই হোম সাহেবের প্রিয়পাত্র হইল। মুচিরামের কাজের যে সকল ত্রুটি হইতে লাগিল, হোম সাহেব তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। আভূমিপ্রণত সেলাম এবং মাই লার্ড বুলির গুণে সে সকলের প্রতি অন্ধ হইয়া রহিলেন। মুচিরামের প্রতি তাঁহার দয়া অচলা রহিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে হোমসাহেব বদলি হইয়া গেলেন, তাহার স্থানে খ্রড সাহেব আসিলেন। খ্রড অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। অতি অল্প দিনেই বুঝিলেন—মুচিরাম একটী বৃক্ষভ্রষ্ট বানর—অকর্ম্মা অথচ ভারি রকমের ঘুষখোর। মুচিরামকে আপিস হইতে বহিষ্কৃত করা মনে স্থির করিলেন। কিন্তু খ্রড সাহেব যেমন বিচক্ষণ তেমনি দয়াশীল ও ন্যায়বান্। মিছে ছুতাছলে কাহাকে অন্নহীন করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; কাহাকে একেবারে অন্নহীন করিতে অনিচ্ছুক। মুচিরাম যে বিপুল ভূসম্পত্তি করিয়াছে—খ্রড সাহেব তাহা জানিতে পারেন নাই। খ্রড সাহেব মুচিরামকে দুইএকবার ইস্তেফা দিতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুচিরাম চোখে জল আনিয়া দুই চারিবার "গরিব খানা বেগর মারা যায়েগা" বলাতে তিনি নিরস্ত হইয়াছিলেন। তার পর, তাহাকে পেষকারির তুল্য বেতনে আবকারির দারোগাই দিতে চাহিয়াছিলেন—অন্যান্য

মফস্বলি চাকরি করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন,—কিন্তু আবার মুচিরাম চোখে জল আনিয়া বলে, যে আমার শরীর ভাল নহে মফস্বলে গেলে মরিয়া যাইব —হজুরের চরণের নিকট থাকিতে চাই। সুতরাং দয়ালুচিত্ত ঋড সাহেব নিরস্ত হইলেন। কিন্তু তাহাকে লইয়া আর কাজও চলে না। অগত্যা ঋড সাহেব মুচিরামকে ডিপুটি কালেক্টর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। সেই সময়ে হোম সাহেব বাঙ্গালি আপিসে সেক্রেটরি ছিলেন—রিপোর্ট পৌঁছিবামাত্র মুচিরাম ডিপুটি বাহাদুরিতে নিযুক্ত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

মুচিরামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি পেস্কারিতে ঘুষ লইয়া অসংখ্য টাকা রোজগার করেন—আড়াইশত টাকার ডিপুটিগিরিতে তাঁহার কি হইবে। মুচিরাম সিদ্ধান্ত করিলেন—ডিপুটিগিরি অস্বীকার করিবেন। কিন্তু ভজগোবিন্দ বুঝাইলেন—যে অস্বীকার করিলে ঋড সাহেব নিশ্চয় বুঝিবে যে মুচিরাম ঘুষের লোভে পেস্কারি ছাড়িতেছে না—তাহা হইলে শীঘ্রই তাড়াইয়া দিবে। তখন দুইদিক্ যাইবে। অগত্যা মুচিরাম ডিপুটিগিরি স্বীকার করিলেন।

মুচিরাম ডিপুটি হইয়া প্রথম রুবকারী দস্তখতকালীন পড়িয়া দেখিলেন, লেখা আছে শ্রীযুক্ত বাবু মুচিরাম গুড় রায় বাহাদুর ডিপোটি কালেক্টর। প্রথমটা বড়ই আহ্লাদ হইল—কিন্তু শেষ কিছু লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যে মুহুরি রুবকারী লিখিয়াছিল তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "ও হে—'গুড়' টা নাই লিখিলে! শুধু মুচিরাম রায়বাহাদুর লেখায় ক্ষতি কি? কি জান, আমরা গুড় বটে, কিন্তু আমাদের খেতাব রায়। তবে যখন অবস্থা তেমন ছিল না, তখন রায় খেতাব আমরা লিখিতাম না। তা, এখন গুড়েও কাজ নাই—রায়েও কাজ নাই, শুধু মুচিরাম রায়বাহাদুর লিখিলেই হইবে।" মুহুরি ইঙ্গিত বুঝিল, হাকিমের মন সবাই রাখিতে চায়। সে মুহুরি দ্বিতীয় রুবকারীতে লিখিল, "বাবু মুচিরাম রায়, রায়বাহাদুর।" মুচিরাম দেখিয়া কিছু বলিলেন না, দস্তখত করিয়া দিলেন। সেই অবধি মুচিরাম "রায়" চলিতে লাগিল; কেহ লিখিত "মুচিরাম রায়, রায়বাহাদুর," কেহ লিখিত "রায় মুচিরাম রায়বাহাদুর।" মুচিরামের একটা যন্ত্রণা ঘুচিল—গুড় পদবীতে তিনি বড় নারাজ ছিলেন, এখন সে জ্বালা গেল। তবে লোকে অসাক্ষাতে বলিত "গুড়ের পো"—অথবা "গুড়ে ডিপুটি।" আর ইস্কুলের ছেলেরা কবিতা করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত,

"গুড়ের কলসীতে ডুবিয়ে হাত
বুঝতে নারি সার কি যাত?"

কেহ বলিত,

"সরা মালসায় খুসি নই।
ও গুড় তোর নাগরী কই?"

মুচিরাম তাহাদের তাড়াইয়া মারিতে গেলেন, তাহারা তাঁহাকে মুখ ভেঙ্গাইয়া, উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ সন্দর্শন করাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কবিতা আওড়াইতে আওড়াইতে পলাইল। লাভের মধ্যে মুচিরাম লম্বা কোঁচা বাঁধিয়া আছাড় খাইলেন—ছেলেদের আনন্দের সীমা থাকিল না। শেষ মুচিরাম স্কুলের ছেলেদের মাসে মাসে কিছু সন্দেশ বরাদ্দ করিয়া দিয়া সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু আর একটা নূতন গোল হইল। শীতকালে খেজুরেগুড়ের সন্দেশ উঠিল—ময়রারা তাহার নাম দিল ডিপুটি মণ্ডা।

বাজারে যাহা হউক, সাহেবমহলে মুচিরামের বড় সুখ্যাতি হইল। বৎসর বৎসর রিপোর্ট হইতে লাগিল, এরূপ সুযোগ্য ডিপুটি আর নাই। এরূপ সুখ্যাতির কারণ—

প্রথম। মুচিরাম গুড় মূর্খ,কাজে কাজেই সাহেবদিগের প্রিয়।

দ্বিতীয়। মুচিরাম অতি সামান্য ইংরেজি জানিত; যাহারা ভাল ইংরেজি জানিত,তাহাদিগকে খাটো করিবার জন্য সাহেবেরা বলিতেন মুচিরাম ইংরেজিতে সুশিক্ষিত; অথচ পাণ্ডিত্যাভিমানী নহে। তাঁহারা বলিতেন, মুচিরাম তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের দৃষ্টান্তস্থল।

তৃতীয়। মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক ছিলেন; সাহেবেরা অপমান করিলেও সম্মান বোধ করিতেন। একবার তিনি কমিশ্যনর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব তখন মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গরমমেজাজ ছিলেন, এত্তেলা হইবা মাত্র বলিলেন, "নেকাল দেও শালা কো!" বাহির হইতে মুচিরাম শুনিতে পাইয়া সেইখান হইতে দুই হাতে সেলাম করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব হুজুর। হামারা বহিনকো খোদা জিতা রাখে।"

চতুর্থ। তোষামোদে মুচিরাম অদ্বিতীয়। তাহার পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছে।

পঞ্চম। মুচিরাম ডিপুটির হাতে প্রায় হপ্তম পঞ্চমের কাজ ছিল—অন্য কাজ বড় ছিল না। হপ্তমপঞ্চমের মোকদ্দমায় একে সহজেই বড় বিচার আচারের প্রয়োজন হইত না—তাতে আবার মুচিরাম বিচার আচারের বড় ধার ধারিতেন না—চোখ বুজিয়া ডিক্রী দিতেন—নথির কাগজও বড় পড়িতেন না। সুতরাং সাফাবার দেখিয়া সাহেবেরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। জনরব যে মুচিরামের একেবারে হঠাৎ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পদবৃদ্ধি হইবে। কতকগুলা চেঙ্গড়া ছোঁড়া শুনিয়া বলিল, "আরও পদবৃদ্ধি? দুটা পা হবে না কি?"

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে চট্টগ্রামের কালেক্টরীতে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইল। গোল মিটাইবার জন্য সেখান-

কার কমিশ্যনর একজন ভারি বিচক্ষণ ডিপুটি কালেক্টর পাইবার প্রার্থনা করিলেন। বোর্ড বলিলেন—বিচক্ষণ ডিপুটি? সে ত মুচিরাম ভিন্ন আর কাহাকে দেখি না—তাহাকেই চট্টগ্রাম পাঠান হোক। গবর্ণমেণ্ট সেই কথা মঞ্জুর করিয়া মুচিরামকে চাটিগাঁ বদলি করিলেন।

সম্বাদ পাইয়া মুচিরাম বলিলেন, এইবার চাকরি ছাড়িতে হইল। তাঁহার শোনা ছিল, চাটিগাঁ গেলেই লোকে জ্বর প্লীহা হইয়া মরিয়া যায়। আরও শোনা ছিল যে চাটিগাঁ যাইতে সমুদ্র পার হইতে হয়—একদিন একরাত্রের পাড়ি। সুতরাং চাটিগাঁ যাওয়া কিপ্রকারে হইতে পারে? বিশেষ ভদ্রকালী—ভদ্রকালী এখন পূর্ণযৌবনা—সে বলিল, "আমি কোন মতেই চাটিগাঁ যাইব না—কি তোমায় যাইতে দিব না। তুমি যদি যাও, তবে আমি বিষ খাইব।" এই বলিয়া ভদ্রকালী একটা বড় খোরা লইয়া তেতুঁল গুলিতে বসিলেন। ভদ্রকালী তেঁতুল ভাল বাসিতেন—মুচিরাম বলিতেন "ওতে ভারি অম্ল হয়—ও বিষ!" তাই ভদ্রকালী তেঁতুল গুলিতে বসিলেন—মুচিরাম হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন—ভদ্রকালী তাহা না শুনিয়া "বিষ খাইব" বলিয়া সেই তেঁতুলগোলায় লবণ ও সর্করা সংযোগ পূর্ব্বক আধসের চালের অন্ন মাখিয়া লইলেন। মুচিরাম অশ্রুপূর্ণ লোচনে শপথ করিলেন যে তিনি কখনই চাটিগাঁ যাইবেন না। ভদ্রকালী কিছুতেই শুনিল না—সমুদায় তেঁতুল মাখা ভাতগুলি খাইয়া বিষপাণ কার্য্য সমাধা করিল। মুচিরাম তৎক্ষণাৎ চাকরিতে ইস্তেফা পাঠাইয়া দিলেন।

স্থূল কথা, মুচিরামের জমীদারীর আয় এত বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে ডিপুটি গিরির সামান্য বেতন, তাঁহার ধর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না। সুতরাং সহজে চাকরি ছাড়িয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চাকরি ছাড়িয়া দিয়া মুচিরাম, ভদ্রকালীকে বলিলেন, "প্রিয়ে!" (তিনি সকের যাত্রার বাছা বাছা সম্বোধন পদগুলি ব্যবহার করিতেন) "প্রিয়ে! বিষয় যেমন আছে—তেমনি একটা বাড়ী নাই। একটা বাড়ীর মত বাড়ী করিলে হয় না?"

ভদ্র। দাদা বলে এখানে বড় বাড়ী করিলে, লোকে বল্‌বে ঘুষের টাকায় বড় মানুষ হয়েছে।

মুচি। তা, এখানেই বা বাড়ী করায় কাজ কি? এখানে বুকপুরে বড়মানুষি করা যাবে না। চল, আর কোথাও গিয়া বাস করি।

ভদ্রকালী সম্মত হইলেন, কিন্তু নিজ পিত্রালয় যে গ্রামে সেই গ্রামেই বাস করাই বিধেয় বলিয়া পরামর্শ দিলেন।

ফলে ভদ্রকালী আর কোন গ্রামের নাম বড় জানিতেন না।

মুচিরাম বিনীতভাবে ইহাতে কিছু আপত্তি করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যত বড় মানুষের বাড়ী কলিকাতায়—তিনিও বড়মানুষ, সুতরাং কলিকাতাই তাঁহার বাসযোগ্য এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এখন ভদ্রকালীর এক মাতুল, একদা কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়া, এক কালে কলিকাতা বেড়াইয়া গিয়াছিলেন, এবং বাটী গিয়া গল্প করিয়াছিলেন, যে কলিকাতার কুলকামিনীগণ সজ্জিতা হইয়া রাজপথ আলোকিত করে। ভদ্রকালীর সেই অবধি কলিকাতাকে ভূতলস্থ স্বর্গ বলিয়া বোধ ছিল। তাঁহার অনেকগুলি অলঙ্কার হইয়াছে, পরিয়া সর্ব্বজননয়নপথবর্ত্তিনী হইতে পারিলে অলঙ্কারের সার্থকতা হয়—ভদ্রকালী তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় বাস করার প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন।

তখন ভজগোবিন্দ ছুটি লইয়া, আগে কলিকাতায় বাড়ী কিনিতে আসিল। বাড়ীর দাম শুনিয়া, মুচিরামের বাবুগিরির সাধ কিছু কমিয়া আসিল—যাহা হউক, টাকার অভাব ছিল না,—অট্টালিকা ক্রীত হইল। যথাকালে মুচিরাম ও ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া, উপস্থিত হইয়া নূতন গৃহে বিরাজমান হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কলিকাতার কুলকামিনী রাজপথ আলোকিত করা দূরে থাকুক, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কঠিনতর কারাগারে নিবদ্ধ। যাহারা রাজপথ কলুষিত করিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা ভদ্রকালী রাখেন না—সুতরাং তাঁহার কলিকাতায় আসা বৃথা হইল। বিশেষ দেখিলেন তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার দেখিয়া কলিকাতার স্ত্রীলোক হাসে। ভদ্রকালীর অলঙ্কারের গর্ব্ব ঘুচিয়া গেল।

মুচিরামের কলিকাতায় আসা বৃথা হইল না। তিনি প্রত্যহ গাড়ি করিয়া বাজার যাইতেন, এবং যাহা দেখিতেন তাহাই কিনিতেন। বাবুটি নূতন আমদানি দেখিয়া বিক্রেতৃগণ পাঁচটাকার জিনিসে দেড়শত টাকা হাঁকিত, এবং নিতান্তপক্ষে পঞ্চাশ টাকা না পাইলে ছাড়িত না। হঠাৎ মুচিরামের নাম বাজিয়া গেল—যে বাবুটি মধুচক্রবিশেষ। পাড়ার যত বানর মধু লুটিতে ছুটিল। জুয়াচোর, বদমাশ, মাতাল, লম্পট, নিষ্কর্ম্মা, ভাল ধুতি চাদর জুতা লাঠিতে অঙ্গপরিশোভিত করিয়া, চুল ফিরাইয়া, বাবুকে সম্ভাষণ করিতে আসিল। মুচিরাম তাহাদিগকে কলিকাতার বড় বড় বাবু মনে করিয়া তাহাদিকে বিশেষ

আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারাও আত্মীয়তা করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় আড্ডা করিল—তামাক পোড়ায়, খবরের কাগজ পড়ে, মদ খায়, তাস পেটে, বাজানা বাজায়, গান করে, পোলাও ধ্বংসায়, এবং বাবুর প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনিয়া আনে। টাকাটায় আপনারা বার আনা মুনাফা রাখে, বলে দাঁওয়ে যোওয়ে সিকি দামে কিনিয়াছি। উভয়পক্ষের সুখের সীমা রহিল না।

যে গলিতে মুচিরাম বাড়ী লইয়াছিলেন, সেই গলিতে একজন প্রথমশ্রেণীর বাটপাড় বাস করিতেন। তাঁহার নাম রামচন্দ্র দত্ত। রামচন্দ্র বাবু প্রথম শ্রেণীর বাটপাড়—একটু ব্রাণ্ডি বা এক খানা কাটলেটের লোভে কাহারও অনুগত্য করিবার লোক নহেন। তাঁহার ত্রিতল গৃহ, প্রস্তরমুকুর কাষ্ঠ কাচ কার্পেটাদিতে সকুসুম উদ্যানতুল্য রঞ্জিত; তাঁহার দরওয়াজায় অনেকগুলা দ্বারবান্ গালচালা বাঁধিয়া সিদ্ধি ঘোঁটে; আস্তাবলে অনেকগুলি অশ্বের পদধ্বনি শুনা যায়—তিনখানা গাড়ি আছে, সোনাবাঁধা হুকা, হীরাবাঁধা গৃহিনী, হ্যাণ্ডনোটে বাঁধা ইংরেজ খাদক, এবং তাড়াবাঁধা "কাগজ"—সকলই ছিল। তথাপি তিনি জুয়াচোর,—জুয়াচুরিতেই এ সকল হইয়াছিল। তিনি যখন শুনিলেন, টাকার বোঝা লইয়া একটা গ্রাম্য গর্দ্দভ পাড়ায় আসিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে, তখন ভাবিলেন, যে গর্দ্দভের পৃষ্ঠহইতে টাকার বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করিতে হইবে। আহা! অবোধ পশু! এত ভারি বোঝা বহিবে কিপ্রকারে—বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করি।

প্রথম প্রয়োজন, মুচিরামের সঙ্গে আলাপ পরিচয়। রামচন্দ্র বাবু বড় লোক—মুচিরামের বাড়ী আগে যাইবেন না। ইঙ্গিত পাইয়া একজন অনুচর মুচিরামের কাণে তুলিয়া দিল, রামচন্দ্র বাবু কলিকাতার অতি প্রধান লোক, আর মুচিরামের প্রতিবাসী—মুচিরামের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অতি ব্যস্ত। সুতরাং মুচিরাম গিয়া উপস্থিত।

এইরূপে উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত হইলেন। উভয়ের উভয়ের বাড়ী যাতায়াত হইতে লাগিল। ঘন ঘন যাতায়াতে ক্রমে সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি। রামচন্দ্র বাবুর সেই ইচ্ছা। তিনি চতুর, মুচিরাম নির্ব্বোধ; মুচি গ্রাম্য, তিনি নাগরিক। অল্পকালেই মুচিরামমৎস্য ফাঁদে পড়িল--রামচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুতা করিল। রামচন্দ্র তাঁহার মুরুব্বি হইলেন—মুচিরামের নাগরিক জীবনযাত্রানির্ব্বাহে শিক্ষাগুরু হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তিনি নাগরিক জীবননির্ব্বাহে মুচিরামের শিক্ষাগুরু—কলিকাতারূপ গোচারণ-

ভূমে তাঁহার রাখাল—কালীঘাট হইতে চিতপুর পর্য্যন্ত,যখন মুচিরাম বলদ সুখের গাড়ি টানিয়া যায়, রামবাবু তখন তাহার গাড়য়ান; সখের ছেকড়ায় এই খোঁড়া টাটুটি জুড়িয়া, রামচন্দ্র পাকা কোচমানের মত মিঠাকড়া চাবুক লাগাইতেন। তাহার হস্তে ক্রমে গ্রাম্য বানর সহুরে বানরে পরিণত হইল। কি গতিকের বানর,তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ পড়িলে বুঝা যাইতে পারে। এই সময় তিনি ভজগোবিন্দকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত করা গেল—

"তোমার পুত্রের বিবাহ শুনিয়া আহ্লাদ হইল। টাকার তেমন আনুকূল্য করিতে পারিলাম না—মাপ করিও। দুইখানা গাড়ি কিনিয়াছি—একখানা বেরুষ—একখানা ব্রৌনবেরি। একটা আরবের যুড়িতে ২২০০ টাকা পড়িয়াছে। ছবিতে, আয়নাতে, কারপেটে অনেক টাকা পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার এত খরচ তাহা জানিলে কখন আসিতাম না—সেখানে সাত সিকায়, কাপড় ও মজুরিসমেত আমার একটা চাপকান তৈয়ার হইত—এখানে একটা চাপকানে ৬৫৲ টাকা পড়িয়াছে। একসেট রূপার বাসনে অনেক টাকা লাগিয়াছে। থাল, বাটি, গেলাস, সে বাসনের কথা বলিতেছি না—এ সেট টেবিলের জন্য। বরকন্যাকে আমার হইয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।"

এই হলো বানরামি নম্বর এক। তার পর, মুচিরাম, কলিকাতার যে কেহ একটু খ্যাতিযুক্ত, তাহারই বাড়ীতে, রামচন্দ্র বাবুর পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন নামজাদা বাবু তাহার বাড়ীতে আসিলে জন্মসার্থক মনে করিতেন। কিসে আসে সেই চেষ্টায় ফিরিতেন। এইরূপ আচরণে, রামবাবুর সাহায্যে, কলিকাতার সকল বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। টাকার মান সর্ব্বত্র; মুচিরামের টাকা আছে; সুতরাং সকলেরই কাছে তাঁহার মান হইল।

তার পর মুচিরাম কলিকাতার ইংরেজ মহল আক্রমণ করিলেন। রামবাবুর পরিচয়ে যত ছোট বড় ইংরেজের বাড়ী যাতায়াত করিলেন। অনেক যায়গাতেই ঝাঁটা লাথি খাইলেন। কোন কোন স্থানে মিষ্ট কথা পাইলেন। অনেক স্থানেই একজন মাতালো জমিদার বলিয়া পরিচিত হইলেন।

তার পর ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশ্যনে ঢুকিলেন। নাম লেখাইয়া বৎসর বৎসর টাকা দিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বাবুর সঙ্গে প্রতি অধিবেশনে যাইতে আরম্ভ করিলেন। রামবাবু কথিত মহানহিম মহাসভার "একটা বড় কামান।" তিনি যখনই বড় কামান দাগিতে যাইতেন এই ছোট মুচিপিস্তলটি সঙ্গে লইয়া যাইতেন—সুতরাং পিস্তলটি ক্রমে মুখ খুলিয়া পুটপাট করিতে আরম্ভ করিল। মুচিরামও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় একজন

বক্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বকিতেন মাথামুণ্ড, কিন্তু ছাপার বিজ্ঞাপনীতে যাহা বাহির হইত, সে আর একপ্রকার। মুচিরাম নিজে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। যাহারা বুঝে, তাহারা পড়িয়া নিন্দা করিত না। সুতরাং মুচিরাম ক্রমে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে লাগিলেন। যেখানে লোকে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়, মুচিরাম তাহার কোন যায়গায় যাইতেই ছাড়িত না। বেলবিডীরে গেলে বড় লোক বলিয়া গণ্য হয়, সুতরাং সে বেলবিডীরে যাইত। যাইতে যাইতে সে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট সুপরিচিত হইল। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহাকে একজন নম্র, নিরহঙ্কারী, নিরীহ লোক বলিয়া জানিলেন। জমীদারী সভার একজন নায়ক বলিয়া পূর্ব্বেই রামচন্দ্রের নিকট পরিচয় পাইয়া ছিলেন।

সম্প্রতি বাঙ্গাল কৌন্সিলে একটি পদ খালি হইল। একজন জমীদারী সভার অধিনায়ককে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাই লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্থির করিলেন। বাছনি করিতে মনে মনে ভাবিলেন, "মুচিরামের ন্যায় এ পদের যোগ্য কে? নিরহঙ্কারী নিরীহ—ইংরেজি কহিতে ভাল পারে না—অতএব তাহা হইতে কার্য্যের কোন গোলযোগ উপস্থিত হইবে না। অতএব মুচিরামকে বাহাল করিব।"

অচিরাৎ অনরেবল বাবু মুচিরাম রায় বাঙ্গাল কৌন্সিলে আসন গ্রহণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বড় বাড়াবাড়িতে অনরেবল মুচিরাম রায়ের রুধির শুকাইয়া আসিল। ভজগোবিন্দ ফিকিরফন্দিতে অল্প দামে অধিক লাভের বিষয়গুলি কিনিয়া দিয়াছিলেন—তাহার কার্য্যদক্ষতায় ক্রীতসম্পত্তির আয় বাড়িয়াছিল—কিন্তু এখন তাহাতেও অনাটন হইয়া আসিল। দুই একখানি তালুক বাঁধা পড়িল—রামচন্দ্র বাবুর কাছে। রামচন্দ্র বাবুর সঙ্কল্প এত দিনে সিদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—এই জন্য তিনি আত্মীয়তা করিয়া মুচিরামকে এতবড় বাবু করিয়া তুলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র অর্দ্ধেক মূল্যে তালুকগুলি বাঁধা রাখিলেন—জানেন যে মুচিরাম কখনও শুধরাইতে পারিবে না—অর্দ্ধেক মূল্যে বিষয়গুলি তাঁহার হইবে। আরও তালুক বাঁধা পড়ে এমন গতিক হইয়া আসিল। এই সময়ে ভজগোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শুনিয়াছিল যে গবর্ণর প্রভৃতি বড় বড় সাহেব তাহার ভগিনীপতির হাতধরা—এই সুযোগে একটা বড় চাকরি যোটাইয়া লইতে হইবে—এই ভরসায় ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন মুচিরামের গতিক ভাল নহে। তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন।

বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কখন তালুকে যান নাই। গেলেই কিছু পাওয়া যাইবে। তালুকে যান।"

মুচিরাম আনন্দিত হইল, ভাবিল, "তাই ত! এমন সোজা কথাটা আমার মনে আসিল না।" মুচিরাম খুশী হইয়া, ভজগোবিন্দের কথায় স্বীকৃত হইল।

চন্দনপুর নামে তালুক—সেইখানে বাবু গেলেন। প্রজাদিগের অবস্থা বড় ভাল। সে বৎসর নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত—কিন্তু সে মহলে কিছু না। কখন মুচিরাম প্রজাদিগের নিকট মাঙ্গন মাথট লয়েন নাই। মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক,—তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করিতেন না। আজ ভজগোবিন্দের পরামর্শে স্বশরীরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমার কন্যার বিবাহ উপস্থিত—বড় দায়গ্রস্ত হইয়াছি, কিছু ভিক্ষা দাও।" প্রজারা দয়া করিল—প্রজা সুখে থাকিলে জমীদারকে সকল সময়ে দয়া করিতে প্রস্তুত। জমীদার আসিয়াছে সম্বাদ পাইয়া, পালে পালে প্রজা, ট্যাঁকে টাকা লইয়া মুচিরাম দর্শনে আসিতে আরম্ভ করিল। মুচিরামের চেষ্ট টাকায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে আর একদিকে, তাঁহার আর একপ্রকার সৌভাগ্যের উদয় হইল।

প্রজারা দলে দলে মুচিরামদর্শনে আসে—কোন দিন পঞ্চাশ, কোন দিন ষাট, কোন দিন আশী, কোন দিন একশত এইরূপ। যাহাদের বাড়ী নিকট তাহারা দর্শন করিয়া ফিরিয়া যায়, যাহাদের বাড়ী দূর, তাহারা দোকান হইতে খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া একটা বাগানের ভিতর রাঁধিয়া বাড়িয়া খায়। মহালটি একে খুব বড়—মুচিরামের এত বড় জমীদারী আর নাই—তাহাতে গ্রামগুলির মধ্যে বিল খাল অনেক থাকায়, দুই চারিজন প্রজাকে প্রায় রাঁধিয়া খাইয়া যাইতে হইত। একদিন অনেক দূর হইতে প্রায় একশত প্রজা আসিয়াছে—তাহাদের বাড়ী একটা ভারি জলা পার; নিকাশ প্রকাশে, তাহাদের বেলা গেল; তাহারা বাড়ী ফিরিতে পারিল না। বাগানে রাঁধাবাড়া করিতে লাগিল। রাত্রি থাকিয়া প্রাতে যাত্রা করিবে। তাহারা যখন খাইতে বসিল, সেই সময়ে নিকটস্থ মাঠপার হইয়া, অশ্বযানে, একটি সাহেব যাইতেছিলেন।

সাহেবটির নাম মীন্‌ওয়েল্। তিনি ঐ জেলার প্রধান রাজপুরুষ—মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর। সাহেবটি ভাল লোক—ন্যায়বান্—হিতৈষী, এবং পরিশ্রমী দোষের মধ্যে বুদ্ধিটা একটু ভোঁতা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে বৎসর ঐ অঞ্চলে একটা দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; সাহেব দুর্ভিক্ষ তদারকে বাহির হইয়াছিলেন নিকটস্থ কোন গ্রামে তাঁহার তাম্বু পড়িয়াছিল—তিনি এখন অশ্বারোহণে তথায় যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে

দেখিতে পাইলেন, একটা বাগানের ভিতর কতকগুলা লোক ভোজন করিতেছে।

দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহারা সকলে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসী দরিদ্র লোক, কোন বদান্য ব্যক্তি ইহাদের ভোজন করাইতেছে। সবিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্য, নিকটে একজন চাসাকে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন।

এখন সাহেবটি, লোক বড় ভাল হইলেও আত্মগরিমাবর্জ্জিত নহেন। তাঁহার মনে মনে শ্লাঘা ছিল যে, তিনি বাঙ্গালা বড় ভাল জানেন। সুতরাং চাসার সঙ্গে বাঙ্গালায় কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

সাহেব চাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"টোমাডিগের গড়ামে* ডুর্ভাখ্‌খা† কেমন আছে?"

চাসা ত জানে না ডুর্ভাখ্‌খা কাহাকে বলে। সে ফাঁফরে পড়িল। ডুর্ভাখ্‌খা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম হইবে, ইহা একপ্রকার স্থির হইল। কিন্তু "কেমন আছে?" ইহার উত্তর কি দিবে? যদি বলে যে সে ব্যক্তিকে আমি চিনি না, তাহা হইলে সাহেব হয় ত, এক ঘা চাবুক দিবে; যদি বলে যে ভাল আছে, তাহা হইলে সাহেব হয় ত ডুর্ভাখ্‌খাকে ডাকিয়া আনিতে বলিবে; তাহা হইলে কি করিবে? চাসা ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল, "বেমার আছে।"

"বেমার—Sick?" সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, "Well, there may much sickness without their being any scarcity—the fellow doesnot understand perhaps; I am afraid these people don't understand their own language—I say ডুর্ভাখ্‌খা কেমন আছে—অটিক আছে কিম্বা অল্প আছে?"

এখন চাসা কিছু ভাব পাইল। স্থির করিল যে এ যখন সাহেব, তবে অবশ্য হাকিম (সে দেশে নীলকর নাই) হাকিম যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে যে ডুর্ভাখ্‌খা অধিক আছে কি অল্প আছে—তখন ডুর্ভাখ্‌খা একটা টেক্সের নাম না হইয়া যায় না। ভাবিল কই আমরা ত ডুর্ভাখ্‌খার টেক্স দিই না; কিন্তু যদি বলি যে আমাদের গ্রামে সে টেক্স নাই—তবে বেটা এখনই টেক্স বসাইয়া যাইবে। অতএব মিছা কথা বলাই ভাল। সাহেব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"টোমাডের গড়ামে ডুর্ভাখ্‌খা অধিক কিম্বা অল্প আছে?"

চাসা উত্তর করিল,

"হজুর আমাদের গাঁয়ে ভারি ডুর্ভাখ্‌খা আছে।"

সাহেব ভাবিলেন, "Humph! I

* গ্রামে। † দুর্ভিক্ষ।

thought as much—" পরে বাগানে যে সকল লোক খাইতেছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কে বোজন করিল?" (উদ্দেশ্য "করাইল")

চাসা। প্রজারা ভোজন কোচ্ছে।

সাহেব, চটিয়া, "টাহা আমি জানে—they eat, that I see—but who pays?—টাকা কাহাড়?"

এখন সে চাসা জানে যে যত টাকা আসিতেছে, সকলই জমীদারের সিন্ধুকে যাইতেছে; সে নিজেও কিছু দিয়া আসিয়াছিল—অতএব এবার বিনা বিলম্বে উত্তর করিল,

"টাকা জমীদারের"

সাহেব। Ah! there it is; they do their duty—জমীদারের নাম কি?"

চাসা। মুচিরাম রায়।

সাহেব। কট ডিবস বোজন কড়িয়াছে?

চাসা। তা ধর্ম্মাবতার প্রজারা রোজ রোজ আসে, খাওয়া দাওয়া করে।

সাহেব। এগ্‌্রামের নাম কি?

চাসা। চন্নপুর।

সাহেব নোটবুক বাহির করিয়া তাহাতে পেন্সিলে লিখিলেন,

For Famine Report.

"Babu Muchiram Ray, Zemindar of Chinnapur—feeds every day alarge number of his ryots."

সাহেব তখন ঘোড়ায় চাবুক মারিয়া টাপে চলিলেন। চাসা আসিয়া গ্রামে রটাইল, একটা সাহেব টাকায় আট আনা হিসাবে টেক্স বসাইতে আসিয়াছিল, চাসামহাশয়ের বুদ্ধিকৌশলে বিমুখ হইয়াছে।

এদিকে মীন্‌ওয়েল্ সাহেব যথাকালে ফেমিন্ রিপোর্ট লিখিলেন। একটি পারাগ্রাফ শুধু মুচিরামরায়সম্বন্ধে। তাহাতে প্রতিপন্ন হইল, যে মুচিরাম জমীদারদিগের আদর্শস্থল। এই দুঃসময়ে অন্নদান করিয়া সকল প্রজাগুলির প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

রিপোর্ট কমিশ্যানরীতে গেল। কমিশ্যানরের হস্ত হইতে কিছু উজ্জ্বলতর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া—কমিশ্যানর সাহেব লেখক ভাল—গবর্ণমেণ্টে গেল। গবর্ণমেণ্টের এই বিবেচনা—যে যার প্রজা সেই যদি দুর্ভিক্ষের সময়ে তাহাদের আহার যোগায়, তাহা হইলেই "দুর্ভিক্ষ প্রশ্নের" উত্তম মীমাংসা হয়। অতএব মুচিরামের ন্যায় বদান্য জমীদারদিগকে সম্মানিত ও উৎসাহিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তজ্জন্য বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিলেন যে, বাবু মুচিরাম রায়মহাশয়কে —পাঠক একবার হরি হরি বল—রাজাবাহাদুর উপাধি দেওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট বলিলেন তথাস্তু। গেজেট হইল, রাজা মুচিরাম রায়বাহাদুর। তোমরা সবাই আর একবার হরি বল।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল।

৪। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা।

যে পুরুষ এবং যে রমণীর ইতিহাস লইয়া অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক, যাহাদের অদৃষ্টপট অভিজ্ঞানশকুন্তলরচয়িতা কর্তৃক চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পৃথক্‌ভাবে দেখা হইয়াছে। সে পুরুষ পুরুষচরিত্রের আদর্শস্বরূপ এবং সে রমণী রমণীকুলের উচ্চপ্রতিমা তাহা দেখা হইয়াছে। দুইটি ভিন্ন জগতের ভিন্ন প্রকৃতি ভিন্নভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছি। কিন্তু যে শক্তির গুণে সেই দুই ভিন্ন জগৎ ভিন্নতাসত্ত্বেও এক হইয়া গেল, ভিন্ন পথ ছাড়িয়া একপথে চলিতে লাগিল, সে শক্তির প্রকৃতি এবং পরিমাণ এখনও দেখা হয় নাই। সে শক্তির নাম প্রেম। এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রেমতত্ত্ব বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অভিজ্ঞান শকুন্তলের পরীক্ষা—অভিজ্ঞানশকুন্তলের নায়কের মনের এক অংশেরদ্বারা অপর অংশের পরীক্ষা। সে মনের এক অংশ দেখিয়াছি; এখন অপর অংশ দেখিতে হইবে। সে মনের সমস্ত দেখা হইয়াছে, কেবল রিপুন্মত্ততা দেখা হয় নাই। এখন সেই রিপুন্মত্ততার প্রকৃতি এবং পরিমাণ দেখাইব।

আশ্রমপ্রবেশকালে দুষ্মন্তের দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হওয়াতে তিনি ভাবিলেন—

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ
ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাম্ দ্বারাণি ভবন্তি
সর্ব্বত্র॥

ইহার অর্থ এই:—এই আশ্রমপদ শান্তিময়। এমন শান্তিময়স্থানে আমার বাহু স্পন্দিত হইল, ইহার ফল কি হইতে পারে, এখানে ত স্ত্রীলাভের সম্ভাবনা নাই। অথবা এমন হইতে পারে যে, ভবিতব্যের বলে সকলস্থানেই স্ত্রীলাভ সম্ভব। দুষ্মন্ত ধার্ম্মিক; হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ ভক্তি। শাস্ত্র স্মরণ করিয়া তিনি স্ত্রীলাভের কথা মনে করিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু এ বিস্ময়ের কারণ কি? এ বিস্ময়ের কারণ—'শান্তমিদমাশ্রমপদং।' অর্থাৎ, স্থানটি শান্তিময় তপস্যাশ্রম বলিয়া তাঁহার বিস্ময়। সংসারাশ্রমবাসী সংসারধর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগের বাসস্থান হইলে তাঁহার এ বিস্ময় হইত না। এ সকলই সম্ভব। কিন্তু এ বিস্ময়ের আরও একটু অর্থ আছে। তাহা "ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র" এই কয়টি কথায় প্রকাশ। এ কথার অর্থ এই—স্ত্রীলাভ হইলে দুষ্মন্ত সুখী বই অসুখী হন না; স্ত্রী সত্ত্বেও দুষ্মন্ত পুনরায় স্ত্রীলাভ করিতে পারিলে আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করেন। শুধু

হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ বলিয়া যে তিনি এইরূপ ভাবিলেন তা নয়। কিছু বেশী স্ত্রীপ্রিয় না হইলে তিনি বোধ হয় এইরূপ ভাবিতেন ঃ—"এ কি! আমার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তবে কেন আমার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হয়? ইহার কি আর কোন অর্থ থাকিতে পারে? জানি না দেবতাদিগের কি অভিপ্রায়।" কিন্তু তিনি এরূপ ভাবিলেন না। কেবল তপস্যাশ্রম বলিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, বিবাহিত বলিয়া বিস্মিত হইলেন না। তিনি কিছু বেশী স্ত্রীপ্রিয়।

তার পর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শকুন্তলা এবং তাঁহার সখীদ্বয়কে দেখিবা মাত্র তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইল, তাহাও তাঁহার স্ত্রীপ্রিয়তার এবং রূপানুরাগের ফল। সে ভাব এই—

"শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো
যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বন-
লতাভিঃ॥

যদি সামান্য আশ্রমবাসিনীগণের শারীরিক সৌন্দর্য্য রাজান্তঃপুরবাসিনীগণের মধ্যে দুর্লভ হইল, তবে যে দেখিতেছি উদ্যানলতা বনলতার কাছে পরাজিতা। অলোকসামান্যরূপরাশি দেখিলে লোকে চমৎকৃত হয়, মুগ্ধ হয়, মন্ত্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হয়, হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়, মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না, অথবা উচ্ছ্বাসময় ভক্তিবাক্য নির্গত হয়। দুষ্মন্তের এ সকল কিছুই হইল না। তিনি তাপসবালাদিগের রূপরাশি দেখিয়া আপনার রূপসীদিগের নিন্দা করিলেন। আমরা এইরূপ বুঝি যে, যে পুরুষ বা যে রমণী অন্য স্ত্রী অথবা অন্য পুরুষ দেখিয়া আপনার পত্নীর অথবা আপনার পতির নিন্দা করে, তাহার লালসা অতিশয় বলবতী। বকুলতলায় সুন্দরকে দেখিয়া যে সকল কুলকামিনীরা আপন আপন পতির নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে কেহ কখন ভাল বলে নাই এবং ভাল মনে করে নাই। যাহাদের ভোগলালসা একান্ত বলবতী, তাহারাই উপভোগ্য বস্তুর তুলনা করিতে ভালবাসে। দুষ্মন্তের ভোগলালসা যে বড়ই প্রবল এবং সে জন্য তিনি যে একটিমাত্র ভোগ্যবস্তুতে পরিতুষ্ট নন, তাহা অভিজ্ঞানশকুন্তলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়া দুষ্মন্ত একদিন মাধব্যের সহিত বসিয়া আছেন এমন সময় এই গীতিধ্বনি শ্রবণ করিলেন—

অহিণবমহুলোলুবো তুমং
তহ পরিচুম্বিঅ চুঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তণিব্বুদো
মহুঅর বিম্হরিদো সি ণং কহং॥

হে মধুকর! তুমি মধুর লোভে লালায়িত হইয়া চূতমঞ্জরীকে সেই ভাবে চুম্বন করিলে, এখন কেবল কমলের

সহবাসে নিবৃত্ত হইয়া বল দেখি কেমন কোরে সেটিকে একেবারে ভুলিলে?

মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, এ গানটির অর্থ কি? দুষ্মন্ত বলিলেন—

সকৃত্কৃত প্রণয়োঽয়ং জনঃ।
তদস্যা দেবীং বসুমতীমন্তরেণ মহ-
দুপালম্ভনং গতোঽস্মি।
সখে মাধব্য মদ্বচনাদুচ্যতাং হংসপদিকা
নিপুণমুপালব্ধোঽস্মীতি।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে দুষ্মন্ত উপভোগসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চঞ্চলচিত্ত। তিনি একটি ভোগ্যবস্তু লইয়া থাকিতে পারেন না। তিনি নূতন ভোগ্যবস্তুর পক্ষপাতী। এই নিমিত্তই মহাকবি তাঁহাকে অগাঢ়প্রণয়ী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। শকুন্তলার চিত্রদর্শনকালে বসুমতীর ভয়ে তাঁহাকে সেই চিত্র লুকাইতে দেখিয়া সানুমতী ভাবিতেছেন—

অণ্ণ সংকন্তহিঅও বি পঢ়মসংভাবণং
অবেক্খদি।
সিঢ়িল সোহদো দাণিং এসো।

ইনি অন্যের প্রেমে তদ্গতচিত্ত হইয়াও পূর্ব্বপ্রণয়ের সম্মান রাখিতেছেন। এক্ষণে বসুমতীর প্রতি ইঁহার প্রণয় শিথিল হইয়াছে।

শকুন্তলাকে প্রথম দেখিয়া গিয়া দুষ্মন্ত মাধব্যের কাছে তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিলে পর মাধব্য পরিহাস করিয়া বলিল, যে যখন আপনার অন্তঃপুর স্ত্রীরত্নে পরিপূর্ণ, তখন এই বালিকার প্রতি আপনার অনুরাগ কেমন?—না, যে ব্যক্তির মিষ্ট খর্জ্জুর খাইয়া অরুচি হইয়াছে, তাহার তেঁতুলের প্রতি অনুরাগ যেমন। তাহাতে দুষ্মন্ত উত্তর করিলেন যে তুমি যদি তাহাকে দেখিতে তাহা হইলে এমন কথা বলিতে না। কিন্তু আমাদিগকে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে মাধব্যের পরিহাস বড় পরিহাস নয় এবং সে পরিহাসের অর্থও যা, দুষ্মন্তের প্রতিবাদের অর্থও তাই।

ফলতঃ দুষ্মন্তের রূপতৃষ্ণা এবং ভোগলালসা অতিশয় বলবতী। সে ভোগলালসার আধিক্য দেখিলে তাঁহাকে নিন্দা করিতে ইচ্ছা হয়। তিনি শকুন্তলাকে পরিণীতা ভার্য্যা বলিয়া চিনিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে গ্রহণ করিলে অধর্ম্ম হইবে বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধপীড়িত হইয়াছেন বলিয়া ঋষিকুমারদিগের অপমান করিতেছেন। তথাপি সেই শকুন্তলার অবগুণ্ঠনমুক্তরূপরাশি দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন—

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথম পরিগৃহীতং স্যান্নবেতি ব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি
হাতুম্॥

এই অক্ষত রূপরাশি আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। আমি কি ইহাকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছি? কই মনে ত হয় না। ভ্রমর যেমন হিমাচ্ছন্ন কুন্দপুষ্পটি ভয়ে ভোগ করিতেও পারে না, আবার

ছাড়িতেও পারে না, তেমনি আমিও ফাঁপরে পড়িলাম।

আমরা প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি যে দুষ্মন্তের অসাধারণ চিত্তসংযমশক্তি না থাকিলে তিনি কণ্বের পবিত্র তপস্যাশ্রম কলঙ্কিত করিয়া ফেলিতেন। এখন বোধ হয় কথাটি অত্যুক্তি বলিয়া কাহারও সংশয় থাকিবে না। রূপবতী রমণী দেখিলে দুষ্মন্ত লালসায় অধীর হইয়া পড়েন। কেবল উন্নতশিক্ষা, উন্নত ধর্ম্মজ্ঞান এবং অসাধারণ চিত্তসংযমশক্তি তাঁহাকে ব্যভিচার হইতে নিবৃত্ত করে।

শকুন্তলা রূপবতী; শকুন্তলা রূপবতীর মধ্যে রূপবতী। তাহাতে আবার তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র দুষ্মন্তের মনে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে ভাব প্রথমে অস্ফুট। "দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ," এই তুলনায় সেই ভাবের প্রথম অস্ফুট স্ফূর্ত্তি। এ রকম তুলনা নূতন প্রেমের পূর্ব্বলক্ষণ। যাহার সুন্দরী রমণী আছে সে যদি কোন নূতন রমণী দেখিয়া উভয়ের তুলনা করিয়া নূতন রমণীকে প্রাধান্য দেয়, তাহা হইলে সেই তুলনাকে নূতন প্রেমের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হয়। যেখানে নূতন বস্তুর তুলনায় পুরাতন বস্তু নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, সেইখানেই নূতন বস্তুতে স্পৃহা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এ তুলনায় স্পৃহাসূচক কিছুই নাই। এ তুলনা কেবল স্পৃহার পূর্ব্বগামী মানসিক অবস্থাব্যঞ্জক। তার পর দুষ্মন্ত শকুন্তলাসম্বন্ধে যাহা ভাবিলেন, তাহাও স্পৃহাসূচক নয় কিন্তু তাহাতে স্পৃহার আভাস আছে। তিনি ভাবিলেন—

কথমিয়ং সা কণ্বদুহিতা।
অসাধুদর্শী খলু তত্রভবান্ কাশ্যপঃ য
ইমামাশ্রমধর্ম্মে নিযুঙ্‌ক্তে।
ইদং কিলাব্যাজ মনোহরং বপুস্তপঃ
ক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপল পত্র ধারয়া
শমীলতাংচ্ছেত্তু মৃষির্ব্ব্যবস্যতি॥

ইহার মর্ম্ম এই যে এমন কোমলাঙ্গীকে কঠিন আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া কণ্ব অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। কোমল নীলোৎপল পত্রের দ্বারা কঠিন শমীবৃক্ষ ছেদন করা যেমন অসম্ভব, এই কোমলাঙ্গীর দ্বারা সেই কঠিন আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালিত হওয়াও তেমনি অসম্ভব।

তপস্যাশ্রমে তপস্বিকন্যাকে দেখিয়া দুষ্মন্তের ন্যায় চিত্তসংযমক্ষম ধর্ম্মবীরের মনে একেবারে বলবতী স্পৃহার উদ্রেক হওয়া অসম্ভব। কিন্তু দুষ্মন্ত স্ত্রীপ্রিয়। 'দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ' এই তুলনাতেই তাঁহার স্ত্রীপ্রিয়তা প্রকাশ। তবে যখন তিনি শকুন্তলাকে তপশ্চর্য্যার অযোগ্যা বলিয়া ভাবিলেন, এবং কণ্বকে নিন্দা করিলেন, তখন তাঁহার নিন্দাবাদের মূলে কিঞ্চিৎ আত্মদৃষ্টি নিহিত আছে। মানুষ যখন দুর্লভ অথবা এক অবস্থাপন্ন বস্তুকে

সুলভ অথবা অন্য অবস্থাপন্ন করিতে চায় তখন প্রায়ই দেখা যায় যে সেই ইচ্ছার মূলে সেই বস্তুপ্রাপ্তির স্পৃহা নিহিত আছে। যাহার কোন দূরস্থিত বস্তু পাইবার স্পৃহা হয়, সেই বলিয়া থাকে যে এই বস্তুটী নিকটে থাকিলে ভাল হয় এবং ইহার নিকটে থাকাই উচিত। যাহার কোন উদ্যানস্থিত পুষ্প লইবার ইচ্ছা হয়, সেই বলিয়া থাকে যে বড় মানুষের বাগান সাধারণের ক্রীড়াস্থল হওয়া উচিত। যাহার কোন অন্তঃপুরস্থিতা সুন্দরী বিধবা রমণীকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হয় সে সেই রমণীর আত্মীয়দিগের কাছে স্ত্রীস্বাধীনতার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান্ হয় এবং 'জেনানা সিস্‌টেমের' নিন্দা করিয়া থাকে। দুষ্মন্তের নিন্দাবাদের অর্থও সেই রকম। তাঁহার মনে এখন স্পৃহার উদ্রেক হইয়াছে। তার পর তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে কণ্বের অভিপ্রায় যাহাই হউক, শকুন্তলা এবং তাঁহার সখীদ্বয়ের মানসিক ভাব ঠিক তপস্বিকন্যার মতন নয়। তিনি এই কথোপকথন শুনিলেন—

শকু। সহি অনসূএ অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ নিঅন্তিদম্হি সিঢ়িলেহি দাব ণং।

অন। তহ।

প্রিয়। এথ পওোহরবিথারইত্তঅং অত্তণো জোব্বণং উবালহ।

শকুন্তলা বলিলেন—প্রিয়ম্বদা আমার বুকের বক্কল অতিশয় আঁটিয়া বাঁধিয়াছে, অতএব, অনসূয়ে, তুমি এটা একটু আল্‌গা করিয়া দেও। প্রিয়ম্বদা উত্তর করিলেন—তোমার নিজের যৌবনের জোরে তোমার পয়োধর বিস্তৃত হইয়াছে, তা আমাকে দোষ দিলে কি হবে?

দুষ্মন্তের মন যাহা চায় এ ত তাই। তপস্বিকন্যারা আশ্রমধর্ম্মপ্রতিপালনে নিযুক্ত; কিন্তু আশ্রমধর্ম্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ও তাঁহাদের মনে স্থান পাইয়া থাকে। তাঁহারা যৌবনের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন এবং যৌবনের বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। এ সব দেখিয়া শুনিয়া স্পৃহাবান্ দুষ্মন্তের বিঘ্নাশঙ্কা কমিবার কথা। বস্তুতঃ সে আশঙ্কা কমিয়া স্পৃহা এবং স্পৃহাজনিত অভিনিবেশ বাড়িয়া উঠিল। তিনি শকুন্তলার শারীরিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তপরে শকুন্তলাকে কেশরবৃক্ষমূলে কিঞ্চিৎ হেলিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রিয়ম্বদা বলিলেন যে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন এই কেশরবৃক্ষটীর একটি লতার সহিত পরিণয় হইয়াছে। তপস্বিকন্যাদিগের মানসিক অবস্থা আরও প্রকাশ পাইল। দুষ্মন্তের বিঘ্নাশঙ্কা আরও কমিয়া গেল; তাঁহার স্পৃহাবিচলিত মন আরও বিচলিত হইল; তিনি সেই বর্দ্ধিতস্পৃহার বলে শকুন্তলার ওষ্ঠ, বাহু, প্রভৃতি এক একটি অঙ্গের সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।

কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু
সন্নদ্ধম্‌॥

অনুরাগ যত বৃদ্ধি হয়, লোকে অনুরাগের বস্তু ততই তন্ন তন্ন করিয়া দেখে। লোকে যখন কোন বস্তুর প্রতিঅংশে সৌন্দর্য্য দেখে, তখন বুঝিতে হয় যে তাহাদের মন সেই বস্তুর প্রতি অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দুষ্মন্তের মনও এখন শকুন্তলার প্রতি প্রবল অনুরাগপূর্ণ। শকুন্তলার প্রতি অঙ্গে সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন, এমন সময় অনসূয়ার মুখে শুনিলেন যে শকুন্তলা নিজে বৃক্ষের সহিত লতার বিবাহ দিয়া থাকেন—কোন বৃক্ষের পত্নী করিয়া দেন, কোন লতার পতি করিয়া দেন।

হলা শউন্তলে ইঅং সঅংবরবহূ সহআরস্স তুএ কিদনামহেআ বনজোসিনী ত্তি ণোমালিআ ণং বিস্মুমরিদাসি।

শকুন্তলা উত্তর করিলেন ঃ—

তদা অত্তাণং বি বিস্মুমরিস্সং। (লতামুপেত্যাবলোক্য চ) হলা রমণীএ ক্খু কালে ইমস্স লদাপাঅবমিহুণস্স বইঅরো সংবুত্তো। ণবকুসুমজোব্বণা বনজোসিনী বদ্ধপল্লবদাএ উবভোঅক্খমো সহআরো।

সখি, রমণীয় সময়েই এই লতা ও পাদপের মিলন হইয়াছে। দেখ, বনজ্যোৎস্না অঙ্গে নবকুসুমের যৌবন আর এই সহকার তরু নবপল্লবধারণ করিয়া সম্ভোগসুখের কেমন উপযুক্ত হইয়াছে।

এতক্ষণ দুষ্মন্ত প্রিয়ম্বদার মুখেই অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া শকুন্তলার মনের ভাবও অবশ্য বুঝিতেছিলেন। কিন্তু এখন স্বয়ং শকুন্তলার মুখে অনেক কথা শুনিলেন এবং শকুন্তলা কি করিতে ভালবাসেন তাহাও জানিলেন। জানিলেন যে শকুন্তলা বৃক্ষ এবং লতার মধ্যে বিবাহ দিতে ভালবাসেন এবং দেখিলেন যে তিনি নবমল্লিকা এবং সহকারের মিলন দেখিয়া তাহাদিগকে স্ত্রীপুরুষ ভাবিয়া পরমহর্ষোৎফুল্ল। আবার দুষ্ট প্রিয়ম্বদা তখনি অনসূয়াকে বুঝাইয়া দিল, যে শকুন্তলার নিজের উপযুক্ত পতিলাভের ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া পতিপ্রাপ্তা বনজ্যোৎস্নার প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে। এবং শকুন্তলা সেই কথা শুনিয়া প্রিয়ম্বদাকে বলিলেন—তোমার নিজের বুঝি সেই ইচ্ছা হইয়াছে। শকুন্তলার মানসিক অবস্থার বিষয় জানিতে আর কিছু বাকি রহিল না। তাঁহার মন এখন মিলনকল্পনাপূর্ণ; তাঁহার ভাবনা এখন মিলনের; তাঁহার জীবন এখন স্বপ্নময় এবং সে স্বপ্ন নবপ্রস্ফুটিত যৌবনের অপরিস্ফুট সঙ্গীতে সঙ্গীতময়। সেই সঙ্গীতধ্বনি দুষ্মন্তের কর্ণে বাজিল। তাঁহার লালসা মিলনকামনায় পরিণত হইল। শকুন্তলাকে ব্রাহ্মণকন্যা মনে করিয়া তিনি তখনি বিবাহসম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। কিন্তু শকুন্তলার মন জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রধান আশঙ্কা এখন ঘুচিয়া গিয়াছে। তাঁহার মন এখন উৎসাহপূর্ণ। তিনি শকুন্তলার জাতি

নির্ণয় করিবেন বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প হই-লেন। লালসার বস্তুকে ঈপ্সিত অবস্থা-পন্ন বুঝিতে পারিলে লোকে তাহা অধিকার করিবার জন্য সাহস এবং ধ্যগ্রতাসহকারে উপায় চিন্তা করিয়া থাকে। দুষ্মন্ত এতক্ষণে শকুন্তলার স-হিত অধিকারের ভাব সংযোগ করিলেন। তার পর শকুন্তলাকে ভ্রমরতাড়না হ-ইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাপস-বালাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সহসা কোন প্রভাবশালী পুরুষবরকে দেখিলে ক্ষুদ্রবালিকার মনে যে চকিতের ভাব হইয়া থাকে, তাহা শমিত হইবার পরেই শকুন্তলা মনোবিকার অনুভব করিলেন ;—

কিং ণু ক্খু ইমং পেক্খিঅ তপোবন বিরোহিণো বিআরস্স গমনীঅ ক্হি সং-বুত্তা।

ইহাকে দেখিয়া আমার তপোবন-বিরোধী মনোবিকার জন্মিল কেন ?

ক্ষুদ্র হরিণী একেবারে ব্যাধশরাহত। প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার মনের ভাব বুঝিলেন। শকুন্তলা তাঁহাদের কাছে এবং দুষ্মন্তের কাছে লুকোচুরি আরম্ভ করিলেন। প্রিয়ম্বদা কি অন-সূয়া দুষ্মন্তসম্বন্ধে তাঁহার মনের মতন কথা বলিলেই তিনি রাগ করিতে লাগিলেন। তিনি সতৃষ্ণভাবে কিন্তু যেন চোরের ন্যায় ভয়ে ভয়ে দুষ্মন্তকে দেখিতেছেন, কিন্তু দুষ্মন্ত তাঁহার পানে চাহিয়া দেখিলেই তিনি চক্ষু ফিরাইয়া লইতেছেন। শকুন্তলাসম্বন্ধে দুষ্মন্তের এখন যেরূপ মনের ভাব, তাহাতে তাঁহার কেবল ইহাই জানা আবশ্যক যে শকু-ন্তলার সহিত তাঁহার বিবাহ হইতে পারে কি না। তিনি শুনিলেন যে শকুন্তলা ক্ষত্রিয়কন্যা। এবং প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে আরো বলিয়া দিল যে কণ্ব শকুন্তলাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে অভি-লাষী। কথাটি শকুন্তলার খুব মনের মতন হইল। কিন্তু তিনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। প্রিয়-ম্বদা তাঁহাকে আর দুইটি গাছে জল দিবার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়া দিল। দুষ্মন্ত তাঁহার শ্রমকাতরতায় কাতরতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার ঋণের বিনিময়ে নিজের অঙ্গুরীটি প্রিয়ম্বদাকে দিলেন। প্রেমের স্নেহময় মূর্ত্তি প্রক-টিত হইল। অঙ্গুরীটি পাইয়া প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে ঋণমুক্ত করিয়া চলিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু শকুন্ত-লার এখন চলিয়া যাইবার সাধ্য নাই। তিনি রাগ করিয়া প্রিয়ম্বদাকে বলি-লেন—

কা তুমং বিসজ্জিদব্বস্স রুন্ধিদব্বস্স বা।

আমাকে তাড়াইয়া দিবারই বা তুমি কে আর ধরিয়া রাখিবারই বা তুমি কে ?

প্রথম প্রেমসঞ্চারের সময় রমণী অধিকতর লজ্জাশীলতাহেতু এইরূপ লুকোচুরিই করিয়া থাকে। রমণী শীঘ্র

মনের কথা বলিতে পারে না। রমণীর অস্তিত্ব হৃদয়গত। যে যত হৃদয়াধীন, বাহ্য অভিব্যক্তি তাহার তত কষ্টকর। সে কষ্ট রমণীমণ্ডলে লজ্জারূপধারণ করিয়া লুকোচুরি প্রভৃতি রমণীর কুটিলতায় অভিব্যক্ত হয়। যেখানে রমণী পুরুষের সহিত বেশী মিশামিশি করে, সেখানে রমণীর বাহ্য অভিব্যক্তি কতকটা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। সেই জন্য রমণীর প্রেমের ইতিহাস, অথবা বলিতে গেলে রমণীর সমস্ত ইতিহাস, ইউরোপে এক রকম, এসিয়ায় কিছু ভিন্ন রকম। শকুন্তলা হিন্দুরমণী। সুতরাং তাঁহার প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে লুকোচুরির ব্যাপার কিছু বেশী। এ লজ্জাশীলতা এবং লুকোচুরির আরো একটু তাৎপর্য্য আছে। যে দেশের ভাবে এবং শিক্ষায় শরীর আত্মার তুলনায় অতি অপবিত্র, সে দেশে শারীরিকসম্ভোগসূচক প্রসঙ্গমাত্রই কিছু লজ্জা উৎপাদন করিয়া থাকে। এবং সেই নিমিত্তই সে দেশে প্রেমের সহিত লুকোচুরির কিছু ঘনিষ্ট-সম্বন্ধ। ইউরোপের ভাব এবং শিক্ষা এ রকমের নয় এবং সেই জন্য ইউরোপীয় কাব্যের নায়িকাগণ প্রেমপ্রসঙ্গে এক রকম প্রগল্‌ভা বলিলেই হয়। কিন্তু ভারতের এই ভাব এবং এই শিক্ষা। এবং শকুন্তলা ভারতরমণী এবং ব্রহ্ম-সেবানিরত তাপসবালা। সেই জন্যই দুষ্মন্তের নিকট হইতে গমনকালে তাঁহার পায় কাঁটা ফুটিল এবং তাঁহার বস্ত্র গাছের ডালে আট্‌কাইয়া গেল। তখন দুষ্মন্তও যেমন তাঁহাতে মজিয়াছেন তিনিও তেমনি দুষ্মন্তে মজিয়াছেন। তবে তিনি এক রকমে মজিয়াছেন, দুষ্মন্ত আর এক রকমে মজিয়াছেন। তিনি দুষ্মন্তকে দেখিবামাত্রই মজিয়াছেন, দুষ্মন্ত তাঁহাকে দেখিবামাত্র মজেন নাই। দুষ্মন্তের প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কার্য্য হইয়াছে; সুতরাং সে প্রেম একটু একটু করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইনি যে দেখিতে পাই তপস্বিকন্যা, ইনি বোধ হয় ব্রাহ্মণকন্যা—দুষ্মন্ত মধ্যে মধ্যে এই সকল বিঘ্নকল্পনা করিয়াছেন। বোধ হয় কোন কল্পিত বিঘ্ন প্রকৃত বিঘ্ন বলিয়া জানিতে পারিলে দুষ্মন্ত শকুন্তলার মোহ ঝাড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু দুষ্মন্তকে দেখিয়া শকুন্তলা সে রকম কোন বিঘ্নকল্পনা করিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মন একেবারেই বিচলিত হইয়া উঠিল, তাঁহার জ্ঞানের কার্য্য কিছুই হইল না। বোধ হয় সে প্রেমের কোন বিঘ্ন ঘটিলে সেই প্রেমানলেই তিনি ভস্মীভূতা হইতেন। রমণী হৃদয়-প্রধান বলিয়াই দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার প্রেমসঞ্চারের এই ভিন্ন প্রণালী।

দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার প্রেমসঞ্চার হইয়াছে। তাঁহারা পরস্পরে এমনি মুগ্ধ, যে কাহারও কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে আর ইচ্ছা হয় না। কিন্তু ছাড়িয়া থাকিতে হইল। দুষ্মন্ত আশ্রম হইতে

চলিয়া গেলেন; শকুন্তলাও আশ্রম-কুটীরে প্রবেশ করিলেন। এই বিচ্ছেদের পর যে পর্য্যন্ত না উভয়ের মিলন হইল, সে পর্য্যন্ত দুইজনের ইতিহাস কতকটা একরকম কতকটা ভিন্নরকম। উভয়েই পরস্পরের চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি দিবা, কি রাত্রি সকল সময়েই সেই চিন্তা। চিন্তা করিয়া করিয়া উভয়েই শীর্ণ, দুর্ব্বল, আহার-নিদ্রাবর্জ্জিত।

ক্ষামক্ষামকপোল মাননমুরঃ কাঠিন্য-
মুক্তস্তনং
মধ্যং ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ
পাণ্ডুরা।
শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়-
মালক্ষ্যতে
পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা
মাধবী॥

ভাবিয়া ভাবিয়া শকুন্তলার ত এই দশা হইয়াছে। দুষ্মন্তেরও তাই ঘটিয়াছে। প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে বলিতেছেন :—

ণং সো রাএসী ইমস্সিং সিণিদ্ধ দিট্ঠিএ সূইদাহিলাসো ইমাইং দিঅসাইং পজ্জাঅরকিসো লক্খীঅদি।

এবং দুষ্মন্ত নিজে এই কথা বলেন :—

ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্বিবর্ণ মণীকৃতং
নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রসারিভির-
শ্রুভিঃ।
অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মুহুর্মণিবন্ধনাৎ
কণকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্য্যতে॥

এ কি রকম চিন্তা? দুষ্মন্তের সম্বন্ধে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ, শকুন্তলার সম্বন্ধে তত সহজ নয়। কারণ দুষ্মন্তের সম্বন্ধে এ চিন্তার বাহ্যস্ফূর্ত্তি আছে, শকুন্তলার সম্বন্ধে বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাই। দুষ্মন্ত আশ্রম হইতে চলিয়া গিয়াই নিজসখা মাধব্যের কাছে সকল কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু শকুন্তলা নিজসখীদ্বয়ের কাছে কোন কথা বলিলেন না। দুষ্মন্ত শকুন্তলার রূপের কথা মনে করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া শকুন্তলা কি করিয়াছিলেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন; আবার কি রকম করিয়া শকুন্তলার সহিত দেখা হইবে তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা তাঁহাকে দেখিয়া কি করিয়াছিলেন, সেই পর্য্যালোচনাই দুষ্মন্তের মনে প্রবল। সে পর্য্যালোচনার প্রকৃতি এই :—

কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাব-
দর্শনাশ্বাসি।
অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয় প্রার্থনা
কুরুতে॥

(স্মিতং কৃত্বা) এবমাত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতেষ্টজনচিত্তবৃত্তিঃ প্রার্থয়িতা বিড়ম্ব্যতে।

স্নিগ্ধং বীক্ষিত মন্যতোঽপি নয়নে যৎ-
প্রেরয়ন্ত্যা তয়া
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং
বিলাসাদিব।
মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি সা সাসূয়মুক্তা
সখী
সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো কামী
স্বতাং পশ্যতি॥

মনে করিলেই প্রিয়াকে পাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমার মন তা বুঝে না। সে সদা তাঁহারই অনুরাগ-দর্শনে উৎসুক। এখনও মনোরথ পূর্ণ হয় নাই বটে, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের অনুরাগ দর্শন করিয়া একপ্রকার আনন্দে উন্মত্ত। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হুঃ এইরূপে প্রণয়ী ব্যক্তি প্রতারিত হয়। সে ভাবে তাহার আপনার মনে যে যে ভাবের উদয় হইতেছে তাহার প্রিয়জনের মনেও অবিকল সেই সকল ভাবের উদয় হইতেছে। তিনি অন্য দিকে যদৃচ্ছায় নয়ননিক্ষেপ করিয়াছেন, আমি ভাবিয়াছি সেটী আমাকে দেখিয়াই। তিনি গুরু নিতম্বের ভরে মন্থরভাবে গমন করিয়াছেন, আমি মনে করিয়াছি আমাকে দেখিয়াই তাঁহার গতি বিলাসে অলস হইয়া পড়িতেছে। প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আটকাইলে তিনি সখীর প্রতি কোপ প্রকাশ করিলেন, সেটীও আমার মনে হইল যে আমারই জন্যে। কামী ব্যক্তি আপনার ভাবে ভোর হইয়া সকলি আপনার বলিয়া দেখে।

এ পর্য্যালোচনার অর্থ—সন্দেহ। প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি প্রেমের লক্ষণ বুঝিয়াও বুঝে না, নিশ্চিন্ত হইয়াও সন্দিহান হয়, আশ্বস্ত হইয়াও প্রতারিত মনে করে। শকুন্তলাকে জর্জ্জরিতাবস্থায় দেখিয়া দুষ্মন্ত একবার সন্দেহ করিয়া পরক্ষণেই নিশ্চয় বুঝিলেন যে মনোবিকারই এ অবস্থার কারণঃ—

বলবদস্বস্থশরীরা শকুন্তলা দৃশ্যতে। তৎ কিময়মাতপদোষঃ স্যাৎ উত যথা মে মনসি বর্ত্ততে। অথবা কৃতং সন্দেহেন

স্তননাস্তোশীরং শিথিলিতমৃণালৈকবলয়ং
প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপুরিদম্।
সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়োর্নতু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু॥

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই যখন প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলাকে তাঁহার পীড়ার কারণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন শকুন্তলার উত্তর প্রতীক্ষায় দুষ্মন্ত ভয়াকুলিত হইয়া পড়িলেন, চিত্তস্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না।

পৃষ্টা জনেন সমদুঃখসুখেন বালা
নেয়ং ন বক্ষ্যতি মনোগতমাধিহেতুম্।
দৃষ্টো বিবৃত্য বহুশোঽপ্যনয়া সতৃষ্ণ
মত্রান্তরে শ্রবণকাতরতাং গতোঽস্মি॥

যাহারা চিরদিন ইহার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী সেই সখীরা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইনি এখন আর মনস্তাপের কারণটী লুকাইতে পারিবেন না। ইনি তৎকালে বারংবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাতে আমার প্রতি প্রণয় প্রকাশ করিলেও এই সময়টা (ইনি কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য) আমার মন অস্থির হইয়া উঠিতেছে।

শুধু প্রেম কেন, সকল বিষয়েই মানুষ যাহার বেশী অভিলাষী হয় তৎসম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া ও সন্দেহসংক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু শকুন্তলার বোধ হয় এ রকম সন্দেহ হয় নাই। এ রকম সন্দেহ

যুক্তিপ্রয়োগের ফল। রমণী হৃদয়সর্ব্বস্ব। সে হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিলে রমণী হৃদয়ের বস্তু পাইবার জন্যই ব্যাকুল হন, পাওয়া সম্ভব কি না তাহা বিবেচনা করেন না। যদি সে বস্তু পান, ভালই; নচেৎ চিরদুঃখিনী হইয়া থাকেন, অথবা শুকাইয়া শুকাইয়া মরিয়া যান।* প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার অনুরোধে মনের কথা প্রকাশ করিয়া শকুন্তলা সখীদ্বয়কে বলিলেন:—

তং জই বো অণুমদং তহ বট্টহ জহ তস্স রাএসিণো অণুকম্পনিজ্জা হোমি। অণ্ণহা অবস্সং সিঞ্চহ মে তিলোদঅং।

অতএব তোমাদের যদি মত হয় ত যাতে সেই রাজর্ষি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করেন তাহার উপায় কর, নতুবা আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ কর।

তবে শকুন্তলার একটি সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তিনি দুষ্মন্তের যোগ্যা কি না। প্রিয়ম্বদা যখন তাঁহাকে পত্র লিখিতে বলিলেন, তখন তিনি বলিলেন:—

চিন্তেমি অহং। অবহীরণভীরুঅং উণ বেবই মে হিঅঅং।

আমি ভাবিতেছি। কিন্তু পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন এই ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপিতেছে।

কিন্তু এ সন্দেহ প্রকৃত যুক্তিমূলক সন্দেহ নয়। এ সন্দেহের নাম ভয়। যাহার অন্যের ইচ্ছার উপর জীবন এবং মৃত্যু নির্ভর করে, তাহার সেই ইচ্ছা জানিবার সময় এইরূপ ভয় হইয়া থাকে।

প্রেমসঞ্চারের পর মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত যে অবস্থা আমরা বর্ণনা করিতেছি তাহার আর একটী লক্ষণ যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণার দুইটী কারণ—সন্দেহ এবং আসঙ্গলিপ্সা। তন্মধ্যে আসঙ্গলিপ্সাই প্রবল কারণ। এই কারণ দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা উভয়েই বর্ত্তমান। উভয়েই জর্জ্জরিত দেহ। উভয়েই উত্তপ্তশোণিত। উভয়েই জ্বলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু এ জ্বালায় দুষ্মন্ত অধীর, অস্থির; শকুন্তলা প্রায় চেতনাশূন্য, বিকলাঙ্গ, উত্থানশক্তি রহিত। দুষ্মন্ত ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতেছেন এবং প্রতিনিশ্বাসে প্রজ্বলিত চুল্লীর ন্যায় অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছেন:—

(নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে) সেই তাপসতনয়া যে পরাধীনা ইহা আমি বিলক্ষণ জানি, এবং তপস্যার কিরূপ উগ্রপ্রভাব তাহাও বিলক্ষণ জানি, তথায় আপন ইচ্ছায় কিছুই করিবার শক্তি নাই। তথাপি সেই দুর্লভ বস্তু হইতে হৃদয়কে কিছুতেই ফিরাইতে পারিতেছি না।

* বঙ্কিমবাবুর শৈবলিনী রমণী বলিয়া উন্মাদগ্রস্তা। সেও এই কথার একটি দৃষ্টান্তমাত্র। তাঁহার কুন্দনন্দিনীও এ কথার একটি প্রমাণ। কিন্তু যে সকল বঙ্গীয় কবি এবং উপন্যাসলেখক অসিদ্ধমনোরথ নায়িকাকে যোগিনী সাজাইয়া শ্মশানে মশানে পুষ্করে হরিদ্বারে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ান, তাঁহারা স্ত্রীপ্রকৃতি বড় একটা বুঝেন বলিয়া বোধ হয় না।

(মদনপীড়া প্রকাশ করিয়া) হে ভগবন্ কুসুমায়ুধ! আপনি এবং চন্দ্র, আপনারা উভয়ে নিজ কোমল ও বিশ্বস্তমূর্ত্তিতে প্রলোভিত করিয়া প্রণয়পীড়িত ব্যক্তিগণকে প্রতারিত করিয়া থাকেন। আপনার শর সুকোমল কুসুমে রচিত এবং চন্দ্রের রশ্মি শীতল সুধাময়, কিন্তু আমার নিকটে ত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। কারণ চন্দ্র হিমগর্ভ রশ্মিদ্বারা অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন আর আপনিও কুসুমশরকে বজ্রের ন্যায় কঠিন করিয়াছেন। তপস্বিগণ যজ্ঞকার্য্যের অবসানে আমাকে গমনে অনুজ্ঞা দিয়াছেন, এক্ষণে কোন্ স্থানে গিয়া শ্রান্তি দূর করি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) একমাত্র সেই প্রিয়তমার দর্শন ভিন্ন আর শান্তি কোথায়? এই দারুণ রৌদ্রের সময় শকুন্তলা সখীজনের সহিত প্রায়ই মালিনীতীরস্থিত নিকুঞ্জদেশে অবস্থান করিয়া থাকেন, অতএব সেই স্থানেই গমন করি। (গমন করিয়া স্পর্শসুখ অনুভব করত) আহা! এই স্থানটী শীতলবায়ুর সঞ্চারে কি মধুর! আমার অঙ্গ সকল না কি অনঙ্গবহ্নিতে জ্বলিতেছে, তাই এই পদ্মসৌরভপূর্ণ মালিনীনদীর শীতল বাতাসটুকু বারংবার গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। বোধ হয় শকুন্তলা এই বেতসলতাবেষ্টিত লতামণ্ডপে অবস্থান করিতেছেন, কেন না, ইহার এই সিকতাময় দ্বারদেশে নূতন পদচিহ্ন সকল পতিত রহিয়াছে, আর এই পদচিহ্ন সকলের পূর্ব্বভাগ উচ্চ রহিয়াছে আর পশ্চাদ্ভাগ জঘনভরে বালুকায় বসিয়া গিয়াছে। অতএব লতান্তরালে থাকিয়া দেখি। (সেইরূপ করিয়া আনন্দে) আঃ! আমার চক্ষু জুড়াইল।*

যাহার অন্তঃপুর সুন্দরী রমণীতে পরিপূর্ণ তাহার এরূপ অবস্থা দেখিলে কে না বলিবে যে তাহার রিপু যথার্থই দুর্দ্দমনীয়, আসঙ্গলিপ্সা কিছুতেই মিটিবার নয়। এ অতি ভয়ানক অবস্থা। এ রকম অবস্থায় মানুষ হিতাহিতবিবেচনাশূন্য হইয়া পড়ে এবং ঘোর-অনিষ্টসাধনে সক্ষম হয়। কিন্তু এ অবস্থার, এ যন্ত্রণার একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। এ যন্ত্রণায় বাহ্যজ্ঞান অতিশয় তীব্র। যে চন্দ্ররশ্মি অন্য সময়ে 'খবরে' আসে না, যে শীতল বায়ু অন্য সময়ে গায়ে লাগে না এ যন্ত্রণায় সে চন্দ্ররশ্মি, সে শীতলবায়ু তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এ যন্ত্রণায় বাহ্যজগৎ ভয়ানক প্রভাবশালী। কিন্তু শকুন্তলার যন্ত্রণা এ রকমের নয়। শকুন্তলা মুমূর্ষুর ন্যায় শয্যাশায়িনী। দুষ্মন্তকে দেখিয়া অবধি তিনি যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এক পা নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু যদিও তাঁহার বাহ্যিক দৃশ্য মুমূর্ষুর ন্যায় তাঁহার অন্তর বিষম জ্বালায় জ্বলিয়া যাইতেছে। সে জ্বালা এক প্রবল যে

*স্থানাভাবে ইহার মূল দেওয়া হইলনা।

তজ্জন্য তিনি একরকম বাহ্যানুভূতি-রহিত। সে জ্বালায় তিনি পদ্মপত্র-সঞ্চালিত বায়ু অনুভব করিতে পারেন নাই। সে জ্বালায় বাহ্যজগৎ তাঁহার কাছে অস্তিত্বহীন। সে জ্বালায় একটি কথাও তাঁহার ওষ্ঠস্খলিত হয় নাই। দুই জনের যাতনার দুই রকম আকৃতি। একজন যাতনায় ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায় এবং বাক্যে এবং নিশ্বাসে অগ্নি উদ্গীরণ করে। আর একজন যাতনায় মুমূর্ষুর ন্যায় শিথিলদেহ এবং মৃতের ন্যায় নিস্তব্ধ। দুই জনেই যেন আগ্নেয় গিরি। কিন্তু একটী গিরির গর্ভস্থ অগ্নি সতেজে শিখর ভেদ করিয়া উৎক্ষিপ্ত হইতেছে এবং দূরে অদূরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে; আর একটি গিরির গর্ভস্থ অগ্নি শিখর ভেদ করিতে না পারিয়া সেই গর্ভকেই বর্দ্ধিতবিক্রমে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। এখানেও দেখিতেছি যে পুরুষ এবং রমণীর মধ্যে প্রভেদ এই যে পুরুষের অভিব্যক্তি আছে, রমণীর অভিব্যক্তি নাই। এই মূলীভূত বৈপরীত্য কালিদাস যেমন আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, আর কোন কবি তেমন দেখান নাই।

তার পর মিলন। প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার সম্মুখে দুষ্মন্ত বলিলেন:—

পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্ব্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্॥

যদিও আমি বহুপত্নী গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু এখন হইতে দুইটী বস্তু আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল—একটী আমার আসমুদ্র সাম্রাজ্য আর একটী তোমাদের সখী শকুন্তলা।

সম্মান প্রকৃত প্রেমের একটী প্রধান উপাদান। দুষ্মন্তের প্রেমের সেই উপাদান এখন ব্যক্ত হইল। দেখিয়া প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া সরিয়া গেলেন। তখন রিপুগ্রস্ত দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা উঠিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। দুষ্মন্ত বলপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন শকুন্তলা বলিয়া উঠিলেন:—

পোরব রক্‌খ অবিণঅং মঅণসংতত্তা বি ণহু অত্তণো পহবামি।

পৌরব! শিষ্টাচার ভঙ্গ করিও না। আমি লালসাবতী সত্য, কিন্তু আমার নিজের উপর আমার কোন ক্ষমতা নাই।

এই কথা শুনিয়া দুষ্মন্ত তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহের ইতিহাস বলিয়া এইটী বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে গুরুজনের অনুমতি ব্যতিরেকেও তিনি আত্মসমর্পণে সক্ষম। শকুন্তলা বুঝিলেন না। তখন দুষ্মন্ত তাঁহাকে বলিলেন যে আমি তোমাকে এখন ছাড়িব না; ছাড়িব কখন, না—

অপরিক্ষত কোমলস্য যাবৎ
কুসুমস্যেব নবস্য ষট্‌পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে
সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য॥

যখন তোমার কোমল অক্ষত অধরের

মধুপান করিয়া আমার খরতর পিপাসা নিবৃত্ত হইবে। এই বলিয়া তিনি অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শকুন্তলা তাঁহারই ন্যায় ভোগতৃষ্ণাতুরা হইয়াও তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লজ্জাশীলার লজ্জাশীলতা এখনও প্রবল; জ্ঞানহীনার জ্ঞান এ সময়েও পরিষ্কার। কিন্তু সংযতচিত্ত দুষ্মন্ত একেবারে বিহ্বলমতি; জ্ঞানপ্রধান দুষ্মন্ত সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। যখন বাহ্যজগৎ ভুলিলে বিষম অনিষ্ট ঘটে তখন রমণী বাহ্যজগৎ ভুলে না, পুরুষ ভুলে। অবশেষে দুষ্মন্তের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইল। রিপু জয়ী হইল। ন্যায়পরায়ণ সংযতচিত্ত ধর্ম্মবীরের পদস্খলন হইল। সে পদস্খলনের কারণ সেই ধর্ম্মবীরের প্রবল রিপু। দুষ্মন্ত বুঝিতেন যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ যুক্তিসঙ্গত নয়; দুষ্মন্ত বুঝিতেন যে শকুন্তলার আত্মসমর্পণক্ষমতা নাই। শকুন্তলাকে প্রথম দেখিয়া গিয়া দুষ্মন্ত মাধব্যের কাছে তাঁহার অতুল রূপের বর্ণনা করিলে পর মাধব্য তাঁহাকে বলিলেন যে আপনি যত শীঘ্র পারেন সে রূপবতীকে দখল করিবার চেষ্টা করুন, বিলম্ব করিলে হয় ত সে কোন চিক্কণমস্তক ঋষির হাতে পড়িবে। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন:—

পরবতী খলু তত্রভবতী।

ন চ সন্নিহিতোঽত্র গুরুজনঃ।

তিনি পরাধীনা এবং তাঁহার গুরুজন গৃহে নাই।

এখন শকুন্তলা স্বয়ং সেই কথাই বলিতেছেন। কিন্তু এখন তিনি সে কথা না শুনিয়া শকুন্তলাকে বুঝাইতেছেন যে তিনি আত্মসমর্পণে সক্ষম, তাঁহার গুরুজনের সম্মতি লইবার আবশ্যকতা নাই। এ রহস্যের অর্থ—দুর্দ্দমনীয় রিপু। শকুন্তলাকে কাছে পাইয়া দুষ্মন্ত তাঁহার উন্নত নীতি, উন্নত বুদ্ধি, উন্নত বিচারশক্তি, অসাধারণ চিত্তসংযমক্ষমতা সকলই হারাইলেন। প্রখর রবি মেঘাচ্ছন্ন হইল।

দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে। এখন তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি কি রকম ভাব তাহা দেখিতে হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে দুষ্মন্ত কিছু বেশী রিপুপরবশ। তিনি ভোগলালসা চরিতার্থ করিয়া কণ্বের আশ্রম হইতে নিজ রাজধানীতে গমন করিয়াছেন। কিন্তু ভোগলালসা চরিতার্থ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার শকুন্তলা-প্রেমের উচ্ছেদ হয় নাই। শকুন্তলা তাঁহার হৃদয় দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়াছেন—সে হৃদয়ে শকুন্তলা-প্রেম জীবন থাকিতে উচ্ছিন্ন হইবার নয়। অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শন করিয়া দুষ্মন্ত যে ভয়ানক যন্ত্রণাভোগ করেন তাহাই তাঁহার শকুন্তলা-প্রেমের গাঢ়ত্বের পরিচয়। কিন্তু মহাকবি সে পরিচয় অপেক্ষা একটি সহস্রগুণে আশ্চর্য্য পরি-

চয় দিয়াছেন। দুর্ব্বাসার শাপে দুষ্মন্ত শকুন্তলাস্মৃতি হারাইয়াছেন। হারাইয়া একদিন মাধব্যের সহিত বসিয়া আছেন। এমন সময় একটি মনোহর গীতিধ্বনি শ্রবণ করিলেন। করিয়া তাঁহার মন এক অলৌকিকভাবে গলিয়া গেল। সেভাব এই :—

কিং নু খলু গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজন বিরহাদৃতেঽপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি। অথবা
রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥

কই আমার ত কোন ইষ্টবস্তুর সহিত বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তবে এই গীতশ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ এত আকুল হইল কেন? অথবা কোন রম্য বস্তু দেখিলে বা কোন মধুর শব্দ শুনিলে সুখের অবস্থায়ও যে মানুষের মন আকুল হইয়া উঠে, সে বোধ হয় তখন পূর্ব্বজন্মের কোন সুদৃঢ় প্রণয়ের বস্তুকে অজ্ঞাতভাবে স্মরণ করে।

কি কোমল, কি গম্ভীর, কি পবিত্রভাব! এ ভাবের গাঢ়তা বিবেচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়! যে বন্ধুত্ব জন্মান্তরপরিগ্রহেও স্মৃতিপথে থাকে সে বন্ধুত্ব কত পবিত্র, কত গাঢ়, কত মিষ্ট। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শকুন্তলার অস্ফুট স্মৃতি আজিও তাঁহার মনকে এই অলৌকিকভাবে পরিপূরিত করিতেছে। দুর্ব্বাসার শাপে দুষ্মন্তচিত্ত আজ শকুন্তলাসম্বন্ধে মহাপ্রলয়গ্রস্ত। কিন্তু সেই মহাপ্রলয়কেও ভেদ করিয়া সেই প্রেম ফুটিয়া উঠিতেছে। মহাপ্রলয়েও সে রকম প্রেমের লয় নাই। দুষ্মন্তের শকুন্তলা-প্রেম যথার্থই গাঢ়তম, পবিত্রতম, কোমলতম। কেনই বা সে প্রেম সে রকম না হইবে? শকুন্তলা শুধু তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের দ্বারা দুষ্মন্তকে পরাজয় করেন নাই। তাঁহার মানসিক সৌন্দর্য্যের দ্বারাও তিনি সেই পুরুষপ্রধানকে পরাজয় করিয়াছেন। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা যে কয়দিন দম্পতিভাবে কণ্বের আশ্রমে ছিলেন, তাঁহাদের সে কয়দিনের জীবনপ্রণালীর বিষয় মহাকবি কিছু বলেন নাই। সে বিষয়টি তিনি পাঠকের দৃষ্টি হইতে যবনিকাচ্ছাদিত রাখিয়াছেন। একটিবারমাত্র একটি মুহূর্ত্তের জন্য সেই যবনিকার একটি পার্শ্ব সরাইয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া মহাকবি এক আশ্চর্য্য নৈতিক বিপ্লব দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে পুরুষপ্রধান, বীরপ্রধান দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাছে বসিয়া শকুন্তলাময় হইয়াছেন, পুরুষের পৌরুষভাব হারাইয়া রমণীর রমণীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পৌরবসভায় শকুন্তলা বলিতেছেন :—

ণং একস্সিং দিঅহে ণোমলিআ মণ্ডবে ণলিণীপত্তভাঅণগঅং উদঅং তুহ হত্থে সণ্ণিহিদং আসি তক্খণং সো মে পুত্ত

কিদও্যো দীহাপঙ্গো ণাম মিঅপোদও্যো উবচ্‌ঢিদো। তুএ অঅং দাব পঢমং পিঅউ ত্তি অনুঅম্পিনা উবচ্ছন্দিদো উঅএণ। ণ উণ দে অপরিচআদো হত্থ-ব্ভাসং উবগদো। পচ্ছা তস্মিং এব্ব মএ গহিদে সলিলে তেণ কিদ পণও্যো। তদা তুমং ইত্থং পহসিদো সি সব্বো সগন্ধেসু বিস্মসদি দুবে বি এত্থ আরণ্ণও্যো ত্তি।

একদিন আমরা উভয়ে নবমল্লিকা-মণ্ডপে বসিয়াছিলাম, আপনার হস্তে পদ্মপত্রের ঠোঙায় জল ছিল, তৎকালে আমার কৃত্রিম পুত্র দীর্ঘাপাঙ্গনামে সেই হরিণশিশু আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তবে অগ্রে জলপান করুক ইহা বলিয়া আপনি স্নেহভরে তাহাকে নি-কটে ডাকিলেন, কিন্তু সে অচেনা বলিয়া আপনার নিকটে আসিল না। অনন্তর সেই জল আমি গ্রহণ করিলে সে আ-সিয়া পান করিল। আপনি তাহাতে উপহাস করিয়া বলিলেন, সকলেই স্বজনে বিশ্বাস করে, তোমরা দুজনেই জঙ্গলা কি না।

যে দুষ্মন্ত বীরবিক্রমে শাণিতশর হস্তে হরিণ তাড়না করিতে করিতে আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এখন সেই দুষ্মন্ত সেই আশ্রমে বসিয়া একটি বালিকার সহিত বালিকার ন্যায় হরিণের শুশ্রূষা করিতেছেন! কঠিনহৃদয় পুরুষপ্রধান কোমলহৃদয় বালিকা হইয়া পড়িয়াছেন! ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয় সসাগরা পৃথিবীর রাজাকে পরাজয় করিয়াছে! এই নৈতিক পরাজয়ের গুণেই দুষ্মন্তের শকুন্তলা-প্রেম এত কোমল, এত গাঢ়, এত পবিত্র, এত স্বর্গীয়ভাবপূর্ণ। সে প্রেম এত বড় বিপ্লব ঘটাইয়াছে বলিয়াই মহাপ্রলয় ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিল। এবং সেই নিমিত্তই হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ দুষ্মন্ত হিন্দুপতির পদগৌরব বুঝিয়াও কশ্যপা-শ্রমে শকুন্তলার কাছে নতশিরে নতজানু হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার প্রেম এক আশ্চর্য্য পদার্থ। সে প্রেমের তুলনা নাই, পরিমাণ নাই, সীমা নাই। সে প্রেম একটি আশ্চর্য্য শক্তি। সেই শ-ক্তির গুণেই কোমলতাময়ী শকুন্তলা কণ্বের আশ্রম হইতে হস্তিনাপুর হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। সে প্রেম একটি মন্ত্র। সেই মন্ত্রে আহত হইয়া শকুন্তলা দুর্ব্বা-সার ভয়ঙ্কর শাপ শুনিতে পান নাই। সে প্রেমের একটি প্রধান উপাদান বি-শ্বাস। দুষ্মন্ত তাঁহাকে গন্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিয়া একটি অবধারিত সময়ের মধ্যে তাঁহাকে হস্তিনাপুরে লইয়া যাই-বেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। গিয়া দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে তাঁহাকে ভুলিয়া রহিলেন। এদিকে অবধারিত সময় অতীত হইয়া গেল। অনসূয়া দুষ্মন্তের উপর চটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন:—

পড়িবুদ্ধা বি কিং করিস্সং। ণ মে উইদেসু বি ণিঅকরণিজ্জ হত্থপাআ পস-রন্তি। কামো দানিং সকামো হোদু

জেন অসচ্চসঙ্কে জণে সুম্নহিঅআ পদং কারিদা।

কিন্তু শকুন্তলার রাগ হইল না। তিনি পতিকে সন্দেহ করিলেন না, গালি দিলেন না। তিনি মুগ্ধহৃদয়ে, সন্দেহশূন্যমনে পুনরায় পতিদর্শনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণকালে চক্রবাকের জন্য চক্রবাকীকে সকাতরে চীৎকার করিতে দেখিয়া তিনি অনসূয়াকে বলিলেন :—

হলা পেক্‌খ নলিনীপত্তন্তরিদং বি সহঅরং অদেক্‌খন্তী আদুরা চকবাই আরড়দি দুক্করং অহং করেমি।

সখি, দেখ, চক্রবাক্ নলিনীপত্রের অন্তরালে আছে। চক্রবাকী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সকাতরে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু আমি এতাবৎকাল আর্য্যপুত্রকে না দেখিয়া আছি। আমি দুষ্কর কার্য্য করিতেছি।

এ কথায় রাগ বা সন্দেহের চিহ্নমাত্র নাই। এ স্নেহের কথা, আদরের কথা, হৃদয়ের মিষ্টতার কথা। অবিশ্বাসীর সম্বন্ধে রমণী এমন কথা কয় না। আবার তখনই তাঁহার সখীদ্বয় তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে যদি দুষ্মন্ত তোমাকে চিনিতে না পারেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহারই নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি দেখাইও। কথাটি শুনিবামাত্র শকুন্তলা একটিবার মাত্র যেন শিহরিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই সব ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গিয়া পথিমধ্যে সেই অঙ্গুরীয়টিই হারাইয়া ফেলিলেন! প্রেমময়ী সরলাবালা পৃথিবীকে সরলহৃদয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিমা দেখাইলেন। সে হৃদয়ে প্রেমের বস্তুসম্বন্ধে সন্দেহ স্থান পায় না। অগাধ প্রেম বিশ্বাসমূলক। যেখানে অগাধপ্রেম সেই খানেই এই রকম সরলতা। শকুন্তলার প্রেম এত অগাধ, এত বিশ্বাসমূলক, এত সরলতাময় না হইলে, তিনি সখীদ্বয়ের উপদেশ শুনিয়া অগ্রে অঙ্গুরীয়টি বস্ত্রাঞ্চলে আঁটিয়া বাঁধিতেন এবং মধ্যে মধ্যে খুঁজিয়া দেখিতেন সেটি যথাস্থানে আছে কি না। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। বোধ হয় কোন কোন বিজ্ঞ পাঠিকা বলিবেন যে শকুন্তলা বড় বোকা মেয়ে। আমরা বলি যে এমন সুমিষ্ট বোকা মেয়ে জগতের আর কোন কবির কল্পনায় উদ্ভূত হয় নাই। শকুন্তলা অগাধপ্রেমে মুগ্ধ থাকিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও পতিকে অবিশ্বাস করেন নাই এবং পতির নিকটে অন্যায়াচরণ আশঙ্কা করেন নাই। সরলাবালার প্রথম আশঙ্কা পতির কথা শুনিয়া জন্মিয়াছিল। গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব যখন দুষ্মন্তকে শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে বলিলেন তখন দুষ্মন্ত বলিলেন :—

কিং চাত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্ব্বা।

ইহাকে কি আমি পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছি?

এবং তখনই শকুন্তলা ভাবিলেন :—
হিঅঅং সংপদং দে আসঙ্কা।*

* Monier Williams এ কথায় এই অর্থ করিয়াছেন :—O my heart, thy

এখন আমার হৃদয়ের একটি আশঙ্কার কারণ জন্মিল।

শকুন্তলার প্রেমের আর একটি প্রধান উপাদান সম্ভ্রম। শকুন্তলা যাঁহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহাকে সেই হৃদয়ের পূজ্য দেবতা বলিয়া সম্ভ্রম করেন। দুঃখভাগিনীর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখপূর্ণ সময়ে এই পতি-সম্ভ্রম তাঁহাকে এক অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত এবং মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছিল। পতি-কর্ত্তৃক কুলটা বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া শকুন্তলা পতিহীনার ন্যায় মলিনবেশে ভগ্নহৃদয়ে দীর্ঘকাল কঠোর ধর্ম্মাচরণে অতিবাহিত করিয়াছেন। সহসা সেই পতির সাক্ষাৎলাভ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় আনন্দোৎফুল্ল হইল। কিন্তু দুষ্মন্ত অনুতাপে শীর্ণ এবং বিবর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তখনও তিনি পতিকে পতি বলিয়া ভাল চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই দুষ্মন্তের কথা শুনিয়া তাঁহার সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। তখন তিনি কি করিলেন? 'জেদু অজ্জউত্তো,' আর্য্যপুত্রের জয় হউক, অস্ফুটস্বরে এই কথা বলিবার পর বাষ্পাকুললোচনায় কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। শকুন্তলার দীর্ঘকালস্থায়ী দুঃখ এখন মুহূর্ত্তসম্বদ্ধ হইয়াছে। যে দুঃখ অনেক বৎসর ধরিয়া ভোগ করিয়াছেন, সেই দুঃখ এখন তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তকালের মধ্যে ভোগ করিতে হইল। যেন সুদীর্ঘ স্রোতস্বতী সহসা একমুষ্টিপরিমিত স্থলে গুটাইয়া পড়িয়া বিপরীত তেজে উৎসাকারে উঠিতে লাগিল। এ রকম মুহূর্ত্ত একটি ভয়ানক পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় রমণী প্রায়ই ভাঙ্গিয়া পড়েন। তিনি হয় মূর্চ্ছাপন্ন হন, না হয় পতির গলা জড়াইয়া ধরিয়া মূর্চ্ছা নিবারণ করেন। ইউরোপীয় সাহিত্যে এ কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু সে পরীক্ষায় শকুন্তলার সে রকম কিছুই হইল না। তিনি আশ্চর্য্য গাম্ভীর্য্যসহকারে অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এ গাম্ভীর্য্যের মূল পতি-সম্ভ্রম। যেখানে সম্ভ্রমের আধিক্য সেইখানেই অসীম শক্তি, অসীম গাম্ভীর্য্য—সেখানেই দুর্ব্বলতা দেখাইতে লজ্জা হয়, মন আপনিই দৃঢ় এবং মহিমাপূর্ণ হইয়া উঠে। সে শক্তি, সে গাম্ভীর্য্য, সে মহিমা অতীব মনোহর। যখন দেহ এবং মন ভাঙ্গিয়া পড়িবার কথা তখন যে অটল এবং গম্ভীর হইয়া থাকে সে জগতের একটি প্রধান সৌন্দর্য্য এবং আরাধ্য বস্তু। শকুন্তলা হিন্দুপত্নী বলিয়াই এত অটল, এত গম্ভীর, কেন না হিন্দুপত্নীই পতিকে শ্রেষ্ঠতম

worst misgivings are confirmed. যেন শকুন্তলা পূর্ব্বাবধি এই রকম আশঙ্কা করিতেছিলেন! কিন্তু তাহা হইলে শকুন্তলার চরিত্র, শকুন্তলার হৃদয় কলঙ্কিত করা হয়। বোধ হয় পণ্ডিতবর সে চরিত্র এবং সে হৃদয় বুঝিতে পারেন নাই।

বলিয়া পরম সম্ভ্রমের সহিত ভালবাসেন। হিন্দুপত্নীর হিন্দুপত্নীত্ব কেহ যেন ঘুচায় না! হিন্দুপত্নীকে ইউরোপীয় পত্নীর ন্যায় সাম্যবাদিনী করিলে তাঁহার হিন্দুপত্নীত্ব ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, শুভাদৃষ্টবশত জগতের শুশ্রূষা যে ভাগ্যবতীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম তাহার পক্ষে পুরুষজাতির সম্বন্ধে সাম্যভাব অপেক্ষা সম্ভ্রমের ভাব বেশী উপযোগী এবং উপকারী।

শকুন্তলার হৃদয় এক আশ্চর্য্য পদার্থ। সে হৃদয়ের ভালবাসা অগাধ, বিশ্বাস অগাধ, স্নেহ অগাধ, সম্ভ্রমকারিতা অপরিমেয় কোমলতা অনির্ব্বচনীয়, সরলতা চমৎকারিণী। সে হৃদয়ের কাছে পুরুষপ্রধান দুষ্মন্ত চিরকালের জন্য পরাজিত। সে হৃদয়ের মৃদুমধুর নিশ্বাসে দুর্দ্দমনীয় রিপুপরবশ দুষ্মন্তহৃদয় এক আশ্চর্য্য নৈতিকবিপ্লবে চিরসংস্কৃত। সে হৃদয় জগতের একটি আবশ্যকীয় মহোপকারী নৈতিক শক্তি। পুরুষজাতির সংস্কার এবং উন্নতির নিমিত্ত সে হৃদয়ের সৃষ্টি।



রত্নতত্ত্ব।

আমরা বঙ্গদর্শনে যে "রত্নরহস্য" নামক প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করি, এ প্রস্তাব তাহারই অবয়বমাত্র। পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রস্তাবে মুক্তাসম্বন্ধীয় কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মুক্তার জাতিনির্ণয় প্রভৃতি প্রকাশ করা হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার দোষ, গুণ, বর্ণ ও মূল্যাদি নিরূপণবিষয়ক কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া উপস্থিত প্রবন্ধ লিখিত হইল। পুরাতনকালের তত্ত্ববিৎ লোকেরা কিরূপে মুক্তাপরীক্ষা করিতেন, তাহা বিবৃত করা যাইতেছে।

মৎস্যপুরাণের মতে মুক্তাফলের গুণ প্রধানতঃ ৮ আটটী এবং দোষও প্রধান রূপে ১০টী। তন্মধ্যে ৪টী মহাদোষ এবং ৬টি মধ্যম দোষ, অগ্রে ইহার যথাক্রমে গুণ সকল বর্ণনা করা যাইতেছে পশ্চাৎ দোষের বিষয় বর্ণিত হইবেক।

গুণ যথা।

"সুতারঞ্চ ১ সুবৃত্তঞ্চ ২ স্বচ্ছঞ্চ ৩ নির্ম্মলং
তথা ৪।
ঘনং ৫ স্নিগ্ধঞ্চ ৬ সচ্ছায়ং ৭ তথা-
স্ফুটিত ৮ মেব চা
অষ্টৌ গুণাঃ সমাখ্যাতা মৌক্তিকানা
মশেষতঃ।
মৎস্যপুরাণ।

রত্নতত্ত্ববিৎপণ্ডিতেরা মুক্তাফলের যে ৮টি মহাগুণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকের নাম এই—সুতার (১) সুবৃত্ত

(২) স্বচ্ছ (৩) নির্ম্মল (৪) ঘন (৫) স্নিগ্ধ (৬) সচ্ছায় (৭) ও অস্ফুটিত (৮)।

"সুতার" নামক গুণ কাহাকে বলে তাহা উক্ত হইতেছে যথা—

তারকাদ্যুতিসংকাশং "সুতার" মিতি গদ্যতে।"

গগনমণ্ডলস্থ তারকার ন্যায় দ্যুতি-বিশিষ্ট হইলে, মুক্তার সে গুণটির নাম "সুতার।" এই সুতার-মুক্তা অতি দুর্লভ।

সুবৃত্তগুণ কি তাহাও উক্ত হইয়াছে, যথা—

"সর্ব্বতো বর্ত্তুলং যচ্চ সুবৃত্তং তন্নিগদ্যতে।"

যাহা সকল দিকে সমান সুগোল তাহা "সুবৃত্ত।"*

স্বচ্ছ গুণ যথা—স্বচ্ছং দোষবিনির্ম্মুক্তং।" ৪ প্রকার মহাদোষ ও ছয় প্রকার মধ্যম দোষ না থাকিলে, তাহা "স্বচ্ছ" বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

নির্ম্মল গুণ যথা—"নির্ম্মলং মলবর্জ্জিতং।" মলরহিত হইলেই সে নির্ম্মল ইহা সকলেই বিদিত আছেন।

ঘনগুণ যথা—"গুরুত্বং তুলনে যস্য তদ্ঘনং মৌক্তিকং বরম্।" যাহা ওজনে ভারি তাহা ঘন। এই ঘন মুক্তা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স্নিগ্ধগুণ যথা—"স্নেহেনৈব বিলিপ্তং যত্তৎস্নিগ্ধমিতি গদ্যতে।" যাহা স্নেহ (ঘৃত তৈলাদি) ম্রক্ষিতের ন্যায় দেখায়, তাহা স্নিগ্ধ গুণ বলিয়া খ্যাত।

সচ্ছায়গুণ যথা—"ছায়াসমন্বিতং যচ্চ সচ্ছায়ং তন্নিগদ্যতে।" যে মুক্তার কোন না কোন ছায়া (কান্তি) বর্ত্তমান থাকে, তাহা সচ্ছায় মুক্তা নামে কথিত হয়। (মুক্তাফলের ছায়া কি? তাহা ছায়া-পরীক্ষাস্থলে প্রকাশ পাইবে।)

অস্ফুটিতগুণ—"ব্রণরেখাবিহীনং যত্তৎ স্যাদস্ফুটিতং শুভম্।"

যে মুক্তার ব্রণ অর্থাৎ কোন প্রকার ছিদ্রাকার চিহ্ন নাই বা কোন প্রকার রেখা নাই, সেই (বেদাগ) মুক্তা অস্ফুটিত বলিয়া গণ্য এবং তাহা অতীব শুভদায়ক। বস্তুতঃ বেদাগ মুক্তাই মূল্যবান্।

মুক্তাসম্বন্ধীয় নির্দ্দিষ্ট ৮টি গুণের কথা বলা হইল। বস্তুতঃ এতদ্ভিন্ন অন্য কয়েকটি লক্ষণ আছে, যাহা থাকিলে রত্নতত্ত্বপরীক্ষকেরা তাদৃশ মুক্তাকে মহারত্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, সেই কয়েকটি মহাগুণ এই—

"ভ্রাজিষ্ণু কমলং কান্তং মনোজ্ঞং স্ফুরতীব চ।
দ্রবতীব চ স্বত্বানি তন্মহারত্ন সংজ্ঞিতম্।"

অপিচ,

"শ্বেতকাচসমাকারং শুভ্রাংশুশতযোজিতম্।"
শশিরাজপ্রতিচ্ছায়ং মৌক্তিকং দেবভূষণম্।"

* মুক্তাফলের গঠন নানাপ্রকার (বিম্বফল, চিপিটক, ধান্য, প্রভৃতি) হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সুবৃত্ত গুণের মুক্তা অতি মূল্যবান্।

ভ্রাজিষ্ণু—দীপ্তিবিশিষ্ট। কোমল—লাবণ্যযুক্ত। কান্তং—ইচ্ছোদ্রেককারী গুণবিশিষ্ট। মনোজ্ঞ—মনোহর। যদি এই সকল গুণ থাকে, আর স্ফুরণ হয় অর্থাৎ যদি আলোক বহির্গত হওয়ার ন্যায় এবং তেজ গলিয়া পড়ার ন্যায় দেখায়, তবে তাদৃশ মুক্তা মহারত্ন নামে ব্যবহৃত হয়। এবং যে মুক্তা স্বচ্ছ ও সুশুভ্র কাচের সদৃশ আকারবিশিষ্ট ও চন্দ্ররশ্মিতুল্য ছায়াযুক্ত হয়, সে মুক্তা দেবভূষণ অর্থাৎ দুর্লভ। ফলতঃ গ্রন্থান্তরে মূল্যবান্ উত্তম মুক্তার সাধারণ লক্ষণ এইরূপে নির্নীত হইয়াছে। যথা—

প্রমাণবদ্গৌরবরশ্মিযুক্তং
সিতং সুবৃত্তং সমসূক্ষ্মরন্ধ্রং।
অক্রেতুরপ্যাবহতি প্রমোদং।
যন্মৌক্তিকং তদ্গুণবৎ প্রদিষ্টং।"

'প্রমাণবৎ' অর্থাৎ দেখিতে বড়। 'গৌরব, অর্থাৎ ওজনে ভারি। রশ্মি অর্থাৎ তেজোময় লাবণ্য। যদি এই কয়েকটি গুণ থাকে, আর বর্ণ শুভ্র, গঠনে সুগোল, ছিদ্রে সমান ও সূক্ষ্মতা থাকে, দেখিলে অক্রেতারও আমোদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই মুক্তার গুণ আছে বলা যায়।

প্রাচীন রত্নশাস্ত্রে এইরূপ মুক্তাসম্বন্ধীয় বহুতর গুণের বিচার করা হইয়াছে, বৃথা প্রস্তাববৃদ্ধির ভয়ে তাহার উল্লেখ করা হইল না। মুক্তাসম্বন্ধীয় যে সকল দোষের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে গরুড়পুরাণোক্ত কয়েকটি প্রবল প্রবল দোষের বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে।

মুক্তাসম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ আছে, তন্মধ্যে ৪টি মহাদোষ, ৬টি মধ্যম দোষ, এবং এতদ্ভিন্ন দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষও আছে। যথা—

"চত্বারঃ স্যু র্মহাদোষাঃ ষন্মধ্যাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এবং দশ সমাখ্যাতা স্তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।"
"শুক্তি১লগ্নশ্চ মৎস্যা২ক্ষো জঠরঞ্চা৩তিরক্ত৪কম্।
ত্রিবৃত্ত৫ঞ্চ চিপীটঞ্চ৬ ত্র্যস্রং৭ কৃশক৮মেব চ॥
কৃশ৯পার্শ্বমবৃত্তঞ্চ১০ মৌক্তিকং দোষবত্তবেৎ॥"

মুক্তাসম্বন্ধে চারিটি মহাদোষ এবং ছয়টি মধ্যমদোষ। সর্ব্বসমেত দশটি দোষ রত্নপরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক আখ্যাত হইয়াছে। এই দশটি দোষের নাম ও লক্ষণ ক্রমে বলা যাইতেছে।

শুক্তিলগ্ন, মৎস্যাক্ষ, জঠর ও অতিরক্ত; এই চারিটি মহাদোষ বলিয়া গণ্য। ত্রিবৃত্ত, চিপীট, ত্র্যস্র, কৃশ, কৃশপার্শ্ব ও অবৃত্ত, এই ছয়প্রকার দোষ মধ্যম বলিয়া খ্যাত। প্রথমোক্ত শুক্তিলগ্ন প্রভৃতির লক্ষণাদি কিরূপ? তাহা উল্লিখিত কল্পদ্রুমধৃত গরুড়পুরাণের প্রমাণেই নির্দ্দিষ্ট আছে যথা—

১ শুক্তিলগ্ন—"যত্রৈকদেশে সংলগ্ন শুক্তিখণ্ডো বিভাব্যতে

শুক্তিলগ্ন সমাখ্যাতঃ সদোষঃ
কুষ্ঠকারকঃ।"

যে মুক্তার কোন এক প্রদেশে ভগ্ন শুক্তিখণ্ড (ঝিনুকের শব্দ) সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহা "শুক্তিলগ্ন" নামে খ্যাত এবং তাহা কুষ্ঠরোগের আকর্ষক।

২ মৎস্যাক্ষ।—"মীনলোচনসঙ্কাশো দৃ-
শ্যতে মৌক্তিকেতু যঃ।
মৎস্যাক্ষঃ স তু দোষঃ
স্যাৎ পুত্রনাশকরো ধ্রুবম্।"

কোন কোন মুক্তার কোন কোন প্রদেশে মৎস্যের চক্ষুর ন্যায় একপ্রকার চিহ্ন দেখা যায়। ঐরূপ দৃশ্যটিকে মৎ-স্যাক্ষ বলে। এই মৎস্যাক্ষ মুক্তা ধারণ করিলে ধারকের পুত্রনাশ হইয়া থাকে।

৩ জঠর।—"দীপ্তিহীনং গতচ্ছায়ং জঠ-
রং তদিহুর্বুধাঃ।
তস্মিন্ সন্ধারিতে মৃত্যুর্জায়তে নাত্র-
সংশয়ঃ।"

যাহার দীপ্তি ও ছায়াবিহীন, তাহার নাম "জঠর।" এই জঠর জাতীয় মুক্তা ধারণ করিলে মৃত্যুপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

৪ অতিরক্ত।—"মৌক্তিকং বিক্রমচ্ছায়
মতিরক্তং বিদুর্বুধাঃ।
দারিদ্রজনকং যস্মাৎ তস্মাত্তৎ-
পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

কোন কোন স্থানের মুক্তায় প্রবালের ন্যায় রক্তাভা জন্মিয়া থাকে, সেই সকল মুক্তা রত্নশাস্ত্রে "অতিরক্ত" নামে নির্দ্ধা-চিত হয়। তাহা ধারণ করিলে দরিদ্রতা জন্মে বলিয়া এই শ্রেণীর মুক্তা বর্জ্জন করিবেক।

৫ ত্রিবৃত্ত।—"উপর্য্যুপরি তিষ্ঠন্তি ব-
লয়ো যত্র মৌক্তিকে।
ত্রিবৃত্তং নাম তৎপ্রোক্তং
সৌভাগ্যক্ষয়কারকম্।"

যে মুক্তায় উপর্য্যুপরি বলি অর্থাৎ শুরের ন্যায় রেখা থাকে তাহার নাম "ত্রিবৃত্ত।" এই ত্রিবৃত্ত মুক্তাধারণে সৌভাগ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৬ চিপীট।—"অবৃত্তং মৌক্তিকং যচ্চ
চিপীটং যন্নিগদ্যতে।
মৌক্তিকং ত্রিয়তে যেন
তস্যাকীর্ত্তির্ভবেৎ সদা।"

যাহা "চিপীট" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা অবৃত্ত মধ্যে গণ্য (অর্থাৎ সুগোল নহে) যে মনুষ্য এই "অবৃত্ত" মুক্তা-ধারণ করে, সে সর্ব্বদাই অযশোভাগী হয়।

৭ ত্র্যস্র।—"ত্রিকোণং ত্র্যস্রমাখ্যাতং
সৌভাগ্যক্ষয়কারকম্।"

ত্রিকোণাকারে যে মুক্তার গঠন নিষ্পন্ন হয়, তাহা "ত্র্যস্র" নামে খ্যাত। ত্র্যস্র মুক্তা সৌভাগ্যের হানিকর।

৮ কৃশ।—"দীর্ঘং যত্তৎ কৃশং প্রোক্তং
প্রজ্ঞাবিধ্বংসকারকম্।"

দীর্ঘাকার মুক্তা "কৃশ" সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। এই মুক্তা বুদ্ধিনাশক বলিয়া প্র-সিদ্ধ।

৯ কৃশপার্শ্ব।—নির্ভগ্ন মেকতো যচ্চ কৃশ-
পার্শ্বং তদুচ্যতে।"

যাহার কোন এক প্রদেশ ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় অথবা নির্ভগ্ন অর্থাৎ বক্র বা বন্ধুর, তাহাকে "কৃশপার্শ্ব" বলা যায়। এই কৃশপার্শ্ব মুক্তাও নিন্দনীয়।

১০ অবৃত্ত।—অবৃত্তং পিড়কোপেতং সর্ব্ব
সম্পত্তি হারকম্।"

† পিড়কাযুক্ত মুক্তাফল "অবৃত্ত" নামে ব্যবহৃত হয়। এই অবৃত্তমুক্তা ধারণ করিলে সকল সম্পত্তি নষ্ট হয়।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, মুক্তাসম্বন্ধে গুণ ও দোষ যাহা পুরাতন রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সমুদয় সঙ্কলন করা দুঃসাধ্য ও নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে অবশ্য জ্ঞাতব্য স্থূল স্থূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হইল। পূর্ব্বে [যেই মধ্যে মধ্যে] মুক্তাসম্বন্ধীয় ছায়া ও কান্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় পরে বিশদরূপে ব্যক্ত করা যাইবে। ফলতঃ কান্তি ও ছায়ার প্রভেদ এই যে, মুক্তার লাবণ্যবিশেষের নাম কান্তি আর বর্ণবিশেষের নাম] ছায়া। "ভরতরসপ্রকরণ" নামক গ্রন্থে মুক্তাফলের কান্তির সহিত উপমা দিয়া "লাবণ্য কাহাকে বলে?" তাহা বুঝান হইয়াছে। মুক্তাতে যে একপ্রকার টল্‌টলে চিক্কণভাব দৃষ্ট হয়, তাহাই স্ত্রীশরীরের লাবণ্য।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামদাস সেন।



পশ্চিমদেশে বাঙ্গালার জ্বর।

শুনা যায়, বাঙ্গালার প্লীহাজ্বর ইদানীং দিল্লী, লাহোর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছে। বাঙ্গালির পক্ষে ইহা স্পর্দ্ধার বিষয় বটে। ওলাউঠার জন্ম বাঙ্গালায়, এক্ষণে সেই ওলাউঠা পৃথিবী রসাতল দিতেছে। আবার বাঙ্গালার জ্বর বাঙ্গালার আল অতিক্রম করিয়াছে, এখন বাঙ্গালার নাম সর্ব্বত্র সর্ব্বকণ্ঠে উচ্চারিত হইবে।

কুলবধুর ন্যায় বাঙ্গালার জ্বর চিরকাল বাঙ্গালায় বদ্ধ ছিল, কখন ঘরের বাহির হয় নাই, কখন এদিক ওদিক নজর করে নাই; এক্ষণে আবার এ নূতন প্রবৃত্তি তাহার কেন হইল বলা যায় না। বাঙ্গালির ছেলেরা ভারতবর্ষের সাবেক সীমা কেন উল্লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা বুঝা যায়, কিন্তু জ্বর কেন আপন ঘরের বাহির হইল তাহা বুঝা যায় না।

বাঙ্গালার জ্বর পশ্চিমদেশে কেন গেল এই লইয়া এখানে সেখানে আন্দোলন হইতেছে; অনুসন্ধানে ইহা নিশ্চিত

† ফুসকুড়ির ন্যায় চিহ্নকে পিড়কা বলে।

হইয়াছে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে নির্ম্মিত হওয়ার পর পশ্চিমাঞ্চলে এই জ্বর গিয়াছে। কাজেই সকল তর্ক মন্দীভূত হইয়া শেষ দুইটি অকাট্য কারণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, একটি এই যে বাঙ্গালার জ্বর রেলের গাড়ি চড়িয়া পশ্চিমে গিয়াছে। অপর হেতু, এই যে রেলওয়েরদ্বারা পয়ঃপ্রণালী রুদ্ধ হওয়ায় পশ্চিমে জ্বর আরম্ভ হইয়াছে।

উভয় হেতুই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। গাড়ির সুবিধা হইয়াছে, অতএব বাঙ্গালার জ্বর যে তীর্থযাত্রা করিতে যাইবে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব। আবার রেলওয়েদ্বারা পয়ঃপ্রণালী যে রুদ্ধ হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়। বিশেষতঃ, সকলেই বলে যে, কেবল রেলয়ের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহেই এই জ্বর প্রবেশ করিয়াছে, দূরগ্রাম সমুদয় পূর্ব্ববৎ সচ্ছন্দে আছে।

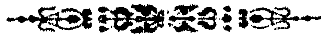
কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, গাড়ী চড়ে জ্বর পশ্চিমে গিয়াছে; তাহারা সামান্য লোক হউক তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অধিক, অতএব বহুতর ব্যক্তির সঙ্গ ছাড়িয়া অনকতক লোকের অনুসরণ করিতে পারা যায় না। আমরাও কাজেই বহুচেষ্টা করিয়া সেই বহুজনদলভুক্ত হইয়াছি।

আমরা একবার রেলওয়ে উঠিয়া হুগলী হইতে বর্দ্ধমানে যাইতেছিলাম, দুই এক ক্রোশ গেলে একটি ঝিল্লী অর্থাৎ ঝিঁঝিঁপোকা মাঠ হইতে উড়িতে উড়িতে আমাদের গাড়ীতে প্রবেশ করিল, এবং গাড়ীর ভিতর উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। গাড়ী বায়ুবেগে ছুটিতেছে, কিন্তু তথাপি ঝিল্লী আপন বেগ বাড়াইল না; মাঠে যেরূপ নবাবি চালে ঘুরিয়া, ফিরিয়া, উঠিয়া, নামিয়া উড়িতেছিল, সেইরূপ উড়িতে লাগিল এবং ক্রমে আমাদের সঙ্গে প্রায় দশ ক্রোশ পথ গেল। ট্রেণের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে যে দুই একটি নীলকণ্ঠ বা কাক উড়িতেছিল, তাহারা দুই মিনিটের মধ্যে পশ্চাতে পড়িতে লাগিল; কিন্তু ঝিল্লী দশক্রোশ পথ ক্রীড়া করিতে করিতে গেল। মাঠে উড়িলে ঝিল্লী শতহস্তও ট্রেণের সঙ্গে যাইতে পারিত না; কিন্তু গাড়ীর ভিতর উড়িতেছিল বলিয়া দশক্রোশ গেল। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতে পারে যে, ঝিল্লী যে বায়ুতে উড়িতেছিল, সে বায়ু গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল, মাঠের বায়ুর ন্যায় গাড়ীর পশ্চাতে পড়িতেছিল না। যদি এ কথা সত্য হয় যে, গাড়ীর ভিতরের বায়ু গাড়ীতেই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালার বায়ু প্রত্যহ বহুপরিমাণে পশ্চিমে চালান যাইতেছে স্বীকার করিতে হইবে। নিত্য ত অমন গাড়ী যায় না! বাঙ্গালার বিষ এক্ষণে কাজেই পশ্চিমে অনায়াসলভ্য হইয়াছে। এই জন্য রেলওয়ের ধারেই বাঙ্গালার জ্বর প্লীহা, দেখা যায়, অন্তর একেবারে নাই।

বঙ্গদর্শন।

সপ্তমবৎসর।

৭৯ সংখ্যা।



নূতন খাজানার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউএর মত।

রেণ্টকমিশনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। প্রায় বৎসরাবধি ধরিয়া এই রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়াছে। যেমন বড় ঝড় বৃষ্টির আগে সব নিথর হইয়া যায়, জল থমথমে মারিয়া যায়, গাছপালার পাতা পর্য্যন্ত নড়ে না, রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার রাজনৈতিকক্ষেত্র সেই রূপই ছিল। যেমন নিস্তব্ধ বিস্তীর্ণ হ্রদে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে চারিদিক্ আলোড়িত হইয়া উঠে, নিস্তব্ধ সংবাদপত্রসমূহমধ্যে ২১শে জুলাইয়ের রিপোর্ট পড়িয়াও ঠিক তাহাই হইয়াছে। রিপোর্ট বিল ও কাগজপত্র লইয়া স্পেশাল গেজেটখানির পত্রসংখ্যা ৫০৪। সকলের পড়িবার অবসর হয় নাই, হইবার কথাও নাই অথচ সকলেই আপন আপন মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কেহ বলিলেন, ছাজার রিপোর্ট কর, আর বিলই কর, রায়তের সঙ্গে স্থায়ী বন্দোবস্ত না করিলে কিছু হইবে না। কেহ বলিলেন, বাপু যা ছিল বেশ ছিল, আবার কেন ঘুমন্ত বাঘ জাগান হয়। কেহ বলিলেন, জমীদারের সর্ব্বনাশ হইল, কেহ বলিলেন, প্রজার শোষণ করাই রাজার উদ্দেশ্য। এই সমস্ত গোলযোগের মধ্যে কলিকাতা রিবিউ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন :—

The permanant settlement is a great accomplished fact in Bengal, and can already claim an antiquity of nearly a century; it has only just recovered from the position of unstable equilibrium into which it was—we still cling to the belief—unintentionally thrown by the Act X of 1859. The elaborate draft Bill in two parts is designed to upset it, it does not

purpose this and that minor alteration in the multiform system of rights which has grown under the shadow of the permanant settlement, but it deliberately aims a decisive blow at its fundamental condition ;

'—But that two handed engine
at the door
Stands ready to smite, once and
smite no more.'

অর্থাৎ দশসালা বন্দোবস্তে যে সব স্বত্ব জমীদারকে দেওয়া হইয়াছিল, ৫৯ সালের ১০ আইনেই তাহার প্রায় সবই লোপ হইয়াছে, যাও কিছু ছিল এইবার তাহাও গেল। আইন সাঁকারির করাত হইয়া দাঁড়াইল আগু হইলেও কাটিবে পিছু হইলেও কাটিবে।

এই সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউএর প্রবন্ধ ৫২ পৃষ্ঠা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান ছাত্রের লেখা। যেমন কলমের জোর, তেমনি লেখার বাঁধনি, তেমনি সূক্ষ্ম দৃষ্টি। কিন্তু হইলে কি হয় লেখা দেখিলেই বোধ হয় কোন উকীলের বক্তৃতা; কেবল মক্কেলের দিকেই টান। লেখার সবই ভাল কেবল গৌতম আর আরিষ্টটালের পিণ্ডদান ও আদ্যশ্রাদ্ধ। আজি কালি যদি গৌতম ঋষি সূত্র নির্ম্মাণ করিতেন তাঁহাকে Fallacy chapterএর হেত্বাভাস ছল জাতিনিগ্রহস্থানের উদাহরণের জন্য আর কোথাও যাইতে হইত না। এক আশুবাবুর প্রবন্ধমধ্যেই সব পাইতেন।

প্রবন্ধটী ইংরেজিতে লিখিত; কিন্তু ইংরেজি যেই পড়িয়াছে সেই হাসিয়াছে বাস্তবিক ইংরেজিতে তাহার খণ্ডন অনাবশ্যক। এইজন্য বাঙ্গালায়ই তাহার খণ্ডন করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি।

যুক্তিখণ্ডনের পূর্ব্বে একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রবন্ধলেখক State Literature এর উপর বড় চটা, তাঁহার মতে আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে যে সকল মিনিট, রিপোর্ট, ও অন্যান্য লেখালেখি চলে সে সকল ত্যাগ করাই লোকের কর্ত্তব্য। তিনি চান যে, লোকে আইনে যা আছে তাহারই অনুযায়ী হইয়া কার্য্য করুক। কিন্তু আইনের অর্থবিষয়ে সন্দেহ হইলে যেখানে ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষার উপর নির্ভর করিতে হইবে, সেখানেও মিনিট রিপোর্ট ইত্যাদির পাঠের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমাদের মতে ঐ রিপোর্ট আদি অমূল্য, উহারা আইনের অর্থবৈশদ্য পক্ষে যেরূপ সাহায্য করে এত আর কিছুতেই করে না। লেখক ষ্টেট লিটরেচরের উপর চটা অথচ আত্মস্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনিও Pemberton Leigh সাহেবের মত উদ্ধার করিতে কসুর করেন নাই। (৩৫৯ পৃঃ)

তিনি বলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কণ্ট্রাক্ট বই ত নয়। যেমন নোট কণ্ট্রাক্ট তেমনি উক্ত বন্দোবস্তও কণ্ট্রাক্ট। চুক্তি অতি জটিল এজন্য অনেকে উহার অনেক

প্রকার অর্থ করিয়া থাকে। তথাপি উহা চুক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। এই চুক্তিতে বর্ত্তমান জমীদারদল যে লাভপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা তাহার পূর্ণ মূল্য দিয়াছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমাদের মতে উহা চুক্তি নহে উহা আইন; ব্যবস্থাপক সমাজদ্বারা বিধিবদ্ধ; উহা হইতে অনেক চুক্তি উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু উহা নিজে চুক্তি নহে। যদি চুক্তি হয় কে কে সে চুক্তি করিল? গবর্ণমেণ্ট আর জমীদার। প্রজা এ চুক্তির মধ্যে কেহ নহে। যাহার দ্রব্য তাহার মত না লইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সামান্য কর্ম্মচারীকে ভূস্বামী বলিয়া প্রকাশ করিবার গবর্ণমেণ্ট কে?

পারমানেণ্ট সেটলমেণ্ট যদি চুক্তি হয় তবে উহা চোরের চুক্তি আইনমতে উহার কোন মূল্য নাই। যদি আশুবাবুর কথামত উহা চুক্তি,সিদ্ধ চুক্তিই হয়, তবে উহা দ্বারা কি প্রজাদের ভূস্বত্ব বাজেয়াপ্ত করা হয় নাই। উহা কি যথেচ্ছাচার প্রণালীর চূড়ান্ত নিদর্শন নহে? তাহা হইলে এক কলমের ঘায় ৩ কোটী প্রজার সমস্ত জমীস্থ স্বত্ব কাড়িয়া লইয়া জন কতক ধনী লোককে ভূমিতে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববান বলিয়া স্বীকার করা,ঘোর মূর্খতার কর্ম্ম হইয়াছে। এমন পারমানেণ্ট সেটলমেণ্ট যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই ভাল।

আরও এক কথা, যদি এই বন্দোবস্ত চুক্তিই হয়—যদি উহা আশুবাবু যাহা বলিয়াছেন তাই হয়,—যদি সমস্ত ইতিহাসের মুণ্ডপাত করিয়া সমস্ত যুক্তির শ্রাদ্ধ করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চুক্তিই হয় তথাপি জমীদারেরা চুক্তিভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। ১৭৯৩ অব্দের প্রথম রেগুলেশনের সপ্তম ধারায় লিখিত আছে—

To discharge the revenues at the stipulated periods without delay or evasion and to conduct themselves with good faith and moderation towards their dependant Talukdars and Ryots, are duties at all times required from the proprietors of land and a strict observance of those duties is now more than ever incumbent upon them in return for the benifits which they will themselves derive from the ordes now issued.

যদি দশশালা বন্দোবস্ত চুক্তিই হয় তবে প্রজাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করাও সে চুক্তির এক করার। কিন্তু জমীদারেরা কি এই করারমত কাজ করিয়াছেন? তাঁহারা কি প্রজাদিগের প্রতি সত্য সত্যই good faith and moderation দেখাইয়াছেন। দশশালা বন্দোবস্ত ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী হইয়াছে। আজিও একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই; ইহারই মধ্যে খোদকস্ত রায়তের নাম লোপ হইয়াছে। পরগণা

নিরীখ,—যাহার অধিক খাজনা আদায় করা চিরদিন আইনবিরুদ্ধ,—প্রথাবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ,—জমীদারেরা উঠাইয়া দিয়াছেন। সর্ব্বত্র আইনসঙ্গত হউক আর নাই হউক, খাজনার বৃদ্ধি লইয়া টানাটানি করিয়াছেন। তাঁহাদের জ্বালায় কত প্রজা দেশত্যাগ করিয়াছে। কত স্থানে গৃহদাহ গ্রামদাহ করিয়া তাঁহারা প্রজাকে উৎখাত করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাহাদের প্রতি এতই অত্যাচার করা হইয়াছে যে, বঙ্গদেশীয় নির্জীব, নিরীহ প্রজাগণও আর সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। এই কি তাঁহাদের good faith and moderation? কর্ণোয়ালিস তাঁহাদিগকে যে করারে দশশালা বন্দোবস্ত রূপ চুক্তি দিয়াছেন সে করার কি ভঙ্গ হয় নাই? একপক্ষ হইতে করার ভঙ্গ হইলে সে চুক্তি কি বাতিল ও নামঞ্জুর হয় না? অতএব শুদ্ধ এই এক করারভঙ্গ অপরাধ বশতঃ দশশালা বন্দোবস্ত কি উঠাইয়া দেওয়া উচিত নয়?

কিন্তু বাস্তবিক দশশালা বন্দোবস্ত চুক্তি নহে—উহা ব্যবস্থাপকসমাজ হইতে বিধিবদ্ধ আইন। নচেৎ দুইপক্ষ চুক্তি করিয়া তৃতীয় পক্ষের স্বত্ব লোপ করা দস্যুর চুক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রকৃত ভূস্বামীকে ত্যাগ করিয়া আর একজনকে ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করা চুক্তির কর্ম্ম নয়। আইন ভিন্ন উহা আর কেহ করিতে পারে না। এবং দশসালা বন্দোবস্তের আইনে তাহাও করে নাই।

আমাদের ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রজাই ভূমির মালিক। আমাদের যে মণ্ডল ও পাটোয়ারী প্রথা প্রচলিত আছে তাহাতে প্রজার স্বত্বই সাব্যস্থ করিয়া দিতেছে। জমীর দরুণ খাজানা (rent) আমাদের দেশে ছিল না। মনুতে তাহার উল্লেখ নাই। সংস্কৃত কোন পুস্তকে খাজানা দিবার উল্লেখ নাই। কাহার কত করে রাজস্ব দিতে হইবে,সেই সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন "ধান্যানামষ্টমোভাগঃ ষষ্ঠ দ্বাদশ এব বা," অর্থাৎ ধান্যের ষষ্ঠ অংশ অথবা অষ্টম অথবা দ্বাদশ অংশ রাজাকে করস্বরূপ দিতে হইবে। রাজার জমী কর আর নাই কর তোমাকে রাজস্ব দিতে হইবে। এইজন্য ঋষিরা বনে কুড়াইয়া যে অকৃষ্টপচ্য ধান্য সংগ্রহ করিতেন, তাহারও ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিতেন। প্রজারা সকলই রাজাকে কিছু না কিছু দিত, কেহই রেয়াত পাইত না। কামার কুমার ছুতার প্রভৃতি সকলেই রাজস্ব দিত অথচ হয় ত তাহারা কেহই জমি করিত না। এইরূপ করের নাম বরং রাজস্ব revenue হইতে পারে কিন্তু উহা খাজানা নহে। সময়ে সময়ে বৃটীষ গবর্ণমেণ্ট যেমন নানা প্রকার টেক্স বসান সেইরূপ আমাদের দেশে চিরস্থায়ী টেক্স ছিল জমির খাজনা স্বতন্ত্র ছিল না। সেই টেক্স বা রাজস্ব কখন কখন রাজারা বৃদ্ধি করিতেন।

সময়ে সময়ে তাঁহারা কর রেয়াতও করিতেন। প্রজা ক্ষীণ এবং রাজা অত্যাচারী হইলে দুর্ব্বহকরভার তাহারা কষ্টে স্বষ্টে বহন করিত কিন্তু ফাক পাইলে তাহারা বিদ্রোহ করিতেও ছাড়িত না। এই রূপে ক্রমে মুসলমানদিগের অধিকার কালে প্রজার টেক্স ছাড়িয়া ভূমির টেক্স হয়,সেই টেক্স কিছু কিছু করিয়া বাড়িয়া, আকবরের সময় এক তৃতীয়াংশে দাঁড়ায়। ইহার নাম আসল জমা। ক্রমে মুসলমানেরা নানা কারণবশতঃ আরও কিছু কিছু আদায় করিত, তাহার নাম আবওয়াব। বৃটীষ গবর্ণমেণ্টও দেওয়ানী পাইয়া অবধি বরাবর ঐরূপ আবওয়াব আদায় করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৭৯৩ অব্দের প্রথম আইন দ্বারা যখন জমীর স্বত্ব চিরকালের জন্য জমীদারকে দেওয়া হয় তখন এই আবওয়াব ইত্যাদি সমস্ত আসল জমাভুক্ত হইয়া যায়। এবং তাহার পর আবওয়াব ইত্যাদি আদায় করা এককালীন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। (১৭৯৩ শালের অষ্টম আইনের ৫৪ ও ৫৫ ধারা) অর্থাৎ প্রজার নিকটহইতে কোন বাবে আর অধিক কর লইব না, স্বীকার করাইয়া এবং সেই অবর্দ্ধনীয় কর নির্দ্দিষ্ট করিবার ভার জমীদারের উপর দিয়া গবর্ণমেণ্ট জমীদারকে চিরদিনের মত ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করিলেন। অতএব দশশালা বন্দোবস্ত বলিলে উহা শুদ্ধ জমীদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বুঝায় না উহাতে প্রজার সহিতও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বুঝায়। এ কথা আমরা যে আজি বলিতেছি এরূপ নহে আমাদের পূর্ব্বেও অনেকে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশুবাবু State Literature উপর বড় চটা। এইজন্য তাহা ছাড়িয়া আইনের কথা ধরিয়া দশশালা বন্দোবস্তের ঐ অর্থ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এই সময়ে আমাদের একটি কথা কেবল বলিতে হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যদি প্রজার সঙ্গেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল তবে জমীদারকে ভূস্বামী করিবার লাভ কি? প্রজার খাজানা যদি বৃদ্ধি করিতে না পারিলেন তবে জমীদার ভূস্বামী হইলেন আর না হইলেন তাহাতে ক্ষতিই বা কি, বৃদ্ধিই বা কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে লর্ড কর্ণোওয়ালিস্ বাঙ্গালার জমীদারেরা যে কি ধাতুর লোক তাহা ভাল করিয়া বুঝেন নাই। জমীদারেরা যে আশী বৎসরের মধ্যে চিরপ্রচলিত পরগণানিরিখ উঠাইয়া দিতে পারিবেন তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। খাজানা ও করসম্বন্ধে যে সব নূতন নূতন মত উনবিংশ শতাব্দীতে বাহির হইয়াছে তাহা তাঁহার সময়ে হয় নাই। তিনি শোর সাহেবের আপত্তির উত্তরে বলিয়াছিলেন জমীদারের উপস্বত্ব বৃদ্ধির দুইটী মাত্র উপায় থাকিবে। পতিত ভূমির পুনরুদ্ধার এবং উৎকৃষ্টতর শস্য উৎপাদনে প্রজাদিগকে প্রবর্ত্তন করা। জমীদার, যে খাজনা বৃদ্ধির জন্য উৎপীড়ন করিয়া আপনার লাভবৃদ্ধি

করিবে এবং প্রজার সর্ব্বনাশ করিবে ইহা তাঁহার একেবারে অভিপ্রায় ছিল না। কার্য্যেও তিনি, তাহার কোন পথ রাখিয়া যান নাই। তৎপ্রণীত অষ্টম আইনের ধারাগুলি উদ্ধৃত করা উচিত কিন্তু স্থানাভাবপ্রযুক্ত কেবল দুইটী ধারা উদ্ধৃত করা গেল।

54. The impositons upon the Raiyats, under the denomination of abwab, mathout, and other appellations, from their number and uncertainty having become intricate to adjust, and a source of oppression to the Raiyats, all proprietors of land and dependent Talukdars shall revise the same in concert with the Raiyats, and consolidate the whole with the assal into one specific sum.

In large Zemindaries or estates the propriators are to commence this simplification of the rents of their Raiyats in the Parganas where the impositions are most numerous, and to proceed in it gradually till completed; but so that it be effected for the whole of their lands by the end of the Bengal year 1198 in the Bengal districts, and of the Fasli and Wilayate year 1198 in the Bihar and Orissa districts, these being the periods fixed for the delivery of pattas, as hereafter specified.

55. No actual proprietor of land or dependent Talukdar or farmer of land, of whatever description, shall impose any new abwab or mathaut upon the Raiyats, under any pretence whatever.

Every exaction of this nature shall be punished by a penalty equal to three times the amount imposed; and if at any future period, it be discovered that new abwab or mathaut have been imposed the persons imposing the same shall be liable to this penalty for the entire period of such impositions.

আশুবাবুও অনেক ধারা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু উপরোক্ত যে ৫৪ ও ৫৫ ধারার উপর সমস্ত নির্ভর করে, সেই দুইটি না দিয়া তাহার কেবল marginal note দুইটি তুলিয়া দিয়া ঠিক উল্টা বুঝাইয়াছেন। আমরা ঐ ধারার ব্যাখ্যাস্থলে তাহা প্রদর্শন করিব।

যে সব নিয়মাবলীতে জমীদার বাধ্য হইবেন, তাহার প্রথম এই। আমলনামা ভিন্ন কেহ প্রজা বা তালুকদারের

নিকট খাজানা আদায় করিতে যাইতে পারিবেন না।

২য়। আবওয়াব ইত্যাদি আসল জমা ভুক্ত হইয়া যাইবে।

৩য়। ১১৯৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে সর্ব্বত্র আবওয়াব আদি জমাভুক্ত হইয়া যাইবে। কোন্ প্রজাকে কত জমা দিতে হইবে, তাহা স্থির এবং নির্ণীত করিতে হইবে।

৪র্থ। ইহার পর কেহ আর নূতন আবওয়াব লইতে পারিবে না। যদি কেহ লয়, তাহাকে ৩ গুণ জরিমানা দিতে হইবে। যদি ভবিষ্যতে প্রমাণ হয় যে, কোন জমীদার বরাবর আবওয়াব লইয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বরাবর যত আবওয়াব আদায় করিয়াছেন, সমস্ত জরিমানা দিতে হইবে।

৫ম। জমীদার ও প্রজার প্রায়ই খাজানামাত্র লইয়া সম্বন্ধ থাকিবে। প্রজা যে কোন প্রকার শস্য ইচ্ছা উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু যেখানে এরূপ প্রথা আছে, যে অন্য প্রকার শস্য উৎপাদন করিলে অধিক রাজস্ব দিতে হয়, সেখানে সেই প্রথাই বলবৎ থাকিবে।

৬ষ্ঠ। প্রজাদের রাজস্ব কি নিয়মে লইতে হইবে, তাহার পাকা বন্দোবস্ত করিবার পাট্টা দিতে হইবে। ঐ পাট্টায় প্রজাকে কত খাজানা দিতে হইবে, তাহা ঠিক করিয়া লেখা থাকিবে।

৭ম। পাট্টায় যেখানে হার ধরিয়া রাজস্ব দিতে হয়, সেখানে হার এবং যেখানে শস্যে রাজস্ব দিতে হয়, সেখানে শস্যদানের নিয়মের পাকা বন্দোবস্ত থাকিবে।

৮ম। জমীদারেরা পাট্টার উক্ত নিয়মানুযায়ী ফরম প্রস্তুত করিয়া কালেক্টরের অনুমতি লইয়া দেওয়ানী আদালতে রেজেষ্টরী করিবেন।

৯ম। জমা নির্ণীত এবং স্থিরীকৃত হইয়া গেলে জমীদার যদি প্রজাকে সেই জমীর পাট্টা না দেয়, তাহা হইলে রায়তের পাট্টা লইতে মোকদ্দমা করিবার সমস্ত ব্যয় জমীদারকে দিতে হইবে।

১০ম। রায়ত কিম্বা পেটাও ইজারদারদিগের সহিত এই বন্দোবস্তের পূর্ব্বে যে বন্দোবস্ত ছিল, তাহা যদি এই সকল নিয়মের বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা বন্দোবস্তের মেয়াদের শেষ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। জুয়াচুরি করিয়া বন্দোবস্ত করিলে, সে বন্দোবস্ত বলবৎ হইবে না।

১১শ। কোন জমীদার নিম্নলিখিত কারণ ব্যতীত খোদকস্ত রায়তের পাট্টা রদ করিতে পারিবে না। যে সকল কারণবশতঃ পাট্টা না মঞ্জুর হইবে তাহা এই। জুয়াচুরি করিয়া পাট্টা লইলে, পরগণা নিরিখ হইতে তিনবৎসরের মধ্যে রাজস্ব কম হইলে, জুয়াচুরি করিয়া রাজস্ব রেয়াত পাইলে, কিম্বা পরগণার জরীপ হইলে।

১২শ। ১১৯৮ শালের মধ্যে জমী-

দারেরা সকল প্রজাকে পাট্টা দিবেন। ১১৯৮ শাল অতীত হইয়া গেলে, প্রজার সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মের বিরুদ্ধ কোন প্রকার বন্দোবস্ত, আইনানুমোদিত হইবে না। যে সকল জমীদার আবওয়াব ইত্যাদি জমাভুক্ত করিয়া প্রজাকে পাট্টা না দিবেন, তাঁহারা রাজস্বের জন্য নালিশ করিলে সে নালিশ না মঞ্জুর হইবে।

এই সমস্ত ধারার অর্থ এই যে, গবর্ণমেণ্ট যেমন জমীদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন, জমীদারও প্রজার সহিত তদ্রূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবেন। যে জমা স্থির হইবে তাহার উপর আর এক পয়সা লইতে পারিবেন না।

বন্দোবস্তের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট জমীদারের কাগজপত্র দেখিয়া,মোট আদায়ের ৯ ভাগ নিজে লইলেন এবং একভাগ জমীদারের জন্য রাখিয়া দিলেন, কিন্তু প্রজার বেলা প্রজা কত দিতে পারিবে এবং তাহার উৎপন্ন কত কিছুই না দেখিয়া আবওয়াব ইত্যাদিতে সে যাহা যথার্থ দিত, তাহাই তাহার ন্যায্য দেয় বলিয়া স্থির করিয়া দিলেন। প্রজার প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন যাহাতে না হয়, লর্ড কর্ণোয়ালিশ তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কর্ণোয়ালিশের সমস্ত আইনগুলির মধ্যে প্রজার উপর রাজস্ববৃদ্ধির নামও নাই। বরং পূর্ব্বে আবওয়াব প্রভৃতি নানা কারণে প্রজার নিকট যে অধিক রাজস্ব আদায় করা হইত, তাহা চিরকালের জন্য উঠাইয়া দেওয়া হইল। প্রজার খাজানা চিরকালের জন্য বাঁধিয়া দেওয়া হইল আইনে কেবল ইহাই দৃষ্ট হয়।

নিয়মমত রাজস্ব দিলে প্রজার যোত উচ্ছেদ করা আমাদের দেশে কখন ছিল না, কর্ণোয়ালিশের আইনেও যোত উচ্ছেদের কোন বিধান নাই। যে কৃষক একবার কৃষিকার্য্যের জন্য* ভূমি লইল, সে যতদিন রাজস্ব দিবে,ততদিন সে ভূমি তাহারই থাকিবে এই আমাদের দেশে চিরন্তন প্রথা। যোত ছাড়াইয়া দেওয়া ও রাজস্ব বৃদ্ধি করা, এ দেশীয় লোকের অরুচিকর, তবে প্রজা দুর্ব্বল ও জমীদার সবল এ জন্য প্রজারা জমীদারকে খুসী করিবার জন্য নজর প্রভৃতি সময়ে সময়ে দিত, কিন্তু রাজস্বের উপর একপয়সা বৃদ্ধি করিতে তাহারা কখন চায় না, এবং এখনও অর্থাৎ দশ আইন পাস

* মৌরসী, মকররী, মেয়াদী প্রভৃতি পাট্টা বাস্তু, উদ্বাস্তু, বাগাত প্রভৃতি স্থলেই চলিত, কৃষিকার্য্যের জন্য ভূমি লইলে ঐরূপ পাট্টা চলিত নহে, কৃষকেরা প্রায় পাট্টা লয় না, ১৭৯৩, ১৮৫৯, ১৮৬৮ শালে পাট্টা লইবার এত সুবিধা করিয়া দিলেও অতি অল্প লোকেই পাট্টা লইয়াছে। কৃষকরায়ত একটু পুরাণ হইলেই তাহারা কদীমী রায়ত কহিত। তাহাদের স্বত্ব প্রায় মৌরুসীর ন্যায়।

হইবার পরও অনেক জায়গায় জমীদার চারিপয়সা রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে চাহিলে প্রজারা জমীদারকে দশটাকা নজর দিবে, জমীদারের আমলাকে দশটাকা ঘুষ দিবে, তথাপি সে চারিটী পয়সা বৃদ্ধি দিতে চাহিবে না; কর্ণোয়ালিশের আইনে যখন ঐ নজরাদি আইনবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, যখন আবার ১১৯৮ শালের মধ্যে আবওয়াব আদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাজস্বের মোট স্থির করিয়া সেই রাজস্বে পাট্টা দিবার কথা রহিল, না দিলে রাজস্বের নালিশ চলিবে না এমত বন্দোবস্ত রহিল, তখন সে পাকা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয় ত কি?

প্রজাদিগের রক্ষার জন্য বিশেষ বিধান করা আবশ্যক বলিয়া লোকে যখন কর্ণোয়ালিশকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, তখন তিনি তাহার উত্তর দিয়াছিলেন যে, শত শত বৎসর হইতে প্রচলিত স্থানীয় হার এবং পরগণানিরিখ কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। এই চিরন্তনপ্রথা প্রজাদিগের পরিত্রাণ করিবে। কিন্তু বাঙ্গালি জমীদার যে কতদূর স্বার্থপর, নৃশংস এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহারা কত গর্হিত, ন্যায়বিরুদ্ধ ও অযন্ত কার্য্য করিতে পারেন তাহা উদারচেতা লর্ড কর্ণোয়ালিশ কিছুই জানিতেন না। জানিলে তিনি আর রাজস্বনির্ণয় এবং পাট্টাদান কার্য্যের ভার ঐ জমীদারদের হস্তে সমর্পণ করিতেন না; সেটা নিজেই করিয়া দিতেন। জমীদারদের হাতে দেওয়ার ফল হইয়াছে এই যে, ঐ সকল রেকর্ড রক্ষিত হয় নাই, যাহাও বা হইয়াছে, তাহাতে প্রজার সর্ব্বনাশ বই আর কিছুই হয় নাই। ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহার কব্‌ডেন ক্লবের প্রবন্ধে এই রেকর্ড না রাখাই গবর্ণমেণ্টের প্রধান ভুল ও বঙ্গীয় প্রজার প্রধান অনর্থ স্থির করিয়াছেন।

আমাদের দেশে রায়তেরা জানিত, জমী করিব খাজানা দিব। খাজানা বাড়ান, যোত ছাড়ান এ সকল তাহাদের পক্ষে নূতন; এবং যখন, দশশালা বন্দোবস্তে উহার কথা নাই, তখন উহা রায়তের পক্ষেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ক্যাম্বেল সাহেব লিখিয়াছেন, "There are in them (regulations) expressions which would seem to imply that no more is to be taken from any class of ryots, old or new, than the customary rates in the neighbourhood."

লর্ড কর্ণোয়ালিশ জমীদারী ফেরাবীর তলা পর্য্যন্ত বুঝুন আর নাই বুঝুন, তিনি জমীদারদের তত বিশ্বাস করিতেন না, এবং গবর্ণমেণ্টের রাজস্বটা ঠিক ঠিক আদায় হইয়া যায় সেই দিকেই তাঁহার অধিক নজর ছিল বলিয়া তিনি তাঁহাদের উপর কতকটা নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি প্রজার রক্ষার্থ পূর্ব্বোক্ত ধারাসকল প্রণয়ন করিয়াও একটি ক্ষমতা নিজ

হস্তে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেটি এই—

It being the duty of the ruling power to protect all classes of people and more particularly those who from their situation are most helpless, the Governor General in Council will whenever he may deem it proper enact such regulations as he may think neccessary for the protection and welfare of dependent Talukdars, Ryots and other cultivators of the soil, and no Zemindar independent Talukdar or actual proprietors of land shall be entitled on this account to make any objection to the discharge of the fixed assessment which they have respectably agreed to pay.

এই ধারার প্রকৃত অর্থ এই যে রায়তদের রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে আইন করিবেন, জমীদার সেইজন্য অবধারিত খাজানা দিতে পারি না বলিয়া আপত্তি করিতে পারিবেন না। কিন্তু আশু বাবু বলেন উহার অর্থ অন্যরূপ। তাহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তিনি ১৭৯৩ শালের দ্বিতীয় রেগুলেশনের মুখবন্ধ হইতে একটি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। এবং সেটি বড় বড় অক্ষরে ছাপাইয়াছেন। সেটি এই—

No power will then exist in the country by which the rights vested in the landholders by the regulations can be infringed or the value of the landed property affected.

অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে যে যদি জমীদারের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাই এ দেশের মধ্যে কাহারও না রহিল তবে গবর্ণরজেনেরল ইন্ কৌন্সিল উক্ত স্বত্বে কিরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন? অর্থাৎ প্রজার রক্ষার জন্য গবর্ণর জেনেরলেরও আইন করার ক্ষমতা নাই। অর্থাৎ ৯৩ শালের প্রথম আইনের অষ্টম ধারার অন্যরূপ অর্থ।

কিন্তু আশুবাবু প্রবন্ধের শেষ অংশ লিখিবার সময় গোড়া ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতা রিবিউ ৩৮৮ পৃষ্ঠা। "None but a fool or madman will deny the power of the legislature to redistribute property in land and indeed private property of every other description." কিন্তু তিনি আবার নিজেই বলিয়াছেন, যে দেশের মধ্যে জমীদারের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিতে পারে এমন ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না। এইরূপে তিনি আপনার পদেই আপনি কুঠার মারিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় রেগুলেশনের উপরোক্ত যে পদটী উদ্ধার করিয়াছেন তাহা "চক্ষুরোগেসমুৎপন্নে কর্ণৌছিত্বা কটিং দহেৎ।" এই অশ্ব চিকিৎসায় বচনটি মনুষ্যচিকিৎ-

ন্যায় ব্যবহৃত করিলে যেরূপ ফল হয় তদ্রূপ ফলপ্রসব করিয়াছে। আমরা স্থান অভাব প্রযুক্ত দ্বিতীয় রেগুলেশনের মুখবন্ধটী তুলিয়া দিতে পারিলাম না। দিতে পারিলে পাঠকগণ দেখিতেন যে ঐ রেগুলেশন দ্বারা কেবল মাল আদালত উঠিয়া যায় ও তাহার কার্য্য দেওয়ানী আদালতে সমর্পণ করা হয়। তাহার মধ্যে প্রজার স্বাপক্ষ আইন করিবার ক্ষমতা কাহারও রহিল না এমন কোন কথাই নাই, থাকিবারও সম্ভাবনা নাই।

আশুবাবুর উদ্ধৃত পদের কেবল উপর এবং শেষ অংশ পড়িলেই উহার অর্থ বোধ হইবে—এই জন্য আমরা তাহা উদ্ধার করিয়া দিলাম, আমরা এ বিষয়ে আর অধিক কথা কহিব না। উদ্ধৃত অংশটুকু এই—

The collectors of the revenue must not only be divested of the power of deciding upon their own acts but rendered amenable for them to the courts of judcature and collect the public dues subject to a personal proseution for every exaction exceeding the amonnt which they are authorized to demand on behalf of the public and for every diviation from the regulations prescribed for the collection of it; no power will then exist in the country by which the rites vested in the land-holders by the regulations can be infringed or the value of landed property affected.

অর্থাৎ কালেক্টর নিজে অত্যাচার করিয়া নিজেই বিচারপতি হইলে জমীদারের স্বত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার যে সম্ভাবনা তাঁহার থাকিত তাহা আর থাকিবে না। ব্যবস্থাপক সমাজের এবং গবর্ণর জেনেরলের ক্ষমতার সহিত ঐ power শব্দের কোন সম্পর্ক নাই। আশুবাবু তাহা পাকা উকীলের ন্যায় গোপন করিয়াছেন।

তিনি Right Hon'ble T. Pemberton Leagueরএকটি রায় হইতে একটি পদ উদ্ধার করিয়া বলেন যে রাজকার্য্যনির্ব্বাহপ্রণালী সুন্দররূপে চালাইবার জন্য এবং প্রজাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য East Indian Company জমীদারকে ভূস্বামীরূপে পরিণত করিয়া এবং তাহাদের সদর জমা চিরকালের জন্য স্থির করিয়া দিয়া সুশাসনের সর্ব্বপ্রথম সোপান করিয়া দিলেন। তিনি বলেন এই প্রথম সোপান ১৭৯৩ শালের ২২ শে মার্চের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেলের ঘোষণা পত্র!! আশুবাবু ঘোষণাপত্রেরও কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছেন কিন্তু অষ্টমধারার কি অর্থ তিনি করেন, কোন স্থানেই খুলিয়া বলেন নাই। তিনি বলেন আমরা উহার কি অর্থবোধ করি তাহা

ঘোষণাপত্রের উদ্ধৃত অংশ পড়িলেই অনুমান করিতে পারা যাইবে। এরূপ অর্থ অনুমান করিয়া লওয়ার ভার পাঠকের হস্তে দেওয়া বড় মন্দ নহে। তাঁহার ঘোষণাপত্রের উদ্ধৃত অংশ পড়িয়া আমরা ত বিশেষ কিছু অনুমান করিতে পারিলাম না। তবে যেন একটু একটু বোধ হয় যে, লোকে বুঝিবে জমীদারেরা পূর্ব্বে পুলিষ-বিচার প্রভৃতি যে সকল রাজকীয় ক্ষমতা পাইয়াছিলেন সেই ক্ষমতা উচ্ছেদ করিবার জন্য নূতন নূতন আইন প্রস্তুত করিবার ভার গবর্ণর জেনেরল রাখিলেন। কিন্তু প্রথম রেগুলেশন বরাবর পড়িয়া আসিলে কখনই এরূপ অর্থ হয় না। সমস্ত প্রথম রেগুলেশনের মধ্যে জমীদারের দেওয়ানী ফৌজদারী ইত্যাদির নামও নাই গন্ধও নাই। সুতরাং মাঝে হইতে তাহার অষ্টমধারার জমীদারের ফৌজদারী ক্ষমতা নিষেধরূপ অর্থ কিরূপে হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

তিনি বলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রূপ চুক্তি করিবার সময় জমীদারকে তাহার অনেক মূল্য Valuable consideration দিতে হইয়াছিল। অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাহার একটি এই যে হাজা শুখা, জন্মা অজন্মা, সমস্ত সত্ত্বেও লাটের ঠিক তারিখে রাজস্ব আদায় দিতে হইবে, না দিতে পারিলে জমীদারী নিলাম হইবে, আর যদি নিলামে রাজস্বের বাকি টাকা না উঠে তবে জমীদারের অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। আশুবাবুর মতে এই Valuable consideration। তাঁহার মতে ইহা অতি কঠিন নিয়ম। কিন্তু মুরশিদ কুলিখাঁর বৈকুণ্ঠ, মুঙ্গেরের হাজত, কয়েদ, জমীদারী খাস করা, জমীদারীর খাস বন্দোবস্ত, জমীদারীর স্বত্বলোপ* এ সকলের চেয়েও কি পূর্ব্বোক্ত নিয়ম এত কঠিন? হইতেও পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে সাবেক আমলে জমীদারকে নবাব কয়েদ করিত, মারিত, না হয় অপমানই করিত। মুসলমানেরা ত টাকা লইতে পারিত না, সুতরাং তাহা অপেক্ষা কিস্তীতে কিস্তীতে টাকা দেওয়া বড়ই শক্ত। বড়ই Valuable consideration।

আশুবাবু যে আর এক কথা কেন বলেন নাই তাহা বলিতে পারি না। ৯৩ শালের চতুর্দ্দশ আইনের নবম দশম একাদশ ধারায় জমীদারকে বাকী খাজানার দায়ে কয়েদ করার যে কথা ছিল সেও ত দশশালা বন্দোবস্তরূপ চুক্তির এক অংশ। ১৭৯৪ শালের তিন আইনের ৩ ধারায় তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কয়েদ করার ক্ষমতা ত্যাগ করার দরুন জমীদারের নিকট কি কিছু ক্ষতিপূরণ লইয়াছেন? লন নাই, তবে গবর্ণমেণ্ট এখন প্রজার রক্ষার জন্য আইন করি-

* আমরা ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে পড়িয়াছি যে অনেক স্থলে মুসলমানেরা দুষ্ট জমীদারের জমীদারী কাড়িয়া লইয়া কৃষ্ণনগরের রাজাকে দিয়াছেন।

তেছেন জমীদারগণ নানা কথা তুলিতেছেন কেন? তাহার পর আশুবাবু footnoteএ লিখিয়াছেন।—

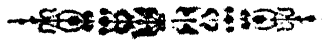
It would be interesting to compute the sum total of other real or personal property sold in the 75 years between 1793 and 1868।

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি, জমীদারেরা এই কয়েক বৎসরের মধ্যে নানা উপায়ে যে অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত অংশ তাহার শতাংশের অর্দ্ধাংশও নহে। আর এই কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রজার কি হইয়াছে, জমীদারেরা যাহা লোকসান দিয়াছেন তাহা আইন অনুসারেই দিয়াছেন। কিন্তু প্রায় তিন কোটী প্রজা তাঁহাদের শাসনের গুণে তাঁহাদের দয়াধর্ম্মের গুণে জমীর মালিক ঘুচিয়া প্রায় ইচ্ছাধীন রায়ত tenant at will হইয়া উঠিয়াছে।* অধিকাংশই লাঠী জুতা ও গৃহদাহ ইত্যাদির দ্বারা ও মাঙ্গন মাথট ভিক্ষা গোমস্তার পার্ব্বণি হিসাবানা নজর ইত্যাদি আইনবিরুদ্ধ আদায়ের চোটে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এত পুলিষ,দেওয়ানী ও ফৌজদারী কাছারী স্থাপন করিয়াও ক প্রজার প্রতি জমীদারের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারেন নাই। এখনও জমীদারের নায়েব গোমস্তা মফস্বলে হর্ত্তা কর্ত্তা; এখনও নানা স্থানে তাহারা জরিমানা করে রামের ধন শ্যামকে দেয়, শ্যামের ধন হরিকে দেয়। কিন্তু গরিব প্রজাদিগের জন্য কথা কহেন এমন লোক কোথায়? জমীদারের দুগ্ধে চিনির ত্রুটি হইলে তাহা লইয়া চীৎকার করিবার লোক দেশশুদ্ধ মিলিবে কিন্তু গরিব প্রজার যে পান্তাভাতে একটু লবণও জুটিয়া উঠে না তাহা কে দেখিবে! কে তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইবে, কে তাহাদিগের দুঃখনিবারণ করিবে! যাহারা প্রজাদের একমাত্র ভরসা সেই শিক্ষিত যুবকদলও ক্রমে নানা কারণে জমীদারদিগের দলের সেনাপতি বা অনুদাস হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

হে বঙ্গবাসী দুর্ব্বল নির্জীব রায়তবৃন্দ! তোমরা ভরসা ত্যাগ কর। তোমাদের কেহই বন্ধু নাই,তোমাদের হইয়া দুকথা কয় এমন লোক একটিও নাই। ইংরেজী শিক্ষায় দেশের যে উন্নতি হইতেছে সে তোমাদের জন্য নহে। সে ধনবানের জন্য। জানিও, শিক্ষিতলোক জমীদার বা তালুকদারের জন্য। কেন না তাহারা পয়সা ব্যয় করিতে পারে। শিক্ষিতলোক তোমাদের কেহ নহে। তোমরা নিজে বুদ্ধিমান্ হইতে চেষ্টা কর লিখিতে পড়িতে ও আপন স্বত্ব বুঝিয়া লইতে শিখ। তোমরা নিজে আপন সাহায্য করিতে পারিলে ঈশ্বর তোমাদিগের সহায় হইবেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট

* হপ্তমের অত্যাচারে যে কত প্রজার সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার তালিকা লইলেও it would be interesting to compute.

তোমাদের রক্ষার্থ নানা যত্ন করিয়াও তোমাদের রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তোমাদের চক্ষু কর্ণ ফুটিলে তাঁহারাও সফলপ্রযত্ন হইতে পারেন। তোমরাও বাঁচিয়া যাও নচেৎ তোমাদের ভরসা নাই। আশা নাই।



অভিজ্ঞানশকুন্তল।

৫। ইহার অর্থ।

চতুর্থ প্রস্তাবে আমরা দেখাইয়াছি যে দুষ্মন্ত কিছু বেশী রিপুপরবশ, কিন্তু রিপুপরবশ বলিয়া তিনি অধার্ম্মিক নন। তিনি বহুস্ত্রীসত্ত্বেও শকুন্তলার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না বটে; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার শকুন্তলার প্রতি আসক্তি যথেচ্ছাচারী দুরাচারের আসক্তি নয়। এ কথা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। এখনও বলি যে রিপুগ্রস্ত দুষ্মন্ত অসাধারণ চিত্তসংযমসহকারে শকুন্তলার জাতিকুল প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া শেষে শকুন্তলাকে অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথম প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র দুষ্মন্তের পরীক্ষা আরম্ভ হয়—তাঁহার রিপু এবং ধর্ম্মভাবের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সে যুদ্ধে তাঁহার ধর্ম্মভাব জয়ী হইয়াছিল। ধর্ম্মভাব জয়ী হইয়া দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে পবিত্র পরিণয়সূত্রে বন্ধন করিয়াছিল। সে পরিণয়ের অর্থ—ঘৃণাস্পদ-কামোন্মত্ত যথেচ্ছাচারীর কদর্য্যবাসনা-পরিতৃপ্তির নিমিত্ত ক্ষণিক সম্বন্ধ নয়। সে পরিণয়ের অর্থ—জীবনব্যাপী পবিত্র পতিপত্নীর সম্বন্ধ। কিন্তু সে পবিত্র পরিণয়ের ফল কি হইল?

সে পবিত্র পরিণয়ের প্রথম ফল—নায়ক নায়িকার যন্ত্রণাময় বিচ্ছেদ। পতিকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া শকুন্তলা কশ্যপাশ্রমে থাকিয়া অনেকবৎসর ধরিয়া ভয়ানক যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন। পতিপ্রাণা পতিহীনার ন্যায় সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কোমল হৃদয়ে বিষম বিচ্ছেদাগ্নি ধারণ করিয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়াছিলেন। স্নেহপ্রাণা স্নেহময়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্নেহের পদার্থ হারাইয়া ভগ্নহৃদয়ে দীর্ঘকাল হাহাকার করিয়াছিলেন। আসমুদ্র ভারতসাম্রাজ্যের রাজ্ঞী অসহায়া অনাথার ন্যায় বহুকাল কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছিলেন। চন্দ্রবংশতিলক, পৃথিবীর রাজকুলতিলক দুষ্মন্তের প্রতিষ্ঠিত মহাদেবী সর্ব্বলোকোপেক্ষিতা অধমতমা কাঙ্গালিনীর ন্যায় ধূলিধুসরিত অঙ্গে মাটি হইয়া মাটিতে মিশাইয়াছিলেন। দুষ্মন্তও শকুন্তলার বিচ্ছেদে উন্মাদগ্রস্ত।

নিরপরাধা সতী সাধ্বীকে নিষ্ঠুরভাবে নিষ্ঠুরবাক্যে তাড়াইয়া দিয়া ধার্ম্মিক-প্রধান দুষ্মন্ত অনুতাপে দগ্ধহৃদয়, জীর্ণ, শীর্ণ, আহারনিদ্রাবর্জ্জিত, আকুলপ্রাণ, শোকবিহ্বল।

সে পবিত্রপরিণয়ের দ্বিতীয় ফল—নায়কনায়িকার আত্মীয় বন্ধুগণের যন্ত্রণা। অপমানিত শকুন্তলাকে রাখিয়া গৌতমী, শার্ঙ্গরব প্রভৃতি যখন আশ্রমে ফিরিয়া যান তখন তাঁহারা যে কি বিষম শোক-ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শকুন্তলা তাঁহাদের সকলেরই আদরের বস্তু। আশ্রমপ্রদেশে দুষ্মন্তের অবস্থান কালে শকুন্তলার যে পীড়া হয় তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া সমস্ত আশ্রমবাসী এবং আশ্রমবাসিনী শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আবার যখন গৌতমী প্রভৃতি আশ্রমে আসিয়া সেই নিদারুণ কথা জ্ঞাপন করিলেন তখন যে পবিত্র ব্রহ্মচিন্তানিমগ্ন ব্রহ্মনামপূর্ণ তপস্যাশ্রম অকিঞ্চিৎকর সংসারাশ্রমের ন্যায় মোহমুগ্ধের হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। সে কথা শুনিয়া ঋষিকুলপতি কণ্বের হৃদয়ে কি ভয়ানক আঘাতই লাগিয়াছিল! শকুন্তলা কণ্বের প্রাণবায়ু—'কণ্বস্য কুলপতেরুচ্ছ্-সিতম্।' আর প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার ত কথাই নাই। তাহারা সে কথা শু-নিয়া যে কি করিয়াছিল তাহা ঠিক করা দুঃসাধ্য। আবার মেনকা কন্যার নিমিত্ত যারপর নাই কাতর এবং শোকা-কুল। তিনি কন্যার দুঃখে অস্থির হইয়া দুষ্মন্তের মনের ভাব জানিবার নিমিত্ত সানুমতীকে হস্তিনাপুরে পাঠা-ইয়াদিলেন। এইরূপ যে যেখানে শকুন্তলাকে জানিত এবং ভাল বাসিত সেই তাঁহার নিমিত্ত ব্যাকুল,শোকসন্তপ্ত। ওদিকে দুষ্মন্তের রাজপুরীও শোকনিমগ্ন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ভীত, উৎকণ্ঠিত, শোকাতুর। তাঁহার রাজপুরবাসিনীরাও তদবস্থ। তাঁহার অনুমতিক্রমে চির-প্রচলিত-বসন্তোৎসব বন্ধ হওয়ায় হস্তিনা-পুরের রাজবাটী যেন একটি প্রলয়ঙ্করী ঘটনার ছায়ায় গাঢ়নিমগ্ন—নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, নিরানন্দ!

সে পবিত্র পরিণয়ের তৃতীয় ফল—রাজ্যের অমঙ্গল। আমরা প্রথম প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে দুষ্মন্ত মহা পরীক্ষায় পড়িয়া রাজকার্য্য ভুলেন নাই। আমরা বলিয়াছি যে সে পরীক্ষায় তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। এখনও আমরা সেই কথা বলি। কিন্তু আরো একটি কথা আছে। অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শন করিয়া যখন তাঁহার শকুন্তলার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি ঘোর যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। সে যন্ত্রণায় তাঁহার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থার যে রকম পরিবর্ত্তন হয়, বৃদ্ধ কঞ্চুকী তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনার কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত করিলেই চলিবে:—

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভি র্ন প্রত্যহং সেব্যতে।

তিনি এখন পূর্ব্বের মত মনোহর বস্তুতে প্রীত হন না এবং অমাত্যবর্গকে প্রতিদিন আস্থা প্রদর্শন করেন না।

তবেই দেখা যাইতেছে যে দুষ্মন্তের যন্ত্রণা রাজকার্য্যবিভাগেও সম্পূর্ণরূপে ফলশূন্য নয়। অমাত্যগণের প্রতি রাজার আস্থাভাব রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলের বিষয় নয়। রাজা এবং অমাত্যমণ্ডলী উভয়েই ভাল হইলে সে আস্থাভাব আশু অনিষ্টসাধনে অক্ষম হয় বটে, কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে সে আস্থাভাব ভাল রাজ্যেও প্রজাবর্গের অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে। ফলতঃ অমাত্য-বর্গের প্রতি রাজার আস্থাভাব রাজ্যের পক্ষে মন্দ বই ভাল নয়। সে আস্থা-ভাব ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইলেও এককালে দোষশূন্য নয়—ঘোর অনিষ্টকারী না হইলেও কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যবিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন করিয়াই থাকে। কিন্তু দুষ্মন্তের যে শুধু অমাত্যগণের প্রতি কিছু আস্থা-ভাব হইয়াছিল তা নয়। তাঁহার যন্ত্রণা আরো কিছু গুরুতর অনিষ্টসাধন করিয়া-ছিল। তিনি ধর্ম্মবীর এবং চিত্তবীর। যে চিত্তবীর সে কোন অবস্থাতেই চিত্ত-ধর্ম্ম একেবারে হারায় না। দুষ্মন্তও ঘোর পরীক্ষায় পড়িয়া তাঁহার চিত্তধর্ম্ম একেবারে হারান নাই। বরং সেই পরীক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় তাঁহার চিত্ত-ধর্ম্ম বর্দ্ধিতগৌরবে প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু সে পরীক্ষায় তিনি যে সম্পূর্ণরূপে অবিজিত ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। যন্ত্রণাবিহ্বলাবস্থায় তিনি যখন রাজকার্য্যের ব্যবস্থা করেন তখন এইরূপ বলিয়াছিলেন:—

বেত্রবতি মদ্বচনাদমাত্যমার্য্যপিশুনং ব্রূহি চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিতমস্মাভিরদ্য ধর্ম্মাসনমধ্যাসিতুং যৎ প্রত্যবেক্ষিতং পৌরকার্য্যমার্য্যেণ তৎ পত্রমারোপ্য দী-য়তামিতি।

বেত্রবতি, আমার কথায় অমাত্য আর্য্য পিশুনকে গিয়া বল যে অনেক বেলায় জাগিয়াছি বলিয়া ধর্ম্মাসনে অধিরূঢ় হ-ইতে আজ আমরা অসমর্থ। তিনি পৌরকার্য্য যাহা দেখিয়াছেন তাহা লিখিয়া দিন।

যন্ত্রণায় দুষ্মন্তের রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই এবং সেই জন্য তিনি আজ বিচারা-সনে বসিতে অক্ষম। কি গুরুতর কি লঘুতর সকল কার্য্যই তিনি স্বয়ং করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ তিনি সে প্রণালী অনুসরণে অশক্ত। আজ তিনি নিজের আসনে প্রধানামাত্যকে বসাইয়া আপনি কেবল গুরুতর কার্য্য পর্য্যালোচনা করি-তেছেন। প্রজাবৎসল রাজকার্য্যানুরক্ত দুষ্মন্ত আজ প্রতিনিধি দ্বারা রাজকার্য্য করিতে বাধ্য। তবে দুষ্মন্ত পুরুষপ্রধান, চিত্তসংযমে অমিতবল, রাজধর্ম্মপ্রতি-পালনে দৃঢ়ানুরাগী। তাই আজিকার পরীক্ষাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত নন—তাই আজ পুরুষপ্রধান পুরুষপ্রধা-

নই রহিয়াছেন। দুষ্মন্ত দুষ্মন্ত না হইলে আজ ভারতের কি দুর্দ্দশা ঘটিত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

দেখা গেল যে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পবিত্র পরিণয় হইতে তিনপ্রকার অমঙ্গল ঘটিল :—স্বয়ং দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার অমঙ্গল; দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার আত্মীয়-স্বজনের অমঙ্গল; ভারতসাম্রাজ্যের অমঙ্গল। কার্য্য দুইটী লোকের কিন্তু তাহার ফল কোটি কোটি লোকের দ্বারা অনুভূত। রোমিও এবং জুলিয়েটে প্রণয়ের ফলও সেই প্রকার হইয়াছিল। "By the introduction of the Prince in his political power, Shakspeare gives a public interest to the private history of the lovers. A whole community is represented in a state of ardent excitement, by which the public good is endangered: the Prince intercedes between the two contending parties, and thus, what in other respects was a private concern, becomes a matter of public and political importance, affecting the whole constitution of society and the common good."* সেক্ষপীয়রকে ঘটনাকৌশলের দ্বারা এই সত্য বুঝাইতে হইয়াছে; কালিদাসকে তাহা করিতে হয় নাই, কেন না তাঁহার নাটকের প্রণয়ী নিজেই রাজা। তবে তিনি এই মহাসত্য বুঝিতেন বলিয়া তাঁহার নায়কের প্রণয়ের ইতিহাস এমন প্রণালীতে বলিয়াছেন যে তাঁহার পাঠক সেই মহাসত্য বুঝিতে পারেন। সে সত্য এই—ব্যক্তিবিশেষের পরিণয় শুধু সেই ব্যক্তিবিশেষের শুভাশুভের কারণ নয়; তাহা সমস্ত সমাজের শুভাশুভের কারণ। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অর্থ।

দেখিলাম যে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পবিত্র পরিণয় হইতে বিষময় ফল ফলিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই—বিষময় ফল কেন ফলিল? ইহার প্রথম উত্তর, দুর্ব্বাসার শাপ। দুর্ব্বাসা শাপ দিয়াছিলেন বলিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া গেলেন, ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন, তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে অসুখী করিলেন এবং শেষে আপনিও অসুখী হইলেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, যে শাপ হইতে এত অনিষ্ট উৎপন্ন হইল মহাকবি কেন সে শাপ দেওয়াইলেন। ইহার উত্তর এই যে, দুর্ব্বাসা শকুন্তলার কাছে আতিথ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শকুন্তলা সে প্রার্থনা শুনেন নাই। তাপসাশ্রমে অতিথিসেবা একটি প্রধান কর্ত্তব্য শকুন্তলা তাহা জানিতেন। প্রাচীন ভারতে তপস্যাশ্রমে সর্ব্বদাই অতিথির সমাগম হইত এবং আশ্রমবাসীদিগের সেই সকল অতিথির সেবা

* Dr. Ulrici র Shakspeare's Dramatic Art নামক গ্রন্থের ১৭৮ পৃষ্ঠা।

করিতে হইত। শকুন্তলা প্রভৃতি সেই অতিথিসেবা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সে ধর্ম্মের উৎকর্ষ বুঝিতেন। শকুন্তলা প্রভৃতির সম্মুখে দুষ্মন্ত উপস্থিত হইবামাত্র অনসূয়া বলিয়াছিলেন—

দাণিং অদিহিবিসেসলাহেণ। হলা সউন্দলে গচ্ছ উড়অং ফলমিস্সং অগ্ঘং উবহর। ইদং পাদোদঅং ভবিস্সদি।

আপনার ন্যায় অতিথিলাভে তপস্যার বৃদ্ধি হইয়েছে। ওলো শকুন্তলে, উটজে যাও এবং ফলযুক্ত অর্ঘ্য আনয়ন কর। এই পা ধুইবার জল।

আবার যখন শকুন্তলা রাগের ভান করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হন, তখন অনসূয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

সহি ণ জুত্তং অকিদসক্কারং অদিহি-বিসেসং বিসজ্জিঅ সচ্ছন্দদো গমণম্।

সখি, অকৃতসৎকার অতিথিকে ত্যাগ করিয়া সচ্ছন্দে চলিয়া যাওয়া উচিত নয়।

মহাকবি দেখাইলেন যে শকুন্তলা অতিথিসেবার কর্ত্তব্যতা এবং উৎকর্ষ সকলই বুঝেন। তার পর তিনি দেখাইলেন যে শকুন্তলা দুষ্মন্তচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অতিথি ফিরাইয়া দিলেন, অতিথি শকুন্তলাকে শাপ দিয়া গেল। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে প্রণয় যতই পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট পদার্থ হউক, সে যদি সামাজিক কর্ত্তব্যসাধনের প্রতিবন্ধক হয়, তবে তাহাকে দূষণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবেক। শকুন্তলা পতির চিন্তা করিতেছিলেন। পতিচিন্তা কিছু অপবিত্র কার্য্য নয়। কিন্তু সে চিন্তায় তিনি এতই নিমগ্ন যে অতিথির সমাগম জানিতে পারিলেন না এবং সেই জন্য শাপগ্রস্ত হইলেন। ইহার অর্থ এই যে হৃদয়ের অতি পবিত্র ভাবও অপবিত্র হইয়া পড়ে যখন তাহা মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়। ইহার অর্থ এই যে, অগ্রে সমাজ পরে আপনি —অগ্রে অপরের চিন্তা পরে আপনার চিন্তা। আপনার চিন্তা অতি বিশুদ্ধ, অতি প্রশংসনীয় হইলেও তদ্দ্বারা যদি অপরের চিন্তা বিলুপ্ত হয়, তবে তাহা অতি অশুদ্ধ, অতি নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। পবিত্র প্রেম অতি উৎকৃষ্ট বস্তু। কিন্তু সে প্রেম যদি মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়, তবে তাহা অতিশয় অপকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এ কথার অর্থ এই যে প্রণয়ের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা শুধু প্রণয়ী অথবা প্রণয়িনীর নিজের মনের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা দ্বারা নিরূপিত হয় না। সমাজও তাহার একটী প্রধান নিরূপক। শকুন্তলা এই নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া এত কষ্ট ভোগ করিলেন। তিনি পবিত্রমনে পবিত্রভাবে প্রণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু তাঁহার মন পবিত্র হইলে কি হইবে? তিনি প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সমাজ ভুলিয়া তাঁহার প্রণয়কে পূর্ণমাত্রায় পবিত্র করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রণয়ের পবিত্রতা অসম্পূর্ণ ছিল। সেই জন্য তাঁহার অদৃষ্টে এত দুঃখ। আর মহাকবি যদি প্রকৃত তত্ত্ব জাপন

করিয়া থাকেন তবে যিনি যেখানে প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সমাজকে ভুলিবেন তাঁহারই অদৃষ্টে এইরূপ দুঃখ ঘটিবে। ইহার একটী অর্থ এই যে, রমণীর ন্যায় যে হৃদয়প্রধান এবং হৃদয়ের মোহে বেশী মুগ্ধ হয়, তাহার হৃদয়কে শিক্ষা দ্বারা কর্ত্তব্যের পথে রাখিতে হয়, এবং সমাজসেবা এবং অপরের নিমিত্ত চিন্তা সেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ এবং উপকরণ। রমণীর যে অন্তর্লীনতার ভাব তৃতীয় প্রস্তাবে বর্ণনা করিয়াছি তাহা আত্মসম্বন্ধে হইলে সমাজবিরোধী। সে ভাব অধিক প্রশ্রয় পাইলে সমাজের অনিষ্টসাধন করে। সেই নিমিত্ত সে ভাবকে শিক্ষা দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু সে শিক্ষা সহজে লাভ হয় না এবং হইবার নয়। শকুন্তলা জন্মাবধি পরোপকারব্রতে ব্রতী থাকিয়াও সে ভাব দমন করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। অনেক ইউরোপীয় দার্শনিকেরও মত এই যে, দাম্পত্যাবস্থায় স্ত্রীপুরুষের প্রেম আপনাদিগের মধ্যে অধিকপরিমাণে আবদ্ধ থাকিয়া সমাজের অনিষ্টকারী হয় এবং সেই নিমিত্ত মানুষের সে অবস্থায় প্রবেশ করা অনুচিত। আমরা মানুষকে এ রকম ব্যবস্থা দি না, কেন না আমরা ইহাকে পাগলের ব্যবস্থা মনে করি। কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করি যে এখনও মনুষ্যের মধ্যে দাম্পত্যপ্রণয় কিছু বেশী পরিমাণে মোহমুগ্ধকারী বলিয়া সমাজসম্বন্ধে কিছু অনিষ্টকর। এবং সেইজন্যই আমরা বলি যে দম্পতির প্রণয়কে শিক্ষা দ্বারা সমাজের অনুকূল করা কর্ত্তব্য। দুষ্মন্ত-নিমগ্না শাপগ্রস্তা শকুন্তলার অর্থও তাই। তাহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের দ্বিতীয় অর্থ। অভিজ্ঞানশকুন্তল জগতের একখানি প্রধান সমাজতত্ত্বজ্ঞাপক নাটক।

শকুন্তলার মোহ দুর্ব্বাসার শাপের একটী কারণ বটে। কিন্তু সেই কারণের অন্তরালে আর একটী কারণ আছে। শকুন্তলা সমস্ত বাহ্যজগৎ ভুলিয়া দুষ্মন্তকে ভাবিতেছিলেন বলিয়া দুর্ব্বাসা তাঁহাকে শাপ দিলেন যে দুষ্মন্ত তোমাকে ভুলিয়া যাইবেন। দুষ্মন্তও তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। শকুন্তলা তাঁহাকে তাঁহাদের বিবাহের প্রমাণ দেখাইতে চাহিলেন। শুনিয়া দুষ্মন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—

উদারঃ কল্পঃ।

বেশ কথা।

তখন শকুন্তলা অঙ্গুরীয় বাহির করিতে গিয়া দেখিলেন যে অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় নাই। দুষ্মন্ত তাঁহাকে চতুরা কুলটা বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু অঙ্গুরীয় সওয়ায় যদি বিবাহের অন্য প্রমাণ থাকিত তাহা হইলে ত কোন গোল হইত না। দুষ্মন্ত নিজেইত পরে মাধব্যকে বলিয়াছিলেন—মাধব্য তুমি কেন আমাকে তখন বিবাহের কথা মনে করিয়া দেও নাই, এবং ঐ স্থূলবুদ্ধি মাধব্য উত্তর করিয়াছিলেন যে আপনি

শকুন্তলার বিষয়ে আমাকে যে রকম বলিয়াছিলেন তাহাতে আমি এইরূপ বুঝিয়াছিলাম যে তাহার সহিত আপনার বিবাহ হয় নাই। অন্য প্রমাণ থাকিলে দুর্ব্বাসাও শকুন্তলাকে সে রকম শাপ দিতে পারিতেন না এবং দিলেও তাহা কার্য্যকর হইত না। কিন্তু সে বিবাহের অন্য প্রমাণ ছিল না, কেন না সে বিবাহ গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল। গোপনে সম্পন্ন হইবার কারণ কি? না দুষ্মন্তের দুর্দ্দমনীয় রিপু। দুষ্মন্তের দুর্দ্দমনীয় রিপুই দুর্ব্বাসার শাপের এবং সেই শাপোদ্ভূত সমস্ত অনিষ্টের অবান্তর কারণ। কিন্তু সে রিপু অপবিত্র নয়। দুষ্মন্ত রিপুগ্রস্ত বটে কিন্তু দুরাচার নন। তিনি শকুন্তলাকে কলঙ্কে ডুবাইবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত মিলনপ্রার্থনা করেন নাই। তিনি শকুন্তলাকে পত্নী করিয়াছিলেন—আসমুদ্র ভারতরাজ্যের রাজ্ঞী করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্দ্দমনীয় রিপুপরবশ হইয়া তিনি কণ্বের প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতে না পারিয়া গোপনে শকুন্তলাকে পত্নীত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্যই আপনি এত কষ্ট পাইলেন, শকুন্তলাকে এত কষ্টে ফেলিলেন এবং সমস্ত ভারতরাজ্যকে বিপদগ্রস্ত করিলেন। ইহার অর্থ এই যে শুধু শুদ্ধান্তঃকরণে বিবাহ করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, শুধু হৃদয়ের মিলনকে বিবাহ বলে না। বিবাহ সামাজিক সুখদুঃখের নিয়ন্তা; অতএব সমাজকে সাক্ষী করিয়া, সমাজের সম্মতি লইয়া বিবাহ সম্পন্ন করিতে হয়। মনুষ্যের হৃদয় সকল সময় এক কথা কয় না।

অজ্ঞাতহৃদয়েষ্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্।
(অভিজ্ঞানশকুন্তল, পঞ্চমাঙ্ক)

যাহার হৃদয় অপরিজ্ঞাত তাহাতে প্রীতিবন্ধন এইরূপ বৈরিতায় পরিণত হইতে পারে।

আরো এক কথা। সমাজ মনুষ্যচরিত্রের উন্নতির প্রধান কারণ। মনুষ্যচরিত্রে যাহা কিছু ভাল, উৎকৃষ্ট এবং মহৎ আছে তাহার অধিকাংশই কেবল সমাজ আছে বলিয়া বিকাশ পায় এবং দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে দুষ্মন্তচরিত্রের বিশ্লেষণে আমরা এ কথার পরিষ্কার প্রমাণ পাইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে আত্মেতর ভাবের কাছে আত্মভাবের লয়েই সে চরিত্রের গৌরব এবং উৎকর্ষ। আমাদের যে সকল মানসিক শক্তি এবং হৃদয়ের প্রবৃত্তি আছে তাহা সমাজ-সেবায় নিযুক্ত না হইলে পবিত্রতালাভ করে না। সমাজসেবায় নিযুক্ত হইলেই সে সকল শক্তি এবং প্রবৃত্তি মহত্বসংযুক্ত হয়। নচেৎ পশুপ্রবৃত্তির ন্যায় হেয় হইয়া থাকে। দাম্পত্যসম্বন্ধও সমাজসেবায় উৎসর্গীকৃত না হইলে হীনতা এবং অপবিত্রতা দোষে দূষিত হয়, কেন না তাহা হইলে তাহা পশুপক্ষীর মিলন অপেক্ষা বড় একটা উৎকৃষ্ট হয় না। সমাজই উন্নত-

নীতির প্রকৃত উৎস এবং উদ্দীপক। এবং সেই জন্যই সমাজকে সাক্ষী করিয়া, সমাজের সম্মতি লইয়া, সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত* স্ত্রীপুরুষের বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত। দুষ্মন্ত সে প্রণালীতে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ না করিয়া মহাপাপ করিলেন এবং মহা অনিষ্ট ঘটাইলেন। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের তৃতীয় অর্থ। অভিজ্ঞানশকুন্তল সমাজতত্ত্বের একখানি প্রধান কাব্য।

কিন্তু দুষ্মন্ত যে চিত্তসংযমে অক্ষম হইয়া মহাপাপে পতিত হইলেন, ইহা কি ভয়ানক কথা! মহাকবি যে প্রণালীতে এই মহাপাপের উৎপত্তি বুঝাইয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলে আমরা সমস্ত মনুষ্যজাতির নিমিত্ত ভীত ও দুঃখিত হই। দুষ্মন্ত সকল গুণের আধার। তিনি রাজা হইয়া, সমগ্রভারতের রত্নভাণ্ডারের অধীশ্বর হইয়াও বিলাসবিদ্বেষী। তিনি মনে করিলে দিবারাত্রি বিলাসসাগরে মগ্ন হইয়া থাকিতে পারেন এবং বিচিত্র প্রণালীতে বিলাসবাসনা পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন না। তিনি পুরুষপ্রধানের ন্যায় দিবারাত্রি পুরুষোপযোগী কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহার আমোদপ্রমোদ গুলিও পুরুষত্বব্যঞ্জক। বিশাল ধনুর্ব্বাণহস্তে মধ্যাহ্ন রবির বিশ্বদগ্ধকারী কিরণরাশি তুচ্ছ করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পর্ব্বতশৃঙ্গান্তরে বিচরণ করিতেই তাঁহার আমোদ। রাজকার্য্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ, গভীর অভিনিবেশ, অপরিমেয় শ্রমশীলতা। বাহুবলে তিনি অদ্বিতীয়; শত্রুদমনে ক্ষিপ্রহস্ত, আগ্রহচিত্ত, অসীমসাহস। তিনি মানুষ, আত্মসেবায় অনুরক্ত। কিন্তু সমাজসেবার্থ আত্মবিসর্জ্জন আবশ্যক হইলে তিনি তাহা অবলীলাক্রমে করিতে পারেন। তিনি মানুষ, মানুষের ন্যায় মোহমুগ্ধ হন, কিন্তু আবশ্যক হইলেই ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় নিমেষমধ্যে মোহজাল কাটিয়া খণ্ডখণ্ড করিতে পারেন। তিনি গুরুজনসম্ভ্রমকারী কিন্তু স্বাধীন চিন্তাশীল। তিনি সৎপ্রবৃত্তির প্রশস্ত আধার—বিপন্নের বন্ধু, দরিদ্রের প্রতিপালক, সকলেরই হিতৈষী। তিনি আত্মশাসনে বীরশ্রেষ্ঠ। তিনি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, চিত্রবিদ্যায় সুনিপুণ, অস্ত্রবিদ্যায় সুদক্ষ। তিনি পুরুষত্বের প্রতিমা—শক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি। কিন্তু তিনিও রিপুর শাসনে স্খলিতপদ। রিপু কি ভয়ানক বস্তু! রিপুর কি অসীম শক্তি! রিপুসেবা কি বিষম, কি দূষণীয় কার্য্য! এ কথা অভিজ্ঞানশকুন্তল ভিন্ন আর কোথাও লেখে না। সেক্সপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েটে ও এ তত্ত্ব দেখিতে পাই না। রোমিও এবং জুলিয়েটে বাহ্য

* সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত উদ্বাহ—এ কথা বোধ হয় উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজসংস্কারক-নিন্দিত হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন আর কোথাও লেখে না। বাইবেলের ত কথাই নাই—তাহাতে লেখে যে বিবাহ না করিতে পারিলেই ভাল হয়।

জগৎ রিপুসেবার প্রতিকূল বলিয়া রিপুসেবা অনিষ্টের হেতু হইল। অভিজ্ঞান শকুন্তলে অন্তর্জগৎ রিপুসেবার প্রতিকূল থাকাতেও রিপুসেবা অনিষ্টের হেতু হইল। বাহ্যজগৎ পরিবর্ত্তনশীল। অতএব রোমিও এবং জুলিয়েটের এমন অর্থ হইতে পারে যে বাহ্যজগৎ অনুকূল থাকিলে রিপুসেবা দূষণীয় নয়। কিন্তু উন্নত-নৈতিক-নিয়ম-শাসিত আধ্যাত্মিক জগৎ অপরিবর্ত্তনীয়। অপরিবর্ত্তনীয়ের সম্বন্ধে যাহা দূষণীয় তাহা সকল সময়েই দূষণীয়। বাহ্যশক্তি প্রবলতম হইলেও দুর্ব্বল। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতেই প্রবল। মানবপ্রধান মনু বলিয়াছেন—,

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।

এবং কবিগুরু বাল্মীকি বলিয়াছেন :—

ন গৃহানি ন বস্ত্রানি ন প্রাকারাস্তিরস্ক্রিয়াঃ।
নে দৃশারাজ সৎকারা বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়ঃ।

অতএব বাহ্যশক্তি অতিক্রম করিয়া যে রিপু কার্য্য করে তাহাকে প্রবল বলিয়া বোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি অতিক্রম করিয়া যে রিপু কার্য্য করে তাহাকে প্রবলতম অপেক্ষা প্রবল বলিয়া বোধ হয়। এই নিমিত্তই রোমিও এবং জুলিয়েটের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা শুদ্ধ সেই নায়কনায়িকার জন্য দুঃখিত হই। কিন্তু দুষ্মন্তের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা সমস্ত মানবজাতির নিমিত্ত ভাবিত হই। যখন দেখি যে রোমিওতে প্রণয় এবং রিপুন্মত্ততা বই আর কিছুই নাই তখন মনে হয় যে আর কোন মানসিক শক্তি থাকিলে রোমিওর ন্যায় রিপুন্মত্ত হইয়া সংসারের দুঃখভাগী হইতে হয় না। কিন্তু যখন দেখি যে দুষ্মন্ত সমস্ত মানসিক শক্তির আধার হইয়াও রিপুন্মত্ততাবশত বিষম পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত, তখন শুধু দুষ্মন্ত কেন সমস্ত মানবজাতির নিমিত্ত চিন্তিত হই। এদিকে মানবজাতির ইতিহাস এবং অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও ত সেই চিন্তার উদয় হয়। মনুষ্যমাত্রেই আজিও রিপুপ্রধান, রিপুর শাসনে নীতিভ্রষ্ট। সামান্য লোকের ত কথাই নাই। যে সকল মহাপুরুষ জগতে বিদ্যা, বুদ্ধি, উন্নতনীতি, উন্নত চিত্তসংযম-শক্তি, বীরত্ব এবং উদারতার আদর্শস্বরূপ তাঁহারাও রিপুর শাসনে হীনগৌরব। একটি মাত্র নাম করিলেই পাঠক এ কথার অর্থ বুঝিবেন। সে নাম আকব্বর সা। আকব্বর সা অশেষ গুণে ভূষিত ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার 'নওরোজের' কথা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ অগস্ত কোমৎও বলেন যে মানুষের বুভুক্ষাপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিলে, তাহার রতিপ্রবৃত্তি অন্যান্য সকল প্রবৃত্তির অপেক্ষা বলবতী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মানবজাতির এই মানসিক এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব সেক্ষপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েটে পাওয়া যায় না, কালি-

দাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে পাওয়া যায়। ফলতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল এই তত্ত্বেরই দৃশ্যকাব্য। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ অর্থ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রায় সমস্তই বুঝিয়া দেখা হইল। কিন্তু এখনও কিছু দেখিতে বাকি আছে। মহাকবি দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন,তাহা বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা পুরুষ এবং প্রকৃতির প্রতিকৃতি। পুরুষের অর্থ --জগতের সূক্ষ্ম, অনপলাপ্য, অপরিবর্ত্তনীয় উপাদান ; প্রকৃতির অর্থ—জগতের স্থূল, অপলাপ্য, পরিবর্ত্তনশীল উপাদান। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমরা দুষ্মন্ত-চরিত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহার একটি মর্ম্ম এই যে, দুষ্মন্ত জ্ঞানপ্রধান এবং তাঁহার মনের এমন একটি ভাব আছে যে, তিনি নানাবিধ অবস্থায় পড়িয়াও সেই ভাবটি রক্ষা করেন। তিনি যখনি কোন মোহে অভিভূত হইতেছেন, তখনি আমরা দেখি যে, তিনি সেই মোহ কাটাইয়া তাঁহার পৌরুষভাব ধারণ করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিলেই বোধ হয় যেন তাঁহাতে এমন একটি ভাব আছে যাহা অপরিবর্ত্তনীয় এবং অনপলাপ্য। কিন্তু শকুন্তলাতে আমরা সে রকম কোন ভাব দেখিতে পাই না। তিনি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করেন; কিন্তু যখন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিভূত, তখন তাঁহাকে দুষ্মন্তের ন্যায় কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ভাবের দিকে ধাবমান দেখিতে পাই না। যেন তাঁহাতে কোন অনপলাপ্য, অপরিবর্ত্তনীয় উপাদান নাই। অধিকন্ত, তৃতীয় প্রস্তাবে শকুন্তলা-চরিত্রের ব্যাখ্যা বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শকুন্তলার মন concrete সম্বন্ধ, দুষ্মন্তের মন abstract প্রিয় ; শকুন্তলার হৃদয় জড়জগৎসাপেক্ষ, দুষ্মন্তের হৃদয় তাহার বিপরীত। এই এক কথা। আবার দেখি যে, পবিত্র তপস্যাশ্রমে রিপুসেবারূপ জড়জগতের কার্য্য হইতেছে; ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মাত্মক ঋষিকুলপতি কণ্ব শকুন্তলাকে সংসারাশ্রমে প্রেরণ করিতেছেন ; এবং দেবতুল্য কশ্যপ দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে দম্পতিরূপে পুনর্ম্মিলিত দেখিয়া আহ্লাদিত চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। এই সকল বিবেচনা করিলে, বোধ হয় যে, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা পুরুষ এবং প্রকৃতির দৃশ্যমান মূর্ত্তি। আবার কুমারসম্ভব পড়িয়া আমরা জানি যে কালিদাস সাঙ্খ্যমতাবলম্বী ছিলেন, এবং কুমারসম্ভবে সাঙ্খ্যদর্শনের পুরুষ এবং প্রকৃতির আধ্যাত্মিক মিলন চিত্রিত করিয়াছেন। এবং সেই কালিদাস দুষ্মন্তের মুখ দিয়া এইরূপ বলাইয়াছেন :—

অদ্যাপি নূনং হরকোপবহ্নি-
স্বয়ি জ্বলত্যৌর্ব্ব ইবাম্বুরাশৌ।
ত্বমন্যথা মন্মথ মদ্বিধানাং
ভস্মাবশেষঃ কথমেব মুক্তঃ।

বোধ হয় আজিও হরকোপানল সমুদ্রে বাড়বানলের ন্যায় নিশ্চয়ই তোমাতে জ্বলিতেছে। নচেৎ, হে মন্মথ, তুমি ভস্মাবশিষ্ট হইলেও বিরহীদিগের পক্ষে কেন এরূপ উষ্ণ হও।

এই সকল কারণে স্পষ্টই বোধ হয় যে কুমারসম্ভবে যেমন পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন চিত্রিত হইয়াছে, অভিজ্ঞান শকুন্তলেও তাই হইয়াছে। তবে কুমারসম্ভবের এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তলের পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের প্রভেদ এই যে, কুমারসম্ভবে পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন আধ্যাত্মিক ভাবে মিলন, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন সাংসারিক ভাবে মিলন। এই প্রভেদবশতঃ কুমারসম্ভবে মদন ভস্মীভূত হইল, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে মদন জয়ী হইল। ইহার অর্থ এই যে, ঋষিতপস্বীর ন্যায় আধ্যাত্মিকভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে প্রকৃতিকে বিনষ্ট করিতে হয়, কিন্তু সংসারাশ্রমে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইলে প্রকৃতির প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষেরদ্বারা প্রকৃতি শাসিত হয়; সংসারাশ্রমে প্রকৃতিরদ্বারা পুরুষ শাসিত হয়। এই প্রভেদ বুঝাইবার জন্য মহাকবি শকুন্তলাকে লইয়া দুষ্মন্তের পদস্খলন দেখাইলেন, এবং বসুমতী, হংসপদিকা প্রভৃতি রাজ্ঞীদিগকে দুষ্মন্তের ইতিহাসের মধ্যে আনয়ন করিয়া পাঠককে বুঝাইলেন যে, জগতে প্রকৃতির বলে স্ত্রীপুরুষের যোগসাধন হয় বলিয়া দুষ্মন্ত শুধু শকুন্তলাকে লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত নন, আরো অনেক রমণী লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত। এবং জগতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে মনুষ্যমাত্রই দুষ্মন্তের ন্যায় বিপদ্‌গ্রস্ত। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের পঞ্চম অর্থ।

কিন্তু প্রকৃতির বলেই স্ত্রীপুরুষের মিলন যদি সৃষ্টির নিয়ম হইল, তবে সে নিয়মসম্ভাবনীয় বিষময় ফল নিবারণের উপায় কি? মহাকবি তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। দুর্ব্বাসার শাপেরদ্বারা দুষ্মন্তকে মহাপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়া এবং সেই পরীক্ষায় দুষ্মন্তকে জয়ী করিয়া মহাকবি দেখাইয়াছেন যে মনুষ্যমনের শক্তি অসীম এবং অপরিমেয়, প্রকৃতি যতই বলবতী হউক, মনুষ্যের মন তদপেক্ষা বলবান্। মানুষ চেষ্টা করিলে উক্ত নিয়ম সম্ভাবনীয় বিষময় ফল নিবারণ করিতে সক্ষম। কিন্তু সে চেষ্টা অনায়াসে সুসিদ্ধ হইবার নয়। প্রকৃতি বড় ভয়ানক শক্তি। সে শক্তি দমন করিতে হইলে মানুষকে দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায় বিপরীত যুদ্ধ করিতে হইবে। করিলে তবে সংসারাশ্রম সুখ, শান্তি এবং পুণ্যের আশ্রম হইবে। সংসারাশ্রম একটি ভয়ানক রণস্থল। সে রণস্থলে প্রত্যেক মনুষ্যকে বীরপ্রধান হইতে হইবে, নচেৎ পাপ-রুধিরে এবং যন্ত্রণার হাহাকাররবে* রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া

* বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষেও সেই রব শুনা যায় না?

উঠিবে। আরো একটি কথা আছে। দুষ্মন্তের ইতিহাসে সপ্রমাণ হইতেছে যে মানসিকশক্তি এবং ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দুইটী পৃথক্ এবং স্বাধীন পদার্থ. মানসিকশক্তি প্রবল হইলেই যে ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দমিত হইবে এমন স্থিরনিশ্চয়তা নাই। অতএব ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দমন করিতে হইলে শুধু মানসিকশক্তির উপর নির্ভর করিলে সকল সময়ে অভিলষিত ফললাভ নাও হইতে পারে। সেইজন্য মানসিকশক্তির সহিত সমাজ-শক্তি যোগ করা আবশ্যক। অর্থাৎ সমাজের গঠনপ্রণালী এবং সামাজিক নিয়ম এমন হওয়া চাই যে সেই প্রণালী এবং নিয়মের বলে লোকের ঐন্দ্রিয়িকশক্তি প্রশ্রয় না পাইয়া দমিত হইয়া আইসে। অভিজ্ঞানশকুন্তলে কালিদাস এই মত স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। শকুন্তলার দ্বারা তিনি বুঝাইয়াছেন যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ দূষণীয়; এবং বসুমতী, হংসপদিকা প্রভৃতি রাজ্ঞীগণের দ্বারা তিনি বুঝাইয়াছেন যে বহুবিবাহ বিষম অনিষ্টকারী। তিনি দেখাইয়াছেন যে উভয়প্রকার বিবাহই প্রকৃতি বা ঐন্দ্রিয়িক শক্তির ফল এবং ঐন্দ্রিয়িকশক্তির প্রতিপোষক। তিনি অভিজ্ঞানশকুন্তলে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দমন করিতে হইলে শুধু মানসিকশক্তি প্রয়োগ করিলে চলিবে না, সমাজকে সুসংস্কৃত এবং নীতিপ্রবণ করিয়া সমাজরূপ মহা শক্তিও প্রয়োগ করিতে হইবে। অভিজ্ঞানশকুন্তল মানসিকশক্তি এবং সমাজশক্তির মহাকাব্য। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের ষষ্ঠ অর্থ।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে, অভিজ্ঞানশকুন্তল ভারতের একটি প্রধান দার্শনিক তত্ত্বের দৃশ্যকাব্য। বেদান্তদর্শনে বলে যে, পুরুষই সত্য এবং সৎ, প্রকৃতি অথবা জড়জগৎ মিথ্যা এবং অ-সৎ—পুরুষই পদার্থ, প্রকৃতি ছায়ামাত্র। সাঙ্খ্যমতাবলম্বী কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে দেখাইয়াছেন যে, পুরুষও যেমন সত্য, প্রকৃতিও তেমনি সত্য; পুরুষও যেমন সৎ, প্রকৃতিও তেমনি সৎ, পুরুষও যেমন পদার্থ, প্রকৃতিও তেমনি পদার্থ। অভিজ্ঞান শকুন্তলে প্রকৃতি যে রকম উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, যে রকম প্রভাবশালী দৃষ্ট হয়, যে রকম স্বাধীন-কায়াবিশিষ্ট দেখা যায় তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে মহাকবির মতে, অস্তিত্ব এবং প্রভাব সম্বন্ধে, প্রকৃতি পুরুষের সমকক্ষ পদার্থ —ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার জিনিস নয়। প্রকৃতি যে ছায়া নয়, প্রকৃতির যে একটি স্বাধীন,একটী মহাপ্রভাবশালী, একটী বিষম সত্য—অস্তিত্ব আছে, অভিজ্ঞানশকুন্তলে তাহা উজ্জ্বলতম অক্ষরে লেখা আছে। সেই মহাতত্ত্বই যেন অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রাণ। ফলতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল কাব্যাকারে সাঙ্খ্যদর্শন। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থতত্ত্বের চরমসীমা। এত অর্থ আর কোন্ কাব্যে কবে কে দেখিয়াছে?

চন্দ্রগুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

আর্য্যাবর্ত্তে মগধনামে যে জনপদ ছিল বৈদিক সময়ে তাহাকে কীকট বলিত। বিখ্যাত জরাসন্ধ নৃপতি মগধদেশে নিজ রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার সময় হইতেই এই দেশ মগধনামে পরিচিত। মগধের অধুনাতন নাম বেহার প্রদেশ। জরাসন্ধ যযাতিপুত্র পুরুর বংশোৎপন্ন এবং মগধবংশীয় মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালগণের আদিপুরুষ। গয়ার পূর্ব্বস্থিত রাজগৃহে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি পাণ্ডবদিগের সমসাময়িক নৃপতি এবং ভীমের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হয়েন। বারানসী নগরীতে জরাসন্ধ যে জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; মুসলমানেরা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। দ্বাবিংশতিজন নৃপতি জরাসন্ধের সিংহাসনে রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে মগধবংশের স্থিতি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত নিরূপিত আছে, অর্থাৎ এই দ্বাবিংশতিজন ভূপাল একসহস্রবৎসর মগধসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। শেষ নৃপতি রিপুঞ্জয় সুনীক নামে তাঁহার দুরাত্মা সচিবের হস্তে নিহত হন। রাজ্যলুব্ধ সুনীক তাঁহার পুত্র প্রদ্যোতকে মগধসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাঁর পরে পঞ্চদশজন মহীপতি মগধরাজ্যে রাজত্ব করেন। ইহাঁদের রাজত্বকাল বিষ্ণুপুরাণের মতে চারিশত নবতি বৎসর। মহারাজ মহানন্দী ইহাঁদিগের পঞ্চদশতম। ইহাঁর মহাপদ্ম নামে এক তনয় জন্মে। এই মহাপদ্মই ইতিহাসে নন্দনামে প্রোথিত হইয়াছেন। মহাপদ্মনন্দ শূদ্রাগর্ভ সমুদ্ভূত ছিলেন। ইহাঁর প্রতাপ এবং বীরত্ব বহুদূর বিদিত হইয়াছিল। কেহই তাঁহার শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইত না। যদ্যপি ইনি শূদ্রার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার সামাজিক প্রতিপত্তি স্থির ছিল। মহাপদ্মনন্দের নব পুত্র জন্মিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ঔরসে মুরানাম্নী দাসীর গর্ভে চন্দ্রগুপ্তনামে আর এক পুত্র হইয়াছিল। এই চন্দ্রগুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা এ প্রস্তাবে সঙ্কলিত করিব।

নন্দের পরলোকগমনান্তর তাঁহার নব পুত্রেরা রাজ্য অধিকার করিলেন। তাঁহারা চন্দ্রগুপ্তকে উপযুক্ত বৃত্তি দিতে চাহিলেন, কিন্তু রাজ্যের অংশ দিতে অসম্মত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাহা গ্রহণ করিলেন না বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে মারিবার উপক্রম করেন। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত পঞ্চনদপ্রদেশে পলায়ন করেন। তথায় তক্ষশীলানিবাসী চাণক্যপণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। চাণক্যের সহিত তাঁহার যেদিন প্রথম আলাপ হয়, সেদিন তিনি দেখিলেন যে, চাণক্য তক্রসেচনপূর্ব্বক কণ্টক-

গুলি কুশাঙ্কুরের মূলোচ্ছেদ করিতেছেন এবং তাঁহাকে আপনার কার্য্যোপযোগী ব্যক্তি স্থির করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। চাণক্য অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং রাজনীতিশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এতাদৃশ সহায়প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন।

গ্রীসদেশীয় ইতিহাসলেখকেরা বলেন যে, চন্দ্রগুপ্ত যখন পঞ্চনদপ্রদেশে ছিলেন, তখন মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, এবং বিপাশা-নদীতীরে শিবিরসন্নিবেশ করেন। চন্দ্রগুপ্ত আলেক্‌জাণ্ডারের সেনানিবেশে প্রবেশ করিয়া আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের বাচালতা ও স্বাধীনভাবে বাক্যপ্রয়োগ হেতু সেকন্দর তাঁহার উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি পলায়নদ্বারা আত্মরক্ষা সম্পাদন না করিলে, নিশ্চয় তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতেন। পরে তিনি কুসুমপুরে পলায়ন করেন, তথায় নবনন্দ নরপতিগণ একত্র মিলিত হইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের রাজত্ব সময়ে রাজগৃহ হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া কুসুমপুর বা পাটলিপুত্রে সংস্থাপিত হয়। কখন যে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। নন্দনরপতিগণ প্রজারঞ্জনদ্বারা প্রজাবর্গের পরম অনুরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। রাক্ষস নামে জনৈক নীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইহাঁদিগের অতিপ্রাচীন সচিব ছিলেন। রাক্ষসের অকৃত্রিম স্বামিভক্তি এবং রাজ্যের হিতচিন্তনহেতু সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত।

একদা চাণক্য রাজবাটীতে কোন কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তথায় কোন কারণবশতঃ তিনি নন্দ-নৃপতিগণকর্ত্তৃক অপমানিত এবং সভা হইতে বহিষ্কৃত হয়েন। এই নিষ্কারণ অবমাননা জন্য তিনি নন্দনৃপতিদিগের ধ্বংস সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন। পরে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছিল। চাণক্যের মন্ত্রণা ও বুদ্ধিকৌশলে চন্দ্রগুপ্ত নিজ ভ্রাতৃগণকে উপাংশুনিহত করেন এবং সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া চাণক্যকে নিজের মন্ত্রিত্বে বরণ করিলেন। তৎপরে উগ্রধন্বানামক একজন নন্দপুত্রদিগের পক্ষীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তের বিনাশের উপায় কল্পনা করিলে, তিনি নেপালরাজা হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং উগ্রধন্বাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসনে দৃঢ়তররূপে সমাসীন হয়েন।(১) এ বিষয়ে আমরা আমাদিগের মতামত প্রকাশিত করিব না।

এ দিকে অমাত্যরাক্ষস স্বচক্ষে চাণক্যকর্ত্তৃক নন্দনৃপতিগণের সমুচ্ছেদ সন্দর্শন করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়া মলয়কেতুনামক জনৈক পার্ব্বতীয় রাজার সহিত মিলিত হইলেন। ইহার সহিত

(১) Asiatic Researches vol V.

নিলিত হইয়া চন্দ্রগুপ্তের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মলয়কেতুকে কুসুমপুর আক্রমণ করিতে বলিলেন। মলয়কেতু সমুদায় নন্দরাজ্য পাইবেন বলিয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসের মন্ত্রণাকৌশলে কুলূতদেশের অধিপতি চিত্রবর্ম্মা, মলয়দেশের রাজা সিংহনাদ, কাশ্মীরাধিপ পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুদেশভূপাল সিন্ধুসেন এবং বহুতুরঙ্গসৈন্যশালী পারসীকপতি মেঘাক্ষ প্রভৃতি ম্লেচ্ছরাজগণ মলয়কেতুর সহায় হইল। অন্যান্য পার্থিবগণও মলয়কেতুর পৃষ্ঠপোষকতা করিতে স্বীকার করিল। ভদ্রভট, পুরুষদত্ত, হিঙ্গুরাত, বলগুপ্ত, রাজসেন, ভাগুরায়ণ, রোহিতাক্ষ, বিজয়বর্ম্মা প্রভৃতি চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী প্রধানপুরুষগণ মলয়কেতুর সহিত যোগ দিল। কুসুমপুরে জৈত্রযাত্রার জন্য খশ, মাগধ, চেদি ও হূনসৈন্যগণ সমাগত হইতে লাগিল। গান্ধার ও যবনভূপালগণ এবং শকভূপতিগণ সজ্জিত হইতে লাগিল। সত্বরই কুসুমপুর অবরোধ করিতে মলয়কেতু স্বসৈন্যে গমন করিলেন এবং দিন দিন নগরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। সর্ব্বত্রই উৎসাহ ও অধ্যবসায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। সকলেই ভাবিল চন্দ্রগুপ্তের আর রক্ষা নাই। অমাত্যরাক্ষস কেবল এই যুদ্ধবিগ্রহের ভরসায় না থাকিয়া চন্দ্রগুপ্তের বিনাশের নিমিত্ত এক বিষময়ী কন্যা গোপনে নিয়োজিত করিলেন, এবং যন্ত্রনির্ম্মাণ, বিষপ্রদান প্রভৃতি কার্য্যে কয়েকজন প্রণিধি প্রেরণ করিলেন এবং অন্যান্য অনেক নীতিকৌশল প্রয়োগ করিলেন।

অমাত্যরাক্ষসের এই সকল কৌশল দেখিয়া নীতিজ্ঞ চাণক্য ভীত হইলেন না, ক্রমে তাহা অন্যথা করিতে আরম্ভ করিলেন। চাণক্য প্রথমতঃ নিজ আজ্ঞাবহ অনুচরগণকে এবং কার্য্যনিপুণ চরদিগকে মলয়কেতু এবং রাক্ষসের নিকটে দাসত্ব স্বীকার করিতে প্রেরণ করিলেন। তাহারা সত্বরেই উভয়েরই অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য হইয়া উঠিল। অমাত্য রাক্ষস তাহাদিগের দ্বারা যে যে কার্য্য করিতেন,চাণক্য তৎসমস্ত জানিতে পারিতেন; অমাত্যরাক্ষস কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই, যে তাঁহার সেবকবর্গ চাণক্যের লোক এবং তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যুক্ত। কোন্ ব্যক্তি চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ এবং কোন্ ব্যক্তি বিপক্ষ, তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত চাণক্য নানাভাষাকুশল চরসকল নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাহারা ভিন্ন ভিন্ন বেশধারণ পূর্ব্বক নানাস্থানে ভ্রমণ করত তত্রত্য লোকদিগের আচারব্যবহার অবগত হইতেছিল এবং কুসুমপুরবাসী নন্দনরপতির অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবদিগের গূঢ় ব্যাপার ও উপায় নিপুণরূপে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষ তিনি রাক্ষসের বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগকে পর্য্যন্ত স্ববশে আনিলেন।

চাণক্য জানিতেন যে অমাত্যরাক্ষস

স্বার্থশূন্য, ভক্তিসহকারে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন এবং কি প্রকারে প্রভুর শ্রেয়ঃ হইবে তাহাই অনন্যচিত্তে চিন্তা করিতেন। অনেক লোকেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য সম্পৎশালী প্রভুকে সেবা করে; কিন্তু রাক্ষস সেরূপ ছিলেন না। চাণক্য বিবেচনা করিলেন যে রাক্ষসকে হস্তগত করিয়া চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করাইবার প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। রাক্ষসের বুদ্ধি, বিক্রম এবং ভক্তি, এই ত্রিবিধ গুণ ছিল বলিয়াই চাণক্য তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যাহাদিগের বুদ্ধি, বিক্রম ও ভক্তি এই তিন গুণ থাকে, তাহারাই প্রকৃত ভৃত্য এবং তাহাদের হইতেই স্বামীর সর্ব্বকালেই যথার্থ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং চাণক্য রাক্ষসকে হস্তগত করিতে যতদূর সাধ্য যত্ন করেন। প্রথমতঃ রাক্ষস ও মলয়কেতুর বিচ্ছেদ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত চাণক্য এক কৌশল করিলেন; রাক্ষসের নামমুদ্রা দ্বারা অঙ্কিত একখানি পত্র চন্দ্রগুপ্তের নিকটে প্রেরণ করিলেন, সেই পত্র পথিমধ্যে চাণক্যের প্রেরিত মলয়কেতুর বিশ্বস্ত সেবকদিগের দ্বারা ধৃত এবং মলয়কেতুর সমীপে আনীত হইল। তদ্দর্শনে রাক্ষসের প্রতি মলয়কেতুর সন্দেহ বদ্ধমূল হইলে তিনি অমাত্য রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া আনাইলেন। এবং তদ্বিষয়ক বিবিধ প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাক্ষস পত্রের মর্ম্ম কিছুই জানিতেন না, তিনি এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন; সুতরাং তিনি সদুত্তর প্রদানে অসমর্থ হইলেন। ইহাতে মুগ্ধবুদ্ধি মলয়কেতু রাক্ষসকে অপমানিত এবং স্বসকাশ হইতে দূরীভূত করিলেন। এবং চিত্রবর্ম্মা প্রভৃতি পাঁচজন মিত্ররাজকে মারিয়া ফেলিলেন। এই জন্য অপরাপর রাজারা "মলয়কেতু অতি অবিবেচক দুর্ব্বৃত্ত" ইহা বিবেচনা করিয়া, বিশেষতঃ ভয়বিহ্বল সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আপনাদিগের বিষয় সম্পত্তিরক্ষার নিমিত্ত মলয়কেতুর সেনানিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর ভদ্রভট, পুরুষদত্ত প্রভৃতি চাণক্যপ্রেরিত প্রধানপুরুষগণ মলয়কেতুকে বদ্ধ করিয়া ফেলিল। তৎপরে রাক্ষস দুঃখিতান্তঃকরণে কুসুমপুরে আগমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চাণক্য তাহা জানিতে পারিয়া আর একটী কৌশলপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে হস্তগত করিলেন। একদিন চন্দ্রগুপ্তের সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং আপনি অমাত্যরাক্ষসকে প্রণাম করিয়া যথাবিহিত বহুমানপুরঃসর চন্দ্রগুপ্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিতে বলিলেন। অমাত্যরাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে "বিজয়ী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এইরূপে রাক্ষস হস্তগত হইলে চাণক্য তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের সচিবকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন ক-

মাত্যরাক্ষস অগত্যা তাহাই করিতে স্বীকৃত হইলেন। তৎপশ্চাৎ চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সমীপে রাক্ষসের নানাবিধ সদ্‌গুণ বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্বের চিহ্নস্বরূপ শস্ত্রপ্রদান করিলেন। অমাত্যরাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের শস্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন, এমন সময়ে রাজপুরুষেরা মলয়কেতুকে হস্তপদে বদ্ধ করিয়া দ্বারদেশে স্থাপিত করিল। রাজপুরুষেরা কি করিতে হইবে এই বিষয় চাণক্যকে জিজ্ঞাসা করিলে, চাণক্য বলিলেন যে এক্ষণে অমাত্যরাক্ষস রাজকার্য্য করিবেন, সুতরাং তাঁহাকে নিবেদন কর। রাক্ষস তখন চন্দ্রগুপ্তকে বলিলেন, "রাজন্, তুমি ত জানই যে আমি মলয়কেতুর সহিত কিছুকাল বাস করিয়াছিলাম, অতএব ইহার প্রাণরক্ষা কর।" চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিলে, তিনি বলিলেন "চন্দ্রগুপ্ত, অমাত্যরাক্ষসের এই প্রথম প্রার্থনা রক্ষা করা উচিত।" তদনুসারে চন্দ্রগুপ্ত মলয়কেতুকে পৈতৃক রাজ্য প্রদান করিলেন এবং সম্মানের সহিত তাঁহাকে নিজ পৈতৃক রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত রাজের জীবনীর এই স্থানে মুদ্রারাক্ষস নামক নাটক শেষ হইয়াছে। এই নাটকে চাণক্যের বুদ্ধিচাতুরী এবং রাক্ষসের অকৃত্রিম প্রভুভক্তি অতি স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের জীবনীর শেষভাগ পুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বায়ুপুরাণে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল আটাইশ বৎসর নিরূপিত আছে। কুমারিকাখণ্ডে এবং অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্ত কলিযুগের ২৭৯০ বৎসরে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত নর্ম্মদাতীরস্থিত শুক্লতীর্থে গমন করেন। এক্ষণে কলিযুগের ৪৯৮২ অব্দ চলিতেছে। সুতরাং শুক্লতীর্থে গমন ৩১২ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে কলিযুগের ২৬৯০ বৎসর গত হইলে নন্দরাজ্য এবং তাহার একশত বৎসর পরে অর্থাৎ ২৭৯০ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য আরম্ভ হইবে। ইহা কুমারিকাখণ্ডের সময়নিরূপণের সহিত মিল হয়। স্কন্দপুরাণের বচন—

"ততোপি ত্রিসহস্রেষু দশাধিকশতত্রয়ে।
ভবিষ্যন্নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি॥"

অর্থাৎ তিনসহস্র বৎসরের তিনশত দশ বৎসর অবশিষ্ট থাকিতে নন্দরাজ্যের আরম্ভ। অনেকে "ত্রিসহস্রেষু" স্থানে "দ্বিসহস্রেষু" পাঠ করিয়া একসহস্র বৎসর পশ্চাতে ফেলেন। ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে মহানন্দীর পুত্র মহাপদ্মনন্দ এবং তাঁহার সুমাল্য প্রভৃতি অষ্ট পুত্র ছিল। এই মহাপদ্মনন্দ এবং তাঁহার পুত্রগণ একশত বৎসর পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন। ভাগবতের মতে ইহারা পরীক্ষিৎ নৃপ

তির জন্মের ১৫১০ বৎসর (এতদ্বর্ষসহস্রঞ্চ শতং পঞ্চ দশোত্তরং) পরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং একশত বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার মতে পরীক্ষিৎ কলিযুগের অশীতি অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং কলিযুগের ১৬৯০ অব্দে নন্দরাজ্য কাল। অতএব ১৭৯০ কলির অব্দে বা ১৩১২ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত সময়ের ঐক্য হয় না। প্রাচীন ভারতের কোন রাজার সময়নিরূপণ প্রায় অসম্ভব। তবে চন্দ্রগুপ্ত বিষয়ে যাহা কিছু পুরাণাদিতে পাওয়া গিয়াছে তাহা পাঠকমহাশয়কে উপহার দেওয়া গেল, তিনি ইহার ভিতর হইতে সারগ্রহণ করিবেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল চৌত্রিশ বর্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে। বৌদ্ধমতে চন্দ্রগুপ্ত ৩৯৬ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুরাণমতে তিনি ২৫ বৎসর নিরুপদ্রবে মগধরাজ্য শাসন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। কোন কোন মতে ২৯২ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চন্দ্রগুপ্ত নিজপ্রতাপ ভারতবর্ষের অনেকত্র বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে গ্রীক্ বা যবন-দিগকে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে তিনি দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণানদীর তটে চন্দ্রগুপ্তনগরী নামে এক নগরী সংস্থাপিত করেন। তত্রত্য লোকেরা চন্দ্রগুপ্তের ইতিহাস বিশেষরূপে অবগত আছে। মুদ্রারাক্ষসের রচয়িতা এবং টীকাকার উভয়েই তদ্দেশীয় লোক। যবনসেনানী সেলিউকস্ ভারতবর্ষে নিজ অধিকার পুনঃ প্রাপ্তির জন্য আর একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়েন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত স্বসৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে তাঁহার গতিরোধ করেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। মুদ্রারাক্ষসের শেষে যে যবন দিগের আক্রমণের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহা এই আক্রমণ। মগধরাজ্য পরাক্রান্ত না থাকিলে যবনহস্ত হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করা ভার হইত। চন্দ্রগুপ্তের সহিত যবনসেনাপতির সন্ধি ৩০২ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে প্রজাদিগের সুখস্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নতি হইয়াছিল। প্রকৃতিবর্গ মগধরাজ্যের শান্তিচ্ছায়াতে নির্ব্বিঘ্নে সুখে কালহরণ করিত, কোন উপদ্রব বা অত্যাচারের শঙ্কা ছিল না।

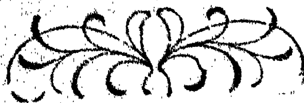
চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র নগর গঙ্গার উপকূলে স্থিত এবং পঞ্চক্রোশ দীর্ঘ ও একক্রোশ প্রস্থে বিস্তৃত ছিল। তৎকালে ইহা বাণিজ্যের একটী প্রধান স্থান ছিল। নদীর বক্ষে শত শত বণিক্‌পোত ভাসিতে দেখা যাইত। নগরের মধ্যে নানাশ্রেণীর কারু শিল্পকর বাস করিত এবং অগণ্য পণ্যবহুল বিপণি ও আপণমালা রাজপথের শোভাসম্পাদন করিত

হস্তিগণ অলঙ্কৃত সুচারু হাওদা পৃষ্ঠে করিয়া গম্ভীরপদবিক্ষেপ পূর্ব্বক রাজপথে ইতস্ততঃ বিচরণ ও যাতায়াত করিত। অশ্বারোহিগণ তুরঙ্গমপৃষ্ঠে বিচিত্রগতিতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিত। রাজা স্বয়ং রণক্ষেত্রে সেনাপতির কার্য্য এবং ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির কার্য্য করিতেন। চন্দ্রগুপ্ত অতিশয় রণকুশল সেনাপতি এবং অতি সুবিজ্ঞ বিচারক ছিলেন। তাঁহার চারিলক্ষ বেতনভোগী স্থির সৈন্য (standing army) ছিল। তিনি মৃগয়াশীল ছিলেন এবং শরাসনধারিণী যবনীগণপরিবৃত হইয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হইতেন। তাঁহার রাজ্যে সভ্যতার আলোক সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল। জাতিভেদ এবং পৈতৃকব্যবসায়ানুসরণপ্রথা সম্যক্ প্রচলিত ছিল। রাজ্যের নানাবিভাগে সুযোগ্য রাজপুরুষদিগেরদ্বারা সুচারুভাবে রাজ্যশাসনকার্য্য ও শান্তিবিধান সম্পাদিত হইত। প্রজাদিগের গৃহে সুখ শান্তি বিরাজমান ছিল। প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিত। বণিক্ ও শিল্পীরা রাজ্যের বিবিধপ্রকারে উন্নতিসাধন করিত। তাহারা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে স্বস্বকার্য্য করিতে অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া রাজাকে কর দিত। অধুনাতন ইংরেজরাজ্যে ব্যবসায়ীরা এবং শিল্পীরা আইনদ্বারা সুরক্ষিত হইয়া নিরাপদে স্বস্বকার্য্য করে বলিয়া রাজাকে কর দিয়া থাকে। অস্ত্রনির্ম্মাণ এবং পোতনির্ম্মাণের স্বতন্ত্র কার্য্যালয় ছিল এবং সেই সেই স্থানে অস্ত্রশস্ত্র ও পোত সকল নির্ম্মিত হইত। রাজা ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় সম্মানপ্রদর্শন করিতেন। প্রতিবৎসর তিনি ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া এক মহাসভা করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত রাজ্যের ও প্রজাদিগের উন্নতির উপায়চিন্তা করিতেন। চন্দ্রগুপ্ত চতুর্বিধ রাজবৃত্ত সম্যক্ সাধন করিতেন। ন্যায়ানুসারে অর্থোপার্জ্জন, সেই অর্থের বর্দ্ধন, তাহার রক্ষণ এবং সৎপ্রকারে তাহার ব্যয় এই চারিটী কার্য্যই তিনি উত্তমরূপে বুঝিতেন। চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধ ছিলেন না, হিন্দু ছিলেন। তাঁহার পৌত্র অশোক বৌদ্ধ হইয়াছিলেন এবং অনেক বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যসময়ে সমাজে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মত প্রচলিত হইয়া সমাজকে অল্পকাল পরে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিবার উপযোগী করিতেছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে এবং তাঁহার পুত্রপৌত্রের সময়ে মগধরাজ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও প্রবলপরাক্রান্ত হইয়াছিল। মগধরাজ্য হইতে ভারতবর্ষের কি উপকার হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা প্রস্তাব শেষ করিব।

যখন শাক্যসিংহ মগধে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন মগধ দুই চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিন্তু যখন আলেক্জাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন মগধ সাতিশয় উন্নত, সুসমৃদ্ধ ও প্রবল। এই দুইশত বা

আড়াইশত বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির সমবায় হইয়া মগধসাম্রাজ্যের উৎপত্তি হয়। কি কারণে এই রাজ্যসকল সমবেত হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ভারতবর্ষে যে রাজ্যের রাজা পরাক্রান্ত তাঁহার রাজ্যেই প্রজাদিগের সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। মগধসাম্রাজ্য অতি প্রবল পরাক্রান্ত ছিল বলিয়াই প্রজাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যও নিরাপদ ছিল। মগধরাজগণ পূর্ত্তাদিকার্য্যদ্বারা প্রজাদিগের সুখস্বচ্ছন্দতাবিধানে যত্নশীল ছিলেন। মগধরাজ্য তৎকালে ভারতবর্ষের প্রাণস্বরূপ হইয়াছিল। যখন সেকন্দর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন পঞ্চনদপ্রদেশের রাজগণ তাঁহার প্রতাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইল। কিন্তু মগধের গর্জ্জনে তাঁহার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল এবং তিনি আর পূর্ব্বদিকে না আসিয়া পঞ্চনদপ্রদেশ হইতেই স্বরাজ্যাভিমুখে প্রতিপ্রয়াণ করিলেন। কিছুদিন পরে আবার যখন সেকন্দরের অন্যতম সেনানী সেলিউকস ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখনও মগধ হইতে ভারতরক্ষা হয়। সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মগধ সাম্রাজ্য না থাকিলে বোধ হয়, ভারতবর্ষ কিছুদিন গ্রীকদিগের অধীনে থাকিত। মুদ্রারাক্ষসের শেষে যে যবনদিগের আক্রমণের কথা দৃষ্ট হয়, তাহা বোধ হয় সেলিউকসের আক্রমণের কথা। অতএব মগধ হইতে ভারতবর্ষের দুইটি প্রধান উপকার সাধিত হয়। একটি প্রকৃতিদিগের সুখস্বচ্ছন্দতাবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি। দ্বিতীয়টী ভারতবর্ষের বিদেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে রক্ষাসাধন। যতদিন মগধের বলবিক্রম বিদ্যমান্ ছিল, ততদিন আর কোন বহিঃশত্রু ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই। মগধরাজ্য হইতে আর একটী উপকার হইয়াছে। তাহা দাক্ষিণাত্যে আধিপত্যবিস্তার। ইহা অশোকরাজের সময়েই ঘটে। অশোক নৃপতির রাজ্যকালে দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান ও সিংহলদেশ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয় এবং তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণ মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কেরল, তৈলঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে পৌরাণিকমত প্রচার করেন। এইটি মগধসাম্রাজ্যের তৃতীয় উপকার। ইহার বিশেষ বিবরণ এ প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে বলিয়া আমরা অদ্য ইহার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম না। সময়ান্তরে ইহা বিবৃত করিবার অভিলাষ রহিল।

র স।



মাধবীলতা।

২০

পরদিবস প্রাতে মাতঙ্গিনী একজন বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বলিল, "আয়ি, আমার চাকুরীতে ইস্তফা—ঠাকুরাণী আমায় খুঁজিলে তাঁহারে বুঝাইয়া বলিও আমি চলিলাম।" বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি! তুই কোথায় চলিলি?"

মাত। তা এখনও ঠিক জানি না।

বৃদ্ধা। কেন চলিলি?

মাত। আর চাকুরী করিব না।

বৃদ্ধা। কি করে খাবি?

মাত। ঘটকালী করে।

বৃদ্ধা। ও আবার কি কথা? তা একটু থেকে যা, ঠাকুরাণী উঠিলে তাঁরে বলে যাস্।

মাত। তাঁরে বলা হবেনা।

বৃদ্ধা। কেন?

মাত। তাঁরে দেখিলে যাইতে পারিবনা।

বৃদ্ধা। তা তোর গিয়ে কাজ কি?

মাত। আমার কাজ আছে, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া মাতঙ্গিনী চলিয়া গেল। বৃদ্ধা একবার ডাকিয়া বলিল, "তোর পাওনা পাইয়াছিস?" মাতঙ্গিনী কোন উত্তর করিল না। বৃদ্ধা আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "মর! ছুঁড়ি পাগল হয়েছে না কি?"

মাতঙ্গিনী রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া একবার বাটীর দিকে ফিরিয়া চাহিল, সজলনয়নে মনে মনে বলিল, "মা নিদ্রা যাও,—নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও, এ দাসী তোমায় তোমার স্বামীর সিংহাসনে আবার বসাইবে।"

অপরাহ্নে মাতঙ্গিনী ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার মন্দিরাভিমুখে গেল। পথে দুই একটি পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহারা মাতঙ্গিনীর প্রতি বিস্মিতলোচনে চাহিল। মাতঙ্গিনীর মনে পড়িল, যে সে যুবতী; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অঞ্চল ধরিয়া মাথা নাড়িয়া সদর্পে চলিয়া গেল, মন্দিরের সম্মুখে পৌঁছিলে তিলার্দ্ধ ইতস্ততঃ না করিয়া প্রবেশ করিল; তথায় কেহ নাই দেখিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া কালীদহতটে ব্রহ্মচারীর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। সায়ংকাল উপস্থিত, ব্রহ্মচারী আসিলেন না। ক্রমে রাত্রি একপ্রহর অতীত হইল, তখনও ব্রহ্মচারীর দেখা নাই। মাতঙ্গিনী অন্ধকার দেখিয়া একবারমাত্র কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়াছিল, কিন্তু পরে সে চাঞ্চল্য আর রহিল না। কালীদহের সোপানে বসিয়া মন্দিরের প্রতি চাহিয়া রহিল। রাত্রি দুইপ্রহরের সময় ব্রহ্মচারী মন্দির হইতে বহির্গত

হইলেন দেখিয়া মাতঙ্গিনী কিঞ্চিৎ বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু সে দিকে মন না দিয়া নির্ভরচিত্তে ব্রহ্মচারীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, "ভিখারিণী।"

ব্রহ্ম। অসময়ে ভিক্ষার নিমিত্ত কেন? আর আমি নিজে ভিক্ষুক আমার নিকট ভিক্ষা কিরূপ?

মাত। আপনার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিতে গেলে বোধ হয় এই ঠিক সময়। আর আপনার নিকট কেবল মাত্র একটি পরিচয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

ব্রহ্ম। কি পরিচয়?

মাত। আপনি রাজজামাতাকে চিনিতেন?

ব্রহ্ম। না—কিন্তু সে পরিচয়ে তোমার কি প্রয়োজন?

মাত। রাজজামাতার নিবাস কোথায় ছিল আপনি জানেন?

ব্রহ্ম। জানি—তক্ষপুর।

মাত। রাজজামাতার নাম কি ছিল জানেন?

ব্রহ্ম। জানি—বিজয়রাজ। কিন্তু আর কোন কথার আমি উত্তর দিব না। তুমি বল, তোমার এ সকল কথায় কি প্রয়োজন?

মাত। আমি বিজয়রাজকে খুঁজিতে যাইব—তাহাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ব্রহ্ম। বিজয়রাজকে তোমার কি প্রয়োজন?

মাত। বিজয়রাজ আমার মাতার নিকট বহুকাল অবধি ঋণী আছেন, সেই ঋণ আদায় করিতে আমি তাঁহার নিকট যাইব।

ব্রহ্ম। কে তুমি?

মাত। আমি বিধবা—অনাথা।

ব্রহ্ম। কিন্তু যুবতী দেখিতেছি।

মাত। বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীর তাহা চিনিতে পারা উচিত হয় না।

ব্রহ্ম। এই অন্ধকারে একাকী যুবতীর প্রান্তরে আসা আরও উচিত হয় না।

মাত। বিপদ্‌গ্রস্তের সে বিচার থাকে না। অন্যেরও সে বিচার করা অন্যায়।

ব্রহ্ম। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কে?"

মাত। আমায় যাহা দেখিতেছেন, আমি তাহাই। ইহার অধিক পরিচয় আর আমার নাই।

ব্রহ্ম। বিজয়রাজকে তোমার মাতা যখন ঋণে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পরিচয় বিলক্ষণ আছে তবে তাঁহার পরিচয় দিতে তোমার আপত্তি কি?

মাত। কোন পরিচয় আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি আপনাকে ভক্তি করি, তাহাই আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার সহায়তা করিতে পারেন, আপনার ধর্ম্ম আছে; সহায়তা

না করেন, বলিয়া দিন তক্ষপুর কোন পথে যাইব।

ব্রহ্ম। বিজয়রাজের বহুকাল মৃত্যু হইয়াছে; তক্ষপুরে তুমি অনর্থক যাইবে।

মাত। তাঁর আর কে আছে।

ব্রহ্ম। এক ভাই আছে।

মাত। আপনি তাঁরে চিনেন? তিনি কিরূপ ব্যক্তি?

ব্রহ্ম। আমি চিনি, কিরূপ ব্যক্তি তাহা ঠিক বলিতে পারি না, তিনি এক্ষণে যুবা—আমরা বৃদ্ধ,যুবার কিম্বা যুবতীর চরিত্র অনুভব করিতে পারি না।

মাত। তাঁর দুই একটি কার্য্য যদি দেখিয়া থাকেন, আমায় বলুন, আমি অনুভব করিব।

ব্রহ্ম। আমি তক্ষপুরে অনেকদিন যাই নাই, যখন যাইতাম তখন ধনমদে তিনি উন্মত্ত ছিলেন। তাঁহার দাম্ভিকতা অতিশয় বলিয়া বোধ হইত। কোন রাজা, কি প্রজা, কি পণ্ডিত, কাহাকেও তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। এমন কি তাঁহার জন্মদাতাকেও তিনি লক্ষ্য করিতেন না। একদিন তাঁহার তাকিয়ায় লাথি মারিয়াছিলেন। আর পিতাকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছিলেন।

মাত। পিতাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন কি, বুঝিলাম না। তাঁহার পিতা রাজা ছিলেন, তাঁহাকে কিরূপ বরখাস্ত করিয়াছিলেন?

ব্রহ্ম। তাঁহার জন্মদাতা রাজা ছিলেন না। তিনি রাজার দেওয়ান্ ছিলেন। রাজা সেই দেওয়ানের পুত্রকে পোষ্যপুত্র লইয়াছিলেন। বিজয়রাজের ভাই এমনি কৃতঘ্ন যে রাজ্য পাইবামাত্রই দেওয়ানের দেওয়ানী কাড়িয়া লইলেন।

মাত। কেন, তাহা কিছু জানেন?

ব্রহ্ম। তাহা আমি ঠিক জানিনা, কাল মাহাত্ম্যে এসকল ঘটে।

মাত। এখন দেওয়ান্ কে?

ব্রহ্ম। বলিতে পারি না, তবে শুনিয়াছি যে বিজয়রাজের সময় যে সকল আমলা ছিল, তাঁহার ভাই তাহাদের সকলকে ডাকাইয়া নিজ নিজ কর্ম্ম দিয়াছেন আর তাঁহার জনকের নিয়োজিত সকল লোককে তাড়াইয়াছেন।

মাত। দুইটিই শুভ সম্বাদ, এখন তক্ষপুরের পথ বলিয়া দিন, আমি আমার ঋণ আদায় করিতে পারিব।

ব্রহ্ম। এই দুইটী পরিচয়েই তুমি কি বুঝিলে?

মাত। আমি এই বুঝিলাম যে বিজয়রাজের ভাই বুদ্ধিমান্—জনকের শঠতা বুঝিয়াছেন।

ব্রহ্ম। তাহা আমি ত কিছুই বুঝি নাই—ভাল, তুমি তক্ষপুরে যাইবে, তোমার সঙ্গে আর কে যাইবে?

মাত। আপনি যাইবেন।

ব্রহ্মচারী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু অন্ধকারে তাহার মুখ কিছুই দেখিতে

পাইলেন না। মাতঙ্গিনী আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মুহূর্ত্তেক মধ্যে মন্দিরপ্রবেশ করিয়া কমুণ্ডলু আনিয়া ব্রহ্মচারীর হাতে দিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি?"

মাতঙ্গিনী বলিল, "চলুন।"

ব্রহ্মচারী অবাক্ হইয়া আবার মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন; মাতঙ্গিনী বলিল, "ভাবিতেছেন কি? আপনাকে যাইতে হইবে। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার আর কেহ নাই যে আমার সঙ্গে যাইবে। আমি যুবতী, অন্যে আমার সঙ্গে গেলে ভাল দেখাইবে না, অতএব আপনি যাইবেন। আপনার এখানে থাকিয়া কি লাভ? কাহার উপকার করিবেন? আমার সঙ্গে গেলে আমার উপকার হইবে। অতএব চলুন।"

ব্রহ্ম। তোমার নাম কি?

মাত। আমার নাম "মাতঙ্গিনী।"

ব্রহ্ম। তোমার বড় সাহস।

মাত। বড় সাহস না হইলে বড় সহায় ধরিতে আসি নাই।

ব্রহ্ম। তুমি আমায় বড় আশ্চর্য্যান্বিত করিলে, তোমার মত স্ত্রীলোক কৈ আমি ত কখন দেখি নাই। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে তুমি তক্ষপুরে গিয়া কি কর তাহা আমি দেখি।

মাত। তবে চলুন।

ব্রহ্ম। আজি নহে।

মাত। আজিই। বিলম্ব হইলে আপনি যাইতে পারিবেন না। অন্ততঃ আজি যাত্রা করে কতকদূর গিয়া বিশ্রাম করিবেন।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, চল, দেখা যাউক, ইহার পর আর কি আছে।"

তাহার পর উভয়ে তক্ষপুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

২১

যে অপরাহ্ণে মাতঙ্গিনী ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিল, সেই অপরাহ্ণে পুঁটুর মার প্রতিবাসিনী পদ্ম, কেশবিন্যাস করিয়া, রক্তবস্ত্র পরিয়া, মুখখানি তৈলে মার্জ্জিত করিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন; এমত সময় দুইজন অশ্বারোহী পথ দিয়া বেগে অশ্বচালনা করিয়া গেল। পদ্ম তাহাদের দেখিয়া অতি চঞ্চল হইলেন, "এইবার আসিতেছেন" বলিয়া বস্ত্র যথাস্থানে ন্যস্ত করিয়া যেন অন্যমনস্কে বাহিরে আসিলেন, যেন কিছু হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহা খুঁজিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে পথিকদের প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অশ্বারোহীদের পর কোন শিবিকা বা লোকজন না দেখিয়া হতাশ্বাস হইয়া আবার যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যে অবধি পুঁটুর মার পরিচর্য্যায় রাজা দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই অবধি পদ্ম প্রায় প্রত্যহ অপরাহ্ণে এইরূপ বেশবিন্যাস করিয়া দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া পথের লোক দেখিতেন।

পদ্মের বয়স বিংশতি বৎসর কিন্তু দেখিলে ত্রিংশৎবর্ষীয়া প্রৌঢ়া বলিয়া বোধ হইত, শ্যামবর্ণা, বিপুলাঙ্গী, দীর্ঘনয়না, ভ্রূযুগ অতি স্থূল। পাড়ার যুবামহলে সুন্দরী বলিয়া পদ্মের পশার ছিল; কিন্তু পদ্ম দুশ্চরিত্রা বলিয়া তাহারা কখন সন্দেহ করিত না, অথচ পদ্ম ইদানীং মুখখানি তৈলমার্জ্জিত করিয়া দ্বারের অন্তরালে যে ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন,তাহা দেখিলে নিজ পাড়ার না হোক্, অপর পাড়ার যুবারা সন্দেহ করিলে করিতে পারিত।

পদ্ম যে কেন দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহা কেবল সোহাগী দাসী বুঝিয়াছিল। অশ্বারোহীর পশ্চাতে সোহাগী পথ দিয়া যাইতেছিল, পদ্মের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ঈষৎ হাসিল। তাহার হাসি দেখিয়া পদ্মের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ পদ্ম দ্বাররুদ্ধ করিয়া অন্তঃপুরে গেলেন, আর চারি পাঁচ দিবস সে দ্বারে আসিলেন না। সেই অবধি সোহাগীর প্রতি পদ্মের বিশেষ বীতরাগ জন্মিল। পাড়ার স্ত্রীলোকমধ্যে একদিন পুঁটুর মার কথা হইতেছিল, সকলেই তাহার নিন্দাবাদ করিতেছিল। পদ্ম বলিল, পুঁটুর মার কোন দোষ নাই, যত দোষ ঐ সোহাগী মাগীর। ঐ ত এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে; রাজা কি নিজে দেখিতে এসেছিলেন, ঐ মাগীই ত সন্ধান দিয়াছিল। ঐ ত দ্বারের পাশে ছুঁড়িকে সেদিন দাঁড় করে রেখে গিয়াছিল। আর একজন বলিল, তা নয় এ সেদিনকার ঘটনা নয়, অনেক দিন অবধি কপাল পুড়েছে, দেখ নাই মাধবীলতা ঠিক রাজার মত? আগে ত কখন মিন্সেকে দেখি নাই, এখন কাণায় বুঝিতে পারে যে, মাধবীর হাতের গড়ন, ঠোঁটের গড়ন, মুখের গড়ন ঠিক রাজার মত।

পদ্ম। আমরা যখন পুঁটুর মার কাছে আদর করে বলিতাম, তোর পুঁটু যেন রাজকুমারী, পুঁটুর মা তখন মুখ টিপে টিপে হাসিত; এখন বুঝিলাম কেন হাসিত, ছুঁড়ি এদিকে শান্ত দেখিতে পাই, ভিতরে এতখানা? ভাল! জিজ্ঞাসা করি মাধবীলতার পেটে এর পর যে ছেলে হবে সে কি রাজার ধন দৌলত পাবে?

প্রথম প্রতিবাসী। তা কেমন করে পাবে? মাধবীলতা ত রাণীর গর্ভের সন্তান নয়, ছেলে মেয়ে কি হলেই হয়, বিবাহ করা স্ত্রীর গর্ভে না হলে কি বিষয় পায়?

পদ্ম। তবে, পরে রাজার রাজ্য কে পাবে? লোকে বলে রাজকুমার কোন্ ভট্টাচার্য্যদের ছেলে, তাহারা নাকিতাদের ছেলে নিজে এনেছিল।

প্র, প্রতিবাসী। সে আবার কি কথা? তবে রাজা কি অন্যের ছেলে চুরি করে এনেছিলেন?

দ্বি, প্রতিবাসী। তিনি সকল পারেন, সকল করেন,চোখের উপর দেখিতেছ না

বৃদ্ধ বয়সে কি কাণ্ড করিলেন। বারে এক রোগে ধরে ক্রমে তারে সকল রোগে ঘেরে।

পদ্ম। তা এখন আমাদের পাড়ার পাড়া কপালির দশা কি হবে? লোকে যে বলিতেছে তারে নাকি পাড়া ছাড়া করে দেবে, এ কথা কি সত্য?

প্র, প্রতিবাসী। সত্য মিথ্যা কেমন করে জান্‌ব বোন্‌। রাজা যাহার সহায়, প্রজায় তাহার কি করিবে? তবে নাকি রামসেবককে সকলে ধরে একদিন লজ্জা দিবে। সকলে বলিবে যে তোমার কালামুখ, তোমার মুখ পুড়ে গেছে।

দ্বি, প্রতিবাসী। তায় আর লাভ কি? যা হবার তা হয়ে গেছে, রামসেবক গোবেচারা তারে মনোদুঃখ দিয়ে আর লাভ কি?

পদ্ম। লাভ আছে বই কি, রাম দাদা শাদা লোক, এ সকল কিছুই জানেন না, তাঁরে বলে দিলে ছুঁড়িকে লয়ে তিনি এখান হইতে দূরে যাবেন, তাহা হইলে পাড়ার কলঙ্ক যাবে।

সোহাগী এই সময় উপস্থিত থাকিলে বলিত, "পাড়ার কলঙ্ক যাক্‌ না যাক্‌ পদ্মের কণ্টক যাবে।" পুঁটুর মাকে পদ্ম বাস্তবিক কণ্টকস্বরূপ বিবেচনা করিতেন, পদ্ম জানিতেন যে, তিনি সুন্দরী, সৌভাগ্য পাড়ায় যাহা কিছু ঘটিবে তাহা তাঁহার ভিন্ন আর কাহারও সম্ভবে না। তিনি থাকিতে রাজার নজরে পুঁটুর মা পড়া অসঙ্গত হইয়াছে। তবে যে এ ঘটনা ঘটিয়াছে কেবল সোহাগীর অবিচারে, অতএব ভাবিলেন সোহাগী মরুক। কিন্তু আবার ভাবিলেন, পূর্ব্বে সোহাগীকে হস্তগত করিতে পারিলে, আজ আমারই অদৃষ্টে এই সকল সুখ ঘটিত। পুঁটুর মা চকথাকি আমায় বঞ্চিত করেছে।

পদ্মের মনে যেরূপ আলোচনা হইতেছিল, পাড়ার আরও দুই এক যুবতীর মনে সেইরূপ ভাব কিছু কিছু আসিয়াছিল। দুই একটি গৃহিণীরাও সেই মতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহাদের কন্যারা থাকিতে পুঁটুর মার অদৃষ্টে এই সৌভাগ্য উচিত হয় নাই, কাজেই পুঁটুর মার প্রতি তাহাদের সকলেরই বিষদৃষ্টি জন্মিয়াছিল। এই সকল গৃহিণীরাই পুঁটুর মার কলঙ্ক রটাইয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে রামসেবককে লজ্জা দিবার বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিল।

পদ্ম বলিল, আমার ইচ্ছা হয়, আমি গিয়ে একবার কালামুখীকে দুকথা শুনাইয়া আসি। আমি এই ভাবি, তার মুখে ভাত উঠে কেমন করে।

পদ্মের মা। তোর সে সকল কথায় কাজ কি, তোর কি মাথা ব্যথা পড়িল যে, তুই দুকথা শুনাতে যাবি।

পদ্ম। আমার যে সহ্য হয় না।

বাস্তবিক পদ্মের অসহ্য হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় মাতাকে লুকাইয়া পদ্ম পুঁটুর মার খড়কীদ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন, পুঁটুর মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওলো

কালামুখী একটা কথা বলি শুনে যাতো।” এই আহ্বানে পুঁটুরমা পরমাপ্যায়িত হইয়া হাসি হাসিমুখে পদ্মের নিকট গেলেন। অনেক দিনের পর পদ্মের সহিত সাক্ষাৎ, ভাবিলেন পদ্ম তাঁহাকে কতই মিষ্ট কথা বলিবে, তাঁহার জন্য কতই আহ্লাদ করিবে, তাহাই হয় ত পদ্ম এই সময়ে একা আসিয়াছে। পুঁটুর মা আরও ভাবিলেন যে, আমার এত বস্ত্র, এত অলঙ্কার ত আবশ্যক নাই; ইহার কতক পদ্ম পরিলে তাহাকে কতই সুন্দর দেখাবে, অতএব এই সময় তাহাকে ডাকিয়া চুপি চুপি কছু দিই; চুপি চুপি বা কেন, আমি দিলে কে রাগ করিবে? তিনি (স্বামী) দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যের দিকে ত একবার ফিরিয়াও চান না; তবে কেন তিনি রাগ করিবেন। সোহাগীই বা কেন বকিবে? তার কি ক্ষতি? হয় ত সে রাণীকে বলে দিবে, তা আমি তার হাতে ধরে তখন বারণ করিব।

এই ভাবিতে ভাবিতে পুঁটুর মা পুষ্করিণীর কূলে পদ্মের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। পদ্ম বলিলেন, “ওলো কালামুখী, বল দেখি, বুড়া রাজার মন কেমন করে ভুলালি?”

পুঁটুর মা। আমি ভুলাই নাই, পুঁটু ভুলাইয়াছে।

পদ্ম। তা বই কি! এরেই বলে পোড়ারমুখে পোয়াতি বত্তায়। হা কালামুখী! তোর মরণের কি আর জায়গা ছিল না; হয় ত বল্‌বি নইলে এ ধন দৌলত কোথা হইতে আসিত। তা অমন ধন কড়ির গলায় দড়ি, অমন কাপড় পরার গলায় দড়ি, অমন গহনা পরার গলায় দড়ি, ধিক্ তোরে, ছার কপালী!

পুঁটুর মা। কেন ঠাকুর ঝি, আমি কি করিলাম?

পদ্ম। আহা কিছু জানেন না, আবার বলেন কি করিলাম, রাজা তোরে এত ভালবাসে কেন, তোরে এত গহনাপাতি দেয় কেন, আর কাহাকেও দেয় না কেন?

পুঁটুর মা। আমি পুঁটুর মা বলে আমায় রাজা এই সকল দিয়াছেন, তিনি পুঁটুকে বড় ভালবেসেছেন।

পদ্ম। বলি, রাজা আর কাহারও পুঁটুকে ভালবাসেন না কেন, ছেলে মেয়ে ত আর অনেকের আছে। এ সকল কি ঢাকা থাকে? না বুঝিতে বাকি থাকে?

পুঁটুর মা। কি ঠাকুরঝি, তবে বল না রাজা আমায় কেন ভালবাসেন?

পদ্ম। আ মরি নেকি, কিছু জানেন না।

পুঁটুর মা। না সত্য বলিতেছি কই আমি ত কিছু জানি না।

পদ্ম। যখন দাদা তোর গলায় বঁটি দিবেন তখন ত বলিতে পারবিনে যে আমি কিছুই জানি না।

পুঁটুর মা। তোমার পায়ে ধরি ঠাকুরঝি

আমায় বলে দেও। আমি জানিনা এই জন্য এখন আমার বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল।

পদ্ম। তবে বলে দিব? একান্ত বলিতে হবে—না বলিলে তুমি মানিবে না? (কর্ণে দুই তিনটি কথা)

পুঁটুর মা তাহা শুনিয়া অবাক্ হয়ে পদ্মের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, পদ্ম চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "এখন টের পাও গহনা পরা কেমন সুখের।"

২২

পরদিবস প্রাতে রাজা অন্তঃপুর হইতে বহির্ব্বাটীতে যাইতে যাইতে একস্থানে দাঁড়াইলেন; একজন দাসীকে বলিলেন, "জ্যোৎস্নাবতীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে।" দাসী তৎক্ষণাৎ রাজভগিনীর মহলে প্রবেশ করিল। রাজা যষ্টির দ্বারা ভূপতিত একটি বিল্বপত্র নাড়িতে লাগিলেন, আর আপনা আপনি অস্ফুটস্বরে দুই একটি কথা বলিতে লাগিলেন। এমতসময় রাজভগিনী আসিয়া প্রণাম করিলেন, এবং নতশিরে একপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা বলিলেন, "দেখ দেখি, কি অন্যায়!" জ্যোৎস্নাবতীর ভয় হইল; ভাবিলেন, রাণীর প্রতিনিধিস্বরূপ রাজা স্বয়ং তাঁহাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছেন।

অনন্তরে রাজা আবার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বড় অন্যায়, বড় অসঙ্গত, কে এখানে বিল্বপত্র ফেলিয়া গিয়াছে, হয় ত এই বিল্বপত্রে আমি পূজা করে থাকিব।" এই বলিবামাত্র জ্যোৎস্নাবতী সযত্নে বিল্বপত্রটি তুলিয়া লইলেন; রাজা বলিলেন, "দেখ, যেন ভাল জায়গায় বিল্বপত্রটী ফেলা হয়। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি উত্তর দাও?" এই বলিয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন; জ্যোৎস্নাবতী কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বল? আমি ত সে সময় ছিলাম না।" জ্যোৎস্নাবতী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ সময়?"

রাজা। যে সময় রাণী প্রসব হন।

জ্যোৎ। আজ্ঞা করুন। সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম।

রাজা। রাণী কি সন্তান প্রসব করেন?

জ্যোৎ। এক মৃতকন্যা প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিয়াছিলাম।

তার পর রাজা আর কোন কথাই না শুনিয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন; জ্যোৎস্নাবতী বলিতে লাগিলেন, "এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ কথা আছে।" রাজা তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না, সভায় গিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্যেরা যে কথা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; রাজকুমার আমার পুত্র নহেন। রাণী মৃতকন্যা প্রসব করিয়াছিলেন, আমি বিশেষ করিয়া তদন্ত করায় সকল কথা

জানিতে পারিয়াছি; অদ্য ভট্টাচার্য্যদিগের আসিবার কথা আছে—এখনই আসিবেন; আমার ইচ্ছা যে ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র লই।"

এই কথা শুনিবামাত্র সভাসদ্ সকলে বিমর্ষ হইলেন। দেওয়ান্ মহাশয় ভ্রূকুটী করিয়া একবার রাজার দিকে কটাক্ষ করিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

এই সময় পিতম পাগলা আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না দেখিয়া সে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া একবার রাজার দিকে, একবার দেওয়ানের দিকে, একবার চূড়াধনের দিকে চাহিল; কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইবে কি অপেক্ষা করিবে ভাবিতেছিল, এমতসময় রাজা বলিলেন, "পিতম, আমার দশা এখন তোমারই মত হইল।"

পিতম দেওয়ান্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

দেওয়ান্ কোন উত্তর দিলেন না। একজন সভাসদ বলিলেন,

"রাজকুমার ভট্টাচার্য্যদিগের পুত্র প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।"

শুনিবা মাত্র পিতম হাসিয়া রাজার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার মত রাজা দুই একটি দেখেছি, কিন্তু এমন অকর্ম্মা দেওয়ান্ আমি কখন দেখি নাই।"

দেওয়ান্‌জীর কর্ণে শেষ কথাটি গেল। দেওয়ান্ আপনা আপনি বলিলেন, "আমি সত্যই অকর্ম্মা দেওয়ান্।"

রাজা। এ সকল কথা যাক্, এখন কি কর্ত্তব্য তোমরা আমায় পরামর্শ দাও। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

পিতম। পরামর্শ আপনি এখন কেবল চূড়াধনবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন। চূড়াধনবাবু বড় পরামর্শী। চূড়াধনবাবু ভুবনেশ্বরের পরামর্শী।

এই কথা শুনিবামাত্রই চূড়াধনবাবু কলের পুত্তলীর ন্যায় সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেওয়ান্ চূড়াধনবাবুর প্রতি একবার কটাক্ষ করিয়া পিতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি রূপ?"

পিতম। আমার মনে নাই।

এই বলিয়া পিতম চলিয়া গেল। কতকদূর গেলে একটা কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড় আসিয়া পিতমের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল; পিতম ষাঁড়কে জিজ্ঞাসা করিল, "ভৈরব, কেমন আছ?" ষাঁড় মুখ তুলিয়া মাথা নাড়িল, অল্প অগ্রসর হইয়া পিতমের স্কন্ধের দিকে গলা বাড়াইয়া দিল; পিতম যত্নে তাহার গলায় হস্তমার্জ্জনা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ভৈরব, তোমার উদরের সংবাদ বল, তুমি ত আমার মত উদরপরায়ণ লোক, বল দেখি গত কল্য কি জুটিয়াছিল? আমার মত বৃক্ষতলে পড়িয়া কি কেবল দন্তঘর্ষণ করিয়াছিলে? তোমার বড় দোষ, কেহ তোমায় না ডাকিলে তুমি খাও না। লোকে তোমায় কেন ডাকিবে? কে তুমি? লোকের

তোমায় কি দরকার ? তোমার বিরাট-মূর্ত্তিতে কে ভুলিবে ? তোমার কোমলতা কে দাঁড়াইয়া দেখিবে ? তোমার এই প্রস্তরস্তূপে নবপল্লবের কোমলতা চিনিয়া কে তোমায় বাহবা দিবে ; তুমি আমার নিরেট মেষ, তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি একবার স্নান করে আসি।” এই বলিয়া পিতম আপনার ঝুলি ভৈরবের শৃঙ্গে ঝুলাইয়া গাত্রবস্ত্র তাহার পৃষ্ঠে ফেলিয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীতে নামিল। এই সময় অনেক ছেলে আসিয়া জুটিল ; তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া ভৈরবকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, ভৈরব “ছালনা তলার” বরপাত্রের ন্যায় গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহাদের কোন কথা গ্রাহ্য করিল না। পিতম আসিলে তাহার জলসিক্ত অঙ্গ দেখিয়া ভৈরব পিতমের গাত্রলেহন করিতে আরম্ভ করিল। বালকেরা হাসিয়া বলিল, “পিতম, তোমায় ভৈরব বৎস ভাবিয়া আদর করিতেছে ?” পিতম হাসিয়া উত্তর করিল, “আর আমায় কে আদর করিবে ?” ছেলেরা সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, “আমরা আদর করিব।” এই বলিয়া সকলেই পিতমকে ঘেরিয়া ধরিল, কেহ হস্তে, কেহ অঙ্গুদেশে, কেহ পৃষ্ঠদেশে চুম্বন করিতে লাগিল। ভৈরব তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

এই সময় দুই চারিজন প্রতিবাসী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা দূরে দশরথ ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া রাজপুত্রের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিল। ক্রমে পিতমকে একজন জিজ্ঞাসা করিল, “সত্যই কি রাজকুমার দশরথ শর্ম্মার পুত্র ?” পিতম বলিল, “দশরথের পুত্র রাম। অনেক দিন তিনি বনে গেছেন।”

প্রথম প্রতিবাসী। পিতম, আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তুমি এখন রাজবাটীতে গিয়া থাক—কি শুনিতে পাও ? এ রাম দশরথের পুত্র কি ?—না সে কথা মিথ্যা ?

পিতম। সে কথা ভুবনেশ্বর বলিতে পারেন, সে দিন রাত্রে তাঁহার মন্দিরে বসে কথা হয়। তাহা শুনিয়া খোদ পাষাণ ভুবনেশ্বর দশরথকে বারণ করিলেন ; বলিলেন, “চূড়াধনের কথা শুনিস্ না।”

এই শুনিবামাত্র একজন বালক গাইয়া উঠিল, “ভুবনেশ্বর কথা কয়। ছেলে দশরথের নয়।” সকলে হাসিয়া বলিল, “বেশ্ বেশ্।” অমনি আর সকল বালকেরা নৃত্য করিতে করিতে একত্রে গাইতে লাগিল :—

ভুবনেশ্বর কথা কয়।
ছেলে দশরথের নয়॥

দশরথ তাহা দূর হইতে শুনিতে পাইয়া তাঁহার সঙ্গীদের মুখপ্রতি চাহিলেন ; ছেলেরা সেইদিকে গাইতে গাইতে যাইতে লাগিল ; দশরথ তাহাদিগকে চীৎকার করিয়া গালি দিলেন”

"এত বড় মজার খেলান" বলিয়া বালকেরা অধিকতর আনন্দে হাসিয়া হাসিয়া আরও গাইতে লাগিল; শেষ দশরথ হস্তে ইষ্টক লইলেন। তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন; তিনি শুনিলেন না দেখিয়া অগত্যা তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যেখানে প্রতিবাসীরা দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছিল, সেই দিকে চলিলেন।

পিতম যাহা বলিয়া গিয়াছিল, তাহাতে সকলে স্থির করিয়াছিল যে দশরথের দাবি মিথ্যা, প্রথম যখন দশরথ দাবি উপস্থিত করেন, উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলে তাহাতে আহ্লাদিত হইয়াছিল; রাজার চরিত্রসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপলক্ষ পাইয়া কতই কথা, কতই পরামর্শ, কতই নিন্দা করিয়াছিল। নিন্দা এ সংসারে পরম সুখ; দশরথের দাবি উপলক্ষে সে সুখভোগ হইয়া গিয়াছে, আর তাহাতে রস নাই, তখন নিন্দার স্রোত ফিরিবার সময় হইয়াছে, কাজেই প্রতিবাসীরা যখন দশরথের দাবি মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ করিবার উপলক্ষ পাইল, আবার তাহারা চরিতার্থ হইল, একজন তখন বলিল, "ঠিক কথা, এমন কি কখন হইতে পারে? রাজা কেন পরের ছেলে চুরি করে আনিবেন? তাঁহার পুত্র না হইলে তিনি অনায়াসে পোষ্যপুত্র লইতেন; তাঁহার কিসের দুঃখ? দেশে এত ছেলে থাকিতে তিনি কেন লক্ষীছাড়া দশরথের পুত্র লইতে যাইবেন। আমাদের ছেলে হয় ত সে স্বতন্ত্র কথা। এ মিথ্যা দাবি বোধ হয়। টাকা পাইবার প্রত্যাশায় দশরথ এই দাবি সাজাইয়াছে।"

দ্বি, প্রতি। তাহার আর সন্দেহ নাই, নতুবা পিতম এ কথা বলিবে কেন? পিতম ত পাগল নহে, পিতম সিদ্ধপুরুষ; কেবল ঠাট করে ফেরে— যেন কতই পাগল, কিন্তু কিছুই নয়— সকল জানে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরে রাত্রে কি হয়েছিল তাহা পর্য্যন্ত জানে।

তৃতীয় প্রতিবাসী। পিতম কি বলিল, আমি বুঝিতে পারিলাম না।

প্র, প্রতি। বুঝিতে পারিলে না? চূড়াধনবাবু দশরথকে কিছু টাকার লোভ দেখাইয়া এই কার্য্যে নামাইয়াছেন। রাজকুমার যদি দশরথের সন্তান বলিয়া জনরব থাকে, তাহা হইলে রাজার অবর্ত্তমানে চূড়াধনবাবু রাজ্য পাইবেন।

চতুর্থ প্রতি। সেই দেড়ো কটাচুলো হারামজাদা! তার আমি হাড় ভাঙ্গিব—

এমত সময় দশরথের সঙ্গীরা উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপারখানা কি, ছেলেরা এ কি বলে?"

প্র, প্রতি। যাহা সত্য, তাহাই বলে।

চতুর্থ, প্রতি। দশরথ শর্ম্মাকে সঙ্গে করে একবার রাজবাটীতে যাও, আপনা জানিতে পারে দেখিতেও পারে। চূড়াধনবাবু ধরা পড়েছেন, দশরথকে ধরিবে

সিপাহী এখনই যাইবে; কিন্তু ঐ দেখিতেছি তিনি আপনিই ধরা দিতে আসিতেছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে রাত্রে যে পরামর্শ হয়ে ছিল, তাহা এখন প্রকাশ হয়েছে।

দশরথ এই সময় উপস্থিত হইলে তাঁহার সঙ্গীরা বলিল, "দশরথ, এই সকল ভদ্র লোকে কি বলিতেছেন, শুন। তুমি কি একদিন রাত্রে ভুবনেশ্বরের মন্দিরে গিয়া চূড়াধনবাবুর পরামর্শ মতে এই মিথ্যা দাবী উপস্থিত করে ছিলে? তাহা হইলে এই সময় বল, আমাদের আর কেন মজাও, একথা রাজসভায় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।"

দশরথ চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। সকলের মুখপ্রতি চাহিলেন, শেষ পলায়ন-উন্মুখ। এই সময় একজন প্রতিবাসী বলিল, "সে গুড়ে বালি! সিপাহীরা আগতপ্রায়।"

দশরথ। আপনাদের সাক্ষাতে বলিতেছি আমি এক পয়সা লই নাই; আমি ত টাকার প্রত্যাশী নই?

এই সময় একজন বালক বলিল, "ঐ সিপাহী আসিতেছে।" দশরথ আর ফিরিয়া চাহিলেন না, পলাইলেন।

২৩

দশরথ পলাইলে পর এই সকল ব্যক্তি একত্রিত হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। যে অধ্যাপক পূর্ব্বে দশরথের পক্ষ হইয়া দেওয়ানকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করিয়াছিলেন, তিনি অগ্রসর হইয়া যোড়করে রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের অপরাধ হইয়াছে, দশরথ বাচস্পতি শোকবিহ্বল হইয়া কেবল পরের পরামর্শে রাজকুমারকে দাবি করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যে পরামর্শ হয়, তাহা এক্ষণে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, আমরা সে পরামর্শের কথা পূর্ব্বে শুনি নাই; তাহা হইলে কদাচ দশরথের সঙ্গে আমরা আসিতাম না। দশরথ এক্ষণে পলাইয়াছেন, তিনি নিতান্ত পরের পরামর্শে এই কুকার্য্য করিয়াছেন; অতএব আমাদের একান্ত প্রার্থনা যে সে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আপনি ক্ষমা করেন। তাহার অপরাধ গুরুতর নহে, যিনি তাঁহাকে লওয়াইয়াছেন, তিনিই প্রধান অপরাধী।"

রাজা কথা কহিবার পূর্ব্বেই দেওয়ান্ বলিলেন, "যিনি প্রধান অপরাধী তাহা আমরা জানিয়াছি, এক্ষণে আপনারা বিদায় হউন।"

ভট্টাচার্য্যেরা বিদায় হইলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে মৃতকন্যার কথাটা কি, আমি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।"

দেওয়ান্। এখনই বুঝিতে পারিবেন, আমি রাধিবাইকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি। আমার ইচ্ছা যে রাজদাসীদের ডাকিয়া এই রাজসভায় সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয়।

রাজা। আবশ্যক নাই, আমি স্বয়ং তাহাদের জিজ্ঞাসা করে আসিতেছি।

রাজা উঠিয়া গেলে,চূড়াধনবাবু বিমর্ষ-মুখে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "পিতম পাগল বিলক্ষণ ধূর্ত্ত, এক কথা রটাইয়া দশরথ বাচস্পতিকে ভাল ভয় দেখাইয়াছে। নিশ্চয় পিতম পাগল দশরথকে পথ হইতেই তাড়াইয়াছে।"

দেও। সম্ভব। পিতম ধূর্ত্ত না হইলে ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যে যে ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম রাজসভায় বলিয়া ফেলিত।

চূড়াধন। যেখানে আপনার মত দেওয়ান্ উপস্থিত, সেখানে পাগলেরও বিজ্ঞতা জন্মে।

দেও। যেখানে আপনার মত ব্যক্তি থাকে, সেখানে বিজ্ঞতা আবশ্যক, তাহা না হইলে বিয়াদবি হয়।

এই সময় একজন নকিব আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "সভা বরখাস্ত, রাজা বাহাদুর অসুস্থ হইয়াছেন।"

সভাভঙ্গ হইলে রাজা অন্দর হইতে আসিয়া এক নির্জ্জন ঘরে অতি বিমর্ষভাবে বসিলেন। তৎক্ষণাৎ ঘরের দ্বার রুদ্ধ হইল। রাণীর মহলে গিয়া রাজা বড় যন্ত্রণায় পড়িয়াছিলেন। রাণীকে মৃত কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ফণিনীর ন্যায় মাথা তুলিয়া রাজার প্রতি খর দৃষ্টিপাত করিলেন। রাজা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "অদ্য প্রাতে জ্যোৎস্নাবতী আমায় বলিয়াছিলেন যে, তুমি এক মৃতকন্যা প্রসব করিয়াছিলে; তাহাই আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।" এই কথা শুনিবামাত্র রাণী অতি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "জ্যোৎস্নাবতী আমার পরম শত্রু; সেই প্রথমে রটাইয়াছে যে, রাজকুমার আমার সন্তান নহে। তাহারই বলে ভট্টাচার্য্যেরা আসিয়াছিল। আপনার ভগিনী নিজের সংসার জ্বালাইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে আমার সংসার শ্মশান করিতে বসিয়াছে। তাহাকে দুশ্চরিত্রা বলে একবার তাহার শ্বশুর তাড়াইয়াছে, এবার আমি তাড়াইব। আপনি তাড়াইতে না দেন, আমি নিজে সংসার ত্যাগ করে যাব, আপনি ভগিনী লয়ে রাজ্য করুন।"

রাজা। স্থির হও, আমার বলিতে ভুল হইয়াছে, হয় ত ভুলে আমি জ্যোৎস্নাবতীর নাম করিয়াছি।

রাণী। আমি আর সে সকল স্তোকবাক্য শুনিতে চাই না। এখনই পাল্কী আনিতে পাঠান, হয় তাহাতে জ্যোৎস্নাবতী উঠিবে, নতুবা আমি উঠিব।

এই বলিয়া রাণী বেগে জ্যোৎস্নাবতীর মহলে গেলেন। রাজা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বহির্ব্বাটীতে গিয়া বসিয়া রহিলেন।

অপরাহ্নে একজন পরিচারিকা সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া বলিল, "রাজভগিনী রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথ-

থায় গেলেন?" পরিচারিকা উত্তর করিল, "জানি না।" রাজা উত্তরীয়দ্বারা চক্ষু আবৃত করিলেন। পরিচারিকা চলিয়া গেল।

পরদিবস প্রাতে রাজসভায় সকলে বিমর্ষভাবে উপবিষ্ট আছেন, রাজা অন্যমনস্কে কি ভাবিতেছেন, এমতসময় কতকগুলি শিবিকাবাহক আসিয়া জানাইল, "রাজভগিনী কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে শিবিকা ত্যাগ করে পদব্রজে গেলেন, আমরা এত মিনতি করিলাম, তিনি শুনিলেন না; বলিলেন, আর আমার পাল্কীর প্রয়োজন কি? এখন আমি কাঙ্গালিনী।"

শুনিবামাত্র রাজা গাত্রোত্থান করিলেন; পিতম পাগলা অন্যমনস্কে দূরে বসে ছিল, উঠিয়া গেল; এই সময় দেওয়ান্ মহাশয়কে একজন জানাইল যে রামিধাই উপস্থিত। রামি প্রণাম করিয়া যোড়করে দাঁড়াইল; রাজা কক্ষান্তরে যাইতেছিলেন, রামি ধাইকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণীর কি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল?"

রামি ধাই। প্রথমে এক কন্যা।

রাজা। তবে কি রাজকুমার রাণীর গর্ভে জন্মে নাই?

রামি ধাই। রাজকুমারও আপনার সন্তান; প্রথমে কন্যা জন্মে, পরে রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হন। রাণী তখন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন, কন্যাটি জন্মিলে মৃত মনে করে আমরা তাহার সৎকার করিতে যাই, সেই সময় কোথা হইতে পিতম পাগলা আসিয়া তাহাকে লইয়া পলাইল; রাত্রে একটি ব্রাহ্মণের কন্যা সেই ভূমিষ্ঠ হইয়াই মরে, তাহার জননী সেই মৃত সন্তান ক্রোড়ে করে শুইয়া থাকে। কন্যাটি মরিয়াছে এ কথা বলিলে, অমনি কন্যাকে ক্রোড়ে টানিয়া চুমা খায়। সে ঘুমাইলে পিতম পাগলা তাহার ক্রোড় হইতে মৃতকন্যা চুরি করে মহারাজের কন্যাকে তাহার ক্রোড়ে রাখিয়া আসে। সেই ক্রোড়ে আপনার কন্যা জীবিতা হয়—অদ্যাপি জীবিতা আছে, আমরা ভয়ে এ কথা এপর্য্যন্ত বলিতে পারি নাই। এক্ষণে রাজভগিনী এসকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছেন, কাজেই বলিতে হইল।

রাজা। এ কি কাণ্ড শুনি!

দেও। অসম্ভব নহে; কিন্তু রামি বলিতেছে যে, মহারাজের মৃতকন্যা ব্রাহ্মণীর ক্রোড়ে দিয়া পিতম সেই ব্রাহ্মণীর মৃতকন্যা উঠাইয়া লয়, এ কথার তাৎপর্য্য ভাল বুঝিতে পারিতেছি না, পিতমকে একবার এই সময় ডাকিলে ভাল হয়।

রাজা। এখনই ডাকিতে পাঠাও; কিন্তু তাহার নিকট সরল উত্তর পাওয়া যায়।

রামি ধাই। পিতম পাগলা যখন ভূমি হইতে মৃতদেহ উঠাইয়া লইয়া পলাইল, আমরা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, সর্ব্বনাশ হইল, পাগলা হয় ত পিশাচ, সকলই

করিতে পারে। তাহার পর যখন পিতম মৃতদেহ লইয়া পুষ্করিণীতে নামিল, তখন আরও ভয় হইল। আমরা পলাইলাম, ভয়ে আর এ কথা মুখে আনি নাই। তাহার পর আমার ভগিনীর কাছে সকল বৃত্তান্ত শুনিলাম। যখন পিতম ব্রাহ্মণীর সূতিকাগারে প্রবেশ করে, তখন আমার ভগিনী হারাধাই জাগ্রত ছিল, তাহাকে পিতম বলিল, "কোন কথা প্রকাশ করিস্ না তোর ভাল হবে।" তাহার পর যখন পিতম ব্রাহ্মণের মৃতকন্যা লইয়া গেল, তখন মহারাজের কন্যা কাঁদিয়া উঠিল। আমার ভগিনী উঠিয়া কন্যাকে দুগ্ধ খাওয়াইতে লাগিল।

রাজা। তবে তোমার ভগিনীকে ডাকিতে পাঠাও। পিতম কই?

একজন পরিচারক বলিল, "পিতম ঐ আসিয়াছে।"

রাজা। পিতম,তুমি আমার কন্যাকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ?

পিতম। আপনার ভগিনীকে আপনি কোথায় পাঠাইয়াছেন? মরা কন্যার সম্বাদ লওয়া অপেক্ষা জীবিত ভগিনীর তত্ত্ব করা ভাল।

রাজার চক্ষে জল আসিল। চক্ষু মুছিয়া দেওয়ানকে বলিলেন, "উদ্যোগ করিতে বল, জ্যোৎস্নাবতীর সন্ধানে আমি স্বয়ং যাইব। সে পদব্রজে কোথায় বনে বনে বেড়াইতেছে; আমিও পদব্রজে তাহার অনুসন্ধানে যাইব। আমার ভগিনী এত কষ্ট পাইতেছে, আমি কি বলে পাল্কী চড়িব।"

দেও। পিতম, তোমায় যাহা জিজ্ঞাসা করি, স্পষ্ট উত্তর দাও; এ সময় পাগলামি কর না।

পিতম। পাগলের পাগলামি আছেই, পাগলের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। চূড়াধনবাবু কোথা, তাঁহাকে যে আজ বড় দেখিতেছি না।

রাজা। এখন আমার কন্যার সম্বাদ বল।

পিতম। আপনি কোন্ কন্যার কথা বলিতেছেন?

রামি ধাই। যে কন্যা মরিয়াছে মনে করিয়া আমরা মাটীতে পুতিতেছিলাম, তুমি দৌড়িয়া আসিয়া লয়ে গেলে।

পিতম। কবে? আমার মনে নাই।

রামি ধাই। ঐ আমার ভগিনী আসিয়াছে। উহার নিকট সকল শুনুন, বল্ ত না—এখন পিতম বলিতেছে কিছু মনে নাই।

হারা ধাই। মনে করে কি হবে, সে কন্যা ত আর এখানে নাই।

রাজা। কেন?

রামি ধাই। পাড়ার লোকেরা ব্রাহ্মণীকে ইদানীং বড় জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শেষ তিনি মেয়েটী লয়ে দেশত্যাগী হয়েছেন।

রাজা। কাহার বাটীতে আমার কন্যা প্রতিপালিত হইত?

পিতম। আপনার রামসেবকের বাটীতে।

রাজা। তবে নিশ্চয়ই মাধবীলতা আমার কন্যা।

বঙ্গদর্শন।

সপ্তমবৎসর।

৮৩ সংখ্যা।

জোসেফ্ ম্যাট্সিনি।*

মিলের জীবনীলেখক ম্যাট্সিনির জীবনী লিখিয়াছেন। মিলের উদারচিন্তা যে সমস্ত উদারভাব উদ্ভাবিত করিয়াছিল তাহা তিনি সুন্দরভাবে বিবৃত করিলেন। সে সমস্ত ভাবের ভিত্তি প্রোথিত করিলেন। তাহাদিগের উদারতা ও যুক্তি বিশদরূপে প্রদর্শন করিলেন। সেই উদারভাবে মানবজীবনী ব্যাপৃত হইলে কি শুভফল ঘটে, ম্যাট্সিনির জীবনে তাহা দেখাইলেন। মিলের মনে অনেককাল পরে যে চিন্তাকুসুমাবলি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, ম্যাট্সিনির জীবনক্ষেত্রে অনেককাল পূর্ব্বে সেই কুসুমাবলী কার্য্যফলে পরিণত হইয়াছিল। মিলের জীবনে যাহা অস্পষ্ট ব্যক্ত, ম্যাট্সিনির জীবনে তাহা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত। আশ্চর্য্য এই মিলের পর ম্যাট্সিনি না হইয়া ম্যাট্সিনির পর মিল জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু, জীবনীলেখক সে পর্য্যায় বিপর্য্যস্ত করিয়া শৃঙ্খলিত করিয়া দিয়াছেন। যাহার পর যাহা তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। মিলের জীবনী পাঠ করিয়া পাঠকের মন যে উদারতায় প্রশস্ত হয়, তাহার মনে যে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, যে আলোকের ঈষৎ আভাস পতিত হয়, ম্যাট্সিনির জীবনী পাঠে সে প্রশস্ততার সম্প্রসারণ হয়, সে আকাঙ্ক্ষার মহৎলক্ষ্য দৃশ্যমান হয়, সে আলোকের উজ্জ্বলতা ও গৌরব বৃদ্ধি হয়। এই দুই ব্যক্তিকে তখন পাঠক অতি ঘনিষ্টসম্বন্ধে গ্রথিত দেখেন।

ম্যাট্সিনি, মিলের শ্রেষ্ঠতর। মিলের বর্দ্ধিতবিকাশ ম্যাট্সিনি। চিন্তায়, কার্য্যে, কৌশলে প্রবৃদ্ধ হইয়া মিল যেন ম্যাট্সিনিরূপে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। মিলের যাহা শেষ, ম্যাট্সিনির যেন তাহা প্রারম্ভ।

* ইতালীয় ইতিবৃত্ত-সম্বলিত ম্যাট্সিনির জীবনবৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ, প্রণীত। শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১২৮৬।

গিলের মনে যে সকল ভাব বহুচিন্তায় অনুসৃত হইয়াছে, ম্যাট্‌সিনির মনে যেন তাহা স্বতঃসিদ্ধরূপে আপনা আপনি উদিত হইয়াছে। ম্যাট্‌সিনির যেন সেই স্বতঃসিদ্ধগুলি তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে, তিনি সেই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া জীবনক্ষেত্রের বিস্তৃত কার্য্যাবলী সম্পাদিত করিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহার বীরত্ব ও কার্য্যাবলী চিন্তা হইতে বৃহত্তর দেখায়। সেই জন্য ম্যাট্‌সিনিকে আমরা চিন্তাশীল মহাজনরূপে অনুভব না করিয়া তাঁহার বৃহত্তর কার্য্যগৌরবে তাঁহাকে একজন মহান্ কার্য্যশীল বীর বলিয়া উপলব্ধি করি। তাঁহার পাণ্ডিত্য তাঁহার কার্য্যগৌরবে লুকাইয়া যায়। ম্যাট্‌সিনির জীবনী ইহার বিলক্ষণ সপ্রমাণ করে। জীবনীলেখক তাঁহার পাণ্ডিত্য অতি বিশদবর্ণে ও স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত করিয়াছেন।

কিন্তু যখন আমরা ইহার ভিতরে প্রবেশ করি তখন এই পাণ্ডিত্যও সামান্যমূল্য বোধ হয়, যখন আমরা ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি ম্যাট্‌সিনির অভ্যন্তরে কেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রতিভালোক কৌস্তুভরত্নের মত উদ্দীপিত হইয়া রহিয়াছে, তখন আমরা ম্যাট্‌সিনির সেই গুণকে অধিকতর প্রশংসা করিতে যাই। কারণ, ইহাই তাঁহার পাণ্ডিত্যের কারণ। তাঁহার এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভা ছিল যাহা মানবলোকে প্রায় দৃষ্ট হয় না। তিনি সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসহকারে অতি চতুরতার সহিত কার্য্যের রহস্যোদ্ভেদ করিতেন। কিরূপ অবস্থায়, কি প্রকার কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করা উচিত, তাহা আলোকের মত দেখিতে পাইতেন। ইউরোপীয় নৃপগণের কার্য্যকৌশলের রহস্য বুঝিতে পারিতেন। পারিয়া তাহাদিগের কৌশলবাগুরা ভেদ করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইতেন। কিজন্য কোন্ কার্য্যের ফলাফল কিরূপ দাঁড়াইল, এবং কিরূপ করিলেই বা সুফলে পরিণত হইতে পারে, তাহা তিনি দিব্যালোকের মত দেখিতে পাইতেন। দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিতেন এবং নিজ কার্য্যতৎপরতাগুণে তাহা একেবারে অবলম্বন করিতেন। ম্যাটসিনি পরের অনুসারী হইয়া কার্য্য করিবার লোক ছিলেন না; কারণ তিনি পরের কার্য্যপ্রণালীর দোষসমুদয় অতি সূক্ষ্মচক্ষে দর্শন করিতে পারিতেন, অমনি সেই কার্য্যপ্রণালীর ত্রুটি সকল পরিবর্জ্জন করিয়া তিনি আপনার জন্য স্বতন্ত্র পথ দেখিয়া লইতেন। এরূপ রাজনৈতিক সূক্ষ্মবুদ্ধি ও প্রতিভা অল্প লোকেরই থাকে। এই অলৌকিক প্রতিভা তাঁহার জীবনের আলোক ও পরিচালক ছিল। ইহার বিশেষ ধর্ম্ম এই ছিল যে, ইহা যে কেবল জ্ঞানজগতের উজ্জ্বল তারকাস্বরূপ প্রজ্বলিত হইত এমত নহে, ইহা কার্য্যজগ-

ত্তের প্রধান দীপ্তিস্বরূপ প্রতিভাত হইত। ইহা জ্ঞানজগতে সত্যের আবিষ্কার করিত, কার্য্যজগতে কার্য্যের জটিলতা ভেদ করিত, ফলাফলের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিত, মন্ত্রণাজালের রহস্যোদ্ভেদ করিত, এবং সিদ্ধিপ্রদ কার্য্যপ্রণালীর উপায় দেখাইয়া দিত। এরূপ প্রতিভা সকলের থাকে না। কাহার প্রতিভা জ্ঞানজগতের উজ্জ্বলমণি, কাহারও বা কার্য্যজগতের পথপ্রদর্শক। কিন্তু ম্যাটসিনির প্রতিভায় এই দুই ধর্ম্ম একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল। এই জন্য তিনি তাঁহার মহৎ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন লোক যে দেশে উদিত হয়, তাহার ভাগ্য যে ফিরিয়া যাইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু যদি তিনি অন্যান্য মহামূল্য গুণে ভূষিত না হইতেন, তাহা হইলে ম্যাটসিনির এই অলৌকিক প্রতিভাও সামান্য-মূল্য জ্ঞান হইত। এই প্রতিভা তাঁহার জ্ঞান-জগতিকে আলোকিত করিয়াছিল সত্য, কিন্তু শুদ্ধ ইহাতেই ভূষিত হইলে তিনি হয় ত একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন। রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম্য সাহিত্যসংসারে তিনি পূজার্হ হইতেন। জগৎ তাঁহার সাহিত্যপাঠে চমৎকৃত হইত। কিন্তু তিনি অপরের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া যাইতেন মাত্র। নিজে যে পথের নেতা হইয়াছিলেন, যাহার প্রতিষ্ঠায় তিনি জগতের আরাধ্য হইয়া আছেন, সে পথ তিনি পরকে দেখাইয়া দিতেন মাত্র। যাহার শক্তি হইত তিনি তাহার অনুসরণ করিতেন। তিনি রাজনৈতিক জগতের নিউটন, লাপ্লাস, কেপলার, মিল, সকলই হইতেন, কিন্তু সেই ইতালীর মুক্তিদাতা চিরস্মরণীয় ম্যাট্‌সিনি হইতেন না। তিনি হয় ত মেকিয়াভিলি গীতেও খ্যাতিলাভ করিতেন, কিন্তু আজি রোম, ম্যাট্‌সিনির রোম বলিয়া প্রখ্যাত হইত না। আধুনিক রোমানেরা স্বাধীনতার গীতে ম্যাটসিনির নাম রোমের প্রতিগৃহে প্রতিধ্বনিত করিত না। রোম ম্যাট্‌সিনির গৌরবে পূর্ণ হইত না। ইতালীর জাতীয় জয়পতাকা উড্ডীন হইত না। যে হৃদয়ের বলে বলীয়ান্ হইয়া, যে অসাধারণ বিশ্বপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া তিনি এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাই ম্যাটসিনির ভূষণ ও ঐশ্বর্য্য। তিনি এই ভূষণের মুকুট ধারণ করিয়া আজি ইতালীর স্বাধীনতার ঈশ্বর হইয়া আছেন।

অসাধারণ মনীষা ও প্রগাঢ় প্রেম ম্যাট্‌সিনির শরীরে একত্রে মিলিত হইয়াছিল। হৃদয় ও মন উভয়ই প্রবল ছিল। হৃদয়ের আবেশ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছিল। স্বদেশের দুঃখ ও যন্ত্রণা তিনি অহোরাত্র দেখিতেন। তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। বিশ্বপ্রেম প্রবল স্বদেশানুরাগে পরিণত হইল। এক

অনুরাগে তিনি উন্মত্ত হইলেন। ইহার জন্য সকল ক্লেশ যন্ত্রণা ও উৎপীড়ন লঘু বোধ হইল। সংসার, ধর্ম্ম, সুখ, সম্পত্তি, আত্মীয়, পরিজন তিনি সকলই এই প্রবল অনুরাগের নিকট বিসর্জ্জন দিলেন। ইতালীর উদ্ধার তাঁহার ব্রত হইল। কল্পনা ইতালীর দুঃখ তাঁহার মনে সহস্রবর্ণে অঙ্কিত করিল। তিনি সেই দুঃখ মোচনের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেশে দেশে অশেষ কষ্টে ফিরিতে লাগিলেন। প্রবল অনুরাগ অটল অধ্যবসায় আনিয়া দিল। ম্যাট্‌সিনি স্বদেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার অনুরাগবলে দেশশুদ্ধ অগ্নিপরীত হইল। দেশ বিদেশ, অরণ্যানী, পর্ব্বত, গিরিগুহা এই আগুনে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। এ হৃদয়বল যখন দেশে ধরিল না, সুইজারলণ্ড, ফ্রান্স, স্যাভয় এবং ইংলণ্ড পর্য্যন্ত তাহার তেজ ও প্রভাব বিস্তৃত হইল। এ অগ্নি সমুদ্র, পর্ব্বত ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সর্ব্বদেশ বেষ্টন করিয়া ইতালীর দিকে জ্বলিতে লাগিল।

যে বল হৃদয়ে জাগে, শরীরে তাহা ধারণ করিতে পারে না। ম্যাটসিনি কার্য্যক্ষেত্রে নামিলেন। এ কার্য্যে যে সমস্ত বিঘ্ন, বিপত্তি ও দুর্ঘটনা তাহা সকলই ম্যাটসিনির হইল। কিন্তু ম্যাটসিনি তাঁহার প্রবল প্রতিভাবলে সর্ব্ববিপত্তির উপর জয়লাভ করিতে লাগিলেন। এইখানে ম্যাটসিনি। যখন আমরা তাঁহাকে স্বদেশানুরাগে উত্তেজিত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে কার্য্য করিতে দেখিতেছি, সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে যখন তিনি স্থির ও অটল হইয়া নিজ সঙ্কল্পানুষ্ঠানে প্রাণপণ যত্নে বীরের ন্যায় কার্য্য করিয়া যাইতেছেন দেখিতে পাই, যখন তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা সর্ব্ববিপত্তির মধ্যে তাঁহাকে পরিচালন করিতেছে দেখিতে পাই, যখন তিনি একাকী স্বকীয় দলের নেতাস্বরূপ হইয়া সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ইতালীর জাতীয় একতাসাধনের জন্য বিবিধ চেষ্টায় দেশে দেশে ফিরিতেছেন দেখিতে পাই, যখন তিনি ইতালীর জন্য আত্মোৎসর্গ করিতেছেন দেখিতে পাই, যখন তিনি হৃদয় ও মন একত্র বাঁধিয়া কার্য্য করিতেছেন দেখিতে পাই, তখনই ম্যাটসিনিকে দেখি। ম্যাটসিনি মণীষা ও হৃদয়বল, মন ও প্রেম, প্রতিভা ও বিশ্বপ্রেম। তিনি দলপতি ও স্বদেশানুরাগী। তিনি প্রতিভাসম্পন্ন উন্মত্ত ম্যাটসিনি। যদি কেহ ম্যাটসিনিকে দেখিতে চাও, এই ভাবে ম্যাটসিনিকে দেখ। এই ভাবে যোগেন্দ্রবাবুর গ্রন্থেও তাঁহাকে ঠিক দেখিতে পাইবে। দেখিবা স্বদেশের প্রতি অনুরাগ কত প্রবল হওয়া চাই তাহা শিখ, মানবজাতির স্বার্থসাধনের জন্য নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়ায় কি সুখ ও উন্মত্ততা তাহা শিখ, সমাজের জন্য, মানবজাতির জন্য।

করায় কি আমোদ ও লাভ তাহা শিখ, সহিষ্ণুতা কি, অধ্যবসায় কি, তাহা শিখ, স্বদেশের একতা কিরূপে সম্পাদন হইতে পারে তাহা শিখ, স্বদেশের হিত-কামনায় প্রাণবিসর্জ্জন দেওয়ায় কি সুখ তাহা শিখ, শিখিয়া ম্যাটসিনিকে আরাধ্য দেবতা ও গুরু বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত কর।

কিন্তু এ ম্যাটসিনিরও কলঙ্ক ছিল—চাঁদের কলঙ্ক। লোকে তাঁহাকে স্বপ্নদর্শী প্রলাপী বলিত। তিনি রাজনৈতিক মঞ্চের যে উচ্চশিখরে উঠিয়াছিলেন, লোকে তাহা বুঝিতে পারে নাই। তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিভায় যে সমস্ত উচ্চ মত উপলব্ধি হইয়াছিল, লোকে সে উচ্চতায় উঠিতে পারে নাই। তিনি স্বদেশবাসিগণের মানসিক প্রবণতা দেখিয়া যে সমস্ত উচ্চ লক্ষ্য তাহাদিগের মানসচক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিপক্ষীয়গণ বুঝিয়াও বুঝেন নাই; কারণ—হয় তাহা তাঁহাদিগের স্বার্থের অনুসারী ছিল না, না হয় তাহা তাহাদিগের সামান্য বুদ্ধির অধিগম্য হয় নাই। এই জন্য অনেকে ম্যাটসিনির মতামতসমূহের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, এবং সেই সমস্ত মতকে প্রলাপবিজৃম্ভিত বলিয়া উপহাস করিত। ম্যাটসিনির দোষ এই, ম্যাটসিনি অগ্রে লক্ষ্যের স্থির করিয়া দিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে বলিতেন। ম্যাটসিনির দোষ এই, ম্যাটসিনি একটি নিজ মত চালাইতে চাহিতেন। অপরের তাহা সহ্য হইত না। ম্যাটসিনির দোষ এই, তিনি স্বদেশের স্বাধীনতামাত্র লাভ করা লোকের নিকট প্রস্তাব করেন নাই। সেই স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইলে স্বদেশবাসিগণ কোন স্থলে দাঁড়াইবেন অগ্রে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে গিয়াছিলেন। এতদূর যাওয়া অনেকের মতে আপাততঃ আবশ্যক বোধ হয় নাই। অনেকে হয় ত সে সকল মতের অনুমোদন করিতেন না। সুতরাং তাঁহারা ম্যাটসিনির দলভুক্ত হন নাই। তাঁহারা কেবল স্বদেশের স্বাধীনতা চাহিতেন। আর যদি স্বাধীনতা উপলব্ধ করা সম্ভাবিত হয়, তবে তাঁহারা সাধারণতন্ত্র স্থাপনের জন্য চেষ্টিত নহেন; চিরাগত রাজতন্ত্রই তাঁহাদের অনুসরণীয়। ম্যাটসিনি বলিতেন, যদি স্বাধীনতা লাভ করা ইতালীবাসিগণের সৌভাগ্যে ঘটিয়া উঠে, তবে আবার একপ্রকার প্রভুতন্ত্র পরিবর্জ্জন করিয়া অন্যপ্রকার প্রভুতন্ত্রের বশবর্ত্তী হওয়ার আবশ্যক কি? প্রভুতন্ত্র যদি মন্দ হয়, তাহা স্বদেশীয় প্রভুর অধীনতা হইলে কিছু দুঃখের ও পীড়নের একেবারে মূলোচ্ছেদ হইল না। কঠিন পীড়নের পরিবর্ত্তে মৃদুপীড়নের স্থাপনমাত্র হইল। আর যদি দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবই ঘটিল, তবে একেবারে যাহা বিশুদ্ধ ও স্বদেশবাসিগণের স্বাধীনতার প্রতিপোষক তাহাই প্রবর্ত্তিত করা যুক্তিসঙ্গত। এই

জন্য তিনি সাধারণতন্ত্র পরিস্থাপনের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। অনেকে বলিতেন, অগ্রে স্বাধীনতা চাই, তৎপরে অন্য কথা। ম্যাটসিনি বলিতেন, অগ্রে কিসের জন্য স্বাধীনতা লাভ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা স্থির করিয়া তবে স্বাধীনতার প্রয়াসী হওয়া উচিত। লক্ষ্যের স্থির না থাকিলে জয়ের পর সকলই বিশৃঙ্খল ঘটিবে। তিনি দেখিয়াছিলেন এইরূপ লক্ষ্যের স্থির না থাকাতে দুই একবার স্বাধীনতার জয় হইয়াও কোন প্রকৃত ফললাভ হয় নাই। বিজয়িগণ কি করিবেন তাহা ঠিক না থাকাতে সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য তিনি অগ্রে লক্ষ্যের নির্দ্ধারণ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে একটি দোষ এই ঘটিয়াছিল; ম্যাট্‌সিনি যে গৃহদ্বন্দ্ব নিবারণ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার মতামত প্রচারেও তাহা সংঘটিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ম্যাটসিনি যে সদভিপ্রায়ে উত্তেজিত হইয়া এই সমস্ত মতামত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা ধরিয়া বিবেচনা করিতে গেলে, তাঁহার প্রতি তত দোষারোপ করা যায় না। যেহেতু মানবীয় কোন কার্য্যপ্রণালী একেবারে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক নহে।

যোগেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে ম্যাটসিনির মতামত ও প্রস্তাবাদি অতি বিস্তৃত করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক সমালোচ্য প্রবন্ধে যদি কোন বিষয় বাহুল্যরূপে বিবৃত হইয়া থাকে, তাহা ম্যাটসিনির মতামত ও হৃদয়োচ্ছ্বাস। ম্যাটসিনি সময়ে সময়ে যে সমস্ত হৃদয়োচ্ছ্বাসে উত্তেজিত হইয়া তদীয় মহৎ কার্য্যে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই হৃদয়োচ্ছ্বাস ও ভাবসমূহ অতি অমূল্য ধন। ম্যাটসিনির হৃদয়োচ্ছ্বাসে ও আত্মচিন্তায় মন অন্তস্তল হইতে উছলিয়া উঠে, এবং হৃদয় ভাবে উছলিয়া পড়ে। স্বদেশবাসিগণকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য ম্যাটসিনি যে সমস্ত মত ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, যে সমস্ত উপায়ের প্রস্তাবনা করেন, সমালোচ্য গ্রন্থে তাহা সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। ভারতের যদি কোন একান্ত অভাব থাকে, তাহা এই একতা। ইতালীর ন্যায় ভারত বিবিধ রাজ্যে, জাতিতে ও বর্ণে বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন। ম্যাটসিনি যে সমস্ত অমূল্য উপদেশে ও উপায়ে ইতালীর একতা সম্পাদন করিয়াছেন তাহা যোগেন্দ্রবাবু বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। এত বিস্তৃত, যেন এই সমস্ত ভাবই প্রচার করা গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিক ভারতবর্ষ এক্ষণে অতি নীচভাবে পরিপূর্ণ। আমরা বিলক্ষণ জানি অগ্রে লোকের মতামত ও মনের পরিবর্ত্ত সাধন করা আবশ্যক। মন যদি উচ্চ অভিপ্রায়ে ও উচ্চ চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়, হৃদয়ভাব আপনা আপনি অনুসৃত হইবে। এক্ষণে এদেশ অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন। অগ্রে ইহার অজ্ঞানতা ও নীচভাব তিরস্করণ

করা উচিত। যোগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থ এ উদ্দেশ্যসাধনে অনেকদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

ম্যাট্সিনির মনীষা ও স্বদেশানুরাগ তাঁহার যে সমস্ত চিন্তায় ও হৃদয়োচ্ছ্বাসে পরিব্যক্ত আছে তাহা গ্রন্থমধ্যে অতি সুন্দর ওজস্বী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে যে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে তাহা আমরা বলিয়াছি। গ্রন্থের যদি তাহাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, আমরা বলি তাহা অনেক পরিমাণে সংসাধিত হইবে। গ্রন্থের যে অসম্পূর্ণতা আছে, তাহার পূরণ হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য অধিকতর পরিমাণে সিদ্ধ হইত। যোগেন্দ্রবাবুর গ্রন্থমধ্যে আমরা অনেক স্থলে ম্যাট্‌-সিনিকে একাকী দেখিতে পাই। হয় তাঁহার আত্মচিন্তা না হয় তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস। তাঁহাকে ঘটনায় পরিবৃত দেখি না। ইহাতে মন সন্তৃপ্ত হয় না। আমরা ম্যাট্সিনির বিষয় অধিক জানিতে ইচ্ছুক হই। তাঁহার কার্য্যের ফলাফল, বিপক্ষ দলের কার্য্যকলাপ, অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণ, বলিতে কি, এই সময়ে সমস্ত ঘটনার বিষয় জানিতে মন অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠে। কিন্তু যোগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থে সে কৌতূহল নিবারণ হয় না। তিনি বিবরণমধ্যে ঘটনার বৈচিত্র দেন নাই। ঘটনার ইতিবৃত্তসম্বন্ধে গ্রন্থখানি অন্ধকারময়। এই জন্য গ্রন্থপাঠে সময়ে সময়ে বিভ্রান্তি ঘটে। কিন্তু যদি এ অভাব সম্পূরণ হইত, যদি আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতাম ম্যাট-সিনি কিরূপ অবস্থায় কিরূপ ভাবিতেছেন ও কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার জীবন কিরূপ বিপদসঙ্কুল হইয়াছে, তিনি কতদূর উৎপীড়ন সহ্য করিতেছেন, এবং কিরূপ অবস্থায় তাঁহার হৃদয় কিরূপ মাতিয়া উঠিতেছে, কিরূপ চিন্তায় পরিপূর্ণ হইতেছে, তাহা হইলে আমাদিগের ম্যাটসিনির ভাগ্যের অনেকদূর সহানুভূতি ঘটিত; তাঁহার চিন্তা ও হৃদয়ভাব দ্বিগুণপ্রভাবে উপলব্ধি করিতাম।

ইতালীর একতা সম্পাদনে ম্যাটসিনি যেরূপ নিরতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম করেন, এবং তাহাতে যে সাফল্য লাভ করেন তাহাই ম্যাটসিনির প্রতিপত্তির প্রধান কারণ। তিনি দেখিয়াছিলেন ইতালী যেরূপ বিভিন্ন জাতিতে পরিপূর্ণ, যেরূপ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাহাতে ইতালী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। সেই বিচ্ছিন্ন ইতালীর একতা সম্পাদন না করিতে পারিলে তাহার মঙ্গলসাধন করা একেবারে অসম্ভব। সেই ইতালীর একতা সাধন করা আপাততঃ অসম্ভব বটে, কিন্তু তাঁহার স্বদেশানুরাগ এত প্রবল ছিল, যে তিনি তাহার অসম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি সকল রাষ্ট্রবিপ্লবকারীর মত অসম্ভব কার্য্যেও বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। বাস্তবিক যিনি রাষ্ট্রবিপ্লব কার্য্যে উদ্যত হন, তিনি যদি কোন বিষয় অসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করেন,

তবে তাঁহার যত্ন নিশ্চয় শিথিল হইয়া যায়। ইহাদিগের বিশ্বাস অতি প্রবল, তাহা সামান্যজনগণের বিশ্বাসের ন্যায় ঈষচ্ছুক্ত নহে। তাহা জীবিত ও উত্তপ্ত। প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী জনগণের বিশ্বাস মাত্রই এইরূপ। এইরূপ অটল বিশ্বাস না হইলে কেহ স্বদেশহিতব্রতে সুসিদ্ধ হইতে পারে না। যিনি যাহা করিতে উদ্যোগী হইবেন, তাহার সাফল্যবিষয়ে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস চাই। ম্যাটসিনির বিশ্বাস এইরূপ ছিল। তিনি প্রবল স্বদেশানুরাগে উত্তেজিত হইয়া এরূপ বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মানব মানসচক্ষে পূর্ণকল্পনা না ধরিতে পারিলে তাহাতে ফললাভ হয় না। সেই পূর্ণকল্পনার সম্পূর্ণ সুসিদ্ধ না হউক, সেইদিকে সমুদায় চেষ্টা ও পরিশ্রম নিয়োজিত হইলে তবু আংশিক ফললাভ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যাহার পূর্ণ কল্পনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না থাকে, তাহা দ্বারা কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না। ম্যাটসিনির পূর্ণকল্পনা ইতালীর সম্পূর্ণ একতা। তিনি সম্পূর্ণ একতার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাতে আংশিক ফললাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার আশয় অত্যন্ত বৃহৎ ছিল বলিয়া তিনি কথঞ্চিৎ ফললাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশয় অতি বৃহৎ ছিল বলিয়া তিনি তদনুসারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কারণ আশয় বৃহৎ না হইলে উদ্যোগ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র উদ্যোগের ফল প্রায়ই ভাল দাঁড়ায় না। বৃহৎ উদ্যোগে অন্যূন কথঞ্চিৎ ইষ্টসিদ্ধি ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ম্যাটসিনির দৃষ্টান্তে এই কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু ম্যাটসিনি যে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইতালীর সম্পূর্ণ একতা সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাহা নহে। যিনি এ সকল কার্য্যে যুক্তি ও বিচার করিতে যান তিনি কখন ইহাতে ব্রতী হইতে উদ্যত হয়েন না। কিন্তু যিনি কেবল নিজ অনুরাগে উত্তেজিত হইয়া পূর্ণোৎসাহে এরূপ দুরূহ কার্য্যে উদ্যোগী হয়েন তিনিই কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে পারেন। দেশহিতৈষী মহাজনগণের কার্য্য কেবল উষ্ণ উৎসাহ ও প্রবল অনুরাগের ফল। শীতল যুক্তি ও বিবেচনার ফল নহে। ম্যাটসিনির কল্পনা ও কার্য্য এইরূপ প্রবল অনুরাগ ও উৎসাহের ফল। ম্যাটসিনির ভিতরে যে রাগ জ্বলিতেছিল, তাহারই তেজে তিনি স্বদেশীয় হিতব্রতের কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন। অন্য কোন উত্তেজনায় তৎকার্য্যে নামিলে তিনি কখনই তাহাতে দাঁড়াইতে পারিতেন না। প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী জনগণের উদ্যোগের সহিত অপর লোকের উদ্যোগের এই প্রভেদ। যাহা হউক ম্যাটসিনি যে বৃহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাহা আপাততঃ অনেকেরই অসম্ভব বলিয়া জ্ঞান হইলেও ম্যাটসিনির উৎসাহ ও অনুরাগে তাহাতে আশাতীত ফললাভ হইল। তিনি নানাবিধ ইতালীয় জাতিগণকে একজাতিতে

পরিণত করিতে পারিলেন। তাহাদিগের মধ্যে একমাত্র জাতীয়ভাব প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। যখন তাহারা সকলেই একজাতি জ্ঞান করিল, ইতালীর ভাগ্য ফিরিয়া গেল। এরূপ জাতীয়ভাব যে দেশে নাই সে দেশের ভাগ্য ইতালীর ন্যায় শোচনীয় থাকিবে। যতদিন না সে দেশের ম্যাটসিনি উঠিবে, ততদিন তাহার দুঃখের অবধি থাকিবে না।

অতি সামান্য উপায়ে ম্যাটসিনি দেশমধ্যে এই একতা ও জাতীয়ভাব প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। রাজনৈতিকসভা সংস্থাপন দ্বারা তিনি কতিপয় উৎসাহপূর্ণ ব্যক্তিকে নিজ মতসমূহে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সভার সদস্যগণের সহিত মতামত স্থির করিতেন, বিচার করিতেন এবং দেশমধ্যে তাহা প্রচার করিতেন। সাময়িকপত্রিকাও তাঁহার অন্যতর সাধন ছিল। এই পত্রিকা দ্বারা তিনি নিজমতসমূহ দেশমধ্যে বহুলরূপে প্রচার করিয়া দিতেন। তাঁহার অনুচরগণ এই পত্রিকাপ্রচারে বিলক্ষণ সহায়তা করিত। এইরূপ সরল উপায়ে ম্যাটসিনির উন্নতমনের ভাবসমূহ যখন দেশমধ্যে সুপ্রচারিত হইতে লাগিল, তখন দেশশুদ্ধ সেই ভাবে পূর্ণ হইয়া সকলেই জাতীয়সম্মিলনের আবশ্যকতা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিল। কিসে সেই সম্মিলন সংসাধিত হয় তজ্জন্য সাধারণ চেষ্টা নিয়োজিত হইল। ভারতের প্রকৃত গৌরব খুঁজিতে গেলে অগ্রে তাহার জাতীয় একতা সম্পাদন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় জাতিনিচয় যেমন পরস্পর বিজাতীয় ভাবে পরিপূর্ণ, এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আমরা আরও জানি ভারত ইতালী নহে, ভারতবর্ষীয়গণের জীবনী শক্তি কিছুই নাই। ইতালীর মত এখানে কার্য্যফল ঘটিবে না। আজিও ভারতবর্ষ অতি নীচভাবে পরিপূর্ণ। ইহার সাধারণজনগণের মনে উচ্চভাবের লেশমাত্র নাই। সমাজের ও দেশের স্বার্থ কি তাহারা কিছুই জানে না ও বুঝে না। আপনাদিগের নিজ নিজ সামান্য স্বার্থ সাধিত হইলে তাহারা অনায়াসে দেশের স্বার্থ বলিদান দিয়া থাকে। তাহারা যদি জানিত দেশের স্বার্থ কি এবং সেই স্বার্থ কত পরাধীন তাহা হইলে তাহারা এরূপ নীচব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইত না। তাহারা সামান্য স্বজাতিগৌরবে পূর্ণ হইয়া ভারতের জাতীয়গৌরবের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করে না। তাহাদিগের স্বজাতিগৌরব বিনষ্ট না হইলে ভারতের জাতীয়গৌরবের কিছুই আশা নাই। যত দিন ব্রাহ্মণ নিজ জাতীয়গৌরবে পূর্ণ হইয়া থাকিবে, ততদিন তিনি শূদ্রকে আপন ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন না। যতদিন হিন্দু নিজ জাতীয়গৌরবে পূর্ণ থাকিবে, ততদিন তিনি ভারতীয় মুসলমানকে নিজ ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিবেন না। কি মুসলমান, কি হিন্দু,

কি পার্শি, কি শিখ এক্ষণে কেহই বুঝে না ভারতের জাতীয়গৌরব কি অমূল্য ধন। এই জাতীয়গৌরবের ভাব দেশমধ্যে প্রচারিত করা এক্ষণকার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। দেশের স্বার্থ, সমাজের স্বার্থ যতদিন ভারতবর্ষীয়গণ না বুঝিতে পারিবে, ততদিন তাহার জাতীয়গৌরবের আশা করা বৃথা। নিজ স্বার্থের সহিত এই স্বার্থের কি প্রভেদ অগ্রে বুঝাইয়া দেওয়া চাই। এই স্বার্থের গৌরব বুঝিতে পারিলে, তবে তাহারা নিজ নিজ সামান্য নীচস্বার্থ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইবে। এবং নিজ স্বার্থে বিসর্জ্জন দিয়া সেই সামাজিক স্বার্থসাধনে চেষ্টা করা কত গৌরবের কার্য্য তখন তাহারা বুঝিতে পারিবে। ম্যাটসিনির দৃষ্টান্তে তখন তাহারা উদ্বোধিত হইবে।

আত্মনির্ভরের মূল্য কত, ম্যাটসিনি তাহা শিক্ষা দেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে ও উপদেশে আমরা যে কেবল আপন আপন চেষ্টার উপর নির্ভর করা প্রতিব্যক্তির উচিত এরূপ শিক্ষা পাই তাহা নহে; আমরা আরও বুঝিতে পারি যে, যাহা ব্যক্তিমাত্রে খাটে, তাহা প্রতি জাতিতেও সত্য। ম্যাটসিনি শিক্ষা দেন যে, যতদিন দেশের স্বজাতীয় বল পরিপুষ্ট না হইবে, ততদিন দেশীয়গণ নিজ বলের উপর নির্ভর করিতে না পারিবে, ততদিন তাহাদিগের প্রকৃত অভ্যুদয়ের কিছুই সম্ভাবনা নাই। অপর জাতির হাত ধরিয়া একটি সমগ্র জাতি কখন উঠিতে পারে না। অপর জাতির সহায়তার প্রত্যাশা করা বৃথা। কার্য্য কালে সে সহায়তায় কোন ফল ফলে না। এক জাতি অপর জাতিকে কখন বাড়িতে দেয় না। ইহা মানবজাতির প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। ফরাসিজাতির অবলম্বনে ইতালীয়গণের এইপ্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। ম্যাটসিনি দেখিলেন, বিদেশীয়গণের হাত ধরিয়া কখন ইতালী উঠিতে পারিবে না। ইতালী নিজ বলে বলীয়ান্ না হইলে, নিজ বলের উপর নির্ভর করিতে না পারিলে, তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইবে। ম্যাটসিনির এই অমূল্য উপদেশ যখন ইতালীতে গৃহীত হইল, তখন হইতে ইতালীর উন্নতির প্রকৃত সূত্রপাত হইল। তৎপূর্ব্বে ইতালীর চেষ্টা সমুদায় বিফল হইয়াছিল। ইউরোপের প্রতিদেশেও এই শিক্ষা দেয়। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই শিক্ষা, রুসিয়ার ইতিহাসে এই শিক্ষা, ফ্রান্সের ইতিহাসে এই শিক্ষা। আপনার বল না থাকিলে, কোন জাতি দাঁড়াইতে পারে না, আপনার চেষ্টা না হইলে কোন জাতি উঠিতে পারে না। ম্যাটসিনির জীবনীর ও ইতালীর স্বাধীনতার ইতিহাসের এই মহার্ঘ উপদেশ।

ম্যাটসিনির জীবনের যে সমস্ত মহৎভাব তাহা আমরা কথঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিলাম। তাহার সম্যক্ আলোচনা

করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। এই সমস্ত মহৎভাবে যিনি উদ্বোধিত হইতে চাহেন, যিনি ম্যাটসিনির পবিত্র জীবনের ভাব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে চাহেন, তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী পাঠ করুন। ম্যাটসিনির ন্যায় লোকের জীবনী প্রচার করিয়া যোগেন্দ্রবাবু বঙ্গসাহিত্যের যে কতদূর শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন আমরা ইতালীর সহিত ভারতের অবস্থার তুলনা করিয়া দেখি তখন আমরা ম্যাটসিনির জীবনীর মহত্ব গৌরব ও প্রয়োজন বিশেষ রূপে উপলব্ধ করি। যাঁহারা স্বদেশের উন্নতি কল্পনায় একদিনও ভাবেন ম্যাটসিনির জীবনী তাঁহাদিগের অধ্যয়ন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা অনেক পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম এদেশে স্বদেশহিতৈষিতা যাহাতে উদ্রিক্ত হইতে পারে এমত সকল গ্রন্থ প্রচার করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এখন দেখি যোগেন্দ্র বাবু সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি ম্যাটসিনির জীবনীর এক খণ্ড প্রচার করিলেন। ওয়ালেসের জীবনীর আরম্ভ করিয়াছেন। এপ্রকার সাহিত্য প্রচার যদি দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের একাঙ্গ হয় তবে যাঁহারা সেই ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদিগের এবিষয়ে বিলক্ষণ সহায়তা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কারণ সাহিত্যপ্রচার একটি প্রধান সাধন। এই উপায়ে যে কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল ম্যাটসিনির জীবনীতে ও ইতালীর ইতিহাসে তাহা বিলক্ষণ প্রদর্শিত হয়। আমাদিগের ইচ্ছা, ম্যাটসিনির ন্যায় মহাজনগণের জীবনী ভারতের প্রতিগৃহে অধীত হউক। তাঁহাদিগের জীবনীর শিক্ষা প্রতি ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হউক। তাঁহাদিগের প্রতিজনের জীবনের মহৎভাবে ভারতবাসিগণ উদ্বোধিত হউক, উদ্বোধিত হইয়া ভারতের বৃহৎ কার্য্যক্ষেত্রে স্বদেশহিতৈষী বীরের ন্যায় অটল বলে ও অটল অধ্যবসায়ের সহিত ভারতের হিতব্রতে ব্রতী হউক। একতা ও জাতীয়ভাব দেশমধ্যে পরিস্থাপিত হউক। প্রকৃত উন্নতিকল্পনায় ভারতবাসিগণ সচেষ্টিত হউক। প্রকৃত মানবের ন্যায় কার্য্য করায় কি গৌরব ও উন্নতত্তা তাহা ভারতবাসী একদিন প্রদর্শন করুক। তবে ভারতের মুখোজ্জ্বল হইবে, ভারতের গৌরবের ইয়ত্তা থাকিবে না।

পূর্ণচন্দ্র বসু।



মাধবীলতা।

২৪

রাত্রিকালে রাজবাটী প্রায় জনশূন্য। রাজা রাজতরঙ্গিনীর অনুসন্ধানে গিয়াছেন, সঙ্গে পারিষদ্‌বর্গ গিয়াছে। দেওয়ান্ মাধবীলতার অনুসন্ধানে গিয়াছেন; নগরের লোক কেবল সেই কথা এখানে সেখানে দাঁড়াইয়া আন্দোলন করিতেছে। পিতম পাগলা শান্তিশতক গ্রামে নাই, কোথায় গিয়াছে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। রাজা যাইবার সময় তাহার অনুসন্ধান পান নাই। চূড়াধন বাবুও তাহার অনুসন্ধান করিতে ছিলেন কিন্তু অতি গোপনে। সায়ংকাল উপস্থিত, পিতম পাগলা ফিরিয়া আসিল না।

সন্ধ্যার পর দুইজন অস্ত্রধারী ব্যক্তি শান্তিশতক গ্রাম হইতে বহির্গত হইল, কতকদূর গিয়া একজন বলিল, "বোধ হয় লোকের কোলাহল শুনা যাইতেছে। রাজা বুঝি ফিরিয়া আসিতেছেন।" আর একজন তখন কোন উত্তর না করিয়া মাথা তুলিয়া শব্দ শুনিয়া পরে বলিল, "বোধ হয় কেবল দুই তিন জন লোক আসিতেছে।" তাহার পর উভয়েই নিঃশব্দে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

অনেক পরে প্রথম ব্যক্তি বলিল, "দেখিলে ত? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে পিতম পাগলাকে সর্ব্বাগ্রে শেষ করা আবশ্যক। তাহা হইলে এই ব্যাপার ঘটিত না। তার পর যখন বাবুর মাথা হেঁট হইল, তখন আর বিলম্ব সহে না। "এখনই পিতমের রক্ত দেখাও, 'এখনই পিতমের রক্ত দেখাও" বলিয়া ধুম পড়িয়া গেল। কিন্তু পিতমকে এখন কোথায় পাওয়া যায়?"

দ্বি, অস্ত্রধারী। গতরাত্রে পিতম কোথায় ছিল তাহার ঠিক অনুসন্ধান হইলে আজি তাহারে পাওয়া যাইত।

প্র, ব্যক্তি। আজি কি তাহারে পাওয়া যাইবে না? তবে কি আমরা অনর্থক যাইতেছি?

দ্বি, ব্যক্তি। বোধ হয় অনর্থক নহে। সে এই পথেই গিয়াছে।

এমত সময়ে দুইজন পথিক আসিতে আসিতে বলিতে ছিল, "পিতম কি সুন্দর বাঁশী বাজায়।" এই কথা শুনিবামাত্র একজন অস্ত্রধারী আগন্তুক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে সুন্দর বাঁশী বাজায়?"

উত্তর। পিতম পাগলা, ঐ দীঘীর পাড়ে বাঁশী বাজাইতেছে। আমরা তাই দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম।

প্রশ্ন। কোন দীঘীর ধারে?—সে এখান হইতে কত দূর?

উত্তর। এখান হইতে পূর্ব্বে অর্দ্ধক্রোশ হইবে। এই পথের ধারেই সে দীঘী।

প্রশ্নকারী আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, কিঞ্চিৎ খরপাদ-বিক্ষেপে সঙ্গীর সহিত পূর্ব্বাভিমুখে চলিল। কিয়দ্দূর গেলে অল্প অল্প বংশীর রব কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, একবার বায়ুর সঙ্গে স্পষ্ট স্বর আসি-

তেছে, আবার তাহা ফিরিয়া যাইতেছে। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সে ধ্বনি আরও স্পষ্টীকৃত হইল। যেন বাঁশী ধীরে ধীরে অলসে কাঁদিতেছে। একজন বলিল, "পিতম এইবার মরণ কান্না কাঁদিতেছে।" সঙ্গী তাহাতে কোন উত্তর করিল না। দুইজন অস্ত্রধারীর মধ্যে একজনের বয়স অষ্টবিংশতি বৎসর। এপর্য্যন্ত অধিকাংশ কথা সেই কহিতেছে। অপর অস্ত্রধারীর বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। চূড়াধনবাবুর বাটীতে রাত্রিকালে সেই ব্যক্তিই যাতায়াত করিত। পূর্ব্বে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যক্তির নাম জনার্দ্দন, অপরের নাম কালিদাস।

যাইতে যাইতে কালিদাস বলিল, অদ্যকার কার্য্যের ভার আমারই থাক। একটা রোগা পাগল তোমার তরবারির যোগ্য নহে। জনার্দ্দন কোন উত্তর করিল না, কিঞ্চিৎ পরেই সঙ্গীত বন্ধ হইল। কালিদাস বলিল, "পাগলা পলাইল না কি?" এবারও জনার্দ্দন কোন উত্তর করিল না। ক্রমে উভয়ে দীর্ঘিকার নিকটে উপনীত হইল। সেখানে কেহই নাই। দীর্ঘিকার কূলে বড় বড় বকুল গাছ নিস্তব্ধভাবে জ্যোৎস্নাকিরণ উপভোগ করিতেছে, নিকটে একটি ক্ষুদ্র মন্দির, বৃক্ষচ্ছায়ায় কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে, দীর্ঘিকা অতি প্রশস্ত; পদ্মপত্রে পরিপূর্ণ; দুই একটি রাত্রিচর পক্ষী জলে ভাসিতেছে—দুই হয় না, মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া আপনার অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। তথাপি দীর্ঘিকা স্থির; যেন নিদ্রিত; অস্ত্রধারীরা আসিয়া বকুল তলায় দাঁড়াইল; কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কালিদাস দৌড়িয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিতে আসিতে বলিল "ওখানে কেহ নাই, বোধ হয় পলাইয়াছে; আমরা আসিতেছি, পাগলা হয় ত সে সন্ধান পাইয়া থাকিবে।"

জনার্দ্দন। পিতম কিরূপে জানিবে যে আমরা আজি তাহার শিরশ্ছেদ করিব?

কালিদাস। যদি না জানিবে তবে শান্তিশতক গ্রাম হইতে পলাইয়া আসিবে কেন?

জনার্দ্দন। আমার বোধ হয় পিতম এইখানেই কোথায় আছে।

"নিশ্চয় কথা, আমি এইখানেই আছি।" এই কথা পিতম এক বৃক্ষ হইতে বলিয়া উঠিল।

একটি পুরাতন মাধবীলতা বকুল বৃক্ষের একস্থল শাখা প্রশাখাদ্বারা এরূপভাবে ব্যাপিয়াছিল যে অনায়াসে একজন তাহার উপর শয়ন করিতে পারিত। পিতম সেইস্থানে স্বচ্ছন্দে শয়ন করিয়াছিল। বাঁশীটী ঘুরাইতে ফিরাইতে ছিল, অন্যমনস্কে কি ভাবিতে ছিল এমত সময়ে জনার্দ্দনের কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, "আমি এইখানেই আছি, নামিব কি?"

জনার্দ্দন। আমরা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছি বুঝিলে তুমি নামিতে চাহিতে না।

পিতম। তাহা সম্পূর্ণ বুঝিয়াছি, আরও একটু বেশী বুঝিয়াছি যে তুমি জনার্দ্দন; চূড়াধনবাবু তোমায় এই সৎকার্য্যের জন্য পাঠাইয়াছেন।

জনার্দ্দন কিঞ্চিৎ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হস্তের তরবারিখানি নাড়িতে নাড়িতে ভাবিতে লাগিল, আমার নাম জনার্দ্দন,এ পাগল কিরূপে জানিল। শান্তিশতক গ্রামের কেহই আমায় চিনে না। আমিও দিবাভাগে বাহির হই না। তবে কিরূপে আমায় চিনিল? চিনিয়াই বা কেন আপনার মরণসন্ধান আপনি বলিয়া দিল। অতএব পিতম হয় সত্যই উন্মাদ নতুবা বীর? উভয়ই সম্ভব, কেন না উভয়প্রকার ব্যক্তির প্রকৃতি কতকাংশে একই রূপ। যাহাই হউক পিতমকে দেখিলে বুঝা যাইবে। তাহার পর পিতমের কথার উত্তর দিল।

"সৎকার্য্য হউক, অসৎকার্য্য হউক, যখন আমি ব্রতী তখন কার্য্য সমাধা করিব।"

পিতম। আমার কোন আপত্তি নাই। কেবল জিজ্ঞসা করি—কি অস্ত্রের দ্বারা?

কালিদাস। এই তরবারির দ্বারা।

পিতম। লাঠি হইলে ভাল ছিল, কারণ আমার সেই ইচ্ছা অনেক দিন অবধি আছে, তবে তরবারিতে ক্ষতি নাই। কিন্তু প্রথমে আমার দক্ষিণ হাত ছেদ করিতে হইবে। আমি সেই হাত আপনি হাতে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিব।

এই বলিয়া পিতম বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিল; জনার্দ্দন ভাবিল, এটা সত্যই পাগল; তখন পিতম হাসিমুখে জনার্দ্দনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সময় কালিদাস পশ্চাৎ হইতে তরবারি তুলিল। জনার্দ্দন লম্ফ দিয়া সেই তরবারি ধরিল। কালিদাস চীৎকার করিয়া জনার্দ্দনকে গালি দিল; বলিল, "তুমি নেমকহারাম, যাহার নুণ খাও, তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত কর?"

জনার্দ্দন। আমি কাহার নুণ খাই? চূড়াধনের? মিথ্যা কথা! আমি তাহার সহায়। আমার সাহায্যে সে রাজা হইতে চায়; তাহারে রাজা করি না করি, আমার ইখ্‌তিয়ার।

কালিদাস। ভাল, তবে আমি যাই। সেই কথাই চূড়াধনবাবুকে বলিগে।

জনার্দ্দন। এখনই চূড়াধন আমার হাতে ধরিবে বই আমি তাহার হাতে ধরিব না।

কালিদাস সদর্পে চলিয়া গেল।

জনার্দ্দন পিতমকে বলিল, "তোমার মরিতে ভয় নাই কেন?"

পিতম। জানি না।

জনার্দ্দন। এই ত তুমি রক্ষা পাইলে? আমি তোমাকে রক্ষা করিলাম। বোধ হয় এখন অবধি তুমি আমার অনুগত থাকিবে, আমি যাহা বলিব করিবে।

পিতম। তুমি আমায় কই রক্ষা করিলে? আমাকে ত হত্যা করিতেই হইবে; নতুবা তোমার দুটাকা লাভ হইবে না।

জনার্দ্দন রাগত হইয়া বলিল, "আমি কি দুই টাকার জন্য নরহত্যা করি?"

পিতম। না হয় চারি টাকার জন্য। না হয় আর কিছু বেশী। এ ব্রতে টাকা ভিন্ন তোমার আর কোন ত উদ্দেশ্য নাই। চূড়াধনবাবু রাজা হবেন তুমি দুই চারি টাকা পারিতোষিক পাইবে; যাহার অদৃষ্টে যাহা আছে। আমি মরিয়া তোমায় চারি টাকা দেওয়াইব; তুমি হত্যা করিয়া আর একজনকে রাজ্য দেওয়াইবে। এ ভাগাভাগি বড় মন্দ নয়।

জনার্দ্দন বলিল, "বুঝিয়াছি তোমার ভয় হইয়াছে। তুমি যেরূপেই আমাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা কর—বৃথা। মৃত্যু তোমার আবশ্যক, অতএব যদি তোমার ইষ্টদেবতার নাম লইতে ইচ্ছা থাকে, এই সময় নাম করিয়া লও।"

পিতম। ইষ্টদেবতার নামে আমার প্রয়োজন নাই। আমি প্রস্তুত আছি। তুমি তরবারি তোল।

এই বলিয়া পিতম বসিয়া মাথা নামাইয়া দিল। মাথা ফিরাইয়া একবার চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, জনার্দ্দনের বিলম্ব দেখিয়া বলিল,"আর অপেক্ষা কি? ইহার পর হয় ত আমার অন্য মত হইতে পারে। আমারও একজনকে মনে পড়িয়াছে, তাহার জন্য আর দিন কতক বাঁচিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

"তবে এই সময়," বলিয়া, জনার্দ্দন সতেজে তরবারি তুলিল। চন্দ্রকিরণ তাহার ফলকে বিদ্যুৎবৎ নাচিয়া উঠিল। কিন্তু তরবারি নামিল না। পশ্চাৎ হইতে এবার কালিদাস আসিয়া জনার্দ্দনের হস্ত ধরিয়াছিল।

কালিদাস জনার্দ্দনের সহিত বচসা করিয়া শান্তিশতক গ্রামাভিমুখে যাইতে যাইতে ভাবিল যে হয় ত জনার্দ্দন আমাকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত আমায় বাধা দিয়াছিল। সে আপনি কৃতকার্য্য হইবে বলিয়া আমাকে তাড়াইয়াছে। অতএব তাহাকেও কৃতকার্য্য হইতে দেওয়া হইবে না, এই বলিয়া সে ফিরিল। যাহা অনুভব করিয়াছিল, আসিয়া তাহাই দেখিল, অতএব তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া জনার্দ্দনকে নিরস্ত করিল।

তখন উভয়ে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইল; বিরোধ আর বাক্যে নহে, অস্ত্রে অস্ত্রে। পিতম একপার্শ্বে বসিয়া শান্তভাবে অস্ত্রের আস্ফালন ও তাহাতে কিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিল। ক্ষণেকবিলম্বে উঠিয়া বলিল, "তোমরা যে সত্য সত্যই আপনা আপনি কাটাকাটি আরম্ভ করিলে। আমি ত উপস্থিত, কাটিতে হয় আমায় কাট, মরিবার লোক থাকিতে আপনা আপনি মরিবে কেন? আপনা আপনি কাটাকাটি করিলে পাপ হবে, ঐ দেখ আকাশ

হইতে চন্দ্র তোমাদের দেখিতেছে; অতএব ক্ষান্ত হও আমায় কাট, আমায় কাটিলে পাপ নাই বরং পুণ্য হইবে, আবার লাভ আছে আমার বাঁশী পাবে, রুদ্রাক্ষমালা পাবে, আমার ঝুলি পাবে আমার ঝুলিতে অনেক দ্রব্য আছে।" এই কথা কালিদাসের পক্ষে অসহ্য হইল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "তফাৎ যাও।" পিতম তখন "ছি! রাগ কর কেন" বলিয়া, উভয়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, উভয়ের সশস্ত্র হস্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিল তখন উভয়েই অপমানিত মনে করিয়া পিতমের উপর আক্রমণ করিল। পিতম হাসিয়া বলিল, "এখন পথে এস; একটু দাঁড়াও, দেখি, আমি কাহার হাতে মরিলে সুখী হইব, সকল বিষয়েরই ত পসন্দ আছে; তোমরা কর্ত্তা পসন্দ করিয়া লইয়াছ, আমি "হর্ত্তা" পসন্দ করিয়া লইব।" এই বলিয়া পিতম দুই এক পদ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লাগিল, তাহার পর লম্ফ দিয়া বৃক্ষশাখা ধরিয়া বলিল, "আজ আমার "হর্ত্তা" পসন্দ করা হইল না।" জনার্দ্দন কালিদাস উভয়ে ঊর্দ্ধে শাখাভিমুখে তরবারি আস্ফালন করিল; কিন্তু তাহাদিগের তরবারি পিতমের পাদস্পর্শ করিল না। পিতম তখন শাখামৃগের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে দুই চারিটি শাখা অতিক্রম করিয়া বহুপল্লববিশিষ্ট একটি শাখায় গিয়া বসিল। ঝুলি হইতে একগাছি দীর্ঘ অথচ সূক্ষ্ম দড়ি বাহির করিয়া তাহার একাগ্র শাখায় বাঁধিয়া অপরাগ্র হস্তে লইয়া পূর্ব্বমত মুহূর্ত্তমধ্যে নানা শাখা, নানা বৃক্ষ অতিক্রম করিতে লাগিল; আর মধ্যে মধ্যে সেই দড়ি টানিতে লাগিল, কেবল দড়ির আকর্ষণে শাখা নড়িতেছে এ কথা জনার্দ্দন ও কালিদাস কেহই অনুভব করিল না, সেই শাখাতেই পিতম বসিয়া আছে স্থির করিয়া প্রথমে ইষ্টক ছুড়িতে লাগিল, তাহাতে পিতমের কোন অনিষ্ট হইতেছে না দেখিয়া কালিদাস বৃক্ষারোহণ করিতে লাগিল; সেই সময় পিতম অপরদিকে আর এক বৃক্ষ অবরোহণ করিতেছিল। অবরোহণ করিবার সময় হস্তস্থিত দড়ি সবলে টানিয়া সেই বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া রাখিয়া গেল।

২৫

কালিদাস বৃক্ষে উঠিয়া দেখিল যে পিতম বৃক্ষে নাই, জনার্দ্দন তাহা বিশ্বাস করিল না। অতএব তরবারি ফেলিয়া আপনি বৃক্ষে আরোহণ করিল, কিন্তু তথায় কেহই নাই দেখিয়া দুই একবার নাম ধরিয়া পিতমকে ডাকিল, কালিদাস হাসিয়া বলিল, "তোমার ডাকার অর্থ এই যে কোথা পিতম, আমি অস্ত্র ভুলে আছি, তুমি মর্‌বার নিমিত্তে শীঘ্র এস, এই বলিয়া কালিদাস উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া রহস্যচ্ছলে ডাকিতে লাগিল, "কোথা পিতম শীঘ্র এস, মরিবার

নিমিত্ত দেরি করিও না। হাড়িকাট খাঁড়া দুই প্রস্তুত।

জনার্দ্দন। উপহাস নহে, পিতম কোথায় লুকাইল?

কালিদাস। বোধ হয় অন্য কোন গাছে গিয়াছে।

এই বলিয়া কালিদাস আর একটি গাছে উঠিল, তথায়ও পিতম নাই দেখিয়া তৃতীয় বৃক্ষারোহণ করিল, এই-রূপে ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি বকুল,তেঁতুল, আম্রবৃক্ষ অনুসন্ধান করিল, কিন্তু পিতম কোনটিতে নাই দেখিয়া, কথঞ্চিৎ বিস্ময়াপন্ন হইয়া অবতরণ করিতেছে, এমতসময় তাহার ভরে একটি শাখা অবনত হইয়া দড়িতে আঘাত করিল। দড়ির প্রথমভাগ অপর যে বৃক্ষে আবদ্ধ ছিল, অমনি তাহার শাখা দুলিয়া উঠিল। জনার্দ্দন কালিদাস উভয়েই ভাবিল, পিতম নিশ্চয়ই ঐ বৃক্ষে আছে, অতএব উভয়ে পুনরায় তাহাতে আরোহণ করিয়া বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। তখন কালিদাসের কিঞ্চিৎ ভয় হইল, জনা-র্দ্দনকে বলিল, "তবে পূর্ব্বে কে আসি-য়াছিল এখন তাহা বুঝেছ?"

জনার্দ্দন। কেন? পিতম আসি-য়াছিল, আমি তাহাকে চিনি, দুই তিনবার পশুশালায় তাহাকে দেখি-য়াছি।

কালিদাস। তবে সকল কথাই বু-ঝেছ। ব্রহ্মদৈত্য এসেছিলেন, পিত-মের রূপ ধরে আমাদের ছলনা করে গেছেন, এখনও হয় ত তিনি এইখানেই আছেন; নতুবা আমার অঙ্গ রোমা-ঞ্চিত হইতেছে কেন? আর দেখ এস্থান ক্রমে কত ভয়ানক হইতেছে। এই দেখে বুঝিতেছ না?

জনার্দ্দন। তোমার ভয় হইয়াছে তাই এ স্থান এখন তুমি ভয়ানক দেখি-তেছ। বালকের এসকল কর্ম্ম নয়, তুমি পলাও—আমিই এইখানে থাকিলাম।

কালিদাস। তবে আমিও থাকিলাম। এখন কি করিতে হইবে বল।

যখন জনার্দ্দন ও কালিদাসে পরস্পর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন পিতম ধীরে ধীরে একটি প্রান্তর অতি-ক্রম করিয়া আর একটি দীর্ঘিকার নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। পূর্ব্বকালে বাঙ্গা-লায় বিস্তর দীর্ঘিকা ছিল, এক্ষণে হিন্দু-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি লোপ পাই-তেছে। পূর্ব্বে যাহারা বুঝিত না, তাহারা হিন্দুধর্ম্মকে সম্পূর্ণ পারত্রিক ধর্ম্ম ভাবিত; যাহারা বুঝিত, তাহারা হিন্দু-ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ ঐহিক, সম্পূর্ণ সামাজিক বলিত। এক্ষণে জলদান আর ধর্ম্মান্ত-র্গত নহে; দীর্ঘিকার কাজেই আর পঙ্কোদ্ধার হয় না, কৃষকেরা কাজেই এখন আকাশমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে তকাবি এড্ভান্স (Tuccavi advance) দিয়া হিন্দুধর্ম্মের উপ-দেশ রক্ষা করিতেছেন। ধর্ম্মানুরোধে যাহা লোকেরা পূর্ব্বে আপনা আপনি

করিত, এক্ষণে তাহা গবর্ণমেণ্ট টাকা দিয়া করাইতেছেন। আমরা এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছি যে, দীর্ঘিকাখনন ধর্ম্ম নহে। কিন্তু তাহা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, সামাজিক কারণে যে অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা বুঝিতে এখনও আমাদের বাকি আছে।

দীর্ঘিকাকূলে উপস্থিত হইয়া পিতম শয়ন করিল; শয়নের সময় একবার বাঁশী বাজাইয়া বলিল, "বাঁশী এখন নিদ্রা যাও, রাত্রি অধিক হয়েছে, যে তোমার স্বর শুনিবে সেও হয় ত নিদ্রা গিয়াছে।"

প্রভাতে পিতম বাল্যকালের কি কথা স্বপ্ন দেখিতেছিল, নিদ্রাভঙ্গে তাহা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোন ক্রমে স্মরণ হইল না দেখিয়া আবার শয়ন করিল। বেলা প্রহরেক অতীত হইলে পিতম শয়ানাবস্থায় দেখিল যে দুইজন অশ্বারোহী আসিয়া স্থানে স্থানে কয়েকটি বংশাগ্র প্রোথিত করিতেছে। শেষ এক বৃহৎ বটবৃক্ষের শিরে এক শ্বেতপতাকা উড্ডীন করিয়া চলিয়া গেল। প্রহরেক পরে বিস্তর লোক সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের বেশ নানাপ্রকার, হস্তে নানা অস্ত্র। পিতম প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিল না, শেষ একটা কথা মনে পড়িল; একজন কর্ম্মচারীকে পিতম কি জিজ্ঞাসা করিলে কর্ম্মচারী বলিল, "তক্ষপুরের রাজা শান্তিশঙ্কর গ্রামে যাইতেছেন, এখানে তিনি দুই একদিন বিশ্রাম করিবেন, তাহাই শিবিরস্থাপন হইতেছে।" পিতম ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তবে আমি তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিব।" কর্ম্মচারী বলিল, "অবশ্য চাহিবে, তাঁহার নিকট দরিদ্রের অবারিতদ্বার," এই বলিয়া কর্ম্মচারী পশ্চাৎ ফিরিল।

আহারের সময় উপস্থিত দেখিয়া, পিতম আহারের চেষ্টায় গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহস্থের গৃহে গৃহে বাঁশী বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল। একজন গৃহস্থ কিছুই দিল না, তাহার সহিত পিতম মহাবিতণ্ডা আরম্ভ করিল। গৃহস্থ রোষাবিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, পিতম সেইখানে পথের প্রান্তে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল; এমত সময় একটি উলঙ্গ শিশু আসিয়া দ্বারের নিকট হইতে পিতমকে গালি দিতে লাগিল; গালি বুঝা যায় না, শিশুর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই, কেবল ভঙ্গী দেখিয়া পিতম বুঝিল যে শিশু গালি দিতেছে; পিতম হাস্যবদনে শিশুকে একটি চড় দেখাইল, শিশু তৎক্ষণাৎ পথ হইতে একটি তৃণ তুলিয়া থমথম করিতে করিতে আসিয়া সেই সধূলি তৃণ পিতমের অঙ্গে নিক্ষেপ করিল। তৃণ পিতমের অঙ্গে পড়িল দেখিয়া, শিশু আপনাকে কৃতকর্ম্মা মনে করিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিল। পিতম তখন হাত তুলিয়া আহ্বান করিবামাত্র শিশু তাহার বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। পিতম শিশুকে ক্রোড়ে বসাইয়া আদর করিতেছে এমত সময় দূর হইতে তাহার মাতা তাহাকে সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে দেখিয়া, পিতমকে ছেলে ধরা

ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল, চীৎকার শুনিয়া পল্লীস্থ অনেকে আসিয়া পিতমকে ঘেরিল। একজন পশ্চাৎ হইতে সজোরে পিতমের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিবার নিমিত্ত হস্ত উত্তোলন করিতেছে, এমতসময়ে জনার্দ্দন আসিয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তোমরা পিতমকে চেন না, এখনই গ্রাম রসাতল যাবে।"

এই বলিয়া জনার্দ্দন যেদিকে যাইতেছিল, পিতমকে সেইদিকে লইয়া চলিল। তাহার পর পিতমকে বলিল, "এইখানে তক্ষপুরের রাজা আসিয়াছেন, দেখিতে যাবে?"

পিতম। তক্ষপুরের রাজাকে চেন?

জনার্দ্দন। এই রাজার এক জ্যেষ্ঠ ছিল, একবার আমি তাঁহার হাতে রজ্জুবদ্ধ করি।

পিতম। তুমি!

জনার্দ্দন। আমি।

পিতম। অদৃষ্টের বন্দবস্ত আশ্চর্য্য।

জনার্দ্দন। ইহার আবার অদৃষ্ট কি? যাহার হাতে তরবারি থাকে তাহার নিকট প্রজাই বা কে আর রাজাই বা কে। রাজার ছাল কি বড় শক্ত? অস্ত্রে কি কাটে না? তোমায় যদি আমি কাটিতে পারি তবে বিজয়রাজকে আমি কি বাঁধিতে পারি না।

পিতম। কি আশ্চর্য্য!

জনার্দ্দন। আবার আশ্চর্য্য কি? আমি তখন রাজবাটীতে সিপাহি ছিলাম সত্য, কিন্তু আমি ত বিজয়রাজের চাকর ছিলাম না, তাঁহার বাপেরও চাকর ছিলাম না।

পিতম। তবে কাহার চাকর ছিলে?

জনার্দ্দন। দেওয়ানজীর। এই রাজা সেই দেওয়ানের পুত্র।

পিতম। তবে তাঁহার কাছে এখন চাকুরীর চেষ্টা কর না কেন?

জনার্দ্দন। ইনি বাপের কুপুত্র। বাপের উপর ইহার বড় বিদ্বেষ; লোকে বলে তাঁহাকে পোষ্যপুত্র দেওয়ায় এইরূপ বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। এখন সেকথা যাক্, কাল তুমি আমাদিগকে বড় বঞ্চনা করিয়াছিলে।

পিতম হাসিয়া বলিল, "সত্য কথা। কার্য্যটা বড় ভাল হয় নাই।"

জনার্দ্দন। তবে অদ্য রাত্রে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হইবে?

পিতম। এখন কিছুদিন দেখা হইবে না। এখন আমার মৃত্যুর দরকার নাই, প্রয়োজন হইলেই আমি তোমার কাছে পরে যাব।

জনার্দ্দন। ভাল, দেখা যাবে।

তাহার পর যেখানে শিবিরস্থাপন হইতেছিল, পিতম সেইদিকে চলিল। জনার্দ্দন অন্যপথে চলিয়া গেল।

প্রাতে পিতম যেখানে অশ্বারোহিগণকে বংশাগ্র প্রোথিত করিতে দেখিয়াছিল, সেই স্থান এক্ষণে নগরের ন্যায় জনসমাকুল; কেহ ডাকিতেছে, কেহ দৌড়িতেছে, কেহ তিরস্কার করিতেছে,

কেহ চন্দ্রাতপ উঠাইতেছে, কেহ ঠিক হইল না বলিয়া তাহা নামাইতেছে, কেহ ঘোড়া টহলাইতেছে, কেহ মোট মাথায় করিতেছে, কেহ তাহা নামাইতেছে; কোন মল্ল ডন কসিতেছে, কেহ বা কস্ত কসিতেছে, কেহ চুলী কাটিতেছে, কেহ ভাঙ্গ ঘুটিতেছে, কেহ ছায়ায় বসিয়া খঞ্জনী বাজাইতেছে। কোলাহলের সীমা নাই, রাজা আসেন নাই, আসিবারও আর বিলম্ব নাই। একজন যুবা এইসময় এক বৃক্ষমূলে গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়াছিল, সে হঠাৎ ঘণ্টাবাদন করিল। ঘণ্টার শব্দ মাত্রে যেন কোলাহল শিহরিয়া থামিয়া গেল। তখন সকলে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বদিকে দেখিতে লাগিল; সেদিকে বাত্যাতাড়িতধূমের ন্যায় ধূলি উড়িতেছিল, ক্রমে সেইদিকে বহু অশ্বপদসঞ্চালিত শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। অমনি শিবিরস্থ সকলে নিঃশব্দে স্বস্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। আর কোন কোলাহল নাই, কোন বিশৃঙ্খলতা নাই। দণ্ডেককাল অতীত না হইতে হইতে কতকগুলি যুবা অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা স্ব স্ব অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাদেরই মধ্যে একজনকে বেষ্টন করিয়া শিবির প্রবেশ করিলেন; তাঁহার পরিচ্ছদে কোন প্রভেদ ছিল না; কেবল মস্তকে একটিমাত্র ক্ষুদ্র ময়ূরপুচ্ছ। তিনিই তক্ষপুরের রাজা। এই সময় যত পশ্চিমপ্রদেশীয় সিপাহীরা উচ্চৈঃস্বরে "জয় মহারাজ মহেশচন্দ্র কি" বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল।

২৬

পরদিবস প্রাতে পিতম দীর্ঘিকার পার্শ্ববর্ত্তী মৃত্তিকাস্তূপে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় হস্তের উপর মস্তক রাখিয়া একটি যুবা ব্রহ্মচারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল। যুবা ক্ষণেক বিলম্বে পিতমের পার্শ্বে আসিয়া বসিল। পিতম জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি রাজার ব্রহ্মচারী?"

যুবা। তোমার কি বোধ হয়?

পিতম। আমার কিছুই বোধ হয় না।

যুবা। আমি ঠিকে ব্রহ্মচারী, আপাততঃ রাজার সঙ্গী। তুমিও কেন আমাদের রাজার সঙ্গী হও না?

পিতম। লাভ?

যুবা। তোমার লাভ যে তুমি কলহ প্রিয়, অনেক কলহ পাইবে। রাজার লাভ যে তিনি একজন কুটুম্ব পাইবেন।

পিতম কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া যুবার প্রতি চাহিয়া দেখিল। যুবা সেই চাঞ্চল্য বুঝিতে পারিয়া বলিল, "তুমি নিজেই ত বলিয়া থাক, সকল দরিদ্র রাজার কুটুম্ব।"

পিতম। আমি বলিয়া থাকি! তবে কি আমাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলে?

যুবা। দেখিয়াছিলাম।

পিতম। কোথায়?

যুবা। জানি না, এখন তুমি আমার একটী কার্য্য কর। সেই অনুরোধ করিতে তোমার নিকট আসিয়াছি।

পিতম। যাহাকে চিনি না, তাহার অনুরোধ রাখি না।

যুবা। না রাখ, এখনই আমি এই রাজার নিকট নালিশ করিব। এখনই তুমি হাজতে যাবে, তাহা হইলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

পিতম। তোমার এ অভীষ্ট কেন?

যুবা। তোমারও যে ব্রত, আমারও সেই ব্রত। উভয়ের ব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্ত তোমায় এইস্থানে দুই একদিন থাকিতে হইবে।

পিতম। আমার কোন ব্রত নাই। ব্রত স্ত্রীলোকে করে।

যুবা। তাই যেন হলো; স্ত্রীলোকের ব্রতে তুমি সহায় হও, একবার একজনকে উদ্ধার কর।

পিতম। কাহাকে উদ্ধার করিব তাহা পূর্ব্বে বল; যদি সীতা উদ্ধার করিতে হয়, তবে আমার কর্ম্ম নয়। তুমি অন্য লোক দেখ।

যুবা। রাম ব্যতীত সীতার উদ্ধার আর কে করিবে?

পিতম। এক্ষণকার সীতাদের উদ্ধার করিতে আর রামের প্রয়োজন হয় না। সীতারা আপনাদের উদ্ধার আপনারাই করেন। একালে আর সীতাহরণ নাই, বরং সীতারা ব্রহ্মচারীর বেশ ধরে রাবণ-হরণ করে। বল দেখি তক্ষপুরের রাবণকে কে হরণ করে এখানে এনেছে? সত্য বল, একজন যুবতী ব্রহ্মচারীর বেশ ধরে এনেছে কি না।

যুবা। এনেছে সত্য, কিন্তু কেন? কেবল রাম অকর্ম্মা বলে।

পিতম। রাম চিরকালত অকর্ম্মা, কেবল বানরের বলে রামের জয়। তবে এবার রাম আর জয়-ইচ্ছুক নহেন, রামের চুল্লী অনেকদিন জ্বলেছে। আবার এখন রাবণ "বধাবধি" কেন?

যুবা। এবারকার রামায়ণে রাবণ-বধ নাই; এবার আদিকাণ্ডে রামবধ; তারপর অরণ্যকাণ্ড। লঙ্কাকাণ্ড আছে, কিন্তু এবার কি হয় বলা যায় না, সকলই শ্রীরামের ইচ্ছা। ভক্তেরা প্রস্তুত। এখন শ্রীরামের ইচ্ছা হলেই উদ্যোগ-পর্ব্ব আরম্ভ হয়।

পিতম। আমি হুকুম দিলাম তোমার রাম যাবজ্জীবন অজ্ঞাতবাস করিবেন। যদি ভক্তদ্বারা অন্যথা হয় তবে মহাপাপ।

যুবা। তবে হুকুম দেন সীতার সঙ্গে অজ্ঞাতবাস হউক।

পিতম। সীতা পাতালে প্রবেশ করেছেন আর তাঁর নাম কেন।

যুবা। এখানে স্থানাভাব বলিয়া ত তিনি পাতালে গিয়াছেন।

পিতম। রামসীতায় আর দেখা হইবে না।

যুবা। অবশ্য দেখা হবে। মিলনও হবে।

পিতম। তোমার নাম কি?

যুবা। এখন কোন নাম নাই।

এই বলিয়া যুবা হাসিয়া উঠিয়া গেল।

এই সময় গুটিকত হস্তী হস্তিনী স্নান উপলক্ষে দীর্ঘিকায় আনীত হইয়াছিল। পিতম দেখিতে লাগিল, যে তাহার মধ্যে একটি হস্তী কতক জলে কতক স্থলে, অশক্ত শিশুর ন্যায় বসিয়া শুণ্ডক্রীড়া করিতেছে। স্থূলাঙ্গ সুকোমল শিশুর ন্যায় তাহার উদর দুইপার্শ্বে স্ফীত দেখাইতেছে। প্রকাণ্ড হস্তীতে শিশুর কোমলতা আশ্চর্য্য। দুইজন মাহুত ঝামা হস্তে তাহার পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করিতেছে। আর কয়টি হস্তিনী কুলবালার ন্যায় জলে আচক্ষু নিমজ্জন করিয়া রহিয়াছে। পিতম একবার উঠিয়া সেইদিকে গেল। প্রথম হস্তীর নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার অমলশ্বেত দীর্ঘদন্ত দেখিতে দেখিতে অস্পষ্টস্বরে তাহাকে ডাকিল, "বৃহদ্দন্তেশ্বর" হস্তী মুখ তুলিল, পিতমকে মাহুত বলিল, "ভাগো।" পিতম সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ধীরে ধীরে হস্তীর শুণ্ডস্পর্শ করিয়া ঈষৎ টানিল; স্পর্শমাত্রেই হস্তী শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল, পিতমকে দেখিতে লাগিল। মাহুত চীৎকার করিয়া পিতমকে সরিয়া যাইতে বলিতে লাগিল, পিতম সে কথা না শুনিয়া আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া হস্তীর গণ্ডে হাত দিল। পরে শুণ্ডাগ্রভাগ ধরিয়া আপনার গণ্ড হস্তীর গণ্ডের উপর রাখিল। তখন হস্তী শুণ্ডদ্বারা পিতমকে আবদ্ধ করিয়া দেখিতে লাগিল, তাহার পর দীর্ঘিকা কম্পিত করিয়া বৃংহিতধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহা শুনিবামাত্র অপর হস্তিগণ ব্যস্ত হইয়া জল হইতে গাত্রোত্থান করিল। কূলে আসিয়া মেঘবৎ গর্জ্জন করিয়া পিতমকে ঘেরিল। মাহুতেরা চীৎকার করিতে করিতে শিবিরাভিমুখে ছুটিল। শিবিরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। "হস্তী একজন ভিক্ষুককে হত্যা করিয়াছে।" এই জনরব সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। মহারাজ মহেশচন্দ্র শিবির হইতে দৌড়িয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "যে পিতম পাগলাকে বাঁচাইবে সহস্র মুদ্রা তাহার পারিতোষিক।" একজন পারিষদ বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পিতম পাগলা কে?" মহেশচন্দ্র বলিলেন, "রাজা ইন্দ্রভূপের পাগল।" এই বলিয়া অন্যলোকের অপেক্ষা না করিয়া মহেশচন্দ্র স্বয়ং অঙ্কুশহস্তে দৌড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে শত শত লোক দৌড়িল। রাজা কিয়দ্দূর আসিয়া, হঠাৎ দাঁড়াইয়া বিস্মিতনেত্রে হস্তীদিগের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। একজন মাহুত দূর হইতে বলিল, "আর যাওয়া বৃথা, শেষ হইয়া গিয়াছে।" রাজা সে কথা না শুনিয়া হস্তহইতে অঙ্কুশ ফেলিয়া দিলেন; পশ্চাদ্দিকে মাথা ফিরাইয়া সকলকে আসিতে নিষেধ করিলেন। তাহার পর একাকী হস্তীদিগের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন হস্তীরা কেহ পিতমের গাত্রে শুণ্ডাগ্র স্পর্শ করাইতেছে, কেহ পদ্মপত্র তুলিয়া তাহা-

ছার অঙ্গে দিতেছে; কেহ কর্দ্দম তুলিয়া তাহার অঙ্গে লেপন করিতেছে। প্রথম হস্তীটি পিতমকে পূর্ব্ববৎ শুণ্ডবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে, পিতমকে দেখিতেছে—পিতমের কপোলদেশে, ধমনী উঠিয়াছে, চক্ষুর নিম্নে শিরা স্ফীত হইয়াছে, পিতম হস্তীর গণ্ডদেশে সাদরে হাত বুলাইতেছে। রাজা মহেশচন্দ্র আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইলেন; হস্তীরা তাহাকে লক্ষ করিল না, পিতমও তাহাকে দেখিতে পাইল না। পিতম হস্ত বাড়াইয়া হস্তীর গলদেশের একস্থান স্পর্শ করিয়া বলিল, " বৃহদ্দন্তেশ্বর এখন আমায় ছাড়িয়া দাও, তোমার রাজা দেখিতে পাইবেন।" বৃহদ্দন্তেশ্বর হুঙ্কার ছাড়িয়া পিতমের অঙ্গ হইতে বেষ্টিত শুণ্ড খুলিয়া লইল। রাজা মহেশচন্দ্র পশ্চাৎ হইতে বলিলেন,"আমি দেখিয়াছি।" পিতম জিজ্ঞাসা করিল,"এ হস্তী বুঝি তোমার? হস্তীগুলি বেচিবে?" মহেশচন্দ্র ঈষৎ হাসিলেন, বলিলেন, "আসুন, আমরা এইখানে বসিয়া হস্তীর মূল্য অবধারণ করি।" পিতম বলিল, "আজ নহে, এক্ষণে আমি ভিক্ষায় যাই।" রাজা মহেশচন্দ্র কাতরনয়নে পিতমের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, পিতম গ্রামাভিমুখে যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমত সময় হস্তীরা আবার আসিয়া তাহাকে ঘেরিল। রাজা মহেশচন্দ্র বলিলেন,"আপনি আমার হস্তীদের যাদু করিয়াছেন দেখিতেছি, হস্তীরা আপনাকে না ছাড়িলে আমিও আপনাকে ছাড়িব না।"

পিতম। আহারের বন্দবস্ত করে দিলে আমি থাকিতে রাজি আছি, কিন্তু আমায় বৃহদ্দন্তেশ্বরের মাহুত করিতে হইবে।

রাজা। তাহাই হইবে।

পিতম। তবে চল।

এই বলিয়া পিতম বৃহদ্দন্তেশ্বরের অঙ্গে হস্ত দিয়া ইঙ্গিত করিয়া শিবিরাভিমুখে চলিল। সঙ্গে রাজা চলিলেন।

কয়েকপদ গিয়া বৃহদ্দন্তেশ্বর পিতমকে হঠাৎ শুণ্ডবেষ্টিত করিয়া তুলিল, সযত্নে ধীরে ধীরে আপনার বামদন্তে তাহাকে বসাইয়া শুণ্ড "রামশিঙ্গার" ন্যায় বাঁকাইয়া উর্দ্ধে তুলিল। পিতম তাহা বামকরে আলিঙ্গন করিয়া তাহার উপর মাথা হেলাইয়া ম্লানমুখে বসিল। তখন সকল হস্তীরা একত্রে মহাসুখে বৃংহিতনাদ করিয়া আকাশ পরিপূর্ণ করিল; শব্দে শিবিরস্থ সকলে শিহরিয়া উঠিল। সকলে দেখিল, দরিদ্র পিতম হস্তিদন্তে বসিয়া দুলিতে দুলিতে শিবির প্রবেশ করিতেছে, রাজা মহেশচন্দ্র হস্তীর একটি দন্তাগ্র ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন।

এই সময় যুবা ব্রহ্মচারী একাকী দাঁড়াইয়া একটি বৃক্ষে মাথা হেলাইয়া চক্ষের জল মুছিতেছিল। রাজা মহেশচন্দ্র তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, " আর আমি প্রমাণ চাহি না, যথেষ্ট প্রমাণ পাইলাম।" যুবা কাঁদিয়া উঠিল, বস্ত্রাগ্রে মুখ ঢাকিয়া বলিল, " এ দাসীর

এখন কার্য্য ফুরাইল, এ অনাথার অদৃষ্টে এত সুখ ছিল!”

মহেশচন্দ্র। মাতঙ্গিনি, তোমার ঋণ আমি আর পরিশোধ করিতে পারিব না।

এই বলিয়া রাজা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন।

২৭

অপরাহ্নে রাজা মহেশচন্দ্র একাকী অন্যমনস্কে বসিয়া আছেন, এমত সময় পিশুমের বংশীরব তাঁহার কর্ণে গেল। রাজা একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কে বংশী বাজাইতেছে?” ভৃত্য বলিল, “সেই ভিক্ষুক।” রাজা দুই হস্তে মস্তক ধরিয়া বংশীধ্বনি শুনিতে লাগিলেন; ভৃত্য চলিয়া গেল। মহেশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, যেন পিশুম সুখসাগর মন্থন করিতেছে, কতই রত্ন তুলিয়া মালা গাঁথিতেছে, আদরে কাহারে পরাইতেছে ও আপনি দেখিতেছে; দেখিয়া আহ্লাদে কাঁদিতেছে। রাজা আবার ভৃত্যকে ডাকিলেন; বলিলেন, “ভিক্ষুক বাঁশী বাজাইতেছে, কেহ তাহাকে বারণ করে নাই?”

ভৃত্য। বারণ করিতে গিয়াছিল, বৃদ্ধ আরজবেগ বারণ করিতে দেন নাই।

রাজা। আরজবেগকে ডাক।

পরক্ষণেই আরজবেগ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে বাঁশী বাজাইতেছে?”

আরজবেগ। যে ভিক্ষুককে মহারাজ প্রাতে শিবিরে আনিয়াছেন।

রাজা। ভিক্ষুকটি বেয়াদব দেখিতেছি, উহাকে আর স্থান দেওয়া সঙ্গত নহে। অন্যসকলে ক্রমে বেয়াদব হইবে।

আরজবেগ। অনুমতি হয় ত তাঁহাকে বাঁশী বাজাইতে বারণ করে আসি। শাস্ত্রীরা বারণ করিতে গিয়াছিল, আমি তাঁহাদের নিবারণ করি, ভাবিয়াছিলাম যখন মহারাজ তাঁহাকে সম্মান করে এখানে আনিয়াছেন, তখন অবশ্য তাঁহার বেয়াদবি মাপ আছে।

রাজা। ভিক্ষুকটি পাগল বোধ হয়।

আরজবেগ। বোধ হয়।

রাজা। ইহাকে আর কখন দেখিয়াছিলে?

আরজবেগ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “বোধ হয় দেখি নাই।”

রাজা। কিন্তু ভিক্ষুক তোমায় জানেন বোধ হইল, যখন তোমার প্রতি তাঁহার প্রথম দৃষ্টি পড়ে, তখনই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

আরজবেগ। তবে বোধ হয় ভিক্ষুক আমায় চিনিতে পারিয়াছেন।

রাজা। তোমার সহিত তবে বহুপূর্ব্বে আলাপ ছিল?

আরজবেগ। আজ্ঞে না।

রাজা। ভয় নাই, সত্য কথা বল।

আরজবেগ মুখ অবনত করিয়া

বলিল, "আমার অনুভবমাত্র; ভিক্ষুকের আকার দেখিয়া আমার কিছুই স্মরণ হয় না।"

রাজা। তোমার অনুভব যাহাই হউক, আর সকলে কি বলে?

আরজবেগ। আর কেহই ত কোন কথা বলে না।

রাজা। বলিতে সাহসও করে না। কে কি বলে শুনিয়া আইস।

আরজবেগ বিদায় হইলে মহেশচন্দ্র কিঞ্চিৎ গোপনভাবে একাকী হস্তিশালার দিকে গেলেন, কিঞ্চিৎ দূর হইতে দেখিলেন, বৃহদ্দন্তেশ্বরের নূতন সজ্জা হইয়াছে; মাথায় খর্জ্জুরপল্লবরচিত এক রাজমুকুট, তাহাতে বনপুষ্প, বনলতা নানা ভঙ্গীতে গ্রন্থিত, গলায় বনফুলের লম্বিত মালা। তাহার শুণ্ডাকৃতি শুণ্ড পিতম বামকরে আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়া দক্ষিণ কর প্রসারিত করিয়া একটি হস্তিশাবককে ডাকিতেছে; শাবকটি মাতৃদেহের নিম্নে দাঁড়াইয়া পিতমকে দেখিতেছে, কোমল ক্ষুদ্র শুণ্ডটি পিতমের দিকে বাড়াইয়া আঘ্রাণ লইবার নিমিত্ত শুণ্ডাগ্র বিস্ফারিত করিতেছে, একবার একবার দুই এক পদ অগ্রসর হইতেছে, আবার পিছাইতেছে, পিতম নানা স্বরে অভয় দিতেছে। শেষ করিশাবক ক্রীড়ালুব্ধ হইয়া পিতমের সম্মুখে আসিয়া মুখ তুলিয়া শুণ্ডাগ্র বিস্ফারিত করিতে লাগিল, সাহস করিয়া একবার পিতমের অঙ্গস্পর্শ করিল, স্পর্শমাত্রেই পলাইয়া আবার মাতৃউদরের নিম্নে গিয়া দাঁড়াইল; তথা হইতে নির্ভয়ে পিতমকে দেখিতে লাগিল। এমতসময় রাজা মহেশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। করিশাবকের মাতাকে দেখাইয়া পিতম জিজ্ঞাসা করিল, "এ গণেশজননীকে কতদিন গৃহে আনা হইয়াছে?"

মহেশচন্দ্র। সম্প্রতি।

পিতম। সম্প্রতি ঐ চন্দ্র উঠিতেছে, আমি চলিলাম।

মহেশচন্দ্র। কোথা যাবেন?

পিতম। যত্রতত্র, আমার আর "কোথা" নাই।

মহেশচন্দ্র। আমি আপনার সঙ্গে যাব।

পিতম। আমার সঙ্গে যাওয়া বৃথা, আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না, আমি তোমায় কি শিখাইব?

মহেশচন্দ্র। যদি সে সকল কিছু জানেন না, তবেএ বেশ কেন,এ রুদ্রাক্ষমালা কেন, এ ঝুলি কেন?

পিতম। এ আমার ভিক্ষার ঝুলি, যখন আমার উপনয়ন হয়, পিতা আমার স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি দিয়াছেন, আমি আর ত্যাগ করিতে পারি না।

মহেশচন্দ্র। আপনার পিতা আপনাকে ভিখারি করে গিয়াছেন। আমার জনক আমাকে পরের রাজ্যে রাজা করে গিয়াছেন, এখন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। এই ঐশ্বর্য্যভার

হইতে মুক্ত হইলেই আমি প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করি। যাঁহার ঐশ্বর্য্য তিনি লই-লেই আমি কৃতার্থ হই, আমি তাঁহারই জন্য রাজ্যরক্ষা করিতেছি।

পিতম। দুরারা ভ্রান্ত।

মহেশচন্দ্র। আমাদের ভ্রান্তি আছে সত্য, তবে আমার নিজের কথা এইমাত্র বলিতে পারি যে, এ ঐশ্বর্য্য আমার কণ্টকস্বরূপ হইয়াছে। যাঁহার ঐশ্বর্য্য তিনি তাহা স্পর্শ করিতে পাইলেন না, তাঁহাকে পথে পথে বেড়াইতে হইল, আর আমি তাঁহার রাজগৃহে বাস করি। তাঁহার যত কষ্ট, তাহা সকলই আমি স্বপ্নে দেখি।

পিতম। এসকল কথার অর্থ পিতম পাগলার বোধগম্য নহে। পিতম শু-নিবে না, বুঝিবে না, দাঁড়াবে না।

এই বলিয়া পিতম চলিল। মহেশচন্দ্র পিতমের অনুসরণ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, পিতম অতি তীব্র ইঙ্গিত-দ্বারা নিষেধ করিয়া চলিয়া গেল। দূর হইতে মহেশচন্দ্র পিতমের বাঁশী শুনিতে লাগিলেন—কি মধুর, কি আনন্দময়! সেই সুর শুনিতে শুনিতে রাজা মহেশ-চন্দ্র দরিদ্রের নিমিত্ত আপনার জীবন সঙ্কল্প করিলেন, দাঁড়াইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "পিতম! তোমার ভিক্ষার ঝুলি আমার যাবজ্জীবনের বীজ-মন্ত্র হইল। যে পরের সুখভঙ্গের ভয়ে আপনি সুখে বঞ্চিত থাকিতে পারে, সে পরম গুরু।"



বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

যে জাতির পূর্ব্বমাহাত্ম্যের ঐতিহা-সিকস্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্য রক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিনকুরের স্মৃতির ফল ব্লেন্‌হিম্ ও ওয়াটর্লু—ইতালি অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হই-য়াছে। বাঙ্গালি আজ কাল বড় হইতে চায়,—হায়! বাঙ্গালির ঐতিহাসিকস্মৃতি কই?

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালি কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই; তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয় বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালিরা মনে জানে যে আমাদিগের

পূর্ব্ব-পুরুষ চিরকাল দুর্ব্বল, অসার আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না। চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।

কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালিরা কি চিরকাল দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার, চৈতন্যের ধর্ম্ম, রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়, জয়দেব বিদ্যাপতি মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল? দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য আরও ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্ত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে? বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে?

সেই সার কথা কোথা পাইব? বাঙ্গালার ইতিহাস আছে কি? সাহেবেরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বই, এত বড় ভারী বই যে, ছুড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শমান লেথব্রিজ প্রভৃতি চুটকিতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে, অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন।

কিন্তু এসকলে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদসাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধিধারণ করিয়া, নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং খিচুড়ীভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধও নাই। বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। যে বাঙ্গালি এসকলকে বাঙ্গালার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে সে বাঙ্গালি নয়। আত্মজাতিগৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালি নয়।

সতের জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? মিনহাজ উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। আমি যদি আজ বলি যে কাল রাত্রে আমি ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস কর না। কেন না অসম্ভব কথা। আর মিনহাজ উদ্দীন তাহা অপেক্ষাও অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তোমরা অম্লানবদনে বিশ্বাস কর। আমি জীবিত লোক, তোমাদের কাছে পরিচিত, আমার কথা বিশ্বাস কর না। কিন্তু সে সাতশত বৎসর মরিয়া গিয়াছে, সে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী

কিছুই জান না, তথাপি তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস কর। আমি বলিতেছি আমি নিজে ভূত দেখিয়াছি, আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না অথচ ভূত আমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বলিয়া বলিতেছি! আর মিনহাজ উদ্দীনের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নহে, জনশ্রুতি মাত্র। জনশ্রুতি কি স্বকপোলকল্পিত তাহাতেও অনেক সন্দেহ। আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে তোমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু সেই গোহত্যাকারী ক্ষৌরিত চিকুর, মুসলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এবিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এই মাত্র কারণ যে সাহেবরা সেই মিনহাজ উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরী হয়! বিশ্বাস না করিবে কেন?

তুমি বলিবে যে তোমার ভূতের গল্প বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই যে ভূত প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। আরিস্টটল হইতে মিল পর্য্যন্ত সকলে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভাই বাঙ্গালি! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, সতেরজন লোকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালিকে বিজিত করিল, এইটাই কি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুমত। যদি তাহা না হয়, তবে হে চাকরীপ্রিয়! তুমি কেন এ কথায় বিশ্বাস কর।

বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। বখ্‌তিয়ার খিলিজির পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ব্ববাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্দ্ধেক বাঙ্গালা শাসন করিয়া আসিলেন। তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তরবাঙ্গালা, দক্ষিণবাঙ্গালা, কোন অংশই বখ্‌তিয়ার খিলিজি জয় করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবতীনগরী এবং তাহার পরিপার্শ্বস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখ্‌তিয়ার খিলিজি সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল এ কথা যে বাঙ্গালিতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।

বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্ব্বত্র। ইতিহাসে কথিত আছে পলাশির যুদ্ধে জন দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেনা সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাসমাত্র। পলাশিতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ্গ তামাসা হইয়াছিল। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর মুসলমানের লিখিত সএর মুতাক্ষরীণ নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ।

নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা আছে মনুষ্য সিংহকে জুতা

মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জানিত, তাহা হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত। বাঙ্গালিরা কখন ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালির ঐতিহাসিক চিত্রের এ দশা হইয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্ম্মী অসার পীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?

তুমি লিখিবে আমি লিখিব সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালি তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ ইহাঁর গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই।

আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।

অনেকে না বুঝিলে না বুঝিতে পারেন যে কোথায় কোন পথে অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতএব আমরা তাহার দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

বাঙ্গালিজাতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? অনেকে মুখে বলেন বাঙ্গালিরা আর্য্যজাতি। কিন্তু সকল বাঙ্গালিই কি আর্য্য? ব্রাহ্মণাদি আর্য্যজাতি বটে, কিন্তু হাড়ি, ডোম, মুচি, কাওরা, ইহারাও কি আর্য্যজাতি? যদি না হয়, তবে ইহারা কোথা হইতে আসিল। ইহারা কোন্ অনার্য্যজাতির বংশ, ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কবে বাঙ্গালায় আসিল? আর্য্যেরা আগে, না অনার্য্যেরা আগে? আর্য্যেরা কবে বাঙ্গালায় আসিল? কোন্ গ্রন্থে কোন সময়ে আর্য্যদিগের প্রাথমিক উল্লেখ আছে? বেদ, পুরাণ, ইতিহাস খুঁজিয়া বঙ্গ, মৎস্য, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি প্রদেশের অনেক উল্লেখ পাইবে। কিন্তু কোথাও এমন পাইবে না যে আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বিশিষ্ট পরিমাণে আর্য্যাধিকার হইয়াছিল। কেবল কোথাও আর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, কোথাও আর্য্যবংশীয় ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত। আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালি ব্রাহ্মণপ্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদি এমন কোন প্রমাণ পাও যে আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আর্য্যাধিকার হইয়াছিল, প্রকাশ কর। নহিলে বাঙ্গালি আধুনিকজাতি।

মধ্যকালে অর্থাৎ আদিশূরের কিছু পূর্ব্বে, বাঙ্গালা যে খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাহা চৈনিকপরিব্রাজকদিগের গ্রন্থের দ্বারা একপ্রকার প্রমাণীকৃত হইতেছে। কয়টী রাজ্য ছিল, কোন্ কোন্ রাজা, প্রজারা কোন্ জাতীয়. তাহাদিগের

অবস্থা কি, মগধের সঙ্গে তাহাদিগের সম্বন্ধ কি, রাজা কে ?

মুসলমানদিগের সমাগমের পূর্ব্বে, বাঙ্গালা যে একীকৃত হইয়াছিল তাহাও কতকটা নিশ্চিত। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহা একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছেন। সন্ধান কর কিপ্রকারে বাঙ্গালা একীকৃত হইল। বাঙ্গালা একীকৃত হইলে পর, মুসলমানকর্ত্তৃক জয় পর্য্যন্ত এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল। রাজশাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপে হইত। রাজসৈন্য কত ছিল, কিপ্রকার ছিল, তাহাদিগের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি ? রাজস্ব কিপ্রকার আদায় করিত। কে আদায় করিত, কিপ্রকারে ব্যয়িত হইত, কে হিসাব রাখিত, কতপ্রকার রাজকর্ম্মচারী ছিল, কে কোন্ কার্য্য করিত, কিপ্রকারে বেতন পাইত, কোনরূপে কার্য্যসমাধা করিত, কে বিচার করিত, বিচারের নিয়ম কি ছিল। বিচারের সার্থকতা কিরূপ ছিল, দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল, প্রজার সুখ কিরূপ ছিল। খানা কিরূপ হইত, রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্ত্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদিগের সুখ দুঃখ কিরূপ ছিল ? চৌর্য্য-পূর্ত্ত স্বাস্থ্য এ সকল কিরূপ ছিল ? কোন্ কোন্ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক চার্ব্বাক, বৈষ্ণব, শৈব, অনার্য্য, কোনধর্ম্ম কতদূর প্রচলিত ছিল ? শিক্ষা, শাস্ত্রালোচনা কতদূর প্রবল ছিল ? কোন্ কোন্ কবি, কে কে দার্শনিক, স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ? তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি কি ? তাঁহাদিগের গ্রন্থের দোষ গুণ কি কি ? তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কি শুভাশুভ ফল জন্মিয়াছে ? বাঙ্গালির চরিত্র কিপ্রকারে তদ্দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ? তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ? সমাজভয় কিরূপ ? ধর্ম্মভয় কিরূপ ? ধনাঢ্যের অশনপ্রথা, বসনপ্রথা, শয়নপ্রথা কিরূপ ? বিবাহ, জাতিভেদ কিরূপ ? বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্পকার্য্যে পারিপাট্য ছিল ? কোন্ কোন্ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্ কোন্ দেশে পাঠাইত ? বিদেশযাত্রার পদ্ধতি কিরূপ ছিল ? সমুদ্রপথে বিদেশে যাইত কি ? যদি যাইত, তবে জাহাজ বা নৌকার আকারপ্রকার কিরূপ ছিল। কোন্ প্রদেশীয় লোকেরা নাবিক হইত ? কোম্পাস ও লগবুক্ ভিন্ন কিপ্রকারে নৌযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। বালী ও যবদ্বীপ সত্য সত্যই কি বাঙ্গালির উপনিবেশ ? প্রমাণ কি ? ভিন্নদেশ হইতে কি কি সামগ্রী আমদানি হইত, পণ্যকার্য্য কিপ্রকারে নির্ব্বাহ হইত।

তার পর মুসলমান আসিল। সপ্তদশ অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা যে জয় করিয়াছিল তাহা যে মিথ্যা কথা সহজেই দেখা যাইতেছে। বখ্‌তিয়ার খিলিজি অত-

টুকু বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, কিপ্রকারে জয় করিয়াছিল? লক্ষ্মণাবতী জয়ের পর বাঙ্গালার অবশিষ্টাংশ কি অবস্থায় ছিল? সে সকল দেশে কে রাজা ছিল? অবশিষ্ট অংশের কিপ্রকারে স্বাধীনতা লুপ্ত হইল? কবে লুপ্ত হইল।

পরে স্বাধীন পাঠানসাম্রাজ্য। পাঠানেরা কতটুকু বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন? যেটুকু অধিকার করিয়াছিলেন, সেটুকুর সঙ্গে তাঁহাদিগের কি সম্বন্ধ ছিল। সেটুকু কিপ্রকারে শাসন করিতেন। আমি যতদূর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে আমার এই বিশ্বাস আছে যে পাঠানেরা কস্মিনকালে প্রকৃতরূপে বাঙ্গালা অধিকার করেন নাই। স্থানে স্থানে তাঁহারা সৈনিকউপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া উপনিবেশের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসকল শাসন করিতেন মাত্র। তাঁহাদিগের আমলে বাঙ্গালিই বাঙ্গালা শাসন করিত। হিন্দুরাজগণের অধিকার সময় হইতে ওয়ারণ্ হেষ্টিংশের সময় পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজগণ বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিত; যেমন বিষ্ণুপুরের রাজা, বর্দ্ধমানের রাজা, বীরভূমের রাজা ইত্যাদি। ইহারাই দীনদুনিয়ার মালিক ছিলেন। ইহারাই রাজস্ব আদায় করিত, শান্তি রক্ষা করিত, দণ্ডবিধান করিত, এবং সর্ব্বপ্রকার রাজ্যশাসন করিত। মুসলমান সম্রাটেরা বড় বড় লড়াই পড়িলে লড়াই করিতেন অথবা করিতেন না। অধীনস্থ রাজগণের নিকট কর লইতেন অথবা পাইতেন না। ইউরোপের মধ্যকালে ফ্রান্সরাজ্যের রাজার সহিত বরগণ্ডী, আঁজু, প্রবেন্স প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশের রাজগণের যে সম্বন্ধ মুসলমানের সহিত বাঙ্গালার রাজগণের সেই সম্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাহারা একজন Suzerain মানিত। কখন কখন মানিত না। তদ্ভিন্ন স্বাধীন ছিল। এ বিষয়ে যতদূর অনুসন্ধান করিতে পার কর। কোন্ রাজবংশ কোন্ কোন্ প্রদেশ কতকাল শাসন করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান কর। তাঁহাদিগের সুবিস্তৃত ইতিহাস লেখ।

ইউরোপ সভ্য কতদিন? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইউরোপ সভ্য হইয়া গেল। অকস্মাৎ বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীকসাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ফিরিয়া পাইয়া যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কূলপরিপ্লাবিনী হয়, যেমন মুমূর্ষু রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বলপ্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেত্রার্ক, কাল লুথর, আজ গেলিলিও, কাল বেকন; ইউরোপের এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল। আমাদিগেরও একবার সেইদিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়; তার পর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। এ দিকে দর্শনে

রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পূর্ব্বগামী। কিন্তু তাহার পরে, চৈতন্যের পরবর্ত্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়া; সে কোথা হইতে?

আমাদিগের এই Renaissance কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? ধর্ম্মবেত্তা কে? শাস্ত্রবেত্তা কে, দর্শনবেত্তা কে? ন্যায়বেত্তা কে? কে কবে জন্মিয়াছিল? কে কি লিখিয়াছিল? কাহার জীবনচরিত কি? কাহার লেখায় কি ফল? এ আলোক নিবিল কেন? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে। হিন্দু রাজা তোড়লমল্লের আসলে তুমার জমার দোষে। সকল কথা প্রমাণ কর।

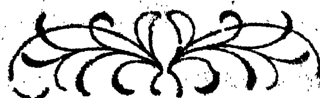
প্রমাণ করিবার আগে বল যে, যে বাঙ্গালা ভাষা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের কবিতায় এ ভাস্বতী কিরণমালা বিকীর্ণ করিয়াছিল, এ বাঙ্গালা ভাষা কোথা হইতে আসিল। বাঙ্গালা ভাষা আত্মপ্রসূতা নহে। সকলে শুনিয়াছি তিনি সংস্কৃতের কন্যা; কুললক্ষণ কথায় কথায় পরিস্ফুট। কেহ কেহ বলেন সংস্কৃতের দৌহিত্রী মাত্র। প্রাকৃতই এঁর মাতা। কথাটায় আমার বড় সন্দেহ আছে। হিন্দী, মারহাট্টী প্রভৃতি সংস্কৃতের দৌহিত্রী হইলে হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা যেন সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া বোধ হয়। প্রাকৃতে কার্য্যের স্থানে কজ্জ বলিত। আমাদের চাষার মেয়েরাও কার্য্যের স্থানে কায্যি বলে। বিদ্যুতের স্থলে বিজ্জুলও বলি না বিজুলিও বলি না। চাষার মেয়েরাও বিদ্যুৎ বলে। অধিকাংশ শব্দই প্রাকৃতের অননুগামী। অতএব বিচার করা আবশ্যক—প্রথম। বাঙ্গালার অনার্য্য ভাষা কি ছিল? দ্বিতীয় কিপ্রকারে তাহা সংস্কৃতমূলক ভাষারদ্বারা কতদূর স্থানচ্যুত হইল। তৃতীয় সংস্কৃতমূলক যে ভাষা তাহা একেবারে সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত না প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত? বোধ হয় খুঁজিয়া ইহাই পাইবে যে কিয়দংশ সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, কিয়দংশ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত। চতুর্থ, সেই সংস্কৃতমূলক ভাষার সঙ্গে অনার্য্য ভাষা কতদূর মিশ্রিত হইয়াছে। ঢেঁকি, কুলো ইত্যাদি শব্দ কোথা হইতে আসিল। পঞ্চম ফারসী, আরবী, ইংরেজি কোন্ সময়ে কতদূর মিশিয়াছে।

মোগল বাঙ্গালা জয় করিয়া শাসন একটু কঠিনতর করিয়াছিল, সেটুকু কতদূর? রাজ্যও একটু অধিক দূর বিস্তৃত করিয়াছিল, সেটুকুই বা কতদূর। তোড়লমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্ত ব্যাপারটা কি? তাহার আগে কি ছিল? তোড়লমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তের ফল কি হইল? মুরশীদ কুলির্খা তাহার উপর কি

উন্নতি বা অবনতি করিয়াছিল? জমীদারদিগের উৎপত্তি কবে? কিসে উৎপত্তি হইল? মোগলসাম্রাজ্যের সময় তাহাদিগের কিপ্রকার অবস্থা ছিল? মোগলসাম্রাজ্যের সময় বাঙ্গালার রাজস্ব কিরূপ ছিল? কোন্ সময়ে কিপ্রকারে বৃদ্ধি পাইল? মুসলমানেরা দেশের রাজা ছিল, কিন্তু জমীদারী সকল তাহাদিগের করগত না হইয়া হিন্দুদিগের করগত হইল কিপ্রকারে? জমীদারদিগের কি ক্ষমতা ছিল? তখনকার জমীদারদিগের সঙ্গে ওয়ারণ্ হেষ্টিংসের সময়ের জমীদারদিগের এবং বর্ত্তমান জমীদারদিগের কি প্রভেদ?

মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন বিভাগমাত্র হইয়াছিল; কিন্তু উভয় সময়ের সামাজিক চিত্র চাই। সামাজিক চিত্রের মধ্যে প্রথম তত্ত্ব ধর্ম্মবল। এখন ত দেখিতে পাই বাঙ্গালার অর্দ্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেন না ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক—কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয় অল্পসংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্পসময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতিলাভ করিবে ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্দ্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।

পাঠকদিগের যদি ইচ্ছা হয়, তবে এ বিষয়ের আরও কিছু বলিব।



ভট্টাচার্য্য বিদায়প্রণালী।

ফরাসীদিগের সর্ব্বপ্রধান চিন্তাশীল মহামতি কোম্‌ট সাহেব একদিন সদর্পে সমস্ত ইউরোপীয় কার্য্যশীল ব্যক্তির নিকট কর চাহিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার এরূপ কর চাওয়া পাগলের কার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু আমরা তাঁহাকে পাগল বলিতে চাহি না; অতি প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর কার্য্যশীল ব্যক্তিগণ চিন্তাশীলদিগকে কর দিয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ শাসন—চি-

স্তার জন্য শাসনকর্ত্তারা করসংগ্রহ করেন। দ্বিতীয়তঃ নানাবিধ উচ্চশ্রেণীর ব্যবসায়িগণ ফি Fee দর্শনী, সেলামী, তৈলাট, মেহনতআনা ইত্যাদি আকারে করসংগ্রহ করেন। বাস্তবিক অর্থনীতিশাস্ত্রে যে উৎপাদক অনুৎপাদক পরিশ্রম বিভাগ আছে, তাহার উৎপাদক শ্রমজীবীরা অনুৎপাদক শ্রমজীবীদিগকে কর দিয়া থাকে। যেমন রাজাকে যে কর দেওয়া যায়, তাহার পরিবর্ত্তে শাসন এবং রক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ যে চিন্তাশীল ব্যক্তিই কর লউন না, তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের কোন না কোন বিশেষ কার্য্য করিতে হয়। এই কার্য্য যিনি প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারেন, তিনি অধিক পরিমাণে কর লন, রাজা অত্যাচার হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করেন এজন্য পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমিই তাঁহার। বৈদ্য, আশু শারীরিক যন্ত্রণার প্রতীকার করিয়া দিতে পারেন, এজন্য তিনি দর্শনী পান, এইরূপ সকল প্রকার অনুৎপাদক শ্রমজীবীরাই করসংগ্রহ করেন। কিন্তু তাঁহাদের সংগ্রহ কায়দার সহিত। তাঁহারা নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলেন, করিয়া কর লইলেন, ঠিক এরূপ প্রকাশ পায় না; যেন যে দিতেছে তাহারই গরজে—তিনি করপ্রাপ্ত হইলেন। যে সকল চিন্তাশীলগণ এইরূপে বাহ্যজগতের উপর আপনাদের চিন্তাশক্তি খাটাইতে পারেন, তাঁহারা কায়দা করিয়া করসংগ্রহ করিতে পারেন; কিন্তু ইঁহাদের চিন্তাশীলতা নীচদরের। যাহাদ্বারা মানুষের মানসিকশক্তির উন্নতি হয়; যাহাদ্বারা পূর্ব্বোক্ত চিন্তাশীলগণের চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, যাহা সর্ব্ববিশ্বব্যাপিনী, তাহার নাম উচ্চঅঙ্গের চিন্তাশীলতা। এ চিন্তাশীলতার কার্য্য, সাধারণে দেখিতে পায় না; দেখাইবার উপায় নাই, এজন্য এই শ্রেণীর চিন্তাশীলগণ বিশেষ কায়দা করিয়া কর আদায় করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের প্রদত্ত উপকার গ্রহণ করিতে সমর্থ লোকের সংখ্যা অতি অল্প এজন্য তাঁহাদিগের করদায়ীদিগের সংখ্যা অল্প। এজন্য তাঁহাদের করসংগ্রহও অল্প। পারিতোষিক অল্প হইলে সে ব্যবসায়ের উন্নতি হয় না, এজন্য উচ্চ অঙ্গের চিন্তাশীলতাব্যবসায় অত্যন্ত সুসভ্য দেশ ভিন্ন অত্যন্ত বিরল। পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন গ্রীশ, ভারতবর্ষ এবং বর্ত্তমান ইউরোপেই এই ব্যবসায়ের কথঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রমজীবীদিগকে শ্রমের পরিবর্ত্তে আমরা যাহা দিয়া থাকি তাহার নাম বেতন। নিম্নশ্রেণীর চিন্তাশীল অনুৎপাদক শ্রমজীবীদিগকে তাহাদের শ্রমের পরিবর্ত্তে যাহা দিয়া থাকি তাহার নাম Fee, দর্শনী, সেলামী ইত্যাদি। কিন্তু উচ্চঅঙ্গের চিন্তাশীলদিগকে আমরা কি দিয়া থাকি? এইরূপ উচ্চঅঙ্গের চিন্তাশীলতা যাহাতে প্রস্ফুট হয় তাহার জন্য আমরা কি চেষ্টা করিয়া থাকি। চিন্তা-

শীলদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য সমাজ হইতে কবে কি চেষ্টা হইয়াছে ? বরং সকল দেশেরই সাধারণ লোকের সংস্কার এই যে যাহারা জ্ঞানী হইবে, যাহারা চিন্তাশীল হইবে তাহারা দরিদ্র,যাহাদেরদ্বারা সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার হইবে, যাহাদের হইতে নূতন নূতন সুখস্বচ্ছন্দের পথ উদ্ঘাটিত হইবে, যাহাদের চিন্তাগুণে মনুষ্যগণ বহির্জগতের উপর আত্মশক্তি পরিচালনা করতঃ সৃষ্টির একমাত্র অধীশ্বর হইতে পারিবে ; তাহারা অতি নিকৃষ্ট শ্রমজীবীর স্বচ্ছন্দভোগেও বঞ্চিত থাকিবে। আহা কি সুবিচার !!! বোধ হয় এই ঘোরতর অবিচারের জন্য ক্ষোভে, সমাজের অকৃতজ্ঞতায় মর্ম্মপীড়িত হইয়াই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান চিন্তাশীল মহামতি কোম্‌ত্‌ উদরজ্বালায় জ্বলিয়া সদর্পে দিগ্বিজয়ী সম্রাটের ন্যায় সমস্ত পৃথিবী হইতে কর চাহিয়া বসিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে অধুনা লোকের সুবুদ্ধি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। ক্রমে চিন্তাশীলদিগের উৎসাহ দিবার নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। দেশের মধ্যে যাহাতে অধিকসংখ্যক চিন্তাশীলতার প্রাবল্য হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, সুইজারলণ্ড প্রভৃতি স্থলে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ প্রধান প্রধান ছাত্রদিগকে followship ফেলোসিপ নামক বহুকালস্থায়ী পুরস্কার দিয়া উঁহাদিগের সংসারভাবনা দূর করত শুধু উচ্চ অঙ্গের চিন্তার জন্য স্বতন্ত্রীকৃত করা হইতেছে। চিন্তাশীলদিগের নব নবোম্ভাবিনী চিন্তার আদর বৃদ্ধি হওয়াতে উঁহাদিগের পুস্তকবিক্রয় হইতে কিছু কিছু লাভ হইতেছে। অনেক সুসভ্য জাতির মধ্যে অধ্যাপকতা(Imfessorship) স্থাপিত হইতেছে ; যাহাদ্বারা অধ্যাপকগণ অল্পকাল কার্য্য করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন-উপযোগী বিত্তসংগ্রহ করত যাবজ্জীবন নূতন নূতন চিন্তায় মগ্ন থাকিতে পারেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইউরোপ দেশে প্রায় সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রের যে সর্ব্বতোমুখী উন্নতি হইতেছে তাহার প্রধান কারণ এই যে তাঁহারা চিন্তাশীলতার আদর করিতে ও চিন্তাশীলতার উৎসাহ দিতে শিখিয়াছেন। পুরাকালেও যে যেদেশে উহার যতটুকু আদর ছিল সেই সেই দেশে ততটুকু উন্নতি হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে বিশেষ আইওনিয়ন নগরসমূহে এইরূপ উচ্চ অঙ্গের চিন্তাশীলতার বিলক্ষণ আদর ছিল। তথায় যেমন উৎকৃষ্ট কাব্য নাটকাদি রচনা করিলে পারিতোষিক পাইত, যেরূপ ব্যায়ামে ও মল্লযুদ্ধাদিতে নৈপুণ্যলাভ করিলে পারিতোষিক প্রাপ্য ছিল,সেইরূপ দর্শনবিজ্ঞান বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিতে পারিলেও তাহার পারিতোষিক ছিল। আমরা অ্যাডামস্মিথের গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি যে গ্রীসীয় অধ্যাপকেরা ছাত্রদত্ত বেতন হইতে অনেক অর্থসঞ্চয় করিতে পারি

তেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ কার্য্যে হউন, আর নাই হউন, শাস্ত্রমতে চিন্তামাত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অধিকাংশই নিম্ন অঙ্গের চিন্তাশীল অর্থাৎ তাঁহারা রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, দণ্ডনীতি ইত্যাদি লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যেও উচ্চ অঙ্গের চিন্তাশীল লোকও অনেক থাকিত, সমস্ত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে মান্য করিত, সমাজে তাঁহাদের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল, এবং স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত বিত্তও তাঁহারা নানাপ্রকারে সঞ্চয় করিতে পারিতেন; একজন প্রধান ছাত্র পাঠ সমাপনান্তে স্নান করিয়া গুরুকুল হইতে নির্গত হইলে বহুসংখ্যক রাজারা তাঁহাকে আপনদেশমধ্যে স্থাপনা করিবার জন্য বিশিষ্ট যত্ন করিত। এরূপস্থলে এরূপ মহাসমাদৃত ব্রাহ্মণ সুধীগণের মধ্যে উচ্চ অঙ্গের স্বাধীন চিন্তা যে অত্যন্ত উন্নত হইবে তাহাতে আর আপত্তি কি?

এই প্রকার উচ্চ অঙ্গের চিন্তাশীল ব্রাহ্মণদিগের নাম কখন ঋষি, কখন আচার্য্য, কখন উপাধ্যায়, তৎপরে ভট্ট এবং সর্ব্বশেষে ভট্টাচার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মনুর মতে উঞ্ছবৃত্তি, শীলবৃত্তি ও অযাচিতবৃত্তি ইহাদিগের মধ্যে প্রশস্ত। অধুনাতন ভট্টাচার্য্যদিগের উঞ্ছ ও শীলবৃত্তি নাই; উঞ্ছ ও শীলবৃত্তির নাম সংসারত্যাগ ও অত্যন্ত কষ্ট, দারিদ্র অতএব এই দুই বৃত্তি উঠিয়া যাওয়ায় আমরা তাদৃশ দুঃখিত নহি। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষায় শরীরপাত করিয়া শেষ যদি উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবননির্ব্বাহ করিতে হয় তাহা হইলে কেহই আর বিদ্যাশিক্ষা করিতে চাহিবে না। অযাচিতবৃত্তির নাম ভট্টাচার্য্যবিদায়প্রণালী; উহার অর্থ এই যে ভট্টাচার্য্যেরা আপন টোলে বসিয়া ছাত্রদিগের নিকট হইতে কিছুমাত্র না লইয়া বিদ্যাদান করিবেন; লোকে সময়ে সময়ে ডাকিয়া (তাঁহারা ভিক্ষা করিতে যাইবেন না চাহিবেনও না।) তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দিবে। আমরা পুনরায় এই দেওয়ার নাম কর বলিলাম। আ্যাডামস্মিথ করগ্রহণপ্রণালী অধ্যায়ে করগ্রহণ সম্বন্ধে যে চারিটী নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন, এ কর সে চারি নিয়মের একটী নিয়ম অতিক্রম করে নাই। অ্যাডামস্মিথের প্রথম নিয়ম এই যে শক্তি ও অবস্থানুসারেই সকলের কর। ভট্টাচার্য্যবিদায় কেহই আপন শক্তি অতিক্রম করিয়া করেন না। দ্বিতীয় নিয়ম এই যে কর দিতে হইলে কত দিতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা; ভট্টাচার্য্য বিদায়স্থলে সেটার করদাতার হস্তে সুতরাং এনিয়ম কোন কালেই অতিক্রম হইবার নহে। তৃতীয়, করদান সময়ের সুবিধা অর্থাৎ যে সময়ে করদাতার সুবিধা হয় সেই সময়েই উহা আদায় করিতে হইবেক। যে সময়ে লোকে আপন খুসিতে কোন সমারোহে অনেক

অর্থব্যয় করে সেই সময়ে তাহার এক অংশই ভট্টাচার্য্যদিগকে দেয়, যখন খরচ করিতে চান তখন ভট্টাচার্য্যবিদায় একটিবার হয় সুতরাং দানে দাতার কোনরূপ অসুবিধা নাই।

চতুর্থ নিয়ম এই যে, দাতার পকেট হইতে যত যাইবে সমস্তই যেন গৃহীতার পকেটে উপস্থিত হয় মধ্যস্থলে যেন কিছু বাঁধিয়া না যায়, ভট্টাচার্য্যবিদায়ে এনিয়ম লঙ্ঘন হয় না, দাতা যাহা দেন সমস্তই ভট্টাচার্য্যদিগকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়, মধ্য হইতে অধ্যক্ষ কেবল কিঞ্চিৎ পারিতোষিক লন। অতএব যতপ্রকার এডুকেশ্যান সেশ শিক্ষকের আছে তাহার মধ্যে ভট্টাচার্য্যবিদায়ের প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

আমরা ভট্টাচার্য্যবিদায়ের প্রণালীকে দুই আকারে দেখিব। প্রথম শিক্ষাকর, দ্বিতীয় উচ্চ অঙ্গের চিন্তাশক্তির উৎসাহ দানের উপায়। (১) অধ্যাপকেরা একেবারে কি লয়েন না, সমস্ত শিক্ষা বিনামূল্যে বিতরিত হয় (gratis) শুধু তাহাই নহে। ভট্টাচার্য্যদিগকে ছাত্রগণের আহার যোগাইতে হয় অর্থাৎ স্কলার্সীপ দিতে হয়; ভট্টাচার্য্যদিগের শিক্ষা লোকশিক্ষা নহে, উহাদ্বারা সাধারণ লোক লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কসিতেমাত্র শিখিবে তাহা নহে, উহাতে বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য অলঙ্কার ভাষা ইত্যাদি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দেওয়া হয় অতএব উহা উচ্চ শিক্ষা। যে উচ্চ শিক্ষার জন্ম ইংরেজগবর্ণমেণ্ট লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন অথচ প্রকৃত উচ্চশিক্ষা কিছুই হইয়া উঠিতেছে না, আমাদের প্রণালীতে হইলে সেই শিক্ষায় এক পয়সাও ব্যয় হইত না অথচ তালরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিলে উহা হইতে উচ্চ অঙ্গের চিন্তাশক্তির শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিত। উচ্চশিক্ষার জন্য ইংরেজগবর্ণমেণ্ট কতকগুলি স্কলারসিপ দিয়া থাকেন; সেগুলি বাস্তবিক উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় হয় না, কারণ কালেজে বিএ, পর্য্যন্ত যাহা পড়া হয় তাহাকে উচ্চশিক্ষা বলিতে প্রাণ কেমন করে। নর্ম্মাণস্কুলের ছাত্রেরা যাহা বাঙ্গালায় তিন বৎসরে শিখে আর ১৫ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপন করে কালেজে তাহাই অথবা তাহা অপেক্ষা অল্প ইংরেজীতে লিখিতে ২০ বৎসর যায় আর অন্ততঃ ৭। ৮। বৎসর পড়িতে লাগে অতএব নর্ম্মাণস্কুলের শিক্ষা যদি উচ্চশিক্ষা না হয় তবে বিএ, পর্য্যন্ত শিক্ষা উচ্চশিক্ষা নহে। যে ছাত্রবৃত্তিসমূহ প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহাও উচ্চশিক্ষার জন্য নহে তাহা মধ্যবিধ শিক্ষাজন্য, আমরা যাহাকে উচ্চশিক্ষা বলিতেছি তাহা কালেজে হয় না, তাহা কালেজের পর হয় অতএব সে উচ্চশিক্ষার উন্নতির জন্য কি উপায় অবধারিত আছে? কিছুই নাই। যে এক প্রেমচাঁদ রায় স্কলারসিপ আছে তাহাতেও কি জানি কোন অভিশাপে এরূপ উচ্চ অঙ্গের শিক্ষিত লোক জন্মিল না।

এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রেমচাঁদ স্কলারসিপ হইতেই ভবিষ্যতে চিন্তাশীল ব্যক্তি উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা।

২। আমরা ওরূপ স্কলারসিপ বৃদ্ধি না করিয়া যদি ভট্টাচার্য্যবিদায়প্রণালীর বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করি তাহা হইলে অতিরিক্ত ব্যয় না করিয়াও বাঞ্ছিতফল লাভের অধিকতর সম্ভাবনা। সত্য বটে এক্ষণে ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত স্বাধীন চিন্তাবিশিষ্ট লোক অতি বিরল। কিন্তু উত্তমরূপ সংস্কারদ্বারা রীতিমত পর্য্যবেক্ষণদ্বারা উহার এতদূর উন্নতি করিতে পারা যায় যে উহা সভ্যমণ্ডলীর আদর্শস্বরূপ হইতে পারে। ভট্টাচার্য্যদিগের সংস্কারের এক প্রধান সুবিধা এই যে আজিও উহাদের দল পাকান হয় নাই যেখানে দল পাকে সেইখানেই উচ্চ অঙ্গের চিন্তাশক্তি লোপ হইয়া সাংসারিকতার বৃদ্ধি হয় অতএব দল যাহাতে না পাকে তাহার বিশেষ চেষ্টা থাকা আবশ্যক। যেখানে সকলেই স্ব স্ব প্রধান এবং সকলেই এরূপ স্বাধীন প্রাধান্যের অহঙ্কার করেন সেস্থলে দল পাকিবার সম্ভাবনা অল্প। একশত বৎসর ইংরেজশাসনে যদি কোথাও স্বাধীনভাব বর্ত্তমান থাকে তবে তাহা আজিও ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে আছে। কিন্তু ক্রমে ভট্টাচার্য্যেরা এই স্বাধীনতা লোপ করিয়া ফেলিতেছেন। আদর অল্প হওয়ায় যতই ভট্টাচার্য্যদিগের বিদ্যা অল্প হইয়া আসিতেছে, যতই তাঁহাদের প্রতি লোকের ঘৃণা জন্মিতেছে ততই তাঁহারা ক্রমে আপনাদিগকে ঘৃণার সম্পূর্ণ পাত্র করিয়া তুলিতেছেন। ক্রমশই ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যাশূন্য উপাধি প্রাপ্ত হইতেছেন। পাঁচ শত পত্র দিতে হইলে দুই শত চলিত পত্র হয় আর তিন শত হয় উপরোধে। যাঁহারা এরূপ উপরোধ করেন তাঁহাদিগকে ধিক্ আর যাঁহারা উপরোধে পত্র দেন তাঁহাদিগকেও ধিক্। তাঁহারা এইরূপ উপরোধ করিয়া ও লইয়া হিন্দুদিগের একটি উৎকৃষ্ট রীতিকে যৎপরোনাস্তি কলুষিত করিয়া থাকেন। ক্রমে এক্ষণে দেখা যায় যে চলিত পত্রমধ্যেও অধিকাংশ মেকী, কাহারও মাতামহ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া এক্ষণে টোলঘর ভাড়া দিয়াও পত্র পান, কেহ রাজা রামচন্দ্রের বাড়ীর পুরোহিত, তিনি "বড় লোকঃ সহায়োযস্য স এব বড় পণ্ডিতঃ।" "বর্ণ জ্ঞানাবচ্ছিন্ন তথাপি বড় পণ্ডিতঃ" হইলেন তাঁহার চলিত পত্র হইল, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই অধ্যক্ষতা করিয়া পত্র হয় অর্থাৎ রাজা দীনদয়াল কর্ম্ম করিয়া পত্র দিলেন, রাজার একজন পারিষদ একটু ব্যাকরণ জ্ঞান ছিল অধ্যক্ষ হইলেন তিনি অমনি বড় পণ্ডিতের মধ্যে গণ্য হইলেন তাঁহার পত্র চলিল। শুনিয়াছি একজন ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহার বিদ্যাসাধ্য যে অধিক তাহা কখন শুনি নাই—তিনি শুদ্ধ ভট্টাচার্য্যেরা তাঁহার দেশে গেলে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক আতিথ্য করিয়া

এমন প্রতিপত্তি করিয়া লইয়াছেন যে তাঁহার সর্ব্বত্র পত্র হয় ও বিদায় প্রায় সর্ব্বোচ্চ।

যদি এই সকল দোষ সংশোধন করিয়া যাঁহারা বিশেষ জ্ঞানাপন্ন যাঁহারা যথার্থ অধ্যাপকতা করিতেছেন, শুদ্ধ তাঁহাদিগকেই পত্র দেওয়া হয় এবং বিশেষ খ্যাতি না থাকিলে পত্র না দেওয়া হয় তাহা হইলে ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার আবার উৎসাহ দেওয়া হয়। আর ভট্টাচার্য্যেরা শুদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষা ও চর্চ্চা লইয়াই কেন ব্যস্ত থাকিবে, তাঁহারা ইংরেজি পড়ুন ইংরেজি দর্শন বিজ্ঞানের অধ্যাপকতা বাড়ী বসিয়া করিতে থাকুন, ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে পাণ্ডিত্যের সহিত ধর্ম্মের যেরূপ নৈকট্যসম্বন্ধ বঙ্গদেশে সেরূপ নহে। বঙ্গদেশের ভট্টাচার্য্যশিক্ষা অনেকটা secular. সুতরাং তাঁহারা কেন ক্রমে ক্রমে সমস্ত অধ্যাপকতা আত্মকরগত করুন না। ইংরেজি মুখে সহস্রমুদ্রাবেতনভোগী ইংরেজ শিক্ষক দ্বারা দর্শন বিজ্ঞান ভাষা শিক্ষা অধিক দিন টিকিবে না। ঐ সকল বিষয়ের শিক্ষা দেশীয় উপায়ে দিতে হইবে। দেশীয় সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাপ্রণালী অপেক্ষা ভট্টাচার্য্যপ্রণালী সস্তা ও সমাজস্থ লোক সুবোধ হইলে অধিক কার্য্যকর। অধ্যাপক বেতনভোগী হইলে তাঁহার স্বাধীনতা থাকে না। ছাত্রদত্ত দক্ষিণা বা fee ভোগী হইলে দক্ষিণার উপর তাঁহার ঝোঁক দাঁড়ায় কিন্তু সমাজ যদি ভট্টাচার্য্যদিগের চলাচলের ভার লন, যদি ভট্টাচার্য্যগণ অন্নের জন্য বড়মানুষের খোষামোদ করিয়া দুপয়সা পাওয়ার প্রত্যাশায় বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে বাধ্য না হন, তবে তাঁহারা অনায়াসে চিন্তাশীলতা ও বিদ্যাচর্চ্চার চরমোৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন। অতএব অধ্যাপকগণের যাহাতে ভালরূপ গুজরান হয় যাহাতে তাঁহারা স্বকর্ত্তব্যসাধন করিতে পারেন, এবং ফাকি দিতে না পারেন, সে বিষয়ে সমাজের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। ফাকি দেওয়া মনুষ্যের স্বভাব, অধ্যাপকগণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই যে তৎস্বভাব ত্যাগ করিতে পারিবেন তাহার কোন অর্থ নাই। কিন্তু আমাদের অধ্যাপকেরা একখানা টোলঘর খাড়া করিয়াই কিসে দুপয়সা পান সেই চেষ্টাতেই দিন রাত বড়মানুষের খোষামোদ করিয়া ছুটিয়া বেড়ান, সেটা আবার অত্যন্ত ঘৃণাকর। টোল খুলিলেন ত লেখাপড়া দক্ষিণান্ত হইল, কেবল জুয়াচুরি খোষামোদ আরম্ভ হইল, কেবল ছেলেবেলায় একদিন লেখাপড়ায় যে বড় সাইন করিয়াছিলেন সেই দাম্ভিকতামাত্র বাকি রহিল ভড়ং বাড়িল কার্য্যে অষ্টরম্ভা। যাহাতে আমাদের অধ্যাপকগণ এই শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার হন, সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা ভদ্রলোকমাত্রেরই উচিত।

উপায় গুণের পুরস্কার ও নির্গুণের তিরস্কার। কিন্তু গুণ ও দোষ নির্ব্বাচন করে কে? অধ্যক্ষ, অতএব অধ্যক্ষের উপর একটি গুরুতর ভার পড়িতেছে। অধ্যক্ষ কোন ক্রমেই অনুপযুক্ত লোককে পত্র দিবেন না, পক্ষপাতিতা করিবেন না, নিজে সর্ব্বপ্রধান বিদ্বান হউন, আর নাই হউন, সর্ব্বশাস্ত্রে দৃষ্টিবান্ কর্ম্মঠলোক হইবেন, যেখানে ছাইতে না জানেন সেখানে গোড় চিনিতে পারিবেন। কিন্তু দেশের মধ্যে যদি এক বা দুইজনমাত্র অধ্যক্ষ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যথেষ্টাচার হইয়া দাঁড়াইবে। এজন্য অধ্যাপকমাত্রেরই অধ্যক্ষকতাকর্ম্মে পারদর্শী হওয়া উচিত। সকল অধ্যাপক অধ্যক্ষ, এবং অধ্যক্ষ অধ্যাপক হইলে পক্ষপাতাদি না হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী গুণগ্রাহী কর্ম্মঠ অথচ ব্যবসায়ান্তরাবলম্বী অপত্রপ্রত্যাশী অধ্যক্ষ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কিছুই নাই।

কিরূপ লোক অধ্যক্ষ হইবেন বলা হইল কিন্তু কিরূপ লোক পত্র পাওয়ার উপযুক্ত তাহাও জানা আবশ্যক। মাথা চাঁচা দেখিলেই ভিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু পত্র দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ পত্র মান, পত্র কর। যাহার কর গ্রহণে অধিকার নাই তাহাকে কেনই কর দিতে যাইব। আমাদের মতে যে ব্যক্তি আগ্রহসহকারে বাল্যে নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যৌবনেও লেখাপড়ার চর্চ্চায় ও চিন্তাশীলতা উদ্দীপনে ব্যস্ত থাকেন তাঁহারাই পত্রপ্রাপ্তির উপযুক্ত, শুদ্ধ টোল করিয়া পড়াইলেই যে তাহাকে পত্র দিতে হইবে তাহার কোন মানেই নাই, বিদ্বানব্যক্তি মূর্খ না হইলেই বা বইয়া না গিয়া বিদ্যানুশীলনে ব্যাপৃত থাকিলেই সে পত্রপ্রাপ্তির উপযুক্ত পাত্র।

এইরূপ অধ্যক্ষ ও এইরূপ অধ্যাপক হইলে চিন্তাশীলতার বৃদ্ধি হয় উচ্চশিক্ষা প্রস্তুত হয় শিক্ষা ভাল হয় এবং সহজ হয়। কিন্তু হায় কি আক্ষেপের বিষয় ভট্টাচার্য্যেরা নিজে জুয়াচোর ভণ্ড হইয়া ও জুয়াচোর এবং ভণ্ডদিগকে আপন দলস্থ করিয়া এবং মূর্খ বড় মানুষেরা না বুঝিয়া যাকে তাকে পত্র দিয়া ব্যবসায়টী মাটিই করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও মহান্ অনিষ্ট সংসাধন করিতেছেন।



ঢাকা ও পূর্ব্ববাঙ্গালা।

প্রথম প্রস্তাব।

আমরা অদ্য ঢাকা এবং তন্নিকট-বর্ত্তী প্রদেশসম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে বাসনা করিয়াছি। কেবল গুণ বা কেবল দোষ দেখান আমাদের উদ্দেশ্য নহে। পশ্চিমবঙ্গে এদেশীর বড় অখ্যাতি, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "বাঙ্গালা যদি মানুষাঃ শিব শিব প্রেতাস্তদা কীদৃশাঃ।" যাহাদিগের ছায়া মাড়াইলে পাপস্পর্শ হয় পূর্ব্ববাঙ্গালায় এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন সত্য। কিন্তু ভালমন্দ উভয়বিধ লোক সর্ব্বত্রই আছেন। রাঢ় ও বঙ্গ চিরকাল ভিন্ন দেশ ছিল এবং চিরকাল পরস্পর দলা-দলি ছিল। গৌড়েশ্বরদিগের দ্বারা উভয় রাজ্য একশাসনভুক্ত হইয়া একজাতি স্বরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, একণে শত শত বৎসর অতীত হইয়াছে তথাপি দলাদলি রহিত হয় নাই এখনও "বাঙ্গাল" "রেঢ়ো" উভয় শব্দ পর-স্পরের নিকট গালাগালি বলিয়া পরি-চিত রহিয়াছে। রাঢ়ি ও বঙ্গ উভয়েই এক্ষণে গৌড়ীয়ভাষায় কথা কহিতেছেন, উভয়েই একধর্ম্মাক্রান্ত একশাসনাধীন তথাপি অদ্যাপি পরস্পরের মধ্যে জাতি-ক্রোধ রহিয়াছে। এই জন্য রাঢ়িকর্ত্তৃক বাঙ্গালের পরিচয় নিতান্ত নিরপেক্ষ হইবার সম্ভাবনা নহে।

ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী। ইহা কলিকাতা হইতে একশত ক্রোশের অধিক নহে। কলিকাতার সিয়ালদহ ষ্টেশনে রাত্রি ৯।০টার সময় গাড়িতে উঠিলে প্রাতঃকালে গোয়ালন্দে পৌছন যায়। ইহা ১৫০ মাইল। পরে গোয়া-লন্দে ষ্টীমারে উঠিয়া রাত্রি ৭।৮টার মধ্যে ঢাকাতে পৌছান যায়। বর্ষাকালে বেলা ২।৩টার সময়ে আসা যায়। ইহার কারণ বর্ষাকালে নদী ও খাল জলে পরিপূর্ণ থাকাতে ষ্টীমার সোজাপথে আসিতে পারে। এই পথ ৬০।৭০ মাইল। এই পথে আসিতে হইলে পদ্মানদী পার হইয়া যমুনানদী দিয়া গঙ্গাটার খালের মধ্য দিয়া ধলেশ্বরী নদী দিয়া এবং বুড়ীগঙ্গা দিয়া আসিতে হয়। ঢাকা বুড়ীগঙ্গার তীরে অবস্থিত। অন্য সময়ে আসিবার পথ ১২০।১৩০ মাইল। ইহা বরাবর পদ্মানদী দিয়া, পরে মেঘনা দিয়া এবং শেষে লক্ষ্যানদী দিয়া নারা-য়ণগঞ্জে উঠিতে হয়। নারায়ণগঞ্জ লক্ষ্যা নদীর তটস্থিত ইহা বিলক্ষণ বাণিজ্যের স্থান। তথা হইতে ঢাকা ৮ মাইল; ঘোড়ার গাড়ীতে দুই ঘণ্টায় আসা যায়। আমরা টগষ্টীমারের কথা বলি-লাম। বড় ষ্টীমারে আসিতে ২।৩ দিন লাগে, এবং নৌকাতে আরও অধিক দিন। সম্প্রতি পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানী আর একখানি ছোট জাহাজ প্রস্তুত

করাইয়াছেন; ইহাদ্বারা ১০ ঘণ্টার মধ্যে একেবারে ঢাকায় আসা যাইবে। ইহার নাম লক্ষ্মী। ইহা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ঢাকা সহর বড় বিস্তৃত নহে। দীর্ঘে দুই মাইল এবং প্রস্থে একমাইলের কিছু বেশী। ইহাকে দুইটি বড় রাস্তাতে বিভক্ত করিয়াছে। একটি পূর্ব্বপশ্চিম লম্বা, এবং অপরটী উত্তরদক্ষিণে। এখানকার কাছারী, কালেজ, স্কুল, অফিস প্রায় সমস্তই একস্থানে স্থিত। এখানে ব্যবসায়ী ইংরেজ প্রভৃতির সংখ্যা অল্প। দেশীয়দিগের মধ্যে বাণিজ্য মন্দ নহে। নদীর তীরস্থিত না হইলে ভাল সহর এবং ব্যবসায়ের স্থান হইতে পারে না। ঢাকা বুড়ীগঙ্গানদীর উপর অবস্থিত বলিয়া ইহাতে অনেকটা ব্যবসায় বাণিজ্য আছে।

ঢাকাতে দুই চারিদিন বাস করিলেই তিনটি বস্তু দর্শকের নয়নপথের পথিক হইবে। কাক কুক্কুর এবং মুসলমান। এই তিনই সমভাবে কলহপ্রিয়, অতি দুদ্দম, অজেয়। ক্রিয়াবাড়িতে কাক আর কুক্কুর, আদালতে মুসলমান। আসামী মুসলমান, ফরিয়াদি মুসলমান, সাক্ষী মুসলমান, মোক্তার মুসলমান। মোকদ্দমাও ইজ্জতের। কাক, কুক্কুর, মুসলমান এই তিনই বাঙ্গালার সর্ব্বত্র আছে, কিন্তু এখানে কিছু বাড়াবাড়ি, ঢাকা মুসলমানপ্রধাননগর। সাধারণতঃ কাককোলাহল শ্রবণ করা যায় না এরূপ সময় দিবসমধ্যে প্রায় ঘটে না। এত অধিক কাকসংখ্যা আর কুত্রাপি আছে কি না সন্দেহ। কুক্কুর কাক অপেক্ষা অধিক নহে, কিন্তু অন্যস্থানের অপেক্ষা অনেক বেশী। কুকুরের চীৎকারে অনেক সময় কর্ণকুহর বধির হইয়া যায়। পূর্ব্ববাঙ্গালায় গলাবাজি বেশী, তাহাই কাক কুকুরের এত চীৎকার। এখানে একটি প্রবাদ আছে যেঃ—

"কাক, কুকুর, নেড়ে,
তিন ঢাকা বেড়ে।"

প্রকৃত ঢাকাবাসীদিগের মধ্যে তন্তুবায় বা তাঁতি, শৌণ্ডিক বা শুঁড়ি, শাঁখারি এবং মুসলমানের সংখ্যা অধিক। ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং বৈদ্যের বাস অতি কম। তাঁতিরা সাধারণতঃ বসাক এবং শুঁড়িরা দাস ও রায় নামে প্রসিদ্ধ। ঢাকার তাঁতিবাজার এবং নবাবপুর তাঁতিদিগের বাসস্থান। বাঙ্গালাবাজার শুঁড়িদিগের বাসস্থান। শাঁখারিদিগের জন্য শাঁখারিবাজার আছে। এই শাঁখারিবাজারের রাস্তাতে যখনই গমন করা যায়, তখনই দেখা যায় শাঁখ কাটিবার ও শাঁখা প্রস্তুত করিবার জন্য শতশত লোক ব্যস্ত রহিয়াছে। তাহাদের যন্ত্রের খস্‌খস্‌ শব্দে এই রাস্তা সর্ব্বদাই পরিপূরিত। শাঁখার ব্যবহার এদেশে অত্যন্ত অধিক। ইহারা যখন পরস্পর ঝগড়া করে তখন দেখিতে অতিশয় কৌতুকজনক। কখন কখন তাহারা শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া ঝগড়া করে এবং

ঝগড়া করিতে করিতে অনেক বেলা হইলে শঙ্খ ও ঘণ্টা ধামাচাপা দেয় এবং সেই সঙ্গে ঝগড়াও ধামাচাকা পড়ে। আহারাদির পরে আবার ধামা হইতে সেই শঙ্খ ঘণ্টা ও ঝগড়া বাহির করে।

বাজারের শুকমৎস্য সকল ইহারাই অধিকাংশ ক্রয় করে। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একেবারে নহে। তাঁতি ও শুঁড়িদিগের মধ্যে অনেক ভদ্রলোক আছেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সৎকার্য্যে ইচ্ছা ও উৎসাহ বিশেষরূপ দৃষ্ট হয়। ঢাকার তিনটি ভাল স্কুল ইহাঁদেরদ্বারা চালিত।

ঢাকার শিক্ষিতসম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গবাসীদিগের অনুকরণ করেন, আবার অনেক সময় তাঁহাদের হয় ত ছাড়াইয়া যান। সভ্যতা, ভব্যতা, বিনয় এবং সুশীলতায় ইহাঁরা, ন্যূন নহেন। অশিক্ষিতসম্প্রদায়সম্বন্ধে ঠিক এ কথা বলা যায় না। একজন এদেশীয় অপরিচিত কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে, ইহারা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিবে 'কই যান, নাম কি এবং কত মাসহারা পান।' ইহাদের নিকট "মাসহারাই" পরিচয়ের প্রধান অঙ্গ। মাসহারা লইয়া ইহাদের নিকট সম্মান। স্বয়ং বশিষ্ঠদেব যদি ঢাকায় যান সকলেই তাঁহাকে "ব্যাতন কি?' জিজ্ঞাসা করিবে। তিনি যদি বলেন, আমি কাহার বেতনভোগী চাকর নহি, তবে তাঁহার কপাল পুড়িবে, তিনি বসিতে আসনও পাইবেন না, আর তাঁহার সম্মুখে রাসা "সদরআলা" "ব্যাতনের" পরিচয় দিয়া সম্মান পাইবে।

বঙ্গদেশীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র অমনি বলিবে 'কি কন।' কহধাতুর প্রয়োগ এখানে সর্ব্বত্র। কেহ ডাকিলে বলিয়া থাকে 'আসি;' কখন 'যাই' বলে না। চাকরকে ডাকিলেই বলিয়া থাকে 'কি কন আসি।' আমরা কেহ ডাকিলে বলিয়া থাকি 'আজ্ঞে যাই বা যাচ্ছি।' ইহারা বলে 'কি কন আসি।' সংস্কৃত ভাষাতেও 'আগচ্ছামি' এবং ইংরেজিতে coming বলে। ইহারা অনেকস্থলে শস্থানে হ বলে। শ বা সকার উভয়স্থানেই হকার উচ্চারণ করে। (See Grim's Law)লেখে সাপ, শাক,শালা,বলে হাপ,হাক,হালা। ঝগড়া করিবার সময়ে যখন 'হালার বেটা হালা' বলিয়া বকাবকি করে, তখন দেখিতে অতি সুন্দর।

এদেশের কথা কতক পারসীমূলক এবং কতক সংস্কৃতমূলক। কাঠকে লাকড়ি, লাউকে কদু, ভাড়াকে কেরেয়া, বাটীকে হাবিলী বা দালান, কর্ম্মকে কাম ইত্যাদি অনেক মুসলমানী ভাষার ব্যবহার আছে। আবার কাষ্ঠ, তৈল, ঘৃত, পাক, কলস, বেতন প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক কথাগুলিও সম্পূর্ণ প্রচলিত আছে। আমরা বলিয়া থাকি 'কালেজ বা আপিস বন্ধ হইবে।' ইহারা বলে 'সন্ধ হইবে।' ইংরে-

জিতেও 'closed' বলে। আমরা বলি ছেলেবেলা বা বাল্যকাল, ইহারা বলে ছোটকাল।

এদেশের লোকেরা অনেকেই বর্গের চতুর্থ বর্ণকে উচ্চারণ করিতে পারে না। ইহারা ঝালকে জাল, ঢাককে ডাক, ঘরকে গর, ঘৃতকে গিরত ও ধারকে দার বলে।

ঢাকার তাঁতিবাজারের কথা একরূপ এবং নবাবপুরের তাঁতির কথা আর একরূপ অথচ উভয়েই একজাতি। শাঁখারিবাজারের কথা একপ্রকার। বিক্রমপুরের এবং অন্যান্য স্থানের কথা আবার ভিন্নপ্রকার। তবে ইহারা পরস্পরে পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে।

এখানকার হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে জাতিভেদ অপেক্ষাকৃত অল্প; এমন কি অনেক হিন্দু মুসলমানের হুঁকাতে তামাক খায়। এবং এক আসনে বসে। তদ্ভিন্ন এক হুঁকাতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য এবং অন্যান্য জাতিকেও তামাক খাইতে দেখা যায়। বসাক, দাস, রায় এবং শাঁখারিরা অত্যন্ত বৈষ্ণব, এতদূর যে দুর্গা বা কালীরপূজার ফুল বা চরণামৃত স্পর্শ করিলে তাহারা স্নান করিয়া থাকে। ইহারা সকলেই গোসাঞের শিষ্য।

হিন্দুদিগের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতা বরং দেখা যায়; কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে উহার সম্পূর্ণ অভাব। পাছে অপরে তাহাদের পারিবারিকদিগকে দেখে, এই ভয়ে মুসলমানেরা তাহাদের ঘরের জানালা পর্য্যন্ত রাখে না। যদিও এত শাসন, তথাপি ব্যভিচারদোষ যত মুসলমানদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহার চতুর্থাংশও অন্যত্র কদাচিৎ দেখা যায়। প্রায়ই মুসলমানদিগের মধ্যে এই বিষয়ে দাঙ্গা ও মারামারি এবং কখন কখন বা খুনও শুনা যায়। স্ত্রীবাহির করার মোকদ্দমা আদালতে সর্ব্বদাই আছে। এ বিষয়ে মুসলমানদিগের যত আঁটাআঁটি ফল ততই মন্দ দেখা যায়।

হিন্দুদিগের মধ্যে বেশ দলাদলি আছে। প্রধানতঃ দুইদল আছে। এক দল বিক্রমপুরের স্বপক্ষ এবং অন্যদল বিপক্ষ। স্বপক্ষদলের লোকেরা অপর দলের লোকদিগকে বিক্রমপুরবিদ্বেষী বলে। স্বপক্ষ ব্যক্তিরা বলেন যে, বিক্রমপুরের তুল্য স্থান ভারতে নাই। রাজা বিক্রমাদিত্য ভারতভ্রমণে বহির্গত হইয়া নানাদেশ দেখেন। অবশেষে বিক্রমপুরই তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করে এবং তিনি ইহাকে স্বনামে নামিত করিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এ পক্ষীয়েরা বলেন যে ব্রজযোগিনী ও রামপাল এই দুই স্থানের অন্যতর স্থানে উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ইহাঁদের মতে রাজা বিক্রমাদিত্য বিক্রমপুরকে বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করিয়া যান। এ পক্ষীয় কোন নির্লজ্জ ব্যক্তি এইভাবে বিক্রমপুরের একখানি ইতিহাস লিখিয়াছিল। পুস্তকখানি ১২ পেজি ফর্ম্মার ১৫ ফর্ম্মা। ইহাতে জানিবার

কিছুই নাই। কেন যে এত কাগজ ও কালি নষ্ট হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না। সে যাহা হউক স্বপক্ষব্যক্তিরা ইহা বলিয়াও ক্ষান্ত নহেন। তাঁহারা বলেন বঙ্গদেশের যত কিছু ভাল কার্য্য সমস্তই বিক্রমপুরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই পক্ষ যাঁহাদিগকে বিক্রমপুরবিদ্বেষী বলেন, তাঁহারা বলেন যে বল্লালসেনের বিক্রমপুরে একটি বাটী ছিল, কিন্তু রাজধানী ছিল না। ইহাঁরা নবদ্বীপের প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং তাহার প্রমাণস্থলে উল্লেখ করেন যে এ দেশে নবদ্বীপে যাইয়া পাঠসমাপ্তি করিবার রীতি আছে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ সকলেই নবদ্বীপ হইতে পাঠসমাপ্ত করিয়া আসিয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কি ন্যায়শাস্ত্র, কি স্মৃতিশাস্ত্র কোন শাস্ত্রেরই কোন গ্রন্থ বিক্রমপুরবাসীর লিখিত নহে। কেহ কেহ বলেন সাহিত্যদর্পণ এখানে লিখিত হয়; কিন্তু ইহা অধিক দিনের নহে। সংস্কৃতগ্রন্থের কথা দূরে থাকুক বাঙ্গালার পুরাতন কোন গ্রন্থকারের নিবাস ঢাকা কি বিক্রমপুরে নহে। কাশীদাস, কীর্ত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, প্রভৃতি সকলেরই নিবাস রাঢ়দেশে। এক্ষণকার যে সকল জীবিত-লেখক বাঙ্গালায় গ্রন্থকার বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নবীনচন্দ্র সেন ভিন্ন আর কাহারও নিবাস পূর্ব্ববাঙ্গালায় নহে।

দলাদলির কথা হইতেছিল। ঢাকার তন্তুবায়, স্বর্ণকার, নাপিত প্রভৃতি জাতির মধ্যেও দলাদলি সম্যক্ বিরাজমান। তাঁতিবাজার এবং নবাবপুরের দলাদলি জন্মাষ্টমীর কালে প্রকাশ পায়। তখন দুইদিন দুইপক্ষের মহা সমারোহসহকারে দুই মিসিল (procession) বাহির হয়। ইহাতে দ্রষ্টব্যগুলি প্রায় সমস্তই উৎকৃষ্ট এবং বিস্ময়জনক। কিন্তু শ্রোতব্যগুলি অতি জঘন্য এবং ঘৃণাজনক। কলিকাতার কাঁসারিপাড়ার সঙ বাহির হইবার মিসিল প্রায় এই প্রকার, কিন্তু এত জাঁকজমকের নহে। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিসিল সমস্তই ভাল; যদি পরস্পরের কুৎসা, গালাগালি ও অন্তর্দোষ প্রকাশ করা না হয়।

ঢাকার পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়ই পানতামাকে সাতিশয় আসক্ত। স্ত্রীলোকেরা পানের সহিত দোক্তা তামাক ব্যবহার করে এবং পুরুষেরা তামাক সাজিয়া খায়। পানখাওয়ার বড় বাড়াবাড়ি।

এখানকার প্রধান আমোদের মধ্যে ঘুঁড়ি উড়ান, পাখীর লড়াই এবং নাচ সর্ব্বপ্রধান। নদীর উপর নৌকার বাচখেলা পূর্ব্বে সর্ব্বদা হইত, এখন প্রায় লোপ পাইয়াছে। ঘুঁড়ি উড়ান অত্যন্ত সাধারণ আমোদ। ইহা শীতকালেই হয়। গ্রামে বসন্তকালেও হইয়া থাকে। আবালবৃদ্ধ সকলেই ঘুঁড়ি উড়াইতে ভালবাসে। প্রতি-

দিনই সহরে ৫০০।৭০০ ঘুঁড়ি উড়ে এবং সরস্বতীপূজার দিনে সহরের উত্তরস্থ "রমনার মাঠে" যে কত ঘুঁড়ি উড়িয়া থাকে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ঘুঁড়ি কাটিয়া গেলে তাহা ধরিবার জন্য শত শত লোক বড় বড় বাঁশ হস্তে করিয়া দৌড়িয়া থাকে; উহা দেখিতে বড় চমৎকার। ঘুঁড়ি ধরিবার জন্য গাছে, ছাদে এবং অতি দুরূহ স্থানেও তাহারা উঠিতে ক্ষান্ত হয় না। শ্রীপঞ্চমীর দিনে কাঁহার কাহার ৭।৮ টাকার নক্ (সুতা) খরচ হয়। পূর্ব্বে কলিকাতা অঞ্চলেও এ আমোদ বড় ছিল, ধনবানেরা ঘুঁড়ির সঙ্গে কোম্পানীর নোট গাঁথিয়া দিতেন, ঘুঁড়ি কাটিয়া গেলে যে তাহা ধরিত, সেই ব্যক্তি নোট পাইবার অধিকারী হইত।

মকরসংক্রান্তি ঢাকার লোকের বড় আমোদের দিন। নানাবিধ পিষ্ঠা ও পুলি খাওয়া ও খাওয়ান এই দিনের প্রধান কার্য্য। আর এই দিনে বাস্তু-পূজা হইয়া থাকে। বিষুবসংক্রান্তিও আর একটি আমোদের দিন। এতদ্ভিন্ন তাসখেলা, কড়িখেলা, নারিকেল এবং ডিম্বভাঙ্গাও খুব প্রচলিত। নারিকেল ভাঙ্গার খেলাতে [illegible] বাজি থাকে।

ঢাকার লোকের শিক্ষিত হইবার অনেক উপায় আছে। অনেকগুলি ভাল ভাল স্কুল ও বিদ্যালয় আছে। উচ্চ-শিক্ষার জন্য ঢাকাকালেজ রহিয়াছে। ডাক্তারিশিক্ষার জন্য মেডিকাল স্কুল এবং জরিপাদিশিক্ষা করিবার নিমিত্ত "সর্ভে স্কুল" আছে। মুসলমানদিগের জন্য মাদ্রাসা আছে, পণ্ডিতদিগের জন্য বিক্রমপুরে অনেক চতুষ্পাঠী রহিয়াছে। আজ কাল শিক্ষাপ্রভাবে পূর্ব্ববাঙ্গালার লোকদিগের অনেক উন্নতি দৃষ্ট হয়। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সহিত আলাপ করিলে হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। দেখিয়া শুনিয়া আশা করা যায় যে অচিরাৎ এ দেশীয় লোক পশ্চিমবাঙ্গালার লোকের সমকক্ষ হইবে। এখানে নীতিশিক্ষা প্রভূত পরিমাণে হইয়া থাকে। ছাত্রদিগকে বিনীত, নম্র, সুশীল ও সচ্চরিত্র করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপ যত্ন করা হয়।

ঢাকাজেলার লোক সাধারণতঃ অধিক মামলাবাজ। নীচজাতিদিগের ত কথাই নাই, ভদ্রলোকের মধ্যেও বিবাদ এবং বিসম্বাদ কম নহে। অতিসামান্য কারণে মোকর্দ্দমা রুজু করা হয়। চুরি, ডাকাইতি এক্ষণে প্রায় গিয়াছে। পূর্ব্বে দস্যুভয়ে পথ চলিবার যো ছিল না। গ্রামের কথা দূরে থাকুক, ঢাকা সহরেই রাত্রি ১০টার পরে বাহির হওয়া যাইত না। রাত্রি ১০।১১টার পরে বাহির হইলে প্রায় ডনগীরদিগের হাতে পড়িতে হইত। ডনগীরেরা ভদ্রলোকের পোষাক পরিয়া রাস্তায় বেড়াইত এবং সুবিধা পাইলেই লোকের টাকাকড়ি কাড়িয়া লইত, কখন বা মারিয়া ফেলিত। ইহাদের দল এবং আখড়া

ছিল। সকলে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা একত্র করিয়া দলপতির মতানুসারে ভাগ করিয়া লইত। আমাদের একজন পরিচিত ব্যক্তি দশবৎসর পূর্ব্বে ঢাকাতে টীকাদার হইয়া আসেন। ইনি একদিন রাত্রি দশটার কিছু পরে বাঙ্গালা বাজার হইতে নবাবপুরে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে একজন ভদ্রলোকের বেশধারী আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। তিনি বলিলেন 'আমার হাত ধরেন কেন।' আগন্তুক বলিল 'আমি তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত হরণ করিতে পারি।' ইহা শুনিয়া তিনি সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, 'এখন কি করিতে হইবে আমাকে বলুন।' ডনগীর বলিল, 'আপনার নিকটে যাহা আছে, তাহা আমাকে সমর্পণ করুন এবং প্রতিমাসে আমাদিগকে একটাকা দিবেন স্বীকার করুন; নতুবা ছাড়িব না। আর এ কথা কাহাকে বলিতে পারিবেন না। কল্য প্রাতে অমুক বাটীতে যাইলে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। সাবধান, এ কথা যদি প্রকাশ করেন, তবে প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিবেন।" টীকাদার ত কম্পান্বিতকলেবরে বাসায় আসিলেন এবং তাঁহার পরমাত্মীয় এক ব্যক্তিকে এই সমস্ত গোপনে জ্ঞাপন করিলেন। তিনি ইহাঁকে ডনগীরদিগের বাসায় যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ইনি তাহা না শুনিয়া প্রাতঃকালে যথানির্দ্দিষ্ট বাটীতে গমন করিয়া রাত্রির ভদ্রলোককে এবং তাহাদের দলপতি বা সর্দ্দারকে দেখিলেন। তদনন্তর ইনি মধ্যে মধ্যে তথায় যাইতেন, ক্রমে ইহাঁর সহিত তাহাদের বেশ ভাব হইল, এবং তাহাদের দলপতি ইহাঁর অনুবেতনহেতু সেই একটাকা ছাড়িয়া দিল এবং বলিল যে যদি কখন পথে কোন বিপদে পড়েন, তবে আমার নাম করিলে রক্ষা পাইবেন। এইরূপ অন্যান্য গল্পও শুনা গিয়াছে। এখন ইহাদের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন ঢাকাতে ডনগীর নাই বলিলেও চলে।

এখানে জুয়াখেলার প্রাদুর্ভাব মন্দ নহে। শুনিতে পাই সহরের মধ্যে খেলিবার অনেকগুলি গুপ্ত আড্ডা আছে। হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই এই খেলাপ্রিয়; বিশেষতঃ মুসলমানগণের একরকম খেলা এই:—খেলুড়েরা সকলে নিজ নিজ বাজিতে চিনি বা গুড় মাখাইয়া মধ্যস্থানে রাখে এবং সকলে গোল হইয়া চারিদিকে বসিয়া থাকে। যাহার দ্রব্যে প্রথমে মাছি বসে বা পিঁপড়া ধরে তাহারই জয় হয় এবং সেই সকলকার বাজি জিতে।

সহরের আর একটি দোষ বেশ্যানিবাসসমূহ। যদি বেশ্যাদিগের বাটী সমস্ত একস্থানে থাকিত তাহা হইলে এত দোষের কারণ হইত না। এক্ষণে বেশ্যাদিগের বাটী প্রায় সহরময় ছড়াইয়া আছে। যে সকল স্থানে ছাত্রগণের

সর্ব্বদা যাতায়াত বা যেস্থানে তাহারা অধিকসংখ্যক বাস করে, সেখানে বা তাহার অতি সন্নিকটে-বেশ্যাদিগের বাটী হইলে নানাবিধ দোষ ঘটিয়া থাকে। এখানকার সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব, ডাক্তার সাহেব এবং কালেজের অধ্যক্ষ সাহেব বেশ্যাদিগের স্বতন্ত্র স্থানে বাসের জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন।

ঢাকায় সকলপ্রকার খাদ্যদ্রব্যই সুলভ। চাউল পূর্ব্বে অতি সুলভ ছিল। এবৎসরে বেশ শস্তা। সুভিক্ষ এবং দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ শুনা-যায় যে অত্রত্য নদীসমূহের জলবৃদ্ধি। যদি বর্ষাকালে নদীর জলবৃদ্ধি হইয়া জমী সকল ডুবিয়া যায় এবং শীতকালে অতি অল্প বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে কৃষক জমীতে ভাল করিয়া লাঙ্গল দিতে পারে। পরে বসন্তকালে এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইলে এবং বর্ষাকালে ক্রমে ক্রমে নদীর জলবৃদ্ধি হইয়া শস্যক্ষেত্র সকল ক্রমশঃ জলে প্লাবিত হইলে, শস্যের অবস্থা অতি উত্তম হয়। এইরূপ হইলে অপরিমিত শস্য জন্মে এবং সর্ব্বত্র সুভিক্ষ হইয়া থাকে। নতুবা যদি বর্ষাকালে একাধারে অত্যন্ত জলবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে শস্য সকল নষ্ট হইয়া যায় এবং দুর্ভিক্ষ হয়।

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে সায়েস্তা খাঁ নামক নবাবের শাসনকালে এক টাকাতে আট মণ চাউল বিক্রয় হইয়াছে। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে নবাব সাহেব ঢাকা সহরের পশ্চিমদিকে একটি ফটক নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং যতদিন টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় না হইবে ততদিন উহা বন্ধ থাকিবে এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন। এই ফটক তদনুসারে বহুকাল বন্ধ ছিল। পরে ১৭৩৯ সালে অত্যন্ত সুভিক্ষ হইলে সারফেরাজ খাঁর প্রতিনিধি যশোবন্ত রায় এই ফটক খুলিয়াছিলেন। অদ্যাপি এই ফটক সহরের পশ্চিমপ্রান্তে দণ্ডায়মান রহিয়া সেই অদ্ভুত সুভিক্ষের সাক্ষ্য দিতেছে। তদনন্তর ১৭৭২, ১৭৯৫, ১৭৯৬ এবং ১৭৯৭ সাল সুভিক্ষের সময় বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই শেষবৎসরে আবার ৷৴০ করিয়া চাউলের মণ হইয়াছিল। এই বৎসরে অত্যন্ত শস্তার জন্য রাজস্ব আদায় হওয়া ভার হইয়া উঠে।

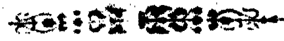
এদেশের নদীগুলির জলবৃদ্ধি হইতেও যেরূপ, জল কমিতেও তদ্রূপ। আষাঢ় মাসের প্রথমেই নদীসকল জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং পূজার পূর্ব্বেই ভয়ানকরূপে কমিয়া যায়। যেখানে ১৫ হাত বা ২০ হাত জল হইয়াছিল, সেখানে ১।২ হাত থাকে, কোথায়ও বা একেবারে শুকাইয়া যায়। নদীর জলবৃদ্ধিকে এস্থানের লোকেরা বর্ষা বলে।

ইতি প্রথম প্রস্তাব।

বঙ্গদর্শন

সপ্তমবৎসর।

৮১ সংখ্যা।



বঙ্গোন্নয়ন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালার রোগ।

বাঙ্গালায় যতপ্রকার অমঙ্গল আছে, ব্যাপক জ্বর* তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

দুশ্চিকিৎস্য ওলাউঠা রোগ আপাততঃ অধিকতর ভয়ানক বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ব্যাপক জ্বরে যদ্রূপ শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য হয়, তদ্রূপ অন্য কোন রোগেই হয় না। এই মহারোগের সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। নিদান অর্থাৎ রোগের কারণনির্ণয় অতি দুরূহ শাস্ত্র। দশব্যক্তি একত্র গঙ্গাস্নান যাইতে পথিমধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে। একজনের সামান্য জ্বর হয়, একজন জ্বরবিকারে প্রাণত্যাগ করে, একজনের কফের কোপ হয়; একজনের সাংঘাতিক যক্ষ্মাকাশের সঞ্চার হয়। অবশিষ্ট ছয়ব্যক্তির কিছুই হয় না। যদি বৃষ্টিতে ভিজাই প্রথমোক্ত ব্যক্তির জ্বরের একমাত্র কারণ হয়, তবে সকলেরই সামান্য জ্বর কেন না হইল? বস্তুতঃ রোগীর শরীরে নিহিত আভ্যন্তরিক কারণের অনুসন্ধান না করিয়া কেবল বাহ্যভৌতিক কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রোগের প্রকৃত নিদান হয় না। পক্ষান্তরে ছয়ব্যক্তিকে সুস্থ দেখিয়া অনেকেই এই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, যে রোগীর শরী-

---

* অনেকে এপিডেমিক্ জ্বরকে সংক্রামক জ্বর বলেন। বসন্ত, হাম ও উপদংশ রোগের যেমন সংক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়, জ্বরের তেমন কিছুই নাই। অনেক ব্যক্তিকে এককালে জ্বরাক্রান্ত দেখিয়া, সংক্রমণ অনুমান যুক্তিসিদ্ধ নহে। জ্বররোগীকে স্পর্শ করিয়া কাহারও জ্বর হয় না। এপিডেমিক্ জ্বরকে ব্যাপক জ্বর বলাই উচিত।

রের পূর্ব্বাবস্থাই রোগের মূলীভূত কারণ; বৃষ্টিতে ভিজা উপলক্ষমাত্র। অনেক কারণে রোগের উৎপত্তি হয়, তন্মধ্যে পরিদৃশ্যমান কোন একটি কারণ সাধারণ লোকে জানিতে পারে ; চিকিৎসক হয় ত সাধারণ লোকাপেক্ষা কিছু ভাল বুঝেন ; কিন্তু সমস্ত আভ্যন্তরিক কারণের বিষয় অন্তর্যামী ভগবান্ ব্যতীত কেহই জানিতে পারেন না।

(১) ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা বলেন একপ্রকার বায়বা বিষ শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলে সবিরাম ও কখন কখন স্বল্পবিরাম জ্বরের উৎপত্তি হয়। এই বিষবায়ুর নাম ম্যালেরিয়া। রাজা দিগম্বর মিত্র বলেন ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ ভূমির নিম্নস্তরের আর্দ্রতা। এই মত সর্ব্বতোভাবে অভ্রান্ত হউক বা না হউক, ইহা যে অনেকদূর সঙ্গত তাহার সন্দেহ নাই। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যেখানে ব্যাপক জ্বরের অধিক প্রাদুর্ভাব, সেখানকার বৃক্ষলতাদির বড় তেজ। বিশেষতঃ কচুগাচগুলি দেখিলে বোধ হয় যেন এক একটি কলাগাছের তেউড়, এবং সিক্তভূমিবিলাসী রক্তএরণ্ড তথায় বিরাজ করে। ভূমির নিম্নস্তর প্রচুর রস না পাইলে বন্য কচু ও লালভেরণ্ডার এমন তেজ হয় না।

হিমালয়াচলের সমস্ত জল নদী দিয়া নির্গত হয় না। অনেক জল নিম্নতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা আর্দ্র করে; এই কারণেই হিমালয়ের তরাই তত অস্বাস্থ্যজনক ; এই কারণেই রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পুর্ণিয়া ও চম্পারণের উত্তরভাগ এমন অস্বাস্থ্যকর।

পক্ষান্তরে ইহা বলা যাইতে পারে, যে ১২৮৬ সনের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে নদিয়া জেলা বন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল। সে বৎসরে জ্বরের অধিক প্রাদুর্ভাব না হইয়া একবৎসর পরে কেন হইল? এই প্রশ্নের সদুত্তর আমরা কাহারও নিকট পাই নাই ; কিন্তু আমরা বলিতে পারি এইরূপ দুই একটি উদাহরণ দ্বারা রাজা দিগম্বরের মতের খণ্ডন হয় না।

(২) অগভীর স্থির জলাশয় ম্যালেরিয়ার অতি প্রধান আকর। বিলময়প্রদেশে জ্বরের প্রাদুর্ভাব এই বাক্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইটালিদেশে পন্টিন বিল হইতে শরৎকালে এত ম্যালেরিয়া উত্থিত হয় যে রাত্রিকালে পথিকগণ তাহার নিকট দিয়া চলিতে পারে না। চলিলেই জ্বর হয়। অগভীর জলাশয় যদি লবণাম্বু হয়, তাহা হইলে আরও অস্বাস্থ্যকর হয়। আমাদের দেশে লোণা লাগার যে সংস্কার আছে, তাহার মূল এই। কলিকাতার পূর্ব্বদিকে যদি খাপা (salt-water lake) না থাকিত, তাহা হইলে কলিকাতা অধিকতর স্বাস্থ্যকর হইত। কলিকাতায় কিতার হাঁসপাতাল স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে, রাজধানীর প্রধান প্রধান ডাক্তারসাহেবেরা একবাক্যে ঐ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় দক্ষিণে হিজলির

নিকটবর্ত্তী স্থান যে অস্বাস্থ্যকর তাহার কারণ এই যে অগভীর লবণাম্বু নিকটে আছে। এই কারণেই ২৪ পরগণা এবং যশোহরের দক্ষিণে সুন্দরবন জরাধিকৃত হইয়াছে। বাখরগঞ্জের সুন্দরবন যে অপেক্ষাকৃত ভাল, তাহার প্রধান কারণ এই যে তথাকার নদীসকল পদ্মার বেণী; তাহারা প্রচুর-অলবণজল সমুদ্রে লইয়া যায়।

ফ্রান্সে লাভেন্দে প্রদেশ পূর্ব্বোক্ত কারণেই অস্বাস্থ্যকর ছিল। অগভীর খাল কাটায় লবণাম্বু বিলসকল প্রায় একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছে। তাহাতেই লাভেন্দে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে।

কয়েকবৎসর হইল কর্ণেল হেগ্ হুগলি জেলার ব্যাপকজরের কারণানুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি আপন বিজ্ঞাপনীতে প্রকাশ করিয়াছেন, "কোন কোন বিলের একপারে বিলক্ষণ জর, অপরপারে কিছুই নাই বলিলে হয়।" পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এমন বৈষম্যের কারণ কি? ইহার উত্তর এই হইতে পারে 'যদি দুই গ্রামের অন্যান্য বিষয়ে অবস্থা সমান হয়, তবে যে গ্রামে অধিক রৌদ্র পায় ও যাহাতে বায়ুসঞ্চালনের সদুপায় আছে, সেই গ্রাম অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর। আর সর্ টমাস ওয়াটসন প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে বিলের পার্শ্বে নিবিড় বৃক্ষাদি থাকিয়া যদি বিলের বায়ু প্রতিরোধ করে, তাহা হইলেও গ্রামের মঙ্গল।

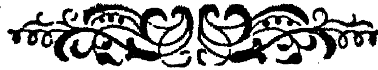
(৩) নদী ভরাট হওয়া এবং নদীর স্রোত বন্ধ হওয়া মহা অনিষ্টের মূল। গত শতাব্দীতে কাশিমবাজার বাঙ্গালাদেশমধ্যে সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, আর্ম্মাণী, দৈনি ও হিন্দুবণিকে নগর পরিপূর্ণ থাকিত। এখনও ভগ্ন অট্টালিকা, ভগ্ন মন্দির, ভগ্ন প্রস্তরময় ঘাট ও বিস্তৃত গোরস্থান বিদ্যমান আছে। মারিভয় হইয়া নগর উৎসন্ন গিয়াছে। তবে যে ইহার প্রাচীন গৌরব একেবারে লুপ্ত হয় নাই, তাহা বঙ্গনারীভূষণ মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রসাদে।

কাশিমবাজারের অধঃপতনের কারণ এই যে ভাগীরথীনদীর গতি আগে সৈয়দাবাদের পূর্ব্ব দিক্ দিয়া ছিল, এক্ষণে পশ্চিমদিক্ দিয়া হইয়াছে। তাহাতে নদীর ভূতপূর্ব্ব গর্ভ ম্যালেরিয়ার আকর বিল হইয়াছে। নদীর গতি পরিবর্ত্তনের অল্পকাল পরেই মহামারি হয়; এক্ষণেও ঐ নগর জরাকীর্ণ জনপদ বলিয়া বিখ্যাত আছে। মুরসিদাবাদ জেলায় যেমন ভাগীরথীর ভূতপূর্ব্ব খাত অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে, নদীয়া জেলায়ও যমুনা, বেতনা, ও কোদলার দুরবস্থা, যশোহরে ভৈরবের অপরিষ্কৃত জলপথ, ২৪ পরগণায় আদিগঙ্গা, লাউইনদী, সুতীনদীর অপকৃষ্টতা, হুগলী জেলার কাণানদী ও সরস্বতীর দুর্গতি মহা অস্বাস্থ্যের মূল হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষগণ রেলওয়ে

প্রস্তুত করিয়া আপনাদের উদার রাজনীতির পরিচয় দিতেছেন। তাহাতে তাঁহাদিগকে সাধুবাদ দিতে হয়; কিন্তু লুপ্তপ্রায় নদীগর্ভের সংস্কার করিলে দেশের যত হিত হয়, এমন আর কিছুতেই হইবে না। লোকে অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল জল পাইবে, নৌকাপথে বাণিজ্যের সুবিধা হইবে, এবং স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি হইয়া যারপর নাই মঙ্গল হইবে। প্রভিন্‌স্যাল্ পব্‌লিকওয়ার্কস্ শেষের অধিকাংশ এই কার্য্যেই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

তা, প্র, চ।



চাকুরীর পরীক্ষা।

বিবাহ উপলক্ষে যেরূপ কুলপরিচয়ের প্রয়োজন হয়, পুর্ব্বে চাকুরী উপলক্ষেও সেইরূপ প্রয়োজন হইত। তৎকালে বিশ্বাস ছিল যে, কর্ম্মদক্ষতা কেবল সৎকুলেই সম্ভব, অসৎকুলে দুর্লভ। সে বিশ্বাসের বিশেষ হেতুও ছিল; তৎকালে শিক্ষা কুলগত ছিল, এক্ষণে আর তাহা নাই, এক্ষণে শিক্ষা সকলকুলেই সম্ভব, কার্য্যদক্ষতাও কাজেই সকল কুলেই পাওয়া যাইতে পারে। কাজেই কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি নির্ব্বাচন করা কিছু কঠিন হইয়াছে।

যোগ্যব্যক্তিকে কার্য্যে নিযুক্ত করা যে অতি কঠিন তাহা সকলের সংস্কার নাই। সাধারণতঃ বিশ্বাস আছে যে, উপযুক্ত ব্যক্তিরাই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা কিঞ্চিৎ বিশেষ জানেন, তাঁহাদের মত স্বতন্ত্র। এইজন্য ইংলণ্ডদেশের একজন প্রধান ব্যক্তি আপনাকে মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া আপন কর্ত্তব্যকার্য্যের তালিকায় লিখিয়াছিলেন যে, আমি মন্ত্রী হইয়া কেবল যোগ্যলোককেই রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিব। তিনি জানিতেন যে এইটি বড় সহজ নহে, ইহার নিমিত্ত বিশেষ প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। অযোগ্য ব্যক্তিরা অনুরোধের জয়পতাকা তুলিয়া সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাদের উল্লঙ্ঘন করা অতি কঠিন। এইজন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় না।

ইদানীং বিজ্ঞরাজপুরুষেরা অনুরোধের মূলোচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিকে সহজে নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা। পরীক্ষা এক্ষণে সকল রা-

ন্যোই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশেও প্রায় ৩২ বৎসর হইল কতকাংশে আরম্ভ হইয়াছে।

পরীক্ষা দিয়া চাকুরী করা এক্ষণকার নিয়ম। যাহারা পরীক্ষা দিতে অসমর্থ অথচ চাকুরীর লোভ রাখে, কেবল তাহারাই পরীক্ষার বিদ্বেষী হওয়া সম্ভব। তদ্ভিন্ন যদি আর কেহ ইহার বিদ্বেষী থাকেন, তাহা হইলে হেতু অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

উমেদার ব্যতীত সত্যই অনেক লোকে এই নিয়মের বিরোধী দেখা যায়; তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, উপযুক্ত কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করিতে গেলে পরীক্ষাই তাহার একমাত্র উপায়। অথচ আবার চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেন, "ভাল! পূর্ব্বকালের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা এক্ষণকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটরা অযোগ্য কেন? পূর্ব্বেও তাঁহাদের পরীক্ষা ছিল এক্ষণেও ত সেই পরীক্ষা আছে।" আবার বলেন "উকীলদের পরীক্ষা পূর্ব্বে ছিল এখনও আছে, তবে পূর্ব্বকালের উকীল অপেক্ষা এক্ষণকার উকীলেরা ভাল কেন?"

এ কথার প্রথমেই আপত্তি হইতে পারে যে, এক্ষণকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটরা যে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য, অথবা এক্ষণকার উকীলেরা যে অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ পুরাতন লোক, এই প্রস্তাবলেখক তাহার মধ্যে একজন। যাহারা উভয় সময়ের কর্ম্মচারী দেখিয়াছে, তাহাদের প্রমাণ গ্রহণ না করিলে আর প্রমাণ নাই। কিন্তু তাহাদের প্রমাণ যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে পরীক্ষাসত্বেও এক্ষণকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটগণ অযোগ্য। পরীক্ষা সত্বেও যদি এরূপ হয় তবে পরীক্ষার প্রয়োজন? যোগ্যব্যক্তি নির্ব্বাচন করিবার নিমিত্ত পরীক্ষা যে একমাত্র উপায় অথবা বিশেষ উপায় তবে তাহা মিথ্যা হইল? অন্যদেশে পরীক্ষাদ্বারা যোগ্য লোক নির্ব্বাচন হইতেছে, অন্ততঃ কতকাংশে হইতেছে, কিন্তু আমাদের দেশে তাহার বিপরীত ফল কেন হয় তদন্ত করা আবশ্যক।

পূর্ব্বে যৎকালে আমাদের দেশে উপযুক্ত ব্যক্তি বড় পাওয়া যাইত না, তখন গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; আর এক্ষণে যোগ্যলোক বাঙ্গালার সর্ব্বত্র শত শত পাওয়া যায়, অথচ যোগ্যলোক রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয় না, ইহার হেতু কি? এই কথা লইয়া বাঙ্গালিরা মধ্যে মধ্যে গোপনে আন্দোলন করিয়া থাকেন। অনেকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুপযুক্ত লোক নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকবৎসর অবধি একটা কথা রটিয়াছে যে ডিসরেলি সাহেব যখন ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রিপদে নিযুক্ত ছিলেন,সেই সময় একবার তথায় কথা উপস্থিত হয়

যে ইংলণ্ড হইতে আর অধিক covenanted servant) কবনাণ্টেড সারবাণ্ট পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, এই সনদি সাহেবদের বেতনে ভারতবর্ষের অনর্থক অনেক অর্থব্যয় হইতেছে। বিশেষতঃ ডেপুটিমাজিষ্ট্রেটদেরমধ্যে যেরূপ উপযুক্ত ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষণে অনায়াসে অধিকাংশ কার্য্য তাহাদের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। ডিসরেলি সাহেব তাহাতে ভাবিলেন সনদি চাকরেরা বেতনদ্বারা ভারতের অনেক টাকা ইংলণ্ডে আনিতেছে, তাঁহাদের সংখ্যা কম হইলে ইংলণ্ডের অর্থাগম কম হইবে। অতএব এই আশঙ্কায় ডিসরেলি সাহেব গোপনে নিষেধ করেন যে, আর যেন বিশেষ উপযুক্ত বাঙ্গালিকে উচ্চপদ না দেওয়া হয়, তবে এখানে সেখানে দুই একটি ভাল লোককে কর্ম্ম দিলে ক্ষতি নাই বরং না দিলে নিন্দা হইবে। অনভিজ্ঞ বাঙ্গালিমহলে এরূপ অমূলক কথা রটিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? নিত্য যাহা হয়, তাহার সামান্য ব্যতিক্রম দেখিলে যে বাঙ্গালিরা দেবতাদের দোষারোপ করে সে বাঙ্গালিরা লোকনির্ব্বাচন সম্বন্ধে সামান্য ব্যতিক্রম দেখিলে যে ডিসরেলি সাহেবকে বা ইংরেজরাজশাসনকে দোষারোপ করিবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? রাজমন্ত্রীর গোপনঅনুমতি সম্বন্ধে তাঁহাদের এতদূর বিশ্বাস যে তাঁহারা অনায়াসে বলিয়া থাকেন "যদি গোপননিষেধ না থাকিবে তবে ব্যবসাদারেরা বা জমীদারগণ যে শ্রেণীর লোকদের কুড়ি কি পঁচিশ টাকায় চাকর রাখেন এক্ষণে সেই শ্রেণীর লোকদের গবর্ণমেণ্ট চারিশত পাঁচশত বেতন দিয়া কেন রাখিতেছেন।" আমরা স্বীকার করি ঐ শ্রেণীর লোক এক্ষণে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের মধ্যে অনেক দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার হেতু গবর্ণমেণ্টের কোন কুঅভিসন্ধি নহে, গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ হইয়া কেবল পরীক্ষাদ্বারা সেই সকল লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। যদি তাহাতে অনুপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া থাকে তবে সে দোষ পরীক্ষার। তাহার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। যোগ্য লোক নির্ব্বাচনের জন্য পরীক্ষাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় সন্দেহ নাই কিন্তু উপযোগী পরীক্ষা এপর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই। এই জন্য ভুল হইতেছে এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত এই ভুল চলিবে।

যখন গ্রেসাহেব গবর্ণর ছিলেন, তখন এই নিয়ম করা হয় যে পরীক্ষা করিয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতে হইবে, নিযুক্ত করিয়া আবার তাহাদের পরীক্ষা লইতে হইবে। পূর্ব্বে এ প্রথা ছিল না, নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে আর কোন পরীক্ষা হইত না, গ্রেসাহেব তাহা প্রথম করিলেন, করিয়া ভাবিলেন, আর অযোগ্য লোক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটীপদে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। নিযুক্তের পূর্ব্বে পরীক্ষা, নিযুক্তের পরে পরীক্ষা,

শুনিলে তাহাই আপাততঃ বোধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রেসাহেবের সময় হইতেই আরও বিশেষরূপে অযোগ্য ও সামান্য লোক নিযুক্ত হইতে আরম্ভ হইল। গ্রেসাহেব বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, যাহারা সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব, যাহারা অনায়াসেই "সুপারিষের" যোগাড় করিতে পারে, সচরাচর তাহারাই ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট হইয়া থাকে; তাহারা অযোগ্য হইলেও ঐ পদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যাহাদের বংশগৌরব নাই, অথচ যোগ্যব্যক্তি তাহারা এ পদ প্রায় পায় না; অতএব এ কুপ্রথার পথরোধ করিবার নিমিত্ত গবর্ণর সাহেব সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিলেন যে, যে কেহ ইচ্ছা করেন তিনি পূর্ব্বাহ্ণে নিয়মিত একটি পরীক্ষা দিয়া আপনার নাম ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী রেজেষ্টরীতে লেখাইতে পারেন, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি কেবল সেই পরীক্ষোত্তীর্ণদের দেওয়া যাইবে। বলা আবশ্যক যে পরীক্ষাটি বড় কঠিন নহে, একটু ইংরেজি, একটু অঙ্কশাস্ত্র, একটু ইতিহাস এই লইয়া সেই পরীক্ষা। আমাদের দেশে বালকেরা স্কুলে সচরাচর যাহা অধ্যয়ন করে কেবল সেই সম্বন্ধে এই পরীক্ষা। সরলচেতা গ্রেসাহেব এই নিয়ম বদ্ধ করিলে সামান্য কেরাণী, গ্রাম্য স্কুলমাষ্টারগণ নাচিয়া উঠিল। তাহারা আপনাদের অযোগ্যতা জানিত, তাহারা কস্মিনকালে হেড কেরাণী বা হেড মাষ্টার হইবার প্রত্যাশা করিত না এক্ষণে তাহাদের কপাল খুলিল, অনায়াসে পরীক্ষা দিয়া তাহারা ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট হইতে লাগিল। কেহ কেহ রহস্য করিয়া এই সকল ডেপুটিদের "গ্রের গাধা" বলিয়া থাকেন। গ্রে সাহেব আপনার ভুল শেষ বুঝিয়াছিলেন। কিছুদিন পরেই সেই পরীক্ষা বন্ধ করিয়াছিলেন। গ্রের সকল ডেপুটিই গাধা নহেন, গুণবান্ ব্যক্তি অনেকে আছেন সন্দেহ নাই।

গ্রে সাহেবের পর ক্যাম্বল সাহেব গবর্ণর হইলেন। তিনি জানিতেন বাঙ্গালিরা শিক্ষাদোষে দুর্ব্বল অতএব ব্যায়াম শিক্ষার উৎসাহ দিবার নিমিত্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটিপদ বলিষ্ঠের পারিতোষিক স্থির করিলেন। তাহাদের প্রথমতঃ কার্য্যপ্রণালী শিক্ষার নিমিত্ত সব্ ডেপুটিপদ নূতন সৃষ্টি করিলেন, যাহারা অশ্বারোহণে, সন্তরণে, পদসঞ্চালনে বিলক্ষণ পটু তাহারাই সব্ডেপুটি হইবার অধিকারী হইল। এই পদের নিমিত্ত সামান্যমত জরিপ জমাবন্দি আর একটু আইন জানিলেই হইবে এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। ক্যাম্বল সাহেবের বিজ্ঞাপন প্রচার হইলে আবার গ্রাম্য স্কুলমাষ্টারদিগের মধ্যে উৎসাহ পড়িয়া গেল। কেরাণি ও মুহুরিদলের সুবিধার জন্য গবর্ণর সাহেব হুকুম দিলেন যে তাহারা জরিপ জমাবন্দি প্রভৃতি শিক্ষা করিবার নিমিত্ত ছুটি চাহিলে অনা-

য়াসে ছুটি পাইবে। সুবিধার আর সীমা রহিল না। সেই সকল মুহুরি, কেরাণি, গ্রাম্যশিক্ষক প্রথমে সব্‌ডেপুটি হইয়া এক্ষণে ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। ক্যাম্বল সাহেব হস্তপদের গুণ পরীক্ষা করিয়া তাহাদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন এই জন্য কেহ কেহ রহস্য করিয়া তাহাদের "ক্যাম্বলি উট" (Campbell's Camel) বলেন।

কিরূপে অযোগ্য ও সামান্য ব্যক্তিরা ইদানীং ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট পদলাভ করিতে পারিয়াছে তাহা বোধ হয় এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়দ্বারা অনায়াসে অনুভব হইতে পারিবে। ইংরেজ কর্ম্মচারী এ দেশে প্রয়োজন ইহা বিলাতে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অযোগ্য বাঙ্গালিকে উচ্চপদে আসীন করা হয় নাই। পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের নিযুক্ত করা হইয়াছে, যদি তাহাতে অযোগ্যব্যক্তির পদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে সে দোষ পরীক্ষার।

পরীক্ষার দোষ গুণ দুই আছে। পরীক্ষার গুণ আছে বলিয়া সকল দেশেই পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, পরীক্ষা থাকিলে অনুরোধের বল হ্রাস হইয়া যায়। এক্ষণে বিনাপরীক্ষায়, কেবল অনুরোধের বলে, আর কেহ মুন্সেফ হইতে পারেন না। ডেপুটিমাজিষ্ট্রেটিতে অদ্যাপি সে নিয়ম বলবৎ হয় নাই, হইবারও বিলম্ব আছে, তথাপি কথঞ্চিৎ সে নিয়ম গবর্ণর ক্যাম্বল সাহেবের সময়ে হইয়াছিল। একবার তিনি একজন জজসাহেবকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, আপনার ভ্রাতষ্পুত্রকে আমি একায়েক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট দিতে পারি না, তিনি উপযুক্ত হইলে অনায়াসে নেটিব সিবিলসার্ব্বিসের অর্থাৎ সব্‌ডেপুটি পরীক্ষা দিতে পারিবেন। তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট অনায়াসে হইতে পারিবেন। পরীক্ষার প্রথা ছিল বলিয়া ক্যাম্বল সাহেব অনুরোধে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। পরীক্ষার অকাট্য নিয়ম থাকিলে কেহ অনুরোধ করিতে আইসে না। কাজেই উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করিবার বাধা কমিয়া যায়।

পরীক্ষা সঙ্গত ও শ্রেয়ঃ বলিয়া সর্ব্বত্রে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃত পরীক্ষা হইলে তাহাই বটে, কিন্তু যে প্রণালীতে আমাদের দেশে পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে তাহা প্রায় অসঙ্গত। যে কার্য্যে যে গুণ আবশ্যক তাহা উমেদারের আছে কি না নির্দ্ধারণ করাই পরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে স্থির করা চাই যে, কোন্ পদের নিমিত্ত কি কি গুণ আবশ্যক। পূর্ব্বাহ্নে তাহা স্থির করিয়া পরীক্ষা করিলে সেই পরীক্ষা সার্থক হয়। নতুবা আমাদের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ পরীক্ষা করেন, সেইরূপ পরীক্ষা অনর্থক। যদি নিয়ম করা যায় যে বলিষ্ঠপদ দেখিয়া "ডাক রনার" নিযুক্ত করা যাইবে তাহা হইলে সঙ্গত হয়। কিন্তু যদি বলা যায়, বলিষ্ঠপদ দেখিয়া মাজিষ্ট্রেটী দেওয়া যাইবে

তাহা হইলে কে না উপহাস করে? বলিষ্ঠপদ মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজন সন্দেহ নাই। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটী কার্য্যের নিমিত্ত যে তাহা বিশেষ আবশ্যক ইহা কেহ প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে কে তাহাতে কর্ণপাত করে?

গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা লোকে পরীক্ষক ভাল, অনেককে গবর্ণমেণ্ট উকিলির ছাপ দিয়া ছাড়িয়া দেন, তাহার পর লোকে তাহাদের বাছনি করে। গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষায় তাঁহারা সকলেই যোগ্য, লোকের পরীক্ষায় তাহাদের মধ্যে অনেকেই অযোগ্য; তাহাই তাহাদের অবস্থার তারতম্য। উকিলদের আইনজ্ঞ হওয়া উচিত সত্য, কিন্তু তদ্ভিন্ন তাঁহাদের আর গুটিকতক গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা না থাকিলে কেবল আইন জানা বৃথা হয়। গবর্ণমেণ্ট সেই গুণগুলির পরীক্ষা একেবারে করেন না, কাজেই দেখা যায় আইনের পরীক্ষা দিয়া যোগ্যতার সার্টিফিকেট হাসিল করিয়াও অনেক উকিল, অযোগ্য বলিয়া আদালতে প্রায় অগ্রাহ্য হইয়া থাকেন; কাজেই বলিতে হইবে এক্ষণে উকিলের যে পরীক্ষা আছে তাহা অসম্পূর্ণ।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটীসম্বন্ধেও সেইরূপ। তাহাদেরও কেবল আইনের পরীক্ষা হইয়া থাকে। কিন্তু সকলেই নিত্য দেখিতে পান যে, কেবল আইন জানিলেই মাজিষ্ট্রেট ভাল হয় না। আইনজ্ঞমাত্রেই যদি ভাল মাজিষ্ট্রেট হইত, তাহা হইলে পরীক্ষোত্তীর্ণ মাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে আর তারতম্য থাকিত না, সকলেই ভাল মাজিষ্ট্রেট হইতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় পরীক্ষোত্তীর্ণদের মধ্যে অনেকে অযোগ্য আছেন।

বিচারকদিগের পক্ষে আইন জানার আবশ্যকতা আছে সত্য, কিন্তু মাজিষ্ট্রেটগণ কেবল বিচারক নহেন, তাঁহাদের অন্য কার্য্যের নিমিত্ত অন্য গুণ আবশ্যক; কেবল আইনের পরীক্ষায় সে সকল গুণের পরীক্ষা হয় না; বিশেষতঃ আইনের নিত্য পরিবর্ত্তন হয়, একসময় গুটিকতক আইনের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিলে ভবিষ্যৎ আইনসম্বন্ধেও পরীক্ষা হইয়া রহিল এ কথা বলা অসঙ্গত। তবে বড় জোর এইমাত্র বলা যায় যে, একবার যে ব্যক্তি উদ্যোগ করিয়া আইনের পরীক্ষা দিতে পারিয়াছেন, তিনি উদ্যোগী পুরুষ। তাঁহার স্মরণশক্তিও আছে।

কিন্তু উদ্যোগ আর স্মরণশক্তি কেবল এই দুই থাকিলেই লোকে বিচারাসনে বসিবার যোগ্য হয় এমত নহে। বিচারপতিদের নানাগুণ আবশ্যক, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটিও পরীক্ষা করেন না, বোধ হয় করিতেও পারেন না। অপক্ষপাতিতা বিচারপতির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, এক্ষণে তাহার কোন পরীক্ষা নাই, এইরূপ শত শত বিষয়ের কোনটিরই পরীক্ষা হয় না, কেবল আইনের

পরীক্ষা হয়। অধিক কি যেটী সর্ব্বপ্রধান, সেই চরিত্রের পরীক্ষাই নাই। তাহাই বলিতেছিলাম গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষা অতি অসম্পূর্ণ। একজন বিচারপতি মধ্যে মধ্যে কোর্টফি গোপনে আত্মসাৎ করিতেন, হঠাৎ ধরা না পড়িলে তিনি অদ্যাপি বিচারপতির উচ্চ আসনে আসীন থাকিতেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বিচারপতির পদ দিয়াছিলেন কাজেই লোকে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য, না করিলে গবর্ণমেণ্টকে অবমাননা করা হয়। তাঁহাকে বিশ্বাস করিলেও লোকের সর্ব্বনাশ হয়। এঅবস্থায় সচ্চরিত্র দেখিয়া বিচারপতি করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ত্রুটি। যোগ্য অযোগ্য বিচার না করিয়া রাজপ্রতিনিধিরা চাকুরি বিতরণ করেন, তাঁহারা সেলামের উপর সেলাম-লইয়া চলিয়া যান, কিন্তু পশ্চাতে কণ্টক রাখিয়া যান। সে কণ্টক সমাজের অঙ্গে বিদ্ধ হয় তাহাতে বিদেশী গবর্ণমেণ্টের অখ্যাতি জন্মে।

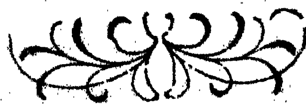
চরিত্রের পরীক্ষা করা অতি কঠিন। সদ্বংশজাত হইলে সচ্চরিত্র হয়, ইহা পূর্ব্বের বিশ্বাস, অদ্যাপিও সে বিশ্বাস কতকাংশে আছে। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে বংশ অনুসন্ধান করিতেন; শুনা যায় এক্ষণেও তাহা করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার ফল বড় দেখা যায় না। ইতরবংশসম্ভূত অনেক লোক এক্ষণে উচ্চপদে নিযুক্ত হইতেছে। বস্তুতঃ তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, যদি কর্ম্মচারী নিজে পবিত্র হন, তবে পূর্ব্বপুরুষ অপবিত্র বলিয়া কি হানি? কিন্তু পদাকাঙ্ক্ষীরা নিজে পবিত্র কি না, ইহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা আমরা জানি না। অনেকের ধারণা যে এই অনুসন্ধানসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কোন উপায়ই নাই। তাহা সম্ভব। আমরা শুনিয়াছিলাম যে ডেপুটি-মাজিষ্ট্রেট পদাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তিসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট একবার একজন ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটকে অনুসন্ধান করিতে একখানি "ডিমি অফিসিয়াল" পত্র লিখিয়াছিলেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব সে ব্যক্তিকে নিজে চেনেন না, অতএব উমেদারের নিবাস যে অঞ্চলে তথাকার ডেপুটিমাজিষ্ট্রেটকে সেইরূপ এক পত্র লেখেন। ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর নূতন আসিয়াছেন, কাহাকেও জানিতেন না, কাজেই তিনি থানার সব্ইনস্পেক্টারকে লিখিলেন, সব্ইনস্পেক্টার যথানিয়মে তলবি পরওয়ানা পাঠাইলেন। পরওয়ানা হস্তে দুইজন কনেষ্টবল উমেদারের বাটী আসিয়া দাঁড়াইলে বাবুর চক্ষুস্থির হইল, কনেষ্টবলদের সঙ্গে অগত্যা তাঁহাকে আসামির ন্যায় যাইতে হইল, তাঁহার অন্দরমহলে কান্না উঠিল, পাড়ার লোকেরাও "আহা" বলিয়া বিপদের সময় যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। শেষ উমেদারবাবু দারগা সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত

হইলে তিনি তাঁহার এজাহার লইতে আরম্ভ করিলেন। নাম, ধাম, পিতার নাম, জাতি, পেশা, বিষয়সম্পত্তি, কি বিদ্যা, কত বিদ্যা, কেমন চরিত্র, আনুপূর্ব্বিক সকল প্রশ্ন করিয়া শেষ যথানিয়মে রোয়দাদে লিখিলেন যে এ ব্যক্তি সচ্চরিত্র ও ভদ্রবংশ বটে। ইহাকে ডেপুটিমেজিষ্ট্রেটি দেওয়া যাইতে পারে।

এ কথা যদি সত্য হয়, তবে রহস্যের বিষয় বটে, কিন্তু আক্ষেপও হয়। চরিত্রের পরীক্ষা অতি কঠিন, কোন রাজ্যেও তাহা সুসম্পন্ন হয় না। ইংলণ্ড হইতে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া যে সকল সনদি সাহেবকে এ দেশে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেটি পদের নিমিত্ত পাঠান হইতেছে তাঁহাদেরও চরিত্রপরীক্ষা হয় না। সেস্থলে চরিত্রপরীক্ষার কোন উপায় নাই, সেখানে বোধ হয় সকল লোকই সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, এবং সদাশয় বলিয়া অনুভব করিয়া লইতে হয়। যতক্ষণ তাহার অন্যথা স্পষ্ট না দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ এ অনুভব ভিন্ন আর উপায় নাই।

আমরা এপর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহার সংক্ষেপ এই যে অনুরোধে "চাকুরী" দেওয়া অপেক্ষা পরীক্ষা করিয়া চাকুরী দেওয়া ভাল। কিন্তু প্রকৃত পরীক্ষা আবশ্যক; যে পরীক্ষা এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট করিয়া থাকেন তাহা অসম্পূর্ণ।

আমাদের আর একটু বলিতে ইচ্ছা যে অযোগ্য ব্যক্তি রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলে যে ক্ষতি, তাহা গবর্ণর সাহেব বা কমিসনর সাহেবের নহে। ক্ষতি সমাজের।



অভিজ্ঞান শকুন্তল।

৬। অন্যান্য ব্যক্তিগণ।

শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রণয় অভিজ্ঞানশকুন্তলের বর্ণনীয় বিষয়; জুলিয়েটের সহিত রোমিওর প্রণয় রোমিও এবং জুলিয়েটের বর্ণনীয় বিষয়। দুই খানি নাটকের বর্ণনীয় বিষয় এক, কিন্তু বর্ণনার প্রণালী বিভিন্ন। দুষ্মন্তের প্রণয়ের বাহ্যপ্রতিবন্ধক নাই; রোমিওর প্রণয়ের বাহ্যপ্রতিবন্ধক আছে। শকুন্তলার আত্মীয় স্বজন সকলেরই ইচ্ছা যে দুষ্মন্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; রোমিওর আত্মীয় স্বজন কাহারো ইচ্ছা নয় যে জুলিয়েটের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই প্রভেদ বশতঃ রোমিও এবং

জুলিয়েটে বাহ্যজগৎ অপেক্ষাকৃত প্রবল; অভিজ্ঞানশকুন্তলে অন্তর্জগৎ অপেক্ষাকৃত প্রবল—রোমিও এবং জুলিয়েটে ঘটনার বাহুল্য; অভিজ্ঞানশকুন্তলে ঘটনার স্বল্পতা। যেখানে দ্বন্দ্ব মনে মনে সেখানে বাহ্যজগতের আবশ্যকতা কম; যেখানে দ্বন্দ্ব বাহিরে সেখানে বাহ্যজগৎ কাজে কাজেই প্রবল। অধিকন্তু যে নাটকে বাহ্যজগৎ নায়কের প্রতিবাদী, সে নাটকের ব্যক্তিগণ একশ্রেণীভুক্ত না হইয়া, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কিন্তু যে নাটকে বাহ্যজগৎ নায়কের প্রতিবাদী নয় সে নাটকের ব্যক্তিগণ বিরুদ্ধ শ্রেণীতে বিভক্ত হয় না। অভিজ্ঞানশকুন্তলে বাহ্যজগৎ নায়কের প্রতিবাদী নহে এবং সেই জন্য অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রায় সমস্ত ব্যক্তি এক শ্রেণীভুক্ত,দুই একজন ছাড়া সকলেই দুষ্মন্তের স্বপক্ষ তাহাদিগের মধ্যে মহর্ষি কণ্ব সর্ব্বাংশেই প্রধান।

মহর্ষি কণ্ব অভিজ্ঞানশকুন্তলের আখ্যায়িকার স্থিতিস্থানীয়। তিনি শকুন্তলার পালক পিতা। শকুন্তলার ঐহিক অদৃষ্ট তাঁহারই ইচ্ছানুগামী। তিনি ইচ্ছা করিলে শকুন্তলাকে যাবজ্জীবন তপশ্চর্য্যায় রাখিতে পারিতেন; তাঁহার ইচ্ছা না হইলে শকুন্তলা কখনই সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতে পারেন না। দুষ্মন্ত অগ্রে তাঁহার অভিপ্রায় জাত হইয়া পরে শকুন্তলাকে লাভ করিতে যত্নশীল হন। শকুন্তলাও তাঁহার অভিপ্রায় জানিতেন বলিয়া দুষ্মন্তের প্রণয়লাভ করিতে অভিলাষিণী হন। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা—এই দুই ব্যক্তির মূলে মহা-ঋষি কণ্ব। মহর্ষি কণ্ব অভিজ্ঞান শকুন্তলের মেরুদণ্ড।

কি চমৎকার মেরুদণ্ড! মহর্ষি কণ্বকে বুঝিয়া উঠা যায় না। কল্পনা তাঁহাকে আঁটিতে পারে না। চিন্তা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে গিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়ায়। তিনি স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য; তিনি ইহকাল এবং পরকাল; তিনি পুরুষ এবং প্রকৃতি; তিনি মোহ এবং বৈরাগ্য; তিনি চিন্তা এবং হৃদয়; তিনি শান্তি এবং তেজ। মহর্ষি কণ্ব ভারতের একজন প্রখ্যাতনামা ঋষি। তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, পার্থিব সুখ তুচ্ছ করিয়া, দুর্দ্দমনীয় ভোগলালসা বিনষ্ট করিয়া, জগতের মোহমুগ্ধকারী মায়াজাল কাটিয়া ফেলিয়া, দেহ, মন, আত্মা, সকলই ব্রহ্মসেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। পৃথিবীর সুখ, পৃথিবীর সম্পদ, পৃথিবীর যশ, পৃথিবীর মর্য্যাদা, পৃথিবীর গৌরব, ইহার কিছুই তাঁহার প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হয় না। এ সকলই তাঁহার কাছে সামান্য, মূল্যহীন, অকিঞ্চিৎকর। যে পার্থিবতায় সমস্ত পৃথিবী মুগ্ধ সে পার্থিবতা তাঁহার কাছে হতশক্তি, হতপ্রভাব, মহিমাশূন্য। পৃথিবীর মোহিনী শক্তি তাঁহার কাছে বিলুপ্ত। পার্থিব পদার্থের সহিত তাঁহার চিন্তা, তাঁহার হৃদয়, তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা, তাঁহার কিছুরই সংস্রব

নাই। পার্থিব পদার্থ তাঁহার চক্ষে নি-কৃষ্ট, ক্ষুদ্রমনেরই যোগ্য। তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গাভিমুখে। তিনি মর্ত্তালোকে আছেন কিন্তু ব্রহ্মলোক তাঁহার প্রকৃত বাসস্থান। পার্থিব পদার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে, কিন্তু তিনি পার্থিব পদার্থের নিকট নাই। তিনি পার্থিব পদার্থে পরিবেষ্টিত, কিন্তু তিনি পার্থিব পদার্থের শাসন অতি-ক্রম করিয়াছেন। তিনি যেন মনুষ্যা-পেক্ষা অনেক উচ্চতর মহাপুরুষের ন্যায় পৃথিবীর ঊর্দ্ধদেশে বিচরণ করেন। তিনি দিবারাত্র ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত। যাগ, যজ্ঞ, ধ্যান, আরাধনা—ইহাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য, একমাত্র সুখ, একমাত্র অভিলাষ। তাঁহার চিন্তা ব্রহ্ম-বিষয়ক, তাঁহার হৃদয় ব্রহ্মআরাধনায়, তাঁহার আশা ব্রহ্মপদে—তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে রহিয়াছেন। ব্রহ্মবলে তিনি বলীয়ান্। তিনি দুষ্ম-ন্তের ন্যায় বীরপুরুষ নন; ক্ষত্রিয়-যোদ্ধার ন্যায় তাঁহার বাহুবল নাই; তিনি শস্ত্রবিদ্যার অধিকারী নন। ত-থাপি তিনি শত্রুদমনে সক্ষম। তাঁহার আশ্রমের সন্নিকটস্থ পর্ব্বতপ্রদেশ রাক্ষস-নামধেয় অনার্য্যজাতির বাসস্থান। রাক্ষ-সেরা দলবদ্ধ হইয়া পর্ব্বতপ্রদেশ হইতে আসিয়া সময়ে সময়ে আশ্রমবাসীদিগের যজ্ঞকার্য্যের এবং তপশ্চর্য্যার বিঘ্নোৎ-পাদন করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে থাকেন তখন তাহারা আশ্রমবাসীদিগের বৈরি-তাচরণে সাহসী হয় না। দুষ্মন্তের আশ্রমপ্রদেশে অবস্থানকালে রাক্ষসেরা আশ্রম আক্রমণ করে। ঋষিগণ উপা-য়ান্তর না দেখিয়া দুষ্মন্তের বাহুবলের প্রার্থনায় তাঁহাকে জানাইলেন যে—

কণ্বস্য মহর্ষেরসান্নিধ্যাৎ রক্ষাংসি নঃ
ইষ্টিবিঘ্নমুৎপাদয়ন্তি। (২য় অঙ্ক।)

মহর্ষি কণ্ব উপস্থিত না থাকা হেতু রাক্ষসেরা যাগযজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছে। কণ্বের কি প্রতাপ! তিনি উপস্থিত থাকিলে দুরন্ত বলবিক্রমশালী রাক্ষসে-রাও তাঁহার আশ্রমের নিকট আসিতে সাহস করে না। তাঁহার বাহুবল নাই। কিন্তু তাঁহার এমন কোন আধ্যাত্মিক বল আছে যাহার কাছে বাহুবলপ্রধান দুরাচার মন্ত্রাহতের ন্যায় হৃতসাহস এবং নির্বীর্য্য। কথাটি কাল্পনিক নয়। আধ্যা-ত্মিক তেজেরদ্বারা দৈহিকশক্তির অপ-নয়ন আমরা সকলেই স্বল্পপরিমাণে দেখিয়া থাকি। মহর্ষি কণ্ব আধ্যাত্মিক শক্তির পূর্ণায়ত প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার কাছে অসংখ্য দৈহিকবলপ্রধান রাক্ষস যে মন্ত্রাহত বিষধরের ন্যায় নির্জীব হইয়া থাকিবে তাহা অসম্ভব নয়। কিন্তু যে মহাপুরুষের কাছে সহস্র সহস্র দুর্দ্দম-নীয় দুরাচার বলবীর্য্যহীন ভীরুর ন্যায় ভগ্নোদ্যম এবং ভয়াকুল, সে মহাপুরুষের মহিমার কে ইয়ত্তা করিবে। তাঁহার অসীম এবং অসাধারণ আধ্যা-ত্মিক শক্তির কে পরিমাণ করিবে। তাঁহার আধ্যাত্মিকতার বিস্তার এবং

গভীরতা কে বুঝিয়া উঠিবে। তিনি রক্তমাংস নন, তিনি আত্মা; তিনি মানুষ নন, তিনি মন্ত্র। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার বলে তাঁহার যেমন বাহ্যপ্রভাব, তেমনি বাহ্যজ্ঞান। অনতিবিলম্বে শকুন্তলার ভাগ্যে বিষম কষ্টভোগ আছে তিনি তাহা জানিতে পারিয়াছেন। পারিয়া তাহার প্রতিবিধানার্থ সোমতীর্থে গমন করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পরিণয় হইয়া গেল। কিন্তু কাহারও কাছে পরিণয়সম্বাদ না পাইয়া ও আশ্রমে আসিয়াই—

সমং তাতকম্বকেণ এব্ব অভিণন্দিঅং দিট্ঠিআ ধুমাউলিঅদিট্‌ঠিণো বি জঅমাণস্স পাবএ এব্ব আহুই পড়িআ। বচ্ছে সুসিস্‌সপরিদিন্না বিজ্জ বিজ্জা অসোঅণিজ্জা সংবুত্তা। অজ্জ এব্ব ইসিপড়িরকৃখিঅং ভুসংকত্তুণো সআসং বিসজ্জামি ত্তি।

কণ্ব এ কথা কেমন করিয়া জানিলেন? প্রিয়ম্বদা বলেন যে তিনি এইরূপ আকাশবাণী শুনিয়াছিলেন:—

দুষ্মন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়ে ভুবঃ।

অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব॥

হে ব্রহ্মন্ তোমার কন্যাকে অগ্নিগর্ভা শমীলতার ন্যায় পৃথিবীর অভ্যুদয়ের নিমিত্ত দুষ্মন্তনিহিত তেজধারণ করিতেছেন জানিও।

আকাশবাণীর অর্থ কি? ইহা কি যথার্থই দেবলোকে উচ্চারিতবাক্য না ইন্দ্রিয়াগোচর ঘটনার আধ্যাত্মিকজ্ঞান? এ প্রশ্নের মীমাংসা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আকাশবাণীর অর্থ যাহাই হউক, এ কথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, যে মহাপুরুষে আধ্যাত্মিকতা প্রবল তাঁহারই আকাশবাণীতে অধিকার—যাঁহার আধ্যাত্মিকতা কম তিনি দেশকাল অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়াগোচর ঘটনায় জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। কণ্ব আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিকতার গুণে দূরে থাকিয়াও দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পরিণয়ের বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। বাহ্যজগৎ মহাঋষির আত্মার অধীন—আত্মার আজ্ঞাকারী—আত্মার ক্রীড়ার পদার্থ। যখন স্বামিভবনগমনার্থ শকুন্তলা বেশবিন্যাস করিতেছেন, তখন দুইজন ঋষিকুমার তাঁহার নিমিত্ত মহামূল্য অলঙ্কার আনয়ন করিল। গৌতমী চমকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

বচ্ছ ণারঅ কুদো এদং।

বাছা, নারদ, এ সব কোথায় পাইলে?

নারদ উত্তর করিলেন—

তাতকাশ্যপপ্রভাবাৎ।

গুরুপ্রধান কাশ্যপের প্রভাবে।

তখনগৌতমী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিং মানসী সিদ্ধি।

তিনি কি তাঁহার মানসিকশক্তিদ্বারা এ সকল সৃজন করিয়াছেন?

কণ্ব মানসিকশক্তিদ্বারা সে সকল সৃজন করেন নাই বটে; কিন্তু যাহার

সম্বন্ধে এ রকম প্রশ্ন হইতে পারে তাঁহার মানসিকশক্তি যে একরকম অসীম তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাহ্যজগৎ তাঁহার অপরিসীম অনন্ত-গভীর আধ্যাত্মিকতার অন্তর্ভূত। তিনি বাহ্যজগতে না থাকিয়াও বাহ্যজগতের অধিকারী। তিনি যেন অনন্তাকাশে উঠিয়া ক্ষুদ্র পৃথিবীকে তাঁহার নখদর্পণস্থ করিয়া অসীম ব্রহ্মাণ্ডের আত্মায় লীন হইয়া রহিয়াছেন। বাহ্যজগৎ তাঁহার নখদর্পণস্থ বলিয়াই তাঁহার বাহ্যপ্রভাব এত অদ্ভুত। পৃথিবী কেমন করিয়া তাঁহার ইয়ত্তা করিবে?

কণ্ব ধীর এবং গম্ভীরস্বভাব। ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিকতা এবং চিন্তাশীলতার ফল। অন্তর্দর্শী আত্মাপ্রধান ব্যক্তি-মাত্রেই গম্ভীর হইয়া থাকে। চিন্তা-শীল ব্যক্তি ধীর। অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ অঙ্ক পাঠ করিতে করিতে কণ্বের ধীর এবং গম্ভীর স্বভাব দেখিয়া মোহিত হইতে হয়—মন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বোধ হয় যেন কোন পূজ্যতম মহাপুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি—হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় না, মনে হয় যেন তাঁহার কাছে আসিয়া উন্নতি এবং পবিত্রতালাভ করিয়াছি, অথচ তাঁহার নিকটে যাইতে ভরসা হয় না, নিকটে যাইবার অযোগ্য বলিয়া দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিয়া মন্ত্রাহতের ন্যায় থাকিতে হয়, হৃদয় আনন্দে, সম্ভ্রমে, ভক্তিরসে, প্রীতিতে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। শকুন্তলা আশ্রম হইতে যাত্রা করিয়াছেন। এক সরোবরের ধারে আসিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে বলিলেন যে, তাঁহার আর শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে আসা কর্ত্তব্য নয়। তখন কণ্ব একটি বৃক্ষ-মূলে বসিয়া মনে করিলেন যে, দুষ্মন্তকে পাঠাইবার উপযুক্ত সম্বাদ একটি স্থির করা আবশ্যক হইতেছে। এই মনে করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। বেদ, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রসকল যিনি মন্থন করিয়াছেন এবং উন্নতজ্ঞান যাঁহার প্রাণবায়ু তিনি আবার চিন্তা করিতে-ছেন যে কি রকম কথা বলিয়া পাঠাইব। ধীর এবং গভীর চিন্তাশীলব্যক্তি ভিন্ন কেহই এ রকম করে না। ইহা কণ্বের অসাধারণ চিন্তাশীলতার প্রমাণ এবং কবিকল্পিত দুষ্মন্ত-চরিত্রের মহিমার প্রতি-পোষক। চিন্তা করিয়া মহাঋষি দুষ্ম-ন্তকে এই কথা বলিতে শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বতকে উপদেশ দিলেন:—

অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযমধনানুচ্চৈঃ
কুলঞ্চাত্মন
স্ত্বয্যস্যাঃকথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিং
চ তাম্।
সামান্যপ্রতিপত্তি পূর্ব্বকমিয়ং দারেষু
দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যং বধূ-
বন্ধুভিঃ।

আমরা তপোধন, আমাদিগকে চিন্তা করিয়া, তোমার উচ্চবংশকে চিন্তা ক-রিয়া, আর স্বজনগণেরা যাহা কোন-

রূপে ঘটাইয়া দেয় নাই, শকুন্তলার সেই স্নেহপ্রবৃত্তি চিন্তা করিয়া তুমি ভার্য্যাগণের মধ্যে সমান আদরে ইহাকে দেখিবে। "ভাগ্যে থাকে ইহা অপেক্ষা অধিক হইবে, বধূবন্ধুগণের তাহা বলা উচিত হয় না।

যেমন মহাপুরুষ, কথাও তেমনি মহত্বপূর্ণ। শকুন্তলা কণ্বের প্রাণবায়ু—'কণ্বস্য কুলপতেরুচ্ছ্বসিতম্।' কিন্তু কণ্ব শকুন্তলার নিমিত্ত কি রকম সুখের কামনা করিলেন? তিনি এমন কামনা করিলেন না যে দুষ্মন্ত তাঁহাকে মহিষী-শ্রেষ্ঠ করেন এবং অন্যান্য ভার্য্যা অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। এত স্নেহের বস্তুর নিমিত্ত সেই কামনাই স্বাভাবিক এবং আর কেহ হইলে সেই কামনাই করিত। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না, কেন না সে কামনা অন্যায়, অবিচার, পক্ষপাতমূলক। শকুন্তলা তাঁহার আদরের বস্তু। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মত মহাপুরুষ শকুন্তলার সুখের অভিলাষী হইয়া অপরের ক্ষতি এবং অনিষ্টকামনা করিতে পারেন না। শকুন্তলা তাঁহার যতই স্নেহের বস্তু হউন না, তাঁহার এইমাত্র কামনা যে দুষ্মন্ত ভার্য্যাগণের মধ্যে শকুন্তলাকে সমান আদরে দেখেন। শকুন্তলার ভাগ্যে তাহার অধিক থাকে, ভাগ্যগুণে হউক, তিনি সে কামনা করিতে পারেন না। ধার্ম্মিক মহাপুরুষেরা স্বার্থপরবশ হইয়া মোহান্ধ হন না। ধর্ম্মের নামে তাঁহাদের মোহজাল অদৃশ্য হইয়া যায়। তাঁহাদের চিন্তা সকলসময়েই ন্যায়মূলক। ন্যায়ানুবর্ত্তিতা উচ্চ, পরিশুদ্ধ চিন্তার প্রধান এবং প্রকৃত লক্ষণ। সে লক্ষণ মহর্ষি কণ্বের চিন্তায় বিশেষরূপে জাজ্বল্যমান—কেন না শকুন্তলা-রূপ একটি বিষম মোহোৎপাদক বস্তু তাঁহার ন্যায়ানুবর্ত্তিতার প্রতিদ্বন্দী আছে। তাঁহার চিন্তার উচ্চতা, উদারতা এবং ন্যায়ানুবর্ত্তিতা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহাকে জ্ঞানবগুরু বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কণ্বের চিন্তার আর একটি রমণীয় উপকরণ আছে—সেটি তাঁহার শকুন্তলার প্রতি উপদেশে প্রকাশ। সে উপদেশ এই :—

সা স্বমিতঃ পতিকুলং প্রাপ্য
শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নী-
জনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং
গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যে-
ষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ
কুলস্যাধয়ঃ॥

তুমি এখান হইতে ভর্তৃকুলে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিও, সপত্নীগণের প্রতি প্রিয়সখীবৎ ব্যবহার করিও, অপমানিত হইলেও পতির প্রতিকূলচারিণী হইও না, পরিচারকদিগের প্রতি অধিক অনুকূল হইও, এবং সৌভাগ্যে

কালে গর্ব্বিত হইও না। যুবতীরা এইরূপেই গৃহিণীপদ পায়। আর যাহারা ইহার বিপরীতাচরণ করে, তাহারা পতিকুলের যাতনাস্বরূপ হইয়া থাকে।

ইহাতে এই কয়টি গুণের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—সম্ভ্রম, ঈর্ষ্যার পরিবর্ত্তে প্রেম, সহিষ্ণুতা, দয়া এবং নম্রতা। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে এই গুণগুলি থাকিলে সংসার-রূপ রঙ্গভূমির সকল স্থানেই মানুষ মানুষের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই গুণগুলি থাকিলে শুধু কুলবধূ কেন, সকল অবস্থার লোকেই জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে পারে। কণ্ব একটি কুলবধূকে যে উপদেশ দিয়াছেন সে উপদেশ সমস্ত মানবজাতির সংসারধর্ম্মের মূলমন্ত্র। লেয়াটিসকে প্রদত্ত পোলোনিয়সের উপদেশের এত সারবত্তা এবং উপযোগিতা নাই। সে উপদেশ সকলের অনুসরণীয় নয়। কিন্তু কণ্বের উপদেশের এত উৎকর্ষ কিসে হইল? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহার উৎকর্ষের প্রধান কারণ হৃদয় অথবা হৃদয়ের কাছে স্বার্থপরতার অপলাপ। গুরুজনের প্রতি সম্ভ্রম—ইহার অর্থ, আত্মগরিমার সম্পূর্ণ অপচয়। পতিকর্ত্তৃক অপমানিত হইলেও তাঁহার প্রতিকূলাচরণ না করা—ইহার অর্থ, শ্রেষ্ঠ এবং প্রিয়ব্যক্তির অনুরোধে আত্মাভিমান পরিত্যাগ করা। পরিচারকদিগের উপর অধিক অনুকূল হওয়া—ইহার অর্থ, দরিদ্র উপকারকের উপকার করা। সৌভাগ্যকালে গর্ব্বিত না হওয়া—ইহার অর্থ, অপরের সহিত তুলনায় আপনাকে বড় মনে না করা। আর সপত্নীর প্রতি প্রিয়সখীবৎ ব্যবহার করা—ইহার অর্থ যে কি চমৎকার তাহা কি বলিব! ইহার অর্থ, *Love thine enemies*—যে কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া কোটী কোটী সুসভ্য এবং উন্নতমতি মনুষ্য এখনও যিশু-খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিতেছেন! এর কাছে কি পোলোনিয়সের উপদেশ দাঁড়ায়? সে উপদেশে হৃদয় কোথায়? সে উপদেশে জগতের আত্মা কোথায়? আবার এই উপদেশ দিয়া মহাঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—

কথং বা গৌতমী মন্যতে।

এই কথায় গৌতমীই বা কি বলেন?

রমণীর কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া মহর্ষি বৃদ্ধা এবং প্রবীণা গৌতমীর মতসাপেক্ষ—গৌতমীকে আপনার অপেক্ষা যোগ্যতর উপদেষ্টা বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। ইহাও তাঁহার নম্রতার এবং ন্যায়ানুবর্ত্তিতার সুন্দর পরিচয় দিতেছে। উচ্চতা, ন্যায়ানুবর্ত্তিতা, নম্রতা, গভীরসহৃদয়তা, ধীরতা এবং সতর্কতা কণ্বের চিন্তার প্রধান লক্ষণ এবং উপকরণ।

ফলতঃ কণ্বের হৃদয় একটি আশ্চর্য্য পদার্থ। সকল বস্তু, সকল জীব, সমস্ত জগৎ তাঁহার ভক্তি স্নেহ এবং আদরের

জিনিস। শকুন্তলাকে বিদায় দিবার কালে তিনি আশ্রমের তরুলতা প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মা-
স্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন
যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা
ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনু-
জ্ঞায়তাম্॥

তরুলতার প্রতি শকুন্তলার স্নেহ এবং শুশ্রূষার উল্লেখ করিয়া মহর্ষি কণ্ব আপনার হৃদয়ের কি চমৎকারিত্বই দেখাইলেন! সে হৃদয় যথার্থই শকুন্তলার হৃদয়ের ন্যায় তরুলতাকে ভালবাসে এবং তরুলতার নিমিত্ত ভাবে। এবং সেইজন্যই মহর্ষি কণ্ব আজি তরুলতার কাছে শকুন্তলাকে বিদায় দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। তরুলতার প্রতি মহর্ষি কণ্বের হৃদয় স্নেহ এবং ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। তিনিই ত শকুন্তলাকে তরুলতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যেমন তরুলতার প্রতি তেমনি পশুপক্ষীর প্রতিও তাঁহার স্নেহ এবং মমতা। তিনি আশ্রমের সমস্ত মৃগ মৃগী এবং মৃগশাবকের ইতিহাস জানেন। যখন শকুন্তলার পশ্চাদ্ভাগ হইতে তাঁহার পুত্রসম মৃগটি তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া টানিল তখন তিনিই ত শকুন্তলাকে বলিলেন যে :—

যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টি পরিবর্দ্ধিতকো জহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে॥

বৎসে! যাহার মুখ কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে তুমি ক্ষতশোষক ইঙ্গুদীতৈলসেক করিতে, তুমি যাহাকে শ্যামাকধান্যমুষ্টি দিয়া পোষণ করিয়াছ, সেই তোমার কৃতকপুত্র মৃগ তোমার অনুসরণ করিতেছে।

এত খবর যে রাখে এবং এমন করিয়া যে পশুপক্ষীর কথা বলে, পশুপক্ষী যথার্থই তাহার হৃদয়ের বস্তু—সে যথার্থই পশুপক্ষীর পিতামাতার স্থানীয়। শকুন্তলাও তাই বলেন। তিনি সেই অনুসরণকারী মৃগটিকে এই বলিয়া ফিরাইয়া দিলেন :—

দাণিং বি মএ বিরহিঅং তুমং তাদো
চিন্তাবেস্সই।

এখন আমি আবার চলিলাম; এখন পিতাই তোমার ভাবনা ভাবিবেন।

মহর্ষি কণ্ব সমস্ত জগৎকে ভালবাসেন, সমস্ত জগৎকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার হৃদয় স্নেহের উৎস। শকুন্তলাকে বিদায় দিবার সময় তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া গিয়াছিল। শকুন্তলা যখন তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে সম্বোধন করিলেন তখন তিনি বলহীনা রমণীর ন্যায় বলিয়া ফেলিলেন :—

শমমেষ্যতি মম শোকঃ কথং নু বৎসে
ত্বয়া রচিতপূর্ব্বম্।

উটজ দ্বারি বিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ॥

বৎসে! তুমি পর্ণশালার দ্বারদেশে যে পুঁড়িধান্যের পূজোপহার দিয়াছিলে তাহাহইতে এখন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। আমি যখন তা দেখ্‌ব তখন কিরূপে আমার শোকসম্বরণ হইবে!

অটল, অনন্তপ্রসারিত, অভ্রভেদী, তুষারমণ্ডিত হিমাচল রবিকিরণস্পর্শে দরদর ধারায় গলিয়া যাইতেছে!

কণ্ব সংসারত্যাগী, বিষয়বাসনাশূন্য, পার্থিবতাপরিমুক্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মসর্ব্বস্ব, ঊর্দ্ধদর্শী। কিন্তু পৃথিবীতে না থাকিয়াও তিনি পৃথিবীময়। তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী তাঁহার পরমস্নেহ ও শ্রদ্ধার বস্তু। তিনি পৃথিবীর কিছুই চাহেন না, কিন্তু পৃথিবীর কীটাণুকীটও তাঁহার কাছে আদৃত এবং সম্মানিত। তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গাভিমুখে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পৃথিবীও তাঁহার স্বর্গের অন্তর্ভূত। তাঁহার চিন্তা ব্রহ্মসম্বন্ধ, কিন্তু জগতের সকলই তাঁহার ব্রহ্মের অন্তর্গত। তাঁহার হৃদয় ব্রহ্মলোকে, কিন্তু জগতে যা যেথানে আছে, সকলই তিনি তাঁহার ব্রহ্মলোকে দেখিতে পান। তিনি চিন্তা, কিন্তু তাঁহারই নাম হৃদয়। তিনি মোহবিজয়ী তপস্বী, কিন্তু তাঁহারই নাম মায়া। অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী! আশ্চর্য্য বৈরাগী!

কণ্ব যেমন ধীর এবং শান্তপ্রকৃতি তেমনি তেজস্বী। তাঁহার তেজের প্রমাণ—শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত, কেন না শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত তাঁহারই শিষ্য এবং প্রতিনিধি। শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বতকে আমরা কণ্বের অংশ বলিয়া বিবেচনা করি, কণ্ব হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বিবেচনা করি না। এবং সেই কারণে আমরা শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বতেরদ্বারা কণ্বকে বুঝাইতেছি। শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়া দুষ্মন্ত যখন তাঁহার সহিত শকুন্তলার পরিণয়সম্বন্ধে সন্দেহপ্রকাশ করিলেন, তখন শার্ঙ্গরব অকুতোভয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কিং কৃতকার্য্যদ্বেষাদ্ধর্ম্মং
প্রতি বিমুখতোচিতা রাজ্ঞঃ।

গান্ধর্ব্ববিবাহরূপ অনুষ্ঠিতকার্য্যের অপলাপ করিয়া ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ বিমুখতাচরণ করা কি রাজার উচিত?

... সমুদ্র ভারতসাম্রাজ্যের সম্রাট্‌কে ... কথা যে বলে সে পৃথিবীর কাহাকেও ভয় করে না, সে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, তাহার তেজ এবং মধ্যাহ্নরবির তেজ একই বস্তু। দুষ্মন্ত যখন আবার তাঁহাদের কথার প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রকাশ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন :—

মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়েণৈশ্বর্য্যমত্তেষু।

ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ব্যক্তি দিগেরই এইপ্রকার চিত্তবিকার হইয়া থাকে।

শার্ঙ্গরব ঋষিকুমার। তাঁহার ধনবল, বাহুবল, লোকবল, কোন বলই নাই। কিন্তু তাঁহার কথা শুনিলে বোধ হয় যে তিনি কোন বলই গ্রাহ্য করেন না,

পার্থিববল, পার্থিবশক্তি, পার্থিবসম্পদ, তাঁহার কাছে কিছুই নয়। তাঁহার সাহস এবং তেজ দেখিলে বোধ হয় যে তিনি রাজার প্রজা নন, রাজার রাজা। তিনি রক্তমাংস নন, তিনি ব্রহ্মতেজ। তিনি শান্তি নন, তিনি প্রজ্বলিত হুতাশন। রাজরাজেশ্বর দুষ্মন্ত যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে শকুন্তলাকে বঞ্চনা করিয়া আমার কি লাভ হইবে, তখন তিনি সক্রোধে বলিলেন :—

বিনিপাতঃ।

হস্তিনাপুরের রাজবাটীতে অসীমমহিমামণ্ডিত পুরুসভায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—'বিনিপাতঃ।' মহর্ষি কণ্ব হিমাচলের ন্যায় দরদরধারায় গলিতেও পারেন এবং বিসুবিয়সের ন্যায় ধূধূ করিয়া জ্বলিতেও পারেন! কল্পনা তাঁহাকে কেমন করিয়া আঁটিবে! চিন্তা তাঁহাকে কেমন করিয়া আয়ত্ত করিবে!

যদিও মহর্ষি কণ্বের সম্পর্কে শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত একই ব্যক্তি, কিন্তু কণ্ব হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাঁহাদের মধ্যে অতি চমৎকার প্রভেদ লক্ষিত হয়—দুইজনকে প্রকৃষ্টরূপে দুই ভিন্নব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। অভিজ্ঞান শকুন্তলে তাঁহাদের কথা অতি অল্পই আছে এবং তাঁহাদিগকে একটির অধিক কার্য্য করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যে স্বল্পপরিমিত স্থান মহাকবি তাঁহাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারই মধ্যে তাঁহাদের প্রত্যেকের পূর্ণ, পরিস্কার এবং হৃদ্বোধক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা দুইজনে একই গুরুর শিষ্য, তাঁহাদের দুই জনের জীবনপ্রণালী একই রকম; তাঁহাদের দুইজনের শিক্ষা একইপ্রকার; তাঁহাদের দুইজনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সকলই এক। কিন্তু তাঁহারা দুইজনে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপ্রকৃতির লোক। শার্ঙ্গরব কিছু বাহ্যদর্শী, শারদ্বত কিছু অন্তর্দর্শী। নির্জ্জন, নিঃশব্দ, শান্তিময় আশ্রম হইতে আসিয়া হস্তিনাপুরের জনাকীর্ণ রাজবাটী দেখিয়া তাপসদ্বয় এক নূতন ভাব অনুভব করিলেন। কিন্তু সে ভাব শার্ঙ্গরবে এক-রকম, শারদ্বতে ভিন্নরকম। শার্ঙ্গরব শারদ্বতকে বলিলেন :—

তথাপীদং শশ্বৎপরিচিত বিবিক্তেন মনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব ॥

আমরা নিরবচ্ছিন্ন নির্জ্জনেই থাকি। এই জনাকীর্ণ গৃহ অগ্নিবেষ্টিত বলিয়া বোধ হইতেছে।

কিন্তু শারদ্বত শার্ঙ্গরবকে বলিলেন :—

অভ্যক্তমিবঃ স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্।
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জ্জনমিহ সুখসঙ্গিনমবৈমি ॥

স্নাতব্যক্তি যেমন অস্নাতকে, শুচি যেরূপ অশুচিকে, জাগরিত যেমন নিদ্রিতকে এবং বিমুক্ত যেমন বদ্ধকে দেখে আমি এখানে সেইরূপ বিষয়সুখাসক্ত লোককে বুঝিতেছি।

দুইজনে একই দৃশ্য দেখিলেন, কিন্তু সে দৃশ্য একজনের মনকে এক রকমে বিচলিত করিল, আর একজনের মনকে আর এক রকমে বিচলিত করিল। সে দৃশ্য দেখিয়া শার্ঙ্গরবের এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড মনে হইল; শারদ্বতের শুচির তুলনায় অশুচি, পবিত্রতার তুলনায় অপবিত্রতা, জাগরণের তুলনায় নিদ্রা এবং মুক্তভাবের তুলনায় দাসত্বশৃঙ্খল মনে হইল। সে দৃশ্য শার্ঙ্গরবের মনে বাহ্যজগৎ প্রবল করিল, শারদ্বতের মনে অন্তর্জগৎ প্রবল করিল। সে দৃশ্য শার্ঙ্গরবে বাহ্যজগৎমূলক কল্পনাকে মাতাইয়া তুলিল; শারদ্বতে অন্তর্জগৎনিহিত চিন্তাশক্তি প্রবল করিল। শার্ঙ্গরব সে দৃশ্য জড়জগতের সাহায্যে বুঝিলেন; শারদ্বত সে দৃশ্য নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক জগতের সাহায্যে বুঝিলেন। শার্ঙ্গরব বাহ্যজগতের কবি; শারদ্বত অন্তর্জগতের কবি। শার্ঙ্গরব বাহ্যস্ফূর্ত্তি; শারদ্বত অন্তর্দৃষ্টি অথবা আধ্যাত্মিকতা। শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বতের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আমরা যতক্ষণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই, ততক্ষণই সেই প্রভেদ লক্ষিত হয়। যখন রাজপুরোহিত তাঁহাদিগকে দুষ্মন্তের সম্মুখে লইয়া গেলেন তখন শার্ঙ্গরবই দুষ্মন্তের গুণ বর্ণনা করিয়া পুরোহিতের সহিত কথা কহিলেন। যখন অভিবাদনাদি সমাপ্ত করিয়া কণ্বপ্রেরিত সম্বাদ জানাইতে হইল, তখন শার্ঙ্গরবই তাহা জানাইলেন। যখন দুষ্মন্ত শকুন্তলার সহিত পরিণয় অস্বীকার করিলেন, তখন শার্ঙ্গরবই ক্রোধপ্রজ্বলিত বিষধরের ন্যায় তাঁহার উপর বাক্যবিষবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শার্ঙ্গরব যখন উন্মত্তের ন্যায় রাজরাজেশ্বর দুষ্মন্তকে নকড়া ছকড়া করিতেছেন, তখন শারদ্বতের মনের অবস্থা কিরূপ? তাঁহার এই কথাতেই সে অবস্থার প্রকাশ :—

শার্ঙ্গরব বিরম ত্বমিদানীম্।
শকুন্তলে বক্তব্যমুক্তমস্মাভিঃ।
সোঽয়মত্রভবানেবমাহ। দীয়তামস্মৈ
প্রত্যয়প্রতিবচনম্॥

শার্ঙ্গরব, তুমি এখন থাম। শকুন্তলে, আমাদের যা বলিবার তা বলিলাম। এই মহামান্য রাজা এইরূপ কহিতেছেন। এখন যাহাতে ইহাঁর মনে প্রত্যয় হয় এমন কথা তুমি কিছু বল।

শারদ্বত এ সময়েও স্থির, গম্ভীর, অবিচলিত। তিনি যেন কোন পক্ষেই নাই। তিনি যেন উভয়পক্ষের মধ্যবর্ত্তী বিচারক! শকুন্তলার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা হইল। তাঁহার কথা শুনিয়াও দুষ্মন্তের প্রত্যয় হইল না। তিনি শকুন্তলাকে চতুরা দুশ্চারিণী বলিয়া গালি দিলেন। শার্ঙ্গরব আবার রাগিয়া উঠিয়া তাঁহার সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শারদ্বত নিস্তব্ধ —তিনি একটিও কথা কহিলেন না। অবশেষে যখন শার্ঙ্গরব পুরুসভায় দাঁড়াইয়া জ্ঞানশূন্য উন্মত্তের ন্যায় পুরু-

বংশের ‘বিনিপাত’ হইবে বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, তখন শারদ্বত এই-মাত্র বলিলেন :—

শার্ঙ্গরব কিমুত্তরেণ। অনুষ্ঠিতো গুরোঃ সন্দেশঃ। প্রতিনিবর্ত্তামহে বয়ম্। (রাজানং প্রতি।)

তদেষা ভবতঃ কান্তা ত্যজ বৈনাং
গৃহাণ বা।
উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী॥

গৌতমি গচ্ছাগ্রতঃ।

শার্ঙ্গরব, কথা কাটাকাটির আর দরকার কি? গুরুদেবের আদেশ অনুষ্ঠান করিলাম। চল আমরা ফিরিয়া যাই। (রাজার প্রতি)

এই তোমার স্ত্রী, ইহাকে এক্ষণে ত্যাগই কর বা গ্রহণই কর; স্ত্রীর প্রতি সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছেই ত।

গৌতমি, চল, আগে আগে চল।

শারদ্বত আগেও যেমন, এখনও তেমনি—স্থির, গম্ভীর, অবিচলিত। তিনি দেখিলেন যে, দুষ্মন্ত বুঝিবেন না এবং তিনি তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টাও করিলেন না। তিনি তর্ক করিবার লোক নন। তিনি কলহ করিবার লোক নন। তিনি শার্ঙ্গরবের ন্যায় তর্কও করিলেন না, কলহও করিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়তম অপেক্ষা দৃঢ়। অল্প কথায়, সরল ভাষায়, তিনি সেই সুদৃঢ় বিশ্বাস আশ্চর্য্য দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। উচ্চতম রাজসিংহাসনাপেক্ষা উচ্চতর বিচারাসন হইতে অপরাধীর অপরাধ ব্যক্ত করিয়া বিচারপতি উঠিয়া গেলেন! শার্ঙ্গরব মনে করিলে পেরিক্লিস হইতে পারেন, দিমস্থেনিস্ হইতে পারেন, সিসিরো হইতে পারেন, বর্ক হইতে পারেন মায়রাবো—ব্রিটীষ পার্লিয়ামেণ্টের ন্যায় মহাসভার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার হইতে পারেন। শারদ্বত বিচারপতি, কিন্তু তাঁহার যোগ্য বিচারাসন পৃথিবীতে নাই। তাঁহার স্থান আধ্যাত্মিক জগতে। কিন্তু শার্ঙ্গরবই বল আর শারদ্বতই বল, মহর্ষি কণ্ব সকলেরই শ্রেষ্ঠ, সকলেরই গুরু, সকলেরই অধিনায়ক। মহর্ষি কণ্বের কে ইয়ত্তা করিবে!

কিন্তু কণ্ব যেমন সেই সকল ঋষি এবং ঋষিকুমারদিগের অধিনায়ক গৌতমী তেমনি তাঁহাদের অধিনায়িকা। গৌতমীকে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বুঝাইতে পারা যায় না। এবং বোধ হয় যে বিদেশীয়েরা তাঁহাকে ভাল বুঝিতে পারেন না। ধর্ম্মনিষ্ঠা, প্রাচীনা, গম্ভীর-প্রকৃতি, মাতৃভাবযুক্তা গৌতমী—পরম পবিত্র দৃশ্য! আশ্রমে যতগুলি ঋষি-তপস্বী আছেন তিনি সকলেরই জননী-স্বরূপ—তিনি সকলকেই বাপু, বাছা, যাদু বলিয়া ডাকিয়া থাকেন এবং তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে জননীবৎ স্নেহ এবং সম্মান করেন। আবশ্যক হইলে তাঁহার কাছে আসিয়া আব্দারও করেন —যথা শকুন্তলা :—

ইমং অসংবদ্ধপ্পলাবিণিং পিঅংবদং
অজ্জাএ গোদমীএ নিবেদইস্সং।

সকলে যেমন তাঁহাকে ভালবাসে এবং সম্মান করে তিনিও তেমনি সকলকে ভালবাসেন এবং সকলের ভাবনা ভাবেন। শকুন্তলা পীড়িতা—প্রায় উত্থানশক্তিরহিত প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া তাঁহার উত্তপ্তদেহে সুশীতল প্রলেপ মাখাইয়া দিতেছেন এবং পদ্মপত্রদ্বারা বীজন করিতেছেন। ওদিকে গৌতমী তাঁহার মঙ্গলার্থ পবিত্র শান্তিজল আনিয়া তাঁহার মস্তকোপরি সিঞ্চন করিয়া সযত্নভাবে তাঁহাকে আশ্রমকুটীরে লইয়া যাইতেছেন। আশ্রম হইতে যাত্রাকালে কণ্ব যেমন শকুন্তলার নিমিত্ত দেবতাদিগের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন, গৌতমীও তেমনি শকুন্তলাকে বনদেবীদিগকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিতে বলিয়া দিলেন। কিন্তু তার পর আর বেশী কথা কহিলেন না। একে ত তিনি বেশী কথা কন না, তাহাতে আবার তখন স্বয়ং কণ্ব যা বলিবার তা বলিতেছেন। কণ্ব যেমন তাঁহার পদমর্য্যাদা বুঝেন, তিনিও তেমনি কণ্বের পদমর্য্যাদা বুঝেন। তিনি নিস্তব্ধভাবে পিতাপুত্রীর সেই হৃদয়বিদারক বিদায়দৃশ্য দেখিলেন। কণ্ব তাঁহারই হস্তে শকুন্তলাকে সমর্পণ করিয়া আশ্রমকুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলে গৌতমী একটি প্রধান চরিত্র। পুরুষচরিত্রগণের মধ্যে কণ্বের যে পদবী, স্ত্রীচরিত্রগণের মধ্যে গৌতমীর সেই পদবী। কণ্ব যেমন দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার ভিত্তিস্বরূপ, গৌতমীও সেইরূপ। গৌতমী না থাকিলে নাটকের কার্য্য চলিতে পারে না। গৌতমীকে কণ্বের অংশ বলিয়া বুঝিতে হইবে, কেন না গৌতমীর সাহায্যব্যতিরেকে কণ্ব তাঁহার নিজের সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিতে অক্ষম। এ কথার আরো একটি অর্থ আছে। শকুন্তলা রমণী। তিনি কণ্বের শাসনাধীন বটে। কিন্তু গৌতমীই তাঁহার প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী এবং অধিনায়িকা। পুরুষ রমণীকে উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু রমণী ভিন্ন রমণীকে রমণী করিতে পারে না। শকুন্তলার সম্বন্ধে গৌতমী কণ্বের একটি উৎকৃষ্ট অংশ।

এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের মেরুদণ্ড পাওয়া গেল। মহর্ষি কণ্ব সেই মেরুদণ্ড, এবং গৌতমী, শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত সেই মেরুদণ্ডের অন্তর্গত। সে মেরুদণ্ডের এক অর্থ মহর্ষি কণ্ব আর এক অর্থ ইহলোক এবং পরলোক, স্থূল এবং সূক্ষ্ম, জ্ঞান এবং মোহ, স্ত্রী এবং পুরুষ, শান্তি এবং তেজ, স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য। সেই মেরুদণ্ডের অর্থও যা পূর্ব্বপ্রস্তাববিবৃত অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থও তাই। সেই চমৎকার মেরুদণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলার সহিত মিলিত হইলেন। প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া সেই মিলনকার্য্যে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার চক্ষু-

কর্ণস্বরূপ। তাঁহাদের সাহায্যেই দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিলেন এবং শকুন্তলা দুষ্মন্তকে চিনিলেন। প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার প্রিয় সখী। এমন সখী কিন্তু কেহ কোথাও দেখে নাই। অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িতে পড়িতে বোধ হয় যে শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা, এবং অনসূয়া এই তিনটিতে একটি। তিনটি একত্রে প্রতিপালিত; তিনটির একত্রে শয়ন, ভোজন, উপবেশন; তিনটির একই কাজ; তিনটির এক চিন্তা, এক হৃদয়। তিনটি পরস্পর যে কত ভালবাসে তা বলিতে পারা যায় না। অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম হইতে শকুন্তলার আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত সে ভালবাসার যে কত প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে ভালবাসার রকম দেখিলে মোহে অভিভূত হইতে হয়—মনে হয় বুঝি স্বর্গে আসিয়া স্বর্গের সুরকন্যাদিগের ভালবাসা দেখিতেছি। শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া পরস্পরের প্রাণবায়ু, পরস্পরে পরস্পরের নিমিত্ত প্রাণপর্য্যন্ত দিতে পারেন। এমন সরল পবিত্র এবং মিষ্ট সখ্যভাব আমরা আর কোথাও দেখি নাই। কিন্তু সকল বিষয়ে এক হইয়াও তিনজনে তিনটি ব্যক্তি। শকুন্তলার এবং প্রিয়ম্বদার একই বয়স,কিন্তু বোধ হয় যেন অনসূয়ার বয়স তাঁহাদের অপেক্ষা কিছু কম। শকুন্তলা এবং প্রিয়ম্বদা যৌবনের তরঙ্গে পড়িয়াছেন; কিন্তু বোধ হয় যেন অনসূয়াকে সে তরঙ্গ এখনও ভাল রকম লাগে নাই, এখনও যেন অনসূয়া হইতে সে তরঙ্গ যৎকিঞ্চিৎ দূরে আছে। শকুন্তলা যখন তাঁহার প্রিয় বন-জ্যোৎস্নার শোভা একদৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তখন প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি, অনসূয়ে, শকুন্তলা কেন অমন করিয়া সহকারের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। অনসূয়া বলিল, আমি জানি না, তুমি আমাকে বলিয়া দেও। শকুন্তলা যখন একটি বৃক্ষের সম্মুখে একটু হেলিয়া দাঁড়াইলেন, তখন অনসূয়া কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু প্রিয়ম্বদা বলিলেন, শকুন্তলে, একটু ঐ রকম করিয়া দাঁড়াইয়া থাক। শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন। প্রিয়ম্বদা উত্তর করিলেন যে তুমি ঐরকম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাতে ঠিক্ বোধ হইতেছে যেন কেশরবৃক্ষটির একটি রমণীয় লতার সহিত পরিণয় হইয়াছে। কিন্তু এত রসের কথা শুনিয়াও অনসূয়ার মুখে কথাটি নাই। অনসূয়া কেবল তরু লতা লইয়াই ব্যস্ত। শকুন্তলা অনসূয়াকে তাঁহার বুকের বল্কল একটু আল্গা করিয়া দিতে বলিলেন। অনসূয়া কোন কথা না বলিয়া বল্কল আল্গা করিয়া দিলেন। কিন্তু প্রিয়ম্বদা বলিলেন যে, যৌবনের জোরে তোমার পয়োধর বিস্তৃত হইয়াছে তা আমাকে দোষ দিলে কি হবে। প্রিয়ম্বদা রঙ্গ করিতে ভাল বাসেন; শকুন্তলা রঙ্গ

বুঝেন, কিন্তু রঙ্গ করিতে পারেন না; অনসূয়া রঙ্গ করিতে শেখেন নাই। অনসূয়া কিছু বালিকা বালিকা রকম। যখন দুষ্মন্ত তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা তিন জনেই কিছু জড়সড় হইলেন। কিন্তু অনসূয়াই অগ্রে দুষ্মন্তের সহিত কথা কহিলেন, তাঁহার অভ্যার্থনার প্রস্তাব করিলেন, এবং প্রিয়ম্বদা ও শকুন্তলাকে তাঁহার কাছে বসিতে আহ্বান করিলেন. সকলে বসিলে পর প্রিয়ম্বদার জানিবার ইচ্ছা হইল যে অভ্যাগত ব্যক্তি কে? কিন্তু তিনি নিজে দুষ্মন্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না; অনসূয়াকে চুপি চুপি বলিলেন, এই মহাশয় ব্যক্তি কে? অমনি অনসূয়া বলিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলিয়াই অকুতোভয়ে এবং অবিচলিতভাবে দুষ্মন্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আবার যখন দুষ্মন্ত শকুন্তলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন প্রিয়ম্বদা কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু অনসূয়া আগ্রহসহকারে শকুন্তলার ইতিহাস বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ইতিহাস বলিতে বলিতে তিনি একবার লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেমন বলিতেছিলেন তেমনি বলিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার ইতিহাস শেষ হইল এবং দুষ্মন্ত শকুন্তলার সম্বন্ধে কণ্বের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন, তখন বালিকা আর কোন কথা বলিল না, তখন প্রিয়ম্বদা ঠাকুরাণী ঘটকালী করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শকুন্তলাকে লইয়া রঙ্গ করিতে লাগিলেন। তখন হইতে অনসূয়া নিস্তব্ধ। তার পর যখন সকলে আশ্রমকুটীরে যান, তখন শকুন্তলা অনসূয়াকে ডাকিয়া বলিলেন যে আমার পায় কাঁটা ফুটিয়াছে এবং বল্কল গাছের ডালে আটকাইয়া গিয়াছে। শকুন্তলার মনে কাঁটা ফুটিয়াছে, ঠাট্টার ভয়ে প্রিয়ম্বদাকে বলিতে তাঁহার সাহস হইল না, তাই সরলা বালিকাকে ডাকিয়া বলিলেন। তার পর যখন শকুন্তলা দুষ্মন্তের নিমিত্ত মৃতপ্রায়, তখন অনসূয়া প্রিয়ম্বদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উপায়ে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার সত্বর এবং গোপনীয় ভাবে মিলন হইতে পারে। প্রিয়ম্বদা বলিলেন যে কি রকমে গোপনীয়ভাবে মিলন হয় ইহাই বিবেচ্য বিষয়, সত্বর মিলনের বিষয়ে কোন ভাবনা নাই। অনসূয়া যেন চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কেমন কথা? তখন প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে বুঝাইয়া দিলেন যে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন দুষ্মন্তের হাব ভাবে বুঝা গিয়াছিল তিনি শকুন্তলার প্রতি বিশেষ অনুরাগী। বালিকা অনসূয়া এত বুঝে না। এখন সব বুঝিল, কিন্তু বুঝিয়াও মিলনের কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। প্রিয়ম্বদাঠাকুরাণী মদনলেখ্যের প্রস্তাব করিলেন। অনসূয়া সরলা বালিকা, প্রিয়ম্বদা পাকা ঘটকী।

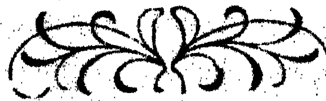
তার পর যখন দুষ্মন্ত উপস্থিত হইলেন তখন অনসূয়া তাঁহাকে বসিতে আহ্বান করিলেন, কিন্তু কাজের কথা প্রিয়ম্বদাঠাকুরাণী কহিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে নির্জ্জনে রাখিয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ হইল তখন প্রিয়ম্বদাঠাকুরাণীই একটা ছল করিয়া অনসূয়াকে লইয়া চলিয়া গেলেন। অনসূয়াটি ফুলের কুঁড়ি—এখনও ফুটে নাই, কিন্তু ফোটে ফোটে। শকুন্তলা-ফুলটি ফুটিয়াছে—কিন্তু নববিকসিতপদ্মের ন্যায় সে ফুলের প্রায় সমস্ত গৌরব পাপ্‌ড়ি ঢাকা। প্রিয়ম্বদাঠাকুরাণী গোলাবফুল—কুঁড়ি ফুটিয়াছেমাত্র, কিন্তু তাইতেই চারিদিকে সুগন্ধ ছড়াইতেছেন। অনসূয়ার কিছু ভারি রকম প্রকৃতি—কিন্তু তাঁহার তুলনা আছে। প্রিয়ম্বদা হাস্যময়ী চপলা—তাঁহারও তুলনা আছে কিন্তু শকুন্তলার তুলনা নাই—তিনি নারীপ্রকৃতির প্রতিমা অথচ একটি ভুবনমোহিনী রমণী।

পূর্ব্বপ্রস্তাবে দেখিয়াছি যে অভিজ্ঞান শকুন্তলের অভিপ্রায়—জড়জগৎ এবং অন্তর্জগতের সম্বন্ধপ্রকাশ। অভিজ্ঞান শকুন্তলে জড়জগতের শক্তি এবং অন্তর্জগতের শক্তি এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব চিত্রিত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত অভিজ্ঞানশকুন্তলের উপন্যাসের দুইটি ভাগ আছে। একভাগে জড়জগতের চিত্র অর্থাৎ দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার ঐন্দ্রিক মিলনের কথা,—প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া এই ভাগের প্রধান চরিত্র, কেন না, তাঁহাদের সাহায্যেই ঐ মিলন ঘটিল। আর একভাগে অন্তর্জগতের চিত্র অর্থাৎ দুষ্মন্তের মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক শক্তির কথা,—বৃদ্ধ কঞ্চুকী, বেত্রবতী, মাতলি এবং অন্তরীক্ষস্থিত স্বয়ং ইন্দ্রদেব এই ভাগের প্রধান চরিত্র, কেন না তাঁহাদের দ্বারাই দুষ্মন্তের মানসিকশক্তি বিজ্ঞাপিত। দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলার স্মৃতিলাভ করিয়া শকুন্তলার মোহে অচেতনপ্রায় তখন ইন্দ্রদেব তাঁহাকে দেবশত্রুদমনার্থ আহ্বান করিয়া তাঁহার মানসিকশক্তির চমৎকার পরিচয় দেওয়াইলেন। কিন্তু ইন্দ্রদেব অন্তরীক্ষস্থিত। মহাকবি তাঁহাকে রঙ্গভূমিতে আনয়ন করেন নাই। ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য হিন্দুমাত্রেই বুঝেন। মহাকবি তাঁহাকে অন্তরীক্ষে রাখিয়া দুষ্মন্তের বীরত্বের চিত্র বেশী জাজ্জ্বল্যমান এবং হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। মাতলি ইন্দ্রের সারথি। সারথির কার্য্যে মাতলি অদ্বিতীয়। সপ্তমাঙ্কে বর্ণিত রথযাত্রা মাতলির সারথিত্বের অপূর্ব্ব পরিচয়। বেত্রবতী প্রভৃতি রাজভক্তি এবং রাজকার্য্যানুরাগের চমৎকার দৃষ্টান্ত। বৃদ্ধ কঞ্চুকী বড়ই মনোহর চরিত্র। তিনি রাজসেবায় বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার কথা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন একটি অশীতিবর্ষীয় অমায়িক এবংগম্ভীর প্রকৃতি বৃদ্ধবর যষ্টির উপর ভর দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার

মুখে দুষ্মন্তের প্রশংসা ধরে না, কেন না দুষ্মন্ত যেমন নামেও রাজরাজেশ্বর, কাযেও তেমনি রাজরাজেশ্বর।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের উপন্যাসের আরও একটি অংশ আছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলে অন্তর্জগতের এবং জড়জগতের যুদ্ধে জড়জগৎ জয়ী হইয়াছিল। বীরপ্রধান দুষ্মন্তের রিপুর শাসনে পদস্খলন হইয়াছিল। ধর্ম্মবীর দুষ্মন্ত রিপুর শাসনে ক্ষণকালের জন্য ধর্ম্মরূপ কণ্বকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শকুন্তলাকে বিবাহ করিতে গিয়া দুষ্মন্ত তাঁহার নিজের এবং শকুন্তলার মেরুদণ্ড ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার মহাপাপ হইল। নৈতিক নিয়ম অথবা Law তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। নিয়ম অথবা Law অতি কঠোর পদার্থ। সেই কঠোরতা দুর্ব্বাসায় প্রতিফলিত। পাঠক এইখানে মনে রাখিবেন যে দুর্ব্বাসা শুধু নিজের নাম করিয়া শাপ দেন নাই, সামাজিকনিয়মের নাম করিয়াও শাপ দিয়াছিলেন। নিয়ম যেমন দেখিতে পাওয়া যায় না, দুর্ব্বাসাও তেমনি আমাদের চক্ষের অগোচর—তিনি সকলের অন্তরালে দাঁড়াইয়া শাপ দিয়া গেলেন। প্রিয়ম্বদা ছুটিয়া গিয়া শকুন্তলাকে শাপমুক্ত করাইবার জন্য তাঁহাকে কত অনুনয় করিলেন। কিন্তু নিয়ম যেমন নির্দ্দয় তিনিও তেমনি নির্দ্দয়। তিনি কোন কথা শুনিলেন না, তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল না। তিনি কেবল এই কথা বলিয়া গেলেন যে, অভিজ্ঞানাভরণ দর্শন করাইলে শাপের নিবৃত্তি হইবে। কিন্তু শকুন্তলা সে অভিজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। তিনি সে অভিজ্ঞান দেখাইতে পারিলেন না। তখন অদৃষ্ট আসিয়া তাঁহাকে এবং দুষ্মন্তকে অনন্তযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিল। মনুষ্যের সুখ দুঃখ শুধু নিয়মাধীন নয়; অদৃষ্ট (chance) অথবা দৈবও তাহার একটি প্রধান কারণ। কি পাপী কি পুণ্যবান্ অদৃষ্ট সকলেরই সহায়তা করে, তাহাতে আবার দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা মহাভ্রমে পড়িয়াও পবিত্রচিত্ত। মহাকবি রাজযোটক পাইলেন। অদৃষ্ট দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার সহায় হইল। এবং অদৃষ্ট সহায় হইয়া তাঁহাদের পতিপত্নীসম্বন্ধ সমস্ত পৃথিবীকে প্রমাণ করিয়া দিল। অঙ্গুরীয় পুনঃপ্রাপ্তির বিবরণ শুনিয়া সকলেই বুঝিল যে শকুন্তলা দুষ্মন্তের পরিণীতা ভার্য্যা। এখন আবশ্যক হইলে সমস্ত সমাজ তাঁহাদের পরিণয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রদান করিতে সক্ষম। হৃদয়ের অভিজ্ঞান সামাজিক অভিজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইল। উপেক্ষিত নিয়ম বিজয়ী হইল। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাও পুনর্ম্মিলিত হইলেন। অদৃষ্ট নিয়মের পোষকতা করিল। অভিজ্ঞানশকুন্তলে অদৃষ্টের অর্থ—ধীবর, রাজশ্যালক, প্রহরিদ্বয়, ইত্যাদি। এই কয়জনের চিত্র অতি চমৎকার। কি কথাবার্ত্তায় প্রণা

নীতে, কি স্বভাব-চরিত্রে, ধীবর যথার্থই ধীবর, প্রহরিদ্বয় যথার্থই প্রহরিদ্বয়, রাজশ্যালক যথার্থই শ্যালকরাজ—বেশ মজার মানুষ। লোকে বলিয়া থাকে যে সেক্ষপীয়র কি উচ্চ কি নীচ, কি গম্ভীর কি হাল্কা, সকল রকম চরিত্র আঁকিতে সুনিপুণ। অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িলে, মহাকবি কালিদাসের সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে পারা যায়। কণ্ব, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, কঞ্চুকী, দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, রাজশ্যালক, ধীবর, প্রহরী—এই কয়খানি চিত্র পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে মনুষ্য-চরিত্রের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত সমস্তই কালিদাসের আয়ত্তাধীন। আবার যখন শকুন্তলার পুত্র সর্ব্বদমনকে দেখা যায়, তখন ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে মহাকবি নবপ্রসূতশিশুসন্তান হইতে মুমূর্ষুবৎ বৃদ্ধবর পর্য্যন্ত সকলেরই আত্মা দিব্যচক্ষে দেখিতে পান।



পালামৌ।

বহুকাল হইল আমি একবার পালামৌ প্রদেশে গিয়াছিলাম, প্রত্যাগমন করিলে পর সেই অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিবার নিমিত্ত দুই একজন বন্ধুবান্ধব আমাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেন, আমি তখন তাঁহাদের উপহাস করিতাম। এক্ষণে আমায় কেহ অনুরোধ করে না, অথচ আমি সেই বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। তাৎপর্য্য বয়স। গল্প করা এ বয়সের রোগ, কেহ শুনুন বা না শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।

অনেকদিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্ব্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি এমত নহে। পূর্ব্বে সেই সকল নির্জ্জন পর্ব্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে চক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন পর্ব্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়। অতএব যাঁহারা বয়োগুণে কেবল শোভা সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ভাল-বাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না।

যখন পালামৌ আমার যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন জানি না যে সেস্থান কোন্ দিকে, কতদূরে। অতএব ম্যাপ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম। হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হইবে এই বিবেচনায় ইন্‌লাণ্ড ট্রান্সিট কোম্পানীর

(Inland Transit Company) ডাকগাড়ী ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড়প্রহরের সময় রাণীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্ব্বপারে গাড়ী থামিল। নদী অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, গাড়ি ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়ওয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

পূর্ব্বপার হইতে দেখিলাম যে, অপর পারে ঘাটের উপরেই একজন সাহেব বাঙ্গালায় বসিয়া পাইপ টানিতেছেন, সম্মুখে একজন চাপরাসী একরূপ গৈরিক মৃত্তিকা হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি পারার্থ সেই ঘাটে আসিতেছে চাপরাসি তাহার বাহুতে সেই মৃত্তিকাদ্বারা কি অঙ্কপাত করিতেছে। পারার্থীর মধ্যে বন্য লোকই অধিক, তাহাদের যুবতীরা মৃত্তিকারঞ্জিত আপন আপন বাহুর প্রতি আড়নয়নে চাহিতেছে আর হাসিতেছে, আবার অন্যের অঙ্গে সেই অঙ্কপাত কিরূপ দেখাইতেছে তাহাও এক একবার দেখিতেছে। শেষে যুবতীরা হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া নদীতে নামিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটীতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া কূলের উপর উঠিতেছে।

আমি অন্যমনস্কে এই রঙ্গ দেখিতেছি এমত সময় কুলিদের কতকগুলি বালক বালিকা আসিয়া আমার গাড়ী ঘেরিল। "সাহেব একটি পয়সা" "সাহেব একটি পয়সা।" এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ধুতি চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙ্গালি বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম, "আমি সাহেব নহি।" একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাগ্র অঙ্গুরীবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নথ নিমজ্জন করিয়া বলিল, "হাঁ, তুমি সাহেব।" আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কি?" আমি বলিলাম, "আমি বাঙ্গালি।" সে বিশ্বাস করিল না, বলিল, "না, তুমি সাহেব।" তাহারা মনে করিয়া থাকিবে, যে, যে গাড়ী চড়ে, সে অবশ্য সাহেব।

এই সময় একটি দুইবৎসরবয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল। এই সময় আমার গাড়ী অপর পারে গিয়া উঠিল।

বরাকর হইতে দুই একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়, অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? বাল্য

কালে পাহাড় পর্ব্বতের পরিচয় অনেক শুনা ছিল, বিশেষতঃ একবার এক বৈরাগীর আখড়ায় চূণকাম করা এক গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়া পাহাড়ের আকার অনুভব করিয়া লইয়াছিলাম। কৃষক-কন্যারা শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করিয়া যে স্তূপ করে, বৈরাগীর গোবর্দ্ধন তাহা অপেক্ষা কিছু বড়। তাহার স্থানে স্থানে চারি পাঁচখানি ইষ্টক গাঁথিয়া এক একটি চূড়া করা হইয়াছে। আবার সর্ব্বোচ্চ চূড়ার পার্শ্বে এক সর্পফণা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা হরিত, পীত,নানাবর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে, পাছে সর্পের প্রতি লোকের দৃষ্টি না পড়ে এই জন্য ফণাটী কিছু বড় করিতে হইয়াছে। কাজেই পর্ব্বতের চূড়া অপেক্ষা ফণাটি বড় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মিস্ত্রির গুণ নহে, বৈরাগীরও দোষ নহে। সর্পটী কালীয়দমনের কালীয়; কাজেই যে পর্ব্বতের উপর কালীয় উঠিয়াছে, সে পর্ব্বতের চূড়া অপেক্ষা তাহার ফণা যে কিছু বৃহৎ হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? বৈরাগীর এই গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়া বাল্যকালেই পর্ব্বতের অনুভব হইয়াছিল। বরাকরের নিকটস্থ পাহাড়গুলি দেখিয়া আমার সেই বাল্যসংস্কারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল।

অপরাহ্নে দেখিলাম, একটি সুন্দর পর্ব্বতের নিকট দিয়া গাড়ী যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে, যে পর্ব্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়ওয়ান্‌কে গাড়ী থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়ওয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইবেন?" আমি বলিলাম, "একবার এই পর্ব্বতে যাইব।" সে হাসিয়া বলিল, "পাহাড় এখান হইতে অধিক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন না।" আমি এ কথা কোনরূপে বিশ্বাস করিলাম না, আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথা যাইতে আমার পাঁচমিনিটও লাগিবে না, অতএব গাড়ওয়ানের নিষেধ না শুনিয়া আমি পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থলে ১৫ মিনিটকাল দ্রুতপাদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্ব্বত পূর্ব্বমত সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। পর্ব্বতসম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙ্গালির পক্ষে বড় কঠিন ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া আমি পুনঃপুনঃ পাইয়াছিলাম।

পরদিবস প্রায় দুইপ্রহরের সময় হাজারিবাগ পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস আহার হয় নাই, অতএব আহারসম্বন্ধীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। যিনি আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি আমার আগমনবার্ত্তা কিরূপে জানি-

লেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর সাবকাশ হইল না, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাটীতে গাড়ী লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম। যাঁহার বাটীতে যাই-তেছি, তাঁহার সহিত আমার কখন চাক্ষুষ হয় নাই। তাঁহার নাম শুনিয়াছি, সুখ্যা-তিও যথেষ্ট শুনিয়াছি; সজ্জন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা সকলেই করে। কিন্তু সে প্রশংসায় কর্ণপাত বড় করি নাই, কেন না বঙ্গবাসীমাত্রই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শুনা যায়, তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রী-কাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ, বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে ভাল কাপড়, ভাল জুতা পরায়, কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদা-ইবার জন্য। তাহারা আপনাদের পুত্র-বধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়, কেবল আমাদের পুত্রবধূর মুখভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ, প্রতিবাসীরা! যাহা-দের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসি-পরিত্যাগী গৃহী। ঋ-ষির আশ্রমপার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিনদিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যা-ইবে। প্রথম দিন প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে, দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গোরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙ্গিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষিপত্নীকে অলঙ্কার দেখা-ইবে। তাহার পরই ঋষিকে ওকালতির পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটীর দরখাস্ত করিতে হইবে।

এক্ষণে সে সকল কথা যাক্। যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার উদ্যানে গাড়ী প্রবেশ করিলে তাহা কোন ধনবান্ ইংরেজের হইবে বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম হইল। পরক্ষণেই সে ভ্রম গেল। বারাণ্ডায় শুটিকত বাঙ্গালি বসিয়া আমার গাড়ী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া গাড়ী থামিলে আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্র-সর হইলেন। না চিনিয়া যাঁহার অভি-বাদন আমি সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই বাটীর কর্ত্তা। তিনি শত লোক-সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধ হয় সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা, অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ,

কাজেই প্রায় বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। একজন মহানুভব বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি।

প্রথম সম্ভাষণ সমাপন হইলে পর স্নানাদি করিতে যাওয়া গেল। স্নান গোছলখানায় ইংরেজি মতেই হইল, কিন্তু আহার ঠিক হিন্দুমতে হয় নাই, কেন না তাহাতে পলাণ্ডুর আধিক্য ছিল। পলাণ্ডু হিন্দুধর্ম্মের বড় বিরোধী। তদ্ভিন্ন আহারের আর কোন দোষ ছিল না, সঘৃত আতপান্ন, আর দেবীদুর্ল্ভ ছাগমাংস, এই দুইই নির্দ্দোষী।

পাকসম্বন্ধে পলাণ্ডুর উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু পিঁয়াজ উল্লেখ করাই আমার ইচ্ছা ছিল। পিঁয়াজ যাবনিক শব্দ এই ভয়ে পলাণ্ডুর উল্লেখ করিয়া সাধুগণের মুখ পবিত্র রাখিয়াছি; কিন্তু পিঁয়াজ পলাণ্ড এক দ্রব্য কি না এ বিষয়ে আমার বহুকালাবধি সংশয় আছে। একবার পাঞ্জাব অঞ্চলের একজন বৃদ্ধরাজা জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইবার সময় মেদিনীপুরে দুই একদিন অবস্থিতি করেন। নগরের ভদ্রলোকেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিলে, তিনি কি প্রধান, কি সামান্য সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানাপ্রকার আলাপ করিতেছিলেন, এমত সময় তাঁহাদের মধ্যে একজন যোড়হস্তে বলিলেন, "আমরা শুনিয়াছিলাম যে, মহারাজ হিন্দুচূড়ামণি, কিন্তু আসিবার সময় আপনার পাকশালার সম্মুখে পলাণ্ডু দেখিয়া আসিয়াছি।" বিস্ময়াপন্ন রাজা "পলাণ্ডু!" এই শব্দ বারবার উচ্চারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তদারকের নিমিত্ত স্বয়ং উঠিলেন, নগরস্থ ভদ্রলোকেরাও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। রাজা পাকশালার সম্মুখে দাঁড়াইলে, একজন বাঙ্গালি পিঁয়াজের স্তূপ দেখাইয়া দিল। রাজা তখন হাসিয়া বলিলেন, "ইহা পলাণ্ডু নহে; ইহাকে পিঁয়াজ বলে। পলাণ্ডু অতি বিষাক্ত সামগ্রী, তাহা কেবল ঔষধে ব্যবহার হয়। সকল দেশে তাহা জন্মে না; যে মাঠে জন্মে সে মাঠের বায়ু দূষিত হইয়া যায়, এই ভয়ে সে মাঠ দিয়া কেহ যাতায়াত করে না। সে মাঠে আর কোন ফসল হয় না।"

রাজার এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অনেকে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। পলাণ্ডু আর পিঁয়াজ এক সামগ্রী কি না তাহা পশ্চিমপ্রদেশে অনুসন্ধান হইতে পারে, বিশেষতঃ যে সকল বঙ্গবাসীরা সিন্ধুদেশঅঞ্চলে আছেন বোধ হয় তাঁহারা অনায়াসেই এই কথার মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন।

আহারান্তে বিশ্রামগৃহে বসিয়া বালকদিগের সহিত গল্প করিতে করিতে বালকদের শয়নঘর দেখিতে উঠিয়া গেলাম। ঘরটি বিলক্ষণ পরিসর, তাহার

চারি কোণে চারিখানি খাট পাতা, মধ্যস্থলে আর একখানি খাট রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় বালকেরা বলিল, "চারি কোণে আমরা চারিজন শয়ন করি, আর মধ্যস্থলে মাষ্টরমহাশয় থাকেন।" এই বন্দোবস্ত দেখিয়া বড় পরিতৃপ্ত হইলাম। দিবারাত্র বালকদের কাছে শিক্ষক থাকার আবশ্যকতা অনেকে বুঝেন না।

বালকদের শয়নঘর হইতে বহির্গত হইয়া আর একঘরে দেখি এক কাঁদি সুপক্ক মর্ত্তমানরম্ভা দোদুল্যমান রহিয়াছে, তাহাতে একখানি কাগজ ঝুলিতেছে, পড়িয়া দেখিলাম, নিত্য যত কদলী কাঁদি হইতে ব্যয় হয়, তাহাই তাহাতে লিখিত হইয়া থাকে। লোকে সচরাচর ইহাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টি, ছোটনজর ইত্যাদি বলে; কিন্তু আমি তাহা কোনরূপে ভাবিতে পারিলাম না। যেরূপ অন্যান্য বিষয়ের বন্দোবস্ত দেখিলাম, তাহাতে "কলাকাঁদির হিসাব" দেখিয়া বরং আরও চমৎকৃত হইলাম। যাহাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র তাহারা কেবল সামান্য বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, অন্য বিষয় দেখিতে পায় না। তাহারা যথার্থই নীচ। কিন্তু আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, দেখিলাম তাঁহার নিকট বৃহৎ সূক্ষ্ম সকলই সমভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে আছেন, বড় বড় বিষয় মোটামুটি দেখিতে পারেন, কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি একেবারে পড়ে না। তাঁহাদের প্রশংসা করি না। যাঁহারা বৃহৎ সূক্ষ্ম একত্র দেখিয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদেরই প্রশংসা করি। কিন্তু এরূপ লোক অতি অল্প।

"কলাকাঁদির ফর্দ্দ" সম্বন্ধে বালকদের সহিত কথা কহিতে কহিতে জানিলাম যে, একদিন একজন চাকর লোভসম্বরণ করিতে না পারিয়া দুইটি সুপক্ক রম্ভা উদরস্থ করিয়াছিল, গৃহস্থের সকল বিষয়েই দৃষ্টি আছে, সকল বিষয়েরই হিসাব থাকে, কাজেই চুরি ধরা পড়িল। তখন তিনি চাকরকে ডাকিয়া চুরির জন্য জরিমানা করিলেন। পরে তাহার লোভ পরিতৃপ্তি করিবার নিমিত্ত যত ইচ্ছা কাঁদি হইতে রম্ভা খাইতে অনুমতি করিলেন। চাকর উদর ভরিয়া রম্ভা খাইল।

অপরাহ্নে আমি উদ্যানে পদচারণ করিতেছি, এমত সময় গৃহস্থ "কাছারী" হইতে প্রত্যাগত হইলেন। পরে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাগান, পুষ্করিণী, সমুদয় দেখাইতে লাগিলেন। যেস্থান হইতে যে বৃক্ষটি আনাইয়াছেন, তাহারও পরিচয় দিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নকালে "কলাকাঁদি" সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহা তখনও আমার মনে পুনঃপুনঃ আলোচিত হইতেছিল; কাজেই আমি কদলীবৃক্ষের প্রসঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আমার ধারণা ছিল এ অঞ্চলে রম্ভা জন্মে না; কিন্তু আপনার

বাগানে যথেষ্ট দেখিতেছি।" তিনি উত্তর করিলেন, "এখানে বাজারে কলা পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে কাহার বাটীতেও পাওয়া যাইত না, লোকের সংস্কার ছিল যে, এই প্রস্তরময় মৃত্তিকায় কলারগাছ রস পায় না, শুকাইয়া যায়। আমি তাহা বিশ্বাস না করিয়া, দেশ হইতে 'তেড়' আনিয়া পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে আমার নিকট হইতে 'তেড়' লইয়া সকল সাহেবই বাগানে লাগাইয়াছেন। এখন আর এখানে কদলীর অভাব নাই।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আমরা উদ্যানের এক প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় দুইটি স্বতন্ত্র ঘর দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করায় গৃহস্থ বলিলেন, "উহার একটিতে আমার নাপিত থাকে, অপরটিতে আমার ধোপা থাকে। উহারা সম্পূর্ণ আমার বেতনভোগী চাকর নহে, তবে উভয়কে আমার বাটীতে স্থান দিয়া একপ্রকারে আবদ্ধ করিয়াছি, এখন যখনই আবশ্যক হয়, তখনই তাহাদের পাই। ধোপা, নাপিতের কষ্ট পূর্ব্বে আর কোন উপায়ে নিবারণ করিতে পারি নাই।"

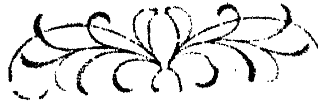
সন্ধ্যার পর দেখিলাম, শিক্ষকসম্মুখে বালকেরা যে টেবিলে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে তথায় একত্র একস্থানে তিনটি সেজ জ্বলিতেছে। অন্য লোকে যাঁহারা কদলীর হিসাব রাখেন না, তাঁহারা বালকদের নিমিত্ত একটি সেজ দিয়া নিশ্চিন্ত হন, আর যিনি কদলীর হিসাব রাখেন, তিনি এই অতিরিক্ত ব্যয় কেন স্বীকার করিতেছেন জানিবার নিমিত্ত আমার কৌতূহল জন্মিল। শেষ আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "ইহা অপব্যয় নহে, অল্প আলোকে অধ্যয়ন করিলে বালকদের চক্ষু দুর্ব্বল হইবার সম্ভাবনা; যথেষ্ট আলোকে অধ্যয়ন করিলে চল্লিসের বহু পরে 'চাল্‌সা' ধরে।"

উচ্চপদস্থ সাহেবেরা সর্ব্বদাই তাঁহার বাটীতে আসিতেন, এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় পরমাপ্যায়িত হইতেন। বাঙ্গালিরা ছোট বড় সকলেই তাঁহার সৌজন্যে বাধ্য ছিলেন, যে কুঠীতে তিনি বাস করিতেন, সেরূপ কুঠী সাহেবদেরও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; কুঠীটী যেরূপ পরিষ্কৃত ও সুসজ্জীভূত ছিল, তাহা দেখিলে যথার্থই সুখ হয়, মনও পবিত্র হয়। মনের উপর বাসস্থানের আধিপত্য বিলক্ষণ আছে। যাহারা অপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ঘরে বাস করে, প্রায় দেখা যায় তাহাদের মন সেইরূপ অপরিষ্কৃত ও ক্ষুদ্র। যিনি বিশ্বাস না করেন তিনি বলিতে পারেন, যে যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে প্রায় অধিকাংশ বাঙ্গালির মন ক্ষুদ্র ও অপরিষ্কৃত হইত। আমরা একথা লইয়া কোন তর্ক করিব না, আমরা যেমন দেখিতে পাই সেই মত লিখিয়াছি। যাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছি তাঁহার

মন "কুঠীর" উপযোগী ছিল। সেরূপ কুঠীর ভাড়ায় যে ব্যক্তি বহু অর্থ ব্যয় করে সে ব্যক্তি যদি কদলীর হিসাব রাখে তাহা হইলে কি বুঝা কর্ত্তব্য?

রাত্রি দেড়প্রহরের সময় বাহকস্কন্ধে আমি ছোটনাগপুর যাত্রা করিলাম। তথা হইতে পালামৌ দুই চারি দিনের মধ্যে পৌঁছিলাম। পথের পরিচয় আর দিব না, এই কয়েক ছত্র লিখিয়া অনেককে জ্বালাতন করিয়াছি, আর বিরক্ত করিব না, এবার ইচ্ছা রহিল মূল বিবরণ ভিন্ন অন্য কথা বলিব না, তবে যদি দুই একটি অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলি তাহা হইলে বয়সের দোষ বুঝিতে হইবে। *

প্র, না, ব।



বাঙ্গালির উৎপত্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেকে বাঙ্গালির উৎপত্তি কি? এই প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইতে পারেন। অনেকের ধারণা আছে যে, বাঙ্গালায় চিরকাল বাঙ্গালি আছে, তাহাদিগের উৎপত্তি আবার খুঁজিয়া কি হইবে? তাঁহাদিগের অপেক্ষা শিক্ষায় যাঁহারা একটু উন্নত, তাঁহারা বিবেচনা করেন, বাঙ্গালির উৎপত্তি ত জানাই আছে; আমরা প্রাচীন হিন্দুগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। যে জাতি বেদপাঠ করিত, সংস্কৃতভাষায় কথা কহিত, যে জাতি মহাভারত ও রামায়ণ, পুরাণ ও দর্শন, পাণিনির ব্যাকরণ, কালিদাসের কাব্য, মনুর স্মৃতি, ও শাক্যসিংহের ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছিল আমরা সেই জাতির সন্তান; এ কথা ত জানাই আছে। তবে আবার বাঙ্গালির উৎপত্তি খুঁজিয়া কি হইবে?

এ কথা সত্য, কিন্তু বড় পরিষ্কার নহে। লোকসংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে, যাহাদিগকে বাঙ্গালি বলা যায়, যাহারা বাঙ্গালাদেশে বাস করে, বাঙ্গালাভাষায় কথা কয়, তাহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক মুসলমান। ইহারা বাঙ্গালি বটে, কিন্তু ইহারাও কি সেই প্রাচীন বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী জাতির সন্ততি? হাড়ি, কাওরা, ডোম ও মুচি; কৈবর্ত্ত, জেলে, কোঁচ, পলি ইহারাও কি তাঁহাদিগের সন্ততি? তাহা যদি নিশ্চিত না হয় তবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থে বাঙ্গালা পরিপূর্ণ

নহে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙ্গালির অতি অল্প-ভাগ। বাঙ্গালির মধ্যে যাহারা সংখ্যায় প্রবল, তাহাদিগেরই উৎপত্তিতত্ত্ব অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

যে প্রাচীন হিন্দুজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমরা মনে মনে স্পর্দ্ধা করি, তাঁহারা বেদে আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখন ত অনেকদিনের পর ইউরোপ হইতে আর্য্যশব্দ আসিয়া আবার ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা আর্য্য ছিলেন; অথবা তাঁহাদিগের সন্তান। এজন্য আমরা আর্য্যবংশ। কিন্তু এই আর্য্যশব্দ আর বেদের আর্য্যশব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদিকঋষিরা বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটী আর্য্যবর্ণ। এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবং তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া ভারতীয় আধুনিকেরাও বলিয়া থাকেন, ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মান, রুষ, যবন, পারসিক, রোমক, হিন্দু, সকলই আর্য্য। আবার ভারতবর্ষের সকল অধিবাসী এ নামের অধিকারী হয় না; হিন্দুরা আর্য্য বলিয়া খ্যাত, কিন্তু কোল, ভীল, সাঁওতাল আর্য্য নহে। তবে আর্য্যশব্দের অর্থ কি?

এই প্রভেদের কারণ কি? কতকগুলি দেশীয় লোক আর্য্যবংশীয়, কতকগুলি অনার্য্যবংশীয় এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি? আর্য্য কাহারা,—কোথা হইতেই বা আসিল? অনার্য্য কাহারা কোথা হইতেই বা আসিল? একদেশে দুইপ্রকার মনুষ্যবংশ কেন? আর্য্যের দেশে অনার্য্য আসিয়া বাস করিয়াছে, না অনার্য্যের দেশে আর্য্য আসিয়া বাস করিয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসের এই প্রথম কথা।

ইহার মীমাংসাজন্য ভাষাবিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অতএব ভাষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা এইখানে আবশ্যক হইল।

ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা ঈশ্বরপ্রদত্ত। সকলই ত ঈশ্বরপ্রদত্ত। ঈশ্বর বৃক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু গাছ গড়িয়া কাহারও বাগানে পুঁতিয়া দিয়া যান না। তেমনি তিনিই ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু তিনি যে ভাষাগুলি তৈয়ারি করিয়া, বিভক্তি, লিঙ্গ, কারকাদিবিশিষ্ট করিয়া, দেশে দেশে মনুষ্যকে শিখাইয়া বেড়ান নাই, ইহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। দ্বিতীয় মত এই যে মনুষ্যগণ সমবেত হইয়া পরামর্শ করিয়া ভাষাসৃষ্টি করিয়াছে। এ মত গ্রহণ করিতে হইলে অনুমান করিতে হয়, যে দশজন একত্র বসিয়া, যুক্তি করিয়াছে, যে এসো আমরা ফুলফলযুক্ত পদার্থগুলিকে বৃক্ষ বলিতে আরম্ভ করি, যাহারা উড়িয়া যায়, তাহাদের পাখী বলিতে আরম্ভ করি। এরূপ যুক্তির জন্য ভাষার প্রয়োজন, এমতে ভাষা না থাকিলে ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে

না। সুতরাং এ মতও অবৈজ্ঞানিক ও অগ্রাহ্য। তৃতীয় মত এই যে, ভাষা অনুকৃতিমূলক। এই মতই এখন প্রচলিত। প্রাকৃতিক বস্তুসকল শব্দ করে। নদী কলকল করে, মেঘ গরগর করে, সিংহ হুঙ্কার করে, সর্প ফোঁস ফোঁস করে। আমরাও যে সকল কাজ করি তাহারও শব্দ আছে। বাঙ্গালি "সপ, সপ" করিয়া খায়; "গপ গপ" করিয়া গেলে; "হন হন" করিয়া চলিয়া যায়, "দুপ দাপ" করিয়া লাফায়। এইরূপ নৈসর্গিক শব্দানুকৃতিই ভাষার প্রথম সূত্র। গাছের ডাল প্রভৃতি ভাঙ্গার শব্দ হইতে "মৃ"; মন্দগমনের সময়ে ঘর্ষণজনিত শব্দ হইতে "স্র" নিশ্বাসের শব্দ হইতে "অস্।" সত্য বটে, অনেক সামগ্রী আছে, যে তাহার কোন শব্দ নাই; কিন্তু সে সকল স্থলে মনুষ্যের শব্দানুকরণপ্রবৃত্তি বিমুখ হয় না। আলোর শব্দ নাই, কিন্তু আমরা আজিও বলি, "আলো ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।" পরিষ্কার ঘরের শব্দ নাই, কিন্তু আমরা বলি যে "ঘরটি ঝরঝর করিতেছে।"

"মৃ" "স্র" "অস্" প্রভৃতি যেন এইরূপে পাওয়া গেল—কিন্তু তাহাতে বিবিধ ভাব ব্যক্ত হইল কৈ? শুধু "মৃ" বলিলে কিপ্রকারে, "মারিলাম" "মারিল" "মারিব" "মারিয়াছি" "মারামারি" "মরণ" "মার"—এতপ্রকার কথা ব্যক্ত হয়? অতএব প্রয়োজন মতে মৃ ধাতুর সঙ্গে অন্যপ্রকার শব্দের যোগ আবশ্যক হইল। সেই সংযোগের কাজকে ভাষার গঠন বলা যাইতে পারে। সেই সংযোগের কাজ, সর্ব্বত্র একরূপ হয় নাই; এজন্য ভাষার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে। কিপ্রকারে সেই সকল গঠন, বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইল, তাহার আলোচনায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই। এখন পৃথিবীর ভাষা সকলের যেপ্রকারের গঠন দেখা যায়, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

একজাতীয় ভাষায়, ধাতুর সঙ্গে যোগমাত্রের দ্বারা বাক্যের গঠন হয়; কোন ধাতুর কোনপ্রকার রূপান্তর হয় না। এ সকল ভাষায় বিভক্তি নাই ইহাদিগকে "সংযোগের অসাপেক্ষ" (Isolating) ভাষা বলা যায়। চৈনিক, শ্যামদেশীয়, আনামদেশীয় বা ব্রহ্মদেশীয় ভাষা এইরূপ। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাতেও বিভক্তি নাই, কিন্তু উপসর্গ, প্রত্যয়াদি, ধাতুদ্বারা রূপান্তর হয়। ইহার ধাতুতে ধাতুতে বা ধাতু ও সর্ব্বনামে একপ্রকার সংযোগ হয়। এই সকল ভাষাকে সংযোগসাপেক্ষ (compounding) ভাষা বলে। দক্ষিণের তামিল প্রভৃতি ভাষা, তাতার ভাষা, আমেরিকার আদিমজাতীয় ভাষা এই জাতীয়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাতেই প্রকৃষ্টরূপে বিভক্তি আছে, সংযোগকালে ধাতুর ও সর্ব্বনামের রূপান্তর ঘটে। ইহাদিগকে বিভক্তিসম্পন্ন ভাষা (inflecting) বলে।

পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ ভাষা, সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।* আরবী,ইহুদী, গ্রীক, লাটিন, ইংরেজি,ফরাশি, সংস্কৃত,বাঙ্গালা, হিন্দি, ফারসী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

দেখা গিয়াছে যে এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলি ধাতু, এবং বিভক্তিচিহ্ন লইয়া গঠিত। ধাতুর পর বিভক্তি ও প্রত্যয়-বিশেষের আদেশে শব্দ ও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তাহা ছাড়া ভাষায় আর যাহা আছে, তাহাকে সাধারণতঃ সর্ব্বনাম বলা যাইতে পারে। সর্ব্বনামগুলি যে অবস্থা-ভ্রষ্ট ধাতু ইহাও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। কিন্তু তাহা হৌক বা না হৌক; ধাতু বিভক্তিচিহ্ন ও সর্ব্বনাম লইয়া ভাষা। যদি কোন দুইটি ভাষায় দেখা যায়, যে ভাষার মূলীভূত ধাতু, বিভক্তি ও সর্ব্বনাম, একই, কেবল দেশকাল ভেদে কিছু রূপান্তর-প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে অবশ্য অনুমান করিতে হইবে যে ঐ দুইটী ভাষা উভয়েই একটী আদিম ভাষা হইতে উৎপন্ন। ভাষাবিজ্ঞানের অতি বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়া এই, তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাতেই ভাষার মূলগত ধাতু, বিভক্তিচিহ্ন ও সর্ব্বনাম এক। অতএব সেই সকল ভাষা যে একটি প্রাচীন মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। সেই সকল ভাষাগুলি এক-পরিবারভুক্ত।

ভারতবর্ষের সংস্কৃত; এবং সংস্কৃতমূলক পালিপ্রভৃতি প্রাচীন ভাষা; বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক আধুনিক ভাষা; জেন্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যের অধিবাসীদিগের ভাষা; ও আধুনিক পারসী; প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন; লাটিনসম্ভূত ফরাশী, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি রোমান্সজাতীয় ভাষা, টিউটন-বংশীয়দিগের ভাষা, অর্থাৎ জর্ম্মান, ওলন্দাজি ইংরেজি; ব্রিটেনীয় আদিম-বাসীদিগের কেলটিক ভাষা, স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্যদেশের কেলিক, দিনেমারি, সুইডেনি, নরওয়ের ভাষা, রূসপ্রভৃতি স্লাবনিক ভাষা,—সকলই সেই এক প্রাচীনা ভাষা হইতে উৎপন্না,—সক-

* এই শ্রেণীবিভাগ অগষ্ট শ্লেচর নামক জর্ম্মানলেখককৃত। মাক্ষমূলর প্রভৃতি ভাষার যেরূপ শ্রেণীভাগ করেন, তাহা আর এক প্রকার। তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীকে দুইটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত করেন—শেমীয় ও আর্য্য। কিন্তু শেমীয় ও আর্য্য যখন উভয়েই তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত তখন তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া দাঁড় করান, কিছু বৈজ্ঞানিক-নীতি বিরুদ্ধ। শ্লেচরের যে গ্রন্থে ঐতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে তাহার নাম—Compendium der Verylei-chenden Grammatik der Indo-German ischen Sprachea. আমি জর্ম্মান জানি না, হণ্টর সাহেবের গ্রন্থ হইতে এই বিজ্ঞানের সার সঙ্কলন করিলাম।

লেই সেই এক বৃদ্ধা মাতার দুহিতা। সেই বহুভাষার জননী প্রাচীনা ভাষা এখন আর নাই—কিন্তু একদিন ছিল। যেমন কোন গৃহে, কতকগুলি মাতৃহীন ভ্রাতা ও ভগিনী বাস করিতেছে দেখিয়া অনুমান করি যে ইহাদের একজন জননী ছিল, তেমনি এই একবংশীয়া বহুতর ভাষা দেখিয়া মনে করি যে এক প্রাচীন মূল ভাষা ছিল। যে জাতি ঐ ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা আর্য্যজাতি বলিয়া অধুনা নামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই ভাষাসমুৎপন্ন ভাষাগুলি আর্য্যভাষা নামপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল জাতির ভাষা আর্য্যভাষা, তাহারা আর্য্যবংশীয় বলিয়া অনুমিত এবং বর্ণিত হইয়া থাকে। যাহারা আর্য্যবংশসম্ভূত নহে, তাহারা অনার্য্যজাতি।

এখন কোল, সাঁওতাল, কোঁচ, কাছাড়ি প্রভৃতি জাতিদিগের ভাষা যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে এই সকল ভাষা, প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত—এ সকল ভাষায় বিভক্তি নাই। অতএব এই সকল ভাষা অনার্য্য ভাষা। যে সকল জাতির মাতৃভাষা অনার্য্যভাষা, সে সকল জাতি অনার্য্য জাতি। কোল, সাঁওতাল, মেচ্ছ কাছাড়ি অনার্য্যজাতি। আর্য্য ও অনার্য্য এ ভেদের তাৎপর্য্য এই। এখন আর্য্যদিগের সম্বন্ধে একটা কথা বলিব।

সে কথা এই যে, প্রাচীন আর্য্যজাতি —যাঁহারা পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ জাতির এবং আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ—তাঁহারা কোথায় বাস করিতেন? ভারতবর্ষীয়েরা বলিতে পারেন—ভারতই আর্য্যভূমি—ভারতবর্ষের সংস্কৃতভাষা সকল আর্য্যভাষা হইতে প্রাচীনা দেখা যাইতেছে। তবে আর্য্যবংশের আদিম বাস ভারতবর্ষ; ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা দলে দলে অন্যদেশে গিয়াছেন, এ কথা না বলিব কেন? অতিপ্রাচীনকালেও মনু যবনপ্রভৃতি জাতিকে ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন।

কর্জননামা একজন পাশ্চাত্য লেখকের সেই মত*—এবং বিখ্যাত ভারতেতিহাসবেত্তা এল্‌ফিনষ্টোনও কতক সেই দিকে টানেন।† কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা আর্য্যভাষা সকলের বিশেষ সমালোচন করিয়াছেন তাঁহাদিগের মত এই যে আর্য্যেরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহেন—অন্যত্র হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা যখন আসেন, তখন ভারতবর্ষে অনার্য্যজাতি বাস করিত। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া বশীভূত অথবা বন্য এবং পা-

---

* Journal Roy. Asiat. Soc, vol XV1, pp 172-200 ডাক্তার মুর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত Sanscrit Texts part II P 299.

† History of India, Vol I, P

র্তত্যাদেশে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। এইস্থলে সেই সকল কথার প্রমাণের সবিস্তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। স্লেগেল, লাসেন, বেনফী, মাক্ষমূলর, পিক্টেট, রেনা, পিক্ট, মূর প্রভৃতির এই মত। এই মতও এক্ষণে সকল পণ্ডিত কর্ত্তৃক আদৃত।*

অতএব আর্য্যেরা দেশান্তর হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, যে হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার উত্তরে, আসিয়ার মধ্যভাগে, প্রাচীন আর্য্যভূমি ছিল, সেইখান হইতে তাঁহারা দলে দলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার মূর বিবেচনা করেন, ঐ হিমালয়োত্তরপ্রদেশই ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে উত্তরকুরু খ্যাত ছিল। একদল ইউরোপের এক প্রান্তে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, হেলেনিক নামধারণ করিয়া, জগতে অতুল্য সাহিত্য শিল্প দর্শনাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আর একদল ইতালীর নীলাকাশতলে সপ্তগিরিশিখরে নগরী নির্ম্মাণ করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আর একদল বহুকাল জর্ম্মানীর অরণ্যরাজিমধ্যে বিহার করিয়া এখনকার দিনে পৃথিবীর নেতা ও শিক্ষাদাতা হইয়াছেন। আর একদল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অনন্তমহিমাময় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের শোণিত বাঙ্গালির শরীরে আছে। যে রক্তের তেজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিসকল শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, বাঙ্গালির শরীরেও সেই রক্ত বহিতেছে।



বাল্মীকির জয়।

বর্ষা শেষ হইয়াছে। শরৎ উপস্থিত। আকাশ পরিষ্কার। মেঘের লেশমাত্রও নাই। নীল—সুনীল—গাঢ়নীল—বর্ণনার অতীব মনোমোহন নীলবর্ণের ক-টার মাঝে বড় বড় তারা জল জল করিয়া জ্বলিতেছে। তারকারাজিময়ো ছায়াপথ সমস্ত আকাশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শেষ নিজেও ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর কাদা শুকাইয়া আসিয়াছে, গাছ পালা সতেজে বাড়িয়া উঠিতেছে, আর সবুজ রঙের ছটায় পৃথিবীর নবযৌবন প্রকাশ করিয়া দিতেছে। উপরে সব গাঢ় নীল, নীচে গাঢ় সবুজ; যেখানে এই দুইয়ে মিলিয়াছে, সেখানে

* ডাক্তার মূর সাহেবের Sanskrit Texts দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার সমালোচনা দেখ।

বোধ হইতেছে যেন এক ফ্রেমে দুই বৃহৎ চিত্র আঁটিয়া দর্শকের জন্য মাঝখানে একটু স্থান রাখিয়া দিয়াছে।

যখন আকাশ নির্ম্মেঘ, যখন ধুন্ধুলার সম্পর্কমাত্র নাই, সেই সময়ে—সেই সুখের শরৎ সময়ে—কেহ কি হিমালয়ের মধুরিমা দেখিয়াছ? একদিকে সমস্ত হিন্দুস্থান শতযোজনব্যাপী মাঠের ন্যায়, একদিকে পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পর পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পরে—কত পরে বরফের পাহাড় দেখিয়াছ কি? সেই শ্বেত স্বচ্ছ বরফের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, বোধ হইতেছে যেন রাজপুত্রের আগমনে বিশাল নগরীসমূহ নানা দীপমালায় মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে, দেখিয়াছ কি? পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কেবল দেখিবে চূড়ার পর চূড়া, তাহার পর চূড়া, তাহার পর চূড়া; শেষ নাই, বিরাম নাই, অনন্ত বলিলেও হয়। বর্ষা সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, চারিদিকে ঝরণা হইতে ঝম্ ঝম্ রবে দুধের ফেণার মত শাদা জল বেগে পড়িতেছে, কোথাও তাহার উপর সূর্য্যের আলোকে রামধনু দেখা যাইতেছে, কোথাও বা কোন নির্ঝরিণী চির-অন্ধকারময় দরী দিয়া চিরকাল অলক্ষিতভাবে প্রবাহিত হইতেছে, কেহ দেখিতেছে না অথচ গতিরও বিরাম নাই। যেখানে ঝরণা সেইখানেই গাছপালা বন, আর যেখানে নাই, সেখানে ভীষণাকার প্রস্তর, কাছে গেলে বোধ হয় এখনই ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। এখানে এই ভয়ানক উচ্চতা আবার পরক্ষণেই গভীর খড্, তাহার তলা কোথায় দেখা যায় না, যদি দেখা যায়, দেখিবে একটি ক্ষুদ্র নদী চলিয়া যাইতেছে, উপলে উপলে জল লাফাইতেছে, নাচিতেছে, আর চলিতেছে। স্থানে স্থানে নীরস কঠিন তরুবর সহস্র বৎসরেরও অধিককাল কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে, আর সেউতিলতা তাহাকে জড়াইয়া জড়াইয়া জড়াইয়া পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছে।

এই হিমালয় তুমি আজি যেমন দেখিতেছ ইহা অনন্তকাল এইরূপ, অনন্তকাল ধরিয়া বরফের পাহাড় এইরূপই আছে, ঝরণা এইরূপই বহিতেছে, আকাশও এইরূপ গাঢ় নীল, সবই এইরূপ। শরতেও হিমালয়ের এমনই গভীর অথচ মনোহর, ভয়ঙ্কর অথচ উন্মাদক সৌন্দর্য্য। কিন্তু আমরা যে শরৎকালের কথা উল্লেখ করিতেছি, সেই শরৎকালের অমাবস্যারাত্রে হিমালয়ের এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হইয়াছিল। সে শরৎ সত্য ও ত্রেতাযুগের সন্ধিসময়ে।

২।

মানুষ মরিয়া কি হয়? কে বলিবে? কেহ বলে ভূত হয়, যাহাদের পিতামাতা মরে তাহারা বলে তাঁহারা স্বর্গে গিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা স্বর্গে যান না। যে সকল লোক পৃথিবীতে

সৎকার্য্য করিয়া যান তাহারা ঋভু* হয়েন, ইহাঁরা কোথায় থাকেন? কি করেন? কে বলিতে পারে! ইহাঁরা ছায়াপথের ওপারে কোন সুখময় ভবনে বাস করেন। উক্ত শরৎ অমাবস্যারাত্রে সহসা ছায়াপথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর তাহার মধ্যহইতে অগণিতসংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের শরীরপ্রভায় আলোকিত হইল। নক্ষত্রের কিরণ অন্তর্হিত হইল, নক্ষত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ আকাশপটে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ঋভুগণ মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশপথ অতিক্রম করিলেন। পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায় দেখিতে কতই সুন্দর, কিন্তু যখন তীব্র জ্যোতির্ম্ময় ঋভুগণ শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া—আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া দলে দলে আসিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবীস্থ মানববৃন্দ চমৎকৃত হইয়া গেল। কেহ বলিল, ধূমকেতু উঠিয়াছে, কেহ বলিল, নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িতেছে, কিয়ৎক্ষণ দেখিয়া যে যাহার ঘরে গেল। ঋভুগণ আজি জন্মস্থান দর্শন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই, তাঁহারা আসিয়া হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন টিব্যায় টিব্যায়†, চূড়ায় চূড়ায়, শিখরে শিখরে, ঋভুগণ দাঁড়াইয়া মহানন্দভরে গান ধরিলেন। মানবের সাধ্য কি সে গান বুঝে! কিন্তু সে শ্রুতিমনোহরস্বরে জগৎ মুগ্ধ হইল। জগৎ নিস্তব্ধ, আকাশ নিস্তব্ধ, নক্ষত্র অচল, দিকাল ছায়াপথ নিশ্চল, নিস্পন্দ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত স্তিমিত মহামোহ নিদ্রায় অভিভূতবৎ হইল। ঋভুগণ একতানস্বনে গান ধরিলেন। গীতধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর পরিপূরিত করিয়া উন্মুক্ত ছায়াপথ দ্বারপথে অনন্তে নিলীন হইল।‡

মুগ্ধ হইয়া পৃথিবীস্থ, আকাশস্থ, ব্রহ্মাণ্ডস্থ, অনন্তস্থ জনগণ এই গান শ্রবণ করিলেন। উহা সকলেরই কর্ণে সুধাধারাবৎ বোধ হইতে লাগিল। যেমন বড় সুখের সময়ে সুখসন্তানবৎ স্বপ্নবৎ অর্দ্ধচেতন অর্দ্ধ অচেতনবৎ মোহময় সুখময়, শান্তিময়, অমৃতময়, দূরস্থ মধুর সঙ্গীতধ্বনিবৎ কাণে কি জানি কি নিলীন হয় সেইরূপ সে গীতধ্বনি সকলের কর্ণে লাগিল। কেহই বুঝিল না কেন তাহাদের প্রাণ প্রফুল্ল হইল, অথচ সকলেই মুগ্ধ হইয়া রহিল; কেবল তিন জন লোক গানের অর্থগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনজনে গানে মত্ত হইয়াছিলেন, তিনজনে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্বর লক্ষ্য করিয়া

*যে মানুষ সৎকর্ম্ম করিয়া মরণের পর দেবতা হয়েন বেদে তাঁহাকে ঋভু কহে।

†পাহাড়ের উচ্চ অংশকে পাহাড়িয়া টিব্যা বলে।

‡ গ্রন্থকার গানটি হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

হিমালয়চূড়ায় আসিয়াছিলেন। ইহাঁরা ভারতের চূড়া, যতদিন ভারত থাকিবে, যতদিন হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে, যতদিন জগতে মাহাত্ম্যের মান থাকিবে, ততদিন ইহাঁদের নাম লোপ হইবে না।

৩।

প্রথম মহর্ষি বশিষ্ঠ, ষষ্টিসহস্র শিষ্য-পরিবৃত হইয়া আপন আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহাদিগকে জ্ঞানধর্ম্মনীতি উপদেশ দিতেছিলেন; কাহাকে বাক্য, বাচ্য, ব্যঙ্গ, কাহাকেও প্রমাণ, প্রমেয়, প্রয়োজন, সংশয়নির্ণয়, ছলজাতিহেত্বা-ভাস প্রভৃতির গূঢ়তত্ব, কাহাকে পঞ্চতন্মাত্রের সহিত লিঙ্গশরীরের ভেদাভেদ, কাহাকে বিবর্ত্তবাদী, কাহাকে পরিণামবাদী বুঝাইয়া দিতেছেন; কাহাকে গোমেধ, অশ্বমেধ, রাজসূয়, অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি শিক্ষা দিতেছেন; শিষ্য বিবেচনায় কাহাকেও বা দশকর্ম্মও শিক্ষা দিতেছেন। এমন সময়ে সহসা তাঁহার শিষ্যসমূহ অন্যমনা, স্থির, নিস্পন্দ, শেষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ বাক্‌শক্তিবিহীন হইলেন। গীতধ্বনিও বশিষ্ঠের কাণে গেল, তিনি যোগবলে জানিলেন ঋভুগণ আসিয়াছেন। তিনি অমনি যোগবলে হিমালয়ের শিখর লক্ষ্য করিয়া আকাশপথে গমন করিলেন। এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া, ঋভুদিগকে নমস্কার করিয়া একতানমনে গান শুনিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয়, বিশ্বামিত্র। ইনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমস্ত দিন সৈন্যচালনা করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে হিমালয়ের পাদদেশে শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন। সৈন্যগণ পথশ্রান্তিনিবন্ধন যে যেখানে পাইল সে সেইখানেই তাম্বু গাড়িতে আরম্ভ করিল। বিশ্বামিত্র কয়েকজন মন্ত্রী লইয়া কালিকার সৈন্যচালনার পরামর্শ করিবার জন্য এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীতটে আসিয়া বসিলেন, এমন সময়ে আকাশ আলোকময় হইয়া উঠিল, আর সেই সুমধুর গীতধ্বনি সকলের কাণে গেল। সৈন্যগণ যে যেভাবে ছিল, সে সেই ভাবেই নিশ্চল, নিস্পন্দ ও সুখমোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। যে তাম্বু গড়িয়াছে তাহার বিছানা করা হইল না, যে গাড়িতেছে, তাহার অর্দ্ধেকেই শেষ হইল, আর যে গাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহার ঐ পর্য্যন্ত। বিশ্বামিত্র গীতধ্বনি বুঝিলেন, অমনি চকিতের ন্যায় তিনলম্ফে এক টিব্বায় উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার আগমনে যে ঋভুদেব কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেলেন তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না।

তৃতীয়, বাল্মীকি। ইনি নিজ দস্যুদল সমভিব্যাহারে গিরিরাজের প্রাসাদে ডাকাতি করিতে গিয়াছিলেন। নিজে প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া দুই পাঁচ জনকেও তথায় আনিয়া সিঁড়িভাঙ্গিবার উদ্যোগ করিতেছেন, চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে, রাজরক্ষিগণ কে কোথায় যাইবে স্থির করিতে

পারিতেছে না, কোথাও ডাকাইতে রক্ষী কাটিতেছে, কোথাও রক্ষীকে ডাকাইত কাটিতেছে, কোথাও ডাকাতে ডাকাত কাটিতেছে কোথাও রক্ষী রক্ষী কাটিতেছে। বাল্মীকি ক্রমাগত অসি আস্ফালন করিতেছেন আর সংস্কেতমত শিঙ্গা বাজাইতেছেন। এমন সময়ে আলোক ও গীতধ্বনি হইল। অমনি যে যেভাবে ছিল চিত্রপুত্তলিবৎ নিস্পন্দ হইয়া গেল। বাল্মীকি গান শুনিলেন ও বুঝিলেন। অমনি অস্ত্রত্যাগ করিয়া লাফ দিয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং নিকটবর্ত্তী টিব্যার আরোহণ করিলেন।

৪।

গানে মুগ্ধ কে নয়? যখন সামান্য মনুষ্যগায়ক তান ছাড়িয়া গায় তখন কে না মুগ্ধ হয়? তাহা অপেক্ষা যখন অন্তরের জ্বালায় কেহ প্রাণ খুলিয়া গায় তখন আরও মধুর হয়, আবার যে গীত বুঝে সে গীতে অধিক মুগ্ধ যে গীতের ভাব বুঝে সে আরও মুগ্ধ হয়, গীতে যদি শুধু কাণ না ভরিয়া মনও ভরাইতে পারে তাহা হইলে সে গীতে লোকে উন্মত্ত হয়। আজি ঋত্বিগণ গায়ক, জন্মভূমিদর্শনে পুলকে পুলকিত হইয়া গাইতেছেন, অন্তরের জ্বালাও আছে! তাঁহারা কি দেখিয়া গিয়াছিলেন আর এখন কি হইয়াছে! বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি শ্রোতা, তাঁহারা শুনিতেছেন বুঝিতেছেন ভাবগ্রহ করিতেছেন। কাণ মন প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে বাহিরের ইন্দ্রিয় কাণে প্রবেশ করিয়াছে মন ও প্রাণ কাণে উঠিয়াছে জ্ঞান চৈতন্য হত তাঁহারা গায়কে মোহিত গায়কের ভাবে মোহিত গানে মোহিত সুরে মোহিত আর গানের ভাবে আরও মোহিত। গানে বলিতেছে সব ভাই ভাই এস ভাই ভাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব ভাই ভাই; সব আপন, সব প্রেম, প্রাণীমাত্রেই ভাই; এস কোলাকুলি করি এস সবে মিলে এক হই একতানমনপ্রাণ হই। এ তে কে না মুগ্ধ হইবে, শুধু মুগ্ধ? মুগ্ধ হইতে মুগ্ধ, তাহা হইতেও মুগ্ধ যদি কিছু থাকে তাহাও হইতে হয়। তিন জনইত মুগ্ধ কিন্তু মনের তলায় তলায় অতি গোপনে গোপনে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে একটি ভাবনাস্রোতঃ সকলেরই মনে বহিতে লাগিল। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া ভাবিতেছেন না কিন্তু ভাবনা থামাইতেও পারিতেছেন না। কেহ কেহ বলে ইচ্ছার মত শক্তি নাই কিন্তু যখন সমস্ত মন উদ্বেল হয় সমস্ত মন দ্রব হইয়া একদিকে স্রোতঃ চলিতে থাকে, তখন তাহাকে ইচ্ছার সাধ্য কি নিবারণ করে।

বশিষ্ঠের মনে আত্মপ্রসাদ, আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিবাদ মিটাইয়া তুলিয়াছি। আমি সব ভাই ভাই করিবার যোগাড় করিয়াছি, নিজে ক্ষত্রিয়ের পুরোহিত হইয়াছি। লাঘব স্বীকার করিয়াছি এই ভাবনাস্রোতঃ যত বাড়িতেছে ততই তিনি আরও উন্মত্ত হইতেছেন।

বিশ্বামিত্র ভাবিতেছেন আমি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া এক করিয়া আনিয়াছি আমার শাসনে সব ভাই ভাই হইয়া যাইবে, যতবার তাঁহার এই ভাবনা হইতেছে ততই তাঁহার মুগ্ধভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। আর বাল্মীকির অন্তরের অন্তরের ভাবনা কি? হায় আমি কি করিতেছি আমি কেবল আমার ভাইএদের সর্ব্বনাশ করিতেছি!!! আমার এ কলঙ্ক কিসে যায়, এ দারুণ জ্বালা কিসে নিবাই; কিরূপে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। গান যত জমিয়া আসে তাঁহার আকুলভাব আরও বৃদ্ধি হয় ক্রমে চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল তিনি কাঁদিয়া ঋভুদেবের পায়ে জড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শরীর ধূলায় লুটিতে লাগিল, দেব রক্ষা কর, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দেও, প্রাণ্ আর বাঁচে না।

দেবমাহাত্মা কে বুঝিতে পারে! সহসা বাল্মীকির মন প্রফুল্ল হইল। কে যেন অন্তরের অন্তরে বলিয়াদিল ভয় নাই ভয় নাই, পাপত্যাগ কর, ভাই ভাই করিয়া গান করিয়া বেড়াও,তোমার প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর কিন্তু ভয় নাই তুমি ভাই ভাই গাইয়া বেড়াও তোমার জীবনে তুমি কিছু সুখ পাইয়া মরিবে, কিন্তু তোমার আত্মা এই পৃথিবীতেই থাকিবে, যেখানে ঘোর অত্যাচার সেইখানেই উঁহার উপস্থিতি হইবে, যেদিন পৃথিবীময় ভাই ভাই হইয়া উঠিবে সেইদিন তুমি আমাদের সঙ্গে ঋভু হইবে ঋভুরাজ হইবে তোমার সুখের শেষ থাকিবে না।

অল্পক্ষণেই বশিষ্ঠের আত্মপ্রসাদ নৈরাশ্যরূপে পরিণত হইল। তাঁহার বোধ হইল যেন কিছু হয় নাই তাঁহার সব চেষ্টা বিফল হইবে।

বিশ্বামিত্রের বোধ হইল তাঁহার ঘোর বিপদ সম্মুখে, তিনি যেন কত পাপ করিয়াছেন কিন্তু তিনি সে কথায় কাণ দিলেন না বীরজনসুলভ আত্মমদে মত্ত হইয়া আত্মগরিমায় পূর্ণ হইতে লাগিলেন।

ক্রমে গানে মুগ্ধভাব অন্তরিত হইল। শেষ এই যে ভাবনাস্রোত তাহাতেই তিনি জলমগ্ন হইলেন, ডুবিয়া রহিলেন, পূর্ব্বে সকল ইন্দ্রিয় কাণে উঠিয়াছিল এক্ষণে ফিরিয়া হৃদয়ের তলে তলে লুকাইয়া হৃদয়ের খেলা দেখিতে লাগিল। ঋভুগণ যে কোন্ দিক দিয়া চলিয়া গেলেন তাহা টেরও পাইলেন না, তখন যে রাত্রি নাই তাহা তাঁহাদের জ্ঞানও নাই, আত্মচিন্তায় যে মগ্ন তাহার আবার দিন রাত্রি কি?

৫।

এদিকে ঋভুগণ হিমালয়শিখরসমূহত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বোধ হইতে লাগিল রাশিচক্র অন্যপথে ঘুরিতেছে। ক্রমে যতদূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন বোধ হয় লক্ষ লক্ষ নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব হইল, ক্রমে আর নক্ষত্রভাবও রহিল না বোধ হইল আকাশ

প্রকাণ্ড এক শাদা মেঘে আবৃত হইয়া উঠিল, ক্রমে মেঘ ছায়াপথগর্ভে প্রবেশ করিল। বোধ হইতে লাগিল হরিতালী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবে, দ্বাপরের শেষকালে অর্জ্জুন যেমন বিরাটমূর্ত্তি নারায়ণের মুখে বিশ্বসংসার প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন এসময়েও সেই প্রকার বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শ্বেতমেঘপুঞ্জে হরিতালীগর্ভে নিলীন হইল। হরিতালীর মধ্যগহ্বর পূর্ণ হইল বিশ্বসংসার আবার যেমন তেমনি হইল আবার নক্ষত্র জ্বলিল আবার আকাশ স্থির হইল আবার আকাশের কোমল নীলিমা বিকাশ হইল। পৃথিবীতে প্রভাত হইল, কাক, কোকিল ডাকিয়া উঠিল। যেমন বড় ভয়ানক ক্রিয়াকাণ্ড শেষ হইলে সমস্ত বাড়ী খাঁ খাঁ করিতে থাকে সমস্ত বিশ্বসংসার তেমনি খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি আপন আপন টিব্যায় ভাবনায় ডুবিয়াছিলেন কতক্ষণ ছিলেন কে বলিতে পারে? ক্রমে যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলেন সমস্তই অন্যরূপ, শরৎ—আকাশে ভানূদয় হইয়াছে, নক্ষত্র কোথায় লুকাইয়াছে, প্রভাতবায়ু প্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে নির্ঝরশব্দ কাণ জুড়াইয়া দিতেছে তিনজনেরই রজনীর বৃত্তান্ত স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। বাল্মীকি যখন উঠিয়া দেখিলেন সে গানও নাই সে দেবও নাই তিনি শোকে আকুল হইয়া বসিয়া পড়িলেন। বশিষ্ঠ প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য যোগবলে আশ্রমে যাইতে যাইতে দেখিলেন বিশ্বামিত্র নামিতেছেন; অমনি সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট আসিয়া দুজনে পদব্রজে পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন।



যার কাজ সেই করুক।

চিরকালই কথা আছে যার কাজ সেই করে। যদি অন্যে অন্যের কাজ করে, তবে সে কাজ নিশ্চয়ই খারাপ হয়। কিন্তু আমাদের এমনি অদৃষ্ট মন্দ, আমাদের সকল কাজই পরে করে। আমরা কেবল আহার করি, দুই হাত নাড়িয়া দুইপাটী দাঁত ফাক করিয়া তাহার মধ্যে সংতর্পণে—কণ্টক হইতে পৃথক্‌কৃত সর্ষপতৈলভর্জ্জিত মৎস্যদেহ সমভিব্যাহৃত—বরিশালোৎপন্ন লঘুপাক বালামচ্ছিদের তণ্ডুলজাত অন্নরাশি গলাধঃকরণ করিয়া থাকি। তাহাও শুনিয়াছি কাহার কাহার গৃহিণী মাছের কাঁটা বাছিয়া গরাসগুলি পাকাইয়া রাখেন, কর্ত্তার কার্য্যের মধ্যে উত্তোলন, প্রবেশন ও গলাধঃকরণ। আমাদের দে-

শের কাজ ত আটশত বৎসর ধরিয়া পরে করিয়া আসিতেছে। আমার সঙ্গে আমার ভাইয়ের ঝগড়া হইলে সাহেবে তাহা মিটাইয়া দিবে। আমার দেশে বর্গী আসিলে আলিবর্দ্দি খাঁ তাহাকে তাড়াইবে। আমাদের সীমাপ্রদেশে অত্যাচার করিলে স্কটলণ্ডের পাহাড়ীরা তাহাদের তাড়াইবে, আমাদের দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে জর্ম্মাণীর ইঞ্জিনিয়ার তাহা সারিয়া দিবে। আমাদের কাজ ভাল হয় না, ভাল হলেও খরচটা বেশী হয়, কিন্তু তা হলে কি হয় আমরা আমীর, সব কাজ পরকে দিয়া করাইয়া লই। অথবা আমরা (genius) জিনিয়স। জিনিয়সের বোল এই Never do yourself what you can have another to do for you. আমাদের বঙ্গভূমিতে সবাই মনে করেন আমি জিনিয়স, আমার কাজ চুপ করিয়া, কাণে তুলা দিয়া বসিয়া থাকা আর অন্যের কাজ এই যে আমার আহার যোগায়। পরে যতক্ষণ করে, ততক্ষণ আমরা হাত পা নাড়ি না। শেষ পরে না করিলে আমরা কিছুই করিতে পারি না।

সে যাই হউক, এটা ঠিক্ যে,যার কাজ তাহারই করা উচিত। আমার বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় জল বাঁধে তাহা পরে মেরামত করিয়া দেয়, আমার বাড়ীর পাশের বন পরে কাটিয়া দিয়া যায়, এটা একান্ত দুঃখের বিষয়। দুঃখের বিষয় হইলেও আমরা করি না, রাস্তায় জল বাঁধিয়াছে, বর্ষায় সময় না হয় নাই বাহির হইলাম ; যদিই বাহির হইলাম, না হয় একবার একটু পায়ে জল লাগিল, তাহাতে ক্ষতি কি ? আমাদের মনের ভাব ঠিক্ এই। কিন্তু আমরা ব্যতীত অন্য যে কেহ এ ব্যাপার দেখে, সেই ঘৃণা করে, এই জন্য ইংরেজ বাহাদুর কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের আপনকর্ম্ম জোর করিয়া করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহাতে আমাদের ঘৃণা হয় না, আমরা আপন কর্ম্ম করি না। টেক্স না দিলে ঘটী, বাটী কাড়িয়া লইয়া যায়, এইজন্য টেক্স দিই, কিন্তু তাহার পর আবার পরের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি ; আর কিছুই দেখি না।

গবর্ণমেণ্ট আমাদের মধ্য হইতে মিউনিসিপাল কমিসনর লন, তাঁহারা কর্ত্তার কথায় আজ্ঞা হাঁ দিয়াই নিশ্চিন্ত হন। কর্ত্তা সাহেব হইলে, না বলিবার কাহারই ত যো নাই, যদি বাঙ্গালি হইলেন, তবে বরং দুই একজন ঠোঁটকাটা দুই একটি কথা বলিলেন। যেই চর্ম্মপাদুকচরণে, উষ্ণীষমস্তকে, দিব্যশুভ্রবর্ম্মাচ্ছাদিতসর্ব্বকলেবর, সুগন্ধিদ্রব্যে সর্ব্বাঙ্গ বিলেপন করিয়া যশোদার নন্দদুলাল মিউনিসিপাল সভায় উপস্থিত হইলেন, অমনি সব চুপ। কেবল মধ্যে মধ্যে "আজ্ঞা হাঁ" নতুবা "যো হুকুম।" ভিন্ন আর কথা নাই।

এখন গবর্ণমেণ্ট আমাদের নিজের কাজ নিজে করাইতে চান, আমরা তাহা করিতে পারি না, গবর্ণমেণ্ট আমাদের কর্ম্ম শিখাইতে চান, গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরা আমাদের তাহা শিখিতে দেন না, এই অকর্ম্মারা যদি কেহ কর্ম্ম করিতে চান, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করেন। তাঁহার ইচ্ছা, তিনি যাহা বলেন, আমরা তাহাতে কেবল "হাঁ" দিয়া যাই। তিনি কেবল হাঁ দিবার মত কমিসনর নির্ব্বাচন করিয়া লন। ইহার এক উপায় আছে,—আমরা নিজে যদি মেম্বরনির্ব্বাচন করিতে পাই, তাহা হইলে চেয়ারমানের ধামাধরাগণ আর বড় কমিটীতে স্থান পায় না, সেই এক ভরসা আছে; অতএব যেখানে যেখানে স্থানীয় মিউনিসিপাল শাসন আছে, নিজে মেম্বরনির্ব্বাচন করিবার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক, নহিলে কমিটী তোমাদের অর্থশোষণ করিবে, তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করিবে, তোমাদের কাছে বড় হইয়া, কর্ত্তার কাছে হাতযোড় থাকিবে। আর তোমাদের কোন কাজ হইবে না। তাই বলি যার কাজ সেই করুক। তোমাদের কমিসনর তোমরাই নির্ব্বাচন কর এ বিষয়ের আইনও আছে।



বঙ্গদর্শন

সপ্তমবৎসর।

৮২ সংখ্যা।

বাঙ্গালার পাঠক পড়ান ব্রত।

প্রচলিত অলঙ্কার-কণ্টকিত বাঙ্গালা ভাষা আমার আয়ত্ত নহে, তথাপি একটা কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার নিরলঙ্কৃত ভাষায় সে কথাটির চটক হইবে না, সুতরাং লোকে তাহা পড়িবে না, তথাপি পড়াইতে আমার ইচ্ছা। কথাটী স্পষ্ট করিয়া, পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু আমি বলিতে পারিলাম না আর একজন পরে বলিবে এই ভরসায় অপেক্ষাও করিতে পারি না।

প্রথমে জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গবাসীদের মধ্যে কতলোক পড়িতে পারে? তুমি বলিবে বিস্তর; গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, পাঠশালা ও স্কুল আছে, পাঠকের সংখ্যা বিস্তর হওয়াই সম্ভব। আমিও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু বিস্তর বলিলে সংখ্যা অনুভব হয় না। বাঙ্গালায় প্রায় দুইকোটী পুরুষ বাস করে, তাহাদের মধ্যে কত লক্ষ পড়িতে সক্ষম? বিংশতি লক্ষ? না, আরও অল্প? এক্ষণে সূক্ষ্ম হিসাব হইতে পারে না; একটা মোটামুটি অনুভব করিয়া লইতে হইবে। গ্রামের অর্দ্ধেক বালক পাঠশালায় যায় না। যাহারা যায়, তাহাদের অর্দ্ধেক—বরং কিছু অধিক হইবে—অক্ষরপরিচয় অবধি অপেক্ষা করে না, পাঠশালার পীড়নে পলায়ন করে। যদি শতকরা চল্লিশজন বালক পাঠশালায় যাইতে আরম্ভ করে, তাহার মধ্যে অক্ষরপরিচয়ের পূর্ব্বে কুড়িজন পাঠশালা ত্যাগ করে, বাঁকি কুড়িজনের মধ্যে দশজন যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তে রামায়ণ প্রভৃতি ছাপার পুঁথি কষ্টে একপ্রকার পড়িতে পারে, আর বাকি দশজন অপেক্ষাকৃত ভাল-

রূপ শিক্ষা পায়। কেবল এই শেষোক্ত ব্যক্তিদের গণ্য করিলে বাঙ্গালায় কুড়ি লক্ষ লোক পড়িতে সক্ষম। অর্থাৎ প্রতিশতে দশজন হিসাবে পড়িতে পারে। যদি কেহ বলেন, বাঙ্গালায় পাঠকসংখ্যা এত হইবে না, তাহাতেও আপত্তি নাই; কুড়িলক্ষ পাঠক কাটিয়া দশলক্ষ করিতে প্রস্তুত আছি। প্রতিশতে পাঁচজন যে পড়িতে পারে ইহার আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে, এই দশলক্ষের মধ্যে কয়জন সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র পাঠ করেন? কোন্ বাঙ্গালা পত্রিকার দুইহাজারের অধিক গ্রাহক আছে? সকল পত্রিকার গ্রাহক একত্র করিলে ঊর্দ্ধসংখ্যা দশহাজার হইবে, দুইকোটি পুরুষের মধ্যে দশ হাজার!

যে বাঙ্গালায় সামান্য পর্ব্বোপলক্ষে নিমেষমধ্যে দশহাজার লোক একস্থানে এক মাঠে উপস্থিত হয় সেই বাঙ্গালায় সংবাদপত্রের গ্রাহকও দশহাজার! পর্ব্বোপলক্ষে বাঙ্গালায় বোধ হয় প্রতিবৎসরে প্রায় আটলক্ষ টাকার মাটীর পুতুল বিক্রয় হয়, কিন্তু সংবাদপত্রের নিমিত্ত তাহার চতুর্থাংশের একাংশও ব্যয় হয় না। তুমি বলিবে সংবাদপত্রের এমন কি মাহাত্ম্য আছে যে, তাহার নিমিত্ত অর্থব্যয় করিতে হইবে? সংবাদপত্রের মাহাত্ম্য সমাজসম্বন্ধে; তাহা পরে বলিতেছি। সকল দ্রব্যেরই মহত্ব আছে; যে পুতুল ক্রয় করিলে পয়সা জলে গেল মনে করিয়া থাক, সেই পুতুলেরও মাহাত্ম্য আছে; সমাজসম্বন্ধে তাহার ক্রম অস্পষ্ট, কিন্তু গুরুতর। পুতুল বালকের নিমিত্ত; ক্রীড়ার সামগ্রী; কেহ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, পুতুলের কোনরূপ আধিপত্য সমাজের উপর আছে কি না কে তাহার তদন্ত করিতে যাইবে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ বঙ্গশিশু কিপ্রকার পুতুল লইয়া খেলা করে? কেবল 'মাটীর হরিণ,' 'মাটীর পক্ষী,' 'মাটীর বৌ' 'মাটীর খোকা।' পরে শিশু বয়ঃপ্রাপ্তে নিজেই সেই মাটীর খোকা দাঁড়াইয়া যায়। যে জাতির ইচ্ছা, সেই জাতির পুতুল সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা কর, বুঝিতে পারিবে যে কতকটা পুতুলের প্রকৃতি অনুসারে সেই জাতির প্রকৃতি। পুতুলের ক্রম অস্পষ্টভাবে প্রত্যেক জাতির অস্থিমজ্জায় আছে।

সংবাদপত্রসম্বন্ধে আরও অধিক বলা যাইতে পারে। সংবাদপত্র সংগ্রহ করিয়া দেখিলে জাতির প্রকৃতি সম্পূর্ণ বুঝা যায়, কিন্তু আমাদের সংবাদপত্র দেখিয়া আমাদের প্রকৃতি বুঝা যায় না। বলিতে গেলে, আমাদের সংবাদপত্র নাই; যাহা আছে, তাহা ইংরেজিপত্রের অনুকরণ, তাহা কোনক্রমেই আমাদের প্রকৃতিব্যঞ্জক নহে। বাঙ্গালা সংবাদপত্র কতকটা বিজাতীয় বলিয়া বাঙ্গালিরা তাহা পড়িতে পারে না; সেইজন্য দশলক্ষ লোকের মধ্যে কেবলমাত্র

দশহাজার লোক সংবাদপত্রের গ্রাহক। অতএব সাধারণোপযোগী দুই একখানি সংবাদপত্র বঙ্গে আবশ্যক। কেবল এই কথা বলিবার নিমিত্ত আমি এত মাথামুণ্ড বকিতেছি।

লোকে যত একভাবে ভাবিবে, ততই তাহাদের জাতিসম্বন্ধ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ভিন্ন আর কে এখন বহুলোককে একবিষয়ে একদিকে ভাবাইবে, একরূপ আলোচনা করাইবে? সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য অধিকাংশ লোকের মন একসূত্রে বদ্ধ করা, একদিকে মনের গতি নির্দ্দেশ করা। তুমি বলিবে পূর্ব্বে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এ সকল কিছুই ছিল না তখন জাতিবন্ধনের সূত্র কোথা হইতে আসিয়াছিল? সংবাদপত্র ছিল না সত্য, কিন্তু তখন অন্য উপায় ছিল। রামায়ণ আর মহাভারত আমাদের জাতিবন্ধনের মূল ছিল; ইহা পড়িতেন অল্প লোকে, কিন্তু শুনিতেন সকলেই। শুনিতেন কথকের মুখে; কথকেরা তাহা বিকৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। আমাদের পূর্ব্বগামী বাঙ্গালিরা সেই বিকৃতব্যাখ্যার ফল। তাঁহাদের ব্যবহার, বিচার, যুক্তি, চিন্তা, সামাজিকতা এই সমুদয়ের মূল কথকের কথকতা। কথকতা আর বড় নাই, এক্ষণে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র সেই কথকতার স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে। পূর্ব্বের কথক; এক্ষণকার সম্পাদক। উভয়ের উদ্দেশ্য এক, কিন্তু উপায় স্বতন্ত্র।

কয়েকজন কথকেরদ্বারা প্রাচীন বাঙ্গালা প্রস্তুত হইয়াছিল, প্রস্তুত ভাল হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহারা করিয়াছিলেন। এক্ষণে নূতন বাঙ্গালা সম্পাদকগণদ্বারা প্রস্তুত হইবে। কথকের কার্য্য সহজ ছিল। তাঁহারা বক্তৃতা করিতেন, আবালবৃদ্ধ সকলে শুনিত, সকলে বুঝিত। ন্যূনকল্পে এককোটী লোক তাঁহাদের কথা শুনিয়াছিল, বুঝিয়াছিল। সম্পাদকের সে উপায় নাই; তাঁহাদের বক্তৃতা ভাল হউক, মন্দ হউক, এককোটীর স্থলে কেবল দশহাজার না হয় পঞ্চাশহাজার লোক শুনিয়া থাকে, পড়িয়া থাকে।

কিন্তু সম্পাদকের কথা শুনিবার নিমিত্ত দশলক্ষ লোক প্রস্তুত হইয়াছে, সম্পাদকেরা সে সকল লোককে আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না। হেতু প্রথমতঃ অনুভব হয় সম্পাদকগণের অযোগ্যতা, দ্বিতীয়তঃ হয় ত তাঁহাদের নিশ্চেষ্টতা। অযোগ্যতা এইজন্য বলি যে, যে গুণে দশলক্ষ লোক আকৃষ্ট হইবে, সে গুণ তাঁহাদের থাকিলে এই দশলক্ষ লোক অবশ্য তাঁহাদের হস্তগত হইত; সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে যাহা তাঁহারা লেখেন, হয় ত সে সকলের কোন উদ্দেশ্যই নাই। কোন্ পত্রিকা কি উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইতেছে তাহা আমি জানি না, বুঝিতেও পারি না; সম্পাদকেরা

নিজে হয় ত তাহা বুঝিলে বুঝিতে পারেন, কিন্তু মোটামুটি যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে নিজের অর্থাগম ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্য অনুভব হয় না, অথচ এদিকে তাঁহাদের অর্থাগমও দেখি না। অর্থাগম হয় না তাহা তাঁহাদের নিজের দোষ, যে স্থলে দশলক্ষ পাঠক প্রস্তুত আছে, সে স্থলে অর্থের ভাবনা কি ?

দশলক্ষ পাঠক প্রস্তুত করা কঠিন ব্যাপার। পুরুষানুক্রমে অনেককাল যত্ন না করিলে তাহা হয় না ; আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তাহা হইয়া রহিয়াছে। তাহা সামাজিক নিয়মবিস্কারণে হউক; অথবা পূর্ব্বপুরুষের প্রযত্নে হউক, বাঙ্গালায় দশলক্ষ লোক পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে ; কিন্তু বহুকালের এই উদ্যোগ আমাদের দোষে বৃথা হইতেছে অথচ সম্পাদকেরা তাহা দেখিতে পাইতেছেন না, তাঁহারা যদি এই দশলক্ষ লোককে পড়াইতে পারিতেন, বাঙ্গালা নূতন হইত, বাঙ্গালির সামাজিকতা কতই বাড়িত।

দুই একজন মহানুভব সম্পাদক স্বপ্ন পীড়িতের ন্যায় "একতা ! একতা !" বলিয়া শয্যায় শুইয়া চীৎকার করেন। কেহ বা বায়ুগ্রস্তের ন্যায় মাথা কাঁপাইয়া, দন্ত বিকট করিয়া, অনৈক্যের নিমিত্ত বাঙ্গালিকে গালি দেন। গালি দিয়া ফল কি ? পত্রিকা কয়জন পড়ে, তোমার কথা কয়জন শুনে, একতা জন্মে এরূপ কি উপকরণ তোমার পত্রিকায় থাকে ? তুমি কি লিখিয়া থাক যে তাহা পড়িয়া সকল বাঙ্গালি সেই কথা আপনা আপনি একভাবে আলোচনা করিবে ?

এক্ষণকার বাঙ্গালির সাধারণতঃ আলোচনা করিবার কিছুই নাই ; তাহাদের যাহা দিবে, তাহারা তাহাই আলোচনা করিবে। আলোচনার পথ দেখাইয়া দাও, তাহারা সেই পথে চলিবে ; কেহ কেহ অন্যপথে গেলেও যাইতে পারে ; কিন্তু অধিকাংশ লোক প্রদর্শিত পথে যাইবে। একবিধ পরস্পর সকলে একই প্রণালীতে ভাবিলে ফল ঐকমত্য।

আমি নিজে ঐকমত্যের গোঁড়া নহি, বরং অনেক সময় মতের অনৈক্যে উন্নতি সম্ভব বিবেচনা করি। কিন্তু অন্যকে যে মতাবলম্বী করিতে চাহি না। যদি এক্ষণে বাঙ্গালার সামাজিক উন্নতি চাও, তবে বাঙ্গালার দশলক্ষ লোককে পড়াইতে চেষ্টা কর, তাহার পর বঙ্গসমাজ নিশ্চয় নূতন হইবে।

দশলক্ষ লোক পড়াইবার চেষ্টা করা কঠিন। যাঁহারা এই চেষ্টা করিবেন এবং ক্রমে কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহারা বঙ্গমাতার সার্থক সন্তান, তাঁহারা ইংরেজি উপাধিধারী "ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া" "নাইট কমাণ্ডার" অথবা বাঙ্গালা উপাধিধারী, রাজাবাহাদুর, মহারাজবাহাদুর অপেক্ষা শতগুণে পূজ্য ও মান্য।

বিশেষ জানি না যে, কে এক্ষণে বাঙ্গালির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মান্য। তিনি যিনিই হউন, অনুসন্ধান করিলে হয় ত দেখা যাইবে যে, ধনাঢ্য রাজবংশোদ্ভব বলিয়া তিনি মান্য। তাঁহার মান্যের হেতু জন্ম। তিনি নিজের কার্য্যের নিমিত্ত মান্য কি গণ্য নহেন; যদি তিনি কখন কোন কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হয় ত কেবল অনুরোধে। আবার হয় ত সে কার্য্য চাঁদা দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাঁহারা চাঁদার জন্য মান্য, তাঁহারা অবশ্য মান্য, তাঁহাদের চাঁদায় দেশের অনেক মঙ্গলকর কার্য্য সম্পাদিত হয়, যাঁহারা চাঁদা দেওয়ান তাঁহারা আরও মান্য। কিন্তু যাঁহারা চাঁদা করান তাঁহারাই সৎকার্য্যের মূল। তাঁহারা নিজে প্রায়ই নির্ধন, এ পৃথিবীর ভাল কার্য্যই নির্ধনেরদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে; এস্থলে বিলাতের ইতিহাস নাড়া দিয়া এ কথা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ধনসম্পন্ন, তাঁহারা প্রায় বিলাসভোগী হইয়া পড়েন, সমাজের মঙ্গল চিন্তা করিবার তাঁহাদের অবকাশ থাকে না, প্রবৃত্তিও হয় না। এ সংসারে কার্য্যক্ষম কেবল নির্ধনেরা। অতএব যদি কখন বঙ্গসমাজের দশলক্ষ লোককে পড়াইবার উদ্যোগ হয়, তাহা নির্ধনেদের দ্বারা হইবে।

যাঁহারা নিঃস্বার্থ হইয়া কেবল আপন চেষ্টায় বাঙ্গালার দশলক্ষ লোককে পড়াইতে পারিবেন, তাঁহাদের দ্বারা বঙ্গসমাজ নূতন হইবে, তাঁহারা যথার্থই বাহাদুর, তাঁহাদের ছিন্নবস্ত্র হইলেও তাঁহারা পূজ্য, তাঁহাদের বাহাদুরী কেহ দেখিবে না সত্য, কিন্তু যে দেখিবে সেই বুঝিবে।

এক্ষণে কি উপায়দ্বারা তাঁহারা বঙ্গসমাজকে পড়াইবেন। মনে কর, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দুই চারিজন বাঙ্গালার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এই ব্রত গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা মনে মনে একান্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দুইটিকে পারেন, দশটীকে পারেন, যত লোককে পারেন, পড়িবার প্রবৃত্তি দিবেন, কিন্তু প্রবর্ত্তিত ব্যক্তিরা কি পড়িবে? সকলেই পড়িতে পারে এরূপ সংবাদপত্র কি সাময়িকপত্র ত কিছুই নাই। যে সকল সংবাদপত্র আছে, তাহাতে ফর্ম্মাণদেশের রাজনীতি, অথবা রুসদেশের কাটিকক নটিকক প্রভৃতির মন্ত্রণা বা ঘটনা লিখিত থাকে, তাহাতে বাঙ্গালির সহানুভূতি কেন জন্মিবে। যে সকল সাময়িকপত্রিকা আছে, তাহাতে হয় ত বিলাতি দর্শনের কচকচি, না হয় অন্য মাথামুণ্ড লিখিত থাকে, লোকের তাহা ভাল লাগে না, যাহা তাহাদের ভাল লাগিবে, তাহা কে তাহাদের দিবে? যাঁহারা বিশেষ বিদ্বান্ সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত লেখা তাঁহাদের সাধ্য নহে; বিদ্যাভারগ্রস্তেরা লিখিতে গেলে বিদ্যার ভেঙ্কী লাগে, তাঁহারা যাহা লেখেন, লোকে তাহা বুঝে না, কেবল

বিদ্বানেরা পরস্পর বুঝেন। তাহাই বোধ হয় সেকালের সংস্কার ছিল, "পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্যা পূরিয়া।" যে বিদ্বানের লেখা বুঝা যায় না তিনি যেন নিদ্রিত থাকেন।

একণে জিজ্ঞাস্য যে, তবে বাঙ্গালার দশলক্ষ লোকের নিমিত্ত কে লিখিবে? আমরা বলি যে, যে সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি অপর সাধারণ লোকের সহিত মন মিলাইতে পারেন; যাঁহারা বুঝেন, লোকেরা কিরূপ চিন্তা করে; সে চিন্তার প্রণালী কি; কোন্ কথার পর তাহাদের কোন কথা মনে আইসে;—তাঁহারাই একণে সাধারণের লেখক হইতে পারেন। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি অতি অল্প, অনুসন্ধান করিলেও পাওয়া কঠিন।

অতএব একণে পরামর্শ আবশ্যক। যাঁহারা সংসারী, যাঁহারা কূপে পণ্ডিত হইয়া সাগর ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এ পরামর্শের অনধিকারী। তাঁহারা স্ত্রীর কণ্ঠ রত্নে ভূষিত করুন, তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে সংসার চালাইতে থাকুন, তাঁহারা বাঙ্গালা চালাইবার কেহই নহেন। তাঁহারা আপন ঘরের উন্নতি ভাবুন, বাঙ্গালার উন্নতি ভাবিবার ভার তাঁহাদের নহে? যে যুবারা সংসারের ক্ষুদ্র আয়তনে এপর্য্যন্ত বদ্ধ হয়েন নাই, তাঁহারাই এ পরামর্শের বিশেষ অধিকারী। অতএব তাঁহারা পরামর্শ করুন।

পরামর্শের বিষয় এই যে, কোন সর্ব্বজনীন পত্রিকার একণে অনুষ্ঠান করা উচিত কি না? যদি তাহা উচিত বোধ হয়, তবে সাধারণযোগ্য লেখক জুটিলে কার্য্য আরম্ভ হইবে এরূপ বিবেচনা করিয়া অপেক্ষা করা উচিত কি না। সুন্দর সরল ভাষায় লিখিত যে কয়েকখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা একণে প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে দুই একখানি নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে কি না। তাহার পর পরামর্শ কিরূপে দশলক্ষ লোকের হস্তে সেই পত্রিকা সমর্পিত হইতে পারে।

রত্নরহস্য।

মুক্তা।

আমরা "রত্নরহস্য" মুকুটার্পণ করিয়া যে কয়েকটি প্রস্তাব লিখিয়াছি, তাহাতে মুক্তার জাতি ও গুণাগুণ বিচারিত হইয়াছে। অদ্য সেই প্রস্তাব সমাপ্ত করিব, পরে রত্নান্তরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

মুক্তাসম্বন্ধে প্রধান প্রধান বক্তব্য সকল বলা হইয়াছে, কেবল "বেধকার্য্য" ও মূল্যকল্পনাপ্রণালী বলিতে অবশিষ্ট আছে, সুতরাং মূল্যকল্পনাতেই প্রস্তাবের শেষ হইবে।

বিদ্ধ করিবার বিধি।

মুক্তাকে একপ্রকার প্রস্তর বলিলেও বলা যায়। মুক্তা অতি কঠিন পদার্থ; সুতরাং তাহার বেধকার্য্য সহজ নহে। ইচ্ছা করিলেই ইচ্ছামত ছিদ্র করা যায় না। শুক্তিগর্ভ হইতে মুক্তাফল চয়ন করিয়া তাহাকে প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা সংস্কৃত করিতে পারিলে তবে তাহা সুখবেধ্য হয়। মুক্তাব্যবসায়ীরা যে প্রক্রিয়াদ্বারা মুক্তা সুখবেধ্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, সে প্রক্রিয়া রত্নশাস্ত্রে অতি উত্তমরূপে উপদিষ্ট আছে। যথা—

"কৃত্বা পচেৎ সুপিহিতে শুভদারভাণ্ডে,
মুক্তাফলং নিহিতনূতনশুক্তিকাণ্ডম্।
স্ফোটস্তথা প্রণিদধীত ততশ্চ ভাণ্ডাৎ,
সংস্থাপ্য ধান্যনিচয়ে চ তমেকমাসম্॥
আদায় তৎ সকলমেব ততোন্ন ভাণ্ডম্।*
ক্ষীরজাত রসযোজনয়া বিপক্কম্॥
ঘৃষ্টং ততো মৃদুতনূকৃত পিণ্ডমূলৈঃ কুর্য্যাৎ
যথেচ্ছ মিহ মৌক্তিক মাশুবিদ্ধম্॥

শুক্তিগর্ভ হইতে মুক্তাফল আহরণ করিয়া, অন্য এক শূন্য গর্ভ শুক্তির মধ্যে রাখিয়া পুটিতকরতঃ "দার†" নামক দ্রব্যেরদ্বারা ভাণ্ডরচনা করিয়া তন্মধ্যে রাখিবেক। যে পরিমাণ পাকে কিঞ্চিৎ স্ফোটতা (উচ্ছূনতা) জন্মে, সেই পরিমাণ পাক হইলে মুক্তাসকল ভাণ্ড হইতে বাহির করিবে। একমাসকাল ধান্য রাশিমধ্যে স্থাপন করিবে। একমাস

---

* "অন্নভাণ্ডং" পাঠের পরিবর্ত্তে কোন কোন পুস্তকে "অনাভাণ্ডম" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কোন পাঠ যথার্থ, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে অসমর্থ। যাহারা মুক্তার শোধনাদি কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারাই এরূপ পাঠাপাঠের বিচার করিবার যথার্থ অধিকারী।

† এই "দার" দ্রব্যের বাঙ্গালা নাম কি তাহা আমরা জানি না। অভিধানগ্রন্থে দেখা যায়, "দার নামে একপ্রকার ওষধি আছে" কেহ কেহ "দারুভাণ্ডে" এরূপও পাঠ করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, কাষ্ঠনির্ম্মিত কি বনজ ওষধিনির্ম্মিত পাত্র যে কিরূপে পাকক্রিয়ায় ব্যবহার করিতে পারা যায়, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।

পরে সেই সকল মুক্তা অম্লযুক্ত অন্য ভাণ্ডে জামির লেবুর রসসংযোগে পাক করিবে। পরে মদনবৃক্ষমূলের সূক্ষ্ম ও মৃদু কুচী প্রস্তুত করিয়া ঘর্ষণ করিবে। এইরূপ করিলে মুক্তাসকলে ইচ্ছানুরূপ ছিদ্র করা যাইবে।

শোধন বিধি।

শুক্তিগর্ভে থাকা অবস্থায় মুক্তার ঔজ্জ্বল্য ও সুকান্তি থাকে না। মণিকারেরা প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা তাহার মালিন্য দূর করিয়া অতি উত্তম কান্তিযুক্ত করিয়া থাকে। গরুড়পুরাণ ও যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে মুক্তার ঔজ্জ্বল্যবৃদ্ধি ও নির্ম্মলীকরণসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে।

মৃল্লিপ্ত মৎস্যপুটমধ্যে গতন্তু কৃত্বা,
পশ্চাৎপচেত্তদনু ততশ্চ বিতানপত্র্যা।
দুগ্ধে ততঃ পয়সি তদ্বিপচেৎ সুধায়াং
পক্কস্ততোঽপি পয়সা শুচি চিক্কণেন।
শুদ্ধং ততো বিমলবস্ত্র নিঘর্ষণেন
স্যান্মৌক্তিকং বিমল সদ্গুণকান্তিজালম্।

অর্থ এই যে, মুক্তাসকল মৃত্তিকালিপ্ত মৎস্যপুটযন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া উশীরমূলযুক্ত দুগ্ধে পাক, তৎপরে উষ্ণজলে প্রক্ষেপ, পরে সুধা অর্থাৎ চূর্ণদ্রবে পাক, তৎপশ্চাৎ পুনরপি কেবল জলে পাক করিবে। অনন্তর নির্ম্মল, শুভ্র ও সূক্ষ্ম বস্ত্রেরদ্বারা মার্জ্জন করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারাই মুক্তাসকল নির্ম্মল ও ঔজ্জ্বল্যযুক্ত হয়, এবং সৎগুণ ও সুকান্তি ধারণ করে।*

কৃত্রিমতা পরীক্ষা।

মুক্তা অতি মূল্যবান্ ও সুন্দর পদার্থ। ভারতবাসীরা ইহাকে মহারত্ন বলিয়া আদর করিয়া থাকেন। আদর ও মূল্যের আধিক্য থাকিলেই তৎসঙ্গে তাহার কৃত্রিমতা ঘটিয়া থাকে। মুক্তাও মূল্যবান্ ও আদরের বস্তু বলিয়া দুষ্টলোকেরা তাহাতে কৃত্রিমতা করিয়া থাকে। যুক্তিকল্পতরুকার ভোজদেব লিখিয়াছেন, যে, সিংহলদেশের কৌশলী মনুষ্যেরা অতি আশ্চর্য্য কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিয়া ক্রেতাদিগের মনোহরণ করিয়া থাকে। তাহারা কাচের ন্যায় শুভ্র "তার" রজতে তৎ শতাংশ হেম (সুবর্ণ) যোগ দিয়া পারদমধ্যে রক্ষাকরতঃ একপ্রকার মুক্তা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সে মুক্তা দেহভূষণমাত্র, ফলাফল কিছু নাই।† যুক্তিকল্পতরু বলেন, মুক্তার যদি কৃত্রিমতা সন্দেহ হয়, তবে তাহার পরীক্ষার্থ এইরূপ প্রক্রিয়ার আশ্রয় লওয়া আবশ্যক। যথা—

---

* যুক্তিকল্পতরুধৃত সংস্কৃত বাক্যটির সংস্কৃতানুরূপ অর্থ এইরূপ; পরন্তু মুক্তাব্যবসায়ীরা যে কিরূপ করিয়া থাকেন তাহা আমরা অনুসন্ধান করি নাই।

† "শ্বেতকাচসমং তারং হেমাংশশতযোজিতম্। রসমধ্যে প্রধার্য্যোক্ত মৌক্তিকং দেহভূষণম্।। এবং হি সিংহলে দেশে কুর্ব্বন্তি কুশলা জনাঃ"—ইত্যাদি।

"যস্মিন কৃত্রিম সন্দেহঃ ক্বচিদ্ভবতি মৌক্তিকে ।
উষ্ণে সলবণে স্নেহে নিশাং তদ্বাসয়েজ্জলে ।
ব্রীহিভির্মর্দ্দনীয়ং বা শুষ্ক বস্ত্রোপবেষ্টিতম্।
যত্তু নায়াতি বৈবর্ণ্যং বিজ্ঞেয়ং তদকৃত্রিমম্।"

যদি কোন মুক্তা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে তাহা জলে ও উষ্ণ সলবণ স্নেহে অর্থাৎ লবণাক্ত তৈল কিম্বা ঘৃত প্রভৃতির মধ্যে একরাত্র রাখিয়া দেখিবেক অথবা শুষ্কবস্ত্রের মধ্যে রাখিয়া ধান্যদ্বারা ঘর্ষণ করিবেক। এইরূপ করিলে যদি বিবর্ণ না হয়, তবেই সে মুক্তা অকৃত্রিম জানিবে।

সিংহলীয় শিল্পীরা যেমন নানা উপাদানে কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিতে পারিত, তেমনি ব্যাড়ি প্রভৃতি মুনিরাও তাহার নানাপ্রকার পরীক্ষা করিতে পারিতেন।

* কল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে কৃত্রিম মুক্তাপরীক্ষাসম্বন্ধে অন্য কয়েকটি বচন আছে। তাহা এই—

"ক্ষিপেৎ গোমূত্র ভাণ্ডে তু লবণক্ষারসংযুতে।
স্বেদয়েদ্বহ্নিনা বাপি শুষ্কবস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
হস্তে মৌক্তিক মাদায় ব্রীহিভিশ্চোপঘর্ষয়েৎ।
কৃত্রিমং ভঙ্গমাপ্নোতি সহজঞ্চাতিদীপ্যতে॥"

কৃত্রিম কি অকৃত্রিম, সন্দেহ হইলে তাহা লবণ ও ক্ষারসংযুক্ত গোমূত্রভাণ্ডে ফেলিয়া রাখিবেক, অথবা বহ্নিদ্বারা স্বেদ লাগাইবেক। অনন্তর শুষ্কবস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া পশ্চাৎ তাহা হস্ততলে রাখিয়া ধান্যের সহিত মর্দ্দন করিবেক। যদি কৃত্রিম হয়, তবে ভাঙ্গিয়া যাইবেক, আর যদি অকৃত্রিম হয়, তবে তাহা ভাঙ্গিবে না, প্রত্যুত নির্ম্মল দীপ্তিযুক্ত হইবেক।

মূল্য ব্যবস্থা।

যুক্তিকল্পতরু, গরুড়পুরাণ ও বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে মুক্তার দোষ, গুণ, ও শোধনবিধি প্রভৃতি যেরূপ বিচারিত হইয়াছে, তাহা বলা হইল, মূল্যের নিয়মও উক্ত গ্রন্থে কথিত আছে, এক্ষণে তাহারও কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বকালে ভার, তেজ, কান্তি এবং অন্যান্য গুণনিচয় (যাহা পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে) অনুসারেই মুক্তার মূল্যাবধারণ করা হইত। এখন আর প্রায় সেরূপ প্রথা দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বকালে

* "ব্যাড়ির্জগদে জগতাংহি মহাপ্রভাব সিদ্ধোবিদগ্ধহিত তৎপরয়াদয়ালুঃ" ইত্যাদি॥

যেরূপ আকারের মুক্তা যে পরিমাণ মূল্যে বিক্রীত হইত, তাহা বৃহৎসংহিতার বচননিচয় আলোচনা করিলেই জানা যায়। তাহাতে লিখিত আছে,

"মাষক চতুষ্টয়ধৃত স্যৈকস্য শতাহতানি পঞ্চাশৎ।
কার্ষাপণা নিগদিতা মূল্যং তেজো গুণযুতস্য।"

৪ মাষক* পরিমিত অর্থাৎ ২০ রতি ওজনের মুক্তা যদি তেজ ও সুতার সুবৃত্ত ইত্যাদি গুণযুক্ত হয়, তবে তাহার মূল্য শতগুণিত ত্রিপঞ্চাশৎ কার্ষাপণ অর্থাৎ ৫৩০০০ শত কার্ষাপণ। যুক্তিকল্পতরুর অন্য প্রমাণ এই—

একস্য শুক্তি প্রভবস্য শুদ্ধ,
মুক্তামণেঃ শাণক সম্মিতস্য।
মূল্যং সহস্রাণি কপর্দকানি
ত্রিভিঃ শতৈ রভ্যধিকানি পঞ্চ।"

শুক্তিজাত বিশুদ্ধ মুক্তামণি যদি শাণ অর্থাৎ ৪ মাষা পরিমিত হয়, তবে তাহার একটির মূল্য ৫ অধিক তিনশত সহস্র কপর্দক। অপিচ—

"চতুঃসহস্রং লভতেহর্দ্ধমূল্যম্"

তাদৃশ গুণযুক্ত মুক্তা যদি তদপেক্ষা অর্দ্ধমাস ন্যূন ভারি হয়, তবে তাহার মূল্য চারিসহস্র কপর্দ্দক হইবে।

বৃহৎসংহিতায় অন্য এক প্রমাণের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

"মাষকদলহান্যাঽতো
দ্বাত্রিংশৎ বিংশতি ত্রয়োদশ চ।
অষ্টৌ শতানি চ শতত্রয়ং
ত্রিপঞ্চাশতা সহিতম্।"

পূর্ব্বোক্ত ৪ মাষা পরিমাণ হইতে যদি মাষকদল অর্থাৎ একমাসার এক চতুর্থাংশ হীন হয়, তবে তাদৃশ অর্থাৎ ৩॥ মাষা পরিমিত মুক্তার মূল্য ৩২।২০।১৩।৮০০।৩০০।৫৩। কার্ষাপণ। উক্ত গ্রন্থে মূল্যঘটিত বচন অনেক আছে। তাহার অপর একটি বচন এই—

"মস্মাষকাংশহীন বিত্রয়াং গুরুত্বে
যে তস্য মূল্যং পরমং প্রদিষ্টম্।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্থ এই যে, যে মুক্তা গুরুত্বে ৩ মাষা পরিমাণ হয় তাহার মূল্য দুইসহস্র কার্ষাপণ।

পূর্ব্বকালে এইরূপ নিয়মে কপর্দ্দক অর্থাৎ কড়ির বিনিময়ে মুক্তারত্ন ক্রীত বিক্রীত হইত। স্বর্ণ, রৌপ্য কি তাম্রাদি মুদ্রার বিনিময় সময়েও উল্লিখিত কার্ষাপণের নিয়ম ব্যতিক্রান্ত হইত না। ভিন্ন ভিন্ন ওজনের মুক্তার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ অনুসারে রত্নশাস্ত্রে যেরূপ

* "মাস" শব্দের অর্থ অনেক। মাষশব্দে অন্নাত্মক কলায় ও পরিমাণবিশেষ বুঝাইয়া থাকে। পরিমাণসম্বন্ধেও নানা মত দৃষ্ট হয়। এখানে মাষশব্দের অর্থ ৫ গুঞ্জা পরিমাণ গ্রহণ করিতে হইবেক। যেহেতু মণি, মুক্তাসম্বন্ধে ঐরূপ পরিমাণ গ্রহণ করিবার জন্য যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে বিস্পষ্ট উক্তি আছে। যথা—"পঞ্চভির্মাষকো জ্ঞেয়ো গুঞ্জাভির্মাষকৈস্তথা। চতুর্ভিঃ শাণমাখ্যাতং মাষকৈর্মণিবেদিভিঃ" ইত্যাদি।

মূল্য অবধারিত আছে, সে সমস্ত সঙ্কলন করা এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু এক্ষণে নূতন প্রণালী প্রবল। অপিচ, নিয়ামক কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে, সেগুলি এস্থলে ব্যক্ত করিলে "মুক্তা কত বড় হইবার সম্ভব?" এই এক কুতূহল চরিতার্থরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে। অতএব, কুতূহল চরিতার্থতার জন্য অন্য ফল না থাকিলেও এস্থলে সেগুলির উল্লেখ করা গেল।

গুঞ্জা...	১ কুচ।	ভিক্ষা......	১৩ ধরণ
মাষক...	৫ „।	দার্বিক...	১৬ „।
শাণ......	২০ „।	সুপূর্ণ......	২০ „।
কুম্ভাণ		শিক্য......	৩০ „।
রূপক		সোম...	৪০ „।*
ধরণ			

বৃহৎসংহিতা অপেক্ষা "যুক্তিকল্পতরু" গ্রন্থে মূল্যসম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ৺রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর শব্দকল্পদ্রুমে কেবল যুক্তিকল্পতরুর বচনমালা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, বৃহৎসংহিতার একটি বচনও উদ্ধৃত করেন নাই। বৃহৎসংহিতাগ্রন্থে ক্ষুদ্র মুক্তার মূল্যসম্বন্ধে কোন নির্দ্ধারিত ও বিশিষ্ট নিয়ম না থাকিলেও "মাষক" পরিমাণ হইতে মূল্যের অতি সুনিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। "মাষক" হইতে "শাণ" পর্য্যন্ত মাষগ্রাহী মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে, কোন এক সাধারণ নিয়ম নাই। "শাণ" হইতেই তাদৃশ সাধারণ নিয়ম অবলম্বীকৃত হইয়াছে। যথা—

শাণাৎপরং মাষক যেক যেকং
যাবদ্বিবর্দ্ধেত গুণৈরপীদম্॥
মূল্যেন তাবৎ দ্বিগুণেন যোগ্য
মাপ্নোত্যনাবৃষ্টিহতেঽপি দেশে॥

"শাণ" পরিমাণের পর, ওজনে যত মাষা অধিক হইবে, অনাবৃষ্টিহত দেশেও তাহার প্রত্যেক অধিক মাষার মূল্যের দ্বৈগুণ্য স্থির থাকিবেক। ভোজদেবকৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে,—

"সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মোত্তম মধ্যমানাং
যথোক্তিকানামিহ মূল্য মুক্তম্।
তজ্জাতিমাত্রেণ ন জাতু কার্য্যম্
গুণৈর্বিহীনস্য হি তৎ প্রদিষ্টম্।"

যদুক্ত রত্নশাস্ত্রে সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম, উত্তম ও মধ্যমাদি মুক্তার যেরূপ মূল্যাবধারণ করা হইয়াছে, তাহা, যে সে মুক্তার জন্য নহে। মুক্তার যে সকল গুণ বর্ণিত হইয়াছে, যদি সেই সকল গুণ থাকে, তবেই সে মুক্তা নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রীত হওয়ার যোগ্য।

"যত্ন্ চন্দ্রাংশুসঙ্কাশ নীরবিম্বকলাকৃতি,
অমূল্যাং সপ্তমং ভাগ মযুতখ্যাপয়েত
তৎ।"

* বৃহৎসংহিতা ও যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে পরিমাণবোধক "নিষ্কপণীর" "কলা" "চূর্ণ" প্রভৃতি আরও কয়েকটি শব্দ আছে, তদ্দ্বারা অনুমান হয়, যে, প্রাচীনকালে কেহ না কেহ উল্লিখিত পরিমাণের বৃহৎমুক্তা দেখিয়াছিলেন।

যে মুক্তার দীপ্তি চন্দ্রাংশুসদৃশ অর্থাৎ মধুরশুভ্র, কিন্তু আকৃতি ঈষৎ বিম্বফলের ন্যায় অর্থাৎ সুগোল নহে, সে মুক্তার মূল্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যের সপ্তমভাগের এক ভাগ হইবেক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে, মুক্তার আকারগত বৈলক্ষণ্য অনেকবিধ হইয়া থাকে। মুক্তার গঠন যতই বিলক্ষণ হউক, সুবৃত্ত অর্থাৎ সুগোল মুক্তারই মূল্য অধিক। গোলতার তারতম্যানুসারে বিষমগঠনের মুক্তার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ,

"পীতকস্য ভবেদর্দ্ধ মবৃত্তস্য ত্রিভাগতঃ।
বিষমব্যস্ত জাতীনাং ষড়্‌ভাগং মূল্যমাদিশেৎ।"

গুণযুক্ত ও অবৃত্ত মুক্তা অপেক্ষা পীতক জাতীয় মুক্তার অর্দ্ধ মূল্য হইয়া থাকে। আর বিষম ও ব্যস্তজাতীয় মুক্তাসকলের মূল্য প্রকৃতাবস্থ মুক্তা অপেক্ষা ছয়ভাগের একভাগ হয়।

অর্দ্ধরূপানি সস্ফোটাৎ পঙ্কচূর্ণানি যানিচ।
অসারাণি চ যানি স্যুঃ করকাকার বন্তিচ॥
একদেশ প্রভাবন্তি সকলান্তেবিকানি চ॥
যানি চাতকবর্ণানি কাংস্যবর্ণানি যানি চ।
মীননেত্রসবর্ণানি গ্রন্থিভিঃ সংযুক্তানি চ॥
সদোষাণি চ যানি স্যুস্তেষাং মূল্যং পাদাংশিকম্॥

যে মুক্তা স্ফোটযুক্ত, কি অর্দ্ধরূপ, এবং যে মুক্তা পঙ্কচূর্ণ অর্থাৎ চূর্ণবিন্দুবিলিপ্তের ন্যায় দৃষ্ট হয়, যে মুক্তা সাররহিত, যাহা করকার ন্যায় আকারযুক্ত, যাহার একদেশমাত্র প্রভাযুক্ত, যাহাতে সুসূক্ষ্ম শুক্তিখণ্ড আশ্লিষ্ট থাকে, যাহার বর্ণ চাতকবর্ণের সদৃশ, অথবা কাংস্যবর্ণের সদৃশ কিম্বা মীননেত্রের ন্যায়, যাহা গ্রন্থিযুক্ত অথবা অন্য কোন দোষে দূষিত, সে মুক্তার মূল্য প্রকৃত অপেক্ষা একচতুর্থাংশ।

রত্নশাস্ত্রে মুক্তার মূল্যসম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্ত্তা থাকিলেও এই স্থানেই শেষ করা গেল। যেহেতু এরূপ প্রস্তাবের কুতূহল চরিতার্থতা ভিন্ন অন্য কোন ব্যবহারযোগ্য ফল নাই।

আর এক কথা—কল্পদ্রুমঅভিধানে যুক্তিকল্পতরু ও গরুড়পুরাণের বচন ভিন্ন বৃহৎসংহিতা ও মুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের একটি কথাও লিখিত হয় নাই। এক্ষণে তাহা হইতে মুক্তাহারসম্বন্ধীয় দুই একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করা বিধেয় বোধ হইতেছে। হারের যে ভাগকে আমরা "নহর" বলি, তাহার সংস্কৃত নাম "লতা।" কোন কোন স্থানে "হার" বলিয়াও উল্লেখিত হয়। বৃহৎসংহিতা বলেন, ভূষণবেত্তা পণ্ডিতেরা পৃথক্ পৃথক্ নহরযুক্ত মুক্তাহারের পৃথক্ পৃথক্ নাম দিয়া থাকেন যথা—"ইন্দ্রচ্ছন্দ" "বিজয়চ্ছন্দ" "দেবচ্ছন্দ" "অর্দ্ধহার" "হার" "রশ্মিকলাপ" "গুচ্ছ" "অর্দ্ধগুচ্ছ" "মাণবক"

"অর্দ্ধমাণবক" "মন্দর" "হারফলক" "নক্ষত্রমালা" "মণিসোপান" "চাটুকার" "একাবলী" "যষ্টি।"

দীর্ঘে চতুর্হস্ত এবং লতায় (নহর) অষ্টাধিক সহস্র।* এরূপ মুক্তাহারের নাম "ইন্দ্রচ্ছন্দ" ইহা দেবতাদের ভূষণ। ইহার অর্দ্ধেক হইলে "বিজয়চ্ছন্দ" অষ্টাধিক শতসংখ্যক নহরের মুক্তাহার "দেবচ্ছন্দ" নামে কীর্ত্তিত হয়। একাশীতি লতাযুক্ত হইলে "হার" এবং চতুঃষষ্টি হইলে "অর্দ্ধহার।" ৫৪ কিম্বা ৬৯ নহর হইলে "রশ্মিকলাপ" ৩২ হইলে "গুচ্ছ" এবং ২০ হইলে "অর্দ্ধগুচ্ছ। ১৬ হইলে "মানবক" ১২ হইলে "অর্দ্ধমানবক" ৮ হইলে "মন্দর" ৫ নহর হইলে "হারফলক।" ২৭ হইলে "নক্ষত্রমালা" অথবা "মুক্তাহস্ত" কিম্বা মধ্যমণি এবং স্বর্ণগুলিকা থাকিলে তাহাকে "মণিসোপান" বলা যায়। এরূপ হার যদি তরলক অর্থাৎ মধ্যমণিযুক্ত হয় তবে তাহাকে "চাটুকার" সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

ইচ্ছানুরূপসংখ্যক মুক্তাহারদ্বারা যে মণিহীন ও হস্তপরিমিত মালা প্রস্তুত হয় তাহার নাম "একাবলী" আর সেই একাবলী মালার মধ্যস্থলে যদি মণি থাকে, তবে তাহার নাম "যষ্টি।" এই সংজ্ঞাসমূহের নির্ণায়ক বৃহৎসংহিতার বচনসমূহ এই—

সুরভূষণং লতানাং
সহস্রমষ্টোত্তরং চতুর্হস্তম্।
ইন্দ্রচ্ছন্দো নাম্না
বিজয়চ্ছন্দস্তদর্দ্ধেন॥
শতমষ্টযুতং হারো
দেবচ্ছন্দো হ্যশীতিরেকযুতা।
অষ্টাষ্টকোঽর্দ্ধহারো
রশ্মিকলাপশ্চ নবষট্কঃ॥
দ্বাত্রিংশতা তু গুচ্ছো
বিংশত্যা কীর্ত্তিতোঽর্দ্ধগুচ্ছাখ্যঃ।
ষোড়শভির্মাণবকো
দ্বাদশভিশ্চার্দ্ধমাণবকঃ॥
মন্দর সংজ্ঞোঽষ্টাভিঃ
পঞ্চলতা হার ফলকমিত্যুক্তম্।
সপ্তাবিংশতি মুক্তা
হস্তো নক্ষত্রমালেতি॥
অন্তর মণিসংযুক্তা
মণিসোপানং সুবর্ণগুলিকৈর্বা।
তরলকমণিমধ্যং তদ্
বিজ্ঞেয়ং চাটুকারমিতি॥
একাবলী নাম যথেষ্ট সংখ্যা
হস্তপ্রমাণা মণিবিপ্রযুক্তা।
সংযোজিতা যা মণিনা তু মধ্যে
যষ্টীতি সা ভূষণবিভিজ্ঞা॥

এইস্থানেই রত্নরহস্যের "মুক্তা" প্রস্তাব সমাপ্ত হইল। শাস্ত্রান্তরে এত-

* কেহ কেহ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক "নহর" নহে, অষ্টোত্তর সহস্র "মুক্তা।"

দপেক্ষা অধিক কথা থাকিলেও বাহুল্য-ভয়ে গ্রহণ করা হইল না। মুক্তাবলী নামক গ্রন্থে মুক্তার অনেকগুলি নাম একত্র পর্য্যায়বদ্ধ হইয়াছে। যথা——

"অন্তঃসারং শৌক্তিকেয় সিন্দুরত্ন চ মৌক্তিকম্"

ইত্যাদি ক্রমে দৃষ্ট করিবেন॥

শ্রীরামদাস সেন।



মাধবীলতা।

২৮

মাধবীলতার মাতা, পদ্মের মুখে আপনার কলঙ্ক শুনিয়া প্রথমে অপঘাত মৃত্যুকল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মরিলে পুঁটুর কি উপায় হইবে, এই কথা স্মরণ হইলে আর মরিতে পারিলেন না,রাত্রিশেষে নিদ্রিত পুঁটুকে বক্ষে করিয়া গৃহত্যাগ করিবেন এই স্থির করিলেন।

সেই রাত্রে পুঁটুর মা বহুক্ষণ অবধি নিদ্রিত পতির পদসেবা করিলেন, তাহার পর স্বর্ণালঙ্কারগুলি একে একে অঙ্গচ্যুত করিয়া আপনার "টেপারির" মধ্যে রাখিয়া তাহার চাবি রামসেবকের যজ্ঞোপবীতে বাঁধিয়া দিলেন। আপনার সঙ্গে কি লইবেন, একবার এই কথা তাঁহার মনে আসিল, তাহার পর কেবল পুঁটুর "চুলের দড়িগুলি" বস্ত্রে অঞ্চলাগ্রে বাঁধিলেন। স্বামীর খড়ম দুইখানি পালঙ্কের নিকটে ছিল তাহার ধুলা ঝাড়িয়া হস্তমার্জ্জনা করিয়া যথাস্থানে রাখিলেন, তাহার পর দীপনির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রা হইল না। ঝটিকাপ্রপীড়িত তৃণের ন্যায় পুঁটুর মার অন্তর থরথর কাঁপিতেছিল, যে ঝটিকার বেগে মহাতরু উন্মূলিত ও নিপতিত হয়, সামান্য তৃণের উপর সেই বেগ প্রধাবিত হইলে তৃণ উন্মূলিত হয় না, মরেও না, কেবল অনবরত ধুলায় লুণ্ঠিত হইতে থাকে; কষ্টের সীমা থাকে না। পুঁটুর মার দশা সেইরূপ হইয়াছিল।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। যাত্রার সময় উপস্থিত দেখিয়া পুঁটুর মা শয্যা হইতে উঠিলেন। স্বামীকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে তাঁহার পালঙ্কের নিকটবর্ত্তী হইলেন। ধীরে ধীরে নিদ্রিত রামসেবকের পাদমূলে

মস্তক রাখিলেন, অমনি চক্ষে জল আসিল; পুঁটুর মা নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন, তাহার পর স্বামীর পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন। জন্মের মত যাইবার সময় একবার স্বামীকে না দেখিয়াই বা কিরূপে যান; পুঁটুর মা সুতরাং প্রদীপ জ্বালিলেন, আলোকে নিদ্রিত স্বামীর স্নেহময় মুখ আরও স্নেহপূর্ণ দেখিয়া পুঁটুর মার চক্ষে আবার জল আসিল। রামসেবককে পুঁটুর মা নিত্য নিদ্রিত দেখেন, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি ত আর কখন এরূপ দেখেন নাই। চক্ষু মুছিয়া পুঁটুর মা রামসেবকের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন; বাল্যকাল হইতে রামসেবক পুঁটুর মাকে যত আদর করিয়াছিলেন, যত যত্ন করিয়াছিলেন, সে আদর, সে যত্ন, সে স্নেহ, সমুদয় যেন তাঁহার মুখে অদ্য একত্রিত হইয়াছে; সজলনয়নে কেবল সেই প্রেমময় মুখ দেখিতেছিলেন। আবার দেখিলেন নিদ্রিত স্বামী যেন নিঃসহায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। পুঁটুর মার আর যাওয়া হইল না, প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া স্বস্থানে গিয়া শয়ন করিলেন। প্রদীপনির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে গৃহমধ্য কতকটা অন্ধকারাবৃত হইল, তখন ক্রমে পদ্মকে আবার স্মরণ হইল, স্মরণমাত্রেই কলঙ্করটনা বিদ্যুতাগ্নির ন্যায় পুঁটুর মার অন্তরে জ্বলিয়া উঠিল, আর শয়ন করা হইল না। প্রাতে স্বামী সেই কলঙ্ক অবশ্য শুনিবেন, এই মনে হইবামাত্র আর থাকিতে পারিলেন না। পুঁটুর মা পুঁটুকে বক্ষে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। ঠাকুরঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া গৃহদেবতা শালগ্রামকে প্রণাম করিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ঠাকুর! বৃদ্ধা খাশুড়ি রহিলেন, যেন তাঁর কোন পীড়া না হয়। আর যিনি তোমার নিত্য পূজা করেন, তাঁহার যেন কোন বিপদ্ না হয়।" পুঁটুর মা আবার প্রণাম করিলেন। তাহার পর বৃদ্ধা খাশুড়ির দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন, উদ্দেশে তাঁহাকেও প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা! আশীর্ব্বাদ কর, পথে যেন আমার পুঁটুর কোন বিপদ্ হয় না।" এই বলিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে দুই এক পদ যাইতে লাগিলেন, যাইতে যাইতে স্বামীর দ্বারের দিকে একবার ফিরিয়া দেখিলেন, দেখিবামাত্র স্বামীর নিঃসহায় মূর্ত্তি মনে পড়িল, আর একবার তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ফিরিলেন কিন্তু দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মস্তক নত করিয়া নিদ্রিত স্বামীর উদ্দেশে আবার প্রণাম করিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে পুঁটুর মা খড়কীদ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন। পথে আসিয়া পুঁটুকে অঞ্চলদ্বারা আবৃত করিলেন, জলাহরণ উপলক্ষে নিত্য দীর্ঘিকায় যাতায়াত তাঁহার অভ্যাস ছিল, অতএব অভ্যাসবশতঃ

সেই দিকেই চলিলেন। নীলাকাশে শত শত নক্ষত্র জ্বলিতেছে, স্নিগ্ধবায়ু ধীরে ধীরে আসিতেছে, অথচ অঙ্গস্পর্শ করিতেছে না, ক্ষীণ চন্দ্রালোকে বৃক্ষ সমুদয় নিস্পন্দ রহিয়াছে, গৃহমাত্রেরই দ্বার রুদ্ধ, পথে কেহ নাই, পুঁটুর মা এ সকল কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তিনি অভ্যাসবশতঃ একেবারে পুষ্করিণীর কূলে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও অল্প রাত্রি আছে। তথায় দাঁড়াইয়া পুঁটুর মা ক্রমে ক্রমে আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, স্বামীর অজ্ঞাতে রাত্রিকালে বাটীর বাহির হইয়াছেন, রামসেবক হয় ত এতক্ষণ জাগরিত হইয়া তাহা জানিতে পারিয়াছেন, এতক্ষণ হয় ত অনুসন্ধান করিতে বাহির হইয়াছেন, তাঁহার এতক্ষণ দৃঢ়প্রত্যয় হইয়াছে যে, তাঁহার স্ত্রী পতিব্রতা নহে। এই কথা মনে হইবামাত্র পুঁটুর মা শিহরিয়া উঠিলেন, লজ্জায় মৃতবৎ হইলেন, অবনতমুখে সরোবরকূলে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। অনেকক্ষণের পর মাথা তুলিয়া দেখিলেন, ম্লানশশী যেন তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। অমনি আপনার গৃহ মনে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, জন্মের মত তিনি গৃহসুখে বঞ্চিত হইয়াছেন। এই সময় নিকটস্থ অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে পক্ষীরা কলরব করিয়া উঠিল। পুঁটুর মা দেখিলেন, পূর্ব্বদিক্ পরিষ্কার হইয়াছে, এখনই লোকে যাতায়াত আরম্ভ করিবে, অতএব তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া প্রান্তরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিয়দ্দূর গেলে পর সূর্য্যোদয় হইল। পুঁটুর মা আবার কতকদূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, শান্তিশতগ্রাম আর দেখা যায় না; কেবল রামসীতার মন্দিরের অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে। তাহার রৌপ্যচূড়া সূর্য্যকিরণে হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে, পুঁটুর মা সেইখানে দাঁড়াইয়া রামসীতাকে প্রণাম করিলেন; মাথায় হাত দিয়া পুঁটুকেও প্রণাম করাইলেন। পুঁটু ক্রোড় হইতে কখন ক্ষুদ্র পদ দোলাইতেছে, কখন হাত তুলিয়া পক্ষীদের ডাকিতেছে, কখন মাতার মুখে হাত দিয়া মাতাকে টানিতেছে। কিন্তু পুঁটুর মা পুঁটুর সঙ্গে আর পূর্ব্বমত কথা কহিতেছেন না, অন্যমনস্কে পথ অতিবাহিত করিতেছেন। কোথা যাইবেন স্থির নাই। প্রথমে পিত্রালয়ে যাইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু কলঙ্ক মনে পড়ায়, আর সে দিকে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং যত্র তত্র চলিতে লাগিলেন। কাহাকেও পথের কথা জিজ্ঞাসা করেন না; কোথায় যাইবে যাহার স্থির নাই, পথের কথা সে কি জিজ্ঞাসা করিবে? পুঁটুর মা নিজে কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করুন, লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিল। প্রথমে একজন ছিন্নবস্ত্রা বৃদ্ধা প্রশ্ন করিল, "বাছা, কোথা যাবে?" পুঁটুর মা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ

করিয়া বলিলেন, "আমি বাপের বাড়ী যাব।" এই উত্তরে বৃদ্ধা পরিতৃপ্ত হইয়া গোময়সঞ্চয়ন করিতে করিতে বলিল, "তা, যাও বাছা; যাবে বই কি; বাপের বাড়ী যাবে না!" বৃদ্ধা একবার করিয়া কথা কহে, আর একবার করিয়া গোময়সন্ধানে চারিদিক্ দেখে। বৃদ্ধার শ্রোতা আবশ্যক করে না, পুঁটুর মা চলিয়া গেলেন, বৃদ্ধা তখনও বলিতে লাগিল, "চিরকাল কি শ্বশুরবাড়ীতেই থাকিতে হয়?"—"যাও বাছা! জন্ম জন্ম বাপের বাড়ী যাও, বাপের কাছে কে? শ্বশুর বল, শাশুড়ী বল, বাপের কাছে কে?"—"এই যে আমি একা পড়ে থাকি; বাতের কামড়ে চীৎকার করি, পাড়ার পোড়াকপালীরা কে একবার এসে জিজ্ঞাসা করে! মোলো!—সকলেই আপনার ঘরে ঘরে শুয়ে থাকে, পেট পেতে শুয়ে থাকে।"—"ওলো! চিরকাল কিছু সমান যায় না! আমারও এককালে সকল ছিল। আমার মানুষ ছিল, গোরু ছিল, ঢেঁকি ছিল।"—"আর এখন ঢেঁকি ঠেলাইতে পারি না, বুড়া হয়েছি,"—"এমন কপালও করে এসেছিলাম, আলখাগীরা কি এত ভাল কাজ করেছিল যে, সকল সুখ তাদের জন্যে।"—"চোখখাগীরা কলসী কাঁকে পথে চলেন, যেন চোখে কাণে দেখ্‌তে পান না।" বৃদ্ধা মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর আপনা আপনি এইরূপ কথা কহিতেছে। অন্য সময় হইলে পুঁটুর মা দাঁড়াইয়া বৃদ্ধার কথা শুনিতেন।

প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পুঁটুর মা যখন রামপুর নামে একখানি অপরিচিত গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন বেলা প্রায় দ্বিতীয়প্রহর; গ্রামপ্রান্তে একটি দীর্ঘিকায় স্নানার্থ গ্রাম্যলোকেরা যাতায়াত করিতেছিল। পুঁটুর মাও স্নান করিবেন মনে করিলেন, কতকদূর গিয়া দেখেন, পথপ্রান্তে বৃক্ষচ্ছায়ায় দুইজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। দুইজনেই যুবতী, পুঁটুর মার ভয় হইল, তিনি ভাবিলেন, ইহারা আমাকে দেখিয়া হয় ত উপহাস করিবে, হয় ত কি কটু বলিবে। নিকটে অন্য পথ থাকিলে, পুঁটুর মা সেই পথে যাইতেন, এক্ষণে অনন্যগতি হইয়া যুবতীদের দিকে সঙ্কোচিত পদে চলিতে লাগিলেন, এক একবার সভয়ে তাহাদের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। এই সময় একজন ঈষৎ স্থূলাঙ্গী বৃদ্ধা পশ্চাৎ হইতে যুবতীদের বলিল, "এখনও দাঁড়ায়ে কেন? বেলা যে গড়িয়ে গেল।" যুবতীরা সভয়ে ভূমি হইতে আপন আপন কলসী তুলিয়া কক্ষে সংস্থাপন করিতে করিতে পশ্চাৎ ফিরিল। পুঁটুর মাকে দেখিয়া বৃদ্ধা একটু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, তিনি নিকটবর্ত্তী হইলে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে বাছা?" পুঁটুর মা মাথা অবনত করিয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় দাঁড়াইলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

আবার বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যাটি কি তোমার?" পুঁটুর মা মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলেন। এই সময় একজন যুবতী অগ্রসর হইয়া পুঁটুর গাল ধরিয়া আদর করিল।

বৃদ্ধা। বাছা, তুমি কি লোকের মেয়ে?

পুঁটুর মা। ব্রাহ্মণের।

বৃদ্ধা। কোথায় যাবে?

পুঁটুর মা কথা কহিল না।

বৃদ্ধা। তোমার সঙ্গে লোক কই?

পুঁটুর মা কথা কহিল না।

বৃদ্ধা। তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথা? তোমার বাপের বাড়ী কোথা?

পুঁটুর মা তথাপি কথা কহিল না।

বৃদ্ধা। তবে বুঝিছি।

এই বলিয়া বৃদ্ধা আপন কন্যা ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে পশ্চাৎ ফিরিলেন, তাঁহার কন্যা এক একবার পুঁটুর মার প্রতি ফিরিয়া চাহিতেছিল, দেখিয়া বৃদ্ধা বলিল, "চলিয়া চল! গৃহস্থের বউ ঝির ওসকল লোককে ফিরে দেখা কেন।"

কন্যা উত্তর করিল, মেয়েটি বড় সুন্দর, বৃদ্ধা তাহাতে বিরক্তিসহকারে বলিল, "অমন সুন্দরের গলায় দড়ি! যে লোক গৃহস্থের মেয়ে নয়, সে আবার সুন্দর কি?"

এই কথা শুনিবামাত্র পুঁটুর মার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, কিয়ৎক্ষণ পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্ত্রীলোকেরা চলিয়া গেলে, নিকটস্থ এক নির্জ্জন আম্রকাননে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষতলে বসিলেন। মাধবী ধূলায় ক্রীড়া করিতে লাগিল, তিনি বৃক্ষে মাথা হেলাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণের পর চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে অস্পষ্টস্বরে আপনা আপনি বলিলেন, "বুঝেছি, সকলই আমার দোষ। পোড়া লজ্জার ভয়ে আমিই আপনি আপনার সর্ব্বনাশ করেছি।"

বাস্তবিক কথা সত্য, কেবল লজ্জার ভয়ে মাধবীলতার মা গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, কলঙ্কের কথা স্বামী প্রাতে শুনিবেন এই লজ্জায় তিনি পলাইয়াছিলেন। এখন কলঙ্কের কথা শুনা দূরে থাকুক, সন্দেহেরও স্থল রহিল না। এতক্ষণ রামসেবক জানিয়াছেন যে, তাঁহার স্ত্রী নিশ্চয়ই কুলটা। তাহাই মাধবীলতার মা বলিতেছিলেন, "সকলই আমার দোষ।" আর উপায় নাই, আর গৃহে যাইবার পথ নাই। পথে পথে বাস, ভিক্ষা করিয়া দিনযাপন, এই এখন মাধবীলতার মার অদৃষ্টের লিখন। তিনি দার্শনিক নহেন যে, অদৃষ্ট লইয়া তর্ক করিবেন। কার্য্যকুশলী নহেন যে, পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্ট খণ্ডন করিবেন। মহাতেজাও নহেন যে, অদৃষ্টের আয়ত্তাতীত থাকিবেন— অদৃষ্ট যতই পীড়ন করুক, তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, তাহাতে কষ্ট অনুভব না করিয়া, পর্ব্বতের ন্যায় অটল থাকিবেন। মাধবীলতার মাতা সামান্যা; অদৃ-

ষ্টের ভয়ে অতি ভীতা, কষ্টের স্পর্শমাত্রেই পরাজিতা, চক্ষের জল তাঁহার একমাত্র সহায়। পিতৃমাতৃ সম্মুখে চক্ষের জল সহায় হইলে হইতে পারে, কিন্তু অদৃষ্টের সম্মুখে তাহা কিছুই নহে, অশ্রুবর্ষণে কোন ফলই হয় না; তথাপি অদৃষ্টের পীড়নে সামান্য লোকেরা কাঁদে, মাধবীলতার মাও সামান্য লোকের মত কাঁদিলেন। সাধারণতঃ লোকে চক্ষের জল মুছিয়া, অদৃষ্টের প্রদর্শিতপথে চলিতে থাকে, মাধবীলতার মাও চক্ষের জল মুছিয়া অদৃষ্টপ্রদর্শিতপথে চলিবেন অর্থাৎ ভিক্ষা করিবেন স্থির করিলেন। "আমার অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাইবে?" এই বলিয়া পুঁটুর মা দাঁড়াইলেন, পুঁটুর ধূলিধূসরিত অঙ্গ যত্নে ঝাড়িয়া ক্রোড়ে লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

লজ্জাভয়ে অনর্থক আর ইতস্ততঃ না করিয়া, একটি গৃহস্থের খড়কীদ্বারে গিয়া "জয় রাধে" বলিয়া দাঁড়াইলেন। "জয় রাধে" বলিবার সময় একবার তাঁহার চক্ষে জল আসিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা সম্বরণ করিলেন, ঘর প্রাচীর দেখিয়া পুঁটু আহ্লাদে মাতৃক্রোড়ে দুলিয়া হাসিতে লাগিল, মাতা তাহার আহ্লাদ বুঝিতে পারিয়া মুখচুম্বন করিলেন। এই সময় একজন গৃহস্থকন্যা ভিক্ষা আনিল, পুঁটুর মা অঞ্চলাগ্রে তাহা লইয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন। গৃহস্থকন্যা বলিল, "ভিখারিণী একবার ফের ত।" পুঁটুর মা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া ফিরিলেন। গৃহস্থকন্যা বলিল, "তুমি নূতন ভিখারিণী! বুঝিয়াছি, তোমার কপাল পুড়েছে! কুলকলঙ্কিনী!"

ভিখারিণী ফণিনীর ন্যায় মাথা ফিরাইয়া একবার গৃহস্থকন্যার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিল, আর কোন উত্তর না করিয়া সদর্পে অঞ্চল হইতে ভিক্ষোপার্জ্জিত চাউল ভূমে নিক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া গেল। পুঁটুর মা স্বভাবতঃ ভীরু ও লজ্জাশীলা, কেন তাঁহাতে বিপরীত লক্ষণ দৃষ্ট হইল, তাহা বুঝা যায় না। গৃহস্থকন্যার রূঢ়বাক্যে পুঁটুর মার চক্ষে কণামাত্র জল আসিল না, তৎপরিবর্ত্তে ক্রোধাগ্নি উদ্দীপ্ত হইল।

২৯

যে রাত্রে পুঁটুর মা গৃহত্যাগ করিয়া যান, সেই রাত্রের প্রথমভাগে সোহাগী চাকরাণী শয়ন করিয়া পান চর্ব্বণ করিতে করিতে অপর আর এক চাকরাণীকে বলিতেছিল, "ওলো! মেনকার মা, আমার আর এখানে চাকরী করা হলো না।"

মেনকার মা। কেন লা?

সোহা। এখানে কোন সুখ নাই, যাঁর কাছে থাকি, তাঁর না আছে সক, না আছে পছন্দ, না আছে কিছু। আজ এত করে চুয়া চন্দন মিলাইয়া একটু বুকে দিতে গিয়াছিলাম, তাঁর মনে ধরিল না, তিনি বলেন ওতে বড় দুর্গন্ধ। এমন পছন্দ যার তার

পায়ে নমস্কার, আমি কাল সকালেই চলে যাব।

মেন। সকালে কেন, এখনই যা না।

সোহা। রাত্রি অন্ধকার, এখন আমার সঙ্গে কে যাবে?

মেন। যম যাবে।

সোহা। যমের ভাব বুড়ার সঙ্গে? তোর মত বুড়া মাগী পেলে যম বড় খুসী হয়, আমাদের কাছে যম কই আসে।

প্রাতে মেনকার মা উঠিয়া দেখিল যে, সোহাগী সত্যই চলিয়া গিয়াছে। ক্ষণবিলম্বে জানিল যে পুঁটুর মাও বাটী নাই, অতএব রামসেবকের বৃদ্ধা মাতাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেই পোড়ার মুখী সোহাগীর সঙ্গে ঠাকুরাণী কোথায় গিয়েছেন?"

বৃদ্ধা। কি জানি বাছা! সোহাগী সঙ্গে গেছে? তবে আর ভাবনা কি? এখনই আসিবে।

মেনকার মা। পোড়ার মুখ সোহাগীর!

পুঁটুর মা কুলত্যাগী হয়েছে, এ কথা মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইলে পুরুষমহলে মহাকোলাহল বাধিয়া গেল। পরস্পর সকলেই বলিতে লাগিল, "আমিই সর্ব্বাগ্রে বলেছিলাম যে, রামসেবকের স্ত্রী কুলটা।"

প্রথমকোলাহল মন্দীভূত হইয়া আসিলে সকলে রাজার উদ্দেশে তিরস্কার আরম্ভ করিল। সকলেরই স্থির প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, সোহাগীকে রাজা কেবল এই কার্য্যের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। অতএব রাজার প্রতি লোকের ক্রোধ বিষম হইয়া উঠিল। কোথায় তিনি রামসেবকের স্ত্রীকে লুকাইয়াছেন প্রথমতঃ কেবল এই সন্ধান করা সকলের পরামর্শসিদ্ধ হইল।

পুঁটুর মার অনুসন্ধান করিতে যুবারাই আপনা আপনি ব্রতী হইলেন; তাঁহাদের মধ্যে একদল—অধিকাংশই টোলের ছাত্র—স্মৃতিশাস্ত্র তক্তাহস্তে বাহির হইলেন, যেখানেই রুদ্ধদ্বার দেখেন, সেইখানেই তাঁহারা দ্বারভেদ করেন। তাহার পর যখন তাঁহারা শুনিলেন যে, রাজভগিনীর অনুসন্ধানচ্ছলে রাজা নগরত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, "আর নগরে অনুসন্ধান করা বৃথা, রাজা যেখানে, রামসেবকের স্ত্রীও সেইখানে।"

শেষ একদিন সকলেই একত্র হইয়া রামসেবককে অনুরোধ করিলেন যে "তুমি একবার নিজে রাজার নিকট যাও, মাধবীলতার সম্বাদ লইয়া আইস।" রামসেবক সে কথার কোন উত্তর করিলেন না, যজ্ঞোপবীতের গ্রন্থিযুক্ত করিতেছিলেন, নতশিরে তাহাই করিতে লাগিলেন। যে অবধি রাজানুগ্রহে রামসেবক সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার মুখাবলোকন করিত

না, কেহ তাঁহার বাটীতে আসিত না, এক্ষণে তিনি সমাজে ঘৃণিত ও পতিত হইয়াছেন, শুক্তানুধ্যায়ী পল্লীবাসীদের সুতরাং যাতায়াত আরম্ভ হইল। রামসেবক তাঁহাদের কথার প্রায় উত্তর দিতেন না অথচ অসম্মানও করিতেন না। তাঁহার পত্নীর কথা কেহ উপস্থিত করিলে তিনি উঠিয়া স্বতন্ত্র স্থানে তামাক সাজিতে বসিতেন।

রামসেবকের স্ত্রী গৃহত্যাগী হইবায় অধিকাংশ প্রতিবাসিনীরা হাস্য পরিহাসদ্বারা পরস্পরকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। কেবল পদ্ম এ সম্বন্ধে বড় অধিক কথা কহে নাই। পদ্ম হিংসাপরবশ হইয়া পূর্ব্বরাত্রে পুঁটুর মাকে তিরস্কার করিয়াছিল, তখন তিরস্কারের ফল অনুভব করে নাই, পরে পদ্ম যখন শুনিল যে, মাধবীলতার মাতাকে গোপনে রাজা লইয়া গিয়াছেন, তখন পদ্ম নিশ্চয় বুঝিল, যে, তাঁহার তিরস্কারই ইহার মূল। তিনি তিরস্কার না করিলে, মাধবীলতার মা সোহাগীদ্বারা রাজাকে কোন কথা জানাইত না, রাজাও তাঁহাকে লইয়া যাইতেন না; সোহাগী সঙ্গে আছে, এক্ষণে হয় ত তাহার পরামর্শে মাধবীলতার মা রাজার নিকট তিরস্কারের কথা বলিয়া দিবে, পদ্ম এই ভাবনায় মৌনাবলম্বী হইয়াছিলেন।

যখন পদ্মের মনে এই সকল আলোচনা হইতেছিল তখন সোহাগী এক উচ্চ রাজপথ দিয়া নবদ্বীপাভিমুখে যাইতেছিল, সঙ্গে দুই চারিজন বৈষ্ণব আর অনেকগুলি বৈষ্ণবী ছিল, গলায় নূতন কণ্ঠী, হস্তে নূতন খঞ্জনী, পরিধানে শুভ্রবস্ত্র, মুখে মধুর গৌর নাম। পুঁটুর মার গৃহত্যাগবার্ত্তা সোহাগী কিছুই জানিত না। কোন সঙ্গীর অনুরোধে সোহাগী হঠাৎ কণ্ঠীধারণ করিয়াছিল। সোহাগী কিঞ্চিৎ স্বাধীনতাপ্রিয়, একটু গাইতেও ভালবাসে, যখন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিলে আর কিছুই চাহে না, পাঁচজন রসিকা বৈষ্ণবীর সহিত নবদ্বীপে যাইতে তাহার বিশেষ সাধ হইয়াছিল, অতএব আর কাহাকে কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, কেবল পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে একবার রাজবাটীর দুই একজন দাসীকে বলিয়াছিল, "আমরা কাল এক জায়গায় যাব।" দাসীরা জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাবি, সোহাগী হাসিয়া উত্তর করিল, "বলিব না।"

দাসীদের মুখে রাণী যখন শুনিলেন যে সোহাগীর সঙ্গে পুঁটুর মা গৃহত্যাগী হইয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই বুঝিলেন যে, পুঁটুর মা কুলত্যাগী হইয়াছে, নতুবা সোহাগী সঙ্গে কেন? দুই একদিন পরে দাসীদের কথার ভঙ্গীতে যখন তিনি বুঝিলেন যে লোকে এই সম্বন্ধে রাজার কলঙ্ক রটাইয়াছে, তখন রাণী কিছু চমৎকৃতা হইলেন। কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনি মনে মনে এই ঘটনার হেতু বিবেচনা করিতে লাগিলেন। হেতু নির্ণয় অনু-

লক বোধ হইল না, পূর্ব্বকথা আলোচনা করিতে করিতে মনে হইল, রাজা মাধবীলতাকে এত ভালবাসেন কেন? তাহার নিমিত্ত এত অর্থব্যয় করেন কেন? তাহার মাতাকেই বা এত অলঙ্কার দিবার তাৎপর্য্য কি? মাধবীলতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবিকল রাজার মত কেন? দেখিলে মাধবীলতাকে রাজার কন্যা বলিয়া বোধ হয়, এইজন্য হয় ত এখন যমজসন্তানের জন্মকল্পনা করা হইয়াছে। রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, " বুঝেছি।"

জ্যোৎস্নাবতীর উপলক্ষে রাজার প্রতি রাণীর মন পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ ভার হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা আরও বিশেষ হইল, তিনি মনে করিয়াছিলেন, জ্যোৎস্নাবতীর অনুসন্ধানে রাজা আপনি যাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না, লোক পাঠাইলেই ত হইত; তবে রাজা নিজে যে গেলেন, তাহা কেবল তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার নিমিত্ত। তাহার পর এক্ষণে রাণী বুঝিলেন যে, জ্যোৎস্নাবতীর অনুসন্ধান কেবল ছলমাত্র, মাধবীলতার মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াই মূল উদ্দেশ্য। রাণী সর্পীর ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি।"

রাণী নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে একবার সদর্পে উঠিয়া কক্ষান্তরে গিয়া প্রিয়তমা দুই একজন পরিচারিকাকে ডাকিলেন। অতি তীব্রদৃষ্টিতে তাহাদের বলিলেন যে, তোমাদের মধ্যে যে মাধবীলতার অনুসন্ধান করিয়া দিবে সেই আমার স্ত্রীধনের অর্দ্ধাংশী হইবে। দাসীরা প্রথমে ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু রাণীর চাঞ্চল্য কেবল নিজ সন্তান মাধবীলতার নিমিত্ত, এই বুঝিয়া তাহারা নিরুদ্বেগে বলিল, যে মাধবীলতার অনুসন্ধান বিধিমতই হইতেছে, দুই একদিনের মধ্যে সে সম্বাদ পাওয়া যাইবে। রাণী বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন যে, "সে সকল অনুসন্ধান আমি চাই না, আমার ইচ্ছা যে আমার নিজের লোকে এই অনুসন্ধান করে।" এই কথা বলিতে বলিতে রাণীর দৃষ্টি আবার পূর্ব্ববৎ প্রখর হইয়া উঠিল। দাসীরা সভয়ে "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় হইল।

পরদিবস রাজা ইন্দ্রভূপ প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি রাজভগিনীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া প্রথমে পদব্রজে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়াই শিবিকারোহণ করিতে বাধ্য হইলেন। শিবিকায় বসিয়া অনুসন্ধান বড় হয় না, তথাপি তিনি চারিদিক দেখিতে দেখিতে গেলেন, কিন্তু রাজভগিনী পথে কোথাও বসিয়াছিলেন না, সুতরাং রাজা ইন্দ্রভূপ তাঁহার দেখাও পাইলেন না। তিনি যেখানে অবস্থিতি করিতেন, সেইখানেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শাস্ত্রালাপ করিত, সুতরাং রাজভগিনীর অনুসন্ধান করিবার আর তাঁহার সাবকাশ থাকিত না। শেষ তিনি হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাজা, রাজভবনে সমুপস্থিত হইয়া অমাত্যবর্গের সহিত দুই একটা কথা কহিয়াই অন্তঃপুরে গেলেন। রাণী তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া কিঞ্চিৎ মন্দগমনে নিকটে উপস্থিত হইলেন। একজন দাসীকে তাম্বূল আনিতে বলিয়া, রাজার শারীরিক কুশলবার্ত্তা কিঞ্চিৎ ঔদাস্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে জন্য মহারাজের যাওয়া হইয়াছিল, তাহার মঙ্গল?"

রাজা। মঙ্গল আর কেমন করে বলিব, জ্যোৎস্নাবতীর জন্য গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও সাক্ষাৎ পাইলাম না। শেষ আর কি করি, আমি পথে পথে বেড়াইলে ত বিষয়কার্য্য চলে না, সুতরাং ফিরে আসিতে হইল; তবে বড় দুঃখ রহিল যে রাজকন্যা এই কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

রাণী। কে রাজকন্যা? মাধবীলতা?

রাজা। না আমি জ্যোৎস্নাবতীর কথা বলিতেছি, তি—

রাণী। আপনার মাধবীলতার মা যে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

রাজা। তাহা জানি; আমি তাহা এখান হইতে যাইবার পূর্ব্বেই শুনিয়া গিয়াছিলাম।

রাণী। সাক্ষাৎ হইয়াছিল? সেই জন্য কি এত বিলম্ব?

রাজা। সে নিমিত্ত আমি এক্ষণে ব্যস্ত নহি; আমি এখন ব্যস্ত জ্যোৎস্নাবতীর নিমিত্ত; তাহার অনুসন্ধান কিরূপে পাইব!

রাণী। মাধবীলতার জন্য আপনি যে ব্যস্ত হইবেন না, তাহা কতক বুঝিয়াছিলাম।

এই বলিয়া রাণী হঠাৎ কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় দাসীকে বলিয়া গেলেন, তুমি ব্যজন কর, আমার আসিতে বিলম্ব হবে।

উভয়ে উভয়ের শেষ কথার অর্থ বিপরীত ভাবিলেন। রাজা বুঝিলেন যে, মাধবীলতার জন্য আমি বড় ব্যস্ত নহি, এ কথা বলায় রাণীর অভিমান হইয়াছে। হওয়াই সম্ভব, কেন না রাণী তাহার গর্ভধারিণী, স্নেহ কোথা যাবে? এদিকে রাণীর নিশ্চয় ধারণা হইল যে, মাধবীলতার মাতা কোন নিরুপদ্রব স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, নতুবা রাজা কেন বলিয়া ফেলিবেন যে, মাধবীলতার নিমিত্ত বড় ব্যস্ত নহেন।

সে দিবস রাজার সহিত রাণীর আর সাক্ষাৎ হইল না। পরদিবস সাক্ষাৎ হইলে রাজাও বিশেষ যত্ন করিয়া অধিক কথা কহিলেন না, তাঁহারও কিঞ্চিৎ মন ভার হইয়াছিল। তিনিও স্থির করিয়াছিলেন যে, নিরপরাধা জ্যোৎস্নাবতীর গৃহত্যাগ কেবল রাণীহইতে; রাণীর নিমিত্ত তিনি আপনার ভগিনীকে বাটী হইতে প্রকারান্তরে তাড়াইয়া দিয়াছেন। এ অকার্য্য তাঁহাকে

কেবল রাণীর ভয়েই করিতে হইয়াছিল। রাণীই এ অনর্থের মূল।

ক্রমে তাঁহাদের পরস্পরের অন্তরভঙ্গ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজা দুই একবার যত্নসহকারে রাণীর সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, রাণী সে যত্ন গ্রহণ করেন না দেখিয়া রাজা প্রথম প্রথম কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন, শেষ অপমানিত বোধ করিতে লাগিলেন। যেখানে স্ত্রীপুরুষে অসদ্ভাব, সেখানে মঙ্গল নাই এ কথা রাণীকে একদিন বুঝাইবেন রাজা মনে মনে স্থির করিলেন।

রাণীও মনে মনে স্থির করিলেন যে, মাধবীলতাকে কদাচ রাজবাটীতে স্থান দিবেন না, তজ্জন্য রাজসংসার বদি ছারেখারে দিতে হয় তাহাও কর্ত্তব্য মনে করিবেন। জারজকন্যাকে রাজকন্যা পরিচয় দিয়া কখন রাজা রাজকুমারের সমযোগ্য করিতে পারিবেন না।

৩০

দেওয়ান্‌মহাশয় মাধবীলতাকে অনুসন্ধান করিবার ভার লইয়াছিলেন, তিনি প্রায় প্রতিগ্রামে পাইক, গোমস্তা, বিশেষতঃ দরিদ্র, ভিক্ষুক, ঠাকুরবাড়ীর পূজারি, অতিথিশালার ভাণ্ডারী প্রভৃতিকে ডাকাইয়া প্রশ্ন করিতেন। এইরূপে গ্রামে গ্রামে, জিজ্ঞাসা করায়, একস্থানে একজন বৃদ্ধা ভিখারিনী বলিল "আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন বোধ হয় আমি তাহাকে দেখিয়াছি, ক্রোড়ে একটি একবৎসরের কন্যা আছে।"

দেওয়ান। কোথায় দেখিয়াছিলে?

বৃদ্ধা। এই গ্রামের প্রান্তভাগে বটবৃক্ষের তলায় বসিয়া কাঁদিতে দেখিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তিনি চক্ষের জলে অঞ্চল ভিজাইলেন তবু কোন কথারই উত্তর দিলেন না। আমি তাঁহার কন্যার নিমিত্ত একটু দুধ আনিতে গেলাম, কিন্তু আসিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। সে আজ চারি পাঁচ দিনের কথা।

দেওয়ান্‌মহাশয় সেই বৃক্ষতলে গিয়া অনুভব করিলেন যে, মাধবীলতার মা পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে, অতএব পাল্কী আরোহণ করিয়া সেই দিকে গেলেন। অপরাহ্নে প্রান্তর হইতে দেখিলেন সম্মুখে এক বৃহৎ নগর, বহুতর দেবমন্দিরে সুশোভিত, তাহার ত্রিতল অট্টালিকাসমূহ শ্বেতকপোতসমাকীর্ণ, লোককোলাহল অতিদূরব্যাপী। দেওয়ান্‌ ভাবিলেন, এ নগরে মাধবীলতার উদ্দেশ পাওয়া কঠিন ব্যাপার।

এই সময় একটি পুষ্করিণীর কূলে দাঁড়াইয়া পুঁটুর মা দেওয়ানের পাল্কীখানি দেখিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন যে, এই পাল্কী যদি আমাদের রাজার হয়, তবে তার পায়ে পুঁটুকে ফেলিয়া দিয়া আমি নির্ব্বিঘ্নে প্রাণত্যাগ করি। রাজা অবশ্য

পুঁটুকে প্রতিপালন করিবেন, তিনি পুঁটুকে ভালবাসেন। পুঁটু আমার কত শান্ত মেয়ে। এই যে রৌদ্রে রৌদ্রে আমি তাকে বুকে করে ফিরিতেছি, পুঁটু তবু ত কাঁদে না, যেন পুঁটুর তাতে আরও আহ্লাদ বেড়েছে, পুঁটু হাসিতেছে, কাক ডাকিতেছে, হাত ঘুরাইতেছে, আয় আয় করে চাঁদ ডাকিতেছে। *** না। পুঁটুকে রাজার কাছে রেখে মরিতে পারিব না, রাজার বাটীতে পুঁটুকে কে দেখিবে। রাজা কি সভা ফেলে পুঁটুর কাছে বসে থাকিবেন? না, দাসিমাগিরা পুঁটুকে ফিরে চেয়ে দেখিবে? পুঁটু কাঁদিলে কে তাকে বুকে করিবে? বাপরে! আমি পুঁটুকে ফেলে একদণ্ডের জন্য মরিতে পারিব না।" মাধবীলতার মা একা দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন, পুঁটু তখন তাঁহার ক্রোড়ে ছিল না।

এই সময় তাঁহার অতি নিকট দিয়া দেওয়ান্‌মহাশয়ের পাল্কী চলিয়া গেল; কিন্তু দেওয়ান্ কিম্বা পরিচারকগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না; তিনিও জানিতেন না যে, তাঁহারই অনুসন্ধানের নিমিত্ত স্বয়ং রাজদেওয়ান্ যাইতেছেন। দেওয়ান্ নগরে প্রবেশ করিয়া কোন এক প্রধান ব্যক্তির বাটীতেঅবস্থান করিলেন, সকলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল, সকলকেই তিনি মাধবীলতার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। ভিখারী, পূজারী, কেহই তাঁহাকে দেখে নাই। মাধবীলতার মা এই নগরে এক গৃহস্থের বাটীতে কুটুম্বকন্যা বলিয়া রক্ষিতা হইয়াছিলেন। দেওয়ান্ কোন সম্বাদ না পাইয়া অগত্যা বিবেচনা করিলেন যে, যে গ্রামে বৃদ্ধার মুখে পুঁটুর মার প্রথম সম্বাদ পাইয়াছিলেন, সেই গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করাই উচিত; অতএব প্রাতে তথায় ফিরিয়া গেলেন।

পথিমধ্যে পিতম পাগলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, পিতম কোন সম্ভাষণ করিল না দেখিয়া, দেওয়ান্ তাঁহাকে ডাকিলেন। পিতম আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

দেওয়ান্ পিতমকে সঙ্গে লইয়া এক নির্জ্জন স্থানে বসিলেন; পিতম তখনও কোন কথা কহিতেছে না দেখিয়া, আপনিই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাইতেছিলে?"

পিতম। এই দিকে।

দেওয়ান্। এই দিকে কোথা?

পিতম। তা এত জানি না। তুমি কোথা গিয়াছিলে?

দেওয়ান্। রাজকন্যা মাধবীলতার অনুসন্ধানে।

পিতম। সন্ধান হইল না বোধ হইতেছে।

দেওয়ান্। কোন অনুসন্ধানই পাই লাম না।

পিতম। ভালই হইয়াছে।

দেওয়ান্। কেন?

পিতম। সে অনেক কথা; তুমি যদি রাজার মঙ্গল ইচ্ছা কর, মাধবী লতার নাম করিও না; মাধবীলতা রাক্ষসী, অথবা আর কিছু; যে তাহার সংশ্রবে আসিবে, সেই কষ্ট পাইবে; অতএব তুমি পলাও। মাধবীলতা নিজে দুরদৃষ্ট, মনুষ্যরূপে জন্মিয়াছে; অতএব তুমি পলাও। অদৃষ্ট মানিয়া থাক। অদৃষ্ট—যাহা দেখা যায় না, যাহা বুঝা যায় না? অদৃষ্ট অজ্ঞানের ওয়ারিস; অজ্ঞান জানেন না যে অদৃষ্ট তাঁহার গর্ভজ, তাহাই বড় গোলযোগ বাঁধিয়াছে।

দেওয়ান্। আমি জানিতাম না যে, তুমি অদৃষ্টবাদী।

পিতম। অদৃষ্টবাদী সকলেই; অদৃষ্টের শত নাম আছে, এক একজন এক এক নামে তাঁহার অর্চ্চনা করে। কালভেদে দেশভেদে অদৃষ্টের নাম স্বতন্ত্র। অদৃষ্ট চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে; অদৃষ্ট মরে না, অদৃষ্টের কেবল নাম মরে; তাহার একটি নাম যায়, আর একটি নাম হয়। মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ হইলে অদৃষ্টের কি হয় বলা যায় না। কিন্তু দেবতারা ত সর্ব্বজ্ঞ, তবে তাঁহারা কেন অদৃষ্টের বশবর্ত্তী? মহাদেব অদৃষ্টের দৌরাত্ম্যে ব্যাকুল। এক এক দেবতার এক একপ্রকার অদৃষ্ট। অদৃষ্ট বহুরূপী, প্রত্যেকের নিকট স্বতন্ত্র রূপ; আমার নিকট অদৃষ্টের রূপ ছিন্নমস্তা, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতিদেবী। জগতের প্রকৃতি কি তাহা জান? আকৃতি হইতে প্রকৃতি বুঝিবে। প্রকৃতিদেবী আপনার মাথা আপনি কাটিয়া আপনি আপনার রুধির পান করিতেছেন। ছিন্নমস্তার রূপ কে কল্পনা করিয়াছিল জান? ঘোর অদৃষ্টবাদীর এ কল্পনা। কল্পনা নহে,ইহা সত্য সত্যই অদৃষ্টের মূর্ত্তি; অদৃষ্ট আর প্রকৃতি এক। আমার সহিত তর্ক করিও না। আমি স্বচক্ষে এ মূর্ত্তি দেখিয়াছি, একদিন রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় একরূপ পৈশাচিক শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। শয্যা হইতে দেখি আমার গবাক্ষের নিম্নে কোন এক স্থান হইতে বহুতর গৃধিনী, শকুনী, উঠিয়া আকাশপথে উড়িয়া যাইতেছে, তাহাদের পক্ষসঞ্চালনের শব্দে হৃদ্‌কম্প হইতে লাগিল। সকল পক্ষীই উর্দ্ধমুখে আকাশের একদিকেই বেগে যাইতেছে, দেখিয়া আমি গবাক্ষের নিকটে গেলাম। যে দিকে পক্ষীরা ছুটিতেছে, সেই দিকে ধীরে ধীরে নেত্রপাত করিলাম, তথায় দেখি, স্বর্গ মর্ত্ত স্পর্শ করিয়া এক রুদ্ররূপিণী যুবতী দাঁড়াইয়া আছে; আপনার মস্তক আপনি ছেদন করিয়া, আপনিই আবার আপনার রুধির পান করিতেছে। বামকরস্থ ছিন্নমস্তক উন্নতমুখে রক্তধারার উল্লম্ফন, ও প্রপতন দেখিতেছে, হাসিতেছে, আর তাহা পান করিতেছে। উৎক্ষেপিত রক্তের আভায়, অন্ধকারও রক্তবর্ণ হইয়াছে। আকাশ, স্থল, সমু-

সমুই রক্তাক্ত! সেই ছিন্নমস্তকের মুক্ত-কেশ অগ্নিবৎ তরঙ্গ তুলিয়া অর্দ্ধেক আকাশ ব্যাপিয়া ক্রীড়া করিতেছে। স্বর্গে, মর্ত্তে, আকাশে, চারিদিক্ ব্যাপিয়া গম্ভীর, "ব্যোম্" শব্দ স্থিরভাবে শব্দিত হইতেছে। তেত্রিশকোটী দেবতা করযোড়ে স্তব করিতেছেন, হে জগন্মাতঃ! কেন মা, তোমার গুপ্তমূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছ? ক্ষমস্ব, ক্ষমস্ব, আবার এ মূর্ত্তি কেন, আমরা যে ভয় পাইতেছি।" মহাদেব কেবলমাত্র হাসিয়া বলিলেন, "প্রকৃতি দেবি! তুমিই সত্য, তোমার এইরূপই সত্য, তোমার এইরূপ আমার মনোমোহিনী।" মহাদেবের কথায় রুদ্ররূপিণী ঈষৎ হাসিয়া ক্রমে ক্রমে আকাশে মিলাইয়া গেলেন। আর কোথাও কেহ নাই, আমি দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম "প্রকৃতিদেবী কি ছিন্নমস্তা? এই কি প্রকৃতির যথার্থ মূর্ত্তি? তবে হে প্রকৃতি! আমাদের কেন ভুলাও? তোমার এই ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ঢাকিয়া কেন নিয়ত মোহিনীমূর্ত্তিতে আমাদের চোখে চোখে বেড়াও?—কেন ফুল ফুটাও, কেন বা কোমললতাবল্লরী দোলাও, কেন পাখী উড়াও, কেন জ্যোৎস্না মাখ, কেন চন্দ্রমণ্ডলবিরাজিত অনন্তনক্ষত্রসনাথ কিরীটি মাথায় পর? এখন বুঝেছি! আমি আর ঠকিব না।"

দেওয়ান্। তুমি মাধবীলতার সন্ধান করিতে পার?

পিতম ছিন্নমস্তার মূর্ত্তি আলোচনা করিতে করিতে এরূপ মাতিয়া উঠিয়াছিল, যে দেওয়ানের উপস্থিতি তাহার একেবারে স্মরণ ছিল না। দেওয়ান্ কথা কহিলে তাহার চৈতন্য হইল। তখন দেওয়ানের কথার কোন উত্তর না করিয়া পিতম ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ইহার পর দেওয়ান্মহাশয় শান্তিপুর গ্রামে গিয়া দেখেন, চূড়াধনবাবুর প্রতি রাণীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; স্ত্রীকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া, চূড়াধনবাবু রাণীকে পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেওয়ান্ ভাবিলেন, "আরম্ভ এই; শেষ কোথা?"

বাল্মীকির জয়।

দ্বিতীয় খণ্ড।

পর্ব্বত হইতে নামিবার সিঁড়ি থাকিলে বড় ভাল হইত, বড় বড় ধাপওয়ালা চাঁদপাল ঘাটের মত যদি সিঁড়ি থাকিত, বোধ হয়, তাহা হইলে সকলেই তাহাতে উঠিত, কিন্তু তাহা নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া কখন গাছের ডাল ধরিয়া, কখন ঝরনার ধার দিয়া, কখন উচ্চ হইতে নিম্ন হইয়া, কখন আবার নিম্ন হইতে উচ্চমুখে, কখন পাহাড় বেড়িয়া কখন বরাবর নামিয়া, আসিতে হয়। কখন এমনি ভয় হয় যে পা একটুকু সরাইলেই পড়িয়া যাইতে হয়। কখন ভয় হয় প্রকাণ্ড পাথর মাথায় আসিয়া পড়িবে, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়ে অবলীলাক্রমে গল্প করিতে করিতে নামিতেছেন। বিশাল বক্ষ, তেজঃপুঞ্জ, বলিষ্ঠ, প্রকাণ্ড দেহ; মুখকান্তিতে একজনের অসাধারণ শৌর্য্য আর একজনের অদ্বিতীয় বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইতেছে। উভয়ে গল্প করিতে করিতে পথ অতিবাহন করিয়া যাইতেছেন। গল্পের বিষয় সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। গতরাত্রের ঘটনাবলী—

বশিষ্ঠ বলিলেন "যাহাতে ভাই ভাই হয় তাহার কি উপায় করিবেন?"

বিশ্বামিত্র। তাহার আবার উপায় কি? আর সমস্ত জগৎ জয় করিয়াছি, আর এক রাজা এই ঠিক হইলেই এক রাজার অধীনে সব প্রজাই ভাই ভাই হইয়া উঠিবে।

বশিষ্ঠ। আপনি কি মনে করেন, একশাসন আর ভ্রাতৃভাব একই জিনিস।

বি। তাহার আর সন্দেহ কি?

বশিষ্ঠ। রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ বিপ্লব চৌর্য্য দাঙ্গা হাঙ্গাম হয় কেন?

বিশ্বামিত্র দক্ষিণ হস্তপ্রসারণ করিয়া বলিলেন, "এই হস্তের বলে সে সমস্ত নিবারণ করিব।"

বশিষ্ঠ। বলিলেন মন?

বি। মনে যাহাই থাকুক প্রকাশ করিতে দিব না?

বশিষ্ঠ। তবে আর ভাই ভাই হইল কই, মনে বিদ্বেষ থাকিলে ভ্রাতৃভাব হয় কই?

বিশ্বামিত্র। আপনারা জনকতক ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহাদেরই মাত্র মন অত্যন্ত ক্রূর, মনোভাব লুকাইয়া কাজ করিতে পারেন, অন্যলোকে কাজে না করিতে পারিলে মনেও কিছু করিবে না।

বশিষ্ঠ দেখিলেন নির্ব্বোধকে বুঝান দায়, তিনি কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন "ব্রাহ্মণের উপর আপনার এত রাগ কেন? ব্রাহ্মণ আপনার কি করিয়াছে?"

বি। আমার কিছু রাগ নাই, আমার কিছু করে নাই, কিন্তু আমার ক্ষোভ এই যে ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার প্রথম বিবাদ

হইবে। কারণ, উহাদের বুদ্ধি বড় পেঁচাও, আপনার কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য উহারা সব করিতে পারে।

বশিষ্ঠ। বলেন কি মহাশয়! ব্রাহ্মণ বরং সকলের সহিত সদ্ভাব করিয়া চলার জন্য বিশেষ উদ্যোগী, তাহার সাক্ষী দেখুন আমি ক্ষত্রিয়ের পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়াছি, ইহাতে লাঘব থাকিলেও স্বীকার করিয়াছি।

বিশ্বা। রাজপৌরোহিত্যে লাঘব আছে তাহা স্বীকারই করি না। বিশেষ আর আপনি যে, বাধ্য হইয়া স্বীকার করেন নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? আর আপনি কি মতলবেই বা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই কে জানে।

বশিষ্ঠ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশ্বামিত্র বলিতে লাগিলেন, আপনি যে মতলবেই আসুন, আর ব্রাহ্মণের যত কুমন্ত্রণাই থাকুক, বিশ্বামিত্র এই ভুজবলে সমস্ত শাসিত করিবে, সমস্ত পৃথিবী একশাসন এবং একমন, একপ্রাণ, করিয়া দিয়া যাইবে।

বশিষ্ঠ দেখিলেন, তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না। চুপ করিয়া পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

বিশ্বামিত্রও দেখিলেন, অকারণ ব্রাহ্মণের মনঃক্ষুণ্ণ করিয়া ভাল করেন নাই, তিনিও খানিক চুপ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! কিছু মনে করিবেন না, আমি আপনাকে অকারণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছি ক্ষমা করুন, আর যদি কোন বাধা না থাকে, আমার শিবির নিকট, আজি আতিথ্য গ্রহণ করুন।" বশিষ্ঠ সম্মত হইলেন। মহা আদরে বশিষ্ঠের আতিথ্য করা হইল, এবং কিঞ্চিৎ অহঙ্কারে তাঁহাকে যে সকল অপার রত্নরাশি নানাদেশ হইতে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছেন, তাহা দেখাইলেন, এবং উপঢৌকন দিলেন। বশিষ্ঠ মহা সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইবার সময় বিশ্বামিত্রকে আপন তপোবনে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

২

বিশ্বামিত্র যথাসময়ে তপোবনে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ বহুদূর হইতে তাঁহাকে আগু বাড়াইয়া লইয়া আসিলেন। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিশ্বামিত্র একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তিনি যখন উপস্থিত হন, তখন তপোবন, শাল, তাল, তমাল, পিয়াসাল, হিন্তাল প্রভৃতি প্রকাণ্ডকায় বনবৃক্ষসমূহে ব্যাপ্ত ছিল, তলায় লতাগুল্মাদির লেশমাত্র নাই, সব পরিষ্কার, সিন্দুর পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়। কিন্তু যাইবার একটু পরেই সে দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল, হঠাৎ বন উদ্যানে পরিণত হইল, প্রকাণ্ড তপোবন নানাপ্রকার শরতের ফুলের কেয়ারিতে বোধ হইতে লাগিল যে, যেন একখানি গালিচা পাতিয়া দিয়াছে। কোথাও শাদা, ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে শাদা, কোথাও নীল ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে নীল, কোথাও রাঙ্গা, ভঙ্গিতে ভঙ্গীতে রাঙ্গ, কোথাও সবুজ, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে

সবুজ, কোথাও পীত, কেমন এক রঙ কমিয়া আর এক রঙ বাড়িয়া যাইতেছে যেস্থলে ফুলের রঙে বৈচিত্র্য হইতেছে না, সেস্থলে উপলে সে দোষ পুরাইয়া দিতেছে। গালিচার চারিপার্শ্বে নানাজাতীয় গন্ধপুষ্প তাহার বাতাসে চারিদিক ভর ভর করিতেছে, প্রকাণ্ড গালিচা ঠিক মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড সরোবরে মার্ব্বল পাথরের সিঁড়ি তলাপর্য্যন্ত মার্ব্বল পাথরে বাঁধান;জল এমনি স্বচ্ছ,তলার মার্ব্বল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। এই গালিচার অবিদূরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা দ্বার কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত। দ্বারে খুদিয়া স্বর্ণাক্ষরে লেখা।

স্বাগতং গাধিকুল তিলকস্য
বিশ্বামিত্রস্য।

বিশ্বামিত্র প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখেন যে, সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াও এরূপ অট্টালিকা কখন দেখেন নাই। হীরা, মতি, পান্না, মুক্তা ইত্যাদি গৃহসজ্জার উপকরণ। উৎকৃষ্ট প্রস্তরে বাটীর আদ্যন্ত নির্ম্মিত, আর তাহার উপর পরশুরামের যুদ্ধকাহিনী চারিদিকে তোলা করিয়া অঙ্কিত, কোথাও ক্ষত্রিয়শোণিতহ্রদে পরশুরাম পিতৃতর্পণকরিতেছেন, কোথাও ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ হইতেছে, আর ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইতেছে, এরূপ যুদ্ধ একুশটী যুদ্ধ একুশটি দেয়ালে লেখা রহিয়াছে।

বিশ্বামিত্র হতবুদ্ধি হইয়া সমস্ত কাল করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, বশিষ্ঠ তাঁহার আতিথ্যের জবাব দিতেছে, এবং তাঁহার সহিত যে, কথোপকথন হইয়াছিল তাহারও জবাব দিতেছে। মনে মনে তাঁহার বিদ্বেষভাব ক্রমে বাড়িতে লাগিল, হিংসা জন্মিতে লাগিল। আপাততঃ মনোভাব গোপন করিয়া আতিথ্যস্বীকার করিলেন। মহানন্দে পান, ভোজন, নৃত্যগীতাদি দর্শন সমাপন হইল, যাইবার সময় বশিষ্ঠ যথোচিত উপঢৌকন আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহাশয় আপনি ঋষি, বনবাসী, আপনার এ অতুল ঐশ্চর্য্য কোথা হইতে আসিল। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাশয় আমার এক গাভী আছেন, তিনি কামধেনুর কন্যা, তাঁহার নাম নন্দিনী, তিনি আমার সমস্ত ইচ্ছামত দিয়া থাকেন। বাস্তবিক সে ধেনু আর কিছুই নহে, বশিষ্ঠের সর্ব্বপ্রাহিণী বিদ্যামাত্র। বিশ্বামিত্র বলিলেন, তবে অন্য উপঢৌকনে আমার তৃপ্তি হইবে না, আমার সেই গোরুটি দিতে হইবে। বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি যখন তাহার মার কাছ হইতে তাহাকে লইয়া আসি, তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি যে, উহাকে কখন কাহাকেও দিব না। বিশ্বামিত্র আর ভাব গোপন করিতে পারিলেন না, বলিলেন, আপনি দিবেন না, কিন্তু আমি অপহরণ করিব। বলিয়াই আপন লোক জনকে গোরু চুরি করিতে হুকুম দিলেন। এ দিকে অতিথি সর্ব্বদেবময়;—ওদিকে বলপূর্ব্বক অপহরণ। বশিষ্ঠ মহাক্রিয়াটে

পড়িয়া গেলেন। বশিষ্ঠ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। লোকে ধেনু অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, ধেনু যাইবার সময় কাতরনয়নে বার বার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। বশিষ্ঠ ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, "কি করি বাছা, অতিথি, রাজা, প্রবল-প্রতাপ দিগ্বিজয়ী তোমায় অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে,তুমিই ইহার প্রমাণ।" বলিবামাত্র নন্দিনী হুঙ্কার ছাড়িলেন, হুঙ্কারশব্দে আকাশ পাতাল ফাটিয়া গেল। আর অগণিত-সংখ্যক পারদ, পারস, চীন, সান, মান প্রভৃতি নানাজাতীয় সেনা রণসজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া তথায় তাঁহার ত্রাণার্থ উপস্থিত হইল।

৩

ধেনু লইয়া মহাবিবাদ বাঁধিয়া উঠিল, একদিকে ক্ষত্রিয়সেনা আর একদিকে যবনসেনা মধ্যস্থলে নন্দিনী। পুনঃ পুনঃ ক্ষত্রিয়দিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা কোনমতেই ছাড়িতেছে না। যবনগণ গাভী ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টাকরায় যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল, যবন ও ক্ষত্রিয়ে যুদ্ধ ব্রাহ্মণের জন্যে যুদ্ধ—ব্রাহ্মণ দর্শক। দীর্ঘ দীর্ঘ তরবারি দীর্ঘ দীর্ঘ বর্শা, আর প্রকাণ্ড ধনুক টঙ্কারে টঙ্কারে মেঘগর্জ্জন অনুভব হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র স্বসৈন্যের অভিনেতা,ব্রাহ্মণপক্ষে অভিনেতা কেহই নাই, বশিষ্ঠ অতিথির সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক, এবং পুত্র ও শিষ্যগণকে যুদ্ধে যাইতে দিলেন না, কিন্তু যুদ্ধ চলিতে লাগিল, ক্রমে রক্তপাত আরম্ভ হইল, ক্রমে রক্তনদী বহিতে লাগিল, যুদ্ধক্ষেত্রের ধূলি রক্তে কর্দ্দম হইল। তখন বিশ্বামিত্র হুকুম দিলেন,"গোরু মেরে ফেল।"গোরু এখন ক্ষত্রিয়দিগের করকবলিত ছিল, উহার প্রাণসংহারে উদ্যম করিবামাত্র গোরু দিব্য স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশ পথে উত্থিত হইল। স্ত্রীমূর্ত্তি স্বয়ং সরস্বতী, শ্বেতপদ্মাসনা শ্বেতবস্ত্রবিভূষিতা শ্বেতবর্ণচ্ছটায় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ধিক্‌কারে, হস্তে শ্বেতবীণা, লাবণ্যে জগৎ আলো, তাহার উপর আবার শ্বেত পদ্মের সমস্ত বিভূষণ! বলিলেন,"রে, মূর্খ, আমি ব্রাহ্মণের বিদ্যা, তোরসাধ্য কি, তুই আমায় অপহরণ করিস্। আমি কুলক্রমে ব্রাহ্মণগৃহে বাস করিয়া থাকি, করিয়াছি ও করিব, তুই কি গায়ের জোরে আমায় হরণ করিতে পারিস, মনে করিয়াছিস। বিশ্বামিত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন, দেখিলেন, সরস্বতী আবার ধেনুমূর্ত্তিধারণ করতঃ বশিষ্ঠসন্নিধানে অবতীর্ণ হইলেন, সমস্ত সৈন্য বায়ুতে মিশাইয়া গেল। বশিষ্ঠের নয়নে দরদর আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল, তিনি স্বহস্তে ধেনুর গাত্রকণ্ডুয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিশ্বামিত্রের এই সর্ব্ব প্রথম পরাজয়। মনের ক্ষোভে, দুঃখে, হিংসায়, বিশ্বামিত্র আর গাভী বা বশিষ্ঠের দিকে চাহিতে পারিলেন না। ক্রোধে ধনুর্ব্বাণত্যাগ করিলেন, সৈন্য সামন্তকে আপন আপন

বাড়ী যাইতে বলিলেন, রাজ্যের ভার মন্ত্রীর উপর দিলেন। বলিলেন।

ধিক্ বলং ক্ষত্রিয় বলং
ব্রহ্মতেজোবলং বলং

বলিয়া ব্রাহ্মণবলাভের জন্য তপস্যা করিবার নিমিত্ত হিমালয় পর্ব্বতমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বশিষ্ঠ দেখিলেন, তাঁহার মনের আশা ব্যর্থ হইল।

বিশ্বামিত্র যে কেবল বাহুবলে সমস্ত ভুবন এক করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার অসারতা বুঝিতে পারিলেন, আর বাল্মীকি দস্যুদলত্যাগ করিয়া, অন্তরের জ্বালায় বনে বনে রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

বিশ্বামিত্র কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না। তিনি সেনাদের সঙ্গে আসিলেন না। মন্ত্রী রাজ্য করিতে লাগিল। তাঁহার পরিবারেরা আজি আসেন, কালি আসেন, ভাবিয়া ক্রমে দিন, মাস, বৎসর, কাটাইয়া ছিল। বশিষ্ঠ আবার আপন মতলব অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল, বিশ্বামিত্র পক্ষীয়গণ তাঁহার ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল, বশিষ্ঠবংশের কি ভয়ানক পরিণাম হইয়াছিল, ইতিবৃত্তে তাহার উল্লেখ আছে।

এদিকে বিশ্বামিত্র একবারে ঘোরতর তপস্যায় মগ্ন হইলেন, ব্রাহ্মণ হইবেন, নিজহস্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, দুই বল এক করিবেন, এবং সসাগরাধরার অদ্বিতীয় প্রভু হইবেন, সকলকে একশাসনে রাখিয়া একভাবে মিলাইবেন। এই তাঁহাদের মনস্থ হইল। তিনি হিমালয়ে এক অতিনিভৃত জঙ্গলময় দুর্গম্যস্থানে গমন করত, একেবারে ঘোরতর তপ আরম্ভ করিলেন। প্রথম দিনে, এক গ্রাস আহার, তাহার পর অর্দ্ধগ্রাস; তাহার পর এক দানা, তাহার পর অর্দ্ধ দানা; তৎপরে জলবিন্দু, তৎপরে আহার বন্ধ করিয়া তপ আরম্ভ করিতে লাগিলেন। শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত সমস্ত মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল। দৃক্‌পাত নাই, কেবল ধ্যান। চক্ষু কোটরগত হইল, নাসিকার মধ্য অস্থিমাত্র স্পষ্ট দেখা যায়, শরীরের সমস্ত হাড়, কেবল চর্ম্মমাত্রে আচ্ছাদিত হইল। কেশরাশি বর্দ্ধিত হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পদের নখর বর্দ্ধিত হইয়া শিকড়ের মত মাটির মধ্যে পুতিয়া গেল। উইপোকা গায়ের উপর বাসা করিল। বিশ্বামিত্রের ধ্যান শেষ হয় না, ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি হিংস্রজন্তুগণ দেখে আর ধীরভাবে মুখ ফিরা চলিয়া যায়।

এই ভয়ানক অবস্থায় বিশ্বামিত্র নানারূপ স্বপ্ন দেখিতেন, কখন বোধ হইত সমস্ত জগৎ বিশ্বসংসার, পরমাণু হইয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে একমাত্র তিনি, তাঁহার শরীর দেখিতে দেখিতে

ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া উঠিল, তাঁহার তেজে পরমাণু দগ্ধ হইতে লাগিল। শেষ নিজ শরীরও দগ্ধ হইতে লাগিল। দারুণ আন্তর জ্বালায় তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে দেখেন কতকগুলি পরমাসুন্দরী— যুবতী,—অপ্সরা কোথায় লাগে, তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, তাহাদের নিতম্ব-দোলন অতীব চমৎকার, তাহারা কেহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। কেহ মদনবিহ্বললালসাঙ্গ হেলাইয়া বেড়াই-তেছে, কেহ শরীরের অর্দ্ধ অংশে বসন-ত্যাগ করিয়া,কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ কটাক্ষবর্ষণ করিতেছে, কটাক্ষ কখন কোমল, কখন চঞ্চল, কখন ঠারে ঠারে হৃদয়ের অভিলাষ ছড়াইয়া দিতেছে। কখন অলস, কখন বিদ্যুৎবৎ, কখন চক্ষের পাতা কাঁপি-তেছে, তাহার উপর কটাক্ষ বাণবৎ ঘন ঘন পড়িতেছে। কাহারও বেণী বদ্ধ কাহারও এলো, কাহারও অলক কু-ঞ্চিত, কাহারও বায়ুভরে দোলায়মান আর সকলেই নানা হাব ভাব বিকাশ করিয়া, কেবল বিশ্বামিত্র প্রতি আপনা-দের আলস, মদমত্তাব প্রকাশ করি-তেছে। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, তাঁ-হার অন্তর-দাহ কিঞ্চিৎ শমিত হইলে, তিনি পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন।

আবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কোটী সূর্য্য প্রকাশ হইয়াছে, তেজে জগৎ জ্বলিয়া যাইতেছে, গা পুড়িয়া যাইতেছে, বিশ্বামিত্র পলায়ন করিয়া সূর্য্য সমূহ হইতে দূরে যাইতে লাগি-লেন। যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে সূর্য্যের তেজ মন্দ হইল, কিন্তু যেখানে গেলেন, সেখানে ভয়ঙ্কর শতসহস্র সর্প তাঁহাকে দংশন করিল। বিষের জ্বালায় তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে দেখেন ভয়ানককাণ্ড, নানাপ্রকার ভী-ষণাকার জন্তুগণ তাঁহাকে ভয় দেখাই-তেছে। কাহার মুখ শূকরের মত সিংহের ন্যায় কেশর, যোজনবিস্তৃত লাঙ্গুল। কেহ ভীষণ পিশাচ,মাথার উপর চোখ, অর্দ্ধেকশরীর হাতে ভরা, দুই হাত আর দুই পা দিয়া, চারিদিকে আহার-সামগ্রী হাতড়াইতেছে, আর যাহা পাইতেছে অমনি উদরসাৎ করি-তেছে। কাহারও দন্ত শূকরের ন্যায় কাহার হস্তীর ন্যায়, কাহারও মাথা পর্ব্বতের চূড়ার ন্যায়, কাহার কেবল মস্তক, পদদ্বয় আছে কি না সন্দেহ। কোন স্ত্রী পিশাচীর কেবল স্তনদ্বয়—বৃ-হৎ পর্ব্বতচূড়ার ন্যায়,আবার কাল। কেহ কাল, কেহ নীল, কেহ পীত, কেহ হরিদ্রা, নানারঙে শোভিত। যখন এই ভয়ানক সৈন্য, সেনাপতির আদেশে তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তাঁহার আত্মা-পুরুষ শুক হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার কটাক্ষে পিশাচসেনা দূর হইয়া গেল। কাহার পদভঙ্গ হইল, কাহার প্রাণনাশ হইল, কাহার মস্তক ক্ষত হইল। স্তন-বতীর স্তনভার গলিয়া গিয়া তাহার শরীর হালকা হইল। এর মুণ্ড ওর

ঘাড়ে গেল ওর পা তাহার মাথায় গেল।

এইভাবে পিশাচসেনার ধ্বংস দেখিয়া, পিশাচসেনাপতি হাসি হাসি মুখে ভাব করিবার জন্য বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বিশ্বামিত্র, তুমি অতি বড় পরাক্রমশালী—তুমি ভুজবলে সমস্ত জয় করিয়াছ। তুমি তপোবলে কটাক্ষে আমার পিশাচসেনা বিহত বিধ্বস্ত করিয়া দিলে। অতএব তুমি আমার পুত্র হও; এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড দেখিতেছ, ইহার সমস্ত অসুর পিশাচ, দৈত্য, দানব, আমার অধীন, তুমিই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী হইবে। আমি অচিরাৎ তোমায় রাজা করিয়া দিয়া স্বয়ং বিলাসসুখভোগে নিরত হইব। অতএব তুমি আমার পুত্র হও। এই হিমালয়চূড়ার উপরে উঠিলে দেখিতে পাইবে অসংখ্য সমৃদ্ধরাজ্য চারিদিকে রহিয়াছে, সমস্ত তোমার হইবে। চীন, জাপান, মিসর, পারস্য, সব তোমার হইবে। এই যে সুন্দরীগণ তোমার প্রলোভনের জন্য আসিয়াছিল, উহারা আমার ভোগ্য; উহারা তোমার হইবে। যত মণি, মুক্তা, কাঞ্চনের খনি দেখিতে পাইবে, সমস্ত আমার। আমার প্রজার সংখ্যা নাই; তুমি আমার পুত্র হও, এই সমস্ত অতুলরাজত্বের একমাত্র অধীশ্বর হও, তোমার কোন ভাবনা নাই চিন্তা নাই। যতদিন তুমি রাজ্যে-স্থির হইতে না পার, আমি তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার রাজ্যের সমস্ত রক্ষা করিয়া দিব।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তুমি আমায় ব্রাহ্মণত্ব দিতে পার, নন্দিনী দিতে পার, বিদ্যা দিতে পার, সরস্বতী দিতে পার?" না, "পারি না। কিন্তু ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ করিবার ক্ষমতা দিতে পারি। নন্দিনীর প্রাণনাশ করিয়া দিতে পারি। বিদ্যার মূলোচ্ছেদ করিতে পারি, কিন্তু সরস্বতীর কিছুই করিতে পারি না।" "তবে তোমায় দিয়া আমার কাজ হইবে না।" বলিয়া, বিশ্বামিত্র আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

এবার তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হয় না। ক্রমাগত নিশ্বাস বন্ধ করায়, ক্রমাগত এক বিষয়ক চিন্তা করায়, ক্রমাগত অনাহারে তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইল না। কিন্তু তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন, তাঁহার কর্ণকুহর হইতে ঝাঁঝার ন্যায় শব্দ বাহির হইতে লাগিল, নাসিকা দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সেই শব্দের পর তাঁহার মস্তকে প্রদক্ষিণ করিয়া রাশিচক্র দক্ষিণ হইতে বামদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ছায়াপথ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, দেখিতে দেখিতে তাঁহার মাথার খুলি অত্যাশ্চর্য্য অগ্ন্যুত্তাপে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল, বিশ্বসংসারে ধুম করিয়া শব্দ হইল, শব্দ আকাশে পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে ব্রহ্মাণ্ডের কপাল কপালিকা পৃথক হইয়া গিয়া সেই পথে শব্দ বাহির হইয়া গেল।

তাহার বাহির হইতে দূরস্থিত শতসহস্র অনবরত মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শুনা গেল।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্ব স্তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো-দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। বিশ্বামিত্র ধ্বনি শ্রবণ করিলেন, তাঁহার ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত সস্তকান্তি নীচে নামিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার শরীর সবল সতেজ ও কান্তিপুষ্টি হইল। বিশ্বামিত্র ভাবিলেন, ব্রাহ্মণত্ব না পাই, বেদমন্ত্র দর্শন ব্রাহ্মণের স্বত্ব ছিল, তাহা ত ছিন্ন করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট। বলিয়া আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

২

বিশ্বামিত্রের ধ্যানে ব্রহ্মাণ্ডে যে হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে, আর কাহারও অবিদিত রহিল না। তখন ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিবার জন্য ব্রহ্মর্ষিদিগকে সিণ্ডিকেটে আহ্বান করিলেন। কণ্ব, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি নারদাদি দেবর্ষি সব আসিয়া জুটিলেন। আকাশপথে সভা হইল, সভায় একজন শূদ্র রাজাকে ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া হইল। বিশ্বামিত্রদৃষ্ট মন্ত্র গায়ত্রীনামে ব্রাহ্মণমাত্রেরই আরাধ্য জপনীয় মন্ত্র বলিয়া, স্বীকার করা হইল। কিন্তু ব্রহ্মা যেই বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন, কোন ব্রহ্মর্ষি বা দেবর্ষি অনুমোদন করিলেন না। কেহ বলিলেন, বিশ্বামিত্র এখনই বিশ্বের প্রায় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণত্ব ও বিদ্যা পাইলে এখনই সৃষ্টিলোপ করিবে। কেহ বলিলেন, উহার দুরাকাঙ্ক্ষা বড় প্রবলা, আজি ব্রাহ্মণত্ব পাইলে, কালি ব্রহ্মত্ব চাহিয়া বসিবে। অতএব উহাকে সাহস দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। অনন্তর সমবেত ব্রহ্মর্ষিগণ ব্রহ্মাকে প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠাইলেন। ব্রহ্মার প্রতি ভার রহিল, তুমি ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন আর যাহাই চায় দিও। ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "আমি ব্রহ্মা, তোমার ধ্যানে তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিয়াছি। কি বর চাহ, যদি অদেয় না হয়, তবে দিব।" "আমি ব্রাহ্মণত্ব চাহি, দিতে পার?" "না।" "আমি তোমার মত ব্রহ্মার বর চাহি না।" ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া আবার যাইয়া ব্রহ্মর্ষিসভায় উপস্থিত হইলেন। এবং উহাকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কেহই সম্মত হইল না। তখন পরামর্শ হইল সকলে গিয়া বিশ্বামিত্রকে বুঝাইয়া পড়াইয়া অন্য কোন বরদানে তুষ্ট করা যাউক। বশিষ্ঠ একবার যাইতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও অন্যান্য সভাসদগণের অনুরোধে গেলেন। ব্রহ্মা আবার তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করাইলেন। বিশ্বামিত্র সমাগত বরদাতাগণের মধ্যে বশিষ্ঠকে দেখিয়াই চটিয়া গেলেন। এবং অনেকক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন। সভাসদগণ বুঝাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণত্ব অতি সামান্য পদার্থ, তুমি যেরূপ উপযুক্ত, যেরূপ তপস্বী মহাপুরুষ, তুমি ত

ব্রাহ্মণের চূড়া। যখন ব্রাহ্মণমাত্রেই তোমার মন্ত্র পাঠ করিবে, জপ করিবে, নিয়ম করা গেল, তখন তোমার ব্রাহ্মণত্বের বাকী কি রহিল। ব্রাহ্মণত্বে অনেক কষ্ট; অনেক ব্রত, নিয়ম করিতে হয়। তুমি রাজা তোমার তাহা কষ্টকর হইবে।

বি। মহাশয় আমি যখন এত কঠোর তপ করিয়াছি, তখন কি তোমার ব্রাহ্মণের ব্রত পালন করিতে পারিব না?

"তুমি পারিবে না তা কি বলিতেছি, এত কষ্টে তোমার কাজ কি? তুমি ইন্দ্রত্ব লইবার জন্য চেষ্টা করনা কেন? তাহাই তোমার যোগ্যপদ। আর আমরা তোমার তপে সন্তুষ্ট হইয়া, আজি তোমায় রাজর্ষি উপাধি দিলাম। তুমি জান ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষির নীচেই রাজর্ষি, তোমায় তৃতীয়শ্রেণীর ঋষি করিয়া দিলাম। তোমার ব্রাহ্মণত্বে কাজ কি? এই লহ রাজর্ষি-সম্ভ্রমসূচক পদগ্রহণ কর।" বিশ্বামিত্র এই সমস্ত কথার চাতুরী বেশ বুঝিতে পারিলেন। ব্রহ্মর্ষিগণ যে তাঁহার তপে ভীত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না। তিনি পদক দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'ব্রহ্মর্ষিগণ, তোমাদের চাতুরী বুঝিয়াছি। তোমরা আমায় স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া আমায় ব্রাহ্মণত্বে বঞ্চিত করিলে। কিন্তু আমি আর ব্রাহ্মণত্বপ্রত্যাশী নহি। আমি ব্রহ্মত্ব চাহি, তোমাদের খোসামোদ ও তপস্যা আর করিব না। আমি নূতন পৃথিবী নির্ম্মাণ করিব, তাহার ব্রহ্মা হইব। আমার পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ দূর করিয়া দিব। রাখ দেখি তোমরা কেমন পার?' বশিষ্ঠ ব্রহ্মাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, কেমন বলিয়াছিলাম ত, ব্রাহ্মণত্ব এখনও পায় নাই, তাহাতেই এই। ঋষিরা আবার নানা উপায়ে বিশ্বামিত্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "তুমি মনে করিলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবে আশ্চর্য্য কি, যাহার তপোবলে ব্রহ্মাণ্ড দ্বিধাখণ্ডিত হইয়াছে, সে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু আমরা তোমার বন্ধু, তোমায় এক উপদেশ দিই, কেন এত কষ্ট পাইবে। এই ব্রহ্মাণ্ডে তুমি ত অদ্বিতীয়। তুমি ব্রাহ্মণের উপর ব্রহ্মারও উপর; তবে কেন তুমি সৃষ্টিশ্রম স্বীকার করিতে চাও।"

বিশ্বামিত্র। ব্রাহ্মণকুল নির্ম্মূল কর, আমি তোমার সৃষ্টিতে থাকিতে পারি। ব্রাহ্মণ আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে।

ব্রহ্মাদি সকলে ক্রোধে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "তোর যত শক্তি আছে কর। আমাদের সঙ্গে তোর কোন সম্পর্ক আর কোন সম্বন্ধ নাই।" বলিয়া ক্রোধভরে বেগে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্রও নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যবেক্ষণার্থ ধবলাগিরির সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশে আরোহণ করিলেন।

বাঙ্গালির উৎপত্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনার্য্য।

আর্য্যেরা উত্তর-পশ্চিম হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে প্রথমে সপ্তসিন্ধুশোভিত পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের প্রথম বাস যে সেই সপ্তসিন্ধুবিধৌত পুণ্যভূমি তাহার প্রমাণ আর্য্যদিগের বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে আছে। আচার্য্য রথ বলেন ঋগ্বেদ-সংহিতায় সিন্ধুনদের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে—কিন্তু গঙ্গার নাম একবার মাত্র গৃহীত হইয়াছে। পঞ্জাবের নদী সকল ও পঞ্জাবের নিকটস্থ গান্ধারাদি দেশই বেদপ্রণেতৃগণের নিকট সুপরিচিত। ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে।*

যদি তাঁহারা উত্তর পশ্চিম হইতে আসিয়া প্রথমে পঞ্জাবে বাস করিয়া থাকেন, তবে ইহা অবশ্য সিদ্ধ, যে তাঁহারা পঞ্জাবে আসিবার পরে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। প্রথমে ব্রহ্মাবর্ত্ত, তার পর ব্রহ্মর্ষিদেশ, তার পর মধ্যদেশ, সর্ব্বশেষে তাঁহারা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী হইয়াছিলেন।+ বাঙ্গালা ব্রহ্মাবর্ত্ত, বা ব্রহ্মর্ষিদেশ, বা মধ্যদেশের মধ্যগত নহে, বাঙ্গালা আর্য্যাবর্ত্তের শেষভাগ। প্রথম কোন্ সময়ে, আর্য্যেরা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা স্থানান্তরে করিব, অথবা চেষ্টার নিষ্ফলতা প্রতিপন্ন করিব—এক্ষণে আমাদিগের আলোচ্য এই যে যখন আর্য্যেরা বাঙ্গালায় আসেন নাই, তখন বাঙ্গালায় কে বাস করিত?

এ প্রশ্নের সচরাচর উত্তর এই যে আর্য্যের

---

* Vide Muir's Sanskrit texts Part II. Chapter II, Sect. XI. & Chapter III, Sect. III.

+ সরস্বতী দৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরং
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরং।
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদ্ অগ্রজন্মনঃ
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।
হিমবদ্বিন্ধ্যয়ো র্মধ্যং যৎপ্রাগ্ বিনশনাদপি
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
আ সমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ
মনু ২। ১৭—২২

পূর্ব্বে অনার্য্যেরা বাঙ্গালায় বাস করিত। এ উত্তর সত্য কি না তাহার কিছু বিচার আবশ্যক। এক্ষণে বাঙ্গালায় আর্য্য ও অনার্য্য উভয়ে বাস করিতেছে। যদি আর্য্য এখানকার আদিমবাসী না হইল, যদি ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে তাহারা কোন ঐতিহাসিককালে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তবে অবশ্য অনার্য্যেরা তৎপূর্ব্বে এখানে বাস করিত--কেবল এইরূপ বিচার অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু এ বিচার অসম্পূর্ণ। এমন কি হইতে পারে না যে, যখন আর্য্যেরা প্রথম বাঙ্গালায় আসেন তখন অনার্য্যেরা বা কোন জাতীয় মনুষ্য বাঙ্গালায় বাস করিত না? এমন কি হইতে পারে না যে, আর্য্যেরা বাঙ্গালাকে শূন্য ভূমি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন, তাহার পর অনার্য্যেরা আসিয়া বন্য ও পার্ব্বত্য প্রভৃতি প্রদেশখালি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিল? আর্য্যেরা ঐতিহাসিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল বলিয়া অনার্য্যেরা যে তাহার পরে আসে নাই, এমত সিদ্ধ হইল না। দেশ থাকিলেই যে লোক থাকিবে এমত কথা নহে। সত্য বটে এখনকার দিনে, বাঙ্গালার ন্যায়, বিস্তৃত, উর্ব্বর এবং জীবননির্ব্বাহের নানাবিধ সুখকর উপাদানবিশিষ্ট দেশ জনশূন্য থাকে না। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে, যখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা এত বাড়ে নাই, যখন জাতিতে জাতিতে বড় ঠেলাঠেলি হয় নাই, তখন বাঙ্গালাও বসতিহীন থাকা বিচিত্র নহে। অতএব এ প্রশ্ন মীমাংসার আর কি প্রমাণ আছে, দেখা যাউক।

যদি ভারতীয় অনার্য্যদিগের এখনকার বাসস্থান, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম বা উত্তরপূর্ব্ব প্রদেশ হইত, তাহা হইলে অবশ্য বলিতাম যে তাহারা বাহির হইতে আসিয়া ঐসকল স্থান খালি পাইয়া বাস করিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের প্রান্ত ভাগে বিশেষ উত্তরপূর্ব্বভাগে কতকগুলি অনার্য্যজাতির বাস আছে এবং তাহারাও যে আর্য্যদিগের আসার পরে আসিয়াছিল, তাহাও ঐতিহাসিক কথা। সে সকল কথা পরে বলিব। অধিকাংশ অনার্য্যজাতি এরূপ সংস্থানবিশিষ্ট নহে। তাহারা কোথাও মধ্যভারতে, কোথাও দক্ষিণে, যেখানে সেখানে বসতি করিতেছে। তাহাদের চারিপাশে আর্য্যনিবাস। ভারতে প্রবেশের পথ, আর তাহাদিগের বর্ত্তমান বসতিস্থলের মধ্যে আর্য্যনিবাস। এ অবস্থা দেখিয়া যিনি বলিবেন যে আর্য্যের পরে এই অনার্য্যেরা আসিয়াছিল, তাঁহাকে বলিতে হইবে যে অনার্য্যেরা আর্য্যদিগকে জয় করিয়া, আর্য্যনিবাস ভেদ করিয়া, তাহাদের এখনকার স্থানে আসিয়াছে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে, যে সকল স্থান উত্তম, মনুষ্যবাসের যোগ্য সেই সকল স্থানে তাহারা বাস করিত। কদর্য্যস্থান সকলে পরাজিতেরা থাকিত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সেরূপ নহে। অনু-

গাঙ্গ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বাসভূমিতেই আর্য্যনিবাস কদর্য্যস্থানেই অনার্য্যনিবাস। বিন্ধ্যোত্তর ভারতে যে সকল সুখের স্থান, সেখানে তাহাদের বাস নাই। ইচ্ছা করিয়া যে সকল স্থানে বাস করিতে হয়, সে সকল স্থানে তাহাদের বাস নাই। যেখানে ভূমি উর্ব্বরা, পৃথ্বী সমতলা, নদী নৌবাহিনী, এবং ধনধান্য প্রচুর, সেখানে তাহারা নাই। যেখানে ভূমি অনুর্ব্বরা, পর্ব্বতে পথ বন্ধুর, পৃথিবী অরণ্যময়ী, মনুষ্যভাণ্ডার ধনশূন্য, সেই সকল স্থানে তাহাদের বাস। যাহারা বিজয়ী তাহারা কদর্য্যস্থান সকল বাছিয়া লইবে, যাহারা বিজিত, তাহাদিগকে ভাল স্থান ছাড়িয়া দিবে ইহা অঘটনীয়। অতএব আর্য্যের পর অনার্য্য আসিয়াছে, এপক্ষ সমর্থন করা যায় না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে আগে অনার্য্য ছিল তার পর আর্য্য আসিয়াছে।

দেখা যাউক, এই পূর্ব্ববর্ত্তী অনার্য্য কাহারা। দেশী বিদেশী সকলেই স্বীকার করেন, বেদ প্রাচীন। দেশীয়েরা বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয়ত্ব বাদ ছাড়িয়া দিয়া, বিদেশীয়দিগের ন্যায় বলা যাউক, যে বেদের ন্যায় প্রাচীন আর্য্যরচনা আর কিছুই নাই। বেদের মধ্যে ঋগ্বেদসংহিতাই প্রাচীন। সেই ঋগ্বেদসংহিতায় "বিজানীহি আর্য্যান্ যে চ দস্যবঃ" "অয়মেতি বিচাকশদ্ বিচিন্বন দাস আর্য্যম্"* ইত্যাদি বাক্যে আর্য্য হইতে একটি পৃথক্ জাতি পাওয়া যায়। তাহারা দাস বা দস্যু নামে বেদে বর্ণিত। দস্যুশব্দের এখন প্রচলিত অর্থ—ডাকাত, দাসের প্রচলিত অর্থ চাকর। কিন্তু এ অর্থে দস্যু বা দাসশব্দ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত নহে। দাসদিগের স্বতন্ত্র নগর, সুতরাং স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।† তাহারা আর্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিত—তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্য্যেরা ইন্দ্রাদির পূজা করিতেন। দাস বা দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ—আর্য্যেরা গৌর। তাহারা "অবর্হিষ্মান্"—যজ্ঞ করে না—আর্য্যেরা যজমান—যজ্ঞ করে—তাহারা "অব্রত"—আর্য্যেরা সব্রত—সুতরাং হে ইন্দ্র, হে অগ্নি—তাহাদের মার, আর্য্যদের বশীভূত কর! আর্য্যদের এই কথা। তাহারা অদেব—সুতরাং "বয়ং তান্ বনুয়াম সঙ্গমে"—তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাই। তাহারা "অন্যব্রত"—"অমানুষ"—"অযজান"—"অদেব।" তাহারা "মৃধ্রবাচ"—

* ঋচ ১। ৫১। ৮—৯। মূরধৃত। মন্মমূলরধৃত। Sanskrit texts Part II. Chap. III. sect 1.

† ঋচ্ ১। ১০। ৮৬। ১৯। মূরধৃত। Ib.

কথা কহিতেও জানেনা। ইত্যাদি।* ইত্যাদি।

এইরূপ বর্ণনায়, নিশ্চিত বুঝা যায় যে যাহাদিগের কথা হইতেছে, তাহারা আর্য্য হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী—এবং আর্য্যদিগের পরমশত্রু। আর্য্যেরা, ভারতবর্ষে প্রথম আসিয়া, ইহাদিগের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইহারা অবশ্য অনার্য্য।

বেদের অনেক পরে মন্বাদি স্মৃতি। মনুতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে মনুসংহিতা সঙ্কলনকালে আর্য্যদিগের চারিপার্শ্বে অনার্য্যেরা ছিল। মনুতে তাহারা ভ্রষ্টক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত আছে। আচারভ্রংশ হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত বলিয়া কথিত আছে। যথা—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়
জাতয়ঃ
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ
শকাঃ—
পারদা পহ্লবা শ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ
খশাঃ

ইহাদিগের মধ্যে যবন পহ্লব আর্য্য অবশিষ্ট অনার্য্য। ইহা ভাষাতত্ত্ব প্রদত্ত প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে।

মনু ও মহাভারত হইতে এইরূপ অনেক অনার্য্যজাতির তালিকা বাহির করা যাইতে পারে। তাহাতে অন্ধ্র পুলিন্দ সবর মূতিব ইত্যাদি অনার্য্যজাতির নাম পাওয়া যায়। এবং মহাভারতের সভাপর্ব্বে উহারাই দস্যুনামে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

দস্যূনাং সশিরস্ত্রাণৈঃ শিরোভির্লূন-
মূর্দ্ধজৈঃ
দীর্ঘ কূর্চ্চৈর্মহী কীর্ণা বিবর্হৈরণ্ড
জৈরিব

ইহারা যে পরিশেষে আর্য্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিত। পরাজিত হইয়াই, উহারা, যে যেখানে বন্য ও পার্ব্বত্যপ্রদেশ পাইয়াছিল সে সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সেই সকল প্রদেশ দুর্ভেদ্য, —আর্য্যেরাও সে সকল কুদেশ অধিকারে তাদৃশ ইচ্ছুক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং সেখানে আত্মরক্ষা সাধ্য হইল। কোন কোন স্থান—যথা দ্রাবিড় আর্য্যের অধিকৃত হইলেও অনার্য্যেরা তথায় বাস করিতে লাগিল, আর্য্যেরা কেবল

* স জাতুভর্ম্মা শ্রদ্দধান ওজঃ বিভিন্দ বিদ্‌ বি দাসীঃ। বিদ্বান্‌ বজ্রিন্‌ দস্যবে হেতিমস্যার্য্যং সহোবর্দ্ধয়া দ্যুম্নমিন্দ্র। ঋচ্‌। ১,১০৩,৩। মূরধৃত। St. ইত্যাদি বহুতর মন্ত্র।

প্রভু হইয়া রহিলেন।* আর্য্যাবর্ত্তের সাধারণ লোক আর্য্য—দাক্ষিণাত্যে সাধারণ লোক অনার্য্য। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য তুল্যরূপে আর্য্যাধিকৃত দেশ, তবে আর্য্যাবর্ত্তের ও দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন অবস্থা কেন ঘটিল, এ প্রস্তাবে সে কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়।† ভারতবর্ষে আর্য্য ও অনার্য্যের সামঞ্জস্য এক রকম ঘটে না। আমরা তিন প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই।

প্রথম। ভারতবর্ষে কোন কোন অংশ আর্য্যজিত নহে—অনার্য্যেরা সেখানে প্রধান—কতকগুলি আর্য্যও সেখানে বাস করে, কিন্তু তাহারা অপ্রধান। ইহার উদাহরণ সিংহভূম।

দ্বিতীয়। অবশিষ্ট আর্য্যজিত প্রদেশের মধ্যে কোন কোন প্রদেশ এরূপ আর্য্যীভূত, যে সে দেশে কেবল আর্য্যবংশ প্রাধান্যবিশিষ্ট এমত নহে—লোকের মাতৃভাষাও আর্য্যভাষা। উত্তর পশ্চিম, মধ্যদেশ ইহার উদাহরণ।

তৃতীয়। কোন কোন আর্য্যজিত দেশ এরূপ অল্প পরিমাণে আর্য্যীভূত, যে সে সকল স্থানে লোকের মাতৃভাষা আজিও অনার্য্য। দ্রাবিড় কর্ণাট প্রভৃতিতে আর্য্যধর্ম্মের বিশেষ গৌরব, ও সংস্কৃতের বিশেষ চর্চ্চা থাকিলেও, সে সকল দেশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বাঙ্গালা দ্বিতীয়শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু তাহা হইলেও, বাঙ্গালারমধ্যে বিস্তর অনার্য্য। অন্য কোন আর্য্যদেশে অনার্য্যশোণিতের এত প্রবলস্রোতঃ বহে না। সেই কথা একণে আমরা স্পষ্টীকৃত করিব।

* "Though by this superior civilization and energy they placed themselves at the head of the Dravidian communities, they must have been so inferior in numbers to the Dravidian inhabitants as to render it impracticable to dislodge the primitive speech of the country, and to replace it by their own language. They would therefore be compelled to acquire the Dravidian dialects. *Muir's Sanskrit Texts, Part II.*

† মুরের দ্বিতীয়খণ্ডে তৃতীয়পরিচ্ছেদে ধৃত মন্ত্র সকল দেখ—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবে। এখানে সে সকল উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

জল।

যে যে উপাদানে মনুষ্যদেহ নির্ম্মিত, তাহার মধ্যে জলের ভাগই অধিক; ১৫৪ ভাগের মধ্যে প্রায় ১১৬ ভাগ জল; অর্থাৎ চারিভাগের তিনভাগ জল। অস্থি, মাংস, রক্ত, মেদ, স্নায়ু, ত্বক ইত্যাদি সকলগুলিতেই জল আছে। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে যে মনুষ্যের দেহ ওজনে ৭৭ সের, তাহার শরীরে জল ৫৮ সের থাকে। শরীরে জলের ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সুতরাং অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা জলের অধিক প্রয়োজন। কিন্তু তাহা বলিয়া যে ঘটি ঘটি জলপান করিলে দেহ বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিবে, তাহা নহে। শরীর এমনি চমৎকার কৌশলে নির্ম্মিত, যে ইহাতে কোন উপাদানের আধিক্য বা অল্পতা হইলে চলিবে না, সব ঠিক ঠিক চাই; বেশী কম হইলেই কল বিগড়িয়া যাইবে।

তৃষ্ণা পাইলেই আমরা জলপান করিয়া থাকি এবং জলপান করিলেই পিপাসা নিবৃত্তি হয়। কিন্তু কেন তৃষ্ণা পায় এবং কি কারণেই বা জলপানে তৃপ্তি হয় তাহা কয় জন জানে বা জানিতে ইচ্ছা করে? তৃষ্ণা পাইলেই জল খাইতে ইচ্ছা করে, এবং জল খাইলেই পিপাসার শান্তি হয় এই মাত্র জানি, তাহার আবার কারণ কি?

মনুষ্যদেহ অহরহঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা চলি, নড়ি, চিন্তা করি, বা চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকি, অথবা নিদ্রা যাই, কিছুতেই নিস্তার নাই; শরীরের কিছু না কিছু ব্যয়িত হইবেই হইবে। যখন খরচ এত অধিক, তখন রোজগারও তেমনি চাই, নচেৎ দেনায় সমস্ত নিলাম হইয়া যাইবে, মহাজনকে অচিরাৎ দেউলিয়া হইতে হইবে। শরীরের এই খরচ রক্তের হ্রাস, এবং ইহার রোজগার খাদ্য ও পানীয়। অন্যান্য ব্যবসায় যেমন রোকড় দৃষ্টে খরচ জানা যায়, শরীরের পক্ষে সেইরূপ ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা শোণিতহ্রাস অনুমিত হইয়া থাকে; সুতরাং ক্ষুধা তৃষ্ণাই ইহার রোকড় বহি। যখনই রক্তে জলের ভাগ কম পড়ে, তখনই আমাদের তৃষ্ণা বোধ হয়। যদিও আপাততঃ এরূপ বোধ হয় যে টাক্‌রা শুকাইয়া যাওয়াতে তৃষ্ণা পায়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে শোণিতে জলের অংশ হ্রাস হওয়াই ইহার মূল কারণ। যেমন শরীরাভ্যন্তরে খাদ্যের অভাব ক্ষুধার প্রকৃত কারণ হইলেও আমরা পাকস্থলীতে ক্ষুধার অনুভব করি, তৃষ্ণার পক্ষেও সেইরূপ অপ্রধান কারণকে প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি। কারণ, তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির টাক্‌রা ভিজাইয়া রাখিলে যে তৃষ্

নিবৃত্ত হয় তাহা অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী, কিঞ্চিৎ পরে আবার যে তৃষ্ণা সেই তৃষ্ণা; পাকস্থলীর পরিপাকক্রিয়াদ্বারাই হউক, দেহে ক্ষত করিয়া শিরামধ্যে প্রবেশিত করিয়াই হউক, অথবা ত্বকের শোষণী-শক্তিদ্বারাই হউক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জল রক্তের সহিত মিশ্রিত না হইতেছে, তত-ক্ষণ একবারে তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতেছে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে যদি রক্তে জলের ভাগ কম পড়াই তৃ-ষ্ণার কারণ হইল,তবে শুদ্ধ টাক্‌রা শুকাই-লেই কেন তৃষ্ণা অনুভব হয়? ইহার কারণ বোধ হয়, যে অন্যান্য স্নায়ু অপেক্ষা মুখের ও টাক্‌রার স্নায়ু জলের অভাব অধিক অনুভব করে। যে সমস্ত জ্ঞান বাস্তবিক সমস্ত শরীরের অবস্থার উপর নির্ভর করে, তৎসমুদায়ও কোন একটি বিশেষ ইন্দ্রিয় হইতে যে অনুভূত হইতে পারে, তাহা ডাং ভকমানের (Volkmann) পরীক্ষাদ্বারা একরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

রক্তে জলের ভাগ কম হওয়া যে পিপাসার কারণ তাহার একটি চমৎ-কার প্রমাণ আছে। ক্লড বারনার্ড দেখিয়াছেন, কোন কুকুরের পাকস্থ-লীতে একটি ছিদ্র ছিল, কুকুর জলপান করিবামাত্র সেই ছিদ্র দিয়া সমুদায় জল বাহির হইয়া পড়িত। সুতরাং জল রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে না পারায় তাহার পিপাসা নিবৃত্ত হইত না, আবার সে জলপানে প্রবৃত্ত হইত,জলও আবার নির্গত হইয়া যাইত। কুকুর এইরূপে পুনঃ পুনঃ জলপানে ক্লান্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় জলপান করিতে আরম্ভ করিত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ছিদ্রটি বদ্ধ করিবামাত্র পীত জল পাকস্থলীতে শোষিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইত, এবং তজ্জন্য তৃষ্ণা এককালে নিবৃত্ত হইত।

ত্বকের শোষণী শক্তিদ্বারা জল দেহমধ্যে নীত হয়। এই বিষয় লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে কিছুকাল অনেক বাদানুবাদ চলে, অবশেষে উহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার এডওয়ার্ডস্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে টিক্‌টিকীর লাঙ্গুল জলে ডুবাইয়া রাখিলে জল শোষিত হইয়া তাহার সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হয়। ডাক্তার মাডেন আধ ঘণ্টাকাল জলে সমস্ত শরীর মগ্ন রাখিয়া দেখিয়াছেন তাঁহার দেহের ভার প্রায় ৪ ড্রাম ১ইস্‌-ক্রুপল ৩ গ্রেণ পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। জলের অংশ দেহমধ্যে শোষিত না হইলে দেহভার কিরূপে বর্দ্ধিত হইল? ডাং বারণও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার দেহভার আরও কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

যতটুকু জলপান করা উচিত,তদপেক্ষা অল্প জলপান করিলে কি কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহা অদ্যাপি সম্যক্ নির্ণীত হয় নাই। বোধ হয় ইহার প্র-ধান কারণ এই, যে যে তৃষ্ণাশান্তির ইচ্ছা এত প্রবল লোকে সেই ইচ্ছাকে কোন

মত্তে নিবৃত্ত ও অর্দ্ধপূর্ণ করিয়া রাখিতে পারে না। কয়েকটীমাত্র পরীক্ষাদ্বারা এতৎসম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, প্রয়োজন অপেক্ষা অল্প জল খাইলে Pulmonary Carbonic Acid অল্পমাত্রায় নিঃসৃত হয়, মল ও মূত্রত্যাগ কমিয়া আসে, এবং বহুদিন এই ভাবে থাকিলে শারীরিক ও মানসিকশক্তি কমিয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশীয় ব্যায়ামজীবি লোকদিগের মধ্যে এই একটি কুসংস্কার আছে যে, ব্যায়ামকারী যত অল্প জল খাইবে ততই ভাল। কিন্তু এটি বিষম ভুল। সাধারণতঃ শরীর হইতে যে জলীয় অংশ নিঃসৃত হয়, ব্যায়ামকালে তদপেক্ষা প্রায় ১২১০৪১ ভাগ অধিক জল নির্গত হয়। সেই অংশ পূর্ণ করিয়া লইবার জন্য বরং অধিক পরিমাণে জল খাওয়া কর্ত্তব্য। তবে একবারে অধিক পরিমাণে জল না খাইয়া অল্প অল্প করিয়া বহুবার জলপান করা মন্দ নহে। শীতপ্রধানদেশে প্রত্যেক লোকের গড়ে প্রতিদিন ২৩ গ্যালন জলের প্রয়োজন হয়; তন্মধ্যে শুদ্ধ পানার্থ যুবকের পক্ষে ৭০ হইতে ১০০ ঔন্স পর্য্যন্ত এবং বালকের পক্ষে ২০ হইতে ৩০ ঔন্স পর্য্যন্ত জল দরকার হয়। সেক্রেটারি অব ষ্টেট ১৮৬৮ সালে এই আদেশ করিয়াছেন, যে প্রত্যেক সৈন্য প্রতিদিন ১৫ গ্যালনের অতিরিক্ত জল পাইবে না। শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জলের কিছু অধিক আবশ্যক, এবং আমরা স্বভাবতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জল ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু কলিকাতায় এখন কলের জল ব্যবহার হইতেছে, যত ইচ্ছা এখন তত জল পাওয়া যায় না, প্রত্যেক অধিবাসী গড়ে যে পরিমাণ জল পাইয়া থাকেন, তাহাতে কলিকাতায় জলকষ্ট হইয়াছে অনেকে বলিয়া থাকেন। এই কারণেই আজ কাল জলের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য আন্দোলন হইতেছে।

পরিশ্রমের তারতম্য অনুসারে আবার জলের আবশ্যকতাও কমবেশী হইয়া থাকে। যে ঘোড়া প্রতিদিন ৪ ক্রোশ গাড়ি টানে, তাহার ৮ গ্যালন জলের দরকার হয়; কিন্তু সেই ঘোড়াই যখন আড়গড়ায় বাঁধা থাকে কোন কর্ম্ম না করে, তখন ৭ গ্যালন জলেই তাহার পর্য্যাপ্ত হয়। আবিসিনিয়ায় যুদ্ধযাত্রাকালে জাহাজে যে যে পশুর প্রাত্যহিক পানার্থ যে যে পরিমাণ জল লওয়া হইয়াছিল, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

হস্তী	১৫	গ্যালন।
উষ্ট্র	১০	,,
বড় বৃষ	৬	,,
ছোট ঐ	৫	,,
অশ্ব	৬	,,
টাট্টু ও অশ্বতর	৫	,,

অনেকে বলেন, "অবিশুদ্ধ জল পান করিলে কোন অপকার হয় না, কারণ এরূপ দেখা গিয়াছে, যে যে সকল বাগ্মী

প্রভৃতি জাতি বাদায় বাস করে, তাহারা প্রায়ই বাদার অপেয় জল পান করিয়া থাকে, অথচ তাহাদের স্বাস্থ্য কেমন সুন্দর! শরীর কেমন বলিষ্ঠ!" দুইটী কারণে এ কথাটী আমাদের সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। প্রথম, বাদার লোকে যে অপেয় বাদার জল নিত্য পান করে তাহা নহে, তাহারা যে দ্বীপাকার স্থানে বাস করে,তথাকার পুষ্করিণীর নির্ম্মল জলই প্রায় পান করে,তবে কার্য্যগতিকে কদাচ কখন বাদার জলও যে না খায় তাহা নহে, কিন্তু তজ্জন্য যে সামান্য অপকার জন্মে তাহা তাদৃশ বলিষ্ঠ দেহে কোন বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না। দ্বিতীয়, সকল বাগ্‌দীই যে বলবান্ ও সুস্থশরীর তাহার কোন প্রমাণ নাই; হইতে পারে যে যাহারা আমাদের নজরে পড়ে তাহারাই কেবল সুস্থকায়; দুর্ব্বল ও রুগ্নদেহ লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবার আমাদের কারণ ঘটে না। আমাদের এরূপ বোধ করিবার অন্যতম কারণ এই যে, লোকে যে দিন অবিশুদ্ধ জল পান করে, সেই দিনেই কিছু পীড়িত হয় না, ইহার ফল অনেক পরে ফলে. কাজেই আমরা পীড়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপেয় জলপানের কোন সম্পর্ক নাই দেখিয়া ইহার অন্য কারণ নির্দ্দেশ করি। কিন্তু বাস্তবিক জলের দোষে অনেক পীড়া জন্মে, তন্মধ্যে উদরাময়, ওলাউঠা ও জ্বর সর্ব্বপ্রধান। কলিকাতা অপেক্ষা আজকাল পল্লীগ্রামে যে জ্বর অধিক, তাহার প্রধান কারণ এই যে, কলিকাতার জল অতি পরিষ্কার, কিন্তু পল্লীগ্রামের জল আবার তেমনি অপরিষ্কার। হিপোক্রেটিস বলিয়া গিয়াছেন, যে বাদার জলে প্লীহা বৃদ্ধি হয়।

জলের সহিত প্রধানতঃ এই সমস্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকে, যথা—জান্তব, উদ্ভিদ বা ধাতব পদার্থ, বায়বীয় পদার্থ, নাইট্রোজন, অক্সিজেন, কারবনিক আসিড, কঠিন পদার্থচয় (Solid matters) চুণ, ম্যাগনিসিয়া, সোডা প্রভৃতি। কখন কখন ধাতুও জলের সহিত মিশ্রিত থাকে, যথা আরসেনিক, ম্যাংগানিস, সীসা, তাম্র, দস্তা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে কোন কোন ধাতব ও জান্তব পদার্থ অতিশয় অপকারী; কিছু আরসেনিক প্রভৃতি ধাতু যে জলে মিশ্রিত আছে তাহা বিষতুল্য। সাধারণতঃ গ্র্যানাইট, বালী ও খড়িময় স্থানের জল বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কর্দ্দমময় স্থান ও বাদার জল প্রায়ই দূষিত ও অপেয়। কীটাণুপূর্ণ জল শরীরের পক্ষে অপকারী কি না তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। ইনফিউসোরিয়া নামক কীটাণুদ্বারা কোন, অনিষ্ট হয় না, কিন্তু কতকগুলি কীটাণু দেহমধ্যে নীত হইলে অপকারও করিতে পারে। দূষিত জলপানে যে রক্তামাশয় রোগ জন্মে, তদ্বিষয়ে একটি আশ্চর্য্য গল্প আছে। West Indies নামক দেশের অন্তর্গত Tertola গ্রামে আগমনমাত্র ত-

ন্নত্য দূষিত জলপানে নাবিকগণের উক্ত রোগ হইত; কিন্তু তথাকার অধিবাসিগণ বৃষ্টির জলপান করিয়া দিব্য সুস্থ থাকিত। নাবিকেরা কোন অধিবাসীকে নিমন্ত্রণ করিলে, সে ব্যক্তি একঘটী খাবার জল সঙ্গে করিয়া আনিত, প্রাণান্তেও জাহাজের জল পান করিত না।

পশ্চিমাঞ্চলের জলে যে যে পদার্থ মিশ্রিত আছে

তাহার তালিকা।

স্থানের নাম	প্রতি গ্যালনে কঠিন পদার্থের পরিমাণ		প্রতি গ্যালনে সাধারণলবণের পরিমাণ	
আগরা নগরের কূপ	৯৮	গ্রেণ	৩২.৪	গ্রেণ
গোয়ালিয়রের কূপ	১৫৫.২	,,	৪৪.১	,,
গোয়ালিয়রের সুখোপত্যকাস্থ কূপ Happy valley	৩১.৮	,,	৭.১	,,
ঝান্সিস্থ কূপ	২৪.৬	,,	১.৭	,,
ফয়জাবাদস্থ কূপ	২১	,,	১.৪	,,
বহরমপুরস্থ কূপ	৮১.৯	,,	৩২.৩	,,
অম্বালাস্থ কূপ	৭৭.৫	,,	১৫.৩	,,
রাউলপিণ্ডীস্থ কূপ	২৬.৪	,,	.৭৪	,,
সাগরস্থ কূপ	১৫৭.৮	,,	৩৮.৬	,,
সীতাপুরস্থ কূপ	২৮	,,	.৬	,,

ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জলে কি পরিমাণে কি কি দ্রব্য মিশ্রিত আছে নিম্নে তাহার এক তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

স্থানের নাম	প্রতি গ্যালনে সোডিয়মের পরিমাণ	প্রতি গ্যালনে সাধারণ লবণের পরিমাণ
ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার জল	৪৮.৪ ...	.৬৭২
বাজারস্থ কূপ	১২০.৪ ...	২৭.০২
কুন্জীপুর বাজারের কূপ	৬৯৩. ...	১৭৩.৮
টি, সান্ডিস্ সাহেবের বাটীস্থিত কূপ	৩৪.১ ...	১.৬৩৭
ক্লিডন্যাও মন্দির সন্নিহিত কূপ	২৮.৩৫ ...	১.১৩

কি কি বস্তু জলের সহিত মিশ্রিত আছে, তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। সাধারণতঃ যে যে লক্ষণ থাকিলে জল পানযোগ্য হইয়া থাকে,—তাহা এই পেয়জল স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হইবে, তাহাতে স্বাদ বা গন্ধ কিছুই থাকিবে না, কোন প্রকার পদার্থ ইহার সহিত মিশ্রিত না থাকে, এবং ইহা বায়ুমিশ্র হয়, কঠিন পদার্থ প্রতি গ্যালনে ৮ গ্রেণের অধিক না থাকে, নাইট্রেট বা আমোনিয়া আদৌ না থাকিলেই ভাল হয়, তবে অতি স্বল্প পরিমাণে থাকিলে হানি নাই।

জলের যে যে দোষ যেরূপে বিনষ্ট হইতে পারে, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে।

জান্তব পদার্থ—ফুটাইয়া লওয়া অনবরত নাড়া, বায়ুসম্পর্ক এবং কয়লা ও ফটকিরি প্রভৃতি দ্বারা বিদূরিত হইতে পারে।

Carbonate of Lime—ফুটাইয়া ও Caustic Lime মিশাইয়া।

Sodium Chloride—কয়লা ও বালি দ্বারা শোধিত করিয়া।

লৌহ—ফুটাইয়া এবং কিছুপরে চুণের জল মিশাইয়া এবং কিয়ৎপরিমাণে কয়লা দিয়া। লৌহ, তাম্র প্রভৃতির অংশ শুষ্ক কয়লাদ্বারা অনেক কম করা যাইতে পারে।

Calcium, Magnisium, Sulphate এবং Chloride প্রভৃতি পদার্থ একবারে

কখন দূর করা যায় না বটে, কিন্তু কয়লাদ্বারা শোধন করিয়া লইলে ইহাদের পরিমাণ অনেক কম হইতে পারে।

আজ কাল আমরা যে কলের জল খাইয়া থাকি তাহা প্রায়ই সীসার নল দ্বারা আনীত হয়। কিন্তু এই জল অতিশয় অপকারী। বহুদিন সীসার নল দিয়া জল আসিলে সীসা ক্রমশঃ ক্ষয়িত হইয়া জলের সহিত মিশিয়া যায়, এবং সীসামিশ্র জলপান করিলে প্রায়ই পক্ষাঘাতরোগ হইয়া থাকে। ১ গ্যালন জলে $\frac{১}{২০}$ গ্রেনমাত্র সীসা মিশ্রিত থাকিলেই উক্ত পীড়া হইবার সম্ভাবনা। এই দোষ পরিহারমানসে অনেকে অনেক প্রস্তাব করেন, তন্মধ্যে „তার (Tar) দিয়া বার্ণিস্ করিয়া লওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ; স্বল্পায়াসসাধ্য ও কার্য্যকারক। সীসার নলের পরিবর্ত্তে পেটা লোহা বা কলাইকরা টিনের নল ব্যবহার করা ভাল। কেহ কেহ কৃত্রিম প্রস্তর ব্যবহার করিবার উপদেশ দেন।

আমরা এতৎসম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করিব। অনেকের বিশ্বাস আছে, যে জলে মদ মিশাইয়া খাইলে সেই জলের সমস্ত দোষ নষ্ট হয়। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। মাতালেরা নিজের দলপুষ্ট করিবার জন্য এরূপ বলিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞলোকে যে কেন এমন কথা বলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বোধ করি লোকের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মদ খাইবার বাসনায় তাঁহারা এরূপ বলিয়া থাকেন। মদ মিশাইয়া অবিশুদ্ধ জল খাইলে এই লাভ হয়, যে দূষিত জলের অপকারের উপর মদের অপকারটুকুও আসিয়া জুটে। দান করিবার জন্য চুরি করায় যেরূপ পুণ্য, ইহাতেও সেইরূপ লাভ।



বঙ্গদর্শন

সপ্তমবৎসর।

৮৩ সংখ্যা।



বাঙ্গালির উৎপত্তি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনার্য্যের দুই বংশ দ্রাবিড়ী ও কোল।

আমরা বুঝাইয়াছি যে, ভারতবর্ষে আগে অনার্য্যের বাস ছিল—তার পর আর্য্যেরা আসিয়া তাহাদিগকে জয় করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। অনার্য্যেরা বন্য ও পার্ব্বত্যপ্রদেশে গিয়া বাস করিতেছে। ভারতবর্ষে অন্যত্র যাহা ঘটিয়াছে—বাঙ্গালাতেও তাই, ইহা সহজে অনুমেয়। কিন্তু বাঙ্গালার সঙ্গে মধ্যদেশাদির একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। মধ্যদেশাদির ন্যায়, বাঙ্গালার অনার্য্যগণ সকলেই বিজয়ী আর্য্যদিগের ভয়ে পলায়ন করে নাই। কেহ কেহ পলাইয়াছে—কেহ কেহ ঘরেই আছে।

জয় দ্বিবিধ, কখন কখন কোন প্রবল জাতি জাত্যন্তরকে বিজিত করিয়া তাহাদিগের দেশ অধিকৃত করিয়া আদিমবাসীদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করে। আদিমবাসীরা সকলে হয় জেতৃগণের হস্তে প্রাণ হারায়, নয় দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে পলাইয়া বাস করে। টিউটনগণকর্ত্তৃক ব্রিটেন জয়ের ফল এইরূপ হইয়াছিল। সাক্সনেরা ব্রিটন জয় করিয়া পূর্ব্বাধিবাসীদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়াছিলেন। কেবল যাহারা ওয়েল্‌স্ কর্ণওয়াল্ বা ব্রিটানীপ্রদেশে গিয়া পলাইয়া বাস করিয়া রহিল, তাহারাই রক্ষা পাইল। ইংলণ্ডে আর ব্রিটন্ রহিল না। ইংলণ্ড কেবল টিউটনের দেশ হইল। দ্বিতীয় প্রকারে দেশজয়ে পূর্ব্বাধিবাসীরা বিনষ্ট বা তাড়িত হয় না। বিজয়ীদিগের

সঙ্গে মিশিয়া যায়। নর্ম্মাণ্‌গণকর্ত্তৃক ইংলণ্ডজয় ইহার উদাহরণ। আর্য্যগণ বাঙ্গালাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা টিউটনদিগের মত অনার্য্যদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস বা বিদূরিত করিয়াছিলেন, বা নর্ম্মাণ্‌বিজিত স্যাক্সনের মত অনার্য্যেরা বঙ্গজেতা আর্য্যদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। যদি দেখি, যে বাঙ্গালার বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে অনার্য্যবংশ এখনও আছে, তবে বুঝিতে হইবে, যে অনার্য্যেরা আর্য্যদিগের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

প্রথমে দেখা যাউক, বাঙ্গালার কোথায় কোন্ কোন্ অনার্য্যজাতি আছে। সে গণনার পূর্ব্বে প্রথমে বুঝিতে হইবে বাঙ্গালা কাহাকে বলিতেছি। কেন না বাঙ্গালা নাম অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক অর্থে পেশোয়র পর্য্যন্ত বাঙ্গালার অন্তর্গত—যথা "বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি" "বেঙ্গল আর্ম্মি।" আর এক অর্থে বাঙ্গালা ততদূর বিস্তৃত না হউক, মগধ, মিথিলা, উড়িষ্যা, পালামৌ উহার অন্তর্গত—এই সকল প্রদেশ বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্টগবর্ণরের অধীন। এই দুই অর্থের কোন অর্থেই বাঙ্গালাশব্দ এ প্রবন্ধে ব্যবহার করিতেছি না। যে দেশের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালি; আমরা সেই বাঙ্গালির উৎপত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত। তাহার বাহিরে যাহারা আছে তাহাদের ইতিহাস লিখিব না—সাঁওতাল বা নাগা এ প্রবন্ধের কেহ নহে। তবে এখানে বাঙ্গালার বাহিরে দৃষ্টিপাত না করিলে, আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। যে সকল অনার্য্যজাতি বাঙ্গালার আর্য্যকর্ত্তৃক দূরীভূত হইয়াছে তাহারা অবশ্য বাঙ্গালার বাহিরে আছে। বাঙ্গালার ভিতরে ও বাঙ্গালার পার্শ্বে কোন্ কোন্ অনার্য্যজাতি বাস করিতেছে—দুইই দেখিতে হইবে।

উত্তরসীমায় ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই, খাম্‌তি, সিংফো, মিশ্‌মি, চুলিকাটা মিশ্‌মি। তারপর অপরজাতি, তাহাও অনেকপ্রকার। যথা—পাদম্‌ মিরী মফ্‌লা, ইত্যাদি। তার পর আসামপ্রদেশের নাগা, কুকি, মণিপুরী, কোপই, তাহার বাহিরে মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো জাতি। আসামের মধ্যে ব্রহ্মপুত্রতীরে দেখিতে পাই, কাছাড়ি বা বোড়ো, মেচ্ ও ধিমালজাতি এবং বাঙ্গালার মধ্যে তাহাদিগের নিকটকুটুম্ব কোচজাতি। তৎপরে উত্তরে, হিমালয়পর্ব্বতের ভিতরে বাস করে, ভোট, লেপ্‌চা, লিম্বু, কিরান্তী বা কিরাতী (প্রাচীন কিরাত।) তার পর বাঙ্গালার পূর্ব্বদক্ষিণ সীমায় মগ, লুসাই, কুকি, কারেণ, তালাইঙ্গ প্রভৃতি জাতি। ত্রিপুরার ভিতরেই রাজবংশী নওয়াতিয়া, প্রভৃতি জাতি আছে বাঙ্গালার পশ্চিমদিকে, কোল, সাঁওতাল খাড়িয়া, মুণ্ড, কৌড়োয়া ওঁরাও বা ধঙ্গড় প্রভৃতি অনার্য্যজাতি বাস করে এই শেষোক্ত কয়েকটি জাতির পূর্ব্বে

আমাদের অনেকগুলি কথা বলিতে হইবে। উত্তর ও পূর্ব্বের অনার্য্যদিগের সঙ্গে আমাদিগের তত সম্বন্ধ নাই, তাহারা অনেকেই হালের আমদানী।

আমরা কেবল কয়টি প্রধান জাতির নাম করিলাম—জাতির ভিতর উপজাতি আছে এবং অন্যান্য জাতি আছে। প্রসঙ্গক্রমে তাহাদের কথাও বলিতে হইবে।

এখন প্রথম জিজ্ঞাসা এই যে, ইহারা সকলে কি একবংশসম্ভূত? আর্য্যেরা সকলেই একবংশসম্ভূত—আর্য্যশব্দের অর্থই তাই। কিন্তু "অনার্য্য" বলিলে কেবল ইহাই বুঝায় যে, ইহারা আর্য্য নহে—যাহারা আর্য্য নহে, তাহারা সকলেই যে একজাতীয় এমত বুঝায় না। যদি এমত প্রমাণ থাকে, যে, ইহারা একবংশোদ্ভূত তবে সহজে অনুমান করিতে পারা যায়, যে ইহারা সকলেই বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী—আর্য্যগণ-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া নানাদেশে নানা নাম ধারণ করিয়াছে; কিন্তু যদি সে প্রমাণ না থাকে—বরং তদ্বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকে, যে তাহারা নানাবংশীয় তবে আবার বিচার করিতে হইবে, এইগুলির মধ্যে কাহারা কাহারা বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী।

প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে ভাষাবিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়া এসকল বিষয়ে গুরুতর প্রমাণ। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে যে ভিন্নশ্রেণীতে ভাষার কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে তৃতীয়শ্রেণীর ভাষার অন্তর্গত আর্য্যভাষা ও সেমীয়ভাষা (আরবী, হিব্রু প্রভৃতি)। প্রথমশ্রেণীর ভাষাগুলি—যাহা সংযোগনিরপেক্ষ, অথবা বিভক্তিবিশিষ্ট নহে—সেই সকল ভাষাকে ইউরোপীয়েরা ভারত-চৈনিক বলিয়া থাকেন। নামটি আমাদিগের ব্যবহারের অযোগ্য—আমরা ঐ ভাষাগুলি চৈনিকীয়ভাষা বলিব। দ্বিতীয়শ্রেণীর ভাষার সাধারণ নাম তুরাণী। বাঙ্গালার মধ্য বা প্রান্তস্থিত অনার্য্যজাতি সকলের ভাষা এই দ্বিবিধ—কতকগুলি জাতির ভাষা চৈনিকীয়—ইহাদিগের বাস প্রায় আসামে—বা বাঙ্গালার পূর্ব্বসীমায়। তাহারা অনেকেই আর্য্যদিগের পরে আসিয়াছে এমত ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তার পর অবশিষ্ট যে সকল অনার্য্যজাতি—তাহাদিগের সকলেরই ভাষা তুরাণীশ্রেণীস্থ।

কিন্তু সেই সকল অনার্য্যভাষার মধ্যেও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, দ্রাবিড়ভাষা তুরাণীশ্রেণীস্থ। বাঙ্গালার অনার্য্যভাষার মধ্যে কতকগুলি জাতির ভাষার শব্দবিন্যাস ও ব্যাকরণ সমালোচন করিয়া পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, ঐ সকল ভাষা দ্রাবিড়ী ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। আর কতকগুলি অনার্য্যভাষাকে দ্রাবিড়ীভাষার সঙ্গে কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, বাঙ্গালার কতকগুলি অনার্য্যজাতি দ্রাবিড়ীদিগের জ্ঞাতি—

কতকগুলি তাহাদিগের হইতে ভিন্ন জাতি।

যাহারা, অদ্রাবিড়ী, তাহাদিগের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য আছে। কোল বা হো, সাঁওতাল, মুণ্ড প্রভৃতি এখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি বটে, কিন্তু যেমন সকল আর্য্যভাষাই পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য ও সম্বন্ধবিশিষ্ট কোল, মুণ্ড, সাঁওতাল প্রভৃতির ভাষাও সেইরূপ সাদৃশ্যও সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতএব ইহারা সকলেই একজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। এই কথা আরও প্রাঞ্জল করিবার জন্য বাঙ্গালার ষ্টাটিষ্টিকল্ আকৌণ্ট হইতে বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের রিজলি সাহেবের লিখিত কয়েক পংক্তির মর্ম্মানুবাদ করিতেছি। তিনি চুটীয়া নাগপুর বিভাগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেছেন, কিন্তু কথাগুলি সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খাটে।

"চুটীয়া নাগপুর প্রদেশের আদিম-বাসীদিগের যতগুলি ভাষা আছে, সকলগুলিরই এক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ভাষার যে গঠনকে প্রত্যয়বিশিষ্ট বলে (সংযোগসাপেক্ষ) ঐ সকল ভাষাগুলিই সেইরূপ, এই জন্য এই ভাষাগুলি তুরাণী গোষ্ঠীর দক্ষিণ শাখার মধ্যে গণিত হয়। তন্মধ্যে উদয়পুর ও সরগুজার গোঁদ-জাতির ভাষা, আসল চুটীয়া নাগপুরের উরাঁও (ধাঁঙ্গড়) জাতির ভাষা, রাজমহলের পাহাড়ের পাহাড়িয়া দিগের ... কয়েকটী ভাষার ভারত-বর্ষের দাক্ষিণাত্যের সুসভ্য ভাষা সকলের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। এই জন্যে আচার্য্য মাক্ষমুলার্ এই ভাষাগুলিকে তামুলী ভাষা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সান্তালি মুণ্ডারি ও সিংহভূমের হো বা লড়কা কোলদিগের ভাষার সঙ্গে তামুলিক ভাষা সকলের সঙ্গে কোন শব্দে ঐক্য নাই। এজন্য মাক্ষমুলার যে গুলিকে ভিন্ন শ্রেণীতে বসাইয়া মুণ্ড নাম দিয়াছেন। ১৮৬৬ সালে ভারতীয়জাতিগণসম্বন্ধে সার্জর্জ্জ ক্যাম্বেল্ যে গ্রন্থ প্রচার করেন, তাহাতে বাঙ্গালা বেহার ও বানারস্ প্রদেশের দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা হইতে হায়দরাবাদ ও মাল্রাজ প্রদেশের সম্মুখ পর্য্যন্ত আর পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত হইতে মধ্য ভারতবর্ষস্থ নাগপুর রাজ্যের সুসভ্য অংশ পর্য্যন্ত যে পার্ব্বত্যপ্রদেশ, তত্রবাসী অনার্য্যজাতিগণকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক দ্রাবিড়ী অনার্য্য, অর্থাৎ যাহারা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষা সকলের সদৃশ ভাষায় কথা কয়, দ্বিতীয় কোলারীয় বা উত্তরবাসী অনার্য্য, যাহারা মাক্ষমুলারের বর্ণিত মুণ্ড জাতীয় ভাষা ব্যবহার করে। এই শেষোক্ত ভাষানিচয়ের দূরস্থিত অন্যান্য ভাষার সঙ্গে যে সম্বন্ধ এবং যে সকল জাতিমধ্যে যে সকল ভাষা প্রচলিত, তাহাদের আদি কি, এ সকল তত্ত্ব অদ্যকালে অনিশ্চিত রহিল। তুরাণী ভাষা সম্বন্ধে মাক্ষমুলার যে পত্র প্রচার করেন

তাহাতে বলিয়াছিলেন এই সকল ভাষার সঙ্গে অন্য কোন ভাষার সম্বন্ধ নাই। আর হজ্‌সন সাহেব তাঁহার প্রণীত কোচ বোড়ো ও ধিমাল জাতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, যে এই সকল ভাষাও তামুলিক। তবে যে দ্রাবিড়ী জাতি হইতে কোল বংশীয় ভাষা সকল ভিন্ন প্রকৃতি-গ্রস্ত ভাষা হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ এই যে মধ্যভারতবর্ষে নিবিড় জঙ্গলে পড়িয়া এই সকল জাতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। হজ্‌সন সাহেব যে দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের সঙ্গে পূর্ব্ব-বাঙ্গালানিবাসী জাতিদিগের সম্বন্ধ সংস্থাপিত করণে ইচ্ছুক আর তিনি যে, তামুলিক শব্দ অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ইহা বুঝাইয়া দিয়া সর্‌জর্জ ক্যাম্বেল্‌ দেখাইয়াছেন, যে সিংহভূমনিবাসী হো জাতিদিগের ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড়ী ভাষা সকলের কয়েকটী বিশেষ লক্ষণের ঐক্য আছে। যথা কোলীয় দ্রাবিড়ী ভাষাসকলে প্রকৃত প্রস্তাবে লিঙ্গভেদ নাই, অচেতনপদার্থ মাত্রই ক্লীবলিঙ্গ। প্রয়োজন মতে শব্দের অগ্রে স্ত্রী পুরুষ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষণ শব্দে বিভক্তি নাই। অথবা তারতম্যবাচক শব্দ নাই। সর্ব্বনামের উত্তম পুরুষের বহুবচনের এবং তাহার সম্বন্ধ পদের দুইটি রূপ আছে, একটিতে মধ্যমপুরুষ বাদ, আর একটির ভিতরে মধ্যম পুরুষ থাকে। কিংবা অভাবাদি অর্থ বাচক সর্ব্বনামের পরিবর্ত্তে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া পদের ব্যবহার হইয়া থাকে। "যে মানুষগিয়াছে" না বলিয়া তাহারা "গত মনুষ্য" বলে। পক্ষান্তরে কোলবংশীয় ভাষাসকল দ্রাবিড়ী বংশীয় ভাষানিচয় হইতে অধিক পরিমাণে বিভক্তিসম্পন্ন। কোলে রীতিমত দ্বিবচন আছে দ্রাবিড়ীতে নাই। অধিকন্তু কোলীয় ভাষার শব্দকোষ অধিকতর সম্পূর্ণ। অতি সামান্য শব্দ ব্যতীত নিকটবর্ত্তী ভাষা হইতে যে অধিক শব্দগ্রহণ করিয়াছে এমত কোন চিহ্ন কোলবংশীয় ভাষায় নাই। যথা সংখ্যা নির্ব্বাচনকরণে গোন্দেরা দ্রাবিড়ী ভাষায় দশের বেশী গণিতে পারে না; ওরাঁওয়েরা চারির বেশী নয়। রাজমহলের পাহাড়িয়া দুইয়ের বেশী নয়। অবশিষ্ট সংখ্যা তাহারা হিন্দি হইতে গ্রহণ করে। কোল সাঁওতাল জাতি আপন আপন ভাষায় অনেক উচ্চ সংখ্যা পর্য্যন্ত গণিতে পারে।

"অতএব এ পর্য্যন্ত কোল বংশীয়দিগের আদিনির্ণয়সম্বন্ধে কেবল ইহাই স্থির হইয়াছিল যে, দ্রাবিড়ীদিগের সঙ্গে তাহাদিগের দূরসম্বন্ধ থাকিতে পারে। ভাষার গঠনে যে সম্বন্ধের চিহ্ন আছে তাহাই সূচিত হইয়াছিল, কিন্তু কর্ণেল ড্যাল্‌টন্‌ সাহেব বাঙ্গালার জাতিনির্ণয় সম্বন্ধীয় নিজ গ্রন্থে বিবেচনা করেন যে, কোলবংশীয়েরা যে দূর উত্তরপূর্ব্ব হইতে আসিয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। হজ্‌সন্‌ সাহেব বলিয়াছেন যে কিরা-

তীর প্রভৃতি নেপালপ্রদেশের বিচ্ছিন্ন জাতির মধ্যে কোন কোন জাতির ভাষায় সর্ব্বনামগুলিতে কোল বা মুণ্ডভাষার সাদৃশ্য দেখা যায়। ড্যাল্টন্ সাহেব নিজ মতের পোষকতায় উহার উপর নির্ভর করিয়াছেন। আর পেগুপ্রদেশে তালাইঙ্গ বা মোননামে একজাতি আছে, তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী জাতিসকলের চৈনাদিকজাতীয় ভাষা হইতে ভিন্নপ্রকৃতিক একটি ভাষা ব্যবহার করে। সেই ভাষা চুটীয়া নাগপুর ও সিংহভূমের হো বা মুণ্ডদিগের ভাষার সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্যবিশিষ্ট। ড্যাল্টন্ সাহেব তাহাও দেখান। আর ব্রহ্মদেশীয় জাতিদিগের ইতিবৃত্তে কর্ণেল ফেয়ার, মে, আর, লোগান সাহেবের একটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। লোগান সাহেব বলেন যে, কোলদিগের ভাষা ও মোন্ আনাম্ গোষ্ঠীর ভাষায় কিং বদ তদাদি সর্ব্বনাম, নির্দ্দেশবাচক সর্ব্বনাম ও সংখ্যাবাচক সর্ব্বনামের ধাতুগত একতা প্রমাণ হইয়াছে। উভয়জাতীয় ভাষাই শাব্দিক মূলে এক কাণ্ডের দুই শাখা। দ্রাবিড়ী অপেক্ষা তিব্বত ব্রহ্মভাষাদির সঙ্গে তাহাদিগের অতিশয় সাদৃশ্য আছে।"

এখন লোগান সাহেব আরও দেখাইয়াছেন, যে আসামের খাসিয়া ও কোলদিগের মধ্যে ভাষাগত সাদৃশ্য আছে; আর সিংহভূমের হো ও খাসিয়াদিগের মধ্যে মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধ ও সমাধিচিহ্ন প্রভৃতিতে বিশেষ সাদৃশ্য আছে।*

ইংরেজলেখকেরা এই বংশের "কোলারায়" নাম দিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালা ভাষায় ইহাদিগকে কোলবংশ বলিব।

অতএব বাঙ্গালার তূরাণীয় অনার্য্যজাতির মধ্যে দুইটী বংশ পাওয়া যাইতেছে—দ্রাবিড়বংশ ও কোলবংশ। ইহাদের মধ্যে কোন জাতি বাঙ্গালার আদিমবাসী?

সে মীমাংসা অতি কঠিন। সমগ্র ভারতসম্বন্ধে ডাং মুরের যে মত নিয়ে তাহার মর্ম্মানুবাদ করিতেছি।

"উত্তরের অনার্য্যগণ এবং দক্ষিণের অনার্য্যগণ এক বংশসম্ভূত কি না এই প্রশ্নসম্বন্ধে ডাক্তার কল্‌ড্‌ওয়েলের মত এই, যে দ্রাবিড়ীদিগকে ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী মনে করা যাইতে পারে, অন্ততঃ ইহারা উত্তর পশ্চিমাংশ হইতে প্রথমে ছড়াইয়া আইসে। কিন্তু আর্য্যেরা আসিয়া ইহাদেরই দেশাধিকারী দেখিয়াছিলেন কি তৎপূর্ব্বেই অন্য কোন শক জাতিকর্ত্তৃক ইহারা বিতাড়িত হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা তত সহজ নহে। এবিষয়ের সুনিশ্চিত মীমাংসা না করিয়া, দ্রাবিড়ী ও উত্তর ভারতে প্রচলিত ভাষাসকলের অনার্য্যমূলক ভাগের সহিত আপাতপ্রতীত প্রভেদ দেখিয়া ডাং কল্‌ড্‌ওয়েল স্থির

* "*Statistical Accounts of Bengal Vol. XVI P. 255-7.*"

করিয়াছেন যে, দ্রাবিড়ী ভাষা শকভাষার প্রাচীনতর অবস্থা। যদি এই মীমাংসা ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহা হইলে স্থির করিতে হইবে, যে উত্তর ভারতবর্ষীয় অনার্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষেরা দ্রাবিড়ীদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, এবং আর্য্যগণকর্ত্তৃক উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইবার পূর্ব্বে তাহারাই দ্রাবিড়ীদিগকে উত্তর ভারতের অনেক অংশ হইতে বিচ্যুত করে। ফলতঃ ডাং কল্ডওয়েলের মতে দ্রাবিড়ীরা উত্তর ভারতবর্ষ হইতে আর্য্যগণকর্ত্তৃক দূরীভূত হয়েন নাই। সংস্কৃত বা দ্রাবিড়ী ভাষায় এই দুই জাতির মধ্যে কোন যুদ্ধ বিগ্রহের কাথাবার্ত্তা নাই। সুতরাং আদৌ ইহাদিগের পরস্পর সখ্যেতরভাব অসম্ভব। যে সকল আর্য্যপূর্ব্ব শক জাতীয়েরা উত্তরবিভাগ হইতে দ্রাবিড়ীদিগকে বিতাড়িত করে আর কোল সাঁওতাল ভীল ডোম প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের আদিমবাসী, ইহাদিগকে এক মনে করা অনুচিত। কোল ভীল সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য্যজাতিরা দ্রাবিড়ীদের তাড়নায় অরণ্যে আশ্রয় লইয়া থাকিবে বা ভুটানজাতির ন্যায় উত্তরপূর্ব্ব প্রদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। ডাক্তার কল্ডওয়েল মনে করেন এই সকল আরণ্যজাতির ভাষার সহিত উত্তর ভারতে প্রচলিত ভাষা সকলের অনার্য্য ভাগের কোন নৈকট্য নাই।"

অতএব পূর্ব্বে যে মতের সংক্ষেপ বিস্তার করা গেল সেই মত অনুযায়ী আমরা ভারতবর্ষবাসীদিগের মধ্যে চারিটি ভিন্ন স্তবকে পাইতেছি।

প্রথম—সর্ব্বপ্রাচীন—কোল, সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি বন্যজাতি, ইহারা উত্তরপূর্ব্বপ্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয়—দ্রাবিড়ী, ইহারা উত্তরপশ্চিম হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, এবং স্বেচ্ছাক্রমেই হউক, অথবা অন্যান্য পশ্চাদ্গামী অনার্য্যদলকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াই হউক, ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে আসিয়া বাস করিয়াছে।

তৃতীয়। শেষকথিত শক বা অনার্য্যদল, যাহারা উত্তরপশ্চিমপথে আসিয়াছিল, ইহাদিগেরই ভাষার সংযোগে সংস্কৃত হইতে উত্তরভারতের প্রাকৃত ভাষা সকল উৎপন্ন হইয়াছিল।

চতুর্থ। আর্য্যগণ।*

তৃতীয়শ্রেণীস্থ শকজাতির কোন চিহ্ন বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। অতএব কোলবংশ ভিন্ন অন্য কোন অনার্য্যজাতি যে দ্রাবিড়ীদিগের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল, ইহা আমরা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহি। বাঙ্গালাভাষায় যে সকল অনার্য্যমূলক শব্দ আছে, তাহা কোলবংশীয়দিগের ভাষা হইতে প্রাপ্ত হয় নাই, এমন কোন প্রমাণ আমরা দেখি নাই। ডাক্তার হণ্টর কতকগুলি উদা

* *Muir's Sanskrit Texts* Vol. *II P.* 485 *to* 487.

হরণে নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলি সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন।

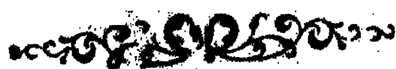
"অতি প্রাচীনকালে সংস্কৃতে ও সাঁওতালীভাষায়, অথবা সাঁওতালীর পূর্ব্বগামী ভাষার সঙ্গে সংঘর্ষিত হইয়াছিল। এমন সম্ভব, যে সংস্কৃত সাঁওতালী হইতে কতকগুলি অনার্য্যোর উচ্চার্য্য বর্ণ গ্রহণ করিয়া তাৎকালিক স্বীয় অসম্পূর্ণ বর্ণমালায় নিবিষ্ট করিয়াছিল। ইহা নিশ্চয় যে সংস্কৃত কথিত ভাষা হইতে কতকগুলি কথা লইয়াছিল, আর প্রাচীন প্রাকৃতে এবং আধুনিক সাঁওতালীতে সেই সকল শব্দগুলি আজি বিকৃতিশূন্য দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতের পক্ষে যেমন প্রাকৃত, প্রাকৃতের পক্ষে তেমনি বাঙ্গালা, মোটামুটি ইহা বলা যাইতে পারে, সেই বাঙ্গালাও সাঁওতালী হইতে অনেক শব্দ লইয়াছে। ইত্যাদি।"*

হণ্টর সাহেবকে সংস্কৃতজ্ঞ বা বাঙ্গালার সুপণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। উপরে যে সকল কথা উদ্ধৃত হইল, তাহার সকলগুলির সমর্থনও করা যায় না। তবে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে এতটুকু অবশ্য স্বীকার করা যায়, যে বাঙ্গালাভাষায় অসংস্কৃতমূলক কতকগুলি শব্দ সাঁওতালি হইতে প্রাপ্ত। অনুসন্ধান হইলে আরও কতকগুলির মূল সেইরূপ সাঁওতালি বা অন্য কোলবংশীয় ভাষাতেই পাওয়া যাইতে পারে। তবে সকলগুলিই কোলবংশীয়দিগের নিকট পাওয়া গিয়াছে, এ কথাই বা না মানিব কেন? অথবা এ কথা না মানিয়া অনর্থক আর একটা তৃতীয় অনার্য্যবংশ স্বীকার করিব কেন? কোলবংশ ও দ্রাবিড়বংশ ব্যতীত অন্য কোন অনার্য্যবংশ যে আর্য্যদিগের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

তবে বাঙ্গালাসম্বন্ধে কল্ডওয়েল সাহেবের মতের মধ্যে এইটুকু গ্রহণ করা যায়, যে কোলবংশীয়েরা দ্রাবিড়বংশীয়দিগের পূর্ব্বগামী। অতএব প্রথমে কোলবংশীয়দিগের কথা বলিতেছি।

---

* *Annals of Rural Bengal* P. 180.



বাঙ্গালা সাহিত্য।*

বর্ত্তমান শতাব্দীর।

ইদানীং ইংরেজদিগের শাসনাধীনে ভারতবর্ষে নিঃশব্দে যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নূতন ধর্ম্মপ্রচার নাই, বলপ্রকাশ নাই অথচ আমাদের মন ক্রমশঃ ফিরিয়া আর একরূপ হইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র চলিতেছে; কিন্তু বাঙ্গালার সেই পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এতদূর আর কোথাও হয় নাই। এই বিপ্লবের প্রধান কারণ ইংরেজিশিক্ষা, ইহার ফল—সমাজ-উন্নতি ও সাহিত্য-উৎপত্তি। ভারতবর্ষের মধ্যেও বাঙ্গালার সমাজে-উন্নতি অধিক ও সাহিত্য প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। আজি সেই উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয়সাহিত্য আমাদের উপপাদ্য প্রস্তাব। বঙ্গীয়সাহিত্যের বিষয় বলিতে গেলে, আরও অনেক কথা বলিতে হয়, কিরূপে এই বিপ্লব ঘটিয়াছে, কিরূপে লোকের মন পূর্ব্বপথ হইতে ঘুরিয়া নূতন পথে দাঁড়াইয়াছে তাহা লিখিতে হয়। প্রত্যেক চিন্তাশীল নেতার মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্ত ও তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর ইতিহাস লিখিতে হয়, এবং তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীতে সমাজে কেমন করিয়া পরিবর্ত্ত হইতে আরম্ভ হয়, তাহার ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু তাহার সময় নাই। তবে যতদূর পারা যায় চেষ্টা করিব।

১৭৯৯ সালের শেষ দিন অতীত হইল। ১৮০০ সালের প্রথম দিন উপস্থিত। ভারতবর্ষের এমন অদিন বোধ হয় আর কখন হয় নাই। ভারতের কোথাও সুখ নাই, কোথাও শান্তি নাই, সর্ব্বত্র লুঠতরাজ, মাঁরামারি, লাঠালাঠি, কাহাকেও বিশ্বাস নাই, যাহার গায়ে জোর সেই অন্যের উপর অবিবাদে অত্যাচার করিয়া যায়। সমস্ত দেশে রাজা নাই। যাঁহারা রাজা বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা লুঠেড়ার সর্দার। পরধন অপহরণ, পরপীড়ন, পরের প্রাণনাশ, তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম। এই সময়ে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্তের কিরূপ অবস্থা তাহারদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই এ কথা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

কাবুলের দুরাণীবংশ পতনোন্মুখ, সেখানে দুরাণী ও বেরুকজাদিগের পর-

---

* সাবিত্রী লাইব্রেরীর বাৎসরিক উপলক্ষে শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই প্রস্তাবটি পাঠ করিয়াছিলেন।

পর বিদ্বেষভাব জন্মিতেছে, দুরাণীদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষের অংশসকলে যুদ্ধ ব্যাং গোলযোগ চলিতেছে, ভূলোকস্বর্গ কাশ্মীর, পেশোয়ার প্রভৃতি প্রদেশে অরাজকতার সূত্রপাত হইয়াছে। পঞ্জাবে মুসলমানশাসন ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু সেথায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন শীখ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে; এই রাজগণ পরস্পরের উপর আপনপ্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটিতে ব্যতিব্যস্ত। সিন্ধুর আমীরদিগের রাজ্য এখনও দৃঢ়বদ্ধ হয় নাই, সেখানেও মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধবিগ্রহ। সরহিন্দপ্রদেশে একজন ইংরেজ এই ঘোরতর অত্যাচারের সময় আপনার জন্য এক রাজ্য করিয়া লইয়াছেন এবং মুসলমানের ন্যায় বহুসংখ্যক মুসলমানউপপত্নীতে পরিবৃত হইয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছেন। রাজপুতগণের আর সে প্রতাপ নাই; যে প্রতাপে তাঁহারা একদিন সমবেত মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের সে প্রতাপ নাই; হিংসা দ্বেষ তাঁহাদের মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; সিন্ধিয়া, হোলকার, যখন ইচ্ছা তাহাদের দেশ লুঠ করিতেছে ও যখন ইচ্ছা তাহাদের নিকট হইতে অন্যায় টাকা লইতেছে। দিল্লীর বাদশাহের নামের মোহিনী আছে, আজিও সম্ভ্রম আছে। কিন্তু বাদশাহ নিজে বন্দী, সিন্ধিয়া তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়াছে। তাঁহার দিনের অন্ন কে যোগায়—তাহারও ঠিক নাই। পেরোঁ নামক সিন্ধিয়ার একজন ফরাসিস সেনাপতি হিন্দুস্থানের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহারও শঙ্কর মত কিছু নিজ উদ্দেশ্য আছে কি না কে বলিতে পারে? অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড একজন নবাবের করতলগত কিন্তু তাঁহার নিজের কোন ক্ষমতা নাই, তিনি নিজপ্রাসাদে উপপত্নীপরিবৃত হইয়া বাস করেন, সময়ে সময়ে তাঁহার প্রাসাদসম্মুখস্থ লাল বারদোয়ারীনামক অভিষেকস্থানও ফিরিঙ্গীদিগের করকবলিত থাকে, তাঁহার রাজ্য অপেক্ষা অরাজকতা শতগুণে শ্রেয়ঃ। তাঁহার রাজে ওমরাগণ করদরাজাগণ, জায়গীরদার ও তালুকদারগণ যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাই করে। বিনাযুদ্ধে কেহই খাজানা দেয় না, প্রতিবারই কর আদায়ের সময় আসিলে, ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়। অনেক টাকা না দিলে সে সাহায্যও প্রায় পাওয়া যায় না। ইংরেজেরা আরও অধিক কিছু আদায় করিবার জন্য তাঁহাকে রাজউপাধি দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। মধ্যভারতবর্ষে বুন্দেলখণ্ডে ক্ষুদ্র রাজাগণ যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। তাহারও দক্ষিণে গোন্দওয়ানায় বড় বড় ডাকাইতের দল তৈয়ারি হইতেছে।" ইহারা একসময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ উজাড় [illegible] করিয়া দিবে।

সিন্ধিয়া ও হোলকার বড় শান্তিপ্রিয় নহেন। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি নাই, করদলার যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহারা জয়ী ও যাঁহারা জিত হন, উভয়পক্ষেরই সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। নিজাম হারিয়া অবধি হৃদয়মধ্যে ইংরেজ ও মহারাষ্ট্রীদিগের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষকে লালন পালন করিতেছেন। মহারাষ্ট্রীরা করদলা হইতে সেই যে আপন আপন ভবনে গিয়াছে, তার পর আর একত্র হয় নাই, উহারা যে যাহার আপন আপন রাজ্যবৃদ্ধি ও শত্রুনিপাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীদিগের মধ্যে বড় রাজা আছেন সত্য, কিন্তু জিবায় যেখানকার ওমরাহগণের অগ্রগণ্য ও সর্ব্বময়কর্ত্তা; উম্মত্ত যশোবন্তরায় যেখানকার শাসনকর্ত্তা, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর কুসংস্কারাপন্ন অবিমৃষ্যকারী বাজীরাও যেখানকার পেশোয়া, সে রাজ্যে কি সুখ সম্ভব? সেখানে কি শান্তি থাকিতে পারে? সেখানে কি লোকের সাহিত্যানুরাগ থাকিতে পারে। মহারাষ্ট্ররাজ্যের দক্ষিণে ইংরেজরাজত্ব সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ব্রিটীসরাজত্বের প্রথম অংশে যেরূপ সর্ব্বনাশ হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই; তাহাতে আবার যখন টীপু তৃতীয়বার হারিয়া মরিয়া হইয়াছিলেন, তখন তিনি যেরূপ ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বলপূর্ব্বক অনেকে আয় মুসলমান করিয়াছেন, বিনাপরাধে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ করেন। দক্ষিণে অন্যান্য স্থানে ইংরেজদিগের প্রভুত্ব ছিল সত্য, কিন্তু মান্দ্রাজে যে সকল ইংরেজ কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা দেশীয় জঘন্য রাজাও অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ছিলেন। তাঁহারা কর্ণাটের নবাবের সেনা লইয়া যে জঘন্য কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিয়া ইংরেজনাম কলঙ্কিত করা আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। যে হিমালয়প্রদেশে, যে উত্তরাখণ্ডে, কখন মুসলমান যাইতে পারে নাই, গোর্খাদিগের দুরাকাঙ্ক্ষায়, রাজ্যবৃদ্ধির ইচ্ছায় সেখানেও যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, পাহাড়মধ্যেও অরাজক। গ্রামবাসীরা লুঠের ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর।

এরূপ অরাজকসময়ে যখন কালি কি হইবে, কেহই বলিতে পারে না যখন পরের উপর অত্যাচারই রীতি যখন কাহার প্রাণ, মান, ধন রক্ষা হ না, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে পারে এরূপ ক্ষমতাশালী একজনও লো সমস্ত ভারতবর্ষে খুঁজিয়া মিলে না। তখ কি সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে তখন কি লোকের চিন্তা করিবার ক্ষম থাকে। যখন ভয়েই লোকে অভিভূ তখন কে লেখাপড়া শিখিবে, ে শিখিতে বসিবে? বাস্তবিক তৎকা ভারতবর্ষে সাহিত্যলোপ হইয়াছি বলিলে অযুক্তি হয় না।

অনেকে মনে করিতে পারেন বাঙ্গালা-সাহিত্যের কথায় ভারতবর্ষের কথা কেন তুলিলেন? বাঙ্গালায় ত তখন সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বাঙ্গালা ত তখন ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শান্তিভোগ করিতেছিল। এটী লোকের মহাভ্রম, ভারতবর্ষে এরূপ দারুণ গোল-যোগ থাকিলে বাঙ্গালির মনে শান্তি সম্ভবিতে পারে না; বিশেষ বাঙ্গালা স-মাজে তখনও শান্তি হয় নাই। প্রথম ইংরেজ রাজত্ব যে স্থায়ী হইবে তাহাতে কাহারও বিশ্বাস হয় নাই, তাহার পর আমরা যাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি তখন বাঙ্গালা বলিলে ইহা বুঝাইত না। বাঙ্গালার গবর্ণরের কর্ত্তৃত্ব উড়িষ্যায় ছিল না। উড়িষ্যা মহারাষ্ট্র-করকব-লিত ছিল। উড়িষ্যায় করদ ও মিত্র-রাজগণ নিরন্তর মেদিনীপুর অঞ্চলে লুঠ পাঠ করিত। বীরভূম, বরাহভূম, সবে-মাত্র ইংরেজদিগের অধিকৃত হইয়াছে। আসাম, কাছার, তখনও ইংরেজদিগের নয়। অতি অল্প পরেই মানেরা (ব্রহ্ম-দেশীয়গণ) অরাজক আসাম দখল করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িয়াছিল। ভুটান শত শত বৎসর ধরিয়া নিরন্তর অরাজক-তায় ভুগিতেছিল। ভুটানে সুবেদারেরা তুংশো পেনলো, পেরো পেনলো, প্র-ভৃতি সকলে আপন আপন ধর্ম্মরাজা ও দেবরাজা খাড়া করিয়া আপনা আপনি কাটাকাটি করিয়া মরিত। সময়ে সময়ে তাহাদের যুদ্ধ গড়াইয়া রংপুর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িত। যদিও মুসলমানেরা ভিন্ন আর কেহ বাঙ্গালা আক্রমণ করিতেই আসে নাই তথাপি বাঙ্গালার সীমা প্রদেশে শান্তি সুখ একেবারে ছিল না। আর বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অরাজ-কতা নৃত্য করিত। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ হইতে বাঙ্গালা শ্মশানকালীর রঙ্গভূমি হইয়াছিল। Double Government এর সময়ে রণদুর্ম্মদ ইংরেজগণ কাহা-কেও মানিত না; তাহারা না করিয়াছে এমন কার্য্যই নাই, বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, ক্ষমতা, কিছুতেই তাহাদের মন বিচলিত করিতে পারিত না। Double Government এর সময় যেমন ছিল ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঠিক তেমনই ছিল। ইংরাজেরা তিন চারিবৎসর থাকিয়া অ-নেক ধনসঞ্চয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেন। আর তাঁহাদের বাঙ্গালি প্রিয়-পাত্রগণও সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় স্বজাতীয়গণের মুণ্ডপাত করিয়া বড় লোক হইয়া উঠিতেন। ৫৬ হইতে ৯৩ পর্য্যন্ত যাহা ছিল, ৯৩ সাল তাহার চূড়ান্ত হইয়া গেল। দেশের যা কিছু ছিল কর্ণওয়ালিশপ্রবর্ত্তিত নিয়মা-বলীতে তাহাও গেল। বাঙ্গালায় মুসল-মান রাজত্বে তিন শক্তি ছিল, এই তিন শক্তির মূল তিন; মুসলমান গবর্ণমেণ্ট, দেশীয় জমীদার, ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত। এই ৩৭ বৎসরে মুসলমান গবর্ণমেণ্টেরও শেষ হইয়াছিল। নবাব বহুলক্ষ টাকা পেন্সন পাইয়া উপপত্নীগণবেষ্টিত হইয়া নিজ

প্রাসাদে বাস করিতেন ও যতদূর তাঁহার সম্পর্কের গন্ধ থাকিত ততদূর দূষিত বায়ু চরিত্রদোষরূপ সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি করিয়া দিত। বড় বড় জমীদারগণ সাহেবের শোষণে অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিলেন। মীরকাসিম অনেকগুলির মূলোচ্ছেদ করিয়া গিয়াছিলেন। ইজারা বন্দোবস্তে অনেকগুলির উচ্ছেদ হয়। দেশের লোক যাহাদিগকে আপনাদের কর্ত্তা বলিয়া বহুকাল আদর ও ভক্তি মান্য ও ভয় করিয়া আসিতেছিল, যাহারা প্রথম স্বাধীন, পরে মিত্র, তাহার পর করদ, শেষ অধীন রাজা ছিল, তাহাদিগের এইরূপ পরিণাম হইতে লাগিল। তার পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল; ইহার সঙ্গত নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নহে। ইহার আসল নাম চিরঅস্থায়ী বন্দোবস্ত, কারণ ইহাতে কেহই বলিতে পারেন না যে আমার জমীদারী স্থায়ী হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমীদারগোষ্ঠীর শেষ হইল। বড় বড় রাজপরিবার ঠিক সময়ে টাকা না দিতে পারায় জমীদারীচ্যুত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগর, নলডাঙ্গা, নাটোর, চাঁচড়া প্রভৃতি প্রদেশের জমীদারদিগের সম্পত্তি হুহুস্বরে নীলাম হইতে লাগিল। কিনিল কে? মাজিষ্ট্রেটের প্রিয়মুহুরী—জাতিতে নাপিত, Foreign Department এর নায়েব—জাতিতে সদ্গোপ, মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টের কেরাণী গোমস্তা ইত্যাদি। কিন্তু এ সকলের মধ্যেও ক্রেতার সংখ্যা অধিক নহে। জমীদারের কর্ম্মচারীরাই এ বিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞ, তাঁহারা প্রজাদের সর্ব্বনাশ করিয়া ধনসঞ্চয় করিতেন। দুরস্থ জমীদার তাহা দেখিতে পাইতেন না। তাহার পর জমীদারী খাজনার দায়ে নীলামে উঠাইয়া দিয়া আপনি ক্রয় করিয়া লইলেন। একস্থানে এমনও হইয়াছে যে জমীদারের খাজানা লইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ নৌকা ডুবি রটাইয়া দিয়া সেই টাকায় গোমস্তা আপনি জমীদারী কিনিয়া লইলেন। একস্থানে একজন ডাকাইতের সর্দ্দার গবর্ণমেণ্টের খাজনা লুঠ করিয়া নগদ টাকার জোরে জমীদার হইলেন। অনেক স্থলে লাঠির জোরে জমীদার হইতে লাগিল। একজনের লাঠির জোর থাকিলে দশ পনর ক্রোশের মধ্যে কাহারও রক্ষা থাকিত না। যাহারা সাহিত্যসংসারের উন্নতি করিত, যাহারা পণ্ডিত প্রতিপালন করিত, যাহাদের কল্যাণে আমরা অনেক উত্তম উত্তম গ্রন্থ পাইয়াছি, তাহাদের এই দশা হইল। যাঁহারা তাহাদের স্থানপ্রাপ্ত হইলেন তাঁহারা আর একসম্প্রদায়ের লোক। তাঁহারা ঘোরতর কুসংস্কারাপন্ন, তাঁহারা গুরু পুরোহিতের একান্ত ভক্ত হইতে লাগিলেন। শাস্ত্র কচকচি তাঁহাদের চক্ষুঃশূল।

মুসলমান গবর্ণমেণ্ট ও জমীদার ভিন্ন বাঙ্গালার আর এক শক্তি ছিল; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। এই অরাজকের সময়, ঘোর তর অত্যাচারের সময়, ভয়ানক বিশৃঙ্খ

লার সময় যদি কেহ দেশের জন্য যথার্থ ভাবিত তবে সে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ। এই সময়ে তাঁহাদের দ্বারা যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত, অত্যাচারী ইংরাজগণও ধার্ম্মিক ইষ্টনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে আদর করিত, লোকে তাঁহাদিগকে হিন্দু-ধর্ম্মের হিন্দুসমাজের আর্য্যজাতির চূড়া -লিয়া জানিত। তাঁহারাও আজিকার ট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় লোভী ক্ষমতা-ত্যাশী ও স্বার্থপর ছিলেন না। ধর্ম্ম-লে তাঁহারা বলীয়ান্ ছিলেন, তাঁহাদের াহস ও অকুতোভয় ছিল। তাঁহাদের ়ই সাহসের স্বপ্ন হেতুও ছিল। তাঁহা-দের সঙ্গে সর্ব্বদাই ৬০।৭০ জন ছাত্র থাকিত। ছাত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত বলিষ্ঠ ও গুরুকার্য্যে আত্মসমর্পণেও কৃতসংকল্প। এই সময়ের জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন গোঁসাই ভট্টাচার্য্য বলরামশ্চ শঙ্করঃ নাথিক তর্কভূষণ প্রভৃতি লোকের নাম কাহার অবিদিত আছে? তাঁহারা এই গোলযোগের সময় ব্যবস্থাপক, বিচারপতি, অধ্যাপক ও সময়ে সময়ে সমাজের সর্ব্বময়কর্ত্তা হইয়াছিলেন। কত কত পরিবারকে যে তাঁহারা কত উপায়ে রক্ষা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে সকল ইংরেজ যথার্থ বিচার করিতে চাহিতেন, এই ভট্টাচার্য্যগণ যে তাঁহাদের কত বিষয়ে সাহায্য করিয়া-ছেন, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি তাঁহাদের ব্যবসায় নহে। তাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়ী, সাহিত্য-ব্যবসায়ী ছিলেন না। বিশেষ তাঁহা-দের উপর এত কার্য্যভার পড়িয়াছিল যে তাঁহারা সাহিত্যের উন্নতির ইচ্ছা থাকি লেও করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহা-দেরই কি পরিণাম হইল। ১৭৯৩ শালে হুকুম হইল, আইন হইল, যে ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। আবার ১৮২৮ ও ১৮৩৩ অব্দে বাজেয়াপ্ত আইন পুনরায় বিধিবদ্ধ হইল। তাঁহাদের সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইল। যে ব্রাহ্মণকুল নির্ব্বিবাদে স্বাধীন উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, যাঁহাদের তেজে সাহসে ও নির্ভীকতায় অত্যাচারী সিরাজউদ্দৌলাও কাঁপিতেন, তাঁহারা এই অবধি বড়মানুষের আশ্রিত হইতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বড়মানুষের সভাশোভাবিধান করিতে লাগিলেন, ক্রমে এক্ষণে তোষামোদ ভট্টাচার্য্যদিগের ব্যবসায়ের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে যে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে, তাহাও এইরূপ ব্রহ্মোত্তর ভোগীদিগের লিখিত, সুতরাং আর নূতন ব্রহ্মোত্তর হইবে না এবং অনেক পুরাতন ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত হইবে আইন হওয়ায় বঙ্গীয় বিদ্যা ও বঙ্গীয় সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত হইল। উন বিংশ শতাব্দীতে বহুদিন পর্য্যন্ত ভট্টাচার্য্যদিগের প্রাধান্য ছিল সত্য; কি চিন্তাশীলব্যক্তিমাত্রই জানিতে পারি ছিলেন যে, সে প্রাধান্য অধিক দি থাকিবে না। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

পর যে সকল পণ্ডিত হইয়াছিলেন সকলেই জানে যে, তাঁহারা উক্ত মহাত্মাদিগের অপেক্ষায় অনেক অংশে নিকৃষ্ট; তাহার পর আরও নিকৃষ্ট, তাহার পর আরও নিকৃষ্ট শেষ এমনি হইয়া দাঁড়াইল যে, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের ভূমিকায় খ্যাতনামা ৺ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননমহাশয় বলিলেন, যে, ভট্টাচার্য্যগণ চারি পাঁচখানি ব্যতীত পুস্তক পড়েন না, এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতিমহাশয় বলেন যে, আধুনক নৈয়ায়িকেরা ন্যায়শাস্ত্রের ৬৪ ভাগের একভাগমাত্র পড়িয়া পাঠসমাপ্ত করেন। ১৯ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ভট্টাচার্য্যদিগেরও সেই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চার উচ্ছেদ হইতে লাগিল।

যে তিনশক্তিতে বঙ্গসমাজ চলিত, তিনেরই ক্রমে ধ্বংস হইতে লাগিল, অথচ নুতন সমাজ গঠিত হইল না। সাহিত্য একেবারে রহিল না; ভারতচন্দ্র ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। রামপ্রসাদ সেন এই সময়ে পরলোক গমন করেন, গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী-প্রণেতা দুর্গাপ্রসাদও তাঁহাদের পশ্চাদ্গামী হন। Double Governmember সময়েই ৬৫ হইতে ৭২রের মধ্যেই প্রাচীন কবিগণ গত হন। তাঁহাদের স্থান অধিকার করে এমন লোক একেবারে হইল না, যে দুই একজন রহিলেন, তাঁহাদেরও প্রতিভা সম্পূর্ণ বিকাশ হইল না। তাঁহারা অতি নীচশ্রেণীর কবিতা লইয়া করজোপ করিতে লাগিলেন মাত্র। আপনারা কি নিধুবাবু, রামবসু প্রভৃতিকে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের স্থান পাইবার যোগ্য মনে করেন? ইহাদের মধ্যে একজন লোক ছিলেন, তাঁহার অনেক উপাসক আজিও আছেন, তাঁহার নাম হরুঠাকুর, ইনি কবির দল সৃষ্টি] করেন; কবির দল স্থায়ী কার্য্য কিছুই করিতে পারেন নাই, [তাঁহারা তৎকালীন হঠাৎ অবতার জমীদার ও বাবুদিগকে প্রীত করিবার জন্য উপস্থিত মত গান বাঁধিতেন, তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ঘোর অত্যাচার অরাজক ও বিশৃঙ্খলার সময় তাঁহাদের প্রতিভা বিকাশ না হইয়া ঐরূপেই বাহিত হইয়াছিল। কীর্ত্তন বাঙ্গালায় সৃষ্টি, বাঙ্গালির গৌরবের ধন, কিন্তু কীর্ত্তনরচয়িতা উনবিংশশতাব্দীর প্রথমে কেহই জীবিত ছিলেন না।

আমি অনেকক্ষণ আপনাদিগকে ভূমিকা লইয়া কষ্ট দিয়াছি; বোধ হয় আপনারা আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে বোধ হইবে যে, প্রাচীন বঙ্গসমাজ ভাঙ্গিয়া গেল, প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন বিদ্যা লোপ হইল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইল, এই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় নূতন সমাজের ও নূতন সাহিত্যের সূত্রপাত হইল। কিন্তু সে সাহিত্য কে করিল? সে সূত্রপাত কে করিল? বঙ্গবাসী এইবার তোমায় বড়ই লজ্জার কথা। বিদেশীয়দিগের উৎসাহে বিদে-

শীয়দিগের উপকারার্থ বিদেশীয়দিগের যত্নে বিদেশীয় পণ্ডিতকর্ত্তৃক তোমাদের সাহিত্য আরম্ভ হইল। সিবিলিয়ান্‌দিগের শিক্ষার জন্য সিবিলিয়ানদিগের উপকারার্থ লর্ড ওয়েল্‌স্‌লির দ্বারা বঙ্গসাহিত্য আরম্ভ হইল, তোমাদের প্রথম গদ্যলেখক সাহেব ফরেষ্টর ও কেরী, আর একজন তিনি জাতিতে উড়িয়া, তাঁহার নাম মৃত্যুঞ্জয়। উড়ে ও সাহেবে বাঙ্গালায় সাহিত্য আরম্ভ করিল। আরও লজ্জার কথা এই যে, যে দুই একজন বাঙ্গালি এই সময় পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুস্তক কদর্য্য ও জঘন্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র রায়চরিত্র ও প্রতাপাদিত্যচরিত্র বাঙ্গালির লেখা। দুইখানিই অপাঠ্য।

এইরূপে বাঙ্গালায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের সূত্রপাত হইল, সাহেবেরা নিজজাতিস্বভাবসুলভ অধ্যবসায়সহকারে বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙ্গালায় সাহিত্যের উন্নতি হইতে এখনও অনেক বিলম্ব রহিল। ১৮০১ অব্দ হইতে ১৮১৫ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় কোনও গ্রন্থ লিখিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালা ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, যেরূপ শান্তিস্থাপন হইলে সাহিত্য উৎপত্তি হইতে পারে, কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও সেরূপ শান্তি রহিল না। যেরূপ অবস্থা হইলে লোকে কতকটা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে পারে, কলিকাতা ভিন্ন আর এমন স্থান রহিল না। বাঙ্গালায় অনেক রাজধানী ছিল, বিদ্যাশিক্ষার অনেক স্থান ছিল; ক্রমে সমস্ত আসিয়া কলিকাতায় মিশিতে লাগিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় হইতে সমস্ত বঙ্গদেশের লোক উঠিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, গঙ্গার দুইধার ক্রমে সভ্যলোকে পূর্ণ হইতে লাগিল; বর্দ্ধমান, যশোহর, ফরিদপুর, নদীয়া প্রভৃতি জেলার কত কত পরিবার যে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ স্থানে বাস করিতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই। ক্রমে এই কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ স্থানেই সাহিত্যের সূত্রপাত আরম্ভ হইতে লাগিল। এই স্থানে লোকে সর্ব্বদা ইংরেজদিগের সংসর্গে আসিত, সর্ব্বদা নানাদেশীয় লোকের সংসর্গে আসিত, তাহাদের ভাব সকল হৃদগত করিত, ক্রমে এই সকল দেশে সভ্যতার আবির্ভাব হইতে লাগিল; ক্রমে ব্রিটিসদিগের প্রকাণ্ড ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, আমরা এই সময়ের নাম transition period বা পরিবর্ত্তনসময় বলিব। যেদিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় বাস করিতে আসিলেন, সেইদিন হইতে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল, সেইদিন হইতে নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত হইল, এই পরিবর্ত্ত এখনও চলিতেছে। কিন্তু পরিবর্ত্তনসময়ের যে যে দোষ গুণ তাহা আর বড় একটা দেখিতে

পাওয়া যায় না; এখন আর ঠিক পরিবর্ত্তসময় নহে, এখন একটা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ইংরেজেরা এই জন্য অধুনাতন সময়কে ইয়ং বেঙ্গলের সময় বলেন, আমরাও সংক্ষেপে 'ইয়ং বেঙ্গল' বলি।

পরিবর্ত্তসময়ে বহুসংখ্যক মহাক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা দেশে যাহাতে জ্ঞানজ্যোতিঃ ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রকাশ হয়, যাঁহাতে দেশের কুসংস্কার দূরীভূত হয়, যাহাতে সমাজ নূতন পথে নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে, তাহাই করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গুরুতর কার্য্যে তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে; পরিবর্ত্তনসময়ে সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি না হইলেও লেখাপড়ার চর্চ্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। বাঙ্গালা ও ইংরেজি এই উভয় ভাষায় লেখাপড়া আরম্ভ হয়, যে সকল মহাত্মা এই সময় আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া যান, তাঁহাদের অনেকয়েকের নাম না করিয়া, তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহাদের নাম করিতে সকল বাঙ্গালিরই মন কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হওয়া উচিত। তাঁহারা আমাদের জাতীয় কৃতজ্ঞতারূপ করলাভের বিলক্ষণ উপযুক্ত। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, ইনি ইংরেজি ও বাঙ্গালায় শত শত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের প্রথমস্থাপনকর্ত্তা, ইনি সর্ব্বপ্রথম সমাজসংস্কারক, ইনি সর্ব্বপ্রথম ইয়ং বেঙ্গল, ইহার ক্ষমতা অপার, ইহার বিদ্যা অগাধ, ইহার মত দেশহিতৈষী তৎকালে আর কেহ ছিল না। ইনি, সমাজ যে ভাঙ্গিয়াছে, তাহা বুঝিয়াছিলেন, সমাজ যে পথে যাইবে, তাহাও বুঝিয়াছিলেন, এবং প্রাণপণে সর্ব্বপ্রযত্নে সমাজকে সেই পথে চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইনি সর্ব্বপ্রথম উৎকৃষ্ট বাঙ্গালিলেখক, ইহা হইতে বাঙ্গালা গদ্য, বাঙ্গালির অভ্যস্ত হইতে আরম্ভ হয়। পদ্য ভিন্ন সাহিত্য হইতে পারে, ইনিই সর্ব্বপ্রথম লোককে বুঝাইয়া দেন।

দ্বিতীয়, গৌরীশঙ্কর—বাঙ্গালায় রামমোহন রায়ের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। বাঙ্গালা গদ্যের একজন শিক্ষাগুরু, রামমোহন রায়ের—তাঁহার মতের এবং তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের—ঘোরতর বিদ্বেষী, এবং হিন্দুসমাজের মহামান্য অগ্রণী। প্রথম নাই হউক, তখনকার একখানি প্রধান বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের সম্পাদক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা, লেখনীচালনে অবিশ্রান্ত, তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান সম্বাদপত্রের সম্পাদক, নানা রসপরিপূর্ণ কবিতালেখায় চমৎকারশক্তিবিশিষ্ট, কিন্তু ইহাঁর আর এক গুণ ছিল, লেখকবর্গের সে গুণ প্রায় থাকে না; এ জন্য লেখকদিগের সঙ্গে

সঙ্গে তাঁহাদের কীর্ত্তিও প্রায় লোপ হয়। ইনি অল্পবয়স্ক, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র ভদ্রসন্তানগণকে লেখা শিখাইতে যত যত্ন করিতেন, এত বোধ হয়, কখন কোন দেশে কোন কালে কোন লেখক করিয়াছেন কি না সন্দেহ। অধিক কি বঙ্কিম, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ ইঁহার মন্ত্রশিষ্য বলিলে অসঙ্গত হয় না।

তাহার পর রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদিগের দেশের আজিকার সমাজের নেতা। পরিবর্ত্তন সময়ের মূর্ত্তিমান ইতিহাস। এই প্রাচীন বয়সেও ইঁহার যেরূপ ক্ষমতা, আর কয়জনের তাহা আছে? ইনি যাহাতে ইংরেজিভাব দেশীয়লোকের মনে প্রবেশ করে, তাহার জন্য যে কত চেষ্টাই করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইঁহার সঙ্কলিত, রচিত ও অনুবাদিত গ্রন্থাবলী একত্র করিলে একটি পুস্তকালয় হয়, ইঁহার বিদ্যাকল্পদ্রুম একখানি Cyclopaedia; বাঙ্গালা সাহিত্য ও ইংরেজিশিক্ষার উন্নতি ইঁহার জীবনের ব্রত। ইনি সাহিত্যব্যবসায়ীদিগের সহায়, উৎসাহদাতা, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ।

তাহার পর রাজেন্দ্রলাল মিত্র; ইঁহার বিবিধার্থসংগ্রহ বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বপ্রধান সর্ব্বপ্রথম সাময়িকপত্রিকা। বাঙ্গালা ও ইংরেজিতে ইনি লেখকাগ্রগণ্য, বাঙ্গালার মঙ্গলের জন্য ইঁহার চেষ্টারও কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। ইনি বরণেকুলার লিটরেচর সোসাইটি ও স্কুল বুক সোসাইটীর অন্যতম সভ্য হইয়া কত গ্রন্থকারকে যে উৎসাহ দিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে। কিন্তু ইনি বাঙ্গালা ছাড়িয়া এক্ষণে ইংরেজি লইয়া অধিক ব্যস্ত হইয়াছেন, এত বড় লোক বাঙ্গালার লেখক হইলে বাঙ্গালার যে উপকার হইত তাহা হইল না, এ জন্য আমরা দুঃখিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি ভারতের প্রাচীনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালার যেরূপ গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা আর কোন একজন লোক বা একটি সোসাইটিদ্বারা হয় নাই।

পরিবর্ত্তনসময়ের আর একজন প্রধান লেখক নীলমণি বসাক; ইঁহার পুস্তকাবলী অদ্যাপি লোকে পাঠ করিয়া থাকে, ইনি সরলগদ্যের জন্মদাতা; যখন লোকে বড় বড় সংস্কৃত কথা ভিন্ন ব্যবহার করিতেন না সেই সময় নীলমণি বসাক সহজ গদ্য লিখিয়া খাটি বাঙ্গালায় কতদূর ভাব-প্রকাশক্ষমতা আছে, তাহা লোককে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার নবনারী আজিও বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ।

টেকচাঁদ ঠাকুর। ইনি কে আমি জানি না, জানিবার বুঝি উপায়ও নাই; কিন্তু ইঁহার রচিত পুস্তকাবলী আমরা বাল্যকালে পাঠ করিয়া যে কত উপকারলাভ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। পরিবর্ত্তন সময়ের ইনিও একজন প্রধান লেখক ও সংস্কারক। ইঁহার সম্বন্ধে [illegible]

মকি বীমস্ বলিয়াছেন "He has had many imitators and certainly stands very high as a novelist; his story might fairly claim to be ranked with some of the best comic novels in our own language for wit spirit and clever touches of nature."

হুতোমপেঁচাও এই পরিবর্ত্তন সময়ের একটি মহার্ঘ রত্ন; ইহাতে তৎকালীন সমাজের অতি সুন্দর চিত্র আছে, হুতোম হুতোমীর ভাষার প্রবর্ত্তক এবং বহুসংখ্যক হুতোমী পুস্তকের আদি-পুরুষ। বোধ হয় মৌলিকতায় তৎকালীন সমস্ত পুস্তকের শিরঃস্থানীয়।

ইহাদের পর সংস্কৃতকালেজের দল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর, বহুসংখ্যক উত্তম নাটকের প্রণেতা, অনুবাদক শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি বহুসংখ্যক লেখক এই সময়ে সংস্কৃতকালেজ হইতে বহির্গত হন। ইহারা ইংরেজিভাব বাঙ্গালায় ব্যক্ত করিতেন না। সংস্কৃত হইতে ভাবমালা সংগ্রহ করিয়া ইহারা বাঙ্গালিকে উপহার দিতেন। ইহাদের কত লোকের নাম করিব? সকলেই পূজ্যপাদ, সকলেরই নিকট বাঙ্গালা নানাকারণে বাধ্য। ইহারাই কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের মহাভারত অনুবাদ করিয়া আপনাদিগকে ও সিংহ মহোদয়কে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। বাঙ্গালি পাঠককে অগাধ রত্নরাশির অধিকারী করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের দলের সর্ব্বাগ্রণী এমন কি পরিবর্ত্তন সময়ের প্রধাননেতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম এখনও করা হয় নাই। ইনি একা একশত, ইনি যে বাঙ্গালিকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙ্গালায় শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করিবার সময় যে গবর্ণমেণ্টকে কত বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সমস্ত খুলিয়া লিখিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়। ইনি সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালিকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিখাইয়াছেন, ইহার কথামালা ও চরিতাবলীর ভাষা যদি বঙ্গীয় সর্ব্বপ্রধান লেখকও পড়েন, অনেক উপকার লাভ করেন। তাহার পর ইহার নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা, ইহার স্বভাবনির্ভীকতা, স্বাধীনভাব, দেশীয় সমস্ত যুবকবৃন্দের আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত।

পরিবর্ত্তন সময়ের লোকে যে, শুধু নিজে নিজে সকল কার্য্য করিতেন এমত নহে, তাঁহাদের সমবেত কার্য্যও ছিল। এই সমবেত কার্য্যের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রধান। তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে তত্ত্ববোধের জন্য তত্ত্ববোধিনী নামক পত্রিকা প্রচার হয়। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, ও দেশের বহুবিধ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তখন একপ্রকার সা

একটীমাত্র সভার কাগজ হয় নাই, উহা এখন সমস্ত বাঙ্গালায় ইয়ুরোপীয়ভাব প্রচারের মিসনরি ছিল, উহা ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসমূহ সম্বন্ধে কত যে নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তাহা যাঁহারা তত্ত্ববোধিনীর আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। বাঙ্গালির ছেলেদের মধ্যে ইংরাজীভাব প্রবেশ করান সর্ব্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্তদ্বারা সাধিত হয়। তিনিই বাঙ্গালির সর্ব্ব প্রথম নীতিশিক্ষক; তাঁহার চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি, বাহ্যবস্তু প্রভৃতি গ্রন্থ বিজ্ঞলোকেও পাঠ করিয়া নীত্যাদিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। বালকেরা এইসকল গ্রন্থ পাঠে কতদূর উপকৃত হয়, তাহা বলা যায় না।

এই সময় কবিওয়ালারা, যাত্রাওয়ালারা বিশেষ পাঁচালীওয়ালা দাশরথী রায়, বাঙ্গালাভাষার পুষ্টির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

আমরা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন সময়ের প্রধান প্রধান নেতৃগণের নামকীর্ত্তন করিলাম, ইঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক ও মহৎ, ইংরাজীভাব বাঙ্গালিকে বুঝান; ইংরাজীভাব বাঙ্গালির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করান। একালের শিক্ষিতসম্প্রদায় এই কার্য্যে এত খেপিয়াছিলেন যে, একজন অতিসুশিক্ষিত যুবক—তাঁহার নাম আমার স্মরণ নাই, তিনি ইস্কুলের মাষ্টার ছিলেন, এবং ইংরেজি বিদ্যায় বৃহস্পতি ছিলেন—রাস্তায় চলিবার সময় মুটে, মজুর, মুদী, ভদ্রলোক, যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই বলিতেন, "গোরু খাবি," "গোরু খাবি?" তাহারা গালাগালি দিত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "ওরা ত খাবেনা জানিই, তবে রোজ রোজ শুনিতে শুনিতে শেষ idea টা আর তত shocking হইবে না।" এইরূপে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ ইউরোপীয় ভাব সকল দেশমধ্যে প্রচার করিয়া দিতেন। পরিবর্ত্তনসময়ের লোক আজিও অনেকে জীবিত আছেন, তাঁহারা যদি সেকালের লোকের মনের কথা বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা তাঁহারা অনেক অধিক বলিতে পারিবেন।

তবে স্থূলতঃ পরিবর্ত্তন সময়ের কাজ এইগুলি:—ভাষার সৃষ্টি, গদ্যের সৃষ্টি, হিন্দু-কালেজের ছাত্রগণকর্ত্তৃক ইংরাজী ভাবের প্রচার, ও সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণকর্ত্তৃক সংস্কৃতঅনুবাদ প্রচার, সমাজকে নূতন পথে চালান, বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ ও উন্নতি, বাঙ্গালা সাহিত্যের কোরকের উৎপত্তি। এখন দেখা যাউক এইসকলের ফল কি হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরিবর্ত্তন এখনও চলিতেছে; পরিবর্ত্তন সময়, অনুবাদের সময়, শিক্ষার সময়, জিনিয়সের সময়, বড় বড় চিন্তাশীলগণের সময়, আমরা যাহা হইয়াছি ও হইতেছি তাঁহাদেরই কৃপায়, তাঁহাদেরই অধ্যবসায়ের গুণে তাঁহাদেরই উচ্চকামনার ফল। কিন্তু তাঁহারা ৫

পরিবর্ত্তসাধন করিয়া তুলিয়াছেন, এমন পরিবর্ত্তন কি আর কখন হইয়াছিল, তাঁহারা যে সমাজ, যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, এমন কি আর কখন হইবে? যত ভাব তাঁহাদের সমবেত পরিশ্রমে বাঙ্গালায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এত কি আর কখন কোন দেশে কোন কালে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল? আমাকার যুবকগণ এই পরিবর্ত্তন সময়ের দরুণ যত উপকার পাইয়াছেন, এত কি কোন দেশে কোন কালে কোন যুবকদল পাইয়াছেন? এরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্ত ইউরোপে একবার হইয়াছিল; কিন্তু ইহার সহিত তুলনা করিলে সে অতি সামান্য। যখন ১৪৫৪ শালে রণদুর্ম্মদ ওসমান্‌আলি মহম্মদ নূতন রোম দখল করিয়া কাইসরের উত্তরাধিকারিগণকে সাম্রাজ্যচ্যুত করিল, সেণ্ট সফির গির্জ্জাকে মসজীদ করিল সেই সময়ে যখন নূতন রোমের পণ্ডিতবৃন্দ বিনিস-সাগরপারস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট নিজের বিদ্যা লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তখন একবার এইরূপ পরিবর্ত্তন ইউরোপে ঘটিয়াছিল, এইরূপ নূতনভাবে লোকে উন্মত্ত হইয়াছিল, লোকের মনে এইরূপ একটা ভীষণ গোলমাল হইয়াছিল, এইরূপ উৎসাহের সহিত লোকে নূতন বিদ্যা শিখিতে এবং নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের এ পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার তুলনা হয় না। তখন শুদ্ধ গ্রীকদিগের সাহিত্য পুনঃপ্রচার হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এখন বাঙ্গালায় কি হইয়াছে একবার দেখ দেখি? প্রাচ্য পাশ্চাত্য সমস্ত বিদ্যা বাঙ্গালির সম্মুখে আপনাদের গুপ্তভাণ্ডার প্রকাশ করিতেছে। এখনকার ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে তখনকার গ্রীক সাহিত্য তুচ্ছ পদার্থ, তাহার উপর আবার সংস্কৃত সাহিত্যের পুনঃপ্রচার আছে, বৌদ্ধ সাহিত্যের পুনরুদ্ধার আছে। দেখ দেখি একবার কত অগাধ ভাণ্ডারের আমরা একেবারে অধিকারী হইয়াছি। এত সম্পদ কাহার ভাগ্যে ঘটে? একদেশে আর একদেশের সাহিত্য প্রচারে মহাবিপ্লব ঘটে। ইংলণ্ডের সাহিত্য ফ্রান্সে গিয়া গতশতাব্দীতে এতকাণ্ড করাইয়াছে, আর আজি আমাদের দেশে ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, জর্ম্মনির, ইতালির, প্রাচীন হিন্দুদের ও প্রাচীন বৌদ্ধদিগের সাহিত্য উপস্থিত। আমরা এক এক সময়ে এই অগাধ সাহিত্যরাশি চিন্তা করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়ি। এইসকল সাহিত্যের সকল পুস্তক ভাল করিয়া পড়া অসম্ভব। অতএব প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের যদি চারি পাঁচ খানি করিয়া উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বা "মাষ্টার পিস" পড়ি তাহা হইলে দশবৎসর কাটিয়া যায়। বাস্তবিক এত সাহিত্যও কখন একেবারে এক অদৃষ্টসমাচ্ছন্ন দেশে উপস্থিত হয় নাই, আর এত সাহিত্য লইয়া খাবড় করিতে পারে, ইয়ংবেঙ্গল

ভিন্ন এমন জাতিও আর কখন হয় নাই। আর এই সকল নানাদেশীয় ভাব এক করিয়া নূতন সৃষ্টি করিবার বিষয়ে ইয়ংবেঙ্গলের যত সুবিধা, বোধ হয় আর কোন দেশের লোকের কখন এত হয় নাই। প্রধান সুবিধা, সমস্ত দেশে শান্তি স্থাপিত আছে, কোথাও কোন গোলযোগ নাই, প্রাণ ও ধন সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হইয়াছে। যুদ্ধের লেশমাত্রও নাই, জমীদারের অত্যাচার নাই, কুসংস্কারাপন্ন গুরু পুরোহিতের প্রাধান্য নাই, স্বাধীন চিন্তার ব্যাঘাত দেয় এমন কিছুই নাই। স্বাধীন দেশে, দেশশাসন, শান্তিরক্ষা, বিচার কার্য্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত হেতু কত কত মহাপ্রতিভাশালী লোকের প্রতিভাবিকাশ হইতে পারে না। বাঙ্গালির অদৃষ্টে এ সকল কার্য্যের জন্য ইংরাজ আছেন। বাঙ্গালি ইচ্ছা করিলে নির্ব্বিবাদে নিরাপদে দেশের সমাজের ও সাহিত্যের উন্নতিতে সমস্ত মানসিকশক্তি ব্যয় করিতে পারেন। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ইংরাজী বিদ্যালয় হইয়াছে। ৩০। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশমাত্র সভ্য ছিল। এই প্রদেশেমাত্র নূতন সমাজের সৃষ্টি হইয়াছিল, এইস্থানে মাত্র সাহিত্যের অঙ্কুর জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সে সভ্যতা, সে নূতন সমাজ, সে সাহিত্য সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়াছে, অতি নিভৃত জঙ্গলমধ্যে নূতন সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, বাঙ্গালি ইয়ংবেঙ্গল এমন সুবিধায় কি কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা নূতন সাহিত্যগঠনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, নূতন চিন্তাস্রোতঃ কতদূর চলিয়াছে, আর যাহা হইয়াছে তাহা হইতে কতদূর আশা করা যাইতে পারে।

আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্ব্বে এরূপ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব। তিলোত্তমা ১৮৬০ সালে প্রচার হয়, তাহার পর বিংশবৎসরমাত্র অতীত হইয়াছে। এই কুড়িবৎসরে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাকে সাহিত্য বলিতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। এই সাহিত্যের যেরূপ বৃদ্ধি, যেরূপ দ্রুত উন্নতি তাহাতে ইহার পরিণামসম্বন্ধে অসীম উন্নতি আমাদিগের স্থিরনিশ্চয়। আমাদিগের এই নব সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়া গর্ব্ব করিবার ও ইহার ভাবী পরিণামসম্বন্ধে নানারূপ আশা করিবার বিশেষ কারণও আছে, এটি শুদ্ধ আমার নিজের কথা নহে, অন্ধবিশ্বাস নহে, বৃথা আশা নহে, যখন আটবৎসর পূর্ব্বে এই বাঙ্গালাভাষায় ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল, তখন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার সময় হইয়াছে। তাহার আটবৎসর পরে কতক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা সেই সাহিত্যের আরও গর্ব্ব করিব আশ্চর্য্য কি। তাহা

তীয় আর্য্যভাষা সমূহের ঔপমিতব্যা-করণকার মহামতি বীমস্ সাহেব দশ-বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সমালোচনান্তে বলিয়াছেন। "That the Bengalis possess the power, as well as, the will to establish a national literature of a very sound and good character cannot be denied." আরও পুষ্পাঞ্জলিপ্রণেতা, চিন্তাশীল, শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "কল কথা সত্যযুগে সরস্বতীসন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই যুগে ভাগীরথীসন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাঁদিগেরই দেশে পূর্ব্বপিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

এই কয়বৎসর মধ্যে কত নূতন পুস্তক হইয়াছে, কত নূতন পত্রিকা হইয়াছে, এবং এই সকল পুস্তক ক্রমেই উৎকৃষ্টতর হইতেছে, পরিবর্ত্তে ক্রমেই দেশের অধিক মঙ্গল হইতেছে।

আমার বোধ হয় সকলে অধীর হইয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগের নিকট ধীরতা ভিক্ষা করি, আমি নিম্নে অনেক কথা ছাড়িয়া দিব স্থির করিয়াছি? যাঁহারা এই দশবৎসর মধ্যে নানা সংস্কৃত ও ইংরেজি পুস্তক অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কথা বলিতে পারিব না। যাঁহারা নানাবিধ স্কুলবুক লিখিয়া কোমলমতি বালকবৃন্দের মনে নানাবিধ ভাবের উদ্রেক করিতেছেন, তাঁহাদের কথা কিছু বলিতে পারিব না। যাঁহারা ইংরেজি বিজ্ঞান অনুবাদ করিয়া দেশের মহতী শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহাদের কথাও বলিতে পারিব না। যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রের নানা নূতন মত আবিষ্কার করিয়া, অনুবাদ করিয়া ও প্রচার করিয়া দেশীয়দিগকে নানাপ্রকার হিতকর এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরনিরপেক্ষ করিতেছেন, তাঁহাদের কথা বলিতে পারিব না, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি যেসকল মহোদয়গণ বঙ্গীয়সম্বাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন তাঁহাদের নামও করিতে পারিব না। কিন্তু যেমন শিব বিষ্ণু ও দুর্গা লক্ষ্মী প্রভৃতি পূজার পূর্ব্বে "আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যঃ" "ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যঃ" ফুলচন্দন দেওয়া হয়, সেইরূপ তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বক্তব্য বিষয়ে অবতীর্ণ হইব। এরূপ সংক্ষেপ করিবার আরও একটি কারণ আছে; আমি ক্ষুদ্র মানব, আমি তাঁহাদের ও তাঁহাদের কার্য্যের সহিত পরিচিতও নহি; আর আমি তাঁহাদের পূজাপদ্ধতিও বিশেষরূপে অবগত নহি। অতএব তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমার নিজ বক্তব্যপথে গমন করি।

আমাদিগের প্রথম লেখক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ইহার জীবনে

ও ইঁহার পদ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য। জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বাধীনতা, সমাজের প্রতি সমূহ অবজ্ঞা, গ্রন্থেও তেমনি সমস্ত কল্পনার বন্ধনচ্ছেদ। কবি আমাদিগকে তাঁহার প্রথম দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে স্বর্গ, নরক, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, সব দেখাইয়াছেন; উন্মত্তকল্পনা উদ্দামভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ইনি সকল ভাষার ব্যুৎপন্নকেশরী ছিলেন, ইঁহার মনোমধ্যে নানাজাতীয় ভাবরাশি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইনি তাহারই মধ্যে কতকগুলি ধরিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থ বহুকাল কেহ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিবে না। তাঁহার তিলোত্তমা কি কাব্য, না মহাকাব্য, না খণ্ডকাব্য? আমি বলি উহা স্বর্গীয় কাব্য, না হয় বলি উহা উন্মাদের কাব্য? তাঁহার পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী অত্যুৎকৃষ্ট নাটক, তাঁহার বীরাঙ্গনা গীতিকাব্যে জয়দেবের সমস্থানীয়, তাঁহার বীরাঙ্গনা বীরাঙ্গনাগণের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশ দেশান্তরাহৃত ভাবরাশি তাঁহার অন্তরাকাশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তিনি তাহাদিগের কয়েকটিকে একত্র করিয়াছিলেন মাত্র। সেটি সত্য, কারণ তিনি সমস্ত কাব্য সবে দুইবৎসরের মধ্যে লিখিয়াছিলেন, আর কত কত ভাবমালা যে তাঁহার মনে ছিল, কত ভাব যে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার জন্য মনেই মিলাইয়া গিয়াছে, কতই যে তাঁহার অকালমৃত্যুহেতু বিকাশ পায় নাই তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার জীবন শোকান্তমহাকাব্য, তাঁহার গ্রন্থগুলিও সেইরূপ শোকান্ত মহাকাব্য; তাঁহার এক একখানি গ্রন্থ এক একখানি রত্ন বা এক একটি রত্নখনি। কত কবিই যে উহা হইতে রত্নরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন তাহার সীমা নাই। তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি বিরল; যখন যে দেশে এ প্রকার প্রতিভা বিকাশ হয়, তখন সেই দেশ ধন্য ও পৃথিবীস্থ জাতিসমূহমধ্যে মহামান্য হয়।

মাইকেলের সঙ্গে সঙ্গে আর দুইজন কবি বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। মাইকেল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা আজিও জীবিত আছেন। হেমচন্দ্র গীতিমালায় দেশীয় লোকের মধ্যে প্রথম উচ্চতর ভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার কবিতাবলী অতুল্য পদার্থ; উহাতে সত্য সত্যই মন গলাইয়া কবির অভিলষিতপথে চালাইয়া দেয়। তাঁহার বৃত্রসংহার স্বদেশহিতৈষায় পরিপূর্ণ। তিনি মাইকেলের শিষ্য, বৃত্রসংহারে মাইকেল তাঁহার আদর্শস্থল। মাইকেলের মেঘনাদ অপেক্ষা তাঁহার বৃত্রসংহার কোন কোন অংশে নিকৃষ্ট হইলেও উহা অন্য

বাসীর অধিকতর আদরের জিনিস, উহাতে মাইকেলের উদ্দামকল্পনা না থাকিলেও উহার আদ্যন্ত একভাবে সুন্দররূপে গ্রথিত। হেমচন্দ্রের বৃত্র ও কবিতাবলী বহুকাল বাঙ্গালার প্রধান পুস্তকমধ্যে গণ্য থাকিবে। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন উহাদের মার নাই। হেমচন্দ্র ইংরেজি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যগুলির অনুকরণ বাঙ্গালায় করিতে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে, বোধ হয় অনেকস্থলে তিনি কাব্যগুণে তাঁহার আদর্শকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার গঙ্গার উৎপত্তি উদ্দাম অথচ সুগঠিত প্রতিভার সুন্দর বিকাশ।

মাইকেলের সমসাময়িক দ্বিতীয় কবি রঙ্গলাল, ইঁহার পদ্মিনী উৎকৃষ্ট উচ্চ অঙ্গের ভাবমালায় পরিপূর্ণ; উহাতে সর্ব্বপ্রথম হিন্দুমহিলার সতীত্ব ও দেশানুরাগ পবিত্রানুরাগ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। স্বাধীনতার মোহিনীশক্তির ছটা দেখাইয়া দিয়াছেন। ইনি বহুকালাবধি পদ্যাদি আর লিখেন না; কিন্তু ইঁহার কবিত্বশক্তির ও কাব্যলিখনক্ষমতার কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই। ৩।৪ বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনে ইনি নীতিকুসুমাঞ্জলিনামে কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার মত পরিষ্কার ইংরেজিতে যাহাকে smart বলে তেমন কবিতা আর কখন দেখি নাই। তাঁহার কবিতার দৌড় ঠিক পোপের মত। পরিষ্কার চিকন অথচ সম্যক্ সম্পূর্ণ।

বাবু নবীনচন্দ্র সেন বহুসংখ্যক কবিতা লিখিয়াছেন, ইঁহার পলাশীর যুদ্ধ বীররসপূর্ণ কবিতামালায় পরিপূর্ণ। তাঁহার রাণীভবানীর চরিত্র আমাদিগের হৃদয়প্রস্তরে চিরঅঙ্কিত থাকিবে।

ইঁহাদের পর দীনবন্ধু, ইনি ঈশ্বরগুপ্তের ছাত্র। ঈশ্বরগুপ্তের হাতের টেকসারি; ইঁহার উপর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এত আর কাহার উপর পারেন নাই। সমাজচিত্র অঙ্কনে ইনি অদ্বিতীয়, ইঁহার সধবার একাদশী ও জামাইবারিক সমাজের উৎকৃষ্ট চিত্র। সমাজে দোষ দেখাইয়া সেই দোষকে ব্যঙ্গ করিতে হইলে যত দূর সম্ভব, ইনি ততদূর অতিরঞ্জিত করিতে পারেন। ইঁহার লীলাবতী অপূর্ব্ব পদার্থ। ইংরেজি শিখিয়া ইংরেজের উৎকৃষ্ট নিয়মাদি অনুকরণে অক্ষম হইয়া অথচ প্রাচীন সমাজের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া তৎকালের যুবকগণ কিরূপে অধঃপাতে যাইতেন, দীনবন্ধু সে সকল বর্ণনায় অদ্বিতীয়। তাঁহার নদের চাঁদ ও হেমচাঁদ, তাঁহার অটল ও নিমেদত্ত কল্পনার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। তাঁহার নীলদর্পণে সমাজের কত উপকার করিয়াছে, কিরূপে অত্যাচারী পাপাশয় নীলকরগণের প্রতি লোকের বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার বিষয় অনেক বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হইলে পুঁথি অত্যন্ত বাড়িয়া যায়।

ইহার পর বঙ্কিমবাবু, ইহার দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল ও কমলাকান্তের দপ্তর, এক একখানি এক এক অদ্ভুত পদার্থ। ইহার গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য যে, বঙ্গীয়পাঠকদিগের সম্মুখে এক একটি উৎকৃষ্ট পুরুষ ও উৎকৃষ্ট নারীচরিত্র দেখান এবং আরও সৎপথভ্রষ্ট হইলে তাহার যে অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত তাহারও চিত্র দেখান, তাঁহার প্রতাপ পুরুষশিরোমণি, যেমন বুদ্ধি, যেমন বিজ্ঞতা, যেমন কর্ম্মক্ষমতা, তেমনি উচ্চতর আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ, আবার তেমনি ধর্ম্মপথে মতিমান্। পূর্ব্বে রামায়ণ ও মহাভারত বঙ্গীয়যুবককে যে সকল শিক্ষা দিত, আজি এই পরাধীন দেশে বঙ্কিমবাবুর পুস্তকগুলি ঠিক সেই শিক্ষা দেয়; তাঁহার কমলাকান্ত আর কেহ নহে, একজন সুশিক্ষিত চিন্তাশক্তিসম্পন্ন বঙ্গবাসীর হৃদয়স্থ অনন্ত শোকসাগরের গভীর সমুচ্ছ্বাসমাত্র; "তুমি এস এস বঁধু এস," এই গীতের ব্যাখ্যাচ্ছলে কমলাকান্তের মুখে যে নানা রসপূর্ণ অপূর্ব্ব কাব্যকলাপের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার সূর্য্যমুখী, আয়েষা, ভ্রমর, ললিত-লবঙ্গলতা, এমন কি তাঁহার রূপসী, হীরা, রোহিণী হইতেও আমরা উৎকৃষ্ট নীতিশিক্ষা পাইয়া থাকি। নীতিশিক্ষা কাব্যে অতি অল্প প্রশংসা, উহার রুচি অতি চমৎকার, বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে সুরুচিবিরুদ্ধ বর্ণনা অতি বিরল, নাই বলিলেও হয়। কিন্তু এই কয়খানি বই লইয়া বঙ্কিমবাবুর সমালোচনা করিলে, তাঁহার উপর শুদ্ধ অবিচার করা হয় মাত্র। তিনি যেরূপ নিজদেশের জন্য দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, এত বোধ হয় আর কেহই করে নাই। তাঁহার বঙ্গদর্শন বঙ্গদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের যত উন্নতিসাধন করিয়াছে, এত বোধ হয় আর কেহ কখন করেন নাই, ইহাতেও বঙ্কিমবাবুর সব বলা হইল না। ইনিও ঈশ্বরগুপ্তের অনুকরণকরতঃ সুশিক্ষিত যুবকবৃন্দকে বঙ্গভাষায় লিখাইবার জন্য বিহিত যত্ন করেন। এখনকার লেখকবৃন্দ বঙ্কিমবাবুর নিকট যত ঋণী এত বোধ হয় আর কাহারও নিকট নহে। এই প্রাচীনবয়সে নানারূপ শারীরিক মানসিক, সাংসারিক যন্ত্রণার মধ্যে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের গুরুতর পরিশ্রমের উপরও বঙ্গসাহিত্যের জন্য ইহার চিন্তা ও পরিশ্রমে বিরতি নাই। বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালি যে ইংরেজিশিক্ষায় কি হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বাঙ্গালি যে চিন্তাশীলতা সুরুচিশীলতায় কাব্যপ্রসঙ্গে অন্য জাতি অপেক্ষা হীন নহে, তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কথা লইয়া আর অধিক আন্দোলন করা আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায়। বঙ্কিমবাবু দেশের উপকার

যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, করিতেছেন ও ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দিলে যাহা করিবেন, তাহা অন্যে বলিলে যত সাজিবে, নানা কারণে আমার বলিলে তত সাজিবে না।

বঙ্গদর্শনের দেখাদেখি আমাদের দেশে আর চারি পাঁচখানি উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রিকা হইয়াছে। ইহার মধ্যে আর্য্যদর্শন কিছুদিন ধরিয়া বাঙ্গালিদিগের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। আর্য্যদর্শনে দেশের মনে পরনিরপেক্ষতাবৃত্তি উদ্দীপনের জন্য নানাপ্রকার যত্ন করা হইয়াছিল। ইহার প্রধান লেখক সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নিজে এবং পূর্ণচন্দ্র বসু। সম্পাদক মিল ও মাটসিনির জীবনচরিত লিখিয়া বঙ্গবাসীকে ইউরোপের দুইজন প্রধান নেতার মনের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র বসু বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীচরিত্রগুলির চরিত্র পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া যথার্থ উচ্চতর সমালোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। বাঙ্গালায় দ্বিতীয় সাময়িকপত্রিকা বান্ধব, ইহার প্রভাব আমাদের এ অঞ্চলে তত অধিক নাই, কিন্তু ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। ইহার সম্পাদক মনীষাসম্পন্ন কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিলক্ষণ দক্ষতাসহকারে পত্রিকাসম্পাদনকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজিতে যাহাকে [redacted] man বলে, আমাদের এ অঞ্চল অপেক্ষা পূর্ব্বাঞ্চলে এইরূপ লোকের সংখ্যা অধিক, আর কালীপ্রসন্ন বাবু এই সকল [redacted] লোকের অগ্রণী; তাঁহার লেখার জীবন্তভাব জ্বলন্ত রচনা। তাঁহার সহযোগিগণকে আমরা বিশেষ জানি না, যাহা জানি, তাহাতে আমাদের যথেষ্ট ভরসা আছে যে কালীপ্রসন্নবাবুর সহযোগিগণের মধ্য হইতে অনেক উৎকৃষ্ট লেখক উৎপন্ন হইবেন। আর একখানি সাময়িকপত্র ভারতী, এখানি যোড়াসাঁকোস্থ ঠাকুরপরিবারকর্তৃক প্রকাশিত, ইহার রুচি মার্জ্জিত, ভাষা ললিত। ইহার কার্য্যপ্রণালী সুন্দর, ইহা কখন বাকী পড়ে না, সকল কাগজ একবৎসর দুইবৎসর বাকী পড়িয়াছে, কিন্তু ভারতীর বাকী নাই। এই পত্রের সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইহাঁর নিজের গ্রন্থাবলী অতি সুন্দর। স্বপ্নপ্রয়াণে ইহাঁর কল্পনাশক্তির অনেক দূর দৌড় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরও সহকারী কে কে আমরা জানি না, কিন্তু শুনিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভ্রাতৃগণ, তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। সেখান হইতে পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে সরোজিনী, পুরুবিক্রম, বাল্মীকিপ্রতিভা প্রভৃতি দশ বারখানি সুরুচিসঙ্গত সুললিত পাঠ্য ও উপাদেয় গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাঁহাদিগকে অল্পক্ষমতাশালী বলিয়া বোধ হয় না।

বঙ্গদর্শনে যাঁহারা বঙ্কিমবাবুর সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা একরূপে সকলেই উৎকৃষ্ট লেখকশ্রেণীর মধ্যে গণ্য

হইয়াছেন। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলিও মহীয়ান্ চিত্রসমূহে পরিপূর্ণ, ইংরেজি, সংস্কৃতসাহিত্যে যাহা কিছু মহান্ সমস্ত তাঁহার কবিতায় আছে; তাঁহার কবিতা বিশুদ্ধ, সদ্ভাবাবলীপরিপূর্ণ। বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী সাধারণীর সম্পাদক, বঙ্গদর্শনে তাঁহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। দশমহাবিদ্যা, প্রাবৃ প্রভৃতি যে প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনের প্রথম অবস্থায় বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে আমোদ ও শিক্ষাদান করিত, তাহার অনেকগুলি তাঁহার লেখনীপ্রসূত। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সময়ে সময়ে বঙ্কিমবাবুকে সহায়তা করিতেন, এক্ষণে তিনি বাঙ্গালার একটি মোহিনীময় রচনাপ্রণালীর জন্মদাতা, তাঁহার লিখিত উদ্ভ্রান্তপ্রেম বহুকালাবধি বঙ্গীয়যুবকদিগকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিবে। বঙ্গদর্শনের আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একখানি উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য লিখিয়াছেন, বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহার প্রধান সহায় তাঁহার ভ্রাতা বঙ্কিমবাবু, আর চন্দ্রনাথবাবু।* চন্দ্রনাথবাবু চিন্তাশীল, তিনি বহুকাল কলিকাতা রিবিউয়ের সমালোচক ছিলেন, এক্ষণে ইংরেজি ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদর্শনে অভিজ্ঞানশকুন্তলের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা ইউরোপীয় সমালোচনা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। আমরা আর্য্যদর্শনের আর একজন লেখকের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ইহার নাম ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি এক্ষণে সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, ইহার কল্পতরু ও ভারতউদ্ধার না পড়িয়াছে বঙ্গীয়পাঠকের মধ্যে এরূপ লোক অতি বিরল। ইহার ভারত উদ্ধার নামক mock heroic কাব্য অতুল্য পদার্থ। ইনি এক্ষণে পঞ্চানন্দ নামক রহস্যপূর্ণ সাময়িকপত্রিকার সম্পাদক।

আমার প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু আমি সকলের নিকট আবার একটু ধীরতা ভিক্ষা করি। এই সময়ে আমরা আর কয়েকটী লোকের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাটক দুইখানিতে ইয়ংবেঙ্গলের দোষ ও গুণের অতি সুচারু চিত্র দেওয়া আছে। বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লিখিতেছেন, যতদূর আমরা পাইয়াছি, তাহাতে বেশ অনুভব করিতে পারি, বইখানি সম্পূর্ণ হইলে, বাঙ্গালায় একখানি অপূর্ব্ব পাঠ্যগ্রন্থ হইবে। তাহার পর বাবু রাজকৃষ্ণ রায় নানাবিধ গ্রন্থ লিখিয়া, নিজের অসাধারণ ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন ও নিজ জায়াকে যথেষ্টপরিমাণে সমৃদ্ধ

* প্রস্তাবলেখকও বটে। বঃ।

করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থের সংখ্যা নাই। সাহিত্যবিষয়ে তাঁহার অসীম সম্বলের শেষ নাই, তাঁহার বয়স অল্প বোধ হয়, তিনি অনেক লিখিয়া যাইতে পারিবেন। আর সম্প্রতি কয়েকটি যুবক কল্পনানামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের যেরূপ দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় দেখিতেছি, তাঁহারা যে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহার আর বিশেষ সন্দেহ দেখিতেছি না।

বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি তিন চারিখানি উৎকৃষ্ট পদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সম্প্রতি যোগেশ নামক অপূর্ব্ব কাব্যসৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালির কৃতজ্ঞতালাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার মন্দা ও নর্ম্মদা স্ত্রীচরিত্রের চরমোৎকর্ষ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর নির্ব্বাসিতের বিলাপ একখানি সুপাঠ্য বাঙ্গালা কাব্য। তাঁহার পুষ্পমালায় বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট কবিতা আছে, যে কবিতায় তিনি স্বদেশের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় উচ্চতর ভাবপূর্ণ কবিতা আর দেখি নাই।

মিষ্টার আর, সি, দত্ত চারি পাঁচখানি সুন্দর ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছেন। তিনি নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট চিত্র লিখিয়া বঙ্গবাসীকে আমোদ ও শিক্ষাদান করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে, আমরা প্রাচীন বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট সমাজচিত্র দেখিতে পাই, তাঁহার ভাষা সুললিত এবং তাঁহার গ্রন্থাবলী সর্ব্বজনমনোরম।

আর দুইখানি গ্রন্থের কথা এ স্থলে বলা আবশ্যক। দুইখানিতে গ্রন্থকার নাম দেন নাই, একখানি বঙ্গাধিপপরাজয় আর একখানি স্বর্ণলতা। বঙ্গাধিপপরাজয়ের গ্রন্থকার সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ বর্ণনায় যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, উঁহার নরনারীচরিত্রগুলিও উত্তম। স্বর্ণলতা ইংরেজিতে যাহাকে নবেল বলে, বাঙ্গালায় সেইরূপ সর্ব্বপ্রথম নবেল। বাঙ্গালিসমাজের এরূপ সুন্দর চিত্র অতি বিরল।

হরলাল রায়ের হেমলতা বঙ্গীয় পুস্তকালয়ে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যে সকল গুণ থাকিলে নাটক হয়, তাহা উহাতে ভূরিপরিমাণে পাওয়া যায়।

আমরা এই বঙ্গীয়লেখক সমালোচনার সর্ব্বশেষে পুস্পগুলির সমালোচনা করিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করিব। পুষ্পাঞ্জলি বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট মহাগ্রন্থ। ইহার ভাষা সংস্কৃতানুকরণ ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের ভাষা তাঁহার নিজের। রামগতি ন্যায়রত্নমহাশয়েরও ভাষা তাঁহার নিজের। কিন্তু ভূদেববাবুর ভাষা প্রাচীন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও কথকসমাজে যে ভাষা কথিত হইত, তন্মধ্যে যাহা কিছু মহীয়ান্ ছিল, সে সমুদয়ের সারসংগ্রহ, অনুকরণাতীত। ইহার ভাবাবলী বঙ্গ-

বাসীর অস্থিমজ্জায় গ্রথিত থাকা উচিত। পুষ্পাঞ্জলি একখানি অদ্ভুত পদার্থ। ভূদেব বাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাস বাঙ্গালায় ইংরেজিওয়ালার লিখিত প্রথম উপন্যাস।

আমরা আর অধিক লোকের গ্রন্থসমালোচনা করিয়া সকলের অধীরতা বৃদ্ধি করিতে চাহি না। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে চিকিৎসক সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইতে সামান্য স্কুলমাষ্টার পর্য্যন্ত বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আগে লোকে ইংরেজি লিখিত, কিন্তু আধুনিক যুবকগণ ইংরেজি পড়িয়া বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিতেছেন। অনেকে ইংরেজি লেখায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াও বাঙ্গালা আরম্ভ করিতেছেন। ক্রমে লোকের সংস্কার দাঁড়াইতেছে যে নানা ভাষা শিখিব, নানা দেশ দেখিব, কিন্তু লিখিব নিজ ভাষায়। ইহার প্রমাণ ভারতীতে প্রকাশিত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পত্রখানি। তাঁহার পত্রাদি বাঙ্গালায় লিখিত, তাঁহার মন বাঙ্গালার জন্য আকুল। তিনি সেণ্টপিটর্সবর্গ হইতে যখন বাঙ্গালাভাষায় বাঙ্গালির জন্য কাঁদিয়াছেন, তখন আর এ কথার বিশেষ প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। যখন সকল অবস্থাপন্ন সকল ব্যবসায়ী লোকের মধ্যেই সাহিত্যানুরাগ প্রকাশ করিতেছে, তখন সাহিত্যের যে সত্বর শ্রীবৃদ্ধি অচিরাৎ সাধিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এখনও একটি কথা বাকি আছে। যে কেহ বাঙ্গালা সাহিত্য লিখিতেছেন, তাঁহারই অন্য ব্যবসায় আছে, কেহ চাকুরী করেন, কেহ জমীদার, কেহ উকীল, কেহ ব্যবসায় করেন অথচ পুস্তক লিখেন। অতএব সকলেই amateur কিন্তু সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে, সাহিত্য একটা ব্যবসায় হওয়া চাই, আজিও তাহা দাঁড়ায় নাই; এখনও শুদ্ধ সাহিত্য ব্যবসায় করিয়া কেহ জীবননির্ব্বাহ করিতে পারেন না। যাহাতে সাহিত্য ব্যবসায় হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। আমার বোধ হয় রজনীকান্ত গুপ্ত ও বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ভিন্ন আর কেহই শুদ্ধ সাহিত্যের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করেন না। কিন্তু এরূপ অবস্থা অধিক দিন থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। আজিও গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে লাভ আছে, আজিও একজন ভাল গ্রাজুয়েট গবর্ণমেণ্ট চাকুরীতে যাইবামাত্র অন্ততঃ ৭৫ কি ১০০ টাকা পাইতে পারেন। যত দিন সাহিত্য ব্যবসায় প্রথম হইতেই ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ না দেখাইতে পারে, ততদিন উৎকৃষ্ট শিক্ষিত লোক সাহিত্যব্যবসায়ে সর্ব্বসাধ্য পরিশ্রম করিতে চাহিবে না। এই নূতন সমাজে সমস্ত ইউরোপীয় প্রাচ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যরাশি উদ্ঘাটিত হইয়াও যে বঙ্গীয় সাহিত্যের আজিও আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই, তাহার কারণ স্বাধীন সাহিত্য

ব্যবসায় না থাকা। আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ যে কেন অনবরত বাহির হয় না, যাহাও বাহির হয়, তাহাও দেরিতে দেরিতে হয়, ইহার প্রধান কারণ এই যে, পুস্তকরচনা ব্যবসায়ান্তরাবলম্বী গ্রন্থকারদিগের খুসী ও অবসরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সাহিত্য জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে ও জন্মিবে, কিন্তু যতদিন সাহিত্য ব্যবসায় না হইবে Profession না হইবে, ততদিন সাহিত্যের বদ্ধমূলতা হওয়া অসম্ভব। সাহিত্য ব্যবসায় করিতে হইলে, আমাদিগের কি করিতে হইবে? কোন ভাল নূতন পুস্তক বাহির হইলেই যদি সেগুলি হুহুক করিয়া বিক্রয় হইবার নিশ্চয় সম্ভাবনা থাকে, এবং সাহিত্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে পারে, এরূপ বহুসংখ্যক লোক থাকে, যদি গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য গ্রন্থকারগণকে অলস, মৎসর, বাক্সর্ব্বস্ব সমালোচকের লেখনীর উপর নির্ভর না করিতে হয়, আর বহুসংখ্যক লাইব্রেরী থাকে, যাহাতে সকলপ্রকার গ্রন্থই ক্রীত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্রই সম্যক্ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে আমরা একপরিবারের গুণের কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না; সে কলিকাতার ঠাকুরবাড়ী। শোভাবাজারের রাজবাড়ী যেমন ভট্টাচার্য্যদিগের উৎসাহদাতা, ঠাকুরপরিবারও তেমনি এই নব্যকুরিত সাহিত্যের উৎসাহদাতা হইয়াছেন। নূতন সাহিত্য প্রচারের সময় অন্যান্য প্রসিদ্ধ পরিবারগণ যদি উৎসাহ দিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে স্বাধীন সাহিত্য ব্যবসায় অচিরাৎ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। সাবিত্রী লাইব্রেরীর ন্যায় লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়িয়া গেলে, লেখকগণ স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত হইলে, বঙ্গীয় সাহিত্যের যে অদ্ভুত উন্নতি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের সাহিত্যের প্রকাণ্ড ভাণ্ডার অচিরাৎ প্রস্তুত করিবার যেমন আশ্চর্য্য সুবিধা হইয়াছে এমন অল্প জাতির ভাগ্যে ঘটে, আমাদের দেশে যে কোন নবোৎসাহ জন্মাক, সকলেই সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে; ব্রাহ্মদিগের নবোৎসাহে সাহিত্যসংখ্যা যে কত বৃদ্ধি করিতেছে তাহা বলা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে সে সাহিত্যের বিষয় কেহ অবগত নহেন। তাহার পর ইংরেজী আমাদের bread winning language আমাদের ইংরেজি পড়িতেই হইবে। সুতরাং ইংরেজি পড়ার দরুণ আমাদের সাহিত্যের যে উন্নতির সম্ভাবনা তাহা একপ্রকার চিরস্থায়ী বলিতে হয়। তাহার পর আমাদের এত বিদ্যানুরাগের সময় সংস্কৃত এখনও অনেকে পড়িবে, প্রাচীন আর্য্যভাষা কোন বাঙ্গালি অবজ্ঞা করিতে পারিবেন না, সুতরাং সংস্কৃত পাঠ হেতু সাহিত্যের যে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা সেও চিরস্থায়ী। এখন কেবল চিরস্থায়ী সাহিত্যমাত্রব্যবসায়ী একদল

লেখক চাই, তাহা হইলে আমরা অল্প দিনে পৃথিবীর আর সমস্ত সাহিত্যকে কাণা করিয়া দিতে পারিব, সকলকে হারাইয়া দিতে পারিব, যাহা এই বিশ বৎসরের মধ্যে হইয়াছে, অন্য দেশে তাহা দুইশত বৎসরে হয় না। আর বিশ-বৎসরে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক হইবে, নিশ্চয় ; কারণ, লেখকদিগের মধ্যে অধি-কাংশই অল্পবয়স্ক, ইহাঁদের বয়োবৃদ্ধিসহ-কারে লেখার গুণও অধিক হইবে, আর সংখ্যাও অধিক হইবে। সাময়িক-পত্রিকাগণ প্রতিবৎসরই দুই একটি করিয়া লেখক তৈয়ারি করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে ; এই সকল লেখক যাহাতে গবর্ণমেণ্ট বা অন্য সর্ব্বিসে নামিয়া কেবল সাহিত্য লইয়া কাল কাটাইতে পারে, তাহার যোগাড় করিয়া দিলেই বাঙ্গালাসাহিত্যের জয়ধ্বনি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতি-ধ্বনিত হইবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি পৃথিবীমধ্যে এক মহাজাতি ব-লিয়া পরিগণিত হইবে। অনেকে ব-লেন বঙ্গভাষার অবস্থা বড় হীন ; কিন্তু এই বঙ্গীয় লেখকমণ্ডলীমধ্যে দাঁড়া-ইয়া তাঁহাদের কথায় সায় দিতে পারি না।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা শোচনীয় নহে। যখন প্রতি তিনমাসে পাঁচ ছয় শত নূতন পুস্তকের রেজিষ্টরি হয়, যখন এক কলিকাতায় পাঁচশত প্রেস অনবরত চলিতেছে, যখন উচ্চ, নীচ, বড়, ছোট, ধনী, নির্ধন-সকলেই বাঙ্গালা লিখিবার ও পড়িবার জন্য উৎসুক, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা শোচনীয় নহে। আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিণাম অতি শুভকর, বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি অনন্ত ও উন্নতিকাল সমাগত। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি শত শত ভাবী লেখক ভাবী প্রতিভা-শালী লোক উদয় হইতেছেন, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শত শত মহা-কাব্য বঙ্গবাসীকে আনন্দে ভরাইয়া ভাষান্তরিত হইয়া দেশ দেশান্তরস্থ পণ্ডিত-বৃন্দকে আনন্দে মগ্ন করিতেছে। আ-মার কর্ণে কত ভবিষ্যৎবাণীর ও বীণার প্রতিঘাত লাগিতেছে তাহা বলিতে পারি না। এই সকলের পশ্চাতে আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, একটি গৌরবান্বিত মহাশক্তিমান্ মহাজাতি সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় উত্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতা-সহকারে বর্ত্তমান পুরুষের মহামহোপাধ্যায়-গণের গুণগান করিতেছে ; আর মহা আনন্দভরে দেশনির্ব্বিশেষে বর্ত্তমান নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষী মহোদয়দিগকে পূজা করিতেছে।

পালামৌ।

দ্বিতীয় অংশ।

সেকালের হরকরা নামক ইংরেজি পত্রিকায় দেখিতাম, কোন একজন মিলিটারি সাহেব "পেরেড" বৃত্তান্ত, "ব্যাণ্ডের" বাদ্যচর্চ্চা প্রভৃতি নানা কথা পালামৌ হইতে লিখিতেন। আমি তখন ভাবিতাম পালামৌ প্রবল সহর, সাহেবসমাকীর্ণ সুখের স্থান। তখন জানিতাম না যে, পালামৌ সহর নহে, একটি প্রকাণ্ড পরগণামাত্র। সহর সে অঞ্চলেই নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ডগ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

পাহাড় আর জঙ্গল বলিলে কে কি অনুভব করেন বলিতে পারি না। যাঁহারা "কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার কৃত" পাহাড় দেখিয়াছেন, আর যাঁহাদের গৃহপার্শ্বে শৃগালভ্রান্তিসংবাহক ভাঁটভেরাণ্ডার জঙ্গল আছে, তাঁহারা যে এ কথা সমগ্র অনুভব করিয়া লইবেন, ইহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য পাঠকের জন্য সেই পাহাড় জঙ্গলের কথা কিঞ্চিৎ উত্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছে। সকলের অনুভবশক্তি ত সমান নহে।

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দ্দেশমত দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন মর্ত্তে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম।

পরে চারি পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল; কিন্তু জঙ্গল ভাল চেনা গেল না। তাহার পর আরও দুই এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে, তাম্রাভ অরণ্য চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল; কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান সমুদয় যেন মেষদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজিদ্বারা সর্ব্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষ আরও কতকদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে, সর্ব্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী, গ্রাম, সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়; যেন বিচলিত

মীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধ হয় যেন অবনীর অন্তরাগ্নি একদনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয় যেন দেখিয়াছিলাম সকল তরঙ্গগুলি পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়াছিল, কোন কোনটি পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়া পশ্চিমদিকে নামে নাই; এইরূপ অর্দ্ধপাহাড় লাতেহারগ্রামপার্শ্বে একটি আছে, আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিমভাগে মৃত্তিকা নাই সুতরাং তাহার অন্তরস্থ সকল স্তর দেখা যায়, এক স্তরে নুড়ি, আর এক স্তরে কালপাথর, ইত্যাদি। কিন্তু কোন স্তরই সমসূত্র নহে, প্রত্যেকটি কোথাও উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে। আমি তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই, লক্ষ্য করিবার কারণ পরে ঘটিয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে এই পাহাড়ের মূলে দাঁড়াইয়া আছি, এমত সময় আমার একটা নেমকহারাম ফরাসিস কুক্কুর (poodle) আপন ইচ্ছামত ছাবুতে চলিয়া গেল, আমি রাগত হইয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম। আমার পশ্চাতে সেই চীৎকার অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চীৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্ব্বমত হ্রস্ব দীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চীৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ব্ব-বৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চ নীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম শব্দ কোন একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়; সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে শব্দও সেইখানে উঠিতে নামিতে থাকে। কিন্তু শব্দ দীর্ঘকাল কেন স্থায়ী হয়, যতদূর পর্য্যন্ত সেই স্তরটি আছে, ততদূর পর্য্যন্ত কেন যায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; ঠিক যেন সেই স্তরটি শব্দ কনডক্টার (conductor) যে পর্য্যন্ত ননকনডক্টারের সঙ্গে সংস্পর্শ না হয় সে পর্য্যন্ত শব্দ ছুটিতে থাকে।

আর একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝর্ ঝর্ করিতেছে। তাহার একস্থান অনেকদূর পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর বৃহৎ এক অশ্বত্থগাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল, অশ্বত্থবৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রসগ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থগাছ আমার মনে পড়িয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই। এখন বোধ হয় অশ্বত্থগাছটি আপন অবস্থানুরূপ কার্য্য করিতেছে; সকল বৃক্ষই যে বাঙ্গালার রসপূর্ণ কোমল ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিনাকষ্টে কালযাপন করিবে

অন্যত্র সম্ভব নহে। যাহার ভাগ্যে কঠিন পাষাণ, পাষাণই তাহার অবলম্বন, এখন আমি অশ্বত্থটির প্রশংসা করি।

একণে সে সকল কথা যাউক, প্রথম দিনের কথা দুই একটি বলি। অপরাহ্নে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সংকীর্ণ গো-পথ দিয়া আমার পাল্কী চলিতে লাগিল, অনেক স্থলে উভয়পার্শ্বস্থ লতা পল্লব পাল্কী স্পর্শ করিতে লাগিল। বনবর্ণনায় যেরূপ "শাল তাল তমাল, হিন্তাল" শুনিয়াছিলাম, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাল, হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শালবন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশী কদম্ববৃক্ষের মত, না হয় কিছু বড়, কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথায়ও তাহার ছেদ নাই, এই জন্য ভয়ানক। মধ্যে মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্য। এইরূপ বন দিয়া যাইতে যাইতে একস্থানে হঠাৎ কাষ্ঠঘণ্টার বিষাদকর শব্দ কর্ণগোচর হইল, কাষ্ঠঘণ্টা পূর্ব্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারাইলে, শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হয়; এইজন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দে আরও যেন অবসন্ন করে; কিন্তু সকলকে করে কি না তাহা বলিতে পারি না।

পরে দেখিলাম, একটী মহিষ মস্তক মুখ তুলিয়া আমার পাল্কীর প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহার গলায় কাষ্ঠঘণ্টা ঝুলিতেছে। আমি ভাবিলাম, পালিত মহিষ যখন নিকটে, তখন গ্রাম আর দূরে নহে। অল্পবিলম্বেই অৰ্দ্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটী ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল, এখানে সেখানে দুই একটি মধু বা মৌয়াবৃক্ষ ভিন্ন সে প্রান্তরে গুল্ম কি লতা কিছুই নাই, সর্ব্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্ব্বতচ্ছায়ায় সে প্রান্তর আরও রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণকান্তি আর কখন দেখি নাই, সকলের গলায় পুতির সাতনরী, ধুকধুকীর পরিবর্ত্তে এক একখানি গোল আরসী; পরিধানে ধড়া; কর্ণে বনফুল, কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে; কেহ বা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া আছে; কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। সকলগুলিই যেন কৃষ্ণঠাকুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেরূপ স্থান তাহাতে এই পাথুরে কোলগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল, চারিদিকে কাল পাথর, পশুও পাথুরে, তাহাদের রাখালও সেইরূপ। এইস্থলে বলা আব-

খায় এ অঞ্চলে মহিষ ভিন্ন গোরু নাই। আর বালকগুলি কোলের সন্তান।

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ কোলের বাস। কোলেরা বন্যজাতি; খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ; দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান্ তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না। যে সকল কোল কলিকাতা আইসে বা চা-বাগানে যায়, তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান্ দেখি নাই; বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোলমাত্রেই রূপবান্, অন্ততঃ আমার চক্ষে। বন্যরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে!

প্রান্তরের পর এক ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নাম স্মরণ নাই; তথায় ত্রিশ বত্রিশটি গৃহস্থ বাস করে। সকলেরই পর্ণকুটীর। আমার পাল্কী দেখিতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আবলুসের মত কাল, সকলেই যুবতী, সকলের কটিদেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ান; সকলেরই কক্ষ, বক্ষ আবরণশূন্য। সেই নিরাবৃত বক্ষে পুঁতির সাতনরী, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরসী দুলিতেছে; কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল, মাথায় বড় বড় বনফুল। যুবতীরা পরস্পর কাঁধ ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু দেখিল কেবল পাল্কী আর বেহারা। পাল্কীর ভিতরে কে বা কি তাহা কেহই দেখিল না। আমাদের বাঙ্গালায়ও দেখিয়াছি পল্লীগ্রামে বালক বালিকারা প্রায় পাল্কী আর বেহারা দেখিয়া ক্ষান্ত হয়। তবে যদি সঙ্গে বাদ্য থাকে, তাহা হইলে "বরকনে" দেখিবার নিমিত্ত পাল্কীর ভিতর দৃষ্টিপাত করে। যিনি পাল্কী চড়েন, সুতরাং তিনি দুর্ভাগা, কিন্তু গ্রাম্যবালক বালিকারাও অতি নিষ্ঠুর, অতি নির্দয়।

তাহার পর আবার কতকদূর গিয়া দেখিলাম পথশ্রান্তা যুবতীরা মদের ভাঁটিতে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। গ্রামমধ্যে যে যুবতীদের দেখিয়া আসিয়াছি, ইহারাও আকারে অলঙ্কারে অবিকল সেইরূপ, যেন তাহারাই আসিয়া বসিয়াছে। যুবতীরা উভয় জানুদ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া দুই হস্তে শালপত্রের পাত্র ধরিয়া মদ্যপান করিতেছে, আর ঈষৎ হাস্যবদনে সঙ্গীদের দেখিতেছে। জানুস্পর্শ করিয়া উপবেশন করা কোলজাতির স্ত্রীলোকদিগের রীতি; বোধ হয় যেন সাঁওতালদিগেরও এই রীতি দেখিয়াছি। বনের মধ্যে যেখানে সেখানে মদের ভাঁটি দেখিলাম, কিন্তু বাঙ্গালার ভাঁটিখানায় যেরূপ মাতাল দেখা যায়, পালামৌপরগণায় কোন ভাঁটিখানায় তাহা দেখিলাম না। আমি পরে তাহাদের আহার ব্যাবহার সকলই দেখিতাম, কিছুই তাহারা আমার নিকট গোপন করিত না, কিন্তু কখন স্ত্রীলোককে মাতাল হইতে দেখি নাই, অথচ তাহারা পানকুণ্ঠ নহে। তাহাদের মদের মাদকতা নাই এ কথাও বলিতে পারি না।

সেই মত পুরুষেরা যাহারা সর্ব্বদা মাতাল হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে কয়েকবার কেবল যুবতীর কথাই বলিয়াছি, ইচ্ছাপূর্ব্বক বলিয়াছি এমন নহে। বাঙ্গালার পথে, ঘাটে, বৃদ্ধাই অধিক দেখা যায়, কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে যুবতীই অধিক দেখা যায়। কোলের মধ্যে বৃদ্ধা অতিঅল্প, তাহারা অধিকবয়ঃ হইলেও যুবতীই থাকে, অশীতিপরায়ণা না হইলে তাহারা লোলচর্ম্মা হয় না। অতিশয় পরিশ্রমী বলিয়া গৃহকার্য্য, কৃষিকার্য্য সকল কার্য্যই তাহারা করে, পুরুষেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় কেবল বসিয়া সন্তানরক্ষা করে, কখন কখন চাটাই বুনে। আলস্যজন্য পুরুষেরা বঙ্গমহিলাদের ন্যায় শীঘ্র বৃদ্ধ হইয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা শ্রমহেতু স্থিরযৌবনা থাকে।

লোকে বলে পশুপক্ষীর মধ্যে পুরুষজাতিই বলিষ্ঠ ও সুন্দর, মনুষ্যমধ্যেও সেই নিয়ম। কিন্তু কোলদের দেখিলে তাহা বোধ হয় না, তাহাদের স্ত্রীজাতিরাই বলিষ্ঠা ও আশ্চর্য্য কান্তিবিশিষ্টা। কিন্তু তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের গায়ে খড়ি উঠিতেছে, চক্ষে মাছি উড়িতেছে, মুখে হাসি নাই, যেন সকলেরই জীবনীশক্তি কমিয়া আসিয়াছে। আমার বোধ হয় কোলজাতির ক্ষয় ধরিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের জীবনীশক্তি যেরূপ কমিয়া যায়, জাতিবিশেষেরও জীবনীশক্তি সেইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। মনুষ্যের মৃত্যু আছে, জাতিরও লোপ আছে।

এই পরগণায় পর্ব্বতে স্থানে স্থানে অসুরেরা বাস করে, আমি তাহাদের দেখি নাই, তাহারা কোলদের সহিত বা অন্য কোন বন্যজাতির সহিত বাস করে না। শুনিয়াছি, অন্যজাতীয় মনুষ্য দেখিলে তাহারা পলায়; পর্ব্বতের অতি নিভৃত স্থানে থাকে বলিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করা কঠিন। তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বকালে যখন আর্য্যেরা প্রথমে ভারতবর্ষে আসেন তখন অসুরগণ অতি প্রবল ও তাহাদের সংখ্যা অসীম ছিল। অসুরেরা আসিয়া আর্য্যগণের গোরু কাড়িয়া লইয়া যাইত, ঘৃত খাইয়া পলাইত, আর্য্যরা নিরুপায় হইয়া কেবল ইন্দ্রকে ডাকিতেন, কখন কখন দলবল জুটিয়া লাঠালাঠিও করিতেন। শেষে বহুকাল পরে যখন আর্য্যগণ উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন হইলেন তখন অসুরগণকে তাড়াইয়াছিলেন। পরাজিত অসুরগণ ভাল ভাল স্থান আর্য্যদের ছাড়িয়া দিয়া আপনারা দুর্গম পাহাড় পর্ব্বতে গিয়া বাসস্থাপন করেন। অদ্যাবধি সেই পাহাড় পর্ব্বতে তাহারা আছে, কিন্তু আর তাহাদের বলবীর্য্য নাই, আর সে অসীম সংখ্যাও তাহাদের নাই। এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অসুরকুল ধ্বংশ হইয়াছে বলিলেও অন্যায় হয় না; যে দশ পাঁচ জন এখানে সেখানে

বাস করে, আর কিছু দিনের পর তাহারাও থাকিবে না।

জাতিলোপ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে, অনেক আদিম জাতির লোপ হইয়াগিয়াছে অদ্যাপি হইতেছে। জাতিলোপের হেতু দর্শনবিদ্গণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, যে পরাজিত জাতিরা বিজয়ীকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া অতি অযোগ্য স্থানে গিয়া বাস করিলে, পূর্ব্বস্থানে যেসকল সুবিধা ছিল তাহার অভাবে ক্রমে তাহারা অবনত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ কথা অনেক স্থলে সত্য সন্দেহ নাই, অসুরগণের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল বোধ হয়। কিন্তু সাঁওতালেরাও একসময় আর্য্যগণকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া দামিনীকোতে পলায়ন করিয়াছিল। সেই অবধি অনেক কাল তথায় বাস করে, অদ্যাপিও তথায় বাস সাঁওতালেরা বাস করিতেছে, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের যে কুলক্ষয় হইয়াছে এমত শুনা যায় না।

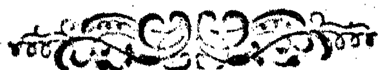
মারকিন ও অন্যান্য দেশে যেখানে সাহেবেরা গিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছেন, সেখানকার আদিমবাসীরা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে, তাহার কারণ কিছুই অনুভব হয় না। রেড ইণ্ডিয়ান, নাটিক ইণ্ডিয়ান, নিউ জিলাণ্ডর, নিউ হলাণ্ডর, তাস্মানিয় প্রভৃতি কত জাতি লোপ পাইতেছে। মৌরিনামক আদিম জাতি বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান্, কর্ম্মঠ, বলিয়া পরিচিত, তাহারাও সাহেবদের অধিকারে ক্রমে লোপ পাইতেছে। ১৮৪৮ সালে তাহাদের সংখ্যা একলক্ষ ছিল, বিষবৎসর পরে ৩৮ হাজার হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সে জাতির অবস্থা কি তাহা জানি না। বোধ হয় এতদিনে লোপ পাইয়া থাকিবে, অথবা যদি এতদিন থাকে, তবে অতি সামান্য অবস্থায় আছে। মৌরি দুর্ব্বল নহে, তৎসম্বন্ধে একজন সাহেব লিখিয়াছেন " He is the noblest of savages, not equalled by the best of the Red Indians." তথাপি এজাতি লোপ পায় কেন ? তুমি বলিবে সাহেবদের অত্যাচারে ? তাহা কদাচ নহে, কানেডার অধিবাসীসম্বন্ধে সাহেবেরা কতই যত্ন করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহাদের কুলক্ষয় রক্ষা করিতে পারেন নাই। ডাক্তার পিকি লিখিয়াছেন যে, " In Canada for the last fifty years the Indians have been treated with paternal kindness but the wasting never stops * * * * The Government has built them houses, furnished them with ploughs, supplied them constantly with rifles, ammunition, and clothes, paid their medical attendants * * * but the result is merely this that their extinction goes on more slowly than it otherwise would." সমাজোপযোগী জল স্থান ত্যাগ করিয়া বিপরীত স্থানে ত এই জাতিদের বা-

উচিত হয় নাই, তবে তাহাদের কুল-লোপ হইল কেন?

কেহ কেহ বলেন যে, সাহেবদের সংস্পর্শে দোষ আছে। প্রধান জাতির সংস্পর্শে আসিলে সামান্য জাতিরা অবশ্য কতকটা উদ্যমভঙ্গ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। একথার প্রত্যুত্তরে একজন সাহেব লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে কতই সামান্য জাতি বাস করে, কিন্তু শ্বেতকায় জাতির সংস্পর্শে তাহাদের ত কুলবৃদ্ধির ব্যাঘাত হয় না।

আমরা একথা সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষের আদিম জাতিদের কুলক্ষয় অনেক দিন আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু ইংরেজদের সমাগমের পর কোন জাতির ক্ষয় ধরিয়াছে এমত নিশ্চয় বলিতে পারি না। তবে কোলদের সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ করা যাইতে পারে, তাহার কারণ আর একসময় সমালোচনা করা যাইবে। এক্ষণে এ সকল কথা যাউক, অনেকের নিকট ইহা শিবের গীত বোধ হইবে, কিন্তু এ বয়সে যখন যাহা মনে হয় তখনই তাহা বলিতে ইচ্ছা যায়; লোকের ভাল লাগিবে না এ কথা মনে তখন থাকে না। যাহাই হউক আগামী বারে সতর্ক হইব। কিন্তু যে কথার আলোচনা আরম্ভ করা গিয়াছিল তাহা শেষ হয় নাই। ইচ্ছা ছিল এই উপলক্ষে বাঙ্গালির কথা কিছু বলি। কিন্তু চারিদিকে বাঙ্গালির উন্নতি লইয়া বাহবা পড়িয়া গিয়াছে, বাঙ্গালি ইংরেজি শিখিতেছে, উপাধি পাইতেছে, বিলাত যাইতেছে, বাঙ্গালি সভ্যতার সোপানে উঠিতেছে, বাঙ্গালির আর ভাবনা কি? এ সকল ত বাহ্যিক ব্যাপার। বঙ্গসমাজের অভ্যন্তরিক ব্যাপার কি একবার অনুসন্ধান করিলে ভাল হয় না? শুনিতেছি গণনায় বঙ্গবাসীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। বড়ই ভাল!

প্র, না, ব।



মাধবীলতা।

৬।

পরদিবস প্রাতে একজন ভৈরবী এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর দিয়া যাইতেছিল, প্রান্তরের এখানে সেখানে কেবল শরগুচ্ছ, কোন স্থানই কর্ষিত নহে, সর্ব্বত্র বালুকাময়, সুতরাং সর্ব্বত্র পথ, অথচ কেহ সে পথ দিয়া যাতায়াত করে না, প্রান্তরের যেখানে দাঁড়াইয়া দেখ, চারিদিকে শরগুচ্ছের পরিধা, অথচ বন নিবিড় নহে, শরগুচ্ছ দূরে দূরে বিযুক্তভাবে রহিয়াছে, কিন্তু দেখিতে সংযুক্ত বোধ হয়। সকল স্থানই পরিষ্কার এবং পরিসর। যেদিকে যতদূর যাও, সেই দিকেই পূর্ব্বমত শরগুচ্ছ আর বালুকাময় ভূমি, তাহা অতিক্রম করিলে আবার সেইরূপ শরগুচ্ছ এবং বালুকাময় ভূমি। চতুর্দ্দিক দেখিয়া বুঝা যায়না যে আদি পথ অতিক্রম করিতেছি। যাহা ছাড়াইলাম আবার অবিকল তাহাই সম্মুখে।

লোকে বলে তথায় দস্যুভয় আছে, কেহবলে ভৌতিক ভয় আছে। জনশ্রুতি যেঁ, একবার একজন পীড়িতব্যক্তি যুবতী ভার্য্যা সমভিব্যাহারে এই প্রান্তর দিয়া যাইতে যাইতে পিপাসাপীড়িত হইয়া স্ত্রীকে জলাহরণের নিমিত্ত পাঠাইয়া আপনি একস্থানে বসিয়া থাকে, কিন্তু অপরাহ্ন পর্য্যন্ত স্ত্রী প্রত্যাবর্ত্তন করিল না দেখিয়া পীড়িতব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিল যে আমি রুগ্ন বলিয়া বিশ্বাসঘাতিনী আমায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অতএব আর স্ত্রীর অপেক্ষা না করিয়া আপনি একা প্রান্তর অতিক্রম করিতে লাগিল। পরদিবস প্রাতে আকাশ হইতে শকুনী, গৃধিনী প্রভৃতি শবভুক্ পক্ষীরা বায়ুবেগে প্রান্তরের দুইস্থানে নামিতে লাগিল। একস্থানে রুগ্ন স্বামীর মৃতদেহ আর একস্থানে যুবতীর শব পড়িয়াছিল। উভয়েই কিরূপে মরিয়াছিল বা কে তাহাদের মারিয়াছিল, তাহা কিছুই প্রকাশ নাই সুতরাং ভৌতিক ভয়ের কথা রাষ্ট্র হয়; সেই অবধি প্রান্তরের নাম "যুগলমারি" হইয়াছিল।

এই ভয়ানক প্রান্তরে কেহ যে একা যাইতে সাহস করে না তাহা ভৈরবী জানিতেন। প্রাতে প্রবেশ করিলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রান্তর যে অতিক্রম করা যায় না, ইহাও তিনি বিলক্ষণ জানিতেন; অথচ কোন বিপদ আশঙ্কা না করিয়া সেই ভয়ানক প্রান্তর দিয়া যাইতেছিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ভৈরবী অতিকষ্টে অশ্বত্থবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন; বৃক্ষতলে এক ভগ্নমন্দির, তাহার সম্মুখে

এক পুরাতন পুষ্করিণী। প্রান্তরমধ্যে এই বৃক্ষ ও মন্দির অথচ প্রান্তর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় না। যেখানেই দাঁড়াইয়া দেখ শরগুচ্ছসমূহ পরিখাস্বরূপ দৃষ্টি অবরোধ করে।

মন্দিরের পশ্চাতে ইষ্টকনির্ম্মিত কতকগুলি পুরাতন কুটীর আছে, পূর্ব্বে তাহা অতিথির নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল; এক্ষণে তথায় এই ভৈরবী অন্য দুইজন অনাথা বিধবার সহিত একত্র বাস করেন। বিধবাদের গৃহীর ন্যায় বেশভূষা, গৃহীর ন্যায় আহার ব্যবহার। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে এই সময় তাঁহারা উভয়ে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন।

প্রথমা। আমার অনেকদিন অবধি ইচ্ছা কাশীতে গিয়া বাস করি।

দ্বিতীয়া। তবে যাওয়া হয় নাই কেন?

প্রথমা। যাহা ইচ্ছা করা যায়, তাহাই কি হয়?

দ্বিতীয়া। আমার শুনা আছে যে, তাহা নিশ্চয়ই হয়,—অর্থাৎ যদি একান্ত মনন থাকে।

প্রথমা। তবে তাহা সকলের কপালে হয় না কেন? ভাল, তোমার আপনার মানস সিদ্ধ হয় না কেন?

দ্বিতীয়া। আমার কোন্ সাধ আছে?

প্রথমা। সে কি কথা! সাধ না কি আমার লোকের থাকে না?

দ্বিতীয়া। আমার এখন সাধ মরণের। তাহাও আন্তরিক নহে, এখনও বাঁচিতে সাধ আছে।

প্রথমা। আমাদের মত লোকের বাঁচতে সাধ কেন? এই তুমিই বলেই বলি, তোমার বাঁচা কেন, তুমি রাজার ভগিনী, এখন পথের ভিখারিণী; তোমার আবার বাঁচা কি সুখে?

দ্বিতীয়া। দিদি! আপনি ভুলে গেছেন, আমার পরিচয়সম্বন্ধে কথা মুখে আনিতে আপনাকে ভৈরবী বিশেষ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমা। আমি আর কাহার কাছে পরিচয় দিতে গিয়াছি, তোমার কথা তোমারই কাছে বলিতেছি।

এই সময় ভৈরবী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন। যাঁহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া ভৈরবীর হস্ত হইতে ত্রিশূল ও কমণ্ডলু লইলেন; অপরা মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া দিলেন। বসিবার সময় ভৈরবী হাসিয়া বলিলেন, এ আমাদের বেশ আসন; গত কল্য এক জায়গায় আমায় বাঘছাল বসিতে দিয়াছিল, অমনি আমার মনে হঠাৎ কেমন একটা ভয় হইয়াছিল।

প্রথমা। কেন? আপনার হাতে ত ত্রিশূল ছিল?

ভৈরবী নিঃশব্দে হাসিয়া বলিলেন, বুঝেছি, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, অতি সুন্দর রহস্য করিয়াছ। রাজা-

লির মেয়ে না হলে এ মিষ্ট কথা আর কেহই বলিতে পারে না।

প্রথমা। কেন? আমাদের হিন্দুস্থানে কি এরূপ রহস্য কেহ করে না?

ভৈরবী। আমি ত হিন্দুস্থানী নহি, আমার জন্ম হিমালয় পর্ব্বতে।

প্রথমা। তবে আপনি পাহাড়ে মেয়ে?

ভৈরবী। (ঈষৎ বিরক্ত হইয়া) পর্ব্বতে জন্ম বলিয়া কেহ কেহ আমায় পার্ব্বতী বলেন।

প্রথমা। কোথায় লোকে তপস্যার নিমিত্ত হিমালয়ে যায়। আপনি হিমালয় হইতে বাঙ্গালায় তপস্যা করিতে আসিয়াছেন।

ভৈরবী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন দেখিয়া, অপরা বিধবা সঙ্কোচিতভাবে বলিলেন, বাঙ্গালিকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত আর একবার হিমালয় হইতে আর একজন স্ত্রীলোক আসিয়াছিলেন।

প্রথমা। কে?

দ্বিতীয়া। ভাগীরথী গঙ্গা।

ভৈরবী। এ রহস্যও মন্দ নহে; একেই ত খোষামোদ বলে?

প্রথমা। এ খোষামোদ ভাল নহে। দেবতার সহিত মনুষ্যের তুলনা।

দ্বিতীয়া। আমি যাই পাকের উদ্যোগ করিয়া দিই।

ভৈরবী। থাক, ব্যস্ত হইতে হইবে না, আমি আপনিই উদ্যোগ করিয়া লইব।

প্রথমা। আমি থাকিতে আপনি সে কষ্ট কেন পাইবেন? এক্ষণে কার্য্যসিদ্ধি কতদূর করিয়া আসিয়াছেন তাহা আপনি পরিচয় দিন, আমি গিয়া পাকের উদ্যোগ করি।

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলে ভৈরবী অপরা বিধবার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

ভৈরবী। আমি শান্তিশতগ্রামে গিয়াছিলাম। রাজা ভাল আছেন, রাজকুমার ভাল আছেন, দেওয়ান্‌ও রাজধানীতে আসিয়াছেন।

প্রথমা। রাজরাণী কেমন আছেন?

ভৈরবী। ভালই আছেন, তবে রাজার সহিত তাঁহার মনান্তর বোধ হয়। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম তোমারই নিমিত্ত মনান্তর হইয়াছে, পরে দেখিলাম তাহা নহে।

ভৈরবী যাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা জ্যোৎস্নাবতী।

জ্যোৎস্নাবতী। তবে কাহার নিমিত্ত মনান্তর?

ভৈরবী (হাসিয়া) সপত্নীর নিমিত্ত। রাণী মনে করিয়াছেন, তাঁহার একটি সপত্নী আছে, এতদিন তাহা জানিতেন না।

জ্যোৎস্নাবতী। এই যা! আবার কার কপাল পুড়লো?

ভৈরবী। কে একটি ব্রাহ্মণকন্যা আছেন লোকে তাঁকে মাধবীলতার মা বলে।

জ্যোৎস্নাবতী। পোড়াকপাল! রাজ-মহিষী তবে পেপেছেন। ব্রাহ্মণকন্যা বড় সাধ্বী, বড় ভালমানুষ। মাধবীলতা তাহার কন্যা নহে, রাণীর কন্যা।

ভৈরবী। সেই ত কাল হয়েছে। রাণীর বিশ্বাস যে রাজার কলঙ্ক ঢাকিবার নিমিত্ত তুমিই যমজসন্তানের গল্প রটনা করিয়াছ। অতএব কেমন করিয়া তিনি সেই সপত্নীসন্তানকে মারিবেন এই এখন তাঁহার চেষ্টা।

জ্যোৎস্নাবতী। সর্ব্বনাশ!

ভৈরবী। দুই একদিনের মধ্যে এই কার্য্য সম্পাদা হইবে, সকল প্রস্তুত।

জ্যোৎস্নাবতী। তবে এখন উপায়?

ভৈরবী। মহাদেব জানেন।

জ্যোৎস্নাবতী। আমার যে মন বুঝে না। আমি একবার যাই।

ভৈরবী। যাইতে বারণ করি না; কিন্তু তুমি বাটী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই এ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

জ্যোৎস্নাবতী। আপনি কোন্ উপায়ে এ সকল জানিলেন?

ভৈরবী। রাজভগিনী পথে পথে বেড়াইতেছেন যে উপায়ে জানিয়া তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিলাম সেই উপায়ে এ সকল জানিয়াছি।

জ্যোৎস্নাবতী। আপনি কি তবে আমায় আনিতে গিয়াছিলেন? আমি মনে করিয়াছিলাম যে হঠাৎ আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় আপনি আমায় রক্ষা করিয়াছিলেন।

ভৈরবী। আমি এইখানে পঁচিশবৎসর পড়িয়া আছি, কখন বাহির হই না, আমি কেমন করিয়া জানিব যে, রাজভগিনী কোথা পথে পথে বেড়াইতেছেন।

জ্যোৎস্নাবতী। তবে কে আপনাকে পাঠাইয়াছিলেন?

ভৈরবী। আমার ইষ্টদেব।

জ্যোৎ। আপনার ইষ্টদেব কোনরূপে মাধবীলতাকে রক্ষা করিতে পারেন না?

ভৈরবী। বোধ হয় পারেন না। তিনি ত সকলই জানেন, রক্ষার উপায় থাকিলে আমায় বলিতেন। আমিও তাঁর কাছে এ কথা উত্থাপন করিয়াছিলাম তিনি আমার কথায় বড় চঞ্চল হইয়া বলিলেন, "সর্পী আপনার সন্তান খায়, কে সে সন্তানকে রক্ষা করে? প্রকৃতির নিয়ম এই। প্রকৃতি নিজে কি? নিজে ছিন্নমস্তা।" আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

জ্যোৎ। আপনার ইষ্টদেব কে?

ভৈরবী। কি বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিব? রাজপুরীতে তোমার বাস, তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ যে চিনিবে? আমার ইষ্টদেব নামকাদা নহেন, সে নাম করিলে বুঝিবে? পাগলাপ্রভু বলিলে চিনিতে পার?

জ্যোৎস্নাবতী। বুঝি পারি।

৩২

সেই রাত্রে জ্যোৎস্নাবতী বড় অস্থির

হইলেন ; মাধবীলতার নিমিত্ত মন কাতর হইয়াছিল কি রাণী এই মহাপাপ করিবেন বলিয়া তিনি অধিক ব্যস্ত হইয়াছিলেন ইহা নিশ্চয় বলা যায় না ; উভয় কারণেই তাঁহার অন্তর চঞ্চল হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অনেকবার মনে মনে আলোচনা করিলেন যে, রাজা থাকিতে বা দেওয়ান্ থাকিতে রাণী কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। বিশেষতঃ রাণী স্ত্রীলোক, শিশুর প্রতি তাঁহার দয়া কোথা যাইবে। অতএব মাধবীলতার কোন ভয় নাই। এই কথায় মনকে অনেকবার বুঝাইলেন, মনও অনেকবার বুঝিল অথচ চিত্তচাঞ্চল্য গেল না ; বরং ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যেন আর একটা কি বিপদ আছে, মন সেই অস্পষ্ট ভয়ের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, যেন কাঁদিয়া উঠিতেছে ; শেষ যখন তাঁহার চিত্ত ক্রমে দুর্দ্দম হইয়া উঠিল তখন ভৈরবীর নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ভৈরবী প্রথমে নানা প্রবোধবাক্যদ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইলেন, তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিলেন, "জ্যোৎস্নাবতি ! তোমায় কি বুঝাইব, আমি নিজে অবুঝ হইয়াছি, আমি এইমাত্র বড় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি।"

জ্যোৎ। কি স্বপ্ন দেখিয়াছেন ?

ভৈরবী। তাহা আর এখন বলিব না ; আমি কল্য প্রাতেই একবার গুরুদর্শনে যাইব।

জ্যোৎ। আমি তবে আপনার সঙ্গে যাব, একবার শান্তিশতগ্রামে গিয়া দাদার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে পারিলেই আমার অনেক যন্ত্রণা যাবে।

ভৈরবী। তুমি কিরূপে একা যাইবে ? আমি ত সে পথে যাইব না।

জ্যোৎ। আপনি কোথা যাবেন ? যতদূর পারি আপনার সঙ্গে যাইব, তাহার পর যাহা হয় করিব।

এইরূপে কথাবার্ত্তায় রাত্রি প্রভাত হইলে,উভয়ে যাত্রা করিলেন। সূর্য্য উঠিয়াছে, অগ্রে অগ্রে ভৈরবী চলিতেছেন, যুগলস্নারীর পরিষ্কার বালুকাক্ষেত্রে তাঁহার পদচিহ্ন অঙ্কিত হইতেছে,তৎপশ্চাতে জ্যোৎস্নাবতী যাইতেছেন, তাঁহার পদভার বালুকা অনুভব করিতেছে না। জ্যোৎস্নাবতীর পদনখ শরপত্রের হিমকণার ন্যায় জ্বলিতেছে। জ্যোৎস্নাবতী আপনার সেই নখভাতি দেখিতে দেখিতে পথ চলিতেছিলেন, কতকদূর আসিয়া ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রাত্রে কি কুস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।"

ভৈরবী কতকদূর অন্যমনস্কে গিয়া বলিলেন, "আমার গুরু ভিন্ন এ জগতে আর কেহ নাই।"

জ্যোৎ। বোধ হয় গুরুসম্বন্ধে কোন কুস্বপ্ন দেখিয়াছেন ?

ভৈরবী দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ করিলেন, আর কোন উত্তর দিলেন না। জ্যোৎস্নাবতী কোন কথা উল্লেখ না করিয়া ভৈরবীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ভৈরবী

কতকদূর গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার গুরুদেবকে দেখেছ? তিনি বহুকালাবধি শান্তিশতগ্রামেই আছেন।"

জ্যোৎ। রাজবাটীতে যাঁহারা আইসেন, তাঁহাদের কখন কখন অন্তঃপুরবাসীনীরা দেখিতে পায়।

ভৈরবী। আমার গুরুদেব কখন রাজবাটীতে গিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

জ্যোৎ। কেন?

ভৈরবী। তাঁর বুঝি কি ব্রত আছে, সেই জন্য তিনি কখন কোন গৃহপ্রবেশ করেন না।

জ্যোৎ। তাঁহার নাম কি পাগলা প্রভু?

ভৈরবী। তাঁহার নাম জানিনা, জানিলেও আমি স্ত্রীলোক তাহা মুখে আনিতে পারিতামনা, কিন্তু হিন্দুস্থানীরা কেহ তাঁহাকে পাগলাপ্রভু বলে, কেহ পাগলাবাহাদুর বলে।

জ্যোৎ। বাঙ্গালিরা তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকে? তাহারাও কি পাগলা প্রভু বলে?

ভৈরবী। বাঙ্গালিরা তাঁহাকে পিতম পাগলা বলে। কিন্তু তাঁহার আসল নাম আর কি হইবে।

জ্যোৎ। তবে তিনিই কি আমায় আশ্রয় দিবার নিমিত্ত আপনাকে পাঠাইয়াছিলেন।

ভৈরবী। তিনিই পাঠাইয়াছিলেন।

জ্যোৎস্নাবতী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। নিঃশব্দে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ভৈরবী মধ্যে মধ্যে দুই একটি কথা কহিতে লাগিলেন, জ্যোৎস্নাবতী তাহা শুনিতে পাইলেন না। অন্যমনস্কে পথ চলিতেছিলেন, যুগলমারীর মাঠ অতিক্রম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় যাবেন?"

ভৈরবী। আমি ত বলিয়াছি গুরুদর্শনে।

জ্যোৎ। আপনি তবে শান্তিশতগ্রামে যাবেন। তিনি ত শান্তিশতগ্রামেই থাকেন।

ভৈরবী। এক্ষণে বুঝি আর সেখানে থাকেন না।

জ্যোৎ। তবে কোথায় থাকেন?

ভৈরবী। ঠিক জানি না, দুইদিন হইল এই অঞ্চলে একস্থানে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম, এক্ষণে পথে পথে তাঁহার সন্ধান করিব, কোথায় তাঁহার দর্শন পাইব কিছুই বলিতে পারি না।

এই সময় সম্মুখে অশ্বত্থবেষ্টিত এক দীর্ঘিকা দেখিয়া উভয়ে তথায় গিয়া বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত বসিলেন। ভৈরবী নিশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিলেন, স্থানটি অতি পবিত্র।

জ্যোৎ। শীতলও কম নহে। তাই দেশের পাখী এই অশ্বত্থবৃক্ষে এসেছে। এরা ত গ্রীষ্ম বুঝিতে পারে?

ভৈরবী। কিন্তু পরের ভাবনাও ভাবে না, দুঃস্বপ্নও দেখে না।

জ্যোৎ। স্বপ্নসম্বন্ধে আবার আমার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। প্রকাশ করিলে দুঃস্বপ্ন ফলে না, এইজন্য লোকে দুঃস্বপ্ন গোপন করে না, বিশেষতঃ শাণ্ডিল্যগোত্রের নিকট বলিলে কুস্বপ্ন একেবারে নিষ্ফল হইয়া যায়। আমি শাণ্ডিল্যগোত্র।

ভৈরবী। তবে একবার কাণ স্থান দেও। কাল স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি যেন আবার সেই হিমালয়ে আছি, আবার যেন আমার বালিকাকাল উপস্থিত। আবার যেন সেই দেবমূর্ত্তি আমার পিতার দ্বারে পড়ে অজ্ঞান অভিভূত :—

জ্যোৎ। কোন্ দেবমূর্ত্তির কথা বলিতেছেন ?

ভৈরবী। আমার গুরুদেবের কথা বলিতেছি। বহুকাল হইল, গুরুদেব একদিন মরণাপন্ন হয়ে আমার পিতার দ্বারে পড়েছিলেন, তখন আমার বয়স দশবৎসর ; আমি জানি না যে তাঁহার কি পীড়া, কিন্তু পীড়া তাহা বুঝিয়াছিলাম। সেই একদিন গেছে। কাল স্বপ্নে দেখিলাম, যেন তিনি আবার পিতার দ্বারে পড়িয়া আছেন এবার চক্ষু চাহিয়া আমায় বলিতেছেন, "পার্ব্বতি! আর উপায় নাই, মন্ত্রৌষধে আর আমি বাঁচিব না, একবার আমায় বাঁচাইয়াছিলে এবার আর পারিবে না। এই দেখ আমার সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে গেছে।" আমি যেন দেখিলাম, তাঁহার পায়ে স্থানে স্থানে ছালা উঠিয়া গিয়াছে।

জ্যোৎস্নাবতী কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নীরব হইয়া রহিলেন। এই সময় দুই জন পথশ্রান্ত ব্রহ্মচারী তথায় উপস্থিত হইলেন। জ্যোৎস্নাবতী বৃক্ষ অন্তরালে গিয়া বসিলেন, বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী প্রথমে ভৈরবীকে সম্ভাষণ করিয়া কথা আরম্ভ করিলেন, ভৈরবী তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় পরমাপ্যায়িত হইয়া শেষ বেদান্তের বিচার উপস্থিত করিলেন, স্ত্রীলোকের অসাধারণ বিচারশক্তি দেখিয়া বৃদ্ধ একেবারে চরিতার্থ হইলেন, অল্পবয়স হইলে হয় ত মোহিত হইতেন। বাঙ্গালায় ভারতচন্দ্র মালাকরের বিদ্যা লইয়া প্রেম গড়িতে গিয়াছিলেন। এ অবস্থায় বেদান্তের বিদ্যায় যে কিছু হয় না এরূপ কোন্ চিহ্ন বলিবে।

যখন ভৈরবীর সহিত বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী শাস্ত্রালাপে অন্যমনস্ক ছিলেন, তখন অপর ব্রহ্মচারী—বয়স অল্প, একটু চঞ্চল—জ্যোৎস্নাবতীর প্রতি কটাক্ষ করিতেছিল। হঠাৎ ভৈরবী তাহা দেখিতে পাইলেন, একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু কিছু না বলিয়া আবার ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, যুবা তখনও অনিমেষলোচনে জ্যোৎস্নাবতীর দিকে চাহিয়া

আছেন, ভৈরবীর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী যুবার এই আগ্রহনিগর্হিত কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে আপনার নিকটে বসাইয়া বেদান্তের গুনব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। যুবা তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না, আবার মুখ ফিরাইয়া এক এক বার জ্যোৎস্নাবতীর প্রতি চাহিতে লাগিলেন। একবার যুবার প্রতি জ্যোৎস্নাবতীর দৃষ্টি পড়িল, যুবা হঠাৎ প্রফুল্লবদনে চঞ্চল হইয়া উঠিল, জ্যোৎস্নাবতী অনিমিষলোচনে যুবার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ভৈরবীর তাহা অসহ্য হইল, বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী হাসিতে লাগিলেন। ভৈরবীর আরও অসহ্য হইল, তিনি তিরস্কার আরম্ভ করেন এমত সময় যুবা বিদ্যুৎ বেগে জ্যোৎস্নাবতীর পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর তাঁহার পাদমূলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নাবতী সস্নেহলোচনে তাহার মুখ মুছাইয়া বলিলেন, "আমার মাতঙ্গিনী?"

ভৈরবী বিস্ময়াপন্নলোচনে একবার জ্যোৎস্নাবতীর প্রতি, একবার বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীর প্রতি চাহিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। মাতঙ্গিনী যাঁহার পাদমূলে গিয়া পড়িল তিনি রাজনন্দিনী জ্যোৎস্নাবতী, ইহা বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী প্রথমে অনুভব করেন নাই।

জ্যোৎ। মাতঙ্গিনি! তোমার এ বেশ কেন?

মাত। স্ত্রীবেশে পথ চলা বড় বিপদ।

জ্যোৎ। কোথা গিয়াছিলে?

মাত। একটা মকোদ্দমা করিতে গিয়াছিলাম।

জ্যোৎ। তোমার আবার কি মকোদ্দমা।

মাত। ছিল একটা।

জ্যোৎ। আমায় বলিয়া যাও নাই কেন।

মাত। বলিলে হয় ত আপনি আমায় ছাড়িয়া দিতেন না।

জ্যোৎ। মকোদ্দমায় কি হইল?

মাত। কিছু হলো না। অদৃষ্ট ভিন্ন সকলই আমার স্বপক্ষ ছিল, এখনও আশা যায় নাই। একজন প্রতিবাদী ফেরার হইয়াছেন তাঁহাকে ধরিতে যাইতেছি।

জ্যোৎ। তবে কি এখনও তোমায় পাব না?

মাত। দিন কতকের জন্য পাবেন না।

জ্যোৎ। তোমার আসামী কোথা?

মাত। তা ত জানি না, পথে পথে খুঁজিব। তাঁহার দেখা না পাই আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।

জ্যোৎ। কোথা যাবে?

মাত। যেখানে সকলে যায়। মকোদ্দমা হারিলে আর আমি বাঁচিব না। কি সুখে বাঁচিব?

জ্যোৎ। কে জানে বাছা, এতদিনের পর তোমার এমন কি মকোদ্দমা পড়িল যে তুমি তাহার নিমিত্ত প্রাণ বাহির করিবে। কই এত দিন ত তোমার মকোদ্দমার কথা কিছুই শুনি নাই।

মাত। শুনিয়াও কাজ নাই। এখন আপনি বাড়ি চলুন, আপনাকে ঘরে রাখিয়া আমি পথে পথে বেড়াই।

জ্যোৎ। আমার বাড়ি কোথা? আমি কোথা যাব? আমিও এখন পথে পথে বেড়াইব। আর আমার ভয় নাই ক্লেশ নাই। তুমিও সঙ্গী পাইয়াছ, আমিও সঙ্গী পাইয়াছি। কিন্তু আমার সঙ্গী এখন আপনার নিজের কর্ম্মে যাইতেছেন, আমার ইচ্ছা যে দিন কতক তোমাদের সঙ্গে থাকি।

মাত। তবে তাহাই ভাল।

এই সময় ভৈরবীর সহিত ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে জ্যোৎস্নাবতীর কথা কহিতেছিলেন। মাতঙ্গিনী তাঁহাদের কি বলিলেন, তাহার পর চারিজনে একত্র গ্রামাভিমুখে চলিলেন।

যে সময় ব্রহ্মচারী, জ্যোৎস্নাবতী প্রভৃতি গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেই সময় অপর পথ দিয়া একজন সন্ন্যাসী সেই গ্রামে প্রবেশ করিলেন। বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিলে তাঁহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া বোধ হয়; তিনি একজন ভক্তের সহিত কথা কহিতে কহিতে এক দেবমন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তথায় পিতম পাগলা মন্দিরপ্রস্তরে অঙ্কিত একটি শ্লোক পাঠ করিতে চেষ্টা পাইতেছিল। পিতম একবার তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করিল; পরে সন্ন্যাসী নিকটবর্ত্তী হইলে, পিতম মুখ অবনত না করিয়া বলিল, "জনার্দ্দন-ভায়া, সন্ন্যাসী কবে অবধি।" সন্ন্যাসী একটু চঞ্চল হইয়াই তৎক্ষণাৎ সাবধান হইলেন, হাসিমুখে কি বলিবেন উপক্রম করিতেছিলেন, এমত সময় পিতম বলিলেন, "বাঙ্গালা অক্ষরগুলি তান্ত্রিক, মুসলমানদিগের অক্ষর সামরিক, ফিরিঙ্গীদিগের অক্ষর গৃহী, সেইরূপ সন্ন্যাসীও গৃহী, তান্ত্রিক, সামরিক আছে। তুমি কোন জাতি সন্ন্যাসী? বুঝি সামরিক?"

সন্ন্যাসী। আমি তোমার কথা বুঝিলাম না।

পিতম। বুঝিলে না? ফারসি অক্ষরগুলি কেবল তরবারি, ছোট তরবারি, বড় তরবারি, ভগ্ন তরবারি, বিনমিত তরবারি, তাই বলিতেছিলাম ফারসি অক্ষর সামরিক। আর একদেশের অক্ষর তীরের মত ছিল, বাঁকা তীর, সোজা তীর, তীর্য্যক্‌তীর; তাহাও সামরিক। ফিরিঙ্গীর অক্ষর, গৃহদ্রব্যের অনুরূপ, কোচ, কেদারা, বাসনকোসন ইত্যাদি। তাহাই সে অক্ষর গৃহী। আর আমাদিগের অক্ষর পূজ্যাঙ্গের অনুরূপ; যন্ত্র, মুদ্রা, নরকপাল ইত্যাদি, তাই তান্ত্রিক। অক্ষরসৃষ্টির সময় যে জাতির যে দিকে দৃষ্টি অধিক থাকে সে জাতির সেই মত অক্ষর হয়। যদি বৈষ্ণবেরা অক্ষর সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে তিলক তুলসীর আকারে তাঁহাদিগের অক্ষর হইত। আর তুমি যদি এখন অক্ষর প্রস্তুত করিতে, তাহা হইলে কাহার আকৃতি লইয়া অক্ষর করিতে। মাধবীলতার? কিন্তু শাস্ত্রে লিখিয়াছে যে তোমার হাতে আমার মৃত্যু। অতএব তুমি এখন মলে আমার দশা কি হবে। আমি তবে কার হাতে মরিব? আমি তোমার ঠিকুজি গণনা করিয়াছি, শ্রীহস্তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মৃত্যু।

সন্ন্যা। তবে তুমিই আগে মরিবে, তোমার পাগলামি ছলমাত্র, তোমায় যমভবন না পাঠাইলে আর আমার কোন সুখ নাই।

এই বলিয়া জনার্দ্দন রাগভরে ফিরিয়া গেল, আর মন্দিরে দাঁড়াইল না। পিতম প্রসন্নবদনে মন্দিরের শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিল।

বঙ্গদর্শন

সপ্তমবৎসর।

৮৪ সংখ্যা।

বাঙ্গালির উৎপত্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আর্য্যীকরণ।

(১) সাঁওতাল (২) হো (৩) ভূমিজ (৪) মুণ্ড (৫) বীরহোড় (৬) কড়ুয়া (৭) কুর্ বা কুর্কু বা মুয়ার্সি (৮) খাড়িয়া ৯ (জুয়াং) এই কয়টি কোলবংশীয় বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণরের শাসন-অধীনে পাওয়া যায়।

জুয়াঙেরা উড়িষ্যার ঢেঁকানাল ও কেঁওঝড়প্রদেশে বাস করে। কুর্ বা মুয়ার্সির সঙ্গে এ ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নাই। খাড়িয়ারা সিংহভূমের অতিশয় বনাকীর্ণপ্রদেশে বাস করে; মানভূমের পাহাড়েও তাহাদের পাওয়া যায়। বীরহোড়েরা হাজারিবাগের জঙ্গলে থাকে। কড়ুয়ারা সরগুজা, যশপুর ও পালামৌ অঞ্চলে থাকে। উহাদিগের সঙ্গে মিশ্রিত "অসুর" নামে আর একটি কোলবংশীয় জাতি পাওয়া যায়। কুরকু জাতি আরও পশ্চিমে।

সাঁওতালেরা গঙ্গাতীর হইতে উড়িষ্যায় বৈতরণীতীর পর্য্যন্ত ৩৫০ মাইল ব্যাপ্ত করিয়া বাস করে—কোথাও কম কোথাও বেশী। যে প্রদেশ এখন "সাঁওতাল পরগণা" বলিয়া খ্যাত, তাহা ভিন্ন, ভাগলপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাজারিবাগ, মানভূম, মেদিনীপুর, সিংহভূম, বালেশ্বর, এই কয় জেলায় ও ময়ূরভঞ্জে সাঁওতালদিগের বাস আছে।

হো, ভূমিজ এবং মুণ্ডের সাধারণ নাম কোল। হোজাতিকে লড়্কা বা লড়াইয়া কোল বলে। ভূমিজেরা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে। মুণ্ড বা মুণ্ডারীরা চুটিয়া নাগপুর অঞ্চলে বাস করে।

হরিবংশে আছে যে, যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র তুর্ব্বসুর বংশে কোল নামে রাজা ছিলেন। উত্তর ভারতে তাঁহার রাজ্য ছিল; তাঁহারই বংশে কোলদিগের উৎপত্তি। * মনুতে "কোলি সর্প" দিগের পুনঃপুনঃ প্রসঙ্গ দেখা যায়। ভারতবর্ষে কোলেরা এককালে প্রধান ছিল, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। হণ্টর সাহেব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই, হো নামক কোন আদিমজাতির বাসের চিহ্ন পাওয়া যায়।† তিনি যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশে অধিক শ্রদ্ধা করা যায় না; কিন্তু হো বা কোলজাতি যে একদিন বহুদূরবিস্তৃত দেশের অধিবাসী ছিল, তাহাও সম্ভব বোধ হয়। হো শব্দেই কোলিভাষায় মনুষ্য বুঝায়। একসময়ে ইহারা স্বজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতির অস্তিত্ব জ্ঞাত ছিল না।

কর্ণেল ড্যাল্টন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোলেরাই পূর্ব্বে মগধাদি অনুগাঙ্গপ্রদেশের অধিবাসী ছিল—যাহা এখন বাঙ্গালা ও বেহার সে প্রদেশে তখন কোলভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। মগধপ্রদেশে বিশেষতঃ শাহাবাদ জেলায় অনেক ভগ্নমন্দির অট্টালিকা আছে। প্রবাদ আছে যে, সে সকল চেরো এবং কোলজাতীয়দিগের নির্ম্মিত। কিম্বদন্তী এইরূপ যে ঐ প্রদেশে সাধারণ লোক কোল ছিল, রাজারা চেরো ছিল।

ঋগ্বেদসংহিতায় কীকত নামে একজাতির প্রসঙ্গ আছে। ঋগ্বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য বলেন যে, কৈকতেরা অনার্য্যজাতি ছিল, এবং ভাগবতপুরাণ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, গয়াপ্রদেশকে কীকতরাজ্য বলিত। অতএব কীকত মগধান্তর্গত ছিল এমত বিবেচনা করা যাইতে পারে। কর্ণেল বিলফোর্ড বলেন যে, জরাসন্ধের পূর্ব্বে মগধদেশকেই কীকতরাজ্য বলিত। জরাসন্ধ প্রথম মগধনাম প্রচার করেন। কৈকতেরা গো-পালন করিত, কিন্তু গোরুর দুগ্ধ ব্যবহার করিত না। কোলেরা অদ্যাপিও গোরুর দুগ্ধ ব্যবহার করে না। এই সকল কারণে অনুমিত হইয়াছে যে, অতি প্রাচীনকালে মগধে কোলদিগেরই বাস ছিল। এই সকল কথার মৌলিকতা আমি নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। আর সেই প্রাচীন কোল রাজ্যের অন্য কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না।

কথিত আছে যে কোলেরা সবর নামক দ্রাবিড়ী অনার্য্যজাতিকর্ত্তৃক মগধ

* Asiatic Researches Vol. IX P. 91 & 92

† Non-Aryan Dictionary, Linguistic Dissertation P. 25 et &c.

হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, সবরেরা মনু ও মহাভারতে অনার্য্যজাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সবর অদ্যাপি উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বর্ত্তমান আছে।

দ্রাবিড়ীয়গণ বাঙ্গালার উপান্ত ভাগ সকলে কোলবংশীয়দিগের অপেক্ষা বিরল। হাজারিবাগের ওঁরাও (ধাঙ্গড়) ও রাজমহলের পাহাড়ীরা ভিন্ন আর কেহ নিকটে নাই। গোন্দেরা দ্রাবিড়ী বটে, কিন্তু তাহারা আমাদিগের নিকটবাসী নহে।

কিন্তু বাঙ্গালার ভিতরেই এমন অনেক জাতি বাস করে, যে তাহারা দ্রাবিড়বংশীয় হইলে হইতে পারে। কর্ণেল ডাল্টন বলেন যে কোচেরা অনুগাঙ্গ বিজয়ী দ্রাবিড়ীগণ হইতে উৎপন্ন। বহুতর কোচ বাঙ্গালার ভিতরেই বাস করিতেছে। দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় কোচদিগকে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ভিতর প্রায় একলক্ষ কোচের বাস আছে। এই লক্ষ লোককে বাঙ্গালি বলা যাইবে কি না?* কেহ কেহ বলেন, ইহাদিগকেও বাঙ্গালির সামিল ধরিতে হইবে। আমরা সে বিষয়ে সন্দিহান। কোচেরা বাঙ্গালি হউক বা না হউক, বাঙ্গালার ভিতরে অনার্য্য আছে কি না এ কথার আমাদিগের একবার আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

কে আর্য্য, কে অনার্য্য? ইহা নিরূপণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বই প্রধান উপায় ইহা দেখান গিয়াছে। যাহার ভাষা আর্য্যজাতীয়ভাষা, সেই আর্য্যবংশীয়। যাহার ভাষা অনার্য্যভাষা, সেই অনার্য্যজাতীয়, ইহা স্থির করা গিয়াছে; পরে দেখান গিয়াছে যে, যে অনার্য্যের ভাষা দ্রাবিড়জাতীয় ভাষা সেই দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য; যাহার ভাষা কোলজাতীয়ভাষা সেই কোলবংশীয় অনার্য্য। কিন্তু এমন কি হইতে পারে না যে, ভাষা একজাতীয় বংশ অন্যজাতীয় একাধারে সমাবিষ্ট হইয়াছে? এমন কি হইতে পারে না, যে পরাজিত জাতি জেতৃগণের ধর্ম্ম, জেতৃগণের ভাষা গ্রহণ করিয়া জেতৃদিগের জাতিভুক্ত হইয়াছে?

এমন উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। ফ্রান্সের বর্ত্তমান ভাষা লাটিনমূলক, কিন্তু ফরাসিজাতির অস্থিমজ্জা কেল্টীয় শোণিতে নির্ম্মিত। প্রাচীন গলেরা রোমকগণকর্ত্তৃক পরাজিত ও রোমকরাজ্যভুক্ত হইলে পর রোমীয়

* "The proud Brahman who traces his lineage back to the palmy days of Kanauj and the half civilized (?) Koch or Palya of Dinagepore may both be fitly spoken as Bengali. *Bengal Census Report* 1871.

ভ্যতা গ্রহণ করে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রোমীয়ভাষা অর্থাৎ লাটিনভাষা গ্রহণ করে। যখন পশ্চিম রোমক-সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন গলদিগের মধ্যে লাটিনভাষাই প্রচলিত ছিল, পরে তাহারই অপভ্রংশে বর্ত্তমান ফরাসি ভাষা দাঁড়াইয়াছে। আইবিরিয়াতেও (স্পেন ও পর্টুগল) ঐরূপ ঘটিয়াছিল। আমেরিকার কাফরিদাসদিগের বংশ প্রভুদিগের ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, জাতীয়ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজি বা ফরাসি ব্যবহার করিয়া থাকে।* অতএব ভাষা আর্য্যভাষা হইলেই আর্য্যবংশীয় বলা যাইতে পারে না অন্য প্রমাণ আবশ্যক।

সকলেই জানে যে আর্য্যেরা ককেশীয় বংশীয়। ককেশীয় বংশের মধ্যে আর্য্য ভিন্ন অন্য বংশও আছে, কিন্তু ককেশীয় বংশের অন্তর্গত নহে এমন আর্য্যজাতি নাই। ককেশীয়দিগের লক্ষণ—গৌরবর্ণ দীর্ঘশরীর মস্তক সুগঠন হনূদ্বয় অনুন্নত। মোঙ্গল বংশ ককেশীয়দিগের হইতে পৃথক্। মোঙ্গলীয়েরা খর্ব্বাকার মস্তকের গঠন চতুষ্কোণ হনূদ্বয় অত্যুন্নত। যদি কোন জাতিকে এমন পাওয়া যায় যে তাহাদিগের শারীরিক গঠন মোঙ্গলীয়, তবে সে জাতিকে কখন আর্য্য বলা যাইবে না। যদি দেখিতে পাই সে জাতীয়ের ভাষা আর্য্যভাষা তাহা হইলে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে তাহারা আদৌ অনার্য্যজাতি, আর্য্যদিগের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আর্য্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। আবার

---

* ভারতবর্ষেও এই আর্য্য অনার্য্যজাতিদিগের মধ্যে আজিকার দিনেই আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচরে এইরূপ ভাষাপরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এখনও অনেক স্থানে অনার্য্যেরা দিনে দিনে আপন মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যভাষা গ্রহণ করিতেছে। কর্ণেল ড্যালটন বলেন যে তিনি ১৮৬৮ সালে কোড়বা জাতীয়গণের ভাষা সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে কোড়বাদিগের বাসভূমি যশপুর রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার তলবমতে বহুসংখ্যক অসভ্য কোড়বা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই কোড়বা ভাষার এক বর্ণও বলিতে পারিল না। তাহারা বলিল তাহারা ডিহি কোড়বা—অর্থাৎ পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমতল প্রদেশে বাস করিয়া চাষ আবাদ করিতেছে। দেশ ও সমাজ পরিত্যাগের সঙ্গে ভাষাও ত্যাগ করিয়াছে। উদাহরণের স্বরূপ কর্ণেল ড্যালটন আরও বলেন যে ছুটীয়া নাগপুর প্রদেশে ওঁরাওদিগের যে সকল গ্রাম আছে তাহার মধ্যে অনেক অনেক গ্রামের ওঁরাওয়েরা জাতীয়ভাষা বলিতে পারে না, হিন্দি বা মুণ্ডদিগের ভাষায় কথা কহে। Ethnology of Bengal P. 115.

যদি দেখি যে সেই অনার্য্যজাতি কেবল আর্য্যভাষা নহে আর্য্যধর্ম্ম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছে—তখন বুঝিতে হইবে যে একজাতি অপর জাতিকে বিজিত করিয়া একত্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্য মিশিয়া গিয়াছে। যদি আবার দেখি যে এই বিমিশ্রজাতিদ্বয়ের মধ্যে আর্য্য উন্নত অনার্য্য অবনত, তবে বিবেচনা করিতে হইবে যে আর্য্যেরা জয়কারী, অনার্য্যেরাই বিজিত হইয়া আর্য্যসমাজের নিম্ন স্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

ইহাতে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম্ম অহিন্দুর পক্ষে গ্রহণীয় নহে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে খ্রীষ্টীয় কি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান হইতে পারেন। কিন্তু যে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই—সে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিতে পারে না। অতএব যে অনার্য্য আদৌ হিন্দুকুলজাত নহে সে কখন হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিয়াছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না।

এই আপত্তি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বলবৎ বটে। কিন্তু এক একটি বৃহৎ জাতির পক্ষে ইহা খাটিতে পারে না। বিশেষতঃ বন্য অনার্য্য জাতিদিগের পক্ষে খাটিতে পারে না। মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান কখন হিন্দু হইতে পারে না, কেন না যে সকল আচার হিন্দুত্ব ধ্বংসকারক তাহারা পুরুষানুক্রমে সেই সকল আচার করিয়া পুরুষানুক্রমে পতিত। কিন্তু এ প্রদেশের বন্য অনার্য্য জাতিদিগের মধ্যে হিন্দুত্ববিনাশক এমন কোন আচার ব্যবহার নাই যে তাহা হিন্দুদিগের অতি নিকৃষ্ট জাতিদিগের মধ্যে—হাড়ি ডোম মুচি কাওরা প্রভৃতির মধ্যে, পাওয়া যায় না। মনে কর হিন্দুপ্রবল কোন প্রদেশের সন্নিকটে অথবা হিন্দুদিগের অধীনে কোন অসভ্য অনার্য্য জাতি বাস করে। এমন স্থলে ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে আর্য্যেরা সমাজের বড় অনার্য্যেরা সমাজের ছোট থাকিবে। মনুষ্যের স্বভাব এই যে যে বড়, ছোট তাহার অনুকরণ করে। কাজে কাজেই এমত স্থলে অনার্য্যেরা হিন্দুদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইবে। আমরা এখন ইংরেজদিগের অনুকরণ করিতেছি পূর্ব্বে মুসলমানদিগের অনুকরণ করিতাম। আমাদিগের একটি প্রাচীন ধর্ম্ম আছে, চারি হাজার বৎসর হইতে সেই ধর্ম্ম নানাবিধ কাব্য দর্শন ও উচ্চ নৈতিক তত্ত্বেরদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া লোকমনোমোহন হইয়াছে, তাহার কাছে নিরাভরণ ইসলাম বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অনুরাগভাজন হয় না। এই জন্য আমরা এখন সর্ব্বথা ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়াও ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহাদের ততটা অনুগমন করি না। কতকটা না করিতেছি এমনও নহে। কিন্তু অনার্য্যদিগের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল বা শোভাবিশিষ্ট কোন জাতীয়

ধর্ম্ম নাই। অনেক স্থলে একেবারে কোন প্রকার জাতীয় ধর্ম্ম নাই। এমত অবস্থায় অধীন অনার্য্যসমাজ প্রভু আর্য্যদিগের অন্য বিষয়ে যেমন অনুকরণ করিবে ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ অনুকরণ করিবে। হিন্দুরা যে ঠাকুরের পূজা করে তাহারাও সেই ঠাকুরের পূজা করিতে আরম্ভ করিবে। হিন্দুরা যে সকল উৎসব করে তাহারাও সেই সকল উৎসব করিতে আরম্ভ করিবে। জীবননির্ব্বাহের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকলে হিন্দুদিগের ন্যায় আচার ব্যবহার করিতে থাকিবে। সমগ্রজাতি এইরূপ ব্যবহার করিতে থাকিলে কালক্রমে তাহারাও হিন্দু নামধারণ করিবে। অন্য হিন্দু কেহ কখন তাহাদিগের অন্ন খাইবে না। তাহাদিগের সহিত কন্যা আদান প্রদান করিবে না, অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহাদিগের সহিত মিশিবে না—হয় ত তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্তও গ্রহণ করিবে না। অতএব তাহারাও একটি পৃথক্ হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইবে। তাহারা আগে যেমন পৃথক্ জাতি ছিল এখনও তেমনি পৃথক্ জাতি রহিল, কেবল হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া খ্যাত হইল। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে একটি বিবাদের কথা আছে। কেহ কেহ বলেন যে হিন্দুধর্ম্ম "proselytizing নহে অর্থাৎ যে জন্মাবধি হিন্দু নয় হিন্দুরা তাহাকে হিন্দু করে না। আর এক সম্প্রদায় বলেন যে হিন্দু ধর্ম্ম proselytizing অর্থাৎ অহিন্দুও হিন্দু হয়। এ বিবাদের স্থূল মর্ম্ম উপরে বুঝান গেল। খ্রীষ্টান বা মুসলমানদিগের proselytism এইরূপ যে তাহারা অন্যকে ডাকায়, "তুমি খ্রীষ্টান হও, তুমি মুসলমান হও।" আহুত ব্যক্তি খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইলে তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার কন্যা আদান প্রদান প্রভৃতি সামাজিক কার্য্য সকলেই করিয়া থাকে, বা করিতে পারে। হিন্দুদিগের proselytization সেরূপ নহে। হিন্দুরা কাহাকেও ডাকে না যে, "তুমি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিয়া হিন্দু হও।" যদি কেহ স্বেচ্ছাক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার বা কোন প্রকার সামাজিক কার্য্য করে না, কিন্তু যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার বংশে হিন্দুধর্ম্ম বজায় থাকিলে তাহার হিন্দুনামও লোপ করিতে পারে না। একটা সম্পূর্ণ জাতি এইরূপে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পুরুষানুক্রমে হিন্দুধর্ম্ম পালন করিলে সকলেই তাহাকে হিন্দুজাতি বলিয়া স্বীকার করে। হিন্দুদিগের proselytism এই প্রকার। ঐ শব্দ মুসলমান বা খ্রীষ্টান সম্বন্ধে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে হিন্দুদিগের সম্বন্ধে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুদিগের মধ্যে proselytism নাই এবং তদর্থবাচক ভারতীয় কোন আর্য্য ভাষায় কোন শব্দও নাই।

যে অর্থে অহিন্দু হিন্দু হইতে পারে বলা গিয়াছে সে অর্থে এখনও অনেক অনার্য্য জাতি হিন্দু হইতেছে। কি প্রকার হইতেছে তাহা বেঙ্গাল সিবিলসার্ব্বিসে রিজলি সাহেব মানভুমের বৃত্তান্তে নিম্ন লিখিতমত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন "এই ঘটনা কিয়দংশে হিন্দু ও অহিন্দু পরস্পরে বিবাহ অথবা উপপত্নী পালন করার প্রথা বলে, কিয়দংশে অনার্য্যেরা হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে হিন্দুনাম ধারণ করায়, এবং কিয়দংশে হিন্দু রাজপুরুষদিগের ইচ্ছা-প্রচারিত আজ্ঞাক্রমে ঘটিয়াছে। কখন কখন হিন্দুরাজগণ অনার্য্য প্রজাবর্গকে অমূলক জাতিবাচক উপাধি দিয়া হিন্দু-সমাজ মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানীয় কিম্বদন্তীতে এরূপ জাতিসৃষ্টির কথা অনেক পাওয়া যায়। উত্তর হাজারিবাগ প্রদেশে ভূম্যধিকারীদিগের পরিচারক কাহার জাতি যে অনার্য্যবংশীয় তাহা তাহাদের বাহ্য প্রকৃতিতে বুঝা যায়।"*

অনার্য্য জাতি যে আপনাদিগের অনার্য্য ভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্য্য ভাষা ও আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক হিন্দু হইয়াছে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

প্রথম। হাজারিবাগ প্রদেশে বিদ্যা নামে একটি জাতি বাস করে। বেদিয়া হইতে তাহারা পৃথক্। বিদ্যা মাহাত্ম নাম তাহারা কখন কখন ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দিভাষা কয় এবং হিন্দু মধ্যে গণ্য কিন্তু এই বিদ্যাগণ মুণ্ডাজাতীয় কোল তাহাতে কোন সংশয় নাই। চুটীয়া নাগপুরের মুণ্ডদিগের যেরূপ আকৃতি ইহাদিগেরও সেইরূপ আকৃতি। মুণ্ডদিগের মধ্যে পহন নামে এক একজন পুরোহিত বা গ্রাম্য কর্ম্মচারী সর্ব্বত্র দেখা যায়, বিদ্যাগণের মধ্যেও ঐরূপ গ্রামে গ্রামে পহন আছে। মুণ্ডেরা লোহা প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ—এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বিদ্যাগণও সেই কাজে সুদক্ষ ও সুব্যবসায়ী। আর মুণ্ডদিগের মধ্যে কিলী অর্থাৎ জাতিবিভাগ আছে, ইহাদিগেরও সেইরূপ আছে। মুণ্ডদিগের কিলীর যে যে নাম বিদ্যাদিগের কিলীরও সেই সেই নাম। অতএব ইহা একপ্রকার নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে বিদ্যাগণ মুণ্ড কোল। কিন্তু এখন তাহারা হিন্দীভাষা বলে ও হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে।*

দ্বিতীয়। আসামে চুটীয়া নামে একটি জাতি আছে। তাহাদের মুখাবয়ব অনার্য্যের ন্যায়। কোন আসামীবুরুঞ্জীতে কর্ণেল ড্যাল্টন দেখিয়াছেন যে, উত্তরপ্রদেশস্থ পর্ব্বত হইতে তাহারা উপর আসামে প্রবেশ করিয়া স্ববনেশ্বরী পার হইয়া সদীয়াপ্রদেশে বাস করে। লকিমপুরপ্রদেশে দিক্রুনদীর উপরে এবং উপর আসামের অন্যত্র দেউরী চুটীয়া নামে এক চুটীয়াজাতি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগের ভাষা

* Statistical Account of Bengal Vol. VII P. 213

সমালোচন করিয়া স্থির হইয়াছে যে, ঐ চুটীয়া ভাষা গারো ও বোড়োদিগের ভাষার সঙ্গে একজাতীয়। অতএব চুটীয়ারা যে অনার্য্যজাতি তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এক্ষণে আসামের অধিকাংশ চুটীয়া হিন্দু বলিয়া গণ্য। এবং তাহারা আপনারাও হিন্দুচুটীয়া বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। হিন্দুচুটীয়া বলিলেই বুঝাইবে যে ম্লেচ্ছ চুটীয়া ছিল বা আছে।*

তৃতীয়। কাচাড়িরা অনার্য্যবংশ। তাহাদের অবয়ব মোঙ্গলীয়। কিন্তু আসামপ্রদেশীয় কাছাড়িরা হিন্দু হইয়াছে। এবং এক্ষণেও অনেকে হিন্দু হইতেছে।

চতুর্থ। কোচেরা আর একটি অনার্য্যজাতি। আসল কোচভাষা মেছ কাছাড়িভাষা সদৃশ, কিন্তু ঐতিহাসিক সময়েই কোচবেহারের রাজাদিগের আদিপুরুষ হজুর পৌত্র বিশু সিং হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কোচ বেহারের যত ভদ্রলোক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা রাজবংশী নাম গ্রহণ করিলেন। ইতর কোচেরা মুসলমান হইল।†

পঞ্চম। ত্রিপুরার পাহাড়িলোক অনার্য্যজাতি। কিন্তু তাহারাও হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।‖

ষষ্ঠ। থাড়োয়ার নামক অনার্য্যজাতি কালীপূজা করিয়া থাকে।¶

সপ্তম। পহেয়া নামে পালামৌতে এক জাতি আছে, তাহারা হিন্দীভাষা কয় এবং কতকগুলি আচার ব্যবহার তাহাদের হিন্দুদিগের ন্যায়। তাহাদের অনার্য্যত্ব নিঃসন্দেহ।

অষ্টম। সর্গুজায় কিসান বলিয়া এক জাতি আছে, তাহারাও অনার্য্য এবং তাহাদিগের আচার ব্যবহার সব কোলের ন্যায়, তাহাদেরও ভাষা হিন্দী এবং তাহারা কতক কতক হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে।§

নবম। "বুনো" কুলি সকলেই দেখিয়াছেন। তাহারা জাতিতে সাঁওতাল, কোল বা ধাঙ্গড় (উরাঁও)। কিন্তু এ দেশে যত "বুনো" দেখা যায়, সকলই হিন্দু।

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যাহা দেওয়া গেল তাহাতেই যথেষ্ট হইবে। এই কয়েকটি উদাহরণদ্বারাই উত্তমরূপে প্রমাণ হইতেছে যে বাঙ্গালির বাহিরে এমন অনেক অনার্য্যবংশ পাওয়া যায় যে

* Statistical Account of Bengal Vol. XVI P. 82-3

† Dalton's Ethnology P. 78.

‖ Buchanan Hamilton—Rungpur Vol. III P. 419 Hodgson I. A. S. B. XXXI. July 1849.

¶ Dalton's Ethnology P. 130.

§ Dalton's Ethnology P. 132.

তাহারা আর্য্যভাষা গ্রহণ করিয়া ও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যদি বাঙ্গালার বাহিরে অনার্য্য হিন্দু পাওয়া যাইতেছে তবে বাঙ্গালার ভিতরে বাঙ্গালির মধ্যে এরূপ অনার্য্য হিন্দু থাকাও সম্ভব। বাস্তবিক আছে কি না তাহার বিচার করার প্রয়োজন।

এইখানে বলা উচিত যে পাশ্চাত্য-দিগের সাধারণ মত এই যে প্রাচীন চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে শূদ্রদিগের উৎপত্তি এই রূপই ঘটিয়াছিল। জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রচার করিয়াছেন। আমাদিগের মতে, জাতিভেদ তিন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ভেদ। এটী ব্যবসায়ভেদেই উৎপন্ন হইয়াছিল। এখন আমরা ইউরোপে, দেখিতে পাই, যে কোন কোন কুলীনবংশ পুরুষানুক্রমে রাজকার্য্যে লিপ্ত। কোন সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে বাণিজ্য করিতেছে। কোন সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে কৃষিকার্য্য বা মজুরী করিতেছে। কিন্তু ইউরোপে, এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের ব্যবসায় গ্রহণ করার পক্ষে কোন বিঘ্ন নাই। এবং সচরাচর এরূপ ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যেরা বিবেচনা করিতেন যে যাহার পিতৃ পিতামহ যে ব্যবসায় করিয়াছে সে সেই ব্যবসাতেই সুদক্ষ হয়। তাহাতে সুবিধা আছে বলিয়া লোকে প্রথমতঃ ইচ্ছা করিয়া পৈতৃপিতামহিক ব্যবসায় অবলম্বন করিত। শেষ উচ্চব্যবসায়ীদিগের নিকট নীচব্যবসায়ীরা ঘৃণ্য হওয়াতেই হউক অথবা ব্রাহ্মণদিগের প্রণীত দৃঢ়বদ্ধ সমাজনীতির বলেই হউক, বিদ্যাব্যবসায়ী যুদ্ধব্যবসায়ীর সঙ্গে মিশিল না। যুদ্ধব্যবসায়ী বণিকের সঙ্গে মিশিল না। এইরূপে তিনটী আর্য্যবর্ণের সৃষ্টি। জাতিভেদ উৎপত্তির দ্বিতীয় রূপ শূদ্রদিগের বিবরণে দেখা যায়। তাহা উপরে বুঝাইয়াছি। শ্রেষ্ঠব্যবসায় সকল আর্য্যেরা আপনার হাতে রাখিল নীচব্যবসায় এবং কৃষিকার্য্য শূদ্রের উপর পড়িল। বোধ হয় প্রথম, কেবল আর্য্যে ও শূদ্রে ভেদ জন্মে। কেন না এ ভেদ স্বাভাবিক, শূদ্রেরা যেমন নূতন নূতন আর্য্যসমাজভুক্ত হইতে লাগিল, তেমনি পৃথক্‌বর্ণ বলিয়া, আর্য্য হইতে তফাত রহিল। বর্ণ শব্দই ইহার প্রমাণ। বর্ণ অর্থে রঙ। পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি যে আর্য্যেরা গৌর, অনার্য্যেরা "কৃষ্ণত্বচ।" তবে গৌর কৃষ্ণ দুইটি বর্ণ পাওয়া গেল। সেই প্রভেদে প্রথম, আর্য্য ও শূদ্র এই দুইটী বর্ণ ভিন্ন হইল। একবার সমাজের মধ্যে থাক আরম্ভ হইলে, আর্য্যদিগের হস্তে, ক্রমেই থাক বাড়িতে থাকিবে। তখন আর্য্যদিগের মধ্যে ব্যবসায়ভেদে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিনটী শ্রেণী পৃথক্ হইয়া পড়িল, সেই ভেদ বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বপরিচিত

"বর্ণ" নামই গৃহীত হইল। তার পর আর্য্যে আর্য্যে আর্য্যে অনার্য্যে বৈধ বা অবৈধ সংসর্গে শঙ্করজাতি সকল উৎপন্ন হইতে লাগিল। শঙ্করে শঙ্করে মিলিয়া আরও জাতিভেদ বাড়িল। জাতিভেদের তৃতীয় উৎপত্তি এইরূপ।

পূর্ব্ব পীঠিকাস্বরূপ এই কয়টি কথা বলিয়া আমরা বাঙ্গালি শূদ্রদিগের মধ্যে অনার্য্যত্বের অনুসন্ধান করিব।



আনন্দ মঠ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

উপক্রমণিকা।

অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেকজাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্র শূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্তসমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার। মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক! তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমসময় অরণ্য। তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার। কাননের বাহিরেও অন্ধকার; কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

পশুপক্ষী একবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধতাব অনুভব করা যাইতে পারে না।

সেই অন্তঃশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননু-

ভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?"

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল। তখন কে বলিবে যে এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল। কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধ মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?"

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি ?"

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবন সর্ব্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, "এ পণে হইবে না।"

"আর কি আছে ? আর কি দিব।"

তখন উত্তর হইল, "তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্ব্বস্ব।"

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃণ্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে; শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল, কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা,—তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায়— সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, দ্বার রুদ্ধ, মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখেও মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ্য হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা একসন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গাইল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিনমাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে, কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এককাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে একসন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর একসন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পরে দুইসন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, একে বাঙ্গালি তাহাতে মুসলমান, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরকরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশটাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে, কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোতজমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কেনে? খরিদদার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া,রোগে পড়িয়া, প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকামধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, তার সকল গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান্—কিন্তু আজ ধনী নির্দ্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণকালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। সেই বহু পরিবার মধ্যে এখন তাঁহার ভার্য্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা। তাহাদেরই কথা বলিতেছিলাম। নিকটে এমন একটি প্রতিবেশী নাই, যে একটু জল দিয়া যায়।

তাঁহার ভার্য্যা কল্যাণী চিন্তা ত্যাগ করিয়া গো-শালে গিয়া স্বয়ং গো-দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া, কন্যাকে খাওয়াইয়া, গোরুকে ঘাস জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিল, "এরূপে কদিন চলিবে?"

কল্যাণী বলিল, "বড় অধিক দিন নয়। যতদিন চলে; আমি যতদিন পারি চালাই, তার পর তুমি মেয়েটী লইয়া, নগরে* যাইও।" নগরে মহেন্দ্রের পিতৃস্বসা বাস করেন।

মহেন্দ্র। নগরে যদি যাইতে হয় তবে, তোমায় বা কেন এত দুঃখ দিই। চল না এখনই যাই।

পরে দুইজনে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল।

ক। নগরে গেলে কি কিছু বিশেষ উপকার হইবে?

ম। সেস্থান হয় ত এমনি জনশূন্য, প্রাণরক্ষার উপায়শূন্য, হইয়াছে।

ক। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে মুরশিদাবাদ, কাশিমবাজার বা কলিকাতায় গেলে প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে। এস্থান ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মহেন্দ্র বলিল, "এই বাড়ী বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনে পরিপূর্ণ; ইহা যে সব চোরে লুঠিয়া লইবে।"

ক। লুঠিতে আসিলে আমরা কি দুইজনে রাখিতে পারিব। প্রাণে না বাঁচিলে ধন ভোগ করিবে কে? চল, এখনও বন্ধ সন্দ করিয়া যাই। যদি প্রাণে বাঁচি ফিরিয়া আসিয়া ভোগ করিব।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি? বেহারা ত সব মরিয়া গিয়াছে, গোরু আছে ত গাড়োয়ান নাই, গাড়োয়ান আছে ত গোরু নাই।"

ক। আমি পথ হাটিব, তুমি চিন্তা করিও না।

কল্যাণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, না হয় পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তবু ত ইহারা দুইজন বাঁচিবে।

পরদিন প্রভাতে দুইজনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, ঘরদ্বারের চাবি বন্ধ করিয়া, গোরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া, কন্যাটীকে কোলে লইয়া, রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মহেন্দ্র

* নগর বা রাজনগর—সাবেক বীরভূম রাজ্যের রাজধানী।

বলিলেন, "পথ অতি দুর্গম। পায়ে পায়ে ডাকাত, লুঠেড়া ফিরিতেছে। শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়।" এই বলিয়া মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বন্দুক, গুলি, বারুদ লইয়া গেলেন।

দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, "যদি অস্ত্রের কথা মনে করিলে, তবে তুমি একবার সুকুমারীকে ধর। আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব।" এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে মহেন্দ্রের কোলে দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহেন্দ্র বলিল, "তুমি আবার কি হাতিয়ার লইবে?" এই বলিয়া মহেন্দ্র তাহার পাছু পাছু গৃহপ্রবেশ করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, কল্যাণী একখানা রূপাবাঁধা ছোরা কোথা হইতে বাহির করিয়া আবার তাহা রাখিল। বলিল, "এ অস্ত্র স্ত্রীজাতির নয়।" এই বলিয়া আর কি খুঁজিতে লাগিল।

মহেন্দ্র বলিল—"আবার কি?"

কল্যাণী বলিল, "কিছু না।" এই বলিয়া কল্যাণী একটি বিষের ক্ষুদ্র কৌটা বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। দুঃখের দিনে কবে কপালে কি হয় বলিয়া কল্যাণী পূর্ব্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

জ্যৈষ্ঠমাস, দারুণ রৌদ্র, পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তামার চাঁদোয়ার মত, পথের ধূলিসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। কল্যাণী ঘামিতে লাগিল, কখনও বাবলা গাছের ছায়ায়, কখনও খেজুরগাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া, শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দ্দমময় জলপান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিল। মেয়েটী মহেন্দ্রের কোলে—এক একবার মহেন্দ্র মেয়েকে বাতাস দেয়। একবার এক নিবিড় শ্যামল-পত্ররঞ্জিত সুগন্ধকুসুমসংযুক্ত লতাবেষ্টিত বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া দুইজনে বিশ্রাম করিল। মহেন্দ্র কল্যাণীর শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বস্ত্র ভিজাইয়া মহেন্দ্র নিকটস্থ পল্বল হইতে জল আনিয়া আপনার ও কল্যাণীর মুখে, হস্তে, পদে, কপালে, জলসেক করিলেন।

কল্যাণী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু দুইজনে ক্ষুধায় বড় আকুল হইলেন। তাও সহ্য হয়—মেয়েটীর ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য হয় না। অতএব আবার তাহারা পথ বাহিয়া চলিলেন। সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক চটীতে পৌঁছিলেন। মহেন্দ্রের মনে মনে বড় আশা ছিল, চটীতে গিয়া স্ত্রী কন্যার মুখে শীতল জল দিতে পারিবেন, প্রাণরক্ষার জন্য মুখে আহার দিতে পারিবেন। কিন্তু কই? চটীতে ত মনুষ্য নাই! বড় বড় ঘর পড়িয়া আছে, মানুষসকল পলাইয়াছে। মহেন্দ্র ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া স্ত্রী কন্যাকে একটি ঘরের ভিতর শোয়াইলেন। বাহিরে হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক হাঁক করিতে লাগিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না। তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, একটু তুমি সাহস করিয়া একা থাক,

দেশে যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি দুধ আনিব। এই বলিয়া একটা মাটীর কলসী হাতে করিয়া মহেন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কলসী অনেক পড়িয়া ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র চলিয়া গেল। কল্যাণী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্যস্থানে প্রায়-অন্ধকার কুটীরমধ্যে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে মনে বড় ভয় হইতেছিল। কেহ কোথাও নাই, মনুষ্যমাত্রের কোন শব্দ পাওয়া যায় না, কেবল শৃগাল কুকুরের রব। ভাবিতেছিলেন কেন তাঁহাকে যাইতে দিলাম, না হয় আর কিছুক্ষণ ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিতাম। মনে করিলেন চারিদিকের দ্বাররুদ্ধ করিয়া বসি। কিন্তু একটি দ্বারেও কপাট বা অর্গল নাই। এইরূপ চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিমাংসাবশিষ্ট, অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলিদ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ,—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর আর একটা আসিল। তার পর আরও একটা আসিল। কত আসিল। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায় অন্ধকার গৃহ নিশীথ শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। একজন তাঁহাকে ধরিল। কল্যাণী মূর্চ্ছিতা। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা তখন কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র কলসী করিয়া দুগ্ধ লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল কেহ কোথাও নাই, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, কন্যার নাম ধরিয়া শেষ স্ত্রীর নাম ধরিয়া অনেক ডাকিল, কোন উত্তর, কোন সন্ধান পাইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল সে বন অতি মনোহর। আলো নাই, শোভা দেখে এমন চক্ষুও নাই, দরিদ্রের হৃদয়ান্তর্গত সৌন্দর্য্যের ন্যায় সে বনের সৌন্দর্য্য অদৃষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা না থাকুক—বনে ফুল আছে, ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল। মধ্যে পরিষ্কৃত সুকোমলশষ্পাবৃত ভূমিখণ্ডে দস্যুরা ক-

ল্যাণী ও তাহার কন্যাকে নামাইল। তাহারা তাহাদিগকে ঘেরিয়া বসিল। তখন তাহারা বাদানুবাদ করিতে লাগিল যে ইহাদিগকে লইয়া কি করা যায়—যে কিছু অলঙ্কার কল্যাণীর সঙ্গে ছিল, তাহা পূর্ব্বেই তাহারা হস্তগত করিয়াছিল। একদল তাহার বিভাগে ব্যতিব্যস্ত। অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে, একজন দস্যু বলিল, "আমরা সোণারূপা লইয়া কি করিব, একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে একমুটা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়—আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।" একজন এই কথা বলিলে সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল। "চাল দাও," "চাল দাও," "ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোণারূপা চাহি না।" দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, গালাগালি হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম। যে, যে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল, সে, সে অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গায়ে ছুড়িয়া মারিল। দলপতি দুই একজনকে মারিল, তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে একজন বলিল, শৃগাল কুকুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই, আজ এই বেটাকে খাই। তখন সকলে জয় কালি বলিয়া উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। বম কালি! আজ নরমাংস খাইব, এই বলিয়া সেই বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল অন্ধকারে খল খল হাস্য করিয়া, করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দলপতির দেহ পোড়াইবার জন্য একজন অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। শুষ্ক লতা, কাষ্ঠ, তৃণ আহরণ করিয়া, চকমকি সোলায় আগুন করিয়া, সেই তৃণকাষ্ঠ জ্বালিয়া দিল। তখন অল্প অল্প অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে পার্শ্ববর্ত্তী আম্র, জম্বীর, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, খর্জ্জূর প্রভৃতির শ্যামল পল্লবরাজি, অল্প অল্প প্রভাসিত হইতে লাগিল। কোথাও পাতা আলোকে জ্বলিতে লাগিল, কোথাও ঘাস উজ্জ্বল হইল। কোথাও অন্ধকার আরও গাঢ় হইল। অগ্নি প্রস্তুত হইলে, একজন মৃতশবের পা ধরিয়া টানিয়া আগুনে ফেলিতে গেল। তখন আর একজন বলিল, "রাখ ভাই রাখ, রও, রও, যদি মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে এই বুড়ার শুক্‌না মাংস কেন খাই। আজ যাহা লুঠিয়া আনিয়াছি তাহাই খাইব; এস ঐ কচিমেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।" আর একজন বলিল, "যাহা হয় পোড়া বাপু, আর ক্ষুধা সয় না।" তখন সকলেই লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী কন্যা লইয়া শুইয়াছিল, সেই দিকে চাহিল। দেখিল যে, সেখানে

শূন্য, কন্যাও নাই, মাতাও নাই। দস্যুদিগের বিবাদের সময়ে সুযোগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্যা কোলে করিয়া কন্যার মুখে স্তনটি দিয়া, বনমধ্যে পলাইয়াছে। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া, মার্ মার্ শব্দ করিয়া, সেই প্রেতমূর্ত্তি দস্যুদল চারিদিকে ছুটিল। অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তুমাত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বন অত্যন্ত অন্ধকার, কল্যাণী তাহার ভিতর পথ পায় না। বৃক্ষলতাকণ্টকের ঘনবিন্যাসে একে পথ নাই, তাহাতে আবার ঘনান্ধকার। বৃক্ষলতাকণ্টক ভেদ করিয়া কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। মেয়েটীর গায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল, মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে লাগিল, শুনিয়া দস্যুরা আরও চীৎকার করিতে লাগিল। কল্যাণী এইরূপে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া অনেকদূর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। এতক্ষণ কল্যাণীর মনে কিছু ভরসা ছিল যে, অন্ধকারে তাঁহাকে দস্যুরা দেখিতে পাইবে না, কিয়ৎক্ষণ খুঁজিয়া নিরস্ত হইবে; কিন্তু এক্ষণে চন্দ্রোদয় হওয়ায়, সে ভরসা গেল। চাঁদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল—ভিতরে বনের অন্ধকার, আলোতে ভিজিয়া উঠিল। অন্ধকার উজ্জ্বল হইল। মাঝে মাঝে ছিদ্রের ভিতর দিয়া, আলো বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া, উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। চাঁদ যত উঁচুতে উঠিতে লাগিল, তত আরও আলো বনে ঢুকিতে লাগিল, অন্ধকার সকল আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিল। কল্যাণী কন্যা লইয়া আরও বনের কোণের ভিতর লুকাইতে লাগিল। তখন দস্যুরা আরও চীৎকার করিয়া চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল—কন্যাটি ভয় পাইয়া আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কল্যাণী তখন নিরস্ত হইয়া আর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে কণ্টকশূন্য তৃণময়স্থানে বসিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় তুমি, যাঁহাকে আমি নিত্য পূজা করি, নিত্য নমস্কার করি, যাঁহার ভরসায় এই বনমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম, কোথায় তুমি হে মধুসূদন!" সেই সময়ে ভয়ে ভক্তির প্রগাঢ়তায় ক্ষুধা তৃষ্ণার অবসাদে কল্যাণী ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আভ্যন্তরিক চৈতন্যময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে স্বর্গীয়স্বরে গীত হইতেছে—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে
হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণী বাল্যকালাবধি পুরাণ শুনিয়াছিলেন, যে দেবর্ষি গগনপথে বীণাযন্ত্রে হরিনাম করিতে করিতে ভুবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন; তাঁহার মনে সেই

কল্পনা জাগরিত হইতে লাগিল। মনে মনে দেখিতে লাগিলেন, শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, মহাশরীর, মহামুনি বীণাহস্তে চন্দ্রালোক-প্রদীপ্ত নীলাকাশপথে গাইতেছেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

ক্রমে গীত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আরও স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" ক্রমে আরও নিকট—আরও স্পষ্ট—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

শেষে কল্যাণীর মাথার উপর বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া গীত বাজিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণী তখন নয়নোন্মীলন করিলেন। সেই অর্দ্ধস্ফুট বনান্ধকারবিমিশ্র চন্দ্ররশ্মিতে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্র শরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, ঋষিমূর্ত্তি! অন্যমনে তথাভূতচেতনে কল্যাণী মনে করিলেন প্রণাম করিব, কিন্তু প্রণাম করিতে পারিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেই বনমধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ভগ্নশিলাখণ্ড সকলে পরিবেষ্টিত হইয়া একটি বৃহৎ মঠ আছে। পুরাতত্ত্ববিদেরা দেখিলে বলিতে পারিতেন, ইহা পূর্ব্বকালে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল—তার পরে হিন্দুর মঠ হইয়াছে। অট্টালিকাশ্রেণী দ্বিতল—মধ্যে বহুবিধ দেবমন্দির এবং সম্মুখে নাটমন্দির। সকলই প্রায় প্রাচীরে বেষ্টিত আর বহিঃস্থিত বন্যবৃক্ষশ্রেণীদ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন যে দিনমানে অনতিদূর হইতেও কেহ বুঝিতে পারে না যে এখানে কোঠা আছে। অট্টালিকা সকল অনেক স্থানেই ভগ্ন কিন্তু দিনমানে দেখা যায় যে সকল স্থান সম্প্রতি মেরামত হইয়াছে। দেখিলেই জানা যায় যে, এই গভীর দুর্ভেদ্য অরণ্যমধ্যে মনুষ্য বাস করে। এই মঠের একটি কুঠারী মধ্যে একটা বড় কুঁদো জ্বলিতেছিল, তাহার ভিতর কল্যাণীর প্রথম চৈতন্য হইলে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর শুভ্রবসন মহাপুরুষ। কল্যাণী বিস্মিত-লোচনে আবার চাহিতে লাগিলেন, এখনও স্মৃতি পুনরাগমন করিতেছিল না। তখন মহাপুরুষ বলিলেন, "মা এ দেবতার ঠাঁই, শঙ্কা করিও না। একটু দুধ আছে তুমি খাও তার পর তোমার সহিত কথা কহিব।"

কল্যাণী প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তার পর ক্রমে ক্রমে মনের কিছু স্থৈর্য্য হইলে, গলায় আঁচল দিয়া তাঁহাকে একটি প্রণাম করিলেন। তিনি সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহান্তর হইতে একটি সুগন্ধ মৃৎপাত্র বাহির করিয়া সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে দুগ্ধ উত্তপ্ত করিলেন। দুগ্ধ তপ্ত হইলে কল্যাণীকে তাহা দিয়া বলিলেন,

"মা কন্যাকে কিছু খাওয়াও, আপনি কিছু খাও, তাহার পর কথা কহিব।" কল্যাণী হৃষ্টচিত্তে কন্যাকে দুগ্ধপান করাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই পুরুষ "আমি যতক্ষণ না আসি কোন চিন্তা করিও না" বলিয়া মন্দির হইতে বাহিরে গেলেন। বাহির হইতে কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, কল্যাণী কন্যাকে দুধ খাওয়ান সমাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনি কিছু খান নাই; দুগ্ধ যেমন ছিল প্রায় তেমনই আছে, অতি অল্পই ব্যয় হইয়াছে। সেই পুরুষ তখন বলিলেন, "মা, তুমি দুধ খাও নাই, আমি আবার বাহিরে যাইতেছি, তুমি দুধ না খাইলে ফিরিব না।"

সেই ঋষিতুল্য পুরুষ এই বলিয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, কল্যাণী আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যোড়হাত করিলেন—

বনবাসী বলিলেন, "কি বলিবে?"

তখন কল্যাণী বলিলেন, "আমাকে দুধ খাইতে আজ্ঞা করিবেন না—কোন বাধা আছে, আমি খাইব না।"

তখন বনবাসী অতি করুণস্বরে বলিলেন, "কি বাধা আছে, আমাকে বল—আমি বনবাসী ব্রহ্মচারী, তুমি আমার কন্যা, তোমার এমন কি কথা আছে যে, আমাকে বলিবে না। আমি যখন বন হইতে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া আনি, তৎকালে তোমাকে অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতা বোধ হইয়াছিল, তুমি না খাইলে বাঁচিবে কি প্রকারে?"

কল্যাণী তখন গলদশ্রুলোচনে বলিলেন, "আপনি দেবতা, আপনাকে বলিব—আমার স্বামী এ পর্য্যন্ত অভুক্ত আছেন, তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইলে, কিম্বা তাঁহার ভোজনসম্বাদ না শুনিলে, আমি কি প্রকারে খাইব?"

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী কোথায়?"

কল্যাণী বলিলেন, "তাহা আমি জানি না—তিনি দুধের সন্ধানে বাহির হইলে পর দস্যুরা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে।" তখন ব্রহ্মচারী একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিয়া কল্যাণী এবং তাঁহার স্বামীর বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হইলেন। কল্যাণী স্বামীর নাম বলিলেন না, বলিতে পারেন না, কিন্তু আর আর পরিচয়ের পরে ব্রহ্মচারী বুঝিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই মহেন্দ্রের পত্নী?" কল্যাণী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তুমি আমার বাক্য পালন কর, দুগ্ধ পান কর, আমি তোমার স্বামীর সংবাদ আনিতেছি তুমি দুধ না খাইলে আমি যাইব না।" কল্যাণী বলিলেন, "একটু জল এখানে আছে কি?" ব্রহ্মচারী জলকলস দেখাইয়া দিলেন। কল্যাণী অঞ্জলি পাতিলেন, ব্রহ্মচারী অঞ্জলি পূরিয়া জল ঢালিয়া দিলেন। কল্যাণী

সেই জলাঞ্জলি ব্রহ্মচারীর পদমূলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি ইহাতে পদরেণু দিন।" ব্রহ্মচারী অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা জল স্পর্শ করিলে কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি পান করিলেন এবং বলিলেন "আমি অমৃতপান করিয়াছি—আর কিছু খাইতে বলিবেন না—স্বামীর সম্বাদ না পাইলে আর কিছু খাইব না।" ব্রহ্মচারী তখন বলিলেন, "তুমি নির্ভয়ে এই দেউলমধ্যে অবস্থিতি কর, আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে চলিলাম।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপর, পূর্ণচন্দ্র নহে, আলো তত প্রখর নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর সেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট অস্পষ্ট আলো পড়িয়াছে। সে আলোকে মাঠের এপার ওপার দেখা যাইতেছে না, মাঠে কি আছে, কে আছে দেখা যাইতেছে না। মাঠ যেন অনন্ত, জনশূন্য, ভয়ের আবাসস্থান বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই মাঠ দিয়া মুরশিদাবাদ যাইবার রাস্তা। রাস্তার ধারে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ের উপর অনেক আম্রাদিবৃক্ষ। গাছের মাথা সকল, চাঁদের আলোতে উজ্জল হইয়া সর্‌সর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে, তাহার ছায়া কালপাথরের উপর কাল হইয়া পড়িয়া তর্‌তর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। ব্রহ্মচারী সেই পাহাড়ের উপর উঠিয়া শিখরে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন—কি শুনিতে লাগিলেন বলিতে পারি না। সেই অনন্ততুল্য প্রান্তরেও কোন শব্দ নাই—কেবল বৃক্ষাদির মর্ম্মরশব্দ। একস্থানে পাহাড়ের মূলের নিকটে বড় জঙ্গল। উপরে পাহাড়, নীচে রাজপথ, মধ্যে সেই জঙ্গল। সেখানে কি শব্দ হইল বলিতে পারি না—ব্রহ্মচারী সেই দিকে গেলেন। নিবিড় জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, সেই বনমধ্যে বৃক্ষরাজির অন্ধকারতলদেশে সারি সারি সারি গাছের নীচে মানুষ বসিয়া আছে। মানুষসকল দীর্ঘাকার, কৃষ্ণকায়, সশস্ত্র, বিটপবিচ্ছেদে নিপতিত জ্যোৎস্নায় তাহাদের মার্জ্জিত আয়ুধ সকল জলিতেছে। এমন দুইশত লোক বসিয়া আছে—একটি কথাও কহিতেছে না। ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে তাহাদিগের মধ্যে গিয়া কি একটা ইঙ্গিত করিলেন—কেহ উঠিল না, কেহ কথা কহিল না, কেহ কোন শব্দ করিল না। তিনি সকলের সম্মুখ দিয়া সকলকে দেখিতে দেখিতে গেলেন, অন্ধকারে মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে গেলেন, যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন পাইতেছেন না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া একজনকে চিনিয়া তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত করিতেই সে উঠিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে লইয়া দূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই ব্যক্তি যুবাপুরুষ—ঘনকৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রুতে

তাহার চন্দ্রবদন আবৃত—সে বলিষ্ঠকায়, অতি সুন্দর পুরুষ। সে গৈরিকবসন পরিধান করিয়াছে—সর্ব্বাঙ্গে চন্দন-শোভা। ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিলেন, "ভবানন্দ, মহেন্দ্রসিংহের কোন সম্বাদ রাখ?"

ভবানন্দ তখন বলিল, "মহেন্দ্র সিংহ আজ প্রাতে স্ত্রী কন্যা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদের পথে যাইতেছিল, চটীতে—"

এই পর্য্যন্ত বলাতে ব্রহ্মচারী বলিলেন "চটীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা জানি। সন্তানের একাজ নহে। কে করিল?"

ভবা। গেঁয়ো চাষালোক বোধ হয়। এখন সকল গ্রামের চাষাভূষো পেটের জ্বালায় ডাকাত হইয়াছে। আজ কাল কে ডাকাত নয়? আমরাই আজ লুটিয়া খাইয়াছি—কোতোয়াল সাহেবের দুই মণ চাউল যাইতেছিল—তাহা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবের ভোগে লাগাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "চোরের হাত হতে আমি তাহার স্ত্রী কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। এখন তাহাদিগকে মঠে রাখিয়া আসিয়াছি। এখন তোমার উপর ভার যে মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া তাহার স্ত্রী কন্যা তাহার জিম্মা করিয়া দেও। এখানে জীবানন্দ থাকিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে।"

ভবানন্দ স্বীকৃত হইল। ব্রহ্মচারী তখন স্থানান্তরে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চটীতে বসিয়া ভাবিয়া, কোন ফলোদয় হইবে না বিবেচনা করিয়া মহেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। রাজনগরে গিয়া রাজপুরুষদিগের সহায়তায় স্ত্রী কন্যার অনুসন্ধান করিবেন এই বিবেচনায় সেই দিকেই চলিলেন। কিছু দূর গিয়া পথিমধ্যে দেখিলেন, কতকগুলি গোরুর গাড়ী ঘেরিয়া অনেকগুলি সিপাহী চলিয়াছে। " রাজনগর, বা নগর " কি তাহা বুঝাইতে হইতেছে।

১১৭৬ সালে বীরভূম প্রভৃতি প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হইয়াও হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান্। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুল-কলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে। মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ্‌লেখে। বাঙ্গালি কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

বাঙ্গালার পক্ষে সাধারণ নিয়ম এই। কিন্তু বীরভূম প্রভৃতি প্রদেশ সম্বন্ধে একটু স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। বীরভূম

প্রদেশ বীরভূমের রাজার অধীনে। রাজনগর বা নগর—তাঁহাদেরই রাজধানী। বীরভূমের রাজারা পূর্ব্বে স্বাধীন ছিলেন, সম্প্রতি মুরশিদাবাদের অধীন হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বীরভূমে হিন্দুরাই স্বাধীন রাজা ছিলেন। কিন্তু আধুনিক রাজবংশ মুসলমান। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তাহার পূর্ব্বে রাজা আলিনকি খাঁ বাহাদুর সিরাজ উদ্দৌলার সহায়তায় কিছু লরাই চৌডাই করিয়া কলিকাতা লুটিয়া আসিয়াছিলেন। তার পর ক্লাইবের পাদুকাস্পর্শে মুসলমানজন্ম সার্থক করিয়া, বেহেস্তে যাত্রা করিবার উন্মুখ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার অন্যান্য অংশের ন্যায় বীরভূমের কর ইংরেজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার বীরভূমের রাজার উপর। যেখানে যেখানে ইংরেজেরা আপনাদিগের প্রাপ্য কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে তাঁহারা এক এক কালেক্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বীরভূম প্রদেশে এ পর্য্যন্তও কালেক্টার নিযুক্ত হয় নাই। রাজাই ইংরেজের কর আদায় করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন।

অতএব বীরভূমের খাজনা কলিকাতায় যায়। লোক না খাইয়া মরুক, খাজনা আদায় বন্ধ হয় না। তবে তত আদায় হইয়া উঠে নাই—কেন না মাতা বসুমতী ধন প্রসব না করিলে ধন কেহ গড়িতে পারে না। যাহা হউক, যাহা কিছু আদায় হইয়াছে, তাহা গাড়ী বোঝাই হইয়া সিপাহীর পাহারায় কলিকাতায় কোম্পানির ধনাগারে যাইতেছিল। আজিকার দিনে দস্যুভীতি অতিশয় প্রবল, এজন্য পঞ্চাশ জন সশস্ত্র সিপাহী গাড়ীর অগ্রপশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের অধ্যক্ষ একজন গোরা। সে কোম্পানীর চাকর নহে। দেশীয় রাজগণের সৈন্যগণমধ্যে তখন অনেক গোরা অধ্যক্ষতা করিত। গোরা সর্ব্বপশ্চাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছিল। রৌদ্রের জন্য দিনে সিপাহীরা পথ চলে না, রাত্রে চলে। চলিতে চলিতে সেই খাজনার গাড়ী ও সৈন্য সামন্তে মহেন্দ্রের গতি রোধ হইল। মহেন্দ্র সিপাহী ও গোরুর গাড়ী কর্ত্তৃক পথরুদ্ধ দেখিয়া, পাশ দিয়া দাঁড়াইলেন। তথাপি সিপাহীরা তাহার গা ঘেঁসিয়া যায়—দেখিয়া, এবং এ বিবাদের সময় নয় বিবেচনা করিয়া, তিনি পথপার্শ্বস্থ জঙ্গলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন একজন সিপাহী বলিল, "এহি একঠো ডাকু ভাগতা হ্যায়।" মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। সে তাড়াইয়া গিয়া মহেন্দ্রের গলা ধরিল। এবং শালা—চোর—বলিয়াই এক ঘুসা সহসা মারিল ও বন্দুক কাড়িয়া লইল। মহেন্দ্র রিক্ত হস্তে কেবল ঘুষাটি ফিরাইয়া মারিল। মহেন্দ্রের একটু রাগ যে বেশী হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। ঘুসাটি খাইয়া সিপাহীমহাশয় ঘুরিয়া অচে-

তন হইয়া রাস্তায় পড়িলেন। তখন তিন চারিজন সিপাহী আসিয়া মহেন্দ্রকে ধরিয়া জোরে টানিয়া সেনাপতি সাহেবের নিকট লইয়া গেল, এবং সাহেবকে বলিল যে, এই ব্যক্তি একজন সিপাহীকে খুন করিয়াছে। সাহেব পাইপ খাইতেছিলেন, মদের ঝোঁকে একটুখানি বিহ্বল ছিলেন, বলিলেন, "শালাকো পাকড়্‌লেকে সাদি করো।" সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না যে, বন্দুকধারী ডাকাতকে তাহারা কিপ্রকারে বিবাহ করিবে। কিন্তু নেশা ছুটিলে সাহেবের মত ফিরিবে বিবেচনায় তিন চারিজন সিপাহী গাড়ীর গোরুর দড়ি দিয়া মহেন্দ্রকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া গোরুর গাড়ীতে তুলিল। মহেন্দ্র দেখিলেন, এত লোকের সঙ্গে জোর করা বৃথা, জোর করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াই বা কি হইবে। স্ত্রী কন্যার শোকে তখন মহেন্দ্র কাতর, বাঁচিবার কোন ইচ্ছা ছিল না। সিপাহীরা মহেন্দ্রকে উত্তম করিয়া গাড়ীর চাকার সঙ্গে বাঁধিল। পরে সিপাহীরা খাজানা লইয়া যেমন চলিতেছিল, তেমনি মৃদুগম্ভীরপদে চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচারীর আজ্ঞা পাইয়া ভবানন্দ মৃদু মৃদু হরিনাম করিতে করিতে, যে চটীতে মহেন্দ্র বসিয়াছিল, সেই চটীর দিকে চলিলেন। সেইখানেই মহেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব বিবেচনা করিলেন।

পাঠক এইস্থানে দিঙ্নিরূপণ করুন। সে সময়ে ইংরেজের কৃত আধুনিক রাস্তা সকল ছিল না। রাজনগর হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে, যাহাকে এক্ষণে সাবেক বেণারস রোড্ বলে সেই রাস্তায় পড়িয়া আসিতে হইবে। প্রধানতঃ রাজনগর হইতে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া আসিতে হইবে। মহেন্দ্রও পদচিহ্ন হইতে রাজনগর যাইতে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। এইজন্য পথে সিপাহীদিগের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভবানন্দ তালপাহাড় হইতে যে চটীর দিকে চলিলেন, সেও দক্ষিণ হইতে উত্তর। যাইতে যাইতে কাজে কাজেই অচিরাৎ ধনরক্ষাকারী সিপাহীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও মহেন্দ্রের ন্যায় সিপাহীদিগকে পাশ দিলেন। একে সিপাহীদিগের সহজেই বিশ্বাস ছিল, যে এই চালান লুঠ করিবার জন্য ডাকাইতেরা অবশ্য চেষ্টা করিবে তাতে আবার পথমধ্যে একজন ডাকাইতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কাজে কাজেই ভবানন্দকে আবার রাত্রিকালে পথে পাশ দিতে দেখিয়াই তাহাদিগের বিশ্বাস হইল, যে এও আর একজন ডাকাত। অতএব সিপাহীরা তৎক্ষণাৎ তাহাকেও ধৃত করিল।

ভবানন্দ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন বাপু।"

সিপাহী বলিল,"তোম শালা ডাকু হো।"

ভবা। "দেখিতে পাইতেছ, গেরুয়া-বসন পরা ব্রহ্মচারী আমি। ডাকাত কি এই রকম।"

সিপাহী। অনেক শালা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ডাকাতী করে। এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দের গলাধাক্কা দিয়া, টানিয়া আনিল। ভবানন্দের চক্ষু সে অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আর কিছু না বলিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "প্রভু কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

সিপাহী ভবানন্দের বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "লেও শালা, মাথে পর একঠো মোট লেও।" এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দের মাথার উপর একটা গুন্রী চাপাইয়া দিল। তখন আর এক জন সিপাহী তাহাকে বলিল, "না, পলাবে, আর এক শালাকে যেখানে বেঁধে রেখেছ, এ শালাকেও গাড়ীর উপর সেইখানে বেঁধে রাখ।" ভবানন্দের তখন কৌতূহল হইল; যে কাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে দেখিব। তখন ভবানন্দ মাথার গুন্রী ফেলিয়া দিয়া, যে সিপাহী গুন্রী মাথায় তুলিয়া দিয়াছিল, তাহার গালে এক চড় মারিল। সুতরাং সিপাহীরা ভবানন্দকেও বাঁধিয়া গাড়ীর উপর তুলিয়া মহেন্দ্রের নিকট ফেলিল। ভবানন্দ চিনিল যে মহেন্দ্র সিংহ।

সিপাহীরা পুনরায় অন্যমনস্কে কোলাহল করিতে করিতে চলিল, আর গোরুর গাড়ীর চাকার কচ্‌কচ্ শব্দ হইতে লাগিল, তখন ভবানন্দ ধীরে ধীরে কেবল মহেন্দ্র মাত্র শুনিতে পায় এইরূপ স্বরে বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ, আমি তোমায় চিনি, তোমার সাহায্যের জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। কে আমি তাহা এখন তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। আমি যাহা বলি সাবধানে তাহা কর। তোমার হাতের বাঁধনটা গাড়ীর চাকার উপরে রাখ।"

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে ভবানন্দের কথামত কাজ করিলেন। অন্ধকারে গাড়ীর চাকার নিকট একটুখানি সরিয়া গিয়া, হস্তবন্ধন-রজ্জু চাকায় স্পর্শ করাইয়া রাখিলেন। চাকার ঘর্ষণে ক্রমে দড়িটি কাটিয়া গেল। তার পর পায়ের দড়ি ঐরূপ করিয়া কাটিলেন। এইরূপে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভবানন্দের পরামর্শে নিশ্চেষ্ট হইয়া গাড়ির উপরে পড়িয়া রহিলেন। ভবানন্দও সেইরূপ করিয়া বন্ধন ছিন্ন করিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধ।

যেখানে সেই জঙ্গলে, যে রাজপথে দাঁড়াইয়া, ব্রহ্মচারী চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন সেই পথে ইহাদিগের যাইবার পথ। সেই পাহাড়ের নিকট সিপাহীরা পৌঁছিলে দেখিল যে, পাহাড়ের নীচে একটা ঢিবির উপর একটি মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রদীপ্ত

নীল আকাশে তাহার কালো শরীর চিত্রিত হইয়াছে দেখিয়া, হাওলদার বলিল, "উহাকে, ধরিয়া আন। মোট বহিবে।" তখন একজন সিপাহী তাহাকে ধরিতে গেল। সিপাহী ধরিতে যাইতেছে, সে ব্যক্তি স্থির দাঁড়াইয়া আছে—নড়ে না। সিপাহী তাহাকে ধরিল, সে কিছু বলিল না। ধরিয়া তাহাকে হাওলদারের নিকট লইয়া আসিল, তখনও কিছু বলিল না। হাওলদার বলিলেন, "উহার মাথায় মোট দাও।" সিপাহী তাহার মাথায় মোট দিল, সে মাথায় মোট লইল। তখন হাওলদার পিছন ফিরিয়া, গাড়ীর সঙ্গে চলিল। এই সময়ে হঠাৎ একটি পিস্তলের শব্দ হইল, হাওলদার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। "এহি শালা হাওলদারকো মারা" বলিয়া একজন সিপাহী মুটিয়ার হাত ধরিল। মুটিয়ার হাতে তখনও পিস্তল। মুটিয়া মাথার মোট ফেলিয়া দিয়া পিস্তল উল্‌টাইয়া ধরিয়া সেই সিপাহীর মাথায় মারিল, সিপাহীর মাথা ভাঙ্গিয়া গেল, সে নিরস্ত হইল। সেই সময়ে "হরি! হরি! হরি!" শব্দ করিয়া দুইশত শস্ত্রধারী লোক আসিয়া সিপাহীদিগকে ঘেরিল। সিপাহীরা তখন সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাহেবও ডাকাত পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া সত্বর গাড়ীর কাছে আসিয়া লাইন ফরম করিবার আজ্ঞা দিলেন। তখনই সিপাহীরা চারিদিকে সম্মুখ ফিরিয়া চতুষ্কোণ করিয়া দাঁড়াইল। অধ্যক্ষের পুনর্ব্বার আজ্ঞা পাইয়া তাহারা বন্দুক তুলিয়া ধরিল। এই সময়ে হঠাৎ সাহেবের কোমর হইতে তাঁহার অসিকে কাড়িয়া লইল। লইয়াই একাঘাতে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। সাহেব ছিন্নশির হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলে আর তাহার ফায়ারের হুকুম দেওয়া হইল না। সকলে দেখিল যে, এক ব্যক্তি গাড়ীর উপরে দাঁড়াইয়া তরবার হস্তে হরি হরি শব্দ করিতেছে এবং "সিপাহী মার, সিপাহী মার," বলিতেছে। সে ভবানন্দ।

সহসা অধ্যক্ষকে ছিন্নশির দেখিয়া এবং রক্ষার জন্য কাহারও নিকটে আজ্ঞা না পাইয়া সিপাহীরা কিয়ৎক্ষণ ভীত ও নিশ্চেষ্ট হইল। এই অবসরে তেজস্বী দস্যুরা তাহাদিগের অনেককে হত ও আহত করিয়া গাড়ীর নিকটে আসিয়া টাকার বাক্সসকল হস্তগত করিল। সিপাহীরা ভগ্নোৎসাহ ও পরাভূত হইয়া পলায়নপর হইল।

তখন যে ব্যক্তি ঢিপির উপর দাঁড়াইয়াছিল, এবং শেষে যুদ্ধের প্রধান নেতৃত্বগ্রহণ করিয়াছিল সে ভবানন্দের নিকট আসিল। উভয়ে তখন আলিঙ্গন করিলে ভবানন্দ বলিলেন, "ভাই জীবানন্দ সার্থক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে।"

জীবানন্দ বলিল, "ভবানন্দ! তোমার নাম সার্থক হউক!" অপহৃত ধন যথাস্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করণে

জীবানন্দ নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার অনুচরবর্গ সহিত শীঘ্রই তিনি স্থানান্তরে গেলেন। ভবানন্দ একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র শকট হইতে নামিয়া একজন সিপাহীর প্রহরণ কাড়িয়া লইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যে ইহারাই দস্যু; ধনাপহরণ জন্যই সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি যুদ্ধস্থান হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। কেন না দস্যুদের সহায়তা করিলে তাহাদিগের দুরাচারের ভাগী হইতে হইবে। তখন তিনি তরবারি ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ভবানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় আপনি কে?"

ভবানন্দ বলিল, "তোমার তাতে প্রয়োজন কি?"

মহে। আমার কিছু প্রয়োজন আছে। আজ আমি আপনারদ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

ভবা। সে বোধ যে তোমার আছে এমন ত বুঝিলাম না—অস্ত্র হাতে করিয়া তফাত রহিলে—তুমি কি কাপুরুষ যে যুদ্ধে ভয় পাও?

ভবানন্দের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে, মহেন্দ্র ঘৃণার সহিত বলিলেন "যুদ্ধ কই—এ যে ডাকাতি।" ভবানন্দ বলিল, "হউক ডাকাতি, আমরা তোমার কিছু উপকার করিয়াছি আরও কিছু উপকার করিবার ইচ্ছা রাখি।"

মহেন্দ্র। তোমরা আমার কিছু উপকার করিয়াছ বটে, কিন্তু আর কি উপকার করিবে? আর ডাকাতের কাছে এত উপকৃত হওয়ার চেয়ে আমার অনুপকৃত থাকাই ভাল।

ভবা। উপকার গ্রহণ কর না কর, তোমার ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয় আমার সঙ্গে আইস। তোমার স্ত্রীকন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।

মহেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "সে কি?"

ভবানন্দ সে কথার উত্তর না করিয়া চলিল। অগত্যা মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিল—মনে মনে ভাবিতে লাগিল এরা দস্যু না দেবতা?

দশম পরিচ্ছেদ।

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুইজনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিল। মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, গর্ব্বিত, কিছু কৌতূহলী।

ভবানন্দ সহসা ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ কর

লেন। সে স্থিরমূর্ত্তি, ধীরপ্রকৃতি সন্ন্যাসী আর নাই; সে রণনিপুণ বীরমূর্ত্তি—সৈন্যাধ্যক্ষের মুণ্ডঘাতীর মূর্ত্তি আর নাই—এখনই যে গর্ব্বিতভাবে মহেন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছিলেন সে মূর্ত্তি আর নাই। যেন জ্যোৎস্নাময়ী, শান্তিশালিনী, পৃথিবীর প্রান্তরকাননগনদীময় শোভা দেখিয়া তাঁহার চিত্তের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইল—সমুদ্র যেন চন্দ্রোদয়ে হাসিল। ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাগ্মি, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন। কথাবার্ত্তার জন্য বড় ব্যগ্র। ভবানন্দ কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না। তখন্ ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন,—

"বন্দে মাতরং
সুজলাং সুফলাং, মলয়জশীতলাং,
শস্যশ্যামলাং, মাতরং।*"

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে, তা ত বুঝিতে পারিল না—জিজ্ঞাসা করিল "মাতা কে?"

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাইতে লাগিল।

"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং—
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।

মহেন্দ্র বলিল, "এ ত দেশ, এ ত মা নয়—"

ভবানন্দ বলিল, "আমরা অন্য মা মানি না—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী; আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা,—"

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিল, তবে আবার গাও।

ভবানন্দ আবার গাইল:—

"বন্দে মাতরং
সুজলাং সুফলাং, মলয়জশীতলাং,
শস্যশ্যামলাং, মাতরং।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।

সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকলনিনাদ-করালে
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
কেবলে মা তুমি অবলে
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরং।"
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।

০　১　×১

*মল্লার—কাওয়ালী তাল যথা—বন্দে মাতরং ইত্যাদি।

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরং
বন্দে মাতরং
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরং।

মহেন্দ্র দেখিল, দস্যু গায়িতে গায়িতে কাঁদিতে লাগিল।

মহেন্দ্র তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কারা?"

ভবানন্দ বলিল, "আমরা সন্তান।"

মহেন্দ্র। সন্তান কি? কার সন্তান?

ভবা। মায়ের সন্তান?

মহেন্দ্র। ভাল—সন্তানে কি চুরি ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবা। আমরা চুরি ডাকাতি করি না।

মহে। এই ত গাড়ি লুঠিলে।

ভবা। সে কি চুরি ডাকাতি? কার টাকা লুঠিলাম?

মহে। কেন? রাজার।

ভবা। রাজা বেটা কে? এই যে টাকাগুলি সে লইবে এ টাকায় তার কি অধিকার?

মহে। রাজার রাজভাগ।

ভবা। হিন্দুর রাজ্যে আবার মুসলমান রাজা কি?

মহে। তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন দিন উড়িয়া যাইবে দেখিতেছি।

ভবা। অনেক শালা সিপাহী দেখিয়াছি—আজও দেখিলাম।

মহে। ভাল করে দেখনি, একদিন দেখিবে।

ভবা। না হয় দেখ্‌লাম, একবার বই ত দুবার মর্‌ব না।

মহে। তা ইচ্ছা করিয়া মরিয়া কাজ কি?

ভবা। মহেন্দ্র সিংহ, তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা তুমিও তা। দেখ সাপ মাটীতে বুক দিয়া হাঁটে, তাহার অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি না; সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না। দেখ যত দেশ আছে,—মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন দেশের এমন দুর্দ্দশা, কোন দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটি খায়? বনের লতা খায়? কোন দেশে মানুষ শিয়াল কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম

রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি বউ রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, ঝি বউয়ের পেটে ছেলে রেখে শোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশে রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ। আমাদের রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণপর্য্যন্তও যায়। এ নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?

মহে। তাড়াবে কেমন করে?

ভবা। মেরে।

মহে। তুমি কি একা তাড়াবে? এক চড়ে না কি?

দস্যুগায়িল :—

"সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকলনিনাদ-করালে
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
কে বলে মা তুমি অবলে—"

মহে। কিন্তু দেখিতেছি তুমি একা?

ভবা। কেন এখনি ত দুশ লোক দেখিয়াছ।

মহে। তাহারা কি সকলে সন্তান?

ভবা। সকলেই সন্তান?

মহে। আর কত আছে?

ভবা। এমন হাজার হাজার, ক্রমে আরও হবে?

মহে। না হয় দশ বিশ হাজার হল, তাতে কি মুসলমানকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারিবে?

ভবা। পলাশীতে ইংরেজের কজন ফৌজ ছিল?

মহে। ইংরেজে আর বাঙ্গালীতে?

ভবা। নয় কি সে? গায়ের জোরে কত হয়—গায়ে জিয়াদা জোর থাকিলে গোলা কি জিয়াদা ছোটে?

মহে। তবে ইংরেজে মুসলমানে এত ফারাক কেন?

ভবা। ধর, এক ইংরেজ পলায় না, মুসলমান গা ঘামিলে পলায়—শরবত খুঁজিয়া বেড়ায়—ধর তার পর, ইংরেজের জিদ আছে—যা ধরে তা করে, মুসলমানের এলাকাড়ি। টাকার জন্য প্রাণ দেওয়া, তাও সিপাহীরা মাহিয়ানা পায় না। তার পর শেষ কথা সাহস,—কামানের গোলা এক জায়গায় বই দশ জায়গায় পড়্‌বে না—সুতরাং একটা গোলা দেখে দুশ জন পলাইবার দরকার নাই। কিন্তু একটা গোলা দেখিলে মুসলমানের গোষ্ঠীশুদ্ধ পলায়—আর গোষ্ঠীশুদ্ধ গোলা দেখিলে ত একটা ইংরেজ পলায় না।

মহে। তোমাদের কি এসব গুণ আছে?

ভবা। না। কিন্তু গুণ গাছ থেকে পড়ে না। অভ্যাস করিতে হয়।

মহে। তোমরা কি অভ্যাস কর?

ভবা। দেখিতেছ না আমরা সন্ন্যাসী? আমাদের সন্ন্যাস এই অভ্যাসের জন্য। কার্য্য উদ্ধার হইলে—অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে—আমরা আবার গৃহী হইব। আমাদেরও স্ত্রী কন্যা আছে।

মহে। তোমরা সে সকল ত্যাগ করিয়াছ—মায়া কাটাইতে পারিয়াছ?

ভবা। সন্তানকে মিথ্যা কথা কহিতে নাই—তোমার কাছে মিথ্যা বড়াই করিব না। মায়া কাটাইতে পারে কে? যে বলে আমি মায়া কাটাইয়াছি, হয় তার মায়া কখন ছিল না, বা সে মিছা বড়াই করে। আমরা মায়া কাটাই না—আমরা ব্রত রক্ষা করি। তুমি সন্তান হইবে?

মহে। আমার স্ত্রীকন্যার সম্বাদ না পাইলে আমি কিছু বলিতে পারি না।

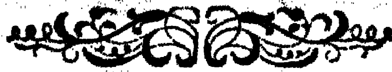
ভবা। চল, তবে তোমার স্ত্রীকন্যাকে দেখিবে চল।

এই বলিয়া দুইজনে চলিল। ভবানন্দ আবার "বন্দে মাতরং" গাইতে লাগিল। মহেন্দ্রের গলা ভাল ছিল, সঙ্গীতে একটু বিদ্যা ও অনুরাগ ছিল—সুতরাং সঙ্গে গাইল—দেখিল যে গায়িতে গায়িতে চক্ষে জল আইসে।

মহে। যদি স্ত্রীকন্যা ত্যাগ না করিতে হয় তবে এ ব্রত আমাকে গ্রহণ করাও?

ভবা। এ ব্রত যে গ্রহণ করে সে স্ত্রী কন্যা পরিত্যাগ করে না। তুমি যদি এ ব্রত গ্রহণ কর, তবে স্ত্রী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হইবে না। তাহাদিগের রক্ষা হেতু উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা যাইবে কিন্তু ব্রতের সফলতা পর্য্যন্ত তাহাদিগের মুখদর্শন নিষেধ।

মহেন্দ্র। আমি এ ব্রত গ্রহণ করিব না।



গৃহসন্ন্যাস।

যে স্বাধীন, নিশ্চয়ই সে সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা ছিল সেই জন্য সন্ন্যাসীও ছিল। সন্ন্যাসীরা অনেকেই গৃহী, স্বাধীন গৃহী। জনকরাজা ভারতের প্রথম সন্ন্যাসী।

স্বাধীনতা ভারতবর্ষের ধন। জর্ম্মণীরা ইদানীং স্বাধীনতার অর্থ কতকাংশে বুঝিয়াছে, এইজন্য জর্ম্মানীতে সন্ন্যাসী সম্ভব হইয়াছে। ইউরোপীয় আর আর জাতিরা অসার, অনেকে আবার বাচাল; তাহাদের স্বাধীনতা অতি দূরে। ইংরেজদের কেবল দাম্ভিকতা, ফরাসিসদের কেবল বাগাড়ম্বর। অদ্যাপি তাঁহারা স্বাধীনতা স্বাধীনতা কেবল রাজসম্বন্ধে উল্লেখ করেন; যে বধির সে কেবল নৃত্যকেই সঙ্গীত বলে; গীত, বাদ্য, তাল, লয় কখন তাহার কর্ণকুহরে যায়নাই। যখন ভারতাকাশ হইতে স্বাধীনতা খসিয়া পড়ে, পতনে তাহা শতধা হইয়াছিল, ম্লেচ্ছরা তা-

ছারট দুই একখণ্ড কুড়াইয়া লয়; সেই ভগ্নখণ্ড তাহাদের এখন পূর্ণখণ্ড। আমরা তাই হাসি। ভগ্নখণ্ডের দুই চারিটী অদ্যাপি ভারতবর্ষে পড়িয়া আছে; সেগুলি এক্ষণে মহাপীঠ। এই জন্য ভারতবর্ষ অদ্যাপি স্বাধীন; সকল দেশ অপেক্ষা স্বাধীন। ক্ষুদ্রেরা এ কথায় হাসিবে, রাজা দেশী কি বিদেশী এই লইয়া তাহারা স্বাধীনতার মীমাংসা করে।

মনুষ্য প্রথম হইতেই পরাধীন—জড়ের অধীন, জীবের অধীন, প্রকৃতির অধীন, নিজ প্রবৃত্তির অধীন। এ অধীনতার সীমা নাই।

মনুষ্যের প্রথম বেগ—উদ্ধারের চেষ্টা। জড়ের শাসন, জঙ্গমের শাসন, আপনার শাসন। জড়ের শাসন প্রথমতঃ ইউরোপ অঞ্চলে আরম্ভ হয়। আপনার শাসন প্রথমতঃ ভারতবর্ষে আরম্ভ হয়। এই শেষ শাসন বড় কঠিন, ভারতবর্ষ বলিয়া তাহা সম্ভব হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বাহ্যিক আভ্যন্তরিক সকল যুদ্ধই হইয়া গিয়াছে। যেখানে কুরুক্ষেত্র, সেইখানেই ঋষিদিগের তপস্যাশ্রম। প্রত্যেকের পুরাতন কথা মহাকথা; সকলগুলিই স্বাধীনতার যুদ্ধবার্ত্তা।

বৌদ্ধদিগের সময়ে আত্মশাসনের বিশেষ বাঁধাবাধি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের শাক্যসিংহ ভীরু ছিলেন, সংসারকে ভয় করিয়া, সংসারকে ফেলিয়া তিনি পলাইয়াছিলেন। স্বাধীনতা সাহসিকের ধন; ভীরু কখন স্বাধীনতা পায় না, সন্ন্যাসীও হয় না।

তান্ত্রিকেরাও স্বাধীনতার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা কেবল মায়াসম্বন্ধে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে মনুষ্যেরা কেবল মায়ার নিমিত্ত পরাধীন। কিন্তু মায়া পরাধীনতার আংশিক কারণ মাত্র।

কেহ বা যোগশিক্ষা দিয়া, দৈহিকশাসন আরম্ভ করাইয়া, স্বাধীনতার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের পরাধীনতা সম্বন্ধে ক্ষুৎপিপাসাই বিশেষ কারণ।

সম্প্রদায়বিশেষের এইরূপ আংশিক চেষ্টায় পূর্ণ স্বাধীনতার উৎপত্তি হইয়াছিল। কেহ কেহ সেই স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অতি ভয়ানক, ও অদ্ভুত হইয়াছিল। "জড়জঙ্গমের অধীন হইব না; জরার অধীন হইব না; ক্ষুধার অধীন হইব না; মায়ার অধীন হইব না; দেবতার অধীন হইব না; বরং ঈশ্বরের সমান হইয়া তাঁহার শরীরে মিলিয়া যাইব।" এই আকাঙ্ক্ষা ভারতীয় স্বাধীনতার বীজ।

ভারতীয় স্বাধীনতা অতি কর্কশ, অতি ভয়ানক; কিন্তু সম্পূর্ণ। ভারতবাসীরা মৃত্যুরও অধীন হইতে চাহিত না। স্বাধীনতার এরূপ মূর্ত্তি আর কোথাও অনুমিত হয় নাই! মৃত্যু আইসে, পার্শ্বে দাঁড়ায়, যোড়হাত করে, অনু-

মতি চায়, অনুমতি কখন পায় কখন পায় না। এই চিত্র কেবল স্বাধীনতার সংস্করণ। অদ্যাপি অনেক পরমহংস গোপনে আহার করে, পাছে ক্ষুৎপিপাসার বশবর্ত্তী দেখিয়া লোকে পরাধীন মনে করে। অনেকে উলঙ্গ বেড়ায়, পাছে সমাজপ্রথার অধীন ভাবিয়া লোকে অশ্রদ্ধা করে। অনেকে দারাপুত্রত্যাগ করে, পাছে লোকে মায়ার অধীন মনে করে। এই সকল ব্যবহার অনর্থক নহে। প্রতিধ্বনি পূর্ব্বধ্বনির পরিচয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা একেবারে লোপ পায় নাই, এখনও ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী আছে, আমি ভস্মমাখা ভিক্ষুকদের কথা বলিতেছি না; মহাপুরুষদের কথা বলিতেছি।

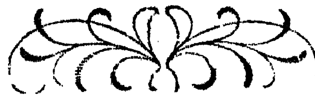
স্বাধীনতার আর এক মূর্ত্তি জর্ম্মাণদেশে কল্পিত হইয়াছে। তথাকার পণ্ডিতেরা বলেন যে নিজে উন্নত হইয়া জড়জঙ্গম প্রভৃতি সকলের অধিকার অতিক্রম করাই স্বাধীনতা। কিন্তু কার্য্যত সম্পূর্ণ অতিক্রম করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত; যাহা সাধ্যাতীত তাহা কেবল মনের দ্বারা অতিক্রম করিতে হইবে। যাহা অবশ্যম্ভাবী, যাহা অলঙ্ঘনীয়, যাহার উপায় নাই, তাহার নিমিত্ত কাতর কেন হইব, কেন তাহার অধীন হইয়া পড়িব? যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা সুতরাং হইতে দিব; হইতে দেওয়াই জিত, প্রভুদের কার্য্য।

এইরূপ জর্ম্মাণ স্বাধীনতা নীতিসম্ভূত। এত কাল নীতিকে কেহ স্বাধীনতার প্রসূতি বলিয়া চিনিত না, এক্ষণে চিনা যাইতেছে। এই পথ অবলম্বন করিলে অনিবার্য্য অত্যাচারকে আর অত্যাচার বলিয়া বোধ থাকে না, মৃত্যুরও ভয়ানকতা কমিয়া যায়।

মনকে অধীন করিয়া আপনি স্বাধীন হইব ইহা ভারতীয় মন্ত্র। মনকে উন্নত করিয়া আপনি স্বাধীন হইব ইহা জর্ম্মাণীর মন্ত্র। পরস্পর প্রভেদ বিস্তর।

ভারতীয় স্বাধীনতায় মনকে দমন করিতে হয়, শাসন করিতে হয়, পীড়ন করিতে হয়, অনেক সুখপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তিরোধ করিতে হয়; মনকে একেবারে শুষ্ক করিয়া ফেলিতে হয়; কিন্তু "when you regulate a man, you narrow him." এই স্বাধীনতার আর এক বিশেষ দোষ যে এতদ্দ্বারা সমাজের সর্ব্বনাশ হয়; যে সকল মনোবৃত্তির প্রাবল্যে সমাজের উন্নতি, সে সকল মনোবৃত্তি একেবারে থাকে না। এই জন্য এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতসমাজের উন্নতি লোপ হইয়া গিয়াছিল। ব্যক্তিগত গুণে সমাজ গুণবন্ত হয়, কিন্তু এই স্থলে সে নিয়ম খাটে নাই। সমাজের পরাধীনতা ব্যক্তিগত পরাধীনতা নহে, যাঁহারা স্বাধীন তাঁহারা সমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাই লোকে তাঁহাদের স্বতন্ত্র নাম দিয়াছিল—সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসীর বাক্যার্থ বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। সন্ন্যাসধর্ম্ম সমাজের অনিষ্টকর, বিশেষতঃ প্রথমতঃ অবস্থায়। পরাধীনতা সমাজের মজ্জা। পরাধীনতা ভিন্ন সমাজ গঠে না, সমাজ থাকে না। পরাধীনতা পরতন্ত্রতা নহে। সমুদয় মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য থাকিলে আর একপ্রকার স্বাধীনতার উৎপত্তি হয়। বাঙ্গালায় সে সামঞ্জস্য একেবারে নাই। এখানে মায়া মমতার প্রাধান্য অতিশয়, এইজন্য আমরা পরাধীন।



বাল্মীকির জয়।

চতুর্থ খণ্ড।

শরৎকালের পরিষ্কার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলে, অগণ্য তারকাপুঞ্জের মধ্যে সময়ে সময়ে সাদা মেঘের মত কিছু কিছু দেখা যায়। দুরবীন দিয়া দেখিলে, ঐ সকল আরও পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সে সব আর কিছু নয়, মালমসলা সংগ্রহ রহিয়াছে, এখনও পৃথিবী সৌরজগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড গড়া হয় নাই। উহাদের ইংরেজি নাম নেবুলা।

যেদিন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত বিবাদ করিয়া ধবলগিরির উচ্চশৃঙ্গে উঠেন, সে দিন ঐ সকল নেবুলায় তাঁহার চোখ পড়ে; তিনি তৎক্ষণাৎ শূন্যপথে তদভিমুখে ধাবিত হন। বাষ্পীয় শকটের ন্যায়, তীরের ন্যায়, তাড়িতগতির ন্যায়, রাজর্ষি বিশ্বামিত্রগমন করিতে লাগিলেন। বায়ু ক্রমে পাতলা হইতে লাগিল, ক্রমে শীতল হইতে লাগিল, ক্রমে নিশ্বাস বহে না এইরূপ হইয়া উঠিল। অমনি বিশ্বামিত্র পৃথিবীবায়ু স্মরণ করিলেন, স্মরণ করিয়া সঙ্গে লইলেন, নিশ্বাস ফেলিবার কিছুই ক্লেশ হইল না। বাইশ ক্রোশ পরেই স্থির বায়ু, সেই বায়ুতে ক্রমাগত উল্কা ঘুরিতেছে, ব্রহ্মার আদেশে সমস্ত উল্কা আজি বিশ্বামিত্রের গাত্রে পড়িতে লাগিল, বিশ্বামিত্র আরও বেগে শূন্যপথ পার হইতে আরম্ভ করিলেন, ধূমকেতুগণ তাঁহার পথরোধ করিল। তিনি তাহাদিগকে ঠেলিয়া দিয়া গেলেন, সমস্ত শূন্যে ঈথর নামে যে পদার্থ আছে, তন্মধ্যস্থ জীবসকল তাঁহার শরীর আচ্ছাদন করিতে লাগিল; তাহারা এত সূক্ষ্ম যে, দূরবীণদ্বারাও দেখা যায় না, কিন্তু ক্রমে শরীর গুরুতর হইয়া উঠিল, তাহাতেও বিশ্বামিত্রের দৃক্‌পাত নাই। বিশ্বামিত্র ত মানুষবলে উঠিতেছেন না, যোগবলে উঠিতেছেন। তিনি ক্রমে

অসংখ্য সৌরজগৎ অতিক্রম করিয়া নেবুলার নিকট উপস্থিত হইয়া, অনন্ত গগনস্থ সমস্ত নেবুলা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। চারিদিক্ হইতে নেবুলা-সমূহ সংগ্রহ হইয়া তাঁহার পদতলে পড়িতে লাগিল। কত অগণ্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যে সেই অগঠিত পদার্থরাশিমধ্যে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, কে বলিতে পারে? ক্রমে আকাশের এক কোন নেবুলায় পূরিয়া গেল। বিশ্বামিত্র তাহার উপর দাঁড়াইয়া নিজ অঙ্গুলি ঘুরাইতে লাগিলেন, আর সেই অনন্ত, অগঠিত পদার্থরাশি ঘুরিতে লাগিল, ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে একত্র হইতে লাগিল; ক্রমে পরস্পর নিকট হইতে লাগিল, ক্রমে পরস্পর গায়ে গায়ে লাগিল, ক্রমে আবার ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে আটিয়া বসিয়া গেল। আরও—ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্নি সে সকল উদগম হইল, প্রকাণ্ড পরমাণুরাশির চারিদিকে অগ্নিময় Atmosphere হইল, খানিক জ্বলিতে থাকিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন, "বুধ হউক," অমনি সেই জ্বলন্তপদার্থ হইতে একখণ্ড বাহির হইয়া গিয়া দূরে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া উহারই চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, এবং ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া বুধগ্রহরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, উত্তম হইয়াছে। অনন্তর কহিলেন, "শুক্র হউক" অমনি সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণামান পদার্থরাশি হইতে আর এক খণ্ড ছুটিয়া গিয়া উহারই চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, শুক্র উত্তম হইয়াছে। আবার বলিলেন, "পৃথিবী হউক" অমনি আবার সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণামান পদার্থরাশি হইতে আর একখণ্ড ছুটিয়া গিয়া পাহাড়-পর্ব্বত-নদ-নদী-দ্বীপ--সাগরবতী-পৃথিবী-রূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, এ পৃথিবীর সহিত পুরাতন পৃথিবীর তুলনা হয় না। এইরূপে সেই অগাধ পরমাণুরাশি হইতে এক এক করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি আমাদের সৌরজগতে যাহা যাহা আছে, বিশ্বামিত্র তৎসমুদয়ই সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার পৃথিবী আমাদের পৃথিবী হইতে কোটী গুণে বড় হইল, সূর্য্য কোটী গুণে বড়, পৃথিবী হইতে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি প্রকাণ্ড দেখাইতে লাগিল। তৃণ, বায়ু, জল, পর্ব্বত, নদী, বন, বৃক্ষ, বরফ, যেমন যেমন এ পৃথিবীতে আছে, সব ঠিক তেমনি তেমনি হইল; অধিকের মধ্যে নারিকেলগাছ তখন এখানে ছিল না তাহা হইল। তাঁহার জগতে হিংস্র জন্তু রহিল না; বিচিত্র পক্ষী পক্ষচ্ছটায় নয়ন মন রঞ্জন করে, এইই অধিক; বিচিত্র পশু, দেখিতে অতি মনোহর; সমস্তই সুগন্ধিপুষ্পের বৃক্ষ—বৃক্ষের পত্র সুগন্ধি, কাষ্ঠ সুগন্ধি, ফুল সুগন্ধি, আস্বাদ সুগন্ধি—যে তৃণদ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগ আচ্ছাদিত তাহাও আতর অপেক্ষা সুগন্ধি। আকাশ হইতে যে বৃষ্টি হইত, তাহা গোলাব। বায়ু, ধুপ-ধুনা-গন্ধামোদিত। আহারীয় পদার্থ উৎপাদন করিতে হয় না—বন, জল, বায়ু আহারীয় প্রদান করে, এবং ইহার পরও সহস্র

সহস্র বৎসর দিতে পারিবে, তাহারও কৃষিকর্ম্মের শ্রমস্বীকার করিতে হইবে না; লোকসংখ্যা যদি অগণ্য বর্দ্ধিত হয়, তবেই যাহা হউক। বাড়ী ঘরদ্বার বিছানা রহিবে না, সুগন্ধি সুস্পর্শ অতি কোমল তৃণই শয্যা, সমস্ত পৃথিবীময় বিশ্বামিত্র পর্ব্বত কাটিয়া বৃষ্টির সময় থাকিবার জন্য সুন্দর স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রাস্তার উপর দারুণ সূর্য্য-উত্তাপ এ জন্য সমস্ত রাস্তার উপর শেড দেওয়া, তাহার উপর দুই প্রহরের সময় বরফ দেওয়া হয়, মাঠে যখন দারুণ গ্রীষ্ম রাস্তার উপর গেলে শরীর একেবারে জুড়াইয়া যায়। বিশ্বামিত্র নিজে স্বভাব সৌন্দর্য্যের জন্য বড়ই পাগল, এইজন্য পাহাড়ে উঠিবার উপায় করিয়া দিলেন। লোকে যাহাতে সর্ব্বদা পর্ব্বতের ডগা হইতে সমুদয় তলা পর্য্যন্ত সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারে, তাহার নানা উপায় করিয়াছিলেন।

২

আর মনুষ্য—নূতন জগতে নূতন মনুষ্য, হইল। সৃষ্টি আপনার মনোমত, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টিতে মনুষ্য সুখময়, দুঃখভোগের প্রবৃত্তি সকল আদৌ রহিল না। অতি উচ্চ অঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিরও উন্নতি হইবার উপায় রহিল। বিশ্বামিত্রের সংস্কার ছিল, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; কেবলমাত্র মনের উচ্চতর বৃত্তিসকল চালনা করিয়াই তাহারা ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার পর স্বার্থসাধন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে একেবারে চক্ষুলজ্জাশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব যাহাতে সকল লোকেরই বুদ্ধিবৃত্তি সমানরূপে পুষ্ট হয়, বিশ্বামিত্র তাহার জন্য চারিদিকে বিদ্যালয়, কালেজ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। উচ্চনীতিশিক্ষা, উচ্চশাসন, প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র লোক রহিল না; সকল লোক একত্র হইয়া এ সকল কার্য্যনির্ব্বাহ করিবে। যুক্তি একমাত্র উপাস্যদেবতা, তদ্ভিন্ন আর উপাস্য দেবতা একেবারে রহিল না। সকলে নিত্য নিত্য যুক্তিদেবীর মাত্র উপাসনা করিত।

আর প্রেম? সকলই প্রেমময়, মানুষ সব সমান। যদি কাহারও কোন বিষয়ে উন্নতি হয়, তবে সে তাহাদ্বারা অন্য লোকের উপকার করিবে, সব সমান করিয়া লইবে। বিশ্বামিত্রের জগতে সব মানুষ সুন্দর, কাল কুৎসিত দুই একটা কদাচ কখন মিলিত কি না সন্দেহ। সকলেরই মুখে এমনি মোহিনীময় ভাব যে, মুখ দেখিলেই পরস্পর মোহিত হইয়া যাইতে হয়। সেখানে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলে, সেকহ্যাণ্ড বা নড বা নমস্কার করিত না, একেবারে কোলাকুলি ও গাঢ় আলিঙ্গন। সকলেই ব্যস্ত every thing onward & forward. নূতন জগতে, নূতন উৎসাহে, লোকে এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইতেছে, কখন পর্ব্বতে

উঠিয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে, কখন নদীগর্ভে গিয়া তথাকার গূঢ়তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছে, কখন আকাশপথে উড্ডীন হইয়া নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে। এইরূপে সকলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আত্মোন্নতি সমাজোন্নতি মনুষ্যোন্নতি সাধনার্থ ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে।

বিশ্বামিত্রের সংসারে বিবাহ নাই; কিন্তু প্রণয় এমনি পদার্থ, বিবাহ না থাকিলেও একবার মনোমিলন হইলে প্রায় আর বিচ্ছেদ হইত না। বিচ্ছেদ হইলেও তিনবৎসরকাল ভগ্ন প্রণয়ের জন্য শোক না করিয়া কেহ বিবাহ করিত না। এরূপ করিলেও কেহ দোষ বলিত না; লোকে জিতেন্দ্রিয় ছিল; ব্যভিচারাদি ভয়ানক দোষ কিছুমাত্র ছিল না। গীতবাদ্যাদি কলায় সমস্ত লোকই পটু ছিল, সকলে মিলিয়া সকল স্থানে হয় গান, নয় বাজনা, নয় অভিনয়, না হয় নৃত্য প্রত্যহই হইত। প্রত্যহ পৃথিবীময় নূতন উৎসব হইত, কোনপ্রকার রাজা, সেনাপতি, বা কিছুর ভয় ছিল না। সকলে মিলিয়া যাহা করে, তাহাই হয়। পদার্থের গূঢ়তত্ত্বানুসন্ধান, আর প্রতিবেশীদিগের মনোরঞ্জন, এই বিশ্বামিত্রপৃথিবীতে লোকের নিত্যকর্ম্ম হইল।

উল্লাস—উল্লাস—উল্লাস, মনের উল্লাসে পৃথিবীস্থ লোক নৃত্য করে। আহা! এমন পৃথিবী যদি আমাদের হইত, তবে না জানি কতই সুখই হইত। যে সকল কারণ থাকায় পৃথিবীর মানুষে মানুষে গরমিল, বিশ্বামিত্র মানুষের মন হইতে সেগুলি অতি যত্নে তুলিয়া দিয়াছিলেন। যশের আশা, টাকার তৃষ্ণা ও আধিপত্যের আশা কাহারও ছিল না। কেবল আমোদ; আজি আমার আমোদে তুমি যোগ দিলে, কালি তোমার আমোদে আমি যোগ দিলাম। বিশ্বামিত্রের দেশে মানুষ মরিত না, উহারা এক পৃথিবী হইতে অন্য পৃথিবীতে চলিয়া যাইত; এইরূপে সাত আটবার ঘুরিয়া আবার সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইত। বিশ্বামিত্রপৃথিবীতে জন্ম দুইপ্রকার; পুনরাবর্ত্তন জন্ম আর নূতন জন্ম; নূতন জন্ম সংখ্যায় সংখ্যাত ছিল, রোজ সেই কয়টি করিয়া নূতন জন্ম হইত; বাকি পুনরাবর্ত্তন জন্ম। বিশ্বামিত্রের পৃথিবী অল্পকাল ছিল, অধিক নূতন জন্ম হইলে কি হইত বলা যায় না।

ওদিকে বাল্মীকি হিমালয়জঙ্গলমধ্যে কেবল রোদন করিয়া বেড়ান, রোদনের বিরাম নাই, অন্তর্দাহেরও বিরাম নাই, কি পাপই করিয়াছি, কেমন করিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, যত ভাবেন ততই হৃদয় উদ্বেল হয়, ততই একস্থানে স্থির থাকিতে পারেন না। ভরদ্বাজের সহিত আর দেখা করেন না। তাঁহারা খুঁজিয়া বেড়ায়, দেখা পায় না। মানুষ

দেখিলে হৃদয়ের জ্বালা আরও বাড়িয়া উঠে, জঙ্গলে পশু পক্ষীর সহিত বাস হইতে লাগিল, পশু পক্ষীও তাঁহার কাতর ভাবে কাতর। তিনি কোন পশুকে আহার দেন, কাহার গলা চুল্কাইয়া দেন, কাহাকেও স্নান করাইয়া দেন, এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে একদিন এক ক্রৌঞ্চমিথুন বড় আদর করিয়া পরস্পর বসিয়া খেলা করিতেছে, এ ওর গায় পড়িতেছে, এ ওকে ঠোকরাইতেছে, এ একবার সরিয়া দূরে যাইতেছে, ও আবার সরিয়া সরিয়া ঘেঁসিয়া যাইতেছে। এ একবার উলটিয়া উহার ঘাড়ে পড়িতেছে, ও আবার উলটিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িতেছে। আবার উড়িয়া উড়িয়া পাখা নাড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শব্দ করিয়া আর এক ডালে বসিতেছে, বাল্মীকি একতান মনে উহাদের ক্রীড়া দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, "ইহারা আমা অপেক্ষা কত সুখী, আমি কেন অমনি করিয়া আমোদে মত্ত হইয়া বেড়াই না। আমারও ত কত সঙ্গী আছে।" আর ভাবিতে পারিলেন না। পূর্ব্ব কথা আবার নূতন হইয়া হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, হঠাৎ একটা তীর আসিয়া একটি পক্ষীর প্রাণ সংহার করিল। পক্ষী পড়িয়া ভূমে লুটাইয়া ছটফট করিতে লাগিল। ব্যাধ দৌড়িয়া পাখী লইতে আসিল। বাল্মীকি বলিলেন, রে পাপাত্মা—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগমঃ শাশ্বতী সমা
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং।

বলিবামাত্র বাল্মীকি দেখিলেন, নির্ঝরমধ্য হইতে একটি কন্যা কানন-পথ আলো করিয়া আসিতেছে, তাহার কান্তি অপ্সরাবিনিন্দিত, জ্যোৎস্না অপেক্ষাও স্নিগ্ধ মন্দ ও হৃদয় মুগ্ধকর। কামিনীর কমনীয় কান্তি দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ব্যাধ ক্রৌঞ্চ সংগ্রহ করিতে হস্ত প্রসারণ করিতে ছিল, সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। পশু, পক্ষীগণ নীরব হইল। কন্যা বাল্মীকির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাল্মীকির কথা সরিল না, কন্যাও বাল্মীকিকে কথা কহিবার অবকাশ দিলেন না। বলিলেন, "বাল্মীকি, বিস্মিত হইও না, আমি সরস্বতী, ব্রাহ্মণদিগের কুলদেবতা। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাহাকেও তোমার মত কোমল হৃদয় দেখি নাই এজন্য তোমায় এই বীণা দিতে আসিয়াছি। এই বীণা তোমার ও তোমার মত লোকের হাতে চিরদিন থাকিবে, তোমরা পরহিতব্রতে দীক্ষিত হইয়া কেবল পরের জন্য ইহার ব্যবহার করিবে।" বাল্মীকি চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া বীণাগ্রহণ করিলেন, কিন্তু বীণা তাঁহার হাতেই রহিল; সরস্বতী অন্তর্দ্ধান হইলেন।

পঞ্চম খণ্ড।

বিশ্বামিত্র পৃথিবী হইতে নূতন সৃষ্টির জন্য প্রস্থান করিলে পুরাতন সৃষ্টির কি হইল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

পৃথিবীময় গোলমাল, অরাজক, লুঠপাট, সর্ব্বদা শোণিতস্রোত-প্রবাহ। আমরা ইতিহাসে অনেক অরাজক সময়ের বিষয় পাঠ করিয়া থাকি। যবন-সাম্রাজ্য বিনাশ হইলে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপন পর্য্যন্ত ভারতে যেরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়াছিল, এমন বোধ হয় পৃথিবীর কোথাও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বিশ্বামিত্রের স্বর্গার্থগমনের পর যাহা ঘটে, উহা তাহার শতাংশের একাংশও নহে। মোটামুটি বলিতে গেলে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাক্ষস ও বানর এই চারিটী প্রধান রাজত্ব ছিল। যবন ম্লেচ্ছ, চীন, হূনাদির রাজ্য, বিশ্বামিত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের রাজারা অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকে পলাইয়া বশিষ্ঠের আশ্রয় পাইয়াছিলেন, অনেকে যে, কে কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার ঠিক নাই, তাঁহাদের রাজ্যেও ভয়ানক বিশৃঙ্খলা। লুঠেরা দল বাঁধিয়া দিনে লুঠ করে, নগর দাহ করে, নগরকে নগর কাটিয়া ওয়ার করিয়া দেয়। এই সময় বাল্মীকি সর্ব্বপ্রধান লুঠেরা-দলের আধিপত্য ত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয় নাই, তাহারা গুহক নামক চণ্ডালকে কর্ত্তা করিয়া সমস্ত হিন্দুস্থান লুঠ আরম্ভ করিয়াছে। আজি যমুনোত্রী, কালি প্রয়াগ, অদ্য শতদ্রু সংগম, পরশ্বঃ সরযূতীরে লুঠ করিতে লাগিয়াছে। এই সময়ে লুঠের দল দেখিলে কলির একাকার বোধ হইত, বড় বড় দলে ম্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস, বানর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সব একত্র আহার, একত্র শয়ন, এক ব্যবসায় এক আমোদে মত্ত হইয়া মহাধুমধামে বাস, এক নরহত্যা ও দেশ লুণ্ঠনকার্য্যে সব ব্রতী, তাহারা একেবারে দেশেরও দুর্দ্দম হইয়া উঠিল। এই ঘোর বিশৃঙ্খলার সময় যদি একটি রাজত্ব প্রবল থাকিত, তাহা হইলে হইত, যদি এক জাতির প্রাধান্য থাকিত, তাহা হইলেও হইত, তাহা ছিল না। সকল রাজ্যেই দুইটি করিয়া দল ছিল। সকল জাতির মধ্যেই অনৈক্য ছিল, যে দলের হস্তে রাজক্ষমতা ছিল, তাহারা ঘোর অত্যাচারী, তাহাদের দারুণ অত্যাচার অপেক্ষা লুঠেরাদিগের অত্যাচার সহস্র অংশে শ্রেষ্ঠ। লুঠেরারা খুন করিত, উহারা দগ্ধাইয়া দগ্ধাইয়া মারিত। এই সময়ে রাবণ প্রবল পরাক্রম নরপতি। পরস্ত্রীহরণ, পরধন অপহরণ, পরদেশ লুণ্ঠন, পর পীড়ন, ক্রীড়ার্থ পরের যন্ত্রণাপ্রদান, তাঁহার প্রধান আমোদ। তাহার দেশে তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষে তাঁহার ভ্রাতা বিভীষণ। রাবণ বিভীষণকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বিভীষণের স্বপক্ষ হইয়া কথা কহিয়াছিল বলিয়া, একজন প্রধান মন্ত্রীর নাসাকর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন। বানররাজাধিপ সুগ্রীবের দলের সহিত বিভীষণের মিত্রতা হইবার সম্ভাবনা, এই জন্য খর দূষণ নামক নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ও অবিমৃষ্য-

কারী সেনাপতিদ্বয়কে দণ্ডকারণ্যে সুগ্রীবের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন।

বানরদিগের দেশে বালিরাজা নিজ বিরুদ্ধ পক্ষকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। নিজে ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতেন। বড় বড় লোকালয় সকল বালির অনুচরবর্গের অত্যাচারে জনশূন্য ভয়ঙ্কর মরুর ন্যায় হইয়াছিল। ঐ যে "দণ্ডকারণ্য" "দণ্ডকারণ্য" শুনা যায়, উহা এককালে সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা নির্জ্জন অরণ্য, সিংহ—ব্যাঘ্রাদিনিবাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দুইদল, দুই দলই বা বলি কেন? সকলেই স্ব স্ব প্রধান তবে এই সমস্ত স্ব স্ব প্রধান, ব্রাহ্মণদিগকে দুই-দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক-দলের প্রধান নায়ক পরশুরাম—ক্ষত্রিয়ের নাম পর্য্যন্ত লোপ করিতে কৃতসংকল্প। কিন্তু পরশুরাম সকলের উপর চটা, তিনি সমুদ্রতীরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন; ব্রাহ্মণেরা তাঁহার কথামত কাজ না করাতে আবার ক্ষত্রিয় প্রবল হইয়াছে; অতএব তাঁহার ইচ্ছা দুয়েরই মূলোচ্ছেদ হয়। তিনি নিজেই একা একসহস্র, তিনি ব্রাহ্মণদিগের কার্য্যে যোগ দেন না, তাঁহার মত যাহারা ক্ষত্রিয়ান্তক, তাহারা যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। ব্রাহ্মণদিগের অপর দলের অধিনায়ক বশিষ্ঠ, তিনিও আপন দলের সর্ব্বময় প্রভু নহেন। তবে তাঁহার দলে তাঁহার কতকটা প্রভুত্ব আছে।

ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে একদল বশিষ্ঠের নিকট নানাপ্রকারে বাধ্য, এইজন্য তাহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে যাহাতে মিল থাকে, তাহার জন্য যত্নবান্। এই দলের মধ্যে অযোধ্যার ও মিথিলার রাজবংশ প্রধান। আর এক দল পরশুরাম যেমন ক্ষত্রিয়ান্তক, সেইরূপ তাঁহারা ব্রাহ্মণান্তক। বিশ্বামিত্রবংশ ইহাদের সর্ব্বপ্রধান। বশিষ্ঠ ভিন্ন আর সকল দলই পরস্পর অনিষ্ট করিবার জন্য প্রাণও দিতে পারে। ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী খরদূষণকে আহ্বান করিতে কখন কিন্তু করিতেন না। প্রয়োজন হইলে পর-পক্ষপীড়নের জন্য দস্যুদল আহ্বান করিতে কাহারও মনে কোনরূপ কষ্ট হইত না, সামান্য কারণে বিবাদ হইয়া দেশকে দেশ ছারখার হইয়া যাইত। অধিক উদাহরণ দিতে হইবে না; একদিন বিশ্বামিত্রের রাজধানী কান্যকুব্জনগরে একজন ব্রাহ্মণ ধরা পড়িল। মন্ত্রী ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত, কষাঘাত করিলেন, তাহার নাসা কর্ণচ্ছেদ করিয়া কর্ণে গলা সীসা ঢালিয়া দিলেন। তাহার পর বহুসংখ্যক কুকুর আনিয়া তাহাকে এই সকল কুকুর সমভিব্যাহারে পিঁজরাবদ্ধ করিলেন, দারুণ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজের নাম করিল। ভরদ্বাজ

ঋষি বহুসংখ্যক শিষ্য সঙ্গে যমুনা হইতে অল্প দূরে বাস করেন, তিনি এক প্রকাণ্ড জঙ্গলখণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা, কিন্তু তিনি বশিষ্ঠ বা পরশুরাম কোন দলেই নহেন। তাঁহার মত ব্রাহ্মণ নির্ব্বিরোধে থাকিবে, তিনি পৌরোহিত্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন; কিন্তু তিনি অসদ্ভাবও করেন না, অতএব তাঁহাকে সকলেই ভক্তি করে। মন্ত্রী যন্ত্রণায় মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের মুখে ভরদ্বাজের নাম শুনিয়া উঁহাকে ভরদ্বাজের গুপ্তচর মনে করিয়া আরও যন্ত্রণা দিয়া উঁহার প্রাণবধ করিলেন, এবং কুড়িদল দস্যু সংগ্রহ করতঃ পরদিন ভরদ্বাজ মুনির তপোবনের চারিদিকে আগুন লাগাইয়া দিলেন। ভরদ্বাজ এবং তাহার কয়েকজন শিষ্য যোগবলে নিস্তার পাইলেন; কিন্তু অসংখ্য প্রাণিসমেত সমস্ত বন একদিনে মরুময় হইয়া উঠিল।

২

এদিকে বাল্মীকি সরস্বতীর বীণা পাইয়া, ও কবিতার আস্বাদ পাইয়া হিমালয়ের গভীর বনভূমি ত্যাগকরতঃ লোকালয়ে আসিলেন, আসিয়া লোকালয়ের ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, লোকের দুঃখে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই নয়ন দিয়া জলধারা পড়িল। এই জলধারা কয়জনের পড়ে? কিন্তু এ জলধারা এক একটি অমূল্যধন, একবিন্দুতে শত অত্যাচার শমিত হয়। এই ভাবে রোদন ও গান করিতে করিতে বাল্মীকি সমস্ত হিন্দুস্থান পর্য্যটন করিলেন। কিরূপে নিবারণ করেন জানেন না; কিন্তু আর থাকিতেও পারেন না। একদিন এক নদীতীরে বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন, আর নয়নাসারে সলিলপ্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছেন, এমন সময়ে অতিদূরে ঘোরতর ভয়ঙ্কর শব্দ হইল;—প্রথম ডাকাইতির মত চীৎকার, তাহার পর আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল, বাল্মীকি আর থাকিতে পারিলেন না। দৌড়িয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। দূরে গিয়া দেখেন, এক প্রকাণ্ড নগরে লুঠ আরম্ভ হইয়াছে। বাল্মীকি বীণা লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং দস্যুদলের নায়কের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তোমরা এ কর্ম্ম ছাড়।"

পরের জন্য কান্নার অনেক গুণ, তুমি নিজের জন্য কাঁদ, তোমার কান্না কেহ শুনিবে না, তুমি একবার পরের জন্য কাঁদ দেখি, সকলেই তোমার সঙ্গে কাঁদিবে, তাহাতে আবার যদি তুমি কাঁদিবার ধরণ জান, তাহা হইলে আরও কাঁদিবে। বাল্মীকির রোদনে ও গানে এবং তাঁহার ভাবে দস্যুদলপতি একটু গলিলেন, গলিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন যে, গায়ক বাল্মীকি। দস্যুদলপতি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ লুঠতরাজ বন্ধ করিতে হুকুম দিলেন। তাঁহার নিজের দল থামিল,

কিন্তু তাঁহার দলে যে ম্লেচ্ছ যবন বানর ও রাক্ষস ছিল, তাহারা থামিবে কেন? দলপতি নিজে তাহাদিগকে থামাইতে গেলেন; কিন্তু গিয়া দেখেন, রাক্ষসেরা রাজপরিবারস্থ সকলকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। দস্যুদলপতি তখনও তাহাদের থামিতে বলিলেন, একে রাক্ষস তাহাতে মদ খাইয়া লুঠে উন্মত্ত হইয়াছে, তাঁহার কথা তাহারা কেন শুনিবে, তাহারা আরও ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন দলপতি বাহুবলে তাহাদিগকে নগরবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু বাহিরে গিয়াই তাহারা যবন ম্লেচ্ছ ও বানরের সহিত মিলিত হইয়া ভীমপরাক্রমে দস্যুশিবির আক্রমণ করিল। দলপতি কষ্টে শিবিরমধ্যে আসিলেন, আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাঁহাতে চমৎকৃত হইলেন। দেখিলেন বাল্মীকি বীণাহস্তে "ভাই ভাই" গাইতেছেন, সমস্ত দস্যুদল শুনিয়া কেবল কাঁদিতেছে,—নিঃশব্দে সহস্র যোদ্ধা কাঁদিতেছে। নরহত্যা যাহাদের ব্যবসায়, জীবিকা, তাহারা সকলেই কাঁদিতেছে—অস্ত্রত্যাগ করিয়াছে। সমবেত রাক্ষসাদি যে আক্রমণ করিতেছে, সেদিকে দৃক্‌পাতও নাই। রাক্ষসেরা ভীমপরাক্রমে আক্রমণ করিল, বাল্মীকির গান আরও উচ্চ হইল, দয়াভিক্ষায় পূর্ণ হইল। মানবদুঃখবর্ণনায় পূর্ণ হইল। ক্রমে মাতাইয়া তুলিল, রাক্ষসগণও ক্রমে মোহিত হইয়া শুনিতে লাগিল। ভক্তদিগের গান শুনিয়া বাল্মীকির যাহা হইয়াছিল, আজি সমস্ত দস্যুদলের সেই ভাব হইল। কি যবন, কি ম্লেচ্ছ, কি রাক্ষস, কি বানর সব মোহিত, দয়া সকল হৃদয়ে প্রবল হইল। গানে কেমন বলিতেছে "ভাই রে যা করেছিস্, করেছিস্, আর করিস্ নে, দেখ দেখি, তোর যদি এমনি হয়, তুই কি করিস্। সকলেই মানুষ তো? তোর শরীর যেমন রক্তমাংসময় সবারই তেমনি। মনে কর, যদি তোর লাগে, কত দরদ হয়, কিন্তু আপনার একটু লাগিলে অস্থির হস্, আর অন্যের মস্তকে তরবারি আঘাত করিস্। আপন পরিবারের প্রতি নজর দিলে সইতে পারিস্ না; কিন্তু পরের পরিবারের প্রতি কত অত্যাচার করিস্। আহা! একবার মনে মনে কর দেখি রে তাদের তখন কি হয়। পরের ছেলের মাথা অনায়াসেই কাটিস্, কিন্তু একবার মনে কর দেখি রে তোর নিজের ছেলের ও রকম হলে কি হয়?" শ্রোতৃগণ ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিয়া গড়াইয়া পড়িল, "রক্ষা কর গুরো! উপায় বলিয়া দেও।" আবার গান চলিল, "সব ভাই ভাই বল, সবাই আপন, পর কেহ নাই। ব্রহ্ম ছাড়া শত্রু আর নাই, সবাই মানুষ, শীতে তোমার যেমন, সবারই তেমনি। গ্রীষ্মে তোমার যায় হয়, সবারই তেমনি। বর্ষার জলে তুমি ভিজ, সবাই সেইরূপ ভিজে। অতএব তোমায় আর মানুষে ভেদ নাই। সবাই মিল, সবাই মিল,

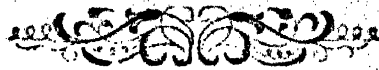
একহাত একপ্রাণ হও, আমি তোমার, তুমি আমার হও। এক তৃণ সবার শয্যা, এক পৃথিবী সবার বাস, এক সূর্য্য সকলকে আলো দেয়, এক চাঁদে সকলের প্রাণ জুড়ায়। তবে প্রাণ কেন ভুষ্ট থাকে ?” গানে সে কত বলিতেছে, কে বলিবে, কতক্ষণ যে গাইল, কে বলিবে ? হীন কবি বাল্মীকির গান কতক্ষণ ব্যাখ্যা করিবে ?

গানের ফল এই হইল, সকল দস্যু বেশত্যাগ করিয়া বাল্মীকির পায়ে জড়াইয়া পড়িল। দস্যুদলপতি গুহকচণ্ডাল পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। বাল্মীকি তাহাদিগকে পা ছুঁইতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, “আমি দেবতাও নহি, অবতারও নহি, রাজাও নহি, তোমরাও যাহা, আমিও তাহাই। আমার পায়ে পড়িলে কি হইবে, দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, আর করিও না। জীবন পরিবর্ত্তন করিয়া সৎপথে জীবন কাটাও সুখী হইবে।”

এই বলিয়া সকলকে নিবৃত্ত করিতেছেন, এমন সময়ে নগরবাসীদিগের হতাবশিষ্টগণ কেহ খঞ্জপদ, কেহ চক্ষুকাণা, কাহারও অঙ্গেতে গাঢ়ক্ষত হইয়াছে, কেহ বৃদ্ধ পিতাকে কাঁধে করিয়া, কেহ অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায় শিশু সন্তান বুকে করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছে; দেখিতে পাইল,রাজবংশ রাক্ষসে খাইয়া ফেলিয়াছে, অরাজক রাজ্যে বাস করা অবিধেয় ভাবিয়া যাহার যেখানে আত্মীয় আছে, সে তথায় যাইতেছে। বাল্মীকি উহাদের দেখাইয়া বলিলেন, “দেখ তোমাদের কীর্ত্তি দেখ,” বলিতে না বলিতে চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল। সকলেই দেখিয়া শোকে অনুতাপে পাপবোধে বিষণ্ণ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। বাল্মীকি বলিলেন, “যাও উহাদের ফিরাইয়া লইয়া এস। সকলে উহাদের নিকট গেল, যাইবামাত্র নগরবাসিগণ আবার আর্ত্তনাদ করিয়া পলায়নপরায়ণ হইল। ডাকাইতেরা তখন বুঝিতে পারিল, দুষ্টলোকে সত্য কথা বলিলেও লোকে বিশ্বাস করে না। তাহারা বাল্মীকিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করিল; বাল্মীকি যে দস্যু নন তাহা উহারা জানিবে কি প্রকারে ?

যাহা হউক বাল্মীকি উহাদিগকে ফিরাইলেন, এবারও আপনগানে বাল্মীকি এমনি মিষ্ট তান ধরিয়া উহাদের নিকট এমনি করুণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে,উহাদের চিত্ত দয়ার্দ্র হইল; উহারা বাল্মীকির কথায় নগরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু অরাজক দেশে বাস করা অন্যায় এজন্য উহারা বাল্মীকিকে রাজা হইতে অনুরোধ করিল। বাল্মীকি রাজা হইলেন না, কিন্তু তিনি দস্যুদলপতি গুহক চণ্ডালকে রাজা করিয়া দিলেন। গুহকের রাজ্যে সমবেত সমস্ত ম্লেচ্ছ যবন বানর রাক্ষস একত্র সুখে বাস করিতে লাগিল, আর দস্যুবৃত্তির নামও করিত না। পরদেশ লুণ্ঠনের ইচ্ছা দূরীভূত হইল। কিন্তু অন্য কেহ

অত্যাচার করিতে অসিলে, উহারা পরাক্রমসহকারে সে উপদ্রব নিবারণ করিত; সুতরাং পৃথিবীমধ্যে একটী শান্তিময় রাজ্য স্থাপিত হইল। কিন্তু এ রাজ্য যে স্থায়ী হইবে, এত দস্যু এক হইয়া থাকিবে বাল্মীকির তাহা মনে মনে বিশ্বাস হইল না, কিন্তু পরিণামে দৃষ্ট হইবে যে, এই রাজ্য হইতেই পৃথিবীর শান্তি পুনঃস্থাপিত হইবে। বাল্মীকি প্রতিমাসে এক একবার গুহকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, আর অপর সময় আপন আপন হৃদয়ের আবেশমত গান করিয়া পৃথিবী শুদ্ধ বেড়াইয়া বেড়াইতেন।



আমার পরাণ।

১

কল্পনে!
বুকের পাষাণ মম, এ জ্যোৎস্নায় একবার,
দেও সরাইয়া—
প্রকৃতির প্রীতিমাখা, মধুর হৃদয়ে আমি,
যাই মিশাইয়া।
তুষার আবৃত ভূমে, তরুণ অরুণভাতি,
যেমনি বিভাত।
দিক্ হতে দিগন্তরে, বিমল কৌমুদীরাশি,
তেমতি সম্পাত।
জীবন্ত স্বপন যেন, অনন্ত-গগন-বক্ষে,
পড়েছে ছড়ায়ে।
স্থাবর জঙ্গম জীব; সকলি মোহেতে যেন,
নয়ন মেলায়ে।
আশার মধুর স্মৃতি, যেন আজ বিশ্ব খানি,
আবেশে অচল।
বিধির প্রথম সৃষ্টি, মধুর আলোকে যেন,
ভুবন উজ্জ্বল।
কল্পনে! বারেক আজ, বুকের পাষাণখানি,
দেও সরাইয়ে।
শূন্য-পথ ভাসাইয়া, জনস্রোত মাতাইয়া,
এই জ্যোৎস্নার সনে যাই মিশাইয়ে।

পরাণ আমার!
হৃদয় কন্দর হ'তে, উথলিয়া একবার,
আইস পড়ায়ে।
শূন্যে শূন্যে ভেসে যাই, ভাসাইয়া দিগন্তর,
সঙ্গীত ছড়ায়ে।
সামান্য বিহঙ্গ-গীতে, সুদূর কাননস্থলী,
প্রতিধ্বনিময়।
জীবন্ত সঙ্গীতময়, ভুলিবে পরাণ মম,
তুমি এ সময়—
নীরবে রহিলে কেন, মিশায়ে হৃদয় সনে,
এই জোছনায়।
বিন্দু বরিষণে যায়, সিন্ধু উছলিয়া যায়,
সে বেগ কোথায়।
ওই দেখ দিগন্তর, হৃদে প্রাণ থর থর,
প্রকৃতির কোলে।
ওই শোন কোকিলার, মর্ম্মভেদী "কুহুরব"
আবেগে উথলে।

মলয় ভূধর ছাড়ি, বিহ্বল মেঘের ওই,
ছুটেছে উল্লাসে
নদীখাত সরোবরে, জড়ের অসাড় প্রাণ—
তাহাও বিকাশে।
তুমি রে পরাণ মম, অনন্ত প্রবাহময়,
তুমি এ সময়—
কেনই মিশায়ে রও, হৃদয় শ্মশানে মম,
হ'য়ে আত্মময়।

৩

হৃদয় কন্দর হতে, নায়াগ্রা-প্রপাত মত,
চলরে উথলি,
সঙ্গীত প্রবাহ ঢালি, আলোড়িয়া শূন্য মর্ত্ত,
দিগন্ত আকুলি।
গভীর উচ্ছ্বাসে তব, নৈশশান্তি স্তব্ধ করি
চল ভেসে যাই,
ওই জোছনার সনে, ও অনন্ত নভস্তলে,
চলরে মিশাই।
এ মধুর চন্দ্রালোকে, প্রাণের পীযূষ তোর
দেও মাখাইয়া।
স্বপ্নময় শান্তিসনে, কাতর আবেগ তব,
দেও মিশাইয়া।
দিগন্ত আকুল হ'য়ে, ছুটুক অনন্ত স্রোতে,
জগত ম্লাতারে।
মধুর জোছনা সনে, মধুর যাতনা তব,
ভাসুক মিশায়ে।
প্রাণে চন্দ্রকরে মিশি বিপুল এ ছায়াপথ,
উঠুক উজলি।
জড়ের অন্তর্দি বক্ষে, নরের মধুর প্রাণে,
ছুটুক বিজলি।
অনন্ত অসীম নভ, সে মোহিনী প্রতিভায়,
উঠুক জলিয়ে।
মরতের নর নারী, বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে,
দেখুক চাহিয়ে।

৪

ইচ্ছা করে একবার, অনাদি অনন্ত ওই,
গগনের তলে।
কলেবর বিস্তারিয়া, হৃদয় বিদীর্ণ করি,
দিই প্রাণ ঢেলে।
ক্ষত মর্ম্মস্থান হ'তে, অজস্র প্রপাত পাতে,
পরাণ আমার।
জোছনায় জোছনায়, ঝরিয়া পড়ুক ভূমে,
ভাসায়ে সংসার।
ভূতলে কঠিন যাহা, দ্রবীভূত করি তাহা,
প্রাণের অমৃতে।
ক্ষিতি শিলা নর নারী, পাষাণ পরাণ আর,
যা কিছু মহীতে।
পরাণে পরাণে এই, শূন্য পথ ভেসে যাক্,
আর—এ সংসার।
আত্মপর জ্ঞান ভুলে, মুহূর্ত্তেক মগ্ন হোক্,
পরাণে আমার।
প্রাণের নিভৃত ব্যথা, নর নারী হৃদে যাহা,
আমার মতন।
আমার পরাণ সনে, উথলি উঠুক তাহা,
আকুলি ভুবন।

৫

বিধাতা আমায় কেন, এ নিষ্ঠুর সংসারের,
মানব গড়িলে।
মানব করিলে যদি, এত প্রাণ কেন বিধি,
এ হৃদে ঢালিলে।
এ প্রাণ দেখাব কায়, কে আছে হে এ ধরায়,
বুঝে কোন্ জন?
শুধু যে কঠিন করি, নিখিল সংসার খানি,
করিলে সৃজন।

বরঞ্চ প্রকৃতি ভাল, কেবলি কঠিন শূন্যে,
উহায় সৃজিলে।
কঠোর স্বার্থের মায়া, গর্ব্বের দারুণ ছায়া,
উহায় না দিলে।
তাহ'তে যে নিদারুণ, গঠিলে সংসার বিধি,
তাহ'তে পাষাণ।
নর নারী হৃদিতলে, স্থাপিলে মরণোপম,
কৃতঘ্ন পরাণ।
দারুণ সংসারে হেন, আমারে মানব করি,
কেনই সৃজিলে।
এই প্রকৃতির বুকে, কেন না এ প্রাণটুকু,
মিশায়ে রাখিলে।
এ প্রাণ দেখাব কায়,কে আছে হে এ ধরায়,
বুঝে কোন্ জন?
নিষ্ঠুর সংসারে বিধি, এ হেন পরাণী কেন
করিলে সৃজন!

৬

হাসিমুখে মিষ্ট কথা, নিদ্রিতের স্বপ্ন মত,
শুনিতে সুন্দর।
পদ্ম সরসীর মত, অনিন্দ্য বদনখানি,
বড় মনোহর।
ভুরু কোলে চল চল, ফুটানা নয়নযুগ,
তাও মোহকর।
এই প্রকৃতির মত, শূন্য জোছনায় ভরা,
গঠনো সুন্দর।
সকলি সুন্দর যার, মর্ম্মে কেন শিলা তার,
বল দয়াময়!
যতনে সর্ব্বাঙ্গ গঠি, অনাদরে কেন বল,
সৃজিলে হৃদয়।
হায়রে সংসার তোর, পরম পীযূষ যাহা,
করেছি সেবন।
হায়রে সংসার তোর, অমূল্য রতন যাহা,
দেখেছি সে ধন।
পীযূষে গরল তোর, রতনে ভুজঙ্গফণা,—
তাও—আধ আধ!
এ প্রাণ হৃদয়ে যার, তোমার ভাণ্ডারে তার,
মিটেনা যে সাধ!

শ্রী ঈঃ—

....

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

শম্ভু-বংশ-চরিত অর্থাৎ কাকিনীয়াধিপতি মহোদয়গণের বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শ্রীবনওয়ারিচন্দ্র চৌধুরী-প্রণীত।

ইদানীং মোসাহেবেরা বংশচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ভাল হইয়াছে। শম্ভু-বংশ-চরিত মোসাহেবের লেখা কি না তাহা আমরা নিশ্চয় জানি না। প্রথমতঃ "কাকিনীয়াধিপতি মহোদয়গণ" এই কয়টী কথা পড়িয়া আমাদের সন্দেহ হয়। কাকিনীয়ার একঘর অধিপতি আছেন, এ কথা আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতাম না; এক্ষণে জানিলাম যে, গ্রন্থকারের ভুল হইয়াছে। যদি উপযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা বংশচরিত লিখিত হয়, তাহা হইলে উপকার আছে

সন্দেহ নাই, সামান্য লোকের বংশচরিত লিখিতে পারিলেও ইতিহাসলেখক, সমাজতত্ত্ববিৎ প্রভৃতি অনেকেরই সাহায্য হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক নদীয়ার ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত লিখিত হইয়াছিল, আমরা তাঁহার গ্রন্থের অনেক প্রশংসা করিয়া থাকি, কিন্তু শম্ভুবংশচরিতের কোন প্রশংসা করিতে পারিলাম না। কোন চৌধুরাণী কিপ্রকার রূপবতী ছিলেন বা কোন চৌধুরী কোন তীর্থপর্য্যটন করিয়াছিলেন কেবল এই পরিচয় বংশতিলকদের ভাল লাগিতে পারে; কিন্তু তাহাতে সাধারণের কি উপকার? যদি সাধারণের উপকারের নিমিত্ত এই গ্রন্থ লিখিত না হইয়া থাকে; তবে ইহা বাড়ী বাড়ী পাঠাইবার প্রয়োজন কি? যদি কোন ধনবান্ আপনার বংশচরিত ফরমাস দিতে চাহেন, তবে ভাল কারিগরের কাছে দিলে সাধারণ পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত হইলে হইতে পারে।

ভারতমহিলা, শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত, ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। মূল্য ॥০ আনা।

১৮৭৫ সালে মহারাজা হোলকার কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কালেজ দর্শন করিতে যান ও তৎকালীন সংস্কৃত কালেজের ছাত্রবর্গের মধ্যে যে কেহ "ভারতবর্ষীয় প্রাচীন লেখকগণ স্ত্রীচরিত্রের কতদূর উৎকর্ষ কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন" এই বিষয়ে যে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে, তাঁহাকে প্রাইজ দিবেন বলিয়া যান। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পরীক্ষক নিযুক্ত হন, পরীক্ষায় ভারতমহিলা উত্তীর্ণ হয়।

গ্রন্থখানি ঠিক স্কুলবয়ের প্রাইজ এসে নহে। ইহাতে প্রাচীন সংহিতাসমূহ হইতে তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা, বিবাহপ্রণালী, শিক্ষাপ্রণালী, ধনাধিকার প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা আছে। সমাজের পরিবর্ত্তনসহকারে স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থাদির যেরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহাও নির্ণীত হইয়াছে।

তাহার পর স্মৃতিসমূহে, পুরাণসমূহে, কাব্যসমূহে, রামায়ণে ও মহাভারতে স্ত্রীচরিত্রবিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইবার যথেষ্ট চেষ্টাও আছে। গ্রন্থকার এই সকল গ্রন্থ হইতে বহুসংখ্যক নারীচরিত্র লইয়া তাহাদের সমালোচনাও করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনে যাহা ভাল বলিয়া প্রকাশ হইয়াছিল, বঙ্গদর্শনে তাহার সমালোচনা ভাল দেখায় না বলিয়া আমরা সমালোচনা করিতে নিরস্ত হইলাম। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, স্ত্রীলোকগণ, এমন কি অনেক পুরুষেও, এ গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক আমোদ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

কৃষিশিক্ষা শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত, কলিকাতা চিকিৎসাযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা।

এই গ্রন্থখানি প্রায় দুই তিনবৎসর হইল প্রচারিত হইয়াছে, এতদিন ইহার গুণাগুণ প্রতিপন্ন হইয়া থাকিবে। গ্রাম্য স্কুলের উপযোগী করিবার নিমিত্ত গ্রন্থকার বিশেষ যত্ন পাইয়াছেন; কিন্তু ঐ সকল স্কুলে চলিত হইয়াছে কি না তাহা আমরা জানি না। আমাদের দেশে কৃষকেরা কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে যাহা জানে, তদপেক্ষা এই গ্রন্থে যে বিশেষ বাহুল্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এমত বোধ হয় না, তথাপি ইহাতে যাহা লিখিত আছে, তাহা অনেকের পক্ষে নূতন। গ্রন্থকার শেষভাগে লিখিয়াছেন :—

"বর্ত্তমানকালে চাকুরীর দুর্দ্দশা দেখিয়া অনেকের ইচ্ছা হইয়াছে হয় কৃষি, নয় বাণিজ্য অবলম্বন করেন। বাণিজ্যে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় বলিয়া, তাহা অনেকের পক্ষে দুর্ঘট। কৃষিকার্য্যে অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধন লাগিলেও তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতার অভাবে কেহই তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। "লাঙ্গল করার" ইচ্ছা হয়, কিন্তু চাসের ফল হঠাৎ দেখিতে না পাওয়ায় কাহারই সে বিষয়ে সাহস হয় না। তাঁহাদিগকে প্রচলিত কৃষিপ্রণালীতে একখানি লাঙ্গলের ফলাফল বিষয়ে, কিয়ৎপরিমাণে আভাস দিবার জন্য পার্শ্বের হিসাবটী সংগ্রহ করিয়াছি।" অর্থাৎ—

আশুধান্যের লাভ	ফিঃ বিঘায়	৩৭॥
আমন ধান্যের ...	... ...	৪২॥
তামাকের	... ...	৩৩॥
হরিদ্রার	... ...	৫৪৮৹

ইত্যাদি

এই লাভের পরিমাণ যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে আহ্লাদের বিষয়; কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে, এক সময়ে হাইকোর্টে হিলসাহেবের মোকদ্দমায় ফিঃ বিঘায় রাইয়তওয়ারি খাজনার নিরীখ বাঁধিতে গিয়া চাসের খরচা প্রজাকে দিয়া মুনাফা সমুদয় জমিদারকে দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন জমিরই নিরীখ ত্রিশ চল্লিশ টাকা হয় নাই, তবে সে দশ আইনের প্রথম সময়ের কথা, এতদিনে মুনাফা কিছু বাড়িয়া থাকিবে, তথাপি ফিঃ বিঘায় চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা যে মুনাফা হইবে এমত বোধ হয় না।

কুসুমারিন্দম অর্থাৎ স্বকপোলকল্পিত উপন্যাস। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ পাল প্রণীত।

স্বকপোলকল্পিত এই কথা লিখিয়া না দিলে লোকে বুঝিতে পারিবে কি না গ্রন্থকার এই সন্দেহ করিয়া থাকিবেন। অতএব গ্রন্থকার বিশেষ বিজ্ঞ মনে করিয়া আমরা তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পড়িলাম "পথিকেরা দেখিল একখানা বৃহৎ সোনার থাল ধক্ ধক্ করিয়া জলিতেছে। আরবার দেখিল, হেমমালীর হাসি চলিয়া যাইতেছে। হেমমালীপরায়ণা হিরণ্দার হৈমহাসি লুকাইল,

মলিনবদনাদেবী বিধবা হইল।” এই স্থলে একটু নোট দিলে ভাল হইত, তাহা না দেওয়ায় আমরা অর্থ বুঝিতে পারিলাম না?

তাহার পর তৃতীয় পৃষ্ঠায় পড়িলাম :—

“নিশাসুন্দরী জগৎকে ভালবাসে, সে এখন পতিহীনা। জগৎকে সান্ত্বনা করিতে আকাশ সহচরীকে বলিল, “সখি আকাশ, জগৎ দিদির মুখে জল দে।” নিশার কথা শিরোধার্য্য করিয়া আকাশ শিশিররূপে জল দিতে লাগিল, শুষ্ক জগৎকে টস্‌টসে করিল।” আমরা আর অধিক পড়িতে পারিলাম না। যাঁহার সাধ্য থাকে তিনি পড়িবেন। গ্রন্থশেষে গ্রন্থকার শাসাইয়াছেন, “পাঠক! পাঠিকা তোমরাও হাসিয়া হাসিয়া বিদায় হও, সম্পাদককে আশীর্ব্বাদ কর, আর একদিন যেন তোমাদের কাছে এই রকম আখ্যায়িকা আরম্ভ করি।” আবার!

সদানন্দ। বিদ্রূপ পত্র। ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুন্সি মওলাবক্স প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পঞ্চানন্দের দেখাদেখি সদানন্দ, রসিকরাজ প্রভৃতি অবতীর্ণ হইয়াছেন। একখানি মাসিক পত্রিকা সুমগ্র হাস্যরসে পূর্ণ করিয়া মাসে মাসে প্রকাশিত করা গোপাল ভাঁড়েরও সাধ্যায়ত্ত নহে। যাত্রায় মধ্যে মধ্যে সং ভাল লাগে, তাহা বলিয়া আগা গোড়া সং কেহ সহ্য করিতে পারে না। সকল রসের সীমা আছে; কোন প্রধান রস দীর্ঘকাল মন্থন করিলে সে রস নষ্ট হইয়া যায়, ভাঁড়ামির ত কথাই নাই।

সন ১২৮৮ সাল।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

বঙ্গদর্শন।

৮৫ সংখ্যা।

আনন্দ মঠ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সেই জনহীন কানন,—এতক্ষণ অন্ধকার, শব্দহীন ছিল—এখন আলোকময়—পক্ষিকূজনশব্দিত হইয়া আনন্দময় হইল। সেই আনন্দময় প্রভাতে আনন্দময় কাননে, "আনন্দমন্দিরে," সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্ম্মে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। কাছে বসিয়া জীবানন্দ। এমন সময়ে ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মচারী বিনাবাক্যব্যয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন, কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। পরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন হইলে, ভবানন্দ, জীবানন্দ উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন। তখন সত্যানন্দ ভবানন্দকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না। তাহার পর উভয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ব্রহ্মচারী সকরুণ সহাস্যবদনে মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবা তোমার দুঃখে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কেবল সেই দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কল্যাণীর রক্ষাবৃত্তান্ত বর্ণিত করিলেন। তার পর বলিলেন যে, "চল তাহারা যেখানে আছে তোমাকে সেখানে লইয়া যাই।"

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। এই নবারুণোদিত প্রাতঃকালে, যখন

নিকটস্থ কানন সূর্য্যালোকে হীরকখচিতবৎ জ্বলিতেছে তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতর কি আছে মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না—দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিত-হৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভস্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্ত্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্ত্তিমান্ রাগ রাগিণী প্রভৃতিপরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সর্ব্বোপরি, বিষ্ণুর মাথার উপরে উচ্চ মঞ্চে বহুলরত্নমণ্ডিত আসনোপবিষ্টা এক মোহিনী মূর্ত্তি—লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে। ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর, অতি ভীত স্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকল দেখিতে পাইতেছ।" মহেন্দ্র বলিল, "পাইতেছি।"

ব্রহ্ম। উপরে কি আছে দেখিয়াছ।

মহে। দেখিয়াছি, কে উনি?

ব্রহ্ম। মা?

মহে। মা কে?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমরা যাঁর সন্তান।"

মহেন্দ্র। কে তিনি।

ব্রহ্ম। সময়ে চিনিবে। বল—বন্দে মাতরং। এখন চল, দেখিবে চল।

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন এক অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

ব্র। মা—যা ছিলেন

ম। সে কি?

ব্র। ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্যপশু সকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্যপশুর আবাস স্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা সকল-ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইঁহাকে প্রণাম কর।"

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন "এই পথে আইস।" ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন,

"দেখ মা যা হইয়াছেন?"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, "কালী ?"

ব্র। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্বা এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাতে খেটক খর্পর কেন ?"

ব্রহ্ম। আমরা সন্তান; অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল বন্দে মাতরং।

"বন্দে মাতরং" বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিল। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এই পথে আইস।" এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিক্ হইতে মধুরকণ্ঠ পক্ষিকুল গায়িয়া উঠিল। দেখিলেন এক মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন,

"এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তিশোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা"—বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদগদ কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল "দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ। এস আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি। তখন দুই জনে যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে, এক কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, "সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে, শরণ্যে ত্র্যম্বকে-গৌরি নারায়ণি নমোস্তু তে।"

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, মহেন্দ্র গদগদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মার এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব।"

ব্রহ্মচারী বলিল, "যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে। সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।"

মহেন্দ্র সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার স্ত্রী কন্যা কোথায় ?"

ব্রহ্ম। চল—দেখিবে চল।

মহেন্দ্র। তাহাদের একবারমাত্র আমি দেখিয়া বিদায় দিব ?

ব্রহ্ম। কেন বিদায় দিবে ?

ম। আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব।

ব্রহ্ম। কোথা বিদায় দিবে।

মহেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার গৃহে কেহ নাই, আমার আর স্থানও নাই। এ মহামারীর সময় আর কোথায় বা স্থান পাইব।"

ব্রহ্ম। যে পথে এখানে আসিলে, সেই পথে মন্দিরের বাহিরে যাও। মন্দিরদ্বারে তোমার স্ত্রী কন্যাকে দেখিতে

পাইবে। কল্যাণী এ পর্য্যন্ত অভুক্তা। যেখানে তাহারা বসিয়া আছে, সেই-খানে ভক্ষ্য সামগ্রী পাইবে। তাহাকে ভোজন করাইয়া তোমার যাহা অভিরুচি তাহা করিও, এক্ষণে আমাদিগের আর কাহারও সাক্ষাৎ পাইবে না। তোমার মন যদি এইরূপ থাকে, তবে উপযুক্ত সময়ে, তোমাকে দেখা দিব।

তখন অকস্মাৎ কোন পথে ব্রহ্মচারী অন্তর্হিত হইল। মহেন্দ্র পূর্ব্বপ্রদৃষ্ট পথে নির্গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, নাটমন্দিরে কল্যাণী কন্যা লইয়া বসিয়া আছে।

এ দিকে সত্যানন্দ অন্য সুরঙ্গ দিয়া অবতরণপূর্ব্বক এক নিভৃত ভূগর্ভকক্ষায় নামিলেন। সেখানে জীবানন্দ ও ভবানন্দ বসিয়া টাকা গণিয়া থরে থরে সাজাইতেছে। সেই ঘরে স্তূপে স্তূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, হীরক, প্রবাল, মুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে। গত রাত্রের লুঠের টাকা, ইহারা সাজাইয়া রাখিতেছে। সত্যানন্দ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "জীবানন্দ! মহেন্দ্র আসিবে। আসিলে সন্তানের বিশেষ উপকার আছে। কেন না তাহা হইলে উহার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থরাশি মার সেবায় অর্পিত হইবে। কিন্তু যতদিন সে কায়মনোবাক্যে মাতৃভক্ত না হয়, ততদিন তাহাকে গ্রহণ করিও না। তোমাদিগের হাতের কাজ সমাপ্ত হইলে, তোমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহার অনুসরণ করিও। সময় দেখিলে, উহাকে শ্রীবিষ্ণুমণ্ডপে উপস্থিত করিও। আর সময়ে হউক, অসময়ে হউক, উহাদিগের প্রাণরক্ষা করিও। কেন না যেমন দুষ্টের শাসন সন্তানের ধর্ম্ম, শিষ্টের রক্ষাও সেইরূপ ধর্ম্ম।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনেক দুঃখের পর মহেন্দ্র আর কল্যাণীতে সাক্ষাৎ হইল। কল্যাণী কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। মহেন্দ্র আরও কাঁদিল। কাঁদাকাটার পর চোখমুছার ধুম পড়িয়া গেল। যতবার চোখ মুছা যায়, ততবার আবার জল পড়ে। জলপড়া বন্ধ করিবার জন্য কল্যাণী খাবার কথা পাড়িল। ব্রহ্মচারীর কে অনুচর খাবার রাখিয়া গিয়াছে, কল্যাণী মহেন্দ্রকে তাহা খাইতে বলিল। দুর্ভিক্ষের দিন অন্ন ব্যঞ্জন পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই, কিন্তু দেশে যাহা আছে, সন্তানের কাছে তাহা সুলভ। সেই কানন সাধারণ মনুষ্যের অগম্য। যেখানে যে গাছে, যে ফল হয়, উপবাসী মনুষ্যগণ তাহা পাড়িয়া খায়। কিন্তু এই অগম্য অরণ্যের গাছের ফল, আর কেহ পায় না। এই জন্য ব্রহ্মচারীর অনুচর বহুতর বন্যফল ও কিছু দুগ্ধ আনিয়া রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিল। কল্যাণীর অনুরোধে মহেন্দ্র প্রথমে কিছু ভোজন করিলেন। তাহার পর ভুক্তাবশেষ কল্যাণী বিরলে বসিয়া কিছু খাইল। দুগ্ধ কন্যাকে কিছু

খাওয়াইল, কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখিল, আবার খাওয়াইবে। তার পর নিদ্রায় উভয়ে পীড়িত হইলে, উভয়ে শ্রমদূর করিল। পরে নিদ্রাভঙ্গের পর উভয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন, এখন কোথায় যাই। কল্যাণী বলিল, বাটীতে বিপদ্ বিবেচনা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, বাড়ীর অপেক্ষা বাহিরে বিপদ্ অধিক। তবে চল, বাড়ীতেই ফিরিয়া যাই। মহেন্দ্রেরও তাহা অভিপ্রেত। মহেন্দ্রের ইচ্ছা কল্যাণীকে গৃহে রাখিয়া কোন প্রকারে একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়া এই পরম রমণীয় অপার্থিব পবিত্রতাযুক্ত মাতৃসেবা ব্রত গ্রহণ করেন। অতএব তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। তখন দুইজনে গতক্লম হইয়া কন্যা কোলে তুলিয়া পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু পদচিহ্নে কোন পথে যাইতে হইবে, সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যানীমধ্যে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে, বন হইতে বাহির হইতে পারিলেই পথ পাইবেন। কিন্তু বন হইতে বাহির হইবার ত পথ পাওয়া যায় না। অনেকক্ষণ বনের ভিতর ঘুরিতে লাগিলেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই মঠেই ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন, নির্গমের পথ পাওয়া যায় না। সম্মুখে একজন বৈষ্ণববেশধারী অপরিচিত ব্রহ্মচারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। দেখিয়া মহেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোঁসাই হাস কেন?"

গোঁসাই বলিল, "তোমরা এ বনে প্রবেশ করিলে কি প্রকারে?"

মহেন্দ্র। যেপ্রকারেই হউক, প্রবেশ করিয়াছি।

গোঁসাই। প্রবেশ করিয়াছ ত বাহির হইতে পারিতেছ না কেন? এই বলিয়া বৈষ্ণব আবার হাসিতে লাগিল।

রুষ্ট হইয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "তুমি হাসিতেছ, তুমি বাহির হইতে পার?"

বৈষ্ণব বলিল, "আমার সঙ্গে আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি। তোমরা অবশ্য কোন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। নচেৎ এ মঠে আসিবার বা বাহির হইবার পথ আর কেহই জানে না।"

শুনিয়া মহেন্দ্র বলিল, "আপনি সন্তান?"

বৈষ্ণব বলিল, "হাঁ আমিও সন্তান, আমার সঙ্গে আইস। তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবার জন্যই আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি?"

বৈষ্ণব বলিল, "আমার নাম ধীরানন্দ গোস্বামী।"

এই বলিয়া ধীরানন্দ অগ্রে অগ্রে চলিলেন, মহেন্দ্র, কল্যাণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ধীরানন্দ অতি দুর্গম পথ

দিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া, একা বনমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

আনন্দারণ্য হইতে তাহারা বাহিরে আসিলে কিছু দূরে সবৃক্ষপ্রান্তর আরম্ভ হইল। প্রান্তর এক দিকে রহিল, বনের ধারে ধারে রাজপথ। এক-স্থানে অরণ্যমধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কলকল শব্দে বহিতেছে। জল অতি পরিষ্কার, নিবিড় মেঘের মত কালো। দুইপাশে শ্যামল শোভাময় নানা জাতীয় বৃক্ষ নদীকে ছায়া করিয়া আছে, নানা জাতীয় পক্ষী বৃক্ষে বসিয়া নানাবিধ রব করিতেছে। সেই রব—সেও মধুর—মধুর নদীর রবের সঙ্গে মিশিতেছে। তেমনি করিয়া বৃক্ষের ছায়া আর জলের বর্ণ মিশিয়াছে। কল্যাণীর মনও বুঝি সেই ছায়ার সঙ্গে মিশিল। কল্যাণী নদীতীরে এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন। স্বামী বসিলেন, কল্যাণী স্বামীর কোল হইতে কন্যাকে কোলে লইলেন। স্বামীর হাত হাতে লইয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে আজি বড় বিমর্ষ দেখিতেছি? বিপদ যাহা তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি—এখন এত বিষাদ কেন?"

মহেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আমি আর আপনার নহি—আমি কি করিব বুঝিতে পারি না।"

ক। কেন?

মহে। "তোমাকে হারাইলে পর আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল শুন।" এই বলিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল মহেন্দ্র তাহা সবিস্তারে বলিল।

কল্যাণী বলিলেন, "আমারও অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ গিয়াছে। তুমি শুনিয়া কি করিবে? অতিশয় বিপদেও আমার কেমন করে ঘুম আসিয়াছিল বলিতে পারি না—কিন্তু আমি কাল শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম—কি পুণ্যবলে বলিতে পারি না—আমি এক অপূর্ব্বস্থানে গিয়াছি। সেখানে মাটী নাই। কেবল আলো, অতি শীতল মেঘভাঙ্গা আলোর মত বড় মধুর আলো। সেখানে মনুষ্য নাই কেবল আলোময় মূর্ত্তি, সেখানে শব্দ নাই কেবল অতিদূরে যেন কি মধুর গীত বাদ্য হইতেছে এমনি একটা শব্দ। সর্ব্বদা যেন নূতন ফুটিয়াছে এমনি লক্ষ লক্ষ মল্লিকা মালতী গন্ধরাজের গন্ধ। সেখানে যেন সকলের উপরে সকলের দর্শনীয়স্থানে কে বসিয়া আছেন, যেন নীল পর্ব্বত অগ্নিপ্রভ হইয়া ভিতরে মন্দ মন্দ জ্বলিতেছে। অগ্নিময় বৃহৎ কিরীট তাঁহার মাথায়। তাঁর যেন চারি-হাত। তাঁর দুই দিকে কি আমি চিনিতে পারিলাম না—বোধ হয় স্ত্রীমূর্ত্তি, কিন্তু এত রূপ, এত জ্যোতিঃ, এত সৌরভ, যে আমি সেদিকে চাহিলেই বিহ্বল হইতে লাগিলাম; চাহিতে পারিলাম না, দেখিতে পারিলাম না সে কে। যেন সেই চতু-

ভুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর এক স্ত্রী মূর্ত্তি। সেও জ্যোতির্ম্ময়ী কিন্তু চারি দিকে মেঘ, আভা ভাল বাহির হইতেছে না, অস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে অতি শীর্ণা কিন্তু অতি রূপবতী মর্ম্মপীড়িতা কোন স্ত্রী মূর্ত্তি কাঁদিতেছে। আমাকে যেন সুগন্ধ মন্দ পবন বহিয়া বহিয়া ঢেউ দিতে দিতে সেই চতুর্ভুজের সিংহাসনতলে আনিয়া ফেলিল। যেন সেই মেঘমণ্ডিতা শীর্ণা স্ত্রী আমাকে দেখাইয়া বলিল, 'এই সে—ইহারই জন্যে মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না।' তখন যেন এক অতি পরিষ্কার সুমধুর বাঁশীর শব্দের মত শব্দ হইল। সেই চতুর্ভুজ যেন আমাকে বলিলেন, 'তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া আমার কাছে এস। এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে। তুমি স্বামীর কাছে থাকিলে এঁর সেবা হইবে না; তুমি চলিয়া আইস।'—আমি যেন কাঁদিয়া বলিলাম, 'স্বামী ছাড়িয়া আসিব কি প্রকারে।' তখন আবার সেই বাঁশীর শব্দে শব্দ হইল 'আমি স্বামী, আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি কন্যা, আমার কাছে এস।' আমি কি বলিলাম মনে নাই। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।' এই বলিয়া কল্যাণী নীরব হইয়া রহিলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত হইয়া নীরবে রহিলেন। মাথার উপর দোয়েল ঝঙ্কার করিতে লাগিল। পাপিয়া স্বরে আকাশ প্লাবিত করিতে লাগিল। কোকিল দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। ভীমরাজ কলকণ্ঠে কানন কম্পিত করিতে লাগিল। পদতলে তটিনী মৃদু কল্লোল করিতে ছিল। বায়ু বন্যপুষ্পের মৃদু গন্ধ আনিয়া দিতেছিল। কোথাও মধ্যে মধ্যে নদীজলে রৌদ্র ঝিকিমিকি করিতেছিল। কোথাও তালপত্র মৃদু পবনে মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল। দূরে নীল পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। দুই জনে অনেকক্ষণ মুগ্ধ হইয়া নীরবে রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কল্যাণী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ভাবিতেছ?"

মহে। কি করিব তাহাই ভাবি—স্বপ্ন কেবল বিভীবিকামাত্র, আপনার মনে জন্মিয়া আপনি লয় পায়, জীবনের জলবিম্ব—চল গৃহে যাই।

ক। যেখানে দেবতা তোমাকে যাইতে বলেন তুমি সেইখানে যাও—এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে স্বামীর কোলে দিলেন।

মহেন্দ্র কন্যা কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আর তুমি—তুমি কোথায় যাইবে—"

কল্যাণী দুই হাতে দুই চোক ঢাকিয়া মাথা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমাকেও দেবতা যেখানে যাইতে বলিয়াছেন আমিও সেইখানে যাইব।"

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিল, বলিল "সে কোথা, কি প্রকারে যাইবে?"—

কল্যাণী বিষের কৌটা দেখাইলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি? বিষ খাইবে?"

ক। "খাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু—" কল্যাণী নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিল। প্রতিপলকে বৎসর বোধ হইতে লাগিল। কল্যাণী আর কথা শেষ করিল না দেখিয়া মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কিন্তু কি বলিতেছিলে?"

ক। খাইব মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু তোমাকে রাখিয়া—সুকুমারীকে রাখিয়া—বৈকুণ্ঠেও আমার যাইতে ইচ্ছা করে না। আমি মরিব না।

এই কথা বলিয়া কল্যাণী বিষের কৌটা মাটীতে রাখিলেন। তখন দুই জনে ভূত ও ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় উভয়েই অন্যমনস্ক হইলেন। এই অবকাশে মেয়েটি খেলা করিতে করিতে বিষের কৌটা তুলিয়া লইল। কেহই তাহা দেখিলেন না।

সুকুমারী মনে করিল, এটি বেশ খেলিবার জিনিস। কৌটাটী একবার বাঁ হাতে ধরিয়া দাহিন হাতে বেশ করিয়া তাহাকে চাপড়াইল, তার পর দাহিন হাতে ধরিয়া বাঁ হাতে তাহাকে চাপড়াইল। তার পর দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিল। সুতরাং কৌটাটি খুলিয়া গেল—বড়িটি পড়িয়া গেল।

বাপের কাপড়ের উপর ছোট গুলিটি পড়িয়া গেল—সুকুমারী তাহা দেখিল। মনে করিল, এও আর একটা খেলিবার জিনিস। কৌটা ফেলিয়া দিয়া থাবা মারিয়া বড়িটি তুলিয়া লইল।

কৌটাটী সুকুমারী কেন গালে দেয় নাই বলিতে পারি না—কিন্তু বড়িটি সম্বন্ধে কালবিলম্ব হইল না। প্রাপ্ত মাত্রেণ ভোক্তব্যং—সুকুমারী বড়িটি মুখে পূরিল। সেই সময়ে তাহার উপর মার নজর পড়িল।

"কি খাইল! কি খাইল! সর্ব্বনাশ!" কল্যাণী ইহা বলিয়া, কন্যার মুখের ভিতর আঙ্গুল পূরিল। তখন উভয়েই দেখিলেন যে, বিষের কৌটা খালি পড়িয়া আছে। সুকুমারী তখন আর একটা খেলা পাইয়াছি মনে করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া—সবে গুটিকত দাঁত উঠিয়াছে—মার মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বোধ হয় বিষবড়ির স্বাদ মুখে কদর্য্য লাগিয়াছিল—কেন না কিছু পরে মেয়ে আপনি দাঁত ছাড়িয়া দিল, কল্যাণী বড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মেয়ে কাঁদিতে লাগিল।

বটিকা মাটীতে পড়িয়া রহিল। কল্যাণী নদী হইতে আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া মেয়ের মুখে দিলেন। অতি সকাতরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু কি পেটে গেছে?"

মন্দটাই আগে বাপ মার মনে আসে—যেখানে অধিক ভালবাসা সেখানে ভয়ই

অধিক প্রবল। মহেন্দ্র কখন দেখেন নাই যে বড়িটা আগে কত বড় ছিল। এখন বড়িটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় অনেকটা খাইয়াছে।"

কল্যাণীরও কাজেই সেই বিশ্বাস হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনিও বড়ি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিলেন। এদিকে, মেয়ে যে দুই এক ঢোক গিলিয়াছিল, তাহারই গুণে কিছু বিকৃতাবস্থাপ্রাপ্ত হইল। কিছু ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল—কাঁদিতে লাগিল—শেষ কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন, "আর দেখ কি? যে পথে দেবতায় ডাকিয়াছে, সেই পথে সুকুমারী চলিল—আমাকেও যাইতে হইবে।"

এই বলিয়া, কল্যাণী বিষের বড়ি মুখে ফেলিয়া দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গিলিয়া ফেলিলেন।

মহেন্দ্র রোদন করিয়া বলিলেন, "কি করিলে—কল্যাণি ও কি করিলে।"

কল্যাণী কিছু উত্তর না করিয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন, "বলিলেন প্রভু, কথা কহিলে কথা বাড়িবে, আমি চলিলাম।"

"কল্যাণি কি করিলে" বলিয়া মহেন্দ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অতি মৃদুস্বরে কল্যাণী বলিতে লাগিল, "আমি ভালই করিয়াছি। ছার স্ত্রীলোকের জন্য পাছে তুমি দেবতার কাজে অযত্ন কর! দেখ, আমি দেববাক্য লঙ্ঘন করিতেছিলাম—তাই আমার মেয়ে গেল। আর অবহেলা করিলে পাছে তুমিও যাও?"

মহেন্দ্র কাঁদিয়া বলিলেন, "তোমায় কোথাও রাখিয়া আসিতাম—আমাদের কাজ সিদ্ধ হইলে আবার তোমাকে লইয়া সুখী হইতাম। কল্যাণী, আমার সব! কেন তুমি এমন কাজ করিলে! যে হাতের জোরে আমি তরবার ধরিতাম, সেই হাতই ত কাটিলে! তুমি ছাড়া আমি কি!"

কল্যাণী। "কোথায় আমায় লইয়া যাইতে—স্থান কোথা আছে? মা, বাপ, বন্ধুবর্গ এই দারুণ দুঃসময়ে সকলি ত মরিয়াছে। কার ঘরে স্থান আছে, কোথায় যাইবার পথ আছে, কোথায় লইয়া যাইবে? আমি তোমার গলগ্রহ। আমি মরিলাম ভালই করিলাম। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সেই—সেই আলোকময় লোকে গিয়া আবার তোমার দেখা পাই।" এই বলিয়া কল্যাণী আবার স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিয়া মাথায় দিলেন। মহেন্দ্র কোন উত্তর না করিতে পারিয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কল্যাণী আবার বলিলেন,—অতি মৃদু অতি মধুর অতি স্নেহময় কণ্ঠ—আবার বলিলেন, "দেখ, দেবতার ইচ্ছা কার সাধ্য লঙ্ঘন করে। আমায় দেবতায় যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি মনে করিলে কি থাকিতে পারি—আপনি না মরিতাম ত অবশ্য

কেহ মারিত। আমি মরিয়া ভালই করিলাম। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ কর, পুণ্য হইবে। আমার তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। দুইজনে একত্রে অনন্ত স্বর্গ ভোগ করিব।"

এদিকে বালিকাটি একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল—তাহার পেটে বিষ যে অল্প পরিমাণে গিয়াছিল, তাহা মারাত্মক নহে। কিন্তু সে সময়ে সেদিকে মহেন্দ্রের মন ছিল না। তিনি কন্যাকে কল্যাণীর কোলে দিয়া উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যেন অরণ্যমধ্য হইতে মৃদু অথচ মেঘগম্ভীর শব্দ শুনা গেল।

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।"

কল্যাণীর তখন বিষ ধরিয়া আসিতেছিল, চেতনা কিছু অপহৃত হইতেছিল, তিনি মোহভরে শুনিলেন, যেন সেই বৈকুণ্ঠে শ্রুত অপূর্ব্ব বংশীধ্বনিতে বাজিতেছে:—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।"

তখন কল্যাণী অপ্সরানিন্দিত কণ্ঠে মোহভরে বলিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

আর বলিলেন, "প্রাণাধিক বল,
হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কাননির্গত মধুর স্বর আর কল্যাণীর মধুস্বরে বিমুগ্ধ হইয়া কাতরচিত্তে ঈশ্বর মাত্র সহায় মনে করিয়া মহেন্দ্রও ডাকিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

তখন চারিদিক্ হইতে ধ্বনি হইতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

তখন যেন গাছের পাখীরাও বলিতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

নদীর কলকলেও যেন শব্দ হইতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

তখন মহেন্দ্র শোকতাপ ভুলিয়া গেলেন—উন্মত্ত হইয়া কল্যাণীর সহিত একতানে ডাকিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

কানন হইতেও যেন তাঁহাদের সঙ্গে একতানে শব্দ হইতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

কল্যাণীর কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু ডাকিতেছেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

তখন ক্রমে ক্রমে কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইল, কল্যাণীর মুখে আর শব্দ নাই, চক্ষুঃ নিমিলিত হইল, অঙ্গ শীতল হইল, মহেন্দ্র বুঝিলেন যে, কল্যাণী "হরে মুরারে" ডাকিতে ডাকিতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছেন। তখন পাগলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কানন বিকম্পিত করিয়া, পশুপক্ষিগণকে চমকিত করিয়া মহেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

সেই সময়ে কে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সঙ্গে তেমনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

তখন সেই অনন্তের মহিমাময়, সেই অনন্ত অরণ্যমধ্যে, অনন্তপথগামিনীর শরীরসম্মুখে দুইজনে অনন্তের নাম গীত করিতে লাগিলেন। পশু পক্ষী নীরব, পৃথিবী অপূর্ব্ব শোভাময়ী—এই চরমগীতির উপযুক্ত মন্দির। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন।

বাঙ্গালির উৎপত্তি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনার্য্য বাঙ্গালি জাতি।

বাঙ্গালার মধ্যে মাল ও মালো বলিয়া দুইটি জাতি আছে। রাজমহল জেলার অন্তর্গত মালপাহাড়িয়া বলিয়া একটি অনার্য্যজাতি আছে; তাহারা কোন আর্য্যভাষা কহে না। কিন্তু বাঙ্গালি-মালেরা বাঙ্গালা কথা কয় এবং বাঙ্গালি বলিয়া গণ্য। জেনেরল ক্যানিংহ্যাম প্রাচীন রোমীয়লেখক প্লিনি হইতে দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তখনও মালেরা বলিয়া জাতি ভারতবর্ষে ছিল। পুরাণাদিতে মালদের প্রসঙ্গ ভূয়োভূয়ঃ দেখা যায় এবং মেঘদূতে মালবদিগের নাম উল্লেখ আছে। অতএব এখন যেমন মালজাতি আছে, প্রাচীন মালজাতিও সেইরূপ ছিল। কিন্তু প্লিনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, মালেরা আর্য্যজাতি হইতে একটি পৃথক্ জাতি ছিল। জেনারেল ক্যানিংহ্যাম বলেন, এই প্লিনির লিখিত মালেরা টলেমিপ্রণীত মণ্ডলজাতি। টলেমিলিখিত মণ্ডল জাতি আধুনিক মুণ্ড কোলজাতি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বিভারলি সাহেব অনুমান করেন যে, ঐ প্লিনির লিখিত মালজাতি এখনকার বাঙ্গালি মাল।* এখন বাঙ্গালার বাহিরে যেখানে যেখানে মাল নাম পাই, সেইখানে সেইখানে

---

* In his late work on the ancient Geography of India, General Cunningham quotes a passage from Pliny in which the *Malli* are mentioned, as occupying the country between the *Calingae* and the

অনার্য্যদিগকেই দেখিতে পাই। কান্দু শের বিভাগকে মাল বা মালো বা নামক অতি অসভ্য অনার্য্যজাতির দে- মালিয়া বলে।* অনার্য্যপ্রধান মানভূম

Ganges. The passage is this :— "*Gentes. Calingœ proximi mari, et supra mandei malli, quorum mons mallas, finisque ejus tractus est Ganges.*" In another passage we have, *ab iis (Palibothris) in interiore sita monedes et Suari quorum mons maleus,* and putting the two passages together, General Cunningham thinks, "it highly probable that both names may be intended for the celebrated Mount Mandar, to the south of Bhaugulpore, which is fabled to have been used by the Gods and demons at the churning of the ocean." The *Mandei* General Cunningham identifes "with the inhabitants of the Mahanadi river, which is the *Manada* of Ptolemy." "The Malli or Malei would therefore be the same people as Ptolemy's Mandalæ, who occupied the right bank of the Ganges to the south of Palibothra—" the Mandalœ or Mandali having been already identified with the Monedes and the modern Munda Kols. "Or" adds General Cunningham "they may be the people of the Rajmahal Hills who are called Maler, which would appear to be derived from the Canarese Male and the Tamil Malei, a "hill." It would, therefore, be equivalent to the Hindu Pahari or Parbatiya a "hillman." Putting this last suggestion aside for the present, it seems to me that there is some little confusion in the attempt to identify both the Monedes and the Malli with the Mundas. If the Mandei and the Malli are distinct nations—and it will be observed that both are mentioned in the same passage—the former rather than the latter would seem to correspond with the *Monedes* or Mundus. The *Malli* would then correspond rather to the Suari "*Quorum Mons Maleas*"—the hills bounded by the Ganges at Rajmahal. They may therefore be the same as the Mals. In other words, the Mals—the words Maler or Malhar seem to be merely a plural form—may possibly be a branch of the great Sauriyan family to which the Rajmahal Paharias, the Oraons and the Sabars all belong, and which Colonel Dalton would describe as Dravidian. Fifteen hundred two thousand years ago this people may have occupied the whole of Western Bengal." *Bengal Census Report* 1871. P 184-185. · কথাগুলি বড় বুঝিতে পারিলাম না—কৌতুহলী পাঠকের নিকট উপহার দিবার মানসেই ইহা উদ্ধৃত করিয়াছি।

* Dalton—P 299.

প্রদেশকে মালভূম বা মল্লভূমি বলে। রাজমহলের দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য পাহাড়িদিগকে মালের জাতি বলে। উড়িষ্যার কিঁউঝড় নামক আরণ্য রাজ্যে ভুঁইয়া নামক এক অনার্য্যজাতি আছে, তাহাদের একটি থাকের নাম মালভুঁইয়া।* বুকানন হ্যামিল্টন ভাগলপুর জেলার ভিতরে বন্যজাতির মধ্যে মালেব বলিয়া একটি অনার্য্যজাতি দেখিয়াছিলেন। কাঁধদিগের মালিয়া বলিয়া একটি জাতি আছে।† রাজমহলীর মাল পাহাড়িদিগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পক্ষান্তরে আর্য্যদিগের মধ্যে মল্ল শব্দ আছে—অনেকে বলেন, এই মালেরা আর্য্য মল্ল। আর্য্য মল্ল হইতে মালজাতির উৎপত্তি? না অনার্য্যমল্লগণ বাহুযুদ্ধে কুশলী বলিয়া আর্য্যভাষায় বাহুযোদ্ধার নাম মল্ল হইয়াছে? মালেরা যে অনার্য্যজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা একপ্রকার স্থির বলা যাইতে পারে।

সাঁওতালদিগের পাহাড়মধ্যে ডম নামে একটি অনার্য্যজাতি আছে। তাহাদিগের হইতে বাঙ্গালার ডোমজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, হণ্টর সাহেব এমন অনুমান করেন।‡ ইহা সত্য বটে যে অন্যান্য নীচ হিন্দুজাতির ন্যায় ডোমেরা ব্রাহ্মণদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ করে না। তাহাদিগের পৃথক্ ধর্ম্মযাজক আছে। ঐ ধর্ম্মযাজকদিগের নাম পণ্ডিত। এইরূপ ডোমের পণ্ডিত আমি স্বয়ং অনেক দেখিয়াছি। নেপালের নিকটে ডুমী নামে এক অনার্য্যজাতি আজিও বাস করে।¶

হণ্টর সাহেব দেখাইয়াছেন যে, অনেক অনার্য্যজাতির নাম অনার্য্যভাষার মনুষ্যবাচক শব্দবিশেষ হইতে হইয়াছে। হো শব্দ ইহার পূর্ব্বে উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে। সাঁওতালী ভাষায় হাড় শব্দে মনুষ্য। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, হাড়ি অনার্য্যবংশ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ককেশীয় ও মোঙ্গলীয় ভিন্ন আরও অনেক মনুষ্যজাতি আছে, তাহার মধ্যে কোন কোন জাতি স্বভাবতঃই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ। আফ্রিকার নিগ্রোরা ইহার উদারণ। কেবল রৌদ্রের উত্তাপে তাহারা এত কৃষ্ণবর্ণ এমত নহে, যেমন তপ্তদেশে কাফ্রির বাস আছে, তেমনি তপ্তদেশে গৌরবর্ণ আর্য্য বা মঙ্গলের বাস আছে। আমেরিকার যে প্রদেশে ইণ্ডিয়ানদিগের বর্ণ লোহিত সেই প্রদেশেই স্যাক্সনবংশীয়-

* Dalton P 145.
† Dalton P 293.
‡ Non-Aryan Dictionary P 29.
¶ Non-Aryan Dictionary P 29.

দিগের বর্ণ গৌর ; তিনশতবৎসরে কিছুমাত্র কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে এক প্রদেশেই শ্যামবর্ণ আর্য্যেরা এবং মসীবর্ণ অনার্য্যেরা একত্র বাস করিতেছে। রৌদ্রসন্তাপে কতকদূর কৃষ্ণতা জন্মিতে পারে বটে। ভারতীয় আর্য্যদের তাহার কিছু দূর জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ গৌর, কেহ শ্যামল, কিন্তু বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটবাসী কতকগুলি অনার্য্যজাতি একেবারে মসীকৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণে তাহাদিগের বর্ণনা আছে। কথিত আছে যে, বেন রাজার উরুদেশ হইতে দগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় খর্ব্বকায় অট্টাস্য এক পুরুষ জন্মে। এই বর্ণনায় মধ্যভারতের খর্ব্বাকৃত অট্টাস্য কৃষ্ণকায় অনার্য্যদিগকে পাওয়া যায়। ঐ পুরুষ নিষাদ নামে সংজ্ঞাত হইয়াছে।* ইহারই বংশে নিষাদাখ্য অনার্য্যজাতির উৎপত্তি।† হরিবংশে বেনের উপাখ্যানে ঐরূপ লিখিত হইয়া ঐ পুরুষকে নিষাদ ও ধীবরজাতির আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণনা আছে।‡ মনু বলিয়াছেন যে, অযোগবি অর্থাৎ শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে উৎপাদিতা স্ত্রীর গর্ভে নিষাদের ঔরসে মার্গব বা দাস জন্মে। আর্য্যাবর্ত্তে তাহাদিগকে কৈবর্ত্ত বলে।¶ অমরকোষাভিধানে কৈবর্ত্তদিগের নাম "কৈবর্ত্ত দাস ধীবর।" পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে যে ঋগ্বেদ সমালোচনায় দাস নামে অনার্য্যজাতি পাওয়া যায়। দাস, ধীবর, কৈবর্ত্ত তিনই এক। যদি দাস ও ধীবর অনার্য্য হইল, তবে কৈবর্ত্তও অনার্য্যজাতি। এক্ষণে বাঙ্গালায় কৈবর্ত্তের মধ্যে কতকগুলি চাষা কৈবর্ত্ত ; কতকগুলি জেলে কৈবর্ত্ত। পূর্ব্বে সকলেই মৎস্যব্যবসায়ী ধীবর ছিল সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কতকগুলি কৃষিব্যবসায় অবলম্বন করিল, তাহারাই চাষা কৈবর্ত্ত। ধোপারা ঐরূপ কেহ কেহ চাষ করিয়া চাষাধোপা বলিয়া পৃথক্ জাতি হইয়াছে।

পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র নামে প্রাচীনজাতির উল্লেখ মন্বাদিতে পাওয়া যায়। মনু লিখিয়াছেন যে পৌণ্ড্রক প্রভৃতি জাতি

---

* কিং করোমীতি তান্ সর্ব্বান্ বিপ্রান্ আহ স চাতুরঃ
নিষীদেতি তমুচু স্তে নিষাদ স্তেন সোঽভবৎ।

† তেন দ্বারেণ নিষ্ক্রান্তং তৎপাপং তস্য ভূপতেঃ
নিষাদাস্তে তথা জাতা বেনকল্মষসম্ভবাঃ।

‡ নিষাদবংশকর্ত্তাসৌ বভূব বদতাং বরঃ
ধীবরানসৃজচ্চাপি বেনকল্মষসম্ভবান্।

¶ নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিনং
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ।

মনু দশম অধ্যায় ৩৪ শ্লোক।

ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পৌণ্ড্রকদিগের সঙ্গে আর যে সকল জাতি গণনা করিয়াছেন,তাহাদিগের মধ্যে যবন ও পহ্লব ভারতবর্ষের বাহিরে। ভিতরের সকলগুলিই অনার্য্য যথা—

পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রাবিড়া কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ

পারদাঃ পহ্লবাশ্চিনাঃ কিরাতা দরদা খসাঃ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে "অন্ধ্রা পুণ্ড্রা শবরা পুলিন্দা মুতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি।" মহাভারতেও এই পুণ্ড্রদিগের কথা আছে। সভাপর্ব্বে আছে যে ভীম দিগ্বিজয়ে আসিয়া পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব এবং কৌশিকি কচ্ছবাসী মনৌজা রাজা এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত বীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গ আধুনিক বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগকে বলিত। এখনও সাধারণ লোকে সেই প্রদেশকেই বঙ্গদেশ বলে। ভীম পশ্চিম হইতে আসিয়া যে দেশ জয় করিয়া বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগে প্রবেশ করিলেন, সে দেশ অবশ্য বাঙ্গালার পশ্চিমভাগে। উইলসন সাহেবও স্বকৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদে ভারতবর্ষের ভৌগোলিকতত্ত্ব নিরূপণকালে বাঙ্গালার পশ্চিমাংশেই পুণ্ড্রজাতিকেই সংস্থাপন করিয়াছেন।*

---

* "*Pundras* the western Provinces of Bengal, or as sometimes used in a more comprehensive sense, it includes the following district : Rajshahi Dinagepore, and Rungpoor ; Nadiya, Beerbhoom, Burdwan, part of Midnapoor, and the Jungle Mehals ; Ramghur, Pacheti, Palamow, and part of Chunar. See an account of Pundra translated from what is said to be part of the Brahmanda Section of the Bhavishyat Purana in the quarterly Oriental Magazine, Decr 1824." *Wilson's Vishnu Puranas.*

আমাদিগের প্রিয়বন্ধু পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভবিষ্যপুরাণখানি সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন (ভবিষ্যপুরাণ ভবিষ্যৎ পুরাণ নহে ; ব্রহ্মখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড নহে; এ গুলি ছোট ছোট সাহেবী ভুল) উহার এক কাপি সংস্কৃত কলেজে আছে। পুঁথিখানি খণ্ডিত, আসাম মণিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া কাশী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের বিশেষ বিবরণ উহাতে দেওয়া আছে। কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িয়া ভক্তি হয় না। গ্রন্থখানিতে বিদ্যাসুন্দরের গল্প আছে। মানসিংহ কর্ত্তৃক যশোরের আক্রমণ বর্ণিত আছে। যবনাধিকারের চারিশত বৎসর পরে চম্পারণের ও নেপালক রাজার যে যুদ্ধ হয় তাহার বর্ণনা আছে। বিশেষ গ্রন্থকারের বঙ্গদেশ মধ্যে আসাম,চাটুল এবং মণিপুর পর্য্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এত দূর ত গ্রন্থের পরিচয় গেল। তাহাতে আছে যে, পৌণ্ড্রদেশ সাত ভাগে বিভক্ত। গৌড়দেশ, বারেন্দ্রভূমি, নীবৃত, বরাহভূমি, বর্দ্ধমান, নারীখণ্ড ও বিন্ধ্য-

তার পর খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিয়েন্থ-সাঙ নামক চীনপরিব্রাজক এ প্রদেশে আসিয়া পুণ্ড্রদিগের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দেখিয়া গিয়াছেন। জেনারেল ক্যানিংহ্যাম সাহেব ঐ চীনপরিব্রাজকের লিখিত দিক্ ও দূরতা লইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন কোথায় ছিল তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া আধুনিক পাবনাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পাবনা না হইয়া বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মালদহ জেলার অন্তর্গত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী পাণ্ডুয়া বলিলে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে প্রকৃত সংস্থান ঘটিত। তার পর দশকুমার চরিতে লেখা আছে, "অনুজায় বিষাণবর্ম্মণে দণ্ড চক্রং চ পুণ্ড্রাভিযোগায় বিরোচেষং।" অর্থাৎ পুণ্ড্রদেশ আক্রমণের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষাণবর্ম্মাকে দণ্ড চক্র অর্থাৎ সৈন্যাদি দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।* দশকুমারচরিত আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ। উপরিলিখিত উক্তি কস্যচিৎ মৈথিলরাজার উক্তি, অতএব দশকুমার যখন প্রণীত হয় তখনও পুণ্ড্রেরা মিথিলার নিকটবাসী।

পার্শ্ব। এই সকল দেশের লোক দুষ্ট, চোর, পরদারনিরত ইত্যাদি ইত্যাদি। গৌড়দেশের প্রধান নগরসমূহের মধ্যে মৌরসিধাবাদ (মুরশিদাবাদ নামের সংস্কৃত করণ, মুরশিদাবাদ নাম ১৭০৪ সালে হয়, তাহার আগে উহাকে মুকশুদাবাদ বলিত বলিয়া ষ্টুয়ার্ট হিষ্টরি অফ্ বেঙ্গলে উক্ত আছে) সুতরাং গ্রন্থখানি ১৫০ বৎসরের মধ্যে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। গৌড়দেশে গৌড়নগরের উল্লেখ নাই। পাণ্ডুয়ারও উল্লেখ নাই। বরেন্দ্রভূমির প্রধান নগর পুট্টিলা নটারো চপলা (যেখানকার রাজা ব্রাহ্মণ) কাকমারী। নীবৃতদেশের প্রধান নগর কচ্ছপ নগর শ্রীরঙ্গপুর ও বিহার। রঙ্গপুরে বাগ্দী রাজা। মারীখণ্ডের প্রধান নগর বৈদ্যনাথ, দেবগড় করা সোণামুখী ইত্যাদি। বরাভূমের প্রধান নগর রঘুনাথপুর ধবল ইত্যাদি। বর্দ্ধমানের প্রধান নগর বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, মায়াপুর, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি। বিন্ধ্যপার্শ্বে প্রধান নগর সুদর্শন পুষ্পগ্রাম ও বদরী কুড়ক গ্রাম। এই সকল দেশের আচার ব্যবহার ও চতুঃসীমা আছে। আমাদের যতদূর মানচিত্র বোধ আছে তাহাতে বোধ হয় চতুঃসীমা অনেক ভজিবে না। গৌড়দেশের উত্তরে পদ্মানদী ও দক্ষিণে বর্দ্ধমান। আসল গৌড়নগর ইহার মধ্যে পড়িল না।

উইলসন সাহেব ঐ স্থলে আরও লিখিয়াছেন যে, রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে পুণ্ড্র দাক্ষিণাত্যে স্থাপিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐ শ্লোকটী আমরা উদ্ধৃত করিতেছি,

নদীং গোদাবরীং চৈব সর্ব্বমেবানুপশ্যতঃ
তথৈ বান্ধ্রাংশ্চ পুণ্ড্রাংশ্চ চোলান্ পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলাং।

* দশকুমার চরিত তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ ইতিহাস স্মৃতি এ সকলের সময় হইতে অর্থাৎ অতি পূর্ব্বকাল হইতে দশকুমার ও হিয়েন্থসাঙের সময় হইতে পর্য্যন্ত পুণ্ড্র নামে প্রবল জাতি বাঙ্গালার পশ্চিমাংশে বাস করিত। এক্ষণে বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার নিকট বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে পুণ্ড্র নামে কোন জাতি নাই। এই পুণ্ড্র জাতি তবে কোথায় গেল।

সংস্কৃত শব্দে "ণ্ড" থাকিলে বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষায় ডকার, ড়কার হইয়া যায়। আর ণকার লুপ্ত হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী হলবর্ণে চন্দ্রবিন্দুরূপে পরিণত হয়। যথা ভাণ্ডের স্থলে ভাঁড়, ষণ্ডের স্থলে ষাঁড়, শুণ্ডের স্থলে শুঁড়। আর সংস্কৃত হইতে অপভ্রংশপ্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালাদিতে পরিণত হইতে গেলে শব্দের রকারাদির সচরাচর লোপ হয় যথা—তাম্র স্থলে তামা, আম্র স্থলে আম ইত্যাদি। অতএব পুণ্ড্র শব্দ লৌকিক ভাষায় চলিত হইলে প্রথমে রেফ লুপ্ত করিয়া পুণ্ড শব্দে পরিণত হইবে। তার পর যেমন ভাণ্ড স্থলে ভাঁড় হয়, শুণ্ড স্থলে শুঁড় হয় তেমনি পুণ্ড স্থলে পুঁড় বা পুঁড়ো হইবে। পুঁড়ো বাঙ্গালায় একটি সংখ্যায় প্রধান জাতি।

আমরা পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও মনুতে পুণ্ড্রেরা অনার্য্যজাতির সঙ্গে গণিত হইয়াছে। অতএব পুঁড়ো আর একটি অনার্য্য বংশোদ্ভূত বাঙ্গালি-জাতি।

শব্দের অপভ্রংশ একপ্রকার হয় না। প্রাচীন ভাষার কোন শব্দ ভাষান্তরে অপভ্রষ্ট হইয়া প্রবেশ করিলে দুই তিন রূপ ধারণ করে। এক সংস্কৃত স্থান শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় কোথাও থান কোথাও ঠাঁই। চন্দ্র শব্দ কখন চন্দর কখন চাঁদ। যেমন চন্দ্র শব্দ বাঙ্গালির উচ্চারণে চন্দর হয়, ভদ্র শব্দ ভদ্দর হয়, তন্ত্র শব্দ তন্তর হয়, তেমনি পুণ্ড্র শব্দ স্থান বিশেষে পুণ্ডর হইবে। জাতিবাচক অর্থে কখন কখন বাঙ্গালিরা শব্দের পরে একটা ঈকার বেশীর ভাগ যোগ করিয়া দিয়া থাকে; যেমন সাঁওতাল, সাঁওতালী, গয়াল গয়ালী, দেশওয়াল হইতে দেশওয়ালী। এইরূপ ঈকার যোগে পুণ্ড্র শব্দ পুণ্ডর হইয়া পুণ্ডরীতে পরিণত হয়। পুণ্ডরী বলিয়া একটি বহুসংখ্যক বাঙ্গালি জাতি আছে, পুণ্ড্রেরা এবং পুঁড়োরা যদি অনার্য্য তবে পুণ্ডরীরাও অনার্য্যজাতি।

পুণ্ডরী হইতে পুণ্ডরীক অধিক দূর নহে। অনেক ইতরলোকে লম্বা লম্বা সাধুভাষা ভালবাসে এবং সহজেই মনে করে যে যদি জাতির নাম দীর্ঘসমাসযুক্ত সংস্কৃত শব্দে বলা যায়, তাহা হইলে জাতির বড় গৌরব বৃদ্ধি হয়। ইতরলোকদের বুদ্ধিতে যত আসুক না আসুক, যাজকেরা মিষ্ট কথা বলিয়া আপনার কাজ গুছাইতে কোন কালেই

পরাঙ্মুখ নহে। অতএব কতকগুলি পুণ্ডরী ক্রমে পুণ্ডরীক শেষ পুণ্ডরীকাক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। সন ১৮৭১ সালের সেন্সস্ রিপোর্টে আটাশ হাজার বাঙ্গালি পুণ্ডরীকাক্ষ জাতি বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। এ আর একটি সাহেবী ভুল। বাস্তবিক পুণ্ডরীকাক্ষ বলিয়া কোন একটা পৃথক্ জাতি নাই। পোদেরাই আপনাদিগকে পুণ্ডরীকাক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

দক্ষিণ অঞ্চলে শত শত পোদের সঙ্গে স্বয়ং কথোপকথন করিয়া এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। যখন কোন পোদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি তুমি কি জাতি সে তখনই প্রায় প্রথমে সংস্কৃত বাক্যাড়ম্বরে জাতিগৌরব বাড়াইবার জন্য বলিয়াছে "আজ্ঞে আমি পুণ্ডরীকাক্ষ।" তার পর যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে পুণ্ডরীকাক্ষ কি জাতি বুঝিতে পারিলাম না। তখন প্রায় সে উত্তর করিয়াছে আমরা পোদ। বাস্তবিক পোদ শব্দ পুণ্ড্র শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। এবং পুণ্ড্র শব্দ হইতেই পোদ নাম জন্মিয়াছে ইহা আমার বিশ্বাস হয়।

যে সকল কথা বলা গেল, তাহাতে বোধ হয় প্রতীতি জন্মিয়া থাকিবে যে, পুঁড়ো পুণ্ডরী পুণ্ডরীকাক্ষ এবং পোদ চারিটী আদৌ এক জাতি এবং চারিটি আদি প্রাচীন পুণ্ড্রজাতির সন্তান। পুণ্ড্রেরা অনার্য্যজাতি ছিল, অতএব বাঙ্গালি সমাজের ভিতর আর চারিটী অনার্য্য জাতি পাওয়া যাইতেছে।

অলঙ্কারশাস্ত্র।

অলঙ্কারশাস্ত্র কাহাকে বলে, আমি আজ সেইটী বুঝাইতে চেষ্টা করিব। অলঙ্কারশাস্ত্রের নাম শুনিলে ইংরেজিওয়ালার আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায়, সংস্কৃতওয়ালার জিব দিয়া জল পড়ে। সাধারণলোকে মনে করে, অলঙ্কার রসের শাস্ত্র, ইহা পড়িলে লোকে রসিক হয়; অর্থাৎ যেখানে সেখানে রসের কথা কহিতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে আলঙ্কারিকেরা যে অর্থে রসশব্দ ব্যবহার করেন, সাধারণলোকে সে অর্থে ব্যবহার করেন না। সুতরাং লোকের যে সংস্কার অলঙ্কার পড়িলে ইয়ার হওয়া যায় তাহা ভুল। ইংরেজিওয়ালারা অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর চটা কেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। এককালে ইউরোপে অলঙ্কারশাস্ত্রের বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল। তথায় সিসিরো হাপ্দেবতা ছিলেন,

লোন্‌জাইনস্‌ গুরু ছিলেন। কিন্তু সে অলঙ্কারপাঠে লোকে কেবল বর্ণবিন্যাস করিতে শিখিতমাত্র, আর কোনরূপ ফল দর্শিত না। যখন পদার্থবিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইল, তখন লোকে অলঙ্কারশাস্ত্র অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিল। যিনি পদার্থবিদ্যার প্রথম পথ দেখান, তিনি অর্থাৎ লর্ড বেকন আলঙ্কারিকদিগের প্রতি অত্যন্ত চটা ছিলেন। সুতরাং লর্ড বেকনের বাঙ্গালি শিষ্য প্রশিষ্য বৃদ্ধপ্রশিষ্যগণও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর চটিয়াছেন। কিন্তু বেকন অলঙ্কারশাস্ত্রের উপযোগিতা মানিতেন, যিনি কেবলমাত্র ঐ শাস্ত্রের আলোচনায় জীবনাতিবাহিত করিতেন বেকন কেবল তাঁহার উপরই চটা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ অলঙ্কারশাস্ত্র সাপ কি বেঙ, কিছুমাত্র না দেখিয়া, অলঙ্কারশাস্ত্রের নামশ্রবণমাত্রেই কাণে আঙ্গুল দেন। সংস্কৃত ইংরেজিওয়ালারা বলেন, অলঙ্কারশাস্ত্রে রসবোধ না হইয়া কেবল কতকগুলা নীরস বাগাড়ম্বর শিক্ষা হয় মাত্র; কতকগুলা অলঙ্কার, কতগুলা দোষের নাম, কতকগুলা কাব্যভেদের নাম মুখস্থ করিয়া মরিতে হয় মাত্র এবং ঐ কবিতার শব্দ শক্ত্যুথ বস্তুধ্বনি কবিউক্তিত অলঙ্কারধ্বনি কাব্যলিঙ্গ ভাবিক পরিসংখ্যা উদাত্ত অথবা ইহার সংসৃষ্টি অথবা অঙ্গাঙ্গীভাব সঙ্কর এই লইয়া বৃথা দন্তকচ্‌কচি হয় মাত্র। আসল যাহাতে রুচির পরিবর্ত্তন ও পরিমার্জ্জন হয় তাহা অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে হয় না।

আমরা বলি যদি তাহা না হয় তবে ইহা অলঙ্কারশাস্ত্রের দোষ নহে, অলঙ্কার শিক্ষার দোষ। সময়ে সময়ে অলঙ্কারগ্রন্থেরও দোষ, অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্দেশ্য মহৎ, শুদ্ধ যে রুচিপরিবর্ত্তনই অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্দেশ্য এরূপ নহে। উহা পদার্থবিদ্যাদির ন্যায় একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে।

শব্দশাস্ত্র মোটামুটি ধরিতে গেলে, তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত, নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার। যাহাদ্বারা শব্দগুলি কিরূপ ব্যুৎপত্তি হয়, তাহার প্রণালী অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম নিরুক্ত; যাহাদ্বারা শব্দসমূহ বাক্যমধ্যে কিরূপে নিবেশিত হয়, তাহার প্রণালী জানা যায়, তাহার নাম ব্যাকরণ। এবং এই সকল বাক্য পরস্পর যোজনা করিয়া বক্তৃতা করিবার, গ্রন্থ লিখিবার এবং প্রবন্ধাদি লিখিবার প্রণালী যাহাদ্বারা অবগত হওয়া যায় তাহার নাম অলঙ্কার। সুতরাং ব্যাকরণাদি যেরূপ উপযোগী অলঙ্কারও সেইরূপ। অনেকে বলিবেন অলঙ্কার না পড়িয়া কি বক্তৃতা করা যায় না, না গ্রন্থ লেখা যায় না, না সকল গ্রন্থকারই আলঙ্কারিক। যদি না হয় তবে অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? আমরা বলি ব্যাকরণ না পড়িলেই কি কথক হওয়া যায় না, না বাক্য রচনা করা যায় না ন্যায়শাস্ত্র না পড়িলে কি

তর্ক করা যায় না, না তর্কশক্তির উদ্ভাবন হয় না, তবে কি ব্যাকরণ ও ন্যায় কার্য্যেরই না। উহা কি অপাঠ্য মধ্যে গণ্য হইবে, তাহা নহে। অলঙ্কারশাস্ত্রের এমত উদ্দেশ্য নহে যে, উহাতে লোককে বক্তৃতা করিতে শিখাইবে, উহাতে কেবল বক্তাকে বিশুদ্ধ প্রণালী দেখাইয়া দেয় মাত্র। যেমন ব্যাকরণ পাঠে অশুদ্ধ শব্দপ্রয়োগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয় এবং শুদ্ধ শব্দপ্রয়োগের উপায় দেখাইয়া দেয়, যেমন ন্যায়শাস্ত্র তর্ক করিবার সূত্রাদি শিখাইয়া দেয় এবং তর্কদোষ ধরিবার উপায় দেখাইয়া দেয়, সেইরূপ অলঙ্কারেও বক্তৃতার উৎকৃষ্ট প্রণালীও দেখাইয়া দেয়। অলঙ্কারশাস্ত্র পড়িলে অবক্তা বক্তা হইতে পারেন না, অকবি কবি হইতে পারেন না। কিন্তু কবি যদি অলঙ্কার শিখে তাহা হইলে অনিন্দনীয় কবি হয়, ও বক্তা যদি অলঙ্কার শিখে, তাহা হইলে সে অনিন্দনীয় বক্তা হইতে পারে। স্বভাব যাহা দেন নাই তাহা শাস্ত্রপাঠে কখন জন্মে না; সঙ্গীত শাস্ত্রে সুপটু লোক যেমন কোথায় তাললয়বিরোধ দেখিলে চটিয়া যান, সেইরূপ অলঙ্কারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাও কাব্যে বা বক্তৃতায় সুরুচিবিরুদ্ধ কোন দোষ দেখিলেই চটিয়া যান। অলঙ্কার পাঠে অরসিক লোক রসিক হয় না; রসিকতাও স্বভাবপ্রদত্ত।

সমাজে যাহা সুরুচি বলিয়া পরিচিত অলঙ্কার পড়িলে লোক তাহা অবগত হন। যেমন একখানি চিত্র দেখিলেই লোকে খুষি হয়, অথবা অখুষি হয়, কিন্তু কেন খুষি বা অখুষি হইল তাহা বলিয়া দিবার জন্য একজন বিচারক চাই, সেইরূপ কোন গ্রন্থ পড়িয়া কেহ খুষি হয় কেহ অখুষি হয়; কিন্তু কেন যে ওরূপ হইল তাহা সকলে আপনি বুঝিতে পারে না। যে খুষি অখুষির প্রকৃত হেতু বলিয়া দিতে পারে সেই ব্যক্তির অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠের ফল হইয়াছে, তিনি সামাজিক কিন্তু আলঙ্কারিক সামাজিক হইতেও উচ্চতর, তিনি সামাজিকদিগের উচ্চতর রুচির পথ দেখাইয়া দেন।

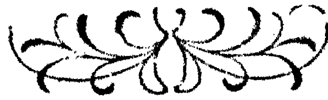
আলঙ্কারিকের কার্য্য অতি গুরুতর। তাঁহাকে সামাজিকের রুচিসংস্কার করিতে হয়; কবির রুচিসংস্কার করিতে হয়; লোকের রুচিসংস্কার করিতে হয়; সেই সঙ্গে অভিনয় কারীদিগেরও রুচিসংস্কার করিতে হয়। আলঙ্কারিক রুচিশাস্ত্রের ফিলাজফার, রুচি কোন পথে যাইবে, কোনটী সৎরুচি, কোনটী কুরুচি এই সমস্ত তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হয়। যদি সত্য বটে "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ।" প্রত্যেক ব্যক্তির রুচি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু মূল নিয়মের অনভিজ্ঞতা হেতু ভিন্নতা জন্মে। সেই মূল নিয়মের প্রদর্শক আলঙ্কারিক।

নৃত্য গীতাদি দেখিবার, সুদৃশ্য দ্রব্য দেখিবার, উত্তম কবিতা শুনিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক, যে মনোবৃত্তি থাকা প্রযুক্ত

এই সকল প্রবৃত্তি হয় তাহার নাম রুচি। রুচি শব্দটী বোধ হয় ঠিক ব্যবহার হয় নাই, উহার ইংরেজি নাম Esthetic faculty। মনুষ্যমাত্রেরই এই মনোবৃত্তি আছে, কিন্তু অসভ্যদেশে ইহার সুবিকাশ হয় না, অত্যন্ত সভ্যদেশে সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্র ইহার পুষ্টিসাধন শিক্ষার এক অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন। সে পুষ্টিসাধন কিরূপ হইবে।

মনেকর থিয়াটার দেখিতে গিয়াছি বা যাত্রা শুনিতে গিয়াছি, যাত্রাওয়ালার বা থিয়াটারওয়ালার উদ্দেশ্য পয়সা, লোককে হাসাইয়া বা কাঁদাইয়া, তাহাদিগকে আমোদ দিয়া, কিছু অর্থসংগ্রহ করা। সুতরাং অধিক লোকে যাহা ভাল বাসে তাহারা সেইরূপ যাত্রা বা অভিনয় করিবে। যিনি কবি তিনি অর্থকাম হউন আর না হউন, অনেকে যাহা ভালবাসিবে তিনিও তাহাই লিখিবেন। যদি এইরূপ চলিয়া যায় তাহা হইলে ক্রমে সে যাত্রা বা অভিনয় জঘন্য হইয়া উঠিবে; কারণ যাহাতে দুই একটি কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা হয় সাধারণ লোকে সেই সকল জিনিষ দেখিতে ভাল বাসে। যদি দর্শকবৃন্দের মধ্যে বহুসংখ্যক সুরুচিসম্পন্ন লোক না থাকেন তাহা হইলে নাটকাদি এই সকল উত্তেজক বস্তুতে পরিপূর্ণ হয়। আট দশ বৎসর পূর্ব্ব আমাদের দেশে যাত্রা কবি যে অতি জঘন্য হইয়াছিল, এবং এখনও যে আমাদিগের রঙ্গভূমি সকল আরও জঘন্য হইয়া উঠিয়াছে তাহারও এই মাত্র কারণ যে দর্শকগণের মধ্যে সুরুচিসম্পন্ন লোক অতি বিরল। ইংলণ্ডে সেক্‌সপিয়ারের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রঙ্গভূমিরও অবস্থা এইরূপ শোচনীয় ছিল, তখন থিয়াটারে এমত চীৎকার হইত, যে এক মাইল পর্য্যন্ত লোক ঘুমাইতে পারিত না, গোল মাল, মার ধোর, রক্তারক্তি হইত, সময়ে সময়ে দর্শকবৃন্দ তাহাতে যোগ দিয়া মহা আমোদ করিয়া উঠিতেন, ক্রমে সুরুচিসম্পন্ন লোক থিয়াটারে যত যোগ দিতে লাগিলেন, ততই ঐ সকল গোলমাল কমিয়া আসিল। পরে যখন সেক্‌সপিয়ার, বেন্‌ জন্‌সন্‌ প্রভৃতি মহাকবিগণ রুচিবিষয়ে টেক্কা দিতে লাগিলেন, তখনই ইংলণ্ডীয় নাটকের সমুন্নতি লাভ হইতে লাগিল। অতএব দেশের মধ্যে বহুসংখ্যক সুরুচিসম্পন্ন লোক থাকা আবশ্যক, কিন্তু যদি সামাজে লোক থাকা পর্য্যন্তই হয়, এবং আলঙ্কারিক লোক না থাকে, তাহা হইলে কাব্যাদি একঘেয়ে মারিয়া যায়; রুচির পরিবর্ত্তন হয় না সুতরাং সকলেই এককচির অনুসরণ করে। এই সময়ে অলঙ্কারের কারিকা প্রস্তুত হয়, ক্রমে কারিকা মতে কাব্যলেখা আরম্ভ হয়, কবিপ্রতিভা সম্যক স্ফূর্ত্তি হয় না। কালিদাসের পর ভারতবর্ষীয় রঙ্গভূমির এই দশা হইয়াছিল। অতএব দেশের মধ্যে শুদ্ধ সামাজিক থাকিলেই রুচিনামক মনোবৃত্তির

সম্যক্ পরিচালনা হয় না, উহার অন্য আলঙ্কারিক চাহি। নূতন নূতন সুরুচি-পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে পারেন এরূপ লোক চাই, চলিত কাব্যগ্রন্থ সকল হইতে নূতন নূতন ভাব সংকলন করিতে পারে এরূপ লোক চাই, কবিদিগের মত নূতন নূতন পদার্থ মনোনীত করিতে পারেন এরূপ লোক চাই। যিনি তাহা পারেন তিনি যথার্থ আলঙ্কারিক। কারিকা পড়িয়া আলঙ্কারিক হয় না। কারিকা যে সময়ে লিখিত হয় উহা সেই সময়ের পক্ষে খাটে, পরবর্ত্তিসময়ের লোক যদি সেই কারিকা সকলের অনুরূপ করে তাহা হইলে কাব্যশাস্ত্রের অধোগতি হয়। পরবর্ত্তিসময়ের লোক যদি ঐ কারিকার পরিবর্ত্ত ও উন্নতিসাধন করিতে পারে তাহা হইলে কাব্যশাস্ত্রের উন্নতি হয়। কারিকার ঐতিহাসিকজ্ঞান হয় উহাতে রুচি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ হয় না। উহাতে আমরা এই মাত্র জানিতে পারি যে অমুক সময়ে রুচির অবস্থা এইরূপ ছিল।



মাধবীলতা।

৩৩

জনার্দ্দন শর্ম্মা সম্বন্ধে পিতম পাগলা যাহা বলিয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে। ভিক্ষার ছলে সন্ধ্যার সময় জনার্দ্দন এক গৃহস্থের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল, ভিক্ষা চাহিল না, কাহাকেও ডাকিল না, কেবল অলক্ষ্যে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিল; শেষ যাহা অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহা দেখিয়া চলিয়া গেল। সেই বাটীতে মাধবীর মা বাস করিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এক পুষ্করিণী-কূলে দাঁড়াইয়া একদিন মাধবীর মা দেওয়ান্‌মহাশয়ের পাল্কী যাইতে দেখিয়াছিল, সে পুষ্করিণী এই বাটীর পশ্চিমাংশে। মাধবীর মা এই বাটীতে কুটুম্বের কন্যা বলিয়া রক্ষিতা; তাহার বিধবা মাতৃস্বসা তাহাকে অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন।

জনার্দ্দন সন্ন্যাসী বড় অধিক দূর চলিয়া গেলেন না, সেই বাটীর সম্মুখে এক অশ্বত্থমূলে গিয়া বসিলেন, তথায় রাত্রিযাপন করিবেন বলিয়া ধূনির কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু রাত্রি প্রহরেক অতীত হইল, তথাপি ধূনি আর জ্বলিল না।

মাধবীর মা তৎকালে মাধবীকে লইয়া বসিয়াছিল; মাধবীর বড় জ্বর, পাড়ার গৃহিণীরা সকলে ভয় পাইয়াছিল;

অনেকে আপনারা বসিয়া থেকে ঠাকুরের চরণামৃত খাওয়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে জ্বরের লাঘব হয় নাই। "কালমেঘ" খাওয়ান হইয়াছে তথাপি কোন উপকার হয় নাই। মাধবীর মা নিরুপায় হইয়া এক একবার কাতর-নয়নে মাসীর মুখ প্রতি চাহিতেছিল।

মাসী মালা জপ করিতেছিলেন, আর এক একবার বলিতেছিলেন "ভয় নাই; কালী রক্ষা করিবেন।" রাত্রি ক্রমে দুই প্রহর হইল; শৃগালেরা একযোগে ডাকিয়া উঠিল, মাধবীর মা শিহরিয়া মাধবীকে ক্রোড়ে তুলিল, মাধবী অঘোর অভিভূত যেন নিদ্রিত; চক্ষু মুদিত ছিল, হঠাৎ একবার চক্ষু খুলিয়া গেল, খুলিয়া বড় হইল, কিন্তু তাহাতে দৃষ্টি নাই, চক্ষু আরও বড় হইল। মা মুখ ফিরাইল। মালা ফেলিয়া বৃদ্ধা নিকটে আসিয়া বসিল। "কালি রক্ষা কর" বলিয়া, মাধবীর মুখে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল।

এই সময় বাটীর বহির্ভাগে গোলযোগ হইতেছিল। মাধবীর মা তাহা কিছুই শুনিতে পান নাই, বৃদ্ধাও তাহা জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সদর বাটীতে আগুন লাগিয়াছিল, যে লাগাইয়াছিল, সে নিদ্রার ছলে অশ্বত্থমূলে শয়ন করিয়া আছে। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল, প্রথমে গৃহকপোতেরা জাগিয়া উঠিল, আলোকে আহ্লাদে তাহারা ফিরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া গর্জ্জিতে লাগিল, তাহার পর উড়িয়া প্রতিবাসীদের আলিসায় গিয়া সারি সারি বসিতে লাগিল; অগ্নির আলোকে তাহাদের শ্বেত শরীর ঈষৎ রক্তাক্ত দেখাইতে লাগিল। কেবল একটি কপোতী উড়িল না, নীড়ে বসিয়া সভয়ে গলা বাড়াইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল, তাহার নীড়ে দুইটি শাবক ছিল।

বাটীর চতুষ্পার্শ্বে শত শত লোক আসিয়া জমিল। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল, সকলেই জল আনিতে বলিতে লাগিল; কিন্তু নিজে কেহ জল আনিবার চেষ্টা করিল না, সকলেই হাঁ করিয়া অগ্নির ক্রীড়া দেখিতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল, "আহা! সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনাশ হইল।" কেহ বলিতে লাগিল, "হায় হায়! আর কিছু না; ঘরে স্ত্রীহত্যা হইল।" কেহ বলিল, "ইস্! দেখ দেখ! আগুনের ঢেউ দেখ; এইবার সদরদ্বার গেল, এইবার ফুরাইল, আর কার সাধ্য ভিতরে যায়।"

এই সময় একজন বৃদ্ধ চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া সকলকে বলিতে লাগিল "যে কেহ এক প্রাণী বাঁচাবে আমি তাকে একশত টাকা দিব।" এ-কথা সকলেই শুনিল, কিন্তু কেহ অগ্রসর হইল না বা কেহ কোন উত্তর দিল না। শেষ জনার্দ্দন শর্ম্মা অঙ্গের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আসিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল "আঁ! তুমি দিবে? কথা ঠিক ত?"

বৃদ্ধ। নিশ্চয় দিব, এখনই দিব, আমি শপথ করে বলিতেছি, এখনই দিব।

জনার্দ্দন। কত টাকা?

বৃদ্ধ। একশত টাকা। যদি বাঁচাতে পার তবে আর কথায় সময় নষ্ট কর না।

জনার্দ্দন। একশত নগদ টাকা ত? রোক?

বৃদ্ধ। হাঁ। তার আর অন্যথা হবে না।

জনার্দ্দন। তোমার নাম কি?

বৃদ্ধ। রামকমল বিদ্যানিধি, আমরা ফুলের মুখুটি, বলরামঠাকুরের সন্তান।

জনার্দ্দন। তবে যা কর ভৈরবী।

এই বলিয়া জনার্দ্দন ইতস্ততঃ অবলোকন করিল, দেখিল দূরে একটা লাঙ্গল পড়িয়া রহিয়াছে, সদর্পে তাহা উঠাইয়া অর্দ্ধদগ্ধ দ্বার আকর্ষণ করিল। দ্বার অমনি পড়িয়া গেল, লক্ষ লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আকাশপথে উঠিল। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া সেই দিকে দৌড়িল, তখন জনার্দ্দন এক দীর্ঘ লগুড় লইয়া আসিল, সকলকে সরিয়া যাইতে বলিল, সকলে সরিয়া দাঁড়াইল, আরও সরিয়া যাইতে বলিল, লোকে আরও সরিয়া গেল। তখন দূর হইতে জনার্দ্দন লগুড় হস্তে দৌড়িয়া আসিয়া লগুড়ে ভর করিয়া এক লম্ফে দগ্ধদ্বার উল্লঙ্ঘন করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল, সকলে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাহির হইতে সকলে লগুড়ের অগ্রভাগ দেখিতে লাগিল, লগুড়াগ্র হেলিতেছে, দুলিতেছে, চলিতেছে। অনেকে বলিতে লাগিল, এখনও সন্ন্যাসী উঠানে রহিয়াছে। অনতি বিলম্বে আকাশমুখী লগুড়াগ্র হঠাৎ দুলিয়া পড়িয়া গেল, সকলে ভয়ে নিস্পন্দ হইল, লগুড় আর উঠিল না; তখন কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিল, বুঝি সন্ন্যাসী পুড়িয়া গিয়াছে। এই সময় জনার্দ্দনের হাসি শুনা গেল, জনার্দ্দন বলিতেছে, "কপোতি তুমি এখনও বসিয়া আছ?"

উত্তাপে কপোতী কাতর হইয়াছে, কণ্ঠ কাঁপিতেছে, ওষ্ঠ বিযুক্ত হইয়াছে, কপোতী চারিদিকে দেখিতেছে, এখানে ওখানে বসিতেছে, আবার ফিরিয়া নীড়ে আসিতেছে। শাবকেরা ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিতেছে। জনার্দ্দন বলিল, "বুঝিছি, মায়া। আমি উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, তোমায় উদ্ধার করিব।"

এই বলিয়া জনার্দ্দন আবার লগুড় গ্রহণ করিয়া তাহার অগ্রভাগ অগ্নিতে ধরিল, শেষ দগ্ধ লগুড় ঊর্দ্ধে উঠাইল, "সন্ন্যাসী বেঁচে আছে" বলিয়া বাহিরের লোকেরা মহাকোলাহল করিয়া উঠিল। ক্রমে লগুড় দুলিতে দুলিতে চণ্ডীমণ্ডপ স্পর্শ করিল, চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লাগিল। লোকেরা বলিয়া উঠিল, "পাপিষ্ঠ সন্ন্যাসী চণ্ডীমণ্ডপে আগুন দিল; মার সন্ন্যাসীকে।" এই বলিয়া সকলে বাটীর ভিতরে ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী তাহা লক্ষ্যও করিল না।

চণ্ডীমণ্ডপ পুড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী লগুড়দ্বারা নীড় ভাঙ্গিয়া দিল। শাবক দুইটি ভূমে পড়িয়া গেল, জনার্দ্দন তাহাদের পক্ষ ধরিয়া দোলাইয়া প্রজ্জলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিল। কপোতী তাহা নিঃশব্দে দেখিল। সন্ন্যাসী তখন লগুড়-হস্তে তাহাকে তাড়না করিল। শোকাকুলা কপোতী ভয়ে উড়িল, চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে আসিয়া ঊর্দ্ধে উঠিল, কিয়দ্দূর উঠিয়াই অগ্নির উত্তাপে অগ্নিতে পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী বলিল, "তোর অদৃষ্ট! আমার দোষ কি?"

চণ্ডীমণ্ডপে একখানি পট ছিল, এতক্ষণ সন্ন্যাসী তাহা দেখে নাই, অগ্নির আলোকে দেখিতে পাইয়া একলম্ফে পটের সম্মুখে গিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইল। পটখানি কালীমূর্ত্তি। জনার্দ্দন বলিল, "মা! আমার অপরাধ হয়েছে, তুমি এখানে আছ তাই এতক্ষণ এ ঘরে আগুন লাগে নাই, আমি তাহা না জেনে আগুন দিয়াছি। ইষ্টদেবি! আমার অপরাধ ক্ষমা কর।"

৩৪

সেই সময় মাধবীর মা দেখিল, সম্মুখে এক ভয়ানক মূর্ত্তি! মনে করিল, যমদূত মাধবীকে লইতে আসিয়াছে, অতএব মাধবীকে বুকে ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আগন্তুক চীৎকার শুনিয়াও শুনিল না; হস্তপ্রসারিয়া মাধবীকে ধরিল। মাধবীর মা মূর্চ্ছা গেল। সেই সাবকাশে আগন্তুক মাধবীকে লইয়া ছুটিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৃদ্ধাও ছুটিল।

আগন্তুককে যমদূত বলিয়া বৃদ্ধার ভ্রম হয় নাই। আপাদমস্তক কর্দ্দমাক্ত বলিয়া আগন্তুকের আকৃতি ভয়ানক দেখাইতেছিল। বৃদ্ধা বাহিরে আসিয়া বুঝিল যে, আগন্তুক অগ্নিভয়ে আপনার সর্ব্বাঙ্গে কাদার প্রলেপ দিয়াছে। আগন্তুক মাধবীকে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া উত্তরের প্রাচীরে উঠিল। এবং তথায় দাঁড়াইয়া সেই প্রাচীর সংলগ্ন অন্য এক গৃহস্থের ত্রিতল অট্টালিকায় উঠিবার নিমিত্ত মাথা তুলিয়া দেখিতে লাগিল; অট্টালিকায় বালির জমাট কিম্বা চূণকাম নাই, এই জন্য তাহাতে উঠিলে উঠিতে পারা যায়; কিন্তু সে অতি দুঃসাহসিক কার্য্য। কিন্তু আগন্তুক আর অধিক ইতস্ততঃ না করিয়া এক দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ করিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। সেই ভয়ানক দুঃসাহসিক কার্য্য দেখিয়া বৃদ্ধার হৃৎকম্প হইতে লাগিল, আপনার বিপদ একেবারে ভুলিয়া বৃদ্ধা একদৃষ্টিতে সেই অপরিচিত ব্যক্তির বিপদ দেখিতে লাগিল; প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার পদস্খলন আশঙ্কা হইতে লাগিল। বৃদ্ধা ঊর্দ্ধশ্বাসে ঊর্দ্ধমুখে কেবল সেই দিকে চাহিয়া রহিল; বিপদে ইষ্টদেবীকে ডাকিবে, কিন্তু ইষ্টদেবীর নাম আর মনে আসিল না।

বহুকষ্টে অপরিচিত ব্যক্তি দ্বিতল অতিক্রম করিয়া কার্ণিসে দাঁড়াইল; একবার

নিশ্বাস ফেলিল, বৃদ্ধার শরীরে যেন সেই সঙ্গে স্পন্দন ফিরিয়া আসিল। আর কতটা উঠিতে হইবে, তাহা একবার অপরিচিত ব্যক্তি মাথা তুলিয়া দেখিল, তাহার পর আবার পূর্ব্বমত উঠিতে লাগিল। এবার আর বৃদ্ধা চাহিয়া দেখিতে পারিল না, মস্তক নত করিয়া চক্ষু মুদিল, ক্ষণেক পরে বৃদ্ধা আবার চাহিয়া দেখিল, অপরিচিত ব্যক্তি ছাদে উঠিয়াছে। তখন বৃদ্ধা আসন্নবিপদুদ্ধৃত ব্যক্তির ন্যায় ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তাহার পর ক্রমে ক্রমে আপনার অবস্থা সম্পূর্ণ অনুভব করিতে লাগিল। বুঝিল, প্রাণ আর কোন ক্রমে রক্ষা হয় না; চণ্ডীমণ্ডপ পর্য্যন্ত অগ্নি আসিয়াছে, তাহার উত্তাপে অন্তঃপুরে আর থাকা যায় না। যে ঘরে মাধবীর মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে, সে ঘর ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিন্তু তাহার দ্বারে অগ্নি লাগিতে আর বিলম্ব নাই। অগ্নিময় বাটী হইতে আর কোন কৌশলে বহির্গত হইতে পারা যায় না। অতএব মৃত্যু নিশ্চয় আগত বুঝিয়া বৃদ্ধা রুদ্রাক্ষমালা মস্তকে বাঁধিবার নিমিত্ত ঘরের ভিতর গেল।

এই সময় পূর্ব্বকথিত অপরিচিত ব্যক্তি আবার অট্টালিকা হইতে অবতরণ করিয়া গৃহপ্রবেশ করিল। তথায় গিয়া মাধবীর মার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, শেষ বলিল, "নিদ্রিতা! যাও বাছা, নিদ্রা যাও, অনেক কষ্ট পেয়েছ, জাগিয়া আর লাভ কি?" তোমার নিদ্রাই এখন আবশ্যক।

তাহার পর অপরিচিত ব্যক্তি ঘর হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল। দেখিল স্ত্রীলোকদের পলাইবার কোন পথ নাই। বহির্ব্বাটীর দিকে গিয়া দেখিল, তথায় চারিদিকের চালাঘর পুড়িয়াছে, পুড়িতেছে—সে দিকেও পথ নাই, তথাপি বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আগন্তুক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইল। তখন জনার্দ্দন শর্ম্মা পটহস্তে চণ্ডীমণ্ডপহইতে নামিতেছিল, আগন্তুককে দেখিতে পাইল না, দেখিলেও চিনিতে পারিত না। কিন্তু আগন্তুক তাহাকে চিনিল। অলক্ষ্যে থাকিয়া দেখিতে লাগিল, জনার্দ্দন উঠান দিয়া যাইতে যেন অশক্ত, অগ্নির দিকে চাহিতে পারিতেছে না, চক্ষু কুঞ্চিত করিতেছে, উত্তাপ যেন তাহার অসহ্য হইয়াছে। সন্ন্যাসী কয়েক পদ গিয়া ফিরিল; দেখিল, ফেরা বৃথা; চণ্ডীমণ্ডপের উপর অগ্নি তরঙ্গ তুলিয়া খেলিতেছে। উত্তাপ সেদিকেও অসহ্য।

অপরিচিত ব্যক্তি তখন এই সময় অগ্রসর হইয়া বলিল, "পলাও, আর বিলম্ব করিও না।"

জনার্দ্দন। তুমি কে? তুমি কি অগ্নির দেবতা? নতুবা এই জলন্ত হুতাশনের মধ্যে কেমন করে অম্লানবদনে বেড়াইতেছ?

অপরিচিত। আমি যে হই, তুমি

পলাও,. নতুবা তোমার প্রাণরক্ষা হইবে না, এখনও পলাও। আগুন আজ ক্ষেপেছে, আজ দেবতারও বশ নহে, কাহারও কথা শুনিবে না, তোমারই জন্য জ্বলেছে, দেখিতেছ না তোমাকে ফাঁদে ফেলেছে, তোমার চারিদিকে আগুন। যদি সাধ্য থাকে এখনও পলাও।

জনার্দ্দন। আমার আর সাধ্য নাই, মাথা ঘুরিতেছে, চক্ষে যেন কি দেখিতেছি, কাণ ভুহু করিতেছে।

অপরি। তবে এইখানে বসে পরকাল চিন্তা কর।

জনার্দ্দন। যে পথ দিয়া তুমি পলাবে সেই পথে আমায় লইয়া চল।

অপরি। আমি পলাব না; অগ্নি নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত আমি এইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিব।

জনার্দ্দন। এই উত্তাপ তুমি কিরূপে সহ্য করিবে? এ উত্তাপে তোমার কি কষ্ট হতেছে না?

অপরি। কিছুমাত্র নহে; অগ্নিতাপে বরং আমার শরীর শীতল হতেছে, আমার অঙ্গে হাত দিয়া দেখ।

জনার্দ্দন। তাই ত! আশ্চর্য্য শীতল! তবে তুমি দেবতা; আমায় বঞ্চনা কর না। সত্য বল।

অপরি। কাদার সঙ্গে মসলা মাখিয়াছি। আমি দেবতা নহি, আমি নরাধম, পৃথিবীতে আমি কেবল আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত রহিয়াছি।

জনার্দ্দন। ও মেয়ে ভুলান কথা কার কাছে বল? পাপ, পাপ! পাপ ত জুয়াচোরের কথা, পয়সা রোজকারের কথা! পাত্র পেলে আমিও পাপের ভয় দেখাই। বোধ হয় তবে তুমিও মতলবি লোক।

অপরি। তুমি পাপ মান না? ভাল, এ আগুন ত তুমিই জ্বেলেছ, এখন দেখ দেখি সেই আগুনে তুমিই পুড়িতে বসিলে। ইহা কি পাপের দণ্ড নহে?

জনার্দ্দন। অমন কতবার হয়ে গেছে; কত স্ত্রীহত্যা, কত ব্রহ্মহত্যা করেছি, তার জন্য কত ফল পেয়েছি, কয়বার পুড়ে মরেছি? অপঘাত মৃত্যু অসাবধানতার ফল; পাপের ফল কিসে?

অপরি। অনিয়ম কাজকেই পাপ বলে; তাহার দণ্ড আছে।

জনার্দ্দন। পাপের দণ্ড! ছয়মাসের শিশু নৌকা ডুবি হয়ে মরে; সে কোন পাপের দণ্ড? ছয়মাসের শিশু কোন পাপ করেছিল? ঝড়ে কাক মরে, সে কোন পাপের দণ্ড? কাক কি করিয়াছিল? তুমি বলিবে কাক বেদবহির্ভূত কোন কার্য্য করেছিল, অথবা কোন ভট্টাচার্য্যের ঘৃতে মুখ দিয়াছিল। তাহা হইলে তুমি মূর্খ। আমি এইমাত্র মনে করে ছিলাম তুমি দেবতা; বুঝিলাম তুমি নির্ব্বোধ। পাপের যদি দণ্ড থাকে তবে পুণ্যেরও দণ্ড আছে; কেন না নিত্য দেখা যায় অনেকে পুণ্য কার্য্য করিতেছে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে কষ্টও পাইতেছে।

সুখ-দুঃখসম্বন্ধে পাপপুণ্য সমান। আমি বেদ বেদান্ত পড়েছি, সকলই আঁধার, সকলেই অন্ধের লেখা—মীমাংসা নাই। আসল কথা—সুখ দুঃখের হেতু অবোধ্য; যদি তা না হবে, তবে বল দেখি, ইন্দ্রভূপ রাজা কেন, আর আমার এই দারিদ্র্যদশা কেন ?

অপরি। ওখান হইতে একটু দূরে আইস। অগ্নি তোমায় লক্ষ্য করেছে, ঐ দেখ চণ্ডীমণ্ডপ হইতে তোমারই মাথায় পড়িবার উদ্যোগ করিতেছে।

এই বলিতে বলিতেই চণ্ডীমণ্ডপের একাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, পূর্ব্বে সতর্ক না হইলে তৎক্ষণাৎ জনার্দ্দনের শেষ হইত। চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়া আরও উত্তাপ বাড়িল; জনার্দ্দন বলিয়া উঠিল, "আমি মরি, আমায় বাঁচাও। না হয় বল আমি আগুনে ঝাঁপ দিই, সে বরং ভাল, শীঘ্র ফুরাবে।"

অপরি। আমি তোমায় কিরূপে বাঁচাব, তাহা বলিয়া দেও।

জনার্দ্দন। তা আমি জানি না, তুমি দেবতা, উপায় তুমি সকলই জান। আমায় বাঁচাও, আমি আর দাঁড়াতে পারি না।

অপরি। বাঁচিতে কি তোমার এত সাধ ?

জনার্দ্দন। আমায় বাঁচাও। আমি কাটাকাটি করে মরিতে পারি; এমন বৃথা দাঁড়াইয়া মরিতে পারি না। এ মরণের বড় যন্ত্রণা।

অপরি। তুমি কোন্ পথ দিয়া আসিয়াছিলে ?

জনার্দ্দন। আমি ঐ সদর দরওয়াজা লাফাইয়া আসিয়াছিলাম, আমি এখন আর তা—

এই বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী পড়িবার উপক্রম করিল। অপরিচিত ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া শুয়াইয়া দিল। জনার্দ্দন চক্ষু বুজিল, আর কথা কহিল না। অপরিচিত ব্যক্তি চীৎকার করিয়া ডাকিল, "জনার্দ্দন!" তখন সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় জনার্দ্দন চক্ষু চাহিয়া আবার চক্ষু মুদিল।

অপরি। জনার্দ্দন! আমায় চিনিতে পার ?

জনার্দ্দন তখন ধীরে ধীরে, অলসে, যেন নিদ্রার আবেশে বলিতে লাগিল, "পারি, তুমি দেবতা, সূর্য্য, আমি সূর্য্যমণ্ডলে এসেছি। পুড়ে মরি! রক্ষা কর, আমি শরণাপন্ন।"

অপরিচিত ব্যক্তি আবার ডাকিল, কিন্তু আর কোন উত্তর না পাইয়া, জনার্দ্দনকে বুকে তুলিয়া, নিমেষমধ্যে দগ্ধদ্বার অতিক্রম করিয়া তৃণাচ্ছাদিত মৃত্তিকায় তাহাকে শয়ন করাইল, তথায় ক্ষণেক দাঁড়াইয়া জনার্দ্দনের মুখপ্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর চীৎকার করিয়া বলিল, "পরিচিত কে আছ, সন্ন্যাসীর শুশ্রূষা কর।" সে চীৎকার শত শত কণ্ঠনিঃসৃত কোলাহলের উপরে উঠিল, যেন ঝিল্লীরবের

উপর সারস ডাকিল; অমনি সভয়ে ঝিল্লীরা নীরব হইল। অপরিচিত ব্যক্তি আবার ফিরিয়া দগ্ধ গৃহে প্রবেশ করিল। একজন পরিচিত ব্যক্তি সে কণ্ঠ শুনিল; শুনিবামাত্র ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর শুশ্রূষা করিতে বসিল।

পরক্ষণেই সেই অপরিচিত ব্যক্তি আবার বহির্গত হইল। এবার বৃদ্ধাকে আনিয়া, মৃত্তিকায় সযত্নে রাখিয়া পুনর্ব্বার গৃহ প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা রক্তবর্ণ হইয়াছে, তাহার অল্পজ্ঞান আছে; লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ব্যক্তি কে?" বৃদ্ধা পথের প্রতি চাহিল; কোন উত্তর করিল না।

তখন দ্বারের সম্মুখে সকলে আসিয়া দাঁড়াইল। সে ব্যক্তি আবার এখনই আর একজনকে আনিবে, এই প্রত্যাশায় সকলে গিয়া জমিল; আসিতেছে কি না দেখিবার নিমিত্ত সকলেই পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সম্মুখে আর স্থান নাই, তথাপি সকলেই ব্যস্ত হইয়া অগ্রে দাঁড়াইবে বলিয়া ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। এই সময় মাধবীর মাকে ক্রোড়ে লইয়া সেই অপরিচিত ব্যক্তি অতি বেগে আসিয়া লম্ফ দিল। কিন্তু সম্মুখে স্থান ছিল না, বেগ সম্বরণ করিতে গিয়া দগ্ধদ্বারের উপর পড়িয়া গেল। চারিদিকে মহা কোলাহল হইয়া উঠিল।

অপরিচিত ব্যক্তি বিদ্যুদ্‌বেগে অমনি উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনও মাধবীর মা তাঁহার ক্রোড়ে। কিন্তু অগ্নিসংস্পর্শে যুবতীর বস্ত্র স্থানে স্থানে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অপরিচিত ব্যক্তি তাহাকে নামাইয়া, উলঙ্গ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিল। যুবতী তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সেই জ্বলন্ত বস্ত্র ধরিয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিল। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সকলই ফুরাইয়া গেল। মাধবীর মা লজ্জার ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়াছিল, এবার লজ্জার ভয়ে দেহত্যাগ করিল।

লোকেরা সকলে দাঁড়াইয়া শবদাহ দেখিতে লাগিল। যতক্ষণ পারিল খড়, বাঁশ, বস্ত্র, মাধবীর মাকে দগ্ধ করিল। তার পর অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে শবের অঙ্গারমূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। কেবল বামপদ খানি অগ্নিতে পড়ে নাই সুতরাং পুড়ে নাই; তাহা অলক্তসংযুক্ত এখনও রহিয়াছে; নখরে অগ্নিশিখা এখনও প্রতিবিম্বিত হইতেছে। অনেকে তাহা দেখিতে ও দেখাইতে লাগিল; কিন্তু একজন যুবা তাহা দেখিতে পারিল না; "আমি সপ্তকাষ্ঠকী দিই," বলিয়া কতকগুলা শুষ্ক কাষ্ঠ আনিয়া সেই কোমল পদখানি আবরণ করিল। তাহার পর আবার কাষ্ঠ আনিয়া নিষ্ঠুর লোকের কঠোর দৃষ্টি হইতে শবের সর্ব্বাঙ্গ গোপন করিল। আবার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, শবদাহ সম্পূর্ণ হইল।

গৈরিকবস্ত্রধারী যুবা-ব্রহ্মচারী, আমা-

দের পূর্ব্বপরিচিত মাতঙ্গিনী। ভৈরবী প্রভৃতি চারিজন এই গ্রামে রাত্রিযাপন করিতেছিল, গৃহদাহ দেখিবার নিমিত্ত মাতঙ্গিনী যুবার বেশে আসিয়াছিল।

৩৫

দূর হইতে জনার্দ্দন শর্ম্মা দেখিল মাধবীর মা দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ভাবিল, "উত্তম হইয়াছে, আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে মাধবীর সংবাদ পাইলেই হয়।" আবার ভাবিল, "মাধবীও রক্ষা পায় নাই, কেন না সেই অপরিচিত ব্যক্তি কেবল বৃদ্ধাকে আর মাধবীর মাকে বহন করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু মাধবীকে ত আনে নাই, মাধবী তবে কোথা গেল? মাধবী অবশ্য মরিয়াছে।" মনে মনে এই আলোচনা করিয়া জনার্দ্দন উঠিয়া বসিল। আহ্লাদে বলিল, "জগদীশ্বর আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছেন। দুইজনেই মরিয়াছে। কল্যই গিয়া সম্বাদ দিব, দেখি রাণী কি পারিতোষিক দেন।"

এই সময় পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ আসিয়া জনার্দ্দনকে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্দ্দমাক্ত ব্যক্তি যে তোমাদের উদ্ধার করিল সে কে?"

জনার্দ্দন। সে আমার পরিচিত বটে, আত্মীয়ও বটে।

বৃদ্ধ। উহার নাম কি, নিবাস কোথায়?

জনার্দ্দন। তা আমি বলিব না; বলিতে সে নিষেধ করে গেছে। পাছে আপনারা কেহ তাহাকে চিনিতে পারেন, এই ভয়ে সে গায়ে মুখে কাদা মাখিয়াছিল।

বৃদ্ধ। আমরা তাকে চিনিলে দোষ কি?

জনার্দ্দন। দোষ একটু আছে; তা আপনার আর শুনে কাজ নাই; সে আমায় বিশেষ করে নিষেধ করে গেছে, আমি আর তাহা বলিব না।

বৃদ্ধ। ভাল আমরা ত কেহ উহাকে গৃহপ্রবেশ করিতে দেখি নাই।

জনার্দ্দন। গৃহদাহের পূর্ব্ব হইতে ঐ ব্যক্তি অন্তঃপুরে ছিল, নিতাই থাকে।

বৃদ্ধ। কিন্তু ঐ ব্যক্তি এ বাটীর কেহ নহে, এ বাটীতে পুরুষমাত্রেই নাই।

জনার্দ্দন। পুরুষ ছিল না, কিন্তু ইদানীং জুটিয়াছিল, আমরা সন্ন্যাসী, এরূপ কতই দেখিয়াছি। সে যাহা হউক এখন আর জুটিবে না, যাহার জন্য জুটিয়াছিল এখন ত সে গেল।

বৃদ্ধ। তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিলাম না।

জনার্দ্দন। সে সকল কথা যাক্; আপনার বুঝিয়াও কাজ নাই। যিনি মরিলেন, তিনি আপনাদের কিম্বা আপনাদের গ্রামেরও কেহ ছিলেন না, শান্তিশতগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। যিনি আমাদের উদ্ধার করিলেন, তিনিও শান্তিশতগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। সেইখানেই আবার গেলেন। যাবার সময় আমায় টাকার কথা বলে গেলেন।

বৃদ্ধ। কোন্ টাকার কথা?

জনার্দ্দন। আপনি যে টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন। এক একজন এক এক শত টাকার হিসাবে তিনশত টাকা তাহার পাওনা, তা আমি বলেছি যে, আমার হিসাব ছেড়ে দেও, আমি বাহিরের লোক। দুইশত টাকা তাহার ন্যায্য পাওনা; তবু আমি আপনার হয়ে বলেছি যে, একজন ত মরে গেল। তা সে শুনিল না; সে বলে "আমি ত উদ্ধার করেছি; তার পর কে এখন জলে ডুবে মরিবে, কি গলায় দড়ি দিয়া মরিবে, তা আমার কি?"

বৃদ্ধা। তা, তারে কাল আসিতে বলিবেন দেখা যাবে।

জনার্দ্দন। আবার তাকে কেন? তবে আমি বলিলাম কি? সে যদি আপনাদের নিকট মুখ দেখাবে, তবে মুখে কাদা মাখ্‌বে কেন, এই সোজা কথা আপনি বুঝিতেছেন না?

বৃদ্ধা। বুঝেছি, কিন্তু সে ব্যক্তি এমন ধর্ম্মিষ্ঠলোক, এমন বীর, সে আমাদের নিকট কেন মুখ দেখাবে না?

জনার্দ্দন। ঐ যে বলিলাম, যে যুবতী এইমাত্র ভস্ম হইল, উহার নিতান্ত অনুরোধে পড়ে এ গ্রাম পর্য্যন্ত সে এসেছিল, তাতেই ভদ্রলোকের ছেলে লজ্জায় মরে গেছে। কিন্তু শান্তিশতগ্রামে যেখানে উভয়ের বাড়ী সেখানে উহার কোন কলঙ্ক নাই, লোকে জানে মাধবীর মা কুলত্যাগিনী হয়েছে, কিন্তু কার সঙ্গে তা কেহ ঠিক জানে না।

বৃদ্ধ। এমন পাপিষ্ঠকে আমি কদাচ পারিতোষিক দিব না।

জনার্দ্দন। কেন দিবেন না? পাপিষ্ঠ হইলে টাকা দিবেন না এমত ত কথা ছিল না। যে উদ্ধার করিবে তাকেই আপনি টাকা দিবেন, এই ত কথা ছিল। হলই বা সে নিজে পাপিষ্ঠ, লম্পটলোকের কি দয়া থাকে না? না, স্নেহ থাকে না? লাম্পট্য দোষে দয়ার কার্য্য কি কখন কলুষিত হয়! সে ব্যক্তি লম্পট বলিয়া কি আমাদের প্রাণরক্ষা হয় নাই? না, আমাদের প্রাণের কোন কমবেশী হইয়াছে? ধর্ম্ম সতত পবিত্র; চণ্ডালে ধর্ম্ম করিয়াছে বলে ধর্ম্ম কখন কি অপবিত্র হয়? আর এক বিশেষ কথা আছে; আপনি দুইশত টাকা দিয়া এই ধর্ম্ম ক্রয় করিতেছেন; এ ধর্ম্ম ত সে অপাত্রে থাকিতেছে না—খরিদ করিলেই ধর্ম্ম আপনাতে আসিবে; খরিদ না করেন এ ধর্ম্ম তাহারই থাকিবে। দুইশত টাকায় প্রাণরক্ষা বড় সস্তা।

বৃদ্ধা। কথা ঠিক বটে, তবে আর ভাবা চিন্তা কি? আইস, আমার সঙ্গে আইস, আমি বলেছি দিব, তার অন্যথা হইবে না। তবে কি জান দুইশত টাকা—অনেকগুলা টাকা; কিছু কম লইলে ভাল হয়।

জনার্দ্দন। তা আমি কি করিব; আমি ত লইতেছি না, তা হইলে আপ-

নার অনুরোধ আমায় রাখিতে হইত। এখন যদি আপনি সমুদয় পুরা, রোক টাকা না দেন, আপনাকে ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে। আপনি ধর্ম্মিষ্ঠ; আপনি কেন অল্পের জন্য আপনার ধর্ম্মের ক্ষতি করিবেন। বিশেষতঃ এ ধর্ম্ম বড় সামান্য নহে,দুইহাজার টাকা ব্যয় করেও কেহ প্রাণরক্ষা করিতে পারে না; এ ঘটনা ত সর্ব্বদা ঘটে না, আপনার বড় ভাগ্য তাই এই গৃহদাহ হইয়াছে, দেখুন দেখি ধর্ম্মের কি আশ্চর্য্য খেলা—একজনের গৃহদাহ হইল, আপনার ধর্ম্ম সঞ্চয় হইল!

বৃদ্ধ। তবে আর কোন কথায় কাজ নাই, তুমি টাকা লইয়া যাও; কিন্তু একটা কথা আছে; যিনি মরিলেন তিনি কে?

জনার্দ্দন। তিনি রামদাস শর্ম্মার বিবাহিতা স্ত্রী—কুলটা; রাজা ইন্দ্রভূপের প্রণয়িনী। আর অধিক পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন না।

এই বলিয়া টাকা লইয়া জনার্দ্দন চলিল। পথে আসিয়া একবার আন্তরিক হাসি হাসিয়া বলিল, "সে বেটা এখন কোথায়; আসিয়া দেখুক, ধর্ম্মের জয় কি পাপের জয়! আবার এ বুড়া বেটা ধর্ম্ম কিনিতে চায়! চাল কেনে, দাল কেনে, কাজেই ধর্ম্মও কিনিবে,তার আর আশ্চর্য্য কি? ধর্ম্ম চাল দালের মধ্যেই বটে।"

রাত্রি প্রভাত হইলে শান্তিশত গ্রামে পারিতোষিক লইতে যাইবে, এই মনে করিয়া জনার্দ্দন পূর্ব্বকথিত অশ্বত্থমূলে গিয়া বসিল। এমত সময় একজন দীর্ঘাকার পুরুষ আসিয়া জনার্দ্দনের অনতিদূরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও ব্রহ্মচারিবেশধারিণী মাতঙ্গিনী চিতার নিকট দাঁড়াইয়াছিল। দীর্ঘাকার পুরুষ তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বলিল, "এ যে নরদেহাবশেষ।"

মাত। দুঃখিনী, অনাথিনীর দেহাবশেষ।

দীর্ঘাকার পুরুষ মৃদুস্বরে বলিল,"মাতঙ্গিনি, তুমি অদ্যাপি শান্তিশতগ্রামে যাও নাই?"

মাতঙ্গিনী চিনিল। ইচ্ছা ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করে, কিন্তু করিল না। বলিল, "মহারাজ আসুন, আর একটু দূরে গিয়া সকল কথা বলিতেছি।" দীর্ঘাকার পুরুষ রাজা মহেশচন্দ্র। মাতঙ্গিনী কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিই কি এইমাত্র গৃহবাসীদের উদ্ধার করিয়াছেন? আপনি ভিন্ন এরূপ বীরত্ব আর কাহারও সম্ভবে না; কিন্তু তাহা হইলে আপনি এখনও দাঁড়াইয়া আছেন কিরূপে? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি আপনার পা হাত পুড়িয়া গিয়াছিল।"

মহেশচন্দ্র বলিলেন, "আমি শিবির হইতে এইমাত্র আসিতেছি,গৃহদাহের বৃত্তান্ত সকল আমায় বল; আমি কিছুই জানি না।" মাতঙ্গিনী আপনার জ্ঞানানুসারে

বলিলে মহেশচন্দ্র ভাবিলেন, "এরূপ বীরত্ব কে করিয়াছে? এরূপ লোক এ অঞ্চলে কে আছে?" তাহার পর মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাহার আকারসম্বন্ধে কোন চিহ্ন স্মরণ করিয়া বলিতে পার।"

মাতঙ্গিনী বলিল, "তিনি সর্ব্বাঙ্গে কি লেপন করিয়াছিলেন, তাঁহার শরীরের বর্ণ কি চিহ্ন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তবে একটা কথা এখন আমার স্মরণ হইতেছে, যে তিনি আপনার মত দীর্ঘাকার কি বলিষ্ঠ নহেন।"

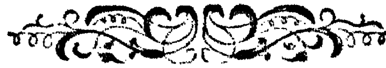
মহেশচন্দ্র। তিনি কাহারও সহিত কথা কহিয়াছিলেন?

মাতঙ্গিনী। না, একেবারে না, তিনি নিমেষের মধ্যে কয়জনের প্রাণরক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন; আমার বোধ হইল, যেন ঝড় আসিয়া মানুষের রূপ ধরে এই কার্য্য করিয়া গেল।

মহেশচন্দ্র। তুমি না বলিতেছিলে তাঁহার অঙ্গের দুই এক জায়গা পুড়িয়া গিয়াছে?

মাতঙ্গিনী। নিশ্চয়ই তাঁহার অঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে, তিনি যখন অমন করে আগুনের উপর পড়ে গেলেন, তখন অবশ্যই তাঁহার অঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে।

মহেশচন্দ্র। তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারিব। এখন আমি যাই; আমার সহিত আবার সাক্ষাৎ না হইলে যেন শান্তিশতগ্রামে যাওয়া না হয়।



যোগেশ।*

যোগেশ-গ্রন্থকার বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গের নিকট অপরিচিত নহেন; বৎসরাধিক হইল, আমরা তাঁহার চিত্ত-মুকুর সমালোচনা করিয়াছি। তৎকালে আমরা ভাবিয়াছিলাম, যে এই কবি এক সময়ে বিশেষ যশস্বী হইবেন, এক্ষণে তাঁহার যোগেশ পাঠ করিয়া আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি, যে তাঁহার যশের সূত্রপাত হইয়াছে।

যোগেশ একখানি কাব্যোপন্যাস—

* যোগেশ কাব্য। শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়প্রণীত। ৮৪ নং রাধাবাজার কলিকাতা প্রেসে মুকর্জি কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ১, এক টাকা।

দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থের নায়কের নামে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। যোগেশ ধনবানের পুত্র, সুশিক্ষিত, সকল-প্রকার সদ্‌গুণশালী, কবিহৃদয়, রূপবান্‌। কিন্তু দৈবযোগে তিনি তাঁহার অতুল-গুণসম্পন্না পতিপ্রাণা ভার্য্যা নর্ম্মদার গভীরপ্রেম তুচ্ছ করিয়া, তাঁহার বাল-বন্ধু-পত্নী মন্দাকিনীর প্রতি অনুরক্ত হইলেন। মন্দাকিনী যোগেশকে সহোদরের ন্যায় দেখিতেন, তাঁহাকে সেই মতই দেখিতে লাগিলেন। হতাশ যোগেশ এই প্রত্যাখ্যানে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক অতি শৈশব একমাত্র পুত্র, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, সকলই ভুলিয়া—সমুদ্রতীরস্থ ভৈরবনামক এক পর্ব্বতে কেবল মন্দাকিনীর ধ্যান করিতে লাগিলেন। যোগেশের শরীর ক্রমশঃ "শ্মশানে প্রোথিত জীর্ণবংশখণ্ড মত" হইয়া আসিল। এইখান হইতে গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে।

একদিন নিদ্রাবস্থায় মন্দাকিনীসম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিয়া যোগেশের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সুপ্তোত্থিত যোগেশ চমকিত হইয়া নিদ্রাকে সম্বোধন পূর্ব্বক স্বপ্নদৃষ্ট সমস্ত বৃত্তান্ত জাগ্রত চক্ষে দেখাইতে বলিলেন; নিদ্রা যোগেশকে স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত দেখাইলেন। তাহা চাক্ষুষ হইবামাত্র যোগেশ গভীর কাতরোক্তি করিয়া মূৰ্চ্ছিত হইলেন। ক্রমশঃ প্রভাত হইল, যোগেশ চেতন পাইয়া পড়িয়া আছেন, এমন সময় তথায় এক ব্যাধ মৃগয়াবেশে উপস্থিত হইল, এবং যোগেশের তাদৃশ অবস্থা দৃষ্টে ব্যথিতান্তঃকরণে তাঁহাকে বক্ষে তুলিয়া আপনার কুটীরে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া ব্যাধ যোগেশকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যোগেশ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ব্যাধের প্রতি প্রশ্নে উন্মাদের ন্যায় "ওই আমার জীবন" বলিয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। বারম্বার ঐরূপ করাতে ব্যাধ নির্দ্দিষ্ট পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তৎপরে পার্শ্বে দেখিবামাত্র যোগেশকে দেখিতে পাইল না—যোগেশ উন্মত্তাবস্থায় কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। ব্যাধ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময়—

শিশু পুত্র শবরের আসি পার্শ্বে তার
ডাকিল তাহায় "বাবা!"—সিহরিয়া ব্যাধ
হেরিল পারশে পুত্র, ভুলিয়া সকল
লইল সন্তানে বক্ষে হাসিতে হাসিতে।

ব্যাধের নিকট হইতে আসিয়া, একদিন ভৈরব পর্ব্বতের গুহায় যোগেশ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তাঁহার মৃত পিতৃআত্মা উপস্থিত হইলেন। তিনি পুত্রকে যাহা বলিলেন, তাহা গম্ভীর মেঘনির্ঘোষতুল্য, পাঠকালে শরীর রোমাঞ্চ হয়, অথচ করুণরসে আপ্লুত— অন্তস্থল ভেদ করে; সে কথাগুলি অতীব দীর্ঘ, কিন্তু আমরা পাঠকবর্গকে তাহা না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না—*

* এই পুস্তকে উদ্ধৃত করিবার বিষয় অনেক আছে, কিন্তু স্থানাভাববশতঃ তাহার অধিকাংশই উদ্ধৃত করিতে পারিব না।

"আমি পিতৃ-আত্মা তব—প্রেতপুরে আজ
ভ্রমিতেছিলাম প্রাতে বৈতরণী তীরে,
ভাগ্য প্রেতসনে দেখা ;—হেরিয়া আমায়
কহিল সে ব্যঙ্গ করি 'তনয় তোমার
হ'য়েছে অদ্ভুত জীব আমার কুহকে,
ভৈরব পর্ব্বতে এবে শ্বাপদের সনে
বিহরিছে, পরিহরি আত্ম পরিজন।
জীবনের সূত্র তার দিয়াছি ছিঁড়িয়া
আশা, স্মৃতি, সুখ, তার দুরাশার স্রোতে,
এমনি কৌশল করি করেছি বেষ্টন,
জাগ্রতে নিদ্রায় তাহে মগ্ন অনুক্ষণ।'
কি দুরাশা! ভাবিলাম জীবন তোমার—
পরিহরি জীবলীলা আসিনু যখন,
নিতান্ত কৈশোর তুমি,—জননী তোমার
শোকে উন্মাদিনী! আহা কতই কাঁদিল
ধরিয়া চরণ মম ; ভগিনী তোমার
ধূলায় পড়িয়া বালা, "বাবা বাবা" বলি
কাঁদিল চীৎকার করি, সহোদর তব
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে চাহি বদনে আমার
বিষাদে আকুল হ'য়ে রহিল দাঁড়ায়ে।
তুমি—সে সময় নাহি বুঝিলে কি শোক,
কাঁদে মাতা, কাঁদে ভ্রাতা, কাঁদে ভগ্নী, হেরি
কাঁদিলে পারশে বসি মুমূর্ষু শয্যার।
কনিষ্ঠ সন্তান বলি তোমায় অধিক
বাসিয়াছিলাম ভাল, দেখিনু চাহিয়া
আসন্ন মরণকালে বারেক তোমার
স্নেহ মাখা মুখখানি,—অন্তিম চিন্তায়
উদিল স্মরণে মম, 'কি করিনু তব?
তরঙ্গসঙ্কুল এই ভীষণ সংসারে
অবোধ শিশুরে আহা! অনাথ করিয়া
চলিনু কেমনে'—দুঃখে ঝরিল নয়ন।
ডাকি সহোদরে তব, কর ধরি তার—
তোমার যুগল কর রাখি তার করে,
কহিনু সজল নেত্রে—'রহিল যোগেশ—
অবোধ সন্তান বাছা, জানেনা উহায়
পথের ভিখারি করি করিনু প্রস্থান ;
পালিও উহারে বৎস!—যতনে তোমারে
দিয়াছি বিপুল শিক্ষা,—কৃতি পুত্র তুমি,
দেখিও যোগেশ যেন জীবনে উহার
ক্লেশ নাহি পায় কভু।'—বলিতে বলিতে
জীবতারা অস্ত গেল ; তদবধি আর
দেখি নাই, ভাবি নাই তোমায় কখনো,
মরতের কোন চিন্তা জাগে নাই মনে,
শুনি ভাগ্যপ্রেত কথা হইল বাসনা
দেখিতে বারেক মম পার্থিব ভবন।
গেলাম তথায়—কিন্তু নিরখিনু যাহা
প্রেতআত্মা মম তায় হৈল বিচলিত।
বিষাদে পূর্ণিত সেই উচ্চ অট্টালিকা,
উত্তপ্ত নিশ্বাসে পূর্ণ পবন তাহার,
আছে কি না আছে তথা নরের বসতি
হেরি সে নীরব গৃহ হয় না ধারণা।
অগ্রজ তোমার সদা বিষণ্ণ বিষাদে,
শাখাহীন তরু প্রায় গিয়াছে শুকায়ে,
প্রাচীনা জননী তব কাঁদি অবিরত
হারায়েছে চক্ষুঃ দুটী,—ভূতল শয্যায়
পড়িয়া সতত শোকে ; ভগিনী তোমার
সতত বিষণ্ণ দুখে সোদর বিরহে।
আর—পরিণীতা সেই রমণী তোমার
কি বলিব!—সে সে দৃশ্য চিত্ত বিদারক!
বিকচ যৌবনা বালা সুবর্ণের ফুল
দারুণ হুতাশে দেহ গিয়াছে শুকায়ে,
প্রফুল্ল পঙ্কজ মুখ রবি অস্তে যেন

হইয়াছে সঙ্কুচিত, শৈবল শরীর
মৃণাল সে ভুজলতা—সলিল বিহনে
জড়ায়ে শুকায়ে যেন পড়িয়া রয়েছে।
চম্পকের কলিমত শিশু পুত্রটিরে
কোলেতে করিয়া বাছা, নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে
গবাক্ষে বসিয়া সদা চাহি পথপানে।
নেত্রে সীতাকুণ্ডসম উত্তপ্ত সলিল
উথলিছে অবিরত, শিশুটি তাহার
চেয়ে আছে অনিমিষে মায়ের বদনে,
খুলিয়াছে অভাগিনী অঙ্গ আভরণ
সধবার চিহ্নমাত্র রেখেছে ললাটে
ক্ষীণ রেখা সিন্দুরের পরম যতনে।
ক্রোধ, ক্ষোভ, যুগপৎ উদিয়া মানসে
প্রেত আত্মা বিচলিত হইল আমার।
সে করুণ দৃশ্য নেত্রে নারিনু সহিতে
তোমার উদ্দেশে দ্রুত আসিনু এখানে"
"যোগেশ!" গম্ভীরে ছায়া কহিলা আবার,
"বড় আদরের পুত্র আছিলে আমার
প্রাচীন বয়সে মম অন্তিম জীবনে
ছিলে তুমি একমাত্র আনন্দ পুতলি,
কত আশা উছলিত হৃদয়ে তখন
হেরিয়া তোমার ফুল্ল বদন কমল!
ভাবিতাম জগতের যা কিছু পবিত্র
যা কিছু আনন্দ ভবে, যা কিছু বাসনা,
সকলি সমষ্টি করি, দয়াবান্ বিধি
তোমা হেন পুত্রনিধি দিয়াছেন মোরে।
বিদ্যা, ধন, যশঃ, মান, পুণ্য, সবি সাধ
করিবে সঞ্চয় তুমি জীবন বিকাশে!
সে সাধ আমার পুত্র!—সে চিরবাসনা—
সাধিছ কি এই ভাবে অলস জীবনে?
জনমদাতার ঋণ শোধিছ কি আজ,
নিভৃত গুহায় বসি প্রেম উপাসনে?
প্রেম পুন কার? ছি ছি—শত ধিক তোমা
পরের রমণী যেই পর প্রণয়িনী
কলুষ হৃদয়ে তারি কর উপাসনা?
পিতৃ-আত্মা আমি তব রাখ বাক্য মম
ভবনে ফিরিয়া যাও,—হেরিয়া তোমারে
কৃতান্ত-কবল ন্যস্ত জননী তোমার
শুষ্ক স্বর্ণলতা তব পত্নী অভাগিনী
এখনো বাঁচিতে পারে, নতুবা এ শোকে—
প্রিয়জন বিরহের দারুণ যন্ত্রণা
নর পিশাচের তব নির্ম্মম অন্তরে
নাহি হয় অনুভূত—এদারুণ শোকে
মাতা পত্নী ভ্রাতা ভগ্নী ত্যজিবে জীবন।
এত কষ্টে এত যত্নে জীবন দশায়
সৃজিয়া ছিলাম যেই সুখের সংসার
কুপুত্র আমার তুমি জন্মি মম কুলে
নির্বিবেকে করিতেছ শ্মশান তাহায়?
ধিক্ শত ধিক্ তোমা! পাষাণ অন্তরে
জাগে না কি একবার, পড়ে না কি মনে?
জননীর সে মমতা, ভগিনীর স্নেহ,
সোদরের ভালবাসা, পত্নীর প্রণয়!
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে এত যে যতনে
পালিলা জননী তব, মরিতে কি শেষে
তোমারি দংশনবিষে?

* * * *

এই বলিয়া প্রেতআত্মা যোগেশের শোকাতুরা মাতা, স্ত্রী, ভগিনী ও ভ্রাতার তৎকালিক চিত্র শূন্যে অঙ্কিত করিয়া পুত্রকে দেখাইলেন। চিত্রগুলি প্রশংসার যোগ্য। শেষে একটি ঘর দেখাইলেন, তাহাতে যো-

গেশ বসিতেন, ও তাহাই তাঁহার পাঠগৃহ ছিল। কোন চিত্রদৃষ্টে যোগেশ অত্যধিক কাতর হন নাই, কিন্তু এই চিত্র দেখিয়া তিনি উন্মত্তের ন্যায় অতিশয় আক্ষেপোক্তি করিলেন। যোগেশের সে যাতনা স্বাভাবিক হইয়াছে। পরে যোগেশ পিতাকে আপনার ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তরে প্রেত যোগেশকে যথোচিত তিরস্করণপূর্ব্বক সুপথে যাইতে অনুরোধ করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন।

এই "পিতৃ-আত্মা" শীর্ষক সর্গের কল্পনা সুন্দর।

সন্ধ্যা হইল —

দিবাকর অস্তমান ধূসর বরণে
ধীরে ধীরে হইতেছে প্রকৃতি মলিন,
সুদূর পশ্চিমে যথা সীমান্তে ধরার
মিশিয়াছে নভস্তল—আরক্ত তপন
অনল গোলক মত নামিতেছে ধীরে।
তপনের নিম্নভাগে সুবর্ণের ছটা
পড়েছে ছড়ায়ে চূর্ণ জলদের গায়,
দিবাকরে সম্ভাষিয়ে লইতে যেন বা
স্বর্গের সুবর্ণ দ্বার খুলিছে অমর।
ধূসরবরণা মহী উচ্চতরু তার,
শূন্যভেদী গিরিশৃঙ্গ, সাগর তটিনী,
বিষণ্ণ ভাবেতে যেন মেলিয়া নয়ন
সেই রবি অস্তপানে রয়েছে চাহিয়া

এমন সময়ে ভৈরব পর্ব্বতের এক স্থান হইতে "রমণীর মন বিধি কেন এত প্রেমময়" ইত্যাদি শব্দে গীতধ্বনি উঠিল; গীত থামিলে যোগেশ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,

"রমণী হৃদয়ে প্রেম! কোথায় সে নারী?
পুরুষের তরে যেই প্রণয়ে কাতর?"

শেষ চিত্তের অত্যধিক আবেগবশতঃ উক্তরূপ দুই চারিটি কথা চীৎকার করিয়া বলিলেন, তাহা পর্ব্বতবাসিনী এক ভৈরবীর কাণে গেল। প্রোক্ত সঙ্গীতগায়িকা তিনিই। সেই নির্জ্জনে যোগেশের স্পষ্টোচ্চারিত কথাগুলি সহসা শুনিবামাত্র ভৈরবী তাহা মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় পূর্ব্বপরিচিত ব্যাধ তথায় আসিয়া, যোগেশের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও যোগেশের অদৃশ্য হওয়ার কথা ভৈরবীকে বলিল; শুনিবামাত্র ভৈরবী তচ্ছ্রুত চীৎকার যোগেশকৃত সন্দেহ করিয়া ব্যাধকে তাহা বলায়, সে যোগেশের সন্ধানার্থ দৌড়িল। ভৈরবী তাঁহার বাসগৃহে—ভৈরবনামক শিবমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠিত এক মন্দিরে—প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ রাত্রি হইল, পৃথিবী অন্ধকারাবৃতা—

ভীষণা যামিনী যেন দেহ বিস্তারিয়া
পড়িয়াছে শৈল অঙ্গে চাপিয়া হৃদয়।

এমন সময় যোগেশ ব্যাধকর্ত্তৃক ভৈরবীসমীপে আনীত হইলেন। ভৈরবী কথায় কথায় যোগেশের দুঃখের কারণ জানিলেন। পরে যোগেশকে স্তোক দিবার জন্য গণনা করিয়া বলিলেন, যে যোগেশের পরজন্মে মন্দাকিনী তাঁহারই পরিণীতা হইবেন। অনন্তর যোগেশের পাপখণ্ডন নিমিত্ত অষ্টাহ ভৈরবদেবের

পূজা করিবেন ইত্যাদি বলিয়া, যোগেশও শবরকে স্ব স্ব স্থানে যাইতে বলিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে যোগেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে ভৈরবীর নিজের জীবনের অতীত ঘটনা মনে পড়িতে লাগিল; তাহার পর ভৈরবী যোগেশের বাটীতে তাঁহার সংবাদ স্বয়ং দিতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন; আবার ভৈরবীব্রত ত্যাগ করিয়া আপনার বাটী ফিরিয়া যাইবার কথা কত ভাবিলেন।

ভৈরবীর নিকট হইতে আসিয়া যোগেশ পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে ছিলেন। তাঁহার—

মস্তক উপরে শূন্য অনন্ত বিস্তারি
ক্ষীরোদ সমুদ্র মত কিরণে ভাসিছে।
পদতলে শৈলমালা উঠিয়া পড়িয়া
নেত্র-পথ অতিক্রমি হয়েছে ধাবিত।

সহসা যোগেশ "মন্দাকিনী" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই নিস্তব্ধ রাত্রিকালে সে চীৎকার চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইল। সে প্রতিধ্বনি আমরা যেন এখনও শুনিতেছি—

শূন্য গগনের বক্ষে কঠোর শবদে
ছুটিল সে ভীমরব অনন্ত আকাশে।
সাগরে পড়িয়া রব তরঙ্গে তরঙ্গে
চলিল হিল্লোলে ভাসি অকূল সলিলে।
উঠিয়া পড়িয়া শৈলে প্রতিধ্বনি করি
ছুটিল সে ভীমরব সীমান্তে গিরির।
পল্লবে পল্লবে বৃক্ষে শিখায় তৃণের
জড়ায়ে জড়ায়ে রব ছুটিল প্রান্তরে।

এমন সময় ভাগ্য যোগেশের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যোগেশকে বলিলেন, যে তাঁহার জীবন আর অধিক দিন স্থায়ী নহে, অতএব যোগেশকে আজীবন কষ্ট দিয়া তিনি তাঁহার একটি মাত্র অন্তিম বাসনা পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছেন। যোগেশ কেবল মন্দাকিনীকে দেখিতে চাহিলেন, আর মন্দাকিনী কখনও তাঁহাকে স্মরণ করে কি না, তাহা ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভাগ্য বলিলেন, "মন্দা সে কথা কখনও ভাবে না, যদি সে কথার ছায়ামাত্র কখনও মন্দার মনে আইসে, তবে তখনই তাহা নিদ্রিতকর্ত্তৃক বক্ষবিক্ষিপ্ত সরীসৃপবৎ অপসৃত করে।" তখন ক্ষোভে যোগেশ যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রণয়ের "নিঃস্বার্থতা" ছত্রে ছত্রে প্রতিপন্ন হইতেছে—

"তাও জানি" ধীরে ধীরে কহিলা যোগেশ
"শুধু অপ্রণয় নাহি করে মন্দাকিনী
ভুজঙ্গ ভাবিয়ে মোরে করে পরিহার।
তথাপি আমার এই নিভৃত অন্তরে
রেখেছি অনন্ত প্রেম মন্দাকিনী তরে।
সে ভাবে পাপাত্মা আমি—পাশব পিপাসা
করিবারে চরিতার্থ অনুরক্ত তায়।
সেই দুখ—সেই ঘৃণা—সেই লজ্জা মম,
সেই চিন্তা অহর্নিশি অন্তরে আমার
দংশিয়া শোণিতসহ রয়েছে মিশিয়া।
প্রতিদান নাহি দিল নহি দুখী তায়,
দুখী শুধু তার সেই দারুণ ঘৃণায়।
আশা তৃষ্ণা বিসর্জ্জিয়া সজল নয়নে
পদপ্রান্তে পড়ি যবে কহিলাম তায়,

"রূপের ভিখারি নই—নহি যৌবনের
দর্শন পর্শনে তব নহি অভিলাষী
শুধু এই হৃদয়ের—হৃদয় ঢালিয়া
উন্মত্ত সাধক মত, নিস্বার্থ প্রণয়ে
বসিয়াছিলাম ভাল অন্তরে অন্তরে।
আঁখির মিলনে কিম্বা মুখের বচনে
আশাতীত প্রতিদান হইত আমার।
তাও কি কঠিন এত?—ভাল একবার
কহ দেখি অন্তরেও ভালবাস কি না।"
কিন্তু যে উত্তর তার করিলা পাষাণী
মর্ম্মস্থলে আজো তাহা রয়েছে বিঁধিয়া।
এত যে কঠিন মন্দা আমি কিন্তু তারে
সুধাস্রোতস্বিনী বই ভাবি নাই কভু।

*　　*

তাহার পর যোগেশ মন্দাকিনীকে আবার দেখিতে চাহিলেন, ভাগ্য তাঁহাকে অনেক তিরস্কার করিলেন; যোগেশ ঈষৎ হাসিয়া ভাগ্যকে "অন্ধদী-দেবতা" বলিয়া গালি দিলেন, তখন ভাগ্য উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন,

"ভাগ্য আমি—চিরবৈরী যোগেশ তোমার
তোমা প্রতি সুপ্রসন্ন নহি আমি কভু;
তবে যে কহিনু এত ছলনা কেবল।
লাভালাভ ছলনায় নাহি কিছু মম
আমার স্বভাবি হেন ব্যথিতে দুখীরে।
তাই ভর্ৎসনার ছলে স্মৃতি পথে তব
জ্বালিয়া দিলাম তীব্র যন্ত্রণা তোমার।

*　　*

পরে ভাগ্য মন্দাকিনীর চিত্র দেখাইলেন; তাহাতে ভাগ্যের কষ্টদায়ক প্রবৃত্তি বিশেষ পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হইয়াছে। চিত্রটী আমরা উদ্ধৃত করিলাম, এই চিত্র ঈশান বাবুর কল্পনা শক্তির বিশেষ পরিচয় দিতেছে—

বামবাহু পতি কণ্ঠে করিয়া বেষ্টন
স্থাপিয়া দক্ষিণ কর পতির হৃদয়ে
হাস্য বিকসিত মুখে চাহি পতিপানে
করি মৃদু প্রেমালাপ চলে মন্দাকিনী।
যোগেশ সে চিত্র হেরি শিহরি উঠিয়া
ত্রস্তে সরাইয়া নিল পশ্চিমে বদন।
অমনি হাসিয়া ভাগ্য পশ্চিম প্রান্তরে
যোগেশের নেত্রপথে সে মূর্ত্তি স্থাপিলা।
পূরবে সরায়ে নিল যোগেশ বদন
হাসিয়া স্থাপিলা ভাগ্য সে চিত্র পূরবে।
উত্তরে যোগেশ ত্রস্তে স্থাপিলা নয়ন,
উচ্চে হাসি ভাগ্য চিত্র স্থাপিলা উত্তরে।
অবনত করি আঁখি চীৎকার করিয়া
কহিলা যোগেশ "আর চাহি না দেখিতে।"
"দেখ দেখ" কহি ভাগ্য পুনঃ নেত্রপথে
স্থাপিলা সে চিত্র হাস্য করি উচ্চৈঃস্বরে।
অবশেষে দুই করে আবরি নয়ন
যোগেশ পড়িল বসি "মন্দাকিনী" বলি।
তবু নাহি পরিত্রাণ, ভাবিলা যোগেশ
অঙ্গুলী তাহার যেন ধরি মন্দাকিনী
করিতেছে আকর্ষণ দেখিবার তরে।
পতি পত্নী দুইজনে দুই শ্রুতিমূলে
স্পর্শ করি ওষ্ঠ যেন কহে "দেখ দেখ।"
উর্দ্ধে প্রসারিয়া বাহু মুদিয়া নয়ন
সঞ্চালিয়া করদ্বয়—মর্ম্মভেদী স্বরে
কহিলা চীৎকার করি যোগেশ তখন
"কোথা ভাগ্য কোথা তুমি কৃপা করি মোরে
এ দৃশ্য নয়ন হ'তে কর অপসৃত।"
শূন্য হ'তে ভীম বাক্য হইল ধ্বনিত

"যোগেশ যে চিত্র আজ করিলে দর্শন
অনুক্ষণ স্মৃতি তব দগ্ধ হবে তায়
কি জাগ্রতে কি নিদ্রায় শোণিতের সহ
এই স্পর্শ মিশে রবে মর্ম্মস্থলে তব।
রুদ্ধ কর স্মৃতি—কিম্বা ভগ্ন কর হৃদি,
এ স্মৃতি জীবনে তব নহে অপনেয়।"

বলিতে বলিতে ছায়া আকাশে মিলাইয়া গেল, যোগেশ মূর্চ্ছিত হইলেন।

যোগেশ এইরূপ যন্ত্রণা পাইয়া জীবন কাটাইতে লাগিলেন। এক দিন—

চন্দ্রকরে বিভাসিত অকূল জলধি
ধূ—ধূ করিতেছে শুধু স্বপনের মত

যোগেশ যন্ত্রণায় হৃদয় ঢালিয়া সমুদ্রকে, অনন্তর জগৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক মর্ম্মব্যথা জানাইলেন। সমবেদনায় কবিও প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া অনেক কথা বলিলেন; সে সকল অতি সুন্দর। যোগেশ কাতরোক্তি করিতেছেন, এমন সময় যোগেশের ছায়ারূপী পিতৃআত্মা পুত্রকে আবার দর্শন দিয়া অনেক অনুযোগ করিলেন। যোগেশ সে সব কথার উত্তর দিতে দিতে বলিলেন—

কিন্তু পিতঃ! পারি কই বুঝাতে হৃদয়ে!
হৃদয়ের ছায়া মম মুছিবার তরে,
কি যত্ন না করিয়াছি—বুঝাতে হৃদয়
কি ব্যথা না সহিয়াছি, দিবস যামিনী
পাপ পুণ্য দুই স্রোত উন্মত্ত তরঙ্গে
আছাড়িয়া বক্ষে মম গিয়াছে বহিয়া,
ঘাত প্রতিঘাতে চিত্ত হয়েছে বিক্ষত,
রক্তে রক্তে অন্তঃস্থল হয়েছে প্লাবিত,
কিন্তু কৈ পারিলাম মুছিতে সে ছায়া!
আর যে পারি না পিতঃ! আর যে সহে না,
এ প্রাণ বহিতে আর পারি না যে আমি;
দিবানিশি বুক যেন উঠিছে ফাটিয়া,
তবু যে জীবন নাহি হয় বহির্গত,
বহ্নিমুখী ভুজঙ্গিনী জলন্ত দংশনে
নিরন্তর দংশিতেছে অন্তর আমার।
এ জীবন আর আমি পারি না বহিতে
লহ—পিতঃ! পদপ্রান্তে তাপিত সন্তানে।

যোগেশের এবম্প্রকার কাতরোক্তিতে সে প্রেতহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; তিনি করে ধরিয়া যোগেশকে উঠাইলেন, ও যোগেশের জীবন নিতান্ত দুর্ব্বিসহ বুঝিয়া সেই দিনই কৃতান্তের নিকট পুত্রের মৃত্যু যাচ্ঞা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং আগামী কল্য প্রাতে যোগেশের দেহত্যাগ হইবে বলিলেন। অনন্তর পুত্রকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া ছায়া মিলাইয়া গেল।

যোগেশ মরিবেন—দারুণ যন্ত্রণা ফুরাইবে—শুনিয়া যোগেশের হর্ষ হইল। দিন ফুরাইল মনে করিয়া যোগেশ একবার আপনার জীবনের অতীত ঘটনাগুলি ভাবিলেন। তৎসমুদয় কবিত্বব্যঞ্জক। তাহার পর নানাপ্রকার বিভীষিকা যোগেশের নয়নগোচর হইতে লাগিল; তদ্দৃষ্টে যন্ত্রণা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, তিনি উন্মত্তের মত সৈকতে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এদিকে যোগেশ গৃহত্যাগ করিলে

কিয়দ্দিবস পরে তাঁহার মাতা প্রাণত্যাগ করিলেন। নর্ম্মদা পিত্রালয়ে আসিয়া থাকিলেন। মন্দাকিনী নর্ম্মদার পিতৃ-দেশস্থা। তাঁহারা উভয়েই বালসখী,এবং শৈশব প্রণয় উভয়ের হৃদয়েই তুল্যরূপে বদ্ধমূল। একদিন মন্দাকিনী বিষবৃক্ষ পড়িতেছিলেন, এমন সময় নর্ম্মদা তথায় আসিলেন; তখন কবি দুইজনের রূপবর্ণন করিবার জন্য পূর্ব্বগামী গ্রন্থকারগণের অনুসরণ করিয়া সরস্বতীবন্দনা করিলেন; বন্দনাটি সুন্দর হইয়াছে, ইহাতে কবির হৃদয়ের চিত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমরা রূপবর্ণনামাত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

দুইটী সুন্দরমূর্ত্তি—দুইটী যুবতী
যৌবন-উদ্যানে দুই বিকচকুসুম,
দুজনাই রূপবতী; কিন্তু মন্দাকিনী
উষার নীহার-ধৌত প্রফুল্ল নলিনী
দলে দলে স্নিগ্ধকান্তি পড়েছে বিকাশি
অনুরাগে স্ফীত বক্ষঃ গরবে উন্মুখ।
সায়াহ্নের সূর্য্যমুখী নিষ্প্রভ নর্ম্মদা,
সঙ্কুচিত দলগুলি অবনত মুখ
হৃদয় পল্লবে ঢাকা সুষমা অস্ফুট।
মন্দাকিনী বসন্তের ফুল্ল সরোরুহ
নিদাঘের দগ্ধকান্তিকুমুদ নর্ম্মদা।
মন্দাকিনী শরতের পূর্ণিমার শশী
হেমন্তের অস্তগামী শশাঙ্ক নর্ম্মদা।
মন্দাকিনী প্রেমিকের প্রথম স্বপন,
নর্ম্মদা আয়াসলব্ধ বিরহীর স্মৃতি।
মন্দাকিনী তেজস্বিনী জলজ লতিকা
নর্ম্মদা অবনী পৃষ্ঠে সজ্জিতা ব্রততী।

*　　*　　*

নর্ম্মদা আসিলে মন্দাকিনী সস্নেহে তাঁহাকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া অভাগিনীর দুরদৃষ্ট ভাবিতেছিলেন; সহসা যোগেশের শেষলিপি মনে পড়িল, অমনি মন্দাকিনীর কোমল হৃদয়ে গর্ব্বসংমিশ্রিত ক্রোধের শিখা প্রজ্বলিত হইল; মুখে "প্রতারক!" "যোগেশ এই কি তব নিরমল স্নেহ" কথাগুলি নির্গত হইল। নর্ম্মদা ভাবিলেন, যোগেশ তাঁহার এবম্বিধ দুর্দ্দশা করিয়া গৃহত্যাগী হওয়ায় মন্দাকিনী তাঁহাকে অনুযোগ করিতেছেন। অমনি নর্ম্মদার চক্ষে তাঁহার আন্তরিকভাব ফুটিয়া উঠিল—

সেই দৃষ্টি তার যেন কহিল কাঁদিয়া
"মন্দাকিনি প্রাণেশেরে নিন্দিও না আর।"

নর্ম্মদা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

"কেন নিন্দ মন্দাকিনি প্রাণেশে আমার?
তাঁর কিবা অপরাধ? আমি অভাগিনী!
আমার অদৃষ্টে বিধি না লিখিলা সুখ।
নহিলে—তেমন পতি—মূর্ত্তিমান্ দেব
কেন হইবেন বাম অভাগিনী প্রতি।
অবশ্য আমারি কোন ছিল অপরাধ!
কি শাস্ত্র না প্রাণেশের আছিল অধীত?
কি গুণ নাথের মম না ছিল সজনী?
কত মিষ্ট কথাগুলি, কেমন স্বভাব,
মৃদু মন্দ গতি কিবা, কি মধুর মন!
দিনেকের তরে নাহি শুনিনু কখন,
একটি কঠোর কথা প্রাণেশের মুখে।
দাস দাসী প্রতিবাসী আত্মপরিজন
সকলেই প্রাণেশের কহিত সুযশ।

এত গুণবান্ ভগ্নি! প্রাণেশ আমার
তাঁর নিন্দা অভাগীর বড় বাজে প্রাণে।”

মন্দাকিনী কত প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কত আদর করিলেন, আবার দুঃখিনী নর্ম্মদা বলিলেন—

ভবেশের মুখপানে আবার যখন
চেয়ে দেখি—মধুমাখা হাসিটুকু তার
ঢল ঢল চক্ষুঃ দুটি—আধ আধ কথা
ক্ষুদ্র হস্ত পদগুলি করি সঞ্চালিত
বাছার সে উল্লসিত মধুর ক্রীড়ন
হেরি মনে হয় নাথ জীবিত নিশ্চয়।
এত যে সুন্দর বাছা হইল আমার
না দেখি প্রাণেশ তায় ত্যজিবে কি প্রাণ?

এই বলিয়া নর্ম্মদা কাঁদিয়া উঠিলেন। মন্দাকিনী, সর্ব্বস্ব পণ—প্রাণ পর্য্যন্ত পণ পূর্ব্বক অচিরে যোগেশের সন্ধান করিয়া দিবেন বলিয়া, তাঁহাকে শয়নগৃহে পাঠাইলেন। নর্ম্মদা চলিয়া গেলে মন্দাকিনী যে সকল স্বগত কথা বলিলেন, তাহা অত্যধিক বলিয়া উদ্ধৃত হইল না; কিন্তু সে কথাগুলি না পড়িলে মন্দাকিনীকে কেহ বুঝিতে পারিবেন না।

মন্দাকিনী ও নর্ম্মদার এই কথোপকথনে গ্রন্থকার প্রণয়ের গভীরতা উজ্জ্বলবর্ণে, ছত্রে ছত্রে চিত্রিত করিয়াছেন।

নর্ম্মদা মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেছেন, ইতিমধ্যে যোগেশের সংবাদ লইয়া ভৈরবী মন্দাকিনীর নিকট আসিলেন। রাত্রিকালে একটি নীরব প্রকোষ্ঠে তিনটী বিষণ্ণা স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন; একজনের বাসনা—

————যেন ছুটি শূন্যপথে
বাহু প্রসারিয়া বক্ষে ধরে জড়াইয়া
নৈশ গগনের সেই গাঢ় অন্ধকার।
অথবা ভাবিছে যেন চিরিয়া হৃদয়
যন্ত্রণা ঢালিয়া দেয় তমসার অঙ্গে।

সে নর্ম্মদা; অপর দুইজনের একজন,

————বসি অবনত মুখে
বিস্ফারিত দুনয়নে চাহি কক্ষতলে।
ভাবনায় অভিভূত; যেন চিন্তাগুলি
আলেখ্যে অঙ্কিত তার নয়নের পথে।

সে মন্দাকিনী; অপরা ভৈরবী। সকলে বসিয়া আছেন—কিছু পরে মন্দাকিনী যোগেশের দুরভিলাষসম্বন্ধে ভৈরবীকে অনেক কথা বলিলেন; কথাগুলি তেজ ও গর্ব্বে নির্গত, তাহাতে মন্দার চরিত্র আরও পরিষ্কার বুঝা যায়। যোগেশ মন্দাকিনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী ও তাঁহারই জন্য দেশত্যাগী, তাহা মন্দাকিনীর মুখে এই প্রথম(?) শুনিয়া নর্ম্মদা মূর্চ্ছিতা হইলেন; মন্দা ও ভৈরবী অনেক কষ্টে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন; নর্ম্মদা সংজ্ঞাপ্রাপ্তা হইলে মন্দাকিনী তাঁহাকে অনেক আদর করিতে লাগিলেন। পরে ভৈরবী, তাঁহার সঙ্গে স্বয়ং ভৈরবপার্ব্বতে যাইয়া যোগেশকে বাটী আনিবার কথা মন্দাকিনীকে বলিলেন, ও পাছে মন্দাকিনী যোগেশকে রূঢ় বলেন, তজ্জন্য সোদরার মত তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিতে মন্দাকে অনুরোধ করিলেন। তাহা শুনিবামাত্র সে গর্ব্বিতহৃদয় গর্ব্বে উছলিয়া উঠিল। মন্দাকিনী তেজে যাহা

উত্তর করিলেন,তৎসমুদয় কেবল যোগেশের প্রতি অমানুষিক সোদরস্নেহে পরিপূর্ণ। বাস্তবিক আমরা মন্দার এই গর্ব্বটুকু দেখিতে বড় ভাল বাসি।

তেজের সহিত অনেক কথা বলিয়া গিয়া মন্দাকিনী স্বামীর নিকট ভৈরবী-কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত পূর্ব্বক, ভৈরবপর্ব্বতে তাঁহার সহিত যাইতে স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। মন্দার পতি কাতরা নর্ম্মদার প্রবোধার্থ পত্নীকে নর্ম্মদার নিকট থাকিতে বলিয়া স্বয়ং যোগেশকে অনিবার জন্য যাইতে উদ্যত হইলেন; তখন স্নেহময়ী মন্দাকিনী বলিলেন—

"আমিও যে সঙ্গে যাব,—তোমার কথায়
হয় ত যোগেশ নাহি ফিরিবে ভবনে,
আমি গিয়া নর্ম্মদার যন্ত্রণা কহিয়া,
ব্যাকুল করিয়া চিত্ত আনিব ফিরায়ে।
আজীবন আমি নাথ সোদরের মত
যোগেশে বেসেছি ভাল—সে যেন অবোধ
তা ব'লে কি আমি তায় করিব অস্নেহ!
এ টুকু না করি যদি নর্ম্মদার তরে
অমঙ্গল নর্ম্মদার ঘটে যদি নাথ,
সে আক্ষেপ চিরদিন রবে যে আমার!
যোগেশ শুধুই নাথ! সুহৃদ তোমার?
আমার সে প্রাণাধিকা নর্ম্মদার পতি
সে মম সোদর হ'তে অধিক স্নেহের।
আমি বিনা নর্ম্মদার এ সংসারে আর
কেহই যে নাই নাথ! সে যে আমা ছাড়া
নাহি জানে অন্য আর; জনক জননী
দারিদ্র্যে পীড়িত—নাহি চাহে
কন্যাপানে।
শ্বশুরের সম্বন্ধ ত গিয়াছে ঘুচিয়া,
অনাথিনী প্রাণেশ্বর নর্ম্মদা আমার।
আমি কি রহিব স্থির এ বিপদে তার!
চল নাথ সঙ্গে লয়ে, যাই দুইজনে।"

তাহাতে যুবা, মন্দাকিনীর অনুপস্থিতিতে নর্ম্মদাকে প্রবোধ দিবার কেহ না থাকা হেতু, দুঃখের আতিশয্যবশতঃ নর্ম্মদার আত্মহত্যার ভয় পত্নীকে দেখাইয়া, তাঁহাকে নর্ম্মদার নিকট থাকিতে পুনরায় অনুরোধ করিলেন। মন্দাকিনী হাসিয়া বলিলেন—

আমরণ সব ক্লেশ সহিবে রমণী
তথাপি পতির আশা থাকিতে তাহার
জীবন ত্যজিতে নাহি পারিবে কখন।

শেষ নর্ম্মদাকে গৃহে রাখিয়া পতি পত্নী উভয়েরই একত্রে যাওয়া স্থির হইল।

মন্দাকিনী ও তাঁহার পতি যোগেশকে বাটী ফিরাইয়া আনিতে ভৈরবীর সহিত যাত্রা করিলে, একদিন নর্ম্মদা চিন্তাযুক্ত মনে একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন—

কত চিন্তা কত ভয় কতই বাসনা
জাগিতে নিবিতেছিল অন্তরে তাহার।
আনমনে তুলি কর স্থাপিতে ললাটে
সিঁথির সিন্দূররেখা মুছিল তাহায়।
নিরখিতে অধঃপানে করতলে তার
পড়িল নয়ন যেই—হেরিলা সিন্দূর।
শিহরিত কলেবরে ছুটিয়া নর্ম্মদা
গেলা দর্পণের কাছে—হেরিলা ললাটে
চির যতনের তার সিন্দূরের রেখা,
হতাশ জীবনে তার শুধুই সান্ত্বনা,

পতিসুখ-বিরহিত অদৃষ্টে তাহার,
সধবার একমাত্র যে চিহ্ন আছিল
অযতনে আজ তাহা আপনি মুছিল।
"হতভাগিনীর ভাগ্য ভেঙেছে নিশ্চয়"
কহিয়া চীৎকার করি পড়িলা ভূতলে।

এমন সময় এক অপূর্ব্ব কামিনী মূর্ত্তি—এক অমরী,সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন—

তুষারের মত তার অঙ্গের বরণ
হিরণ্ময় দ্যুতি তায় পড়িছে ঝরিয়া,
কি এক গভীর গন্ধে অঙ্গ সুরভিত
প্রবেশিতে পূর্ণ হইল কক্ষ সে সৌরভে।

* *

মেঘে চন্দ্র-করে যেন একত্রে মিশিয়া
সেই স্বপ্নময় দেহ হয়েছে উদ্ভব।
আছে অঙ্গ—আছে মূর্ত্তি—কিন্তু যেন তায়
নাহি সত্তা শরীরের—শুধুই কিরণ
শূন্যময় দেহে তার উঠিছে উথলি।

এ প্রকার রূপকল্পনা কালিদাসের যোগ্য।

অমরী আসিয়া নর্ম্মদাকে বলিলেন, যে তাঁহার পতিনিষ্ঠা দেখিয়া ইন্দ্রাণী স্বহস্তে তাঁহার জন্য স্বর্গে সন্তাকুঞ্জ প্রস্তুত করিয়াছেন, তথায় তাঁহাকে যাইতে হইবে। নর্ম্মদা ভয়বিহ্বলিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু কোথা প্রাণেশ আমার," অমরী বলিলেন,"যোগেশ আর কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রাণত্যাগ করিবেন, সতীর বৈধব্য নাই—তোমাকে যোগেশের মৃত্যুর পূর্ব্বেই অনন্তধামে যাইতে হইবে।" এই বলিয়া অমরী নর্ম্মদার করধারণ করিলেন—

প্রাণশূন্য দেহখানি অমনি তাহার
ঢলিয়া পড়িল ভূমে ছিন্ন লতা প্রায়।
আযৌবন পতিপদ পূজিতে পূজিতে,
আযৌবন সহি ক্লেশ পতি-অনাদরে,
অন্তিম জীবনে স্মরি পতির চরণ,
নর্ম্মদা ত্যজিল প্রাণ নবীন যৌবনে।

এ দিকে যোগেশেরও দিন ফুরাইল। যে রাত্রিতে যোগেশের পিতৃআত্মা পুত্রকে দ্বিতীয়বার দর্শন দিয়াছিলেন, সে রাত্রি পোহাইল। বেলা প্রথম প্রহর, মৃত্যুচরের প্রতীক্ষায় যোগেশ ঊর্দ্ধদৃষ্টে এক তরুতলে বসিয়া আছেন, এমন সময়—

সরাইয়া দুই করে জলদের দল,
ছায়াময় মূর্ত্তি এক হইল বাহির।

নিমেষমধ্যে মৃত্যুচর যোগেশের পার্শ্বে "ধূমখণ্ডমত" দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে নির্ব্বাণলাভ করিতে অনুরোধ পূর্ব্বক তাহার উপায় বলিলেন। যোগেশ উক্ত নির্ব্বাণ প্রাপ্তির কামনায় বসিলেন—

বসিলা যোগেশ জড় মূরতির মত
স্থিরভাবে বক্ষঃস্থলে বেষ্টি বাহুদ্বয়।
অচঞ্চল নেত্রদ্বয় হইল ক্রমশঃ,
শান্তির বিমল জ্যোতিঃ ভাতিল বদনে,
অন্তরের প্রাণময়ী গভীর বাসনা
ক্রমে ক্রমে চিত্ত হ'তে খসিতে লাগিল
হইতে লাগিল দৃষ্টি ক্রমে স্থিরতর।

এমন সময় নিষ্পন্দ যোগেশের কর্ণে কামিনীকণ্ঠ-নির্গত "যোগেশ" "যোগেশ" শব্দ "তড়িৎস্পর্শের" মত প্রবেশ করিল। যোগেশ শিহরিয়া দেখিলেন—

মন্দাকিনী শৈল-অঙ্কে উঠিছে ছুটিয়া।
শ্লথ কলেবর তার কাঁপিল বারেক,

তখনি সংযত চিত্ত করিয়া যোগেশ
মৃত্যুছায়া-পরিব্যাপ্ত শুষ্ক ওষ্ঠাধরে
বিকাশিয়া ক্ষীণ হাসি দৃষ্টি সরাইলা।

মন্দাকিনী আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, " যোগেশ এ দশা তব আপনি করিলে!" শুনিয়া ভীমকণ্ঠে যোগেশ উত্তর করিলেন—

"বক্ষঃস্থল শূন্য আজ—নহিলে এখনি
দেখাতেম চিরি বুক হৃদয় আমার ;
ত্যজিতে এ পাপ তৃষ্ণা, এই দীর্ঘকাল
এত যুঝিয়াছি আমি হৃদয়ের সনে,
নর-প্রকৃতিতে তত পারে না যুঝিতে।
ভাবিয়াছি কতবার তীক্ষ্ণ ছুরিকায়
চিরি বুক পাপতৃষ্ণা দিই ফেলাইয়া।
তথাপি সে পাপতৃষ্ণা পারিনি ত্যজিতে
ঘৃণায় লজ্জায় নিজে মুহূর্তে মুহূর্তে
মরিয়াছি কতবার—প্রাণের ভিতর
ভীষণ-নরক-কুণ্ড ছিলাম ধরিয়া ;
আজ সে পিপাসা মম গেছে শুকাইয়া
কিন্তু উন্মাদের জ্ঞান মরণের আগে!"

ইতিমধ্যে মন্দাকিনীর স্বামী ও ভৈরবী তথায় আসিলেন। তখন মন্দাকিনী কাতরকণ্ঠে আবার যোগেশকে বলিলেন—

————"আমিই পাষাণী
আমারি সে ভ্রম ভ্রাতঃ!—কিন্তু জ্ঞানহীনা
রমণী—ভগিনী তব—কনিষ্ঠা তোমার
অপরাধী যদি—কেন এ কঠিন পণ?
আপনা ভুলিলে ভাই—দেখ দেখি চেয়ে
এই কি যোগেশ—সেই জ্ঞানরত্নাকর?
এ কি বেশ, এ কি দেহ, এ কি ভাব তার
সে কান্তি—সে রূপ কোথা?—কোথা সে বরণ?
কোথা সে প্রকৃতি—কোথা সে জ্ঞান গভীর?
সততার চিত্রপট—নীতির দর্পণ,
মহত্ত্বের লীলাভূমি—পুণ্যের আশ্রম,
গাম্ভীর্য্যের প্রতিকৃতি—করুণার খনি
বরদার প্রিয়সুত—কমলার আশা
যে যোগেশ, আজ তার এ দারুণ দশা?
কি দুঃখে—কিসের দুঃখ—কিসের অভাব
অমরে বঞ্চিত করি অপার্থিব ধনে
দিলা বিধি পূর্ণ করি জীবন যাহার
এ ক্ষুদ্র সংসারে ভাই কি অভাব তার?
প্রণয়ের আদ্যাশক্তি নর্ম্মদা যাহার
প্রণয়ে তাহার কেন আক্ষেপ আবার?
এস ভ্রাতঃ!—গৃহে চল—নর্ম্মদা আমার
কণ্ঠাগত প্রাণ আজ বিরহে তোমার।"

যোগেশ কষ্টে নাভিস্থল হইতে বায়ু টানিয়া পুনরায় মন্দাকিনীকে বলিলেন—

এ নহে প্রথম চিত্র—নহিলে যোগেশ
জিজ্ঞাসিত এই দণ্ডে তুমি কি অমরী!
নিরন্তর—নিশি দিন—নিশ্বাসের সহ
বহিত এ স্বপ্নময় প্রশ্ন অহরহঃ।
বিমুক্ত সে স্বপ্ন আজ—জাগ্রত নয়নে
দেখিতেছি দেবীমূর্ত্তি সম্মুখে আমার,
অমরী না হ'বে যদি—কোন্ প্রয়োজনে
নরাধম যোগেশেরে এখনো করুণা?
যা কহিলে তুমি—সত্য,—একদিন মম
আছিল বিপুল তৃষ্ণা জীবনে আমার
বিদ্যা—ধন—যশ—মান—জ্ঞান—পুণ্য-তরে ;

কিন্তু কেন ?—কোন সুখে ?—কোন
অভিলাষে ?—
যোগেশ সে রত্নরাশি করিত সঞ্চয় !
ভাবিতে কি—বুঝিতে কি—অথবা আবার
হেন প্রশ্নে যোগেশের কিবা অধিকার !
সে আশা--সে অভিলাষ—সেই সুখ দুঃখ
আমূল বিলুপ্ত আজ অন্তরে আমার
জীবতারা অস্তমান—নহিলে যোগেশ
প্রতিকৃতি নির্ম্মাইয়া মন্দাকিনী তব
পথে ঘাটে হাটে মাঠে পল্লীতে নগরে
ভারতের যথা তথা করিত স্থাপন।
নিম্নভাগে স্বর্ণাক্ষরে লিখিতাম তার
'মন্দাকিনী এ সংসারে নারী-রত্ন সার।'
তাহার পর—
"এস সখে" বলি কর প্রসারি যোগেশ
মন্দার পতির কর ধরিলা সাদরে,
"এ সংসারে সুখী তুমি তুমি ভাগ্যবান্
ধন, মান, জ্ঞান, যশ, পুণ্য স্তূপাকার
এই মন্দাকিনী সখে সংসারে তোমার !
প্রতিদ্বন্দ্বী—প্রতিযোগী—চির প্রতারক
আজীবন নরাধম যোগেশ তোমার,
কিন্তু এ অন্তিমকালে ক্ষমি অপরাধ
শৈশবের আলিঙ্গন দেহ একবার।"

অতঃপর মন্দাকিনী সস্নেহে অঞ্চলদ্বারা যোগেশের অশ্রু মুছাইয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, যোগেশ মন্দাকিনীর প্রতি করুণাবিস্ফারিত দৃষ্টে চাহিয়া আবার গম্ভীর নির্ঘোষে বলিলেন,

"মন্দাকিনি ! বৃথা যত্ন—বৃথা কেন ক্লেশ !
কাহারে ফিরিতে গৃহে কর অনুরোধ ?
যোগেশে ?—কি পরিতাপ ! এখনো
মমতা ?
দেখ চেয়ে দেহে মোর—কি আছে ইহার
দেখিছনা—মৃত্যু ছায়া ব্যাপ্ত কলেবরে
দেখিছনা—অস্তমান নয়নের তারা
দেখিছনা—নাশারন্ধ্রে বহে প্রাণবায়ু
কি দেখিছ—কি ভাবিছ—ভীত কেন
হও ?
হতভাগ্য যোগেশের মরণই মঙ্গল।
কিন্তু এই ক্ষোভ মম—মমতা তোমার
বহু বিলম্বেতে চিত্তে ঢালিলে আমার।
দেবী অবতীর্ণা সমা ভাবিতাম তোমা
অহ্লদী পাষাণী বলি ছিল কিন্তু জ্ঞান।
আজ বুঝিলাম দেবী—পাষাণপ্রতিমা
কিন্তু অন্তঃশীলাবাহী সে হৃদে করুণা।
মন্দাকিনি ! এই জ্যোতিঃ দিনকত আগে
বিতরিতে যদি মম দগধ জীবনে
এভাবে যোগেশ আজ ত্যজিতনা প্রাণ !
যাও এবে—গৃহে যাও—নাহি প্রয়োজন
পাপাত্মার তরে ক্লেশ সহি অকারণ।
পতিসুখে আজীবন হ'ও সোহাগিনী
যোগেশের শেষ আশা এই মন্দাকিনি।
আমি চলিলাম—কিন্তু চলিলাম কোথা !
অহো ভবিষ্যৎ মম গাঢ় অন্ধকার।"

অনন্তর যোগেশ অশ্রু মুছিয়া অবনত মুখে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তদ্দৃষ্টে মন্দাকিনী উচ্চৈঃস্বরে "যোগেশ" "যোগেশ" বলিয়া ডাকিলেন; যোগেশ ইঙ্গিতদ্বারা তাঁহাদের অন্তরে যাইতে বলিলেন। তখন মন্দাকিনী বলিলেন, "যোগেশ ! নর্ম্মদা তব—ভবেশ তোমার" "আর কেন মন্দাকিনী" বলিয়া যোগেশ দূরে ধূমাকার প্রেতমূর্ত্তি দেখাইলেন। কিয়ৎকাল সকলে বিস্ময়ে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে যোগেশের দিকে ফিরিয়া দেখেন—

————যোগেশ তখন
বেষ্টিয়া হৃদয়ে বাহু সহাস্য বদনে
বসেছিলা স্থির দৃষ্টে মন্দাকিনী পানে।
স্থির নয়নের তারা ক্রমে যোগেশের
বিন্দু বিন্দু জ্যোতিঃহীন হইতে লাগিল।
ক্রমে স্থির নেত্রতারা হইয়া চঞ্চল
নয়নের দুই কোণে চলিয়া পড়িল।
অধরের ক্ষীণ হাসি গেল শুকাইয়া
চাহি মন্দাকিনী পানে হাসিতে হাসিতে
যোগেশ ত্যজিলা চির হতাশ জীবন।

হাসিতে হাসিতে সে প্রেমপয়োধি শুকাইল—যোগেশের দুঃখময় জীবন ফুরাইল। তাহার পর—

সুদীর্ঘ নিশ্বাস স[illegible] "যোগেশ!" বলিয়া
মন্দাকিনী প্রাণশূন্য দেহ পানে তার
স্থিরদৃষ্টে কতক্ষণ রহিলা চাহিয়া।

* *

অবশেষে মন্দাকিনী ত্যজি গাঢ় শ্বাস
ধরিয়া পতির কর তুলিলা তাহায়।
পতিপত্নী দুইজনে ধরাধরি করি
শৈল হ'তে নামাইলা যোগেশের দেহ।
অনুচরগণে ডাকি কহিলা রচিতে
সাগরসৈকতে চিতা—শেষে দুইজনে
যোগেশের মৃতদেহ ধরাধরি করি
জ্বলন্ত চিতার বক্ষে করিলা স্থাপন।
প্রজ্বলিত তৃণগুচ্ছ স্বহস্তে করিয়া
মন্দাকিনী দিলা বহ্নি যোগেশের মুখে।
হুহু শব্দে বহ্নিশিখা উঠিল জ্বলিয়া
আরক্তিয়া সিন্ধুনীর ভৈরব শিখর,
আরক্তিয়া শূন্যদেশ সৈকত ভূমির।
নির্নিমেষে মন্দাকিনী রহিলা চাহিয়া
হাস্যময়ী চিতাবক্ষে যোগেশের পানে।
অকূল জলধিতীরে—মন্দার সম্মুখে
চিতায় হইল ভস্ম যোগেশের দেহ।
স্বহস্তে সাগর হ'তে কলসি করিয়া
তুলিয়া সলিল মন্দা ঢালিল চিতায়।
নির্ব্বাপিত চিতানল হইল যখন
কলসি ফেলিয়া দূরে,—পতির হৃদয়ে
চাপিয়া বদন মন্দা কহিলা কাঁদিয়া
"চিতা যে নিবিল নাথ!"—এই সে প্রথম
যোগেশের তরে মন্দা অশ্রু বিসর্জ্জিলা।
"চিতা যে নিবিল নাথ!" বলিয়া আবার
মন্দাকিনী উচ্চৈঃস্বরে করিলা রোদন।

এই সকল কবিতা অমূল্যরত্নবিশেষ। আমরা বিলক্ষণ বলিতে পারি, এপ্রকার অমৃতময় কবিতা বাঙ্গালা সাহিত্যসংসারে অতি বিরল; বিশেষতঃ উপরোদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ের মধ্যে "চিতা যে নিবিল নাথ" এই চারিটি কথায় ঈশান বাবু যেরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। এই চারিটি কথায় মন্দাকিনীর তৎকালীন হৃদয়ের ভাব যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র লেখক সহস্র পৃষ্ঠা লিখিয়াও তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সে চারিটী কথার ভাব কথায় সম্যক্ ব্যক্ত হইবার নহে; তাহার ভাষা মনের ভিতর—কথায় নাই। যিনি মন্দাকিনীর এই রোদন বুঝিয়াছেন, তিনি বোধ হয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে বাঙ্গালা কাব্যপাঠে এত সুখ বুঝি শীঘ্র ঘটে নাই। আমরা আগামীবারে এই রোদনের অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

যোগেশ প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার আত্মার বামকরধারণপূর্ব্বক মৃত্যুচর "ধূমশিখা" মত উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। তাহার অনতিউর্দ্ধে নর্ম্মদার আত্মা অমরীর করধারণপূর্ব্বক উঠিতেছিল—

বিদ্যুত-প্রতিম রশ্মি অঙ্গ হ'তে তার
ঝরিয়া সে শূন্যপথ উঠিছে উজলি।

মৃত্যুচর যোগেশকে নর্ম্মদার আত্মা দেখাইল। যোগেশ নর্ম্মদার প্রেতাত্মা দেখিয়া তাহার মৃত্যুর বিবরণ প্রভৃতি মৃত্যুচরকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত জানিলেন। তখন—

"নর্ম্মদে! নর্ম্মদে!" বলি কাতর বচনে
যোগেশ ডাকিল উচ্চে—প্রতিধ্বনি তার
শূন্যধাম ভাসাইয়া হৈল প্রবাহিত।

* *

"প্রাণেশ! প্রাণেশ!" বলি কাতর বচনে
নর্ম্মদা চীৎকার করি ডাকিলা যোগেশে।
যোগেশ ডাকিলা পুনঃ "নর্ম্মদে! নর্ম্মদে!"
সেই দুই সম্বোধনে শূন্য উথলিল।

এ ডাকে "নর্ম্মদে!" বলি কাতর বচনে
ও ডাকে "প্রাণেশ!" বলি সকরুণ স্বরে।
ডাকিতে ডাকিতে দুই মূর্ত্তি ছায়াময়
গেল শূন্যে মিশাইয়া—কিন্তু দুজনার
সকরুণ সম্বোধন নর্ম্মদে! প্রাণেশ!
গগনের শূন্যবক্ষে ভাসিতে লাগিল।

ভীষণ বাত্যান্দোলিত সমুদ্র ক্রমশঃ শান্তভাব ধারণকালীন তাহার উপর যখন মৃদুল মৃদুল তরঙ্গ নাচিতে থাকে, কচিৎ বা দূরে মৃদু মৃদু মেঘগর্জ্জন করে, সে সময়ে হৃদয়ে যেরূপ ভাব হয়, এই কয় পংক্তি পাঠান্তে ঠিক্ তদ্রূপ হইয়া থাকে।

অনন্তর "বিষশৈল" নামক নরকে যোগেশ স্বীয় দুষ্কৃতির ফলভোগ করিতে লাগিলেন, তদূর্দ্ধে সতীকুঞ্জ বিরাজমান—

উজলিয়া শূন্যমার্গ, সতীকুঞ্জ হ'তে
উঠিছে হিরণ্যভাতি; নিকুঞ্জ প্রদেশ
ভাসিতেছে শূন্যদেশে স্বপ্নোদ্যান মত।
নাহি বহু কুঞ্জ তায়—সংখ্যা পরিমিত;
মোমের ব্রততী মত অপূর্ব্ব লতায়
রচিত সে কুঞ্জগুলি—তুষার বর্ণের
জ্যোতির্ম্ময় নানা পুষ্প ফুটিয়া তাহায়।
সবি শ্বেতবর্ণ তথা—তৃণ লতা তরু
পাতা, পুষ্প, ফল, মূল, পশু, পক্ষী, কীট,
জ্যোতির্ম্ময় শ্বেতবর্ণ অঙ্গে সবাকার।
ঋতুভেদ নাহি তথা—বিরাজে বসন্ত
চিরদিন সেই ধামে মোহকর বেশে।
সকলি সঙ্গীতময় সে কুঞ্জ প্রদেশে;—
কুসুমে সঙ্গীত ফোটে—ফোটে কিসলয়ে,
সলিলে সঙ্গীত ওঠে— *

* * *

মোহন সঙ্গীতে আর মধুর সৌরভে
নিরন্তর পূর্ণ সেই সতীকুঞ্জধাম।
নাহি বর্ষা হিমকণা—প্রফুল্ল আলোকে
আবরিত সে প্রদেশ। বিমলা তটিনী
মন্দাকিনী নামে যাহা খ্যাত দেবলোকে
সঙ্গীত তুলিয়া তথা বহে নিরন্তর।

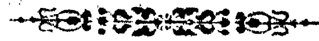
একদা বিষশৈল হইতে যোগেশ একদৃষ্টে সতীকুঞ্জের দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন, নর্ম্মদাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া কতিপয় কামিনী—

মৃণালে গঠিত বংশী করিয়া বাদন,
পুষ্পরেণু বিমণ্ডিত অঙ্গুলী কাঁপায়ে,

একটি নিকুঞ্জের নিকট আসিল, আসিয়া তরুকুল হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া নর্ম্মদাকে পরাইল, পরাইয়া তাঁহাকে সেই নিকুঞ্জমধ্যে এক মঞ্চোপরি উপবিষ্ট করাইল। তাহার পর শচী আপনার কণ্ঠ হইতে পুষ্পমালা খুলিয়া নর্ম্মদার কণ্ঠে পরাইলেন, এবং তাঁহাকে আশীষ করিয়া সতীকুঞ্জের অধিশ্বরী করিলেন। চারিদিকে কামিনীকুল—ইহাঁরা জগতে সকলেই সতী ছিলেন—নর্ম্মদাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে যোগেশ নরকযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া "নর্ম্মদে" "নর্ম্মদে" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে আর্ত্ত ধ্বনি পতিপ্রাণা নর্ম্মদার কর্ণে গেল না। দেখিতে দেখিতে নর্ম্মদাকে পুষ্পমঞ্চ হইতে নামাইয়া সকল কামিনীগণ একটি মধুর গীত গায়িতে গায়িতে স্থানান্তরে গেল। সেই পর্য্যন্ত যোগেশ কেবল "নর্ম্মদে" "নর্ম্মদে" শব্দে চীৎকার করিতেন। নর্ম্মদা মহানন্দে সতীকুঞ্জধামে যোগেশের চক্ষের উপর বেড়াইতেন।

এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। আমরা এবার কেবলমাত্র গ্রন্থের উপন্যাসভাগের পরিচয় দিয়াছি; আগামী বারে গ্রন্থের দোষ ও অন্যান্য বক্তব্য বিষয়ের সমালোচনা করিব। যোগেশ গ্রন্থের দোষ আছে বটে, কিন্তু গুণের ভাগ সে সকল দোষ ঢাকিয়া রাখে।

বঙ্গদর্শন।



৮৬ সংখ্যা।

আনন্দ মঠ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে রাজধানীতে রাজপথে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রব উঠিল যে রাজসরকার হইতে কলিকাতায় যে খাজনা চালান যাইতেছিল, সন্ন্যাসীরা তাহা মারিয়া লইয়াছে। তখন রাজাজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসী ধরিতে সিপাহী বরকন্দাজ ছুটিতে লাগিল। এখন সেই দুর্ভিক্ষপীড়িতপ্রদেশে সে সময়ে প্রকৃত সন্ন্যাসী বড় ছিল না। কেন না তাহারা ভিক্ষোপজীবী; লোকে আপনি খাইতে পায় না, সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেবে কে? অতএব প্রকৃত সন্ন্যাসী যাহারা তাহারা সকলেই পেটের দায়ে কাশী প্রয়াগাদি অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল। কেবল সন্তানেরা ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিত, প্রয়োজন হইলে পরিত্যাগ করিত। আজ গোলযোগ দেখিয়া, তাহারা অনেকেই সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিল। এজন্য বুভুক্ষু রাজানুচরবর্গ কোথাও সন্ন্যাসী না পাইয়া কেবল গৃহস্থদিগের হাঁড়ি কলসী ভাঙ্গিয়া উদর অর্দ্ধপূর্ণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। কেবল সত্যানন্দ কোন কালে গৈরিকবসন পরিত্যাগ করিতেন না।

সেই কৃষ্ণকল্লোলিনী ক্ষুদ্র নদীতীরে সেই পথের ধারেই বৃক্ষতলে নদীতটে কল্যাণী পড়িয়া আছে, সেইখানে মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুলোচনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, নজরদ্দী জমাদার সিপাহী লইয়া, এমন সময়ে সেইখানে উপস্থিত। একেবারে সত্যানন্দের গলদেশে হস্তার্পণপূর্ব্বক বলিল, "এই শ্যালা সন্ন্যাসী।" আর একজন অমনি মহেন্দ্রকে ধরিল—কেন না যে সন্ন্যাসীর সঙ্গী সে অবশ্য সন্ন্যাসী

হইবে। আর একজন শস্পোপরি লম্বমান কল্যাণীর মৃতদেহটাও ধরিতে যাইতেছিল—কিন্তু দেখিল যে, একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ—সন্ন্যাসী না হইলেও হইতে পারে। আর ধরিল না। বালিকাকেও ঐরূপ বিবেচনায় ত্যাগ করিল। পরে তাহারা কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া দুইজনকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কল্যাণীর মৃতদেহ আর তাহার বালিকাকন্যা বিনারক্ষকে সেই বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিল।

প্রথমে শোকে অভিভূত এবং ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া মহেন্দ্র বিচেতনপ্রায় ছিলেন। কি হইতেছিল, কি হইল বুঝিতে পারেন নাই, বন্ধনের প্রতি কোন আপত্তি করেন নাই, কিন্তু দুই চারিপদ গেলে বুঝিলেন যে, আমাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। কল্যাণীর শব পড়িয়া রহিল সৎকার হইল না, শিশুকন্যা পড়িয়া রহিল,এইক্ষণে তাহাদিগকে হিংস্র পশু খাইতে পারে, এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র মহেন্দ্র দুইটি হাত পরস্পর হইতে বলে বিশ্লিষ্ট করিলেন, এক টানে বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে এক পদাঘাতে জমাদার সাহেবকে ভূমিশয্যা অবলম্বন করাইয়া একজন সিপাহীকে আক্রমণ করিতেছিলেন। তখন অপর তিনজন তাঁহাকে তিনদিক্ হইতে ধরিয়া পুনর্ব্বার বিজিত ও নিশ্চেষ্ট করিল। তখন দুঃখে কাতর হইয়া মহেন্দ্র সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, যে "আপনি একটু সহায়তা করিলেই এই পাঁচজন দুরাত্মাকে বধ করিতে পারিতাম।" সত্যানন্দ বলিলেন, "আমার এই প্রাচীন শরীরে বল কি—আমি যাঁহাকে ডাকিতেছিলাম, তিনি ভিন্ন আমার আর বল নাই—তুমি,যাহা অবশ্য ঘটিবে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। আমরা এই পাঁচজনকে পরাভূত করিতে পারিব না। চল কোথায় লইয়া যায় দেখি। জগদীশ্বর সকল দিক্ রক্ষা করিবেন।" তখন তাহারা দুইজনে আর কোন মুক্তির চেষ্টা না করিয়া সিপাহীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিছু দূর গিয়া সত্যানন্দ সিপাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু আমি হরিনাম করিয়া থাকি—হরিনাম করার কিছু বাধা আছে?" সত্যানন্দকে ভালমানুষ বলিয়া জমাদারের বোধ হইয়াছিল, সে বলিল, "তুমি হরিনাম কর, তোমায় বারণ করিব না। তুমি বুড়া ব্রহ্মচারী, বোধ হয় তোমায় খালাসের হুকুমই হইবে, এই বদমাস ফাঁসি যাইবে।" তখন ব্রহ্মচারী মৃদু মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেন।

ধীর সমীরে, যমুনাতীরে,
বসতি বনে বনমালী।
ইত্যাদি

নগরে পৌছিলে তাহারা কোতয়ালের নিকট নীত হইল। কোতয়াল রাজসরকারে এত্তালা পাঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে সম্প্রতি ফাটকে রাখি-

লেন। সে কারাগার অতি ভয়ঙ্কর, যে যাইত, সে প্রায় আর বাহির হইত না, কেন না বিচার করিবার লোক ছিল না। ইংরেজের জেল নয়—তখন ইংরেজের বিচার ছিল না। আজ নিয়মের দিন—তখন অনিয়মের দিন। নিয়মের দিনে আর অনিয়মের দিনে তুলনা কর।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কারাগারমধ্যে বদ্ধ সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "আজ অতি আনন্দের দিন। কেন না আমরা কারাগারে বদ্ধ হইয়াছি। বল হরে মুরারে!" মহেন্দ্র কাতরস্বরে বলিল, "হরে মুরারে!"

সত্য। কাতর কেন বাপু? তুমি এ মহাব্রত গ্রহণ করিলে, এ স্ত্রীকন্যা ত অবশ্য ত্যাগ করিতে। আর ত কোন সম্বন্ধ থাকিত না।

মহে। ত্যাগ এক, যমদণ্ড আর। যে শক্তিতে আমি এ ব্রত গ্রহণ করিতাম, সে শক্তি আমার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে গিয়াছে।

সত্য। শক্তি হইবে। আমি শক্তি দিব। মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, মহাব্রত গ্রহণ কর।

মহেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল যে "আমার স্ত্রী কন্যাকে শৃগালে কুক্কুরে খাইতেছে—আমাকে কোন ব্রতের কথা বলিবেন না।"

সত্য। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। সন্তানগণ তোমার স্ত্রীর সৎকার করিয়াছে—কন্যাকে লইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছে।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইল, বড় বিশ্বাস করিল না, বলিল, "আপনি কি প্রকারে জানিবেন? আপনি ত বরাবর আমার সঙ্গে।"

সত্য। আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত। দেবতারা আমাদিগের প্রতি দয়া করেন। আজি রাত্রেই তুমি সে সম্বাদ পাইবে। আজি রাত্রেই তুমি এ কারাগার হইতে মুক্ত হইবে।

মহেন্দ্র কোন কথা কহিল না। সত্যানন্দ বুঝিলেন, যে মহেন্দ্র বিশ্বাস করিতেছে না। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "বিশ্বাস করিতেছ না—পরীক্ষা করিয়া দেখ।" এই বলিয়া সত্যানন্দ কারাগারের দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। কি করিলেন, অন্ধকারে মহেন্দ্র কিছু দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কাহার সঙ্গে কথা কহিলেন ইহা বুঝিলেন। ফিরিয়া আসিলে, মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "কি পরীক্ষা?"

সত্য। তুমি এখনই কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

এই কথা বলিতে বলিতে কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একব্যক্তি ঘরের ভিতর আসিয়া বলিল,

"মহেন্দ্র সিংহ কাহার নাম?"

মহেন্দ্র বলিল "আমার নাম।"

আগন্তুক বলিল, "তোমার খালাষের হুকুম হইয়াছে—যাইতে পার।"

মহেন্দ্র প্রথমে বিস্মিত হইল—পরে মনে করিল মিথ্যা কথা। পরীক্ষার্থ বাহির হইল। কেহ তাহার গতিরোধ করিল না। মহেন্দ্র রাজপথ পর্য্যন্ত চলিয়া গেল।

এই অবসরে আগন্তুক সত্যানন্দকে বলিল, "মহারাজ! আপনিও কেন যান না? আমি আপনারই জন্য আসিয়াছি।"

সত্য। তুমি কে? ধীরানন্দ গোঁসাই?

ধীর। আজ্ঞা হাঁ।

সত্য। প্রহরী হইলে কি প্রকারে?

ধীর। ভবানন্দ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি নগরে আসিয়া আপনারা এই কারাগারে আছেন শুনিয়া এখানে কিছু ধুতুরা মিশান সিদ্ধি লইয়া আসিয়াছিলাম। যে খাঁ সাহেব পাহারায় ছিলেন, তিনি তাহা সেবন করিয়া ভূমিশয্যায় নিদ্রিত আছেন। এই জামা জোড়া পাকড়ী বর্শা যাহা আমি পরিয়া আছি, সে তাঁহারই।

সত্য। তুমি উহা পরিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া যাও। আমি এরূপে যাইব না।

ধীর। কেন—সে কি?

সত্য। আজ সন্তানের পরীক্ষা।

মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিল। সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরিলে যে?"

মহেন্দ্র। আপনি নিশ্চিত সিদ্ধ পুরুষ। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইব না।

সত্য। তবে থাক। উভয়েই আজ রাত্রে অন্যপ্রকারে মুক্ত হইব।

ধীরানন্দ বাহিরে গেল। সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র কারাগারমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচারীর গান অনেকে শুনিয়াছিল। অন্যান্য লোকের মধ্যে জীবানন্দের কাণে সে গান গেল। মহেন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইবার তাহার প্রতি আদেশ ছিল, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। পথিমধ্যে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে সাতদিন খায় নাই, রাস্তার ধারে পড়িয়াছিল। তাহার জীবনদান জন্য জীবানন্দ দণ্ড দুই বিলম্ব করিয়াছিলেন। মাগীকে বাঁচাইয়া তাহাকে অতি কদর্য্য ভাষায় গালি দিতে দিতে (বিলম্বের অপরাধ তার) এখন আসিতেছিলেন। দেখিলেন, প্রভুকে মুসলমানে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে—প্রভু গান গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন।

জীবানন্দ মহাপ্রভু, সত্যানন্দের সঙ্কেত সকল বুঝিতেন। "কুরু মম বচনং সত্বররচনং"—কি করিতে হইবে?

"ধীর সমীরে, যমুনাতীরে,
বসতি বনে বনমালী।"

নদীর ধারে কেহ আছে না কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া, জীবানন্দ নদীর ধারে ধারে চলিলেন। জীবানন্দ দেখিয়াছিলেন, যে ব্রহ্মচারী স্বয়ং মুসলমানকর্ত্তৃক নীত হইতেছেন। এস্থলে, ব্রহ্মচারীর উদ্ধারই তাঁহার প্রথম কাজ। কিন্তু জীবানন্দ ভাবিলেন, "এ সঙ্কেতের সে অর্থ নয়। তাঁর জীবনরক্ষার অপেক্ষাও তাঁহার আজ্ঞাপালন বড়—এই কথাই তাঁহার কাছে প্রথম শিখিয়াছি। অতএব তাঁহার আজ্ঞাপালনই করিব।"

নদীর ধারে ধারে জীবানন্দ চলিল। যাইতে যাইতে সেই বৃক্ষতলে নদীতীরে দেখিল যে এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ আর এক জীবিতা শিশুকন্যা। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যাকে জীবানন্দ একবারও দেখেন নাই। মনে করিলেন হইলে হইতে পারে যে ইহারাই মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা। কেন না প্রভুর সঙ্গে মহেন্দ্রকে দেখিলাম, তাহার স্ত্রী কন্যা দেখিলাম না। যাহা হউক মাতা মৃতা, কন্যাটী জীবিতা। আগে ইহার রক্ষাবিধান করা চাই—নহিলে বাঘ ভালুকে খাইবে। ভবানন্দ ঠাকুর এইখানেই কোথায় আছেন, তিনি স্ত্রীলোকটির সৎকার করিবেন, এই ভাবিয়া জীবানন্দ বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

মেয়ে কোলে করিয়া জীবানন্দ গোঁসাই সেই নিবিড় জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল পার হইয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামখানির নাম ভৈরবীপুর। লোকে বলিত ভরুইপুর। ভরুইপুরে দুই চারি ঘর সামান্য লোকের বাস, নিকটে আর বড় গ্রাম নাই, গ্রাম পার হইয়াই আবার জঙ্গল। চারিদিকে জঙ্গল—জঙ্গলের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু গ্রামখানি বড় সুন্দর। কোমলতৃণাবৃত গোচারণভূমি, কোমলশ্যামলপল্লবযুক্ত আম, কাঁটাল, জাম, তালের বাগান, মধ্যে মধ্যে নীলজলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ দীর্ঘিকা, তাহাতে জলে বক, হংস, ডাহুক; তীরে কোকিল, চক্রবাক; কিছুদূরে ময়ূর উচ্চরবে কেকাধ্বনি করিতেছে। গৃহে গৃহে, প্রাঙ্গণে গাভী, গৃহের মধ্যে মরাই, কিন্তু আজ কাল দুর্ভিক্ষে ধান নাই—কাহারও চালে একটি ময়নার পিঁজরে, কাহারও দেয়ালে আলিপনা—কাহারও উঠানে শাকের ভূমি। সকলই দুর্ভিক্ষপীড়িত, কৃশ, শীর্ণ, সন্তাপিত। তথাপি এই গ্রামের লোকের একটি শ্রীছাঁদ আছে—জঙ্গলে অনেক রকম মনুষ্যখাদ্য জন্মে, এজন্য জঙ্গল হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া সেই গ্রামবাসীরা প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

একটি বৃহৎ আম্রকাননমধ্যে একটি ছোট বাড়ী। চারিদিকে মাটীর প্রাচীর চারিদিকে চারিখানি ঘর। গৃহস্থের গোরু আছে, ছাগল আছে, একটা ময়ূর আছে, একটা ময়না আছে, একটা টিয়া

আছে। একটা বাঁদর ছিল, কিন্তু সেটাকে আর খাইতে দিতে পারে না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। একটা ঢেঁকি আছে, বাহিরে থামার আছে, উঠানে লেবু গাছ আছে, গোটাকতক মল্লিকা যুঁইয়ের গাছ আছে, কিন্তু এবার তাতে ফুল নাই। সব ঘরের বারাণ্ডায় একটা একটা চরকা আছে; কিন্তু বাড়ীতে বড় লোক নাই। জীবানন্দ মেয়ে কোলে করিয়া সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই জীবানন্দ একটা ঘরের বারাণ্ডায় উঠিয়া একটা চরকা লইয়া ঘেনর ঘেনর আরম্ভ করিলেন। সে ছোট মেয়েটা কখন চরকার শব্দ শুনে নাই, বিশেষতঃ মা ছাড়া হইয়া অবধি কাঁদিতেছে, চরকার শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়া আরও উচ্চ সপ্তকে উঠিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরের ভিতর হইতে একটি ১৭।১৮ বৎসরের মেয়ে বাহির হইল। মেয়েটি বাহির হইয়াই দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী সন্নিবিষ্ট করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। "এ কি এ, দাদা চরকা কাটো কেন, মেয়ে কোথা পেলে, দাদা তোমার মেয়ে হয়েছে না কি—কোথায় মেয়ে হলো?"

জীবানন্দ মেয়েটী আনিয়া সেই যুবতীর কোলে দিয়া তাহাকে কীল মারিতে উঠিলেন, বলিলেন, "বাঁদরী, আমার আবার মেয়ে, আমাকে কি হেঁজিপেঁজি পেলি না কি, ঘরে দুধ আছে?"

তখন যে যুবতী বলিল, "দুধ আছে বইকি, খাবে।"

জীবানন্দ বলিল, "হ্যাঁ খাবো।"

তখন সে যুবতী ব্যস্ত হইয়া দুধ জ্বাল দিতে গেল। জীবানন্দ ততক্ষণ চরকা ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিলেন। মেয়েটী সেই যুবতীর কোলে গিয়া আর কাঁদে না। মেয়েটী কি ভাবিয়া ছিল বলিতে পারি না—বোধ হয় এই যুবতীকে ফুল্লকুসুমতুল্য সুন্দরী দেখিয়া মা মনে করিয়াছিল। বোধ হয় উননের তাপের আঁচ মেয়েটীকে একবার লাগিয়াছিল তাই সে একবার কাঁদিল। কান্না শুনিবামাত্র জীবানন্দ বলিলেন, "ও নিমি ও পোড়ার মুখি ও হনুমানি তোর এখনও দুধ জ্বাল হলো না।" নিমি বলিল, "হয়েছে।" এই বলিয়া সে পাথর বাটীতে দুধ ঢালিয়া জীবানন্দের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। জীবানন্দ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "ইচ্ছা করে যে এই তপ্ত দুধের বাটী তোর গায়ে ঢালিয়া দিই—তুই কি মনে করেছিস্ আমি খাব না কি?"

নিমি জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কে খাবে?"

জীবা। ঐ মেয়েটা খাবে দেখছিস্ নে, ঐ মেয়েটাকে দুধ খাওয়া।

নিমি তখন আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার চক্ষু হতে ফোঁটাকতক জল

পড়িল। তাহার একটি ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছিল, তাহারই ঐ ঝিনুক ছিল। নিমি তখনই হাত দিয়া জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল,

"হ্যাঁ দাদা, কার মেয়ে দাদা ?"

জীবানন্দ বলিল, "তোর কিরে পোড়ার মুখী।"

নিমি বলিল,"আমায় মেয়েটী দেবে।"

জীবানন্দ বলিল, "তুই মেয়ে নিয়ে কি কর্‌বি।"

নিমি। "আমি মেয়েটীকে দুধ খাওয়াব, কোলে করিব, মানুষ করিব—" বল্‌তে বল্‌তে ছাই পোড়ার চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে, আবার হাসে।

জীবানন্দ বলিল, "তুই নিয়ে কি কর্‌বি, তোর কত ছেলে মেয়ে হবে।"

নিমি। তা হয় হবে, এখন এ মেয়েটী দাও, এর পর না হয় নিয়ে যেও।

জীবা। তা নে, নিয়ে মরগে যা। আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাব। উটি কায়েতের মেয়ে, আমি চল্‌লুম এখন—

নিমি। সে কি দাদা, খাবে না! বেলা হয়েছে যে, আমার মাথা খাও, দুটি খেয়ে যাও।

জীবা। তোর মাথাও খাব, আবার দুটি খাব, দুই ত পেরে উঠবো না দিদি। মাথা রেখে দুটি ভাত দে।

নিমি তখন মেয়ে কোলে করিয়া ভাত বাড়িতে ব্যতিব্যস্ত হইল।

নিমি পিঁড়ি পাতিয়া জলছড়া দিয়া, জায়গা মুছিয়া মল্লিকাফুলের মত পরিষ্কার অন্ন, কাঁচা কলাইয়ের দাল, জঙ্গলে ডুমুরের দালনা, পুকুরের রুইমাছের মুড়োর ঝোল, এবং দুগ্ধ আনিয়া জীবানন্দকে খাইতে দিল। খাইতে বসিয়া জীবানন্দ বলিলেন,

"নিমাই দিদি, কে বলে মন্বন্তর, তোদের গাঁয়ে বুঝি মন্বন্তর আসে নি ?

নিমি বলিল, "মন্বন্তর আস্‌বে না কেন, বড় মন্বন্তর, তা আমরা দুটী মানুষ ঘরে যা আছে, লোককে দি থুই ও আপনারা খাই। আমাদের গাঁয়ে বৃষ্টি হইয়াছিল, মনে নাই ?—তুমি যে সেই বলিয়া গেলে, বনে বৃষ্টি হয়। তা আমাদের গাঁয়ে কিছু কিছু ধান হয়েছিল—আর সবাই নগরে বেচে এলো—আমরা বেচি নাই।"

জীবানন্দ বলিল, "বোনাই কোথা ?"

নিমি ঘাড় হেঁট করিয়া চুপি চুপি বলিল, "সের দুই তিন চাল লইয়া কোথায় বেরিয়েছেন, কে নাকি চাল চেয়েছে।"

এখন জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেক কাল হয় নাই। জীবানন্দ আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া গপ্‌গপ্ টপ্‌টপ্ সপ্‌সপ্ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যে অন্নব্যঞ্জনাদি শেষ করিলেন। এখন শ্রীমতী

নিমাইমণি শুধু আপনার ও স্বামীর জন্য রাঁধিয়াছিলেন, আপনার ভাতগুলি দাদাকে দিয়াছিলেন, পাথর শূন্য দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর অন্নব্যঞ্জনগুলি আনিয়া ঢালিয়া দিলেন। জীবানন্দ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে সকলই উদরনামক বৃহৎ গর্ত্তে প্রেরণ করিলেন। তখন নিমাইমণি বলিল, "দাদা আর খাবে কিছু ?"

জীবানন্দ বলিল, "আর কি আছে ?"

নিমাইমণি বলিল, "একটা পাকা কাঁটাল আছে।"

নিমাই সে পাকা কাঁটাল আনিয়া দিল—বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া জীবানন্দ গোস্বামী কাঁটালটিকেও সেই ধ্বংসপুরে পাঠাইলেন। তখন নিমাই হাসিয়া বলিল,

"দাদা আর কিছু নাই।"

দাদা বলিলেন, "তবে যা, আর একদিন আসিয়া খাইব।"

অগত্যা নিমাই জীবানন্দকে আঁচাইবার জল দিল। জল দিতে দিতে নিমাই বলিল, "দাদা, আমার একটা কথা রাখিবে ?"

জীবা। কি ?

নিমি। আমার মাথা খাও।

জীবা। কি বল্ না পোড়ারমুখী।

নিমি। কথা রাখ্‌বে ?

জীবা। কি আগে বল্ না।

নিমি। আমার মাথা খাও পায়ে পড়ি।

জীবা। তোর মাথাও খাই—তুই পায়েও পড়, কিন্তু কি বল ?

নিমাই তখন এক হাতে আর এক হাতের আঙুলগুলি টিপিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, সেইগুলি নিরীক্ষণ করিয়া, একবার জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া একবার মাটীপানে চাহিয়া, শেষ মুখ ফুটিয়া বলিল, "একবার বউকে ডাক্‌বো ?"

জীবানন্দ আঁচাইবার গাড়ু তুলিয়া নিমির মাথায় মারিতে উদ্যত; বলিলেন, "আমার মেয়ে ফিরিয়ে দেও, আর আমি একদিন তোর চাল দাল ফিরিয়া দিয়া যাইব। তুই বাঁদরী, তুই পোড়ারমুখী, তুই যা না বলবার তাই আমাকে বলিস্।"

নিমাই বলিল, "তা হউক, আমি বাঁদরী, আমি পোড়ারমুখী একবার বৌকে ডাক্‌বো ?"

জীবা। আমি চল্লুম, এই বলিয়া জীবানন্দ হন্‌হন্ করিয়া বাহির হইয়া যায়,—নিমাই গিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, দ্বারের কপাট রুদ্ধ করিয়া দ্বারে পীঠ দিয়া বলিল, "আগে আমায় মেরে ফেল, তবে তুমি যাও। বৌয়ের সঙ্গে না দেখা করে তুমি যেতে পারিবে না।"

জীবানন্দ বলিল, যে "আমি কত লোক মারিয়া ফেলিয়াছি তা তুই জানিস্ ?"

এইবার নিমি রাগ করিল, "বলিল, বড় কীর্ত্তিই করেছ—স্ত্রীত্যাগ কর্‌বে, লোক মার্‌বে, আমি তোমায় ভয়

কর্‌বো, তুমিও যে বাপের সন্তান, আমিও সেই বাপের সন্তান—লোক মারা যদি বড়াইয়ের কথা হয়, আমায় মেরে বড়াই কর।"

জীবানন্দ হাসিল, "ডেকে নিয়ে আয়—কোন পাপিষ্ঠকে ডেকে নিয়ে আস্‌বি নিয়ে আয়, কিন্তু দেখ্‌ ফের যদি এমন কথা বল্‌বি, তোকে কিছু বলি না বলি সেই শালার ভাই শালাকে মাথা মুড়াইয়া দিয়া ঘোল ঢেলে উল্টা গাধায় চড়িয়ে দেশের বার্‌ করে দিব।"

নিমি মনে মনে বলিল, "আমিও তা হলে বাঁচি।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিমি বাহির হইয়া গেল, নিকটবর্ত্তী এক পর্ণকুটীরে গিয়া প্রবেশ করিল। কুটীরমধ্যে শতগ্রন্থিযুক্ত বসনপরিধানা রুক্ষকেশা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা কাটিতেছিল। নিমাই গিয়া বলিল, "বৌ শিগ্‌গির শিগ্‌গির!" বৌ বলিল, "সিগ্‌গির কি লো! ঠাকুরজামাই তোকে মেরেছে নাকি, ঘায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে?"

নিমি। কাছাকাছি বটে, তেল আছে ঘরে?

সে স্ত্রীলোক তৈলের ভাণ্ড বাহির করিয়া দিল। নিমাই ভাণ্ড হইতে তাড়াতাড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল লইয়া সেই স্ত্রীলোকের মাথায় মাখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি একটা চলনসই খোঁপা বাঁধিয়া দিল। তার পর তাহাকে এক কীল মারিয়া বলিল, "তোর সেই ঢাকাই কোথা আছে বল।" সে স্ত্রীলোক কিছু বিস্মিতা হইয়া বলিল, "কি লো তুই কি খেপেছিস্‌ নাকি, না তোর কেউ জুটেছে?"

নিমাই দুম্‌ করিয়া তাহার পিঠে এক কীল মারিল, বলিল, "শাড়ী বের কর, দুয়ের একটা হয়েছে।"

রঙ্গ দেখিবার জন্য সে স্ত্রীলোক শাড়ীখানি বাহির করিল। রঙ্গ দেখিবার জন্য, কেন না এত দুঃখেও রঙ্গ দেখিবার যে বৃত্তি তাহা তাহার হৃদয়ে লুপ্ত হয় নাই। নবীন যৌবন; ফুল্লকমলতুল্য তাহার নববয়সের সৌন্দর্য্য তৈল বিনা—বেশ বিনা—আহার বিনা—সেই প্রদীপ্ত, অননুমেয় সৌন্দর্য্য সেই শতগ্রন্থিযুক্ত বসনমধ্যে লুকায়িত। বর্ণে ছায়ালোকের চাঞ্চল্য, নয়নে কটাক্ষ, অধরে হাসি, হৃদয়ে ধৈর্য্য। আহার নাই—তবু শরীর লাবণ্যময়, বেশ ভূষা নাই, তবু সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। যেমন মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে অনির্ব্বচনীয় কি ছিল! অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য, অনির্ব্বচনীয় উন্নতভাব, অনির্ব্বচনীয় প্রেম, অনির্ব্বচনীয় ভক্তি। সে হাসিতে হাসিতে (কেহ সে হাসি দেখিল না,) হাসিতে হাসিতে সেই ঢাকাই শাড়ী বাহির করিয়া দিল। বলিল, "কি লো নিমি, কি হইবে?" নিমাই বলিল, "তুই পর্‌বি?" সে

বলিল, "আমি পরিলে কি হইবে?" তখন নিমাই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আপনার কমনীয় বাহু বেষ্টন করিয়া বলিল, "দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে।" সে বলিল, "আমায় যেতে বলেছেন। ত ঢাকাই শাড়ী কেন, চল না এমনি যাই।" নিমাই তার গালে এক চড় মারিল—সে নিমাইয়ের কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে কুটীরের বাহির করিল। বলিল, "চল এই ন্যাকড়া পরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি।" কিছুতেই কাপড় বদলাইল না, অগত্যা নিমাই রাজি হইল। নিমাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত গেল, গিয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিকবয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না। মলিন গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বোধ হইল যেন গৃহ আলো হইল। বোধ হইল পাতায় ঢাকা কোন গাছে কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল; বোধ হইল যেন কোথায় গোলাবজলের কার্ব্বা মুখ আঁটা ছিল, কে কার্ব্বা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যেন কে জলন্ত অগ্নিতে ধূপ ধুনা গুগ্‌গুল ফেলিয়া দিল। সে রূপসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল, প্রথমে ত দেখিতে পাইল না। তার পর দেখিল, গৃহপ্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে, আম্রের কাণ্ডে মাথা রাখিয়া জীবানন্দ কাঁদিতেছেন। সেই রূপসী তাঁহার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হস্তধারণ করিল। বলি না যে তাহার চক্ষে জল আসিল না, জগদীশ্বর জানেন, যে তাহার চক্ষে যে স্রোতঃ আসিয়াছিল, বহিলে তাহা জীবানন্দকে ভাসাইয়া দিত; কিন্তু সে তাহা বহিতে দিল না। জীবানন্দের হাত হাতে লইয়া বলিল, "ছি, কাঁদিও না, আমি জানি তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ, আমার জন্য তুমি কাঁদিও না—তুমি যেপ্রকারে আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।"

জীবানন্দ মাথা তুলিয়া চক্ষু মুছিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"শান্তি! তোমার এ শতগ্রন্থি মলিনবস্ত্র কেন? তোমার ত ধনের অভাব নাই, সে বিষয়ে ত আমি তোমাকে কষ্ট দিই না।"

শান্তি বলিল, "তুমি যে ধন দিয়াছ, তাহা তোমারই জন্য আছে। আমি টাকা লইয়া কি করিতে হয় তাহা জানি না, যখন তুমি আসিবে, যখন তুমি আমাকে আবার গ্রহণ করিবে—"

জীবা। গ্রহণ করিব—শান্তি? আমি কি তোমায় ত্যাগ করিয়াছি?

শান্তি। ত্যাগ নহে—যবে তোমার ব্রত সাঙ্গ হইবে, যবে আবার আমায় ভালবাসিবে—

কথা শেষ না হইতেই জীবানন্দ শান্তিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেষে জীবানন্দ বলিল,

"কেন দেখা করিলাম!"

শান্তি। কেন করিলে—তোমার ত ব্রত ভঙ্গ করিলে?

জীবা। ব্রতভঙ্গ হউক—প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাহার জন্য ভাবি না, কিন্তু তোমায় দেখিয়া ত আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। আমি এই জন্য নিমাইকে বলিয়াছিলাম যে, দেখায় কাজ নাই। তোমায় দেখিলে আমি ফিরিতে পারি না। একদিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জগৎসংসার একদিকে ব্রত হোম যাগ যজ্ঞ; সবই একদিকে, আর একদিকে তুমি। একা তুমি। আমি সকল সময়ে বুঝিতে পারি না যে, কোন দিক্ ভারি হয়। দেশ ত শান্তি, দেশ লইয়া আমি কি করিব? দেশের এক কাঠা ভুঁই পেলে তোমায় লইয়া আমি স্বর্গ প্রস্তুত করিতে পারি, আমার দেশে কাজ কি? দেশের লোকের দুঃখ, যে তোমা হেন স্ত্রী পাইয়া ত্যাগ করিল—তাহার অপেক্ষা দেশে আর কে দুঃখী আছে? যে তোমার অঙ্গে শতগ্রন্থিবস্ত্র দেখিল, তাহার অপেক্ষা অতুর দেশে আর কে আছে? আমার সকল ধর্ম্মের সহায় তুমি। সে ধর্ম্ম যে ত্যাগ করিল, তার কাছে আবার সনাতনধর্ম্ম কি। আমি কোন ধর্ম্মের জন্য দেশে দেশে, বনে বনে, বন্দুক ঘাড়ে করিয়া, প্রাণিহত্যা করিয়া এই পাপের ভার সংগ্রহ করি। পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত হইবে কি না জানি না; কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত, তুমি পৃথিবীর অপেক্ষা বড়, তুমি আমার স্বর্গ। চল গৃহে যাই—আর আমি ফিরিব না।

শান্তি কিছুকাল কথা কহিতে পারিল না। তার পর বলিল। "ছি—তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালবাসিও না—আমি সে সুখ চাহি না—কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম্ম কখন ত্যাগ করিও না। দেখ—আমাকে একটা কথা বলিয়া যাও—এ ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

জীবানন্দ বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত—দান—উপবাস—২২ কাহণ কড়ি।"

শান্তি ঈষৎ হাসিল। বলিল, "প্রায়শ্চিত্ত কি তা আমি জানি। এক অপরাধে যে প্রায়শ্চিত্ত—শত অপরাধে কি তাই?"

জীবানন্দ বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"এ সকল কথা কেন ?"

শান্তি। এক ভিক্ষা আছে। আমার সঙ্গে আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।

জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিল, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিব না। মরিবার তত তাড়াতাড়ি নাই। আর আমি এখানে থাকিব না, কিন্তু চোখ ভরিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, একদিন অবশ্য সে দেখা দেখিব। একদিন অবশ্য আমাদের মনস্কামনা সফল হইবে। আমি এখন চলিলাম, তুমি আমার এক অনুরোধ রক্ষা করিও। এ বেশভূষা ত্যাগ কর। আমার পৈতৃক ভিটায় গিয়া বাস কর।

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় যাইবে ?"

জীবা। এখন মঠে ব্রহ্মচারীর অনুসন্ধানে যাইব। তিনি যে ভাবে নগরে গিয়াছেন, তাহাতে কিছু চিন্তাযুক্ত হইয়াছি; দেউলে তাঁহার সন্ধান না পাই, নগরে যাইব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভবানন্দ মঠের ভিতর বসিয়া হরিগুণ গান করিতেছিলেন। এমত সময়ে বিষণ্নমুখে ধীরানন্দ তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবানন্দ বলিলেন, "গোঁসাই, মুখ অত ভারি কেন ?"

ধীরানন্দ বলিলেন, "কিছু গোলযোগ বোধ হইতেছে। কালিকার কাণ্ডটার জন্য নেড়েরা গেরুয়া কাপড় দেখিতেছে, আর ধরিতেছে। অপরাপর সন্তানগণ আজ সকলেই গৈরিক ত্যাগ করিয়াছে। কেবল সত্যানন্দ প্রভু গেরুয়া পরিয়া একা নগরাভিমুখে গিয়াছেন। কি জানি, যদি তিনি মুসলমানের হাতে পড়েন।"

ভবানন্দ বলিলেন, "তাঁহাকে আটক রাখে এমন মুসলমান বীরভূমে নাই। তথাপি আমি একবার নগর বেড়াইয়া আসি। তুমি মঠ রক্ষা করিও।"

এই বলিয়া ভবানন্দ এক নিভৃত কক্ষে গিয়া একটা বড় সিন্দুক হইতে, কতকগুলি বস্ত্র বাহির করিলেন। সহসা ভবানন্দের রূপান্তর হইল। গেরুয়া বসনের পরিবর্ত্তে চুড়িদার পায়েজামা, মেরজাই, কাবা, মাথায় আমামা, এবং পায়ে নাগরা শোভিত হইল। মুখ হইতে ত্রিপুণ্ড্রাদি চন্দনচিহ্ন সকল বিলুপ্ত করিলেন। ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত সুন্দর মুখমণ্ডল অপূর্ব্বশোভা পাইল। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া মোগলজাতীয় যুবাপুরুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ভবানন্দ এইরূপে মোগল সাজিয়া সশস্ত্র হইয়া মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেখান হইতে ক্রোশেক দূরে দুইটি

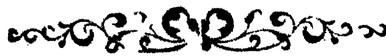
অতি অনুচ্চ পাহাড় ছিল। সেই পাহাড়ের উপর জঙ্গল উঠিয়াছে। সেই দুইটি পাহাড়ের মধ্যে একটি নিভৃতস্থান ছিল। তথায় অনেকগুলি অশ্ব রক্ষিত হইয়াছিল। মঠবাসীদিগের অশ্বশালা এই খানে। ভবানন্দ তাহার মধ্য হইতে একটি অশ্ব উন্মোচন করিয়া তৎপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। যাইতে যাইতে সহসা তাহার গতিরোধ হইল। সেই পথিপার্শ্বে কলনাদিনী তরঙ্গিণীকূলে গগনভ্রষ্ট নক্ষত্রের-ন্যায়, কাদম্বিনীযুত বিদ্যুতের ন্যায়,দীপ্ত স্ত্রীমূর্ত্তি শয়ান দেখিল। দেখিল জীবন লক্ষণ কিছু নাই—শূন্য বিষের কৌটা পড়িয়া আছে। ভবানন্দ বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, ভীত হইল। জীবানন্দের ন্যায়, ভবানন্দও মহেন্দ্রের স্ত্রীকন্যাকে দেখেন নাই। জীবানন্দ যে সকল কারণে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে এ মহেন্দ্রের স্ত্রীকন্যা হইতে পারে—ভবানন্দের কাছে সে সকল কারণ অনুপস্থিত। তিনি ব্রহ্মচারীকে মহেন্দ্রকে বন্দীভাবে নীত হইতে দেখেন নাই—কন্যাটীও সেখানে নাই। কৌটা দেখিয়া বুঝিলেন কোন স্ত্রীলোক বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভবানন্দ সেই শবের নিকট বসিল, বসিয়া কপোলে করলগ্ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল। মাথায়, বগলে,হাতে, পায়ে হাত দিয়া দেখিল; অনেক রূপপ্রকার অপরের অপরিজ্ঞাত পরীক্ষা করিল। তখন মনে মনে বলিল, এখনও সময় আছে, কিন্তু বাঁচাইয়া কি করিব। এই রূপ ভবানন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষের কতকগুলি পাতা লইয়া আসিলেন। পাতাগুলি হাতে পিষিয়া রস করিয়া সেই শবের ওষ্ঠ দন্তভেদ করিয়া অঙ্গুলীদ্বারা কিছু মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, পরে চক্ষে ও নাসিকায় কিছু কিছু রস দিলেন—অঙ্গে সেই রস মাখাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে লাগিলেন,মধ্যে মধ্যে নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিতে লাগিলেন, যে নিশ্বাস বহিতেছে কি না। বোধ হইল যেন যত্ন বিফল হইতেছে। এইরূপ বহুক্ষণ পরীক্ষা করিতে করিতে ভবানন্দের মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল—অঙ্গুলীতে নিশ্বাসের কিছু ক্ষীণ প্রবাহ অনুভব করিলেন। তখন আরও পত্ররস নিষেক করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিশ্বাস প্রখরতর বহিতে লাগিল। নাড়ীতে হাত দিয়া ভবানন্দ দেখিলেন, নাড়ীর গতি হইয়াছে। শেষে অল্পে অল্পে পূর্ব্বদিকের প্রথম প্রভাতরাগবিকাশের ন্যায়, প্রভাতপদ্মের প্রথমোন্মেষের ন্যায়,প্রথম প্রেমানুভাবের ন্যায় কল্যাণী চক্ষুরুন্মীলন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া ভবানন্দ সেই অর্দ্ধজীবিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া নগরে গেলেন।

অষ্টদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা না হইতেই সন্তানসম্প্রদায় সকলেই জানিতে পারিয়াছিল, যে সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী আর মহেন্দ্র দুই জনে বন্দী হইয়া নগরের কারাগারে আবদ্ধ আছে। তখন একে একে, দুয়ে দুয়ে, দশে দশে, শতে শতে, সন্তানসম্প্রদায় আসিয়া সেই দেবালয় বেষ্টনকারী অরণ্য পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সকলেই সশস্ত্র। নয়নে রোষাগ্নি, মুখে দম্ভ, অধরে প্রতিজ্ঞা। প্রথমে শত, পরে সহস্র, পরে দ্বিসহস্র। এইরূপে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন মঠের দ্বারে দাঁড়াইয়া তরবারি হস্তে ভবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—"আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া অজয়ের জলে ফেলিয়া দিব। এই শূয়ারের খোঁয়াড় আগুনে পোড়াইয়া মাতা বসুমতীকে আবার পবিত্র করিব। ভাই, আজ সেই দিন আসিয়াছে। আমাদের গুরুর গুরু পরমগুরু, যিনি অনন্ত জ্ঞানময়, সর্ব্বদা শুদ্ধাচার, যিনি লোকহিতৈষী, যিনি দেশহিতৈষী, যিনি সনাতনধর্ম্মের পুনঃপ্রচার জন্য শরীরপাতনপ্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—যাঁহাকে বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ মনে করি, যিনি আমাদের মুক্তির উপায়, তিনি আজ মুসলমানের কারাগারে বন্দী। আমাদের তরবারে কি ধার নাই?" হস্ত প্রসারণ করিয়া, ভবানন্দ বলিল, "এ বাহুতে কি বল নাই?"—বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিল, "এ হৃদয়ে কি সাহস নাই?—ভাই ডাক, হরে মুরারে মধুকৈটভারে!—যিনি মধুকৈটভ বিনাশ করিয়াছেন—যিনি হিরণ্যকশিপু ধ্বংস, দন্তবক্র, শিশুপাল, প্রভৃতি দুর্জ্জয় অসুরগণের নিধনসাধন করিয়াছেন—যাঁহার চক্রের ঘর্ঘরনির্ঘোষে মৃত্যুঞ্জয় শম্ভু, ভীত হইয়াছিলেন—যিনি অজেয়, রণে জয়দাতা, আমরা তাঁর উপাসক, তাঁর বলে আমাদের বাহুতে অনন্ত বল—তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলেই আমাদের রণজয় হইবে। চল আমরা সেই যবনপুরী ভাঙ্গিয়া ধূলিগুঁড়ি করি। সেই শূকর নিবাস অগ্নিসংস্কৃত করিয়া অজয়ে ফেলিয়া দিই। সেই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া খড়কুটা বাতাসে উড়াইয়া দিই। বল—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।" তখন সেই কানন হইতে অতি ভীষণ নাদে সহস্র সহস্র কণ্ঠে একেবারে শব্দ হইল, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে!" সহস্র অসি একেবারে ঝনৎকার শব্দ করিল। সহস্র বল্লম ফলক সহিত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। সহস্র বাহুর আস্ফোটে বজ্রনিনাদ হইতে লাগিল। সহস্র ঢাল যোদ্ধৃবর্গের কর্কশ পৃষ্ঠে তড়বড় শব্দ করিতে লাগিল। মহাকোলাহলে পশু সকল ভীত হইয়া কানন হইতে পলাইল। পক্ষী সকল ভয়ে উচ্চরব করিয়া গগনে উঠিয়া গগন আচ্ছন্ন করিল। সেই সময়ে শত শত জয়

ঢক্কা একেবারে নিনাদিত হইল। তখন "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" বলিয়া কানন হইতে শ্রেণীবদ্ধ সন্তানের দল নির্গত হইতে লাগিল। ধীর, গম্ভীর পদবিক্ষেপে মুখে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তাহারা সেই অন্ধকার রাত্রে নগরাভিমুখে চলিল। বস্ত্রের মর্ম্মর শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনা শব্দ, কণ্ঠের অস্ফুট নিনাদ, মধ্যে মধ্যে তুমুলরবে হরিবোল। ধীরে, গম্ভীরে, সরোষে, সতেজে, সেই সন্তানবাহিনী নগরে আসিয়া নগর বিত্রস্ত করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত দেখিয়া নাগরিকেরা কে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিকানা নাই। নগররক্ষীরা হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

এদিকে সন্তানেরা প্রথমেই রাজকারাগারে গিয়া কারাগার ভাঙ্গিয়া রক্ষিকবর্গকে মারিয়া ফেলিল। এবং সত্যানন্দ, মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া মস্তকে তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। তখন অতিশয় হরিবোলের গোলযোগ পড়িয়া গেল। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াই তাহারা যেখানে মুসলমানের গৃহ দেখিল আগুন ধরাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু এই সকল কার্য্যে তাহাদের অধিক সময় নষ্ট হইল। ইত্যবসরে নগরের রাজা আসদুল্‌জমান বাহাদুর নগরস্থ সৈন্য সকল সংগ্রহ করিলেন, এবং কামান, গোলা, বন্দুক লইয়া সন্তানসম্প্রদায়ের সম্মুখীন হইলেন। সন্তানদিগের অস্ত্র কেবল ঢাল তরবারি ও বল্লম। কামান, গোলা, বন্দুক দেখিয়া তাহারা কিছু ভীত হইল। তোপের মুখে অসংখ্য সন্তান মরিতে লাগিল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "ফিরিয়া চল, অনর্থক বৈষ্ণববধে প্রয়োজন নাই।" তখন পরাজিত হইয়া সন্তানেরা ম্লানমুখে নগর ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন।



বাঙ্গালির উৎপত্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আর্য্য শূদ্র।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি তাহাতে বোধ হয় ইহা স্থির হইয়াছে যে বাঙ্গালির মধ্যে অনেকগুলি জাতি অনার্য্যবংশ। আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল কয়টি এক্ষণে বাঙ্গালি শূদ্র বলিয়া গণিত। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে বাঙ্গালি শূদ্রে সকল না হউক কেহ কেহ অনার্য্যবংশ।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে আমরা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে যে সকল প্রমাণ দিয়াছি তাহা সবগুলি ছিদ্রশূন্য নহে। তাহা আমরা কতক স্বীকার করি, কিন্তু এক প্রমাণ অচ্ছিদ্র, অকাট্য আছে। বর্ণ ও আকৃতি। যেখানে বর্ণ ও আকৃতি আর্য্যজাতীয় নহে, সেখানে যে অনার্য্য শোণিত বর্ত্তমান, তাহা নিশ্চিত। আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল কয়জাতি সম্বন্ধেই অন্যান্য প্রমাণের উপর এই আকারগত প্রমাণ বিদ্যমান। অতএব ঐ কয়টি জাতির অনার্য্যত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া যাইতে পারে।

আমরা মনে করিলে এরূপ উদাহরণ অনেক দিতে পারিতাম। দিনাজপুর ও মালদহে পলি বা পলিয়াদিগের কথা লিখিতে পারিতাম। পলিয়ারা ভাষায় বাঙ্গালি ও ধর্ম্মে হিন্দু সুতরাং তাহারা বাঙ্গালি বলিয়া গণ্য। কিন্তু তাহাদের আকার ও আচার অনার্য্যের ন্যায়। তাহারা কৃষ্ণকায়, খর্ব্বাকৃত শূকর পালে এবং শূকর খায়। সুতরাং তাহাদিগের অনার্য্যত্বে কোন সংশয় নাই। মনু, মহাভারতাদির পুলিন্দজাতি বর্ত্তমান পলিদিগের পূর্ব্বপুরুষ, এমন অনুমান কতদূর সঙ্গত, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে পারিলাম না।

কোন আর্য্যবংশীয় জাতি যে শূকরপালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ইহা সম্ভব নহে। কেন না শূকর আর্য্যশাস্ত্রানুসারে অতি অপবিত্র জন্তু, বাঙ্গালাজয়কারী আর্য্যেরা ঐ সকল ব্যবসায় যে অনার্য্যদিগের হাতে রাখিবেন, ইহাই সম্ভব। বিশেষ শূকর বা শূকরমাংস আর্য্যদিগের কোন কাজে লাগে না। যদি এইরূপে শূকরপালক জাতিদিগকে অনার্য্য বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলে দক্ষিণ বাঙ্গালার কাওরারাও অনার্য্য বলিয়া বোধ হয়। কাওরাদিগের জাতীয় আকারও অনার্য্যদিগের ন্যায়, কাওরারা কোন্ অনার্য্যজাতিসম্ভূত তাহা নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু কতকগুলি অনার্য্য জাতির সঙ্গে ইহাদিগের নামের সাদৃশ্য আছে। যথা কোড়োয়া, খাড়োয়া, খাড়িয়া, কৌর, ইত্যাদি। কিরাত শব্দ প্রাকৃতে

কিরাও হইবে। কিরাও শব্দের অপভ্রংশে কাওরাও হওয়া অসম্ভব নহে। বাঙ্গালার উত্তরে কিরাতেরা কিরাতি বা কিরান্তি নামে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

পাশ্চাত্যেরা বাগ্‌দী দিগকেও অনার্য্যবংশ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। বাস্তবিক বাগ্‌দীদিগের আকার ও বর্ণ হইতে অনার্য্যবংশ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। অনেকে বাগ্‌দী ও বাউরী এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন।

আমাদিগের এমত ইচ্ছা নহে, যে বাঙ্গালার হিন্দু জাতিদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি অনার্য্যবংশ তাহা একে একে নিঃশেষ করিয়া মীমাংসা করি। বাঙ্গালার শূদ্রদিগের মধ্যে অনেকাংশ যে অনার্য্যবংশ, ইহাই দেখান আমাদিগের উদ্দেশ্য। এবং পূর্ব্বপরিচ্ছেদে যে সকল উদাহরণ দিয়াছি তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে বাঙ্গালি শূদ্রের মধ্যে অনার্য্যবংশ অতিশয় প্রবল। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে শূদ্রমাত্রেই অনার্য্যবংশ। প্রথম বর্ণভেদ উৎপত্তির সময়ে সকল শূদ্রই অনার্য্য ছিল বোধ হয়। কিন্তু ক্রমে আর্য্যসম্ভূত সঙ্কীর্ণ বর্ণ ও অসঙ্কীর্ণ আর্য্যবর্ণ যে এখন শূদ্রের মধ্যে মিশিয়াছে, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। এখনকার সকল শূদ্রই অনার্য্য এই কথার অমূলকতা প্রতিপাদন করিতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথম, কে আর্য্য আর কে অনার্য্য ইহা মীমাংসা করিবার দুইটি মাত্র উপায়। এক ভাষা, দ্বিতীয় আকার। দেখা যাইতেছে, যে কেবল ভাষার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার ভিতরে ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। কেননা সকল বাঙ্গালিশূদ্রই আর্য্যভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। তবে আকারই একমাত্র সহায় রহিল। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কায়স্থ প্রভৃতি অনেক শূদ্রের আকার আর্য্যপ্রকৃত। কায়স্থে ও ব্রাহ্মণে আকার বা বর্ণগত কোন বৈসদৃশ্য নাই। আকারে প্রমাণ হইতেছে কতকগুলি শূদ্র আর্য্যবংশীয়।

দ্বিতীয়, পূর্ব্বে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের রীতি ছিল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যাকে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিত। ইহাকে অনুলোম বিবাহ বলিত। এইরূপ অধঃস্থজাতীয় পুরুষ শ্রেষ্ঠজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিলে প্রতিলোম বিবাহ বলিত। ইহার বিধি মন্বাদিতে আছে। যেখানে বিবাহ বিধি ছিল, সেখানে অবশ্য বৈধবিবাহ ব্যতীতও অসবর্ণ সংযোগে সন্তানাদি জন্মিত। তাহারা চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে স্থান পাইত না। মনু বলিয়াছেন, চতুর্ব্বর্ণ ভিন্ন পঞ্চমবর্ণ নাই।* টীকাকার কুলুক ভট্ট তাহাতে লেখেন, যে সঙ্কীর্ণ জাতিগণ অশ্বতরবৎ মাতা বা পিতার জাতি হইতে

* ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ
চতুর্থ এব জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।
মনু ১০ ম অধ্যায় ৪

ভিন্ন; তাহারা জাত্যন্তর বলিয়া তাহাদিগের বর্ণত্ব নাই।* এইরূপ অসবর্ণ পরিণয়াদিতে কাহারা জন্মিত, তাহা দেখা যাউক।

ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়া মম্বষ্ঠো নাম জায়তে
নিষাদ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পরাশ্ব উচ্যতে।

মনু ১০ ম অধ্যায় ৮

অর্থাৎ বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠের জন্ম, আর শূদ্রকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে নিষাদ বা পরাশ্বের জন্ম। পুনশ্চ

শূদ্রাদায়োগব ক্ষত্রাঃ চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাং
বৈশ্য রাজন্য বিপ্রাসৌ জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।

মনু ঐ ১২

অর্থাৎ বৈশ্যার গর্ভে শূদ্র হইতে আয়োগব, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূদ্র হইতে ক্ষত্র, আর ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে শূদ্র হইতে চণ্ডালের জন্ম।

যে সকল ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ অব্রত হইয়া পতিত হয়, মনু তাহাদিগকে ব্রাত্য বলিয়াছেন। এবং ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় ব্রাত্য এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে নীচজাতির উৎপত্তির কথা লিখিয়াছেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ব্রাত্যদিগকে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূদ্র হইতে জন্মিত বলিয়া বর্ণিত আছে।

এই সকল শঙ্করবর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য মধ্যে স্থান পায় নাই, ইহা একরূপ নিশ্চিত। এবং ইহারা যে শূদ্রদিগের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। আয়োগব বা ব্রাত্য এক্ষণে বাঙ্গালায় নাই; কখন ছিল কি না সন্দেহ, কেন না ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় কখন আইসে নাই। কিন্তু চণ্ডালেরা বাঙ্গালায় অতিশয় বহুল; বাঙ্গালি শূদ্রের তাহারা একটি প্রধান ভাগ। চণ্ডালেরা অন্ততঃ মাতৃকুলে আর্য্যবংশীয়। বাঙ্গালায় শূদ্রজাতি অনেকেই সঙ্করবর্ণ, সঙ্করবর্ণ হইলেই যে তাহাদের শরীরে আর্য্যশোণিত, হয় পিতৃকুল নয় মাতৃকুল হইতে আগত হইয়া বাহিত হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বাঙ্গালায় অম্বষ্ঠ আছে, তাহারা যে উভয়কুলে বিশুদ্ধ আর্য্য তাহার প্রমাণ উপরে দেওয়া গিয়াছে। কেন না ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য উভয়েই বিশুদ্ধ আর্য্য।

তৃতীয়, আমরা শেষ তিন পরিচ্ছেদে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে, বাঙ্গালার শূদ্রমধ্যে কতকগুলি বিশুদ্ধ আর্য্যবংশীয় এবং কতকগুলি আর্য্যে অনার্য্যে মিশ্রিত, পিতৃমাতৃ-

---

* পঞ্চমঃ পুন র্বর্ণো নাস্তি। সঙ্কীর্ণজাতীনাং অশ্বতরবৎ মাতা পিতৃজাতিব্যতিরিক্ত জাত্যন্তরত্বাৎ ন বর্ণত্বং।

কুলের মধ্যে এক কুলে আর্য্য আর এক কুলে অনার্য্য।

চতুর্থতঃ। কতকগুলি শূদ্রজাতি প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যজাতি মধ্যে গণ্য, কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালায় তাহারা শূদ্র-বলিয়া পরিচিত; যথা বণিক্। বণিকেরা বৈশ্য। তাহার প্রমাণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বোধ হয় কেহই তাহাদিগের বৈশ্যত্ব অস্বীকার করিবেন না। বাঙ্গালায় শূদ্র মধ্যে যে বৈশ্য আছে, তাহার ইহাই এক অকাট্য প্রমাণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্থূল কথা।

বাঙ্গালি জাতির উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা পুনরুক্ত করিতেছি।

ভাষা বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রধান জাতি সকল এক প্রাচীন আর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন। যাহার ভাষা আর্য্যভাষা, সেই আর্য্যবংশীয়। বাঙ্গালির ভাষা আর্য্যভাষা, এজন্য বাঙ্গালি আর্য্যবংশীয় জাতি।

কিন্তু বাঙ্গালি অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ আর্য্য নহে। ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত এবং বিশুদ্ধ আর্য্য সন্দেহ নাই, কেননা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপত্তি ভিন্ন সঙ্করত্ব সম্ভবে না, সঙ্করত্ব ঘটিলে ব্রাহ্মণত্ব যায়। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বৈশ্যসম্বন্ধে ঐরূপ হইলে হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় নাই বলিলেই হয়। অতি অল্পসংখ্যক বৈদ্যগণকে বাদ দিলে দেখা যায় যে বাঙ্গালি কেবল দুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ আর্য্য, কিন্তু শূদ্রদিগকে বিশুদ্ধ আর্য্য কি বিশুদ্ধ অনার্য্য বিবেচনা করিব কি উভয়েই মিশ্রিত বিবেচনা করিব, ইহারই বিচার আমরা এতদূর বিস্তারিত করিয়াছি। কেননা বাঙ্গালি জাতির মধ্যে সংখ্যায় শূদ্রই প্রধান।*

অনুসন্ধানে ইহাও পাওয়া গিয়াছে—যে আর্য্যেরা দেশান্তর হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তখন আমরা এই তত্ত্ব উত্থাপন করিয়াছিলাম, যে তাহারা আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বসতি ছিল কি না?

বিচারে পাওয়া গিয়াছে, যে আর্য্যেরা বাঙ্গালায় আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় অনার্য্যদিগের বাস ছিল। তার পর দেখিয়াছি, যে সেই অনার্য্যগণ একবংশীয় নহে। কতকগুলি কোলবংশীয়, আর কতকগুলি দ্রাবিড়বংশীয়। দ্রাবিড়বংশের পূর্ব্বে কোলবংশীয়েরা বাঙ্গালায় অধি-

* ৭১ সালের লোকসংখ্যাগণনায় স্থির হইয়াছে—যে বাঙ্গালার যে অংশে বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত, তাহাতে ৩০৬০০০০০ লক্ষ লোক বসতি করে—তন্মধ্যে ১১ লক্ষ মাত্র ব্রাহ্মণ।

কারী ছিল। তার পর দ্রাবিড়বংশীয়েরা আইসে। পরে আর্য্যগণ আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিলে কোলীয় ও দ্রাবিড়ী অনার্য্যগণ তাহাদিগের তাড়নায় পলায়ন করিয়া বন্য ও পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কিন্তু সকল অনার্য্যই আর্য্যের তাড়নায় বাঙ্গালা হইতে পলাইয়া বন্য ও পার্ব্বত্যদেশে আশ্রয় লইয়াছিল এমত নহে; আমরা দেখাইয়াছি, যে অনার্য্যগণ আর্য্যের সংঘর্ষণে পড়িলে আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যভাষাগ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়া হিন্দুসমাজভুক্ত হইতে পারে, হইয়াছিল ও হইতেছে। অতএব বাঙ্গালি শূদ্রদিগের মধ্যে এইরূপে হিন্দুত্বপ্রাপ্ত অনার্য্য থাকা অসম্ভব নহে। আছে কি না—তাহার প্রমাণ খুঁজিয়া দেখিয়াছি।

দেখিয়াছি, যে বাঙ্গালাভাষার এমন একটি ভাগ আছে, যে অনার্য্যভাষাই তাহার মূল বলিয়া বোধ হয়। আরও দেখিয়াছি, যে বাঙ্গালি শূদ্রদিগের মধ্যে এমন অনেকগুলি জাতি আছে, যে অনার্য্যগণকে তাহার পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া বোধ হয়।

পরিশেষে ইহাও প্রমাণ করা গিয়াছে যে, বাঙ্গালিশূদ্রের কিয়দংশ অনার্য্যসম্ভূত হইলেও অপরাংশ আর্য্যবংশীয়। কেহ বিশুদ্ধ আর্য্য, যেমন অম্বষ্ঠ কায়স্থ, কেহ আর্য্য অনার্য্য উভয়কুলজাত; যেমন চণ্ডাল।

এক্ষণে এই বাঙ্গালিজাতি কিপ্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা আমরা বুঝিয়াছি। প্রথম কোলবংশীয় অনার্য্য, তার পর দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য; তার পর আর্য্য; এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙ্গালিজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সাক্সন, ডেন ও নর্ম্মান মিশিয়া ইংরেজ জন্মিয়াছে। কিন্তু ইংরেজের গঠনে ও বাঙ্গালির গঠনে দুইটি বিশেষ প্রভেদ আছে। টিউটন হউক বা ডেন হউক বা নর্ম্মান হউক, যতগুলি জাতির সংমিশ্রণে ইংরেজ জাতি প্রস্তুত হইয়াছে, সকলগুলিই আর্য্যবংশীয়। বাঙ্গালি যে কয়েকটি জাতিতে গঠিত হইয়াছে, তাহার কেহ আর্য্য, কেহ অনার্য্য। দ্বিতীয় প্রভেদ এই, যে ইংলণ্ডে টিউটন ও ডেন ও নর্ম্মান এই তিন জাতির রক্ত একত্রে মিশিয়াছে। পরস্পরের সহিত বিবাহাদিসম্বন্ধের দ্বারা মিলিত হইয়া তাহাদিগের পার্থক্য লুপ্ত হইয়াছে। তিনে একজাতি দাঁড়াইয়াছে, বাছিয়া তিনটি পৃথক্ করিবার উপায় নাই। মোটের উপর এক ইংরেজজাতি কেবল পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যদিগের বর্ণধর্ম্মিত্বহেতু বাঙ্গালায় তিনটী পৃথক্ জাতিস্রোত মিশিয়া একটি প্রবলপ্রবাহে পরিণত হয় নাই; আর্য্যসম্ভূত ব্রাহ্মণ অনার্য্যসম্ভূত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ রহিয়াছে। যদি কোন স্থানে আর্য্যে অনার্য্যে বৈধবিবাহ বা অবৈধসংসর্গের দ্বারা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে সেই

সংমিশ্রণে উৎপন্ন সন্তানেরা আর্য্য অনার্য্য হইতে আর একটি পৃথক্ জাতি হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডালেরা ইহার উদাহরণ। ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালিরা বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালি বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারিপ্রকার বাঙ্গালি পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালি মুসলমান। চারিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকে। বাঙ্গালিসমাজের নিম্নস্তরেই বাঙ্গালি অনার্য্য বা মিশ্রিত আর্য্য ও বাঙ্গালি মুসলমান; উপরের স্তরের প্রায় কেবলই আর্য্য। এইজন্যে দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালিজাতি অমিশ্রিত আর্য্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আর্য্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।



বঙ্গোন্নয়ন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালার রোগ।

আমেরিকায় পীতজ্বরে* সহস্র সহস্র শ্বেতকায় মনুষ্যের মৃত্যু হয়; কিন্তু কৃষ্ণত্বক্ ব্যক্তিদের এই রোগ প্রায়ই হয় না। আফ্রিকায় গিনির উপকূলে ইউরোপীয় প্রবাসীদের মধ্যে প্রায় পঞ্চমাংশ প্রতিবৎসর জ্বরাক্রান্ত হইয়া মরিয়া যায়। আদিম নিবাসীদের মধ্যে ঐ রোগের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই। ইহাতে পণ্ডিতবর ডারউইন অনুমান করেন যে, কৃষ্ণকায়দের প্রতি ম্যালেরিয়া অর্থাৎ জ্বরজ বায়ুর কম কোপ।†

ভারতবর্ষে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের

---

* Yellow fever. এই রোগ একপ্রকার পিত্তজ্বর। ইহার আক্রমণে শ্বেতবর্ণ পীত হয়; এজন্য ইহাকে পীতজ্বর বলে।

† Various facts which I have given elsewhere prove that the colour of the skin and hair is sometimes correlated in a surprising manner with a complete immunity for the action of certain vegetable

প্রতি ম্যালেরিয়ার সমান কোপ। কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। প্রভেদ থাকিলে, কৃষ্ণাঙ্গের যে এত অনাদর, তাহা আমরা উপেক্ষা করিতে পারিতাম।

এই দেশে বর্ণভেদে ম্যালেরিয়ার কোপের ভেদ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু রোগীর বলানুসারে যে উক্ত কোপের ন্যূনাধিক্য হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্বাস্থ্যতত্ত্বাবধারক (Sanitary Commissioner) ডাক্তর প্লাঙ্ক্‌স্ সাহেবের এই মত যে, ভারতবর্ষের ব্যাপক জ্বর ও দুর্ভিক্ষজাত জ্বরে কোন প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। উভয়ের কারণ অনশন বা অপুষ্টি।* ডাক্তর লাইয়ন্স বলেন যে, ভারতবর্ষবাসীদের আহার অপ্রচুর ও অপুষ্টিকর। বলের ন্যূনতাবশতঃ তাহাদের জীবনীশক্তি রোগের সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম। ডাক্তর সওার্শ, ডাক্তর লেথ্‌ব্রিজ প্রভৃতি কতিপয় ভিষগ্‌বরেরও ঐ মত।

উক্ত মত যে অনেকদূর যুক্তিসিদ্ধ, তাহার কোন সংশয় নাই। ১২৮৭ সনে নদিয়া জেলায় যে মারিভয় হইয়াছিল, তাহাতে তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছে, যে, বালক বালিকা ও বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মৃত্যুর সংখ্যাই অধিক, এবং যুবক যুবতী আর প্রৌঢ় প্রৌঢ়াদের মৃত্যুসংখ্যা অনেক কম। ইহাতে ডাক্তর লাইয়ন্সের মতের বিলক্ষণ পোষকতা হইতেছে। নানা-কারণবশতঃ ভারতবর্ষের এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, যে যাহাদের আহারের সংস্থান

poisons and from the attacks of certain parasites. * * * Hence it occurred to me that Negroes & other dark races might have acquired their dark tints by the darker individuals escaping from the deadly influence of the miasma of their native countries during a long series of generations. It has long been known that Negroes & even mulattoes are almost completely exempt from the yellow fever so destructive in Tropical America. They likewise escape to a large extent the fatal intermittent fevers that prevail along at least two thousand and six hundred miles of the shores of Africa and which annually cause one fifth of the white settlers to die another fifth to return home invalided. *Darwin's Descent of Man* (1877) *P.* 193.

প্রসিদ্ধ মানবতত্ত্ববিৎ কাট্রফাজেরও ঐ মত।

Sierra Leone is one of the most unhealthy stations for the white man, while for the Negro, it is on the contrary, one of the places where the rate of mortality is the lowest—Quatrefages on the Human species (1879) P. 424.

* Supplement to the N. W. Provinces Gazette, June 26, 1880.

আছে, তাহাদের ক্ষুধা নাই, এবং যাহাদের ক্ষুধা আছে, তাহাদের আহারের সংস্থান নাই। ভারতের এই দুর্দ্দশা কেন ঘটিল, তাহার সমালোচনা পরে করা যাইবে।

জ্বররোগ অপেক্ষা ওলাউঠারোগ অধিকতর দুশ্চিকিৎস্য। ডাক্তর টানার্ প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় চিকিৎসক বলেন যে, উক্ত রোগের প্রকৃত প্রস্তাবে চিকিৎসাই নাই।*

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, যশোহর জেলার অন্তর্গত গদখালি গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে ঐ রোগের প্রথম আবির্ভাব হয়। এক্ষণে এই রোগ জগদ্ব্যাপী হইয়াছে।

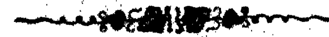
১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১২২৩ সনে ঐ রোগ কলিকাতায় প্রথমতঃ দেখা দিয়া ক্রমশঃ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে; পরে কলের জল হওয়া অবধি তাহার দর্প খর্ব্ব হইয়াছে। বৈদ্যশাস্ত্রে বিসূচিকা ব্যাধির যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে, সে সকল লক্ষণের সহিত ওলাউঠার কোন কোন লক্ষণের ঐক্য নাই। সুতরাং ওলাউঠা যে বিসূচিকা নহে, একটি নূতন ব্যাধি, চিকিৎসকমণ্ডলীর মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে। রাধারমণ সেন নামক বরিশালের একজন বিজ্ঞচিকিৎসক প্রস্তাবলেখককে বলিয়াছিলেন যে, ১২২৫ সনে ঐ রোগ বরিশাল, মাধবপাশা প্রভৃতি স্থানে প্রথম দেখা দিলে, লোক সকল যারপর নাই ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল। ঐ বৃদ্ধ কবিরাজ ইহার পূর্ব্বে ঐ রোগ কখনও দেখেন নাই।

মানবজাতির এই দুর্দ্দান্ত শত্রুর কিরূপে যশোহরে উৎপত্তি হইল, তাহা বোধ করি কেহই বলিতে পারেন না, এবং তাহার অনুসন্ধান করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। তবে বলা যাইতে পারে যে, যেস্থানে ও যে সময়ে নির্ম্মল জল অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, সে স্থানে ও সে সময়ে ওলাউঠা প্রবল হইতে পারে না। কলিকাতার স্বাস্থ্যতত্ত্বাবধারক প্রতিবৎসর যে বিজ্ঞাপনী প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার কয়েকখানি পাঠ করিলেই প্রতীত হইবে যে কলের জল হওয়া অবধি অর্থাৎ ১২৭৬ সন হইতে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব উক্ত নগরে অনেক কম হইয়াছে। বর্ষাকালে সর্ব্বত্রেই জল অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল হয়; সুতরাং ঐ কালে ওলাউঠারোগ অতি বিরল। বর্ষাকালে নদীর জল ধৌতমৃৎকণিকায় পরিপূর্ণ হইয়া বিবর্ণ হয় বটে, কিন্তু মৃত্তিকায় কেবল স্বচ্ছতার ব্যাঘাত হয়, প্রকৃত নির্ম্মলতার ব্যাঘাত হয় না।

* তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, এই উৎকট রোগে হোমিওপাথি চিকিৎসায় যেমন সুফল দৃষ্ট হয়, এমন অন্য কোনপ্রকার চিকিৎসাতেই নহে।

জলের যে প্রধান দোষ, তাহার উৎপত্তি কেবল গলিত উদ্ভিদ ও গলিত জন্তুশরীর হইতে। প্রাচীন গ্রন্থকারগণ জলকে জীবন বলিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ নির্ম্মল জলের ওলাউঠানিবারিকাশক্তির এবং অন্যান্য গুণের পর্য্যালোচনা করিলে প্রাচীনদের বর্ণনায় অত্যুক্তি আছে বোধ হয় না।

বাঙ্গালার কি কি অভাব আছে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে, নির্ম্মল জলের অভাব একটি প্রধান অভাব বলিয়া প্রতীত হইবে। প্রায় কোন গ্রামে এমন জলাশয় নাই, যাহাতে গলিতপত্র, গলিত জন্তুদেহ ও মলমূত্র না আছে। ভূমির শুষ্কতা, জলের নির্ম্মলতা ও বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চালনের উপায় যিনি করিতে পারিবেন, তিনি বাঙ্গালার বারআনা রোগ দূর করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন। এমন মহাত্মা কোথায়? যদি এমন উদারচেতা কেহ থাকেন, বঙ্গবাসীদের সাহায্য ব্যতীতই বা তিনি কি করিবেন!



নূতন কথা গড়া।

যে কেহ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই জানেন, যে বাঙ্গালা ভাষায় অনেক ভাব সহজে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। ঐ সকল ভাব ব্যক্ত করিতে গেলে, কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা লইয়া নানা মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, নূতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নূতন শব্দ গঠন করা আবশ্যক। অনেকে বলেন, অন্যান্য ভাষা হইতে নূতন শব্দ আমদানী করা আবশ্যক। অনেকে বলেন, চলিত কথা দিয়া যেরূপে হউক, ভাবপ্রকাশ হইলেই যথেষ্ট হইল। ইংরেজিতে যে ভাব এক কথায় ব্যক্ত হয় বাঙ্গালায় যদি তাহাই ব্যক্ত করিতে তিনছত্র লিখিতে হয়, সেও স্বীকার, তথাপি নূতন শব্দ গঠন বা ভাষান্তর হইতে শব্দ আনয়ন উচিত নহে। আমরা এ তিনটির কোন মতেরই সম্পূর্ণ পোষকতা করিতে পারি না। কখন কখন নূতন শব্দ গঠনের প্রয়োজন হয়। কখন ভাষান্তর হইতে শব্দ আনয়নের প্রয়োজন হয়। কখন অনেক কথায় ভাবটি ব্যক্ত করিতে গেলে, লেখার বাঁধনী থাকে না, এবং ভাবটিও সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায় না।

একটি উদাহরণ দিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা

করিব। "উকিলীতে আজ কাল বড়ই compition." এখন compition শব্দে যে ভাব ব্যক্ত হয়, বাঙ্গালা ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিবার কোন কথা নাই। আমরা কি করিব? ঐ শব্দটি কি বাঙ্গালা করিয়া লইব, না উহার পরিবর্ত্তে সংস্কৃতধাতু-পাঠ খুঁজিয়া "সঙ্ঘর্ষ" শব্দ গড়িয়া লইব। না বলিব উকিলীতে আজ কাল অনেক লোক হইয়াছে, অতএব উহাতে পসার করা বড়ই শক্ত।

এই তিন উপায়েই দোষগুণ উভয়ই আছে। সঙ্ঘর্ষ শব্দটি হয় ত একেবারেই নূতন, যদি সংস্কৃতে থাকে এরূপ অর্থে কখন ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং সঙ্ঘর্ষ বলিলে, যিনি শব্দটি গড়িবেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু উহার এক গুণ আছে। উহা সংস্কৃতমূলক; সুতরাং অনেক লোক উহা ইংরেজি কথা অপেক্ষা ভাল বলিবেন, আর উহা যদি চলিয়া যায়, তবে ইংরেজের কাছে উহার জন্য দেনদার থাকিতে হইবে না। কিন্তু এ কথা চলিবে কি?

যাহারা ইংরেজি জানে না, Compition কথাটী তাহারা বুঝিবে না; কিন্তু সঙ্ঘর্ষ বলিলে যত লোকে বুঝিবে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লোকে বুঝিতে পারিবে।

"উকিলীতে অনেক লোক হইয়াছে, অতএব পসার করা শক্ত" বলিলে সকলেই বুঝিতে পারিবে, কিন্তু অন্য কথায় বলা না হওয়ায় কেমন একটু ভাসা ভাসা লাগে। হয় ত যে প্রণালীতে রচনা হইতেছে, অত কথায় বলিলে সে প্রণালীর সহিত সহচারবিরুদ্ধ হইয়া উঠে।

আমরা যে এই কথা বলিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে নূতনভাব প্রকাশ করিতে গেলে প্রকাশকের বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। হঠাৎ যাহা হয়, একটি করিয়া ফেলা উচিত নহে। কারণ এরূপ দুরূহ কার্য্যে হঠাৎ কিছু করিলে ভাল না হইয়া বরং মন্দ হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমরা বলি নূতন ভাব প্রকাশ করিতে হইলে বা নূতন জিনিসের নাম দিতে হইলে, বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া, সংস্কৃত প্রভৃতিতে যে সকল কথা চলিত আছে, সেগুলি প্রণিধানপূর্ব্বক দেখা উচিত, যদি তাহার মধ্যে কোন কথায় ভাব প্রকাশ হয়, তাহা হইলে সেই ভাষার কথাই প্রচলিত করিয়া দেওয়া উচিত। অনেক সময় চলিত ভাষায় এবং ইতর ভাষায় এমন সুন্দর কথা পাওয়া যায় যে, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মনের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে।

প্রথম উদাহরণ।

কাচ সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। সহজে ভাঙ্গা গুণ প্রকাশ করিবার জন্য ইতর ভাষায় একটি শব্দ আছে "ঠুন্‌ক" কিন্তু যাঁহারা স্কুলের বই লেখেন, তাঁহারা ঐ কথাটি না জানিয়া অথবা উহা ব্যবহার

করিতে ইচ্ছা না করিয়া লিখিলেন কাচ ভঙ্গপ্রবণ। যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায় তাহার নাম সংস্কৃতে ভঙ্গুর, সুতরাং ভঙ্গপ্রবণ শব্দটী না বাঙ্গালা, না ইংরেজি, না সংস্কৃত। অথচ বাঙ্গালায় প্রায় দশ-লক্ষ ছাত্র গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতে শিখিল কাচ ভঙ্গুর নহে, ঠুনকও নহে, উহা ভঙ্গপ্রবণ।

দ্বিতীয় উদাহরণ।

"দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান" বাঙ্গালায় নাই। সুতরাং উহার নামও বাঙ্গালায় নাই। কিন্তু আমার প্রয়োজন ঐ স্থানটির নাম দেওয়া। হিন্দীতে ঐ স্থানকে "দূন" বলে। কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ ঐ কথাটি না জানিয়া অথবা উহা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা না করিয়া লিখিলেন কি না উপত্যকা। উপত্যকা সংস্কৃতে চলিত শব্দ, কিন্তু দুঃখের মধ্যে এই যে, উহাতে পর্ব্বতের আসন্নভূমি বুঝায়, দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান বুঝায় না। সুতরাং গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতে দশলক্ষ বালক একটি "ভুল" শিখিল।

তৃতীয় উদাহরণ।

যেখানে বসিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি গণনা করেন, তাহার হিন্দী নাম মানমন্দির বা তারাঘর কিন্তু অনেকে উহার ইংরেজি নাম observatoryর তর্জ্জমা করিয়া নাম রাখিলেন, পর্য্যবেক্ষণিকা। কেহ বুঝিল না, অথচ কেতাবে কেতাবে চলিয়া গেল।

চতুর্থ উদাহরণ।

ভারতবর্ষের উত্তর অংশের পর্ব্বতময় প্রদেশকে লোকে উত্তরাখণ্ড বলে, কিন্তু ইংরেজিতে উহাকে Himalayan regions বলে বলিয়া বাঙ্গালা পুস্তকে উহার নাম হিমালয়প্রদেশ হইয়াছে। এরূপ উদাহরণের অভাব নাই, যথেষ্ট আছে।

তাই বলিতেছিলাম যে, নূতন ভাব প্রকাশ করিতে গেলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। কিন্তু দুঃখের মধ্যে বাঙ্গালিলেখকদিগের মধ্যে কাহারই সে বিবেচনা নাই। তাঁহারা পড়েন ইংরেজি, ভাবেন ইংরেজিতে সুতরাং লিখিবার সময়ে ইংরেজিতে ভাব আসিয়া যোগায়। জাতীয় স্বভাব আলস্য বিশেষ অনুসন্ধান করিতে দেয় না। অনেকের ইচ্ছা থাকিলেও বিদ্যায় কুলাইয়া উঠে না। যাঁহারা বেশী অলস, অথচ একটু বুদ্ধি আছে, তাঁহারা ইংরেজি ঠিক্ রাখিয়া দেন। যাঁহাদের উহারই মধ্যে একটু হিতাহিত জ্ঞান আছে, তাঁহারা যাহা হয় একটা তর্জ্জমা করিয়া পরেই বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি কথাটি রাখিয়া দেন, অর্থাৎ দেশ শুদ্ধ লোককে বলিয়া দেন, আমি তর্জ্জমা করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু আমার বিদ্যায় কুলাইয়া উঠিল না। অনেকে আবার শুদ্ধ তর্জ্জমা করিয়াই রাখিয়া দেন, ইহাদের লেখা সময়ে সময়ে বড়ই মিষ্ট। Bear the

Responsibility থাকিলে ইহার তর্জ্জমা করেন, জবাবদিহি বহন। Is appointed a Lecturer তর্জ্জমা করেন বক্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। He seconded my proposal, আমার প্রস্তাব দ্বিতীয় করিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরস্বতীর বরপুত্র বা ভিক্ষাপুত্র* বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা বড়ই প্রবল। মনে মনে সকলেই অহম্ উত্তম পুরুষ। জ্ঞান আমি জিনিষস। সুতরাং খাটিবার ইচ্ছা একেবারেই নাই। ইংরেজি পুস্তক যেমন দেখিলেন, অমনি তখনি তর্জ্জমা করিয়া ফেলিলেন। প্রায় পূর্ব্বকালের মাছিমারা কেরাণীদিগের মত যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং করিয়া ফেলিলেন। অনেক সময়ে তাঁহাদের পুস্তকে দেশী নামগুলি চিনিয়া লওয়া ভার হয়। তাঁহারা মল্লার রায়কে "মল্হর" রায় লেখেন। রাঘবকে "রাঘোবা" লেখেন। তাঁহাদের গ্রন্থে রজপুত-কুল-ধুরন্ধর সংগ্রাম সিংহকে আমরা আর চিনিতে পারি না। তাঁহার নাম হয় রাণা সঙ্গ। জয়জীরাও জিজিরায় হন। তাঁতীয়া রায় টাণ্টিয়া টোপী হন। পবিত্র তীর্থ বারাণসী "বেনারস" হইয়া যায়। লাহোরের নিকট একটি নগর আছে, তাহার নাম গুজরানওয়ালা। কিন্তু বাঙ্গালা ভূগোলে উহাকে চিনিয়া উঠা ভার, উহার নাম গুজম্বার্লা হইয়াছে।

যাহারা দেশীয় নামের বানান পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া লইতে অনিচ্ছুক তাহারা যে নূতন শব্দ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবে ইহা একান্ত অসম্ভব। ইচ্ছামত নূতন শব্দ গঠনের বড় বড় ইংরেজি কথা প্রবেশনের এবং জবাবদিহি বহন গোছ, তর্জ্জমার ফল এই যে বাঙ্গালা পুস্তক প্রায়ই অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে বরং সংস্কৃত বা ইংরেজি বুঝা যায়, তথাপি বাঙ্গালা বুঝা যায় না। ইহারই জন্য শিক্ষিত মহলে বাঙ্গালার তাদৃশ আদর হয় না। ইহার আর এক ভয়ানক দোষ এই যে ভাষার কিছু স্থিরতা থাকে না। অধিকাংশ বাঙ্গালালেখক বাঙ্গালা পড়েন না কেবল লেখেন। নূতন ভাব প্রকাশ করিতে হইলে তাঁহারা নিজের মনোমত নূতন শব্দ গড়িয়া দেন। পূর্ব্বে অন্য লোক সেই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য কি কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা সন্ধান লয়েন না। এইরূপে একটি ভাব প্রকাশের জন্য রাশি রাশি নূতন কথা সৃষ্টি করা হয়। অথচ আমরা দেখিতে পাই, হয় চলিত ভাষায়

---

* যাঁহারা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদিগকে লোকে সরস্বতীর ভিক্ষাপুত্র বলে।

না হয় পার্শ্বস্থ দেশের চলিত ভাষায় অথবা চলিত সংস্কৃতে একটু খুঁজিলে উৎকৃষ্ট শব্দ পাওয়া যাইত।

দুই একজন লোক এমনি আহাম্মক আছে যে ঘরে টাকা থাকিতে ধার করে। আমাদের বাঙ্গালি লেখকও ঠিক সেইরূপ হইতেছে। বৃথা অভিধানের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে, অথচ ভাষার কিছুমাত্র উন্নতি হইতেছে না, এবং বাঙ্গালা-ভাষা কি তাহাও ঠিক হইতেছে না। বাঙ্গালা যে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র ভাষা সংস্কৃত হইতে ইহার সত্তা স্বতন্ত্র, জীবন স্বতন্ত্র, উৎপত্তি, স্থিতি, এবং লয় এই তিনই স্বতন্ত্র, এ কথা বর্ত্তমান লিখিত বাঙ্গালাভাষা দেখিলে কাহারও বোধগম্য হয় না। যে পারস্যভাষায় প্রায় ৭০০ শত বৎসর ধরিয়া দেশের প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, ভদ্র-সমাজে কথিত বাঙ্গলাভাষায় শতকরা ৫০টী কথা যে ভাষা হইতে গৃহীত, বাঙ্গালা ব্যাকরণের হাড়ে হাড়ে যে ভাষা বিঁধিয়া আছে, যে ভাষার কথা ব্যবহার করিলে দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতা বুঝিতে পারে, আমরা প্রাণপণে সে ভাষার কথাগুলি লিখিত ভাষা হইতে দূর করিবার চেষ্টা করি। নালিশ বলিলে সকলে বুঝিতে পারে; কিন্তু তাহা ত্যাগ করিয়া গ্রন্থকারেরা অভিযোগ লেখেন। অথচ সংস্কৃত অভিধান খুজিলে অভিযোগ শব্দে আর এক অর্থ বুঝায়, নালিশ বুঝায় না। এই রূপে আদালতে প্রচলিত সমস্ত পারসী কথা লিখিত বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সেই সকলের পরিবর্ত্তে অতি দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ সকল অসংস্কৃত অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

উদাহরণ—রফা বলিতে গেলে মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলাকে বলে, মীমাংসা বলিলে সে অর্থ বুঝায় না কিন্তু রফার জায়গায় অনেকেই মীমাংসা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পাট্টাকবুলতি চলিত কথা, সকলেই বুঝিতে পারে, কিন্তু অনেকে উহার পরিবর্ত্তে ভোগনিয়োগপত্র না এমনি কি একটা কথা ব্যবহার করেন তাহা আমাদের মনে থাকে না। কেহ তাহা বুঝেও না।

যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃতাধ্যাপকগণ প্রথম বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন পারস্য কথার প্রতি এরূপ বিদ্বেষ থাকা কতক সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন লেখকগণের মধ্যে সংস্কৃত পণ্ডিত অতি বিরল। কিন্তু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, এবিষয়ে উঁহাদের অপেক্ষাও ইঁহারা অধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু ইঁহারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে গিয়া প্রায়ই অর্থ-বিষয়ে ভয়ানক ভুল করিয়া ও নানারূপ গোলযোগ করিয়া বসেন।

যে সর্ব্বদা উচ্চ অঙ্গের শাস্ত্রতত্ত্ব ভাবিয়া থাকে তাহার নাম ইংরেজিতে thoughtful বাঙ্গালা লেখকেরা উহার

নাম রাখিয়াছেন, চিন্তাশীল। চিন্তা বলিলে বাঙ্গালায় দুর্ভাবনা বুঝায়, চিন্তিত, চিন্তাযুক্ত, চিন্তাশীল বলিলে, যে সর্ব্বদা দুর্ভাবনাগ্রস্ত অর্থাৎ মনমরা তাহাকেই বুঝায় সুতরাং চিন্তাশীল শব্দে গ্রন্থকার যাহা বুঝিলেন পাঠক তাহার ঠিক উল্টা বুঝিল।

উপন্যাস বলিতে গল্প বুঝায়, কিন্তু ইংরেজিতে একপ্রকার উপন্যাস আছে তাহার নাম নবেল, তাহাতে এবং উপন্যাসে প্রণালীগত একটু ভেদ আছে এই জন্য বাঙ্গালি লেখকেরা উপন্যাস শব্দ ত্যাগ করিয়া নবেলের নাম নবন্যাস রাখিয়াছেন। নবন্যাস বলিতে গেলে সংস্কৃতে নূতন গচ্ছিতধন বুঝায়, কারণ ন্যাস মানে গচ্ছিতধন, অতএব নবন্যাস কথাটি সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য্য।

এক এক দল সৈন্যের নাম আছে column কিন্তু column বলিতে থাম বুঝায় আর থামের সঙ্গে সৈন্যদলের ইংরেজের চক্ষে কোন রূপ সৌসাদৃশ্য থাকায় বোধ হয় ইংরেজে উহাকে column বলে আমাদের সে সৌসাদৃশ্য চক্ষে লাগে না তথাপি আমাদের লেখকেরা অনায়াসে সৈন্যস্তম্ভ বলিয়া উহার তর্জ্জমা করিয়া থাকেন।

তাই আমরা বলিতেছিলাম, লিখিতে বসিয়া ভাবপ্রকাশ করিবার পূর্ব্বে যে কথাগুলি ব্যবহার করিতে হইবে, বিশেষরূপ তদন্ত করিয়া তাহাদের অর্থ ঠিক করা উচিত। এবং নূতন শব্দ গঠনের পূর্ব্বে বিশেষরূপ সতর্ক হওয়া উচিত।

এ সকল অপেক্ষা আর একটি সহজ পরামর্শ আছে। যতদিন পর্য্যন্ত মনোমধ্যে ভাব ইংরেজিতে উদয় হয় ততদিন যেন কেহ বাঙ্গালা লিখিতে না বসেন। বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যেন বাঙ্গালায় ভাবিতে শিখা হয়, তাহা হইলে অনেক সময় নূতন ভাব আপনা আপনিই বাঙ্গালায় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাহার জন্য বেশী মাথা কুটাকুটি করিতে হইবে না।



মহাত্মা রামমোহনরায়।*

আধুনিক বঙ্গদেশের গৌরবই মহাত্মা রামমোহন রায়। এই মহাত্মাকে সম্মান করিলে বাঙ্গালিজাতি সম্মানিত হয়। ইঁহাকে সম্মান করা অগ্রে বাঙ্গালিজাতির কর্ত্তব্য। তিনি জীবিতকালে অনাদৃত ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে যখন আমরা তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব ও গৌরব সম্যক্ উপলব্ধ করিতে পারিয়াছি, এখন তাঁহার যথোচিত সম্মান ও আদর না করিলে আমরা নিতান্ত নিন্দনীয় হইব। সর্ব্বসাধারণে যাহাতে রামমোহন রায়ের জীবনের মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে তাঁহার জীবনী প্রকাশ করা উচিত। নগেন্দ্র বাবু সেই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতকাল যে তাঁহার অমূল্য জীবনী প্রচারিত ছিল না, ইহা বাঙ্গালিজাতিরই কলঙ্ক। নগেন্দ্র বাবু সেই কলঙ্ক অপনয়ন করিয়াছেন। সেই জন্য গ্রন্থকার অনেক কারণে আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন। বাঙ্গালিজাতি যে রামমোহন রায়ের নিকট কতপ্রকার ঋণে আবদ্ধ নগেন্দ্র বাবু তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ করিয়া রামমোহন রায়ের প্রতি বাঙ্গালিজাতির কি কর্ত্তব্য তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের জীবনী অতি সরল বিশুদ্ধ ভাষায় রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নানাস্থান হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আর্য্যদর্শনে শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় রামমোহনের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন তাহাতে গ্রন্থকারের অনেক সাহায্য হইয়াছে। গ্রন্থকারের একটি চমৎকার গুণ এই তিনি বক্তব্য বিষয় বেশ সাজাইয়া বলিতে পারেন। সে গুণ সমালোচ্য গ্রন্থেও বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের জীবনী আলোচনায় যেস্থলে যেরূপ চিন্তা সহজে উদয় হয়, সেইরূপ চিন্তায় গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ; এবং গ্রন্থকার অনেক স্থলে যে সমস্ত মত ও অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশুদ্ধ ও ন্যায্য।

জীবনীলেখকের যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তির আবশ্যক করে নগেন্দ্র বাবুর তাহা আছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে এমত প্রতীতি হয় যে তিনি রামমোহন রায়কে অত্যন্ত ভক্তি করেন। সেই

---

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা রায় যন্ত্রে মুদ্রিত সন ১২৮৮ সাল।

ভক্তিভাজনের জীবনী লিখিতে উৎসাহিত হইয়া তিনি বিলক্ষণ পরিশ্রমও করিয়াছেন। পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তিনি এমত অনেক বিষয় সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যাহা পূর্ব্বে অল্পলোকেরই বিদিত ছিল। তিনি সমস্ত বিষয় অতি শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের বিশুদ্ধ নামে যে অপকলঙ্ক ছিল, যে অপকলঙ্ক তাঁহার সমগ্র জীবনের ঘটনাবলির সহিত কখন সম্ভবপর হইতে পারে না; যাহা কেবল তাঁহার শত্রুগণের বিদ্বেষভাবের পরিচায়ক মাত্র বলিয়া উপলব্ধ হইতে থাকে, সেই দুই অপকলঙ্কের নগেন্দ্র বাবু অতি সুন্দররূপে অপনয়ন করিয়াছেন। বাস্তবিক সমগ্র গ্রন্থখানি ভক্তির উপহার স্বরূপ এবং যিনি ইহা পাঠ করিবেন তিনি রামমোহন রায়কে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

রামমোহন রায় যে একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনীতে বিলক্ষণ প্রকাশিত হয়। অতি তরুণবয়সে যখন তিনি হিন্দু শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে সহসা একদা একেশ্বরবাদে উপনীত হন, তখন তাঁহার প্রতিভার প্রথম আলোক পরিদৃশ্য হয়। বহুকাল ধরিয়া হিন্দুরা শাস্ত্রালোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কেহ কখন সেই শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া রামমোহনের মত অতি তরুণবয়সেই একেশ্বরবাদে উপনীত হইতে পারেন নাই। যদিও রামমোহনের সময়ে খৃষ্টীয় পাদ্রিগণ এখানে আসিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহারা খৃষ্টের বিশেষ মতামত প্রচারে এত ব্যস্ত যে তাহাতে ঠিক প্রকৃত একেশ্বরবাদ কখন প্রকাশিত হয় নাই। তৎকালে খৃষ্টান পাদ্রিগণের মতামতও বিশেষরূপে সকলের শ্রবণযোগ্য হইত না, এবং সাধারণ জনেরা অবগত ছিলেন না। বিশেষতঃ রামমোহন রায় যে অল্পবয়সে একেশ্বরবাদে উপনীত হন, তখন তিনি খৃষ্টীয় মত বোধ হয় অবগত ছিলেন না। যদি থাকেন তাহা হয় ত খৃষ্টীয় মত বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের বিশেষ গৌরব এই তিনি সেই একেশ্বরবাদ হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে নিহিত দেখিয়াছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি শাস্ত্রের অশেষ মতামত ভেদ করিয়া এই মহৎ সত্য উপলব্ধ করিয়াছিল। রামমোহন রায় প্রথমে ইহা হিন্দুশাস্ত্রের সারমাত্র বলিয়া দেখিলেন, এবং তাহা প্রচার করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি এই মত প্রচার করিতে এত উদ্যোগী হইলেন, ইহার সত্য তাঁহার মনে এত বদ্ধমূল হইয়াছিল, যেন তিনি হঠাৎ কি অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যেন কোন দিব্যালোক তাঁহার মনে সহসা প্রভাসিত হইয়াছিল। তিনি সে আলোকে মোহিত হইয়া তাহা জগৎময় প্রকাশিত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

রামমোহনের প্রতিভা সকল অবস্থায় তাঁহাকে প্রচালন করিত। তিনি এই প্রতিভাবলে অতি জটিল তর্কসকল ভেদ করিয়া সত্য প্রকাশিত করিতেন। এই প্রতিভাবলে সকল শাস্ত্রালোচনায় অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল নির্দ্ধারণ করিতেন। বাক্‌বিতণ্ডায় ও তর্কযুদ্ধে এই প্রতিভাবলে তিনি সকলের উপর জয়লাভ করিতেন। তাঁহার বিপক্ষে যে কেহ উদয় হউন না কেন, তিনি কাহারও সহিত বিচার করিতে শঙ্কা করিতেন না। যেরূপ তর্কজাল হউক না কেন, সে তর্ক না পড়িতে পড়িতে রামমোহন রায় তাহার অসারতা সুন্দর দেখাইয়া দিতে পারিতেন। যেন তাঁহার নিকট সকল কুতর্কের অস্ত্র ছিল। কুতর্ক উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহা খণ্ডন করিতেন। একটু কালবিলম্ব হইত না। ইহাই উপস্থিত বুদ্ধি, ইহাই প্রতিভা। এই প্রতিভা যেন আন্তরিক আলোক রূপে তাঁহার মনোমন্দিরে বিরাজিত ছিল। কুতর্কজালের কুজ্ঝটিকা বিস্তৃত হইবামাত্র তাঁহার অভ্যন্তরিক আলোকদ্বারা তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত।

যাঁহারা প্রতিভাসম্পন্ন লোক হন, তাঁহারা এক এক যুগের অগ্রণী স্বরূপ হন। রামমোহন রায় এক্ষণকার কালের অগ্রগামী লোক ছিলেন। তাঁহার কালের পূর্ব্বে তিনি উদয় হইয়াছিলেন। অথবা তিনি এক নূতন যুগের প্রারম্ভ করিয়া যান। এদেশীয় দেশাচার সম্বন্ধে আজ কাল অনেক তর্কের পর যে সমস্ত সত্য নির্ণীত হইতেছে, রামমোহন রায় বহুকাল পূর্ব্বে তাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন। বলিতে গেলে আমরা আজি কালি তাঁহারই মতামতের অনুসারী হইয়াছি মাত্র। রামমোহন রায় তাঁহার পরিষ্কার বুদ্ধিতে সকল বিষয় বহুকাল পূর্ব্বে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি এক্ষণকার কালের উজ্জ্বল শুখতারা রূপে বঙ্গগগনে উদয় হইয়াছিলেন।

যে সমস্ত অসাধারণ গুণে রামমোহন রায়কে উচ্চগৌরবে উত্তোলিত করিয়াছিল, প্রতিভা তাহার অন্যতম। প্রতিভা তন্মধ্যে সামান্য গুণ। কারণ প্রতিভা অনেকেরই থাকিতে পারে। রামমোহন রায় যদি অন্যান্য গুণের আধার না হইতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই একজন অসাধারণ লোক হইতে পারিতেন না। তাঁহার অপরাপর গুণের মধ্যে তাঁহার সাহসকে আমরা একটি শ্রেষ্ঠতম গুণ বলি। যে সাহস থাকিলে মানব উচ্চে উঠিতে পারে, রামমোহন রায়ের সেই সাহস ছিল। সকল সময়েই মনুষ্যসমাজ এক এক স্থির অবস্থায় অথবা স্তরে স্থাপিত থাকে। রামমোহন রায়ের যে সময় অভ্যুদয় হয়, তখনকার কালে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ কিরূপ জঘন্য অবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, তাহা সমালোচ্যগ্রন্থমধ্যে সুন্দর বর্ণিত আছে। মনুষ্যসমাজের ধর্ম্ম এই যে, লোকে এই স্তরে সর্ব্বসাধারণকে রক্ষা করিতে চেষ্টা

করে। ইহাই সামাজিক শাসন ও বন্ধন। মানবজাতির অবস্থা কখন একভাবে থাকিতে পারে না। সমাজ কখন একভাবে দাঁড়াইতে পারে না। হয় তাহা ভিতরে ভিতরে উন্নতিপথে উঠিতেছে, না হয় তাহা অবনতির দিকে অবনত হইতেছে। মানবসমাজের নিশ্চেষ্টতায়ও তাহার অপকার সাধন হয়। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ নিশ্চেষ্টতায় ক্রমশই অধঃপাতে যাইতেছিল। দিন দিন তাহার অবনতি হইতেছিল। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ এখন এইরূপ নিশ্চেষ্ট স্থিরভাবে অবস্থিত ছিল। ভিতরে ভিতরে তাহার অবনতিসাধন হইতেছিল। তাহার গতি অধোদিকেই অভিমুখী ছিল। রামমোহন রায় এই সমাজের গতি ফিরাইয়া দিলেন। সামাজিকতরঙ্গে বিপরীত বল বিক্ষেপ করিলেন। সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যে বল রামমোহন রায়ের হৃদয়ে; সেই বল, সেই সাহস, সেই অধ্যবসায়, সেই বিদ্যাবুদ্ধি, সেই প্রতিভা, সেই মহান্ আভ্যন্তরিক বলে রামমোহন রায় এই সামাজিক তুফানে দণ্ডায়মান হইলেন। বলিতে গেলে একাকীই দণ্ডায়মান হইলেন। যে বলে, যে সাহসে তিনি আত্মস্বজন, ভাইবন্ধু জনকজননীকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী দেশে দেশে ফিরিয়াছিলেন, সেই বল রামমোহন রায়কে আবার স্বদেশীয় জনসমাজের প্রতিকূলমুখে সংরক্ষা করিল। সমুদায় সমাজ তাঁহার বিপক্ষে। রামমোহন রায় একাকী বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন। শুদ্ধ দাঁড়াইয়া নয়, মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে যেরূপ অস্ত্রবিক্ষেপ করিতেছে, রামমোহন রায় তাহা সেইরূপ বলে কাটাইতেছেন। যাহা সহ্য করিবার তাহা সহ্য করিতেছেন। যাহা কাটাইবার তাহা কাটাইতেছেন। ইহাই বীরত্ব, ইহাই সাহস। এই সাহসে রামমোহন রায় সামাজিক গতি উন্নতির দিকে বিক্ষেপ করিয়াছেন। রামমোহন যখন প্রথম সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের জন্য সত্যের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান; যখন নদ নদী, বন, পর্ব্বত, সিংহ, শার্দ্দূল এবং মানবের ভয়ঙ্কর শত্রুতা প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে নাই, তখন তাঁহার হৃদয়বল একদিন দেখা গিয়াছিল। তখন তাঁহার সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় কত, একদিন দেখা গিয়াছিল। তখন তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রথম আলোক প্রভাসিত হইয়াছিল। এই হৃদয়বলে কয়জনকে বলীয়ান্ দেখা যায়। এই মহান্ হৃদয়বলে কয়জন লোক সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, সত্যের জন্য, প্রকৃতধর্ম্মের অনুসন্ধানের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন। আবার যখন আমরা ভাবি, রামমোহন রায়ের বয়স তখন কত তরুণ, সম্পত্তি ও সহায় কেমন বিহীন, তখন তাঁহার হৃদয়বলের যে কতদূর গৌরব তাহা একদিন উপলব্ধি হয়। তখন তাঁহাকে

আমরা ভবিষ্যৎ রামমোহন রায় বলিয়া চিনিতে পারি। চিনিতে পারি, তিনি দেশের উদ্ধারের জন্য উদয় হইতেছেন, তিনি দেশের উন্নতিকল্পে সজ্জিত হইতেছেন। চিনিতে পারি, এই হিমালয় অতিক্রমী তিব্বতভ্রমী রামমোহন রায় একদিন সাতসমুদ্র পার হইয়া আবার বিলাতে যাইবেন, ফ্রান্সে সম্মানিত হইবেন, বিলাতে আবার ফিরিয়া আসিবেন, বিলাতের সর্ব্বস্থানে পূজিত হইবেন, এবং সেই সাত সমুদ্র পারে বিদেশীয় শোভাময়ী ব্রিষ্টলনগরীতে পূজার সহিত দেহত্যাগ করিবেন। চিনিতে পারি, রামমোহন রায়ের এই হৃদয়বল এক স্থানে আবদ্ধ থাকিবার নহে, বঙ্গদেশে তাহা ধরিবে না, তাহা বিস্তীর্ণ হইয়া সমুদায় পৃথিবী একদা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইবে। একস্থানে আবদ্ধ হইলে ইহার তেজ কত, তাহা বঙ্গদেশ জানিয়াছে। বিস্তীর্ণ হইলে, ইহার প্রসার কত, তাহা বিদেশীয়গণ বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছেন।

সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য সন্ন্যাসিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। সন্ন্যাসী হইতে রামমোহন রায়ের অনেক প্রভেদ। এই প্রভিন্নতা না থাকিলে রামমোহন রায় যে তরুণবয়সে সংসার ধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে তিনিও হয় ত একজন সন্ন্যাসী হইতেন। আর যে সময়ে রামমোহন রায় সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সে সময়ে সন্ন্যাসধর্ম্মেরও বিশেষ গৌরব ছিল। সেই গৌরব রামমোহন রায়ও প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। তখন সন্ন্যাসী হওয়ার দৃষ্টান্তেরও বঙ্গধামে অভাব ছিল না। ঈশ্বরোপাসনার জন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তখন গৌরবের বিষয় বলিয়া লোকে জ্ঞান করিত। সে কালের অনেক সন্ন্যাসীও হয় ত আজিও জীবিত আছেন। দুই কারণে রামমোহন রায়কে সন্ন্যাসী করে নাই।

প্রথম কারণ এই; যে জন্য সন্ন্যাসিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া যান, রামমোহন রায় সে কারণে যান নাই। সন্ন্যাসিগণ ঈশ্বরের উপাসনার জন্য প্রলোভনপূর্ণ, মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে যান। রামমোহন রায় সংসার পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু সংসার তাঁহাকে দাঁড়াইতে স্থল দেয় নাই। সংসার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। তিনি ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সংসারের বহির্দ্দেশে যান নাই। কিন্তু তিনি তত্ত্বানুসন্ধায়ী ছিলেন। সকল ধর্ম্মের সার কি, তিনি অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সকল ধর্ম্মের দোষগুণ বিচারোদ্দেশে তিনি দেশে দেশে বেড়াইতেছিলেন। এইরূপে তাঁহার জ্ঞান পূর্ণ না হইলে তাঁহাকে ধর্ম্মসংস্কারক মহাত্মা রামমোহন করিতে পারিত না। সংসার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপকারসাধন করিয়াছিল। তাঁহাকে ভবিষ্যৎ রামমোহন রায় করিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ, রামমোহন রায়ের হৃদয়। রামমোহন রায়ের হৃদয় সন্ন্যাসিগণের হৃদয়ের মত যদি শুষ্ক, নির্ম্মম হইত, রামমোহন রায় হয় ত তত্ত্বানুসন্ধানের পর ঈশ্বরোপাসনার জন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন। কিন্তু রামমোহন রায় হৃদয়শূন্য লোক ছিলেন না। যে নির্ম্মম জনসমাজমধ্যে রামমোহন রায় বাস করিতেন, সেই সমাজের জন্য রামমোহনের তরলহৃদয় অতি তরুণ বয়সেই কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারই পরিবারমধ্যে যখন সতীদাহের দৃষ্টান্ত ঘটে, তখনই তাঁহার হৃদয় একেবারে ওতপ্রোত হইয়া আলোড়িত হইয়াছিল। তিনি তখনই যে উচ্চরবে কাঁদিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাতেই তাঁহার হৃদয়ব্যথার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাঁহার মমতা লোকের জন্য ছিল না, তাহা ব্যক্তিগত মমতা ছিল না, কিন্তু তাঁহার মমতা মানবজাতির প্রতি ছিল। তিনি একজনের জন্য যত না কাঁদিতেন, সমাজের জন্য ততোধিক কাঁদিতেন।

রামমোহন রায় একজন বিশেষরূপে সামাজিক লোক ছিলেন। সমাজের রোদন তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিত। সমাজের অমঙ্গল তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিত। তিনি বঙ্গসমাজের দুরবস্থা দেখিয়াছিলেন মাত্র নহে, সেই দুরবস্থার জন্য অহরহঃ মনে মনে কাঁদিতেন। তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে সেই দুরবস্থার ভাব প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছিল ; তাঁহার সহৃদয়তা সেই দুরবস্থা অপনয়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। তিনি ভারতের দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় স্বদেশে আকৃষ্ট ছিল, স্বদেশের দুঃখের জন্য কাঁদিত। তাঁহার হৃদয় যে প্রকৃতপক্ষে কাঁদিত, স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া যখন তিনি তাহার দুঃখমোচনের জন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়াছিলেন, কায়মনোবাক্যে তাহার হিতকামনায় নিরত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সেই হৃদয়ব্যথার একদা পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি আত্মস্বজনের জন্য তত ভাবিতেন না, কিন্তু সমগ্র বঙ্গসমাজ ও জাতির জন্য ভাবিতেন। এ প্রবৃত্তি কি সন্ন্যাসিগণের হৃদয়ে অবস্থিতি করে। সন্ন্যাসিগণ কেবল আত্মোন্নতির জন্য ব্যস্ত। আপনার মুক্তিসাধনের জন্য দিনরাত অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা সংসারের মায়া মমতা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ফেলেন। হৃদয়ের সকল প্রবৃত্তি ও বাসনা বিসর্জ্জন দেন। আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্নেহ মমতা ভুলিয়া যান। সংসারের কেহই তাহাদিগের ভাবনার বিষয় নহে। কাহার প্রতি দয়া নাই, শ্রদ্ধা নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই। কাহারও জন্য এবং কিছুরই জন্য তাহাদিগের হৃদয়ে কখন ব্যথা উপস্থিত হয় না। যদি হয়, তাহা তাহারা দমন করে। তাহারা হৃদয়কে ক্রমশঃ শুষ্ক ও

নীরস করিয়া ফেলে। প্রথমেই যখন তাহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিল, তখনই তাহারা একদা তৎসঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকল মায়া বিসর্জ্জন দিয়াছিল। সেই মন, সেই হৃদয় তাহারা বরাবর রক্ষা করিয়া আসিতে থাকে। কোন কোমল প্রবৃত্তির অঙ্কুরমাত্র তাহাতে জন্মিতে পারে না। অঙ্কুরোৎপত্তি হইবামাত্র তাহা বিনষ্ট করে। কারণ তদ্রূপ অঙ্কুরকে স্থান দেওয়াই তাহাদিগের পক্ষে মহাপাতক। এ হৃদয় কি মানবোচিত? এ ব্যক্তিগণকে কি সংসারে স্থান দেওয়া উচিত? তাহারা সংসারের জন্য নহে, সংসারও তাহাদিগকে চাহে না। তাহারা যত শীঘ্র সংসার হইতে দূরীকৃত হয়, যত শীঘ্র তাহাদিগের পাপদৃষ্টান্ত সংসারকে স্পর্শ না করে, ততই সংসারের পক্ষে মঙ্গল ও শ্রেয়স্কর। রামমোহন রায় এ ধাতুর লোক ছিলেন না। তিনি এরূপ হৃদয়ে সংসারধাম পরিত্যাগ করেন নাই। এরূপ হৃদয়ে তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করেন নাই। এরূপ হৃদয় লইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। এরূপ হৃদয়ে তিনি স্বদেশের মঙ্গলকার্য্যে ব্যাপৃত হন নাই। যখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহার হৃদয়কোষ স্বদেশের মমতায় ও স্বজাতির হিতকামনায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি গৃহে আসিয়া সেই পরিপূর্ণ হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সেই হৃদয়বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সকল সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন এবং সকল নিন্দার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারই জন্য তিনি বিদূর বিদেশবাসে প্রাণপরিত্যাগ করিলেন।

আশ্চর্য্য এই, রামমোহন রায়ের হৃদয়ে এই প্রকার সামাজিক প্রবৃত্তি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল। যে অপবিত্র, ঘোর স্বার্থপর জনসমাজক্ষেত্রে রামমোহন রায় বাস করিতেন, সে গগনে এ প্রবৃত্তির সুখস্পর্শ বায়ু কখন বহিত না। যে লোকমণ্ডলীমধ্যে তিনি বাস করিতেন, সে লোকমণ্ডলীর স্বপ্নেতেও কখন এ প্রবৃত্তির বিষয় উদয় হয় নাই। তখন ইউরোপীয় ভাব দেশমধ্যে প্রবেশলাভ করে নাই। তখন ইংরেজী সাহিত্যে রামমোহন রায় শিক্ষিত হন নাই। সাহিত্য অধ্যয়ন করিলেই এরূপ ভাব তন্মধ্য হইতে গ্রহণ করা বড় সহজ লোকের কার্য্য নহে। রামমোহন রায় এই প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশের দুরবস্থা তাঁহার এই প্রবৃত্তিরই ফূর্ত্তিসাধন করিয়াছিল। এই প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া তাঁহার হৃদয়কে বলীয়ান্ করিয়াছিল। এই প্রবৃত্তির উত্তেজনায় তাঁহার সমস্ত জীবন উত্তেজিত হইয়া কার্য্যময় হইয়াছিল। তিনি নিশ্চেষ্ট, ও নিরীহ বাঙ্গালি ছিলেন না। তাঁহার হৃদয়বল ও চেষ্টায় দেশশুদ্ধ আলোড়িত হইয়াছিল। তিনি স্বদেশের

প্রবৃত্তিস্রোতকে ভিন্ন দিকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রবৃত্তি তাঁহাকে একজন অসাধারণ লোক করিয়াছিল। একজন মহাজনের যশোগৌরবে উত্তোলিত করিয়াছিল। তিনি ইহারই জন্য সমগ্র বাঙ্গালিজাতি হইতে পৃথক্ হইয়াছেন।

রামমোহন রায় স্বদেশহিতৈষী সন্ন্যাসী ছিলেন। ঐশ্বরিক ধ্যান ও জ্ঞানে তাঁহার সন্ন্যাস নিয়োজিত ছিল না; কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাস ঐশ্বরিক সর্ব্বাঙ্গীণ উপাসনা। যে উপাসনা কেবল ঐশ্বরিক ধ্যানে নিঃশেষিত হয় না; যাহার প্রধান কার্য্য ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যসাধন করা, রামমোহন রায় সেই কার্য্যময় উপাসনায় বিশেষরূপে নিরত ছিলেন। এই উপাসনায় নিরত হইয়া রামমোহন রায় যেরূপ কঠিন যোগসাধন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি দিবারাত্র এই সাধনায় অনুরক্ত থাকিয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি বিব্রত হইয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কার্য্যময় জীবনে বিশ্রান্তি ছিল না। এক কার্য্য সমাধা করিয়া অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। স্বদেশের মঙ্গল যখন যেরূপে তাঁহার নিকট উদয় হইয়াছিল, তখন তিনি সেইরূপে তাহা সাধন করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি অনেক মঙ্গল অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, অনেক মঙ্গলকার্য্য সাধন করিয়াছেন। তাঁহার তুল্য লোক আজি পর্য্যন্ত জন্মে নাই বলিয়া তাঁহার প্রারম্ভিত অনুষ্ঠান-প্রণালী অবলম্বিত হইল না। তাঁহার জীবন অগ্নিময় অনুরাগে পরিপূর্ণ ছিল। এখন সে অগ্নিরাশি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সে রাশির তাপ ও তেজঃ ক্ষুদ্র অগ্নিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক্ষণকার স্বদেশহিতৈষী কতিপয় বাঙ্গালির জীবনে ইহাই প্রমাণিত করে মাত্র। আমরা আজি পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালির জীবন রামমোহন রায়ের মত কার্য্যময় ও উদ্যোগপূর্ণ দেখি নাই। সমুদায় জীবন কেবল মঙ্গলময় উদ্যোগ ও অনুষ্ঠানে উৎসর্গিত দেখি নাই। কার্য্যের পর কার্য্য, অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান, ব্রতের পর ব্রতে কাহারও জীবন অবিশ্রান্তভাবে নিয়োজিত হয় নাই। বিশ্রাম কাহাকে বলে রামমোহন রায়ের জীবনে তাহা লক্ষিত হয় নাই। এই কঠিন কার্য্যময় যোগসাধনায় রামমোহন রায় জীবনকে উৎসর্গিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালির মধ্যে এরূপ যোগী ত কখন জন্মে নাই, অপর জাতিমধ্যেও এরূপ যোগী প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। দুঃখের বিষয় ইহার দৃষ্টান্ত আজি পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালি অবলম্বন করেন নাই।

যে দেশের দুরবস্থা যত, সে দেশের সন্তানগণের কার্য্যভার তত গুরুতর। ভারতের দুরবস্থা যত, ভারতের সন্তানগণের কর্ত্তব্য তত কঠিনতর। এরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান ভারতসন্তানগণের মধ্যে

কাহার আছে? বোধ হয় রামমোহন রায়ের এই জ্ঞান অন্তরে পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি ছিল। তিনি জানিতেন আমার স্বদেশ যতদূর দুরবস্থাগ্রস্ত, তাহার মঙ্গলোদ্দেশে ততদূর উদ্যোগী হওয়া আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু শুদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানে রামমোহন রায় তাঁহার সদনুষ্ঠান ব্রতে উত্তেজিত হন নাই। সেই জ্ঞান যে অনুরাগ আনিয়া দিয়াছিল, তাহা একটি প্রবল রিপুরূপে পরিণত হইয়াছিল। তিনি সেই রিপুবশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যতক্ষণ না লোকে কোন রিপুর বশবর্ত্তী হয়, ততক্ষণ তাহার সমস্ত জীবনকে ব্যাপৃত করিতে পারে না। রামমোহন রায়ের জীবনে এই রিপু ক্রমশঃই প্রবল হইতেছিল। তিনি সেই প্রবল রিপুর বশবর্ত্তী হওয়াতে তাঁহার সমুদায় জীবন দেশের মঙ্গলময় কার্য্যাবলীতে ব্যাপৃত হইয়াছিল। এই রিপু তাঁহাকে স্বদেশহিতৈষী রামমোহন রায় করিয়াছিল। আশ্চর্য্য রামমোহন রায়ের কার্য্যশক্তি, আশ্চর্য্য তাঁহার যোগসাধনা!

রামমোহন রায় একজন অধ্যয়নশীল লোক ছিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বিস্তর গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন; ইংরেজিভাষা সুন্দর জানিতেন। তদ্ব্যতীত তিনি চারিটি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার যখন যে গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন হইত, একদিনে তাহা অধ্যয়ন করিতেন। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ তিনি এইরূপ একদিনে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নকালে তাঁহার আহার নিদ্রা মনে থাকিত না। যখন যে গ্রন্থের আবশ্যক হইত, তিনি কলিকাতাময় তজ্জন্য অন্বেষণ করিতেন। কিন্তু তিনি যে শুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য এতদূর অনুরক্ত ছিলেন, তাহা নহে। তিনি সুধীগণের মত শুদ্ধ বিদ্যার প্রতি অনুরাগী হইয়া অধ্যয়নশীল হয়েন নাই। তিনি যে মহৎ লক্ষ্যে সমুদায় জীবনকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন, অধ্যয়নশীলতা ও জ্ঞানলাভ তাহার অন্যতর উপায়মাত্র ছিল। ইহা তাঁহার একটি প্রধান উপায় ছিল। তাঁহার শত্রুদিগের উপর জয়লাভ করিবার এই প্রধান উপায় ছিল। তিনি ইহাদ্বারা প্রতিবাদিগণকে পরাস্ত ও নীরব করিয়া সত্যজ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রচার করিতেন। পৃথিবীতে সত্যের পতাকা দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিতেন।

রামমোহন রায়ের জীবনে একটি সুন্দর শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত আছে। হৃদয়ভাব ক্রমশঃ কেমন প্রসারিত হয়, প্রীতি ক্রমশঃ কেমন বর্দ্ধিত হয়, স্বদেশহিতৈষণা ও স্বজাতিপ্রেম ক্রমশঃ কেমন বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয় ইহা রামমোহন রায়ের জীবনে সুস্পষ্ট প্রকাশিত আছে। রামমোহন রায় প্রথমে স্বদেশের ধর্ম্মসংস্করণে প্রবৃত্ত হন। সেই ধর্ম্মসংস্করণ কার্য্যে তাঁহাকে যে উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার হৃদয়ানুরাগ ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইয়াছিল। সেই কার্য্যে তিনি আরও দৃঢ়রূপে ব্রতী

হইয়াছিলেন। যাহাতে সামান্য জনগণকে নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যোগী করে, তাহাতে রামমোহন রায়কে দ্বিগুণতর উদ্যোগ ও উৎসাহে পূর্ণ করিয়াছিল। মহজ্জনগণের জীবনের এই একটি সুন্দর ভাব। উৎপীড়নে তাঁহাদিগের সদনুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। রামমোহন রায়ের এই বর্দ্ধিত অনুরাগ শুদ্ধ স্বদেশীয় ধর্ম্মসংস্করণে নিঃশেষিত হয় নাই। ইহা ক্রমে স্বদেশহিতৈষণায় উত্থিত হইয়াছিল। যাহা প্রথমে ধর্ম্মে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে সামাজিক মঙ্গলমাত্রে প্রসারিত হইয়াছিল। ধর্ম্মসংস্কারক ক্রমে স্বদেশহিতৈষী পেট্রিয়টের মহৎকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। স্বদেশের সর্ব্ববিধ মঙ্গল রামমোহন রায়ের আলোচ্য হইয়াছিল। ধর্ম্মীয় হিতকামনা সামাজিক হিতকামনায় উন্নত হইল। তাঁহার হস্ত স্বদেশের সর্ব্ববিধ মঙ্গলকার্য্যে প্রসারিত হইল। যে হৃদয়াকাশে সন্ধ্যাকালে কেবল একটি মাত্র উজ্জ্বল তারকা ফুটিয়াছিল, সেই হৃদয়াকাশে ক্রমশঃ সহস্র তারকা একে একে প্রস্ফুটিত হইল। অবশেষে তাহা বিশ্বপ্রেমের চন্দ্রালোকে আলোকিত হইয়া গেল। যে রামমোহন রায় একদিন শুদ্ধ স্বদেশের মঙ্গলোপায় ভাবিতেন, সেই রামমোহন রায় পরে ইংরেজ ও ফরাসীসমাজের উন্নতি কল্পনায় একদিন মস্তক আলোড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যখন রামমোহন রায়ের বিশ্বপ্রেমপ্রবৃত্তি কেবলমাত্র সঞ্জাত হইতেছিল তখনই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। আমরা তাঁহাকে স্বদেশহিতৈষী বলি, বিদেশীয়গণ তাঁহাকে বিশ্বপ্রেমিক বলেন। বিদেশীয়গণ অবশ্য তাঁহার বিশ্বপ্রেমের বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাইয়াছেন। যদিও স্বদেশ তাঁহার মনকে এত অধিকার করিয়াছিল যে, তজ্জন্য তাঁহার বিশ্বপ্রেম স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে নাই, তথাপি আশ্চর্য্য এই, বিদেশীয়গণের নিকট তাঁহার সার্ব্বভৌমিক প্রীতির এতদূর পরিচয় হইয়াছিল যে, তাহারা তাঁহাকে একজন বিশ্বপ্রেমিক নামে অভিহিত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

আমরা রামমোহন রায়ের অনেকগুলি গুণের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এই সমস্ত গুণ তাঁহার জীবনীতে সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহা দেখিতে পান। এক্ষণে রামমোহনের নাম প্রধানতঃ যে জন্য এদেশ মধ্যে সুপ্রচারিত আছে তাহারই বিষয় আলোচনা করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। দুই কারণে রামমোহনের নাম ভারতমধ্যে সুবিখ্যাত হইয়াছে। তিনি এদেশে প্রকৃত ও বৈদিক হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা প্রবর্ত্তিত করেন এবং তৎপরে একেশ্বরের সার্ব্বভৌমিক সামাজিক পূজার পরিস্থাপনা করিয়া যান। এই দুই কার্য্যে তিনি যে শুদ্ধ এতদ্দেশীয় ধর্ম্মীয় জগৎকে আলোড়িত করিয়াছেন

এমত নহে, সেই জগতের প্রবৃত্তিস্রোতকে বিভিন্ন দিকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া দিয়াছেন। বলিতে গেলে, তিনি এদেশের ধর্ম্মীয় জগতে এক মহাবিপ্লবসাধন করিয়াছেন।

বৈদিকসাহিত্যের আলোচনা এদেশে বহুকাল হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিরূপে ও কোন সময় হইতে এরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা আজি নিরূপণ করা একপ্রকার অসাধ্য কার্য্য। পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল, কিন্তু মুসলমানরাজত্বকালে ত্রয়ীবিদ্যার আলোচনা একেবারে প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল বলিলেও বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের আবশ্যক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শুদ্ধ সেই শাস্ত্রের আলোচনা করিত। এমত কি, মনুর স্মৃতিশাস্ত্র যে ক্রিয়াকাণ্ডের নিদানভূত, সেই স্মৃতিরও মতামত সর্ব্বসময় পরিগৃহীত হইত না। সুতরাং তাহারও আলোচনা ক্রমশঃ বিলোপ হইয়াছিল। এ সমস্ত শাস্ত্রের স্থানে, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাহিত্য এবং কথঞ্চিৎ বৈষ্ণবগ্রন্থাদির আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রামমোহন রায় যে সময়ে উদিত হন, তখনকার কালে বঙ্গদেশে শাস্ত্রালোচনা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সময়কার অবস্থা সমালোচ্য গ্রন্থের একস্থানে সুন্দর বর্ণিত আছে। আমরা সে স্থলটি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাঠকগণ তখনকার অবস্থার সহিত এখনকার সামাজিক অবস্থা তুলনা করিয়া দেখুন।

"রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল ধর্ম্মকাণ্ড, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না; কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদিদ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জ্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থিরবিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটি কথাও বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্ম্মের কাষ্ঠাভাব ছিল, অন্নশুদ্ধির উপায়েই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিষ্যভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরেজদিগের অধীনে বিষয়কর্ম্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্য্যালয় হইতে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া অব-

গাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যা-পূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টমভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তাঁহাদের যশঃ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা পূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন; এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন; তাহাতেই তাঁহাদিগের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশাকুশি হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভাল মন্দ সকলপ্রকারই সংবাদ প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা,শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্ব্বত্র কীর্ত্তন এবং ধনদাতাদিগের যশঃ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোকদ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে,কেহ বা প্রশংসালাভের আশ্বাসে বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্রধনীদিগের উপর তাঁহাদিগের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্য-বিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে নগরে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞানানুশীলন থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন। কিন্তু তাঁহাদের আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতিদিন তিনবার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কি না সন্দেহ। বিষয়ী ধনীদিগের মধ্যে ত কোন প্রকার বিদ্যাচর্চ্চা ছিল না। চলিত বাঙ্গালাভাষায় ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক কাহারও বর্ণাশুদ্ধি জ্ঞান ছিল না। বিষয়কর্ম্মের উপযোগী পত্রলেখা ও অঙ্কজানা থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পারসী পড়িতে ও ইংরেজি অক্ষর ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন; তাঁহারা বিদ্যার গরিমা আর মনে ধারণ করিতে পারিতেন না। তখনকার বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে কেবল চৈতন্য চরিতামৃত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রসিদ্ধ; এ সকলই পদ্যের; গদ্যের গ্রন্থ তখন একখানিও ছিল না। বুলবুলি ও ঘুঁড়ীর খেলা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বিন্ সেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবাদিগের আমোদ ছিল, এবং তাঁহারা দোলের আবির খেলার

ন্যায় নন্দোৎসবের গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকীপ্রসূতির প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তিপূর্ব্বক খাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা এই ছিল যে, তখন পানদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপদেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই।"

বঙ্গদেশের যখন এইরূপ অবস্থা, রামমোহন রায় তখন জন্মগ্রহণ করেন। দেশ যখন অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ, রামমোহন রায় তখন শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করেন। অতি তরুণ বয়সেই পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ জন্মে এবং সেই পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হয়েন। ইহার ফলাফল যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সকলেরই বিদিত আছে। যাহাতে তাঁহার মত সমর্থন করিতে পারেন এরূপ গ্রন্থাদি তিনি নানাদেশে গিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহারই সম্যক্ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি স্বদেশীয়গণের মন সেই সকল এক ব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থাদির প্রতি প্রথম আকৃষ্ট করেন। তিনি দেখিয়াছিলেন পুরাণাদির অলীক মতামতসমূহ দেশমধ্যে এতদূর সুপ্রচারিত যে তাহাতে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরসম্বন্ধীয় প্রকৃততত্ত্ব সমুদায় একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। যে মূল বৈদিকশাস্ত্রে, উপনিষদে ও দর্শনাদিতে সেই প্রকৃততত্ত্ব সমুদায় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার আলোচনা দেশমধ্যে কিছুই নাই। অথচ হিন্দুজাতির তাহাই প্রধান ও মূল শাস্ত্র। এজন্য তিনি সেই শাস্ত্রের প্রতি যাহাতে সাধারণ জনগণের মন আকৃষ্ট হয় এমত চেষ্টা করিয়া ছিলেন। সে চেষ্টা যে বিফল হইয়াছে এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। যেহেতু তাঁহারই সময় হইতে বেদ ও দর্শনাদির আদর বৃদ্ধি হইয়াছে।

মাষ্টার ফেয়ারবেয়ারণ (fairbairn) বলেন * যে আর্য্যজাতির শাস্ত্র মধ্যে যে একেশ্বরবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সহিত সেমেটিক জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র-নিহিত একেশ্বরবাদের একটু বিভিন্নতা আছে। তিনি কহেন আর্য্যজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল প্রকৃতি-পূজা। আদিতে এই প্রকৃতি পূজাই প্রচলিত ছিল। প্রকৃতি পূজা হইতে আর্য্যজাতি একেশ্বরবাদে উত্থিত হয়েন। এজন্য তিনি বলেন যে যদিও, আমরা দেখিতে পাই যে আর্য্যজাতীয় একেশ্বরবাদে ঈশ্বরের একত্ব ব্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেমিটিক জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে যেমন বলে যে সেই এক ঈশ্বর ব্যতীত আর দ্বিতীয়

* In his *Studies on the Philosophy of Religion.*

ঈশ্বর নাই, দেব দেবতা সকলই মিথ্যা, একেশ্বরবাদের এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব আর্য্যজাতীয় ধর্ম্মে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর্য্যশাস্ত্রে যেমন একদিকে বলিয়াছে ব্রহ্ম একমাত্র, অন্যদিকে বলিয়াছে তাঁহার সহস্র অবতার। কিন্তু সেমেটিক জাতীয় ধর্ম্মে এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় দেবতার অস্তিত্ব ও অবতারণ অসম্ভব। জিসস এই একেশ্বর বাদ শিক্ষা দেন। মহম্মদ ইহার প্রধান উপদেশক।* ফেয়ারবেয়ারণের এসমস্ত কথা কতদূর সত্য তাহা এস্থলে আলোচিত হইতে পারে না। তাহা একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাবের বিষয়। কিন্তু রামমোহন প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আর্য্যজাতীয় ধর্ম্মেও ফেয়ারবেয়ারণ যাহাকে সেমেটিক জাতীয় একেশ্বরবাদ বলেন, তাহা সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। তিনি এক নিরাকার ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় ব্রহ্ম নাই এই বৈদিক মতদ্বারা পৌত্তলিকতার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করিয়াছেন। যাঁহারা সেই বেদাদি হইতেও দ্বিতীয় ব্রহ্ম অথবা দেবতার কল্পনার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়াছেন, রামমোহন রায় তাঁহাদিগের বিপক্ষে আপন মত সমর্থন করিয়াছেন। তবে রামমোহনের যুক্তি সমুদায় কতদূর শাস্ত্রসঙ্গত তাহা এখনও সমালোচ্য হইতে পারে। এমত হইতে পারে যে, রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় মত মহম্মদীয় অথবা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম হইতে প্রথমে গৃহীত হইয়া থাকিবে; তৎপরে তিনি সেই মত হিন্দুধর্ম্মে আরোপ করিয়া তাহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

বৈদিক শাস্ত্রে একমাত্র অদ্বিতীয়ের স্বরূপ নিরূপণ যে রূপই হউক না কেন, উপনিষদ ও দর্শন শাস্ত্রে ঐশ্বরিক কল্পনা যে অতি পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু দার্শনিক ঈশ্বর যত কেন পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত হউক না, তাহা কেবল কল্পনা ও নীরস চিন্তার বিষয় মাত্র ছিল, তাহা কেহ কখন পূজার বিষয় করেন নাই। পাতঞ্জলের ঈশ্বরভক্তি কখন পূজাতে পরিণত হয় নাই। তাহা কেবল শুদ্ধ

* Mr. Fairbairn traces upwards IndoEuropean religion from its more complete to its simpler forms until he finds it in that condition which is generally understood by the word Monotheism, but which, it must be admitted, is more accurately designated as Henotheism, the affirmative belief in one God without the sharply defined exclusive line, which makes it a belief in Him as the only God. This latter form of Monotheism proper may be rather the semetic than the Aryan Conception.— *W. E Gladstone.*

ঈশ্বরকল্পনা করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু দার্শনিক ঈশ্বরকল্পনা ও পূজার ঈশ্বর এ দুই বিভিন্ন ভাব। দার্শনিকতত্ত্বে ঈশ্বরের অনেক স্বরূপ নিরূপণ হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন মুনি, ঋষি আজি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ঐশ্বরিক পূজাপ্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই। ঈশ্বরকে কেহ ব্যক্তিস্বরূপ দর্শন করে নাই। দর্শনশাস্ত্রে ঈশ্বরের একত্ব অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে সত্য কিন্তু তাহা কেবল মতখণ্ডনমাত্র। কোন উপনিষদ বা দর্শনশাস্ত্রপ্রণেতা ঐশ্বরিক ধর্ম্মস্থাপন করিয়া যান নাই। ধর্ম্মের ঈশ্বর পূজার বিষয়, কিন্তু দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার ঈশ্বর কেবল চিন্তার ফলমাত্র।*

রামমোহন রায় এই বৈদিক ও দার্শনিক ঈশ্বরকে পূজার বিষয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি উপনিষদ ও দর্শনের ঐশ্বরিক তত্ত্ব কেবল নিরূপণ ও উৎঘোষণ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, সেই শুষ্ক ও নীরস চিন্তার বিষয়কে পূজার সামগ্রী করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি দর্শনশাস্ত্র হইতে ঈশ্বরকে বিমুক্ত করিয়া দেবালয় ও মন্দিরে বেদির উপর তাঁহাকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "রামমোহন রায় নূতন কি করিয়া গিয়াছেন? নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা কি নূতন? সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভক্তিভাজন মহর্ষিগণ নিরাকার ব্রহ্মকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ অনুভব করিয়াছিলেন।" অনুভব করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকাশ্যরূপে তাঁহার অর্চ্চনাপ্রণালী কেহ স্থাপন করিয়া যান নাই। এদেশে দেবাদির অর্চ্চনাপ্রণালী যেমন প্রবর্ত্তিত আছে একেশ্বরের উপাসনাপ্রণালী সেরূপ প্রবর্ত্তিত করিতে কোন মুনি ঋষি কখন যত্ন করেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বর ছিল। অথবা তাহা বৌদ্ধদেবের উপাসনাপ্রণালী মাত্র। রামমোহন যথার্থ একেশ্বরের উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। ভারতে এই তাঁহার নূতন কার্য্য। আশ্চর্য্য এই, যে ভারতে ঐশ্বরিকতত্ত্বের চরম সীমায় মানবচিন্তা উত্থিত হইয়াছে সে ভারতে কখন ঐশ্বরিক পূজা বিদ্যমান ছিল না। যদি থাকে, তাহা সাধারণো প্রচলিত হয়

---

* Mr, Fairbairn recognises the tendency of the semetic races to Monotheism, and considers that IndoEuropean man not only has been tolerant of the different gods of different nations, but has conceived the Divine Unity as abstract, while the semite holds it as personal. The IndoEuropean tendency was to religious multiplicities, but to philosophic unities. The God of a religion is an object of worship; the deity of a philosophy is product of speculation—*W. E. Gladstone.*

নাই। আশ্চর্য্য এই, যে ভারতে ঈশ্বর-চিন্তা এতদূর উন্নত হইয়াছে যে, আজিও ইউরোপীয় দর্শন তদূর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই, সেই ভারত চিরকাল পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ ছিল! আশ্চর্য্য এই, যে মুনিঋষিগণ ঐশ্বরিক ভাবে ততদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, তাঁহারা কখন নিজ নিজ নবভাবে মোহিত হইয়া দেবপূজাস্থলে একেশ্বরের অর্চ্চনা প্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই। সে কার্য্যের জন্য যে একজন রামমোহনের আবশ্যক হইবে এই আশ্চর্য্য। দুইসহস্র বৎসর মধ্যে ভারতে কি এমত কেহ জন্মেন নাই যে এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠেন।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে প্রকৃত ঐশ্বরিক পূজা নাই। নিজে জিসস ও তদীয় শিষ্যগণ যে ঐশ্বরিক পূজা প্রতিষ্ঠা করিতে মানস করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টানেরা সে ঐশ্বরিক পূজাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। মহম্মদীয় ধর্ম্মে কেবল ঐশ্বরিক পূজা আছে। কিন্তু সে ঐশ্বরিক পূজায় নিতান্ত অনুদার মুসলমান ভিন্ন অন্য কেহ অধিকৃত নহে। মহম্মদীয় ঐশ্বরিক কল্পনাও তত বিশুদ্ধ নহে। তদপেক্ষা জিসসের ও হিন্দুশাস্ত্রীয় ঐশ্বরিক কল্পনা অধিকতর বিশুদ্ধ ও পবিত্র। রামমোহন যে ঐশ্বরিক কল্পনা গ্রহণ করেন তাহা সম্পূর্ণ হিন্দুশাস্ত্রসঙ্গত। তিনি দেখিয়াছিলেন, আমাদিগের উপনিষদ ও দর্শনেও যখন সে কল্পনা অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্ররূপে পাওয়া যায়, তখন অন্য ধর্ম্মের কল্পনা গ্রহণ করা অন্যায়। তিনি এই উপনিষদের ঈশ্বরের উপাসনা জন্য সমাজপ্রতিষ্ঠা করিলেন। এক্ষণকার ব্রাহ্মসমাজ রামমোহন রায়ের সুমহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ।

ভারতে ঐশ্বরিক উপাসনাপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করা নূতন কার্য্য হইলেও জগতে তাহা নূতন কার্য্য নহে। জগতের মধ্যে রামমোহন রায় কি নূতন কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। রামমোহনরায়প্রবর্ত্তিত একেশ্বরের উপাসনাপ্রণালী মধ্যেও একটি নূতন ভাব বিদ্যমান আছে। আমাদিগের গ্রন্থকার রামমোহন রায়ের সেই প্রধান ভাবটি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"মহাজনগণের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, নানা মহৎ ভাবের মধ্যে একটি ভাব প্রধান হইয়া তাঁহাদিগের জীবনপথের নেতাস্বরূপ হয়। তাঁহারা যাহা কিছু বলেন, যাহা কিছু করেন, সেই ভাবটি তন্মধ্যে মধ্যবিন্দু হইয়া অবস্থিতি করে। 'আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন' উপনিষদকারদিগের ইহাই প্রধান ভাব। 'বিশ্বব্যাপী মৈত্রী' বুদ্ধদেবের ইহাই প্রধান ভাব। 'আপনাকে আপনি জান,' সক্রেটিসের ইহাই প্রধান ভাব। 'একমাত্র ঈশ্বরের পূজা, অপর সকল দেব-পূজায় প্রতিবাদ' মহম্মদের ইহাই প্রধান ভাব। 'ধর্ম্মচিন্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' লুথরের ইহাই প্রধান ভাব। 'ভক্তিতেই মুক্তি'

চৈতন্যের ইহাই প্রধান ভাব। 'মানবপ্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি' থিওডোর পার্কারের ইহাই প্রধান ভাব। সেইরূপ রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান ভাব 'সার্ব্বভৌমিক উপাসনা।' কেবল তাহাই নহে, সেই সার্ব্বভৌমিক উপাসনার জন্য সমাজপ্রতিষ্ঠা, এটীও জগতের পক্ষে নূতন। দ্বিতীয় ভাবটী প্রথম ভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। এই ভাবের মৌলিকত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।"

রামমোহন রায়ের এই উদারভাব তৎপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের • ট্রষ্টডিডে প্রকাশিত আছে। তিনি এইরূপ উদারভাবে এক ব্রহ্মের প্রকাশ্য উপাসনালয় স্থাপন করিয়া ভারতে অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন। আজি সেই ব্রাহ্মসমাজ নানা শাখাবিশাখায় বিস্তৃত হইয়া ঈশ্বরের যশোঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায়ের সুমহৎ জীবনের পরিচয় দিতেছে। এই ব্রাহ্মসমাজের সহিত রামমোহন রায়ের নাম পৃথিবীতে চিরদিন অবস্থান করিবে।

পূর্ণচন্দ্র বসু



প্রলয়ের জলোস্তাবন।

এক্ষণে বাঙ্গালার বহুতর লোক ইংরেজি ভূগোলবৃত্তান্ত শিখিয়াছেন; পৃথিবীর ম্যাপ দেখিয়াছেন, কোথায় কোন সমুদ্র, কোথায় কোন দেশ তাহা ম্যাপে দেখিয়া জল ও স্থলের বিভাগ বুঝিয়াছেন। বুঝিয়া তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়টি কথা অনুধাবন করিয়া থাকিবেন, যদি কেহ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এক্ষণে তাহা স্মরণ করিয়া দিই।

(ক) জলের ভাগ পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে অধিক; স্থলের ভাগ পৃথিবীর উত্তরদিকে অধিক। ইহা সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু ম্যাপে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

(খ) যদি জিওগ্রাফিওয়ালারা এই কথা স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা আর একটি বিষয় দেখুন, দক্ষিণ ভাগের মহাসমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদ্বীপগুলি যেরূপ ভঙ্গীতে স্থানে স্থানে একত্র সন্নিবেশিত আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন এক একটি মহাদ্বীপ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশমাত্র আছে।

এই যে দুইটি বিষয় অতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলাম তাহা যদি প্রকৃত বলিয়া কেহ স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি যেন একটি অনুভবসম্বন্ধে বিচার করেন। অনুভবটি এই :—

এক সময় দক্ষিণ কেন্দ্র হইতে মহাজল রাশি উদ্ভাবিত হইয়া উত্তরাভিমুখে ছুটিয়াছিল, তাহার মহাবেগ স্থল জঙ্গম পাহাড় পর্ব্বত সকলই ভাঙ্গিয়া, ডুবাইয়া, গলাইয়া দিয়াছিল। যতদূর পর্য্যন্ত সেই মহাস্রোতের বেগ মন্দীভূত না হইয়াছিল ততদূর পর্য্যন্ত আর কিছুই রক্ষা পায় নাই। সেই বেগ দক্ষিণ দিক্ হইতে আসিয়াছিল, সুতরাং দক্ষিণ দিকে স্থলভাগ প্রায় একেবারে লোপ পাইয়াছিল। সেই জলপ্লাবনের নাম প্রলয়। সকল দেশে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে এই প্রলয়ের প্রবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু সকল দেশে সকল শাস্ত্রে বলে যে কেবল বৃষ্টিবর্ষণে পৃথিবী জলনিমগ্ন হইয়াছিল। কোন শাস্ত্রেই বলে না যে দক্ষিণ অংশ হইতে এই জলরাশি সমুত্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে পৃথিবীর জল স্থল বিভাগ দেখিয়া অনুভব করা যাইতে পারে যে, জলরাশি দক্ষিণ দিক্ হইতে আসিয়াছিল।

এ অনুভব বোধ হয় অনেকের নিকট অমূলক ও অসঙ্গত। এক্ষণে তাঁহাদের নিকট আর একটি প্রমাণের কথা উত্থাপিত করি। আসিয়া ও মার্কিনদেশের মধ্যবর্ত্তী যে মহাসমুদ্র আছে (Pacific) তাহাই দেখাই; ইহার দক্ষিণভাগ প্রশস্ত উত্তরদিক্ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ সেই জলরাশির বেগ যত উত্তরে যাইতে হ্রাস পাইয়াছে তত মহাসমুদ্র ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। আবার সেইরূপ অপর মহাসমুদ্র (Atlantic) দেখ; ইহাতে নদীর ন্যায় বক্রতা ও টঁ্যাক আছে, আফ্রিকার যে ভাগ পশ্চিমাংশে বাড়িয়া গিয়াছে, অপর পারে মার্কিনদেশের সেই অংশ সরিয়া গিয়াছে, আবার মার্কিনদেশের যে ভাগ বাড়িয়া আসিয়াছে অপরপারে সেই ভাগ সরিয়া ভিতরে আসিয়াছে। ইহাতে কি বোধ হয়? এই মহাসমুদ্র যখন প্রথম নদীর ন্যায় ছুটিয়াছিল, তখনই এই টঁ্যাক হইয়াছিল। ম্যাপ দেখিয়া যিনি ইহা স্বীকার না করেন, তাঁহাকে কিছু আর বলিবার নাই। যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি আর একটি বিষয় স্থির করিতে চেষ্টা করুন। দক্ষিণ কেন্দ্র হইতে কিরূপে এই জলোচ্ছ্বাস আসিয়াছিল।

আমরা এই পত্রিকার কেবল ১১ ও ১২ সংখ্যা পাইয়াছি। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ বৎসরের সূচিপত্র সংলগ্ন থাকায় গত বারমাসে কি কি বিষয় লিখিত হইয়াছিল তাহা জানিতে পারিয়াছি। বিষয়গুলি অধিকাংশই সাহিত্যসম্বন্ধে। সাহিত্য ভিন্ন অন্য বিষয় লিখিবার সময় অদ্যাপি বাঙ্গালায় হয় নাই, অন্য বিষয়ের পাঠক বাঙ্গালায় নাই।

কয়েক মাস পূর্ব্বে একবার অন্যপ্রসঙ্গ বঙ্গদর্শনে লিখিত হইয়াছিল। "কল্পনা যে কৃতকার্য্য হইবে তাহার আর সন্দেহ দেখিতেছি না।" কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি তাহা ভুল, গ্রাহকেরা টাকা দেন না; বোধ হয় কল্পনা কৃতকার্য্য হইবে না। কল্পনাপ্রকাশক নিবেদন হেডিং দিয়া লিখিয়াছেন—"ঈশ্বরানুগ্রহে কল্পনার প্রথমবৎসর সম্পূর্ণ হইল। * * দুঃখের বিষয় তথাপি বৎসরান্তে একটি করিয়া টাকা অনেকের নিকট আদায় হইল না। * * সকলেই যাহাতে অনায়াসে ইচ্ছা করিলেই বিনা কষ্টে দিতে পারেন এইরূপ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ খরচ নির্ব্বাহার্থ যৎকিঞ্চিৎ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; তবুও ইহারই মধ্যে এই দুঃখের কান্না কাঁদিতে হইতেছে।"

তাহাই বলিতেছিলাম কল্পনা টিকিবে না; কল্পনার দোষ দিতেছি না, দোষ গ্রাহকের। বাঙ্গালি গ্রাহকের কলঙ্ক অতিশয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, "আমি টাকা না দিলে কি ক্ষতি, আর দশজনে ত দিবে, তাহা হইলেই পত্রিকা চলিবে।" বাঙ্গালিরা প্রায় সকলেই এইরূপ ভাবিয়া থাকেন। সকলেই এইরূপ ভাবিলে সর্ব্বনাশ। গল্প আছে যে একবার এক রাজসভায় গোয়ালাদের কথা উত্থাপন হয়, সভাসদ্ সকলেই একবাক্যে বলেন, "গোয়ালামাত্রেই বঞ্চক।" রাজা এ কথা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্বেতপ্রস্তরদ্বারা একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী প্রস্তুত করিলেন। রাজ্যের সকল গোয়ালার প্রতি আদেশ করিলেন যে আগামী অমাবস্যার রাত্রে প্রত্যেকে এক এক কলস খাটি দুগ্ধ পুষ্করিণীতে ঢালিয়া যাইবে, কেহ কাহার সহিত একত্রে আসিতে পারিবে না, কি পথে কেহ কাহার সহিত আলাপ করিতে পারিবে না। গোয়ালারা পরস্পর ভাবিল, সকলেই ত খাটি দুগ্ধ দিবে, তবে আমি একা যদি কিছুই না দিই, পুষ্করিণী খালি থাকিবে না পূরণ হইবে। এই ভাবিয়া সকলেই বাটী বসিয়া রহিল, কেহই দুগ্ধ ঢালিল না। বাঙ্গালি গ্রাহক প্রায়ই সেইরূপ। সকলেই ভাবেন আমি ফাকি দিলে কি ক্ষতি? মূল কথা বাঙ্গালির এখনও নিজের নিকট নিজের সম্ভ্রম হয় নাই, এখনও ফাকি দিতে পারিলে নিজে বাহবা লওয়া আছে; সুতরাং নিজের নিকট লজ্জা হয় না।

তাহাই বলি, যাঁহারা নিজে টাকা ব্যয় করিতে অসম্মত তাঁহারা যেন পত্রিকা প্রকাশ না করেন। বাঙ্গালায় তাহা "দিল্লিকা লাড্ডু, যো খায়া ও পস্তায়া, যো না খায়া ও ভি পস্তায়া।"

বঙ্গদর্শন।

৮৭ সংখ্যা।

অভিজ্ঞান শকুন্তল।

৭। ইহার গল্প।

অভিজ্ঞানশকুন্তল যে রকমে সমালোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে নাটক কাহাকে বলে সহজেই বুঝা যাইতে পারে। প্রথমপ্রস্তাবে যে নাটকত্বের কথা বলিয়াছি তাহা নাটকের আকার-গত নাটকত্ব। নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যে রকম সম্পর্ক থাকা উচিত তাহাকে নাটকের আকার-গত নাটকত্ব বলে। এই সম্পর্কের নাম একত্ব বা সাম্য-ভাব। যে মানসিক শক্তি অথবা প্রবৃত্তি সকল অবস্থাতে নিজ প্রকৃতি রক্ষা করে তাহাই নাটকে চিত্রিত হয়। সুতরাং নাটকের নায়ক যে সকল কার্য্য করেন সে সমস্ত কার্য্যেরই একটি নির্দ্দিষ্টভাব অথবা প্রকৃতি থাকে। এবং সেই কারণ বশতঃ নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে একটি একতাসম্বন্ধ অথবা সাম্যভাব লক্ষিত হয়। তাহাই নাটকের আকার-গত নাটকত্ব। এই একতা রক্ষা অথবা সাম্যভাব প্রদর্শনই নাটককারের কার্য্য। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রভূত ক্ষমতার প্রয়োজন। মনে কর কোন একটি বিশেষ চরিত্র নাটকে চিত্রিত করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন একটি নির্দ্দিষ্টচরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃত জীবনে অর্থাৎ জগতের বৈচিত্রপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে কখন কি প্রণালীতে কার্য্য করিবে তাহাই দেখাইতে হইবে। সমস্যাটির গুরুত্ব এবং কঠিনতা বুঝিয়া দেখ। সংসার একটি ঘোর দুর্ভেদ্য রহস্য। তথায় কিছুরই

স্থিরতা নাই, সকলই অনিশ্চিত। আজ যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী কাল তিনি পথের ভিখারী। এই মুহূর্ত্তে যিনি সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্ত পরমুহূর্ত্তে তিনি বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত। প্রতিদণ্ডে প্রতি মুহূর্ত্তে মনুষ্যের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। সেই সকল বিভিন্ন অবস্থাতে কোন একটি নির্দ্দিষ্টচরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার সেই চরিত্রের গুণে যেমন যেমন কার্য্য করিলে তাঁহার চরিত্রের সার্থকতা হয় নাটককার তাঁহাকে সেই রকম কার্য্য করান। অর্থাৎ তাঁহার যে রকম চরিত্র তাহাতে যে অবস্থায় তাঁহার যে রকম কার্য্য করা, কথা কওয়া, বা ভাব প্রকাশ করা সম্ভব এবং সঙ্গত, নাটককার তাঁহাকে তাহাই করান। নাটকের পাত্রের প্রত্যেক কার্য্যে এবং প্রত্যেক কথাতে তাঁহার চরিত্র প্রদর্শিত হওয়া অবশ্যক। তিনি নানাবিধ অবস্থায় নানাপ্রকার কার্য্য করিবেন এবং নানাপ্রকার কথা কহিবেন। কিন্তু তিনি যদি প্রকৃত নাটকের পাত্র হন, তবে তাঁহার প্রতি কার্য্য তাঁহারই কার্য্য এবং তাঁহার প্রতি কথা তাঁহারই কথা বলিয়া পাঠকের বুঝিতে পারা চাই। বুঝিতে পারা চাই যে তিনি যে অবস্থায় পতিত সে অবস্থায় তিনি যে কার্য্য করিতেছেন, বা কথা কহিতেছেন সে কার্য্য এবং সে কথা তিনি যে চরিত্রবিশিষ্ট সেই চরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তির ভিন্ন অপর কাহারো হইতে পারে না। অর্থাৎ কোন একটি জ্যামিতিসূত্র হইতে যেমন অপরাপর জ্যামিতিসূত্র অবশ্য নিঃসৃত হয়, তেমনি নাটকের পাত্রের সমস্ত কার্য্য এবং সমস্ত কথা তাহার চরিত্র হইতে অবশ্য-নিঃসৃত বলিয়া উপলব্ধি হওয়া চাই। এবং প্রকৃত নাটকে তাহাই হইয়া থাকে। হ্যামলেটের কথা হ্যামলেটের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না; ইয়াগোর কথা ইয়াগোর ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না; দুষ্মন্তের কথা দুষ্মন্তের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না। শার্ঙ্গরবের কথা শার্ঙ্গরবের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না। এই কারণেই নাটকের আকারগত বা প্রত্যঙ্গ নাটকত্ব। অধিকন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, প্রকৃত নাটককার সামান্য চরিত্র চিত্রিত করেন না। যে চরিত্র চিত্রিত করিলে মনুষ্যজাতির শিক্ষালাভ হইতে পারে তিনি সেই চরিত্রই চিত্রিত করিয়া থাকেন। কিন্তু চরিত্র শুধু গুরুত্ব গুণবিশিষ্ট হইলেই হয় না। একজন উন্নত-চরিত্র-ব্যক্তিকে বসিয়া থাকিতে অথবা ভোজন করিতে অথবা পুস্তক পাঠ করিতে দেখিলে কোন শিক্ষালাভ হয় না। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে বিপদ্‌জনক অবস্থায় কার্য্য করিতে দেখিলে শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। সেই নিমিত্তই নাটককার কোন গুরুত্বগুণবিশিষ্ট চরিত্রকে কোন অসামান্য অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার ছবি

তুলিয়া দেন। সে ছবি তজ্রূপ চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিকার্য্যে এবং প্রতি কথায় আঁকা থাকে। কত ক্ষমতা থাকিলে তবে সে রকম ছবি তুলিতে পারা যায়? আমাদের মধ্যে একথা সকলে বুঝেন না বলিয়া, প্রতিবৎসর বাঙ্গালা ভাষায় রাশি রাশি পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত হয়। প্রথম প্রস্তাবে প্রত্যক্ষ অথবা আকারগত নাটকত্বের বিষয় যাহা বলিয়াছি তাহা কেবল অভিজ্ঞানশকুন্তলের সম্বন্ধে বলিয়াছি—তাহা কেবল নাটকের শ্রেণীবিশেষ সম্বন্ধেই খাটে। এখন ঐ নাটকত্ব বিষয়ে যাহা বলিলাম তাহা নাটকমাত্রেই প্রযোজ্য। এই নাটকত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথম প্রস্তাবে অভিজ্ঞানশকুন্তল হইতে কতকগুলি প্রমাণ বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া দিয়াছি। কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রতিশব্দে এই নাটকত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠক ইচ্ছা করিলেই তাহা দেখিতে পারেন। দেখিলে নিশ্চয়ই চমৎকৃত হইবেন।

এখন বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ বা আকারগত নাটকত্ব ভালরূপে দেখাইতে পারিলেই ভাল নাটক হয় না। অপ্রত্যক্ষ বা চরিত্রগত নাটকত্ব ভাল হইলেই তবে ভাল নাটক হয়। অভিজ্ঞানশকুন্তলের অপ্রত্যক্ষ বা চরিত্রগত নাটকত্ব দ্বিতীয় প্রস্তাবে বুঝাইয়াছি। যে চরিত্রনিঃসৃত কার্য্যপ্রণালী নাটকে চিত্রিত হয়, সে চরিত্র যত গভীর, দৃঢ়মূল এবং ব্যাপক হয় ততই তাহার নাটকের চরিত্র বলিয়া উৎকর্ষ এবং সার্থকতা হয়। দুষ্মন্তের চরিত্র লইয়া অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক। সে চরিত্রের কত দৃঢ়তা, গভীরতা এবং ব্যাপকতা তাহা বুঝাইয়াছি। বুঝাইয়াছি যে সে চরিত্রের অর্থও যা সমস্ত মনুষ্যসমাজের অর্থও তা। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে অপ্রত্যক্ষ বা চরিত্রগত নাটকত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞান শকুন্তল একখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক।

কিন্তু আকারগত এবং চরিত্রগত নাটকত্ব ছাড়া অভিজ্ঞানশকুন্তলে আর একরকম নাটকত্ব আছে। তাহা পঞ্চম প্রস্তাবে বুঝাইয়াছি। দুষ্মন্তের প্রেমের ইতিহাসের অর্থ এই যে জগৎ যে দুইটি উপাদানের সমষ্টি, অর্থাৎ জড়ত্ব এবং সূক্ষ্মতা অথবা প্রকৃতি এবং পুরুষ, সে দুইটি উপাদান পরস্পর স্বাধীন এবং তাহাদের সংযোগ বা মিলন নিয়মাধীন না হইলে বিষম অনিষ্টের কারণ হয়। এই মহাতত্ত্ব দর্শনশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে অভিজ্ঞানশকুন্তলে প্রথমত একটি প্রত্যক্ষ বা আকারগত নাটকত্ব আছে; সে নাটকত্ব ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধ। দ্বিতীয়ত একটি অপ্রত্যক্ষ বা চরিত্রগত নাটকত্ব আছে; সে নাটকত্ব মনুষ্যবিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মনুষ্যসমাজ ব্যাপিয়া আছে। তৃতীয়ত একটি দার্শনিক বা জাগতিক (cosmic) নাটকত্ব আছে;

সে নাটকত্ব মনুষ্যবিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এত গভীর এবং ব্যাপক নাটকত্ব অতি অল্প নাটকেই আছে। যে কয়খানা নাটকে আছে বোধ হয় তাহাদের সংখ্যা দুই কি তিন খানার বেশী হইবে না। অভিজ্ঞানশকুন্তল সেই দুই তিন খানার মধ্যে একখানা। গেটের 'ফাউষ্ট' আর একখানা। সেক্সপীয়রের 'রোমিও এবং জুলিয়েট' আর একখানা বটে, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল এবং 'ফাউষ্ট' অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট।

এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের যথার্থ প্রকৃতি বুঝা গেল, ইহার প্রকৃত গুণ কি তাহা বুঝা গেল। অতএব এখন বলা যাইতে পারে যে গল্পরচনা নাটককারের কার্য্য নয়। অনেকে তাহাই মনে করেন বটে, কিন্তু সেটি ভ্রম। যাঁহারা নাটককারকে গল্পলেখক বলিয়া বুঝেন তাঁহাদের মনে করা উচিত যে, অভিজ্ঞান শকুন্তলের গল্প মহাভারত হইতে গৃহীত এবং সেক্সপীয়রের প্রায় সকল নাটকগুলি প্রচলিত গল্প লইয়া রচিত। কিন্তু গল্পরচনা নাটককারের কার্য্য না হইলেও নাটকের গল্প একটি স্বতন্ত্র জিনিস। নাটকের উদ্দেশ্য বিবেচনায় নাটককারগৃহীত গল্প কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। যে সকল প্রচলিত গল্প লইয়া সেক্সপীয়র নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা তিনি কোন কোন অংশে পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। অভিজ্ঞান শকুন্তলে কালিদাসও তাহাই করিয়াছেন। মহাভারতে যে শকুন্তলোপাখ্যান আছে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এই। দুষ্মন্ত একদা মৃগয়ায় গিয়া মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে মহর্ষি তথায় নাই, কেবল শকুন্তলা আছেন। শকুন্তলাকে দেখিয়া লালসায় অধীর হইয়া শকুন্তলার জাতিকুল নির্ণয় করণানন্তর এক রকম বলপূর্ব্বক তৃপ্তিসাধন করিয়া তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কণ্ব আসিয়া এই গান্ধর্ব্ব বিবাহ অনুমোদন করিয়া শকুন্তলার একটি পুত্রসন্তান হইলে পর তাঁহাকে দুষ্মন্তের নিকট পাঠাইয়া দেন। তখন দুষ্মন্ত ভাণ করিতে লাগিলেন যে, তিনি শকুন্তলাকে কখন দেখেন নাই এবং বিবাহও করেন নাই। শকুন্তলা অপমানিতা সাধ্বীর ন্যায় দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিলেন। সেই সময়ে দৈববাণী হইল যে শকুন্তলা দুষ্মন্তের পরিণীতা ভার্য্যা। তখন দুষ্মন্ত তাঁহাকে এই বলিয়া গ্রহণ করিলেন যে "আমি জানি যে শকুন্তলা আমার পত্নী এবং এই পুত্রটি আমারই পুত্র, কিন্তু সহসা গ্রহণ করিলে পাছে লোকে আমাকে দোষী বিবেচনা করে এবং এই পুত্রটি কলঙ্কী হয় এই ভয়ে শকুন্তলার সহিত বিতণ্ডা করিতেছিলাম।" এ গল্পে দুষ্মন্তের চরিত্রে কোন মাহাত্ম্য লক্ষিত হয় না, তিনি কেবল একজন কামুক পুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান। এ রকম গল্প নাটকের গল্প

হইতে পারে না। সেইজন্য কালিদাস এই গল্পটিকে পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। কালিদাসের প্রধান উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক জগতের এবং জড়জগতের স্বাধীনতা চিত্রিত করা এবং কি উপায়ে ঐ দুই জগতের মধ্যে শান্তি এবং সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইতে পারে তাহা প্রদর্শন করা। অতএব মহাভারতের গল্পটি পরিবর্ত্তন না করিয়া লইলে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, কেন না সে গল্পে কেবল ঐন্দ্রিয়িক বা জড়জগতের কার্য্য বর্ণিত আছে। কালিদাসের দুইটি শক্তির প্রয়োজন—মানসিকশক্তি এবং ঐন্দ্রিয়িক শক্তি। অতএব যাহাতে দুইটি শক্তির কার্য্যই উজ্জলবর্ণে চিত্রিত হইতে পারে তিনি এমনি করিয়া মহাভারতের গল্পটিকে গড়িয়া লইলেন। তিনি দুষ্মন্তকে দুইটি ভিন্ন আকারে প্রদর্শন করিলেন। এক আকারে দুষ্মন্ত ইন্দ্রিয়ের শাসনে পরাভূত,বিলাসবাসনায় বিহ্বলমতি, সম্পূর্ণরূপে আত্মভাবমুগ্ধ। আর এক আকারে দুষ্মন্ত ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, শ্রমশীল, বিলাসবিদ্বেষী, আত্মভাবশূন্য, পরদুঃখকাতর, পরসুখান্বেষী, আত্মেতরভাবের পূর্ণায়ত প্রতিমূর্ত্তি। এই দুইটি মূর্ত্তি যে প্রণালীতে গঠিত হইয়াছে, তাহা কি চমৎকার! মহাভারতের উপাখ্যানে ঐন্দ্রিয়িক শক্তির কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাস সেই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া দুষ্মন্তের কামমুগ্ধাকৃতি চিত্রিত করিলেন। কিন্তু মহাভারতের উপাখ্যানে মানসিক শক্তির কার্য্য বর্ণিত হয় নাই। সেইজন্য মহাকবি শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান, রাক্ষসগণকর্ত্তৃক আশ্রমাক্রমণ, রাজমাতাপ্রেরিত সম্বাদ, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা, এবং ইন্দ্রলোকে দৈত্যদিগের দৌরাত্ম্য কল্পনা করিলেন। এই সকল ঘটনায় দুষ্মন্তের সৎপ্রবৃত্তি এবং মানসিক শক্তি কি আশ্চর্য্যরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে বুঝাইয়াছি। এখন আর একটি কথা বলা আবশ্যক। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দৃশ্যে এবং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় দুষ্মন্তের মোহবিজয়ী মানসিকশক্তির চমৎকার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আশ্রমাক্রমণ এবং ইন্দ্রলোকে দৈত্যদিগের দৌরাত্ম্যকল্পনা মহাকবির প্রতিভার চরমকীর্ত্তি। দুষ্মন্ত ঐন্দ্রিয়িক লালসায় জর্জ্জরিতদেহ, পার্থিবমোহে মধুকলসমগ্ন মধুকরাপেক্ষাও মুগ্ধ, পার্থিবভাবে জড়জগতাপেক্ষাও জড়তাময়। কিন্তু নিমেষমধ্যে দুষ্মন্ত বীরভাবে উন্মত্ত, উন্নত হৃদয়াবেগে যেন পৃথিবীর ঊর্দ্ধদেশে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, মোহজাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া যেন দিব্যালোকে সন্তরণ করিতেছেন,যেস্থানে মাটীর সহিত মাটী হইয়া বসিয়াছিলেন, সে স্থান তুচ্ছ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহার ঠিকানা নাই, সত্যই যেন একটা জগৎ অনন্তদূরে ফেলিয়া রাখিয়া আর একটা সর্ব্বরকমে ভিন্ন জগতে প্রবেশ করিয়া

ছেন। যে দুই ঘটনায় এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দৃষ্ট হয়, সে দুই ঘটনা দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেমের উপাখ্যানের অংশ নয়। সে উপাখ্যান হইতে সেই দুই ঘটনার উৎপত্তি হয় নাই এবং হইতেও পারে না। কিন্তু সেই জন্যই আমরা সেই দুই ঘটনার এত চমৎকারিত্ব দেখিতেছি। অভিজ্ঞানশকুন্তল আধ্যাত্মিক প্রণালীর নাটক। সে নাটকে বর্ণিত সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে উপাখ্যানমূলক অথবা বাহ্যগ্রন্থি কখনই থাকিতে পারে না। দুইটা ভিন্ন জগতের কথায় সমস্ত ঘটনা একসূত্রে গ্রথিত হওয়া অসম্ভব। এই নিমিত্ত যে দুই ঘটনার কথা বলিতেছি, সেই দুই ঘটনার এবং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা প্রভৃতি অপরাপর মানসিক শক্তিপ্রকাশক ঘটনার প্রকৃত গ্রন্থি দুষ্মন্তের মনে। সেই মনের সহিত তাহাদের সামঞ্জস্যেই তাহাদের সার্থকতা এবং নাটকের মধ্যে স্থান। কালিদাস, তোমার কাব্যের আধ্যাত্মিক গভীরতার পরিমাণ কে করিবে! দেব! তুমি শুধু ভারতের কালিদাস নও; তুমি জগতের কালিদাস। লোকে না বুঝিয়া সেক্সপীয়রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকে, 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।'

জড়জগতের শক্তি এবং মানসিকজগতের শক্তি এই দুই শক্তি পরস্পর স্বাধীন। যেখানে একটি শক্তি প্রবল, সেখানে অন্য শক্তিটিও প্রবল হইতে পারে। শুধু তাও নয়। জগতে জড়জগতের শক্তি মানসিকশক্তি অপেক্ষা প্রবল। সেই নিমিত্ত মহাভারতে বর্ণিত দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পরিণয়প্রণালী পরিবর্ত্তন না করিয়া মহাকবি অসীমমানসিকশক্তিসম্পন্ন দুষ্মন্তকে রিপুর শাসনে জ্ঞানভ্রষ্ট করিয়া চিত্রিত করিলেন। কিন্তু জড়জগৎ এবং মানসিক জগৎ পরস্পর স্বাধীন হইলেও তাহাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপন করা অর্থাৎ জড়জগৎকে মানসিক জগতের অধীন করা মনুষ্যজীবনের প্রধান অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, এবং অবশ্যকরণীয় কার্য্য। কেন না, মনুষ্যজীবনে জড়জগতের শক্তি মানসিকশক্তি অপেক্ষা প্রবল হইলে জীবন যন্ত্রণাময় হয় এবং মনুষ্যসমাজ নিয়মশূন্য হইয়া বিশৃঙ্খলতাপ্রাপ্ত হয়। দুষ্মন্তের ঐন্দ্রিয়িকশক্তি তাঁহার মানসিকশক্তি অপেক্ষা প্রবল হইল। এবং সেই নিমিত্ত যে শাপ এবং শাপোদ্ভূত ঘটনাবলী মহাভারতের আখ্যায়িকায় নাই মহাকবি তাহা কল্পনা করিলেন। এই কল্পনার গুণে মহাভারতের অসম্পূর্ণ আখ্যায়িকা সংসারক্ষেত্রের সম্পূর্ণ চিত্র হইয়া উঠিল।

মহাভারতের উপাখ্যানে একটি দৈববাণীর কথা আছে। দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া শকুন্তলা যখন ক্রোধভরে পৌরবসভা হইতে চলিয়া যাইতেছেন তখন দৈববাণী হইল যে, তিনি দুষ্মন্তের পরিণীতা ভার্য্যা। সেই দৈববাণী শুনিয়া সকলে বুঝিল যে, শকুন্তলা যথার্থই

দুষ্মন্তের পত্নী এবং দুষ্মন্তও তখন লোকাপবাদের ভয় হইতে মুক্ত হইয়া শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন। কালিদাসের উপাখ্যানে সে দৈববাণী নাই। কেন না যেখানে দুর্ব্বাসার শাপ সেখানে সে দৈববাণী থাকিতে পারে না এবং থাকিলে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার বিহিত যন্ত্রণাভোগ হয় না। অতএব কালিদাস সে দৈববাণীর কথা পরিত্যাগ করিয়া অন্য রকমে তাঁহার নায়ক এবং নায়িকার মিলন সঙ্ঘটন করিলেন। অঙ্গুরীয় পুনঃপ্রাপ্তিদ্বারা দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পরিণয় প্রমাণীকৃত হইল এবং দুষ্মন্তও সেই অঙ্গুরীয় দেখিয়া বিষম যন্ত্রণাভোগকরতঃ তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। পরে সেই যন্ত্রণাবিহ্বল অবস্থায় দুষ্মন্ত তাঁহার গভীর আভ্যন্তরভাবের এবং অসাধারণ মোহবিজয়ীশক্তির একটি আশ্চর্য্য পরিচয় প্রদানকরতঃ তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির উৎকৃষ্টতা সাব্যস্ত করিলে পর পুরস্কারস্বরূপ রমণীরত্ন শকুন্তলাকে পুনর্লাভ করিলেন।

কালিদাস মহাভারতের উপাখ্যান কি প্রণালীতে পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন তাহা বুঝাইলাম। পরিবর্ত্তনানন্তর উপাখ্যানটি কি রকম ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা একবার বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। কালিদাসের উপাখ্যানের প্রধান প্রধান ঘটনা এই :—প্রথম, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার অবতারণা; দ্বিতীয়, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার প্রণয়সঞ্চার এবং ঐন্দ্রিয়িক মিলন; তৃতীয়, দুর্ব্বাসার শাপ, এবং দুষ্মন্তকর্ত্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান; চতুর্থ, অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শনানন্তর দুষ্মন্তের যন্ত্রণাভোগ; পঞ্চম, দুষ্মন্তের দেবলোকে দেবশত্রুদমন; ষষ্ঠ, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পুনর্ম্মিলন। যখন দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা প্রথম আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত, তখন উভয়কেই আমরা বিকাসোন্মুখ মুকুলের মতন দেখিতে পাই। উভয়েই যেন একটি বিশেষ অবস্থার দিকে যাইতেছেন, যেন একটি বিশেষ অবস্থায় আসিয়া পড়িলেন পড়িলেন, যেন প্রণয়ানুরাগে মুগ্ধ হইলেন হইলেন, যেন ঊষা ভাঙ্গিয়া দিবালোক প্রকাশ হয় হয়। দেখিতে দেখিতে মুকুল যেমন ফুটিয়া পড়ে, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার সেই অস্ফুটরাগও তেমনি পূর্ণ-গৌরবে প্রদীপ্ত হইল—যেন ঊষার অস্ফুট রাগ মধ্যাহ্ন রবির বিশ্বদগ্ধকারী কিরণরূপে রাগিয়া উঠিয়া দিগ্‌দিগন্ত অগ্নিময় করিয়া তুলিয়াছে—দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা সেই বিষম অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া তৃণনির্ম্মিত পুত্তলির ন্যায় ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছেন, যেন তাঁহাদের চেতনা নাই, জ্ঞান নাই, সাহস নাই, শক্তি নাই—যেন তাঁহারা জড়জগতের জড়তামাত্র। সহসা এক ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন। কোথায় হইতে যেন এক অসীম তেজঃসম্পন্ন জ্ঞানময় অনন্তপুরুষ আসিয়া সেই অগ্নিরাশি নিবাইয়া দিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন প্রলয়-তিমিরে ডুবিয়া গেল, সেই মহাপ্রলয়ে

শকুন্তলা কোথায় তাহার ঠিকানা নাই, দুষ্মন্ত প্রলয়যন্ত্রণার প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় প্রলয়াধীন। অকস্মাৎ এক মহাবাক্য শ্রুত হইল। দুষ্মন্ত প্রলয়ভেদ করিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হাসিয়া উঠিল, স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইল, অপূর্ব্ব প্রভায় প্রভাসিত হইল। সেই অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডে, সেই স্বর্গীয় আলোকে, সেই হেমকূটশিখরস্থিত বৈকুণ্ঠসদৃশ পুণ্যাশ্রমে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা পতিপত্নীভাবে দণ্ডায়মান— উভয়েই পাণ্ডুবর্ণ, উভয়েই শীর্ণদেহ, উভয়েই বিমর্ষ, যেন অতি নির্ম্মলজ্যোতির্ম্ময়-পরমাত্মাশ্রিত দুইখানি পবিত্র চেতনাখণ্ড! কি দেখিয়াছিলাম, আবার কি দেখিতেছি! বসন্তের রাগগর্ভ মুকুল শরতের ম্রিয়মাণ কুসুমে পরিণত হইয়াছে। রাগময় জড়তা চিন্ময় ভাবে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী হইতে স্বর্গ—এই অদ্ভুত নাটকের রঙ্গভূমি। পৃথিবী হইতে স্বর্গ—এই মহাকবির মহাস্বপ্নের আকার। পৃথিবী হইতে স্বর্গ—এই মহাদর্শকের মহাদৃষ্টির পরিমাণ। গেটে সত্যই বলিয়াছেন—

"Wouldst thou the young year's blossoms and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed, enraptured feasted, fed ?
Would thou the earth and heaven itself in one sole name combine ?
I name thee, O Sakoontala ! and all at once is said."

এই জড়তাময় পৃথিবী এবং এই দিব্যালোকপূর্ণ স্বর্গ!—যিনি এই জড়তাময় পৃথিবী চরণে দলিত করিতে পারেন, এই দিব্যালোকপূর্ণ স্বর্গ তাঁহারই, তিনিই এই দিব্যালোকপূর্ণ স্বর্গের নির্ম্মাণকর্ত্তা। যিনি এই জড়তাময় পৃথিবীর প্রতি আত্মাময় পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই এই পৃথিবীতে স্বর্গস্থাপন করেন। প্রকৃতি এবং পুরুষ পরস্পর স্বাধীন। কিন্তু যিনি প্রকৃতিকে পুরুষের শাসনাধীন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত পুরুষ। দুষ্মন্ত প্রকৃত পুরুষ বলিয়াই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিলেন। মহাকবি তাঁহার বিশাল চিত্রপটে এই আশ্চর্য্য পরিণতি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সে চিত্রের বিস্তার— পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত। সে চিত্রে গ্রীক নাটকের আকারগত সৌন্দর্য্য, কর্ম্মাণনাটকের প্রণালীগত আধ্যাত্মিকতা, এবং ইংরেজীনাটকের কার্য্যগত জীবন্তভাব পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। সেই সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর গূঢ়রহস্যাত্মক মহাপটের নাম অভিজ্ঞানশকুন্তল।

অভিজ্ঞান শকুন্তলের গল্প মহাভারতের গল্প অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট তাহা দেখা হইল। দুই গল্পের মূল এক, কিন্তু পরিণতি বিভিন্ন। এই বিভিন্নতার গুণেই নাটকের গল্পটির উৎকর্ষ। এই বিভি-

ময়তা সম্পাদনই নাটককারের কার্য্য। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে সেই কার্য্য কি আশ্চর্য্য প্রতিভা সহকারে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়! মনুষ্যমাত্রই যেন জীবনরূপ মহানাটকে সেই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন।

আনন্দ মঠ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবানন্দ চলিয়া গেলে পর শান্তি নিমাইয়ের দাওয়ার উপর গিয়া বসিল। নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বসিল। শান্তির চোখে আর জল নাই; শান্তি চোখ মুছিয়াছে, মুখ প্রফুল্ল করিয়াছে, একটু একটু হাঁসিতেছে। কিছু গম্ভীর, কিছু চিন্তাযুক্ত, অন্যমনা। নিমাই বুঝিয়া বলিল

"তবুতো দেখা হলো।"

শান্তি কিছু উত্তর করিল না, চুপ করিয়া রহিল। নিমাই দেখিল শান্তি মনের কথা কিছু বলিবে না। শান্তি মনের কথা বলিতে ভাল বাসে না তাহা নিমাই জানিত। সুতরাং নিমাই চেষ্টা করিয়া অন্য কথা পাড়িল—বলিল

"দেখ দেখি বউ কেমন মেয়েটী।"

শান্তি বলিল

"মেয়ে কোথা পেলি—তোর মেয়ে হলো কবে লো।"

নিমা। "মরণ আর কি—তুমি যমের বাড়ী যাও—এযে দাদার মেয়ে।"

নিমাই শান্তিকে জ্বালাইবার জন্য এ কথাটা বলে নাই। "দাদার মেয়ে" অর্থাৎ দাদার কাছে যে মেয়েটী পাইয়াছি। শান্তি তাহা বুঝিল না; মনে করিল, শান্তি বুঝি সূচ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব শান্তি উত্তর করিল,

"আমি মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—মার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"

নিমাই উচিত শাস্তি পাইয়া অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"কার মেয়ে কি জানি ভাই, দাদা কোথা থেকে কুড়িয়ে মুড়িয়ে এনেছে, তা জিজ্ঞাসা করবার তো অবসর হলো না! তা এখন মন্বন্তরের দিন, কত লোক ছেলে পিলে পথে ঘাটে ফেলিয়া দিয়া যাইতেছে; আমাদের কাছেই কত মেয়ে ছেলে বেচিতে আনিয়াছিল—তা পরের মেয়ে ছেলে কে আবার নেয়?" (আবার সেই চক্ষে সেইরূপ জল আসিল—নিমি চক্ষের জল মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল)

"মেয়েটী দিব্য সুন্দর, নাদুস নুদুস চাঁদপানা দেখে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছি।"

তার পর শান্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিমাইয়ের সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন

করিল। পরে নিমাইয়ের স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিল দেখিয়া শান্তি উঠিয়া আপনার কুটীরে গেল। কুটীরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উননের ভিতর হইতে কতকগুলি ছাই বাহির করিয়া তুলিয়া রাখিল। অবশিষ্ট ছাইয়ের উপর, নিজের জন্য যে ভাত রান্না ছিল, তাহা ফেলিয়া দিল। তার পরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনা আপনি বলিল, "এতদিন যাহা মনে করেছিলাম, আজ তাহা করিব। যে আশায় এত দিন করি নাই তাহা সফল হইয়াছে। সফল কি নিষ্ফল— নিষ্ফল! এ জীবনই নিষ্ফল! যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি তাহা করিব। এক বারেও যে প্রায়শ্চিত্ত, শত বারেও তাই।"

এই ভাবিয়া শান্তি ভাত গুলি উননে ফেলিয়া দিল। বন হইতে গাছের ফল পাড়িয়া আনিল। অন্নের পরিবর্ত্তে তাহাই ভোজন করিল। তার পর তাহার যে ঢাকাই শাড়ীর উপর নিমাইমণির চোট তাহা বাহির করিয়া তাহার পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিল। বস্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট রহিল গেরিমাটীতে তাহা বেশ করিয়া রঙ করিল। বস্ত্র রঙ করিতে, শুকাইতে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা হইলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অতি চমৎকার ব্যাপারে শান্তি ব্যাপৃত হইল। মাথার রুক্ষ আগুল্‌ফলম্বিত কেশদামের কিয়দংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া পৃথক করিয়া রাখিল। অবশিষ্ট যাহা মাথায় রহিল তাহা বিনাইয়া বিনাইয়া জটা তৈয়ারি করিল। রুক্ষকেশ অপূর্ব্ব বিন্যাসবিশিষ্ট জটাভারে পরিণত হইল। তারপর সেই গৈরিক বসন খানি অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া ধড়া করিয়া চারু অঙ্গে শান্তি পরিধান করিল। অবশিষ্ট অর্দ্ধেকে হৃদয় আচ্ছাদিত করিল। কিন্তু কিছুইতো ঢাকিল না। সে হৃদয়ের অপূর্ব্ব গঠন-শোভা বস্ত্রের উপর হইতে সম্পূর্ণ অনুমেয় রহিল। ঘরে এক খানি ক্ষুদ্র দর্পণ ছিল, বহুকালের পর শান্তি সেখানি বাহির করিল; বাহির করিয়া দর্পণে আপনার বেশ আপনি দেখিল। দেখিয়া বলিল "হায়! কি করিয়া কি করি।" তখন দর্পণ ফেলিয়া দিয়া, যে চুলগুলি কাটা পড়িয়া ছিল তাহা লইয়া শ্মশ্রু গুম্ফ রচিত করিল। চাঁদমুখ খানি নবীন দাড়ি গোঁপে শোভা পাইতে লাগিল। তার পর ঘরের ভিতর হইতে এক বৃহৎ হরিণচর্ম্ম বাহির করিয়া কণ্ঠের উপর গ্রন্থি দিয়া কণ্ঠ হইতে জানু পর্য্যন্ত শরীর আবৃত করিল। যদি কোন কবি সে রূপ দেখিত, তাহা হইলে এই নবীন "কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানাকে" দেখিয়া এবার মন্মথের বিনাশ দূরে থাকুক, পুনরুজ্জীবনের শঙ্কা করিত। এইরূপে সজ্জিত হইয়া সেই নূতন সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে ধীরে ধীরে চারিদিক নিরীক্ষণ করিল। নিরীক্ষণ করিয়া কেহ কোথায় নাই নিশ্চিত বুঝিয়া, অতি গোপনে সংরক্ষিত একটী পেটিকা খুলিল। খুলিয়া তাহা হইতে একটী মোট বাহির করিল। মোট খুলিয়া তাহার ভিতর যাহা ছিল তাহা মাটীর উপরে সাজাইল। কতকগুলি ফুল

টের পুঁথি। ভাবিল "এগুলি কি করি, সঙ্গে লইয়া গিয়া কি হইবে? এত বা বহিব কি প্রকারে? রাখিয়া গিয়াই বা কি হইবে? রাখাই বা আর প্রয়োজন কি—দেখিয়াছি জ্ঞানেতে আর সুখ নাই, ও ভস্মরাশিমাত্র—ও ভস্ম ভস্মই হোক।"—এই বলিয়া শান্তি সেই গ্রন্থগুলি একে একে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। কাব্য, সাহিত্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, আর কি কি তাহা এখন বলিতে পারি না, পুড়িয়া ভস্মাবশিষ্ট হইল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে শান্তি সেই সন্ন্যাসী বেশে দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক অন্ধকারে একাকিনী গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রামবাসীগণ সেই নিশীথ কানন মধ্যে অপূর্ব্ব গীতধ্বনি শ্রবণ করিল।

গীত।*

"দড় বড়ি ঘোড় চড়ি কোথা তুমি যাও রে।"†
সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণ রঙ্গে,
ঝাঁপ দিব প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে,
তুমি কার, কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে,
রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাও রে॥"

২

"পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমাছেড়ে যেও না।"
"ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা।
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ করে কামনা,
উড়িল আমার মন, ঘরে আর রবনা,
রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাওরে।"

---

*রাগিণী বাগীশ্বরী বাহার—তাল আড়া।

†এই গীতের " " চিহ্নিত উক্তির উত্তর " " চিহ্নিত পরবর্ত্তী কয় চরণ।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন আনন্দ মঠের ভিতর নিভৃত কক্ষে বসিয়া ভগ্নোৎসাহ সন্তান নায়ক তিন জন কথোপকথন করিতেছিলেন। জীবানন্দ সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! দেবতা আমাদিগের প্রতি এমন অপ্রসন্ন কেন? কি দোষে আমরা মুসলমানের নিকট পরাভূত হইলাম।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "দেবতা অপ্রসন্ন নহেন। যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়েই আছে। সে দিন আমরা জয়ী হইয়াছিলাম, আজ পরাভূত হইয়াছি। শেষ জয়ই জয়। আমার নিশ্চিত ভরসা আছে, যে যিনি এতদিন আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন, সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বনমালী আবার পুনর্ব্বার দয়া করিবেন। তাঁহার পাদ স্পর্শ করিয়া যে মহাব্রতে আমরা ব্রতী হইয়াছি, অবশ্য সে ব্রত আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। বিমুখ হইলে আমরা অনন্ত নরক ভোগ করিব। আমাদের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন দৈবানুগ্রহ ভিন্ন কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না, তেমনি পুরুষকারও চাই। আমরা যে পরাভূত হইলাম, তাহার কারণ এই, যে আমরা নিরস্ত্র। গোলাগুলি বন্দুক কামানের কাছে লাটি সোঁটা বল্লমে কি হইবে।

অতএব আমাদিগের পুরুষকারের লাঘব ছিল বলিয়াই এই পরাভব হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য, যাহাতে আমাদিগেরও ঐরূপ অস্ত্রের অপ্রতুল না হয়।"

জীব। সে অতি কঠিন ব্যাপার।

সত্য। কঠিন ব্যাপার জীবানন্দ? সন্তান হইয়া তুমি এমন কথা মুখে আনিলে? সন্তানের পক্ষে কঠিন কাজ আছে কি?

জীব। কিপ্রকারে তাহার সংগ্রহ করিব আজ্ঞা করুন।

সত্য। সংগ্রহের জন্য আমি অদ্য রাত্রে তীর্থযাত্রা করিব। যতদিন না ফিরিয়া আসি, তত দিন তোমরা কোন গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিও না। কিন্তু সন্তানদিগের একতা রক্ষা করিও। তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইও, এবং মার রণ জয়ের জন্য অর্থ ভাণ্ডার পূর্ণ করিও। এই ভার তোমাদিগের দুই জনের উপর রহিল।

ভবানন্দ বলিল, "তীর্থযাত্রা করিয়া এ সকল সংগ্রহ করিবেন কিপ্রকারে? গোলাগুলী বন্দুক কামান কিনিয়া পাঠাইতে বড় গোলমাল হইবে। আর এত পাইবেন বা কোথা, বেচিবে বা কে, আনিবে বা কে?"

সত্য। কিনিয়া আনিয়া আমরা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। আমি কারিগর পাঠাইয়া দিব, এইখানে প্রস্তুত করিতে হইবে।

জীব। সে কি এই আনন্দ মঠে?

সত্য। তাও কি হয়। ইহার উপায় আমি বহুদিন হইতে চিন্তা করিতেছি। ঈশ্বর অদ্য তাহার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। তোমরা বলিতেছিলে, ভগবান প্রতিকূল, আমি দেখিতেছি তিনি অনুকূল।

ভব। কোথায় কারখানা হইবে।

সত্য। পদচিহ্নে।

জীব। সে কি? সেখানে কি প্রকারে হইবে?

সত্য। নহিলে কি জন্য আমি মহেন্দ্র সিংহকে এ মহাব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য এত আকিঞ্চন করিয়াছি?

ভব। মহেন্দ্র কি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?

সত্য। ব্রত গ্রহণ করে নাই, করিবে। আজ রাত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিব।

জীব। কই, মহেন্দ্র সিংহকে ব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য কি আকিঞ্চন হইয়াছে, তাহা আমরা দেখি না। তাহার স্ত্রী কন্যার কি অবস্থা হইয়াছে? কোথায় তাহাদিগকে রাখিল? আমি আজ একটি কন্যা নদী তীরে পাইয়া, আমার ভগিনীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছি। সেই কন্যার নিকট একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়াছিল। সে তো মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা নয়? আমার তাই বোধ হইয়াছিল।

সত্য। সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা।

ভবানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন যে, যে স্ত্রীলোককে তিনি ঔষধ-বলে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণী। কিন্তু এক্ষণে কোন কথা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না।

জীবানন্দ বলিল, "মহেন্দ্রের স্ত্রী মরিল কিসে ?"

সত্য। বিষ পান করিয়া।

জীব। কেন সে বিষ খাইল ?

সত্য। ভগবান্ তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন।

ভব। সে স্বপ্নাদেশ কি, সন্তানের কার্য্যোদ্ধারের জন্যই হইয়াছিল ?

সত্য। মহেন্দ্রের কাছে সেইরূপই শুনিলাম। এক্ষণে সায়াহ্নকাল উপস্থিত, আমি সায়ংকৃত্যাদি সমাপনে চলিলাম। তৎপরে নূতন সন্তানদিগকে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ভব। সন্তানদিগকে ? কেন মহেন্দ্র ব্যতীত আর কেহ আপনার নিজ শিষ্য হইবার স্পর্দ্ধা রাখে না কি ?

সত্য। হাঁ, আর একটী নূতন লোক। পূর্ব্বে আমি তাহাকে কখন দেখি নাই। আজ নূতন আমার কাছে আসিয়াছে। সে অতি তরুণ বয়স্ক যুবা পুরুষ। আমি তাহার আকারেঙ্গিতে ও কথা বার্ত্তায় অতিশয় প্রীত হইয়াছি। খাঁটী সোনা বলিয়া তাহাকে বোধ হইয়াছে। তাহাকে সন্তানের কার্য্যশিক্ষা করাইবার ভার, জীবানন্দের প্রতি রহিল। কেননা জীবানন্দ, লোকের চিত্তাকর্ষণে বড় সুদক্ষ। আমি চলিলাম, তোমাদের প্রতি আমার একটী উপদেশ বাকি আছে। অতিশয় মনঃসংযোগ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর।

তখন উভয়ে যুক্ত কর হইয়া নিবেদন করিল, আজ্ঞা করুন।

সত্যানন্দ বলিলেন "তোমরা দুই জনে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাক, অথবা আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে কর, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি না আসিলে করিও না। আমি আসিলে, প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে।"

এই বলিয়া সত্যানন্দ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ভবানন্দ এবং জীবানন্দ উভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিল।

ভবানন্দ বলিল "তোমার উপর নাকি ?"

জীব। বোধ হয়। ভগিনীর বাড়ীতে মহেন্দ্রের কন্যা রাখিতে গিয়াছিলাম।

ভব। তাতে দোষ কি, সেটা তো নিষিদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছ কি ?

জীব। বোধ হয় গুরুদেব তাই মনে করেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

সায়াহ্নকৃত্য সমাপনান্তে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া সত্যানন্দ আদেশ করিলেন,

"তোমার কন্যা জীবিত আছে।"

মহে। কোথায় মহারাজ ?

সত্য। তুমি আমাকে মহারাজ বলিতেছ কেন ?

মহে। সকলেই বলে, তাই। মঠের অধিকারীদিগকে রাজ সম্বোধন করিতে হয়। আমার কন্যা কোথায় মহারাজ !

সত্য। তা শুনিবার আগে, একটা

কথার স্বরূপ উত্তর দাও। তুমি সন্তান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে?

মহে। তাহা নিশ্চিত করিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছি।

সত্য। তবে কন্যা কোথায় শুনিতে চাহিও না।

মহে। কেন মহারাজ!

সত্য। যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজন বর্গ কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে হয় না। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। যত দিন না সন্তানের মানসসিদ্ধ হয়, তত দিন, তুমি কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে না। অতএব যদি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ তোমার স্থির হইয়া থাকে, তবে কন্যার সন্ধান জানিয়া কি করিবে? দেখিতে ত যাইবে না।

মহে। এ কঠিন নিয়ম কেন প্রভু?

সত্য। সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্ব্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেহ এ কাজের উপযুক্ত নহে। মায়ারজ্জুতে যাহার চিত্ত বদ্ধ থাকে, লকে বাঁধা ঘুঁড়ির মত সে কখন মাটি ছাড়িয়া স্বর্গে উঠিতে পারে না।

মহে। মহারাজ, কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। যে স্ত্রী পুত্রের মুখদর্শন করে, সে কি কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী নহে?

সত্য। পুত্র কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই। সন্তানধর্ম্মের নিয়ম এই যে, যে দিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে?

মহে। তাহাকে না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব?

সত্য। না ভুলিতে পার, এ ব্রত গ্রহণ করিও না।

মহে। সন্তান মাত্রেই কি এইরূপ পুত্র কলত্রকে বিস্মৃত হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছে? তাহা হইলে সন্তানেরা সংখ্যায় অতি অল্প।

সত্য। সন্তান দ্বিবিধ, দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী। তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, লুটের ভাগ বা অন্য পুরস্কার পাইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত, তাহারা সর্ব্বত্যাগী। তাহারাই সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। তোমাকে অদীক্ষিত সন্তান হইতে অনুরোধ করি না। যুদ্ধের জন্য লাঠী সড়কীওয়ালা অনেক আছে। দীক্ষিত না হইলে তুমি সম্প্রদায়ের কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী হইবে না।

মহে। দীক্ষা কি? দীক্ষিত হইতে হইবে কেন? আমি ত ইতি পূর্ব্বেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি।

সত্য। সে মন্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার নিকট পুনর্ব্বার মন্ত্র লইতে হইবে।

মহে। মন্ত্র ত্যাগ করিব কি প্রকারে?

সত্য। আমি সে পদ্ধতি বলিয়া দিতেছি।

মহে। নূতন মন্ত্র লইতে হইবে কেন?

সত্য। সন্তানেরা বৈষ্ণব।

মহে। ইহা বুঝিতে পারি না। সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম্ম।

সত্য। সে চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেননা, বিষ্ণুই সংসারের পালন কর্ত্তা। দশবার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধার-কর্ত্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান্ কেবল প্রেমময় নহেন— তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্য দেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব— কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব। কথাটা বুঝিলে?

মহে। না। এ যে কেমন নূতন নূতন কথা শুনিতেছি। কাশিম বাজারে একটা পাদরির সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল—সে ঐ রকম কথা সকল বলিল—অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমময়—তোমরা যীশুকে প্রেম কর—এ যে সেই রকম কথা।

সত্য। যে রকম কথায় আমাদিগের চতুর্দ্দশ পুরুষ বুঝিয়া আসিতেছে, সেই রকম কথায় আমি তোমায় বুঝাইতেছি। ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক, তাহা শুনিয়াছ?

মহে। হাঁ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ।

সত্য। ভাল। এই তিনটি গুণের পৃথক পৃথক উপাসনা। সত্ত্ব গুণ হইতে তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যাদির উৎপত্তি; তাহার উপাসনা ভক্তির দ্বারা করিবে। চৈতন্যের সম্প্রদায় তাহা করে। আর রজো গুণ হইতে তাঁহার শক্তির উৎপত্তি; ইহার উপাসনা যুদ্ধের দ্বারা—দেবদ্বেষীদিগের নিধন দ্বারা—আমরা তাহা করি।* আর তমো গুণ হইতে ভগবান শরীরী—চতুর্ভুজাদি রূপ ইচ্ছাক্রমে ধারণ করিয়াছেন। স্রক্ চন্দনাদি উপহারের দ্বারা সে গুণের পূজা করিতে হয়—সর্ব্বসাধারণে তাহা করে। এখন বুঝিলে?

মহে। বুঝিলাম। সন্তানেরা তবে উপাসক সম্প্রদায় মাত্র?

সত্য। তাই। আমরা রাজ্য চাহি না— কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।

---

* এ মত কেবল একা সত্যানন্দের নহে। ইউরোপের Knights Templar প্রভৃতি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কথা এখানে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। সত্যানন্দের যে মত মহম্মদের অনুচরবর্গেরও সেই মত।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সত্যানন্দ কথাবার্ত্তা সমাপনান্তে মহেন্দ্রের সহিত সেই মঠস্থ দেবালয়াভ্যন্তরে, যেখানে সেই অপূর্ব্ব শোভাময় প্রকাণ্ডাকার চতুর্ভুজমূর্ত্তি বিরাজিত, তথায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে তখন অপূর্ব্ব শোভা। রজত, স্বর্ণ ও রত্নে রঞ্জিত বহুবিধ প্রদীপে, মন্দির আলোকিত হইয়াছে। রাশি রাশি পুষ্প স্তূপাকারে শোভা করিয়া, মন্দির আমোদিত করিতেছিল। মন্দিরে আর এক জন উপবেশন করিয়া মৃদু মৃদু "হরে মুরারে" শব্দ করিতেছিল। সত্যানন্দ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র সে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি দীক্ষিত হইবে?"

সে বলিল, "আমাকে অনুগ্রহ করুন।"

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা যথাবিধ স্নাত, সংযত, এবং অনশন আছ ত?"

উত্তর। আছি।

সত্য। তোমরা এই ভগবৎ সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর। সন্তানধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন করিবে?

উভয়ে। করিব।

সত্য। যত দিন না মাতার উদ্ধার হয়, তত দিন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। মাতা পিতা ত্যাগ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। ভ্রাতা ভগিনী?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। দারা সুত?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। আত্মীয় স্বজন? দাস দাসী?

উভ সকলই ত্যাগ করিলাম।

সত্য। ধন—সম্পদ—ভোগ?

উভ। সকলই পরিত্যাজ্য হইল।

সত্য। ইন্দ্রিয় জয় করিবে? স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখন একাসনে বসিবে না?

উভ। বসিব না। ইন্দ্রিয় জয়করিব।

সত্য। ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবে না? যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহা বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে?

উভ। দিব।

সত্য। সনাতন ধর্ম্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে?

উভ। করিব?

সত্য। রণে কখন ভঙ্গ দিবে না।

উভ। না।

সত্য। যদি প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গা হয়?

উভ। জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

সত্য। আর এক কথা—জাতি। তোমরা কি জাতি? মহেন্দ্র কায়স্থ জানি। অপরটি কি জাতি?

অপর ব্যক্তি বলিল "আমি ব্রাহ্মণকুমার।"

সত্য। উত্তম। তোমরা জাতিত্যাগ

করিতে পারিবে? সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহা ব্রতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বল?

উভ। আমরা সে বিচার করিব না। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্য। তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইহার সাক্ষী। যিনি রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি বিনাশহেতু, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বজয়ী, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বনিয়ন্তা, যিনি ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জ্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন, তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।

উভ। তথাস্তু।

সত্য। তোমরা গাও "বন্দে মাতরং।"

উভয়ে সেই নিভৃত মন্দির মধ্যে মাতৃস্তোত্র গীত করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাদিগকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

দীক্ষা সমাপনান্তে সত্যানন্দ, মহেন্দ্রকে অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন,

"দেখ বৎস! তুমি যে এই মহাব্রত গ্রহণ করিলে, ইহাতে ভগবান আমাদের প্রতি অনুকূল বিবেচনা করি। তোমার দ্বারা মার সুমহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। তুমি যত্নে আমার আদেশ শ্রবণ কর। তোমাকে জীবানন্দ, ভবানন্দের সঙ্গে বনে বনে ফিরিয়া যুদ্ধ করিতে বলি না। তুমি পদচিহ্নে ফিরিয়া যাও। স্বধামে থাকিয়াই তোমাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।"

মহেন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত ও বিমর্ষ হইলেন। কিছু বলিলেন না। ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, "এক্ষণে আমাদিগের আশ্রয় নাই, এমন স্থান নাই যে প্রবল সেনা আসিয়া আমাদিগকে অবরোধ করিলে আমরা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দশ দিন নির্ব্বিঘ্নে থাকি। আমাদিগের গড় নাই। তোমার অট্টালিকা আছে, তোমার গ্রাম তোমার অধিকার। আমার ইচ্ছা সেই খানে একটী গড় প্রস্তুত করি। পরিখা প্রাচীরের দ্বারা পদচিহ্ন বেষ্টিত করিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে ঘাঁটি বসাইয়া দিলে, আর বাঁধের উপর কামান বসাইয়া দিলে, উত্তম গড় প্রস্তুত হইতে পারিবে। তুমি গৃহে গিয়া বাস কর, ক্রমে ক্রমে দুই হাজার সন্তান সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবে। তাহাদিগের দ্বারা গড়, ঘাঁটি বাঁধ এই সকল তৈয়ার করিতে থাকিবে। তুমি সেখানে উত্তম লৌহ নির্ম্মিত এক ঘর প্রস্তুত করাইবে। সেখানে সন্তানদিগের অর্থের ভাণ্ডার হইবে। সুবর্ণে পূর্ণ সিন্দুক সকল তোমার কাছে একে একে প্রেরণ করিব। তুমি সেই সকল অর্থের দ্বারা এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। আর আমি নানা স্থান

হইতে কৃতকর্ম্মা শিল্পী সকল আনাইতেছি। শিল্পী সকল আসিলে তুমি পদচিহ্নে কারখানা স্থাপন করিবে। সেখানে কামান, গোলা, বারুদ, বন্দুক প্রস্তুত করাইবে। এই জন্য তোমাকে গৃহে যাইতে বলিতেছি।

মহেন্দ্র স্বীকৃত হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র সত্যানন্দের পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলে, তাহার সঙ্গে যে দ্বিতীয় শিষ্য, সেই দিন দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন। সত্যানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া কৃষ্ণাজিনের উপর বসিতে অনুমতি করিলেন। পরে অন্যান্য মিষ্ট কথার পর বলিলেন, কেমন কৃষ্ণে তোমার গাঢ় ভক্তি আছে কি না?

শিষ্য বলিল, কি প্রকারে বলিব। আমি যাহাকে ভক্তি মনে করি, হয় ত সে ভণ্ডামি, নয় ত আত্ম-প্রতারণা।

সত্যানন্দ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাল বিবেচনা করিয়াছ। যাহাতে ভক্তি দিন দিন প্রগাঢ় হয়, সেই অনুষ্ঠান করিও। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার যত্ন সফল হইবে। কেন না তুমি অতি নবীনবয়াঃ। বৎস, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব, তাহা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই।"

নূতন সন্তান বলিল, আপনার যাহা অভিরুচি, আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস।

সত্য। তোমার নবীন বয়স দেখিয়া তোমায় নবীনানন্দ বলিতে ইচ্ছা করে—অতএব এই নাম তুমি গ্রহণ কর। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পূর্ব্বে কি নাম ছিল? যদি বলিতে কোন বাধা থাকে, তথাপি বলিও। আমার কাছে বলিলে কর্ণান্তরে প্রবেশ করিবে না। সন্তান-ধর্ম্মের মর্ম্ম এই—যে যাহা অবাচ্য, তাহাও গুরুর নিকট বলিতে হয়। বলিলে কোন ক্ষতি হয় না।

শিষ্য। আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্ম্মা।

সত্য। তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা। এই বলিয়া সত্যানন্দ, শিষ্যের কাল কুচ্ কুচে দেড় হাত লম্বা দাড়ি বাম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া এক টান দিলেন। জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল।

সত্যানন্দ বলিলেন,

"ছি মা! আমার সঙ্গে প্রতারণা—আর যদি আমাকেই ঠকাবে, ত এ বয়সে দেড় হাত দাড়ি কেন? আর দাড়ি খাট করিলেও কণ্ঠের স্বর—ও চখের চাহনি, এ বুড়োর কাছে কি লুকাতে পার? যদি এমন নির্ব্বোধই হইতাম, তবে কি এত বড় কাজে হাত দিতাম?"

শান্তি পোড়ার মুখী, তখন দুই হাতে দুই চোক ঢাকা দিয়া, কিছু ক্ষণ অধোবদনে বসিল। পরক্ষণেই হাত নামাইয়া বুড়োর মুখের উপর বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, বলিল "প্রভু, দোষই বা কি করিয়াছি। স্ত্রী-বাহুতে কি কখন বল থাকে না?"

সত্য। গোষ্পদে যেমন জল।

শান্তি। সন্তানদিগের বাহুবল কি আপনি কখন পরীক্ষা করিয়া থাকেন?

সত্য। থাকি।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, এক ইস্পাতের ধনুক, আর লোহার কতকটা তার আনিয়া দিলেন, বলিলেন যে এই ইস্পাতের ধনুকে এই লোহার তারের গুণ দিতে হয়। গুণের পরিমাণ দুই হাত। গুণ দিতে দিতে ধনুক উঠিয়া পড়ে. যে গুণ দেয়, তাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। যে গুণ দিতে পারে, সেই প্রকৃত বলবান্।

শান্তি ধনুক ও তার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল "সকল সন্তান কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে?"

সত্য। না, ইহাদ্বারা তাহাদিগের বল বুঝিয়াছি মাত্র।

শান্তি। কেহ কি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই।

সত্য। দুই জন মাত্র।

শান্তি। জিজ্ঞাসা করিব কি, কে কে?

সত্য। নিষেধ কিছু নাই। এক জন আমি।

শান্তি। দ্বিতীয়?

সত্য। জীবানন্দ।

শান্তি ধনুক লইল, তার লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া, সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল।

সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত এবং স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "একি? তুমি দেবী না মানবী?"

শান্তি করযোড়ে বলিল, আমি সামান্যা মানবী। কিন্তু আমি ব্রহ্মচারিণী।

সত্য। তাই বা কিসে? তুমি ভৈরবী নও, বৈষ্ণবী নও, তবে কি বালবিধবা? না বালবিধবারও এত বল হয় না, কেননা তাহারা একাহারী।

শান্তি। আমি সধবা।

সত্য। তোমার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট।

শান্তি। উদ্দিষ্ট। তাঁহার উদ্দেশেই আসিয়াছি।

সহসা মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের ন্যায় স্মৃতি সত্যানন্দের চিত্তকে প্রভাসিত করিল। তিনি বলিলেন, "মনে পড়িয়াছে, জীবানন্দের স্ত্রীর নাম শান্তি। তুমি কি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী?"

এবার জটাভারে নবীনানন্দ মুখ ঢাকিল। যেন কতকগুলা হাতীর শুঁড়, রাজীবরাজির উপর পড়িল। সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন "কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে?"

শান্তি সহসা জটাভার পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত করিয়া উন্নত মুখে বলিল,

"পাপাচরণ কি প্রভু? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ? সন্তানধর্ম্মশাস্ত্র, যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তান ধর্ম্ম অধর্ম্ম। আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করিতে আসিয়াছি।

শান্তির তেজস্বিনী বাণী শুনিয়া, উন্নত গ্রীবা, স্ফীত বক্ষ, কম্পিত অধর এবং

উজ্জ্বল অথচ অশ্রুপ্লুত চক্ষু দেখিয়া সত্যানন্দ প্রীত হইলেন। বলিলেন

"তুমি সাধ্বী। কিন্তু দেখ মা—পত্নী কেবল গৃহ-ধর্ম্মেই সহধর্ম্মিণী—বীর-ধর্ম্মে রমণী কি?

শান্তি। কোন্ মহাবীর অপত্নীক হইয়া, বীর হইয়াছেন? রাম সীতা নহিলে কি বীর হইতেন? অর্জ্জুনের কতগুলি বিবাহ গণনা কর দেখি? ভীমের যত বল ততগুলি পত্নী। কত বলিব? আপনাকে বলিতেই বা কেন হইবে?

সত্য। কথা সত্য, কিন্তু রণ-ক্ষেত্রে কোন্ বীর জায়া লইয়া আইসে?

শান্তি। অর্জ্জুন যখন যাদবীসেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালাইয়াছিল? দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকিলে পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝিত?

সত্য। তা হউক, সামান্য মনুষ্য দিগের মন স্ত্রীলোকে আসক্ত এবং কার্য্যবিরত করে। এই জন্য সন্তানের ব্রতই এই, যে রমণীজাতির সঙ্গে, একা সনে উপবেশন করিবে না। জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ?

শান্তি। আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি; স্বামী সন্দর্শনের জন্য নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই। স্বামীর ধর্ম্মচ্যুতির ভয়ে আমি কাতরা। বৃষ্টির অভাবে মহান্ মহীরুহও শুষ্ক হয়, আমি মহান্ মহীরুহ তলে বৃষ্টি করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সত্য। সে কি? মহান্ মহীরুহের অনাবৃষ্টির ভয়? জীবানন্দের ধর্ম্মচ্যুতি?

শান্তি। যাহা ঘটিয়াছে তাহা আবার ঘটিতে পারে।

সত্য। কি ঘটিয়াছে? জীবানন্দের ধর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়াছে? হিমালয় গহ্বরে ডুবিয়াছে?

শান্তি। কেবল সহধর্ম্মিণী-সাহায্যের অভাবে।

সত্য। কি বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

শান্তি। কাল মধ্যাহ্নে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে।

এবার সেই পলিত কেশ ব্রহ্মচারী চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে বসিল। সত্যানন্দকে আর কেহ কখন কাঁদিতে দেখে নাই।

শান্তি বলিল "প্রভু, আপনার চক্ষে জল কেন?

সত্য। প্রায়শ্চিত্ত কি জান?

শান্তি। জানি, আত্মহত্যা।

সত্য। তাই কাঁদিতেছি। জীবানন্দের শোকে কাঁদিতেছি।

শান্তি। আমিও তাই আসিয়াছি; যাহাতে জীবানন্দ না মরে, সেই জন্য আসিয়াছি।

সত্য। বৎসে, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ

হউক। তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম। তুমি সন্তান মধ্যে পরিগণিত হইলে। আমি এতক্ষণ তোমার মর্ম্ম বুঝি নাই, তাই তিরস্কার করিতেছিলাম ? আমি কি বুঝিব ? বনচারী ব্রহ্মচারী বৈ ত নই। স্ত্রীলোকের তুল্য হইব কি প্রকারে। জীবানন্দ মরিবে, আমিও রাখিতে পারিবনা, তুমিও রাখিতে পারিবে না। আমার এ মহাব্রতের পণ প্রিয়জনের প্রাণ। জীবানন্দ আমার প্রাণাধিক প্রিয়, কিন্তু দেখ দক্ষিণ হস্ত গেলে দেবতার কার্য্য করিতে পারিব না। যত দিন পার, জীবানন্দকে পৃথিবীতে রাখিও। সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্রহ্মচর্য্য রাখিও। তুমি আমার প্রিয় শিষ্য হইলে। সন্তান মাত্রই আমার আনন্দ। এই জন্য সন্তানেরা সকলে আনন্দ নাম ধারণ করে। এ আনন্দমঠে তুমিও আনন্দ নাম ধারণ কর। তোমার নাম নবীনানন্দই রহিল।

শান্তি বলিলেন, "আনন্দমঠে আমি থাকিতে পাইব কি ?"

সত্য। আজ আর কোথা যাইবে ?

শান্তি। তার পর ?

সত্য। মা ভবানীর মত তোমার ও ললাটে আগুণ আছে, সন্তান সম্প্রদায় কেন দাহ করিবে ? এই বলিয়া পরে আশীর্ব্বাদ করিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে বিদায় করিলেন।

শান্তি মনে মনে বলিল "র বেটা বুড়ো ! আমার ললাটে আগুণ ! আমি পোড়া কপালি না, তোর মা পোড়া কপালি !" বস্তুতঃ সত্যানন্দের সে অভিপ্রায় নহে—চক্ষের বিদ্যুতের কথাই তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু তা কি বলা যায় ?

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রি শান্তি মঠে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। অতএব ঘর খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক ঘর খালি পড়িয়া আছে। গোবর্দ্ধন নামে এক জন পরিচারক, সেও ক্ষুদ্র দরের সন্তান, প্রদীপ হাতে করিয়া ঘর দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কোনটাই শান্তির পছন্দ হইল না। হতাশ হইয়া গোবর্দ্ধন ফিরিয়া সত্যানন্দের কাছে শান্তিকে লইয়া চলিল। শান্তি বলিল

"ভাই সন্তান, এই দিকে যে কয়টা ঘর রহিল, এতো দেখা হইল না ?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "ও সব খুব ভাল ঘর বটে, কিন্তু ও সকলে লোক আছে।"

শান্তি। কারা আছে ?

গোব। বড় বড় সেনাপতি আছে।

শান্তি। বড় বড় সেনাপতি কে ?

গোব। ভবানন্দ,জীবানন্দ,ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ। আনন্দমঠ আনন্দময়।

শান্তি। ঘর গুলো দেখি চল না।

গোবর্দ্ধন শান্তিকে প্রথমে ধীরানন্দের ঘরে লইয়া গেল। ধীরানন্দ মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব পড়িতেছিলেন। অভিমন্যু কি প্রকার সপ্তরথীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতেই মন নিবিষ্ট—তিনি

কথা কহিলেন না। শান্তি সেখান হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল।

পরে ভবানন্দের ঘরে প্রবেশ করিল। ভবানন্দ তখন ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া, একখানা মুখ ভাবিতেছিলেন। কাহার মুখ, তাহা জানি না, কিন্তু মুখ খানা বড় সুন্দর, কৃষ্ণ কুঞ্চিত সুগন্ধি অলকারাশি আকর্ণপ্রসারি ভ্রূযুগের উপর পড়িয়া আছে। মধ্যে অনিন্দ্য ত্রিকোণ ললাট দেশে মৃত্যুর করাল কাল ছায়া গাহমান হইয়াছে। যেন সেখানে মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয় দ্বন্দ্ব করিতেছে। নয়ন মুদিত, ভ্রূযুগ স্থির, ওষ্ঠ নীল, গণ্ড পাণ্ডুর, নাসা শীতল, বক্ষ উন্নত, বায়ু বসন বিক্ষিপ্ত করিতেছে। তার পর যেমন করিয়া, শরমেঘ-বিলুপ্ত চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে মেঘদল উদ্ভাসিত করিয়া,আপনার সৌন্দর্য্য বিকাশিত করে, যেমন করিয়া প্রভাতসূর্য্য তরঙ্গাকৃত মেঘমালাকে ক্রমে ক্রমে সুবর্ণীকৃত করিয়া আপনি প্রদীপ্ত হয়, দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করে, স্থল জল কীট পতঙ্গ প্রফুল্ল করে, তেমনি সেই শব-দেহে জীবনের মোহ সঞ্চার হইতেছিল। আহা কি শোভা! ভবানন্দ তাই ভাবিতেছিল, সেও কথা কহিল না। কল্যাণীররূপে তাহার হৃদয় কাতর হইয়াছিল; শান্তির রূপের উপর সে দৃষ্টিপাত করিল না।

শান্তি তখন গৃহান্তরে গেল। জিজ্ঞাসা করিল, এটা কার ঘর?

গোবর্দ্ধন বলিল "জীবানন্দ ঠাকুরের।"

শান্তি। সে আবার কে, কৈ কেউতো এখানে নেই।

গোব। কোথায় গিয়াছেন, এখনি আসবেন।

শান্তি। এই ঘরটী সকলের ভাল।

গোব। তা এই ঘরটা ত হবে না।

শান্তি। কেন?

গোব। জীবানন্দ ঠাকুর এখানে থাকেন।

শান্তি। তিনি না হয় আর একটা ঘর খুঁজে নিন্।

গোব। তাকি হয়? যিনি এ ঘরে আছেন, তিনি কর্ত্তা বল্লেই হয়, যা করেন, তাই হয়।

শান্তি। আচ্ছা তুমি যাও, আমি স্থান না পাই, গাছ তলায় থাকিব।

এই বলিয়া গোবর্দ্ধনকে বিদায় দিয়া শান্তি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া জীবানন্দের অধিকৃত কৃষ্ণাজিন বিস্তারণ পূর্ব্বক, তদুপরি শয়ন করিল।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দঠাকুর প্রত্যাগত হইলেন। হরিণ চর্ম্মের উপর একটা মানুষ শুইয়া আছে, ক্ষীণ প্রদীপালোকে অতটা ঠাওর হইল না। জীবানন্দ তাহারই উপর উপবেশন করিতে গেলেন। উপবেশন করিতে গিয়া শান্তির হাঁটুর উপর বসিলেন। হাঁটু অকস্মাৎ উঁচু হইয়া জীবানন্দকে ফেলিয়া দিল।

জীবানন্দের একটু লাগিল। জীবানন্দ উঠিয়া একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,"কে হে তুমি বেল্লিক?"

শান্তি। আমি বেল্লিক না, তুমি বেল্লিক। মানুষের হাঁটুর উপর কি বস্‌বার জায়গা?

জীব। তা কে জানে যে তুমি আমার ঘরে চুরি করিয়া এসে শুইয়া আছ?

শান্তি। তোমার ঘর কিসের?

জীব। কার ঘর?

শান্তি। আমার ঘর।

জীব। মন্দ নয়, কে হে তুমি?

শান্তি। তোমার বনাই।

জীব। তুমি আমার হও না হও, আমি তোমার বোধ হইতেছে। তোমার গলার সঙ্গে আমার ব্রাহ্মণীর গলার একটু সাদৃশ্য আছে।

শান্তি। বহু দিন তোমার ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার একাত্মতা ভাব ছিল, সেই জন্য বোধ হয় গলার আওয়াজ এক রকম হয়ে গেছে।

জীব। তোর যে বড় জোর জোর কথা দেখ্‌তে পাই? মঠের ভিতর না হতো তো এক ঘুষোয় দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিতুম।

শান্তি। দাঁত ভেঙ্গেছে অনেক সম্বন্ধী। কাল রাজনগরে কটা দাঁত ভেঙ্গেছিলে, হিসাব দাও দেখি। বড়াইয়ে কাজ নেই, আমি এখানে ঘুমুই। তোমরা সন্তানের দল, লেজ গুটিয়ে, বামুন্‌ঠাকুরুণদের আঁচলের ভিতর সুকোওগে।

এখন জীবানন্দ ঠাকুর কিছু ফাঁপরে পড়িলেন। মঠের ভিতর বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে মারামারি করা সত্যানন্দের নিষেধ। কিন্তু এরও বড় মুখের দৌড়, ঘুষা না দিলেও নয়। রাগে সর্ব্বাঙ্গ শরীর জ্বলিতে লাগিল। অথচ গলার আওয়াজটা মধ্যে মধ্যে বড় মিঠে লাগিতেছে, যেন কি মনে হয়, যেন কে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া ডাকিতেছে, আর বলিতেছে এলেই ঠ্যাঙে লাটী মার্‌বো। জীবানন্দের উঠিতেও ইচ্ছা করিতেছিল না, বসিতেও ইচ্ছা করিতেছিল না। ফাঁপরে পড়িয়া বলিলেন,

"মহাশয় এ ঘর আমার, চিরকাল ভোগ দখল করিতেছি, আপনি বাহিরে যান।"

শান্তি। এ ঘর আমার, অর্দ্ধ দণ্ড ভোগ দখল করিতেছি। আপনি বাহিরে যান।

জীব। মঠের ভিতর মারামারি করিতে নাই বলিয়াই লাথি মারিয়া তোমায় নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিই নাই, কিন্তু এখনি মহারাজের অনুমতি আনিয়া তোমায় তাড়াইয়া দিতে পারি।

শান্তি। আমি মহারাজের অনুমতি আনিয়াই তোমায় তাড়াইয়া দিতেছি। তুমি দূর হও।

জীব। তাহা হইলে এ ঘর তোমার। মহারাজকে কেবল জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি; আগে বল তোমার নাম কি?

শান্তি। আমার নাম নবীনানন্দ গোস্বামী, তোমার নাম কি?

জীব। আমার নাম জীবানন্দ গোস্বামী।

শান্তি। তুমিই জীবানন্দ গোস্বামী! তাই এমন?

জীব। তাই কেমন?

শান্তি। লোকে বলে, আমি কি কর্‌বো।

জীব। লোকে কি বলে?

শান্তি। তা আমার বলতে ভয়ই কি? লোকে বলে বড় জীবানন্দ ঠাকুর গণ্ডমূর্খ।

জীব। গণ্ডমূর্খ, আর কি বলে?

শান্তি। মোটা বুদ্ধি।

জীব। আর কি বলে?

শান্তি। যুদ্ধে কাপুরুষ।

জীবানন্দের সর্ব্ব শরীর রাগে গর গর করিতে লাগিল, বলিলেন, "আর কিছু আছে?"

শান্তি। আছে অনেক কথা—নিমাই ব'লে আপনার একটি ভগিনী আছে।

জীব। তুমি বড় বেল্লিক হে—

শান্তি। তুমি ভল্লূক হে।

জীব। তুমি উল্লূক, অর্ব্বাচীন, নাস্তিক, বিধর্ম্মী, ভণ্ড, পামর!

শান্তি। তুমি—যলায়বায়াবোচীচঃ—তুমি স্তশ্চুভিঃ শ্চুশাৎ—তুমি ষ্টুভিঃ ষ্টুঃ—যদাস্তটোঃ।

জীব। বের শালা এখান থেকে—তোর দাড়ি ছিঁড়িব।

শান্তি তখন গণিল প্রমাদ! দাড়ি ধরিলেই মুস্কিল। পরচুলো খসিয়া পড়িবে। শান্তি সহসা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নে তৎপর হইল।

জীবানন্দ পিছু পিছু ছুটিল। মনে মনে ইচ্ছা, শালা মঠের বাহিরে গেলে দুই ঘা দিব। শান্তি যাই হউক স্ত্রীলোক—দৌড়ধাপে অনভ্যস্ত। জীবানন্দ এ সকল কাজে সুশিক্ষিত। শীঘ্র গিয়া শান্তিকে ধরিল। এবং তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া প্রহার করিবে বলিয়া তাহাকে কায়দা করিয়া জাপটাইয়া ধরিতে গেল। কিন্তু স্পর্শ মাত্রেই জীবানন্দ চমকিয়া শান্তিকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু শান্তি বাহু দ্বারা জীবানন্দের গলা জড়াইয়া ধরিল।

জীবানন্দ বলিল, "এ কি! তুমি যে স্ত্রীলোক! ছাড়! ছাড়! ছাড়!" কিন্তু শান্তি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল "ওগো, তোমরা দেখ গো! একজন গোঁসাই জোর করিয়া স্ত্রীলোকের স্বতীত্ব নষ্ট করিতেছে।"

জীবানন্দ তাহার মুখে হাত দিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! অমন কথা মুখে এনোনা। ছাড়! ছাড়! আমার ঘাট হয়েছে, ছাড়!"

শান্তি ছাড়ে না; আরও চেঁচায়; শান্তির কাছে জোর করিয়া ছাড়ানও সহজ নয়। জীবানন্দ যোড়হাত করিয়া বলিতে লাগিল "তোমার পায়ে পড়ি, ছাড়!" শেষ স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে অরণ্য পরিপূরিত হইয়া গেল।

এ দিগে মঠের গোঁসাইরা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার হইতেছে শুনিয়া, অনেকে ধুনুচির ভিতর প্রদীপ জ্বালিয়া লাঠি সোঁটা লইয়া বাহির হইলেন। দেখিয়া জীবানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল। শান্তি বলিল, "অত কাঁপিতেছ কেন?"

তুমি ত বড় ভীত পুরুষ। আবার লোকে তোমাকে বলে মহাবীর?

গোঁসাইরা আলো লইয়া নিকটবর্ত্তী হইল দেখিয়া জীবানন্দ সকাতরে বলিলেন, "আমি অতিশয় কাপুরুষ, তুমি আমায় ছাড়, আমি পলাই।"

শান্তি। "জোর করিয়া ছাড়াও না।"

জীবানন্দ লজ্জায় স্বীকার করিতে পারিলেন না যে তিনি স্ত্রীলোকের জোরে পারিতেছেন না। বলিলেন,

" তুমি বড় পাপিষ্ঠা।"

শান্তি তখন মুচকি হাসিয়া, বিলোল কটাক্ষ ক্ষেপণ করিয়া বলিল,

"প্রাণাধিক! আমি তোমার প্রতি অতিশয় আসক্ত। তোমার দাসী হইব বলিয়াই এখানে আসিয়াছি, আমায় গ্রহণ করিবে, স্বীকার কর, ছাড়িয়া দিতেছি।"

জীব। "দূর হ পাপিষ্ঠা! দূর হ পাপিষ্ঠা! দূর পাপিষ্ঠা! অমন কথা আমাকে কাণে শুনিতে নাই।

শান্তি। আমি পাপিষ্ঠা, তাতে সন্দেহ নাই; নহিলে স্ত্রীজাতি হইয়া পুরুষের কাছে প্রেম ভিক্ষা চাইতে যাইব কেন— আমার কথাটি রাখিবে? ছাড়িয়া দিতেছি।

জীব। ছি! ছি! ছি! আমি ব্রহ্মচারী—আমাকে অমন কথা বলিতে নাই—তুমি আমার—

শান্তি সভয়ে বলিল "চুপ কর! চুপ কর! চুপ কর! আমি শান্তি।"

এই বলিয়া শান্তি জীবানন্দকে ছাড়িয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। পরে যোড়হাত করিয়া বলিল, "প্রভু! অপরাধ নিও না। কিন্তু ছি! পুরুষমানুষের ভালবাসার ভাণ্ করাকে ধিক্! আমাকে চিনিতেই পারিলে না।"

তখন জীবানন্দের মনে সকল কথা প্রস্ফুট হইল। শান্তি নহিলে এ কার্য্য আর কার? শান্তি নহিলে এ রঙ্গ আর কে জানে? শান্তি নহিলে কার বাহুতে এত বল? তখন আনন্দিত হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া জীবানন্দ কি বলিতে যাইতেছিলেন—কিন্তু অবকাশ পাইলেন না, গোঁসাইয়েরা আসিয়া পড়িয়াছিল। ধীরানন্দ আগে আগে। ধীরানন্দ এই সময়ে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, " গোলমাল কিসের?"

জীবানন্দ ফাঁপরে পড়িলেন, কি উত্তর দিবেন? শান্তি সেই সময়ে চুপি চুপি তাঁহাকে বলিল,

" কেমন বলিয়া দিই—তুমি আমায় ধরিয়াছিলে?"

এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া শান্তি, ধীরানন্দের কথার উত্তর দিল—বলিল,

"গোলমাল—একটা স্ত্রীলোকে চেঁচাইতেছিল, "আমার সতীত্ব নষ্ট করিল! আমার সতীত্ব নষ্ট করিল' বলিয়া চেঁচাইতেছিল। কিন্তু কই? জীবানন্দঠাকুর এত খুঁজিলেন, আমি এত খুঁজিলাম, দেখিতে পাইলাম না। এই বনটার ভিতর আপনারা একবার দেখুন দেখি—ওদিকে শব্দ শুনিয়াছিলাম।"

গোঁসাইদিগকে শান্তি অরণ্যের নিবিড় অংশ দেখাইয়া দিল। জীবানন্দ শান্তিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বৈষ্ণবদিগকে এত দুঃখ দিয়া তোমার কি ফল? ও বনে গেলে কি ওরা ফিরিবে? সাপেই থাক্, কি বাঘেই থাক্।"

শান্তি। যখন বৈষ্ণব স্ত্রীলোকের নাম শুনেছে, তখন কি একটু কষ্ট না পেলে ফিরিবে না। তা না হয় ফিরাইতেছি।

এই বলিয়া শান্তি গোঁসাইজিদের ডাকিয়া বলিলেন, "আপনারা একটু সতর্ক থাকিবেন। কি জানি ভৌতিক মায়ায়ও হইতে পারে।"

শুনিয়া একজন গোঁসাই বলিল, "তাই সম্ভব। নহিলে স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিবে।"

গোঁসাইয়েরা সকলেই এই মতে মত দিল। ভৌতিক মায়া স্থির করিয়া সকলেই মঠে ফিরিল। জীবানন্দ বলিল "এসো, আমরা এইখানে বসি—এ ব্যাপার টা আমাকে বুঝাইয়া বল—তুমি এখানে কেন—কি প্রকারে আসিলে—এ বেশই বা কেন? এত রঙ্গই বা কোথায় শিখিলে? শান্তি বলিল "আমি কেন আসিলাম?—তোমার জন্য আসিয়াছি। কি প্রকারে আসিলাম?—হাঁটিয়া। এ বেশ কেন? আমার শক। আর এত রঙ্গ শিখিলাম কোথায়? একটি পুরুষমানুষের কাছে। সব তোমায় ভাঙ্গিয়া বলিব। কিন্তু এখানে বসে বসিব কেন? চল তোমার কুঞ্জে যাই।

জীব। আমার কুঞ্জ কোথায়?

শান্তি। মঠে।

জীব। সেখানে স্ত্রীলোক যাইতে আসিতে নিষেধ।

শান্তি। আমি কি স্ত্রীলোক?

জীব। আমি মহারাজের নিয়ম লঙ্ঘন করিব না।

শান্তি। আমার প্রতি মহারাজের অনুমতি আছে। কুঞ্জেই চল, সব বলিতেছি। বিশেষ ঘরের ভিতর না গেলে আমার দাড়ি খুলিব না। দাড়ি না খুলিলে তুমি এ পোড়ার মুখ চিনিতে পারিবে না। ছি! পুরুষ এমন!"

ভূমিষ্ঠ শিশুর প্রতি।

এস রে মানব শিশু, এস ধরাতলে;
নয় মাস অন্ধকারে করেছ নিবাস,
আলোকের স্পর্শে কেন করহ ক্রন্দন?
দেখেছ কি সম্মুখেতে মায়ারূপ জাল?
পাইয়াছ পিতৃমাতৃ উভয়-বৃত্তি।
ভাবিছ, সে হেতু পাবে তাদের দুর্গতি?
মুদ্রিত নয়নে কিবা করিছ কল্পনা!
জেনেছ কি এ জগতে দুখের সাগরে,
তরঙ্গে আকুল হয়ে সাঁতারিতে হবে?
—মাতার মাথায় তুলি সংসারের ভ্রম,

ডুবিবে মাতার সনে আশার সাগরে ?
বালির ভিত্তিতে মাতা নির্ম্মাণিবে গৃহ,
ঘটনার স্রোতে তাহা পড়িবে ভূতলে।
তুমিও ভাবিবে স্মৃত, "জগতের মাঝে,
শ্রেষ্ঠ জীবরূপে আমি লভেছি জনম,
জগতের শুভ-তরে ধরেছি জীবন,
উঠাইব জগতেরে নিজ বীর্য্যবলে—
দুখ হরি, সুখময় করিব সংসার ?"
হায়, মানবের স্মৃত, কেন এত ভ্রম,
নৈরাশে লভিতে কর বক্ষেতে ধারণ।
মানুষ জন্মেছে হয়ে ঘটনার দাস,
ঘটনায় শুভাশুভ নির্ভরিবে তার।
কার্য্যক্ষেত্রে উত্তরিয়া বুঝিবে সকলি,
দেখিবে তোমার বীর্য্য হবে তেজোহীন।
(দেখিবে)শিষ্টকে দলিছে দুষ্ট নির্যাতন করি
নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-সুখ, দম্ভ, অহঙ্কার,
চরিতার্থ করিবারে। স্বকার্য্য সাধিতে,
সাজিয়া নিঃস্বার্থপর স্বার্থপরগণ,
বন্ধুতার ছলে, শিশো, প্রতারিছে সবে।
(ভেবেছ)—
"অজ্ঞান-তিমির হরি,শুভ্রজ্ঞান-জ্যোতিঃ
বিতরিবে যথা তথা ; নাশি নীচ সুখ,
সৃজিবে তাহার স্থলে সুখ নিরমল ;
রাখিবে না ভেদ কভু নির্ধন ধনীতে,
অর্থের সমান ভাগ, শিখাবে জগতে ;
—শিখাবে যথার্থ যাহা অর্থ ব্যবহার।
দৃষ্টান্ত দেখাবে তুমি ভ্রান্ত মানুষেরে,
দেখিতে কিরূপে হয় সর্ব্বে সমভাবে ;
অনাথের অশ্রুজল করিবে মোচন ;
নিপীড়িত-দুখভার করিবে বহন ;
মনুষ্য-আনন কভু হইতে মলিন
দিবে না ; চুম্বিয়া তায় বসাবে হৃদয়ে
প্রফুল্ল করিবে তারে আশার কুহকে।"
এত যদি আশা তব মানবের স্মৃত,
হতভাগ্য, হায়, কেন লভিলে জনম,
জান না কি পৃথিবীর অখণ্ড নিয়ম ?
বালুকা-কণার মত তুমিও তাহাতে,
ক্রীড়িত হইছ, তব আশা-সুখ লয়ে।
নিষ্ঠুর প্রকৃতি কভু দেখিবে না চেয়ে,
কি আশায় হৃদি তব সর্ব্বদা ফুলিছে।
দুখের পীড়ন শুধু দেখে চারিদিকে,
স্তম্ভিত হইবে তুমি, কভু না পারিবে,
জীবন অর্পিলে তাহা করিতে মোচন,
উদ্যমে কেবল, স্মৃত, নিস্তেজিবে বল।
ভেবে দেখ কবে তুমি পেরেছ ফিরাতে,
কিম্বা অবরোধিবারে ঘটনার স্রোত।
মানব বিজ্ঞান চর্চ্চি দেখে সব বটে,
কিন্তু বল কার তাহে ঘটিয়াছে স্মৃত,
হৃদয়ের শান্তি, কিম্বা পুরিয়াছে আশা ?
মানুষের সৃষ্টি হতে, ঘূর্ণমান সদা,
সুখ-দুখরূপ চক্র পরিবর্ত্তনীল।
সংসারের অংশ হয়ে বল দেখি তবে,
কেমনে এড়াবে তুমি সে দুখের ভোগ ?
মানিলাম, শ্রেষ্ঠ তুমি সংসারের মাঝে,
বল দেখি সে শ্রেষ্ঠতা দিয়াছে কি ফল ?
কেবল জেনেছ তাহে দুখময় ধরা ;
—করিয়াছে তাহে, উচ্চ হৃদয় তোমার
অনুভব, হায় শিশো, তীব্রতার সহ,
সে দুখের ভার। যদি বল অকাতরে,
সহিবে সে সব ক্লেশ তব জ্ঞান-বলে,
আসিতে দিবে না চক্ষে কণা মাত্র জল,
নিঃশব্দে সহিবে ব্যথা—সহয়ে যেমন

রোগের যন্ত্রণা রোগী, যবে চিকিৎসক
আরোগ্য ভরসা ছাড়ে। বল কি করিলে,
সাধিলে কি কায তবে জগতে আসিয়া ?
ধর্ম্ম-শাস্ত্র বটে উচ্চে বলিবে তোমারে,
রহ রহ রহ সুত, পাইবে সান্ত্বনা ?"—
হবে সুখী পরকালে এ দেহ ত্যজিলে ?"
কিন্তু হায়, যদি তাহে করহ বিশ্বাস,
ঘুরিবে তোমার দুখ ক্ষণেকের তরে।
যথা অহিফেণ দূরে রোগের যাতনা
ক্ষণ-নিদ্রা আনি। বল, প্রমাণ-বিহীন
কল্পিত যে আশা, সে কি তিষ্ঠিবারে পারে—
যবে সাংসারিক দুখে শোণিত শুকায়,
করে হৃদয়েরে শূন্য, মনেরে নিস্তেজ ?
—তখন ফুটিবে তব সুজ্ঞানের আঁখি,
শিহরি দেখিবে যবে প্রকৃতির রীতি,
তখন বলিবে তুমি—"প্রকাণ্ড জগতে
কণামাত্র বটে আমি।"—তবে কেন আশা ?
জীবনেরে ছেড়ে দাও সংসারের স্রোতে।

সাবেক "মনুষ্যত্ব" ও হালের "সাইন কল্লা।"

ইংরাজের সহবাসে বাঙ্গালী যে কত কি হারাইয়াছে, তাহার ঠিক নাই। বাঙ্গালীর কথকতা উঠিয়া গিয়াছে। কবি, পাঁচালী, যাত্রা, একেবারে নাই বলিলেই হয়। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা স্বভাবের নির্ভীকতা, সত্যনিষ্ঠতা, ধর্ম্মপরতা প্রভৃতি বলে সমাজে এক প্রকার অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিতেছে। যে সকল সামাজিক কার্য্যে ও বাৎসরিক পর্ব্বাহে সমস্ত দেশীয় লোক আনন্দে উন্মত্ত হইত, তাহা কমিয়া আসিতেছে। যে সন্তোষ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিত, তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আত্মীয়ের, কুটুম্বের ও প্রতিবেশীর বিপদে সম্পদে লোকে যেমন বুক দিয়া পড়িত, এক্ষণে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

এখন সবাই আপন লইয়া ব্যস্ত, কেহ কাহারও আপদ বিপদে মনোযোগ দেয় না। কিছুতেই যেন লোকের তৃপ্তি হয় না। দেশীয় সমাজ-বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াছে। গ্রাম বা নগরবাসীদিগের মধ্যে যে একটু বাঁধাবাঁধি সম্পর্ক ছিল, সকলেই পরস্পরের কার্য্যে যেমন পরস্পরের মুখাপেক্ষা করিত, এক্ষণে আর সেটী দেখা যায় না। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট, ইংরাজ রাজপুরুষ, হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়াছেন। সকলেই তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করেন। পুরাণ পারিবারিক, গ্রামিক, নাগরিক, সামাজিক বন্ধন খুলিয়া মানুষ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের জাতীয় চরিত্র,এমন কি তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও যেন পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব ছিল। মনুষ্যত্ব কথাটী বলিলে যত ভাব ব্যক্ত হয়, এত কি আর

একটী কথায় ব্যক্ত হইতে পারে? মনুষ্যত্ব বলিলে লোক-লৌকিকতা, আত্মীয়-কুটুম্বিতা ব্রাহ্মণসজ্জনের প্রতি শ্রদ্ধা, গরিব দুঃখীর প্রতি দয়া নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার, অনাথের সহায়তা, ব্যথিতের ব্যথানিবারণ, দরিদ্রের দুঃখভঞ্জন, নিরন্নকে অন্নদান, বিবস্ত্রকে বস্ত্রদান, অপরাধির অপরাধ-মার্জ্জনা, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, সর্ব্বদা ক্রিয়াকলাপ করা ক্রিয়াকলাপে লোকের অভ্যর্থনা, লোকের বাড়ী যাওয়া আসা, প্রভৃতি যত কিছু মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, সরল, উদার কার্য্য আছে, এক মনুষ্যত্ব শব্দে সকলই বুঝায়। মনুষ্যত্ব বলিলে মনুষ্য সমূহের সর্ব্বাঙ্গীন হিতসাধন বুঝায়। মনুষ্য যত কেন ছোটই হউক না, যে যথার্থ মনুষ্য হইবে, তাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব থাকিবে, সে তাদৃশ নীচ মনুষ্যেরও ব্যথা, যত কেন অল্প হউক না, সে ব্যথাও ব্যথী হইবে।

কিন্তু আজি কালি মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য আর মনুষ্যত্ব নাই। আজি কালি যে লোক পরের দুঃখে দুঃখী হয়, পরের ব্যথায় যাহার হৃদয় গলিয়া যায়, তাহাকে লোকে আহাম্মক বলে। যে প্রতিবেশী-দিগের কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকে, লোকের বিপদ দেখিলে বুক্ দিয়া পড়ে, লোক তাহাকে "হমবগ্" (Humbug ও Weak-minded) বলে। আজ কালি মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। আজি কালি লোকে কেবল "সাইন করিতে চেষ্টা করে। "সাইন" শব্দটী বাঙ্গালায় তর্জ্জমা হইতে পারে না। বাঙ্গালীর অভিধানে এরূপ উৎকট স্বার্থ-পরতা-সার-সংগ্রহ-দ্যোতক কথা থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে যত প্রকার স্বার্থ-পরতা আছে, বোধ হয়, তাহাদিগের শেষ সীমা "সাইন" করা। আত্মীয় স্বজন দেখিব না, জ্ঞাতি বন্ধুর মুখপানে চাহিব না, প্রতি-বেশী দীন দুঃখী দরিদ্র প্রভৃতির প্রতি দৃক্‌পাত করিব না। কেবল দেখিব আমি কিসে বড় হইতে পারি, কিসে আমার গাড়ী, জুড়ী, বড় বাড়ী প্রভৃতি হয়। কিসে লোকের কাছে অধিক পরিমাণে বাহবা লওয়া যায় (লোকের কাছে বলিতে গেলে কালা বাঙ্গালীর কাছে নয়। শুদ্ধ লাল মুখের কাছে বুঝায়) কিসে সাহেবদিগের কাছে সম্মান বাড়ে, কিসে নামের পাশে ৭।৮ টা ইংরাজি অক্ষর ঘুড়িতে পারা যায়, আমাদের জীবনে শুদ্ধ এই মাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যাহারা আপন জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিয়া যাইতে পারে, লোকে তাহাকেই বড়লোক বলে। আমি দেখিতেছি এখনকার বড়লোক ও প্রাচীন বাঙ্গালার বড়-লোকে কত তফাৎ।

এখনকার বড়লোক কাহার সহিত মিশেন না, প্রায়ই একাকী থাকেন। সঙ্গে থাকিবার মধ্যে স্ত্রী ও পুত্র; যাহারা খুব "সাইন" করিয়া উঠিয়াছেন, তাহারা স্ত্রী পুত্রেরও বড় ভার রাখেন না। পার্শ্বের বাড়ীতে কে থাকে, কখনই খবর

লয়েন না। ভাই, ভগিনীপতি, খুড়া জ্যেঠা কে কোথায় থাকেন, তাহা জানেনও না। তাঁহার কেবল চিন্তা, যাহারা তাঁহা অপেক্ষা বড়, কিসে সেই সকল লোকের সঙ্গে মিশিতে পারেন। নর লোকের প্রায়ই মুখ দেখেন না। যাহারা তাঁহা অপেক্ষা কোন অংশে ছোট, তাহারা একেবারে অগ্রাহ্যের মধ্যে গণ্য। এই সকল বড়লোকের দিবানিশি অন্তরের আশা এই যে, সাহেবলোকে কিসে বড় বলে। এই রূপ বড়লোক যদি আশানুরূপ বাহবা না পাইলেন, তাহা হইলে তিনি ইংরাজরাজের এবং তৎকর্তৃক অনুগৃহীত স্বদেশীয়বর্গের প্রতি উৎকট বিদ্বেষভাবকে হৃদয়ে লালন পালন করিতে লাগিলেন। লাভ এই হইল যে, তাঁহার নিজের মনে সুখ রহিল না। এবং যে কেহ কার্য্যোপলক্ষে (অন্য উপলক্ষে তাঁহার নিকট কাহার যাইবার হুকুম নাই) তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহে, তাহারই মনে ঐ প্রকার বিদ্বেষ ভাবরূপ সংক্রামক রোগ চালনা করিয়া দেয়। নিজে তো অসুখী আছেন অন্যকেও অসুখী করিয়া দেন।

আর সেকালের বড়লোকই বা কি রূপ ছিল? যেখানে এক জন বড় লোক থাকিতেন, সে পরগণা তাঁহার চরিত্রগুণে আলোকিত থাকিত। বাক্যে হউক, কার্য্যে হউক, অর্থের দ্বারা হউক, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব প্রতিবেশীদিগের উপকার সাধনেই তাঁহারা সকল সময়ে ব্যস্ত থাকিতেন। যাহারা উপকার প্রত্যাশী নহেন, তাঁহাদেরও বিপদে সম্পদে যাওয়া আসা কায কর্ম্ম কথাবার্ত্তায় সাহায্য করিতেন। ইহাতে সম্পদের সময় আনন্দ দ্বিগুণতর হইত। এবং বিপদের সময় কষ্ট অর্দ্ধেক দূর হইত। সেরূপ বড়লোক প্রাতঃকালে উঠিয়াই বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণ একে একে তথায় উপস্থিত হইলেন। পরস্পর মিষ্টালাপে সময় কাটিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে পাঁচুর জামাইয়ের চাকরী, তর্করত্ন মহাশয়ের পুত্রের বিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় কথা হইয়া গেল। হরে চাঁড়ালের ব্যাম হইয়াছে তাহার শিশু পুত্রটী কাঁদিয়া আসিয়া বাবুকে সমাচার দিল। তখন সকলেই আহা! হরে চাঁড়াল, দিব্য লোক ছিল বলিয়া নানা প্রকারে তাহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাবু বলিলেন একবার দেখে আসিলে হয় না?

তখন সমস্ত গ্রামস্থ লোক হরে চাঁড়ালের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং যাহার মনে যাহা ভাল বিবেচনা হইল, সেই মত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় সঙ্গেই ছিলেন, অমনি পুঁটলী খুলিয়া ঔষধ দিলেন। দুঃখীলোক অনুপান ও পথ্য কোথায় পাইবে, কর্ত্তার বাড়ী হইতেই তাহার ব্যবস্থা হইল। হরে চাঁড়াল সারিয়া উঠিল। বল দেখি, হরে চাঁড়াল দেশের লোকের প্রতি কত কৃতজ্ঞ

হইবে। হরে চাঁড়ালের বাড়ী হইতে আসিতে আসিতে পরাণ মণ্ডল ধরিল, বাবু! আমার বাগানে একবার পদার্পণ করিয়া যান। পরাণও নানা কারণে বাবুর নিকটে বাধ্য আছে। বাবু একবার তাহার বাগানে পদার্পণ করিলে সে কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবে। বাবু পরাণের বাগানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পরাণের বাগান, পুকুর, গাছ-পালা কেমন স্নুন্দর হইয়াছে। বাবুর একবার মনে হইল এই পরাণ এক সময়ে খাইতে পাইত না! মনে একটু খুসী হইয়া কহিলেন, "বাঃ পরাণ! তোর যে দিব্য বাগান হইয়াছে"। পরাণ তখন আহ্লাদে আটখানা হইয়া গলায় কাপড় দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বাবুকে কহিল, "বাবু, সে আপনারই প্রসাদ"। বাবু, "দূর বেটা" বলিয়া সেখান হইতে সত্বর-পদে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। রাস্তায় একটী গলির মোড়ে রামনাথ বসুর বিধবা স্ত্রী মাথা হেট করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেও বাবুর অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী, তাহার আর কেহ নাই; কষ্টে দিনপাত করিয়া থাকে; কিন্তু থাকিবার ঘরটী সারায় তাহার এমন সঙ্গতি নাই। ঘরটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর মেরামত না হইলে শীঘ্রই আশ্রয়হীন হইতে হইবে। বাবু শুনিলেন, মৃত রামনাথের জন্য বিস্তর দুঃখ আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন, তাহার বিধবা স্ত্রীকে বলিলেন, মা তুমি এক সময়ে আমার কাছে যাইও, আমি ইহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব। বাবু বাড়ী আসিলেন, তাহার অনুচরবর্গ ক্রমে ক্রমে একে একে বিদায় হইয়া গেল। তখন বাবু স্নানাহারের জন্য বাড়ীর ভিতর গেলেন। সেখানে ভাই,ভাইপো,ভাগিনেয়, ভাইঝি-জামাই, নাতি প্রভৃতির আহারাদির দেখা শুনা করিলেন। তাহার পর অতিথি কেহ আছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। সকলের আহারাদির পর আপনি আহার করিলেন। একটু বিশ্রামের পর অভ্যাগত অতিথিদিগের সহিত কিয়ৎক্ষণ নানা দেশীয় কথাবার্ত্তায় অতীত হইলে, আবার গ্রামের অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া জুটিল। তখন গ্রামের কে কেমন আছে, কাহার কেমন অবস্থা, এই সকল বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল, তখন বাবু যথাসাধ্য লোকের কষ্ট নিবারণের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সেকালের বাবুরা ছেলে দেখিলেই কোলে করিয়া লইতেন, কড়ানিয়া শতকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কাহাকেও "তুমি কি দিয়া ভাত খাইয়াছ," কাহাকেও বা "কে তোমায় অধিক ভাল বাসে," ইত্যাদি মিষ্টালাপে খুসী করিয়া দিতেন। কাহাকেও বা দোলাই কিনিয়া দিব বলিয়া খুসী করিতেন। সে দৌড়িয়া গিয়া তাহার মার কাছে গিয়া বলিত, মা! বাবু আমায় দোলাই কিনিয়া দিবেন বলিয়াছেন। দেশের মধ্যে কেহ কোন নূতন বিদ্যা, নূতন শিল্প, শিখিলে, কেহ গুণী হইলে তাহাকে উৎসাহ দেওয়া, তাহাকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করা বাবুর নিত্যকর্ম্মের মধ্যে।

যেমন এক জায়গায় একটী ফুল ফুটিলে তাঁহার সৌরভে চারিদিক আমোদিত হয়, সেইরূপ কোন জায়গায় এক জন বড়লোক হইলে তাঁহার দ্বারা চারিদিগের লোক উপকৃত হইত। আমাদের নূতন সমাজে এখন আর সে রকম ফুল ফুটে না। সেরূপ বড়লোক আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজের সঙ্গে থাকিয়া, ইংরাজি-ভাষা শিখিয়া আমরা বড়ই আত্মম্ভরী ও অসামাজিক হইয়া পড়িয়াছি। (Live for others), এইটী আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালীরা যত বুঝিত, এত বুঝি অন্য কোন দেশের লোক বুঝে না। এখনকার ইয়ং বেঙ্গলেরা (Live for others), করিবার জন্য সভা সমাজ এসোসিয়েশন, জলসা, ক্লব, সোসাইটী, মিটিং ইত্যাদি করিয়া থাকেন। একটু ভাবিয়া দেখিতে গেলে এই গুলির তলায়ও (সাইন) করিবার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নাই। অনেকে এই উপায়ে পরহিত করিতে গিয়া গুরুতর আত্মহিত করিয়া বসেন। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল লোকে সভাদি স্থাপন করিতে যায়, তাহারা আপনাপন ইষ্ট সিদ্ধি হইলেই সভার প্রতি হতাদর হইয়া পড়েন। সময়ে সময়ে দেখিতে পাই, লোকে ১০।১৫ বৎসর পরহিতে কাটাইয়া অতি সামান্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় সে পথ পরিত্যাগ করেন। সভা বা এসোসিয়েসনের পরহিত ফাঁপা জিনিস, ভিতরে তাহার সার নাই। খালি হাঁড়ীর মত বাজাইলে খুব শব্দ হয় বটে; কিন্তু কার্য্য তাহাতে কিছু হয় না। কারণ এখনকার যে সকল লোকে সভা করেন, তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্যই সাইন্ করা। সুতরাং তাহারা সভাগুলিকে এমনি করিয়া তৈয়ার করেন যে উহাতে শব্দ অধিক হয়। পৃথিবীর লোক জানিতে পারে যে অমুক অমুক খুব সাইন করিতেছে।

বাঙ্গালীরা ইংরাজ সহবাসে যত কিছু হারাইয়াছেন, মনুষ্যত্বই তাহাদের মধ্যে প্রধান, মনুষ্যত্বের অভাবে সমস্তই সারশূন্য হইয়া উঠিতেছে। গিল্টী অধিক চলিতেছে, যত সার কম, ততই অধিক চক্‌চক্যে হইতেছে। যে সমাজে যথার্থ মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট লোকের আদর নাই এবং গিল্টী লোকের আদর অধিক, সে সমাজের অবস্থা বাস্তবিকই অতি শোচনীয়। আমাদের এখানে সমাজের অবস্থা সুতরাং বড়ই মন্দ। কিন্তু সে মনুষ্যত্ব কি আর দেখিতে পাইব? আবার কি বাঙ্গালীর মনে মনুষ্যত্ব করিবার বাঞ্ছা প্রবল হইবে? এ ছার সাইন করার বাঞ্ছা তিরোহিত হইবে? ভরসা ত দেখি না, সমাজেরও যে বড় মঙ্গল হইবে তাহারও ভরসা নাই।

রত্নরহস্য।

মাণিক্য।

আমরা "রত্ন রহস্য" নামক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে মুক্তা রত্নের উপর লেখনী সঞ্চালন করি। তাহার কারণ এই যে 'রত্ন' শব্দের বহু অর্থ থাকিলেও প্রস্তর-জাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুতেই 'রত্ন' শব্দ প্রকৃষ্ট সংযোগ বিশিষ্ট হওয়ায় এবং মুক্তাও প্রস্তরকল্প শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলিয়া শাস্ত্রকারেরা মুক্তাকেও রত্ন মধ্যে গণনা করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমরাও রত্ন-রহস্য প্রবন্ধে অগ্রে তাহারই গুণ দোষাদি বর্ণনা করিয়াছি। রত্ন নামধেয় প্রস্তর সকলের মধ্যে প্রধানতম রত্ন নয়টী (৯)। তাহা প্রস্তাবারম্ভের প্রথমে বলা হইয়াছে। পুনরায় পাঠকগণের স্মরণ জন্য উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—

> "মুক্তা মাণিক্য বৈদূর্য্য
> গোমেদা বজ্র বিক্রমৌ।
> পদ্মরাগং মরকতং
> নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ॥"

রত্নের মধ্যে এই নয়টী প্রধান; এতদ্ভিন্ন বহুতর উপরত্ন আছে। আমাদের প্রতিজ্ঞা এই, যে, অগ্রে প্রধানতম নয়টী রত্নের বিষয় বর্ণনা করিব। পশ্চাৎ অন্যান্য রত্নের কথা লিখিব। সেই প্রতিজ্ঞা ও উপরোক্ত কবিতার ক্রম অনুসারে অগ্রে মুক্তারত্ন সম্বন্ধে যে কিছু বক্তব্য তৎসমুদায় বলা হইয়াছে। এক্ষণে মাণিক্য নামক রত্নের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

"এক মাণিক সাত রাজার ধন" এই নারী-প্রবাদ একবারে সত্য মনে করিবেন না। পূর্ব্বকালের অনেক রাজা (এক্ষণেও বটে) কেবল শস্য ও পশু-সম্পত্তি লইয়াই রাজাভিমান চরিতার্থ করিতেন। মণি মাণিক্য যে তাঁহাদের নিকট দুর্লভ ছিল, তাহা বলা বাহুল্য; অধিকন্তু সুবর্ণও তাঁহাদের নিকট দুর্লভ বস্তু ছিল বলিয়া অনুমান হয়, সুতরাং এক মাণিক্য সেরূপ সাত রাজার ধন হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

১৮০২ খৃষ্টাব্দে কৌণ্ট বুরনন রুবি, সেফায়ার, প্রভৃতি নাম দ্বারা মাণিক্যর শ্রেণী বদ্ধ করেন। এক্ষণে মাণিক্য শ্যাম দেশ, ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রেজিল, বোরনিও, সুমাত্রা, ফ্রান্স, প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়; কিন্তু ব্রহ্ম দেশের মাণিক্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কথিত আছে ব্রহ্মদেশের রাজার নিকট পারাবতের অণ্ডের ন্যায় এক খানি বৃহৎ মাণিক্য আছে। টাবরনিয়ার লিখিয়াছেন, যে তিনি দীল্লীশ্বর মোগল সম্রাটের

সিংহাসনোপরি ১০৮ খণ্ড বৃহৎ মাণিক্য সুশোভিত দেখিয়াছেন। তাহার প্রত্যেক খণ্ডের ১০০ হইতে ২০০ শত রত্তিকা পর্য্যন্ত পরিমাণ হইবেক। মার্কপলো কহেন, সিংহলেশ্বরের একখানি বৃহৎ মাণিক্য ছিল। কব্‌লাই খাঁ এই বহুমূল্য প্রস্তর খণ্ডের জন্য সিংহলাধিপতিকে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও তিনি এই প্রস্তর বিক্রয় করেন নাই। টাবরনিয়ার তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছন যে, বিশাপুরের রাজার একখানি উৎকৃষ্ট ৫০ রত্তিকা পরিমাণের মাণিক্য ছিল। এক্ষণে এতাদৃশ বৃহৎ মাণিক্য ভূমণ্ডলস্থ রাজ-ভাণ্ডারে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। লুই নেপোলিয়ানের রাজমুকুটে কয়েকখানি উত্তম মাণিক্য ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের প্রদর্শনে আমাদিগের মহারাজ্ঞী এম্প্রেশ মহোদয়ার দুই খানি মাণিক্য যাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা প্রশংসার যোগ্য। রুশিয়ার রাজভাণ্ডারে একখানি বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট মাণিক্য আছে। উহা সুইডেনের নৃপতি তৃতীয় গষ্টেভস্‌ উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাভিন্ন অষ্টীয়ার রাজমুকুটে কয়েকখানি বহু মূল্য মাণিক্য আছে।

প্রাচীন ইতিবৃত্ত লেখকেরা বহুমূল্য মাণিক্যের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। থিওক্রেসটস্‌ এবং প্লিনি প্রজ্জলিত দীপশিখার ন্যায় দীধিতি-বিকাশক মাণিক্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গ্রীকগণ বৃহৎ মাণিক্যের উপর যে সকল সুদৃশ্য প্রতিকৃতি খোদিত করিতেন, তাহা কএকখান এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

মাণিক্য এক প্রকার প্রস্তর। রত্নশাস্ত্রে তাহার এতগুলি নাম আছে। যথা— "মাণিক্য" ১, "শোণরত্ন" ২, "রত্নরাজ" ৩, "রবিরত্ন" ৪, "শৃঙ্গারী" ৫, "রঙ্গ মাণিক্য" ৬, "তরুণ" ৭, "রাগযুক্" ৮, "পদ্মরাগ" ৯, "রত্ন" ১০, "শোণোপল" ১১, "সৌগন্ধিক" ১২, "লোহিতক" ১৩, "কুরুবিন্দ" ১৪।

রত্নশাস্ত্রোক্ত এই সকল নামের মধ্যে ২।৪।৬।৭।৮।৯।১১।১৩ নাম বর্ণ ঘটিত। বিশেষ ১১ অর্থাৎ শোণোপল নামটীতে উহার বর্ণ ও স্বরূপ স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে। শোণোপল অর্থাৎ রক্তবর্ণ প্রস্তর। "রক্তবর্ণ প্রস্তরই মাণিক" এই কথা বলিলাম বলিয়া যে সে রাঙ্গা পাথর মাণিক নহে। রত্নশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ও পরীক্ষাদি বর্ণিত আছে। সেই লক্ষণাদি-যুক্ত প্রস্তর বিশেষই মাণিক্য। রত্নশাস্ত্রে মাণিক্য নামক রত্নের যেরূপ লক্ষণাদি বর্ণন দৃষ্ট হয়, তদনুসারে বোধ হয়, আধুনিক "পান্না" নামক প্রস্তর বিশেষকেই পূর্ব্বকালের সংস্কৃতবেত্তারা "মাণিক্য" নামে অভিহিত করিতেন। তাহা হইলে পান্না ও মাণিক একই পদার্থ; তবে মাণিক্য নামটী সংস্কৃত নাম, এবং পান্না নামটী পারসিক নাম, ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

পুরাণাদি শাস্ত্রে রত্নোৎপত্তির বিষয় যেরূপ লিখিত আছে তাহার অন্তস্তত্ত্ব আমাদের বোধগম্য হয় না। বল নামে

এক অম্বুর, তাহার বিশুদ্ধ সত্তাক্রান্ত অবয়ব সকল রত্নোৎপত্তির কারণ, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রকার প্রলাপকল্প গল্প আছে। এই প্রলাপকল্প গল্পের দ্বারা আমরা রত্নোৎপত্তির মূল ভাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ,তবে রত্নশাস্ত্রে যে দুই একটী কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তদনুসারে অতি সামান্যাকারে রত্নোৎপত্তির বীজ ও ভাব গ্রহণ করিতে পারা যায়। রত্নশাস্ত্রে তিন প্রকার মতের আভাস পাওয়া যায়। যথা—

"মহোদধৌ সরিতি বা
পর্ব্বতে কাননেঽপিবা।
তত্তদাকারতাং যাতং
স্থানতৃমাধেয় গৌরবাৎ।"

[যুক্তিকল্পতরুঃ।

"কেচিদ্বদন্তিভুবঃ স্বভাবাৎ
বৈকৃতাচ্চান্যান্যোবাঞ্চভূতানাম্।
প্রাদুর্ভবন্তি রত্নানি——"

[জ্যোতিষম্।

সমুদ্রেই হউক, নদীতেই হউক, পর্ব্বতেই হউক, কিংবা অরণ্যে (অরণ্যস্থ সর্পাদি জন্তুতে) হউক, স্থান অর্থাৎ তত্তৎ স্থানীয় বস্তু বিশেষ আধেয় অর্থাৎ আগন্তুক কিংবা আকাশিক (জলাদি) বস্তুর শক্তিতে সেই সেই রত্নের আকার প্রাপ্ত হয়।

কেহ বলেন, পৃথিবীর স্বভাব বলেই রত্ন সকল প্রাদুর্ভূত হয়; অপরে বলেন, ভূত সকল অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, বায়ু ও তেজ, এই সকল পরস্পর পরস্পর কর্ত্তৃক অনুবিদ্ধ হইয়া পৃথক পৃথক বিকার ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই রত্ন সকল উৎপন্ন হয়। যাহা হউক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতটী আংশিক ভাল বটে।

যে কোন রত্ন হউক, অগ্রে আকার, তৎপরে বর্ণ, তৎপরে গুণ ও দোষ, পরে ফলাফল, পশ্চাৎ জাতি বিজাতি পরীক্ষা, মূল্যাবধারণ করিতে হয়, যথা—

"আকারবর্ণৌ প্রথমং গুণদোষৌ
তৎফলং পরীক্ষাচ।
মূল্যাঞ্চ রত্ন কুশলৈর্বিজ্ঞেয়ং
সর্ব্ব শাস্ত্রানাম্।"

[গরুড় পুরাণ।

অতএব, আমরা মাণিক্য সম্বন্ধেও উক্ত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অগ্রে আকার, পরে বর্ণ ও গুণ দোষাদির কথা বলিব।

আকার।

এস্থলে আকার ও লক্ষণ একই কথা। অতএব রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে লক্ষণ শব্দের উল্লেখে যে সকল আকারগত চিহ্নের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"স্নিগ্ধং গুরু গাত্রযুতং দীপ্তং
স্বচ্ছং সমাঙ্গঞ্চ সুরঙ্গদঞ্চ।
ইতি জাত্য মাণিক্যং
কল্যাণং ধারণাৎ কুরুতে।"

স্নিগ্ধ—অর্থাৎ স্নেহ গুণযুক্ত (টলটলে) গুরু-গাত্রযুত—অর্থাৎ দৃশ্যে ও ওজনে ভারি (অন্যান্য সাধারণ কাঁচা পাথর অপেক্ষা ইহা সমধিক ভারি)। দীপ্ত—দীপ্তিমান। স্বচ্ছ—সুন্দর নির্ম্মল। সমাঙ্গ—গঠন সমান। সুরঙ্গদ—সুন্দর রাগ

অর্থাৎ রঞ্জনকারী (এই শক্তির বিষয় পরে ব্যক্ত হইবে)।

"বিরূপং রাগ বিমলং
লঘু মাণিক্যং নধারয়েদ্ধীমান্।"

যাহার রূপ বিকৃত, রাগ অর্থাৎ রক্ততা বিকৃত বা মলিন, আকার ও ওজনে লঘু, বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ মাণিক্য ধারণ করিবেন না। অর্থাৎ এরূপ মাণিক্য উৎকৃষ্ট নহে।

"মাণিক্যং কষ ঘর্ষণেঽপ্যবিকলং
রাগেন জাত্যং জগুঃ।"

[রাজনির্ঘণ্টঃ।

কষ, অর্থাৎ কষ্টিপাথর। কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করিলে যে মাণিক্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এবং ঘৃষ্ট স্থানের রাগ অর্থাৎ রক্তিমা নষ্ট হয় না, তাহাই জাত্য মাণিক, ইহা রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন।

জাত্য মাণিক্য কি? তাহা পরে বর্ণন করা যাইবেক। এক্ষণে দুই চারিটী গুণ দোষের কথা বলা যাউক।

বস্তু মাত্রেরই দুই শ্রেণীর গুণ আছে। এক রাসায়নিক গুণ, দ্বিতীয় শোভাগত গুণ। রাসায়নিক গুণ সকল বৈদ্যশাস্ত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে, সে সকল সংগ্রহ করা এ প্রস্তাবে অপ্রয়োজন। রত্নশাস্ত্রে যে শোভাগত গুণের উল্লেখ আছে তাহাই সংগ্রহ করা যাউক।

গুণ।

"গুরুত্বং স্নিগ্ধতাচৈব
বৈমল্য মতি রক্তত।।"

[যুক্তি কল্পতরু।

গুরুত্ব অর্থাৎ ওজনে ভারি। স্নিগ্ধতা অর্থাৎ স্নেহাক্তের ভাব। বৈমল্য অর্থাৎ নির্ম্মলের ভাব। অতিরক্ততা অর্থাৎ অসাধারণ রক্ত বর্ণের ভাব। এই রক্ত বর্ণের ভাবটী ছায়া-নির্ণয় ব্যতীত বোধগম্য হইতে পারে না। পদ্মরাগ বা মাণিক্য মণির ছায়া কি? তাহা পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হইবে। ফল, উপরোক্ত গুণ থাকিলেই তাহা উৎকৃষ্ট মাণিক্য হইবে।

এই গুণ কয়েকটী মতান্তরে অতি স্পষ্ট রূপে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"বর্ণাধিকং গুরুত্বঞ্চ
স্নিগ্ধতাচ তথাচ্ছতা।
অর্চ্চিষ্মত্তা মহত্তাচ
মণীনাং গুণ সংগ্রহঃ।"

[কল্পদ্রুমধৃত বচন।

বর্ণের আধিক্য অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণযুক্ততা। গুরুত্ব—ভারগত আধিক্য। স্নিগ্ধতা—স্নেহ ম্রক্ষিতের ন্যায় দৃশ্য অর্থাৎ লাবণ্যযুক্ত। অচ্ছতা—নৈর্ম্মল্য। অর্চ্চিষ্মত্তা—তেজ বা দীপ্তিমত্তা। মহত্তা—বৃহত্ত্বের ভাব। (অর্থাৎ যে মণি যত বড় সে ততই উৎকৃষ্ট। এই জন্য মহত্তা একটী প্রধান গুণ)। ইহাই মণি সকলের গুণের সংগ্রহ। অর্থাৎ এই সকল গুণ মণিমাত্রেরই থাকা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ গুণ সকল প্রসঙ্গ ক্রমে ব্যক্ত হইবেক।

সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত জাত্য মাণিক্য শব্দের অর্থ নির্ব্বাচন করা যাইতেছে।

মণিমাত্রেরই জাতি আছে। তাহা

গুণ অনুসারেই অবধারিত হয়। কি কি গুণে জাতি ও কি কি গুণ অভাবে বিজাতি, তাহার কিঞ্চিৎ অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"মাণিক্যং কম ঘর্ষণেঽপ্য
বিফলং রাগেণ জাত্যংজগুঃ।"
[রাজ নির্ঘণ্টঃ।

ইহার অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যুক্তি-কল্পতরু বলেন,—

"অপ্রনশ্যতি সন্দেহে
শিলায়াং পরিঘর্ষয়েৎ।
ঘৃষ্টা যোঽত্যন্ত শোভাবান্
পরিমাণং নমুঞ্চতি।
স জ্ঞেয়ঃ শুদ্ধ জাতিস্তু
জ্ঞেয়াশ্চান্যে বিজাতয়ঃ।
স্বজাতকং সম্মুখেন
বিলিখেৎ বা পরস্পরম্।
বজ্রং বা কুরুবিন্দংবা
বিমুচ্যান্যোন্যকেন চেৎ।
ন শক্যং লেখনং কর্ত্তুং
পদ্মরাগেন্দ্র নীলয়োঃ।"
"যঃ শ্যামিকাং পুষ্যতি পদ্মরাগো
যোবা তুষানামিব চূর্ণ মধ্যঃ।
স্নেহ প্রদিগ্ধো ন চ য়ো বিভাতি
যোবা প্রমৃজ্যঃ প্রজাহাতি দীপ্তিম্।
আক্রান্ত মূর্দ্ধা চ তথাঙ্গুলিভ্যাং
যঃ কালিকাং পার্শ্বগতাং বিভর্ত্তি।"
ইত্যাদি ইত্যাদি।

জাত্য মণি কি বিজাত মণি সন্দেহ নাশ না হইলে কস-শিলায় ঘর্ষণ করিবেক। ঘর্ষণ করিলে যদি শোভার আধিক্য জন্মে এবং পরিমাণ নষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহা বিশুদ্ধ জাতি; তদ্ভিন্ন বিজাতি। এই এক প্রকার পরীক্ষা। দ্বিতীয় প্রকার পরীক্ষা এই যে, হীরক হউক, বা মাণিক্য হউক, স্বজাতীয় দুইটী মণি মুখোমুখি করিয়া ঘর্ষণ করিবেক, অথবা একের দ্বারা অন্যকে বিলেখিত অর্থাৎ আঁচোড়ন করিবেক। জাত্য হইলে কেহ কাহারও গাত্রে বিলেখন করিতে সমর্থ হইবেক না। তৃতীয় প্রকার পরীক্ষা এই যে, যে পদ্মরাগ মণি শ্যামিকার পুষ্টি করে, যে মণি তুষবৎ চূর্ণমধ্য, এবং যাহাকে স্নেহাক্ত দেখায় না, মার্জ্জন করিলে যাহার দীপ্তি ন্যূন হয়, অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা যাহার মস্তক অর্থাৎ ঊর্দ্ধভাগ ধারণ করিলে যাহার পার্শ্বে কালিকা অর্থাৎ কাল ছবি প্রকাশ পায়, তাহা জাত্য মণি নহে, তাহা নিশ্চিত বিজাত। জাত্য মণিতে ঐ সকল ঘটনা হয় না। শব্দকল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থের অন্য এক প্রমাণে চতুর্থ প্রকার পরীক্ষার কথাও আছে। যথা—

"তুল্য প্রমানস্যতু তুল্যজাতে
র্যোবা গুরুত্বেন ভাবন্নতুল্যঃ।"

এক জাতীয় দুইটী মণি যদি আকার প্রমাণে অর্থাৎ দেখিতে তুল্য হয়, আর যদি তাহা গুরুত্বে তুল্য না হয়, তাহা হইলে যেটী লঘু, সেটী বিজাত। এতদ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, তুল্যাকার অন্য মণির সঙ্গে ওজন করিয়া দেখাও এক প্রকার জাত্য পরীক্ষা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মাণিক্যরত্ন রক্তচ্ছবি-বিশিষ্ট। মাণিক্য মাত্রেই রক্ত বর্ণ বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। রক্তবর্ণতারও প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ অনুসারে নাম-ভেদ ও মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। উপরে যে জাতি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ সকল জাতি গুণ যদি বিভিন্ন বর্ণের মাণিক্যেও সমঞ্জস্য লাভ করে, তাহা হইলেই তাহাকে মাণিক বলা যাইবেক, নচেৎ তাহা অন্য এক প্রকার প্রস্তর মাত্র।

কোন কোন মতে এই রত্ন রক্তবর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণও হইয়া থাকে। সেই বর্ণ অনুসারে মাণিক্য চারি প্রকার জাতি বলিয়া গণ্য হয়। যথা—

"তত্ররক্তং যদি পদ্মরাগ মথতৎ
পীতাভি রক্তং দ্বিধা।
জানীয়াৎ কুরু বিন্দকং যদরুণং-
স্যাদেষু সৌগন্ধিকম্।
তন্নীলং যদি নীল গন্ধিক-মিতি
জ্ঞেয়ং চতুধা বুধৈঃ।"

[রাজ নির্ঘণ্টঃ।

অর্থ এই, যে, সেই মাণিক্য যদি রক্ত বর্ণ হয় তবে তাহার "পদ্মরাগ" নাম দেওয়া যায়। আর যদি তাহা পীতাভ কি অতি রক্ত হয়, তবে তাহা দুই প্রকার স্থির করিবে। যাহা অতি রক্ত, তাহা "কুরুবিন্দক" এবং যাহা পীতাভ, তাহা "সৌগন্ধিক"। যদি তাহা নীলাভ হয়, তবে তাহা "নীলগন্ধিক" বলিয়া জানিতে হইবেক।

দোষ।

রত্নবিৎ পণ্ডিতেরা মাণিক্য রত্নের যে সকল দোষনিচয় বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, ক্রমে তাহাও উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"মাণিক্যস্য সমাখ্যাতা
অষ্টৌ দোষা মনীশ্বরেঃ।
দ্বিচ্ছায়ঞ্চ দ্বিরুপঞ্চ সম্ভেদঃ
কর্করাস্তথা।
গুণাশ্চত্বার আখ্যাতাশ্ছায়াঃ
ষোড়শ কীর্ত্তিতাঃ।"

রত্ন পরীক্ষক মুনিগণ মাণিক্যরত্নের আটটী দোষ (মহৎ দোষ) স্থির করিয়া গিয়াছেন। দুইটী ছায়াগত দোষ, দুইটী রূপগত দোষ, সম্ভেদ দোষ এবং কর্কর দোষ। এইরূপ চারিটী গুণ ও ১৬ ষোল প্রকার ছায়ার কথাও বলিয়াছেন। ছায়া কি? এবং তাহা ১৬ ষোল প্রকারই বা কেন? ইহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবেক। "দ্বিচ্ছায়" "দ্বিরূপ" "সম্ভেদ" ও "কর্কর"—এই দোষচতুষ্টয় বিবৃত্ত করা যাউক।

"ছায়া দ্বিতয় সম্বন্ধাৎদ্বিচ্ছায়ং বন্ধুনাশনম্।"
"দ্বিরূপং দ্বিপদং তেনমাণিক্যেন পরাভবঃ।"
"সম্ভেদো ভিন্ন মিত্যুক্তংশস্ত্রঘাত বিধায়কম্।"
"কর্করাং কর্করা যুক্তং পশুবন্ধ বিনাশকৃৎ।"

[যুক্তি কল্পতরু।

যে মাণিক্যে দুই প্রকার ছায়ার সংযোগ থাকে, তাহা দ্বিচ্ছায় দোষগ্রস্থ। দ্বিচ্ছায় মাণিক ধারণ করিলে বন্ধু বিনাশ হয়। যাহার উভয়দিকে পদ তাহা দ্বিরূপ দোষযুক্ত। (পদ কি? তাহা স্বতন্ত্র স্থানে

ব্যক্ত হইবেক) এই দ্বিরূপ মাণিক্য ধারণে পরাভব হয়। ভিন্ন অর্থাৎ ভাঙ্গা হইলে সচ্ছেদ বলে। সচ্ছেদ মাণিক্য ধারণে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়। কর্করা অর্থাৎ কাঁকর সংযোগ থাকিলে তাহা কর্কর দোষে দুষ্ট বলা যায়। এই কর্কর মাণিক্য ধারণ করিলে নানা প্রকার দুঃখ ঘটনা হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীরামদাস সেন ॥

পালামৌ ।

তৃতীয় অংশ ।

পূর্ব্বে একবার "লাতেহার" নামক পাহাড়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই পাহাড়ের কথা আবার লিখিতে বসিয়াছি বলিয়া আমার আহ্লাদ হইতেছে। পুরাতন কথা বলিতে বড় সুখ, আবার বিশেষ সুখ এই যে আমি শ্রোতা পাইয়াছি। তিন চারিটি নিরীহ ভদ্রলোক, বোধ হয় তাঁহাদের বয়স হইয়া আসিতেছে, পুরাতন কথা বলিতে শীঘ্র আরম্ভ করিবেন এমন উমেদ রাখেন, বঙ্গদর্শনে আমার লিখিত পালামৌ-পর্য্যটন পড়িয়াছেন, আবার ভাল বলিয়াছেন। প্রশংসা অতিরিক্ত, তুমি প্রশংসা কর আর না কর, বৃদ্ধ বসিয়া তোমায় পুরাতন কথা শুনাবে, তুমি শুন বা না শুন সে তোমায় শুনাবে, পুরাতন কথা এই রূপে থেকে যায়, সমাজের পুঁজি বাড়ে। আমার গল্পে কাহারও পুঁজি বাড়িবে না, কেন না আমার নিজের পুঁজি নাই। তথাপি গল্প করি, তোমরা শুনিয়া আমায় চিরবাধিত কর।

নিত্য অপরাহ্নে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শত কার্য্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিলে আমি অস্থির হইতাম; কেন তাহা কখন ভাবিতাম না; পাহাড়ে কিছুই নূতন নাই; কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোন গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমায় সেখানে যাইতে হইত জানি না। এখন দেখি এ বেগ আমার একার নহে। যে সময় উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে; জলে যে যাইতে পাইল না সে অভাগিনী, সে গৃহে বসিয়া দেখে উঠানে ছায়া পড়িং

তেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রং ফিরিতেছে, বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধ হয় আমিও পৃথিবীর রং ফেরা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু আর একটু আছে, সেই নির্জ্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম।

এই পাহাড়ের ক্রোড় অতি নির্জ্জন, কোথায়ও ছোট জঙ্গল নাই, সর্ব্বত্র ঘাস। অতি পরিষ্কার, তাহাও বাতাস আসিয়া নিত্য ঝাড়িয়া দেয়। মৌয়া গাছ তথায় বিস্তর। কতকগুলি একত্রে গলাগলি করে বাস করে, আর কতকগুলি বিধবার ন্যায় এখানে সেখানে একাকী থাকে। তাহারই মধ্যে একটীকে আমি বড় ভাল বাসিতাম, তাহার নাম "কুমারী" রাখিয়াছিলাম। কখন তাহার ফল কি ফুল হয় নাই; কিন্তু তাহার ছায়া বড় শীতল ছিল। আমি সেই ছায়ায় বসিয়া "দুনিয়া" দেখিতাম। এই উচ্চ স্থানে বসিলে পাঁচ সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত দেখা যাইত। দূরে চারিদিকে পাহাড়ের পরিখা, যেন সেই খানে পৃথিবীর শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই পরিখার নিম্নে গাঢ় ছায়া, অল্প অন্ধকার বলিলেও বলা যায়। তাহার পর জঙ্গল। জঙ্গল নামিয়া ক্রমে স্পষ্ট হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্যে দুই একটী গ্রাম হইতে ধীরে ধীরে ধূম উঠিতেছে, কোন গ্রাম হইতে হয়ত বিষণ্ণ ভাবে মাদল বাজিতেছে, তাহার পরে আমার তাঁবু, যেন একটি শ্বেত কপোতী জঙ্গলের মধ্যে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছে। আমি অন্যমনস্কে এই সকল দেখিতাম, আর ভাবিতাম এই আমার "দুনিয়া।"

একদিন এই স্থানে সুখে বসিয়া চারিদিক দেখিতেছি, হঠাৎ একটি লতার প্রতি দৃষ্টি পড়িল; তাহার একটি ডালে অনেক দিনের পর চারি পাঁচটী ফুল ফুটিয়াছিল। লতা আহ্লাদে তাহা আর গোপন করিতে পারে নাই, যেন কাহারে দেখাইবার জন্য ডালটি বাড়াইয়া দিয়াছিল। একটী কালো কোলো বড় গোচের ভ্রমর তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; আর এক একবার সেই লতায় বসিতেছিল। লতা তাহাকে নারাজ, ভ্রমর বসিলেই অস্থির হইয়া মাথা নাড়িয়া উঠে। লতাকে এইরূপ সচেতনের ন্যায় রঙ্গ করিতে দেখিয়া আমি হাসিতেছিলাম এমত সময়ে আমার পশ্চাতে উচ্চারিত হইল,

"রাধে মন্থ্যং পরিহর হরিঃ
পাদ মূলে তরায়ং।"

আমি পশ্চাৎ ফিরিলাম, দেখিলাম কেহই নাই, চারিদিক চাহিলাম কোথায়ও কেহ নাই। আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছি এমত সময় আবার আর এক দিকে শব্দিত হইল,

"রাধে মন্থ্যং ইত্যাদি।"

আমার শরীর রোমাঞ্চ হইল, আমি সেই দিকে কতক সভয়ে, কতক কৌতূহল পরবশে গেলাম। সে দিকে গিয়া আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না কিয়ৎ

পরেই "কুমারীর" ডাল হইতে সেই শ্লোক আবার উচ্চারিত হইল, কিন্তু তখন শ্লোকের স্পষ্টতা আর পূর্ব্বমত বোধ হইল না, কেবল স্বর আর ছন্দ শুনা গেল, "কুমারীর" মূলে আসিয়া দেখি, হরিয়াল ঘুঘুর ন্যায় একটী পক্ষী আর একটীর নিকট মাথা নাড়িয়া এই ছন্দে আস্ফালন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে, পক্ষিণী তাহাকে ডানা মারিয়া সরিয়া যাইতেছে, কখন কখন অন্য ডালে গিয়া বসিতেছে। এবার আমার ভ্রান্তি দূর হইল, আমি মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দের একটিমাত্র শ্লোক জানিতাম; ছন্দটী উচ্চারণ মাত্রেই শ্লোকটি আমার মনে আসিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেও তাহার কার্য্য হইয়াছিল, আমি তাহাই শুনিয়াছিলাম "রাধে মন্যুং।" কিন্তু পক্ষী বর্ণ উচ্চারণ করে নাই কেবল ছন্দ উচ্চারণ করিয়াছিল। তাহা যাহাই হউক আমি অবাক হইয়া পক্ষীর মুখে সংস্কৃত ছন্দ শুনিতে লাগিলাম। প্রথমে মনে হইল যিনি "উদ্ধব দূত" লিখিয়াছেন, তিনি হয়ত এই জাতি পক্ষীর নিকট ছন্দ পাইয়াছিলেন? শ্লোকটির সঙ্গে এই "কুঞ্জকীরানুবাদের" বড় সুসঙ্গতি হইয়াছে। শ্লোকটী এই—

রাধে মন্যুং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ং।
জাতং দৈবা দশদৃশ মিদং বারমেকং ক্ষমস্ব॥
এতানাকর্ণয়সি নয়বন্ কুঞ্জকীরানুবাদা।
নেভিঃ ক্রৈরেধয়মবিরতং বঞ্চিতাঃ বঞ্চিতাঃস্ম

উদ্ধব মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া রাধার কুঞ্জে উপস্থিত হইলে গোপীগণ আপনাদের দুঃখের কথা তাঁহার নিকট বলিতেছেন, এমত সময়ে কুঞ্জের একটা পক্ষী বৃক্ষশাখা হইতে বলিয়া উঠিল, "রাধে আর রাগ করিও না। চেয়ে দেখ, স্বয়ং হরি তোমার পদতলে। দৈবাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে একবার তাহা ক্ষমা কর।" গোপীরা এতবার এই কথা রাধিকাকে বলিয়াছে যে কুঞ্জ পক্ষীরা তাহা শিখিয়াছিল। যাহা শিখিয়াছিল অর্থ না বুঝিয়া পক্ষীরা তাহা সর্ব্বদাই বলিত। গোপীরা উদ্ধবকে বলিলেন, "শুন্‌লে— কুঞ্জের ঐ পাখি কি বলিল—শুন্‌লে? একে বিধাতা আমাদের বঞ্চনা করেছেন, আবার দেখ পোড়া পক্ষীও কত দগ্ধাচ্ছে।"

পক্ষী আবার বলিল "রাধে মন্যুং পরিহর হরিপাদমূলে তবায়ং" তাহাই বলিতেছিলাম বিহঙ্গচ্ছন্দে বিহঙ্গের উক্তি বড় সুন্দর হইয়াছিল।

ছন্দ কি গীত শিখাইলে অনেক পক্ষী তাহা শিখিতে পারে; কিন্তু ছন্দ যে কোন পক্ষীর স্বরে স্বভাবিক আছে তাহা আমি জানিতাম না, সুতরাং বন্য পক্ষীর মুখে ছন্দ শুনিয়া বড় চমৎকৃত হইয়াছিলাম। পক্ষীটীর সঙ্গে কতই বেড়াইলাম, কতবার এই ছন্দ শুনিলাম, শেষ সন্ধ্যা হইলে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে মনে হইল যদি এখানে কেহ ডারউইন সাহেবের ছাত্র থাকিতেন তিনি ভাবিতেন নিশ্চয়ই এ পক্ষীটী রাধাকুঞ্জের শিক্ষিত পক্ষীর বংশ, বৈজিক কারণে পূর্ব্ব পুরুষের অভ্যস্ত শ্লোক ইহার কণ্ঠে

আপনি আসিয়াছে। বৈষ্ণবদের উচিত এ বংশকে আপন আপন কুঞ্জে স্থান দেন। রাধাকুঞ্জের সকল গিয়াছে, সকল ফুরাইয়াছে, কেবল এই বংশ আছে। আমার ইচ্ছা আছে একটী হরিয়াল পালন করি, দেখি সে "রাধে মুন্যং পরিহর" বলে কি না বলে।

আর একদিনের কথা বলি ; তাহা হইলেই লাতেহার পাহাড়ের কথা আমার শেষ হয়। যে রূপ নিত্য অপরাহ্নে এই পাহাড়ে যাইতাম সেই রূপ আর একদিন যাইতেছিলাম, পথে দেখি একটি যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে, পশ্চাতে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে সাধিতে সাধিতে সঙ্গে যাইতেছে। আমি ভাবিলাম যখন স্ত্রীলোক সাধিতেছে তখন যুবার রাগ নিশ্চয় ভাতের উপর হইয়াছে ; আমি বাঙ্গালী, স্থতরাং এ ভিন্ন আর কি অনুভব করিব? এককালে এরূপ রাগ নিজেও কতবার করিয়াছি, তাহাই অন্যের বীরদর্প বুঝিতে পারি।

যখন আমি নিকটবর্ত্তী হইলাম তখন স্ত্রীলোকেরা নিরস্ত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল "আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এই মাত্র আমার গরুকে বাঘে মারিয়াছে ; আমি ব্রাহ্মণ সন্তান ; সে বাঘ না মারিয়া কোন্ মুখে আর জল গ্রহণ করিব?" আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতীত হইয়া বলিলাম "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" আমার অদৃষ্টদোষে বগলে বন্দুক, পায়ে বুট, পরিধানে কোট প্যান্টুলন, বাস তাঁবুতে, স্থতরাং একথা না বলিলে ভাল দেখায় না, বিশেষতঃ অনেকে আমায় সাহেব বলিয়া জানে অতএব সাহেবি ধরণে চলিলাম কিন্তু নিঃসঙ্কোচ চিত্তে। আমি স্বভাবতঃ বড় ভীত, তাহা বলিয়া ব্যাঘ্র ভল্লুক সম্বন্ধে আমার কখন ভয় হয় নাই। বৃদ্ধ শিকারীরা কত দিন পাহাড়ে একাকী যাইতে আমায় নিশেধ করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহা কখনও গ্রাহ্য করি নাই, নিত্য একাকী যাইতাম ; বাঘ আসিবে, আমায় ধরিবে, আমায় খাইবে, এ সকল কথা কখনও আমার মনে আসিত না। কেন আসিত না তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি না। সৈনিক পুরুষদের মধ্যে অনেকে আপনার ছায়া দেখিয়া ভয় পায়, অথচ অম্লান বদনে রণ-ক্ষেত্রে গিয়া রণ করে। গুলি কি তরবার তাহার অঙ্গে প্রবিষ্ট হইবে একথা তাহাদের মনে আইসে না। যত দিন তাহাদের মনে একথা না আইসে, ততদিন লোকের নিকট তাহারা সাহসী ; যে বিপদ না বুঝে সেই সাহসিক। আদিম অবস্থায় সকল পুরুষই সাহসী ছিল, তাহাদের তখন ফলাফল জ্ঞান হয় নাই। জঙ্গলীদের মধ্যে অদ্যাপি দেখা যায় সকলেই সাহসী, ইউরোপীয় সভ্যদের অপেক্ষাও অনেক অংশে সাহসী ; হেতু ফলাফল বোধ নাই। আমি তাহাই আমার সাহসের বিশেষ গৌরব করি না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সাহসের ভাগ কমিয়া আইসে ; পেনাল

কোড যত ভাল হয় সাহস তত অন্তর্হিত হয়। এখন এ সকল কচকচি যাক।

যুবার সঙ্গে কতকদূর গেলে সে আমায় বলিল, "বাঘটি আমি স্বহস্তে মারিব।" আমি হাসিয়া সম্মত হইলাম। যুবা আর কোন কথা না বলিয়া চলিল। তখন হইতে নিজের প্রতি আমার কিঞ্চিৎ ভালবাসার সঞ্চার হইল। "স্বহস্তে মারিব" এই কথায় বুঝাইয়াছিল, যে পরহস্তে বাঘ মরা সম্ভব; আমি সাহেববেশধারী, অবশ্য বাঘ মারিলে মারিতে পারি, যুবা এ কথা নিশ্চয় ভাবিয়াছিল, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাহার পর কতকদূর গিয়া উভয়ে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যুবা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। যুবার স্কন্ধে টাঙ্গী, সে একবার তাহা স্কন্ধ হইতে নামাইয়া তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার পর কতক দূর গিয়া মৃদুস্বরে আমাকে বলিল আপনি জুতা খুলুন, শব্দ হইতেছে। আমি জুতা খুলিয়া খালি পায় চলিতে লাগিলাম, আবার কতকদূর গিয়া বলিল, "আপনি এখানে দাঁড়ান আমি একবার অনুসন্ধান করিয়া আসি।" আমি দাঁড়াইয়া থাকিলাম, যুবা চলিয়া গেল। প্রায় দণ্ডেক পরে যুবা আসিয়া অতি প্রফুল্ল বদনে বলিল, "হইয়াছে, সন্ধান পাইয়াছি, শীঘ্র আসুন বাঘ নিদ্রা যাইতেছে।" আমি সঙ্গে গিয়া দেখি, পাহাড়ের এক স্থানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার ন্যায় একটী গর্ত্ত বা গুহা আছে, তাহার মধ্যস্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত একটি কুটির, চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। যুবা সেই গর্ত্তের নিকটে এক স্থানে দাঁড়াইয়া অতি সাবধানে ব্যাঘ্র দেখাইল। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভাল মানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে, মুখের নিকট সুন্দর নখর সংযুক্ত একটী থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয় নিদ্রার পূর্ব্বে, থাবাটি একবার চাটিয়াছিল। যে দিকে ব্যাঘ্র নিদ্রিত ছিল, যুবা সেই দিকে চলিল। আমায় বলিল, "মাথা নত করিয়া আসুন, নতুবা প্রাঙ্গণে ছায়া পড়িবে" তদনুসারে আমি নত শিরে চলিলাম; শেষ একখানি বৃহৎ প্রস্তরে হাত দিয়া বলিল, "আসুন, এই খানি ঠেলিয়া তুলি," উভয়ে প্রস্তরখানিকে স্থানচ্যুত করিলাম। তাহার পর যুবা একা তাহা ঠেলিয়া গর্ত্তের প্রান্তে নিঃশব্দে লইয়া গেল, একবার ব্যাঘ্রের প্রতি চাহিল, তাহার পর প্রস্তর ঘোর রবে প্রাঙ্গণে পড়িল; শব্দে কি আঘাতে তাহা ঠিক জানিনা ব্যাঘ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার পর পড়িয়া গেল। এ নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না। পর দিবস বাহক স্কন্ধে ব্যাঘ্রটি আমার তাঁবু পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন; কিন্তু তখন তিনি মহানিদ্রাচ্ছন্ন বলিয়া বিশেষ কোন প্রকার আলাপ হইল না।

প্র, না, ব,

বাঙ্গালায় কলের কাপড়।

যখন আগ্নেয় যন্ত্র বাঙ্গালায় প্রথম আনীত হইল, আনন্দে ইতর লোকেরা গাইয়াছিল ;—

"কি কল বানালে সাহেব কোম্পানি ;
কলেতে ধূমা উঠে আপনি।"

তখন তাহারা জানিত না যে সেই কলে তাহাদের কোন অপকার হইবে ; এখনও অনেক ভদ্র বাঙ্গালী জানেন না যে কলের আবির্ভাবে বাঙ্গালার কোন অপকার হইয়াছে বা হইতেছে। মোটামুটি দেখিতে পাই কলের বলে দুই দিনের পথ দুই ঘণ্টায় যাই, অপার নদী পার হই, সস্তা দরে কাপড় পরি ; সুতরাং আমরা কলের অপেক্ষা বাঙ্গালার মঙ্গলদায়ী আর দেখি না।

স্বীকার করি, কল শুভপ্রদ। কিন্তু সে শুভ অনেক সময় আমাদের নিজের ; বঙ্গসমাজের নহে। আমাদের নিজের শুভ এবং সমাজের শুভ পরস্পর বিরোধী নহে সত্য, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহা হয়। চোরের দৃষ্টান্ত স্মরণ কর ; যে ব্যক্তি লক্ষ টাকা চুরি করিল, তাহার কত আহ্লাদ। কিন্তু সেই চুরির নিমিত্ত সমাজের কত রাগ, কত ক্ষতিবোধ! তাহাকে ধরিয়া কারাবদ্ধ না করিলে সে রাগের শান্তি হয় না। এই স্থলে ব্যক্তি বিশেষের এবং সমাজের শুভাশুভ পরস্পর বিরোধী। বিরোধী বলিয়াই নীতিশাস্ত্র ও পেনাল-কোডের প্রয়োজন হইয়াছে।

কলের কাপড় আমাদের আপন আপন পক্ষে বিশেষ ভাল। কিন্তু বঙ্গ সমাজের পক্ষে সেই রূপ কি না, তাহাই প্রথমে আলোচনা করিবার নিমিত্ত দুই একটি কথা স্মরণ করিয়া দিই।

বস্ত্রের বিষয়ে বাঙ্গালা এক সময় পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইয়াছিল। ঢাকায় যেরূপ সূক্ষ্ম ও সুন্দর বস্ত্র বয়ন হইত, তদ্রূপ আর কোন দেশে হইত না। পূর্ব্বকালে যখন রোমানেরা অতি সুবেশী হইয়া উঠেন, তখন ঢাকা হইতে তাঁহারা কার্পাস কাপড় লইয়া যাইতেন। আমাদের দেশে সে সময় "পাট কাপড়" আর "কাপাস কাপড়," এই দুই জাতি বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। রোমানেরা কাপাস কাপড় লইয়া যাইতেন এবং তাঁহাদের দেশে কার্পাস কথাটি চলিত হইয়া গিয়াছিল। তাৎকালিক ইহুদিরাও বাঙ্গালার বস্ত্র ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের অতি প্রাচীন গ্রন্থে কার্পাসের উল্লেখ আছে।

ঢাকায় যে সকল সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহার মধ্যে "সবনাম" আর "আবরোঙা" ভুতি আশ্চর্য্য। "সবনাম" সন্ধ্যার সময় ঘাসে বিস্তার করিয়া রাখিলে প্রাতে

আর তাহা বড় চেনা যায় না; যেন, মাকড়সার জালে শিশির পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ "আবরোঙা" জলে ফেলিলে আর বড় দেখা যায় না। জাহাঙ্গির বাদসার সময় এই সকল বস্ত্র এত সূক্ষ্ম প্রস্তুত হইত যে ৩০ হাত দীর্ঘ আর ২ হাত বহরের থান ওজনে ৫ ভরির অধিক হইত না, তাহার মূল্য ৪০০ টাকা ছিল। এরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র অদ্যাপি আর কোন দেশে হয় নাই।

বাঙ্গালায় ভূমি-কর্ষণ আর বস্ত্র-বয়ন, এই দুই প্রধান কার্য্য ছিল। অধিকাংশ লোকেই এই দুই কার্য্যে লিপ্ত থাকিত। যেমন কস্মিন্‌কালে অন্যদেশ হইতে বাঙ্গালায় চাল আমদানির প্রয়োজন হইত না, সেই রূপ কস্মিন্‌কালে অন্য দেশ হইতে পরিধানের বস্ত্র আসিত না, এই খানেই প্রস্তুত হইত। সুতরাং সমুদয় বাঙ্গালীর বস্ত্র প্রস্তুত করিতে বহু লোক লিপ্ত থাকিতে হইত। কেবল তাঁতিদের দ্বারা এ কার্য্য সমাধা হইয়া উঠিত না, তাহারা মাত্র তাঁত বুনিত। তাহাদের নিমিত্ত সূতা সকল জাতিতেই কাটিয়া দিত, নতুবা অন্যদেশের "হাত তোলায়" থাকিতে হয়। স্ত্রীলোকেরা একার্য্যের ভার লইয়াছিল। তৎকালের স্ত্রীলোকেরা বঙ্গসমাজের অর্থবৃদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ সহায় ছিল; বাঙ্গালার যত ধান্য তাহা সমুদয় তাহারা ভানিয়া দিত; এবং আবাল বৃদ্ধা জুটিয়া সূতা কাটিয়া দিত। বোধ হয় প্রায় এক কোটি স্ত্রীলোক কেবল এই সূতা কাটা কার্য্যে লিপ্ত থাকিত। সূতা কাটা উঠিয়া গিয়াছে, সুতরাং এই এক কোটি স্ত্রীলোক এখন "বেকার।" তাহাদের উপার্জ্জন এখন কলে কাড়িয়া লইয়াছে।

তাহাদের সেই উপার্জ্জন যদি অন্য কোন প্রকারে পূরাণ হইত, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাহা হয় নাই। তাহাই বলিতেছিলাম কলের সূতায় আমাদের নিজের ইষ্ট হইয়াছে, কেননা আমরা কাপড় সস্তা পাইতেছি। কিন্তু বঙ্গ সমাজের অনিষ্ট হইয়াছে, কেননা এক কোটি বঙ্গবাসী বৎসর বৎসর যে অর্থ উপার্জ্জন করিত, সে অর্থ এখন ইংলণ্ড দেশের মাঞ্চেষ্টার নগর লইতেছে।

যাঁহারা বিবেচনা করেন পূর্ব্বে যত লোক এ কার্য্যে লিপ্ত ছিল, এখনও তত লোকই লিপ্ত আছে, তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কি ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ, প্রায় ঘরে ঘরেই চর্কা ঘুরিত। প্রাচীন কালে একটি চলিত কথা ছিল যে "রাজার মা সোনার পাঁইজ কাটে।" এই প্রবাদ দ্বারা এই বুঝা যায় যে সূতা-কাটা বাঙ্গালার সকল অবস্থার লোকের সম্ভব ছিল। আরও দেখা যায় সূতা ও চর্কার জাতকথা এখনও সকল ঘরেই চলিত আছে। অদ্যাপি বলে "আপনার চর্কায় তেল দেও" অর্থ আপনার ভাবনা ভাব। "আর টানা পড়েন করিতে পারি না," অর্থাৎ অনবরত আর যাতা-

কোন মহাজন বিদেশী কাপড় ইংলণ্ডে লইয়া যান তাহা হইলে সে মাল গুদামযাত করা যাইবে অথবা ফেরত পাঠান যাইবে *। তৎকালে ইংরেজরা ভাবিতেন যে বিদেশজাত দ্রব্যাদি ইংলণ্ডরাজ্যে আসিলে স্বদেশজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ক্ষতি হইবে সুতরাং তৎসঙ্গে প্রজাদের অর্থাগম পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিবে। এক্ষণে এ আপত্য তাঁহাদের আর নাই তাঁহারা এখন সকল দেশের দ্রব্যাদি অবাধে আসিতে দেন কেবল মাস্থল (custom duty) আপনাদের হাতে রাখিয়াছেন; কখন কখন তাহা চড়াইয়া বাঁধেন কখন বা নাবাইয়া দেন। তাহাতেই অনেকটা মতলব হাসিল হয়। কিন্তু আমাদের সেরূপে মতলব হাসিল হইবার নহে; ম্যাঞ্চেষ্টারের উপর মাস্থল বাড়িবে না, সুতরাং বার্ডউড সাহেবের পরামর্শ শুনা ভাল, শুনা আবশ্যক। আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারের দ্রব্য কিনিব না, ব্যবহার করিব না, এই প্রতিজ্ঞা যদি করি এবং তাহা রক্ষা করি, তাহা হইলে আমাদের আর গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বিষয়ের নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে হইবে না, কাঁদিতে হইবে না, মর্ম্মব্যথা পাইতে হইবে না; আপনার ইচ্ছার অধীন থাকিয়া, আপনার প্রতিজ্ঞার অধীন থাকিয়া, স্বাধীনতার সুখ লাভ করিতে পারি। স্বাধীনতা আর কিছুই নহে; কে রাজা তাহা লইয়া স্বাধীনতা নহে। আমি যদি ম্যাঞ্চেষ্টারের অধীন না হই তবেই আমি একদিকে স্বাধীন।

---

* "That from and after the 29th day of September 1701, all wrought silks, Bengals, and stuffs mixed with silk or herba, of the manufacture of China, Persia, or the East Indies and all calicoes painted, dyed printed or stained there, which are or shall be imported into this kingdom, shall not be worn or otherwise used in Great Britain; and all goods imported after that day, shall be warehoused or exported again."

বঙ্গদর্শন।

৮৮ সংখ্যা।

আনন্দ মঠ।

(বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়প্রণীত ।)

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাল ৭৬ সাল ঈশ্বর কৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে, কত কাটী তা কে জানে, যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্ব্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ শালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ন হইয়া ছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী কিন্তু জনশূন্যা। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ী পড়িয়া, গবাদির বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্ব্বরা ভূমিখণ্ড সকল অকর্ষিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল, অথবা জঙ্গলে পুরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলময় হইল। যেখানে হাস্যময় শ্যামল শস্যরাশি বিরাজ করিত, যেখানে অসংখ্য গো মহিষাদি বিচরণ করিত, যে সকল উদ্যান গ্রাম্য যুবক যুবতীর প্রমোদ ভূমি ছিল, সে সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর গেল, জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যেখানে মনুষ্যের সুখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্র

আসিয়া হরিণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে সুন্দরীর দল অলক্ত-কাঙ্কিত চরণে চরণভূষণ ধ্বনিত করিতে করিতে, বয়স্যার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে করিতে, উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে যাইত, সেই খানে ভল্লুকে বিবর প্রস্তুত করিয়া শাবকাদি লালন পালন করিতে লাগিল। যে থানে শিশু সকল নবীন বয়সে সন্ধ্যা কালের মল্লিকাকুসুম তুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেই খানে আজি যূথে যূথে বন্যহস্তী সকল মদমত্ত হইয়া বৃক্ষের কাণ্ড সকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যে খানে দুর্গোৎসব হইত সে খানে শৃগালের বিবর, দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, নাটমন্দিরে বিষধর সর্প সকল দিবসে ভেকের অন্বেষণ করে। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই; বিক্রেয় জন্মে কিনিবার লোক নাই; চাসায় চাস করে টাকা পায় না, জমীদারের খাজনা দিতে পারে না; জমীদারেরা রাজার খাজনা দিতে পারে না, রাজা জমীদারী কাড়িয়া লওয়ায় জমীদার সম্প্রদায় হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী সুপ্রসবিনী হইলেন তবু আর ধন জন্মে না। কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহার পায় কাড়িয়া খায়। চোর ডাকাতেরা মাথা তুলিল, সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।

এ দিকে সন্তান সম্প্রদায় নিত্য সচন্দন তুলসী দলে বিষ্ণুপাদ-পদ্ম পূজা করে, যার ঘরে বন্দুক পিস্তল আছে কাড়িয়া আনে। ভবানন্দ বলিয়া দিয়াছিলেন "ভাই! যদি এক দিকে এক ঘর মণি মাণিক্য হীরক প্রবালাদি দেখ আর একদিকে একটা ভাঙ্গা বন্দুক দেখ, মণি-মাণিক্য হীরক প্রবালাদি ছাড়িয়া ভাঙ্গা বন্দুকটী লইয়া আসিবে।"

তার পর, তাহারা গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইতে লাগিল, চর গ্রামে গিয়া, যেখানে হিন্দু দেখে, বলে ভাই বিষ্ণু পূজা করবি? এই বলিয়া ২০।২৫ জন জড় করিয়া মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয়। মুসলমানেরা প্রাণ রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়, সন্তানেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া নূতন বিষ্ণুভক্তদিগকে বিতরণ করে। লুঠের ভাগ পাইয়া গ্রাম্য লোকে প্রীত হইলে বিষ্ণুমন্দিরে আনিয়া বিগ্রহের পাদ স্পর্শ করাইয়া তাহাদিগকে সন্তান করে। লোকে দেখিল সন্তানত্বে বিলক্ষণ লাভ আছে। বিশেষ মুসলমান রাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের বিলোপে অনেক হিন্দুই হিন্দুত্ব স্থাপনের জন্য আগ্রহচিত্ত ছিল। অতএব দিনে দিনে সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দিনে দিনে শত শত, মাসে মাসে সহস্র সহস্র সন্তান আসিয়া ভবানন্দ জীবানন্দের পাদ পদ্মে প্রণাম করিয়া দলবদ্ধ হইয়া দিগদিগন্তরে মুসলমানকে শাসন করিতে বাহির হইতে লাগিল। যেখানে রাজপুরুষ পায়, ধরিয়া মার পিট করে, কখন কখন প্রাণবধ

করে, যেখানে সরকারী টাকা পায় লুটিয়া লইয়া ঘরে আনে, যেখানে মুসলমানের গ্রাম পায় দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করে।

তখন নগরের মহারাজাধিরাজের চৈতন্য হইল। সন্তানদিগের শাসনার্থে তিনি ভূরি ভূরি সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন কিন্তু এখন সন্তানেরা দলবদ্ধ সস্ত্রযুক্ত এবং মহাদম্ভশালী। তাহাদিগের দর্পে সম্মুখে মুসলমান সৈন্য অগ্রসর হইতে পারে না। যদি অগ্রসর হয়, অমিত বলে সন্তানেরা তাহাদিগের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া হরিধ্বনি করিতে থাকে। যদি কখনও কোন সন্তানের দলকে যবন সৈনিকেরা পরাস্ত করে, তখনই আর এক দল সন্তান কোথা হইতে আসিয়া বিজেতাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া হরি হরি বলিতে বলিতে চলিয়া যায়। রাজা আসদউলজমান বড় বিভ্রাটে পড়িলেন। অনেকগুলি গোলা, কামান, হাতী, ঘোড়া, পাঠাইলেন, কিছুতেই সন্তানদিগের "জয় জগদীশ হরে" শব্দের নিবারণ নাই। আসদউলজমান দেখিলেন যে রাজ্যচ্যুত হই।

তখন তিনি কাতরে ইংরেজকে চিঠী লিখিলেন। লিখিলেন যে, কোন মতে আমি আর রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারি না বা পাঠাইতে পারি না; আপনারা রক্ষা করেন তবেই খাজনা আদায় করিব, নচেৎ আপনারা আসিয়া আদায় করুন। ইংরেজেরা পূর্ব্ব হইতে নিজে কতক২ খাজনা আদায় করিতে ছিলেন কিন্তু এখন তাঁহাদিগেরও যত্ন বিফল হইতে লাগিল। এই সময়ে প্রথিত-নামা ভারতীয় ইংরেজকুলের প্রাতঃসূর্য্য ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল। কলিকাতায় বসিয়া লোহার সিকল গড়িয়া তিনি মনে২ বিচার করিলেন, যে এই সিকলে আমি সদ্বীপা সসাগরা ভারতভূমিকে বাঁধিব। একদিন জগদীশ্বর সিংহাসনে বসিয়া নিঃসন্দেহ বলিয়াছিলেন তথাস্তু। কিন্তু সে দিন এখনও দূরে। আজিকার দিনে সন্তানদিগের ভীষণ হরিধ্বনিতে ওয়ারণ হেষ্টিংসও বিকম্পিত হইলেন।

ওয়ারণ হেষ্টিংস প্রথমে ফৌজদারী সৈন্যের দ্বারা বিদ্রোহ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ফৌজদারী সিপাহীর এমনি অবস্থা হইয়াছিল যে তাহারা কোন বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের মুখেও হরিনাম শুনিলে পলায়ন করিত। অতএব নিরুপায় দেখিয়া ওয়ারণ হেষ্টিংস কাপ্তেন টমাস নামক এক জন সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক করিয়া এক দল কোম্পানির সৈন্য বিদ্রোহ নিবারণ জন্য বীরভূম দেশে প্রেরণ করিলেন।

কাপ্তেন টমাস বীরভূমে পৌঁছিয়া বিদ্রোহ নিবারণের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রাজার সৈন্য ও জমীদারদিগের সৈন্য চাহিয়া লইয়া কোম্পানীর সুশিক্ষিত সদস্ত্রযুক্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠ

দেশী বিদেশী সৈন্যের সঙ্গে মিলাইলেন। পরে সেই মিলিত সৈন্য দলে২ বিভক্ত করিয়া সে সকলের আধিপত্যে উপযুক্ত যোদ্ধৃবর্গকে নিযুক্ত করিলেন। পরে সেই সকল যোদ্ধৃবর্গকে দেশ ভাগ করিয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন তুমি অমুক প্রদেশ জেলিয়ার মত জাল দিয়া ছাঁকিতে ছাঁকিতে যাইবে। যেখানে বিদ্রোহী দেখিবে পিপীলিকার মত তাহার প্রাণ সংহার করিবে। কোম্পানির সৈনিকেরা কেহ গাঁজা, কেহ রম মারিয়া বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া সন্তান বধে ধাবিত হইল। কিন্তু সন্তানেরা এখন অসংখ্য অজেয়, কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাসার কাস্তের নিকট শস্যের মত কর্ত্তিত হইতে লাগিল। হরি হরি ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কর্ণ বধির হইয়া গেল। এই রূপে ১১৮০ সাল বীরভূমে সন্তান নাম কীর্ত্তিত করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তখন কোম্পানির অনেক রেশমের কুঠী ছিল। শিবগ্রামে ঐরূপ এক কুঠী ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই কুঠীর ফ্যাক্টর অর্থাৎ অধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার কুঠী সকলের রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই জন্য কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা করিতে পরিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কন্যাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ংও সন্তানদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। সেই প্রদেশে এই সময়ে কাপ্তেন টমাস সাহেব দুই চারি ব্যাটেলিয়ম ফৌজ লইয়া তশরিফ আনিয়াছিলেন। এখন জন কতক চোয়াড়, হাড়ি, ডোম, বাগদী, বুনো সন্তানদিগের উৎসাহ দেখিয়া পরদ্রব্যাপহরণে উৎসাহী হইয়াছিল। তাহারা কাপ্তেন টমাসের রসদ আক্রমণ করিল। কাপ্তেন টমাসের সৈন্যের জন্য গাড়ো গাড়ী বোঝাই হইয়া উত্তম ঘি, ময়দা, মুরগী, চাল যাইতেছিল—দেখিয়া ডোম বাগদীর দল লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। তাহারা গিয়া গাড়ী আক্রমণ করিল, কিন্তু কাপ্তেন টমাসের সিপাহীদের হস্তস্থিত বন্দুকের দুই চারিটা গুতা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। কাপ্তেন টমাস তৎক্ষণেই কলিকাতায় রিপোর্ট পাঠাইলেন যে আজ ১৫৭ জন সিপাহী লইয়া ১৪,৭০০ বিদ্রোহী পরাজয় করা গিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের মধ্যে ২১৫৩ জন মরিয়াছে আর ১২৩৩ জন আহত হইয়াছে। ৭ জন বন্দী হইয়াছে। কেবল শেষ কথাটাই সত্য।

কাপ্তেন টমাস, ব্লেনহিম বা রসবাকের মত দ্বিতীয়যুদ্ধ জয় করিয়াছি মনে করিয়া গোঁপ দাড়ী চুমরাইয়া নির্ভয়ে ইতস্তত বেড়াইতে লাগিলেন। এবং ডনিওয়ার্থ সাহেবকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন যে, আর কি এক্ষণে

বিদ্রোহ নিবারণ হইয়াছে, তুমি স্ত্রী পুত্রদিগকে কলিকাতা হইতে লইয়া আইস। ডনিওয়ার্থ সাহেব বলিলেন, "তা হইবে, আপনি দশদিন এখানে থাকুন, দেশ আর একটু স্থির হউক, স্ত্রী পুত্র লইয়া আসিব।" ডনিওয়ার্থ সাহেবের ঘরে পোলা মটন মুরগী ছিল। পনীরও তাঁহার ঘরে অতি উত্তম ছিল। নানাবিধ বন্যপক্ষী তাঁহার টেবিলের শোভা সম্পাদন করিত। শ্মশ্রুমান বাবুর্চীটি দ্বিতীয় দ্রৌপদী। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে কাপ্তেন টমাস সেইখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিগে ভবানন্দ মনে মনে গর গর করিতেছে, ভাবিতেছে কবে এই কাপ্তেন টমাস সাহেব বাহাদুরের মাথাটী কাটিয়া, দ্বিতীয় সম্বরারি বলিয়া উপাধি ধারণ করিবে। ইংরেজ যে ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধন জন্য আসিয়াছিল, সন্তানেরা তাহা তখন বুঝে নাই। কি প্রকারে বুঝিবে? কাপ্তেন টমাসের সমসাময়িক ইংরেজরাও তাহা জানিতেন না। তখন কেবল বিধাতার মনে মনেই একথা ছিল। ভবানন্দ ভাবিতেছিল এ অসুরের বংশ একদিনে নিপাত করিব, সকলে জমা হউক, একটু অসতর্ক হউক, আমরা এখন একটু তফাত থাকি। সুতরাং তাহারা একটু তফাত রহিল। কাপ্তেন টমাস সাহেব নিষ্কণ্টক হইয়া সাঁওতাল কুমারীদিগের গুণগ্রহণে মনোযোগ দিলেন। তখনকার ভারতীয় ইংরেজেরা এখনকার ইংরেজদিগের ন্যায় পবিত্র চরিত্র ছিলেন না।

সাহেব বাহাদুর শীকার বড় ভাল বাসেন, মধ্যে২ শিবগ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে মৃগয়ায় বাহির হইতেন। একদিন ডনিওয়ার্থ সাহেবের সঙ্গে অশ্বারোহণে কতকগুলি শিকারী লইয়া কাপ্তেন টমাস শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। বলিতে কি, টমাস সাহেব অসমসাহসিক, বলবীর্য্যে ইংরেজ জাতির মধ্যেও অতুল্য। সেই নিবিড় অরণ্য ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লুকাদিতে অতিশয় ভয়ানক। বহুদূর আসিয়া শিকারীরা আর যাইতে অস্বীকৃত হইল, বলিল ভিতরে আর পথ নাই, আমরা আর যাইতে পারিব না। ডনিওয়ার্থ সাহেবও সেই অরণ্য মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের গর্জ্জন অনেক দিন শুনিয়াছিলেন যে, তিনিও আর যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা সকলে ফিরিতে চাহিলেন। কাপ্তেন টমাস বলিলেন "তোমরা ফেরো ফেরো, আমি ফিরিব না।" এই বলিয়া কাপ্তেন সাহেব নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বস্তুতঃ অরণ্য মধ্যে পথ ছিল না। অশ্ব প্রবেশ করিতে পারিল না কিন্তু সাহেব ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া কাঁধে বন্দুক লইয়া একা অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ব্যাঘ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাঘ্র দেখিলেন না। কি দেখিলেন? এক বৃহৎ বৃক্ষতলে প্রাস্ফুটিত কুসকুসুমযুক্ত

লতা গুল্মাদিতে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া ও কে? বাঘ কি?—বাঘ তো নয়, এক নবীন সন্ন্যাসী, রূপে বন আলো করিয়াছে। প্রস্ফুটিত ফুল যেন সেই স্বর্গীয় বপুর সংসর্গে অধিকতর সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে। কাপ্তেন টমাস সাহেব বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের পরেই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি শুনিয়াছিলেন কতক দেখিয়াও ছিলেন, যে, বিদ্রোহীরা অনেক সময়ে সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে বেড়ায়। কাপ্তেন সাহেব দেশী ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, বলিলেন, "তুমি কে"?

সন্ন্যাসী বলিল "আমি সন্ন্যাসী।"

কাপ্তেন বলিলেন "তুমি বিদ্রোহী।"

সন্ন্যাসী, "না হয় তাই হলেম।"

কাপ্তেন। "তবে তোমায় গুলি করিয়া মারিব"

সন্ন্যাসী। "মার"

কাপ্তেন একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, গুলি মারিবেন কি না, এমন সময় বিদ্যুৎবেগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। সন্ন্যাসী বক্ষাবরণ চর্ম্ম খুলিয়া ফেলিয়া দিল। একটানে দাড়ি, গোপ, জটা, খুলিয়া ফেলিল; কাপ্তেন টমাস সাহেব দেখিলেন অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি। সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল "সাহেব, আমি স্ত্রীলোক, কাহাকেও আঘাত করি না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু মোছলমানে মারামারী হইতেছে তোমারা মাঝখানে কেন? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।

সাহেব। তুমি কে।

শান্তি। দেখিতেছ সন্ন্যাসিনী। যাহাদের সঙ্গে লড়াই করিতে আসিয়াছ তাহাদেরই কাহারও স্ত্রী।

সাহেব। তুমি আমার ঘরে থাকিবে?

শান্তি। কি? তোমার উপপত্নী স্বরূপ?

সাহেব। স্ত্রীর মতই থাকিতে পার, তবে বিবাহ হইবে না।

শান্তি। আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে; আমাদের ঘরে একটা রূপী বাঁদর ছিল, সেটা সম্প্রতি মরে গেছে; কোটর খালি পড়ে আছে। কোমরে চেকল দেবো, তুমি সেই কোটরে থাকবে? আমাদের বাগানে বেশ মর্ত্তমান কলা হয়।

সাহেব। তুমি ভাল মেয়ে মানুষ, তোমার সাহসে আমি খুসী হইয়াছে। তুমি আমার ঘরে চল। তোমার স্বামী যুদ্ধে মরিয়া যাইবে। তখন তোমার কি হইবে?

শান্তি। তবে তোমায় আমায় একটা কথা থাক। যুদ্ধ ত দুদিন চারিদিনে হবেই। যদি তুমি জেত তবে আমি তোমার উপপত্নী হইয়া থাকিব স্বীকার করিতেছি, যদি বাঁচিয়া থাকি। আর আমরা যদি জিতি, তবে তুমি আসিয়া, আমাদের সেই কোটরে বাঁদর সেজে কলা খাবে ত?

সাহেব। কলা খাইতে উত্তম জিনিষ। এখন আছে?

শান্তি। নে তোর বন্দুক নে। এমন বুনো জেতের সঙ্গেও কেউ কথা কয়!

শান্তি বন্দুক ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্তি সাহেবকে ত্যাগ করিয়া হরিণীর ন্যায় ক্ষিপ্রচরণে বন মধ্যে কোথায় প্রবিষ্ট হইল। সাহেব কিছু পরে শুনিতে পাইলেন স্ত্রীকণ্ঠে গীত হইতেছে;—

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

আবার কোথায় শারঙ্গের মধুর নিক্কনে বাজিল তাই,

এ যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

তাহার সঙ্গে পুরুষ কণ্ঠ মিলিয়া গীত হইল;—

এ যৌবন জলতরঙ্গে রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

তিন স্বরে এক হইয়া গানে বনের লতা সকল কাঁপাইয়া তুলিল। শান্তি গাইতে গাইতে চলিল।

"এই যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

জলেতে তুফান হয়েছে,
আমার নূতন তরী, ভাসল সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে,
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পূরাই মনের সাধ,
জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে, রাখিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!"

সারঙ্গেও ঐ বাজিতেছিল,

জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবেকে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

যেখানে অতি নিবিড় বন, ভিতরে কি আছে বাহির হইতে একেবারে অদৃশ্য, শান্তি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেইখানে সেই শাখাপল্লব রাশির মধ্যে লুক্কাইত একটী ক্ষুদ্র কুটীর আছে। ডালের বাঁধন, পাতার ছাওয়া, কাঠের মেজে, তার উপরে মাটী ঢালা। তাহারই ভিতরে লতাদ্বার মোচন করিয়া শান্তি প্রবেশ করিল। সেখানে জীবানন্দ বসিয়া সারঙ্গ বাজাইতেছিলেন।

জীবানন্দ শান্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"এত দিনের পর জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে কি?"

শান্তিও হাসিয়া উত্তর করিল। "নালা ডোবায় কি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে?

জীবানন্দ বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, দেখ

শান্তি! একদিন আমার ব্রত ভঙ্গ হওয়ায় আমার প্রাণত উৎসর্গই হইয়াছে। যে পাপ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। এত দিন এ প্রায়শ্চিত্ত করিতাম, কেবল তোমার অনুরোধেই করি নাই। কিন্তু একটা ঘোরতর যুদ্ধের আর বিলম্ব নাই। সেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে, আমার সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। আমার মরিবার দিন পর্য্যন্তই কি—"

শান্তি বলিল "আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, সহধর্ম্মিনী, ধর্ম্মে সহায়। তুমি অতিশয় গুরুতর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ। সেই ধর্ম্মের সহায়তার জন্যই আমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। দুই জনে একত্রে সেই ধর্ম্মাচরণ করিব বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া বনে বাস করিতেছি। তোমার ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিব। ধর্ম্মপত্নী হইয়া, তোমার ধর্ম্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহকালের জন্য, এবং বিবাহ পরকালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ মনেকর তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য। পরকালে দ্বিগুণ ফল ফলিবে। হায় প্রভু! তুমিই আমার গুরু, আমি কি তোমায় ধর্ম্ম শিখাইব? তুমি বীর, আমি কি তোমায় বীর ব্রত শিখাইব?

জীবানন্দ আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া বলিল, "শিখাইলে ত। আমিও শিখিলাম। তুমিই স্ত্রীকূলে ধন্যা।"

শান্তি প্রফুল্লচিত্তে বলিতে লাগিল, আরও দেখ গোঁসাই, ইহকালেই কি আমাদের বিবাহ নিষ্ফল? তুমি আমায় ভাল বাস, আমি তোমায় ভাল বাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে? বল "বন্দে মাতরং" তখন দুইজনে গলা মিলাইয়া "বন্দে মাতরং" গাইল। গাইতে গাইতে দুই জনেই কাঁদিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভবানন্দ গোস্বামী একদা রাজনগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া একটা অন্ধকার গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। গলির দুই পার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকা শ্রেণী; সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নে এক একবার গলির ভিতর উঁকি মারেন মাত্র। তৎপরে অন্ধকারেরি অধিকার। গলির পাশের একটী দোতালা বাড়ীতে, ভবানন্দ ঠাকুর প্রবেশ করিলেন। নিম্নতলে একটী ঘরে, যেখানে অর্দ্ধবয়স্কা একটা স্ত্রীলোক পাক করিতে ছিল, সেই খানে গিয়া ভবানন্দ মহাপ্রভু দর্শন দিলেন। স্ত্রীলোকটী অর্দ্ধবয়স্কা, মোটা সোটা, কালো কোলো, ঠেঁটি পরা, কপালে উল্কি, সীমন্ত প্রদেশে কেশদাম চূড়াকারে শোভা করিতেছে। ঠন্ ঠন্ করিয়া হাঁড়ির কানায় ভাতের কাটি বাজিতেছে,

কর কর করিয়া অলক দামের কেশ গুচ্ছ উড়িতেছে, গল গল করিয়া মাগী আপনা আপনি বকিতেছে, আর তার মুখ ভঙ্গীতে তাহার মাথার চুড়ার নানা-প্রকার টলুনি টালুনির বিকাশ হইতেছে। এমন সময় ভবানন্দ মহাপ্রভু গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন;—

"ঠাকুরুণ দিদি প্রাতঃপ্রণাম!"

ঠাকুরুণ দিদি ভবানন্দকে দেখিয়া, শশ-ব্যস্তে বস্ত্রাদি সামলাইতে লাগিলেন। মস্তকের মোহন চূড়া খুলিয়া ফেলিবেন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুবিধা হইল না, কেননা সকড়ি হাত! নিষেকমসৃণ সেই চিকুর জাল—হায় তাহাতে পূজার সময় একটী বকফুল পড়িয়াছিল!—বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিতে যত্ন করিলেন; বস্ত্রাঞ্চল ঢাকিতে সক্ষম হইল না, কেননা ঠাকুরুণটী একখানি পাঁচ হাত কাপড় পরিয়াছিলেন। সেই পাঁচ হাত কাপড় প্রথমে গুরু-ভার প্রশস্ত উদরপ্রদেশ বেষ্টন করিয়া আসিতে প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছিল, তার পরে দুঃসহ ভারগ্রস্ত হৃদয় মণ্ডলেরও কিছু আবরু পর্দ্দা রক্ষা করিতে হইয়াছে। শেষে মাথায় পৌঁছিয়া বস্ত্রাঞ্চল জবাব দিল। কাণের উপর উঠিয়া বলিল আর যাইতে পারি না। অগত্যা পরম ব্রীড়াবতী গৌরী ঠাকুরাণী কথিত বস্ত্রাঞ্চলকে কাণের কাছে ধরিয়া রাখিলেন। এবং ভবিষ্যতে আট হাত কাপড় কিনিবার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিলেন "কে গোসাই ঠাকুর? এস এস! আমায় আবার প্রাতঃপ্রণাম কেন ভাই?"

ভব। তুমি ঠান্‌দিদি যে!

গৌরী। আদর করে বল বলিয়া। তোমরা হলে গোসাই মানুষ, দেবতা! তা করেছ করেছ, বেঁচে থাক। তা করলেও করতে পার, হাজার হোক আমি বয়সে বড়।

এখন ভবানন্দের অপেক্ষায় গৌরী দেবী মহাশয়া বছর পঁচিশের বড়, কিন্তু সুচতুর ভবানন্দ উত্তর করিলেন, "সেকি ঠানদিদি! রসের মানুষ দেখে ঠানদিদি বলি। নইলে যখন ছিলাম হয়েছিল, তুমি আমার চেয়ে [illegible] ছোট হইয়াছিলে [illegible] বৈষ্ণবের সব রকম [illegible] মনে মনে [illegible] বলিয়া [illegible] কথাটাই বল্‌তে এসেছি।"

গৌরি। সেকি কথা [illegible]ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে! আমরা হলাম বিধবা।

ভব। তবে নিকে হবে না কি?

গৌরী। তা ভাই, যা জান তা কর। তোমরা হলে পণ্ডিত, আমরা মেয়ে মানুষ কি বুঝি, তা, কবে হবে?

ভবানন্দ অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন "সেই ব্রহ্মচারীটার সঙ্গে এক বার দেখা হইলেই হয়। আর—সে কেমন আছে?"

গৌরী বিষণ্ণ হইল। মনে মনে সন্দেহ

করিল নিকার-কথাটা তবে বুঝি তামাশা। বলিল, "আছে আর কেমন, যেমন থাকে।"

ভব। তুমি গিয়া একবার দেখিয়া আইস কেমন আছে, বলিয়া আইস আমি আসিয়াছি একবার সাক্ষাৎ করিব।

গৌরী দেবী তখন ভাতের কাটি ফেলিয়া, হাত ধুইয়া বড় বড় ধাপের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, দোতালার উপর উঠিতে লাগিল। একটী ঘরে মলিন শয্যার উপর বসিয়া, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী। কিন্তু সৌন্দর্য্যের উপর, একটা ঘোরতর ছায়া আছে। মধ্যাহ্নে কূলপরিপ্লাবিনী প্রসন্নসলিলা বিপুলজলকল্লোলিনী স্রোতস্বতীর বক্ষের উপর অতি নিবিড় মেঘের ছায়ার ন্যায় কিসের ছায়া আছে। নদীহৃদয়ে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তীরে কুসুমিত তরুকুল বায়ুভরে হেলিতেছে, ঘন পুষ্প ভরে নমিতেছে, অট্টালিকা শ্রেণীও শোভিতেছে। তরণীশ্রেণী তাড়নে জল আন্দোলিত হইতেছে। কাল মধ্যাহ্ন, তবু সেই কাদম্বিনী নিবিড় কালো ছায়ায় সকল শোভাই কালিমাময়। এও তাই। সেই পূর্ব্বের মত চারু চিক্কণ চঞ্চল নিবিড় অলকাদাম, পূর্ব্বের মত সেই প্রশস্ত পরিপূর্ণ ললাটভূমে পূর্ব্ব মত অতুল তুলিকালিখিত ভ্রূধনু, পূর্ব্বের মত বিস্ফারিত সজল উজ্জ্বল কৃষ্ণতার বৃহচ্চক্ষু, তত কটাক্ষময় নয়, তত লোলতা নাই, কিছু নম্র। অধরে তেমনি রাগ রঙ্গ, হৃদয় তেমনি শ্বাসানুগামী পূর্ণতায় চল চল, বাহু তেমনি বন্যলতাদুষ্প্রাপ্য কোমলতাযুক্ত। কিন্তু আজ সে দীপ্তি নাই, সে উজ্জ্বলতা নাই, সে প্রখরতা নাই, সে চঞ্চলতা নাই, সে রস নাই। বলিতে কি, বুঝি সে যৌবন নাই। আছে কেবল সে সৌন্দর্য্য আর সে মাধুর্য্য। নূতন হইয়াছে ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য। ইহাকে পূর্ব্বে দেখিলে মনে হইত, মনুষ্য লোকে অতুলনীয়া সুন্দরী, এখন দেখিলে বোধ হয়, ইনি দেবলোকে শাপগ্রস্তা দেবী। ইহার চারি পার্শ্বে দুই তিন খানা তুলাটের পুথি পড়িয়া আছে। দেওয়ালের গায়ে হরিনামের মালা টাঙ্গান আছে, আর মধ্যে মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার পট, কালীয় দমন, নবনারী কুঞ্জর, বস্ত্রহরণ, গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি ব্রজলীলার চিত্র রঞ্জিত আছে। চিত্রগুলির নীচে লেখা আছে, "চিত্র না বিচিত্র?" সেই গৃহ মধ্যে ভবানন্দ প্রবেশ করিলেন।

ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কল্যাণী শারিরীক মঙ্গল ত?"

কল্যাণী। এ প্রশ্ন কি আপনি ত্যাগ করিবেন না? আমার শারিরীক মঙ্গলে আপনারই কি ইষ্ট, আর আমারই বা কি ইষ্ট?

ভব। যে বৃক্ষ রোপণ করে, সে তাহাতে নিত্য জল দেয়। গাছ বাড়িলেই তাহার সুখ, তোমার মৃত দেহে আমি জীবন রোপণ করিয়া ছিলাম, বাড়িতেছে কি না, জিজ্ঞাসা করিব না কেন?

ক। বিষবৃক্ষের কি ক্ষয় আছে?

ভব। জীবন কি বিষ?

ক। না হলে অমৃত সিঞ্চনে আমি তাহা ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলাম কেন?

ভব। সে কথা অনেক দিন জিজ্ঞাসা করিব মনে ছিল, সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। কে তোমার জীবন বিষময় করিয়াছিল?

কল্যাণী স্থির ভাবে উত্তর করিলেন, "আমার জীবন কেহ বিষময় করে নাই। জীবনই বিষময়। আমার জীবন বিষময়, আপনার জীবন বিষময়, সকলেরই জীবন বিষময়।"

ভব। সত্য কল্যাণী আমার জীবন বিষময়। যে দিন অবধি—তোমার ব্যাকরণ শেষ হইয়াছে?

ক। সকলি শেষ হইয়াছে। কেবল স্ত্রীত্ব শেষ হয় নাই।

ভব। অভিধান?

ক। স্বর্গ বর্গ বুঝিতে পারিলাম না। আপনি বুঝাইয়া দিতে পারেন?

ভব। যাহা আপনি বুঝি না, তাহা বুঝাইতে পারি না। সাহিত্য পূর্ব্ব মত পড়া হইতেছে?

ক। পূর্ব্বাপর বুঝি না। কুমারসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া হিতোপদেশ পড়িতেছি।

ভব। কেন কল্যাণী?

কল্যাণী। কুমারে দেব চরিত্র, হিতোপদেশ পশুচরিত্র।

ভব। দেবচরিত্র ছাড়িয়া, পশুচরিত্রে অনুরাগ কেন?

ক। চিত্ত বশ নহে বলিয়া। আমার স্বামীর সম্বাদ কি প্রভু?

ভব। বার বার সে সম্বাদ কেন জিজ্ঞাসা কর? তিনি তো তোমার পক্ষে মৃত।

ক। আমি তাঁর পক্ষে মৃত, তিনি আমার পক্ষে নন।

ভব। তিনি তোমার পক্ষে মৃতবৎ হইবেন বলিয়াই ত তুমি মরিলে। বার বার সে কথা কেন কল্যাণী?

ক। মরিলে কি সম্বন্ধ যায়? তিনি কেমন আছেন?

ভব। ভাল আছেন।

ক। কোথায় আছেন? পদচিহ্নে?

ভব। সেই খানেই আছেন।

ক। কি কাজ করিতেছেন?

ভব। যাহা করিতেছিলেন। দুর্গনির্ম্মাণ, অস্ত্র নির্ম্মাণ। তাঁহারই নির্ম্মিত অস্ত্রে সহস্র সহস্র সন্তান সজ্জিত হইয়াছে। তাঁহার কল্যাণে কামান, বন্দুক, গোলা, গুলী, বারুদের আমাদের আর অভাব নাই। সন্তান মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদিগের মহৎ উপকার করিতেছেন। তিনি আমাদিগের দক্ষিণ বাহু।

ক। আমি প্রাণ ত্যাগ না করিলে কি এত হইত? যার বুকে কাদা পোরা কলসী বাঁধা সে কি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে? যার পায়ে লোহার শিকল সে কি দৌড়ায়? কেন সন্ন্যাসী তুমি এ ছার জীবন রাখিয়াছিলে?

ভব। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মের সহায়।

ক। ছোট ছোট ধর্ম্মে। বড় বড় ধর্ম্মে

কণ্টক। "কণ্টকেনৈব কণ্টকং" আমি বিষ কণ্টকের দ্বারা তাহার অধর্ম্ম কণ্টক উদ্ধৃত করিয়া ছিলাম। ছি! দুরাচার পামর ব্রহ্মচারী! এ প্রাণ তুমি ফিরাইয়া দিলে কেন?

ভব। ভাল, যা দিয়াছ তা না হয় আমারই আছে। কল্যাণী! যে প্রাণ তোমায় দিয়াছি, তাহা কি তুমি আমায় দিতে পার?

ক। আপনি কিছু সম্বাদ রাখেন কি, আমার সুকুমারী কেমন আছে?

ভব। অনেক দিন সে সম্বাদ পাই নাই। জীবানন্দ অনেক দিন সে দিকে যান নাই।

ক। সে সম্বাদ কি আমায় আনাইয়া দিতে পারেন না? স্বামীই আমার ত্যাজ্য, বাঁচিলাম ত কন্যা কেন ত্যাগ করিব? এখনও সুকুমারীকে পাইলে এ জীবনে কিছু সুখ সম্ভাবিত হয়। কিন্তু আমার জন্য আপনি কেন এত করিবেন।

ভব। করিব কল্যাণী। তোমার কন্যা আনিয়া দিব। কিন্তু তার পর?

ক। তার পর কি ঠাকুর?

ভব। স্বামী?

ক। ইচ্ছা পূর্ব্বক ত্যাগ করিয়াছি।

ভব। যদি তার ব্রত সম্পূর্ণ হয়?

ক। তবে তাঁর পায়ে লুটাইব। আমি যে বাঁচিয়া আছি তিনি কি জানেন?

ভব। না।

ক। আপনার সঙ্গে কি তাঁহার সাক্ষাৎ হয় না।

ভব। হয়।

ক। আমার কথা কি কিছু বলেন না?

ভব। না. যে স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গে স্বামীর আর সম্বন্ধ কি?

ক। কি বলিতেছেন?

ভব। তুমি আবার বিবাহ করিতে পার, তোমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে।

ক। আমার কন্যা আনিয়া দাও।

ভব। দিব, তুমি আবার বিবাহ করিতে পার?

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। বিবাহ করিবে?

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। যদি তাই হয়?

ক। সন্তান ধর্ম্ম কোথায় থাকিবে?

ভব। অতল জলে।

ক। পরকাল?

ভব। অতল জলে।

ক। মহাব্রত? এই ভবানন্দ নাম?

ভব। অতল জলে।

ক। কিসের জন্য এসব অতল জলে ডুবাইবে?

ভব। তোমার জন্য। দেখ, মনুষ্য হউন, ঋষি হউন, সিদ্ধ হউন, দেবতা হউন, চিত্ত অবশ; ধর্ম্ম অধর্ম্মের কাছে পরাজিত। যুধিষ্ঠির বলিয়া ছিলেন, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ"; ইন্দ্র সহস্রলোচন, চন্দ্র কলঙ্কী, ব্রহ্মা কন্যাগামী। সন্তানধর্ম্ম আমার প্রাণ, কিন্তু আজ প্রথম বলি, তুমিই আমার প্রাণাধিক প্রাণ। যে দিন তোমায় প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেই

দিন হইতে তোমার পাদমূলে বিক্রীত। আমি জানিতাম না, যে সংসারে এ রূপ-রাশি আছে। এমন রূপরাশি, আমি কখন চক্ষে দেখিব জানিলে, কখন সন্তান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতাম না। এ ধর্ম্ম এ আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়। ধর্ম্ম পুড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ আছে। আজ চারি বৎসর প্রাণও পুড়িতেছে, আর থাকে না। দাহ! কল্যাণী দাহ! জ্বালা! কিন্তু জ্বলিবে যে ইন্ধন তাহা আর নাই। প্রাণ যায়। চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে?

ক। তোমারি মুখে শুনিয়াছি যে সন্তান ধর্ম্মের এই এক নিয়ম যে, যে ইন্দ্রিয় পরবশ হয় তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। একথা কি সত্য?

ভব। এ কথা সত্য।

ক। তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু?

ভব। আমার এক মাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে, তুমি মরিবে?

ভব। নিশ্চিত মরিব।

ক। আর যদি মনস্কামনা সিদ্ধ না করি?

ভব। তথাপি মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত; কেন না চিত্ত আমার ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব না। তুমি কবে মরিবে?

ভব। আগামী যুদ্ধে।

ক। তবে তুমি বিদায় হও। আমার কন্যা পাঠাইয়া দিবে কি?

ভবানন্দ সাশ্রুলোচনে বলিল, "দিব। আমি মরিয়া গেলে আমায় মনে রাখিবে কি?"

কল্যাণী বলিল "রাখিব। ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী বলিয়া মনে রাখিব।"

ভবানন্দ বিদায় হইল কল্যাণী পুঁথি পড়িতে বসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভবানন্দ ভাবিতে ভাবিতে মঠে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাত্রি হইল। পথে একাকী যাইতেছিলেন। বনমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন বনমধ্যে আর এক ব্যক্তি তাঁহার আগে আগে যাইতেছে। ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে হে যাও?"

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, "জিজ্ঞাসা করিতে জানিলে উত্তর দিই—আমি পথিক।"

ভব। বন্দে।

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, "মাতরং।"

ভব। আমি ভবানন্দ গোস্বামী।

অগ্রগামী। আমি ধীরানন্দ।

ভব। ধীরানন্দ, কোথায় গিয়াছিলে?

ধীর। আপনারই সন্ধানে।

ভব। কেন?

ধীর। একটা কথা বলিতে।

ভব। কি কথা?

ধীর। নির্জ্জনে বক্তব্য।

ভব। এইখানেই বল না, এ অতি নির্জ্জনস্থান।

ধীর। আপনি নগরে গিয়াছিলেন?

ভব। হাঁ।

ধীর। গৌরী দেবীর গৃহে?

ভব। তুমিও নগরে গিয়াছিলে না কি?

ধীর। সেখানে একটি পরম সুন্দরী যুবতী বাস করে?

ভবানন্দ কিছু বিস্মিত, কিছু ভীত হইলেন। বলিলেন—"এ সকল কি কথা?"

ধীর। আপনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?

ভব। তার পর?

ধীর। আপনি সেই কামিনীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত।

ভব। (কিছু ভাবিয়া) ধীরানন্দ, কেন এত সন্ধান লইলে? দেখ ধীরানন্দ তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই সত্য। তুমি ভিন্ন আর কয় জন একথা জানে?

ধীর। আর কেহ না।

ভব। তবে তোমাকে বধ করিলেই আমি কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে পারি?

ধীর। পার।

ভব। আইস তবে এই বিজন স্থানে দুই জনে যুদ্ধ করি। হয় তোমাকে বধ করিয়া আমি নিষ্কণ্টক হই, নয় তুমি আমাকে বধ করিয়া আমার সকল জ্বালা নির্ব্বাণ কর। অস্ত্র আছে?

ধীর। আছে—শুধু হাতে কার সাধ্য তোমার সঙ্গে এ সকল কথা কয়। যুদ্ধই যদি তোমার মত হয়, তবে অবশ্য করিব। সন্তানে সন্তানে বিরোধ নিষিদ্ধ কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য কাহারও সঙ্গে বিরোধ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু যাহা বলিবার জন্য আমি তোমাকে খুঁজিতে ছিলাম তাহা সবটা শুনিয়া যুদ্ধ করিলে ভাল হয় না?

ভব। ক্ষতি কি—বল না।

ভবানন্দ তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া ধীরানন্দের স্কন্দে স্থাপিত করিলেন। ধীরানন্দ না পলায়।

ধীর। আমি এই বলিতেছিলাম,—তুমি কল্যাণীকে বিবাহ কর—

ভব। কল্যাণী তাও জান?

ধীর। বিবাহ কর না কেন?

ভব। তাহার যে স্বামী আছে।

ধীর। বৈষ্ণবের সেরূপ বিবাহ হয়।

ভব। সে নেড়া বৈরাগীর—সন্তানের নহে। সন্তানের বিবাহই নাই।

ধীর। সন্তান ধর্ম্ম কি অপরিহার্য্য—তোমার যে প্রাণ যায়। ছি! ছি! আমার কাঁধ যে কাটিয়া গেল? (বাস্তবিক এবার ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল।)

ভব। তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাকে অধর্ম্মে মতি দিতে আসিয়াছ? অবশ্য তোমার কোন স্বার্থ আছে।

ধীর। তাহাও বলিবার ইচ্ছা আছে—তরবার বসাইও না, বলিতেছি। এই

সন্তান ধর্ম্মে আমার হাড় জর জর হইয়াছে—আমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখিয়া দিনপাত করিবার জন্য বড় উতলা হইয়াছি। আমি এ সন্তান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব। কিন্তু আমার কি বাড়ী গিয়া বসিবার যো আছে? বিদ্রোহী বলিয়া আমাকে অনেকে চিনে। ঘরে গিয়া বসিলেই হয় রাজপুরুষে মাথা কাটিয়া লইয়া যাইবে, নয় সন্তানেরাই বিশ্বাসঘাতী বলিয়া মারিয়া ফেলিয়া, চলিয়া যাইবে। এই জন্য তোমাকে আমার পথে লইয়া যাইতে চাই।

ভব। কেন আমায় কেন?

ধীর। সেইটি আসল কথা। এই সন্তান সেনা তোমার আজ্ঞাধীন—সত্যানন্দ এখন এখানে নাই, তুমি ইহার নায়ক। তুমি এই সেনা লইয়া যুদ্ধ কর, তোমার জয় হইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যুদ্ধজয় হইলে তুমি কেন স্বনামে রাজ্যস্থাপন কর না, সেনা ত তোমার আজ্ঞাকারী। তুমি রাজা হও—কল্যাণী তোমার মন্দোদরী হউক, আমি তোমার অনুচর হইয়া স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করি, আর আশীর্ব্বাদ করি। সন্তান ধর্ম্ম অতল জলে ডুবাইয়া দাও।

ভবানন্দ, ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে তরবারি ধীরে ধীরে নামাইলেন। ধীরানন্দও সরিয়া গেল। ভবানন্দ কিছুক্ষণ অন্যমনা ছিলেন, যখন খুজিলেন তখন আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মঠে না গিয়া, ভবানন্দ গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই জঙ্গল মধ্যে একস্থানে একপ্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টাকাদির উপর, লতাগুল্ম কণ্টকাদি অতিশয় নিবিড় ভাবে জন্মিয়াছে। সেখানে অসংখ্য সর্পের বাস। ভগ্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত অভগ্ন ও পরিষ্কৃত ছিল, ভবানন্দ গিয়া তাহার উপরে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভবনান্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রজনী অতি ঘোর তমসাময়ী। তাহাতে সেই অরণ্য অতি বিস্তৃত, একেবারে জনশূন্য, অতিশয় নিবিড়, বৃক্ষলতায় দুর্ভেদ্য, বন্য পশুরও গমনাগমনের বিরোধী। বিশাল, জনশূন্য, অন্ধকার দুর্ভেদ্য, নীরব! রবের মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার অথবা অন্য শ্বাপদের ক্ষুধা ভীতি বা আস্ফালনের বিকট শব্দ। কদাচিৎ কোন বৃহৎ পক্ষীর পক্ষ কম্পন, কদাচিৎ তাড়িত এবং তাড়নকারী, বধ্য এবং বধকারী পশুদিগের দ্রুতগমন শব্দ। সেই বিজনে অন্ধকারে ভগ্ন অট্টালিকার উপর বসিয়া একা ভবানন্দ। তাঁহার পক্ষে তখন যেন পৃথিবী নাই, অথবা কেবল ভয়ের উপাদানময়ী হইয়া আছেন। সেই সময়ে ভবানন্দ কপালে হাত দিয়া ভাবিতেছিল; স্পন্দ নাই, নিশ্বাস

নাই, ভয় নাই, অতি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। মনে মনে বলিতেছিলেন, "যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্য হইবে। আমি ভাগী রথী জল তরঙ্গ সমীপে ক্ষুদ্র গজদেহ স্থাপন করিয়া কি করিব? ইহা আমাকে করিতে হইয়াছে, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। আপনার ওজন আপনি না বুঝিয়া মাণদণ্ডে আমি তুলিত হইতে উঠিয়াছিলাম। যে লোভী, যে পাপিষ্ঠ, যে ইন্দ্রিয় পরবশ, যে অধর্ম্মী তাহার আবার ধর্ম্ম কি? তাহার আবার সত্য কি? পাপে আমার ভয় কি? অনন্ত নরক আমার কপালে নিশ্চিত। ইহজীবন ধ্বংসের সম্ভাবনা, এই ইহজীবন ধ্বংসে আমার ভয় কি? অতএব যাহাই কপালে ঘটুক, আমি এদুষ্কর্ম্ম করিব। এদিকেও প্রাণ যায়, সে দিকেও প্রাণ যাইবে। যে বিপদ দূরবর্ত্তী তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যে বিপদ নিকটবর্ত্তী তাহা হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হয়। আমি ধীরানন্দের পরামর্শ শুনিব।—না! ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু, এ জীবন হয় তো এই মুহূর্ত্তেই সর্প দংশনে শেষ হইতে পারে, কিন্তু জন্মান্তরের তো শেষ নাই। এ জীবনে আমি যদি সুখী হই, সে দুই দিনের জন্য, পরলোকে যদি আমি দুঃখী হই, সে অনন্তকালের জন্য।"

এমন সময়ে পেচক মাথার উপর মৃদু গম্ভীর শব্দ করিল। ভবানন্দ তখন মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "ও কি শব্দ? কাণে যেন গেল, যেন যম আমার ডাকিতেছে। আমি জানি না কে শব্দ করিল, কে আমায় ডাকিল, কে আমায় বিধি দিল, কে আমায় নিষেধ করিল। পুণ্যময়ি অনন্তে! তুমি শব্দময়ী, কিন্তু তোমার শব্দের তো মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমার ধর্ম্মে মতি দাও, আমার পাপ হইতে নিরস্ত কর। ধর্ম্মে, হে গুরুদেব! ধর্ম্মে যেন আমার মতি থাকে।"

তখন সেই ভীষণ কানন মধ্যে হইতে অতি মধুর অথচ গম্ভীর, মর্ম্মভেদী মনুষ্য কণ্ঠ শ্রুত হইল; কে বলিল "ধর্ম্মে তোমার মতি থাকিবে—আশীর্ব্বাদ করিলাম।"

ভবানন্দের শরীরে রোমাঞ্চ হইল। "একি এ? এ যে গুরুদেবের কণ্ঠ! মহারাজ কোথায় আপনি! এ সময়ে দাসকে দর্শন দিন।"

কিন্তু কেহ দর্শন দিল না—কেহ উত্তর করিল না। ভবানন্দ পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন—উত্তর পাইলেন না। এ দিক ওদিক খুঁজিলেন—কোথাও কেহ না।

যখন রজনী প্রভাতে প্রাতঃ সূর্য্য উদিত হইয়া বৃহৎ অরণ্যের শিরঃস্থ শ্যামল পত্র রাশিতে প্রতিভাসিত হইতেছিল তখন ভবানন্দ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ণে প্রবেশ করিল—"হরে মুরারে! হরে মুরারে।" চিনিলেন সত্যানন্দের কণ্ঠ। বুঝিলেন, প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

রঙ্গমতী।

কাব্য।

(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত)

বঙ্গভাষায় উৎসর্গ পত্র কেহ সমালোচনা করেন না,—কেন না সচরাচর তাহা সমালোচনার যোগ্য নহে। সমালোচ্য "রঙ্গমতী কাব্যের" উৎসর্গ পত্র বাস্তবিক সমালোচনার যোগ্য। বাঙ্গালীর কাব্যরসজ্ঞতার উপর অনেকের এমনই অটল ভক্তি, যে তাঁহারা অনায়াসে স্থির করিতে যান যে "বাঙ্গালী কবি কেন?" মনে হইতেছে, সেদিন এক জন লেখক জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন "বাঙ্গালী কবি নয় কেন?" কোন্ কথা ঠিক্ একেবারে বলিয়া উঠা বড় সহজ নহে; অথচ, বাঙ্গালীকে অরসিক বলিতে প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠে! সে যাহা হউক, যে বৈচিত্র কবিপ্রতিভা বিকাশের প্রধান উপকরণ, বঙ্গসমাজে তাহা বড় নাই। এই চিরস্থিতিশীল সমাজে বৈচিত্র হাসির কথা; আনুবর্ত্তিতা পাগলামী। সুতরাং চিন্তাশীল স্বীকার করিবেন যে 'বঙ্গসমাজ কাব্যের প্রশস্ত ক্ষেত্র নহে। বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রে মলয়ানিল যেমন অব্যাহতগতিতে বহিতে পায়, সমাজক্ষেত্রে কাব্যসমীরণ তেমন সৌভাগ্যশালী নহে।

তবে বঙ্গভূমে মহাকাব্য সকল জন্মিল কি রূপে? ইহার উত্তর সহজ। যখনই এই চিরস্থিতিশীল সমাজের অটুট বন্ধনীগুলি কালপ্রভাবে এক এক বার শিথিল হইয়াছে, অমনি বঙ্গে কাব্য জন্মিয়াছে। বৈদেশিক ভাবপ্রবাহ যখন বহিয়াছে, তখনই কাব্য দেখা দিয়াছে—কেন না তখন সমাজ বৈচিত্র্যের মহিমা বুঝিয়াছে। স্বীকার করি, সমাজের এইরূপ অবস্থাতেই সকল দেশে কাব্য জন্মে। কিন্তু ইহাও স্বীকার করি যে, স্থিতিশীলতায় বঙ্গসমাজের তুলনা নাই। নদীমুখনীত কর্দ্দমরাশিতে কতিপয় সহস্র বর্ষ মধ্যে বঙ্গভূমি গঠিত না হউক, কিন্তু স্থিতিশীল আর্য্যজাতির শেষ লীলাস্থলী এই বঙ্গভূমি। তাই সমাজবন্ধন এত কঠোর।—কেন না, নিবিবার আগে প্রদীপ উজ্জ্বলতর হয়! সমাজবন্ধন এত কঠোর বলিয়াই, শিথিলাবস্থায় ইহার কার্য্যক্ষেত্র এত প্রশস্ত হইয়া উঠে। যেখানে ঘাতের বেগ প্রবল, প্রতিঘাতের বেগ সেখানে অসহ্য।

বাঙ্গলার "রঙ্গমতীর" কবি, উৎসর্গপত্রে স্বীয় জীবনের বৈচিত্র্য বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অন্য দেশে সে কার্য্য সমালোচকের। ইহাতেই প্রভেদ

বুঝা যায়। কবির প্রতি আমাদের ভক্তি কেমন, তাহা জানিতে তত কষ্ট পাইতে হয় না। সাধারণতঃ বাঙ্গালী সমালোচক যদি বঙ্গকবিজীবনের বৈচিত্র্য বুঝিতেন, তবে আর বাঙ্গালী কবিকে নিজের কথা নিজে বলিতে হইত না।

ছয় সর্গে "রঙ্গমতী" কাব্য শেষ হইয়াছে। প্রথম সর্গে, কাব্যের নায়ক বীরেন্দ্রের নৌকাযাত্রা এবং দারুণ ঝটিকায় তাঁহার নিমজ্জন বর্ণিত হইয়াছে। সর্গারম্ভে নিদাঘের ছবিটী কমনীয় বটে। আর বাঙ্গলাভাষার "চন্দ্রকলার গীত" এক নূতন জিনিস। তাহা ছাড়া এসর্গে সুখ্যাতির যোগ্য আর কিছু নাই।

দ্বিতীয় সর্গে—"কানন কালীর শ্বেত-প্রস্তর মন্দিরে" সুষুপ্ত যুবা বীরেন্দ্র। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তপস্বিনী। সুষুপ্ত বীরেন্দ্রের নিদ্রায় শান্তি নাই——

নিদ্রার সাগরে

* * * বহিতেছে কুস্বপ্নঝটিকা।

তপস্বিনীর "বৎস বীরেন্দ্র!" সম্বোধন শুনিয়া যুবার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন তিনি আপন স্বপ্নবৃত্তান্তছলে জীবনের পূর্ব্বকাহিনী বিবৃত করিলেন।

এই দীর্ঘ বিবৃতি বড় অস্বাভাবিক হইয়াছে। কবির মনোহর কবিত্বগুণে ইহা পড়িতে ভাল লাগে বটে, কিন্তু ইহা সুরুচিকর নহে। এই সর্গে মহারাষ্ট্র কুলতিলক শিবজীর একটি বড় সুন্দর ছবি আছে। এই ছবি পূর্ণ এবং ভাস্বর। ইতিহাসে শিবজীর সেই সকল অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী পড়িয়া পাঠকের মনে তাঁহার প্রতি যে ভক্তি জন্মে, কবি নবীনচন্দ্রের এই স্বর্ণাক্ষরগ্রথিত, ক্ষুদ্র চিত্রে তাহার শত গুণ ফল হয়। এই দেখুন,

"সগর্ব্বে ফিরায়ে পুনঃ প্রদীপ্ত বদন,
ললাটে ধমনীত্রয় স্ফীত, আরক্তিম,—
বালার্ক কিরণরেখা, হায় রে যেমতি
উদয় গগনে ঝলে নিদাঘ-প্রভাতে।
কুঞ্চিত অধরে পুনঃ বলিতে লাগিলা।
'দস্যু আমি! আমি দস্যু মহারাষ্ট্রকুলে!'
ঘোর অট্ট হাসি বীর উঠিল হাসিয়া।
হাসিয়া? হাসি ত নহে। ভৈরব গর্জ্জনে
আগ্নেয় ভূধর রুদ্ধ হুতাশন-রাশি
হইল নির্গত যেন!—ভয়ঙ্কর হাসি!"

এই চিত্র বড় সুন্দর, বড় উদ্দীপক বটে, কিন্তু ইহা যথাস্থানে নিবেশিত হয় নাই। স্বপ্নবৃত্তান্ত শেষ করিয়া জীবন বৃত্তান্ত আরম্ভ করিলে নির্জ্জনবাসিনী তপস্বিনীর একদিন ভাল লাগিলেও লাগিতে পারে, কিন্তু অন্যের পক্ষে তাহা অসহ্য। সেই উপন্যাসপ্রবাহে শিবজীর এই দৃপ্ত চিত্র ভাসিয়া গিয়াছে;—কবির উদ্দীপনা গুণেও ইহার ফল স্থায়ী হয় নাই। শিবজীর উপর বড় অবিচার করা হইয়াছে। এই মহাচিত্রের গৌরবানুরোধে কবি পুনা দুর্গের চিত্র, কাব্যের প্রথম সর্গে যথাযথ দিলে ভাল করিতেন। সেইখানে আমরা নয়ন ভরিয়া মহারাষ্ট্র দুর্গে শেষ হিন্দুকুলতিলক শিবজীর অনন্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিতাম! তাহা হইলে আর পিতামহীর গল্পমধ্যে, নিম-

অনবস্রান্ত ক্ষীণকণ্ঠ বীরেন্দ্রের মুখে শুনিতে হইত না—

"প্রীতি দৃষ্টি মম পানে করি কিছুক্ষণ,
ত্যজিয়া পর্য্যঙ্কাসন,বীরেন্দ্র কেশরী
ভ্রমিতে লাগিলা ধীরে, অবনত মুখে
অন্য মনে,সন্ধ্যালোকে,শিবির বাহিরে।"

অথচ কাব্যও ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। এই কাব্যের যাহা কেন্দ্র, তাহা বুঝি, তাহা হইলে আরও স্পষ্টীকৃত হইত।

তৃতীয় সর্গের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়,চন্দ্রশেখরের অদ্ভুত নৈসর্গিক শোভা! এই কাব্যের প্রধান আকর্ষণ নিসর্গ বর্ণনা। কাব্যের যে কোন সর্গে ইহার প্রাচুর্য্য আছে। চিরসমতলবাসী বঙ্গকবিকুলের সৃষ্ট সাহিত্যসংসারে "রঙ্গমতী কাব্য" নূতন জিনিস। নিসর্গের অনন্ত ভাব এরূপ উজ্জ্বল বর্ণে আর কোন বাঙ্গালি কবি চিত্রিত করিতে পারেন নাই। এবং নবীন বাবু ভিন্ন আর কোন বাঙ্গালি কবি সে দৃশ্যের প্রতি বিচার করিতে পারেন কি না,জানি না।

এই সর্গে একটী বানরের চিত্র আছে। সে চিত্র পূর্ণ এবং আকাঙ্ক্ষার অতীত। সাধারণতঃ বাঙ্গালী কবি শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া বসেন। সুতরাং ইচ্ছা করিয়া বানর গড়িতে বসিলে কুশলী বাঙ্গালিকবির চিত্র যে, অভ্রান্ত হইবে, ইহা বিস্ময়ের কথা নহে। জলধর এবং বিদ্যাদিগ্গজ বাঙ্গালীর মৌলিক চিত্র। আর সেদিন রামদাস কল্পতরু মূলে দেখা দিয়াছেন। আজ আবার "চৌকি পঞ্চানন" আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন!

"দোহাই তোমার বাবা! যাহা আছে সব
দিতেছি বলিয়া—এক গুণ দুগ্ধ তাহে
দধি দুই গুণ—তিন গুণ লুচি আর
মণ্ডা চতুর্গুণ। ক্ষুদ্র উদর সাগরে
দধি, দুগ্ধ অম্বুরাশি, লুচি মণ্ডাচর।
ভীষণ ঝটিকা তাহে,—অর্থের পিপাসা!"

চতুর্থ সর্গে "রঙ্গমতী বনের" ছবি।—সে বড় সুন্দর! উচ্চতম শৃঙ্গে বসিয়া প্রভাতে বীরেন্দ্র চিন্তামগ্ন! সেইখানে বসিয়া তিনি শৈশবের কথা ভাবিতেছিলেন। শৈশবের, কৈশোরের সরল সুখ, সরল প্রীতির সহিত যৌবনের কুটিল ভাবের তুলনা করিতেছিলেন। শৈশবের যে চিরসঙ্গিনী,—শূন্যহৃদয়া বালিকা,—যৌবনের সে সুখস্বপ্ন তাহার কথা—সেই কুসুমের কথা—তিনি একমনে ভাবিতেছিলেন। এই বনে বালিকা কুসুমের সঙ্গে কেমন খেলা করিতেন, কেমন স্নেহের বিবাদ করিতেন, সে সব কথা মনে পড়িয়া তাঁহার স্মৃতিসাগর মথিত হইতেছিল! যে সকল কবিতায় এই দৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে, তাহারা সকল মোহময়;—পাঠককে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে। কিন্তু এই দৃশ্য বাঙ্গালা কাব্যে আর একবার দেখিয়াছিলাম। বীরেন্দ্র কুসুমকে দেখিয়া, প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যকালের প্রণয়টা মনে পড়িয়া যায়।

বীরেন্দ্রের সুখের চিন্তা থামিয়া গেল —কেন না তিনি দূরে শিকারীর বীরগান

শুনিতে পাইলেন। এই শিকারীর গানের প্রশংসা করিয়া উঠা যায় না। বঙ্গ সাহিত্য-সংসারের প্রধানতঃ গীতি কবিতার জন্যই নবীনবাবুর প্রতিষ্ঠা। তাঁহার "অবকাশ রঞ্জিনীর" পীযূষময়ী গীতি কবিতানিচয়ের নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধের" গীতি কবিতায় মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক স্বীকার করিয়াছেন যে, গীতিকবিতায় তিনি সম্যক্ সিদ্ধ। ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে "রঙ্গমতী কাব্যে" তিনি সে যশঃ সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছেন। বরং গাম্ভীর্য্য ও নৈপুণ্যে এ সম্বন্ধে তিনি সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছেন।

সর্গ শেষে দস্যু বেঞ্জামিনের সঙ্গে বীরেন্দ্রের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পড়িতে পড়িতে আমোদের "Lady of the Lake" মনে পড়িয়া গেল। রডরিকের (Roderick) সঙ্গে ফিজ্জেমসের (Fitz-James) ঠিক্ এইরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল। "রঙ্গমতীর" ধরণ অনেকটা (Lady of the Lake"এর মত। যে সময় গীতি শুনিতে শুনিতে Roderick প্রাণত্যাগ করিয়াছিল "রঙ্গমতী কাব্যে" তপস্বিনীর কাছে পুরোহিতের বিজয় গীতি তাহারই স্থলাভিষিক্ত। তবে বোধ হয় যে, উদ্দীপনায় নবীন বাবুর কবিতার সার্থকতা অধিকতর।

পঞ্চম সর্গের প্রভাতে "রঙ্গমতী দেবী মন্দিরে" জীবন্ত বিষাদের গীতি!—শুনিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। নবীন্ বাবুর গীতিকাব্য কুশলতার আমরা বিস্তর প্রশংসা করিয়াছি—পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। পঞ্চম সর্গের আকর্ষণ বলিতে গেলে দুইটি গীতিই—কুমুদিকার বিষাদগীতি আর তপস্বিনীর কাছে কানন কালীর পুরোহিতের সমরগীতি। সে কথা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি।

ষষ্ঠ সর্গের কবিতার অধিকাংশ বড় ভাবোদ্দীপক। বিশেষ অশোকমূলে একাকিনী বসিয়া, ক্ষুমিয়া রমণী বিচিত্র বাস বুনিতে বুনিতে, বিষাদে, যে বিরহ গীতি গায়িতেছে, তাহা শুনিয়া তৃপ্তি মিটে না।—সে গীতির আমূল উদ্ধৃত করিতে সাধ করে!—একটু শুনুন,

"যে দেশে রয়েছ তুমি,
নাহি কি আকাশ ভূমি
সে দেশে, সলিল নাহি, নাহি রবি শশী?
আকাশে নীলিমা নাই
ভূমে, বৃক্ষলতা নাই,
সলিলে তরল শোভা, নিশি কণ্ঠে শশী?

"দিনে দিবাকর নাই?
প্রদোষ, প্রভাত নাই?
নরের হৃদয় নাই, হৃদয়েতে স্মৃতি?
থাকলে, এ দুঃখিনীরে
ভাসায়ে বিস্মৃতি নীরে,
কেমনে রয়েছ ছাড়ি আশ্রিতা প্রকৃতী?

"যখন যে দিকে চাই,
কেবল দেখিতে পাই

অঙ্কিত তোমার মুখ,—শূন্য, ধরাতল!
ঝর ঝর নিরঝরে,
নিত্য প্রেম গীত ঝরে,
অনন্ত প্রেমের কাব্য গগন, ভূতল!"

নবীন বাবুর বিশ্লেষণ শক্তি "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যে পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। "রঙ্গমতী কাব্যে" তাঁহার আশ্লেষণ শক্তি স্ফূটতালাভ না করুক, দেখা দিয়াছে। "রঙ্গমতীর" অধিকাংশ চিত্র ফোট ফোট হইয়াও ফুটে নাই, তবে ফুটিবার উদ্যম আছে বটে। বীরেন্দ্র চরিত্রে তিনি কয়টী রেখাপাত করিয়াছেন;—তাহারা তাঁহার বিকাশোন্মুখ আশ্লেষণ শক্তির পরিচায়ক। তাঁহার বীরেন্দ্র আশার যেন অবতার! তিনি রঙ্গমতীর সুন্দর কানন দেখিতে দেখিতে উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠেন

"একটী রাজ্যের উপকরণ সুন্দর
রয়েছে পড়িয়া!"

"পলাশীর যুদ্ধে" নবীন বাবু যখনই মাতৃভূমির দুঃখ ভাবিয়া রোদন করিয়াছেন, তাঁহার কবিতা গৈরিকনিস্রববৎ তীব্র উদ্দীপনা উদ্গীর্ণ করিয়াছে। সেই মর্ম্মভেদী রোদন "রঙ্গমতীর" অস্থি পঞ্জর! প্রভেদ এই "পলাশীর যুদ্ধ" কেবলমাত্র সুপদ্যের সমষ্টি! তাহার বড় একটা লক্ষ্য নাই। "রঙ্গমতী কাব্যের" কেন্দ্র আছে, বীজ আছে। সুতরাং কবি, কাব্যসোপানে আর একপদ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

পালামৌ।

আবার পালামৌর কথা লিখিতে বসিয়াছি; কিন্তু ভাবিতেছি এবার কি লিখি? লিখিবার বিষয় এখন ত কিছুই মনে হয় না, অথচ কিছু না কিছু লিখিতে হইতেছে। বাঘের পরিচয় আর ভাল লাগে না; পাহাড় জঙ্গলের কথাও হইয়া গিয়াছে, তবে আর লিখিবার আছে কি? পাহাড়, জঙ্গল, বাঘ, এই লইয়াই পালামৌ। যে সকল ব্যক্তিরা তথায় বাস করে তাহারা জঙ্গলি, কুৎসিত, কদাকার জানওয়ার, তাহাদের পরিচয় লেখা বৃথা।

কিন্তু আবার মনে হয়, পালামৌ জঙ্গলে কিছুই সুন্দর নাই একথা বলিলে লোকে আমায় কি বিবেচনা করিবে? সুতরাং পালামৌ সম্বন্ধে দুটা কথা বলা আবশ্যক।

একদিন সন্ধ্যার পর চিকপর্দ্দা ফেলিয়া তাঁবুতে একা বসিয়া সাহেবি ঢঙ্গে কুকুরী লইয়া ক্রীড়া করিতেছি, এমত সময় এক জন কে আসিয়া বাহির হইতে আমাকে ডাকিল "খাঁ সাহেব!" আমার সর্ব্বশরীর

জ্বলিয়া উঠিল। এখন হাসি পায়, কিন্তু তখন বড়ই রাগ হইয়াছিল। রাগ হইবার অনেক কারণও ছিল; কারণ, নং এক এই যে আমি মান্য ব্যক্তি; আমাকে ডাকিবার সাধ্য কাহার? আমি যাহার অধীন, অথবা যিনি আমা অপেক্ষা অতি প্রধান, কিম্বা যিনি আমার বিশেষ আত্মীয়, কেবল তিনিই আমাকে ডাকিতে পারেন। অন্য লোকে "শুমুন" বলিলে সহ্য হয় না।

কারণ নং দুই যে, আমাকে "খাঁ সাহেব" বলিয়াছে বরং "খাঁ বাহাদুর" বলিলে কতক সহ্য করিতে পারিতাম, ভাবিতাম হয় ত লোকটা আমাকে মুসলমান বিবেচনা করিয়াছে, কিন্তু পদের অগৌরব করে নাই। "খাঁ সাহেব" অর্থে যাহাই হউক, ব্যবহারে তাহা আমাদের "ঘোস মশায়" বা "দাস মশায়" অপেক্ষা অধিক মান্যের উপাধি নহে। হারম্যান কোম্পানি যাহার কাপড় সেলাই করে, ফরাসি দেশে যাহার জুতা সেলাই হয় তাহাকে "ঘোস মহাশয়" বা "দাস মহাশয়" বলিলে সহ্য হইবে কেন? বাবু মহাশয় বলিলেও মন উঠে না। অতএব স্থির করিলাম এ ব্যক্তি যেই হউক, আমাকে তুচ্ছ করিয়াছে আমাকে অপমান করিয়াছে।

সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে ইহার বিশেষ প্রতিফল পাইতে হইত, কিন্তু "হারামজাদ্", "বদ্জাত" প্রভৃতি সাহেবজাতীয় সুলভ গালি ব্যতীত আর তাহাকে কিছুই দিই নাই, এই আমার বাহাদুরি। বোধহয়, সে রাত্রে বড় শীত পড়িয়াছিল, তাহাই তাঁবুর বাহিরে যাইতে সাহস করি নাই। আগন্তুক গালি খাইয়া আর কোন উত্তর করিল না; বোধ হয় চলিয়া গেল। আমি চিরকাল জানি, যে গালি খায়, সে হয় ভয়ে মিনতি করে, নতুবা গালি অকারণ দেওয়া হইয়াছে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তর্ক করে; তাহা কিছুই না করায়, আমি ভাবিলাম এব্যক্তি চমৎকার লোক। সেও হয় ত আমাকে ভাবিল "চমৎকার লোক।" নাম জানে না, পদ জানে না, কি বলে ডাকিবে তাহা জানে না; সুতরাং দেশীয় প্রথা অনুসারে সম্ভ্রম করে 'খাঁ সাহেব' বলিয়া ডাকিয়াছে, তাহার উত্তরে যে 'হারামজাদ' বলিয়া গালি দেয়, তাহাকে "চমৎকার লোক" ব্যতীত আর কি মনে করিবে?

দণ্ডেক পরে আমার "খানশামা বাবু" তাঁবুর দ্বারে আসিয়া ঈষৎ কণ্ঠকণ্ডুয়ন-শব্দ দ্বারা আপনার আগমনবার্ত্তা জানাইল। আমার তখন ও রাগ আছে, "খানসামা বাবু"ও তাহা জানিত, এই জন্য কলিকা হস্তে তাঁবুতে প্রবেশ করিল, কিন্তু অগ্রসর হইল না, দ্বারের নিকট দাড়াইয়া, অতি গম্ভীরভাবে কলিকায় "ফু" দিতে লাগিল, আমি তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ভাবিতেছি, কতক্ষণে কলিকা আলবোলায় বসাইয়া দিবে, এমন সময়ে দ্বারের পার্শ্বে কি নড়িল, চাহিয়া দেখিলাম সেদিকে কিছুই নাই,

কেবল নীল আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে; তাহার পরেই দেখি দুইটি অস্পষ্ট মনুষ্য-মূর্ত্তি দাড়াইয়া আছে, টেবিলের বাতি সরাইলাম, আলোক তাহাদের অঙ্গে পড়িল। দেখিলাম একটি বৃদ্ধ আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রুতে পরিপ্লুত, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, তাহার পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক বোধ হয় যেন যুবতী। আমি তাহাদের প্রতি চাহিবামাত্র উভয়ে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া যোড়হস্তে নতশিরে আমায় সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবতীর মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন বড় ভয় পাইয়াছে, অথচ ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি আছে। তাহার যুগ্ম ভ্রূ দেখিয়া আমার মনে হইল যেন অতি ঊর্দ্ধে নীল আকাশে কোন বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে। আমি অনিমিষ লোচনে সুন্দরী দেখিতে লাগিলাম; কেন আসিয়াছে, কোথায় বাড়ী এ কথা তখন মনে আসিল না। আমি কেবল তাহার রূপ দেখিতে লাগিলাম, তাহাকে দেখিয়াই প্রথমে একটি রূপবতী পক্ষিণী মনে পড়িল; গেঙ্গোখালি "মোহানায়" যেখানে ইংরেজেরা প্রথম উপনিবাস স্থাপন করেন, সেইখানে একদিন অপরাহ্নে বন্দুক স্কন্ধে পক্ষী শিকার করিতে গিয়াছিলাম, তথায় কোন বৃক্ষের শুষ্ক ডালে একটি ক্ষুদ্র পক্ষী অতি বিষণ্ণভাবে বসিয়াছিল, আমি তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, আমায় দেখিয়া পক্ষী উড়িল না, মাথা হেলাইয়া আমায় দেখিতে লাগিল। ভাবিলাম, "জঙ্গলী পাখী হয় ত কখন মানুষ দেখে নাই দেখিলে বিশ্বাসঘাতকে চিনিত।" চিনাইবার নিমিত্ত আমি হাসিয়া বন্দুক তুলিলাম; তবু পক্ষী উড়িল না, বুক পাতিয়া আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। আমি অপ্রতিভ হইলাম, তখন ধীরে ধীরে বন্দুক নামাইয়া অনিমিষলোচনে পক্ষীকে দেখিতে লাগিলাম; তাহার কি আশ্চর্য্য রূপ! সেই পক্ষিণীতে যে রূপরাশি দেখিয়াছিলাম, এই যুবতীতে ঠিক্ তাহাই দেখিলাম। আমি কখন কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের মত রূপ দেখিয়া থাকি, এই জন্য আমি যাহা দেখি, তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। রূপ যে কি জিনিস, রূপের আকার কি, শরীরের কোন কোন স্থানে তাহার বাসা, এ সকল বার্ত্তা আমাদের বঙ্গকবিরা বিশেষ জানেন, এই জন্য তাঁহারা অঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া বর্ণনা করিতে পারেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তাহা পারি না। তাহার কারণ আমি কখন অঙ্গ বাছিয়া রূপ তল্লাস করি নাই। আমি যে প্রকারে রূপ দেখি নির্লজ্জ হইয়া তাহা বলিতে পারি; একবার আমি দুই বৎসরের একটি শিশু গৃহে রাখিয়া বিদেশে গিয়াছিলাম শিশুকে সর্ব্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারও দেখিতে পাইতাম না অনেক দিনের পর একটি ছাগ শিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহ্লাদে তাহাকে

বুকে করিয়াছিলাম। আমার সেই চক্ষু! আমি রূপ রাশি কি বুঝিব? তথাপি যুবতীকে দেখিতে লাগিলাম।

বাল্যকালে আমার মনে হইত যে ভূত প্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন অন্যের দেহ আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপ ও সেই প্রকার অন্যদেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষতঃ মানবী। কিন্তু বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে যেরূপ, লতায় সেইরূপ, নদীতে ও সেই রূপ, পক্ষীতে ও সেই রূপ, ছাগে ও সেই রূপ সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্র ভেদ। আমি পাত্র দেখিয়া ভুলি না; দেহ দেখিয়া ভুলি না; ভুলি কেবল রূপে। সে রূপ, লতায় থাক অথবা যুবতীতে থাক, আমার মনের চক্ষে তাহার কোন প্রভেদ দেখি না। অনেকের এই প্রকার রুচিবিকার আছে। যাহারা বলেন যুবতীর দেহ দেখিয়া ভুলিয়াছেন তাঁহাদের মিথ্যা কথা।

আমি যুবতীকে দেখিতেছি এমত সময় আমার খানসামা বাবু বলিল "এরা বাই, এরাই তখন খাঁ সাহেব বলিয়া ডাকিয়াছিল" শুনিবামাত্র আবার রাগ পূর্ব্বমত গর্জ্জিয়া উঠিল, চিৎকার করিয়া আমি তাহাদের তাড়াইয়া দিলাম। সেই অবধি আর তাহাদের কথা কেহ আমায় বলে নাই। পরদিবস অপরাহ্নে দেখি এক বটতলায়, ছোট বড় কতকগুলা স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, নিকটে দুই একটা "বেতো" ঘোড়া চরিতেছে; জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম তাহারা ও "বাই;" ব্যাঘ্র লাঘব করিবার নিমিত্ত তাহারা পালামৌ দিয়া যাইতেছে, এই সময় পূর্ব্বরাত্রের বাইকে আমার স্মরণ হইল, তাহার গীত শুনিব মনে করিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলাম। কিন্তু লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল অতি প্রত্যূষে সে চলিয়া গিয়াছে, আমি আর কোন কথা কহিলাম না দেখিয়া একজন রাজপুত প্রতিবাসি বলিল, "সে কাঁদিয়া গিয়াছে।"

আ। কেন?

প্র। এই জঙ্গল দিয়া আসিতে আসিতে তাহার সঙ্গিরা সকলে মরিয়াছে মাত্র একজন বৃদ্ধ সঙ্গে ছিল "খরচাও" ফুরাইয়াছে। দুইদিন উপবাস করেছে, আরও কতদিন উপবাস করিতে হয় বলা যায় না। এ জঙ্গল পাহাড় মধ্যে কোথা ভিক্ষা পাইবে? আপনার নিকট ভিক্ষার নিমিত্ত আসিয়াছিল, আপনিও ভিক্ষা দেন নাই।

এ কথা শুনিয়া আমার কষ্ট হইল, তাহার বিপদ কতক অনুভব করিতে পারিলাম, নিজে সেই অবস্থায় পড়িলে কি যন্ত্রণা পাইতাম, তাহা কল্পনা করিতে লাগিলাম। জঙ্গলে অন্নাভাব আর অপার নদীতে নৌকা ডুবি একই প্রকার। আমি তাহাকে অনায়াসে দুই পাঁচ টাকা দিতে পারিতাম, তাহাতে নিজের

কোন ক্ষতি হইত না; অথচ সে রক্ষা পাইত। আমি তাহাকে উদ্ধার করিলাম, না তাড়াইয়া দিলাম; এ নিষ্ঠুরতার ফল একদিন আমায় অবশ্য পাইতে হইবে, এইরূপ কথা আমার সর্ব্বদা মনে হইত। দুই চারি দিনের পর একটি সাহেবের সহিত আমার দেখা হইল, তিনি দশক্রোশ দূরে একা থাকিতেন, গল্প করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার তাঁবুতে আসিতেন। গল্প করিতে করিতে আমি তাঁহাকে যুবতীর কথা বলিলাম, তিনি কিয়ৎক্ষণ রহস্য করিলেন, তাহার পর বলিলেন, আমি স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়াছি; সে এ জঙ্গল অতিক্রম করিতে পারে নাই, পথেই মরিয়াছে; এ কথা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, আমার বড়ই কষ্ট হইল; আমি কেবল অহঙ্কারের চাতুরীতে পড়িয়া "খাঁ সাহেব" কথায় চটিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে একদিন আপনার অহঙ্কারে আপনি হাসিব।

সাহেবকে বিদায় দিয়া অপরাহ্নে যুবতীর কথা ভাবিতে ভাবিতে পাহাড়ের দিকে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে কতকগুলি কোলকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা "দাড়ি" হইতে জল তুলিতেছিল। এই অঞ্চলে জলাশয় একেবারে নাই, নদী শীতকালে একে বারে শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়, সুতরাং গ্রাম্যলোকেরা এক এক স্থানে "পাতকুয়ার" আকারে ক্ষুদ্র খাত খনন করে—তাহা দুই হাতের অধিক গভীর করিতে হয় না—সেই খাতে জল ক্রমে ক্রমে চুঁইয়া জমে, আট দশ কলস তুলিলে আর কিছু থাকে না, আবার জল ক্রমে আসিয়া জমে। এই ক্ষুদ্র খাদগুলিকে দাড়ি বলে।

কোলকন্যারা আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে একটি লম্বোদরী—সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা—মাথায় পূর্ণ কলস দুই হস্তে ধরিয়া হাস্যমুখে আমায় বলিল, রাত্রে নাচ দেখিতে আসিবেন? আমি মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলাম, অমনি সকলে হাসিয়া উঠিল। কোলের যুবতীরা যত হাসে, যত নাচে, বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন জাতির কন্যারা তত হাসিতে নাচিতে পারে না; আমাদের দুরন্ত ছেলেরা তাহার শতাংশে পারে না।

সন্ধ্যার পর আমি নৃত্য দেখিতে গেলাম; গ্রামের প্রান্তভাগে এক বটবৃক্ষতলে গ্রামস্থ যুবারা সমুদয়ই আসিয়া একত্র হইয়াছে। তাহারা "খোঁপা" বাঁধিয়াছে, তাহাতে দুই তিনখানি কাঠের "চিরুনী" সাজাইয়াছে। কেহ মাদল আনিয়াছে, কেহ বা লম্বা লাঠি আনিয়াছে, রিক্তহস্তে কেহই আসে নাই; বয়সের দোষে সকলেরই দেহ চঞ্চল, সকলেই নানা ভঙ্গীতে আপন আপন বলবীর্য্য দেখাইতেছে। বৃদ্ধেরা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃণ্ময় মঞ্চের উপর জড়বৎ বসিয়া আছে, তাহাদের জানু প্রায়

স্কন্ধ ছাড়াইয়াছে, তাহারা বসিয়া নানা ভঙ্গীতে কেবল ওষ্ঠক্রীড়া করিতেছে, আমি গিয়া তাহাদের পার্শ্বে বসিলাম।

এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে, যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ বারটি, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশজন, সেই চল্লিশজনে হাসিলে হাইলণ্ডের পল্টন ঠকে।

হাস্য উপহাস্য শেষ হইলে, নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল, সকলগুলিই সমউচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কাল; সকলেরই অনাবৃত দেহ; সকলের সেই অনাবৃত বক্ষে আরসির ধুক্‌ধুকি চন্দ্রকিরণে এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল, যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।

সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, যুবাদের পশ্চাতে মৃণ্ময়মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎসঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। যদি দেহের কোলাহল থাকে তবে যুবতীদের দেহে সেই কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাদের নৃত্য আমাদের চক্ষে নূতন; তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে, অথচ কেহ চলে না; দোলে না, টলে না। যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া তালে তালে পা ফেলিতে লাগিল, তাহাদের মাথার ফুলগুলি নাচিতে লাগিল, বুকের ধুক্‌ধুকি দুলিতে লাগিল।

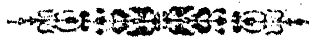
নৃত্য আরম্ভ হইলে পর একজন বৃদ্ধ মঞ্চ হইতে কম্পিত কণ্ঠে একটি গীতের "মহড়া" আরম্ভ করিল, অমনি যুবারা সেই গীত উচ্চৈঃস্বরে গাইয়া, উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যুবতীরা তীব্র তানে "ধুয়া" ধরিল। যুবতীদের সুরের ঢেউ নিকটের পাহাড়ে গিয়া লাগিতে লাগিল। আমার তখন স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল যেন সুর কখন পাহাড়ের মূল পর্য্যন্ত, কখন বা পাহাড়ের বক্ষ পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিতেছে। তাল পাহাড়ে ঠেকা অনেকের নিকট রহস্যের কথা কিন্তু আমার নিকট তাহা নহে, আমার লেখা পড়িতে গেলে এরূপ প্রলাপ বাক্য মধ্যে মধ্যে সহ্য করিতে হইবে।

যুবতীরা তালে তালে নাচিতেছে, তাহাদের মাথার বনফুল সেই সঙ্গে উঠিতেছে নামিতেছে, আবার সেই ফুলের

দুটি একটি ঝরিয়া তাহাদের স্কন্ধে পড়িতেছে। শীতকাল নিকটে দুই তিন স্থানে হুহু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির আলোকে নর্ত্তকীদের বর্ণ আরও কাল দেখাইতেছে; তাহারা তালে তালে নাচিতেছে, নাচিতে নাচিতে ফুলের পাপড়ির ন্যায় সকলে এক এক বার "চিতিয়া" পড়িতেছে; আকাশ হইতে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিতেছে, আর বটমূলের অন্ধকারে বসিয়া আমি হাসিতেছি।

নৃত্যের শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে পারিলাম না; বড় শীত অধিকক্ষণ থাকা গেল না।

প্রঃ নাঃ বঃ।



রস।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রস নয়টি। আদি, হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীবিষয়ক রতি আদিরসের স্থায়ী ভাব; হাস হাস্যরসের স্থায়ী ভাব; শোক করুণরসের স্থায়ী ভাব; উৎসাহ বীররসের স্থায়ী ভাব; বিস্ময় অদ্ভুতরসের স্থায়ী ভাব; ভয়, ভয়ানকরসের স্থায়ী ভাব; জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা বীভৎসরসের স্থায়ী ভাব; ক্রোধ, রৌদ্ররসের স্থায়ী ভাব এবং নির্ব্বেদ শান্তরসের স্থায়ী ভাব। আলঙ্কারিকেরা বলেন, পূর্ব্বোক্ত স্থায়ী ভাবসকল প্রকৃষ্টরূপে আস্বাদ্যমান হইলে তাহাকেই রস কহে।

তাঁহারা মনের ভাবসকলকে স্থায়ী ও সঞ্চারী এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন, কিন্তু কোনস্থলেই কি নিয়মে ভাগ করিয়াছেন, তাহা বলেন নাই। তাঁহাদের মতে কখন কখন স্থায়ী ভাবও সঞ্চারী ভাব হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে স্থায়ী ভাব নয়টির অধিক হইতে পারে না, সুতরাং রসও নয়টির অধিক হইতে পারে না। প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের মনে যাহাই থাকুক না, আধুনিক আলঙ্কারিকেরা নবাধিক রস স্বীকারে একান্ত অসম্মত।

তাঁহাদের মতে প্রত্যেক রসের দেবতা আছে ও প্রত্যেক রসের রূপও আছে। তাঁহাদের মতে আদিরস শ্যামবর্ণ, উহার দেবতা বিষ্ণু। হাস্যরস শ্বেতবর্ণ, উহার দেবতা প্রমথ। রৌদ্ররস রক্তবর্ণ, উহার দেবতা রুদ্র। বীররস হেমবর্ণ, উহার দেবতা মহেন্দ্র। বীভৎসরস নীলবর্ণ, উহার দেবতা মহাকাল। ভয়ানক রস কৃষ্ণবর্ণ, উহার দেবতা কাল। অদ্ভুতরস পীতবর্ণ, উহার

দেবতা গন্ধর্ব্ব। শান্তরস কুন্দেন্দুসুন্দরচ্ছায় অর্থাৎ উহার কান্তি কুন্দপুষ্প এবং চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, উহার দেবতা শ্রীনারায়ণ। করুণরস কপোতবর্ণ অর্থাৎ পারাবতের গলদেশের বর্ণের ন্যায় উহার বর্ণ, উহার দেবতা যম।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের রসপরিচ্ছেদ পাঠ করিলে, কতকগুলি প্রশ্ন স্বতই আমাদের মনোমধ্যে আবির্ভূত হয়। তাঁহারা রস কাহাকে বলিতেন? মনের অসংখ্য ভাবের মধ্যে নয়টিকে বাছিয়াই স্থায়ী ভাব বলিলেন কেন? এই নয়টি ভিন্ন, আরও অনেকগুলি ভাব ত মনোমধ্যে স্থায়ী হইতে পারে। স্ত্রীবিষয়ক অনুরাগ রস হইল; কিন্তু অনুরাগ কি স্ত্রীভিন্ন অপর কাহারও প্রতি বর্ত্তিতে পারে না? না, বর্ত্তিলে স্থায়ী হইতে পারে না? আমরা ত দেখিতেছি অপত্যস্নেহ, বন্ধুতা, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, রাজভক্তি প্রভৃতি অনুরাগের নানা অঙ্গ, এবং সকলগুলিই স্থায়ী। যদি স্ত্রীবিষয়ক অনুরাগভিন্ন রস না হয়, তাহা হইলে স্বদেশানুরাগোদ্দীপক বাঙ্গালাসাহিত্যের উৎকৃষ্ট প্রস্তাবলী নীরস অথবা নীচরস বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে আমরা এই প্রস্তাবে রস কি? ও রস কেন নয়টি হইল? তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

রস কি? এ সম্বন্ধে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের বিস্তর মতভেদ আছে। রসের কার্য্যের নাম অনুভাব, কারণের নাম বিভাব। উহা দুইপ্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন। যাহাভিন্ন রসোৎপত্তি হয় না, তাহার নাম আলম্বন। যাহাতে প্রাবল্য জন্মে তাহার নাম উদ্দীপন। রসের সঙ্গে সঙ্গে যে অন্যভাবের উদ্দীপন হয় তাহার নাম সঞ্চারী। আদিরসের স্ত্রী আলম্বন চন্দ্রকিরণ মলয় পবনাদি উদ্দীপন, দীর্ঘ নিঃশ্বাসাদি অনুভাব উহাতে হাস্য প্রভৃতি যে নানা ক্ষণস্থায়ী ভাবের উদয় হয় তাহার নাম সঞ্চারী।

ভট্টলোল্লট প্রভৃতি বলেন, ললনা, উদ্যান প্রভৃতি কারণজনিত অনুরাগাদি স্থায়ীভাব, কটাক্ষ, ভ্রূক্ষেপ প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা প্রতীতিযোগ্য, এবং নির্ব্বেদাদি সহকারী ভাব দ্বারা উপচিত হয়। উহা মুখ্যকল্পে প্রকৃত রামাদিতেই থাকে। কিন্তু কেহই স্বরূপ অনুসন্ধান করেন না বলিয়াই কাব্যস্থ রামাদিতেও আছে বোধ হয়, তখনই উহার নাম রস। এই মতে বিভাবাদি দ্বারা অনুরাগাদির অনুমান হয়।

শ্রীশঙ্কুক বলেন, সম্যক্ জ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান, সংশয় ও সাদৃশ্যজ্ঞান (যথা রামই এই, এই রাম; উত্তরকালে এ রাম নয়, এরূপ বাধা সম্ভাবনাসত্বে, এই রাম এ ব্যক্তি রাম হইতেও পারে, নাও পারে; এ রামসদৃশ) এই যে চারিপ্রকার জ্ঞান আছে তৎসমুদয় হইতে পৃথক্ কোন চিত্রিত তুরঙ্গ দেখিয়া তুরঙ্গজ্ঞানের ন্যায়

নর্ত্তককে রাম বলিয়া প্রতীতি হইলে,সে যখন শিক্ষা, অভ্যাস, নৈপুণ্যবলে—

এই সে আমার দেহে সুধারসচ্ছটা
কর্পূর শলাকারাশি নয়নযুগলে
মূর্ত্তিমতী মনোরথ লক্ষীস্বরূপিণী
প্রাণেশ্বরী লোচনগোচরে দেখা দিলে

দৈবক্রমে ত্যজি মোরে চপলনয়না
গেল চলি প্রাণপ্রিয়া সহাস্যবদনা
অমনি বিষম কাল হল উপস্থিত
অবিরল হয় যাহে জলদগর্জ্জিত

ইত্যাদি করুণ বাক্যদ্বারা কারণ, কার্য্য ও সহকারী ভাবসমূহ প্রকাশ করে, (ইহারই নাম বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব) তখন তাহারা কৃত্রিম হইলেও লোকে কৃত্রিম বলিয়া অনুমান করিতে পারে না; এবং সেই সকল কার্য্য কারণাদির দ্বারা অনুরাগাদির অনুমান করে। অনুরাগাদি যদিও নর্ত্তকে নাই, তথাপি সামাজিকদিগের মনে উহা আছে বলিয়া আস্বাদ্যমান হয়। অন্য অনুমান হইতে অনুরাগাদির অনুমানের বিশেষ এই যে, বস্তু সৌন্দর্য্যবলে, এবং আস্বাদ্যমান বলিয়া উহা অনুমান বলিয়াই বোধ হয় না। প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হয়, এই মতে নর্ত্তকের ভাব দেখিয়া সীতাবিষয়ক রামের অনুরাগ আমরা এক প্রকার সাক্ষাৎকারে দেখিতে পাই।

ভট্টনায়ক বলেন, "অনুরাগাদি রামে আছে আমি দেখিতেছি, অথবা আমাকে আছে আমিই অনুভব করিতেছি এই উভয়প্রকার সিদ্ধান্তই ভ্রমাত্মক। কিন্তু কাব্য ও নাটকপাঠে ভাবকত্ব নামে একটি ব্যাপার (মনের কার্য্য) উৎপত্তি হয় এবং উহার দ্বারা বিভাবাদি সাধারণীকৃত হয়, (অর্থাৎ ঐ ব্যাপার দ্বারা রাম সীতা জ্ঞান থাকে না, কেবলমাত্র স্ত্রী পুরুষ নায়িকা জ্ঞান থাকে।) ঐ ভাবকত্ব ব্যাপারে অনুরাগাদিকে উপস্থিত করে সেই অনুরাগাদি আস্বাদ্যমান হয়। আস্বাদ সময়ে রজঃ ও তমঃ গুণ অতিক্রম করিয়া সত্ত্বগুণ প্রবল হয়। তখন স্বপ্রকাশ আনন্দময় জ্ঞানমাত্র বর্ত্তমান থাকে। এই স্বপ্রকাশ আনন্দময় জ্ঞানস্বরূপ রসাস্বাদের নাম ভোগ বা ভোজকত্ব ব্যাপার।" এই মতে মানুষের মনে ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব নামে দুইটি ব্যাপার আছে। প্রথমটির দ্বারা অনুরাগ কারণ সকল সাধারণরূপে প্রতীত হয়, দ্বিতীয়টির দ্বারা উহাদের আস্বাদগ্রহণ করা যায়।

আচার্য্য অভিনব গুপ্ত বলেন, "যাহারা সর্ব্বদা প্রমদাদিসহকারে অনুরাগাদির অনুমান করিতে নৈপুণ্যলাভ করিয়াছে, এরূপ সামাজিকেরা কাব্য বা নাটক পাঠ করিলে পূর্ব্বোক্ত বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব কারণ, কার্য্য, এবং সহকারিতা পরিহার করিয়া অলৌকিক বিভাবাদিরূপে পরিণত হয়। তখন এই সকল বিভাবাদি আমার অথবা শত্রুর অথবা উদাসীনের অথবা আমার নয়,

শক্রর নয়, অথবা উদাসীনের নয়, এরূপ সম্বন্ধবিশেষে প্রতীত হয় না। সম্বন্ধশূন্য সাধারণভাবে উহা অভিব্যক্ত হইয়া সামাজিকদিগের মনে অবস্থিত হয়। যদিও উহা নিয়মিত প্রমাতৃগত তথাপি সাধারণ উপায়বলে তৎকালে উহার নিয়মিত প্রমাতৃভাব বিগলিত হয়। তখন প্রমাতার জ্ঞানান্তর সম্পর্কশূন্য অপরিমিত ভাবের উদয় হয়। তিনি যেন সকল হৃদয়ের এই সংবাদ অবগত হইতে পারেন। তখন পূর্ব্বোক্ত অনুরাগাদি জ্ঞান হইতে অভিন্ন হইলেও যেন নিজ আকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। আস্বাদই উহার প্রাণ। বিভাবাদির অবধিই উহার জীবনের অবধি। যেমন পানক রস নামক মোদকে মরীচ থাকিলেও তাহার আস্বাদ নষ্ট হয় না, অনুরাগাদির আস্বাদও তদ্রূপ বিরোধী কারণে বিকৃত হয় না। উহা যেন সম্মুখে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকে, সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিতে থাকে, অন্য সমস্ত তিরোহিত করে। যেন ব্রহ্মাস্বাদ অনুভব করাইয়া দেয়। ভূলোক-দুর্ল্লভ চমৎকার উৎপন্ন করে। তখন উহার নাম রস হয়।”

এই মতেও ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব নামে ব্যাপারদ্বয় স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ভট্টনায়কের মতের উপর কিছু উন্নতি মাত্র। ইহার মতে অলৌকিক ব্যাপার দ্বারা রস নিষ্পত্তি হয়। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজও মুগ্ধকল্পে এই মতই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

ভাবকত্ব ব্যাপারটি কি? উহার স্বরূপ কি? কার্য্য কি? জানা আবশ্যক। ন্যায়মতে করণের কার্য্যকে ব্যাপার বলে। যথা দাত্রের পতন উহার ব্যাপার। সংস্কৃতমতে মন জ্ঞানের করণ। মনের কার্য্যের নাম উহার ব্যাপার। ভাবকত্ব মনের কার্য্য, এই কার্য্য দ্বারা পরিমিত ব্যক্তিগত শোকাদি সাধারণরূপে প্রতীত হয়।

ভোজকত্ব ব্যাপার শব্দেও মনের কার্য্য বুঝায়। মনের যে কার্য্যদ্বারা কাব্যরসের আস্বাদগ্রহ হয়, যাহাতে চিত্ত আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহার নাম ভোজকত্ব ব্যাপার।

ইউরোপীয়দিগের মতে মন জ্ঞানোপলব্ধির করণ নহে উহাই কর্ত্তা। সংস্কৃতমতে আত্মা কর্ত্তা, মন করণ। ইদানীন্তন ইউরোপীয়েরা মন ভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে মনোবৃত্তিসমূহ তিনভাগে বিভক্ত। বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা। হৃদয়বৃত্তিসমূহের মধ্যে তাঁহাদের মতে কতকগুলি বৃত্তি আছে, যাহার নাম (Esthetic faculty) বা সৌন্দর্য্যগ্রাহবৃত্তি। অভ্যাসবলে এই বৃত্তি পরিপুষ্ট হইলে উহার দ্বারা আমরা সুন্দর বস্তুকে সুন্দর বলিয়া বুঝিতে পারি এবং তাহার আস্বাদও গ্রহণ করিতে পারি। এই সৌন্দর্য্যগ্রাহকতাবৃত্তি আমা-

দিগের ভোজকত্ব ব্যাপার। আমরা যাহাকে ভাবকত্ব ব্যাপার বলি, ইংরেজেরা তাহা মানেন না। কবিরা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন। আমরা তাহার আস্বাদ গ্রহ করি। যাহার সৌন্দর্য্য গ্রাহক মনোবৃত্তিসমূহ যত পরিপুষ্ট সে সেই পরিমাণে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে।

সৌন্দর্য্যগ্রহ ও রসগ্রহ যদি একই হইল, তবে রস নয়টী হয় কেন? সৌন্দর্য্য অশেষবিধ, সুতরাং রসও অশেষ বিধ হওয়া উচিত। যদি বল বাহ্যিক সৌন্দর্য্য রস নহে কেবলমাত্র আন্তরিক সৌন্দর্য্যই রস। বাহ্যবস্তু সমূহ—আকাশ, নদ, নদী, পর্ব্বত, কন্দর, পুরী, হর্ম্ম্য প্রভৃতিগত সৌন্দর্য্য রস নহে কেবল মনের অনুরাগাদি ভাবসমূহগত সৌন্দর্য্যই রস, তাহা হইলেও বাহ্যবস্তুগত সৌন্দর্য্য যখন আস্বাদের বিষয় হইতে পারে তখন উহা কেন রস হইবে না ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। যদিও কেবল মনোবৃত্তিগত সৌন্দর্য্যকেই রস বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে উহা কেন যে নয়টীমাত্র হইবে বুঝিতে পারিলাম না। মনোবৃত্তি অসংখ্য। সুতরাং রসও অসংখ্য হওয়া উচিত। যখন যে মনোবৃত্তিগত সৌন্দর্য্য আস্বাদনীয় হয় তখন তাহাই রস হইবে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে নয়টী স্থায়ী এবং তেত্রিশটী সঞ্চারী ভাব স্বীকার করিলে ম্যাক্‌বেথের রাজ্যতৃষ্ণা, হ্যামলেটের অনুৎসাহময় প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি, প্রস্‌পেরোর উদারচরিত্রতা, ম্যানফ্রেডের মানবজাতির প্রতি ঘৃণা, রসের মধ্যেই পড়ে না অথচ সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই সংস্কার এই যে, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থচতুষ্টয়ই রসাংশে পৃথিবীর সমস্ত কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অতএব আমাদের মতে মনের যে বৃত্তি সুন্দররূপে লিখিত হইতে পারে, তাহারই নাম রস। কেবল একজন মাত্র সংস্কৃত আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্য বা চমৎকারকেই রস বলিয়াছেন।

রসে সারঃ চমৎকারঃ সর্ব্বত্রৈবানুভূয়তে
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রৈবাদ্ভুতো রসঃ॥
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসং।

কিন্তু নারায়ণের মত সংস্কৃত আলঙ্কারিকমণ্ডলীমধ্যে তাদৃশ সমাদৃত হয় নাই।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা যে নয়টি মাত্র রস নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন কেন, সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে, যখন অলঙ্কারশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল তৎকালে প্রচলিত গ্রন্থাদিমধ্যে এই নয়প্রকার ভাবেরই প্রাধান্য দেখিয়া তাঁহারা কাব্যের নয়টি মাত্র রস নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় এক এক সময়ে সামাজিক অবস্থা অনুসারে এক একপ্রকার লিখনপ্রণালী প্রচলিত হয়। কখন নাটকের বহুল প্রচার হয়, কখন গীতিকাব্যের, কখন উপন্যাসের, কখন নবন্যাসের, কখন বা মহাকাব্যের।

সামাজিক অবস্থা অনুসারে লোকে ভিন্ন ভিন্নবিষয়ক গ্রন্থাদিপড়িতে ভালবাসে। কখন যুদ্ধবিষয়িনী কবিতা, কখন প্রণয়ের প্রবন্ধ, কখন শোকোদ্দীপক প্রস্তাব, কখন ধর্মগ্রন্থ, ইত্যাদি ইত্যাদি। মধ্যসময়ে ইউরোপখণ্ডে প্রণয় ও যুদ্ধের কাব্যই অধিক সমাদৃত হইত। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে প্রণয় ও স্বদেশানুরাগই অধিক পরিমাণে লিখিত ও পঠিত হয়। এরূপ অলঙ্কারগ্রন্থ প্রণীত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে কখন প্রণয়, কখন যুদ্ধ, কখন পরিহাস, কখন শোক, কখন বিস্ময়, কখন ঘৃণা ইত্যাদি-বিষয়ক গ্রন্থাদি অধিক পরিমাণে লিখিত ও পঠিত হইত। আলঙ্কারিক পণ্ডিতেরা যখন অলঙ্কারশাস্ত্র লিখিতে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের বোধ হইয়াছিল যে, এই নয়প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া গ্রন্থ লিখিতে পারিলেই উহা জনসমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইবে, এই জন্য তাঁহারা উক্ত নয়টিকেই প্রধান ভাব বা রসমধ্যে স্থির করিয়াছেন। নচেৎ এই নয়টিকেই উচ্চস্থান দিবার আর কোন কারণ দেখা যায় না।



বাঙ্গালা ভাষা।

বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে গেলে প্রথমতঃ রচনাপ্রণালী লইয়া বড়ই গোল বাধে। একদল, জনমেজয় যেমন সর্প দেখিলেই আহুতি দিতেন, সেইরূপ পারসী কথা দেখিলেই তাহাকে তাহার আহুতি দেন। আর একদল আছেন, তাঁহারা সংস্কৃত কথার প্রতি সেইরূপ সদয়। কেহ ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার কথা দেখিলেই চটিয়া উঠেন, প্রবন্ধের মধ্যে হাজার ভাল জিনিস থাকুক, আর পড়েন না। আবার কেহ আছেন যেই দেখিলেন, দুই পাঁচটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, অমনি সে গ্রন্থ অপাঠ্য বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। এখন আমরা গরীব, দাঁড়াই কোথা? আমরা ইংরেজি পড়ি আমাদের অর্দ্ধেক ভাবনা ইংরেজিতে। আমরা কলম ধরিলেই ইংরেজি কথায় ইংরেজি ভাব আইসে। সংস্কৃত আমরা যা পড়ি, তাতে সে ভাব ব্যক্ত হয় না। বাঙ্গালার বিদ্যা বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস, আর বঙ্কিমবাবুর নবেল কয়খানি। তাতেও ত কুলায় না। নূতন কথা গড়ি এমন ক্ষমতাও নাই। তবে আমাদের কি হইবে। হয় কলম ছাড়িতে হয়, না হয় যেরূপে পারি মনের ভাব

ব্যক্ত করিয়া দিতে হয়। নিজের কথায় নিজের ভাব আমি ব্যক্ত করিব, তাহাতে অন্যের কথা কহার স্বত্ব কতদূর আছে জানি না। কিন্তু, পূর্ব্বোক্ত দুই দলের লোক দুইদিক্ হইতে কুঠার লইয়া তাড়া করেন। সুতরাং এক এক সময়ে বোধ হয় " * * * তত্র মৌনং হি শোভতে" কিন্তু আবার যখন অঙ্গুলিকণ্ডূয়ন উপস্থিত হয়, তখন না লিখিয়াও থাকিতে পারি না। বিশেষ এই যে, যখন কর্ত্তব্যবোধে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন পাঁচজনের কথায় তাহা হইতে নিরস্ত হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। যে কোন ভাষাই হউক, যে কোন রচনাপ্রণালীতেই হউক, যদি দুটা ভাল কথা বলিতে পারি, পাঁচজনের ভয়ে চুপ করিয়া থাকিব কেন?

তবে ভাল কথা বলিতে যদি মন্দ কথা বলি, তাহা হইলে পাঁচজনের গালাগালি দিবার বাস্তবিক অধিকার আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর সমালোচকগণ কথাটা ভাল কি মন্দ সেদিকে লক্ষ্যও করেন না। নাই করুন, কথাটা ভাল করিয়া বলা হইয়াছে কি না, তাহাও দেখেন না। দেখেন কেবল লেখার মধ্যে বড় বড় সংস্কৃত কথা আছে কি পারসী ও ইংরেজি শব্দ আছে। মারামারি করেন কেবল তাহাই লইয়া। সুতরাং আমার মত ক্ষুদ্র লেখকবর্গের সেই বিষয়েই দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। তাহাতেও গোলযোগ। যখন দুই দল দুইদিক ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন, তখন উভয়দলের মন রক্ষা করা অসম্ভব। অথচ যে দলের মনরক্ষা না হইবে, তিনিই কুঠার উত্তোলন করিয়া লেখকের প্রতি ধাবমান হইবেন। এ অবস্থায় লেখকবেচারা বিষম সমস্যায় পড়িয়া যায়।

এ সমস্যার কি পূরণ হয় না? এ সঙ্কট হইতে কি পরিত্রাণের উপায় নাই? বঙ্গীয়লেখককুল কি এই প্রতিকূল বাত্যায় ভগ্নপোত হইয়া অপার সমুদ্রে ভাসিবেন? তাঁহারা কি কূলে উঠিতে পারিবেন না? সমালোচকদিগের এই বিষম রোগের কি উপশম হইবে না? উপশম নাই হউক, ইংরেজিতে বলে রোগের নির্ণয় অর্দ্ধেক উপশম। এ রোগের কারণনির্ণয়ের কি কিছুই চেষ্টাও হইবে না।

অনেকগুলি সুচিকিৎসকের সহিত বিশেষ পরামর্শ করিয়া আমরা ইহার কতক কারণ ঠিক করিয়াছি। ঠিক করিয়াছি বলিতে পারি না। কতক অনুভব করিয়াছি। যাহা বুদ্ধিস্থ হইয়াছে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব। এস্থলে কুঠারের ভয় করিলে চলিবে না। যদি আর কেহ অন্যহেতুপ্রদর্শন করিতে পারেন, নিরতিশয় আনন্দসহকারে শ্রবণ করিব।

* কথাটি এই যে, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত

বাঙ্গালা ভাষায় লেখনীধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বাঙ্গালা ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই। হয় ইংরেজি পড়িয়াছেন, না হয় সংস্কৃত পড়িয়াছেন, পড়িয়াই অনুবাদ করিয়াছেন। কতকগুলি অপ্রচলিত সংস্কৃত ও নূতন গড়া চোয়ালভাঙ্গা কথা চলিত করিয়া দিয়াছেন। নিজে ভাবিয়া কেহ বই লেখেন নাই, সুতরাং নিজের ভাষায় কি আছে না আছে তাহাতে তাঁহাদের নজরও পড়ে নাই।

এখন তাঁহাদের বই পড়িয়া যাঁহারা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহাদের যথার্থ মাতৃভাষায় জ্ঞান সুদূরপরাহত হইয়াছে। অথচ ইঁহারাই যখন লেখনীধারণ করেন, তখন মনে করেন যে, আমার বাঙ্গালা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাঁহার বাঙ্গালা তিনি এবং তাঁহার পারিষদবর্গ বুঝিল, আর কেহ বুঝিল না। কেমন করিয়া বুঝিবে! সে ত দেশীয় ভাষা নহে। সে অনুবাদকদিগের কপোলকল্পিত ভাষার উচ্ছিষ্ট মাত্র। দেশের অধিকাংশ লোকই উচ্ছিষ্টভোজনে জাতিপাতের ভয় করে অথচ লেখকমহাশয়েরা তাহাদিগকে কুসংস্কারাপন্ন মূর্খ বলিয়া উপহাস করেন। এই গেল একদলের কথা :—

আবার যখন অনুবাদকদিগের এইরূপ দীর্ঘ ছন্দ সংস্কৃতের "নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্নের" নদ, নদী, পর্ব্বত, কন্দরের অসম্ভব বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল, যখন সংস্কৃত, ইংরেজি পড়া অপেক্ষা বাঙ্গালা পড়ায় অভিধানের অধিক প্রয়োজন হইয়া পড়িল, তখন কতকগুলি লোক চটিয়া বলিলেন, এ বাঙ্গালা নয়। বলিয়া তাঁহারা যত চলিত কথা পাইলেন, তাহাই লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু ইঁহারা সংস্কৃতের সং পর্য্যন্ত শুনিলে চটিয়া উঠেন। এমন কি ইঁহারা সংস্কৃতমূলক শব্দ ব্যবহার করিতে রাজি নন। অপভ্রংশ শব্দ, ইংরেজিশব্দ, পারসীশব্দ ও দেশীয়শব্দের দ্বারা লিখিতে পারিলে সংস্কৃতশব্দ প্রাণান্তেও ব্যবহার করেন না। এই গেল আর একদলের কথা। সুতরাং এই উভয় দল যে পরস্পর বিরোধী হইবেন, এবং বঙ্গীয় লেখকগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন, আপত্তি কি।

আমরা যে পূর্ব্বে লিখিয়াছি বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহারা এ পর্য্যন্ত লেখনীধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বাঙ্গালা ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই, ইহা অতি সত্য কথা। আমরা ইতিহাস দ্বারা এইটি সমর্থন করিব।

সকলেই জানেন অতি অল্পদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যগ্রন্থ ছিল না, কিন্তু পদ্য প্রচুর ছিল। ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে সকল পদ্য লিখিত হইয়াছিল, তাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, অনুবাদ করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাদের গ্রন্থে দু পাঁচটি অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ থাকিলেও উহা প্রধানতঃ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা

কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি কবিগণের লেখা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। গদ্য না থাকিলেও ভদ্রসমাজে যে ভাষা প্রচলিত থাকে তাহাকেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা কহে। আমাদের দেশে সেকালে ভদ্রসমাজে তিনপ্রকার বাঙ্গালা ভাষা চলিত ছিল। মুসলমান নবাব ও ওমরাহদিগের সহিত যে সকল ভদ্রলোকের ব্যবহার করিতে হইত, তাঁহাদের বাঙ্গালায় অনেক উর্দ্দূ শব্দ মিশান থাকিত। যাঁহারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত। এই দুই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ভিন্ন বহুসংখ্যক বিষয়ী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাঙ্গালায় উর্দ্দূ ও সংস্কৃত দুই মিশান থাকিত। কবি ও পাঁচালীওয়ালারা এই ভাষায় গীত বাঁধিত। মোটামুটি ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বিষয়ী লোক, ও আদালতের লোক এই তিন দল লোকের তিন রকম বাঙ্গালা ছিল। বিষয়ী লোকের যে বাঙ্গালা তাহাই পত্রাদিতে লিখিত হইত, এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ঐরূপ বাঙ্গালা শিখিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিত।

ইংরেজেরা এদেশ দখল করিয়া ভাষার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা বহুসংখ্যক আদালত স্থাপন করায় এবং আদালতে উর্দ্দূ ভাষা প্রচলিত রাখায় বাঙ্গালাময় পারসী শব্দের কিছু অধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল মাত্র। সাহেবেরা পারসী শিখিতেন, বাঙ্গালা শিখিতেন। দেশীয়েরা দেশীয় ভাষায় তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেন। সুতরাং ইংরেজি কথা বাঙ্গালার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। যাঁহারা ইংরেজি শিখিতেন বা ইংরেজের সহিত অধিক মিশিতেন দেশের মধ্যে প্রায়ই তাঁহাদের কিছুমাত্র প্রভুত্ব থাকিত না।

কথক মহাশয়েরা বহুকালাবধি বাঙ্গালায় কথা কহিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা সংস্কৃতব্যবসায়ী কিন্তু তাঁহারা যে ভাষায় কথা কহিতেন তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধ বিষয়ী লোকের ভাষা। কেবল অমকাল বর্ণনাস্থলে ও সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা স্থলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতী ভাষার অনুসরণ করিতেন।

আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে যে সময়ে ইংরেজ মহাপুরুষেরা বাঙ্গালীদিগকে বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, সেই সময়ে যে সকল পণ্ডিতের সহিত তাঁহাদের আলাপ ছিল তাঁহারা সংস্কৃত কালেজের ছাত্র। তখন সংস্কৃত কালেজ বাঙ্গালায় একঘরে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে যবনের দাস বলিয়া সঙ্গে মিশিতে দিতেন না। তাঁহারা যে সকল গ্রন্থাদি পড়িতেন তাহা এ দেশমধ্যে চলিত ছিল না। এমন কি দেশীয় ভদ্রসমাজে তাঁহাদের কিছুমাত্র আদর ছিল না। সুতরাং তাঁহারা দেশে কোন্ ভাষা চলিত কোন্ ভাষা অচলিত, তাহার কিছুই বুঝিতেন না। হঠাৎ তাঁহাদিগের উপর বাঙ্গালা পুস্তক

প্রণয়নের ভার হইল। তাঁহারাও পণ্ডিত-স্বভাবসুলভ দাম্ভিকতাসহকারে বিষয়ের গুরুত্ব কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া লেখনীধারণ করিলেন।

পণ্ডিতদিগের উপর পুস্তক লিখিবার ভার হইলে তাঁহারা প্রায়ই অনুবাদ করেন। সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিতেরাও তাহাই করিলেন। তাঁহারা যে সকল অপ্রচলিত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন তাহারই তর্জ্জমা আরম্ভ করিলেন। রাশি রাশি সংস্কৃতশব্দ বিভক্তিপরিবর্জ্জিত হইয়া বাঙ্গালা অক্ষরে উত্তম কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়া পুস্তকমধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। যিনি কাদম্বরী তর্জমা করিয়াছিলেন, তিনি লিখিলেন, "একদা প্রভাতকালে চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী কোলাহলময় হইলে, নবোদিত রবির আতপে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইলে, গগনাঙ্গনবিক্ষিপ্ত অন্ধকাররূপ ভস্মরাশি দিনকরের কিরণরূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা দূরীকৃত হইলে, সপ্তর্ষিমণ্ডল অবগাহনমানসে মানসসরোবরতীরে অবতীর্ণ হইলে, শাল্মলীবৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অন্বেষণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল।" আমরা পূর্ব্বে যে তিন ভাষার উল্লেখ করিয়াছি, ইহার সহিত তাহার একটিরও সম্পর্ক নাই।

এ ত গেল সংস্কৃত হইতে অনুবাদ। ইংরেজি হইতে অনুবাদ একবার দেখুন, "পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে, খেলায় আসক্ত হইত; কিন্তু তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করিতেন। একদা, তিনি একটা পুরান বাক্স লইয়া জলের ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ীর শঙ্কু বাক্সমধ্য হইতে অনবরত বিনির্গত জলবিন্দুপাতের দ্বারা নিমগ্ন কাষ্ঠখণ্ডপ্রতিঘাতে পরিচালিত হইত; বেলাববোধনার্থ তাহাতে একটি প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।" ইংরেজি পড়িলে বরং ইহা অপেক্ষা সহজে বুঝা যাইতে পারে।

এই শ্রেণীর লেখকের হস্তে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির ভার অর্পিত হইল। লিখিত ভাষা ক্রমেই সাধারণের দুর্ব্বোধ ও দুষ্পাঠ্য হইয়া উঠিল। অথচ এডুকেশন ডেস্প্যাচের কল্যাণে সমস্ত বঙ্গবাসী বালক এই প্রকারের পুস্তক পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টির দফা একেবারে রফা হইয়া গেল।

সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের দেখাদেখি ইংরেজিওয়ালারাও লেখনীধারণ করিলেন। বাঙ্গালায় সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা যেমন একঘরে ছিলেন, ইংরেজিওয়ালারাও তাহা অপেক্ষা অল্প ছিলেন না। তাঁহারাও পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বাঙ্গালা ভাষার কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। অধিকন্তু তাঁহাদের ভাব ইংরেজিতে মনোমধ্যে উদিত হইত, হজম করিয়া নিজ কথায় তাহা ব্যক্ত

করিতে পারিতেন না। নূতন কথা তাঁহাদের গড়ার প্রয়োজন হইত। গড়িতে হইলে নিজ ভাষায় ও সংস্কৃতে যেটুকু দখল থাকা আবশ্যক তাহা না থাকায় সময়ে সময়ে বড়ই বিপন্ন হইতে হইত। উৎপিপীড়িষা, জিজীবিষা, জিঘাংসা, প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইত। "তুষারমণ্ডিত হিমালয়, গিরি-নিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, চিত্তচমৎকারক ভয়ানক জলপ্রপাত, অযত্নসম্ভূত উষ্ণপ্রস্রবণ, দিক্‌দাহকারী দাবদাহ, বসুমতীর তেজঃপ্রকাশিনী সুচঞ্চলশিখানিঃসারিণী লোলায়মানা জ্বালামুখী, বিংশতিসহস্র জনের সন্তাপনাশক বিস্তৃতশাখাপ্রসারক বিশাল বটবৃক্ষ, শ্বাপদনাদে নিনাদিত বিবিধ বিভীষিকাসংযুক্ত জনশূন্য মহারণ্য, পর্ব্বতাকার তরঙ্গবিশিষ্ট প্রসারিত সমুদ্র, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, জীবিতাশাসংহারক হৃৎকম্পকারক বজ্রধ্বনি, প্রলয়শঙ্কাসমুদ্ভাবক ভীতিজনক ভূমিকম্প, প্রখররশ্মিপ্রদীপ্ত নিদাঘমধ্যাহ্ন, মনঃপ্রফুল্লকরী সুধাময়ী শারদীয় পূর্ণিমা, অসংখ্য তারকামণ্ডিত তিমিরাবৃত বিশুদ্ধ গগনমণ্ডল ইত্যাদি ভারতভূমিসম্বন্ধীয় নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক ব্যাপার অচিরাগত কৌতূহলাক্রান্ত হিন্দুজাতীয়দিগের অন্তঃকরণ এরূপ ভীত, চমৎকৃত ও অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ সমুদয়কে সচেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত থাকিলেন।" এ ভাষার মন্তব্যপ্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। আমরা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক দেখিয়াছি যে, যে বালকেরা এই সকল গ্রন্থপাঠ করে, তাহারা অতি সত্বরেই এই সকল কথা ভুলিয়া যায়। কারণ, এরূপ শব্দ তাহাদিগকে কখনই ব্যবহার করিতে হয় না। আমাদের এক পুরুষপূর্ব্বে লোকের সংস্কার এই ছিল যে, চলিত শব্দ পুস্তকে ব্যবহার করিলে সে পুস্তকের গৌরব থাকে না। সেই জন্য তাঁহারা বরফের পরিবর্ত্তে তুষার, ফোয়ারার পরিবর্ত্তে প্রস্রবণ, ঘূর্ণীর পরিবর্ত্তে আবর্ত্ত, গ্রীষ্মের পরিবর্ত্তে নিদাঘ প্রভৃতি আভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া, গ্রন্থের গৌরবরক্ষা করিতেন। অনেক সময়ে তাঁহাদের ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতেও তত চলিত নহে, কেবল সংস্কৃত অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত ছিল, তাহা গ্রন্থকারেরা জানিতেন না, সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থে সে সকল কথা মিলেও না। শুনিয়াছি গ্রন্থকারদিগের মধ্যে দুই পাঁচজন হয়, একখানি অভিধান, না হয় একজন পণ্ডিত সঙ্গে লইয়া লিখিতে বসিতেন।

এই সকল কারণবশতঃ, বলিয়াছিলাম যে, যাঁহারা বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা ভাল বাঙ্গালা শিখেন নাই। লিখিত বাঙ্গালা ও কথিত বাঙ্গালা এত তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে যে, দুইটিকে

এক ভাষা বলিয়াই বোধ হয় না। দেশের অধিকাংশ লোকেই লিখিত ভাষা বুঝিতে পারে না। এ জন্যই সাধারণ লোকের মধ্যে আজও পাঠকের সংখ্যা এত অল্প। এ জন্যই বহুসংখ্যক সম্বাদ-পত্র ও সাময়িকপত্রিকা জলবুদ্বুদের ন্যায় উৎপন্ন হইয়াই আবার জলে মিশিয়া যায়।

গ্রন্থকারেরা বাঙ্গালা ভাষা না শিখিয়া বাঙ্গালা লিখিতে বসিয়া এবং চলিত শব্দ সকল পরিত্যাগ করিয়া অপ্রচলিত শব্দের আশ্রয় লইয়া ভাষার যে অপকার করিয়াছেন, তাহার প্রতিকার করা শক্ত। যদি তাঁহাদের সময়ে ইংরেজি ও বাঙ্গালায় বহুল চর্চ্চা না হইত, তাহা হইলে অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থকারদিগের ন্যায় তাঁহাদের নামও কেহ জানিত না। কিন্তু তাঁহাদের সময়ে শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হওয়ায়, তাঁহাদিগের প্রভাব কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। এবং এই কয়বৎসরের মধ্যে ইংরেজির অতিরিক্ত চর্চ্চা হওয়ায় বহুসংখ্যক ইংরেজি শব্দ ও ভাব, বাঙ্গালাময় ছড়াইয়া পড়ায় বিষয়ী লোকের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বে উহা কিরূপ ছিল, তাহা আর নির্ণয় করিবার যো নাই।

ভট্টাচার্য্য ও কথকদিগের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা এখনও কতক কতক নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর লোক এত অল্প হইয়া আসিয়াছে যে, সেরূপ নির্ণয় করাও সহজ নহে। গ্রন্থকারদিগের বাঙ্গালা বাঙ্গালা নহে। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। এ অবস্থায় আমাদের মত লেখকের গতি কি? হয়, ইংরেজি, পারসী, বাঙ্গালা, ও সংস্কৃতময় যে ভাষায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনাদি প্রসিদ্ধ ভদ্রসমাজে কথা বার্ত্তা চলে সেই ভাষায় লেখা, না হয়, যাহার যেমন ভাষা যোগায় সেই ভাষায় নিজের ভাব ব্যক্ত করা। এই সিদ্ধান্তের প্রতি যাঁহাদের আপত্তি আছে, তাঁহারা কিরূপ ভাষাকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা বলেন, প্রকাশ করিয়া বলিলে গরীব লোকের যথেষ্ট উপকার করা হয়। যতদিন না বলিতে পারেন, ততদিন কুঠার আঘাত বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই।

গ্রাজুএট—

রত্নরহস্য।

মাণিক্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রথম প্রস্তাবে "মাণিক্য" সম্বন্ধে অনেক রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট এই প্রস্তাবে সমাপ্ত হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ছায়া অনুসারে একই মাণিক্য পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ছায়া কি? এবং কতপ্রকার? তাহা বলা হয় নাই, কিন্তু তাহা অবশ্য বক্তব্য বিধায় অগ্রে তাহাই ব্যক্ত করিব, পশ্চাৎ তাহার দোষ, গুণ, পরীক্ষা এবং মূল্যাদির বিষয় যথাক্রমে লিখিত হইবে।

ছায়া বা বর্ণ।

মুক্তা, মাণিক্য, কি অন্য যে কোন রত্ন হউক, তাহাদের বর্ণ বিশেষই (রঙ্) রত্নশাস্ত্রে "বর্ণ" "ছায়া" "ত্বিট্" "ভাস্" "আভা" প্রভৃতি নানা নামে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মাণিক্য রত্নের বর্ণ সম্বন্ধে এইরূপ নির্ব্বাচন করিয়াছেন যে, মাণিক্যরত্নের বহুপ্রকার ছায়া বা বর্ণ থাকিলেও তন্মধ্যে প্রধানতম বর্ণ ১৬ ষোলটী। সেই বর্ণ বা রঙ্ অনুসারে উহা পৃথক্ পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদেরই তারতম্য অনুসারে মাণিক্যরত্নের মূল্যাদির প্রভেদীকৃত হইয়া থাকে। ইহা বিস্পষ্ট বুঝাইবার জন্য কল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল এবং বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতির দুই চারিটী প্রমাণও যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যুক্তিকল্পতরুস্থ প্রমাণ যথা—

"বন্ধুক-গুঞ্জাসকলেন্দ্রগোপ-
জবা-শশাসৃক্-সমবর্ণশোভাঃ।
ভ্রাজিষ্ণবো দাড়িমবীজবর্ণাঃ
তথাপরে কিংশুকপুষ্পভাসঃ॥"
"সিন্দুর পদ্মোৎপল কুঙ্কুমানাং
লাক্ষারসস্যাপি সমানবর্ণাঃ।
সান্দ্রে নিরাগে প্রভয়া স্বয়ৈব
ভান্তি স্বলক্ষ্যা স্ফুটমধ্যশোভাঃ॥"
কুসুম্ভনীলী ব্যতিমিশ্র রাগ-
প্রত্যগ্র রক্তাম্বরতুল্যভাসঃ।
তথাঽপরেঽরুণ্ডর কণ্টকারী
পুষ্পত্বিষো হিঙ্গুলকত্বিষোঽন্যে।"
"চকোর পুংস্কোকিলসারসানাং
নেত্রাবভাসাশ্চ ভবন্তি কেচিৎ।
অন্যে পুনর্ভান্তি বিপুষ্পিতানাং॥
তুল্যত্বিষঃ কোকনদোদরাণাম্॥"

মানিক্যের "বন্ধুক" বাঁধুলিফুল [১] "গুঞ্জাসকল" গুঞ্জার্দ্ধ অর্থাৎ কাল আধখান ভিন্ন কুঁচ [২] "ইন্দ্রগোপ" বর্ষাকীট [৩] "জবা" জবাফুল [৪] "অসৃক্" শোণিত [৫] এই সকলের সমান বর্ণ এবং ইহাদিগের বর্ণের ন্যায় বর্ণ ও দীপ্তিযুক্ত এবং "দাড়িমবীজ বর্ণ" দাড়িম বীজের বর্ণ (৬) ইহাও প্রায় রক্তবর্ণ "কিংশুক বর্ণ" পলাশ ফুলের বর্ণ [৭] "সিন্দুর" [৮] "পদ্মোৎপল" রক্ত পদ্ম বা রক্তকমলনাইল (৯) "কুঙ্কুম" জাফরান (১০) "লাক্ষারস" অলক্তকতুল্যবর্ণ (১১) "কুসুম্ভ" কুসুম ফুল ও "নীলী" নীল রস, এই দুই মিশ্র-বর্ণ (১২) "রক্তাম্বর" সায়ংকালের রক্তবর্ণ আকাশ অর্থাৎ সিঁদুরে মেঘের বর্ণ (১৩) "অরুষ্কর পুষ্প" "ভেলা" বৃক্ষের ফুল (১৪) "কণ্টকারী পুষ্প" (১৫ "হিঙ্গুল" হিঙ্গুল ধাতুর বর্ণ বা ছায়া (১৬), হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন মানিক্য "চকোর" চকোর পক্ষী, পুরুষ কোকিল ও সারস পক্ষীর চক্ষুর ন্যায় বর্ণযুক্তও হইয়া থাকে। অন্যান্য রত্নতত্ত্ববেত্তারা বলেন অল্প প্রস্ফুটিত কোকনদ অর্থাৎ রক্ত নাইল ফুলের গর্ভস্থ বর্ণের ন্যায় বর্ণও হইয়া থাকে।

বর্ণ অনুসারে মানিক্যের নাম ও
উত্তমাধমাদি ব্যবস্থা।

"সিংহলে তু ভবেদ্রক্তং
পদ্মরাগ মনুত্তমম্।"
পীতং কানপুরোদ্ভূতং
কুরুবিন্দমিতি স্মৃতম্।"
"অশোকপল্লবচ্ছায়
মমুং সৌগন্ধিকং বিদুঃ।"
"তুম্বুরে ছায়য়া নীলং
নীলগন্ধি প্রকীর্ত্তিতম্।"
"উত্তমং সিংহলোদ্ভূতং
নিকৃষ্টং তুম্বুরোদ্ভবম্।"
মধ্যমং মধ্যজং জ্ঞেয়ং
মানিক্যং ক্ষেত্রভেদতঃ।"

সিংহলদেশে যে মানিক্য জন্মে তাহা রক্তবর্ণ, নাম "পদ্মরাগ" ইহা অপেক্ষা উত্তম কুত্রাপি হয় না। কানপুরদেশজাত*মানিক্য "পীত" বর্ণ হয় এবং তাহা "কুরুবিন্দ" নামে বিখ্যাত। এই একই মানিক্য যদি অশোকপল্লবের কান্তির ন্যায় কান্তিযুক্ত হয়, তবে তাহার "সৌগন্ধিক" নাম জানিবে। তুম্বুরদেশজ মানিক্য কিঞ্চিৎ নীলাভ হয়, তন্নিমিত্ত তাহা "নীল" নামে প্রসিদ্ধ। সিংহলীয় মানিক্যই অত্যুত্তম। তুম্বুরদেশীয় মানিক্য অধম এবং কানপুরাদি মধ্যদেশোৎপন্ন মানিক্য মধ্যম। এইরূপ, ক্ষেত্র অর্থাৎ উৎ-

* কানপুর? কোন্ কানপুর? যদি আধুনিক কালের সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ কানপুর হয়, তবে ইহাই বুঝিতে হইবে, যে, এখন আর তৎপ্রদেশে কোন রত্নই জন্মে না।

পত্তি স্থানের ভিন্নতা অনুসারে মাণিক্যও বিভিন্ন রূপগুণাদি যুক্ত হইয়া থাকে।

"প্রভাব কাঠিন্য গুরুত্বযোগৈঃ
প্রায়ঃ সমানাঃ স্ফটিকোদ্ভবানাম্।
আনীল রক্তোৎপল চারুভাসঃ
সৌগন্ধিকাখ্যা মণয়ো ভবন্তি ॥"

স্ফটিক হইতে একপ্রকার মাণিক্য উৎপন্ন হয়, তাহারা কি প্রভাবে, কি কাঠিন্যে, কি গুরুত্বে সর্ব্বাংশেই জাত্য মাণিক্য তুল্য হইয়া থাকে। সৌগন্ধিক-নামক মণি ঈষৎ নীলাভাযুক্ত রক্তোৎ-পলের ন্যায় মনোহর কান্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

মাণিক্যরত্নের জাতিবিভাগ।

রত্নতত্ত্ববেত্তারা প্রায় সকল রত্নেরই চারিপ্রকার জাতি কল্পনা করিয়া থাকেন। তাহাও আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি নামে নির্দ্দিষ্ট। এরূপ জাতিকল্পনা করিবার মূল কি? তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, চিন্তা করিয়াও বোধ-গম্য করিতে পারি না। যাহাই হউক, মাণিক্যরত্নের জাতি, যাহা রত্নশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল বৃদ্ধি করিব।

"মাণিক্যস্য প্রবক্ষ্যামি
যথা জাতিচতুষ্টয়ম্।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ
শূদ্রাশ্চাথ যথাক্রমম্।"
"রক্তশ্বেতো ভবেদ্বিপ্র-
স্ত্বতিরক্তস্তু ক্ষত্রিয়ঃ।
রক্ত পীতো ভবেদ্বৈশ্যো
রক্তনীল স্তথান্ত্যজঃ॥"

অর্থ এই যে, যেপ্রকারে মাণিক্যরত্নের চারি জাতি স্থির হয় তাহা বলিতেছি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিপ্রকার জাতি। যাহা রক্তশ্বেত অর্থাৎ অল্পরক্তিম তাহা ব্রাহ্মণজাতীয় মাণিক্য। যাহা অত্যন্ত লোহিত তাহা ক্ষত্রিয়জাতীয় মাণিক্য, যাহা রক্তপীত অর্থাৎ পীতাভাযুক্ত রক্তিম, তাহা বৈশ্য-জাতীয় এবং যাহা নীল আভাযুক্ত রক্তিম তাহা অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্রজাতীয় মাণিক্য।

(এই জাতিবিভাগসাধক বচনাবলীর দ্বারা পূর্ব্বের লিখিত পীতাদি শব্দের অর্থ ইহার অনুরূপ করিয়া লইবেন। অর্থাৎ যেখানে পীতবর্ণ বলা হইয়াছে সেখানে তাহা পরিষ্কার পীত নহে, পীতাভ রক্তিম, এইরূপ অর্থ হইবেক; কেন না রক্তবর্ণ মণিই মাণিক্য ইহা "শোণোপল" প্রভৃতি নামদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।) যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে এই জাতিনির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিশেষ উক্তি আছে। যথা—

"পদ্মরাগো ভবেদ্বিপ্রঃ
কুরুবিন্দস্তু বাহুজঃ।
সৌগন্ধিকো ভবেদ্বৈশ্যো
মাংসখণ্ড স্তথাপরে॥"

পূর্ব্বোক্ত পদ্মরাগ-মণিই বিপ্রজাতীয়। কুরুবিন্দনামক মাণিক্য বাহুজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়জাতীয়। সৌগন্ধিকনামক মাণিক্য বৈশ্যজাতীয় এবং মাংসখণ্ডনামক মাণিক্য শূদ্রজাতীয়।

বর্ণের সাদৃশ্যাদি।

মাণিক্যরত্নের বর্ণের প্রভেদ থাকায় উহা নানা নামে ব্যবহৃত হয় এবং তদনুসারেই জাত্যাদি বিভাগের কল্পনা করা হয়। অতএব মাণিক্যরত্ন সাধারণতঃ রক্তবর্ণ, ইহা স্থির রাখিয়া তাহার প্রভেদ বুঝাইবার জন্য বর্ণান্তরের সহিত সংযোগের কথা বলা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক। যথা—"রক্তশ্বেতো ভবেদ্বিপ্রঃ" ইত্যাদি। সেই মিশ্রবর্ণের যথার্থ ভাব ও অবস্থা বুঝাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রক্তিম বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া কোন মাণিক্যের কিরূপ রঙ্ তাহা বুঝান হইয়াছে, পরন্তু রত্নপরীক্ষার অভ্যাস না থাকিলে কেবল লেখারদ্বারা সে প্রভেদ অনুভব হইতে পারে না! মাণিক্য চেনা সুকঠিন; ব্যবসায়ী ব্যতীত সহস্র লেখাপড়া জানিলেও মাণিক্যের নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হওয়া যায় না। ফল, বচনগুলি উদ্ধৃত না করিলে প্রস্তাব অসম্পূর্ণ ও পাঠকবর্গের কুতূহল বিচ্ছিন্ন হইবে বলিয়া সেগুলি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

"শোণপদ্মসমাকারঃ
খদিরাঙ্গারসপ্রভঃ।
পদ্মরাগো দ্বিজপ্রোক্ত-
শ্ছায়াভেদেন সর্ব্বদা।"
"গুঞ্জা সিন্দূর বন্ধূক
নাগরঙ্গসমপ্রভঃ।
দাড়িমী কুসুমাভাসঃ
কুরুবিন্দস্তু বাহুজঃ॥"
"হিঙ্গুলাভা শোকপুষ্পা-
ভমীষৎ পীতলোহিতং।
জবা লাক্ষারস প্রায়ং
বৈশ্যং সৌগন্ধিকং বিদুঃ।"
"আরক্তঃ কান্তিহীনশ্চ
চিক্কণশ্চ বিশেষতঃ।
মাংসখণ্ডো সমাভাসো-
হন্ত্যজঃ পাপনাশনঃ॥" ইত্যাদি

শোণপদ্ম অর্থাৎ রক্তোৎপল এবং খদিরাঙ্গার (অলন্ত খদিরকাষ্ঠ) সদৃশ ছায়াযুক্ত মাণিক্যের নাম "পদ্মরাগ" এবং তাহা ব্রাহ্মণজাতীয়।

কুঁচ, সিন্দূর, বাঁধলিফুল, নাগরঙ্গ এবং দাড়িমপুষ্পের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত হইলে তাহা "কুরুবিন্দ" ও ক্ষত্রিয়জাতীয়।

হিঙ্গুল, অশোকপুষ্প কি ঈষৎ পীতযুক্ত লোহিত, অথবা জবাপুষ্প কি অলক্তকসদৃশ কান্তিযুক্ত হইলে তাহা "সৌগন্ধিক" ও বৈশ্যজাতি।

অল্প লোহিত, কান্তিবর্জ্জিত কিন্তু চিক্কণগুণযুক্ত মাংসখণ্ডের ন্যায় আভাযুক্ত হইলে তাহা "মাংসখণ্ড" অথবা "নীলগন্ধি" এবং তাহা অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্রজাতীয়।

এতদ্ভিন্ন আটপ্রকার দোষ, চারিপ্রকার গুণ, ষোলপ্রকার ছায়া সমস্তই পূর্ব্ব মাসের বঙ্গদর্শনে বিবৃত করা হইয়াছে। এক্ষণে সদোষ মাণিক্য ধারণের দুই একটা ফলাফল বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ পরীক্ষা ও মূল্যাদি নিরূপণ করা যাইবেক।

"যে কর্করা শ্ছিদ্রমলোপদিগ্ধাঃ
প্রভাবিমুক্তাঃ পরুষা বিবর্ণাঃ।
ন তে প্রশস্তা মণয়ো ভবন্তি
সমাসতো জাতিগুণৈঃ সমস্তৈঃ।"
"দোষোপসৃষ্টং মণিমপ্রবোধাৎ
বিভর্ত্তি যঃ কশ্চন কশ্চিদেকম্।
তং বন্ধুদুঃখায় সবন্ধ বিত্ত-
মাশাদয়ো দোষগণা ভজন্তে।"
"সপত্নমধ্যেঽপি কৃতাধিবাসং
প্রমাদবৃত্তাবপি বর্ত্তমানম্।
ন পদ্মরাগস্য মহাগুণস্য
ভর্ত্তারমাপৎ সমুপৈতি কাচিৎ॥"
"দোষোপসর্গপ্রভবাশ্চ যে তে
নোপদ্রবা স্তং সমভিদ্রবন্তি।
গুণৈঃ সমুখ্যৈঃ সকলৈরুপেতং
যঃ পদ্মরাগং প্রযতো বিভর্ত্তি।"
[ইত্যাদি]

কর্কর অর্থাৎ কাঁকরযুক্ত, সচ্ছিদ্র, মলিন, বা মললিপ্ত, প্রভাহীন, কর্কশ ও বিবর্ণ হইলে সে মণি অপ্রশস্ত অর্থাৎ ভাল নহে।

যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতও একটি সদোষ মণি ধারণ করে, তাহাকে নানাপ্রকার আপৎ আশ্রয় করে।

শত্রুমধ্যে বাস করিলেও প্রমাদ অবস্থায় অবস্থান করিলেও গুণসম্পন্ন পদ্মরাগমণিধারণকর্ত্তা কদাপি আপদগ্রস্ত হয় না।

প্রধান প্রধান গুণযুক্ত পদ্মরাগ মণি যদি শুচি ও যত্নবান্ হইয়া ধারণ করা যায়, তাহা হইলে দোষ ও উৎপাত-সম্ভব কোন প্রকার আপদই উপস্থিত হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন আরও অধিক ফলশ্রুতি থাকিলেও বাহুল্যভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

পরীক্ষা।

"পদ্মরাগ" প্রভৃতি নামধারী মাণিক্যও একপ্রকার হীরক; সুতরাং হীরকপরীক্ষাকালে ইহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরীক্ষা প্রকটিত হইবেক। এক্ষণে সামান্যাকারে কেবলমাত্র জাত্য ও বিজাতীয় এই দুইপ্রকারের ভেদবোধক পরীক্ষা ব্যক্ত করিব। যথা—

"বালার্ককরসংস্পর্শাৎ
যঃ শিখাং লোহিতাং বমেৎ।
রঞ্জয়েদাশ্রয়ং বাপি
স মহাগুণ উচ্যতে।"

নবোদিত সূর্য্যের কিরণস্পর্শে যে পদ্মরাগমণি রক্তবর্ণ শিখা উদ্বমন করে অর্থাৎ যাহা হইতে রক্তিম আভা নিক্রান্ত হয়, কিম্বা আধারগৃহ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করে, সেই পদ্মরাগ মহাগুণশালী।

"দুগ্ধে শতগুণে ক্ষিপ্তো
রঞ্জয়েদ্ যঃ সমন্ততঃ।
বমেচ্ছিখাং লোহিতাং বা
পদ্মরাগঃ স উত্তমঃ।"

শতগুণ দুগ্ধে নিক্ষিপ্ত করিলে যে পদ্মরাগ সমস্ত দুগ্ধকে রক্তবর্ণ করে কিম্বা রক্তবর্ণ শিখা বমন করে, সেই পদ্মরাগই উৎকৃষ্ট।

"অন্ধকারে মহাঘোরে।
যো ন্যস্তঃ সন্ মহামণিঃ।

প্রকাশয়ন্তি সূর্য্যাভঃ
স শ্রেষ্ঠঃ পদ্মরাগকঃ॥"

যে মহামণি ঘোর অন্ধকারে রাখিলেও সূর্য্যবৎ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় এবং অন্য বস্তুকেও প্রকাশ করে সেই পদ্মরাগই শ্রেষ্ঠ।

"পদ্মকোষে তু যো ন্যস্তো
বিকাশয়ন্তি তৎক্ষণাৎ।
পদ্মরাগো বরোহ্যেষ
দেবানামপি দুর্লভঃ।"

যাহা পদ্মোদরে স্থাপন করিলে পদ্মটি বিকশিত হয়, সেই পদ্মরাগই শ্রেষ্ঠ ও দেবদুর্লভ।

"চত্বারস্ত ময়োদ্দিষ্টা
গুণিনশ্চ যথোত্তরম্।
সর্ব্বারিষ্টপ্রশমনাঃ
সর্ব্বসম্পত্তিদায়কাঃ॥"

উল্লিখিত চারিপ্রকার পদ্মরাগ আমি বর্ণন করিলাম, উহারা পর পর অধিক গুণযুক্ত এবং উহারা সকলেই অনিষ্ট-নাশক ও সকলেই সম্পত্তিবৃদ্ধিকারক।

যো মণির্দৃশ্যতে দূরাৎ
জ্বলদগ্নিসমচ্ছবিঃ।
বংশকান্তিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ
সর্ব্বসম্পত্তিকারকঃ॥"

যে মণি দূর হইতে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দৃশ্য হয়, তাহার নাম "বংশকান্তি" এই বংশকান্তি মাণিক্য, ধারণকর্ত্তার সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি আনয়ন করে।

"পঞ্চ সপ্ত নববিংশতি রাগঃ
সিন্ধু এব সকলং খলু বস্ত্রে।
রঞ্জয়েদ্যদি বা করজালম্,
উত্তরোত্তর মহাগুণিনস্তে॥"

"নীলরসং দুগ্ধরসং জলং বা,
যে রঞ্জয়ন্তি দ্বিশতপ্রমাণম্।
তে তে যথাপূর্ব্ব মতিপ্রশস্তাঃ
সৌভাগ্য সম্পত্তি বিধানদায়কাঃ।"

যে মণি আপনার ওজন অপেক্ষা দুই শত গুণিত অধিক পরিমাণ নীলরস, দুগ্ধ, কি জলকে রাগবান্ করিতে পারে সেই সকল মণি পূর্ব্বক্রমে প্রশস্ত অর্থাৎ নীলরসরঞ্জক অধিক উত্তম, দুগ্ধরঞ্জক অপেক্ষাকৃত অনুত্তম, জলরঞ্জক তদপেক্ষা অনুত্তম। ইত্যাদি।

বিশেষ পরীক্ষা।

গত মাসের বঙ্গদর্শনে পরীক্ষাসম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং দুইটিমাত্র সন্দেহনাশক পরীক্ষা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

"অপ্রণশ্যতি সন্দেহে
শিলায়াং পরিঘর্ষয়েৎ।
ঘৃষ্টা যোঽত্যন্তশোভাবান্
পরিমাণং ন মুঞ্চতি॥"

মাণিক্য দেখিলে তাহা জাত্য কি বিজাতীয় কি কৃত্রিম, যদি কোন প্রকার সন্দেহ দূর না হয়, তাহা হইলে তাহা অন্য এক জাত্য মাণিক্যে ঘর্ষণ করিবেক। ঘর্ষণ করিলে যদি শোভা বৃদ্ধি হয় আর পরিমাণ অর্থাৎ ওজনে না কমে, তাহা হইলে তাহা—

"সজ্ঞেয়ঃ শুদ্ধজাতিস্তু
জ্ঞেয়া শ্চান্যো বিজাতয়ঃ।"

—শুদ্ধ জাতি এবং বিপরীত হইলে তাহা বিজাতীয় বুঝিতে হইবেক ।

পরিমাণ ।

মাণিক্যরত্নের আকারের ও ওজনের উচ্চসীমা কি, তাহা বলা যাইতেছে। দেখিতে কুঁচের সমান একটি মাণিক্য ওজন করিলে দশকুচ, অর্থাৎ দশরতি পর্য্যন্ত হইতে পারে এবং দেখিতে বিম্ব-ফল সমান একটি মাণিক্য ওজনে দশ তোলা পর্য্যন্ত হইতে পারে। রত্নতত্ত্ব-বিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, কি আকারে, কি ওজনে, উহা অপেক্ষা অধিক হয় এরূপ মাণিক্য কেহ কখন লাভ করে নাই। যথা—

"গুঞ্জাফলপ্রমাণস্তু
দশ সপ্ত ত্রিগুঞ্জকান্ ।
পদ্মরাগ স্তুলয়তি
যথাপূর্ব্বং মহাগুণঃ ।।"

যে পদ্মরাগ দেখিতে গুঞ্জাপ্রমাণ, তাহা ১০, ৭, ও ৩ গুঞ্জার তুলিত অর্থাৎ ওজন হইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ওজনযুক্ত পদ্মরাগই প্রশস্ত বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ একটি গুঞ্জাকার পদ্মরাগ ওজন করিলে যদি ১০ গুঞ্জার সমান হয়, তাহা হইলে তাহা যত ভাল, ৭ গুঞ্জার সমান হইলে তাহা তত ভাল নহে। এইরূপ ৩ গুঞ্জার সমান হইলে তাহা অপেক্ষা অধম বলিয়া জানিতে হইবেক ।

"ক্রোষ্টুকোলফলাকারো
দ্বাদশাষ্টাব্ধিগুঞ্জকান্ ।
পদ্মরাগস্তুলয়তি
যথাপূর্ব্বং মহাগুণঃ ।"

ক্রোষ্টুকোল অর্থাৎ শৃগালবদরী, যাহার বঙ্গভাষা "স্যাকুল।" সেই স্যাকুলের সমান দৃশ্য একটি পদ্মরাগ ১২, ১০, ৮, কি ৭ গুঞ্জার সহিত তুলিত অর্থাৎ ওজন হইতে পারে। তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্বক্রমে মহাগুণ বলিয়া গণ্য হইবে। ওজনে ভারি হওয়াই যে একটি মহৎগুণ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

"বদরীফলতুল্যো যঃ
স্বরদিক্ বসুমাষকঃ ।
তথা ধাত্রীফলস্ত্রিংশ
দ্বিংশতি ষষ্টমাষকঃ ।"

বদরী অর্থাৎ কুল। দেখিতে কুলের মত একটি মাণিক, ওজনে ১৪, ১০, ৮, মাষা হইতে পারে। এই রূপ ধাত্রী অর্থাৎ দেখিতে আমলকী ফলের মত একটি মাণিক ৩০ ও ২০ ও ১৬ মাষা পর্য্যন্ত হইতে পারে। এখানেও যে যত ভারি সে তত ভাল ইহা বুঝিতে হই-বেক।

"বিম্বীফলসমাকারো
বসুষট্ দশতোলকঃ ।
অতঃপরং প্রমাণেন
মানেন চ ন লভ্যতে ।।"
"যদি লভ্যেত পুণ্যেন
তদা সিদ্ধি যথাপুরাৎ ।।"

বিম্বফলের সমানাকার একটি মাণিক্য গুরুত্বে ৮, ৬, ও দশ তোলা হইতে

পারে। কি প্রমাণে কি মানে ইহার অধিক হয় এরূপ মাণিক্য লাভ হয় না। যদি কেহ কখন পুণ্যবলে লাভ করিতে পারেন, তবে তিনি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিবেন, বলা যাইতে পারে।

উপরোক্ত বচননিচয়ে যে প্রমাণ ও মানের নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা কেবল দিক্‌দর্শন মাত্র। ফল, উহার তারতম্যও হইয়া থাকে। বিল্বফল যেমন ছোট বড় হয়, বিল্বফলাকার মাণিক্যও তেমনি কিঞ্চিৎ ছোট বড়, এবং তাহাদের ওজন ৮, ৬, ও ১০ না হইয়া ৮॥০, ৬॥০, ১০॥০ কি তাহারও কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক হয়, ইহাও বুঝিতে হইবেক।

মূল্য।

এক্ষণে মূল্যের কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করা যাউক। পরন্তু শাস্ত্রানুযায়ী মূল্যই লিখিত হইবেক। যে সময়ে ভারতবর্ষে রত্নশাস্ত্র সকল লিখিত হইয়াছিল, তৎকালে যে প্রকার মূল্যে ক্রীত বিক্রীত হইত শাস্ত্রকারেরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে তাহার অনেক অন্যথা হইয়া গিয়াছে। এখন গরজ বুঝিয়া দর; এবং যে যাহার নিকট যত লইতে পারে সে তত লয়। পূর্ব্বে এরূপ অবস্থা ছিল না। প্রায় সকল বস্তুরই এক একটা মূল্যের নিয়ম ছিল। পূর্ব্বকালে কি রূপ নিয়মে ও কি রূপ মূল্যে মাণিক্য রত্নের ক্রয় বিক্রয় নিষ্পত্তি হইত, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

"বালার্কাভিমুখং কৃত্বা
দর্পণে ধারয়েন্মণিম্।
তত্র কান্তিবিভাগেন
ছায়া ভাগং বিনির্দ্দিশেৎ।"

প্রাতঃকালে নবোদিত সূর্য্যের অভিমুখে দর্পণের উপর মণিটি রাখিবেক। রাখিয়া মণির কান্তির প্রভেদ স্থির করিবেক; স্থির করিয়া ছায়া বা কান্তি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের তারতম্য নির্ণয় করিবেক। (এ নিয়ম আমরা বিশেষ রূপে জ্ঞাত নহি এবং এক্ষণকার মণিকারেরাও জ্ঞাত আছেন কি না সন্দেহ) নির্দ্দিষ্ট মূল্য কি? তাহা ব্যক্ত করা যাইতেছে। যথা—

"বজ্রস্য যত্তণ্ডুল সংখ্যয়োক্তং
মূল্যং সমুন্মাপিতগৌরবস্য।
তৎ পদ্মরাগস্য গুণান্বিতস্য
স্যান্মাষকাখ্যা তুলিতস্য মূল্যম্॥"

অর্থ এই যে, এক তণ্ডুল গুরু হীরকের যে মূল্য; এক মাষা পরিমাণ উৎকৃষ্ট পদ্মরাগের সেই মূল্য।

"যন্মূল্যং পদ্মরাগস্য
সগুণস্য প্রকীর্ত্তিতম্
তাবন্মূল্যং তথা শুদ্ধে
কুরুবিন্দে বিধীয়তে॥"

গুণযুক্ত অর্থাৎ উত্তম পদ্মরাগের যে মূল্য বলা হইল, বিশুদ্ধ "কুরুবিন্দ" মণিরও সেই মূল্য বিহিত আছে।

"সগুণে কুরুবিন্দে চ
যাবন্মূল্যং প্রকীর্ত্তিতম্।

তাবন্মূল্য চতুর্থাংশ-
হীনং স্যাদ্বৈ সুগন্ধিকে।"

উৎকৃষ্ট কুরুবিন্দের যে মূল্য বলা হইল, "সৌগন্ধিক" মাণিক্যের মূল্য তাহার এক চতুর্থাংশ ন্যূন হইয়া থাকে।

"যাবন্মূল্যং সমাখ্যাতং
বৈশ্যবর্ণে চ সূরিভিঃ।
তাবন্মূল্যচতুর্থাংশং
হীনং স্যাৎ শূদ্রজন্মনি।"

রত্নবিৎ পণ্ডিতেরা "সৌগন্ধিক" মণির যে মূল্য অবধারিত করিয়াছেন, শূদ্রবর্ণের মণি অর্থাৎ মাংসখণ্ড বা নীলগন্ধি মণির মূল্য তাহার এক চতুর্থাংশ হীন হইয়া থাকে।

"পদ্মরাগঃ পণং যস্তু
ধত্তে লাক্ষারসপ্রভঃ।
কার্ষাপণ সহস্রাণি
ত্রিংশন্মূল্যং লভেত সঃ।"

অলক্তকাভ পদ্মরাগ যদি কর্ষ পরিমাণ গুরুত্ব ধারণ করে, তবে তাহার মূল্য ত্রিশসহস্র কার্ষাপণ।

"ইন্দ্র গোপকসঙ্কাশঃ
কর্ষত্রয় ধৃতো মণিঃ।
দ্বাবিংশতি সহস্রাণাং
তস্য মূল্যং বিনির্দ্দিশেৎ।"

ইন্দ্রগোপ অর্থাৎ বর্ষাকীটের ন্যায় বিচিত্রচ্ছায় একটি মণি যদি ৩ কর্ষ ভারি হয়, তবে তাহার মূল্য দ্বাবিংশতি সহস্র কার্ষাপণ নির্দ্দেশ করিবেক।

"একোনো নূয়তে যস্তু
জবাকুসুম সন্নিভঃ।
কার্ষাপণ সহস্রাণি
তস্য মূল্যং চতুর্দ্দশ।"

জবাপুষ্পের ন্যায় আভাযুক্ত এক মণি যদি ওজনে পাদোন কর্ষ পরিমাণ হয়, তবে তাহার মূল্য চতুর্দ্দশ সহস্র কার্ষাপণ।

"বালাদিত্যদ্যুতিনিভং
কর্ষং যস্তু প্রতুল্যতে।
কার্ষাপণ শতানান্তু
মূল্যং সদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্।"

নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় অনতি গাঢ় লোহিত দ্যুতিযুক্ত মাণিক্য যদি ওজনে কর্ষ পরিমিত হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতেরা বলেন যে তাহার মূল্য একশত কার্ষাপণ।

"যস্তু দাড়িমপুষ্পাভঃ
কর্ষার্দ্ধেন তু সম্মিতঃ।
কার্ষাপণ শতানান্তু
বিংশতিং মূল্য মাদিশেৎ।"

দাড়িমপুষ্পের আভার ন্যায় আভাযুক্ত মণি যদি গুরুত্বে অর্দ্ধকর্ষ হয়, তবে তাহার মূল্য দুই সহস্র কার্ষাপণ অবধারিত করিবেক।

"চত্বারো মাষকা যস্তু
রক্তোৎপলদলপ্রভঃ।
মূল্যং তস্য বিধাতব্যং
সূরিভিঃ শতপঞ্চকম্।"

রক্ত পদ্মদলের ন্যায় প্রভাযুক্ত মণি যদি চারি মাষা হয়, তবে রত্নবিৎপণ্ডিতেরা তাহার মূল্য পঞ্চশত কার্ষাপণ স্থির করিবেন।

"দ্বিমাষকো যস্তু গুণৈঃ
সর্ব্বৈরেব সমন্বিতঃ।
তস্য মূল্যং বিধাতব্যং
দ্বিশতং তত্ত্ববেদিভিঃ।"

সর্ব্বপ্রকার গুণসম্পন্ন মণি যদি গুরুত্বে দুই মাষা পরিমিত হয়, তাহা হইলে রত্নতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ তাহার দুইশত কার্ষাপণ মূল্য ব্যবস্থা করিবেন।

"মাষৈকমিতো যস্তু
পদ্মরাগো গুণান্বিতঃ।
শতৈক সম্মিতং বাচ্যং
মূল্যং রত্নবিচক্ষণৈঃ।"

যে গুণযুক্ত পদ্মরাগ ওজনে এক মাষা পরিমিত হয়, রত্নতত্ত্ববিচক্ষণগণ তাহার এক শত কার্ষাপণ মূল্য বলিবেন।

"অতোন্যূন প্রমাণাস্তু
পদ্মরাগাঃ গুণোত্তরাঃ।
স্বর্ণ দ্বিগুণমূল্যেন
মূল্যং তেষাং প্রকল্পয়েৎ।"

উহা অপেক্ষা ন্যূনপরিমাণ গুণযুক্ত পদ্মরাগের সুবর্ণের দ্বিগুণ মূল্য স্থির করিবেক। অর্থাৎ একরতি সুবর্ণের যে মূল্য, ১ রতি পদ্মরাগের তাহার দ্বিগুণ মূল্য। *

"অন্যো কুসুম্ভ পানীয়
মঞ্জিষ্ঠোদক সন্নিভাঃ।
কাষায়া ইতি বিখ্যাতাঃ
স্ফটিকপ্রভবাশ্চ তে।"
"তেষাং দোষো গুণো বাপি
পদ্মরাগ বদাদিশেৎ।
মূল্য মল্পন্তু বিজ্ঞেয়ং
ধারণেঽল্পফলং তথা।"

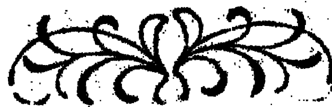
(ইত্যাদি)।

অন্যান্য যে সকল মণির রঙ, কুসুমফুলের বা মঞ্জিষ্ঠোদকের ন্যায়, তাহারা স্ফটিক হইতে সমুৎপন্ন এবং তাহাদিগকে "কাষায়" মণি বলে। তাহাদিগেরও দোষ গুণ পদ্মরাগমণির ন্যায় বিচার্য্য কিন্তু তাহাদের মূল্য অতিঅল্প এবং ধারণেও ফল অল্প।

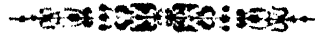
মানিক্যপরীক্ষা প্রস্তাব সমাপ্ত।

শ্রীরামদাস সেন।

* ৮০ রতি কাঞ্চনকে পূর্ব্বকালে সুবর্ণ বলিত। উহাই তৎকালের মুদ্রা। সে অর্থ এস্থলে গৃহীত হইবেক না।



বঙ্গদর্শন।



৮৯ সংখ্যা।

বহুপতিত্ব।

বহুবিবাহ বলিলে আমরা পুরুষের বহুবিবাহ বুঝি; কেন না বাঙ্গালায় কেবল পুরুষের মধ্যেই বহুবিবাহ প্রচলিত। কিন্তু কোন কোন দেশে স্ত্রীলোকের মধ্যে বহুবিবাহ আছে; আমরা এস্থলে সেই বহুবিবাহের কথার উল্লেখ করিতেছি, এইজন্য বহুপতিত্ব বলিয়া শিরোনামা দিলাম।

এক ভার্য্যার বহুভর্ত্তা এ কথা শুনিলে আমরা হাসি। হাসিবার দাবি রাখি; কেন না, বঙ্গযুবতীরা বহুবিবাহ করেন না—ইহা তাঁহাদের অনুগ্রহ—কিন্তু যদি বহুবিবাহের প্রথা তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে কোন বাঙ্গালি হাসিত? এই যে আমাদের পুরুষবাহাদুরেরা বহুবিবাহ করিতেছেন কে বা তাঁহাদের শ্রীমুখপ্রতি বিস্মিতলোচনে চাহিয়া থাকে? নিত্য দেখিলে রহস্যে আর রস থাকে না।

যেরূপ সময় পড়িয়াছে, বহুপতিত্বের পরিচয় বাঙ্গালায় দিতে কিছু ভয় হয়। তবে এক ভরসা যে সর্ব্বকার্য্যে অগ্রসারী, সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদকারী, সর্ব্বভ্রান্তিসংহারকারী মার্কিন সুন্দরীরা বহুপতিত্বের কথা শুনিয়া আগ্রহতাপ্রকাশ করেন নাই; তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, একদিকে বহুপতিত্ব আর একদিকে অতিদাসীত্ব। যত ভর্ত্তা, তত প্রভু! অতএব নির্ভয়ে আমরা বহুপতিত্বের কথা উল্লেখ করিতেছি; মার্কিন সুন্দরীরা বিঘ্ন বিনাশ করুন।

অনেকেই জানেন আদিম অবস্থায়

মনুষ্যেরা যথেচ্ছাচারী থাকে। অদ্যাপি দেখা যায় স্থানে স্থানে বন্যজাতিদের মধ্যে দাম্পত্যসম্বন্ধ একেবারে নাই, কে পতি, কে পত্নী, তাহার কিছুই স্থির নাই, পশুদের ন্যায় তাহারা পরস্পর পরস্পরের অভিসারী। তাহাদের সন্তান জন্মে, কিন্তু সে সন্তানের কে জনক তাহার স্থিরতা হয় না। তাহাদের সংসার নাই। যেখানে সংসার নাই সুতরাং সেখানে সমাজ হইতে পারে না। সংসার সমাজের আদি।

বন্যদের এই যথেচ্ছাচারিতা হইতে ক্রমে বিবাহের সূত্রপাত আরম্ভ হয়। তখন একজনের সঙ্গে কেবল একজনের বিবাহ না হইয়া, বহুজনের সঙ্গে বিবাহ প্রচলিত হয়। প্রত্যেক স্ত্রীর বহুস্বামী, প্রত্যেক স্বামীর বহুস্ত্রী। যথেচ্ছাচারিতার পরই একচারী হওয়া অতি কঠিন, তখন বহুবিবাহই সম্ভব ও সঙ্গত; বহুবিবাহ অর্থাৎ বহুপত্নীত্ব এবং বহুপতিত্ব।

বহুপতিত্ব একসময় সকল দেশেই প্রচলিত ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস; তাঁহারা বলেন যে, বন্য অবস্থা হইতে উন্নত হইতে গেলে ক্রমে যে যে সোপান উঠিতে হয়, বহুপতিত্ব তাহার মধ্যে প্রথম। সুতরাং এই সোপান উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন জাতিই সভ্য বা উন্নত হয় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

এক্ষণে দেখা যায় যে অসভ্য জাতিদের মধ্যে অনেক দেশে বহুপতিত্ব অদ্যাপি প্রচলিত আছে। বোম্বে অঞ্চলে নায়র নামে একজাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে বহুপতিত্ব আছে। নাগপুর অঞ্চলে গঁদ নামে আর এক জাতি বাস করে, তাহাদেরও যুবতীরা বহুবিবাহ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মান্দ্রাজ অঞ্চলে ও উত্তরাখণ্ডের পর্ব্বতে এইরূপ বহুপতিত্ব সাধারণতঃ না হউক, স্থানে স্থানে আছে। ভারতবর্ষের বহির্ভাগে তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি অনেক দেশে এই রীতি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সকল দেশের মধ্যে কোনটিই সভ্যতাপ্রাপ্ত হয় নাই। যে সকল দেশ সভ্যতালাভ করিয়াছে, সে সকল দেশে এক সময় বহুপতিত্ব ছিল কি না তাহা নিরাকরণ করা এক্ষণে কঠিন; সকল দেশের পুরাবৃত্তে এ কথা লিখিত নাই। ইংরেজদের পুরাবৃত্তে পাওয়া যায় যে, যখন তথায় কেবল বন্যরা বাস করিত, তখন তাহাদের মধ্যে বহুপতিত্ব প্রচলিত ছিল। আমাদের বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত নাই, কখন তাহা লিখিত হয় নাই; কিন্তু যাহা আমাদের গ্রন্থে নাই তাহা অনেকটা আমাদের ব্যবহার থাকিয়া গিয়াছে; অতএব বহুপতিত্ব সম্বন্ধে আমাদের ব্যবহারদ্বারা যতদূর অনুভব করা যাইতে পারে তাহা স্থানে স্থানে চেষ্টা করা যাইবে।

(১) বহুপতিত্ব প্রধানতঃ তিন প্রকার।

তাহার মধ্যে প্রথমপ্রকারের কথা বলা যাইতেছে। যখন স্বেচ্ছাচারিতা ঘুচিয়া বহুপতিত্ব প্রথম আরম্ভ হয়, তখন বিবাহের কোন বাঁধাবাঁধি থাকে না; যুবতীরা যাহাকে ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করে, এই বিবাহ স্বেচ্ছাচারিতার অনুরূপ; তবে এইমাত্র প্রভেদ যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি কাহার সহিত সহবাসের অধিকারী কেবল তাহাই নির্দ্দিষ্ট হয়, স্বেচ্ছাচারিতায় সেরূপ নির্দ্দিষ্ট থাকে না। পূর্ব্বে যে নায়র জাতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই শ্রেণীর বহুপতিত্ব প্রচলিত, তবে কেহ কেহ বলেন যে, নায়র সুন্দরীরা দ্বাদশটি পর্য্যন্ত পতি গ্রহণ করিতে পারে, তাহার অধিক পারে না; কিন্তু এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। তাহা যাহাই হউক, এইরূপ বহুপতিত্ব যে দেশে প্রচলিত, সে দেশে বোধ হয় রীতিমত সংসার নাই। কে কাহাকে লইয়া সংসার করিবে? স্ত্রীর বহুস্বামী, স্বামীর বহু স্ত্রী, কে কাহার গৃহে থাকে! তদ্ব্যতীত কে পিতা, কে পুত্র কিছুই স্থির হয় না। সুতরাং পিতাপুত্র বলিয়া তথায় কোন সম্বন্ধ নাই, খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত, জ্ঞাতি গোত্র কিছুই নাই, সংসারবন্ধনীর প্রায় কোন উপকরণ নাই। স্বসম্পর্কীয়ের মধ্যে কেবল, সহোদর সহোদরা, মাতা আর মাতুল। কিন্তু তাহারা সকলে এক গৃহে বাস করে না; কেবল মাতা শৈশব সন্তানগুলিকে লইয়া একা বাস করে। পিতার যত্নে সন্তানের যাহা সম্ভব, কেবল মাতার যত্নে তাহার শতাংশ হয় না; অনেক সন্তানের প্রাণরক্ষা পর্য্যন্ত হয় না।

এই জাতীয় বহুপতিত্ব যে অঞ্চলে প্রচলিত সে অঞ্চলে পিতার সম্পত্তি পুত্র পায় না। কে জনক তাহার স্থিরতা নাই, সুতরাং সন্তান কিরূপে পিতার সম্পত্তি দাবী করিবে? কে পুত্র, পিতার তাহা জানা নাই, সুতরাং পিতা কাহাকে সম্পত্তি দিয়া যাইবে? কিন্তু পুত্রসম্বন্ধে এই যে আপত্তি, ভাগিনেয়সম্বন্ধে সে আপত্তি সম্ভবে না। সহোদরার সন্তানকে সকলেই জানিতে পারে, সুতরাং পুরুষেরা ভাগিনেয়কে উত্তরাধিকারী করে। বন্য অবস্থায় সম্পত্তি কিছুই নাই, তথাপি তীর, ধনুক, চর্ম্ম বা তদ্বৎ সামগ্রী যাহাই থাকে ভাগিনেয় তাহাই পায়।

স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, বহুপতিত্ব নাই অথচ তথায় ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী; এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, বহুপতিত্ব একসময় তথায় প্রচলিত ছিল; বহুপতিত্ব লোপ পাইয়াছে, তথাপি তাহার আনুষঙ্গিক দায়ভাগ থাকিয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলের স্থানে স্থানে পুত্রসত্ত্বেও ভাগিনেয় যে উত্তরাধিকারী হয় তাহার হেতু এই।

(২) ইহার পর আর একজাতীয় বহুপতিত্ব আরম্ভ হয়। যাহাকে ইচ্ছা যত ইচ্ছা বিবাহ করিবার যে প্রথা ছিল তাহার

পরিবর্ত্তে, কেবল স্বসম্পর্কীয় পুরুষদিগকে বিবাহ করিবার প্রথা জন্মে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রথম অবস্থায় স্বসম্পর্কীয় পুরুষদের মধ্যে কেবল মাতুল আর ভাগিনেয়। সুতরাং যে স্ত্রীলোক বিবাহ করে সে মাতুল আর ভাগিনেয় উভয়কে পতিত্বে বরণ করে। ভাগিনেয়েরা সুতরাং মাতুলানী বিবাহ করে, মাতুল ভাগিনেয়বধূ বিবাহ করে।

এক্ষণে বোধ হয় অনেকে বুঝিতে পারিতেছেন পশ্চিম অঞ্চলে মাতুলানীর সম্বন্ধে আদিরসের রহস্য কেন প্রচলিত। এই জাতীয় বহুপতিত্ব এক সময় পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মাতুলানী আর স্ত্রী তথায় এক ছিল। পরে এ সম্বন্ধ রহিত হইয়াছে কিন্তু এ ভাব কতকটা অদ্যাপি থাকিয়া গিয়াছে। আমাদের নিজের প্রথাদি আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন এক-সময় বাঙ্গালায় এই ঘৃণিত বিবাহের প্রথা আসিবার আশঙ্কা হইয়াছিল, অথবা হয় ত আসিয়াছিল। তাহা উঠাইবার নিমিত্ত মাতুলানীকে শাস্ত্রে মহাগুরু বলা হইয়াছে। ভাগিনেয়বধূ সম্বন্ধে অতি কঠিন নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাকে দেখিতেও নাই বলা হইয়াছে। এই নিয়ম এক্ষণে অনর্থক, অনাবশ্যক, কিন্তু একসময় ইহা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল।

যে জাতীয় বহুপতিত্বের কথা বলা যাইতেছে, এক্ষণে তাহা রহস্যের বিষয় হইলেও একসময় তদ্দ্বারা প্রধান সুফল ফলিয়াছিল। এই বহুপতিত্ব উপলক্ষে গৃহান্তর সংসার প্রথম স্থাপিত হয়, পূর্ব্ব অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে তাহা ছিল না। তদ্ভিন্ন আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয়সংখ্যা এই বহুপতিত্বে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ইহাও আর এক প্রধান লাভ বলিতে হইবে। কেন না স্বসম্পর্কীয়ের সংখ্যা বাড়িলে ক্রমে সমাজের উৎপত্তি হয়।

(৩) তৃতীয়, আর এক জাতীয় বহুপতিত্ব আছে। পরিবারের মধ্যে যত পুরুষ থাকে, তাহাদের সমুদয়কে বিবাহ করিবার যে প্রথা ছিল, অর্থাৎ মাতুল ও ভাগিনেয় বিবাহ করিবার যে প্রথা ছিল, সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের একদলের সহোদরগণকে বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। অর্থাৎ কেবল মাতুল-দের বিবাহ করা হয়, নতুবা কেবল ভাগি-নেয়দের বিবাহ করা হয়। তাহাদের মধ্যে যাহারা পরস্পর সহোদর কেবল তাহারাই নির্ব্বাচিত হয়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যে সুন্দরীকে বিবাহ করে, সেই সুন্দরী কনিষ্ঠদের ভার্য্যা হয়, কনিষ্ঠ-দের আর স্বতন্ত্র বিবাহ করিতে হয় না। তাহাদের সন্তানেরা জ্যেষ্ঠের বলিয়া গণ্য হয়, এবং তাহারা যত্নে প্রতিপালিত হয়। প্রথমোল্লিখিত বহু-পতিত্বে সন্তানদের কোন যত্ন হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর বহুপতিত্বে সন্তানদের কথঞ্চিৎ যত্ন হয়, কিন্তু এই শেষ শ্রেণীর বহুপতিত্বে সন্তানদের প্রতি রীতিমত যত্ন

আরম্ভ হয়। কে পিতা তাহা স্থির নাই সত্য, কিন্তু সহোদরেরা সকলেই পরস্পর জানে সন্তানেরা একান্ত পক্ষে নিজপুত্র না হউক, ভ্রাতুষ্পুত্র নিশ্চয়ই। সুতরাং সন্তানদের প্রতি যত্ন বিশেষরূপে হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বহুপিতার উপার্জ্জনে সন্তানদের অন্নকষ্ট একেবারে না থাকিবারই সম্ভাবনা। তবে সন্তান-দিগের এইমাত্র দোষ সম্ভবে যে, বহুপিতার উপদেশ কখন কখন পরস্পর বিরোধী হইলে, তাহাদিগের মানসিক পুষ্টিসম্বন্ধে কিছু ব্যাঘাত হইলে হইতে পারে।

সন্তানসম্বন্ধে আর এক কথা আছে, পূর্ব্ব অবস্থায় তাহাদের পিতৃকুল ছিল না, পিতৃ পিতৃব্যের সম্পত্তি উত্তরাধি-কারিস্বরূপে তাহারা পাইত না, তৎ-কালে উত্তরাধিকারিত্ব কেবল মাতৃকুলগত ছিল। এই তৃতীয় প্রকার বহুপতিত্বে তাহা পিতৃকুলগত হইল। এস্থলে পিতা কে স্থির নাই সত্য, কিন্তু পিতৃকুলের স্থিরতা যে থাকে ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

বহুপতিত্বের কথা কেবল একটি মাত্র আমাদের দেশে রাষ্ট আছে—দ্রৌপ-দীর বহুপতিত্ব। বোধ হয় তৎপূর্ব্বে বা সেই সময়ে ভারতবর্ষে বিস্তর এরূপ সতী ছিলেন, হয় ত একসময় আমাদের বাঙ্গালায়ও এ প্রথা ছিল। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে পশ্চিমদেশীয় মাতুলানীর ন্যায় জ্যেষ্ঠের স্ত্রীকে লইয়া রসিকতা করা হয়। এ রসিকতার কারণ অন্য কিছু অনুভব হয় না। পূর্ব্ব সম্বন্ধ উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব আলাপন থাকিয়া গিয়াছে।*

তিব্বতদেশে এই জাতীয় বহুপতিত্ব বিশেষ মঙ্গলদায়ক হইয়াছে। উহা বরফের দেশ, শস্য সামান্যমত উৎপন্ন হয়, তথায় প্রজা বৃদ্ধি হইলে, অন্নকষ্ট হয়, সুতরাং তথায় প্রজাবৃদ্ধি না হওয়াই মঙ্গল। এক্ষণে দুই উপায় দ্বারা তথায় প্রজাবৃদ্ধি নিবারিত আছে। এক উপায় সন্ন্যাস আশ্রম, অপর উপায় বহুপতিত্ব। বহুপতিত্বে সন্তান অল্প জন্মে।

যে দেশে রাজশাসন আরম্ভ হয় নাই বা সুশাসন নাই, সে দেশে এই জাতীয় বহুপতিত্ব মঙ্গলদায়ক বলিয়া পরিচিত। একজন ইংরেজ লিখিয়াছেন যে, যখন ব্যবসা উপলক্ষে বা কোন কর্ম্ম উপলক্ষে একজন স্বামী বিদেশে যায় অপর স্বামীরা গৃহে থাকিয়া তত্ত্বাবধারণ করে। সংসারের রক্ষণাবেক্ষণের আর কোন ভাবনা থাকে না। আরও লাভ এই যে বহুস্বামীর উপার্জ্জনে সংসারের ব্যয়ের

* অনেকে বলিতে পারেন, "শ্যালীর" সহিতও ত এইরূপ রসিকতা প্রচলিত আছে। তাহা সত্য। তাহার হেতু "বহুপত্নীত্ব" প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

সন্তুলান হয়। বোধ হয় আমাদের একান্নবর্ত্তিতার মূল এই বহুপতিত্ব। সহোদরদের একমালি বিবাহ বাঙ্গালা হইতে বহুকাল উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহার আনুষঙ্গিক একান্নবর্ত্তিতা মঙ্গলদায়ক বলিয়া এদেশে থাকিয়া গিয়াছে। ফলতঃ এবিষয়ে মত ভেদ আছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইবে।*

ত্রিবিধ বহুপতিত্বের কথা বলা হইল। এই পরিচয়ে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পতির সংখ্যা ক্রমে কমিতে থাকে। প্রথম অবারিত পতিত্ব, তাহা অতি অসভ্য অবস্থায় হয়। তাহার পর বিবাহাকাঙ্ক্ষিণীরা যত ইচ্ছা তত পতি আর গ্রহণ করে না, কারণ, তাহাতে ক্ষতি হয়, সন্তান পালন হয় না, সুতরাং যুবতীরা পতির সংখ্যা কমাইতে আরম্ভ করে, যাহারা পরস্পর স্বসম্পর্কীয় ও আত্মীয় অর্থাৎ যাহারা একপরিবারস্থ কেবল তাহাদেরই পতিত্বে বরণ করে। এই দ্বিতীয় বহুপতিত্ব অসভ্য অবস্থায় উৎপত্তি বটে কিন্তু তখন স্রোত ফিরিতেছে। তাহার পর পরিবারস্থ অপর সকলকে বিবাহ করা অপেক্ষা কেবল সহোদরদের বিবাহ করা হয় ইহা তৃতীয় বহুপতিত্ব। ক্রমে এইরূপে শেষ এক পতিত্বের উৎপত্তি হয়।

কিন্তু দেশের অবস্থা অনুসারে এই সকল নানাবিধ পতিত্ব প্রচলিত থাকে। তিব্বতদেশের অবস্থা একপতিত্বের উপযোগী নহে, তথায় রাজা যদি রাজদণ্ডের ভয় দেখাইয়া একপতিত্ব বিধান করেন, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যে প্রজাবৃদ্ধি হইয়া পড়িবে, কিন্তু যুবতীকে বহুপ্রসবিনী দেখিয়া সে দেশের ভূমি কদাপি বহুপ্রসবিনী হইবে না, সুতরাং আহারের অনাটনে সকলে মরিবে। যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, কেবল সেই পরিমাণের প্রতিপাল্য প্রজা জীবিত থাকিবে। তদ্ভিন্ন সেই দেশে যদি রাজশাসন ভাল না থাকে, তাহা হইলে একপতি কখন সংসার রক্ষা করিতে পারিবে না; সুতরাং আবার পূর্ব্বমত বহুপতিত্ব আরম্ভ হইবে।

এই ত্রিবিধ বহুপতিত্ব দেশ কাল পাত্র অনুসারে নিজে উৎপন্ন হয়, স্থায়ী হয়, লয় পায়। কাহার ইচ্ছাধীন নহে। কাহার বক্তৃতারও অধীন নহে, চেষ্টার ও অধীন নহে।

আর এক জাতীয় বহুপতিত্ব আছে; কিন্তু সকল দেশে তাহা বহুপতিত্ব বলিয়া গণ্য নহে। বহুপতিত্বের লক্ষণ বিলাতে একরূপ, বাঙ্গালাদেশে অন্যরূপ। সহপতি না থাকিলে, বিলাতে বহুপতি বলে না। অনেক বিবির দুই বিবাহ, কিন্তু দুই পতি এক সময় জীবিত থাকে না বলিয়া সাহেবেরা বিধবা বিবাহকে বহুপতিত্ব বলেন না। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে বিধবাবিবাহ বহুপতিত্বের অন্তর্গত। তাহা সঙ্গত কি না পরে বলা যাইবে।

* সমাজ তত্ত্ব সম্বন্ধে একান্নবর্ত্তিতার কথা নিতান্ত আবশ্যক সুতরাং এক সময়ে তাহা আলোচনা করা যাইবে।

ফুলের ভাষা।

আকাশে নক্ষত্র ফোটে; পৃথিবীতে ফুল ফোটে। নক্ষত্র অন্ধকারের ভিতর দিয়া ফুল দেখিয়া বলে, তুই ফুটিস্ বলিয়া আমি ফুটি; ফুল অন্ধকারের ভিতর দিয়া নক্ষত্র দেখিয়া বলে, তুই ফুটিস্ বলিয়া আমি ফুটি। আকাশ বিশ্বের আধখানা; পৃথিবী বিশ্বের আর আধখানা। তাই বলি যখন আকাশে নক্ষত্র ফোটে আর পৃথিবীতে ফুল ফোটে, তখন আর আধাআধি ভাব থাকে না। তখন বিশ্বের উপরার্দ্ধ এবং বিশ্বের নিম্নার্দ্ধ মিশিয়া এক হইয়া যায়। ফুলের ডোরে উপর নীচে বাঁধা।

আবার ফুলের ডোরে নীচে সব বাঁধা। এখানেও ফুল আর নক্ষত্র একই বস্তু, কেন না নক্ষত্রের কিরণ ডোরে ও নীচে সব বাঁধা। একটু ভাবিয়া দেখ। মনুষ্যের ইতিহাসের যুগযুগান্তরের পিছনে গিয়া দাঁড়াও। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি ভুলিয়া যাও; গ্রীস, রোম, পারশ্য ভুলিয়া যাও; তাজমহল, পার্থিনন, ভুবনেশ্বর, কনারক ভুলিয়া যাও। সব ভুলিয়া সভ্যতাবিহীন, শাস্ত্রবিহীন, ইতিহাসবিহীন, অন্নবস্ত্রবিহীন কালদীয় মেষপালকদিগের মধ্যে গিয়া দেখ তাহারা কি করিতেছে। দেখিবে তাহারা দিনে ভেড়া চরাইতেছে, রাত্রে নক্ষত্র আবিষ্কার করিতেছে। অথবা গো-মহিষ-সম্বল ভারতীয় আদিম আর্য্যগণের মধ্যে গিয়া দেখ, তাহারা কি করিতেছে। দেখিবে তাহারা দিনে গো-ধন বাড়াইবার জন্য কত গব্য-কাষ্ঠ জ্বালাইতেছে, রাত্রে আকাশে সপ্তর্ষি দেখিয়া সাধের গো-ধন পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছে। তার পর সেই আদিমকাল হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হও। হইয়া উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ কর। বরাবর দেখিবে মানুষের এক চক্ষু পৃথিবীর জিনিসে আর এক চক্ষু আকাশের নক্ষত্রে। নক্ষত্র মনুষ্যের চিরন্তন চিন্তা, আবহমান আকাঙ্ক্ষা, গূঢ়নিহিত কৌতূহল। আবার পিছাইয়া যাও—সোণা, রূপা, মণি, মুক্তা, বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহ, অট্টালিকা, অর্ণবযান, বাষ্পীয় যান প্রভৃতি সমস্ত বাহ্য সম্পদ এবং সভ্যতাসূচক বস্তু ভুলিয়া, আদিম মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া আদিম মনুষ্যকে দেখ। দেখিবে তোমার যাহা আছে তাহার সে সব কিছু নাই। কেবল তোমার যে ফুলটি আছে তাহারও সেই ফুলটি আছে। তার পর ক্রমে অগ্রসর হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে প্রবেশ কর। বরাবর দেখিবে মানুষ সব পরিবর্ত্তন করিতেছে কিন্তু যে ফুল প্রথমে তুলিয়া পরিয়া

এখনও সেই ফুল তুলিয়া পরিতেছে। ফুল মানুষের চিরন্তন সাধ, আবহমান অনুরাগ, গূঢ়-নিহিত ভাব! তাই বলি যে আকাশের নীচে ফুলের ডোরে আর নক্ষত্রের কিরণ-ডোরে সব বাঁধা। সেই জন্যই বুঝি ঐ দুইটি ডোর মিশিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ফুল! তুমি কি কঠিন! তোমার কল্পনাতীত কমনীয় কান্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাঁধা! তবে বুঝি বাঁধিতে হইলে কমনীয়তা দ্বারা বাঁধিতে হয়?

ফুল, তুমি মানব-গুরু! মানুষে মানুষ আছে আর পশু আছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা, পশুত্বটুকু নষ্ট করিয়া মনুষ্যত্ব টুকু প্রবল করে। সেই নিমিত্ত মানুষ পৃথিবীতে উদ্ভূত হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত কত চেষ্টা করিয়াছে। কত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে, কত দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছে, কত স্কুল, কালেজ, টোল করিয়াছে, কত দেশ ভ্রমণ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রভূত চেষ্টার প্রথম কার্য্য—ফুল তোলা। যে দিন আদিম মনুষ্য আদিম পশুর ন্যায় ক্ষুধার জ্বালায় মহারণ্যে বিচরণ করিয়া পশুবধকরত মধ্যাহ্নে বৃক্ষমূলে বসিয়া কাঁচা মাংস চিবাইয়া খাইয়া সহচর সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় নিদ্রার দ্বারা ক্লান্ত দেহের শান্তি সম্পাদন করিয়া অপরাহ্নে অস্তাচলগামী সূর্য্যের মৃদুমধুর সুবর্ণজ্যোতিঃ দেখিয়া, কি জানি কেন, বিলম্বিত লতা হইতে একটি সুবর্ণ-জ্যোতিঃ পুষ্প ছিঁড়িয়া মাথার চুলে গুঁজিল, সেই দিন মনুষ্যের বিশাল ইতিহাসের সূত্রপাত হইল। সেইদিন জানা গেল যে, মহারণ্যনিবাসী সহচর সিংহ ব্যাঘ্র অনন্তকাল মহারণ্যেই বাস করিবে, কিন্তু তাহাদের আদিম সহচর মনুষ্য মহারণ্য বিনষ্ট করিয়া মহা সম্পদ সৃষ্টি করিবে। সেইদিন জানা গেল যে সহচর সিংহ ব্যাঘ্রে কেবল পৃথিবী আছে, কিন্তু মনুষ্যে পৃথিবী এবং স্বর্গ দুই-ই আছে। সেইদিন জানা গেল যে সহচর সিংহব্যাঘ্র চিরকাল নতশিরে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, কিন্তু মনুষ্য অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া বিশ্বের ঊর্দ্ধ-তম প্রদেশে উঠিবে। সেইদিন মনুষ্যের অনন্ত শিক্ষার, অনন্ত উন্নতির সূত্রপাত হইল। সে শিক্ষা, সে উন্নতির মূলে—ক্ষুদ্র, কোমল, কমনীয় ফুল! কেন না ঊর্দ্ধতম স্বর্গ, অনন্ত নক্ষত্ররূপী ব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীর আর কিছুর সহিত বাঁধা নাই, কেবল ফুল-ডোরে বাঁধা। অতএব যদি স্বর্গাভিমুখী হইতে হয়, যদি অনন্ত উন্নতির পথে চলিতে হয়, তবে আদি গুরু ফুল ভুলিও না। আদি ছাড়া অন্ত নাই। ফুলের কোমলতা, ফুলের কমনীয়তা, ফুলের গগনস্পর্শী নির্ম্মলতা হারাইলে উন্নতির পথে কাঁটা পড়িবে, স্বর্গযাত্রা অকালে বন্ধ হইবে। অতএব, ভাই সকল, আমাদের মহারণ্যবাসী আদিপুরুষ যেমন মাথায় ফুল রাখিতেন, তেমনি করিয়া মাথায় ফুল রাখিয়া অগ্রসর হও।

ফুল, তুমি জগতের গূঢ় রহস্য !

ফুল সর্ব্বত্রই ফোটে। মরুভূমিতেও ফোটে, উদ্যানপ্রদেশেও ফোটে, পৃথিবীর উত্তর সীমার তুষাররাশির মধ্যেও ফোটে, পৃথিবীর উত্তপ্ত কটিদেশেও ফোটে, মনুষ্যের বাসস্থানেও ফোটে, মনুষ্যের অগম্য প্রদেশেও ফোটে। ফুল সর্ব্বব্যাপী।

আমি এখানে, ওখানে কি আছে জানি না। তুমি ওখানে, এখানে কি আছে জান না। ভারতে ইংলণ্ড নাই, ইংলণ্ডে ভারত নাই। ফ্রান্সে আমেরিকা নাই, আমেরিকায় ফ্রান্স নাই। এ স্থান মৃত্তিকাময়, এখানে সমুদ্র নাই। ওস্থান অগাধ সমুদ্র, ওখানে মৃত্তিকা নাই। তুমি সব জান না, আমি সব জানি না, ভারত ইংলণ্ড জানে না, ইংলণ্ড ভারত জানে না, মৃত্তিকা সমুদ্র জানে না, সমুদ্র মৃত্তিকা জানে না। ফুল সর্ব্বত্র ফোটে। ফুল সব জানে। ফুল সর্ব্বজ্ঞ।

ভারতবর্ষ, পারস্যদেশ, আরবদেশ, আফরিক মহাদেশ—এই সকল স্থান প্রখর রবির প্রখর রঙ্গভূমি। এই সকল স্থানে প্রখর রবিকিরণে সকলই জ্বলিয়া যায়, পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, জল শুকাইয়া বাষ্প হইয়া যায়, জলাধার নদীগর্ভ ফাটিয়া বিকটাকার ধারণ করে। কিন্তু এ সকল স্থানে ফুল ফোটে। আবার লাপ্‌লাণ্ড, গ্রীণ্‌লাণ্ড, নোভাজেম্‌লা প্রভৃতি স্থানে হিমের পরিমাণ নাই। উপরে হিম, নীচে হিম, চতুঃপার্শ্বে হিম —যেন হিমাংশুর হিমঋতুর হিমশয্যা—হিমদেহ, হিমপ্রাণ, হিম-আত্মা ! সে হিমে কিছুই হয় না, কিছুই বাঁচে না, মানুষ জমাট হইয়া যায়, জল জমাট হইয়া যায়, জগৎ জমাট হইয়া যায়। কিন্তু সে হিমে ফুল ফোটে। ফুল সর্ব্বশক্তিমান। ফুলের কোমলতা শক্তির প্রাণ।

সুগন্ধিনিশ্বাস বিবৃদ্ধ তৃষ্ণং
বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফম্।
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রমলোলদৃষ্টি—
লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী॥

এখন বুঝিতেছি ফুল সর্ব্বত্র ফোটে কেন। একজন কবি-নাম-খ্যাত ইংরেজ বলিয়াছেন :—

Full many a flower is born to
blush unseen
And waste its sweetness in the
desert air.

মরুভূমিতে ফুল ফুটিয়া অপচয় হয় মাত্র ! মিথ্যা কথা। অসার কথা। অগভীর আত্মার কথা। প্রশস্ত মরুভূমি—জীবশূন্য, তৃণশূন্য, বারিশূন্য—জ্বালাময়, অগ্নিময়—প্রকৃতির রুদ্র, বিকট, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! যেমন করিয়া দেখ, সে মূর্ত্তি হইতে কেবল অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে ; রুদ্রভাব ফাটিয়া বাহির হইতেছে ; কঠোরতা, কঠিনতা, নিষ্ঠুরতা প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু ঐ দেখ ঐ ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে একটি ফুল ফুটিয়াছে—ঐ কঠোর, কঠিন, নিষ্ঠুর, রুদ্রমূর্ত্তিতে একটি অনির্ব্বচনীয় কোমলতা অঙ্কিত রহিয়াছে ! প্রকৃতি

ঐ কোমলতায় অনুপ্রাণিত। ঐ কোমলতা লইয়া প্রকৃতি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, প্রকৃতি আপনাকে সার্থক মনে করিতেছে। তুমি দেখ আর নাই দেখ, তুমি বুঝ আর নাই বুঝ, প্রকৃতি ঐ কোমলতার গুণে পূর্ণতার ভাবে ভোর হইয়া রহিয়াছে, সজীবতা অনুভব করিতেছে, আপনার প্রাণবায়ু আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছে। ফুল, তুমি মরুভূমিতে ফুটিও, নহিলে মরুভূমি প্রাণশূন্য হইবে . . . ম শক্তি শক্তিহীন হইবে! বিশ্বনিন্দিত পৌরাণি কবি ইহা বুঝিতেন। বুঝিয়া বিকটদশনা, ভীমনয়না, খড়্গধারিণী, অসুরঘাতিনী, রক্তাক্তকলেবরা রণরঙ্গিণীকে কোমলতম নীলোৎপলসদৃশ অপরাজিতায় সুশোভিত করিয়াছেন। মরুভূমিতে ফুল না ফুটিলে মরুভূমি কি পৃথিবীতে থাকিত? না মহাশক্তির প্রকৃতশক্তি বুঝা যাইত? মরুভূমিতে ফুল না ফুটিলে আকাশের নক্ষত্র কেমন করিয়া মরুভূমিকে পৃথিবী বলিয়া চিনিত? তুমি মরুভূমি দেখ আর নাই দেখ, কিন্তু মরুভূমিকে ত নক্ষত্রের কাছে পরিচিত হইতে হইবে। তাই মরুভূমিতে ফুল ফোটে। ফুল-ডোর ব্যতীত পৃথিবীকে আকাশের সহিত বাঁধা যায় না।

মহারণ্যে মহান্ধকার। কোথাও কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না—যেন কোথাও কিছু নাই। সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে একটি ফুল ফুটিল। আর্য্যকবি গাহিলেন :—

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ইত্যাদি।

সেই অবধি আর্য্য ভক্ত মহাশক্তির পদে জবাপুষ্পের অঞ্জলি দিতেছেন।

আর্য্যকবিগণ বুঝিয়াছিলেন যে ফুল জগতের গূঢ়রহস্য। তাঁহাদের মতন ফুলের ভাষা আর কোথাও কেহ বুঝিতে পারে নাই। গ্রীক্ কবিগণ ফুলে যত মানসিক সৌন্দর্য্য দেখিতেন, তদপেক্ষা শারীরিক সৌন্দর্য্য দেখিতেন। তাঁহারা বেশী ফুল কোরিণ্থিয়ান্-স্তম্ভের শিরোপরি চাপাইতেন। রণপ্রিয় রোমানেরা রাজপথে ফুলের মালা ঝুলাইয়া জয়োল্লাস প্রকাশ করিতেন। ইংলণ্ডে সেক্ষপীয়র ফুলের ভিতর প্রবেশ করিয়া অনেক কথা বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু, সকল কথাই পৃথিবীসম্বন্ধীয়। Midsummer Night's Dream—এ ও তদপেক্ষা বেশী নাই। কেবল ভারত ফুলে পৃথিবী এবং স্বর্গ দুইই দেখিয়াছে। বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি ফুলে পৃথিবীর যাহা কিছু দেখিবার তাহা দেখিয়াছেন; পৌরাণিক কবিগণ ফুলে স্বর্গের অথবা বিশ্বরহস্যের সম্পূর্ণ চিত্র দেখিয়াছেন।

ফুল জগতের গূঢ় রহস্য। ফুল জগতের প্রাণ। ফুল-ডোরে স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য বাঁধা। ফুল ছাড়া গতি নাই, ফুল ছাড়িলে স্বর্গের দ্বার খোলা যায় না। অতএব, ভারতসন্তানগণ, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় ফুল মাথায় করিয়া অগ্রসর

হও! কিন্তু ফুলকে শুধু ফুল বলিয়া জানিলে চলিবে না। আমাদের পিতৃপুরুষদিগের ন্যায় ফুলকে জগতের গূঢ় রহস্য, মহাশক্তির শক্তি, প্রকৃতির প্রাণ, স্বর্গদ্বারের চাবি বলিয়া না জানিলে তোমাদের যুগযুগান্তরের ফুলে—মেল ভাঙ্গিয়া যাইবে—তোমরা পৃথিবীর হাড়ী হইয়া পড়িবে।



যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহবাদ।

শৈশবাবধি সকলে যাহা শুনিয়া আসিতেছেন, তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী কোন মত শুনিলে যে অনেকে বিস্ময়ান্বিত হইবেন তাহা কিছুই বিচিত্র নহে বরং সর্ব্বথাই সম্ভব। সেই জন্য অনেকের নিকট এই সন্দেহবাদ বিস্ময়কর হইলে হইতে পারে।

আমরা কোন শাস্ত্র ঈশ্বরপ্রেরিত (Revelation) বলিয়া বিশ্বাস করি না, কেবল যুক্তির দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে যত দূর স্থির করা যাইতে পারে ও তদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণের মতামত কি তাহাই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পূর্ব্ব পুরুষগণ যাহা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন তাহাই যে বিনা যুক্তিতে অনুসরণ করিতে হইবে এ কথা সঙ্গত নহে। আমরা নিরীশ্বরবাদী নহি; তবে অন্যের ন্যায় অলৌকিক বিশ্বাসের অনুমোদন করি না।

সাধারণতঃ ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও পরম কারুণিক, নিষ্ঠুরতার লেশ মাত্র হীন বলা হইয়া থাকে। ঈশ্বরের উপাসনা না করিলে পাপী হইতে হয়; নরকে যাইতে হয় ইত্যাদি লোকপ্রচলিত চিরাভ্যস্ত উপদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি আছে বলিলেই হয় ত অনেকে আমাদের উপর খড়্গহস্ত হইবেন। তথাপি নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী পাঠকবর্গের হস্তে সমর্পণ করিতেছি। ইহাতে আমাদের স্বকপোলকল্পিত নূতন তত্ত্ব অধিক নাই। সর্ব্বপরিচিত মহাত্মাদের ধীশক্তি সমুদ্ভূত এতৎসম্বন্ধীয় তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া আমরা লিখিতেছি।

আমাদের আলোচ্য মূল বিষয় কয়েকটী এইরূপ নির্দ্দেশ করিলাম।

১ম। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে তন্মধ্যে যেটি আমাদের বিবেচনায়

সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, সেটীর বিষয় সংক্ষেপে বলিব।

২য়। সকল ধর্ম্মের কেন্দ্রীভূত ঈশ্বরের যে সকল গুণ সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহার বিচার করা যাইবে। বর্ত্তমান কালের উন্নত বিজ্ঞান ঐ সকল গুণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দিতে পারে কি না তাহাও দেখিব।

৩য়। ধর্ম্মে বিশ্বাস (Religious faith) দ্বারা মানবমণ্ডলী যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, বিশ্বাস বিনষ্ট হইলে তাহা অন্তর্হিত হইতে পারে কি না? ধর্ম্ম দ্বারা আমরা এখনও যে সকল উপকার পাইতেছি ও ভবিষ্যতে পাইবার আশা করি, তাহা অন্য কোন সহজ সুদৃঢ় উপায় দ্বারা সাধিত হইতে পারে কি না এই দুইটী প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

৪র্থ। এই সকল বিচারের পর আমাদের বিশ্বাস কিরূপ হওয়া উচিত, এবং কার্য্য ক্ষেত্রেই বা কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

প্রথমতঃ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে তাহা বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান-বিরোধী—; সে সকল খণ্ডন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কারণ তাহা কেবল বিরক্তিকর হইবে এবং বিশেষ ফলদায়কও হইবে না; তবে যাহা বিজ্ঞান সম্মত কেবল তাহারই উল্লেখ করিব।

কৌশলময়ী কোন ক্রিয়া দেখিলেই তাহার কর্ত্তাকে বুদ্ধিজীবী বলিয়া উপলব্ধি হয়। জীবদেহে যে সকল অদ্ভুত কৌশল দেখিতে পাওয়া যায় ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে যে একই প্রকার উপায় সংস্থান বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে ইহার একজন বুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন পণ্ডিতবর নিউটন ও লাপলাসের পূর্ব্বে, জড় জগতের অদ্ভুত গতিপ্রণালী দেখিয়া গ্যালিলিও, কেপ্লার প্রভৃতি মহাত্মাগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐ গতিই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কৃত হইবার পর আর তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইল না; তখন ঈশ্বর যে জড় জগতের গতিতে হস্তক্ষেপ করেন না ইহাই সকলের উপলব্ধি হইল। তদ্রূপ যদি জীবদেহের কৌশল সমুদায় ও কোন কালে অন্ধ জড় নিয়মের ফল বলিয়া স্থিরীকৃত হয় তাহা হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত প্রমাণ বিচলিত হইবে; কিন্তু, তাহার সম্ভাবনা হইয়াছে। যে Evolution theory এক্ষণে বিলাতে কতকগুলি মহামহোপাধ্যায় দার্শনিকদের মন আকৃষ্ট করিয়াছে তাহা যাঁহারা বিশেষ অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে প্রকৃতির সঙ্কোচন ও প্রসারণ নিয়মের ফল জীবদেহের সমুদয় কৌশল।

দ্বিতীয়তঃ। ঈশ্বরের গুণসম্বন্ধে সাধারণতঃ এই বিশ্বাস যে, সর্ব্বশক্তিমত্বা সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বমঙ্গলময়তা এ তিনটী গুণ না থাকিলে ঈশ্বর ঈশ্বরই নহেন, কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

প্রথম সর্ব্বশক্তিমত্বা, সর্ব্বজ্ঞতা এবং সর্ব্বমঙ্গলময়তা এই তিনটী শব্দের যথার্থ এবং পূর্ণ অর্থ, বোধ হয়, সকলেই বিদিত আছেন, তবে শর্ব্বশক্তিমত্বা শব্দটী আমরা কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

যদি কোন শক্তিসমগ্র মানব জাতির শক্তি সমষ্টির কোটী কোটী গুণ হয় তাহা হইলেই যে সেই শক্তিকে অসীম বলিতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই, যাহাকে অসীম ক্ষমতা বলা যায় তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সে ক্ষমতার সম্মুখে কোন বিঘ্নই বিঘ্ন বলিয়া গণ্য হইবে না। যতই অধিক হউক না কেন যে শক্তি বিঘ্ন ব্যাঘাতের অধীন, তাহাকে কখন অসীম বলিব না। বলা বাহুল্য যে আমরা সর্ব্বশক্তি ও অসীম শক্তি এক অর্থে প্রয়োগ করিতেছি ও এই প্রবন্ধের অন্যান্য স্থানেও সেই রূপ করিব।

প্রথমেই বলা যাইতে পারে যে সর্ব্বশক্তিমান্ ইচ্ছাময় পুরুষের কোন কৌশল অবলম্বন করার আবশ্যক নাই। যাহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ তাহারাই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে ও তাহাদের কৌশলময় কার্য্যের কোন কোন অংশ জটিল ও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। মনুষ্যের কৌশলের জটিলতার কারণ তাহাদের অল্প জ্ঞান ও অল্প বুদ্ধি। ঈশ্বরের কৌশলময়ী সৃষ্টিতেও অসম্পূর্ণতা ও জটিলতা দৃষ্ট হয় এইজন্য তাঁহার ঐ গুণত্রয় তাঁহাতে যে যুগপৎ অবস্থিত ইহা স্বীকার করিতে আমরা যে কেন প্রস্তুত নহি তাহা দেখাইতেছি।

মনুষ্যদেহের অংশ সকল যে যে কার্য্য সাধন করিবার অভিপ্রায়ে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা সেই সেই কার্য্য করে ইহা স্বীকার করিলাম। কিন্তু তৎকার্য্যকারিতা সর্ব্বতোভাবে অসম্পূর্ণতা, দোষবিহীন, বা জটিলতা বিরহিত কি না তাহা দেখুন। কে না স্বীকার করিবে যে "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং ?" অল্প কারণেই শরীরস্থ যন্ত্র সকলের বিশৃঙ্খলা হইয়া থাকে। অতএব এই কৌশলময় যন্ত্র একবারে সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ নহে। ইচ্ছাময়, মঙ্গলময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর মনে করিলে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায়ে অল্প কৌশল অবলম্বন করিয়া, বা একবারে কৌশলবিবর্জ্জিত করিয়া, উৎকৃষ্ট এরূপ মানবদেহ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, যে তাহা ব্যাধিমন্দির হইত না, এত ক্ষণভঙ্গুরও হইত না। যদি কেহ বলেন ঈশ্বর এরূপ কেন করিয়াছেন, ওরূপ কেন করেন নাই, তাহা আমাদের আলোচনা করিবার অধিকার নাই; যাহ

করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার মহিমা, করুণা, ক্ষমতা সকলই জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে আমরা বলি যে, অবশ্য ঈশ্বর তাঁহার যতদূর মহিমা, করুণা, ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন তাহা করিয়াছেন ও তাঁহার ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তবে সকল বিঘ্ন ব্যাঘাত তিনি অতিক্রম করিতে পারেন না, তন্নিবন্ধন বিঘ্ন বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এই রূপ অসম্পূর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার প্রভূত শক্তিমত্তা প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রকাশ পাইতেছে না, তাঁহার শক্তি সীমিত। তাঁহার করুণা অসীম হইলেও তিনি তাঁহার শক্তির অধিক কিছুই করিতে পারেন নাই। যতদূর চেষ্টা করিতে হয় করিয়াছেন ও যতদূর পারেন ততদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ততদূর পর্য্যন্ত তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছা প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহার মহিমা ব্যাপ্ত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত তিনি আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র! কিন্তু তিনি সর্ব্বশক্তিমান নহেন।

যদি ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিতে হইবে। কিম্বা যদি তাঁহাকে নিষ্ঠুরতার লেশ মাত্র হীন বলিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলা যাইতে পারে না।

যাঁহারা বলেন যে ঈশ্বর তাঁহার বিদ্যমানত্বের চিহ্ন চারি দিকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন ও তদভিপ্রায়েই কৌশল সমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের কি ইহা চিন্তা করিবার বিষয়ীভূত হইতে পারে না যে, যে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁহার পক্ষে এই অকিঞ্চিৎকর স্বার্থের জন্য এত কৌশল প্রদর্শন করিয়া জীবগণকে এত কষ্ট দিবেন না? যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি যদি তাঁহার নিজের অস্তিত্বের চিহ্ন দেখাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা অন্য কোন সহজ উপায়েই করিতে পারিতেন। কিন্তু যদি আমরা তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লই তাহা হইলে আর তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিতে হয় না, এবং তাঁহার সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া ইহাই অধিক সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবগণকে কষ্ট দিতে উৎসুক নন, তবে যে জীবগণ কষ্ট পায় সে কেবল তাঁহার সৃষ্টিকৌশলের অসম্পূর্ণতা হেতু জীবগণকে যন্ত্রণা দিবার জন্য তাহাদের শরীরের মধ্যে কোন বিশেষ কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে এমত দৃষ্ট হয় না; তবে তাহারা যে যন্ত্রণা ভোগ করে সে সকল কেবল তাহাদিগকে অধিক যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিবারনিমিত্ত, কিম্বা তাহাদের সাচ্ছন্দ্য বিধানার্থ সৃষ্ট কোন শরীরাংশের অসম্পন্নতা নিমিত্ত। একথা শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে।

ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান না বলিলে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিতে কোন বিশেষ আপত্তি নাই, তবে সর্ব্বজ্ঞ বলিলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে

যে তিনি জানিয়া শুনিয়া এরূপ অসম্পূর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না, কারণ তাহা হইলে আমাদের তাঁহাকে একপ্রকারে নিষ্ঠুর বলা হয়, অথচ আমরা অন্যান্য বিষয়ে ও বিশেষতঃ জীবদেহ নির্ম্মাণ কৌশলে দেখিতে পাইতেছি যে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক নিষ্ঠুরতা করেন নাই। যদি কেহ বলেন যে তিনি নিষ্ঠুর নহেন কেবল ক্রমশঃ উন্নতি করিবার নিমিত্ত জানিয়াও অসম্পূর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা এই উত্তর দিই যে, তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সৃষ্টি করিতে জানেন না, শিখিবেন বলিয়া চেষ্টা করিতেছেন সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেন না।

ফলতঃ যদি ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান হন এবং জড় জগৎ ও অন্তর্জগৎ যদি তাঁহারই সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এই দুই জগতের যেখানে যে অসম্পূর্ণতা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানকৃত ও স্বেচ্ছাসম্মত কার্য্য। যাঁহারা বলেন যে মনুষ্যের সুখ দুঃখ তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছার (Free will) ফল, তাঁহাদিগকে আমরা বলি যে সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর দত্ত স্বাধীনইচ্ছার ফল স্থানে স্থানে যেমন সুখকর হইয়া থাকে তেমনি আবার স্থানে স্থানে বিষময়ও হইয়া থাকে; ইহা জানিয়াও কেন মনুষ্যকে স্বাধীন ইচ্ছা দেওয়া হইয়াছে?

তৃতীয়তঃ। ধর্ম্মে বিশ্বাসের কথা। ধর্ম্মে বিশ্বাস বলিলে, সাধারণতঃ লোকে সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও পরম কারুনিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনশ্বরত্ব, পরলোকের অস্তিত্ব ও ইহ লোকের কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ এই কয়েকটি বিষয়ে বিশ্বাস বুঝিয়া থাকেন। আমরাও সেই অর্থেই "ধর্ম্মে বিশ্বাস" পদটি ব্যবহার করিব। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে ধর্ম্মে বিশ্বাসের দ্বারা মনুষ্যজাতির কি উপকার হইয়াছে, হইতেছে ও হইতে পারে।

মনুষ্যের স্বার্থসাধন প্রবৃত্তি (Selfishness) অতীব বলবতী। কিন্তু মনুষ্যের শক্তি যেরূপ অল্প ও নৈসর্গিক নিয়ম সমুদয় যেরূপ অপরিবর্ত্তনীয় তাহাতে স্বতন্ত্র হইয়া নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিলে একজন বহুকাল পরিশ্রম করিয়াও অধুনাতন সুখ সাচ্ছন্দ্য ও জ্ঞানের শতাংশের এক অংশও লাভ করিতে পারিত না, সুতরাং দলবদ্ধ হইয়া সকলের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করাই নিজ উন্নতির প্রধান উপায়; কিন্তু সমাজের আদিম অবস্থায় লোকে ইহার কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারে নাই; সমাজের ক্রমোন্নতি সহকারে অল্প দিন হইল মনুষ্য এই উপায় বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে; ইহার পূর্ব্বে ধর্ম্মই সকল মনুষ্যকে এক ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া একত্রে রাখিয়া প্রকারান্তরে সমাজ সৃজন করিয়াছে।

যে সকল পণ্ডিতেরা কেবল প্রয়োজন বলিয়া ধর্ম্মপক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে, ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকিলে লোকে নীতিঅনুযায়ীক কার্য্য-করার আবশ্যকতা বোধ করিতে পারে না। তাঁহাদের মতে পরলোকে পুরস্কার তিরস্কারের ভয় না থাকিলে লোকে যথেচ্ছাচারী হইবে, সমাজবন্ধন এক বারে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাঁহাদিগকে আমরা এই উত্তর দিই যে যদি লোকে বুঝিতে পারে যে নীতির প্রয়োজনীয়তার ভিত্তি পরলোকে পুরস্কার তিরস্কারের উপর স্থাপিত নহে, তদপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী ও অধিক প্রয়োজনীয় সমাজ বন্ধনে সংস্থাপিত, তাহা হইলে ধর্ম্মে বিশ্বাস বিনষ্ট হইলেও নীতির ভিত্তি বিচলিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই, ও মনুষ্যজাতির উন্নতির পথে কাঁটা পড়িবারও কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

পরলোকের ভয়ই মনুষ্যকে পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত রাখে সত্য। কিন্তু পরলোকের ভয় অপেক্ষা লোকনিন্দার ভয় অধিক কার্য্যকারী। আমরা দেখিতে পাই যে লোকে প্রকাশ্যে সাধারণ সমীপে মিথ্যা কথা কহিতে যে পরিমাণে ভীত ও কুণ্ঠিত হয়, অন্যত্র ও সাধারণতঃ কথাবার্ত্তায় তত পরিমাণে সঙ্কুচিত হয় না, কিন্তু ধর্ম্ম মিথ্যা মাত্রকেই পাপ বলিয়া পরিগণিত করে। আরও আমরা দেখি যে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষে ব্যভিচার সমভাবে ধর্ম্মনিষিদ্ধ কিন্তু সমাজ ব্যভিচারিণীকে যেরূপ ঘৃণা করে ও যত দণ্ড দেয় ব্যভিচারীকে তাহার শতাংশের একাংশও দণ্ডার্হ বিবেচনা করে না। ইহার ফলস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে ব্যভিচারিণী হইতে স্ত্রীলোক যেরূপ ভীত, ব্যভিচারী হইতে পুরুষ কখনই ততদূর ভীত নয়, সুতরাং ব্যভিচার করণে ভয় যতদূর লোকনিন্দাভীতি হইতে সমুদ্ভূত হয় ধর্ম্মোপদেশ বা পরলোকে নরকযন্ত্রণার ভয় হইতে ততদূর উৎপন্ন নহে।

এদিকে পরলোকে পুরস্কারের আশা অপেক্ষা ইহ জগতে যশোলাভের আশা মনুষ্যকে সৎকার্য্যে উত্তেজিত করিয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ করিলে যে ফল লাভ হইবে অবস্থানুরূপে অল্পব্যয়ে ঐ শ্রাদ্ধকার্য্য ভক্তি সহকারে সাধন করিলেও ফল, বরং ভক্তির তারতম্য অনুসারে ফলের ন্যূনাধিক্য হয়; কিন্তু যিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শ্রাদ্ধ করেন তিনিই অধিক যশোভাজন হইয়া থাকেন বলিয়া লোকে অনাবশ্যক ঋণ করিয়া—ঋণ-করণ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ হইলেও ঋণ করিয়া—পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব ব্যয় করে। সুতরাং পরলোকে পু স্কার লাভের আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা ই জগতে যশোপার্জ্জনের ইচ্ছা মনুষ্যকে কার্য্যে অধিক পরিমাণে উত্তেজিত কর

লোকে মনে করে যে মৃত্যু বড় ভ নক, মরিতে হইবে ইহা ভাবিতে আ

দের হৃদয় যে কম্পিত হয়, উন্নতির চেষ্টা যে দূরে যায়, যাহাদিগকে আমরা জীবন অপেক্ষা অধিক ভাল বাসি তাহাদের সহিত পুর্নমিলনের আশা যে থাকে না, এসকলের হেতু ধর্ম্মে ও পরলোকে অবিশ্বাস, ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, চিরকালের নিমিত্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইব এই চিন্তা তত ভয়ানক নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য ও শ্রেষ্ঠ মোক্ষ নির্ব্বাণ, অর্থাৎ জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিনাশ, এই মত এককালে পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক গ্রহণ করিয়াছিল। যদি নির্ব্বাণচিন্তা এত ভয়ানক হইত তাহা হইলে যে ধর্ম্মে নির্ব্বাণই মোক্ষ সে ধর্ম্ম কখনই এত লোকে গ্রহণ করিত না।

ধর্ম্ম এবং কাব্য (poetry) এই দুইটীতে অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয়েই আমাদের সম্মুখে উচ্চ আদর্শধারণ করে, উভয়েই আমাদিগকে অনেক অসীম সুখের আশা প্রদান করে, এই শোকসঙ্কুল, হাহাকাররবপূর্ণ, অন্যায়াচরণ বিধ্বস্ত জগতে যদি লোকের পরকালে সুখভোগের আশা না থাকিত তাহা হইলে দুঃখ প্রপীড়িত জনগণ দিনান্তে বহুশ্রমার্জ্জিত কদন্ন মুষ্টিও উদরস্থ করিতে পারিত না। কাব্যরসাস্বাদন ও ধর্ম্মভাব কেবল মনুষ্যের মনে নানা কাল্পনিক সুখ ও আশ্বাস প্রদান করিয়া কথঞ্চিৎ তাহাদিগকে জীবনভার বহন করিতে সক্ষম করিয়াছে; তবে কাব্য ও ধর্ম্মে বিভিন্নতা এই যে, কাব্যের কল্পনাতে আমরা আনন্দ অনুভব করি বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের কিছু বিশ্বাস থাকে না; কিন্তু ধর্ম্মে আমাদিগকে যে সকল ভাবী সুখের আশ্বাস প্রদান করে তাহাতে আমাদের বিশ্বাস থাকে। যদিও এই সকল বিশ্বাস আপাততঃ সুখদায়ক তথাপি এসকল বিশ্বাস কতদূর যুক্তিমূলক তাহাও আমাদের চিন্তা করা উচিত। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় যে রূপ অন্যায়াচরণ হইয়া থাকে ও সাধারণতঃ লোকের যেরূপ কষ্ট তাহাতে পারলৌকিক সুখে বিশ্বাস করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু আমরা আশা করিলে করিতে পারি যে, সময়ে জ্ঞানের উন্নতির সহিত মনুষ্যের ইহলৌকিক সুখসমষ্টি এত বর্দ্ধিত হইবে ও দুঃখভার এত হ্রাস হইবে যে তখন আর বিশ্বাসের অত্যল্পই প্রয়োজন থাকিবে। এবং সমগ্র মানবজাতির সেই জ্ঞানোন্নতি, এবং তাহা হইতে শক্তি ও সুখবৃদ্ধির ও দুঃখনিবারণের আশাকেই আমরা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত করিতে পারি। অনেকেই বলিবেন যে এই নশ্বর মনুষ্যজীবনের সুখের আশা রূপ ধর্ম্ম কি অবিনশ্বর আত্মার চিরন্তন সুখের আশারূপ ধর্ম্মের সহিত তুলিত হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই বলিতে পারি যে যদিও একজন মনুষ্যের জীবন ক্ষণস্থায়ী তাহা বলিয়া সমগ্র মানবজাতির জীবন ক্ষণস্থায়ী নহে, এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির সুখের উন্নতির চেষ্টাও সামান্য বিষয় নহে। ফলতঃ

কম্‌টনামক ফরাশীদেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিকের মতে সমগ্র মনুষ্যজাতির সুখের উন্নতিচেষ্টাই মনুষ্যজাতির প্রধান ও একমাত্র ধর্ম্ম হওয়া উচিত। এই ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত তিনি অনেকের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। এই ধর্ম্মের দোষগুণসম্বন্ধে আমরা এক্ষণে অধিক কিছু বলিব না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সমাজবন্ধন, লোকদিগকে পাপ হইতে নিবৃত্ত রাখা, পরস্পরের উপকার করা ও অপকারী ক্রিয়া হইতে বিরত রাখা প্রভৃতি যে সকল কার্য্য, পরলোকে তিরস্কার ভয় ও পুরস্কার লোভ ইত্যাদির দ্বারা ঐশ্বরিক ধর্ম্ম, সংসাধন করে, সেই সকল কার্য্য লইয়া এই ধর্ম্ম, অধিকন্তু এ ধর্ম্ম ঐশ্বরিক ধর্ম্ম অপেক্ষা অধিক যুক্তিযুক্ত; ইহার আরও একটী গুণ এই যে ঐশ্বরিক ধর্ম্মে স্বার্থ চিন্তা যতদূর নিকটবর্ত্তী ইহাতে ততদূর নহে। ঐশ্বরিক ধর্ম্মে পরলোকে সুখলাভের অভিলাষই মনুষ্যকে পুণ্যকার্য্যে উত্তেজিত করে, কিন্তু এধর্ম্মের মতে যদিও নিজের উন্নতির নিমিত্তই সমগ্র মানবজাতির উন্নতি চেষ্টা বিহিত তথাপি সমুদয় মানবজাতির উন্নতিচেষ্টাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং আমরা যখন ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলিতে প্রস্তুত নহি অথচ ইহাও জানি যে আমাদের সুখবৃদ্ধি হওয়াই তাঁহার ইচ্ছা তখন তাঁহার সেই ইচ্ছা সফল করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার প্রধান উপায়। কেহ বলিতে পারেন যে, আমাদের মত ক্ষুদ্রপ্রাণী কেমন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবে? তদুত্তরে বলি যে সমগ্র মনুষ্যজাতি একত্র হইয়া চেষ্টা করিলে, ও উন্নতিই তাহাদের লক্ষ্য হইলে, তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবার যে অনেক সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ধর্ম্মের বিপক্ষে কেহ কেহ এই মাত্র বলিতে পারেন, যে আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস না থাকায় আত্মীয়জনের সহিত পুনর্মিলনের কোন আশা থাকে না, সুতরাং তদুত্তরে এই চিন্তা আমাদের কষ্টকর হয়। আমরা বলি যে এই ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে হইলে আত্মাকে যে নশ্বর বলিতেই হইবে এমত কোন কারণ নাই। আমরা দেখিতে পাই যে, প্রকৃতির নিয়মই এই যে, নিকৃষ্ট প্রকৃতির দ্রব্য হইতে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট প্রকৃতির দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়। জড় পদার্থ হইতে রসগ্রহণ করিয়া সজীব উদ্ভিদ্ বর্দ্ধিত হয়, আবার উদ্ভিজ্জ-রস গ্রহণ করিয়া সচেতন জীবদেহ পুষ্ট হয় এবং সেই জীবরাজ্যের শ্রেষ্ঠ মনুষ্য; সুতরাং ইহা আমরা ভাবিতে পারি যে মনুষ্যের আত্মা এই সকল অপেক্ষা অধিক সম্পূর্ণ ও নির্দ্দোষ। এবং ইহাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে মনুষ্যের আত্মা অবিনশ্বর নহে। আমরা যাহা লিখিলাম তাহা যদিও আত্মার অবিনশ্বরত্বের প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না এবং সেই কারণে আমাদের আত্মার

অনীশ্বরত্বে বিশ্বাসোৎপাদক হইতে পারে না; তথাপি আমরা আত্মার অবিনশ্বরত্বের আশা করিতে পারি। ইহাও ভাবিতে পারি যে যদিও ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন তথাপি যিনি ক্ষমতাবলে আমাদিগের এই সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়াছেন তিনি আমাদের সুখের নিমিত্ত হয় ত আত্মাকে অবিনশ্বর করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অতএব ঐশ্বরিক ধর্ম্মে বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এধর্ম্ম গ্রহণ করিলে যে আত্মাকে নশ্বর বলিতেই হইবে তাহা নহে। প্রত্যুত, যদিও আত্মাকে অবিনশ্বর বলিবার আমাদের কোন বিশেষ প্রমাণ নাই, নশ্বর বলিবারও কোন প্রমাণ নাই, বরং অবিনশ্বরত্বের কিঞ্চিৎ আশা আছে।

এখন আমরা এমন সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, এককালে সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ও নিষ্ঠুরতার লেশমাত্রহীন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বর্ত্তমানকালের বিজ্ঞান কোন প্রমাণ দিতে পারে না, কিন্তু অসীম ক্ষমতাশালী বহুজ্ঞানসম্পন্ন দয়ালু এক ঈশ্বর আছেন, ইহার প্রমাণ কথঞ্চিৎ পাওয়া যায়। এরূপ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা দ্বারা কোন ফল লাভ করিবার আশা করা যাইতে পারে না; কারণ তিনি অপরিবর্ত্তনীয় নৈসর্গিক নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, অথবা হয় ত, তিনিও ঐ সকল নিয়মের অধীন, সুতরাং সমস্ত জগতবাসী সমস্বরে এক বিন্দু বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিলে তিনি নৈসর্গিক নিয়ম সকল ভঙ্গ করিয়া প্রার্থয়িতৃগণের মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন না: কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রকৃতির কোন কার্য্যই নিয়মবহির্ভূত নহে। মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, সমুদ্র হইতে সূর্য্য কর্ত্তৃক বাষ্প উত্থাপিত না হইলে মেঘ হয় না, আবার সেই মেঘ শীতল না হইলে বৃষ্টি হয় না। অকস্মাৎ একটি পরমাণুও সৃষ্টি করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। উপাসনা অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই, কিন্তু আমাদের মতে মিথ্যা বাক্যব্যয় করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপেক্ষা কার্য্যের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। এবং যখন আমাদের সুখসমৃদ্ধি তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, তখন তাঁহার সেই উদ্দেশ্যসাধনার্থ জীবগণের উপকার ও উন্নতির চেষ্টা করা প্রকৃত কৃতজ্ঞতার কার্য্য। সুতরাং জীবগণের উপকার ও তাহাদের ক্লেশ নিবারণের ও উন্নতির চেষ্টা করাই আমাদের মতে প্রধান ধর্ম্ম।

যদিও পরলোকের কিয়ৎপরিমাণে আশা করি তথাপি আমরা ইহা বলিতে পারি না যে পরলোক পাপপুণ্যের তিরস্কার পুরস্কারের স্থান; কারণ, সে কথা বলিবার কোন প্রমাণ নাই, বরঞ্চ তাহার বিরুদ্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, নৈসর্গিক নিয়মভঙ্গের ফল এই স্থানেই আমরা ভোগ করি; ধর্ম্মের

নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পরের অনিষ্ট করিলে এই ধর্ম্মের (Religion of Humanity) মতে প্রত্যক্ষভাবে সমাজের ও পরোক্ষভাবে নিজের অনিষ্ট ঘটে। ইহা সমধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে যদি পরলোক থাকে, তথায়ও নিয়মানুসারে ও নিজ নিজ কার্য্যানুসারে আমাদের ফলভোগ হইবে, আর এখানকার অধিকাংশ সুখদুঃখ শরীরধারণজনিত, সুতরাং যে লোকে এই শরীর সঙ্গে যাইবে না সে লোকে এখানকার সুখদুঃখ ভোগ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই, তবে যদি নূতনপ্রকারের সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা যে আবার তথায় নূতন কার্য্যক্ষেত্রে নূতন কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিব না তাহারই বা প্রমাণ কি? ইহাও ভাবিতে পারি না যে, যে ঈশ্বরকে পরমকারুণিক, নিষ্ঠুরতার লেশমাত্রহীন বলিতেছি, আবার তাঁহাকেই নরকের সৃষ্টিকর্ত্তা মনে করিতে হইলে আমাদের বিচারশক্তিকে অতলস্পর্শ সাগরে অগ্রে নিমগ্ন করিতে হয়; যে পুরুষ নরক সৃষ্টি করিতে পারেন, আমরা তাহা অপেক্ষা নিষ্ঠুর লোক এ জগতে দেখিতে পাই না। অতএব আমরা আমাদের ঈশ্বরকে নরকের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পরলোককে পুরস্কার তিরস্কারের স্থান বলিতে প্রস্তুত নহি। আমাদের মতে সুখোৎপাদন ও দুঃখোৎপাদন এই দুইটি পাপপুণ্যের পরিমাপক নিজের স্বার্থের জন্য অর্থাৎ পরলোকে দুঃখনিবারণ ও সুখভোগ করিবার জন্য আমরা পুণ্যকার্য্যে রত ও পাপ হইতে বিরত হইতে বলি না। তবে পাপ হইতে বিরত ও পুণ্যকার্য্যানুষ্ঠানে রত হইবার প্রয়োজন এই যে, তদ্দ্বারা সমাজের উপকার হইতে থাকিবে এবং তজ্জন্যই আমরা নিজেও অবশ্য উপকৃত হইতে থাকিব।

শ্রী অঃ



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জীবানন্দ কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেলে পর, শান্তিদেবী আবার সারঙ্গ লইয়া মৃদু মৃদু রবে গীত করিতে লাগিলেন।

"প্রলয় পয়োধিজলে, ধৃতবানসি বেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্র মখেদং
কেশব ধৃত মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে।"

গোস্বামী বিরচিত মধুর স্তোত্র যখন শান্তিদেবী কণ্ঠ নিঃসৃত হইয়া রাগ তাল লয় সম্পূর্ণ হইয়া সেই অনন্ত কাননের অনন্ত নীরব বিদীর্ণ করিয়া, পূর্ণ জলোচ্ছ্বাসের সময়ে বসন্তানিল-তাড়িত তরঙ্গ ভঙ্গের ন্যায় মধুর হইয়া আসিল, তখন তিনি গায়িলেন।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর
জয় জগদীশ হরে।

তখন বাহির হইতে কে অতি গম্ভীর রবে গায়িল, গম্ভীর মেঘ গর্জ্জনবৎ তানে গায়িল,

ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতু মিব কিমপি করালং
কেশব ধৃত কল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

শান্তি গলা চিনিল, বলিল "রহ্ পোড়াকপালীর ছেলে! বুড়ো বয়সে তুমি মেয়েমানুষের সঙ্গে গায়িতে এসো!" এই বলিয়া শান্তি সারঙ্গের তারগুলি আর একটু চড়াইয়া লইয়া, কণ্ঠ আর একটু উচুকে তুলিয়া দিয়া, গায়িল

বেদানুদ্ধরতে, জগন্তি বহতে,
ভূগোলমুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে, বলিং ছলয়তে
ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে,
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে
কারুণ্যমাতন্বতে।
ম্লেচ্ছান্মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে
কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।

বলিতে বলিতে সে দীর্ঘ তাল সেই উচ্চৈঃরব সে গগন বিদারক তান ছাড়িয়া দিয়া শান্তি গায়িল

শ্রিত কমলা. কুচমণ্ডল
ধৃত কুণ্ডল কলিত ললিত বনমাল
জয় জয় দেব হরে।"

বাহির হইতে যে সঙ্গে গায়িতেছিল সে আর সহ্য করিতে পারিল না। শ্বেত শ্মশ্রু, শ্বেত কান্তি, শ্বেত বসন, শ্বেত পুষ্পাভরণ লইয়া আসিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল,—বলিল "মা গাও, তোমা হইতে সনাতন ধর্ম্ম উদ্ধার হইবে, গাও" বলিয়া আপনি গাইল,

দিনমণিমণ্ডন, ভবখণ্ডন
মুনিজন মানস হংস—

শান্তি ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া সত্যানন্দের পদধূলি গ্রহণ করিল, বলিল "প্রভো! আমি এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে, আপনার শ্রীপাদপদ্ম এখানে দর্শন পাই—আজ্ঞা করুন আমাকে কি করিতে হইবে" বলিয়া সারঙ্গে সুর দিয়া শান্তি আবার গায়িল

"তব চরণ প্রণতাবয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু।"

সত্যানন্দ বলিল "মা তোমার কুশলই হইবে।"

শান্তি। "কিসে ঠাকুর—তোমার তো আজ্ঞা আছে আমার বৈধব্য"

সত্যা। "তোমাকে আমি চিনিতাম না, চিনিলে আমি বলিতাম হে জীবানন্দ! আমার নিকট শপথ কর যে তুমি পত্নীসহবাস ত্যাগ করিবে না। মা আমার এক ভিক্ষা আছে, তুমি স্ত্রীবেশ আর গ্রহণ করিও না। সন্তান বেশ গ্রহণ করিয়া অসি চর্ম্ম বল্লম গ্রহণ পূর্ব্বক সন্তানসেনা মধ্যে প্রবেশ কর।"

শান্তি। "প্রভো এ আজ্ঞা আমায় কেন করেন? আপনার আজ্ঞায় শিবের শত্রু জয় করিয়াছি, বিষ্ণুর শত্রুও জয় করিতে হইবে? বলিয়া শান্তি গায়িল,

"মধুমুর নরক বিনাশন—
গরুড়াসন সুরকুল কেলি নিদান
অমল কমলদল লোচন
ভব মোচন ত্রিভুবন ভবনিধান
জয় জয় দেব হরে।"

বাবা! আপনি চুপ করিয়া রহিয়াছেন কেন, দেখিতেছেন না কি কাণ্ড হইতেছে?

সত্যা। কি কাণ্ড হইতেছে?

শান্তি। আপনি কি জানেন না?

সত্যা। সকল জানি না।

শান্তি। তবে আমি কাল বলিব। কিন্তু একটা কথা আমার জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা আছে—আমার স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণ আমি। মৃত্যুদণ্ড তাঁহার কপালে বিধান। তিনি ধর্ম্মে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাকে মরিতে হইবে। সুতরাং আমাকেও মরিতে হইবে। কিন্তু আপনার কার্য্য উদ্ধার হইবে কি? কে কার্য্যোদ্ধার করিবে?"

সত্যা। মা দড়ীর জোর না বুঝিয়া আমি জেয়াদা টানিয়াছি, তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী; ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে আমি সকল জানি। তোমার প্রলোভনে তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারেন। এতদিন করিতেছেন। তাহা হইলে আমার কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে।"

সেই বিশাল নীল উৎফুল্ল লোচনে নিদাঘ কাদম্বিনী বিরাজিত বিদ্যুতুল্য ঘোর রোষ কটাক্ষ হইল। শান্তি বলিল "কি ঠাকুর! আমি আর আমার স্বামী এক আত্মা, যাহা যাহা তোমার সঙ্গে কথোপকথন হইল সবই বলিব। মরিতে

হয় তিনি মরিবেন, আমার ক্ষতি কি? আমি তো সঙ্গে সঙ্গে মরিব। তাঁর স্বর্গ আছে, মনে কর কি আমার স্বর্গ নাই।

ব্রহ্মচারী বলিল যে "আমি কখন হারি নাই, আজ তোমার কাছে হারিলাম। মা আমি তোমার পুত্র, সন্তানকে স্নেহ কর, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা কর, আপনার প্রাণ রক্ষা কর, আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে।"

বিজলী হাসিল। শান্তি বলিল "আমার স্বামীর ধর্ম্ম আমার স্বামীর হাতে; আমি তাঁহাকে ধর্ম্ম হইতে বিরত করিবার কে? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা কিন্তু পরলোকে সবারই ধর্ম্ম দেবতা— আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম বড়, তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম্ম বড়। আমার ধর্ম্মে আমি যেদিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে পারি; আমার স্বামীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব? মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না।"

ব্রহ্মচারী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "মা মনের কথা সকল তোমায় বলি, জীবানন্দ বল, ভবানন্দ বল, মহানন্দ বল, যে কেহ বল আমার মনের কথা বুঝিবার যোগ্য তুমি ভিন্ন কেহ নহে। এ ঘোর ব্রতে বলিদান আছে। আমাদের সকলকেই বলি পড়িতে হইবে। আমি মরিব জীবানন্দ ভবানন্দ সবাই মরিবে, বোধ হয় মা তুমিও মরিবে; কিন্তু দেখ কাজ করিয়া মরিতে হইবে, বিনা কার্য্যে কি মরা ভাল— আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি আর কাহাকেও মা বলি নাই, কেন না সেই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক। তোমাকে কেবল মা বলিলাম, তুমি মা হইয়া সন্তানের কাজ কর যাহাতে সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হয় তাহা করিও, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা করিও, তোমার প্রাণ রক্ষা করিও।"

এই বলিয়া সত্যানন্দ "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" গায়িতে গায়িতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ক্রমে সন্তানসম্প্রদায় মধ্যে সম্বাদ প্রচারিত হইল যে সত্যানন্দ আসিয়াছেন, সন্তানদিগের সঙ্গে কি কথা কহিবেন, এই বলিয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন দলে দলে সন্তান সম্প্রদায় অজয়তীরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। জ্যোৎস্না রাত্রিতে অজয়সৈকত পার্শ্বে বৃহৎ কানন মধ্যে আম্র, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, অশ্বত্থ, বেল, বট, শাল্মলী প্রভৃতি বৃক্ষাদি রঞ্জিত মহা গহনে দশ সহস্র সশস্ত্র সন্তান সমবেত হইল। তখন সকলেই পরস্পরের মুখে সত্যানন্দের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহা কোলাহলধ্বনি করিতে লাগিল। সত্যানন্দ কি জন্য কোথায়

গিয়াছিলেন, তাহা সাধারণে জানিত না। প্রবাদ এই যে তিনি সন্তানদিগের মঙ্গলকামনায় তপস্যার্থ হিমালয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন। আজ সকলে কানাকানি করিতে লাগিল "মহারাজের তপঃসিদ্ধি হইয়াছে—আমাদের রাজ্য হইবে।" তখন বড় কোলাহল হইতে লাগিল। কেহ চীৎকার করিতে লাগিল "মার মার নেড়ে মার" কেহ বলিল "জয় জয় মহারাজ কি জয়" কেহ গায়িল "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" কেহ গায়িল "বন্দে মাতরং" কেহ বলে ভাই এমন দিন কি হইবে তুচ্ছ বাঙ্গালি হইয়া রণক্ষেত্রে এ শরীর পাত করিব? কেহ বলে ভাই এমন দিন কি হইবে মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িব? কেহ বলে ভাই এমন দিন কি হইবে আপনার ধন আপনি খাইব? সহস্র নরকণ্ঠের কলকল রব, মধুর বায়ু সন্তাড়িত বৃক্ষপত্ররাশির মর্ম্মররব, সৈকতবাহিনী তরঙ্গিণীর মৃদু মৃদু তর তর রব, নীল আকাশে চন্দ্র তারা শ্বেত মেঘরাশি, শ্যামল ধরণীতলে হরিৎ কানন, নীল নদী, শ্বেত সৈকত, ফুল্ল কুসুমদাম। আর মধ্যে মধ্যে সেই সর্ব্বজন মনোরম "বন্দে মাতরং।" তখন সত্যানন্দ আসিয়া সেই সমবেত সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেন। তখন সেই সহস্র সহস্র সন্তান মস্তক বৃক্ষবিচ্ছেদ পতিত চন্দ্রকিরণে প্রভাসিত হইয়া শ্যামল তৃণভূমে প্রণত হইল। অতি উচ্চৈঃস্বরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে উভয় বাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন,

"শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী বনমালী বৈকুণ্ঠনাথ যিনি কেশিমথন মধুমুর মর্দ্দন লোকপালন তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন, তিনি তোমাদের বাহুতে বল দিন, মনে ভক্তি দিন, ধর্ম্মে মতি দিন, তোমরা একবার তাঁহার মহিমা গীত কর। তখন সেই সহস্র কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গীত হইতে লাগিল

"জয় জগদীশ হরে
প্রলয় পয়োধি জলে ধৃত বানসি বেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্র মখেদং
কেশব ধৃত মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে।"

তখন সত্যানন্দ তাহাদিগকে পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "হে সন্তানগণ, তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে। টমাসনামা এক জন বিধর্ম্মী দুরাত্মা বহুতর সন্তান নষ্ট করিয়াছে। আজ রাত্রে আমরা তাহাকে সসৈন্যে বধ করিব। জগদীশ্বরের আজ্ঞা—তোমরা কি বল?"

ভীষণ হরিধ্বনিতে কানন বিদীর্ণ করিল। "এখনই মারিব—কোথায় তারা দেখাইয়ে দিবে চল" "মার! মার! শত্রু মার!" ইত্যাদি শব্দে দূরস্থ শৈলে প্রতিধ্বনিত হইল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "সে জন্য আমাদিগকে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। ইংরেজের কামান আছে—কামান ব্যতীত ইংরেজের সঙ্গে জয় সম্ভবে না। বিশেষ

বড় বীরজাতি। পদচিহ্নের দুর্গ হইতে ১৭টা কামান আসিতেছে—কামান পৌঁছিলে আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব। ঐ দেখ প্রভাত হইতেছে—বেলা চারিদণ্ড হইলেই—ও কিও!

গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্! অকস্মাৎ চারিদিকে বিশাল কাননে তোপের আওয়াজ হইতে লাগিল। তোপ ইংরেজের। জালনিবদ্ধ মীনদলবৎ কাপ্তেন টমাস সন্তানসম্প্রদায়কে এই আম্রকাননে ঘেরিয়া বধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

"গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।" ইংরেজের কামান ডাকিল। সেই শব্দ বিশাল কানন কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল, "গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম।" অজয়ের বাঁকে বাঁকে ফিরিয়া সেই ধ্বনি দূরস্থ আকাশপ্রান্ত হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইল। "গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্!" অজয়পারে দূরস্থ কাননান্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ধ্বনি আবার ডাকিতে লাগিল "গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্!" সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখ তোমরা কিসের তোপ। কয়েকজন সন্তান কাননমধ্যে আপনাদের অশ্ব বাঁধিয়া রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া দেখিতে ছুটিল, কিন্তু তাহারা কানন হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর গেলেই শ্রাবণের ধারার ন্যায় গোলা তাহাদের উপর বৃষ্টি হইল, তাহারা অশ্বসহিত আহত হইয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। দূর হইতে সত্যানন্দ তাহা দেখিলেন। বলিলেন "উচ্চ বৃক্ষে উঠ, দেখ কি।" তিনি বলিবার অগ্রেই জীবানন্দ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিতেছিল, সে বৃক্ষের উপরিস্থ শাখা হইতে ডাকিয়া বলিল "তোপ ইংরেজের।" সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "অশ্বারোহী না পদাতি।"

জীব। দুই আছে।

সত্য। কত।

জীব। আন্দাজ করিতে পারিতেছি না, এখনও বনের আড়াল হইতে বাহির হইতেছে।

সত্য। গোরা আছে না কেবল সিপাহী।

জীব। রাঙামুখ আছে।

তখন সত্যানন্দ জীবানন্দকে বলিলেন "তুমি গাছ হইতে নাম।"

জীবানন্দ গাছ হইতে নামিল।

সত্যানন্দ বলিলেন "দশহাজার সন্তান উপস্থিত আছে; কি করিতে পার দেখ। তুমি আজ সেনাপতি।" জীবানন্দ সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উল্লম্ফনে অশ্বে আরোহণ করিলেন। একবার নবীনানন্দ গোস্বামীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া নয়নেঙ্গিতে কি বলিলেন কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। নবীনানন্দ নয়নেঙ্গিতে কি উত্তর করিল তাহাও কেহ বুঝিল না, কেবল তারা দুইজনেই মনে মনে বুঝিল, যে হয় ত এ জন্মের মত এই বিদায়। তখন নবীনানন্দ দক্ষিণ

বাহু উত্তোলন করিয়া সকলকে বলিলেন "ভাই এই সময় গাও 'জয় জগদীশ হরে!'" তখন সেই দশসহস্র সন্তান এককণ্ঠে নদী কানন আকাশ প্রতি-ধ্বনিত করিয়া, তোপের শব্দ ডুবাইয়া দিয়া সহস্র সহস্র বাহু উত্তোলন করিয়া গায়িল,

"জয় জয় জগদীশ হরে
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং—"

এমন সময়ে সেই ইংরেজের গোলা-বৃষ্টি আসিয়া কাননমধ্যে সন্তান সম্প্রদায়ের উপর পড়িতে লাগিল। কেহ গায়িতে গায়িতে ছিন্নমস্তক, ছিন্ন বাহু, ছিন্ন-হৃৎ হইয়া মাটীতে পড়িল, তথাপি কেহ গীত বন্ধ করিল না, সকলে গায়িতে লাগিল "জয় জগদীশ হরে" গীত সমাপ্ত হইলে সকলেই একেবারে নিস্তব্ধ হইল। সেই নিবিড় কানন, সেই নদীসৈকত, সেই অনন্ত বিজন একেবারে গম্ভীর নীরবে নিবিষ্ট হইল, কেবল ইংরেজের সেই অতি ভয়ানক কামানের ধ্বনি আর দূরশ্রুত গোরার সমবেত অস্ত্রের ঝঞ্চনা ও পদধ্বনি।

তখন সত্যানন্দ সেই গম্ভীর নিস্তব্ধ মধ্যে অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "জগদীশ হরি তোমাদিগকে কৃপা করিবেন এই সময় তোমরা তাঁহার কার্য্য কর—তোপ কতদূর?"

উপর হইতে একজন বলিল "এই কাননের অতি নিকট একখানা ছোট মাঠ পার মাত্র।"

সত্যানন্দ বলিল "কে তুমি?"

উপর হইতে উত্তর হইল "আমি নবীনানন্দ।"

তখন সত্যানন্দ বলিলেন "তোমরা দশসহস্র সন্তান আছ, তোমাদেরই জয় হইবে, তোপ কাড়িয়া লও।" তখন অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী জীবানন্দ বলিল "আইস।"

সেই দশসহস্র সন্তান—অশ্ব ও পদাতি, অতিবেগে, জীবানন্দের অনুবর্ত্তী হইল। পদাতির স্কন্ধে বন্দুক, কটীতে তরবারি, হস্তে বল্লম। কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবা মাত্র, সেই অজস্র গোলাবৃষ্টি পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। বহুতর সন্তান বিনা যুদ্ধেই প্রাণত্যাগ করিয়া ভূমিশায়ী হইল। একজন জীবানন্দকে বলিল "জীবানন্দ, অনর্থক প্রাণিহত্যায় কাজ কি।"

জীবানন্দ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল ভবানন্দ—জীবানন্দ উত্তর করিল "কি করিতে বল।"

ভব। বনের ভিতর থাকিয়া বৃক্ষের আশ্রয় হইতে আপনাদিগের প্রাণ রক্ষা করি—তোপের মুখে পরিষ্কার মাঠে বিনা তোপে এ সন্তান সৈন্য এক দণ্ড টেঁকিবে না; কিন্তু ঝোপের ভিতর থাকিয়া অনেকক্ষণ যুদ্ধ করা যাইতে পারিবে।"

জীব। তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন তোপ

কাড়িয়া লইতে হইবে, অতএব আমরা তোপ কাড়িয়া লইতে যাইব।

ভব। কার সাধ্য তোপ কাড়ে। কিন্তু যদি যেতেই হবে, তবে তুমি নিরস্ত হও আমি যাইতেছি।

জীব। তা হইবে না—ভবানন্দ! আজ আমার মরিবার দিন।

ভব। আজ আমার মরিবার দিন।

জীব। আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ভব। তুমি নিষ্পাপ শরীর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমার চিত্ত কলুষিত—আমাকেই মরিতে হইবে—তুমি থাক, আমি যাই!

জীব। ভবানন্দ! তোমার কি পাপ তাহা আমি জানি না। কিন্তু তুমি থাকিলে সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হইবে। আমি যাই।

ভবানন্দ নীরব হইয়া শেষে বলিল "মরিবার প্রয়োজন হয় আজই মরিব, যে দিন মরিবার প্রয়োজন হইবে সেই দিন মরিব, মৃত্যুর পক্ষে আবার কালাকাল কি।"

জীব। তবে এসো।

এই বলিয়া ভবানন্দ সকলের অগ্রবর্ত্তী হইল। তখন দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পড়িয়া সন্তান সৈন্য খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে, ছিঁড়িতেছে, চিরিতেছে, উল্টাইয়া ফেলিয়া দিতেছে, তাহার উপর ইংরেজের বন্দুকওয়ালা সিপাহী সৈন্য অব্যর্থ লক্ষ্যে সারি সারি সন্তানদলকে ভূমে পাড়িয়া ফেলিতেছে। এমন সময়ে ভবানন্দ বলিল "এই তরঙ্গে আজ সন্তানকে ঝাঁপ দিতে হইবে—কে পার ভাই? এই সময়ে গাও বন্দে মাতরং" তখন উচ্চ নিনাদে মেঘমল্লার রাগে সেই সহস্রকণ্ঠ সন্তান সেনা তোপের তালে গায়িল "বন্দে মাতরং"



বঙ্গদেশের পরাধীনতা।

পাঠশালায় ছেলেরা শিখিয়াছে যে, সাতশত বৎসর হইল, বখ্‌তিয়ার খিলিজির সময় হইতে বঙ্গদেশের পরাধীনতা আরম্ভ হইয়াছে। ছেলেদের বয়স হয়, কিন্তু পাঠশালার কুশিক্ষা তাহাদের অন্তরে থাকিয়া যায়; এখনও আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে বঙ্গদেশের পরাধীনতা বহুদিনের। পাঠশালার পুস্তকপ্রণেতা বাহাদুরগণ দীর্ঘায়ু হউন, সি, এস, আই হউন, কিন্তু একবার তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, একবার বুঝিবার চেষ্টা করুন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, বখ্‌তিয়ার খিলিজির সময়ে বাঙ্গালা পরাধীন হয় নাই; কোন মুসলমানের সময়ে বাঙ্গালা পরাধীন হয় নাই। ইংরেজেরা যখন দেওয়ানী লন তখনও বাঙ্গালা স্বাধীন, তাঁহারা যখন শাসনের ভার লন, তখনও বাঙ্গালা আপনার খায় আপনার পরে। তাহার পর কপাল ফাটিয়াছে। এই সম্প্রতি,—এই আমাদের সময় বাঙ্গালা পরাধীন হইয়াছে।

ইংলণ্ডেরও পরাধীনতা আরম্ভ হইয়াছে। যে দিন হইতে বিদেশী "সস্তা মাল" ইংলণ্ডের বাজারে স্থান পাইয়াছে, সেই দিন হইতে তথাকার স্বাধীনতার আসন টলিয়াছে।

সস্তা বলিয়া লোকে বিদেশী মাল খরিদ করিতে থাকে, দেশী জিনিস সুতরাং আর বিক্রয় হয় না, ইহার প্রথম ফল, দেশী শিল্পের অবনতি; দ্বিতীয় ফল দেশী শিল্পের অন্তর্ধান; শেষ ফল বিদেশের প্রতি নির্ভর। শিল্পসংহারের বীজমন্ত্র আড়াই অক্ষর—"সস্তা"। "সস্তা" করিতে গেলে "ভেল" মিশাইতে হয়, ব্যয় খাট করিতে হয়, জিনিস মন্দ করিতে হয়, পুরুষানুক্রমে শিল্পসম্বন্ধে যে পারিপাট্য শিক্ষা হইয়াছিল তাহার লোপ করিতে হয়। ইহাতে যদি বিদেশী মালকে বাজার ছাড়া করিতে পারা গেল তবেই রক্ষা, নতুবা বিদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে।

যে ব্যক্তি আপনার অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত অন্যের মুখাপেক্ষী হয়—অন্যের প্রতি নির্ভর করে, সে ব্যক্তি পরাধীন; সেই রূপ, যে দেশ অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত বা সাংসারিক কোন সামগ্রীর নিমিত্ত অন্য দেশের প্রতি নির্ভর করে সে দেশও পরাধীন। এখনও আমাদের অন্ন জোটে সত্য, কিন্তু বস্ত্রের নিমিত্ত বঙ্গদেশ পরমুখাপেক্ষী হইয়াছে—ম্যানচেষ্টারের অধীন হইয়াছে। কয়েক বৎসরমধ্যেই বাঙ্গালির চরকা একেবারে চুপ করিয়াছে, সুতা এখন বিলাত হইতে আসিতেছে। অল্পদিনের মধ্যে শতকরা আশীখানা তাঁত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সাধারণের বস্ত্র এখন বিলাত হইতে আসিতেছে। যে

কয় খানি তাঁত অদ্যাপি আছে তাহা আর অধিক দিনের নিমিত্ত নহে।

ম্যানচেষ্টার এসকল ঘটাইতেছে, কাপাসে কোষ্টা মিশাইয়া বাঙ্গালার বাজারে "সস্তা" কাপড় পাঠাইতেছে। আর রক্ষা নাই, বাঙ্গালার দুই তিন সহস্র বৎসরের শিল্পশিক্ষা লোপ পাইতে চলিল; বাঙ্গালার তাঁতি পূর্ব্বপুরুষের কারিগরি ভুলিয়াগেল; অন্নাভাবে তাহারা তন্তুবয়ন ছাড়িয়া দিতে লাগিল। যে কয়খানি তাঁত এখানে সেখানে অদ্যাপি শব্দ করে, শীঘ্রই তাহাদের কণ্ঠ রোধ হইতে চলিল। এখন সকলকেই বিলাতি কাপড় পরিতেই হইবে। বাঙ্গালার কাপড় ফুরাইল, এখন ম্যানচেষ্টার বাঙ্গালার "আব্‌রুদার।" সুতরাং আমাদের এখন ম্যানচেষ্টারের মনরক্ষা করিতে হইবে, তাহার রাগ সহ্য করিতে হইবে, তাহাকে বিনতি করিতে হইবে, তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে; পরাধীনের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সকলই করিতে হইবে। আমাদের সঙ্গে যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ম্যানচেষ্টারের কাহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত শুনিলে আমাদের মাথা ঘুরিয়া যাইবে। বিলাতে যুদ্ধ হইবে শুনিলে আমরা ঘর আর বাহির করিব। কিন্তু এ সম্বন্ধ আত্মীয়তার নহে, পরাধীনতার।

বস্ত্রসম্বন্ধে বাঙ্গালার পরাধীনতা ঘটিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে সেইরূপ ঘটিয়াছে কি না দেখিতে গেলে প্রথমেই চিকিৎসার কথা মনে হয়। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র অতি প্রাচীন বলিয়া পরিচিত, বহুকালের পরীক্ষাদ্বারা ইহার অঙ্গ পরিপুষ্ট হইয়াছিল। অনেক ইংরেজ আমাদের চিকিৎসাসম্বন্ধে বিস্তর প্রশংসা করিয়া থাকেন। কলিকাতায় দেখা যায় দেশী বিলাতী উভয়বিধ চিকিৎসা একত্র চলিতেছে। বড় ডাক্তারের যেরূপ পসার প্রধান কবিরাজের সেইরূপ পসার। দুই একজন কবিরাজ মাসে অন্ততঃ সহস্রমুদ্রা উপার্জ্জন করেন। যে শাস্ত্রের বলে তাঁহারা বিলাতী ডাক্তারের সমকক্ষ হইয়া এত উপার্জ্জন করিতেছেন, সে শাস্ত্রে যে কিছু পদার্থ নাই এরূপ বলা যায় না। সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়, ডাক্তারেরা যে রোগ অসাধ্য বলিয়াছেন, কবিরাজেরা সে রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, অনেক বিষয়ে ইংরেজি চিকিৎসার প্রাধান্য আছে। এক্ষণে বাঙ্গালায় প্রধান রোগ জ্বর। পূর্ব্বে যে জ্বর বাঙ্গালায় সর্ব্বদা হইত, এ সে জ্বর নহে। কবিরাজেরা যে ঔষধ প্রস্তুত রাখিতেন, ইহার সে ঔষধ নহে; নেপালদেশস্থ নিম্বের পাচন ইহার ঔষধ, তাঁহাদের শাস্ত্রে এই ঔষধের ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া লিখিত আছে। কিন্তু কবিরাজেরা সে পাচন কোথায় পাইবেন? সুতরাং তাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া বাঙ্গালির মৃত্যু দেখিতে লাগিলেন। শেষ মার্কিনদেশে আর একরূপ নিম্বের

পালো আবিষ্কার হইল; তাহার নাম কুইনিন। ডাক্তারেরা সেই পালো ব্যবহার করিয়া জ্বর আরোগ্য করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহাদের আদর বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজের পসার গেল। আর এক্ষণে সামান্য কবিরাজের অন্ন হয় না, কেহ আর কবিরাজি শিখে না, এতকালের চিকিৎসাশাস্ত্র লোপ পাইল, কত সহস্র বৎসরের দর্শনপরীক্ষা সকলই বৃথা হইল। বাঙ্গালায় এখন ইংরেজি চিকিৎসা প্রধান হইয়া উঠিল।

তাহার পর? তাহার পর,—পরাধীনতা। চিকিৎসা এখানে, ঔষধ বিলাতে। যতদিন কেহ তথা হইতে ঔষধ আনিয়া দিবে, ততদিন বিলাতী চিকিৎসা এ দেশে চলিবে। তাহার পর নেপালী নিম্বের পালোর মত হইবে। ব্যবস্থা ভারতবর্ষে, ঔষধ নেপালে। বিলাতী অর্থশাস্ত্র (Poletical economy) এখানে খাটিল না। নেপাল হইতে নিম্বের পালো এখানে আসিল না।

দেশী চিকিৎসা লোপ পাইতে বসিয়াছে, আর কিছু দিনে একেবারে লোপ পাইবে। দেশী ঔষধ যাহারা আহরণ করে—অর্থাৎ গন্ধবণিক্—তাহারা এখনই অনেক দ্রব্যের নাম ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর পূর্ব্বমত কবিরাজ নাই, পূর্ব্বমত লতামূলের ফরমাইস নাই। কিছুদিন পরে তাহাদের ব্যবসা উঠিয়া যাইবে, আর সে ব্যবসা পুনঃস্থাপিত হইবে না। যেরূপ কবিরাজের শিক্ষা কঠিন, তদপেক্ষা তাঁহাদের সহকারী এই বণিক্দের শিক্ষা আরও কঠিন। গ্রন্থ দ্বারা তাহাদের শিক্ষা হয় না, তাহা হইলে সহজ হইত। পুরুষপরম্পরা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ উপদেশ দ্বারা তাহারা লতামূল চিনিয়া আসিতেছে। এক পুরুষ তাহারা এইরূপ চাক্ষুষ উপদেশ না পাইলে আর তাহাদের উপদেশ হইবে না। কে উপদেশ দিবে? যাহারা দ্রব্য চিনিত, তাহারা তখন আর থাকিবে না। কবিরাজ গেল; তাহাদের ঔষধসংগ্রহকারী বণিক্ গেল। সুতরাং বিলাতী চিকিৎসাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন থাকিল। কিন্তু বিলাতী ঔষধ বিলাত হইতে আনিতে হইবে। ঔষধের নিমিত্ত বাঙ্গালা এখন বিলাতের অধীন। বাঙ্গালার পরাধীনতাসম্বন্ধে এই আর একটী গ্রন্থি।

আমাদের ঔষধ আমাদের দেশে ছিল এখন বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইল। অনেকের বিশ্বাস রোগ যে দেশে ঔষধও সেই দেশে। আমরা সে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কোন কথা বলিতেছি না। আমরা এইমাত্র বলিতেছি যে, যদি পঞ্চপিত্তের পরিবর্ত্তে কড লিভর অইল ঔষধ শিখিলাম তবে সে শিক্ষার ফল পরাধীনতা। পরের দেশ হইতে কড লিবর তৈল আসিবে তবে আমাদের চিকিৎসা চলিবে, নতুবা চিকিৎসা হইবে না। ইহাই পরদেশের অধীনতা।

আহারসম্বন্ধে বাঙ্গালা অদ্যাপি নিতান্ত পরাধীন হয় নাই সত্য, কিন্তু একটা বিষয় স্মরণ হইলে বড় হাসি পায়। আমরা লবণসম্বন্ধে অতি পরাধীন হইয়াছি। ইংরেজেরা বিদেশ হইতে আমাদের লবণ আনিয়া দিবেন, তবে আমরা আহার করিব ; নতুবা আমরা আহার করিতে পাইব না। আহারের নিমিত্ত ধান্য, মুগ, মসুরি, ছোলা, কলা, যাহা ইচ্ছা সকলই প্রস্তুত করিয়া খাইতে পাই, তাহাতে আপত্তি নাই কিন্তু লবণ প্রস্তুত করিতে আমাদিগের আর অধিকার নাই। লবণ প্রস্তুত করা মহাপাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—ইহার ঘোরতর দণ্ড—প্রায়শ্চিত্ত—জরিমানা—জেল। আহার প্রস্তুত করা পাপ, ইদানীং। লবণ খাও পাপ নাই, কিন্তু লবণ প্রস্তুত কর অমনি পাপ। এখানে স্মার্ত্তগ্রন্থকার ঠকিয়া গিয়াছেন; তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে মুরগী খাওয়া পাপ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু লবণ প্রস্তুত করা পাপ লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার অল্প বুদ্ধি! হয় ত তাঁহার চক্ষু-লজ্জা ছিল। হয় ত তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। হয় ত তিনি ভবিষ্যৎ রাজ-নীতিজ্ঞের নিমিত্ত কিছু বাকি রাখিয়া গিয়াছেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক। কিন্তু যাহাই হউক, মুরগি খাইলে পরকাল যায় কি না সন্দেহ, কিন্তু লবণ প্রস্তুত করিলে ইহকাল যে যায় তাহা নিশ্চয়ই। রঘুনন্দন স্মার্ত্তবাগীশের পেনালকোড ভাল, কি মেকলি সাহেবদের পেনালকোড ভাল এ বিচার এখানে অপ্রয়োজন। আমাদের এইমাত্র বলিবার প্রয়োজন ছিল যে, লবণসম্বন্ধে বাঙ্গালা পরাধীন। সহস্র সহস্র বৎসর অবধি বাঙ্গালিরা সমুদ্রের জল হইতে লবণ বাহির করিয়া লইত, সমুদ্র তাহাতে রাগ করিত না। কেহ কথা কহিত না। এখন কথা কহিবার লোক দাঁড়াইয়াছে।

এই সম্বন্ধে সাতক্ষীরা অঞ্চলের এক জন দরিদ্র ব্যক্তির গল্প বলি। লেখক সেই সময় সাতক্ষীরায় উপস্থিত ছিলেন। সকল দিন সে ব্যক্তি আপনার বালক বালিকাদের উদর পূরিয়া অন্ন দিতে পারিত না, যেদিন সে অন্নসংগ্রহ করে সেদিন হয় ত ব্যঞ্জন জুটে না। একদিন দেখিল সন্তানেরা শুধু অন্ন খাইতে পারিতেছে না, অন্ন ক্রোড়ে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতেছে; একটু লবণ পাইলে তাহারা অন্ন খাইতে পারে কিন্তু লবণের পয়সা নাই। সন্তানদের চক্ষের জল মুছাইয়া সে ব্যক্তি বাহির হইল। কলাগাছের কতকগুলা শুষ্ক বাস্না সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নি দিল, তাহার ভস্ম—এক প্রকার ক্ষার—শেষ তাহাই আনিয়া লবণ বলিয়া সন্তানদের দিল। তাহা কতক মৃত্তিকা, কতক ভস্ম, কিন্তু লবণাক্ত, সন্তানেরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইল। কিছু দিন পরে পুলিষ এ সম্বাদ পাইয়া দরিদ্রকে গ্রেপ্তার করিল। সকলে বলিতে লাগিল, "আহা! কেন তোর এ বুদ্ধি ঘটিল? কেন তুই কলার বাস্না পোড়ালি? কেন

তুই লবণ করিলি ?" একটি বালিকা ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, "বাবাকে ছেড়ে দেও, আমরা লুণ আর খাব না।" পুলিস সে ক্রন্দনে কর্ণ দিল না; অপরাধী সাতক্ষীরার মেজেষ্টরীতে আনীত হইল। ডেপুটি মাজিস্ট্রেট নেমকহারাম নন, তিনি দুঃখীকে শক্ত দণ্ড দিলেন, লবণ ক্রয় করিতে যাহার পয়সা ছিল না, তাহার জরিমানা করিলেন; আবার কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন, কত দিনের নিমিত্ত তাহা এক্ষণে আমাদের স্মরণ নাই। বালক বালিকারা লবণ পাইত না; এই হুকুমের পর হয় ত আর তাহারা অন্নও পাইল না।

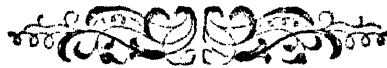
আইনের অত্যাচার মধ্যে মধ্যে সকল রাজ্যেই ঘটে, আমরা আইনের দোষ দিই না, যখন বিজ্ঞেরা আইন করিয়াছেন, তখন দোষ দেওয়া বৃথা, আমরা কেবল বলিতেছিলাম যে, লবণসম্বন্ধে বাঙ্গালা এখন পরাধীন হইয়াছে।

এইরূপে একে একে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালা অনেক বিষয়ে পরাধীন হইয়াছে; ক্রমে আরও হইতেছে। এই আমি বসিয়া যে কাগজে লিখিতেছি তাহা বিলাত হইতে আসিয়াছে। একসময় বাঙ্গালায় বড় সুন্দর কাগজ হইত, বিলাতী Hand laid কাগজ অপেক্ষা টেকসই হইত, গবর্ণর কেম্বল সাহেব তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এখন সে কাগজ লোপ পাইয়াছে। আমি যে কলমে লিখিতেছি, তাহা বিলাত হইতে আসিয়াছে, যে দুয়াত ব্যবহার করিতেছি তাহাও বিলাতের। যে ছুরিকাদ্বারা কলম কাটিয়াছি তাহাও বিলাতে প্রস্তুত হইয়াছে। আমার চারিদিকে যাহা দেখিতেছি, তাহা সমুদয় বিলাতী দ্রব্য।

কিন্তু এ দেশের সমুদয় অংশ এখনও সমভাবে পরাধীন হয় নাই, পল্লীগ্রামাঞ্চল অপেক্ষা নগরাঞ্চল অধিক পরাধীন হইয়াছে। যদি কেহ কলিকাতায় কোন বাবুর দিনযাপন লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন যে, বাঙ্গালার মধ্যে কলিকাতা বিশেষ পরাধীন। বাবু প্রাতে উঠিয়া মুখপ্রক্ষালন করিবেন তাহার উপকরণ বিলাতী টুতব্রস, বিলাতী পাউডার। তাহার পর স্নান করিবেন, খানসামা বিলাতী সাবান, বিলাতী টুয়ালিয়া আনিল। বাবু সিক্তবস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন, খানসামা বিলাতি কাপড়, বিলাতি সার্ট আনিল, তাহার বোতামগুলি পর্য্যন্ত বিলাতী। তাহার পর কেশবিন্যাসের সময় সম্মুখে দর্পণ আনীত হইল, তাহাও বিলাতী। যাহা দ্বারা কেশবিন্যাসিত হইল—ব্রস—তাহাও বিলাতী। তাহার পর বাবু চা পান করিতে বসিলেন, চার পাত্র বিলাতী, চামচে বিলাতী, লোফ সুগার বিলাতী; যে কেট্‌লিতে তাহা পাক হইয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত বিলাতী।

তাহার পর বাবু সংবাদপত্র পাঠ করিতে বসিলেন—মনে করুন ইংলিসম্যান—তাহার কাগজ বিলাতী, কালী বিলাতী, লেখক বিলাতী, হয় ত সম্বাদও বিলাতী। তাহার পর বাবুর আহারের কথা আর বলিলাম না।

কলিকাতার বাবু যেরূপ বিলাতের অধীন পল্লীগ্রামের চাষা তত নহে। চাষারা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন।



আহার *VERSUS* বিবাহ।

বাঙ্গালার সাহিত্যারণ্যে একই রোদন শুনিতে পাই—বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই। এই অভিনব অভ্যুত্থানকালে বাঙ্গালীর ভগ্নকণ্ঠে একই অস্ফুট বোল—"হায়! বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই।" বাঙ্গালীর যত দুঃখ তার একই মূল—বাহুতে বল নাই।

যদি অনুসন্ধান করা যায়, বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই কেন? তাহার একই উত্তর পাইব—বাঙ্গালী খাইতে পায় না—বাঙ্গালায় অন্ন নাই। যেমন এক মার গর্ভে বহু সন্তান হইলে কেহই উদর পুরিয়া স্তন্য পায় না তেমনি আমাদের জন্মভূমি বহু-সন্তান-প্রসবিনী বলিয়া তাঁহার শরীরোৎপন্ন খাদ্যে সকলের কুলায় না। পৃথিবীর কোন দেশই বুঝি বাঙ্গালার মত প্রজাবহুল নহে। বাঙ্গালার অতিশয় প্রজাবৃদ্ধিই বাঙ্গালার প্রজার অবনতির কারণ। প্রজাবাহুল্য হইতে অন্নাভাব, অন্নাভাব হইতে অপুষ্টি, শীর্ণশরীরত্ব; অরাদি পীড়া এবং মানসিক দৌর্ব্বল্য।

অনেকে বলিবেন, দেখ দেশে অনেক বড় মানুষের ছেলে আছে—তাহাদের আহারের কোন কষ্ট নাই, কিন্তু কই, তাহারা ত অনাহারী চণ্ডাল পোদের অপেক্ষাও দুর্ব্বল—বড়মানুষের ছেলেরাই প্রকৃত মর্কটাকার। সত্য বটে, কিন্তু একপুরুষে অন্নাভাবের দোষ খণ্ডে না। যাহারা পুরুষানুক্রমে মর্কটাকার, দুই একপুরুষ তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই মনুষ্যাকার ধারণ করে না। বিশেষ বড়মানুষের ছেলের কথা ছাড়িয়া দাও—তাঁহারা নড়িয়া বসেন না—সুতরাং ক্ষুধাভাবে প্রস্তুত আহার খাইতে পান না—ভুক্ত আহার জীর্ণ

করিতে পারেন না। সকল দেশেই বাবুর দল মর্কটসম্প্রদায়বিশেষ। শ্রমজীবী, সাধারণ দরিদ্র লোকের বাহুবলই দেশের বাহুবল।

আবার অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, "এ রকম কঠিনহৃদয় মালথসি বুলি রাখিয়া দাও! ও ছাই আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। কেন, যদি দেশে খাবার কুলায় না, তবে ভিন্ন দেশে এত চাউল গম রপ্তানি হয় কি প্রকারে?" এসম্প্রদায়ের লোকে বুঝেন না, যে দেশে অকুলান থাকিলেও বিদেশে জিনিষ রপ্তানি হইতে পারে। যে আমায় বেশী টাকা দিবে তাহাকেই আমি জিনিষ বেচিব।

যদি এ দেশে কোন খাদ্য কুলান হয়, তবে সে চাউল। চাউল জুটিল না বলিয়া খাইতে পাইল না—এরূপ দুরবস্থা যে সকল লোকের ঘটে, তাহাদের সংখ্যা এদেশে নিতান্ত অল্প। অধিকাংশ লোকের আর যাহারই অভাব থাক না কেন চাউলের অপ্রতুল নাই। পেট ভরিয়া প্রায় সকলেই ভাত খাইতে পায়। কিন্তু পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইলেই আহার হইল না। শুধু ভাতে জীবন রক্ষা হইলে হইতে পারে—কিন্তু সে জীবনরক্ষা মাত্র। শরীরের পুষ্টি হয় না। চাউলে বলকারক সারপদার্থ শতাংশে সাতভাগ আছে মাত্র। চর্ব্বি—যাহা শরীর পুষ্টির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় চাউলে তাহা কিছু মাত্র নাই।

শুধু ভাত খায়, এমন লোক অতি অল্প না হউক, বেশীও নয়। বাঙ্গালার অধিকাংশ লোকে ভাতের সঙ্গে একটু ডালের ছিটা, একটু মাছের বিন্দু, শাক বা আলু কাঁচকলার কনিকা দিয়া ভোজন করে। ইহার নাম "ভাত ব্যঞ্জন।" এই ভাত ব্যঞ্জনের মধ্যে ভাতের ভাগ পনের আনা সাড়ে উনিশ গণ্ডা—ব্যঞ্জনের ভাগ দুই কড়া। সুতরাং ইহাকেও শুধু ভাত বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালার চৌদ্দ আনা লোক এই রূপ শুধু ভাত খায়। তাহাতে কোন উপসর্গ না থাকিলে জীবনরক্ষা হইতে পারে—হইয়াও থাকে। কিন্তু এরূপ শরীরে রোগ অতি সহজেই প্রাধান্য স্থাপন করে,—(সাক্ষী ম্যালেরিয়া জ্বর)—আর এরূপ শরীরে বল থাকে না। সেই জন্য বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেকে বলেন, যত দিন না বাঙ্গালী সাধারণতঃ মাংসাহার করে, তত দিন বাঙ্গালীর বাহুতে বল হইবে না। আমরা সে কথা বলি না। মাংসের প্রয়োজন নাই, দুগ্ধ, ঘৃত, ময়দা, ডাল, ছোলা, ভাল শবজী ইহাই উত্তম আহার। দৃষ্টান্ত—পশ্চিমে হিন্দুস্থানী। নৈবেদ্যে বিল্বপত্রের মত ভাতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শমাত্রের পরিবর্ত্তে অন্নের সঙ্গে ইহাদের যথোচিত সমাবেশ হইলেই বলকারক আহার হইল। বাঙ্গালী যদি ভাতের মাত্রা কমাইয়া দিয়া এই সকলের মাত্রা

বাড়াইতে পারে, তবে একপুরুষে নী· রোগ, দুই তিন পুরুষে বলিষ্ঠকায় হইতে পারে।

আমি এই সকল কথা রামধন পোদকে বুঝাইতে ছিলাম—কেন না রামধন পোদের সাতগোষ্ঠী বড় রোগা। রামধন আমার কাছে হাত যোড় করিয়া বলিল, "মহাশয় যা আজ্ঞা কর্‌লেন, তা সবই যথার্থ—কিন্তু ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা! বাবা, এ সকল পাব কোথায়? এমনই যে শুধু ভাতের খরচ জুটিয়ে উঠিতে পারি না।"

কথাটা দেখিলাম সত্য। আমি রামধনের ঢেকিশালে ঢেঁকির উপর বসিয়াছিলাম—উঠানে একটা ঘেও কুকুর পড়িয়াছিল বলিয়া আর আগু হইতে পারিনাই—সেই খান হইতেই রামধনের বংশাবলীর পরিচয় পাইতেছিলাম। রামধন একটি একটি করিয়া দেখাইল যে তাহার চারিটি ছেলে, পাঁচটি মেয়ে, একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ের বিবাহ দিতে বাকি আছে—পোদজেতের ছেলের বিয়েতেও কড়ি খরচা, মেয়ের বিয়েতেও বটে—তবে কম। পোদ বলিল যে, "মহাশয় গা! একটু পরিবার ছেঁড়া নেকড়া জুটাইতে পারি না—আবার ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা!" আমি বুঝিলাম কথাটা বড় অসঙ্গত হইয়াছে। বোধ হইল যেন প্রাঙ্গণশায়ী রুগ্ন কুকুরটিও আমার উপর রাগ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিবার উদ্যোগী—বোধ হইল যেন সে বলিতেছে "একমুঠা ফেলা ভাত পাই না, আবার উনি বুট পায়ে দিয়া ঢেঁকির উপর বসিয়া ঘি ময়দার বাহানা আরম্ভ করিলেন!" একটি রোমশূন্য গৃহমার্জ্জার আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, লেজ উচু করিয়া চলিয়া গেল—সেই নীরস রামধনালয়ে ঘৃত দুগ্ধ নবনীতের কথা শুনিয়া সে আমাকে উপহাস করিয়া গেল সন্দেহ নাই।

আমি রামধনকে বলিলাম, "চারিটি ছেলে—তিনটি মেয়ে! আবার তার উপর দুইটি পুত্রবধু বাড়িয়াছে?" রামধন হাত যোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞা হাঁ আপনার আশীর্ব্বাদে দুইটি পুত্রবধু হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তাহাদের সন্তান সন্ততিও হইয়াছে?"

রামধন বলিল, "আজ্ঞা একটির দুই টী মেয়ে, একটির একটি ছেলে।"

আমি বলিলাম, "রামধন শত্রুর মুখে ছাই দিয়া অনেকগুলি পরিবার বাড়িয়াছে। বহুপরিবার বলিয়া তোমার আগেই খাইবার কষ্ট ছিল, এখন আরও কষ্ট হইয়াছে বোধ হয়।"

রামধন বলিল, "এখন বড় কষ্ট হইয়াছে।"

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রামধন! কেন এত পরিবার বাড়াইলে?"

রামধন কিছু বিস্মিত হইল। বলিল "সে কি মহাশয়! আমি কি পরিবার

বাড়াইলাম ? বিধাতা বাড়াইয়াছেন।”

আমি বলিলাম, “গরিব বিধাতাকে অনর্থক দোষ দিও না। ছেলের বিয়ে তুমি দিয়াছ—সুতরাং তুমিই দুইটী পুত্র-বধূ বাড়াইয়াছ। আর ছেলের বিয়ে দিয়েছ বলিয়াই তিনটি নাতি নাতিনী বাড়াইয়াছ।”

রামধন কাতর হইয়া বলিল, “মহাশয় আমাকে অমন করিয়া খুঁড়িবেন না, যমদণ্ডে সে দিন আমার আর একটি নাতি নষ্ট হয়েছে।”

আমি দুঃখ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “সেটি কিসে গেল রামধন !”

রামধন কিছু উত্তর দেয় না। পীড়াপীড়ি করিয়া, কতকগুলি জেরার সওয়াল করিয়া, বাহির করিলাম যে সেটি অনাহারে মরিয়াছে। মাতা পীড়িত হওয়ায় মাতৃস্তনে দুধ ছিল না। রামধনের গোরু মরিয়া গিয়াছিল—দুধ কিনিবার সাধ্য নাই। ছেলেটী না খাইয়া পেটের পীড়ায় ভুগিয়া * মরিয়া গিয়াছিল।

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “তার পর ছোট ছেলেটির বিয়ে দিবে ?”

রামধন বলিল, “টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই দিই।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই যে গুলি জুটিয়েছ, তাই খেতে দিতে পার না —আবার বাড়াবে কেন ? বিয়ে দিলেই ত আপাততঃ বৌ মা আস্‌বেন—তাঁর আহার চাই। তার পর তাঁর পেটে দুটি চারিটি হবে—তাদেরও আহার চাই। এখনই কুলায় না—আবার বিয়ে ?”

রামধন চটিল। বলিল, “বেটার বিয়ে কে না দেয় ? যে খেতে পায় সেও দেয়, যে না খেতে পায় সেও দেয়।”

আমি বলিলাম “ যে না খেতে পায় তার বেটার বিয়ে টা কি ভাল ?”

রামধন বলিল—“জগৎ শুদ্ধ এই হচ্চেছে।”

আমি বলিলাম, “জগৎ শুদ্ধ নয় রামধন, কেবল এই দেশে। এমন নির্ব্বোধ জাতি আর কোন দেশে নাই।”

রামধন উত্তর করিল, “তা দেশ-শুদ্ধ লোক যখন করিতেছে, তখন আমাতেই কি এত দোষ হইল ?”

এমন নির্ব্বোধকে কিরূপে বুঝাইব ? বলিমাম—“রামধন ! দেশশুদ্ধ লোক যদি গলায় দড়ি দেয়, তুমিও কি দিবে ?”

রামধন চেঁচাইতে আরম্ভ করিল “তুমি বল কি মশাই ? গলায় দড়ি আর বেটার বিয়ে দেওয়া সমান ?”

আমিও রাগিলাম, বলিলাম “সমান কে বলে রামধন ! এরূপ বেটার বিয়ে দেওয়ার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া অনেক ভাল। আপনার গলায় না পার, ছেলের গলায় দিও।”

এই বলিয়া আমি ঢেঁকি হইতে

* অনাহারের একটি ফল পেটের পীড়া, ইহা সকলের জানা না থাকিতে পারে।

উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। ঘরে আসিয়া রাগ পড়িয়া গেলে ভাবিয়া দেখিলাম গরিব রামধনের অপরাধ কি? বাঙ্গালা শুদ্ধ এই রূপ রামধনে পরিপূর্ণ। এ ত গরিব পোদের ছেলে—বিদ্যা বুদ্ধির কোন এলাকা রাখে না। যাঁহারা কৃত-বিদ্য বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন, তাঁহারাও ঘোরতর রামধন। ঘরে খাবার থাক বা না থাক—আগে ছেলের বিয়ে। শুধু ভাতে ডালের ছিটা দিয়া খাইয়া সাত গোষ্ঠী পোড়া কাঠের আকার—জ্বর প্লীহায় ব্যতিব্যস্ত—তবু সেই কদন্ন খাইবার জন্য সেই অনাহারের ভাগ লইবার জন্য—সে জ্বর প্লীহার সাথি হইবার জন্য টাকা খরচ করিয়া পরের মেয়ে আনিতে হইবে! মনুষ্যজন্মে তাহাই তাঁহাদের সুখ। যে বাঙ্গালী হইয়া ছেলের বিয়ে না দিতে পারিল তাহার বাঙ্গালী জন্মই বৃথা। কিন্তু ছেলের বিয়ে দিলে, ছেলে বেচারি বউকে খাওয়াইতে পারিবে কি না, সে টা ভাবিবার কোন প্রয়োজন আছে এমত বিবেচনা করেন না। এ দিকে ছেলে ইস্কুল ছাড়িতে না ছাড়িতে একটি ক্ষুদ্র পলটনের বাপ—রশদের যোগাড়ে বাপ পিতামহ অস্থির। গরিব বিবাহিত তখন স্কুল ছাড়িয়া পুঁথি পাঁজি টানিয়া ফেলিয়া দিয়া উমেদওয়ারিতে প্রাণ সমর্পণ করিল। যোড় হাত করিয়া ইংরেজের দ্বারে দ্বারে হা চাকরি! হা চাকরি! করিয়া কাতর। হয় ত, সে ছেলে একটা মানুষের মত মানুষ হইতে পারিত। হয় ত, সে সময়ে আপনার পথ চিনিয়া জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে, জীবন সার্থক করিতে পারিত। কিন্তু পথ চিনিবার আগেই সে সকল ভরসা ফুরাইল, উমেদওয়ারির যন্ত্রণায় আর চাকরির পেষণে—সংসারধর্ম্মের জ্বালায়,—অন্তর ও শরীর বিকল হইয়া উঠিল। বিবাহ হইয়াছে—ছেলে হই-য়াছে, আর পথ খুঁজিবার অবসর নাই—এখন সেই একমাত্র পথ খোলা—উমেদওয়ারি। আর লোকের উপকার করিবার কোন সম্ভাবনা নাই—কেন না আপনার স্ত্রীকন্যা পুত্রের উপকার করিতে কুলায় না—তাহারা রাত্রিদিন দেহি দেহি করিতেছে। আর দেশের হিতসাধনের ক্ষমতা নাই, স্ত্রীপুত্রের হিতের জন্য সর্ব্বস্ব পণ! লেখা পড়া, ধর্ম্মচিন্তা—এ সকলের সঙ্গে আর সম্বন্ধ নাই—ছেলের কান্না থামাইতেই দিন যায়। যে টাকা টা পেট্রি-য়টিক আসোসিয়েসনে চাঁদা দিতে পারি-ত, ছেলে এখন তাহা বধূঠাকুরাণীর বালা গড়াইয়া দিল। অথচ বাঙ্গালার রামধনেরা শৈশবে ছেলের বিবাহ দিতে না পারিলে, মনে করেন ছেলেরও সর্ব্ব-নাশ নিজেরও সর্ব্বনাশ করিলেন। ছেলে থাকিলেই তাহার বিবাহ দিতেই হইবে, মনুষ্যমাত্রকেই বিবাহ করিতে হইবে; আর বাপ মার প্রধান কার্য্য—শৈশবে ছেলের বিবাহ দেওয়া—এরূপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সর্ব্বব্যাপী সে দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে, বাপ মা

ছেলে সাঁতার শিখিতে না শিখিতে বধূরূপ পাতর গলায় বাঁধিয়া দিয়া, ছেলেকে এই দুস্তর সংসারসমুদ্রে ফেলিয়া দেয় সে দেশের উন্নতি হইবে?



কমলাকান্তের জোবানবন্দী।

সেই আফিঙ্গখোর কমলাকান্তের অনেক দিন কোন সম্বাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম। অকস্মাৎ সম্প্রতি একদিন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম। দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে। মনে করিলাম আর কিছু না, ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিঙ্গ চুরী করিয়াছে—অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরী করিবে না—ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে একজন কালোকোর্ত্তা কনষ্টেবলও দেখিলাম। আমি বড় দাঁড়াইলাম না—কি জানি যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে কাণ্ডটা কি হয়।

কিছু কাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন একজন কনষ্টেবল রুল ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজলাসে লইয়া গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া, দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজলাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্ম্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে—সাক্ষী। মোকদ্দমা গোরুচুরী। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটরায় পুরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশী ধমকাইল—"হাস কেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি—যে আমাকে এর ভিতর পুরিলে?"

চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাসার জায়গা এ নয়—হলফ পড়।"

কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু।"

একজন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, "বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া—"

কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব?

মুহুরি। শুন্‌তে পাও না—"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"।

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্ব্বনাশ!

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাঁধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্ব্বনাশ কি?"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি—এ কথাটা বল্‌তে হবে?

হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের কায়দই এই।

কমলা। হজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম—কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব—সেটা কি ভাল?

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, "তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত?" প্রকাশ্যে বলিল, "ধর্ম্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি, যে পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চসমা নাকে দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন—কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না—তখন কেমন করিয়া বলি—আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

ফরিয়াদীর উকীল চটিলেন—তাঁহার মূল্যবান্ সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকীল তখন গরম হইয়া বলিলেন, "সাক্ষীমহাশয়! Theological Lectureটা ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিলে ভাল হয় না। এখানে আইনের মতে চলিতে মনস্থির করুন।"

কমলাকান্ত তাহার দিকে ফিরিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি বোধ হইতেছে উকীল।"

উকীল (হাসিয়া)। কিসে চিনিলে?

কমলা। বড় সহজে—মোটা চেন আর ময়লা শামলা দেখিয়া। তা, মহাশয়! আপনাদের জন্য এ Theological Lecture নয়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি—যখন মোয়াক্কেল আসে।

উকীল সরোষে উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, "I ask the protection of the Court against the insults of this witness."

কোর্ট বলিলেন, Oh Baboo! the witness is your own witness, and you are at liberty to send him away if you like."

এখন, কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীলবাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না—সুতরাং উকীলবাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কমলাকান্ত ভাবিলেন, এ হাকিমটি জাতিভ্রষ্ট—পালের মত নয়।

হাকিম গতিক দেখিয়া, মুহুরিকে আদেশ করিলেন, যে ওথের প্রতি সাক্ষীর objection আছে—উহাকে simple affirmation দাও। তখন মুহুরি কমলাকান্তকে বলিল, "আচ্ছা, ও ছেড়ে দাও—বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—বল!"

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না?

মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার! সাক্ষী বড় সেরকশ্।"

উকীলবাবু হাঁকিলেন, "Very distinctive"

কমলাকান্ত (উকীলের প্রতি) "শাদা কাগজে দস্তখত করিয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের বাহিরে চলে জানি—ভিতরেও চলিবে কি?"৮

উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে?

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে তাহা না জানিয়া প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কি লেখা হয় তাহা না দেখিয়া, দস্তখত করা, একই কথা।

হাকিম তখন মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও—গোলমালে কাজ নাই।" মুহুরি তখন বলিল, "শোন, তোমাকে বলিতে হইবে যে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না—সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।"

কমলা। ওঁ মধু মধু মধু।

মুহুরি। সে আবার কি?

কমলা। পড়ান, আমি পড়িতেছি।

কমলাকান্ত তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞাপাঠ করিল। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য উকীলবাবু গাত্রোত্থান করিলেন, কমলাকান্তকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "এখন আর বদ্‌মায়েশি করিও না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।"

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে? আর কিছু বলিতে পাইব না?

উকীল। না।

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, 'কোন কথা গোপন করিব না।' ধর্ম্মাবতার, বে-আদবি মাফ হয়! পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল; সে সাধ এইখানেই মিটিল। উকীলবাবু অধিকারী—আমি যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব। যা না বলাইবেন, তা বলিব না। যা না বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধ লইবেন না।"

হাকিম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা

করিবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার।

কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব।" উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, "তোমার নাম কি?"

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

উকীল। তোমার বাপের নাম কি?

কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যুতিক আছে না কি?

উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, "হুজুর! এ সব Contempt of Court!" হুজুর, উকীলের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন্—বলিলেন, "আপনারই সাক্ষী।" সুতরাং উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, "বল। বলিতে হইবে।"

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জাতি।"

কমলা। আমি কি একটা জাতি?

উকীল। তুমি কোন্ জাতীয়?

কমলা। হিন্দুজাতীয়।

উকীল। আঃ! কোন বর্ণ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকীল। দূর হোক্ ছাই! এমন সাক্ষীও আনে! বলি তোমার জাত আছে?

কমলা। মারে কে?

হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় হইবে না। বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, হিন্দুর নানাপ্রকার জাতি আছে জান ত—তুমি তার কোন জাতির ভিতর?"

কমলা। ধর্ম্মাবতার! এ উকীলেরই ধৃষ্টতা! দেখিতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্ত্তী—ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কিপ্রকারে জানিব?

হাকিম লিখিলেন, "জাতি ব্রাহ্মণ।" তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত?"

এজলাসে একটা ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, "আমার বয়স ৫১ বৎসর, দুই মাস তের দিন চারি ঘণ্টা পাঁচ মিনিট—"

উকীল। কি জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায়?

কমলা। কেন এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, কোন কথা গোপন করিব না।

উকীল। তোমার যা ইচ্ছা কর! আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথা?

কমলা। আমার নিবাস নাই।

উকীল। বলি, বাড়ী কোথা?

কম। বাড়ী দূরে থাক্, আমার একটা কুঠারীও নাই।

উকীল। তবে থাক কোথা?

কমলা। যেখানে সেখানে।

উকীল। একটা আড্ডা ত আছে?

কম। ছিল, যখন নশীবাবু ছিলেন। এখন আর নাই।

উকীল। এখন আছ কোথা?

কম। কেন, এই আদালতে।

উকীল। কাল ছিলে কোথা?

কম। একখানা দোকানে।

হাকিম বলিলেন, "আর বকাবকিতে কাজ নাই—আমি লিখিয়া লইতেছি নিবাস নাই। তার পর?"

উকীল। তোমার পেশা কি?

কম। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকীল না বেশ্যা, যে আমার পেশা আছে?

উকীল। বলি, খাও কি করিয়া?

কম। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকীল। সে ডাল ভাত জোটে কোথা থেকে?

কম। ভগবান্ জোটাইলেই জোটে, নইলে জোটে না।

উকীল। কিছু উপার্জ্জন কর?

কম। এক পয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরী কর?

কম। তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন।

উকীল, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া, আদালতকে বলিলেন, "আমি এ সাক্ষী চাহি না। আমি ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারিব না।"

প্রসন্ন বাদিনী, উকীলের কোমর ধরিল; বলিল, "এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য কথা বলিবে তাহা আমি জানি—কখনও মিছা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে জান না—তাই ও অমন করিতেছে। ও বামনের আবার পেশা কি? ও এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উপার্জ্জন কর! ও কি বল্‌বে?"

উকীল তখন হাকিমকে বলিল, লিখুন "পেশা ভিক্ষা।"

এবার কমলাকান্ত রাগিল, "কি? কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ভিক্ষোপজীবী? আমি মুক্তকণ্ঠে হলফের উপর বলিতেছি আমি কখন কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই নাই।"

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না—সে বলিল, "সে কি ঠাকুর! কখনও আফিঙ্গ চেয়ে খাও নি?"

কমলা। দূর মাগি যেমো গয়লার মেয়ে! আফিঙ্গ কি পয়সা! আমি কখন একটি পয়সাও কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই।

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "কি লিখিব কমলাকান্ত?"

কমলাকান্ত নরম হইয়া বলিল, "লিখুন, পেশা ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ।" সকলে হাসিল—হাকিম তাই লিখিয়া লইলেন।

তখন উকীল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই ফরিয়াদীকে চেন?"

কম। না।

প্রসন্ন হাঁকিল,"সে কি ঠাকুর! চিরটা কাল আমার দুধ দই খেলে, আজ বল চিনি না?"

কমলাকান্ত বলিল, "তোমার দুধ দই চিনি না, এমন কথা ত বল্‌তেছি না—তোমার দুধ দই বিলক্ষণ চিনি। যখনই দেখি একপোওয়া দুধে তিনপোওয়া জল, তখনই চিনিতে পারি যে এ প্রসন্ন গোয়ালীর দুধ; যখনই দেখিতে পাই যে, ঘোলের চেয়ে দই ফিঁকে, তখনই চিনিতে পারি যে এ প্রসন্নময়ীর দধি। তোমার দুধ দই চিনিনে?

প্রসন্ন নথ ঘুরাইয়া বলিল, "আমার দুধ দই চেন, আর আমায় চিনিতে পার না!"

কমলাকান্ত বলিল, "মেয়েমানুষকে কে কবে চিনিতে পেরেছে দিদি? বিশেষ, গোয়ালার মেয়ের কাঁকালে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে?"

উকীল তখন আবার সওয়াল করিতে লাগিল, "বুঝা গেল; তুমি বাদিনীকে চেন—উহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে?"

কমলা। মন্দ নয়—এত গুণ না থাকিলে কি উকীল হয়!

উকীল। তুমি আমার কি গুণ দেখিলে?

কমলা। বামনের ছেলে গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

উকীল। এমন সম্বন্ধ কি হয় না? কে জানে তুমি ওর paramour কি না?

কমলা। উকীল মহলে ওটাও কি একটা সম্বন্ধ বলিয়া গণ্য হয় না কি? তা না হইলেই বা মোয়াক্কেলেরা আপনাদের কাছে টাকা আনিয়া কথায় কথায় "নিন্"* বলিবে কেন?"

উকীল ও হাকিম, ব্যাকরণের সঙ্গে সম্বন্ধবিরহিত—সুতরাং কেহ কথাটার অপরাধ লইলেন না। উকীল বলিলেন, "বুঝা গেল তোমার সঙ্গে বাদিনীর কোন সম্বন্ধ নাই—একেবারে সাফ বলিলেই হইত—এত দুঃখ দাও কেন? এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ মোকদ্দমার কি জান?"

কমলা। জানি যে এ মোকদ্দমার আপনি উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী, আর এই নেড়ে আসামী।

উকীল। তা নয়, গোরুচুরীর কি জান?

কমলা। গোরুচুরী আমার বাপ দাদাও জানে না। বিদ্যাটা আমায় শিখাইবেন?—আমার দুধ দধির বড় দরকার।

উকীল। আঃ—বলি গোরু চুরী দেখিয়াছ?

* (১) লউন (২) "নিন" প্রত্যয়।

কমলা। একদিন দেখিয়াছিলাম। নশীবাবুর একটা বক্না—এক বেটা মুচি—

উকীল। কি যন্ত্রণা! বলি, প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু যখন চুরী যায় তখন তুমি দেখিয়াছ?

কমলা। না—চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া গোরুটা চুরী করে। তাহা হইলে আপনারও কাজের সুবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত।

প্রসন্ন দেখিল, উকীলকে টাকা দেওয়া সার্থক হয় নাই—তখন আপনার হাতে হাল লইবার ইচ্ছায়, উকীলের কানে কানে বলিয়া দিল, "ও বামন সে সব কিছুর সাক্ষী নয়—ও কেবল গোরু চেনে।"

উকীলমহাশয় তখন কূল পাইলেন। গর্জ্জিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোরু চেন?"

কমলাকান্ত মধুর হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞা চিনি বই কি—নহিলে আপনার সঙ্গে এত মিষ্টালাপ করি?"

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—বলিলেন, "ও সব রাখ।" প্রসন্ন গোয়ালীর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা ছিল—দেখা যাইতেছিল। ডিপুটিবাবু সেই-দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোরুটি চেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "কোন্ গোরুটি ধর্ম্মাবতার?"

হাকিম বলিলেন, "কোন্ গোরুটি কি? একটি বই ত সামনে নাই?"

কমলা। আপনি দেখিতেছেন একটি—আমি দেখিতেছি অনেকগুলি।

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখিতে পাইতেছ না—ঐ শামলা?"

কমলাকান্ত শামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকীলের শামলার প্রতি চাহিল। বলিল, "এ শামলাও চুরীর না কি?"

কমলাকান্তের নষ্টামি হাকিম আর সহ্য করিতে পারিলেন না—বলিলেন, "তুমি আদালতের কাজের বড় বিঘ্ন করিতেছ—Contempt of Court জন্য তোমার পাঁচটাকা জরিমানা।"

কমলাকান্ত আভূমিপ্রণত সেলাম করিয়া যোড়হাত করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব হজুর! জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রতি?"

হাকিম। কেন?

কমলা। কিরূপে আদায় করিবেন সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিব।

হাকিম। উপদেশের প্রয়োজন কি?

কমলা। ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই—তিনি পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করিব।

হাকিম। জরিমানা না দিতে পার, কয়েদ যাইবে।

কমলা। কতদিনের জন্য ধর্ম্মাবতার?

হাকিম। জরিমানা অনাদায়ে একমাস কয়েদ।

কমলা। দুই মাস হয় না?

হাকিম। বেশী মিয়াদের ইচ্ছা কর কেন?

কমলা। সময়টা কিছু মন্দ পড়িয়াছে—ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সুলভ নয়—জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়।

এরূপ লোককে জরিমানা বা কয়েদ করিয়া কি হইবে? হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমি যদি গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা যাইতে পারে। বল—ঐ গোরু তুমি চেন কি না?"

হাকিম তখন একজন কনষ্টেবলকে আদেশ করিলেন, যে গোরুর নিকট গিয়া প্রসন্নের গাই দেখাইয়া দেয়। কনষ্টেবল তাহাই করিল। বিষণ্ণ উকীল বাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ গোরু তুমি চেন?"

কমলা। সিং-ওয়ালা গোরু—তাই বলুন!

উকীল। তুমি বল কি?

কমলা। আমি বলি শামলাওয়ালা—তা যাক্—আমি ও সিং-ওয়ালা গোরুটা চিনি। বিলক্ষণ আলাপ আছে।

উকীল। ও কার গোরু?

কমলা। আমার।

উকীল। তোমার!!

কমলা। আমারই।

হরি হরি! প্রসন্নের মুখ শুকাইল! উকীল দেখিল, মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া যায়। প্রসন্ন তখন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তবে রে বিট্‌লে! গোরু তোমার!"

কমলাকান্ত বলিল, "আমার না ত কার! আমি ওর দুধ খেয়েছি, ওর দই খেয়েছি, ওর ঘোল খেয়েছি, ওর ছানা খেয়েছি—ওর মাখন খেয়েছি, ওর ননী খেয়েছি—ও গোরু আমার হলো না, তুই বেটি পালিস্ বল্যে কি তোর বাবার গোরু হলো!"

উকীল অতটা বুঝিলেন না। বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার witness hostile! permission দিন্ আমি ওকে cross করি।

কমলা। কি? আমায় cross করিবে?

উকীল। হাঁ, করিব।

কমলা। নৌকায়, না সাঁকো বেঁধে?

উকীল। সে আবার কি?

কমলা। বাবা! কমলাকান্তসাগর পার হও, এত বড় হনুমান্ তুমি আজও হও নাই।

এই বলিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী রাগে গর্ গর্ করিয়া কাটরা হইতে নামিয়া যায়—চাপরাশী ধরিয়া আবা

কাটরায় পুরিল। তখন কমলাকান্ত আলু থালু হইয়া নিশ্চেষ্ট হইল—বলিল, "কর বাবা ক্রস্ কর!—আমি অগাধ সমুদ্রে পড়িয়া আছি—যে ইচ্ছা সে লম্ফ দাও—'অপামিবাধার মনুত্তরঙ্গং'—উকীলমহাশয়! এ প্রশান্ত মহাসমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষেপ করে না, আপনি সচ্ছন্দে উল্লম্ফন করুন।"

উকীল তখন কোর্টকে বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে এ ব্যক্তি বাতুল; ইহাকে আর ক্রস করিবার প্রয়োজন নাই। বাতুল বলিয়া ইহার জোবানবন্দী পরিত্যক্ত হইবে। ইহাকে বিদায় দেওয়া হউক।"

হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচেন, বিদায় দিতে প্রস্তুত, এমত সময়ে প্রসন্ন হাতযোড় করিয়া আদালতে নিবেদন করিল, "যদি হুকুম হয়, তবে আমি স্বয়ং উহাকে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর বিদায় দিতে হয় দিবেন।"

হাকিম কৌতূহলী হইয়া অনুমতি দিলেন। প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল,

"ঠাকুর! মৌতাতের সময় হয়েছে না?"

কমলা। মৌতাতের আবার সময় কিরে বেটী—অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাং নেশাঞ্চ চিন্তয়েৎ।

প্রসন্ন। অং বং এখন রাখ—এখন মৌতাত করিবে?

কমলা। সে!

প্রসন্ন। আচ্ছা, আগে আমার কথার উত্তর দাও—তার পর সে হবে।

কমলা। তবে জলদি জলদি বল—জলদি জলদি জবাব দিই।

প্রসন্ন। বলি, গোরু কার?

কমলা। গোরু তিনজনের; গোরু প্রথম বয়সে গুরুমহাশয়ের; মধ্যবয়সে স্ত্রীজাতির; শেষবয়সে, উত্তরাধিকারীর; দড়ি ছিঁড়িবার সময়ে কারও নয়।

প্রসন্ন। বলি, ঐ শামলা গাই কার?

কমলা। যে ওর দুধ খায় তার।

প্রসন্ন। ও গোরু আমার কি না?

কমলা। তুই বেটি কখন ওর এক বিন্দু দুধ খেলিনে, কেবল বেচে মর্‌লি, গোরু তোর হলো? ও গোরু যদি তোর হয়, তবে বাঙ্গাল বেঙ্কের টাকাও আমার। দে বেটি গোরু চোরকে ছেড়ে দে—গরিবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক।

হাকিম দেখিলেন, দুই জনে বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—আদালত মেছো হাটা হইয়া উঠিল। তখন উভয়কে ধমক দিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,

"প্রসন্ন এই গোরুর দুধ বেচে?"

কমলা। আজ্ঞা, হাঁ।

"উহার গোহালে এই গোরু থাকে?"

কমলা। ও গোরুও থাকে, আমিও কখন কখন থাকি।

"ঐ খাওয়ায়?"

কমলা। উভয়কে।

বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন, "আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে—আমি উহাকে আর জিজ্ঞাসাকরিতে চাই না।" এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আশামীর উকীল গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিয়া কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার তুমি কে?"

আশামীর উকীল বলিলেন, "আমি আশামীর পক্ষে তোমাকে ক্রস্ করিব।"

কমলা। একজন ত ক্রস্ করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাদুর এলে না কি?

উকীল। কুমার বাহাদুর কে?

কমলা। রাজপুত্রকে চেন না? ত্রেতা যুগে আগে ক্রস করিলেন, পবনাত্মজ মহাশয়! তার পর ক্রস করিলেন কুমার বাহাদুর।*

উকীল। ও সব রাখ—তুমি গোরু চেন বলেছ—কিসে চেন?

কমলা। কখন শিঙ্গে—কখন শামলায়।

উকীল রাগিয়া উঠিয়া, গর্জ্জন করিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন,

"তোমার পাগলামি রাখ—তুমি এই গোরু চিনিতে পারিতেছ কিসে?

কমলা। ঐ হাম্বারবে।

উকীল হতাশ হইয়া, বলিলেন, "Hopeless!" উকীল মহাশয় বসিয়া পড়িলেন—আর জেরা করিবেন না। কমলাকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "দড়ি ছেঁড় কেন বাবা?"

উকীল আর জেরা করিবেন না দেখিয়া হাকিম কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন। কমলাকান্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। আমি কিছু কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, যে কমলাকান্ত থেলে হুঁকা হাতে করিয়া বসিয়া আছে—চারি দিকে লোক জমিয়াছে—প্রসন্নও সে খানে আসিয়াছে। কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করিতেছে আর বলিতেছে, "তোর মঙ্গলার বাঁটের দিব্য, তোর দুধের কেঁড়ের দিব্য, তোর ঘোল মউনির দিব্য, তোর ফাঁদিনথের দিব্য, তুই যদি চোরকে গোরু ছেড়ে না দিস্!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! চোরকে গোরু ছাড়িয়া দিবে কেন?"

কমলাকান্ত বলিল, "Liberty! Individuality! Fraternity! Humanity! মটর শুঁটি!"

এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিলাম মানুষ টা, নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

খোসনবীশ জুনিয়র।

---

* অঙ্গদ।

কৃষিতত্ত্ব।

মাসিক পত্রিকা, শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৸০।

এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি দুই তিনবৎসর অবধি প্রকাশ হইতেছে, আমরা মনে করিয়াছিলাম এদেশে সর্ব্বত্র ইহা গৃহীত ও পঠিত হয়। বাঙ্গালা শস্যপ্রসবিনী, বাঙ্গালীরা শস্য উপজীবী, কৃষিতত্ত্ব তাহাদের উপযুক্ত পত্রিকা। কিন্তু এক্ষণে সন্দেহ হইতেছে বুঝি কৃষিতত্ত্ব অদ্যাপি কৃষকদের নিকট পৌঁছে নাই, তাহা হইলে এতদিন কৃষিতত্ত্বের সহস্র সহস্র গ্রাহক হইত। পত্রখানি বোধ হয় কুপথে গিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়াছে। তাহাই বুঝি গত চৈত্রমাসে সম্পাদককে নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন লিখিতে হইয়াছিল ;—

"কৃষিতত্ত্বের মূল্যজন্য কয়েক মাস হইতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে এবং যাঁহাদিগের নিকট গত বৎসরের মূল্য বাকী আছে, তাঁহাদিগকে আবার স্বতন্ত্র এক এক খানি পত্র লেখা হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় অনেকেই মূল্য দেওয়া দূরে থাকুক ভদ্রতানুসারে আমাদের পত্রের জবাব পর্য্যন্তও দিতেছেন না। আমাদের অপরাধ আমরা নিজের অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে কৃষিতত্ত্ব দিয়া আসিয়াছি। এবং মূল্যজন্য অতি বিনীতভাবে ভিক্ষুকের ন্যায় তাঁহাদিগের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিতেছি, তথাপি তাঁহারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। মূল্যদান সময়ে এরূপ গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করা যে কতদূর সঙ্গত তাহা তাঁহারা একবার বিবেচনা করিবেন। কাগজ লইয়া মূল্য না দেওয়া এ কলঙ্ক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে যার পর নাই লজ্জার বিষয়।"

দোষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একেবারে নহে, দোষ সম্পাদকের নিজের। যে পত্রিকা চাষার নিমিত্ত সম্পাদিত সে পত্রিকা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সমর্পণ করা বিষাদবি। সুতরাং গ্রাহকেরা পত্রিকা গ্রহণ করিবেন এবং রাগ করিয়া যে তাহার মূল্য কাটিবেন ইহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু একটা কথা বলি; উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটি না দিলে বড় ভাল হইত, পত্রিকার মর্য্যাদা রক্ষা হইত, গ্রাহকদেরও মর্য্যাদা থাকিত। এ বিজ্ঞাপন দিয়া কোন ফল নাই, কোন গ্রাহকই এরূপ বিজ্ঞাপন পড়েন না, পড়িয়াও লজ্জিত হন না, বা টাকা পাঠান না। তবে এরূপ বিজ্ঞাপন কেন? ইদানী বিস্তর পত্রিকায় এরূপ বিজ্ঞাপন দেখা যায়। তাহা না দেখিতে পাওয়া গেলেই ভাল।

আর এক কথা, কৃষিতত্ত্ব যাহাতে পঠিত হয় তাহার উপায় করা আবশ্যক। সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা পরে বলিব।

৯০ সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

আনন্দ মঠ।

দশম পরিচ্ছেদ।

সেই দশসহস্র সন্তান বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে বল্লম উন্নত করিয়া অতি দ্রুতবেগে তোপশ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। গোলাবৃষ্টিতে খণ্ড বিখণ্ড বিদীর্ণ উৎপতিত অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, তথাপি সন্তানসৈন্য ফেরে না। সেই সময়ে কাপ্তেন টমাসের আজ্ঞায় একদল সিপাহী বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া প্রবলবেগে সন্তানদিগের দক্ষিণপার্শ্বে আক্রমণ করিল। তখন দুইদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া সন্তানেরা একেবারে নিরাশ হইল। মুহূর্ত্তে, শত শত সন্তান বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ তোমারই কথা ঠিক আর বৈষ্ণবধ্বংসে প্রয়োজন নাই; ধীরে ধীরে ফিরি।"

ভব। এখন ফিরিবে কি প্রকারে? এখন যে পিছন ফিরিবে সেই মরিবে।

জীবা। সম্মুখে ও দক্ষিণপার্শ্ব হইতে আক্রমণ হইতেছে। বামপার্শ্বে কেহ নাই, চল অল্পে অল্পে ঘুরিয়া বামদিক্ দিয়া বেড়িয়া সরিয়া যাই।

ভব। সরিয়া কোথায় যাইবে? সেখানে যে অজয় নদী—নূতন বর্ষায় অজয় যে অতি প্রবল হইয়াছে। তুমি ইংরেজের গোলা হইতে পলাইয়া এই সন্তানসেনা অজয়ের জলে ডুবাইবে?

জীবা। অজয়ের উপর একটা পুল আছে আমার স্মরণ হইতেছে।

ভব। এই দশসহস্র সেনা সেই

পুলের উপর দিয়া পার করিতে গেলে এত ভিড় হইবে, যে বোধ হয় একটা তোপেই অবলীলাক্রমে সমুদায় সন্তান-সেনা ধ্বংস করিতে পারিবে।

জীব। এক কর্ম্ম কর, অল্পসংখ্যক সেনা তুমি সঙ্গে রাখ, এই যুদ্ধে তুমি যে সাহস ও চাতুর্য্য দেখাইলে তোমার অসাধ্য কাজ নাই! তুমি সেই অল্প-সংখ্যক সন্তান লইয়া সম্মুখ রক্ষা কর। আমি তোমার সেনার অন্তরালে অবশিষ্ট সন্তানগণকে পুল পার করিয়া লইয়া যাই, তোমার সঙ্গে যাহা রহিল তাহারা নিশ্চিত বিনষ্ট হইবে, আমার সঙ্গে যাহা রহিল তাহা বাঁচিলে বাঁচিতে পারিবে।

ভব। আচ্ছা, আমি তাহা করিতেছি।

তখন ভবানন্দ দুইসহস্র সন্তান লইয়া পুনর্ব্বার বন্দে মাতরং শব্দ উত্থিত করিয়া ঘোর উৎসাহসহকারে ইংরেজের গোলন্দাজসৈন্য আক্রমণ করিলেন। সেইখানে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তোপের মুখে সেই ক্ষুদ্র সন্তান-সেনা কতক্ষণ টিকে? ধানকাটার মত তাহাদিগকে ইংরেজেরা ভূমিশায়ী করিতে লাগিল।

এই অবসরে জীবানন্দ অবশিষ্ট সন্তান সেনার মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া বামভাগে কানন বেড়িয়া ধীরে ধীরে চলিল। কাপ্তেন টমাসের একজন সহযোগী লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসন দূর হইতে দেখিলেন, যে এক-সম্প্রদায় সন্তান ধীরে ধীরে পলাইতেছে, তখন তিনি একদল ফৌজদারী সিপাহী, একদল রাজার সিপাহী আর একদল গোরা লইয়া জীবানন্দের অনুবর্ত্তী হইলেন।

ইহা কাপ্তেন টমাস দেখিতে পাইলেন না। সন্তানসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান ভাগ পলাইতেছে দেখিয়া তিনি কাপ্তেন হে নামা একজন সহযোগীকে বলিলেন, যে "আমি দুই চারিশত সিপাহী লইয়া এই উপস্থিত ভগ্নবিদ্রোহীদিগকে নিহত করিতেছি, তুমি তোপগুলি ও অবশিষ্ট গোরা ও সিপাহী লইয়া উহাদের প্রতি ধাবমান হও, বামদিক্ দিয়া লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসন যাইতেছেন, দক্ষিণদিক্ দিয়া তুমি যাও। আর দেখ, আগে গিয়া পুলের মুখ বন্ধ করিতে হইবে; তাহা হইলে তিনদিক্ হইতে উহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া জালের পাখীর মত মারিতে পারিব। উহারা দ্রুতপদ দেশী ফৌজ, সর্ব্বাপেক্ষা পলায়নেই সুদক্ষ, অতএব তুমি উহাদিগকে সহজে ধরিতে পারিবে না, তুমি আগে অশ্বারোহীদিগকে একটু ঘুর পথে আড়াল দিয়া গিয়া পুলের মুখে দাঁড়াইতে বল, তাহা হইলে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে। কাপ্তেন হে তাহাই করিল।

অতি দর্পে হতা লঙ্কা। কাপ্তেন টমাস সন্তানদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া দুইশত মাত্র পদাতিক ভবানন্দের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রাখিয়া আর সকল হের সঙ্গে পাঠাইলেন। চতুর ভবানন্দ যখন দেখিলেন ইংরেজের তোপ সকলই গেল, সৈন্য সব গেল, যাহা অল্পই রহিল তাহা

সহজেই বধ্য, তখন তিনি নিজ হতাবশিষ্ট দলকে ডাকিয়া বলিলেন যে "এইকয় জনকে নিহত করিয়া জীবানন্দের সাহায্যে আমাকে যাইতে হইবে। আর একবার তোমরা জয় জগদীশ হরে বল।" তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানসেনা জয় জগদীশ হরে বলিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় কাপ্তেন টমাসের উপর লাফাইয়া পড়িল। সেই আক্রমণের উগ্রতা অল্পসংখ্যক ইংরেজ ও তৈলঙ্গীর দল সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা বিনষ্ট হইল। ভবানন্দ তখন নিজে গিয়া কাপ্তেন টমাসের চুল ধরিলেন। কাপ্তেন শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন,"কাপ্তেন সাহেব তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ? আইস—তোমার প্রাণদান দিলাম। আপাততঃ তুমি বন্দী। ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।" কাপ্তেন টমাস তখন ভবানন্দকে বধ করিবার জন্য সঙ্গীনসহিত একটা বন্দুক উঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভবানন্দ তাহাকে বাঘের মত ধরিয়াছিল, কাপ্তেন টমাস নড়িতে পারিলেন না। তখন ভবানন্দ অনুচরবর্গকে বলিল যে "ইহাকে বাঁধ।" দুই তিন জন সন্তান আসিয়া কাপ্তেন টমাসকে বাঁধিল। ভবানন্দ বলিল "ইহাকে একটা ঘোড়ার উপর তুলিয়া লও, চল উহাকে লইয়া আমরা জীবানন্দ গোস্বামীর আনুকূল্যে যাই।"

তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানগণ কাপ্তেন টমাসকে ঘোড়ার উপর বাঁধিয়া লইয়া বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

জীবানন্দের সন্তানসেনা ভগ্নোদ্যম, তাহারা পলায়নে উদ্যত। জীবানন্দ ও ধীরানন্দ, তাহাদিগকে বুঝাইয়া সংযত রাখিলেন, কিন্তু সকলকে পারিলেন না, কতকগুলি পলাইয়া আম্রকাননের আশ্রয় লইল। তাহারা যখন আম্রকাননে প্রবেশ করে, তখন গাছের উপর হইতে একজন বলিল, "গাছে উঠ! গাছে উঠ! নহিলে বনের ভিতর ঢুকিয়া ইংরেজ তোমাদিগকে মারিবে।" অস্তু সন্তানেরা গাছের উপর উঠিল।

গাছের উপর হইতে নবীনানন্দ গোস্বামী কথা কহিতেছিলেন। সকলে গাছে উঠিলে, নবীনানন্দ বলিলেন, "বন্দুক তৈয়ার রাখ—এখান হইতে আমরা নিরাপদে শত্রুসংহার করিব।" সকলে বন্দুক তৈয়ার রাখিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

লেপ্টনাণ্ট ওয়াটসন দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে আম্রকানন ঘেঁসিয়া চলিলেন। দুর্ব্বুদ্ধিই বা কি, জীবানন্দের দক্ষিণে কাপ্তেন হে যাইতেছে দেখিয়া ওয়াটসন মনে করিলেন যে, আমি ঠিক বামে গিয়া ঘেরিব, এই ভাবিয়া আম্রকানন ঘেঁসিয়া চলি-

লেন। তখন অকস্মাৎ দুড় দুড় দুড় দুড় শব্দে গাছের উপর হইতে তাঁহার সৈন্য-পৃষ্ঠে বন্দুকের গুলি পড়িতে লাগিল। লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসন তখন উপরে চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "আকাশ হইতে গুলি পড়ে না কি!" নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে একজন বলিল, "না সাহেব, আমরা গাছ থেকেই মারিতেছি, ঐখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গাছের উপর দুই চারিটা গুলি চালাও না।"

আর একজন বলিল, "সাহেব ঐখানে একটু দাঁড়াইয়া দেখ, শুনিয়াছি জীবানন্দ নাকি যীশুখ্রীষ্ট ভজিবে, ঐ আস্‌ছে।"

লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসন দেখিলেন বেগোছ, ইহাদিগের কিছু করিতে পারিব না। সৈন্যগণকে বলিলেন "তোমরা শীঘ্র অগ্রসর হও, একটু দূরে গেলে, গাছের বাঁদরে আর কামড়াইতে পারিবে না।"

তখন গাছের বাঁদরের বন্দুকের দৌড়ের বাহিরে সৈন্য লইয়া ওয়াটসন দ্রুতবেগে জীবানন্দের আক্রমণে চলিলেন।

শান্তি তখন গাছের উপর হইতে বলিল "ভাই বাঁদরের দল, একবার লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিয়া রাঙ্গামুখোদের বাঁদরের কামড়ের জ্বালাটা দেখাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।" শান্তি মনে মনে বলিতে লাগিল যে "যদি মেয়ে মানুষ না হইতাম তো"—সকলটুকু লিখিতে পারিলাম না। আগে নবীনানন্দ গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িল, সঙ্গে ঝুপ ঝাপ করিয়া বৃক্ষস্থ সকল সন্তান লাফাইয়া পড়িল, তখন নবীনানন্দ বলিলেন "ধীরে ভাই, ধীরে, মিলে মিসে, গোল কর না; সার বাঁধ, বন্দুক কাঁধে, বল্লম হাতে, ছুট! দৌড়! বল বন্দে মাতরং।" তখন বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে তাহারা লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের ব্যাটেলিয়নের উপর ধাবমান হইল।

শান্তি পিছাইয়া পড়িল—বলিল "ছি! কি করিতেছি? স্ত্রীলোক হইয়া যুদ্ধে যাই কেন? আমার ধর্ম্ম ত এ নয়! আমি গাছের বাঁদর গাছেই থাকি।" এই বলিয়া শান্তি ফিরিয়া আসিয়া গাছের উপর উঠিয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

জীবানন্দ প্রায় পুল পাইয়াছিল, কিন্তু দূর হইতে বন্দে মাতরং কানে গেল। জীবানন্দ বলিল "ভাই দূর হইতে বন্দে মাতরং শুনিতেছি, ভাই মরি মর্‌বো, পুলে কাজ নাই, চল একবার উহাদের সঙ্গে গিয়া বন্দে মাতরং গাই। ঐ যে দেখিতেছ লাল কাল জরদা সবুজ, ও পাঁচরঙা মুগের লাড়ু, উহাতে ফৌজদারী বাদসাহী ইংরেজী আছে, চল ভাই বৈষ্ণব সেবায় সব লাগাই।" জীবানন্দের সেনার আর প্রাণভয়ে পলান হইল না। বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে সেই হতাবশিষ্ট পঞ্চসহস্র সন্তানসেনা লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের দিকে ধাবমান হইল এবং বজ্রের মত লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের সেনার উপরে পড়িয়া তাহাদিগকে খণ্ড

বিখণ্ড করিল। একদিকে জীবানন্দের সৈন্য আর একদিকে নবীনানন্দের প্রেরিত সৈন্য দুই প্রবল তরঙ্গের আঘাতে দৃঢ়বল পর্ব্বততুল্য ইংরেজ সেনা ক্ষয়িত হইতে লাগিল। ক্ষয় হয় তবু ভাঙ্গেনা! ইংরেজের অতুল বল, অতুল সাহস, অতুল অধ্যবসায়। রাউণ্ডের পর রাউণ্ড, ফায়ারের পর ফায়ার, বৃষ্টির পর বৃষ্টি, মেঘের উপরে আরো মেঘ! পৃথিবী অন্ধকার হইল, গগন প্রতিধ্বনিতে বিদারিত হইতে লাগিল, কাননে ঝড় বহিল, পশু পক্ষী ভয়ে বিবরে লুকাইল, অন্তরে তুফান উঠিল। নবীনানন্দ বৃক্ষ হইতে ডাকিল "মার মার যবন মার। ঐ ওপাশে এই সেনার পরে জীবানন্দ আছে, যাও ফৌজদারী বাদসাহী ভেদ করিয়া যাও ভাই! মার মার ফৌজদারী মার।" তখন দক্ষিণ বামে বিদ্ধ হইয়া, আহত নিহত বিপ্লুত স্থানচ্যুত বিদ্রাবিত হইয়া লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের সেনা ছিন্ন ভিন্ন ভাবে দিখ্বিদিকে পলায়ন করিল। মাঝখানে জীবানন্দের দলে এবং নবীনানন্দের প্রেরিত দলে দেখা হইল। তখন শান্তি আর থাকিতে পারিল না "ছি! নারীজন্মেই ধিক্!" এই বলিয়া শান্তি আবার গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িল। যেখানে দুই বিজয়ী সন্তানসেনার সম্মিলন হইয়াছে সেই খানে কুরঙ্গীর ন্যায় শান্তি ছুটিয়া গিয়া উপস্থিত হইল। রণক্ষেত্রে মাঝখানে জীবানন্দে নবীনানন্দে দেখা হইল। দুইজনে দুইজনকে আলিঙ্গন করিল। যখন একটু অবসর পাইল তখন জীবানন্দ বলিল "শান্তি, আজ তোমার সমক্ষে মরিলে কি সুখ হইত!"

নবীনানন্দ বলিল "মরিবার এখনও সময় আছে, তুমি পুরুষ মানুষ তোমার তো বুদ্ধি শুদ্ধি নাই, মরিবার দরকার হলে আমায় বলিও, আমি পথ দেখাইয়া দিব; যাও দেখি যদি ঐ পথে মৃত্যু নামে অমূল্যনিধি খুঁজিয়া পাও।" এই বলিয়া শান্তি কাপ্তেন হের সৈন্য দেখাইয়া দিল, যাইবার সময়ে জীবানন্দের কানে কানে বলিয়া দিল, "আজ মরিতে পাইবে না। সত্যানন্দের আদেশ।"

তখন বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ অশ্বারোহণে সসৈন্যে কাপ্তেন হের প্রতি ধাবমান হইলেন। শান্তি বিষণ্ণমনে নারীজন্মকে ধিক্কার করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া গাছে উঠিয়া "গেছো মেয়ে" বলিয়া আপনার নিন্দা করিতে লাগিলেন। কাপ্তেন হেও দেখিলেন, যে যাহার পলায়ন অবরোধ করিবার জন্য যাইতেছিলেন, সেই স্বয়ং আমার সম্মুখে আসিতেছে। কাপ্তেন হে ফিরিয়া জীবানন্দকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহার অভিমুখী হইলেন। যেমন দুইটী পর্ব্বতনিঃসৃত নদী বিপরীত দিক্ হইতে আসিয়া এক উপত্যকার এক গহ্বরে পরস্পরকে প্রহত করে—উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালার ফেণনিচয় আকাশে প্রেরিত করে, শব্দে পর্ব্বতকন্দর বিদীর্ণ করে, তেমনি হেও জীবানন্দের সেনাদ্বয় তুমুল

সংগ্রামের সংঘর্ষণে সংঘর্ষিত হইল। জয় পরাজয় নাই, শত শত প্রাণী নিহত হইতেছে, একবার ইংরেজসেনা "hurrah" বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া শত শত বৈষ্ণব দলিত করিতেছে, আবার "কলয়সি করবালং" বলিয়া সন্তানের দল ইংরেজের সেনাদলকে দলিত করিতেছে। জয় পরাজয় নাই, কি হয় বলা যায় না। কাপ্তেন হের কাছে ইংরেজের বাছা বাছা সেনা, বিশেষ গোরা, অনেক—পরাজয় কাহাকে বলে তাহারা ইউরোপে বা ভারতবর্ষে কখনও তা জানে না। প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরশ্রেণীবৎ তাহারা স্থির দাঁড়াইয়া রহিল। সন্তানেরা যত উদ্যম করিল কিছুতেই গোরার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পারিল না। তাহারা শত শত সন্তান নিহত করিতেছে কিন্তু এক পদ পশ্চাদ্গামী হয় না।

ইংরাজের ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তাহাদের তোপগুলি দক্ষিণে আসিয়া পৌঁছিল। তখন সন্তানের দল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইল, জয়ের আর কোন আশা রহিল না। সন্তানেরা যে যেখানে পাইল পলাইতে লাগিল। জীবানন্দ ধীরানন্দ তাহাদিগের সংযত এবং একত্রিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না। সেই সময়ে উচ্চৈঃশব্দ হইল "পুলে যাও পুলে যাও! ওপারে যাও। নহিলে অজয়ে ডুবিয়া মরিবে, ধীরে ধীরে ইংরেজসেনার দিকে মুখ রাখিয়া পুলে যাও।"

জীবানন্দ চাহিয়া দেখিল সম্মুখে ভবানন্দ। ভবানন্দ বলিল "জীবানন্দ পুলে লইয়া যাও, রক্ষা নাই।" তখন ধীরে ধীরে পিছে হটিতে হটিতে সন্তানসেনা পুলের দিকে চলিল। পুল নিকটেই ছিল। কিন্তু পুল নিকটে পাইয়া বহুসংখ্যক সন্তান একেবারে পুলের ভিতর প্রবেশ করায় ইংরেজের তোপ সুযোগ পাইল। পুল একেবারে ঝাঁটাইতে লাগিল। সন্তানের দল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ভবানন্দ জীবানন্দ ধীরানন্দ একত্র। একটা তোপের দৌরাত্ম্যে ভয়ানক সন্তানক্ষয় হইতেছিল। ভবানন্দ বলিল, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, এস তরবারি ঘুরাইয়া আমরা তিন জন এই তোপটা দখল করি। তখন তিন জনে তরবারি ঘুরাইয়া সেই তোপের নিকবর্ত্তী গোলন্দাজ সেনা বধ করিল। তখন আর আর সন্তানগণ তাহাদের সাহায্যে আসিল। তোপটা ভবানন্দের দখল হইল। তোপ দখল করিয়া ভবানন্দ তাহার উপর উঠিয়া বসিল। করতালি দিয়া বলিল "বল বন্দে মাতরং।" সকলে গায়িল "বন্দে মাতরং।" ভবানন্দ বলিল, "জীবানন্দ এই তোপ ঘুরাইয়া বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ার করি।" সন্তানেরা সকলে ধরিয়া তোপ ঘুরাইল। তখন তোপ উচ্চৈঃনাদে বৈষ্ণবের কর্ণে যেন হরি হরি শব্দে ডাকিতে লাগিল। বহুতর সিপাহী তাহাতে মরিতে লাগিল। ভবানন্দ সেই তোপ টানিয়া আনিয়া পুলের মুখে স্থাপন

করিয়া বলিল "তোমরা দুই জনে সন্তান-সেনা সারি দিয়া পুল পার করিয়া লইয়া যাও আমি একা এই বূহমুখ রক্ষা করিব —তোপ চালাইবার জন্য আমার কাছে জন কয় গোলন্দাজ দিয়া যাও।" কুড়ি জন বাছা বাছা সন্তান ভবানন্দের কাছে রহিল।

তখন অসংখ্য সন্তান পুল পার হইয়া জীবানন্দ ও ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে সারি দিয়া পরপারে যাইতে লাগিল। একা ভবানন্দ কুড়িজন বৈষ্ণবের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিল—কিন্তু ইংরেজসেনা জলোচ্ছ্বাসোত্থিত তরঙ্গের ন্যায়! তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ!—ভবানন্দকে সংবেষ্টিত, উৎপীড়িত, নিমগ্নের ন্যায় করিয়া তুলিল। ভবানন্দ অশ্রান্ত, অজেয়, নির্ভীক—কামানে কামানে শব্দে শব্দে কতই সেনা বিনষ্ট করিতে লাগিল। ইংরেজ বাত্যাপীড়িত তরঙ্গাভিঘাতের ন্যায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে লাগিল কিন্তু কুড়ি জন সন্তান, তোপ লইয়া পুলের মুখ বন্ধ করিয়া রহিল। তাহারা মরিয়াও মরে না—ইংরেজ পুলে ঢুকিতে পায় না। সে বীরেরা অজেয়, সে জীবন অবিনশ্বর। অবসর পাইয়া দলে দলে সন্তানসেনা অপরপারে গেল। আর কিছু কাল পুল রক্ষা করিতে পারিলেই সন্তানেরা সকলেই পুলের পারে যায়—এমন সময়ে কোথা হইতে নূতন তোপ ডাকিল—"গুড়ুম্ গুড়ুম্ বুম্ বুম্।" উভয়দল কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল—কোথায় আবার কামান! দেখিল, বনের ভিতর হইতে কতকগুলি কামান দেশী গোলন্দাজ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নির্গত হইতেছে। নির্গত হইয়া সেই বিরাট কামানের শ্রেণী সপ্তদশ মুখে ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া হে সাহেবের দলের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিল। ঘোর শব্দে বন নদ গিরি সকলই প্রতিধ্বনিত হইল। সমস্ত দিনের রণে ক্লান্ত ইংরেজের সেনা প্রাণভয়ে সিহরিল। অগ্নিবৃষ্টিতে তৈলঙ্গী, মুসলমান, হিন্দুস্থানী পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল গোরা খাড়া দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিল।

ভবানন্দ রঙ্গ দেখিতেছিল। ভবানন্দ বলিল, "ভাই, ইংরেজ ভাঙ্গিতেছে, চল এক বার উহাদিগকে আক্রমণ করি।" তখন পিপীলিকাস্রোতোবৎ সন্তানের দল, নূতন উৎসাহে পুল পারে ফিরিয়া আসিয়া ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা ইংরেজের উপর পড়িল। ইংরেজ যুদ্ধের আর অবকাশ পাইল না—যেমন ভাগীরথী গঙ্গা সেই দম্ভকারী বৃহৎ পর্ব্বতাকার মত্ত হস্তীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সন্তানেরা তেমনি ইংরেজদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। ইংরেজেরা দেখিল পিছনে ভবানন্দের পদাতিক সেনা, সম্মুখে মহেন্দ্রের কামান। তখন হে সাহেবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। আর কিছু টিকিল না—বল,

বীর্য্য, সাহস, কৌশল, শিক্ষা, দম্ভ সকলই ভাসিয়া গেল। ফৌজদারী, বাদসাহী, ইংরেজী, দেশী, বিলাতী, কালা গোরা সৈন্য নিপতিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ইংরেজের দল পলাইল। মার মার শব্দে জীবানন্দ, ভবানন্দ, নবীনানন্দ, ইংরেজসেনার পশ্চাতে ধাবমান হইল। ইংরেজের সব তোপ বৈষ্ণবেরা কাড়িয়া লইল, অসংখ্য ইংরেজ ও সিপাহী নিহত হইল। সর্ব্বনাশ হইল দেখিয়া কাপ্তেন হে ও ওয়াটসন ভবানন্দের নিকট বলিয়া পাঠাইল "আমরা সকলে তোমাদিগের নিকট বন্দী হইতেছি আর প্রাণিহত্যা করিও না।" জীবানন্দ ভবানন্দের মুখপানে চাহিল, ভবানন্দ মনে মনে বলিল "তা হইবে না, আমায় যে আজ মরিতে হইবে।" তখন ভবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে হস্তোত্তোলন করিয়া হরিবোল দিয়া বলিল "মার মার।"

আর আর প্রাণী বাঁচিল না—শেষ এক স্থানে ৫০।৬০ জন গোরা সৈন্য একত্রিত হইয়া আত্মসমর্পণে কৃতনিশ্চয় হইয়া অতি ঘোরতর রণ করিতে লাগিল। জীবানন্দ বলিল "ভবানন্দ আমাদের রণজয় হইয়াছে, আর কাজ নাই, এই সাগরতুল্য সৈন্যের মধ্যে এই কয়জন ব্যতীত আর কেহ জীবিত নাই। উহাদিগকে প্রাণদান দিয়া চল আমরা ফিরিয়া যাই।" ভবানন্দ বলিল "একজন জীবিত থাকিতে ভবানন্দ ফিরিবে না—জীবানন্দ তোমায় দিব্য দিয়া বলিতেছি, যে তুমি তফাতে দাঁড়াইয়া দেখ একা আমি এই ৫০ জন ইংরেজকে নিহত করি।"

কাপ্তেন টমাস অশ্বপৃষ্ঠে নিবদ্ধ ছিলেন। ভবানন্দ আজ্ঞা দিলেন "উহাকে আমার সম্মুখে রাখ, আগে ঐ বেটা মরিবে তবে তো আমি মরিব।"

কাপ্তেন টমাস বাঙ্গালা বুঝিত, বুঝিয়া ইংরেজসেনাকে বলিল "ইংরেজ! আমি তো মরিয়াছি, প্রাচীন ইংলণ্ডের নাম তোমরা রক্ষা করিও, তোমাদিগকে খ্রীষ্টের দিব্য দিতেছি, আগে আমাকে মার তার পরে এই বিদ্রোহী কাফ্‌রিকে মার।

ভোঁ করিয়া একটী বুলেট ছুটিল, একজন আইরিসম্যান কাপ্তেন টমাসকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়িয়াছিল। ললাটে নিবিদ্ধ হইয়া কাপ্তেন টমাস প্রাণত্যাগ করিল। ভবানন্দ তখন ডাকিয়া বলিলেন "আমার ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে, কে এমন পার্থ বৃকোদর নকুল সহদেব আছ যে এসময়ে আমায় রক্ষা করিবে। দেখ বাণাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গোরা আমার উপর ঝুকিয়াছে, আমি মরিবার জন্য আসিয়াছি, আমার সঙ্গে মরিতে চাও এমন সন্তান কি কেহ আছ।"

আগে ধীরানন্দ অগ্রসর হইল, পিছে জীবানন্দ—সঙ্গে সঙ্গে আর ১০।১৫।২০।৫০ জন বৈষ্ণব আসিল। ভবানন্দ ধীরানন্দকে দেখিয়া বলিল "তুমিও যে আমাদের সঙ্গে মরিতে আসিলে?"

ধীর। কেন, মরা কি কাহারও ইজারা

মহল নাকি ? এই বলিতে বলিতে ধীরানন্দ একজন গোরাকে আহত করিলেন।

ভব। তা নয়। কিন্তু মরিলে ত স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করিতে পারিবে না!

ধীর। কালিকার কথা বলিতেছ? এখন বুঝ নাই ? (ধীরানন্দ আহত গোরা বধ করিলেন।)

ভব। না—(এই সময়ে একজন গোরার আঘাতে ভবানন্দের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইল।)

ধীর। আমার সাধ্য কি যে তোমার ন্যায় পবিত্রাত্মাকে সে সকল কথা বলি। আমি সত্যানন্দের প্রেরিত চর হইয়া গিয়াছিলাম।

ভব। সে কি? মহারাজের আমার প্রতি অবিশ্বাস ? (ভবানন্দ তখন এক হাতে যুদ্ধ করিতেছিলেন।) ধীরানন্দ, তাঁহাকে রক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, "কল্যাণীর সঙ্গে তোমার যে সকল কথা হইয়াছিল তাহা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন।"

ভব। কি প্রকারে ?

ধীর। তিনি তখন স্বয়ং সেখানে ছিলেন। সাবধান থাকিও! (ভবানন্দ একজন গোরা কর্তৃক আহত হইয়া তাহাকে প্রত্যাহত করিলেন।) তিনি কল্যাণীকে গীতা পড়াইতেছিলেন এমত সময় তুমি আসিলে। সাবধান! (ভবানন্দের বাম বাহুও ছিন্ন হইল।)

ভব। আমার মৃত্যুসম্বাদ তাঁহাকে দিও! বলিও আমি অবিশ্বাসী নহি।

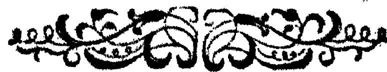
ধীরানন্দ বাষ্পপূর্ণলোচনে, যুদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন "তাহা তিনি জানেন। কালি রাত্রির আশীর্ব্বাদ বাক্য মনে কর। আর আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, 'ভবানন্দের কাছে থাকিও। আজ সে মরিবে। মৃত্যুকালে তাহাকে বলিও আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, পরলোকে তাহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইবে।'"

ভবানন্দ বলিলেন "সন্তানের জয় হউক, ভাই! আমার মৃত্যুকালে একবার বন্দে মাতরং শুনাও দেখি।"

তখন ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে যুদ্ধোন্মত্ত সকল বৈষ্ণব মহাতেজে বন্দে মাতরং গায়িল। তাহাতে তাহাদিগের বাহুতে দ্বিগুণ বলসঞ্চার হইয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে অবশিষ্ট গোরাসৈন্য নিহত হইল। রণক্ষেত্রে আর শত্রু রহিল না।

সেই মুহূর্ত্তে ভবানন্দ মুখে বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে, মনে বিষ্ণুপদ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

হায়! রমণীরূপ লাবণ্য! ইহ সংসারে তোমাকেই ধিক!



মেঘনাদবধ কাব্যসম্বন্ধে কয়টী কথা।

"মেঘনাদবধ কাব্যের" প্রকৃত সমালোচনা আজিও হইল না। অথচ এই রূপকপ্রিয় দেশে, কোন লেখক যদি অধুনাতন বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া "ভগবান্ মরীচিমালীর" সহিত ইহার উপমা দিবার লোভটুকু সম্বরণ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে মনে করিতে হইবে যে, "মেঘনাদই" বঙ্গের "প্রদীপ্ত প্রভাত তারা।" যিনি বাঙ্গালিকে "মেঘনাদবধ কাব্য" বুঝাইতে সক্ষম, তিনি বুঝাইলেন না। ভরসা ছিল, বঙ্কিমবাবু একবার সে প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু তিনি বুঝি আর তাহা করিলেন না। কে তবে এই গুরুতর ব্রতগ্রহণ করিবে? প্রবন্ধলেখকের সে উদ্যম বুঝি কেবল ধৃষ্টতামাত্র। তবে কথা এই যে, "মেঘনাদবধের" রীতিমত সমালোচনার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিতেছি না।

হিন্দুসন্তানমাত্রই রামায়ণের উপাখ্যানভাগের সহিত সুপরিচিত। রামের মহত্ত্ব, তাঁহাদের চরিত্রের বীরদর্প; জগতে অতুলনীয়া, দোষমাত্রপরিশূন্যা সীতার কমনীয়তা, তাঁহার পতিভক্তি; লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, সেই বীরপুরুষের চিরোজ্জ্বল, নিঃস্বার্থপর বীরভাব;—সংক্ষেপতঃ রামায়ণের সেই স্বর্গীয়ভাব, বাল্যকালাবধি হিন্দুসন্তান অনুদিন হৃদয়ে ধারণ করেন। আর সেই সঙ্গে রাবণের বংশাবলীর উপর আমাদের কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া যায়। কবির "সৌধকিরীটিনী" লঙ্কা পাঠকের চক্ষে ভাসিতে থাকে, কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় না। লঙ্কার কথা মনে আসিলে নরভুক্ রাক্ষসের ভীষণ পাপাচার সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মনে পড়ে। আর সেই অশোকবনে, চেড়ীদলবেষ্টিতা, চিরলোকমোহিনী, জনকনন্দিনীর চিত্র মনে করিয়া তিনি ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় অশ্রুবর্ষণ করেন। ইহাই রামায়ণ! অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে রামায়ণ ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। "মেঘনাদবধ কাব্য" রামায়ণ মহাবৃক্ষের পল্লব মাত্র লইয়া রচিত। কিন্তু যেমন কেন পাঠক হউন না, "মেঘনাদবধ" পাঠকালে তাঁহার মনে হইবে, যাহা রামায়ণে নাই, মেঘনাদে তাহা পড়িতেছি। "মেঘনাদের" রাক্ষসকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় না;—সে ভাবই মনে আসে না। প্রতি পদে যেন "জগতের অলঙ্কার" লঙ্কার প্রতি সহানুভূতি হয়। কবি নিজেই বন্ধুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "People here grumble and say that the heart of the poet in মেঘনাদ" is with the Rakshasas! And that is the real truth." অর্থাৎ

এ দেশের লোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া থাকে যে মেঘনাদবধ কাব্যে কবির মনের টান রাক্ষসদের প্রতি। বাস্তবিকও তাহাই বটে।" জানিয়া শুনিয়া কবি হিন্দুসন্তানের চিরাচরিত সংস্কারস্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইতেছেন! আপাততঃ ইহা বড় বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভাবুক দেখিবেন, এই প্রভেদই মেঘনাদবধকাব্যের বীজ।

আবার রামায়ণের সেই রাবণকে মনে কর!—যেন প্রলয়ের স্থানচ্যুতগ্রহ, মিল্টনের সেই সয়তানতুল্য!—নরকে রাজ্য করিবে সেও ভাল; তথাপি স্বর্গের দ্বিতীয় অধীশ্বর হইতে চাহে না! এ দৃশ্য অনন্ত গাম্ভীর্য্যময় বটে, কিন্তু কেমন ভয়ানক! আর "মেঘনাদবধের" রাবণ? কতকটা ভক্তি প্রীতির আধার! তিনি নিজহৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, সেতুনিগড়বদ্ধ, চিরকল্লোলময়, চিরস্বাধীনতাময় সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া, তীব্র ব্যঙ্গের লহরী তুলিয়া বলেন—

"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায় এই কি হে তোমার ভূষণ
রত্নাকর?"

যখন পুত্রশোকাতুরা, অভিমানিনী, সাধ্বী চিত্রাঙ্গদা দৃপ্ত বাক্যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

"হায় নাথ, নিজ কর্ম্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলে আপনি!"

তখন "মহামন্ত্র বলে" নম্রমুখ ফণীর মত রাবণ নতমুখে তাহা শুনিয়াছিলেন!—যেন নিরুত্তরে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। রামায়ণের রাবণ তাহা পারিতেন কি? অসভ্যাবস্থায় দুর্ব্বৃত্ত নর যেমন নারীমাত্রকে জঘন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরই নিদান মাত্র মনে করে, রামায়ণের রাবণ সেই প্রকৃতির। "মেঘনাদবধের" রাবণ কতকটা ভক্তি ও প্রীতির আধার। যখন ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসম্বাদ দিয়া রক্ষোদূতবেশী বিরূপাক্ষচর অদৃশ্য হইলেন, স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূর্ণ হইল,

"দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী
ভীষণ ত্রিশূল ছায়া"

তখন মর্ম্মপীড়িত লঙ্কেশ্বর প্রণাম করিয়া ভক্তি গদগদস্বরে বলিয়াছিলেন,—শুনিলে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না,—বলিয়াছিলেন,

"এত দিনে প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার? এ মায়া হায় কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব হে সর্ব্বজ্ঞ; পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে, ও রাজীবপদে!"

ফলতঃ "মেঘনাদবধ কাব্যের" রাবণকে দেখিলে, রামায়ণের সেই রাবণ বলিয়া বড় একটা চেনা যায় না। "মেঘনাদের" রাবণ,—যেন মানুষ অনেক শোক পাইয়া ধৈর্য্যলাভ করিয়াছে;—দুর্ব্বৃত্ত যুবক যেন কতক ঠেকিয়া, কতক

বুঝিয়া শান্ত হইয়াছে! বলা বাহুল্য যে, অলৌকিক চরিত্র কল্পনাস্থলেও কবি কিয়ৎপরিমাণে মানবচরিত্রের অনুকরণ করিতে বাধ্য! আর অবস্থাবৈষম্যেও একই চরিত্রের যে উত্থান, পতন হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, একথা মনে রাখিলে, ভরসা করি, কেহ কেহ রাবণকে কেবলমাত্র "ফোঁসম সে ফুলসন" বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না।

আমরা যাহা বুঝাইতে চাই, তাহাতে রাবণচরিত্রের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে সে চরিত্রকে রামায়ণেতর চরিত্র করিয়া গড়িবার যে তাৎপর্য্য আছে তাহা বুঝাইবার জন্যই এ প্রয়াস পাইলাম। ভাবুক দেখিতে পাইবেন যে কাব্যমধ্যে এই চরিত্রের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। আমাদের মুখ্য প্রয়োজন ইন্দ্রজিতের চরিত্র লইয়া। একবার তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম করিয়া দেখি।

প্রথম সর্গে ধাত্রীর মুখে লঙ্কার বিপদবার্ত্তা শুনিয়া মেঘনাদ বীরের যোগ্যভাবে বিলাসশয্যা ত্যাগ করিলেন;—ক্রোধে সে কুসুম দাম ছিঁড়িলেন! বলিলেন।

"ধিক্ মোরে।
হা ধিক্ মোরে! বৈরীদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদলমাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"

মেঘনাদের পিতৃভক্তি বড় সুন্দর! তাঁহার বীরভাব যেমন সঙ্গত, তেমনি সরল! এতদিন তিনি নিশ্চিন্ত মনে, প্রমোদ-উদ্যানে পত্নীসহবাসে আমোদনিরত ছিলেন। পিতার আকস্মিক বিপদবার্ত্তায় অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু বিপদ তিনি তৃণ জ্ঞান করেন! সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন,—

"হে রক্ষকুল পতি,
শুনেছি, মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব। এ মায়া, পিতঃ বুঝিতে না পারি!
কিন্তু অমনুতি দেহ, সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

ইন্দ্রজিতের তেজস্বিতা তড়িৎতরঙ্গের মত হৃদয়ে প্রবেশ করে। এই দেখুন—

"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুইবার আমি হারানু রাঘবে;
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"

ইন্দ্রজিতের মাতৃভক্তি হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে! পুত্রবৎসলা মন্দোদরী কিছুতেই যুদ্ধার্থ মেঘনাদকে বিদায় দিবেন না। রামের দৈববল সৈন্যবলের উল্লেখ করিয়া যুদ্ধযাত্রার অবৈধতা প্রতিপন্ন করিলেন। বিপদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া রক্ষোমহিষী বিদায়ার্থী পুত্রের সম্মুখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। এ সংসারে বীর যিনি, তিনি বুঝি সকলই সহিতে

পারেন, কিন্তু মাতার, মাতৃভূমির রোদন সহিতে পারেন না। এ সংসারে ক্ষণজন্মা বীরবর সেকন্দরসাকে কখন মাতৃভূমির রোদন শুনিতে হয় নাই, কিন্তু তিনি মাতার অশ্রু সহিতে পারেন নাই। কুমার কাতর হইলেন, কিন্তু যুদ্ধে না গেলে নহে।—বলিলেন,

"কি সুখ ভুঞ্জিব
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে!
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে?
বিখ্যাত রাক্ষসকুল, দেব দৈত্য নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে দেবি! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি মা রাববি
ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে শুনিলে এ কথা
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে
যাইব সমরে মাতঃ, নাশিব রাঘবে!
ওই শুন কুজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস দলে পশিব সমরে
আপন মন্দিরে দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদরাজীবযুগ, সমরবিজয়ী।
পাইয়াছি পিতৃআজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি!
কে আঁটিবে দাসে,দেবি,তুমি আশীষিলে।"

এ বীরত্ব, এই পিতৃ মাতৃ ভক্তি পত্নীর প্রণয়ে আরও মধুময় হইয়াছে। মেঘনাদের পত্নীবাৎসল্য প্রেমের আদর্শ-স্থল। তাহার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়। ঊষাসমাগমে কুঞ্জবনগীতে, কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। প্রমীলা তখনও নিদ্রিতা।—

"প্রমীলার করপদ্ম, করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র মধুর স্বরে, হায়রে যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখিকুল! মীল প্রিয়ে, কমললোচন!
উঠ চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি
সম এ পরাণকান্তে; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি, তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়নতারা! মহার্ঘ রতন।
উঠি দেখ, শশীমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরী করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!"

আবার,—তখন প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে—

"পোহাইল এতক্ষণে তিমির সর্ব্বরী;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি কমলিনী,
জুড়াতে এ চক্ষুদ্বয়?"

প্রমীলাকে, রক্ষোমহিষী ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যজ্ঞাগারে যাইতে দিলেন না। পুত্রের বিরহে, পুত্রবধূর মুখ দেখিয়াও তপ্তপ্রাণ শীতল করিবেন। তবু প্রমীলা আর একবার স্বামীকে নির্জ্জনে না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। মেঘনাদ "ধীরে ধীরে,"

"কুসুম বিবৃত পথে যজ্ঞশালামুখে" যাইতেছিলেন! "ধীরে ধীরে," কেন না

তখন প্রমীলার চারুমূর্ত্তি হৃদয়ে তাঁহার জাগিতেছিল। এমন সময়ে,

"সহসা নূপুরধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিতময়ী, প্রণয়ীর কানে
প্রণয়িনী পদশব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহুপাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা
প্রমীলারে।"

ইন্দ্রজিতের দেবভক্তি,—তাহাও বড় উন্নত। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তিনি ধ্যানে মগ্ন।—দেববৈশ্বানর সশরীরে আবির্ভূত হইয়া বর দিবেন, কথা আছে। এমন সময়ে লক্ষ্মণ মায়াবলে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন। কুমার নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন মূর্ত্তি চিরশত্রু লক্ষ্মণের!—কিন্তু দেবতায় তাঁহার অটল ভক্তি,—

"সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর কৃতাঞ্জলিপুটে
কহিলা।"

আবার যখন মূর্ত্তিমান্ অন্যায় যুদ্ধের ফলে মেঘনাদ অন্তিমশয্যায় শয়ান, প্রাণ দেহবিচ্যুত হইতে আর বড় দেরি নাই, তখন তাঁহাকে দেখ! তখনও দেবতায় তাঁহার ভক্তি অটল! নিজের পাপের ফলে এ শাস্তি হইল ইহাই তাঁহার ধারণা হইল, তথাপি বিধাতার ন্যায়-শাসনে সন্দেহ জন্মিল না!

"দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?"

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের সেই অপূর্ব্বদৃশ্য আমূল উদ্ধৃত করিতে পারিলে তবে মেঘনাদচরিত্রের পূর্ণতা বুঝাইতে পারি। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। আমরা জানি সে অংশ কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে অনল অক্ষরে মুদ্রিত আছে।

সংসারে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু উন্নত,যাহা কিছু সুন্দর সেই উপকরণেই ইন্দ্রজিতের দেবোপম চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে। সৌন্দর্য্য লইয়াই কাব্য;—ইন্দ্রজিতের চরিত্র অনন্ত সৌন্দর্য্যময়! সে হৃদয় যাহার সে যদি মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ না করিবে, তবে মানবহৃদয়ের মহত্ত্ব কি? তাই যখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, আত্মাভিমানমাত্র সহায় করিয়া অসহায়, নির্ভীক ইন্দ্রজিৎ আত্মচরিত্রের সর্ব্ববিধ বীরদর্প দেখাইয়া আসন্ন মৃত্যুকে উপহাস করে, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। দেবতাদিগকেও ভাল লাগে না;—তাঁহাদের কার্য্য কাপুরুষের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়! সকল ভুলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়;—মেঘনাদের বীর দর্প; সে চরিত্রের অতুলিত সৌন্দর্য্য!

রামায়ণের মেঘনাদবধে পাঠকের মনে আনন্দ হয়।—মনে হয় অশ্রুদুঃখিনী সীতার উদ্ধারের তবে আর বড় বিলম্ব নাই! কিন্তু 'মেঘনাদ বধ কাব্যের' মেঘনাদের অন্যায়মৃত্যুতে কে চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারে? 'অন্যায় মৃত্যু?' সে আবার কি! রামায়ণ পাঠকালে সে কথা ত মনেই হয় না! সে অন্যায় বোধ, সে দুঃখে সহানুভূতি

কেবল 'মেঘনাদ বধ' পাঠকালেই হয়! ইহার অর্থ কি?

এতক্ষণে বোধ হয় আলোক দেখিতে পাইলাম। যে মহাবিষ বৃক্ষ শেষে বিপুল রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়াছিল, তাহার বীজ উপ্ত করিয়াছিল কে? রাবণ! তাহার দণ্ড হউক, সেই ত ন্যায়ানুগত। কিন্তু একের দোষে অন্যে মরে কেন? সর্ব্বগুণাধার মেঘনাদ পিতৃদোষে অকালে, অপঘাতে মরিল কেন?

'প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা মাতা ভ্রাতা
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে
স্বর্ণলঙ্কা অলঙ্কার!'

তাই বলিতেছিলাম যে এতক্ষণে বুঝি আলোক দেখিতে পাইলাম। পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, ইহা পুরাণ কথা; কিন্তু ইহাই 'মেঘনাদবধ কাব্যের' বীজ, নহিলে মেঘনাদকে সকল গুণের আধার করিয়া গড়িবার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। চিরাচরিত সংস্কারস্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইবার নহিলে অন্য অর্থ নাই।

এক কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম বটে কিন্তু কথাটা বোধ করি পরিষ্কার হইল না। আমাদের বাহ্য ও অন্তর্জগতের জ্ঞান বড় সঙ্কীর্ণ, তাই আমরা কাব্যে যে নীতি উপদেশ দিতে চাই তাহাও সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে কাব্যের ন্যায় পরতা বা Poetica justice এইরূপ সঙ্কীর্ণতার ফল। উন্নত জ্ঞানে মনুষ্য দিন দিন বুঝিতে পারিতেছে যে যে সকল নিয়মে জড় জগৎ শাসিত, নিয়মিত সংযমিত হয়, অন্তর্জগৎ অবিকল তাহাদেরই অনুবর্ত্তন করে। মনের মাধ্যাকর্ষণ কি, আজি জানিনা, ঠিক্ করিয়া বলিতে পারি না বটে, কিন্তু এমন দিন আসিবে, যখন তাহা আর হাসির কথা থাকিবে না। প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি এমন অনেক কথা মানেন, এমন অনেক তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করেন যাহা তোমার আমার ধারণায় আইসে নাই—কাজেই না হাসিলে চলিবে কেন? পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, ইহা আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত কিম্বদন্তী কিন্তু এটা কি কেবল কথার কথা মাত্র, না কিছু সত্য ইহাতে আছে। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে নিয়ম ভিন্ন কথা নাই। সামান্য নীহারকণা, যে শষ্পোপরি ভানুরশ্মি মাখিয়া মুহূর্ত্তে মিশিয়া যায়, সে যেমন নিয়মের অধীন; অনন্ত শূন্যে অনন্ত পরিমিত অনন্ত সৌর জগৎমণ্ডলী তেমনি নিয়মেরই অধীন।—সর্ব্বত্র নিয়ম! তুমি কবি;—শরতের চাঁদকে অকস্মাৎ জলদাবৃত হইতে দেখিলে ব্যথিত হও; প্রবল বাত্যায় সুকুমার তরুকে ধরাশায়ী হইতে দেখিলে অশ্রু বিসর্জ্জন কর; তোমার মনে হয় যে এ বড় অবিচার! অবিচার হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিয়ম। জড় জগৎ কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। ইহার শক্তিবিশেষ যখন আপন প্রভাব বিস্তার

করে,তখন ইহার গন্তব্য পথে কেহ দাঁড়াইও না। দাঁড়াইও না!—দাঁড়াইলে নিয়তিচক্রের পদতলে মথিত হইয়া যাইবে! বিজ্ঞান নিত্য এই কথা বলে; ইতিহাসও অহর্দিন এই মহাতত্ত্ব কীর্ত্তন করে, "মেঘনাদ বধ" কাব্যেরও বীজ এই তত্ত্ব! সৌন্দর্য্যসার মেঘনাদ দেবদুর্ল্লভ গুণে তোমার আমার আরাধ্য! সর্ব্বজ্ঞ কবির অপূর্ব্ব, অতুল্য, মোহময় সৃষ্টি! সত্য বটে।—কিন্তু যে অজেয় শক্তি রক্ষোবংশ ধ্বংস করিতে আসিয়াছিল, তিনি সেই চক্রে মথিত হইলেন। এজগতে ইহাই নিয়ম—ইহাই সত্য! এ সত্যের ব্যভিচার নাই।

বলিয়াছি ত যে জড় জগৎ বল, অন্তর্জগৎ বল; দুইই এক শক্তির আধার। শক্তি এক, তবে মূর্ত্তি বিভিন্ন। যে ভয়ানক শক্তির উচ্ছ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তাহার নাম জড়শক্তি; আর যে অদম্য শক্তি রোমরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল, আজি রুসিয়া সাম্রাজ্যে বিষবীজ বপন করিয়াছে, তাহা অন্তঃশক্তি!—শক্তি এক, তবে মূর্ত্তি বিভিন্ন। নামও বিভিন্ন!—এক প্রলয়, অন্য বিপ্লব! তবে সান্ত্বনার কথা এই যে অন্তর্জগতের শক্তিবিশেষের বীজ রোপণ করা মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। জড়শক্তি সম্বন্ধে তেমন কিছু আছে কি না, আজও মনুষ্য জ্ঞানে তাহা প্রতিভাত হয় নাই। কিন্তু যে শক্তিই বল, একবার বিকাশ হইলে তাহার বেগ অসহ্য, অপ্রতিহত! সাধ্যপক্ষে কেহ সে পথে দাঁড়াইও না! সাবধান! বিষবীজ রোপণ করিও না; কুশক্তিপ্রয়োগের কারণ হইও না! তোমার কার্য্যের ফলভোগী তুমি একা নও। তোমার সৃষ্ট শক্তিতে, তোমার বংশপরম্পরা ভাসিয়া যাইবে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদীরও সেই কথা। একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বুঝিয়া দেখ কথা এক। সুতরাং স্বতঃ না হউক পরতঃ 'মেঘনাদবধ কাব্য' অদৃষ্টবাদের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রণীত হইয়াছে। জগতের অধিকাংশ অমর কাব্যের এই তত্ত্বই মেরুদণ্ড।

'মেঘনাদ বধ কাব্যের' জ্ঞানময় কবি প্রমীলাচরিত্রে কয়েকটী গুরুতর নৈতিক তত্ত্ব নিহিত রাখিয়াছেন। সে গুলি স্বতঃ সুন্দর এবং লোকহিতকর। এক্ষণে আমরা যথাসাধ্য তাহা পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইব।

যে বলিয়াছিল যে ভারতীয় সমাজ পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত, সে বাস্তবিক ভাবিতে শিখিয়াছে। আমাদের সমাজে স্ত্রী পুরুষের সাম্য কখন ছিল কি না ঠিক্ বলা যায় না। থাকিলেও তাহা যে বহুকাল হইতে লোপ পাইয়াছে, তাহাতে বড় সন্দেহ নাই। আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র দেখ, যত বন্ধন স্ত্রী জাতি লইয়া! কাব্য দেখ, স্ত্রী জাতির প্রধান ধর্ম্ম সতীত্ব। ইহা গুরুতর বৈষম্য। পবিত্রতা ইহ সংসারে সকল সুখের আকর;—কিন্তু বিধিটা একতরফা করায় ইহার শুভকারিতা অনেক কমি-

য়াছে। যখন ভাবিয়া দেখি যে পবিত্রতার সাক্ষাৎ প্রতিমা সীতাচরিত্র আর্য্য নারী সমাজের আদর্শ এবং আমাদের গৃহে গৃহে সে দেবীদুর্লভ চরিত্রের অভাব নাই, তখন মনে হর্ষ বিষাদের তরঙ্গ খেলে, বিষাদ,—কেন না তাহা হইলে সমাজের এ পক্ষাঘাত রোগ বুঝি জন্মিত না। যে ধর্ম্মের পরিণতিতে সামাজিক মঙ্গল নাই, তাহা ঠিক্ ধর্ম্ম নহে। ফলনিরপেক্ষ ধর্ম্মাধর্ম্ম সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর কথা। সীতাচরিত্রের পবিত্রতা, পবিত্রতার একশেষ! যে সমাজ স্ত্রী পুরুষের সমবায়ে নির্ম্মিত, উভয়ের সহকারিতা যাহার প্রাণ তাহাতে ইহা একরূপ বিড়ম্বনা। সীতাচরিত্র আমাদের জাতীয় গৌরব, কিন্তু তাহার পরিণাম, গৌরববিধ্বংসকর!

সীতাচরিত্র সমাজে যে অশুভ উৎপাদন করিয়াছে, লোকহিতৈষী কবিগণ মধ্যে মধ্যে তেজস্বিনী চিত্তময়ী রমণীচরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার নিরাকরণের চেষ্টা পাইয়াছেন, এই আর্য্যসমাজে দুই তিনবার সে চেষ্টা হইয়াছে;—তবে ফল বড় হয় নাই। কেন না সে সকল চরিত্রের কার্য্যকারিতা সমাজ গণ্য করেন না। একবার দ্রৌপদীচরিত্রে সে চেষ্টা হইয়াছে। দ্রৌপদী পবিত্রা আর্য্যরমণী কিন্তু দ্রৌপদী আবার প্রখর বুদ্ধিশালিনী, প্রতিভাময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী! তিনি পুরুষের যোগ্য সহধর্ম্মিণী!—সখী কিন্তু দাসী নহেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করেন না। আর একবার সে যত্ন হইয়াছিল তন্ত্র শাস্ত্রে। যিনি মন দিয়া তন্ত্র শাস্ত্রালোচনা করিয়াছেন তিনি প্রতিপদে ইহা স্বীকার করিবেন। তন্ত্রপ্রচারের সময় দেশ বোধ হয় বড় বৈষম্যময় হইয়াছিল। পুরুষ সর্ব্বে সর্ব্বা স্ত্রী বলিতে গেলে কেহ নহে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অধঃপতিত সমাজ আর চলে না। যে কেহ আসিয়া—অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য যে সে আসিয়া—অত্যাচার করে; রাজা হইয়া বসিতে যায়। তখন স্থিতিশীল ফলবাদী ব্রাহ্মণকুলের চিরোর্ব্বর মস্তিষ্ক আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার ফলে তন্ত্রশাস্ত্রের কুহক বিস্তৃত হইল। বুঝা গেল যে, দিনকতক স্ত্রীচরিত্রের একটু বাড়াবাড়ি হইলে ক্ষতি নাই—শেষে আপনিই সাম্য আসিবে। শক্তিরূপিণী অসুরকুলদলনী দুর্গার আর নৃমুণ্ডমালিনী, করালবদনী, হরহৃদিবিলাসিনী কালিকার মূর্ত্তি দেখিলে বীরপুরুষেরও আতঙ্ক উপস্থিত হয়! যাহা অনন্ত শক্তি দেবে পারিল না বলিয়া কল্পিত হইয়াছে তন্ত্রের দেবী মুহূর্ত্তে তাহা করিল। তন্ত্রশাস্ত্রে নারীচরিত্র অনেক সময়ে পুরুষ হইতে প্রবলতর; কখন বা পুরুষের সমান; পুরুষাপেক্ষা হীন কখন নহে। ওডিনের Odin উপবর্গ অসভ্য ইয়ুরোপীয়গণকে সাহস শিখাইয়াছিল। বঙ্গভূমে তন্ত্র শাস্ত্র, সামাজিক সাম্য প্রচারের জন্য প্রণীত হইয়াছিল।

'মেঘনাদ বধ কাব্য' যখন লিখিত হয়, তখন বঙ্গসমাজে সবেমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চ্চার উন্নতি আরম্ভ হইতেছিল। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীযুবক, হৃদয়ে যে সাম্য ভাব ধারণ করিলেন, গৃহে তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই অবগুণ্ঠন-বতী ব্রীড়াসঙ্কুচিতা বঙ্গনারীকে প্রমীলার বেশে দেখিয়া কৃতবিদ্য যুবক তখন মোহিত হইয়াছিলেন।

'অধরে ধরিলো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে?"

বড় মধুর, বড় ভাবব্যঞ্জক আর বড় সাম্যসংস্থাপক। যখন পড়ি যতবার পড়ি, মিষ্ট লাগে। প্রথমে বুঝি আরো মিষ্ট লাগিয়াছিল। দার্শনিকপ্রবর জন্ ষ্টুয়া-র্টমিল স্ত্রীজাতির সাম্য প্রতিপাদন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন;—আর আমাদের মধুসূদন 'প্রমীলা' চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য উভয়েরই এক।

প্রমীলাচরিত্রের আর একটী ভঙ্গী দেখ। ইহা ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময়। এই প্রবন্ধে আমরা ইন্দ্রজিতের চরিত্র সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি;—প্রমীলা-চরিত্র সন্ধান করিয়া প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে চাহিনা। তবে সে চরিত্র যে ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময় তাহা কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। এই চরিত্রসাম্য, এই রাক্ষস দম্পতীর অতুল মোহ ময় প্রেমের কারণ। যাঁহারা সাম্যকে প্রেমের কারণ বলিতে প্রস্তুত নহেন, একথাটী তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।



ফুলের ভাষা।

২

সমস্ত দিন পৃথিবী দগ্ধ করিয়া নিষ্ঠুর রবি নিস্তেজ হইয়া অস্তাচলে চলিয়া পড়িয়াছে। অগ্নিময় জ্যোতি অল্পে অল্পে প্রখরতা হারাইয়া অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে পরিণত হইয়াছে। জ্যোতির বর্ণ সুবর্ণ-নিন্দিত। সুবর্ণ-নিন্দিত জ্যোতি ঈষৎ ম্রিয়-মাণ, যেন ষোড়শীর সুন্দর উজ্জ্বল চক্ষে ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূযুগলের ছায়া পড়িয়াছে। আকাশ এবং পৃথিবী হাস্যময়। সেই হাসিতে ফুলগাছে ফুলের কুঁড়ি একটি একটি করিয়া দেখা দিতেছে। স্বর্গ মর্ত্ত্যের হাসিতে ফুলের জন্ম। ফুলের কুঁড়ি বিশ্বের হাসির উচ্ছ্বাস—বিশ্বের হাসির সাকার মূর্ত্তি।

অল্পে অল্পে ঐ সুবর্ণনিন্দিত জ্যোতি মলিন হইয়া আসিতেছে। অল্পে অল্পে ফুলের কুঁড়িগুলি ঐ মলিন আবরণে লুকাইয়া পড়িতেছে। এখন আর সে মলিন জ্যোতিও নাই—এখন সব অন্ধকার। এখন সে কুঁড়িগুলির কোথায় কি হইতেছে কে বলিবে? কিন্তু ঐ দেখ আকাশে একটি একটি করিয়া কত নক্ষত্র ফুটিয়া পড়িয়াছে, আর ঐ নক্ষত্ররাশির মধ্যে চতুর্থীর চাঁদ নির্ম্মল, শীতল, সুমধুর, পবিত্র হাসি হাসিতেছে। আর নীচে পৃথিবীতে নির্ম্মল, শীতল, সুমধুর, পবিত্র আলোকরাশির মধ্যে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া নির্ম্মল, শীতল, সুমধুর, পবিত্র হাসি হাসিতেছে। এখন আর সে কুঁড়ি নাই। এখন সব কুঁড়ি ফুটিয়া ফুল হইয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া কুঁড়ি ফুটিয়া ফুল হইল কে বলিবে? কে বুঝিবে? এ রহস্য ভেদ করা কাহার সাধ্য? এ রহস্য কেহ কখন ভেদ করিতে পারে নাই। বিষ্টর হুগো বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন :—

"But yesterday she was a child, today she is an incomprehensible woman."

সূর্য্যের বিশ্ব-উজ্জ্বলকারী আলোক এবং চন্দ্রের ছায়ারূপী আলোক এই দুই রকম আলোকের মধ্যবর্ত্তী অন্ধকারের ভিতর কুঁড়ি ফুটিয়া ফুল হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে কোন পবিত্র শক্তি গোপনে, নির্জ্জনে, নিস্তব্ধভাবে ফুলের কুঁড়ি ফুটাইয়া দেয়। মানুষ সে শক্তি দেখিতে পায় না, বুঝিতে পারে না। মানুষ কেবল সেই শক্তির কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হয় আর আপনাকে চরিতার্থ মনে করে। ইহাই ফুল ফুটিবার প্রণালী। সে প্রণালী মানুষের বুদ্ধির অতীত বলিয়াই মানুষ ফুল দেখিয়া এত মুগ্ধ। পৃথিবীতে মানুষ মুগ্ধ—হৃদয়ের কার্য্যে এবং প্রতিভার কার্য্যে। ফুল, তোমাকে ফুটিতে দেখি, কিন্তু কেমন করিয়া ফোট তাহা বুঝিতে পারি না। তাই বলি তুমি বিশ্বের প্রতিভার কীর্ত্তি। তোমার মতন রহস্য, তোমার মতন কাব্য, তোমার মতন দৃশ্য পৃথিবীতে আর আছে কি?

আবার, ফুল, তুমি বিশ্বের হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি। সেই মধ্যাহ্ন রবির প্রখর শাসন মনে কর দেখি। তাপের পরিমাণ নাই। মাটী উত্তপ্ত হইয়া উত্তপ্ত কটাহের ন্যায় স্পর্শমাত্রে স্পর্শকারীর হস্তপদ যেন দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। ক্ষুধার জ্বালায় যে সকল পশু পক্ষী মাঠের উপর বিচরণ করিতেছিল তাহারা আর সেই অগ্নিবৎ ভূমিখণ্ডোপরি বিচরণ করিতে না পারিয়া কেহ বৃক্ষচ্ছায়ায় কেহ বৃক্ষশাখায় নিরাশার প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় মুমূর্ষুবৎ বসিয়া আছে বা শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এমন কি দুর্দ্দর্ষ শৃগাল কুকুর এবং বায়সগণ কোথায় লুকাইয়া

পড়িয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। নদ নদী, তড়াগ পুষ্করিণীর বারিরাশি এমনই উত্তপ্ত হইয়াছে যে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে তথাপি এক গণ্ডূষ জল লইয়া পান করিতে সাহস করিতেছে না এবং মৎস্য কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুগণ জলক্রীড়া আহারান্বেষণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া বারিরাশির নিম্নতম প্রদেশে পঙ্কের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কোন মতে প্রাণ-রক্ষা করিতেছে। মানুষ সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রবির উত্তাপে মৃতবৎ হইয়া, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রুদ্ধশ্বাস রোগীর ন্যায় ঘরের ভিতর পড়িয়া রহিয়াছে। আকাশ এবং পৃথিবী ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে। আর দেখিতে পারি না—আর সহিতে পারি না—আর বলিয়া জানাইতে পারি না। কাহাকেই বা জানাইব? সকলেই ত আমার মতন পুড়িয়া যাইতেছে। বিশ্ব-শক্তি কঠিন নিষ্ঠুর সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। যেন ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কণা-মাত্র দয়া নাই, কৃপা নাই, করুণা নাই। সত্যই কি ব্রহ্মাণ্ডে করুণা নাই? সত্যই কি ব্রহ্মাণ্ডে হৃদয় নাই? আছে বৈ কি। ঐ দেখ সেই প্রখর রবি এখন অস্তাচলে মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। বিশ্বশক্তি বিশ্বের ক্লেশে কাতর হইয়া এখন বিশ্বের সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিতেছেন। ঐ দেখ অসীম বিশ্ব এখন বিশ্ব-শক্তির করুণার নিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া সকৃতজ্ঞচিত্তে, মুগ্ধান্তঃকরণে গদ্‌গদ ভাবে বিশ্বের হৃদয়ে ডুবিয়া পড়িতেছে। চারি দিকে শীতল মধুর বায়ু বহিতেছে। নিঃশব্দে নিস্তব্ধ-ভাবে পৃথিবীর বারিরাশি সুমধুর সুশীতল শ্বাসে দিগ্‌দিগন্ত মধুময়, মাধুর্য্য-ময় করিয়া তুলিতেছে। বৃক্ষ, লতা, কোমল তৃণ হইতে কি এক অনুপম কল্পনাতীত মধুরিমা নির্গত হইতেছে। অনুপ্রাণিত জীববৃন্দের প্রাণের প্রাণ হইতে কি এক অপূর্ব্ব রসের লহরী নিঃসৃত হইতেছে। এই সমস্ত মধুরতা চতুর্থীর চাঁদের নির্ম্মল, সুশীতল, সুমধুর চন্দ্রিকায় মিশিয়া যাইতেছে। আর সেই মুগ্ধ চন্দ্রিকার প্রাণের প্রাণ ফুলরূপে ফুটিয়া পড়িতেছে। সেই বিশ্বের হৃদয়রূপ ফুলের নেশায় মানুষ ভোর হইয়া উঠিতেছে। মানুষ সব ভুলিয়া, সব ছাড়িয়া সেই ফুলের ভিতর গলিয়া যাইতেছে। ফুল রসে ভরিয়া উঠিতেছে। অনন্ত আকাশ সমস্ত রাত্রি সেই কোমল ফুলে কোমল সুধা ঢালিয়া দিতেছে। কোমল উষা-কালে ক্ষুদ্র ক্ষুধার্ত্ত ভ্রমর, ক্ষুদ্র ক্ষুধার্ত্ত মধুমক্ষিকা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া সেই হৃদয়রূপ ফুলের হৃদয়গত সুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া যাইতেছে। ফুল, এ জগতে ক্ষুদ্রের নিমিত্ত কাহারো হৃদয়ে সুধা নাই, কেবল তোমার আছে। তুমি যথার্থই বিশ্বের হৃদয়ের হৃদয়! তোমার হৃদয়ের গুণে তুমি রাজার উষা-

নেও ফোট, গৃহস্থের প্রাঙ্গণেও ফোট, দরিদ্র কৃষকের গোময়স্তূপোপরিও ফোট। তোমাকে কেবল জটাজুটধারী সন্ন্যাসী-সদৃশ ঝাউ, দেবদ্রুম, সরলদ্রুম প্রভৃতি গোটাকত গাছে দেখিতে পাই না; এবং বুদ্ধ ও চৈতন্যের ন্যায় বহুলোকাশ্রয় বট, অশ্বথ প্রভৃতি দুই চারিটা গাছে দেখিতে পাই না। কিন্তু ঐ সকল গাছের অন্তর খুঁজিলে তোমাকে দেখিতে পাই কি না বলিতে পারি না।

ফুল, তুমি ফোট কেন? আকাশে নক্ষত্র ফোটে বলিয়া? তা ত জানি। কিন্তু আমি জানিতে চাই, ফুটিয়া তোমার কি লাভ? তুমি কি জন্য ফোট? একথা আমি তোমাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সন্ধ্যার আধ-ছায়া আধ-আলোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। গভীর নিশীথে অনন্ত আকাশের দিব্য দিয়া, অনন্ত নক্ষত্র-রাজির দিব্য দিয়া, অনন্ত পথের পথিক চন্দ্রের দিব্য দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি। নিশাবসানে উদয়াচলস্থ রাগরূপী সূর্য্যমণ্ডলের দিকে চাহিয়া, সত্য কথা না বলিলে ঐ অগ্নিপর্ব্বা তোমাকে পোড়াইয়া মারিবে, এই রূপ ভয় দেখাইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমাকে কোন উত্তর দাও নাই। তোমাকে কত স্তব স্তুতি করিয়াছি, কত খোসামোদ করিয়াছি, কত তিরস্কার করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমাকে কোন উত্তর দাও নাই। কেবল একটিবার মাত্র যখন তোমাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলাম যে, উত্তর না দিলে ঐ যে ক্ষুদ্র মক্ষিকাটি তোমার বুকের অমৃত পান করিতেছে, ঐটিকে মারিয়া ফেলিব, তখন ব্যাকুল হইয়া তুমি আমাকে বলিয়াছিলে—আপনি কি বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তাই জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দিতে তোমার এত অনিচ্ছা কেন? উত্তর দিতে কি তোমার ভয় হয়? তা ত নয়। যখন তোমাকে পোড়াইবার ভয় দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তখন ত তোমাকে ভয়ে জড়সড় হইতে দেখি নাই? তখন ত তোমার সেই স্বাভাবিক লজ্জাশীল, বিনয়নম্র, প্রফুল্লতাময় মুখখানি বই আর কিছুই দেখি নাই? কোন কোন কবি বলিয়া থাকেন যে তুমি ফোট কেন, না ফুটিয়াই তোমার সুখ। কিন্তু সে কথাটি আমার মনে লাগে না। সে কথায় আমি তোমার হৃদয়ের তত্ত্ব পাই না। ফুটিয়াই যদি তুমি সুখী হইতে, তাহা হইলে তোমার মুখেই ত সে কথা শুনিতে পাইতাম। যার ফুটিয়াই সুখ সে ত আপনার শক্তি, আপনার তেজ আপনি বুঝে; সে ত আপনার তেজে আপনি তেজস্বী, আপনার তেজে আপনি ফাটিয়া পড়ে; সে ত আপনার সুখের নেশায় আপনি উন্মত্ত; সে ত আপনার মদে আপনি মত্ত; সে ত স্ফূর্ত্তিশীল, বাচাল, দাম্ভিক। সে ত সুখে তুষ্ট হয়, সুখ নাশের ভয়ে শত্রুর নিকট

হইতে পলায়ন করে। কিন্তু তোমার ত সে রকম প্রকৃতি নয়। তুমি চন্দ্রের শীতল, সুধাময় আলোকে উন্মত্ত হও না, আবার প্রচণ্ড রবির বিশ্বদগ্ধকারী রশ্মিতে অকাতরে তোমার ক্ষুদ্র কোমল বুকটুকু পাতিয়া দাও, সে বুকটুকু সে অগ্নিতে পুড়িয়া গেলেও তুমি দুঃখিত নও। তবে, ফুল, তুমি ফোট কেন? তুমি এ কথার উত্তর দিবে না তা জানি। বুঝিতেছি তুমি এ কথার অর্থ জান না,—কেমন করিয়া উত্তর দিবে? কিন্তু তোমাকে দেখিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে রকম সুখী, তুমি যেমন অকাতরে কি বড় কি ছোট, কি বৃহৎ কি ক্ষুদ্র সকলকেই সমান আদরে তোমার হৃদয়ের সুধা ঢালিয়া দিয়া পরিতৃপ্ত কর, তুমি যে রকম করিয়া মরুভূমিকেও হাস্যময় করিয়া তোল, তুমি যেমন অকাতরে আপনার কোমল হৃদয় পোড়াইয়া ফেলিতে পার, তাহা ভাবিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারি যে ফুটিয়া তোমার সুখ নয়, ফুটাইয়াই তোমার সুখ। তুমি স্বয়ং এ কথা বলিবে না তা জানি, বলিতে পারিবে না তা জানি, কেন না ফুটাইয়াই যাহার সুখ, সেই জগতে মহৎ, সে আপনাকে আপনি জানে না, সে সব ফুটায় কিন্তু মারিয়া ফেলিলেও আপনি ফুটিতে পারে না। ফুল, এ জগতে ফুটান কেবল তোমারি ধর্ম্ম, তোমারি কর্ম্ম, তোমারি ব্রত। তুমিই এ জগৎ রক্ষা করিতেছ, তুমিই এ জগতের প্রাণ। তুমি পৃথিবী-রূপে স্বর্গ!

তাই বুঝি, ফুল, তুমি চিরকাল ভাব-রূপী। স্বর্গ কেহ কখন বুঝিল না; স্বর্গ চিরকালই ভাবময়—ভাবের ভাণ্ডার। ফুল, তোমাকেও কেহ কখন জ্ঞানের দ্বারা বুঝিল না; তুমি চিরকালই ভাবময়—ভাবের ভাণ্ডার। ফুল, এমন ভাব নাই যাহা তোমাতে দেখিতে পাই না। গাম্ভীর্য্য বল, প্রফুল্লতা বল, নম্রতা বল, লজ্জাশীলতা বল, সরলতা বল, উল্লাস বল, শোক বল, বিষাদ বল, বিমর্ষ বল, চপলতা বল, সঙ্কোচ বল, সকলই তোমাতে দেখিতে পাই। দেখিতে পাই বটে, কিন্তু কেমন করিয়া বুঝাইতে হয় তাহা জানি না। কেমন করিয়াই বা বুঝাইব? তোমাতে যখন যে ভাব দেখি, তখন সেই ভাবে ভোর হইয়া যাই, তখন সমস্ত জগৎ সেই ভাবে ভোর বলিয়া অনুভূত হয়। তবে কেমন করিয়া বুঝাই? আর বুঝাইলেই বা বুঝিবে কে? সকলেই ত আমার মতন তোমার ভাবে ভোর। তুমি ক্ষুদ্র ফুল, তোমার শক্তি অসীম। যেখানে তুমি, সেখানে আর কিছুই থাকিতে পারে না, সেখানে সবই তুমি। ক্ষুদ্র ফুল, তুমি অমোঘ মন্ত্র। তোমার ভাবরূপ নিশ্বাসে, সকলই গলিয়া ভাবময় হইয়া যায়। পাথরের পাহাড়ে তুমি হাসিলে পাথরের পাহাড়ও হাসির পাহাড় বলিয়া বোধ হয়। ফুল, তুমিই পৃথিবীর ভাবের ছাঁচ! তুমিই পৃথিবীতে ভাবরূপী মন্ত্র!

আর সেই জন্যই, ফুল, তুমি সুন্দর এবং সৌন্দর্য্য। জগতে সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি। যে দিকে ফিরি সেই দিকেই সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখি আকাশ সৌন্দর্য্যময়। আবার আকাশ অপেক্ষা ঊর্দ্ধতর প্রদেশ, যাহা চক্ষে দেখিতে পাই না, তাহাও ভাবিয়া দেখিলে সৌন্দর্য্যময়, সৌন্দর্য্যের উৎস বলিয়া মনে হয়। এ সৌন্দর্য্যের অর্থ কি? এ সৌন্দর্য্য কিসে হয়? অনেকে ভ্রান্ত হইয়া এই কথার কত ভ্রান্তিমূলক উত্তর দিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন,যে বর্ণবিশেষের নাম সৌন্দর্য্য—বর্ণ বিশেষ সৌন্দর্য্যের কারণ বা উপাদান। যাহাতে সে বর্ণ আছে তাহা সুন্দর, যাহাতে সে বর্ণ নাই তাহা সুন্দর নয়। ফুল তোমাকে দেখিলে ত এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। তোমাতে কোন্ বর্ণ নাই?—নীল,পীত, হরিৎ, শ্বেত, যত বর্ণ আছে এবং যত রকমে সেই সকল বর্ণের সংযোগ এবং মিশ্রণ হইতে পারে সকলই ত তোমাতে আছে। তবে কেমন করিয়া বলিব যে বর্ণ বিশেষের গুণে সৌন্দর্য্য? আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে আকার বিশেষের নাম সৌন্দর্য্য—আকারবিশেষ সৌন্দর্য্যের উপাদান। কিন্ত, ফুল, তোমাকে দেখিলে একথাও ত সত্য বলিয়া মনে হয় না। তোমার কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, তোমাতে অনেক আকার দেখিয়া থাকি। কিন্তু তোমাকে যে আকারে দেখি তুমি সেই আকারেই সুন্দর। তবে কি, ফুল, তুমি সৌরভের গুণে সুন্দর? তাই বা কেমন করিয়া বলি? কত ফুল ফোটে যাহার সৌরভ নাই, কিন্তু সে ফুলও ত সুন্দর। তাই বলি, ফুল, তুমি কেবল তোমার ভাবের গুণে সুন্দর এবং সৌন্দর্য্য। এবং তুমি, ক্ষুদ্র ফুল, তুমিই জগৎকে এই মহাতত্ত্ব বুঝাইয়া দেও যে স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে যাহা কিছু সুন্দর আছে তাহা কেবল ভাবের গুণেই সুন্দর। একজন ইংরাজ কবি জগদ্বিখ্যাত তাজমহল দেখিয়া বলিয়াছেন—

It is a sigh made stone!

যিনি এ কথা বলিয়াছেন তিনি প্রকৃত সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বুঝিয়াছেন।—তিনি বুঝিয়াছেন যে সৌন্দর্য্য চক্ষে দেখা যায় না, কেবল ভাবের ঘোরে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলি, ভাই সকল, যদি সুন্দর হইতে চাও, যদি জগতের প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ইচ্ছুক হও, তবে ফুলের কাছে যাইও, ফুল তোমাকে শিখাইয়া দিবে যে, সৌন্দর্য্য রূপে নাই, সৌন্দর্য্য গুণে; সৌন্দর্য্য আকারে নাই, গঠনে নাই, রঙে নাই, সৌরভে নাই, সৌন্দর্য্য ভাবে। ফুলের কাছে এই শিক্ষা লইয়া ফুলের ভাবে ভরিয়া থাকিও, দেখিবে তোমাদের সুখের সীমা নাই, তোমাদের অদৃষ্টচক্র অনন্ত উন্নতির পথে, অনন্ত সুখধামের দিকে ঘুরিয়া যাইতেছে।

কিন্তু ফুল, তোমাকে হৃদয়রূপেই দেখি, ভাবরূপেই দেখি, আর সৌন্দর্য্যরূপেই দেখি তুমি যে কি রহস্য তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দেখ, যখন সন্ধ্যার মৃদু-মধুর শোভায় আকৃষ্ট হইয়া ঐ দেবালয়সম্মুখস্থ শেফালিকা-মূলে উপবেশন করি, তখন আমার ক্ষুদ্র দেহের সামান্য সংঘর্ষে রাশি রাশি শেফালিকা বৃন্তচ্যুত হইয়া চারিদিক্ ছাইয়া ফেলে; অথবা যখন প্রাতঃকালের সঞ্জীবনী সমীরণে উৎসাহিত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হই, তখন কেবল মাত্র আমার গমনজনিত বায়ু-সঞ্চালনে ঐ প্রাঙ্গণপার্শ্বস্থ কামিনীবৃক্ষ হইতে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামিনীফুল ঝর ঝর করিয়া খসিয়া পড়ে। এ দিকে ত দেখি, ফুল, তুমি এমনি কোমল, এমনি অসহিষ্ণু, এমনি ভঙ্গুর যে শুধু যেন একটু নিশ্বাস গায় লাগিলে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কি এক রকম হইয়া যাও। কিন্তু আবার ঐ দেখ দেখি ওখানে তোমাকে কি ভিন্ন প্রকৃতির দেখিতেছি। ঐ দেখ আজ মহাসমুদ্রে নিদাঘ-ঝটিকা উঠিয়াছে। অপরাহ্ন-রবি অদৃশ্য হইয়াছে। আকাশ মেঘ-যুদ্ধে সংক্ষুব্ধ। অসংখ্য মেঘ-খণ্ড ভীমরবে গর্জ্জন করিতে করিতে অনন্ত আকাশে পরস্পরকে তাড়না করিয়া বেড়াইতেছে; এক এক খানা মেঘ ক্রুদ্ধ হইয়া অপর মেঘের প্রতি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, আর অমনি দিগ্‌দিগন্ত ঝলসিয়া উঠিতেছে এবং বিকট শব্দে চমকিয়া পড়িতেছে। সমুদ্রের নীল জল কাল হইয়া উঠিয়াছে। সেই কাল জলে প্রচণ্ড ঝটিকোত্থিত ভীষণ তরঙ্গ সকল নভোমণ্ডলস্থ মেঘখণ্ডের ন্যায় পরস্পরকে তাড়না করিতেছে এবং রাগে ফেণা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গর্জ্জন করিয়া চারি দিকে ধাবিত হইতেছে। আকাশে মেঘ-গর্জ্জন, সমুদ্রে তরঙ্গ-গর্জ্জন, আকাশ-সমুদ্রে ঝটিকা-গর্জ্জন, আর সেই সমস্ত গর্জ্জনরাশি ভেদ করিয়া ঝটিকা-পক্ষীর উৎকট চীৎকার—যেন এই মহাপ্রলয়ের অন্তরাল হইতে প্রলয়শক্তি প্রলয়-তূর্য্য ধ্বনিত করিতেছে। এই মহাপ্রলয়ে পড়িয়া একখানা প্রকাণ্ড অর্ণবযান খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে। বড় বড় মোটা মোটা পাল তরঙ্গাঘাতে ছিঁড়িয়া কুটী কুটী হইয়া যাইতেছে, বড় বড় মাস্তল ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলকায়ে ভাসিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ঐ দেখ একটী ক্ষুদ্র ফুল কোথা হইতে আসিয়া ঐ ঝটিকা-তাড়িত ভীষণ তরঙ্গোপরি অসীম সাহসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, প্রলয়যন্ত্রণা দেখিয়া ভিজিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু একটীও পাপ্‌ড়ি খসে নাই, একটীও পাপ্‌ড়ি সরে নাই! ফুল, কে বলে তুমি কোমল? তুমি দৃঢ়তম অপেক্ষা দৃঢ়! কে বলে তুমি অসহিষ্ণু? তুমি সহিষ্ণুতার উজ্জ্বলতম আদর্শ! কে বলে তুমি ভঙ্গ-ভুক্তিক? তুমি সাহসের,

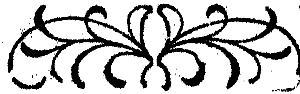
তুমি বীরত্বের জীবন্ত প্রতিমা। তোমার অপেক্ষা রহস্য এ জগতে আর কি আছে! তুমি বৈপরীত্যের আধার! এই জন্য মানুষ সমাজের প্রারম্ভ হইতে কোমলহৃদয় কবি এবং সাহস সহিষ্ণুতা এবং শক্তির আদর্শরূপী ধর্ম্মবীর এবং কর্ম্মবীর, উভয়েরই শিরোপরি ফুলের মালা চাপাইয়া কোমলতার এবং বীরত্বের পুরস্কার করিয়া আসিতেছে। যে মহাপুরুষ এ জগতে পুরস্কৃত হইবার যোগ্য, কেবল তিনিই মাথায় ফুল পরিতে পারেন। অতএব, ভারত-সন্তানগণ, যদি তোমরাও মাথায় ফুল পরিতে চাও, তবে দেহ, মন, প্রাণ সংকল্প করিয়া যাহাতে হৃদয়ের কোমলতা-গুণে এবং জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বীরত্বগুণে মনুষ্য সমাজে পুরস্কৃত হইবার যোগ্য হও, তাহার চেষ্টা কর। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের চেষ্টা যেন সফল হয়, বীরভূষণ ফুল যেন তোমাদের শিরে শোভা পায়!

সুবিস্তীর্ণ কাননে সন্ধ্যা-সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। গাছের পাতা অল্প অল্প নড়িতেছে। আকাশে নক্ষত্র মিট্ মিট্ করিতেছে। দুই একখানা পাতলা শাদা মেঘ আস্তে আস্তে উড়িয়া যাইতেছে। সেই মেঘের ভিতর দিয়া এক রাশি ছায়ারূপী জ্যোৎস্না একখানা আবেশময় আবরণে আকাশ, পৃথিবী, দিগ্দিগন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কাননে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। শরীর আবেশময়, মন আবেশময়, পৃথিবী আবেশময়। কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, বুঝিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। চক্ষে কিছু স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না, যেন কি একখানা হইয়া গিয়াছি, যেন এই আবেশময় দৃশ্যে মিশিয়া গিয়াছি। এই এক রকম হইয়া পড়িয়া আছি আর কত কি দেখিতেছি, কত কি শুনিতেছি। শুনিতেছি, কানন, পৃথিবী, অনন্তশূন্য জুড়িয়া এক অপূর্ব্ব, অস্ফুট, সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি হইতেছে। সে সঙ্গীত ক্ষুদ্র তৃণ হইতে নির্গত হইতেছে, কত শত লতা হইতে নির্গত হইতেছে, কত ছোট ছোট, কত বড় বড় গাছ হইতে নির্গত হইতেছে, কত সলিলরাশি হইতে, কত প্রস্তর কত পর্ব্বত হইতে নির্গত হইতেছে, ভূগর্ভ হইতে ঊর্দ্ধতম আকাশ হইতে নির্গত হইতেছে। যেন তৃণ, লতা, পাতা, গাছ, পাথর পর্ব্বত, জল, জঙ্গল সকলে মাতিয়া একস্বরে একতানে গাহিতেছে—আজ আমরা সব এক হইয়াছি, আজ আমাদের মধ্যে ছোট বড় নাই, উচ্চ নীচ নাই, আজ আমরা বিরোধশূন্য, বিদ্বেষশূন্য, বিকারশূন্য, আজ আমরা চক্ষু পাইয়াছি, এক চক্ষে সকলে সকলকে এক-আত্মা দেখিতেছি, আজ আমরা প্রাণ পাইয়াছি, আজ আমরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণে মিশিয়াছি। এই মোহকর সঙ্গীতে মজিতেছি আর দেখিতেছি কত

অশরীরী, ছায়ারূপী, নির্ম্মল, সুন্দর, হাস্যময় মূর্ত্তি আসিতেছে, যাইতেছে, উড়িতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে, পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছে, ফুলের ভিতর লুকাইতেছে, ফুল দেখিতে দেখিতে যেন ঘুমাইয়া পড়িতেছে। কত শান্ত, সুধীর, সরল, ভাবময় মূর্ত্তি ধীরে ধীরে, অস্ফুট সঙ্গীত ধ্বনি করিতে করিতে শূন্য হইতে নামিয়া কত ফুলের গাছ বেষ্টন করিয়া গদ গদ ভাবে ফুল-স্তোত্র গাহিতেছে আর ফুল তুলিয়া ফুলকে অঞ্জলি পুরিয়া উপহার দিতেছে। এক একটী পবিত্র জ্যোৎস্নাময় মূর্ত্তি আস্তে আস্তে ফুলের কাছে আসিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতেছে আর কি জানি কি শুনিয়া উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া অসীম শূন্যে উড়িয়া যাইতেছে, এবং নিমেষ মধ্যে নামিয়া আবদ্ধ মুষ্টি খুলিয়া ফুলটীকে বলিতেছে—এই লও তোমার সাধের বুধগ্রহ লও। তখন সেই সব স্বপ্নময় মূর্ত্তি সেই অপূর্ব্ব আবেশময় পুষ্প-কাননে দাঁড়াইয়া এক-স্বরে এক তানে এক অশ্রুতপূর্ব্ব ফুল-স্তোত্র পড়িয়া সগর্ব্বে গাহিয়া উঠিল ;—

Over hill, over dale,
Thorough bush, thorough brier,
Over park, over pale,
Thorough flood, thorough fire,
We do wander everywhere,
Swifter than the moones sphere.

গান শুনিয়া আমার চমক হইল। আমি বুঝিলাম যে এই সকল মহাপুরুষ ফুলকে কল্পনার চক্ষে কল্পনাময় দেখিয়া অনন্তশক্তি লাভ করিয়াছে; রাগ দ্বেষাদি বিবর্জ্জিত হইয়া প্রেম-বলে এক-প্রাণ এক-আত্মা হইয়া গিয়াছে, এবং প্রতিভাবলে এই অসম্পূর্ণ জগতে এক অপূর্ব্ব আদর্শ জগৎ স্থাপন করিয়াছে। অতএব, ভাই সকল, তোমরা ফুলকে শুধু হৃদয় বা ভাব বা সৌন্দর্য্য রূপে দেখিয়া ক্ষান্ত হইও না। তাহা হইলে ফুলের সম্পূর্ণ শক্তির অধিকারী হইতে পারিবে না। তোমরা ফুলকে কল্পনার চক্ষে দেখিও তাহা হইলে ফুল হইতে অনন্ত শক্তি লাভ করিবে এবং যে জগৎ এখন শুধু কল্পনায় রহিয়াছে সত্য সত্যই সেই জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিবে।



বাল্মীকির জয়।*

বঙ্গদর্শনে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, পুনর্মুদ্রিত হইলে তাহা বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইয়া থাকে না। "বাল্মীকির জয়" কিয়দংশে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু গ্রন্থের অধিকাংশই বঙ্গদর্শনে বাহির হয় নাই। উহার যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এ অবস্থায়, আমার সমালোচ্য গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। অতএব পাঠক যদি অনুমতি করেন, তবে ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। সম্পাদকের অনুমতি পাইয়াছি।

দুঃখের বিষয়, সমালোচনা আরম্ভ করিয়া, আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না, যে এখানি কোন শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহা পদ্যে লিখিত নহে, সুতরাং সমালোচক সম্প্রদায় ইহাকে কাব্য বলিবেন না। ইহা নাটক নহে আমি নিশ্চিত জানি, কেন না ইহা কথোপকথনে বিন্যস্ত নহে। ইহাকে নবেলও বলিতে পারিলাম না, কেন না ইহাতে নায়ক নাই, নায়িকা নাই, ভালবাসা নাই, কোর্টসিপ নাই, বিবাহ নাই, লুকোচুরি মারামারি খুনোখুনি কিছুই নাই। ইহাতে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কথা আছে—কিন্তু পুরাণ নহে—দিগ্বিজয়ের কথা আছে, কিন্তু ইতিহাস নহে। একটা সৃষ্টির বিবরণ আছে কিন্তু বিজ্ঞান নহে; নক্ষত্রনীহারিকার কথা আছে, কিন্তু জ্যোতিষ নহে; মনুষ্যকে পশু করিবার কথা আছে, অথচ "Origin of species" নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিশ্চিত একটা কিম্ভূত কিমাকার পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভাল, গ্রন্থের জাতিনির্ব্বাচন করিতে না পারি, একরকম পরিচয় দিতে পারিব। গ্রন্থকার নিজে টাইটেল পেজে এক প্রকার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, "The Three Forces, Physical Intellectual and Moral." ইংরেজি ভাষার শপথ করিতেছি, যদি ইহার কিছু বুঝিয়া থাকি। Forceত কিছু দেখিলাম না, দেখিলাম কেবল তিনটি বিরাটমূর্ত্তি—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি! যদি বল এই তিনটিই আমার Force, আমার উত্তর, তোমার Force লইয়া গঙ্গাজলে ফেলিয়া দাও, আমি এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা করিব। তোমার মানবদেবী অপেক্ষা আমার দুর্গাঠাকুরাণী অনেক ভাল। দুর্গাঠাকুরা-

---

* বাল্মীকির জয়। শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ প্রণীত। কলিকাতা, ১৭ নং ভবানীচরণ দত্তের লেন, রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৷৹ আনা।

নীকে গড়িতে পারি, তাই পূজা করিতে পারি। মানবদেবী কোথায়?

কথা অনেক দিন হইতে দেশে আছে—কোন্ কথা নাই? তিনটি force—physical, intellectual, moral. ত্রিগুণ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; অথবা তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব, বহুকাল হইতে আছে। ক্রমে তিন গুণ ত্রিমূর্ত্তিতে পরিণত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। কিন্তু এই ত্রিমূর্ত্তিতে আর কাজ চলে না—ইহারা কেবল দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন। দুই জন মন্দিরে বসিয়া চাল কলা, মহার্ঘ্য করেন, আর একজন কেবল দুর্গা প্রতিমার চাল চিত্রে। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং—আমরা অন্য ত্রিমূর্ত্তির অনুসন্ধান করি।

যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম যে দেখাইবে, সে গুরুদেব এক্ষণে সাগরপারে। ইউরোপ হইতে কর্ণরন্ধ্রে মন্ত্র প্রেরিত হইতেছে, পূজা কর এই ত্রিমূর্ত্তি Physical, Intellectual Moral!—"দেখ Physical—আমাদের এই বাহ্য সম্পদ! এই অতুল ঐশ্বর্য্য! এই অসংখ্য অজেয় সেনা!" Intellectual—সে এই সেক্ষপীয়রের নাটক, এই গেটের কাব্য, এই কাণ্টের দর্শন এই ইউরোপীয় বিজ্ঞানসমুদ্র!! আর Moral? বুঝি শুধু খ্রীষ্ট ধর্ম্ম। এ ত্রিমূর্ত্তিতেও আমাদের মন উঠিল না—আমরা আপনাদের জন্য ত্রিমূর্ত্তি গড়িব। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং! দেখি চল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্ত্তি কি প্রকার।

তুমি যেই হও না কেন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কর কি? তুমি বলিবে—আমি আপনার অন্নবস্ত্রের যোগাড় করি। কে তোমাকে অন্নবস্ত্র দেয়? সমাজ। তুমি যেই হও, তুমি সমাজের খাটিয়া দাও—সমাজ তোমাকে খাইতে দেয়। যেই যাই করুক, সব পরের কাজ। সকল কাজের শেষ ফল সমাজের উপকার।

এই সমাজের উন্নতির জন্য বহু সহস্র বৎসর হইতে, সমস্ত মনুষ্যবংশ চেষ্টা করিতেছে। সমাজের অনেক উন্নতিও হইয়াছে। কিন্তু এখনও মানুষের মন উঠে না। অনেকেই বলে সমাজ এখনও বড় অবনত। উন্নতির এক আধটা সোজা উপায় বাহির হয় না কি? সোজা উপায় গোটা কতক প্রথম ফরাসিস রাষ্ট্র বিপ্লবের সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। তাহার একটার বীজমন্ত্র "Faternity!" ভ্রাতৃভাব। যখন মনুষ্যে মনুষ্যে দ্বেষশূন্য হইবে, যখন কেহ কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করিবে না, যখন সকলেই সকলের উপকারে ব্রতী হইবে, তখন সবাই অপর সবাইকে ভাল বাসিবে, যখন মনুষ্যে মনুষ্যে "ভাই ভাই" সম্বন্ধ হইবে তখনই মনুষ্যসমাজ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইবে। এই "ভাই ভাই" সম্বন্ধ যাহাতে ঘটিয়া উঠে, তাহাই সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

কথাটা বড় পাকা কথা বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। এদেশের অবস্থা আমরা যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে আমু-

ভাবকে বড় একটা শান্তিময় পদার্থ বলিয়া বোধ হয় নাই। আমাদের ভয় হয়, যে যদি সকল বাঙ্গালীতে ভ্রাতৃভাব ঘটিয়া উঠে—তাহা হইলে ঘরাও বিবাদে আর শরিকী মামলা মোকদ্দমায় দেশটা পয়মাল হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে জেলায় জেলায় হাইকোর্ট আর গ্রামে গ্রামে সব জজ নহিলে চলিবে না। আমাদের দেশী পণ্ডিত চানক্য ঠাকুর ইহার অপেক্ষা সার বুঝিয়াছিলেন; ভ্রাতৃভাবে হইবে না—আত্মভাব চাই। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু দেখিতে হইবে। আরও মধুর—সর্ব্বভূতেষু!

যাই হউক, আমরা ধরিয়া লই, যে এই গ্রন্থে যেখানে "ভাই ভাই" পড়িব সেখানে মনুষ্যে মনুষ্যে অবিচল, পবিত্র প্রেম বুঝিব। এই পবিত্র প্রেম, এই ভ্রাতৃভাব কি সে হইবে? কেহ বলেন বাহুবলে। সব জয় করিয়া, এক ছত্রাধীন কর, এক খড়্গে শাসিত কর, এক আইনে বদ্ধ কর, সবাই একাচার, কাজেই একপ্রাণ হইবে। সে বৎসর লর্ড সালিসবরি, একটা সভায় বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের এক ছত্রাধীনে সমস্ত ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে একীভূত হইতেছে। বৎসর কত হইল, আমেরিকার দক্ষিণ ভাগ নিগ্রোকে ভাই বলিতেছে না দেখিয়া, উত্তরভাগ তরবারি লইয়া দক্ষিণকে রক্তস্রোতে ডুবাইয়া ভ্রাতৃমন্ত্র জপাইল। আর এক সম্প্রদায় বলেন, পণ্ডিত হও! আমি যাহা শিখাই শিখ, আমি যে শিকল পরাই পর, সকলে এক অবস্থায় দাঁড়াইবে—সকলেই ভাই ভাই হইবে। মধ্যকালে ইউরোপের রোমীয় পাদ্রীরা এই সম্প্রদায়ের লোক। যাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষের মর্ম্ম না বুঝেন, তাঁহারা ঐ ব্রাহ্মণগণকে এই দলভুক্ত করেন। আর একদল বলে, "আমাদের বাহুবল নাই, বিদ্যাবল নাই —আছে কেবল বাক্যবল; আমরা পরের জন্য কাঁদিতেছি, তোমরা দাঁড়াইয়া একবার শুন দেখি। তাহা হইলেই তোমরা ভাই ভাই হইবে।" যীশু ও শাক্যসিংহের ন্যায় ধর্ম্মবেত্তা, সোক্রেতিসের ন্যায় নীতিবেত্তা, আর সুকবিগণ এই দলভুক্ত। এই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্ত্তি—এই তাঁহার বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ এবং বাল্মীকি। এই তিনকে "Physical, Intellectual, এবং Moral" নাম দেওয়া ঠিক হইয়াছে—এমত আমাদের বোধ হয় না।

যাহাই হোক, এক্ষণে গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করি। লোকে বলে পুণ্যবান্ মনুষ্য মরিয়া স্বর্গে যায়, কিন্তু বেদমতে তাহারা স্বর্গে যায় না তাহারা ঋভু হয়। ঋভুগণ, কোন দিব্য লোকে বাস করে। গ্রন্থের প্রথমদৃশ্য, ঋভুগণ এক রাত্রে, সংমিলিত হইয়া পৃথিবীদর্শনে আসিতেছেন। কাব্যাংশে বাঙ্গালা ভাষায় এদৃশ্যের তুল্য কোথাও কিছু নাই। সত্য ও ত্রেতা যুগের সন্ধিসময়ে এক অমাবস্যার রাত্রে "সহসা ছায়াপথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইল—তাহার মধ্য হইতে অগণিত সংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন।

উক্ত শরৎ অমাবস্যারাত্রে সহসা ছায়াপথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া গেল,আর তাহার মধ্য হইতে অগণিতসংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের শরীরপ্রভায় আলোকিত হইল। নক্ষত্রের কিরণ অন্তর্হিত হইল, নক্ষত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ আকাশপটে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ঋভুগণ মুহূর্তমধ্যে আকাশপথ অতিক্রম করিলেন। পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়, দেখিতে কতই সুন্দর; কিন্তু যখন তীব্র জ্যোতির্ম্ময় ঋভুগণ শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া—আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া দলে দলে আসিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবীস্থ মানববৃন্দ চমৎকৃত হইয়া গেল। কেহ বলিল, ধুমকেতু উঠিয়াছে, কেহ বলিল, নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িতেছে।"

ঋভুগণ হিমালয়ে অবতীর্ণ হইলেন। গ্রন্থারম্ভে হিমালয়ের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম না—উহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল'এ জন্য উদ্ধৃত করিলাম না। ঐ বর্ণনা পড়িয়া, যে অদ্বিতীয় হিমালয়-বর্ণনা আজিও সাহিত্য সাগরে অতুল—তাহা স্মরণ কর। 'দেখিবে পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে বা গুণে দেশী ক্লাসিকে আর দেশী আধুনিকে কি প্রভেদ! কুমারসম্ভবের কবি,—জগতের কবিকুলের আদর্শ— অতিপ্রকৃত সৌন্দর্য্যের (Ideal) অবতারণায় অদ্বিতীয়, কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারে না। কিন্তু আধুনিককবি প্রকৃতের (Real) বর্ণনায় কি সুচতুর! ইউরোপ হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইতেছি। আমাদের চিরমার্জ্জিত পবিত্র অতিপ্রকৃত চরিত্র পরিত্যাগ করিয়া, আমরা ইউরোপীয় আদর্শ দেখিয়া পার্থিব অপবিত্র প্রকৃত চরিত্রের অনুসরণ করিতেছি। ইহাকে বলে উচ্চশিক্ষা। নীচশিক্ষা কাহাকে বলিব?

ঋভুগণ হিমালয়শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া গান করিলেন। সে গানে বিশ্ব বিমোহিত হইল। গানের ধুয়া "ভাই! ভাই! ভাই! সকলেই ভাই!" গান করিয়া ঋভুগণ আকাশপথে চলিয়া গেলেন —

"কিয়ৎক্ষণ পরে ঋভুগণ হিমালয়শিখরসমূহ ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠাদির বোধ হইল, রাশিচক্র অন্যপথে ঘুরিতেছে। ক্রমে ঋভুগণ যত দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, বোধ হইতে লাগিল, লক্ষ লক্ষ নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব হইল, ক্রমে আর নক্ষত্রভাবও রহিল না। বোধ হইল, আকাশ প্রকাণ্ড এক শাদা মেঘে আবৃত হইয়া উঠিল, ক্রমে মেঘ ছায়াপথগর্ভে প্রবেশ করিল। বোধ হইতে লাগিল, হরিতালী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবে, দ্বাপরের শেষকালে অর্জ্জুন যেমন বিরাটমূর্ত্তি নারায়ণের মুখে বিশ্বসংসার প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন, এ সময়েও সেইপ্রকার বোধ হইতে লাগিল।

ক্রমে সমস্ত শ্বেতমেঘপুঞ্জ হরিতালীগর্ভে নিলীন হইল। হরিতালীর মধ্যগহ্বর পূর্ণ হইল। বিশ্বসংসার আবার যেমন তেমনি হইল, আবার নক্ষত্র জ্বলিল, আবার আকাশ স্থির হইল, আবার আকাশের কোমল নীলিমা বিকাশ হইল। পৃথিবীতে প্রভাত হইল, কাক, কোকিল ডাকিয়া উঠিল।”

গান শুনিয়া পৃথিবীস্থ সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনজনের উপর এই গানের বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল। একজন বাহুবলে বলী দিগ্বিজয়ী রাজা বিশ্বামিত্র। দ্বিতীয় বিদ্যাবলে বলবান্ ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ। তৃতীয় নরহত্যাকারী দস্যু বাল্মীকি।

বিশ্বামিত্র সেই “ভাই ভাই” মোহময় গীত শুনিয়া ভাবিতেছেন, যে তিনি মনুষ্যজাতিকে ভাই ভাই সম্বন্ধে মিলাইতে পারিবেন। “অহহ বিশ্বামিত্র। ভুবন জয় ত করি। তাতে কেহ বাধা দিতে পারিতেছে না। সব হাত ত করি। তার পর মিলাইব। কাণে বাজিল ভাই ভাই। ভাবিলেন পৃথিবীতে এক দিন এইরূপ গাওয়াইতে পারি তবে আমি বিশ্বামিত্র—কিন্তু পারিব না কি? এ কাজে এ ভুজদ্বয় কি সক্ষম হইবে না?”

বশিষ্ঠ ভাবিতেছেন:—“বুদ্ধির কি মহিমা! একবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়দিগকে কি ফাকিই দিয়াছি। আবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে মিলাইয়াছি, এমন কি অন্য জাতি মিলাইতে পারিব না? * * সর্ব্বশাস্ত্র ত আয়ত্ত করিয়াছি। তেজ কি? শাস্ত্রে ত বলে “স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ” তার আবার মান অবমান কি? পৌরোহিত্য লাঘব সত্য, কিন্তু ক্ষমতা ত সবই ব্রাহ্মণের। খুব খেলাই খেলিয়াছি। আবার সংহিতা করিতেছি। তারও এই মানে। যোগ শাস্ত্র, তারও ঐ মানে। মান হউক, অবমান হউক, কাজ উদ্ধার করিব, পারিব না কি? তেজঃ, সত্য। ধর্ম্ম, সব মিথ্যা। কাজ সত্য। পারিব না কি? ঋভুরা কেন আসিলেন?

বাল্মীকি ভাবিতেছেন, ‘কত খুনই করিয়াছি, কত অভাগিনীকে বিধবাই করিয়াছি, এ মহাপাতক কিসে যায়? এ জ্বালা কিসে নিবাই। এই যে ঋভু দেখিলাম। এই যে গান শুনিলাম। তাহাতে হৃদয় জ্বালাইয়া দিল। আমি ইহার সঙ্গে মাতিতে ত পারিলাম না! হায় কেন আমি মানুষ হইয়াছিলাম। কোথায় সব ভাই ভাই হব না আমায় দেখে সবাই পালায়। হে দেব! কেন আমার এ জঘন্য বৃত্তি হইয়াছিল।’ ”

গোড়াতেই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রে একটা দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র উভয়ে প্রভাতে হিমালয় অবতরণ করিতেছিলেন—সাক্ষাৎ হওয়াতে পরস্পরে পরিচিত হইলেন—এবং প্রথমে মিষ্টালাপ হইল। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিবিরে লইয়া গেলেন,—আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন,

বশিষ্ঠের বড় সমারোহে আতিথ্য-সৎকার করিলেন, এবং রত্নরাশি তাঁহাকে উপঢৌকন দিলেন। বশিষ্ঠ বিদায়কালে, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের তপোবনে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলেন। গিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষাও বশিষ্ঠের ঐশ্বর্য্য গুরুতর। দেখিয়া :—"বিশ্বামিত্র বলিলেন,

'মহাশয় আপনি ঋষি, বনবাসী, আপনার এ অতুল ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে আসিল।'

বশিষ্ঠ বলিলেন, 'মহারাজ আমার এক গাভী আছেন, তিনি কামধেনুর কন্যা, তাঁহার নাম নন্দিনী, তিনি আমায় সমস্ত ইচ্ছামত দিয়া থাকেন।'

বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'তবে অন্ন উপঢৌকনে আমার তৃপ্তি হইবে না, আমায় সেই গোরুটি দিতে হইবে।'

বশিষ্ঠ বলিলেন, 'আমি যখন তাহার মার কাছ হইতে তাহাকে লইয়া আসি, তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি যে, উহাকে কখন কাহাকেও দিব না।' "

বশিষ্ঠ গোরু দিলেন না—বিশ্বামিত্র আপনার সৈন্যের প্রতি আদেশ করিলেন, যে গোরু কাড়িয়া লইয়া চল। তখন বশিষ্ঠ কি করেন?—ব্রাহ্মণস্য বলং ক্ষমা। কিন্তু নন্দিনীকে কাড়িয়া লইয়া যায়, কার সাধ্য?—নন্দিনীর প্রতিহুঙ্কারে অগণিতসংখ্যক সেনা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র তাহাদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া নন্দিনীকে ছাড়িয়া দিয়া পলাইলেন।

বাহুবল, বিদ্যাবলের কাছে পরাজিত হইল। তার পর এখন, বিদ্যাবল, ধর্ম্মবলের কাছে পরাজিত হইলেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়—বাল্মীকির জয় ঘটিয়া যায়। কিন্তু নবীন গ্রন্থকার—অব্যয়িত প্রতিভার বলে মহাবলবান্—এ সোজা পথে যাইতে ঘৃণা করিলেন। আমরা এই গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে লেখকের গতিকে দৃপ্তসিংহের গতির সঙ্গে মনে মনে তুলনা করিয়াছি।

বিশ্বামিত্র দেখিলেন, "ধিক্ বলং ক্ষত্রিয় বলং—ব্রহ্মতেজোবলং বলং"—তিনি তখন সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে তপস্যা করিতে গেলেন—তাঁহার কঠোর তপস্যায় দেবগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—ব্রহ্মা বর দিতে আসিলেন। বিশ্বামিত্র চান, "ব্রাহ্মণত্ব"। কিন্তু বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রেই হউক, আর যাই হউক, ব্রহ্মা কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব দিলেন না। বিশ্বামিত্র কিছুতেই অন্য বর পাইলেন না—ব্রহ্মাকে ও ব্রহ্মর্ষিগণকে হাঁকাইয়া দিলেন। বলিলেন :—

"তোমরা স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া আমায় ব্রাহ্মণত্বে বঞ্চিত করিলে। কিন্তু আমি আর ব্রাহ্মণত্বপ্রত্যাশী নহি। আমি ব্রহ্মত্ব চাহি, তোমাদের খোসামোদ ও তপস্যা আর করিব না, আমি নূতন পৃথিবী নির্ম্মাণ করিব, তাহার ব্রহ্মা

হইব। আমার পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ দূর করিয়া দিব। রাখ দেখি তোমরা কেমন পার।”

তপোবলে বিশ্বামিত্র নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে দুঃখ রহিল না—ব্রাহ্মণ রহিল না। বিশ্বামিত্র তাহার নিয়ন্তা। পাঠক দেখিবেন যে, গ্রন্থকারের বিশ্বামিত্র এখন আর বিশ্বামিত্র নহেন—এখন তিনি বশিষ্ঠ। এখন তিনি বাহুবল নহেন—এখন বিশ্বামিত্র তপোবল, বিদ্যাবল। নন্দিনীর হুঙ্কারে সাগরবৎ সেনা সকল সৃষ্ট হইয়াছিল—বিশ্বামিত্রের ইচ্ছায় নূতন গৌরজগৎ সৃষ্ট হইল। বিশ্বামিত্রকে বশিষ্ঠ করিয়া, গ্রন্থকার আবার তখনই তাঁহাকে বাল্মীকির পথে আনিতেছেন। বিশ্বামিত্র নূতন জগতের নিয়ন্তা--কিন্তু মনুষ্য। মনুষ্য বলিয়া, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, একদিন কাঁদিয়াছিলেন, “সব হইল—কিন্তু সুখ কই?” বিশ্বামিত্রও এখন কাঁদিলেন, “সব হইল, কিন্তু সুখ কই?” সুখের জন্য পৃথিবী হইতে নিজ পুরী ও আত্মীয় স্বজন সহিত কান্যকুব্জনগর উঠাইয়া লইয়া আপনার সৃষ্টিতে চলিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের তপোবল ফুরাইয়া গিয়াছিল, কিছুদূর গিয়া পুরী আর যায় না—পড়িয়া যায়—ব্রহ্মা ধরিয়া নামাইয়া লইলেন। তার পর, বিশ্বামিত্র নিজে স্বীয় সৃষ্টিতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া অজ্ঞান অবস্থায় শূন্য হইতে পৃথিবীতে পড়িতে লাগিলেন।

এদিকে বাল্মীকি, ঋভুদিগের গান শুনিয়া অবধি দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন তিনি পরের দুঃখে বড় কাতর। পরের দুঃখে কাতর বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে পবিত্রতা জন্মিল। সেই কাতরতাই নীতি—তাহার প্রকাশ কবিত্ব। পরের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া বাল্মীকি হৃদয়ে কবি হইয়াছিলেন—ভারতীর কৃপায় তিনি বাক্যেও কবি হইলেন। যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “বাল্মীকিপ্রতিভা”—পড়িয়াছেন, বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখন ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বাবুর অনুগমন করিয়াছেন।

বাল্মীকি এখন পৃথিবীর নীতিশিক্ষক—প্রথম কবি। তিনি পৃথিবীময় গান করিয়া বিচরণ করেন—সমবেদনা শিখান—তিনি ভাই ভাই মন্ত্রের প্রকৃত সাধক। সম্প্রতি কৌশাম্বীনগরে রাজা যজ্ঞ করিতেছেন—সেইখানে সমস্ত পৃথিবী আহূত ও সমবেত। একটা গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে—একদল যজ্ঞ করিতে দিবে আর একদল দিবে না। দুইদলে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। নিবারক একা বাল্মীকি। বাল্মীকির অস্ত্র—অশ্রুজল,—বাণীদত্ত বীণা। এই সময় অনন্ত শূন্য হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে চেতনাশূন্য

বিশ্বামিত্র আসিয়া সেই যজ্ঞকুণ্ডে পড়িলেন। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া লোকে ভীত ও বিস্মিত হইল—বাল্মীকির বাক্যবল বাড়িয়া গেল—তাঁহার সকরুণ গানে সমস্ত চরাচর বিমুগ্ধ হইল—লোকের মন ফিরিল—বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া গেল—বাল্মীকির জয় হইল।

ব্রহ্মার কৃপায় বিশ্বামিত্র জীবন পাইলেন। বিশ্বামিত্র দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মার স্তুতি ও আপনার অপরাধ স্বীকার করিলেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকিতে মিল হইল। বাহুবল, বিদ্যাবল, ধর্ম্মবল একত্রিত হইল। ব্রহ্মা ঋষিত্রয়কে আদেশ করিলেন যে:—"সর্ব্বলোকমধ্যে ঐক্য স্থাপন মানসে নারায়ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইতেছেন। তোমরা তাঁহার ক্রিয়াপ্রণালী স্থির করিয়া রাখ।" বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

তখন তিনজন ঋষি রামায়ণ "Plot" নির্ম্মাণ করিতে বসিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, "রামকে ধার্ম্মিক কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তাঁহাকে রাজনীতিজ্ঞ কর।" বাল্মীকি বলিলেন, "আমি রামকে আদর্শ মনুষ্য করিব।"

রামায়ণ প্রণীত হইল। তার পর রাম অবতীর্ণ হইলে রামায়ণ অভিনীত হইল। তার পর রামায়ণ গীত হইল—নারায়ণ বৈকুণ্ঠে গেলেন। শেষ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার আদেশে দেহত্যাগ করিলেন। বশিষ্ঠ সপ্তর্ষিমধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন—বিশ্বামিত্র ঋভুদিগের নেতা হইলেন। ব্রহ্মা, বাল্মীকিকেও স্বর্গযাত্রার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বাল্মীকি তখন গেলেন না—তাঁহার কার্য্য শেষ হয় নাই, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃভাব তখনও জন্মে নাই। শেষে ব্রহ্মার আদেশে তিনি নভোমণ্ডলে বিরাট মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। বাল্মীকি সেই বিরাট মূর্ত্তির স্তুতিবাদ করিলেন।

'নমঃ পুরস্তাদথপৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বতএব সর্ব্ব
অনন্তবীর্য্যা মিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোসি সর্ব্বঃ ॥'

"তখন ব্রহ্মা বলিলেন 'বাল্মীকে! তুমি দেখ সকল মানুষ সমান, সব ভাই ভাই, আর সবাই এক। যাও পৃথিবীময় এই সাম্য ভ্রাতৃভাব ও একতা গাইয়া বেড়াও, তুমি অমর হইলে, তোমারই জয়।'

বিরাটের মুখ হইতে বিরাটস্বরে ধ্বনি হইল 'জয়!'"

পাঠক গ্রন্থের পরিচয় পাইলেন, এখন ইহাকে যাহা বলিতে হয়, তিনি নিজেই বলুন। অনেকে বোধ হয় বলিবেন, এ সকল কেবল পৌরাণিক কথা—আমাদের জানা আছে। যাঁহারা আরও বাহাদুর তাঁহারা বলিবেন, যে এ—কেবল গাঁজা। ছায়াপথ কাটিয়া দিবা হইল—নন্দিনীর প্রতিহুঙ্কারে সহস্র সহস্র সেনা

সৃষ্টি হইতে লাগিল, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার ন্যায় দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করিলেন, এ সকল গাঁজা নয় ত কি? যাঁহারা আর একটু সুশিক্ষিত, তাঁহারা বলিবেন, এ রূপক। নন্দিনীর প্রতিহুঙ্কারে সৈন্যের সৃষ্টি, ইহার অর্থ সরস্বতীর অনুকম্পায় জড়বলের উপর মনুষ্যের আধিপত্য স্থাপন। নন্দিনীর এক হুঙ্কারে বারুদের সৃষ্টি; আর এক হুঙ্কারে ধূমযন্ত্র ষ্টীমের কল, বাষ্পীয়পোত, রথ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। যদি কেহ রূপক বলিতে চান, আমরা তাঁর সঙ্গে বিবাদ করিয়া সময় নষ্ট করিব না। আমরা বলিব, ইহা যদি রূপক হয়, তবে স্পেন্সরের রূপকের মত, রূপক কাব্যে ডুবিয়া গিয়াছে। ইহার রূপকত্ব কেহ দেখিবে না।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অনেক দোষ আছে। কাব্যের গঠন সকল স্থানে কৌশলযুক্ত নহে। যথা, বিদ্যাবলের পরাজয়, বশিষ্ঠে নহে, বিশ্বামিত্রে। বাল্মীকির গীত গুলিতে কারিগরি নাই। কিন্তু আমরা এ সকলের কথা বলিব না। চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন কিরণে ডুবিয়া যায়, এও তাই। ইহার গুণ সকল বলিয়া উঠি এমন সময়ও নাই। কাব্যের প্রধান উৎকর্ষ—কল্পনায়। ইহার কল্পনা অতিশয় মহিমাময়ী। ঋভুদিগের আগমন, বিশ্বামিত্র, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি, বিশ্বামিত্রের অধঃপাত, কৌশাম্বীর যজ্ঞ, অন্তে বিরাট দর্শন;—যাহা দেখ সকলই মহিমাময়ী কল্পনায় সমুজ্জ্বল। সর্ব্বাপেক্ষা এই বিশ্বামিত্রই ভয়ানক মূর্ত্তি। রাবণ বা বৃত্রাসুর যে ছাঁচে ঢালা এ সে ছাঁচে ঢালা। আমরা রামায়ণের রাবণ বা পুরাণের বৃত্রের কথা বলিতেছি না। মধুসূদনের রাবণ—হেমচন্দ্রের বৃত্রাসুর। সে ছাঁচ বড় ভারি ছাঁচ। কিন্তু মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কাব্যের ধাত্রী ইংরেজি সাহিত্য। ইংরেজি সাহিত্যের পক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মাপা জোঁকা বেড়া গোড়া। রাবণ ও বৃত্র প্রকাণ্ড মূর্ত্তি হইলেও মাপা জোকা বেড়া গোড়া। কেবল সেই প্রাচীন পুরাণপ্রণেতারা অপরিমেয়, অনন্ত বিরাটমূর্ত্তি সৃষ্টি করিতে জানিতেন; পৃথিবীতে আর কোথাও এমন কোন জাতি জন্মে নাই যে সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় মানসিকশক্তি ধরিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইংরেজিতে সুশিক্ষিত হইয়াও প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রে অতিশয় সুপণ্ডিত, তাঁহার মানসিক শক্তির পরিপোষণে পাশ্চাত্য ও আর্য্য উভয়বিধ সাহিত্যই তুল্যরূপে প্রবেশ করিয়াছে। এবং এই বিশ্বামিত্র প্রণয়নকালে তিনি প্রাচীন আর্য্যসাহিত্যের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যাঁহাদের রুচি পাশ্চাত্য সমালোচকদিগের ব্যবস্থানুযায়ী, তাঁহাদের কাছে এ বিশ্বামিত্রের কোন আদর হইবে না।

যেমন কল্পনা, তেমন বর্ণনা। বর্ণনায় আমরা অনেক পরিচয় দিয়াছি। ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে কিন্তু

আমরা এই গ্রন্থের বাঙ্গালাকে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বলি। এই বঙ্গদর্শনে অনেকবার এ পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে, সুতরাং সে কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থ খানি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থকার এত অল্প বয়সে এরূপ প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এমন আমাদের স্মরণ হয় না।



"স্বভাবে কি অর্থ নাই ?"

"স্বভাবে কি অর্থ নাই"—প্রান্তর সে স্থান
অদূরে ভীষণ মূর্ত্তি বিশাল ভূধর
ভেদিয়া গগনবপু হয়েছে উত্থিত।
গিরি-পদমূলে ভূমি—প্রকাণ্ড প্রান্তর
তৃণহীন—তরুহীন—প্রবাহ বিহীন
মরুময়—ভীমাকৃতি—বিশাল কান্তার।
নিম্নভাগে এই দৃশ্য—ঊর্দ্ধে ততোধিক
অচল অটল বেশে সায়াহ্ন গগন
অনাদি—অনন্ত—শূন্যে পড়েছে ছড়ায়ে।
সুদীর্ঘ—সুদূর—যেন তা হ'তে অধিক
অবিশ্রাম—অবিরাম—অনাদি অক্ষয়
একটী মহান্ দৃশ্য করিয়া চিত্রিত
দর্শকের নেত্র-পথে করেছে স্থাপিত।
বিস্ফারিত নেত্রে যেন চাহি ক্ষিতি পানে
ছুটেছে অসীম শূন্যে অশ্রান্ত প্রভাবে ;
ইঙ্গিতে কহিছে যেন—"হও অগ্রসর
এইরূপে—এইবেশে এমনি প্রভাবে
দেও চিত্ত ছড়াইয়া—অনন্ত বিস্তারে
সাধনার এই ছবি—এমনি আকার
আকাঙ্ক্ষার শূন্য-পথে এমনি করিয়া
অবিশ্রাম অবিরাম হও অগ্রসর।"
এ হেন মহান দৃশ্যে নয়ন রাখিয়া
ভীষণ কান্তারে সেই দাঁড়াইয়া যুবা
"স্বভাবে কি অর্থ নাই ?" কহিল কাতরে।
অস্তমান দিবাকর লোহিত বরণে,
ঢালিয়া কাঞ্চন ভাতি উত্তরে পশ্চিমে
দেখাইয়া গগনেরে যেন প্রলোভন
কহিছে ইঙ্গিত করি—" কোথা যাও ছুটি
আইস আমার সনে অধঃপাতে যাই
হেম কান্তি অঙ্গে মম ঝরিতেছে যাহা
ঈষৎ প্রভায় যার এত শোভা তব
এ হ'তে কতই রম্য মহার্ঘ রতন
অধঃপাতে রাশি রাশি রয়েছে বিস্তৃত।
এই পদছায়া মম করিয়া ধারণ
এস নভঃ অধঃপাতে ভবনে আমার।"
হাসিয়া ঘৃণায় যেন উগ্রতর বেশে
ছুটেছে গগন শূন্যে অসঙ্কোচ ভাবে।
মলয় সমীর পুন ছড়ায়ে সৌরভ

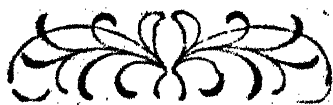
ঊর্দ্ধ মুখে ছুটিয়াছে নিয়ে গগনের,
কহিছে আদরে যেন মোহিনী ভাষায়
" কোথা যাও রহ রহ দেখ একবার—
কুসুম ভাণ্ডার লুটি ভূতল হইতে
এনেছি সুগন্ধ কিবা তোমার কারণ,
কত যে কৌশল করি কতই যতনে
কমল কোরক হ'তে এ গন্ধ হরিনু
কি আর কহিব তোমা, কেতকী মালতী
টগর মল্লিকা আর গোলাপ সেফালি
লাজে জড়সড় আহা ঘন দলে ঢাকি
রেখেছিল লুকাইয়া হৃদয়ের নিধি
দরিদ্র সাধুর গুপ্ত সুখের মতন
তা সবে কতই সাধি কতই ভুলায়ে
হরিয়া এনেছি এই গন্ধ সম্মোহন।
দেখ পুন অঙ্গ মোর আলিঙ্গি বারেক
অকূল অতল সিন্ধু সলিলে ভাসিয়া
মধ্যস্থল হ'তে তার শীতল পরশ
এনেছি হৃদয়ে তুলি, নির্ম্মল নির্ঝর
নিভৃত পর্ব্বত দেশে বহিছে গোপনে
রমণীর হৃদয়ের প্রেমস্রোতমত,
ভাসিয়া ভাসিয়া তার প্রতি কণা হ'তে
এনেছি এ শীতি ভাব যতনে তুলিয়ে
শীতলিতে অঙ্গ তব,—আইস গগন
কোথা যাও ছুটি শূন্যে রহ এইখানে
ক্ষণকাল প্রেমালাপ করি দুই জনে।
না হেরি—না শুনি তাহা সমধিক বেগে
ছুটেছে গগন শূন্যে উদ্দেশে আপন।"
বসুন্ধরা খুলি বক্ষ ছড়ায়ে সুষমা
কহিতেছে যেন পুন মোহিনী ভাষায়
"একবার দেখ চেয়ে গগন হেথায়,
সৌন্দর্য্যের চিরবাস হৃদয় আমার
এমন শীতলতোয়া অকূল বারিধি
এমন উদ্যান বন শোভার আধার
শাখায় শাখায় যার পল্লবে পল্লবে
মধুর শীতল ছায়া রয়েছে জড়ান।
বৃন্তে বৃন্তে বৃন্তে যার বিবিধ কুসুম
দলে দলে বিকাশিছে ঘ্রাণ সম্মোহন
এমন ভূধর রাজি জঙ্গমে ভূষিত
এমন প্রান্তর মাঠ দূর্ব্বায় শোভিত।
বীণাবিনিন্দিত স্বরে কল নিনাদিনী
দর্পণ হৃদয়া হেন নির্ঝর তটিনী
ষড় ঋতু রঙ্গভূমি এমন আবাস
নর নারী পশু পক্ষী পূর্ণ এ সংসার
তোমার মানস সুধু তুষিবার তরে
বিপুল এ শোভা বক্ষে করেছি ধারণ
কোথা যাও শূন্য-পথে কি আছে উহায়
মম রাজ্যে ক্ষণকাল করহ বিহার।"
হাসিয়া বিকৃত হাস তীব্র দৃষ্টি করি
উগ্রতম বেগে নভঃ যেন শূন্যে ছোটে।
ধীরে নত করি যুবা অবসন্ন শির,
"স্বভাবে কি অর্থ নাই ?" কহিল কাতরে
মলিন যুবার মুখ, বদন মণ্ডলে
অঙ্কিত হয়েছে গাঢ় বিষাদের ছায়া
রুক্ষ মস্তকের কেশ, শুষ্ক কলেবর
অঙ্গ আবরিত জীর্ণ মলিন বসনে
অতি দরিদ্রের বেশ—কিন্তু অবয়বে
আয়ত উজ্জ্বল শান্ত যুগল নয়নে
গাম্ভীর্য্যে প্রশান্ত সেই কাতর বদনে
ঝরিয়া পড়িছে যেন মহত্বের আভা।
ধনী হও—রাজা হও—জ্ঞানী কিম্বা বীর
শঙ্কিত হইবে তুমি সম্ভাষিতে তায়
ভয় ভক্তি যুগপৎ অন্তরে তোমার

উঠিবে উথলি,—তুমি স্তম্ভিত হইবে।
বিস্মিত নয়নে সুধু রহিবে চাহিয়া
অদ্ভুত লক্ষণপূর্ণ যুবার বদনে।
ওই দেখ অঙ্গে অঙ্গে এখনো যুবার
বিরাজিছে সুলক্ষণ অস্ফুট ছায়ায়
হায়রে! যেমতি আজ আর্য্যাবর্ত্ত হৃদে
বিলুপ্ত—চিতোর কিম্বা রাজস্থান ছায়া
অথবা শিবজী কীর্ত্তি দক্ষিণ ভারতে
ক্লেশকর দৃশ্য ধরি করিছে বিরাজ।
"স্বভাবে কি অর্থ নাই?" বলিতে বলিতে
ত্যজি দীর্ঘ শ্বাস যুবা চাহিল গগনে
নিরখিয়া ক্ষণকাল কহিল কাতরে
"ওই যে প্রকাণ্ড দৃশ্য সম্মুখে আমার
অনাদি—অনন্ত ওই—বিপুলা প্রকৃতি
শিক্ষার জীবন্ত পত্র ভাবিয়া যাহায়
ছুটিলাম আজীবন শূন্য আকাঙ্ক্ষায়—
সেই শিক্ষা পত্র—ওই অশ্রান্ত প্রভাব
কেবলি কি শূন্যে আদি—শূন্যে অন্ত তার!
আমার এ দুর্নিবার আশা অবিশ্রাম
নিরাশাই কেবলি কি তার পরিণাম!
পারিনা দেখিতে আর—পারিনা ভাবিতে
প্রকৃতি তোমার অর্থ—অতৃপ্ত হৃদয়ে।
সহিষ্ণুতা!—সহিষ্ণুতা—বাকি কিবা আর!
ছিন্ন করি—ছিন্ন করি—গ্রন্থি হৃদয়ের
দুস্ত্যজ্য—দুশ্ছেদ্য—মম সূত্র মমতার
ছিন্ন করি ভাসিলাম একা পারাবারে
সুধু ওই অর্থ তব দেখিতে দেখিতে—
ভাসে যথা সিন্ধুনীরে বিপথ নাবিক
সুদূর গগনে দূর তারা লক্ষ্য করি!
কিন্তু কি করিনু—সুধু পণ্ডশ্রম সার
কিম্বা নাহি বুঝিলাম প্রকৃতি তোমার
কিবা সে প্রকৃত অর্থ!—কিন্তু যে আমার
দৃষ্টি নাহি চলে আর—হেরি শূন্যময়
শব্দহীন—প্রাণহীন—অর্থহীন শূন্য
না পারি সরিতে আমি না পারি তিষ্ঠিতে
পদতলে শূন্য—উর্দ্ধে শূন্য ততোধিক
সম্মুখে নীবিড় শূন্য—পশ্চাতে আবার
কেবলি অনন্ত শূন্য—নহে ফিরিবার।
ভাবি যেন সরিতেছে শূন্য পদমূলে
পতন না হয় তবু! দুর্জ্ঞেয় বিধাত!
কৃপা করি অনুভূতি কর অপহৃত,
এ চিন্তা হৃদয়ে আর পারিনা বহিতে
নতুবা দেখাও পথ তাপিত সেবকে
ফিরে যাই দুরাশার প্রবাহ আমার
উপজিল যথা হতে—অথবা আমায়
দেহ বল বিশ্বনাথ! শূন্য ভেদ করি
আমার কল্পিত রাজ্য করিব উদ্ধার
অমিত প্রভাবে যথা বিশ্বামিত্র ঋষি
সৃজিল ব্রহ্মাণ্ড নব মথি শূন্য পথ।"
নীরব হইল যুবা—ক্ষণকাল পরে
ত্যজি দীর্ঘশ্বাস ধীরে নত কৈল শির।
সহসা কঠোর রব জলদ গম্ভীরে
শূন্য-দেশ হ'তে যেন হইল উত্থিত,
সিহরি চকিত নেত্রে চাহিল যুবক
হেরিল চৌদিকে ঘোর শবদ বিকাশে
ক্ষিপ্ত-তেজ-মরুদ্ব্যোম হ'তে সমস্বরে
উঠিছে কঠোর-রব—ভাবিল যুবক
বিশ্ব মগ্ন যেন সেই অদ্ভুত ভাবায়।
ক্রমে স্পষ্টতর রব হইল উত্থিত—
"প্রকৃতি নিরর্থ নহে দেখ নেত্র তুলি
এই যে বিপুল বিশ্ব সম্মুখে তোমার
প্রকাণ্ড এ শূন্য-পথ বিশাল ধরণী

অনন্ত—এ জীবকুল তরু লতাগিরি,
নদ নদী সরোবর অকূল জলধি
এই আলো অন্ধকার—দিবসরজনী
এই ঋতু পরকাশ ঋতু অবসানে
পরিপূর্ণ অর্থে সব বিশ্ব অর্থময়।
এই গগনেতে লেখা কঠোর সাধনা
ধরণীর বক্ষে ওই লেখা সহিষ্ণুতা
পবনের স্পর্শে লেখা ঘোর উদ্দীপনা
ভূধরের অঙ্গে ওই লেখা দৃঢ়ব্রত
সলিলের অঙ্গে অঙ্গে লেখা আত্মদান
জীবকুল-আস্যে লেখা ওই দেখ আশা
তরুলতা অঙ্গে ওই লেখা সফলতা
দিবস রজনী আর ঋতুর বিকাশে
অবস্থার বিচিত্রতা সতত প্রকাশে।"
নীরব হইল রব—নীরব প্রান্তর—
হইল নীরবতর—শূন্য নভস্তল
হইল অধিক শূন্য—উর্দ্ধমুখে যুবা
উদাস উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টে তখনো চাহিয়া
শূন্য গগনের তলে, দেখিতে দেখিতে
যুবার কাতর মুখ প্রশান্ত হইল
জ্বলিতে লাগিল নেত্রে জীবন্ত প্রতিভা
উৎসাহে বিশাল বক্ষঃ দীর্ঘ বাহুদ্বয়
হইল প্রশস্ততর অস্তমান রবি
নিরখি সে ভীম মূর্ত্তি প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক
নিরাশ্রয়—নিঃসহায়—একাকি যে যুবা
অদ্ভুত দুষ্কর কার্য্য করিবে সাধন
সেই কীর্ত্তিধর—সেই অপূর্ব্ব নরের
নিরখি চৈতন্য ভয়ে ত্বরিত চরণে
পশিলেন অস্তাচলে—অস্ফুট প্রদোষ
ধীরে ধীরে শূন্যদেশে পড়িল ছড়ায়ে
ক্রমে গাঢ়—গাঢ়তর—গাঢ়তম শেষে
অন্ধকারশূন্যমর্ত্ত্য আবরিল ধীরে
অনন্য আঁধারে ক্রমে ডুবিল জগৎ।
তখনো যুবক উর্দ্ধে উদ্ভ্রান্ত-নয়নে
চেয়েছিল অন্ধময় আকাশের পানে।
দেখিতে দেখিতে দূর—সুদূর আকাশে
ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ—সূক্ষ্ম আলোক বিকাশি
ভাতিল তারকা এক—দুই—তিন—চারি
ক্রমে পুঞ্জ—ক্রমে শত—সহস্র তারকা
উজ্জ্বল—উজ্জ্বলতর—সমুজ্জ্বল হয়ে
চৌদিকে উঠিল জ্বলি—দেখিতে দেখিতে
অস্ফুট নিষ্প্রভ এক অঙ্গ চন্দ্রমার—
প্রকাশিল দূরনভে—ক্রমে স্পষ্টতর
অর্দ্ধাংশ—ত্রয়াংশ—ক্রমে পূর্ণ—আয়তনে
রজত থালার মত—পূর্ণ—জোছনায়
হাসায়ে ভুবন চন্দ্র—ভাসিল গগনে।
হেরিল যুবক শেষে শূন্য নভস্থল—
গ্রহ—উপগ্রহে পূর্ণ—নহে—শূন্য আর—
তখন একাগ্রদৃষ্টে—তীর্য্যক নয়নে
দেখিতে লাগিল যুবা গগন মণ্ডলে,
বিস্ময়ে পূরিল চিত্ত—ক্ষণকাল আগে
অর্থ-হীন ভাবি যেই নভস্তল হ'তে
সরাইয়াছিল নেত্র—সেই শূন্য এবে
হেরিল যুবক পূর্ণ—গ্রহ উপগ্রহে।
শত সহস্র—অযুত—লক্ষ—কোটী কোটী
গ্রহে পরিপূর্ণ শূন্য বিচিত্র বিস্তার।
এমন সময় এক তাপস প্রাচীন
মূর্ত্তিমান বহ্নিপ্রায় উপনীত তথা।
শ্বেত-শ্মশ্রুরাজি—রজত প্রবাহে
পড়িয়াছে কোটি ঢাকি, গৈরিক বসন,
লোহিত চন্দন লেপ—প্রশস্ত ললাটে
বিশাল দক্ষিণ করে ধৃত কমণ্ডলু

বাম করে দেহাধিক বিশাল ত্রিশূল,
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যেন নিজে মহাযোগ
তাপসের বেশে আজ সম্মুখে যুবার।
আয়ত লোচন কিন্তু শান্তির সাগর
পলকে পলকে তাঁর ঝরিছে অভয়।
এত যে ভীষণ মূর্ত্তি দীপ্ত উগ্রতেজে
দৃষ্টিতে ঝরিছে কিন্তু " অভয় অভয়। "
" মহেন্দ্র ! " গম্ভীরে ডাকি কহিল তাপস
" স্বভাবের অর্থ তুমি বুঝিলে কি এবে ?"
মহেন্দ্র চকিতে ফিরি হেরিল তাপসে—
পূর্ণচন্দ্রমার প্রভা পড়িয়া ত্রিশূলে
জ্বলিয়া উঠিছে যেন ত্রিফলা তাহার
গৈরিক বসনে সেই উজ্জ্বল কিরণ
পড়িয়া রক্তাক্ত বেশ হৈল দৃশ্যমান
ললাটে সে পূর্ণজ্যোতি হইয়া পতিত
বহ্নিপ্রায় দীপ্ত হৈল চন্দন প্রলেপ
কাঁপিয়া উঠিল যুবা সে মূর্ত্তি নিরখি।
তাপস কহিল পুন,"বুঝিলে মহেন্দ্র ?
" অনন্ত—অদ্ভুত এই সৃষ্টি চতুর্দ্দিকে
সাধনার কার্য্য ইহা—মন্ত্রে সৃষ্ট নয়।
শোক দুঃখ ক্ষোভ আর ছায়া নিরাশার
কর অপসৃত তব হৃদিতল হ'তে।
প্রকৃতির এই অর্থ দেখিতে দেখিতে
হও অগ্রসর তব সাধনার পথে।
পুরস্কার তার—শূন্যে ওই সৃষ্টি মত
গ্রহ উপগ্রহে শেষে হবে পরিণত। "
দেখিতে দেখিতে ঋষি গেল মিলাইয়া
প্রকৃতির শূন্য অঙ্কে—বিস্ময়ে যুবক
চৌদিকে আগ্রহ নেত্রে করিল দর্শন
কিন্তু তাপসের আর নহিল সন্ধান
ধীরে ধীরে ভূমিতলে বসিয়া তখন
প্রকৃতির চিত্রপটে রহিল চাহিয়া।
গগনে ভূতলে জলে লতায় পাতায়
যেখানে নিরখে যুবা হেরে অর্থ তায়।
তোমরাও বঙ্গবাসি ! যুবকের সনে
প্রকৃতির এই অর্থ দেখিতে দেখিতে
হও অগ্রসর সবে আকাঙ্ক্ষার পথে
পুরস্কার তার—শূন্যে ওই সৃষ্টিমত
অনন্ত অসীম রাজ্যে হবে পরিণত।

ঈশান—



পালামৌ।

কোলের নৃত্যসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে, এবার তাহাদের বিবাহের পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কোলের অনেক শাখা আছে। আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় যেন উরাও, মুণ্ডা, খেরওয়ার এবং দোসাদ এই চারি জাতি তাহার মধ্যে প্রধান। ইহার এক জাতির বিবাহে আমি বরযাত্রী হইয়া কতক দূর গিয়াছিলাম। বরকর্ত্তা আমার পাল্‌কি লইয়া গেল, কিন্তু আমায় নিমন্ত্রণ করিল না; ভাবিলাম, না করুক, আমি রবাহূত যাইব। সেই অভিপ্রায়ে অপরাহ্নে পথে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি পাল্‌কিতে বর আসিতেছে। সঙ্গে দশ বার জন পুরুষ আর পাঁচ ছয় জন যুবতী, যুবতীরাও বরযাত্রী। পুরুষেরা আমায় কেহই ডাকিল না, স্ত্রীলোকের চক্ষুলজ্জা আছে, তাহারা হাসিয়া আমায় ডাকিল, আমিও হাসিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিলাম, কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিলাম না, তাহারা যেরূপ বুক ফুলাইয়া, মুখ তুলিয়া, বায়ু ঠেলিয়া মহাদম্ভে চলিতেছিল আমি দুর্ব্বল বাঙ্গালি আমার সে দম্ভ, সে শক্তি কোথায়? সুতরাং কতক দূর গিয়া পিছাইলাম; তাহারা তাহা লক্ষ্য করিল না, হয় ত দেখিয়াও দেখিল না; আমি বাঁচিলাম। তখন পথপ্রান্তে এক প্রস্তরস্তূপে বসিয়া ঘর্ম্ম মুছিতে লাগিলাম আর রাগভরে পাতুরে মেয়ে গুলাকে গালি দিতে লাগিলাম। তাহাদিগকে সেপাই বলিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর পাল বলিলাম, আর কত কি বলিলাম। আর একবার বহু পূর্ব্বে এইরূপ গালি দিয়াছিলাম। একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় টিটাগোড়ের বাগানে "লসিংটন লজ" হইতে গজেন্দ্রগমনে আমি আসিতেছিলাম —তখন রেলওয়ে ছিলনা সুতরাং এখনকার মত বেগে পথ চলা বাঙ্গালির মধ্যে বড় ফেসন হয় নাই—আসিতে আসিতে পশ্চাতে একটা অল্প টক টক শব্দ শুনিতে পাইলাম। ফিরিয়া দেখি গবর্ণর জেনেরল কাউন্‌সলের অমুক মেম্বারের কুলকন্যা একা আসিতেছেন। আমি তখন বালক, ষোড়শ বৎসরের অধিক আমার বয়স নহে, সুতরাং বয়সের মত স্থির করিলাম স্ত্রীলোকের নিকট পিছাইয়া পড়া হইবে না, অতএব যথাসাধ্য চলিতে লাগিলাম। হয় ত যুবতীও তাহা বুঝিলেন। আর একটু অধিক বয়স হইলে এদিকে তাঁহার মন যাইত না। তিনি নিজে অল্পবয়স্কা; আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠা, সুতরাং এই উপলক্ষে বাইচ খেলার আমোদ তাঁহার মনে আসা সম্ভব। সেই জন্য একটু যেন তিনি জোরে বাহিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমে মেঘের মত আমাকে ছাড়াইয়া

গেলেন, যেন সেই সঙ্গে একটু "ছুয়ো" দিয়া গেলেন,—অবশ্য তাহা মনে মনে, তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি ছিল তাহাই বলিতেছি। আমি লজ্জিত হইয়া নিকটস্থ বটমূলে বসিয়া সুন্দরীদের উপর রাগ করিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলাম। যাহারা এত জোরে পথ চলে তাহারা আবার কোমলাঙ্গী? খোসামুদেরা বলে তাহাদের অলকদাম সরাইবার নিমিত্ত বায়ু ধীরে ধীরে বহে। কলা গাছে ঝড়, আর সীমুল গাছে সমীরণ?

সে সকল রাগের কথা এখন যাক, যে হারে সেই রাগে। কোলের কথা হইতে ছিল। তাহাদের সকল জাতির মধ্যে এক-রূপ বিবাহ নহে। এক জাতি কোল আছে, তাহারা উরাও কি, কি তাহা স্মরণ নাই, তাহাদের বিবাহপ্রথা অতি পুরা-তন। তাহাদের প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তে একখানি করিয়া বড় ঘর থাকে। সেই ঘরে সন্ধ্যার পর একে একে গ্রামের সমুদায় কুমারীরা আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই ঘর তাহাদের ডিপো। বিবাহযোগ্যা হইলে আর তাহারা পিতৃগৃহে রাত্রি যাপন করিতে পায় না। সকলে উপস্থিত হইয়া শয়ন করিলে গ্রামের অবিবা-হিত যুবারা ক্রমে ক্রমে সকলে সেই ঘরের নিকটে আসিয়া রসিকতা আরম্ভ করে; কেহ গীত গায়, কেহ নৃত্য করে, কেহ বা রহস্য করে। যে কুমারীর বিবাহের সময় হয় নাই সে অবাধে নিদ্রা যায়। কিন্তু যাহাদের সময় উপস্থিত তাহারা বসন্তকালের পক্ষিণীর ন্যায় অনি-মেষলোচনে সেই নৃত্য দেখিতে থাকে, একাগ্রচিত্তে সেই গীত শুনিতে থাকে। হয় ত থাকিতে না পারিয়া শেষ ঠাট্টার উত্তর দেয়, কেহ বা গালি পর্য্যন্তও দেয়। গালি আর ঠাট্টা উভয়ে প্রভেদ অল্প, বিশেষ যুবতীর মুখবিনির্গত হইলে যুবার কর্ণে উভয়ই সুধাবর্ষণ। কুমারীরা গালি আরম্ভ করিলে কুমারেরা আনন্দে মাতিয়া উঠে।

এইরূপে প্রতিরাত্রে কুমার কুমারীর বাক্‌চাতুরি হইতে থাকে, শেষ তাহাদের মধ্যে প্রণয় উপস্থিত হয়। প্রণয় কথাটী ঠিক নহে। কোলের প্রেম প্রীতের বড় সম্বন্ধ রাখে না। মনোনীত কথাটি ঠিক্। নৃত্য, হাস্য উপহাস্যের পর পরস্পর মনোনীত হইলে, সঙ্গী সঙ্গিনীরা তাহা কাণাকাণি করিতে থাকে। ক্রমে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রকথা শুনিয়া উভয় পক্ষের পিতৃকুল সাবধান হইতে থাকে। সাবধানতা অন্য বিষয়ে নহে। কুমারীর আত্মীয় বন্ধুরা বড় বড় বাঁস কাটে, তীর ধনুক সংগ্রহ করে; অস্ত্রশস্ত্রে সান দেয়। আর অন-বরত কুমারের আত্মীয় বন্ধুকে গালি দিতে থাকে। চীৎকার আর আস্ফা-লনের সীমা থাকে না। আবার এদিকে উভয় পক্ষে গোপনে গোপনে বিবাহের আয়োজনও আরম্ভ করে।

শেষ একদিন অপরাহ্নে কুমারী

হাসি হাসি মুখে বেশ বিন্যাস করিতে বসে। সকলে বুঝিয়া চারি পার্শ্বে দাঁড়ায়, হয় ত ছোট ভগিনী বন হইতে নূতন ফুল আনিয়া মাথায় পরাইয়া দেয়, বেশ বিন্যাস হইলে কুমারী উঠিয়া গাগরি লইয়া একা জল আনিতে যায়। অন্য দিনের মত নহে, এ দিনে ধীরে ধীরে যায়, তবু মাথার গাগরি টলে। বনের ধারে জল, যেন কতই দূর! কুমারী যাই-তেছে আর অনিমেষলোচনে বনের দিকে চাহিতেছে। চাহিতে চাহিতে বনের দুই একটী ডাল দুলিয়া উঠিল, তাহার পর এক নবযুবা, সখা সুবলের মত, লাফাইতে লাফাইতে সেই বন হইতে বহির্গত হইল, সঙ্গে সঙ্গে হয় ত দুটা চারিটা ভ্রমরও ছুটিয়া আসিল। কোল-কুমারীর মাথা হইতে গাগরি পড়িয়া গেল। কুমা-রীকে বুকে করিয়া যুবা অমনি ছুটিল। কুমারী সুতরাং এ অবস্থায় চীৎ-কার করিতে বাধ্য, চীৎকারও সে করিতে লাগিল। হাত পাও আছ-ড়াইল। এবং চড়টা চাপড়টা যুবা-কেও মারিল; নতুবা ভাল দেখায় না! কুমারীর চীৎকারে তাহার আত্মীয়েরা "মার মার" রবে আসিয়া পড়িল। যুবার আত্মীয়েরাও নিকটে এখানে সে খানে লুকাইয়াছিল তাহারাও বাহির হইয়া পথরোধ করিল। শেষ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ রুক্মিণীহরণের যাত্রার মত, সকলের তীর আকাশমুখী। কিন্তু শুনি-য়াছি দুই একবার নাকি সত্য সত্যই মাথা ফাটাফাটিও হইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক শেষ যুদ্ধের পর আপশ হইয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ উভয় পক্ষ একত্র আহার করিতে বসে।

এইরূপ কন্যা হরণ করাই তাহাদের বিবাহ। আর স্বতন্ত্র কোন মন্ত্র তন্ত্র নাই। আমাদের শাস্ত্রে এই বিবাহকে আসু-রিক বিবাহ বলে। এক সময় পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই বিবাহ প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে স্ত্রী আচারের সময় বরের পৃষ্ঠে বাউটিবেষ্টিত নানা ওজনের কর-কমল যে সংস্পর্শ হয় তাহাও এই মার-পিট প্রথার অবশেষ। হিন্দুস্থান অঞ্চলে বরকন্যার মাসি পিসি একত্র জুটিয়া নানা ভঙ্গীতে, নানা ছন্দে, মেছুয়াবাজা-রের ভাষায় পরস্পরকে যে গালি দিবার রীতি আছে তাহাও এই মারপিট প্রথার নূতন সংস্কার। ইংরেজদের বরকন্যা গির্জ্জা হইতে গাড়ীতে উঠিবার সময় পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় তাহাদের অঙ্গে যে জুতাবৃষ্টি হয় তাহাও এই পূর্ব্বপ্রথার অন্তর্গত। *

কোলদের উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা বিবাহে। তদুপলক্ষে ব্যয়ও বিস্তর। আট টাকা, দশ টাকা, কখন কখন

* যে আসুরিক বিবাহের পরিচয় দিলাম তাহা Exogamy নহে। কেন না ইহা স্বজাতি বিবাহ।

পনর টাকা পর্য্যন্তও ব্যয় হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অতি সামান্য কিন্তু বন্যের পক্ষে অতিরিক্ত। এত টাকা তাহারা কোথা পাইবে? তাহাদের এক পয়সা সঞ্চয় নাই, কোন উপার্জ্জনও নাই, সুতরাং ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কর্জ্জ করিতে হয়। দুই চারি গ্রাম অন্তর একজন করিয়া হিন্দুস্থানী মহাজন বাস করে, তাহারাই কর্জ্জ দেয়। এই হিন্দুস্থানীরা মহাজন কি মহাপিশাচ সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তাহাদের নিকট একবার কর্জ্জ করিলে আর উদ্ধার নাই। যে একবার পাঁচ টাকা মাত্র কর্জ্জ করিল সে সেই দিন হইতে আপন গৃহে আর কিছুই লইয়া যাইতে পাইবে না, যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহা মহাজনকে আনিয়া দিতে হইবে। খাতকের ভূমিতে দুই মণ কার্পাস কি চারি মণ যব জন্মিয়াছে; মহাজনের গৃহে তাহা আনীত হইবে; তিনি তাহা ওজন করিবেন, পরীক্ষা করিবেন, কত কি করিবেন, শেষ হিসাব করিয়া বলিবেন যে আশল পাঁচ টাকার মধ্যে এই কার্পাসে কেবল এক টাকা শোধ গেল, আর চারি টাকা বাকি থাকিল। খাতক যে আজ্ঞা বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরিবার খায় কি? চাষে যাহা জন্মিয়াছিল মহাজন তাহা সমুদয় লইল। খাতক হিসাব জানে না, এক হইতে দশ গণনা করিতে পারে না, সকলের উপর তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। মহাজন যে অন্যায় করিবে ইহা তাহার বুদ্ধিতে আইসে না। সুতরাং মহাজনের জালে বদ্ধ হইল। তাহার পর পরিবার আহার পায় না, আবার মহাজনের নিকট খোরাকী কর্জ্জ করা আবশ্যক, সুতরাং খাতক জন্মের মত মহাজনের নিকট বিক্রীত হইল। যাহা সে উপার্জ্জন করিবে তাহা মহাজনের। মহাজন তাহাকে কেবল যৎসামান্য খোরাকি দিবে। এই তাহার এ জন্মের বন্দোবস্ত।

কেহ কেহ এই উপলক্ষে "সামকনামা" লিখিয়া দেয়। সামকনামা অর্থাৎ দাসখত। যে ইহা লিখিয়া দিল সে রীতিমত গোলাম হইল। মহাজন গোলামকে কেবল আহার দেন, গোলাম, বিনা-বেতনে তাঁহার সমুদয় কর্ম্ম করে; চাষ করে, মোট বহে, সর্ব্বত্র সঙ্গে যায়। আপনার সংসারের সঙ্গে আর তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। সংসারও তাহাদের অন্নাভাবে শীঘ্রই লোপ পায়।

কোলদের এই দুর্দ্দশা অতি সাধারণ, তাহাদের কেবল এক উপায় আছে—পলায়ন। অনেকেই পলাইয়া রক্ষা পায়। যে না পলাইল সে জন্মের মত মহাজনের নিকট বিক্রীত থাকিল।

পুত্রের বিবাহ দিতে গিয়া যে কেবল কোলের জীবনযাত্রা বৃথা হয় এমত নহে, আমাদের বাঙ্গালির মধ্যে অনেকের দুর্দ্দশা পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে অথবা পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে। সকলেই মনে মনে জানেন আমি বড় লোক,

আমি "ধুমধাম" না করিলে লোকে আমার নিন্দা করিবে। সুতরাং কর্জ্জ করিয়া সেই বড়লোকত্ব রক্ষা করেন তাহার পর যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সে কর্জ্জ হইতে উদ্ধার হওয়া ভার হয়। প্রায় দেখা যায় "আমি ধনবান্" বলিয়া প্রথমে অভিমান জন্মিলে শেষ দারিদ্র্য-দশায় জীবন শেষ করিতে হয়।

কোলেরা সকলেই বিবাহ করে। বাঙ্গালা শস্যশালিনী, এখানে অল্পেই গুজরান চলে, তাহাই বাঙ্গালায় বিবাহ এত সাধারণ। কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে সম্পূর্ণ অন্নাভাব, সেখানে বিবাহ এরূপ সাধারণ কেন, তদ্বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদেরা কি বলেন জানি না। কিন্তু বোধ হয় হিন্দুস্থানী মহাজনেরা তথায় বাস করিবার পূর্ব্বে কোলদের এত অন্নাভাব ছিল না। তাহাই বিবাহ সাধারণ হইয়াছিল। এক্ষণে মহাজনেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লয়। তাহাদের অন্নাভাব হইয়াছে, সুতরাং বিবাহ আর পূর্ব্বমত সাধারণ থাকিবে না বলিয়া বোধ হয়।

কোলের সমাজ এক্ষণে যে অবস্থায় আছে দেখা যায় তাহাতে সেখানে মহাজনের আবশ্যক নাই, যদি হিন্দুস্থানী সভ্যতা তথায় প্রবিষ্ট না হইত তাহা হইলে অদ্যাপি কোলের মধ্যে ঋণের প্রথা উৎপত্তি হইত না। ঋণের সময় হয় নাই। ঋণ উন্নত সমাজের সৃষ্টি। কোলদিগের মধ্যে সেউন্নতির বিলম্ব আছে। সমাজের স্বভাবতঃ যে অবস্থা হয় নাই কৃত্রিম উপায়ে সে অবস্থা ঘটাইতে গেলে, অথবা সভ্য দেশের নিয়মাদি অসময়ে অসভ্য দেশে প্রবিষ্ট করাইতে গেলে, ফল ভাল হয় না। আমাদের বাঙ্গালায় এ কথার অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক সময় ইহুদি মহাজনেরা ঋণ দানের সভ্য নিয়ম অসভ্য বিলাতে প্রবেশ করাইয়া অনেক অনিষ্ট ঘটাইয়াছিল। এক্ষণে হিন্দুস্থানী মহাজনেরা কোলদের সেইরূপ অনিষ্ট ঘটাইতেছে।

কোলের নববধূ আমি কখন দেখি নাই। কুমারী এক রাত্রের মধ্যে নববধূ! দেখিতে আশ্চর্য্য! বাঙ্গালায় দুরন্ত ছুঁড়িরা ধুলাখেলা করিয়া বেড়াইতেছে, ভাইকে পিটাইতেছে, পরের গোরুকে গালি দিতেছে, পাড়ার ভালখাগীদের সঙ্গে কোঁদল করিতেছে; বিবাহের কথা উঠিলে ছুঁড়ি গালি দিয়া পলাইতেছে। তাহার পর একরাত্রে ভাবান্তর। বিবাহের পরদিন প্রাতে আর সে পূর্ব্বমত দুরন্ত ছুঁড়ি নাই। এক রাত্রে তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমি একটী এইরূপ নববধূ দেখিয়াছি। তাহার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়।

বিবাহের রাত্রি আমোদে গেল। পর দিন প্রাতে উঠিয়া নববধূ ছোট ভাইকে আদর করিল, নিকটে মা ছিলেন নববধূ মার মুখ প্রতি এক বার চাহিল, মার চক্ষে জল আসিল, নববধূ মুখাবনত করিল, কাঁদিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে এক নির্জ্জন

স্থানে গিয়া দ্বারে মাথা রাখিয়া অন্যমনস্কে দাঁড়াইয়া শিশিরসিক্ত সামিয়ানার প্রতি চাহিয়া রহিল। সামিয়ানা হইতে টোপে টোপে উঠানে শিশির পড়িতেছে। সামিয়ানা হইতে উঠানের দিকে তাহার দৃষ্টি গেল, উঠানের এখানে সেখানে পূর্ব্ব রাত্রের উচ্ছিষ্টপত্র পড়িয়া রহিয়াছে, রাত্রের কথা নববধূর মনে হইল, কত আলো! কত বাদ্য! কত লোক! কত কলরব! যেন স্বপ্ন! এখন সেখানে ভাঙ্গা ভাঁড়, ছেঁড়া পাতা! নববধূর সেই দিকে দৃষ্টি গেল। একটি দুর্ব্বলা কুক্কুরী—নবপ্রসূতি,—পেটের জ্বালায় শুষ্কপত্রে ভগ্ন ভাণ্ডে আহার খুজিতেছে, নববধূর চক্ষে জল আসিল। জল মুছিয়া নববধূ ধীরে ধীরে মাতৃকক্ষে গিয়া লুচি আনিয়া কক্কুরীকে দিল। এই সময় নববধূর পিতা অন্দরে আসিতেছিলেন, কুক্কুরীভোজন দেখিয়া একটু হাসিলেন, নববধূ আর পূর্ব্বমত দৌড়িয়া পিতার কাছে গেল না, অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা বলিলেন ব্রাহ্মণভোজনের পর কুক্কুর ভোজনই হইয়া থাকে, রাত্রে তাহা হইয়া গিয়াছে, অদ্য আবার এ কেন মা? নববধূ কথা কহিল না! কহিলে হয় ত বলিত এই কুক্কুরী সংসারী।

পূর্ব্বে বলিয়াছি নববধূ লুচি আনিতে যাইবার সময় ধীরে ধীরে গিয়াছিল, আর দুই দিন পূর্ব্বে হইলে দৌড়িয়া যাইত। যখন সেই ঘরে গেল তখন দেখিল মাতার সম্মুখে কতকগুলি লুচি সন্দেশ রহিয়াছে। নববধূ জিজ্ঞাসা করিল "মা! লুচি নেব?" মাতা লুচিগুলি হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন "কেন মা আজ চাহিয়া নিলে? যাহা তোমার ইচ্ছা তুমি আপনি লও, ছড়াও, ফেলিয়া দাও, নষ্ট কর, কখন কাহাকেও ত জিজ্ঞাসা করে লও না? আজ কেন মা চাহিয়া নিলে? তবে সত্যই আজ থেকে কি তুমি পর হ'লে, আমায় পর ভাবিলে?" এই বলিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। নববধূ বলিল "না মা! আমি বলি বুঝি কার জন্য রেখেছ?" নববধূ হয় ত মনে করিল পূর্ব্বে আমায় "ওই" বলিতে, আজ কেন তবে আমায় "তুমি" বলিয়া কথা কহিতেছ?

নববধূর পরিবর্ত্তন সকলের নিকট স্পষ্ট নহে সত্য, কিন্তু যিনি অনুধাবন করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্য! একরাত্রের পরিবর্ত্তন বলিয়া আশ্চর্য্য! নববধূর মুখশ্রী একরাত্রে একটু গম্ভীর হয়, অথচ তাহাতে একটু আহ্লাদের আভাসও থাকে। তদ্ব্যতীত যেন একটু সাবধান, একটু নম্র, একটু সঙ্কোচিত বলিয়া বোধ হয়। ঠিক যেন শেষ রাত্রের পদ্ম। বালিকা কি বুঝিল যে মনের এই পরিবর্ত্তন হঠাৎ এক রাত্রের মধ্যে হইল। শ্রীঃ নাঃ বঃ



যোগবল।

সেকালের যোগবল একালের অনালোচ্য। সেকাল একালের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ। সর্ব্বত্র সেকালের ফল এ কাল। বাঙ্গালায় বুঝি তাহা নহে। এখানে বাঙ্গালা দ্বাদশ শতাব্দীর পর ইংরেজি উনবিংশ শতাব্দী। রাজাদের পর ওয়ারেন্ হেষ্টীংস্।

তথাপি স্মৃতি আসিয়া সেকালে একালে গ্রন্থি দিতে চায়। তাই অদ্যাপি বাঙ্গালি হিন্দু। খ্রীষ্টীয়ান হউক, ব্রাহ্ম হউক, বাঙ্গালি হিন্দু। হিন্দুর মন ইংরেজের মত কেবল বহির্জ্জগৎ লইয়া পরিতৃপ্ত নহে, তদতিরিক্ত আর কিছু চায়, ইংরেজি শিক্ষায় তাহা পায় না। ইংরেজেরা জড় জগতের উপাসক, তাঁহাদের একাধিপত্য সেই জন্য কেবল বহির্জ্জগতে। অন্তর্জগতের তাঁহারা অনধিকারী। একজন ইংরেজ চিত্রকর ইংরেজি সমৃদ্ধির এক চিত্রপট লিখিয়াছিলেন—একদিকে নদী, তাহার বক্ষে শত পতাকা তুলিয়া জাহাজ দাঁড়াইয়া; দূরে এক কপিকল, তাহার পার্শ্বে কাপড়ের গাঁট সুতার গাঁট, অন্য গাঁট, গাঁটের উপর গাঁট : আর এক দিকে অট্টালিকা, ট্রেণ, টেলিগ্রাফ, টেলিস্কোপ, টেলিফোন। এ সকল বিলাতী বাহাদুরীর চূড়ান্ত পরিচয়! বিলাতী বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য সৃষ্টি! কল আর কৌশল। বহির্জ্জগতে আর কি চাই!

কিন্তু হিন্দুর চক্ষে বহির্জ্জগৎ এই জগতের অর্দ্ধেক মাত্র। ইংরেজদের জীবনযাত্রার নিমিত্ত এই অর্দ্ধেকই যথেষ্ট; হিন্দুর নিমিত্ত তাহা যৎসামান্য, অতি অসম্পূর্ণ। হিন্দু আর অর্দ্ধেক চায়, সে অর্দ্ধেক কি, তাহা হয় ত স্পষ্ট বুঝিতে পারে না, অথচ সে অর্দ্ধেকের প্রতি জন্মান্তরীণ সংস্কারের ন্যায় তাহার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে।

সে অর্দ্ধেক অন্তর্জগৎ। ইংরেজেরাও অন্তর্জগতের নাম করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সে জগৎ স্বতন্ত্র। হিন্দুর অন্তর্জগৎ এই বহির্জ্জগতের আত্মাস্বরূপ। আত্মা ব্যতীত দেহ বৃথা,—শবমাত্র; অন্তর্জগৎ ব্যতীত বহির্জ্জগৎ বৃথা, নির্জ্জীব। অন্তর্জগতের সংযোগে বহির্জ্জগৎ চেতনা পায়, জীবিত হয়; হিন্দুর এই বিশ্বাস, এই সংস্কার। এই সংস্কার আর কোন জাতিরই নাই, তাহাই আর কোন জাতি হিন্দু হয় না। ইংরেজ দশভুজা পূজা করিতে পারেন, আমাদের ব্রত নিয়ম পালন করিতে পারেন, অথচ হিন্দু হওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন! ধর্ম্ম লইয়া মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি। কিন্তু মন লইয়া হিন্দু; অন্ততঃ আমি এই রূপ বুঝি।

হিন্দু পুরুষানুক্রমে মনে মনে তর্ক করিয়াছেন, যে নির্জ্জীব বহির্জ্জগতে কেবল জড়ের সাহায্যে যদি শিল্প জন্মিতে পারে,

অর্থাৎ জড়ের সাহায্যে জড় হইতে যদি ট্রেণ টেলিগ্রাফ টেলিফোন ইত্যাদি হইতে পারে, তবে সেই নির্জ্জীবকে সজীব করিতে পারিলে কি না হয়? ইংরেজের মত হিন্দুরা ট্রেণ টেলিগ্রাফে পরিতৃপ্ত নহে। তাহাদের মনে শক্তির আদর্শ আরও উন্নত। হিন্দু আকাশপথে চলিতে চায়, চন্দ্রলোকে যাইতে চায়; জড়দেহ হইতে ইচ্ছামত নিষ্ক্রান্ত হইতে চায়, বাক্‌সিদ্ধ হইতে চায়, আরও কত কি হইতে চায়। ইহার সম্ভাবনা-শূন্যতা হিন্দুর মনে একেবারে আইসে না। হিন্দুর মন সর্ব্বশক্তিমান্। মনের সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় হিন্দু পাইয়াছে, পরিচয়ে বিশ্বাস করিয়াছে। কে সে বিশ্বাসের অন্যথা করিবে? হিন্দুকে কে বুঝাইবে যে তোমার আকাঙ্ক্ষা স্বভাব-বিরুদ্ধ, জগতের ক্ষমতাতীত? হিন্দু তৎ-ক্ষণাৎ হাসিবে, বলিবে "বাপু, জগতের ক্ষমতা কি পর্য্যন্ত? কোথায় তাহার সীমা? আজ তুমি যে ব্যাপার জগতের ক্ষমতাতীত বলিতেছ, কাল সে ব্যাপার ক্ষমতার অধীনে আসিতেছে। কাল তুমি বলিয়াছ, তারে সম্বাদ অসম্ভব, আজ তুমি নিজে তারে সম্বাদ দিতেছ। তোমার মন জড়দেহের অধীন, কাম ক্রোধ লোভ লইয়া তোমার মন, তাই তোমার এত ভ্রম। মনের অধীনত্ব ঘুচাও, তাহার জড়ের ভাগ নষ্ট কর, তোমার ক্ষমতা আরম্ভ হইবে। নির্জ্জীব জড়জগৎকে সজীব কর, তোমার ক্ষমতা অসীম হইবে।"

তাঁহারা বলেন, নির্জ্জীব জড়জগৎ সজীব হয় অন্তর্জ্জগতের সংযোগে।

সেই সংযোগের নাম যোগ। যোগীর যোগ।

অন্তর্জ্জগতে বহির্জ্জগতে সংযোগ! অর্থাৎ জগৎসঙ্গম! এ প্রকাণ্ড ব্যাপার হিন্দু ভিন্ন কে বুঝিতে চেষ্টা করিবে? তাঁহারা বলেন, যোগী ভিন্ন কে বা তাহা বুঝাইবে? কিন্তু যোগীরা তাহা গোপন করেন। আপনারাও গোপনে থাকেন। দুই এক জন বিলাতী লোক যাঁহারা এখন যোগ যোগী মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদেরও এই বিশ্বাস!

অনেক হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস, নির্জ্জীব জগৎ নিত্য সজীব হইতেছে। নিত্য আশ্চর্য্য কাণ্ড উদ্ভাবিত হইতেছে। জড় জগতের উপাসকগণ তাহা দেখিতে পায় না, তাহারা দেখিবার অধিকারী নহে, দেখিলে তাহারা ভোজ বাজি মনে করে। ভোজবাজি! যাহা তাহা-দের বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত তাহাই ভোজ বাজি। যাহা তাহাদের বুদ্ধির অতীত তাহাই ভোজবাজি। ভূকৈলাসের যোগী ভোজ বাজি। দেখিয়াও বিশ্বাস হয় না এই জন্য ভোজ বাজি।



বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

নবম বৎসর।

CALCUTTA:

PRINTED BY SARACHCHANDRA DEVA,
AT THE VINA PRESS, 37 MACHUABAZAR STREET.

শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৮৮৩

১২৮৯ সাল—

সূচিপত্র।

বঙ্গদর্শন।

৯১ সংখ্যা।

রত্ন-রহস্য।

" গোমেদমণি।"

এই মণি স্বনামখ্যাত। ইহাকে পীত মণিও বলে। সংস্কৃত রত্নশাস্ত্রে ইহার ৫টী নাম দেখা যায়। যথা—গোমেদ, রাহু-রত্ন, তমোমণি, স্বর্ভানব, পিঙ্গস্ফটিক। পিঙ্গস্ফটিক ও পীতমণি এই দুইটী নাম গুণ ও দৃশ্য অনুসারী। ইহা এক প্রকার স্ফটিক বলিলেও বলা যায়। কেবল রঙের ও রাসায়নিক গুণের প্রভেদ থাকাতেই স্বতন্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। স্ফটিক শ্বেতবর্ণ কিন্তু ইহা পিঙ্গলবর্ণ বা পীতবর্ণ হয় বলিয়া ইহাকে পীতমণি ও পিঙ্গলস্ফটিক বলা যায়। হিমালয় ও সিন্ধুপ্রদেশে এই রত্ন অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রাজনির্ঘণ্ট নামক বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার ভৈষজ্যোপযোগী গুণ এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। যথা—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, বিকারনাশক, উত্তেজক, অগ্নিশুদ্ধিকারক।

জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে ইহা ধারণ করিলে পাপ নষ্ট হয়। শুক্রনীতি নামক প্রাচীন গ্রন্থের রত্নপ্রকরণে গোমেদমণি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

" বজ্রং মুক্তা প্রবালঞ্চ
গোমেদশ্চেন্দ্রনীলকঃ।
বৈদূর্য্যঃ পুষ্পরাগশ্চ
পাচির্ম্মাণিক্য মেবচ।
মহারত্নানি চৈতানি
নব প্রোক্তানি সূরিভিঃ। "

উল্লিখিত শ্লোকে যে সকল মহারত্নের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মুক্তা, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, পুষ্পরাগ ও মাণিক্য রত্নের বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকগণকে উপহার দিয়াছি। এই প্রস্তাবে গোমেদ রত্ন এবং বিদ্রুমের বিষয়ও থাকিবেক।

শুক্রনীতিপ্রণেতা গোমেদ মণিকে মহারত্ন বলিলেন অথচ ইহার মূল্য অতি অল্প; ইহাও বলিয়াছেন। যথা—

" রত্নশ্রেষ্ঠতরং বজ্রং
নীচং গোমেদ বিদ্রুমম্।"

রত্নের মধ্যে বজ্র অর্থাৎ হীরকই শ্রেষ্ঠ আর গোমেদ ও বিদ্রুমই অধম। রত্নরাজ হীরকের বিষয় আগামী মাসে বহু বিস্তারিত লিখিত হইবেক।

শুক্রনীতিকার গোমেদ মণির পরীক্ষা সম্বন্ধে অধিক কথা লেখেন নাই, কেবল এই মাত্র বলিয়াছেন, যে—

" নায়সোল্লিখ্যতে রত্নং
বিনা মৌক্তিক বিদ্রুমাৎ।
পাষাণোচাপিচ প্রায়
ইতি রত্নবিদো বিদুঃ।"

রত্নতত্ত্ববেত্তারা জানেন, যে, মুক্তা ও বিদ্রুম ভিন্ন কোন রত্নই লৌহশলাকার দ্বারা উল্লিখিত (গাত্রে আঁচোড় দেওয়া) করা যায় না। সুতরাং গোমেদও লৌহের দ্বারা আক্ষোড়িত ও পাষাণে ঘৃষ্ট করা যায় না।

মূল্য সম্বন্ধেও এইরূপ লিখিত আছে—
" অত্যল্প মূল্যো গোমেদো
নোন্মানন্ত্ব যতোঽর্হতি।"
"সংখ্যাতঃ স্বল্পরত্নানাং মূল্যংস্যাৎ——"

[শুক্রনীতি।

অর্থাৎ গোমেদ মণির মূল্য অতি অল্প; সেই হেতু উহা উন্মান অর্থাৎ ওজন করিবার যোগ্য নহে। গোমেদ ও অন্যান্য স্বল্প রত্ন সকলের সংখ্যা অর্থাৎ গণ্তি অনুসারে মূল্য অবধারিত করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে,—

" অত্যন্ত রমণীয়ানাং
দুর্লভানাঞ্চ কামতঃ।
ভবেন্মূল্যং ন মানেন
তথাতি গুণশালিনাম্।"

[শুক্র নীতি।

স্বল্পরত্ন হইলেও যদি দেখিতে সুন্দর হয় বা দুষ্প্রাপ্য হয় তবে তাহার মূল্য ক্রেতা বিক্রেতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং অত্যন্ত গুণান্বিত মহারত্নের পক্ষেও এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। পরন্তু রাজার দোষে কখন কখন ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

"রজতং ষোড়শগুণং
ভবেৎ স্বর্ণস্য মূল্যকম্।"

স্বর্ণের মূল্য রজতের ১৬ গুণ। এই নিয়ম এখন রাজার দুরভিসন্ধিক্রমে ব্যতিক্রান্ত হইয়া ১৬ গুণের পরিবর্ত্তে

২০ গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রৌপ্যের মূল্য কম ও সুবর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতবর্ষে ক্ষতি ও বিলাতের বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। এরূপ ঘটনা পুরাতন কালেও কখন কখন হইত বলিয়া শুক্র-নীতিকার স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে—

" রাজদৌষ্ট্যাচ্চ রত্নানাং
মূল্যং হীনাধিকং ভবেৎ।"

সে যাহা হউক, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। গোমেদ মণির উৎপত্তি স্থান, বর্ণ, কান্তি, পরীক্ষা ও মূল্যাদির বিষয় অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা যুক্তিকল্পতরু ও গরুড় পুরাণে কিছু বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গরুড় পুরাণের পাঠ এবং শব্দকল্পদ্রুমধৃত যুক্তি-কল্পতরুগ্রন্থের পাঠ প্রায় একরূপ। হিমালয় ও সিন্ধুপ্রদেশেই গোমেদ মণি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা—

" হিমালয়ে বা সিন্ধৌ বা
গোমেদমণিসম্ভবঃ।"

পরীক্ষা।

" পরীক্ষা বহ্নিতঃ কার্য্যা
শাণে বা রত্নকোবিদৈঃ।"

রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যক্তি অগ্নিতে অথবা শাণযন্ত্রে ইহার পরীক্ষা করিবেন।

স্ফটিকেনৈব কুর্ব্বন্তি
গোমেদ প্রতিরূপিণম্।"

চতুর শিল্পীরা স্ফটিকের দ্বারা কৃত্রিম গোমেদ মণি প্রস্তুত করিয়া থাকে এজন্য পরীক্ষা করা আবশ্যক।

বর্ণাদি।

স্বচ্ছকান্তির্গুরুঃ স্নিগ্ধো
বর্ণাঢ্যো দীপ্তিমানপি।
বলক্ষঃ পিঞ্জরো ধন্যো
গোমেদ ইতি কীর্ত্তিতঃ।

গোমেদ মণির কান্তি অতি স্বচ্ছ এবং স্নিগ্ধ। ওজনে ভারি এবং বর্ণও গাঢ়। দীপ্তি অর্থাৎ তেজও আছে। কিঞ্চিৎ শ্বেত ও পিঞ্জর বর্ণও হয় এবং ইহা ধন বলিয়া গণ্য।

জাতি।

রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বৈদূর্য্যাদি মণির ন্যায় ইহারও চারি প্রকার জাতি কল্পনা করিয়া থাকেন যথা—

" চতুর্ধা জাতিভেদস্তু
গোমেদেঽপি প্রকাশ্যতে।"
" ব্রাহ্মণঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ
ক্ষত্রিয়ো রক্ত উচ্যতে।
আপীতো বৈশ্যজাতিস্তু
শূদ্রস্ত্বনীল উচ্যতে।"

যাহা শ্বেতাভ তাহা ব্রাহ্মণ জাতি, রক্তের আভা থাকিলে তাহা ক্ষত্রিয় জাতি, কিঞ্চিৎ পীত থাকিলে বৈশ্যজাতি এবং নীলভাগ থাকিলে তাহা শূদ্র জাতি।

ছায়া ॥

অন্যান্য মণির ন্যায় ইহারও চারি প্রকার ছায়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

" ছায়া চতুর্ব্বিধা শ্বেতা
রক্তা পীতাঽসিতা তথা। "

শ্বেত ছায়া, রক্ত ছায়া, পীত ছায়া ও নীল ছায়া। এই চারি প্রকার ছায়া হয়। পরন্তু পীতের ভাগ প্রত্যেক ছায়ায় থাকে এবং পীতই অধিক বলিয়া ইহার " পীত মণি " নাম দেওয়া হয়।

দোষ ॥

" যে দোষা হীরকে জ্ঞেয়া
স্তে গোমেদমণাবপি। "

হীরক প্রকরণে হীরকের সম্বন্ধে যে সকল দোষ আছে, গোমেদ মণিতেও সেই সকল দোষ গৃহীতব্য। হীরক প্রস্তাবে সে সকল বিশেষরূপে বিবৃত হইবেক। এক্ষণে স্থূলতর দোষের উল্লেখ করিতেছি।

" লঘুর্ব্বিরূপোঽতি খরোন্যমানঃ
স্নেহোপলিপ্তো মলিনঃ খরোঽপি।
করোতি গোমেদ মণির্ব্বিনাশং
সম্পত্তি ভোগা বলবীর্য্যরাশেঃ। "

লঘু অর্থাৎ ওজনে হাল্কা, বিরূপ, দেখিতে বিবর্ণ, অত্যন্ত খর অর্থাৎ কর্কশ, স্নিগ্ধতা সত্বেও মলিন, এরূপ গোমেদ মণি ধারণ করিলে সম্পত্তি, ভোগ, বল ও বীর্য্য বিনাশ হয়।

গুণ ॥

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম গুণ হীরক প্রবন্ধ হইতে জ্ঞাতব্য; পরন্তু স্থূলতর গুণ এই যে—

" গুরুঃ প্রভাঢ্যঃ সিতবর্ণরূপঃ
স্নিগ্ধো মৃদুর্ব্বাতি মহাপুরাণঃ।
স্বচ্ছস্তু গোমেদ মণির্ধৃতোঽয়ং
করোতি লক্ষ্মীং ধনধান্য বৃদ্ধিম্। "

গুরু অর্থাৎ ওজনে ভারি, প্রভাপরিপূর্ণ, শুভ্রবর্ণ, স্নিগ্ধ, মৃদু অর্থাৎ কর্কশতা বর্জ্জিত ও পুরাতন অর্থাৎ উৎপত্তির পর দীর্ঘকালে উদ্ধৃত (পাকা); এরূপ গোমেদ মণি ধারণ করিলে লক্ষ্মীর কৃপা হয় ও ধন ধান্য বৃদ্ধি হয়।

মূল্য।

ইহার মূল্য অতি স্বল্প। তথাপি এতৎ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মূল্য কল্পিত আছে যথা—

" শুদ্ধস্য গোমেদমণেস্তু মূল্যং
সুবর্ণতো দ্বৈগুণ মাহুরেকঃ।
অন্যো তথা বিক্রম তুল্য মূল্যম্
তথাঽপরে চামরতুল্য মাহুঃ। "

শুদ্ধ অর্থাৎ নির্দ্দোষ গোমেদ মণির মূল্য এক শত সুবর্ণ অপেক্ষা দ্বিগুণ; কেহ বলেন, তাহা বিক্রমের সহিত সমান মূল্য; অপরে বলেন যে তাহাও নহে; উৎকৃষ্ট চামরের যে মূল্য, একখণ্ড গোমেদ মণিরও সেই মূল্য।

বিক্রম বা প্রবাল।

বিক্রম ও প্রবাল একই বস্তু। ইহার ভাষা নাম "পলা" এবং হিন্দি নাম "মুঙ্গা।" সংস্কৃত শাস্ত্রে ইহার আর ৬ টী নাম আছে। যথা—অঙ্গারকমণি, অম্ভোধিবল্লভ, ভৌমরত্ন, রক্তাঙ্গ, রক্তা-কার ও লতামণি।

জ্যোতিঃশাস্ত্র বলেন যে এই রত্ন মঙ্গলগ্রহের অতি প্রিয়, তজ্জন্য উহার নাম ভৌমরত্ন। ভৌমরত্ন ধারণ করিলে পাপ নষ্ট হয়, অলক্ষ্মীর দৃষ্টি থাকে না।

রাজনির্ঘণ্টকার বলেন, প্রবাল দ্বারা অশেষবিধ ঔষধ প্রস্তুত হয়, যেহেতু উহার নিম্নলিখিত গুণসমূহ আছে। মধুর, অম্লরস, কফপিত্তাদি দোষের নাশক, স্ত্রীলোকের বীর্য্য ও কান্তিপ্রদ।

রাজবল্লভ বলেন, তদ্ভিন্ন উহার আরও কয়েকটী গুণ আছে, তাহা এই—সারক, শীত বীর্য্য, কষায়যুক্ত, স্বাদুপাকী, বমি-কারক, চক্ষুর হিতজনক।

গরুড়পুরাণেও এই রত্নের বিশেষ উল্লেখ আছে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, প্রধান রত্ন সনীসক, দেবক ও রোমক প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য স্থানেও উৎপন্ন হয় কিন্তু সে সকল উৎকৃষ্ট নহে। যথা—

"সনীসকং দেবক রোমকঞ্চ
স্থানানি তেষু প্রভবঃ সুরাগম্।
অন্যত্র জাতঞ্চ ন তৎপ্রধানং
মূল্যং ভবেৎ শিল্পিবিশেষযোগাৎ।"
[গরুড় পুরাণ।

শুক্রনীতিগ্রন্থেও ইহা রত্ন বলিয়া গণ্য বটে কিন্তু মহারত্ন নহে। পরন্তু উপরত্ন অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ।

উৎপত্তি।

"শ্বেত সাগর মধ্যে তু
জায়তে বল্লরী তু যা।
বিক্রমানাম রত্নাখ্যা
দুর্লভা বজ্ররূপিণী।"
"পাষাণং প্রভজত্যেষা
প্রযত্নাৎ কথিতা সতী।
বিক্রমং নাম যদ্রত্ন
মামনন্তি মনীষিণঃ।"

শ্বেত সমুদ্রের মধ্যে বিক্রমা নামে এক প্রকার লতা জন্মে, তাহাই বিক্রম-রত্ন নামে খ্যাত। এই লতারত্ন অতি দুর্লভ ও বজ্রের সদৃশ গুণবিশিষ্ট। রত্ন-তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ বলেন, যে, ইহা যে প্রস্তরের মত কঠিন হয় তাহা তাহার স্বাভাবিক গুণ নহে; যত্নপূর্ব্বক জলের সহিত অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে পর তাহা প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হয়। প্রথমে ইহা ঘনীভূত মাংস নির্য্যাস অর্থাৎ আঠার মত থাকে। ইউরোপীয় পরীক্ষকেরা দেখিয়াছেন যে, প্রবাল এক প্রকার কীট। তাহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

পরীক্ষা।

শুক্রনীতি গ্রন্থে লিখিত আছে, যে,—

" নায়সোল্লিখ্যতে রত্নং
বিনা মৌক্তিক বিক্রমাৎ।"

মুক্তা ও বিক্রম ব্যতীত অন্যান্য কোন রত্নে লৌহশলাকার দ্বারা আঁচোড় পাড়া যায় না। অতএব উল্লেখন বা ঘর্ষণাদি পরীক্ষা নাই। না থাকাই সুসঙ্গত; যেহেতু বিক্রমে কৃত্রিম অকৃত্রিম সন্দেহ করিবার সম্ভাবনা নাই। তবে ইহার ভাল মন্দ পরীক্ষা আছে বটে তাহা বর্ণাদি গুণের দ্বারাই হইয়া থাকে।

বর্ণ।

প্রবালের বর্ণ পরীক্ষা বিষয়ে গরুড় পুরাণ ও যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এই—

তত্র প্রধানং শশলোহিতাভং
গুঞ্জা জবা পুষ্পনিভং প্রদিষ্টম্।"

" জবা বন্ধূক সিন্দূর
দাড়িমী কুসুম প্রভম্।"
পলাশ কুসুমাভাসং
তথা পাটলসন্নিভম্।"
রক্তোৎপলদলাকারং—"

যে সকল প্রবালের বর্ণ শশকের রক্তের ন্যায়, সে সকল প্রবাল প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ প্রধান। যাহা গুঞ্জা অর্থাৎ কুচ, বাঁধুলিফুল, সিন্দুর, অথবা দাড়িম্ব ফুলের বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট তাহারা ২য় শ্রেণীর প্রবাল। যাহা পলাশ পুষ্প, কি পাটলা পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট তাহারা ৩য় শ্রেণীর বিক্রম। যে সকল প্রবাল কোকনদ-দলের রঙ্ ধারণ করে তাহা ৪র্থ শ্রেণীর প্রবাল অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা হীন।

গুণ।

" প্রসন্নং কোমলং স্নিগ্ধং
সুরাগং বিক্রমং হি যৎ।"

প্রসন্ন অর্থাৎ পরিষ্কার কান্তি যুক্ত, কোমল অর্থাৎ সুখবেধ্য স্নিগ্ধ ঘৃত তৈলাদি ম্রক্ষিতের ন্যায়, সুরাগ— মনোজ্ঞ রঙ্। এইরূপ গুণবিশিষ্ট বিক্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর প্রবাল ব্রাহ্মণ জাতি বলা যায়। ব্রাহ্মণজাতীয় বিক্রমই সুন্দর, সুখবেধ্য ও ধারণে শুভপ্রদ। ২য় শ্রেণীর প্রবাল ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া গণ্য, তাহা অপেক্ষাকৃত কঠিন সুতরাং দুর্ব্বেধ্য ও অস্নিগ্ধ। ৩য় শ্রেণীর বিক্রম বৈশ্য জাতি মধ্যে গণ্য। এই জাতীয় বিক্রম স্নিগ্ধ বটে, ইহার বর্ণও উত্তম বটে কিন্তু ইহার লাবণ্য অল্প। ৪র্থ শ্রেণীর বিক্রম শূদ্র জাতীয় বলিয়া পরিগণিত। শূদ্র জাতীয় বিক্রম অতি কঠিন এবং তাহার দ্যুতি অল্প কালেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

" রক্ততা স্নিগ্ধতা দার্ঢ্যং
চিরদ্যুতি সুবর্ণতা।

প্রবালানাং গুণাঃ প্রোক্তাঃ
ধনধান্যকরাঃ পরা।"

সুরাগ, স্নিগ্ধতা, সুখবেধ্য, বহুকাল-স্থায়ী লাবণ্য, সুন্দরবর্ণ, এই কয়েকটী প্রবালের প্রধান গুণ। গুণবান্ প্রবাল ধারণেই ধনধান্য লাভ হইয়া থাকে।

"হিমাদ্রৌ যত্তু সংযাতং
তদ্রক্ত মতি নিষ্ঠুরং।
তস্য ধারণ মাত্রেণ
বিষবেগঃ প্রশাম্যতি।"

হিমালয় সর্ব্বরত্নের আকর, না হয় এমন রত্নই নাই। এতাদৃশ হিমালয়ে যে এক প্রকার প্রবাল জন্মে তাহা রক্ত-বর্ণ ও অতি কঠিন, তাহা ধারণ করিলে বিষ নষ্ট হয়।

দোষ।

"বিবর্ণতা তু খরতা
প্রবালে দূষণদ্বয়ম্।
রেখা কাকপদৌ বিন্দু
র্যথা বজ্রেষু দোষকৃৎ।
তথা প্রবালে সর্ব্বত্র
বর্জ্জনীয়ং বিচক্ষণৈঃ।"

বিবর্ণ ও খর অর্থাৎ খশ্‌খশে, এই দুইটী প্রধান দোষ। তদ্ভিন্ন রেখা প্রভৃতি আরও কয়েকটী দোষ আছে, তাহাও পরিত্যাজ্য।

"রেখা হন্যাৎ যশোলক্ষ্মী
মাবর্ত্তঃ কুলনাশনঃ।
পট্টলো রোগকৃৎ খ্যাতো
বিন্দুর্ধনবিনাশকৃৎ।
ত্রাসঃ সঞ্জনয়েৎ ত্রাসং
নীলিকা মৃত্যুকারিণী।"

রেখা থাকিলে সে প্রবাল ধারণে যশ ও লক্ষ্মী ভাগ্য ধ্বংস করে। আবর্ত্ত থাকিলে তাহা বংশনাশক হয়। পট্টল নামক দোষ (ইহা হীরক পরীক্ষায় বিবৃত হইবেক) রোগ আনয়ন করে। বিন্দু থাকিলে তাহা ধন বিনাশ করে। ত্রাস নামক দোষ (ইহাও হীরকোক্ত দোষ) ভয় উৎপাদন করে। নীলিকা দোষে মৃত্যু হয়।

বিরূপ জাতিং বিষমং বিবর্ণং
খরং প্রবালং প্রবহন্তি যে যে।
তে মৃত্যু মেবাত্মনি বৈ বহন্তি
সত্যং বদন্ত্যেষ যতো মুনীন্দ্রঃ।

অন্যান্য রত্নের ন্যায় প্রবাল রত্ন ধারণেও জাত্যাদি নিয়ম আছে। যথা—বিবর্ণ, বিজাতি, বিষম (উচ্চ নীচ), খর,—যে যে ব্যক্তি এরূপ প্রবাল ধারণ করে সেই সেই ব্যক্তিই আপনার মৃত্যু বহন করে। মুনিশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন যে ইহা সত্য।

নীতিশাস্ত্রকার ভগবান্ শুক্রাচার্য্য স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, কেবল মুক্তা ও প্রবাল এই প্রকার রত্নই কালে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অন্যান্য রত্ন জীর্ণ হয় না।

ন জরাং কান্তি রত্নানি
বিক্রমং মৌক্তিকং বিনা।"

মূল্য।

শুক্রনীতির মতে ১ তোলা উৎকৃষ্ট প্রবাল সুবর্ণের অর্দ্ধ মূল্য হইবার যোগ্য। যথা—

"প্রবালং তোলকমিতং
স্বর্ণার্দ্ধং মূল্যমর্হতি।"

কিন্তু যুক্তিকল্পতরুর মতে—

"মূল্য শুদ্ধ প্রবালস্য
রৌপ্য দ্বিগুণমুচ্যতে।"

নির্দ্দোষ ও পরীক্ষিত প্রবাল রূপার দ্বিগুণ মূল্য অর্থাৎ দুই তোলা শুদ্ধ রৌপ্যের যে মূল্য এক তোলা প্রবালের সেই মূল্য।

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই পৃথিবীর সকল সভ্য জনপদে রক্তবর্ণ প্রবাল অলঙ্কারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। থিওফ্রাসটস তাঁহার গ্রন্থে প্রবালের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রাচীন সুসভ্য গলজাতি ইহার অলঙ্কার ব্যবহার করিত। এক্ষণে উৎকৃষ্ট রক্তবর্ণ প্রবাল যাহা অলঙ্কারের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর প্রভৃতি জলমধ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীরামদাস সেন।



আনন্দ মঠ।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রণজয়ের পর, অজয়তীরে সত্যানন্দকে ঘেরিয়া বিজয়ী বীরবর্গ নানা উৎসব করিতে লাগিলেন। কেবল সত্যানন্দ বিমর্ষ, ভবানন্দের জন্য।

এতক্ষণ বৈষ্ণব দিগের একটীও রণবাদ্য ছিল না, কিন্তু সেই সময় কোথা হইতে সহস্র সহস্র কাড়ানাগরা ঢাক ঢোল কাঁসি সানাই, তুরী ভেরী, রামসিঙ্গা দামামা আসিয়া জুটিল। জয়-সূচক বাদ্যে কানন প্রান্তর নদীসকল শব্দ ও প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে সন্তানগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারূপ উৎসব করিলে পর সত্যানন্দ বলিলেন, "জগদীশ্বর আজ কৃপা করিয়াছেন, সন্তানধর্ম্মের জয় হইয়াছে, কিন্তু এক কাজ বাকি আছে। যাহারা আমাদিগের সঙ্গে উৎসব করিতে পাইল না, যাহারা আমাদের উৎসবের জন্য প্রাণ দিয়াছে, তাহাদিগকে ভুলিলে চলিবে না। যাহারা রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া পড়িয়া আছে, চল যাই আমরা গিয়া তাহাদিগের সৎকার করি, বিশেষ যে মাহাত্মা আমাদিগের জন্য এই রণজয় করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, চল মহান্ উৎসব করিয়া সেই ভবানন্দের সৎকার করি। তখন সন্তানদল বন্দে মাতরং বলিতে বলিতে নিহত দিগের সৎকারে চলিল। বহুলোক একত্রিত হইয়া হরিবোল দিতে দিতে ভারে ভারে চন্দন কাষ্ঠ বহিয়া আনিয়া ভবানন্দের চিতা রচনা করিল, এবং তাহাতে ভবানন্দকে শায়িত করিয়া, অগ্নি জ্বালিত করিয়া, চিতা বেড়িয়া বেড়িয়া হরে মুরারে গায়িতে লাগিল। ইহারা বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত নহে, অতএব দাহ করে।

কাননমধ্যে তৎপরে কেবল সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ ও ধীরানন্দ আসীন; গোপনে পাঁচ জনে পরামর্শ করিতেছেন। সত্যানন্দ বলিলেন "এতদিন যে জন্য আমরা সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ব্রত সফল হইয়াছে, এপ্রদেশে ইংরেজের সেনা আর নাই, মুসলমানের যাহা অবশিষ্ট আছে, একদণ্ড আমাদিগের নিকট টেঁকিবে না, তোমরা এখন কি পরামর্শ দাও।"

জীবানন্দ বলিল "চলুন এই সময়ে গিয়া নগর অধিকার করি।"

সত্য। আমারও সেই মত।

ধীরানন্দ। সৈন্য কোথা?

জীব। কেন এই সৈন্য?

ধীর। এই সৈন্য কই? কাহাকে দেখিতে পাইতেছেন?

জীব। স্থানে স্থানে সব বিশ্রাম করিতেছে, ডঙ্কা দিলে অবশ্য পাওয়া যাইবে।

ধীর। একজনকেও পাইবেন না।

সত্য। কেন?

ধীর। সবাই লুটিতে বাহির হইয়াছে। গ্রাম সকল এখন অরক্ষিত। মুসলমানের গ্রাম আর রেশমের কুঠি লুটিয়া সকলে ঘরে যাইবে। এখন কাহাকেও পাইবেন না। আমি খুঁজিয়া আসিয়াছি।

সত্যানন্দ বিষণ্ণ হইলেন, বলিলেন, "যাই হৌক নগর ভিন্ন সমস্ত বীরভূমি আমাদের অধিকৃত হইল। নগরের বাহিরে আর এমন কেহ নাই যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। অতএব বীরভূমিতে তোমরা সন্তানরাজ্য প্রচার কর। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় কর এবং নগর অধিকার করিবার জন্য সেনা সংগ্রহ কর। হিন্দুর রাজ্য হইয়াছে শুনিলে, বহুতর সেনা, সন্তানের নিসান উড়াইবে।"

তখন জীবানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া বলিল "আমরা প্রণাম করিতেছি—হে মহারাজাধিরাজ! আজ্ঞা হয় ত আমরা এই কাননেই আপনার সিংহাসন স্থাপিত করি।"

সত্যানন্দ তাঁহার জীবনে এই প্রথম কোপ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন "ছি! আমায় কি শূন্য কুম্ভ মনে কর? আমরা রাজা কেহ নহি—আমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হইলে, যাহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয় রাজমুকুট পরাইও, কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে আমি এই ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না। এক্ষণে তোমারা স্বস্ব কর্ম্মে যাও।"

তখন চারি জনে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিল। সত্যানন্দ তখন অন্যের অলক্ষিতে ইঙ্গিত করিয়া মহেন্দ্রকে রাখিলেন। আর তিন জন চলিয়া গেল, মহেন্দ্র রহিল। সত্যানন্দ তখন মহেন্দ্রকে বলিলেন, "তোমরা সকলে বিষ্ণুমণ্ডপে শপথ করিয়া সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। ভবানন্দ ও জীবানন্দ দুইজনেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে, ভবানন্দ আজ তাহার স্বীকৃত প্রায়শ্চিত্ত করিল, আমার সর্ব্বদা ভয় কোন দিন জীবানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দেহ বিসর্জ্জন করে। কিন্তু আমার এক ভরসা আছে, কোন নিগূঢ় কারণে সে এক্ষণে মরিতে পারিবে না। তুমি একা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হইল। প্রতিজ্ঞা ছিল যে যতদিন না সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হয় ততদিন তুমি স্ত্রী কন্যার মুখদর্শন করিবে না, এক্ষণে কার্য্যো-

হ্মার হইয়াছে, এখন আবার সংসারী হইতে পার।”

মহেন্দ্রের চক্ষে দরবিদরিত ধারা বহিল। মহেন্দ্র বলিল “ঠাকুর, সংসারী হইব কাহাকে লইয়া? স্ত্রী ত আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, আর কন্যা কোথায় যে তাতো জানিনা। কোথায় বা সন্ধান পাইব? আপনি বলিয়াছেন জীবিত আছে। ইহাই জানি, আর কিছু জানি না।”

মাথার উপর গাছের ডালে বসিয়া কে বলিল “আমি জানি কন্যা কোথায় আছে।” মহেন্দ্র উন্মুখ হইয়া বলিলেন “তুমি কে?”

সত্যানন্দ একটু রুষ্টভাবে উন্মুখ হইয়া বলিলেন, “নবীনানন্দ! আমি তোমাকে বিদায় দিয়াছিলাম! তুমি এখনও এখানে কেন?”

শান্তি গাছের উপর হইতে বলিল, “প্রভু, স্বর্গে মর্ত্তে আপনার অধিকার আছে; গাছের ডালে কি?”

এই বলিয়া ঝুপ করিয়া শান্তি নামিয়া পড়িল। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, “ইনি নবীনানন্দ গোস্বামী—অতি পবিত্রচেতা, আমার প্রিয়শিষ্য। ইনি তোমার কন্যার সন্ধান দিবেন।” এই বলিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে কিছু ইঙ্গিত করিলেন। শান্তি তাহা বুঝিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তখন মহেন্দ্র বলিলেন “কোথায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে?”

শান্তি বলিল, “আমার আশ্রমে আসুন।” এই বলিয়া শান্তি আগে আগে চলিল।

তখন মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন। এবং শান্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। তথাপি শান্তি বিশ্রাম না করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

সকলে চলিয়া গেলে, ব্রহ্মচারী, একা ভূমে প্রণত হইয়া, মাটীতে মস্তক স্থাপন করিয়া মনে মনে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। এমন সময়ে কে আসিয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিল “আমি আসিয়াছি।”

ব্রহ্মচারী উঠিয়া চমকিত হইয়া অতিব্যগ্রভাবে বলিলেন “আপনি আসিয়াছেন? কেন?” যে আসিয়াছিল সে বলিল “দিন পূর্ণ হইয়াছে।” ব্রহ্মচারী বলিলেন, “হে প্রভু! আজ ক্ষমা করুন। আগামী মাঘী পূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব।”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে বীরভূমি পরিপূর্ণা হইল। সন্তানেরা দলে দলে যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ “বন্দে মাতরং” কেহ “জগদীশ হরে” বলিয়া গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ শত্রুসেনার অস্ত্র, কেহ বস্ত্র অপহরণ

করিতে লাগিল। কেহ মৃতদেহের মুখে পদাঘাত, কেহ তদুপরি পুরীষাদি পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কেহ গ্রামাভিমুখে, নগরাভিমুখে ধাবমান হইয়া, পথিক বা গৃহস্থকে ধরিয়া বলে "বল বন্দে মাতরং নহিলে মারিয়া ফেলিব।" কেহ ময়রার দোকান লুটিয়া খায়, কেহ গোয়ালার বাড়ী গিয়া হাঁড়ি পাড়িয়া দধিতে চুমুক মারে, কেহ বলে "আমরা ব্রজগোপ আসিয়াছি, গোপিনী কই?" সেই এক রাত্রের মধ্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, "ইংরেজ মুসলমান একত্রে পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।" গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, "মুই হেঁদু।"

দলে দলে ত্রস্ত মুসলমানেরা নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। যেখানে মহারাজ বীরভূমাধিপতি আসাদ-উজ্‌জমান বাহাদুর রাজসিংহাসনে সুখে আসীন, সেই খানেই দারুণ রাজ্যধ্বংসসূচক বার্ত্তা পৌঁছিল। তখন অতি ব্যস্তে চারিদিকে রাজপুরুষেরা ছুটিল, রাজার অবশিষ্ট সিপাহী সুসজ্জিত হইয়া নগররক্ষার্থে শ্রেণীবদ্ধ হইল। রাজনগরের গড়ের ঘাটে ঘাটে প্রকোষ্ঠে সকলে রক্ষকবর্গ সশস্ত্রে অতি সাবধানে, দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইল। রাজধানী মধ্যে সমস্ত লোক সমস্তরাত্রিজাগরণ করিয়া, কি হয় কি হয় চিন্তা করিতে লাগিল। হিন্দুরা বলিতে লাগিল, "আসুক সন্ন্যাসীরা আসুক, মা দুর্গা করুন, হিন্দুর অদৃষ্টে সেই দিন হউক।" মুসলমানেরা বলিতে লাগিল "আল্লা আকবর! এতনা রোজের পর কোরাণসরিফ বেবাক কি ঝুটো হলো; মোরা যে পাঁচু ওয়াক্ত নমাজ করি, তা এই তেলককাটা হেঁদুর দল ফতে করতে নারলাম। দুনিয়া সব ফাঁকি।" এইরূপে কেহ ক্রন্দন, কেহ হাস্য করিয়া সকলেই ঘোরতর আগ্রহের সহিত রাত্রি কাটাইতে লাগিল।

এ সকল কথা কল্যাণীর কাণে গেল—আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও অবিদিত ছিল না। কল্যাণী মনে মনে বলিল "জয় জগদীশ্বর! আজ তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। আজ আমি স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিব। হে মধুসূদন! আজ আমার সহায় হইও!"

গভীর রাত্রে কল্যাণী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, একা খিড়কীর দ্বার খুলিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া, কাহাকে কোথাও না দেখিয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গৌরীদেবীর পুরী হইতে রাজপথে নিক্রান্ত

হইল। মনে মনে ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া বলিল, "দেখো ঠাকুর, আজ যেন পদচিহ্নে তাঁর সাক্ষাৎ পাই।"

কল্যাণী নগরের ঘাটিতে আসিয়া উপস্থিত। পাহারাওয়ালা বলিল "কে যায়?" কল্যাণী ভীতস্বরে বলিল "আমি স্ত্রীলোক।" পাহারাওয়ালা বলিল "যাবার হুকুম নাই।" কথা দফাদারের কাণে গেল। দফাদার বলিল "বাহিরে যাইবার নিষেধ নাই, ভিতরে আসিবার নিষেধ।" শুনিয়া পাহারাওয়ালা কল্যাণীকে বলিল "যাও মায়ি, যাবার মানা নাই, লেকেন আজ কা রাতমে বড় আফত, কেয়া জানে মায়ি তোমার কি হোবে, তুমি কি ডেকেতের হাতে গিরবে, কি খানায় পড়িয়া মরিয়া যাবে, সো তো হাম কিছু জানে না, আজকা রাত মায়ি, তুমি বাহার না যাবে।"

কল্যাণী বলিল "বাবা আমি ভিখারিণী—আমার এক কড়া কপর্দ্দক নাই, আমায় ডাকাতে কিছু বলিবে না।"

পাহারাওয়ালা বলিল "বয়স আছে মায়ি, বয়স আছে, দুনিয়ামে অহি তো জেওরাত হায়! বল্‌কে হামি ডাকাত হতে পারি।" কল্যাণী দেখিল বড় বিপদ, কিছু কথা না কহিয়া, ধীরে ধীরে ঘাটি এড়াইয়া চলিয়া গেল। পাহারাওয়ালা দেখিল মায়ি রসিকতাটা বুঝিল না, তখন মনের দুঃখে গাঁজায় দম মারিয়া খাঁটি খাম্বাজে সোরির টপ্পা ধরিল। কল্যাণী চলিয়া গেল।

সে রাত্রে পথে দলে দলে পথিক, কেহ মার মার শব্দ করিতেছে, কেহ পলাও পলাও শব্দ করিতেছে, কেহ কান্দিতেছে, কেহ হাসিতেছে, যে যাহাকে দেখিতেছে, সে তাহাকে ধরিতে যাইতেছে। কল্যাণী অতিশয় কষ্টে পড়িলেন। পথ মনে নাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই, সকলে রণোন্মুখ, কেবল লুকাইয়া লুকাইয়া অন্ধকারে পথ চলিতে হইতেছে। লুকাইয়া লুকাইয়া যাইতেও এক দল অতি উদ্ধত উন্মত্ত বিদ্রোহীর হাতে তিনি পড়িয়া গেলেন। তাহারা ঘোর চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিল। কল্যাণী তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে দুই একজন দস্যু তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। একজন গিয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিল, বলিল "তবে চাঁদ!" সেই সময়ে আর একজন অকস্মাৎ আসিয়া অত্যাচারকারী পুরুষকে এক ঘা লাঠি মারিল। সে আহত হইয়া পাছু হটিয়া গেল। এই ব্যক্তির সন্ন্যাসীর বেশ—কৃষ্ণাজিনে বক্ষাবৃত—বয়স অতি অল্প। সে কল্যাণীকে বলিল "তুমি ভয় করিও না, আমার সঙ্গে আইস—কোথায় যাইবে?"

ক। পদচিহ্নে।

আগন্তুক বিস্মিত ও চমকিত হইল, বলিল "সে কি, পদচিহ্নে?" এই বলিয়া আগন্তুক কল্যাণীর দুই স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া মুখপানে সেই অন্ধকারে

অতি যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কল্যাণী অকস্মাৎ পুরুষস্পর্শে রোমাঞ্চিত, ভীত, ক্ষুব্ধ, বিস্মিত অশ্রুবিপ্লুত হইল—এমন সাধ্য নাই যে পলায়ন করে, ভীতিবিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল। আগন্তুকের নিরীক্ষণ শেষ হইলে বলিল "হরে মুরারে! চিনেছি যে, তুমি পোড়ার মুখী কল্যাণী।"

কল্যাণী ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কে?"

আগন্তুক বলিল "আমি তোমার দাসানুদাস—হে সুন্দরি! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

কল্যাণী অতি দ্রুতবেগে সেখান হইতে সরিয়া গিয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল "এই অপমান করিবার জন্যই কি আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন? দেখিতেছি ব্রহ্মচারীর বেশ, ব্রহ্মচারীর কি এই ধর্ম্ম? আমি আজ নিঃসহায়, নহিলে তোমার মুখে আমি নাথি মারিতাম।"

ব্রহ্মচারী বলিল, "অয়ি স্মিতবদনে! আমি বহুদিবসাবধি, তোমার ও বরবপুর স্পর্শ কামনা করিতেছি।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া কল্যাণীকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল। তখন কল্যাণী খিল খিল করিয়া হাসিল, বলিল, "ও পোড়া কপাল! আগে বলতে হয় ভাই, যে আমারও ঐ দশা।" শান্তি বলিল "ভাই মহেন্দ্রের খোঁজে চলিয়াছ?"

কল্যাণী বলিল। "তুমি কে, তুমি যে সব জান দেখিতেছি।"

শান্তি বলিল, "আমি ব্রহ্মচারী—সন্তানসেনার অধিনায়ক—ঘোরতর বীর পুরুষ। আমি সব জানি। আজ পথে সিপাহী আর সন্তানের যে দৌরাত্ম্য তুমি আজ পদচিহ্নে যাইতে পারিবে না।"

কল্যাণী কাঁদিতে লাগিল।

শান্তি চোখ ঘুরাইয়া বলিল "ভয় কি? আমরা নয়নবাণে সহস্র শত্রু বধ করি। চল পদচিহ্নে যাই।"

কল্যাণী এরূপ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সহায়তা পাইয়া যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। বলিল, "তুমি যেখানে লইয়া যাইবে সেইখানে যাইব।"

শান্তি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া বন্যপথে লইয়া চলিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যখন শান্তি আপন আশ্রম ত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রে নগরাভিমুখে যাত্রা করে, তখন জীবানন্দ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। শান্তি জীবানন্দকে বলিল "আমি নগরে চলিলাম। মহেন্দ্রের স্ত্রীকে লইয়া আসিব। তুমি মহেন্দ্রকে বলিয়া রাখ যে উহার স্ত্রী আছে।"

জীবানন্দ ভবানন্দের কাছে কল্যাণীর জীবন রক্ষা বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়া-

ছিল—এবং তাহার বর্ত্তমান বাসস্থানও সর্ব্বস্থানবিচারিণী শান্তির কাছে শুনিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সকলে মহেন্দ্রকে শুনাইতে লাগিল।

মহেন্দ্র প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। শেষে আনন্দে অভিভূত হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইলেন।

সেই রজনীপ্রভাতে শান্তির সাহায্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল। নিস্তব্ধ কাননমধ্যে, ঘনবিন্যস্ত শালতরুশ্রেণীর অন্ধকার ছায়ামধ্যে, পশু পক্ষী ভগ্ননিদ্র হইবার পূর্ব্বে, তাহাদিগের পরস্পরের দর্শনলাভ হইল। সাক্ষী কেবল সেই নীল গগনবিহারী ম্লানকিরণ আকাশের নক্ষত্রনিচয়, আর সেই নিবাত নিষ্কম্প অনন্ত শালতরুশ্রেণী। দূরে কোন শীলাসংঘর্ষণনাদিনী, মধুর কল্লোলিনী, সংকীর্ণা নদীর তর তর শব্দ, কোথাও প্রাচীসমুদিত উষামুকুটজ্যোতিঃ-সন্দর্শনে আহ্লাদিত এক কোকিলের রব।

বেলা এক প্রহর হইল। সেখানে শান্তি জীবানন্দ আসিয়া দেখা দিল। কল্যাণী শান্তিকে বলিল—"আমরা আপনার কাছে বিনা মূল্যে বিক্রীত। আমাদের কন্যাটীর সন্ধান বলিয়া দিয়া এ উপকার সম্পূর্ণ করুন।"

শান্তি জীবানন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল "আমি ঘুমাইব। অষ্টপ্রহরের মধ্যে বসি নাই—দুই রাত্র ঘুমাই নাই—আমি যাই পুরুষ!"

কল্যাণী ঈষৎ হাসিল। জীবানন্দ মহেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "সে ভার আমার উপর রহিল। আপনারা পদচিহ্নে গমন করুন—সেইখানে কন্যাকে পাইবেন।"

জীবানন্দ ভরূই পুরে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন—কাজটা বড় সহজ বোধ হইল না।

তখন নিমাই প্রথমে একবার ঢোক গিলিল, একবার এদিক ওদিক চাহিল। তার পর একবার তার ঠোঁট নাক ফুলিল। তার পর সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর বলিল "আমি মেয়ে দিব না।"

নিমাই, গোল হাত খানি উল্টাপিট চোখে দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চক্ষু মুছিলে পর জীবানন্দ বলিল, "তা দিদি কাঁদ কেন, এমন দূরও ত নয়—তাদের বাড়ী তুমি না হয় গেলে, মধ্যে২ দেখে এলে।"

নিমাই ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তা তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যাও না কেন? আমার কি?" নিমাই এই বলিয়া সুকুমারীকে আনিয়া রাগ করিয়া দুম করিয়া জীবানন্দের কাছে ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। সুতরাং জীবানন্দ তখন আর কিছু না বলিয়া এদিক ওদিক বাজে কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের রাগ পড়িল না। নিমাই উঠিয়া গিয়া সুকুমারীর কাপড়ের বোচকা, অলঙ্কারের বাক্স, চুলের দড়ি, খেলার পুতুল ঝুপঝাপ করিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল। সুকুমারী সে সকল আপনি

গুছাইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল " হাঁ মা—কোথায় যাব মা?" নিমাইয়ের আর সহ্য হইল না। নিমাই তখন সুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পদচিহ্নে নূতন দুর্গমধ্যে, আজ সুখে সমবেত, মহেন্দ্র, কল্যাণী, জীবানন্দ, শান্তি, নিমাই, নিমাইয়ের স্বামী, সুকুমারী। সকলে সুখে সম্মিলিত। শান্তি নবীনানন্দের বেশে আসিয়াছিলেন। কল্যাণীকে যে রাত্রে তিনি আপন কুটীরে আনেন, সেই রাত্রে বারণ করিয়াছিলেন, যে নবীনানন্দ যে স্ত্রীলোক এ কথা কল্যাণী স্বামীর সাক্ষাতে প্রকাশ না করেন। নবীনানন্দবেশে শান্তি, পদচিহ্নে বাস করিতেছিলেন। একদিন কল্যাণী তাঁহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নবীনানন্দ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্যগণ বারণ করিল, শুনিলেন না।

শান্তি কল্যাণীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, " ডাকিয়াছ কেন?"

ক। পুরুষ সাজিয়া কতদিন থাকিবে? দেখা হয় না,—কথা কহিতে পাই না। আমার স্বামীর সাক্ষাতে তোমায় প্রকাশ হইতে হইবে।

নবীনানন্দ বড় চিন্তিত হইয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। শেষ বলিলেন, " তাহাতে অনেক বিঘ্ন কল্যাণি।"

দুই জনে সেই কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। এদিকে যে ভৃত্যবর্গ নবীনানন্দের অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিল, তাহারা গিয়া মহেন্দ্রকে সংবাদ দিল, যে নবীনানন্দ জোর করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, নিষেধ মানিল না। কৌতূহলী হইয়া মহেন্দ্রও অন্তঃপুরে গেলেন। কল্যাণীর শয়নঘরে গিয়া দেখিলেন, যে নবীনানন্দ গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে; কল্যাণী তাহার গায়ে হাত দিয়া বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া দিতেছে। মহেন্দ্র অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন—অতিশয় রুষ্ট হইলেন।

নবীনানন্দ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "কি গোঁসাই! সন্তানে সন্তানেও অবিশ্বাস?"

মহেন্দ্র বলিলেন, "ভবানন্দ ঠাকুর কি বিশ্বাসী ছিলেন?"

নবীনানন্দ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "কল্যাণী কি ভবানন্দের গায়ে হাত দিয়া বাঘছাল খুলিয়া দিত?" বলিতে বলিতে শান্তি কল্যাণীর হাত টিপিয়া ধরিল, বাঘছাল খুলিতে দিল না।

ম। তাতে কি?

নবী। আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন—কল্যাণীকে অবিশ্বাস করেন কোন্ হিসাবে?

এবার মহেন্দ্র বড় অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন,

"কই কিসে অবিশ্বাস করিলাম?"

নবী। নহিলে আমার পিছু পিছু অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত কেন?

ম। কল্যাণীর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল; তাই আসিয়াছি।

ন। তবে এখন যান। কল্যাণীর সঙ্গে আমারও কিছু কথা আছে। আপনি সরিয়া যান, আমি আগে কথা কই। আপনার ঘর বাড়ী, আপনি সর্ব্বদা আসিতে পারেন, আমি কষ্টে একবার আসিয়াছি।

মহেন্দ্র বোকা হইয়া রহিল। কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। এ সকল কথা ত অপরাধীর কথাবার্ত্তার মত নহে। কল্যাণীরও ভাব বিচিত্র। সেও ত অবিশ্বাসিনীর মত পলাইল না, ভীতা হইল না, লজ্জিতা নহে—কিছুই না বরং মৃদু মৃদু হাসিতেছে। আর কল্যাণী—যে সেই বৃক্ষতলে অনায়াসে বিষভোজন করিয়াছিল সে কি অপরাধিনী হইতে পারে? মহেন্দ্র এই সকল ভাবিতেছেন এমত সময়ে অভাগিনী শান্তি, মহেন্দ্রের দুরবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া, কল্যাণীর প্রতি এক বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। সহসা তখন অন্ধকার ঘুচিল—মহেন্দ্র দেখিল, এ যে রমণীকটাক্ষ। সাহসে ভর করিয়া, যা থাকে কপালে বলিয়া, নবীনানন্দের দাড়ি ধরিয়া মহেন্দ্র এক টান দিল—কৃত্রিম দাড়ি গোঁপ খসিয়া আসিল। সেই সময়ে অবসর পাইয়া, কল্যাণী বাঘ ছালের গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিল—বাঘছালও খসিয়া পড়িল। ধরা পড়িয়া শান্তি অবনতমুখী হইয়া রহিল।

মহেন্দ্র তখন শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

শা। শ্রীমান্ নবীনানন্দ গোস্বামী।

ম। সে ত জুয়াচুরি; তুমি স্ত্রীলোক?

শা। এখন কাজে কাজেই।

ম। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি স্ত্রীলোক হইয়া সর্ব্বদা জীবানন্দ ঠাকুরের সহবাস কর কেন?

শা। সে কথা আপনাকে নাই বলিলাম।

ম। তুমি যে স্ত্রীলোক জীবানন্দ ঠাকুর তা কি জানেন?

শা। জানেন।

শুনিয়া, বিশুদ্ধাত্মা মহেন্দ্র অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। দেখিয়া, কল্যাণী আর থাকিতে পারিল না, বলিল, "ইনি জীবানন্দ গোস্বামীর ধর্ম্মপত্নী শান্তিদেবী।"

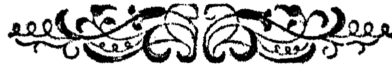
মুহূর্ত্ত জন্য মহেন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। আবার সে মুখ অন্ধকারে ঢাকিল। কল্যাণী বুঝিল, বলিল, "ইনি ব্রহ্মচারিণী।"

মহেন্দ্র বিষণ্ণভাবে বলিল, "হউক—তথাপি প্রায়শ্চিত্ত আছে।" পরে শান্তির মুখপানে চাহিয়া বলিল, "কি প্রায়শ্চিত্ত আপনি জানেন?"

শান্তি বলিল, "মৃত্যু। কোন্ সন্তানে

না জানে? আগামী মাঘী পূর্ণিমায় সে প্রায়শ্চিত্ত হইবে স্থির হইয়াছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

এই বলিয়া শান্তি সেখান হইতে চলিয়া গেল। মহেন্দ্র আর কল্যাণী বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।



কোজাগর পূর্ণিমা।*

ওহে শশী এত সাজ
আজ কেন বল বল?
কে তোমারে পরাইল
শুভ্রবাস নিরমল?
হাসাতে কুসুমকুলে,
মাতাতে প্রেমিকদলে,
ভুলাতে অখিল নরে
কে তোমারে নিরমিল?
নক্ষত্র মুকুতামালা
কে তোমার গলে দিল?
ফুটিতকুসুমকরে,
বল বল কার তরে,
কাহারে পূজিতে আসি
তুমি ওহে শশধর,
মনোহর নীলাম্বর
আসনে বসিয়া সাজি
সুধারাশি চন্দনরাশি
বরষিছ সুশীতল।

জ্যোৎস্না পট্টবাসে শশী
মরি কি শোভা হইল।
যে তোমার স্রষ্টা ওহে
তাঁরে কি দেখেছ তুমি,
দেখে থাক যদি ওহে
বল হে আমারে বল,
কতরূপ ধরেন সে
জ্যোতির্ম্ময় সুবিমল।
সেই নিরমল ছবি,
হৃদে ভাবি নিরবধি,
পাপতপ্ত হৃদি জুড়াই
হেরে কান্তি সুশীতল॥

ঐ কবিতা।

(১)

আজি কেন এত হাসি হে নিশিরমণ,
ভুলাইতে কার মন, কুমুদীর প্রাণধন,

---

* এই পদ্য কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ স্ত্রীলোকের লেখা। আমরা ইহার কেবল দুই এক স্থানে যৎসামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছি। সম্পাদক।

ধরেছ মোহন বেশ রমণীরঞ্জন,
আজি কেন এত হাসি হে নিশিরমণ!

(২)

অথবা কাহার আজি ভুলাইতে মন
শরৎ গগনে বসি, প্রণয় আমোদে ভাসি,
শুভ্র বাস পরি শশী আহ্লাদে মগন,
কারে হেরে এত হাসি যামিনীশোভন!

(৩)

পার্শ্বে শত তারা নারী, তারা নয় মনোহারী,
তাই তাহাদের বিভা মলিন অমন।
জানি আমি, অভাগিনী মলিন যেমন!
ওই তারা সম তার মলিন কিরণ!

(৪)

জানি জানি সেই রামা, নহে পতিপ্রিয়তমা,
তাই হে মলিন সদা তাহার বদন,
তুমি ত হাসিছ খুব তারকারমণ,
পেয়েছ কি নব বধূ মনের মতন?

(৫)

ছিছি শশী পায় হাঁসি, নিশি কি এতরূপসী,
বল কিসে শ্যামাঙ্গিনী, ভুলাইল মন,
কিম্বা যে প্রবাদ আছে যার যাতে মন,
রজনী সজনী, সে তো চির পুরাতন!
(পুরাতনে পুরুষের এত কি যতন?)

(৬)

পড়েছ পড়েছ ধরা, ওহে শশধর,
যাহার কারণে আজি বেশ মনোহর,
যে দেখি ধরার ধারা, সাজিয়াছে মনোহারা,
হেসে ঢলে দেখাইছে শুভ্র কলেবর;
(শরম থাকিলে পর ভুলান দুষ্কর)

(৭)

হেরিয়া ধরার হাসি, প্রমোদে মাতিয়া শশী,
হাসিতেছ সুধারাশি বিকাশি বদন,
ও হাসি হেরিয়া হাসে অখিল ভুবন,
নব অনুরাগ বটে অমনি অমন?

(৮)

পড়ে বটে পড়ে মনে, দেখেছি কবে কে জানে,
ওই মত হাসি ভরা দুখানি বদন,
মিছামিছি কত হাসি কে জানে কারণ,
কোথা সেই হাসিমাখা তরল যৌবন?

(৯)

কোথা হ'তে চিন্তা এবে ঢেকেছে বদন,
যেন হে কালের করে সব পুরাতন।
পক্ষান্তরে তোমারও রবে না অমন
ঢাকিবে অমা রজনী ও বিধুবদন।

(১০)

হেরি তোমাদের ধারা, কত হাসি হাসি মোরা
এত শোভা আর নাহি দেখেছি কখন;
পরপতি ভুলাইতে বেশ প্রয়োজন
সুগন্ধ কুসুম লতা কবরী বেষ্টন।
(পরেছ ধরণী তাই কৌমুদীবসন?)

(১১)

আহা এ পূর্ণিমা নিশি মরি কিবা মনোহর,
মোহিত না হয় মরি হেরে কাহার অন্তর,
কোমল অঙ্গুলি তুলি, বোলে আধ২ স্বর,
হেসে দেখাইছে শিশু হায় শর-শশধর।
(মরি২ কি সুন্দর জননীর অঙ্কোপর)

(১২)

বালক যুবক ভোলে, দেখে বৃদ্ধ চিন্তা ফেলে,
মরি কি সুন্দর নিশি মনোহর কোজাগর
যে সৃজিল হেন নিশি তব জন্যে ওহে নর
বারেক কৃতজ্ঞ হয়ে ভাব সে জগদীশ্বর॥

অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য।

কোন বিষয়ে লিখিতে গেলে যতই বিনীত থাকিতে চেষ্টা করি দুটী কথার অন্যতর অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। হয় বলিতে হইবে আমি এমন কথা বলিব যে তাহাতে পাঠকের জ্ঞানোদয় হইবে। নতুবা মানিতে হইবে যে প্রস্তাবিত বিষয়ে লেখক পাঠক উভয়ে সমান কিন্তু অবস্থানুসারে পরস্পরের মতভেদ আছে এবং পাঠকের মত খণ্ডন করাই লেখকের অভিপ্রেত। ইদানীন্তন ইংরাজি ভাষাজ্ঞ বাঙ্গালির কোন কথা ব্যক্ত করিতে হইলে কয়েকটী বিষম সঙ্কট উপস্থিত হয়। এতাদৃশ স্থলে আমাদিগের মনের ভাব ইংরাজি ও বাঙ্গালাতে নিতান্ত জড়ীভূত। যে সকল কথা স্পষ্টতঃ মনে উদয় হয় তাহার অধিকাংশ বিষয়ের বাদানুবাদ ইংরাজি পুস্তক অবলম্বন করিয়াই করিতে হয়। বাঙ্গালাতে ইংরাজি পুস্তক লইয়া বাদানুবাদ করিতে হইলে একটু লজ্জা বোধ হয়। কেন না এরূপ বিষয়ে ইংরাজেরাই প্রধান শ্রোতা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যখন ইংরাজিতে ঐ সকল কথা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা যায় তখন অনেক স্থলে সাহেবেরা দেখাইয়া দেন "অমুক অমুক কথা ত আমরা তোমাকে শিখাই নাই। এ গুলি ভ্রান্তিমূলক।" তথাচ ইহাতে সকল সময়ে আমাদিগের মত পরিবর্ত্তন হয় না। কারণ উল্লিখিত ইংরাজবিদ্বিষ্ট কথার অনেকাংশ আমাদিগের প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রমূলক। সেগুলি স্পষ্টতঃ মনে উদয় না হইতে পারে; আমরা অনেক কথা নিজের অগোচররূপে মনে ধারণ করিয়া থাকি। সুতরাং ইংরাজের প্রতিবাদ করিতে সক্ষম না হইয়াও কেবল প্রাচীন হিন্দুসংস্কারবশতঃ অনেক ইংরাজবিদ্বিষ্ট কথা আমাদিগের মুখে ব্যক্ত হওয়া সম্ভব। এগুলি সংস্কৃত পুঁথি খুঁজিলে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমি সংস্কৃত জানি না তবে এরূপ কথা কোথায় পাইব? সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট পাইয়াছি? কতক বটে। কিন্তু এগুলির উপরেই বা আমাদিগের ঐকান্তিক বিশ্বাস হয় কি প্রকারে? ইংরাজি, আমাদিগের পুঁজি, শিখাবিশিষ্ট অধ্যাপক দেখিলেই প্রায় মনে করিয়া থাকি ইনি হস্তিমূর্খ। [বিলাত ফেরতেরাও আমাদিগের সহিত আলাপ কালে সেইরূপ আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন অতএব প্রাগুক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাতে হাতে পাইতেছি] তবে সংস্কৃতপণ্ডিতের কথাতে আমাদের এত দৃঢ় সংস্কার হইবার সম্ভাবনা কি যে সাহেবের মুখে আপত্তি শুনিলেও তাহা ত্যাগ করি না? ইহার হেতু এই যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এতদিন পুরুষানুক্রমে যে উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন

তাহা হিন্দুসমাজে প্রোথিত হইয়া আছে। স্পষ্টতঃ মনে উদয় হয় না অথচ সকল চিন্তাতে মিশিয়া থাকে ; সুতরাং তাহার দোষ গুণ বিচার না করিয়াও তাহা অবলম্বন করিয়া থাকি।

বালিকাবিবাহ স্ত্রীশিক্ষা লইয়া যতই ইংরাজের অনুকরণ করি ; হিন্দুগণের গার্হস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে তাহা প্রবিষ্ট করাইতে গেলে ইংরাজি শিক্ষা যেন উড়িয়া যায়! একবার এক বিবাহের নিমন্ত্রণে ১৪। ১৫ বৎসর বয়স্কা একটী কন্যাকে পিঁড়িতে বসিয়া বর প্রদক্ষিণ হইতে দেখিয়া আমার চৈতন্য হয়। তখন বুঝিলাম যে সাহেবেরা স্ত্রীজাতির সঙ্গে যেরূপে মিশিয়া জীবন যাপন করেন তাহা কেবল মুখের কথায় আয়ত্ত করা যায় না। ১৬ আনা কি, বরং ১৮ আনা সাহেব না হইলে সেই প্রণালী আশ্রয় করা অসাধ্য। সাহেবদিগের মধ্যে অথবা থিয়েটরে যেরূপ স্ত্রীপুরুষের সম্ভাষণ দেখা যায় এবং বাঙ্গালা নবেল রোমান্স মধ্যে যেরূপ নায়ক নায়িকার বৃত্তান্ত পাঠ করা যায় তাদৃশ আচরণ মাতা ভগিনী বা কন্যার প্রতি আমরা কদাচ করিতে পারি না। মনে যতই তর্ক করি চক্ষে প্রাগুক্ত আচরণ দেখিলে স্ত্রীজাতির অপকৃষ্ট সম্প্রদায়ের তুলনা স্বভাবতঃ উপস্থিত হয় এবং অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এতদ্বিষয়ে আমাদিগের মনের ভাব নিতান্ত জটিল। তাহা কতক হিন্দুশাস্ত্রকার এবং কতক ইংরাজি শিক্ষকগণের যত্নে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে বৈষম্য আছে তাহা না বুঝিয়া কথা কহিলেই সাহেবেরা বলেন "বর্ব্বর" অধ্যাপক মহাশয়েরা বলেন "বেল্লিক।"

এইরূপ ঘটনা নানাস্থলেই ঘটিয়া থাকে সুতরাং আমরা না সাহেব না বাঙ্গালি এইরূপ এক অদ্ভুত শ্রেণী হইয়া উঠিতেছি। ইহাতেও মনের ভাব প্রকাশ করা নিতান্ত সঙ্কটস্থল হইত না। যদি এমন হইত যে বাঙ্গালি হইয়া ইংরাজিতে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিলেই ইংরাজ এবং হিন্দু সম্প্রদায়চ্যুত হইবেন বটে কিন্তু এরূপ সকল বাঙ্গালির মনের ভাব প্রায় একরূপ হইবে ; তাহা হইলেও আমরা নিতান্ত আকর্ষণবিহীন বালুকারাশির ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইতাম না। কেন না তাহা হইলেও মনের ঐক্যহেতু পরস্পরের সহযোগিতা করিবার স্থল থাকিত। এবং সেই আশয়ে মনের চিন্তা ভুল হউক বা ঠিক হউক ব্যক্ত করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজি শিক্ষা হইতে উত্তরোত্তর আমাদিগের অনৈক্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা সকলেই সমাজ নূতন করিয়া গড়িতে চাই কিন্তু ইংরাজ ও বাঙ্গালির মধ্যে ভেদ নির্ণয় পূর্ব্বক বিষয় বিশেষের অনুরোধে অন্য বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা সম্বরণ পূর্ব্বক স্বজাতির উপযোগী বন্দোবস্ত করিতে সক্ষম নহি। বঙ্গভাষিগণের

পরস্পরের মঙ্গল চেষ্টা করা প্রায় আশার অতিরিক্ত হইয়া উঠিতেছে। যদি বাঙ্গালি প্রকৃতিতে কিছু সার পদার্থ থাকে তবে অবশ্যই কোন সময়ে না কোন সময়ে তাহা প্রকাশ হইবে এবং তখন এই অসার বৈষম্য স্বভাবতঃই অপনীত হইয়া যাইবে। এই জন্য বলি যে ইংরাজি-ভাবাক্ত বাঙ্গালির কোন কথা বলা বিষম সঙ্কট স্থল।

নিম্নলিখিত কথাগুলি যে কাহারও হৃদয়গ্রাহী হইবে এতদূর প্রত্যাশা করি না। কিন্তু উহার বিষয়ে ইংরাজি ভাব গতিকের আপত্তি আর হিন্দু প্রকৃতি-সম্মত বিভেদ পৃথক করিতে পারিয়াছি এইরূপ স্পর্দ্ধা মনে উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্য গুটি তিন কথা সম্বন্ধে পাঠক-গণেরইংরাজি মত ধরিয়া কয়েকটী কথা এবং হিন্দুসমাজাশ্রিত সংস্কার ধরিয়া আর কতকগুলি বক্তব্য প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি। কথা তিনটীর মধ্যে একটী লইয়াই এই প্রস্তাব লিখিব আর দুইটী ইহার সংলগ্ন বলিয়া নাম করি-তেছি। তাহার কথা কবে লিখিতে পারিব তাহা বলিতে পারি না।

কথা তিনটী ইংরাজিতে বলিলে এই-রূপ নাম দিব (১) Dignity of Labor. (২) Scientific বা Objective method এবং (৩) Principles of theorising অথবা Subjective method। বাঙ্গালাতে ইহার অনুবাদ করিলে আমি ১০ দিন পরে নিজেই সেই অনুবাদের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিব না। সে যাহা হউক আপাততঃ প্রথমোক্ত বিষয়টীই আলোচনার স্থল।

Dignity of labor বাক্যের কেবল dignity শব্দ ধরিলে তৎপরিবর্ত্তে বোধ হয় মাহাত্ম্য শব্দই প্রয়োগ করা যাইত। কিন্তু আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি যে প্রাগুক্ত বাক্যে যেরূপ মাহাত্ম্য ব্যক্ত হইতেছে তাহা একজন হিন্দু স্বভাবতঃ প্রকাশ করিতে গেলে বৈরাগ্য শব্দই প্রয়োগ করিবেন। আমার বক্তব্য কথা এই যে ইংরাজিতে শ্রমের যে লক্ষণ বা অঙ্গ ধরিয়া উহার dignity বা মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহা আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্যের লক্ষণ-বিশিষ্ট। কিন্তু হিন্দু সমাজস্থ সংস্কার মতে পরিশ্রমে নিষ্কাম বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখা যায় না। অতএব শ্রমের মাহাত্ম্য বা শ্রমের বৈরাগ্য বলিলে হিন্দুর পক্ষে হয় দুর্ব্বোধ নচেৎ অগ্রাহ্য হইবে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে।

হিন্দু শাস্ত্রমতে বৈরাগ্য অতি মহৎ গুণ। সন্ন্যাসী সর্ব্বতোভাবে বৈরাগী হইবার আকাঙ্ক্ষা বশতঃ আশ্রম ত্যাগ করেন কিন্তু তথাপি গৃহস্থ আশ্রমের শ্রম অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয়। দণ্ডধারী এক-সন্ধ্যা আহারের জন্য গৃহস্থের নিকট একাধিকবার যাচ্ঞা করেন না বটে কিন্তু সেই একবার যাচ্ঞাও হিন্দুধর্ম্মোক্ত সন্ন্যাস লক্ষণবিরুদ্ধ বলিয়া মানিতে হইবে। যোগী বলেন আমি জীবনের

সমস্ত ক্রিয়া স্তম্ভিত রাখিয়া শ্রমের আবশ্যকতা নিবারণ করিব এবং আত্ম-হত্যার দোষ হইতেও বিরত থাকিব। কিন্তু যোগ ভঙ্গ হইলেই আবার তাঁহার জীবনের কল চলিবে; জীবনের কল চালাইতে হইলে শ্রমরূপ ইন্ধন অপরি-হার্য্য। অতএব হিন্দুশাস্ত্র মতে বৈরাগ্য কখনই অবিশ্রান্ত হয় না। সুতরাং বৈরাগ্য কি প্রকারে অবিশ্রান্ত হইবে তাহাতে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর কৌতুক জন্মিতে পারে। আমার স্থূল বক্তব্য এই যে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া নিঃস্বার্থ-ভাবে শ্রম করিলে মনোমধ্যে প্রকৃত বৈরাগ্য ভাব আশ্রয় করে। অতএব যখন গৃহীর পক্ষে শ্রম হইতে অব্যাহতি নাই তখন সেই অবিশ্রান্ত শ্রমই অবি-শ্রান্ত বৈরাগ্যের সার উপায়। বৈরাগ্য রক্ষা করিতে হইলে নিরন্তর জগতের হিতজনক শ্রমসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাই একমাত্র বিধি।

পক্ষান্তরে ইংরাজি ভাষাজ্ঞগণের সমী-পে dignity of labor সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ বক্তব্য আছে। প্রাগুক্ত বিষয়ে আমার বিদ্যা বুদ্ধি কোমতের উপদেশ হইতে উৎপন্ন। তাঁহার সহিত অন্যান্য ইউরোপীয় শিক্ষকের গুরুতর মতভেদ আছে। ইদানীন্তন ইউরোপীয় মণ্ডলী কেহই পরিশ্রমের dignity (মাহাত্ম্য) অস্বীকার করিবেন না কিন্তু আমার সংস্কার এই যে কোম্‌তের উপদেশ বাস্ত-বিক বৈরাগ্যলক্ষণবিশিষ্ট এবং অন্যান্য শিক্ষকেরা বৈরাগ্যের সমাদর করেন না। অতএব শ্রম ও বৈরাগ্যের সম্বন্ধ প্রদর্শন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ইংরাজি ভাষাজ্ঞের পক্ষে শ্রমের সঙ্গে বৈরাগ্য অবলম্বন করা এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে শ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবি-শ্রান্ত করা এই দুটী উপদেশ সপ্রমাণিত করাই আমার সংকল্প।

উপরে বলিয়াছি যে শ্রমের মাহাত্ম্য বৈরাগ্য লক্ষণাক্রান্ত কি না তদ্বিষয়ে ইউরোপীয়গণের মধ্যে মতভেদ আছে। অতএব এতদ্বিষয়ক বিচার ইংরাজিভাষাজ্ঞ পাঠকের উদ্দেশেই বক্তব্য।

এক প্রকার মত এই যে dignity of labor কেবল ইউরোপেই ব্যক্ত হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের কথা আমি এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছি যে ব্যবসা, কারখানা, রাস্তা, গাড়ি, জাহাজ, কল, ভাল বন্দুক, ইউ-রোপীয়দিগের যুদ্ধপ্রণালী, শাসন প্রণালী, আচার ব্যবহার, টেবিল, চৌকি, ছুরি, কাঁটা ইত্যাদি Civilization নামক পদা-র্থের অঙ্গমধ্যেই শ্রমের মাহাত্ম্য প্রতীয়-মান। তাঁহাদিগের মতে Civilisation শব্দে উল্লিখিত এবং তদানুষঙ্গিক বিষয়াদি বুঝা আবশ্যক এবং Civilisation ও পরিশ্রমের মাহাত্ম্য অভেদ্য। এই প্রণালীতে বিচার করিতে হইলে শ্রম-জীবিগণকে রাজা ব্রাহ্মণের উপরে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক। এবং এই নিমিত্ত বিলাতে শ্রমজীবিগণের উন্নতির জন্য স্কুল, খবরের কাগজ trade-union

representation ইত্যাদি ব্যাপার হইয়া থাকে। অনেকের প্রত্যাশা এতদূর যে, অল্প কাল মধ্যে উহারাই পার্লিয়ামেন্টের প্রধান অবলম্বন হইবে এবং পাদরি সাহেবেরা ও ভূম্যধিকারীরা ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া উহাদের সহিত মিশিয়া যাইবেন। এবং তাহা হইলেই শ্রমজীবিগণেরও শ্রমের মাহাত্ম্য জগতে যথাযোগ্য মতে জাজ্বল্যমান হইবে। আর ইউরোপীয়েরা সভ্য-প্রধান; তাহাদিগের এইরূপ সভ্যতা শিখিলে সর্ব্বত্র শ্রমের মাহাত্ম্য সুসিদ্ধ হইবে।

উল্লিখিত প্রণালী মতে আর কিছু-দূর বিচার করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ইউরোপীয়েরা ভারত অধিকার করিয়া জগতে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছেন। মূর্খ চীনেরা উহাঁদিগের আশ্রয় গ্রহণ না করাতে নিতান্ত বর্ব্বরতা প্রকাশ করিতেছে। জাপানবাসীরা ইউরোপের অনুকরণ করাতেই এসিয়া খণ্ডের মধ্যে উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছে। আলজিরিয়া টিউনিস কম্বোজ, ফরাসি অধিকৃত হওয়াতে পরম মঙ্গল হইয়াছে। কাবুল কাশ্মীর নেপাল ইংরাজাধিকৃত এবং চীন তাতার রুশিয়া-ধিকৃত হইলে জগতে যার পর নাই সুখ হইবে। কেবল ইজিপ্ট টুরকি এবং পারস্যকে অধিকার করিলে ভাল হয় তাহাই চিন্তার স্থল।

যদি এই মতের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান কর তবে এই কথা প্রকাশ হইবে যে struggle for existence একটি নৈসর্গিক নিয়মবিশেষ এবং natural selection ইহার স্বভাবসিদ্ধ ফল। তাহার অন্যথা চেষ্টা করা মূঢ়তার লক্ষণ মাত্র। সভ্য ও অসভ্যগণ বিরোধ করিলে natural selection মতে সভ্যজাতির বর্দ্ধন ও অসভ্যের ক্ষয় অবশ্যই হইবে। অণ্ডামানবাসিগণ, আমেরিকার ইণ্ডিয়ান জাতিগণ, নিউজিলাণ্ড দেশের লোক ইত্যাদি ইউরোপীয়ের প্রাদুর্ভাবে নিঃশেষিত হইলে এবং উহাদিগের দেশে ইউরোপীয়গণের অধিষ্ঠান হইলে জগতের উৎপাদিকা শক্তির পূর্ণ চালনা হইবে। ইউরোপীয়েরাই শ্রম করিতে সক্ষম; তাঁহারাই শ্রমের সার বুঝিতে পারিয়াছেন; তাঁহারাই সংসারসাগরে শ্রমরূপ মন্থন প্রবর্ত্তন করিয়া Civilisation সুধা উদ্ধার করিতেছেন। ইঁহারা অন্য জাতির সহিত বিরোধ struggle করিয়া জয় লাভ করিলে কৃষি বাণিজ্যাদির দ্বারা ধনবৃদ্ধি হইবে; বর্ব্বরগণ আলস্যে কাল-যাপন না করিয়া শ্রম করিতে বাধ্য হইবে, অথবা যদি অবাধ্য হয় তবে ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পরিশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদিগের স্থলে ইউরোপীয়গণের অভিষেক হইয়া অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ জাতি ধরাতল সুশোভিত করিবে।

উল্লিখিত শ্রমের লক্ষণ (struggle for existence) উহাতে বিন্দুমাত্র বৈরাগ্য দেখিতে পাই না। যদি Dignity of labor পদে ঐরূপ মাহাত্ম্য বুঝিতে হয়

তবে তাহা সত্য হউক বা না হউক তাহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের সংযোগ সাধন করা আমার সাধ্যাতীত।

Spencer এবং Darwin, struggle for existence ও natural selection নামক মতের পক্ষবাদী। তাঁহারা কেহই এ কথা বলেন না যে এসিয়া আফ্রিকা এবং আমেরিকা হইতে বর্ব্বরদিগকে ধ্বংস কর। কিন্তু তাঁহাদিগের দোহাই দিয়া সকল চা-কর নীলকরই বলিতে পারেন যে,আমরা কোন অপরাধ করি না কেবল স্বভাবসিদ্ধ ঘটনাতে natural selection হেতুক আমাদিগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে।*

যাঁহারা উপরিলিখিত মত অবলম্বন করেন তাঁহাদিগের সমীপে আমার একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। মনে কর আমি এক জন এণ্ডামানবাসী, ২০০/ বিঘা ভূমিস্থ জঙ্গল ব্যতীত আমি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম, একজন ইংরাজ এখানে থাকিলে আমাকে স্থানান্তরিত হইতে হয় বটে কিন্তু ঐ ভূমিখণ্ডে ৫০ জন ইংরাজের ভরণপোষণ হইবে। তাহাদিগের শ্রমের দ্বারা এই অরণ্য, জঙ্গল, অপূর্ব্ব উদ্যান হইয়া উঠিবে কিন্তু আমার জন্য জগতে আর স্থান নাই, আমার বুদ্ধি, প্রবৃত্তি এবং কার্য্যনিষ্ঠা ঐ ইংরাজের ব্যবস্থার পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী। আমি ইংরাজের আজ্ঞাবর্ত্তী হইতে নিতান্ত অক্ষম। এই ২০০/ বিঘা ছাড়িলে আমার আপাততঃ মহা কষ্ট এবং পরিশেষে নিজের অথবা বংশাবলীর দেহ নাশ অবশ্যই হইবে। অতএব আমার পক্ষে natural selection এর সহকারিতা করিয়া আত্মহত্যা করাই কি বিধেয়? না ইংরাজের পক্ষে শ্রম, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করা ও এই ২০০/ বিঘা ভূমি সম্বন্ধে মহীতলের দুরবস্থা সহ্য করা বিধেয়। দুর্ব্বল ও অক্ষমকে বিনষ্ট করা যদি সৎপ্রকৃতির লক্ষণ না হয় তবে উল্লিখিত প্রকরণের পরিশ্রম ও সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়েও কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করা আবশ্যক। অতএব natural selection এবং struggle for existence বিষয়ক মতের সমধিক পোষকতা করিতে হইলে উল্লিখিত লক্ষণ-বিশিষ্ট পরিশ্রমের মাহাত্ম্য নিতান্ত সূক্ষ্ম হইয়া যায়। সভ্যতা এবং পরিশ্রমের মাহাত্ম্য সমধিকরূপে রক্ষা করিতে হইলে

* ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে Pioneer লিখিতেছেন। There is a great deal of nonsenses talked about the impropriety of annexation. Perhaps some annexation in this country in the past, have been needless and impolitic, though it would be difficult to point any example, which, however little justifiable in diplomacy, has not been a good thing for all parties concerned—a distinct gain to humanity in the end." *May 9. 1882.*

প্রাগুক্ত নিয়মের নিতান্ত অধীন হইয়া থাকা চলে না।

মিল individuality ভক্ত। individuality স্থলে স্বানুবর্ত্তিতা শব্দ প্রয়োগ একপ্রকার চলিয়া আসিয়াছে। স্বানুবর্ত্তিতা বর্দ্ধন ইদানীন্তন ইংরাজি শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু মিল যে প্রকার স্বানুবর্ত্তিতার পক্ষবাদ করিয়াছেন তাহা এক বিষয়ে অতি ভয়ানক। মিল বলেন মনুষ্যের সকল প্রকার মানসিক এবং শারীরিক ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এ বিষয়ে লোকে নিজের সুবিধা নিজেই ভাল বুঝে, অপর ব্যক্তিরা ততদুর বুঝিতে পারে না। অতএব স্বানুবর্ত্তিতার কোনরূপ অবরোধ করা কর্ত্তব্য নহে; কেবল এই পর্য্যন্ত নিষেধ থাকিলেই যথেষ্ট যে একজনের স্বানুবর্ত্তিতার দ্বারা অন্য ব্যক্তির স্বানুবর্ত্তিতা খর্ব্ব না হয়। এই নিষেধ পালন করিলেই যথেচ্ছাচাররূপ কলঙ্ক মোচন হইয়া স্বানুবর্ত্তিতার অমল রশ্মি বিকাশিত হইবে।

মিলের অনুসরণ করিতে হইলে স্ব স্ব মানসিক এবং শারীরিক ক্ষমতার চালনা করাই অনন্যকর্ত্তব্য। আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব তুমিও সেইরূপ করিও আমি তাহাতে আপত্তি করিব না। আমি ইচ্ছামতে টাকা উপার্জ্জন করিব, টাকা উড়াইব, সামাজিক প্রথা ও ধর্ম্মের আদেশ লঙ্ঘন করিব, তাহাতে আমার পাপ হয়, হউক, দেহ ক্ষয় হয় হউক, অর্থক্ষয় হয় হউক। যতক্ষণ তোমার কোন ক্ষতি না হয় ততক্ষণ তুমি কোন কথা কহিতে পারিবে না, ততক্ষণ আমার কার্য্য স্বানুবর্ত্তিতা নামে অভিধেয়, এবং স্বানুবর্ত্তিতা জগতের অত্যন্ত হিতকর জানিও।

ইহাতে শ্রমের বিলক্ষণ আধিক্য দৃষ্ট হইবে কিন্তু বৈরাগ্যলক্ষণ নিতান্তই বিরল মনে হয়। অতএব শ্রমের মাহাত্ম্য বলিলে যদি এই রূপ স্বানুবর্ত্তিতারই আদর করা হয় তবে আমার প্রস্তাবিত অবিশ্রান্ত বৈরাগ্যের স্থল ইহাতে নাই।

মিলের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। কিন্তু কয়েকটি কথার বিচার করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। বাঙ্গালি নব্যসম্প্রদায় সর্ব্বদা স্বানুবর্ত্তিতার ভাণ করিয়া থাকেন। আমিও স্বানুবর্ত্তিতা ভাল বাসি বটে কিন্তু মিলের প্রদর্শিত স্বানুবর্ত্তিতাকে যথেচ্ছাচার বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সে যাহা হউক মিল অস্মদ্দেশে স্বানুবর্ত্তিতা অবলম্বন বিষয়ে কি বলেন তাহা মনে করা আবশ্যক। মিল লিখিয়াছেন—

It is perhaps hardly necessary to say that this doctrine (of Liberty) is meant to apply only to human beings in the maturity of their faculties. We are not speaking of children, or of young persons below the age which the law may fix as that of manhood

or womanhood. Those who are still in a state to require being taken care of by others, must be protected against their own actions as well as against injury. For the same reason we may leave out of consideration those backward states of society (যথা ভারতবর্ষ) in which *the race itself may be considered as in its nonage.* (এরূপ তুলনা দিয়া বর্ণনা করিলে অলঙ্কারদোষ হয় না বটে, কিন্তু বক কাষ্ঠের মত বক্র বলিয়া কাষ্ঠের আঘাত করাটা একটু ন্যায়বিরুদ্ধ বলিতে পারা যায়।) "The early difficulties in the way of spontaneous progress are so great that there is *seldom any choice of means* for overcoming them; and a ruler (যথা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি) full of the spirit of improvement is warranted in the use of *any expedients* (! যথা Aitchison প্রকাশিত treaty সমূহ) that will attain an end *perhaps* otherwise unattainable. Despotism is a legitimate mode of government in dealing with barbarians provided the end be their improvement and the means justified (কবে ?) by actually effecting that end." (*Liberty 4th Edn pp 22-24.*)

ইনিই স্থানান্তরে লিখিয়াছেন—

"And some of those modern refomers who have placed themselves in strongest opposition to the religions of the past, have been no way behind either churches or sects in their assertion of the right of spiritual domination: M. Comte in particular, whose Social System, as unfolded in his *Systeme de Politique positive*, aims at establishing (though by moral more than by legal appliances) ইহাতেও মিল সন্তুষ্ট নহেন, a despotism of Society over the individual, surpassing anything contemplated in the political ideal of the most rigid disciplinarian among the ancient philosophers."—(*Do* pp 28-29)

এস্থলে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, মিল কি ইণ্ডিয়া আফিসে চাকরি করিতেন বলিয়া এতই ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে বলপূর্ব্বক অন্যের রাজ্যাধিকার করিলে কি দোষ হয় তাহা কোন মতেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে নাই ? ফলতঃ মিল স্বানুবর্ত্তিতার মাহাত্ম্য দেখিতে দেখিতে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা দূরে থাকুক আত্মশাসনের

মাহাত্ম্যও একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে এবং Utility মতে মনুষ্যের কর্ত্তব্য স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু utility মানিলেও আত্মশাসনের প্রতি উপেক্ষা করিবার বিধান দেখা যায় না। যদি মিল, কার্য্যের (utility) বিচার স্থলে, এই কথার অনুসন্ধান করিতেন যে কর্ত্তার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইলে তাঁহার কার্য্যে utility আশ্রয় করা সম্ভব, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই স্বীকার করিতেন যে আত্মহিতের পরিবর্ত্তে পরের হিত অভিলাষ করিলেই অপেক্ষাকৃত বহুলপরিমাণে জগতের হিতসাধন হইতে পারে। কিন্তু নিজের হিতসাধনে বিরাগ করা মিলের রুচিবহির্ভূত হইয়া থাকিবে। সুতরাং প্রাগুক্ত বৈরাগ্য স্বীকার না করিয়া কতদূর স্বানুবর্ত্তিতা লাভ করা যায় তাহাই সাধ্যমত প্রদর্শন করিয়াছেন। বাস্তবিক পরের হিতসাধন অভিপ্রেত হইলেও স্বানুবর্ত্তিতার যথেষ্ট স্থল থাকে। অন্য ব্যক্তি স্বানুবর্ত্তী হইতে পাইলে স্বেচ্ছা চরিতার্থ করিয়া সুখী হইবে এবং তাহার মানসিক ও দৈহিক শক্তির যথাযোগ্য চালনা হইয়া তদ্দ্বারা জগতের হিতসাধন হইবে—এরূপ তর্কের দ্বারাও স্বানুবর্ত্তিতার মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করা অসাধ্য নহে। কিন্তু তাহা হইলে কোমৎ প্রণীত পরার্থপরতামূলক প্রামাণিক (Positive) ধর্ম্ম অগত্যা অবলম্বন করিতে হয়। মিল কোন মতেই তাহা স্বীকার করিতে পারেন নাই। মিল কি পিতৃশাসনে এতই উৎপীড়িত জ্ঞান করিয়াছিলেন যে গুরূপদেশ মাত্রেই অভক্তি হইয়াছিল? কিন্তু জেম্স্ মিলের শাসনে কই জন মিলের স্বানুবর্ত্তিতার তো কোন ব্যাঘাত হইয়াছিল বলিয়া দেখা-যায় না। যাহা হউক মিল এইরূপ ভাবিয়াই বোধ হয়, পিতা স্নেহবশতঃ সন্তানের যেরূপ শাসন করেন তাহার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতশাসনের কোন প্রভেদ দেখিতে পান নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনে ভারতবাসীদিগের প্রতি বল প্রয়োগ হয়, আর কোমৎ প্রণীত ধর্ম্ম শাসনে মিলের ন্যায় ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারের বা স্বানুবর্ত্তিতার স্থল থাকে না। সুতরাং মিল উভয় কূল ত্যাগ করিয়া ইউরোপ অঞ্চলে স্বানুবর্ত্তিতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। ভূমধ্যসাগর পার হইলে আর স্বানুবর্ত্তিতা চলিবে না। Nature abhors vacuum,—but up to thirty two feet only! আর স্বানুবর্ত্তিতা ও যথেচ্ছাচারের মধ্যে ভেদ কি রহিল? মিল বলেন অন্যের স্বানুবর্ত্তিতা। উত্তরটা সর্ব্বপ্রকারেই ঠিক গ্যালিলিওর মত হইয়াছে। ফলতঃ যথেচ্ছাচার এবং স্বানুবর্ত্তিতার মধ্যে কোন ব্যবধান রাখা আবশ্যক হইলে আত্মশাসন ব্যতীত তাহার উপায়ান্তর নাই এবং সেই আত্মশাসনেরই নামান্তর স্বার্থপরতাদমন। তাহা হইতেই পরার্থপরতা ধর্ম্ম সাধন হয়।

এবং এতদুভয় একত্র করিলেই বাস্তবিক বৈরাগ্যের লক্ষণ সংঘটিত হয়।

মিল যে প্রকারে স্বানুবর্ত্তিতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রায় সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রমের প্রতিই বর্ত্তে। পরিশ্রম মাত্রই হয় আপনার অনুষ্ঠিত নচেৎ অন্যের আদিষ্ট। অন্যের আদেশ পালন করা নিজের সংকল্পিত হইলে তাহাতেও স্বানুবর্ত্তিতা থাকে। কেবল উৎপীড়নভয়ে উহা পালন করিতে হইলেই সকল দোষ আশ্রয় করে। সে যা হউক মিলের কথিত স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তি যত্নসহকারে আপন স্বেচ্ছা চরিতার্থ করেন। ইহাতে ঐ যত্নই প্রকৃত পক্ষে মাঙ্গলিক বিষয়; স্বেচ্ছা চরিতার্থ করিবার স্বাধীনতা কেবল উপায় মাত্র। মনুষ্য শ্রম করিলেই কার্য্যকুশল হয় ঐ শ্রমের দ্বারা আমাদিগের যে সকল বৃত্তি সঞ্চালিত হয় তৎসমুদায়ই পুষ্টি লাভ করে। আর শ্রমলব্ধ ফল যে কেবল শ্রমী ব্যক্তিরই ভোগে আইসে তাহা নহে। শ্রমী নিজে বেতন বা মূল্য প্রাপ্ত হয় এবং কার্য্যবিশেষে দক্ষতা লাভ করে। কিন্তু তাহার শ্রম কিম্বা শ্রমজাত দ্রব্য যে ক্রয় বা গ্রহণ করে সেও বিশিষ্ট রূপে উহার ফলভোগী। যদি কোন স্থলে কাহারো শ্রমের দ্বারা অন্যের অপকার হয় অথবা কোন হিত না হয় তাহা হইলে নানাপ্রকার প্রতীকার হইয়া থাকে। অতএব শ্রমের দ্বারা আপন ও পর, একত্রে বহুলোকেরই হিতসাধন হয়। এবং পরের সুখ দুঃখ আমার কার্য্যেরই উপর নির্ভর করিতেছে এই কথা বুঝিয়া এবং আপন ইষ্ট অপেক্ষা পরের আবশ্যকতাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া শ্রম করিলেই স্বানুবর্ত্তিতা পরার্থপর এবং বৈরাগ্যলক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠে। মনে কর আমি শ্রম স্বীকার করিয়া একটী গ্যালি কম্পোজ্ করিলাম, ইহাতে যদি টাইপ্ নষ্ট হয় তবে আমাকে অবশ্যই নিন্দা করিবে এবং আমিও ভবিষ্যতে কম্পোজিটরের কার্য্য হইতে বিরত থাকিব। যদি ঐ গেলি বেশি ভুল থাকাহেতু অব্যবহার্য্য হয় অর্থাৎ উহাতে উপকার অনুপকার কিছুই না দর্শে তবে আমার শ্রমের বেতন পাইব না। সুতরাং আমি তজ্জন্য যে সময় অতিবাহিত করিলাম তাহা আমার জীবন হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইল বলিতে হইবে। এবং সেই পরিমাণে অন্যান্য ব্যক্তির প্রয়োজনসিদ্ধির কালবিলম্ব এবং অভাবও ঘটিবে।

"We will quote on this subject, the reply made by a workman to the commissioners appointed to inquire into the position of the labouring classes. They told him that his labor was a commodity, on the same footing with other commodities, and that he was free to dispose of it on fair terms.

'And yet' replied the workman it has a character of its own, because, if ordinary commodities are not sold one day, they are another; whereas if I do not sell my labor, it is lost for all the world and for me; and as the existence of society depends on the results of labor, society is the poorer by the value of what I might have been able to produce."

A report on the labor question presented to the Positivist society. Translated from the French. London. George Manwaring. 1861.

অতএব শ্রমী পরের হিত মনে করুক না করুক,শ্রমের নিগূঢ় মাহাত্ম্য লোকের হিত,শ্রমীর নিজের হিত এবং তাহার শ্রমজাত ফল যাহারা উপভোগ করে তাহাদিগের হিত তাহাতে সন্দেহ নাই। এস্থলে শ্রমের utility প্রকৃষ্ট রূপেই সাব্যস্ত হইতেছে। এখন জিজ্ঞাসা যে ইহার সহিত পরার্থপরতার বিভেদ কি।

Utility মতের বিরুদ্ধে ইউরোপের বড় বড় পণ্ডিতেরা যে সকল প্রতিবাদ করিয়াছেন ইংরাজি ভাষাজ্ঞ পাঠকের নিকট তাহার পুনরুক্তি করা অনাবশ্যক। অন্য পাঠকের নিকট তাহা প্রকাশ করা এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের আয়ত্ত নহে। কিন্তু দুটা কথা না বলিলে আমার বক্তব্য বিষয় অসংলগ্ন হইবে।

The greatest happiness of the greatest number—(অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক ব্যক্তির, অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ সুখ) সাধন করিবার উদ্দেশ্যে, সকল কার্য্য করিতে হইলে স্বীকার করিতে হয় যে সকল ব্যক্তিই পরস্পরের সহিত তুল্য। এ কথার ভাবান্তর এইরূপ হইতেছে যে, স্বপরিবার ও স্বগ্রাম বা স্বদেশবাসী বলিয়া যে সম্বন্ধ ভেদ গণ্য করা গিয়া থাকে তাহা সঙ্গত নহে। অতএব উপকারের পাত্র মধ্যে উল্লিখিত কোন তারতম্য রক্ষা করা utility বিধানের বহির্ভূত। কিন্তু ভরসা করি এ কথাতে অনেকেই অসম্মত হইবেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে প্রাগুক্ত বিধান মতে হিতসাধকের মনের অভিসন্ধি সম্বন্ধে সকল বিচার পরিত্যাগ করা আবশ্যক। আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক সাদরে ভোজন করাইলাম। ইহাতে তোমার সুখ বর্দ্ধন হইল সুতরাং utility মতে কার্য্যটী নিন্দনীয় নহে। কিন্তু মনে কর যে আমার অভিসন্ধি যে তুমি আমার বিশেষ প্রত্যুপকার করিবে। এখন জিজ্ঞাসা এই যে এই অভিসন্ধি ধরিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য কি না?

খ্রীষ্টানেরা বলেন জগদীশ্বর কেবল লোকের অভিসন্ধিই বিচার করেন কার্য্যের ফলোদয় দেখেন না। মনে কর এক জন খ্রীষ্টান আমার মঙ্গলো-

দেশে আমাকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিলেন। তিনি জানেন যে পরিণামে ইহাতে গুরুতর বিপত্তি হইতে পারে; অর্থাৎ হিন্দু খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে বিষম্বাদ হেতু যুদ্ধ বিগ্রহাদি ঘটিত নানা অমঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু তিনি সদভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে খ্রীষ্টান করিতেছেন, এই নিমিত্ত আপনাকে এই সকল অহিতের জন্য দায়িক মনে করেন না, এবং জগদীশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় হইবারও আশঙ্কা করেন না।

হিন্দুগণ বলেন ব্রাহ্মণকে দান করা বিধেয়। শাস্ত্রকার আদেশ করিয়াছেন এই জন্য বিধেয়। ইহাতে মনের অভিসন্ধি বা কার্য্যের ফলাফল কিছুই বিচার করা আবশ্যক নহে। শাস্ত্রকারের আদেশ পালন করিলে তোমার আজ্ঞাবাহিতা এবং ভক্তির চালনা হইবে। একজন দরিদ্রকে দান করিলে তোমার দয়াধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে পারে; যজন--যাজন- অধ্যয়ন -অধ্যাপন--কারী কোন ব্যক্তিকে দান করিলে সংসারে বিদ্যানুশীলন এবং ধর্ম্মানুশীলনের উন্নতি হইতে পারে; কিন্তু এই সমস্ত হিতাভিসন্ধি অথবা হিতসাধন কিছুই হিন্দুর বিচার্য্য বিষয় নহে। শাস্ত্রানুসারে যে ব্রাহ্মণ পতিত হইয়াছে যাহাকে ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে বহিষ্কৃত করাই কর্ত্তব্য এবং যেখানে এরূপ শাসন (তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমার অধিকার চর্চ্চাও বটে) সেস্থলেও এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে দান করা বিধেয়; ইহাতে শাস্ত্রাজ্ঞাই প্রকারান্তরে লঙ্ঘন হইতেছে তথাচ ঐ অব্রাহ্মণকে দান করিয়া শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধি তোমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে; তোমার অভিসন্ধি এমন হইতে পারে যে ব্রাহ্মণ বশীভূত করিয়া সমাজের সমক্ষে তোমার হিঁদুয়ানি বজায় রাখিবে মাত্র. তথাচ তাহাতে দোষ নাই; ঐ ব্রাহ্মণকে দান করিলে হয় ত সে অদ্য রাত্রেই রেল যাত্রা করিবে এবং তাহার পরিবারবর্গকে যার পর নাই বিপদে নিক্ষেপ করিবে, তুমি ইহা জানিলেও এই অহিতের দায়িক নহ।

হিন্দুশাস্ত্রের কথা এতই অসঙ্গত বোধ হয়। কিন্তু কার্য্যে হিন্দুগণ অনেক স্থলেই Utility ভক্ত দেখা যায়। ফলাফলের বিচারটা চক্ষে পড়িলে এড়ায় না; অভিসন্ধির কথা গুহ্য বলিয়া আন্দোলন হয় না। সুতরাং বাঙ্গালি, ইংরাজি শিক্ষাবশতঃ একবার মনু যাজ্ঞবল্ককে ভণ্ড কি মূর্খ মনে করিতে আরম্ভ করিলেই Utility বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন। কেন না খ্রীষ্টানের প্রতি ঘৃণা অন্য কারণে বদ্ধমূল হইয়াই আছে। এই কথাগুলিতে কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি হইতেছে বটে তাহা বাদ দিতে হইলে পুঁথি বেড়ে যায়। অতএব যাঁহারা utilityর পরিবর্ত্তে, আদেশ, intuition আদির সমাদর করিয়া থাকেন তাঁহারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন! তাঁহাদিগের কথায় প্রতিবাদ utility বিষয়ক পুস্তকে যথেষ্টই আছে।

বাস্তবিক মনুষ্যের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার সময়ে উপরোক্ত তিন বিধানই অবলম্বন করা আবশ্যক। গুরূপদেশ, কর্ত্তার অভিসন্ধি, এবং ক্রিয়ার হিতাহিত ফল, এই তিনটী বিষয়ের প্রতিই লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কেবল গুরূপদেশের অধীন হইয়া থাকিলে খ্রীষ্টানের উপদেশটী ত্যাগ করিতে হয়; অর্থাৎ অভিসন্ধির বিচার থাকে না। কেবল গুরূপদেশ অথবা খ্রীষ্টানের পরামর্শ শুনিলে utility বিধানের অবমাননা পূর্ব্বক কার্য্যের হিতাহিত ফলের প্রতি দৃষ্টি ছাড়িতে হয়। কেবল সদসদভিসন্ধি ধরিয়া গুরূপদেশ এবং ক্রিয়াফল উপেক্ষা করিলে লোকের হিতসাধন বিষয়ে ত্রুটী স্বীকার করিতে হয়। ইহার একটীও নির্দ্দোষ নহে। অমুক কার্য্যে utility আছে কি না এই কথার মীমাংসার জন্য পণ্ডিতগণের অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা utility বিষয়ক বিধানেই আছে। সুতরাং প্রাগুক্ত বিধানে গুরূপদেশের স্থল বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে। লোকের কার্য্য এবং মনের অভিসন্ধি মধ্যে প্রবল সম্বন্ধই আছে। তাহা না থাকিলে লোকের চরিত্র নিতান্ত অব্যবস্থিত হইত, এবং কেহ কাহারই প্রতি বিশ্বাস করিতে পারিত না। অতএব মনের অভিসন্ধি উপেক্ষা করিবার বিষয় নয়। Utility বিধান মতেও greatest happiness of the greatest number (বহুব্যক্তির সুখ বাহুল্য) লোকের অভিসন্ধি মধ্যে পরিগণিত হওয়া আবশ্যক। এস্থলে বহু ব্যক্তির মধ্যে কর্ত্তা স্বয়ংও গণনীয়। কিন্তু যতগুলি লোকের সুখ সাধনার্থ utility বিধানমতে কার্য্য করা যায় তন্মধ্যে আপনি ভিন্ন অন্য সকলের সম্বন্ধেই পরার্থপর অভিসন্ধি বর্ত্তে। Utilityতে স্বচ্ছন্দ পরচ্ছন্দ উভয়ই সংকলিত থাকে। সুতরাং পরচ্ছন্দানুবৃত্তি, utility মতে নিষিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু যে যে স্থলে স্বচ্ছন্দানুবৃত্তি বা স্বার্থপরতার দ্বারা পরচ্ছন্দের ব্যাঘাত হয় সেখানে পরার্থপরতা (altruism) বিষয়ক বিধান মতে Utility দূষণীয় হইয়া উঠে বলিতে হইবে। স্বার্থপরতা হইতে নিজের হিত; পরার্থপরতা হইতে অন্যের হিত হইবার কথা। অভিসন্ধি এবং কার্য্যের সম্বন্ধে এইরূপ। কিন্তু স্বার্থপরতা হইতে পরের অহিতও হইতে পারে। দুরভিসন্ধি প্রযুক্ত হইতে পারে, দুরভিসন্ধি অভাবেও হইতে পারে। এবং কোম্‌ৎ পরার্থপরতা বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে নিজের অহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। Utility অবলম্বন করিয়া স্বানুবর্ত্তী হইলে স্বচ্ছন্দাভিলাষী এবং পরের অহিতকারী হওয়া অসম্ভব নহে। স্বানুবর্ত্তিতা বিষয়ে মিল যে নিষেধ অবধারণ করিয়াছেন তাহাতে পরের অহিত কতকদূর নিবারিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে হইতে পারে না।

আমি স্বানুবর্ত্তী চিন্তাতে নিমগ্ন

হইয়া স্থির করিলাম যে এক স্ত্রীর বহু পতি বরণ করাতে কোন দোষ নাই। স্থির করিয়া স্বানুবর্ত্তিতার বিধান মতে আপন মতানুসারে কার্য্য করিলাম; এবং মিলের আদেশ প্রতিপালনার্থে অন্যকেও সেইরূপ করিতে দিলাম। মনে করা যাউক গে কার্যটা সত্যই নিতান্ত গর্হিত। কিন্তু আমার মতিভ্রম এবং আমার সহকারিগণের যথেচ্ছাচার বশতঃ প্রাগুক্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল। এবং আমার অনুকরণ হেতু কিছু কাল পর্য্যন্ত দেশ বিশেষে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, লোকের বুদ্ধিবহির্ভূত হইয়া থাকিল। এই অহিতকে স্বানু-বর্ত্তিতার ফল বলিতে হইবে।

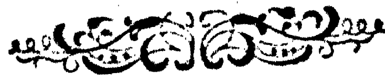
এস্থলে আমার কার্য্যটীর দোষ গুণ বিচার করিতে হইলে মিলের মতে দেখিতে হইবে যে কতগুলি লোক আমার মতাবলম্বী হইয়া অহিতগ্রস্ত হইল আর কতগুলি লোক স্বানুবর্ত্তী হইয়া মানব-প্রকৃতির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিল। এই কথা স্থির করিতে হইলে সহস্র বৎসর চুপ করিয়া থাকা আবশ্যক। অন্যান্য মত অনুসারে দেখিতে হইবে যে আমার অভিসন্ধি কি ছিল—সমাজের হিত সাধন করা না নিজের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করা। আমার মতাবলম্বিগণের মঙ্গল কামনাই যদি আমার মনোগত অভিপ্রায় হইত তবে সাধাপক্ষে প্রস্তাবিত কার্য্যের ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না এবং আপন ভ্রম জানিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ অবশ্য ক্ষান্ত হইতাম। কিন্তু যদি নিজের বাহাদুরী দেখানই আমার অভিপ্রেত হয় তবে আমার স্বানুবর্ত্তিতা হইতে কেবল বিলাসবাসনাই চরিতার্থ হইবে।

এতাদৃশ আচরণ স্থলে অভিসন্ধির দোষ কিছুতেই খণ্ডন হইতে পারে না। এরূপ স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তিকে এক বিষয়ে কোন মতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেও প্রকারান্তরে তাহার দ্বারা আবার অহিত সাধন হইবে; অন্ততঃ তাহার অনুকরণ হেতু অন্য ব্যক্তির দ্বারা ক্রমশঃ লোকের অনেক অমঙ্গলই ঘটিতে থাকিবে। অত-এব কার্য্যের হিতাহিত ফল জানিবার জন্য কেবল আপন অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর না করিয়া গুরূপদেশ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। স্ব স্ব আন্তরিক প্রকৃতির একতা রক্ষা করিবার জন্য মনোগত অভিসন্ধি গুলিকেও সুনিয়মানুবর্ত্তী করা আব-শ্যক। এবং কার্য্যফলের হিতাহিত বিচারে নিতান্ত বিমুখ হইলে গুরূপদেশ এবং মনের অভিসন্ধি উভয়ই বিফল হইতে পারে, অতএব মনোগত অভি-সন্ধির অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়াই মনুষ্য-বর্গের সেবা করা বিধেয়।

কেবল স্বানুবর্ত্তী হইলেই যে চরি-ত্রের উৎকর্ষ সাধন হয় তাহা নহে। অন্যের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে না শিখিলে কখনই ব্যাপক কাল স্বীয় সংকল্পের অনুবর্ত্তী থাকা যায় না। বহুজন সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে হইলে একজনের

আজ্ঞাদান এবং অন্য সকলের আজ্ঞা বহন ব্যতীত কোন কার্য্যই সমাধা হয় না। যাহারা আজ্ঞা বহন করিতে শিখে নাই তাহারা সুপ্রণালীমতে আজ্ঞা দান করিতেও নিতান্ত অক্ষম হয়। জগতের কার্য্য অল্পাধিক পরিমাণে সমবেত হইয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়। সুতরাং স্বানু-বর্ত্তিতা এবং আজ্ঞানুবর্ত্তিতা উভয়ই আবশ্যক। উভয়ের পরিমিত অবস্থাতে কোন দোষই হয় না। অপরিমিত হইলে উভয় হইতেই বিভিন্ন দোষ উৎ-পন্ন হয়। অপরিমিতরূপে স্বানুবর্ত্তী হইলে স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তিকেই দোষী বলিতে হয় কিন্তু অপরিমিতরূপে আজ্ঞা-নুবর্ত্তী হইলে সেই দোষ বাহুল্যপরিমাণে আজ্ঞাদাতাতেই স্পর্শ করে। যে আজ্ঞা দাতা আজ্ঞাবাহীকে অযথারূপে অবনত রাখেন তাঁহার দোষের বিষয়ে বিচার করিলে প্রকাশ হইবে যে বল প্রয়োগ বিষয়ে স্বানুবর্ত্তিতা এবং পরচ্ছন্দের প্রতি উপেক্ষাই দোষের সার ভাগ। এই কারণেই ইউরোপ কর্ত্তৃক এসিয়ার উপরে যে বলপ্রয়োগ হইতেছে তাহা দূষণীয়। এবং তদ্বিষয়ে মিলের মত ভ্রান্ত।

শ্রীযো,



ফুলের ভাষা।

১

আর এই শীতকালটা ভাল লাগে না। যে অনন্ত নীল আকাশ দেখিতে এত সুন্দর, এত সুশ্রী—যে অনন্ত আকাশে অনন্ত নক্ষত্ররাজিপরিবেষ্টিত অনন্ত শোভায় শোভিত চন্দ্রমণ্ডল দেখিলে এত আহ্লাদ, এত উল্লাস, এত মোহ জন্মে শীতকালে সে সকল কিছুই থাকে না। এই স্থূল এবং দৃষ্টি ও ঘ্রাণের অপ্রী-তিকর পদার্থে পরিপূর্ণ জড়জগৎ হইতে কি এক রকম ধমবৎ, কুরূপ এবং স্ফূর্ত্তি-নাশক বাষ্প উঠিয়া মানুষের চক্ষু এবং আকাশরূপ অনন্ত সৌন্দর্য্যের আবাস স্থলের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায়। মানুষ অতুল রূপের পরিবর্ত্তে অসহনীয় কুরূপ দেখিতে থাকে। দ্রষ্টব্য জগতের উপরার্দ্ধ বিকৃত হইয়া পড়ে, তাহা দেখিতে ইচ্ছা হয় না, দেখিলে বিরক্তি জন্মে এবং মেজাজ খারাপ হইয়া যায়। জগতের নিম্নার্দ্ধও তদ্রূপ। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মনোহর বৃক্ষলতাশোভিত ভটভূমি-

বেষ্টিত স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ, পুষ্করিণী; সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত, প্রস্ফুটিত পদ্মশোভিত, সুনির্ম্মলবারিপূর্ণ সরোবর; পর্ব্বতোদ্ভূতা, ক্রীড়াময়ী, রঙ্গপ্রিয়া, চঞ্চলনেত্রা, মধুরভাষিণী, স্রোতস্বিনী; সুদূরবিস্তৃত, গাম্ভীর্য্যময়, গর্জ্জনপ্রিয়, বাত্যান্দোলিত, সুনীল, স্ফীতবক্ষ সমুদ্র—এ সকলই শীতকালে সেই অনন্ত বিস্তৃত, কু-রূপ, স্ফূর্ত্তিনাশক বাষ্পরাশিতে আবৃত। ইহাদের সমস্তরূপ, সমস্ত সৌন্দর্য্য অনন্তাকাশের অতুল সৌন্দর্য্যের ন্যায় বিলুপ্ত অথবা কলুষিত। পৃথিবী এবং আকাশ একটা ঘোলা আবরণে মণ্ডিত। দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত হয় এমন কিছুই নাই। বৃক্ষে পত্র নাই। বৃক্ষের শাখা গুলা এক একখানা পোড়া কাষ্ঠের ন্যায় এদিকে ও দিকে প্রসারিত। বৃক্ষটা যেন মৃত্যুর প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। কীট, পতঙ্গ, পশু কেহ ক্রীড়া করিতেছে না—যেন সকলেই মরিয়া রহিয়াছে। কি অদূরে কি সুদূরে কোথাও পাখীর ডাক শুনিতে পাই না। মানুষের বাহ্যজগতের সহিত সম্পর্ক নাই। মানুষ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শীতে জড় সড় হইয়া পড়িয়া আছে অথবা বস্ত্রাভাবে ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরাভ্যন্তরে কিম্বা পথপার্শ্বে পড়িয়া হিমঋতুর নিদারুণ মর্ম্ম হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে। রোগী রোগ বাড়িয়া রুগ্নশয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। পৃথিবী হিমময়, যেন হিমে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। জড় জগতের শক্তি, জড় জগতের শ্রী, জড় জগতের সৌন্দর্য্য সকলই বিলুপ্ত!

ক্রমে সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে গমন করিলেন। তাঁহার নিস্তেজ মূর্ত্তি সতেজ ভাব ধারণ করিতেছে। পৃথিবী হাড়ে হাড়ে তাপ অনুভব করিতেছে।

এখন দেখ দেখি পৃথিবীতে কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে! যে অনন্ত বিস্তৃত, কু-রূপ, স্ফূর্ত্তিনাশক বাষ্পরাশি সুন্দর আকাশ এবং সুন্দর পৃথিবীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, সে বাষ্পরাশি কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। উপরে তারকাখচিত নীলাকাশ, নীচে নীল সমুদ্র, স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী, এবং প্রস্ফুটিত পদ্মশোভিত সরোবর হাসিতেছে। মৃতবৃক্ষ প্রাণ পাইয়াছে। তাহার প্রতি শাখা এবং প্রশাখা ছোট ছোট কচি কচি পাতায় আবৃত। সেই সকল পাতার ভিতর ছোট ছোট পাখী খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। মরা গাছ যেন একটি নবজাত শিশুর শোভায় পরিশোভিত হইয়াছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে গাছ অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছে—কখনই মরিবে না। আজ যে দিকে চাই, সেই দিকেই সৌন্দর্য্য, সেই দিকেই জীবন-শক্তির রমণীয় স্ফূর্ত্তি। আজ মানুষ গৃহের দ্বার খুলিয়া বৃক্ষ, লতা, আকাশ, সমুদ্রের শোভা দেখিয়া বেড়াইতেছে। আজ শীতক্লিষ্ট কাঙ্গাল এবং কৃষক হাসিয়া

কথা কহিতেছে। আজ রোগী রুগ্নশয্যা ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ কীট; পতঙ্গ; পশু উন্মত্ত হইয়া খেলা করিতেছে। আজ কি অদূরে কি সুদূরে সর্ব্বত্রই সুকণ্ঠ পক্ষী গলা ছাড়িয়া গীত গাহিতেছে। আজ পৃথিবীর স্ফূর্ত্তি আকাশের স্ফূর্ত্তিতে মিশিয়াছে। আর এই আজিকার তপনতাপজনিত অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তির দিনে উদ্যানে, প্রাঙ্গণে, কাননে, অরণ্যে ফুট্ ফুট্ করিয়া রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া পড়িতেছে।

যে তাপ জড় জগতের প্রাণ, যে তাপে জড় জগৎ ফোটে, সেই তাপ ফুলেরও প্রাণ, সেই তাপে ফুল ও ফোটে। যে তাপের প্রভাবে জড় জগতের এত বাহ্যবিকাশ, এত বাহ্য রঙ্গ, সেই তাপের প্রভাবে ফুলেরও এত বাহ্যবিকাশ, এত বাহ্য রঙ্গ। ফুল তুমি এত জড়, তোমার ভিতর এত তাপ?

শুধু কি তাই? ফুল কি শুধু তাপোদ্ভূত, তাপগর্ভ জড়? ফুল আদর্শ জড়।

দেখ, সকল জড়ের একরকম না আর একরকম রূপ আছে। কিন্তু ফুলের মতন রূপ কার আছে বল দেখি? প্রশস্ত সরোবরে যখন বড় বড় পদ্ম ফুল ফুটিয়া থাকে আর সেই পদ্মফুলে অসংখ্য ভ্রমর বসিয়া মধুপান করে তখন দেখিলে মনে হয় না কি যে সরোবরের স্বচ্ছ জলে কত আগ্রীবনিমজ্জিতা সুন্দরী কাল চুল এলাইয়া দিয়া পরস্পরের প্রতি চাহিয়া নিঃশব্দে আপন আপন রূপের প্রশংসা করিতেছে? যখন চাঁপা গাছে চাঁপার কলিটি দেখা দেয় তখন মনে হয় না কি যে জগতের আদর্শ গঠনটি প্রকাশ পাইয়াছে,—ক্ষুদ্র, ঈষৎ দীর্ঘ, নিটোল, নিখুঁত? ঐ দেখ একটি লতা একটা সরলদ্রুম বেষ্টন করিয়া বৃক্ষটিকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়াছে। মন্দ মন্দ সমীরণে লতারাশি অল্প অল্প হেলিতেছে দুলিতেছে। লতার গায় এক একটি গুচ্ছে কতকগুলি করিয়া ঈষৎ দীর্ঘ লাল ফুল ঝুলিতেছে এবং বাতাসে অল্প অল্প নড়িতেছে। ঠিক বোধ হইতেছে যেন লতাম্বরালে কত অনুপম রূপসী লুকাইয়া ছোট ছোট রাঙ্গা রাঙ্গা করপল্লব গুলি বাহির করিয়া তোমাকে আমাকে খেলা করিতে ডাকিতেছে। ঐ দেখ ও খানে কতকগুলি কিংশুক বৃক্ষ ফুলে ছাইয়া পড়িয়াছে। ঠিক যেন—

> "আদীপ্ত বহ্নিসদৃশৈর্ম্মরুতাবধূতৈঃ
> সর্ব্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।
> সদ্যো বসন্তসময়ে সমুপাগতে হি
> রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ॥"

ঐ স্বচ্ছসলিলা নদীর তীরে ঐ রমণীয় উদ্যানে বেল, যুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি কতকগুলি ফুলগাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। সকল গুলিই সুন্দর, সুহাস্যময়, রূপের ছটায় চারিদিক আলো করিয়া রহিয়াছে। অল্প অল্প বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া এ ওর গায় ঢলিয়া পড়িতেছে। সকলের মধ্যস্থলে একটা উচ্চ

গোলাবের ডালে একটা বড় গোলাব ফুটিয়া রহিয়াছে—হেলিতেছেও না দুলিতেছেও না। যেন রূপসীর সভা হইয়াছে—সকল রূপসী হাবভাব প্রকাশ করিয়া রূপের চটক বাড়াইতেছে, কেবল মধ্যস্থলে একটা ক্লিওপেট্রা রূপগর্ব্বে গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আবার ঐ দেখ নদীর অপর পারে কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! অনন্ত বিস্তৃত কানন। কাননে কোথাও অসংখ্য কর্ণিকার বৃক্ষে অসংখ্য কর্ণিকার ফুটিয়া রহিয়াছে; কোথাও অসংখ্য জবাবৃক্ষে অসংখ্য জবা ফুটিয়া রহিয়াছে; কোথাও অসংখ্য অশোক বৃক্ষে অসংখ্য অশোক ফুটিয়া রহিয়াছে; কোথাও অসংখ্য টগর বৃক্ষে অসংখ্য টগর ফুটিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষও অসংখ্য ফুলও অসংখ্য। বৃক্ষও বিবিধ ফুলও বিবিধ। বৃক্ষও নানাজাতীয় ফুলও নানা বর্ণের। যেন একখানা সুবিস্তৃত সবুজ বস্ত্রে ভারতের খ্যাতনামা শিল্পী নানা বর্ণের রেশমী সূতায় নানাবিধ ফুল তুলিয়া নক্ষত্রখচিত নীলাকাশের সহিত তুলনা করিবার নিমিত্ত ছড়াইয়া রাখিয়াছে। অথবা যেন মিল্টন কর্তৃক চিত্রিত সূর্য্যালোকস্থিত নানা রত্নখচিত সুদূরপ্রসারিত মহাদেশ;—

“If metal, part seems gold,
part silver clear;
If stone, carbuncle most or
chrysolite,
Ruby or topaz, to the twelve
that shone
On Aaron's breast plate, and
a stone besides
Imagin'd rather oft than else-
where seen.”

ফুল, তোমার রূপের কথা আর কি বলিব। তোমার রূপেই পৃথিবী রূপবতী। তুমি রূপের উৎস, এবং সেই জন্যই মুগ্ধ Wilhelm অতুল রূপ দেখিতে দেখিতে ভাবিল;—“As Minerva sprang in complete armour from the head of Jove, so does this goddess seem to have stept forth with a light foot, in all her ornaments, from the bosom of some flower.”

আবার, ফুল, তোমার রূপ যেমন রসও তেমনি। তুমি অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তোমার রসের পরিমাণ নাই। তোমার রসে পৃথিবী ডুবিয়া রহিয়াছে। তোমাকে দেখিলে বোধ হয় না যে তোমার বেশী রস আছে। কিন্তু তোমার ভিতর প্রবেশ করিলে, রসের হ্রদে পড়িতে হয়। ঐ দেখ দেখি একটা মধুমক্ষিকা ঐ ক্ষুদ্র যূঁই ফুলটার রস কতবার খাইয়া যাইতেছে, আবার আসিয়া কতবার খাইতেছে, আবার যাইতেছে, আবার আসিয়া কতবার খাইতেছে। আবার এদিকে দেখ দেখি একটা ক্ষুদ্র গোলাব ফুলে কত

মৌমাছি বসিয়া রসপান করিতেছে। ঐ দেখ মৌমাছিগুলা রস পান করিয়া উড়িয়া গেল; কিন্তু আর একদল মৌমাছি আসিয়া রস পান করিতে বসিল। দেখ, দেখ, কত মৌমাছির দল রস পান করিতে আসিতেছে, রস পান করিয়া যাইতেছে। তবুও ত ঐ ক্ষুদ্র গোলাবের রসের ভাণ্ডার ফুরাইতেছে না। আর এ রস কি সামান্য রস? এই রসের নামই ত মধু। ফুলের মধু কত মিষ্ট তা কে না জানে? ফুলের মধু যে খায় সে কখন কি ভুলিতে পারে। আবার ফুলের রস যে শুধু মিষ্ট তা নয়। ফুলের রস মাদক। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ফুলের রসে সুরা প্রস্তুত হয়। সেই সুরা পান করিয়া মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, আপন পর জ্ঞানশূন্য হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, কর্দ্দমকে বিশুদ্ধ শয্যা মনে করে, পাপকে পুণ্য বলিয়া আলিঙ্গন করে, সংসারক্ষেত্রে উন্মত্ত পশুর ন্যায় ছুটিয়া বেড়ায়। ফুল, তুমি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তুমি বিষম প্রতারক। তোমাকে দেখিলে বোধ হয় তুমি নীরস। কিন্তু যে তোমার সহিত আলাপ করে সে তোমার রস পান করিয়া শেষ করিতে পারে না এবং তোমার রস পান করিয়া মুগ্ধ এবং নেশায় বিহ্বল হইয়া মধুকলসমগ্ন মধুকরের ন্যায় ইহকাল এবং পরকাল হারাইয়া থাকে। তাই বলি, ফুল, তুমি রসের ভাণ্ডার এবং তোমার রসের মতন রস জগতে আর কিছুতেই নাই।

তোমার গন্ধই বা কি চমৎকার! তোমাকে আঘ্রাণ করিলেই শরীরে কি একটা অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয় তাহা ঠিক করিতে পারা যায় না। বুঝিতে পারা যায় না যে বিশেষ কিছু অনুভব করিলাম, অথচ সর্ব্বশরীরে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন অনুভূত হয়। আর যখন সেই পরিবর্ত্তন অনুভূত হয়—যখন সেই চমৎকার সৌরভে শরীর উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তখন শরীর, মন, প্রাণ সমস্তই সেই পরিবর্ত্তিত ভাবে, সেই চমৎকার সৌরভে মজিয়া যায়, ডুবিয়া যায়, গলিয়া যায়। তখন এই জগতে শরীর, মন, প্রাণ আর কিছুই অনুভব করে না, আর কিছুই অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। ফুল, যখন তোমার কোমল সৌরভ আঘ্রাণ করা যায়, তখন সমস্ত শারীরিক শক্তি যেন অল্পে অল্পে হ্রাস প্রাপ্ত হয়—যে শারীরিক তেজ মহাবীরের অদ্ভুত বিক্রমের উৎসস্বরূপ, সেই তেজ অল্পে অল্পে নিবিতে থাকে—যে সচেতন ভাব জীবাত্মার প্রধান ধর্ম্ম এবং লক্ষণ সেই সচেতন ভাব অল্পে অল্পে বিলুপ্ত হইয়া আইসে। ফুল, তোমার কোমল, সৌরভের কি অসাধারণ শক্তি! বোধ হয় যদি মানুষ সর্ব্বক্ষণ তোমার সৌরভ আঘ্রাণ করে তাহা হইলে মানুষ চিরকালই এক রকম মরিয়া থাকে। ক্ষুদ্র ফুল, তোমার কোমল সৌরভে কৃতান্তের কঠিন শাসন দেখিতে পাই! আবার তোমার সৌর-

ত্তের বৈচিত্রই বা কত। চাঁপার উগ্র গন্ধ এবং শিরীষের কোমলতম অপেক্ষা কোমলতর গন্ধ—এই দুই গন্ধের মধ্যে কত রকমের গন্ধ আছে কে ঠিক করিবে? এবং সেই সকল গন্ধের মধ্যে প্রত্যে-কেই যে মনোমধ্যে এক একটী বিশেষ স্পৃহার উদ্রেক করে তাহাই বা কে না জানে? কে না জানে যে ফুলের যত রকম সৌরভ ফুল তত রকম লালসা উৎপন্ন করিয়া থাকে? ফুল, তোমার সৌরভের গুণে তুমি ঘোর মায়াবিনী—ঘোর কুহকিনী! ফুলের সৌরভ কি মিষ্ট কি মাদক! যখন বিস্তীর্ণ পুষ্প কাননে মন্দ মন্দ বাতাস বহে এবং পুষ্পের সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তখন দিগ্‌দিগন্ত যথার্থই মধুময় হইয়া যায়, যথার্থই নেশায় ভোর হইয়া উঠে। নিদারুণ গ্রীষ্মের জ্বালায় মানুষ যখন জ্বলিয়া যাইতে থাকে তখন ফুলের গন্ধ শরীরে যেন মধু ঢালিয়া দেয়—গ্রীষ্মের জ্বালা যেন সেই মধুর রসে বিলীন হইয়া যায়। ফুলের সৌরভ একটী ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় হইয়াও অনেক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করে। তাই বলি, ফুল, তোমার গন্ধ কি চমৎ-কার! তোমার গন্ধের গুণে তুমি ঐন্দ্র-জালিক।

ফুল, তোমার স্পর্শ কি সুখপ্রদ! জগতে কোমল পদার্থ অনেক আছে। শ্যামল দূর্ব্বাদল অতি কোমল। শুভ্র কার্পাস অতি কোমল। পক্ষীর পক্ষা-ন্তরালস্থিত রোমাবলী অতি কোমল। ভারত শিল্পের গৌরব 'সবনাম' অতি কোমল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন-টীরই স্পর্শ ফুলের স্পর্শের ন্যায় সুখপ্রদ নয়। কেন? শিরীষ অতিশয় কোমল মাধবী অতিশয় কোমল তা জানি। কিন্তু মাধবীর কোমলতা কি শিরীষের কোম-লতা ইহাদের কোমলতা অপেক্ষা যে বেশী তাহা বলিতে পারি না। তবে কেন ফুলের স্পর্শ ইহাদের স্পর্শাপেক্ষা এত বেশী সুখপ্রদ? কেন তাহা জানি না, কিন্তু বেশী সুখপ্রদ তাহা জানি। ইহাও জানি যে অনেক ফুল অপেক্ষা কার্পাস প্রভৃতি পদার্থ অনেক গুণে কোমল কিন্তু তাহাদের স্পর্শ সেই সকল ফুলের স্পর্শের ন্যায় সুখকর নয়। আর এইটী জানি বলিয়া বলিতে পারি যে, ফুলে এমন কোন গুণ আছে যাহা অন্য কোমল পদার্থে নাই। সে টুকু কি? যিনি ফুল স্পর্শ করিয়াছেন তিনি কোম-লতা ছাড়া আরো এক প্রকার ভাব অনুভব করিয়াছেন। কোমলতার ন্যায় সে ভাবটুকু শরীরে অনুভূত হয় না, সে ভাবটুকু কেবল প্রাণে অনুভূত হয়। তাই ফুলের স্পর্শে প্রাণে কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাবের অথবা রসের সঞ্চার হয় আর মনে হয় বুঝি ফুলের কোমলতার সহিত আরো কত কি মিশ্রিত আছে। মনে হয় বুঝি ফুলের একটা প্রাণ আছে, ফুলের একটা ভাব আছে, ফুলের একটা মোহিনী মন্ত্র আছে—ফুল আমাকে

সেই প্রাণে অনুপ্রাণিত করিল, সেই ভাবে ভাবময় করিল, সেই মন্ত্রে মন্ত্রবদ্ধ করিল। ফুল ছাড়া আর কোন পদার্থে সে প্রাণ নাই, সে ভাব নাই, সে মন্ত্র নাই। তাই ফুলের স্পর্শ সকল স্পর্শাপেক্ষা এত সুখকর, এত মোহকর, এত কোমল, এত কল্পনাবৎ। আর সেই জন্যই কল্পনাময় মহাকবি তাঁহার কল্পনাপ্রসূত কল্পিত সুন্দরীর নিমিত্ত ফুলের শয্যার রচনা করিয়াছেন *।

ফুল, তুমি রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, সকল রকমেই শ্রেষ্ঠ। রূপ দেখিতে হইলে মানুষ তোমারই রূপ দেখে; রস পান করিতে হইলে তোমারই রস পান করে; গন্ধে মজিতে হইলে তোমারই গন্ধে মজে; স্পর্শসুখে গলিতে হইলে তোমাকেই স্পর্শ করে। তাই বলি তুমি আদর্শ জড়। এবং তুমি আদর্শ জড় বলিয়াই জগতের জড়প্রকৃতির মূল মন্ত্র, মূল শক্তি, প্রাণের প্রাণ। হিমাচলের মহারণ্যে মহাদেব যোগমগ্ন। সহসা সেই মহারণ্যে বসন্তের ফুল ফুটিয়া উঠিল। অশোক ফুটিল, কর্ণিকার ফুটিল, পলাশ ফুটিল, আরো কত ফুল ফুটিল। যেমন ফুল ফুটিল অমনি—

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি
গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥
গীতান্তরেষু শ্রমবারিলেশৈঃ
কিঞ্চিৎসমুচ্ছ্বাসিত পত্রলেখম্।
পুষ্পাসবাঘূর্ণিতনেত্রশোভি
প্রিয়ামুখং কিম্পুরুষশ্চুচুম্বে॥

ফুল, তুমি আদর্শ জড় বলিয়া, জড় প্রকৃতি তোমাকে লইয়া উন্মত্ত। বৃক্ষ বল, লতা বল, পর্ব্বত বল, সরোবর বল, নদ বল, নদী বল, সকলেই তোমার রূপের পক্ষপাতী, সকলেই তোমার রূপের তৃষ্ণায় কাতর, সকলেই তোমার রূপের দোহাই দিয়া রূপের হাটে পরিচিত, সকলেই তোমার স্পর্দ্ধায় স্পর্দ্ধাবান্। যেখানে তুমি নাই সেখানে জড় জগৎ নাই বলিলেই হয়, কেন না সেখানে রূপের ছটা নাই, রসের স্রোত নাই, সৌরভরূপ সুরা নাই, স্পর্শসুখ নাই। যেখানে তুমি নাই সেখানে হাসি নাই, উল্লাস নাই, সঙ্গীত নাই, তৃষ্ণা নাই, পরিতৃপ্তি নাই,—কেন না সেখানে কেহই ফোটে না, কেহই নাচে না, পাখী গীত গায় না, মৌমাছি মধুপান করে না। তাই বলি, ফুল, তুমি জড়প্রকৃতির প্রাণ। একথাটা কিছু তোমার পক্ষে নিন্দার কথা নয়। এ জগতে যে কাহারও প্রাণস্বরূপ

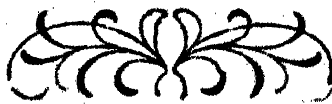
* সেক্সপীয়রের Midsummer Night's Dream দেখ।

হয়, জগৎ তাহাকে চায়, জগতে তাহার কায আছে। সে যে রকমেরই প্রাণ হউক, উচ্চ প্রকৃতির অথবা নীচ প্রকৃতির, জগতের প্রাণ তাহার প্রাণের সহিত জড়িত—তাকে ছাড়িলে জগৎ বাঁচে না। তাই বলি, ফুল, তুমি যদিও জড়প্রকৃতির প্রাণ, তথাপি তুমি নিন্দনীয় নও—তথাপি তুমি অনেক সুখের কারণ, অনেক ভোগের প্রধান উপাদান, অনেক সম্পদের মূল। পৃথিবীতে যতক্ষণ জড়ত্ব আছে, যতক্ষণ জড় প্রকৃতিতে ভোগলালসা আছে, ততক্ষণ পৃথিবী তোমাকে চায়। কিন্তু তোমার কতকগুলি গুরুতর দোষ আছে। তুমি বড় হাল্কা, কেন না তুমি বড় মোহপরবশ। তুমি আদর্শ জড়, কিন্তু তুমি তোমার পদমর্য্যাদা বুঝনা। তোমার আত্মা নাই, হৃদয় নাই, সুরুচি নাই, লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই। পৃথিবী তোমায় চায় বলিয়া তুমি পৃথিবীর সহিত এত মেশ কেন, পৃথিবীকে এত মাতাও কেন। ঐ দেখ দেখি, তুমি ওখানে ফুটিয়া রহিয়াছ আর কত ভ্রমর, কত মৌমাছি তোমায় মধুপান করিতেছে, মধুপান করিয়া উন্মত্ত হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় তোমাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আবার তোমার মধুপান করিতেছে, আবার আরও উন্মত্ত হইয়া গান করিতে করিতে তোমার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঐ দেখ একটি ক্ষুদ্র পক্ষী ঘৃণা করিয়া তোমাকে তাহার ক্ষুদ্র পদ দ্বারা আঘাত করিয়া উড়িয়া গেল। কিন্তু তুমি একটিবার মাত্র নড়িয়া আবার স্থির হইয়া বসিলে এবং তোমার নির্লজ্জ ভোমরা এবং মৌমাছিগুলি আবার ঝঙ্কার করিয়া তোমার মধুপানে প্রবৃত্ত হইল। মধু আছে বলিয়া তাহা কি এই রকম করি. য়াই যাহাকে তাহাকে বিলাইতে হয়? ফুল, তোমার মধু আছে বলিয়া তুমি নিজে নির্লজ্জ এবং উন্মত্ত এবং যে তোমার কাছে আসে তাহাকেই নির্লজ্জ এবং উন্মত্ত করিয়া ফেল। তুমি বড় হাল্‌কা, তুমি বড় অপদার্থ। তুমি নদীর স্রোত, তোমাতে সমুদ্রের মহত্ব, সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য নাই। তুমি মর না কেন?

ফুল, পৃথিবী তোমাকে চায়, তুমি পৃথিবীর একটি প্রয়োজনীয় পদার্থ, কিন্তু তুমি আপনার রসে এমনি ডুবিয়া থাক যে তোমার নিজের মর্য্যাদা কিছুই মনে থাকে না; তুমি যে জড় এবং ক্ষণস্থায়ী তাহাও মনে থাকে না। তাই তোমার এত দুর্দ্দশা, এত অপমান এত অধঃপতন। মনে কর দেখি কাল তুমি কি ছিলে। কাল তুমি মনোহর গুচ্ছাকারে মনোহর হর্ম্ম্যে মনোহর পুষ্পাধারে সযত্নে, সাদরে রক্ষিত। কাল তোমাকে যে দেখিয়াছে সেই তোমার গুণগান করিয়াছে, তোমাকে কত আদর করিয়াছে, কত স্নেহের, কত প্রীতির, কত গৌরবের বস্তু বলিয়া বুকে করিয়া রাখিয়াছে। অথবা, কাল তুমি

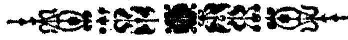
সিংহাসনাধিরূঢ়া মহারাণী। তোমাকে একটিবার মাত্র দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক মাথা ফাটাফাটি করিয়াছে। কাল তোমার স্তাবকের সংখ্যা ছিল না। তোমার একটি কটাক্ষের কামনায় কত-লোক রক্তপাত করিয়াছে। কাল তোমার মজ্‌লিস্‌ই বা কি আর দিল্লীর বাদশাহের মজ্‌লিস্‌ই বা কি। কিন্তু আজ তুমি কোথায়? আজ তোমার সেই রাজপ্রাসাদ কোথায়? তোমার সেই স্ফাটিক সিংহাসন কোথায়? তোমার সেই স্তাবকবৃন্দ কোথায়? তোমার সে আদর কোথায়, সে গৌরব কোথায়? আজ তুমি ধূলিধূসরিত অঙ্গে ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছ, কাল যাহারা তোমার গুণগান করিয়া শেষ করিতে পারে নাই, কাল যাহারা তোমার কটাক্ষ লাভার্থ রক্তপাত করিয়াছিল, আজ তাহারা তোমাকে চরণে দলিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আজ তুমি পৃথিবীর ধূলি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কেন, ফুল, তুমি তোমার আপনার রসে এত ভিজিয়া এত লোককে ভিজাইতে চাও? জান না কি যে, যে বেশী রস বিতরণ করে সে নিজে শেষে শুকাইয়া মরে? তাই বলি, ফুল, সাবধান হইও। রসে অত ডুবিয়া থাকিওনা; তাহা হইলে আপনাকে আপনি ভুলিয়া, অপমানিত ভিক্ষুকেরও অধম হইয়া শুকাইয়া মরিতে হইবে। তোমার রসই তোমার সর্ব্বনাশের গোড়া। তোমার রসের গুণেই তুমি এত মুগ্ধ, এত অন্ধ। তাই বলি, ফুল, তোমার রসকে তুমি আপনি ঘৃণা করিতে শিখিও।

আর, ভাই সকল, তোমাদিগকেও বলি, তোমরা ফুল লইয়া ক্রীড়া করিও না। ফুল আদর্শ জড়, ফুল জড়প্রকৃতির প্রাণ, ফুলের মধু বড় মোহকর, ফুলের মধুতে বিষ আছে। তপনতাপজনিত ফুলে যে অগ্নি আছে তাহাতে ফুল আপনি পুড়িয়া মরে এবং সকলকেই পোড়াইয়া মারে। যদি উন্নত হইতে চাও তাহা হইলে ফুলকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। কিন্তু মনে রাখিও যে ফুল জড়, ফুলে জড়ত্ব আছে, ফুল জড়ত্ব পোষণ করিতে ভাল বাসে। অতএব ফুলের কাছে সাবধানে থাকিও। এবং ফুল যাহাতে জগতের জড়ত্ব বৃদ্ধি করিতে না পারে প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিও।



ঢেঁকি।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত।



আমি ভাবি কি, যদি পৃথিবীতে ঢেঁকি না থাকিত, তবে খাইতাম কি? পাখীর মত দাঁড়ে বসিয়া ধান খাইতাম? না, লাঙ্গূলকর্ণচুলামানা গজেন্দ্রগামিনী গাভীর মত মরাইয়ে মুখ দিতাম? নিশ্চয় তাহা আমি পারিতাম না—নব-যুবা কৃষ্ণকায় বস্ত্রশূন্য কৃষাণ আসিয়া আমার পঞ্জরে যষ্টিপাত করিত, আর আমি ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শৃঙ্গ লাঙ্গুল লইয়া পলাইতাম। আর্য্য-সভ্যতার অনন্ত মহিমায় সে ভয় নাই—ঢেঁকি আছে—ধান, চাল হয়। আমি এই পরোপকার-নিরত ঢেঁকিকে আর্য্য সভ্যতার এক বিশেষ ফল মনে করি—আর্য্য সাহিত্য, আর্য্য দর্শন আমার মনে ইহার কাছে লাগে না—রামায়ণ কুমার-সম্ভব, পাণিনি পতঞ্জলি, কেহ ধানকে চাল করিতে পারে না। ঢেঁকিই আর্য্য-সভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধি-কারী,—নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। শুধু কি ঢেঁকিশালে? সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মসংস্কারে, রাজসভায়,—কোথায় না ঢেঁকি আর্য্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী, নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। দুঃখের মধ্যে ইহাতেও আর্য্য-সভ্যতা মুক্তিলাভ করিল না, আজিও ভূত হইয়া রহিয়াছে। ভরসা আছে কোন ঢেঁকি অচিরাৎ তাহার গয়া করিবে।

ঢেঁকির এই অপরিমেয় মাহাত্ম্যের কারণানুসন্ধানে আমি বড় সমুৎসুক হইলাম। এ উনবিংশ শতাব্দী, বৈজ্ঞা-নিক সময়—অবশ্য কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। কোথা হইতে ঢেঁকির এই কার্য্যদক্ষতা! এই পরোপকারে মতি! এই Public spirit? না বস্তুনা বস্তুসিদ্ধিঃ—বিনা কারণে কি ইহা জন্মে? অনুসন্ধানার্থ আমি ঢেঁকিশালে গেলাম।

দেখিলাম, ঢেঁকি খানায় পড়িতেছে। বিন্দুমাত্র মদ্যপান করে নাই, তথাপি পুনঃ পুনঃ খানায় পড়িতেছে, উঠিতেছে, বিরতি নাই। ভাবিলাম মুহুর্মুহুঃ খানায় পড়াই কি এত মাহাত্ম্যের কারণ? ঢেঁকি খানায় পড়ে বলিয়াই কি এত পরোপকারে মতি? এত টা Public spirit? ভাবিলাম—না, তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন না আমার রামচন্দ্র ভায়াও দুই বেলা খানায় পড়িয়া থাকেন—কিন্তু কই তাঁহার ত কিছুমাত্র Public spirit নাই—শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে ত তাঁহার পরোপকার কিছু

দেখি না। আরও—মনের কথা লুকাইলে কি হইবে? আমিও—আমি শ্রী কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী স্বয়ং, এক দিন থানায় পড়িয়াছিলাম। দ্রাক্ষারসের বিকার বিশেষের সেবনে আমার সেই গর্ত্তলোক প্রাপ্তি ঘটে নাই—কারণান্তরে। প্রসন্ন-গোয়ালিনী—গোপাঙ্গনা-কুল-কলঙ্কিনী,—একদিন তাহার মঙ্গলা গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছাড়িবামাত্র মঙ্গলা, ঊর্দ্ধপুচ্ছে, প্রণতশৃঙ্গে ধাবমানা! কি ভাবিয়া মঙ্গলা ছুটিল তা বলিতে পারি না,—স্ত্রীজাতি ও গোজাতির মনের কথা কি প্রকারে বলিব? কিন্তু আমি ভাবিলাম, আমিই তাহার উভয় শৃঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য। তখন আমি কোটিদেশ দৃঢ়তর বদ্ধ করিয়া, সদর্পে বদ্ধপরিকর হইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়মান! পশ্চাতে সেই ভীষণা ঘটোঘ্নী রাক্ষসী! আমিও যত দৌড়াই, সেও তত দৌড়ায়। কাজেই, দৌড়ের চোটে ও চট খাইয়া, গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে, চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে—বিবরলোক প্রাপ্তি! "আলু থালু কেশ পাশ, মুখে না বহিছে শ্বাস"—হায়! তখন কি আমার এই হৃদয় আকাশ মধ্যে Public spirit রূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল? না হইয়াছিল এমত নহে। তখন আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে বসুন্ধরা যদি গো-শূন্যা হয়েন, আর নারিকেল, তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে দুগ্ধ নিঃসরণ হয়, তবে এই দুগ্ধপোষ্য বাঙ্গালিজাতির বিশেষ উপকার হয়। তাহারা শৃঙ্গভীতিশূন্য হইয়া দুগ্ধ পান করিতে থাকে। সে দিন সেই বিবরপ্রাপ্তি হেতু আমার পরহিতকামনা এতদূর প্রবল হইয়াছিল, যে, আমি প্রসন্নকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম, "অয়ি দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর-নবনীত-পরিবেষ্টিতা গোপকন্যে! তুমি গোরুগুলি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউ ভুসি খাইতে থাক, তুমি স্বয়ং ঘটোঘ্নী হইয়া বহুতর দুগ্ধপোষ্য প্রতিপালন করিতে পারিবে,—কাহাকেও গুঁতাইও না।" প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন হঠাৎ সম্মার্জ্জনী হস্তে গ্রহণ করায়, সে দিন আমাকে পরহিতব্রত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অতএব পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য "সাধারণ আত্মা" অর্থাৎ Public spirit, বিশেষতঃ কার্য্যদক্ষতা, এ সকল থানায় পড়িলে হয় কি না? যদি না হয়, তবে ঢেঁকির এ কার্য্যদক্ষতা, এ মহাবল কোথা হইতে আসিল? আমি এই কুটতর্কের মীমাংসার জন্য সঙ্কিহানচিত্তে ভাবিতেছিলাম, এমত সময়ে মধুরকণ্ঠে কে বলিল, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! হাঁ করিয়া কি ভাবিতেছ? ঢেঁকি কখন দেখ নাই?"

চাহিয়া দেখিলাম, তরঙ্গিণী মাতঙ্গিনী দুই ভগিনী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে। সে দিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই। হাতী দেখিতে গিয়া অন্ধ কেবল শুণ্ড দেখিয়াছিল আমিও ঢেঁকি দেখিতে গিয়া কেবল ঢেঁকির শুঁড় দেখিতেছিলাম। পিছনে যে দুই জনের দুই

খানি রাঙ্গা পা ঢেঁকির পিঠে পড়িতেছে তাহা দেখিয়াও দেখি নাই! দেখিবা মাত্র যেন কে আমার চোখের ঠুলি খুলিয়া লইল।

আমার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল—কার্য্য কারণ সম্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর সূর্য্যকিরণে প্রভাসিত হইল। ঐত ঢেঁকির বল!—ঐত ঢেঁকির মাহাত্ম্যের মূল কারণ!—ঐ রমণী পাদপদ্ম! ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল করিতেছে। উঠিয়া পড়িয়া—ঢক ঢক কচকচ্! কত পরোপকারই করিতেছে! হায় ঢেঁকি! ও পায়ের কি এত গুণ! পিঠে পাইয়া তুমি এই সাত কোটি বাঙ্গালীকে অন্ন দিতেছ—তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছে! এস, মেয়েমানুষের শ্রীচরণ! তুমি ভাল করিয়া ঢেঁকির পিঠে পড়, আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া তোমায়—হায়! কি করিব?—কাঁসার মল পরাই!

আর ভাই, ঢেঁকির দল! তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি বুঝিয়াছি। যখনই পিঠে রমণীপাদপদ্ম ওরফে মেয়ে লাথি পড়ে তখনই তোমরা ধান ভান,—নহিলে কেবল কাঠ—দারুময়—গর্ত্তে শুঁড় লুকাইয়া, লেজ উঁচু করিয়া, ঢেঁকিশালে পড়িয়া থাক। বিদ্যার মধ্যে খানায় পড়া; আনন্দের মধ্যে 'ধান্য'; পুরস্কারের মধ্যে সেই রাঙ্গা পা। আবার শুনিতে পাই তোমাদের একটি বিশেষ গুণ আছে নাকি?—ঘরে থাকিয়া নাকি মধ্যে মধ্যে কুমীর হও? আর ভাই ঢেঁকি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শুনিয়াছি, সত্য সত্যই কি সেখানে গিয়াও ধান ভানিতে হয়? দেবতারা সকলে অমৃত খায়, পারিজাত লোফে, অপ্সরা লইয়া ক্রীড়া করে, মেঘে চড়ে, বিদ্যুৎ ধরে, রতি রতিপতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে—তুমি নাকি ততক্ষণ কেবল ঘেঁচর ঘেঁচর করিয়া ধান ভান? ধন্য সাধ্য ভাই তোমার!

ঢেকি কোন উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে। রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম—একেবারে কমলাশ্রমে। কমলাশ্রমটা কি? নিপ্রত্যাশী নাপিতানী একখানি ভাঙ্গা চালা ঘর রাখিয়া উত্তরাধিকারি-বিরহিতা হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে—ঘর খানির এমনি অবস্থা যে আর কেহ তাহার কামনা করিল না—সুতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম করিয়াছি—কেবল কমলাকান্তের আশ্রম নহে—সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম। আমি সেই খানে চারপাইর উপর পড়িয়া আফিঙ্গ চড়াইলাম। তখন চক্ষু বুজিয়া আসিল। জ্ঞাননেত্র উদয় হইল। দেখিলাম এ সংসার কেবল ঢেঁকিশাল। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী সব ঢেঁকিশালা—তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া হইয়া রহিয়াছে কোথাও জমীদাররূপ ঢেঁকী, প্রজাদিগে হৃৎপিণ্ড গড়ে পিশিয়া, নূতন নিরি

রূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিশিয়া, ভানিয়া বাহির করিতেছেন—আইন; বিচারক ঢেঁকি সেই আইন গুলি গড়ে পিশিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র, কারাবাস—ধনীর ধনান্ত—ভাল মানুষের দেহান্ত। বাবু ঢেঁকি, বোতল গড়ে পিতৃধন পিশিয়া বাহির করিতেছেন—পিলে যকৃৎ; তাঁর গৃহিনী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিশিয়া বাহির করিতেছেন,—অনাহার। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁকি; সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিশিয়া বাহির করিতেছেন—স্কুলবুক!

দেখিতে দেখিতে দেখিলাম—আমিও একটা মস্ত ঢেঁকি—কমলাশ্রমে লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছি; নেশার গড়ে মনোদুঃখ ধান্য পিশিয়া দপ্তর চাউল বাহির করিতেছি। মনে মনে অহঙ্কার জন্মিল—এমন চাউল ত কাহারও গড়ে হইতেছে না। তখন ইচ্ছা হইল—এ চাউল মনুষ্যলোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে গিয়া ধান ভানিব। তখনই স্বর্গে গেলাম—"অশ্বমনোরথে।" স্বর্গে গিয়া, দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "হে দেবেন্দ্র! আমি শ্রীকমলাকান্ত ঢেঁকি—স্বর্গে ধান ভানিব।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "আপত্তি কি—পুরস্কার চাই কি?"

আমি। উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা।

দেবরাজ। উর্ব্বশী মেনকা পাইবে না—আর যাহা চাহিলে তাহা ত মর্ত্যলোকেও তুমি পাইয়া থাক,—আটটার হিসাবে।

আমি দুর্ম্মুখ—বলিলাম "কি ঠাকুর, অষ্টরম্ভা! সে কি আজ কাল নরলোকের পাবার যো আছে? সে আজকাল দেবতাদেরই একচেটে।"

সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ আমাকে বক্‌শিশ হুকুম করিলেন,—এক সের অমৃত, আর এক ঘণ্টার জন্য উর্ব্বশীর সঙ্গীত। চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, পাশে ঘটিতে একসের দুগ্ধ,—আর প্রসন্ন, দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে—"নেশাখোর!" "বিটলে" "পেটার্থি!" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উর্ব্বশীকে বলিলাম, "বাইজি! এক ঘণ্টা হইয়াছে—এখন বন্ধ কর।"



সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

সামুয়েল হানিমানের জীবনী।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য ।৵০ আনা।

গ্রন্থকার চারি পাতা ভূমিকা লিখিয়াছেন, আবার এক জন প্রকাশক তাহার উপর আর চারি পাতা লিখিয়া গ্রন্থের মাহাত্ম্য বুঝাইয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থ লিখিবার হেতু বুঝিতে আর কাহারও বাকি থাকিবার কথা নহে। প্রকাশক এক স্থলে লিখিয়াছেন— "এই গ্রন্থ সঙ্কলনে গ্রন্থকর্ত্তাকে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমাদের ভরসা হইতেছে, জনসাধারণ এইরূপ মহোচ্চ গুণ-সম্পন্ন গ্রন্থের এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন।" এই অনুরোধ গ্রন্থকার নিজে করিতে বোধ হয় একটু কুণ্ঠিত হইয়া থাকিবেন, তাহাই প্রকাশকের সাহায্য আবশ্যক হইয়াছে; নতুবা প্রকাশকলিখিত ভূমিকা অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজন জন্য লিখিত হইয়াছে এমত স্পষ্ট বোধ হইল না।

প্রকাশক আরও একটী কথা আমাদের বলিয়া দিয়াছেন যে এই গ্রন্থ "যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকরূপে পরিগণিত হইতে পারে" গ্রন্থকার তাহার উপযোগী করিয়া লিখিয়াছেন। এ কথাটি বলিয়া না দিলে আমরা কোন মতে তাহা অনুভব করিতে পারিতাম না।

তাহার পর ভাষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বয়ং লিখিয়াছেন "যাহাতে বৈজ্ঞানিক মত সকল সাহিত্যে প্রাঞ্জল ভাষায় পরিব্যক্ত হয়, তাহার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি।" কিন্তু তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের এই ভাষায় কতকটা প্রকাশ আছে। তথাপি প্রকাশক আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন— "সর্ব্বসাধারণ যাঁহাতে ইহার পঠনাধিকারী হইতে পারেন, তদ্রূপ প্রাঞ্জল ভাষায় ইহা লিখিত হইয়াছে।" সুতরাং প্রকাশকের এই সার্টিফিকিটে সাহস করিয়া আমরা পাঠ আরম্ভ করিলাম দ্বিতীয় পাতে দেখিলাম গ্রন্থকার লিখিতেছেন— "ব্যাধিপ্রশমনের উপায় মন্ত্র, তাঁহাদের (বিদ্যাভিমানী দল) হস্ত-তল-ন্যস্ত থাকিয়া এত ভ্রমসংকুল অসঙ্গতিকে দার্শনিক মতের দোহাই দিয়া কি ধারাবাহিক কাল নির্ব্বিবাদে বিরাজিত রাখিতে পারে? না, অনন্ত শক্তির প্রভুত্ব আকর্ষণে অধিকারী হয়?" প্রকাশকের সার্টিফিকেট মিথ্যা নহে। আশ্চর্য্য প্রাঞ্জল ভাষা!

এই দ্বিতীয় পাতে আর এক স্থানে লিখিত আছে "তাহা জানিতে অবশিষ্ট নাই।" ইহা পড়িয়া আমাদের এক-জন সেকালের অধ্যাপককে মনে হইল। তিনিও অবিকল এই ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক জন ছাত্র এক স্থলে লিখিয়াছিল "জানিতে বাকি ছিল

না।” অধ্যাপক তাহা কাটিয়া করিলেন “তাহা জানিতে অবশিষ্ট ছিল না।” অধ্যাপক বলিতেন ছোট কথায় কখন বিদ্যা প্রকাশ হয় না। একদিন তিনি ছাত্রদিগকে আজ্ঞা করিলেন “ওহে! তোমারা একটি প্রবন্ধ লেখ। subject কে বৃহৎ মনুষ্য?” ছাত্রেরা হাসিয়া উঠিল। তিনি মুখ ভার করিয়া বলিলেন “ইতর ভাষায় না বলিলে তোমরা বুঝিতে পার না। ভাল! তাহাই বলিতেছি—লেখ ‘কে বড় লোক।’ এক জন ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল “কে বৃহৎ মনুষ্য তবে আর লিখিব না?” অধ্যাপক ক্রোধ করিয়া বলিলেন—যাহাকে তোমাদের ভাষায় বড় লোক বলে, সাধু ভাষায় তাহাকে বৃহৎ মনুষ্য বলে। বড় শব্দ ইতর কথা, তৎপরিবর্ত্তে বৃহৎ শব্দ ব্যবহার করা উচিত। ছাত্র বলিল “অপরাধ হইয়াছে।” অধ্যাপক তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন কখন সরল ভাষা ব্যবহার করিওনা; তাহা করিলে লোকে তোমায় মূর্খ মনে করিবে, বৃহৎ বৃহৎ বাক্য ব্যবহার করিলে লোকে আশ্চর্য্য হইবে, আর ভাবিবে “না জানি এ ব্যক্তি কতই সংস্কৃত কথা জানে। জান না? আমি গ্রন্থ লিখিয়া কতই মান্য হইয়াছি, কেহ সে গ্রন্থ বুঝিতে পারে নাই। সে গ্রন্থ পণ্ডিতী ভাষায় লেখা, অভিধান হাতে করে লেখা! মূর্খের কর্ম্ম তাহা বুঝা?”

আমরা বলি না যে এই জীবনী-লেখক অভিধান হাতে করিয়া লিখিয়াছেন, সে শ্রেণীর লেখক বাঙ্গালায় যদিও বিস্তর আছেন, কিন্তু এই গ্রন্থকার সে দলস্থ নন, তবে ইঁহার ভাষা ও ভাব উভয়ই স্থানে স্থানে কিছু জটিল।

এই গ্রন্থখানির প্রশংসা করিবার বড় সাধ ছিল। হোমিওপ্যাথি আবিষ্কর্ত্তা হানিম্যানকে আমরা শ্রদ্ধা করি, তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সকল বাঙ্গালিই অবগত হন ইহা আমাদের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু গ্রন্থকার যে ভাষায় জীবনী লিখিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে অধিক লোকে এগ্রন্থ পড়িবে না। প্রকাশক যে ভরসা করিয়াছেন তাহা বুঝি বৃথা হইবে। “বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য” হওয়া দূরের কথা।

এই পুস্তকের সঙ্কলন বিষয়ে গ্রন্থকার অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন ইহা স্বীকার করি। এরূপ পরিশ্রম বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে সুখ্যাতির কথা।

প্রায়শ্চিত্ত। অবকাশ হইতে পুনর্মুদ্রিত। শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৵৹

এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে গল্পটি যে প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে তাহা পড়িয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম। নির্ম্মলের অধঃপতন দুই এক স্থলে স্পষ্ট বুঝা যায় না সত্য, কিন্তু তাহা বুঝাইতে গেলে আয়তন বাড়াইতে হয়। সুতরাং ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে, তথাপি গল্পটির আমরা পক্ষপাতী। ইহা সর্ব্বপ্রকারে সাধারণের উপযোগী হইয়াছে, মূল্য আরও অল্প হইলে ভাল হইত। কিন্তু পল্লীগ্রাম অঞ্চলে যাহারা এইরূপ মূল্য দিয়া পড়িতে সক্ষম তাহাদের মধ্যে শতাংশের একাংশ লোকও এই গ্রন্থ চক্ষে দেখিতে পাইবেন না। কে তাহাদের দেখাইবে? পল্লীগ্রাম বাসীরা বটতলার হাততোলা; যে গ্রন্থ বটতলার দল দেখাইবে কেবল সেই গ্রন্থ গ্রাম্য লোকেরা দেখিতে পাইবে, অন্য গ্রন্থ তাহাদের পক্ষে নষ্ট চন্দ্র। যদি তাহারা সকলে এ গ্রন্থখানি দেখিতে পাইত তাহা হইলে ন্যূনকল্পে ইহার দশ হাজার কাপি প্রথমেই বিক্রয় হইত।

বঙ্গদর্শন।



৯২ সংখ্যা।



অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি natural selection, struggle for existence, utility এবং ndividuality বিষয়ক মতের প্রতিবাদ করিলাম। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলাম কি না এরূপ প্রশ্ন মনে করাও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু আমার কথার সার সংগ্রহ এই মাত্র যে ঐ সকল বিধান মতে শ্রম করা মনুষ্যের নিতান্ত কর্ত্তব্য বটে তবে জীবমাত্রেই স্বার্থপরতাবশতঃ পরস্পরের সহিত যে বিরোধ (struggle) করিয়া থাকে, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে তাহার নিবারণ চেষ্টা করাও আবশ্যক। এবং এই চেষ্টাতে কৃতকার্য্য হইলেই শ্রমের মাহাত্ম্য সুসিদ্ধ হয়, এবং তাহা হইয়া শ্রমসংসৃষ্ট কার্য্য মাত্রেই বৈরাগ্য আশ্রয় করে। Utility পরার্থপরতার সহিত মিশ্রিত হইলেই অথবা উহার স্বার্থপরতা ভাগ নিবৃত্ত হইলেই তদ্দ্বারা হিন্দু খ্রীষ্টানাদি বিষয়বাদী সম্প্রদায়ের উপদেশও প্রতিপালন করা সাধ্যায়ত্ত হয় এবং তাহা হইলেই আবার স্বানুবর্ত্তিতার এক সুচারু নিয়ামক স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং শ্রমের মধ্যে যে স্বার্থপরতা নিহিত আছে—যাহার জন্য হিন্দু খ্রীষ্টান উভয়েই এতকাল ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন—তাহা চিত্ত হইতে দূরীকৃত করা কর্ত্তব্য এবং দূরীকৃত করিতে পারিলে উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি সমস্তই সুসিদ্ধ হয়।

অতএব পরার্থপরতা এবং স্বার্থ-

পরতা মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা একবার বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। আমাদিগের মন একটী স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়, এবং কাম-ক্রোধাদি ষড় রিপু যে অন্তরেন্দ্রিয়তে আশ্রয় করে তাহাতেই আবার দয়া দাক্ষিণ্যও অধিষ্ঠান করে এরূপ কথা বলিলে বোধ হয় কোন হিন্দুর সহিত মতভেদের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু খ্রীষ্টানেরা বলেন সয়তান মানবপ্রকৃতি অধিকার করাতে আমাদিগের সমস্ত সদ্‌গুণ বিলুপ্ত হইয়াছে তবে মনুষ্যের যে যৎকিঞ্চিৎ সদাচার দেখা যায় সে কেবল ঈশ্বর প্রসাদাৎ (grace)। অতএব ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত আমাদিগের না মুক্তি হইতে পারে, না মুক্তির উপায় স্বরূপ কোন সৎপ্রবৃত্তি (merit) আমাদিগের আত্মাতে আশ্রয় করিতে পারে। বিশেষতঃ এমন লোক নাই যে সৎকর্ম্ম হইতে কখনই স্খলিতচিত্ত হয় না। পুণ্য কর্ম্ম সকল সময়েই আবশ্যক। এক সময়ের কৃত পাপ সময়ান্তরের পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা বিমুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যও জগদীশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। অতএব যীশুখ্রীষ্টের অনুসরণ পূর্ব্বক এই কথা মনে করা উচিত, যে যেমন তাঁহার নশ্বর দেহ পতন হইবার পরে তাঁহার অবিনশ্বর দেহ লাভ হইয়াছিল সেইরূপ খ্রীষ্টধর্ম্মে অবগাহন করিলে অনন্তের স্বার্থপরতাময় কলুষিত আত্মা হইতে বিমুক্ত হইয়া অপূর্ব্ব বৈরাগ্য লক্ষণ-বিশিষ্ট পুনর্জন্ম লাভ করা যায়। এই দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিতে পারিলে, যাহাতে খ্রীষ্টের ইচ্ছা পালন হয় তাহাই আমাদিগের শ্রেয়স্কর হইয়া উঠে। যাহাতে নিজের স্বার্থ চেষ্টা করি অথবা যখন নিজের চেষ্টার উপরে নির্ভর করিয়া মুক্তি লাভের আশা করি সে সমস্তই কেবল উল্লিখিত পূর্ব্বজন্মাশ্রিত সয়তানের কার্য্য। অতঃপর আত্মবিষয়ে একান্ত বিরাগী হইয়া যীশুর অনুসরণ করিতে পারিলে আমাদিগের মুক্তি-লাভের আর কোন সংশয় থাকিবে না।

এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইলে দয়া আর মনুষ্যের স্বধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং পরচ্ছন্দানুবৃত্তির চালনা করিব অথবা পরার্থপরতারূপ বৈরাগ্য আমাদিগের শ্রম মধ্যে আশ্রয় করিবে এতাদৃশ কথা একবারেই অপ্রাসঙ্গিক হইয়া উঠে। খ্রীষ্টানের সহিত বিরোধ করা আমার অভিপ্রেত নহে সুতরাং পরার্থপরতা কিসে স্বভাবসিদ্ধ হইল তাহা সপ্রমাণিত করিবার আবশ্যকতা নাই। হিন্দুগণ পরার্থপরতাকে মনুষ্য-প্রকৃতির বহির্ভূত বলেন না সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে vicarious punish ment বিষয়ক মত অবলম্বন করা অসাধ্য। তাঁহাদিগের নিমিত্ত স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার বৈষম্য দূর করিবার উপায় কি ইহা দেখানই আবশ্যক হইতেছে।

স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতার বৈষম্য

দুই প্রকারে থর্ব্ব হইয়া থাকে। এক চেষ্টার দ্বারা আর স্বভাবতঃ। আমি স্বার্থপর হইলে তোমার স্বচ্ছন্দের প্রতি উপেক্ষা করা কোন মতেই বিচিত্র নহে। কিন্তু তাহা হইলে তুমিও আবার স্বভাবতঃ স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে শাসিত রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই প্রণালীতে আমাদিগের পরস্পরের যে বিরোধ হইয়া থাকে, তাহাতে স্বার্থপরতা স্বভাবতই কতক দূর থর্ব্ব হইয়া আইসে। Struggle for existence এবং individualityর বিধানমতে এই বিরোধ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ভূপতিগণ যুদ্ধ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পরিশেষে স্ব স্ব রাজ্যের সীমা অবধারণ করেন। স্বামুবর্ত্তী ব্যক্তি সম্বন্ধে মিল ঠিক ঐরূপ একটী সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দস্যুগণ স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়াও মারামারি হইতে ক্ষান্ত থাকে। ইহার জন্য চেষ্টা আবশ্যক করে না। পরদ্রব্য অপহরণ করিব না,কেবল শ্রমলব্ধ দ্রব্যজাত হইতে জীবিকানির্ব্বাহ করিব; এইরূপ সংকল্প হইতে স্বভাবতঃ পরদ্বেষ অনেকদূর সাম্য লাভ করে বটে, কিন্তু ইহাতে পরার্থপরতা আশ্রয় না করিলে কথনই মনের অভিসন্ধি পবিত্র হয় না।

পরার্থপরতাও নৈসর্গিক ব্যাপার বটে। লোকে শ্রম বা অপহরণ দ্বারা যে প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাতে যদি কেবল নিজের স্বচ্ছন্দ লাভই অভীষ্ট হইত তবে মনুষ্য পশুবৎ পৃথক অবস্থায় বিচরণ করিত। তস্কর বল কি দস্যুই বল, ইহারাও স্বভাবতঃ স্নেহ এবং ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকে, এবং এইরূপে আপ্লুত হইয়া আহরিত দ্রব্যজাতের অধিকাংশ স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ইত্যাদির পোষণে নিয়োজিত করে। ইহাতে তাহাদিগের মনে যে ভাব আশ্রয় করে তাহা বাস্তবিক বৈরাগ্য। কিন্তু একথা পরে বিচার করিতে হইবে। এখানে ইহাকে পরচ্ছন্দানুবৃত্তি বা পরার্থপরতা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। অতএব স্বার্থপরতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ এই পরার্থপরতাও সেই রূপ। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এক প্রধান বিভেদ এই যে একটী বিরোধজনক আর একটী একতাজনক। প্রবৃত্তিসমূহের বৈষম্য দূর হইলে মনের একাগ্রতা জন্মে। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে একতা লাভের নাম হৃদ্যতা। জগতে বিরোধ হৃদ্যতা উভয়ই বিদ্যমান। বিরোধহেতু জীবন এবং পরস্পরের তেজ ক্ষয় হয় আর হৃদ্যতা হইতে পরস্পরের সহযোগিতা এবং সহযোগিগণের একত্রিত বল সংগৃহীত হয়।

মনুষ্য যতই কেন যথেচ্ছাচারী হউক না কালসহকারে অনেকের চরিত্র ক্রমশঃ এমন পাকিয়া উঠে যে অনুসন্ধান করিলে প্রায় সকল কার্য্যই যেন এক সূত্রে গাঁথা বলিয়া প্রকাশ হয়। ইহারই নাম character যাহার যে charac-

ter তাহা তাহার প্রতি কার্য্যেই ব্যক্ত হয়। এবং একজনের character চিনিলে তাহার ভাবী আচরণ কতকদূর গণনা করা যাইতে পারে।

নেপোলিয়ান বিসমার্ক আদির ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কোন মনুষ্যের একটী মাত্র আচরণ দেখিলেই এক রকম স্থির করিতে পারেন যে উহাকে সময়ান্তে অমুক কথা বলিলে ঐ ব্যক্তি নিশ্চয় অমুক প্রকার আচরণ করিবে। কেবল নেপোলিয়ান বিসমার্ক নহে। সকল সিয়ানা ব্যক্তি অল্পাধিক মাত্রায় এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। বিষয়ী ব্যক্তির যদি আদালতের মত পদে পদে প্রমাণ লইয়া এবং সাক্ষীর মুখভঙ্গির বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হইত তবে সংসার চালান কঠিন হইত। এই নিমিত্তই পরস্পরের character জানা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই প্রকার বুদ্ধিচাতুর্য্য সকলের সমান পরিমাণে নহে। সুতরাং সংসারে এই চতুরতা দ্বারা কেহ লাভ করে কেহ বা ইহার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আপনি লাভ অথবা ক্ষতি নিবারণ করিব বলিয়া সংসারে ভয়প্রদর্শন কৌশল প্রবঞ্চনা আদির আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে পরস্পরের সহকারিতা থাকে না। Struggle for existence প্রকারান্তরে উপস্থিত হইয়া নানা বিপত্তি ঘটায়। নীতি শিক্ষকেরা বলেন যে এটা ভাল নয়। মনুষ্য পরস্পরের সহকারিতা করিলেই ভাল হয়।

ফলতঃ এই প্রণালীকে বিচার করিতে করিতে পরিশেষে এই মূলতত্ত্বের বিচার করা আবশ্যক হয় যে মনুষ্যগণ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিবে কি না। সমাজের অপেক্ষা না করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা কাহারো সাধ্য কি না তাহা বিভিন্ন কথা। আমি বলি অসাধ্য। কিন্তু অসাধ্য না হইলেও এ কথার সন্দেহ নাই যে, সমাজে থাকিতে হইলে সমাজ ক্ষয় করিবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকা কর্ত্তব্য। তুমি কিরূপ ব্যক্তি তাহা আমি বুঝিতে না পারিলে তোমার নিকট কাপট্য ত্যাগ করি না। আমি কিরূপ ব্যক্তি তাহাও ঐরূপে তোমার জানা আবশ্যক। কিন্তু উভয়ের কাপট্য না গেলে কেহ কাহারো উপরে নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে পারে না। পরস্পরের প্রতি নির্ভর না করিতে পারিলে পরস্পরের সাহায্য পাওয়া যায় না। বিরোধ ও struggle for existence তো আছেই। পরস্পরের সহযোগিতা ব্যতীত তাহাই প্রবল হইয়া উঠে এবং পরিশেষে সমাজ ভাঙ্গিয়া যায়। অতএব যাহাতে বিরোধের হ্রাস হয় এবং ঐক্যের বর্দ্ধন হয় তাহাই সামাজিকতার নিগূঢ় উদ্দেশ্য এবং মর্ম্ম। সেই মর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই চিত্তের সুচারু ব্যবস্থা উৎপন্ন হয়।

ক্ষণে তুষ্টিঃ ক্ষণে রুষ্টিঃ
তুষ্টি রুষ্টী ক্ষণে ক্ষণে।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য
প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥

এইরূপ অব্যবস্থিত চিত্ত পরিত্যাগ এবং চিত্তব্যবস্থা লাভ করাই সমস্ত নীতি শিক্ষার উদ্দেশ্য। ইহাতে পরকালের মঙ্গলামঙ্গল যেরূপ হউক, ইহকালের পক্ষে অর্থাৎ নরসমাজের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য।

স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতা উভয়ই স্বভাবতঃ মানব প্রকৃতির অঙ্গ। কিন্তু উভয়ের মধ্যে গুরুতর বৈষম্য আছে। সেই বৈষম্য ভিন্ন ভিন্ন লোকের আচরণে ব্যক্ত হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সেই আংশিক নিবৃত্তি স্বভাবসিদ্ধ বটে কিন্তু তাহা সমাজরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে। জগতে খলের প্রাদুর্ভাব এবং সরলের দুর্গতি পদে পদে দৃষ্ট হয়। অতএব স্ব স্ব চেষ্টার দ্বারা স্ব স্ব মনোমধ্যে এই বৈষম্যের কোন প্রতিবিধান করা নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ চেষ্টা সহকারে উল্লিখিত বৃত্তিদ্বয়ের যে ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় তাহাকেই বলি চিত্তব্যবস্থা।

এই চিত্তব্যবস্থা সাধন করিতে হইলে স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতা মধ্যে কোনটীর সমধিক চালনা করা আবশ্যক? এই প্রশ্নের সদুত্তর এই যে দুর্দমনীয় স্বার্থপরতাকে যত দমন করিতে চেষ্টা করিবে ততই পরার্থপরতার পথ খুলিবে। স্বার্থপরতা কখনই একবারে বিনষ্ট হইবার নহে; বিনষ্ট হইলে জীবন রক্ষা হয় না। জীবন থাকিলে তদুপযোগী স্বার্থপরতা লোপের আশঙ্কা নাই। বরং পরার্থপরতার উদ্দেশে জীবন রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। অতএব স্বার্থপরতা দমন করিবার চেষ্টা হইতে অহিত-আশঙ্কা করা ভ্রান্তিমাত্র। পরার্থ-পরতার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে প্রত্যেকেই অন্যের দ্বারা উপকৃত হইতে পারে এবং পরচ্ছন্দ সাধনান্তে স্বচ্ছন্দ লাভেরও সময় পাওয়া যায়। অতএব ঐকান্তিক চিত্তে পরার্থপরতা পালন করিতে চেষ্টা করিলেই উহার সহিত স্বার্থপরতার বৈষম্য এবং ব্যক্তিপরম্পরার স্বার্থপরতা জনিত লোকালয়ের বিসম্বাদ অপনীত হইতে পারিবে।

উল্লিখিত মতে ঐকান্তিকচিত্তে পরার্থপরতা ব্রত স্বীকার করাই নীতি-শিক্ষার উদ্দেশ্য। ইহাতে পরস্পরের সহযোগিতা এবং প্রত্যেকের একাগ্রতা দুই সুসিদ্ধ হইতে পারে। স্বভাবতঃ মনুষ্যের বিরোধ হইতে স্বার্থপরতার কিঞ্চিৎ দমন হয় আর চেষ্টাপূর্ব্বক পরার্থ-পরতার চালনা এবং স্বার্থপরতার শাসন করিলে নির্ম্মল ধর্ম্ম বা নীতিশিক্ষা হয়।

পরার্থপরতা হইতে কদাচ বলপ্রয়োগে অভিরুচি হয় না। যদি অগত্যা প্রয়োজন হয় তাহা হইলেও উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। যাহার মঙ্গলের জন্য বল প্রয়োগ করা আবশ্যক মনে কর সে তাহা বুঝিতে পারিলে সহজেই শ্রদ্ধা সহকারে তোমার সহযোগিতা করিবে। আর দীর্ঘকাল পরেও যদি সে তাহা না করে তবে তোমার নিজের কার্য্যে কোন দোষ

আছে কি না তাহা দেখাই আবশ্যক হইবে। এমন হইতে পারে যে তুমি যাহাতে তাহার হিত হইবে মনে করিতেছ তাহাই ভ্রান্ত। তুমি নিজে ভ্রান্ত অথবা দুষ্টও হইতে পার। আমার হিত আমি বুঝিব। একেবারে না পারি, কালসহকারে পারিব। কিন্তু আমি যদি কিছুতেই না মানি যে তোমার অমুক কার্য্য আমার হিতজনক তবে আমার বুদ্ধিই যে ভ্রান্ত তাহার প্রমাণ কি? অতএব বল প্রয়োগ করিয়া অসভ্য জাতির শাসন করা বিধিসঙ্গত নহে। যদি কালসহকারে তাহারা বলবানের বশীভূত হয় তাহা হইলে আর বল প্রয়োগের আবশ্যকতা থাকে না। আর যদি চিরকালই বল প্রয়োগ করিতে হয় তবে সেই উৎপীড়িত অসভ্যগণের সুখবর্দ্ধন হইতেছে না এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ন্যায়সঙ্গত।

শ্রম কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক কেহ বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক করিয়া থাকে। যে কেবল আত্মসুখের লালসাতে শ্রম করে সে ভাবিতে পারে যে শ্রমজনিত দুঃখ টুকু না স্বীকার করিতে হইলে আরো ভাল হইত। কিন্তু সে পরের সুখাভিলাষী, পরদুঃখে কাতর। সে আর পরোপকার করিবার জন্য মন্ত্রবল লাভ করিবার প্রতীক্ষা করে না। শ্রম ভিন্ন তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবার নহে জানিয়া সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই পরিশ্রমে রত হয়। কিন্তু ইহাতেও তাহার পরার্থ-পরতার পূর্ণ উদ্রেক না হইতে পারে। পরিবার প্রতিপালন করা যন্ত্রণাবিশেষ এবং শ্রম সেই যন্ত্রণার অঙ্গ এই প্রকার ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে পরিবারগণের উপকার হয় না এমন নহে। ইহাতে হিতসাধন, utility পালন, সম্পূর্ণরূপেই সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু কার্য্যগুলির অভিসন্ধিতে কিঞ্চিৎ কলঙ্ক থাকিয়া যায়, এবং চিত্ত ব্যবস্থার বিষয়েও ব্যতিক্রম থাকে। সেই ব্যক্তির মনের কিম্বা সংসারের অবস্থার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হইলেই তাহার সংকল্প পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এতাদৃশ লোকের প্রতিও সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। সমাজের বাঁধন রক্ষা করিতে হইলে শ্রম-উদ্দিষ্ট একাগ্রতা বিধেয় নহে।

পরন্তু যদি শ্রমী মনে করে যে পরিবার প্রতিপালন করাই আমার ধর্ম্ম্য কার্য্য; তাহাদিগের সুখের নিমিত্তই শ্রম করিব, মরি আর বাঁচি যতক্ষণ পারি ততক্ষণ করিব, সাধ্য মতে ত্রুটী করিব না। তাহা হইলে শ্রমীর কার্য্যে আর স্বার্থপরতা থাকে না। সকল শ্রমী পরস্পরের সহযোগী হইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। এবং অক্ষম ব্যক্তিরাও শ্রমীর আশ্রয় লাভ করিতে পারে। শ্রমীর এইরূপ মনের ভাব বৈরাগ্যলক্ষণাক্রান্ত, বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইরূপ পরার্থ-পরতার সীমা শ্রমীর স্বজন। কিন্তু শ্রমের ফল যে কেবল শ্রমীর

স্বজনমধ্যেই নিহিত থাকে তাহা নহে। শ্রমলব্ধ বেতনই তাঁহার স্বজনগণের অবলম্বন। কিন্তু যাহার বিনিময়ে সেই বেতন উপার্জ্জিত হয় সেই শ্রমজাত বস্তুতে সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপকার দর্শে। অতএব পরার্থপর শ্রমের উপকার জগৎ বিস্তীর্ণ।

যাঁহারা free trade ভক্ত এবং ঐ নিমিত্ত চীনের স্বাতন্ত্র্য ব্যবস্থা সহ্য করিতে পারেন না, আপনাদের শ্রমজাত পণ্য সর্ব্বদেশে বলপূর্ব্বক প্রবিষ্ট করাইতে অভিলাষ করেন তাঁহারা হয় ত বুঝিবেন না যে ম্যাঞ্চেষ্টরবাসিগণ ভারতের উপকারার্থে কৃতসংকল্প হইলেই ভাল হয়। কিন্তু এস্থলে free trade যদি পরার্থ-পরতার অনুরোধে অবলম্বিত হইত তবে তুলার মাসুল উঠান লইয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের সহিত আমাদিগের এত মনান্তর ঘটিত না। বাস্তবিক আমরা আমেরিকার কার্পাস-উৎপাদক এবং ম্যাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়গণের দ্বারা নিতান্ত উপকৃত হইতেছি। ইহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্বিষয়ক চৈতন্য না আমাদিগের আছে না ম্যাঞ্চেষ্টরবাসিগণের আছে।

এই চৈতন্য লাভ হইলেই শ্রমের প্রকৃত মাহাত্ম্য অনুভূত হইবে। এবং ইহা দ্বারা মনোমধ্যে যে বৈরাগ্য আশ্রয় করিবে তাহাতে বিশ্রাম থাকিবে না। এই মহানুভব শ্রম হইতেই প্রকৃত civilization, ন্যায়ানুগত natural selection যথার্থ utility এবং বৈধ স্বানুবর্ত্তিতা সম্ভবে। আর এইরূপ অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য হইতেই বোধ হয়, হিন্দুগণের উন্নতি এবং হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধার সাধন হইতে পারে।

হিন্দুগণ যে ক্রমশঃ এই পথেই চলিয়াছে তাহা ইহার পরে প্রদর্শন করিব।

শ্রী ঘো—

আনন্দমঠ।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বীরভূমি ইংরেজ মুসলমানের হাত ছাড়া হইয়াছে। ইংরেজ মুসলমান কেহই এ কথা মানেন না—মনকে চোখ ঠারেন—বলেন কতকগুলা লুঠেরাতে বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে—শাসন করিতেছি। এইরূপ কতকাল যাইত বলা যায় না কিন্তু এই সময়ে ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতার গবর্ণর জেনেরল। ওয়ারেন হেষ্টিংস মনকে চোখ ঠারিবার লোক

নহেন—তাঁর সে বিদ্যা থাকিলে আজ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোথায় থাকিত? অগৌণে বীরভূমি শাসনার্থ উড নামা দ্বিতীয় সেনাপতি নূতন সেনা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

উড দেখিলেন এ ইউরোপীয় যুদ্ধ নহে। শত্রুদিগের সেনা নাই, নগর নাই, রাজধানী নাই, দুর্গ নাই, অথচ সকলই তাহাদের অধীন। যে দিন যেখানে ব্রিটিশ সেনার শিবির, সেই দিনের জন্য সেস্থান ব্রিটিশ সেনার অধীন—তার পর দিন ব্রিটিশ সেনা চলিয়া গেল ত অমনি চারিদিকে "বন্দে মাতরং" গীত হইতে লাগিল। উড সাহেব খুঁজিয়া পান না কোথা হইতে ইহারা পীপিলিকার মত এক এক রাত্রে নির্গত হইয়া যে গ্রাম ইংরেজের বশীভূত হয় তাহা দাহ করিয়া যায় অথবা অল্পসংখ্যক ব্রিটিষ সেনা পাইলে তৎক্ষণাৎ সংহার করে। অনুসন্ধান করিতে করিতে উড সাহেব জানিলেন যে, পদচিহ্নে ইহারা দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া সেইখানে আপনাদিগের অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করিতেছে। অতএব সেই দুর্গ অধিকার করা বিধেয় বলিয়া স্থির করিলেন।

চরের দ্বারা তিনি সম্বাদ লইতে লাগিলেন যে, পদচিহ্নে কত সন্তান থাকে। যে সম্বাদ পাইলেন তাহাতে তিনি সহসা দুর্গ আক্রমণ করা বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে এক অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।

মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার শিবিরের অদূরবর্ত্তী কেন্দুবিল্লগ্রামে জয়দেব গোস্বামীর মেলা হইবে। এবার মেলায় বড় ঘটা। সহজে মেলায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এবার বৈষ্ণবের রাজ্য হইয়াছে, বৈষ্ণবেরা মেলায় আসিয়া বড় জাঁক করিবে সংকল্প করিয়াছে। অতএব যাবতীয় সন্তানগণের, পূর্ণিমার দিন কেন্দুবিল্লতে একত্র সমাগম হইবে, এমন সম্ভাবনা। মেজর উড বিবেচনা করিলেন যে পদচিহ্নের রক্ষকেরাও সকলেই মেলায় আসিবার সম্ভাবনা। সেই সময়েই সহসা পদচিহ্নে গিয়া দুর্গ অধিকৃত করিবেন।

এই অভিপ্রায় করিয়া, মেজর উড রটনা করিলেন, যে তিনি মেলার দিবস কেন্দুবিল্ল আক্রমণ করিবেন। এক ঠাঁই সকল বৈষ্ণব পাইয়া, একদিনে শত্রু নিঃশেষ করিবেন। বৈষ্ণবের মেলা হইতে দিবেন না।

এ সম্বাদ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। তখন যেখানে যে সন্তানসম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মেলা রক্ষার জন্য কেন্দুবিল্ল অভিমুখে ধাবিত হইল। সকল সন্তানই কেন্দুবিল্লে আসিয়া মাঘী পূর্ণিমায় মিলিত হইল। মেজর উড যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই ঠিক হইল। ইংরেজের সৌভাগ্যক্রমে মহেন্দ্রও ফাঁদে পা দিলেন

মহেন্দ্র পদচিহ্নের দুর্গে অল্পমাত্র সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য লইয়া কেন্দু-বিল্ব যাত্রা করিলেন।

এ সকল কথা হইবার আগেই জীবানন্দ ও শান্তি পদচিহ্ন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। তখন যুদ্ধের কোন কথা হয় নাই, যুদ্ধে তাহাদের তখন মন ছিল না। মাঘী পূর্ণিমায়, পুণ্যদিনে, শুভক্ষণে, জয়দেব গোস্বামীর তীর্থে, অজয়ের পবিত্র জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ইহাই তাহাদের অভিসন্ধি। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাহারা শুনিল যে কেন্দুবিল্বে সমবেত সন্তানদিগের সঙ্গে ইংরেজদিগের মহাযুদ্ধ হইবে। তখন জীবানন্দ বলিল, "তবে যুদ্ধেই মরিব, শীঘ্র চল।"

তাহারা শীঘ্র শীঘ্র চলিল। পথ এক স্থানে একটা টিলার উপর দিয়া গিয়াছে। টিলায় উঠিয়া, বীরদম্পতী দেখিতে পাইল—যে নিম্নে কিছু দূরে ইংরেজ-শিবির। শান্তি বলিল, "মরার কথা এখন থাক্—বল বন্দে মাতরং।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তখন দুই জনে কানে কানে কি পরামর্শ করিল। পরামর্শ করিয়া জীবানন্দ এক বনে লুকাইল। শান্তি আর এক বনে প্রবেশ করিয়া এক অদ্ভুত রহস্যে প্রবৃত্ত হইল।

শান্তি মরিতে যাইতেছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে স্ত্রীবেশ ধরিবে ইহা স্থির করিয়াছিল। তাহার এই পুরুষ বেশ জুয়াচুরি, মহেন্দ্র বলিয়াছে। জুয়াচুরি করিতে করিতে মরা হইবে না। সুতরাং ঝাঁপি টেপারিটি সঙ্গে আনিয়াছিল। তাহাতে তাহার সজ্জা সকল থাকিত। এখন নবীনানন্দ ঝাঁপি টেপারি খুলিয়া বেশপরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল।

চিকন রকম রসকলির উপর খয়েরের টিপ কাটিয়া, তৎকালপ্রচলিত ফুর ফুরে কোঁকড়া কোঁকড়া কতক গুলো ঝাঁপটার গোছায় চাঁদমুখ খানি ঢাকিয়া, শান্তি একটি সারঙ্গ হস্তে বৈষ্ণবীবেশে, ইংরেজ-শিবিরে দর্শন দিল। দেখিয়া ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুযুক্ত সিপাহীরা বড় মাতিয়া গেল। কেহ টপ্পা, কেহ গজল, কেহ শ্যামা-বিষয়, কেহ কৃষ্ণবিষয়, ফরমাস করিয়া শুনিল। কেহ চাল দিল, কেহ দাল দিল, কেহ মিষ্ট দিল, কেহ পয়সা দিল, কেহ সিকি দিল। বৈষ্ণবী তখন চলিয়া যায়, সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল "আবার কবে আসিবে।" বৈষ্ণবী বলিল "তা জানি না, অমার বাড়ী ঢের দূর।" সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল "কত দূর?" বৈষ্ণবী বলিল "আমার বাড়ী পদচিহ্নে।" এখন সেই দিন মেজর উড্ পদচিহ্নের কিছু খবর লইতেছিলেন। একজন সিপাহী তাহা জানিত। বৈষ্ণ-বীকে ডাকিয়া কাপ্তেন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। কাপ্তেন সাহেব তাহাকে

মেজর উডের কাছে লইয়া গেল। মেজর উডের কাছে গিয়া বৈষ্ণবী মধুর হাসি হাসিয়া, মর্ম্মভেদী কটাক্ষে উড সাহেবের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া, খঞ্জনীতে আঘাত করিয়া, গান ধরিল।

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে, কলয়সি করবালং।

উড সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথা বিবি।"

বিবি বলিল, "আমি বিবি নই, বৈষ্ণবী। বাড়ী পদচিহ্নে।"

উড। Well that it is Padsin! Padsin * is it? "হুঁয়া একটো গর হ্যায়?"

বৈষ্ণবী বলিল "ঘর?—কত ঘর আছে।"

উড। গর নেই,—গর নেই,—গর,—গর।—

শান্তি। সায়েব তোমার মনের কথা বুঝেছি। গড়?

উড। ইয়েস্ ইয়েস্, গর! গর! হ্যায়?

শান্তি। গড় আছে। ভারি কেল্লা।

উড্। কেট্টে আড্‌মি।

শান্তি। গড়ে কত লোক থাকে? বিশ পঁচাশ হাজার।

উড। নন্সেন্স। একটো কেল্লেমে ডো চার হাজার রহে শক্তা। হুঁয়া পর আবি হ্যায়? ইয়া নিকেল গিয়া?

শান্তি। আবার নেক্‌লাবে কোথা?

উড। মেলামে—কিয়া বোল্‌টা হ্যায়। কিণ্ডেল—

শান্তি। কেঁদুলী—কেঁদুলীর মেলায় তারা যাবে না।

উড। টোম কব আয়া হ্যায় হুঁয়াসে।

শান্তি। কাল এসেছি সায়েব।

উড। ও লোক আজ নিকেল গিয়া হোগা।

শান্তি মনে মনে ভাবিতেছিল যে "তোমার বাপের শ্রাদ্ধের চাল যদি আমি না চড়াই, তবে আমার রসকলি কাটাই বৃথা। কতক্ষণে শিয়ালে তোমার মুণ্ড খাবে আমি দেখ্‌বো!" প্রকাশ্যে বলিল। "তা সাহেব হতে পারে, আজ বেরিয়ে গেলে যেতে পারে। অত খবর আমি জানি না, বৈষ্ণবী মানুষ, গান গেয়ে ভিক্ষা শিক্ষা করে খাই, অত খবর রাখিনে। বকে বকে গলা শুকিয়ে উঠ্‌লো, পয়সাটা সিকেটা দাও উঠে চলে যাই। আর ভাল করে বক্‌শিশ দাও তো না হয় পরশু এসে বলে যাব।"

উড সাহেব ঝণাৎকরিয়া একটা নগদ টাকা ফেলিয়া দিয়া, বলিল—"পরশু নেহি বিবি।"

শান্তি বলিল, "দূর বেটা! বৈষ্ণবী বল্; বিবি কি?"

উড। পরশু নেহি, আজ রাৎকো হামকো খবর মিল্‌না চাহিয়ে।

* পদচিহ্ন।

শান্তি। বন্দুক মাথায় দিয়ে সরাপ টেনে সর্‌সের তেল নাকে দিয়ে ঘুমোও। দশ কোশ রাস্তা যাব আস্‌বো আজ আমি ওঁকে খবর এনে দেব! ছুঁচো বেটা কোথাকার।

উড। ছুঁচো বেটা কেস্কা কয়তা হ্যায়।

শান্তি। যে বড় বীর—ভারি জাঁদরেল।

উড। Great general হামহো· শক্তা হ্যায় ক্লাইবকা মাফিক। লেকেন্ আজ হাম্‌কো খবর মিল্‌নে চাহিয়ে। শও রুপেয়া বখসিস দেঙ্গে।

শান্তি। শ-ই দাও আর হাজারই দাও বিশ ক্রোশ এ দুখানা ঠেঙ্গে হবে না।

উড। ঘোড়ে পর।

শান্তি। ঘোড়ায় চড়তে জান্‌লে আর তোমার তাঁবুতে এসে সারেঙ্গ বাজিয়ে ভিক্ষে করি।

উড। গদি পর লেযায়েগা।

শান্তি। কোলে বসিয়ে নিয়ে যাবে? আমার লজ্জা নাই?

উড। ক্যা মুস্কিল, পান্‌সো রুপেয়া দেঙ্গে।

শান্তি। কে যাবে, তুমি নিজে?

উড্ তখন অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান লিণ্ডলে নামক, এক জন যুবা এন্‌সাইনকে দেখাইয়া, তাহাকে বলি· লেন "লিণ্ডলে তুমি যাবে?" লিণ্ডলে শান্তির রূপ যৌবন দেখিয়া বলিল "আহ্লাদ পূর্ব্বক।"

তখন ভারি একটা আরবী ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আসিলে লিণ্ডলেও তৈয়ার হইল। শান্তিকে ধরিয়া ঘোড়ায় তুলিতে গেল। শান্তি বলিল "ছি, এত লোকের মাজখানে? আমার কি আর কিছু লজ্জা নাই। আগে চল ছাউনী ছাড়াই।"

লিণ্ডলে ঘোড়ায় চলিল। ঘোড়া ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া ২ লইয়া চলিল। শান্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া চলিল। এইরূপে তাহারা শিবিরের বাহিরে আসিল।

শিবিরের বাহিরে আসিলে নির্জ্জন প্রান্তর পাইয়া, শান্তি লিণ্ডলের পায়ের উপর পা দিয়া এক লাফে ঘোড়ায় চড়িল। লিণ্ডলে হাসিয়া বলিল, "তুমি যে পাকা ঘোড়সওয়ার।"

শান্তি বলিল, "আমরা এমন পাকা ঘোড় সওয়ার, যে তোমার সঙ্গে চড়িতে লজ্জা করে। ছি! জিন পায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়া?"

একবার বড়াই করিবার জন্য লিণ্ডলে জিন হইতে পা লইল। শান্তি অমনি নির্ব্বোধ ইংরেজের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল। শান্তি তখন অশ্বপৃষ্ঠে রীতিমত আসন গ্রহণ করিয়া ঘোড়ার পেটে মলের ঘা মারিয়া, বায়ুবেগে আরবীকে ছুটাইয়া দিল। শান্তি চারিবৎসর সন্তান সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া অশ্বারোহণবিদ্যাও শিখিয়াছিল। তা না শিখিলে জীবানন্দের সঙ্গে কি বাস করিতে পারিত? লিণ্ডলে মাথা ভাঙ্গিয়া

পড়িয়া রহিলেন। শান্তি বায়ুবেগে অশ্ব-পৃষ্ঠে চলিল।

যে বনে জীবানন্দ লুকাইয়া ছিল, শান্তি সেই খানে গিয়া, জীবানন্দকে সকল সম্বাদ অবগত করাইল। জীবানন্দ বলিল, "তবে আমি শীঘ্র গিয়া, মহেন্দ্রকে সতর্ক করি। তুমি কেন্দুবিল্ব গিয়া সত্যানন্দকে খবর দাও। তুমি ঘোড়ায় যাও—প্রভু যেন শীঘ্র সম্বাদ পান।" তখন দুই জনে দুই দিকে ধাবিত হইল। বলা বৃথা শান্তি আবার নবীনানন্দ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

উড্ পাকা ইংরেজ। ঘাটিতে ঘাটিতে তাহার লোক ছিল। শীঘ্র তাহার নিকট খবর পৌঁছিল, যে সেই বৈষ্ণবীটা লিণ্ডলে সাহেবকে যমালয় নামক খারাপ যায়গায় পাঠাইয়া দিয়া আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াই মেজার উড্ বলিলেন-"An imp of Satan! A spy! Strike the tent"

তখন ঠক্ ঠক্ খটা খট্ তাম্বুর খোটায় মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল। মেঘরচিত অমরবতীর ন্যায় বস্ত্রনগরী অন্তর্হিতা হইল। মাল গাড়িতে বোঝাই হইল। মানুষ ঘোড়ায় অথবা আপনার পায়ে। হিন্দু মুসলমান মাদরাজী গোরা বন্দুক ঘাড়ে, মস্ মস্ করিয়া চলিল। কামানের গাড়ি ঘড়োর ঘড়োর করিতে করিতে চলিল।

এদিকে মহেন্দ্র সন্তানসেনা লইয়া ক্রমে কেন্দুবিল্বের পথে অগ্রসর। মহেন্দ্র ভাবিল বেলা পড়িয়া আসিল। শিবির সংস্থাপন করা যাক।

তখন শিবির সংস্থাপন উচিত বোধ হইল। বৈষ্ণবের তাঁবু নাই। গাছ তলায় গুণ চট বা কাঁথা পাতিয়া, শয়ন করে। একটু হরিচরণামৃত খাইয়া রাত্রি যাপন করে। ক্ষুধা যে টুকু বাকি থাকে, স্বপ্নে বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর অধরামৃত পান করিয়া পরিপূরণ করে। শিবির-উপযোগী নিকটে একটী স্থান ছিল। একটা বড় বাগান—আম কাঁঠাল বাবলা তেতুল। মহেন্দ্র আজ্ঞা দিলেন "এই খানেই শিবির কর।" তারি পাশে একটা পাহাড় ছিল, উঠিতে বড় বন্ধুর, মহেন্দ্র একবার ভাবিল এ পাহাড়ের উপর শিবির করিলেও হয়। স্থান টা দেখিয়া আসিবেন মনে করিলেন।

এই ভাবিয়া অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে পর্ব্বতশিখরে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিছু দূর উঠিলে পর এক যুবা যোদ্ধা বৈষ্ণবসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, "চল, পর্ব্বতে চড়।" নিকটে যাহারা ছিল তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল "কেন?"

যোদ্ধা এক শিলাখণ্ডের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "চল এই জ্যোৎস্না রাত্রে ঐখানে পর্ব্বতশিখরে, নূতন বসন্তের নূতন ফুলের নূতন গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে আজ আমাদের ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ

করিতে হইবে।” সন্তানেরা দেখিল সেনাপতি জীবানন্দ।

তখন হরে মুরারে উচ্চ শব্দ করিয়া যাবতীয় সন্তানসেনা বল্লমে ভর করিয়া উচু হইয়া উঠিল। এবং সেই সেনা জীবানন্দের অনুকরণ পূর্ব্বক, বেগে পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। এক জন সজ্জিত অশ্ব আনিয়া জীবানন্দকে দিল। দূর হইতে মহেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল একি এ? না বলিতে ইহারা আসে কেন?

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া পিঠে চাবুকের ঘায়ের ধোঁয়া উঠাইয়া দিয়া পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন। সন্তানবাহিনীর অগ্রবর্ত্তী জীবানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন।

“এ আবার কি আনন্দ।” জীবানন্দ হাসিয়া বলিল।

“আজ বড় আনন্দ। পাহাড়ের ওপিঠে ইংরেজ। যে আগে উপরে উঠ্‌বে তারি জিত।”

তখন জীবানন্দ সন্তানসৈন্যের প্রতি ডাকিয়া বলিলেন;

“চেন তোমরা! আমি জীবানন্দ গোস্বামী। অজয়তীরে সহস্র সহস্র ইংরেজের প্রাণবধ করিয়াছি।”

তুমুল নিনাদে পর্ব্বত কন্দর কানন প্রান্তর সব ধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল “চিনি আমরা! তুমি জীবানন্দ গোস্বামী।”

জীব। বল হরে মুরারে!

পর্ব্বত কন্দর কানন প্রান্তর সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, হরে মুরারে!

জীব। পাহাড়ের ও পিঠে ইংরেজ। আজ এই পর্ব্বতশিখরে, এই নিলাম্বরী যামিনী সাক্ষাৎকার, ইংরেজে বৈষ্ণবে রণ হইবে। দ্রুত আইস, যে আগে শিখরে উঠিবে, সেই জিতিবে। বল, বন্দে মাতরং।

তখন পর্ব্বত কন্দর কানন প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া গীত ধ্বনি উঠিল বন্দে মাতরং। ধীরে ধীরে বৈষ্ণবীসেনা পর্ব্বতশিখর আরোহণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা সহসা সভয়ে দেখিল, মহেন্দ্র সিংহ অতি দ্রুতবেগে পর্ব্বত অবতরণ করিতে করিতে তূর্য্যনিনাদ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে পর্ব্বতশিখরদেশে নীলাকাশ পটে প্রতিবিম্বিত হইল, কামানশ্রেণীসহিত, ইংরেজের গোলন্দাজ সেনা শোভিত হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণবী সেনা গায়িল,

তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি,
তুমি মা বাহুতে শক্তি
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

কিন্তু ইংরেজের কামানের গুড়ুম গুড়ুম গুম শব্দে, সে মহাগীতিশব্দ ভাসিয়া গেল। শত শত সন্তান হত নিহত হইয়া, অশ্ব অস্ত্রসহিত, পর্ব্বতসানুদেশে শয়ান হইল। আবার গুড়ুম গুম, দধিচির অস্থিকে ব্যঙ্গ করিয়া সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া,

ইংরেজের বজ্র গড়াইতে লাগিল। চাসার কর্ত্তনীসম্মুখে সুপক্ক ধান্যের ন্যায় সন্তানসেনা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বৃথায় জীবানন্দ, বৃথায় মহেন্দ্র যত্ন করিতে লাগিল। পতনশীল শিলারাশির ন্যায় বৈষ্ণবসেনা পর্ব্বত-সানু হইতে ফিরিতে লাগিল। কে কোথায় পলায় ঠিকানা নাই। তখন একেবারে সকলের বিনাশসাধনের জন্য হুর্‌রেএ হুর্‌রেএ শব্দ করিতে করিতে গোরার পল্টন পাহাড় হইতে নামিল। সঙ্গীন উঁচু করিয়া অতি দ্রুতবেগে, পর্ব্বত-বিমুক্ত বিশাল তটিনীপ্রপাতবৎ দুর্দ্দমনীয় অলঙ্ঘ্য অজেয়, ব্রিটিশসেনা পলায়ন-পর সন্তানসেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। জীবানন্দ একবার মাত্র মহেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিলেন, "আজ শেষ। এস এই খানে মরি।"

মহেন্দ্র বলিল, "মরিলে যদি রণজয় হইত তবে মরিতাম। বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম্ম নহে।"

জীব। আমি বৃথাই মরিব। তবু যুদ্ধে মরিব। তখন পাছু ফিরিয়া, উচ্চৈঃ-স্বরে জীবানন্দ ডাকিল, "কে হরিনাম করিতে করিতে মরিতে চাও, আমার সঙ্গে আইস।"

অনেকে অগ্রসর হইল। জীবানন্দ বলিল, "অমন নহে। হরিসাক্ষাৎ শপথ কর, জীবন্তে ফিরিবে না।"

যাহারা আগু হইয়াছিল, তাহারা পিছাইল। জীবানন্দ বলিলেন, "কেহ আসিবে না? তবে আমি একা চলিলাম।"

জীবানন্দ অশ্বপৃষ্ঠে উঁচু হইয়া বহুদূর পশ্চাৎস্থিত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই! নবীনানন্দকে বলিও আমি চলিলাম। লোকান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ লৌহ-বৃষ্টি মধ্যে বেগে অশ্বচালনা করিলেন। বামহস্তে বলগা—দক্ষিণে বন্দুক—মুখে হরে মুরারে! হরে মুরারে! হরে মুরারে! যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই। এ সাহসে কোন ফল নাই—তথাপি হরে মুরারে! হরে মুরারে! গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ শত্রুব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পলায়নপর সন্তানদিগকে মহেন্দ্র ডাকিয়া বলিল "দেখ, একবার তোমরা ফিরিয়া জীবানন্দ গোঁসাইকে দেখ। দেখিলে মরিবে না।"

ফিরিয়া কতকগুলি সন্তান জীবানন্দের অমানুষ কীর্ত্তি দেখিল। প্রথমে বিস্মিত হইল, তার পর বলিল "জীবানন্দ মরিতে জানে, আমরা জানি না? চল, জীবা-নন্দের সঙ্গে আমরাও বৈকুণ্ঠে যাই।"

এই কথা শুনিয়া, কতকগুলি সন্তান ফিরিল। তাহাদের দেখা দেখি আর কতকগুলি ফিরিল, তাহাদের দেখা দেখি আরও কতকগুলি ফিরিল। বড় এক-টা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। জীবানন্দ শত্রুব্যূহ প্রবেশ করিয়াছিলেন; সন্তা-নেরা আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে সমস্ত রণক্ষেত্র হইতে সন্তানগণ দেখিতে পাইল, যে কতক সন্তানেরা আবার ফিরিতেছে। সকলেই মনে করিল সন্তানের জয় হইয়াছে; সন্তান ইংরেজকে তাড়াইয়া যাইতেছে। তখন সমস্ত সন্তানসৈন্য মার মার শব্দে ফিরিয়া ইংরেজসৈন্যের উপর ধাবিত হইল

এদিকে ইংরেজসেনার মধ্যে একটা ভারি হুল স্থুল পড়িয়া গেল। সিপাহীরা যুদ্ধে আর যত্ন না করিয়া দুই পাশ দিয়া পলাইতেছে; গোরারাও ফিরিয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া শিখরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, পর্ব্বতশিখরে অসংখ্য সন্তানসেনা দেখা যাইতেছে। তাহারা বীরদর্পে অবতরণ করিয়া, ইংরেজসেনা আক্রমণ করিতেছে। তখন ডাকিয়া সন্তানগণকে বলিলেন,

"সন্তানগণ! ঐ দেখ পর্ব্বতশিখরে প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাইতেছে। আজ স্বয়ং মুরারি মধু-কৈটভ-নিসূদন কংস-কেশি-বিনাশন, রণে অবতীর্ণ, লক্ষ সন্তান পর্ব্বতপৃষ্ঠে। বল হরে মুরারে! হরে মুরারে! উঠ! ইংরেজ মুসলমানের বুকে পিঠে চাপিয়া মার। লক্ষ সন্তান পর্ব্বত পিঠে।"

তখন হরে মুরারের ভীষণ ধ্বনিতে পর্ব্বত কন্দর কানন প্রান্তর মথিত হইতে লাগিল। সকল সন্তান মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ললিত-তাল-ধ্বনি-সম্বলিত অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় সর্ব্ব জীব বিমোহিত করিল। তেজে মহেন্দ্রের বাহিনী পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। শিলাপ্রতি-ঘাতপ্রতিপ্রেরিত নির্ঝরিণীবৎ ইংরেজের সেনা বিলোড়িত, স্তম্ভিত, ভীত হইল। সেই সময়ে পঞ্চবিংশতি সহস্র বৈষ্ণব-সেনা লইয়া স্বয়ং সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী পর্ব্বত শিখর হইতে, সমুদ্র প্রপাতবৎ ইংরেজ সেনার উপর বিক্ষিপ্ত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল।

যেমন দুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সঙ্ঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনি দুই সন্তানসেনা সঙ্ঘর্ষে সেই বিশাল ইংরেজসৈন্য, পর্ব্বত সানুদেশে, নিঃশেষ নিষ্পেষিত হইল।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।

ইংরেজ ইংরেজের মত যুদ্ধ করিল। কিন্তু দেশী সিপাহীরা সকলে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণিমার রাত্রি!—সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির। সেই ঘোড়ার দড়বড়ি, বন্দুকের কড়কড়ি, কামানের গুম্—সর্ব্ব-ব্যাপীধূম, আর কিছুই নাই। কেহ হুর্‌রে বলিতেছে না—কেহ হরিধ্বনি করিতেছে না। শব্দ করিতেছে—কেবল শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী। সর্ব্বোপরি আহত ব্যক্তির ক্ষণিক আর্ত্তনাদ। কেহ ছিন্ন-

হস্ত, কেহ ভগ্নমস্তক, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পঞ্জর বিদ্ধ হইয়াছে, কেহ ঘোড়ার নীচে পড়িয়াছে। কেহ ডাকিতেছে মা! কেহ ডাকিতেছে বাপ! কেহ চায় জল, কাহারও কামনা মৃত্যু। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ, মুসলমান, একত্রে জড়াজুড়ি; জীবন্তে মৃতে; মনুষ্যে অশ্বে, মিশামিশি ঠেসাঠেসি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই মাঘ মাসের পূর্ণিমার রাত্রে, দারুণ শীতে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে সেই রণভূমি অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। সেখানে আসিতে কাহারও সাহস হয় না।

কাহারও সাহস হয় না, কিন্তু নিশীথকালে, এক রমণী সেই অগম্য রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল। একটী মশাল জ্বালিয়া সেই শবরাশির মধ্যে সে কি খুঁজিতেছিল। প্রত্যেক মৃতদেহের মুখের কাছে মশাল লইয়া মুখ দেখিয়া, আবার অন্য শবের কাছে মশাল লইয়া যাইতেছিল। কোথাও, কোন নরদেহ মৃত অশ্বের নীচে পড়িয়াছে; সেখানে যুবতী, মশাল মাটিতে রাখিয়া, অশ্বটী দুই হাতে সরাইয়া নরদেহ উদ্ধার করিতেছিল। তার পর যখন দেখিতে পায়, যে যাকে খুঁজিতেছি সে নয়, তখন মশাল তুলিয়া লইয়া সরিয়া যায়। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া, যুবতী সকল মাঠ ফিরিল—কোথাও যা খুঁজে তা পাইল না। তখন মশাল ফেলিয়া, সেই শবরাশিপূর্ণ রুধিরাক্ত ভূমিতে লুঠাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সে শান্তি, জীবানন্দের দেহ খুঁজিতেছিল।

শান্তি লুঠাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময়ে এক অতি মধুর সকরুণধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। কে যেন বলিতেছে, "উঠ মা! কাঁদিও না।" শান্তি চাহিয়া দেখিল—দেখিল সম্মুখে জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া, এক অপূর্ব্বদৃশ্য প্রকাণ্ডাকার জটাজূটধারী মহাপুরুষ।

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজিয়া দিতেছি। তুমি আমার সঙ্গে আইস।"

তখন সেই পুরুষ শান্তিকে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন; সেখানে অসংখ্য শবরাশি উপর্য্যুপরি পড়িয়াছে। শান্তি তাহা সকল নাড়িতে পারে নাই। সেই শবরাশি নাড়িয়া, সেই মহাবলবান্ পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিলেন। শান্তি চিনিল সেই জীবানন্দের দেহ। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রুধিরে পরিপ্লুত। শান্তি, সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আবার তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা! জীবানন্দ কি মরিয়াছে? স্থির হইয়া উহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখ। আগে নাড়ী দেখ।"

শান্তি শবের নাড়ি টিপিয়া দেখিল, কিছু মাত্র গতি নাই। তিনি বলিলেন, "বুকে হাত দিয়া দেখ?"

যেখানে হৃৎপিণ্ড, শান্তি সেই খানে হাত দিয়া দেখিল, কিছু মাত্র গতি নাই; সব শীতল।

সেই পুরুষ আবার বলিলেন,"নাকের কাছে হাত দিয়া দেখ—কিছু মাত্র নিঃশ্বাস বহিতেছে কি?"

শান্তি দেখিল, কিছু মাত্র না।

তিনি বলিলেন, "আবার দেখ, মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়া দেখ—কিছু মাত্র উষ্ণতা আছে কি না?" শান্তি আঙ্গুল দিয়া দেখিয়া বলিল, "বুঝিতে পারিতেছি না।" শান্তি আশামুগ্ধ হইয়াছিল।

মহাপুরুষ, বামহস্তে জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, "তুমি ভয়ে হতাশ হইয়াছ! তাই বুঝিতে পারিতেছ না—শরীরে কিছু তাপ এখনও আছে বোধ হইতেছে। আবার দেখ দেখি।"

শান্তি তখন আবার নাড়ী দেখিল, কিছু গতি আছে। বিস্মিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের উপর হাত রাখিল—একটু ধক্ ধক্ করিতেছে। নাকের আগে আঙ্গুল রাখিল—একটু নিঃশ্বাস বহিতেছে। মুখের ভিতর অল্প উষ্ণতা পাওয়া গেল। শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল, "প্রাণ ছিল কি? না আবার আসিয়াছে?"

তিনি বলিলেন, "তাও কি হয় মা! তুমি উহাকে বহিয়া পুষ্করিণীতীরে আনিতে পারিবে? আমি চিকিৎসক, উহার চিকিৎসা করিব।"

শান্তির শরীরে অগাধ শক্তি, অনায়াসে জীবানন্দকে কোলে তুলিয়া পুকুরের দিকে লইয়া চলিল। চিকিৎসক বলিলেন, "তুমি ইহাকে পুকুরে লইয়া গিয়া, রক্ত সকল ধুইয়া দাও। আমি ঔষধ লইয়া যাইতেছি।"

শান্তি জীবানন্দকে পুষ্করিণীতীরে লইয়া গিয়া রক্ত ধৌত করিল। তখনই চিকিৎসক বন্য লতা পাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিল। তার পর, বারম্বার জীবানন্দের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইল। তখন জীবানন্দ এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। শান্তির মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যুদ্ধে কার জয় হইল?"

শান্তি বলিল, "তোমারই জয়। এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।"

তখন উভয়ে দেখিল কেহ কোথাও নাই! কাহাকে প্রণাম করিবে?

নিকটে বিজয়ী সন্তানসেনার বিষম কোলাহল শুনা যাইতেছিল, কিন্তু শান্তি বা জীবানন্দ কেহই উঠিল না—সেই পূর্ণচন্দ্রের কিরণে সমুজ্জ্বল পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া রহিল। জীবানন্দের শরীর ঔষধের গুণে, অতি অল্প সময়েই সুস্থ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "শান্তি! সেই চিকিৎসকের ঔষধের আশ্চর্য্যগুণ! আমার শরীরে আর কোন বেদনা বা গ্লানি নাই—এখন কোথায় যাইবে চল। ঐ সন্তানসেনার জয়ের উৎসবের গোল শুনা যাইতেছে!"

শান্তি বলিল "আর ওখানে না। মার কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে—এ দেশ সন্তানের

হইয়াছে। আমরা রাজ্যের ভাগ চাহি না—এখন আর কি করিতে যাইব ?”

জী। যা কাড়িয়া লইয়াছি, তা বাহুবলে রাখিতে হইবে।

শা। রাখিবার জন্য মহেন্দ্র আছেন, সত্যানন্দ স্বয়ং আছেন। তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্তানধর্ম্মের জন্য দেহ ত্যাগ করিয়াছিলে; এ পুনঃপ্রাপ্ত দেহে সন্তানের আর কোন অধিকার নাই। আমরা সন্তানের পক্ষে মরিয়াছি। এখন আমাদের দেখিলে, সন্তানেরা বলিবে, জীবানন্দ যুদ্ধের সময়ে প্রায়শ্চিত্তভয়ে, লুকাইয়াছিল, জয় হইয়াছে দেখিয়া রাজ্যের ভাগ লইতে আসিয়াছে।

জী। সে কি শান্তি? লোকের অপবাদ ভয়ে আপনার কাজ ছাড়িব? আমার কাজ মাতৃসেবা; যে যা বলুক না কেন, আমি মাতৃসেবাই করিব।

শা। তাহাতে তোমার আর অধিকার নাই—কেন না তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ। যদি আবার মার সেবা করিতে পাইলে, তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি হইল? মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়াই, এ প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অংশ। নহিলে শুধু তুচ্ছ প্রাণ পরিত্যাগ কি বড় একটা ভারি কাজ?

জী। শান্তি! তুমিই সার বুঝিতে পার। আমি এ প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রাখিব না। আমার সুখ সন্তানধর্ম্মে—সে সুখে আপনাকে বঞ্চিত করিব। কিন্তু যাইব কোথায়? মাতৃসেবা ত্যাগ করিয়া, গৃহে গিয়া ত সুখভোগ করা হইবে না।

শা। তা কি আমি বলিতেছি? ছি! আমরা আর গৃহী নহি; এমনই দুইজনে সন্ন্যাসীই থাকিব—চিরব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। চল, এখন গিয়া আমরা দেশে দেশে তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াই।

জী। তার পর?

শা। তার পর—হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া, দুই জনে দেবতার আরাধনা করিব—যাতে মার মঙ্গল হয়, সেই বর মাগিব।

তখন দুইজনে উঠিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময় নিশীথ-অনন্তে অন্তর্হিত হইল।

হায়! আবার আসিবে কি? মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি?

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সত্যানন্দ ঠাকুর, রণক্ষেত্র হইতে কাহাকে কিছু না বলিয়া, আনন্দমঠে চলিয়া আসিলেন। সেখানে গভীর রাত্রে, বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত। এমত সময়ে, সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া, সত্যানন্দ উঠিয়া প্রণাম করিলেন।

চিকিৎসক বলিলেন “সত্যানন্দ, আজ মাঘী পূর্ণিমা।”

সত্য। চলুন—আমি প্রস্তুত। কিন্তু

হে মহাত্মন্!—আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্ত্তে যুদ্ধ জয় করিয়া আর্য্য ধর্ম্ম নিষ্কণ্টক করিলাম—সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল?

যিনি আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, "তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে; মুসলমান-রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য্য নাই অনর্থক প্রাণি-হত্যার প্রয়োজন নাই।"

সত্য। মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই—এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।

তিনি। হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না—তুমি থাকিলে, এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চল।

শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন "হে প্রভু! যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে?"

তিনি বলিলেন, "না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।"

সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপা জন্মভূমি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া, যোড়-হাতে, বাষ্পনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না।"

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ! কাতর হইও না। যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ আগে রাজা না হইলে আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, এ কথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা আর্য্যধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত আর্য্যধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে, তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। অন্তর্ব্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই আর্য্যধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত আর্য্যধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত; লোক

শিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া, অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন না তা হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্ গুণবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে। অতএব হে বুদ্ধিমন্—এখন ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "হে মহাত্মন্! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংরেজের রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, তবে আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্য্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন?"

মহাপুরুষ বলিলেন, "ইংরেজ এক্ষণে বণিক্—অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্য শাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তান বিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে, কেন না রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস—জ্ঞান লাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।"

সত্যানন্দ। হে মহাত্মন্—আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না—জ্ঞানে আমার কাজ নাই—আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি ইহাই পালন করিব। আশীর্ব্বাদ করুন আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।

মহাপুরুষ। ব্রত সফল হইবে না—কেন তুমি নিরর্থক নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিতা করিতে চাও? যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।"

মহাপুরুষ। তুমি আর কিছু করিতে পারিবে না—তোমার দুই বাহু ছিন্ন হইয়াছে—তোমারও আর পরমায়ু নাই।

সত্যানন্দ। না থাকে, এইখানে, এই মাতৃপ্রতিমা সম্মুখে দেহত্যাগ করিব।

মহাপুরুষ। অজ্ঞানে? চল জ্ঞান লাভ করিয়া দেহ ত্যাগ করিবে চল। হিমালয়শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইব।

এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব্ব শোভা! সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই মহা প্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষমূর্ত্তি শোভিত—একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে

ধরিয়াছে; বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা; মহাপুরুষ বিসর্জ্জন।

বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল। বিষ্ণুমণ্ডপ শূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ, উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।

সমাপ্ত।



একটী প্রিয় জলাশয়।

১

কত মনোহর ছিলি সরোবর
যবে হৃদি পর তোর।
আলো করি জল ভাসিত কমল
কিরণে রাঙ্গিলে ভোর॥

২

কিবা পরিসর!——ও দেহের পর
সুফুট অফুট কলি
মৃদুল পবন দুলাত যখন
ঢেউ নাচাইয়া চলি!

৩

সে শোভা নয়নে কখনও দেখিনে
জনমের আগে যাহা;
তবু পদ্মহ্রদ নামেতে আহ্লাদ!
ভুলিতে নারিব তাহা॥

৪

নারিব ভুলিতে যখন নিশিতে
চাঁদখানি ভাঙাভাঙা
বুকে তুলে নাও দুলে দুলে যাও
চাঁদের কিরণে রাঙা॥

৫

ভুলিতে নারিব যেখানে থাকিব
ও তোর প্রতিমাখানি।
শিশুকাল হ'তে শিশির শরতে
ঐ রূপই তোর জানি॥

৬

অই সে উত্তরে ত্রিশূল শিখরে
উঠেছে শিবের মঠ।
প্রাসাদ কুটীর ঢাকা চারি তীর
সেই মনোরম পট॥

৭

তরু ছায়াকর তাহার ভিতর
তৃণের কুটীর কোলে;
শাখা ছড়াইয়া আছে দাঁড়াইয়া
পাতাগুলি ধীরে দোলে!

৮

গরিমা করিয়া আকাশে উঠিয়া
নারিকেল সারি তায়
শিরে যেন ছাতা ছড়ায়েছে পাতা
পশ্চিমে গগনগায় ॥

৯

হ'লে সন্ধ্যাকাল মৃদু রশ্মিজাল
যখন সে সবে পড়ে,
দিক্ তরু জল করি সুবিমল—
ছবিখানি যেন গড়ে ॥

১০

বৃহৎ শরীর জলাশয়নীর
গোধুলি বরণে কালো;
তীরে থরে থর গৃহতরু'পর
চিকি চিকি করে আলো ॥

১১

পশ্চিম চাপিয়া থরে থর দিয়া
সাদা কালো মেঘদলে,
গায়ে মাখি ছটা করি মহা ঘটা
গগনের গায়ে জ্বলে ॥

১২

জলে তার সনে কত কি বরণে
কলধর মঠশির।
ছায়াঢাকা জল গৃহ তরুদল
ছবিগুলি তাহে স্থির!

১৩

আরো কিছু দূরে শূন্যদেশ পুরে
আকাশের কোলে গাঁথা
ঝাউ তরুসারি বিথারি বিথারি
ধরে যারা রূপ পাতা !!

১৪

সে সবে মিশিয়া আকাশে উঠিয়া
জাহাজের চুড়াগুলি।
কখনও জড়ায়ে কখনও ছড়ায়ে
পতাকা পাইল তুলি ॥

১৫

পূর্ণিমা-জোছনা যবে অতুলনা
এ সবে জড়ায়ে রয়।
কিবা মনোহর ছবিটী সুন্দর
তোর চারিধার হয়!

১৬

ভুলিব না ওরে সরোবর তোরে
গগনে যখন মেঘ।
কালো ছায়া জলে ধারা ধেয়ে চলে
ঝাপটে ঝটিকাবেগ !!

১৭

ফুৎকারে ফুৎকারে জলকণা সরে
মুক্তাঝারা যেন ধায়!
মেঘে গরজন, বারি বরিষণ
বায়ুর নর্ত্তন তায় !!

১৮

ভুলিব না তোর সন্ধ্যা নিশি ভোর
এখনও নিরখি যাহা;
যামিনী জোছনা হিল্লোল খেলনা
প্রভাত রক্তিমা আহা !!

১৯

ন বৎসর হ'তে বসন্ত শরতে
হেমন্ত বরিষাভাগে।
হে বিশাল হ্রদ সরল বিশদ
সেই রূপ হৃদে জাগে !!

২০

গুটায়েছে বেলা জীবনের ভেলা
এবে ধিকি ধিকি যায়।
তবু তোর তীর প্রাসাদ কুটীর
ভুলিতে নারিরে হায়॥

২১

চারিধারে ঘাট রজকের পাট
অই তরুসারি জল—
দেখিলে এখনও নিশিতে কখনও
ভেজেরে হৃদয়তল॥

২২

মনে পড়ে কত হারায়েছি যত
এখন খুঁজিলে নাই!—
আমি যাব চলে লোকে যেন বলে
তোর তীরে ছিল ঠাঁই॥



বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ।

কামরূপ—রঙ্গপুর।

কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এই দেশ কি ছিল? আর এখন এ দেশ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, কি প্রকারে, কিসের বলে এ অবস্থান্তর প্রাপ্তি, ইহা আগে না বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে বসা অনর্থক কালহরণ মাত্র। আমাদের কথা দূরে থাক, ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা-দিগের মধ্যে এই ভ্রান্তির বাড়াবাড়ি হই-য়াছে। "বাঙ্গালার ইতিহাস" ইহার এক প্রমাণ। বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িতে বসিয়া আমরা পড়িয়া থাকি পালবংশ সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, "বখ্-তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিলেন, পাঠানেরা বাঙ্গালায় রাজা হইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকলই ভ্রান্তি, কেন না সেন পাল ও বখ্তিয়ারের সময় বাঙ্গালা বলিয়া কোন রাজ্য ছিল না। এখন কার এই বাঙ্গালা দেশের কোন নামান্তরও ছিল না। সেন ও পাল গৌড়ের রাজা ছিলেন, বখ্তিয়ার খিলিজি লক্ষণাবতী জয় করিয়াছিলেন। গৌড় বা লক্ষণাবতী বাঙ্গালার প্রাচীন নাম নহে। বাঙ্গালী বলিয়া কোন জাতি তথাকার অধিবাসী ছিল না। যাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি, গৌড় বা লক্ষণাবতী তাহার এক অংশ মাত্র। সে দেশে যাহারা বাস করিত, তাহারা অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আধু-

নিক বাঙ্গালী হইয়াছে। যেমন গৌড় বা লক্ষণাবতী একটি রাজ্য ছিল, তেমনি আরও অনেক গুলি পৃথক্ রাজ্য ছিল। সে গুলি বাঙ্গালার অংশ ছিল না, কেন না বাঙ্গালাই তখন ছিল না। সে গুলি কোন একটি রাজ্যের অংশ ছিল না—সকলই পৃথক্ পৃথক্, স্ব স্ব প্রধান। সকলই ভিন্ন ভিন্ন অনার্য্যজাতির বাসভূমি। ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতি। কিন্তু সর্ব্বত্র প্রায় আর্য্য প্রধান; এই আর্য্যেরাই এই ভিন্ন দেশগুলি একীভূত করিবার মূল কারণ। যে দেশে যে জাতি থাকুক না কেন, তাহারা আর্য্য দিগের ভাষা গ্রহণ করিল, আর্য্যদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। আগে একধর্ম্ম, এক-ভাষা, তার শেষে একচ্ছত্রাধীন হইয়া আধুনিক বাঙ্গালায় পরিণত হইল।

কিন্তু সেই একচ্ছত্রাধীনত্ব সম্প্রতি হইয়াছে মাত্র, ইংরেজের সময়ে। বাঙ্গালীর দেশ, মুসলমানেরা কখনই একচ্ছত্রাধীন করিতে পারেন নাই। মোগলেরা অনেক দূর করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও আধুনিক বাঙ্গালার অধীশ্বর হইতেপারেন নাই।

অতএব যে অর্থে গ্রীসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, সে অর্থে বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। যেমন আধুনিক ফ্লোরেন্সের ইতিহাস লিখিলে, বা মিলানের ইতিহাস লিখিলে, বা নেপলসের ইতিহাস লিখিলে আধুনিক ইতালির ইতিহাস লেখা হয় না বাঙ্গালারও কতক তেমনি। কিন্তু ইতালি বলিয়া দেশ ছিল; বাঙ্গালা বলিয়া দেশ ছিল না। বাঙ্গালার ইতিহাস আরম্ভ মোগলের সময় হইতে।

আমরা বাঙ্গালার ঐতিহাসিক ধ্যান এখন আর পরিস্ফুট না করিয়া, যাহা বলিতেছি বা বলিব আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে উত্তর পূর্ব্ব বাঙ্গালার কথা বলিব। দেখা যাউক কবে এ অংশ বাঙ্গালাভুক্ত হইয়াছে, কবেই বা বাঙ্গালার সংস্পর্শে আসিয়াছে।

যেমন এখন যাহাকে বাঙ্গালা বলি, আগে তাহা বাঙ্গালা ছিল না, তেমনি এখন যাহাকে আসাম বলি তাহা আসাম ছিল না। অতি অল্পকাল হইল আহম নামে অনার্য্য জাতি আসিয়া ঐ দেশ জয় করিয়া বাস করাতে উহার নাম আসাম হইয়াছিল। সেখানে, যথায় এখন কামরূপ তথায় অতি প্রাচীন কালে এক আর্য্যরাজ্য ছিল। তাহাকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বলিত। বোধ হয় এই রাজ্য পূর্ব্বাঞ্চলের অনার্য্যভূমি মধ্যে একা আর্য্য জাতির প্রভা বিস্তার করিত বলিয়া, ইহার এই নাম। মহাভারতের যুদ্ধে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, দুর্য্যোধনের সাহায্যে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অধিবাসী, তাম্রলিপ্ত, পৌণ্ড্র, মৎস্য প্রভৃতি সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তাহারা অনার্য্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাঙ্গালা যে সময়ে অনার্য্যভূমি, সে সময়ে আসাম যে

আর্য্যভূমি হইবে, ইহা এক বিষম সমস্যা। কিন্তু তাহা অঘটনীয় নহে। মুসলমানদিগের সময়ে ইংরেজদিগের এক আড্ডা মান্দ্রাজে, আর আড্ডা পিপ্পলী ও কলিকাতায়, মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সকলের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার ইতিহাস আছে, বলিয়া বুঝিতে পারি। তেমনি প্রাগ্‌জ্যোতিষের আর্য্যদিগের ইতিহাস থাকিলে, তাহাদিগের দূর গমনের কথাও বুঝিতে পারিতাম। বোধ হয় তাহারা প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগেই বাস করিয়াছিল। তার পর আর্য্যেরা দাক্ষিণাত্য জয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সেখানকার অনার্য্য জাতি সকল দূরীকৃত হইয়া, ঠেলিয়া উত্তর পূর্ব্ব মুখে আসিয়া বাঙ্গালা দখল করিয়াছিল। তাহাদেরই ঠেলা ঠেলিতে অল্পসংখ্যক আর্য্য ঔপনিবেশিকেরা সরিয়া সরিয়া ক্রমে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়া ছিল।

এক সময়ে এই কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্ব্বে করতোয়া ইহার সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্ত্যা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরীতে লেখে, যে ভগদত্তের বংশের ২৩ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। যাহাই হউক, পৃথুনামা রাজার পূর্ব্বে কোন রাজার নামের নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। পৃথু রাজার রাজধানী তন্নামে নদীতীরে, চাকলা ও বোদা পরগণা বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যস্থলে ছিল, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। কথিত আছে কীচক নামে এক ম্লেচ্ছ জাতির দ্বারা পৃথু রাজা আক্রান্ত হয়েন। ম্লেচ্ছের স্পর্শের ভয়ে তিনি এক সরোবরের জলে অবগাহন করেন। তথায় নিমজ্জনে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

তার পর পাল বংশীয়েরা রঙ্গপুরে রাজা হয়েন। ইতি পূর্ব্বে, রঙ্গপুর কামরূপ হইতে কিয়ৎকালজন্য, পৃথক্ রাজ্য হইয়াছিল। বোধ হয় রঙ্গপুরে পালবংশের প্রথম রাজা ধর্ম্মপাল। এই পালেরা ইউরোপের বুর্বোঁ বংশের, আর আসিয়ার তৈমূর বংশের ন্যায় নানা দেশের রাজা ছিলেন। গৌড়ে পাল রাজা, মৎস্যে পাল রাজা, রঙ্গপুরে পাল রাজা, কামরূপে পাল রাজা ছিল। বোধ হয় এই রাজবংশ অতিশয় প্রতাপশালী ছিল। ধর্ম্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, ডিমলার দক্ষিণে আজিও আছে। তাহার ক্রোশেক দূরে, রাণী মীনাবতীর গড় ছিল। রাণী মীনাবতী ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃজায়া। মীনাবতী অতি তেজস্বিনী ছিলেন—বড় দুর্দ্দান্তপ্রতাপ। গোপী চন্দ্র নামে তাঁহার পুত্র ছিল। মীনাবতী ধর্ম্মপালকে বলিলেন "আমার পুত্র রাজা হইবে, তুমি কে?" ধর্ম্মপাল রাজ্য না দিবায় মীনাবতী সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং

যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু গোপীচন্দ্র নাম মাত্র রাজা হইলেন, রাজমাতা তাঁহাকে রাজ্য করিতে দিবেন না স্বয়ং রাজ্য করিবেন ইচ্ছা। পুত্রকে ভুলাইবার জন্য তাঁহার এক শত মহিষী করিয়া দিলেন, কিন্তু পুত্র ভুলিল না। তখন মাতা পুত্রকে ধর্ম্মে মতি দিতে লাগিলেন। এইবার পুত্র ভুলিয়া, যোগধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, বনে গমন করিলেন।

গোপীচন্দ্রের পর, তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র রাজা হইলেন। পাঠক হবচন্দ্র রাজা, গবচন্দ্র পাত্রের কথা শুনিয়াছেন? এই সেই হবচন্দ্র; নাম হবচন্দ্র নয়, ভবচন্দ্র, আর একটি নাম উদয়চন্দ্র। ভবচন্দ্র গবচন্দ্রের বুদ্ধি বিদ্যার পরিচয় লোকপ্রবাদে এত আছে, যে তাহার পুনরুক্তি না করিলেও হয়। লোকে গল্প করে গবচন্দ্র, বুদ্ধি বাহির হইয়া যাইবে ভয়ে চিপ্‌লে দিয়া নাক কান বন্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট নন, পাছে বুদ্ধি বাহির হইয়া যায় ভয়ে সিন্দুকে গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন, রাজার কোন বিপদ আপদ পড়িলে, সিন্দুক হইতে বাহির হইয়া, নাক কানের পুঁটুলি খুলিয়া বুদ্ধি বাহির করিতেন। একদিন রাজার এইরূপ এক বিপদ উপস্থিত, নগরে একটা শূকর দেখা দিয়াছে। শূকর রাজসমীপে আনীত হইলে রাজা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, যে এ কি জন্তু। বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীকে সিন্দুক হইতে বাহির করিলেন। মন্ত্রী চিপলে খুলিয়া অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, এটা অবশ্য হস্তী, না খাইয়া রোগা হইয়াছে, নচেৎ ইন্দুর, খাইয়া বড় মোটা হইয়াছে। আর একদিন, দুই জন পথিক আসিয়া সায়াহ্নে এক পুষ্করিণীতীরে উত্তীর্ণ হইল। রাত্রে পাক শাক করিবার জন্য, সরোবরতীরে স্থান পরিষ্কার করিয়া চুলা কাটিতে আরম্ভ করিল। নগরের রক্ষিবর্গ দেখিয়া মনে করিল, যে যখন পুকুর থাকিতেও তার কাছে আবার খানা কাটিতেছে, তখন অবশ্য ইহাদের অসৎ অভিপ্রায় আছে। রক্ষিগণ পথিক দুই জনকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা স্বয়ং এরূপ গুরুতর সমস্যার কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া, পরম ধীমান্ পাত্র মহাশয়কে সিন্দুকের ভিতর হইতে বাহির করিলেন। তিনি নাক কানের চিপলে খুলিয়াই দিব্যচক্ষে, কাণ্ডখানা দর্পণের মত পরিষ্কার দেখিলেন। তিনি আজ্ঞা করিলেন, "নিশ্চিত ইহারা চোর! পুকুরটা চুরি করিবার জন্য পাড়ের উপর সিঁধ কাটিতে ছিল। ইহাদিগকে শূলে দেওয়া বিধেয়।" রাজা ভবচন্দ্র, মন্ত্রীর বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণেই পুষ্করিণীচোরদ্বয়ের প্রতি শূলে যাইবার বিধি প্রচার করিলেন।

কথা এখনও ফুরায় নাই। পুকুর চোরেরা শূলে যাইবার পূর্ব্বে, পরামর্শ

করিয়া হঠাৎ পরস্পর ঠেলাঠেলি মারামারি আরম্ভ করিল। রাজা ও রাজমন্ত্রী এই বিচিত্র কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে ব্যাপার কি? তখন এক জন চোর নিবেদন করিল যে "হে মহারাজ! দেখুন দুই শূলের মধ্যে একটি বড়, একটি ছোট। আমরা জ্যোতিষ জানি। আমরা গণনা করিয়া জানিয়াছি যে আজি যে ব্যক্তি এই দীর্ঘ শূলে আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে সে পুনর্জ্জন্মে চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে, আর যে এই ছোট শূলে মরিবে, সে তাহার মন্ত্রী হইয়া জন্মিবে। মহারাজ! তাই আমি দীর্ঘ শূলে চড়িতে যাইতে ছিলাম, এই হতভাগা আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, আপনি বড় শূলে মরিয়া সম্রাট্ হইতে চায়।" তখন দ্বিতীয় চোর যোড় হাত করিয়া বলিল, "মহারাজ! ও কে যে ও চক্রবর্ত্তী রাজা হইবে? আমি কেন না হইব? আজ্ঞা হউক ও ছোট শূলে চড়ুক, আমি সম্রাট্ হইব, ও আমার মন্ত্রী হইবে।" তখন রাজা ভবচন্দ্র ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিলেন, "কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! তোরা চোর হইয়া জন্মান্তরে চক্রবর্ত্তী রাজা হইতে চাহিস্! সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্র যদি কেহ থাকে তবে সে আমি। আমি থাকিতে তোরা!!" এই বলিয়া রাজা ভবচন্দ্র তখন দ্বারীগণকে আজ্ঞা দিলেন যে এই পাপাত্মাদিগকে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দাও। এবং মন্ত্রীবরকে আহ্বান পূর্ব্বক, সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যের লোভে স্বয়ং উচ্চ শূলে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রী মহাশয়ও আগামী জন্মে তাদৃশ চক্রবর্ত্তী রাজার মন্ত্রী হইবার লোভে ছোট শূলে গিয়া চড়িলেন। এইরূপে তাঁহার মানব লীলা সমাপ্ত হইল।

এ ইতিহাস নহে—এ সত্যও নহে এ পিতামহীর উপন্যাস মাত্র। তবে এ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে এই অমূলক গাল গল্পকে স্থান দিলাম কেন? এই কথা গুলি রাজার ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায়, যে রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধে এতদূর নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক গল্প বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে। ভবচন্দ্র রাজা ও হবচন্দ্র পাত্রের দ্বারাও বাঙ্গালার রাজ্য চলিতে পারে ইহা বাঙ্গালীর বিশ্বাস। যে দেশে এই সকল প্রবাদ চলিত, সে দেশের লোকের বিবেচনা এই, যে, রাজারাজড়া সচরাচর ঘোরতর গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকে, হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। বাস্তবিক এই কথাই সত্য। বাঙ্গালায় চিরকাল, সমাজই সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে। রাজারা হয়, সেই বাঙ্গালা কবিকুলরত্ন শ্রীহর্ষ দেবের চিত্রিত বৎসরাজের ন্যায় মদের পুতুল, নয় এই ভবচন্দ্র হবচন্দ্রের ন্যায়, বারোইয়ারির সং। আজ কালের রাজপুরুষদের কথা বলিতেছি না; তাঁহারা

অতিশয় দক্ষ। কথাটা এই যে আমাদের এ নিরীহ জাতির শাসনকর্ত্তা বটবৃক্ষকে করিলেও হয়।

ভবচন্দ্রের পর কামরূপ রঙ্গপুর রাজ্যে আর একজন মাত্র পাল বংশীয় রাজা রাজ্য করিয়া ছিলেন। তাঁহার পর মেছ গারো কোচ লেপ্‌চা প্রভৃতি অনার্য্য জাতিগণ রাজ্যমধ্যে ঘোরতর উপদ্রব করে। কিন্তু তার পর আবার আর্য্যজাতীয় নূতন রাজবংশ দেখা যায়। তাঁহারা কিপ্রকারে রাজা হইলেন, তাহার কিছু কিম্বদন্তী নাই। এই বংশের প্রথম রাজা নীলধ্বজ। নীলধ্বজ কমতাপুর নামে নগরী নির্ম্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ আজিও কুচবেহার রাজ্যে আছে। ইহার পরিধি ৯।।০ ক্রোশ অতএব নগরী অতি বৃহৎ ছিল সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে শাত ক্রোশ বেড়িয়া নগরীর প্রাচীর ছিল আর ২।।০ ক্রোশ একটি নদীর দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীরের ভিতর প্রাচীর; গড়ের ভিতর গড়—মধ্যে রাজপুরী। সে কালের নগরী সকলের সচরাচর এইরূপ গঠন ছিল। শত্রুশঙ্কাহীন আধুনিক বাঙ্গালী খোলা সহরে বাস করে, বাঙ্গালার সে কালের সহর সকলের গঠন কিছুই অনুভব করিতে পারে না।

এই বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের সময়ে রাজ্য পুনর্ব্বার সুবিস্তৃত হইয়া ছিল দেখা যায়। কামরূপ, ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত রঙ্গপুর, আর সংযোর কিয়দংশ তাঁহার ছত্রাধীন ছিল। এই সময়ে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান রাজারা দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে সর্ব্বদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত, অতএব অবসর পাইয়া নীলাম্বর তাঁহাদের কিছু কাড়িয়া লইয়াছিলেন বোধ হয়। কমতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত তিনি এক বৃহৎ রাজবর্ত্ম নির্ম্মিত করেন, অদ্যাপি সে বর্ত্ম সেই প্রদেশের প্রধান রাজবর্ত্ম। তিনি বহুতর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি নিষ্ঠুরস্বভাব ছিলেন তাহাতেই তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইল। শচীপুত্র নামে তাঁহার এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিল। শচীপুত্রের পুত্র কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল। নীলাম্বর তাহাকে বধ করিলেন। কিন্তু কেবল বধ করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, তাহার মাংস রাঁধাইয়া শচীপুত্রকে কৌশলে ভোজন করাইলেন। শচীপুত্র জানিতে পারিয়া দেশত্যাগ করিয়া গৌড়ের পাঠান রাজার দরবারে উপস্থিত হইল। শচীপুত্রের দেখান প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া, পাঠানরাজ (আমি কখনই গৌড়ের পাঠানরাজাদিগকে বাঙ্গালার রাজা বলিব না।) নীলাম্বরকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর আর যাই হউন—বাঙ্গালার সেনকুলাঙ্গারের মত ছিলেন না। খড়কীদ্বার দিয়া পলায়ন না করিয়া সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে মুসলমানকে পরাজিত করিলেন। তখন সেই ক্ষৌরিত মুণ্ড প্রতারক, যে পথে টুয় হইতে আজি কালি-

কার অনেক রাজ্য পর্য্যন্ত নীত হইয়াছে চোরের মত সেই অন্ধকার পথে গেল। হার মানিল; সন্ধি চাহিল। সন্ধি হইল। ক্ষৌরিতমুণ্ড বলিল, "মুসলমানের বিবিরা মহারাণীজিকে সেলাম করিতে যাইবে।" মহারাজা তখনই সম্মত হইলেন। কিন্তু যে সকল দোলা বিবিদের লইয়া আসিল তাহা রাজপুরমধ্যে পৌছিলে, তাহার ভিতর হইতে একটিও পাঠানকন্যা, বা কোনজাতীয় কন্যা বাহির হইল না—যাহারা বাহির হইল, তাহারা শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত সশস্ত্র যুবা পাঠান। তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজপুরী আক্রমণ করিয়া নীলাম্বরকে এক পিঞ্জরের ভিতর পুরিয়া গৌড়ে পাঠাইল; নীলাম্বর পথে পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, কেননা কেহ তাঁহাকে আর দেখে নাই।

এ দেশে রাজা গেলেই রাজ্য যায়। নীলাম্বর গেলেন ত তাঁহার রাজ্য পাঠানের অধীন হইল। ইহার পূর্ব্বে মুসলমান কখন এদেশে আইসে নাই। কিন্তু যখন নীলাম্বরের পর আর্য্যবংশীয় রাজার কথা শুনা যায় না তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে রঙ্গপুর রাজ্য এই সময় পাঠানের করকবলিত হইল।

এই সময়ে—কিন্তু কোন সময়ে সেই আসল কথা! সন তারিখ শূন্য যে ইতিহাস—সে পথশূন্য অরণ্যতুল্য—প্রবেশের উপায় নাই। এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে যে বিখ্যাত পাঠানরাজ হোসেন শাহাই রঙ্গপুরের জয়কর্ত্তা। হোসেন শাহা ইং ১৪৯৭ সন হইতে ১৫২১ সন পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। মুসলমানেরা রঙ্গপুরের কিয়দংশ মাত্র অধিকৃত করিয়াছিলেন। কামরূপ কোচেরা অধিকৃত করিয়াছিল। তাহারা রঙ্গপুরের অবশিষ্ট অংশ অধিকৃত করিয়া কোচ বিহার রাজ্য স্থাপন করিল।

ক্রমশঃ



বহুপত্নীত্ব।

আদিম অবস্থায় স্ত্রীগণ সকলেই একপ্রকার স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু সে স্বেচ্ছাচারিতা চিরস্থায়ী নহে। ক্রমে ক্রমে তাহা বিনা চেষ্টায় লোপ পায়। তজ্জন্য প্রথমে অন্য দ্রব্যের ন্যায় স্ত্রীতেও সম্পত্তি বোধ আবশ্যক, তাহা সহজেই জন্মে, সুতরাং সহজেই স্বেচ্ছাচারিতা লোপ পায়। সম্পত্তি যেরূপে অর্জ্জিত,

স্ত্রীও প্রথমে সেইরূপে অর্জ্জিত হয়। কোন পক্ষী ধরিলে শিকারী যেরূপ মনে করে পক্ষী আমার হইল, বন্যেরা স্ত্রী ধরিলে ঠিক সেইরূপ মনে করে। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বিজয়ীরা পরাজিতদের স্ত্রীলোক ধরিয়া আনে। যেটীকে যে ধরিয়া আনে সেটী তাহারই হয়। অন্য দ্রব্য অপহরণ করিয়া আনিলে যদি তাহা অপহারকের নিজস্ব হয়, তবে স্ত্রী লুঠ করিয়া আনিলে কেন না সে স্ত্রী তাহার নিজস্ব হইবে। স্ত্রী নিজস্ব হইলে আর তাহার স্বেচ্ছাচারিতা থাকিতে পায় না।

কিন্তু স্ত্রী প্রথমে নিজস্ব হইতে গেলে ঘটী বাটীর ন্যায় নিজস্ব হইতে হয়, অর্থাৎ ঘটী বাটীর ন্যায় সম্পত্তিস্বরূপে নিজস্ব হইতে হয়। এবং সেই জন্য স্ত্রীরা উত্তরাধিকারীতে অর্পিত হয়। পূর্ব্বসম্বন্ধ তাহার কোন প্রতিবন্ধক হয় না। যে দেশে ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী, সে দেশে মাতুল মরিলে মাতুলানীকে ভাগিনেয়ের স্ত্রী হইতে হয়। যে দেশে সহোদর উত্তরাধিকারী, সে দেশে ভ্রাতা মরিলে উত্তরাধিকারী ভ্রাতা ভ্রাতৃপত্নীকে নিজপত্নীস্বরূপে গ্রহণ করে। অন্য সম্পত্তি যদি উত্তরাধিকারী পায়, স্ত্রীও কেন সে না পাইবে? আমাদের দেশে গল্প আছে, যে নহুষ যখন ইন্দ্রত্ব লাভ করেন শচীকে তিনি এই কারণে দাবি করিয়াছিলেন। বালির রাজ্যে যখন সুগ্রীব রাজা হন, তারাকে এই কারণে তাঁহার রাণী হইতে হইয়াছিল। রাবণের মন্দোদরীকেও এই কারণে বিভীষণের রাণী হইতে হইয়াছিল। এ সকল গল্প সত্য নহে, কিন্তু ইহাতে যে প্রথার কথা উল্লেখ আছে তাহা সত্য।

স্ত্রী যাহার সম্পত্তি, তাহার নাম স্বামী। যে স্বত্ববলে পুরুষেরা অন্য সম্পত্তির স্বামী সেই স্বত্ববলে স্ত্রীরও স্বামী। "স্ত্রীর স্বামী" এই কথায় পূর্ব্বপরিচয় সমুদয় স্পষ্ট রহিয়াছে। যখন সম্পত্তি বলিয়া স্ত্রী গৃহীত হইয়াছিল, স্বামী কথাটী সেই সময়ের। অদ্যাপি আমরা সেই স্বামী শব্দ ব্যবহার করি। অদ্যাপি আমাদের সংসারে স্ত্রীগণ কতকাংশে সম্পত্তিস্বরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

যাহা সম্পত্তি স্বরূপ, তাহা দান করা, ধার দেওয়া, নষ্ট করা, ত্যাগ করা স্বামীর সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। বন্যলোকের মধ্যে অনেক স্থানে এইরূপ স্বামিত্ব অদ্যাবধি আছে। আমাদের দেশেও স্বামীরা পূর্ব্বে এই সকল ক্ষমতার সম্পূর্ণ চালনা করিতেন, পরে বহুকাল হইতে তাহা এক একটি করিয়া কমিয়া আসিতেছে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত আছে যে যখনই স্বামী মনে করেন তখনই তিনি স্ত্রী ত্যাগ করিতে পারেন। স্ত্রীর সম্পত্তিত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালায় অদ্যাপি এই শেষ চিহ্ন আছে। শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যদি কেহ স্ত্রী ত্যাগ করে তবে সে ব্যক্তি ত্যক্ত স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবে, তাহাকে খোরাকি দিবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে আর স্ত্রী ত্যাগ করিয়া নিঃ-

সম্বন্ধ হওয়া যায় না। অন্য কোন সম্পত্তি ত্যাগ করিলে আর সে ত্যক্ত সম্পত্তির সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে সেই ত্যক্ত স্ত্রীর সহিত সুতরাং এক্ষণে ঈষৎ সম্বন্ধ থাকিতেছে। কতক সুবিধা বটে, কিন্তু তথাপি স্ত্রীত্যাগ করার এই ক্ষমতা যতদিন না একেবারে যাইবে তত দিন স্ত্রী এদেশে সম্পত্তিরূপে থাকিবেন। এক্ষণে ব্রাহ্মদল, সাম্যবাদী দল সকলেই দাসী শব্দ এবালিস করিয়া স্ত্রীকে স্বাধীন করিয়াছেন, আমরা অনুরোধ করি তাঁহাদের স্ত্রীরা যেন স্বামী শব্দ এবালিস করিয়া সেই স্বাধীনতার আরও বৃদ্ধি করেন। স্বামী শব্দ বড় কুপরিচয় দেয়। স্বামী শব্দ যত দিন ব্যবহার থাকিবে ততদিন তাঁহাদিগকে স্বামীর সম্পত্তি বুঝাইবে।

স্ত্রী প্রথমে কেবল যে সম্পত্তিস্বরূপে নিজস্ব হইয়াছিল এমত নহে, ভৃত্যস্বরূপেও নিজস্ব হইয়াছিল। বন্য অবস্থায় কুটীর প্রস্তুত করা, মোট বহন করা, ফল মূল আহরণ করা, এ সকল ভৃত্যের কার্য্য; স্ত্রীরা ভৃত্যরূপে এ সকল করিত। যখন সম্পত্তিস্বরূপা, তখন স্ত্রীর অধিকারীর নাম স্বামী। যখন ভৃত্যস্বরূপা তখন তাহার প্রভুর নাম ভর্ত্তা। এই নামটী আমাদের দেশে অদ্যাপি আছে। এখনকার উন্নত যুবতীরা হয় ত "ভর্ত্তা" শব্দ আর সহ্য করিতে পারিবেন না, সে বিষয়ে ব্রাহ্মবিবাহিতাদের মত কি আমরা এক্ষণে জানি না। কিন্তু স্বামী শব্দ, ভর্ত্তা শব্দ, উভয় শব্দই অপরাধী; উভয়ই কাটা পড়িবার যোগ্য।

কিন্তু আসল কথা, বাঙ্গালার এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে শত বার ভর্ত্তা শব্দ, শত বার স্বামী শব্দ কাটা পড়িলে, অথবা তাহাদের পুরুষেরা, ওরফে "বাড়ীর লোক", শত বার দাসী শব্দ কাটিয়া দিলেও বিবাহিতার দাসীত্ব ঘুচিবে না। কেবল বাঙ্গালায় কেন? ইংলণ্ডে, ফরাসিদেশে, মারকিন দেশে, অন্যান্য সভ্য দেশে অদ্যাপিও প্রকারান্তরে স্ত্রীর দাসীত্ব আছে। তাহাই মোচন করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায়েরা মধ্যে মধ্যে গণ্ডগোল করিয়া থাকেন। এবং Liberty of women বলিয়া নানাপ্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু সংসারের বর্ত্তমান প্রণালীর যত দিন পরিবর্ত্তন না হইবে, তত দিন এইরূপ দাসীত্ব থাকিবে। যত দিন প্রণয়ের, স্নেহের বেগ ও বন্ধন, পরিবর্ত্তন না হইবে, ততদিন এইরূপ দাসীত্ব থাকিবে। তত দিন পতিব্রতারা এ দাসীত্ব আপনারাই পরিয়া আত্মভূষণ করিবে। তবে যেখানে ভক্তি প্রীতি কিছু মন্দা পড়িয়াছে, বা রূপান্তর হইয়াছে, সেখানকার কথা স্বতন্ত্র হইতে পারে।

স্ত্রীর এরূপ দাসীত্ব নিতান্ত অর্থাভাবে নহে। এ দাসীত্ব কেবল উন্নতির জন্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক সম্পত্তির সামিল না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত তাহাদের উপর স্বত্বাধিকার জন্মিতে

পায় নাই অর্থাৎ তাহারা কাহারও নিজস্ব হইতে পায় নাই, সুতরাং সে পর্য্যন্ত তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতা কমিবার কোন উপায় হয় নাই। প্রথম অবস্থায় স্ত্রীলোককে সম্পত্তি জ্ঞান করাই মহা মঙ্গলের বিষয় হইয়াছিল। তাহার পর স্ত্রীর দাসীত্ব দ্বারা সংসার বাঁধিয়াছে, সংসার আঁটিয়াছে, সংসার হইতে সমাজ গড়িয়াছে। দাসীত্বের কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই, তদ্দ্বারা আরও কোন ইষ্টসাধন হইবার সম্ভাবনা এখনও আছে। তাহা সিদ্ধ হইলে দাসীত্ব আপনিই যাইবে।

এই সঙ্গে আর একটা কথা বলিয়া রাখি। এক সময় ভারতবর্ষে ভক্তি, প্রীতি বড় প্রবল হইয়াছিল, সেই সময় ভারতমহিলাদের দাসীত্বও বড় বাড়িয়াছিল; তাহারা সকলেই পতিব্রতা হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে সেই দাসীত্ব এতটা পরিপুষ্ট হইয়াছিল যে, স্বামীর নিমিত্ত স্ত্রীরা অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিত। তাহাদের যুক্তি কি ছিল জানি না। হয় ত তাহারা মনে ভাবিত "সেবায় ভর্ত্তার দেহ আর রক্ষা হইল না, তবে দাসীর দেহে আর কাজ কি? অর্দ্ধ দেহ গেলে অপরার্দ্ধে আর কাজ কি? বরং উভয় অর্দ্ধ একত্রে ভস্মীভূত হওয়া ভাল।" একত্র মরণ, সহমরণ, প্রণয়িনীর একমাত্র অভিলাষ। সে অভিলাষ ভারতে নিত্য পূর্ণ হইতে লাগিল। জর্ম্মণি ভিন্ন আর কোন দেশের কবিরাও কখন এই অভিলাষ ধ্যানেও পান নাই। কিন্তু ভারতে গ্রামে গ্রামে এই নাটক নিত্য অভিনীত হইতে লাগিল। সেই অবধি ভারতমহিলাদের মূলমন্ত্র হইল—আত্মবিসর্জ্জন। এই মহাকাব্য নিজোদ্ভব হইয়াছিল। কবির কাব্য লেখন, সমাজ ও মহাকাব্য উদ্ভাবন করে। কিন্তু সে মহাকাব্য কেহ দেখে না, দেখিতে পাইলেও কেহ বুঝে না। কে বুঝাইয়া দিবে? কোন দেশেই তাহার টীকাকার এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তবে দুই একজন মহাত্মা পূর্ব্বগত সমাজের স্তিমিত উচ্ছ্বাস কখন কখন দূরগত শব্দের ন্যায় মাত্র অনুভব করিয়াছেন। লোকে তাঁহাদের মহাকবি বলে। তাঁহারাই সমাজ-সৃষ্ট মহাকাব্যের টীকা লিখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন। টীকা সম্পূর্ণ না হউক, লোকে তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতেছে। কিন্তু লোকে কেবল টীকাই পড়িল, কেহ কখন মূল আর খুলিল না! মূল সমাজতত্ত্ব!

আমরা যে কথা আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা অনেকক্ষণ ছাড়িয়া আসিয়াছি। বন্য অবস্থায় যাহারা দলপতি, বলবীর্য্যে অসাধারণ, তাহারাই প্রথমে স্ত্রীর স্বামী হয়। একটী দুইটী করিয়া তাহারা ক্রমে বহু স্ত্রীর স্বামী হয়। সর্ব্বদাই পরাজিতদের স্ত্রী লুঠ করিয়া আনে এবং সেই সকল স্ত্রীকে নিজস্ব করিয়া রাখে। ইহাই বহুপত্নীত্বের আদি।

যাহার বলবীর্য্য অসাধারণ তাহারই বহু স্ত্রী। সুতরাং বহুপত্নীত্ব গৌরবের

পরিচয় হইয়া উঠে। তখন অন্য সকলেই সম্ভ্রমের নিমিত্ত বহুস্ত্রী লাভের চেষ্টা করিতে থাকে। প্রধানের অনুকরণ সকল অবস্থাতেই আছে। হীনবলেরা যুদ্ধে স্ত্রী লুঠ করিতে পারে না গোপনে স্ত্রী চুরি করিতে আরম্ভ করে, তাহাতেও সম্মান। সে চুরি বিপক্ষদলের সম্বন্ধে হউক, অথবা নিজ দলের সম্বন্ধে হউক বহুস্ত্রী থাকিলেই সম্মান। বহুপত্নী কেবল বল বীর্য্যের পরিচয় নহে, সঙ্গতিরও পরিচয়, বহুস্ত্রী প্রতিপালন করা অর্থসাপেক্ষ। সুতরাং বর্ব্বর অবস্থায় একপত্নীত্ব হীনবল ও হীনঅর্থের পরিচয়, আর বহুপত্নীত্ব বহু বল ও বহু অর্থের পরিচয়। কাজে কাজেই সকলেই বহু স্ত্রী সংগ্রহের চেষ্টা করে।

কিন্তু তাই বলিয়া সকলেই যে বহুপত্নী লাভ করিবে এমত সম্ভব নহে। যদি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী অধিক জন্মিত তবে সকলেরই বহু স্ত্রী সম্ভব হইত, কিন্তু তাহা জন্মে না। বন্য অবস্থায় পুরুষের সংখ্যা কতক কমিয়া যায় সত্য,—তাহাদের বিপদ অনেক, সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিতে হয়, সর্ব্বদাই ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হয়—কিন্তু তথাপি যে সকল পুরুষ জীবিত থাকে তাহাদের প্রত্যেকের ভাগে বহুপত্নী পড়ে না। কেবল তাহাদের মধ্যে কতক লোক বহুপত্নী লাভ করে।

বহু স্ত্রী নিজস্ব থাকিলে বন্যদেশে অনেক সুবিধা হয়। যাহা পূর্ব্বে নিঃসহায় হইয়া একা করিতে হইত, বহুস্ত্রী দ্বারা তাহা অক্লেশে সুসম্পাদিত করা যায়। নিজস্ব স্ত্রীরা আহার প্রস্তুত করে, কুটীর প্রস্তুত করে, ফল আহরণ করে, চাষ করে, মোট বহন করে, শিকারে তীর যোগায়। এ সকল ত পূর্ব্বে আপনাকে একা করিতে হইত, একা বলিয়া আবার হয় ত তাহা কিছুই সুসম্পাদিত হইত না।

আর এক কথা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে বন্যদের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়া থাকে, তাহাদের স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা কমিয়া যায়। সুতরাং তাহাদের মধ্যে বহুপত্নীত্ব প্রচলিত না হইলে কখন কখন বংশ লোপ পায়। মনে কর তাহাদের একপক্ষের পুরুষেরা মাত্র এক একটী করিয়া স্ত্রী গ্রহণ করিল, অপর পক্ষের পুরুষেরা এক একটী স্ত্রী গ্রহণ না করিয়া প্রত্যেকে বহু স্ত্রী গ্রহণ করিল। এ অবস্থায় বহুপত্নীকদের যে পরিমাণে বংশবৃদ্ধি হইবে, একপত্নীকদের বংশ সে পরিমাণে কদাপি বৃদ্ধি হইবে না। বহুপত্নীকদের সমুদয় স্ত্রী পুত্রবতী হইবে, কিন্তু একপত্নীকদের অনেক স্ত্রী অবিবাহিতা থাকিবে। সুতরাং সংখ্যাপ্রাবল্য হেতু বহুপত্নীকেরা যুদ্ধে বিজয়ী হইবে; আর একপত্নীকের বংশ ক্রমে উচ্ছেদ হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় কথা। বন্য অবস্থায় আত্মরক্ষা অতি কঠিন; পুরুষের সাহায্য

ব্যতীত যুবতীরাই প্রাণ ধারণ করিতে প্রায় অক্ষম, বয়স্থা হইলে ত আর কথাই নাই। আহার অর্জ্জন করা দুর্ব্বল বা পীড়িতের পক্ষে অতি কঠিন, তদ্ব্যতীত হিংস্র জন্তু হইতে উদ্ধার পাওয়া আরও কঠিন। স্ত্রীলোকদের কথা দূরে থাক, সে অবস্থায় পুরুষেরাই অধিক দিন রক্ষা পায় না। আণ্ডামানের মধ্যে চল্লিশ বৎসর বয়স কোন পুরুষেই অতিক্রম করিতে পায় না, সেই বয়সের পূর্ব্বেই তাহাদের বলক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়, আর তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না, সুতরাং মরিতে আরম্ভ করে। এ অবস্থায় স্ত্রীলোকের কথা বাহুল্য। এস্কুইমো জাতির মধ্যে দেখা যায় স্বামী না থাকিলে বয়স্থারা একেবারেই বাঁচে না। অনেক বর্ব্বর জাতির মধ্যে বৃদ্ধা স্ত্রী যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার কারণ অন্য কিছুই নাই। এই সকল দুর্দ্দশার বহুপত্নীত্ব দ্বারা কতকাংশে মোচন হয়। বহুপত্নীতে সকলেই স্বামী পায়, স্বামীর আশ্রয়ে স্ত্রীলোকেরা অপেক্ষাকৃত কিছুকাল বাঁচিতে পারে।

বন্য অবস্থায় বহুপত্নীত্ব মঙ্গলদায়ক, কিন্তু সকল দেশে, সকল অবস্থায় তাহা নহে। মরুভূমি অঞ্চলে বহুস্ত্রী বড় কষ্টদায়ক। যথায় বহুশ্রমেও স্ত্রীগণ আপন আপন উদরান্ন উপার্জ্জন করিতে পারে না, তথায় বহু স্ত্রী অসম্ভব। যাহারা মরুভূমে থাকিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বহুপত্নী গ্রহণ করে তাহাদের অন্নাভাব বৃদ্ধি পায়, সন্তান সন্ততিরা সুতরাং প্রতিপালিত হয় না; দুই এক পুরুষের মধ্যে তাহাদের বংশলোপ হইয়া যায়।

যে আচার ব্যবহার এক সমাজের উপযোগী, তাহা যে অবশ্য অন্য সমাজের উপযোগী হইবে এমত মনে করাই ভ্রম। এই ভ্রম আমাদের দেশে ইদানীং অতি প্রবল হইয়াছে।

এক সমাজে বহুপত্নীত্ব মঙ্গলদায়ক দেখিয়া অন্য সমাজে তাহা জোর করিয়া প্রচলিত করিলে, সে সমাজের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। আমরা পূর্ব্বে ৮৯ সংখ্যক বঙ্গদর্শনে বহুপতিত্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে তিব্বৎদেশের পক্ষে বহুপতিত্ব সম্পূর্ণ উপযোগী; যদি তথাকার অধিবাসীরা এক্ষণে সকলে একবাক্যে বহুপতিত্ব ত্যাগ করিয়া বহুপত্নীত্ব প্রচলিত করে, তাহা হইলে তিব্বৎদেশে আপাততঃ হঠাৎ প্রজা বৃদ্ধি হইবে। প্রজা বৃদ্ধিতে অন্নাভাব হইবে। তথায় যে সংখ্যক লোকের জন্য উৎপন্ন হইতে পারে, এক্ষণে কেবল সেই সংখ্যক লোকের জন্ম হইয়া থাকে। বহুপতিত্ব দ্বারা জন্ম সম্বন্ধে এই বন্দোবস্ত বহুকাল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তদ্বিরুদ্ধে এখন বহুপত্নীত্ব দ্বারা লোকের সংখ্যা বাড়াইলে অন্ন অকুলান হইবে, সকলেই মরিবে। যদি সভ্যতার অনুরোধে তথা হইতে বহুপতিত্ব উঠাইতে চাও, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় কেবল গলাবাজি না করিয়া প্রথমতঃ ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি কর।

যদি তাহা করা সম্ভব হয় এবং যদি কৌশলে সে শক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে আর বহুপত্নীত্ব কিম্বা একপত্নীত্বের সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গও আবশ্যক হইবে না, যাহা সেই অবস্থার উপযোগী তাহা আপনা আপনি উদ্ভাবিত হইবে। সমাজ তাহা আপনিই উদ্ভাবন করিবে। তিব্বৎদেশের বহুপতিত্ব কেহ কখন অনুরোধ করিয়া বা বক্তৃতা করিয়া প্রচলিত করায় নাই। যাহা আবশ্যক এবং সর্ব্বপ্রকারে উপযোগী তাহা বহুদিন ধরিয়া ক্রমে ক্রমে আপনিই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ইংরেজদের সামাজিক নিয়মাদি দেখিয়া আমাদের অর্দ্ধশিক্ষিত যুবারা তাহা অনুকরণ করিতে গেলে এই সকল কারণে সে উদ্যোগ নিষ্ফল হইয়া পড়ে। যাহা এখন আছে, তাহা পরেও থাকিবে। অন্যথার কারণ ঘটিলে, তাহা আপনি অন্যথা হইবে। কদাচ বক্তৃতাদ্বারা অন্যথা হইবে না।

বলা হইয়াছে বন্য অবস্থায় বহুপত্নীত্ব মঙ্গলদায়ক। কিন্তু সেই অবস্থার কিঞ্চিৎ তারতম্য হইলে বহুপত্নীত্ব অনিষ্টদায়ক হইয়া পড়ে, যাহা অনিষ্টদায়ক তাহা ক্রমে লোপ পাইতে থাকে। এই জন্য বিদেশী ব্যবহার দেখিয়া স্বদেশে সেই ব্যবহার প্রচলিত করা কঠিন। যাহা সমাজোপযোগী নহে তাহা অবশ্য লোপ পাইবে কোন মতে প্রচলিত থাকিবে না।

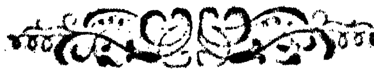
আদিম অবস্থা হইতে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় বহুপত্নীত্ব চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে যতটা ছিল এখন আর ততটা নাই। এক্ষণে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অনায়াসে বলা যাইতে পারে এখানে বহুপত্নীত্বে অনিষ্ট ঘটে, কুলীনেরা তাহার উদাহরণস্থল। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কুলীনেরা বাঙ্গালার প্রধান ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ধনবান্, বিদ্বান্, গুণবান্, কেহ বিদ্যালঙ্কার, কেহ বিদ্যাবাচস্পতি এইরূপ উপাধি তাঁহাদের ছিল। এই অবস্থায় দেবীবর ঘটক অকুলীন হেতু মাতৃসম্মুখে একদিন অপমানিত হন। তিনি সেই অবধি কুলীনের অধঃপতন চেষ্টায় দৃঢ়সংকল্প হইলেন। সাত বৎসর পরে কৌলীন্য ধ্বংসের বীজ বপন করিলেন। তিনি বাক্‌সিদ্ধ হইয়াছেন রাষ্ট্র করিয়া সকলের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিলেন এবং একদিন কুলীনদের সমবেত করিয়া মেল বাঁধিয়া দিলেন। অর্থাৎ কে কোন্ গোষ্ঠিতে বিবাহ করিবে ইহাই নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ঘর বাঁধাবাঁধির পর দেখা গেল অনেক কন্যার বিবাহ হয় না! কোন গোষ্ঠিতে কন্যা বিস্তর কিন্তু তাহার "পালটী" গোষ্ঠিতে পুত্র অল্প। সুতরাং তাহাদের মধ্যে ক্রমে বহুপত্নীত্ব আরম্ভ হইল। বহুপত্নীত্বের সঙ্গে সঙ্গে কুলীনদের একেবারে অধঃপতন হইয়া গেল। যাঁহারা দেশের শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা এখন দেশের অপকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। তাঁহাদের বিদ্যা

নাই, বুদ্ধি নাই, ধন নাই, আছে কেবল অভিমান। আজন্ম পরান্নে প্রতিপালিত, পিতৃস্নেহে, পিতৃযত্নে বিবর্জ্জিত। বন্য অবস্থায় যখন বহুপত্নীত্ব প্রচলিত থাকে, তখন পিতা অপরিচিত বলিয়া সন্তানের যে দুর্দ্দশা ঘটে, কুলীন বংশীয়দের বাঙ্গালায় সেই সকল দুর্দ্দশা ঘটিতে লাগিল। হতভাগ্যদের দাঁড়াইবার স্থান নাই, সংসার নাই; আবার, বলিলে বলা যায় যে তাহাদের বিবাহও নাই। তাঁহারা যে বিবাহ করেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস, সে বিবাহে কেবল মন্ত্রপড়া মাত্র। আমরা একবার একটী কন্যাকে পুষ্পবৃক্ষের সহিত বিবাহ দিতে দেখিয়াছিলাম; কন্যাটী বড় হইল, পুষ্পবৃক্ষও বড় হইল, কিন্তু পুষ্পবৃক্ষ কখন কন্যাটীকে লইয়া সংসার করিল না। দেখিতাম কন্যাটী মধ্যে মধ্যে পুষ্পবৃক্ষে জল দিত; লোকে জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া বলিত আমি কুলীনের স্ত্রী। সত্য কথা!

কুলীনদের অধঃপতন দেখিয়া বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে বহুপত্নীত্ব আর বাঙ্গালার উপযোগী নহে।

কুলীন ব্যতীত আর কোন সম্প্রদায় মধ্যে রীতিমত বহুপত্নীত্ব প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় না; যাঁহারা পুত্র কামনায় বা কোন মন্ত্রণায় পড়িয়া একাধিক বিবাহ করেন তাঁহাদের লইয়া বহুপত্নীত্বের ফলাফল বিচার হয় না।

আমাদের দেশে এক্ষণে কেবল এক প্রকার বহুপত্নীত্ব প্রচলিত। এই জাতীয় বহুপত্নীত্বে পত্নীরা প্রায়ই পরস্পর নিঃসম্পর্কীয়া। কিন্তু পূর্ব্বে সহোদরারাই সপত্নী হইত, একজনের সঙ্গে সমুদয় সহোদরার বিবাহ হইত। জ্যেষ্ঠা ভগিনী যাহার স্ত্রী, কনিষ্ঠাও তাহারই স্ত্রী। সে প্রথা গিয়াছে কিন্তু সে অবস্থার সম্ভাবণ কতকটা অদ্যাপি থাকিয়া গিয়াছে।



প্রকৃতি।*

সাধারণতঃ মানবসমাজের একই ধারণা,—তাঁহাদের সমাজ প্রকৃতির অনুকরণ মাত্র। সুতরাং তাহার ফল এই হইয়াছে যে প্রকৃতি বা স্বভাব সকল দেশে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। সেই অর্থ একটু ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে বড় গোল বাঁধিয়া যায়। বুঝা যায় যে প্রকৃতির মৌলিক অর্থ লুপ্ত

* Nature; Vide Three Essays on Religion By J. S. Mill.

হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের নামে প্রতিবাদে যেমন পাপাচার অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, স্বভাবের অর্থবিকৃতিতে তেমনি আমাদের রুচি ও নীতি সর্ব্বথা কলঙ্কিত হইয়াছে। এবং অনেক সময় ভ্রমাত্মক দর্শনশাস্ত্র বা ভ্রমসঙ্কুল ব্যবহারশাস্ত্র পর্য্যন্ত প্রণীত হইয়াছে। স্বভাবের দোহাই দিতে পারিলে সকলেই একরূপ নিরাপদ। ধার্ম্মিকের প্রধান সহায় এই স্বভাব;—Intuition বা সহজ জ্ঞান। পাপী অনেক সময় স্বভাবের দোহাই দিয়া বাঁচিতে চায়; এবং যেখানে সমাজ বিচারক, সেখানে তাহার মুক্তি অনেক সময় নিশ্চিত। ছেলে যদি পিতামহীর আদর পাইয়া বহিয়া গিয়া নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে, তবে পিতার মন খুলিয়া তাহাকে শাসন করিবার যো নাই।—গৃহে মাতা দোহাই দিবেন সেই স্বভাবের। শাসনার্থী পুত্রকে বুঝাইয়া দিবেন যে ছেলেবেলায় তিনিও তেমনি দুরন্ত ছিলেন! যৌন কারণে অনুদিন সমাজে যে অশান্তি উপস্থিত হয়, তাহার যথোচিত শাসনের দিকে আমাদের তত মনোযোগ নাই। কেন না সমাজ জানেন, প্রকৃতির শাসন কেবল কথার কথা মাত্র। এইরূপে দেখান যায় যে প্রকৃতির অতি কদর্থ সমূহ দুষ্ট শোণিতের মত সমাজশরীরের অস্থি মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত তাহা সমাজকণ্ঠে লাগিয়াই রহিয়াছে। তাহা জীর্ণ হইবার নহে;—সহজে উদ্গীর্ণ হইবারও নহে!

প্রকৃতির এইরূপ অর্থবিকৃতিতে মানবসমাজ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছে। নীতিবীর মিলের তাহা সহ্য হইল না। তাই তিনি প্রকৃত বীরপুরুষের মত চিরাচরিত কুসংস্কার ভেদ করিয়া প্রকৃতি সম্বন্ধে অপূর্ব্ব প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার "Liberty" র ন্যায় এই প্রবন্ধ অনেকের কাছে দৈব প্রসাদস্বরূপ গণ্য। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে সেই মহৎ প্রবন্ধই অবলম্বন।

প্লেটোর রীতি অবলম্বন করিয়া মিল বিশেষ (particular) অর্থের দ্বারা, সাধারণ (general) অর্থ স্থির করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি প্রকৃতির অর্থ নির্ণয় করিতে গিয়া কোন্ পদার্থের প্রকৃতি কাহাকে বলে প্রথমতঃ তাহাই দেখাইয়াছেন। অগ্নি বা জল, উদ্ভিদ বা জন্তুবিশেষের প্রকৃতি কি? উত্তর—সেই সেই পদার্থের একীভূত শক্তি বা গুণই তাহার প্রকৃতি। অতএব এক পদার্থ অন্য পদার্থের উপর যে প্রণালীতে আপন শক্তি প্রয়োগ করে, অথবা অন্যের শক্তি দ্বারা যে প্রণালীতে পরিচালিত হয়, তাহাকেও সেই পদার্থের প্রকৃতি বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞানবান্ জীবের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে, সাধারণ শক্তির উপর তাহার অনুভব শক্তি এবং হিতাহিত জ্ঞানের শক্তিও ধর্ত্তব্য। বস্তুবিশেষের প্রকৃ-

তির অর্থ এইরূপে স্থির করিয়া প্রকৃতির সাধারণ অর্থ বুঝা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। সকল পদার্থের একীভূত শক্তি বা গুণসমষ্টির নামই প্রকৃতি। এই চরাচর বিশ্বে যে সকল ব্যাপার নিত্য ঘটিয়া থাকে এবং ঘটিতে পারে, তাহারা ও তাহাদের কারণ সমূহ সেই প্রকৃতি। কারণসমূহের যে শক্তিপরম্পরা আজিও অপরিণতাবস্থায় রহিয়াছে তাহারাও সুতরাং পরিণত শক্তির মত প্রকৃতিরই অঙ্গ। মনুষ্য এতকাল ধরিয়া প্রকৃতির যে সকল ব্যাপারকে নিয়মিতরূপে এবং যথাসময়ে ঘটিতে দেখিয়াছে, তাহাদিগকেই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া স্থির করিয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি নিয়ম সাধারণ, আর কতকগুলি বিশেষ। মাধ্যাকর্ষণের যে শক্তি, তাহা সকলের পক্ষেই প্রযুজ্য, এজন্য সেটী সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম। জীবমাত্রের পক্ষে বায়ু ও খাদ্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, এই চিরজ্ঞাত সত্যের যদি ব্যভিচারস্থল না থাকে, তবে ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম; কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের মত সাধারণ নিয়ম নহে,—প্রকৃতির বিশেষ নিয়ম মাত্র।

সুতরাং সহজ অর্থে, প্রকৃত এবং সম্ভব ঘটনাবলীর একীভূত নামকেই প্রকৃতি বলে। আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, যে প্রণালীতে সংসারে ব্যাপার সকল ঘটিতেছে—তাহার কতক আমরা জানি, কতক বা জানি না—সেই প্রণালীর নামই প্রকৃতি।

প্রকৃতির এই সংজ্ঞাই ঠিক বটে কিন্তু তথাপি গোল মিটিল না। অর্থ সম্বন্ধে শিল্প (Art) ও প্রকৃতি। (Nature) চিরদিন পরস্পরের বিরোধী। প্রকৃতির উপস্থিত অর্থে চিরদিনের সেই বিরোধ লোপ হইয়া যাইবার কথা। কেন না এখন বুঝা যায় যে আর আর সকলের মত শিল্পও প্রকৃতির অঙ্গমাত্র। যাহা কিছু শিল্প তাহাই কৃত্রিম, সুতরাং তাহাই প্রাকৃতিক; শিল্পের নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব কিছুই নাই। কোন একটা প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য মনুষ্যেরা প্রাকৃতিক শক্তির নিয়োগ করে। সেই নিয়োগের ফলে শিল্পের জন্ম। চিরদিন ধরিয়া হাজার চেষ্টা করিয়াও কেহ কখন নূতন সত্তার সৃষ্টি করিতে পারিল না,—কখন পারিবেও না। আমরা কেবল প্রাকৃতিক সত্তার সহায়ে যাহা কিছু করিতে পারি। প্রকৃতির যে যে শক্তিপ্রভাবে প্রবল ঝড়ে গগনস্পর্শী বৃক্ষও উন্মূলিত হয় এবং জলে ভাসিতে থাকে, সেই সেই শক্তি সহায়ে জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া আমরা বিজ্ঞানের বাহাদুরী দেখাই। অরণ্য কুসুম সকল নির্জ্জনে, নীরবে ফুটিয়া, আপনাদের রূপ সৌরভের পরিচয় কাহাকেও না দিয়া যে নিয়মে ফলে পরিণত হয়, আমাদের জীবনযাত্রার উপায় স্বরূপ শস্য সকলও সেই নিয়মে জন্মে। এই সকল ব্যাপার মানুষের কাজ—অতি সামান্য;—কেবল জিনিস গুলিকে স্থানান্তরিত করা মাত্র।

দুইটা জিনিস স্বতন্ত্র আছে, আমরা মিলিত করিলাম ; অথবা মিলিত আছে, আমরা পৃথক্ করিয়া দিলাম। এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তনে, প্রকৃতির নিদ্রিত শক্তি সকল সুপ্তোত্থিত মহাবল সিংহের মত জাগিয়া উঠে এবং তখন কার্য্যে পরিণত হয়। সেইরূপ আমাদের হৃদয়ের যে কিছু বল, যে কিছু বিকাশ ; শারীরিক যে কিছু সামর্থ্য, যে কিছু স্ফূর্ত্তি সে সকল আর কিছুই নহে ; প্রাকৃতিক নিয়ম মাত্র।

এইরূপে মিল প্রকৃতির দুইটী প্রধান অর্থ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এক অর্থে অন্তর ও বহির্জগতের শক্তিসমূহ এবং তাহাদের কার্য্যগুলি প্রকৃতি। দ্বিতীয় অর্থে প্রকৃতি মনুষ্যগন্ধমাত্র বিরহিত ;—যাহা কিছু মানবসহায়তা ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয়, তাহাই প্রকৃতি। বলা বাহুল্য, যে নিতান্ত সূক্ষ্মদর্শীর নিকট এখনও গোল মিটিল না। যাহা হউক, বিচারের পথ এক্ষণে নিষ্কণ্টক হইয়া আসিয়াছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে স্বীকৃত অর্থ দুইটীর মধ্যে, কাহার দোহাই দিয়া মানুষ প্রকৃতিকে প্রশংসা ও নীতির আদর্শ মনে করে? কোন্ প্রকৃতি দেবতার নাম গ্রহণ করিলেই পাপ পুণ্যের ভেদ থাকে না, সুন্দর, কুৎসিত সব সমান হইয়া যায়? আর মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত বিষম লোকলজ্জা ভয় পর্য্যন্ত কাহার নামমাহাত্ম্যে শক্তিহীন হইয়া পড়ে?

প্রকৃতির প্রথম অর্থ,—যাহা কিছু সংসারে আছে তাহাই ;—সকল পদার্থের একীভূত শক্তি ও গুণসমূহ। আমরা কি এই প্রকৃতির অনুকরণ করিতে যাই? কিন্তু এজন্য আবার অনুরোধ কেন? যাহা না করিলে নহে, গত্যন্তর নাই, তার জন্য অনুরোধ করিলে যেন তামাসা করা হয়। উপস্থিত অর্থে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকলেই প্রকৃতির অন্ধ দাস মাত্র। এমন কাজ কিছুই হইতে পারে না, যাহা এই অর্থে প্রকৃতিসঙ্গত নহে। কার্য্যমাত্রেই প্রাকৃতিক শক্তির আন্দোলন এবং তাহার পরিণাম, প্রকৃতির কোন না কোন নিয়মের অধীন। মনে করুন আমার আহার করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। আহারের চেষ্টা ও উদর পূর্ত্তি দুইই প্রাকৃতিক নিয়ম। আমি যদি ক্ষীরের বাটী ভাবিয়া বিষপাত্র হস্তে লইয়া ক্ষুধার জ্বালায় সদ্য প্রাণহারক হলাহল পান করিয়া ভূতের দেহ ভূতে মিশাই, তবে কি আমি কোন অস্বাভাবিক কার্য্য করিলাম? অতএব প্রকৃতিকে এই অর্থে অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া হাস্যভাজন হওয়া উচিত নহে। আমরা এই মাত্র শিক্ষা দিতে পারি যে বিশেষ কার্য্যে বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়োগ করা বিহিত। মনে করুন কেহ অতি সঙ্কীর্ণ অথচ অরক্ষিত সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইবেন। সেখানে যদি তিনি সমসংস্থিতির নিয়মের সহায়তা গ্রহণ

করিয়া পার হইতে চান, তবে তাঁহার কোন ভয় নাই। কিন্তু তখন মাধ্যাকর্ষণশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেলে তাঁহার নিমজ্জন নিশ্চিত।

অতএব এই অর্থে প্রকৃতিকে মানুষের আদর্শ বলা বাতুলের কাজ। তথাপি এই অর্থেও আমাদের পরম লাভ আছে। বেকন্ বলিয়াছিলেন যে আমরা প্রকৃতির আজ্ঞাবহ হইয়াও উহার প্রভু হইতে পারি। প্রকৃতির সম্যক্ শক্তি হইতে আমরা আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না বটে, কিন্তু যত্ন করিলে বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি হইতে অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারি। অবস্থা পরিবর্ত্তনে প্রাকৃতিক শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং কোন লক্ষ্য সাধন করিবার সময়, উচিত বোধ হইলে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা প্রাকৃতিক শক্তিবিশেষের বলের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারি। এই কথা বুঝিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী পর্য্যালোচনা করা মনুষ্যমাত্রের কর্ত্তব্য। এতদিন ইহা বুঝিলে মনুষ্য উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিত। সেই কথা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই একদিন ইউরোপের ঘোর অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের তিমির মধ্যে জ্ঞানচক্ষুতে বেকন ভাবী জ্যোতির আভাস দেখিয়াছিলেন। সে কথা বুঝেন নাই বলিয়াই আর্য্য ঋষিগণ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক দুঃখের ভাবনায় সুখময় শান্তিময় সংসার ছাড়িয়া, সোণার ভারতবর্ষ শ্মশানে পরিণত করিয়া, কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।*

মানুষের ধৈর্য্য ও বুদ্ধিবৃত্তির যত বিকাশ হইবে, ততই মানুষ প্রকৃতির নিয়মাবলী আলোচনা করিয়া নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে শিখিবে। প্রকৃতির অনুকরণ করিবে না। অনুকরণের সঙ্গে সম্বন্ধ নীতির। ভাল, দেখা যাউক প্রকৃতির দ্বিতীয় অর্থে এই নীতির ভাব ঠিক থাকে কি না।

দ্বিতীয় অর্থে প্রকৃতি মনুষ্যগন্ধমাত্র বিরহিত;—সংসারে যাহা কিছু মানবসহায়তা ব্যতীত নিষ্পন্ন হয়, তাহাই প্রকৃতি। এ অর্থে কি প্রকৃতি আমাদের অনুকরণীয়? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, অনুকরণের কথাটা এ স্থলেও অর্থহীন। প্রকৃতিকে যদি অনুকরণই করিব, তবে উহাকে নিজের উপযোগী করিবার জন্য পরিবর্ত্তিত ও উন্নীত করিয়া লইব কেন? সংসার ধর্ম্মের সকল ব্যাপারই ত কৃত্রিম। কৃত্রিম যদি প্রাকৃতিক অপেক্ষা মনুষ্যের

* লেখক প্রবন্ধে স্বাক্ষর করিয়াছেন, ভরসা করি কোন পাঠকই ইহা সাধারণতঃ বঙ্গদর্শনের মত বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। "আর্য্য ঋষিরা ভারতবর্ষকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছিলেন"—ঠিক ইহার বিপরীত মতই বঙ্গদর্শনে অনেক সময়ে সমর্থিত হইয়াছে। বং সং

পক্ষে হিতকর না হইত, তবে ইষ্টক প্রস্তরে সৌধমালা রচনা করি কেন, বন জঙ্গল কাটিয়া অপূর্ব্ব নগর নির্ম্মাণ করি কেন, প্রবল প্রবাহের উপর সেতু নির্ম্মাণ করি কেন, ছত্রের আশ্রয়ে তাপ জলের অত্যাচার নিবারণ করি কেন, আহার্য্য পাক করিয়া লই কেন? মানুষের পক্ষে প্রকৃতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সর্ব্বসন্তোষবিধায়িনী হইলে, মানুষকে এত পরিশ্রম করিতে হইত না। সংসারের ঘোর জীবন সংগ্রামে তাহা হইলে মনুষ্যকে প্রতিপদে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না।

আবার, আমরা যাহাকে নীতি বলি প্রকৃতিতে তাহার সকলই বিপরীত। যে সকল কার্য্য অহরহঃ প্রকৃতি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, মানুষ তাহার সহস্রাংশের একাংশ করিলেও গুরুতর শাস্তি পাইবার যোগ্য। আমরা কি সাধারণ জন্তুগণের আচার ব্যবহার দেখিয়া স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে বসিব? যে আত্মসংযম, যে সতীত্ব সমাজে নরনারীর ভূষণ, যাহার বলে ইহসংসার স্বর্গে পরিণত হইয়াছে, প্রকৃতির কথা শুনিতে গেলে ত তাহা বিসর্জ্জন দিতে হয়! দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার প্রকৃতিতে সদাই দেখিতে পাই। সিংহ পশুর রাজা—কেন না সিংহ বলবান্, একাই অনেক জন্তুর জীবন সংহার করিয়া উদর পূর্ত্তির সামর্থ্য শরীরে ধারণ করেন। ভাল, প্রকৃতির অনুকরণ কর্ত্তব্য হইলে আমরা অত্যাচারী জমীদারের কবল হইতে নিত্য দুর্ভিক্ষপীড়িত কপর্দ্দকশূন্য, দুর্ব্বল অনক্ষর প্রজাগণকে উদ্ধার করিবার জন্য চীৎকার করিয়া মরি কেন? প্রকৃতি বলিতে কোন্ ভাগ অনুকরণের উপযুক্ত? প্রকৃতি যখন রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ভীষণ বাত্যা বা বন্যার উচ্ছ্বাসে অসংখ্য জীবের প্রাণনাশ করেন, অসংখ্য জীবের জীবিকা হরণ করিয়া প্রাণনাশের পথ পরিষ্কৃত করিয়া রাখেন; তার পর অবিচলিতচিত্তে, রাক্ষসী গাম্ভীর্য্যে শান্তি লাভ করেন প্রকৃতির সেই ভাব, সেই বেশ আদর্শ করিয়া কি কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিব? শুধু তাহাই নহে। প্রকৃতিকে অনুকরণ করিতে গেলে কি মনুষ্যকুলরত্ন সাম্যবাদিগণ কোন কাজ করিতে পারিতেন? রুসো সেই চেষ্টা পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার কৃত কার্য্যে যত অনিষ্ট হইয়াছে, ইষ্ট তত হয় নাই। বৈষম্যই প্রাকৃতিক নিয়ম, সাম্য তাহার ব্যভিচার মাত্র। রোমের জগদ্‌গুরু পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিতেন না যে মানুষে মানুষে সমান এবং দাসত্ব মহাপাপ। এ সংসারে জলে জল বাঁধে, তৈলাক্ত শিরে তৈল বর্ষিত হয়। যাহার ধন সম্পদ মানের অবধি নাই, সেই আবার অধিকতর সম্মান, অধিকতর সম্পদ লাভ করে। যে সুন্দর, যে পবিত্র, যে উন্নত; সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা এবং উন্নতি তাহার নিত্য সহচর।

আর যাহার ভাঙ্গা কপাল ? তাহার কপাল আরও ভাঙ্গে ! একবার যে পাপ করিল, আর তার উদ্ধার নাই। কোথা হইতে পাপের শক্তিসমূহ একত্রিত হইয়া দুর্দ্দম বলে তাহাকে পাপের পথে আরও অগ্রসর করে। "যেমন জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জ্জগতে পাপের আকর্ষণে, প্রতিপদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয়।"

মুখে স্বীকার করুক বা না করুক কার্য্যে মানুষ প্রতিপদে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সামাজিক সুখে সুখী হইয়াছে। একদিন সমবেত শিষ্যসম্প্রদায়কে নরদেব সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন "আমি প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজয় করিয়া তবে নীতির বলে বলীয়ান্ হইয়াছি।" যিনি মহাত্মা, তিনিই তাহা করেন। যাহাকে আমরা instinct বা পশুবুদ্ধি বলি তাহা অবশ্য জীবমাত্রেরই পক্ষে সাধারণ। এই পশুবুদ্ধি কি ধর্ম্মভাবের সহায়কারিণী ? পশুবুদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট শক্তি হিংসাবৃত্তি। এই হিংসাবৃত্তি সংসারবন্ধনের, সামাজিক শুভস্থাপনের একমাত্র বিঘ্নকারিণী। প্রতি পদে এই বৃত্তিকে দমন করিয়াছে বলিয়াই মানুষ এত উন্নত হইয়াছে। এখন মানুষ পরের দুঃখে আত্মবিস্মৃত হয়, পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলী দেয়। মহাত্মা ডার্ব্বিন দেখাইয়াছেন যে কালক্রমে মনের সামাজিক বৃত্তিসমূহ শিক্ষা-প্রভাবে পশুবৃত্তির উপর আশ্চর্য্য আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। যাহাকে আমরা হিতাহিত জ্ঞান বলি তাহা আর কিছুই নহে, তাহা সামাজিক বৃত্তির পূর্ণ শক্তি মাত্র। মানুষ যদি প্রকৃতিস্রোতে ভাসিয়া আত্মসংযম করিতে না পারিয়া কখন পাপ করিয়া বসে, তবে এই সামাজিক বৃত্তি ভ্রূকুটি করিয়া তাহাকে শাসন করে। এইরূপে দেখান যায় যে আমরা প্রকৃতিকে যতই দমন করিতেছি, ততই সংসারে পাপস্রোত কমিতেছে। যে নৈতিক বল, যে পবিত্রতা আমাদের সকল সুখের আকর, তাহা মানুষেরই সৃষ্ট ;—প্রকৃতি তাহার নেতা বা বিধাতা নহে।

অতএব প্রকৃতির ঠিক অর্থ আমরা যতই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, ততই মঙ্গল। মানুষ এখন প্রকৃতিকে পবিত্রতারূপিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী—সুতরাং আমাদের আদর্শ—বলিয়া জানে অথচ কার্য্যে ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করে। অতীতসাক্ষী ইতিহাস বলিয়া দেয় যে এমন দিনও ছিল যখন লোকে ভাবিত যে শিল্পীরা ঐশী শক্তির অবমাননা করে। পোত নির্ম্মাণ ও সমুদ্রযাত্রা এক দিন ইউরোপে অধর্ম্ম্য কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। আমাদের দেশে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ বিধির অন্তরালে ঐরূপ একটা কিছু রহস্য লুকান আছে বোধ হয়। প্রকৃতিকে সাক্ষাৎ ঐশী শক্তি জানিয়াও

যখন মনুষ্যেরা প্রতি পদে প্রয়োজনানুরোধে তাহাকে পরিবর্ত্তিত ও পরিশোভিত করিয়া লইতে বিমুখ হয় নাই, তখন প্রকৃতির ঠিক অর্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় অনেক স্থায়ী উপকার হইতে পারিবে। মিলের ধ্রুব বিশ্বাস তাহাই। বাস্তবিক যে নৈতিক শিথিলতা, পাপের প্রতি যে অন্যায় সহানুভূতি আজিও মানবসমাজ কলঙ্কিত করিতেছে, প্রকৃতির প্রকৃত অর্থ সাধারণের ধারণা হইলে তাহা আর থাকিবে না। মানবসমাজের সেই উচ্চ ভাব, সেই অপাপবিদ্ধতা কল্পনা করিলেও অপরিমেয় সুখ আছে।

অন্যের কথা যাহাই হউক, স্বভাবের দোহাই দিয়া সাধারণতঃ কাব্যশাস্ত্রের প্রতি বড় অবিচার করা হয়। চিরদিন সেইরূপ অবিচার হইয়া আসিতেছে। প্রায় সাড়ে পনর আনা লোকের ধারণা যে কাব্য কেবল প্রকৃতির যথাযথ চিত্র মাত্র। একবার তাঁহাদের মনে হয় না যে প্রত্যক্ষ থাকিতে নকল দেখিবার জন্য পুস্তকের অন্বেষণ করিব কেন? যে হিমালয় দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে, সে আবার পরিশ্রম করিয়া কালিদাসের হিমালয় বর্ণনা পড়িতে যাইবে কেন? অতএব কাব্য প্রকৃতির যথাযথ অনুকৃতি নহে। সৌন্দর্য্য লইয়াই কাব্য;—প্রকৃতি অনন্ত সৌন্দর্য্যরূপিণী। তবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ নহে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিচ্ছিন্ন এবং সে সৌন্দর্য্য নৈতিক বলে সুকুমার নহে। কাব্যের সৌন্দর্য্য পূর্ণতায় বিভাসিত এবং কাব্যের সৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। কাব্যের সৃষ্টি অপূর্ণ বহির্জ্জগতের ভিত্তিতে নির্ম্মিত বটে কিন্তু সে সৃষ্টি উন্নততর। বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রবাহে অন্তরসৌন্দর্য্যপ্রবাহ মিশাইয়া কবি অপূর্ব্ব সৃষ্টির অবতারণা করেন। তিনি শারীরিক বলে ধর্ম্মবল প্রয়োগ করেন। যে রাম বা যুধিষ্ঠির কবির মোহময় শক্তির ফল; সংসারে, প্রকৃতিতে তাহা সুলভ নহে। সীতার সেই পবিত্রতা, দেসদিমোনার সেই সতীত্ব গর্ব্ব, শকুন্তলার সেই কমনীয়তা, মিরন্দার সেই সরলতা অপার্থিব;—প্রকৃতিতে ত তেমন কিছু দেখিতে পাই না! যে কবি সে কথা মানেন না, তাঁহার স্থান বটতলায় নির্ণীত হইয়া থাকে।

এ সংসারের প্রধান শিক্ষক কবিগণ। মনুষ্যলোকে তাঁহাদের ন্যায় মানসিক শক্তিসম্পন্ন আর কেহই নহে। ধার্ম্মিক বা নীতিবেত্তা, দার্শনিক বা ব্যবহারশাস্ত্রবিৎ, প্রকৃতির প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাই মনুষ্য গুরুতর ভ্রমে পড়িয়া প্রকৃতিকে চিরদিন আদর্শ মনে করিয়া আসিয়াছে। কেবল জগৎগুরু কবিগণের সে ভ্রম হয় নাই। তাঁহারা প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন যে প্রকৃতি কদাপি অনুকরণীয় নহে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।



সভার কার্য্যনির্ব্বাহবিষয়ক বিধি।

হৌস অফ কমন্স সভার সহকারী ক্লার্ক শ্রীযুক্ত পালগ্রেভ সাহেব বিরচিত 'চেয়ারম্যান্‌স্‌ হ্যাণ্ডবুক' নামক ইংরাজী গ্রন্থ হইতে ভাষান্তরিত। ভবানীপুর যন্ত্র। মূল্য ৷৷০ আনা।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন লিখিবার বিষয় এত থাকিতে, এ গ্রন্থ কেন? অনুবাদক তাহার উত্তর কতকটা দিয়াছেন। "এতদ্দেশে এখন যে সমস্ত সভা ও কমিটী সংস্থাপিত হইতেছে তাহার আদর্শ ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট। সাক্ষাৎকল্পে না হউক নিগূঢ় সম্বন্ধে বটে তাহার সন্দেহ নাই। ঐ সকল সভার কার্য্যনির্ব্বাহের সাহায্য, অন্ততঃ পার্লি-য়ামেণ্টের কার্য্যপ্রণালী ও তৎসংসৃষ্ট ইংলণ্ডের ইতিবৃত্ত বুঝিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে এই সংস্কার বশতঃ এই অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই পুস্তকের সার কথা আমাদিগের স্বদেশবাসিগণের বোধগম্য করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ প্রণালী অবলম্বন করা অসাধ্য না হইতে পারে। কিন্তু এতদ্বিষয়ে মূল গ্রন্থকারের যে ব্যুৎপত্তি এবং খ্যাতি আছে তাহার আশ্রয় পাইবার আশা করিলে অনুবাদ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

"অনুবাদক পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্যপ্রণালীকে যে একান্তচিত্তে ভক্তি করেন এমন নহে। কিন্তু ঐ প্রণালী বুঝিলে এদেশের লোক স্বকীয় বুদ্ধিমতে দলাদলি করিবার জন্যে সম্ভবতঃ একটি সুচারু পদ্ধতি ক্রমশঃ সংস্থাপন করিয়া উঠিতে পারেন। পল্লিগ্রামের দলাদলি এখনকার উপহাস স্থল হইলেও উহাই আমাদিগের প্রকৃতি সঙ্গত অনুষ্ঠান হয়; ঐ প্রথার পূর্ণ লোপ সম্ভব বোধ হয় না, এবং তাহা বাঞ্ছনীয় কি না আরো সন্দেহের স্থল। পার্লিয়া-মেণ্টের কার্য্যও বাস্তবিক আমাদিগের দলাদলি হইতে বড় বিভিন্ন নয়। পরন্তু এ সমস্ত ঘরের কথা। ইংরাজিমতে ইংরাজের সঙ্গে একত্রে সভার কার্য্য করিতে হইলে এই সকল পার্লিয়ামেণ্টের নিয়মের প্রতি উপেক্ষা করা বর্ত্তমান অবস্থায় সুবুদ্ধির কার্য্য নহে।"

এ দেশে আজি কালি বিস্তর লোক আছেন, যাঁহারা রোডশেষ কমিটির মেম্বর, ব্রাঞ্চ রোডশেষ কমিটির মেম্বর,

মিউনিসিপল কমিটি, ডিস্পেনসরি কমিটি, ড্রেনেজ কমিটি প্রভৃতি কমিটির মেম্বর; সম্প্রতি Self goverment ওরফে "আত্মশাসন" ওরফে "স্বায়ত্ত শাসনের" আবির্ভাবে এই শ্রেণীর লোক আরও বাড়িবে। তদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র লোক সর্ব্বদা এখানে এসোসিয়েশন, ওখানে ক্লব, সেখানে পব্লিক মিটিং প্রভৃতিতে সমবেত হয়েন। তাঁহারা অনেকেই জানেন না, যে এই সকল সভার কার্য্যপ্রণালী কোথা হইতে আসিল? মোশন, ভোট, আমেণ্ডমেণ্ট, প্রভৃতির মূল কোথায়? সকলই সেই পার্লিয়ামেণ্ট কার্য্যবিধির অনুকরণ। সেই কার্য্যবিধি সবিশেষ অবগত না থাকাতে অনেকেই রীতিবিপরীত কাজ করিয়া সভামধ্যে উপহাসাস্পদ হয়েন। অতএব এ দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এ সকল নিয়ম অবগত হওয়া উচিত—কেন না সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এই সকল সভার কাজে লিপ্ত। বিশেষ সেল্‌ফগবর্ণমেণ্টের বিস্তারে এইরূপ কাজের বিশেষ বিস্তার হইতে চলিল; এখন, এইরূপ গ্রন্থ সকলের ঘরেই থাকা চাই। এসময়ে এ গ্রন্থের অনুবাদ প্রচারের জন্য আমরা অনুবাদককে ধন্যবাদ করি। অনুবাদক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুপণ্ডিত লেখক, সুতরাং অনুবাদের প্রশংসা করা বাহুল্য।

বন-প্রসূন। শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় বিরচিত। কলিকাতা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র। ১৮৮২। মূল্য ৺৹ আনা।

"বনপ্রসূন" নাম শুনিয়াই পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন এখানি কাব্য গ্রন্থ; ইহাতে কতকগুলি কবিতা আছে। আর "মুখোপাধ্যায়" শব্দ ব্যবহার সত্বেও পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন, যে ইহা কোন মুখুয্যা মহাশয়ের লিখিত নহে—শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবীর রচিত। শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী, দেবী সংজ্ঞায় যে অসন্তুষ্ট. শচী সরস্বতী লক্ষ্মী প্রভৃতি যে নামের অনুরাগিণী, তাহা ছাড়িয়া, "মুখোপাধ্যায় মহাশয়া" হইতে কামনা করেন, আমরা এ রুচির প্রশংসা করি না। কিন্তু কোন্দল ছাড়িয়া দিই—ও বিদ্যায় আমরা শ্রীমতীগণের সমকক্ষ হইবার প্রত্যাশা রাখি না।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ার কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে তিনি ক্ষমতাশালিনী বটে। স্ত্রীলোকের কবিতার বেশী প্রশংসা করিতে আমরা বড় ভয় পাই—পাছে উৎসাহ দিলে গৃহিণীর দল, গৃহকর্ম্ম ছাড়িয়া সকলেই কাগজ কলম লইয়া বসেন! তাহা হইলে গরিব পুরুষের দল একমুঠা অন্ন পাইবে না।

অতএব শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়, আমাদের একটু মার্জ্জনা করিবেন—আমরা একটু কম করিয়া প্রশংসা

করিব। পুরুষ গ্রন্থকার হইলে আমরা এ ভিক্ষা করিতাম না; পুরুষের এত ক্ষমা-গুণ প্রকাশের ক্ষমতা নাই। কিন্তু স্ত্রী-লোকেরা মিনিটে মিনিটে পাঁচ দিক হইতে পঞ্চাশ রকম প্রশংসা পাইতেছেন —রূপের প্রশংসা—বস্ত্রালঙ্কারের প্রসংশা, গৃহিণীপনার প্রশংসা—রান্নার প্রশংসা—শিল্পকার্য্যের প্রশংসা—আর ব্যক্তিবিশেষের কাছে বিনা দাবি দাওয়াতে ছবিয়েক রকমের প্রশংসা দিনে ও রাত্রে পাইয়া থাকেন। তাঁহারা কাজে কাজে বাজে লোকের বাজে প্রশংসা একটু কম করিয়া লইতে পারেন। অতএব আমরা এই গ্রন্থকর্ত্রীর অন্যান্য গুণের প্রশংসা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার কাব্যগত সাহসের প্রশংসা করিব। সকলেই জানেন, বাঙ্গালায় সাহিত্যসংগ্রামক্ষেত্রে, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্বিতীয় মহারথী। তাঁহার প্রতি শরসন্ধানে সাহস করে বাঙ্গালার পুরুষ লেখকদিগের মধ্যে এমন শূর বীর কেহ নাই। তাঁহার প্রণীত "বাঙ্গালার মেয়ে" নামক কবিতার জ্বালায়, অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে আজিও কাতর। আজি সেই আঘাতের প্রতিশোধের জন্য এই কাব্যবীরাঙ্গনা বদ্ধপরিকর—ধৃতাস্ত্র। হেমচন্দ্রের ঐ কবিতার উত্তরে মোক্ষদায়িনী "বাঙ্গালির বাবু" শিরোনামে একটি কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতাটি বড় রঙ্গদার—লেখিকার লিপিশক্তিপরিচায়িকা—আদ্যোপান্ত পাঠের যোগ্য। আমরা এ কবিতাটি কিছু বাদ দিয়া প্রায় সমস্ত উদ্ধৃত করিলাম—গ্রন্থকর্ত্রী আমাদের এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন;—

"কে নায় কে খায় অই, করে দড় বড়ি,
বাঙালীর বাবু! হায় বড় তাড়াতাড়ি;
সাহেব করিবে রাগ, বেলা হ'লে যেতে,
তাই এত তাড়াতাড়ি, নাইতে খাইতে।
চাপকান পেণ্টালুনে, পোষাকের ঘটা,
শিরে শোভে শোলা পাক্‌ড়ী, শাল দিয়ে আঁটা;

চেঙারির মত দৃশ্য কিবা চমৎকার!
দিতে কিছু দেরী হ'লে করেন চীৎকার;
সে সময় ছেলে যদি বাবা ব'লে ডাকে
মারিতে উদ্যত হ'য়ে খিঁচ্‌য়ে যান তাকে।
তাড়াতাড়ি করে অন্য সব কর্ম্ম হয়,
তামাক টানিতে থাকে, যথেষ্ট সময়,
টানিতে টানিতে ধূম, দয়া হ'লে মনে,
শিশুরে সান্ত্বনা করা উচ্ছিষ্ট পানে।
গাড়ি ভাড়া পাঁচ পয়সা, চল্‌তে হ'ন কাবু,
হায় হায় অই যায় বাঙালীর বাবু।

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু!
দশটা হ'তে চারটাবধি দাসা বৃত্তি করা
সারাদিন বইতে হয় দাসত্ব পশরা।
উকীল, ডেপুটী কেহ, কেহবা মাষ্টার,
সব জজ কেরাণী কেহ, ওভার সিয়ার,
বড় কর্ম্ম বড় মান, অহঙ্কার কত
ধরারে দেখেন বাবু সরা খানা মত।
সারা দিন খেটে খোটে, রক্ত উঠে মুখে
পেটের বড়াই হয় ঘরে এসে সুখে।

"বড় কর্ম্ম করি" ভেবে, দেমাকে অজ্ঞান,
এদিকে সাহেব দেখে, হৃদি কম্পমান ;
সাহেব দেখে মান্য করা, ইংরাজি বুলি,
হৃদ হলো নিজ ভাষে, দেন তারে গালি ;
শিখিয়া ইংরাজি ভাষা, বড় অহঙ্কার,
তাড়াতাড়ি যান দিতে ইংরাজি লেক্‌চার,
কহিতে ইংরাজি বুলি, খান হাবু ডুবু,
শুনে যা, ইংরাজি কয়, বাঙ্গালির বাবু।

হায় হায় অই যায় বাঙালির বাবু !
খোলা হয় ধরা চূড়া গোলামির ভার,
ঘরে এলে খোলা গায়ে চটিতে বাহার ;
পরিধান থান ফাড়া চাকর কোঁচানে,
সিলিপার কারু পায়ে চটি ঠনঠনে।
আয়েস তামাক পানে, তাকিয়া হেলন,
হুঁকা-নল মুখে দিলে স্বর্গে আরোহণ।
বৈঠক্‌ খানা গুলজার, হাসির ধমকে ;
পাপোশেতে থুথু ফেলা, পিক্‌দানি সম্মুখে।
নাহি কোন ধর্ম্ম চর্চ্চা, শুয়ে গীত গান,
মধ্যে মধ্যে হুংকারেন "পান তামাক আন"
সম্মুখে সেজের আলো, ভ্যারাণ্ডার তেলে
মর্দ্দানি ফলান হয়, মূর্খ কেহ এলে।
ইয়ার এলে খেলা হয়, দাবা কিম্বা গ্রাবু,
হায় হায় অই বোসে বাঙালির বাবু !

হায় হায় অই যায় বাঙালির বাবু !
ছড়ি হাতে, সুজ পায়ে, মুখেতে চুরোট,
কাহারো সাহেবি চাল পরা হ্যাট কোট,

* * *

ফর্শা হ'তে বড় সাধ সাবাং মাখা কোসে,
উঠে যায় ছাল চামড়া, তোয়ালেতে ঘোসে।
সোজা সিঁতে কাটা চুল, আল্‌বার্ট ফ্যাশান,
সেণ্ট মেখে গন্ধগোকুল্‌, হন মূর্ত্তিমান্।

* * *

নাটক দেখিতে সাধ সখে ভরা প্রাণ,
মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিটুকু, গালে ভরা পান ;
একসেলেণ্ট এন্‌কোরে যেন ছাড়ে বৃষ নাদ,
ধূম টেনে দমরাখা, দোকানিপ্রসাদ।
ঋণে মাথা ডুবে আছে, সখে মত্ত তবু
হায় হায় অই যায় বাঙালির বাবু !

যিনি নাহি মদ খান, তাঁর অহঙ্কার
বুঝি বা যে করিলাম ভারত উদ্ধার ;
নাম লিখায়ে ব্রাহ্ম হন, ধর্ম্ম গজে পেটে,
দোকানি পশারি তাক বক্তৃতার চোটে ;
স্বাধীন করিতে নারী হন ব্রহ্মজ্ঞানী
আনেন বাহির করে কুলের কামিনী ;
মদ্যপায়ী মদ খেয়ে, খুলে দেয় মন
ভারত উদ্ধার হেতু হয় আন্দোলন ;
কথা কন খই, মুড়কী, ইংরাজি, বাঙালি,
মন খুলে ইংরেজেরে দেন গালাগালি ;
লীলা খেলা বাবুদের যত রাত্রিকালে,
মুখ মুচে ভদ্র হন সকাল হইলে ;

* * *

* * *

এখন আমাদের দুইটি জিজ্ঞাসা আছে। প্রথম, "বাঙ্গালি বাবু" দিগকে জিজ্ঞাসা করি, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনীর এই পদ্য

গুলির আঘাত, সহ্য হইবে কি? দ্বিতীয় হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি, মিষ্ট লাগে কি? সেবার মহারাজ্ঞীর পুত্র ভারতবর্ষে আসিলে, কবি যাহা পাইয়া ছিলেন, তাহার অধিক কিছু হইল কি?

উপসংহারে শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবীকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা কবিতাটির কিয়দংশ পরিত্যাগ করিলাম কেন, বুঝিয়াছেন কি? আমাদের বিবেচনায় বনপ্রসূনের অনেক স্থান এইরূপ পরিত্যজ্য; দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি উঠাইয়া দিলে ভাল হয়। পুরুষে যাহাই লিখুক, কুলকামিনীগণের ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করাই উচিত।

দুই শিকারী। মূল্য।০ আনা।

গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই কিন্তু তাহা গোপনও নাই। ইনি "ঘোড়ার ডিম" হইতে নাটক পর্য্যন্ত সকলই লেখেন। এরূপ অবিশ্রান্ত লেখক বাঙ্গালায় অতি অল্প। অন্য দেশে হইলে ইনি ধনী হইতে পারিতেন। কিন্তু এদেশে লোকে বড় পড়ে না, পড়িবার ইচ্ছা থাকিলেও পড়িতে বড় পায় না। মফস্বলে গ্রন্থ বিক্রয়ের উপায় এপর্য্যন্ত রীতিমত হয় নাই। সুতরাং এ সকল লেখকের শ্রম বৃথা হইয়া পড়িতেছে। ইহার উপায় ভবিষ্যতে আপনিই হইবে, কিন্তু আপাতত তাহা করিতে হইলে কিছু যত্ন আবশ্যক। যে সকল গ্রন্থকার অপর সাধারণ সকলকে পড়াইবার জন্য এত শ্রম করিতেছেন তাঁহাদের আর একটু শ্রম করা উচিত। মফস্বলের পথ পরিষ্কার আছে, কেবল কোথায় কোন নূতন পথ আবশ্যক কি না তাহা একবার দেখা চাই। পূর্ব্বে যে সকল উপন্যাস শুনাইয়া পিতামহীরা শিশুদিগকে "ঘুম পাড়াইতেঁন" সেই সকল উপন্যাস অবলম্বন করিয়া "দুই শিকারী" লিখিত হইয়াছে। ইহাতে সাতমুণ্ড রাক্ষস আছে, ডাকিনী আছে, মায়া বন আছে; ইহার শৃগাল কুক্কুর ঔষধ জানে, তাহারা পয়ারে কথা কয়, মৃত ব্যক্তিকে বাঁচাইয়া দেয়। বালক ও ইতর লোকেরা যাহা শুনিতে চায় তাহা ইহাতে যথেষ্ট আছে। তাহাদের বোধগম্য করিবার জন্য গ্রন্থকার গল্পটি যথেষ্ট সরল ভাষায় লিখিয়াছেন।



বঙ্গদর্শন।

৯৩ সংখ্যা।

বাঙ্গালিদিগের পৌরুষ।

বাঙ্গালিদিগের যে বিসয়ে যতদূর উন্নতি হউক না কেন, কাপুরুষ বলিয়া যে তাহাদের কলঙ্ক আছে, সে কলঙ্কের অপনয়ন না হইলে, তাহারা মানবজাতির মধ্যে কস্মিন্‌কালে গণনীয় হইবে না।

বাঙ্গালিদের শারীরিক দৌর্ব্বল্যই তাহাদের পৌরুষাভাবের প্রধান কারণ। দুর্ব্বল ব্যক্তি কখন কখন সাহসী হয় বটে, এবং সবল ব্যক্তিও সময়ে সময়ে ভীরু হয়, কিন্তু সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে বল ও সাহস একত্র বর্ত্তমান থাকে। বায়ুর দোষে, আহারের দোষে, এবং বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথার দোষে, ঐ দৌর্ব্বল্য উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে শিক্ষার গুণে পৌরুষ কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিচার করা হইতেছে।

যে বনে দুর্দ্দান্ত ইংরাজসৈনিক বন্দুক হাতে না করিয়া প্রবেশ করিতে সাহস করে না, সে বনে সাঁওতালবালক অনায়াসে বিচরণ করে। প্রস্তাবলেখক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন একদা বলেশ্বর নদে প্রবল বাতাসে ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, এমন সময়ে একজন ধীবরবালক অকুতোভয়ে আপন পিতার নৌকার কর্ণ ধরিয়া রহিয়াছে; কোন সিপাহী ঐ বালকের কার্য্য করিতে সক্ষম হইত কি না সন্দেহ। আবার যদি সাঁওতালবালককে নৌকায় উঠান যায়, এবং ধীবরবালককে বনে পাঠান যায়, উভয়ে ভীত হয়; এমন স্থলে সাঁওতাল

ও ধীবরবালককে সাহসী বলা উচিত কি ভীরু বলা উচিত? আমাদের বিবেচনায় এমন স্থলে সাহসগুণ অথবা ভীরুতা দোষ আরোপ করা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসিদ্ধ নহে। প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, বাল্যাবধি যে প্রকার আপদের সম্মুখীন হইবার শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই প্রকার আপদ উপস্থিত হইলে ভয় জন্মে না। সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালিবালক বাল্যাবধি ঘোড়ায় চড়িতে শিখিলে নিপুণ অশ্বারোহী হয়; তবে যিনি অধিক বয়সে সব্‌ডিপুটী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় অথবা কোন কার্য্যানুরোধে অশ্বারোহণ করিতে শিখেন তাঁহার অশ্বারোহণে প্রায়ই পারদর্শিতা জন্মে না, এবং যদি তাঁহার হাত, পা, দাঁত না ভাঙ্গিয়া যায়, তবে তিনি সৌভাগ্যশালী পুরুষ। অস্ত্রশিক্ষার নৈপুণ্যসম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। অশ্বারোহণ ও অস্ত্র ব্যবহার যুদ্ধের প্রধান অঙ্গ। যদি বাঙ্গালিরা বাল্যাবস্থা হইতে শিক্ষা পাইয়া অশ্বারোহী ও অস্ত্রবিৎ হইতে পারে, তবে তাহারা যোদ্ধা হইতে কেন পারিবে না? অনেকেই এই আপত্তি করিবেন যে তাহাদের সাহস নাই; কিন্তু সাহস যে অনেক পরিমাণে অভ্যাসগত তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যদি বাঙ্গালি বালকেরা বাল্যাবধি রাজপুতানার ক্ষত্রিয় বালকদের ন্যায় শিক্ষা পায় যে, "প্রাণ অপেক্ষা মান অধিকতর আদরের বস্তু, এবং যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া অতি নীচ পুরুষের কর্ম্ম," তাহা হইলে বাঙ্গালিদের ভীরুতার অনেক লাঘব হইবে তাহার সন্দেহ নাই। অশ্বারোহণ, বন্দুক শিক্ষা এবং মৃগয়ায় বাঙ্গালিদিগের বাল্যাবধি প্রবৃত্তি থাকিলে তাহারা অধিকতর সাহসী হইবে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি বনে সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ব্যাঘ্রকে নিপাত করিয়াছে, সে ব্যক্তি রণক্ষেত্রে অস্ত্রধারী পুরুষ দেখিয়া সহসা কেন ভীত হইবে? মার্শেল লানে নামক একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী যোদ্ধা একজন সহযোগীকে বলিয়াছিলেন "কর্ণেল সাহেব! যে ব্যক্তি বলেন যে আমি কস্মিন কালে ভয় পাই নাই, সে ব্যক্তি দাম্ভিক, কাপুরুষ।" কোন কোন সময়ে মনুষ্যের এমন আপদ ঘটে যে অতি সাহসী পুরুষও ভীত হয়। মহাবীর নাপোলেয়ন্‌ বনা-পার্টও কোন সময়ে রণে ভঙ্গ দিয়াছিলেন। তেমন স্থলের কথা বলা যাইতেছে না, কিন্তু সাধারণ যুদ্ধের স্থলে শিক্ষিত বাঙ্গালী যোদ্ধা যে ভীরুতা প্রকাশ করিবে এরূপ বিবেচনা একান্ত সঙ্গত নহে।

আমাদের সমাজের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে যে অশ্বারোহণ, বন্দুক ব্যবহার ও মৃগয়াকে অধিকাংশ বাঙ্গালিই গোঁয়ার ও ডাংপিটের কার্য্য বলিয়া নিন্দা করে। কএক বৎসর হইল রাজা দিগম্বর মিত্রের পুত্র অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া হত হওয়ায় কলিকাতার অনেক বাঙ্গালি বালক অশ্বারোহণে-

বিরত হইয়াছেন। বস্তুতঃ কলিকাতা অনেক বিষয়ে বাঙ্গালার আদর্শ স্বরূপ হইয়াও যুদ্ধাভ্যাস ব্যায়াম সম্বন্ধে মফস্বলের অনেক স্থান অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র যে পুরুষের শরীর নারী-শরীরের ন্যায় কোমল, যাহার মাংসপেশী অপেক্ষা মেদভাগ অধিক, সেই পুরুষেরই অধিক আদর; কারণ তাহার দেহ বড়মানুষের লক্ষণোপেত। বিশেষত কলিকাতাবাসীদের এই সংস্কার যেমন বদ্ধমূল, এমন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই।

মৃগয়া বিষয়ে কলিকাতাবাসী বাঙ্গালিদের প্রবৃত্তি নাই বলিলেই হয়। তাঁহাদের মৃগয়া, উল্টডিঙ্গি, ঘুঘুডাঙ্গা ও বেলগেছিয়ার পুকুরে মৎস্য ধরা। এক্ষণে, কলিকাতাবাসীদিগের পৌরুষের কথা ছাড়িয়া মফস্বলবাসীদিগের পৌরুষ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলি। প্রায় ২৬ বৎসর হইল বাকরগঞ্জ জেলার গায়েস উদ্দিন ওরফে গগনমিঞা এবং মণিরুদ্দিন ওরফে মোহনমিঞা নামে দুইজন সামান্য হাওলাদার এমন ব্যাপার করিয়াছিল, যে ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব মিষ্টার এচ, এ, আর, আলেক্জেণ্ডার তাহাদের বিরুদ্ধে এক সময়ে কতিপয় সৈনিক নিযুক্ত করার মানস করিয়াছিলেন। লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি অভি-যোগ তাহাদের নামে উপস্থিত হওয়ায়, প্রথমতঃ তাহাদের নামে গ্রেপ্তারী ওয়ারাণ্ট বাহির হয়। তাহারা টগরা থানার দারোগাকে বেদখল করিয়াছিল। তাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে অন্য থানার দারোগা, জমাদার, বরকন্দাজ এবং চৌকিদার নিযুক্ত হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গগনমিঞা ও মোহনমিঞার লাঠিয়ালের ভয়ে সকলে প্রস্থান করিলে, পরিশেষে আলেক্জেণ্ডর সাহেব সকল থানা হইতে দারগা, জমাদার, বরকন্দাজ ও চৌকিদার প্রভৃতি আনাইয়া এবং সরলিয়ার মোরেল সাহেবদিগকে সঙ্গে লইয়া মিঞাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। মিঞারা যে বাটীতে থাকিত তাহা একটী ক্ষুদ্র দুর্গ। নারিকেল, গুপারি ও বাঁশ গাছ এবং নালা তাহাদের গৃহ এরূপ পরিবেষ্টন করিয়াছিল, যে তাহাতে শত্রুপক্ষ সহজে প্রবেশ করিতে সক্ষম নহে। আলেক্জেণ্ডার সাহেবের বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার এবং মোরেলদের হাতে বন্দুক দেখিয়া মিঞারা পরাজয় স্বীকার করিবে, কিন্তু তাঁহার সে বিশ্বাস অমূলক। তাঁহারা অগ্রসর হইলে মিঞাদের লাঠিয়াল সকল সড়কী, লাঠি এবং বাঁশের ঢাল হাতে করিয়া মার মার শব্দে বাহির হইল। অবশেষে যখন তাহাদের মধ্যে কয়েকজন গুলি দ্বারা হত এবং আহত হইল, তখন তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল। এক্ষণে এই জিজ্ঞাসা করিতে পরা যায় যে, যে বাঙ্গালিরা লাঠি এবং সড়কী ও বাঁশের ঢাল লইয়া ইউরোপীয় বন্দুকীদের সম্মুখীন হইতে পারে, তাহারা কি অস্ত্রশিক্ষা এবং নিয়মিত রণকৌশল

শিক্ষা করিলে যোদ্ধা হইতে পারে না? লাঠালাঠি করিয়া অনেকানেক বাঙ্গালি মরিয়াছে, এবং দেশ সুশাসিত হইলেও, স্থানে স্থানে অদ্যাপি মরিতেছে। যদি সেই ক্ষুদ্র যুদ্ধপ্রিয় বাঙ্গালিদের মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে লাঠির আঘাতে মরণ ও গুলির আঘাতে মরণ দুই সমান, বরং শেষোক্তপ্রকার মরণ সহজ, তাহা হইলে কি তাহারা কস্মিন্‌ কালে সিপাহি হইতে পারে না? আমরা লাঠিয়াল কর্ত্তৃক শান্তিভঙ্গের পোষকতা করি না, কিন্তু ক্ষুদ্র রণ-ক্ষেত্রে লাঠিয়ালেরা সময়ে সময়ে এমন পৌরুষ দেখায় যে তাহাতে যুদ্ধোপযোগী গুণ তাহাদের শরীরে বর্ত্তমান আছে, ইহা প্রতীয়মান হয়। বাঙ্গালিদের মধ্যে অনেক কাপুরুষ আছে বটে, কিন্তু ইউ-রোপীয় জাতিদের মধ্যে সংস্কার আছে যে, সকল বাঙ্গালিই কাপুরুষ, তাহা নিতান্ত অমূলক।

নবাব আলীবর্দ্দির শাসনকালে মহারা-ষ্ট্রীয়েরা বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে, বাঁকুড়া জেলা নিবাসী মল্লরা বিষ্ণুপুরের দুর্গ রক্ষা করিতে বিলক্ষণ পৌরুষ দেখাইয়া ছিলেন। এক্ষণে বিষ্ণুপুরের যে পল্লীতে ফৌজদারী কাচারি স্থাপিত হইয়াছে সে পল্লী মহারাট্টা নামে প্রসিদ্ধ। ঐ স্থানে মহারাষ্ট্র সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্গ অধিকার করিতে অক্ষম হইয়া বর্দ্ধমানা-ভিমুখে যাত্রা করিয়া ছিলেন। বিষ্ণু-পুরের লোক বলিয়া থাকে যে প্রভু মদনমোহন দেবের কৃপায় তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং দল মাদল নামক বৃহৎ দুই কামান হইতে গোলা নিক্ষেপ করায় তাহার শব্দে গর্ভি-ণীর গর্ভপাত হইয়াছিল এবং নিক্ষিপ্ত গোলাতে শত শত মহারাষ্ট্র সৈনিক হত হওয়ায় ভস্কর পণ্ডিত প্রস্থান করিয়াছিল। মল্লদিগের জয় সম্বন্ধে যে কবিতা আছে, আমরা তাহা স্থানান্তরে প্রকাশ করিব। মল্লদিগের এক্ষণে তাদৃশ পৌরুষ নাই কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে সাহসী শিকারী বলিয়া বিখ্যাত আছেন।

বাঙ্গালার পশ্চিম প্রদেশে মল্লরাজ মহারাষ্ট্রদিগকে তাড়াইয়া যেমন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, পূর্ব্বাঞ্চলে রাজা প্রতাপাদিত্য তাদৃশ সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন নাই। তিনি কি সাহসে জাহাঙ্গির বাদসাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, তাহা আমরা ভাল বুঝিতে পারি না, কিন্তু তিনি যে একজন বীর পুরুষ ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। "কালিকা প্রসন্না আছেন; তাঁহার প্রসাদে যবনজিৎ হইব," যদি তিনি কেবল এরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রকৃত বীর না বলিয়া উদ্দাম-ডাংপিটে বলিতে হইবে; কিন্তু বোধ হয় তিনি কেবল কালীভক্তির উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করেন নাই; তাঁহার

বিশ্বাস ছিল যে পাঠানরা সকলেই মোগলদের বিপক্ষ; তাহারা তাঁহার সহায়তা করিবে। প্রতাপাদিত্যের চরিত্র অনুকরণীয় নহে; কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে লাক্ষ্মণ্য সেন আপন কাপুরুষতা দোষে যে কলঙ্কসাগরে বাঙ্গালিকুলকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বাঙ্গালির উদ্ধার জন্য প্রতাপাদিত্য বিলক্ষণ যত্নবান্ ছিলেন। তিতুমিরের পৌরুষের কথা শুনিলেই লোকে হাসে। তাঁহার "হামূতো গোলা খাডেলা" পরিহাসজনক প্রবাদবচন সমূহের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সেনানী গোলাম মাসুম্ একজন প্রকৃত সাহসী যুদ্ধবিশারদ পুরুষ ছিলেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বাঙ্গালিদের পৌরুষবিষয়ক প্রস্তাবে এ সকল লোকের কথা কেন? আমরা স্বীকার করি যে মল্লরাজ ব্যতীত উল্লিখিত কোন ব্যক্তির কার্য্য অনুকরণীয় নহে; কিন্তু যাঁহারা বলেন যে বাঙ্গালিতে যুদ্ধোপযোগী গুণ নাই ও কখনও ছিল না, তাঁহাদের মত খণ্ডন করা আবশ্যক। ২৪ বৎসর হইল উত্তরপাড়ানিবাসী বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মুন্‌সেফ ছিলেন। বিদ্রোহীরা কাছারি লুঠ করিতে আসিলে তিনি পেয়াদা প্রভৃতি কতকগুলি লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে দূরীকৃত করেন। সে জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জাইগির দান করিয়াছিলেন। প্যারী বাবুর ন্যায় বাঙ্গালি রণ-কৌশল শিখিলে কি সিপাহি হাবলদার, সুবাদার, অথবা কাপ্তেন হইতে পারে না?

বাল্য শিক্ষার ফল অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রৌঢ়কে সাহসী করিতে হইলে, বালককে অশ্বারোহণ, বন্দুক ব্যবহার ও মৃগয়া প্রভৃতি যুদ্ধাভাস ব্যায়ামপ্রবৃত্ত করিতে হইবে। কিন্তু যোদ্ধা করিতে হইলে কেবল এইরূপ শিক্ষাতেই সম্যক্ ফল উৎপন্ন হইবে না। রণকৌশল উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। যৎকালে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের সহিত পার্লেমেণ্টের যুদ্ধারম্ভ হয়, তৎকালে পার্লেমেণ্টের সেনা রাজকীয় সেনা কর্ত্তৃক প্রায়ই পরাজিত হইত। উভয় সেনাই অশিক্ষিত ছিল; কিন্তু রাজকীয় সৈনিকদের মধ্যে অনেকেই অশ্বারোহণ, বন্দুক ব্যবহার ও মৃগয়ায় পারদর্শী ছিলেন। পরে ক্রমওএল্ পার্লেমেণ্টের সেনাকে এমন শিক্ষা দিলেন যে উক্ত সেনা অজেয় হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উৎকৃষ্ট রণকৌশল শিক্ষা দিতে দিতে ক্রম্ওএল্ সৈনিকদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলেন, যে রাজার পক্ষে যুদ্ধ রাজার গৌরব ও প্রজার দাসত্ব জন্য; কিন্তু পার্লেমেণ্টের পক্ষে যুদ্ধ ঈশ্বরের মহাত্ম্য-প্রকাশ সদ্ধর্ম্মপ্রচার, ও ইংরেজদের স্বাধীনতার জন্য। পার্লেমেণ্টের সৈনিকদের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইল যে ঐ ধর্ম্মযুদ্ধে হত হইলে, নিশ্চয় স্বর্গলাভ

হইবে। ফরাশিশ পণ্ডিত ভল্টেয়ার বলেন যে এই বিশ্বাস থাকাতেই ক্রমওএলের সেনা অজেয় হইয়াছিল। *

পরিশেষে পার্লেমেণ্টের ১০,০০০ সৈনিকের নিকট রাজকীয় ৩০,০০০ সৈনিক অপদস্থ হইলেন। যে বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় ক্রমওয়েলের সুশিক্ষিত সেনা অজেয়প্রায় হইয়াছিল, সেইরূপ প্রবল বিশ্বাস প্রভাবে উৎসাহিত হইয়া মুসলমানগণ দিগ্বিজয়ী হইয়াছিল।

রণকৌশল শিক্ষার প্রভাবে মনুষ্যের পৌরুষ ও পরাক্রম কতদূর বর্দ্ধিত হয়, তাহার আর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনাধিরূঢ় হইবার অত্যল্পকাল পরে, কতকগুলি ইংরেজ রাজশাসন প্রণালী পরিবর্ত্তিত করার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহারা চার্টিষ্ট্ নামে বিখ্যাত। প্রথমতঃ তাঁহারা সভাস্থাপন, বক্তৃতা, পার্লেমেণ্টে আবেদন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ জনরব হইল যে তাঁহারা বল পূর্ব্বক নিউপোর্ট নগর অধিকার করিবেন। নগরের মাজিষ্ট্রেটের প্রার্থনা মতে, তথায় ৩০ জন সৈনিক লেপ্টনেণ্ট গ্রে নামকের অধীনে প্রেরিত হয়। সৈনিকেরা, তাহাদের নায়ক ও মাজিষ্ট্রেট নগরের প্রধান হোটেলের দ্বিতীয়তলগৃহে বসিয়া আছেন এমন সময়ে অন্যূন ৫০০০ চার্টিষ্ট আসিয়া হোটেল আক্রমণ করিল এবং তাঁহাদের উপর গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। কিন্তু গ্রেসাহেব ও তাঁহার সৈনিক ত্রিশ জন এমন যুদ্ধনৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন, যে চার্টিষ্ট সকলে সত্বর রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল। এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে চার্টিষ্ট্রা কি বাঙ্গালি কাপুরুষ, না সহসী ইংরেজ? ৫০০০ লোক ৩২ জন কর্ত্তৃক পরাজিত হইল! ইহার উত্তর এই যে চার্টিষ্ট্রা ঐ সৈনিকদের ন্যায় ইংরেজ এবং প্রকৃতিদত্ত পৌরুষে তাহারা সৈনিকদের সমান; কিন্তু সৈনিকদের এরূপ শিক্ষা যে তাহাদের পরাক্রম ও পৌরুষ চার্টিষ্ট্দের পরাক্রম ও পৌরুষের শতগুণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

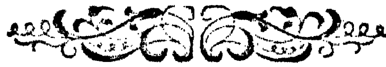
রণকৌশল শিক্ষা গুণে ইংরেজদের মধ্যে যে ফল উৎপন্ন হইয়াছে, বাঙ্গালিদের মধ্যে কি তাহার কিছুই হইতে পারে না? যিনি বলেন হইতে পারে না, তাঁহার সত্যের প্রতি লক্ষ্য নাই, অথবা তিনি মানবপ্রকৃতির কিছুই জানেন না।

এক্ষণে আমাদের যুবকদের নিকট এই নিবেদন যে যাঁহার শরীরে বল ও সাহস আছে, তিনি রাজকীয় সৈনিক বা সৈনিকনায়ক হইবার চেষ্টা করুন।

* Dictionnaire philosophique, Art: Fanatisime, Sec: 4

যাঁহারা জাতিকুল ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন, তাঁহাদের কর্ম্মশূন্য বারিষ্টার হওয়ার ফল কি? ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই একটিং মুন্সেফির জন্য হাইকোর্টে উমেদারি করেন। সে বিড়ম্বনা অপেক্ষা সৈনিক কমিসন্ পাইবার চেষ্টা করিলে, যদি কৃতকার্য্য হন, বাঙ্গালার বহুকালের কলঙ্ক অপনয়ন করার উপায় করিতে পারিবেন ও বাঙ্গালিজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। বাঙ্গালিরা যতই লেখা পড়া শিখুন না কেন, বণিক্ বৃত্তিতে ও শিল্পে যতই প্রতিষ্ঠা লাভ করুন না কেন, যত কাল তাহাদের মধ্যে কতক লোক যোদ্ধা না হইবে, ততকাল অন্যান্য জাতি তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিবে। পৃথিবীর এই গতি যে, যে জাতির বাহুবল নাই তাহাদের বুদ্ধিবলের আদর থাকে না; এমন কি তাহাদের ধর্ম্মবলকেও লোকে উপেক্ষা করে।

তা. প্র. চ.



বিষ্ণুপুর হইতে মহারাষ্ট্রদিগের প্রস্থান।

(প্রাচীন কবিতা)

দক্ষিণের এক ভাস্কর বর্গী (১) চড়াও করিল,
গুপ্তবৃন্দাবন (২) লুঠ্‌ব বলে তারা মনে দড়াইল।
ঢাকা মুর্শিদাবাদ লুঠে বর্গী এল বিষ্ণুপুরে,
দেবতারো খিয়াতি গড় তারা সেন্ধাতে না পারে।
হাতি আড় দিয়ে বর্গী, থানা যে কাটিছে,
সেই ঘাটের গোলন্দাজ তখন দেখিবারে গেছে।
সেই ঘাটের গোলন্দাজ তখন দেখিবারে গেলো
দ্রুতগতি কামানেতে পল্‌তে লাগাইল।
দুইচার দেউড় পিটে ভাই মুচ্চার উপরে,
বর্গীর মাথার উপর দিয়ে গোলা গেল তাদের কিছু করতে নারে।
দ্রুতগতি সেই গোলন্দাজ গমন করিল,
দক্ষিণ ভদ্রে মহারাজায় এসে আদাশ করিল।

(১) বর্গী বোধ হয় আরবী বাগী শব্দের অপভ্রংশ—বাগী অর্থাৎ বিদ্রোহী। কবির সংস্কার ছিল যে দাক্ষিণাত্য মহারাষ্ট্রদিগের দেশ।

(২) বিষ্ণুপুর মদনমোহন দেবের গুপ্তবৃন্দাবন বলিয়া খ্যাত ছিল।

শুন শুন মহারাজা বসে কর কি,
প্রায় বর্গী গড় সেন্ধিল, রাজা! বলতে
এসেছি।
রাজা বলে শুন গোলন্দাজ বলিরে বচন,
আমাদের কিছু আও নাই আছেন মদন
মোহন।
সহরেতে ঢেঁড়রা দিল রাজা প্রজার
ঘরে ঘরে,
ঘরে ঘরে নাম সংকীর্ত্তন তোমরা করগে
উচ্চৈঃস্বরে।
জয় জয় মদনমোহন বলে উঠে গেল গোল
জয় জয় মদন মোহন বলে বাজ্‌ছে কত
খোল।
বাবুভেয়ে চাকর নফর তারা হেত্তের
ফেলিল,
জয় জয় মদন মোহন বলে নাচতে লাগিল।
অন্তর্যামী মদন মোহন লাল জানিলেন
অন্তরে,
রাজায় প্রজায় ভার দিয়েছে বর্গী তাড়া-
বার তরে।
দুই প্রহর বেলা যখন ভাই গগনে লাগিল,
নীল জামা যোড়া পরিধান প্রভু ঘোড়ায়
সওয়ার হোল।
ধবলা হাঁসা ঘোড়ার উপরে প্রভু সও-
য়ার হইয়ে,
বর্গী তাড়াতে যান মদন মোহন তখন
শাঁখারি বাজার দিয়ে।

শাঁখারি বাজার দিয়ে প্রভুর ঘোড়া ছুটে
যায়,
প্রভুকে কেউ দেখতে পায় না প্রভুর
ঘোড়া দেখতে পায়।
মল বেড়ার লোক ছুটল ভাই ঘোড়া
ধরবার তরে,
কার সাধ্য ঘোড়া ধরি প্রভু আছেন উপরে।
মুড় মালার মুচ্চায় (৩) যেয়ে প্রভুর
ঘোড়া দাঁড়াইল
বর্গীর কর্ত্তা ভাস্কর পণ্ডিত তখন দেখি-
বারে পেলো।
কেউ দেখে বার বৎসরের ব্রাহ্মণ ছাও-
য়াল মুচ্চার উপরে,
নীল জামা যোড়া পরিধান প্রভুর ঢাল
তরবার করে।
কেউ দেখে পর্ব্বত আকার যমের স্বরূপ,
কেউ হ্যারে শ্যাম বংশীবদন যেমন
রসের কূপ।
এসব চরিত্র দেখে বর্গী আপনার মোট
মাট্‌ বান্ধে
আপনা আপনি গণ্ডগোল করে তারা
পড়ে কান্দে।
কেউ বলে তোদিকে পূর্ব্বে বলেছিলাম
ভাই,
দেবতার গড় লুঠ্‌তে নারবি চল পলায়ে
যাই।
এমন সময় ভুমে নামলেন প্রভু মদন-
মোহন,

(৩) দুর্গের উন্নত কোণ, যে অংশকে ইংরেজিতে Bastion বলে বোধ হয় তাহাই মুচ্চা। বিষ্ণুপুরের দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিলে বোধ হয় তাহা এক সময়ে দুর্ভেদ্য ছিল।

নিজকরে পল্‌তে প্রভু নিলেন তখন।
নিজকরে পল্‌তে লয়ে দল মাদল কামা-
নেতে দিল,
ধানগড়ার মাঠে গোলা খেয়ে যত বর্গী
মরেগেল।
নিজ মন্দিরে মদন মোহন এসে বিশ্রাম
করিল।
তিন দিন গুরগুরুনি ভাই গগনে লাগিল।
তিন দিন গুরগুরুনি ভাই গগনে লাগিল,
যত গর্ত্তবতী নারী ছিল তাদের গর্ভপাত
হোল।
রাজা বলে এমন কর্ম্ম কে করিলে ভাই,
হুকুম ছাড়া কামান দাগে বুঝি চিনতে
পারে নাই।
চার ঘাটের শাত শ গোলন্দাজকে রাজা
ডাকাইল
একে একে গোলন্দাজে রাজা জিজ্ঞাসা
করিল।
তাল বোরজের গোলন্দাজ এসে বলছে
ধীরে ধীরে,
আমার একটী নিবেদন আছে রাজা
বলিগো তোমারে।
যখন বর্গী এসে থানা কাটে, রাজা হলাম
নিরানন্দ,
ভাব্‌তে ভাব্‌তে মুর্চ্ছার পাড়ে পেলাম
কৃষ্ণ অঙ্গের গন্ধ।
তেমন সময় দুটী নয়ন অন্ধ হইল শুন
হে রাজন,
এমন সময় শব্দ পেলাম রাজা, করি
নিবেদন।
বিষ্ণুপুরের মহারাজার দেব অংশে জন্ম,
যত কিছু বুঝতে পারলেন সব মদন
মোহনের মর্ম্ম।
যোল সম্প্রদায় কীর্ত্তন করে রাজা গমন
করিল,
পূজারি ডাকিয়ে কপাট ঘুচায়ে প্রভুর
বারামত হোল।
রাজা দেখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম চোয়াচ্চে
মদন মোহনের গায়,
করে সকল বারুদ লেগে আর ধুলা
লেগে পায়।
সুকোমল অঙ্গে কত পরিশ্রম করেছেন
প্রভু মদন মোহন
আপনার গড় আপনি রাখলেন আপ-
নার গুপ্ত বৃন্দাবন।
আরকি আসিবে এমন দিন কি হবে
মদন মোহন লাল,
তোমার গড়ের ভিতর দিয়ে ইংরাজ
বেন্ধেছে জাঙ্গাল (৪)

(৪) বিষ্ণুপুরে ইংরেজাধিকারের পর এই কবিতা লিখিত হইয়াছিল স্পষ্ট বোধ হইতেছে। মহারাষ্ট্রদের উৎপাতে বর্দ্ধমানের মহারাজা মুলাজোড় ও কাউগাছি গ্রামের মধ্যে গড় শ্যামনগর নামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ছিল। বিষ্ণু-পুরে দুর্গ থাকায় মল্লরাজের সে দুর্গতি ঘটে নাই।

অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য।

হিন্দুধর্ম্ম উপলক্ষিত কথা।

(১)

মোরে না মানিয়া সব লোক হৈল নাশ।
এই লাগি মহাপ্রভু করিল সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাসি জানিয়া মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দোষ পাইবে নিস্তার॥
আদ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ।

*　*　*　*
*　*　*　*

শচী আগে পড়িল প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া।
কান্দিতে লাগিল শচী কোলে উঠাইয়া॥
দুঁহার দর্শনে দুঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল॥

*　*　*

"যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস।
তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥
কেহ যেন এই বোল না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কর যাতে রহে দুই ধর্ম্ম॥"

*　*　*

* "এই যুক্তি ভাল, মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়॥
নীলাচল নবদ্বীপ যেন দুই ঘর।"
মধ্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ।
চৈতন্যচরিতামৃত।

আমার পক্ষে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করা নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চা এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। এই কার্য্যের নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক ভক্তি এবং যাজন কার্য্যবিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য মতের সারভাগ জানিয়া তাহার প্রতি যথাযোগ্য সমাদর করাও চাই। এ সমস্ত যে আমার অনধিকৃত একথা বলাই অতিরিক্ত। কিন্তু ইংরাজির চর্চ্চা করিলেই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অল্লাধিক অনাস্থা জন্মে। আর যতদিন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সম্যক্ আস্থা থাকে ততদিন ইউরোপীয়গণকে নিতান্ত বর্ব্বর মনে হয়। এ রোগের প্রতীকার দেখি না; অথচ প্রতীকার ভিন্নও মঙ্গল নাই। শাস্ত্রে বলে কলিকালে হিন্দুধর্ম্ম উৎসন্ন হইবে, ইংরাজের নিকট শিক্ষা, জীর্ণ বস্ত্রে তালি দেওয়া, বাতুলের কার্য্য। সুতরাং কি করিলে লোকের মনে হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা করিবার ইচ্ছা হয় তাহাতে কাহারই মন নাই। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের গৌরব করেন তাঁহাদের উর্দ্ধতম চেষ্টা যে আপনাপন দেহটা অপবিত্র না হয়। পুত্র কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার শ্লেচ্ছকরে ত্যাগ করা অভিপ্রেত না হইতে পারে, কিন্তু 'শিক্ষা' বলিতে স্কুলের পড়া মুখস্থ করা—উদ্ধি-

সংখ্যা বহি লেখা—ইহার অধিক আর কাহারই মনে হয় না। কিন্তু ধর্ম্মটাও শিখিতে হয়। এ কথা তুলিলে, হয় ত, কেহই না বলিবেন না, অথচ কার্য্যে দেখা যায় যে ধর্ম্মোপদেশ খ্রীষ্টানের অধিকার, এবং ব্রাহ্মের চীৎকার ভিন্ন নয়। হিন্দুর ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার নিমিত্ত উপনয়ন দীক্ষা আদি ব্যতীত যে অনেক জিনিস আবশ্যক তাহা হিন্দুগণের বুঝা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে বুঝান পর্য্যন্ত কঠিন হইয়াছে। আমাদিগের স্থির সংস্কার এইরূপ মনে হয়, যে বিধবা কিম্বা তীর্থবাসী না হইলে ধর্ম্মের আলোচনা করা জেঠামী মাত্র। সাংসারিক কার্য্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভাব নাই। সুতরাং ধর্ম্ম শিখাও, এইরূপ প্রস্তাব করিলে সহজ উত্তরটী জানিতে বিলম্ব হয় না। 'শাস্ত্রের বচন এই, এইরূপে স্নান আহ্নিক কর, ব্রতনিয়ম রক্ষা কর, শ্রাদ্ধ পূজা নির্ব্বাহ কর ইত্যাদি।' কিন্তু এই পর্য্যন্ত। কেন করিব? না করিলে কি ক্ষতি? প্রচলিত অনুষ্ঠানাদি দ্বারা সেই সকল ক্ষতি নিবারণ হয় কি না? এ কথা বুঝাইয়া দেওয়া কাহারই কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নহে। সুতরাং যাঁহারা ব্রত নিয়মাদি প্রতিপালন করেন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধি কি পর্য্যন্ত হইল তাহা দেখিবারও লোক নাই। হিন্দুধর্ম্ম শুনিয়া শিখিতে না পাইলেও দেখিয়া শিক্ষা করা চলিতে পারিত। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের যুক্তি বিষয়ক উপদেশ অভাবে প্রথম পথ অবরুদ্ধ, আর উহার দোষ গুণের বিচার এবং সমালোচনা অভাবে দ্বিতীয় উপায়টী অগাধ্য হইয়াছে। বাস্তবিক হিন্দু শাস্ত্র ঠেকিয়া শিখিতে হয় সুতরাং তাহা জীবনের শেষ কালেরই কার্য্য হইয়া আছে, তাহাতে যৌবনের তেজ সম্মিলিত হইবার সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। হিন্দুধর্ম্ম লোপের সহস্র কারণ থাকিতে পারে কিন্তু তাহার মধ্যে উপদেষ্টার ত্রুটী সর্ব্বপ্রধান। বাইবেলের বচন যেরূপ বিচার দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার শতাংশের একাংশ যত্নপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের অবক্তব্য (apocrypha) পরিত্যাগ করিলে এ দুঃখ অনেক দিন পূর্ব্বে অপনীত হইত।

আমরা—ইংরাজি-ভাষাজ্ঞেরা—ভক্তিপূর্ব্বক গুরুর আদেশ গ্রহণ করি না। এ দোষ আমাদিগের মধ্যে অতি প্রবল বটে এবং মার্জ্জনার যোগ্য নহে, স্বীকার করি। কিন্তু শিষ্য কেন গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছু? গুরু ত তাহার জন্য বিন্দুমাত্রও উৎকণ্ঠিত হন না। ধর্ম্মোপদেশ কি কেবল শিষ্যের মনের অবস্থার প্রতিই নির্ভর করে? সন্তান মন্দ হইলে শিক্ষাদান বিষয়ে ঔদাস্য করাই কি ন্যায়সঙ্গত? না অধিকতর যত্ন করাই বিধেয়? নব্য সম্প্রদায়ের জবানী কথা বলিতে ভয় করে। তথাচ বলিলাম যে শিষ্যগণের সহস্র দোষ আছে। কিন্তু এক হাতে তো তালি বাজে না; তবে গুরু পুরোহিত ও অধ্যাপক

মহাশয়দিগের ভ্রম দূর করিবার উপায় কি? তাঁহারা শিখিবেন না, শিখাইবেন না, অথচ যাজন অধ্যাপন কার্য্য একচেটিয়া করিয়া রাখিবেন। এই দুঃখেই এত কথা বলিলাম। আমরা যদি মাথা কুটিয়া মরি যে গ্রহণের মুক্তি হইয়াছে, এখন স্নানের সময় উপস্থিত, মা ঠাকুরাণী তাহাতে একবারও কর্ণপাত করিবেন না, কিন্তু যদি একজন গণ্ডমূর্খ শিখাধারী আসিয়া বলে যে কবে একাদশীর উপবাস তাহা বলিতে পারি না, অমনি তিন দিন অনশন স্বীকার করিবেন।

গুরু পুরোহিত মহাশয়দিগকে আমি এই পর্য্যন্ত উপদেশ দিতে অভিলাষ করি যে শিষ্যের মনের ভাব বুঝা তাঁহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। শিশু সন্তান যদি বাবাকে দাদা, কি দাদাকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করে, তাহা হইলে কি তাহার সম্বোধন ত্যাগ করিতে হইবে? বালকেরা শিক্ষককে প্রায়ই অক্ষম অমনোযোগী অথবা পক্ষপাতী মনে করে; কিন্তু এরূপ দোষের দণ্ড করিবার বিধান নাই। যদি গুরুর সহ্য এত টুকুও না হয়, তবে শিষ্যের সহিষ্ণুতা আর কত অধিক হইবে?

বর্ত্তমান কালের প্রধান কথা এই যে ইউরোপ বর্ব্বর নহে; ইউরোপীয়েরা যে সকল বিজ্ঞান, ন্যায় এবং মীমাংসা শিখাইতেছেন তাহা ফেলিবার বস্তু নহে, সম্যকরূপে প্রণিধান করাই আবশ্যক; তাহা করিয়া হিন্দু এবং তৎপ্রতিকূল ধর্ম্ম সমূহের বৈষম্য বুঝা কর্ত্তব্য এবং বুঝিবার পরে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিয়া শিষ্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা তাহা করিতে অনিচ্ছু তাঁহারা আপন কার্য্যেরই জবাবদিহি করিতে বাধ্য; অন্যের প্রতি দোষার্পণ করা তাঁহাদিগের পক্ষে পাতক বলিয়া গণনীয়।

ইংরাজি বিদ্যা কেবল অর্থকরি নহে। পক্ষান্তরে ইহাতে পরকালের মঙ্গল না হউক, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা সম্পূর্ণরূপ বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু "চোরের উপরে রাগ করিয়া" সন্ততি বর্গের শিক্ষা বিষয়ে উপেক্ষা করাও কর্ত্তব্য নহে। এতাদৃশ ব্যবস্থা যাঁহারা অবলম্বন করেন তাঁহারা আর একটী কথা বিবেচনা করিবেন। হিন্দুধর্ম্ম যদি ইংরাজি বিদ্যার সংস্পর্শে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তবে পরমার্থ লাভ বিষয়ে আমাদিগের পিতৃ পৈতামহিক বিধান প্রতিপালন করাতে আর লজ্জা কি? পৃথিবী হইতে ইউরোপ বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা বড় দেখা যায় না। আর হিন্দুগণও এমন কথা বলেন না যে ইউরোপীয়েরা স্বধর্ম্ম পালন করিলে মুক্তিলাভ করিবে না। ব্যাপটাইজের পদ্ধতি আমাদের মধ্যে চলিবে না। জমা শূন্য, খরচ বিলক্ষণ। অতএব ইউরোপীয় শিক্ষার প্রতি বেশি বিদ্বেষ করিলে পূর্ব্বপক্ষের কথা এমন হইতে পারে যে হিন্দুধর্ম্ম লোপ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া উপায়ান্তর অবলম্বন করাই বিধেয়।

ইউরোপীয় বিদ্যা ছাড়িবার যো নাই; উহা বেষ্টন করাই কর্ত্তব্য।

ফলতঃ ইংরাজি বিজ্ঞান এবং ইংরাজি ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের ভেদ নির্ণয় করা এবং সেই ভেদের অপনয়ন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই নিমিত্তে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগেরও একটু বিনয় অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। "আমি অমুক বিষয় জানিনা" এইরূপ বিনীত ভাব মনে উদয় না হইলে সেই বিষয়ের জ্ঞান দূরে থাকুক, তাহার চেষ্টা পর্য্যন্ত লাভ কখনই হইতে পারে না। ইংরাজিতে না জানি কি উপদেশ আছে, এইরূপ মনের ভাব না হইলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারে না এবং সেই জ্ঞান ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করা সঙ্গত নহে।

"যত দিন চন্দ্র সূর্য্য আছেন তত দিন হিন্দু ধর্ম্মের বিনাশ নাই" এই কথা শুনিলেই অধ্যাপক মহাশয়ের বদন মণ্ডল অপূর্ব্ব প্রভাতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তাঁহার সেই প্রফুল্ল বদন মনে করিলে এই সকল কথা লিখিতেও কষ্ট বোধ হয় না। কিন্তু যদি বলি "যতদিন চন্দ্র সূর্য্য আছেন" এই কথার স্বরূপ অর্থ এই যে "যতদিন মনুষ্য বর্গ চন্দ্রালোকে উল্লসিত হইবে, সূর্য্যাতপে ধান্য উৎপাদন করিবে" তাহা হইলেই বিরোধের সূত্রপাত হয়। ইহার পরে যদি কথা তুলিতে পাই এবং বলিতে পথ পাই যে "হিন্দু ধর্ম্মের সারাংশ মাত্র ততদিন থাকিবে"—যদি বলি যে সত্যের মাহাত্ম্য হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা অধিক, হিন্দু ধর্ম্মে যে অমূলক ভ্রমাত্মক অসার কথা আছে, তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না, তাহা হইলেই অধ্যাপক মহাশয়ের মনের কপাট বন্ধ হইবে; আমার কথা বিলাতী বলিয়া ঘৃণিত হইবে; এবং "ইহাদিগের দ্বারাই ধর্ম্মলোপ হইল" বলিয়া কাণের বাহিরে আরো দুই চারিটী মিষ্ট কথা নিঃসৃত হইবে। এ রোগের প্রতীকার ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মের মঙ্গল নাই।

মনুষ্যের জ্ঞান, আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক বিষয় একত্রিত হইয়া উৎপন্ন হয়। ইহার একটী ছাড়িয়া আর একটী ধরিলে জ্ঞান কোন মতে ফুটে না। অপর, একজনের আভ্যন্তরিক বিষয় অন্যের মনে প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। "এটা অগ্নি, দহন করে", এই জ্ঞানটী কেবল আমার মনে উদয় হইলেই হয় না। আর একটু আবশ্যক আছে। আমি "হাঁ—হাঁ, কি কর, সর সর" বলিলে তুমি সরিয়া দাঁড়াইবে; পতঙ্গের মত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে যাইবে না এটীও আবশ্যক। ইহার এক মাত্র উপায় ভাষা। শব্দ শুনিয়া, লিপি পড়িয়া, আলেখ্য দেখিয়া, ইঙ্গিত অঙ্গভঙ্গি বুঝিয়া অন্য ব্যক্তির মনের ভাব আপন মনে গ্রহণ করিতে হয়, আপনার ভাব অন্যকে দিতে হয়। ইহাই মনুষ্য পরম্পরায় মহাগ্রন্থি। একজাতীর মধ্যে এই গ্রন্থি

স্বভাবসিদ্ধ। দ্বিতীয়ীর সাহায্যে এই গ্রন্থিদ্বারা সমগ্র মনুষ্যজাতি একত্রিত হয়। গো অশ্বাদি গৃহপালিত পশুগণও কতকদূর এই গ্রন্থিতে আবদ্ধ কিন্তু কীট পতঙ্গ সিংহ ব্যাঘ্রাদি ইহার বহির্ভূত। এই গ্রন্থিতেই এক জনের সাহায্যে অন্যের জ্ঞান লাভ হয়, এক জনের দ্বারা আর এক জনের ভ্রম ব্যক্ত হয়, এবং উভয় হইতে তৃতীয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করে। ইহাতেই এক সময়ের কথা, সেই সময় অবসান হইলেও যেন সজীব থাকে; এক সময়ের ভুল আর এক সময়ে অপনীত হয় এবং কাল পরম্পরায় বিরোধ, কাল সহকারে শান্তিলাভ করে। ইহাতেই সত্য, মিথ্যাকে পরাজয় করে। ইহাতেই দশজনের অর্জ্জিত জ্ঞান এক জনের আয়ত্ত হয়। এবং মহামহোপাধ্যায়ের উপদেশ সামান্য ব্যক্তির মনে প্রবেশ করে, করিয়া তাহার কার্য্যে নিয়োজিত হয়। ইহাতেই এক পুরুষের লব্ধ জ্ঞানরত্ন পুরুষান্তর কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়; ভূতকাল অপেক্ষা বর্ত্তমান কালের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয় এবং বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের প্রাধান্য অনন্যচিত্তে আশা করা যায়। মহাকাল কেবল নশ্বর পদার্থকেই গ্রাস করেন। অবিনশ্বর সত্যই ত্রিকালব্যাপী কালীর বরাভয়ের মূলীভূত কারণ। নশ্বর বিষয়—কু এবং ভ্রান্তি—মনুষ্যের স্মৃতিবহির্ভূত হইয়া অন্ধকার ময়ী কালীর করাল গ্রাসে নিপতিত হয়। অবিনশ্বর বিষয় ও বুদ্ধি নীল নভোমণ্ডলের ন্যায় জগৎব্যাপী হইয়া—কালান্তর কাল উত্তীর্ণ হইয়া—তাবৎ লোককে তারণ করে। ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকাল মধ্যে বিচ্ছেদ নাই। মনুষ্য বহু কষ্টে যে জ্ঞান লাভ করে তাহার বিস্মরণই ঘোরতর অমঙ্গল। জ্ঞান কখন জ্ঞানপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা যায় না। নতুবা এতাদৃশ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। মনুষ্যের মন্দ অংশ ভ্রান্তি মাত্র; সত্যের এবং মঙ্গলের নির্ম্মল বায়ু স্পর্শমাত্রেই তাহার পূতিগন্ধ অনুভূত হয় এবং তখন তাহাকে ত্যাগ করাই সৎকৃতি বলিয়া গণ্য করা কর্ত্তব্য। অতএব যে ব্রাহ্মণ মনে করেন আমার দেহাবসান পর্য্যন্ত সদাচার রক্ষা করিতে পারিলেই যথেষ্ট; কলির প্রভাবে পুত্র কলত্র সবর্ণাদি অধঃপাতে যাউক; কিম্বা বলেন সবর্ণগণ রক্ষা হউক, বিধর্ম্মীগণ অধঃপাতে যাউক, অথবা, হিন্দুগণ রক্ষা হউক, ইউরোপীয়েরা অধঃপাতে যাউক, তিনি সদাচারী হউন বা কদাচারী হউন, তাঁহার কথা সত্য নহে, উহা কেহ শুনিবে না। তিনি নিজেও অন্যের মুখে শুনিলে এরূপ কথা স্বীকার করিবেন না। এরূপ কথা ভ্রান্ত এবং হিন্দু ধর্ম্ম যদি সত্য হয় তবে উহা কখনই হিন্দু ধর্ম্ম সম্মত হইতে পারে না। যদি হিন্দু ধর্ম্মে কোন সার পদার্থ থাকে তবে উহা বাইবেল কোরাণ উপাসক দিগের পক্ষে কেনই বোধগম্য হইবে না। আর

যদি বাইবেল কোরাণে কিছু মঙ্গলের পথ থাকে তবে বেদোপাসকের নিকটে কেনই বা তাহা ত্যাজ্য হইবে? আমাদের বেদ আমরা পালন করিব, ইংরাজকে এবং ইংরাজ শিক্ষিতস্বদেশবাসীকে তাহা বুঝাইয়া দিব না, এরূপ সংকল্প ত্যাগ না করিলে বিচারের পথ বন্ধ হইয়া যায়। যাঁহারা এইরূপে হিন্দুধর্ম্মের বিচার করিতে অনিচ্ছু তাঁহারাই বাস্তবিক সনাতন ধর্ম্মের দ্বেষক। তাঁহাদিগের গঙ্গাস্নান অবগাহন মাত্র, তাঁহাদিগের সংকল্পই দূষিত, সুতরাং উহাতে সার্থকতা নাই।

আমার মূল সূত্র দুটী। "কালপ্রবাহ" এবং "লোক সমষ্টি।" কাল প্রবাহ অর্থাৎ আজি, কালি পরশ্ব—গত এবং আগামী—সমস্তই এক সূত্রে গাঁথা। গত পরশ্ব ও গত কল্য ভুলিব না, আগামি কল্য আগামি পরশ্ব ছাড়িব না। গত পরশ্বের যে ভুল গতকল্য দেখিয়াছি আগামি পরশ্ব দিবস যাহাতে তাহা নিবারণ হয় অদ্য তাহার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিব। কে করিবে? যে এতকাল করিয়া আসিয়াছে সেইকরিবে। মনুষ্যবর্গ —লোকসমষ্টি এচেষ্টা করিবে। আমি করিব, তুমি করিবে, উনি করিবেন। সকলে সমবেত হইয়া করিব, সকলে পরামর্শ করিয়া করিব। ভুল হইলে এক বারে না শিখি দশবারে শিখিব। কিন্তু শিখিবই শিখিব। দেখিয়া শুনিয়া, ঠেকিয়া শিখিব। আর শিখিয়া বসিয়া থাকিব না; ভুলিবার সূত্রপাত করিব না, যাহাতে ভুল ক্রমশঃ সংশোধন হয় তাহাই করিব। এই কার্য্যের কর্ত্তা, প্রতি ব্যক্তি—উদ্যোগী সমষ্টি—বর্গাশ্রিত মনুষ্য। আর, কাল প্রবাহ ইহার সীমা। চিরকাল এইরূপ হইয়াছে, এখন ও তাহাই হইবে। যাহাতে হয় তাহার উদ্যোগ করিতে হইবে। সত্য ত্রেতা ভেদে যাহা হইবার তাহা হউক। কলির শেষে যাহা ঘটিবে তাহা ঘটুক। আমাদের কার্য্য আমরা করিব। কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিবার নহে। করিতে নাই। নিরবচ্ছিন্ন অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করা সম্ভবপর নহে, এবং উহা শাস্ত্র সঙ্গত হইতে পারে না। শাস্ত্রের সদর্থ করাই কর্ত্তব্য। কূটার্থ ধরিয়া কুকর্ম্মান্বিত হওয়া অনুচিত।

আমি বৈরাগ্যের কথা লিখিতে বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মানুসারে বৈরাগ্যই জীবনের সার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি যে বৈরাগ্যের কথা বলিব তাহা হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত কিনা একথা বিবেচনা করা আবশ্যক। তুমি বলিবে বৈরাগ্যের কথা বলা আমার অধিকার বহির্ভূত। আমি বলি আমার প্রদর্শিত বৈরাগ্য কেন অগ্রাহ্য তাহা বুঝাইয়া দেও। আমি দেখিতেছি ব্রাহ্মণের অস্ত্রত্যাগ, বৌদ্ধের প্রব্রজ্যা, অর্জ্জুনের গাণ্ডীবধারণ স্বীকার, তান্ত্রিকের পঞ্চতত্ত্ব সাধন, চৈতন্যের শিক্ষিত পঞ্চরস, খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টোদ্দেশে আত্মবিসর্জ্জন, এবং কোম্‌তের পরার্থপর

পরিশ্রম সমস্তই বৈরাগ্য লক্ষণাক্রান্ত।* যদি তুমি ইহা স্বীকার না কর, তবে বল সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগে হিন্দু-গণ ক্রমশঃ বৈরাগ্যের বিষয় কি শিখিয়াছেন। এবং কি শিখাইয়াছেন; অহিন্দুগণইবা এতদিন কি করিয়াছেন? আর এতদুভয়ের ঐক্য বুঝাইয়া দেও, নতুবা বৈলক্ষণ্য এবং বৈলক্ষণ্যের হেতু ও পরিণাম দেখাইয়া দেও। আমি বলি বৈরাগ্য সকলেরই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, তুমি যদি তাহা স্বীকার না কর, তবে বল তোমার মতে যাহাদের বৈরাগ্যে অধিকার নাই, যাহারা বৈরাগ্য চেষ্টার অযোগ্য, তাহারা কি করিলে ভাল হয়। তোমার লক্ষিত শ্রেষ্ঠ পথ এবং অহিন্দু-প্রদর্শিত শ্রেষ্ঠ পথ পরস্পরের তুলনা করিয়া, উভয়ের হয় ঐক্য দেখাইয়া দেও, নচেৎ বল উভয়ের ভেদ এই, এবং এই ভেদের ফলাফল এই। কেবল তাহা নহে, তোমাকে আরো দেখাইতে হইবে যে, তোমার দ্বারা মনুষ্যবর্গের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। পরকাল বল, মুক্তি বল, আর পুণ্য বল তাহার উপায় আমি একাকী কাণে কাণে শুনিয়া স্থির থাকিতে ইচ্ছা করি না। যাহাতে সকলের মঙ্গল সাধন হয় তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অতএব বৈরাগ্য বা ধর্ম্ম সঞ্চয়ের পথে কাহাকেও ছাড়িতে বলিও না। অপর বৈরাগ্যের লক্ষণ কেবল শাস্ত্র হইতে দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে না, শাস্ত্রের আদেশ কেমন করিয়া প্রতিপালিত হইয়াছে এবং তাহার ফলাফল কি দেখিয়াছ এবং তদনুসারে এখনকার কর্ত্তব্যই বা কি? তোমার কর্ত্তব্য আমার কর্ত্তব্য এবং সসাগরা পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের কর্ত্তব্য কি এ সমস্ত বুঝাইয়া দেও। তদ্ভিন্ন কেন ক্ষান্ত হইব?

তৈলঙ্গস্বামী।

আমি একবার মনে করিয়াছিলাম যে ইংরাজী দুই একখানি পুঁথি ঘাঁটিয়া, কি সংস্কৃতজ্ঞ দুই একজন বন্ধু তাড়াইয়া বৈরাগ্যের লক্ষণগুলি বাঁধিয়া লইব। কথাতে লক্ষণ বাঁধিতে পারিলে কথার লড়াই করিবার বিলক্ষণ সুবিধা হয়। কিন্তু এ প্রণালীটী ন্যায়বিরুদ্ধ, এই মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছি। ত্যাগ করাতে পাঠকের অসুবিধা জন্মিবে জানিতেছি, এই দোষ অপনয়ন করা আমার পক্ষে অসাধ্য। আমি যাহা জানি না, তাহা প্রকারান্তরে একটী বচনের মধ্যে

* চৈতন্য চরিতামৃত লেখক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে একটী পদ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন—যথা "মর্কট বৈরাগ্য"। নাম করিলেই পদার্থটা কতক উপলব্ধ হইবে। কথাটা একটু কটু বটে। কিন্তু গায়ে না মাখলেই হ'ল। মূল কথা এই যে "মর্কটবৈরাগ্য" ত্যাগ করা আবশ্যক।

খুরিয়া তর্ক করিলে অন্ধকারে ঢিল মারা হইবে। কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যে পর্য্যন্ত জানি তাহারই প্রতিবাদ করিতে সক্ষম, তাহার অতিরিক্ত চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র। সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয়েরা বৈরাগ্যের যে লক্ষণ বলিবেন তাহা হয়তো আমি সহসা বুঝিতে পারিব না। আমি মোটামুটী যাহা বুঝি এবং যাহা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইতে পারি সেই প্রণালীই আমাকে অগত্যা অবলম্বন করিতে হইবে।

বৈরাগ্য কাহাকে বলে ? ইহা চক্ষে দেখিবার জন্য একবার বারাণসী ধামে তৈলঙ্গস্বামীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। যাহারা স্বামীজির বিষয় কিছু মাত্র জানেন না তাঁহাদিগের জন্য বলা আবশ্যক যে তৈলঙ্গস্বামী পরমহংসগণ মধ্যে অপেক্ষাকৃতরূপে পূজিত। ইনি নগ্ন এবং মৌনী। এবং সুদীর্ঘ ও অত্যন্ত পুষ্টকায়। প্রবাদ আছে যে গবিণ সাহেব তাঁহাকে নানাপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া অবশেষে বুঝিয়াছিলেন যে ইঁহার বিষ্ঠা চন্দন তুল্য জ্ঞান হইয়াছে।

সন ১৮৭৪ সাল নবেম্বর মাসে এক দিন বেলা আন্দাজ ২ টার সময়ে আমরা প্রায় এক ঘণ্টা কাল স্বামীজির নিকটে বসিয়া অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। তিনি তখন মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিতেছেন। নিকটে দুই জন চেলা, বোধ হইল তাঁহাদিগের আহার সমাধা হইয়াছে। স্বামীর নিকটে দুই খানি শাল পত্রের পাতা। এক খানি সম্মুখে তাহাতে খিচুড়ি অন্ন এবং অন্যান্য "কাঁচা" খাদ্যসামগ্রী। আর একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট পাতা বাম পার্শ্বে। তাহাতে নানাবিধ মিষ্টান্ন। খিচুড়ির উপরে স্বামীজি প্রসারিত হস্তে দুই টী রেখা দিয়া তিন ভাগ করিলেন। তৎপূর্ব্বে খিচুড়ি ভাত খাইয়াছিলেন কি না লক্ষ্য করি নাই। আমরা দেখিলাম একবার এ পাতা একবার ও পাতা হইতে এক এক প্রকার খাদ্য মুখে দিতেছেন এবং উচ্ছিষ্টগুলি পাতে রাখিয়া দিতেছেন। বোধ হইল যেন কোন্ জিনিসটার কি আস্বাদ তাহা পরীক্ষা করিতেছেন। খিচুড়ি ভাগ করিবার পূর্ব্বে এবং পরেও এইরূপ করিতেছিলেন; কিছুক্ষণ পরে হাত বাড়াইয়া দিলেন অমনি একজন চেলা তাহা ধৌত করিতে লাগিল। ধুইতে ধুইতে একবার হাত টানিয়া একটা ভাঁড় মুখে দিলেন। বোধ হইল তাহাতে দধি ছিল। পরে আঁচাইয়া একখানা তক্তপোষে উঠিয়া বসিলেন এবং নগ্নাবস্থাতেও গাত্রে যে এক খানা গেরুয়া বস্ত্র ছিল তাহা টানিয়া নিলেন। তাহাতেও হইল না। নবেম্বর মাস শীত পড়িয়াছিল। একখানি লেপ লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার সেই পুষ্ট কলেবর সঞ্চালন করিতে যেন বিপাক উপস্থিত হইল। পরে একজন চেলা আসিয়া

তাঁহার শীত নিবারণের উপায় করিয়া দিল। তৈলঙ্গস্বামী মৌনী। কোপীন ত্যাগ করিয়াও তাঁহার সঙ্কল্পিত বৈরাগ্য সম্পূর্ণ হয় নাই। বাক্যালাপেও বীতরাগ হইয়া আছেন। এতাদৃশ অবস্থায় আমার পক্ষে এক অতি রহস্যজনক ঘটনা উপস্থিত হইল। স্বামী কথা কহিবেন না কিন্তু কথা কহিবার উদ্দেশ্য ত্যাগ করিতে পারেন না। কৌপীন ত্যাগ করিয়া নগ্নাবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সামান্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে দেখিয়া কিরূপ লজ্জিত হয়, সে চিন্তা বিষয়ে বৈরাগ্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল কিন্তু শীতের যন্ত্রণা আর দধি আস্বাদনের ইচ্ছা ছাড়িতে পারেন নাই। এ গুলিতেও আমার ভক্তি সম্পূর্ণরূপে টলে নাই। কিন্তু পরমহংসের সঞ্চয় বাসনা দেখিয়া অসহ্য বোধ হইল। স্বামীকে পয়সা টাকা দিলে তাহা লইয়া তিনি খেলা করেন এবং যথেচ্ছা বিলাইয়া দেন। কিন্তু আহারান্তে উচ্ছিষ্ট সামগ্রীগুলি ছাড়িতে পারিলেন না। একটী পিত্তলের পাত্রে একখানা পাতা এবং কমণ্ডলুতে মিষ্টান্ন ভাত এবং খিচুড়ির অবশিষ্ট সযত্নে রক্ষিত হইল। ইহাতে দোষ কি? হয়তো এগুলি দরিদ্র ভিক্ষুকদিগের নিমিত্ত রাখিতেছিলেন। কিন্তু আবার দেখিলাম যে চিনির মঠ আদি স্বামী খাদ্যগুলি বহুযত্নে পৃথক একটী লোটাতে উঠিল। অতঃপর একখণ্ড জীর্ণবস্ত্রের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে লোটার মুখ বাঁধা আবশ্যক। লোটা আচ্ছাদন করিয়া পরিশেষে তাহা দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে হইবে, এতক্ষণ স্বামী ইঙ্গিতের দ্বারা আদেশ করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিতেছিলেন। এখন প্রাজ্ঞ স্বয়ং একখণ্ড রজ্জু সংগ্রহ করিয়া চেলাদিগকে দিলেন। চেলাগণ ঘটির মুখ বাঁধিয়া মাথার উপরে শিকাতে তুলিয়া রাখিল। তবে স্বামীজির শান্তি লাভ হইল। আমি অধ্যাপক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি ইহাই কি তাঁহাদিগের বৈরাগ্য।

স্বামী ভণ্ড নহেন। দয়াশূন্যও নহেন। আমাদিগকে চেলার দ্বারা সদয়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আহার হইয়াছে?" কিন্তু যখন আমাদিগের জ্ঞান তৃষ্ণা নিবারণের প্রার্থনা করিলাম তখন চেলার মারফত আদেশ হইল যে "কল্য প্রাতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা লইয়া আসিও, যে সকল পণ্ডিতেরা স্বামীজীর দর্শন লাভার্থে আসিয়া থাকেন, তাঁহারা তোমাদিগের প্রশ্নের উত্তর দিবেন।" "স্বামীজি কতক্ষণ বিশ্রাম করিবেন?" "প্রদীপ জ্বালিবার সময় পর্য্যন্ত।" "অনুগ্রহ করিয়া যদি একটা দোয়াত কলম দেন তবে প্রাচীরে যে সকল শ্লোক লেখা আছে তাহা নকল করিয়া লই।" চেলা বলিল "দোয়াত কলম সংগ্রহ করিয়া রাখিব কল্য প্রাতে আসিয়া নকল করিও।" তখন স্বামী একটু শব্দ করিলেন, চেলা মুখ ফিরাইয়া তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিয়া বলিল "না, না,

তোমরা সঙ্গে লইয়া আসিও।" স্বামীজি পুনঃ পুনঃ আমাদিগের প্রতি আড়ে আড়ে দেখিতেছিলেন। রকম দেখিয়া বিলক্ষণ বোধ হইল যে আমরা বিদায় হইলেই অব্যাহতি পান। তাঁহার ঘরে একখানা তক্তপোষ দুইখানা লেপ দুইটা বালিশ, মাথার উপরে রৌদ্র নিবারণার্থে একখানি কম্বল টাঙ্গান। এতদ্ভিন্ন একটা সিন্দুক, কতকগুলা জলের কুঁজা, আর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির উপরে যেরূপ পিত্তলের মুকস দেয় সেইরূপ কতকগুলি। শিকার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেয়ালে লেখা—

অন্নং ব্রহ্ম রসং বিষ্ণুঃ
ভোক্তা দেবো মহেশ্বরঃ
প্রিয়তাং ভগবানীশঃ
পরমাত্মা সদাশিবঃ।
ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ
ভগিনী শান্তিশ্চিত্তং গেহিনী
ইত্যাদি।

সর্ব্বত্যাগী পরমহংস ও দণ্ডী আদির দ্বারা সমাজের কোন উপকার হয় না এইরূপ কথা সহসা মনে হইতে পারে। কিন্তু আমি এপর্য্যন্ত স্বীকার করি যে লোককে এইশ্রেণীর বৈরাগ্য শিখাইবার নিমিত্তে এরূপ আদর্শ থাকা নিতান্ত আযৌক্তিক নহে। কিন্তু ইহাতে তৈলঙ্গস্বামীর বিষয়ে পরাজয় মানিতে হয়। ইঁহার মত ধৈর্য্যশিক্ষা এবং শান্তি লাভ হইলেই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা হইবে।

ভরত রাজা বানপ্রস্থ হইবার পরে মৃগ শাবকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজ্যত্যাগ ব্যর্থ হইয়াছিল। তবে তৈলঙ্গস্বামী লোটার মধ্যে মিষ্টান্ন রাখিয়া উদ্ধার হইবার আশা করেন কি প্রকারে? লোকেই বা তাঁহাকে নির্ব্বাণ পদের সমীপবর্ত্তী মনে করে কেন? ফলতঃ তৈলঙ্গস্বামী কেবল মৌন হইবার ব্রত রক্ষা করিতেছেন মাত্র। বৈরাগ্য কি তাহা বুঝিবার জন্য তাঁহাকে দর্শন করা ছাড়িয়া উপায়ান্তর অবলম্বন করা আবশ্যক।

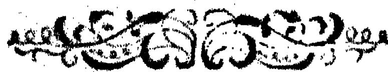
বৈরাগ্য বাহ্যিক আচরণে লব্ধ হয় না। তবে উহা কি বহু শাস্ত্র পাঠ করিলেই হয়? শুকদেব দ্বাদশ বর্ষ গর্ভ মধ্যে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করেন, এবং ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র লোকালয় পরিত্যাগ করেন। ইহাই কি বৈরাগ্যের সার লক্ষণ? রাশি রাশি পুস্তক পাঠ ভিন্ন কি বৈরাগ্য হয় না? রত্নাকর বীতরাগ হইয়া উপাস্য দেবের নামোচ্চারণ মাত্র করিতে শিখিবেন বলিয়া "মরা, মরা" জপ করিয়াছিলেন। ধ্রুব নিবিড় বনে শার্দ্দূলাদিকেও পদ্ম পলাশ লোচন বলিয়া সম্বোধন করেন। রত্নাকর ও ধ্রুবের পাণ্ডিত্য আবশ্যক হয় নাই। বুদ্ধি বৃত্তির চালনা ব্যতীত যদি বৈরাগ্য অনায়ত্ত হইত তবে ধ্রুব ও রত্নাকরের মুক্তির পথ থাকিত না।

রত্নাকরের গল্প বাল্মীকিতে নাই বলিয়া শুনিয়াছি। বোধ হয় কৃত্তিবাস নিম্ন লিখিত স্থল হইতে প্রাগুক্ত কথা উঠাইয়াছেন।

হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ॥
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
হা রাম হা রাম বলি কহে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম হা রাম।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥

চৈতন্য চরিতামৃত। অন্ত্যখণ্ড
৩য় পরিচ্ছেদ।

চৈতন্য স্বভাবতঃই হউক, বা কাহারো অনুকরণ করিয়াই হউক, আপামর তাবৎ লোকের—কেবল 'তাহা নহে—স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত পদার্থের মুক্তি-লাভ বিষয়ে উৎসুক হইয়াছিলেন। স্থাবর জঙ্গমের মুক্তির কথাতে মনে হয় যে হিন্দু সকল বিষয়েই ফাজিল। শুকদেবের উপগর্ভ মধ্যে বেদশিক্ষা; তৈলঙ্গস্বামীর আচরণ; হারাম, মরা-মরার সঙ্গে রাম-নামের সংযোগ; এবং হালের হ্যাট কোট, মায় দাড়ী ধারণ করিয়া ভারত-উদ্ধার করিবার সংকল্প, সকলই ঐ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগে না। হিন্দুও ফাজিল বুদ্ধি ছাড়ে না। মোটা কথা, বৈরাগ্য ভাবটা মনে রক্ষা করিয়া সকল কার্য্য করা যাইতে পারে, বৈরাগ্যও চাই কার্য্যে অনুরাগও চাই, একথা একবারও মনে হয় না। আমি যেটা করিব সেটা আর দশ জনেরও কর্ত্তব্য হইবে একথা বুঝিয়া পরস্পরের সহযোগীতা না করিলে মনুষ্যত্ব থাকে না। কিন্তু সহযোগীতা যেন আমাদের দুচক্ষের বিষ। বিভিন্ন বুদ্ধির সহযোগীতা, বিভিন্ন ইচ্ছার সহযোগীতা, ইচ্ছা বুদ্ধির সহযোগীতা, অন্তর বাহিরের সহযোগীতা, দেহ মনের সহযোগীতা এ গুলি ধর্ম্মের পথ; পরিবার, গ্রাম, বর্ণ, রাজ্য ইত্যাদি বিষয়ে সহযোগীতা সংসারের ব্যবস্থা। ইহার মধ্যে কোন সহযোগীতার মাহাত্ম্যই আমাদের মনে তেজ করে না, ধর্ম্মোপাসনা ও সাংসারিক কার্য্যের সহযোগীতার তো কথাই নাই। ধন্য পাতঞ্জলীর বি—যোগ। আর কত পোড় পুড়িলে এই পতঙ্গ কুলের অগ্নি বোধ জন্মিবে তাহা বলা যায় না।



মহারাজা নন্দকুমার রায়।

সকলেই অবগত আছেন যে, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতার গড়ের মাঠে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। হেষ্টিংস সাহেব তাঁহার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া, আপনার মান ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য, সুপ্রীম কোর্টের চিফ জষ্টিস ইম্পে সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহার বধ সাধন করেন। ফ্রান্সিস, ক্লাবরিং, মনসন প্রভৃতি কৌন্সিলের মেম্বরগণ বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে পারেন নাই। এই প্রকাণ্ড পুরুষ কে? ইহাঁকে মারিবার জন্য বঙ্গের অদ্বিতীয় অধীশ্বর এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেন? এবং কৌন্সিলের মেম্বরেরা ইহাঁর জীবন রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত কেন? জানিবার জন্য অনেকেরই ঔৎসুক্য হইতে পারে। তাঁহাদের সেই ঔৎসুক্য কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্য আমরা অদ্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

কিন্তু নন্দকুমারের জীবনচরিত লিখিতে গিয়াও আমরা কোন সন্ধান পাই না। তিনি সবেমাত্র ১০৭ বৎসর গত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি কোথায় জন্মান, কিরূপে লেখা পড়া শিখেন, কিরূপে প্রথম চাকরী করিতে যান, কত জায়গায় কি কি চাকরী করেন, এ সকল কথা আমরা কিছুই জানিতে পারি না। একশত সাত বৎসরের মধ্যে এতবড় একটা লোকের কথা লোকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। আমরা যাহা জানিতে পারি, ইংরাজ ও মুসলমান লেখকের নিকট। তাহাও নন্দকুমারের জীবনের শেষ ২০ বৎসরের কথা। কিন্তু এই কুড়ি বৎসর বাঙ্গালার ভয়ানক সময়। এই ভয়ানক সময়ের নন্দকুমার একজন প্রধান লোক। দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার যখন বিপদ পড়িয়াছে, তিনিই নন্দকুমারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কি হেষ্টিংস, কি মীরজাফর, কি নজমউদ্দৌলা, কি ক্লাইব, কি মণিবেগম, সকলেই এক না এক সময়ে তাঁহার শরণাগত হইয়াছেন। আবার বাঙ্গালায় এমন বড় লোক অল্পই ছিলেন যাঁহারা নন্দকুমারকে ভয় না করিতেন। তাঁহার মত তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক অতি বিরল, ভয় কাহাকে বলে তিনি বোধ হয় একেবারেই জানিতেন না।

নন্দকুমারের জীবনচরিত লিখিবার পূর্ব্বে হিন্দুরা যে মুসলমানের চাকরী করিতে যাইত, তাহার কতকটা ইতিহাস দেওয়া আবশ্যক। যখন পাঠানেরা রাজা, তখন হিন্দুরা বড় চাকরী করিত না

এবং পাইতও না। আরস্কিন সাহেব "বাবর ও হুমায়ুন নামক" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে মিশিত না। মুসলমানেরাও মুসলমান না হইলে তাহার সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিত না। ফেরিস্তা ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণেরা প্রয়োজন হইলে কখন কখন দরবারে আসিত; কিন্তু কখন চাকরী স্বীকার করে নাই। তাঁহার মতে দিল্লীর গঙ্গু নামক ব্রাহ্মণ দক্ষিণের বামনী রাজ্যের রাজস্বসচিব হন। এই ব্রাহ্মণ প্রথম মুসলমানের নিকট চাকরী স্বীকার করে। ইহার পূর্ব্বে দুই এক জন হীন জাতীয় লোক বড় চাকরী পাইয়াছে শুনা যায়, কিন্তু বড় লোকে মুসলমানের চাকর হইয়াছে শুনা যায় না। গঙ্গুর পরও অনেককাল সদ্বংশীয় হিন্দু, মুসলমানের চাকরী করিয়াছে দেখা যায় না। হিমু বড় চাকরী করিয়াছিল, কিন্তু সে কি জাতি ছিল জানা যায় না।

পাঠানরাজ্য যায় যায় এমন সময়ে, হিন্দুবুদ্ধির একটা নূতন বিপ্লব হয়। সেই বুদ্ধিবিপ্লবের ফল এই হয়, যে হিন্দুসমাজের বাঁধাবাঁধি একটু কমিয়া যায়। আর উহাদের একটু নূতন জীবনের আভাস উপলব্ধ হয়। কয়েকটী নূতন ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, নূতন ন্যায়, নূতন স্মৃতি, নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এই জীবনের ফল কতকগুলি ছোট ছোট হিন্দুরাজ্য স্থাপন, অনেক স্থানে স্বাধীন হইবার চেষ্টা এবং যেখানে যেখানে পরাক্রান্ত রাজা ছিল, সেখানে সেখানেই রাজকর্ম্মে প্রবেশ করা ও তাহাতে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের ইচ্ছা।

বাবর ও আকবর আসিয়া এইটী লক্ষ্য করেন এবং ঐ হিন্দুদিগের সহিত মিলিয়া একটী মহাপরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করেন। যাঁহাদিগের উপর মোগলেরা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা কখন বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। তবে মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস হইল কেন? মহারাষ্ট্রীদের পরাক্রমে, নূতন মুসলমানদিগের বিশ্বাসঘাতকতায়, এবং আরঞ্জীবের গোঁড়ামীতে।

যে রূপেই হউক, আরঞ্জীবের মৃত্যুর পর হইতেই যত এদিকে গোলযোগ বাড়িতে লাগিল, মহারাষ্ট্রীরা যত অধিক বলবান হইতে লাগিল, চাকরিয়া হিন্দুরাও ততই বলবান হইতে লাগিল। দিল্লীর উজীরের দেওয়ান রতনচাঁদ যেরূপ কিছু দিন সমস্ত মুলুকের কর্ত্তা হইয়াছিল, যা বলিত তাই হইত, তাহা অনেকেই জানেন।

হিন্দুরা যেখানে যতই ক্ষমতাপন্ন হউন না কেন, বাঙ্গালায় তাহাদের আধিপত্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। মুরশিদ কুলী খাজানার কাজে হিন্দু বই মুসলমান রাখিতেন না। সুজার দরবারে দুই জন মুসলমান এবং তিন জন হিন্দু দরবারী ছিলেন। এ ত গেল কেবল রাজস্বের কার্য্যে। কিন্তু মীর হবীব সম-

সের খাঁ প্রভৃতি মুসলমানদিগের বার বার বিদ্রোহে যখন আলিবর্দ্দি বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি প্রায় সকল বড় পদেই হিন্দু নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। রামনারায়ণকে বেহারের নায়েবনিজাম করিলেন। রায় দুর্লভ রায় রাইঞা হইলেন, রাম-রাম সিং ডাক ও গুইন্দা বিভাগের কর্ত্তা হইলেন। মাণিকচাঁদ নবাবের প্রিয় পাত্র হইলেন। রাজবল্লভ ঢাকার, নায়েবনিজাম হইলেন, শ্যামসুন্দর পূর্ণিয়ার গোলন্দাজ সৈন্যের কর্ত্তা হই-লেন। যিনি আলিবর্দ্দির বঙ্গ অধি-কারের প্রধান সহায় ছিলেন, তিনিও হিন্দু। তাঁহার নাম নন্দ সিং। তিনি ১৭৪০ সালে রাজমহলের নিকট আলিবর্দ্দির জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

এইরূপে আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে যে সকল লোক বড় বড় পদ প্রাপ্ত হয় আমাদের নন্দকুমার তাহাদের একজন। ইনি রাঢ়ীশ্রেণীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ভঙ্গকুলীন। ইহার জন্মস্থান কোথায় জানি না, কিন্তু ইনি মুরশিদা-বাদের নিকট কুঞ্জঘাটায় বাস করিতেন বোধ হয় তাঁহার জন্মস্থানও ঐখানে। কারণ সে কালের হিন্দুরা নিজের জন্ম-ভূমি ত্যাগ করিতে প্রায়ই চাহিতেন না খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেই ইহার জন্ম হয়। কারণ বর্ক বলিয়াছেন "যে ফাঁসির সময় ইহার বয়স ৭০ বৎসর।*"

আমরা শুনিয়াছি ইনি প্রথম হইতে আপনার দক্ষতা গুণে নবাবের প্রিয়পাত্র হন। ইতিহাসলেখকেরা বলেন, যে ইনি অতি দরিদ্রের সন্তান। নন্দকুমারের বিষয় কিছু কিছু জানেন আমরা এমন এক জনের মুখে শুনিয়াছি, যে এক সময়ে মুরশিদাবাদ অঞ্চলে প্রজারা খাজনা দিতে চাহে না, যে কেহ নবাব সরকারের লোক যায় তাহাকেই মারিয়া তাড়াইয়া দেয়। সুতরাং সে অঞ্চলে কেহই যাইতে চাহে না। সেই সময় নন্দকুমার—তখন প্রথম চাকরীতে প্রবেশ করিয়াছেন,—যাইতে চাহিলেন, এবং অল্প দিবস মধ্যে সে মহল শাসিত করিয়া আসিলেন। ইহাতে নবাব তাঁহার উপর বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং এই তাঁহার উন্নতির প্রথম সোপান হইল। কিন্তু ঐ সময়ে নবাব কে ছিলেন তাহা আমাদের সংবাদ দাতা বলিতে পারিলেন না। এ কথাটিতে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়, কারণ তাঁহার জীবনচরিতে খাজনা আদায় সম্বন্ধে আরও এইরূপ দুই একটী দুঃসাহসিক কার্য্যের কথা লিখিত হইবে।

যাহা হউক আমরা এক্ষণে শোনা কথা ত্যাগ করিয়া ইতিহাস ক্ষেত্রে অব-তীর্ণ হইব।

সিরাজ উদ্দৌলা যখন কলিকাতা

---

* Burke Vol X III. 591.

আক্রমণ করেন তখন নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার ছিলেন।* কিন্তু কলিকাতা আক্রমণসম্বন্ধে তাঁহার কথা একবারও শুনিতে পাই না। বরং আর্ম্ম বলেন, যে সে সময় মাণিকচাঁদ হুগলীর ফৌজদার ছিলেন।† কিন্তু সিয়ার মতক্ষরীনের গ্রন্থকার বলেন যে মাণিকচাঁদ বর্দ্ধমানের রাজার দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে রাজা নন্দকুমার অনেক কাল ধরিয়া হুগলীতে ফৌজদারী করেন। কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন যে, যখন সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগকে উৎসন্ন দিয়া ফরাসী ও ওলন্দাজদিগকেও উৎসন্ন দিবার ভয় দেখান, তখন নন্দকুমার তাহাদিগকে টাকা দিয়া এ দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পরামর্শ দেন। তাহাতেই ফরাসীরা ৪॥০ লক্ষ এবং ওলন্দাজেরা ৩॥০ লক্ষ টাকা দিয়া সে যাত্রা অব্যাহতি পায়।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে ১৭৫৬ খ্রীঃঅব্দে নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার হইয়াছেন। তৎকালে সুবা বাঙ্গালায় দশটী ফৌজদারী ছিল। ইস্লামাবাদ চাটগাঁ, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, রাঙামাটি, জেলালগড় পূর্ণিয়া, রাজমহল আকবরনগর, রাজসাহী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং বন্দীবন্দর হুগলী ‡। জমিদারদিগকে দমনে রাখা চোর ডাকাত লুঠেড়ার শাস্তি দেওয়া এবং সৈন্যদিগের তত্ত্বাবধারণ করা ইত্যাদি ফৌজদারের কর্ম্ম, নিজামের অনুমতি মাত্র সসৈন্যে তাহার নিকট পৌছান তাঁহার অপর এক কার্য্য, নন্দকুমার ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ইংরাজেরা উৎসন্ন গেলেন। সিরাজউদ্দৌলা খুড়তত ভাএর সঙ্গে লড়াই করিতে পুরনিয়ায় গেলেন। এ অঞ্চল ঠাণ্ডা হইল। সবাই জানিল ঠাণ্ডা হইল। মাণিকচাঁদ কলিকাতায় বন্দোবস্ত করিয়া বর্দ্ধমানে গেলেন। তিনি জৈন ছিলেন, বেহারের পাহাড়ে তাঁহার মন্দির তৈয়ার হইতেছিল, কলিকাতার লুঠের টাকা লইয়া সেই সদ্ব্যয়ে লাগাইয়া দিলেন। সকলেই জানিল যে ইংরাজেরা ইহকালের মত এ দেশ হইতে বিদায় হইল। কিন্তু হুগলীর ফৌজদারের ধারণা অন্যরূপ ছিল। তিনি কলিকাতার দক্ষিণ তানার ওপারে আলিগড় নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন, এবং যদি দুর্গ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ইংরাজ আইসে এই জন্য দুইখানি জাহাজ কিনিয়া তাহাতে ইট বোঝাই ¶ করিয়া রাখিলেন, যে বিপদের সময়, তানা ও আলিগড়ের মধ্যে গঙ্গার সঙ্কীর্ণ অংশ ঐ ইট দিয়া বুজাইয়া দিবেন।

* Mill Vol III 277. † Ormes Indostan Book VI P 53.

‡ Seer Ul mataksherim, Vol III. 724.

¶ Seer mataksherim Vol II. Sec VI.

পরে ইংরেজেরা সসৈন্যে আসিতেছেন শুনিয়া আবার মাণিকচাঁদ কলিকাতায় আসিয়া জুটিলেন। তাহার গুইন্দারা ক্লাইবের সৈন্যের সঙ্গ লইল, এবং বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু একটী সামান্য যুদ্ধে মাণিকচাঁদ এত ভয় পাইলেন যে, পলায়ন করিয়া একেবারে মুরসিদাবাদে উপস্থিত। ইংরাজেরাও অতি সত্বর আলিগড়ের নিকটে যুদ্ধ জাহাজ আনিয়া উপস্থিত করিল। নন্দকুমারের দুই জাহাজ ইট হুগলীর ঘাটেই বাঁধা রহিল।

মাণিকচাঁদ কলিকাতা হইতে যাইবার সময় হুগলী হইয়া গেলেন, সকলকে বলিয়া গেলেন যে, ইংরাজের সাহস ভয়ানক, তোমরা সাবধান! সেনাগণ অত্যন্ত ভীত হইল। নন্দকুমার এই সময়ে মাণিকচাঁদের মত ভীত হইলে হুগলীও নবাবের হাতছাড়া হইত। ইংরাজেরা কলিকাতা অধিকার করিলেন, এবং হুগলীতে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে জানিতে পারিয়া হুগলী দখল করিবার জন্য অনেক সৈন্য ও জাহাজ লইয়া যাত্রা করিলেন। রাস্তায় ৪ দিন দেরি হইয়া গেল। এই সময়ে চুচুড়ার কোল হইতে হুগলী গঙ্গার ধারে ৩ মাইল বিস্তৃত ছিল। নগরের উত্তর ধারে একটী কেল্লা ছিল, হুগলীতে তখন দুই সহস্র সৈন্য থাকিত, এবং তিন সহস্র সৈন্য মুরশিদাবাদ হইতে আসিয়াছিল। ইংরেজেরা জল হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং কেল্লার উপর তোপ ছাড়িতে লাগিলেন। কেল্লার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন ইংরাজেরা বড় ফটকের দিকে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। মুসলমান সৈন্য সেইদিকে ধাবিত হইল। এদিকে ছিদ্রপথে আর একদল দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিল। অনায়াসেই দুর্গ অধিকৃত হইল, ইংরাজের নাকি এই যুদ্ধে সবে ৩ জন গোরা আর দশ জন সিপাহী মরে। দুর্গ দখল হইলেও ইংরেজেরা নগর অধিকারের চেষ্টা করিলেন না। তাঁহারা পরদিন ধানের গোলা লুঠ করিতে করিতে বান্দেলে পঁহুছেন। কিন্তু তথায় তাহাদিগকে এমনি ঘেরাও করে যে, অতি কষ্টে তাঁহারা পলায়ন করেন; তাহার পর জলে জলে লুঠতরাজ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে নন্দকুমার কি করেন জানিতে পারা যায় না। কিন্তু তিনি মাণিকচাঁদের ন্যায় পলায়ন করিলে ইংরাজেরা নিশ্চয়ই হুগলী অধিকার করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যে স্থলে বিশেষ উপদ্রব করেন নাই এবং হুগলী দখল করিয়াও রাখিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহাতেই বোধ হয় নন্দকুমার বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন।

আবার সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতায় আসিলেন, আবার ইংরাজদিগের সহিত মুসলমানের যুদ্ধ হইল, কিন্তু সে সকল বলিবার কোন প্রয়োজন নাই।

যখন ইংরাজেরা চন্দননগর অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, তখন নবাব নন্দকুমারকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "তুমি অতি সত্বর সমস্ত সৈন্য সঙ্গে ফরাসীদিগের সাহায্য করিবে। আমার সমস্ত সৈন্য অগ্রদ্বীপে রহিল, প্রয়োজন হইলে তাহারাও গিয়া পৌঁছিবে।" নন্দকুমার অমনি তৎক্ষণাৎ কতকগুলি সৈন্য লইয়া ফরাসডাঙ্গায় ছাউনী করিলেন।

এই সময়ে ওয়াট সাহেব ও উমিচাঁদ আসিয়া হুগলী উপস্থিত হইলেন। এবং নন্দকুমারকে নানারূপ আশা ভরসা দিলেন, বলিলেন "ইংরেজদের যুদ্ধে কেহ পারিবে না।" কিছু ঘুস দিলেন এবং বলিয়া দিলেন ইংরেজেরা চিরদিন তোমার বন্ধু থাকিবে, তুমি আমাদের পক্ষ হও। নন্দকুমার সম্মত হইলেন এবং উহারাও নবাবের অনুমতির জন্য মুরশিদাবাদ যাত্রা করিলেন। *

নবাবের অনুমতি পাওয়া গেল, এবং গেলও না, কেন না সিরাজ একবার বলিলেন "আচ্ছা তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় কর।" আর একবার বলিলেন, "না চন্দননগর আক্রমণ করিও না।" কিন্তু বোম্বাই হইতে ইংরাজদিগের তিনখানি যুদ্ধজাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা নবাবের অনুমতির প্রতি তত লক্ষ্য না করিয়া এই সুযোগে ফরাসডাঙ্গা আক্রমণ করিলেন। এবং যত শীঘ্র নগর দখল হয় তাহার চেষ্টায় রহিলেন। এত তাড়াতাড়ি করিবার কারণ এই যে নবাব বারত্রয় দূত পাঠাইয়াছেন, যে, তোমরা ফরাসডাঙ্গায় ঘেরাও করিও না। এবং রায়দুর্লভকে অনেক সৈন্যের সঙ্গে সত্বর ফরাসডাঙ্গায় পঁহুছিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। রায়দুর্লভও হুগলীর দশ ক্রোশের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নন্দকুমার তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে আপনার আসা বৃথা, আপনি আসিবার পূর্ব্বেই দুর্গ জয় হইয়া যাইবে। দুর্গ জয় হইল, ইংরাজের সহিত নন্দকুমারের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হইল।

এই সময়ে নবাবের অনুমতি অনুসারে হুগলীর লোকে ফরাসী সৈন্যগণের বিস্তর উপকার করিয়াছিল, না হইলে ইংরাজেরা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেরূপ ধাবমান হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহাদের একটীও নিরাপদ হইতে পারিত না। ফরাসীদিগের উদ্ধার সম্বন্ধে নন্দকুমার বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহারাও নির্ব্বিঘ্নে মুরশিদাবাদে পৌঁছিয়াছিল।

নন্দকুমার আলিবর্দ্দি খাঁর বংশের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু তথাপি পলাশির যুদ্ধের কিছু দিন পূর্ব্বে নবাব তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া হুগলীর ফৌজদারী হইতে অবসৃত করেন†

* Orme's Indostan Book VII, 123—125.
† Orme Book VII 164.

সুতরাং পলাশীর যুদ্ধের সময় নন্দকুমার কি অবস্থায় ছিলেন আমরা জানিতে পাই না। কিন্তু যে বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজ উদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিল, তিনি তাহার মধ্যে ছিলেন না।

সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ বলেন যে, সিরাজ উদ্দৌলার মৃত্যুর পর নন্দকুমার ক্লাইবের মুন্সী ও দেওয়ান হন।* তাঁহার পূর্ব্বে বড় বাজারের, দেওয়ান কাশীরাম নামে একজন ক্লাইবের দেওয়ান ছিলেন।

মীরজাফর নবাব হইবার অল্প দিন পরেই রামনারায়ণকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, এবং ক্লাইবের সহিত সসৈন্যে পাটনাযাত্রা করেন। কিন্তু রামনারায়ণ ইংরাজের শরণাপন্ন হওয়ায় তাঁহার মনোরথ বিফল হয়। রামনারায়ণকে বাঁচাইবার জন্য নন্দকুমারকে অনেকবার ক্লাইবের এজেণ্ট হইয়া নবাবের নিকট যাইতে হইয়াছিল। † তিনি এ বিষয়ে ক্লাইবের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং ক্লাইব, রামনারায়ণ, ও নবাব, এ তিন জনের যাহাতে সম্প্রীতি থাকে, তাহার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সসৈন্যে পাটনাযাত্রা কালে নন্দকুমার বরাবর ক্লাইবের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন, যখন যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হইয়া গেল, তখন ক্লাইব মুরশিদাবাদে আসিলেন, এবং সেখান হইতে সত্বর কলিকাতায় আসিলেন। কেবল সানক্রপ্ট সাহেব নবাবের নিকট টাকা আদায় করিবার জন্য মুরশিদাবাদে রহিলেন, নবাব ইতিপূর্ব্বে বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগরের রাজার উপর ইংরাজদিগকে টাকা দিবার বরাত দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজারা টাকা দিতে পারেন নাই। নন্দকুমার সুবা বাঙ্গালার সব খবর রাখিতেন, তিনি রাজস্ব বিষয়ে অতিশয় দক্ষ ছিলেন, এজন্য রাজা রায় দুর্লভ তাঁহাকে আপন অধীনে নিযুক্ত করেন। বরাতী টাকা আদায় না হওয়ায় যখন ইংরাজেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, তখন নন্দকুমার প্রস্তাব করেন যে, যদি নবাব, রায়দুর্লভ এবং ইংরাজেরা আমায় ভার দেন, আমি অতি অল্প দিনেই টাকা আদায় করিয়া দিতে পারি। সকলে ভার দিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণনগরের রাজাকে একেবারে কয়েদ করিবার হুকুম দিলেন। রাজা পলায়ন করিয়া কলিকাতার ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। নন্দকুমারের প্রাদুর্ভাব বাড়িতে লাগিল। সকলেই তাহাকে ভয় করিতে লাগিল। এই সময়ে নবাব, রায়দুর্লভের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু এতদিন পারেন নাই, কারণ, ইংরাজেরা তাঁহার পক্ষ ছিলেন। নন্দকুমার ইংরাজদিগকে বেশ চিনিয়াছিলেন, তিনি

---

* Seir. Mutakherim. Vol II SectXII P. 378.

† A note Seir. Mutakherim. Vol II. Sec IX 20.

নবাবকে বুঝাইয়া দিলেন, যে টাকা দিতে পারিলে, ইংরাজেরা কিছুই বলিবে না এবং তিনি নবাবকে বলিয়াছিলেন যে, আমিই ইংরাজদের টাকা যেরূপে পারি দিব। তিনি শেঠদিগকে বলিলেন, যে রায়দুর্লভ যদি রাজকোষ হইতে টাকা দিতে না চান, তাহা হইলে নবাবের যে রূপ টাকার দরকার, হয় ত, তোমাদেরই সেই টাকা দিতে হইবে। এই কথায় তাঁহারাও রায়দুর্লভের উপর বিরক্ত হইল।

তখন মীরণ ঢাকার ডেপুটী গবর্ণর, রাজবল্লভকে আপনার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন, এবং রায়দুর্লভকে ঢাকা সুবার নিকাশ দিতে বলিলেন। রায়দুর্লভ পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আসিতে চাহিলেন, মীরণ বলিলেন, নবাবের সৈন্যগণের যতদিন মাহিয়ানা না দেওয়া হয় ততদিন আপনি যাইতে পারিবেন না। যাহাই হউক, শেষ ইংরাজদিগের সহায়তায় রায়দুর্লভ সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া সে যাত্রা পরিত্রাণ পান।

ইহার পর নন্দকুমার আবার হুগলী আইসেন, নবাব এই সময়ে রায়দুর্লভের উপর ইংরাজদিগের বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিবার জন্য একটী কাণ্ড উপস্থিত করেন। তিনি একদিন মসজিদে যাইতেছেন, দেখিলেন খোজাহাদীর কতকগুলি অধীনস্থ লোক সশস্ত্রে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। তিনি কোন মতে তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া রটাইয়া দিলেন যে রায়দুর্লভ তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য এই সকল লোক রাখিয়াছিল। নবাব রায়দুর্লভের একখানি চিঠি দেখান, ঐ চিঠি খোজা হাদীর নামে লিখিত, উহাতে লেখা আছে যে "আমি ক্লাইবেরও এ বিষয়ে মত করিবার চেষ্টায় আছি, এবং সে জন্য ওয়াট ও সানক্রপ্ট সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছি। তুমি আমার সাহায্য কর" চিঠিখানি জাল। কিন্তু মীরজাফর ঐ চিঠিখানি সত্য বলিয়া প্রমাণ করাইতে চাহেন, এবং তজ্জন্য নন্দকুমারকে লিখেন যে "তুমি যদি ঐ চিঠি সত্য বলিয়া ইংরাজদের বিশ্বাস করাইয়া দিতে পার, আমি তোমায় উপাধি দিব এবং জায়গীর দিব।"* নন্দকুমার ঐ পত্র ক্লাইবকে দেখান, ঐ পত্র মীর জাফরের স্বহস্তে লিখিত। ক্লাইব বরাবর নন্দকুমারকে সম্মান করিতেন এবং তাঁহাকে বাধ্য করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

ক্লাইব বিলাত চলিয়া গেলে কলিকাতায় দুইটী দল হয়। বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস একদল এবং এমিএট প্রভৃতি আর একদল। এই সময়ে নন্দকুমার কলিকাতায় থাকিতেন, তিনি মীরজাফরের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়া-

* Orme Book XI, P 356 to 62.

ছিলেন। যাহারা মীরজাফরকে কলিকাতায় নজরবন্দী রাখিয়া মীর কাশিমকে নবাব করিল তাহারা সুতরাংই তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। আমরা এই চারি বৎসর নন্দকুমার কি করিয়াছিলেন জানি না। মিল বলেন যে তিনি ইংরাজদিগের শত্রুগণের সহিত পত্রাদি লিখিতেন এবং একবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।* গোলাম হোসেন বলেন নন্দকুমার সমস্ত দেশের লোককে চটাইয়াছিলেন। তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা ভয়ানক ছিল। গবর্ণর হেনরি বান্সিটার্ট সাহেব নন্দকুমারের উপর এত চটিয়াছিলেন, যে তিনি নন্দকুমারের সর্ব্বনাশের জন্য একখানি বই দপ্তরীর বাড়ী হইতে বাঁধাইয়া আনেন। তাহাতে নন্দকুমারের দোষের কথা উল্লেখ করিয়া রেকর্ড রাখিয়া যান। তিনি বেশ জানিতেন যে ক্লাইব নন্দকুমারের কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। পাছে ক্লাইব তাহাকে কোন উচ্চ পদ প্রদান করেন এই জন্য বান্সিটার্ট বিলাত যাইবার সময় আপন ভ্রাতা জর্জ্জ বান্সিটার্টের হাতে ঐ বাঁধান বই খানি দিয়া যান। এবং প্রয়োজন হইলে ঐ বই কৌন্সিলে এবং ক্লাইবের নিকট উপস্থিত করিবার উপদেশ দিয়া যান।†

নন্দকুমার এত কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার গবর্ণর বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহার সর্ব্বনাশের জন্য এতদূর গুরুতর কার্য্য করিয়া যান, তাহা আমরা জানিনা। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, মীরজাফরের নন্দকুমার নহিলে চলিত না, যখন ইংরাজেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন, যখন তিনি মুরশিদাবাদের সিংহাসন হারাইলেন, যখন পৃথিবীতে তাঁহার আর আমার বলিবার লোক রহিল না, তখন নন্দকুমারই তাঁহার একমাত্র সহায় ছিলেন। যে সকল কৌন্সিলের মেম্বরেরা মীরজাফরের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা নন্দকুমারেরও পক্ষপাতী ছিলেন। এক্ষণে যেখানে বীডন স্কোয়ার হইয়াছে ঐ স্থানে নন্দকুমারের বাড়ী ছিল ‡। কলিকাতার সাহেব মহলে তাহার খুব পসার ছিল। তিনি তন্তুবায় জাতীয় শেট দিগকে কলিকাতায় আনিয়া বাস করান। যখন মীরজাফর দ্বিতীয়বার নবাব হন তখন তিনি নন্দকুমারকে আপনার দেওয়ান করেন। বান্সিটার্ট সাহেব বাধা দিলেন, মীরজাফর ছাড়িলেন না। শেষ নন্দকুমার কলিকাতায় বসিয়াই দেওয়ানী করিতে লাগিলেন। কিন্তু নবাব বারম্বার তাঁহাকে মুরশিদা-

* Mill Vol III 360.

† Seir Metakherim Vol II Sec XII, 375. 76. 77.

‡ রাজা নবকৃষ্ণের জীবন চরিত।

বাদে লইয়া যাইবার জন্য পত্র লিখিতে লাগিলেন; রাজ্যের মধ্যে নানা গোল যোগ ঘটিতে লাগিল। বান্সিটার্ট সাহেব তথাপি ছাড়িবেন না; কিন্তু কৌন্সিলের মেম্বরেরা অনেকেই নন্দকুমারের পক্ষ-ছিলেন। নন্দকুমার মুরশিদাবাদ যাইবার অনুমতি পাইলেন। তিনি তথায় গিয়াই ঢাকার নাজিম মহম্মদরেজা খাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া মুরশিদাবাদে আনিলেন। তাঁহার নাজিমি কাড়িয়া লইলেন, এবং ঢাকায় সমস্ত কাজে মুরশিদাবাদ হইতে নিজের লোক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তিনি মহম্মদ রেজাখাঁর বিচারের জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে কাশীম বাজারের ইংরাজ চিফ তাঁহাকে বাধাদিলেন এবং এই সময়ে মীরজা-ফরের সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইল। মীরজাফর মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নন্দ-কুমারকে কিরীটকোনা নামক স্থানের ঠাকুরের চরণামৃত আনিতে আদেশ দেন—এবং সেই চরণামৃত পান করিয়া তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

বান্সিটার্ট চলিয়া গেলেন। মীরজা-ফর মরিয়া গেলেন। নন্দকুমারের প্রধান শত্রু ও প্রধান মিত্র দূর হইলেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা নজমউদ্দৌলাকে নবাব করিলেন। নন্দকুমারকে দেওয়ান করিলেন। কিছু দিন নন্দকুমার বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যায় সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। কিন্তু জর্জ বান্সিটার্ট তাঁহার দাদার পুস্তক খানি একদিন কৌন্সিলে পাঠ করিলেন। তখন কৌন্সিলের মেম্বরেরা তাঁহাকে মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিতে বলিলেন। কিন্তু পদচ্যুত করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহারই অধীনস্থগণ মুরশিদাবাদে তাঁহার নামে দেওয়ানের কার্য্য করিতে লাগিল। কৌন্সিলের মেম্বরেরা তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। ক্লাইব কলি-কাতায় আসিলে নন্দকুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ক্লাইবের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল তাঁহার উপকার করেন, কিন্তু বান্সিটার্টের পুস্তক পড়িয়া তিনি নন্দকুমারকে পদচ্যুত করিলেন, এবং তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে মহম্মদ রেজা খাঁ দেওয়ানী লাভ করিলেন।

১৭৬৭ খৃঃ অব্দে নন্দকুমার কমলঘোষ নামক আর এক জন লোকের সহিত যোগ করিয়া রাজা নবকৃষ্ণের নামে ঘুষ লওয়া অপরাধের নালিশ করেন, রাজা নবকৃষ্ণ এই সময়ে সাতটী বড় বড় ডিপার্টমেণ্টের কার্য্য করিতেন। তাঁহার বিচারক গবর্ণরের কৌন্সিল। এই বিচারে নবকৃষ্ণ অব্যাহতি পান। *

ক্লাইব যখন শেষবারে এখান হইতে যান তখন বান্সিটার্টের শত্রুরা এবং ক্লাইবের মিত্রেরা একত্র হইয়া নন্দকুমা-

* রাজা নবকৃষ্ণের জীবন চরিত।

রকে বাঙ্গিটার্টের শাসনের দোষ প্রকাশ করিতে বলেন। নন্দকুমারের নিকট ইহা অপেক্ষা ভাল কাজ আর কি হইতে পারে? তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হন, এবং বাঙ্গিটার্টের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন, গোলাম হোসেন বলেন তিনি এই কথা শুনিয়াছেন কিন্তু ইহার বিশেষ খবর কিছু জানেন না।

ইহার পর তিন চারি বৎসর নন্দকুমারের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরে যখন ইংরাজেরা মহম্মদ রেজা খাঁকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনিলেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে কে ভালরূপ সংবাদ দিতে পারে, তাহার সন্ধান আরম্ভ হইল, তখন নন্দকুমারই এ কাজের উপযুক্ত বোধে তাঁহার পুত্র গুরুদাসকে মুরশিদাবাদের দেওয়ান করিয়া দেওয়া হইল। মহম্মদ রেজাখাঁর সমস্ত লোককে বিদায় দিয়া রাজা নন্দকুমারের সমস্ত লোককে তথায় চাকরী দেওয়া হইল। আবার নন্দকুমার বাঙ্গালায় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এবার তাঁহার প্রভুত্ব পূর্ব্বের মত নহে। এখন কোম্পানি দেওয়ান, কোম্পানির অধীন একজন রায় রাইঞা আছেন। এখন রাজা গুরুদাস নিজামতের দেওয়ান হইলেন মাত্র। নবাব নাবালগ তাহার শিক্ষার ভার মণি বেগমের হস্তে অর্পিত হইল।

সকলেই অবগত আছেন যে বাঙ্গিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেব বরাবর এক মত ছিলেন। সুতরাং হেষ্টিংস নন্দ কুমারের একজন প্রধান বিরোধী। এখন নন্দকুমারকে এরূপ পদ ও ক্ষমতা দেওয়ায় সকলেই হেষ্টিংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কেন এমন অন্যায় কার্য্য করেন। তাহাতে হেষ্টিংস উত্তর দেন, নন্দকুমার যখন মীর জাফরের কর্ম্মচারী ছিলেন, তখন তিনি ইংরাজ রাজ্যের প্রজা ছিলেন না। তখন তিনি মীর জাফরের মঙ্গলের জন্য ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি নিজ প্রভুর কখন মন্দ করেন নাই। মীরজাফর ও মীরজাফরের বংশে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল অতএব তিনি এখন ইংরাজের প্রজা এবং ইংরাজের অধীন হইলে, ইংরাজদিগের প্রতিও সেইরূপ প্রভুভক্তি দেখাইবেন।*

আমরা হেষ্টিংসের এই সার্টিফিকেট হইতে নন্দকুমারের চরিত্রের বিষয় অনেক বুঝিতে পারি। তাঁহাকে ইংরাজেরা যেরূপ ভয়ানক নরাধম বলিয়া বর্ণনা করেন তিনি তাহা ছিলেন না। এইরূপ পদপ্রাপ্তির কিছু দিন পরেই ক্লেবরিং, ফ্রান্সিস, ও মনসন মেম্বর হইয়া আসিলেন। তাহারা হেষ্টিংসের নামে নানা রূপ নালিশ লইতে লাগিলেন। তখন নন্দকুমারও হেষ্টিংসের নামে কৌন্সিলে নালিশ করিতে গেলেন।

* Burke Vol XIII 497.

নন্দকুমার কেন হেষ্টিংসের নামে শুধু শুধু নালিশ করিতে যান, জানিতে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। নন্দকুমার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে জানিয়াছিলেন যে, এক দিন না একদিন, হেষ্টিংস তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবেন। এমন কি তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন হেষ্টিংস তাঁহার দুই একজন কর্ম্মচারীর সহিত গোপনে কি পরামর্শ করেন। একদিন নন্দকুমার হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, সাক্ষাৎ পাইলেন না, বরং শুনিলেন তাহারই পদচ্যুত দুই জন কর্ম্মচারীর সহিত কি পরামর্শ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি হেষ্টিংস কিছু করিবার পূর্ব্বেই হেষ্টিংসের সর্ব্বনাশ করিতে সংকল্প করিলেন। তিনি হেষ্টিংসের বিপক্ষ মেম্বরদিগকে বলিলেন আমি স্বহস্তে মনিবেগমের ঘুস হেষ্টিংসকে দিয়াছি। তখন হেষ্টিংস দেখিলেন মহা বিভ্রাট—নন্দকুমার অনায়াসেই তাঁহার দোষ সাব্যস্ত করিয়া দিতে পারিবেন। তখন তিনি কৌন্সিল সভা ভঙ্গ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি এই সময়ে যেরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি যে দোষী তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ হয়। তিনি নিজে ও বারওএল, ও বান্সিটার্ট সাহেব ও কান্তবাবু এবং রায় রাইঞা রাজা রাজবল্লভ, একত্র হইয়া সুপ্রীমকোর্টে নন্দকুমার ও তাহার জামাই রায় রাধাচরণ এবং ফক সাহেবের নামে এক ষড়যন্ত্রের জন্য ইনডাইটমেণ্ট আনিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। মেম্বরেরা নন্দকুমারের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া গেলেন। তখন হেষ্টিংস সাহেব মোহনপ্রসাদ নামক নন্দকুমারের একজন অনুচরের সহিত মিলিত হইয়া, তাহার নামে জাল করার এক নালিশ রুজু করিলেন। নন্দকুমারকে লইয়া গিয়া জেলে রাখা হইল। নন্দকুমার অত্যন্ত ইষ্টনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারাগারে তাঁহার আহারাদি করার বিশেষ আপত্তি ছিল। তিনি সে বিষয়ে কৌন্সিলের সাহেবদিগকে জানাইলেন, এদিকে জজ ইম্পে ভট্টাচার্য্যদিগের মত গ্রহণ করিলেন। রাজধানীঘেঁসা ভট্টাচার্য্যগণ প্রবল পক্ষেরই চিরকাল পক্ষপাতী। তাঁহারা বলিলেন নন্দকুমার যে গৃহে ছিলেন তথায় আহার করিলে জাতিপাত হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কৌন্সিলের মেম্বরেরা আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না। ইহার পর কয়েক দিনের মধ্যে একদল ইংরেজ জুরি নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দিল, এবং তদনুসারে তাঁহার ফাঁসী হইল।

ফাঁসীর দিন নন্দকুমার হরিনামের মালা জপ করিতে করিতে পালকীতে, গড়ের দক্ষিণ ফাঁসী তলায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখে কিছুমাত্র ভয়ের বা ক্ষোভের চিহ্ন লক্ষিত হইল না। তিনি সকলের নিকট বিদায় লইলেন। তাঁহার পালকীর দুইধারে অসংখ্য লোক

আসিয়াছিল। কেহ ৫।৭।১০ ক্রোশ তফাৎ হইতে ও আসিয়াছিল। কাহারই বিশ্বাস হয় নাই যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট—অন্য বিষয়ে এত দয়ালু—ব্রাহ্মণের ফাঁসি দিয়া হিন্দুর শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিবে। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিল। মহাপুরুষ অক্ষুণ্ণ মনে বন্ধু বান্ধবের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া পাদুকা ত্যাগ করিয়া কাট গড়ায় আরোহণ করিতে লাগিলেন। তখনও কাহারও বিশ্বাস হয় নাই, যে রায়রাইঞা রাজা নন্দকুমারের বাস্তবিক ফাঁসী হইবে। পরে যখন ফাঁসীর দড়ী তাঁহার গলায় লাগিল। যখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদেহ ফাঁসী কাটে ঝুলিতে লাগিল, তখনও হস্তে হরিনামের মালা ঘুরিতেছে। তখন প্রান্তরস্থ অসংখ্য-জন মণ্ডলী হইতে গভীর আর্ত্তনাদ হইল, সকলে ভাবিল হিন্দুর গৌরব অস্তমিত হইল। ইংরাজেরা যখন ব্রাহ্মণের ফাঁসী পর্য্যন্ত দিতে পারিল, তখন আর হিন্দু ধর্ম্মের মান রহিল কই? বালীর কতক-গুলি ভট্টাচার্য্য তৎকালে গড়ের মাঠে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এই ব্রহ্মহত্যা দেখিয়া গঙ্গাজলে ঝাপ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে গেলেন এবং একেবারে গঙ্গা-পার হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহাদের অনেকে আর কলিকাতার পাপ ভূমিতে পদার্পণ করেন নাই।

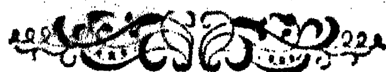
এইরূপে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী হয়, তাঁহার চেহারা দেখিলে সকল লোকেরই ভয় ও ভক্তি হইত। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার এক জামাই শাক্ত ছিলেন। নন্দ-কুমার তাঁহাকে বৈষ্ণব করেন। তদবধি ঐ জামাইএর বংশে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা হয়। তৎকালে বড় বড় জমীদারেরা প্রায় শাক্ত ছিলেন কিন্তু যাঁহারা মুসল-মানের চাকরী করিতেন তাঁহারা প্রায়ই বৈষ্ণব ছিলেন। দেশের বড় বড় জমীদারেরা যে, নন্দকুমারের নামে কাঁপিত, ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ ও তাহার এক প্রধান কারণ। নন্দ-কুমার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে ভক্তি করি-তেন। প্রবাদ আছে তিনি হুগলী থাকিবার সময় নবাব সিরাজউদ্দৌলার নিকট হইতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে একটী অঙ্গুরী দেওয়াইয়া ছিলেন জগন্নাথ যে অনেক সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন, নন্দকুমারের সপক্ষতাই তাহার কারণ বলিয়া বোধ হয়। নন্দ-কুমার চরিত্র সম্বন্ধে মুসলমান ইতিহাস-লেখক বড়ই দুর্ম্মুখ। তিনি বলেন নন্দ-কুমার অহঙ্কৃত নষ্টস্বভাব লোক ছিলেন; দেশের লোক তাঁহার উপর চটা ছিল। এমন কি, তিনি দুইটী কোয়ার্টো পেজ পুরিয়া নন্দকুমারের উপর গালি বর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও তিনি একটী সার্টিফিকিট দিয়াছেন। নন্দ-কুমার দুই চারি জন লোকের ভাল করিয়াছিলেন এবং তিনি যাহাদিগকে

ভাল বাসিতেন তাহাদিগের প্রতি তাঁহার স্নেহ অচল ছিল।* আমরা জানি নন্দকুমার, দুই চারি জনের নহে, অনেকের ভাল করিয়াছেন। তাঁহার নিকট অনেক লোক প্রত্যাশা করিত। দুইবার তিনি নিজের লোক দিয়া সমস্ত বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার কার্য্য চালাইয়া ছিলেন। শেষ বার যে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা নিজের জন্য নহে, কেবল নিজের অধীনস্থ লোকের জন্য। সত্তর বৎসর বয়সে যে লোক শুদ্ধ আত্মীয় প্রতিপালনের জন্য বিনা পয়সায় হেষ্টিংসের ন্যায় পরম শত্রুর অধীনে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন, সে লোক আত্মীয় দিগের বড় অল্প হিতৈষী নহেন। তিনি এতবার দুই গবর্ণমেণ্টের এত কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু কখন টাকা বকসিস্ লন নাই। বর্ক তাঁহাকে "The great Nuncomar" বলিয়াছেন। তিনি এই নামের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

মুসলমান ইতিহাস লেখক নন্দকুমারের নামে দুই দোষারোপ করেন তিনি বলেন নন্দকুমারের মৃত্যুরপর তাঁহার বাড়ী হইতে এক বাক্স মোহর পাওয়া যায়। ইহাতে বাঙ্গালার সমস্ত বড় বড় লোকের জাল মোহর ছিল। অনেক ইতিহাস লেখক এ কথা বিশ্বাস করেন না।

আর এক দোষ এই যে তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার বাড়ীতে নগদ ৫২ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু এই টাকা নন্দকুমারের মত লোকের পক্ষে বড় অধিক নহে। হুগলীর ফৌজদারের মাহিনা ও উপরিতে বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা আয় ছিল। মহাম্মদ রেজা খাঁ নায়েব নাজিম হইয়া বৎসরে নয় লক্ষ টাকা পাইতেন। কথিত আছে গোবিন্দ সিংহ চারি বৎসর বোর্ডের দেওয়ানি করিয়া আড়াই কোটী টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ অল্পদিন চাকরী করিয়া নয় লক্ষ টাকা মাতৃশ্রাদ্ধে খরচ করিয়াছিলেন। লেডি হেষ্টিংসের সরকারের বংশ এখন কলিকাতার এক ঘর বড় বড়মানুষ। সুতরাং নন্দকুমার যে ২০ বৎসর ফৌজদারী দাওয়ানী, নায়েব দাওয়ানী, প্রভৃতি বড় কাজ করিয়া ৫২ লক্ষ টাকা ও যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি রাখিয়া যাইবেন ইহা বিচিত্র নহে। ইহাতে তিনি বড় লোভী ছিলেন বোধ না করিয়া বরং তাঁহার লোভ কম ছিল বোধ করাই উচিত।

* Mutakhorin Vol. III Sec. XIII P. P. 464 65.



কাঞ্চনমালা।

উপন্যাস।

প্রথম খণ্ড।

দুইটী ফুল, সমান ফুটিয়াছে, সমান হাসিতেছে, গন্ধে চারিদিক আমোদ করিতেছে। পাশাপাশি ফুটিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গন্ধ ছড়াইতেছে, আর হাসিভরে একবার এ ওর গায়ে পড়িতেছে, একবার ও এর গায়ে পড়িতেছে। একবার এ উহাকে পাপড়ী দিয়া মারিতেছে, ও আবার তাহার শোধ দিতেছে। বাতাস ইহাকে উহার গায়ে ফেলিয়া দিতেছে। বাতাস থামিলে ও আবার ইহার গায়ে পড়িয়া সরিয়া যাইতেছে। কেমন সুন্দর। এরূপ সম বিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমগন্ধামোদিত, সমান কুসুমদ্বয়ের মিলন কেমন সুন্দর!

আবার দুইটী পাখী,—সুন্দর, সুরস—সুকণ্ঠ,—সুপুষ্ট,—ও সুহৃষ্ট,—যখন মদভরে খেলা করে তখন উহারা কেমন সুন্দর! এই উড়িতেছে, এই পড়িতেছে, এই বসিতেছে, আবার উড়িতেছে, একবার দেখিতে না পাইলেই করুণস্বরে বন পুরিয়া ডাকিতেছে, আবার দেখা হইলেই ঠোকরাইতেছে, কেমন? এমন দুটী পাখীর মিল কেমন সুন্দর!

পাখী ও ফুলের মিল সুন্দর বটে, কিন্তু যদি ঐরূপ সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমসুরভি মানুষের মিল হয়, তাহার চেয়ে সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে আর আছে কি? সুন্দর,—সুস্থ,—সবল,—সতেজ,—সুশিক্ষিত,—সুবংশজাত,—কলাকোবিদ দুটী মানুষের যদি মিল হয়, তবে তাহা কবির বড় লোভনীয় হয়, তাহার উপর আবার যদি তাহাদের দুইটী হৃদয়ের মিল হয়, যদি সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমসুরভি, হৃদয়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মিল হইয়া যায়; তবে দেবতারাও তাহা স্বর্গ হইতে দেখেন।

এমন মিল কেহ কোথাও দেখিয়াছ কি? হৃদয়ে হৃদয় প্রেমডোরে বাঁধা দেখিয়াছ কি? নয়নের আড় হইলে হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায় দেখিয়াছ কি? নয়নে নয়নে এক হইলে প্রাণ কাড়িয়া লয় দেখিয়াছ কি? দেখিলে বাক্‌শক্তি থাকে না দেখিয়াছ কি? না দেখিলে সব অন্ধকার হয় দেখিয়াছ কি? নয়নে শরৎ জ্যোৎস্না, কর্ণে সুধাধারা, স্পর্শে অমৃতহ্রদ, আর হৃদয়ে মহামোহ, এমন মিল দেখিয়াছ কি? অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ বারিধির সহিত অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল স্বচ্ছ আকাশের মিল দেখিয়াছ কি? তেমনি অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, প্রেমরাশির অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল,

স্বচ্ছ, প্রেমরাশির মিল দেখিয়াছ কি? যখন আবার সেই অপার, অগাধ, অনন্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, প্রেমরাশি দ্বয় পরস্পর সংঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়, যখন সেই অনন্ত সমুদ্রে আকাশ স্পর্শী তরঙ্গ উঠে দেখিয়াছ কি? আবার যখন অদর্শনে অনন্ত আকাশে ভীষণ ঝটিকা উঠে, যখন ঝটিকায় অনন্ত আকাশ ও অনন্ত সমুদ্রে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড উপস্থিত করে দেখিয়াছ কি?

দেখিবে কোথা হইতে? অবোধ মানুষ আহারের জ্বালায় ব্যস্ত, এরূপ দেবদুর্ল্লভ প্রেমরাশি কোথা হইতে দেখিবে? পৃথিবীতে এরূপ অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, প্রেমরাশি কদাচ কখন মিলে বলিয়া কবিরা লেখেন বটে কিন্তু কাজে মিলে না।

একবার মিলিয়াছিল। দুহাজার বৎসর আগে পাটলীপুত্র নগরে একবার মিলিয়াছিল, সেইখানে একবার দেখিয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার সময়, গঙ্গার তীরে অশোক রাজার প্রমোদ কাননে, এইরূপ দুইটী হৃদয় মিলিতে দেখিয়াছিলাম।

২

একটী রমণী অপরটী পুরুষ। দাঁড়াইয়া মালা গাঁথিতেছেন। উভয়ের মধ্যে অগাধ পুষ্পরাশি; মল্লিকা, মালতী, যূথি, জাতি, সেফালিকারাশির দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই জনে মালা গাঁথিতেছেন। উভয়ের রূপরাশি পুষ্পরাশিতে প্রতিফলিত হইতেছে। পুষ্প রাশির রূপরাশি উভয়ের কমনীয় শরীর প্রভায় প্রতিফলিত হইতেছে। জ্যোৎস্নাময় পুষ্পরাশিতে প্রেমিক যুগলের জ্যোৎস্নাময় লাবণ্য পতিত হইয়া, শাদার উপর শাদা, তাহার উপর শাদা, তাহার উপর শাদা মিশাইতেছে। তরল দীপ্তির উপর তরলদীপ্তি, তাহার উপর তরল দীপ্তি, পড়িয়া মিশিয়া তরলতর তরলতম হইয়া যাইতেছে। যুবকের উজ্জ্বল, শ্যামল, দীর্ঘ, কর্ণান্তবিশ্রান্ত নয়ন একবার মালায় আর একবার যুবতীর মুখে পড়িতেছে। নয়নের গতি কখন অলস, কখন চঞ্চল, হইতেছে। অলস,—অথচ মধুর; চঞ্চল—অথচ মধুর, সদাসর্ব্বদাই মধুর। দৃষ্টি "অলস বলিত মুগ্ধ স্নিগ্ধ নিস্পন্দ, মন্দ"; অলস অথচ মধুর; বলিত কুঞ্চিত, অথচ মধুর; মুগ্ধ,—হৃদয়ের মোহব্যঞ্জক,—অথচ মধুর, স্নিগ্ধ. স্নেহপরিপূর্ণ, অথচ মধুর; নিস্পন্দ, অথচ মধুর; মন্দ,—ধীর গতি,—অথচ মধুর: ডাগর ডাগর চক্ষু মধ্যে, গাঢ়ান্ধকারময় স্থানের ভিতর দিয়া এক একবার বিদ্যুত ঝলসিতেছে। প্রতিনয়ননিপাতে প্রণয়িনীর উপর স্নেহ, মমতা, প্রেম, বিকীর্ণ করিতেছেন। নয়ন দিয়া হৃদয় যেন গলিয়া প্রাণেশ্বরীকে স্নান করাইয়া দিতেছে।

যুবতীও মুগ্ধ, সুন্দর ও কমনীয়। তিনি আপন মনে মালা গাঁথিতেছেন। আর মনে মনে কি ভাবিতেছেন। কি ভাবিতে-

ছেন কেমন করিয়া আনিব, বোধ হয় প্রাণনাথের অপরিমেয়, অজেয়, অক্ষুব্ধ, প্রেমরাশির কথা ভাবিতেছেন। নহিলে তাঁহার কোমল, চিক্কণ, মার্জ্জিত, মহামূল্য মনিমনোহর কপোলে মধ্যে মধ্যে রক্তিমোদয় হইতেছে কেন? তিনি এক একবার তাঁহার প্রিয়তমের দিকে চাহিতেছেন কেন? তাঁহার চাহনি বড় চমৎকার, তিনি চঞ্চলসুন্দরীর ন্যায় আড়ে আড়ে চাহিতেছেন না; একবার চাহিয়াই চক্ষু ফিরাইতেছেন না; যখন চাহিতেছেন উজ্জ্বল ও বৃহৎ চক্ষু মেলিয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিতেছেন; যেন এক তান মনে, প্রাণ ভরিয়া, নয়নচকোরকে প্রিয়বক্ত্রসুধা পান্ করাইতেছেন।

তাঁহাদের কাজ দেখিয়া বোধ হইতেছে একটু ত্বরা আছে, মালা গাঁথিতে দুইজনেই ক্ষিপ্র হস্ত। দেখিতে দেখিতে ফুল অর্দ্ধেক হইয়া দাঁড়াইল। তখন যুবক আপন হস্ত স্থিত মালা গুলি যুবতীর মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে পরাইয়া দিলেন। যুবতীও আপন মালাগুলি যুবকের মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে পরাইয়া দিলেন, সেই সময়ে যুবক রমণীর চিবুক ধরিয়া তুলিলে যুবতী দেখিলেন, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে; যুবক দেখিলেন, মাটীতে চাঁদ উঠিয়াছে। দুজনেই দেখিলেন, দুজনেই মুগ্ধ হইলেন, নয়ন ভরিয়া দেখিলেন, তৃপ্ত হইলেন না। যুবক মুখ অবনত করিয়া আনিতেছেন, এমন সময়ে যুবতী হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, আকাশের দিকে দেখিতেছ না? আর যে বেলা নাই মালা গাঁথিয়া শীঘ্র শীঘ্র সাজিয়া লইতে হইবে।

যুবক "তাহোক" বলিয়া বাহুযুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া বারম্বার যুবতী বিম্ববিনিন্দিত, কোমল, মসৃণ, রসপরিপূর্ণ অধরের উপর, আপনার বিম্ববিনিন্দিত, কোমল, মসৃণ, রসপরিপূর্ণ অধর স্থাপন করতঃ তাঁহাকে ছাড়িয়া আবার মালাগাঁথিতে গেলেন। যুবতীও একটু অপ্রতিভ হইয়া আবার মালা গাঁথিতে গেলেন।

৩

মালা গাঁথিতেছেন। এক হস্তে সূচি ও সূত্র, অন্য হস্তে ফুল। টুপ টুপ করিয়া তুলিতেছেন ও পরাইতেছেন; যেটীর পর যেটী বসিবে, যেটীর পর যেটী বসিলে সুন্দর দেখাইবে, সেটী ঠিক সেইটীর পর সেইরূপেই বসিতেছে। উভয়েই কৃতকর্ম্মা, এজন্য ফুল তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইতেছে না। একছড়া মালা হইল সরু যুইফুলের, এক ছড়া মোটা মল্লিকার, একছড়া ছোট কুঁদফুলের। কোন ছড়ায় দুই প্রকার ফুল, কোনটীতে তিন প্রকার, কোনটীতে চারিপ্রকার। লাল, নীল, সবুজ পুষ্প, কেয়ারিতে কেয়ারিতে সাজান হইতে লাগিল। যুবকের মস্তকে যূঁইএর থড়ে, তাহার পার্শ্ব হইতে কর্ণ বিলম্বী

দুই ছড়া ছোট ছোট মালার আগায় ভুমিচম্পক দুলিতেছে। তিনি যতবার হাত নাড়িতেছেন, ভুমিচম্পক ততবার তাঁহার নাকের উপর পড়িয়া তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় শীতল করিয়া দিতেছে।

রমণীর অঙ্গে সমস্ত পুষ্প আভরণ, পুষ্পের কঙ্কণ, পুষ্পের মুকুট, পুষ্পের হার, পুষ্পের অঙ্গদ, পুষ্পের অবতংস, পুষ্প নির্ম্মিত গ্রীবা ভুষণ। তিনি মালা গাঁথিতেছেন, আর সেইগুলি নড়িতেছে, দুলিতেছে। পুষ্পরাশি যত কমিয়া আসিতেছে, দুজনে তত নিকট হইতেছেন, ততই কাছে আসিতেছেন। এক একখানি গহনা গাঁথা হইতেছে, আর উহা যথাস্থানে পরান হইতেছে, আর দেখা হইতেছে। একে ত যখনই দেখা যায় তখনই নুতন, তাহাতে আবার নুতন নুতন গহনা, বড়ই নুতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে যত পুষ্পরাশি ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, প্রণয়ি যুগল, ততই বসিতে লাগিলেন। মনে মনে বাসনা সমস্ত পুষ্পাভরণ প্রস্তুত হইলে খানিক দুজনে একটু গল্প করিয়া যান; দুইজনে সেই পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া একবার কাছে কাছে বসিয়া, গাছ, পালা, বন, জঙ্গল, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি পার্থিব সমস্ত ব্যাপার ভুলিয়া স্বর্গের উপর স্বর্গ, তাহার উপর স্বর্গ, তাহার উপর যে স্বর্গ আছে, একবার সেই স্বর্গীয় লোকের মত "প্রেমে সুখে মোহে আর মোহিনীতে মজিয়ে" কিছুকাল মনুষ্য জীবনে দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য, সুখস্বপ্নবৎ অবস্থায় মৃদু মৃদু আলাপ করেন। আলাপ বলিব, না রসালাপ? ছি! রসালাপ! অশোক রাজার প্রিয়পুত্র, প্রধান সেনাপতি, অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কলাভিজ্ঞ, ধর্ম্মানুরাগী কুণাল, রমণী কুলচূড়া, সুশিক্ষিতা, সুপণ্ডিতা, প্রেমপূর্ণ হৃদয়া, কাঞ্চনমালার সঙ্গে রসালাপ করিবে? কুৎসিত নায়ক নায়িকাবৎ কদর্য্য ভাবের অথবা কদর্য্যভাবব্যঞ্জক কথায় ঠাট্টাতামাসা করিবে? আমার ত এমন বোধ হয় না। যদি তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইত, যদি তাহারা সেইরূপ আলাপ বা রসালাপ করিতে পারিত, তবে বুঝিতাম, লিখিতেও পারিতাম কি কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। কিন্তু এখনও ফুলধনু প্রস্তুত হয় নাই, এখনও পঞ্চশর প্রস্তুত হয় নাই, এখনও কাঞ্চন মালার মুকুটের মাথার ফুলের থোবনা প্রস্তুত হয় নাই, ফুল ফুরাইয়া গেল।

৪

সন্ধ্যা প্রায় উপস্থিত; সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ হইয়াছেন, এখনও ডুবেন নাই। মৃদু পবন হিল্লোলে গঙ্গাতরঙ্গ দুলিতেছে ও খেলিতেছে। কিন্তু ফুল ফুরাইয়াছে, সন্ধ্যার একটু পরেই তূর্য্যধ্বনি হইবে সেই সময় সকলকে সাজিয়া ললিত বিস্তরের অভিনয়ে উপস্থিত হইতে হইবে। কিন্তু সাজা এখনও হয় নাই, ফুলও ফুরাইয়াছে। এই কার্য্য উপলক্ষে বাগানের অর্দ্ধ স্ফুটিত কোরক পর্য্যন্ত তোলা হইয়াছে, আর ফুল বাগানে নাই। কুণাল

ও কাঞ্চনমালা চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন নবদূর্ব্বাদলময় সমতল ভূভাগ, তাহার উপর দূর্ব্বা পুষ্প সুধাময় শ্বেতকান্তি ছড়াইয়া নমিয়া নমিয়া পড়িতেছে দেখিলেন, অশোক কিংশুক, বক, বকুল, নাগ, পুন্নাগাদি বৃক্ষসমূহ বায়ুভরে নড়িতেছে দেওদার জাতীয় নানা বৃক্ষ শোঁ শোঁ করিয়া শব্দ করিতেছে। বক্ষঃস্থলে ছায়াকাশ ধারণ করিয়া গঙ্গাবক্ষঃ প্রেমভরে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তদুপরি ক্ষুদ্র নৌকা সমূহ সারি দিয়া পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় যাইতেছে, নাবিকেরা প্রাণখুলিয়া গাইতে গাইতে যাইতেছে, তাহার স্বরের দূরস্থ তরঙ্গ, গঙ্গা সমীরণে শীতল হইয়া মৃদু মৃদু কাণে লাগিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের একটু উৎকণ্ঠা থাকায় তাঁহারা ইহার তত মর্ম্ম-গ্রহ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা দ্রুতপদে লতা, কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, পুষ্প-বৃক্ষাদি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, পুষ্প কোথাও পাইলেন না। সময় যত বহিয়া যাইতে লাগিল, ততই একটু একটু করিয়া উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উৎকণ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটু ত্বরাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা গাত্রস্থিত পুষ্পাভরণ সকল মোচন করিয়া নিকটস্থ সংমর্ম্মর নির্ম্মিত মঞ্চে রাখিলেন। কাঞ্চন-মালার অলঙ্কারগুলি বামে ও কুণালেরগুলি দক্ষিণে রক্ষিত হইল তখন উভয়ে একটুকু উত্তর মুখে গেলেন। তথায় নিকটে কৃত্রিম শৈলের প্রতি তাঁহাদের নয়ন পড়িল। তখন কাঞ্চনমালা বলিলেন, "যাহারা পুষ্পচয়ন করিয়াছিল তাহারা বাগানের ফুলই তুলিয়াছে। বোধ হয় দুরারোহ বলিয়া এই শৈল শিখরস্থিত পুষ্প চয়ন করে নাই। উহার উপর গেলে নিশ্চয়ই ফুল পাইব।" কুণাল ও সম্মত হইলেন। তখন উভয়ে শৈল আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন।

যে দুইটী পথ শৈল বেষ্টন করিয়া বরাবর উপরে উঠিয়াছে তাহার একটীর পার্শ্বে অত্যন্ত বন হইয়াছে। ঘাস, লতা, ফুল গাছ প্রভৃতি এত ঘন হইয়া দাঁড়াই-য়াছে যে কিছুই দেখা যায় না। এইটী কিছু অধিক খাড়াই, অতএব ইহা দ্বারা শীঘ্র উঠিতে পারিবেন ভাবিয়া উভয়ে ঐ পথই অবলম্বন করিলেন। দুই এক পা উঠিতে না উঠিতেই নিবিড় লতান্তরাল হইতে কুপিতফণিফণার ঘোরগর্জ্জনবৎ কি শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু ত্বরা প্রযুক্ত তাঁহারা কেহই উহার প্রতি কোন লক্ষ্য করিলেন না। কিছু দূর উঠিয়াই দেখিলেন কোথাও একটা পাতা ছেঁড়া, কোথাও একটা ডাল ভাঙ্গা, কোথাও দুটী পুষ্প দলিত। দেখিয়া কাঞ্চন বলিল "বুঝি কে এইমাত্র এখানে আসিয়াছিল" আরও কিছু দূর উঠিয়া একস্থানে দেখি-লেন, একটী ডালে একেবারে পাতা নাই, পাতাগুলি যেন পদদলিত দেখিয়া কুণাল বলিলেন, "যে আসিয়াছিল সে বোধ হয় এইখানে বসিয়া বা দাঁড়াইয়াছিল।" আর একটু উপরে উঠিয়াই দেখিলেন

কাঞ্চন যাহা বলিয়াছিল তাহা ঠিক, পুষ্প চয়ন কারীরা এতদূর উঠে নাই। রাশি রাশি পুষ্প শৈলাগ্রদেশ পর্য্যন্ত ফুটিয়া যেন আকাশের লঘুবায়ুকেও সৌরভময় করিয়া তুলিতেছে। তখন কাঞ্চন আপন অঞ্চলে এবং কুণাল উত্তরীয়ে পুষ্প তুলিয়া রাখিতে লাগিলেন। উভয়ে পুষ্পচয়নে ক্ষিপ্রহস্ত,—ফুল চয়ন বড় সোজা, টানিয়া ছিঁড়িতে হয় না, হাত দিলেই খসিয়া যায়—অমনি ধরেন, আর যথা-স্থানে রাখেন। এই ফুল, এই ফুল, এই ফুল, দুটীতে নড়িয়া নড়িয়া যাইতেছেন আর ফুল তুলিতেছেন। নাচ ইহার কাছে কোথায় লাগে? হে নৃত্যকলাকোবিদত্ব-গর্ব্ব কারিণী বঙ্গীয় নৃত্যেশ্বরীগণ! তোমরা যদি তাহাদের দুজনের সে দিনকার ফুল তোলা দেখিতে, তোমাদের নৃত্য গর্ব্ব কোথায় থাকিত? এই এখানে, আবার পাহাড়ের আড়ালে, আবার উপরে, আবার পার্শ্বে। কুণাল যেমন সময়ে সময়ে আপন মনোমধ্যে দেখিতেন, এই আসে, এই যায়, থাকে না তিলেক, এখানেও সেইরূপ দেখিতে লাগিলেন। উভয়েই বিদ্যুৎবৎ চঞ্চল পদে চলিতেছেন। আর তর তর করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছেন, আর ফুল তুলিতেছেন। অত দ্রুত না কাঞ্চন, অত দ্রুত না কুণাল, একবার একটু থাম, আমি একবার তোমাদের এই অবস্থার চিত্র লিখিয়া লই। না, তোমরা থামিবে না। বুঝিয়াছি তোমাদের ত্বরা আছে। যাও শীঘ্র পুষ্প চয়ন করিয়া ধনুক বাণ আর থোপনাটী তৈয়ারি করিয়া লও। দাঁড়াইও না, যে মহৎ কর্ম্মের জন্য তোমরা আজি উদ্যোগী, বিধর্ম্মী ব্রাহ্মণের যদি আশীর্ব্বাদ গ্রাহ্য হয়, আশীর্ব্বাদ করি, কৃতার্থ হইয়া জগৎ কৃতকৃতার্থ কর।

ক্রমে ফুল তুলিতে তুলিতে অপ্সরার ন্যায়, প্রোজ্জ্বল কান্তি দেব দেবীর ন্যায় কুণাল ও কাঞ্চনমালা পর্ব্বতের শিখরা-রোহণ করিলেন। তথায় উপবেশনার্থ যে সুন্দর মর্ম্মরখণ্ড পাতিত ছিল, তথায় বসিয়া অঞ্চল ও উত্তরীয়স্থিত পুষ্প লইয়া ত্বরায় অভিলষিত ধনুর্ব্বাণাদি প্রস্তুত হইল। গগণে বিষমমণ্ডল রাজহংস ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার দুগ্ধফেণধবল কিরণ-মালা বসুধাকে প্লাবিত করিয়া দিতে লাগিল। শৈত্যসৌগন্ধমান্দ্যময় মলয় সমীর দক্ষিণদিক হইতে গঙ্গা পার হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে শীতল করিতে লাগিল।

কুণাল তখন বলিতে লাগিলেন, "কাঞ্চন, আমি যখন যখন এই শৈল-শৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হই, তখনই আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ে।"

কা। "তুমি আমায় এখানে আর আসিতে দিবে না তাহারই যোগাড় করিতেছ।"

কু। না কাঞ্চন! এখানে আসিলেই সেই কথা মনে পড়ে যেদিন গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে মৃগয়া করিতে গিয়া—

কা। "আমি কাণে আঙুল দিলাম ও কথা আমি শুনিব না।"

কু। কেন কাঞ্চন, যেদিন আমার ধর্ম্ম লাভ হয়, যে দিন আমার প্রাণ লাভ হয়, যেদিন আমার তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সে দিনের কথা শুনিতে তোমার এত অনিচ্ছা কেন, কাঞ্চন ?

কাঞ্চন মৃণালকোমল বাহুযুগলে কুণালের কণ্ঠ জড়াইয়া বিহ্বলভাবে বলিল, "কণ্ঠরত্ন যাহাতে তোমার এত আমোদ তাহা শুনিতে কি আমার অনিচ্ছা হইতে পারে, তবে—

কু। "তবে তোমার অনেক প্রশংসার কথা আছে বলিয়া তুমি শুনিতে রাজী নহ।"

কা। "তা কেন ?"

কু। "তবে কি ?"

কা। "তুমি আমার কথা কেন বলিবে ? তুমি তোমার কথা বল।"

কু। "তাকি হয়, কাঞ্চন, সেইদিন থেকে আমার কথা বলিলেই তোমার কথা, তোমার কথা বলিলেই আমার কথা—"

কা। "হবে বই কি ? বলিবে বল। তোমার কথা তুমি বল, আমার কথা তাহার পর আমি বলি।"

কু। আচ্ছা বেশ ! প্রায় আট বৎসর হইল ফাল্গুনমাসের পুর্ণিমার দিন আমি শীকার করিতে করিতে গয়াশীর্ষ পর্ব্বতের চুড়ায় উঠিলাম তথা হইতে দেখিলাম একটী ব্যাঘ্রদম্পতী এক জায়গায় রহিয়াছে, আমি একেবারে অশ্বপৃষ্ঠে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর ব্যাঘ্রদিগের খরনখর প্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া আছি, স্বপ্নবৎ বোধ হইল, যেন এক প্রাচীন ঋষির আদেশে ব্যাঘ্রেরা, পালিতকুকুরের মত তাঁহার গা চাটিতে লাগিল। তখন তিনি অপ্সরানিন্দিত রূপমাধুরী একটী দেবকন্যাকে আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। কন্যা আমায় বক্ষঃস্থলে রাখিয়া আস্তে আস্তে একটি বৃহৎ বট বৃক্ষের মূলে শয়ন করাইল। তখন আমার চৈতন্য হইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখি, সত্য সত্যই সেই বটবৃক্ষ, সত্য সত্যই সে অপ্সরানিন্দিত রূপ মাধুরী কন্যা, আর সত্য সত্যই সেই ঋষি তুল্য সিতশ্মশ্রু স্থবিরবর রক্তাম্বর পরিধায়ী। তাঁহার দুই দিকে দুইটি ব্যাঘ্র। তিনি স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্তবে আমার মন গলিয়া যাইতে লাগিল। আমি তাঁহার বাটী রহিলাম। আহা ! তেমন সুখের দিন কি আর হইবে ! তাহার পর আমি একদিন সেই অপ্সরার সহিত গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে গেলাম সে কত কি বলিল। রোজ সেইখানে বেড়াইতে যাইতে লাগিলাম। ঋষি প্রবর্ত্তনায় অপ্সরার প্ররোচনায় ও নিজের মনের আবর্ত্তনায়, সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারিলাম ঐহিক ভিন্ন অন্য পদার্থ আছে। ভোগ

ভিন্ন জগৎ চলে, আকাঙ্ক্ষা অনেক উচ্চে উঠিতে পারে, অনেক সুন্দর হইতে পারে। ক্রমে সেই ঋষির অনুকম্পায় আমার ত্রিরত্ন লাভ হইল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমা হেন চতুর্থ রত্ন লাভ করিলাম।"

কা। "আর কত বলিবে।"

কু। "তাহার পর ধর্ম্ম ত্যাগ করায় পিতা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেন, কত দেশে কত অবস্থায়ই ঘুরিয়াছি কিন্তু দেখিলাম গৃহে বনে শ্মশানে মশানে গাছতলায় পালঙ্কে তুমি সকল অবস্থাতেই সমান।"

কা। "সে কাহার গুণ? তোমার না আমার?"

কু। "আজ এই পাহাড়ে উঠিয়া পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল। যেদিন ত্রিরত্ন লাভ হয়, যেদিন তোমায় লাভ হয়, যেদিন ঐহিক পারত্রিক সুখের বীজ বপন হয়, আজি সেই দিন স্মরণ হইতেছে; কারণ, সে একদিন ছিল, আর এ আর একদিন। বল দেখি তোমার কোন্‌টি ভাল লাগে, কাঞ্চন?

কা। যখন রোজ রোজ বনে ও পাহাড়ে তোমায় দেখিতাম, তুমি বাঘ শিকার করিতে, বাঘের পীঠে বর্শা ফুটাইয়া দিয়া তাহারই উপর আরোহণ করিয়া পর্ব্বতচূড়া হইতে পর্ব্বতচূড়া গমন করিতে তোমায়, দেখিতাম। আর পিতার সহিত সদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকিতাম, সে সময়ের কথা মনে হইলে সত্য সত্যই আনন্দ হয়। তুমি তখন আমার প্রতি কত সদয় ছিলে, পরিচয় ছিল না অথচ বোধিবৃক্ষমূলের নিকটে আসিলে আমার সঙ্গে দুই চারি দণ্ড গল্প না করিয়া যাইতে না। সে এক দিনই ছিল। যে দিনের কথা কহিতে তুমি এত ভালবাস, যেদিন তুমি যখন ব্যাঘ্রনখরাঘাতে পীড়িত হইলে, পিতা তোমার উদ্ধার করিলেন, তখন তোমার অসুখ দেখিয়া আমার যে কি কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা কি প্রকারে বলিব। তাহার পর তোমায় যখন বোধিবৃক্ষমূলে লইয়া গেলাম, তখন বড়ই আনন্দ হইল, বোধিদ্রুম সহসা মুকুলিত হইল। উহার শোভা সমৃদ্ধি যে, শুদ্ধ আমিই দেখিলাম এমন নহে, পিতা দেখিয়া বলিলেন, এই রাজকুমার হইতে সদ্ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমার প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছিলাম, তুমিও আমার প্রতি বিরূপ নও জানিতাম। কিন্তু শুদ্ধ ভোগমাত্র যে প্রণয়ের উদ্দেশ্য, সে প্রণয়ে আমার প্রবৃত্তি ছিল না। যখন শুনিলাম, তোমা হইতে আমার চির অভিলষিত সদ্ধর্ম্ম বিস্তার হইবে, "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" প্রচার হইবে, সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান বিস্তার হইবে, তখন তোমার সহিত মিলিবার জন্য বড়ই বাসনা হইল। পিতার অনুগ্রহে ত্রিরত্ন প্রসাদে ও তোমার অনুকম্পায় মিলন হইল, তোমার সহিত মিলনে একদিনও অসুখী নহি। এখন সদ্ধর্ম্ম প্রচারের যত সমৃদ্ধি হয়, ততই আমার

আনন্দ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু সত্য বলিতে কি? সদ্ধর্ম্ম প্রচার, আর তোমার অতুল্য প্রণয়, এই উভয়ে আমি এত মগ্ন আছি, আর আমার অন্য চিন্তা নাই।

এইরূপ প্রণয়পূর্ণ হৃদয়োন্মাদক বাক্য লহরী স্বজন করিয়া উভয়ে উভয়কে মোহিত করিতেছেন। উচ্চপর্ব্বতোপরি শান্ত সমীরণ বহিতেছে, নির্ম্মল আকাশে উজ্জল তারা জ্বলিতেছে, জগত যেন তাঁহাদের অগাধ অপার অনন্ত প্রশান্ত প্রণয়ের প্রতিকৃতি। ঝিল্লীরব যেন তাহাদের প্রণয় পূর্ণ স্বরলহরীর প্রতিধ্বনি।

৬

উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন কথাবার্ত্তায় বিশ্রাম, হৃদয় পূরিয়া উঠিয়াছে মন উন্মত্ত হইতেছে, মন ক্রমে মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে, তাহার ভুবোলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক প্রভৃতি সপ্তশত স্বর্গ অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম অব্যক্ত, সুখময়, প্রেমময়, মোহময় ধামে উঠিতেছে। সমস্ত জগতের সত্তালোপ হইয়াছে, শরীর আছে কি না আছে জ্ঞান নাই, আছে কেবল তিনটী জিনিস, একটী সুধাময় সুখময় প্রেমময় কি যেন কি ময় স্বর লহরী, একটী সুধাময় সুখময় প্রেমময় কি যেন কি ময় আত্মা, আর তাহার সঙ্গে উহারই সমান সুধাময় সুখময় প্রেমময় কি যেন কি ময় আর একটী আত্মা। পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে।

এমন সময়ে দূরে বাজনা বাজিল, অভিনয়ারম্ভসূচক তূর্য্যধ্বনি হইল। উভয়কে আবার পৃথিবীর অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দিল। উভয়ে আবার পৃথিবী বায়ু স্পর্শ অনুভব করিলেন, আসনস্বরূপ মর্ম্মর প্রস্তরের স্পর্শ অনুভব করিলেন। কিন্তু হঠাৎ স্বর্গ হইতে নামিতে হইল বলিয়াই হউক বা আর কিছুতেই হউক কাঞ্চনমালা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। যেন মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। কি যেন হারাইয়াছি, আশা যেন পূরিল না। যে সুখে এতক্ষণ নিমগ্ন ছিলাম, উহা যেন আর ইহজন্মে ফিরিয়া আসিবে না। যেন যে সকল আশা এতক্ষণ করিতেছিলাম, তাহা যেন স্বপ্ন, কখন পূরিবে না। তিনি একবার বলিলেন "হঠাৎ মনটা কেন উদ্বিগ্ন হইল, বল দেখি?"

কুণাল বলিলেন, "আমরা আত্মচিন্তায় মগ্ন ছিলাম, হঠাৎ অন্যচিন্তায় বিশেষ কার্য্যনাশ সম্ভাবনা চিন্তা উদয় হওয়ায় আমিও উদ্বিগ্ন হইলাম।"

কাঞ্চন বলিলেন "না এ সে উদ্বেগ নহে, বোধ হয় কোন বিপদ শীঘ্র উপস্থিত হইবে।" এই কথা কহিতে কহিতে উভয়ে সত্বরে শৈল শেখর হইতে নামিয়া আসিলেন।

সেই দিন।

সেই দিন
ফুল্ল শরতের চাঁদ গগন-মণ্ডলে,
জগত কিরণময়,
নীরবে সমীর বয়,
বিষাদ—প্রতিমা সেই বাতায়নতলে,
দুই চক্ষু অবিরল ভাসে অশ্রুজলে।

সেই দিন
নব অনুরাগে যবে প্রথম মিলন,
সলাজ সরল মুখ,
অলক চুম্বিত বুক,
সপ্রেম চকিত দৃষ্টি মানস মোহন;
শূন্য বালিকার সেই শূন্য দরশন।

সেই দিন
বিকসিত মুখপদ্ম জ্যোৎস্নার প্রভায়,
কুসুমে জড়িত কেশ,
স্নেহ বিগলিত বেশ,
স্ফুরিত অধর ওষ্ঠ দীপ্ত প্রতিভায়,
আধ হাসি যেন মুখে মিলাইয়া যায়।

সেই দিন
বালিকার কণ্ঠে যবে নব সম্ভাষণ,
প্রতি অক্ষরেতে যার,
বেজেছিল হৃদি তার,
অন্তরে জড়ায়ে যাহা রয়েছে এখন,
অস্ফুট মধুর সেই প্রণয় বচন।

সেই দিন
সুখ সায়াহ্নের তারা আকাশ সীমায়,
একাকিনী ফুল বনে,
ভ্রমিলে যবে গোপনে,
ফুলকুলেশ্বরী যেন ফুলের ভূষায়,
স্বপ্নময় সেই নৈশ পুষ্পবাটীকায়।

সেই দিন
বহুকাল পরে যবে ফিরিনু ভবন,
প্রভাত নক্ষত্রপ্রায়,
ম্লান জ্যোতির্ম্ময় কায়,
পাগলিনী বেশে মোরে দিলে দরশন,
রাহুগ্রস্ত তব সেই মলিন আনন।

সেই দিন
গভীর তাহার স্মৃতি, ভুলিব কেমনে,
আদরে গলিয়ে প্রিয়ে,
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে,
কত যে প্রণয় কথা কহিলে গোপনে
—ভালবাসা-মাখা সেই হৃদয়বেদনে।

সেই দিন
স্মৃতিপটে চিরকাল থাকিবে অঙ্কিত;
সেই লজ্জাবতী বালা,
সেই পরিণয় মালা,
প্রেমময় মুখখানি অলক-শোভিত,
বালিকা হৃদয়কাব্য নব-প্রস্ফুটিত।

সেই দিন! হায় রে,
গত সে সুখের দিন প্রেয়সী এখন,
স্মৃতিমাত্র হৃদয়েতে আছে নিমগন:
সেই প্রেম, সে আনন্দ,
সেই মন সদানন্দ,
বৃন্তচ্যুত সে কুসুম কানন রতন;
আর কি পাইব ফিরি সে সুখ জীবন।

শ্রী মোহিনীমোহন দত্ত।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মেঘেতে—বিজলী বা হরিশ্চন্দ্র। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত মূল্য ।০ আনা। বালকের লেখা বলিয়া বোধ হয়।

The Bengal Miscellany। মাসিক পত্র। মে ১৮৮২। বাবু বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বাৎসরিক মূল্য ২॥০ টাকা।

মাসিক পত্রখানি কতক ইংরেজী কতক বাঙ্গালা। আমরা ইহার মাত্র একখানি পাইয়াছি। ইংরেজীতে দুইটি প্রবন্ধ আছে। প্রথম Sir Ashley Eden দ্বিতীয় The Governor Generals of India. প্রথমটিতে আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেপটিনাণ্ট গবর্ণরের রাজকার্য্য সম্বন্ধে উপহাস করিয়া এক আবেদন পত্র প্রকাশ করা হইয়াছে; তাহাতে স্বাক্ষর কারির নাম, প্রথম কালাগোপাল পাল, দ্বিতীয় সন্ন্যাসী লাল ঠাকুর, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ রুচির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আমাদের সংবাদ পত্র এ সকল বিষয় এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছে, মাসিক পত্রের আর তাহাতে হাত দেওয়া ভাল হয় নাই। এতৎভিন্ন এই মাসিক পত্রে আর আর যাহা পাঠ করা গেল, তাহা কিছুই নিন্দার নহে বরং প্রশংসার যোগ্য।

প্রবাহ। মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন। শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। শ্রীযুক্ত বি, ব্যানর্জ্জি, এবং কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত।

প্রবাহের প্রধান সংকল্প এই যে ইহা নিয়মিত মত মাসে মাসে প্রকাশিত হইবে। এই সংকল্পে আমরা বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম। অন্যান্য মাসিক পত্র কেন নিয়মিত মত প্রকাশ হয় না ইহা প্রবাহ প্রকাশকগণ অবশ্য জানিয়াছেন এবং জানিয়া শুনিয়া এই সংকল্প করিয়াছেন। এইজন্য আমাদের সাহস হইতেছে যে প্রবাহ স্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু যদি না জানিয়া না বুঝিয়া কেবল প্রবাহর টাকায় প্রবাহ প্রতিপালিত হইবে এরূপ অনুভাবে এ সংকল্প করিয়া থাকেন তাহা হইলে বোধ হয় ভ্রম হইয়াছে। প্রবাহর লিপি পারিপাট্য মন্দ নহে। দুই এক জন সুলেখক ইহাতে ব্রতী আছেন বলিয়া বোধ হইল।

রাজ উদাসীন। শাক্যসিংহ ও রামমোহন রায়। কলিকাতা ৩৭ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা।

মেছুয়া বাজার, বীণা, শরচ্চন্দ্র এই তিন জিনিস একত্র মনে করিয়া আমাদের

প্রথমে হাসি আসিয়াছিল। কিন্তু পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম। গ্রন্থকারের কবিতা শক্তি আছে। আর কিছু দিন পরে ইনি একজন সুলেখক হইবেন। তাহার পরিচয় স্বরূপ আমরা গুটিকতক পুঁক্তি উদ্ধৃত করিলাম। শাক্য সিংহ যখন সংসার ত্যাগ করিয়া যান, "তখন তামস বাসনা নিশা দ্বিতীয় প্রহর।" তাঁহার স্ত্রী নিদ্রাগত। তিনি যাইতে উদ্যত অথচ যাইতে পারিতেছেন না, শেষঃ—

"যাই এই বার। বলি ফিরায়ে বদন,
চাহিলা বিষাদে যুবা প্রিয়া মুখ পানে।
দেখিলা সে মুখ-শশি সরলতা ময়
রয়েছে তেমতি, শুধু নিদ্রার আবেশে
চারু অলকার দাম পড়েছে ছড়ায়ে
মুখের উপর; অর্দ্ধ স্খলিত বসন;
তেমতি মুদিত নেত্র;—সেই স্থির ভাব,
কেবল কপোল বহি নয়নের জল
ঝরিতেছে বিন্দু বিন্দু বাহুর উপর;
স্ফুরিছে নাসিকা—ধীরে কাঁপে ওষ্ঠাধর।
বুঝি কি দুঃস্বপ্ন বালা দেখি নিদ্রাবেশে,
কাঁদিচে নীরবে। হায়! প্রণয়ীর মন,
দেখি হেন ভাব, কভু পারে কি থাকিতে?
অমনি সে মুখ-শশি তুলিয়া আদরে
চুম্বিলা হৃদয়ে ধরি। স্বপ্নাবেশে বালা,
"যাবে নাথ—যাবে তুমি ত্যজি এদাসীরে?
তা আমি দিবনা যেতে জীবন থাকিতে"
কহিলা অস্ফুট স্বরে।"

আর এক স্থানেঃ—

ভীষণ শ্মশান!—তার দূর প্রান্তদেশে
—বিনাশিয়া রজনীর গাঢ় তমোরাশি—
জ্বলে চিতানল। * * *
——————"চিতার পারশে
একটি রমণী মুর্ত্তি দাঁড়ায়ে নীরবে,
পাষাণ-প্রতিমা সম। ঝরে না নয়নে
একটি অশ্রুর বিন্দু, এক দৃষ্টে চেয়ে
আছে শুধু হৃদয়ের রতন তাহার
পুড়িছে যেখানে; যেন হু-হু হু হু রবে
পোড়ায় অনল আজি হৃদিপিণ্ড তার;
তবু সংজ্ঞাহীন। যেই নিবিল অনল
"কোথা গেলি বাপ" বলি পড়িল ভূতলে।"

কতকটা "যোগেশের" অনুকরণ।

যাবনিক পরাক্রম। উপন্যাস। নীলরতন রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ৮০ আনা। ২৫ কর্ণোওয়ালিস ষ্ট্রীট।

উপন্যাসটীর সংক্ষেপ বিবরণ কতক অংশ গ্রন্থ কারের নিজ ভাষায় বলিতে পারিলে গ্রন্থের গুণাগুন অনেকটা বুঝা যায়।

রাজা মানসিংহের ভ্রাতৃ কন্যা ইন্দুমতীর সয়ম্বর সভায় ঘোষণা হইল যে যে বীরপুরুষ পেশওয়ারের দুর্গ সেকন্দর খাঁর হস্ত হইতে পুনর্জ্জয় করিয়া দুই বৎসর কাল নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিতে পারিবেন তিনিই ইন্দুমতীর বরমাল্য পাইবার

যোগ্য। এই ঘোষণা শুনিয়া সয়ম্বর সভায় রঘুনাথ সিংহ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমিই এ কার্য্য উদ্ধার করিব। "তদবধি তাঁহার প্রিয় দর্শন মূর্ত্তি" ইন্দুমতীর "হৃদয় পটে চিত্রিত" রহিল। রঘুনাথ সিংহ পেশওয়ারের দুর্গ পুনরুদ্ধার করিয়া তাহা রক্ষা করিতেছেন, এমত সময় ইন্দুমতী আপনার "প্রিয়তমকে ঘোর বিপদগুলী পরিবৃত শুনিয়া ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া ছদ্মবেশে" (অর্থাৎ যুবা পুরুষ বেশে) হরিৎস্বামী নামক একজন বৃদ্ধ গায়কের "সমভিব্যাহারে প্রিয়তমের সমদুঃখ ভাগিনী হইবার নিমিত্ত" তথায় যাত্রা করিলেন। পেশওয়ার প্রদেশ কাবুল নদীর "সুরম্য বক্রগতি দ্বারা তত্রত্য ক্ষেত্রমালা অপর্য্যাপ্ত শস্যশালিনী হইয়া রাজলক্ষ্মীর সুচারু লাবন্য প্রফুল্লাস্যে প্রকটিত করিত।" সেই প্রদেশে কতক দুর গিয়া ইন্দুমতী (ওরফে বিজয়) হরিৎস্বামীকে বলিলেন "পিতঃ! পেশওয়ারের দুর্গ আর কত দূর? পথ শ্রমে বড় কাতর হইয়াছি।" হরিৎস্বামী উত্তর করিলেন "আহা! লাবণ্য ময়ী বালেন্দুবৎ দেহবল্লী অধ্বশ্রমে ও বিচ্ছেদোত্তাপে একেবারে শুষ্ক ও জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।" "হরিৎস্বামী এইরূপ বলায় যুবতীর শোকাবেগ একেবারে উচ্ছাসিত হইয়া উঠিল।" শেষে স্থির হইল নিকটেই আলম খাঁর ভবন তথায় যাইয়া রাত্রি-যাপন করা কর্ত্তব্য। ইনি এক জন বিখ্যাত যোদ্ধা। যুবতী বলিলেন "তবে কি তিনি সৈনিক পুরুষ?" হরিৎস্বামী উত্তর করিলেন আলম খাঁ "কখন কখন অসিধারণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তিনি অবিমৃষ্যকারিতা কি জিঘাংসা পরতন্ত্র নহেন।" শেষ আলম খাঁর সহিত উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, উভয়ে তাঁহার সঙ্গে গেলেন। আলম খাঁর ভবনে রঘুনাথ সিংহর কথকগুলি রাজপুত সেনা থাকিত, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল খাঁ সাহেবের সঙ্গে অপর দুই জন (ইন্দুমতী আর হরিৎস্বামী) "দেখিতেছি, উহারা কে?—দেখিতে যে ভয় করে—"।

পর দিবস প্রাতে হরিৎস্বামী বিজয়কে এক ধর্ম্মশালায় রাখিয়া বলদেব সিংহের সঙ্গে দুর্গে গেলেন। তৎকালে রঘুনাথ সিংহ তথায় ছিলেন না, পরে তাঁহার অনুপস্থিত সময়ে একজন অপরিচিত ব্যক্তি দুর্গে স্থান পাইয়াছে শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন, আগন্তুক শত্রুপক্ষীয় কোন দূত হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন; কিন্তু তাহাকে দেখিতে গেলেন না, তাহার কোন অনুসন্ধানও লইলেন না। পরদিবস মৃগয়ায় গেলেন। তথায় বিকটাকার এক পুরুষ দেখিলেন তাঁহার নাম করম খাঁ। রঘুনাথ সিং "কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন পরে কিঞ্চিৎ স্থৈর্য্য লাভ করিয়া বলিলেন—"যবনের কি দুঃসাহস? যবন উত্তর করিল সেকন্দর খাঁর অনুচর করম খাঁর ভয় কিসের? রঘুনাথ সিং এক্ষণে স্পষ্ট

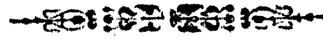
জানিতে পারিলেন যে এব্যক্তি সেকেন্দর খাঁর প্রেরিত।" শেষ করম খাঁ "সাহসে নির্ভর করত এক ভয়ানক লম্ফ দ্বারা" পলাইল। রঘুনাথ ও বলদেব দুর্গে আসিলেন। পর দিবস প্রাতে হরিৎস্বামী সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ হইল। হরিৎস্বামী বলিলেন বিজয়ের অনুমতি ব্যতীত আমি উভয়ের "রহস্য" ব্যক্ত করিতে পারি না। রঘুনাথ সুতরাং ধর্ম্মশালায় বিজয়ের নিকট গেলেন, বিজয় দেখা দিল না। রঘুনাথ প্রত্যাগমন করিয়া বলদেবকে পাঠাইয়া দিলেন। বলদেবের সঙ্গে পথে সেকন্দরের সাক্ষাৎ হইল; তিনি আপনার পরিচয় দিয়া "অচিন্তনীয় দ্রুতবেগে সমীপবর্ত্তী গহ্বরমধ্যে বিদ্যুৎ-প্রায় অন্তর্হিত হইলেন।" বলদেব শেষে ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া তথাকার অধ্যক্ষের দ্বারা বিজয়কে আপনার সম্মুখে আনাইলেন। অধ্যক্ষ এই সময় বলদেবকে বলিয়া দিলেন যে ইনি "ইন্দুমতী এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন।" ইন্দুমতীর সঙ্গে বলদেবের কথা বার্ত্তা হইল। ইন্দুমতী শয়নগৃহে গেলেন। বলদেব তথায় একজন প্রহরী রাখিলেন কিন্তু প্রাতে উঠিয়া দেখেন শয়ন-গৃহে বিজয় নাই। গ্রন্থকার এই সময় বলিতেছেন "পাঠক মহাশয়! উৎকণ্ঠা হইবেন না, আমি নিম্নেই বিজয়ের অন্ত-র্ধান বিবরণ বর্ণনা করিয়া আপনার কৌতূহল নিবারণ করিতেছি।"

এই সময় আমরাও বলি, পাঠক মহা-শয়! উৎকণ্ঠা হইবেন না, আমরা ক্ষান্ত হইলাম। এই মাথামুণ্ড লিখিয়া আমরা অনেকটা কষ্ট দিয়াছি অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

এস্থলে বলা বাহুল্য, উপন্যাস লেখ-কের যে সকল শক্তি আবশ্যক, গ্রন্থকা-রের তাহা কিছুই নাই অন্তত এপর্য্যন্ত কিছুই দেখিতে পাই না।



বঙ্গদর্শন।



৯৪ সংখ্যা।



কাঞ্চনমালা।

দ্বিতীয় ভাগঃ।

১

কুণাল নামিয়া আসিয়া দেখেন, কাঞ্চনমালার উৎকণ্ঠার বাস্তবিকই কারণ হইয়াছে। যেখানে তাঁহারা আপন আপন পুষ্পাভরণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, কুণালের আভরণ সেইখানেই রহিয়াছে কিন্তু কাঞ্চনের পুষ্পগুলি সেখানে নাই। কোথায় গেল? কে লইল! এ রাত্রে এখানে লোক আসিবার ত সম্ভাবনা নাই? আর ত সময় নাই যে খুঁজি। অভিনয় সত্বর আরম্ভ হইবে। ললিত বিস্তরের তৃতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইলেই কুণাল ও কাঞ্চনমালা মার ও মারপত্নী সাজিয়া বুদ্ধদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে যাইবেন। উভয়েই অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। কি করা যায়, কাঞ্চন ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইলেন, কুণালের আর তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবারও অবসর হইল না। আবার তূর্য্যধ্বনি হইল, প্রস্তাবনা শেষ হইয়াছে। পাত্র প্রবেশ আবশ্যক। কুণাল বলিলেন কাঞ্চন তুমি অমনি আইস তুমি নিরাভরণা হইয়াও মারপত্নীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবে, কিন্তু কাঞ্চন কোন জবাব করিল না। তাহার উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, সে কেবলই ভাবিতেছে, আমার মন যে চঞ্চল হইয়াছিল, তাহাতে জানিয়াছিলাম অমঙ্গল অবশ্য হইবে। কিন্তু সে অমঙ্গল কি এই মাত্র—না তা হইবে না—এখনও ত উৎকণ্ঠা দূর হইতেছে না, তবে নিশ্চয় আরও বিপদ হইবে। তিনি এইরূপ ভাবিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। সুতরাং কুণালের কথার উত্তর দিলেন না, সমস্ত শুনিলেন কি না সন্দেহ। কুণাল বলিলেন "মারপত্নী কিছু নাটকে নাই, তুমি

আমায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছ, অতএব অশোক রাজার ধর্ম্ম গ্রহণের সময় তুমি আমোদ করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া আমি মারপত্নী নামে একটী নূতন পাত্র উহাতে নিবেশ করিয়াছি। অতএব তুমি না যাইলেও আমি যাই। নচেৎ অভিনয় ব্যাঘাত হইবে, বলিয়া কুণাল দ্রুততর অভিনয়স্থলে গমন করিলেন। কাঞ্চন ভাবিতে লাগিলেন, আমার অমঙ্গলের কি এইখানেই বিরাম হইবে?

২

কুণাল আসিয়া দেখেন সমস্ত প্রস্তুত, তাঁহার জন্য নেপথ্য গৃহে সকলেই ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত। তাঁহার অন্বেষণ জন্য লোকও প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহার রঙ্গস্থল প্রবেশের আর বিলম্ব নাই, বরং দুই এক মিনিট বিলম্ব হইয়াছে। কুণাল আর নেপথ্যশালায় বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া রঙ্গভূমে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "কই? আমার সেনাপতি ও দুহিতৃগণ কই?" অমনি মারপত্নী আসিয়া কহিলেন, "নাথ! সকলই উপস্থিত। বসন্ত, কোকিল-কুহু, আম্রমুকুল, দক্ষিণপবন প্রভৃতি দল বল সব উপস্থিত। আপনার কন্যাগণ সব উপস্থিত।" কুণাল বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। যে মারপত্নী সাজিয়া আসিয়াছে, এ কে? মুখ দেখিতে পাইলেন না, কারণ উহা আবৃত। গলার স্বরে বুঝিলেন কাঞ্চনমালা নহে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহার স্বহস্তগ্রথিত পুষ্প অলঙ্কারগুলি সমস্তই তাহার গায়ে রহিয়াছে। এ অলঙ্কার এ কোথা হইতে পাইল। তিনি এই সকল ভাবিতেছেন আর অন্যমনস্ক হইতেছেন। যে যুবতী মারপত্নী সাজিয়া আসিয়াছে সে অতি রসিকা, প্রত্যুৎপন্নমতিশালিনী। সে অমনি বলিল "নাথ এত চিন্তিত কেন? যখন সত্যযুগে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণের ধ্যানভঙ্গ করাইয়াছ তখন কলিতে এই সামান্য রাজপুত্রের ধ্যানভঙ্গ করিতে পারিবেন না?" কুণাল ভয় বিস্ময়সূচক স্বরে কহিলেন "কিন্তু বোধ হয় এ অত্যন্ত কঠিন ঠাঁই" তাঁহার ভাব এমনি মনোহর হইল যে সভাস্থ লোক সকলেই "বেশ বলিয়াছ" "খুব বলিয়াছ" বলিয়া সুখ্যাতি করিয়া উঠিল। কুণালের বিস্ময়জড়তা কতক দূর হইল। তিনি তাহার পর রীতিমত অভিনয় করিতে লাগিলেন; দেখিতে লাগিলেন যে মারপত্নী হাবভাব আদির দ্বারা তাঁহার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটা কে জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। তাঁহার এইরূপ কৌতূহল ও বিস্ময় থাকাপ্রযুক্ত তাঁহার অভিনয় আজি অন্য দিন অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সকলেই কুণালের অভিনয় পারিপাট্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। কুণাল অভিনয়ে অত্যন্ত পটু, কিন্তু আজি তাঁহার সুখ্যাতির কারণ শিক্ষার গুণ নহে। ঐ যে চমকিত ভাব উহাই সভাস্থ জনগণের মনোরঞ্জনের

মূল। তাহারা কিন্তু জানিল না যে কেন তাঁহার অভিনয় এত সুন্দর,তিনিও জানিতে পারিলেন না কেন আজিকার অভিনয় লোকের এত ভাল লাগিল।

এই রমণী কে ? এত কাঞ্চনের ফুলের গহনা গুলি চুরি করিয়াছে ? নিশ্চয়ই ঐ করিয়াছে, নহিলে সে সব দেবদুর্লভ অলঙ্কার, কুণালের স্বহস্তগ্রথিত, ও ত আমরা বেশ চিনি, ও গহনা ও কোথায় পাইল, বিশেষ ঐ দেখ মুকুটের থোপনা নাই। "এই থোপনার ফুলের জন্য পাহাড়ে উঠিয়াই ত কাঞ্চন বেচারার আজি এই মনঃপীড়া ভুগিতে হইল। অতএব এ নিশ্চয় সেই গহনা চুরি করিয়াছে,কিন্তু লোকটা কে ? কেমন করিয়া জানিব ? স্ত্রীলোকের মুখের ঘোমটা খুলিয়া ত দেখিতে পারি না। আপনার কেহ হইত,কোন রূপ আশা থাকিত, না হয় অভব্যতা করিয়াও দেখিতাম। কিন্তু ঐ চোরের মুখের ঘোমটা খুলিয়া উহার পরিচয় লইব, উহাকে চিনিয়া লইব ? ছি ! ও কেন রাজরাণী হউক না? ও চোর—না হয় চোরাও মাল কিনিয়াছে—ওর সঙ্গ আমরা চাইনা।"

নিজেই চুরি করিয়াছে, নহিলে ফুল আবার কে চুরি করিতে যাইবে ? ধরা পড়ারও ত ভয় করিতেছে না। কি সাহস, যাহার চুরি করিয়াছে তাহারই সম্মুখে, সেই জিনিস লইয়া কেমন সপ্রতিভের মত কথা কহিতেছে, যেন কোন দুষ্কর্ম্মই করে নাই। এত সাহস ! এত সামান্য লোক নয়। কিন্তু কি জন্য চুরিই করিল, কি জন্যই বা এত সাহস করিয়া চোরাও মাল শুদ্ধ রাজাধিরাজের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিতেছ না উহার রকম ? ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া কুণালের কাছে দাঁড়াইতেছে, যতবার নাম করিতেছে যেন গলার স্বর জড়িত হইয়া আসিতেছে, দেখিতেছ না ভাবভঙ্গী ? ওকি ভাল ? ওর বড় সুবিধা হয়েছে, লোকে জানে এ কাঞ্চনমালা—কুণাল ভিন্ন আর কেহ ত জানে না যে ও কাঞ্চনমালা নহে। কাঞ্চনমালা হতাশ্বাস হইয়া অভিনয় দেখিতেও আজি আইসেন নাই। সুতরাং ও লোকের কাছে ঠিক কাঞ্চনের মতই বোধ হইতেছে। দুষ্টাও এ সব ঠিক বুঝিয়া বুঝিয়া আপনার সুবিধা পাইয়াছে, একেবারে মারপত্নী ও কাঞ্চনমালা এই উভয়ের ভূমিকা ধারণ করিয়া অভিনয় করিতেছে। কুণাল প্রথম খানিক হা করিয়া অন্যমনস্ক ছিলেন, তাহার পর রীতিমত অভিনয় করিতে লাগিলেন। হতবুদ্ধিভাবটা কতক অন্তরিত হইল। তিনি আপন কলানৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেবল নজর রাখিলেন যে, দুষ্ট মাগী যেন হঠাৎ বাহির হইয়া না যায়। উহার প্রতি কুণালের বার বার দৃষ্টি পড়ায় সে মনে করিল, বুঝি শিকার পাকড়াইয়াছি। সে তখন মারপত্নীর কর্ত্তব্য নৃত্য করিতে লাগিল।

সম্মুখে উপগুপ্ত, অশোকের দীক্ষাগুরু, বৌদ্ধধর্ম্মের মূলভিত্তি, বুদ্ধ সাজিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যান করিতেছেন। প্রশান্তমূর্ত্তি, স্থূলকায় মুণ্ডিতশিরঃ,কৌপীনমাত্ররক্তাম্বর পরিধান, অটল অচলবৎ নিস্পন্দ। তাহারই প্রলোভনার্থ মার ও মারপত্নী বসন্তসেনা মারদুহিতাদিগের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। মারপত্নী নৃত্য করিতে লাগিল। যে হও তুমি সে হও, অত নাচিও না সুন্দরি! কি নৃত্য! ! মরি মরি মরি! বুদ্ধদেব নিতান্ত পাষাণ তাই তোমার নৃত্যে ভুলে নাই। তোমার নৃত্য ধ্যানের দুর্লভ, কামনার উচ্চপদ, সার হইতেও সার,—অত নাচিও না সুন্দরি! মনুষ্য দর্শক মজিয়া যাইবে, হয় ত অশোক রাজার দীক্ষা লওয়া ফিরিয়া যাইবে। অত নাচিও না। উহার সঙ্গে আবার ওকি! কটাক্ষ! এক একবার বিদ্যুৎ ছুটিতেছে। ও কাহার উপর! কুণাল আজি বুঝিব, তুমি সীসা কি সোণা, আজি তোমার ধর্ম্ম বুঝিব, আজি তোমার বিদ্যা পরীক্ষা হইবে। ওকি কুণাল, তুমিও যে আরম্ভ করিলে, তুমিও কটাক্ষ করিতেছ, একি তোমার কলানৈপুণ্য? তুমি কি শুদ্ধ দর্শকমণ্ডলীর মন রাখিবার জন্য কটাক্ষে কটাক্ষের জবাব দিতেছ? না, কাচ মূল্যে কাঞ্চন মণি বিক্রয় করিতেছ। না! না! তোমার কটাক্ষ আমি বুঝিয়াছি, ভয় নাই ও কখন পালাবে না, তোমার রূপ দেখিয়া যে মজিয়াছে তাহাকে না তাড়াইলে সে যাইবে না নিশ্চয়।

কিন্তু হঠাৎ সব স্তব্ধ হইল কেন? এ কি? সূচ পড়িলে শুনা যায়, হঠাৎ এরূপ কেন হইল। এক অংশে রাজপরিবার সমভিব্যাহারে মহারাজ অশোক, আর এক পার্শ্বে করদ ও মিত্ররাজগণ, মধ্যস্থলে মন্ত্রী প্রাড়্বিবাক মহামাত্র প্রভৃতি সকলেই নিস্তব্ধ। পার্শ্বে রমণীকুল নিস্তব্ধ। কেন এত নিস্তব্ধ? শুদ্ধ নিস্তব্ধ? সকলে একতানমনে বুদ্ধদেবের দিকে তাকাইয়া আছে। অর্হৎ শ্রেষ্ঠ উপগুপ্তের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি কথা কহিতেছেন, মার কন্যারা তাঁহাকে লোভ দেখাইতেছে, আর তিনি তাহার জবাব দিতেছেন। কি গভীর ভাব! কি গভীর স্বর! যে স্বরে উপগুপ্ত দেবাসুর যক্ষ রক্ষ নর কিন্নর সমীপে সদ্ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন, যে স্বরে বৌদ্ধমণ্ডলী মোহিনীমুগ্ধ হইয়া থাকে, আজি সেই স্বরে ভগবান উপগুপ্ত মার দুহিতাদিগের সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, "তোমরা আমার নির্ব্বাণ পথ দেখাইয়া দিতে পার ত দাও। ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া আমার মন তোমাদের ভোগ আশায় নিবিষ্ট হইবে না। তোমরা বিদায় হও। অসংখ্য প্রাণী আমার চারিপার্শ্বে জন্ম জরা মরণকৃত দুঃখের জ্বালায় দহিয়া মরিতেছে, আমি দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া কিরূপে আবার সেই দুঃখে পড়িব। আমি প্রাণত্যাগ করিয়া এই অসংখ্য জীবের মুক্তির

উপায় করিয়া দিব। তাহাদের নির্ব্বাণ লাভের পথ করিয়া দিব। তোমরা কি মনে কর আমায় ভুলাইবে?” এইরূপ নানা কথোপকথন হইতে লাগিল, শ্রোতৃবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া, কর্ণ ভরিয়া নিজ উপাস্য দেবতার অধরচ্যুত বচনসুধা-পানে আত্মজীবন সার্থক করিতে লাগিল। কুণালের চক্ষে জল আসিতে লাগিল।

চোরের মন বুঁচকির দিকে। দুষ্টরমণী ক্রমাগত কুণালের কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উপগুপ্তের বক্তৃতায় সকলে মোহিত হইতেছে, কিন্তু সে দুষ্ট চরিত্রার তাহাতে কাণও নাই। না শুনিলে কে কবে কোন কথায় মজিয়া থাকে। তাহার চেষ্টা কুণালকে লইয়া কোন ঘরাও কথা পাড়ে, অভিনয় ছাড়া অন্য কথা পাড়ে, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি কুণাল উপগুপ্তের বক্তৃতায় মোহিত হইতেছেন, বক্তৃতা যখন বড় জমিয়া আসিল, তাঁহার নয়ন বাষ্পে ভরিয়া গেল, সে অমনি তাড়াতাড়ি অঞ্চল দিয়া তাঁহার নয়ন মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত। কি দুষ্ট! কুণালের এটা অত্যন্ত অসহ্য হইল। তিনি সরিয়া গিয়া দূরে উপ-গুপ্তের ওপাশে দাঁড়াইলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে কুণালের বড় অনুরাগ, তিনি যদিও মার সাজিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তিনিই পাটলীপুত্র রাজধানীর প্রথম বৌদ্ধ। উপগুপ্তের বক্তৃতায় তাঁহার ভাব লাগিয়া গেল। কিছুক্ষণের পর উপগুপ্ত মার দুহিতাদিগের প্রলোভন অতিক্রম করিয়া আবার ধ্যানস্থ হইলেন। পাত্রগণ রঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। কুণাল বাহির হইয়া যে রমণী মারপত্নী সাজিয়াছিল তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলেন, তাহাকে পাইলেন না। তখন কাঞ্চনমালাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য এবং তাঁহাকে এই অদ্ভুত ব্যাপার জানাইবার জন্য দ্রুতপদবিক্ষেপে কাঞ্চনপুরী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। আর একবার ফুলের গহনা পরিয়া যাত্রা ভঙ্গের সময় দেবদম্পতী সাজিয়া অশোক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতে হইবে। এবার স্থির করিয়াছেন নিরাভরণা কাঞ্চন-মালাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন।

৩

তিনি দ্রুতপদে যাইতেছেন আর ভাবিতেছেন আহা! কাঞ্চন এতক্ষণ কত মনস্তাপ পাইতেছে, তাহার এই অভিনয়ে উপস্থিত হইবার বড়ই সাধ ছিল। তাহাকে গৃহে গিয়া কি ভাবে দেখিব? হয় ত শয্যায় শুইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছে, না হয় গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত আছে, না হয় গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া পথপানে চাহিয়া আছে, সেই প্রেমময়ী মূর্ত্তি জ্যোৎস্নায় নাইয়া জ্যোৎস্নায় মিশিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এই ভাবিতেছেন আরও দ্রুতপদে যাইতেছেন। এমন সময়ে রাজবাটীর একজন দাসী বলিল যে,তোমার ফুল যে

চুরি করিয়াছে, তাহাকে দেখিতে চাও? কুণাল কহিলেন হাঁ চাই। সে বলিল তবে ঐ লতাকুঞ্জমধ্যে যাও। কুণাল ভাবিলেন একাকী লতাকুঞ্জমধ্যে স্ত্রীলোকের নিকট যাওয়া উচিত কি না—কিন্তু মালা চোর কে, ও চুরি করার অভিপ্রায়ই বা কি, জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত ঔৎসুক্য ছিল, এই ঔৎসুক্যের প্রধান কারণ এই যে, জানিলে কাঞ্চনমালাকে প্রবোধ দিতে পারিবেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন।

৪

স্ত্রীলোকটা কোন পথে আসিয়াছিল জানি না, আসিয়া এই লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছে, কুঞ্জটী নানা বিলাস সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। কোথাও ঝারিপূর্ণ গন্ধবারি কোথাও স্বাদুতোয়,কোথাও স্বাদু অন্ন প্রভৃতিতে সুশোভিত। সে কি ভাবিতেছিল জানি না, বোধ হয় ভাবিতেছিল কতদিন ভেবেছি কুণালকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব, যেদিন অশোক রাজার বাটীতে কুণাল আমার নজরে পড়িয়াছে সেইদিন অবধি জানিয়াছি যে রাজপরিবারে এই বৃদ্ধ স্বামীর সংসারে কুণাল বই আমার গতি নাই। কত দিন কত দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি পারি নাই, কতদিন ঠারে ঠোরে লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছি, প্রত্যাখ্যান বই পাই নাই। আজ পাহাড় থেকে প্রাণভরে দেখিয়াছি। আর আসবার সময় ফুলের মালা চুরি করায় আরও সুবিধা হইয়াছে। রঙ্গভূমে কেহই টের পায় নাই আমি কে? আমি প্রাণ ভরিয়া তাহারে আমার জীবন সর্ব্বস্ব দিয়াছি। তাহাকে "নাথ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। কত কথাই কহিয়াছি। কতবার কটাক্ষ করিয়াছি। বোধ হয় কুণালও একটু টলিয়াছেন। টলিবার কথাই ত? তাতে আর সন্দেহ আছে? একবার, দুইবার, বার বার, আড়ে আড়ে দেখিতেছিলেন, না টলিবে কেন? যা হোক আজ অতি সুদিন, যা ধরেছি তাই হয়েছে, ধরিলাম দেখিব—প্রাণভরে দেখিলাম। ধরিলাম রঙ্গভূমে উহার পাশে উহার স্ত্রী সাজিয়া দাঁড়াইব—বিধাতা ফুলের গহনাগুলি আমার পথে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর রঙ্গস্থলে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় বিধাতা বুঝি বড় সদয়। কি চোখ পটলচেরা !! এমন চোখ কখন দেখি নাই। মরি সেই চোখের আড়ে আড়ে চাহনিতে প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে। ঐ চোখেই ত আমায় মজাইয়াছে। ঐ চোখেই ত আমার এই কলঙ্কে টানিয়া আনিয়াছে। কিন্তু কলঙ্কই বা কি? টের ত কেউ পাবে না, আর যদি কেউ টের পায়,আমার রসিক বুড়া কখন বিশ্বাস করিবে না। বাকী লোক ত বাজে লোক। বিশ্বাস করলে আর না করলে বড় বয়ে গেল। কিন্তু এই যে নূতন ফাঁদ পেতে বসে আছি, এ ফাঁদে ত এখনও কিছু হল না।

সে স্ত্রীলোক ব্যস্তভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া খানিক রহিল। তখনও কুণাল ইতস্তত: করিতেছেন। পরে কুণাল যখন যাওয়াই স্থির করিলেন, তখন লতাকুঞ্জমধ্যে তাঁহার বিমাতা তিষ্যরক্ষা এইরূপ চিন্তায় আকুল ছিলেন।

৫

কুণাল ক্রমে যত নিকটে আসিতে লাগিলেন তিষ্যরক্ষা আহ্লাদে আটখান হইতে লাগিলেন। দ্বারের আড়ালে লুকাইয়া উঁহার ভাব ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যখন কুণাল কুঞ্জগৃহে কাহাকেও না দেখিয়া কতকটা থতমত খাইয়া গেলেন। তখন তিষ্যরক্ষা হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন "কি রাজকুমার চিন্তে পার?" তখনও অভিনয়ের বেশ অপনীত হয় নাই।

"পারি বই কি—মালাচোর!"

"তবে চোরের কাছে এত রাত্রে নির্জ্জনে!"

কুণালের স্বর একটু গম্ভীর হইল বলিলেন "আমি জানিতে আসিয়াছি আপনি কাঞ্চনের গহনাগুলি কেন চুরি করিলেন।"

"সত্য কথা বলিব"

"নির্ভয়ে বলুন"

"তুমি আমার মনঃ কেন চুরি করিলে?"

"আমি আপনার কথার ভাব পাইলাম না।"

তখন পাপীয়সী তিষ্যরক্ষা আপন অন্তরের পাপ আশা, পাপ আকাঙ্ক্ষা, মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিল; আপনার অন্তরের পাপজ্বালা জানাইল; স্বামীর প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল; আপনার পরিচয় দিল; বলিতে লাগিল "জানি আমি, তোমার পাপ হইবে, কিন্তু এই সংসারে বিশুদ্ধ পুণ্য কোথাও নাই। তোমার হৃদয় বিশাল, তাহার এক প্রান্তে আমায় স্থান দাও। আমার দারুণ পিপাসা, আমায় বারি দান কর।"

কুণাল বলিল "মাতঃ"—

"এই সম্বোধনটী করিও না। তোমার মুখে ও সম্বোধন বিষবৎ লাগে।"

"আপনি এরূপ কথা আর মুখে আনিবেন না।"

"দেখ কুণাল! তুমি আমায় চরণে রাখ। আমি তোমার উপকার করিব, তুমি জান অশোক রাজা আমা অন্ত প্রাণ। আমি বলিতেছি এই বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার তোমায় দেওয়াইব। তুমি জান তোমার শতাধিক ভ্রাতা আছে, তোমার উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা বড় অল্প। তুমি জান রাজকর্ম্মচারী মধ্যে তোমার অনেক শত্রু। সমস্ত হিন্দুগণ তোমার বিদ্বেষী, তোমার জীবন নাশের জন্য অনেকে উদ্যোগী আছে। তোমার বন্ধু নাই, তোমার ন্যায় গুণবান্ সাধুশীলের বন্ধু মিলে না। অতএব যদি বন্ধু চাও যদি উত্তরাধিকার চাও আমায় ভিক্ষা দাও। আর দেখ অশোক রাজার জীবন আমার মুষ্টিমধ্যে,

চাও কালই তোমায় উত্তরাধিকার দেওয়াইতে পারি।

কুণাল আপনি এ সকল নিষ্ঠুর কথা মুখেও আনিবেন না। ত্রিরত্ন আমার এক মাত্র সহায় ও বন্ধু। আমি উত্তরাধিকার চাহি না, বিশেষ আপনি যে উপায়ে উহা দিতেছেন, ও উপায়ে আমি ইন্দ্রত্ব লইতেও স্বীকৃত নহি। আমায় আর কিছু বলিবেন না, আমি চলিলাম।

তি। বলিব না, জানিও তুমি স্ত্রীহত্যা করিলে, জানিও তুমি মাতৃহত্যা করিলে।

কু। আমি নির্দ্দোষী।

তি। একদিন ইহার জন্য তোমার অনুতাপ করিতে হইবে। একদিন বলিবে তিষ্যরক্ষার মান রাখিলে আমার এ বিপদ হইত না।

"কখন না" বলিতে বলিতে কুণাল কুঞ্জ ত্যাগ করিয়া অনেকদূর অগ্রসর হইলেন। এবং ত্বরিতগতিতে কাঞ্চন-মালার অন্বেষণে গেলেন।

৬

তখন তিষ্যরক্ষার মনের ভিতর বসিয়া সুমতি আর কুমতি দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিল। সুমতি বলিল, কেমন? সতীন-পোর কাছে গিয়েছিলে উচিত শাস্তি হয়েছে?

কু। একদিনেই কি আশা ছেড়ে দিতে হবে নাকি?

সু। আবার যাবে নাকি?

কু। যাব না? আজ ও আমার কাছে এসেছিল, এবার আমি ওর কাছে যাব।

সুমতি। ধন্য মেয়ে আবার যদি অমনি হয়। এবার কি কিছু সুবিধা দেখেছ না কি।

কু। না।

সু। তবে আর কেন? মিছা কষ্ট পাবে। ও আশা ছেড়ে দাও।

কু। খুব বুদ্ধি! এতটা করিলাম, এত অবমান সইলাম, বুঝি ছেড়ে দিবার জন্যে?

সু। ধরতে ত পার নাই, তবে আর ছাড়লে কই? বৃথা চেষ্টায় কষ্ট পাও কেন? তাই বলি ও আশা ত্যাগ কর। কুণাল বড় ভাল ছেলে।

তখন কুমতি ও সুমতি একটু ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সুমতি। বলি অবমানটার শোধ লও না কেন? যে ভরসায় যাইতেছে সে ভরসা নাই।

কুমতি। এই ভাল পরামর্শ, খানিকটে জব্দ হলে উহাকে বশে আনা সুকর হইবে।

সুমতি। তবে সেই ভাল, যাও,

এই বলিয়া দুজনে নিরস্ত হইল। তিষ্যরক্ষা লতাকুঞ্জ ত্যাগ করিয়া কোথায় গেল।

তৃতীয় খণ্ড।

১

কুণাল অত্যন্ত কাতর ও আকুল মনে কাঞ্চনের সন্ধানে গেলেন, কিন্তু অন্তঃপুরে উহাঁকে খুঁজিয়া পাইলেন না, পুষ্পোদ্যানে খুঁজিলেন, পাইলেন না, বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। যেখানে কাঞ্চনমালাকে ফেলিয়া অভিনয়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে দাড়াইয়া খানিক ভাবিলেন। তথা হইতে নিকটবর্ত্তী মঠায়তনে দেখিলেন, তখনও আলো জ্বলিতেছে। কাঞ্চন প্রত্যহ তথায় ত্রিরত্নসেবার্থ গমন করেন, কিন্তু সে ত এত রাত্রে নয়। এরাত্রে কাঞ্চন কুণালের কাছ ছাড়া প্রায় থাকেন না, আজি কাছ ছাড়া হওয়ায়, কোথায় গেলেন, ভাবিয়া কুণাল কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একবার মঠ দেখা ভাল বলিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে ও ত্রাস্ত ভাবে তথায় গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুণাল ত্যাগ করিয়া গেলে পর কাঞ্চন খানিক আপনাকে বড়ই অসহায় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, স্বামী বুঝি আর ফিরিয়া আসিবেন না। তিনি অন্তঃপুরে গেলেন না। রঙ্গভূমিতে গেলেন না, কোন খানেই গেলেন না। খানিক ত্রিরত্নের ধ্যান করিয়া "ভগবান রক্ষা কর" যে বিপদ হয় আমার হউক, যেন কুণালের পায়ে কাটাটীও না ফুটে। আর যেন, অভিনয়ান্তে তাঁহাকে দেখিতে পাই।" এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ক্রমে মঠের সন্ধ্যাকালীন পূজা আরম্ভ হইল, কাঞ্চন সেই দিকে গেলেন, পূজার সমস্ত উদ্যোগ স্বয়ং স্বহস্তে করিলেন। পূজার পর অর্হৎগণের অনুমতি লইয়া ত্রিরত্নমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া পূজা, স্তব, ও প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। মঠবাসীরা অনেকেই অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন, সুতরাং কাঞ্চনকে, কেন এখানে? কি বৃত্তান্ত? ইত্যাদি প্রশ্নের বড় একটা জবাব দিতে হইল না। যাহাও হইল তাহা সংক্ষেপে সারিয়া দিয়া একান্ত মনে গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। "হে ধর্ম্ম! হে সংঘ! হে বুদ্ধ! আমার উৎকণ্ঠা দূর কর, আমার স্বামীর কোনরূপ অমঙ্গল না হউক, আমার স্বামীকে সুস্থ শরীরে আমার নিকট আনিয়া দাও।"

এমন সময়ে স্বয়ং কুণাল ত্রিরত্ন সমীপে গললগ্নীকৃতবাসাঃ হইয়া নমস্কার করতঃ মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হে ত্রিরত্ন! হে ত্রিশরণ! আমার সমূহ বিপদ উপস্থিত, আমার চিত্ত স্থির করিয়া দাও, আজি যাহা শুনিলাম ও এপর্য্যন্ত যাহা জানি, ইহাতে প্রাণ বড়ই আকুল হইতেছে, ধৈর্য্য হইতেছে না। দেব! মনে বল দাও, তোমাতে যেন মন স্থির থাকে ইহা করিয়া দাও, আমি রাজ্য ধন কিছু চাহি না। সদ্ধর্ম্ম প্রচার আমার উদ্দেশ্য, যাহাতে সদ্ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হয়, করিয়া দাও, পাপ হইতে রক্ষা কর।"

উভয়েই অবনত মস্তক হইয়া নীরবে রোদন করিতেছেন, আর প্রার্থনা করিতেছেন, কুণাল যে, উপস্থিত তাহা কাঞ্চন জানেন না। কুণালও কাঞ্চনের ধ্যানে এ পর্য্যন্ত বাধা দেন নাই। কিন্তু প্রণয়ীদের মনে কিছু বৈদ্যুতী আছে, তাহার বলে উহারা পরস্পরের কার্য্যকলাপ যেন কিছু কিছু টের পায়। বিশেষ কাছে আসিলে,কে যেন সে সুখের কথা উহাদের মনোমধ্যে বলিয়া দেয়। সেই ঘোরা দ্বিপ্রহরা, শান্তনলিনী, কুমুদগন্ধামোদিনী, ঝিল্লীরবরব্ধতমারুতসংসেবিনী, বিহগকুলকলরব বিধ্বংসিনী, পুঞ্জ পুঞ্জ মঞ্জু তারকারাজিব্যাপ্তা, যামিনী যখন সভয় রুচিতুৎক্ষিপ্তনয়না কামিনী ধৌত বিধৌত সুরভিচর্চ্চিত বদন শাট্যাঞ্চলে আচ্ছাদন করে,আপন আপন প্রাণকান্তের নিকটাভিসারিকা হতেছেন, তখন প্রহরাধিক গাঢ় প্রগাঢ় বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য মেধ্যামনঃসংযোগবৎ, পুরীতকীমনঃসংযোগবৎ, রুদ্ধবাহ্যকরণকধ্যানের পর সহসা কাঞ্চনমালার মনে প্রফুল্লতার সঞ্চার হইল। যেন ঘোর ঝটিকা বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হইল। যেন দারুণ গ্রীষ্মক্লেদের পর ধীরে ধীরে শৈত্য সৌগন্ধ মান্দ্যময় সমীরণ বহিল। তখন দেবতা প্রসন্ন বুঝিয়া কাঞ্চনমালা মস্তক উত্তোলন করিলেন, দেখিলেন, পার্শ্বেই কুণাল—গভীর ধ্যানেমগ্ন, কাঞ্চন একবার ভাবিতেছেন, ধ্যান ভঙ্গ করি কি না? তাঁহার সংস্কার জন্মিয়াছে, অমঙ্গলের ভাবিফল উত্তম, অতএব তিনি নির্ভয়ে উহার ধ্যানভঙ্গ করাইলেন, তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠা চিন্তা মনো বেগের পর পরস্পর সাক্ষাতে, পরস্পর গাঢ়ালিঙ্গনের পর কাঞ্চন কহিলেন, "নাথ! আমার প্রতি ত্রিরত্ন প্রসন্ন হইয়াছেন, আমাদের উপস্থিত অমঙ্গল শুভফল প্রসব করিবে। কিন্তু নাথ! রাজবাটীর এ সকল সুখ দুঃখময়, ইহাতে পদে পদে উৎকণ্ঠা, পদে পদে বিপদ, ও পদে পদে বাধা, আইস অদ্যাবধি আমরা এই বৃথা সুখভোগ ত্যাগ করিয়া সদ্ধর্ম্ম প্রচারার্থ তীর্থে তীর্থে, গ্রামে গ্রামে, বেড়াই গিয়া, আমাদেরও কখন বিচ্ছেদ হইবে না। বিশেষ যাহার জন্য আমাদের এত ব্যাকুলতা তাহারও সুসিদ্ধি হইবে।"

কুণাল। কাঞ্চন! তুমি কি মনে করিয়াছ আমি সুখভোগের জন্য আবার রাজবাটীতে আসিয়াছি? ধনলোভে অথবা যশো লোভে আসিয়াছি? কিছুমাত্র না। আমি এই আশায় আসিয়াছি যে, এখানে থাকিলে,—রাজার প্রিয়পুত্র হইতে পারিলে, সদ্ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হইবে। দেখ আমি করি আর নাই করি, রাজপরিবারের কেহ কেহ আমাদের মত গ্রহণ করিতেছে, রাজা সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আবার উপগুপ্তের নিকট পুনর্দ্দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। এবার উনি সদ্ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যথাবিহিত চেষ্টা করিবেন, এইবার আমার দ্বারা

অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইবে ভরসা আছে।

কাঞ্চন কহিলেন "নাথ তোমার এরূপ উদ্দেশ্য তাহা কি আমি জানি না? জানি, কিন্তু আজি আমার এক প্রস্তাব আছে, আজি পূর্ণিমা রাত্রি শুভ-লগ্ন উপস্থিত। আজি ত্রিরত্ন আমাদের উপর বড় সদয়। নচেৎ এমন উৎ-কণ্ঠার সময় তোমায় আমার কাছে, আনিয়া দিবেন কেন? অতএব আমার নিতান্ত ইচ্ছা আমি এই দ্বিপ্রহররাত্রে দেবতা সাক্ষাৎ শুভলগ্নে আমরা সদ্ধর্ম্মের জন্য এ জীবন উৎসর্গ করি।

কুণাল "সেটা বাহুল্য কাঞ্চন!" বলিয়া জোড়করে গললগ্নীকৃতবাসে জানুপরি উপবেশন করতঃ উভয়ে একতান মনঃপ্রাণ হইয়া একস্বরে পর-স্পরের গলা মিলাইয়া বলিতে লাগি-লেন, "হে ত্রিরত্ন! হে ধর্ম্ম! হে সংঘ! হে বুদ্ধ! হে বোধিসত্ব! প্রত্যেক বুদ্ধ! শুদ্ধ বুদ্ধ! জীবন্মুক্তগণ, তোমরা সাক্ষী, আমরা স্ত্রী পুরুষ অদ্য শুভ-দিনে, শুভক্ষণে, সদ্ধর্ম্মের উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি ও প্রচারের জন্য জীবনের অবশিষ্ট অংশ উৎসর্গ করিলাম। যাহাতে সদ্ধর্ম্মের উন্নতি নাই, যাহাতে বুদ্ধদেবের মহিমা ঘোষণা নাই, এমন কার্য্য আমরা কখন করিব না। অদ্যাবধি ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ধন, বিদ্যা যদি কখন চাই। সে কেবল ঐ এক মাত্র কার্য্যের জন্য। হে ত্রিরত্ন, বুদ্ধ,বোধিসত্বগণ, আমাদের চিত্ত-স্থৈর্য্য সম্পাদন কর।" সহসা মঠায়-তনের দীপ হাসিয়া উঠিল। দেবমূর্ত্তির মুখে আনন্দময় মৃদু হাস্য আবির্ভাব হইল। শৈত্য, সৌগন্ধ, মান্দ্যময় বায়ু প্রবাহিত হইল। আকাশে যেন মাঙ্গল্য তূর্য্যধ্বনি হইল, বোধিসত্বগণ যেন বলিলেন "তোমাদের মঙ্গল হউক।" এই-রূপে জীবন উৎসর্গ করার পর উভয়ে দীক্ষানন্তর অশোক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য দেবদম্পতী সাজিতে গেলেন।

২

তিষ্যরক্ষা লতাকুঞ্জ হইতে যখন বহি-র্গত হন,তখন তাঁহার এই ধারণা হইয়াছে যে, ভয়মৈত্রতা ভিন্ন কুণালকে বশ করা অসম্ভব। এই জন্য তিনি অশোককে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন। অশোককে আশু খুসী করার একমাত্র উপায় আছে বলিয়া বোধ হইল। অশোকের কোন মহি-ষীই অদ্যাবধি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তিষ্যরক্ষা যদি এই দিনেই অশোকের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার বড়ই প্রিয়পাত্র হইতে পারিবেন। এই ভাবিয়া পাপীয়সী নিজ পাপবাসনা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে অনায়াসে এক ধর্ম্মত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল। নিজ গৃহে গিয়া নিভৃতে অশোক রাজার নামে এক চিঠি

লিখিল, পত্রের মর্ম্মার্থ এই যে, "কয়েক মাস ধরিয়া আমি স্বপ্নে দেখিতেছি, ভগবান বুদ্ধ আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। পাছে লোকে অন্যরূপ ভাবে বলিয়া শ্রীচরণে এ ঘটনার বৃত্তান্ত নিবেদন করি নাই, কিন্তু আজি এ উৎসবের সময় আপনাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না, প্রার্থনা দাসীর অনুনয় গ্রাহ্য হয়, ইতি।" দাসী দ্বারা পত্র প্রাড়্বিবাকের নিকট প্রেরিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই প্রাড়্বিবাক নানা-কারণে এই দুশ্চারিণীর বশীভূত হইয়া-ছিলেন। এক্ষণে মুহূর্ত্ত মধ্যে সভাস্থ রাজার হস্তে পত্র পহুঁছিল, রাজা পত্র পাঠে মহাহৃষ্ট হইয়া তিষ্যরক্ষাকে সময়োচিত রক্তাম্বর পরিধান করিয়া আসিতে অনুমতি দিলেন, মহা আদরে নিকটবর্ত্তী অনুচর বর্গকে পত্র দেখাই-লেন, এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন যে আজি রাজার প্রিয়মহিষী তিষ্যরক্ষারও দীক্ষা হইবে।

৩

গভীর নিবাত নিস্তব্ধ পয়োধির ন্যায় মহার্হৎ উপগুপ্ত বুদ্ধ সাজিয়া বোধিদ্রুম-মূলে ধ্যানে মগ্ন আছেন, তাঁহার সমস্ত বাধা, সমস্ত বিঘ্ন, অতিক্রম হইয়া গিয়াছে, ক্রমে তাঁহার মুখে হর্ষচিহ্ন প্রকাশ হইতে লাগিল। নয়ন মুদ্রিত, মুখে হাস্যময় হইতে লাগিল; তাঁহার শরীর আহ্লাদে কাঁপিতে লাগিল, তিনি ক্রমে নয়ন উন্মীলিত করিলেন, তাঁহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া ত্রিশরণের নাম উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল। স্বর্গ হইতে সিদ্ধপুরুষ এক-জন নামিয়া আসিয়া বলিলেন, ভগবন্ আপনার তপঃসিদ্ধির উদ্দেশ্য কি? উত্তর হইল "মগধ সাম্রাজ্যে ধর্ম্মভ্রংশ হইয়াছে, এই খানে সদ্ধর্ম্ম প্রচারই আমার উদ্দেশ্য।" অমনি সিদ্ধপুরুষবেশী অশোকরাজার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপনীত করিলেন এবং বলিলেন "মহারাজ সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বাসনা করিতেছেন, তাঁহার প্রিয়মহিষী তিষ্য-রক্ষাও এই সঙ্গে দীক্ষিত হইতে চান।" তখন বুদ্ধরূপী উপগুপ্ত উভয় হস্তে উভয়কে ধারণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে সহস্র সহস্র গাথা পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই গভীরস্বরে মধ্যরাত্রির গভীর নিস্তব্ধ-ভাব ভেদ হইয়া যাইতে লাগিল। সভাবৃন্দ একতান মনে তাঁহার গাথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে স্বর্গে দেবদম্পতী উপস্থিত হই-লেন। শরীর নিরাভরণ অথচ শরীর-প্রভায় সভাস্থ দীপমালা নিস্তেজ হইয়া গেল। তাঁহারা আশীর্ব্বাদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সসাগরা, সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর সদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন, অচিরাৎ সসাগরা সদ্বীপা মেদিনী বৌদ্ধধর্ম্ম মহিমায় ব্যাপ্ত হইবে। অশোকের কীর্ত্তিকলাপ দিকচক্রবাল আচ্ছাদন করিবে। মহারাজাকে আর জম্বুপরি-

গ্রহ করিতে হইবে না, তাঁহার ইহ-লোকেই নির্ব্বাণ লাভ হইবে। যেমন কৌমুদী স্রোত এক প্রস্রবণ হইতে বহির্গত হইয়া অবিরতধারে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর পূরিত করে, তেমনি অশোকের যশঃ একমাত্র প্রস্রবণ হইতে বহির্গত হইয়া দিগ্দিগন্তর আচ্ছাদিত করুক।" সকলে মুগ্ধ হইয়া দেবদম্পতীর আশীর্ব্বাদ শুনিতে লাগিলেন, মহারাজ অশোক দেখিতে লাগিলেন। দিগ্বলয় সমুদ্র জলে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার কেন্দ্রস্থ দ্বীপে তিনি বসিয়া আছেন। তাঁহার চারিদিকে দ্বীপমালা। উত্তর,দক্ষিণ পূর্ব্ব, পশ্চিম, ঈশান, বায়ু, অগ্নি ও নৈর্ঋত যে দিকে চাও দ্বীপের পর দ্বীপ, তাহার পর দ্বীপ, অনন্ত দ্বীপমালা অনন্ত দিগ্বলয়ে লীন হইয়াছে, আর দেখা যায় না। প্রত্যেক দ্বীপে এক একটী বোধিদ্রুম এক একটী বৃক্ষের বহুকোটী পত্র, বহুকোটী ফল, বহুকোটী শাখা এবং বহুকোটী কাণ্ড। কোথাও পত্র সকল মরকতময়, স্বর্ণময় ফল, মর্ম্মর নির্ম্মিত ডাল পালা ও স্ফটিকের কাণ্ড, কোথাও শ্বেতমণির পত্র পীতমণির ফল, নীল মণির পত্র কৃষ্ণমণির গুঁড়ি, কোথাও কোটী পত্র নীল, কোটী পত্র সবুজ, বৃক্ষ সমূহ আদ্যন্ত উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে। সমস্তের উপর ধর্ম্মজ্যোতি চন্দ্রজ্যোতি অপেক্ষা শুভ্রতর স্নিগ্ধতর কিরণ বর্ষণ করিতেছে। বোধ হইতেছে দুগ্ধসমুদ্রে নবনীত দ্বীপ সমূহ ভাসমান। প্রত্যেক বোধিদ্রুম তলে এক একজন বোধিসত্ব ধ্যানমগ্ন, কেহ নবনবতি কোটীকল্প ধ্যান করিতেছেন, কেহ বা তাহার অধিক, কেহ বা তাহা অপেক্ষা অল্প ধ্যান করিতেছে। কেহ কীটযোনি হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতি কোটী যোনি ভ্রমণান্তেও এক্ষণে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধ্যান করিতেছে। কেহ কেহ বুদ্ধ হইতেছেন, নির্ব্বাণ লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের ওষ্ঠাধরে হাস্য হইতেছে আর দন্তপংক্তি হইতে শ্বেত নীল পীত হরিদ্বর্ণের অংশু নির্গত হইয়া জগৎব্রহ্মাণ্ড আলোকিত করিয়া গাঢ় অন্ধতমসাচ্ছন্ন জীবগণের নিকট ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে।

তিষ্যরক্ষা দেখিলেন ভয়ানক অন্ধকার মধ্যে চৌরাশীটী নরককুণ্ড রহিয়াছে, একরকম না আলো না অন্ধকারে দেখা যাইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক এই অন্ধকারে চীৎকার করিতেছে, একটী নরকে গন্ধকের অগ্নি জ্বলিতেছে, নাক জ্বলিয়া যায় কোথাও বিমূত্র-হ্রদে পড়িয়া পাপী বিমূত্র উদ্গার করিতেছে, তাহাদের যাতনায় উহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। উনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। করিলে কি হয়? তখনও উপগুপ্তের হস্ত তাহার অঙ্গে স্থাপিত সেই নরকদৃশ্যই দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন কাঞ্চনমালা অবলোকিতেশ্বর সাজিয়া পাপীদের ত্রাণার্থ উপস্থিত, দেখিলেন লক্ষ লক্ষ

পাপী চৌরাশীকুণ্ড ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কাঞ্চনমালা তাঁহার দিকে চাহিল না। সমস্ত পাপীগুলি উদ্ধার করিয়া লইয়া গেল। সেই ঘোরান্ধকার মধ্যে চৌরাশী ভীষণ নরককুণ্ডের মধ্যে তিষ্যরক্ষা—একাকিনী—বড় ভীতা—প্রায় সেই সভামধ্যে চীৎকারোন্মত্তা। এমন সময়ে একটী রশ্মি উপর হইতে তাহার মুখে পড়িল। রশ্মিপথে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন কাঞ্চনমালা তাঁহাকে "আয় আয়" বলিয়া ডাকিতেছে আর কুণাল পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। এই ভাবে উভয়ে আছেন উপগুপ্ত তাহাদের শরীর স্পর্শ ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা আবার মর্ত্ত্যভুবনে প্রবেশ করিয়া উপগুপ্তকে প্রণাম করিলেন। উপগুপ্ত তখন জিজ্ঞাসা করিলেন কুণাল ও কাঞ্চনমালা কোথায়? তিনি তাহাদিগকেও আশীর্ব্বাদ করিতে চান। তাঁহারা পরম ধার্ম্মিক ধর্ম্মার্থ বহুতর ক্লেশ পাইয়াছে। তখন অশোকরাজা প্রিয়পুত্রের এরূপ প্রশংসা শুনিয়া উল্লসিত হইয়া পুত্রকে আহ্বান করার জন্য লোক পাঠাইলেন। পুত্র উপরে বসিয়া তিষ্যরক্ষার ভাব দেখিতেছিলেন। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত স্মরণ হইতে লাগিল, তাহার পর দেখিলেন, তিষ্য কেমন ভাল মানুষের মত, বরং পরমধার্ম্মিকের মত, অশোকের পাশে বসিয়া দীক্ষাসূচক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। যেন সে লোকই নয়। কুণাল তিষ্যের আচরণে স্ত্রীচাতুরীর চরম দেখিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন পিতা তাঁহার অন্বেষণে লোক প্রেরণ করিতেছেন। অমনি সস্ত্রীক উপর হইতে নামিয়া পিতার চরণে নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া উপগুপ্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপগুপ্ত তাহাদের মস্তকে হস্ত দিয়া গাথা উচ্চারণ করতঃ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কুণাল দেখিলেন যে জেতবনে বুদ্ধদেব সদ্ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন। সিদ্ধচারণ দেব নর কিন্নর সকলে শুনিতেছেন, বুদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কাহিনী বলিতেছেন, এবং কিরূপে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধ হওয়া যায়, কিরূপে ক্রমে দশভূমি অতিক্রম করিয়া বুদ্ধ হওয়া যায়, সমস্ত বিবৃত করিতেছেন কর্ণামৃত পানে হৃদয় পুলকিত, শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, এমন সময়ে বুদ্ধদেব কুণালকে লইয়া আপন আসনপার্শ্বে বসাইলেন, অমনি সমবেত জনমণ্ডলী হইতে "জয় কুণাল, জয় কুণাল" ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল।

কাঞ্চনমালা দেখিতে লাগিলেন তিনি নিজে বোধিদ্রুম মূলে ধ্যানমগ্না, তাঁহার নির্ব্বাণ সময় উপস্থিত, প্রায় দশমভূমি উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন ব্রহ্মাণ্ডস্থ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ দেবদানব সিদ্ধচারণগণ তাঁহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'মাতঃ! আমাদের কি উপায় করিয়া গেলে' বলিয়া রোদন আরম্ভ

রিলেন। তখন কাঞ্চনমালা প্রতিজ্ঞা রিতেছেন আমিও অবলোকিতেশ্বরের ায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ব্রহ্মাণ্ডে এক াণী নির্ব্বাণশূন্য যতক্ষণ থাকিবে, তত ণ আমি নির্ব্বাণপ্রত্যাশী নহি। মনি সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল, পৃথিবী, চৌরাশী নরক হইতে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিল, দেখিলেন ভগবান তেজঃপুঞ্জ অবলোকিতেশ্বর তাঁহার দেহে মিশাইয়া গেলেন। চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি শুনিতে-ছেন, আশীর্ব্বাদ শেষ হইল। উপগুপ্ত কুণাল ও কাঞ্চনমালাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, মহারাজ আপনার পুত্র ও পুত্র-বধুর তুল্য লোক জগতে আর নাই। উহারা সদ্ধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। কুণাল ও কাঞ্চনমালার প্রতি, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণাবধি, রাজার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল। অদ্য উপগুপ্তের মুখে তাহাদের অতিবাদ প্রশংসা শুনিয়া রাজার আনন্দ আরো বৃদ্ধি হইল। তিনি স্নেহনির্ভরহৃদয়ে উহাদের গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখন জয় ধর্ম্ম, জয় সংঘ, জয় বুদ্ধ, জয় মহারাজ ধর্ম্মা-শোক, জয় কুণাল, জয় কাঞ্চনমালা, জয় রাজমহিষী তিষ্যরক্ষা ইত্যাকার জয়ধ্বনির মধ্যে সকলে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আপন আপন বিশ্রামালয়ে গমন করিলেন।



জাল প্রতাপচাঁদ।

১

পূর্ব্ব কথা।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল, হুগলীতে জাল রাজার মোকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে প্রতাপচাঁদ নাই, সে পরাণ বাবু নাই, সে জজ নাই, সে মেজেষ্টর নাই, সে মহিবুল্লা দারগা নাই, সে আসাদ আলি নাজির নাই, সে মনসারাম সেরেস্তাদার নাই; সুতরাং এ পুরাতন কথা তুলিলে কাহারও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। দুই একজন সাক্ষী অদ্যাপি জীবিত আছেন, ভরসা করি তাঁহারা আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া ক্ষমা করিবেন।

আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ঐতিহা-সিক। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ ছিল, বিচারপ্রণালী কিরূপ ছিল, আর সে

সময়ে আমাদের এই অঞ্চলের এই বাঙ্গালিরা কিরূপ ছিলেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা জালরাজার কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি। মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে যে সকল কাগজ পত্র পূর্ব্বে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া এই বিষয়টি লিখিলাম। এই স্থলে বলিয়া রাখি যে লেখক নিজে সেই সময়ে হুগলীতে উপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁহার বয়স অল্প, কিন্তু এই মোকর্দ্দমা লইয়া ঘরে ঘরে যেরূপ হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল তাহা তাঁহার স্মরণ আছে।

এ অঞ্চলের স্ত্রীলোক মাত্রেই জাল রাজার পক্ষপাতী হইয়াছিল। তাহারা গঙ্গার ঘাটে গিয়া, আপনার কথা ভুলিয়া, শিবপূজা ভুলিয়া, কেবল প্রতাপচাঁদের কথা কহিত। ভিক্ষুকেরা কৃষ্ণগীত ছাড়িয়া কেবল প্রতাপচাঁদের গীত গাইত, প্রতাপচাঁদের জয় হউক বলিয়া ভিক্ষা চাহিত। বৈষ্ণবের গীত বালকেরা শিখিয়া পথে ঘাটে দল বাঁধিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাইত। "পরাণ বাবু, হরে কাবু, হাবু ডুবু খেতেছে" এই গীত যখন তখন যেখানে সেখানে তাহাদের মুখে শুনা যাইত।

মূল কথা; এ অঞ্চলের কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই এইরূপ পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল। হুগলীর চতুষ্পার্শ্বস্থ দুই তিন ক্রোশের অন্যূন দশ হাজার লোক নিত্য আদালতে আসিয়া গাছতলায় দাঁড়াইয়া থাকিত; কে কে সাক্ষী দেয়, তাহারা কে কি বলে শুনিয়া যাইত, গ্রামে গিয়া সেই সকল পরিচয় দিত। যে দিবস সাক্ষীরা প্রতাপচাঁদের স্বপক্ষ কথা বলিত, সে দিবস আর তাহাদের আহ্লাদের সীমা থাকিত না; সে দিন গঙ্গার বক্ষে শত শত নৌকা ছুটাছুটি করিত, ময়রার দোকানে খরিদ্দারের উপর খরিদ্দার ঝুঁকিত। আর যে দিবস সাক্ষীরা বিপক্ষতা করিত, সে দিবস লোকে একপ্রকার ক্ষিপ্তপ্রায় হইত। সাক্ষীর প্রাণরক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিত।

প্রতাপচাঁদের দুর্গতি সকলের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিয়াছিল। জাল প্রমাণের পূর্ব্বেই তাঁহার পীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব ঘটনা অনুরোধেই হউক, আবাল বৃদ্ধ সকলেই জালরাজার স্বপক্ষ হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর এই ঘটনা হইয়াছিল যে প্রতাপচাঁদ কোন পাপিষ্ঠার কৌশলে পড়িয়া মহাপাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস গিয়াছেন—মরেন নাই। প্রকাশ্যে গৃহত্যাগ করিলে যদি অজ্ঞাতবাস সিদ্ধ না হয়, তাহাই তিনি কালনার ঘাটে শব সাজিয়াছিলেন। এ ঘটনা সহজেই লোকে বিশ্বাস করিল। বিশ্বাসের তাৎপর্য্যও ছিল। একে যুবা, তাহাতে

আবার রাজপুত্র, ঐশ্বর্য্যাদি সকল ছাড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিলেন! এরূপ যাওয়াই বীরত্ব। এ বীরত্বের কথা শুনিয়া বাঙ্গালির অন্তঃকরণে কেমন এক প্রকার পবিত্র সুখ উদয় হইল। সে পবিত্র সুখ লোকে ত্যাগ করিতে পারিল না। সুতরাং সকলে এ ঘটনা বিশ্বাস করিল, প্রতাপচাঁদের উপর লোকের ভালবাসা বাড়িল, সকলেই ঘরে বসিয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। "আহা! ভালয় ভালয় আবার ফিরিয়া আসুন" এ কামনা স্ত্রীলোক মাত্রেই করিল।

পনর বৎসর পরে একজন আসিয়া বলিল, আমি প্রতাপচাঁদ। তৎক্ষণাৎ সকলের অন্তঃকরণ একেবারে উথলিয়া উঠিল। সকলেই ভাবিল, তাঁহার আসিবার ত কথাই ছিল। কিন্তু যখন লোকে শুনিল, প্রতাপচাঁদকে বর্দ্ধমান হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, মেজেষ্টর তাঁহাকে কয়েদ করিয়াছে, তখন লোকের আর সহ্য হইল না। তাহাই এতটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

কিন্তু সে সকল পরিচয় আনুপূর্ব্বিক দিবার অগ্রে প্রতাপচাঁদের পিতা মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কেন না, পরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা অনেকটা সেই প্রকৃতির ফল। দুই একটি ঘটনা বলিলে তাঁহার প্রকৃতি সহজেই অনুভব হইতে পারিবে।

২

তেজচন্দ্র বাহাদুর।

(বর্দ্ধমানের বুড়া রাজা।)

প্রতিদিন প্রাতে দেওয়ান, মোহসাহেব, ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা, অন্দরমহলের দ্বারে আসিয়া তেজচন্দ্র বাহাদুরের বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতেন, তেজচন্দ্র যথা সময়ে এক স্বর্ণপিঞ্জর হস্তে বহির্গত হইতেন, পিঞ্জরে কতকগুলি "লাল" নামা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী আবদ্ধ থাকিত, তিনি তাহাদের ক্রীড়া ও কোন্দল দেখিতে দেখিতে আসিতেন। সম্মুখবর্ত্তী হইবা মাত্র তাঁহাকে সকলে অভিবাদন করিত, মহারাজও হাসিমুখে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিতেন। একদিন প্রাতে তিনি পিঞ্জর হস্তে অন্দর মহল হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময় একজন প্রধান কর্ম্মচারী অগ্রসর হইয়া যোড়করে নিবেদন করিল, "মহারাজ হুগলীতে খাজনা দাখিল করিবার নিমিত্ত সে দিবস যে এক লক্ষ টাকা পাঠান হইয়াছিল, তাহা তথাকার মোক্তার আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়াছে।" তেজচন্দ্র বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "চুপ! হামারা লাল ঘবরাওয়েগা!" এক লক্ষ টাকা গেল শুনিয়া তাঁহার কষ্ট হইল না, কিন্তু কথার শব্দে লালপক্ষী ভয় পাইবে এই জন্য তাঁহার কষ্ট হইল! এই মনে করিয়া কর্ম্মচারী বড় রাগ করিলেন, পাপীষ্ঠ

মোক্তারকে সমুদয় টাকা উদ্গীরণ করাইব নতুবা কর্ম্ম ত্যাগ করিব এই সঙ্কল্প করিলেন। মোক্তারের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল যে, মোক্তার আপন বাটীতে বসিয়া পুষ্করিণী কাটাইতেছে, দেউল দিতেছে, আর যাহা মনে আসিতেছে, তাহাই করিতেছে। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য রাজসরকার হইতে সিপাহী ও হাওয়ালদার বাহির হইল। কিন্তু রাজা তেজচন্দ্র তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিছু দিন পরে মোক্তার ধৃত হইয়া রাজবাটীতে আনীত হইল। রাজা মোক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"তুমি আমার একলক্ষ টাকা চুরি করিয়াছ?

মোক্তার। না,মহারাজ, আমি চুরি করি নাই,আমি তাহা বাটীতে লইয়াগিয়াছি।

তেজচন্দ্র। কেন লইয়া গেলে?

মোক্তার। মহারাজের কার্য্যে ব্যয় করিব বলিয়া লইয়া গিয়াছি। আমাদের গ্রামে একটিও শিবমন্দির ছিল না, কুমারীরা শিবমন্দিরে দীপ দানের ফল পাইত না, যুবতীরা শিবপূজা করিতে পাইত না। এক্ষণে মহারাজের পুণ্যে তাহা পাইতেছে। আর, একটি অতিথিশালা করিয়াছি, ক্ষুধার্ত্ত পথিকেরা এখন অন্ন পাইতেছে।

তেজচন্দ্র। তুমি কি সমুদয় টাকা ইহাতেই ব্যয় করিয়াছ?

মোক্তার। আজ্ঞা না মহারাজ! আমাদের দেশে বড় জলকষ্ট ছিল; গোবৎসাদি দুই প্রহরের সময় একটু জল পাইত না, আমি মহারাজের টাকায় একটি বড় পুষ্করিণী কাটাইয়াছি। মহারাজের পুণ্যে তাহার জল কিরূপ আশ্চর্য্য পরিষ্কার ও সুস্বাদু হইয়াছে, তাহা সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করুন।

তেজচন্দ্র। পুষ্করিণীটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছ?

মোক্তার। আজ্ঞা না, টাকায় কুলায় নাই।

তেজচন্দ্র। এখন কত টাকা হইলে প্রতিষ্ঠা হয়?

মোক্তার। ন্যূনকল্পে আর দশহাজার টাকা চাই।

তেজচন্দ্র। কিন্তু দেখ!—খবরদার!—দশহাজার টাকার এক পয়সা বেশী না লাগে, তাহা হইলে আর আমি দিব না।

তাহার পর পূর্ব্বকথিত কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া মহারাজ বলিলেন, আমি ত মোক্তারের কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না। মোক্তার যাহা করিয়াছে, তাহাতে আমার টাকা সার্থক হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আমি আর কি ভাল ব্যয় করিতাম। কর্ম্মচারী নিরুত্তর হইল।

মহারাজ তেজচন্দ্রের মধ্যবয়সের একটা কথা বলি, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রের আর একদিক দৃষ্ট হইবে।

তিনি একদিন একটি দরিদ্র বালিকাকে পথে খেলিতে দেখিলেন, বালিকা পরমা সুন্দরী। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহার পিতার সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক আসিয়া বলিল, পিতার নাম কাশীনাথ, জগন্নাথ দর্শনে যাইবে বলিয়া সপরিবারে লাহোর হইতে এখানে আসিয়াছে। জাতিতে ক্ষত্রিয়। মহারাজের আর বিলম্ব সহিল না, দরিদ্রকে অর্থলোভ দেখাইয়া কন্যাটিকে বিবাহ করিলেন। কন্যাটীর নাম কমলকুমারী, তিনিই মহারাণী কমলকুমারী হইলেন।

সেই অবধি দরিদ্র কাশীনাথের অদৃষ্ট ফিরিল, পুত্র লইয়া তিনি বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পুত্রটী বালক, তাহার নাম পরাণ,—শেষে তিনি পরাণ বাবু হন—তখন কেহ জানিত না যে ভবিষ্যতে সেই পরাণের পুত্র মহারাজাধিরাজ হইবেন!

যেরূপ এক্ষণে বর্দ্ধমান রাজগোষ্ঠী বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য হইতে চাহেন না, পূর্ব্বরাজারা সেরূপ "এক ঘরের"মত থাকিতেন না। তখন এদেশী অধিকাংশ প্রধান ও ধনবানদের সঙ্গে তেজচাঁদ বাহাদুরের আত্মীয়তা ছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি কলিকাতায় আসিতেন, এ অঞ্চলের যাবতীয় প্রধান লোকের সহিত মিশিতেন, সকলে তাঁহাকে সম্মান করিতেন, তিনিও সকলকে ভালবাসিতেন, অনেকের বাটীতে পর্য্যন্ত যাইতেন; সালিখার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় মধ্যে মধ্যে গিয়া "প্রমারা" খেলিতেন। একদিন খেলিবার সময় মহারাজের হাতে "মাছ" ছিল, রাধামোহন বাবুর হাতে "কাতুর" ছিল; দুই প্রধান "দান" সুতরাং দুইজনেই "ডাকাডাকি" চলিল। ক্রমে দেড়লক্ষ পর্য্যন্ত "ডাক" উঠিল। রাধামোহন বাবু দেড়লক্ষ টাকা সহিলেন। শেষ মহারাজ "মাচ" দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে দেড়লক্ষ টাকার নোট লইয়া চলিয়া আসিলেন।

এই সময় এ অঞ্চলে প্রমারা খেলার অতিশয় চলন ছিল। সকলেই প্রমারা খেলিত, পাড়ায় পাড়ায় প্রমারার আড্ডা ছিল। বালকেরা পর্য্যন্ত এ খেলায় দক্ষ হইয়া উঠিয়া ছিল। কোজাগর লক্ষ্মী পূজার রাত্রে নারিকেল জল খাওয়া যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, সেইরূপ ঐ রাত্রে প্রমারা খেলাও অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন রাশ যাত্রায়, ঝুলান যাত্রায়, যে কোন যাত্রায় হৌক যেখানে লোক সমারোহ হইত সেই খানেই প্রমারার দোকান খুলিত, বড় বড় বাটী ভাড়া করিয়া আড্ডাধারীরা পরিষ্কার দোশুতি বিছাইয়া তাহার উপর প্রমারার নূতন তাস সাজাইয়া বসিত। ক্রমে ক্রমে সেই আড্ডায় খেলওয়াড় জমিতে আরম্ভ হইত, শেষ, উপর, নীচে, দালানে, বারেণ্ডায়, উঠানে কোথাও স্থান থাকিত না, সর্ব্বত্র প্রমারা চলিত। সে সময় দেখিতে চমৎকার!

খেলওয়াড়ুরা চক্ষু নাশা উভয় কুঞ্চিত করিয়া একাগ্র চিত্তে তাস টিপিতেছেন, একবারে সে কাগজে দেখিতে সাহস হয় না, তাহাই তাস ক্রমে ক্রমে টিপিয়া দেখিতেছেন, ভয় আছে পাছে "ফিগরু" সরিয়া থাকে! পাছে বাজে রং সরিয়া থাকে! তাহা হইলেই সর্ব্বস্ব যাবে। আবার, যদি যাহা ধরিয়াছি তাহাই আসিয়া থাকে, যদি তেরেস্তার উপর পঞ্জা সরিয়া থাকে, তাহা হইলে সকলের কোল কুড়াইব, এই প্রবল আশা। এই আশা, এই ভয়। আবার এই ভয়, এই আশা। অন্য সময়ের এক যুগের চাঞ্চল্য সে সময়ের এক দণ্ডে উপস্থিত হয়। প্রমারা উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু খেলটী *Dramatic*। যে খেলা এ সংসারে সকলে নিত্য খেলিতেছি সেই খেলার আশ্চর্য্য অনুকরণ এই প্রমারা। তবে প্রভেদ এই যে, এ সংসারে যে চাঞ্চল্য, যে বেগ, যে আশা দশ বৎসরে, ক্রমে ক্রমে, মন্দগতিতে, কখন আইসে কখন আইসে না; সেই আশা, সেই বেগ, সেই চাঞ্চল্য, এক দিনে, এক দণ্ডে, দুর্দ্দম বেগে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই এ খেলার সুখ! আবার তাহার উপর অদৃষ্টের কুহক। প্রমারায় অদৃষ্টের নাম "পড়্‌তা।" এ সংসারে অদৃষ্ট খুলিলে "ধুলা মুটা ধরিলে সোণা মুটা হয়" প্রমারার পড়্‌তা লাগিলে যে কাগজ ধর সেই কাগজে তুমি জিতিবে। একরঙ্গা ফিগরু ধর তুমি ফুরুস মারিবে, ফুরুস পাচার কর নূনকল্পে তোমার কোরেস্তা মান জুটিবে। পড়্‌তা সম্বন্ধে স্পেন্সার *Spencer* বলেন, যে তাস যেরূপ ভাল মন্দ পরম্পরা ক্রমে সাজান থাকে, সেইরূপ একজন ভাল এক জন মন্দ পায়। মিথ্যা কথা! তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া কাগজ সাজাইয়া দেও, ভাঁজিয়া দেও, পড়্‌তা ঠিক থাকিবে, যে তাস লইয়া খেলিতেছিলে, সে তাস ফেলিয়া অন্য তাস দেও, পড়্‌তা সেইরূপ থাকিবে।

আমি প্রেমারা খেলার পক্ষপাতী নহি, বা সে জন্য এই খেলার পরিচয় দিতে বা প্রশংসা করিতে বসিয়াছি এমত নহে। তখনকার লোক কেন প্রমারায় মাতিয়া উঠিত, তাহাই বুঝাইবার জন্য এত কথা বলিলাম। প্রমারা খেলায় উন্মত্ত করে, দিন রাত্রি কখন আইসে কখন যায় তাহা খেলওয়াড় কিছুই জানিতে পারে না। এখন প্রমারা খেলা নাই তাই এখনকার লোক মদ খায়। একালে মদ খাইয়া যে অভাব পূরণ হয়, সেকালের প্রমারা দ্বারা সেই অভাব পূরণ হইত। এ উভয়ের মধ্যে কোনটী ভাল আমি বলিব না। মোট কথা, পূর্ব্বে মহারাজাধিরাজ হইতে জেলেমালা পর্য্যন্ত প্রমারা খেলিত, আর—কবি শুনিত।

কবির কথা এখন আর তুলিব না। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, কবি সে সময়ের *Esthetic culture*এর প্রধান

সহায় ছিল। তদ্দ্বারা তখনকার লোক কবিত্ব বুঝিয়াছিল, কবিত্ব লইয়া মাতিয়াছিল। সেরূপ জিনিস এখন কিছুই নাই। একালের পুঁজি কেবল নাটক! তাহা দেখিয়া শুনিয়া হাসি পায়, তাহা যে কিছুই নহে একথা বুঝাইবার সাধ্য নাই। এ নাটক এখনকার সময়োপযোগী। যিনি এখনকার সময়োপযোগী নহেন, তিনিই কেবল বুঝিতে পারেন, তাঁহাকেই কেবল বুঝান যাইতে পারে যে এই সকল নাটক নাটিকা কিছুই নহে। মূল কথা, এখন বাঙ্গালায় নাটক হইতে পারে না। নাটক উত্তর প্রত্যুত্তর নহে, উপন্যাস নহে। যাহা লইয়া নাটক তাহা বাঙ্গালির অদ্যাপি হয় নাই। নাটকের মজ্জা কার্য্যকারিতা, সে কার্য্যকারিতা ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত, সমাজগত। তাহা আমাদের কই? ইস্পেনদেশ যখন কার্য্যকারিতায় অতুল, তখন তথায় সরবন্টিস নাটক লিখিয়াছিলেন। মহারাজ্ঞী ইলিজেবেতের সময় ইংলণ্ডের কার্য্যকারিতাশক্তি বড় প্রবল হইয়াছিল, সেই সময় ইংরেজি ভাষায় নাটক হয়। তাহার পর উভয় দেশের কার্য্যকারিতাশক্তি কমিয়াছে, উভয় দেশের নাটকপ্রসবিনীশক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। তবে এখন যে সকল নাটক তথায় লেখালিখি হয়, তাহা প্রায় আমাদের বাঙ্গালা নাটকের মত—বাক্‌বিতণ্ডা মাত্র! বকাবকি, হাঁকাহাঁকি!

সে সকল কথা এখন যাক্। তেজচাঁদ বাহাদুরের কথা হইতেছিল, তিনি শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এক একটি করিয়া ক্রমে সাতটি বিবাহ করেন। শেষবিবাহটি অতি বৃদ্ধবয়সে করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পুত্র প্রতাপচাঁদ যুবাপুরুষ, বিষয়কার্য্য তিনিই দেখেন, বৃদ্ধরাজা অপটু বলিয়া সে সকল কার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

৩

কুমার বাহাদুর।

কুমার প্রতাপচাঁদের বালককালের কথা সবিশেষ বড় প্রকাশ নাই, তবে এই মাত্র শুনা যায় যে তিনি বড় দুরন্ত ছিলেন, ঘুঁড়ি উড়াইবার সখ তাঁহার বিশেষ ছিল, একবার ঘুঁড়ির লক পড়িয়া তাঁহার কর্ণের উপরিভাগ কাটিয়া গিয়াছিল। একবার একটা ঘোড়া তাঁহার পীঠ কামড়াইয়া মাংস তুলিয়া লইয়াছিল। গোলকচাঁদ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে ইংরেজি পড়াইতেন। এদেশে রাজকুমারদের যেরূপ বিদ্যা হইয়া থাকে, প্রতাপচাঁদের তাহাই হইয়াছিল।

সর্ব্বদাই প্রতাপচন্দ্র আহ্লাদ আমোদ করিয়া বেড়াইতেন, তিনি হাসিতে বড় পটু ছিলেন, হাসিতে গেলে তাঁহার গালে টোল পড়িত। সর্ব্বদাই তাঁহার ঘর্ম্ম হইত, পৌষমাসের শীতেও তিনি ঘামিতেন। এই ঘর্ম্মরোগ তাঁহার মৃত্যুকাল অবধি ছিল।

অল্প বয়সেই তাঁহার গর্ভধারিণী

নান্‌কী রাণীর কাল হয়। সেই অবধি তাঁহার পিতামহী বিষণকুমারি তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বিষণকুমারীর আদরে প্রতাপচাঁদের কোন শিক্ষা হইতে পায় নাই।

কমলকুমারী তাঁহার বিমাতা, তাঁহার প্রতি বড় সদয় ছিলেন না। বিমাতা সর্ব্বত্রে কুমাতা, বিশেষ রাজবাটীতে। একা বিমাতা নহে, বিমাতার সহোদর পরাণবাবু প্রতাপচন্দ্রকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না। প্রতাপ তাহা জানিতেন এবং তাহার প্রতিশোধ মধ্যে মধ্যে লইতেন। জনশ্রুতি আছে যে এক দিন প্রতাপচন্দ্র পরাণ বাবুর পশ্চাদ্দেশে কলিকা পুড়াইয়া ছাপ দিয়াছিলেন।

৪

ছোট রাজা।

প্রতাপচাঁদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সকলে তাঁহাকে ছোট রাজা বলিত। তিনি বালককালে দুরন্ত ছিলেন, যৌবনকালে আরও দুরন্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অসাধারণ সাহস ও শক্তি সকলেই জানিত, এই জন্য সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত। কিন্তু সামান্য লোকের নিকট তিনি বড় শান্ত ছিলেন। কোন ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া তাঁহার নিকট গেলে তিনি যেরূপে পারেন তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। তজ্জন্য যদি নিজে বিপদগ্রস্ত হইতে হইত, তাহাতে তিনি বরং সুখী হইতেন। বিপদ তিনি খুঁজিতেন। রাজা বলিয়া একটা দাম্ভিকতা তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরিত থাকিত; কেবল অন্যকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার সময় সেটি একেবারে লোপ পাইত।

তাঁহার সঙ্গে একটি পালওয়ান সর্ব্বদা ছায়ার মত বেড়াইত, তাহার নাম আগা আব্বাছ—মোগল—সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তিনি অনেক দুঃসাহসিক কার্য্য করিতেন। অপঘাত মৃত্যু যে কখন হইতে পারে, এ কথা বুঝি তাঁহার বুদ্ধির অতীত ছিল।

তিনি দেখিতে শ্যামবর্ণ একহারা পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শরীরে বিলক্ষণ শক্তি ছিল। নিত্য প্রাতে কুস্তি করিতেন; কুস্তি করা তখনকার প্রথাই ছিল। সঙ্গীতবিদ্যা আর মল্লবিদ্যা না জানা অভদ্রের লক্ষণ বলিয়া তখনকার ধনবানদের ধারণা ছিল। এ ধারণা বোধ হয়, গায়ক ও পালওয়ানদিগের দ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকিবে। পশ্চিমাঞ্চলের নানা প্রদেশ হইতে "কুস্তিগীর পালওয়ান" আসিয়া বল ও কৌশল দেখাইত। তদুপলক্ষে বিস্তর ধনবান একত্রিত হইতেন। তাঁহারা পালওয়ানদের মুখে শুনিতেন যে, পশ্চিমাঞ্চলের মহারাজারা কুস্তিগীরকে কোল দেন, ইংরেজ ডাকিয়া তাহাদের তসবির লন, এবং আপনারা স্বয়ং তাহাদের সঙ্গে কুস্তি করিয়া সাধারণ সমক্ষে বলবন্ত বলিয়া পরিচিত হন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ভরত নামে একজন প্রসিদ্ধ পালওয়ান এ অঞ্চলে ছিল, কিন্তু সে ব্যক্তি হিন্দুস্থানী। এই সময় বাঙ্গালির মধ্যে অনেকে বলবান্ বলিয়া খ্যাত ছিলেন; তন্মধ্যে মনোহর চক্রবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের পৌত্র নাকি বড় কুস্তিকৌশলী ছিলেন, তাঁহার বলমাংস এরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল যে, তিনি মাথা নিম্নভাগে রাখিয়া উর্দ্ধভাগে পা তুলিয়া কেবল দুই হস্ত দ্বারা অনায়াসে নারিকেলগাছে উঠিতেন।

প্রতাপচাঁদ কুস্তি করিতে, সাঁতার দিতে, ঘোড়ায় চড়িতে, বড় পরিপক্ক ছিলেন। লোকে বলে তিনি ইংরেজ ঠেঙ্গাইতে আরও মজবুদ্ ছিলেন। গল্প আছে বর্দ্ধমানের একজন জজ্‌কে তিনি বড় মর্ম্মপীড়া দিয়াছিলেন, সেই অবধি অধিকাংশ সিবিল সরবণ্ট তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। তিনিও তাহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল যে ধোপা নাপিতের ছেলেরা সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইয়া এদেশে আসে। এবং সেই জন্য তাহাদের দাম্ভিকতা তাঁহার সহ্য হইত না। একবার তাঁহার সহিত পথে একজন মেজেষ্টরের দেখা হইয়াছিল। মেজেষ্টার সাহেব সেই সময় তাঁহার বগি একপার্শ্বে লইয়া যান নাই, কি কি একটা এইরূপ সামান্য ত্রুটি করিয়াছিলেন, প্রতাপচন্দ্রের নিকট ইহা "বেয়াদবি" বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বগি হইতে মেজেষ্টরকে নামাইয়া আগা গোড়া বিতাইয়া দিলেন। লোকে বলে তাঁহার নামে গবর্ণমেণ্ট হইতে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল।

তিনি আবার এদিকে বড় সামাজিক ছিলেন। দেশী বিদেশী সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতেন। এ অঞ্চলে আসিলে একবার সালিখায় যাইতেন, একবার তেলিনীপাড়ার রামধন বাবুর ভদ্রেশ্বরের বৈঠকখানায় আমোদ করিয়া আসিতেন। চুচড়ায় রাজবাটী আছে, তথায় আসিয়া দীনামারের গবর্ণর ওবারবেক সাহেব, হাজি আবু তালিব প্রভৃতি অনেকানেক প্রধান লোকের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন। শীপুরের নবাব বাবুর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। কথিত আছে, নবাব বাবু দোল উপলক্ষে তাঁহার সহিত ফাক খেলিবার জন্য বর্দ্ধমান প্রতি বৎসর যাইতেন, একবার এত ফাক সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, যে পোনর দিবস ধরিয়া অনবরত ব্যয় করিয়াও তাহা ফুরাইল না, শেষ প্রত্যাগমন কালে বস্তা বস্তা ফাক বাঁকার জলে ফেলিয়া আসিলেন, বাঁকার জল একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া গেল। কয়েক দিন ধরিয়া লোকে সে জল ব্যবহার করিতে পারিল না। সেই নবাব বাবুর

স্ত্রী ইদানীং বৃন্দাবনে ভিক্ষা করিয়া খাইতেন।

অল্প বয়সে প্রতাপচাঁদের ভারীত্ব এত দূর জন্মিয়াছিল, যে অনেক বড় বড় লোক তাঁহার নিকট কুণ্ঠিত হইত, অথচ তাঁহার বয়সসুলভ আহ্লাদ আমোদ সর্ব্বদাই ছিল, হাসি ভিন্ন তিনি কথা কহিতেন না।

প্রতাপচন্দ্র অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন, এবং অল্প বয়সেই বিষয় কার্য্য দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লোকে বলে পরাণ বাবু তাহাতে প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। কেন হইয়াছিলেন তাহা কেহ বুঝে নাই, কিন্তু প্রতাপচাঁদ সে কথা বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য কৌশল করিয়া পিতার নিকট হইতে সমুদয় বিষয় লিখিয়া লইয়াছিলেন।

পরাণ বাবু ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য ব্যস্তথাকিলেন,কিছু কাল পরে এক নূতন চাল চালিলেন। তাঁহার এক পরমাসুন্দরী কন্যা অবিবাহিতা ছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই কন্যা বৃদ্ধ রাজা তেজশ্চন্দ্রকে সম্প্রদান করিলেন। লোকে অবাক্ হইল। কন্যার নাম বসন্তকুমারী। তিনিই মহারাণী বসন্তকুমারী বলিয়া পরিচিতা।

লোকে এ বিবাহের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই বিবাহে সকলেই বিরক্ত হইল, অনেকে সন্দেহ করিল। মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর পরাণবাবুর ভগিনীপতি ছিলেন, এবার আবার জামাতা হইলেন। লোকে ভাবিল, ইহা গ্রন্থির উপর গ্রন্থি। প্রতাপচাঁদ ভাবিলেন, পরাণ "মামা দড়ি পাকাচ্ছেন," বাঁধনের উপর বাঁধন দিতেছেন।

পরাণ বাবুর যখন সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হন, সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, অষ্টম গর্ভের পুত্র যদি বাঁচে, তবে অসাধারণ ব্যক্তি হইবে। শুনা যায় এই কথায় প্রতাপচন্দ্র বিমর্ষ হইয়া বলিয়াছিলেন, অষ্টম গর্ভের সন্তান বাঁচিলে রাজা হয়, পরাণের পুত্র নিশ্চয় রাজা হবে, যদি পরাণ ততদিন জীবিত থাকে, তবে আমার অন্ন উঠিবে, আমার গদিতে পরাণের পুত্র বসিবে বরং তোমরা এ কথা লিখিয়া রাখ। এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এবং পরাণ বাবুর ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালীর বীজ স্বরূপ হইল।

দানপত্রের পর হইতেই পরাণ বাবুর সহিত প্রতাপচন্দ্রের অকৌশল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল; কিন্তু এই বিবাহের পর আরও বাড়িয়া উঠিল। সে সকল পরিচয় এখন অপ্রয়োজন।

প্রতাপচন্দ্র বিষয় প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে দান আর সঞ্চয় সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে রাজবাটীতে কেবল মুষ্টি ভিক্ষা ছিল, তিনি তাহার পরিবর্ত্তে পূর্ণ মাত্রা বরাদ্দ করিয়া দেন। পূর্ণ মাত্রা অর্থাৎ চাল, ডাল, লবণ, তৈল প্রভৃতি যে পরিমাণ দ্রব্য

প্রত্যেক ভিক্ষুকের আবশ্যক, তাহা সমুদয় দিবার নিয়ম করিয়া দেন। পূর্ব্বে ধনসঞ্চয় হইত না, তিনি আমলাদিগের চুরি অনেকটা খর্ব্ব করিয়া সঞ্চয় বৃদ্ধির পন্থা করিয়া দেন। প্রতি লাটে কর্জ্জ করিয়া খাজনা দিতে হইত, এখন কর্জ্জ করা দূরে থাকুক, প্রতি লাটে টাকা জমিতে লাগিল। শুনা যায়, প্রথমে তিনিই "হৌজে" টাকা ফেলার নিয়ম করেন।

কথিত আছে ১৮১৯ সালের ৮ আইন যাহাকে সচরাচর "অষ্টম" আইন বলে তাহা প্রতাপচাঁদ নিজে উদ্ভাবন করেন। গবর্ণমেণ্টের যেরূপ বন্দোবস্ত তাহাতে নিয়মিত দিনে সূর্য্য অস্তর মধ্যে সরকারি রাজস্ব সমুদয় না দিতে পারিলে জমিদারী নিলাম হইয়া যায়। এই নিয়মের চক্রে, বড় বড় জমীদারদিগের জমিদারী নিলাম হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান রাজার জমিদারী বিস্তর, তাহার খাজনা নিয়মিত মুহূর্ত্ত মধ্যে দেওয়া কঠিন ব্যাপার। এ অবস্থায় প্রতাপচাঁদ স্থির করিলেন গবর্ণমেণ্ট যেমন খাস তহসিলের দায় নিজে গ্রহণ করেন নাই, মধ্যবর্ত্তী জমীদারের স্কন্ধে তাহা ফেলিয়া খাজনা তহসিল করেন, আমিও সেইরূপ করিব। প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিবার নিমিত্ত মধ্যবর্ত্তী পত্তনীদার রাখিব। জমীদার নিয়মিত মুহূর্ত্ত মধ্যে খাজনা দিতে না পারিলে, গবর্ণমেণ্ট যেমন জমিদারী নিলাম করিয়া লন, আমিও সেই মত অনাদায়ের নিমিত্ত পত্তনী নিলাম করিয়া সেই নিলামের টাকা হইতে গবর্ণমেণ্টকে খাজনা দিব। এই বিষয় দরখাস্ত করিলে গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন, এবং ১৮১৯ সালের ৮ আইন দ্বারা পত্তনী নিলামের বিধি করিয়া দিলেন।

এই কৌশলে প্রতাপচাঁদ আপনার জমিদারী চিরস্থায়ী করিয়া লইলেন। এবং সেই সঙ্গে অন্য জমিদারের জমিদারী রক্ষা পাইল। নতুবা পূর্ব্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (permanent settlement) নামে মাত্র চিরস্থায়ী বলা হইত। চিরস্থায়ী দূরে থাক কাহার জমিদারী ক্রমান্বয়ে চার বৎসর স্থায়ী হইত না। এ অস্থায়ীত্ব লইয়া কোর্ট অব ডাইরেক্টারেরা অনেক পত্র লেখা লিখি করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন কিছুই করিতে পারেন নাই।

বুদ্ধিমান বা কার্য্যকৌশলী বলিয়া প্রতাপচাঁদের যতই প্রশংসনীয় থাক, তিনি অতিশয় মদ্যপায়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ইদানীং তাঁহাকে এই জন্য দেখিতে পারিতেন না। কেহ কেহ বলেন, না দেখিতে পারার অন্য কারণ ছিল। তাহা যাহাই হউক, শেষ অবস্থায় তেজচন্দ্র বাহাদুর পুত্রের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যাহারা কুমার কৃষ্ণনাথকে দেখিয়াছেন

তাঁহারা বোধ হয়, প্রতাপচাঁদের সহিত তাঁহার কতক সাদৃশ্য অনুভব করিয়া থাকিবেন। আমরা বিলক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, দুই জনের প্রকৃতি একই রূপ ছিল। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সে সময় এইরূপ ব্যক্তি আরও দুই একটী জন্মিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা কেহই দীর্ঘকাল টিকিতে পারেন নাই। তাঁহারা সময়োপযোগী বা সমাজোপযোগী ছিলেন না। যেরূপ চারিপার্শ্বস্থ আর সকল, সেইরূপ হইলেই, মানুষ বল, পশু বল, যাহা বল তাহা টেকসই হয়, নতুবা লোপ পায়। এই নিয়ম। যেখানে সমাজ অতি নীচ সেখানে নীচ ব্যক্তিরই উন্নতি, উচ্চ প্রকৃতির লোক সে সমাজে প্রধানত্ব পাওয়া দূরে থাক লোপ পাইবে। কৃষ্ণনাথ প্রতাপচাঁদ উভয়ে লোপ পাইয়াছিলেন। উভয়েই চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের মত ছিলেন না, কিছু ভিন্ন ছিলেন, ভাল ছিলেন কি মন্দ ছিলেন তাহা বলিতেছি না।

৫

প্রতাপচাঁদের মৃত্যু।

প্রতাপচাঁদ ছাব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপে অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর তাঁহার মানসিক অবস্থা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি হাসিলে ঘর ভরিয়া যাইত, তাঁহার সে হাসি আর বড় শুনা যাইত না। নিত্য অপরাহ্ণে বারদ্বারির ছাদে উঠিয়া তিনি নীলপুরের দিকে দূরবীণ কসিতেন, কখন তথাকার একটি গেট হইতে একখানি বগি ছুটিয়া বাহির হয় দেখিতেন, তিনি আর সে ছাদে যান না। দূরবীণ স্পর্শ করেন না, হেয়ার সাহেবকে একটি দূরবীক্ষণ মেরামত করিতে দিয়াছিলেন, তাহা মেরামত হইয়া আসিল, আর তাহা স্পর্শ করিলেন না। রাজবাটীর দক্ষিণভাগে বহু ব্যয়ে এক অপূর্ব্ব স্নানাগার প্রস্তুত করাইতেছিলেন, তাহা প্রস্তুত হইল, কর্ম্মচারী আসিয়া সে সংবাদ দিল, একবার তাহা দেখিতে গেলেন না। শেষ, মোসাহেবদের সহিত আর সাক্ষাৎ করিতেন না। শ্যামচাঁদ বাবু নামে একজন পারিষদ ছিলেন, কেবল তাহারই সঙ্গে দুই একটি কথা বার্ত্তা কহিতেন, আর একজন ইউরোপীয় চিত্রকরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন—সে ব্যক্তি তখন প্রতাপচাঁদের একখানি প্রমাণ চিত্রপট চিত্র করিতে নিযুক্ত ছিল।

একদিন প্রাতে প্রতাপচাঁদ শয্যা হইতে উঠিয়া খানসামাদের বলিলেন যে, "আজ নূতন মহলে স্নান করিব," খানসামারা পয়ঃপ্রণালীতে জল পুরিয়া সমুদয় ফোয়ারা খুলিয়া দিল, বাটীর বাহির হইতে জলের গর্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল। প্রতাপচাঁদ তথায় প্রবেশ করিলেন, প্রায় প্রহরেক পরে বহির্গত হইলেন। চক্ষু তখন আরক্ত হইয়াছে, সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে।

সেই দিন অপরাহ্নে রাষ্ট হইল, মহারাজ প্রতাপচাঁদের পীড়া হইয়াছে। চিকিৎসকেরা যাতায়াত করিতে লাগিল। একজন মুসলমান চিকিৎসক প্রতাপচাঁদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল, তাহার নাম আসগর আলি। পীড়ার প্রথম অবস্থায় তাহারই ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। শেষ তথাকার সিবিল সার্জন ডাক্তার কুলটার সাহেব আসিয়া দেখিলেন। কোন ব্যবস্থা করিলেন না।

সেই দিবস কি পরদিবস হইবে, প্রতাপচাঁদ বলিলেন, আমায় গঙ্গাযাত্রা কর। তখন পীড়া সাংঘাতিক বলিয়া কাহারও বিশ্বাস ছিল না, পরে রাজবল্লভ কবিরাজ আসিয়া গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দিলেন। সুতরাং তাঁহাকে কালনায় লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহার সঙ্গে স্বসম্পর্কীয় কেহই গেলেন না। স্ত্রীলোক মাত্রেই নহে, তাঁহার দুই স্ত্রী ছিলেন তাঁহারা কেহই যান নাই, বোধ হয় তাঁহাদের যাইতে নিষেধ করা হইয়া থাকিবে।

মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর তখন কালনায় ছিলেন। সেখানে পুত্রের সঙ্গে কি কথা বার্ত্তা হয় প্রকাশ নাই। কিন্তু ব্যবহারে বোধ হয় তেজচন্দ্র বড় কাতর হন নাই, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইদানীং তিনি প্রতাপচাঁদকে দেখিতে পারিতেন না। রাত্রে যখন পুত্রের মৃত্যু হইল, তখনই, তিনি বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলেন।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর বিবরণ এই মাত্র প্রকাশ আছে যে, রাত্রি দেড়প্রহরের সময় কানাত দ্বারা ঘাট ঘেরিয়া তাঁহাকে অন্তর্জ্জলি করা হয়। সে সময় বিস্তর লোক তথায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহারা সকলে কানাতের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল।

মৃত্যুর দুই চারিদিন পরেই রাষ্ট হইল প্রতাপচাঁদ পলাইয়াছেন। রাজা তেজচন্দ্র তাহা শুনিলেন, কিন্তু হাঁ না কিছুই বলিলেন না। যে কারণেই হউক প্রতাপচাঁদের সমাজ মন্দির কালনায় তখন প্রস্তুত হইল না। রাজবাটীর রীতি আছে কেহ মরিলে একটী নূতন মন্দিরে তাঁহার অস্থি রক্ষিত হয়। প্রতাপচন্দ্রের সমাজ মন্দির শুনা যায় তেজচন্দ্র বাহাদুরের মৃত্যুর পর প্রস্তুত হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর, জমিদারী লইয়া তেজচন্দ্র বাহাদুরের সহিত প্রতাপচাঁদের দুই রাণীর মোকর্দ্দমা বাধিয়া গেল। প্রতাপচাঁদ দানসূত্রে বিষয় পাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার রাণীরা বিষয়াধিকারিণী বলিয়া দাবি করিলেন। কিন্তু শেষ তেজচাঁদেরই বিষয় থাকিল।

কিছু দিন গেলে পোষ্যপুত্রের কথা উত্থাপিত হইল; তেজচন্দ্র পোষ্যপুত্র লইতে অসম্মত হইলেন। কেন অসম্মত তাহার কোন হেতু দর্শাইলেন না। আবার কিছুদিন পরে পোষ্যপুত্রের কথা উত্থাপিত হইল, আবার

তিনি অস্বীকৃত হইলেন। এবার বলিলেন যে, আমার প্রতাপ আসিবে, সে অবশ্য আসিবে। তাঁহার আত্মীয়েরা বলিলেন, মহারাজ! আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আপনাকে পুত্রশোক হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লোকে প্রতাপের অজ্ঞাতবাস কল্পনা করিয়াছে। আমরা আপনার এ সুখের ভ্রম নষ্ট করিতে চাহি না। যদি প্রতাপ ফিরে আসেন ভালই, কিন্তু যদি তিনি না আসেন, বা আসিতে তাঁহার বিলম্ব হয়, আর ইহার মধ্যে যদি মহারাজের দেহ নাশ হয়, তবে এই সমস্ত বিষয় কোম্পানী বাহাদুর লইবেন। যাহাতে না লইতে পারেন তাহার একটি উপায় করিয়া রাখা আবশ্যক।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর তেজচাঁদ বাহাদুর পোষ্যপুত্র লইতে সম্মত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, পরাণ বাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র—যেটী অষ্টম গর্ভের,—সেইটি গ্রহিত হইল। তাঁহার নাম কুঞ্জবেহারী কি নারায়ণবেহারী এমনি একটি ছিল—রাজপুত্র হইলে সে নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া মহাতাপচাঁদ বাহাদুর হইল।

৬

আলোক শা।

পঞ্চদশ বৎসর পরে ১৮৩৫ সালে একজন সন্ন্যাসী বর্দ্ধমানে প্রবেশ করিল। তখন বর্দ্ধমান আর পূর্ব্বমত নাই, স্থানে স্থানে ইংরেজ পচন্দ নূতন রাস্তা হইয়াছে, তাহার ধারে বিলাতী ফুলের বন গজাইয়াছে। কৃষ্ণসায়েরের পাড় ঝর্ ঝর্ করিতেছে, সেখানে আর জঙ্গল নাই, স্থানে স্থানে মনোহর উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের নাম আরও মনোহর রাখা হইয়াছে। রাজবাটীর বহির্ভাগ পূর্ব্বমত অপরিষ্কার রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে অনেক নূতন মহল প্রস্তুত হইয়াছে। পায়রার পাল বিলক্ষণ বাড়িয়াছে, চিড়িয়াখানা সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু চিড়িয়াখানায় কাক্তা কুমারী প্রভৃতি শাবেক দল সমুদয় মরিয়া গিয়াছে,এখন বিলাতী পক্ষীই অধিক।

সন্ন্যাসী রাজবাটী প্রবেশ করিল, চারিদিক্ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেহ তাহাকে নিবারণ করিল না, সন্ন্যাসীও কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। শেষ সন্ন্যাসী বারদারীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বারদারী বহুকাল মেরামত হয় নাই, তাহার দুই একটি দ্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দুই এক স্থানের চূণকাম খসিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী সেইখানে থাকিবে মনে করিল, কিন্তু রাজবাটীর জনকতক লোক কি সন্দেহ করিয়া সন্ন্যাসীকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল।

তাহার কিঞ্চিৎ পরে সন্ন্যাসী গোলাপবাগে গিয়া উপস্থিত হইল। ভিতরে প্রবেশ না করিয়া গেটের নিকট বসিয়া

থাকিল। সেই গেটের নিকট গোপীনাথ ময়রা পরামাণিক নামক একজন বৃদ্ধ একখানি দোকান করিত, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীকে দেখিবা মাত্র বলিয়া উঠিল, "আমাদের ছোট মহারাজ।" সন্ন্যাসী হাসিল, গোপীনাথ গলায় কাপড় দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, তাহার পর উঠিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসী তাহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। এদিকে বিস্তর লোক আসিয়া সন্ন্যাসীকে ঘেরিল। ছোট মহারাজ আসিয়াছেন, এ কথা সহরের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া গেল। চারিদিক্ হইতে লোক ছুটিল। রাজবাটীর অনেক পুরাতন আমলা ছুটিয়া দেখিতে আসিল। তাহার মধ্যে কুঞ্জবিহারী ঘোষ নামে একজন মুহুরী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া গিয়া পরাণ বাবুর মধ্যম পুত্র তারাচাঁদকে বলিল, "বাবু! আর দেখিতে হইবে না, আমাদের ছোট মহারাজ সত্যই।" তারাচাঁদ সে কথা পরাণ বাবুকে বলিলেন, তৎক্ষণাৎ পরাণ বাবু কতকগুলি লাঠিয়াল পাঠাইলেন। লাঠিয়ালেরা সন্ন্যাসীকে দামোদর পার করিয়া দিয়া আসিল।

কিছু দিন পরে সেই সন্ন্যাসী বিষ্ণুপুরের রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ। তিনি সন্ন্যাসীকে মহারাজা প্রতাপচন্দ্র বলিয়া হঠাৎ চিনিলেন, এবং বহু যত্ন করিয়া তাঁহাকে রাখিলেন। রাজা ক্ষেত্রমোহন পরামর্শ দিলেন, যে সন্ন্যাসী একবার বাঁকুড়ায় যান, মেজেষ্টার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আপনার অবস্থা তাঁহাকে বলুন। মেজেষ্টার সাহেব অভয় দিলে পুলিসের সাহায্য লইয়া বর্দ্ধমানে যাওয়া সহজ হইবে, তখন পরাণ বাবুর লাঠিয়াল আর কিছু করিতে পারিবে না। পরাণ বাবু বিষয় ফিরিয়া না দেন, তখন আদালত আছে।

এই পরামর্শ অনুসারে সন্ন্যাসী বাঁকুড়া যাত্রা করিল। পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিল না, সঙ্গেও কোন লোক লইল না।

এই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাঁকুড়ার পার্শ্ববর্ত্তী মানভূম জেলায় জঙ্গলি লোকেরা একটা এমন গোলমাল উপস্থিত করিয়াছিল যে, তাহাদের নিরস্ত করিবার নিমিত্ত মিলিটারী ফৌজ পাঠাইতে হইয়াছিল। এখন সে সকল গোলমাল চুকিয়া গিয়াছে; তথাপি ক্যাপ্টেন উইলকিন্সন নামে একজন সাহেব পোলিটিকেল এজেণ্ট হইয়া মানভূমে আসিয়াছেন, তাঁহার অধীন আর একজন আসিষ্টাণ্ট আসিয়াছেন, নাম ক্যাপ্টেন হানিংটান। তাঁহারা উভয়ে বড় সতর্ক, মানভূমে বসিয়া চিলের ন্যায় চারিদিক্ দেখিতেছেন; কোথায় কে বিদ্রোহিতা করিবার উদ্যোগ করিতেছে, কোথায় দশজন পাঁচজন লোক একত্র হইতেছে, তাঁহারা তাহা দেখিতেছেন, আর, নোট করিতেছেন।

পলিটিকেল এজেণ্ট মকরর হওয়ায় বাঁকুড়া ও মানভূমের মেজেষ্টারেরা একটু সতর্ক হইয়াছিলেন, মনে মনে সংকল্প করিয়া থাকিবেন, যে আর ঠকিব না। এবার বিদ্রোহ অঙ্কুরে বিনষ্ট করিব।

এই সময় সন্ন্যাসী বাঁকুড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল, কোথাও বাসা না করিয়া শরকারী সরকিট হউসের নিকট একটি তেঁতুল তলায় গিয়া থাকিল, মেজেষ্টার সাহেবের বাটীতে দেখা করা বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; সন্ন্যাসিবেশে তথায় দেখা হওয়া বড় সম্ভব ছিল না। যে কারণেই হৌক, সন্ন্যাসী সেই বৃক্ষমূলেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, মনে করিয়া থাকিবেন মেজেষ্টার সাহেব এই পথে হাওয়া খাইতে আসিলেই সাক্ষাৎ হইবে।

প্রতাপচাঁদ ফিরে আসিয়াছেন এ বার্ত্তা বাঁকুড়া অঞ্চলের সর্ব্বত্র রাষ্ট হইয়াছিল। রাজা ক্ষেত্রসিংহ তাঁহাকে চিনিয়াছেন, এ কথাও লোকে শুনিল, সুতরাং সকলে নিঃসন্দেহচিত্তে দলে দলে প্রতাপচাঁদকে দেখিতে আসিল।

মেজেষ্টার এলিয়ট সাহেব দেখিলেন এই এক সময়। এবার আর ঠকা হইবে না। অতএব তৎক্ষণাৎ দারোগা, জমাদার, বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিলেন, যাহারা প্রতাপচাঁদকে দেখিতে আসিয়াছিল, অনেকেই পলাইল, তথাপি তাহাদের মধ্যে প্রায় এক শত জন ধরা পড়িল। সকলেই জেলখানায় প্রেরিত হইল। বলা বাহুল্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট গেল যে, একজন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হইয়াছে; সে ব্যক্তির পাল্লায় বিস্তর লোক ছিল, কেবল তাহার মধ্যে একশত জন ধরা পড়িয়াছে। সন্ন্যাসী জেলখানায় থাকিলেন।

যাঁহারা প্রতাপচাঁদের প্রত্যাগমনবার্ত্তা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কলিকাতা হইতে একজন ইংরেজ উকীল বাঁকুড়ায় পাঠাইলেন। উকীল সাহেব গিয়া মেজেষ্টর সাহেবের নিকট গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্টের নকল চাহিলেন, মেজেষ্টর সাহেব বলিলেন, "কোন ওয়ারেণ্ট হয় নাই, আমার হুকুমই ওয়ারেণ্ট।" উকীল সাহেব তখন আপনার মক্কেলের অপরাধ কি? জানিতে চাহিলেন, দরখাস্ত দিয়া বলিলেন, চার্জের নকল দেওয়া হউক। মেজেষ্টার সাহেব হাসিয়া বলিলেন, আমরা মফস্বলে চার্জ লিখি না। তোমার মক্কেলের অপরাধ অবশ্য আছে, তাহা পূর্ব্বে বলা রীতি নহে। সুতরাং উকীল সাহেব কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রায় আট মাস পরে সন্ন্যাসী হুগলীতে চালান আসিলেন। হুগলীতে কেন আনীত হইলেন তাহার কোন হেতু প্রকাশ নাই। দায়রায় বিচার

আরম্ভ হইল। কৌন্সলি টার্টন সাহেব তাঁহার পক্ষ হইয়া হুগলীর আদালতে উপস্থিত হইলেন। জজ সাহেব তাঁহাকে কোন কথা কহিতে দিলেন না। টার্টন সাহেব নিজামতে দরখাস্ত করিলেন, নিজামত আদালতও জজ সাহেবের মতে মত দিলেন। সন্ন্যাসিপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কোন উকীল, কি কাউন্সলি, কি মোক্তার কেহই থাকিল না। জজ সাহেব বিচার করিয়া সন্ন্যাসীকেও ছয় মাস কারাবন্ধের আজ্ঞা দিলেন; এবং খালাসের পর চল্লিশ হাজার টাকার পরিমাণে এক বৎসরের নিমিত্ত ফেলজামিন দিতে হুকুম দিলেন।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, বিচারপতি! আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই যে, কি অপরাধের নিমিত্ত আমি দণ্ড পাইলাম।

বিচারপতি বলিলেন, তোমার নাম আলোক শা! তুমি মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বলিয়া লোক জুটাইয়াছ, রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছ। সন্ন্যাসী নিরস্ত হইলেন।

সন্ন্যাসী যথা রীতি ছয় মাস কারাবাস করিয়া চল্লিশ হাজার টাকা পরিমাণে এক বৎসরের নিমিত্ত ফেলজামিন দিয়া খালাস হইলেন। এই মোকর্দ্দমা যখন হয়, তখন এ অঞ্চলের লোক বড় জানিতে পারে নাই। এইজন্য তখন বিশেষ কোন গোল হয় নাই।

৭

কাপ্তেন লিটিলের লড়াই।

১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাল রাজা হুগলীর জেলখানা হইতে খালাস হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। যাঁহাদের সঙ্গে রাজা প্রতাপচাঁদের আলাপ বা আত্মীয়তা ছিল, তাঁহারা সকলে আসিয়া জালরাজাকে প্রকৃত রাজা বলিয়া সমাদর করিলেন। তাঁহার অদৃষ্টের জন্য সকলেই কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কয়েক মাস পরে সকলে স্থির করিলেন যে, আপাততঃ কলিকাতায় সম্পত্তির নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করা হউক; তাহার পর মফস্বলের সম্পত্তির নিমিত্ত সুবিধামত মফস্বল আদালতে দরখাস্ত করা যাইবে। এই পরামর্শ হইলে ট্রেজরির দেওয়ান্ বাবু রাধাকৃষ্ণ বসাক টাকা কর্জ্জ দিলেন। সুপ্রিম কোর্টে মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল।

বর্দ্ধমানের রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত মাহাতাবচাঁদ তখন নাবালক। তাঁহার পূর্ব্ব পিতা পরাণ বাবু কোর্ট অব ওয়ার্ড্‌সের পক্ষ হইয়া তাঁহার বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সুপ্রিম কোর্টের মোকর্দ্দমা জবাব দিবার নিমিত্ত মদনমোহন কপূ‌রাকে পাঠাইয়া দিলেন।

জাল রাজা প্রকৃত পক্ষে প্রতাপচাঁদ কি না এই বিষয়ে সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত কলিকাতা অঞ্চলের অনেক

প্রধান ব্যক্তির জোবানবন্দী হইল সকলেই স্বীকার করিলেন যে বাদি সত্যই রাজা প্রতাপচাঁদ তার পর বর্দ্ধমান অঞ্চলের সাক্ষ্য আবশ্যক হইল, সুতরাং উকীলেরা পরামর্শ দিলেন যে একবার প্রতাপচাঁদ স্বয়ং সেখানে গেলে ভাল হয়, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন, তাঁহাদের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের মোকর্দ্দমা প্রমাণীত হইবে।

জাল রাজা বর্দ্ধমানে যাইতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু কলিকাতা নিবাসী দুই একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন; তাঁহারা স্পষ্টই বলিলেন যে, বর্দ্ধমানে গেলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হওয়া ভার হইবে। জাল রাজাও তাহা বুঝিলেন। শেষ উকীলদের পরামর্শ মত আত্মরক্ষার নিমিত্ত ডিপুটি গবর্ণর এলেকজাণ্ডর রস সাহেবের নিকট দরখাস্ত করা হইল * কিন্তু হ্যালিডে সাহেব তখন সেক্রেটারি, তিনি দরখাস্ত না মঞ্জুর করিলেন।†

দরখাস্ত অসঙ্গত হয় নাই, বর্দ্ধমানে গেলে পাছে কেহ অপমান করে বা অত্যাচার করে এই ভয়ে দরখাস্ত করা হইয়াছিল; সে দরখাস্ত না মঞ্জুর হওয়ায় অনেকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কেহ ভাবিলেন যে পূর্ব্বে প্রতাপচাঁদ সিবিল সরবণ্টদের উপর যে সকল অত্যাচার করিয়াছিলেন, এখনও গবর্ণমেণ্ট তাহা ভুলেন নাই। কেহ ভাবিলেন, রঞ্জিত সিংহের দেশে প্রতাপচাঁদের সহিত ইংরেজদের একজন জাঁদরেলের সাক্ষাত হওয়ার কথা যে রটনা হইয়াছিল, তবে তাহা সত্য। ইহাকে গবর্ণমেণ্ট এখন রঞ্জিতের অনুচর মনে করিয়াছেন, তবে ইহার আর রক্ষা নাই।

---

* *Extract from petition dated 15th February 1838.*

"Your memorialist prays, therefore, that your Honor will be graciously pleased to grant to him (through the proper channel) such means of safeguard to protec this person and life, from any eventual insult or danger, during the time he may be obliged to stay at Burdwan."

† *Reply.*

"The prayer of this petition cannot be complied with."

Signed.

Fort William. Fred. Jas. Halliday.
March 5. 1838. *Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.*

জালরাজা সে সকল কথা কিছু মনে না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন।* কাল্না দিয়া গেলে সুবিধা হয় বোধ করিয়া তিনি সেই পথেই গেলেন। এ অঞ্চলের অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তি সঙ্গে চলিলেন। সীঁতুরের শ্রীনাথ বাবু, যাঁহাকে লোকে সচরাচর নবাব বাবু বলিত, তিনি অন্য পথে বর্দ্ধমান গেলেন।

জাল রাজা আত্মরক্ষার নিমিত্ত অধিক লোক লইলেন না, যে সকল ভৃত্যবর্গ কলিকাতায় থাকিত, কেবল তাহাদেরই সঙ্গে লইলেন। তথাপি নৌকার বহর বড় মন্দ হইল না। রাজার নিমিত্ত এক খানি পিনেস, সঙ্গীদের নিমিত্ত বজরা, চাকরদের নিমিত্ত পানসী, তদ্ভিন্ন পাকের নৌকা, স্নানের নৌকা, প্রায় ৩০ কি ৪০ খানা নৌকা একত্রে বাহির হইল।

রাজা প্রতাপচাঁদ বর্দ্ধমান যাইতেছেন এ কথা পরদিন গঙ্গার উভয় কূলে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কুলবধূ অবধি গঙ্গাতীরে ছুটিয়া দেখিতে আসিল। মাস্তুলে মাস্তুলে রক্তপতাকা উড়িতেছে, নৌকার ছাদে ছাদে তখ্‌মাওয়ালা প্রহরি দাঁড়াইয়া আছে। কতই লোক নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া কূল দেখিতেছে। কতই লোক কূল হইতে নৌকা দেখিতেছে। রাজা পিনেসের ভিতরে আছেন, তাহার খড়খড়ি খুলা রহিয়াছে কিন্তু তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না। তাঁহার উদ্দেশে বৃদ্ধারা বলিতে লাগিল "যাও, বাছা! আপনার ঘরে যাও? কতদিন পথে পথে বেড়ালে, এখন ঘরে যাও।"

নৌকা গমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। ২রা বৈশাখ† তারিখে তিনি কালনায় পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়াই দুই জন মোক্তারকে বর্দ্ধমানে পাঠাইলেন। তাহারা মেজেষ্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিবে যে, প্রতাপচাঁদ কালনায় পৌঁছিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা বর্দ্ধমানে আইসেন। কিন্তু হুজুরের অভয় না পাইলে আসিতে সাহস করেন না।

এদিকে গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমানের মেজেষ্টারকে সংবাদ দিয়াছেন যে জালরাজা বর্দ্ধমানে যাইতেছেন এবং সেই সঙ্গে জালরাজা সম্বন্ধে কি একখানা গোপন মিনিট পাঠাইয়া দিয়াছেন।‡ মেজেষ্টর সাহেব—ওগিল্‌বি—তিনি তাহা পাঠ করিয়া ইতি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এলেকজাণ্ডার নামে একজন পাদ্‌রি কালনায় থাকিতেন মেজেষ্টর

* ইংরেজি সন ১৮৩৮ সালের মার্চ মাস।

† ২ রা বৈশাখ ১২৪৫ ইংরেজি ১৩ই এপ্রেল ১৮৩৮।

‡ এই মিনিটের কথা সুপরিমকোর্টে জোবানবন্দিতে প্রকাশ পায়।

সাহেব প্রথমেই তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন যে তিনি গোপনে জালরাজার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া লেখেন,যে কত লোক সঙ্গে এবং তাহারা কিরূপ ব্যবহার করিতেছে।

পরে একদিন মেজেষ্টর সাহেব ডাক্তার চিক সাহেবের সঙ্গে একত্রে আহারান্তে কুঠি হইতে বহির্গত হইতেছেন এমত সময়ে গেটের নিকট দেখিলেন জালরাজার দুইজন মোক্তার দরখাস্ত লইয়া কালনা হইতে আসিয়াছে। কি দরখাস্ত তাহা তিনি অনুসন্ধান করিলেন না, একেবারে উভয়কে গ্রেপ্তার করিয়া জেলখানায় পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন মোক্তারের নাম রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল। মোক্তারদের জেলখানায় পাঠাইয়া মেজেষ্টর সাহেব কালনার দারগাকে হুকুম দিলেন যে তথায় জমিয়তবস্ত হইতে দিবে না, যদি জাল রাজা আপনার সজিদের বরখাস্ত না করে তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।

ইতিপূর্ব্বে পরাণবাবু জাল রাজার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া প্যারালাল নামে একজন ক্ষত্রিয়কে কালনায় পাঠাইয়াছিলেন। সে ব্যক্তি এতদূর পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে বাজারের কেহ কোন দ্রব্য জাল রাজাকে বিক্রয় করিতে সাহস করিত না। অধিক মূল্যে যে যাহা বিক্রয় করিত তাহা অতি গোপনে।

কালনার পাদরি এলেকজাণ্ডারের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য প্যারালাল বাবু একজন খৃষ্টানকে হস্তগত করিয়াছিলেন। সেই খ্রীষ্টান যাহা বলিত তাহাই তিনি মেজেষ্টরকে লিখিতেন, স্বয়ং কোন বিষয় তদন্ত করিতেন না, এ কথা তিনি পরে আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন।

কালনার দারগা রাজবাটীর অনুগত, তাঁহার নিমিত্ত প্যারালাল বাবুকে কোন কষ্ট করিতে হইল না। দারগা পুনঃ পুনঃ প্যারালালকে জানাইলেন যে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ অধীন জীবিত থাকিতে জালরাজা কখন কালনায় পা পাতিতে পারিবে না।

দারগার নাম মহিবুল্লা। লেখা পড়া তিনি একেবারে জানিতেন না, একজন মুহুরীতে তাঁহার রিপোর্ট লিখিয়া দিত, তিনি কেবল তাহাতে মোহর ছেফ করিতেন। প্যারালাল বাবু মুহুরীকে হস্তগত করিলেন।

জালরাজার মোক্তারেরা বর্দ্ধমানে পৌঁছিবা মাত্র জেলখানায় প্রেরিত হইয়াছে এ সংবাদ জালরাজা কিছু মাত্র জানিতে পারেন নাই। সুতরাং "বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি" ভাবিয়া কিছু দিন নিশ্চিন্ত থাকিলেন। কিন্তু কত দিন আর চুপ করিয়া নৌকায় বসিয়া থাকিবেন একবার কালনায় নামিতে ইচ্ছা করিলেন।

৯ই বৈশাখ তারিখে প্রাতে বেলা ৮ টার সময় নামিবার উদ্যোগ হইল।

তাঁহার সঙ্গে নৌকায় তাঞ্জাম ও বাহক ছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ পাথুরিয়া মহল ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। নগরে রাষ্ট্র হইল যে, রাজা আসিতেছেন, আবালবৃদ্ধ সকলে পাথুরিয়া মহল ঘাটের দিকে ছুটিল। প্যারালাল থানার দিকে ছুটিলেন। দারগা তখন অতি ব্যস্ত হইয়া পোষাক পরিতেছিলেন, প্যারালাল গিয়া বলিলেন, সর্ব্বনাশ হইল, শীঘ্র আসুন। দারগা পাগড়ি জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন "ভয় কি, এই আমি চলিলাম, কাহার সাধ্য এখানে নৌকা ভিড়ে।" মহিবুল্লা দারগা বাহির হইলেন, সঙ্গে জমাদ্দার, বরকন্দাজ, চৌকিদার প্রভৃতি অনেকে চলিল। তাঁহার ইচ্ছা সদর্পে চলেন, কিন্তু চলিতে তাঁহার কষ্ট হয়। তিনি অতি স্থূলকায় * একটি প্রকাণ্ড মহিষাকার বলিলেই হয়। মহিবুল্লা যথাকালে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জাল রাজার নৌকা ঘাটে ভিড়িতেছে। অতি ব্যস্ত হইয়া তিনি নৌকার নিকটে গেলেন, আভূমি নতশিরে জাল রাজাকে সেলাম করিয়া যোড়করে দাঁড়াইলেন। রাজা নৌকা হইতে তাঞ্জামে উঠিলেন, একজন ভৃত্য আসিয়া রাজার দক্ষিণ দিকে একখানি তরবারি রাখিয়াগেল। † এক জন ছাতি ধরিল, একজন আড়ানি ধরিল, দুইজন চামর করিতে লাগিল, পাঁচ ছয় জন আশা সোটা ধরিল। সম্মুখে নকিব ফুকরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মহিবুল্লা ফুকারিয়া উঠিলেন—"তফাত, তফাত" —আর লোক তাড়াইতে লাগিলেন। তাঞ্জামের দুই পার্শ্বে দুইজন আড়দালি তাঞ্জাম ধরিয়া যাইতেছিল, মহিবুল্লা একজনকে সরাইয়া আপনি আড়দালি হইয়া তাঞ্জাম ধরিয়া চলিলেন। জালরাজাকে দেখিয়া গঞ্জের বৃদ্ধ মহাজনেরা চিনিল, তাহারা আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইল, দূর হইতে স্ত্রীলোকেরা উলু দিতে লাগিল। আনন্দের আর সীমা রহিল না। নগর প্রদক্ষিণ করিয়া রাজা নৌকারোহণ করিলেন; সেই সময় কয়েক জন বৃদ্ধ আসিয়া আপন

---

* বর্দ্ধমানের রাজারা জাতিতে ক্ষত্রিয়, জাতীয় ধর্ম্মানুরোধে হউক, অথবা রাজা বলিয়াই হউক, তরবারি তাঁহাদের পরিচ্ছদের মধ্যে গণ্য। কিন্তু জালরাজার তাঞ্জামে তরওয়ার থাকায় "drawn sword" বলিয়া পাদরি সাহেব ভয় পাইয়াছিলেন।

† "Mahaboolah, the worthy Darogah of Culna, the constituted authority, who can neither read nor write, nor walk nor run." *Petition to the Nizamut Audalut.*

আপন পরিচয় দিতে লাগিল, রাজা তাহাদের সঙ্গে অনেক পূর্ব্ব কথা কহিলেন। বৃদ্ধেরা আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিয়া ঘরে ফিরিল।

এই ব্যাপারের কথা পাদরি এলাকজাণ্ডার সাহেব আপনার খৃষ্টানের নিকট শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মেজেষ্টারকে লিখিলেন যে একশত তরবারধারী আর দুইশত সড়কিওয়ালা লইয়া প্রতাপচাঁদ কালনা প্রদক্ষিণ করিয়া গিয়াছে। রাজবাটীর প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল। কেবল সুদক্ষ দারগার জন্য কিছু করিতে পারে নাই। ছয় হাজার কি আট হাজার লোক জমিয়াছিল। যদি প্রতাপচাঁদকে শীঘ্র দমন করা না হয় তবে বোধ হয় একটা দাঙ্গা উপস্থিত হইবে।*

পত্র পাইয়া মেজেষ্টার সাহেব প্রতাপচাঁদের গ্রেপ্তারি জন্য তাঁহার চতুর নাজির আসাদ আলিকে পাঠাইয়া দিলেন। পরাণ বাবুও এই সুযোগ পাইয়া রাধামোহন সরকারের সঙ্গে বিস্তর লাঠিয়াল পাঠাইলেন।

কিন্তু মেজেষ্টার যাঁহার অধীন তিনি জালরাজাকে গ্রেপ্তার করিতে পরামর্শ দেন নাই, তিনি পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, যে যদি জালরাজা আপনার লোক বিদায় না করে তবে তাহার নিকট হইতে ফেল জামিন লইতে পার। † মেজেষ্টার সাহেব এই আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বে পরওয়ানা জারি করি-

---

* My dear sir,—Protap Chund has just gone on board his boat, after parading the whole length of Kalna in a *tonjohn* with a drawn sword in his own hand, attended by upwards of a hundred swordsmen and double that number of stickmen. The concourse was altogether 6 or 8,000. He appeared to be intent on the Rajbarry. But your active Darogah prevented him. The aspect of things, I think, threatens an affray, if he is not checked soon.

I am &c. A. Alexander.

† Extract from Superintendents' letter No 400 dated 28th. April 1838.

4th. "The conduct of the claimant of the Burdwan Raj. appears to me to be of such a dangerous nature, so insulting to the family in possession, that I think there is every reason to apprehend a serious affray. * *

5th. Considering the tendency of his acts to tumult and riot, I am of opinion, that you will be fully justified in requiring to disband his array, and to behave himself like a good and quiet subject, and on his refusal to obey or evasion of your orders, I think you will be fully justified in calling on him to furnish good security to keep the peace.

6th. It will be necessary previous to the adoption of such a measure to take evidence of his having assembled such a body of men, and of the tendency of their conduct to break the peace."

ছিলেন, জালরাজাও তদনুসারে লোক বিদায় করিতে চাহিয়াছিলেন, কেবল দুই মাত্র ওজর করিয়াছিলেন যে কোন্ কোন্ লোক বিদায় করিবেন তাহা বলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু মেজেষ্টার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তারের নিমিত্ত নাজিরকে পাঠাইলেন।

কিন্তু নাজিরকে পাঠাইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্মরণ হইল যে পূর্ব্বদিন একটি পল্টন † বর্দ্ধমান দিয়া বারাকপুর গিয়াছে। অতএব আর ইতস্ততঃ না করিয়া তাহার কাপ্তেনকে পত্র লিখিয়া পথে আটক করিলেন। কাপ্তেন সাহেব সিপাহী লইয়া বৈঁচিতে অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন। কিছু পরে মেজেষ্টার সাহেব স্বয়ং আর ডাক্তার চিক সাহেব একত্রে বৈঁচিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। জাল রাজার সংবাদের নিমিত্ত ডাক্তার সাহেব কালনার পাদরিকে এক পত্র লিখিলেন, উত্তরে পাদরি ভয় দেখাইলেন। সুতরাং মেজেষ্টার সাহেব ফৌজ লইয়া তৎক্ষণাৎ কালনা যাত্রা করিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে পল্টন কালনায় পৌঁছিল। কাপ্তেনের নাম লিটিল। তিনি মেজেষ্টার সাহেবের পরামর্শ মতে প্রথমে সিপাহী লইয়া পাদরি সাহেবের কুঠিতে গেলেন, তথায় স্থির হইল যে, মেজেষ্টার একবার নদীর কূলে গিয়া সংবাদ লইয়া আসিবেন তাহার পর ইতি কর্ত্তব্য স্থির হইবে। ওগিলবি সাহেব পিস্তল হস্তে লইয়া দারগা ও নাজিরের সঙ্গে ঘাটে গেলেন। তথা হইতে কাপ্তেন লিটিলকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বিনা যুদ্ধে জাল প্রতাপকে গ্রেপ্তার করা কঠিন অতএব আপনি সসৈন্যে সত্বর আসুন। কাপ্তেন সাহেব হুকুম দিলেন, সিপাহীরা বন্দুকে গুলি গাদিল, তাহার পর গম্ভীর পদচারণে তাহারা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল। সম্মুখে জল কলকল করিয়া ছুটিতেছে, এখানে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না। গঙ্গার মধ্যস্থানে একখানি পিনিস নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে তৎপশ্চাৎ চারি পাঁচখানি বজরা, তাহার পশ্চাৎ কতকগুলি পানসী আর কিছুই নাই। মাজিরা নৌকার ছাদে, ভদ্রলোকেরা নৌকার ভিতরে, নিদ্রা যাইতেছে। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। নৌকায় আলোক নিবিয়া গিয়াছে, সকল অন্ধকার, সকলে ঘুমাইতেছে, নৌকাও ঘুমাইতেছে। সিপাহীরা ভাবিতেছে, কাহার সহিত যুদ্ধ হইবে; এমন সময় কাপ্তেন সাহেব মেজেষ্টারের সহিত কি পরামর্শ করিয়া ফায়ারের হুকুম দিলেন।

† A detachment of 3rd Regiment N. I. under command of Captain Little.

ওগলবি সাহেব নৌকা দেখাইয়া "মারো, মারো" বলিয়া চীৎকার করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার পিস্তল ছুড়িলেন। অমনি গুড়্ গুড়্ গুড়্ করিয়া পল্টনের বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। ছাদে যাহারা নিদ্রিত ছিল, তাহাদের মধ্যে ১৮ জনের আর নিদ্রা ভাঙ্গিল না, অপরদের মধ্যে কাহার হাত ভাঙ্গিল, কাহার পা ভাঙ্গিল, কাহার দেহ উলটিয়া জলে পড়িল। জাল রাজা হঠাৎ উঠিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন, পশ্চাতের বজরা হইতে আর একজন লাফ দিয়া গঙ্গায় পড়িলেন, তাঁহার নাম রাজা নরহরি চন্দ্র; নিবাস হরধাম। উভয়ে গঙ্গাপার হইয়া শান্তিপুরের উত্তরে একস্থানে লুকাইয়া থাকিলেন।

এ দিকে যুদ্ধ ফুরাইল, যুদ্ধের পর লুঠ। সুতরাং লুঠ আরম্ভ হইল, সিপাহীরা ঘাট হইতে নৌকা খুলিয়া লইয়া পিনাসে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আসাদ আলি নাজির ও মহিবুল্লা দারগা আপন আপন দল বল লইয়া উপস্থিত হইলেন। জাল রাজা, রাজা সাজিয়াছেন, কর্জ্জ করিয়া রাজার আসবাব কিনিয়াছিলেন, সোনার আসা, সোণার সোটা, সোণার ছাতি, সোণার আড়ানি, লুঠের মুখে তাহা সকলই অন্তর্হিত হইল।

লুঠ শেষ হইলে পর গ্রেপ্তার আরম্ভ হইল। মাঝিমাল্লা, খানসামা, খেজমৎগার, যাহারা গুলিবৃষ্টিতে রক্ষা পাইয়াছিল এবং জলে ঝাঁপ দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই ধরা পড়িল; কিন্তু তাহাদের সংখ্যায় নাজিরের মন উঠিল না। দারগা নাজির উভয়েই রিপোর্ট করিয়াছেন যে, রাজার সঙ্গে ৭০০ কি ৮০০ লোক; রাজা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে ৩৪২ জন লোক। এখন অল্প লোক চালান দিলে গ্রেপ্তার অসম্পন্ন হয়, সুতরাং গ্রেপ্তারীর আড়ম্বর কিছু বাড়াইতে হইল। নিকটে দুই একখানি তীর্থযাত্রীর নৌকা ছিল, নাজির সে সকল নৌকা হইতে যাত্রীদের বাহির করিয়া আনিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি স্ত্রীলোক বাহির হইল, কিন্তু স্ত্রীলোক বলিয়া ত্যাগ করার আর সময় নাই, সুতরাং তাহারা জাল রাজার সঙ্গী বলিয়া গ্রেপ্তার হইল। ওগিলবি সাহেব ২রা মে (১৮৩৮) তারিখের রোবকারিতে সেই হতভাগাদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মময়ী বেওয়া, সূর্য্যী, গঙ্গামণি, অন্নু, চন্দ্রমণি, তুলসী, পদ্ম গোয়ালিনি, কম্ন, পদ্ম ঠাকুরাণী, গয়াঠাকুরাণী কাসীঠাকুরাণী ইত্যাদি ইত্যাদি। বৃদ্ধারা বর্দ্ধমানে চালান গিয়া প্রায় নয় মাস তথায় আবদ্ধ থাকিল। যেরূপ তখন গবর্ণমেণ্ট ছিল, যেরূপ কর্ম্মচারি ছিল, যেরূপ সমাজ ছিল, তাহাতে বিপদগ্রস্তের নিকটে আসিলে বিপদগ্রস্ত হইতে হইত।

কালনাগঞ্জের যে সকল বৃদ্ধ দোকানদার প্রতাপচাঁদকে চিনিয়াছে বলিয়াছিল তাহারাও তীর্থযাত্রীর সঙ্গে সঙ্গী হইল।

তথাকার কতকগুলি স্ত্রীলোকও সেই দশা-পন্ন হইল। মেজেষ্টার সাহেব তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত রোবকারিতে লিখিয়াছেন যে, তারা আর গুণমণি জাল রাজার লোককে বাটীতে অন্নপাক করিতে দিয়াছিল। গৌরমণি তারার বাটীতে থাকে। গোবিন্দ সরকার আর নাথু পাইক গুণমণির দোকানে চাকুরী করে। আর, তারাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সেখানে কিশোরমণি উপ-স্থিত ছিল। সুতরাং এই সমস্ত লোকই গ্রেপ্তারের যোগ্য।

এইরূপে ২৯৪ জন গ্রেপ্তার হইয়া বর্দ্ধমানের জেলখানায় প্রেরিত হইল। জাল রাজা আর নরহরি চন্দ্র শান্তিপুরের নিকটে ধরা পড়িলেন। কিন্তু জাল রা-জাকে বর্দ্ধমানে না পাঠাইয়া হুগলির জেলে পাঠান হইল। তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহাকে বর্দ্ধমানে চালান দেওয়া হয়, তিনি ত বর্দ্ধমানেই যাইতেছিলেন, রাজার মত যাইতেন, না হয় অপরাধীর মত গেলেন; যেরূপেই যান, বর্দ্ধমানে যাইতে পারিলেই তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ হইল না। তিনি সিপাহী পরিবেষ্টিত হইয়া হুগলিতে বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইলেন। নরহরিচন্দ্র প্রভৃতি আর সকলে বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইল। কিন্তু যে জেলায় অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল সে জেলায় তাঁহার বিচারের পক্ষে কি আপত্য ছিল তাহা কোন কাগজ পত্রে প্রকাশ নাই।

জাল রাজা গ্রেপ্তার হইলে পর তাঁহার একজন উকীল সুপ্রিম কোর্টের এটর্নি—নাম সা (W. D. Shaw)—গ্রে-প্তার হইলেন, তিনি লড়াইয়ের সময় উপ-স্থিত ছিলেন না, নিকটে পাইগাছি গ্রামে লায়েল সাহেবের নীলকুঠিতে ছিলেন, প্রাতে তথা হইতে আসিতে ছিলেন, পথে ওগিলবি সাহেব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। ওকিল সাহেব British born subject প্রভৃতি কত কথাই বলিলেন, মেজেষ্টার সাহেব তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। গ্রেপ্তারের সময় সা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কি অপরাধ? মেজেষ্টার সাহেব মুখ গ-ম্ভীর করিয়া বলিলেন, "রাজবিদ্রোহিতা! Treason!

মেজেষ্টারের মুখে হঠাৎ যাহা আসি-য়াছিল, তাহাই যে তিনি বলিয়াছিলেন এমত নহে। পরে পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনার ২৪ মে ১৮৩৯ সালের ৫২৭ নং পত্রে এই ভাব ব্যক্ত করিয়া-ছিলেন। তিনি আসামীদের এই বলিয়া উল্লেখ করেন যে "person's accused of being conspirators against the Government, and of resistance to the constituted authorities."

সা সাহেব গ্রেপ্তার হইয়াছেন এই

জনরব শুনিয়া পাইয়াছির নীলকর সাহেব তাহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত তাঁহার একজন সরকারকে পাঠাইয়া দিলেন। আসামির তত্ব লইতে আসিয়াছে বলিয়া গরিব সরকার তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হইল, এবং সরকার যে হাতী চড়িয়া আসিয়াছিল, সে হাতীটিও সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হইল।

প্রতাপচাঁদের পরম বন্ধু নবাব বাবু সিঙ্গুর হইতে একাবেক বর্দ্ধমানে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। সে সংবাদ মেজেষ্টার সাহেব কিরূপে পাইলেন, পাইয়া যথা নিয়মে নবাব বাবুকে জেলে পুরিলেন।

তাহার পর আর কাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন খুঁজিতে লাগিলেন, শেষ সন্ধান পাইলেন যে, বিলকুলির নবাব আনওয়ার আলি, জালরাজার স্বপক্ষ অতএব তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত হুগলির মেজেষ্টারকে পত্র লিখিলেন। সেই সঙ্গে জাহানাবাদের রামদীন্ সিংহ, বল্লালদীঘির হাফেজ করে আলিকে গ্রেপ্তার করিতে অনুরোধ করিলেন। * আরও জনকয়েককে গ্রেপ্তার করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন যে কলিকাতার মুলুকচাঁদ বাবু পানিহাটির জয়নারায়ণ বাবু প্রভৃতি কয়েকজন জাল রাজার নৌকায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিবার কি চেষ্টা হইয়াছিল তাহা কাগজ পত্রে প্রকাশ নাই।

লড়াই হইল, লুঠ হইল, গ্রেপ্তারহইল, কিন্তু একটা বাকি থাকিল। মেজেষ্ট্রিতে এজেলা গিয়াছিল যে, জাল রাজার সঙ্গে পাঁচ সাত শত অস্ত্রধারী আছে; কিন্তু তাহাদের সে অস্ত্র কোথায় গেল?

---

* Extract from a letter from the Acting magistrate of Burdwan to the magistrate of Hooghly, dated Calcutta 6th May 1838.

"In my recent capture of *soi disant* Rajah of Burdwan, with his armed followers, some hundreds of swords were discovered in his boats. The Sepoys, however, of Captain Little's detachment considering them fair plunder, appropriated to themselves as many as they could carry away. Their camp followers did the same, and my burkundazes and chowkeedars caught the infection, so that there are only now 86 swords forthcoming, of which upwards of 50 were received from the sepoys. * * As Captain Little is today at Hooghly may I request you will join with him, if necessary, in making the necessary search in his camp, and do your best to get possession for me the plundered swords. It is of the greatest importance to get them, as they form such strong evidence in the case."

নৌকায় চারি পাঁচখানি তরওয়ার, একটি বন্দুক আর একটি পিস্তল ব্যতীত পাওয়া গেল না। দারগা সাহেব বড়ই গোলে পড়িলেন। আসাদ আলি নির্ভীক পুরুষ, তৎক্ষণাৎ কালনার রাজবাটী হইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে ৮৬ খানি তরওয়ার সংগ্রহ করিলেন। তাহার পর মেজেষ্টার সাহেবকে জানাইলেন যে, সিপাহীরা সমস্ত তরওয়ার লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি বহু যত্নে তাহাদের নিকট হইতে মাত্র পঞ্চাশখানা উদ্ধার করিয়াছি। এখনও তাহাদের নিকট এত তরওয়ার আছে যে গাড়ী বোঝাই হইতে পারে। কাপ্তেন লিটিল এই সময় হুগলিতে পৌছিয়াছেন অনুভব করিয়া ওগলবি সাহেব হুগলির মেজেষ্টারকে পত্র লিখিলেন যে, সিপাহীদের নিকট হইতে তরওয়ারগুলি লইয়া পাঠাইয়া দিবেন; কেন না সেই তরওয়ারগুলিই এ মোকর্দ্দমার প্রধান প্রমাণ। [ক্রমশঃ]



অদৃষ্ট।

আমি অদৃষ্টবাদী। ভারতবাসী বলিয়াই যে আমি অদৃষ্টবাদী তা নয়। ভারত অদৃষ্টবাদের চিরপ্রসিদ্ধ ভূমি। অদৃষ্টবাদিত্ব ভারতবাসীর ধাতুগত প্রকৃতি। সেকেলে লোকের ত কথাই নাই। এখন যাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান চর্ব্বণ করিতেছেন তাঁহারাও, কথায় না হউক কাজে, জ্ঞাতসারে না হউক অজ্ঞাতসারে, ইচ্ছাপূর্ব্বক না হউক অনিচ্ছাপূর্ব্বক, অদৃষ্টবাদী। আমিও সেই জন্য অদৃষ্টবাদী; কিন্তু শুধু সেই জন্য নয়। আমি অদৃষ্টবাদে যত দর্শন দেখি, তদপেক্ষা কবিতা দেখি; যত জ্ঞান দেখি তদপেক্ষা ভাব দেখি; যত চিন্তা দেখি তদপেক্ষা কর্ম্ম দেখি। কথাটা কিছু বিস্ময়কর, কিছু নূতন রকমের, কিন্তু আমার এই মত। মানুষের সুখ দুঃখের কারণ সকল সময়ে বুঝিতে পারা যায় না। শাস্ত্রকারেরা বলেন সুখদুঃখ কর্ম্মফল মাত্র, এবং অনেকে বলেন যে কর্ম্মফলের নামই অদৃষ্ট। কিন্তু সে অর্থে অদৃষ্ট বড় ভাল জিনিস নয়। অন্ধ যদি কর্ম্মফলে অন্ধ হইয়া থাকে তবে কেন আমি তাহার দুঃখে দুঃখিত হই? কিন্তু যখন শুনি লোকে বলিতেছে, এই অন্ধের কি অদৃষ্ট!—তখন অদৃষ্টে কর্ম্মফল দেখিতে পাই না। তখন অদৃষ্টে জগতের দুর্ভেদ্য দুঃখ-রহস্য দেখিতে পাই—তখন মানুষকে কি-জানি-কাহার, কি-জানি-কিসের ক্রীড়ার পদার্থ বলিয়া অনুভূত করিয়া কাতর হই—তখন মানুষ্যকে এক অসাধারণ অতলস্পর্শ

কবিত্বের সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়—সেকন্দর বাদশাহ যেমন হোমর পড়িয়া বীরমদে মত্ত হইয়া উঠিতেন, তেমনি তখন সেই অদ্ভুত কবিত্বে মজিয়া দুঃখীর দুঃখ মোচনে প্রধাবিত হই! এ অদৃষ্ট যদি অলীক হয় তবে জানিব যে অলীক মনুষ্যের অলীকত্বের প্রয়োজন আছে।

কথাটা আরো একটু বুঝাইবার চেষ্টা করি। বুঝান বড় কঠিন, কিন্তু চেষ্টা করি। দুঃখ দেখিলে দুঃখ হয়। এইটি মনুষ্যের প্রকৃতি—মনুষ্য-হৃদয়ের ধর্ম্ম। কিন্তু এই প্রকৃতি, এই ধর্ম্মের মূলে শিক্ষা আছে। তাহার প্রমাণ—অসভ্য মনুষ্য। দুঃখ দেখিলে অসভ্য মনুষ্যের হৃদয় গলে না। মানুষ যত সভ্য হয়, ততই দুঃখ দেখিলে দুঃখিত হয়। অথবা দুঃখ দেখিয়া মানুষ যত দুঃখিত হয়, তত সভ্য বলিয়া গণ্য হয়। কোম্তের মতে Egoistic প্রবৃত্তির দমন এবং Ultraistic প্রবৃত্তির প্রাধান্য লাভের নামই সভ্যতা। সভ্যতার অর্থ শিক্ষা, অতএব দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হওয়ার অর্থও শিক্ষা। শিক্ষার অর্থ—মনের সহিত বাহ্যশক্তির সংযোজনা। সেই সংযোজনার সম্পূর্ণতায় শিক্ষার সম্পূর্ণতা এবং সভ্যতার সম্পূর্ণতা। অদৃষ্টবাদ কি শিক্ষার অন্তর্গত নয়? মনুষ্যের হৃদয় মনুষ্যকে দুঃখে দুঃখিত করে। কিন্তু বুদ্ধি অনেক সময়ে হৃদয়ের প্রতিকূল হইয়া থাকে। ভারতের আধুনিক কর্ম্মফলবাদীরা অনেক সময়ে দরিদ্র এবং আতুরদিগকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করেন। ইউরোপের আধুনিক কর্ম্মফলবাদীরা * তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। কিন্তু দুঃখ ত দুঃখ বটে। যে কারণেই হইয়া থাকুক, দুঃখ ত দূর করা চাই, নহিলে দুঃখ যে বাড়িয়া যায়। কিন্তু বল দেখি, যদি দুঃখ আর দুরদৃষ্ট এক বলিয়া বুঝা যায় তাহা হইলে দুঃখে দুঃখিত না হইয়া কি থাকা যায়? মানুষকে এক অচিন্তনীয়, অপরিমেয় শক্তির অথবা শক্তি-সমষ্টির, এক অপূর্ব্ব, অতলস্পর্শ কবিত্বের ক্রীড়ার পদার্থ বলিয়া ভাবিলে, মানুষের দুঃখে না কাঁদিয়া, মানুষের দুঃখ না মোচন করিয়া কি থাকা যায়? খেল্না ভাঙ্গিলে বালকের কান্নার কি সীমা থাকে? অদৃষ্টবাদী না হইলে মানুষ কি মানুষের জন্য বালকের ন্যায় কাঁদিতে পারে? যাহা মানুষকে সরল, সুকোমল বালকবৎ করিয়া তুলে তাহা অলীক হইলেও কি অমূল্য নয়? অলীক হইলেও কি শিক্ষা প্রণালীর অন্তর্গত নয়?

আর অদৃষ্ট যে অলীক তাই বা কেমন করিয়া বলি? মানুষের সুখ

---

* ইউরোপের আধুনিক কর্ম্মফলবাদের কর্ম্মফলের অর্থ ইহজন্মের কর্ম্মফল; ভারতের কর্ম্মফলের অর্থ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।

দুঃখের সমস্ত কারণ কি আমরা বুঝিতে পারি? মানুষ শত সহস্র শক্তি পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র। শত সহস্র শক্তিসম্ভূত একটী ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র। তাহার ক্ষুদ্র শক্তি অসংখ্য বাহ্যশক্তির সহিত সম্পর্কবদ্ধ, কিন্তু তাহার জ্ঞান অল্প, কত শক্তি এবং কি প্রকারের শক্তির সহিত তাহার সম্পর্ক তাহা সে জানে না, তাহার জানিবার উপায়ও অল্প। আধুনিক উদ্ধত বিজ্ঞান এ কথা মানে, কিন্তু মানিয়াও তাহার ধ্যান করিতে পারে না। এবং সেই জন্যই আধুনিক ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্রে Survival of the fittest প্রভৃতি নৃশংস মতের প্রাদুর্ভাব। আধুনিক Evolution মতানুসারে আজিকার মনুষ্য জগতের বিকাশাবধি যত যুগ অতীত হইয়াছে সেই সমস্ত যুগের ফল বই নয়। কিন্তু কে কবে সেই সকল যুগ বুঝিয়াছে বা বুঝিবে? এবং আজিকার মনুষ্যকেই বা কে কেমন করিয়া বুঝিবে? তবেই বুঝা যাইতেছে যে বিজ্ঞান এবং দর্শনানুসারে মানুষে অদৃষ্ট আছে। তথাপি Evolution মতাবলম্বী দার্শনিকেরা যখন মানুষের সুখ-দুঃখের কথা বলেন তখন কেবল তাহার স্বকৃত কর্ম্মের দোষগুণ নির্ণয় করিয়া সমাজকে শিক্ষা দেন এবং রাজপুরুষদিগকে ব্যবস্থা প্রদান করেন! তখন তাঁহারা আজিকার মানুষে আজিকার মানুষ বই আর কিছুই দেখিতে পান না! তখন তাঁহাদের মতে জগতে কিছুই অদৃষ্ট থাকে না! ইহার অর্থ এই যে, ইউরোপীয়েরা মানুষকে পড়িতে পারেন, কিন্তু ধ্যান করিতে পারেন না। পদার্থবিজ্ঞানের শাসনেই হউক আর তাঁহাদের মানসিক প্রকৃতির গুণেই হউক, তাঁহারা কোন বিষয়েই 'দুই দু-গুণে চারি' এই কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন না। এমন কি তাঁহাদের কবিবর Tennyson, যিনি De Profundis লিখিয়াছেন, বোধ হয় তিনিও সংসারক্ষেত্রে 'দুই দু গুণে চারি' প্রণালী অতিক্রম করিতে পারেন না এবং দুরদৃষ্ট শুভাদৃষ্ট কিছুই বুঝেন না। পুরাকালে দুইটী অসাধারণ প্রতিভাশালী জাতি অদৃষ্ট মানিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—গ্রীক এবং হিন্দু। কিন্তু দুইটী জাতির অদৃষ্ট ভিন্ন রকমের। হিন্দু অদৃষ্টে যুগ যুগান্তর নিহিত আছে; কোটি কোটি কর্ম্মফল নিহিত আছে; জল, বায়ু, পশু, পক্ষী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি অসীম বিশ্ব নিহিত আছে। সে অদৃষ্টের আকার নাই, মূর্ত্তি নাই—কিন্তু সে অদৃষ্টের ধ্যান আছে। সে অদৃষ্ট ব্যক্তি নয়, বিষয়। সে অদৃষ্টের নাম অনন্ত—অসীম ব্রহ্ম—অনাদি ইতিহাস। সকলি সেই অদৃষ্টে আছে; সেই অদৃষ্ট সকলেতেই আছে। সে অদৃষ্ট শুভ এবং অশুভ, দুইই। 'দুই-দু-গুণে চারি' যেমন করিয়া বুঝি, সে অদৃষ্ট তেমন করিয়া বুঝি না বটে; কিন্তু ধ্যানে জানি সেও 'দুই দুগুণে চারি।' এবং

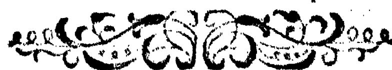
সেই জন্যই তাহাকে অতলস্পর্শ কবিত্ব বলি। যে মহাতত্ত্বের মূলে জ্ঞান আছে, কিন্তু যাহাকে জ্ঞানে পাওয়া যায় না, ধ্যানে পাওয়া যায় তাহাকেই প্রকৃত কবিত্ব বলে। গ্রীক অদৃষ্টের সীমা আছে,—দুঃখ তাহার অন্তর্গত, সুখ নয়। সঙ্কীর্ণায়তন গ্রীক-মন হিন্দুর ন্যায় অসীম, অনিশ্চিত এবং অনির্দ্দিষ্টের ধ্যান করিতে পারিত না। তাই সে মনে অদৃষ্ট সীমাবদ্ধ এবং প্রথর-মূর্ত্তি বিশিষ্ট। সে কঠোর মূর্ত্তি দেখিয়া গ্রীক কাঁদিত এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া পরিশেষে মানুষ হইত। কিন্তু সে মূর্ত্তির কাছে গ্রীক মন্ত্রাহতের ন্যায়—ভয়ে বা শোকে এককালে অভিভূত—ভীষণ অজগর বেষ্টনে আবদ্ধ। ইহাও কবিত্ব। কিন্তু ইহা নাটকের কবিত্ব। হিন্দু অদৃষ্ট মহাকাব্যের কবিত্ব, কেন না গ্রীক অদৃষ্ট অপেক্ষা ইহার মূলে জ্ঞানের ভাগ বেশী। এই জন্য হিন্দু, অদৃষ্টের খেল্না হইয়াও, অদৃষ্টকে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ঘরকন্না করে; গ্রীক কেবল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অদৃষ্টের কঠিন শাসনে শাসিত হয়। এই জন্য ফলাফল সম্বন্ধেও হিন্দু অদৃষ্ট গ্রীক অদৃষ্ট অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

দেখিলাম যে অদৃষ্ট মহাকবির কল্পনা, কিন্তু জ্ঞানমূলক। মনুষ্যের সুখদুঃখের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে অদৃষ্টের আশ্রয় না লইলে চলে না। মানুষ মহাকবির বিকাশ মাত্র। অতএব মানুষ মহাকবির কল্পনা উপেক্ষা করিলে কেমন করিয়া আত্মসাধনায় কৃতকার্য্য হইবে? মহাকবির কল্পনায় প্রবেশ করিতে না পারিলে মানুষ কি সভ্য হয়, শিক্ষিত হয়, না মানুষ হয়।

আরো এক কথা। অদৃষ্টের নাম করিয়া যে কাঁদে তার কান্নার মতন কান্না ত পৃথিবীতে আর নাই। কেন না সে কান্না অনন্তের দোহাই দিয়া কান্না। অনন্ত যাহার কারণ অথবা যাহার কারণ অনন্ত, তাহার জন্য কাঁদিবার কোন সঙ্কোচ বা প্রতিবন্ধক হইতে পারে না—তাহার জন্য কাঁদিবার কারণও অনন্ত। হিন্দুরা অদৃষ্টবাদী—হিন্দুদের মতন কাঁদিতেও কেহ পারে না। কিন্তু হিন্দুরা কি শুধু কাঁদিয়াই ক্ষান্ত? তাহা যদি হইত তাহা হইলে হিন্দুপরিবারে এত প্রাণীর সমাবেশ কখনই হইত না। যখন ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রবল ছিল, তখন ইউরোপ দুঃখীর জন্য যত কাঁদিয়াছিল তত আর কখন কাঁদে নাই। কিন্তু তখন ইউরোপীয়েরা প্রকাশ্যে না হউক অন্তরে অন্তরে অদৃষ্টবাদী ছিল। এইরূপ দেখিবে যেখানে দয়ার সমুদ্র সেইখানেই অদৃষ্টবাদ। ইহার অর্থ কি? বোধ হয় ইহার অর্থ এই যে, অদৃষ্ট হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা—হৃদয়ের কামনা—দুঃখের সহিত অদৃষ্টের সংযোগ করিতে হৃদয় ভালবাসে এবং সেই সংযোগ করিয়া হৃদয় যত গলে শুধু দুঃখ দেখিয়া তত গলে না।

হৃদয়ের গভীরতা অনন্ত, হৃদয়ের ক্ষেত্র অনন্তব্যাপী। এবং সেই জন্য হৃদয় হৃদয়ের পাত্রকে অনন্তে উৎসর্গ না করিয়া থাকিতে পারে না। লীয়রের কষ্ট দেখিয়া আমাদের এত কষ্ট কেন হয়? তাঁহার দুর্ব্বল মনই ত তাঁহার যন্ত্রণার প্রধান কারণ। তবে কেন আমরা তাঁহাকে 'ঠিক হইয়াছে,' 'বেশ হইয়াছে' বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে পারি না? পারি না কেন—না, এত পাইয়া,—রাজ্য, ধন, জন, রাজসম্মান সব পাইয়া কেবল একটু মানসিক বল পাইলেন না এবং সেই জন্য রাজ্য, ধন, জন, রাজসম্মান, শেষে প্রাণপর্য্যন্ত হারাইলেন! আবার ওদিকে তাঁহার কন্যাদ্বয়ের কথা মনে হইলে ভাবি যে, যে এত ভালবাসিতে পারে এবং এত ভালবাসা খুঁজে,সে সব পাইল, কিন্তু একটু সন্তানভাগ্য পাইল না! তখন হৃদয় কাঁদিয়া বলে, লীয়র যদি অদৃষ্টের হাতের—ব্রহ্মাণ্ডের মহাকবির হাতের খেল্‌না নন, ত সে খেল্‌না কে? লীয়রের কি দোষ? লীয়র বিশ্বের দুর্ভেদ্য রহস্যের রঙ্গের পদার্থ বই ত নয়? হৃদয়ের এই ভাব এবং সেই জন্য হৃদয় লীয়রের জন্য এত ব্যাকুল। অতএব হৃদয়ে অদৃষ্টের আসন, হৃদয়ে অদৃষ্টের উৎপত্তি, অদৃষ্ট হৃদয়ের পরিপোষক। হৃদয়রূপ ক্ষেত্রে যাহার জন্ম এবং হৃদয়ের যে পুষ্টিসাধন করে সে কি ফেলিয়া দিবার সামগ্রী?—সে কি মনুষ্যজাতির, জগতের, বিশ্বের অনন্ত মঙ্গলের কারণ নয়?

দেখিলাম, অদৃষ্টের জন্ম—জ্ঞানে এবং হৃদয়ে। একা জ্ঞানমূলক বিজ্ঞান কেমন করিয়া তাহাকে উড়াইয়া দিবে? তাই বলি, অদৃষ্টবাদী ভারত যেন ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দাম্ভিক কথায় মজিয়া তাহার অমূল্যনিধি অদৃষ্টকে ছাড়িয়া না দেয়। যাহা মানুষকে না মারিয়া রাখে, তাহাই মানুষের জীবনযাত্রার সম্বল। দাম্ভিক বিজ্ঞান দুঃখিকে মরিতে বলে। কিন্তু দুঃখী মরিলে সুখীও কি মরেন না? যতক্ষণ দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে পাও ততক্ষণই ত তোমার বাঁচিয়া থাকা সার্থক। তাই বলি, ভারত যেন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের ঠাট্টার ভয়ে অদৃষ্টবাদ ছাড়ে না। অদৃষ্টবাদ ছাড়িলে যথার্থই ভারতের দুরদৃষ্ট ঘটিবে। ভারতের শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইবে; মনুষ্যত্ব কমিয়া যাইবে। ভারতে মনুষ্য-সমাজ বিশৃঙ্খল হইবে। ভারত দুঃখভারে অতল জলে ডুবিবে!



ক্ষুদ্র উপন্যাস সমালোচন।

ক্ষুদ্র উপন্যাস সমালোচনা করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু না করিলেও নিবৃত্তি নাই—এখন বিস্তর ক্ষুদ্র উপন্যাস প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু তাহার ভাল মন্দ কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, তাহাই আমরা সমালোচনা করিতে অনিচ্ছু। ক্ষুদ্র উপন্যাস লেখকেরা কেবল ঘটনা লেখেন। কিন্তু কেবল ঘটনায় অন্তর-স্পর্শ করে না। যতক্ষণ ঘটনার সঙ্গে অন্তরের একটা সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে না পারা যায় ততক্ষণ ঘটনা বৃথা।

কেবল ঘটনা লেখক রামায়ণ লিখিতে গেলে হয় ত লিখিবেন :—"রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই বিমাতার কৌশলে বনে গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সীতা ছিলেন, একটা রাক্ষস আসিয়া সীতাকে হরণ করিল। তখন রাম চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন আর এবনে ওবনে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এমত সময় কতকগুলি বানর আসিয়া রামের সহায় হইল। তাহাদের সাহায্যে রাম সমুদ্র বাঁধিলেন, রাক্ষসকে মারিলেন, সীতাকে উদ্ধার করিলেন, অযোধ্যায় আসিলেন। তাহার পর একদিন সীতা সম্বন্ধে তাঁহার কি একটা সন্দেহ হইল, অমনি রাম তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন, বনে পাঠাইলেন। বাল্মীকি যদি এই ঘটনা গুলি এখানকার মত ক্ষুদ্র উপন্যাস আকারে লিখিয়া ছাপাইতেন তাহা হইলে তাঁহার রামায়ণের দুর্দশা বটতলার গ্রন্থের মত হইত।

ঘটনা লেখক কেবল যড়যন্ত্রের মত। তাপমান যন্ত্র দাঁড়াইয়া বলিতেছে এই ৮৮ ডিগ্রি উত্তাপ, তাহার পর এই ৮৭ হইল, তাহার পর এই ৯০ হইল, তাহার পর এই আবার ৮৮ হইল। ঘটনা লেখক ঠিক তাহাই বলেন, এই ঘটনা ঘটিল, তাহার পর এই ঘটিল, তাহার পর আবার এই ঘটিল। কেন ঘটিল তাহা বলিব না; ঘটনার বীজ দেখিতে দিব না, কেবল ঘটনা বলিব।

সুতরাং ঘটনালেখকের পাঠক কেবল বালক। বালকেরা ঘটনার উপর ঘটনা চায়, তাহারা এ সংসারে নূতন, ঘটনাও তাহাদের পক্ষে নূতন, তাহারা উপর্যুপরি ঘটনা চায়। "তার পর কি হইল? তাহার পর কি হইল?" এই তাহাদের বুলি। রৌদ্রের পর মেঘ করিল বালকের আনন্দ হইল, তাহার পর বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আরও আনন্দ বাড়িল। কিন্তু তখনই সঙ্গে সঙ্গে আবার আর একটা ঘটনা চাই, নতুবা ভাল লাগে না। সুতরাং বালক বলিতে লাগিল "হে, বৃষ্টি! ধরে যা।"

আমরা মোটামুটি বুঝি উপন্যাস লেখকরা প্রকৃতির পাণ্ডা, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দর্শককে প্রকৃতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সূত্র গুলি দেখাইতেছেন;—"এই সূত্রে জগৎ বাঁধা, স্পর্শকর, তুমি পবিত্র হইবে। এই সূত্রে স্ত্রী পুরুষ বাঁধা—ইহা আদি সূত্র—বড় মজবুত। আর এই সূত্র অন্য সূত্রকে টানিতেছে, খুলিতেছে, বাঁধিতেছে—ইহা

ভাল করিয়া দেখ,সংসারের অনেক গ্রন্থি এই সূত্রে।"

মনুষ্য হৃদয় গুপ্তসাগর। তাহার শত শত তরঙ্গ অলক্ষ্যে উঠিতেছে, অলক্ষ্যে মিলাইতেছে, আমরা তাহা দেখি না, উপন্যাস লেখক তাহা আপনি দেখিতেছেন, আমাদের দেখাইতেছেন, আর বুঝাইতেছেন যে, এ সংসারের যত ক্রিয়া সকলই এই তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত। ক্ষুদ্র গল্পে সে তরঙ্গ থাকে না। সুতরাং তাহার ক্রিয়া অসম্পন্ন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

এ সংসারে কতই ঘটনা নিত্য ঘটিয়া থাকে। তাহার কোনটি কেহ বর্ণন করিলে হয় ত প্রকৃত ঘটনা অপেক্ষাও যেন প্রকৃত বোধ হয়। আবার সেই ঘটনা অপর কেহ বর্ণন করিলে হয় ত পূর্ব্ব বর্ণনার মত মনোহারী হয় না, নিত্য যাহা হইতেছে কেবল তাহাই হয়। ইহার হেতু কি? এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সকল পরিচয় এক্ষণে আমাদের অনাবশ্যক। আমরা কেবল এই মাত্র বলি যে, যে ঘটনাই হউক, হৃদয়ের সঙ্গে তাহা শত সূত্রে আবদ্ধ আছে। তুমি যদি সেই হৃদয়ের সম্বন্ধ বাদ দিয়া কেবল ঘটনা মাত্র বর্ণন কর, তবে তাহা নীরস ও নিষ্ফল হয়। ক্ষুদ্র গল্পে হৃদয়ের সম্বন্ধ দেখাইবার স্থান থাকে না, তাহাই ক্ষুদ্র গল্প প্রায় অপাঠ্য হয়।

আমরা সম্প্রতি যে কয়েকখানি ক্ষুদ্র গল্প পাইয়াছি তাহা পড়িতে পড়িতে আমাদের এই সকল কথা মনে আসিয়াছিল। বাবু তারকনাথ বিশ্বাসের লিখিত "গিরিজা" পড়িতে গিয়া প্রথমে আমরা তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই—আরম্ভেই ঘটনার উপর ঘটনা—সে ঘটনার কতক হইয়া গিয়াছে কতক হইতেছে।

গিরিজাকে বসন্তকুমার আর হরকুমার এই দুই জনে ভালবাসেন। দুই জনেই বিবাহ করিতে উদ্যত। গিরিজার পিতা হরকুমারের প্রতি নারাজ, কিন্তু গিরিজা নিজে তাহার প্রতি রাজি। হরকুমার দেখিল, আর উপায় নাই। সুতরাং প্রেমপীড়িত হইয়া এখনকার মত এক পয়সার গেরিমাটী আর দু পয়সার শুষ্ক অলাবু আনিয়া এক প্রকাণ্ড ব্রহ্মচারী সাজিয়া রাত্রে গিরিজার সহিত সাক্ষাৎ করিল। গিরিজা প্রথমে চিনিতে পারিল না, এখানকার প্রণয় এই রূপ; পাঁচবার উত্তর প্রত্যুত্তরের পর চিনিল; তখন হস্ত ধরিল, তাহার পর দস্তুর মত কান্দা কাটা আরম্ভ করিল। এ সকল আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গিরিজার প্রণয় কতদূর হইয়াছিল তাহা জানি না, হরকুমারের প্রণয় কতদূর ছিল তাহাও জানি না। সুতরাং আমরা ইহাদের কোন পক্ষই হইলাম না, কাহারও কান্নায় কাঁদিলাম না, বরং হাসিলাম, ভাবিলাম "এরা কি জন্য কাঁদে!" গ্রন্থকার পূর্ব্বে গিরিজার সঙ্গে বা হরকুমারের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতি স্থাপনা করিয়া দিলে হয় ত

আমরা সকল কথা বুঝিতে পারিতাম কিন্তু তাঁহার স্থান সঙ্কীর্ণ, তিনি "তাহার পর কি হইল" এই পরিচয় দিতে আসিয়াছেন, হৃদয়ের সম্বন্ধ লিখিতে ~~বসিয়াছেন।~~

কাঁদাকাটার পর গিরিজা হরকুমারের সঙ্গে কুলত্যাগিনী হইল। উভয়ে মুরসিদাবাদে গিয়া উপস্থিত। তথায় কিছু দিন পরে গিরিজার পিতাও নৌকা করিয়া গেলেন, কিন্তু তখন তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থা। কন্যার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি প্রীতমনে হরকুমারকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সেটা বাহুল্য হইয়াছিল। তাহা আর বড় প্রয়োজন ছিল না। এখনকার নূতন ফেসনের বিবাহ বুঝি আবশ্যক ছিল। যাহাই হউক, তাহার পর তিনি পরলোক যাত্রা করিলেন।

কিছু দিন পরে হরকুমার, যিনি গেরিমাটি কিনিয়া ব্রহ্মচারী সাজিয়াছিলেন, তিনি আর এক জনের প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়িলেন। গিরিজা তাহা বুঝিলেন, কিন্তু হরকুমারের প্রতি পূর্ব্বমত শ্রদ্ধা রাখিলেন। একদিন তিনি হরকুমারের নিমিত্ত মালা গাঁথিতেছেন আর কাঁদিতেছেন, এমত সময় একটি পাগল গীত গাইতে গাইতে আসিল—তাহার সকল গীতগুলি ভাল নহে—তাহা না হউক—গিরিজার অবস্থানুযোগী বটে। গিরিজা তাহাকে চিনিলেন। সে ব্যক্তি পূর্ব্বপরিচিত বসন্ত-প্রেমপাগল হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বের খবর বড় পাই নাই, বসন্ত কিরূপ লোক, তাহা জানি না, কতদূর ভাল বাসিতে পারে কতদূর ভাল বাসিয়াছিল, এ সকল কিছুই জানি না। গ্রন্থকার হঠাৎ বলিয়া দিলেন বসন্ত প্রণয়ে পাগল হইয়াছে, আমরা তাহাই স্বীকার করিয়া লইলাম উপায় নাই।

তাহার পর এক দিন রাত্রে গিরিজা একা বসিয়া কাঁদিতেছে এমত সময়ে হরকুমার আসিয়া বলিল "গিরিজা! তুমি কাঁদিতেছ, আমার সুখের পথে কাঁটা দিতেছ?" গিরিজা উঠিয়া চক্ষু মুছিল। শেষে হরকুমার বলিল "গিরিজা আমার একটী অনুরোধ রাখ, আমায় সুখী কর, তোমার চক্ষের জল দেখিতে পারি না। তোমার পিত্রালয়ে যাও।" গিরিজা আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিল। হরকুমার গিরিজাকে একখানি পানসীতে উঠাইয়া দিল তাহার পর দুই একটী কথার পর সরোদনে বলিল "গিরিজা যথেষ্ট হইয়াছে আর তোমার যাইতে হইবে না।" গিরিজা কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ সরিয়া যাইয়া "নাথ—"এই বাক্যটীমাত্র উচ্চারণ করিয়াছে, এমন সময় নৌকার একটি কাষ্ঠফলক স্খলিত হইবামাত্র গিরিজা গঙ্গার গর্ভে পড়িয়া গেল। আর উঠিল না। হরকুমার দাঁড়াইয়া রহিল। এমত সময় পাগল বসন্ত আসিয়া সেই জলে ঝাঁপ দিল, সেও আর উঠিল না। গল্প ফুরাইল।

গল্পটী মন্দ নহে, কিন্তু যদি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে ইহাকে ঠাসিয়া পুরিতে না হইত, তাহা হইলে সুন্দর বলিতাম। আমরা গ্রন্থকারের দোষ দিই না, বরং তাঁহার প্রশংসাই করি। তিনি এই অল্প আয়তনের মধ্যে উপন্যাসের সর্ব্বাঙ্গ ঠিক রাখিয়াছেন, স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে তিনি যে সুলেখক হইবেন তাহার যথেষ্ট চিহ্ন দেখাইয়াছেন।

বঙ্গদর্শন।

৯৫ সংখ্যা।

কাঞ্চনমালা।

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

তিষ্যরক্ষা।

তিষ্যরক্ষা প্রাতঃকালে কি করিল বলিবার পূর্ব্বে উহার জীবনবৃত্তান্তের পূর্ব্ব কথা বলা আবশ্যক। তিষ্যরক্ষা একজন ক্ষৌরকারের কন্যা। তাহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধেও এ বংশের বিশেষ সুখ্যাতি ছিল না। তিষ্যরক্ষা ভূমিষ্ঠ হইলে একজন গণক বলিয়াছিলেন যে সে রাজরাণী হইবে। তিষ্যরক্ষা অতি অল্প বয়সে সে কথা শুনিয়াছিল। তদবধি রাজরাণী হইবার জন্য তাহার বাসনা বড়ই প্রবল হয়। তাহার পিতা তাহাকে সমান ঘরে বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে সে বলিয়াছিল "রাজরাণী হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে শূর্পনখার ন্যায় বাসর ঘরেই বৈধব্যের উপায় করিয়া লইব।"

এই সময়ে, বিন্দুসার পুত্র অশোক অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিলেন। বয়স অল্প; অথচ তাঁহার জ্বালায় রাজা, মন্ত্রী, রাণীগণ, প্রজা, বণিক, ব্যবসায়ী, সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। রাজা এরূপ দুর্বৃত্ত পুত্রকে রাজধানী হইতে দূর করিবার অভিপ্রায়ে কীকট দেশের দক্ষিণস্থিত অরণ্যবাসী পিঙ্গলবৎসের নিকট শিক্ষার্থ তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। পিঙ্গলবৎস যে কেবল জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন তাহা নয়; তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। বিশেষ তিনি দুর্গম জঙ্গলমধ্যে বাস করিতেন বলিয়া সন্তান দুর্বৃত্ত হইলে লোকে তাঁহারই নিকট শিক্ষার্থ প্রেরণ করিত।

অশোক তথায় প্রেরিত হইবার অল্প দিন পরেই তিষ্যরক্ষার পিতাও উহার জ্বালায় অস্থির হইয়া উহাকে সেইখানে প্রেরণ করেন। এইরূপে পিঙ্গলবৎসের গৃহে এই দুই ঘোর দুর্বৃত্ত, নিষ্ঠুর, খল-

স্বভাব যুবক যুবতীর পরস্পর সাক্ষাৎ হয়।

অশোকের ইতিপূর্ব্বে দুই তিন বার বিবাহ হইয়াছিল। পিঙ্গলবৎস গণিয়া বলিয়াছিলেন যে বিন্দুসারের সন্তানগণের মধ্যে অশোকই রাজা হইবে। এই কথা শুনিয়া অবধি পিঙ্গলবৎসের আশ্রমে অশোককে মুগ্ধ করাই তিষ্যরক্ষার প্রধান কর্ম্ম হইয়াছিল। তিষ্যরক্ষা তাদৃশ সুন্দরী ছিল না। শিল্পাদি বিদ্যায়ও তাহার কিছু মাত্র দখল ছিল না। কিন্তু সে যাহা ধরিত তাহা ছাড়িত না। সে সংকল্প করিল যেরূপে হয় অশোককে বিবাহ করিতেই হইবে। সে ষড়যন্ত্র কার্য্যে বাল্যকাল হইতেই বৃহস্পতি; প্রথম হইতেই অশোককে ভুলাইবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিল। অশোক প্রথম হইতেই নাপিতের মেয়ে বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিতেন। সুতরাং বিবাহের নামেই তিনি চটিয়া আগুণ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিষ্যরক্ষা পণ করিলেন ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াও অশোকের সহিত মিলিতে হইবে।

অশোকেরও এ সময় পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ভাল মন্দ, কিছুই জ্ঞান ছিল না। সুতরাং নিজ পণ বজায় করিতে তিষ্যরক্ষার বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল না। তিনি অচিরাৎ পাপীয়সীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। ধর্ম্ম বিক্রয় করিয়া তিষ্যরক্ষা সর্ব্বপ্রথম মহাবিপদে পড়িলেন; এ কথা প্রকাশ করিলে অশোক তাঁহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবে। অপ্রকাশ থাকিলেও রাজরাণী হওয়া হইবে না। আপনাআপনি প্রকাশ হওয়া অনেক গোল। অতএব পাপীয়সী গোপনে তাহার পিতাকে পত্র লিখিল। পত্রে জানাইল, "এখানে অনেক দুষ্ট লোক আছে, অধিক দিন রাখিলে আমার উপর ঘোরতর অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা।"

পত্র পাইয়া ধূর্ত্ত নাপিত বুঝিল। সে তৎক্ষণাৎ পিঙ্গলবৎসের আশ্রমে গিয়া প্রকৃত অবস্থা পিঙ্গলবৎসকে বলিল। আর বলিল আমাদের জাতি কুল যাহাতে রক্ষা হয় তাহা আপনি করুন।

পিঙ্গলবৎস ক্রোধে অন্ধ হইয়া অশোককে ডাকাইলেন, জোর করিয়া তিষ্যরক্ষার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত রাজাকে লিখিয়া বলিলেন—"এরূপ দুর্বৃত্ত কুমারের শিক্ষাদান আমার কর্ম্ম নহে। আপনি আপনার পুত্র ও পুত্রবধূকে এখান হইতে লইয়া যান।"

বিন্দুসার উভয়কে রাজধানী লইয়া গেলেন, পুত্রকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন, পুত্রবধূকে অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। সে অতি দীনভাবে অন্তঃপুর মধ্যে দিন যাপন করিতে লাগিল।

অল্প দিনের মধ্যেই আবার রাজ-

পুত্রের অত্যাচারে নগরশুদ্ধ লোক উত্যক্ত হইয়া উঠিল। রাজা পুত্রকে আবার রাজধানী হইতে বিদায় করিবার উপায় চিন্তা করিতেছেন এমন সময় তক্ষশিলায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বিদ্রোহী হইয়াছে সংবাদ আসিল। রাজা এই সুযোগে অশোককে সেনাপতি করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন।

তিষ্যরক্ষা অশোকের মহিষী হইল এবং রাজার অন্তঃপুরেও রহিল। কিন্তু সে দেখিল রাজরাণী হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। অশোকের জ্যেষ্ঠ অনেক গুলি ভাই আছে। সে গুলিকে বঞ্চিত করিতে না পারিলে রাজরাণী হওয়া হইবে না। অতএব কি উপায়ে ইহা-দিগকে দূর করা যায় সেই চেষ্টায় রহিল। প্রথমতঃ বিহিত বিধানে শাশুড়ী সুভদ্রা-ঙ্গীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। রাজার কাণে গেল নাপিতকন্যা পুত্রবধূ বড়ই সাধু-শীলা। অতএব এই অবধি তাহার আদর বাড়িল, তাহার পরিচর্য্যায় দাস-দাসী নিযুক্ত হইল। অন্তঃপুরস্থিত অপর স্ত্রীলোকেরা তাহার শত্রু হইল। সেও রাণীর কাছে বসিয়া নিত্য নিত্য পৌর-স্ত্রীগণের বিরুদ্ধে তাঁহার কাণভারি করিয়া দিতে লাগিল। রাজারও কাণ ক্রমে অন্যান্য পুত্রবধূদের বিরুদ্ধে ভারি হইয়া উঠিল। অল্প দিনের মধ্যেই সকলে জানিল অন্তঃপুরে তিষ্যরক্ষা যা করে তাই হয়।

এই সময়ে রাধগুপ্ত রাজবাড়ীতে প্রথম চাকুরী স্বীকার করিয়াছেন। রাধগুপ্ত চাণক্যের মন্ত্রশিষ্য। ষড়যন্ত্র নির্ম্মাণে কুটিল রাজনীতিজ্ঞতায় বিষাদি প্রয়োগে চাণক্যের প্রায় সমকক্ষ। কিন্তু অদ্যাপি লোকে তাহার মর্ম্ম জানিতে পারে নাই। সেও বুঝিয়াছিল যে একটা কোন বিষম গোলযোগ না ঘটিলে সহসা বড় হইতে পারা যাইবে না। সুতরাং সে রাজ্যের মধ্যে একটা বিষম গোলমালের সময় অপেক্ষা করিতে ছিল। সে দেখিল নাপিতানী তিষ্যরক্ষা আমার অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে। নাপিতানীও দেখিল রাধগুপ্তকে হাত করিলে রাজরাণী হইবার যোগাড় হইতে পারে। সুতরাং অর্দ্ধপথে উহাদের মিল হইল। দুজনেই পরস্পর মন-যোগাইয়া চলিতে লাগিল। দুজনেই অপেক্ষা করিতে লাগিল একটা গোল-যোগ বাধিলে হয়। তাহাদের অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না; শীঘ্রই একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল।

রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুষীম এই গোল-যোগ বাধাইবার হেতু। রাজা অনেক কার্য্যে সুষীমের পরামর্শ লইতেন। সুষীম বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ধীর ও সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তিনি অতি লম্পটস্বভাব। তাঁহার লাম্পট্য দোষ হেতুক রাধগুপ্ত ও প্রধান মন্ত্রী উভয়েই তাঁহার প্রতি চটা ছিলেন। এক্ষণে পাটলীপুত্রস্থ শ্রেষ্ঠীবংশীয় কোন

মহিলার প্রতি দারুণ অত্যাচার করায় তাঁহার প্রতি দেশের লোক অতিশয় চটিয়া গেল। এমন কি, সকলে আসিয়া মহারাজের নিকট উঁহার নির্ব্বাসনের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রধান মন্ত্রী, রাধগুপ্ত ও তিষ্যরক্ষা সকলেই এই লোকবিরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে এমনি হইয়া দাঁড়াইল যে রাজপ্রাসাদ মধ্যেও সুষীমের বাস করা দুরূহ হইয়া পড়িল। তখন রাজা অনন্যোপায় হইয়া সুষীমকে তক্ষশীলায় প্রেরণ করিলেন এবং অশোককে রাজধানী প্রত্যাগমনের আদেশ দিলেন।

মাস মধ্যে অশোক আসিয়া পাটলী পুত্রে পৌঁছিলেন। তিনি পৌঁছিবার দুই তিন দিনের মধ্যেই হঠাৎ রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু হইল। হঠাৎ মৃত্যুর কারণ নির্ণয় হইল না। নগরবাসীরা কেহ কেহ "বিষ বিষ" বলিয়া কাণাকাণি করিতে লাগিল, কিন্তু কে দিল কেহই জানে না। দুই এক দিনের মধ্যেই নগরবাসিগণ নূতন অভিষেকে মত্ত হইল। পুরাণ রাজার আকস্মিক মৃত্যুর কথা সকলেই ভুলিয়া গেল। রাধগুপ্ত অশোককে অভিষেক করিলেন; রাধগুপ্ত প্রধান মন্ত্রী হইল। অশোকের প্রধান মহিষী পরিবারক্ষিতা পাঠরাণী হইয়া সিংহাসনার্দ্ধভাগিনী হইলেন।

কিন্তু সাত আট দিনের মধ্যেই অভিষেকের আহ্লাদ ভয়ে পরিণত হইল। সুষীম বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া পাটলীপুত্র অবরোধ করিলেন। অশোকের মন ভ্রাতার সহিত বিবাদ করা উচিত কি না ভাবিয়া চলৎচিত্ত হইল। তিনি কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে তিষ্যরক্ষা আসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। রাজার মনের অস্থিরতা দেখিয়া বলিলেন,—

"মহারাজ! আমি আপনার মত অবস্থায় পড়িলে এতদিন ফলে ফুলে বাগানের সমস্ত গাছ কাটিয়া পার করিয়া দিতাম।"

তিষ্যরক্ষা যেরূপ দার্ঢ্য সহকারে বাগানের গাছ কাটিয়া পার করিবার কথা বলিলেন তাহাতে অশোকের মনে দার্ঢ্য সম্পাদন করিল। তিনিও বলিয়া উঠিলেন,—

"নাপিতানী! এই চলিলাম, বাগানে একটি গাছ থাকিতে কুঠার ত্যাগ করিব না।"

বলিয়া সশস্ত্রে মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধকার্য্যে অশোক বীরাগ্রগণ্য। তাঁহার ভুজবলে সুষীমসেনা পরাজিত হইল। সুষীমও পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাহার পর চন্দ্রগুপ্তের বংশীয় গর্ভস্থ শিশুরও প্রাণসংহার করিয়া অশোক বিস্তীর্ণ মগধ সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। কেবল আত্মা স্তভদ্রাঙ্গীর একান্ত অনুরোধে স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বীতাশোককে জীবিত রাখিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু

তিষ্যরক্ষা তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া বৌদ্ধ মঠে আবদ্ধ করিবার পরামর্শ দিল। বীতাশোক শাক্যভিক্ষু হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে ভিক্ষা দ্বারা জীবনাতিপাত করিতে লাগিল।

৩

এইরূপে অশোক রাজা হইলেন, তিষ্যরক্ষা রাজরাণী হইল। সে নাপিত-কন্যা এবং সম্যক বিবাহিতাও নহে, এইজন্য সে পাটরাণী হইতে পারিল না। কিন্তু গণকে সে তো পাটরাণী হইবে বলে নাই? সুতরাং সেজন্য তাহার মনের ক্ষোভও নাই। অশোক রাজা হইলেন, তিষ্য রাজরাণী হইল। বাল্যকালাবধি যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দিনরাত্রি চিন্তা করিতেন, যাহার জন্য ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, সকলই অসার বলিয়া বোধ হইত, যাহার জন্য কোন দুষ্কর্ম্ম করিতেই কুণ্ঠিত হন নাই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। অশোক রাজা হইলেন, তিষ্য রাজরাণী হইল। উভয়েই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। উদ্দেশ্যসিদ্ধির আমোদে কিছু দিন কাটিয়া গেল, ক্রমে রাজপদ ও রাণীপদ পুরাণ হইয়া উঠিল। উভয়েরই ভাবিবার অবসর হইল।

উভয়েই দেখিলেন যে সব ত হইল, কিন্তু আমার কি হইল। এত কষ্ট করিয়া এত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া এত আত্মীয় বান্ধবের প্রাণনাশ করিয়া এই যে উচ্চপদে আরোহণ করিলাম ইহাতে আমার নিজের কি হইল।

অশোকের "নিজের কি হইল" ইহার অর্থ আমার পরকালের কি হইল। তিষ্যরক্ষার " আমার কি হইল" ইহার অর্থ আমার নারীজন্মের সুখ কই হইল।

অশোকের এই ভাবনার ফল বৌদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয় ও জগতে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" প্রচার।

তিষ্যরক্ষার ভাবনার ফল হইল, স্বামীতে তাহার মন উঠিল না। স্বামীর বয়স হইয়াছে, তিনি রাজকার্য্যে ব্যস্ত, আবার তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক হইলেন। তিষ্যরক্ষা জানিল এ স্বামী হইতে তাহার নারীজন্মের সুখ হইবে না। সুতরাং সে পরপুরুষ সহবাসে নারীজন্মের সুখ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে ভুবনমোহন রূপবান কুণাল তাহার নয়নপথের পথিক হইল। কুণালের স্নিগ্ধ শ্যামল উজ্জ্বল নয়ন দেখিয়া সে ভুলিয়াছিল। সে কুণালকে পাইবার জন্য বিবিধ বিধানে চেষ্টা করিতে লাগিল। কাঞ্চনমালার সুখ তাহার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। সে প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বদাই কুণালকে চখে চখে রাখিতে লাগিল। তাই আজি সন্ধ্যার সময়ে কৃত্রিম শৈলোপরি দাঁড়াইয়া কুণাল ও কাঞ্চনমালার মালা গাঁথা দেখিতেছিল। তাই সে কাঞ্চনমালার মালাগুলি চুরি করিয়া অভিনয় স্থলে মায়বেশী কুণালের পত্নী সাজিয়া উপ-

স্থিত হইয়াছিল। তাই সে আজ কুঞ্জমধ্যে এ প্রকার নির্লজ্জভাবে আপনার মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।



অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য।

(২)

Isabella does not return to the sisterhood of Saint Clare. Putting aside from her the dress of religion, and the strict convention rule, she accepts her place as Duchess of Vienna. In this there is no dropping away from her ideal. ......She has learned that in the world may be found a discipline more strict, more awful than the discipline of the convent.

Dowden on Measure for Measure.

যাজন।

তৈলঙ্গস্বামী, শুকদেব এবং রত্নাকরের কথাতে এই পর্য্যন্ত বুঝা গিয়াছে যে কেবল ব্রত করিলেই বৈরাগ্য হয় না, এবং পাণ্ডিত্য অভাবেও বৈরাগ্যের পথরোধ হয় না। বৈরাগ্য জীবনের অংশ হওয়া আবশ্যক। মন মোহ হইতে এতদূর বিরক্ত হইবে যে যাহাতে স্বভাবতঃ লোকের মোহ উপস্থিত হয় তাহাতে ডুবিলেও বিরাগী মোহাচ্ছন্ন হইবেন না। * বৈরাগ্য মনের শীতবস্ত্র নহে যে ইহাতে মনকে নিরন্তর আবরিত রাখিয়া মোহকর বিষয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে। অগ্নিসেবন প্রভাবে শীত সহ্য করা যেরূপ সহজ, তীর্থে বাস করিয়া মোহ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাও প্রায় তদনুরূপ। বৈরাগ্য শিখিবার জন্য কখন কিছুকাল লোকালয় ত্যাগ করা প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু সময়বিশেষে নিরালয় হইবার পরিবর্ত্তে যদি নিরন্তর অরণ্যে বাস করিতে হয় তবে বৈরাগ্যের সার্থকতা কোথায় থাকে? এরূপ বৈরাগ্য বিরাগীর মনে আশ্রয় করে না। এই মর্কট বৈরাগ্য মর্কটের ন্যায় কেবল জীবনবৃক্ষের শাখাপ্রদেশে বিচরণ করিতে থাকে।

* —"The imperial votaress passed on,
In maiden meditation, fancy-free."

অতঃপর দেখা যাউক যে ভারতবাসীগণ তৈলঙ্গস্বামীর ন্যায় ব্যক্তিকে কি শিখাইয়াছেন। কেবল তৈলঙ্গস্বামী কেন, আমি যে শিক্ষার কথা মনে করিতেছি তাহা তুমি আমিও কিছু কিছু শিখিয়াছি। ভারতবাসীরা মর্কট বৈরাগ্যের সমাদর করেন না। তাঁহারা যে বৈরাগ্য ভাল বাসেন তাহা স্থিরচিত্তে বুঝা আবশ্যক।

ব্রাহ্মণের বৃত্তি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। ইহার মধ্যে যজন এবং যাজন লইয়া প্রথমতঃ বিচার করা যাউক। যজন দ্বিজমাত্রেরই অধিকৃত, যাজন এক ব্রাহ্মণ বর্ণেরই ব্যবসা। যজন স্বাধীন কার্য্য; যাজন করিতে যজমান কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হওয়া আবশ্যক। যাজ্ঞিক যজমানকে অনেক বিষয় শিখাইতে পারেন তথাপি উভয়ের স্বরূপ সম্বন্ধ এই মাত্র যে যজমান নিজে যজ্ঞ করিলে যাহা করিতেন, যাজ্ঞিক প্রতিনিধি পদে কেবল তাহাই করিবেন অতএব যাজন করিতে হইলে যাজ্ঞিককে মানিতে হয় আমি যজমানের অধীন। অথচ দেখিতে পাই যাজ্ঞিক যজমানের নিতান্ত পূজনীয়। ইহার মর্ম্ম কি?

যজমান স্বয়ং যজ্ঞ করিতে সক্ষম অথচ তাহা করেন না কিঞ্চিৎ দক্ষিণামাত্র দান করিয়া সফলকাম হন। যাজ্ঞিক যজমানের আজ্ঞাধীন এবং দানগ্রাহী, অথচ অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠপদারূঢ়। যজমান ইচ্ছা করিলেই যজনকার্য্য হইতে অবসৃত হইতে পারেন। যাজ্ঞিকও ইচ্ছাপূর্ব্বক যাজনে ব্রতী হন। উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও আদান প্রদান হইয়া থাকে। সেই দক্ষিণাই কি এই বন্দোবস্তের মুখ্য বিষয়? কেহ কেহ তাহাই মনে করে বটে। বাস্তবিক কথাটা বিচারসাপেক্ষ। ব্রাহ্মণের পক্ষে অর্জ্জিত দক্ষিণা, স্বীকৃত কষ্টের সহিত তুল্য মূল্য হইয়াছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না সত্য। কিন্তু কিসে তুল্য মূল্য হইল? যখন ব্রাহ্মণেরা দ্বিজগণের যাজনবৃত্তি স্বীকার করেন তখন তাঁহারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হইয়াছিলেন, না দারিদ্র্যে তাঁহাদিগের তাদৃশ আশঙ্কা ছিল না, এবং অন্য কোন কারণবশতঃ যৎসামান্য দক্ষিণাতেই স্বীকৃত কষ্টের পরিশোধ হইল জ্ঞান করিয়াছিলেন। দক্ষিণা যাজনের মূল্য, না অর্থ সঞ্চয় বিষয়ে বৈরাগ্যের আর একটী প্রমাণ? অপর কেবল যাজনেই বা বৈরাগ্যের কি লক্ষণ আছে?

ব্রাহ্মণকে অক্ষম বলিতে পারি না। ব্রাহ্মণ যে কোন মতে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য দক্ষিণার প্রয়াস করিয়াছিলেন এ কথা বলা যায় না। আমি যে সময়ের কথা মনে করিতেছি তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক নতুবা স্বরূপ অবস্থা অনুভূত হইবে না। পরশুরাম এক সময়ে ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। একুশবার নিক্ষত্রিয় করার কথাতে অত্যুক্তি থাকিলেও মানিতে হইবে যে ঐ সকল ঘটনার

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ হয় নাই। অপর, ব্রাহ্মণের যুদ্ধব্যবসা বিষয়ক যে নিষেধ এখনও বলবৎ রহিয়াছে তাহার আরম্ভ পরশুরামের সময় হইতে, একথা বলিলে অযথা উক্তি হইবে না। অতএব পরশুরামের অস্ত্রধারণকে ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তের মধ্যে একটী বিপ্লবকারী ঘটনা মনে কর। ব্রাহ্মণবর্ণ তাহার পূর্ব্ব হইতেই যাজন বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। নতুবা পরশুরামের কার্য্যকে ব্রাহ্মণের পক্ষে অসাধারণ মনে করিবার স্থল দেখা যায় না। ব্রাহ্মণের যাজন স্বীকার এবং যুদ্ধত্যাগ এই দুটী ঘটনার মধ্যে পরশুরামের সময়ের বিপ্লব ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ যাজন স্বীকার, পরে ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ, তদনন্তর কেবল যাজন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ এবং যুদ্ধত্যাগের বন্দোবস্ত। পরশুরামের গল্প এবং ব্রাহ্মণের ব্যবসা বিষয়ক স্মৃতি এতদুভয় হইতে প্রাগুক্ত ক্রম অবধারিত করিতে পারা যায়।

এখন মনে কর যে যাজন স্বীকার এবং যুদ্ধত্যাগে বৈরাগ্য বিষয়ক কি কি লক্ষণ বিদ্যমান আছে। যাহারা যুদ্ধ করিতে অক্ষম তাহাদের পক্ষে যাজন স্বীকার অনন্য গতি হইতে পারে। কিন্তু যাহারা ধনুর্ব্বান চ্যুত হয় নাই তাহারা যে ভিক্ষা স্বরূপ দক্ষিণা লাভের চেষ্টা করিবে ইহা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ দক্ষিণা বিষয়ক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে তৈল বটের লোভ এখন যতই প্রবল হউক প্রথম অবস্থাতে সেরূপ ছিল না। ফলতঃ কুল পুরোহিতের সহিত গ্রাম্য সম্প্রদায়ের (প্রাচীন পরিষদ?) যেরূপ সম্বন্ধ এবং দক্ষিণার পরিমাণ সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচলিত আছে তাহা দেখিয়া অনুমান হয় এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তন অথবা স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের বৈরাগ্য বিশিষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রাম সম্বন্ধে অনেক স্থানের প্রথানুসারে পুরোহিত উৎপন্ন শস্যের ভাগ পান। অহিন্দুগণ মধ্যেও কোন কোন দেশে উৎপন্নের দশমাংশ যাজকের নিয়মিত প্রাপ্য। কিন্তু দক্ষিণা বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ কঠিন নিয়ম নাই। যাঁহারা নিয়ম করিয়া অন্য বর্ণকে যাজন হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছেন, তাঁহারা যে এরূপ কোন নিয়ম করিতে কিম্বা উল্লিখিত প্রথা বিধিবদ্ধ করিতে পারিতেন না, একথা মনে করা যুক্তিবিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণ ধান দূর্ব্বা, কিম্বা একটী হরীতকী পাইলেও সন্তুষ্ট। অতএব দক্ষিণা ও যাজনের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণের দারিদ্রের ফল নহে, দারিদ্রের হেতু।

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বানপ্রস্থ আশ্রম নিষিদ্ধ নহে। এক সময়ে সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব বশতঃ সকল বর্ণই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে বটে। তথাচ জানিতে হইবে যে বানপ্রস্থ হইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর হইয়াছেন।

ইহাতেও সপ্রমাণ হইতেছে যে দারিদ্র্য স্বীকার ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বেচ্ছাধীন কার্য্য হইয়াছিল, ইচ্ছার বিরুদ্ধে অগত্যা শ্রেয়ঃ হইয়াছিল এমত বলা যায় না। অতএব পরশুরামের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের যাজন অবলম্বন প্রগাঢ় বৈরাগ্যের প্রমাণ।

এই বৈরাগ্যের সার মর্ম্ম এই মাত্র।—অন্যান্য বর্ণ যজন কার্য্যে অধিকারী হইলেও তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম ছিলেন না। ব্রাহ্মণেরা আজন্মকাল যজন করিয়া যাজন কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব যজমানের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করাতেই স্বভাবতঃ পুরস্কৃত হইলাম মনে করিয়া দক্ষিণা বিষয়ে এত ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ দাতার অভিরুচিকেই এতদ্বিষয়ের নিয়ামক করাতে ব্রাহ্মণেরা গভীর ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

শুকদেব, ধ্রুব, রত্নাকর ইত্যাদি, বৈরাগ্যের আদর্শ স্বরূপ। উহাতে উপাখ্যানলেখকদিগের রচনা কৌশল যথেষ্ট দেখা যায়। তৈলঙ্গস্বামী সেই আদর্শেরই অনুকরণকারী বটে। মর্কট বৈরাগ্যে বাহ্যিক আড়ম্বরের লাঘব হয় না। কিন্তু যাজন বৃত্তি ব্রাহ্মণের বৈরাগ্যের সাক্ষী। এই সাক্ষীতে সন্দেহ করিবার স্থল নাই।

যুদ্ধত্যাগ।

ব্রাহ্মণেরা যাজন স্বীকার করিবার কিছু দিন পরে, পরশুরামের সময়ে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মধ্যে ঘোরতর বিরোধ হইয়াছিল। ইতিহাসের কথা এই যে, সেই বিরোধে ক্ষত্রিয় বর্ণ পরাজিত হন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরাই ইতিহাস লেখক। অতএব এই বিরোধে ব্রাহ্মণ প্রকৃত প্রস্তাবে জয়ী হইয়াছিলেন কিনা তাহা সন্দেহ করা যাইতে পারে। আশ্চর্য্য এই যে, জয়লাভ না করিয়া থাকিলেও ইহাতে ব্রাহ্মণের সামান্য মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হয় নাই। মনে কর, ব্রাহ্মণেরা পরাজিত রাজপদচ্যুত এবং ক্ষত্রিয়ের নিকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে পরাজয়কারী ক্ষত্রিয় যাজন হইতে নিবারিত হইলেন কাহার দ্বারা? এই নিষেধ বিষয়েত কোন সন্দেহ নাই। অতএব যে দিক হইতে দেখ ব্রাহ্মণের যাজনবৃত্তি বিশেষ মহত্বের লক্ষণ বলিয়া প্রকাশ হইবে।

পরশুরামের সময় অবধি ব্রাহ্মণ যুদ্ধ কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে বীতরাগ হন। আজিকে হিন্দুগণ ভীরু বলিয়া ঘৃণিত হইতেছে, সুতরাং যুদ্ধত্যাগের গুণ কীর্ত্তন করিতে ভয় হয়। কিন্তু যুদ্ধ সৎকর্ম্ম বলিয়া গণনীয় নহে। আত্মরক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধ অগত্যা স্বীকার করিতে হয় বটে তদ্ভিন্ন অরাজকতা দোষ নিবারিত হইতে পারে না। কিন্তু বলপূর্ব্বক এবং নরহত্যা সংকল্প করিয়া পরের রাজ্য অপহরণ নিমিত্ত যুদ্ধ করা কোন মতেই প্রশংসনীয় নহে। যখন ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ ব্যবসা পরিত্যাগ

করেন তখন তাঁহারা ভীরু বলিয়া পরিগণিত হন নাই। যাঁহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইলেন তাঁহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ কার্য্যে প্রাণ পণ করা কঠিন বোধ হইয়াছিল বলিতে পারি না। ক্রোধ উপস্থিত হইলে সহজেই জীবনের প্রতি মমতা খর্ব্ব হইয়া যায়। অতএব যুদ্ধার্থীর জীবন ত্যাগ সংকল্প সন্ন্যাস অপেক্ষা কঠিন নহে। ক্রোধ, সংহারবৃত্তি, অন্য কি বাহুবলও যুদ্ধের প্রধান উপকরণ নহে। যুদ্ধের প্রধান অঙ্গ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সাহস, লোকবল, এবং লোকবল সংগ্রহ করিবার কৌশল। উপস্থিত বিচারে লোক বলের কথা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু সন্ন্যাসে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও সাহসের অভাব নাই। অতএব যুদ্ধ ত্যাগ করাতে ব্রাহ্মণের ন্যূনতা দেখিতে পাই না। তাঁহাদিগের কঠোর সংকল্প মনে করিলে কখনই ভীরু বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারি না। ফলতঃ যাঁহারা চতুর্থাশ্রম অবলম্বনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াই যুদ্ধ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য, ধন এবং গৌরব লাভের আকাঙ্ক্ষাও পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব ক্ষত্রিয়ের নিকট পরাজিত হইয়া থাকিলেও ব্রাহ্মণের পক্ষে যুদ্ধকার্য্য হইতে অপসৃত হওয়া সহজ হয় নাই। আর যদি ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াও ব্রাহ্মণেরা এই ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের মহত্ব চিন্তা করিয়া উঠাও কঠিন হয়।

পরশুরামের বৃত্তান্ত কাল্পনিক হইলেও এই কথায় অন্যথা হইবে না। পরশুরামের সময়ে না হইলেও কোন এক সময়ে ব্রাহ্মণ যুদ্ধত্যাগ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। এবং কেবল একবার ত্যাগ নহে, সেই ত্যাগ হইতে অদ্যাবধি ব্রাহ্মণ এতদ্বিষয়ে একবারে নিস্পৃহ হইয়া আছেন।

এই বৈরাগ্য নিশ্চেষ্টের লক্ষণও বলিতে পারি না, কেননা যাজন কার্য্যে ব্রাহ্মণেরা ক্রমশঃ এত উন্নতি করিয়াছিলেন যে অপর এক সময়ে যুদ্ধার্থী বিশ্বামিত্র শান্তপ্রকৃতি বশিষ্ঠের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন, এবং তদনন্তর যুদ্ধব্যবসা ও রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

অধ্যাপন।

আদ্যকালে ব্রাহ্মণবর্ণের মহত্ব তিন বিষয়ে প্রকাশ হয়। যাজন, অধ্যাপন এবং যুদ্ধত্যাগ। ইহার প্রথম ও তৃতীয়টীর মধ্যে সময়ের অগ্র পশ্চাৎ ছিল মনে হয়। এবং এই দুটী বিষয়ের কথাই এতক্ষণ বলিয়াছি। কিন্তু অধ্যাপনাই বোধ হয় উভয়ের মূলাধার। যিনি যজন বিষয়ে অধ্যাপনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাঁহাকেই যাজনের ভারার্পণ করা সম্ভবপর মনে হয়। সে যাহা হউক, অধ্যয়ন বিষয়ে সম্যক উৎকর্ষ লাভ না হইলে অধ্যাপন কার্য্যে হস্ত-

ক্ষেপণ সম্ভবে না। অতএব অধ্যাপনের মাহাত্ম্য দেখাইলে আর অধ্যয়নের কথা পৃথক রূপে ব্যক্ত করিবার আবশ্যকতা থাকে না।

যজন এবং যাজন মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যাজনে যজমান ও যাজ্ঞিক পরস্পরের সহিত বন্দোবস্ত করেন। অধ্যাপনাতে কেবল বন্দোবস্ত করিলেই হয় না। ইহার নিমিত্ত বিশেষ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের কোন ব্যক্তি যদি অধ্যাপনা কার্য্যে সমর্থ হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে নিবারিত রাখা সুসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু তাদৃশ স্থলে শিক্ষার্থীকে নিবারণ করা অপেক্ষাকৃত দুষ্কর। তদ্ভিন্ন, ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীরা নিকৃষ্ট বর্ণের নিকটেও যে কখন কোন উপদেশ গ্রহণ করেন নাই এরূপ কথা প্রমাণ করাই অসাধ্য; এবং মনে করাও সঙ্গত নহে। যাজনের নিদান যজন। যাজকের বিশেষ লক্ষণ যজ্ঞকর্ত্তার প্রতিনিধিত্ব। যজমানের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলে তাঁহার প্রতিনিধি সহজেই সেই কার্য্য অনুসারে যাজন করিতে পারেন। এরূপ স্থলে যাজকের বিশেষ অর্থলাভ না দেখিলে ত্যাগ স্বীকারই মানিতে হয়। অধ্যাপনেও যাজনের ন্যায় যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার আছে। কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণেরা অধ্যাপনা করিতে পারিবেন আর কেহ পারিবেন না, সক্ষম হইলেও পারিবেন না এরূপ ব্যবস্থা, ত্যাগ স্বীকারের লক্ষণ নহে। যাজনও ব্রাহ্মণের একচেটিয়া বৃত্তি বটে এবং স্থলবিশেষে যাজন অধ্যাপন, উভয় একচেটিয়াই তুল্যরূপে দূষিত হইতে পারে। কিন্তু অধ্যাপনার পথ খোলা থাকিলে যাজন বিষয়েও শিক্ষা দান চলিতে পারে এবং যাজকের একচেটিয়ার দোষ বিমুক্ত হয়। যাজকের সংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে অবরোধ আবশ্যক হয় বটে। কিন্তু পারদর্শী ব্যক্তির অধ্যাপনা জনমাত্রের প্রতি নিষিদ্ধ করিলেও অনন্ত ক্ষতি হয়। ফলতঃ যাঁহারা অনন্যরূপে অধ্যাপনা করিবেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণরূপে পূজিত হইবেন এরূপ নিয়ম হইলে আর এই বন্দোবস্তের বিন্দুমাত্র দোষ থাকিত না। কিন্তু একথা তখন মনে হইবার সময় হয় নাই।

অধ্যাপনার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর অধ্যয়ন। কিন্তু অধ্যয়নের উদ্দেশ্য কি? এরূপ প্রশ্ন ইংরাজিতেই ভাল শুনায়। কিন্তু ভারতের চরমকালে এ প্রশ্নও শুনিতে হইয়াছে!! শিক্ষকের সকল যন্ত্রণা সহ্য হয় কিন্তু শিষ্যের মুখে আপনার উপদিষ্ট কথা উপদেশের আকারে শুনিতে হইলে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়। অধ্যয়নের উদ্দেশ্য অর্থলাভ নহে একথা হিন্দুগণের চির পরিচিত। ইহা বাঙ্গালাতে লোকের বিদিত করিতে হইলে বাচালতা জন্য লজ্জা বোধ হয়।

ইদানী লোকের সংস্কার এইরূপ হইয়াছে যে যজন ও ধর্ম্মালোচনা মনুষ্যের

একটা অলঙ্কার বিশেষ। ঘড়ি যেমন পর্ব্ব উপলক্ষে বাহির করিতে হয়, ময়রার দোকানে সন্দেশের মাঝখানে বসাইতে হয়, দেয়ালের গায়ে ছবির সঙ্গে রাখিতে হয়, এবং সোণার শিকলি দিয়া টেঁকে ঝুলাইতে হয়, ধর্ম্মও সেইরূপ হলফ্ পড়িবার সময়ে বিস্মরণ করিতে হয়। সে যাহা হউক আমার এখনকার বক্তব্য কথা এই যে ধর্ম্মালোচনা এবং অধ্যয়ন বিভিন্ন করা এ কালের সূক্ষ্মবুদ্ধি। এই ভেদ অপ্রমাণ করিতে হইলে আমাকে বিষ্ণু বলিয়া একটী নূতন প্রবন্ধ আরম্ভ করিতে হইবে। আরও অনেক দোষ ঘটিবে। অতএব সে কথায় কাজ নাই। আমার কলম বলিয়া আমার মতটাই গ্রাহ্য করিলাম।

ধর্ম্মালোচনা ও অধ্যয়নের অভেদ প্রকৃতি স্বীকার করিলে যজন এবং অধ্যাপনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সহজেই উপপন্ন হইবে। আর, মাষ্টার মহাশয়েরা রাগ করিবেন না, কিন্তু যদি নির্ভয়ে বলিতে পাই তবে বলিব যে, তাঁহারা এইটা বুঝেন না বলিয়াই এখনকার বংশধরেরা এত কীর্ত্তিমান হইতেছেন। হিন্দুধর্ম্ম মতে ধর্ম্মালোচনার সারভাগ বৈরাগ্য। বিদ্যার্থী প্রথম হইতেই ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে বৈরাগ্য অভ্যাস করিতেন, এবং অধ্যয়নকালেই উহা প্রগাঢ় হইয়া অধ্যাপকের চরিত্রে আশ্রয় করিবার কথা। অতএব হিন্দুর বৈরাগ্য অধ্যয়ন কাল হইতে আরম্ভিত হইয়া যজন যাজন এবং অধ্যাপন সকল কার্য্যেই ব্যাপৃত হইত বলিতে হইবে। নব্য সম্প্রদায়ও বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য শিখিলে বোধ হয় পরিণামে তজ্জন্য কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন। অন্ততঃ নিতান্ত টিকিওয়ালার সঙ্গে অধঃপাতে যাইবেন না—এ কথার সন্দেহ নাই।

যাজন আর অধ্যাপন পরস্পর সম্বদ্ধ। এইপর্য্যন্ত বলিলাম। কিন্তু ইহার মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে সাহস হয় না। বোধ হয় অধ্যাপন হইতে যাজনের সূত্রপাত; রাজা ও যুদ্ধত্যাগ হইতে উভয়ের প্রাধান্য এবং যাজনের প্রাধান্য হইতে অধ্যাপনার অবনতি হইয়াছে। অধ্যাপনার পুনরুন্নতি ব্যতীত ভারতের মঙ্গল নাই। এই উন্নতি, কৌশলে সুসিদ্ধ হইবে না। দক্ষিণা বাড়াইবার বন্দোবস্ত ইহার সহকারী নহে। অর্থলোভীর অধ্যাপনা—চিনেবাজারের যোগ্য। ব্রাহ্মণের অধ্যাপনাতে যে টুকু স্বার্থপরতা ছিল মনে হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু উহাতে অর্থলোভ ছিল না এই জন্যেই সহস্রবার ব্রাহ্মণের পদধূলি লইতে ইচ্ছা করে; থানায় পড়িয়া আছে দেখিলেও যজ্ঞোপবীতধারীর সম্মান করিতে ইচ্ছা করে। অধ্যাপনার নিস্বার্থপরতা দেখিয়া যাজনের মাহাত্ম্য বুঝা আবশ্যক। লার্ড বিশপের যাজন আর ব্রাহ্মণের যাজনে অনেক প্রভেদ। সন্ন্যাসাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণেরা বৈরাগ্য বিষয়ে যতই অযথা কার্য্য করুন না কেন, যাজন অধ্যাপন ও যুদ্ধত্যাগ

বিষয়ে তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য কখনই ভুলিব না।

এখন একবার আমার বিরুদ্ধ পক্ষের কতকগুলি কথার আলোচনা করা আবশ্যক।

রাজা প্রজাপালন করেন। প্রজাপালন, বলিতে রাজ্যের মধ্যে যে সকল ক্ষতি কি মঙ্গলাভাব ঘটে তাহার প্রতীকার আর রাজ্যের বাহিরের বন্দোবস্ত—যথা যুদ্ধ বাণিজ্যাদি—বিষয়ক সন্ধি। রাজ্যের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবস্থা মধ্যে গুরুতর ভেদ মনে হইতে পারে, কিন্তু এক বিষয়ে উভয়ই সমতুল্য। বাহিরে অধিকার বিস্তার কিম্বা আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহার নিগূঢ়পন্থা বলপ্রয়োগ। আর আভ্যন্তরিক বন্দোবস্তের অন্তিম উপায়ও সেই পদার্থ। বলপ্রয়োগের আতিশয্যে নানা দোষ হয় তাহা সকলেরই স্বীকৃত কথা বটে। কিন্তু উহাতে কিছু মাত্র শুভ নাই ইহা স্বীকার করি না। পিন্যালকোডের আসল পদার্থটা একেবারে মন্দ বলিতে কাহার সাহস হয়? সত্য, এই আইনের ধারার সংখ্যা এবং দণ্ডের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল এ কথা কেহ বলিবে না। নতুবা সকল অপরাধের দণ্ড ফাঁসি বলিলে আরো সুলভ হইত। তথাচ পিনালকোডের আসল পদার্থ পুলিষ। পুলিসের বেটনের মধ্যে সাঙ্গিনের আত্মা। সাঙ্গিনের সম্বন্ধ কেবল পিনালকোডের সঙ্গে নহে। ডিক্রীজারীর নিয়মও ঐ কোডের কনিষ্ঠ সহোদর। সুতরাং উহাতেও সাঙ্গিন ঝিক্‌মিক্ করে। ইউরোপীয় শাসনপ্রণালীতে ফৌজ, তোপ, বারুদ, বেটন এবং জেল, অরাজকতা নিবারণের অব্যর্থ সন্ধান। ইহা সমস্তই বল প্রয়োগের অঙ্গ। ইহাতে যে কোন দোষ থাকে তাহার একমাত্র প্রতীকার পার্লিয়ামেণ্ট আর (স্থলবিশেষে) ক্যাবিনেট। কিন্তু ইহার সমস্তই দোষ এ কথা স্বীকার করি না।

এইরূপ কথার উপরে নির্ভর করিয়া পূর্ব্বপক্ষ আরো বলিতে পারেন আমাদের দেশের প্রাচীন কালীন ফৌজ ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় বটে। কিন্তু তখনকার প্রহরী আর এখনকার পুলিষের মধ্যে বোধ হয় বড় ভেদ নাই। কারাগার বলিতে চুণের গুদাম ব্যতীত আর কিছু মনে না হইতে পারে, এবং তাহাতে ইদানীন্তন জেলখানার কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর বোধ হইতে পারে, কিন্তু যখন দেখিতেছি আমাদিগের রাজা ছিল, ফৌজ ছিল, পুলিষ ছিল, তখন দেখিতে হইবে যে প্রাচীন জজ, মেজেষ্টর, পুলিষ ইনস্পেক্টর-জেনেরল আদি কি প্রণালীতে পরস্পরের সহযোগীতা করিতেন। তাঁহাদিগের ক্ষমতার মূলীভূত কারণ বলপ্রয়োগ ভিন্ন আর কি? এই অনুসন্ধানে সম্যকরূপে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন সন্দেহ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য ধরিয়া এতদ্বিষয়ক পুরাবৃত্ত

স্থির করা সহজ নহে। তথাচ প্রচলিত প্রথা অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে জজ্ মেজেষ্টরের কতক কার্য্য ব্রাহ্মণেরই চতুষ্পাটী হইতে নির্ব্বাহ হয়। আইনের তর্ক টোলেই মীমাংসিত হয়। ক্ষত্রিয় রাজা দণ্ডাজ্ঞা দিলেও চতুষ্পাটী এবং অধ্যাপক মহাশয়দিগের অধিকার যায় না। রাজা কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণেরই আজ্ঞা পালন করিতেন। বাস্তবিক ব্রাহ্মণই রাজা, ক্ষত্রিয় সেবক মাত্র। ব্রাহ্মণেরা শ্রুতি অধ্যাপন করিতেন, স্মৃতি লিখিতেন, টোলের ব্যবস্থা দিতেন; এবং হাতিবাগান নবদ্বীপ হইয়া অবশেষে কাশী পর্য্যন্ত আপীল হইত। সুতরাং তৈলঙ্গস্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তীগণ তক্তপোষ বাজাইয়াই * রাজ্যের আভ্যন্তরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পরশুরাম ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করাইয়াছেন বটে। কিন্তু যেমন গবর্ণর-জেনেরল হইলেই কমাণ্ডর-ইন চীফের কার্য্য করিতে হয় এমন নহে, অথচ তাঁহাকেও বন্দুক অবলম্বী বলা যাইতে পারে: সেইরূপ ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণেরা নিরস্ত্র হইয়া থাকিলেও তাঁহাদিগের কলমেই সর্ব্বপ্রকার বলপ্রয়োগ প্রবিষ্ট আছে, এবং সেই বলপ্রয়োগদোষ হইতে তৈলঙ্গস্বামীও নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। অতএব যুদ্ধত্যাগে ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য কিছুই নাই।

এই কথাগুলি পূর্ব্বপক্ষের। আমি যে প্রকারে বলিলাম তাহা স্বরূপ হইল কি না বলিতে পারি না। যাঁহারা ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য অস্বীকার করেন তাঁহারা এই প্রণালীতে তর্ক করিতে পারেন। আমি তাহা ভুল মনে করি। পূর্ব্বপক্ষের কথা লিখিতে যদি অযথা উক্তি হইয়া থাকে তবে আমার অপরাধ স্বীকার করিতেছি।

উল্লিখিত তর্কে ভুল এই। চতুষ্পাটী হইতে ব্যবস্থা আইসে সত্য। কিন্তু সেই ব্যবস্থা পালন করাইবার নিমিত্ত উপায়ান্তর আবশ্যক হয়। চতুষ্পাটী অপেক্ষা অধ্যাপকের আদেশ বলবৎ হইতে পারে না। অধ্যাপক স্থল বিশেষে কেবল সাক্ষী, কখন বা জুরীর অনুরূপ হয়েন। কদাচ মেজেষ্টর কিম্বা ডিক্রি-জারীর হাকীমের কার্য্য করিতে পারেন না। সুতরাং তাহাতে বলপ্রয়োগ নাই। অপর রাজসন্নিধানে কোন্ অধ্যাপকের মীমাংসা প্রবল হইবে তাহার স্থিরতা নাই। গবর্ণর-জেনেরল কমাণ্ডর-ইন-চীফকে পদচ্যুত করাইতে পারেন; জজ মেজেষ্টরের তো কথাই নাই। ভারতবর্ষীয় রাজা কিম্বা রাজক্ষমতাধারী ব্যক্তিরা অধ্যাপকের অধ্যাপনা বন্ধ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে হিন্দু রাজা, ব্যবস্থাদায়কের কথা না শুনিলেও তাহার প্রতীকার নাই। কার্য্যত রাজা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বর্ণ, ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিতেন না বটে। কিন্তু ইহাতে

* "তখন স্বামীমহাশয় একটু শব্দ করিলেন" বঙ্গদর্শন আষাঢ় ১২৮৯। ১১৪ পৃষ্ঠা।

ব্রাহ্মণের আধিপত্য বা ক্ষত্রিয়ের অধীনতা সপ্রমাণিত হয় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় একত্রে রাজ্য * করিতেন বলা যাইতে পারে। এবং কেবল এই বুঝা যায় যে ক্ষত্রিয়েরা অতি ধীরপ্রকৃতি; ক্ষমতা থাকা সত্বেও ব্রাহ্মণের মন্দকারী হন নাই। আর উভয়ের এইরূপ ঐক্য হইতে আর একটী কথা বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণেরা অতি সুবোধ ছিলেন; বুদ্ধি এবং প্রকৃতির গুণে বরাবর ক্ষত্রিয়কে বশীভূত রাখিয়াছেন।

এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বতন বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমুতবাহন, এবং ইদানিন্তন শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ৺ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিষয়ে একটু তুলনা করিতে ইচ্ছা করি। ভবশঙ্কর এবং অপর কতিপয় স্মার্ত্ত শ্যামবাবুর বিধবা কন্যার বিবাহের পক্ষে একটী ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষর করেন। পরে তদুপলক্ষে বিচার উপস্থিত হয় এবং ভবশঙ্কর নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত ব্রজনাথের সহিত বিচারে জয়ী হন; হইয়া শাল পুরস্কার পান। অনন্তর বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিষয়ের প্রস্তাব করিলে ভবশঙ্কর প্রাগুক্ত ব্যবস্থাপত্র সত্বেও তাঁহার মতের বিরোধী হইয়া প্রতিবাদ করেন।† বিদ্যাসাগর প্রাচীন নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া ছাপাতে বিচার করিতে আরম্ভ করেন এবং প্রতিপক্ষগণের ছাপা বন্ধ হইলে গবর্ণমেণ্টে আবেদন পূর্ব্বক আইন জারি করান। বিধবা বিবাহের আইন হইয়াছে কিন্তু উহা হিন্দুসম্প্রদায়ের গ্রাহ্য হয় নাই। শ্যাম বাবুও ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করিবার পরে আর কিছু করিতে পারেন নাই।

বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমুতবাহন দায়বিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত নাই। কিন্তু উভয়ে একই শাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন; সুতরাং একজনের যে ভুল হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। অথচ এখন উভয়ের মতই প্রবল। এ দিকে ঈশ্বরচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের সাহায্য সত্বেও বিফল প্রয়াস হইয়াছেন। আর ভবশঙ্কর দুপক্ষে গাইয়া দুবারই জয়লাভ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় যদি জীমুতবাহনের ন্যায় কিম্বা রঘুনন্দনের ন্যায় চাল চালিতে পারিতেন তবে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু তাহাতে বিফল হইলেও বিধবাবিবাহের প্রতিদ্বন্দীতা এত প্রবল হইত না। ভবশঙ্কর প্রথম বিচারে জয়ী হওয়াতেও তাঁহার ব্যবস্থা কেন প্রবল হয় নাই তাহা ব্যক্ত নাই। বোধ হয় শ্যামবাবু সমাজপতি ও আপন দলের সহকারীতা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সেই সময়ে শ্যাম বাবু কিম্বা তাঁহার কোন মুরুব্বি যদি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতেন তবে আর

---

† বিধবা বিবাহ বিষয়ক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ দেখ।

বিধবাপত্তিগণের একঘরে হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এবং একবার চলিয়া গেলে প্রথা বন্ধ করাও সহজ হইত না।

আমি বিধবাবিবাহের সপক্ষ নহি। এবং ঐ বিষয়ে কোন দোষ গুণ ধরিতেও চাহি না। উল্লিখিত উদাহরণ হইতে এতদ্দেশের শাসনপ্রণালীর ব্যাখ্যামাত্র করিতেছি। বিদ্যাসাগর ঐ প্রণালী উল্লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রণালীটির নিগূঢ় মর্ম্ম এই যে শাস্ত্রীয় বিচার হিন্দুগণের সভাতে (পরিষদ ?) ভিন্ন আদালতে কি লেজিসলেটিব কৌন্সিলে হইতে পারে না। হিন্দু ভিন্ন হিন্দুর আইন করিতে পারে না। ভবশঙ্কর যখন প্রথমবার জয়লাভ করেন তখন কেহ মীমাংসক পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন কি না তাহা জানি না, কিন্তু পুরস্কারটা বোধ হয় কোন ধনাঢ্য কায়স্থ দিয়া থাকিবেন। অন্ততঃ বোধ হয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত তাহার কোন সংস্রব ছিল না। বর্ত্তমান কালে এ কথার প্রমাণ দেওয়াও আবশ্যক নহে, এবং পুরস্কর্ত্তা ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণব্যবসানুসারে তিনি এই কার্য্য করেন নাই। ফলতঃ ভবশঙ্কর ও তাঁহার পুরস্কর্ত্তার সাহায্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে সম্ভবতঃ সেই সময়ে হইতে পারিত। তাহাও সন্দেহের স্থল। কেন না অধ্যাপকের ব্যবস্থা গ্রামস্থ যজমানবর্গের সম্মতি ব্যতীত প্রতিপালিত হয় না। ঐ যজমানবর্গকে বশীভূত করা একাকী ব্যবস্থাদাতার কার্য্য নহে। ভবশঙ্করের পুরস্কর্ত্তা পুরস্কার দিলেন বলিয়াই যে গ্রাম্যসম্প্রদায় নিরস্ত* হইয়াছিলেন এ কথা সহসা বলা যায় না। তবে নবদ্বীপের বিচারে জয় লাভ করাতে ভবশঙ্করের প্রথম ব্যবস্থা বলবৎ হইবার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছিল এই মাত্র। গ্রাম্যসম্প্রদায় কতকদূর পার্লিয়ামেণ্টের সদৃশ বটে কিন্তু প্রভেদ এই যে, পার্লিয়ামেণ্টকে হস্তগত করিতে পারিলে পাদরি সাহেবেরা কিছুই করিতে পারেন না। গ্লাডষ্টোন যখন পার্লিয়ামেণ্টকে বশীভূত করেন তখন আয়রলণ্ডের প্রটেষ্টাণ্ট পাদরিরা সহজেই পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহেব বশীভূত করিয়া এবং আইন পাশ করাইয়াও ফল লাভ করিতে পারেন নাই। আর গ্রাম্যসম্প্রদায় ব্যবস্থাদাতার সহিত একমতাবলম্বী না হওয়াতে ভবশঙ্করের প্রথম ব্যবস্থা অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় নাই। ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিতে হইলে lords temporal এবং commons স্থলে গ্রাম্য সম্প্রদায়কে ও Lords spiritual স্থলে ব্যবস্থাদাতাগণকে পৃথকরূপে সম্মত করা আবশ্যক। ভবশঙ্কর যখন ব্রহ্মবিদ্যারত্নকে পরাজিত করেন তখন অনেকগুলি ব্যবস্থাদাতা বিদ্যাসাগরের মতের ন্যায় মত স্বীকার করেন। সেই সময়েই আবার যদি কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের দলও বশীভূত হইত তবেই

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতে পারিত। ভবশঙ্কর, জজ মেজেষ্টর পুলিষ কিছুই নহেন অথচ জজ মেজেষ্টর আদির অধীনও নহেন। কিন্তু ভবশঙ্কর তৈলঙ্গস্বামীর অধীন। তৈলঙ্গস্বামী একটী অঙ্গুলি নাড়িলে ভবশঙ্করের প্রথম ব্যবস্থা অগ্রাহ্য হইত, এমন কি, শাল পুরস্কারও গোপন করিতে হইত।

এস্থলে আর একটী দৃষ্টান্ত মনে হইতেছে। দয়ানন্দ স্বরস্বতী, তৈলঙ্গস্বামী ও বিদ্যাসাগরের মাঝামাঝি আর এক জিনিস। ইঁহার ক্ষমতাও ঐরূপ মধ্যমশ্রেণীস্থ।

অতএব আমাদিগের শাসনপ্রণালীতে অধ্যাপকের ব্যবস্থা বিষয়ে যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহাতে ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণের পক্ষ হইতে কিছু মাত্রও বলপ্রয়োগ হয় না। এবং ঐ ব্যবস্থা যে গ্রাম্যসম্প্রদায় কর্ত্তৃক বলবৎ হইয়া থাকে তাঁহারাও কোন অধ্যাপক বিশেষের অধীন নহেন। অথচ উভয়ের এক বাক্যেই এতদ্দেশের ধর্ম্মশাসন ও রাজশাসন চলিতেছে। বাস্তবিক উভয়েই পরস্পরের অধীন। এবং এই অধীনতাই উভয়ের বৈরাগ্যের সাক্ষী। হিন্দুসমাজের শাসনপ্রণালী অতি সুকৌশলপূর্ণ। উহা এখন অপাত্রে পড়িয়াই অনর্থের কারণ হইয়াছে। বাস্তবিক উহার বিধানমতে সুশিক্ষিত এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের উপরেই সকল দিক রক্ষা করিবার ভার রহিয়াছে। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া আসিয়াছেন এবং ইহাতেই হিন্দুধর্ম্ম অন্য সমস্ত ধর্ম্মের বৈরী হইয়াও তাহাদিগের সারগ্রাহী হইতে পারে।

পরশুরাম নামমাত্র ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করেন নাই। সেই সঙ্গেসঙ্গে ব্রাহ্মণবর্ণকে রাজকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়াছেন। রাজকার্য্যের বাহ্যিক কি আভ্যন্তরিক বন্দোবস্তে যে যে স্থলে বলপ্রয়োগ করা আবশ্যক—ফৌজ তোপ বারুদ বেটন জেল—সমস্ত হইতে ব্রাহ্মণ বীতরাগ হইয়া আছেন। আর এইরূপ বীতরাগ হইয়া আছেন বলিয়া এখানে বিধবা বিবাহের আইন বহিমাত্র হইয়া আছে। ব্রাহ্মণের এই বৈরাগ্যের সম্মুখে দুর্দ্দান্ত গ্লাডষ্টোনও পরাজিত হইবেন; আয়র্লণ্ডের পাদরির উপরে তিনি যত জোর জোরাবরী করুন না কেন, তৈলঙ্গস্বামী নিকটে পরাজিত হইতেই হইবে। দুর্ভাগ্য এই যে তৈলঙ্গস্বামী দধিভাণ্ডের বিচার করিতেই ব্যস্ত।

ইংলণ্ডীয় যাজক সম্প্রদায়ের অবস্থা আরও শোচনীয়। ইহা সপ্রমাণিত করিবার জন্য ইংলিসম্যান সংবাদপত্রের একটী ধমকানী নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

The Pastoral of the Bishop of Bombay on the subject of divorce,...is an extraordinary production....No ecclesiastic in India has ever given to the public such a plain declaration that they

hold themselves, so far as the ceremonies of the Church are concerned, above the law of the land. We are well aware that as the law of England and India at present stands, it is left optional with any Clergyman to perform the marriage ceremony for a divorced person or not as his scruples may dictate....But Bishop Mylne went much further than this, for, referring to the law as it at present stands, he said:—

When Parliament sanctioned this (the law about the remarriage of the adulterers), they set Christ on one side altogether. When they made it possible for any wicked woman to run away from her husband and children and be married to the partner of her guilt, they did not even pretend that this concession was sanctioned by our Lord...."Christ calls it adultery. The law of the land calls it marriage. I trust that Christians know which to believe. &c-"

This is exactly the style of argument which we hear from the pulpit....On such matters it is a mere waste of time to argue with a cleric of any persuasion.... But the Bishop of Bombay. went far beyond mere discussion...and if he acts up to his expressed intentions may find that much as he affects to despise the law he is still not beyond its reach. Towards the conclusion of his pastoral he is reported to have said :—

"For my own part and duty, I hereby give public intimation that no persons who have contracted a marriage after one of them has been divorced for adultery, and during the lifetime of the wife or husband, can be admitted to the Lord's Table in this Diocese, so long as they continue to live together; and that no clergyman who performs a marriage ceremony for a person divorced for adultery, during the lifetime of the former wife or husband can continue to retain my licence to minister in this Diocese."

A few years ago, in England, a person who had been refused admission to the Lord's Table by the Vicar of a parish for an offence which was against the

law, brawling in Church, brought an action for damaging his character against the Clergyman, and recovered damages. And should the Bishop of Bombay or any of his Clergy refuse to admit a divorced person, who is legally remarried, to the Lord's Table, they will find that they also have rendered, themselves liable in a Court of law....The Bishop is a paid servant of a State Church as established by law. (৪ ঠা আগষ্ট ১৮৮২।)

ব্যভিচার সম্বন্ধে টুপীওয়ালা ভায়াদিগের দৌড় এতদূর। সামান্য বিষয়ে যাজকের আজ্ঞা পালন করিতে হইলে বোধ হয় দুটা দশটা খুন হইত। যখন রোমান কাথলিক মতের সঙ্গে স্বয়ং পোপ রসাতল গিয়াছেন তখন আর বিশপ রেভরেণ্ড বাবাজিরা কোথায় লাগেন। কিন্তু ইউরোপীয় প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ভুলিতেছেন বলিয়া ধর্ম্ম বিনাশ হইবে না। আর যতদিন ধর্ম্ম থাকিবে ততদিন ধর্ম্ম-শিক্ষকদিগকেও মস্তকে ধারণ করিতে হইবে। অতএব দোহাই বাবু সাহেবেরা! গরিব ব্রাহ্মণকে পায়ে ঠেলিবেন না। ব্রাহ্মণ ব্যবসাটা অতি অমূল্য পদার্থ।

শ্রী ঘো—



কোকিল।

পৃথিবীতে দুঃখ এবং দুর্নামের ভাগই বেশী। মনুষ্যের ইতিহাসে ওয়াশিংটনের সংখ্যা খুব কম; অতিলা এবং জঙ্গিসের সংখ্যার শেষ নাই। কথাটা খারাপ বটে, কিন্তু ইহাতে রাগ বা বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। পৃথিবীতে পৃথিবী প্রবল হইবারই কথা, স্বর্গ সর্ব্বদা কেমন করিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে? তবে যে স্বর্গও দেখিতে পাওয়া যায় সে কেবল পৃথিবীর উপর আকাশ আছে বলিয়া। উপরে আকাশ না থাকিলে কাল মেঘে শাদা বিজলী খেলিত না। অতএব পৃথিবীতে যে এত লোক অপযশের ভাগী বলিয়া আপন আপন অদৃষ্টের দোষ দেয় সে বড় একটা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কেহ কেহ আছে যাহারা অনেক গুণের অধিকারী হইয়াও লোকের কাছে যথেষ্টরূপে পরিচিত নয়, যাহাদিগকে লোকে জানে কিন্তু চিনে না। তাহাদেরই যথার্থ দুরদৃষ্ট। তাহাদের মধ্যে কোকিল প্রধান।

লোকে বলে কোকিলের রূপ নাই, কোকিল কুৎসিত—কেন না কোকিল কাল। এ কথা স্বীকার করি যে নানা বর্ণচিত্রিত-সুকোমলপক্ষবিশিষ্ট অনেক পক্ষী আছে—তাহারা কোকিল অপেক্ষা সুন্দর। তাহাদের মধ্যে অনেকের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব কমনীয়তা, অনেকের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, অনেকের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব কান্তি, অনেকের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব মহিমাও লক্ষিত হয়। তাহাদের কাহারো সৌন্দর্য্য দেখিয়া বালক ভুলে, কাহারো সৌন্দর্য্য দেখিয়া যুবা ভুলে, কাহারো সৌন্দর্য্য দেখিয়া বৃদ্ধ ভুলে। কোকিল কাল—অতএব কোকিলের সে রকম সৌন্দর্য্য নাই। কিন্তু কাল বলিয়াই কি কোকিল কুৎসিত? কাল জল সুন্দর, কাল মেঘ সুন্দর, কাল চুল সুন্দর। তবে কাল কোকিল সুন্দর নয় কেন?—কাল কোকিল কুৎসিত কেন? তুমি বলিবে:—কেন তা বলিতে পারি না, তবে কুৎসিত দেখি, সেই জন্য বলি কাল কোকিল কুৎসিত। আমি বলি,—তুমি নিজে কুৎসিত; সৌন্দর্য্য দেখিতে জান না, তাই কাল কোকিলকে কুৎসিত দেখ। দেখ, কাল জল কাল বলিয়া সুন্দর নয়, তাহা হইলে এই যে কাল কালিতে লিখিতেছি ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই হইত না। কাল জলে নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের ছবি উঠে বলিয়া কাল জল সুন্দর। তেমনি কাল মেঘ অমৃতবৎ বারিবর্ষণ করিয়া কাল জলের সহিত কথা কয় বলিয়া সুন্দর, আর কাল চুল সুন্দরীর পায় লুটায় বলিয়া সুন্দর। কাল বলিয়া ভাল কেহই নয়। ভাল-র সম্পর্কে থাকিয়াই কাল ভাল। কৃষ্ণ মোহিনীশক্তিরূপী বলিয়াই গোপকন্যারা তাঁহার কাল রূপে এত মুগ্ধ। ছেলে নাড়িছেঁড়া ধন বলিয়াই জননীর চক্ষে তাহার কাল রঙ্ এত সুন্দর। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের একটি প্রধান সূত্র এই—যাহা মনের সহিত গাঁথা, মন তাহার দোষটুকুতেই বেশী গুণ দেখে—তাহার যেটুকু কম সুন্দর সেই টুকুতেই বেশী সৌন্দর্য্য দেখে। যাহা সুন্দর নয় তাহাই সৌন্দর্য্যের প্রাণ। যাহা সুন্দর নয় তাহাকে যাহা অতীব সুন্দর করে তাহাই সৌন্দর্য্য বোধের প্রকৃত ইন্দ্রিয়, কেন না তাহা জগতের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অগাধ সদ্ভাব স্থাপন করে—জগতের কদর্য্যতা নাশ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। সে ইন্দ্রিয় চক্ষু নয়, মন অথবা হৃদয়। কাল কোকিলের কি এমন কিছুই নাই যাহার গুণে তাহাকে কুৎসিত না দেখিয়া সুন্দর দেখি? তুমি বলিবে—কিছুই ত নাই, তাহা হইলে তাহাকে কুৎসিত দেখিব কেন? আমিও এই কথার একটা মীমাংসা করিব বলিয়া আজ কোকিলের কথা পাড়িয়াছি।

অনেক দিনাবধি কোকিল কবিদিগের সম্পত্তি। তাঁহারা কোকিলকে লইয়া

অনেক খেলা খেলাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কোকিলের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তাই আজ কোকিল এত কুৎসিত পাখী। তাঁহারা কোকিলের কণ্ঠে একরাশি বিরহের বিষ ঢালিয়া দিয়া তাহাকে একটা বিষম হাড়জ্বালানে পাখী করিয়া তুলিয়াছেন। আর সেই জন্যই আজিকাল বঙ্গীয় নব্য কবিদিগের মধ্যে যিনি কোকিলের নাম করেন তাঁহার ভাগ্যে বিধাতা উপহাস ভিন্ন আর কিছুই লেখেন না। এটি নব্য কবির দুরদৃষ্ট নয়; কোকিলের দুরদৃষ্ট। কবিরা বলেন যে কোকিলের স্বরে বিষ বই আর কিছুই নাই—যে মধু আছে তাহাও বিষমাখা। কোকিলের স্বর শুনিলে কেবল বিরহকাতরতা বৃদ্ধি হয় অথবা আসঙ্গলিপ্সার উদ্রেক হয়, মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্বের দিকে প্রধাবিত হয়। এ কথা সত্য কি না আমি জানি না। কিন্তু কোকিলের স্বরে বিষ বই কি আর কিছুই নাই? সেই সুললিত, সুমধুর, সুঠাম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সতেজ, হোমাগ্নিশিখার ন্যায় পূর্ণাবয়ব, স্বতোৎপন্ন, স্ফূর্ত্তিবৎ কু-উ ধ্বনিতে কি বিষ থাকিতে পারে? খলতাশূন্য, গ্লানিশূন্য, সরল, নির্ম্মল, সুকোমল বালক, সমস্ত রাত্রি সুখের ঘুম ঘুমাইয়া, শেষ নিশিতে দিবসের খেলার স্বপ্ন দেখিতেছে। গৃহপার্শ্বস্থ কাননে কোকিল কুউ কু-উ * করিয়া উঠিল। বালক আহ্লাদে মাতিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া খেলা করিতে ছুটিল। কোকিল ডাকিয়াছে, আর তাহাকে ধরে কে? কোকিলের স্বরে বিষ কই? কোকিলের স্বর তমসাচ্ছন্ন জগৎকে প্রদীপ্ত করিল; নিদ্রিত বিষাদমণ্ডিতদিঙ্মণ্ডলকে হাসাইয়া তুলিল; কারাগারের দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল; সমস্ত শিরায় রক্ত স্রোত ছুটাইয়া দিল; সর্ব্ব শরীরে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-তাড়িৎ হানিল। কোকিলের কু-উ ধ্বনি স্বর্গীয় ঐন্দ্রজালিকের নিশ্বাস! আবার বালককে ছাড়িয়া বাল সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখ। তমসাবৃত সুদূর গগণপ্রান্ত ঈষৎ লাল রঙে রঞ্জিত হইয়াছে। অন্ধকারের প্রাণের ভিতর চোরের ন্যায় নিঃশব্দে এবং অলক্ষিত ভাবে একটু একটু অস্পষ্ট আলোক প্রবেশ করিতেছে। এখানে ওখানে কোথায় কি যেন আস্তে আস্তে খুস্ খাস্ করিতেছে। ঠিক বলিতে পারা যায় না, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন শূন্যে কোন একটা শব্দের নিস্তব্ধ রকম প্রতিধ্বনি শুনা গেল। যেন কাণের কাছে একটা গাছের পাতা আস্তে আস্তে নড়িয়া উঠিল। যেন কোথায় কে রুদ্ধকণ্ঠে 'আব্' 'হাম্' এইরূপ একটা শব্দ করিল।

---

* কোকিল কুহু বলে না, কুউ বলে। কবিদিগের কু-হুর হু কোকিলের নয়, বোধ হয় কবি মহাশয়দিগের হুহু বিশেষের হু।

নিদ্রিত মনুষ্য যেন গভীর সমুদ্রতল হইতে একটু একটু করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসিয়া পড়িল পড়িল—তাহার মুদ্রিত চক্ষের পল্লবের ভিতর একটু একটু আলো খেলা করিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটা ফুটিল ফুটিল বোধ হইতেছে। এমন সময় যেন সমস্ত কোটনোন্মুখী পৃথিবী খানা কু-উ শব্দ করিয়া উঠিল, আর একেবারে বনে পাখী পাখা ঝাড়া দিয়া উঠিল, গ্রামে মানুষ 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া উঠিল, পূর্ব্বদিকে একটা প্রকাণ্ড রাঙ্গা গোলা হুস্ করিয়া উঠিয়া পড়িল, চারি দিক ফরসা হইয়া গেল। কাল কোকিল ব্রহ্মাণ্ড-টাকে ফুটাইয়া দিল। কোকিলের কু-উ স্বরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্ফোট একত্রীভূত। সেই বিশাল স্ফোটের অপূর্ব্ব সঙ্গীত কোকিলের কাল কণ্ঠ দিয়া নিঃসৃত হয়। কোকিলের সুললিত, সুমধুর, সুঠাম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সতেজ, হোমাগ্নিশিখার ন্যায় পূর্ণাবয়ব, স্বতোৎ-পন্ন, স্ফূর্ত্তিবৎ কু-উ ধ্বনি কেহ কখন বুঝিয়াছে কি * ?

অসার, পরান্নভোজী, সদ্যাসুখপ্রিয় চাটুকারকে লোকে 'বসন্তের কোকিল' বলিয়া গালি দেয়। লোকে কোকিলকে বুঝে না বলিয়াই এইরূপ গালি দেয়। এটা কোকিলের দুরদৃষ্ট নয় ত কি? বসন্তে কাননের কি অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছে! শীতের কুজ্ঝটিকা ঘুচিয়া গিয়াছে। সূর্য্যের নবীন আলোকে চারিদিক ফুট্ ফুট্ করিতেছে। বিমল আকাশে কাননটি বেড়িয়া বেড়িয়া ছোট ছোট পাখীগুলি উড়িয়া বেড়াই-তেছে। পৃথিবী সজীব দুর্ব্বাদলে আবৃত। তদুপরি নানাবর্ণশোভিত পতঙ্গ আ-নন্দে লাফাইয়া বেড়াইতেছে। বৃক্ষলতা নূতন সাজে সাজিয়া সরোবরের স্বচ্ছ জলে আপন আপন শোভা দেখিতেছে। নীলোজ্জ্বল আকাশ সমস্ত কাননটিকে অপূর্ব্ব আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখি-য়াছে। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, আলো, জল, আকাশ, পৃথিবী—সব ফুটিয়াছে। ফুটিয়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। এই সমস্ত হর্ষ, এই সমস্ত উল্লাস, এই সমস্ত স্ফোট—আকাশ এবং পৃথিবীর এই সমস্ত সঙ্গীতময় স্ফূর্ত্তি যেন ঐ কোকি-

* অধ্যাপক Monier Williams বিলাতী nightingale এর সহিত তুলনা করিয়া আমাদের কোকিলের নিন্দা করিয়াছেন। আমি কখনও বিলাতেও যাই নাই, nightingale-এর গানও শুনি নাই। কিন্তু এ কথা বলিতে পারি যে Monier Williams কখনও কোকিলের স্বর যাহাকে প্রকৃত শুনা বলে তেমন করিয়া শুনেন নাই। যদি তেমন করিয়া শুনিতেন তাহা হইলে তাহার নিন্দা করিতে পারিতেন না। যে স্বরে ব্রহ্মাণ্ডের স্ফোট এবং স্ফূর্ত্তি ধ্বনিত হয়, সে স্বর কি তুলনায় হারে? না তাহার অপেক্ষা ভাল স্বর থাকা সম্ভব?

লের প্রাণে প্রবেশ করিয়া তাহার কু-উ স্বরে অপূর্ব্বতানে নির্গত হইতেছে। বৃক্ষ, লতা, ফুল, ফল, পশু, পক্ষী, আকাশ, পৃথিবী,—আজিকার অপূর্ব্ব জগতের অপূর্ব্ব, উন্নত, পূর্ণবিকাশিত প্রাণ ঐ তরঙ্গিনী সদৃশ কু-উ ধ্বনিতে নির্গত হইতেছে—গলিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে! আজ বসন্ত—আজ জগতের এক দিন। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত—পৃথিবী পর্য্যায়ক্রমে এই কয়টি ঋতু ভোগ করিয়াছে। এই কয় ঋতু পর্য্যায়ক্রমে পৃথিবীর উপাদানে যে সকল গূঢ় পরিবর্ত্তন করিয়াছে বসন্ত ঋতু তাহার চরমফল। দশ মাস ধরিয়া পৃথিবী আজিকার অপূর্ব্ব বিকাশের দিকে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছিল। আজ সেই গতি চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই চরম সীমা অথবা সেই চরম বিকাশের নাম বসন্ত। বসন্তের কোকিলের কণ্ঠ হইতে সেই চরম বিকাশ স্বররূপে নির্গত হইতেছে। বসন্তের কোকিল নিন্দার পাত্র নয়। বসন্তের কোকিলের কু-উ ধ্বনি স্ফোটের সঙ্গীতাত্মক প্রতিকৃতি—অপূর্ব্ব বিকাশের অপূর্ব্ব বিজ্ঞাপনী! কোকিল জগতের চরম স্ফূর্ত্তির গীত গায় বলিয়া জগতের চরমবিকাশরূপ বসন্তের পাখী। জগতে যত কিছু অপূর্ব্ব স্ফোট, অপূর্ব্ব বিকাশ, অতুল উন্নতি আছে, সবই যেন কোকিলের অপূর্ব্ব কু-উ ধ্বনি। প্রস্ফুটিত ফুল, প্রস্ফুটিত শিশু, প্রস্ফুটিত যুবা, হোমরের ইলিয়দ, কালিদাসের কুমার, সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ, শেলীর স্কাইলার্ক, ফিদিয়সের যুপিতর, বীরশ্রেষ্ঠ নাপোলিয়, দয়াবতার হাউয়ার্ড, প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য, জ্ঞানোন্মত্ত শঙ্কর—সকলই এক একটি অপূর্ব্ব কু-উ ধ্বনি। বসন্তের কোকিল, তুমি বিকাশ গীত গাও, উন্নতির সঙ্গীত শুনাও, তথাপি তোমাকে কেহ এপর্য্যন্ত চিনিল না! ভারতবাসী তোমাকে যে দিন চিনিবে, যে দিন তোমার অপূর্ব্ব কু-উ ধ্বনির মর্ম্ম বুঝিবে এবং মর্ম্মে মজিবে, সেই দিন ভারতের উন্নতির সূত্রপাত হইবে, জীবন-সঙ্গীতের প্রথম তান শুনা যাইবে। এক তানাত্মক শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ কাহাকে বলে ভারতবাসী সেই দিন বুঝিয়া তাহার অতুল সৌন্দর্য্য অধিকার করিবার জন্য উন্মত্ত হইবে। সেই দিন বসন্তের কোকিলকে নিন্দা না করিয়া ভারতবাসী বসন্তের কোকিল হইবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। বসন্তের কোকিলকে কেহ কখন বুঝিয়াছে কি?

আবার কোকিলের একটা পঞ্চম আছে। নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, অন্ধকারময় বনের ভিতর একটা কু-উর উপর আর একটা কু-উ চড়িয়া উঠিল, তার উপর আর একটা কু—উ আরো চড়িয়া উঠিল, তার উপর আর একটা কু-উ আরো চড়িয়া উঠিল, শেষে আরো কত চড়িয়া উঠিল ঠিক করিতে পারিলাম না। শিশুর পর বালক, বালকের পর

যুবা, যুবার পর সুযোগ্য মানুষ। অগ্নির পর বায়ু, বায়ুর পর জল, জলের পর জমি, জমির পর মৎস্য, মৎস্যের পর সরীসৃপ, সরীসৃপের পর পশু, পশুর পর মনুষ্য। উন্নতির উপর উন্নতি, তার উপর আরো উন্নতি, তার উপর আরো উন্নতি। বিকাশের পর বিকাশ, তার পর আরো বিকাশ, তার পর আরো বিকাশ। ক্ষুদ্র জগতের উপর বড় জগৎ, তার উপর আরো বড় জগৎ, তার উপর আরো বড় জগৎ। ইহাই কোকিলের পঞ্চস্বরে ব্যক্ত হইতেছে, সুমধুর শব্দে ধ্বনিত হইতেছে, অপূর্ব্ব সঙ্গীতরূপে নিনাদিত হইতেছে। উন্নতির পর উন্নতি, বিকাশের পর বিকাশ—ইহাই ত সঙ্গীতের তানের-উপর-তান—সে তানের-উপর-তান কোকিলের পঞ্চম ভিন্ন আর কোথাও শুনা যায় না। কোকিলের পঞ্চম কে কবে বুঝিয়াছে? কোকিলের পঞ্চমের মর্ম্মে মজিতে না পারিলে, ভারতের উন্নতির পর উন্নতি, তার পর আরো উন্নতি, অবশেষে মানুষের প্রাপ্য চরম উন্নতি কখনই হইবে না। প্রার্থনা করি ভারত যেন কোকিলের ন্যায়, ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গীতময় কল্পনার ন্যায়, পঞ্চমে উঠিতে সক্ষম হয়! প্রার্থনা করি আমাদের কোকিলকে আমরা যেন চিনিতে পারি! আমরা যেন কোকিলের পঞ্চমের ন্যায় ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, বৃহত্তর হইতে বৃহত্তমে ফুটিয়া উঠি! আমরা যেন সেই সুমধুর গগনভেদী পঞ্চমের ন্যায় জগৎভরা সঙ্গীত হইয়া পড়ি!

নগরে কেহ কোকিলের কু-উ ধ্বনি শুনিয়াছ? প্রকাণ্ড জনপদ—বিস্তীর্ণ রাজধানী। রাজধানীতে অসংখ্য পল্লী; প্রত্যেক পল্লীতে অসংখ্য রাজবর্ত্ম; প্রত্যেক রাজবর্ত্মে অসংখ্য বাড়ী; প্রত্যেক বাড়ীতে অসংখ্য মনুষ্য। নগর কোলাহলে পরিপূর্ণ। অসংখ্য গাড়ি ঘর্ঘরশব্দে চলিয়া যাইতেছে; অসংখ্য অশ্ব হ্রেষারব করিতেছে; অসংখ্য কল বিষম শব্দে মানুষকে বধির করিয়া দিতেছে। পথে ভিখারী চীৎকার করিতেছে; পণ্যবিক্রেতা হাঁকিতেছে; যানবাহকেরা গোলমাল করিতেছে; কেহ গান ধরিয়া উঠিতেছে। কোথাও বালক কাঁদিতেছে, প্রহরী তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, শববাহক হরি হরি ধ্বনি করিতেছে। মানুষ গাড়ির উপর পড়িতেছে, গাড়ি মানুষের উপর পড়িতেছে, মানুষ মানুষের ঘাড়ে পড়িতেছে। সমস্তই কোলাহল, সমস্তই গোলমাল, সমস্তই বিশৃঙ্খলা, সমস্তই অনিয়ম—কবির Chaos। এই Chaos, এই গোলমাল, এই বিশৃঙ্খলতার ভিতর কি শুনিলাম?—কু-উ! এখন বুঝিলাম ও কুউ কি। অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র ছুটিয়া বেড়াইতেছে; চারিদিকে উল্কাপাত হইতেছে; সহসা ধূমকেতু দেখা দিতেছে, সহসা কোথায় চলিয়া যাইতেছে; সহসা নক্ষত্র নিবিতেছে, সহসা খসিয়া পড়িতেছে;—কি

বিশাল বিশৃঙ্খলতা! রাজা ভিখারী হইতেছে, ভিখারী রাজা হইতেছে; প্রেমিক পিশাচ হইতেছে, পিশাচ প্রেমিক হইতেছে; দুরাত্মা মহাত্মা হইতেছে, মহাত্মা দুরাত্মা হইতেছে—কি বিষম রহস্য, কি বিকট বিশৃঙ্খলতা! পর্ব্বত সমুদ্রে ডুবিতেছে, সমুদ্র পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যাইতেছে; জনপদ অরণ্য হইয়া যাইতেছে, অরণ্য জনপদে পরিণত হইতেছে; এক প্রকার জীব অদৃশ্য হইতেছে, আর এক প্রকার জীব দৃষ্টিপথে আসিতেছে! কিছুই বুঝা যায় না, যেন সব গোলমাল, সমস্তই বিশৃঙ্খলা। কিন্তু ঐ বিশৃঙ্খলতাময় নগরের কোলাহলভেদী কু-উ ধ্বনি এই ভাবে মন ভরিয়া দিতেছে যে বিশ্বের সমস্ত বিশৃঙ্খলতার মূলে ঐরূপ একটী কু-উ ধ্বনি আছে, যাহা অনিয়ম বলিয়া অবাক্ হইয়া দেখি তাহার অন্তরালে ঐ অপূর্ব্ব কু-উ ধ্বনির ন্যায় একটী অমৃতময় সঙ্গীতধ্বনি অবিরত ধ্বনিত হইতেছে, প্রলয়ের তুফানের তলে মধ্যরাত্রির সুগভীর শান্তির সমতানে সুমধুর কু-উ ধ্বনি হইতেছে। যে সঙ্গীত, যে কবিত্ব হৃদয়ঙ্গম না করিলে মানুষের মন, মানুষের আত্মা বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, নগরবাসী কাল কোকিলের কণ্ঠ হইতে সেই সঙ্গীত, সেই কবিত্ব নিঃসৃত হইতেছে। কোকিলের কু-উ স্বরে বিরহের বিষ নাই—তাহাতে কেবল ব্রহ্মাণ্ডের কবিত্বমূলক দুর্ভেদ্য রহস্যের অপূর্ব্ব গীতিধ্বনি আছে। কোকিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মরূপ সঙ্গীত বা কবিত্বের কাল কবি। অতএব, ভারতসন্তানগণ, কোকিলের কাছে দীক্ষিত হও। কোকিল তোমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে ব্রহ্মাণ্ডের আর কিছু বুঝিতে পার আর নাই পার, ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে অপূর্ব্ব কবিত্ব আছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিও, নহিলে তোমরা মানুষ হইবে না, বিশৃঙ্খল হইয়া বিনষ্ট হইবে। কোকিল তোমাদিগকে ইহাও শিক্ষা দিতেছে যে তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর বিষম বিশৃঙ্খলতা আছে, কিন্তু সে বিশৃঙ্খলতার মূলেও অপূর্ব্ব সঙ্গীত বা কবিত্ব আছে। তোমরা যখন সেই বিশৃঙ্খলতা দূর করিয়া সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত বা কবিত্বে তোমাদের সমস্ত দেহ, প্রাণ, মন, আত্মা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি পুরাইতে পারিবে, তখনই তোমাদের শিক্ষা, তোমাদের স্ফূর্ত্তি (Culture) সম্পূর্ণ হইবে—তোমরা মানুষ হইবে; তার আগে নয়। বসন্তের হাড়জ্বালানে কুৎসিত কোকিলকে গুরু করিয়া তাহার শিষ্য হইতে পারিবে না কি? কাল কোকিল যে কবিত্বের কবি তোমরাও কি সেই কবিত্বের কবি হইতে পারিবে না? না বলিও না, তাহা হইলে তোমাদের বংশমর্য্যাদা বিলুপ্ত হইবে। ব্যাস-বাল্মীকিরূপ কু-উ ধ্বনির প্রতিধ্বনি বলিয়া কেহ তোমাদিগকে চিনিতে পারিবে না।

জাল প্রতাপচাঁদ।

৮

ওগলবি সাহেব আসামী।

কাপ্তেন লিটিল সাহেবের যুদ্ধের পর কলিকাতার ইংরেজি কাগজে তাঁহার বিস্তর প্রশংসা প্রকাশ হইল। ৮ই মে তারিখের হরকরা লিখিলেন যে, সিপাহীদের বুঝিবার দোষে কয়জন লোক আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু "The arrangements and preceedings of this officer (Captain Little) reflect equal credit on his judgement and humanity;" শেষ কথাটি বড় ঠিক!

জালরাজা সম্বন্ধে তাঁহারা কেহ কটু বলিলেন, কেহ রসিকতা করিলেন। কোরিয়ার (Courier) পত্রের সম্পাদক লিখিলেন, "there is a good chance of his closing his eventful career, *an exalted character*। হরকরা তাহার টীকা করিয়া বুঝাইলেন যে, "exalted situation অর্থে বুঝিতে হইবে উর্দ্ধে ঝুলন। জালরাজা শেষে উর্দ্ধে ফাঁসি কাটে ঝুলিবেন।" লোকে ভাবিল বিচার বটে! খুন করিল কোম্পানীর সিপাহী, ফাঁসি যাইবে জালরাজা।

এই সময় কে একজন, সম্পাদকদের ধমক দিয়া, হরকরায় লিখিলেন যে আমি বিশেষ জানি সে রাত্রে নৌকার নর্দ্দামা দিয়া রক্ত গড়াইয়া গঙ্গায় পড়িয়াছিল—ঘুমন্ত লোকের রক্ত—তোমরা তাহা ভুলিয়া কেবল কাপ্তেনের প্রশংসা করিতেছ, মেজেষ্টরের প্রশংসা করিতেছ, এই ঘটনা যদি আজি ইংলণ্ডে হইত, তাহা হইলে সেখানকার সম্পাদকগণ কি বলিতেন? এই পত্রের পর সম্পাদকদের সুর একটু যেন ফিরিল, তদারকের নিমিত্ত তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন। ক্রমে ডেপুটি গবর্ণর রস সাহেবের আসন একটু টলিল, তিনি তদারকের হুকুম দিলেন। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে তখন মেজেষ্টারদিগের উপর একজন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, তাঁহার নাম স্মিথ সাহেব। তদারকের ভার সুতরাং তাঁহার উপরেই পড়িল। কিন্তু তিনি অতি প্রধান পদস্থ ব্যক্তি। যখনই কিছু তদারকের প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি একাল পর্য্যন্ত মেজেষ্টারকে তাহার ভার দিয়া আসিয়াছেন। এবারও তাহাই দিলেন। সুতরাং মেজেষ্টার ওগলবি আপনার অপরাধের তদারক আপনি করিতে বসিলেন।

এদিকে কলিকাতায় জয়নারায়ণ চন্দ্র নামক এক ব্যক্তি এফিডেবিড করিয়া সা সাহেবের খালাসের নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টের (writ of Habeas Corpus) পরওয়ানা বাহির করিলেন। কিন্তু সে

পরওয়ানা ওগলবি সাহের গ্রাহ্য করিলেন না। যতক্ষণ কথা হইতেছিল বাঙ্গালির রক্ত নৌকার নর্দ্দামা দিয়া গড়াইয়াছে, ততক্ষণ ওগলবি সাহেবের ন্যায় মেজেষ্টারের নিমিত্ত কোন ইংরেজের ভয় হয় নাই। আর যাই প্রকাশ হইল যে, সুপ্রিমকোর্টের পরওয়ানা এই মেজেষ্টার গ্রাহ্য করেন নাই, আর অমনি হরকরা লিখিলেন যে, তবে আমাদের আর রক্ষা নাই। "The British inhabitants of Bengal will now look with intense anxiety to the course which Sir Edward Ryan may adopt on this occasion. On him will depend in a great measure the degree of protection for life and property and freedom, Europeans *not in the service* may expect. If it be once ruled that a Company's servant can hold a writ of *Habeas corpus* at arm's length, no man is safe."

কিছুদিন পরে মেজেষ্টার সাহেব জামিন লইয়া সা সাহেবকে খালাস দিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিয়াই সা সাহেব ওগলবির নামে বেআইনি কয়েদ রাখার জন্য নালিস করিলেন। এই মোকর্দ্দমার এজাহারে অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সুপ্রিমকোর্টের এটর্নি ও কৌন্সলি মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মফস্বলের অরাজকতা সম্বন্ধে সকলে একবাক্য হইলেন। সকলেই বলিলেন যে, ওগলবির নামে খুনের নালিস আনা উচিত, কিন্তু শেষ স্থির হইল যে, প্রথমে গবর্ণমেণ্ট কি করেন তাহা দেখিয়া পরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মীমাংসা করা যাইবে। পুলিসে যে জোবানবন্দী হইয়াছিল, কৌন্সলিরা তাহার নকল গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন।

স্মিথ সাহেব দেখিলেন যে, গতিক বড় ভাল নহে, সুতরাং বর্দ্ধমানে গিয়া কি একটা রিপোর্ট করিলেন। আমরা তাহা দেখি নাই, কিন্তু সেই রিপোর্ট পাইবার পর গবর্ণমেণ্ট কিছুদিনের নিমিত্ত ওগলবি সাহেবকে সস্পেণ্ড করিলেন। বোধ হয় তাহাতে সুপ্রিম কোর্টের এটর্নি ও কৌন্সলির দল সন্তুষ্ট হইলেন না, তাঁহারা উদ্যোগ করিয়া ওগলবির নামে খুনের নালিস উপস্থিত করাইলেন।

এই স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আমাদের মধ্যে শাক্ত আর বৈষ্ণবে যেরূপ এই সময় দলাদলি ছিল, এদেশে ইংরেজদের মধ্যে কোম্পানীর চাকর আর অপর দলে প্রায় সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। যে সাহেবেরা কোম্পানীর চিহ্নিত চাকর (covenanted servants) তাঁহাদের অহঙ্কার ছিল যে আমরা এদেশের হর্ত্তা কর্ত্তা, আর কোন সাহেব আমাদের সমকক্ষ নহে। সুপ্রিম কোর্টের উকিল কৌন্সলিরা কোন মোকর্দ্দমায় মফস্বল আদালতে আসিলে এই হর্ত্তা

কর্ত্তাদের যথেচ্ছাচারিতার কিছু ব্যাঘাত হইত, এবং তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধিও ধরা পড়িত, সুতরাং তাঁহারা কৌন্সলিদের সুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কোম্পানীর কোন কোন জজ, আপন আপন নির্ভীকতা অথবা যথেচ্ছা ক্ষমতা দর্শাইবার জন্য কৌন্সলিকে কখন কখন তুচ্ছ করিতেন, তাঁহার মক্কেলের সর্ব্বনাশ করিতেন, আইনকানন কিছু মানিতেন না, দেখিতেন না, শুনিতেন না। সুতরাং কৌন্সলিরা চিহ্নিত চাকরদের প্রতি একটু অশ্রদ্ধা করিতেন। অপর সাহেবেরাও বিশেষ সম্ভ্রম পাইতেন না বলিয়া চিহ্নিত চাকরদের প্রতি একটু বিরক্ত ছিলেন।

এই দলাদলির ফল কতকটা এই সময় ফলিয়াছিল। এ দলাদলি না থাকিলে, ওগলবি সাহেব হয় ত মা সাহেবকে কয়েদ করিতেন না, তাহা না করিলে হয় ত কালনার হত্যাকাণ্ড কৌন্সলিদের অন্তস্পর্শ করিত না। কালনার ব্যাপার সম্বন্ধে যাহা কিছু তদারক হইয়াছিল, তাহা কেবল কৌন্সলিদের উদ্যোগে। ওগলবি সাহেব যে খুনের নিমিত্ত আসামী হইয়াছিলেন তাহাও ইঁহাদের যত্নে। নতুবা এই হত্যাকাণ্ড হয় ত গবর্ণমেণ্ট শুনিতেও পাইতেন না।

ওগলবি সাহেবকে কলিকাতার মেজেষ্টার ওহনলন সাহেব দুইলক্ষ টাকার জামিন লইয়া দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন। বিচার সুপ্রিম কোর্টের জজ, সার জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট ১৩ই আগষ্ট তারিখে আরম্ভ হইল। জুরি সকলেই ইংরেজ, কেবল একজন বাঙ্গালি ছিলেন, আসামীর কৌন্সলি তাঁহার প্রতি আপত্তি করায় আর একজন ইংরেজ মনোনীত হইলেন।

আসামী ওগলবি আসিলেন। আর তাঁহার সে তেজ, সে দাম্ভিকতা নাই, মুখখানি শুকাইয়াছে, বড় দুর্ব্বল। পীড়া হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে বসিতে একখানি কেদারা দেওয়া হইল। তাঁহার পক্ষ কৌন্সলি প্রিন্সেপ। ফরিয়াদীর পক্ষে কৌন্সলি লঙ্গবিল ক্লার্ক। ফরিয়াদীর পক্ষ সাক্ষী জোবানবন্দী আরম্ভ হইল।

একজন সাক্ষী জালরাজা। তাঁহাকে দুইজন সার্জন আর মেজেষ্টার সাহেব স্বয়ং সঙ্গে করিয়া আলিপুরের জেলে দিয়া আসিয়াছিলেন। আলিপুর হইতে তাঁহাকে সার্জনের পাহারায় আদালতে আনা হয়। জোবানবন্দীতে তিনি বলেন:—কালনায় একদিন রাত্রে বন্দুকের শব্দে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিল। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী চীৎকার করিয়া বলিল, আমায় গুলি লাগিয়াছে। এই শুনিয়াই আমি জলে ঝাঁপ দিলাম। আমি পালাইতেছি জানিতে পারিয়া সিপাহীরা জলে গুলী মারিতে লাগিল। বন্দুকের আলোক দপ করিয়া উঠে আর আমি ডুব মারি, গুলি আমার চারিদিকে পড়িতে

লাগিল। নৌকায় আমার সঙ্গে ১০ কি ১৫ খানা তরওয়ার, তিনটি কি চারিটি বন্দুক, একটি পিস্তল, দুইটি কি তিনটি বর্শা ছিল। আমার স্বসম্পর্কীয়দের সঙ্গে অসদ্ভাব হইয়াছিল তাহাই আমি পলাইয়াছিলাম, আমি মরি নাই। পীড়ার ভান করিয়াছিলাম। সে সকল অনেক কথা।

জয়নারায়ণচন্দ্র বলিলেন, আমি সা সাহেবের কেরাণী, রাত্রে যখন সিপাহীরা গুলি করে আমি তখন নৌকায় নিদ্রিত ছিলাম। তাহার পর সকালে কলিকাতায় পলাইয়া আসি। নৌকা-যাত্রীদের সঙ্গে তরওয়ার রাখিতে হয়।

ভিকা সিংহ বলিলেন, আমি ৩ নং পল্টনের সুবাদার। গুলি করিবার পূর্ব্বে মারো মারো হুকুম শুনিয়াছি, সে হুকুম কে দিয়াছিলেন বলিতে পারি না, সাহেবেরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখান হইতে এ হুকুম দেওয়া হয়।

এল, এ, মেকলিন বলিলেন, আমি ঐ পল্টনের এনসাইন। কাপ্তেন লিটিল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, প্রতাপকে যেরূপে পারি, জীবিত হউক বা মৃত হউক, গ্রেপ্তার করিব কি না। ওগলবি তাহাতে বলেন, হাঁ যেমন করে পার তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।

বাবু তিওয়ারী বলিলেন, গুলি করিবার পূর্ব্বে মেজেষ্টার সাহেব মারো মারো বলেন, একবার গুলী করা বন্ধ হইলে পর যখন বুঝা গেল রাজা সাঁতার দিয়া পলাইতেছে, তখন মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "ওস্কো গুলীসে মারো" আবার গুলী আরম্ভ হইল। সকল সাহেবের হাতে বন্দুক ছিল, পাদরী সাহেবও গুলী করিয়াছেন আমি দেখিয়াছি। মেজেষ্টার সাহেব প্রথম গুলী করেন।

খোদা বক্‌স হাবিলদার বলে গুলী করিতে আমি পাদরীকে দেখি নাই। হয় ত তিনি গুলী করিয়া থাকিবেন, কিন্তু মেজেষ্টার মারো মারো হুকুম দিয়াছেন তাহা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

কাপ্তেন লিটিল বলিলেন, গুলি করিতে কেহ হুকুম দেয় নাই। সিপাহীরা ভুলে গুলি করিয়াছে, ওগলবি সাহেব গুলী করিতে হুকুম দিয়াছেন এমত আমি শুনি নাই। তিনি, কি ডাক্তার সাহেব, কি পাদরী সাহেব কেহ গুলি করেন নাই। প্রতাপের সঙ্গে তিনশত জন যোদ্ধৃ (fighting men) ছিল। প্রতাপকে ধরিয়া আমার তাঁবুতে রাখিলে পর দুই প্রহর হইতে অস্ত পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ হাজার লোক জমিয়াছিল। তাহারা রাজাকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে নাই, তবে একটু রুক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিল।

ডাক্তার চিক বলিলেন, বর্দ্ধমানের জজ আমাকে ও ওগলবিকে এক একটা করিয়া পিস্তল নিজ হাতে গুলি পুরিয়া দিয়াছিলেন। গুলি করিবার সময় মেজেষ্টার আমার নিকট হইতে দূরে ছিলেন, সুতরাং তিনি কি বলিয়াছেন

না বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনি নাই। পাদরী এলেকজাণ্ডার পূর্ব্বে পল্টনে গোরা ছিলেন।

এইরূপে অনেকে সাক্ষী দিলেন সকল লিখিবার স্থান নাই। বাদীর সাক্ষীর জোবানবন্দী হইয়া গেল। আসামী ওগলবি আপনার জবাব স্বরূপ একখানি বর্ণনা পত্র লিখিয়া আনিয়াছিলেন কিন্তু তাহা তিনি স্বয়ং পাঠ করিতে অসমর্থ হইলেন। হুগলির মেজেষ্টার সাবুওয়াল সাহেব আদালতের অনুমতি লইয়া তাহা পাঠ করিলেন। এই জবাবে আসামী ওগলবি জানাইলেন যে, আমি নির্দ্দোষী। কালনায় যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা কেবল সিপাহীদের দোষে। আমি পল্টন লইয়া গিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা কেবল ভয় দেখাইবার নিমিত্ত। সকলেই জানেন মেজেষ্টারের কার্য্য কি গুরুতর। সকলেই জানেন পরাণ বাবুর কার্য্যদোষে লোকে রাজপরিবারের উপর কতদূর বিরক্ত। এ সময় লোকে জালরাজার পক্ষ হইয়া একটা গোলমাল বাধাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। জালরাজা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে যে হুকুম আমি পাইয়াছিলাম, তাহা দাখিল করা হইয়াছে। আর ওপক্ষে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে যে আমি স্বয়ং গুলি করিয়াছি এবং "মারো মারো" বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে ডাক্তার চীক সাহেব ও কাপ্তেন সাহেবের জোবানবন্দীর পর আমার আর কিছু বলা বাহুল্য। যাহাই হউক যদি কেহ আমাকে এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আমি নিদ্রিত লোকদের সিপাহী দ্বারা হত্যা করাইতে পারি, তাহা হইলে যে দণ্ডবিধান হইবে, আমি শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। *

তাহার পর আসামীর সাক্ষী জোবানবন্দী আরম্ভ হইল। আসাদ আলি নাজির আর মহিবুল্লা দারগা ভিন্ন আর যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই কালনায় উপস্থিত ছিলেন না। এই সকল সাক্ষীর জোবানবন্দী শেষ হইলে পর সার জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব জুরিদের চার্জ দিলেন।

জুরিরা বলিলেন, ওগলবি সাহেব নির্দ্দোষী।

জজ সাহেব ওগলবি সাহেবকে খালাস দিলেন, খালাস দিবার সময় তাঁহাকে বলিলেন যে, "You now stand quite free from all charges and imputations, and if there have been a little error of judgement, you are still most clearly proved to have had no participation whatever in the act itself, which

* উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা জবাবের অনুবাদ নহে, কেবল স্থূল মর্ম্ম মাত্র।

resulted so fatally, and to have been acted throughout by no feeling or motive, other than becomes a gentleman."

সংবাদ পত্রের সম্পাদকের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন যে, কাপ্তেন লিটিলকে আসামী না করা ভুল হইয়াছিল।

৯

সামুয়েল সাহেবের উদ্যোগ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জালরাজা গ্রেপ্তার হইয়া হুগলি প্রেরিত হইলেন। কিন্তু সে সময় তাঁহার কি দুরবস্থা করা হইয়াছিল তাহা বলা হয় নাই, বলিতেও ইচ্ছা নাই। তবে এইমাত্র উল্লেখ করিয়া রাখি যে, জালরাজা আর তাঁহার সঙ্গি রাজা নরহরিচন্দ্রকে দুইখানি মলিন ক্ষুদ্র বস্ত্র পরাইয়া পুলিস দ্বারা দুই চারিবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হইয়াছিল। কিন্তু কে তাহা দেখিবে, গ্রামে কেহই ছিল না। দোকান বন্ধ, হাট বন্ধ, পথে লোকজন আর চলে না, বৃদ্ধা ভিখারিনীরা পর্য্যন্ত কুঁড়ে ফেলিয়া পলাইয়াছিল।

সিপাহী সঙ্গে দিয়া সেই ক্ষুদ্র বস্ত্র পরাইয়া জালরাজাকে পদব্রজে হুগলি পাঠান হইল। কিন্তু প্রতাপ পথে কি আহার করিবে, বোধ হয় ভুলক্রমে তাহার কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। সুতরাং তাঁহাকে নিরাহারে পথ চলিতে হইল। যেখানে সিপাহীরা অন্নপাক করিত, জালরাজা সেইখানে বসিয়া আপনার হাতকড়ি নাড়িতেন, আর দেখিতেন। একদিন একটি সিপাহীর দয়া হইল, সে ব্যক্তি আপনার পয়সায় দুটি চাল আনিয়া দিল, জালরাজা সেদিন অতি গুরুতর আহার করিলেন।

জালরাজা নসরাই নামক স্থানে পৌঁছিলে বিস্তর লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। হরকরার সম্পাদক বলেন আট দশ হাজার লোকের ন্যূন নহে। আমরা শুনিয়াছি তাহাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক প্রতাপের নিমিত্ত অঞ্চলে করিয়া মিষ্টান্ন আনিয়াছিল, দরিদ্রেরা পয়সা আনিয়াছিল, ভিখারিণিরা চাল আনিয়াছিল। তখনও বাঙ্গালা দয়ায় পূর্ণ। আমাদের বহুকালের শিক্ষার ফল এই দয়া। সহস্র পুরুষ ধরিয়া ভক্তি আর দয়া বাঙ্গালায় অভ্যাস হইয়াছিল। মুসলমানের সংস্পর্শে এই সহস্র পুরুষ অর্জ্জিত রত্ন লোপ পায় নাই; বরং সংসর্গপ্রাবল্যে দয়া মুসলমানদের মর্জ্জাগত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ সংস্পর্শে আমরা অনেক মূলধন হারাইয়াছি। আমরা এখন বলিতে অভ্যাস করিয়াছি দয়া a weakness। ভক্তি a weakness। স্নেহ a weakness। সুতরাং যাহা দয়ার বিপরীত, যাহা স্নেহের বিপরীত, যাহা ভক্তির বিপরীত তাহাকে বলি strength of mind। আবার যদি কখন আরও অদৃষ্ট পোড়ে, যদি

এই গরুর পাল হস্তান্তর হয়, তখন হয় ত বলিতে অভ্যাস করিব সত্যবাদ বেওকুফি; মিথ্যাবাদ সিয়াস্তামি; পরদ্রব্য হরণ কর্ত্তব্য কার্য্য, কেন না তাহাতে কখন কখন লাভ আছে।

সে সকল দুঃখের কথা যাক। যাহারা প্রতাপের নিমিত্ত খাদ্য বা পয়সা আনিয়াছিল তাহারা কেহই প্রতাপকে দিতে পারিল না। সিপাহীদের তাড়নায় কেহ তাঁহার নিকট আসিতেও পারিল না।

৫ ই মে তারিখে জালরাজা হুগলীতে পৌঁছিলেন। তথাকার জেলখানায় একটী ক্ষুদ্র ঘরে রক্ষিত হইলেন। একখানি কম্বল পাইলেন, সেখানি নূতন কি পুরাতন, কি অন্য কয়েদির ব্যবহৃত, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না; তবে সংবাদপত্রে কে একজন লিখিয়াছিলেন যে কম্বলখানি নূতন নিশ্চয়ই।

এই সময়ে হুগলীতে সেমুয়াল সাহেব মেজেষ্টর। তিনি ইহার কিছু পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে মেজেষ্টরি করিয়াছিলেন। যখন জালরাজা সন্ন্যাসীবেশে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন তখন তিনি সেখানে ছিলেন। সেই সময় তিনি জাল প্রতাপচাঁদ সম্বন্ধে সবিশেষ সকল কথাই পরাণ বাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন, সুতরাং সেই অবধি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল জালরাজা একজন ভয়ানক জুয়াচোর। এক্ষণে হুগলীতে তাহাকে আপন হাতে পাইয়া বিশেষ ব্যস্ত হইলেন। কোথা হইতে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিবেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে সেই জন্য এখানে সেখানে পত্র লিখিতে লাগিলেন। কথিত আছে তিনি এই নিমিত্ত পরাণ বাবুকে এক পত্র লেখেন। সে পত্রের নকলের জন্য লেষ্টার সাহেবের নিকট জালরাজা দরখাস্ত করেন, নকল প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু সামুয়াল সাহেব তাহা দিতে দেন নাই। তিনি দিনকতকের নিমিত্ত অনুপস্থিত ছিলেন। লেষ্টার সাহেব তাঁহার পরিবর্ত্তে কার্য্য করিতেন।

সামুয়েল সাহেব শুনিয়াছিলেন, গোয়াড়ির শ্যামলাল ব্রহ্মচারীর পুত্র কৃষ্ণলাল বলিয়া একজন পাকা জুয়াচোর ছিল। চার পাঁচ বৎসর অবধি সে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল এক্ষণে সেই ব্যক্তি এই জালরাজা সাজিয়াছে। অতএব তাহার সেনাক্তের জন্য তিনি নদীয়ার মেজেষ্টার হালকেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন। হালকেট সাহেব কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর কতকগুলি প্রতিবাসী পাঠাইয়া দিলেন। সামুয়েল সাহেব তাহাদের সঙ্গে লইয়া জেলখানায় গেলেন। তাহারা জালরাজাকে দেখিয়া তাল সেনাক্ত করিতে পারিল না। সুতরাং সামুয়াল সাহেব বড় চটিয়া গেলেন। জোবানবন্দি না লইয়া তাহাদের ফেরত পাঠাইলেন। আবার হালকেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন। এবার হালকেট সাহেব আপনার নাজীর

পেস্কার সেরেস্তাদার প্রভৃতি বিস্তর আমলা পাঠাইয়া দিলেন। আপনিও একদিন নিজে আসিয়াছিলেন।

সামুয়েল সাহেব আর একখানি পত্র বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরকে লেখেন। তাঁহার কতদূর চেষ্টা ছিল তাহা বুঝা যাইবে বলিয়া আমরা সেই পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। রাজা বৈদ্যনাথের জোবানবন্দী হইয়া গেলে পর এই পত্রখানি লেখা হয়।

Hooghly, Sept 4, 1838.

My dear Dwarkanath,

I was disappointed at your non-arrival, as I think you could speak more decidedly than any of the other witnesses to the man's non-identity, but it is not of much consequence. I have no objection to make a bargain with you. I will let you off altogether, if you will procure me the names of half a dozen good respectable witnesses from Boranagore, who know him as Kristolall. I dare say you could do this through Kali Nath Roy Chowdhery, Mothooranath Mookerji or any of your own servants. Let me know what you say to this. What scoundrel that Buddinath Roy is! If I had known his character, I would rather have gone without evidence altogether than have had his.

Remember I must have the evidence from Boranagore within a week or so. Persuade Mothooranath also to come. His *hormut* and *izzut* shall be *hureck soorut se bahal.*

Yours truly

E. A. Samuells.

সামুয়েল সাহেব বিস্তর সাক্ষী জুটাইয়াছিলেন, তাহাদের জোবানবন্দী হইত কিন্তু তিনি তাহা সাক্ষীদের পড়িয়া শুনাইতেন না। তখন সে প্রথা ছিল না। জালরাজার উকিলেরা বলিতেন যে, সাক্ষীরা যাহা বলিত, তাহা অবিকল লেখা হইত না। তাঁহারা আরও বলিতেন, কোন কোন সাক্ষীর জোবানবন্দী জালরাজার অসাক্ষাতে লওয়া হইত।

হরকরা সম্পাদক একজন রিপোর্টার পাঠাইয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন সামুয়েল সাহেব তাঁহার রিপোর্ট সংশোধন করিয়া হুগলি কালেজের অধ্যাপক সদরল্যাণ্ড সাহেবের দ্বারা তাহা হরকরায় পাঠাইতেন। জালরাজার উকিলেরা বলিতেন, হরকরায় যে জোবানবন্দী প্রকাশ হয়,

তাহা প্রকৃত নহে, তাহা কেবল মেজেষ্টার সাহেবের মনগড়া। ইহা লইয়া অনেক তর্ক হইয়াছিল, নিজামতে দরখাস্তও হইয়াছিল। সামুয়েল সাহেব বলেন, সদরলাণ্ড সাহেবকে তিনি তাঁহার ইয়াদদাস্ত দিতেন মাত্র আর কিছু নহে।*

যাহাদের জাল রাজার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা তাহারাই ফরিয়াদির সাক্ষী। সুতরাং তাহাদের জোবানবন্দি প্রথমে ছাপা হইতে লাগিল। হরকরা হইতে তাহা সমাচারদর্পণে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইতে লাগিল। সামুয়েল সাহেব সেই জোবানবন্দী সর্ব্বত্র প্রচার করিবার নিমিত্ত সপ্তাহে সপ্তাহে কতকগুলি করিয়া সমাচারদর্পণ থানায় থানায় পাঠাইয়া দিতেন, থানার দারগারা তাহা গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু যখন দায়রায় জালরাজার সাপক্ষ সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ভ হইল, তখন আর সেরূপ থানায় থানায় সমাচারদর্পণ পাঠান হইল না। প্রথম জোবানবন্দী পড়িয়া অনেকের ধারণা হইল যে জালরাজা সত্যই জাল, সুতরাং সামুয়েল সাহেবকে এই বিষয়ে লোকে দোষী করিত। তিনি বলেন যে লোকের মনে একটা অসঙ্গত ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত সমাচারদর্পণ আমি দারগা ও জমিদারদিগকে পাঠাইয়া দিতাম। তাহা কোন অন্যায় অভিপ্রায়ে করি নাই।

* এই অপবাদের উত্তরে সামুয়েল সাহেব সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, A silly reporter was deputed by the publisher of that paper (Hurkura) to Hooghly, for the purpose of reporting the proceedings in my Court. The reports which he furnished, however, were so exceedingly incorrect that, Mr. Sutherland now principal of the Hooghly College, who resides with me, and who had formerly been connected with the Hurkura press, requested me to furnish him with my notes, in order that he might correct these reports before they were forwarded. To this, of course, I could have no objection, and the reports which appeared from that time, forwarded in the Hurkura, were the only reports which gave a tolerable idea of the evidence which was given in court. That there were many inaccuracies even in these, is very probable, as Mr. Sutherlands' leisure was not such as to enable him, in most instances, to give more than a general correction.

১০

দায়রা সোপর্দ্দ।

সামুয়েল সাহেব ১ লা সেপ্টেম্বর তারিখে জালরাজার মোকর্দ্দমা আরম্ভ করেন। সেই দিন এজলাসে বসিয়া জালরাজাকে বলিলেন, তুমি আপনার নাম গোপন করিয়া অসৎ অভিপ্রায়ে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্রের নাম ব্যবহার করিয়াছ। সেই জন্য তোমাকে আসামি করা হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া অনেকে অবাক্ হইলেন। হরিবোল হরি! কালনার জমিয়তবস্ত তবে কোন কাজের কথা নহে। তাহা কেবল ছল মাত্র। প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করাই তবে মূল অপরাধ। এ গুরুতর অপরাধের আবার জামিন নাই। খুনের মোকর্দ্দমায় ওগলবি সাহেবের জামিন লওয়া হইয়াছিল। প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করার অপরাধে জামিন লওয়া হইতে পারিল না। খুন অপেক্ষা ইহা গুরুতর অপরাধ। এ অপরাধের নিমিত্ত চারি মাস ধরিয়া হাজতে রাখা হইল।

সামুয়েল সাহেব জালরাজার এই গুরুতর অপরাধ প্রকাশ করিলে জালরাজার উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ফরিয়াদি? মেজেষ্টর উত্তর করিলেন "গবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদি।" আবার সকলে অবাক্ হইল! প্রতাপের নাম ব্যবহার করায় যাহাদের ক্ষতি, তাহারা কেহ নালিস করিল না, পরাণ বাবু নালিস করিলেন না, তবে গবর্ণমেণ্টের কেন এত গরজ পড়িল? কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না, সুতরাং নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। তাহার পর সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ভ হইল।

চিনারি সাহেব দ্বারা প্রতাপচাঁদ নিজের যে প্রমাণ চিত্রপট লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানি বর্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে আনীত হইয়া এজলাসের পার্শ্বে এক ঘরে রাখা হইল। চিনারি সাহেব একজন প্রধান চিত্রকর ছিলেন, তিনি রাজা প্রতাপচাঁদের ছবি লিখিতেছেন এ কথা সাহেব মহলে সকলে শুনিয়াছিলেন। অনেকে সেই ছবি দেখিতে চিনারি সাহেবের বাটী যাইতেন। ছবিখানি বাস্তবিক নির্দ্দোষ হইয়াছিল। প্রতাপচাঁদ চিনারি সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজের দেহ যেমন লম্বা, পটের দেহ যেন ঠিক সেই পরিমাণে লম্বা হয়, দৈর্ঘ্যতায় যেন কিছুমাত্র প্রভেদ না থাকে। পট ঝুলাইবার স্থানানুরোধে বা তাহার দূরতা অনুসারে চিত্রকরেরা দৈর্ঘ্যতার কিছু হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া থাকে, প্রতাপ সেরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই চিত্রপট হুগলির মেজেষ্টরিতে আনীত হইল। অনেকেই বুঝিলেন ছবিখানি এ মোকর্দ্দমায় প্রধান সাক্ষী—

নির্লোভী নিরপেক্ষ সাক্ষী—কথা কহে না, কাহারও মুখ চাহে না। পার্শ্বের ঘরে দাঁড়াইয়া, কাহারও সহিত কথা না কহিয়া ছবি কি বলিল, জজ, মেজেষ্টার তাহা কি বুঝিলেন, সে সকল বৃত্তান্ত ক্রমে লেখা যাইতেছে।*

গবর্ণমেণ্ট আপনার চাকরদের সাক্ষী দিতে পাঠাইলেন। সেক্রেটরি প্রিন্সেপ একজন সাক্ষী, সদর দেওয়ানীর জজ হাচিনসন একজন সাক্ষী, বোর্ডের মেম্বর প্যাটাল একজন সাক্ষী। ঐরাবতী নামক জাহাজ করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সকল সাক্ষীদের মহা সমারোহে হুগলি পাঠাইলেন। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর আপনার জাহাজে করিয়া আর একদিন আসিলেন। এইরূপে ঘটার আর সীমা রহিল না। তিন বিষয়ের সাক্ষী লওয়া হইল। প্রথমত, জালরাজার সেনাক্ত সম্বন্ধে, দ্বিতীয়ত, প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে, তৃতীয়ত, জালরাজা গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল এই সম্বন্ধে। কেবল ফরিয়াদির পক্ষ এই তিন বিষয়ের প্রমাণ লইয়া সামুয়েল সাহেব জালরাজাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিলেন। কিন্তু সোপর্দ্দের সময় একটি চার্জ বাড়াইয়া দিলেন—কালনার অমিয়তবস্তু। এ বিষয়ে কোন সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহার চার্জ হইল।

সামুয়েল সাহেব বর্দ্ধমান হইতে প্রায় সকল আসামীকে আনাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেবল সাতজনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন।

প্রথম, জালরাজা। দ্বিতীয়, মোক্তার রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল, যিনি বর্দ্ধমানে মেজেষ্টারের গেটের নিকট গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তৃতীয়, কাফেম কস্তে উল্লা। চতুর্থ, সাগরচন্দ্র ধর। পঞ্চম, কালীপ্রসাদ সিংহ। ষষ্ঠ, ঝুমন খাঁ। সপ্তম, রাজা নরহরি চন্দ্র।

কালনা হইতে জালরাজাকে পদব্রজে হুগলি আনা হইয়াছিল, কিন্তু জেল হইতে তাঁহাকে নিত্য পাল্কী করিয়া কাছারি লইয়া যাওয়া হইত। লোকের এত জনতা হইয়াছিল যে, তাহাতে সামুয়েল সাহেবের মত মেজেষ্টারও আসামীকে হাঁটাইতে সাহস করেন নাই। জেল হইতে কাছারি পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বের ছাদে স্ত্রীলোকেরা,

---

* Some curious evidence transpired concerning the "Portrait" that novel mute witness. * * The prosecution certainly seem to have unwittingly subpoenaed, in this portrait, a rather *hostile witness.* * * Long odds in favor of the Rajah and no takers. Prawn Babu is quite a *dark* horse, however; and may prove a winner.—*Hurkura 5th September* 1838.

গাছে পুরুষেরা বসিয়া থাকিত—কতক্ষণে রাজা যাইবেন। কাছারির চতুষ্পার্শ্বের ত কথাই নাই। কত লোক পিয়াদার পোষাক পরিয়া সাক্ষীর জোবানবন্দী বলিয়া বেড়াইত আর পয়সা উপার্জ্জন করিত।

১১

দায়রার বিচার।

এ মোকর্দ্দমা বিচারের নিমিত্ত ২০শে নবেম্বর দিন ধার্য্য ছিল, এবং সাক্ষীদিগকে সেই দিনে উপস্থিত হইতে আদেশ হইয়াছিল, কিন্তু কি গতিকে বলা যায় না, তাহার পূর্ব্বদিনে মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। সাক্ষীরা আইসে নাই, কিন্তু অপর কার্য্য হইল। জজ সাহেবের নাম কার্টিস।

গবর্ণমেণ্ট, প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে বিগনেল নামে একজনকে পাঁচশত টাকা বেতনে ডিপুটি লিগল রিমেম্ব্রেন্সার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিগনেল সাহেব বড় বুদ্ধিমান, হ্যালিডে সাহেবের বিশেষ অনুগৃহীত। তাঁহাকে এই মোকর্দ্দমায় দায়রায় গবর্ণমেণ্ট পক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত হ্যালিডে সাহেব পাঠাইয়া দিলেন। তিনি এই ১৯শে তারিখে আসিয়া উপস্থিত হন।

সেই দিন পত্রের দ্বারা কৌন্সলি মর্টন সাহেব জালরাজার পক্ষ সমর্থন করিবার অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। জজ সাহেব সে পত্র পাইয়া ফরিয়াদির উকিল বিগনেল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অনুমতি দেওয়া যাইবে কি? বিগনেল উত্তর করিলেন যে, এ বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে গবর্ণমেণ্ট নিষেধ করিয়াছেন। জজ সাহেব তখন মর্টন সাহেবকে অনুমতি পাঠাইলেন, তাহার পরেই মর্টন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল।

আসামীর কৌন্সলি জজ সাহেবকে জানাইলেন যে, আসামী শারীরিক কিছু অসুস্থ, অতএব ইহাকে বসিবার আসন দিতে অনুমতি করিলে ভাল হয়। জজ সাহেব কেদারা দিতে হুকুম দিলেন।

ফৌজদারি হইতে এই মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত যে রোবকারি আসিয়াছিল, তাহা মনসারাম দেওয়ানজি ১১টার সময় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দেড়টার সময় তাহা পড়া শেষ হইল। তাহার পর সাক্ষীর জোবানবন্দী যাহা মেজেষ্টার পাঠাইয়াছেন, তাহাও দেওয়ানজি মহাশয় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। জজ সাহেব বলিলেন, এখানে জোবানবন্দী লওয়া হইবে, সুতরাং সাবেক জোবানবন্দী আর পড়া অনাবশ্যক। বিগনল সাহেব তাহাতে সম্মতি দিলেন, দেওয়ানজি শ্রীযুক্ত মনসারাম মহাশয় বলিলেন, তাহা হইতে পারে না; এ সমুদয় পাঠ করা আবশ্যক। ফৌজদারির সমুদয় কাগজ পত্র না পড়িলে আসামীদের ফেরেবি কিরূপে বুঝা যাইবে।

জজ আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না, দেওয়ানজির যাহা ইচ্ছা তাহা সমুদয় পড়িয়া শুনাইলেন।

তাহার পর চার্জ পড়া হইল। [১] আলক সা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী, মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করিয়াছে। [২] সেই নাম ব্যবহার করিয়া ত্রেঝরির দেওয়ান্ রাধাকৃষ্ণ বসাককে ঠকাইয়া তাহার টাকা লইয়াছে ও [৩] বেআইনিরূপে কালনায় বিস্তর লোক জমিয়তবস্ত করিয়াছে।

আসামী নিরপরাধী বলিয়া জবাব দিল।

সে দিবস আর কোন কার্য্য হইল না।

এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে জালরাজা একখানি লিখিত জবাব দিয়াছিলেন। দুই দিন পরে (২১শে নবেম্বর) সেই সম্বন্ধে কথা উঠিল। জজ সাহেব বলিলেন যে জালরাজার একটা আপত্তি সঙ্গত, আমার বোধ হয়। এই মোকর্দ্দমা দেওয়ানির বিচার্য্য, ফৌজদারির নহে। অন্ততঃ জুরি কিম্বা আর একজন জজের সঙ্গে বসিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি কি করিব? আমার আপত্তি আমি গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্ট তাহা শুনেন নাই, সুতরাং আমার উপর যেরূপ হুকুম আমি তাহাই করিতে বাধ্য।

আর এক কথা। ডাক্তার হ্যালিডে বর্দ্ধমানে রাজবাটীর চিকিৎসক ছিলেন, তিনি অনেকবার প্রতাপচাঁদের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, একবার তাঁহার উরুস্তম্ভ অস্ত্র করিয়াছিলেন। সুতরাং ডাক্তার হ্যালিডে আসামীর একজন প্রধান সাক্ষী, তাঁহাকে হাজির করিবার নিমিত্ত আসামী সপিনা জারি করাইল। ডাক্তার সাহেব তখন কাশীতে থাকেন, তাঁহার আসিতে বিস্তর ব্যয় এবং বেতন ক্ষতি, সুতরাং তিনি লিখিলেন যে, আমার খরচ অগ্রিম পাঠাইলে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি। জালরাজার তখন এক পয়সার সঙ্গতি নাই, কেহ আর তাঁহাকে কর্জ্জ দেয় না। তিনি টাকা পাঠাইতে না পারিয়া জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলেন যে, ফৌজদারী আদালতের সাক্ষী অন্য মোকর্দ্দমায় যেমন বিনা খরচে হাজির করা হইয়া থাকে, যেমন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সাক্ষীদের এ মোকর্দ্দমায় হাজির করা হইতেছে, আমার পক্ষ এই সাক্ষীকে সেইরূপে হাজির করা হউক। ডাক্তার হ্যালিডে গবর্ণমেণ্টের চাকর, গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিলেই তিনি আসিতে বাধ্য হইবেন। জজ সাহেব সে দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মনোযোগী হইলেন না। নিজামতে দরখাস্ত করা হইল, সেখানকার জজেরাও তাহা শুনিলেন না। জালরাজা তখন নিরুপায় হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, আমার নৌকায় যে সকল দ্রব্যাদি ছিল তাহা অবশ্য রাজকর্ম্মচারীরা কোম্পানীতে দাখিল করিয়া থাকিবেন, সেই সকল দ্রব্যাদির কিয়দংশ নিলাম

করিয়া হ্যালিডে সাহেবকে পথ খরচ পাঠান হউক। এ প্রার্থনায় কেহ উত্তর দিলেন না। কমিসন দ্বারা তাঁহার জোবানবন্দী লইবার প্রার্থনা করা হইল। জজ সাহেব বলিলেন, কমিসন বাঙ্গালি সাক্ষীর পক্ষ হইতে পারে, ইংরেজের পক্ষে নহে।

কোম্পানির পক্ষ সাক্ষীদের উপস্থিত করিবার জন্য সপিনায় লেখা থাকিত, যদি ধার্য্য দিনে কোন সাক্ষী অনুপস্থিত হয়, তাহার এত টাকা দণ্ড হইবে। কিন্তু জালরাজার সাক্ষীদের হাজির করিবার জন্য এরূপ দণ্ডের কোন কথা থাকিত না, কেহ অনুপস্থিত হইলে তাহাকে হাজির করিবার নিমিত্ত কোন উপায় করা হইত না। যাঁহারা আপনা হইতে উপস্থিত হইয়াছিলেন বরং জজ সাহেব তাঁহাদের কটুক্তি করিতেন। বিষ্ণুপুরের রাজা সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আপনি আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে "গাধা" বলিয়া গালি দেওয়া হইয়াছিল। তেলিনীপাড়ার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সাক্ষীর তালিকায় ছিল, তিনি নিত্য হুগলীতে গাড়ি করিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু সাক্ষ্য দিতেন না। জালরাজার উকিল তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন "যেরূপ দেখিতেছি সাক্ষ্য দিতে আমার সাহস হয় না। আমি এই জেলায় বাস করি, আমার জমিদারি বিষয় আশয় সমুদয় এই জেলায়, শেষ কি বিপদে পড়িব? এইরূপ অনেকে ভয় পাইয়াছিলেন, সুতরাং অনেকে উপস্থিত হইলেন না।

২০শে নবেম্বর হইতে সাক্ষী জোবানবন্দী আরম্ভ হইল। ফরিয়াদির পক্ষ যে সকল সাক্ষীরা মেজেষ্টরীতে জোবানবন্দী দিয়াছিলেন তাঁহারাই আবার দায়রায় জোবানবন্দী দিলেন কিন্তু কিছু সংক্ষেপে। আমরা সেই জন্য মেজেষ্টরীতে যে জোবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল নিম্নে তাহারই স্থূল মর্ম্ম লিখিলাম। দায়রায় অতিরিক্ত কেহ কিছু বলিয়া থাকিলে তাহাও উল্লেখ করিলাম। আসামীর সাক্ষী সম্বন্ধে যে জোবানবন্দী নিম্নে দেওয়া হইল তাহা দায়রায় লওয়া হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদ, সত্য কি জাল?

গবর্ণমেণ্টের সাক্ষী।

ট্রাওয়ার সাহেব (*C. T. Trower*) বলিলেন আমি ১৮০৮ সাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের কালেক্টর ছিলাম। প্রতাপকে বিলক্ষণ চিনিতাম। অপর ঘরে যে ছবি আছে, তাহা দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে, কিন্তু এই আসামীকে দেখিলে প্রতাপকে মনে পড়ে না। যতদূর আমার স্মরণ হয়, তাহাতে এ ব্যক্তিকে কোন মতেই প্রতাপ বলিয়া বিশ্বাস হয় না। প্রতাপের চক্ষু কটা ছিল, এ ব্যক্তির চক্ষু কাল। ডাক্তার হ্যালিডে প্রতাপের

চিকিৎসা করিতেন। একবার প্রতাপের উরুস্তম্ভ হয়, হালিডে তাহা অস্ত্র করেন। কিন্তু সেই হ্যালিডে আমায় বলিয়াছিলেন যে, এই আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ। হ্যালিডে এখন কাশীতে আছেন। এই সাক্ষী দায়রায় বলিলেন যে আসামি কোন ক্রমেই রাজা প্রতাপচাঁদ নহে।

প্রিন্সেপ সাহেব (*H. T. Prinsep*, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি) বলিলেন আমি প্রতাপকে চিনিতাম, ১৯ বৎসর কি ২০ বৎসর যাহাকে দেখি নাই তাহার আকৃতি যেরূপ স্মরণ থাকে প্রতাপের আকৃতি আমার সেইরূপ স্মরণ আছে। আসামীকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া বোধ হয় না। (I should say that he was not Protap Chunder) প্রতাপ বেঁটে ছিলেন, এ লোকটা লম্বা। অপর ঘরে যে ছবি দেখিয়াছি তাহা প্রতাপের। সে ছবির সঙ্গে এই ব্যক্তির কোন সাদৃশ্য নাই। প্রতাপের নাক চোক কিরূপ ছিল তাহা আমার স্মরণ নাই। দায়রায় বলেন যে জেনেরল আলার্ড ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া আসিলে পর আমায় একদিন বলিয়াছিলেন, লাহোরের নিকট আসামীর সঙ্গে তাঁহার অনেক দিন হইল একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আসামী তখন ফকিরের বেশে বেড়াইতেন।

প্যাটল সাহেব (*James Pattle*, বোর্ডের মেম্বর) বলিলেন ১৮১৩ সালে আমি কলিকাতায় যাই। প্রতাপ আমার সহিত দেখা করিতে সেখানে যাইতেন, কয়বার গিয়াছিলেন স্মরণ নাই। যে ছবি দেখিলাম, তাহা যদি প্রতাপের হয়, তবে প্রতাপের আকৃতি আমার আর কিছুমাত্র স্মরণ নাই। ঐ ছবির সঙ্গে আসামীর কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম না।

হাচিনসন সাহেব (*Mr. Hutchinson*) বলিলেন আমি সদর দেওয়ানী আদালতের জজ। পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের একটীং জজ ছিলাম। আসামীকে আমি চিনি না। এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ নহে। এ ব্যক্তি অনেক লম্বা ও স্থূলকায়। ইহার সঙ্গে প্রতাপের ছবির সাদৃশ্য নাই। তবে বুক হইতে উপরদিকে কতক মেলে। প্রতাপের মৃত্যুর পূর্ব্বে ডাক্তার কোণ্টারের নিকট শুনিয়াছিলাম, প্রতাপের জর হইয়াছিল। দায়রায় এই সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই, তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

বিচর সাহেব (*John Becher*) বলিলেন আমি একজন হাউসওয়ালা। আমি প্রতাপকে চিনিতাম। তাঁহার আকৃতি আমার কিছু স্মরণ নাই। ছবি দেখিয়াও তাঁহার আকৃতি আমার স্মরণ হইল না। তবে এই ছবির সঙ্গে আসামীর সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। মাপিয়া দেখিলাম ছবির প্রতাপ আর আসামী প্রতাপ একইরূপ লম্বা। দায়রায় অনুপস্থিত।

ওবারবেক সাহেব (*D. A. Overbeck*) বলিলেন আমি এক্ষণে চুচুড়ায়

থাকি। দিনামারের আমলে আমি চুচুড়ার গবর্ণর ছিলাম। আমি এই আসামীকে চিনি না। (তাহার পর অপর ঘরে প্রতাপের ছবি দেখিয়া আসিয়া বলিলেন) এখন আমি আসামীকে চিনিলাম, ইনি আমার পূর্ব্বপরিচিত ছোট রাজা। ছবির আকৃতি আর আসামীর আকৃতি স্পষ্ট একই রূপ। দায়রায় এই সাক্ষী বলিলেন যে, পূর্ব্বে জেলখানায় ও মেজেষ্টারিতে আমি এই আসামীকে দেখিয়াছি, আমি তখন ইহাকে জুয়াচোর মনে করিয়াছিলাম, আমি প্রতাপকে বিশেষ জানিতাম। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পরে আমি শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ চক্ষের বামভাগে মেহগনি রঙ্গের একটি ক্ষুদ্র দাগ ছিল, তিনি ঊর্দ্ধে চাহিলে সেটি দেখা যাইত, এই আসামীর ঠিক সেইখানে সেই দাগ আছে, তবে একটু যেন বর্ণের ঘোর কমিয়াছে। এরূপ দাগ কাহার চক্ষে আর কখন দেখি নাই। শুনিয়াছি একবার গবর্ণর জেনারেলের একজন এজেণ্ট গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলেন যে, রাজা প্রতাপচাঁদ সেই রেসিডেন্সিতে বাস করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট সে বিষয় রাজা তেজচন্দ্রকে লেখায় তিনি উত্তর করেন, আমি প্রতাপকে মরিতে দেখি নাই। এই চিঠির কথা প্রকৃত কি না তাহা গবর্ণমেণ্টের কাগজ খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে।

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বলিলেন, প্রতাপচাঁদের সঙ্গে আমার বড় বন্ধুতা ছিল, তিনি ওয়াটর্লুর যুদ্ধের পর একবার কলিকাতায় রোসনাই দেখিতে আসিয়া আমার বাটীর নিকট কান্ত বাবুর বাটীতে ছিলেন, সেই সময় আমার সঙ্গে তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। তিনি গবর্ণমেণ্ট হাউসের রোসনাই দেখিতে যান, আমি তাঁহার সঙ্গে যাই। প্রতাপ কখন কলিকাতার তাঁতি কি বেনের বাড়ী যান নাই, তিনি কেবল আপনার সমযোগ্য লোকের বাড়ী যাইতেন। রাজা গোপীমোহন আর আমার বন্ধু রামমোহন রায়ের বাটী যাইতেন। আমি এই আসামীকে চিনি না, এ ব্যক্তি নিশ্চয় প্রতাপ নহে। ওগলবির মোকর্দ্দমায় যখন এই আসামী সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষী দিয়াছিল, তখন আমি ইহাকে দেখিয়াছিলাম, ঐ সময় আমাকে এ ব্যক্তি চিনিয়াছিল, কিন্তু এ ব্যক্তি আমাকে চিনিলে কি হইবে, আমি ত উহাকে চিনি নাই। ওয়াটর্লু লড়াইয়ের সময় হইতে আমার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে, তাহার পূর্ব্বে যে আমায় দেখিয়াছে, সেই আমায় চিনিতে পারে। মেজেষ্টার সাহেব আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নকল কে চুরি করিয়া আনিয়াছে। আমি সে চোর ধরিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। (চিঠি সম্বন্ধে কথাগুলি

সাক্ষী বিনা সওয়ালে বলিলেন) দায়রায় আসিয়া বলিলেন যে, প্রতাপের ছবি এই আদালতে দেখিলাম, তাহার সঙ্গে এই আসামীর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। আমি ঠিক বলিতে পারি না যে এ আসামী প্রতাপচাঁদ কি না, তবে আমার বোধ হয় ইনি প্রতাপচাঁদ নহেন।

রাজা বৈদ্যনাথ রায় বলিলেন, প্রতাপের সঙ্গে আমার দুইবার সাক্ষাৎ ছিল, একবার গবর্ণর জেনরলের দরবারে, আর একবার একটা বিবাহ বাটীতে। সেখানে প্রতাপ ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন। এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ নহে। আমি কাহারও নিকট বলি নাই যে ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ। (রাজা বৈদ্যনাথ আদালতের বাহিরে আসিলে লোকে তাহার গাত্রে ধূলা দিয়াছিল, এ সাক্ষীকে আর দায়রায় তলব হয় নাই, বরং তাঁহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার নিমিত্ত দণ্ড দিবার পরামর্শ হইয়াছিল।)

হারক্লটস সাহেব (*Gregory Herclots*) বলিলেন, আমি হুগলীর সদর আমিন ছিলাম। দুই তিনবার প্রতাপকে দেখিয়াছি, এখন দেখিলে বোধ হয় তাঁহাকে চিনিতে পারি। এই আসামী প্রতাপ নহে। কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া তাহা বলিতে পারি না। দায়রায় বলিলেন, এই আসামীকে মৃত প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা এক ইঞ্চ লম্বা দেখায়।

রাধাকৃষ্ণ বসাক বলিলেন, আমি এই আসামীকে অনেক টাকা কর্জ্জ দিয়াছি। কত তাহা হিসাব নিকাশ না করিয়া বলিতে পারি না। ষোল হাজার হইবে। ইহাকে সত্যই প্রতাপচাঁদ মনে করিয়া আমি টাকা দিয়াছি, ইহাকে আমি নিজে চিনিতাম না। কেবল লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া টাকা দিয়াছি। রাজা গোপীমোহন দেব বলিয়াছেন ইনি নিশ্চয় প্রতাপচাঁদ। গোপীমোহন এখন মরিয়াছেন। গোপীমোহন তাঁহার লোকের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন যে, এ ব্যক্তি সত্যই প্রতাপচাঁদ। ডাক্তার হ্যালিডে আমার নিকট বলিয়াছেন, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ। এই সকল লোকে বলায় তবে আমি টাকা দিয়াছি। তদ্ভিন্ন জেনারেল এলার্ড* আমায় বলিয়াছেন, তাঁহার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাঁহার সঙ্গে আলাহাবাদে এই আসামীর সাক্ষাৎ ছিল। আমি একা ইহাকে টাকা কর্জ্জ দিই নাই, আরও অনেকে দিয়াছেন, দুই একজন ইংরেজও দিয়াছেন। দায়রায় উপস্থিত হইয়া এই সাক্ষী বলিলেন যে, রাজা বৈদ্যনাথের সঙ্গে এই আসামীকে হুগলীর জেলে দেখিতে

* জেনেরল এলার্ড মহারাজা রঞ্জিত সিংহের সৈনাধ্যক্ষ ছিলেন।

আসিয়াছিলাম। আমি ছয় মাস ইহাকে কলিকাতায় আমার আপনার বাটীতে রাখিয়াছিলাম, সেখানে ডাক্তার হালিডে একদিন আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে ইনি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

রাধামোহন সরকার, যাঁহার সঙ্গে পরাণ বাবু এক দল লাঠিয়াল কালনায় পাঠাইয়াছিলেন, গঙ্গাজল হাতে করিয়া বলিলেন যে, প্রতাপচাঁদের সঙ্গে এই আসামীর বিস্তর প্রভেদ। প্রতাপচাঁদ দেখিতে বিক্রমাদিত্যের মত ছিলেন, আর এ লোকটা দেখিতে যেন ভিকে হাড়ি। এ লোকটার হাত পা বড়, শরীর লম্বা, বর্ণ কাল, ছবির সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। আমি এখন রাজবাটীর দেবত্তর মহলের মোক্তার। আগা আব্বাস নামে কোন মোগল কস্মিন্‌কালে প্রতাপচাঁদের চাকর ছিল না।

বসন্তলাল বাবু বলিলেন, আসামীকে আমি চিনি না। ইহাকে একবার বাঁকুড়ার মেজেষ্টারীতে দেখিয়াছিলাম, তখন ইহার দাড়ি ছিল। এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ নহে। আমি এক্ষণে রাজবাটীর খাস দপ্তরে কর্ম্ম করি। পরাণ বাবুর পুত্র তারাচাঁদ আমার নাতিনীকে বিবাহ করিয়াছেন। দায়রায় বলিলেন, আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা লম্বা, বয়স অল্প। বাঙ্গালা ১১৯৭ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রতাপ জন্মগ্রহণ করেন।

মোহনলাল বাবু বলিলেন, আমি রাজবাটীর হাতীশালার দারগা। এই আসামী প্রতাপচাঁদ নহে। দায়রায় বলিল, রাজা প্রতাপের সঙ্গে আসামীর, বয়সে, বর্ণে, দৈর্ঘ্যে, আকৃতিতে, গঠনে, কি কোন বিষয়ে সাদৃশ্য নাই।

ভৈরবনাথ বাবু বলিলেন, আমি প্রতাপচাঁদকে দুই তিনবার দেখিয়াছি, এ আসামী প্রতাপচাঁদ নহে। আমি রাজবাটী হইতে তঙ্কা পাই। দায়রায় বলিল, আমি পরাণ বাবুর ভগিনী বিবাহ করিয়াছি, পরাণ বাবুও আমার ভগিনী বিবাহ করিয়াছেন।

নন্দলাল বাবু বলিলেন, আসামী প্রতাপচাঁদ নহে। আমি রাজসরকারে কর্ম্ম করি। দায়রায় বলিল, পরাণ বাবু আমার কুটুম্ব।

এইরূপ আর কয়েকজন জোবানবন্দী দিলেন, তাঁহারা রাজবাটীর সাক্ষী।

আসামীর সাক্ষী।

ডাক্তার স্কট সাহেব [*Robert Scott, 37th Madras Native Infantry*] বলিলেন, আমি ১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলাম, আমি রাজা প্রতাপচাঁদকে ভাল চিনিতাম, তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ। জেলখানায় গিয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গের চিহ্ন বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, সকল চিহ্ন মিলিয়াছে। ১৮১৭ সালে ইহার গালের

ভিতর একখানি ঘা হইয়া সোড় হয়, আমি তাহা ভাল করি। সে ঘার দাগ রহিয়াছে। অন্য লোকে মুখে ঘার দাগ করিতে পারে সত্য, কিন্তু ঠিক সেই স্থানে সেইরূপ দাগ করিতে কেহই পারে না। প্রতাপচাঁদ শীত-কালেও ঘামিতেন, আসামীও সেইরূপ ঘামে। আর প্রতাপের মত ইহার হাসি, কথা কহিবার পূর্ব্বে প্রতাপের মত কণ্ঠ পরিষ্কার করা ইহার অভ্যাস। প্রতাপের মত ইহার বসিবার ভঙ্গি। প্রতাপ আমার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা কহিতেন, কিন্তু আসামী তেমন কহিতে পারিল না দেখিয়া আমি হেতু জিজ্ঞাসা করায় বলিল, আর অভ্যাস নাই। তাহা হইতে পারে। আমি পূর্ব্বে বিলক্ষণ হিন্দী বলিতে পারিতাম, কিন্তু দুই বৎসর বিলাতে থাকিয়া আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। পূর্ব্বের কথা দুই একটা আসামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তখনকার জজ মার্টিন সাহেবের নাম ব্যতীত আর কোন সাহেবের নাম করিতে পারিল না। আমি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে আমি কি করিয়া বেড়াইতাম? আসামি বলিল একটি পিস্তল লইয়া পথে পথে কুকুর মারিয়া বেড়াইতে। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সময় দেওয়ানী জেলে কি একটা গোলমাল হইয়াছিল? আসামি উত্তর করিল, বুলার সাহেব রঘু বাবুকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন, রঘু বাবু বিষ খাইয়া মরিয়াছিলেন। তুমি তাহার দেহ চিরে বিষের কথা বলিয়াছিলে। এ সকল কথাই সত্য। প্রতাপ মেদেরা মদ খাইতেন, আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করায় আসামি বলিল আমি আর মদ খাই না, তবে ব্রাণ্ডি ভাল বাসি। আমি যখন বর্দ্ধমানে ছিলাম, তখন সেখানে ট্রাওয়ার (Trower) সাহেব থাকিতেন, আমি তাঁহার পুত্রদের চিকিৎসা করিতাম। সেদিন আমি তাঁহার আপিসে গিয়াছিলাম, তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না; তাঁহার স্মরণশক্তি অতি সামান্য।

রিডলি [John Ridley] বলিলেন, আমি প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম, আমি ১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলাম। এই আসামী রাজা প্রতাপ চাঁদের মত। আমি ইহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইনি সে সকল কথার যথার্থ উত্তর দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনার নিকট কখন কিছু আমি বিক্রয় করিয়াছিলাম কি না? আসামী বলিলেন যে, একবার একটি সোণার ঘড়ি বিক্রয় করিয়াছিলে। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রাজবাটীর সিপাহীদের সঙ্গে প্রোবিনসাল্ সিপাহীদের যে বিবাদ হয়, তাহা কিরূপে মিটিয়াছিল? তাহাকে আসামী বলেন, রেবিনিউ বোর্ড হুকুম দেন যে, রাজবাটীর

সিপাহীরা সবুজ পোষাক পরিবে, তাহাতেই সে বিবাদ ভঞ্জন হয়। এ সকল প্রকৃত কথা।

বিবি হেরিয়াট কিটিং বলিলেন, আমি প্রতাপচাঁদকে বিশেষরূপে চিনিতাম, আসামী সেই প্রতাপচাঁদ। আমার বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন আমি ইহাকে অনেকবার আমার পিতার বাটীতে ও অন্যত্রে দেখিয়াছি।

বিবি সফিয়া ক্রেন বলিলেন, আমি প্রতাপচাঁদকে ভালরূপে জানিতাম, আসামী নিশ্চয় প্রতাপচাঁদ।

জন মার্শাল বলিলেন, আমি ৭১ নং সিপাহীপল্টনের ব্রিবেট মেজর। আসামী প্রতাপচাঁদ কি না তাহা আমি জানি না, তবে ২০ বৎসর কি ততোধিক হইল, ইহার সঙ্গে ওবারবেক সাহেবের বাটীতে ও অন্যত্রে আমার সর্ব্বদা সাক্ষাৎ ছিল। ইহাকে আমরা ছোট রাজা বলিতাম। ইহার অন্য কোন নাম যদি তখন শুনিয়া থাকি, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। কতবার ইহাকে দেখিয়াছি, তাহা আমার মনে নাই। বোধ হয় ১৮২০ সালের পর আর আমি ইহাকে দেখি নাই। তাহার পর ওগলবির মোকর্দ্দমার সময় সুপ্রিম কোর্টে ইহাকে সাক্ষী দিতে দেখি, দেখিয়াই তখন স্মরণ হইল যে, এ ব্যক্তি আমার আলাপী, কোথায় দেখিয়াছি। স্মরণ করিবার নিমিত্ত ইহার মুখের ছবি আমি আমার প্যান্টুলনে আঁকিয়া লইলাম, সেই ছবি ইংলিসম্যান কাগজে প্রকাশ হয়। তখন আমার বোধ হইয়াছিল, এ ব্যক্তি জুয়াচোর, ইহাকে আমি পশ্চিমে কোথায় দেখিয়া থাকিব। তাহার পর গত কল্য ওবারবেক সাহেবের বাটীতে আহার করিতে করিতে এই ব্যক্তির কথা উপস্থিত হয়, তিনি ছোট রাজার সংক্রান্ত দুই একটি ঘটনা বলিলেন, আমার তখন সকল স্মরণ হইল, ছোট রাজাকে মনে পড়িল। আসামী বর্দ্ধমানের রাজা বলিয়া পরিচয় দিতেছে, আমি তাহা জানিতাম, কিন্তু চুচুড়ায় যাঁহাকে আমরা ছোট রাজা বলিতাম, তিনিই যে বর্দ্ধমানের রাজা তাহা আমি জানিতাম না।

ফ্রানসুয়া সুলিমান, সাং চন্দননগর, জাতি ফরাসিস, বলিলেন, আমি প্রতাপচাঁদকে চিনি, আমি সর্ব্বদাই চুচুড়ায় যাইতাম, সেখানে প্রতাপচাঁদকে দেখিয়াছি। একবার নীলকুঠী ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আট দশবার যাতায়াত করিয়াছিলাম। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ। অদ্য আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমাকে ইনি চিনিতে পারিলেন এবং নীলকুঠী বিক্রয় সম্বন্ধে কথা বলিলেন।

হাজি আবু তালেব, চুচুড়ার একজন মোগল, সওয়াল মতে বলিলেন, আমি প্রতাপচাঁদকে ভালরূপে চিনিতাম। আসগর আলি নামে একজন হাকিম

তাঁহার বাটীতে থাকিত, আমি রাজবাটীতে গিয়া সেই আসগর আলির নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র শিখিতাম। সুতরাং প্রতাপচাঁদকে বিলক্ষণ চিনিতাম। কিছুকাল পরে আমি লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলাম, তথা হইতে আসিয়া শুনিলাম, রাজা মরিয়াছেন, কিন্তু আসগর আলি এবং অন্যান্য লোক আমায় বলেন যে, রাজা মরেন নাই, পলাইয়াছেন। এই আসামী সেই রাজা। আমি পূর্ব্বে রাজার চক্ষে যে দাগ দেখিয়াছিলাম, আসামীর চক্ষে সেই দাগ দেখিয়াছি।

ডাক্তার জুলিয়ান নইটার্ড,সাং ফরাসডাঙ্গা, ফরাসি ভাষায় জোবানবন্দী দিলেন:—আমার বয়স ৭৯ বৎসর। আমি এখনও ভাল দেখিতে পাই। এই আসামীকে চিনি, ইনি বর্দ্ধমানের রাজা, ইঁহার নাম স্মরণ নাই, ইঁহাকে আমরা ছোট রাজা বলিতাম। আমি সেদিন জেলখানায় ইঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, আসামী আমাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল।

ফ্রেডারিক থিয়ার্স বলিলেন, আমি ফরাসডাঙ্গার মেজেষ্টার, আমি নিজে আসামীকে চিনি না, সেদিন আমি ডাক্তার নইটার্ড সাহেবের সঙ্গে জেলখানায় গিয়াছিলাম। ডাক্তারকে আসামী দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল। আমি জেনারেল এলার্ডকে চিনি, তিনি এক্ষণ লাহোরে আছেন। তিনি একদিন জেলখানায় আসামীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। জেলখানা হইতে ফিরিয়া গেলে তাঁহার সহিত এই আসামী সংক্রান্ত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছেন যে, এই আসামীকে তিনি লাহোরে অনেকবার দেখিয়াছিলেন। জেনারেল এলার্ড বোধ হয়, ১৮৩৫ সালে বিলাত যান, ১৮৩৭ সালে প্রত্যাগমন করেন। তাহার পর আমার সহিত কথা হয়।

গোলকচন্দ্র ঘোষ, সাং সালিখা, বলিলেন, আমি কিছু দিনের নিমিত্ত ছোট রাজাকে ইংরেজি পড়াইয়াছিলাম, তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, তাঁহাকে আমি চিনি, এই আসামী ছোট মহারাজ। ছোট রাজা মরিয়াছেন এ কথা শুনিয়াছিলাম, আবার একমাস পরে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন।

গোপীমোহন পরামাণিক বলিল, আমি জাতিতে ময়রা, আমার বয়স ৮৬ বৎসর, গোলাপবাগের গেটের কাছে আমার দোকান আছে। এই আসামীদের মধ্যে আমি কেবল মহারাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরকে চিনি। যখন ইনি বর্দ্ধমানে প্রথম ফিরিয়া আসিলেন, আমি ইঁহাকে গোলাপবাগে দেখিয়াছিলাম। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম ছোট মহারাজ মরেন নাই, মৃত্যুর ভান করিয়া পলাইয়াছিলেন, তীর্থযাত্রায় গিয়াছিলেন।

রামধন বাগ্দী বলিল, আমি পলতার

ঘাটমাজি। এই আসামী মহারাজকে চিনি, ষোল সতর বৎসর ধরিয়া আমি তেলিনীপাড়ার রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাউলের মাজি ছিলাম। ভদ্রেশ্বরে রামধন বাবুর একখানি বাগান ও বৈঠকখানা ছিল, সেইখানে মহারাজ মধ্যে মধ্যে যাইতেন, একরাত কি একদিন সেখানে থাকিতেন আমি দেখিয়াছি।

আমীরউদ্দিন আমেদ বলিলেন, আমার নিবাস চুচুড়া। আমি প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। আমি চুচুড়ার রাজবাটীতে মুন্সি কালাম উদ্দিনের নিকট প্রায় দশ বৎসর অধ্যয়ন করি। তাহার পর ইসাবেল নামে মৃত বুড়া রাজার ফরাসিস বিবি আপন পুত্রদের শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে রাজবাটীতে রাখেন। প্রতাপচাঁদ চুচুড়ায় আসিলেই আমি দেখিতে পাইতাম। আসামী সেই প্রতাপচাঁদ।

আগা আব্বাস, যে ব্যক্তি প্রতাপের ছায়ারূপে সঙ্গে থাকিত, সেই ব্যক্তি বলিল, এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

ডেবিড হেয়ার সাহেব (*David Hare*) বলিলেন, আমি রাজা প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। তিনি যখন কলিকাতায় ছিলেন, ১৮১৭ কি ১৮১৮ সালে ছয় সাত বার আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে এই আসামীর সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। পার্শ্বের ঘরে যে ছবি আছে, তাহা আমি দেখিয়াছি, সেই ছবির পার্শ্বে আসামীকে একবার এ দিকে একবার ও দিকে দাঁড় করাইয়া দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে আসামীর নাক, চোক, অবয়ব বিলক্ষণ মিলে। বিশেষত ছবির বামদিকে আসামীকে দাঁড় করাইলে আরো মিলে, আসামীর চিবুক ও নিম্ন ঠোঁটের নীচে যে গর্ত্তের মত আছে তাহাও মিলে। আমি যখন আসামীকে প্রথম দেখিলাম, তখন তাহাকে প্রতাপ অপেক্ষা লম্বা বোধ হইয়াছিল। তাহার পর আমি তাহার নিকটে দাড়াইয়া দেখিলাম যে লম্বা নহে, ঠিক প্রতাপের মত উচ্চ। অদ্য প্রাতে জেলখানায় আসামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই সময় দুই এক বিষয়ে কথা বার্ত্তা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম রামমোহন রায়কে স্মরণ আছে কি? প্রথমে আমি রামমোহন রায়ের সঙ্গে প্রতাপচাঁদের সহিত আলাপ করিতে যাই তাহা প্রথমে আসামীর স্মরণ হইল না, তাহার পর স্মরণ হইল, আমাকে বলিলেন, যে "তুমি সেই দিন একটা বন্দুকের মত বাক্স করিয়া একটা দুরবীন লইয়া গিয়াছিলে আর একটা খাঁচায় দুইটা পাখী লইয়া গিয়াছিলে। আমরা একত্রে ছাদে গিয়া কথা কহি" এ সকল কথা প্রকৃত। দুরবীন

প্রায় ৪০ ইঞ্চ লম্বা ছিল, তাহাও আসামীর স্মরণ আছে। আমার বিশ্বাস যে এই আসামী প্রতাপচাঁদ বটে। আমি আর একটিবার পানিহাটি গ্রামে একটা নাচের নিমন্ত্রণে আসামীকে দেখিয়াছিলাম, ইহার মুখের উপরভাগ দেখিয়াই বোধ হইয়াছিল, এ ব্যক্তিকে আমি চিনি। কিন্তু তখন ইহার দাড়ি ছিল বলিয়া ভাল চিনিতে পারি নাই, তাহার পর ওগলবির মোকর্দ্দমায় ইহাকে আমি সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষী দিতে দেখি, দেখিয়াই ইহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। সেইখানেই এই কথা আমি কৌন্সলি লিত সাহেবকে বলি। আমি অনেক দিন জনরব শুনিয়াছিলাম যে, প্রতাপের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে।

রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ বলিলেন, আমার পিতার নাম মহারাজা চৈতন সিংহ, নিবাস বিষ্ণুপুর। তেজচাঁদ বাহাদুরের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল; আমি বর্দ্ধমানে সর্ব্বদা যাইতাম, এক একবার গিয়া দুই মাস করিয়া থাকিতাম। আসামী নিশ্চয়ই রাজা প্রতাপচাঁদ। আমি প্রতাপের পলায়ন বার্ত্তা শুনিয়াছিলাম। সাত আট বৎসর হইল একজন পাঠান আমাকে বলিয়াছিল যে, রঞ্জিত সিংহের পুত্র খড়ক সিংহ আর প্রতাপচাঁদ উভয়কে এক হাতীতে চড়িয়া যাইতে সে দেখিয়াছে। আসামী তিন বৎসর হইল, একবার আমার বাটীতে গিয়াছিল, আমি যত্নপূর্ব্বক ইহাকে তিন মাস রাখি, সেই জন্য বাঁকুড়ার মেজেষ্টার আমাকে দেড় বৎসর আটক রাখেন, আর বিস্তর অপমান করেন।

রাজা জয় সিংহ বলিলেন, আমি বিষ্ণুপুরের রাজগোষ্ঠী, আমি আসামীকে চিনি, ইনি প্রতাপচাঁদ।

হাকিম আলি উল্লা বলিলেন, আমি আসামীকে চিনি, ইনি প্রতাপচাঁদ, পূর্ব্বে ইহার চিকিৎসা আমি করিয়াছি। আসগর আলি ইহার বেতনভোগী হাকিম ছিলেন। তাঁহার মুখে বিশেষ করিয়া শুনিয়াছিলাম যে প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, পলাইয়াছেন।

কুঞ্জবিহারি ঘোষ বলিলেন, আসামী আমার সাবেক মুনিব প্রতাপচাঁদ, ইনি যখন প্রথম গোলাপবাগে আসেন, আমি উঁহাকে দেখিয়া চিনিয়াছিলাম এবং পরাণ বাবুর পুত্র তারাচাঁদকে বলিয়াছিলাম। সেই জন্য আমার রাজবাটীর চাকুরি যায়।

আসামীর পক্ষ এইরূপ আরও কয়েকজন সাক্ষীর জোবানবন্দী হইয়া গেল। প্রতাপচাঁদের পিসি তোতাকুমারী, আর তাঁহার দুই স্ত্রী সপিনা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাক্ষী দিতে অস্বীকার করেন।

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি ও বক্তৃতা আলোচনা করিয়া জজ সাহেব আসামীর বিরুদ্ধে আর কাজি সাহেব আসামীর সাপক্ষে রায় দিলেন। সে কথা পরে সবিশেষ বলা যাইবে। ক্রমশঃ

বঙ্গদর্শন।

৯৬ সংখ্যা।

মুসলমান কর্ত্তৃক বাঙ্গালা জয়।

১। লক্ষ্মণাবতী।

যাহা এক্ষণে বাঙ্গালা দেশ বলিয়া পরিচিত, মুসলমানেরা আসিবার আগে, তাহা কতকগুলি ক্ষুদ্রতর রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তাহার মধ্যে একটি রাজ্য। এইরূপ আর কয়েকটি রাজ্য ছিল। উত্তর বাঙ্গালায় কামরূপ বা রঙ্গপুরের রাজাদিগের অধিকার ছিল। পশ্চিমে, যাহা এক্ষণকার মানভূম, ও বাঁকুড়া প্রদেশ, তাহা পঞ্চকোটি ও বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল। এক্ষণকার মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশ; বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশেও তাঁহাদিগের অধিকার ছিল বোধ হয়। আধুনিক মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার অধিকাংশ উড়িষ্যাধিপতির অধীন ছিল। ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গঙ্গাবংশীয়দিগের অধিকার বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে যাঁহারা ইংরেজের অধীনস্থ হইতে ঘৃণা করেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই পূর্ব্ব পুরুষ দ্বাদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার অধীন ছিলেন। দক্ষিণে বরিশাল জেলা ও যশোহরের পূর্ব্বাংশ, চন্দ্রদ্বীপের রাজার রাজ্যান্তর্গত। তৎপূর্ব্বে ত্রিপুরা, নোয়াখালি প্রভৃতি প্রদেশ ত্রিপুরারাজ্য ভুক্ত। চট্টগ্রাম "মগের মুলুক।"

এই সকল রাজ্যের মধ্যে কেহ কাহারও অধীন ছিল না। তথাপি গৌড়ের কিছু প্রাধান্য ছিল। এই প্রাধান্যের একটা কারণ, গৌড়রাজ্য সকলের মধ্যবর্ত্তী; এবং লক্ষ্মণ সেন, ও বল্লাল সেন প্রভৃতি প্রবল প্রতাপ রাজগণের রাজ্যকালে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ সেন ও বল্লাল সেনের সময়ে এই সকল রাজ্যের মধ্যে কেহ কেহ গৌড়েশ্বরের অধীনতা স্বীকার

করিয়াছিল, এমতও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। মিথিলা ইহাদের করতলস্থ ছিল—বারাণসী পর্য্যন্ত ইহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু শেষ দশায় এ গৌরবের কিছুই ছিল না। তবে সে গৌরবের স্মৃতি ছিল—পূর্ব্ব সৌষ্টবের ভগ্নাংশ ছিল। আর, ইহাও বিবেচনা করা যাইতে পারে, যে এই রাজ্য মধ্যদেশের অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়া, মগধ কান্যকুব্জাদি মধ্যদেশী সুসভ্য সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের সহিত ইহার অধিকতর নিকট সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। এইখানেই আর্য্যজাতীয়দিগের অধিকতর ভরাভর ছিল। কাজেই বিদ্যালোচনা, বাণিজ্য, প্রভৃতি সভ্যতার উপাদান সকল বাঙ্গালার অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা লক্ষ্মণাবতীতে অধিকতর প্রচুর ছিল।

এই গৌড়রাজ্যও সেনরাজাদের শেষাবস্থায় দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। একভাগের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী; কেবল মধ্য বাঙ্গালা, অর্থাৎ এখন যাহা মালদহ, মুরশীদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় বিভক্ত, তাহাই লক্ষ্মণাবতীপতির অধিকৃত ছিল। আর পূর্ব্বাঞ্চল, অর্থাৎ বঙ্গদেশ, সুবর্ণগ্রামের অধিকারভুক্ত ছিল। সেখানেও সেনরাজা রাজ্য করিতেন।

অতএব এককালে গৌড়রাজ্য যত বড়ই থাকুক না কেন, বখ্‌তিয়ার খিলিজির সময়ে তাহা অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। প্রাচীন গৌরবে বড়, নহিলে আর বড় কিছুতেই নহে। এখন সেই রাজ্য একজন অশীতিপর বৃদ্ধ অক্ষম শাসনকর্ত্তার হস্তে, মুসলমানের জন্য সুপক্ক ফলের ন্যায় ঝুলিতেছিল।

এই সকল রাজ্যগুলিকে আর্য্যভূমি বলা একটু অত্যুক্তি। আজিও বাঙ্গালা আর্য্যভূমি নহে। বাঙ্গালার অধিকাংশ লোক অনার্য্যবংশ সম্ভূত। ভারতবর্ষের অন্যত্র যাহা হইয়াছে বাঙ্গালাতেও তাহা হইয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্রই সমাজের উচ্চস্তর সকল আর্য্যবংশীয়, সমাজের নিম্নস্তর সকল অনার্য্যবংশীয়। কোথাও কম, কোথাও বেশী। কোথাও, অনার্য্যেরা আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছে, আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু আর্য্যভাষা গ্রহণ করে নাই। দাক্ষিণাবর্ত্তে ঐরূপ। কোথাও, ঐ অনার্য্যগণ, আর্য্যদিগের বশীভূত হইয়া, আর্য্যপ্রভুদিগের সমাজভুক্ত হইয়া, আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, আর্য্যভাষাও গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালায় সেইরূপ। আর্য্যেরা বাঙ্গালার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালী আর্য্য নহে।

যদি এখন এই অবস্থা, তবে সেন রাজ্যের শেষাবস্থাতেও এইরূপ ছিল বিবেচনা করিতে হইবে। বরং এখন, কালসহকারে জাতীয় সম্মিলন পূর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তর হইয়াছে। তখন আর্য্যে ও অনার্য্যে পার্থক্য আরও স্পষ্ট ছিল, ইহাই অনুমেয়। বাঙ্গালায় পূর্ব্ববৃত্তান্ত

ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন। এই অন্ধকারে, ক্ষীণালোকে দেখিতে পাই, নানাজাতি চলিতেছে, ফিরিতেছে, ঠেলাঠেলি করিতেছে। আগে কোলবংশ। অন্ধকারে সর্ব্বপ্রথমে তাহাদের কৃষ্ণকায় দেশব্যাপক দেখা যায়। তার পর, দ্রাবিড়ী অনার্য্যেরা আসিয়া দক্ষিণপশ্চিম হইতে তাহাদিগকে ঠেলিতেছে। তার পর আর্য্যদিগের আবির্ভাব। বাঙ্গালায় আর্য্যেরা কখন আসেন, তাহার নিরূপণ অতি কঠিন। যখনই আসুন, আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আর্য্যের সংখ্যা অল্প ছিল সন্দেহ নাই। এখনকার বাঙ্গালী আর্য্যদিগের মধ্যে সংখ্যায় ব্রাহ্মণ কায়স্থই অধিক; এই ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের মধ্যে অল্পাংশ ভিন্ন সকলের পূর্ব্বপুরুষেরা আদিশূরের সময়ে এদেশে আসিয়াছিলেন। অতএব আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আর্য্যসংখ্যা অল্প ছিল। ঐতিহাসিক প্রভাতে বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম্ম সাম্যময়; এই বৌদ্ধধর্ম্ম কর্তৃক বাঙ্গালার অনার্য্যগণ প্রথমে আর্য্যসমাজভুক্ত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল থাকিলে কি হইত বলা যায় না; কিন্তু পালবংশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তর্হিত হইল। সেনরাজারা পৌরাণিকধর্ম্ম স্থাপিত করিলেন। পৌরাণিকধর্ম্ম বৈষম্যময়—ইহার হাতে সমাজকর্তৃত্ব ন্যস্ত হইলে সমীকরণ কার্য্য আর তত নির্ব্বিঘ্ন রহিল না। জনসমূহমধ্যে একজাতীয়ত্ব জন্মিল না। তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, মুসলমান আসিলেই, সেই সমাজের একভাগ—অর্দ্ধেক ভাগ বলিলেও বলা যায়—মুসলমানের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। বিজিতের সমাজ ত্যাগ করিয়া জেতৃগণের সমাজে গেল। জাতীয় বন্ধন ছিল না।

অতএব দেখিতে পাই, মুসলমানেরা যখন বাঙ্গালায় আসিল, তখন বাঙ্গালা একেবারে বন্ধনশূন্য। কতকগুলি অনতিবৃহৎ রাজ্য—রাজ্যে রাজ্যে কোন বন্ধন নাই। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতি—জাতিতে জাতিতে কোন অচ্ছেদনীয় বন্ধন নাই। যাহা ছিল, তাহাও ভিতরে ঘুনেধরা। এই ভিন্ন ভিন্ন অনতিবৃহৎ রাজ্যগণের মধ্যে কোনটিও একতাসম্পন্ন নহে—কোনটি আধুনিক ইউরোপীয় রাজ্যের মত নিরেট গড়নের নয়। এই সকল রাজ্যের ভিতর আবার করদ রাজারা ছিলেন। বৃহত্তর রাজ্যের রাজা তাঁহাদের উপর সার্ব্বভৌম ছিলেন। মধ্যকালের ইউরোপে ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে বার্গণ্ডি বা নর্ম্মাণ্ডির অধিপতির যে সম্বন্ধ ছিল; অর্থাৎ সুজারাইনের* সঙ্গে বাসালের † যে সম্বন্ধ,

* Suzerain.

† Vassal.

সার্ব্বভৌমের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র রাজাদিগের সেই সম্বন্ধ ছিল। ইহারা সার্ব্বভৌমকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতেন, সার্ব্বভৌমকে কদাচিৎ কর দিতেন, যুদ্ধের সময়ে সৈন্য যোগাইতেন। তার পর তাঁরাই রাজা—তাঁহারাই প্রজাপালক —দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, রাজভাগের অধিকারী। এরূপ সার্ব্বভৌমের বাহু বড় দুর্ব্বল। অধীনস্থ রাজগণের সাহায্য সকল সময়ে পাওয়া যায় না। কখন তাহারা জুটিতে পারিল না—কখন অনিচ্ছুক—কখনও শত্রুপক্ষ। এইরূপ অধীনস্থ রাজগণকে কাবু করিয়াই ইউরোপীয় সাম্রাজ্য সকল বলবিশিষ্ট হইতে পারিয়াছে। গৌড়ে তাহা হয় নাই—গৌড়েশ্বর সার্ব্বভৌম অনায়াসপরাজিত হইলেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজগণ হইতে একটা বিশেষ সুফল জন্মিল। সার্ব্বভৌম পরাজিত হইলেন বটে—মুসলমান তাঁহার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইল, কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজারা বজায় রহিলেন। তাঁহারা যেমন সেনরাজাকে মানিতেন, মুসলমান সুলতানকেও সেইরূপ মানিতে লাগিলেন—কিন্তু প্রকৃত রাজশাসন তাঁহাদেরই হাতে রহিল। যে অর্থে এখন বাঙ্গালা পরাধীন, পাঠানদিগের সময়ে সে অর্থে পরাধীন হইল না। আকবর শাহের সময়েও ইহারা এমন প্রবল ছিলেন, যে তাঁহারা প্রয়োজনমতে অতি বিশাল অশ্বারোহী ও পদাতি যুদ্ধপোত বাহির করিতে পারিতেন। এখনও ইহাদের উচ্ছেদ হয় নাই—তবে ইংরেজের আমলে ইহারা জমীদারমাত্র—আর কোন শক্তি নাই।

মুসলমান কর্ত্তৃক বাঙ্গালা জয় সম্বন্ধে যাহা কিছু আমরা জানি, তাহা "তাকরাত নাছিরি" নামক পারস্য গ্রন্থ হইতে। ঐ গ্রন্থের প্রণেতা আবু ওমার মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন জর্জাতি—অথবা সংক্ষেপতঃ, মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন। তিনি যাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সারার্থ এই।—

"৫৯৯ হেজিরা-অব্দে (ইং ১২০২।৩) মুসলমানেরা বেহার জয় করিয়াছে এবং বাঙ্গালার সীমায় আসিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও জ্যোতির্ব্বিদেরা রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, যে পুরাণে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যে তুর্কিয়েরা বাঙ্গালা জয় করিবে। অতএব মহারাজ, নিজ ধনসম্পত্তি, পৌরজন, ও রাজধানী নবদ্বীপ হইতে এমন কোন নির্ব্বিঘ্ন ও দূরবর্ত্তী প্রদেশে লইয়া যান, যে সেখানে এই বৈরীবর্গের আক্রমণের কোন শঙ্কা না থাকে।

"এই কথা শুনিয়া,রাজা ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে পুরুষ বাঙ্গালা জয় করিবে, পুরাণে তাহার কোন বর্ণনা আছে কি না। ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিল—হাঁ আছে; আর সে বর্ণন,

বেহারে যে মুসলমান সেনাপতি নিযুক্ত আছে, তাহারই অনুরূপী।

"রাজা তখন অতিশয় বৃদ্ধ, এবং নবদ্বীপের পক্ষবাদী। তিনি ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না, এবং বিপদ হইতে ত্রান পাইবার কোন উপায়ও করিলেন না। কিন্তু অমাত্যবর্গ এবং যত প্রধান ব্যক্তি, সকলেই আপন আপন পৌরজন ও ধনসম্পত্তি "জগন্নাথ প্রদেশে"(উড়িষ্যায়)অথবা গঙ্গার পূর্ব্বোত্তর পারস্থিত প্রদেশে পাঠাইয়া দিল।

"৬০০ হেজিরা অব্দে, [ইং ১২০৩।৪] মহম্মদ বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালার অরক্ষিত অবস্থার বিশেষ সম্বাদ পাইয়া গোপনে সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। বেহার হইতে তিনি এমন সত্বর নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন, যে তাঁহার আগমন কেহ অনুমান করিতে পারিল না।

"নগরের নিকটে আসিয়া তিনি এক বনমধ্যে সৈন্য লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়া সপ্তদশমাত্র অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নগর রক্ষিবর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন, যে তাঁহারা রাজদূত; নবদ্বীপাধিপতিকে প্রণাম করিতে যাইবেন। রক্ষিবর্গ তাঁহাদিগকে পুরী প্রবেশ করিতে অনুমতি দিল। পুরী প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা অসি নিষ্কাষিতপূর্ব্বক রাজানুচরবর্গকে বধ করিতে লাগিল।

"রাজা লাছমনীয়া* তখন ভোজনে বসিয়াছিলেন। তিনি পৌরবর্গের আর্ত্তনাদ শুনিয়া,খড়ক্কীদ্বার দিয়া,পুরী হইতে পলায়ন করিলেন। একখানা ডিঙ্গীতে চড়িয়া অতি দ্রুতবেগে নদী বাহিয়া গেলেন।

"মুসলমান সেনার অবশিষ্ট ভাগ এক্ষণে আসিল। তাহারা কতকগুলি হিন্দুকে প্রাণে বধ করিয়া নগর ও পুরী অধিকার করিল। রাজা এই সম্বাদ শুনিয়া শোকে নিমগ্ন হইলেন; এবং অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্মানুশীলনে নিয়োগ করা স্থির করিয়া জগন্নাথে চলিয়া গেলেন। পরে শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে মৃত্যুলাভ করিয়াছিলেন।

"রাজার পলায়নের পর বখ্‌তিয়ার সৈন্যের দ্বারা নগর লুঠ করাইলেন—আপনি কেবল হস্তীগুলি এবং রাজভাণ্ডারস্থ দ্রব্যজাত রাখিলেন। তাহার পর তিনি নির্ব্বিবাদে লক্ষ্মণাবতী গমন করিলেন।"

এই সকল কথার কিছু পরে লেখা আছে যে বখ্‌তিয়ার এক বৎসরে বাঙ্গালাজয় সম্পন্ন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত কতদূর সমূলক, তাঁহার বিচার পশ্চাৎ করিতেছি। কিন্তু সমূলক হৌক আর অমূলক হৌক, এই লেখার উপর নির্ভর করিয়া স্থূলবুদ্ধি ইংরেজ ইতিহাসবেত্তৃগণ রটাইয়াছেন, যে সপ্ত-

* বোধ হয়, ইহারও নাম লক্ষ্মণসেন ছিল।

দশ অশ্বারোহী বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। অল্প বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, যে এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

প্রথমতঃ, সপ্তদশ অশ্বারোহী বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন কোথায় লিখিয়াছেন? উপরে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে কেবল ইহাই লেখা আছে, যে সপ্তদশ অশ্বারোহী মিথ্যা ছল করিয়া রাজপুরী প্রবেশ করিয়াছিল। ছিঁচ্‌কে চোরে সচরাচর এরূপ ছল করিয়া সকলেরই পুরী প্রবেশ করিয়া থাকে—তাহাদিগকে কেহ রাজ্যবিজেতা বলে না। এই সতের জন জুয়াচোর রাজপুরী অধিকার করিতে পারে নাই—তাহা মিন্‌হাজ উদ্দীনের কথাতেই প্রকাশ পাইতেছে। কেন না, মিনহাজউদ্দীন লিখিতেছেন, যে অবশিষ্ট মুসলমান সেনা তৎপশ্চাৎ আসিয়া নগর ও পুরী অধিকার করিয়াছিল। অতএব রাজ্যজয় দূরে থাক্‌, নগর জয় দূরে থাক্‌, রাজপুরী খানিও সেই সপ্তদশ চোরে জয় করিতে পারে নাই। বৃদ্ধ রাজা পলাইয়াছিলেন বটে—তাঁহার মুখ রাখিবার জন্য নাবিক রণপণ্ডিত ইংলণ্ডের দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ উদাহরণ আছেন—কিন্তু সমস্ত সৈন্য না আসিলে যখন রাজপুরী অধিকৃত হয় নাই, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে, যে রাজা পলাইলে পরেও পুরীরক্ষকেরা যুদ্ধ করিয়া সেই সপ্তদশ অশ্বারোহীকে বিমুখ করিয়াছিল। সপ্তদশ অশ্বারোহী কিছু করিতে পারে নাই—কেবল তাহারা মার্শমান প্রভৃতি স্থূলবুদ্ধি সাহেবদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বখ্‌তিয়ার সমস্ত সৈন্য লইয়া পুরী ও নগর অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমস্ত রাজ্য অধিকার করিতে তাঁহার এক বৎসর লাগিয়াছিল, ইহা মীনহাজউদ্দীন নিজেই লিখিয়াছেন। সপ্তদশ অশ্বারোহী পদার্পণ করিয়াই দেশ জয় করা দূরে থাক্‌, সমস্ত মুসলমান সেনা এক বৎসরের কমে রাজ্য জয় করিতে পারে নাই।

তৃতীয়তঃ, একবৎসরে সমস্ত মুসলমান সেনা লইয়া বখ্‌তিয়ার যাহা জয় করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা নহে—লক্ষ্মণাবতী। বাঙ্গালা যে নয় দশটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল, বখতিয়ার তাহার মধ্যে একটি মাত্র জয় করিয়াই কেবল ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার জয়কর্ত্তা বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত হইয়াছেন। তিনি নিজে জীবিতকালে বাঙ্গালার আর কোন অংশ জয় করিতে পারেন নাই। কামরূপ জয় করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কামরূপরাজের নিকট হইতে ব্যাঘ্রতাড়িত শৃগালপালের ন্যায় সসৈন্যে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পাঠানবংশে কেহই সমস্ত বাঙ্গালার অধিপতি হয়েন নাই। মোগলেরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন কোন প্রদেশ তাঁহাদেরও অবিজিত ছিল—যথা কুচবেহার ও বিষ্ণুপুর। কেবল ইংরেজই

প্রকৃতার্থে বাঙ্গালা জয় করিয়াছেন—সপ্তদশ চৌর বাঙ্গালা জয় করে নাই।

তার পর আমার ব্যক্তব্য এই, যে আদৌ মিন্‌হাজউদ্দীনের কথা বিশ্বাস-যোগ্য কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। যে ইতিহাস লেখে সেই সত্য লেখে না। কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যাকথা লেখে, কেহ অজ্ঞতাবশতঃ মিথ্যা লেখে। মীন্‌হাজউদ্দীনের ইচ্ছা-পূর্ব্বক মিথ্যা কথা লিখিবার সম্ভাবনা কি না, তাহা পরে বিবেচনা করিব। আগে দেখি অজ্ঞতাবশতঃ মিথ্যা কথা বলিবার সম্ভাবনা আছে কি না। বাঙ্গালা জয়ের বৃত্তান্ত মীনহাজউদ্দীন কিসে জানিলেন? যে স্বয়ং দেখিয়াছে, তাহার কথা বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু, মীনহাজউদ্দীন স্বয়ং বাঙ্গালা জয় দেখেন নাই; তিনি সে সময়ের লোক নহেন। তিনি বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে নিজ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। স্বয়ং না দেখুন, ঘটনার সমকালিক লোক না হৌন, কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ অবলম্বনপূর্ব্বক লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার কথা মানি। কিন্তু মিন্‌হাজউদ্দীন কোন বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লেখেন নাই। নাই হৌক—যদি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়া লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলেও মানি। তাঁহারও সেই দাবিদাওয়া—বিশ্বাসের উপর তাঁহার অন্য দাবিদাওয়া নাই। তিনি স্বয়ং বাঙ্গালায় মাসকত বাস করিয়া লোকের সঙ্গে কথোপকথনের দ্বারা বাঙ্গালার জয় বৃত্তান্ত জানিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কবে তিনি বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন? তাহার ঠিকানা করা যায়। ইং ১২৩৪ সালে, তৈমুর খাঁ ও তোঘন খাঁ নামক দুই জন মুসলমানে বাঙ্গালার আধিপত্য লইয়া বিবাদ হয়। ইতিহাসে পড়া যায়, মিন্‌হাজউদ্দীন মধ্যস্থ হইয়া রফা করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব বাঙ্গালা জয়ের ৪০ বৎসর পরে তিনি বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এই ৪০ বৎসর পাঠা-নেরা নিয়ত যুদ্ধে বিব্রত ছিল। কতক-গুলি যোদ্ধা, যদি চল্লিশ বৎসর অবিরাম যুদ্ধ করে, তবে তাহাদের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিবে এমত সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধেই সবাই মরিবে এমত বলিতেছি না। ইহা সম্ভব নহে, যে বখ্‌তিয়ার কতকগুলি অপোগণ্ড শিশু বা কিশোর বয়স্ক কুমার লইয়া অপরিচিত দেশ জয় করিতে আসেন। অতএব তাঁহার সহচর যোদ্ধৃবর্গ, আর ৪০ বৎসরের মধ্যে সহজেই—কেবল মনুষ্যজীবনের ক্ষুদ্র আয়তন পূর্ণ হইল বলিয়াই—স্বর্গা-রোহণ করাই সম্ভব। তবে, যদি লড়াই ঝগড়া না থাকিত, তাহা হইলেও সত্তর আশী বৎসরের বুড়া দুই চারি জনকে পাওয়া গেলে যাইতে পারিত। কিন্তু যখন বঙ্গবিজেতাদিগকে প্রতি-বৎসর অসিহস্তে যুদ্ধে বাহির হইতে হইয়াছে, তখন চল্লিশ বৎসর পরে

তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও পাওয়া যাইবে, ইহা বড় সম্ভব নয়। ধরা যাউক, যে চল্লিশ বৎসর পরেও কেহ কেহ বাঁচিয়া ছিল। যদি কেহ ছিল, তবে তাহাদের কথায় কত দূর বিশ্বাস করা উচিত? যদি কেহ বাঁচিয়া থাকে, তবে দুই একজন বুড়া মাত্র। বাঙ্গালা জয়ের গল্পটা তাহাদের একচেটে মহল—কেহ প্রতিবাদ করিবার নাই। তার পর বুড়া বয়সে কিছু গাল গল্পের শ্রীবৃদ্ধি—মনুষ্য মাত্রেরই এই স্বভাব। তার পর, গল্পটার বিষয় আপনাদের মরদানি—সেই বহুকাল অন্তর্হিত জোয়ানগির বাহাদুরি। তার উপর বিজিত, ঘৃণিত, শত্রুপদেস্থিত, কাফেরদের জব্দ করার কথা। সেই বুড়ারা যে আপনাদের কেরদানি না বাড়াইয়া, মীন্‌হাজউদ্দীনকে সত্য কথা বলিয়াছিল, যাহার বিশ্বাস হয় হৌক—আমি এমন বিশ্বাস করিব না। আজিকার দিনে আমাদের চক্ষের উপর যে সকল ঘটনা হইতেছে, তাহাতে জাতীয় গৌরবের সম্বন্ধ থাকিলে, তাহারই সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা যায় না। সত্যাভিমানী, কৃতবিদ্য, বড় সভ্য, জাতিদিগের মধ্যে যাহা কোটি কোটি চক্ষের উপর হইতেছে, তাহাই সত্য মিথ্যা জানা যায় না। ওয়াটার্লুর যুদ্ধ কে জিতিল তাহা আজিও জানিতে পারিলাম না। ইংরেজ বলে আমাদের ওয়েলিংটন জিতিয়াছে। জর্ম্মান বলে আমাদের ব্লুচর জিতিয়াছে। ফরাশী বলে কেহ জেতে নাই; আমাদেরই কুলাঙ্গার বুর্মোঁ ও গ্রুশির বিশ্বাসঘাতকতায় আমরা হারিয়াছি। আইলোর লড়াই নাপোলেয়ন জিতিল কি হারিল তাহা ইতিহাস আজিও ঠিক বলে না। তুলুসের যুদ্ধে ইংরেজ জিতিল, কি ফরাশী জিতিল, তাহা লইয়া ঘোর বিবাদ। বিদেশ দূরে থাক, যে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক অন্ধকারের কথার আন্দোলন করিতেছি, সেই বাঙ্গালার ঐতিহাসিক মধ্যাহ্নে আইস। পলাসির যুদ্ধ ইংরেজের আমলে হইয়াছে। ইংরেজ বিজেতারা—যাঁহারা স্বয়ং লড়াই করিয়াছিলেন—তাঁহারা নিজে সে যুদ্ধ সম্বন্ধে, চিঠিপত্র, রিপোর্ট, ডেস্পাচ, করেস্পণ্ডেন্স, মেময়ের, ইতিহাস—এইরূপ বহুতর লিখিয়াছেন। সেই মূলের উপর নিশান গাড়িয়া, ইংরেজি ইতিহাস বলে, যে তিন শত ইংরেজ অনকত তেলাঙ্গার সাহায্যে পঞ্চাশ হাজার নবাবী ফৌজ পরাজয় করিয়াছিল—ইহাসপ্তদশ অশ্বারোহীর আর এক এডিশ্যন্। সৌভাগ্যক্রমে, এইখানে একজন ইংরেজের পক্ষবাদী মুসলমান ইংরেজের মাধ্যাহ্ন সূর্য্যের কাছে একটি মুস্কিল আসানের চেরাগ জ্বালিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখায় স্থূল বৃত্তান্ত এই জানা যায়, যে পলাসিতে যেটুকু যুদ্ধ হইয়াছিল, সেটুকু ইংরেজের হার হইয়াছিল। বেগোছ দেখিয়া ক্লাইব

মীর জাফরকে বলিয়া পাঠাইলেন, যে এ আবার কি? সত্যকার লড়াইয়ের ত কথা ছিল না। শুনিয়া মীর জাফর নবাবকে বলিলেন, যে আজ বেলা গিয়াছে, আজ আর যুদ্ধে কাজ নাই—ফৌজ ফিরিয়া আসুক। নবাবের ফৌজ ফিরিল। তখন ক্লাইব পিছন হইতে তাহাদের উপর গোটাকত কামান দাগিলেন। পলাসির লড়াই ফতে হইল। সেও আজ ১২৫ বৎসরের কথা। পঞ্জাবের লড়াই আজিও চল্লিশ বৎসর হয় নাই—পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেরই সে কথা মনে থাকিতে পারে। ইংরেজি ইতিহাসে পড়ি যে মুদকীর লড়াইয়ে, ফিরোজসহরের লড়াইয়ে, চিলিয়ানওয়ালার লড়াইয়ে ইংরেজের জয় হইয়াছিল। যাঁহারা ইংরেজি ইতিহাসের উপর নির্ভর করেন না, তাঁহারা জানেন যে সে বৃত্তান্ত কি।

যদি এই ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক মাধ্যাহ্নে, যদি সত্যনিষ্ঠ কৃতবিদ্য জাতির মধ্যে, যদি কোটি দর্শকের চক্ষুর উপর, যদি এই লেখালেখি, দেখাদেখির মধ্যে, যদি এই সম্বাদপত্র, পত্রপ্রেরক, সমালোচক বাজারের মধ্যে, ছাপাখানা, ডাকঘর, স্বজাতি, ভিন্নজাতির সাক্ষাৎকার এইরূপ ইতিহাস চলে, তবে সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঘোরান্ধকারে, বাঙ্গালার ন্যায় ইতিহাসশূন্য স্থানে, অশীতিপর গালগল্পপরায়ণ, আত্মগরিমায় অন্ধ, বাঙ্গালির দ্বেষক জন দুই বুড়া মুসলমানের কথায় বিশ্বাস কি?

মনে কর, যেন তাহারা সত্য কথাই মিন্হাজউদ্দীনকে বলিয়াছিল, তাহা হইলেও মীন্হাজ্উদ্দীন্ যে সত্য কথা লিখিয়াছেন তাহার ঠিক কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোন জাতিই মিথ্যা কথা দ্বারা স্বজাতির গৌরব বাড়াইতে ত্রুটি করে না। কিন্তু ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা এই সব সময়ে কখনই সত্য লেখেন না। যেখানে হিন্দুদিগের সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধ হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহারা হয় হিন্দুদিগের কীর্ত্তি একেবারে গোপন করিয়াছেন, নয় যেখানে অগত্যা পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, সেখানে মিথ্যা রচনা করিয়া জাতীয় গৌরব বাড়াইয়াছেন। হিন্দুদিগের কীর্ত্তি যে তাঁহারা সচরাচর গোপন করেন, তাহার তিনটি উদাহরণ দিব।

প্রথম উদাহরণ, রাজপুতানা। রাজপুতানা, মুসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানীর নিকট। তাহার চারিপাশে মুসলমান রাজ্য। মুসলমানেরা ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিল, কিন্তু মাঝখানে এই রাজপুতমণ্ডল মুসলমান রাজ্যের বহির্ভূত রহিল। রাজপুতানা অধিকার করিতে মুসলমানেরা যত্নের ত্রুটি কিছুই করে নাই। পাঠানরাজার শ্রেষ্ঠ আলাউদ্দীন, মোগল বাদশাহার শ্রেষ্ঠ আকবর; আরও যে পারিয়াছে সেই পুনঃ পুনঃ রাজপুতানা আক্রমণ করিয়াছে। অনেকবার মুসলমানের রণজয় হইয়াছে; যতবার রণজয় হইয়াছে,

ততবার ক্ষুদ্র রাজপুতরাজগণ আবার স্বাধীন হইয়াছে, আবার মুসলমানকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ইহা সামান্য বীরত্বের পরিচয় নহে। সসাগরা ভারতেশ্বরগণ ক্ষুদ্র রাজপুত রাজগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরাজিত না হইলে, কখন এ ফল ফলে নাই—মুসলমান শক্তি থাকিতে কখন কোন দেশ ছাড়ে নাই। কিন্তু মুসলমান ইতিহাসবেত্তারা রাজপুতানায় মুসলমানের জয়েরই পরিচয় দিয়াছেন—মুসলমানের পরাজয়ের একছত্রও কেহ কোথাও লেখেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে, রাজপুতানার ইতিহাস রাজপুতে লিখিয়া রাখিয়াছিল। রাজপুতের ঘর হইতে সেই ইতিহাস বাহির করিয়া একজন ইংরেজ তাহা প্রচার করিয়াছেন। কর্ণেল টডের গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই, মুসলমান সম্রাট ক্ষুদ্র রাজপুত কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়াছেন। সেই কথা বিশ্বাস করিতে হয়, কেন না তাহা সত্য না হইলে শেষ পর্য্যন্ত রাজপুতানা স্বাধীন থাকিত না। অথচ রাজপুতদিগের এই অলৌকিক কীর্ত্তির বিন্দুবিসর্গ মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা প্রচার করেন নাই। যে মুক্ত রাজপুতানার আরাধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যাহা রাজপুতানায় থার্ম্মপিলি, মুসলমানেরা তাহার কথা মুখে আনেন না।

দ্বিতীয় উদাহরণ, দাক্ষিণাত্য। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে মুসলমানেরা দিল্লীতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন—ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে দাক্ষিণাত্য মুসলমানের সম্পূর্ণ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই চারিশত বৎসর ধরিয়া দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরা মুসলমানদিগের সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিল। সেই হিন্দুদিগের কয়টা কথা মুসলমানেরা লিখিয়া রাখিয়াছেন? সেই হিন্দুদিগের মুখোজ্জ্বলকারী মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কথা, একজন ইংরেজ লেখক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"The commencement of the sixteenth century discloses the allies fighting rather unsuccessfully against the great Hindu monarch of the south, who at that time founded a power which threatened to sweep the Mahomedans into the sea. The heroism and policy of Krishna Raya still live in the songs of Southern India. The popular legends love to relate how he carried his victorious arms from Ceylon to the mountains of Thibet, and sober history recognises in him the last breakwater which Hindu valor opposed to Mussulman conquest. In this great national struggle the Orissa monarch fought on the unpatriotic side. But his perfidy failed to yield

safety. The southern monarch crushed the unholy alliance, and the Orissa king found himself compelled to give up his daughter in marriage to the last of the Hindu heroes. * * * We may pass over with a smile the legendary expeditions of their hero-monarch from Ceylon to Thibet; but the Portuguese historians attest his greatness, and all India, from the Narbudda downwards, acknowledge his sway."*

হণ্টর সাহেব একটি নোটে পর্ত্তুগিস ইতিহাসবেত্তাদের কথা লিখিয়াছেন, "They mention Krishna Raya's siege of Rachol, near Bombay, with an army of 35,000 horse and 733,000 foot. A Mahommedan force which advanced to relieve the city was defeated, and had to accept, as the degrading terms of peace, the acknowledgement of Krishna Raya as the Lord Paramount of Kanara, and the kissing of his feet." pp. 8-9.

পাঠান বা মোগল, মহারাষ্ট্র বা ইংরেজ, ভারতবর্ষে কেহ কখন আট লক্ষ সৈন্য এক যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করিতে পারেন নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ভারতবর্ষের মুসলমানি ইতিহাসে এই মুসলমানের যমদণ্ড স্বরূপ মহাবীরপুরুষ সম্বন্ধে কি লেখা আছে? আমি ফারসি জানিনা, কিন্তু যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাঁহারা কৃষ্ণরায়ের নামও করেন নাই। এ সকল নাম করিয়া তাঁহারা লেখনীকে পাপগ্রস্ত করেন না। সের শাহা বাঙ্গালা জয় করিলেন, তাহার ইতিহাস লেখকেরা লিখিয়া শেষ করিতে পারেন না—রাজা গণেশ বাঙ্গালা জয় করিলেন, তাহার ইতিহাস মোটে তিন ছত্র লিখিলেন।

তৃতীয় উদাহরণ—উড়িষ্যা। পরের রাজ্য বিশেষ হিন্দুরাজ্য দেখিলে তাহা কাড়িয়া লইতে হইবে, ইহা মুসলমানদিগের অলঙ্ঘ্য ব্রত ছিল। পাঠানেরা বাঙ্গালায় সিংহাসন স্থাপন করিয়া, সীমান্তস্থিত উড়িষ্যা রাজ্যের প্রতি যে লোভ করেন নাই, তাহা নহে। বাঙ্গালায় স্থির হইয়াই, পুনঃ পুনঃ উড়িষ্যা জয়ের জন্য চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কিন্তু সাড়ে তিনশত বৎসর চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। যে উড়িয়ারা, এখন একজন বাঙ্গালির ধমকে কাঁদিয়া ফেলে, সে উড়িয়ারা তখন প্রকৃত বীরপুরুষ ছিল। বাঙ্গালাজয়ের পর প্রথম অর্দ্ধ শতাব্দীমধ্যে বাঙ্গালার পাঠানেরা চারিবার উড়িষ্যা আক্রমণ করেন; চারিবারই উড়িয়া খণ্ডাইতদিগের অস্ত্রাঘাতের জ্বালায় প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিয়া-

* Hunter's Orissa, Vol II, pp. 7-9.

ছিলেন। মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা এই সকল যুদ্ধের উল্লেখ করেন নাই এমত নহে। কিন্তু তাঁহারা যাহা লেখেন তাহাতে এই বুঝিতে হয়, যে মুসলমান সেনাপতিরা উড়িষ্যা জয় করিয়া পলায়ন করিয়া ছিলেন। জয় করিয়া পলায়ন করা একপ্রকার নূতন রকমের যুদ্ধ বটে; ইহা কেবল মুসলমান লেখকদিগের কাছেই শুনিতে পাই। ইচ্ছা আছে, ভবিষ্যতে মুসলমানকৃত ভারত জয়ের বৃত্তান্ত সমালোচনা করিয়া, এই পলায়নতৎপর বিজেতৃবর্গের কীর্ত্তি কলাপের পরিচয় দিব। বসরার খলিফাগণের সেনাপতি সম্প্রদায় হইতে ঘোরীর সাহাবুদ্দীন পর্য্যন্ত মুসলমানেরা সাত শত বৎসর ধরিয়া কেবল ভারতবর্ষ জয় করিয়া পলাইতেন। শেষ যেবার শিকায় ছিঁড়িল, সেবার আর পলাইলেন না!

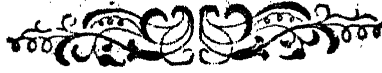
সে যাই হউক, উড়িয়াদিগের সঙ্গে পাঠানদিগের যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি কৌতুহলাবহ পরিচয় দিয়া, এ বিষয়ে এখন ক্ষান্ত হইব। ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তোঘন খাঁ নামে একজন উগ্রস্বভাব তাতার বাঙ্গালার সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তোঘন সসৈন্যে উড়িষ্যাজয়ে যাত্রা করিলেন। সেই সময়ে গঙ্গাবংশীয় রাজা নরসিংহ দেব উড়িষ্যার সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। লোকে তাঁহাকে লাঙ্গুলীয় নরসিংহ বলিত; কেন, তাহা জানি না। কিন্তু এই লাঙ্গুলীয়ের নাম চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত। তিনিই কোনার্কের অদ্ভুত সূর্য্যমন্দির প্রস্তুত করেন—জগতে অতুল্য কীর্ত্তি। তিনি শাহাজাঁহার মত নির্ম্মাতা ছিলেন; তাঁহার অপেক্ষা রণপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হস্তে তাতারের বর্ব্বর এরূপ প্রহার প্রাপ্ত হইলেন, যে সসৈন্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে গৌড়াভিমুখে পলায়ন করেন। কিন্তু লাঙ্গুলীয় ছাড়িবার পাত্র নহে—সৈন্য লইয়া খাঁ সাহেবের পিছু পিছু ছুটিল। উড়িয়া সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত হইল। বীরভূমের রাজধানী নগরে মুসলমানদের এক আড্ডা ছিল—একভাগ গিয়া বীরভূম জয় করিয়া নগর অধিকৃত করিল। আর একভাগ গৌড়ে গিয়া রাজধানী অধিকৃত করিল। তোঘন ফাঁপরে পড়িয়া দিল্লীর বাদশাহের কাছে নালিস করিলেন। দিল্লীশ্বর গৌড় পুনর্জ্জয়ের জন্য ফৌজ পাঠাইলেন। শুনিয়া নরসিংহ দেব হাতির উপর লুঠের মাল বোঝাই করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু মুসলমান ইতিহাসলেখক ফেরেশতা এই ঘটনা লইয়া বড় গোলে পড়িলেন। হিন্দুর হাতে মুসলমানের এ অপমান কি প্রকারে লেখেন? বুদ্ধি খরচ করিয়া লিখিলেন, জজীস্ খাঁ তাঁহার অসংখ্য সেনা প্রবাহ লইয়া আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছেন। ইতিহাসবেত্তার কৃপায়, যাজপুরের লাঙ্গুলীয় পৃথিবী প্রমথনকারী জজীস্ খাঁ হইয়া গেল—উড়িষ্যার খণ্ডাইতেরা

মোগলসেনা হইয়া গেল। আর বাকি কি?

এই ত মুসলমানি ইতিহাস। মীনহাজ-উদ্দীনও সেই গোষ্ঠী। তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া, কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে না। বখ্‌তিয়ারের কামরূপের যুদ্ধের বিবরণে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে মিনহাজউদ্দীন উপন্যাসলেখক—ইতিহাসলেখক নহেন। ইহা হইতে পারে, তাঁহার লিখিত বাঙ্গালা জয়ের বিবরণ সত্য—হইতে পারে মিথ্যা। কোন দিগ ঠিক করিয়া বলা যায় না। ইহা নিশ্চিত যে লক্ষণাবতী বিজিত হইয়াছিল। আর সে সময়ে লক্ষণাবতীর যে অবস্থা, তাহার পর্য্যালোচনায় ইহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যায়, যে লক্ষণাবতী সহজে বিজিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সে সময়ে সামাজিক ঐক্য ছিল না। শাসনকর্ত্তৃগণ আর্য্য—প্রজাগণ অনার্য্য। সাধারণ প্রজার পক্ষে মুসলমান যেমন পর, আর্য্যেরাও তেমনি পর। এ অবস্থায় আর্য্যের জন্য যে অনার্য্যেরা মুসলমানের বিরোধী হইবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। বরং সাম্যময় ইস্‌লাম, বৈষম্যময় পৌরাণিক ধর্ম্মের অপেক্ষা তাহাদের কাছে আদরণীয়—নীচ জাতি বলিয়া আর্য্যের কাছে তাহারা ঘৃণিত—মুসলমান নীচ জাতি বলিয়া ঘৃণা করিবে না। এই জন্যই মুসলমান জয়ের পর অর্দ্ধেক অনার্য্য হিন্দু ইস্‌লামের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। দ্বিতীয়, লক্ষণাবতী তখন এক বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য রাজার হাতে পড়িয়াছিল। রাজা রাজ্যরক্ষণে অক্ষম; আর কে তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিবে? ভারতবর্ষীয় প্রজার পক্ষে রাজ্য রাজার, তিনি রক্ষা করিতে হয় করিবেন, না হয় পরে লইবে, প্রজার তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। এ কথা ভারতকলঙ্কে একবার বুঝাইয়াছি। বাঙ্গালার অন্যান্য রাজ্য মুসলমানেরা শীঘ্র অধিকার করিতে পারেন নাই—সে সকল রাজ্যে সেন রাজার মত অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ পায়েন নাই। তৃতীয়, লক্ষণাবতীতে—বাঙ্গালার অধিকাংশ রাজ্যে, তখন যুদ্ধব্যবসায়ী কোন সম্প্রদায় ছিল না। পড়া যায় যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ক্ষত্রীয়েরা যুদ্ধব্যবসায়ী ছিল। কিন্তু ক্ষত্রিয় বাঙ্গালায় আসে নাই। আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশে, প্রকৃত ক্ষত্রিয় না থাকুক, রাজপুত ছিল। সেই জন্য পশ্চিম ভারত অধিকার করিতে মুসলমানদিগকে সাত শত বৎসর কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। লক্ষণাবতীতে তাহা ছিল না—লক্ষণাবতী এক বৎসরে অধিকৃত হইল।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে লক্ষণাবতীর সেই অবস্থা তুলনা করিয়া দেখা যাউক। দেখিতেছি বাঙ্গালার সেই অবস্থা আজিও আছে। তখন যেমন আর্য্যে অনার্য্যে অনৈক্য ছিল, এখনও সেইরূপ হিন্দু মুসলমানে

অনৈক্য আছে। তখন যেমন যুদ্ধব্যবসায়ী সম্প্রদায় ছিল না—এখনও নাই। রাজা এখন খুব যুদ্ধতৎপর বটে, কিন্তু ইংরেজ গেলে কি হইবে? যে পারিবে সেই আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিবে। বাঙ্গালীর উচিত ইংরেজের সৈন্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করা।



কাঞ্চনমালা।

৫ম খণ্ড।

১

কুণাল ও কাঞ্চন গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দুজনেরই মনে ভয়ানক আশঙ্কা হইয়াছে, শীঘ্রই বিপদ হইবে, কিন্তু দুজনেরই ভরসা হইয়াছে, যে উহার পরিণাম সদ্ধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে বড় শুভকর হইবে। তাঁহারা সমস্ত পথ কাটাইয়া কাঞ্চনকুটীরের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। দ্বার উদ্ঘাটন করিবামাত্র দ্বারের উপর হইতে একখানি ভূর্জ্জপত্র পতিত হইল, তাহাতে এই লেখা আছে,—

"তোমার আজি আমার বিশেষ প্রয়োজন, একবার তিষ্যরক্ষার কুঞ্জে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও—অভিনয়ান্তে তথায় তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।"

কুণাল দেখিলেন, পাটরাণী পরিষ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর। তখন তিনি আর বিলম্ব না করিয়া কাঞ্চনকে বলিলেন,—

"কাঞ্চন! পাটরাণী আমায় স্মরণ করিয়াছেন, আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি।"

কাঞ্চন বলিলেন "এত রাত্রে পাটরাণী ডাকিবেন কেন?"

"যখন ডাকিয়াছেন, তখন তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য" বলিয়া কুণাল তিষ্যরক্ষার কুঞ্জাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

কাঞ্চন ভাবিলেন, রাজবাড়ীতে কেবল ভয়ভাবনা আর বিচ্ছেদ ও অধর্ম্ম। ইহা অপেক্ষা বনে বনে ভ্রমণ ভাল না কি? ভাবিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কুণালও দ্রুতপদে কুঞ্জ মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

২

তিষ্যরক্ষাই বাস্তবিক যত নষ্টের গোড়া। সে পরিষ্যরক্ষিতার গৃহ হইতে ঐ পত্রখানি চুরি করিয়াছিল, গোপনীয় পত্র বলিয়া তাহাতে শিরোনাম ছিল না। চুরি করিয়া সে নিজেই পত্রখানি কুণালের দ্বারের চৌকাঠে লাগাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, যে

অভিনয়ের পর এই উপায়ে আবার কুণালকে কুঞ্জ মধ্যে পাইবে; এবং সেই সুযোগে আপনার অভীষ্টসিদ্ধির সুবিধা করিয়া লইবে। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সাধনের এক বড় বিঘ্ন উপস্থিত হইল। অভিনয় শেষ হইলে রাজা বলিলেন,—

"তিষ্যরক্ষে প্রেয়সি! আজি দীক্ষা-গ্রহণ করিয়া তুমি আমায় বড় সন্তুষ্ট করিয়াছ। আজি আমি তোমার মহলেই রাত্রিযাপন করিব।"

তিষ্যরক্ষা মুখে মহা আনন্দসহকারে বলিল, "মহারাজ! দাসীর প্রতি ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি অনুগ্রহ হইতে পারে।"

কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল, এবং কি উপায়ে বৃদ্ধ রাজাকে শীঘ্র ঘুম পাড়াইয়া নিজের পাপ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য শীঘ্র পলায়ন করিতে পারে, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন, "আমি তোমার গৃহে যাইব শুনিয়া হঠাৎ এমন অন্যমনস্ক হইলে কেন?"

দুষ্টবুদ্ধি তিষ্যরক্ষা অমনি বলিল, "মহারাজ! আমার ইচ্ছা ছিল অদ্যরাত্রে শয়ন করিব না। বহুকাল অসদ্ধর্ম্মে কাটাইয়াছি, কখন বৌদ্ধ দেবায়তন দেখি নাই, তাই মনে করিতেছিলাম, দীক্ষা লইয়া একবার রাজপ্রাসাদের ও নগরের মঠগুলি নমস্কার করিয়া আসি।"

রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"প্রেয়সি! তুমি অত্যন্ত সাধু সংকল্প করিয়াছ। অতএব আমি আর তোমার মহলে যাইব না, আমি নিজ মহলেই যাই।"

তিষ্যরক্ষা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল,—

"স্বামিন্! দেবদর্শন অপেক্ষা স্বামি-পাদদর্শন অধিক বাঞ্ছনীয়। অতএব আপনি যদি আজি আমার মহলে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে অতি সত্বর দেবদর্শন সমাপন করিয়া স্বামিপাদ দর্শন করিব, তাহাতে অনেক পাপ বিনষ্ট হইবে এবং সদ্ধর্ম্ম গ্রহণের বিশেষ অধিকারী হইব।"

রাজা মহা আহ্লাদিত চিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং শতমুখে তিষ্যরক্ষার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

৩

কোনরূপে রাজাকে শয়ন করাইয়া তিষ্যরক্ষা তাড়াতাড়ি কুঞ্জের মধ্যে উপস্থিত হইল। দেখিল, কুণাল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, এবং চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

তিষ্যরক্ষা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিষ্যরক্ষাকে দেখিয়া কুণালের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—

"তবে তুমিই কি চক্র করিয়া আমাকে এখানে আনাইয়াছ?"

তিষ্যরক্ষা হাসিতে হাসিতে কহিল,—

"হাঁ, আনাইয়াছি। আমি পরিষারক্ষিতার পত্রখানি চুরি করিয়া তোমার দ্বারে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। উহা গোপনীয় পত্র, উহাতে শিরোনামা ছিল না বলিয়া আমার বড়ই সুবিধা হইয়াছে। সে যাহা হউক, আমি তোমার জন্য এত করিতেছি, তোমার মন কি কিছুতেই বিচলিত হয় না? এইমাত্র বৃদ্ধপতিকে বঞ্চনা করিয়া তোমার নিকট আসিতেছি, তুমি এত কঠিন কেন?"

কুণাল অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া তথা হইতে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তিষ্যরক্ষা দৌড়িয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বলিল,—

"যখন তুমি আসিয়াছ, যখন তোমায় একবার পাইয়াছি, তোমায় আমার কতকগুলি কথা শুনিতে হইবে। নহিলে আমি ছাড়িব না, এখনি চীৎকার করিয়া উঠিয়া মহারাজের নিদ্রা ভঙ্গ করিব।"

কুণাল বড় বিপদে পড়িলেন। উহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াও যাইতে পারেন না, অথচ রাগে সর্ব্বাঙ্গ শরীর জ্বলিতেছে, বলিলেন,—

"বল, কিন্তু আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না।"

তিষ্যরক্ষা বলিল,—

"আচ্ছা শুন, রাজার উপর আমার প্রতাপ দেখিলে তো? এক মুহূর্ত্তে আমি রাজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র হইয়াছি। তুমি আমার নিকট যাহা চাহিবে আমি তাহাই দেওয়াইতে পারিব। তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও। যদি না হও, আমি রাজাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার কাঞ্চনমালার সর্ব্বনাশ করিব।"

কুণাল বলিলেন,—

"সে যাহা করিবার করিও, এখন আমায় ছাড়িয়া দেও।"

তিষ্যরক্ষা বলিল,—

"তবে জানিও, রাজপুরী মধ্যে আমি তোমার পরম শত্রু রহিলাম।"

কুণাল বলিলেন,—

থাক, তাহাতে আমার কিছু ক্ষতি নাই। তোমার আর কিছু বলিবার আছে?"

"না, কিন্তু আর একদিন তোমায় আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে।"

"সে যখন হইবার তখন হইবে, এখন আমায় পথ ছাড়িয়া দেও।"

এমন সময় দূরে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। তিষ্যরক্ষা বুঝিল, পরিষারক্ষিতা এই কুঞ্জে আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি সরিয়া একটী নিবিড় লতার মধ্যে প্রবেশ করিল, কুণালকে বলিল,—

"তুমি পলাও।"

৪

পরিষারক্ষিতা লতাগৃহে প্রবেশ করিয়া মহামাত্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন,

"আজি কি কি ঘটনা হইল ?" ব্রাহ্মণ সমস্ত আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল। তিষ্যরক্ষা "বৌদ্ধ হইয়াছে" শুনিয়াই পাটরাণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—

"সে কি !!! সে যে আমার ডান্ হাত।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—

"তাহার অভিপ্রায় তো বুঝিতে পারিলাম না।"

পাটরাণী বলিলেন,—

"তবে তো কাহাকেও বিশ্বাস নাই ? আমাদের কাজকর্ম্ম অতি গোপনে করিতে হইবে। তুমি কি পরামর্শ বল ?"

ব্রা। "গোপন তো নিশ্চয়ই, কিন্তু কিসে এ বিধর্ম্ম স্রোতঃ রোধ হয় ?"

পা। "দেবতারা নিজেই রক্ষা করিবেন। কিন্তু আপাততঃ কি করিলে লোকের মন ফিরান যায়।"

ব্রা। "যেখানে যেখানে ব্রাহ্মণ প্রবল সেইখানে সেইখানেই বিদ্রোহ হইবে।"

পা। "কিন্তু অশোক রাজার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিবে কি ?"

ব্রা। "সকলে একত্র হইলে কি হয় বলা যায় না। কিন্তু সকলের একত্র হইবার সম্ভাবনা বড়ই অল্প। ব্রাহ্মণেরা যে সকলেই স্ব স্ব প্রধান !"

পা। "বিদ্রোহের কথায় আমাদের কাজ নাই। অন্য কিছু উপায় আছে বলিতে পার ?"

ব্রা। "এক উপায় আছে। আমরা বোধিদ্রুমটী লুকাইয়া ফেলি। তাহার পর দিন দেশময় রাষ্ট্র করিয়া দিব, যে বিধর্ম্মীদের বটগাছ দেবতারা নষ্ট করিয়া দিয়াছেন।"

"কিন্তু তাহা কি প্রকারে করিবেন ? সেখানে অনেক পাহারা আছে।"

"সে ভার আমার। বৃক্ষ অদৃশ্য হইলে লোকে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবে এবং বিধর্ম্মীদিগের মুখে চুনকালী পড়িবে।"

এই প্রস্তাবে উভয়ে সম্মত হইয়া দণ্ড দুই রাত্রি থাকিতে উভয়ে ফিরিয়া গেল। উভয়ে দিব্য করিয়া গেল কাহাকেও এ কথা প্রকাশ করিবে না। তাহার পর প্রয়োজন হয় নগরমধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামও লাগাইয়া দিবে। কিন্তু এই দুজন ছাড়া আর কাহারও কাণে উঠিবে না।

তিষ্যরক্ষা বনান্তরালে বসিয়া সমস্ত শুনিল। শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল,—

"আর কাজ নাই।"

আবার,—

"যদি অভীষ্টই সিদ্ধ না হইল তবে জীবনেরই প্রয়োজন কি ?

এইরূপ কুণালের কথা ভাবিতে ভাবিতে পরিষারক্ষিতা ও ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়িল। তখন পাপীয়সী ভাবিল,—

"এই পরিষারক্ষিতাকে তাড়াইয়া পাটরাণী হইবার বড়ই সুবিধা হইয়াছে। পাটরাণী হইলে, পরিষারক্ষিতা অপেক্ষা আমার অনেক অধিক ক্ষমতা

হইবে। যদি পাটরাণী হইতে পারি, কুণালকে আয়ত্ত করিবার অনেক সুবিধা হইবে। আমি পাটরাণী হইলে, আমিই রাজা, আমিই মন্ত্রী, এবং আমিই সেনাপতি হইব। তখন আর একবার দেখিব।

পরিব্যরক্ষিতার সর্ব্বনাশ করিয়া পাট-রাণী হইবে আপাততঃ ইহাই তাহার সঙ্কল্প হইল। সে কিছুকালের মত কু-ণালকে বিস্মৃত হইবে বলিয়া মন বাঁধিল।

৫

কুণাল নিজগৃহে ফিরিয়া দ্বার খুলি-লেন। খুলিয়াই দেখিলেন, কাঞ্চন-মালা স্বপ্নে কাঁদিয়া বলিতেছে,—

"তুমি কোথায় নাথ! তুমি কোথায় নাথ!"

কুণাল শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না-লোকে দেখিলেন, কাঞ্চনের শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছে। সে যেন কোন বিষম স্বপ্ন দেখিয়া বিহ্বল ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কুণাল আস্তে আস্তে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আস্তে আস্তে উহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—

"এই যে কাঞ্চন, আমি এসেছি।"

কাঞ্চন কাঁদিয়া বলিল,—

"ওকি, তুমি যে পথ দেখিতে পাই-তেছ না? তুমি যে অন্ধ হইয়াছ?"

কুণাল আবার বলিল,—

"কই কাঞ্চন, আমার ত দিব্য চক্ষু রহিয়াছে?"

"না, না, তুমি অন্ধ হইয়াছ বই কি? চল, এখানে আর কাজ নাই। ঐ দেখ, ভগবান ডাকিতেছেন। আমি লাঠী ধরি, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে এস। আস্তে আস্তে! নহিলে উঁচট খাইয়া পড়িবে।"

কুণাল দেখিলেন, কাঞ্চনমালা বড়ই যন্ত্রণা পাইতেছে। উহার অনাবৃত শ্বেতবক্ষ তরঙ্গাভিহত গঙ্গাসলিলের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তিনি আস্তে আস্তে উহার গায়ে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া উহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। সহসা নিদ্রাভঙ্গ করিতে সাহস হইল না। ভাবিলেন,—

"সমস্ত দিন উৎকণ্ঠার পর একটু ঘুমাই-তেছে। ঘুম ভাঙ্গাব কি?"

অনেকক্ষণ গায়ে হাত বুলাইয়া দেখিলেন, স্বপ্নের কষ্ট নিবারণ হইল না। কাঞ্চন বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। উহার বুক আরও ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তখন আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে—অতি ধীরে উহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন।

ঘুম ভাঙ্গিলেই কাঞ্চনের একটু সুস্থ বোধ হইল। কিন্তু তখনও হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল,

"নাথ! করিলে কি? এ যে শেষ রাত্রের স্বপ্ন?"

কুণাল বলিলেন,—

"তা হোক্, তুমি আবার ঘুমাইবার চেষ্টা কর।"

বলিয়া উভয়েই শয়ন করিলেন। কুণাল অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সহজেই ঘুম আসিল। কিন্তু কাঞ্চন অনেক চেষ্টা করিয়াও ঘুমাইতে পারিল না। তাহার প্রাণ হুহু করিতে লাগিল। বার বার প্রাণনাথকে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনের ভয় ও উদ্বেগ দূর হইল না।

৬ষ্ঠ খণ্ড।

১

রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তিষ্য-রক্ষা আপন মহলে আসিয়া জুটিল। দেখিল, মহারাজের এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। সে আর নিজে ঘুমাইল না। রাজার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল। পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি জাগ-রণে নিজের এক একবার ঢুলনী আসিতে লাগিল, অতিকষ্টে তাহা সম্বরণ করিয়া রাজার নিদ্রাভঙ্গের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একবার অঞ্চল পাতিয়া রাজার পদপ্রান্তে শয়ন করিল। আবার উঠিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বেই মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি দেখিলেন, তিষ্য-রক্ষা তাঁহার পদসেবা করিতেছে; উঠিয়াই রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি এখনও ঘুমাও নাই!!"

"না মহারাজ, আমার আর ঘুমাইবার যো নাই।"

"সে কি, যো নাই কেন? তুমি বুঝি এই ঠাকুর দেখিয়া আসিতেছ।"

"না মহারাজ, আমার ঠাকুর দেখিতে যাওয়া হয় নাই।"

"আমি তো দেখিলাম, তুমি বাহির হইয়া গেলে?"

"গিয়াছিলাম বটে; তখনই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।"

"আসিতে হইয়াছে! ইচ্ছাপূর্ব্বক আইসো নাই?"

"না মহারাজ, সে সব কথায় কাজ নাই" বলিয়া তিষ্যরক্ষা তাড়াতাড়ি স্বহস্তে রাজার মুখ প্রক্ষালনার্থ সুগন্ধি বারি আনিয়া দিল, এবং তাঁহার মুখাদি প্রক্ষালনের জন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া উদ্যোগ করিতে লাগিল।

রাত্রে কি স্বপ্ন দেখিয়া রাজার মন বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। তিষ্যরক্ষার কথায় তাঁহার মন আরো ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি উহার কার্য্যে বাধা দিয়া বলি-লেন,—

"তুমি বল, কেন তোমায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে?"

"সে অতি সামান্য কারণ, আমি ভয় পাইয়াছিলাম।"

"না, না, তুমি গোপন করিতেছ। ঠিক করিয়া বল কি হইয়াছে।"

"কিছু নয়," বলিয়া তিষ্যরক্ষা আবার রাজার মুখ প্রক্ষালনার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিল। রাজা আবার তাহাকে ধরিয়া বলিলেন,—

"না বলিলে আমি ছাড়িব না; তোমায় বলিতেই হইবে।"

"সত্যই মহারাজ, আমায় ভয় লাগিয়াছিল।"

"কিসের জন্য ভয় লাগিল?"

"মহারাজ, আমি মহল হইতে বাহির হইয়া আমার বাগানের সীমা পার হইতে না হইতেই দেখি, আমারই কুঞ্জমধ্যে জনকতক লোক বসিয়া কি বলাবলি করিতেছে। আমার অত্যন্ত ভয় হইল। তাহার পর দেখি, দুই তিনজন লোক আমার বাড়ীর দিকে আসিতেছে। মহারাজ এখানে একাকী শয়ন করিয়া আছেন, সুতরাং আমার বড় ভয় হইল। আমি ঘুরিয়া অন্যপথে বাড়ীমধ্যে আসিবার চেষ্টা করিলাম, দেখিলাম সকল পথেই দুই একজন, দুই একজন লোক। হঠাৎ কতকগুলা শুষ্ক পাতা আমার পায়ে লাগিল। তাহার মধ্যে একটা কি ঠাণ্ডা জিনিস বোধ করিলাম, আস্তে আস্তে তুলিলাম; তুলিয়া দেখি ছোরা। তখন আর আমার সন্দেহ রহিল না। ভয়ে প্রাণ হাঁপাইতে লাগিল। ভাবিলাম, মহারাজ আমার মহলে একা শয়ন করিয়া আছেন।"

"অ্যাঁ, শুষ্ক পাতার মধ্যে ছোরা পেলে!!!"

"তাই পাইয়াই তো আমারি আরো ভয় হইল; আমি একটু থতমত খাইয়া রহিলাম। শেষ ভাবিলাম, মহারাজ একাকী শুইয়া রহিয়াছেন, আমার কোথায়ও যাওয়া উচিত নয়।"

"তোমার কি বোধ হয়, আমারই উপর তাহাদের রাগ?"

"কেমন করিয়া জানিব মহারাজ? আমি তো সেই ছোরা সহায় করিয়া, সাহসে ভর করিয়া দরজার দিকে দৌড়িলাম। যাহারা আমার বাড়ীর দিকে আসিতেছিল, তাহারা আমায় তাড়া করিল। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ঝনাৎ করিয়া দরজা ফেলিয়া হুড়্কা দিলাম। সে শব্দ কি আপনি শুনিতে পান্ নাই?"

রাজাও স্বপ্নে কি একটা শব্দ শুনিয়াছিলেন, বলিলেন,—

"ঝনাৎ শব্দ শুনি নাই, একটা কি হড়্ হড়্ হড়্ হড়্ শব্দ শুনিয়াছিলাম।"

"তবে আপনি হুড়কা দিবার শব্দ শুনিয়াছিলেন।"

রাজা অন্যমনস্ক হইয়া বলিলেন,—

"হবে।"

তিষ্যরক্ষা আবার তাঁহার মুখ প্রক্ষালনাদির উদ্যোগ করিতে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন রাজা সম্বিৎ হইলেন, তিষ্যরক্ষাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—

"কে কে লোক আসিয়াছিল, কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছ কি?"

"না মহারাজ, কাহাকেও চিনিতে পারি নাই।"

"তাহাদের বেশ কিরূপ ছিল?"

"একে আমার ভয়ে ধাঁদা লাগিয়াছিল, তাহার পর জ্যোৎস্নালোকে সবই চক্‌চকে দেখাইতেছিল।"

"কয়েকজন লোককে এদিক ওদিক দিয়া আসিতে দেখিলে, কে কোন্ দিক দিয়া আসিল মনে হয়?"

"দুই একজন লোক কাঞ্চনকুটীরের দিক দিয়া আসিয়াছিল।"

"কাঞ্চনকুটীরের দিক দিয়া! ব্যাপারখানা কিছু বুঝ্‌তে পারিতেছি না। যা হোক্, তুমি আমায় ডাক নাই কেন?"

"প্রথমে দরজা দিয়াই তো খানিকক্ষণ অজ্ঞানের মত পড়িয়া রহিলাম। তাহার পর আসিয়া দেখিয়া গেলাম, মহারাজ নিদ্রাগত আছেন, বাড়ীর ভিতরে কোন গোলযোগ নাই। একবার ভাবিলাম, মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ করি; আবার ভাবিলাম, ছাদের উপর হইতে দেখিয়া আসি, বিশেষ বাড়াবাড়ি দেখিলে মহারাজকে জাগাইব।"

"তুমি ছাদে উঠিয়াছিলে? কিছু দেখিতে পাইয়াছ?"

"কিছুই না।"

"একবারে কিছু না? এত লোক সব তবে কোথায় গেল?"

"কেবল বোধ হইল যেন দুজন একজন লোক পাটরাণীর মহলের কাছ দিয়া কোথায় গেল।"

"পাটরাণীর মহলের দিক্ দিয়া গেল, না মহলে গেল?"

"ঠিক্ বলিতে পারিতেছি না; সেই পর্য্যন্তই গেল, তার পর তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না।"

"আমার একটা বড় সন্দেহ হইতেছে।"

"আমি তো মহারাজ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, রাত্রে আমার বড় ভয় হইয়াছিল।"

মহারাজ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"ভয়ের তো খুবই কারণ আছে দেখিতেছি," বলিয়া মহারাজ সত্বর রাধগুপ্তকে ডাকাইয়া তাহাকে এই ব্যাপারের তথ্য অনুসন্ধানের ভার দিয়া প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিষ্যরক্ষা আপত্তি করিল, যে তাহার মহলে বসিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান না হয়। রাজা তাহার সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না।

২

রাজা চলিয়া গেলে, রাধগুপ্ত রাণীকে ইঙ্গিত করিয়া একটু নিভৃত স্থানে গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এ আবার কি খেলা খেলিতেছ?"

"বুঝিতেছ না কি?"

"কার মাথা খেতে হবে?"

"পরিষ্যরক্ষিতার প্রথম, আর কুণালের যদি পারি।"

"পরিষ্যরক্ষিতার কি অপরাধ? পাটরাণী হবার সখ হয়েছে না কি?"

"কণ্টক দূর করাই ভাল?"

"কুণালের উপর অত্যাচার কেন?"

"রাজা বৌদ্ধ হইয়া অবধি উঁহার উপর বড় ভক্তি, উঁহাকে বিদায় করা প্রয়োজন।"

"আবার তক্ষশীলায় না কি ?"

"বিম্বিসার বংশের কোন্ ছেলে তক্ষশীলার জল না খেয়েছে ?"

"বুঝিলাম। আপাততঃ তবে কুণাল আর পরিষ্যরক্ষিতাকে ধরে আস্তে হচ্চে ?"

"শুধু তাই নয়, আর জনকত লোক যারা পড়লেই কথাটা বুঝতে পারে, আর কিছুতেই ডরায় না, এমন চার পাঁচজন লোকও সেই সঙ্গে।"

৩

রাধগুপ্ত অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজকে সংবাদ দিল,—

"কিছুই তো ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিলাম না।"

রাজা অত্যন্ত উৎসুকচিত্তে তাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার পর কিছুই সন্ধান পাইল না শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"আমার বাড়ীর মধ্যে আমার দ্বারদেশে কতকগুলা লোক জমায়েত হইল, তোমরা ইহার কিছুই সন্ধান করিতে পারিলে না ? তোমাদের মত মন্ত্রী লইয়া রাজ্য করা বিড়ম্বনামাত্র।"

রাধগুপ্ত অবনতবদনে অধোমুখে বলিতে লাগিলেন,—

"মহারাজ, আমি তো কিছুই সন্ধান পাইলাম না, কিন্তু আপনি সত্বরই সন্ধান পাইতে পারেন। যাহারা জমায়েত হইয়াছিল তাহাদের কেহ কেহ কাঞ্চনকুটীরের দিকে, কেহ কেহ পাটরাণীর মহলের দিকে গিয়াছে। আপনি ইহাদের কাহাকেও যদি আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, অনেক সংবাদ পাইতে পারেন। আমি উঁহাদের ভৃত্য কঞ্চুকীবর্গকে প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারা কেহই কিছু বলে না।"

"বলে না, তাহাদের মুণ্ডপাত করিতে হইবে। কঞ্চুকী! শীঘ্র যাইয়া কুণাল ও পরিষ্যরক্ষিতাকে কহ যে রাজা অশোক আপনাদের স্মরণ করিতেছেন।"

কঞ্চুকী দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রাজা, মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষা গত রাত্রের ঘটনাবলীর বিষয় কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষা রাজার ভয় ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করিয়া দিতে লাগিলেন।

৪

কঞ্চুকী কাঞ্চন কুটীরে প্রবেশ করিবামাত্র টিক্‌টিকি "টিক্ টিক্ টিক্" শব্দ করিয়া উঠিল, বামভাগে কাক সকল "আকা আকা আকা" করিয়া বিকট শব্দ করিয়া উঠিল, আর মৎস্যাহারক গৃধ্রের মুখচ্যুত রক্তবিন্দু কাঞ্চনের সম্মুখে পতিত হইল। কাঞ্চন কুণালের জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে চারিদিকে নেত্রনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই কঞ্চুকীকে দেখিতে পাইলেন, বোধ হইল যেন যমদূত; তিনি ত্বরায় কুণালের পার্শ্বে যাইয়া লুকাইলেন।

কঞ্চুকী কুণালকে রাজাদেশ বিজ্ঞাপন করিল। কাঞ্চন শুনিয়া আরও উৎকণ্ঠিত হইল। কুণালও একটু উৎকণ্ঠিত হইলেন। কুণাল উৎকণ্ঠিতচিত্তে রাজসমীপে যাইতে লাগিলেন, কাঞ্চন পথ পানে তাকাইয়া রহিল। কুণাল নয়নের অন্তরাল হইলে সে বসিয়া পড়িল, ভাবিল "বুঝি আর দেখা হইবে না।"

৫

কুণাল রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠিত ভাব বিশুষ্কমুখ দেখিয়া রাজারও বিস্ময় ও ত্রাস হইল। রাজা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কালি কতকগুলি লোক কোন গুপ্ত অভিপ্রায়ে এই বাড়ীর বাগানে জমায়েত হইয়াছিল, তাহাদের হাতে অস্ত্রাদিও ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার বাড়ীর দিকে বা দিক্ দিয়া গিয়াছে। তাহারা কে তুমি জান?"

"না মহারাজ, আমি নিজেই তিষ্যরক্ষা দেবীর কুঞ্জে কালি আসিয়াছিলাম।

"তুমি?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

সশস্ত্রে?"

"যে বেশে অভিনয়ে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়াছিলাম সেই বেশে।"

"তুমি তবে অভিনয়ান্তে নিজ গৃহে যাও নাই?"

"গিয়াছিলাম, তথায় এক পত্র পাইলাম।"

"পত্র কাহার?"

"হস্তাক্ষরে বোধ হইল পরিষ্যরক্ষিতার।"

"পরিষ্যরক্ষিতার?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

মন্ত্রী বলিল "যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে, তিনি সদ্ধর্ম্মের বড়ই দ্বেষবতী।"

এমন সময়ে প্রতিহারী পরিষ্যরক্ষিতার আগমন সংবাদ রাজার গোচর করিল, রাজা যথোচিত সম্বর্দ্ধনা সহকারে তাহাকে পার্শ্বে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "দেবী! আপনি কল্য কুণালকে তিষ্যরক্ষার কুঞ্জে আসিতে বলিয়াছিলেন?"

"কুণালকে? কই না।"

রাজা মন্ত্রীর মুখপানে চাহিলেন। মন্ত্রী কুণালকে বলিলেন "কই সে পত্র?"

"কোথায় ফেলিয়াছি মনে নাই,—

মন্ত্রী বলিল "ওরূপ কথায় এখানে হইবে না, স্বরূপ বল। রাজার নিদ্রাগৃহের নীচে সশস্ত্রে লোক আসিয়াছিল, তাহার প্রমাণ তোমার পত্র।"

রাজা বলিলেন, "একি কুণাল, তোমার পিতার যাহারা সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিল, তাহাদের আজি বিচার হইবে, তুমি কোথায় আগ্রহসহকারে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ সন্ধান করিয়া দিবে, না তুমিই তাহাদের প্রশ্রয় দিতেছ।"

কু। "আমি নির্দ্দোষ, আমি কাহাকেও প্রশ্রয় দিতেছি না; কিন্তু আপনি তো আমার সব কথা শুনিলেন না?"

রা। এ বিষয়ে তোমার কি কথা থাকিতে পারে তাহা আমি জানি না।

কু। কথাটী এই, পত্রখানি যদিও পরিষ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর, কিন্তু সেখানি তিষ্যরক্ষা পাঠাইয়াছেন।

মন্ত্রী বলিলেন,—

"তাহার প্রমাণ?"

কু। তিষ্যরক্ষা ঠাকুরাণী কাল আ-মাকে তাহা কুঞ্জগৃহে বলিয়াছেন।

রা। তবে তিষ্যরক্ষার সহিত কাল তোমার কুঞ্জগৃহে সাক্ষাৎ হইয়াছিল!!

কু। হইয়াছিল।

রাজা বিরক্তভাবে তিষ্যরক্ষার মুখপানে চাহিলেন। তিষ্যরক্ষার মুখ শুকাইয়া উঠিল। সে বলিল—

"মহারাজ! ভয়ে আপনাকে আমি সকল কথা বলিতে পারি নাই। আমি বৌদ্ধ দেবায়তন দর্শনের সঙ্গী কুণাল-কেই স্থির করিয়াছিলাম, এবং উহাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম।"

রাজা বলিলেন,—

"পরিষ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর কোথা হইতে আসিল?"

তিষ্যরক্ষা অম্লানমুখে বলিল—

"উনি বিনা স্বাক্ষর, বিনা শিরোনামা অনেক পত্র প্রত্যহ পাঠাইয়া থাকেন।"

পরিষ্যরক্ষিতা আর থাকিতে পারি-লেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"মহারাজ, আমি আর এখানে থা-কিতে পারি না। আমি দেখিতেছি, আপনি বৌদ্ধ হইয়া অবধি আমার প্রতি আপনি বিরূপ হইয়াছেন, কুচক্রী লোকে সেই সুযোগে আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে। মহারাজ, আপনি বিচারকর্ত্তা, সুবিচার করুন, আমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই।" বলিয়া ব্যস্তভাবে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কুণাল কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহি-লেন। রাজা, মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষা কিয়ৎ-ক্ষণ পরস্পর চাহাচাহি করিতে লাগিল। তিষ্যরক্ষা বলিল, "আরো আছে টের পাবেন।"

রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে পরিষ্য-রক্ষিতাই তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করি-য়াছে। কিন্তু তাহাদের কথা কহিবার পূর্ব্বেই নগরমধ্যে মহা কোলাহলধ্বনি হইয়া উঠিল। প্রকাণ্ড দাঙ্গা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সকলে ব্যস্ত হইয়া ছাদের উপর উঠিলেন। গিয়া দেখিলেন, কুক্কুটারাম ভস্মীভূত হইতেছে। রাজা তিষ্যরক্ষার দিকে চাহিয়া বলি-লেন,—

"এও কি উহার কাণ্ড না কি?"

তিষ্যরক্ষা বলিল "বিচারে যাহা হয় করিবেন, আমার কোন কথায় কাজ নাই।"

রাজা ক্রোধে অন্ধ হইয়া মন্ত্রীর প্রতি পরিষ্যরক্ষিতার ঘর ঘেরাও করিতে আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং কুণাল সমভি-ব্যাহারে দাঙ্গা হাঙ্গাম নিবারণার্থ নগরাভি-মুখে প্রস্থান করিলেন।

৬

এরূপ মহামারীর সময় তিষ্যরক্ষা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে পুরুষের বেশ ধারণ করিল, দশ বার জন সৈনিক সংগ্রহ করিল, করিয়া একবারে দাঙ্গা হঙ্গামাস্থল ভেদ করিয়া মহামাত্য ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ দাঙ্গা হঙ্গামা সমস্ত বাধাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছে, যেন কিছুই জানে না। তিষ্যরক্ষা হঠাৎ সশস্ত্র লোক সঙ্গে তাহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে মহামাত্য একটু ব্যস্ত হইলেন। তখন তিষ্যরক্ষা বলিল,—

"আমার পুরুষের বেশ দেখিতেছ, আমি পুরুষ নহি, আমার নাম তিষ্যরক্ষা। আমার কুঞ্জে বসিয়া পাঠরাণীর সহিত যে পরামর্শ করিয়াছ, তাহা শুনিয়াছি। তুমিই এই দাঙ্গা হঙ্গামের মূল আমি জানি, এবং রাজাকে বলিয়াছি। তুমি যদি প্রাণ চাও, গাছটী কোথায় দেখাইয়া দেও। যদি দেখাইয়া দেও তোমায় নির্ব্বিবাদে নগরের বাহির করিয়া দিয়া আসিব। যদি না দেও তবে এখনি তোমায় রাজার নিকট লইয়া যাইব। লইয়া গিয়া তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়াইব। জান, বৌদ্ধ রাজার দেশে ব্রাহ্মণ আর অবধ্য নয়।"

ব্রাহ্মণ ভয়ে ত্রাসে শঙ্কায় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। একটী কথাও কহিতে পারিল না। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহাকে একটী সুড়ঙ্গের মুখ দেখাইয়া দিল। তিষ্যরক্ষা তাহাকে সঙ্গে করিয়া নগরের বাহিরে লইয়া গেল। সেখানে ব্রাহ্মণের কথা ফুটিল। ইতিপূর্ব্বেই পরিষ্যরক্ষিতার কি দশা হইয়াছে তিষ্যরক্ষা তাহাকে শুনাইয়াছিল। সে করযোড়ে নানা প্রকার বিশ্লিষ্ট বাক্যপরম্পরা সৃজন করিয়া তিষ্যরক্ষার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল।

তিষ্যরক্ষা তাহাকে গঙ্গাতীরে শপথ করাইয়া লইল, যে "অদ্যাবধি আমি যা বলিব তুমি তাহাই করিবে।"

শপথ শেষ হইলে তিষ্যরক্ষা বলিল,—

"কুঞ্জরকর্ণ, তুমি তক্ষশীলায় যাও। তোমায় আমার বিস্তর প্রয়োজন আছে। আমি প্রাণপণে তোমার ভাল করিব।"

কুঞ্জরকর্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

তিষ্যরক্ষা স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

৭

অশোক ও কুণালের প্রতাপে দাঙ্গা হঙ্গাম শীঘ্রই শমিত হইল। কুর্কুটারামের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের কি ঘোর অপযশ! ব্রাহ্মণদের দেবতা কি জাগ্রত! নাস্তিকদের সেই বটগাছ দেবতারা হরণ করিয়াছেন। তাহা আর পাওয়া গেল না। রাজা অশোক, কুণাল, উপগুপ্ত প্রভৃতি বহু সংখ্যক প্রধান প্রধান বৌদ্ধ বিষণ্ণবদনে, অনাহারে, যেখানে বৃক্ষ ছিল, তাহার চারি দিকে বসিয়া বিলাপ ও

পরিতাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে তিষ্যরক্ষা মহারাজের সংবাদ লইবার জন্য বার বার লোক পাঠাইতে লাগিল। রাজা আসিলেন না। তিষ্যরক্ষা রাজদর্শনের প্রার্থনা জানাইল। রাজা সম্মত হইলে, তিনি বোধিমণ্ডপে গমন করিলেন, এবং তথায় অন্যলোকেও যেরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে, তিনিও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিষ্যরক্ষা কহিল,—

"মহারাজ! ভগবান অবলোকিতেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। আমি [illegible] বোধিবৃক্ষ দেবভবন হইতে পুনরানয়ন করিব। আপনারা আর কিয়ৎক্ষণ কোন মঠায়তনে গিয়া ধ্যানমগ্ন থাকুন।"

তিষ্যরক্ষা যেখানে বৃক্ষ ছিল সেইখানে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইল, বোধিবৃক্ষ অল্পে অল্পে উঠিতে লাগিল। ভূখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া বোধিদ্রুম স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে তিষ্যরক্ষার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। বৃক্ষ ক্রমে ক্রমে যথা স্থানে স্থাপিত হইল। দেবপূজকদিগের মুখ কালিমাবর্ণ হইল। বৌদ্ধদিগের জয়ধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

অশোকাদি বৌদ্ধমণ্ডলী তিষ্যরক্ষার চারিদিকে দাঁড়াইয়া তাহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। উপগুপ্ত এই সভাস্থলে তিষ্যরক্ষাকে অর্হৎ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন, এবং আর্হতী দীক্ষা দিয়া আপনার জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী তখন এই ঋদ্ধিমতী* পতিপরায়ণা ধর্ম্মানুরাগিণী, রমণীকুলললামভূতা কামিনীকে সদ্ধর্ম্ম বিদ্বেষিণী, পতিপ্রাণহারিণী, ষড়যন্ত্রকারিণী পরিষারক্ষিতার পরিবর্ত্তে পাটরাণী করিবার প্রস্তাব করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্থির হইল তিষ্যরক্ষা পাটরাণী হইবেন; এবং [illegible] পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের দুর্গে অবরুদ্ধ হইবেন।

৮

এই জয়োল্লাসের মধ্যে তিষ্যরক্ষা পুনঃ পুনঃ কুণালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন কুণালের মুখে সেই ঘৃণা, সেই অবজ্ঞা ও সেই বিতৃষ্ণা।

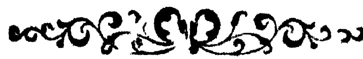
৯

এই ব্যাপারের দুই পাঁচ দিনের মধ্যেই তিষ্যরক্ষার অভিষেক হইল। তিষ্যরক্ষা অন্যান্য পাটরাণীদের ন্যায় কেবলমাত্র অন্তঃপুরের কর্ত্রী হইলেন না। তিনি সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন। যে সকল আজ্ঞা বাহির হইত তাহা অশোক ও তিষ্যরক্ষা এই উভয়ের নামে বাহির হইত। মন্ত্রী

* অলৌকিক কার্য্যকরণের ক্ষমতার নাম ঋদ্ধি।

সভায়ও তিষ্যরক্ষা রাজার বামে বসিতেন। রাজাও এই অবধি ষড়যন্ত্রের ভয়ে তিষ্যরক্ষার মহল ত্যাগ করিতেন না। সুতরাং এই অবধি তিষ্যরক্ষাই প্রকৃতপক্ষে মগধ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন। তাঁহার আজ্ঞায় অন্তঃপুর চলিত, মন্ত্রী সভা চলিত এবং রাজা অশোকও চলিতেন। কিন্তু তিষ্যরক্ষা সর্ব্বদাই ভাবিতেন,—

"আমার উদ্দেশ্য কি করিয়া সিদ্ধ করিব।"



জাল প্রতাপচাঁদ।

গত সংখ্যায় স্থানাভাব প্রযুক্ত জালরাজার সেনাক্ত সম্বন্ধে সকল কথা বলা হয় নাই। এখন তাহা বলিতে গেলে বোধ হয় সংলগ্ন হইবে না। তথাপি একটি কথা উল্লেখ করি।

উভয় পক্ষের জোবানবন্দী প্রায় শেষ হইয়া আসিলে একদিন রাজা প্রতাপচাঁদের মাতুল হঠাৎ আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জালরাজা তাঁহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে জজ সাহেবকে বলিয়া উঠিলেন ঐ আমার মাতুল আসিয়াছেন। ইঁহার জোবানবন্দী লওয়া হউক। কিন্তু জালরাজার উকিল তাহাতে আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, সেনাক্তসম্বন্ধে যে প্রমাণ আমরা দিয়াছি, এ মোকর্দ্দমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, আর প্রমাণ দিব না। জালরাজা তাহাতে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিলে, উকিল সাহেব তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, উপস্থিত ফৌজদারি মোকদ্দমায় দেওয়ানির প্রমাণ অনাবশ্যক, যে প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে তাহাই অতিরিক্ত হইয়াছে। আমি যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আর পাঁচ হাজার সাক্ষী আপনাকে সেনাক্ত করিলেও জজ সাহেবের মত ফিরিবে না। আপনি প্রতাপচাঁদ কি না, এ কথার বিচার দেওয়ানি আদালতে ভিন্ন এখানে হইবে না। এখানে সে বিচার হইলেও কোন ফল দর্শিবে না, এখানকার বিচারে আপনি রাজত্ব পাইবেন না, আপনাকে আবার দেওয়ানিতে নালিস করিতে হইবে। তবে এখন সকল প্রমাণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি?

সা সাহেব এখানে ভুলিলেন। তিনি জানিতেন, যে গুটীকতক প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী একত্র হইয়া পূর্ব্বাহ্নে পরামর্শ করিয়াছিলেন, যে জালরাজাকে আসামী ভিন্ন কখন কোন মোকর্দ্দমায় ফরিয়াদি হইতে দেওয়া হইবে না; এবং সেই পরামর্শ অনুসারে জালরাজাকে ফৌজদারিতে আসামী করা

হইয়াছিল, এ কথা সা সাহেব নিজে লিখিয়া গিয়াছেন। তথাপি তিনি মনে করিয়াছিলেন যে অন্য লোকে দেওয়ানি আদালতে যেরূপে নালিস করে, জালরাজাও সেইরূপ নালিস করিতে পাইবেন। তাঁহার এ প্রত্যাশা অসঙ্গত! জালরাজার পক্ষে দেওয়ানির দ্বার অভাবনীয় ঘটনায় রোধ হইয়াছিল। সে কথা পরে বলা যাইবে। আপাততঃ এ মোকর্দ্দমায় অন্য প্রমাণ সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যু প্রকৃত কি না।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যু প্রমান করিবার নিমিত্ত রাজবাটীর সাক্ষী রাধামোহন সরকার, বসন্তলাল বাবু, নন্দবাবু, ভৈরব বাবু প্রভৃতি পনরজন জোবানবন্দী দিলেন। তাঁহাদের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে, তাঁহারা সকলেই রাজবাটীর বেতনভোগি এবং পরাণ বাবুর আত্মীয় কুটুম্ব। তাঁহারা কে কি বলিলেন, আনুপূর্ব্বীক সে পরিচয় দেওয়া অনর্থক। মোটকথা, তাঁহারা সকলেই এইরূপ বলিলেন যে ১২২৭ সালের ২১ শে পৌষ রাত্র দেড় প্রহরের সময় কালনার রাজবাটী হইতে প্রতাপচাঁদকে পালকী করিয়া গঙ্গাযাত্রা করা হয়, রাত্র তখন বড় অন্ধকার। পৌষমাসের রাত্রে বড় শীত। গঙ্গাতীরে সেই শীতে প্রতাপচাঁদকে রাখায় তাঁহার কম্প আসিল, কাজেই তাঁহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া যাইতে হইল, তাঁবু সেই স্থানে জলের ধারেই পূর্ব্বে খাঁটান হইয়াছিল। তাহার পর তথায় গীতাপাঠ আরম্ভ হইল। এদিকে প্রতাপচাঁদ পালঙ্কে শুইয়া হাতী ঘোড়া ধন ধান্য দান করিতে লাগিলেন। দান করা হইলে পর তাঁহাকে অন্তর্জলি করা গেল, তাঁহার পা মোহন বাবু জলে ডুবাইয়া ধরেন। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হইলে ঘাসিরাম তাঁহার মুখাগ্নি করেন, বাবলা ও চন্দনকাষ্ঠে প্রতাপের শবদাহ হয়। সেই সময়ে ঘাটে দশ বারটা মসাল জালা ছিল।

এই সকল বৃত্তান্ত সাক্ষীরা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। কিন্তু তেজচাঁদ বাহাদুরের মৃত্যু কোন্ তারিখে বা কোন্ সময়ে হয়, তাহা সাক্ষীরা অনেকেই বলিতে পারিলেন না। অথচ প্রতাপের মৃত্যুর প্রায় ১২ বৎসর পরে তেজচাঁদের মৃত্যু হয়। কেহ বলিলেন, তাহা স্মরণ নাই, কেহ বলিলেন বধুরাণীদের মোকর্দ্দমায় এই সকল বিষয়ে আমি সাক্ষী দিয়াছিলাম তাহাতেই প্রতাপচাঁদের মৃত্যু বৃত্তান্ত আমার স্মরণ আছে। তেজচাঁদের মৃত্যু স্মরণ রাখিবার সেরূপ কোন কারণ ঘটে নাই। সাক্ষীরা এইরূপ নানা হেতু দর্শাইলেন।

কিন্তু এই সকল জোবানবন্দীতে জজ সাহেবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। তিনি আপনার রায়ে লিখিলেনঃ—

"The proof here is of the strongest

description of the testimony of the fact; viz. the deposition of the witnesses (fifteen in number) named in the margin, who have sworn positively to the death and cremation, and who are consistent in their narrative of the attendant particulars, their testimony would appear to be conclusive."

বিশ বৎসরের ঘটনা পোনেরজন সাক্ষীতে বর্ণনা করিল, অথচ কেহ কাহার সহিত কোন অংশে অনৈক্য হইল না। কি কাষ্ঠ দ্বারা শবদাহ করা হইয়াছিল, তাহা পর্যান্ত সাক্ষীরা একইরূপ বলিয়াছিল, কোন অংশে অনৈক্য হয় নাই। সুতরাং তাহাদের জোবানবন্দীর প্রতি জজ সাহেবের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল।

জাল রাজা জজকে বলিলেন, পরাণের আত্মীয় কুটুম্বের কথায় নির্ভর করিয়া কেন আমার মাথা খাও? প্রতাপের মরণের সময় পরাণের কুটুম্ব ব্যতীত কি আর কেহ ছিল না? প্রতাপেরও ত কুটুম্ব, আমলা, চাকর সকলই ছিল, কই তাহাদের একজনকেও ত ডাকা হয় নাই। কেবল পরাণের চাকর, পরাণের কটুম্ব, পরাণের অন্নদাস ব্যতীত আর কি কেহ ছিল না? জজ সাহেব এ সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

জালরাজা স্বীকার করেন, যে তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা তাঁহার নিজের ইচ্ছামতে হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, যে কোন পীড়া আমি অনুকরণ করিতে পারি। মৃত্যুও অনুকরণ করিতে পারি। কবিরাজেরা সে অনুকরণ ছলাংশে বুঝিতে পারিবে না।

পীড়ার ভাণ সম্বন্ধে জালরাজার কথা কতদূর গ্রাহ্য তাহা বলা যায় না। তবে বড় বড় ডাক্তার ও বিজ্ঞানবিদের মধ্যে দুই একজন বলেন যে মৃত্যু অনুকরণ তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ডাক্তার চেনি সাহেব বলেন, যে একসময় কর্ণেল টাউন্‌সেণ্ড বড় পীড়িত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ কর্ণেল সাহেবকে দুইবার করিয়া দেখিতে যাইতেন। একদিন কর্ণেল সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, যে "কতকদিন হইতে আমার কেমন একটা হইয়াছে, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না, আমায় বুঝাইয়া দেও। আমি দেখিতেছি যে আমি মনে করিলে মরিতে পারি, আবার চেষ্টা করিলে বাঁচিতে পারি।" সেস্থানে আর একজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম বেনার্ড এবং একজন এপথিকারি ছিলেন তাঁহার নাম স্ক্রাইন। এই কয়জনে কর্ণেল সাহেবের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, কতকটা অবিশ্বাসও করিলেন। কিন্তু কর্ণেল সাহেব এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইবার নিমিত্ত জেদ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিবার পুর্ব্বে ডাক্তার সাহেবেরা একে একে কর্ণেল সাহেবের

নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। নাড়ী বেশ পরিষ্কার তবে একটু ক্ষীণ। তাঁহারা পরস্পর বুকে হাত দিয়া দেখিলেন তাহাও সহজমত টিপ্ টিপ্ করিতেছে। তাহার পর কর্ণেল সাহেব চিৎ হইয়া স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিলেন। ডাক্তার চেনি সাহেব তাঁহার দক্ষিণ হস্তের নাড়ী টিপিয়া ধরিলেন, ডাক্তার বেনার্ড বুকে হাত দিয়া থাকিলেন। আর স্কাইন সাহেব একখানি পরিষ্কার দর্পণ নাসার নিকট ধরিয়া রহিলেন। ক্রমে নাড়ী যাইতে লাগিল, শেষ একেবারে পাওয়া গেল না। হৃদ্দীচালনা স্থগিত হইল, নিশ্বাস প্রশ্বাসও স্থির হইয়া গেল। যে দর্পণ নাসাগ্রে ধরা হইয়াছিল, তাহাতে আর নিশ্বাসের ঘাম লাগিল না। তাহার পর ডাক্তারেরা একে একে সকলেই নাড়ী দেখিলেন, সকলেই বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, সকলেই দর্পণ ধরিয়া দেখিলেন, জীবিতের চিহ্ন কেহই কিছু পাইলেন না। তখন তিন জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্কাতর্কি করিলেন, এ সময়ের মধ্যে কর্ণেল সাহেবের আর চেতন হইল না। শেষ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে কর্ণেল সাহেব নিশ্চয়ই মরিয়াছেন। এইরূপে অনেক ক্ষণ গেল। তাহার পর তাঁহারা চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমত সময়ে কর্ণেল সাহেবের শরীর একটু নড়িল। ডাক্তারেরা নাড়ী দেখিলেন, নাড়ী হইয়াছে। বুক দেখিলেন, বুকের গতি আরম্ভ হইয়াছে। নাসায় হাত দিলেন, নিশ্বাস বহিতেছে। শেষ কর্ণেল সাহেব ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা অবাক্ হইয়া থাকিলেন। কেহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, অথচ মৃত্যু যে নিশ্চয়ই হইয়াছিল সে বিষয়ে তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ থাকিল না।*

এরূপ আরও দুই চারিটি ঘটনার

---

* ডাক্তার চেনি এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

"Colnel Townsend told us, he had sent for us to give him some account of an odd sensation he had for some time observed and felt in himself: which was, that composing himself, he could *die* or expire when he pleased, and yet by an effort or some how, he could come to life again, which it seems he had sometimes tried before he had sent for us. We heard this with surprize, but as it was not to be accounted for from now common principles, we could hardly believe the fact as he related it, much less give any account of it: unless he should please to make the experiment before us, which we were unwilling he should do, lest, in his weak condition, he might carry it too far.

কথা শুনা যায়। ডাক্তার টানার সাহেব লিখিয়াছেন যে, দেহের উপর মনের একাধিপত্য অতি অসাধারণ, এ সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনার প্রমাণ আছে। যথা সেল্সাস সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, যে একজন পাদরি যখনই ইচ্ছা করিতেন তখনই আপনার সংজ্ঞাকে স্বতন্ত্র করিয়া আপনি জ্ঞানশূন্য ও প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারিতেন।*

He continued to talk very distinctly and sensibly above a quarter of an hour about this (to him) surprizing sensation and insisted so much on our seeing the trial made, that we were at last forced to comply. We all three felt his pulse first: it was distinct, tho' small and *thready*: and his heart had its usual beating. He composed himself on his back, and lay in a still posture some time: while I held his right hand, Dr. Baynard laid his hand on his heart, and Mr. Skrine held a clean looking glass to his mouth. I found his pulse sink gradually till at last I could not feel any by the most exact and nice touch. Dr. Baynard could not feel the least motion in his heart, nor Mr. Skrine the least soil of breath on the bright mirror he held to his mouth; then each of us by turns examined his arm, heart and breath, but could not by the nicest scrutiny discover the least symptom of life in him. We reasoned a long time about this odd appearance as well as we could, and all of us judging it inexplicable and unaccountable, and finding he still continued in that condition, we began to conclude that he had indeed carried the experiment too far, and at last were satisfied he was actually dead, and were just ready to leave him. This continued about half an hour. By nine O'Clock in the morning in autumn, as we were going away, we observed some motion about the body, and upon examination found his pulse and the motion of his heart gradually returning; he began to breathe gently and speak softly: we were all astonished to the last degree at this unexpected change, and after some further conversation with him, and among ourselves, went away fully satisfied as to all the particulars of this fact, but confounded and puzzled and not able to form any rational scheme that might account for it"—*Quoted by T. H. Tanner in his Practice of Medicine.*

* The influence of the will over even the involuntary muscles is sometimes extraordinary, as many remarkable cases attest. Thus

শুনা যায় দেহ হইতে জীবাত্মাকে ইচ্ছামত স্বতন্ত্র করিবার পদ্ধতি আমাদের যোগশাস্ত্রে বিশেষ করিয়া লিখিত আছে। অনেকে বলেন যোগীদের মধ্যে সে পদ্ধতির চর্চ্চা অদ্যাপিও বিলক্ষণ প্রচলিত। এ কথা কতদূর সত্য আমরা তাহা জানি না; সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারি না।

জালরাজার পীড়ার ভাণ সম্বন্ধে উকিল সা সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার এ বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। তিনি বলেন যে, প্রথমে আমার সংস্কার হইয়াছিল, যে এ ব্যক্তি সত্যই জাল, তাহার পর ক্রমে ক্রমে সে সংস্কার যায়, ক্রমে নানা বিষয় দেখিতে দেখিতে বুঝিলাম, যে ইনি প্রতাপচাঁদ নিশ্চয়ই। কিন্তু মৃত্যুর ভাণ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিল। পরে একদিন সে সন্দেহের কথা হুগলীর জেলখানায় জালরাজাকে বলিলে, জালরাজা হাসিয়া উত্তর করিলেন যে, "এ পরীক্ষা অতি সহজ। তুমি ডাক্তার সাহেবকে এখনই আসিতে লেখ, আমি এখনই একটা পীড়ার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকি।" তখন ডাক্তার ওয়াইজ (Dr Wise) সাহেব হুগলীর সিবিল সার্জ্জন ছিলেন। তাঁহাকে পত্র লেখায় তিনি তৎক্ষণাৎ জেলখানায় আসিলেন এবং জালরাজাকে দেখিয়া রিপোর্ট করিলেন, যে "জালরাজার বড় জর হইয়াছে এবং পা ফুলিয়াছে, বোধ হয় তাঁহার গোদ হইবে। আপাততঃ তিনি কিছু দিন আদালতে যাইতে পারিবেন না।" এ কথা প্রকৃত হইলে পীড়ার ভাণ করিবার ক্ষমতা জালরাজার ছিল বলিয়া বোধ হইলে হইতে পারে।

সে কথা সত্য মিথ্যা যাই হউক, ডাক্তার সাহেবের এই রিপোর্ট উপলক্ষ করিয়া সা সাহেব জজ সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যে জামিন লইয়া জালরাজাকে খালাস দেওয়া হয়, এবং আপাততঃ তাঁহাকে একখানি চারপাই আর একখানি গাত্রবস্ত্র দেওয়া হয়। জজ সাহেব কিছু বলিবার পূর্ব্বে বিগনেল সাহেব বলিলেন যে, জেলের আসামীর জন্য এ সকল সরঞ্জাম দিবার কোন বিধি আইনে নাই। তবে যদি একান্ত তাহা আবশ্যক হয় তাহা হইলে

Celsus speaks of a priest who could separate himself from his senses when he chose, and lie like a man void of life and sense. Carden used to boast of being able to do the same. But the most surprising example of this kind is the well known case of Colnel Townsend related by Dr. George Cheyne. *T. H. Tanner's Practice of Medicine 6th Edi, Vol I, page 500.*

ডাক্তার সাহেব আসামীকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন। জজ কার্টিস সাহেব বিগনেল সাহেবের অমতে কোন হুকুম দিতে সাহস করিতেন না, তথাপি তিনি বলিলেন, যে এ বিষয়ের দরখাস্ত করিলে বিবেচনা করা যাইবে। আর জামিন লইয়া খালাস দেওয়া সম্বন্ধে নিজামতে দরখাস্ত করা হউক। সা সাহেব সেইমত দুই আদালতে দুই দরখাস্ত করিলেন। কার্টিস সাহেব চারপাই দিলেন এবং নিজামত আদালত হইতে হুকুম হইল, যে জামিন লইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়ার আপত্তি নাই। কিন্তু জজ কার্টিস সাহেব নিজামতের সে হুকুম তামিল করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, যে এ অঞ্চলের লোকেরা জালরাজার জন্য যেরূপ মাতিয়া উঠিয়াছিল এখন আর তত নাই। এ সময়ে তাহারা জালরাজাকে পাইলে আবার সেইরূপ মাতিয়া উঠিবে। সুতরাং জালরাজাকে ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। নিজামত আদালত কাজেই সেই মতে মত দিলেন।

রাজা প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টপক্ষের প্রমাণ দেওয়া হইলে জালরাজা তাহা খণ্ডন করিবার কোন বিশেষ চেষ্টা না করিয়া কেবল এইমাত্র দেখাইলেন, যে এই সময় রটনা হইয়াছিল যে প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, অজ্ঞাতবাস গিয়াছেন। জালরাজার উকিলেরা বলেন যে, যে স্থলে বড় বড় লোকে বলিতেছে আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ, সে স্থলে মৃত্যুর প্রমাণ অন্যথা করিবার আর প্রয়োজন কি? কিন্তু সে কথার বিপরীতে জজ সাহেব বলিলেন, যে যখন প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হওয়া স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে, তখন তাঁহাকে কেহ সেনাক্ত করিলে আর কি হইবে?

জালরাজা আপনার মৃত্যু রটনার হেতু এইরূপ বলেন :—

"বিমাতা মহারাণী কমলকুমারী আমার পরম শত্রু ছিলেন, আমার বয়স যখন ষোল কি সতর, তখন তিনি দুইবার আহারের সঙ্গে আমায় বিষ দেন। একবার আমি তাহা ফেলিয়া দিই, আর একবার তাহা একটা ইন্দুরকে খাইতে দিই; ইন্দুর তাহা খাইয়া তৎক্ষণাৎ মরে। সেই অবধি আমার অন্ন আমি সতন্ত্র পাক করাইতাম। পরাণ আর বসন্তলাল বাবু আমার সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত সহস্র ফাঁদ পাতিতেন, আমি তাহা হইতে কৌশলে উদ্ধার হইতাম। কিন্তু শেষ তাঁহারা আমার পিতার মন ভার করিয়া দিলেন। তাহার আর কোন উপায় করিতে পারিলাম না।

"আমি সেই অবধি অধঃপাতে গেলাম। অদৃষ্টদোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইলাম। তখন কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, 'এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল; তাহা অসক্তে চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস। কিন্তু এরূপ ভাবে অজ্ঞাতবাস করিবে, যেন

সকলেই জানে তুমি মরিয়াছ।' এই অজ্ঞাতবাস কিরূপে আরম্ভ করিব, প্রথমে ঠিক অনুভব করিতে পারি নাই; সুতরাং প্রথমে কাহাকেও না বলিয়া পলাইলাম। সেবার আমার পিতা আমাকে রাজমহল হইতে ধরিয়া আনেন। মুন্সি আমীরউদ্দিন তাঁহাকে আমার সন্ধান বলিয়া দেয়। আমি ফিরিয়া আসিলে, পিতা মহাশয় পরাণের অত্যাচার ও পীড়নের কথা জানিতে পারিলেন, এবং সেই অবধি পরাণের উপর তিনি হাড়ে চটিয়া গেলেন। আমাকেও অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এবার ভাবিলাম, কেবল পলাইলে হইবে না, যেরূপ ব্যবস্থাপত্র সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। আমি মরিয়াছি সকলে জানা আবশ্যক। অতএব পীড়ার ভাণ করিয়া কালনায় গেলাম, কালনার ঘাটে কালীপ্রসাদ একখানি ভাউলিয়া আনিয়া রাখিবেন কথা ছিল; আর তাঁহাকে বলা ছিল, ভাউলিয়া পৌঁছিলে তিনি শঙ্খধ্বনি করিবেন। আমি শয্যায় শুইয়া সেই সঙ্কেত শুনিলাম। তাহার পর ক্রমে বিকারের রোগীর ন্যায় ভ্রমবাক্য বলিতে লাগিলাম। সকলে আমায় পাল্কী করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেল। শেষ অন্তর্জলি করিল। অন্তর্জলির পর যখন রাজবাটীর লোকেরা শীতে কাতর হইয়া তাঁবুর ভিতর গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, সেই সময় আমি জলে সরিয়া পড়ি। নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া বজরায় উঠি। রাত্রিশেষে সেই বজরায় মুরশিদাবাদ যাত্রা করি।"

এদিকে রটনাও হইয়াছিল রাজবাটীর লোকেরা ঘাটে শব না পাইয়া গঙ্গায় জাল ফেলিয়া অনুসন্ধান করে। সুতরাং লোকের বিশ্বাস হইয়া পড়ে যে প্রতাপ পলাইয়াছেন।

পূর্ব্বে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা মুসলমানের সরা মতে হইত, সুতরাং সরার ব্যবস্থার নিমিত্ত একজন করিয়া কাজি বিচারাসনে বসিতেন। হুগলীর কাজি জালরাজাকে বলিলেন, তুমি মৃত্যুর ভাণ করিয়া পলাইয়াছিলে বলিতেছ, এখন আমি শুনিতে চাই, যে এই চতুর্দ্দশ বৎসর তুমি কোন্ কোন্ স্থানে ছিলে, এবং কি করিতে? জালরাজা সে পরিচয় দিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার উকিল তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, প্রমাণ ব্যতীত সে পরিচয় কোন মতে গ্রাহ্য হইবে না, এবং প্রমাণেরও আর সময় নাই। জালরাজা তাহা শুনিলেন না, তিনি জজ সাহেবকে বলিলেন, যে আগামী কল্য আমি এ বিষয়ের একখানি লিখিত ফর্দ্দ দিব।

মোকর্দ্দমার শেষে তিনি একদিন সেই ফর্দ্দ আর তাহার সঙ্গে একখানি বাঙ্গালা দরখাস্ত নিজে লিখিয়া দাখিল করিলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

"কালনা হইতে পলাইয়া কালীপ্রসাদ আর আমি মুরশিদাবাদ ও ঢাকা হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে গিয়া তীর্থস্নান করি। তাহার

পর চন্দ্রশেখরে যাই। সেখান হইতে অদ্দিনাথ দর্শন করিতে যাই। তথায় এক বৎসর থাকি। তাহার পর বৈস্তেশ্বরী ও ত্রিপুরেশ্বরী দর্শন করিয়া বানেশনাথ মহাদেবের নিকট একবৎসর থাকি। সেখান হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যাই। কাশী, প্রয়াগ, চিত্রকূট, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, প্রভাস, বদ্রিকাশ্রম, হরিদ্বার, হিঙ্গুলাক্ষ, জ্বলামুখী প্রভৃতি নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন করি। পাঞ্জাবে গিয়া লাহোর, অমৃতেশ্বর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করি, শেষ কাশ্মীরে যাই। সেইখানে জেনারেল এলার্ডের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। কাশ্মীরে আমি ছয় বৎসর থাকি। তাহার পর আবার হিন্দুস্থানে আসি। দিল্লীতে বিবি রামজে আমাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলেন। আমি ইতস্ততঃ যাইতাম, তাহাতে অনেকে আমায় চিনিয়াছিল, যেখানে আমার কথা লইয়া আন্দোলন হইত, আমি সেই স্থান তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিতাম। প্রায়ই আমি যোগীদের সঙ্গে বেড়াইতাম। যখন যাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইতাম, তখন তাঁহাদের সঙ্গ লইতাম, তাঁহারা একস্থানে স্থায়ী হইতেন না, সুতরাং আমি দীর্ঘকাল কাহার সঙ্গে থাকিতে পাই নাই। আমার একখানি ইয়াদাস্ত বহি ছিল। যেদিন যেখানে গিয়াছিলাম, যেখানে যাহা আশ্চর্য্য দেখিয়াছি, তাহা সকলই সেই ইয়াদাস্তে লিখিয়া রাখিয়াছি।* এলিয়ট সাহেব বাঁকুড়ায় যখন আমায় গ্রেপ্তার করেন, তখন সেই ইয়াদাস্তখানি হারায়। আমি সেখানির নিমিত্ত মেজেষ্টার সাহেবের নিকট বিস্তর মিনতি করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আর ফিরিয়া পাইলাম না; মেজেষ্টার তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত কোন হুকুমও দিলেন না। আমি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে কালীঘাটে যাই, তাহার পর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হই; সেখানে গোলাপবাগে আমাকে অনেকে চিনিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

যদি আমি বাস্তবিক মরিতাম, তাহা হইলে কি আমার ত্যক্তসম্পত্তির কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতাম না? সামান্য লোকে সামান্য সম্পত্তির নিমিত্তে পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি দিয়া যায়,

* রাজা প্রতাপচাঁদেরও এইরূপ ইয়াদাস্ত বহি রাখা অভ্যাস ছিল। তিনি যে সময়ে যাহা করিতেন, তাহা নিত্য লিখিয়া রাখিতেন। অনেকে বলেন, যে তাঁহার সেই ইয়াদাস্ত বহি জালরাজা কোনরূপে হস্তগত করিয়াছিলেন, সেই জন্য প্রতাপচাঁদের সমুদায় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ঘটনা তিনি বলিতে পারিতেন। কেহ বলে, সে ইয়াদাস্ত বহি রাজবাটীতেই ছিল, মোকর্দ্দমার সময় তাহা আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল।

অথবা দানপত্র লিখিয়া যায়। কিন্তু আমার এত ধন, এত সম্পত্তি, আমি কি কোন একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিতাম না? আমি পীড়িত হইয়া ত অনেক দিন ছিলাম, আমার বাক্‌রোধ হয় নাই। আমায় গঙ্গাযাত্রা করিলেও ত আমি অনেকদিন কালনায় ছিলাম; যদি সত্যই আমি মরিব এরূপ হইত, তাহা হইলে আমি কি পোষ্যপুত্রের অনুমতি দিয়া যাইতাম না? অথবা একখানা দানপত্র কি উইল করিয়া যাইতাম না? এ সকল করিবার সময় ত যথেষ্ট ছিল?

আর এক কথা। আমি যাইবার সময় একখানি প্রমাণ ছবি রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখানে আনা হইয়াছে। লোকে বয়সে কেহ স্থূল হয়, ক্রেশে কেহ শুষ্ক হয়, কেহ কাল হয়; কিন্তু মাথায় কেহ ছোটও হয় না, কেহ বড়ও হয় না। সেই ছবির সঙ্গে আমায় মাপিয়া দেখা হইয়াছে, চুল পরিমাণে ছবির মূর্ত্তি আমার সহিত প্রভেদ হয় নাই।

এখন বিচারকর্ত্তা পরমেশ্বর, আর তাঁহার প্রতিনিধি আপনারা, অধিক বলা বাহুল্য।"

জালরাজা গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী কি না।

এই মোকর্দ্দমার প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যশোর জেলা নিবাসী শ্যামলাল তেওয়ারি নামে একজন ব্রাহ্মণ গোয়াড়িতে আসিয়া একখানি কালীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে সেই প্রতিমা উপলক্ষ করিয়া তাঁহার দিনযাপন হইতে থাকে। লোকে তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলিত। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণলাল, মধ্যম রূপলাল, সর্ব্বকনিষ্ঠ গৌরলাল। ইহাদের মধ্যে পৈতৃক ব্যবসায়ে কৃষ্ণলালের একেবারে অনুরাগ ছিল না; তিনি চাকুরি করিবেন, এই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা জুটে নাই, তিনি কেবল উমেদারি করিয়া বেড়াইতেন। তথাকার পাদরি ডিয়ার সাহেব তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন, কৃষ্ণলাল তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ একবার করিয়া গিয়া সেলাম করিয়া আসিতেন। কিছুদিন পরে পাদরি সাহেব একখানি সুপারিস চিঠি তথাকার মেজেষ্টার সাহেবকে দেন। সেই সময় শান্তিপুরের দারগাগিরি খালি ছিল। চিঠি পাইবামাত্র মেজেষ্টার সাহেব কৃষ্ণলালকে সেই দারগাগিরি দিলেন। কিন্তু একদিন পরে আবার পরওয়ানা ফিরাইয়া লইলেন এবং সেই সঙ্গে পাদরি সাহেবকে লিখিলেন, যে কৃষ্ণলালের চরিত্র অতি মন্দ; আর তাহার একজন খুড়া ডাকাইত। সুতরাং উহাকে আমি চাকুরি দিতে পারিলাম না। পাদরি সাহেব পত্র পাইয়া কৃষ্ণলালকে বলিলেন, যে তুমি আর কখন আমার কুঠীতে আসিও না। সেই অবধি কৃষ্ণলালের উমেদারি করা ফুরাইল।

সাক্ষীরা বলেন, কৃষ্ণলাল তাহার পর ব্রহ্মচারী সাজিয়া এখানে ওখানে বুজরুকি দেখাইয়া দিনপাত করিতেন। দুই একবার বর্দ্ধমানেও গিয়াছিলেন।

পরাণ বাবু মনে করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণলাল এই জালরাজা সাজিয়াছে। যখন জালরাজা বাঁকুড়ায় গ্রেপ্তার হন, তখন পরাণ বাবু তাঁহাকে কৃষ্ণলাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি পাদরি ডিয়ার সাহেবের নিকটেও লোক পাঠাইয়াছিলেন,এবং অন্যান্য সাক্ষী জুটাইয়াছিলেন; কিন্তু সে সকল প্রমাণ তখন আদালতে বড় গ্রাহ্য হয় নাই। সে-বার জালরাজা আলক সা বলিয়া প্রতিপন্ন হন। এবার খোদ মেজেষ্টার সামুয়েল সাহেব এ বিষয়ে উদ্যোগী, সুতরাং সাক্ষী অনেক জুটিয়াছিল। সেই সকল সাক্ষী দ্বারা জানা গেল, যে কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল,তাহার এক পায়ে ছয়টি আঙ্গুল ছিল, আর বয়সে কৃষ্ণলাল রাজা প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা দশ বার বৎসরের ছোট ছিল। জালরাজার মুখে বসন্তের দাগ ছিল না, তাঁহার কোন পায়েও ছয়টা অঙ্গুলি ছিল না।

এই মোকর্দ্দমার চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণলাল নিরুদ্দেশ হন। কেহ বলে তাঁহার মৃত্যু হয়, কেহ বলে তিনি ২৪ পরগণায় কয়েদ হন। তাঁহার দুই সহোদরের অগ্র পশ্চাৎ লোকান্তর হয়। এই সময় শ্যামলালেরও মৃত্যু হয়, সুতরাং শ্যামলালের ত্যক্ত সম্পত্তি লাওয়ারিস বলিয়া আদালতে জব্দ থাকে। গোয়াড়ির সাক্ষীরা কিরূপ সেনাক্ত করিল তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লেখা গেল।

ফকিরচাঁদ তেওয়ারি,নিবাস যশোহর। বলিল, আসামী আমার ভাগিনা কৃষ্ণলাল। আমি ইহাকে ৮ বৎসর দেখি নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র তেওয়ারি বলিল, আসামী কৃষ্ণলাল আমার পিসিপুত্র। যখন ইহার ১৫। ১৬ বৎসর বয়স তখন ইহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহার পর আর দেখি নাই।

গঙ্গাপ্রসাদ তেওয়ারি বলিল, এই আসামী আমার ভ্রাতষ্পুত্র, ইহার নাম কৃষ্ণলাল। ইহার বয়স এখন ৩৬ বৎসর হইবে। আমার ভগিনীপতি বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে চাকুরী করিতেন, সম্প্রতি তিনি মরিয়াছেন। ইদানী আমি কালনায় থাকি, উমেদারী করি। কৃষ্ণলালের পায়ের আঙ্গুল পাঁচটা কি ছয়টা তাহা আমি বলিতে পারি না।

রামচন্দ্র বিশ্বাস, আবকারীর খুচরা দোকানদার। বলিল, আমি আসামীকে চিনি, ইহার নাম কৃষ্ণলাল। আমরা এক পাঠশালায় লিখিয়াছি। (রাজা প্রতাপচাঁদের পৃষ্ঠে ঘোড়ার কামড়ের যে দাগ ছিল,সেইরূপ আসামীর পৃষ্ঠে একটা দাগ থাকায় সাক্ষীকে মেজেষ্টরীতে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে কৃষ্ণলালের পৃষ্ঠে কোন দাগ ছিল কি না। সাক্ষী তাহাতে তৎ-

ক্ষণাৎ উত্তর করিল, যে হঁা বিলক্ষণ দাগ ছিল। কিন্তু পৃষ্ঠের কোন্ অংশে সে দাগ ছিল তাহা জিজ্ঞাসা করায় সাক্ষী ইতস্তত করিতেছে, এমত সময়ে সেরেস্তাদার মোনসারাম আপনার পৃষ্ঠে হাত দিয়া সাক্ষীকে ইঙ্গিত করিলেন। জালরাজার উকিল তাহা মেজেষ্টরকে দেখাইয়া দিলেন। সুতরাং মেজেষ্টর সাহেব মোনসারামের দশ টাকা জরিমানা করিতে বাধ্য হইলেন।)

পাল খ্রীষ্টান বলিল, এই আসামী কৃষ্ণলাল বটে, আমি ইহাকে গোয়াড়িতে ১৮৩৪ সালে দেখিয়াছি। ইহার সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক করিয়াছি। ইহার পিতার নাম শ্যামলাল। হুগলীর জেলখানায় আসামীকে সেনাক্ত করিবার নিমিত্ত আমাকে পাঠান হয়; তখন আমি যদিও ইহাকে চিনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা প্রকাশ করি নাই। সেনাক্তর নিমিত্ত দশ দিন সময় লইয়াছিলাম। জেরায় বলিল, গত রাত্রে মানিকসিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে সেরেস্তাদার মনসারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল সত্য, আমি তাঁহার নিকট পথখরচা চাহিয়াছিলাম, তিনি জজ সাহেবের নিকট চাহিতে বলিয়াছিলেন।

মহেশ পণ্ডিত নামে একজন খ্রীষ্টান জোবানবন্দীতে বলিলেন, এই আসামীকে আমি গোয়াড়িতে ও বর্দ্ধমানে দেখিয়াছি, ইহার নাম কৃষ্ণলাল। জেরায় বলেন, আমি যখন মেজেষ্টার ও ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে জেলখানায় গিয়া এই আসামীকে দেখি, তখন আমি বলিয়াছিলাম, যে এই ব্যক্তি কৃষ্ণলাল কি না তাহা আমি দশ দিন পরে বলিব। আমি বর্দ্ধমানে থাকি, আমার নিবাস ঐ জেলার অন্তর্গত রায়না গ্রামে।

গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি এই আসামী কৃষ্ণলাল। ইহার সঙ্গে এক পাঠশালায় লিখিয়াছি। ইহাকে গত ১৫। ১৬ বৎসরের মধ্যে কেবল দুই তিন বার দেখিয়াছিলাম। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি না বলিতে পারি না।

রামচাঁদ মিত্র বলিলেন, আমি বর্দ্ধমানের কালেক্টরীর মুহুরি। এই আসামী কৃষ্ণলাল, ইহাকে আমি চিনি। এ ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে আমার তৈলমাড়ুয়ের বাসায় গিয়া থাকিত। যখন ঐ ব্যক্তি বর্দ্ধমানে শেষে গিয়া প্রচার করে যে আমি ছোট রাজা, তখন আমি কাহাকেও ইহার পরিচয় দিই নাই, কেবল ইহাকে গোপনে তিরস্কার করিয়াছিলাম। কিন্তু সে তিরস্কার এ ব্যক্তি শুনে নাই।

ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায় বলিলেন, আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারী পেস্কার। এই আসামীকে চিনি, ইনি কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী।

রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (খ্রীষ্টান) বলিলেন, এই আসামী কৃষ্ণলাল। ইনি ইতিপূর্ব্বে মহাপুরুষ সাজিয়াছিলেন,

আমি ইঁহার চেলা হইয়াছিলাম। ইঁহার সঙ্গে শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, মশাগ্রাম, বর্দ্ধমান, বরানগর প্রভৃতি নানা স্থানে বেড়াইয়াছি। আমি ইঁহার পাদকজল পর্য্যন্ত খাইয়াছি। আমি তখন ইঁহাকে দেবতা মনে করিতাম। যখন ইনি বর্দ্ধমানের রাজা হইবার কল্পনা করেন, তখন আমি ইঁহার সঙ্গে ছিলাম। আমি ও ইঁহার ভ্রাতা গৌরলাল মশাগ্রামে থাকিলাম, কৃষ্ণলাল বর্দ্ধমানে গেলেন, আসামী সেখান হইতে পলাইয়া বিষ্ণুপুরে যান। আমরা সে সংবাদ পাইয়া তথায় যাই। তাহার পর আমরা এক সঙ্গে বাঁকুড়ায় যাইতেছিলাম, এলিয়ট সাহেব আমাদের বলগমা ঘাঁটিতে গ্রেপ্তার করেন।* গৌরলাল পলাইয়াছিল, আমি ধরা পড়িয়াছিলাম। তিনমাস জেল খাটি। জেলখানায় কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে খালাসের অন্য উপায় না দেখিয়া মেজেষ্টারের নিকট কৃষ্ণলালের প্রকৃত পরিচয় বলিয়াছিলাম, তিনি আমার এজেহার লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে খালাস দেন নাই। তখন আমার নাম কৃপানন্দ ছিল। আমি কৃষ্ণলালের চেলা হইয়া ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রকৃত নাম রামকৃষ্ণ। আমি খালাস হইলে পর পাদরি হিল সাহেব আমায় খ্রীষ্টান করিয়াছেন, আমি সেই অবধি আর মিথ্যা কথা বলি না। আমার পূর্ব্ব চরিত্রের পরিচয় পাদরি সাহেবকে লিখিয়া দিয়াছি, তিনি তাহা বিলাতে ছাপাইতে পাঠাইয়াছেন। কৃষ্ণলালের পায়ে কয়টি অঙ্গুলি তাহা বলিতে পারি না। (বাঁকুড়ার মোকর্দ্দমায় এই ব্যক্তি কয়েদ হইয়াছিল কি না তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।)

প্রেমচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারী নাজির। এই আসামী গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে এই ব্যক্তি কৃষ্ণলাল। কেন না, ইনি রাজা প্রতাপচাঁদ বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল।

নীলকমল ঘোষ বলিলেন, আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারী সেরেস্তাদার। এই আসামী কৃষ্ণলালের মত, কিন্তু আমি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

---

* এলিয়ট সাহেব কমিসনর হইয়া যখন বাঁকুড়ায় যান, তখন একদিন তথাকার সার্কিট হাউসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, যে এই তেঁতুলতলায় জালরাজাকে আমি গ্রেপ্তার করি। যখন তিনি এই কথা বলেন, তখন লেখক নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই সাক্ষী যাহা বলিলেন সুতরাং তাহার সহিত এলিয়ট সাহেবের কথা মিলে না।

প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, আমি নদিয়া জেলার জজ আদালতের সেরেস্তাদার। এই আসামীকে কৃষ্ণলাল বলিয়া আমার বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। কৃষ্ণলালের পিতা শ্যামলাল গত বৎসর মরিয়াছে। কেহ তাহার ত্যজ্য সম্পত্তি দাবি করে নাই। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি না তাহা বলিতে পারি না।

হরচন্দ্র হাজরা বলিলেন, আমি নদিয়া জজ আদালতের উকিল, এই আসামী গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল, ইহাকে আমি চিনি, তবে ইহাকে আট বৎসর দেখি নাই।

ব্রজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, কৃষ্ণলালকে আমি বিলক্ষণ চিনি, সে আমার নিকট অনেক দিন ধরিয়া উমেদার ছিল। এই আসামীর সহিত সে কৃষ্ণলালের বিস্তর প্রভেদ।

মুন্সি মকিম বলিলেন, কৃষ্ণলালকে আমার ভাল স্মরণ নাই। এই আসামী সে কৃষ্ণলাল নহে। আমি শুনিয়াছি কৃষ্ণলাল মরিয়াছে।

পাদরি ডিয়ার সাহেব (Revd. W. J. Deere) বলিলেন, আমি এখন কৃষ্ণনগরে থাকি, পূর্ব্বে কিছুদিন বর্দ্ধমানে ছিলাম। আমি কৃষ্ণলালকে ভাল চিনি। তাহার পিতা শ্যামলাল, কৃষ্ণলালের চাকুরির নিমিত্ত আমায় অনুরোধ করে। কৃষ্ণলাল প্রত্যহ আমার বাটীতে আসিত। ব্যাটি সাহেবকে কৃষ্ণলালের নিমিত্ত আমি একখানি পত্র দিই। ব্যাটি সাহেব তাহাকে চাকুরি দেন নাই। ১৮৩৬ সালে বর্দ্ধমানের পরাণ বাবু আমার নিকট দুইজন লোক পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা আমায় বলে, যে একবার হুগলী গিয়া জালরাজাকে সেনাক্ত করিতে হইবে। তাহারা আমায় পথ খরচ বলিয়া টাকা দিতে চাহিয়াছিল, আমি তাহা লই নাই। আমি তাহাদের বলিলাম, যদি তোমরা কৃষ্ণলালের সন্ধান চাও, তাহা হইলে আমি এখনই সন্ধান দিতে পারি। এই বলিয়া গোয়াড়িতে কৃষ্ণলালের নিকট একজন লোক পাঠাইয়া দিলাম। লোক আসিয়া সংবাদ দিল, যে শ্যামলাল ব্রহ্মচারী বলিলেন, কৃষ্ণলালকে টাকার নিমিত্ত শিষ্যবাটীতে পাঠাইয়াছেন, দশ বার দিনের মধ্যে সে আসিবে, আসিলে তাহাকে পাঠাইয়া দিব। তাহার পর সে না আসায়, প্রায় পনর দিবস পরে আবার শ্যামলালের নিকট লোক পাঠাইলাম। সেবার শ্যামলাল বলিলেন, যে কৃষ্ণলালকে যদি পাদরি সাহেবের এতই দরকার থাকে তবে যেন তিনি নিজে তাহাকে তল্লাস করিয়া লন। এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে। আমি তাহাকে ছয় বৎসর দেখি নাই। এই ব্যক্তি যদি কৃষ্ণলাল হয়, তবে ছয় বৎসরে ইহার অতিরিক্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কৃষ্ণলালের নাসাগ্র ঊর্দ্ধমুখী ছিল,

আসামীর নাসাগ্র নিম্নমুখী। ১৮২১ সালে আমি শুনিয়াছিলাম, যে রাজা প্রতাপচাঁদ এদেশে বিদ্রোহ উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত রঞ্জিতসিংহের নিকট গিয়াছেন।

গৌরমোহন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, আমি কৃষ্ণলালকে বিলক্ষণ চিনিতাম, সে ব্যক্তি যখন উমেদারী করিত, তখন ডিক্ সাহেবের কাছারীতে তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতাম। তাহার পিতা শ্যামলালকে চিনিতাম। কৃষ্ণলালের আকৃতি এই আসামীর মত ছিল না।

কৃষ্ণমোহন সরকার (এই সাক্ষী জোবানবন্দী দিবার সময় জজ সাহেব বলিলেন, আমি এই সাক্ষীকে চিনি, ইনি ভাল লোক, ভদ্র এবং সত্যবাদী) সওয়াল মতে বলিলেন, আমি গোয়াড়িতে ওকালতি করি, আমি কৃষ্ণলালকে চিনিতাম, এই আসামীকে কৃষ্ণলালের মত বোধ হয় না।

রামধন খ্রীষ্টান বলিলেন, আমি এই আসামীকে চিনি না, ইহাকে কখন দেখি নাই। আমি কৃষ্ণলালকে চিনিতাম, তাহার সহিত ইহার কিছু আদল আইসে বটে; কিন্তু এ ব্যক্তি সে নহে। কৃষ্ণলাল ইহার অপেক্ষা লম্বা ও গৌরবর্ণ। কৃষ্ণলালের নাসাগ্র উন্নত ছিল, এ ব্যক্তির তাহা নহে আর তাহার চক্ষু ছোট ছিল।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, আমি এখন উত্তরপাড়ায় থাকি। পূর্ব্বে টোল দারগা ছিলাম, কৃষ্ণলাল আমার নিকট মধ্যে মধ্যে আসিত। এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে, তাহার মুখ লম্বা ছিল, আর তাহার মুখে দাগ ছিল।

গোয়াড়ির অন্য অন্য যে সকল লোকেরা মেজেষ্টরিতে বলিয়াছিল যে এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে, দায়রায় তাহাদের জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই; সুতরাং আমরাও তাহাদের কথা আর উল্লেখ করিলাম না।

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি দেখিয়া কাজি সাহেব রায় দিলেন যে আসামী কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী নহে। কৃষ্ণলালের আত্মীয় উল্লেখে যাহারা জোবানবন্দী দিয়াছে তাহাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রাণকৃষ্ণ খ্রীষ্টানের কথাও সেইরূপ। সে বলে, যে সে তিন চারি বৎসর ধরিয়া কৃষ্ণলালের চেলা ছিল, অথচ সে জানে না যে কৃষ্ণলালের পায়ে কয়টী অঙ্গুলি ছিল।*

জজ সাহেবও কতকটা বুঝিয়াছিলেন, যে জালরাজা যে কৃষ্ণলাল এ কথা ভাল প্রমাণ হয় নাই, তথাপি তিনি রায়ে লিখিলেন যে এ কথা একপ্রকার প্রমাণ হইয়াছে। আরও বলিলেন, যে এ সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু ও তাঁহার

* প্রাণকৃষ্ণ জোবানবন্দীতে বলিয়াছিল, যে কৃষ্ণলালের পাদকজল সে খাইত।

শব দাহ যখন বিশেষরূপ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, তখন এই আসামী কৃষ্ণলাল প্রমাণ না হইলেও কিছু ক্ষতি নাই। *

কালনায় জমিয়তবস্ত হইয়াছিল কি না?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ মেজেষ্টরীতে লওয়া হয় নাই। দায়রায়ও এ বিষয়ে প্রথমতঃ বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। স্বয়ং জজ সাহেব বলিয়াছিলেন, যে কালনার জমিয়তবস্ত অতি সামান্য ব্যাপার। তথাপি কয়েকজন সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়া হইল। নাজির আসাদ আলি আর দারগা মহিবুল্লা প্রধান সাক্ষী। তাঁহারা অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু কালনার চৌকিদারেরা

* "Combining all their testimonies I cannot avoid the conclusion that the prisoner's identity is sufficiently established by a preponderance of evidence above whatever has deen adduced to impeach it. Evidence in such a matter cannot be expected to amount to absolute demonstration. Some dimness, and it may be doubt, will obscure the recital now of details which occured at a remote date. But circumstances considered, I look upon the proofs as being on the whole satisfactory. It is true that in the main point the Law-Officer rejects the evidence on the grounds that there are several descrepancies, which I admit, in the averments made by the witnesses who swears to the prisoner's identity with Kristo Lal. * * * For the reason's which I have stated above, it appears to me, the identity is established by tolerably good, or I may say, sufficient evidence, although it may not be so satisfactory and decisive as the testimony to the Rajah's death. But I have a remark to make on this subject. After the prosecutor had proved the death and cremation of Rajah Protab Chunder, it was, I think, in no way incumbent on him to show who the prisouer really is. So long as the death, cremation, and non-identity remain, as I regard them] firmly established, it would have been a matter of no moment to the case had he failed to prove that the prisoner is Kistolall." *Extract from No 3 of the Calender for Sept. 1838.*

সামান্য চাকর, কি বলা আবশ্যক, কি বলা অনাবশ্যক, তাহা কিছুই বুঝিল না; সুতরাং তাহারা অনেকেই অম্লান বদনে বলিল,কালনায় কোন জমিয়তবস্ত হয় নাই।

জজ সাহেব রায়ে লিখিলেন, যে কালনার জমিয়তবস্ত প্রমাণ হইয়াছে। "This charge, I view, is substantiated by the evidence of Mahaboollah Darogah and other Police officers, and by that of Assad Ali, the Burdwan Foujdari Nazir; but there is, I conceive, no proof of an affray or actual breach of the peace. I should say the only facts proved are, *first*, that the prisoner No. 1, the *soi-disant* Rajah, did not disperse his armed followers on receiving orders from the Police officer to that effect, after the Darogah had explained to him the nature of the purwanah or orders issued from the Burdwan Magistrate, requiring him to disperse his armed followers. *Secondly*, that the prisoner No. 1 persisted in landing with a drawn sword in his hand, and visiting the shrine of Lalji Thakur at Culna; in the progress to which place, attended by a part of his followers, he ordered some of his people to disarm the two sepoys on guard at the burying ground of the Burdwan Rajah, but, on the remonstrance of the Darogah, he, at last, desisted from this foolish freak; after which, the *soi disant* Rajah and his people returned to the boats."

জজ সাহেব যাহাই বলুন, আপিলে একথা রক্ষা হয় নাই। সে পরিচয় পরে দেওয়া যাইবে।

দায়রার হুকুম।

সাক্ষীদের জোবানবন্দী হইয়া গেল। আসামীর পক্ষ সকল সাক্ষী হাজির হইলেন না। প্রতাপচাঁদের রাণীরা জোবানবন্দী দিয়াছিলেন, এবং জালরাজাকে তাঁহারা সেনাক্ত করিয়াছিলেন, এইরূপ এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র রটনা আছে। কিন্তু বাস্তবিক সে রটনা সত্য নহে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, জালরাজা তাঁহাদিগকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন, কিন্তু আদালতে আসিয়া সাক্ষ্য দিতে তাঁহারা অস্বীকার করেন। জজ সাহেব তাহাতে বলেন, যে তাঁহারা চুঁচুড়ার রাজবাটীতে আসিলে,কমিসন্ দ্বারা তাঁহাদের জোবানবন্দী লওয়া যাইবে। তাহাতেও রাণীরা সম্মত হইলেন না। সুতরাং জালরাজা আর কোন চেষ্টা করিলেন না। তাহার কিছুদিন পরে রাণীরা হঠাৎ বরখাস্ত

করিয়া পাঠাইলেন, যে আমরা সাক্ষী দিতে প্রস্তুত আছি। এবার জালরাজা তাহাতে আপত্তি করিলেন। বলিলেন, আমি রাণীদের সাক্ষ্য চাহি না। ইহার হেতু কেহ বুঝিতে পারিল না। লোকে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল, এ সকল বুঝি কৃষ্ণ রাধার মান কেলি। যখন জালরাজা উপযাচক হইয়াছিলেন, তখন রাণীরা মাথা নাড়িলেন; আবার যাই জালরাজা মান করিলেন, আর তাঁহারা থাকিতে পারিলেন না, আপনারা সাধিয়া সাক্ষ্য দিতে চাহিলেন।

লোকে যে যাহা বলুক, আমরা শুনিয়াছি, যে রাণীরা সপিনা পাইয়া স্থির করিয়াছিলেন, যে "আসামীকে যদি বাস্তবিক আমরা ছোট মহারাজ বলিয়া চিনিতে পারি, তথাপি সে কথা আমরা মুখে আনিতে পারিব না; আসামীকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিলে পোড়া লোকে বলিবে, যে বৈধব্য ঘুচাইবার নিমিত্ত রাণীরা মিথ্যা বলিয়াছে। এবং হয় ত সেই কারণে জজ সাহেবও আমাদের কথা গ্রাহ্য করিবেন না। সুতরাং আমরা স্বামী পাইব না। তবে কেন কলঙ্কের পসরা মাথায় লইব?"

এদিকে যখন জালরাজা শুনিলেন, যে রাণীরা জোবানবন্দী দিবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিয়াছেন, তখন তিনি সা সাহেবকে বলিলেন যে "কাহার দ্বারা এ দরখাস্ত আসিয়াছে, এবং সে ব্যক্তি কোথায় বাসা করিয়াছে, এই সকল তদন্ত করা আবশ্যক।" সা সাহেব তদন্ত করিয়া জানিলেন যে পরাণ বাবুর লোক এই দরখাস্ত আনিয়াছে, এবং পরাণ বাবুর মোক্তারের বাসায় সে ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে। জালরাজা উকীলকে বলিলেন, যে এবার পরাণের অনুরোধে রাণীরা সাক্ষী দিতে সম্মত হইয়াছেন। সে অনুরোধের অর্থ, যে তাঁহারা আমাকে সেনাক্ত না করেন। কিন্তু কি জানি? স্ত্রীজাতি! আমায় দেখিয়া যদি তাঁহারা সে অনুরোধ ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদের পপে দাঁড়াইতে হইবে। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে, আবার তাঁহাদের কপাল কেন ভাঙ্গি? তাঁহারা এখন সুখে আছেন, সুখে থাকুন। আমি তাঁহাদের সাক্ষ্য চাহি না। জালরাজার কথামত রাণীদের এত্রা করা হইল। কিন্তু জজ সাহেব বিপরীত ভাবিলেন; তিনি বিবেচনা করিলেন, যে আসামী নিশ্চয়ই জাল, তাহাই সে ভয় পাইয়াছে। রাণীরা কখনই মিথ্যা বলিবে না, এ কথা আসামী এখন বুঝিয়াছে।

অন্য সকল সাক্ষীদের জোবানবন্দী হইয়া গেলে উভয় পক্ষের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। কিন্তু বক্তৃতা মুখে হইল না, লিখিত দাখিল হইল। তাহার পর কাজি সাহেব ফতওয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, যে সেনাক্ত সম্বন্ধে সরকারের পক্ষে যে সকল প্রমাণ দাখিল হই-

য়াছে, তাহা আসামীর প্রমাণ অপেক্ষা গুরুতর নহে। আসামী বাস্তবিক কে, তাহা ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে প্রমাণ হয় নাই। যতক্ষণ তাহাকে অপর ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন না করা হয়, ততক্ষণ প্রতাপচাঁদের নামধারণ অপরাধে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু জজ সাহেব অন্যপ্রকার বিবেচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, যে আসামী কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী, সুতরাং প্রতাপের নামধারণ জন্য তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপে উভয়ের মত অনৈক্য হইল। উভয়ের রায় "মওয়াফেক্" না হইলে তখনকার আইন অনুসারে জজ সাহেব নিজে দণ্ড দিতে পারিতেন না, তাঁহাকে নিজামতে রিপোর্ট করিতে হইত। সেই জন্য জজ সাহেব নিজামতকে জানাইলেন, এবং সেই সঙ্গে লিখিলেন, যে আসামীর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, একটি ব্যতীত তাহা সমুদয় প্রমাণ হইয়াছে। অতএব তাহাকে পাঁচ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দেওয়া হয়, ন্যূনকল্পে তিন বৎসর।

অন্য আসামীদের প্রতি হুকুম।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে আসামীশ্রেণীতে কালনায় ২৯৪ জন গ্রেপ্তার হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে আরও অনেকগুলিকে তাহাদের সামিল করা হয়। সেই সকল লোকের মধ্যে কেবল ৩১০ জনকে হুগলিতে পাঠান হইয়াছিল। হুগলির মেজেষ্টার সামুয়েল সাহেব তাহাদের সাতজনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন, বাকি ৩০৩ জনের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পান নাই, অথচ তাহাদের খালাসও দেন নাই। তাহাদিগকে তিনি জেলখানায় রাখিয়াছিলেন। গ্রীষ্মকাল গেল, বর্ষা গেল, তাহার পর শীত পড়িল; তাহাদের গাত্রবস্ত্র নাই। তিনশত লোককে শীতবস্ত্র দেওয়া সহজ কথা নহে; সুতরাং সেদিকে আর কেহ দৃষ্টিপাত করিল না। আসামীরা একে একে মরিতে আরম্ভ করিল। জালরাজা আপনার উকীলদের বিস্তর অনুরোধ করিলেন, যে এই হতভাগাদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছু চেষ্টা কর। সা সাহেব মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, এই তিনশত লোকের জন্য গাত্রবস্ত্র কে দিবে? জালরাজা বলিলেন, আমি আর দেখিতে পারি না, তোমরা না কর,আমি নিজে দরখাস্ত করিব। শেষ সা সাহেব দরখাস্ত লিখিতে সম্মত হইলেন। জালরাজা লিখাইলেন, "হতভাগাদের এইমাত্র অপরাধ, যে তাহারা আমাকে রাজা প্রতাপচাঁদ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। যদি আমি সত্যই জাল হই, তবে আমিই তাহাদের ঠকাইয়াছি, আমিই দণ্ডের যোগ্য। তাহারা ঠকিয়াছে, তাহাদের অপরাধ নাই। তাহা-

দের খালাস দেওয়া হউক, অন্ততঃ গাত্রবস্ত্র দেওয়া হউক।*

দরখাস্তের ফল কতক ফলিল। ১৪০ জন খালাস পাইল, কিন্তু সাত মাসের পর খালাস পাইল। তাহাদের বিপক্ষে একজন সাক্ষীরও সাক্ষ্য লওয়া হয় নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ছিল না; অথচ তাহারা সাত মাস কারাবদ্ধ ছিল। তাহাদের খালাস দিবার সময় কেবল একখানি করিয়া মুচলকা দস্তখত করাইয়া লওয়া হইল। তাহাদের আর কোন বিচার হইল না। বাকি ১৬৩ জন জেলে থাকিল, তাহার মধ্যে কতক লোক সেইখানেই মরিয়া গেল।

বেআইনি কয়েদ রাখার নিমিত্ত সা সাহেব যে ওগলবি সাহেবের নামে নালিস উপস্থিত করেন, তাহার বিচার সুপ্রিম কোর্টে ৯ই জানুয়ারি তারিখে আরম্ভ হয়। সেই মোকর্দ্দমায় হুগলির মেজেষ্টার সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাকে এই সকল আসামী-দের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলি-লেন, যে ৩১০ জনের মধ্যে আমি ছয় মাসের পর ১৪০ জনকে খালাস দিয়াছি; আর বাকি ১৫০ কি ১৬০ জন বিচারের নিমিত্ত জেলখানায় অদ্যাপি আবদ্ধ আছে। যে ১৪০ জনের কথা বলিলাম, আমি তাহাদের বিচার করিয়াছিলাম, অর্থাৎ ওগলবি সাহেব বর্দ্ধমানে তাহাদের এজাহার লইয়া আমার নিকট দণ্ডের নিমিত্ত পাঠাইয়া-ছিলেন। আমি তাহাদের ছয় মাস পরে ছাড়িয়া দিয়াছি। আদালতে তাহাদের আনি নাই। আমার আদালতঘর বড়

---

* "Their whole crime consisted in believing me to be Rajah Protap Chand. If I am an impostor, as alleged, I am guilty of having deceived them, and I may therefore be liable to punishment. Of these persons only six have been thought criminal enough to be sent for trial before you, and the others have been in custody for a period of nearly seven months without knowing the crime which they are alleged to have committed, without being confronted with any of the witnesses for the prosecution, and without having been brought to trial. Of the remainder, thirteen are dead,—two more I understand are at the point of death, and twentytwo are in the hospital. I am also informed that several of these in hospital have not sufficient clothes to cover their bodies." *Extract from petition dated 30th November 1838.*"

ক্ষুদ্র, এত লোক সেখানে ধরিতে পারে না বলিয়া আদালতে তাহাদের হাজির হইতে দিই নাই। সা সাহেব তাহাদের মোক্তার ছিলেন বলিয়া তাহাদের উপস্থিত হইবার আবশ্যকও হয় নাই। সা সাহের তাহাদের পক্ষ হইতে কোন মোক্তারনামা দাখিল করেন নাই, আমিও দাখিল করিতে দিই নাই। সা সাহেব নিজে আসামী, সুতরাং তিনি মোক্তার হইবার অধিকারী নহেন।

এ বিচারপদ্ধতি শুনিয়া সুপ্রিম কোর্টের অনেকে হাসিলেন। বোধ হয় সামুয়েল সাহেব তাহা দেখিয়া ভাবিলেন, ইহারা তবে বিচার কাহাকে বলে? তিনি তখন বলিলেন "What do you mean by a trial? There certainly has been no regular trial of those prisoners whom I released, nor of those who, I have said, are now awaiting their sentence; those whom I released I considered less criminal than the others, and I thought the punishment they had already undergone was sufficient—they had been in prison six months—Yes! certainly without having any regular trial or sentence passed on them. By Regulation I cannot try after six months' imprisonment.

আরও হাসি পড়িয়া গেল। যাহারা ছয় মাসের অধিক কাল জেলে থাকে, তাহাদের বিচার করিতে আইনে নিষেধ! সেই জন্য মেজেষ্টার বাহাদুর তাহাদের বিচার করেন নাই, জেলে রাখিয়াছিলেন! যাহাদের বিচার নিষেধ, তাহাদের জেলে রাখিতে আইনে নিষেধ নাই! ছয় মাস ছেড়ে নয় মাস তাহারা জেলে আছে, আরও থাকিবে, তাহাতে আইনের আপত্তি নাই। আইনের আপত্তি কেবল বিচার সম্বন্ধে। ছয় মাসের পর খবরদার যেন আর বিচার না হয়, ছয় মাসের পর যত দিন ইচ্ছা জেলে রাখ, কিন্তু বিচার করিও না। ইহা কোম্পানীর আইন।

যে সকল আসামীদের কথা বলা হইতেছিল, তাহারা কতদিন পরে খালাস পাইল তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। বোধ হয়, জালরাজার মোকর্দ্দমার পর মেজেষ্টার সাহেবের অবকাশ হইলে তাহাদের খালাস দেওয়া হইয়া থাকিবে। সামান্য লোকদের জেলে রাখা তখন সামান্য ব্যাপার বলিয়া মেজেষ্টরদের বোধ ছিল। গরিব দুঃখীরা কে খালাস পাইল কি না পাইল, তাহা লইয়া আন্দোলন করিতে কাহার সাহস হইত না। "চাচা আপন বাঁচা" এই তখনকার প্রচলিত বুলি ছিল। তদ্ব্যতীত সকল দিকে দৃষ্টি করিবার অবকাশ মেজেষ্টারদের একেবারে ছিল না। তখন ডিপুটি মেজেষ্টার ছিল না, সবডিবিজন ছিল না,

সকল কার্য্যই মেজেষ্টারকে নিজে করিতে হইত। সুতরাং কোন কার্য্যই হইয়া উঠিত না, অনেকটা আমলাদের উপর নির্ভর করিতে হইত। তাহাই দেওয়ান মনসারাম মিত্রের অসম্ভব প্রভুত্ব হইয়াছিল। তিনি মনে করিলে এই আসামীদের খালাস দিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার এ সামান্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবার কোন হেতু উপস্থিত হয় নাই।

দায়রায় সাতজন আসামী সোপর্দ্দ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে জালরাজার পক্ষে জজ সাহেব যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অপর ছয়জন সম্বন্ধে কোন প্রমাণ ছিল না, মেজেষ্টার সাহেবও কোন প্রমাণ নিজে লন নাই; দায়রায়ও কোন প্রমাণ পাঠান নাই; সুতরাং জজ সাহেব তাহাদের খালাস দিলেন।*

এই ছয়জনকে কেন দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছিল, ইহার হেতু ঠিক বুঝা যায় না। ইহারা জালরাজার সঙ্গে ছিল সত্য, কিন্তু আরও অনেকে ত সেই সঙ্গে ছিল, তাহাদের সকলকে সোপর্দ্দ কেন করা হইল না, কেবল এই ছয় জনকে কেন সোপর্দ্দ করা হইল, তাহা লইয়া কেহ কেহ তর্ক করিয়াছিলেন। জালরাজার উকিল সা সাহেব উপহাস করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, যে সাত সংখ্যা শুভপ্রদ, তাহাই সাতজনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করা হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

---

* এই ছয় জনের মধ্যে হরধামের রাজা রায় নরহরিচন্দ্র একজন আসামী ছিলেন। তিনি খালাস হইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় আর সমাজে মুখ দেখাইতে পারিলেন না। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র বলিয়া তাঁহার বংশাভিমান কিছু অতিরিক্ত ছিল, এমন কি তিনি কৃষ্ণনগরের রাজা গিরীশচন্দ্র অপেক্ষা আপনাকে সম্ভ্রান্ত মনে করিতেন। রাজা গিরীশচন্দ্রও তাঁহার প্রতি কতকটা জ্ঞাতিবৈরিতা দর্শাইতেন। একবার কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে নরহরিচন্দ্রের দুর্দ্দশা অনুকরণ করিয়া একটা যাত্রায় "সং" দেওয়া হয়। তাহাতে নরহরিচন্দ্র আরও অপমানিত মনে করেন।

বঙ্গদর্শন।

৯৭ সংখ্যা।

অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য।

৩

বৌদ্ধবিদ্রোহ।

পরশুরামের সময় হইতে শাক্যসিংহ পর্য্যন্ত কতদিন তাহার কিছুই স্থির নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বিষয়ে কাল নির্ণয় করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতেছেন। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই উপলক্ষের কথা প্রায়ই আমি বুঝিতে পারি না, এবং তাঁহারা যে সকল তারিখ স্থির করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিতেও সম্মত নহি। তাঁহারা এতদ্দেশের পুরাবৃত্তকে বাইবেললিখিত পুরাবৃত্ত অপেক্ষা গৌণ ভিন্ন মনে করিতে পারেন না। বাইবেলের মত ধরিতে হইলে মনুষ্যজাতির বয়ঃক্রম ৬০০০ বৎসরের অধিক নহে। সুতরাং ইউরোপীয়েরা এতদ্দেশের পুরাবৃত্ত বিষয়ে যে কিছু আলোচনা করেন তাহাতে ঐ ৬০০০ বৎসরের কথা ছাড়িতে পারেন না। ফলতঃ তাঁহাদিগের মধ্যেই আবার এই মতের যথেষ্ট প্রতিবাদ শুনিতে পাই। সত্য বটে, এরূপ একটী সূত্র ধরিয়া না চলিলে কোন বিষয়েরই মীমাংসা হয় না। কিন্তু তাহাই বলিয়া এতদ্দেশের শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ,তন্ত্রাদি সমস্তই যে ঐ মিয়াদের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া মতিস্থির করিতে হইবে, এ কথা স্বীকার করা আমার পক্ষে অসাধ্য।

এতদ্বিষয়ে আর একটী হাস্যজনক উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইংরাজি কবি চসরের সময় হইতে সেক্সপিয়রের সময় পর্য্যন্ত এত বৎসরের মধ্যে ইংরাজি ভাষার এতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অতএব বৌদ্ধদিগের সংস্কৃত ও বেদের সংস্কৃত পরস্পর তুলনা করিয়া স্থির করা গেল, যে দুইএর মধ্যে এত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে; সুতরাং

চন্দ্রগুপ্ত রাজার এতদিন অগ্রে ঋগ্বেদ রচনা হইয়াছিল। এ হিসাবটী লিখিতে সহজ : কেবল একটু দোষ এই, যে তিনটা সুপারির মূল্য যদি এক পয়সা হয় তবে এক কান্দি মর্ত্তবান কলার মূল্য কত হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। আর জ্যোতিষ ধরিয়া যে হিসাবে বেদের সময় নির্ণয় হয়, তাহার কথা জ্যোতির্ব্বেত্তারাই বলিতে পারেন। আমি এই পর্য্যন্ত বুঝিয়া রাখিয়াছি, যে বেদের কথা ইংরাজি ভাষাতে বুঝিয়া সমালোচনা করা ধৃষ্টতা ভিন্ন নহে। এ কথাটী আমার নহে; দয়ানন্দ স্বরস্বতীর নিকট এই শিক্ষাটী লাভ করিয়াছি। অতএব ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বিষয়ে কাল নির্ণয় করা কিম্বা কালনির্ণয়ের সমালোচনা করা সর্ব্বপ্রকারেই আমার সাধ্যাতীত।

পরন্তু ভারতবর্ষের ঘটনাবিশেষের পারম্পর্য্য স্থির করিতে পারিলেও অনেক মঙ্গল হয়। অর্থাৎ শাক্যসিংহ এবং পরশুরাম অমুক তারিখে দেহত্যাগ করেন এপ্রকার সূক্ষ্ম কালনির্ণয়ের অভাবে যদি এ পর্য্যন্তও অবধারণ করা যায় যে—অমুক ঘটনার পরে অমুক ঘটনা হইয়াছে বা উভয় ঘটনা সমসাময়িক—অথবা প্রথমটি অগ্রবর্ত্তী এবং দ্বিতীয়টি অল্প কি অধিক পরবর্ত্তী, কি কেবল পরবর্ত্তী,—তাহা হইলেও ভাল হয়। এ প্রকার আন্দাজ করা নিতান্ত অসাধ্য মনে হয় না; এবং এরূপ আন্দাজি কথা একেবারে অকর্ম্মণ্যও নহে। কেন না, যে সময় পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা অন্য দেশের সহিত মিশ্রিত হন নাই,সে সময় উপলক্ষে ভারত এবং অ-ভারত মধ্যে সমসাময়িক সম্বন্ধ না জানিতে পারিলে ক্ষতি নাই। যাহারা এক পাঠশালায় পড়ে, তাহাদিগের মধ্যেই বিদ্যা ও বয়ঃক্রমের পরিচয় লইয়া পরস্পরের ন্যূনাতিরেক স্থির করা আবশ্যক হয়। কেন না, উভয়ের তুলনা দ্বারা ছাত্রগণের বুদ্ধির তারতম্য ও শিক্ষাপ্রণালীর গুণাগুণ কতক বিচার করা যাইতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন পাঠশালার ছাত্র মধ্যে কেহ এক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অগ্রবর্ত্তী ও অন্য বিষয়ে অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্বর্ত্তী বলিয়া প্রকাশ হইলে এতাদৃশ কোন ফল লাভ হয় না। ভারত এবং ইউরোপের সমসাময়িক উন্নতির তুলনা করা ঐরূপ অকিঞ্চিৎকর। ব্যাস ও বাল্মীকির সময় সূক্ষ্মরূপে স্থির করিতে পারিলে একটী লাভ এই যে, বুঝা যাইবে তখন ইউরোপীয়েরা কি অবস্থায় ছিলেন; সে সময়ে কাহারা শ্রেষ্ঠ কাহারা নিকৃষ্ট ছিল, এবং এত বৎসরের মধ্যে কোথায় কত উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকারে পরস্পরের শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধ স্থির হইলেও কাহারও ন্যূনাতিরেক স্থির হইবে না।— এক সময়ে ভারতে অন্নকষ্ট ছিল না বলিয়া কোন বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে এবং কোন বিষয়ে হয়তো ঐ কষ্ট অভাবে দুর্ব্বুদ্ধিও ঘটিয়াছে; আর, সেই সময়ে

ইউরোপীয়েরা অন্নাভাবে নিতান্ত কাতর ছিলেন, কিম্বা সময়ান্তে অন্নকষ্টের অভিজ্ঞতা সহকারে অমুক অমুক বিষয়ে ভারতবাসিগণ অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর উন্নতিলাভ করিয়াছেন—পুরাবৃত্ত শাস্ত্রে এরূপ সমসাময়িক সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিলে এমন কোন আসাধারণ উপকার দেখিতে পাই না।

ভারতের পুরাবৃত্তের তারিখ স্থির করিতে পারিলে লাভ হইত না এমন নয়। যে লাভ হইত তাহা অন্য প্রকারের। ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে বুঝা যাইত, যে যখন অমুক ঘটনার পরে অমুক ঘটনা হইয়াছে,তখন তদুভয়মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে। অথবা অমুক অমুক বিষয়ে লোকের বুদ্ধির ভ্রম বা চৈতন্য প্রযুক্তই পরে এই এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। লোকে বিবেচনা করিয়া এক সময়ে যে কোন প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছে, না বুঝিয়া সেই প্রথা পুনরায় প্রবর্ত্তন করিলে আবার তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা জন্মিতে পারে। পক্ষান্তরে যেখানে বিবেচনার ত্রুটী হইয়াছে সেখানে ধারাবহন ত্যাগ করিলে দোষ হইতে পারে না, বরং লাভ হওয়াই সম্ভব। কিন্তু এরূপ উপপত্তির নিমিত্তে ঘটনাসমূহের তারিখ অভাবে কেবল পারম্পর্য্য নির্ণীত হইলেও অনেক সুবিধা হইতে পারে।

কালপ্রবাহে নানা অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে, সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থারও রূপান্তর করা আবশ্যক হইবে; ইহাতে বিচিত্র কি? প্রাচীন কালে এতদ্দেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের চর্চ্চা হয় নাই,এবং তদ্বিষয়ক বুদ্ধিও অপরিণত ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র সংক্রান্ত ঘটনাদির মধ্যে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা নির্দ্ধারিত করাতেই ইউরোপের এত উন্নতি হইয়াছে। অতএব ভারতপুরাবৃত্তের ঘটনাবলীর তারিখ অভাবে কেবল পারম্পর্য্য বুঝিতে পারিলেও ঐরূপ লাভ দর্শিবে। এবং এতদ্দেশের অবস্থা অনুসারে বিজ্ঞান শাস্ত্রোক্ত মতে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা ধরিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা—বিজ্ঞান শাস্ত্রের এই বিধান। অবস্থা বুঝিতে পারিলে ব্যবস্থার বিষয়ে মতভেদের স্থল স্বভাবতই সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষীয় ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য স্থিরীকৃত হইলে অন্ততঃ একটি লাভ হইবে। ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে যে সকল উপদেষ্টা আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের গুণেই ভারতবাসীরা ক্রমশঃ নানা বিষয়ে বৈরাগ্য শিখিয়াছেন। এই শিক্ষার পারম্পর্য্য স্থির হইলে অতীত ক্রম অবলম্বন পূর্ব্বক ভাবী বিধান স্থির করা যাইবে। সংসার আশ্রম হইতে বীতরাগ হইয়াই সন্ন্যাস অবলম্বনের অভিলাষ জন্মিয়াছিল, এবং সন্ন্যাসের পরিচয় হইতে স্বার্থানুরাগ বিহীন শ্রমের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। এইগুলি স্থির হইলে পরিশেষে পরিশ্রমই

বৈরাগ্যের প্রধান উপায় বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

পরশুরামের সময়ে ব্রাহ্মণদিগের যুদ্ধত্যাগ এবং শাক্যসিংহের সময়ে বৌদ্ধমতের সূত্রপাত হয়। এই দুই সময়ের মধ্যের সামাজিক ব্যাপার,—বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বিরোধ এবং শ্রুতি রচনার সমাপ্তি ও স্মৃতি রচনার প্রারম্ভ,—এইগুলি অনুমান হয়। কেবল স্মৃতি কেন, এই সময়ে দর্শনশাস্ত্রেরও অন্ততঃ কতক উন্নতি হইয়া থাকিবে।

ইদানীন্তন ইউরোপীয় সমালোচকেরা বৌদ্ধশাস্ত্র লইয়া এতই বিব্রত হইয়াছেন, যে উহার পূর্ব্বের ও পরের ঘটনার প্রতি তাঁহাদিগের তাদৃশ মনোযোগ দেখা যায় না। অনেকের, বিশেষতঃ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের, মনের সংস্কার, যে হিন্দুধর্ম্ম কেবল ব্রাহ্মণদিগের ক্রূর বুদ্ধির ফল মাত্র। সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট বৌদ্ধমত অপেক্ষাকৃত আদরণীয় হইয়াছে। শত্রুর শত্রু মিত্রপদেই অভিষিক্ত হয়। ফলতঃ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহার বিচার পৃথকরূপে নিষ্পন্ন করা আবশ্যক হইয়াছে। ভরসা করি, নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা ইংরেজি ও সংস্কৃতভাষাতে ব্যুৎপন্ন, তাঁহারা পালিভাষার অনুশীলন করিয়া এই বিচারে ব্রতী হইবেন।

শাক্যসিংহের উপদেশ অন্ততঃ কতক পরিমাণে যে ব্রাহ্মণগণের শিক্ষা হইতে উৎপন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই। আর বৌদ্ধগণও এতদ্দেশ হইতে দূরীকৃত হইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতেই ব্রাহ্মণের ক্রূরতা প্রতীত হয় না। বরং বৌদ্ধমতের দোষ এবং ব্রাহ্মণদিগের উপদেশের প্রাধান্যই প্রতিপন্ন হইতে পারে। ভারতবাসীরা বৈদিকধর্ম্মের প্রতি অধিকতর সমাদর না করিলে এত বড় প্রবল বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষয় হইবে কেন? এবং যে সমস্ত লক্ষণবশতঃ* সেই পরিত্যক্ত বৈদিকধর্ম্ম আবার লোকের নিকটে এত আদরনীয় হইয়াছিল, তাহা কখনই সর্ব্বতোভাবে নিন্দার বিষয় হইতে পারে না।

প্রবাদ আছে, যে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমতাবলম্বীগণকে পরাস্ত করিয়া বারাণসী তীর্থ পুনঃসংস্থাপন করেন। অতএব পরশুরাম হইতে শাক্যসিংহের সময় পর্য্যন্ত বৈদিক সময় এবং শাক্যসিংহ হইতে শঙ্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধ সময় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণ ও বেদের বিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু আমরা বেদ ও ব্রাহ্মণের অধীন। এই জন্য বৌদ্ধদিগের বিদ্রোহ নাম দিয়াছি। ফলতঃ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণের কথা ছাড়িয়া হিন্দু গণের মতে বিচার করিলে বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্রোহস্বরূপ বলিয়া সহজেই অনুভব হইবে।*

* শাক্যসিংহ কুল ও গোত্র বিষয়ক নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী গোপা, দণ্ডপানি শাক্যের দুহিতা। অতএব বিবাহটা সগোত্রেই হইয়াছিল। ঐতিহাসিক রহস্য ২ ভাগ ৫৫,৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

শাক্যসিংহ হইতে শঙ্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত যে সকল ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা হইয়াছে,তাহাতে এই সময়টাই অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ মনে হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক এই সময়ে ভারতবর্ষ নানা ধর্ম্মে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। যখন বিপ্লব উপস্থিত হয় তখনই পুরাবৃত্তের ঘটনা বৃদ্ধি হয়। এবং উহার বিপরীত-অবস্থাই প্রকৃত প্রস্তাবে মাঙ্গলিক। শান্তির সময়েই বাস্তবিক লোকের চরিত্র সংস্কার হইয়া থাকে। এইরূপ মাঙ্গলিক ঘটনা পরশুরামকৃত বিপ্লবের অব্যবহিত পরে, অর্থাৎ বৈদিক সময়েই ঘটিয়া থাকিবে। ঐ বিপ্লবের পরে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধ ঘটিয়াছিল; ইহার মর্ম্ম এইরূপ বোধ হয়, যে ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্মবলের তুলনায় বাহুবলের ন্যূনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই প্রকার লোক-সংস্কার সামান্য উন্নতির লক্ষণ নহে। এই উপাখ্যানের প্রতি কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ করিলে আরও বোধ হইবে, যে নিরস্ত্র অহিংসক ব্যক্তির প্রতি বলবান লোভপরবশ ব্যক্তি অত্যাচার আরম্ভ করিলে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির পক্ষেই সকলে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করে। বিশ্বামিত্রও পরিশেষে এই কথা বুঝিয়া বিপ্রধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

বিশ্বামিত্রের সহিত শাক্যসিংহের তুলনা হইয়া থাকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ আছে। শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করেন, আর বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া বিপ্র-বৃত্তি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন। শাক্যসিংহ নিজে রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধরাজা অজাতশত্রু এবং অশোক, বৌদ্ধসঙ্ঘ এবং বৌদ্ধ আচার্য্যগণের উপরেও আধিপত্য করেন। বৌদ্ধমতাবলম্বী ভোট রাজ্যে ধর্ম্মরাজা এখনও দেবরাজ নামক পিউলো বা সুবাদারের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। আর জাপানের মিকাডো এবং চীনের সম্রাটের কর্ত্তৃত্বও ঐরূপ। * ফলতঃ বৌদ্ধমতে যাজন, অধ্যাপন আদি বিপ্রধর্ম্ম ক্ষত্রবৃত্তির সহিত বিভিন্ন থাকে নাই। বৌদ্ধেরা শ্রুতি, স্মৃতির অবমাননা করাতেই ব্রাহ্মণদিগের বৃত্তির বিঘ্ন হয়। নন্দরাজার সময় উপলক্ষ্য করিয়া বৃহৎকথার গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন, যে সামবেদের আবৃত্তি শুনিয়া শৃগালের রব ভ্রম হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের বৃত্তি উচ্ছেদ করিবার চেষ্টাকে তুচ্ছ কথা মনে করিতে পারি না। যাজনবৃত্তি রাজকার্য্য হইতে বিভিন্ন হওয়াতে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। শাক্যসিংহের বিদ্রোহের মূল কথা প্রাগুক্ত বৃত্তিভেদের হনন। বিশ্বামিত্র কখনই উল্লিখিত বৃত্তিভেদের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই; বরং কার্য্যের দ্বারা

* Beat's Fah-Hian PP. XXV, 42. &c.

তিনি বিপ্রবৃত্তির সম্মান বর্দ্ধন করিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন মনে হয়। বিশ্বামিত্রের সময়েও ব্রাহ্মণেরা শাক্যসিংহের সময়ের অনুরূপ হইয়া নব্যবিধানের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া থাকিবেন, ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রতি ব্রাহ্মণের বৈরিতার নিদর্শন এইমাত্র আছে, যে তিনি ব্রহ্মর্ষির সমান এবং সপ্তর্ষির মধ্যে একজন হইয়াছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণবর্গকে দোষ দেওয়া অসঙ্গত। এই উপাখ্যান হইতে বুঝা যায়, যে রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি উভয় পদই ক্ষত্রিয় বর্ণের আয়ত্তের মধ্যে বটে। কেবল ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণটী নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য। কিন্তু এই স্বল্প স্বার্থপরতাটীও বিবর্জ্জিত হইতে পারিলে ব্রাহ্মণেরা মনুষ্যপ্রকৃতি অতিক্রম করিতেন। মনুষ্যের নিকট এতদূর প্রত্যাশা করা সঙ্গত নহে। প্রত্যুত ব্রাহ্মণেরা বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মর্ষি করাতেই স্বীকার করা কর্ত্তব্য, যে শাক্যসিংহও ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মর্ষি হইতে পারিতেন।

বেণ, নিমি ইত্যাদি রাজাদিগের বৃত্তান্ত জানি না, সুতরাং তাঁহারা শাক্যসিংহের শ্রেণীতে গণনীয় কি না তাহাও বলা যায় না। কিন্তু প্রভেদ এই, যে ইঁহারা শীঘ্রই শাসিত হইয়াছিলেন আর বৌদ্ধ দিগকে শাসন করিতে করিতে ভারত যবন হস্তে নিপতিত হইয়াছেন। শাক্যসিংহের খ্যাতি এতদিনের পরে জগৎ বিস্তীর্ণ হইতেছে। আমি উহার বিরোধী নহি। বেণের সময়ের কোন সদনুষ্ঠান শুনা যায় না। শাক্যসিংহের মহৎ কীর্ত্তি অদ্যাপি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে দেখিতেছি। অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত কার্য্যসমগ্রকে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বিদ্রোহাচরণ বলাতে পাঠক এমন মনে করিবেন না, যে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আমাদিগের কোন উপকার হয় নাই।

কংস ও জরাসন্ধের সহিত বৌদ্ধ পুরাবৃত্তের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না বলিতে পারা যায় না; কিন্তু কংসারী এবং কাল যবনতাড়িত দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ উপলক্ষেই ভগবদ্গীতা রচনা হইয়াছিল। যবন আলেকজন্দরের পূর্ব্বে বৌদ্ধবিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল, এবং কৃষ্ণোপাসনা মূলক ভগবদ্গীতাতে বৌদ্ধদিগের কথা স্পষ্ট না থাকিলেও উক্ত মতের, অথবা, স্বধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক বিপ্রধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা মাত্রের, প্রতিবাদ বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শাক্যসিংহের সময়ে বোধ হয় বেদাধ্যাপকদিগের মধ্যে অনেক দোষ ঘটিয়া থাকিবে। এই জন্য তিনি বেদের শিক্ষা এবং ব্রহ্মর্ষি পদপ্রাপ্তির কামনা পরিত্যাগ করিয়া এক অভিনব ধর্ম্ম প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তৎকালে যে সকল ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণপদ ধারণ করিতেন, তাঁহাদের যতই ত্রুটি হইয়া থাকুক, তাঁহারা যে সম্প্রদায়ভুক্ত এবং

যে পদে অভিষিক্ত ছিলেন সেই সম্প্রদায় এবং সেই পদের মাহাত্ম্য লঙ্ঘন করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? একজন রাজা যদি অত্যাচার করেন তবে সকল রাজাই কি দোষী হইবেন? এবং রাজ-পদ মাত্রই কি উন্মূলনের যোগ্য হইতে পারে?

বিশেষতঃ একটী কথা স্মরণ করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণপদ এবং ব্রাহ্মণসম্প্রদায় হইতেই যুদ্ধ নিবারিত হয় এবং এই শুভ ঘটনা হেতুই শাক্য বিশ্বামিত্রাদি ধর্ম্মালোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরাও যে আপন পদবিষয়ক যুক্তির সার কথা সম্যকরূপে বুঝিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না, কেন না, তাহা হইলে এতদ্বিষয়ক বাদানুবাদ সংস্কৃতজ্ঞদিগের নিকট শুনা যাইত। গীতাকার নিষ্কাম কর্ম্ম এবং কর্ম্মত্যাগের তুলনা করিয়া কেবল এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন "যুদ্ধ ধর্ম্ম এবং অহিংসা ধর্ম্ম উভয়ই সমান, কিন্তু সম্যক অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেয়স্কর।" ৩ অঃ ৩৫। এস্থলে গীতাকার অনায়াসে বলিতে পারিতেন, যে উভয় ধর্ম্ম সমান বটে, অথচ যুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী না থাকিলে অহিংসা বা বিপ্রধর্ম্ম রক্ষা হয় না; আর, একাধারে উভয় ধর্ম্ম ধারণ করাও অসাধ্য। অতএব ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাতে বিপ্রধর্ম্ম ক্ষত্রধর্ম্ম উভয়েরই বিঘ্ন হইবে। আশ্চর্য্য এই যে, শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাসধর্ম্মের পোষকতা করিতে গিয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন, যে উভয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান "এককালে একপুরুষ কর্ত্তৃক সম্ভব হয় না," (বেদান্তবাগীশের ভগবদ্গীতা ৪০ পৃষ্ঠা) তথাচ বলিতে পারেন নাই, যে একের রক্ষার্থে দ্বিতীয়ের রক্ষণ অপরিহার্য্য। অতএব ব্রাহ্মণেরা কার্য্যে বিপ্রধর্ম্ম ও ক্ষত্রধর্ম্মের প্রভেদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার নিগূঢ় যুক্তি পরিষ্কাররূপে স্থির করিতে পারেন নাই। তথাচ তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্রোহাচরণ হইতে যে ক্ষতি উৎপন্ন হইয়াছে শাক্যসিংহকেই তাহার মূলীভূত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। আমরা বুঝি আর না বুঝি, আমাদিগের কার্য্যফলের দোষ গুণ আমাদিগের উপরেই বর্ত্তিবে।

শাক্যসিংহ যে ধর্ম্ম প্রণয়ন করেন তাহা যুদ্ধবৃত্তির পোষক নহে। এবং বৌদ্ধগণ যখন যাজনকার্য্য ও ক্ষত্রবৃত্তির বিভেদ উঠাইয়া দেন, তখন তাঁহারাও যে এতদ্বিষয়ের সমধিক বিচার করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্নও দেখা যায় না। বাস্তবিক বিপ্রধর্ম্ম, অর্থাৎ যাজন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ, যুদ্ধধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন হওয়াতেই দেশের মঙ্গল হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু উভয় পক্ষই নিগূঢ় কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভুলিয়া অসঙ্গত কার্য্যের দ্বারা তাঁহাদিগের বংশাবলীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধগণ বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রতিকূলতা করাতেই প্রাগুক্ত বৃত্তিভেদ বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর ব্রাহ্মণেরা যাজন অধ্যাপনের সম্বন্ধ ও

মাহাত্ম্য না বুঝিয়া যজন এবং তপস্যার প্রতি অযথা মনঃসংযোগ করাতেই এত বিপত্তি ঘটিয়াছে। সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণের যুক্তি এবং তদ্বিষয়ে বৌদ্ধের ভ্রম স্ব স্ব সম্প্রদায়ের দোষ গুণ জ্ঞাপক নহে, কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বিশেষের ফল, এবং পরবর্ত্তী ঘটনা বিশেষের কারণ মাত্র। সেই সকল ঘটনার অশুভকর ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভকর ভাগ রক্ষা করাই আমাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য। যাজন বৃত্তির পার্থক্য রক্ষা ও বৌদ্ধগণের উপদেশ পালন, উভয়ই কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু বিপ্রবৃত্তি হরণান্তে বৌদ্ধেরা যে বৃত্তিভেদের লোপ চেষ্টা করেন, তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর বৌদ্ধবিদ্রোহের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার আলোচনা করা যাউক। যাহাকে ইতিপূর্ব্বে বৈদিক সময় বলিয়াছি, ঐ সময়ে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধই প্রবল হইয়াছিল। এবং এই বিরোধে উভয় পক্ষ নিরস্ত হওয়াতেই বিপ্রধর্ম্ম এবং ক্ষত্রধর্ম্মের বিভেদ সংস্থাপিত হয়। এই ঘটনাটী নিতান্ত অস্বাভাবিক বটে, কিন্তু ইহার সত্তার বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বভাবতঃ এতাদৃশ বিরোধে এক পক্ষের সম্পূর্ণ পরাজয় হওয়াই সম্ভবপর। এবং এরূপ পরাজয় হইতে, হয় যুদ্ধব্যবসায়ীদিগের একাধিপত্য ঘটিবে, নচেৎ ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগের অনন্য প্রাধান্য সংস্থাপিত হইবার কথা। ধর্ম্মব্যবসাটী প্রধান হইলে যুদ্ধব্যবসায় যে উঠিয়া যাইত এমত নহে, কেবল যাজ্ঞিকের আদেশ ব্যতীত কোন যুদ্ধ হইতে পারিত না। ব্রাহ্মণদিগকে প্রথম হইতে এইরূপ কর্ত্তৃত্ব করিতে হইলে তাহারা যুদ্ধ-কলুষস্পৃষ্ঠ হইয়া ক্রমশঃ মুসলমান বাদসাহের ন্যায় হইয়া উঠিতেন। যে দেশেই হউক যাজ্ঞিক সম্প্রদায় এইরূপে যুদ্ধকাম হইলে তাঁহারা ধর্ম্মালোচনা বিষয়ে স্বভাবতঃ নানা বিশৃঙ্খলা ঘটান। সুতরাং পরিশেষে আবার যুদ্ধব্যবসায়ীরা উৎপীড়িত এবং বিদ্রোহী হইয়া যাজ্ঞিকদিগকে শাসিত করিয়া ফেলে। ভারতবর্ষে শাক্যসিংহ রাজসুখ ভোগেও সন্তুপ্ত হন নাই। না হইয়া বিপ্রবর্ণের তপস্যাবৃত্তির জন্য আকিঞ্চন করিলেন। এবং এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মের আত্যন্তিক এবং বিকৃত ভাব উৎপাদন করিলেন।

ফলতঃ যাজ্ঞিক এবং যুদ্ধব্যবসায়ীদিগের বিরোধ ঘটিলে অগত্যা উভয় পক্ষকেই বাহুবলের উপরে নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু বাহুবল দ্বারা এই বিরোধ মীমাংসা করিতে হইলে ধর্ম্মোপদেষ্টা অপেক্ষা অস্ত্রধারীগণের জয়লাভই যে অধিকতর সম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। ইউরোপে যাঁহারা পোপের ধর্ম্মশাসন ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা অগত্যা যুদ্ধব্যবসায়ীগণের একান্ত অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় এই প্রণালী অবলম্বন করাতে ইংলণ্ডে এবং ইংরাজ জাতির

মধ্যে ধর্ম্মশাসন কত হীনবল হইয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বে বোম্বাই বিভাগের বিশপের দুরদৃষ্ট উপলক্ষে দেখান গিয়াছে।

যুদ্ধব্যবসায়ীদিগের প্রাধান্য হইতে ধর্ম্মালোচনার বিঘ্ন হয় বটে, কিন্তু রাজকার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে বিশেষ উন্নতিও হইয়া থাকে। ধর্ম্ম এবং সৎপরামর্শের বল, বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতা সত্বর প্রতিপন্ন হইবার নহে। বাহুবল দ্বারা লোককে বশীভূত করা অপেক্ষাকৃত সহজ; এই জন্য তাহা হইতে যে সকল উন্নতি হয় তাহা যুদ্ধব্যবসায়ীর প্রাধান্য হইতেই লব্ধ হয়। আর যুদ্ধব্যবসায় উন্নতি হইতে আজ্ঞাদান ও আজ্ঞাপালন বিষয়ক বন্দোবস্ত লোকের অভ্যস্ত ও হৃদয়ঙ্গম হয়। ভারতের দুর্ভাগ্য এই যে, এই সকল উন্নতি দূরে থাকুক, বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণের বিদ্রোহিতা করিয়াও স্বকীয় ধর্ম্মের কয়েকটি ক্ষতি নিবারণ করিতে পারিলেন না। বৌদ্ধরাজ্যের সময়ে অনেক উন্নতি হয়, কিন্তু বৃত্তির সাঙ্কর্য্য হইতে মহা ক্ষতি হইয়াছে।

যুদ্ধব্যবসায়ীরা প্রাধান্য করিতে পাইলে একছত্র স্থাপন করিতে ব্যগ্র হন। একছত্র স্থাপন করিতে পারিলে রাজ্যস্থ লোক সমূহের একতা এবং তন্নিবন্ধন নানাবিধ উন্নতি লাভ হয়। কিন্তু যুদ্ধকার্য্যে দক্ষ হইলেই যে একছত্র স্থাপন করিতে পারা যায় এমত নহে। বাহুবলে রাজ্যাধিকার হইতে পারে, কিন্তু একছত্র স্থাপনার্থ লোকের মন বশীভূত করা আবশ্যক। সে কৌশল, সকল যুদ্ধব্যবসায়ীর আয়ত্ত হয় না। মুসলমানেরা এক সময়ে অনেকদূর রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে রাজ্যের একতা স্থাপিত হয় নাই। সেকন্দর সাও বিস্তর রাজ্যাধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল লাভ হয় নাই। বৌদ্ধগণ গন্ধার, (কাণ্ডাহার) তাম্রলিপ্ত (তমলুক), এবং সিংহল পর্য্যন্ত একছত্র স্থাপন করিয়া থাকিবেন। এবং স্তূপ গুহা বিহার আদিতে অসামান্য শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু রাজকার্য্যের ভাল বন্দোবস্ত কোথাও করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ শাসনের ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিলে বৌদ্ধশাসনে, ভারত, তিব্বত, শ্যাম, ব্রহ্ম, চীন, জাপান, যেখানে বল সর্ব্বত্র কেবল সম্রাট, রাজা, তালুকদার বা সুবেদার মাত্রের শাসন দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই যাজ্ঞিকগণের উপরে কর্ত্তৃত্বপরায়ণ। ইঁহাদের দ্বারা কোথাও প্রকৃতিবর্গের মহত্ত্ব কিম্বা সহযোগীতার পথ আবিষ্কৃত হয় নাই। কোথাও মতভেদ নিবৃত্তিকরণের উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। চাণক্যের বুদ্ধি নৈপুণ্যের বর্ণনা পাঠ করিয়া একবারও বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা মনে হয় না। বররুচির সদর্প কথা—পাঁচজনের ঐক্য অভাবে দুইজনের ঐক্যেই রাজ্য রক্ষা হইতে পারে—মনে

হইলে কেবল হাঁসি পায়। (মুদ্রারাক্ষস, বৃহৎ কথা দেখ।) একছত্রের বন্দোবস্ত, রাজধর্ম্ম ও রাজনীতির অঙ্গ। তাহা সহজে বোধগম্য হইলে বর্ত্তমান সময়ে আত্মশাসন লইয়া এত আড়ম্বর শুনা যাইত না। এ কথাটী অপ্রাসঙ্গিক। কেবল মূল বিষয়ের অর্থজ্ঞাপনার্থে ইহার নাম করিলাম।

একছত্র স্থাপন বিষয়ে রোমকেরা শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাহার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, সমগ্র ইউরোপ এখন বিভিন্ন রাজার অধীন হইলেও নানা বিষয়ে এক মতাবলম্বী। রোমের শিক্ষা এখনও ইউরোপের সর্ব্বত্র সজীব রহিয়াছে। রোমের আইন রোমের শাসনপ্রণালী, রোমের বন্দোবস্ত ব্যতীত ইউরোপীয়েরা আর কিছুই বুঝেন না। হিন্দুশাস্ত্র দেখিয়া ইউরোপীয়দিগের এত তাক্ লাগিবার এক কারণ এই যে, রোমের ব্যবস্থার সহিত সমস্ত মিলাইতেও পারেন না, আর অব্যবস্থা বলিয়া একেবারে পরিত্যাগও করিতে পারেন না। আর আমাদিগের দুর্ভাগ্য এই যে, হিন্দুশাস্ত্রের রাজধর্ম্মে রাজ্যের বন্দোবস্তের বিষয়ে যথা যোগ্য উপদেশ নাই; আর সন্ন্যাসধর্ম্মে কেবল সংসার উচ্ছৃঙ্খল করিবার ব্যবস্থাই দেখা যায়। উভয় ধর্ম্মের সহযোগিতা বৌদ্ধবিদ্রোহের পূর্ব্বে কিয়ৎ পরিমাণে ছিল। তাহার পরে রাজধর্ম্ম বিষয়ে ভারতের যার পর নাই ক্ষতি হইয়াছে। এবং রাজধর্ম্মের অবনতি হইতে বৈরাগ্য বিষয়ে কুবুদ্ধি ঘটিয়াছে।

ইংরাজেরা ভাণ করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে আমরা রোমকদিগের ন্যায় রাজ্য করিতেছি। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রম। যদি ইংরাজ প্রকৃতিতে রোমকদিগের অনুকরণ করিবার ক্ষমতাও দেখা যাইত, তাহা হইলে এ কথা বলিতাম না। রোমরাজ্যে বিদেশীয় প্রজাগণ গর্ব্ব করিয়া বলিত আমরা "রোমান"। এক সময়ে য়িহুদী সেণ্ট পল "আমি রোমান" বলিয়া ঘোর বিপত্তি হইতে উদ্ধার পান। কিন্তু এখানে হুইট্লি ষ্টোক্স ফৌজদারী কার্য্যবিধির আইন সংশোধন করিবার সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেই বুঝা যায়, যে ইংরাজদিগের প্রজা বশীভূত করিবার ক্ষমতা কত অল্প। ইংরাজজাতির মধ্যে স্বগণের ঐক্য সাধন কৌশল অতি উৎকৃষ্ট। বোধ হয় ঐ কৌশল এত ভাল বলিয়াই অন্য জাতি বা জিত প্রজাবর্গের সহিত ঐক্য সাধনের ক্ষমতা এত অল্প। ফলতঃ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা, যেখানে যেখানে ইংরাজেরা পদার্পণ করিয়াছেন, সেইখানেই জয়পতাকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সমগ্র প্রজাবর্গকে উৎসন্ন দিয়াছেন। আর ভারতবর্ষেও যদি ঐরূপে কৃতকার্য্য না হইতে পারেন, সে কেবল ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষার ফল ভিন্ন কিছুই নহে। কিন্তু কৃতকার্য্য হইবেন না তাহা মনে করিবার পথ

বড় দেখি না। ইংরাজিভাষাজ্ঞ ভারতবাসীরা মনে করিয়া থাকেন, আমরা সাহেবের মত হইতেছি। ইহা সত্য হউক না হউক, আমাদিগের দ্বারা ব্রাহ্মণের ক্ষতি এবং দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে বটে। আমার সংস্কার অনুসারে এই কথা বলিলাম, যদি ভুল হয় তবে পরম সুখলাভ করিব। আমার কথার এক প্রমাণ এই, যে বৌদ্ধেরাও এইরূপ ক্ষতি করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক যুদ্ধব্যবসায়ীরা প্রাধান্য লাভ করিলে যে সকল মঙ্গল সম্ভাবিত হয়, ভারতবর্ষে তাহা ঘটিতে পারে নাই। পরশুরামের সময়ে ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে এক পক্ষের জয় ও অন্য পক্ষের পরাজয় না হইয়া কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন দ্বারা ব্যবসার ভেদ হইয়া গেল ও স্ব স্ব ব্যবসাতে উভয়েই প্রধান হইলেন। ক্ষত্রিয়েরা যাজন অধ্যাপনাদিতে ব্রাহ্মণের অধীন, এবং যুদ্ধধর্ম্মে উচ্চতর পদে আরূঢ় হইলেন। ইহাতে রাজ্যবিস্তারের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়া থাকিবে। মনু লিখিত রাজধর্ম্ম পাঠ করিলে এই সংস্কার প্রগাঢ় হয়।

যুদ্ধবিষয়ে রাজধর্ম্মের সার কথা এই, যে যুদ্ধের সময় পলায়নপরায়ণ হইও না। এ কথা যদি রাক্ষস অসুরাদির সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে ব্যক্ত হওয়া মনে করা যায় তবেই সঙ্গত হয়। কেন না, মনু অথবা হিন্দুধর্ম্মানুসারে অন্যায় যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন মনুর মতে জয়লব্ধ রাজ্যের ব্রাহ্মণাদি প্রজাবর্গের প্রতি এবং পরাজিত রাজপুরুষগণের প্রতিও অত্যাচার চলে না। এরূপ স্থলে যেখানে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীগণের বাস ছিল তাহার মধ্যে রাজারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া কি ফল লাভ করিবেন দেখিতে পাই না। সত্য বটে, মুসলমানদিগের পূর্ব্বে হিন্দুরা পরস্পরের সহিত সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিতেন। কিন্তু ইহার হেতু এরূপ হইতে পারে যে বৌদ্ধগণকে শাসিত করিবার নিমিত্তে ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধবিষয়ক নিষেধ শিথিল করিয়া দেন; অনন্তর যুদ্ধ বৃদ্ধি হইয়া ভারতের সমস্ত অনর্থ উপস্থিত হয়। ফলতঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়েও যে বৌদ্ধবিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই এ কথা বলিবার পথ সঙ্কীর্ণ।

বৈদিক সময়ে রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞের উপলক্ষ ব্যতীত বিভিন্ন রাজগণ একচ্ছত্রের অধীন হইতেন না। আর ঐ সকল যজ্ঞের সময়েও করদ রাজারা যে নিতান্ত প্রজাগণের সমান হইতেন এমতও নহে। বাস্তবিক ভারতবর্ষের নানা রাজারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া পরস্পরের সমকক্ষতা করিতেন তন্মধ্যে কোন রাজ্য বিশিষ্টরূপ বর্দ্ধন লাভ করিলে, তথাকার রাজা যজ্ঞাদির দ্বারা প্রাধান্য স্থাপন করিতেন। এবং দুর্ব্বল রাজাগণ চক্রবর্ত্তী রাজার অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক সমকক্ষ দুর্বৃত্ত রাজাগণের

হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতেন। এতদ্ভিন্ন জয়লাভ করিয়া কোন রাজ্যে ভূমি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত, কি রাজা কি হাকিম পরিবর্ত্তন, কিম্বা আইনের রূপান্তর করা, হিন্দুরাজাদিগের রীতি ছিল না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে দেশাচার এবং শাস্ত্রসংক্রান্ত যে সকল প্রভেদ ছিল, এবং দেশ দেশান্তরের লোকমধ্যে যে বৈরভাব ছিল তাহারও কোন ব্যত্যয় হয় নাই। কেবল ব্রাহ্মণেরাই বোধ হয় বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করণান্তে পরস্পরের সহিত বাদানুবাদ এবং দিগ্বিজয়াদি করিতেন; এবং এইরূপ দিগ্বিজয় হইতেই বোধ হয় বিভিন্ন রাজ্যের ব্রাহ্মণমধ্যে একতা সংস্থাপিত হইয়া থাকিবে। ফলতঃ বৈদিক সময়ে ক্ষত্রবৃত্তি ও বিপ্রবৃত্তি মধ্যে ভেদ সংস্থাপিত এবং সর্ব্বত্র যুদ্ধবিষয়ে বৈরাগ্য প্রবল হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগেরই বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, অন্যবর্ণের মধ্যে তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অধীন থাকাতে তাঁহাদিগের কোমল গুণ সকল কতক অভ্যস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বার্থপরতার দমন হেতু রাজধর্ম্ম, উচ্চাভিলাষ, প্রজাশাসন আদি গুণের উন্নতি হয় নাই। তাঁহারা বলপ্রয়োগে বীতরাগ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে বলপ্রয়োগের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করাও আবশ্যক—তাহা তাঁহারা শিখেন নাই। যে কৌশলে ইংরাজেরা ভারতবাসিগণকে কুহকিত করিয়াছেন তাহার কিছুই তাঁহারা শিখিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের বিরোধ বুঝিবার নিমিত্ত য়িহুদী জাতি, গ্রীস ও রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত, এবং পোপের শাসন বুঝিয়া তুলনা করা আবশ্যক। য়িহুদিদিগের প্রথম যাজ্ঞিক (ধর্ম্মোপদেষ্টা) মুসা, এবং এব্রেহাম স্বয়ং জগদীশ্বরের দোহাই দিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করেন বটে, কিন্তু শিষ্যবর্গকে চল্লিশ বৎসর বনে ভ্রমণ করাইয়া যুদ্ধবিদ্যা ও সৈনিক বন্দোবস্ত শিখাইয়া দিয়াছিলেন। মুসার পরে যে সকল প্রধান যাজ্ঞিক এবং রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারা ধর্ম্ম এবং যুদ্ধ উভয় বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব করিতেন। ইহারা কেহই বুঝিতে পারেন নাই, যে বিপ্রধর্ম্ম এবং যুদ্ধধর্ম্ম একত্রে ধারণ করা অসাধ্য। পরে যখন যীশুখ্রীষ্ট সর্ব্বপ্রকার বল প্রয়োগের দোষ দেখাইয়া নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, তখন যাজ্ঞিকেরাই ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে বধ করাইয়াছিল। ভারতবর্ষের দধীচি মুনির কথা আর য়িহুদীদিগের যীশুখ্রীষ্টকে হত্যা করিবার বৃত্তান্ত একত্রে মনে করিলে অনেক চৈতন্য লাভ হয়*

---

* যীশুখ্রীষ্ট এবং জন্-দি-ব্যাপটিষ্ট উভয়ে পরস্পরের সহকারী ছিলেন। এসিন্ নামক সম্প্রদায়ের জন্ একজন ছিলেন। যীশুখ্রীষ্টের বিষয়েও সেই ভাবের দুই একটী কথা পাওয়া যায়। এসিনেরা বানপ্রস্থ ছিলেন মনে হয়, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে আত্যন্তর করিবার নিয়ম নিতান্ত হিন্দুগণেরই অনুরূপ ছিল।

যীশুখ্রীষ্টের সময়ের পূর্ব্বে রোম গ্রীসেও যাজন এবং যুদ্ধবৃত্তির বিরোধ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তথায় য়িহুদিদেশের ন্যায়, যুদ্ধাভিলাষী যাজ্ঞিকেরা প্রাধান্য লাভ করেন নাই। রোম গ্রীসে যাজন-অপহরণকারী যুদ্ধার্থিগণেরই প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। পরে খ্রীষ্টানধর্ম্ম রোমের সম্রাটগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে, রোমের প্রাধান্য যতদূর বিস্তৃত ছিল সেই পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম্মও বিস্তার করে। এবং তখন রোমের সম্রাটেরা বৌদ্ধগণের ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ে আধিপত্য করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতেও ক্যাথলিক্ শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইল না, রাজা ও যাজ্ঞিকের ভেদ হইল না। অথবা যাজ্ঞিকেরা রাজা হইলেন না। রাজাই প্রধান যাজ্ঞিক হইলেন। পরে কন্সটান্টিনোপল্ সহরে রাজধানী হইলে ক্যাথলিক্ এবং গ্রিকচর্চ্চ সম্বন্ধীয় ভেদের প্রথম সূত্রপাত হয়। তৎপূর্ব্বে যাজন কার্য্যে রোম সম্রাটের যে আধিপত্য ছিল তাহা গ্রীকচর্চ্চ এবং রুসিয়াধিপতিতে প্রকাশ হয়। রাজধর্ম্ম বিষয়ে রোমের আধিপত্য কিছু দিন পরে বিনষ্ট হয়। অসভ্যগণ রোমরাজ্য ছারখার করিয়া নানা স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করে। কিন্তু সকলেই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করাতে রোমনগরস্থ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী যাজ্ঞিকপ্রধানেরা ক্রমশঃ রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিশপের পদে যাজন কার্য্যের স্বতন্ত্রতা সংস্থাপন করেন।

পরে ফরাসীসম্রাট সার্লেমেন, উপাসনা বিষয়ে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজাদিগের ন্যায় হইয়া যাজ্ঞিকদিগের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেন, এবং ইহাতেই ইউরোপ কতক পরিমাণে নিরস্ত্র থাকিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত শান্তিসুখ লাভ করেন। সপ্তম গ্রেগরী নামক পোপ ইউরোপীয় রাজাগণকে যেরূপে কৌশল দ্বারা শাসিত করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়শাসন বিষয়ে তাহার অতিরিক্ত কিছুই করেন নাই। যাঁহারা কেবল হ্যালামের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সপ্তম গ্রেগরীকে অতি দুর্দ্দান্ত লোভী এবং অধার্ম্মিক যাজ্ঞিক মনে করিতে পারেন। কিন্তু এখন অনেকেই বুঝিতেছেন, যে প্রটেষ্ট্যাণ্ট মতাবলম্বীরা ক্রোধান্ধ হইয়াই প্রাগুক্ত যাজ্ঞিক প্রধানের মাহাত্ম্য জানিতে পারেন নাই। আমি ব্রাহ্মণবর্ণকে সপ্তম গ্রেগরী অপেক্ষা ধার্ম্মিক বলিতে চাহি না। প্রতিপক্ষেরা এপর্য্যন্ত স্বীকার করিলেই যথেষ্ট, যে শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ভাঙ্গিয়া যেরূপ বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন, ইউরোপে লুথর কর্ত্তৃক সেইরূপ বিপ্লব হইয়াছে, এবং ধর্ম্মালোচনা এবং রাজকার্য্য সম্বন্ধে তজ্জনিত বিশৃঙ্খলা এখনও চলিতেছে। আমাদিগের গবর্ণর জেনরেল্ এখানকার লর্ড বিশপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইংলণ্ডেশ্বরী, আর্চ বিশপ অফ্ ক্যাণ্টরবরীর নিয়োগকর্ত্রী। ডিজ্‌রেলির মন্ত্রিত্বের সময়ে ইংরাজ বিশপেরা কাবুলযুদ্ধে জয়লাভ জন্য যজ্ঞ করিতে প্রস্তুত ছিলেন;

পরে মন্ত্রি—পরিবর্ত্তন হইলে গ্লাডষ্টোনের অনুচর যাজ্ঞিকেরা কাবুলে যুদ্ধ না করিতে হয়, তজ্জন্যেও বোধ হয়, ঈশ্বরের সমীপে স্তোত্র পাঠ করিতেও সক্ষম হইয়া থাকিবেন। আবার এখন ঈজিপ্ত রাজ্যাধিকার করিবার জন্য কতই না ধুম হইতেছে। পূরাকালের ব্রাহ্মণদিগের দোষ ছিল না একথা বলি না। দোষহীন লোক অন্বেষণ করাই ভ্রম। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা রাজাজ্ঞার অধীন ছিলেন না এবং জিগীষার কলুষস্পৃষ্ট হইতেন না। এস্থলে বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা মনে করা অসঙ্গত। শাক্যসিংহের বিদ্রোহ দমনার্থে ব্রাহ্মণেরা কি কৌশল করিয়াছিলেন, এবং যবনাধিকার না হইলে কি করিতেন তাহা বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু যুদ্ধব্যবসায়ীর অনধীন হওয়াতেই ব্রাহ্মণেরা যে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্তস্থল সপ্তম গ্রেগরীর যাজকতা, এইমাত্র বলিলাম।

(ক্রমশঃ)



কাঞ্চনমালা।

৭ম খণ্ড।

১

তিষ্যরক্ষার রাজ্যাভিষেকে বৌদ্ধধর্ম্মের বড়ই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাজবাড়ী মধ্যে একটি ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইল। ভগবান্ উপগুপ্ত তাহার সভাপতি হইলেন। মহারাজা অশোক, কুণাল, তিষ্যরক্ষা ও রাধগুপ্ত উহার প্রধান সভ্য হইলেন। বোধিবৃক্ষের অলৌকিক আবির্ভাব অবধি বৌদ্ধগণ তিষ্যরক্ষাকে "ঋদ্ধিমতী" বলিয়া ডাকিত। এই সভার মধ্যে রাজা ও উপগুপ্ত আপন আপন উপাসনাদি লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। মন্ত্রী রাজকার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারাদির ভার তিষ্যরক্ষা ও কুণালের উপর অর্পিত ছিল। তিষ্যরক্ষা কুণালকে সর্ব্বদা ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য করিত; রাজা বা উপগুপ্তের সহিত কুণালের মতান্তর হইলেই কুণালের পক্ষ সমর্থন করিত; যাহাতে সদ্ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়, যাহাতে দেশে দেশে অর্হৎগণ প্রেরিত হয়, যাহাতে "ভিক্ষুদের" সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যাহাতে "শ্রমণদিগের" বিদ্যোন্নতি হয়, যাহাতে "শ্রাবক" সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, যাহাতে বহুসংখ্যক মঠ স্থাপিত হয়, যাহাতে "চৈত্য" সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে বুদ্ধদেবের লীলাভূমি সকলের সমুচিত সম্মান হয়, যাহাতে

বাৎসরিক বিজ্ঞান সভার উন্নতি হয়, যাহাতে চিকিৎসালয় ও পশু-চিকিৎসালয় প্রভৃতি সংস্থাপিত হয়, যাহাতে বুদ্ধদেবের নখ কেশাদি সুসংরক্ষিত হয়, যাহাতে "দন্তযাত্রাদি" উৎসবের শ্রীবৃদ্ধি হয়, যাহাতে ধর্ম্মের, সঙ্ঘের ও বুদ্ধের প্রতি লোকের মন আকর্ষিত হয় সেই সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বপ্রযত্নে কুণালকে সাহায্য করিত। যাহাতে তাহার প্রতি কুণালের শ্রদ্ধা জন্মে, তদ্বিষয়ে সে কিছু মাত্র ত্রুটি করিত না।

২

কাঞ্চনমালা এই সভার কেহই নহেন। তিনি সভায় আসিতেন; কুণাল, তিষ্যরক্ষা ও উপগুপ্তের সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিতেন। কিন্তু তিনি রাজবাটীতে প্রায় থাকিতেন না। তিনি দিবারাত্রি হীনবেশে নগরমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেন, "ভিক্ষুদিগকে" ভিক্ষা দিতেন, বালক বালিকাদিগের সহিত মিলিয়া সদ্ধর্ম্মে তাহাদের মতি লওয়াইতেন। যে দিন উপগুপ্ত কুর্ক্কুটারামে বসিয়া বৌদ্ধমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেন, সে দিন অবহিতচিত্তে ভক্তিভাবে সেই উপদেশ গ্রহণ করিতেন, এবং তৎপরদিবস গোষ্ঠে গোষ্ঠে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ী বাড়ী, সেই উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেন। যাহারা সদ্ধর্ম্মবিদ্বেষী তাহাদের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ ছিল না। তাহাদের বিপদ হইলে, তাহাদের অন্নাভাব হইলে, তাহাদের পীড়া হইলে, তিনি সাধ্যমত তাহাদের সাহায্য করিতেন। প্রত্যহই সংঘভোজন করাইতেন। প্রত্যহ স্বহস্তে দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেন। যেখানে শোক, যেখানে পীড়া, যেখানে দ্বন্দ্ব, যেখানে দুঃখ, কাঞ্চনমালা সেইখানেই উপস্থিত থাকিতেন। তিনি কাহাকেও পর ভাবিতেন না। পরদুঃখ নিবারণে কাতর হইতেন না। পরের সুখে তাঁহার সুখ, পরের দুঃখে তাঁহার দুঃখ হইত। ধর্ম্মালয়, চিকিৎসালয়, মঠায়তন প্রভৃতি স্থানে তিনি সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিতেন। এমন কি, তিনি পরের জন্য একপ্রকার আত্মবিস্মৃতবৎ হইয়া উঠিলেন। রাজা কাঞ্চনমালার ধর্ম্মাচরণে এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন, যে কোষাধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, যে কাঞ্চন যখনই যাহা চাহিবেন, তখনই বিনা আপত্তিতে তাহা প্রদান করা হয়। কাঞ্চনের প্রার্থনায় রাজা ও কুণাল, এমন কি, তিষ্যরক্ষাও নগর পরিভ্রমণার্থ বাহির হইতেন এবং আধিব্যাধিপীড়িতদিগের দুঃখ নিবারণ করিতেন। লোকে কাঞ্চনমালাকে স্বর্গীয় দেবী বলিয়া মনে করিত। যেন নূতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য, আর্ত্ত ব্যক্তির আর্ত্তি নিবারণের জন্য, এবং আপামর সাধারণ লোকের নির্ব্বাণপ্রদানের জন্য ভগবান "অবলোকিতেশ্বর" রমনীবেশে পাটলীপুত্র নগরে ভ্রমণ করিতেছেন।

৩

এইরূপে বৎসরাবধি কাটিয়া গেল। প্রকাণ্ড মগধ সাম্রাজ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পাটলীপুত্র নগরে সদ্ধর্ম্ম-বিরোধী লোক রহিল না। সব পরিবর্ত্তন হইল, কিন্তু তিষ্যরক্ষার মন ফিরিল না। কুণালকে ভুলাইবার জন্য তিষ্য-রক্ষা অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল— কিন্তু দেখিল কুণাল অটল।* সুতরাং তিষ্যরক্ষা আর সাহস করিয়া আপন মনের কথা তাঁহার নিকট পাড়িতে পারিল না। এইরূপে সম্বৎসর কাটিয়া গেল—তিষ্যরক্ষা নানা ছলে কুণালের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিবার চেষ্টা পাইত। কখন নিজ মহলে, কখন কাঞ্চনকুটীরে, কখন গঙ্গাতীরে, কখন উদ্যানমধ্যে, কখন কুঞ্জবনেও উঁহার সহিত পরামর্শ করিতে যাইত, কিন্তু ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না। কেবল একদিন কুণালকে এক নিভৃত স্থানে পাইয়া সাবধানে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—

"কুণাল, তুমি কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না?"

কাঞ্চনমালার সংঘভোজনে উপস্থিত থাকিতে হইবে বলিয়া কুণাল সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। এই অবধি নির্জ্জনে পরামর্শের প্রস্তাব হইলে কুণাল আর সম্মত হইতেন না। দৈবাৎ নির্জ্জনে তিষ্যরক্ষার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কুণাল অন্যপথে চলিয়া যাইতেন।

৪

একদিন তিষ্যরক্ষা অশোক রাজার প্রাচীন রাজপ্রাসাদে অর্থাৎ অশোকের পূর্ব্বকার কেলিগৃহে গমন করিয়া তাহার একটি প্রকোষ্ঠ নানাবিধ বিলাস-সামগ্রীতে পরিপূর্ণ করিল। তথায় কতকগুলি কদর্য্য চিত্রপট ছিল, তাহাতে গৃহটি সাজাইল। নিজে নানাবিধ বেশ-ভূষা করিল, এবং সেই অবস্থায় প্রকাশ্য আজ্ঞাপত্র দ্বারা কুণালকে ডাকাইয়া পাঠাইল।

কুণাল এবার আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না। সম্রাটের প্রকাশ্য আজ্ঞা-পত্র লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তিনি উঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়াছেন, হঠাৎ কাঞ্চনমালা কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিল, এবং নানাপ্রকারে জেদ করিতে লাগিল, "আজি তোমার কোথাও যাওয়া হইবে না।" কুণাল তাহাকে আজ্ঞাপত্র দেখাইলেন, কিন্তু কাঞ্চনমালা আজি প্রবোধ মানিল না। সে আজি বড় অবাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। "কেন" "কি বৃত্তান্ত" কিছুই বলে না; হয় ত নিজেই জানে না যে তাহার এত ব্যাকুলতা কেন? কিন্তু কোন মতেই কুণালকে যাইতে দিতে চাহে না। কুণাল নানারূপে

কাঞ্চনমালাকে ভুলাইতে লাগিলেন, শেষ বলিলেন,—

"কাঞ্চন, কুক্কুটারামের পশ্চিমদিকে আম্রকাননের মধ্যবর্ত্তী পুষ্করিণীর ধারে যে ব্রাহ্মণ সন্তানটি পীড়িত হইয়াছিল এতক্ষণ হয় ত সে মরিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে মুমূর্ষু দশায় দেখিয়া আসিয়াছি। সে অনেকক্ষণ হইয়াছে। তুমি যাও, গিয়া তাহার পিতাকে সান্ত্বনা কর।"

কাঞ্চন আগ্রহসহকারে বলিল,—

"আমি যাই, তুমি কোথায়ও অনেকক্ষণ থাকিও না, শীঘ্রই সেখানে উপস্থিত হইও," বলিয়াই প্রস্থান করিল।

৫

কুণালের মাথার উপর "কা কা কা" করিয়া কাক ডাকিয়া উঠিল। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই একটা ভয়ানক সাপ তাঁহার রাস্তা পার হইয়া গেল। দূরে শিবাগণ বিকটশব্দ করিয়া উঠিল। কুণাল ক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন—দেখিলেন, অন্তঃপুর বিলাসদ্রব্যে পরিপূর্ণ। এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষ গমন করিয়া তিনি শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বরাবর দেখিয়া আসিয়াছেন, কক্ষভিত্তিতে অশ্লীল আলেখ্য ঝুলিতেছে। কিন্তু শয়নদ্বারে আসিয়া দেখিলেন, ভিত্তিসমূহে কতকগুলা অতি জঘন্য আলেখ্য; চারি ভিত্তিরই ঠিক মধ্যস্থানে পরস্পর সম্মুখীন চারিখানি প্রকাণ্ড দর্পণ। গৃহমধ্যস্থলে খট্টোপরে অর্দ্ধবিবসনা তিষ্যরক্ষা বিচিত্র অঙ্গরাগে বিভূষিত। দর্পণে তাহার প্রতিবিম্ব, সেই প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব তাহার প্রতিবিম্ব, আবার প্রতিবিম্ব, অনন্ত, অসংখ্য, অর্দ্ধবিবসনা তিষ্যরক্ষা দেখা যাইতেছে। ইহা দেখিয়াই কুণাল ফিরিলেন, তিষ্যরক্ষা তখন সেই আলুথালু অবস্থাতেই দৌড়াইয়া উহাঁর পদপ্রান্তে আসিয়া লুণ্ঠিত হইল। আপন অনাবৃত হৃদয় কুণালের পদপ্রান্তে ফেলিয়া পদদ্বয় বেড়িয়া ধরিল। সর্পে পদ বেষ্টন করিয়া ধরিলে লোকে যেমন পা ছুড়িয়া সর্পকে দূরে নিক্ষেপ করে, কুণাল তিষ্যরক্ষাকে তদ্রূপ ফেলিয়া গম্ভীর পদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন। আর ফিরিয়াও চাহিলেন না।

৬

বহুক্ষণ পরে তিষ্যরক্ষার চৈতন্য হইল। সে ফণিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। চুল গুছাইল। যে পথে কুণাল গিয়াছে, সেই দিকে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল "যদি ওই চোখ!" পরে মাটিতে পা ঘসিয়া বলিল, "যদি ওই চোখ—একদিন এমনি করিয়া পদতলে দলিত করিতে পারি, তবেই আমি তিষ্যরক্ষা।"



কাকাতুয়া।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

মাস পাঁচ ছয় হইল, একদিন প্রাতে স্নানাদিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কিঞ্চিৎ গুড় ছোলা খাইয়া বসিয়া তামাকু টানিতেছি, এমন সময় প্রসন্ন গোয়ালিনী আসিয়া উপস্থিত। সু-বামহস্ত কোমরস্থিত সুধাভাণ্ড জড়াইয়া রহিয়াছে, পোড়া ডান হাতে একটা পাখীর খাঁচা। খাঁচাটা অতি সাবধানে মাটীতে রাখিয়া প্রসন্ন বসিল। রকম দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কত রঙ্গই জান?

প্রসন্ন উত্তর করিল—কেন, রঙ্গ আবার কি দেখিলে?

আমি। তোমার সব দুধ দই আমাকে না দিয়া পাঁচজনকে বেচিয়া বেড়াও, এই ত এক রঙ্গ। আবার এতদিনের পর একটা নূতন পাখী কেন?

প্র। নূতন পুরাতন আবার কি? আমি ত আর কখন পাখী পুষি নাই।

আ। সে কি প্রসন্ন! আর কখন পাখী পোষ নাই কি? আমিই যে তোমার খাঁচার পাখী—তোমার ঐ পরম ভাণ্ডের মধ্যে আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ক্ষীরোদশয্যাশায়ী অনন্ত পুরুষের ন্যায় সদাই যোগমুগ্ধ। ঐ ক্ষীরাধার ভাণ্ড আমার অনন্তশয্যারূপী খাঁচা। আমি ঐ খাঁচার ক্ষীরপায়ী পক্ষী। তাই বলি, আবার একটা পাখী কেন?

প্র। দেখিলাম পাখীটা আর একটা পাখীর বাসায় ঢুকিতে গিয়া ঠোকর খাইয়া মাটীতে পড়িয়া ধড়ফড় করিতেছে। দেখিয়া বড় দুঃখ হইল; তাই পাখীটাকে খাঁচায় পুরিয়া আনিলাম।

আ। যে পরের বস্তু লইবার জন্য অনধিকার-প্রবেশের চেষ্টা করে, তাহার জন্য আবার দুঃখ কি? সে ত ঘোর অত্যাচারী? পিনালকোডের ৫১১ ধারানুসারে সে ষোল আনা চুরি এবং অনধিকার-প্রবেশের দায়ে দায়ী, তা জানিস্?

প্র। অমন কথা বল না! ওর কিছু নাই বলিয়াই অমন অসাহসের কাজ করিতে গিয়াছিল। আহা! যার নাই, তাকে যদি লোকে না দেবে ত সে কোথায় যাবে—আমরা মেয়েমানুষ এই ত বুঝি।

প্রসন্নের মুখে দান দাতব্যের কথা বড়ই ভয়াবহ। আমার এককালে ভয় এবং রাগের সঞ্চার হইল। গরম হইয়া বলিলাম—

তবে বুঝি ওই পাখীটাকে তোর যথা সর্ব্বস্ব দিবি? আমি বুঝি আমার এই দুগ্ধপুষ্ট তনুখানি গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিব?

প্র। ও কি রকম কথা? আমি কি তোমাকে তাই করতে বলছি?

আ। নয়ই বা কেন? ঐ পাখীটাই যদি তোর সব দুধ দই খেলে, তবে আমি কি বাতাস খেয়ে থাক্‌ব না Huxley সাহেবের protoplasm খেয়ে থাক্‌ব?

প্র। কেন, তুমিও খাবে, ও-ও খাবে।

আ। না, প্রসন্ন, কমলাকান্ত সরিকিতে নাই।

প্র। সে আবার কি?

আ। ভাগাভাগিতে আমি নাই। দায়ভাগের ভাগাভাগির ভয়ে আমি সংসারধর্ম্মই করিলাম না। আবার তোর ভাঁড়েও ভাগাভাগি?

প্র। কেন, তুমিই ত সেদিন কত দান ধর্ম্মের কথা, কত হোমান্টি মটরশুঁটির কথা বল্‌ছিলে?

আ। সে পরকে শেখাবার জন্য।

প্র। ও মা সে কি গো! আপনার বেলা লীলাখেলা, পাপ পুণ্য পরের বেলা!

আ। প্রসন্ন, কমলাকান্তের জাতিকে তুই এখনও চিনিস্ নাই। তা সে সব কথা যাক্। পাখীটাকে ছেড়ে দে।

প্র। তা হবে না। যাকে একবার ঠাঁই দিয়েছি তাকে তাড়াতে পার্‌ব না।

আ। সেটা ত তোদের জাতিরই ধর্ম্ম নয়?

এবার প্রসন্ন রাগিল। বলিল—

কি, বামণ, তুমি ধর্ম্ম ধর্ম্ম কর? তোমার মতন দুর্ম্মুখ ত ভূ-ভারতে নাই? তোমার কাছে আবার মানুষ আসে?

এই বলিয়া প্রসন্ন উঠিল। প্রত্যহ প্রাতে আমাকে যে দুধটুকু দেয় তাহা না দিয়াই চলিল। দুধ চলিয়া যায় দেখিয়া আমি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম—আচ্ছা, আমিও একটা পাখী পুষিব, আমার যা কিছু আছে সব তাকে দিব। প্রসন্ন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া খাঁচাটা মাটিতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত নাড়িয়া আমাকে বলিল—আচ্ছা, আমি ও এই বলে যাচ্চি, যে দিন তুমি পাখীকে পোষমানাতে পার্‌বে, সেই দিন আমি আমার এই দুধের কেঁড়ে ভেঙ্গে ফেল্‌ব।

এই বলিয়া প্রসন্ন খাঁচাটা তুলিয়া লইয়া ঠিকুরে বেরিয়ে গেল। কেঁড়ের দুধ চল্‌কে কাপড় বাহিয়া পড়িতে লাগিল। O what a fall was there!

আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পাখীর সন্ধানে বাহির হইলাম। অনেক ঘুরিলাম, অনেক পাখীর দোকানে গেলাম। কোথাও মনের মতন পাখী পাইলাম না। শেষে এক দোকানে একটি পাখী মনোনীত হইল, কিন্তু তখনই দামের কথা মনে পড়িল। আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, আমার ত একটি পয়সাও নাই; তবে কি বলিয়া পাখী কিনিতে আসিলাম? কিছু অবসন্ন হইলাম; কিন্তু তখনই মনে হইল যে কমলাকান্তের দেশে কয়জন সম্বলবিশিষ্ট লোক আছে? আর সম্বলহীন হইয়াও কে না বড় বড় সওদার চেষ্টায়

ফিরিতেছে? কে না বড় বড় পদ, লম্বা লম্বা খেতাবের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? কিন্তু তাহারা কেহই ত লজ্জা, অপমান, ঘৃণা, কিছুই অনুভব করে না? তবে আমিই কেন লজ্জিত হই? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছি এমন সময় একটা কর্কশ শব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দট এইরূপ— Plateetud, Plateetud, Plateetud, বারম্বার এই অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ শুনিয়া শব্দের কারণ জানিবার ইচ্ছা হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে এক দরিদ্র মুসলমানের বাড়িতে আসিলাম। উঁকি মারিয়া দেখিলাম উঠানে এক কচ্ছহীন বীরপুরুষ কতকগুলা মুর্গী জবাই করিতেছে—রক্তের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। একখানা ঘরের দাবায় একটা স্ত্রীলোক পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছে, এবং বিষম যন্ত্রণাসুচক চীৎকার করিতেছে। ঘরের চালে ডাঁড়ে বসিয়া একটা পাখী একবার সেই রক্তের স্রোত দেখিতেছে, একবার সেই স্ত্রীলোকটাকে দেখিতেছে এবং আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। এক একবার স্ত্রীলোকটাকে ঠোক্রাইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া Plateetud, Plateetud করিতেছে। আমি গৃহস্বামীকে ডাকিলাম। গৃহস্বামী বাহিরে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার বাড়িতে কাহার কোন পীড়া হইয়াছে?

গৃ-স্বা। হাঁ, আমার স্ত্রীর হাঁটুতে বড় একটা বেদনা হইয়াছে। আমি সেইজন্য বড় বিপাকে পড়িয়াছি। আমার বাড়ীতে আজ দশজন লোক খাবে, আর এই বিপদ?

আ। আমি একটা ঔষধ দিতেছি; জলে গুলিয়া হাঁটুতে মালিশ করিয়া দেও, শীঘ্র আরাম হইবে। কিন্তু আমাকে কি দিবে?

গৃ-স্বা। আপনি কি চান?

আ। ঐ পাখীটা।

গৃ-স্বা। এখনি লইয়া যান। ওটাকে আমি খুব যত্ন করিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্তু মহাশয়, এখন ওটা আমার ছেলেপিলেকে ঠুক্রে ঠুক্রে মারিয়া ফেলিতেছে। আপনি এখনই লইয়া যান।

তখন আমি বিষম গোলে পড়িলাম। আফিঙ্গ দিই কেমন করিয়া? যে আফিঙ্গ দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন করিয়া, সৃষ্টির সারভূত পদার্থ স্বরূপ লাভ করিয়া আমি লোভ-পরিশূন্য সংসারবিরাগী বলিয়া আমার জিম্মায় রাখিয়াছেন, সে আফিঙ্গ দিই কেমন করিয়া? কিন্তু না দিলেও নয়। প্রসন্নের কাছে আগে মুখ রাখা চাই, সে দুধ দেয়। দেবাসুরে আমাকে এক ছিলিম তামাকুও দেয় না। সুতরাং ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে চক্ষু বুজিয়া ছোট্ট একটি গুলি গৃহস্বামীর হাতে দিয়া পাখীটা লইয়া চলিয়া আসিলাম। কাজটা মন্দ করিলাম কি? উপকার করিয়া তাহার মূল্য স্বরূপ

পাখীটা লইলাম? কে না লয়? ডাক্তার মহাশয়েরা দরিদ্র রোগীর নিকট হইতে fee লয়েন না? উকিল মহাশয়েরা নিস্ব মোয়াক্কেলের নিকট হইতে fee লয়েন না? রাজপুরুষেরা দরিদ্র গৃহস্থের নিকট হইতে টেক্স লয়েন না? কুলকামিনীরা দরিদ্র স্বামীর নিকট হইতে খোরপোষ লয়েন না? তবে আমিই কি এমন ভয়ানক কাজ করিলাম?

সেই দিন সন্ধ্যার পর আফিঙ্গ খাইয়া পাখীর ডাঁড়টা সাম্‌নে ঝুলাইয়া তামাকু খাইতে বসিলাম। ক্রমে আফিঙ্গ চড়িয়া উঠিল। তখন শুনিলাম পাখীটা বলিতেছে—আমাকে কেন তেমন জায়গা হইতে এখানে আনিলে? Plateetud, Plateetud।

আ। তুমি এই যে বেশ কথা কহিতে পার। তোমার নাম কি, বাড়ী কোথা?

পা। আমার নাম কাকাতুয়া, অর্থাৎ, তুয়া কাকা। তোমাদিগকে uncleship শিখাইবার নিমিত্ত আমার এ প্রদেশে আগমন। Plateetud, Plateetud।

আ। তুমি তবে এ দেশীয় নও? তোমার বাড়ী কোথা?

পা। আপাততঃ এখান হইতে অনেক পশ্চিমে।

আ। আগে কোথায় থাক্‌তে?

পা। সে অনেক কথা। শুনিবে কি?

আ। শুনিব। আজ কাল অনেকে পুরাতত্ত্ব চর্চ্চা করিয়া খুব সম্ভ্রমে নাম কিন্‌চে, দেখি যদি আমিও কিছু করিতে পারি।

পা। শুনিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিবে বল?

আ। সে পরের কথা। আগে শুনি।

পা। আমি পাখী নই। আমি পশু। বহুকাল পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগরের নিকট আমার বাস ছিল। তখন আমি শূকর ছিলাম। পাঁক ঘাঁটিতাম, পাঁক মাখিতাম, পাঁক খাইতাম। ক্রমে সেখানে মনুষ্যনামা এক প্রকার দ্বিপদবিশিষ্ট হিংস্রক জন্তু দেখা দিল। এবং পাঁকাল মাছ মনে করিয়া আমাদিগকে ধরিয়া খাইতে লাগিল।

আ। শূকরকে পাঁকাল মাছ মনে করিল কেমন করে?

পা। শূকরও পাঁক ঘাঁটে, পাঁকাল মাছও পাঁক ঘাঁটে। অতএব শূকর এবং পাঁকাল মাছ এক।

আমার Whately's Logic জানা ছিল, ফস্ করে বলিলাম—

ওটা যে fallacy of undistributed middle হল।

পা। Tut, fal-la-cy of un-dis-tri-bu-ted mid-dle! ও ত logic এর কথা? Antiquities-এর সহিত Logic-এর সম্পর্ক কি? দিন কতক Antiquities চর্চ্চা কর, Weber সাহেবের গ্রন্থ পড়, তাহা হইলে আর কিছু আট্‌কাবে না, ও রকম খট্‌কা হবে না। দ্বিপদগণের তাড়নায় আমরা পলাইতে

লাগিলাম। যত পলাই ততই শীত, আর ততই আমাদের গায় বড় বড় লোম দেখা দিতে লাগিল। Plateetud; Plateetud.

আ। সেটা কি রকম করিয়া হইল?

পা। দেখ, কথায় কথায় ছল ধরিলে পুরাতত্ব শেখা যায় না। শিবের কপালে চোক হইল কেমন করিয়া? গণেশের ঘাড়ে হাতির মুণ্ড হইল কেমন করিয়া? হিমালয় পর্ব্বতটা দুর্গার বাপ হইল কেমন করিয়া? কুমারী মেরীর গর্ব্ভে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হইল কেমন করিয়া? এ সব পুরাণের কথা, কে না বিশ্বাস করে? তবে পুরাতত্বের বেলা এত খট্‌কা কেন? দেখ পুরাণ আর পুরাতত্ব একই জিনিস। উভয়েই পুরা কবিত্বময়। একত্বের কি চমৎকার প্রমাণ দেখ দেখি! তবে দুইটি শব্দের শেষ ভাগে যে একটু প্রভেদ দেখিতে পাও, সে কেবল প্রত্যয় ভেদে ঘটিয়াছে।

আ। তুমি যে সংস্কৃত ব্যাকরণও জান দেখিতেছি?

পা। আমি জানিব না ত কি তুমি জানিবে? সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে তা জান? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না, বই কাছে নাই, কিন্তু আমার বোধ হয় Weber সাহেবের গ্রন্থে একথারও প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

আ। কোবিদবর! বলিয়া যান্!

পা। পলাইতে পলাইতে শেষে আমরা সমুদ্র মধ্যস্থিত একটা গিরি-গুহায় ঢুকিয়া রক্ষা পাইলাম। সেখানে খুব শীত। সেই শীতে আমাদের ভুঁড়ো পেট কুঁকড়ে গেল—আমরা সিংহ হইয়া গেলাম। এই দেখ সেই সিংহের কেশর আমার ঘাড়ে উচ্চ ঝোটন আকারে বিরাজমান।

আ। আবার সেই রকম fallacy হল না?

পা। দেখ, এই মাত্র তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম, এ সকল পুরাতত্ব, ইহাতে fallacy কোন ক্রমেই হইতে পারে না, তুমি সে সব কথা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছ? তোমাকে আর শুনাইয়া কি করিব, আমি ক্ষান্ত হইলাম।

আ। দেখ, তুমি রাগ করিও না, আমি একটু একটু আফিঙ্গ খাই বলিয়া সকল সময় আমার সব কথা মনে থাকে না।

পা। ওঃ! তুমি আফিঙ্গ খাও। তবে ত আমি তোমার একজন পরম সুহৃৎ, প্রধান শুভানুধ্যায়ী। আমি নিজে আফিঙ্গ খাই না বটে, আফিঙ্গ খেলে আমার পেট কাঁপে, কিন্তু আফিঙ্গখোর মাত্রই আমার স্নেহের বস্তু, আমার পোষ্যপুত্র বলিলেই হয়। তবে শুন।

যখন সিংহ ছিলাম তখন মধ্যে মধ্যে গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিকটস্থ

একটা দেশে আহার সংগ্রহ করিতে যাইতাম। কিন্তু শীঘ্রই সে দিকে কাঁটা পড়িল। একটা ভূতের মেয়ে এক দিন এমনি আমাদের লেজ মুচড়াইয়া দিয়াছিল যে লেজগুলা একেবারে চেপ্‌টা হইয়া গেল, আর সে দিকে যাইতে সাহস হইল না। কাজেই পেটের জ্বালায় আপনাপনি খাইতে আরম্ভ করিলাম। বোধ হয় এই রকম করিয়া সমস্ত সিংহকুল নিঃশেষিত হইয়া যাইত। কিন্তু "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"; ভাগ্য বলে আমাদের গায় পালক দেখা দিল। আমরা সাদা সাদা ডানা বিস্তার করিয়া সমুদ্র পার হইয়া এ দেশে ও দেশে যাইতে লাগিলাম। যেখানে উত্তম আহারের সম্ভাবনা দেখিলাম, সেইখানে বাসা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলাম। যে প্রতিবাদী হইল, তাহাকে মারিয়া ফেলিলাম, অথবা তাড়াইয়া দিলাম। Plateetud, Plateetud।

আ। এদেশেও কি বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছ ?

পা। করিয়াছি, কিন্তু পাকা পোক্ত রকম নয়।

আ। নয় কেন ?

পা। এখানে এত বেশী খাই যে শীঘ্র উদরাময় জন্মিয়া যায়, বাড়ীতে না গেলে সারে না। আর গুহার ভিতর সঞ্চিত আহার লুকাইবার সুবিধাও খুব।

আ। আচ্ছা, তোমার দুইটি বই পা দেখিতেছি না। আর দুইটি পা কি হইল ?

পা। সে বড় দুঃখের কথা, কাহাকেও বলিও না। সংক্ষেপে বলি—ইচ্ছানন্দপুর নামক স্থানে একটা বিপদবিশিষ্ট জন্তুর বাসায় আহারের লোভে প্রবেশ করিয়াছিলাম। জন্তুটা আমাকে ধরিয়া আমার একটা পা কাটিয়া দিল। এবং মহানন্দপুর নামক আর এক স্থানে ঐরূপ কারণে আর একটা পা কাটা গিয়াছে! অতএব আমি পক্ষীরূপে একটি পশু। Plateetud. Plateetud।

এই সময় প্রসন্ন গোয়ালিনী সেখানে না থাকায় আমার বড়ই আপ্‌শস্ হইল। থাকিলে শুনাইয়া দিতাম, পরের ঘরে লুকোচুরি খেলা কি রকম লাভের কাজ। পরে পাখীটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম— তুমি কিও Plateetud, Plateetud কর ?

পা। এদেশে আসা অবধি আমি Plateetud বলিতে বড় ভালবাসি।

আ। কথাটার কোন অর্থ আছে কি ?

পা। আছে বৈ কি। কথাটা Plantain শব্দ হইতে উৎপন্ন।

আ। বুঝিয়াছি, তুমি plantain খাইতে ভাল বাস বলিয়া সর্ব্বদা plateetud, plateetud কর।

পা। তা নয়। আমি এদেশের যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া খাইতেছি। কাজেই

দেশের দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তুগুলার ভাগ্যে plantain বই আর কিছুই থাকে না। তাই তাহাদিগের edification-এর জন্য plateetud, বলি। বুঝ্‌লে?

আ। আহা তুমি কি পরোপকারী!

পা। তার প্রমাণ ঐ নীচে দেখ।

দেখিলাম ডাঁড়ের নীচে, মেজের উপর পিপীলিকার ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কিল্ কিল্ করিয়া বেড়াইতেছে। পাখীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ও সব ত পিপীলিকা দেখিতেছি। ওখানে তোমার পরোপকারিত্বের প্রমাণ কই?

পা। উহারা পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র বটে, দেখিতেও প্রায় পিপীলিকা, কিন্তু উহারা পিপীলিকা নয়। উহাদিগকে বঙ্গজ বলে। ঐ দেখ আমার ডাঁড় থেকে এক ফোঁটা দুধ পড়িল আর বঙ্গজগুলা কিল্ কিল্ করিয়া মারামারি ঠেলাঠেলি করিয়া ঐ দুধটুকু খাইতে আসিল। আমার ডাঁড় হইতে যে দুই এক ফোঁটা দুধ পড়ে তাই খাইয়া উহারা জীবনধারণ করে। আমি উহাদের উপকারক নই?

আ। শুধু উপকারক? যখন তুমি উহাদের উদর চালাইতেছ, তখন তুমি উহাদের প্রাণপুরুষ, জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রেতাত্মা, হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা, সবই, কেন না উহারা উদরময় উদরসর্ব্বস্ব। আচ্ছা, উহাদের মধ্যে ঐ যে কতকগুলার বড় বড় মাথা দেখিতেছি উহারা কে? উহাদের মাথা অত বড় কেন?

পা। মাথা বড় নয়। আমার কাছে মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া উহারা মাথা ফুলাইয়া ফেলিয়াছে। উহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। দেখিতেছ না উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শান্ত শিষ্ট স্বজাতীয়দিগকে মারিয়া ধরিয়া, তাড়াইয়া দিয়া আমার ডাঁড়ের নীচে দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িয়া আমাকে কত সেলাম করিতেছে এবং আমার প্রসাদের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া দূরস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বঙ্গজের দলে প্রবেশ করিয়া মোটা মাথা উন্নত করিয়া বেড়াইতেছে?

আ। এ তোমার বড় অন্যায়। তুমি ছোট ছোট কৃষাঙ্গগুলিকে যত্ন না করিয়া মোটা মোটা গুলাকে অনুগ্রহ কর?

পা। দেখ, আমি প্রকৃত পক্ষে কাহাকেও যত্ন কি অনুগ্রহ করি না। আমার সমস্ত যত্ন এবং অনুগ্রহ আমাতেই অর্পিত। তবে, মোটা মাথাগুলো আমাকে খুব সেলাম করে এবং বিভীষণের ন্যায় আপনাদের ঘরের সমস্ত কথা আমাকে বলিয়া দেয়, তাই উহাদিগকে দুধের উপর দুই একটা ছোলার খোসা দিয়া থাকি। Plateetud।

আ। ওরা কি দানা খেতে কিছু ভাল বাসে?

পা। দানা নয়, খোসা, খোসা, খোসা, তার বেশী হজম করিবার ক্ষমতা উহাদের নাই। তবে এখন আমাকে ছাড়িয়া দেও। আমার ইতিহাস শুনিলে ত?

আ। কেন, তুমি কোথায় যাবে?

পা। আমি সেই মুসলমানের বাড়ীতে গিয়া থাকিব।

আ। কেন, এখানে তোমার কিসের কষ্ট?

পা। এখানে ত মুর্গী জবাই দেখিতে পাইব না, ছোট ছেলের নেড়া মাথা ঠোক্‌রাইতে পাইব না। এখানে কি সুখে থাকিব? আমাকে ছাড়িয়া দেও—আমি তোমাকে সর্ব্বদা আফিঙ্গ সরবরাহ করিব—plateetud।

আ। সে ভাল কথা, কিন্তু দুই চারি দিন আমি তোমাকে ছাড়িব না—আমার একটু কাঁদ্ আছে।

প্রসন্ন বলিয়া উঠিল—কি ঠাকুর, ছাড়িবে না, পোষ মানাবে? ঐ দেখ তোমার পাখী কট্ করে শিক্‌লি কেটে উড়ে গেল।

আমি চমকিয়া উঠিলাম। কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম—কে ও, প্রসন্নময়ি, কি মনে করে?

প্র। আর আদরে কাজ নাই। চল দুধ নেবে চল।

আ। এস। কিন্তু আগে একটা কাজ কর ত। ঐ ঝাঁটা গাছটা দিয়া ঐ বঙ্গজগুলাকে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দেও ত।

গোয়ালিনী মাগী তাহাই করিল।



জাল প্রতাপচাঁদ।

ওগিলবি সাহেব আবার আসামী।

একবার ওগিলবি সাহেব খুনের মোকর্দ্দমায় আসামী হইয়াছিলেন। আবার তিনি আর এক মোকর্দ্দমায় আসামী হইলেন। এবার তাহাতে জালরাজার কিছু উপকার হইয়াছিল; এই জন্য সেই মোকর্দ্দমার সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কালনার হত্যাকাণ্ডের পর দিবস জালরাজার উকিল জা সাহেব পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমত সময় বর্দ্ধমানের মেজেষ্টার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ রাখেন। সেই বেআইনি কয়েদের বিচার এতদিনের পর ৯ই জানুয়ারি তারিখে আরম্ভ হইল। এবার চীফ্ জষ্টিস্ সার্ এডওয়ার্ড রায়ান সাহেব স্বয়ং বিচার করিতে বসিলেন। ওগিলবি সাহেবের কপাল ভাঙ্গিল। জজ রায়ান উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করিয়া জুরিদের চার্জ দিলেন। জুরিরা ওগিলবি সাহেবকে অপরাধী করিলেন। চীফ্ জষ্টীস্ তাঁহার দুই হাজার টাকা জরিমানা করিলেন।

সেই সময় জজ সাহেব ধীরে ধীরে যাহা বলিলেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"James Balfour Ogilvy—It is my painful duty to pass the sentence of this Court upon you. You have been found guilty of false imprisonment of the prosecutor Mr Shaw. (The learned judge then recapulated the facts of the case) The Darogah a most important witness, as to the acts of Shaw and the necessity for his restraint, was not called by either party,—why, I cannot understand, as he certainly could have given the best evidence as to what took place, and whether Mr Shaw was party to any disturbance or breach of the peace. But I must say that there is not a tittle of evidence to show that Mr Shaw was guilty of sedition, or any other offence whatever. It is in evidence, that he knew only of one perwanah being served on Pertaup * at Culna, and, I must say, that his conduct on that occasion appears to me to have been judicious, regular and proper. He made his client write a letter offering submission to the order of the authorities, and it was delivered to the Nazir that night. Mr Shaw so far from committing any improper acts, gave the best advice as to how to get rid of the assembly, by telling the Nazir to point out who of the followers should be sent away. The treatment of Mr shaw after his arrest was certainly exceedingly harsh, and is without justification either in law or in fact, and he was made to undergo by you most unwarrantable and most unjustifiable inprisonment.

* চীফ্ জষ্টীস সার্ এডওয়ার্ড রায়াণ সাহেব অম্লান বদনে "প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমা" "প্রতাপচাঁদের গ্রেপ্তার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোম্পানীর জজ মেজেষ্টারগণ প্রতাপচাঁদ নাম উচ্চারণ করিতে সাহস করেন নাই। জোবানবন্দীতে হউক, রায়ে হউক, যেখানে প্রতাপচাঁদের নাম উল্লেখ করিতে হইয়াছে, সেখানে তাহার soi dissant Rajah প্রভৃতি শব্দ বলিয়া গিয়াছেন। আমরাও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কেবল "জালরাজা" বলিয়া আসিতেছি।

The Court will not however cause you to suffer imprisonment, because, we must suppose, that you have been actuated by motives arising from erroneous information and a mistaken zeal, but ardent wish to preserve peace and good order in your district. (the letters from Mr Alexander the missionary and Captain Harrington were then read.) It is probable that these letters excited considerable alarm in your mind, and after the unfortunate affray in the morning you may have imagined it necessary to arrest Mr Shaw, but those letters should have led you to enquire into matters, before you proceeded to act as you have acted. It appears that there was no disturbance whatever when he affray took place, nor had here been any for a considerable ime before the event took place. But the Court believing, that you icted upon erroneous information, lthough rashly and unjustifiably, vill give you in your sentence he benefit of that consideration, vhich they on that account xtend towards you. Such conduct cannot however be lightly passed over. Liberty is dear to all; you have deprived the prosecutor of his with very unnecessary and very considerable harshness. It will also serve as a warning to others who may at any future time be placed in situations similar in nature to yours. The sentence of the Court therefore is, that you pay a fine to the Queen of two thousand Rupees, upon payment of which, you be discharged.

জরিমানার হুকুম দিবার সময় আসামীকে রায়ান সাহেব বলিলেন তোমায় কয়েদ দিলাম না, কারণ তুমি ভ্রমে পড়িয়া মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিয়া এই অকার্য্য করিয়াছ।

কয়েদের কথা উল্লেখ করাতেই যথেষ্ট হইয়াছিল। কোম্পানীর মেজেষ্টার অত্যাচার করিলে কেহ যে দণ্ড দিবার আছে, ইহা লোকে জানিত না। মহারাণীর আদালতে আর কোম্পানীর আদালতে যে কি প্রভেদ তাহা লোকে এখন বুঝিতে পারিল। তাহাদের কতক ভরসা হইল। কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে বড় গোলযোগ বাধিয়া গেল। সে সকল পরিচয় দেওয়া এক্ষণে অপ্রয়োজন। তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে কোম্পানী বাহাদুরের চক্ষে ওগিলবি সাহেব দাগি হইলেন না।

তিনি ফৌজদারীতে দণ্ড পাইয়াছেন বলিয়া মেজেষ্টরির আসনে বসিবার অযোগ্য হইলেন না, একটীন্ মেজেষ্টার ছিলেন, শীঘ্র পাকা হইলেন।

নিজামত আদালতের হুকুম।

এই সময় হুগলীর জজ সাহেব জাল রাজা সম্বন্ধে যে এস্তেমেজাজ করিয়াছিলেন তাহা নিজামত আদালতে পেষ হইল। জজেরা বড় গোলে পড়িলেন, ভাবিতে লাগিলেন আসামীকে কি বলিয়া দণ্ড দেওয়া যায়। কালনায় জমিয়তবস্ত হওয়ার অপরাধে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এত দিন কয়েদ রাখা হইয়াছে, অথচ সেখানে কোন গোলযোগ হয় নাই। সুপ্রিমকোর্টের বিচারে প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে, যে কালনায় কোন গোলযোগ হয় নাই। এ বিচারের পর কালনায় জমিয়তবস্ত বলিয়া দণ্ড দেওয়া ভাল দেখায় না। অন্য অপরাধে দণ্ড দিতে গেলে রাজা প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করা ব্যতীত আর কোন অপরাধ নাই। অন্যের নাম গ্রহণ করাই বা কি এমন গুরুতর অপরাধ। বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির নাম ধরায় কাহার কোন ক্ষতি হয় নাই। কেহ সে জন্য নালিশ উপস্থিত করে নাই। তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য! এই সময় নিজামতের কাজি সাহেব তাঁহাদের উদ্ধার করিলেন। তিনি ফতওয়া দিলেন যে আত্ম উপকারের নিমিত্ত যদি কেহ অন্যের নাম ব্যবহার করে, তাহা হইলে মহম্মদীয় ব্যবস্থানুসারে সে ব্যক্তি অপরাধী। জজেরা তখন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া হুকুম দিলেন, যে মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করাব নিমিত্ত আসামী আলক সা ওরফে প্রতাপচাঁদ ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর এক হাজার টাকা জরিমানা করা যায়; অনাদায়ে তাহার ছয় মাস কারাবাস। আর প্রকাশ থাকে যে অন্যান্য চার্জ হইতে তাহাকে মুক্তি দেওয়া গেল।

অন্যান্য অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া জালরাজা দরখাস্ত করিলেন, যে নানা অপরাধ আমার শিরে আরোপ করিয়া মেজেষ্টারেরা আমাকে এমনই গোলে ফেলিয়াছিলেন যে তাহা অপ্রমাণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ সেই সময় তাঁহারা আমাকে জেলে পুরিয়া আমায় নিশ্চেষ্ট করিয়াছিলেন। আমি কোথায়ও যাইতে পারি নাই, কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, কোন অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। জেলে বদ্ধ থাকিয়া আমি কিরূপে এত বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিব। এক্ষণে সে সকল অভিযোগ হইতে হুজুর আদালত আমায় মুক্ত দিয়াছেন, বাকি যে অপরাধটি আমার স্কন্ধে রাখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আর একটু প্রমাণ গ্রহণ করুন, তাহা হইলেই দেখিবেন

আমি নিরপরাধী, আমি অন্যের নাম ব্যবহার করি নাই। আমি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ। নিম্ন আদালতে আমি এ বিষয়ে সকল প্রমাণ দিই নাই। দিবার প্রয়োজন আছে এমতও বিবেচনা করি নাই। আমি প্রতাপচাঁদ হইলেও হইতে পারি মাত্র এই সন্দেহ ফৌজদারী হাকিমের মনে উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারিলেই অব্যাহতি পাইব এই মনে করিয়া আমি প্রমাণ দিয়াছিলাম। ফৌজদারী হইতে অব্যাহতি পাওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ অন্য কেহ নহি, এরূপ প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে প্রয়োজন বলিয়া আমার তখন বিশ্বাস ছিল। বিশেষতঃ, আমার উকিলেরা আমায় বুঝাইয়াছিলেন যে মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা কোম্পনীর আইনানুসারে অথবা হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে কোন অপরাধই নহে। এই জন্য এই সম্বন্ধে একপ্রকার আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। এখন আমার ক্রটী হইয়াছে বুঝিতেছি, তাহা মার্জ্জনা করুন, আমার বাকি প্রমাণ গ্রহণ করুন, তাহার পর আমার প্রতি যে আজ্ঞা দিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য হইবে।

কিন্তু নিজামত আদালত এই দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন। জজেরা বলিলেন, যে দরখাস্তকারী যখন নিম্ন আদালতে আপনিই ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ প্রমাণ দেয় নাই, তখন আর এখানে সে বিষয়ের কোন ওজর শুনা যাইতে পারে না, বিশেষতঃ রাজা প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে অতি সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং আর পুনর্ব্বিচারের কোন হেতু দেখা যায় না।

এই হুকুমের পর জালরাজার পক্ষ হইতে আর এক দরখাস্ত দাখিল হইল। দরখাস্তখানি বোধ হয় বড় রাগ করিয়া লেখা হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এই—"দরখাস্তকারীর এক্ষণে জানিবার প্রার্থনা যে কোন্ আইন অনুসারে তাহার হাজার টাকা জরিমানা করা হইয়াছে? কোন্ আইন বা বিধি অনুসারে হুগলীর জজ এ মোকদ্দমা হুজুর আদালতে সোপর্দ্দ করিয়াছেন? এবং হুজুর আদালতের কাজি যে ফতওয়া দিয়াছেন, যে আত্ম উপকারার্থ মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা দণ্ডার্হ, তাহা তিনি কোথা পাইয়াছেন, কোন্ মুসলমানি গ্রন্থে দেখিয়াছেন। দরখাস্তকারী এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান মৌলবিদের দ্বারা বিশেষরূপে তদন্ত করাইয়াছে কিন্তু তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা অপরাধ বলিয়া কোন গ্রন্থে তাঁহারা পান নাই।"

নিজামত আদালত তাহাতে হুকুম দিলেন যে, এ সম্বন্ধে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে এক্ষণে আর কোন কথা শুনা যাইতে পারে না। ভবিষ্যতে দরখাস্তকারী প্রতাপচাঁদ বলিয়া কোন দরখাস্ত করিলে

তাহা আর গ্রহণ করা যাইবে না। কেন না বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে যে দরখাস্তকারী প্রতাপচাঁদ নহে।* এই হুকুম সর্ব্বনাশের মূল হইল।

জালরাজার সর্ব্বনাশ।

এই হুকুমটী শুনিতে সামান্য, কিন্তু পরিণামে অতি গুরুতর হইয়া পড়িল। ওগিলবি সামুয়েল যাহা করিতে না পারিয়াছিলেন, নিজামতের এই হুকুমটী তাহা করিয়াছিল। "বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, যে জালরাজা প্রতাপচাঁদ নহে, সুতরাং প্রতাপচাঁদ বলিয়া তিনি কোন দরখাস্ত করিলে আর তাহা গ্রহণ করা যাইবে না" এই কথায় জালরাজার পক্ষে সকল দ্বার পাকত রোধ হইল। তিনি দেওয়ানীতে প্রতাপচাঁদ বলিয়া রাজত্ব দাবি করিলে তাঁহার আর্জ্জি দাখিল হইবে না, এবং প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আবার তিনি দণ্ড পাইবেন। সুতরাং আর কোন আদালতে তিনি বিচারপ্রার্থী হইতে পাইলেন না; আপিল পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। প্রতাপচাঁদ বলিয়া যে ব্যক্তি আপনার বিষয় কোন আদালতে দাবি করিতে আসিয়াছে, সে ব্যক্তি আর্জ্জিতে আলক সা বা কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী বলিয়া দস্তখত করিতে পারে না। করিলে সেইখানেই তাহার দাবি শেষ হইবে। সুতরাং এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সকলের ধারণা হইল, যে জালরাজার পক্ষে দেওয়ানী আদালতের দ্বার রোধ করিবার জন্য জজেরা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, গবর্ণমেণ্টের কোন চতুর সেক্রেটরি এই কৌশল তাঁহাদের শিখাইয়া দিয়াছেন।

এই কৌশলের পর জালরাজা কপাল ঠুকিয়া আর এক দরখাস্ত নিজামতে দাখিল করিলেন। দরখাস্তে নাম দিলেন না, নামের পরিবর্ত্তে লিখিলেন, The humble petition of one who hath been sued at the instance of Government by the name of Aluck Shah, alias Rajah Protap Chand, alias Kistolall Brohmocharee.

দরখাস্তখানি অতি দীর্ঘ, রাগে ভরা, এবং ঠাট্টা বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। তাহার

---

* নিজমতের এই সকল হুকুম জজ (W. Braddon) ব্রাডন সাহেব এবং (C. Tucker) টকর সাহেব একত্রে দিয়াছিলেন। শেষ হুকুমটী এইরূপ লিখিত হয়—

The Court further remark, that as they have judicially pronounced the petitioner not to be the Moharajah Protaub Chand, they cannot in future, receive any petitions or applications from him under that name and title.—*Extract from order dated 19th July 1839.*

কিছু পরিচয় দিবার নিমিত্ত কোন কোন অংশের মর্ম্ম উদ্ধৃত করা গেল।—

১। "দরখাস্তকারীকে কখন আলক সা বলিয়া কখন কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী বলিয়া দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু দেখা যাইতেছে এখনও স্থির হয় নাই, যে ভবিষ্যতে আদালত হইতে তাহার কি নাম কায়েমি রাখা হইবে। সুতরাং যে অবধি তাহা না রাখা হয়, সে অবধি দরখাস্তকারী কোম্পানী আদালত ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্রে তাহার পূর্ব্ব-পরিচিত নামে পরিচয় দিবে। বেআদবির ভয়ে সে নাম এখানে উল্লেখ করিতে পারিল না। কিন্তু এখনও দরখাস্তকারী জানিতে পারে নাই যে কেহ সে নাম উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত করিলে হুজুর আদালতের কি ক্ষতি হইবে।"

২। "হুজুর আদালত হইতে যে নূতন অপরাধ আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা (is a crime unknown to the English Law, as well as to the codes of Law of civilized Europe, and was, till the gloss put upon it by your Court and its Mohammedan officer, unknown to Mohammedan Law, as it is still unknown to Regulation Law (wide and sweeping as it is) কি বিলাতে কি এদেশে কেহ জানিত না—অন্যের নাম ব্যবহার করাকে গুরুতর অপরাধ করিয়া তোলা হইয়াছে, কেন না মিথ্যা কথা ব্যবহার করা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু এপর্য্যন্ত হলপ করিয়া মিথ্যা কথা বলা ভিন্ন অন্য মিথ্যা কথার দণ্ড কখন হয় নাই।"

৩। "এখন দরখাস্তকারী বুঝিয়াছে, যে প্রতাপচাঁদ নাম উল্লেখ করিয়া বর্দ্ধমান কি অন্য কোন মফস্বল আদালতে নালিশ করিলে আবার তাহাকে এই মিথ্যা কথার অপরাধে ফেলিয়া দণ্ড দেওয়া হইবে। সুতরাং তাহার পক্ষে দেওয়ানীর দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে।"

৪। "এখন তাহার মানস যে একবার ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট এ বিষয়ের আপিল করে, অতএব হুজুর আদালতের অনুমতি প্রার্থনা।"

এই প্রার্থিত অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল কি না তাহা আমরা কোন কাগজ পত্রে পাইলাম না। বোধ হয় দেওয়া হয় নাই, সুতরাং বিলাতেও আপিল হয় নাই।

এখানেও দেওয়ানী আদালতে আর কোন নালিশ করা হয় নাই। তাহা করিবার পক্ষে যে ব্যাঘাত নিজামতের জজেরা দিয়াছিলেন তাহা ব্যতীত আরও এক ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। যাহারা জালরাজাকে মোকদ্দমা চালাইতে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল, তাহারা সকলেই বুঝিল যে, গবর্ণমেণ্ট যে কোন কৌশলে হউক, এ ব্যক্তিকে বর্দ্ধমানের সম্পত্তি অধিকার করিতে দিবেন না। সুতরাং তাহারা

হাত গুটাইল। জালরাজার আশা ভরসা সকল ফুরাইল। বিলাত আপিল হইল না; তিনি যে সন্ন্যাসী ছিলেন, আবার সেই সন্ন্যাসী হইলেন।

সাধারণের বিচার।

জজ সাহেবেরা যে যাহা বিচার করুন, বাঙ্গালিরা অনেকেই আপন আপন ঘরে বসিয়া জালরাজা সম্বন্ধে এক প্রকার মীমাংসা করিয়া লইল। যে যাহা জানিত না, এই মোকর্দ্দমা উপলক্ষে তাহা সকলেই জানিয়াছিল। সুতরাং সকলেই সিদ্ধান্ত করিল, যে জালরাজা সত্যই প্রতাপচাঁদ এ বিষয়ে আর কণামাত্র সন্দেহ নাই। কেহ বলিল, "যদি এ ব্যক্তি সত্যই জাল হইবে, তবে পরাণ বাবুর এত ভয় হইবে কেন? তিনি সামান্য জুয়াচোরের নিমিত্ত রাজবাটীর পূর্ব্ব সঞ্চিত সমুদয় ধন ব্যয় করিবেন কেন?*" কেহ বলিল, যদি এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ

---

* যে সময় প্রতাপচাঁদের মোকর্দ্দমা চলিতেছিল সে সময় পরাণ বাবু বর্দ্ধমানের রাজসংক্রান্ত অধিকাংশ জমিদারীর খাজনা নিয়মিত সময় মধ্যে দিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট সে সকল জমিদারী বিক্রয় না করিয়া তাহা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন আনিবার জন্য দুইজন সুদক্ষ ইংরেজ কর্ম্মচারীকে কমিসনর নিযুক্ত করিয়া বর্দ্ধমানে পাঠান। লোকে বুঝিল, যে পরাণ বাবু এই মোকর্দ্দমা উপলক্ষে রাজবাটীর সমুদয় আয় ও সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি জমিদারীর খাজনা দিতে পারেন নাই, এবং বোধ হয় সেই জন্য বিস্তর ঘুসের কথা রাষ্ট্র হইয়াছিল। এমন কি, ওগিলবি সাহেব খুনি মোকর্দ্দমার সময় বম্বে নগরে আপনার সহোদরকে পত্র লিখিয়াছিলেন, যে "লোকে বলে আমি তিন লক্ষ টাকা ঘুস লইয়াছি।" পত্রখানি বম্বের সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, সম্প্রতি আমরা তাহা দেখিতে পাইয়াছি। ইচ্ছা ছিল, পত্র খানি সমুদয় উদ্ধৃত করিয়া দিই, কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত কেবল কতকাংশ দিয়ে দিলাম। আমরা কলিকাতার সংবাদ পত্র দেখিয়া লিখিয়াছিলাম, যে ডিপুটী গবর্ণর রাস সাহেব ওগিলবিকে সস্পেণ্ড করিয়াছিলেন, এখন দেখিতেছি বস্তুতঃ তাহা নহে। কলিকাতায় আসিবার জন্য ওগিলবি সাহেবকে কিছু দিনের নিমিত্ত অবসর দেওয়া হইয়াছিল, তিনি যথা নিয়ম এই সাবকাশের সময়ে সম্পূর্ণ বেতন পাইয়াছিলেন।

"The lawyers of Calcutta are the natural and inveterate enemies of our service, the whole of the profession was up in arms against me. They knew not of course the rights of the story, for that was an official secret. (এই কথাটি বাঙ্গালিরা অনেকেই বুঝিয়াছিলেন) * * * Besides this, all those Zemindars who were to join the pretender, and all who have lent him money (and he had contrived to raise enormous sums) have also deeply vowed to be revenged upon me, for all their schemes and hopes of all

না হইবে, তবে গবর্ণমেণ্ট ইহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়া আপন ব্যয়ে পরাণ বাবুর মোকর্দ্দমা চালাইবেন কেন, মেজেষ্টারদের গোপনে পত্র লিখিবেন কেন, এবং এ সম্বন্ধে নানা অন্যায় কৌশল করিবেন কেন, অবশ্য এ ব্যক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টের ভয় হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে জানিতেন, যে প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, রঞ্জিতসিংহের সঙ্গে মিলিয়াছেন। রঞ্জিতের স্বাপক্ষ ব্যক্তি এখন বাঙ্গালার মধ্যে বসিয়া অতুল ধন সম্পত্তি অধিকার করিলে, ভবিষ্যতে কোম্পানীর বিপদ ঘটিতে পারে। তাহাই গবর্ণমেণ্ট একপ্রকার

---

plunder have been defeated; and these are the party who pay the expense of the proceedings against me, whilst the lawyers conduct them, some of them positively acting without a fee, contrary to all professional rule and precedent, the only reward they seek is to crush me if possible. It was by no means sufficient with them to vilify me in the papers as man was never before abused, but they would hang me if they could; and accordingly are trying to prove me guilty of murder. * * The public have been taught to believe that I fired upon unresisting sleeping innocents. * * * The papers have it that I am suspended but that is not the case, I am required to attend in Calcutta pending this business, but I continue to draw my salary: and the Deputy Governor tells me that Govt. express no opinion one way or the other. I understand that but for a blunder the case would have been dropped long ago· To show you the spirit that is working against me I must tell you that I had notices of actions for damages in fourteen civil actions with which I was threatened; one case of false imprisonment, one of contempt of Court, and one of murder. They tried also to get up a case of bribery and corruption, swearing I had taken a consideration of three lacs of Rupees; and I was also accused of subornation of perjury. Finding they could make out no case, they have given up all but two—contempt of the Supreme Court and murder; and these they only persevere in to keep up the odium against me and the agitation while the trial of Mr Shaw and the pretender is pending. My being in difficulty gives great weight to them as it cows all the witnesses who have to give evidence for the prosecution. * * এই শেষ কথা ওগিলবি মেজেষ্টার হইয়া আপনার সম্বন্ধে বলিয়াছেন। জালরাজার সম্বন্ধে এ কথা আরও কত বলবৎ।

চাতুরী করিয়া প্রতাপচাঁদকে বঞ্চিত করিলেন।"

এইরূপে যে ব্যক্তি, যে কারণেই জাল-রাজাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া স্থির করুন, তাঁহারা এই ঘটনা আপন আপন ধর্ম্ম বুদ্ধির সহিত মিলাইয়া একপ্রকার তৃপ্তি-লাভ করিলেন। যাঁহারা ধর্ম্মভীত,তাঁহারা ভাবিলেন, "ধর্ম্ম আছেন, প্রতাপচাঁদ মহাপাপ করিয়াছিল, সে যদি আবার রাজত্ব পাইত, তাহা হইলে বলিতাম, ধর্ম্ম মিথ্যা।" আর একদল ভাবি-লেন, "ধর্ম্ম মিথ্যা, কেন না, যথা শাস্ত্র চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া অজ্ঞাতবাস করিয়াও প্রতাপচাঁদ যখন রাজ্য পাইল না, তখন ধর্ম্ম মিথ্যা।"

কেহ বলিল, অদৃষ্টই মূল। সকলই অদৃষ্ট দোষে ঘটে। প্রতাপচাঁদ যে মহাপাপ করিয়াছিলেন, তাহাও অদৃষ্ট হেতু। তিনি যে আর রাজ্য পাইলেন না তাহাও অদৃষ্ট দোষে। যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহা কে খণ্ডাইতে পারে? যদি কোম্পানী বাহাদুর মনে করিতেন, তবুও প্রতাপচাঁদকে রাজ্য দেওয়াইতে পারিতেন না। প্রতাপের অদৃষ্টে না থাকিলে কোম্পানীর মনে এ কথা আসিবেই বা কেন?"

যাঁহারা কর্ম্মফলবাদী, অর্থাৎ যাঁহারা খাটি হিন্দু, তাঁহারা ভাবিলেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। ইহজন্মে হউক, পূর্ব্বজন্মে হউক, প্রতাপচাঁদ অবশ্য কাহাকে বঞ্চিত করিয়া থাকিবেন, তাহাই আপনি বঞ্চিত হইলেন।"

এইরূপে সকলে এক একটা স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যাঁহারা ধর্ম্ম কর্ম্মের বড় পক্ষপাতী নহেন,তাঁহারা বুঝি-লেন, "কেনা সাহেবেরা" পরাণ বাবুর অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়াছেন। তৎকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজদের প্রত্যেককে ক্রয় করা যায়, প্রত্যেকে ক্রীত হইয়া থাকেন। কেহ কোন নূতন সাহেবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলে, অগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন, "ইনি কাহার সাহেব?" অর্থাৎ কাহার ক্রীত। যাঁহার"কেনা সাহেব" থাকিত, তাঁহার সম্মান বঙ্গসমাজে অতুল হইত। তিনি মনে করিলে শত্রুর প্রতি যথেচ্ছা অত্যাচার করিতে পারিতেন, "কেনা সাহেব" তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিত। সাহেবক্রয় করার পদ্ধতির মধ্যে এই মাত্র একটু বিশেষ ছিল যে, সাহেব ক্রয় করিতে বাজারে যাইতে হইত না, যে সাহেবরা বিক্রীত হইবেন, তাঁহারা আপনারাই বাটীতে আসিয়া শৃঙ্খল গলায় পরিয়া যাইতেন। তখন সাহেবদের সংসারে বিস্তর ব্যয় ছিল, একে তাঁহাদের বিলাতিদ্রব্যাদি এ-দেশে অতি দুর্ম্মূল্য ছিল, তাহাতে আবার তাঁহারা এক একটি ক্ষুদ্র নবাবের মত ধুমধামে থাকিতেন। তাঁহারা কোম্পানীর নিকট যে বেতন পাই-তেন, তাহাতে সকল দিক কুলাইতে

পারিতেন না। এই জন্য তাঁহারা কেহ কেহ বাটী হইতে টাকা আনাইতেন, কেহ কেহ বা এদেশে কর্জ্জ করিতেন। কিন্তু কর্জ্জ দুই চারিশত পরিমাণে নহে, একেবারে পঞ্চাশ হাজার, আশী হাজার, লক্ষ, এইরূপ পরিমাণে লওয়া হইত। যাঁহার আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়, তাঁহার এই কর্জ্জ পরিশোধ করা অসাধ্য, এ কথা খাতক মহাজন উভয়ে জানিতেন, অথচ কর্জ্জ আদান প্রদান হইত। যিনি কর্জ্জ লইতেন, তিনি জানিতেন উপকার করিয়া ঋণ পরিশোধ করিব। যিনি কর্জ্জ দিতেন, তিনি জানিতেন আমি সময়ে সময়ে বিপদ উদ্ধার হইব। তখন লোকের বিপদ পদে পদে ঘটিত। বাঙ্গালির মধ্যে আত্মীয়তা শত্রুতা উভয়ই তখন গুরুতর ছিল। এখন আর সে আত্মীয়তা নাই, সে শত্রুতাও নাই, বাঙ্গালি সমাজের স্রোত কিছু মন্দা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে একজন "কেনা সাহেব" সহায় থাকিলে বড় উপকার হইত। তাহাই ধনবানেরা বহু অর্থ কর্জ্জ দিয়া অর্থাৎ বহু অর্থ ক্ষতি করিয়া সাহেব ক্রয় করিতেন। অন্য উপায়ে কেহ কোন গুরুতর বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেও লোকে ভাবিত, এ ব্যক্তি "কেনা সাহেব" দ্বারা উদ্ধার হইয়াছে। এক্ষণকার ইংরেজ কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা তখনকার সাহেবদের ক্ষমতা অনেক অংশে অধিক ছিল, তাঁহারা স্বাপক্ষে হউক, বিপক্ষে হউক, যখনই যাহা মনে করিতেন, তখনই তাহা করিতে পারিতেন, তাহা আইনি হউক, বেআইনি হউক, সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, তাঁহারা অনায়াসে সকল কার্য্যই করিতেন। এখনকার ইংরেজ কর্ম্মচারীদের সেরূপ প্রবৃত্তি থাকিলেও ধরাধরির ভয়ে তাহা পারেন না; এখন ধরাধরির ভয়; প্রকাশের ভয়, নালিশের ভয় কিছুবৃদ্ধি পাইয়াছে। বুঝি দেশী সংবাদ পত্র ইহার মূল হেতু।

"কেনা" সাহেবের কৌশলে জাল-রাজার দণ্ড হইয়াছে, এ কথা যাঁহারা না বলিলেন, তাঁহারা সকল দোষ গবর্ণমেণ্টের শিরে সমর্পণ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট চাতুরী যে করিয়াছেন, অকার্য্য করিয়াছেন, অবিচার করিয়াছেন, অধর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা সকলেই বলিতে লাগিলেন। যাঁহারা অদৃষ্টবাদী, যাঁহারা কর্ম্মফলবাদী, যিনি যে বাদী হউন, সকলেই এ বিষয়ে একবাক্যে গবর্ণমেণ্টকে দোষী করিলেন। প্রতাপচাঁদ পাপী, প্রতাপচাঁদের অদৃষ্টের দোষ এ কথা সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে এই অত্যাচার হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আর দ্বিমত থাকিল না। সুতরাং কোম্পানীর প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মিল; পাদরিদের প্রতি লোকের ভক্তি না হউক, একরূপ শ্রদ্ধা জন্মিতেছিল,

তাঁহারা সত্যবাদী, এ কথা সকলেই বলিত, সে শ্রদ্ধা আর বড় থাকিল না। কালনায় যে পাদরি ছিলেন, যিনি এই মোকর্দ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাকে সে অঞ্চল ত্যাগ করিতে হইল। পূর্ব্বে লোকে যে সংখ্যায় খ্রীষ্টান হইতেছিল সে সংখ্যার যেন হ্রাস হইতে লাগিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবল হইবার একটু সূচনা দেখা দিল। অন্যের মোকর্দ্দমা ফুরাণ করিয়া লওয়ার রীতি বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তাহাও একটু হ্রাস পাইল। সম্প্রতি মেকলি সাহেব পিনাল কোডের খসড়া করিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে আর দুই একটি ধারা সন্নিবেশিত হইল। এবং সেই সঙ্গে কার্য্যবিধি আইনের সূত্রপাত হইল।

বর্দ্ধমানের রাজার সহিত বাঙ্গালির সম্বন্ধ।

অনেকে বলেন, এই মোকর্দ্দমার পর বর্দ্ধমানের রাজার সহিত বাঙ্গালির সম্বন্ধ একেবারে ছেদ হয়। তাহা সম্পূর্ণ সত্য না হউক, কতক অংশে বটে। পরাণ বাবুর প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে পুরুষানুক্রমে পশ্চিম বাঙ্গালার লোকেরা বর্দ্ধমানের রাজাকে আমাদের রাজা বলিত। রাজা নিজে বাঙ্গালি ছিলেন, বাঙ্গালা কথা কহিতেন, ধুতি চাদর পরিতেন, লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতেন, সকলকে ভাল বাসিতেন। প্রজারাও তাঁহাকে ভাল বাসিত, শ্রদ্ধা করিত, তাঁহার মঙ্গলে মাতিয়া উঠিত, তাঁহার অমঙ্গলে আপনাদের অমঙ্গল জ্ঞান করিত। মূল কথা তাঁহার সহিত রাজা প্রজা সম্বন্ধ বড় দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল।

তেজচাঁদ বাহাদুরের মৃত্যুর পর রাণী কমলকুমারীর প্রতিনিধি হইয়া পরাণ বাবু কর্ত্তৃত্ব আরম্ভ করিলেন। লোকে তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিত, সুতরাং পূর্ব্ব রাজাদের মত তাঁহাকে কেহ শ্রদ্ধা করিত না, তিনি প্রতাপচাঁদের বিদ্বেষী ছিলেন ইহাও অশ্রদ্ধার আর এক কারণ, প্রতাপচাঁদের রাজত্বে ভাগ বসাইবেন বলিয়া পরাণ বাবু আপনার বালিকা কন্যার সহিত অশীতি পরায়ণ রাজার বিবাহ দিয়াছিলেন ইহা তৃতীয় কারণ; প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর কৌশলক্রমে তেজচন্দ্র দ্বারা আপনার পুত্রকে পোষাপুত্র লওয়াইয়াছিলেন ইহা চতুর্থ কারণ। এই সকল কারণে লোকে তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিত। সেই অশ্রদ্ধার নিমিত্ত তিনি তাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব দর্শাইতেন, কখন কখন জ্বালাতন করিতেন। সেই জ্বালাতনে লোকেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।*

তাহার পর জালরাজা আসিলেন,

---

* The present Zemindar is an infant, an adopted son of the late Rajah Tejchand, still under the tutilage of his natural father Prawn Babu, whose administration of these vast possession has rendered the family unpopular in the extreme," *Ogilvy's address to the Supreme Court.*

লোকে ভাবিল আমাদের সেই প্রতাপচাঁদ আসিয়াছেন, তখন পরাণবাবুর অত্যাচার লোকের চক্ষে দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। এবং সেই পরিমাণে জালরাজার প্রতি তাহাদের ভালবাসা বাড়িল। কিরূপে আমাদের রাজা আবার রাজা হইবেন, সকলের এই ঐকান্তিক যত্ন হইল। প্রতাপচাঁদের যত অমঙ্গল হইতে লাগিল ততই তাঁহার প্রতি লোকের যত্ন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেকে সর্ব্বস্ব বেচিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে ছুটিল, ব্রাহ্মণেরা ঘরে ঘরে সস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন, কেহ নারায়ণকে তুলসী দিতে লাগিলেন, কেহ বা নিত্য সহস্র দুর্গানাম জপ করিবার সংকল্প করিলেন, বৃদ্ধারা "কাটনাকাটার পয়সা" ব্যয় করিয়া সত্যনারায়ণকে বাতাসা দিতে লাগিলেন। এখনকার যুবারা এ কথা বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালায় এইরূপ তরঙ্গ উঠিয়াছিল বঙ্গবাসীরা তখন এইরূপ মাতিত।

শেষ, পরাণ বাবুর জয় হইল। সেই জন্য তাঁহার প্রতি লোকের রাগ আরও বাড়িল। এদিকে অধিকাংশ বাঙ্গালিই জালরাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া বাঙ্গালির প্রতি পরাণবাবুরও জাতক্রোধ জন্মিল, তিনি একরূপ দলাদলি আরম্ভ করিলেন, এ অঞ্চলের লোকের সঙ্গে রাজবাটীর যে সম্বন্ধ ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া দিলেন।

তাহার পর মহারাজ মাহাতাপচাঁদ বাহাদুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু লোকের টান আর ফিরিল না; তিনি পরাণবাবুর ঔরসজাত পুত্র এ কথা লোকে ভুলিল না। অনেকে ভাবিয়াছিলেন সময়ে সাবেক রাজভক্তি ফিরিবে, কিন্তু তাহার প্রতিবন্ধক ক্রমে আরও বাড়িল। এদেশীয়ের প্রতি তাচ্ছল্যভাব মহাতাপচাঁদ বাহাদুর বাল্যকাল হইতে পরাণ বাবুর নিকট কতকটা শিখিয়াছিলেন, বিবাহের পর সেই ভাব আর একটু বাড়িল। বিলাতী লোকের বিশ্বাস আছে রাণী ধর্ম্মরক্ষিণী, তিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী রাজাও ক্রমে সেই ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়েন। সেই জন্য তথাকার রাজারা স্বধর্ম্মাবলম্বী রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য। আমাদেরও বিশ্বাস আছে, স্ত্রী যে দেশী স্বামী সেই দেশীর পক্ষপাতী হন। মহাতাবচাঁদ বাহাদুর হিন্দুস্থানীর কন্যা বিবাহ করিলেন। তিনি নিজে বাঙ্গালি, তাঁহার রাণী হিন্দুস্থানী। সুতরাং তিনি ক্রমে ক্রমে হিন্দুস্থানী হইয়া দাঁড়াইলেন, লক্ষ্ণৌই ঢঙ্গের চাপকান ও চুড়িদার পায়জামা পরিয়া আপনি হিন্দুস্থানী সাজিলেন, অন্য ক্ষত্রিয়দের সেইরূপ সাজাইলেন, এবং কপ্পুরা প্রভৃতি হিন্দুস্থানী উপাধি তাঁহাদের পুনঃগ্রহণ করাইলেন। পালে পালে সারস্বত ব্রাহ্মণ বর্দ্ধমানে আনাইলেন। হিন্দুস্থানী আচার, হিন্দুস্থানী ব্যবহার ইওেণ্ট করিলেন। শেষ পৈতৃক নবান্ন পর্য্যন্ত উঠাইয়া হিন্দুস্থানী

নবান্নের প্রথা প্রচলিত করিলেন। মূল কথা, তিনি আর বাঙ্গালি থাকিলেন না, বাঙ্গালির সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখিলেন না। বাঙ্গালিরাও তাঁহাকে এক প্রকার বিদেশী রাজা মনে করিয়া ক্রমে ক্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। সে ভক্তি, শ্রদ্ধা, সে সম্বন্ধ, সে টান, আমাদের রাজা বলিয়া সে আহ্লাদ, সকলই ফুরাইল। বহুকালের বহুমূল্যের বন্ধন শিথিল হইল। এখন রাজভাণ্ডারে অন্য রত্ন যতই থাক, স্বদেশী বন্ধনীমহারত্ন আর নাই।

বর্দ্ধমান রাজগোষ্ঠীর সহিত বাঙ্গালির নিঃসম্বন্ধতা কেবল যে জালরাজার পরাজয়ে অথবা মহাতাবচাঁদের ব্যবহারে হইয়াছিল এমত নহে। পত্তনির প্রথাও নিস্বম্বন্ধতার আর একটি কারণ। পত্তনির সৃষ্টি অবধি রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে, রাজার স্থলে পত্তনিদার দাঁড়াইয়াছে।

কৃষ্ণনগরের রাজারা এক সময়ে বঙ্গসমাজে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। সেই একাধিপত্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা জমিদারী কখন পত্তনি দেন নাই। একজন রাজা বলিয়াছিলেন যে দিন আমি পত্তনি দিব, সেই দিন অবধি "প্রজার রাজা" বলাইতে আর আমার দাবি থাকিবে না। তাঁহার কথা নিতান্ত অমূলক নহে। শ্রী বর্দ্ধমানের রাজার প্রজারা এখন পত্তনিদারের প্রজা পত্তনিদারের অধীন, পত্তনিদারের আজ্ঞাবহ; রাজার কোন সংস্রব রাখে বলিয়া মনে করে না, তাঁহার কোন প্রভুত্ব স্বীকার করে না।

প্রজার নিকট যাহাই হউক, গবর্নমেণ্টের নিকট তাঁহার সম্মান এখন যথেষ্ট, তিনি বহু প্রজার জমিদার বলিয়া তাঁহার বিশেষ সম্মান, তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে বিস্তর বাঙ্গালি সন্তুষ্ট থাকিবে, তিনি সম্মানিত হইলে বিস্তর বাঙ্গালি সম্মানিত হইবে, এই গবর্নমেণ্টের বিশ্বাস। আমরা প্রার্থনা করি এ বিশ্বাস সত্য হউক, চিরস্থায়ী হউক, তাঁহার সহিত বাঙ্গালির পূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা পুনস্থাপিত হউক। আমরা দেখিয়া সুখী হই।

জালরাজা ধর্ম্মপ্রণেতা।

মোকর্দ্দমা ফুরাইল। জালরাজা দেওয়ানীতে নালিশ করিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ সঙ্গতি নাই, দ্বিতীয়তঃ তথায় প্রতাপচাঁদ বলিয়া নালিশ করিলে আবার জেলে যাইতে হইবে। সুতরাং নিরস্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া কলিকাতায় বসিয়া থাকিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা বিশেষ স্বাপক্ষতা করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহ কেহ একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "কি জানি, গবর্নমেণ্টের যে গতিক দেখিতেছি, আর সাহস হয় না।" কেহ বা সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাশ্যে জালরাজার সহিত আত্মীয়তা রাখিলেন, জালরাজা তাঁহাদের নিষেধ করিতেন কিন্তু তাঁহারা শুনিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে জালরাজার অসংখ্য—

কোন কষ্টই ছিল না, ধনবানের ন্যায় সুখে সচ্ছন্দে তিনি দিনযাপন করিতেন।

প্রথমে তিনি কিছু দিন কলিকাতার চাঁপাতলায় ছিলেন, তাহার পর কলুটোলায় গোবিন্দ প্রামাণিকের বাটীতে দুই তিন মাস থাকেন। তাঁহার নিমিত্ত গোবিন্দ বাবু আপনার সর্ব্বস্ব ব্যয় করেন, সে ব্যক্তির একান্ত ধারণা ছিল যে জালরাজা সত্যই প্রতাপচাঁদ।

কলুটোলা হইতে জালরাজা শ্যামপুকুরে গিয়া থাকিলেন। কিছু দিন পরে লাহোরের লড়াই উপস্থিত হইল। এই সময় জালরাজার প্রতি গবর্ণমেণ্টের আবার দৃষ্টি পড়ে। গতিক বুঝিয়া তিনি কোম্পানীর রাজ্য হইতে পলাইয়া প্রথমে চন্দননগরে বোড়াইচণ্ডীতলায় ফরাসিস্ আশ্রয়ে কয়েক বৎসর থাকিলেন, তাহার পর শ্রীরামপুরে যান। শ্রীরামপুর তখন কোম্পানীর রাজ্য হয় নাই। সেখানে প্রায় ছয় সাত বৎসর ছিলেন। এই সময় শ্রীরামপুরে আমাদের যাতায়াত ছিল। শুনিতাম তিনি তথায় ঠাকুর সাজিয়া দিনযাপন করিতেন। নিত্য সন্ধ্যার সময় বেশ্যারা এক এক পঞ্চপ্রদীপ আর ঘণ্টা লইয়া সকলে একত্রে তাঁহাকে আরতি করিত, তিনি ঠাকুরের মত সিংহাসনে বসিয়া দীপের নৃত্য দেখিতেন। লোকে বলে সে সময় বড় সমারোহ হইত।

এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করিত, যে জালরাজার বুদ্ধির একটু গোলমাল হইয়াছে। তিনি সত্যই প্রতাপচাঁদ হইলে এই দুর্ঘটনার পর তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু বাস্তবিক তাহার মতিভ্রম হয় নাই। যাঁহারা তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যে কথায় বার্ত্তায় কখন তাঁহার ভ্রান্তি বুঝা যায় নাই। বরং তখন তাঁহাকে অসাধারণ বুদ্ধিমান ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বোধ হইত। তিনি তৎসাময়িক, কি ইংরেজি, কি বাঙ্গালা— সমুদয় সংবাদ পত্র নিত্য পাঠ করিতেন, যাঁহারা সে সময় উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে ফরাসিস politics, রুসদেশীয় রাজনীতি, পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেন। কেহ কেহ বলেন, বিলাতী রাজনীতিতে (European politics) তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। আরও শুনা যায়, তিনি রুসীয় রাজনীতি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝিতেন এবং সেই দেশের কিছু পক্ষপাতীও ছিলেন। এদিকে, বেদান্তশাস্ত্রে তিনি বড় পণ্ডিত ছিলেন, শ্রীরামপুরে থাকিবার সময় দুই একজন অধ্যাপক তাঁহার নিকট বেদান্তের কথা শুনিতে যাইতেন। সুতরাং এ অবস্থায় বলা যায় না, যে তাঁহার কোন প্রকার চিত্তবৈকল্য জন্মিয়াছিল। অথচ, আবার দেখা যায়, তিনি শালগ্রামশিলার ন্যায় ঝারায় বসিয়া থাকিতেন, লোকের সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি লইতেন, পূজা গ্রহণ

করিতেন, বৈকালি খাইতেন। তখন তাঁহার প্রকৃত অভিসন্ধি কেহ বুঝে নাই।

যাহারা তাঁহার পূজা করিতে আসিত, তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক, পুরুষের দলও নিতান্ত অল্প নহে। অনেকগুলি বাবাজি তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিত। বোধ হয় তাহাদের দ্বারাই জালরাজার অমানসিক শক্তি দেশ বিদেশ রাষ্ট্র হইত। স্ত্রীলোকদের ধারণা হইয়াছিল, যে এ ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেবতা। অনেকে তাঁহাকে গৌরাঙ্গদেব মনে করিত।

শুনিতে পাওয়া যায় যোগীদের ন্যায় তাঁহার দুই এক বিষয়ে আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। কেহ অনুভব করেন প্রতাপচাঁদ যখন হিমালয় অঞ্চলে যোগীদের সঙ্গে বেড়াইতেন,তখন এ বিষয় কিছু শিখিয়া থাকিবেন। কেহ বলেন, যে হটযোগ তাঁহার বিলক্ষণ অভ্যাস ছিল। সেই কারণে লোকে তাঁহাকে মহাপুরুষ মনে করিত। হটযোগ অভ্যাস থাকিলে, বিলক্ষণ "বুজরুগি" দেখান যায় সত্য। যতদূর শুনা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয়, তিনি বৌদ্ধমতে কিছু যোগ শিক্ষা করিয়া থাকিবেন, তান্ত্রিকমতে যোগ অভ্যাস করা বড় কঠিন। বৌদ্ধমতের যোগ অপেক্ষাকৃত সহজ; যত্ন করিলে কতকটা অভ্যাস হয়। বোধ হয় সেই জন্য এখন বৌদ্ধ যোগীই অধিক। আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম সতন্ত্র বলি, অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। বিষ্ণু উপাসনা, শক্তি উপসনা উভয়ই হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ শাখা, বৌদ্ধধর্ম্মও সেইরূপ। বেদান্তের গ্রন্থি বৌদ্ধধর্ম্মের হাড়ে হাড়ে আছে, বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থার দুই একখানা গ্রন্থ, আর আমাদের তন্ত্র একইরূপ ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা কর্ম্মফলবাদি; এবং কর্ম্মফল যে মানে তাহাকেই হিন্দু বলি। বৈষ্ণব শাক্তর মধ্যে আর পূর্ব্বমত বিচ্ছেদ নাই, উভয়েই হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন। আর কিছু দিন পরে হয় ত ভারতীয় বৌদ্ধেরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবেন। বৌদ্ধদের সঙ্গে হিন্দুর আর বিচ্ছেদ না থাকিবার সূত্রপাত পূর্ব্বে কতক আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধদের দন্তযাত্রা এখন হিন্দুদের রথযাত্রা, উভয় উৎসব প্রায় এক হইয়া গিয়াছে। হিন্দুদের কোন শাস্ত্রে, কোন গ্রন্থে রথযাত্রার উল্লেখ নাই। ইদানীং উৎকলখণ্ড বলিয়া পুরাণের এক অংশ নূতন প্রস্তুত হইয়াছে, কেবল তাহাতেই রথের কথা দেখা যায়। উৎকলের যে দেবতাকে হিন্দুরা জগন্নাথ বলিয়া পূজা করিতেছেন, যাঁহার প্রসাদ ব্রাহ্মণ, বাগ্দী একত্রে আহার করিয়া, হিন্দু আচার পবিত্র করিতেছেন, সে দেবতা মূলে বৌদ্ধদের। পুরীতে তাহাদের দন্তযাত্রা হইত। সিংহলিরা সে দন্ত লইয়া পলাইয়াছে, হিন্দুরা দন্তযাত্রার রথ লইয়াছে, ঠাকুর লইয়াছে, আচার পর্য্যন্ত লইয়াছে। বৌদ্ধ আচার

ই স্থলে হিন্দু আচার হইয়া গিয়াছে, কান কোন স্থানে বৌদ্ধমূর্ত্তি শিবমূর্ত্তি ইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত আর কছুই হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি াহাদের বিদ্বেষ ছিল, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম াহাকে বলে জানিতেন, তাহাদের াতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহারা বুঝি- তন, এখনকার হিন্দুরা তাহা জানেন া, বুঝেনও না। সুতরাং তাঁহাদের বদ্বেষভাব আর ধর্ম্মসম্বন্ধে সম্ভব নহে, কবল নামসম্বন্ধে সম্ভব। আচার, ব্যব- ার, উপাসনা দেখিয়া এখন যাহাদের াহিত আমরা মিলিয়া থাকি, তাহাদের বৗদ্ধ নাম শুনিলে হয় ত আর তাহাদের াহিত মিলি না। বৌদ্ধ নামের প্রতি যাক্রোশ আছে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আর তত নাই, সুতরাং বৌদ্ধনাম না জানিলে, মনেকেই এখন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ারেন, অনেকে হয় ত তাহা গ্রহণ চরিয়াছেন। শুনা যায়, এখন বাঙ্গালীর ধ্যে অনেকে বৌদ্ধ; কিন্তু তাঁহারা তাহা ানেন না। এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা মাচার ব্যবহারে অনেকটা হিন্দুদের াত। তাঁহারা হিন্দু বলিয়া আপনা- দর পরিচয় দেন। হিন্দুরাও সেই বৌদ্ধদের হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করেন। মামাদের জালরাজা বোধ হয় এই- রূপ কোন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ছিলেন। প্রথমে ছিলেন না, পরে হইয়া থাকি- বেন। জালরাজাকে বৌদ্ধ স্থির করিলে চাহার শেষ অবস্থার কার্য্য অনেকটা বুঝা যায়। তিনি অনেক লোককে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন, এমন কি পঞ্জাবী ও অপর হিন্দুস্থানী পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার অন্য চেলার সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না, স্ত্রীলোক শিষ্যার ত কথাই নাই। বাবুগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইতেন। দূরস্থ পল্লীগ্রামে গিয়া অতি গোপনে স্ত্রীলোকদের মন্ত্র দিয়া আসিতেন। তিনি যে মন্ত্র দিতেন তাহা বিষ্ণুমন্ত্র নহে, শক্তিমন্ত্রও নহে। তাঁহার দীক্ষাপ্রণালী, অর্চ্চনপদ্ধতি নূতন প্রকার। সুতরাং লোকে সে সকল কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাহা হিন্দুধর্ম্মের কোন গুপ্ত প্রণালী হইবে মনে করিত। অদ্যাপি তাঁহার শিষ্য প্রশি- ষ্যেরা মন্ত্র দিয়া বেড়ান। স্থানে স্থানে লোকে তাঁহাদের ঘোষপাড়ার দল বলিয়া জানে। কিন্তু বোধ হয়, তিনি যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্গত কিছু হইবে, অথবা তিনি নিজে কোন নূতন পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন।

এই নূতন ধর্ম্মটি ক্রমে বিস্তার হই- তেছে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা জাল- রাজার শিষ্যর সংখ্যা বোধ হয় এখন বহু গুণে অধিক।

অদ্যাপি লোকে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে কিন্তু কেহই জানে না যে জালরাজার প্রণীত ধর্ম্মে তাহারা উপদিষ্ট হইতেছে। শিষ্যদের মধ্যে জালরাজার

সভত্র নাম ছিল এখনও সেই নাম আছে। উপাসকেরা সেই নাম প্রভুর নাম বলিয়া ভক্তি করে, কিন্তু তাহারা কেহ জানে না যে সে নাম জালরাজার। পূর্ব্বে অধিকাংশ শিষ্যরা সে নাম জানিত।

জালরাজার ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে আর এক সময়ে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করিব ইচ্ছা থাকিল। সেই সময় তাঁহার গুপ্ত নাম প্রকাশ করিলে অনেকেই তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম চিনিতে পারিবেন।

জালরাজার মৃত্যু।

জালরাজার মূর্ত্তি বড় প্রশান্ত ছিল, যে দেখিয়াছে সেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে। সে মূর্ত্তি ক্ষুদ্রচেতা জুয়াচোরের নহে। গল্প আছে, তিনি একবার কোন পল্লিগ্রামে শিষ্যাদের দেখিতে গিয়া একটী গৃহস্থের বাটীতে গোপনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে বাটীতে কেহ পুরুষ থাকিত না, শিষ্যারা সকলেই তথায় গোপনে গুরুদর্শনে আসিত। গ্রামস্থ লোকেরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিল, যে একজন বদমায়েস মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া অভিভাবকশূন্য স্ত্রীলোকদের লইয়া রঙ্গরস করিয়া যায়। সেই জন্য তাহারা সংকল্প করিয়াছিল, যে সে বদ্‌মায়েসকে একবার ধরিতে পারিলে তাহার অস্থি চূর্ণ করিবে। এখন সে সময় উপস্থিত হইল। "বদমায়েসের" সন্ধান পাইয়া তাহারা রাত্রিকালে আট দশ জন হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইল। প্রভু তখন শিষ্যা পরিবেষ্টিত হইয়া নবধর্ম্মানুশীলন করিতেছিলেন। গ্রামস্থ লোকেরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া গেল। তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। তাহার পর, যখন তাহারা যথাস্থানে তাঁহাকে লইয়া ফেলিল, তখন তাঁহাকে প্রহার করা দূরে থাকুক, কেহ কোন রূঢ় কথাও বলিতে পারিল না। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের শ্রদ্ধা হইল।

ইদানী তিনি ঈষৎ স্থূলকায় হইয়াছিলেন। মোকর্দ্দমার সময় তাঁহার বর্ণ শ্যাম বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু পরে সেই শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষু এরূপ ছিল, যে তাঁহাকে দেখিতে গেলে প্রথমেই তাঁহার চক্ষের প্রতি দৃষ্টি পড়িত; অথচ সে চক্ষুতে প্রখরতা মাত্র ছিল না।

তিনি সকলকেই মিষ্ট কথা বলিতেন, মিষ্ট কথাই তাঁহার বশীকরণ মন্ত্র ছিল।

মৃত্যুর আট দশ মাস পূর্ব্বে তিনি কলিকাতার উত্তর বরাহনগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দৈহিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না। অর্থেরও কিছু অনাটন হইয়া থাকিবে, কেন না, বাটীর ভাড়া একবারে দিতে পারেন নাই। এই সময় বোধ হয় তিনি নিজ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেন, তাহাই আপনাকে একা বলিয়া ভাবিতেন। একা আর থাকিতে পারিতেন না, একা থাকিতে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। মধ্যে

মধ্যে তিনি গ্রামের ভদ্রলোকদের আহ্বান করিতেন, কেহ তাঁহার নিকট আসিতেন, কেহ বা আসিতেন না। যাঁহারা আসিতেন, কাতরভাবে তাঁহাদের বলিতেন, আমি আর একা থাকিতে পারি না, আপনাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে যেন সুখে থাকি।

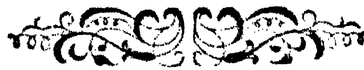
এই প্রকার অবস্থায় তিনি ১৮৫২ সালে কি ৫৩ সালের প্রথমে ময়রাডাঙ্গা পল্লিতে একটি সামান্য বাটীতে সামান্য দুই তিনটি লোক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার যাত্রার সময় চক্ষের জল মুছিবার কেহ ছিল না।

তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ মনে করিলে তাঁহার এই শেষ অবস্থার নিমিত্ত চক্ষে জল আইসে। পরের দোষে তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, এই জন্য আরও কষ্ট হয়।

তাঁহাকে জালরাজা মনে করিলেও তাঁহার প্রতি রাগ থাকে না; তিনি যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলেন।

তিনি প্রতাপচাঁদ হউন, আর জাল-রাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি হাস্যমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এই জন্য আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি।

সমাপ্ত।



বঙ্গে বিজ্ঞান।

ভারত বিজ্ঞানের জন্মভূমি। গণিতশাস্ত্র ভারত হইতে পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জ্যোতিষ, রসায়ণ, আয়ুর্ব্বেদ, শস্ত্রবিদ্যা, সকলই সর্ব্বাগ্রে ভারতে দেখা দেয়, এবং বিশেষ যত্ন, আগ্রহ এবং প্রতিভা সহকারে অধীত হয়। আজ ইউরোপ এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু আমরা মানি না। মানি না বলিতেছি, কেন না, আমরা মুখে স্বীকার করি বটে, কিন্তু কাজে স্বীকার করি না। পিতৃপুরুষের কীর্ত্তি রক্ষা না করাও যা, না মানাও তাই। অপরের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না; অপরে যদি আমাদের পৈত্রিক কীর্ত্তি মুখে স্বীকার করে, তাহাতেই তাহাদের মানা হয়। কিন্তু আমাদের পৈত্রিক কীর্ত্তি যদি আমরা রক্ষা না করি তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা তাহা মানি না। আমাদের পিতৃপুরুষেরা দেবসেবা, সদাব্রত ইত্যাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। আমরা সে সকল

অনুষ্ঠান পালন করি না। তবে কেমন করিয়া বলিব যে আমরা তাঁহাদিগকে সদনুষ্ঠানপ্রিয় বলিয়া মানি? পিতৃপুরুষের সহিত ত কেবল গলাবাজির সম্বন্ধ নয়। পিতৃপুরুষের সহিত সম্পূর্ণ দায়যুক্ত সম্বন্ধ। আমরা যদি সে দায় ঠেলিয়া ফেলি, তবে কেমন করিয়া বলিব যে আমরা তাঁহাদিগকে অথবা তাঁহাদের কীর্ত্তি মানি? এখন তাঁহারা কেবলমাত্র তাঁহাদের কীর্ত্তিতে জীবিত রহিয়াছেন। সে কীর্ত্তি রক্ষা না করিলে তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক রক্ষা হয় না। তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক ঘুচিলে আমরা পৃথিবীতে চণ্ডাল—হাড়ীর হাড়ী, কেন না আমাদের স্বোপার্জ্জিত ধন কিছুই নাই, আপনলব্ধ মনুষ্যত্ব কিছুই নাই। অতএব পৃথিবীতে দশজনের মধ্যে একজন হইতে হইলে, আমাদিগকে তাঁহাদের কীর্ত্তি রক্ষা করিতে হইবে। যে বিজ্ঞান গৌরবে জগতে তাঁহাদের এত গৌরব, আমাদিগকে সেই বিজ্ঞান অনুশীলন করিতে হইবে। শুধু অনুশীলন নয়, তাঁহারা যেমন বিজ্ঞানে যশস্বী হইয়াছিলেন, এবং বিজ্ঞানের দ্বারা জগতের হিতসাধন করিয়াছিলেন, আমাদিগকেও সেইরূপ বিজ্ঞানে যশস্বী হইতে হইবে, এবং বিজ্ঞানের দ্বারা জগতের হিত সাধন করিতে হইবে। যতদিন আমরা এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম না করি ততদিন, মুখে যতই স্পর্দ্ধা বা আস্ফালন করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা ভারতবাসী হিন্দুও নই, ভারতানুরাগী হিন্দুও নই। স্বদেশানুরাগের মূল সূত্র পিতৃপুরুষের পূজা। কিন্তু পিতৃপুরুষের পূজা ফুল বিল্বপত্র দিয়া হয় না। সে পূজার একমাত্র পদ্ধতি—পিতৃপুরুষের কীর্ত্তিরক্ষা। পৃথিবীতে আমাদের মত পূজা কেহ কখন করে নাই। আমাদের পূজার সংখ্যা নাই, আমাদের পূজার শেষ নাই। মনুষ্যমধ্যে আমরা পূজারি। জগতে পূজারি হইয়া জন্মিয়া আমরা কি আমাদের পিতৃপুরুষের পূজা করিতে পারিব না?

কিন্তু যদি আমরা এতই অপদার্থ হইয়া থাকি, যে পিতৃপুরুষের পূজা করিতে অসমর্থ হই, পিতৃপুরুষের কীর্ত্তিতে আমাদের দেহ, প্রাণ, আত্মা, হৃদয় অর্পণ করিতে অপারগ হই, পিতৃপুরুষের পবিত্র পদে আমাদের যথা সর্ব্বস্ব বলি দিতে সাহস না পাই—যদি আমরা আমাদের নূতন সভ্যতার গুণে যথার্থই হাড়ী হইয়া থাকি, তথাপি আমাদের আর একপ্রকারের একটা পূজা ত করিতেই হইবে। পেট পূজা না করিলে ত এক মুহূর্ত্তও চলিবে না। কিন্তু আমাদের পেট যে আর চলে না। যা করিলে আমাদের পেট চলে, সে সকলই ত প্রায় এখন বিদেশীয়েরা করিতেছে। ছুরি, কাঁচি, চাবি, তালা, কাগজ, ধুতি, শাড়ী, চাদর, বনাত, জুতা, টুপি, ঘড়ি, ঘড়ির চেইন, দেশ-

শাই, শোডা, কুইনাইন্, ইপিকাক্, আরো কত কি বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া এ দেশে আসিতেছে। অতএব আমাদের ক্ষতি কি কম হইতেছে? ভারতের তাঁতির মত তাঁতি জগতে আর কোথাও জন্মে নাই। কিন্তু সে তাঁতি-কুলের আজ কি দশা বল দেখি? আরো কত কুলের কি দশা হইবে তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? তবে পেটের উপায় কি করিতেছ? শুধু ইংরাজকে গালি দিলে ত চলিবে না। ইংরাজের দোষ কি? তাহারা তোমাদের দেশীয় শিল্প নষ্ট করিতে সক্ষম বলিয়াই নষ্ট করিয়াছে। শক্তি কথন ব্যর্থ হয় না। তোমরা যদি হিন্দু হও, তাহা হইলে তোমাদিগকে একথার অর্থ বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তোমাদের পুরাণে শত শত শাপের কথায় লেখা আছে, যে অশেষ অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও কোন শাপ কথন ব্যর্থ হয় নাই। কিন্তু শাপ কি? শক্তি বই ত নয়। তবে আজ তোমরা কেমন করিয়া, তোমাদের অপূর্ব্ব পুরাণের উত্তরাধিকারী হইয়া, শক্তির বিরুদ্ধে কথা কহিতেছ? কেমন করিয়া ইংরাজের উৎকৃষ্টতর শক্তির কথা লইয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতেছ? তোমরা নিশ্চয়ই শক্তির অর্থ হারাইয়াছ। নতুবা, হিন্দু পৌরাণিকের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আজ তোমরা ইংরাজের শক্তি দেখিয়া ইংরাজের উপর এত চটা কেন, এবং জীবিকার জন্য এত নিশ্চেষ্ট এবং ম্রিয়মাণ কেন? কটু কথায় অথবা চক্ষের জলে কথন শক্তির শক্তি নষ্ট করা যায় না। শক্তির শক্তি নষ্ট করিতে হইলে উৎকৃষ্টতর শক্তি প্রয়োগ করা চাই। অতএব বিজ্ঞানমূলক ইংরাজ শক্তিকে বিজ্ঞানমূলক হিন্দুশক্তি দ্বারা পরাজয় কর। উপায়ান্তর নাই। প্রাণ-পণে বিজ্ঞান অনুশীলন কর।

আমাদের দেশ খারাপ; হয় ত কেহ কেহ এইখানে বলিবেন, যে বেশী বিজ্ঞান শিখিবার দরকার কি, দুই চারিটা কল চালাইতে শিখিলেই চলিবে। আমি বলি, কথনই নয়। প্রকৃতি অথবা জড় পদার্থের নিয়ম না জানিলে, কথনই জড় পদার্থ তোমার বশীভূত হইবে না। ইহার এক প্রমাণ এই যে, ইউরোপে কল কারখা-নার উন্নতি বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছে, আগে হয় নাই। আমাদের দেশে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি বিপরীত মত সমর্থন করণার্থ বলিয়া থাকেন, যে মানুষ বিজ্ঞান শিখিবার আগে রন্ধন করিয়া খাইতে শিখিয়াছিল। আমিও বলি, সে কথা ঠিক; কিন্তু তাহার মানে কি এই, যে বিজ্ঞান ব্যতি-রেকে শিল্প সম্ভব? কথনই নয়। সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববেত্তা টাইলর সাহেব বলেন,* যে মানুষ কত সহস্র বৎসর ধরিয়া কত রকম চেষ্টা করিয়া যে

* Early History of Mankind নামক গ্রন্থ দেখ।

আগুণ প্রস্তুত করিয়াছিল তাহার ঠিকানা নাই। এখন জিজ্ঞাসা করি, সেই দীর্ঘকালব্যাপী বহুবিধ চেষ্টার অর্থ কি? তাহার অর্থ এই, জড়পদার্থের নিয়মের অনভিজ্ঞতা, এবং সেই নিয়ম জানিবার প্রয়াস। আদিম মনুষ্য অগ্নি জ্বালিবার জন্য যে সকল চেষ্টা করিয়াছিল, আধুনিক ভাষায় তাহার প্রত্যেকের নাম experiment অথবা hypothesis *। আরো একটী উদাহরণ দিই। বোধ হয় ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে একজন ফরাশী, হাঁড়ি প্রভৃতি মৃত্তিকানির্ম্মিত পদার্থ glaze করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনেকবার অনেক রকম দ্রব্য ব্যবহার করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে, ঠিক বলিতে পারিতেছি না, বোধ হয় প্রায় ১০ কি ১২ বৎসর ধরিয়া এইরূপ বহুবিধ চেষ্টা করিয়া সফলপ্রয়াস হইয়াছিলেন। এত চেষ্টাই বা কেন? আর এত নিষ্ফলতাই বা কেন? ইহার অর্থও তাই। জড় পদার্থের নিয়ম না জানা এবং সেই নিয়ম জানিবার নিমিত্ত experiment বা hypothesis করা। অতএব, বুঝিতে হইতেছে যে রন্ধনের আগেও বিজ্ঞান আছে—বিজ্ঞান ব্যতিরেকে শিল্প অসাধ্য এবং অসম্ভব। অতএব আমাদিগকে, নিদানপক্ষে, পেটের জ্বালায়ও বিজ্ঞান শিখিতে হইবে।

এখন কথা এই যে, বিজ্ঞান ত অনেকদিন হইতে আমাদের স্কুল এবং কালেজে শেখান হইতেছে, কিন্তু কয়জন বাঙ্গালী বিজ্ঞান জানে? তবেই বুঝা যাইতেছে যে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে কোথাও কিছু দোষ আছে, কোথাও কিছু অভাব আছে। বিষয়টী গুরুতর। ইহার সম্বন্ধে সকল কথা ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন। বলিতে সক্ষম বলিয়াও আমার সংস্কার নাই। তবে যে দুই একটী কথা আপাততঃ বুঝিতে পারিতেছি তাহাই বলিতেছি।

আমি এইরূপ বুঝি যে, যে শিক্ষা আমাদের জীবনের সম্বল হইবে, জীবনের প্রারম্ভেই তাহার সূত্রপাত হওয়া উচিত। সকল দেশেই শৈশবাবস্থায় শিক্ষা আরম্ভ হয়। অধিক বয়সে শিক্ষা আরম্ভ হইলে, ব্যক্তিগত বিশেষ মানসিক শক্তি বা প্রবৃত্তি না থাকিলে, সে শিক্ষা যথোচিত ফল দান করে না। এ কথা সত্য, যে শৈশবাবস্থায় বা বাল্যকালে সকল বিষয়ের শিক্ষা একেবারে আরম্ভ হয় না, এবং করাও যায় না। কিন্তু যে যে শিক্ষা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া গণ্য হয়, যত অল্প বয়সে তাহার সূত্রপাত করিতে পারা যায়, ততই

* Experiment এবং Hypothesis এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে সত্য। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে, এক হিসাবে দুইই এক।

তাহার সফলতা সম্ভবপর। এবং যেখানে যে প্রকার শিক্ষা বিশেষ ফলবতী হইতে দেখা যায়, নিশ্চয় জানিবে, সেখানে শৈশবে তাহার সূত্রপাত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হিসাব-কিতাবে বড় পটু ছিলেন। দশ বার বৎসর বয়সের মধ্যেই তাঁহারা পাঠশালায় হিসাব প্রণালীতে শিক্ষা সমাপ্ত করিতেন। বিলাতে বিজ্ঞান শিক্ষা ভাল হয়; বিলাতে ছেলের খেলনাও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। যদি আমাদিগকে বৈজ্ঞানিক হইতে হয় তবে আমাদিগকেও শৈশবাবস্থা হইতে যে রকমে হউক বিজ্ঞানের সহিত আলাপ করিতে হইবে। ২০ বৎসর বয়সে, এল, এ, পরীক্ষা দিয়া বিজ্ঞান পড়িতে আরম্ভ করিলে, বিজ্ঞানে প্রকৃত আসক্তিও জন্মিবে না, এবং যা কিছু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চয় করা যাইবে তাহাও মনে বদ্ধমূল হইবে না। অতএব দশ বৎসর বয়সে বিজ্ঞান শিখিতে আরম্ভ করা চাই। অতি সহজ ভাষায়, সহজ experiment সহকারে, তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইলে দশ বৎসরের শিশু কেন যে বিজ্ঞানের দুই চারিটী মোটা মোটা কথা শিখিতে পারিবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। অতএব আমাদের আবশ্যক হইতেছে, যে অতি সহজ বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিয়া experiment সহকারে বাঙ্গালী শিশুকে বিজ্ঞান শিখাইতে আরম্ভ করা হয়। দেশের 'হাওয়া' বৈজ্ঞানিক রকমের হইয়া উঠিলে এত শীঘ্র বিজ্ঞান-শিক্ষা আরম্ভ না করিলেও চলিবে। কিন্তু যতক্ষণ সে 'হাওয়া' নাই, ততক্ষণ এই প্রণালীতে কার্য্য না করিলে সে 'হাওয়া' প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব।

এ দেশে অনেকে ইংরাজী জানেন না এবং শিখেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের ও উদর আছে এবং উদরান্ন চাই। তাঁহারা কেমন করিয়া বিজ্ঞান শিখিবেন? শিখিলে তাঁহাদের উপকার বই অপকার নাই। ঢাকার একজন স্বর্ণকার আমাকে বলিয়াছিল, যে আমরা যদি ইংরাজ কারিগরের মত সোণা রূপা পালিশ করিতে জানিতাম, তাহা হইলে পৃথিবীতে কেহ ঢাকার জহরৎ বই অপর জহরৎ কিনিত না, আমাদেরও ঘরে টাকা ধরিত না। কথাটা অনেক পরিমাণে সত্য। অতএব যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহাদিগেরও বিজ্ঞান শেখা উচিত। কিন্তু তাঁহাদিগকে বিজ্ঞান বুঝাইতে হইলে সহজ বাঙ্গালায় বুঝাইতে হইবে। অতএব এবারও দেখা গেল, যে এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ফলবতী করিতে হইলে, সহজ বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রস্তুত করা চাই, এবং বৈজ্ঞানিক উপদেশ দেওয়া চাই।

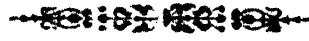
যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃতরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা

হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারি জন ইংরাজীতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন? সমাজে তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক শক্তিই বা কতটুকু হইবে? একে ত তাঁহারা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথোপকথন করিবার লোক পাইবেন না; যদিও পান, ত ইংরাজিতে কথোপকথন করিবেন। তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন? সামাজিক 'আব হাওয়া' কেমন করিয়া বদলাইবে? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুনুক আর নাই শুনুক, দশবার নিকটে বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এই রূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্ত্তিত হয়। ধাতু পরিবর্ত্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল সুদৃঢ় রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।

এই কয়টি কথা আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রকেই বলিলাম। কিন্তু আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান সভার স্থাপনকর্ত্তা ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকারকে বিশেষ করিয়া বলিলাম। মহেন্দ্র বাবু এদেশের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকার্য্য তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত স্বরূপ করিয়াছেন। ভরসা করি, আমাদের কথা কয়টি তাঁহার কাছে অনাদৃত হইবে না।



বঙ্গদর্শন।



৯৮ সংখ্যা।

রজনীর মৃত্যু।

১

পশ্চিমের জলদ-শয্যায়
পড়িয়া রজনী মৃত-প্রায়।
দিগন্তের স্নিগ্ধ কোলেতে,
গুরু-ভার মাথাটী রাখিয়া ;—
অনিমিক অরধ-নেত্রেতে,
দেখিতেছে আত্ম হারাইয়া—
ঘুমন্ত বিশ্বের মুখখানি!
ছেড়ে যেতে চাহে না পরাণ,—
তবু না গেলেও নয়!
আশা, তৃষ্ণা সব ছেড়ে—স্মৃতির সান্ত্বনা
ফেলে—
শূন্যে পুরিয়া হৃদয়—
জানে না কোথায় হবে করিতে প্রয়াণ!
একবার ভাঙ্গাইয়া ঘুম,
চুম্বি' নিমীলিত নয়নকুসুম
বিদায়ের শেষ কথা—প্রাণের একটি ব্যথা
না বলিয়া ছেড়ে যাওয়া দায়!
তবু যেতে হবে হায়!

অসময়ে জাগাইবে? জাগিলে বিরক্ত হবে!
কাজ নাই জাগাইয়া আর—
যাক্ তবে যাক্ অন্ধকার!
—হৃদয়ের তারাগুলি, একে একে অন্ধকারে
গিয়াছে নিবিয়া—
সারা নিশি জেগে জেগে, আঁখিপাতা
নাহি ফেলে,
দেখিয়া—দেখিয়া
তবু নয়নের সাধ মেটে নাই হায়!
কেমন করিয়া তবে যায়!
যেন কি সাধের তায়—
এক পরমাণু কণা,
জানানো,—কি দেখানো হলো না!
বিধাতা সাধিল বাদ!

চাহিয়া রয়েছে শুকতারা,
রজনীর হৃদয় উপরে।
পরাণটী আঁকা যেন তায়,
তৃষা-মাখা আঁখির ভিতরে!—
দেখিতেছে, শুনিতেছে, গণিতেছে প্রতিশ্বাস,
কয়টী পরেতে দিবে আর—
দুর্ব্বহ-পরাণ উপহার!

মৃদু মৃদু করিছে ব্যজন।
নিস্তব্ধতা পারশে বসিয়া,
বিষাদের একটীও রেখা
মুখে নাহি উঠেছে ফুটিয়া!
জন্মেছে যাহার সঙ্গে, বাড়িয়াছে এক সঙ্গে,
যাহাদের এক-প্রাণ দুইটী শরীর,
তাহাদের একজন মুমূর্ষু পড়িয়া আজ—
অপর অমন কেন স্থির!
মনে মনে কি একটা—না জানি করেছে স্থির!
তাই বসে অমন গম্ভীর!

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দিগঙ্গনাগণ,
দেব-শিল্পী গড়া পুতলীর প্রায়!
জীবন্ত রয়েছে তারা—উজ্জ্বল নয়ন-তারা
দেখিলে কেবল বুঝা যায়!
ব্রহ্মাণ্ডের জলরাশি গর্জ্জিছে নয়নান্তরে,
বাহিরে তাহার নাই কোন নিদর্শন!
একবার দেখে স্বপ্ন—রজনীর পাণ্ডু-মূর্ত্তি,
হৃদয়ের বেগ নাহি সামালিতে পারে,—
দু'টী কর চাপি' বুকে ছুটে যায় নিদ্রা যেথা
কাঁদিতেছে বসি এক ধারে!
দুজনারে জড়ায়ে দুজনে,—
—চারিটী নয়ন ছল ছল,—
শব্দ শূন্য, কর্ণাতীত কি ভাষায় কাঁদিতেছে
উভয়েই বুঝিছে কেবল!

৩

ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি, ছুটে গিয়ে—বুকে লয়
কৃশামূর্ত্তিখানি রজনীর!
ফেলে পৃথিবী-সম্পর্ক-শূন্য
স্বর্গ-সমবেদনার—
বারি বিন্দু ছলে অশ্রুনীর!
ধীরে ধীরে আসে ধীর বায়
আসে কি না জানা নাহি যায়!
এলো থেলো অলকা দুইটী,
একবার যত্নে সরাইয়া—
ঘুমন্ত-জোছনামাখা, ঘুমন্ত-স্বরগ আঁকা
মুখ-খানি ঈষৎ-চুম্বিয়া,—
একেবারে যেতেছে মরিয়া!
অরধ-ঘুমন্ত পারাবার—
একটু উথলি উঠি, একটু আসিয়া ছুটি,
পাদু'খানি চুম্বি একবার,—
চাহে না ফিরিয়া যেতে আর!
—একটু মলিন শশিকলা,
গগনের কোলেতে বসিয়া—
রহিয়াছে জীবন্তে মরিয়া!
প্রাণ চায়—ছুটে গিয়ে— প্রাণের ভগীর কাছে,
সবলে জড়ায়ে ধরে গলা,

না পারি দেখিতে আর, মেঘে মুখ ঢাকা দেয়,
কাঁদিয়া সে অধীনা অবলা!

৪

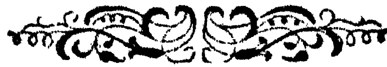
নিঠুর মুরতি প্রকৃতির,
কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই—
রহিয়াছে সুগম্ভীর স্থির!
কত শত লক্ষ লক্ষ প্রাণ—
মিলিয়া গিয়াছে বুকে তার!
কত শত লক্ষ লক্ষ প্রাণ—
ওই বুকে মিলিবে আবার!
ব্রহ্মাণ্ডের কিছুতেই— চাহে না থাকিতে বাঁধা
আপনি আপন হ'তে চায়!
ব্রহ্মাণ্ড সাধিছে বলে সদা
পদে পদে বাঁধিতে তাহায়।
অর্দ্ধবশীভূতা হয়ে, অর্দ্ধ আপনার হয়ে,
তাহাই সে ছুটিয়া বেড়ায়।
এক চক্ষে তাই তার— ঝরিছে শিশিরবিন্দু
আর চক্ষু মরুময় হায়!
হৃদয়ের এক প্রান্তে আজ—
জ্বলিতেছে দারুণ শ্মশান!
হৃদয়ের আর প্রান্তে আজ—
স্বর্ণপুরী হ'তেছে নির্ম্মাণ!
—কুসুমের প্রথম সৌরভ,
গগনের প্রথম শিশির,
প্রথম তরঙ্গ জাহ্নবীর,
জননীর সস্নেহ চুম্বন,
শিশুর হৃদয় নিরমল,
বালিকার অকপট প্রেম,
মরণের স্নেহ আলিঙ্গন,
প্রেমিকের মিলনের হাসি,
জীবনের প্রথম রোদন,
যোগীর ঈশ্বর তন্ময়ত্ব,
হতাশের স্বর্গীয় জীবন
প্রকৃতির শ্মশান হিয়ায়
সবি বুঝি—মিলাইয়া যায়!

৫

রজনীর অন্ধকারে মৃত্যু—
হায় কিরে দেখে নাই কেহ!
পাখী জগতের মাঝে— দেখেছে একটি পাখী,
স্ফূর্ত্তি-ছাড়া সে পাণ্ডুর দেহ!
বিশ্বের ভাঙ্গাতে ঘুম—তাই অত প্রাণপণে,
গলা ভেঙ্গে করিছে চীৎকার,
ফুলজগতের মাঝে—দেখেছে একটি ফুল,
—সে প্রভাতে ফুটে নাই আর!
উদ্ভিদ জগত মাঝে—দেখেছে একটি লতা
—হয়ে আছে অর্দ্ধমৃতা প্রায়!
একটু নিশ্বাসে মরে যায়!
জল-জগতের মাঝে—দেখেছে একটী অশ্রু
—অর্দ্ধ-পথে লুকায়েছে দেহ আপনার,
সুরজগতের মাঝে—দেখেছে একটী সুর,
স্নেহ দয়া, প্রেমে মন গলেছে তাহার,
অদ্যাপিও সেই সুর হায়,
বিশাল—ব্রহ্মাণ্ডব্যাপি, নিরন্তর নিরন্তর ঘুরি ঘুরি,
কাঁদে আর কাঁদায়ে বেড়ায়।
—নারীজগতের মাঝে— দেখেছে একটী নারী,

বলেছে সে গরব করিয়া
কেবা আর এ জগতে, বসিবারে পারে
নারীবিনা পরাণ ভরিয়া ?
নরজগতের মাঝে— দেখেছে একটি নর,
ভাবিছে অদৃষ্ট আপনার !—

এ জনমে দেখিবে না কেহ
একবার হৃদয় তাহার !
মৃতজগতের মাঝে—দেখেছে একটি মৃত,
—বলেছে পূরবদিকে সকলেই চায়—
দেখে না পশ্চিমে ভুলে—কিডুবিয়া যায়।



অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অন্যান্য দেশের শাসনপ্রণালীর সহিত তুলনা করিয়া বুঝা গেল, বিপ্রধর্ম্ম ও রাজধর্ম্মের প্রভেদমূলক ব্যবস্থাতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় স্ব স্ব বৃত্তিতে সর্ব্বতোভাবে প্রধান হইয়াছিলেন, এবং ঐ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। ইহার আর এক মাহাত্ম্য এই যে, অন্যান্য বর্ণের লোকেরা সবর্ণ সম্বন্ধে আত্ম (বা স্বায়ত্ত) শাসন নির্ব্বাহ করিতে পারিত, অথচ তাহা করিয়াও অধীনভাবেই উচ্চবর্ণের আজ্ঞাবহন করিতে পারিত। এবং তদ্বারা শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টবর্ণের ঐক্য এবং সহযোগীতা সুসিদ্ধ করিত। এই বন্দোবস্ত রাজধর্ম্মের অঙ্গ এবং বর্ণভেদের মূল। সৈনিক বন্দোবস্তও এইরূপ সহযোগীতার উপান্তর। বৌদ্ধেরা এই ব্যবস্থা বুঝিতে না পারিয়া রাজাকেই যাজনকার্য্যের কর্ত্তা করিয়াছিলেন। এবং অন্যান্য বর্ণভেদ উঠাইয়াদিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে এতদ্দেশীয় তীর্থস্থানের কথা মনে হয়। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, পুরুষোত্তম, আমাদিগের দেশের প্রধানতীর্থ। তন্মধ্যে প্রয়াগের পবিত্র স্থান—ত্রিবেণিতে—লোকের বসবাস থাকিতে পারে না ; সুতরাং এই তীর্থে শাসনপ্রণালীর কিছু দেখিতে পাওয়া যাইবে না। পরন্তু প্রয়াগের পাণ্ডারা স্বকীয় ব্যবসায় সম্বন্ধে কাশীর গঙ্গাপুত্রদিগের অনুরূপ মনে হয়। অপর তিনটী তীর্থ মধ্যে প্রভেদ এই যে, পুরুষোত্তমে পুরীর রাজা, জগন্নাথদেবের সেবা বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করেন, কিন্তু কাশী, গয়া ও বৃন্দাবনের পাণ্ডারাই সর্ব্বপ্রধান। ইহারা দেবোত্তর ভোগী অথচ সেই সকল দেবোত্তর কোন রাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত বলিয়া ব্যক্ত হয় না। কাশীতে ৺ বিশ্বেশ্বরই রাজা। গয়া ও বৃন্দাবনে ৺ বিষ্ণু এবং শ্রীকৃষ্ণকে রাজা

বলে কি না জানি না। অনুসন্ধান কর্ত্তব্য] প্রবাদ আছে, যে শঙ্করাচার্য্য কাশী আবিষ্কার করেন। অর্থাৎ এই তীর্থ এক সময়ে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং পরে ইহার পুনরুদ্ধার হয়। [কাশী তীর্থের লোপ ও পুনরুদ্ধারের সঙ্গে, সারনাথের ভগ্নাবশেষ, তথাকার বৌদ্ধস্তম্ভ এবং বুধমন্দির এতদ্দেশের বৌদ্ধবিপ্লব এবং শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয় সমস্তই পাঠকের মনে আসিবে।] সে যাহা হউক, কাশীর বর্ত্তমান বন্দোবস্ত যদি শঙ্করাচার্য্যেরই স্থাপিত হয়, তথাচ তাহা প্রাচীন শাসনপ্রণালীর অনুকরণ বলিয়া মানিতে হইবে। শৈবসম্প্রদায় স্বধর্ম্মানুসারে মঠে মহান্তের অধীন হইয়া থাকেন। কাশীর ব্যবস্থা মহান্তদিগের শাসনপ্রণালীর অনুরূপ নহে। অথচ কাশীর পাণ্ডাদিগের শাসন পরশুরামের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-শাসন হইতেও বিভিন্ন। পাণ্ডারা যজন যাজন দুই করিয়া থাকেন কিন্তু অধ্যাপন অধ্যয়ন তাঁহাদিগের বৃত্তির অঙ্গ মনে হয় না। আর ইহারা সকল বর্ণেরই দান গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবং সমাজের বিচারে অন্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহার হেতু কি? যদি দানে পতিত হইয়া থাকেন, তবে পতিত্যের পূর্ব্বে প্রাচীন কাশীতে যাহারা দেবসেবা করিত তাহাদিগের ব্যবস্থাই বা কিরূপ ছিল? তখন কি শূদ্রগণ তীর্থ দর্শনাদি করিতে পারিত না? অথবা তখন তাহাদিগের দান কে গ্রহণ করিত? তখনকার যাজ্ঞিকেরা ও পতিত ছিলেন, এ কথা মনে করা অসঙ্গত। আর তখন তীর্থস্থানে যজন ব্যতীত যাজন হইত না, ইহা মনে করাও সঙ্গত নহে। অতএব তীর্থাধিকারীর পক্ষে, অধ্যাপন এবং কেবল দ্বিজগণের দান গ্রহণ, এইদুটী বৃত্তি এখানে ব্রহ্মণের স্বধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কাশীর পাণ্ডারা রাজার অধীন নহে, তাঁহারা কেবল বিশ্বেশ্বরকে রাজা বলিয়া মান্য করেন। পাণ্ডা ও গঙ্গাপুত্রদিগের মধ্যে যে অধিকার ভেদ আছে, তাহাতেও এই অনুমান হয়, যে তীর্থাধিকারীরা অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় রাজার অধীন নহে, স্ব স্ব ব্যাপারাধিকার মধ্যে যাজন এবং রাজধর্ম্ম উভয়ই প্রতিপালন করিতে সক্ষম। এই প্রণালী কতকদূর বৌদ্ধপ্রথার অনুরূপ মনে হইতে পারে, কিন্তু কাশীর পাণ্ডারা অশোক রাজার মত রাজ্যাধিকার করিতেন না।

কেহ কেহ বলে, পুরুষোত্তমে বৌদ্ধ বিপ্লব হইয়াই ভুবনেশ্বরের দুরবস্থা ঘটিয়াছে, আর ৬ জগন্নাথদেবের মন্দির বৌদ্ধ প্রাধান্যের পরবর্ত্তী।

এস্থলে কাশীর পাণ্ডা, অশোক রাজা এবং পুরীর রাজা এই তিন শ্রেণীস্থ শাসন প্রণালীর পারম্পর্য্য আন্দাজ করা সঙ্গত কি না পাঠক বিবেচনা করিবেন। এই পারম্পর্য্য স্বীকার করিলে তীর্থাধিকারীদিগের শাসনপ্রণালীর সহিত

মুসার প্রণীত য়িহুদীদেশীয় ঈশ্বর শাসনের কতক নৈকট্য ব্যক্ত হইবে। ফলতঃ য়িহুদিদিগের মধ্যে ঈশ্বরের রাজত্ব এবং কাশীতে বিশ্বেশ্বরের রাজত্ব, শাসন-প্রণালী বিষয়ে নিতান্ত অনুরূপ বটে। [এস্থলে সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাবিষয়ক ভেদ ত্যাগ করিয়াই বিচার করা যাইতেছে।] অতএব কাশীর পাণ্ডাদিগের শাসন প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। শৈবদিগের কাশী আর চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৃন্দাবন অনেক বিষয়ে সমান।

কাশীর পাণ্ডাও গয়ার গয়ালীরা এক শ্রেণিভুক্ত। কিন্তু গয়াতে কোন লুপ্ত তীর্থের কথা শুনা যায় না; আর গয়া এবং বুধ গয়ার সমকক্ষতার সঙ্গে জগন্নাথদেব ও ভুবনেশ্বরের বৈরিতা সমতুল্য ইহা স্পষ্ট প্রকাশিত। গয়ালির মধ্যে কোন "সর্দ্দার" নাই। * বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডার সংখ্যা সঙ্কীর্ণ হইয়া একজন স্ত্রীলোকে ঠেকিয়াছে সুতরাং তন্মধ্যে প্রধান নাই। অন্নপূর্ণার পাণ্ডাদিগের কথা জানি না। ফলতঃ কাশী তীর্থস্থানের শাসন প্রণালীর লক্ষণ এই মনে হয় যে যাজ্ঞিকেরা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত অথচ রাজশাসনের অধীন নহে। পুরুষোত্তমের রাজা—যাজ্ঞিকের আধিপত্য, অপেক্ষাকৃত অভিনব। এখানকার শাসন প্রণালী বৌদ্ধ রাজা অশোকের অনুরূপ। রাজা, যাজ্ঞিকদিগের উপরে কর্তৃত্ব করেন। অতএব কাশী গয়ার রাজধর্ম্মবিহীন যাজ্ঞিকের আধিপত্য পরশুরামের বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মানিতে হইবে। অশোক ও পুরীরাজের শাসন তাহার পরবর্ত্তী এবং রোমগ্রীসের অনুরূপ। ব্রাহ্মণবর্গের শাসন ক্যাথলিক যাজ্ঞিকদিগের শাসনের অনুরূপ, কিন্তু তাহাতে পোপের একাধিপত্যের সমতুল্য কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। বৌদ্ধবিদ্রোহ দ্বারাই বোধ হয় ইহার বিঘ্ন জন্মিয়াছিল।

সামান্য তীর্থগুলি মহাতীর্থের অনুকরণ মাত্র। ৺কালীঘাট তীর্থ নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। হালদার বংশ তাঁহার শিষ্য। ইঁহাদিগের দ্বারা দেবীর উপাসনা আরম্ভ হইলে ভূম্যাধিকারী সাবর্ণ চৌধুরীরা দেবোত্তর দেন। নন্দকিশোর শাক্ত ছিলেন, এবং শেষাবস্থায় দারপরিগ্রহ করিয়া তান্ত্রিকমতে গুরুশাসন সংস্থাপন করেন। † কাশীর পাণ্ডারা হালদারদিগের অনুরূপ বটে কিন্তু তথায় সাবর্ণ চৌধুরী এবং হালদারদিগের গুরুকুলের অনুরূপ কিছুই দেখা যায় না। পাণ্ডারা দানপতিত হইলেও পূজারী বলিয়া গণ্য নহেন। কাশী গয়া ও কালীঘাট স্থানেই পৃথক পুজারি আছে।

এখন একবার শাসনপ্রণালী সংক্রান্ত

* কালীঘাটের পাথুরেপটী নিবাসী শ্যামাচরণ তর্করত্নের বাচনিক শ্রুত।
† গয়ালি রাম হরিচেড়ির নিকট বাচনিক প্রাপ্ত।

আদ্যোপান্ত কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করা যাউক। প্রথমতঃ সর্ব্বত্র কাশী গয়ার মত শাসন ছিল, গ্রাম্য দেবতা গ্রামের রাজার স্বরূপ ছিলেন, যাজ্ঞিকেরা ঐ রাজা স্বরূপ দেবতার ও কুলদেবতার উপাসনা করিতেন; যাজন অধ্যাপন একায়ত্ত করেন নাই এবং প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে কোন নিয়মাধীন ছিলেন না। পরে পরশুরামের বিপ্লব উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পরে যুদ্ধে মগ্ন হইলেন; অনন্তর সন্ধি দ্বারা বৃত্তিভেদ সংস্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা রাজধর্ম্ম ও যুদ্ধবিষয়ে বীতরাগ হইলেন; নিকৃষ্ট বর্ণের দান গ্রহণ অস্বীকার পূর্ব্বক কেবল রাজা এবং দ্বিজগণের স্বেচ্ছানুযায়ী দানের উপরে নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; যাজন ও অধ্যাপনের বিশিষ্ট উন্নতি হইল। বাণপ্রস্থ ব্রাহ্মণেরা তপস্যার প্রভাবে তেজস্বী হইয়া সন্ন্যাস দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যের ঐক্য বন্ধন করিতে লাগিলেন; সর্ব্বত্র সংস্কৃত ভাষার আলোচনা হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়েরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলেন; এবং ব্রাহ্মণের আজ্ঞা বহন প্রভাবে যুদ্ধকার্য্যে অনেকদূর বিরত থাকিলেন। বর্ণভেদমূলক সামাজিক বন্দোবস্ত পরিপক্ক হইতে লাগিল। প্রতিবর্ণে রাজা কি চৌধুরি কিম্বা সমাজপতির শাসন চলিল। অথচ বর্ণ পরস্পরা শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহযোগীতা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা কেবল তপস্বীগণের অধীন হইলেন। স্মৃতির সৃষ্টি হইল এবং দর্শন শাস্ত্রাদির চর্চ্চা চলিতে লাগিল।

অনন্তর ক্ষত্রিয়বর্ণ রাজধর্ম্মে নিশ্চেষ্ট হইয়া বিপ্রধর্ম্মের প্রতি লোলুপ হইলেন; বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইলেন। দর্শনশাস্ত্র প্রভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ব্রাহ্মণের যাজনকার্য্য সম্বন্ধে নানা মত প্রকাশ হইল। শাক্যসিংহ ক্ষত্রধর্ম্ম বিপ্রধর্ম্ম উভয় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বর্ণভেদ এবং বিভিন্ন বর্ণমধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধের বিশৃঙ্খলা ঘটিল। রাজা, যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ের উপরে কর্ত্তৃত্ব আরম্ভ করিলেন ব্রাহ্মণেরা ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য ক্ষত্রিয়গণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। বৌদ্ধের জয় হইল, ইহারা বৈদিক ভেদ উঠাইয়া দিলেন। আবার ব্রাহ্মণেরা প্রবল হইলেন; সৌর শৈব আদি নানা সম্প্রদায় উৎপন্ন হইল। ভারতে বিরোধ বই আর কথা নাই। ব্রাহ্মণেরা নিজেই সুবোধ ছিলেন, ক্ষত্রিয়গণকে বুদ্ধি দেন নাই। ক্ষত্রিয়েরা বিরোধপ্রিয় হইল। অনন্তর যবনাধিকার হইয়া পালা সাঙ্গ হইল।

বৌদ্ধগণ শূদ্রবর্ণ সম্বন্ধে বৈরাগ্যধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ কথা বুঝিবার জন্য দ্বিজ ও শূদ্রমধ্যে সামাজিক ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। এস্থলে এক

বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীরা স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণবিদ্বেষী, অতএব তাঁহাদের প্রমুখাৎ কর্ণ অপহরণের সংবাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে।

দ্বিজ ও শূদ্রের প্রাথমিক অবস্থা বুঝিবার জন্য, একদিকে সন ১৮৬৪ সালের পূর্ব্বে রুশিয়ার প্রকৃতিবর্গের অবস্থা কি ছিল, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বে তথাকার প্রজাবর্গের দশা কি ছিল, ইংলণ্ডের শ্রমজীবী এবং মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর মধ্যে এখনকার সম্বন্ধ কিরূপ, এবং আয়র্লণ্ডের প্রজাগণের অবস্থা কি, এই সমস্ত জানা আবশ্যক। আর, পক্ষান্তরে প্রাচীন কালের হাড়ি,ডোম,কেওরাদিগের কতদূর সম্বর্দ্ধনা করা সম্ভবপর ছিল, এক্ষণকার নেটিভ ষ্টেটের কৃষিবর্গের অবস্থা কি, এবং ব্রিটিশ রাজ্যাধীন জমিদার ও প্রজার মধ্যেই বা কি সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, এ সকল কথারও বিচার করা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, যে এত কথার বিচার এ প্রস্তাবে হইতে পারে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্রবর্ণের যাজন অস্বীকার বিষয়ে দুটী কথা স্মরণ করাইয়া দিব।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে যখন কায়স্থগণকে ভর্ত্তি করিবার নিয়ম হয় তখন ব্রাহ্মণবর্ণের আপত্তি ক-জন হিন্দুর পক্ষে কষ্টজনক মনে হইয়াছিল? আর এখন হেয়ারস্কুল ও প্রেসিডেন্সি কালেজ সাহেব-বংশের অনুপযোগী বলিয়া পরিগণিত হওয়াতেই বা কাহারা হা হুতোশি করিতেছে? দ্বিতীয় কথাটী আরো সহজ। তুমি যে স্কুলে তোমার পুত্রকে পড়িতে দেও তাহাতে হাড়ি ডোম ভর্ত্তি হয় শুনিলে তোমার মনে কোন বিকার উপস্থিত হয় কি না? এখনও ময়রা কলুর সহিত একত্রে জুরিগিরি করিতে অনেক হিন্দু আপত্তি করিয়া থাকেন। অতএব পরশুরামের সময়ে শূদ্রবর্ণকে ব্রাহ্মণের যাজন হইতে বহিষ্কৃত করাতে ব্রাহ্মণের আচরণ এত অসহ্য মনে করি কেন? এই জন্যই বলিয়াছি কাকের উপরে কাণহরণের দোষ দিবার পূর্ব্বে আপনাআপনি কাণমলা খাওয়াই বিধেয়।

যাঁহারা শূদ্র ও এতদ্দেশের প্রজাবর্গের অবস্থা মনে করিয়া সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহারা মনে করেন না যে ব্রাহ্মণের আশ্রয় ব্যতীত ইহাদিগের অনেককে সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়া দেহপাত করিতে হইত। যুদ্ধকার্য্য বলিলে ইংরাজিভাষাজ্ঞ বাঙ্গালিরা প্রায়ই মনে করেন, যে যাহার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা সে স্বদেশের মঙ্গলের জন্য জীবন ত্যাগ করিবে ইহাতে দুঃখ কি। কিন্তু বাস্তবিক জীবন ত্যাগ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যুদ্ধার্থিগণের মান অপমান, সুখদুঃখ পাপ পুণ্য যত হউক না হউক, তাহাদের পরিবারবর্গের যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। আর স্বেচ্ছাক্রমে যুদ্ধ করা কেবল উপকথা মাত্র। ইদানীন্তন সৈনিক পুরুষেরা প্রাণাচ্ছাদনের

কষ্ট ভিন্ন যুদ্ধ করিতে সম্মত হয় না।

শূদ্র বর্ণের যুদ্ধে যাইতে হইত না; ঘরে বসিয়া পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট ছিল না—এরূপ ব্যবস্থার প্রতি এতদ্দেশীয় কৃষকেরা দোষারোপ করিবে না। কৃষকের গুণানুবর্গ করিতে পারেন। যে সকল রাজ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য আবশ্যক, তাহাদিগের মধ্যে আইনের বলেই সৈনিক নিযুক্ত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে কেবল ব্রাহ্মণবর্ণের সুকৌশলেই বৈশ্য ও শূদ্রেরা যুদ্ধকার্য্য হইতে রক্ষিত হইয়াছে। যদি এতদ্দেশীয় প্রজাবর্গকে আইনের বিধানক্রমে যুদ্ধ অবলম্বন করিতে হইত, তাহা হইলে এদেশে এত শান্তি দৃষ্ট হইত না; এবং জমিদার ও প্রজার বিরোধস্থলে এতদ্দেশীয় ধর্ম্মঘটের ন্যায় সুমধুর দ্বন্দ্বের দ্বারা নিষ্কৃতি লাভ হইত না। কখন বা আয়র্লণ্ডের ন্যায় জমিদারপাতন এবং কখন বা রুশিয়ার ন্যায় প্রজাক্ষয় হইত।

শূদ্রগণের প্রাথমিক অবস্থা বিষয়ে আর একটী কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। দক্ষিণা গ্রহণ না করিলে যাজন সিদ্ধ হয় না বটে, কিন্তু যজমানের চিত্তের পবিত্রতা অনেক দূর সাধন হইতে পারে। শূদ্রের নিকট বেতন গ্রহণ না করিয়া যজন করাইলে শূদ্রযাজনের দোষ হয় না, অথচ শূদ্রের পারলৌকিক মঙ্গল আংশিকরূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে। এরূপ প্রণালীর কার্য্যের প্রতি কোন নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং এই প্রণালী যে অবলম্বিত হয় নাই তাহার হেতু শূদ্রগণের হীনাবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ফলতঃ শাস্ত্রের নিষেধ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণেরা শূদ্রগণকে অনেক উন্নত করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে বৌদ্ধদিগের সময়ে শূদ্রগণ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইত না।

তথাচ শূদ্রের উন্নতি বৌদ্ধ হইতেই, এ কথা ভক্তিভাবে স্বীকার করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিভেদ বিনষ্ট হওয়াতেই শূদ্রসম্প্রদায়ের উন্নত ব্যক্তিরা ক্রমশঃ উচ্চপদ লাভ করেন। এ বিষয়ে বৌদ্ধবিদ্রোহ মুখ্য কারণ হইলেও ব্রাহ্মণের প্রতি উপেক্ষা করা যায় না, কেন না, বৌদ্ধের দেখাদেখি হউক বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হউক, ব্রাহ্মণেরাও ক্রমশঃ বেদ ভিন্ন সমস্ত শাস্ত্রে শূদ্রের অধিকার স্থির করিয়া দেন। বৈদিক দীক্ষা, বৈদিক যজ্ঞ, বৈদিক মন্ত্রপাঠ শূদ্রের অনধিকৃত বটে, কিন্তু পৌরাণিক দীক্ষা ও পৌরাণিক পূজা আদি হইতে স্মৃতি, দর্শন, কাব্য, এবং ইতিহাস অধ্যয়ন পর্য্যন্ত বোধ হয় পুরাণ এবং তন্ত্র ও পাঠ্য বটে, কিছুতেই শূদ্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ নাই।

এতদ্ভিন্ন শূদ্রগণ কথকতা শুনিয়া যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। পুরাণ পাঠের নিয়ম কত দিন হইয়াছে তাহা বলা যায় না; কিন্তু বৌদ্ধেরা রাত্রিকালে

দেশ-ভাষাকে "বন" (কথা) পাঠ করিতেন এবং তাহা শুনিবার জন্য বহুলোক সমবেত হইত। (Hardy's Eastern monachism, pp. 232-237. Beal's *Fah-Hian, CH. XVII. p. 62*) পুরাণাদি, উপনিষৎ ও বেদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু শূদ্রগণের শিক্ষার নিমিত্ত তাহা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না।

বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে বর্ণভেদের অনেক ব্যত্যয় হয়, অথচ উহার নিগূঢ় দোষের কোন অপনয়ন হয় নাই। ইহার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মকে দোষ দিই না, কিন্তু স্বরূপ কথাটী বুঝা আবশ্যক। সংসারের কার্য্যভেদ অনুসারে সম্প্রদায়ভেদ সংস্থাপন করা দোষের বিষয় নহে, এবং বৃত্তিভেদ অনুসারে সম্প্রদায়ের ন্যূনাতিরেক করাও সঙ্গত বটে। বর্ণভেদের প্রধান দোষ এই যে, যে ব্যক্তি যে বৃত্তির যোগ্য সে তাহা অবলম্বন করিতে পায় না। বর্ণভেদ বংশানুক্রমে নির্দ্ধারিত হয় বলিয়াই এত বিপত্তি ঘটিতেছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত হেতু দুইটি। প্রথম, লোকের স্বেচ্ছানুযায়ী ব্যবসায় শিক্ষার অসুবিধা। দ্বিতীয়, একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে পিতৃপৈতামহিক বৃত্তি শিখিবার সুযোগ। ইদানীন্তন কালেজও স্কুল দেখিয়া সকলেই মনে করেন, যে অধ্যাপন, আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি ব্যবসায় শিক্ষা করা অতি সহজ। কিন্তু এক সময়ে কেবল চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকের আশ্রয়ে থাকিয়া এবং অধ্যাপকের ও পরস্পরের জন্য ভিক্ষা আদি করিয়াই ছাত্রবর্গের পঠদ্দশা যাপন করিতে হইত। তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর বড় কেহ সাহসী হইতেন না। ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ প্রতিপালন করিয়া সন্ততিবর্গকে সুশিক্ষিত করিতেন। অন্যান্য সকলে আপনাপন গৃহে পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা ইত্যাদি জ্ঞাতিবর্গের নিকট ব্যবসায় শিখিত, সুতরাং ছাত্রগণ জ্ঞাতিবর্গের ব্যবসায়ই অবলম্বন করিত। যে সকল দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের নিয়ম অনেক দিন হইতে উঠিয়া গিয়াছে, সেখানে এপ্রেণ্টিস্ এবং গিল্ড্ বিষয়ক ব্যবস্থা দ্বারা শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। এই ব্যবস্থা বর্ণভেদ অপেক্ষা যে কত অপকৃষ্ট তাহা বলা যায় না।

অতএব বর্ণসমূহের শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধ রূপান্তরিত করিয়া এবং রোগী সেবার নিমিত্ত হাসপাতাল করিয়া বৌদ্ধেরা যতই উপকার করুন, এবং চীন রাজ্যে তাঁহারা শিক্ষাকার্য্য বিষয়েও যতই উন্নতি করুন,* তাঁহারা এখানে বর্ণভেদের নিগূঢ় দোষ

* এতদ্দেশের গুরুমহাশয়ের পাঠশালা কি বৌদ্ধগণের সৃষ্টি ?

"The respective nobles & land-owners of this country (Patna) have founded hospitals within the city to which the poor of all countries, the destitute, cripples and the diseased may repair (for shelter.) *Fah-Hian, CH. XXVII.*

অপনয়ন করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই যে, এতদ্দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের ব্যবস্থা বদ্ধমূল হইয়াছিল। একান্নবর্ত্তী পরিবারের সহস্র দোষ স্বীকার করিলেও মানিতে হইবে, যে ইহাতে গৃহস্বামী এবং উপার্জ্জনকারী পুরুষেরা বিস্তর ত্যাগ স্বীকার না করিলে কুপোষ্য প্রতিপালন হয় না। কুপোষ্যগণ স্বাবলম্বী হইলে সকল দোষ দূর হয় বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা না ঘটে সে পর্য্যন্ত পোষ্টৃগণের বৈরাগ্য ব্যতীত পোষ্যগণের উপায়ান্তর নাই। কুপোষ্যকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য শ্মশানবাসী করা আবশ্যক কি না এ কথা বিচার সাপেক্ষ। আমি সহসা এ কথাতে মত দিতে পারি না। ইদানীন্তন ইংরাজি শিক্ষা হইতে কুপোষ্যের স্বাবলম্বন বৃদ্ধি হইয়াছে কি না সন্দেহের স্থল, কিন্তু পোষ্টৃবর্গের পরার্থপরতা এবং বৈরাগ্যের বিলক্ষণ হ্রাস হইয়াছে। ভারতবাসী বৌদ্ধেরা এতদূর বাড়াবাড়ী করিতে পারেন নাই। সুবর্ণবণিকদিগের এ বিষয়ে দুর্নাম আছে, এবং তাঁহাদিগের উপদেশ, বোধ হয়, জৈনশ্রেষ্ঠীগণ হইতে লব্ধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাঁহারাও বাঙ্গালি সাহেবদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেন।

এখন আদ্যোপান্ত সমালোচনা করিলে প্রকাশ হইবে, যে ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণকে যুদ্ধকার্য্য হইতে রক্ষা করিয়াছেন, একান্নবর্ত্তী পরিবারের* ব্যবস্থা করিয়া সকল কর্ম্মঠ লোককে কুপোষ্যপালন বিষয়ে বৈরাগ্য শিখাইয়াছেন। বর্ণভেদের ব্যবস্থা দ্বারা হীনবর্ণস্থ লোক সকলকে আজ্ঞাবহন বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং পরে বৌদ্ধগণের দেখাদেখি শূদ্রবর্ণের শিক্ষা বিষয়েও কতকদূর উদ্যোগী হইয়াছেন। বৌদ্ধেরা বেদ অবজ্ঞা করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস বিষয়ে বিস্তর উন্নতি করেন, কিন্তু বিপ্রধর্ম্ম ও রাজধর্ম্মের প্রভেদ লোপ করিয়া নানা বিশৃঙ্খলা ঘটান। শিক্ষাকার্য্য বিষয়ে তাঁহারা কতক উন্নতি করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ উপকার হইয়াছিল এ কথা বলা যায় না।

শ্রীযো—

"They (the hospitals) were probably first intituted by Asoka as are read in the Edicts....These...are distinctively Buddist. The hospices founded by Brahmans (পুণ্যশালা, p. 82) were houses of shelter & entertainments for travellors rather than places for the restoration of the sick." Beal. p. 107.

রত্নরহস্য।

উপরত্ন।

প্রধান ও বহুমূল্য রত্নসম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলা হইয়াছে। এক্ষণে উপরত্ন সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

উপরত্ন—অর্থাৎ মণিতুল্য কাচাদি। "উপমিত রত্নেন" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে কাচ ও অন্যান্য প্রকার সামান্য মূল্যের প্রস্তর সকল উপরত্ন বলিয়া গ্রাহ্য। ক্রিষ্টাল্ ও পোক্‌রাজ প্রভৃতি পাথর—যাহা প্রায় রত্নতুল্য—সে সমস্তই সংস্কৃত-শাস্ত্রে উপরত্ন নামে খ্যাত। পূর্ব্বকালে মুক্তাশুক্তি, অর্থাৎ মুক্তার ঝিনুক ও শঙ্খকেও সামান্যাকারে রত্ন নামে গৃহীত হইত। সেই জন্যই ভাবপ্রকাশ বলিয়াছেন, যে—

"উপরত্নানি কাচশ্চ
কর্পূরাশ্মা তথৈবচ।
মুক্তাশুক্তি স্তথা শঙ্খ
ইত্যাদীনি বহূন্যপি॥"

কাচ, কার্পূরাশ্ম, অর্থাৎ শ্বেত প্রস্তর, (ইহাকেই অধুনা মার্বেল বলিয়া থাকে) মুক্তাশুক্তি, শঙ্খ, ইত্যাদি বহুপ্রকার উপরত্ন আছে। সেই সকল উপরত্ন প্রায় রত্নতুল্য গুণসম্পন্ন। তাহারত্ন অপেক্ষা উপরত্নের গুণ অল্প বলিয়া সেই সেই উপরত্নকে সতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। যথা—

"গুণা যথৈব রত্নানাং
উপরত্নেষু তে তথা।
কিন্তু কিঞ্চিত্ততো হীনা
বিশেষোঽয় উদাহৃতঃ।"

উপরোক্ত ভাবপ্রকাশের বচনে "কাচ" শব্দ দেখিয়া কাচের প্রাচীনত্ব পক্ষে সংশয় জন্মিতে পারে, একারণ অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতেও দুই চারিটি কাচ শব্দের উল্লেখ প্রদর্শিত হইল।

আজ কাল কাচের উন্নতি দেখিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন, যে কাচ ইংরাজজাতীর আবিষ্কৃত বস্তু। বস্তুতঃ তাহা নহে। অন্যূন ৩০০০ তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশে কাচের ব্যবহার ছিল, ইহা সপ্রমাণ হয়। উক্ত সময়ের লোকেরা কাচের প্রকৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, ইহাও জানা যায়। পঞ্চতন্ত্র নামক পুরাতন গ্রন্থে লিখিত আছে, যে, "কাচঃ কাঞ্চন সংসর্গাৎ ধত্তে মারকতীং দ্যুতিম্।" এই উল্লেখটী পুরাণ হইতে সংগৃহীত। এতদ্ভিন্ন "আকারে পদ্মরাগানাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ?" এই বচনটীও বহু প্রাচীন। তন্ত্রক নামক প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থেও কাচের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

পানীয়ং পানকং মদ্যং
মৃণ্ময়েষু প্রদাপয়েৎ।
কাচ স্ফটিক পাত্রেষু
শীতলেষু শুভেষু চ ॥"

জল, সর্‌বৎ ও মদ্য, মৃণ্ময়পাত্র, কাচপাত্র ও স্ফাটিকপাত্রে ব্যবহার করিবে। এই সকল পাত্র শীতল ও শুভ অর্থাৎ দোষাবহ নহে।

"অনুশস্ত্রানি তু ত্বক্‌সার-
স্ফটিক-কাচ কুরুবিন্দাঃ।"

শুশ্রুত ঋষি শস্ত্রচিকিৎসা প্রকরণে বিশেষ বিশেষ অস্ত্রের উল্লেখ করিয়া অবশেষ কতকগুলি অনুশস্ত্রের কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে ত্বক্‌সার, অর্থাৎ বাঁশের চ্যাচাড়ি, স্ফাটিক, কাচ, কুরুবিন্দ নামক প্রস্তরই প্রধান। এই দ্রব্যের দ্বারা আংশিক শস্ত্রকার্য্য সমাধা হয় বলিয়া অনুশস্ত্র আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। অদ্যাপি পর্য্যন্ত পল্লীগ্রামের দাই, বাঁশের চ্যাচাড়ি দিয়া নবপ্রসূত শিশুদিগের নাড়ী ছেদ কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

অনেকের ভ্রম আছে, যে, "প্রাচীনকালে কাচ ছিল না। যেখানে যেখানে কাচের উল্লেখ আছে—তাহা কাচ নহে। তাহা স্ফাটিক। বর্ত্তমান ক্ষারসম্ভূত কাচ তখন কেহই বিদিত ছিল না।" একথা যে নিতান্তই ভ্রমোচ্চারিত তাহা উপরোক্ত শ্লোকে কাচ ও স্ফাটিক পৃথক্‌রূপে উল্লিখিত থাকায় সপ্রমাম হইতেছে। ক্ষারসম্ভূত কাচ যে তৎকালে বর্ত্তমান ছিল এবং কাচের প্রকৃতি যে ক্ষার তাহা নিম্ন লিখিত মেদিনীকোষের উল্লেখ দেখিলে সপ্রমান হয়।

"ক্ষারঃ পুং লবণে কাচে।"

লবণ ও কাচ অর্থে ক্ষার শব্দ পুংলিঙ্গ। মেদিনীকারের মতে ক্ষার ও কাচ, নামে মাত্র ভিন্ন, বস্তুতঃ পদার্থ এক। সুতরাং উত্তম বুঝা গেল যে, প্রাচীন কালের লোকেরা কাচের প্রকৃতি বা উপাদান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। এতদ্ভিন্ন আমরা কাচের "ক্ষারমনি" নামও প্রাপ্ত হইয়াছি। চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বাৎস্যায়ণ মুনি যে ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া ছাত্রবর্গের মহোপকার করিয়াছেন, ব্যাসশিষ্য অক্ষপাদ ঋষিকৃত সেই ন্যায়সূত্রেও কাচের উল্লেখ আছে। যথা—

"অপ্রাপ্য গ্রহণং কাচাভ্রপটল
স্ফটিকান্তরিতো পলব্দেঃ।"(৪৪সূত্র)

এই সূত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিনির্ণয় প্রসঙ্গে লিখিত। চক্ষুরিন্দ্রিয় যে কাচ, অভ্র, ও স্ফটিক ভেদ করিয়া গিয়া তদন্তরালস্থ বস্তুকে গ্রহণ করে, এ সূত্রে তাহাই বলা হইতেছে। সুতরাং কাচ আর স্ফটিক যে বিভিন্ন পদার্থ এবং তাহা ৩০০০ সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের লোকেরা বিদিত ছিল—ইহা বলা বাহুল্য। মহাভারত ও উপনিষদাদি প্রাচীন গ্রন্থে যে ভাবে আদর্শ ও দর্পনাদি শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা কাচ বলিয়া গ্রহণ করিলেও করা যায়। অত্যন্ত আদিম অবস্থায় এদেশে তীক্ষ লৌহ ও অন্যান্য ধাতু

বিশেষকে প্রতিবিম্বপাতযোগ্য (পালিস্) নির্ম্মল করিয়া তাহাকে দর্পণ বা আদর্শ নামে আত্মমূর্ত্তি দর্শনার্থে ব্যবহার করিত বটে, কিন্তু মহাভারতাদির সময় কাচ বা স্ফাটিক দর্পণের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। অসুরগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্য্য স্বকৃত রাজনীতি গ্রন্থে "কাচাদেঃ করণং কলা।" ইত্যাদি ক্রমে কাচ প্রস্তুত করিবার উপদেশ করিয়াছেন, এতদনুসারেও কাচ এদেশের বহু প্রাচীন কৃত্রিম বস্তু।

প্রাচীন মিশর দেশে কাচের ব্যবহার ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের নৃপতিগণের সমাধি উপরে নানা বর্ণের কাচের কারুকার্য্যপরি লক্ষিত হয়। রাজ্ঞী হাতাসুর সময়ের নীল, লোহিত ও বিবিধ বর্ণের কাচনির্ম্মিত পানপাত্র, পুষ্পগুচ্ছাধার প্রভৃতি সম্প্রতি "ব্রিটিশ মিউসিয়মে" প্রেরিত হইয়াছে। এ সকল ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। হিরোডোটস্ লিখিয়াছেন, ইথোপিয়ণ্‌রা কাচের আধারমধ্যে মৃতদেহ রাখিত, কিন্তু এপর্য্যন্ত মিশর দেশের প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ ঐরূপ আধার দর্শন করেন নাই। আসেরিয়া নিম্‌রুডের ধ্বংশ মধ্যে বিবিধ আকারের কাচপাত্র মৃত্তিকা মধ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ সকল প্রাচীন সময়ের কাচ প্রভাহীন ও স্বচ্ছ নহে। ইউরোপীয়গণ দ্বারা কাচের উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছে এবং প্রতিবৎসর ইহার উন্নতি হইতেছে। এমন কি, সম্প্রতি চাইনায় কাচের কাপড় পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। মিউনিচ্, নারেন্‌বর্জ, প্যারিশ, বারমিংহ্যাম্, এডিন্‌বরা প্রভৃতি স্থানে কাচের উপর বিবিধ উৎকৃষ্ট চিত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

স্ফটিক।

ইহাও একপ্রকার প্রস্তর ও উপরত্ন। ইহার এক জাতি "সূর্য্যকান্ত মণি" নামে বিখ্যাত,এবং অন্য এক জাতি "চন্দ্রকান্ত" নামে প্রসিদ্ধ। যাহাতে সূর্য্যকান্ত কি চন্দ্রকান্তের গুণ নাই তাহা স্ফাটিক, স্ফটিক, স্ফাটক, স্ফাটিকোপল, ভাস্বর, শালিপিষ্ঠ, ধৌতশিলা,সিতোপল, বিমলমণি,নির্ম্মলোপল, স্বচ্ছ, স্বচ্ছ মণি, অমর রত্ন, নিস্তুষ রত্ন, শিবপ্রিয় ইত্যাদি নানা নামে খ্যাত। যাহার সংস্কৃত নাম সূর্য্যকান্তমণি, ভাষায় তাহাকে "আতস্ পাথর" বলে। গরুড় পুরাণ ও কল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরু নামক গ্রন্থে এই স্ফটিক-উপরত্নের পরীক্ষাদি অভিহিত হইয়াছে। যথা—

"যদ্‌গঙ্গাতোয়বিন্দুচ্ছবি
বিমলতমং নিস্তুষং নেত্রহৃদ্যং
স্নিগ্ধং শুদ্ধান্তরালং মধুর
মতিহিমং পিত্তদাহাপহারি।
পাষাণে যন্নিঘৃষ্টং স্ফুটিতমণি
নিজাং সচ্ছতাং নৈব জহ্যাৎ
তজ্জাত্যং জাতুলভ্যং শুভ
মুপচিনুতে শৈবরত্নং রত্নম্।"
(গরুড় পুরাণ।)

যাহা গোমুখনির্ঝরনিঃসৃত গঙ্গা-

সলিল ও বিদ্যুতুল্য নির্ম্মল, নিস্তুষ, অর্থাৎ মলিন বিন্দু রহিত, নেত্রপ্রিয় (দেখিলে সুন্দর); স্নিগ্ধ, নির্ম্মল অন্তরাল, মধুর, হিমবীর্য্য, পিত্তদাহ-রক্তদোষহারী, যাহা কষ পাষানে ঘর্ষণে স্ফুটিত হইলেও আপন নৈর্ম্মল্য ত্যাগ করে না,—তাহাই জাত্য স্ফটিক। এই শ্রেষ্ঠ শৈবরত্ন, অর্থাৎ স্ফটিক, যদি কদাচিৎ পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাপ্ত ব্যক্তির শুভ বৃদ্ধি হয়।

ইহার উৎপত্তিস্থান ও মূল্যাদি সম্বন্ধে গরুড় পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।

"কাবের-বিন্ধ্য-যবন-
চীন-নেপাল ভূমিষু।
লাঙ্গলী ব্যকিরন্মেদো
দানবস্য প্রযত্নতঃ॥
আকাশ শুদ্ধং তৈলাখ্যং
উৎপন্নং স্ফটিকং ততঃ।
মৃণাল শঙ্খধবলং
কিঞ্চিৎ বর্ণান্তরান্বিতম্॥
ন তত্তুল্যং হি রত্নানাং
অথবা পাপ নাশনম্।
সংস্কৃতং শিল্পি না সদ্যো
মূল্যং কিঞ্চিৎ লভেত্ততঃ।"

বলরাম ঠাকুর এক দানবের মেদ কাবেরী তীর সন্নিহিত প্রদেশ, বিন্ধ্যাচল প্রদেশ, যবন দেশ, চীনদেশ ও নেপাল দেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই আকাশতুল্য নির্ম্মল তৈলাখ্য মেদ হইতে স্ফটিকের জন্ম হইল। মৃণাল ও শঙ্খের ন্যায় ধবল কিন্তু তাহাতে অন্য বর্ণের কিঞ্চিৎ সম্মিশ্রণ আছে। রত্নের মধ্যে ইহার তুল্য পাপনাশক আর নাই। (এই সাধারণ স্ফটিকই অধুনা পোক্‌রাজ নামে খ্যাত বলিয়া অনুমান হয়) শিল্পিরা ইহাকে সংস্কার করে, সেই জন্য তাহারা ইহার মূল্য পায়। বস্তুতঃ অসংস্কৃত স্ফটিকের মূল্য অতি অল্প, সংস্কৃত স্ফটিকের মূল্য কিছু অধিক। যুক্তিকল্পতরু-কার ভোজদেব বলেন, যে এই স্ফটিকের অন্য দুই জাতি আছে, তাহার বিবরণ এই।

"হিমালয়ে সিংহলে চ
বিন্ধ্যাটবি তটে তথা।
স্ফটিকং জায়তে চৈব
নানারূপং সমপ্রভম্॥
হিমাদ্রৌ চন্দ্র সঙ্কাশং
স্ফটিকং তৎ দ্বিধা ভবেৎ।
সূর্য্যকান্তঞ্চ তত্রৈকং
চন্দ্রকান্তং তথা পরম্॥"

হিমালয় প্রদেশ, সিংহলদেশ, ও বিন্ধ্যাচল সমীপবর্ত্তী স্থান সমুদায়ে স্ফটিকের খনি আছে। তাহাতে নানা বর্ণের তুল্যকান্তি স্ফটিক উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু হিমালয়ে যে স্ফটিক উৎপন্ন হয় তাহা চন্দ্র কিরণের ন্যায় শুভ্র এবং তাহা দুই প্রকার। তাহার এক প্রকারের নাম সূর্য্যকান্ত ও অপর প্রকারের নাম চন্দ্রকান্ত। সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্ত স্ফটিকের লক্ষণ ও পরীক্ষা এইরূপ।

"সূর্য্যাংশু স্পর্শমাত্রেণ
বহ্নিং বমতি যৎক্ষণাৎ।

সূর্য্যকান্তং তদাখ্যাতং
স্ফটিকং রত্ন বেদিভিঃ॥"
"পূর্ণেন্দুকর সংস্পর্শাৎ
অমৃতং স্রবতে ক্ষণাৎ।
চন্দ্রকান্তং তদাখ্যাতং
দুর্লভং তৎ কলৌ যুগে॥"

যে স্ফটিক সূর্য্য কিরণে রাখিলে বহ্নি উদ্গীরণ করে তাহার নাম "সূর্য্যকান্ত স্ফটিক।" (ইহার নাম আতস্ পাথর)। আর যাহা চন্দ্র কিরণে রক্ষা করিলে জলস্রাব হয়, রত্নতত্ত্ববেত্তারা তাহাকে "চন্দ্রকান্ত স্ফটিক" আখ্যা প্রদান করেন। এই চন্দ্রকান্ত স্ফটিক কলিযুগে অর্থাৎ বর্ত্তমানকালে দুর্লভ। বোধ হয় এখন আর উহা জন্মে না। শুশ্রুত নামক বৈদ্যক গ্রন্থে লিখিত আছে যে,

"চন্দ্রকান্তোদ্ভবং বারি
পিত্তঘ্নং বিমলং স্মৃতম্।"
"অশোক পল্লব ছায়ং
দাড়িমীবীজ সন্নিভম্।
বিন্ধ্যাটবি তটে দেশে
জায়তে মন্দ কান্তিকম্॥
সিংহলে জায়তে কৃষ্ণ-
মাকরে পদ্মনীলকে।
পদ্মরাগ ভবে স্থানে
দ্বিবিধং স্ফটিকং ভবেৎ॥
অত্যন্ত নির্ম্মলং স্বচ্ছং
স্রবতীচ জলং শুচি।
জ্যোতির্জ্জ্বলন মাশ্লিষ্টং
মুক্তা জ্যোতী রসং দ্বিজ॥
তদেব লোহিতাকারং
রাজাবর্ত্ত মুদাহৃতম্।
অনীলং তত্তু পাষাণং
প্রোক্তং রাজময়ং শুভম্।"

বিন্ধ্যারণ্য সমীপস্থ দেশ সমূহে যে স্ফটিক জন্মে তাহা অতি হীনকান্তি। তাহার বর্ণ অশোক পল্লবের এবং দাড়িম বীজের ন্যায়। সিংহলীয় স্ফটিক কৃষ্ণ বর্ণ হয় এবং তাহা "নীলম" নামক হীরকের খনিতে জন্মে। পদ্মরাগ মণির আকরে যে স্ফটিক জন্মে তাহা দুই প্রকার। তাহার এক প্রকারের নাম "রাজাবর্ত্ত" ও দ্বিতীয় প্রকারের নাম "রাজময়"। রাজাবর্ত্ত নামক স্ফটিক অতি নির্ম্মল, অন্তরাল স্বচ্ছ, জলস্রাবীর ন্যায়, অলিত জ্যোতিঃসংযুক্ত ও মুক্তা-কান্তির ন্যায় কান্তিমান। এইরূপ গুণযুক্ত স্ফটিক লোহিত বর্ণ হইলে তাহা "রাজাবর্ত্ত" আখ্যা ধারণ করে, এবং নীলবর্ণ হইলে "রাজাময়" নাম প্রাপ্ত হয়। এতদ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে, "আকরে পদ্মরাগাণাং জন্মকাচ মনেঃ কুতঃ?" এই পুরাতন বাক্যে "কাচ মণি" শব্দের অর্থ স্ফটিক নহে। প্রকৃত কাচকেই কাচমণি শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। পদ্মরাগ আকরে স্ফটিক উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। কাচ উৎপন্ন হওয়াই সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাচ-মণি শব্দের প্রকৃত অর্থ, মণি সদৃশ কাচ, অর্থাৎ সে কাচ আর স্ফটিক দৃশ্যতঃ প্রায় একরূপ। সুতরাং অনুমিত

হইতেছে, যে উক্ত বচনের উৎপত্তি-কালে অতি পরিষ্কার কাচ উৎপন্ন হইত।

রাজপট্ট নামক এক প্রকার হীরক আছে। তাহারও মূল্য অল্প বলিয়া উপ-রত্ন মধ্যে গণ্য। "রাজপট্টং বিরাটজম্" বিরাট দেশোৎপন্ন অল্প মূল্যের হীরককে রাজপট্ট বলে। "উপলানি বিচিত্রানি নানাবর্ণান্যনেকধা। দৃশ্যান্তে রত্ন কল্পানি তেষাং মূল্যং ন কল্পয়েৎ।" অনেক বর্ণের ও অনেক আকারের উপল দেখা যায়— তাহা দৃশ্যতঃ রত্নতুল্য হইলেও মূল্য সম্বন্ধে কোন বিধি নাই।

শ্রীরামদাস সেন।



জগৎ শেঠ।

অনেকের বিশ্বাস, জগৎ শেঠ একজন লোকের নাম। মার্শমান্ সাহেবের কল্যাণে এই কথা দেশময় রাষ্ট হই-য়াছে। পাঠশালার ছেলেরা জগৎ শেঠকে একটী লোক বলিয়াই জানে। আমাদের স্কুলে প্রকৃত ইতিহাসের চর্চ্চা হয় না, তাই এইরূপ দুই একটা ভ্রম থাকিয়া যায়। জগৎ শেঠ কোন মানু-ষের নাম নহে। একটী উপাধি মাত্র। শ্রেষ্ঠি শব্দের অপভ্রংশে শেঠ হইয়াছে। শ্রেষ্ঠি বৈশ্যদের উপাধি। হিন্দু রাজা-দের অধিকারকালে বৈশ্যেরা ধনরক্ষ-কের কাজ করিতেন। অসময়ে তাঁহারা রাজাকে টাকা ধার দিতেন। মুসলমান্ নবাবদের অধিকারকালে সেই শেঠেরা ধনরক্ষক হন, সময়ে অসময়ে টাকা ধার দিয়া নবাবের সাহায্য করেন। এই সময়ে শেঠদিগের অসীম ক্ষমতা। ধনে, মানে, খ্যাতিতে, ইহারা এই সময়ে ভারতবর্ষের অনেক জমীদারের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বর্ক সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, শেঠদিগের কারবার ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ন্যায় বিস্তৃত। ইহা অত্যুক্তি নহে। শেঠ-গণ ভারতবর্ষে ধনকুবের ছিলেন। ইহারা ভারতবর্ষের "রথ্‌চাইল্ড্" বলিয়া বর্ণিত হইতেন। এক সময়ে ইহারা আপনাদের ক্ষমতাবলে দিল্লীর আমখাসেও আধি-পত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহাদের অর্থ, ইহাদের প্রভুশক্তি ও ইহাদের মন্ত্রণা অনেক সময়ে দিল্লীর বাদশাহকে রক্ষা করিয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহা-সের অনেক প্রধান প্রধান ঘটনায় সহিত শেঠদিগের সংস্রব আছে। শেঠ-গণ এক সময়ে বাঙ্গালার নবাবকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং এক সময়ে সেই নবাবেরই বিরুদ্ধে উঠিয়া, তাহাকে হত-

মান ও হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া, শ্বেতপুরুষকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন।

যে শেঠবংশের কথা বলা যাইতেছে, তাহা দুই শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। রাজপুত হইতে এই বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। মাড়য়ারীগণ শেঠদিগের মূল। শেঠ শ্বেতাম্বরীর জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত। যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত নাগর ইঁহাদের আদি বাসস্থান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইঁহাদের আদিপুরুষ হীরানন্দ শাহ অর্থ উপার্জ্জন মানসে পাটনায় আসিয়া বাস করেন। হীরানন্দের সাত পুত্র। ইঁহারা সকলেই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে আপনাদের কারবার চালাইতে আরম্ভ করেন। জ্যেষ্ঠের নাম মাণিকচাঁদ। ইনি ঢাকায় আসিয়া বাস করেন। শেঠগণ এই মাণিকচাঁদকেই বাঙ্গালায় আপনাদের বংশের স্থাপনকর্ত্তা বলেন। ঢাকা এই সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী এবং প্রধান বাণিজ্য ব্যবসায়ের স্থান। মাণিকচাঁদ এইখানে আপনার ভাগ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। বাঙ্গালার নবাবী এই সময়ে মুর্শিদ কুলি খাঁর হাতে ছিল। মাণিকচাঁদ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দেখাইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই মুর্শিদ কুলির প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ১৭০৪ অব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁ ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করিলে মাণিকচাঁদ মুর্শিদাবাদে আইসেন। এইখানে তাঁহার ক্ষমতা বাড়িয়া উঠে। মাণিকচাঁদ নবাবের দক্ষিণ হস্ত হন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে রাজ্যের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকে। বাঙ্গালার যে সমস্ত জমীদার ও তহশীলদার নবাব সরকারে রাজস্ব দিতেন, তাঁহাদের সকলকেই মাণিকচাঁদের হাতে টাকা দিতে হইত। ইহা ছাড়া দিল্লীতে প্রতি বৎসর যে দেড় কোটী টাকা রাজস্ব দিতে হইত, তাহাও মাণিকচাঁদের হাত দিয়া যাইত। নবাব অনেক সময়ে নিজের টাকাকড়ি মাণিকচাঁদের ধনাগারে জমা রাখিতেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ দিল্লীর সম্রাট ফিরোক্ শাহকে অনুরোধ করিয়া ১৭১৫ অব্দে মাণিকচাঁদকে "শেঠ" উপাধি দেন। এই সময় হইতে মাণিকচাঁদ ও তাঁহার সন্তানগণ মুর্শিদাবাদের কৌন্সিলের প্রধান সভ্য হন। শাসনসংক্রান্ত সকল বিষয়েই ইঁহাদের আধিপত্য থাকে। ইঁহারা অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে দিল্লীর দরবারের প্রধান প্রধান ওমরাহকে পত্র লিখিয়া আপনাদের মতামত নির্দ্দেশ করিতে থাকেন।

মাণিকচাঁদ নিঃসন্তান ছিলেন। ফতেচাঁদ নামে তাঁহার একটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি দত্তকপুত্র লন। ফতেচাঁদও "শেঠ" উপাধি পাইয়াছিলেন। সম্রাট ফিরোক্ শাহ ইঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। ১৭২২ অব্দে মাণিকচাঁদের মৃত্যু হয়। ফতেচাঁদ তাঁহার পদ অধিকার করেন। কেহ কেহ কহেন, ১৭২৪ অব্দে ফতেচাঁদ যখন দিল্লীতে

উপস্থিত হন, তখন সম্রাট্ মহম্মদ শাহ তাঁহাকে "জগৎ শেঠ" উপাধি দান করেন। আবার কেহ কেহ কহেন, ফতেচাঁদ ফিরোক্ শাহের নিকট হইতে এই উপাধি প্রাপ্ত হন। যাহা হউক, ফতেচাঁদই যে সকলের আগে "জগৎ শেঠ" উপাধি পাইয়াছিলেন, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ফতেচাঁদের বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দিল্লীর দরবারে তাঁহার বড় সুখ্যাতি। কোন সময়ে মুর্শিদ কুলি খাঁ সম্রাটের বিরাগভাজন হওয়াতে বাঙ্গালার নবাবী পদ ফতেচাঁদকে দিবার কথা হয়। কিন্তু মুর্শিদ কুলি খাঁ শেঠবংশের সহায় ছিলেন, এজন্য ফতেচাঁদ এই পদ গ্রহণ করেন নাই ; বরং সম্রাটের সহিত নবাবের মিল করিয়া দিয়া উপকারীর প্রত্যুপকার করেন। এবিষয়ে দিল্লী হইতে যে ফর্ম্মান প্রচার হয়, তাহাতে লেখা ছিল, "ফতেচাঁদের বিশেষ চেষ্টায় ও প্রার্থনায় বাঙ্গালার নবাব দিল্লীর সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইলেন।" নবাব শাসনসংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ে ফতেচাঁদের পরামর্শ লইতেন। এই সময় হইতে ফতেচাঁদের সন্তানগণ দিল্লীর দরবারে প্রসিদ্ধ হন। বাঙ্গালার নবাবকে কোন সময়ে খেলাত দেওয়া আবশ্যক হইলে, সেই সঙ্গে জগৎ শেঠকেও খেলাত দেওয়া হইত। বাদশাহের নিকট ফতেচাঁদ মণিখচিত একটী উৎকৃষ্ট সিল মোহর উপহার প্রাপ্ত হন। ইহাতে "জগৎ শেঠ" উপাধি ক্ষোদিত ছিল। শেঠবংশীয়গণ বহুকালপর্য্যন্ত এই মোহরটী যত্নের সহিত রাখিয়াছিলেন।

মুর্শিদ কুলি খাঁর মৃত্যু হইলে সুজাউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হন। ফতেচাঁদ সুজাউদ্দৌলার কৌন্সিলের চারি জন সভ্যের মধ্যে একজন সভ্য ছিলেন। এই নবাব, ফতেচাঁদের পরামর্শ অনুসারে, চৌদ্দ বৎসর বাঙ্গালার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহার পর সর্ফরাজ্ খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হইলেও ফতেচাঁদ কৌন্সিলের পদ ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু শেষে সর্ফরাজের ইন্দ্রিয়পরতা ও যথেচ্ছাচারে ফতেচাঁদ বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। শীঘ্র উভয়ের মধ্যে অসদ্ভাব জন্মিল। ইতিহাসলেখক অর্ম্মি সাহেব কহেন, ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ পরমা সুন্দরী ছিলেন। নবাব তাঁহার রূপলাবণ্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। ফতেচাঁদ নবাবকে এই অনুচিত কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। দুরাচার নবাব আপনার জিদ্ বজায় রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ফতেচাঁদ নিরুপায় হইলেন। যুবতী পুত্রবধূ নবাবের ঘরে প্রেরিত হইলেন। নবাব কিয়ৎক্ষণমাত্র নয়নযুগল পরিতৃপ্ত করিলেন। যুবতী অকলঙ্কিত শরীরে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই ঘটনায় ফতেচাঁদের হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরবাসিনী বধূ

পরধর্ম্মাক্রান্ত পরপুরুষের মুখ দেখাতে ফতেচাঁদ আপনাকে বড় অপমানিত জ্ঞান করিলেন। এ বিরাগ, এ অপমান ও এ ক্ষোভ তিনি আর ভুলিতে পারিলেন না। ক্ষোভে, রোষে ও অপমানে ফতেচাঁদ আপনার বংশের মঙ্গল বিধাতা মুর্শিদ কুলি খাঁর বংশধরের পক্ষ ছাড়িয়া আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত মিশিলেন।

কিন্তু শেঠবংশীয়গণ এই ঘটনাটী আর এক ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, মুর্শিদ কুলি খাঁ মানিকচাঁদের নিকট সাত কোটী টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। এই টাকা আর তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। ইহার পর সর্‌ফরাজ্‌ খাঁ এই টাকার জন্য ফতেচাঁদকে পীড়াপীড়ি করাতে তিনি নবাবকে কিছু কাল অপেক্ষা করিতে কহেন। এই সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ বেহারে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। ফতেচাঁদ এই অবসরে তাঁহার সহিত মিশেন। এই বিদ্রোহের ফল বাঙ্গালার ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। গড়িয়ার যুদ্ধে সর্‌ফরাজ্‌ নিহত হন, এবং আলিবর্দ্দী, বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন।

১৭৪৪ অব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুটী ছেলে, পিতা বাঁচিয়া থাকিতেই, এক একটী পুত্র রাখিয়া, পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠ পৌত্রের নাম মহাতাব রায়, এবং কনিষ্ঠ পৌত্রের নাম স্বরূপচাঁদ। মহাতাব রায় "জগৎ শেঠ" এবং স্বরূপচাঁদ "মহারাজ" উপাধি পাইয়া, দুই জনেই একত্রে আপনাদের কারবার চালাইতে লাগিলেন। এই সময়ে শেঠদিগের বাণিজ্যলক্ষ্মীর বড় উন্নতি। কথিত আছে, তাঁহাদের মূলধন দশ কোটী টাকা হয়। ১৭৪২ অব্দে মারহাট্টা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত মুর্শিদাবাদ লুঠিয়া লন। ইহাতে শেঠদিগের আড়াই কোটী টাকা অপহৃত হয়। মুসলমান্‌ ইতিহাসলেখক (সয়ের মতাক্ষরীন প্রণেতা গোলাম হোসেন) কহিয়াছেন, শেঠগণ এক কোটী টাকার বিল দেখিবামাত্র টাকা দিতে পারিতেন। প্রবাদ আছে, শেঠেরা ইচ্ছা করিলে টাকা সাজাইয়া সুতির নিকট ভাগীরথীর মুখ বুজাইয়া ফেলিতে পারিতেন। নবাবের শাসনসময়ে টাকা রাখিবার জন্য দেশের সকল স্থানে ক্ষুদ্র ধনাগার ছিল না। জমীদারগণ রাজস্ব আদায় করিয়া মুর্শিদাবাদের ধনাগারে জমা করিয়া দিতেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে রাজস্বঘটিত বার্ষিক বন্দোবস্তের সময় সকল জমীদারকেই আপনাদের হিসাবাদি পরিষ্কার করিবার জন্য মুর্শিদাবাদে শেঠদিগের ব্যাঙ্কে আসিতে হইত।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ যখন কাশীমবাজারের কুঠী আক্রমণ করেন, সেই সময়ে ইংরাজেরা ১২ লক্ষ টাকা দিয়া অব্যাহতি পান। এই টাকা শেঠদিগের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল।

বার্টসন সাহেব, ১৭৬০ অব্দে যে বিবরণ লিখেন, তাহাতে জানা যায়, জগৎ শেঠ শতকরা অর্দ্ধ মুদ্রা দিয়া মুর্শিদাবাদের টাকশাল হইতে টাকা প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

১৭৫৩ অব্দে বিলাতের ডিরেক্টর্ সভা কলিকাতার কৌন্সিলের অধ্যক্ষকে কলিকাতায় একটী টাকাশাল স্থাপন করিবার অনুরোধ করেন, কিন্তু কৌন্সিলের অধ্যক্ষ শেঠদিগের ধনবাহুল্যের উল্লেখ করিয়া এই অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হন। এসম্বন্ধে তিনি ডিরেক্টরদের স্পষ্টাক্ষরে লিখেন, "আমরা নবাবকে যত টাকা দিব, জগৎ শেঠ তাহা অপেক্ষা অনেক টাকা দিয়া নবাবকে বশীভূত করিবেন। সুতরাং নবাবের নিকট হইতে টাকশাল স্থাপনের অনুমতি পাইবার সম্ভাবনা নাই।" ইহার পর ডিরেক্টর্ সভার অধ্যক্ষ কলিকাতার কৌন্সিলকে জগৎ শেঠের অজ্ঞাতসারে অতি গোপনে দিল্লীর দরবার হইতে অনুমতি আনিবার পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ১৭৫৭ অব্দে ইংরাজেরা কলিকাতায় টাকশাল স্থাপন করেন। কিন্তু জগৎ শেঠের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া কার্য্য করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ হয় নাই। ভগদাস্ নামে একজন সমৃদ্ধিপন্ন ব্যবসায়ীর সহিত কোম্পানীর টাকা লেনা দেনা ছিল। কলিকাতায় টাকশাল হওয়ার এক বৎসর পরে ভগদাস্ ইংরাজদের মুদ্রিত টাকা লইয়া কারবার চালাইতে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন "জগৎ শেঠ মুর্শিদাবাদের টাকার মূল্য অনায়াসে কম করিয়া আপনার কারবার চালাইবেন; কিন্তু তিনি তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ইংরাজদের মুদ্রিত সিক্কা টাকার মূল্য কম করিতে পারেন না।" শেঠেরা কেমন সমৃদ্ধিপন্ন ও কেমন ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহা ইহাতে সুন্দর বুঝা যাইতেছে।

১৭৫৬ অব্দে আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হয়। এই অবধি শেঠদিগের সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ বাড়িতে থাকে। নবাব সেরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ ও অবরোধ করিলে ইংরাজেরা পলাইয়া পলতার নিকট উপস্থিত হন, এবং জাহাজে থাকিয়াই নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার গূঢ় মন্ত্রণা করেন। এই সময়ে ইংরাজেরা জগৎ শেঠকে হাত করিবার চেষ্টা পান। ২২এ জুন কলিকাতা নবাবের অধিকৃত হয়। ২২এ আগষ্ট কলিকাতার কৌন্সিল নবাবের সহিত সম্মিলনের অভিপ্রায়ে জগৎ শেঠকে একখানি পত্র লিখিবার প্রস্তাব করেন।

মীর জাফর প্রভৃতি সেরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতিগণ পূর্ণীয়ার শাসনকর্ত্তা সকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে গেলে, বাঙ্গালার নবাবের সহিত জগৎ শেঠের অসদ্ভাব জন্মে। জগৎ শেঠ স্বয়ং চেষ্টা করিয়া দিল্লী হইতে সনন্দ আনিয়া

নবাবকে দেন নাই, এই তাঁহার এক অপরাধ। তাঁহার আর এক অপরাধ, নবাব তাঁহাকে বনিকদের নিকট হইতে তিন কোটী টাকা তুলিয়া দিতে বলেন; কিন্তু জগৎ শেঠ মহাতাব রায় ইহাতে এই উত্তর করেন, যে এরূপে টাকা তুলিতে গেলে অতিশয় অত্যাচার হইবে। এই কথা শুনিয়া নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন এবং তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই কারণেই সিরাজের কপাল পুড়ে।

অপমানিত হইয়া মহাতাব রায় ইংরাজদের সহিত মিশিয়া সিরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিতে যথাশক্তি চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ১৭৫৬ অব্দের ২৩এ নবেম্বর কৌন্সিলের সভ্যগণ পূর্ব্বের ন্যায় ফলতাতেই থাকিয়া গোপনে চক্রান্ত করিতে থাকেন। তাঁহাদের অনুরোধে মেজর কিলপাট্রিক্ জগৎ শেঠকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে এই লিখিত ছিল, "ইংরাজেরা সমুদয় বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য কেবল জগৎ শেঠের উপরেই নির্ভর করিতেছেন।" প্রকাশ পাইলে পাছে নবাব তাঁহাদের উপর নিষ্ঠুরাচরণ করেন, এই ভয়ে শেঠেরা প্রকাশ্যভাবে কার্য্যক্ষেত্রে নামিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা রণজিৎ রায়কে কর্ণেল ক্লাইবের সহিত সমুদয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার অনুমতি দিলেন। ১৭৫৭ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের যে সন্ধিপত্র অনুসারে সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদের সমুদয় প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তাহা এই রণজিৎ রায়ের উদ্যোগেই সম্পন্ন হয়।

ইহার পর ক্লাইব চন্দননগর অধিকার করিলেন। নবাবের সহিত ইংরাজদের আবার যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। এই সময় শেঠেরা ইংরাজদের বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গৃহে সিরাজউদ্দৌলার পদচ্যুতির ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে ইংরাজদের বল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

এই ষড়যন্ত্রের ফল প্রসিদ্ধ পলাশির যুদ্ধ। ১৭৫৭ অব্দের ৩০এ জুন (পলাশির যুদ্ধের সাত দিন পরে) জগৎ শেঠের গৃহে ষড়যন্ত্রকারিদের প্রাপ্য বিষয়ের মীমাংসা হইল। এই খানেই শ্বেত ও লোহিত বর্ণ সন্ধিপত্রের মর্ম্ম বাহির হয়। এইখানেই উমীচাঁদের মাথায় বজ্র পড়ে।

ইহাতে শেঠদিগের কি লাভ বা কি ক্ষতি হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। কিন্তু ইংরেজ দরবারে শেঠদিগের সম্মান ও সমাদর যে বাড়িয়া উঠে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। শেঠদিগের মন্ত্রণা ও অর্থবলেই ইংরাজদিগের আধিপত্য লাভ হয়। ১৭৫৯ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নবাব মীর জাফর ও জগৎ শেঠ মহাতাব রায় কলিকাতায়

আইসেন। কেবল নবাবের অভ্যর্থনার জন্য ইংরাজেরা ৮০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। আর জগৎ শেঠের পরিচর্য্যার জন্য ১৭,৩৭৪ অর্কট মুদ্রা ব্যয়িত হয়।

ইহার পর নবাব মীর কাসেমের সময়ে জগৎ শেঠ মহাতাব রায়ের কপাল ভাঙ্গিল। ইংরাজদের সহিত শেঠদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। মীর কাসীম তাঁহাকে সন্দেহ করিতেন। ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে নবাব তাঁহাকে ও মহারাজ স্বরূপচাঁদকে কারারুদ্ধ করিয়া মুঙ্গেরের দুর্গে আনেন। ইহাতে ইংরাজ গবর্ণর ১৭৬৩ অব্দের ২৪এ এপ্রিল নবাবকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেন "আমি এইমাত্র অলিয়টের পত্রে অবগত হইলাম, মহম্মদ তকি খাঁ ২১এ তারিখ রাত্রিতে জগৎ শেঠ ও স্বরূপচাঁদের গৃহে যাইয়া তাঁহাদিগকে হীরা ঝিলে আনিয়া সৈন্যগণের পাহারায় রাখিয়াছেন। আমি ইহাতে বড় বিস্মিত হইতেছি। যখন আপনি নবাবী পদ গ্রহণ করেন, তৎকালে, আমার, আপনার ও শেঠদিগের সাক্ষাতে স্থির হইয়াছিল, যে আপনি শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে শেঠদিগের পরামর্শ লইবেন, এবং কখনও তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে অপদস্থ বা হৃতসর্ব্বস্ব করিবেন না। যখন আমি আপনার সহিত মুঙ্গেরে সাক্ষাৎ করি, তখনও আমি এ সম্বন্ধে এইভাবে আপনাকে অনেক কথা কহিয়াছিলাম, আপনিও শেঠদিগের কোন অনিষ্ট করিবেন না বলিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া অবরুদ্ধ করা অন্যায় হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের সম্মানের সম্পূর্ণ হানি হইয়াছে। আমাদেরও সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়াছে, এবং আপনার ও আমার সম্মান বিনষ্ট প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই আমাদের দুর্নাম করিবে। পূর্ব্বকার নবাবেরা কেহ কখন শেঠদিগকে এমন অপদস্থ করেন নাই।" ইত্যাদি। কিন্তু গবর্ণরের এই অনুরোধ বিফল হইল। উদয়নালার যুদ্ধে পরাজয়ের পর মীর কাসেম ক্রোধে অধীর হইয়া পাটনায় ইংরাজদিগকে হত্যা করিলেন, সেই সঙ্গে মহাতাব রায় ও স্বরূপচাঁদও নৃশংসরূপে নিহত হইলেন।

মহাতাব রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কুশলচাঁদ এবং স্বরূপচাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম উদয়চাঁদ। বাদশাহ শাহ আলম্ কুশলচাদকে "জগৎ শেঠ" ও উদয়চাদকে "মহারাজ" উপাধি দিলেন। ইঁহারা উভয়েই একত্র হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদের কারবার চালাইতে লাগিলেন।

মীর কাসেম যখন মহাতাব রায় ও স্বরূপচাদকে কারারুদ্ধ করেন, তখন মহাতাবের কনিষ্ঠ পুত্র শেঠ গোলাবচাদ ও স্বরূপচাদের কনিষ্ঠপুত্র বাবু মিহিরচাদ আপন আপন পিতার সঙ্গে ছিলেন

এই অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতৃদ্বয় শেষে অযোধ্যার উজীরের হাতে পড়েন। ইঁহাদের কারামুক্তি প্রার্থনা করিলে উজীর বহুসংখ্য অর্থ চাহিলেন। কুশলচাঁদ ও উদয়চাঁদ এজন্য ক্লাইবকে একখানি অনুনয়পূর্ণ পত্র লিখিয়া আপনাদের দীনতা ও দুরবস্থার বিষয় জানাইলেন, কিন্তু এই বিনয়পূর্ণ প্রার্থনায় ক্লাইবের হৃদয় গলিল না। ক্লাইব কঠোরভাবে ১৭৬৫ অব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহাদের পত্রের এই উত্তর দিলেন, "আমি যেরূপ যত্নের সহিত আপনাদের পিতার পক্ষসমর্থন করিয়াছি এবং এই পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতি যেরূপ সৌহার্দ্দ দেখাইয়া আসিতেছি, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। এখন আপনাদের প্রতিপত্তি রক্ষার ও সাধারণের উপকারের জন্য আপনাদিগকে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আপনারা বিশেষরূপে বিবেচনা করিতেছেন না; এজন্য আমার বড় ক্ষোভের উদয় হইতেছে। * * আমি দেখিতেছি, আপনাদের সমস্ত ধন আপনাদের ঘরে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। * * আমি জানিয়াছি, যখন জমীদারদিগের নিকট গবর্ণমেণ্টের পাঁচ মাসের খাজানা বাকি রহিয়াছে, তখন আপনারা তাঁহাদের নিকট হইতে আপনাদের পিতার প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায়ের জন্য তাঁহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিতে ত্রুটী করেন নাই। আমি কখনই এমন কঠোর কার্য্যপ্রণালীর অনুমোদন করিতে পারি না। আপনারা এখনও সাতিশয় সমৃদ্ধিপন্ন বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, বুঝি আপনাদের এই অর্থকামুকতাই শেষে আপনাদের উন্নতির প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়, এবং আপনারা সকল সময়ে সাধারণের উপকারে উদ্যত বলিয়া আমার যে সংস্কার আছে, তাহাও বুঝি নষ্ট হয়।"

শেঠেরা ইহার পরবৎসর ইংরাজদের নিকট ৫০। ৬০ লক্ষ টাকা দাবী করেন। এই টাকায় ২১ লক্ষ, মীর জাফর ও কোম্পানীর সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য, মীর জাফরকে দেওয়া হইয়াছিল। ক্লাইব এই ২১ লক্ষ টাকার দেনা স্বীকার করেন, এবং ইহা কোম্পানী ও নবাব উভয়েই সমান অংশে শোধ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এই বৎসর কলিকাতার কৌন্সিল শেঠদিগের নিকট আবার দেড় লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিতে উদ্যত হন।

ক্লাইবের যত্নে যখন কোম্পানী বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন, তখন কুশলচাঁদ জগৎ শেঠ কোম্পানীর ব্যাঙ্কর হন। এই সময় কুশলচাঁদের বয়স আঠার বৎসর।

লর্ড ক্লাইব কুশলচাঁদকে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু কুশলচাঁদ ইহা লইতে সম্মত হন নাই। কুশলচাঁদের মাসিক ব্যয় লক্ষ টাকা ছিল। উনত্রিশ বৎসর

বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কুশলচাঁদ জীবদ্দশায় আপনাদের পুণ্যক্ষেত্র পরেশ্নাথ পাহাড়ে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া যান।

অনেকে অনুমান করেন, কুশলচাঁদের অপরিমিত ব্যয়েই শেঠদিগের দৈন্যদশা উপস্থিত হয়। কিন্তু ইহার আর কয়েকটী কারণ আছে। ১৭৭০ অব্দের দুর্ভিক্ষে শেঠেরা বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্ ১৭৭২ অব্দে গবর্ণমেন্টের ধনাগার মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠাইয়া আনেন। এই জন্য ক্রমে তাঁহাদের দুরবস্থা হয়। শেঠেরা আপনাদের অবনতির আরও একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, কুশলচাঁদ বহুসংখ্য অর্থ মাটীতে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তিনি সে কথা কাহাকেও বলিয়া যাইতে পারেন নাই। আর কেহই এ বিষয় অবগত ছিলেন না। সুতরাং যেখানকার টাকা সেইখানেই রহিল।

ইহার পর শেঠদিগের অধঃপতনের কথা। এ কথা অতি সামান্য। কুশলচাঁদের পুত্র ছিল না। ইনি ভ্রাতৃপুত্র হরকচাঁদকে দত্তকপুত্র করেন। ইংরাজেরা দিল্লীর দরবারের অনুমতি না লইয়াই ইহাকে "জগৎশেঠ" উপাধি দেন। হরকচাঁদের প্রথমে অর্থের বড় অসচ্ছল হইয়াছিল, শেষে তিনি তাঁহার পিতৃব্য গোলাপচাঁদের সম্পত্তি পাইয়া কিছু সচ্ছল হন। হরকচাঁদ প্রথমে অপুত্রক ছিলেন। পুত্রকামনায় কোন বৈরাগীর পরামর্শে জৈনধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন। শেষে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রচাঁদ "জগৎ শেঠ" উপাধির অধিকারী হন। ইন্দ্রচাঁদের পুত্র গোবিন্দচাঁদ পিতৃসম্পত্তি সমুদয় নষ্ট করিয়া ফেলেন। গবর্ণমেণ্ট গোবিন্দচাঁদকে কোন উপাধি দেন নাই। সুতরাং তাঁহারা পাঁচ পুরুষ ধরিয়া যে বহুমানিত "জগৎ শেঠ" উপাধি অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা ইন্দ্রচাঁদের সঙ্গেই লোপ পায়। গোবিন্দচাঁদ কিছু দিন পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত মণিমুক্তা প্রবালাদি বেচিয়া দিন কাটান, শেষে কোম্পানী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কৃত উপকার মনে করিয়া তাঁহার বার্ষিক ১২০০০ টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। কিন্তু সে কথা তুলিয়া আর কাজ কি?

যাহারা ব্যবসায় করে, সাধারণতঃ তাহাদিগকেই শেঠ বলা যায়। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শেঠ উপাধিধারী অনেক লোক বাস করে। ইহাদের সহিত মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত জগৎশেঠের কোন সংস্রব নাই। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ ১৭৫১ অব্দের ৩০ এ মে কলিকাতার কৌন্সিলের সভাপতিকে লিখেন, "আমি শুনিলাম, রামকৃষ্ণ শেঠ নামে এক ব্যক্তি মুর্শিদাবাদে কর না

দিয়া, কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায় চালাইতেছে। ইহাতে আমি বিস্মিত হইতেছি, এবং অনুমান করিতেছি, এই ব্যক্তি কাহারও ভয়ে ভীত নহে। আমি আপনাকে লিখিতেছি, আপনি একজন চোপদার পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিবেন, এবং যত শীঘ্র পারেন, এখানে পাঠাইয়া দিবেন। আমি যেমন লিখিলাম, তদনুসারেই যেন কাজ হয়।" এই পত্র পাইয়া কৌন্সিলের অধ্যক্ষ নবাবকে লিখেন, "রামকৃষ্ণ শেঠ কোম্পানীর দাদন লইয়া দ্রব্যাদি যোগাইয়া থাকে। তাহার নিকট কোম্পানীর অনেক টাকা পাওনা আছে। এজন্য তিনি তাহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারেন না।" রেবারেণ্ড্ লঙ্ সাহেব কলিকাতার যে শেঠবংশের উল্লেখ করিয়াছেন, বোধ হয় এই সেই বংশীয়। কিন্তু বিখ্যাত জগৎ শেঠের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। লর্ড ক্লাইবের চন্দননগর আক্রমণ প্রসঙ্গে ইতিহাসলেখক অর্ম্মি সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, শেঠদিগের সহিত ফরাসীদিগের বন্ধুত্ব ছিল। মহাতাব রায় ও স্বরূপচাদ ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে দেড় কোটী টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, পলাশির যুদ্ধের পূর্ব্বে শেঠগণ ইংরাজদিগকে অনেক টাকা দেন। ব্রিটিশ সৈন্যের তরবারি ও সঙ্গীনের ন্যায় জগৎ শেঠের মন্ত্রণা ও জগৎ শেঠের অর্থ ইংরাজকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইয়াছে।



কাঞ্চনমালা।

অষ্টম খণ্ড।

১

তিষ্যরক্ষা আবার যে সেই হইল। যেন কিছুই জানে না; যেন কোন গোলযোগই ঘটে নাই, পূর্ব্বমত ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইতে লাগিল, তিষ্যরক্ষা কুণালের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিল; বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য সে বড়ই উৎসাহবতী হইল। বাহিরে সব যেমন ছিল, তেমনি রহিল। কিন্তু সে ভুলিবার পাত্র ছিল না। এইরূপে মাসেক কাটিয়া গেল। ত্রিশ দিনের দিন তক্ষশিলা হইতে

দ্রুত অশ্বারোহণে দূত আসিল। তথায় বিদ্রোহ হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কুঞ্জরকর্ণ বিদ্রোহীদের নেতা।

পত্র পাইয়াই রাজা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পাটলীপুত্রনগরে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। কামারের দোকানে দিবারাত্রি ঠন্ ঠন্ শব্দ হইতে লাগিল; রাশি রাশি তরবারি প্রস্তুত হইয়া আয়ুধাগারে সংরক্ষিত হইতে লাগিল। বড় বড় বাঁশ কাটিয়া ধনুক নির্ম্মাণ হইতে লাগিল। মণিপুর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, অঙ্গ, ওড্র, বিদেহ, সমতট প্রভৃতি প্রদেশের করদ রাজাগণকে সুশিক্ষিত হস্তী প্রেরণের জন্য পত্র লেখা হইল। সহস্র সহস্র ঘোটকে রাজার অশ্বশালা পূরিয়া যাইতে লাগিল। হ্রেষারবে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র সূত্রধর দিবানিশি রথ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। পাটলীপুত্র বন্দরের সমস্ত আহারীয় দ্রব্য যুদ্ধার্থ ক্রীত হইতে লাগিল। নানা দেশীয় বীরগণকে সৈন্য ও সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা হইল। সৈন্যেরা নগরপ্রান্তরে সর্ব্বদা যুদ্ধ অভ্যাস করিতে লাগিল, এবং যুদ্ধের উপকরণ বহিবার জন্য অযুত অযুত শকট ও অযুত অযুত নৌকা আনীত হইতে লাগিল। দেশের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এ দিকে তক্ষশিলা হইতে দূতের পরদূত আসিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এক কথা। আজি এ গ্রাম, আজি ও গ্রাম, আজি সে গ্রাম, বিদ্রোহীদের হস্তগত হইতেছে। সংবাদ আসিতে লাগিল সমস্ত দেশের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তথায় সমবেত হইতেছে। সংবাদ আসিতে লাগিল, বৌদ্ধদেবায়তন সকল উন্মূলিত ও উৎপাটিত হইতেছে। সংবাদ আসিতে লাগিল, ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞকার্য্যে বৌদ্ধদিগকে ধরিয়া বলি দিতেছে। সমস্ত উদ্যোগ সমাধা হইলে রাজা, মন্ত্রী, ও প্রধান পারিষদবর্গ সেনাপতি নির্ব্বাচন করিতে বসিলেন। রাজা প্রিয়পুত্র কুণালকে ছাড়িয়া দিতে একান্ত অসম্মত। কিন্তু মন্ত্রী যে সকল অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহা কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রথম ও প্রধান যুক্তি এই, যে কুণাল বৌদ্ধ এবং তাঁহার ধর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। দ্বিতীয়, তিনি বীর। তৃতীয়, তিনি কষ্টসহিষ্ণু। তিনি সকল দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি সকল লোকের সঙ্গে মিশিতে পারেন। চতুর্থ, যে সমস্ত জাতি হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারা কুণালের একান্ত অনুগত।

এই সকল কারণবশতঃ কুণালই এই বিদ্রোহ শান্তি নিমিত্ত সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেন। রাজাও অন্য উপায় না দেখিয়া কুণালকেই সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার মন কেন এরূপ ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

২

কুণাল সেনাপতি হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে, যে ত্রিশরণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, সেই ত্রিশরণের কার্য্যসিদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে জীবন গেলেও ক্ষতি নাই। তিনি আবার ভাবিলেন যে এই সুযোগে তিনি পাপীয়সী তিষ্যরক্ষার চক্র হইতে অন্ততঃ কিছু কালের জন্য পরিত্রাণ পাইবেন। একবার কাঞ্চনমালার কথা মনে পড়িল। কাঞ্চনমালাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে মনে করিয়া একবার বড়ই কষ্ট হইল। আবার ভাবিলেন, কাঞ্চনমালা যেরূপ মহৎ কার্য্যে ব্রতী আছে, যে কার্য্যের জন্য সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সে যে আমায় যাইতে বাধা দিবে তাহা বোধ হয় না। যদি আমি না থাকায় তাহার কিছু কষ্ট হয়, সেই জন্য তাহাকে আমার সমস্ত কার্য্যের ভার দিয়া যাইব। যে সমস্ত কার্য্য লইয়া তাহার জীবন, যে সকল কাজ সে এত ভালবাসে, তাহা পাইলে সে নিশ্চয়ই দিন কতকের মত আমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিবে।

৩

কাঞ্চনমালা যখন শুনিলেন কুণাল সেনাপতি হইয়াছেন, তখন তাঁহার মন হর্ষে ও বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বামী পশ্চিমাঞ্চলে বিলুপ্তপ্রায় সদ্ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিবেন, এই ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আবার যখন সে দিনের স্বপ্নের কথা মনে পড়িল, যখন সেই ফুল চুরির উৎকণ্ঠার কথা মনে পড়িল, যখন কঞ্চুকীর আগমনে নানা অনিমিত্ত দর্শনের কথা মনে পড়িল, তখন তিনি ভাবিলেন, এত কাল যে অমঙ্গলের ভয় করিয়াছিলাম, এইবার বুঝি সেই অমঙ্গল ঘটিবে। কিন্তু এই মহৎ কর্ম্মে স্বামীকে বাধা দিতে তাঁহার মন উঠিল না। তিনি একবারও "না" এ কথা বলিতে পারিলেন না।

কুণাল বিদায় হইতে আসিলে তিনি উঁহাকে নানাপ্রকার উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত করিলেন। পরে বৌদ্ধদেব যশোধরাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় যে গান করিয়াছিলেন, সেই গান গাইলেন—বলিলেন,—

"ভগবান যেরূপ যশোধরাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া লোকহিত-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ সদ্ধর্ম্মের হিতে সিদ্ধকাম হও। আমি এখানে যে ভাবে আছি এই ভাবেই থাকিব। কিন্তু আমায় অনুমতি দিতে হইবে, যে এই সময়ে একবার গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে গিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব।"

কুণালও কাঞ্চনমালার ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন—বলিলেন, "তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অনুমতি রহিল।" এই বলিয়া হাসিমুখে অথচ সজলচক্ষে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সৈন্যমণ্ডলীর অগ্রবর্ত্তী হইতে চলিলেন। কাঞ্চনমালা

দেখিতে লাগিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে নয়নপথ অতিক্রম করিয়া গেলেন। যখন কুণালের অশ্ব আর দেখা গেল না, তখন কাঞ্চনমালা সত্বরপদে আবার সেই শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন অগণ্য রণপোত এক তালে দাঁড় ফেলিয়া যাইতেছে। মাঝিরা ও আরোহীরা সমস্বরে সিংহনাদ পূর্ব্বক অশোক রাজার জয় গান করিতে করিতে যাইতেছে। তাহাদের জয়ধ্বনিতে নৌকার দাঁড়ের ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার প্রশান্ত গম্ভীর শব্দ হইতেছে। সে শব্দে ভীরু লোকেরও সাহস উদয় হয়। নৌকার মাস্তুলে মাস্তুলে শ্বেত, নীল, পীত, হরিদ্রাদি নানা রঙ্গের পতাকা সকল শোভমান হইতেছে। অনুকূল বায়ুতে পতাকা সকল প্রতাড়িত হইয়া দুলিতেছে—যেন বলিতেছে শত্রুগণ পলায়ন কর, আমাদের সঙ্গে পারিবে না। কাঞ্চনমালা আর এক দিকে নেত্র নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, তক্ষশিলা যাযী রাজবর্ত্ম পরিপূরিত করিয়া সৈন্য সমূহ চলিতেছে। কোথায়ও ভেরী, তুরী, কাড়া, পাড়া, দামামা, দগড়া বাজাইয়া পদাতীগণ চলিতেছে। কোথায়ও প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডের ন্যায় হস্তীসমূহ ধূলিপটলে আবৃত হইয়া আকাশ ও পৃথিবীর একতা সম্পাদন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে আরোহীদিগের শাণিত তরবারিতে ক্ষীণ সূর্য্যালোক পড়িয়া ক্ষীণ চাকচিকা বিকাশ করিতেছে—যেন গাঢ় মেঘে ক্ষীণ বিদ্যুত উঠিতেছে। কোথায়ও দেখিলেন, অশ্বসমূহ লাল, নীল, পীত, সবুজ নানাবর্ণের পৃষ্ঠাবরণে শোভিত হইয়া যাইতেছে। তাহার উপর প্রকাণ্ডকায় বীরসকল শব্দায়মান বর্ম্মকবচাদি ধারণ করিয়া "আমি অগ্রে যাইব" "আমি অগ্রে যাইব" বলিয়া অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিতেছে।

আর এক স্থানে দেখিলেন, রথসমূহ দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া চলিতেছে। রথের অশ্ব সকল সারথি কর্ত্তৃক প্রতাড়িত হইয়া বায়ু অপেক্ষাও বেগে ধাবিত হইতেছে। দেখিলেন, রথের পতাকা সকল হেলিতেছে ও দুলিতেছে। এই দিগন্তব্যাপী রথমণ্ডলীর মধ্যে দেখিলেন, একখানি প্রকাণ্ড রথ, উহার অভ্রভেদী ধ্বজ, চীনাংশুক নির্ম্মিত চারুপতাকা। রথের স্বর্ণময় কিঙ্কিণী সকল সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত করিতেছে। কাঞ্চনমালা দেখিয়াই জানিলেন, যে এই কুণালের রথ। কাঞ্চনমালা চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বায়ু অনুকূল, আকাশ নির্ম্মেঘ, চারিদিকে বলাকা উড়িতেছে। দেখিলেন, আকাশে চাতকপক্ষী মধুস্বরে শব্দ করিতেছে। এই সকলের মধ্যে কেবল একটী জিনিস দেখিয়া তাঁহার কিছু উৎকণ্ঠা হইল। তিনি দেখিলেন, কুণালের অভ্রভেদী ধ্বজের উপর একটী শকুনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

নবম খণ্ড।

১

প্রথমে পাটলীপুত্র হইতে কুণালের যুদ্ধযাত্রা সংবাদ তক্ষশিলা প্রদেশে পৌঁছিল। তৎকালে তক্ষশিলপ্রদেশ প্রায় দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে মহা ধূমধাম পড়িয়া গেল। তাহারা সকলে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। কুঞ্জরকর্ণ নিজে ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধবিদ্বেষী; সুতরাং সমস্ত বৌদ্ধদ্বেষীগণ তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। তাহারা পরামর্শ করিল, আপনাদের দ্বারা যে সমস্ত দেশ আয়ত্ত হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে রাজার সৈন্য উপস্থিত হইলেই প্রজারা রাজার সহিত যোগ দিবে। অতএব রাজার অধিকৃত দেশেই যুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত।

এই পরামর্শের পর এক লক্ষ রণদর্পিত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ তক্ষশিলা প্রদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া অশোক রাজার রাজ্যমধ্যে আসিয়া কুণালের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সৈন্য শিবিরের চারি দিক খাত করিয়া তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এক দিন হঠাৎ তাহারা শুনিতে পাইল, কুণাল অল্প সংখ্যক কিন্তু বীরপূর্ণ সৈন্যের সহিত পশ্চাৎ ভাগে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন।

কুণাল শত্রুদের শিবিরসন্নিবেশের বিষয় চরমুখে বিশেষরূপ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি কতকগুলি দ্রুতগামী অশ্ব এবং হস্তী আপন সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা অনেকদূর ঘুরিয়া শত্রু শিবিরের প্রায় পাঁচ সাত ক্রোশ পশ্চাদ্ভাগে নির্ব্বিঘ্ন স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিতে লাগিল। কুণাল সৈন্যদের প্রতি নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন শত্রুদের রসদাদি যেন বন্ধ করা না হয়। দেশের লোক আমাদের পক্ষীয়, অতএব তাহাদের প্রতি যেন কোন উৎপাত করা না হয়। সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে, তোমরা কোথায় আছ তাহা যেন শত্রুরা টের না পায়। কুণাল এই সময়ে কেবল আকাশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। যুদ্ধের জন্য কোন ব্যস্ততাই প্রদর্শন করিতেন না। সেনাপতিরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "যুদ্ধের বিলম্ব আছে"। আর কেহ দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিত না। কিন্তু বিলম্বে সৈন্যগণ ক্রমে বড়ই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিন প্রাতঃকালে কুণাল হঠাৎ আজ্ঞা করিলেন, "অদ্য বৈকালে যুদ্ধ।" সৈন্যগণ রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিল।

২

শত্রুরা অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছিল, যে কুণালের অধিকাংশ সেনা তাহাদের সম্মুখে আছে। সুতরাং আশঙ্কা করিয়াছিল নিশ্চয় সম্মুখে যুদ্ধ হইবে। কিন্তু

হঠাৎ একদিন পশ্চাদ্ভাগ হইতে কুণাল পদাতি ও অশ্বারোহীর সহিত ভীম পরাক্রমে আক্রমণ করিলে তাহারা কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। পরে তাহারা দুইভাগ হইয়া একভাগ ফিরিয়া কুণালের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল ও অপর ভাগ শিবিরে প্রস্তুত হইয়া রহিল।

বিদ্রোহীরা প্রায়ই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। পুরুষানুক্রমে তাহারা কখন রণে ভঙ্গ দেয় নাই। তাহারা যখন অসমসাহসে কুণালের সৈন্য আক্রমণ করিল, তখন বৌদ্ধসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু কুণাল স্বয়ং রথোপরি হইতে সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। দার্ঢ্য সহকারে বলিতে লাগিলেন—

"ধর্ম্মের জয়! ব্রাহ্মণ কখনই জিতিবে না?"

তথাপি কুণালসৈন্য ক্ষত্রিয়দিগের রণে স্থির থাকিতে পারিল না। অনেকশত বৌদ্ধ রণে নিহত হইতে লাগিল। কিছু পরে দৈব বৌদ্ধদের সহায় হইলেন। পশ্চিমাকাশ সহসা গাঢ় নীল হইয়া ভীমবেগে আঁধি উঠিল। পশ্চিমদিক হইতে যে ঝড় বহিতে লাগিল, সেই বায়ুতে পৃথিবীস্থ ধূলি আকাশে উত্থিত হইয়া চারিদিকে অন্ধকার করিয়া তুলিল। কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কুণালের সৈন্য পশ্চিমে, তাহাদের মুখ পূর্ব্বদিকে; ব্রাহ্মণ সৈন্য পূর্ব্বে—তাহাদের মুখ পশ্চিম দিকে। সুতরাং এই আঁধির সমস্ত ধূলি আসিয়া ব্রাহ্মণ সৈন্যের নয়নে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু কুণালের সৈন্যের কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। তখন কুণাল উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—

"সৈন্যগণ! বৌদ্ধগণ! ধর্ম্ম আমাদের অনুকূল, বুদ্ধ আমাদের অনুকূল, আঁধি থাকিতে থাকিতে বিধর্ম্মীদিগকে পরাজিত কর।" ঝঞ্ঝা বায়ুর সহিত অসির ঝন্‌ঝনা বিদ্রোহী সৈন্যের বিষম ভয় উৎপাদন করিল। তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না—কে স্বদল কে বৈরী কিছুই চিনিতে পারে না, সুতরাং ভ্রমে আপনাদের সৈন্য আপনারা কাটিতে লাগিল। কুঞ্জরকর্ণ ইহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিন্তু কুণাল তাহা বিলক্ষণ জানিয়াছিলেন, এবং কৌশলে আপনার সেনা অক্ষত রাখিয়াছিলেন। পরে যখন আঁধি ছাড়িয়া আসিতে লাগিল, বিদ্রোহীরা আপনাদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিল। সেই সময় কুণালের সেনা সদর্পে ঘোর হুঙ্কার করিয়া তাহাদের উপর পড়িল। কুঞ্জরকর্ণ দেখিলেন সৈন্যেরা পলায়নমুখ, তাহাদের গতিরোধ করা দুঃসাধ্য। ক্রমে অশ্বে, হস্তীতে, মানুষে, ঢালে, তরবারিতে, ধূলায় আর ভয়ে, ব্রাহ্মণশিবিরে একটা ভয়ানক গোলযোগ হইয়া উঠিল।

কুণাল অমনি এই সুযোগে পলায়নপর শত্রু ও শত্রুশিবিরের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কয়েকজন বীর

সৈনিককে অশ্বারোহণে দ্রুতগতি উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন।

এইরূপ অল্প প্রাণিহত্যার জয়লাভে তাঁহার উল্লাসের সীমা রহিল না। কুণালের পর অনেকেই আঁধির আশ্রয়ে জয় লাভ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই প্রাণিহিংসা নিবারণার্থ উহার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। যবন ও মুসলমান পশ্চিম হইতে আসিয়া অনেকবার জয়ী হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই জানেন,যে আঁধি তাঁহাদের অনুকূল,আর হিন্দুর প্রতিকূল ছিল। এই আঁধিতেই হিন্দুকে বরাবর পরাজিত করিয়াছে। নহিলে বুদ্ধি ও ভুজবলে কাহার সাধ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সমকক্ষ হয়।

৩

ক্রমে রাত্রি হইয়া পড়িল। দুই দিকের শত্রুসৈন্যের মধ্যে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া কুণালের কিছু মাত্র ত্রাস জন্মিল না। তিনি সমস্ত রাত্রি স্বয়ং প্রহরীর কাজ করিতে লাগিলেন, এবং "ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, বুদ্ধের জয়" বলিয়া তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

পর দিন প্রভাত হইবামাত্রই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, যে অশ্বারোহীদিগকে তিনি পলায়নপর হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা কয়েকজন প্রধান বন্দী লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বন্দীরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক রাজবিদ্রোহী কুঞ্জরকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কুঞ্জরকর্ণকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে এমনি নিশঙ্ক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, যেন সেই প্রকৃত বিজেতা। কুণাল তাহাকে এক জন সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিয়া মহারাজ অশোককে এই যুদ্ধের সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। এবং কুঞ্জরকর্ণের প্রতি কি আজ্ঞা হয় জানিতে চাহিলেন।

৪

তৎপর দিনে সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া হিন্দুশিবির ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তখন কুণাল বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে তক্ষশিলা রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তক্ষশিলা রাজ্যে আবার শান্তি স্থাপিত হইল। কুণাল ভগ্ন মঠায়তন সকল পুনর্নির্ম্মিত করিতে লাগিলেন। অর্হৎ, ভিক্ষু, শ্রমণ, শ্রাবক, আবার নির্ভয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম পালন করিতে লাগিল। যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াই কুণাল বিদ্রোহীদের অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। কাঞ্চনমালাকে যুদ্ধের সংবাদ দিয়া তিনি যে পত্র লিখিলেন তাহার শেষভাগে লিখিলেন, "বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ যুদ্ধে আহত হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছে,আমি তাহাদিগের শুশ্রূষার চেষ্টা করিতেছি সত্য; কিন্তু তুমি থাকিলে বোধ হয় তাহারা শীঘ্রই আরাম হইতে পারিত।"

ইহলোক ও পরলোক।

আমি এই রূপ বুঝি যে হিন্দু ধর্ম্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্ম্মের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে সকলেই পরলোককে ইহলোক হইতে অধিক বা অল্প পরিমাণে পৃথক্ বিবেচনা করে। এবং যখন উভয় লোককে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তখন কাহাকেও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ, সকল ধর্ম্মগুলিতেই ঈশ্বর প্রধান পদার্থ এবং ঈশ্বর, হয় পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, নয় পার্থিব পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। খ্রীষ্ট এবং মুসলমান ধর্ম্মে ঈশ্বর পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বর পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র না হইয়াও পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ধর্ম্মের আরাধ্য বস্তু পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র বা শ্রেষ্ঠ, সে ধর্ম্মের পরলোক কাজে কাজেই ইহলোক হইতে অধিক বা অল্প পরিমাণে স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্রতার ফল বড় গুরুতর; অনেক স্থলেই অতিশয় শোচনীয়। কারণ, যেখানে ইহলোক হইতে পরলোক স্বতন্ত্র, সেখানে মানুষ পরলোকের নিমিত্ত ইহলোক উপেক্ষা করে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, সকলেই পারলৌকিক সুখের আশায় ইহলোকের প্রতি আস্থাহীন। বস্তুতঃ, দেখা যায় যে ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সংসারের প্রতি অনাস্থা, পরলোকের প্রতি বিশেষ আস্থা এবং পরলোকের প্রতি চূড়ান্ত আস্থার অর্থ চূড়ান্ত সাংসারিক বৈরাগ্য। কি হিন্দু, কি খ্রীষ্ট, কি মুসলমান ধর্ম্মে, সন্ন্যাসীই ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ এবং পরলোকের প্রথম অধিকারী। কিন্তু পরলোকের নিমিত্ত ইহলোকের প্রতি অনাস্থা করিলে একটা না আর একটা বিষম অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মে ইহলোকের প্রতি অনাস্থা প্রবল ছিল বলিয়া সংসারপ্রিয় ইউরোপ সপ্তদশ শতাব্দীতে ঐ ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিল। ইতিহাস লেখকেরা বলিয়া থাকেন, যে রোমানক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রধান মোহান্ত পোপের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশীয়েরা প্রটেষ্টাণ্ট বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। কথাটি ঠিক নয়। আমার বোধ হয় সে বিপ্লবের নিগূঢ় কারণ এই যে, উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ইউরোপবাসীরা, তাহাদিগের স্বাভাবিক প্রকৃতিগুণে, সংসার অথবা ইহলোক প্রিয়, এবং সেই জন্য তাহারা দক্ষিণ ইউরোপের পরলোক-প্রধান ধর্ম্মনীতি পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু প্রটেষ্টাণ্ট বিপ্লব যে কারণেই ঘটিয়া থাকুক, তাহার ফল এই হইয়াছে যে, প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী এবং রোমানক্যাথলিক মতাবলম্বীদিগের পরস্পর শত্রুতায় ইউরোপ শয়তানের রাজ্য অপেক্ষাও অধম হইয়া পড়িয়াছে

হিন্দুধর্ম্মও পরলোক প্রধান। কিন্তু দেখ আজ ইহলোকে হিন্দুদিগের কি অবস্থা! মুসলমান ধর্ম্মে পরলোক অনেকাংশে ইহলোকের সদৃশ বটে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, মহম্মদের ঐহিক স্পৃহা বলে মুসলমানের পরলোক, মুসলমানের ইহলোক অপেক্ষাও জঘন্য।

ফল কথা এই যে, ইহলোক এবং পরলোকের মধ্যে পার্থক্য, শুধু মানুষের অনিষ্টের হেতু নয়। ইহা স্বাভাবিক নিয়মেরও বিরুদ্ধ। আগেকার অপেক্ষা এখন মানুষ এই তথ্যটি বেশী বুঝিয়াছে যে, স্বভাবে কোন অবস্থার লয় নাই এবং প্রত্যেক অবস্থা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার সম্পূর্ণ অনুযায়ী। অর্থাৎ স্বভাবে অবস্থা এবং অস্তিত্বের বিচ্ছেদ নাই। বিচ্ছেদশূন্যতা স্বভাবের একটি প্রধান নিয়ম। অতএব পরলোককে ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্পূর্ণ রূপে অস্বাভাবিক ক্রিয়া এবং সেই জন্যই এত অনিষ্টের মূল। পরলোককে ইহলোক হইতে ভিন্ন করা যে যথার্থ ন্যায় বিরুদ্ধ এবং অস্বাভাবিক ক্রিয়া তাহার একটি পরিষ্কার প্রমাণ আছে। হিন্দু বল, মুসলমান বল, খ্রীষ্টান বল, সকলেই ইহলোকে পরলোকের নিমিত্ত প্রস্তুত হয়। সকলেই যাগযজ্ঞ, দান-ধ্যান, ঈশ্বরের চিন্তা প্রভৃতি কার্য্যে বিশিষ্টরূপে নিবিষ্ট থাকিয়া পরলোক-বাসের উপযোগী হইতে চেষ্টা করে। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাইট, সত্তর বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করে। কিন্তু এত-কাল ধরিয়া এত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও ত ইহলোকের মায়া কাটাইতে পারে না। অশীতিবর্ষীয় পরম ঈশ্বর-ভক্তও ত মরিতে ভয় করে এবং মরিবার সময় এই সংসারের জন্য কাঁদে। কেহ কেহ মরিতে ভয় করে না সত্য; কেহ কেহ মরিবার সময় ইহলোকের নিমিত্ত কাঁদে না সত্য; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। এবং অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তাহাদের মধ্যে কেহ বা ইহলোকে থাকিয়াও ইহলোক-বাসী নয়—সংসারশূন্য বৈরাগী; কেহ বা বার্দ্ধক্য বশতঃ আশা, স্পৃহা, অনুরাগাদি অনুভব করিতে অক্ষম; এবং কদাচিৎ কেহ গোঁড়া খ্রীষ্টানের ন্যায় ধর্ম্মকুহকের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী। বস্তুতঃ,মানুষ পরলোক-প্রয়াসী হইয়াও ইহলোকের মোহে মুগ্ধ এবং ইহলোক ত্যাগ করিতে নিতান্তই ভীত এবং অনিচ্ছুক। এবং সেই জন্যই যিনি যেখানে সম্পূর্ণরূপে পরলোক-পথের পথিক হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনিই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা সংসারে থাকিয়া পরলোক চিন্তায় সংসারের কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরলোককে ইহলোক হইতে পৃথক্ করিলে মানব-প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, এবং সেই জন্যই পরলোক-প্রয়াসীর মনে ইহলোক

এবং পরলোক লইয়া একটি বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মে গণ্ডগোল নাই; গণ্ডগোলের স্থানও নাই। প্রকৃত ধর্ম্ম আগাগোড়া সুমধুর সমতান—আগাগোড়া কোকিলের কুউধ্বনি—আগাগোড়া মহাকাব্য। নিশ্চয় জানিও যাহার মনে ইহকাল এবং পরকাল লইয়া গোল আছে, যে পরলোকের নিমিত্ত ইহলোককে তুচ্ছ করিয়াও ইহলোকের জন্য কাঁদে, যে পরলোককে ইহলোক হইতে পৃথক্ এবং উচ্চ করিয়াও ইহলোক ত্যাগ করিতে ভয় পায় (মুখে মানুক আর নাই মানুক কিন্তু সত্য সত্যই ভয় পায়) এবং ইহলোকের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে মরে, সে পরলোকও বুঝে নাই, ইহলোকও বুঝে নাই; প্রকৃত ধর্ম্ম কাহাকে বলে সে তাহা জানে না। যে ধর্ম্মে পরলোক ইহলোক হইতে ভিন্ন, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়।

তুমি বলিবে, যে ব্যক্তি পরলোকপ্রবাসী হইয়াও ইহলোকের জন্ত কাঁদে, সে হীনবুদ্ধি, দুর্ব্বলমনা, প্রকৃত পরলোক কাহাকে বলে তাহা বুঝে নাই। আমি জিজ্ঞাসা করি, ইহলোকের জন্ত কান্না এত ঘৃণনীয় কেন? মরিতে ভয় করা এত লজ্জার কথা কেন? আমি যাহাদিগকে ভালবাসি এবং যাহারা আমাকে ভাল বাসে তাহাদিগের নিমিত্ত কাঁদিব না কেন? ভালবাসাই জীবন—ভালবাসাই জীবনের প্রধান কার্য্য এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। মানুষ ভালবাসিতে পারে বলিয়াই মানুষ পশু নয়—প্রকৃত মানুষ। মানুষ ভালবাসার বলে পরের জন্ত প্রাণ পর্য্যন্ত আহুতি দিতে পারে বলিয়াই মানুষ দেবতা। ভালবাসা পৃথিবীর জীবন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার পরমাত্মা, ধর্ম্মের পবিত্র ভিত্তি, জগতের মোহিনী মূর্ত্তি। আমি যাহাকে ভাল বাসি, আমাকে যে ভাল বাসে, তাহাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব—তাহাকে ছাড়িয়া কেন যাইব? জগতের আবির্ভাব কাল হইতে মানুষ অশ্রুপূর্ণলোচনে করুণস্বরে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে। জগতের আবির্ভাব কাল হইতে ধর্ম্ম যাজকেরা বলিয়া আসিতেছেন—কাঁদিও না, যেখানে যাইতেছ সে বড় উচ্চ স্থান। কিন্তু মানুষ সে কথা শুনিয়াও শুনে নাই, মানুষ বরাবর স্ত্রীপুত্রের নিমিত্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। যাহাকে ভাল বাসি, যে আমাকে ভাল বাসে, তাহার নিমিত্ত কাঁদিয়া মরিতে তবে দোষ কি? কেনই বা কাঁদিয়া না মরিব? ধর্ম্ম যাজকেরা যাহাই বলুন, যিনি যাহাই বলুন, এ কথার উত্তর নাই। ধর্ম্মযাজক বলেন—পরলোকে ঈশ্বরকে ভাল বাসিও। কিন্তু মানুষ সে কথা শুনিয়াও শুনে নাই। মানুষের দোষ কি? ঈশ্বরকে ভাল বাসিব আমার এমন ক্ষমতা কই? যাঁহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারি না তাঁহাকে কেমন করিয়া আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে পুরিব? আর তাঁহাকে কি জন্যই বা

ভাল বাসিব? তাঁহার ত কোন অভাবই নাই যাহা আমি পূরণ করিব? কোন ক্লেশই নাই যাহা আমি মোচন করিব? কোন যন্ত্রণাই নাই যাহা আমি ঘুচাইব? যদি তাঁহার নিমিত্ত কিছু করিতে পারিলাম না, তবে তাঁহাকে কেমন করিয়া ভাল বাসিব? কিছু করিতে না পারিলে ত ভালবাসা হয় না? তাই মানুষ ধর্ম্মযাজকের কথায় কাণ দিয়াও কাণ দেয় নাই, সৃষ্টিকর্ত্তাকে ছাড়িয়া সৃষ্টবস্তুর জন্য লালায়িত। সেই জন্যই প্রায় সকল দেশে সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা এই বলিয়া মনকে বুঝাইয়া আসিতেছেন যে, ইহলোকে যে ভালবাসার পদার্থটিকে হারাইয়াছি, তাহাকে পরলোকে পাইব; যে ভালবাসার পদার্থটিকে রাখিয়া যাইতেছি, সে পরলোকে আমাদের কাছে যাইবে। খ্রীষ্টীয় জননী কোলের মাণিক হারাইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়া থাকেন—"যাদু, এখন তাঁহার কাছে থাক, আমি গিয়া আবার তোমাকে বুকে করিয়া লইব!" ভূদেব বাবুর মাতৃদেবীর মৃত্যুর পঁচিশ বৎসর পর তাঁহার পিতৃঠাকুরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দিবস তাঁহার পিতৃঠাকুর বলিয়াছিলেন—"আমাকে গঙ্গাযাত্রা করাও—সে, এতদিনের পর আমাকে লইতে আসিয়াছে—আমি তাহাকে আবার দেখিতে পাইয়াছি।" * ভগবান মনু বলিয়াছেন,যে পতিপ্রাণা বিধবা একমনে পতিধ্যানে জীবন কাটাইয়া থাকেন, তিনি পরলোকে পতিক্রোড় পুনর্লাভ করেন। এইরূপে মানুষ তাহার প্রকৃতির সফলতা সাধন করে; ধর্ম্ম যাজকের উপদেশ এবং মনের সুগভীর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে বিষম বিসম্বাদ আছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ উপশম সম্পাদন করে। কিন্তু এত করিয়াও মানুষের সুখ নাই। মনে এত আশা ফলাইয়াও মানুষ মরিতে ভয় করে। লোকে বলে মানুষ দুর্ব্বল তাই মরিতে ভয় করে। তা নয়। মরিতে ভয় করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ধর্ম্মযাজকেরা মানুষকে মৃত্যুভয় শিখাইয়াছেন। তাঁহারা যে নরক যন্ত্রণার কথা বলেন তাহা শুনিলে হৃৎকম্প হয়। প্রচলিত ধর্ম্ম সকলের কঠোর দণ্ডনীতিই তাহাদিগের বিনাশ সম্পাদন করিবে। আধুনিক উন্নত চিন্তার একটি সিদ্ধান্ত এই যে, দণ্ডের দ্বারা চরিত্রের প্রকৃত সংশোধন হয় না। এবং সেই জন্যই আজিকাল শিক্ষাকার্য্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান হইতে দণ্ডবিধি উঠিয়া যাইতেছে। প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে দণ্ডবিধি উঠিয়া না গেলে প্রচলিত ধর্ম্মও উঠিয়া যাইবে। কিন্তু ও সব কথা এখন থাক্। মৃত্যুভয়ের আসল কারণ এই। যে হৃদয়ের নিধিটিকে হারাইয়াছি তাহাকে আবার পাব; যে হৃদয়ের নিধিটিকে রাখিয়া যাইতেছি তাহাকেও আবার পাব,—মনে এই আশা বড়ই প্রবল। ধর্ম্মের শিক্ষা, ধর্ম্ম যাজকের উপদেশ ঠেলিয়া ফেলিয়া, পরলোকে ইহলোকের প্রেমপূর্ণ পরিবারটি

* পারিবারিক প্রবন্ধ, ১০২ পৃষ্ঠা।

দেখিতে পাইব,—হৃদয়ের এই বাসনা যে কতই প্রগাঢ় তাহা আর কি বলিব। কিন্তু তবুও ত মন আশ্বস্ত হয় না। কই কেহই ত নিশ্চয় করিয়া আমাকে বলে না যে আমার আশা পূর্ণ হইবে, যে প্রেমময় পরিবারে এখানে আছি, সেখানেও সেই প্রেমময় পরিবারে থাকিতে পাইব? সেই জন্যই ত কত আশা সত্ত্বেও মরিতে এত ভয় করে। কে বলে যে সে ভয় দুর্ব্বলতার লক্ষণ? যে বলে সে জানে না যে ভয় পবিত্র প্রেমের প্রাণ।

কিন্তু এত আশা করিয়াও মানুষের মনে যে এত ভয়, তাহার কি কোন কারণ আছে? আছে বৈ কি। সে কারণের নাম—অদৃষ্ট। আমি কেমন করিয়া জানিব যে পরলোকে আমি আমার ভালবাসার জিনিস গুলি পাইব? ইহলোকেই ত আমার সকল আশা পূর্ণ হয় না। আমি একটি বিশিষ্ট কারণে আমার স্ত্রীপুত্রকে গৃহে রাখিয়া দূরদেশে গিয়াছিলাম। সেখানে প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলাম। কিন্তু দেখিয়াও সুখী হই নাই। কেননা যাহাদিগের সুখের নামই সুখ, যাহাদিগকে সুখের ভাগ না দিতে পারিলে সুখ দুঃখে পরিণত হয়, তাহারা আমার কাছে ছিল না। ছিল না কেন? না, আমি আমার হইয়াও সম্পূর্ণরূপে আমার নই এবং তাহাদের হইয়াও সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নই। এই ক্ষুদ্র সংসারে আমি এবং তাহারা যে কত শক্তির এবং কত রকম শক্তির ক্রীড়ার পদার্থ, কে তাহার ঠিকানা করিবে? আমি তাহাদিগকে দেখিব মনে করিলেই দেখিতে পাই না, তাহাদিগকে কাছে আনিব মনে করিলেই কাছে আনিতে পারি নাই। তাহারা যেমন আমাকে একদিকে টানিতেছে, তেমনি শত সহস্র শক্তি আমাকে শত সহস্র দিকে টানিতেছে। কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র সংসার চক্রের মধ্যেই যদি এইরূপ হইল, তবে কেমন করিয়া বলিব যে মৃত্যুর পর যখন এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড আমার চক্র হইয়া উঠিবে, তখন আমি আমার ভালবাসার জিনিস গুলিকে আমার কাছে রাখিতে পারিব! ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি শক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে কোটি কোটি কার্য্য, কোটি কোটি সংযোজনা, কোটি কোটি ব্যবচ্ছেদ সাধন করিতেছে। সেই ভীষণ শক্তি সংগ্রামে কে কখন কি হইয়া যাইতেছে, কে কখন কি হইয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? আমি মরিলে, সেই শক্তিরাশি আমাকে লইয়া কি করিবে কেমন করিয়া জানিব? আমার হৃদয়দেবী মরিলে সেই শক্তিরাশি তাঁহাকে লইয়া কি করিবে কেমন করিয়া বলিব—কেমন করিয়া জানিব? যখন এই ক্ষুদ্র সংসার চক্রেই এত কাটা ছেঁড়া, তখন বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের হাতে পড়িলে কি হইবে কেমন করিয়া বলিব? ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি প্রয়োজন—আমার নিজের প্রয়োজন অপেক্ষা কত উচ্চতর প্রয়োজন। কোন্

প্রয়োজনে আমাকে নিযুক্ত হইতে হইবে কেমন করিয়া জানিব? সাধে কি মরিতে ভয় করি?

কিন্তু সে ভয় কি নিবারণ করা যায় না? বোধ হয় যায়। পরলোককে ইহলোক হইতে পৃথক মনে করিও না। ইহলোকে যাহা জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার পরমাত্মা, সেই ভালবাসাকে পরলোকেও জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার পরমাত্মা করিও। কিন্তু ইহলোকে যাহাকে ভাল বাস, তাহাকে যে পরলোকে পাইবে, তাহার ত কোন ঠিকানা নাই। তবে কি করিবে? আমি বলি তোমার ভাল বাসা বিশ্বব্যাপী হউক। বিশ্বব্যাপী ভালবাসা কাহাকে বলে, প্রাচীন হিন্দুরা তাহা জানিতেন, আর কেহই তাহা জানিতে পারেন নাই। কোম্‌তের ভাল বাসা অতি সঙ্কীর্ণ। আমার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্পর্ক আছে। কিন্তু কোম্‌তের ভালবাসা মনুষ্যসম্বন্ধ। কোম্‌তের ভালবাসায় আমার কুলায় না। কি জানি মরিয়া যদি এমন স্থানে যাইতে হয়, যেখানে মানুষ নাই, তাহা হইলে ত মরিলে আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না। তাই বলি, প্রাচীন হিন্দুর বিশ্বব্যাপী ভালবাসার পক্ষপাতী হও। সমস্ত বিশ্বমণ্ডলকে স্ত্রীপুত্রের ন্যায় ভাল বাস, দেখিবে যে ইহলোক এবং পরলোকের মধ্যে যে বিবাদ, তাহা মিটিয়া গিয়াছে, ধর্ম্মোপদেশ এবং মানব প্রকৃতির মধ্যে যে বিরোধ তাহা ভঙ্গ হইয়াছে, মানুষের পারলৌকিক চেষ্টা এবং আশার মধ্যে যে গণ্ডগোল তাহা চুকিয়া গিয়াছে। ইহলোকেও ভালবাস, পরলোকেও ভালবাসিবে। বিশ্ব-শক্তি বিশ্বমণ্ডলের অন্তর্ভূত পদার্থ বিশেষকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে এবং করিতে পারে; কিন্তু সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের কিছুই করিতে পারে না। তুমি মরিয়া কোথায় যাইবে তাহার ঠিকানা নাই; তোমার স্ত্রী মরিয়া কোথায় যাইবেন তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু তুমি মরিয়া যেখানেই যাও এবং তোমার স্ত্রী মরিয়া যেখানেই যাউন, তুমি যদি সমগ্র বিশ্বমণ্ডলকে এবং সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থকে তোমার স্ত্রীর ন্যায় ভাল বাসিয়া মরিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে মরিতে ভয় করিতে হইবে না, মরিতে কাঁদিতে হইবে না। ইহলোকেও যেমন ভালবাসায় ভাসিয়াছ,পরলোকেও তেমনি ভালবাসায় ভাসিবে। সাধনা বড় কঠিন; কিন্তু ফলও বড় চমৎকার। বিশ্বব্যাপী ভালবাসাই প্রকৃত ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মে ভয় নাই, সন্দেহ নাই, ইহলোক এবং পরলোকের বিবাদ নাই, শিক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিরোধ নাই। সেই ধর্ম্মের নামই বিশ্ব-জীবন, বিশ্ব-কাব্য, বিশ্ব-গীতি, বিশ্ব-মোহিনী। সমগ্র বিশ্বমণ্ডলই প্রকৃতবিশ্ব-দেবতা। এবং বিশ্বব্যাপী ভালবাসা সেই বিশ্বদেবতার

বিমোহন মূর্ত্তি। শক্তিরূপা সহধর্ম্মিনীতে সেই বিমোহন মূর্ত্তি দেখিতে অভ্যাস করিও, সাধনার সূত্রপাত হইবে।

মেঘদূত।*

কালিদাস কবি, মেঘদূত কাব্য, রাজকৃষ্ণ বাবু অনুবাদক, এ তিনের কিছুতেই কাহার কোন বক্তব্য থাকা সম্ভব নহে। কালিদাসের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, মেঘদূতের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন; রাজকৃষ্ণ বাবু গবর্ণমেণ্টের বঙ্গানুবাদক, সুতরাং তাঁহারও পরিচয় দিবার প্রয়োজনাভাব। মূলের ভাব রাখিয়া সংস্কৃতের প্রতিবাক্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ করণে রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় দক্ষ ব্যক্তি বাঙ্গালায় অতি দুর্লভ। রাজকৃষ্ণ বাবু নিজে কবি এবং কালিদাসের সম্পূর্ণ মর্ম্মগ্রাহী; আমরা তাঁহার অনুবাদ আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। যদি কেহ সংস্কৃত পাঠের পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া মেঘদূত পাঠের ফললাভ করিতে চান, তাঁহার পক্ষে রাজকৃষ্ণ বাবুর গ্রন্থ অত্যন্ত উপযোগী হইবে। বাঙ্গালায় মেঘ-দূতের আর দুই একখানি অনুবাদ আছে, তদপেক্ষা মূলের সহিত ঐক্য রাখা সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ বাবুর অনুবাদ যে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট তাহা বলা অনাবশ্যক। রাজকৃষ্ণ বাবু কালিদাসের প্রত্যেক কবিতা ছয়-ছত্রে অনুবাদ করিয়াছেন; এইরূপ ছয়-ছত্ররূপ শিকল পরায় কোন কোন স্থলে অনুবাদ সমাপ্তির পর তাঁহাকে কিছু টানিয়া বুনিতে হইয়াছে। এবং কোন কোন স্থানে অল্পের মধ্যে অধিক ভাব প্রবিষ্ট করায় ভাষা একটু দুর্ব্বোধও হইয়াছে। উদাহরণ দ্বারা এ কথা সপ্রমাণ করার বিশেষ প্রয়োজন নাই, পাঠকগণ পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। বোধ হয় এ শিকল না পরিলেই ভাল হইত।

এই উপলক্ষে মেঘ-দূতের সমালোচনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। লোকে যাহাকে ভালবাসে তাহার সম্বন্ধে কোন একটা কথা পড়িলেই সেই কথা লইয়া আমোদ করিতে চায়। কালিদাস এই নূতন বেশে বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা যদি তাঁহার

* The Meghaduta.—Translated into Bengali Verse, by Rajkrishna Mookerjee M. A., AND B. L. Calcutta, Printed by Behary Lall Bannerjee at Messrs J. G. Chatterjea & Co.'s Press. 44, Amherst Street. Published by the Sanskrit Press Depository, 148, Baranoshi Ghose's Street. Price 8 annas.

মেঘদূতের বিষয় কিঞ্চিৎ সমালোচনা করি, বোধ হয় তাহাতে কেহ আমাদের দোষ ধরিবেন না।

কালিদাসের মেঘ-দূত ১১৫টী বই কবিতা নয়; কিন্তু মহা কবি এই ১১৫টী কবিতায় যেন একটী নূতন জগত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সে জগতের নিকট রুসোর Ideal World বোধ হয় পরাজিত হয়; যাঁহারা উপর উপর দেখেন তাঁহারা দেখিবেন, যে একজন যক্ষ স্বীয় প্রিয়ার অদর্শন দুঃখে উন্মত্ত প্রায় হইয়াছে এবং মেঘকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া তৎসমীপে দৌত্যভারপ্রার্থনা জানাইতেছে; এবং তাহাকে কর্ত্তব্য উপদেশ-চ্ছলে যক্ষ-পত্নীর বিরহ অবস্থা প্রভৃতি বর্ণনা করিতেছে। কিন্তু যাঁহারা প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিবেন তাঁহারা দেখিবেন যে যদিও সম্মুখে মেঘ ও যক্ষ বই আর কিছুই নাই; কিন্তু তাহার পশ্চাতে, দূরে, যতই প্রনিধান পূর্ব্বক দেখ, অতি পরিস্ফুট রূপে একটী নূতন জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। কবির কল্পনায় সমাজের, মনুষ্যের,সমাজ নিয়মের,মনুষ্যের সুখের, যতদূর উৎকর্ষ কল্পনা করা যাইতে পারে এই জগৎ সেই উৎকর্ষ সমূহের সমষ্টি মাত্র। তাঁহারা দেখিবেন হিমালয়ের ওদিকে তুষারধবল কৈলাসের উপরে ভারতভূমি হইতে দুর্ভেদ্য প্রাচীর মালার দ্বারা পৃথক্‌কৃত করিয়া মহাকবি একটী মহানগরী সৃষ্টি করিয়াছেন। জল-ভরিত মেঘে অনবরত গর্জন ও বিদ্যুৎ বিলসন হইলে উহার যেরূপ শোভা হয় সে নগরের শোভাও সেইরূপ। উহার বরাঙ্গনাগণ বিদ্যুৎবরণী স্থির-সৌদামিনী তুল্য, উহার আলেখ্য সমূহ ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিবিধ বর্ণে শোভিত, উহার মৃদঙ্গের ধ্বনি মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর, উহার মণিময় তলদেশ বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল ও চাকচক্য ময়; উহাতে ছয় ঋতু নিরন্তর বিরাজমান; ছয় ঋতুরই ফুলকুল উহার বায়ুকে নিত্য আমোদিত করিতেছে; উহার পাদপ-সমূহ সকল সময়েই পুষ্পাভরণে ভূষিত থাকে; সকল সময়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত থাকে, আর তাহার পার্শ্বে হংসসমূহ সকলকালে মেখলাকারে বিচরণ করে; সকল সময়ে ময়ূরসমূহ বিচিত্র পুচ্ছ বিস্তার করত জন-গণের আনন্দ সমুৎপাদন করে। সর্ব্ব-রাত্রেই সুধাংশুদেব স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল কিরণমালা বিস্তার করিয়া উহার সুধা-ধবলিত হর্ম্ম্য শ্রেণীকে শোভিত করেন।

তথায় আনন্দ ভিন্ন অন্য কোন কারণে লোকের নয়নাশ্রু পতিত হয় না। প্রণয় কলহ ভিন্ন অন্য প্রকার মনোবাদ কখন উপস্থিত হয় না; আর যৌবন ভিন্ন অন্য বয়স কখন দেখা যায় না; অর্থাৎ সে পুরীতে দুঃখ নাই, শোক নাই, ক্ষোভ নাই, কলহ নাই, জরা নাই, মরণ নাই।*

* বিদ্যুদ্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ॥

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

পৃথিবীতে যে সকল দুঃখ অপরিহার্য্য সেখানে তাহার লেশমাত্র নাই; সেখানে দস্যু নাই, তস্কর নাই, দণ্ডবিধি নাই, ভয় নাই, শঙ্কা নাই, সেখানে সকলই সুখ; কেবল আনন্দ, কেবল উল্লাস, কেবল ভোগ, সে ভোগের বিরাম নাই, অন্ত নাই। যে এক মদন বাণের তাপ আছে তাহাও বিশেষ তীব্র হইবার যো নাই, কারণ মহাদেব কৈলাসে বাস করেন, মদন ভয়ে বড় একটা অধিক জারী করিতে পারেন না।

অন্য কবি হইলে এরূপ সমাজের লোকে কি করিয়া দিনযাপন করে তাহার ইতিহাস দিতে পারিতেন না, কিন্তু কালিদাসের সৃষ্টির ক্ষমতার নিকট বুঝি বিধাতারও সৃষ্টি-ক্ষমতা পরাভূত হয়। মানব চরিত্রের গূঢ় তত্ত্ব তাঁহার কিছুমাত্র অবিদিত নাই; তিনি দেখিয়াছেন যে এই সুখের সংসারে স্ত্রীপুরুষ যুবক যুবতী কেহই বসিয়া থাকে না, সকলেই এই অপূর্ব্ব সুখাস্বাদে নিরন্তর ব্যাপৃত। তথায় কন্যাকুল মন্দাকিনীর তীরস্থ বালুকা ভূমির মধ্যে মণি লুকাইয়া রাখিয়া তাহারই অন্বেষণ করত ক্রীড়া করে, শৈত্যসৌগন্ধমান্দ্যময় মন্দাকিনীর সমীরণ তাহাদিগকে ক্লান্ত হইতে দেয় না। যদি কখন কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ হয়, নিকটেই কুসুমিত মন্দার বৃক্ষ, তাহারই তলায় গিয়া খেলিতে আরম্ভ করে, খেলা কখন ছাড়ে না; তথাকার অধিবাসীগণ নিরন্তর রূপে স্থিরসৌদামিনী সদৃশ রমণীগণের সমভিব্যাহারে বৈভ্রাজ নামে পুরীর বহিস্থিত উপবনে বসিয়া কিন্নরদিগের গান শ্রবণ করে। সে গান আর কিছুই নহে, কেবল কুবেরের যশঃ গানমাত্র।

এই সুখময় পুরীতে যে সকল যক্ষ বাস করে তাহাদের মধ্যে একজন মেঘদূতের নায়ক। তিনি যে অলকাপুরীর একজন প্রধান ব্যক্তি, কালিদাস একথা কোথাও বলেন নাই; আমাদেরও বোধ হয়, তিনি একজন সাধারণ কর্ম্মচারী মাত্র; কিন্তু তিনি শঙ্খ ও পদ্ম নামক দুইটী নিধির অধীশ্বর; তাঁহার তোরণের পার্শ্বে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। শঙ্খ ও পদ্মনিধি কি? নিধি শব্দে সঞ্চিত ধন বুঝায়; আমাদের দেশে লক্ষপতি কোটীপতি বড়ই গৌরবের কথা, কিন্তু এই সামান্য যক্ষ—লক্ষের উপর নিযুত, তাহার পর কোটী, তাহার পর অর্ব্বুদ, তাহার পর বৃন্দ, তাহার পর খর্ব্ব, তাহার পর নিখর্ব্ব, তাহার পর শঙ্খ, ও তাহার পর পদ্ম-এত ধনের অধিকারী। তাঁহার এক পত্নী, সেই তাঁহার প্রাণ,——

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা
নিত্যজ্যোৎস্নাপ্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ॥

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং নচ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি॥

"তন্বী শ্যামা শিখরি-দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলস-গমনাস্তোকনম্রাস্তনাভ্যাং
যাতত্র স্যাদ্যুবতি বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥"

"কৃশাঙ্গী, যৌবনযুতা, সুপ্রান্তদশনা,
ক্ষীণমধ্যা, নিম্ননাভি, পক্কবিম্বাধরা,
চকিত হরিণীতুল্য ললিত লোচনা,
স্তনভরে কিছু অবনত কলেবরা
শ্রোণীভারে মন্দগতি তথা যে বিরাজে
বিধাতার আদ্যসৃষ্টি যুবতী-সমাজে।"

যক্ষ এই রমণীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া একপ্রকার আত্মবিস্মৃতবৎ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়াই তাঁহার জীবন—তাঁহার প্রাণ—তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়াছিল; বাহ্য জগতের সত্তা তাঁহার নিকট বোধ হয় লুপ্ত হইয়াছিল।

কুবের এই সুখস্বর্গনের অধিপতি। যক্ষকুল তাঁহার আজ্ঞাবহ; অন্যদেবগণ পশুপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করেন, কুবেরের যান মনুষ্য; যাঁহার আজ্ঞায় এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমস্ত সমাজ চলিতেছে, নিজপুরী মধ্যে তাঁহার কথা লঙ্ঘন করে এমন কেহই থাকিতে পারে না। আমাদের যক্ষ হয়ত দুই একবার আপন পত্নীর সহবাস আর অলকার সুখভোগে মগ্ন হইয়া তাঁহার কথার অন্যথা করিয়াছিলেন। এই জন্য কুবের তাঁহাকে হয়ত দুই একবার সতর্ক করিয়া দিয়া থাকিবেন। এক বার আশ্বিন মাসে তিনি উহাঁকে আজ্ঞা দিলেন, "আমার এই কর্ম্ম সম্প্রতি তোমায় করিতে হইবে, দেখিও যেন ভুলিও না, আর যেন তোমায় সতর্ক করিয়া দিতে না হয়"।

আজ্ঞা পাইয়া যক্ষ বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। তোরণমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দুইটী মন্দার বৃক্ষের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। উভয়ে পুষ্পস্তবকভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া তাহার বড়ই আনন্দ হইল; বৃক্ষ দুইটী তাঁহার প্রিয় পত্নীর পোষ্য পুত্র, তাহাদের এই অপূর্ব্ব পুষ্পোদ্গম দেখিয়া মহা আনন্দভরে প্রিয়াকে সংবাদ দিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। প্রিয়া দীর্ঘিকাতীরে ভ্রমণ করিতে পারেন বলিয়া তথায় গেলেন; দেখিলেন, মরকতশিলানির্ম্মিত সোপানাবলী পুষ্করিণীর গভীর জল পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে; বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত নালের উপর হেম পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া পুষ্করিণীকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে; হংসকুল তাহার চারি দিকে বিচরণ করিতেছে; বর্ষাকালে মানস সরোবরে যে যাইতে হয় সে কথা তাহাদের মনেও নাই; দেখিলেন প্রিয়া তথায় নাই। নিকটেই ক্রীড়া শৈল ছিল; মনে করিলেন প্রিয়াকে তথায় পাইবেন, এই বলিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। পুষ্করিণীর তীর হইতে সে শৈল গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে; উহার শিখর সমূহ ইন্দ্রনীলমণিতে নির্ম্মিত; উহার তলদেশ

নক-কদলীতে বেষ্টিত; উহার একাংশে াধবীলতা কুঞ্জের (হয়ত এই মাধবী-লতাকুঞ্জেই কল্য রজনীতে বিহার করিয়াছিলেন) কুরুবক নির্ম্মিত বেড়ার পার্শ্বে একটী অশোক ও একটী বকুল-বৃক্ষ; দুইটী বৃক্ষের ফুলে মদনের বাণ প্রস্তুত হয়; এই দুইটী বৃক্ষের মধ্যস্থলে একটী সোণার দাঁড় স্ফটিকের একখানি তক্তায় দুলিতেছে, এবং তাহার তলদেশ অঙ্কুরাবস্থ বংশের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট মণির দ্বারা বাঁধান। সেই দাঁড়ে একটী ময়ূর বসিয়া আছে। যক্ষ তথায় গিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রিয়া করতালী দিয়া তাহাকে নাচাইতেছেন; আর তাঁহার বালা রুণ রুণ করিয়া বাজিতেছে; শিখীটী সেই শব্দে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতেছে। প্রিয়াকে পাইয়া যক্ষ কুবেরের কথা একবারে ভুলিয়া গেলেন; তিনি সে দিন কিরূপে দিনযামিনী যাপন করিয়াছিলেন, তাহা লিখিলে হয়ত সুরুচি-সম্পন্ন আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর বাঙ্গালা কাগজ সম্পাদক মহাশয়েরা বলিবেন এপ্রবন্ধ-লেখকের রুচি পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তিনি একখানি বাঙ্গালা অনুবাদের সমালোচনা করিতে গিয়া অনর্থক অশ্লীলতার অবতারণা করতঃ আপনার কুরুচি, কুশিক্ষা এবং কুচরিত্রের পরিচয় দিয়াছেন, সভ্য সাময়িক পত্রে উহার ছড়াছড়ি না করিলেই ভাল হইত। সুতরাং যদি কেহ যক্ষ কিরূপে সময় কাটাইয়াছিলেন জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমরা বলি যে তাঁহারা যেন উত্তর মেঘের ৫, ৭, এই দুইটী কবিতা প্রনিধান পূর্ব্বক পাঠ করেন।

পর দিন প্রভাত হইলে কুবের দেখিলেন, পুনরায় যক্ষ তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিয়াছেন, এবং প্রিয়ার প্রতি তাঁহার সর্ব্বান্তরিক অনুরাগই এরূপ অমান্য করার কারণ ইহা জানিতে পারিয়া কুবের এক বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন।

কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলায় যাহা দেখাইয়াছেন, মেঘদূতে তাহাই দেখাইলেন। দেখাইলেন, স্বর্গেই হউক বা পৃথিবীতেই হউক, সুখ-ভবনেই হউক বা দুঃখ-ভবনেই হউক—সমাজ যেখানেই হউক, উহার আজ্ঞা কঠোর, অলঙ্ঘনীয় ও অপরিহার্য্য। যেমন শাস্তির আজ্ঞা হইল, অমনি সে যক্ষ অলকাপুরী হইতে রামগিরিতে আনীত হইল।

কুবের শাস্তি বিধান করিলেন; যক্ষকে অলকার কোন কারাগারে বদ্ধ করিলেন না কেন? তাহা হইলে ত যক্ষের জ্ঞানযোগ হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু বোধ হয় অলকার ন্যায় সুখ-ভবনে কারাগার নাই, বোধ হয় দুঃখভোগ যাহার অদৃষ্ট লিপি, অলকা তাহার বাসস্থান হইতে পারে না; তাই কুবের তাঁহাকে দুঃখময় পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিরহ ভিন্ন অন্য তাপ অলকাবাসীদের হইতে পারে না, এই জন্য কুবের সেই বিরহ-

মাঝে শান্তিরই বিধান করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। অলকায় বিরহ তাদৃশ দারুণ হইতে পারে না, কারণ মহাদেবের তথায় বাস, এই জন্য তাহাকে পৃথিবীতে পাঠান হইল।

পাঠাইয়া দিলেন ত রামগিরিতে কেন? আণ্ডামানে দিলেই ত ঠিক্ হইত। কিন্তু না,—যক্ষের যাহাতে বিরহ যন্ত্রণা অতি তীব্র হয়, সেই জন্য কালিদাস তাহাকে রামগিরিতে আনাইলেন। কালিদাস জানিতেন রামায়ণ দেবলোক ও দেবযোনিদিগের সুপরিচিত। রাম ও সীতা যেখানে পরস্পর সহবাসে বিপুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন যক্ষকে সেই খানে উপস্থিত করিলেন। সেখানকার প্রত্যেক তরু রামচন্দ্রের সুখের সাক্ষী; সেইখানে যক্ষ, প্রিয়া বিরহিত, স্বদেশ নির্ব্বাসিত। যক্ষরাজ রামায়ণের সেই সকল কথা স্মরণ করিতেন। রামচন্দ্র নির্ব্বাসিত হইয়া যে সুখ ভোগে অযোধ্যার কথা কথঞ্চিত বিস্মৃত হইয়াছিলেন, আমার অদৃষ্টে বিধাতা সে সুখও লেখেন নাই; তাই যক্ষ বলিয়াছেন যে বনদেবতারাও তাঁহার দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। বোধ হয় ভবভূতিও যক্ষের এই অবস্থা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই উত্তররামচরিতে রামকে আবার পঞ্চবটীবনে আনিতে সাহস করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সীতার ছায়া দেখাইয়া ও বনদেবতাদিগের দয়ার পাত্র করিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়াছেন। যক্ষও দিবানিশি রাম সীতার এই ছায়া দেখিতেন এবং তাহাই দেখিয়া তিনি এত উন্মত্ত হইয়াছিলেন; সে গিরির যে খানে যে খানে জল ছিল, অর্থাৎ নির্ঝরিণী, জলপ্রপাত, উৎস, প্রবাহ, নদী, ক্ষুদ্র নদী ছিল, জনক তনয়া সর্ব্বত্রই রামের সহিত স্নান করিয়াছিলেন। যক্ষ সর্ব্বদাই সেই সকল স্থানে রাম ও সীতার ছায়া দেখিতেন। কালিদাস এই সকল কথা বলিবার জন্যই "জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু" অর্থাৎ "যথা জানকীর স্নানে পুণ্যময় জল" এই বিশেষণটী দিয়াছেন।

যক্ষ রামগিরিতে বসিয়া কি করিতেন? তিনি কখন কখন প্রিয়ার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরে লিখিয়া তাহার চরণতলে আপনাকে স্থাপন করিতেন। হরিণীর চঞ্চল নয়ন দেখিলে প্রিয়ার নয়ন তাঁহার মনে পড়িত, পূর্ণচন্দ্র দেখিলে প্রিয়ার মুখচ্ছবি তাঁহার প্রাণ আকুল করিত, ময়ূরের পুচ্ছ দেখিলে তিনি প্রিয়ার কেশপাশভ্রমে তাহার বেশ বিন্যাস করিতে অগ্রসর হইতেন; ক্ষুদ্র নদীতে ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিলে তাঁহার বোধ হইত নৃত্যকালে তাঁহার প্রিয়ার ভ্রূযুগ কম্পিত হইতেছে। কিন্তু তিনি চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াও কোথাও প্রিয়ার সম্পূর্ণ উপমা না পাইয়া, হতাশ্বাস হইয়া, ভূমিতলে বসিয়া রোদন করিতেন। কখন কখন স্বপ্নাবস্থায় প্রিয়ার সন্দর্শন পাইয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, এমন সময়ে জাগরিত

হইয়া দেখিতেন, চারি দিকে টপ্ টপ্ করিয়া শিশির বিন্দু পড়িতেছে। তখনই তাঁহার বোধ হইত বন-দেবতারা আমার দুঃখ দেখিয়া কান্দিতেছেন, অমনি তিনি সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইতেন। উত্তর-দিক্ হইতে বায়ু বহিতে লাগিলে, তিনি সে বায়ু বক্ষে গ্রহণ করিতেন, ভাবিতেন যে ইহারা অবশ্যই আমার প্রিয়ার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে।

এইরূপে অতি কষ্টে কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র,বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, এই আট মাস কাটিয়া গেল। ভাবনায় তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া গেল; তাঁহার ক্ষীণ হস্ত হইতে বলয় খসিয়া পড়িল। এমন সময়ে সর্ব্ব প্রথম মেঘ দর্শন দিল; মেঘ দেখিলে প্রিয়সহবাসেও লোকের মন উৎকণ্ঠিত হয়; বোধ হয় যেন কিছু হারাইয়াছি, বোধ হয় যাহা হারাইয়াছি তাহা আর পাইব না। কিন্তু যাহারা প্রিয় বিরহী, বল দেখি তাহাদের মন কত ব্যাকুল হয়; তাহারা ভাবে যাহা গিয়াছে তাহা আর পাইব না, তাহা না পাইলে আমাদের জীবনের প্রয়োজন নাই। যাহার যাহার জন্য জীবন,যাহাতে সুখ, তাহা ছাড়িয়া দিয়া এ নিঃসার অপদার্থ ভারভূত দেহে প্রয়োজন কি? গরিব যক্ষ মেঘ দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। মেঘ যে জড়পদার্থ, ধূমময় ব্যতীত আর কিছুই নয়, এ কথা তাহার মনেও রহিল না; মেঘ উত্তর দিকে যাইতেছে। আহা! আমার প্রিয়া এতদিনে জীবিত আছে কি না,যদি থাকে,মেঘ দেখিলে সে আর প্রাণ রাখিতে পারিবে না; যে দূরে আসিয়াছি,সংবাদ দিবার, সংবাদ লইবার, লোকও নাই, এই মেঘ দিয়া যদি একটী খবর পাঠাইতে পারি, হয়ত প্রিয়া বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। সে এই ভাবিয়া কতকগুলি কুর্চ্চির ফুল তুলিয়া মেঘকে অর্ঘ্য দিল, দিয়া বলিল "মেঘ! তুমি বড় বংশে জন্মিয়াছ, তুমি সন্তপ্তদিগের দুঃখ বিমোচন কর, আমি অতি কাতর, তোমার শরণাগত, আমার দুঃখ দূর কর; তুমি ইন্দ্রের প্রধান অমাত্য, তোমার অগম্য স্থান নাই, আমার বিরহে প্রিয়ার প্রাণ মলিন কুসুমের ন্যায় অতি কষ্টে বৃন্তে লাগিয়া আছে। কখন খসিয়া পড়িবে জানি না; তুমি তাহাকে গিয়া আমার এই সংবাদটী দিবে। তাহা হইলে একটী স্ত্রীলোকের জীবন রক্ষা হয়; আমি আজি হইতে তোমার ভাই হইলাম; তুমি ভায়ের কার্য্য কর; মনে করিও না যে আমার প্রিয়ার—আহা!—কিছু হইয়াছে, তাহার এখনও আশা আছে আমি ফিরিয়া যাইব; কিন্তু বোধ হয় সে ম্লানকুসুম আর বৃন্তে থাকে না; তুমি যাও, গিয়া তাহাকে আমার সম্বাদ দিয়া জীবিত কর। এই কথা বলিতে বলিতে, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে, যক্ষের চক্ষে মেঘের যা কিছু জড়ত্ব ছিল তাহা দূরীভূত হইল; তিনি মেঘকে শুভক্ষণ সুযাত্রা দেখাইয়া দিলেন; বলিলেন বলাকাকুল তোমার

পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে; বলিলেন পথিক-রমণীগণ তোমায় আশীর্ব্বাদ করিবে; তুমি দ্রুত যাও। যাহাতে মেঘের পথে কষ্ট না হয় তাহার জন্য যক্ষ এই সময় যে সকল উপদেশ দিয়াছিল তাহা পাঠ করিলেই বোধ হইবে যে সে মেঘকে বাস্তবিকই মানুষ বলিয়া ভাবিয়াছিল, এবং মেঘের জন্য বাস্তবিকই সহানুভূতি অনুভব করিয়াছিল।

এই সময়ে মেঘকে পথ বুঝাইয়া দিবার ছলে কালিদাস যে সকল দেশ, নগর, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কালিদাসের ভৌগলিক বিবরণ লেখকের হস্তে সমর্পণ করিলাম। সে সকল দেশ কোথায়? এবং এখন খুঁজিয়া সে সকল পাওয়া যায় কি না প্রত্নতত্ত্ববিৎ তাহার সন্ধান করুন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই যে হিন্দু কবিগণ জড়জগতকে দূর হইতে দেখিতেন; তাঁহারা দেখিতেন জড়জগৎ নিম্নে, অন্তর্জগৎ উপরে। সংস্কৃত কবিরা জড়জগতের সহিত মিশিয়া জড়জগতের বর্ণনা করিতে ভাল বাসিতেন না, তাঁহারা উপর হইতে জড়জগৎ দেখিতেন। কালিদাস বল, ভবভূতি বল, এই চক্ষেই জড়জগৎ দেখিয়াছেন, আর এই এই চক্ষে দেখিলেই জড়জগতের যথার্থ প্রকাণ্ডতা, যথার্থ সৌন্দর্য্য, যথার্থ মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারা যায়। কালিদাস এই চক্ষে জড়জগৎ নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে এই অবস্থায় রাখিয়া অদ্য পাঠকগণের নিকট বিদায় লইলাম।

ক্রমশঃ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

উষা-হরণ বা অপূর্ব্ব মিলন।—গীতি-নাট্য। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য ৵১০ মাত্র। গ্রন্থকার কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন, পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু————এবং শ্রীযুক্ত বাবু———— ও শ্রীযুক্ত বাবু————মহোদয়গণ যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সমধিক পরিশ্রম করিয়া এই গীতি নাট্যের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন"। যে ২২ পাতা এক জনে লিখিয়াছেন আর তিন জনে পড়ে "আদ্যোপান্ত" সংশোধন করিয়াছেন তাহা সমালোচনা করা রীতি বিরুদ্ধ ও নীতি বিরুদ্ধ।

মায়াবতী।—গীতি নাট্য। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। ১৬৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কর প্রেস। ১৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ৵০ মাত্র। কালকেতু নামে এক জন ব্যাধ "দেবীপদ নিত্য স্মরে, ধনুর্ব্বাণ লয়ে করে, নাশে প্রাণী অগণন"। সুতরাং দেবী তাহার প্রতি সদয় ছিলেন। এক দিন বনে সে কিছুই না পাইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল:— "নিত্য আনি

নিত্য খাই, সঙ্গতি কিছুই নাই,
কার কাছে ধার চাই, ওগো মা জননী।"

সুতরাং ভগবতী আর থাকিতে পারিলেন না। স্বর্ণ গোধিকা হইয়া তাহার সম্মুখে গেলেন। ব্যাধ অগত্যা সেই গোধিকা ভোজন করিবে বলিয়া তাহাই ধরিল, কুটীরে গেল, তথায় দেবী গোধিকা মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া স্বমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং বলিলেন—

"আমি চণ্ডী আসিলাম তোরে দিতে বর।
শুন কথা কালকেতু ত্যজ ধনু শর।
সপ্ত নৃপ-ধন-সম, লও এ অঙ্গুরী মম,
না হবে ভ্রমিতে তোরে, কানন ভিতর।
এ অঙ্গুরী ভাঙ্গাইয়া, ত্বরা গুজরাটে গিয়া,
কাটায়ে সে বন সব করহ নগর।

গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য কি বুঝিলাম না। দেবীকে ভক্তি করিলে তিনি টাকা দেন, এই শিক্ষা দিবার কি উদ্দেশ্য?

সতীবাসনা।—পদ্য। শ্রীঈশানচন্দ্র সেন গুপ্ত দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য।০ আনা। ঈশান বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী——— উপহারে লিখিয়াছেন "দাসী অবসর মতে বালিকাদিগের উপযুক্ত পাঠ্য বিবেচনায় সতী বাসনা নামে পুস্তক রচনা করিয়াছে"। আমরাও বলি নিশ্চয় সতীবাসনা বালিকাদের উপযুক্ত পাঠ্য। নমুনা স্বরূপ বেহুলা সম্বন্ধে কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"প্রবল নদীর স্রোত ভর ভর যায়
ছোট ছোট ঢেউ গুলি ছুটিয়া বেড়ায়।
কল কল করে জল কূল পরশিয়া,
চন্দ্রমা দিয়াছে তায় চন্দ্রিকা ঢালিয়া।

মৃদুল পবন বহিতেছে ঝির ঝির,
টপ টপ পড়িতেছে নিশির শিশির।
কূলে কূলে শব খুঁজে শৃগাল কুকুর,
ঝিঁ ঝিঁ পোকা ঝিঁঝিঁ রবে ধরিয়াছে সুর।

'হা নাথ! কোথায় নাথ' করুণ কাকলী
কে বালা ও চারু রূপে খেলিছে বিজলী?
মাঝে দিয়ে ভেসে যায় কলার মান্দাস,
পচা শব কোলে শুয়ে খ'সে পড়ে মাস।

বঙ্গের প্রতিমা উটি বণিক নন্দিনী,
মুকুলেই শুকাইয়া গেছে কমলিনী।

বসন্তোপহার।—গীতি-কাব্য সংগ্রহ। রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। রায় প্রেস ডিপজিটারিতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র। সমালোচকের মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত গ্রন্থকার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন "কবিতা গুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে জনৈক সুবিজ্ঞ সমালোচক মহাশয়কে দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহাঁর প্রতি রচয়িতার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, ইনি বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত এবং গ্রন্থকারের দৃঢ় বিশ্বাস যে বঙ্গ-ভাষায় অদ্বিতীয় লেখক ভূতপূর্ব্ব বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাশয় যে শ্রেণীর সমালোচক, ইনিও সেই শ্রেণীস্থ। তিনি পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, যে 'ইহা মুদ্রিত করিবার

সম্পূর্ণ উপযোগী'। রচয়িতা সেই সুবিজ্ঞ সমালোচকের নাম না প্রকাশ করিয়া ভাল করিয়াছেন, এবং আপনারও সুরুচির এক প্রকার প্রমাণ দিয়াছেন। তথাপি বলিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার সুবিজ্ঞ সমালোচকের কথা না উল্লেখ করিলেই ভাল হইত। এ সার্টিফিকিট কোন কাজের হয় নাই। যাঁহার নাম শুনিতে পাইলাম না তিনি সুবিজ্ঞ সমালোচক কি না তাহা কি রূপে বুঝিব। রচয়িতা বলিতেছেন তিনি সুবিজ্ঞ, আবার সমালোচক বলিতেছেন রচয়িতা সুকবি। এরূপ পরস্পর সার্টিফিকট দেওয়া লওয়াতে লোকে সন্দেহ করিতে পারে। তাহাই বলিতে ছিলাম একথা উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত। ইদানীং দেখিতে পাওয়া যায় সার্টিফিকট সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করা একটা ফেসন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বুঝা আবশ্যক যে, সার্টিফিকট দেখিলেই পাঠকের মনে সন্দেহ হয় যে এ লেখক সার্টিফিকট ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তাহাই সার্টিফিকটদাতা দয়া করিয়া, বা অনুরোধে পড়িয়া, অথবা জ্বালাতন হইয়া সার্টিফিকট দিয়াছেন। মনে এই সন্দেহ হইলে আর সে রচয়িতা বা রচনার প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা থাকে না। অতএব তখন সার্টিফিকটে উপকার না করিয়া অপকার করে। বসন্তোপহার লেখক উপলক্ষে এ সকল কথা বলিলাম বলিয়া যে আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে প্রস্তুত নহি এমত নহে; তাঁহার ছন্দ মাধুরী ও বাক্য বিন্যাস সুন্দর। না বাছিয়া আমরা একস্থান হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম।

"কিন্তু হায়,
অভাগিনী বঙ্গবালা আজ দুঃখ সাগরে,
ভাসিতেছি একাকিনী নিরানন্দ অন্তরে,
কোথা ওই প্রেম-নদী,
বহিতেছে নিরবধি,
কোথায় দুঃখের স্রোত কূলে কূলে কাঁদিছে,
অনাথিনী পড়ে তায় ঘন ঘন কাঁপিছে।

আমার সে সুখ-রবি অস্তমিত হয়েছে,
অপ্রভাত দুঃখ-নিশি ঘোর বেশে এসেছে,
জানিনা কখন হায়,
আঁধারে নিবিয়া যায়,
জীবনের সুখ-তারা ধ্রুব তারা নয় রে,
কালের ভীষণ মেঘে আবরিলে তাহারে।

কতকাল আর আমি সহিব এ যাতনা,
নিদয় বিধাতা ওরে আমারে তা বলনা,
পারিনা পারিনা আর,
সহিতে এ দুঃখ ভার,
গুরু ভারে পাপ প্রাণ ফেটে কেন যায় না,
অভাগিনী ব'লে বুঝি মৃত্যু মোরে ছোঁয় না?

আজ হ'তে পৃথিবীতে একা পড়ে থাকিব,
একাকিনী এ বিজনে অশ্রু জলে ভাসিব,
কেহ না দেখিতে পাবে,
দিন রাত চলে যাবে,
আবার দিবস নিশি পুনঃ ফিরে আসিবে,
অভাগিনী একাকিনী তথাপিও কাঁদিবে।

বঙ্গদর্শন।

১১ সংখ্যা।

জীয়ন্ত মানুষের ভূত।

ভূতের কথা বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য একবার বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু ভূতের কথা ভূতে লিখিলে ভাল হয়, এই ভাবিয়া আমরা এপর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করি নাই। আমাদের তখন ধারণা ছিল যে মনুষ্য না মরিলে ভূত হয় না, এখন দেখিতেছি যে আমাদের ভ্রম হইয়াছিল। মনুষ্য না মরিয়াও ভূত হয়— পাড়া প্রতিবাসী অথবা পাঠশালার গুরু মহাশয়েরা দুরন্ত ছেলেদের ভূত বলেন বলিয়া যে হঠাৎ আমাদের এরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে এমত নহে। আমাদের বেদান্ত, মারকীনদের Owen's Foot falls on the other world, ইংরেজদের Gregory's animal magnetism, অষ্ট্রীয়ানদের Von Reichenbach's Researches on magnetism প্রভৃতি নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের সংস্কার জন্মিয়াছে যে জীবিত মনুষ্যের ভূত আছে। কেহ নাস্তিকের মত আমাদের সহিত তর্ক করিতে চাহিলে আমরা আস্তিকের মত কর্ণে হস্ত দিয়া বসিয়া থাকিব, আর কেবল বলিব "ভূতোস্তি"— "ভূতোস্তি"।

বেদান্তে বলে আমাদের শরীর কোষময় অর্থাৎ "খাপ" স্বরূপ। একটী খাপের ভিতর আর একটী খাপ, তাহার ভিতর আর একটী খাপ, এইরূপ পাঁচটী খাপ। যেন Chinese puzzle। প্রথম খাপটীর নাম অন্নময় কোষ। সেটীর ভিতর যেটী আছে তাহার নাম প্রাণময় কোষ। তৃতীয়টীর নাম বিজ্ঞান

ময় কোষ, ইত্যাদি। আমাদের এই দেহের নাম সুতরাং অন্নময় কোষ। ইহার আর একটী নাম স্থূল শরীর। হস্ত পদ, চক্ষু কর্ণ, উদর, ওষ্ঠ, এ সকল স্থূল শরীরের অন্তর্গত। এই স্থূল শরীরের ভিতর পর পর যে তিনটী থাপ আছে তাহা একত্রের নাম সূক্ষ্ম শরীর। ইহাই "আসল" ভূত—জীবিতে ও মৃতে। মনুষ্য মরিলে অর্থাৎ আমাদের স্থূল শরীর নষ্ট হইলে সূক্ষ্ম শরীর বহির্গত হইয়া পড়ে। সূক্ষ্ম শরীর চর্ম্ম চক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু ভাল ভাল লোকের নিকট শুনিয়াছি যে অন্ধকারে, বনে জঙ্গলে, লোকের আনাচে কানাচে এই সূক্ষ্ম শরীর কখন কখন দেখা দেয়, তখন ইনি ভূত নামে অভিহিত হন। কেবল যে মরিলেই স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীর বহির্গত হয় এমত নহে। পণ্ডিতেরা বলেন আর তিন প্রকারে বহির্গত হইতে পারে। প্রথম, নিদ্রা অবস্থায়; দ্বিতীয় যোগবলে, তৃতীয় আপনা আপনি, বিনা চেষ্টায়। নিদ্রা অবস্থায় সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ আমাদের ভূত—স্থূল শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যাহা দেখিয়া বা শুনিয়া আসেন, তাহার নাম স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন মাত্রেই এই ভূতের পর্য্যটন নহে, স্বপ্নের অন্য হেতুও আছে। Magnetism বা Mesmerism দ্বারা ভূত বাহির করিবার যে নূতন কৌশল এক্ষণে বিলাতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা আমাদের যোগের সঞ্চারণ বিদ্যা। সে সম্বন্ধে অধিক কথা উল্লেখ এক্ষণে অনাবশ্যক। তবে এই মাত্র পরিচয় দিয়া রাখি, মার্কিন দেশে, ইংলণ্ডে, জর্ম্মন ও অন্যান্য দেশে, যাহারা এ বিষয় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে দৃষ্টি সঞ্চারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা একজন অপর জনকে এরূপ বশীভূত করিতে পারে, যে তাহাকে নিদ্রা যাইতে বলিলে সে তৎক্ষণাৎ নিদ্রা যাইবে, উঠিতে বলিলে সে তৎক্ষণাৎ উঠিবে, অজ্ঞান হইতে বলিলে সে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইবে। তাহার দেহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্যত্র যাইতে বলিলে সে তৎক্ষণাৎ যাইবে। কি কারণে এরূপ হয় তাহা অদ্যাপি বুঝা যায় নাই, কিন্তু ইহা যে হইয়া থাকে তাহা অনেকের নিশ্চয় ধারণা আছে; এবং তাঁহারা বলেন যে সেই সময় স্থূল শরীরকে ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীর যেখানে যেখানে যায়, এবং যাহা যাহা দেখে, তাহা সবিশেষ পরিচয় দিতে থাকে, এবং সে পরিচয় তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন সম্পূর্ণ সত্য হইয়াছে।

সূক্ষ্ম শরীর যে মধ্যে মধ্যে স্থূল শরীর হইতে আপনা আপনি বিনা চেষ্টায় বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগত হয়, তাহার কথা আমাদের শাস্ত্রে কি আছে জানি না। তবে বিলাতি বহিতে যাহা পাওয়া যায় তাহার দুই একটী উদাহরণ পরে দেওয়া যাইতেছে। তদ্ভিন্ন আমাদের বেদান্ত প্রভৃতির যে মত বলা হইয়াছে তাহারও পোষকতা

স্বরূপ ইংরেজি গ্রন্থ হইতে দুই চারিটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

একটী এই। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পরে মার্কিন দেশের একখানি জাহাজ হিম সাগর দিয়া যাইতেছিল। এক দিন মধ্যাহ্ন কালে জাহাজের কাপ্তেন ও তাহার প্রথম মেট্ ছাদে দাঁড়াইয়া কিয়ৎকাল সূর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জাহাজ পরিচালনা সম্বন্ধে কোন বিষয় গণনা করিবার জন্য উভয়ে ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন। কাপ্তেনের বসিবার ঘর মেটের বসিবার ঘরের সংলগ্ন। মেট নামিয়া নিজের ঘরে আসিবামাত্র গণনায় নিমগ্ন হইলেন, তাঁহার নিজের গণনা সমাপ্ত হইয়া আসিলে তিনি কাপ্তেনের ঘরের দিকে না চাহিয়া কাপ্তেনকে গণনার ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে কোন উত্তর না পাওয়ায় তিনি সেই দিকে মাথা ফিরাইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তথাপি কাপ্তেন কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া তিনি উঠিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দেখিলেন কাপ্তেন নহে অপর কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি বসিয়া স্লেটে কি লিখিতেছে। জাহাজে অপরিচিত ব্যক্তি নিতান্ত অসম্ভব, সুতরাং তাঁহাকে দেখিবামাত্র মেট বিস্মিত হইয়া কাপ্তেনকে খুজিতে গেলেন। এবং ছাদে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া অপরিচিত ব্যক্তির কথা তাঁহাকে জানাইলেন। মেটের ভ্রম হইয়াছে ভাবিয়া কাপ্তেন তাঁহাকে উপহাস করিলেন। মেটের একান্ত জেদ দেখিয়া পরিশেষে, তিনি ছাদ হইতে নামিয়া দেখিলেন, তাঁহার কামরায় কেহই নাই। ইহাতে তিনি মেট্‌কে কিছু অনুযোগ করিলেন। মেট্ তথাপি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই এই থানে একজন অপরিচিত লোককে স্লেটে লিখিতে দেখিয়াছেন। লেখার কথা শুনিয়া কাপ্তেন তখন স্লেট খানি তুলিয়া দেখিলেন অপরিচিত অক্ষরে স্লেটে লেখা রহিয়াছে "উত্তর পশ্চিমে জাহাজ চালাও"। কে ইহা লিখিল জানিবার জন্য কাপ্তেন একে একে জাহাজের সকল ব্যক্তিকে ডাকিয়া "উত্তর পশ্চিমে জাহাজ চালাও" এই কথা গুলি লিখাইলেন, কিন্তু কাহারও লেখার সহিত স্লেটের লেখা মিলিল না। কাপ্তেন শেষ ভাবিলেন, কেহ এই কথা লিখিয়া জাহাজেরই কোথায়ও লুকাইয়া আছে, এই জন্য তিনি জাহাজের ভিতরের সকল স্থান অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। বিশেষ অনুসন্ধান হইল। কিন্তু কোথায়ও কাহাকেও পাওয়া গেল না। শেষ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাপ্তেন উত্তর-পশ্চিমেই জাহাজ চালাইতে অনুমতি করিলেন। জাহাজ কিছুক্ষণ উত্তর পশ্চিমমুখে গেলে একটী বৃহৎ হিম-শিলা ভাসিতেছে দেখিতে পাওয়া গেল এবং আর একখানি জাহাজ সেই শিলাখণ্ডে ভগ্ন অবস্থায় আবদ্ধ রহিয়াছে ইহাও দেখা গেল। দেখিবা-

মাত্র কাপ্তেন দুই তিন খানি নৌকা পাঠাইয়া ভগ্ন জাহাজের আরোহীদিগকে নিজের জাহাজে আনাইলেন। তাহারা একে একে জাহাজে উঠিতেছে, প্রধান মেট্‌ সেই খানে দাঁড়াইয়া তাহাদের দেখিতেছেন এমত সময় আরোহীদিগের মধ্যে এক জনকে দেখিবামাত্র মেট শিহরিয়া উঠিলেন। পরে কাপ্তেনকে গোপনে বলিলেন, "ঐ ব্যক্তিকেই আমি পূর্ব্বে আপনার কামরায় বসিয়া স্লেটে লিখিতে দেখিয়াছি"। পরে আহারাদি কার্য্য সমাধানান্তর কাপ্তেন সেই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে ও ভগ্ন পোতের কাপ্তেনকে ডাকিয়া অপর কামরায় লইয়া গেলেন, এবং কথিত ব্যক্তিকে বলিলেন আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করেন তবে চরিতার্থ হই। অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর করিলেন "একি কথা বলিতেছেন, আপনি আমাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য। কাপ্তেন বলিলেন আমার অনুরোধ অতি সামান্য; এই স্লেটে দুই একটী কথা আপনি লেখেন এই মাত্র আমার অনুরোধ।

অপরিচিত ব্যক্তি স্লেটের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলে স্লেটের যে দিকে লেখা ছিল, "উত্তর পশ্চিমে জাহাজ চালাও" কাপ্তেন সে পৃষ্ঠা উলটাইয়া যে দিকে কিছু লেখা ছিল না, সেই দিকে তাঁহাকে লিখিতে দিলেন। অপরিচিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন কি লিখিব? কাপ্তেন বলিলেন যাহা আপনার ইচ্ছা তাহাই লিখুন। ইচ্ছা হয়, লিখুন "উত্তর পশ্চিমে জাহাজ চালাও।" অপরিচিত তৎক্ষণাৎ তাহাই লিখিয়া কাপ্তেনের হাতে দিলেন। কাপ্তেন স্লেট উলটাইয়া পূর্ব্বের লেখার সহিত এক্ষণকার লেখা মিলাইয়া অবাক হইয়া থাকিলেন। পরে উপস্থিত লেখককে পূর্ব্বের লেখাটী দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা কি আপনার লেখা বলিতেছেন?"

উত্তর। আমায় তাহা আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? আপনিত আমাকে ইহা লিখিতে এখনই দেখিয়াছেন।

কাপ্তেন তখন স্লেট খানি উলটাইয়া অপর দিকের লেখা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এ লেখা কাহার?"

ইহাতে লেখক বড় গোলে পড়িলেন। তিনি স্লেটের একবার এপিট্‌ একবার ওপিট্‌ উলটাইয়া বলিলেন—

"ইহার অর্থ কি? আমি একদিকে লিখিয়াছি, অপর দিকের লেখাও আমারই দেখিতেছি, অথচ আমি ত তাহা লিখি নাই।

কাপ্তেন বলিলেন, "আমার মেট বলিতেছেন যে আপনিই অদ্য বেলা দুই প্রহরের সময় এই ডেস্কে বসিয়া উহা লিখিয়া গিয়াছেন।

ইহাতে লেখক ও ভগ্ন জাহাজের কাপ্তেন উভয়েই আশ্চর্য্য হইলেন। ভগ্ন জাহাজের কাপ্তেন, লেখককে জিজ্ঞাসা

করিলেন তুমি যে স্বপ্নের কথা বলিয়াছিলে তাহাতে স্লেটে লেখার কথা কিছু ছিল কি ?

উত্তর। তাহা আমার মনে নাই।

তখন অপর কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিলেন স্বপ্নের কথা কি ? ভগ্ন তরির কাপ্তেন উত্তর করিলেন, হিমশিলা হইতে আমাদের আর উদ্ধারের কোন উপায় না দেখিয়া আমরা সকলেই হতাশ হইয়া ছিলাম, তদ্ভিন্ন অনাহারে সকলেই বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কখন্ মরি, কখন্ মরি একথা সকলের মনেই হইতেছিল। ইনি অদ্য দুই প্রহরের সময় অবসন্ন হইয়া শয্যায় পড়িয়াছিলেন; তাহার পর নিদ্রা ভঙ্গে শয্যা হইতে উঠিয়া আমাকে বলিলেন 'অদ্য আমরা উদ্ধার হইব। আমি স্বপ্নে দেখিতেছিলাম একখানি জাহাজ আমাদের উদ্ধারের নিমিত্ত আসিতেছে।' ইনি আপনার এই জাহাজের আকৃতি সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক মিলিয়াছে।

তখন অপর কাপ্তেন অপরিচিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন স্বপ্নে স্লেটে লেখার বিষয় কিছু কি আপনার স্মরণ নাই ?

উত্তর। আমার সে বিষয় কিছু মনে নাই। আমি কেবল স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম যেন একখানি জাহাজ আমাদের বাঁচাইতে আসিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইখানে যত দ্রব্য দেখিতেছি তাহা যেন আমার অপরিচিত নহে, সকলই যেন আমি পূর্ব্বে আর একবার দেখিয়াছি।

এই পরিচয় বিশ্বাস করিলে বুঝিতে হইবে যে নিদ্রিত অবস্থায় এই ব্যক্তির সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ ভূত দেহ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রের ইতস্ততঃ খুজিয়া শেষ এই জাহাজ খানিতে উপস্থিত হয়। এবং উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আপনার দেহে আসিয়া পুনঃ প্রবেশ করে। কিন্তু কথা এই, সকলেই ত বিপদগ্রস্ত হয়, সকলেরই ত প্রেতাত্মা আছে; তবে সকলেরই ভূত কেন বহির্গত হইয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করে না। বোধ হয় অনেকেই বলিবেন সকলের ভূত সমান উদ্যোগী নহেন।

আর একটা মার্কিন গল্প বলি। একজন গৃহস্থ ইউরোপে আসিয়া দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন, যে সময়ে প্রত্যাগমন করিবার কথা ছিল কার্য্যগতিকে সে সময় অতীত হইয়া গেল। কোন পত্রাদি না পাইয়া তাঁহার স্ত্রী বড় ব্যস্ত হন। স্ত্রীলোকের স্বভাব সকল দেশেই সমান। স্বামীর তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত তিনি একজন গণকের নিকট গিয়া আপনার কাতরতা জানাইলেন। গণক তাঁহাকে সেই স্থানে বসাইয়া অপর ঘরে উঠিয়া গেলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি শীঘ্র আপনার স্বামীর সংবাদ আনিয়া

দিতেছি। বিবিটী অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিল, তাহার পর উঠিয়া গণক কি করিতেছে দেখিবার নিমিত্ত দ্বারের নিকট গেল, গিয়া দেখে একখানি কোচের উপর গণক মৃতবৎ শয়ন করিয়া রহিয়াছে। বিবি ঘরের ভিতর আর প্রবেশ না করিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিয়া থাকিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গণক কোচ হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া বিবিকে বলিল, ভয় নাই, আপনার স্বামী ভাল আছেন, তিনি এখন লণ্ডননগরের অমুক কাপিহাউসে বাসা করিয়া আছেন, আপনাকে অদ্যাই তিনি পত্র লিখিবেন। বিবি তাহাতেই সান্ত্বনা লাভ করিয়া গৃহে আসিলেন। কিছুদিন পরে পত্র পৌঁছিল। এবং যথা সময়ে স্বামী স্বয়ংও দেশে ফিরিয়া আসিলেন। স্বামীকে পাইয়া বিবি তাঁহার গলা ধরিয়া যথা নিয়মে ক্ষণেক কাঁদিল, তাহার পর কত গল্প করিল, শেষ সেই গণকের পরিচয় দিল, এবং একদিন স্বামীকে গণকের নিকট লইয়া গেল। স্বামী, গণককে দেখিবা মাত্র চিনিল। স্ত্রীকে গোপনে বলিল, "আমি ইহাকে এক দিন লণ্ডনে আমার বাসায় দেখিয়াছিলাম, তথায় গিয়া এই ব্যক্তি আমাকে বলে যে তুমি আমার সংবাদ না পাইয়া বড় কাতর হইয়াছ।" তাহার পর হিসাব করিয়া দেখা হইল যে, যে দিবস তাঁহার স্ত্রী গণকের নিকট গণাইতে গিয়াছিলেন সেই দিবস সেই সময়ে তাঁহার সহিত লণ্ডনে এই ব্যক্তির দেখা হইয়াছিল।

এই গল্পটী বিশ্বাস করিলে বুঝিতে হইবে যে গণক আমাদের যোগের ন্যায় কোন এক কৌশলে আপনার দেহ হইতে বহির্গত হইয়া লণ্ডনে এই গৃহস্থের অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিল।

আর একটী ইংরেজী গল্প বলি। যিনি পরিচয় লিখিয়াছেন তিনি বিশেষ প্রমাণ পাইয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। অতএব যাঁহার ইচ্ছা হয় তিনি এ গল্প বিশ্বাস করিতে পারেন। একদিন রাত্রে এক জন কর্ণেল সাহেব যথা প্রথা সস্ত্রীক হইয়া নিদ্রার অর্চ্চনা করিতে করিতে সফল মনস্কাম হইয়াছিলেন। সেই রাত্রের ঘটনা তাঁহার স্ত্রী এইরূপ বলেন যে "আমরা উভয়ে নিদ্রা গেলে কতক রাত্রে দেখি আমি শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছি; আমার স্বামী কর্ণেল সাহেব শয্যায় অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন আর তাঁহার পার্শ্বে আমার দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। ভাবিলাম, আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি আর আমার দেহ ওখানে কিরূপে থাকিল? আমি কতই ভাবিতে লাগিলাম, তাহার পর বিশেষ করিয়া দেখিলাম আমার সেই শরীর মৃত দেহের ন্যায় দেখাইতেছে— স্পন্দন রহিত, শ্বাস প্রশ্বাস বিবর্জ্জিত। তখন আমার ক্রমে ক্রমে স্থির বিশ্বাস হইল আমি নিশ্চয়ই মরিয়াছি। শেষ ভাবিলাম উত্তম হইয়াছে, মরণের

কষ্ট কিছুই পাইতে হইল না। এই সময় আমায় যেন প্রাচীরের দিকে ভাসিতে ভাসিতে যাইতে হইল, আমার নিজের ইচ্ছা নাই অথচ সেই দিকে যাইতে হইল; ভাবিলাম প্রাচীরে আটকাইয়া থাকিব। কিন্তু তাহা হইল না, আমি প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়া গেলাম, যেমন প্রাচীর সেইরূপ থাকিল, কোথাও ভেদ চ্ছেদ কিছুই হইল না। প্রাচীরের অপর দিকে একটা বৃক্ষ ছিল, ভাবিলাম এই বৃক্ষে আমার দেহ আটকাইয়া যাইবে, কিন্তু তাহাও হইল না, যেমন বৃক্ষ সেইরূপ থাকিল অথচ আমি তাহার ভিতর দিয়া সরিয়া গেলাম। তাহার পর শূন্য পথে কতক দূর গিয়া দেখিলাম সম্মুখে গোরাদের বারিক, একজন সান্ত্রী বন্দুক ঘাড়ে করিয়া পাহারা দিতেছে। আমি তাহার সম্মুখে গেলাম। কিন্তু সে আমাকে একেবারে দেখিতে পাইল না, তাহার পর অস্ত্রাগারে গেলাম সেখানেও সান্ত্রী পাহারা দিতেছে, আমি তাহারও সম্মুখে দাঁড়াইলাম সে ব্যক্তিও আমাকে দেখিতে পাইল না। তাহার পর আমার কোন আত্মীয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, গৃহিণীর সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা বার্ত্তা কহিলাম। তখন রাত্রি ৩টা বাজিল। * * *

প্রাতে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিলে আমি আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিলাম "তবে আমি মরি নাই।"

চীৎকার শুনিয়া আমার স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি? আমি তখন আদ্যোপান্ত সকল পরিচয় দিলাম। তিনি বলিলেন তুমি একথা শুক্রবার পর্য্যন্ত প্রকাশ করিও না; আমাদের যে আত্মীয়ের সহিত তুমি কথা কহিয়া আসিয়াছ বলিতেছ, তিনি এই শুক্রবারে আমাদের এখানে আসিবেন। আসিয়া কি বলেন তাহা শুনা যাইবে।

শুক্রবারে সেই আত্মীয় যথাসময়ে আসিলেন। তাঁহাকে লইয়া আহ্লাদ আমোদ হইতে লাগিল। অপরাহ্নে সকলে একত্রে পুষ্প উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে টুপির কথা উঠিল। আমি বলিলাম এবার আমি গোলাপি বর্ণের টুপি ক্রয় করিব; ঐ বর্ণ আমি বড় ভালবাসি। তাহাতে আমাদের আত্মীয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তাহা আমি জানি, সে দিন রাত্রি ৩ টার সময় যখন আমার গৃহে তুমি গল্প করিতে গিয়াছিলে, তখন তোমার গোলাপি বর্ণের বেশ ভূষা ছিল।"

তাহার কিছু দিন পরে কর্ণেল সাহেব ভারতবর্ষে এডজুটাণ্ট জেনেরল হইয়া আসিলেন; কিন্তু তাঁহার বিবি বিলাতে থাকিলেন। বিবি জি পূর্ব্বমত ভূত-বেশে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য কতই আকাঙ্ক্ষা করিতেন, কিন্তু তাহা হইত না!

এই তিনটি গল্পই যথেষ্ট, আর অধিক পরিচয় অনাবশ্যক। আমাদের দেশে সাধারণতঃবিশ্বাস আছে যে মানুষ কেবল মরিলেই ভূত হয়; কিন্তু এই কয়টী পরি-

চয় যদি সত্য হয় তবে বলিতে হইবে মানুষ জীবিত অবস্থায়ও ভূত হইতে পারে। এরূপ গল্প আমাদের দেশে প্রচলিত নাই তাহাই এই বীজ রোপণ করিলাম, সময়ে এরূপ কত গল্প রটিবে। কত রূপ গল্প আছে, না হয় তাহার উপর আর দুই চারিটা জন্মিবে তাহাতে ক্ষতি কি?

কাঞ্চনমালা।

প্রথম অধ্যায়।

যথাকালে কুণালের পত্র রাজধানী পৌঁছিল। কিন্তু তখন অশোক আর রাজা নাই। যে দিন কুণাল যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন, তদবধি প্রিয়পুত্রের শোকে ও উৎকণ্ঠায় তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্ব্বদাই ভাবনা হইতে লাগিল, কুণালের পাছে কোন রূপ অনিষ্ট হয় এই আশ-ঙ্কায় তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। এক-বার মনে করিলেন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপ-স্থিত হন; কিন্তু আর কেহই সে পরা-মর্শ দিল না। ক্রমাগত ভাবনায় ও ক্রমাগত পরিশ্রমে অশোক রাজার বহু-মুত্র রোগ উপস্থিত হইল। বহুমূত্র রোগের লক্ষণ এই প্রথম অবস্থাতেই উহা অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। কুণাল যাইবার দশ বার দিন পরে রাজার এই বিষম অবস্থা ঘটিয়া উঠিল। পাটলী পুত্র নগরের প্রধান প্রধান চিকিৎসক পুস্তকাদি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিবারাত্রি রাজ বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিল। পাতা লতা ফল মূল গুল্ম অস্থি প্রভৃ-তিতে রাজবাড়ীর এক মহাল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। যে বড় বড় কবিরাজেরা পঞ্চাবর্ষিকী সভায় সাত আটবার পারি-তোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা স্বয়ং স্বহস্তে ঔষধ তৈল আরক বটিকা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। পাটলী পুত্র নগ-রের বড় বড় বৌদ্ধ মঠে প্রত্যহ উপহা-রাদি প্রেরিত হইতে লাগিল। ভগবান উপগুপ্ত প্রত্যহ রাজবাটীতে আসিয়া রাজার ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে লাগিল যে পরিচর্যার কিছু মাত্র ত্রুটি হইলেই রাজার জীবন রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। ঔষধ সেবন, পথ্যাদি প্রদান, নিদ্রার সময় ব্যাঘাত হইতে না দেওয়া, আহারাদির বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া, শয্যা গৃহাদি পরিষ্কার করা প্রভৃ-তির কোন রূপ ত্রুটী হইলেই তাহার আর অব্যাহতি থাকিবে না। এরূপ

পরিচারিকা অন্তঃপুর মধ্যে মিলিয়া উঠা ভার। অশোকের মহিষীগণ প্রায়ই ব্রাহ্মণ শাক্যীয়, সুতরাং তাহাদের বিশ্বাস হয় না। যাঁহারা বৌদ্ধ তাহারা হয় সেরূপ পরিচর্য্যা করিতে জানেন না; না হয় করিতে প্রস্তুত নন। কাঞ্চন রোগ শোকে পরের মাতা পিতা। কিন্তু রাজার পীড়ায় পুত্র বধূ অপেক্ষা মহিষীরা সেবা করিলেই ভাল হয়। সুতরাং সে ভার তিষ্যরক্ষার স্কন্ধেই পড়িল।

তিষ্যরক্ষা দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, বিশ্রাম নাই, রাজা অশোকের সেবা করিতে লাগিলেন। দুই তিন দিনেই অশোক এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, যে তাঁহার উত্থান শক্তি একেবারে রহিল না। তখন তিষ্যরক্ষাই তাঁহার হাত পা হইল। তিষ্যরক্ষারও কিছুতেই সেবার বিরক্তি হইত না। যে সময়ে কোন কাজ না থাকিত, সে সময়ে সে রাজার কাছে বসিয়া নানা প্রকার গল্প করিত। দিনরাত্রি গায় হাত বুলাইত, পাখা লইয়া বাতাস করিত, একবার ঘর হইতে বাহির হইত না। দাসী বৃন্দকে রাজার নিকটে আসিতে দিত না। রাজা নিদ্রিত হইলে পার্শ্বে বসিয়া মশা মাছি তাড়াইত এবং যাহাতে রাজার নিদ্রার বিঘ্ন না হয় তাহার জন্য নিজে ঘুমাইত না। দারুণ গ্রীষ্ম সময়ে সে রাজার মহলটী এমনি সুশীতল করিয়া রাখিত, যে গেলে লোকের আর ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করিত না।

২

এইরূপ নিরন্তর সেবায় রাজার শরীর ক্রমে সুস্থ হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তিষ্যরক্ষা অনিদ্রায় অনাহারে অস্নানে ও অনিয়মে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি উহার সেবায় বিতৃষ্ণা বা বিরতি রহিল না। অনিয়মে তাহার একপ্রকার উৎকট শিরঃপীড়া জন্মিল, শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে সময়ে সময়ে সে দুই তিন ঘণ্টা অজ্ঞান অভিভূত হইয়া থাকিত।

রাজা আরোগ্য হইয়া উঠিয়া তিষ্যরক্ষার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। পরে বিশেষ সেবা শুশ্রূষা করাইয়া উহার শরীর শোধরাইয়া দিলেন। এবং তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। সে প্রার্থনা করিল যে আমি একাকী এক বৎসরের জন্য মগধ সাম্রাজ্য শাসন করিব। অশোক সম্মত হইলেন। চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে মহারাণী তিষ্যরক্ষা এক বৎসরের জন্য মগধ সাম্রাজ্যে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইবেন। মৌল, রক্ষী, সামন্ত, গ্রামীক, সেনাপতি দিগকে আজ্ঞা দেওয়া হইল যে তাহারা এই এক বৎসরের জন্য তিষ্যরক্ষার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। এই কয়দিন অশোক প্রজাভাবে রাজপুরী মধ্যে বাস করিবেন।

৩

এই নূতন রাজত্বের দ্বিতীয় দিনে কুণালের দূত জয়বার্ত্তা লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইল। এবং কুঞ্জরকর্ণের বন্দী

হওয়ার সংবাদ আনিয়া দিল। যুদ্ধের জয় সংবাদে মহারাণী তিষ্যরক্ষা ঘোষণা দ্বারা নগরবাসীদিগকে উৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন, রাত্রিতে মহানগর দীপ রাজিতে আলোকিত হইল; বৌদ্ধমহলে আজি বড়ই আনন্দ। অশোক শুনিলেন, তিনিও নিজ বাসস্থান প্রদীপ দিয়া দীপান্বিতা করিয়া তুলিলেন।

রাজা ও তিষ্যরক্ষার পীড়ার সময় কাঞ্চন সর্ব্বদাই রোগীদের নিকট থাকিত, উভয়ে সারিয়া উঠিলে আবার নগর পরিভ্রমণ করিয়া দীন দরিদ্রদিগের দুঃখ মোচন করিতে আরম্ভ করিল। আজি এই সুখের দিনে সেও কাঞ্চন কুটীর দীপমালায় শোভিত করিল। দূত আসিয়া তাহাকেও পত্র দিল, পত্রের শেষ অংশ পড়িয়া তাহার বড়ই কষ্ট হইল। সে তক্ষশীলা গমনের অনুমতি তিষ্যরক্ষার নিকট প্রার্থনা করিল। তিষ্যরক্ষা যুদ্ধস্থলে স্ত্রীলোকের যাওয়া উচিত নয় বলিয়া যাইতে দিলেন না। কাঞ্চনের যাওয়া হইল না এবং সে বড় বিমর্ষ হইল। তাহার হাসিখুসী ও প্রফুল্লতার দিনকত বড় একটা দেখা গেল না। দুই পাঁচ দিন পরে আবার যে সেই হইল, কুণালের নিকট হইতে সদ্ধর্ম্মের জয় সংবাদ এবং কুণালের অবিচলিত প্রণয়ের চিহ্নসকল প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কাঞ্চন ইহাতেই সুখী।

ওদিকে যথাসময়ে কুণালের নিকট তিষ্যরক্ষার রাজ্যারোহণ বার্ত্তা পঁহছিল। তৎপরদিন যুদ্ধজয় শ্রবণে মহারাণী বড় আনন্দিত হইয়াছেন সংবাদ আসিল। তৎপরে কুঞ্জরকর্ণকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা আসিল, কুণাল তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তৎপর দিন পত্র আসিল যে কুঞ্জরকর্ণ আমায় "মা" বলিয়াছে, অতএব আমি তাহাকেই তক্ষশীলায় শাসনকর্ত্তা করিলাম, তুমি তাঁহার আজ্ঞাধীন হইবে। এই সংবাদে কুণালের অধীনস্থ সেনাপতিগণ বড় অসন্তুষ্ট হইল এবং তাঁহাকে মাপিত কন্তার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে উপদেশ দিল। কুণাল বলিলেন, সে যেই হোক, সে যখন মহারাণী হইয়াছে তখন অবশ্যই আমার তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে। সেনাপতিরা অগত্যা সম্মত হইল, কিন্তু সেনাস্থ লোক রাগে ও ক্ষোভে অস্থির হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, "স্ত্রীলোকের রাজত্বে মানুষের বাস করিতে নাই। কি অবিচার! বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বন্দী রাজা হইল, আর বিজয়ী রাজপুত্র তাঁহার অধীন হইল।"

এইভাবে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। পাঁচ দিনের দিন কুঞ্জরকর্ণ বাস্ত সমস্ত ভাবে কুণালকে আসিয়া বলিল, মহারাণীর আজ্ঞা আজি তোমায় আমার সহিত তক্ষশিলার দুর্গের মধ্যে যাইতে হইবে। কুণাল মস্তক অবনত করিয়া রাণীর আজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া কুঞ্জরকর্ণের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। বাজার শূন্য হইল,

কাক চিল উড়িতে লাগিল, কুণাল ভাবিলেন বুঝি কাঞ্চনের সঙ্গে আর দেখা হইল না। বাহিরে তাঁহার আন্তরিক আবেগের চিহ্নও দেখা গেল না। ধর্ম্ম সঙ্ঘ ও বুদ্ধের নাম করিয়া তিনি কুঞ্জর কর্ণের পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন।

বহু সংখ্যক সৈনিক তাঁহার সহিত যাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি হস্ত সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

কুঞ্জরকর্ণ কিয়দ্দূর গিয়া বলিল, কুণাল মহারাণী তোমার উপর বড় কঠিন আজ্ঞা করিয়াছেন।

"তিনি যাই আজ্ঞা করুন তাহাই আমার শিরোধার্য্য।"

"সে আজ্ঞা পালন করিলে জীবন ও মৃত্যু সমান হইবে।"

"হয় হইবে।"

কুঞ্জরকর্ণ বলিলেন,—

"এসো! আমরা কেন দুইজনে যোগ করিয়া তক্ষশীলায় নূতন রাজত্ব স্থাপন করি না?"

কুণাল এ কথার উত্তর দিলেন না; কিন্তু এমনি অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন যে তাহার হৃদয় কম্পিত হইল। সে ভয়কম্পিত স্বরে বলিল,—

"তবে আমি মহারাণীর আজ্ঞার সহিত লোক পাঠাইয়া দিতেছি, তুমি আপন মন দৃঢ় কর।" বলিয়া কুঞ্জরকর্ণ প্রস্থান করিল।

৫

কুণাল, ধর্ম্ম, সঙ্ঘও বুদ্ধের স্তব করিতে লাগিলেন। একমনে বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—

"জীবলোকের সুখের জন্য জীবন ত্যাগ করা শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু আমি কিসের জন্য জীবন ত্যাগ করিতেছি? ইহাতে পাপীয়সীর পাপবাসনা চরিতার্থ বই আর কিছুই হইবে না।" তখনি আবার মনে হইল,—"সে যেই হোক সে এক্ষণে মহারাণী। তাহার আজ্ঞা কোনরূপেই লঙ্ঘন করা হইতে পারে না। করিলেই যুদ্ধবিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইবে।"

এই সময়ে একবার কাঞ্চনমালার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি উদ্দেশে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন— বলিলেন,—

"জীবিতেশ্বরি! আমার সহিত তোমার এবার আর দেখা হইল না।"

এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়ে দুই জন চণ্ডাল রাজ পত্র হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। উভয়েই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্ব শরীর তৈলাক্ত; প্রকাণ্ড মুখ, বড় বড় চোখ, অনবরত মদ্য সেবনে জবা ফুলের ন্যায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সেই কাল তৈলাক্ত মুখের উপর কোঁকড়া কোঁকড়া দাড়ী এবং অপরিষ্কার ভয়ানক কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। গলায় রাঙা জবা ফুলের মালা, [illegible] তীর ও ধনুক। আসিয়াই এক [illegible]

এক জনকে বলিল—"ওরে, এই শালাটার কি চোখ্ তুল্‌তে হবে? কিন্তু শালার চোখ দুট কি বড়।"

দ্বিতীয় চণ্ডাল বলিল,—"লেখন খানা ওর হাতে দে।"

প্রথম চণ্ডাল আবার বলিল,—

"আর পত্র দিয়ে কি হবে? এখনি তো ওর পত্র দেখা ফুরিয়ে যাবে।"

"তবে আর কাজ নাই" বলিয়া উভয়ে কুণালের চক্ষু লক্ষ্য করিয়া তীর তুলিল। প্রথম চণ্ডাল বাম ও দ্বিতীয় চণ্ডাল দক্ষিণ চক্ষুঃ লক্ষ্য করিল। কুণাল দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"তোমরা পত্রখানি আগে দেখাও, তাহার পর যাহা হয় করিও।"

তাহারা বলিল,——

"দেখিয়া আর কি হইবে, কাজ নেথো না।"

"না দেখিলে আমি কিছুই করিতে দিব না।" বলিয়াই তিনি তাহাদের প্রতি এমনি তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন যে তাহাদের হস্ত কম্পিত হইল।

কুণাল উহাদের হস্ত হইতে পত্র লইয়া মস্তকে ছোঁওয়াইয়া পড়িলেন—দেখিলেন তাঁহারই চক্ষু উৎপাটনের আজ্ঞা। দেখিলেন তাহাতে তিষ্যরক্ষার নাম স্বাক্ষর—

পত্রখানি পাঠ করিয়া চণ্ডাল দুই-জনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"তোমরা যাহা আজ্ঞা পাইয়াছ তাহা কর।"

প্রথম চণ্ডাল বলিয়া উঠিল,—

"দেখলে তো, এখন চোখ্ তুলি?"

এই বলিয়া তীর ধনু তুলিল। কিন্তু চোখের দিকে সে আর চাহিতে সাহস করিল না।

ধনুর্ব্বাণ ভূমিতে রাখিয়া কুণালের চক্ষে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়া বাম চক্ষুটী উৎপাটন করিল। কুণাল তখন

"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি,"

"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"

বলিতে লাগিলেন। প্রথম চক্ষু উৎপাটন করিয়াই সে মাতিয়া উঠিল এবং অপর অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইল। তখন দ্বিতীয় চণ্ডাল বলিল,——

"ও চক্ষু আমার, আমি তুলিতে দিব না" এবং কুণালের চক্ষু আবরণ করিয়া দাঁড়াইল। প্রথম চণ্ডাল উহাকে পদাঘাত দ্বারা দূর করিয়া দিয়া কুণালের অপর চক্ষুটীও উপাড়িয়া লইল। পরে চক্ষুদুটী কুড়াইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় দ্বিতীয় চণ্ডালকে আর একটী লাথী মারিয়া গেল।

৬

দ্বিতীয় চণ্ডাল কি ভাবিয়াছিল বলিতে পারি না—সে এপর্য্যন্ত কথা কহে নাই। প্রথম চণ্ডাল চলিয়া গেলে সে কুণালকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"তুমি এখনও সেই মন্ত্র পড়িতেছ?"

কুণাল বলিলেন,——

"হাঁ।"

"তোমার লাগে নাই?"

"অল্প।"

"চোখ্ উপড়াইয়া লইল, অথচ অল্প লাগিয়াছে বলিতেছ কেমন করিয়া?"

কুণাল বলিলেন,——

"আমার তো সামান্য কষ্ট হইল, কিন্তু কত লোক আমা অপেক্ষা কত অধিক কষ্ট পায়?"

"তুমি কি তাই ভাবিয়া এত স্থির থাকিতে পারিয়াছ?"

"হাঁ, তাহাই আমাদের ধর্ম্মের উপদেশ।"

"কি তোমাদের ধর্ম্মের উপদেশ?"

"আপনার কষ্ট মনে করিবে না, কেবল পরের কষ্ট মনে করিবে এবং তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে।"

"এই তোমাদের ধর্ম্ম?"

"হাঁ।"

"তবে আমি চলিলাম।"

কুণাল দেখিতে পাইলেন না, সে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তীর ধনুক অস্ত্রশস্ত্র জবাফুলের মালা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

৭

কিয়ৎক্ষণপরে কুঞ্জরকর্ণ কুণালের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল—বলিল,——

"কুণাল, তোমায় এই গৃহেই অবস্থান করিতে হইবে,—মহারাণীর আজ্ঞা।"

"শিরোধার্য্য" বলিলে কুঞ্জরকর্ণ স্বহস্তে সেই ভূগর্ভস্থ অন্ধকার গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

একাদশ খণ্ড।

পাটলীপুত্রে তিষ্যরক্ষা একাধিশ্বরী। মহামন্ত্রী রাধগুপ্ত তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। উভয়ে পরামর্শ করিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন; দুই এক বিষয়ে মহারাজা অশোকেরও মত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই মাস অতীত হইয়া গেল। পঞ্চম মাসের প্রথমেই সংবাদ আসিল "তক্ষশিলায় কুঞ্জরকর্ণ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছেন।" দুই এক দিন পরে আবার সংবাদ আসিল "কুঞ্জরকর্ণ আবার বিদ্রোহী হইয়া কুণালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।" আবার দুই তিন দিন মধ্যে সংবাদ আসিল "যুদ্ধে কুঞ্জরকর্ণ জয় লাভ করিয়াছে ও কুণাল বন্দী হইয়াছেন।"

যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে সংবাদ আসিতে প্রায় এক মাস লাগে, সুতরাং এই এক মাস কুঞ্জরকর্ণ কি করিতেছে তাহা কেহই জানিতে পারিল না। নগরবাসী লোকদের মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল—

"কুঞ্জরকর্ণ বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে পাটলীপুত্র নগরে আসিতেছে।"

কেহ বলিল—

"ব্রাহ্মণেরা সমস্ত বৌদ্ধ বধ করিতে করিতে আসিতেছে।"

কেহ বলিল—

"মেয়ে মানুষের হাতে রাজ্য দিলে সবই বিশৃঙ্খল হয়।"

কেহ বলিল—

"যখন কুণালকে পরাজয় করিয়াছে, তখন রাজা অশোকের তো কথাই নাই।"

অনেকে পাটলীপুত্র নগর হইতে স্ব স্ব পরিবার স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে লাগিল। কাঞ্চনমালা কুণালের বন্দীত্ব শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইবার জন্য তিষ্যরক্ষার অনুমতি প্রার্থনা করিল—তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল—কিন্তু এবার তাহার প্রাণ বড়ই কাঁদিতেছে—সে আর কাহারও কথা মানিল না। সেই রজনী যোগেই সে তক্ষশিলা যাইবার পথ আশ্রয় করিল। কাঞ্চনমালা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, শুনিয়া নগরের মধ্যে আবার হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল,—

"অশোক রাজার রাজলক্ষ্মী এইবার ত্যাগ করিয়া গেলেন।"

কাঞ্চন যে দুঃখী দরিদ্রদের মাতা পিতা ছিলেন, কাঞ্চন যাওয়া অবধি তাহারা সর্ব্বদাই অশোক রাজাকে গালি দিতে লাগিল—কেহ কেহ উঁহার অনুসন্ধানার্থ তক্ষশিলার পথে গমন করিতে লাগিল, কিন্তু কাঞ্চনের সন্ধান পাওয়া গেল না।

পাটলীপুত্র হইতে বহু সংখ্যক সৈন্য আবার প্রেরিত হইল। তাহারা কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই সংবাদ আসিল "তাহারা কুঞ্জরকর্ণের সহিত যোগ দিয়াছে।" তখন নগরবাসীদের ভয়ের আর সীমা রহিল না। তাহারা সকলে তিষ্যরক্ষার প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে গিয়া মহা চীৎকার করিতে লাগিল—বলিতে লাগিল—

"শত্রু তো এলো, নগরের রক্ষার উপায় কি?"

তিষ্যরক্ষা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে গালি দিতে দিতে অশোক রাজাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। মহারাজা অশোক তখন নগর হইতে অনেক দূরে বেণুবনে উপগুপ্তের সহিত বাস করিতেছিলেন—সমস্ত লোক গিয়া তথায় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং তাঁহাকে এই অভাবনীয় বিপদের সময় স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন অশোক, রাধগুপ্ত ও তিষ্যরক্ষার প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

২

অশোক আসিতে আসিতে নগরবাসীদের মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন। কাঞ্চন ও কুণালের অবস্থা

শুনিয়া তাঁহার মনের উদ্বেগ আরো বৃদ্ধি হইল। তিনি রাজবাটীর দ্বার হইতে আশ্বাস বাক্যে প্রজাদিগকে বিদায় দিয়া প্রথমেই তিষ্যরক্ষার মহালে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, তিষ্যরক্ষা ও রাধগুপ্ত কি পরামর্শ করিতেছে। রাজা রাধগুপ্তকে দেখিয়া বলিলেন—

"কুঞ্জরকর্ণ নাকি সসৈন্যে আসিতেছে?"

রাধগুপ্ত বলিল—

"কুঞ্জরকর্ণ তক্ষশিলায় জয়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু সে তক্ষশিলা হইতে বহির্গত হইয়াছে এরূপ সংবাদ আমরা পাই নাই।"

"কুণালের কি হইয়াছে? কাঞ্চন কোথায়? তোমরা এত দিন সৈন্য পাঠাও নাই কেন? যে সব সৈন্য পাঠাইয়াছ তাহাদেরই বা সংবাদ কি? আমি তো এপর্য্যন্ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

রাজা এত দ্রুত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন যে রাধগুপ্ত কিছুরই জবাব দিতে পারিল না। রাজা যে এসময় উপস্থিত হইবেন তাহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। রাজা প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া আরো ব্যস্ত হইয়া আরো লক্ষ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—এমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া তিষ্যরক্ষাকে সংবাদ দিল "যে তক্ষশিলা হইতে একজন বিজ্ঞানবিৎ আসিয়াছে। সে বলে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

রাজা বলিলেন;—

"তক্ষশিলা হইতে?" কঞ্চুকী রাজাকে দেখিয়াই আভূমি প্রণত হইয়া বলিল,—

"মহারাজের জয় হউক।"

"জয় পরে হবে, সেলোক কি তক্ষশিলা হইতে আসিয়াছে?"

কঞ্চুকী বলিল—,

"আজ্ঞা হাঁ।"

"তাহাকে লইয়া আইস।" মন্ত্রী নিষেধ করিয়া কঞ্চুকীকে বিদায় দিয়া বলিল,—"দূতের সহিত সাক্ষাতের এ সময় নহে, বিশেষ মহারাণী ক্লান্ত আছেন।"

রাজা রাধগুপ্তের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—

"তুমি মহারাজের আজ্ঞা পালন কর।"

কঞ্চুকী শশব্যস্তে বিজ্ঞানবিৎকে আনিতে প্রস্থান করিল। মন্ত্রী বলিল,—

"মহারাজ, আপনার রাজ্যারম্ভের আর অল্প দিনই আছে।"

রাজা বলিলেন,—

"অল্প দিন আছে, তাহা জানি, কিন্তু সে কথা স্মরণ করিয়া দিবার তাৎপর্য্য?"

"এই কয় দিন মহারাণীকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে না দিলে আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে।"

"তত দিনে মগধ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইবে?" রাজা এই কথা বলিতেছেন এমন সময়ে কঞ্চুকী বিজ্ঞানবিৎকে লইয়া উপস্থিত হইল এবং মহারাণীর

সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বিজ্ঞানবিৎ আপন বস্ত্র মধ্য হইতে একটী বাক্স লইয়া রাণীর হস্তে দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি তক্ষশিলা হইতে আসিতেছ?"

সে বলিল,—

"হাঁ"।

সে রাজার কথায় আর কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল,—

"দেবি, এই দুইটী চক্ষু লইয়া আসিতে আমার যে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে বলিতে পারি না। রাজপথে বিশল্যকরণী মিলে না। সুতরাং আমাকে——

চক্ষুর কথা শুনিয়া তিষ্যরক্ষা শিহরিয়া উঠিল, বাকসটী খুলিল, খুলিয়া চক্ষু দুটী বাহির করিল—দেখিল সে চক্ষু এখনও তেমনি উজ্জ্বল—সে উহা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পাতিত করিয়া পদতলে দলিত করিল—করিয়াই ব্যস্ত সমস্ত ভাবে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। রাজাও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন এ চোক কাহার কোথা পাইলে? কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনার পথের কষ্টের কথা বলিতেছিল সে বিশল্যকরণী অন্বেষণ করিবার জন্য কখন সাপের মুখে পড়িয়াছে কখন বাঘের মুখে পড়িয়াছে; নহিলে সে চক্ষু টাটকা থাকে না ইত্যাদি বলিতে ছিল।

রাণী চলিয়া গেলে রাধগুপ্ত তাহাকে বলিলেন,—

"থাম, দেখিতেছো না রাণীর অসুখ হইয়াছে? তোমায় এ সময় কে আসিতে বলিয়াছিল?"

সে বলিল,—

"আমি কি করিয়া জানিব? আমায় একজন অনেক টাকা দিয়া ঐটী মহারাণীর হস্তে দিতে বলিয়াছিল। আরো বলিয়াছিল যে মহারাণীর হাতে দিলে তিনি অনেক পুরস্কার দিবেন।"

রাজা বলিলেন,—

"কে সে লোক?"

বিজ্ঞানবিৎ বলিল,—

"তাহা আমি জানি না। আমার বিজ্ঞানের অনেক পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহাতে আমার অনেক টাকার প্রয়োজন। সে আমায় টাকা দিল এবং আরো পাইবার আশা দিল—আমি লইয়া আসিলাম।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে সে তুমি তাহাকে চেনো?"

সে বলিল,—

"না।"

"তুমি আসিতেছ কোথা হইতে?"

"বাসুকীশীল হইতে।"

"সে কোথায়?"

"তক্ষশিল হইতে আট ক্রোশ পূর্ব্বে।"

"সেখানকার বিদ্রোহের কি সংবাদ জান?"

"বিদ্রোহ কোথায় ?"

"তক্ষশিলায়।"

"হাঁ, একটু একটু জানি। পাঁচ ছয় মাস হইল, কতকগুলি কাটা পা ঘোড়া দিয়াছি। শুনিয়াছিলাম বিদ্রোহে তাহাদের পা কাটা গিয়াছিল।"

রাজা দেখিলেন, উহার নিকট হইতে কোন সংবাদই পাওয়া গেল না; জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি কি পরীক্ষার জন্য এত টাকা চাও ?"

সে বলিল ;—

"অন্ধত্ব দূর করিবার জন্য।"

রাজা বলিলেন,——

"অশোক সিংহাসনে আরূঢ় হইলে আসিও, তিনি তোমার পুরস্কার করিবেন।"

"মহারাণী আমায় পুরস্কার কই দিলেন ? আমি কি অশোকের অভিষেক পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিব ?"

"থাকিলেই বা হানি কি ?"

"তাহাও যদি ঠিক জানিতাম যে নিশ্চয় হইবে, না হয় দুপাঁচ দিন থাকিতাম। কিন্তু যে একবার আপন রাজ্য পরকে, বিশেষ স্ত্রীলোককে দেয় সে কি আর উহা ফিরিয়া পায় ?"

মন্ত্রী তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন,—

"তুমি তো বড় অর্ব্বাচীন। তুমি জান কাহার সহিত কথা কহিতেছ ?"

সে বলিল—

"জানি আর নাই জানি, সত্য কথা যমের সাক্ষাতেও কহা যায়।"

মন্ত্রী বলিলেন—

"তুমি এখন অতিথিশালে যাও, আমি রাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার পুরস্কারের ব্যবস্থা করিব।"

"কিন্তু আমি অধিক দিন থাকিতে পারিব না।"

"আজিই ব্যবস্থা করিব" বলিয়া মন্ত্রী তাহাকে বিদায় দিলেন।

৪

বিজ্ঞানবিৎ চলিয়া গেলে রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এ সব কি ?"

মন্ত্রী গললগ্নীকৃতবাস হইয়া রাজার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন—

"মহারাজ, এ কয়দিন আমায় কিছু বলিবেন না। আমি আপনারই ভৃত্য। আপনিই আমাকে অন্য হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। আপনি জানেন, রাজ্যের কার্য্য অতি দুরূহ। এ কয়েক দিন আমার প্রভুর অনুমতিতে আপনাকে কোন কথা বলিতে পারিব না।"

রাজা বলিলেন—

"সাধু, কিন্তু নগরবাসীদের ভয় নিবারণের কি উপায় করিয়াছ ?"

"তাহাও মহারাণীর ইচ্ছা।"

এই সময়ে আবার তক্ষশিলা হইতে দূত আসিল। কুণাল বন্দী হওয়ার পর তাঁহার সৈন্যেরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কেহ বিদ্রোহে যোগ দিতেছে, কেহ দেশীয়

লোকদের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। শীঘ্র সৈন্য ও সেনাপতি না পাঠাইলে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ হইবে। এই সংবাদ লইয়া উভয়েই দ্রুতগতি রাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখনও তাহার মনের আবেগ শান্ত হয় নাই। সে হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিয়া উহাদিগকে পুনরায় সেই প্রকোষ্ঠে অপেক্ষা করিতে বলিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই তথায় আসিয়া মহারাজকে সম্বোধন করিয়া কহিল—

মহারাজ, আমার আর রাজত্বে কাজ নাই। আমি স্ত্রীলোক। রাজ্য চিন্তা আমার পক্ষে বড়ই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

মন্ত্রী তখন বার বার রাণীর শরীরের অসুখের কথা কহিতে লাগিল—"এ দিন শিরঃপীড়া হইয়াছিল, ও দিন ভ্রমি হইয়াছিল, সেদিন মূর্চ্ছা হইয়াছিল, আজিও তো দেখিলেন" ইত্যাদি।

রাজা বলিলেন—

"রাজ্যভার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

অমনি রাধগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন—

"তবে আপনি প্রধান মন্ত্রী হইয়া আমায় অব্যাহতি দিন।"

"রাধগুপ্ত থাকিতে অন্য কেহ মন্ত্রী।"

রাণী বলিলেন——

"তবে এই গোলযোগের সময় আপনি সেনাপতি হন।"

রাজা বলিলেন———

"সেই ভাল। আমি নগরবাসীদিগকে শান্ত করিয়া তক্ষশিলায় যাত্রা করিব। যাবৎ না ফিরিয়া আসি তোমরা যেমন রাজ্য করিতেছিলে তেমনি রাজ্য কর।

জীবন ও পরলোক।

মৃত্যুতে ও মৃত্যু নাই, ইহলোকের পর পরলোক আছে—মানুষ চিরকাল এইরূপ বুঝিয়া আসিতেছে, বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, আশা করিয়া আসিতেছে।

এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস, এই আশা কি অমূলক? মৃত্যু কি সত্যই মৃত্যু? ইহলোকের পর কি পরলোক নাই?

অসভ্য আদিম অবস্থাপন্ন মানুষ কেন পরলোক বিশ্বাস করে ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয় তাহারা নিজেও বুঝিতে এবং বুঝাইতে পারে না। কিন্তু সেই জন্যই বোধ হয় যে পরলোকবাদ নিতান্ত অমূলক নয়। কেহ কেহ বলেন যে অসভ্য মনুষ্য অনেক সময়েই ক্রোধ ভয় প্রভৃতি প্রবৃত্তির তাড়নায় বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস করিয়া থাকে, অতএব অসভ্য মনুষ্য প্রায়ই কুসংস্কারপরতন্ত্র (superstitious)। কিন্তু ক্রোধই বল

আর ভয়ই বল, অসভ্যাবস্থার প্রবৃত্তি মাত্রই স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন, শিক্ষার ফল অথবা শিক্ষা দ্বারা বিকৃত নয়। তবে কেমন করিয়া বলি যে অসভ্যের পরলোকবাদ কুসংস্কার মাত্র? অসভ্য মনুষ্যের বিশ্বাস অনেকস্থলে ভ্রান্তিমূলক হইয়া থাকে সত্য। অসভ্য মনুষ্যরা চিত্রিত মনুষ্যমূর্ত্তিকে জীবিত মনুষ্য বলিয়া বুঝিয়া থাকে। কিন্তু অসভ্য মনুষ্যের যে সকল বিশ্বাস,ভ্রান্তি অথবা শিক্ষাভাবের ফল, সে সকল বিশ্বাস সভ্যতা অথবা শিক্ষার প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু মনুষ্যের অসভ্যাবস্থার যে সকল বিশ্বাস তাহার সভ্য অথবা শিক্ষিত অবস্থাতেও থাকিয়া যায় সে সকল বিশ্বাসকে কেমন করিয়া অমূলক, ভ্রান্তিমূলক বা কুসংস্কারমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিই? অধিকন্তু যে বিশ্বাস অনেক শিক্ষা, অনেক উন্নতি, অনেক পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, থাকিয়া যায়, তাহা সত্য হওয়াই সম্ভব। স্থিতিশীলতা অসারতার গুণ নয়, সারত্বের গুণ। অপরপক্ষে আমি এইরূপ বুঝি যে মানুষের কুসংস্কার প্রায়ই কুশিক্ষার ফল এবং সেই জন্য প্রকৃত কুসংস্কার মানুষের শিক্ষার পূর্ব্বগামী অবস্থার লক্ষণ হইতেই পারে না। আদিম অসভ্য অবস্থায় মানুষ শিক্ষাধীন* থাকে না। অতএব শিক্ষিত অথবা সভ্য অবস্থার কোন বিশ্বাস বা সংস্কার অশিক্ষিত অথবা অসভ্যাবস্থায় দেখিতে পাইলে তাহার সারত্ব এবং বিশুদ্ধতা বিষয়ে অনেকটা স্থিরনিশ্চয়তা জন্মে। মনুষ্যের পরলোকবাদ সেই শ্রেণীর বিশ্বাস। পরলোকবাদ উড়াইয়া দিবার জিনিস নয়। কিন্তু অসভ্যের পরলোকবাদের হেতু ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। অতএব সে বিষয়ে আর কিছু বলিব না।

মোটা মুটি বলিতে গেলে,শিক্ষিত অথবা সভ্য মনুষ্যের পরলোকবাদের তিনটি হেতু আছে। প্রথম, বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা; দ্বিতীয়, কর্ম্মফলভোগ; তৃতীয়, আত্মার অমরতা। মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা এতই প্রবল যে মৃত্যু হইলে সমস্তই লয় হইবে, এইরূপ ভাবিতে মানুষের যথার্থই হৃৎকম্প হয়। কিন্তু মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা বলবতী বলিয়া মানুষ মরিয়াও মরিবে না, ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে থাকিবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। মানুষের নিতান্ত ইচ্ছা যে তাহাকে মরিতে না হয়। কিন্তু মরিতে ইচ্ছা হয় না বলিয়া মানুষ অমরতা লাভ করে না। তবে মনুষ্যের মধ্যে অনেক মহাপুরুষ এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ যুক্তিও প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যথা মহাকবি মিল্টন লিখিয়াছেন :—

——————Who would lose,
Though full of pain, this intellectual being,
Those thoughts that wander through eternity,
To perish rather, swallow'd up and lost
In the wide womb of uncreated night,
Devoid of sense and motion?

* শিক্ষা শব্দে এখানে শাস্ত্রবেত্তার উপদেশ অথবা পুস্তকলব্ধ জ্ঞান বুঝিতে হইবে।

মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার যে বলবতী ইচ্ছা আছে মহাকবি তাহাই প্রধানতঃ ব্যক্ত করিয়াছেন সত্য। কিন্তু তাঁহার উক্তিতে একটু যুক্তিরও আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যেন তর্ক করিতেছেন যে, উন্নত জ্ঞানময় অস্তিত্ব এবং অনন্তভেদী অনন্তবিহারী চিন্তার ন্যায় উত্তম পদার্থ কি লয় হইতে পারে? আমরা যতদূর বুঝি এবং বৈজ্ঞানিক দার্শনিকেরা আমাদিগকে যতদূর বুঝাইতে পারিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট উদ্ভাবন করা এবং অধমকে নষ্ট করিয়া উত্তমকে রক্ষা করা জাগতিক শক্তির অভীষ্ট কার্য্য। কিন্তু উত্তমও ত বিনষ্ট হয়? সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহও ত ছাই হইয়া যায়? তবে কেমনে করিয়া জোর করিয়া বলি যে চিন্ময় অস্তিত্ব উত্তম জিনিস বলিয়া তাহার বিনাশ নাই?

দ্বিতীয় কারণ কর্ম্মফলভোগ প্রথম কারণ অপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কর্ম্মের ফলভোগ অপরিহার্য্য, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আগুনে হাত দিলে হাত অবশ্যই পুড়িবে এবং দুর্নীতি অনুসরণ করিলে জীবন অবশ্যই কদর্য্য হইবে। কিন্তু কর্ম্মের ফলভোগ আছে বলিয়া পরলোকও আছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ দেখা যায় না। অনেক অধার্ম্মিক দুর্নীতিপরবশ লোককে ইহলোকে সুখভোগ করিতে দেখা যায় বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে তাহারা পরলোকে তাহাদের দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিবে। কিন্তু বুঝা আবশ্যক যে অধার্ম্মিক এবং দুর্নীতিপরবশ হইলেই মানুষের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব ও বিকৃত হইয়া যায়, বিশাল এবং বিশুদ্ধ মনুষ্যত্ব লাভে যে উৎকৃষ্টতম সুখ ও সৌন্দর্য্য মানুষ তাহা ভোগ করিতে পায় না—মানুষ তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। তাহাই কি দুষ্কর্ম্মান্বিত মানুষের দুষ্কর্ম্মের যথেষ্ট ফলভোগ নয়? অনেক ধার্ম্মিক লোক ক্লেশ পাইয়া মরে সত্য; কিন্তু ধার্ম্মিকের সুখ মনে, সম্পদে নয়। অতএব কর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত পরলোক কত প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারি না। আরো এক কথা। দেখিতে পাওয়া যায় যে সুখ দুঃখের কারণ অনেক স্থলে উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে উদ্ভূত হয়, লোকের নিজের নিজের সৃষ্ট নয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের ফলভোগের নৈতিক হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না এবং পরলোকেরও প্রয়োজন থাকে না। তবে যদি বল যে প্রত্যেক সৎকর্ম্ম এবং অসৎকর্ম্ম শক্তির ফল, এবং শক্তির বিনাশ নাই, তাহা হইলে কথাটি কিছু গুরুতর হইয়া উঠে। কেন না তাহা হইলে কর্ম্মের ফল বিনষ্ট হইতে পারে না এবং অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু বোধ হয় অনেকে বলিবেন যে তাহা হইলেও একটু গোল থাকে। কেন না কর্ম্মের ফল শক্তিরূপ বলিয়া যদিও বিনষ্ট হইবার নয়, তথাপি কর্ম্মফলরূপ শক্তি

যে কর্ম্মকর্ত্তাতেই আবদ্ধ থাকিবে, তাহাকে ছাড়িয়া অপর কাহাকেও অধিকার করিবে না, এমন কোন কথাই নাই। কথা নাই সত্য। কিন্তু কর্ম্মফল কর্ম্মকর্ত্তাকে ছাড়িয়া অপর কাহাকে অধিকার করিলে, সেই অপর ব্যক্তিই কর্ম্মকর্ত্তার পরলোক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বস্তুতঃ, ইদানীন্তন ইউরোপীয় দার্শনিকেরা কর্ম্মফলবাদ হইতে এই প্রকারেই পরলোকবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। যথা জর্ম্মাণ দার্শনিক ফেকনর:—*

Every person, in his lifetime, takes hold of, and grows into the minds of others, by his words and works, spoken, written, or acted. While Goethe was still alive thousands of his cotemporaries bore within them some sparks from the light of his genius, which afterwards kindled up into new light. While Napoleon was still alive, his powerful genius exercised its influence on the whole generation almost, and when the one and the other died, the germs which had fallen into other minds, did not die with them, they grew, and developed themselves, constituting in their total an individual being, as their origin had been from an individual.

কর্ম্ম ও শক্তি একই বস্তু; শক্তির বিনাশ নাই। অতএব ঠিক পৌরাণিক পদ্ধতিতে না হউক, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরলোক কর্ম্মফলবাদের অপরিহার্য্য ফল। কিন্তু লোকে যাহাকে পরলোক বলে, এ সে পরলোক নয়। না হইলেও এ কথা বলিতে পারি যে লোক সাধারণের শিক্ষার যত উন্নতি হইবে এই সিদ্ধান্ত ততই তাহাদের হৃদয় অধিকার করিবে; ততই তাহাদের ধর্ম্মনীতি পরলোকমূলক হইবে; ততই পৃথিবীতে ইহলোক এবং পরলোক, ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়িবে; এবং ততই কালের স্রোত প্রেমের স্রোত হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু পরে যাহা লিখিতেছি তাহা বিবেচনা করিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যাইবে যে এ পরলোক নিতান্তই অঙ্গহীন, অসম্পূর্ণ এবং অতৃপ্তিকর।

আত্মা কোন একটা স্বতন্ত্র জিনিস কি না, এবং দেহ মন সমস্ত নষ্ট হইলে আত্মা জীবিত থাকিবে কি না, বলিতে পারি না। বহুকাল হইতে মানুষ সেইরূপ বুঝিয়া আসিতেছে বটে এবং বুঝিবার হেতুও দর্শাইয়া আসিতেছে। বিশেষ প্রাচীন ভারতবর্ষে যোগশাস্ত্রদ্বারা আত্মার স্বাধীনতা এবং অমরতা এক রকম কার্য্যতঃ প্রতিপন্ন হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু সে সকল কথা এখন ভাল বুঝা যায় না। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে যে আত্মার স্বাধীনতার এবং অমরতার প্রমাণ পাওয়া কঠিন। অপরপক্ষে আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রকারে জীবন-তত্ত্ব বুঝাইয়া থাকেন তাহা বিবেচনা করিতে গেলে দেহ

* "Life after Death" নামক গ্রন্থ, ২০পৃষ্ঠা।

হইতে আত্মার স্বতন্ত্র জীবন একেবারেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা বলেন, যেখানে স্নায়ু অথবা স্নায়ব প্রণালী নাই সেখানে চিন্ময় জীবন নাই। মরিলে স্নায়ব প্রণালী ধ্বংস হইয়া যায়, অতএব মরিলে আত্মা কি অপর কিছুই জীবিত থাকিতে পারে না। আত্মার স্বাধীনতার এবং অমরতার প্রমাণ যে নাই তাহা আমরা জানি। অতএব আত্মার স্বাধীন জীবন প্রমাণ কি অপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক জীবন-তত্ত্বের উল্লেখ করি নাই। যে কারণে উল্লেখ করিয়াছি পরলোকবাদের সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। বৈজ্ঞানিকের জীবন-তত্ত্ব পরলোকবাদের প্রতিকূল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের জীবন-তত্ত্বে একটী বিষম ভ্রম আছে। সেই ভ্রমটি বুঝাইয়া পরলোক প্রমাণ করিব।

জীবন কি? অথবা জীবন কিসে থাকে, কিসে হয়? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক অনেক রকম চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হয়েন নাই। কৃতকার্য্য না হইবার একটি প্রধান কারণ এই যে যাঁহারা এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এক একটি পদার্থ বিশেষকে জীবনের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে জীবন তাপ বই আর কিছুই নয়। কেহ বলিয়াছেন জীবন তাড়িৎ বই আর কিছুই নয়। কেহ বলিয়াছেন জীবন স্নায়ব প্রণালী বই আর কিছুই নয়। কেহ বলিয়াছেন জীবন কোন একটি স্বতন্ত্র শক্তি বিশেষ। কিন্তু একটু নিবিষ্ট ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে জীবন কোন একটি পদার্থ বা শক্তি বিশেষ নয়; জগতে যাহা কিছু আছে সকলই জীবন। যাহা না থাকিলে বা না পাইলে জীবন থাকে না তাহাই জীবন। স্নায়ব প্রণালী না থাকিলে মানুষের জীবনের ক্রিয়া হয় না সত্য। কিন্তু স্নায়ব-প্রণালী থাকে কেমন করিয়া? পানাহারের জোরেই স্নায়ব-প্রণালী থাকে কি না? যদি তা হয়, তবে যাহা পানাহার করিলে স্নায়ব প্রণালী থাকে তাহাকেই জীবন বলিয়া স্বীকার করা উচিত কি না? দেহে যত ধাতু বা মৌলিক পদার্থ, (elementary substance) আছে সকলই জীবন এবং সেই সকল ধাতু বা মৌলিক পদার্থ যাহাতে আছে তাহাই আমাদের জীবন। আবার মানুষ ছাড়িয়া পশু, পশু ছাড়িয়া পক্ষী, পক্ষী ছাড়িয়া সরীসৃপ, সরীসৃপ ছাড়িয়া কীটপতঙ্গ, কীটপতঙ্গ ছাড়িয়া মৎস্য, মৎস্য ছাড়িয়া উদ্ভিদ, এইরূপ পৃথিবীতে যত জীবিত বস্তু আছে, সকলের পুষ্টিসাধক জীবনপোষক বস্তুই জীবন। যখন অনাহারে মৃত্যু হয় তখন যাহা আহার করা যায় তাহাই জীবন। যখন তৃষ্ণায় অশান্তিতে মৃত্যু হয়, তখন যাহা

পান করা যায় তাহাই জীবন। যখন শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হয় তখন যাহা নিশ্বাসিয়া লওয়া যায় তাহাই জীবন। কিন্তু জগতে এমন কোথায় কি আছে যাহা আহারীয় নয়, পানীয় নয়, অথবা নিশ্বাসিয়া লই-বার নয়? অতএব জগতে এমন কোথায় কি আছে যাহা জীবন নয়? এইটি জীবন-তত্ত্ব বুঝিবার প্রকৃত পদ্ধতি। এবং এই পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে জগতে এমন কিছুই নাই যাহা জীবন নয়, কেন না জগতে এমন কিছুই নাই যাহা জীবন-সাধন এবং জীবনপোষক নয়,—ধূলা ও জীবন, মৃত্তিকাও জীবন, জলও জীবন, সূর্য্যা-লোকও জীবন, চাঁদের সুধাও জীবন, দুগ্ধও জীবন, মাংসও জীবন, গোধূমও জীবন, বাতাসও জীবন, পাথরও জীবন, সাপের বিষও জীবন, পচা মৃতদেহও জীবন। বাস্তবিক জগতে মৃতবস্তু বা মৃত্যু নাই—সকলই জীবন। শুধু তাও নয়। জগতে জীবিত ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষ নাই। জগতে যাহা কিছু আছে সমস্ত লইয়া জীবন—যেন সমস্ত জগতের সমস্ত বস্তুতে দুগ্ধস্থিত জলের ন্যায় জীবন হাড়ে হাড়ে মিশিয়া রহিয়াছে, ওতপ্রোত ভাবে প্রসারিত রহিয়াছে। যেন সমস্ত জগৎ একটি বিপুল জীবনময় উচ্ছ্বাস। সমস্ত জগৎ একটি বিশাল জীবন। জগতে যাহা কিছু আছে, সেই বিশাল জীবনের অন্তর্ভূত—সেই বিশাল জীবনে জীবিত। আমার জীবন, তোমার জীবন, সকলেরই জীবন সেই বিশাল জীবনের অন্তর্ভূত। আবার সেই বিশাল জীবনের দৈর্ঘ্য ভূতকালেও অসীম, ভবিষ্যতেও অসীম। অথবা তাই বা কেন বলি? ভূত ভবিষ্যতের বিভাগ কোথায়? জগতের বিশাল জীবনে ছেদ কোথায়? ছেদ হয় কেমন করিয়া? না, জগতের বিশাল জীবনে ছেদ নাই, ছেদ হইতেও পারে না। জগতের বিশাল অনন্ত জীবনের নাম অসীম অনন্ত জগৎ। অসীম অনন্ত জগতের নাম বিশাল অনন্ত জীবন। অসীম অনন্ত জীবনে ইহলোক ও পরলোকের প্রভেদ কি? অসীম অনন্ত জীবনে ইহলোক ও আছে, পরলোকও আছে, সব লোকই আছে। যে বলে, অসীম অনন্ত জীবনে পরলোক নাই, জীবন কাহাকে বলে সে জানে না, জগৎ কাহাকে বলে সে জানে না। এই জীবনরূপী জগতে ইহলোকের পর পরলোক থাকিবেই থাকিবে। কেন না যে খানে জীবন বই আর কিছুই নাই, সেখানে মৃত্যুর স্থান নাই।

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল জীবনে আমি ও জীবন, তুমি ও জীবন। আমার জীবন ও সেই বিশাল জীবনে জীবিত, তোমার জীবন ও সেই বিশাল জীবনে জীবিত। আমি ও সেই বিশাল জীবন ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, তুমিও সেই বিশাল জীবন ছাড়িয়া থাকিতে পার না। তবে আইস আমরা সেই বিশাল

জীবনে মজিয়া থাকি, সেই বিশাল জীবনে মাতালের ন্যায় মাতিয়া থাকি, সেই বিশাল জীবনে প্রেমিকের ন্যায় মরিয়া থাকি। সেই মৃত্যুতেই তোমারও প্রকৃত জীবন, আমারও প্রকৃত জীবন।

রাজা সিতাব রায়।

মুসলমান ও ইংরাজী ইতিহাস লেখকেরা যদি কখন কোন হিন্দুর প্রশংসা করিয়া থাকেন তবে সে সিতাব রায়ের। সিতাব রায় জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয় জাতি নানা ভাগে বিভক্ত। তিনি সুক্সন জাতীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। দিল্লী সাজেহানাবাদে তাঁহার জন্ম হয়। মহম্মদ সার রাজত্বকালে সামসাম উদ্দৌলা আমির উল ওমরা ছিলেন। তিনিই খাঁ দৌরান নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। খাঁ দৌরানের পুত্র সাম সাম উদ্দৌলা দিল্লীর মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ধনী লোক ছিলেন। সিতাব রায় অতি অল্প বয়সে তাঁহার বাড়ীতে চাকরী আরম্ভ করেন। তাঁহার বেতন প্রথমে অত্যন্ত অল্প ছিল। সাম সাম উদ্দীনের দাওয়ান আগা সলিমান সিতাব রায়কে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এবং তিনি সিতাবকে বিষয় কর্ম্মে শিক্ষা দেন; অতি অল্প দিনের মধ্যে সিতাব আপন কার্য্য দক্ষতা বলে আগা সলিমান ও সাম সাম উদ্দীনের বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। যখন সাম সাম উদ্দীনের পরলোক হয় তখন দিল্লীতে ভয়ানক অরাজক, নিত্য রাজপরিবর্ত্তন হইত, বাহিরের লোক দিল্লী আক্রমণ করিত; মহারাষ্ট্রীয়েরা লুঠপাট করিত এবং দিল্লীর ভিতরের ওমরাহদিগের অন্তর্ব্বিবাদে রাজবর্ত্ম সকল রক্তে প্লাবিত হইত। আপনার প্রভুর পরলোক গমনের পর সিতাব দেখিলেন যে দিল্লীতে বাস করিলে নানা বিপদ হইতে পারে, এজন্য তিনি বাদসাহের নিকট বেহার প্রদেশের দাওয়ানী গ্রহণ করেন। এবং মালদহ অঞ্চলে তাঁহার প্রভুর পুত্রের যে জায়গীর ছিল তাহার কর্ত্তা হন। বাদসাহ তাঁহার গুণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রোটাস্ দুর্গের গবর্ণর করিয়া দেন, সুতরাং তিনি এই তিনটী কর্ম্ম লইয়া ১৭৫৮ সালে দিল্লী হইতে পাটনা যাত্রা করেন।

এই সময়ে মিরজাফর ইংরাজ বন্ধু-দিগের সহিত পাটনায় অবস্থিতি করিতে ছিলেন; রাজা রামনারায়ণ বিহার প্রদেশের নিজাম ছিলেন; রাজা রাম-নারায়ণের পরম বন্ধু মহম্মদী খাঁ সিতাব রায় যে তিন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন সেই তিন কর্ম্ম করিতে ছিলেন। সিতাব

পাটনায় উপস্থিত হইয়াই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পদপ্রাপ্তি নিতান্ত দুরূহ; তিনি অনেক লোকজন সঙ্গে প্রকৃত ওমরাহের ন্যায় অসিয়াছিলেন; তাঁহার কথা বার্ত্তা এবং আচার ব্যবহারে সকলেই প্রীত হইয়াছিল; তিনি প্রথমেই আসিয়া রাজা রামনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার দ্বারাই মিরজাফারের নিকট পরিচিত হইলেন। সিতাবের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ছিল এবং তিনি একজন বিচক্ষণ লোক ছিলেন; তিনি দুই এক দিনের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন যে মিরজাফার আপনার আমোদ লইয়াই ব্যস্ত, রাজকার্য্য বুঝেন না; তিনি আর বুঝিলেন মহম্মদী খাঁর সহিত রামনারায়ণের যেরূপ সদ্ভাব তাহাতে রামনারায়ণ দ্বারা তাঁহার কোন সাহায্য হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তিনি প্রথমেই ইংরাজদিগের সহিত সদ্ভাব করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি নানা প্রকার বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া এবং সর্ব্বদা আনুগত্য করিয়া কর্ণেল ক্লাইবকে বশ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মুরসিদাবাদে আগমন করিলেন। তথায় কর্ণেল ক্লাইব এবং মিরজাফার উভয়ে তাঁহাকে রামনারায়ণের নিকট এই মর্ম্মে এক অনুরোধ পত্র দিলেন যে, "আপনি রাজা সিতাব রায়কে বাদসাহ দত্ত পদ সমূহ প্রদান করিবেন।" রাম নারায়ণ কর্ণেল ক্লাইবের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। এইরূপ নির্ব্বিবাদে সিতাব রায় বেহারের দেওয়ান ও রোটাস্ দুর্গের গবর্ণর হইলেন। বলা বাহুল্য যে ইংরাজদিগের সহায়তা না পাইলে বাদসাহের ক্ষমতা তৎকালে এরূপ লুপ্ত প্রায় হইয়া আসিয়াছিল, যে সিতাবের এতাদৃশ উচ্চ পদ প্রাপ্তি দুরূহ হইয়া উঠিত। দেওয়ানী পাইয়া সিতাব রায় এরূপ দক্ষতা সহকারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, যে অতি অল্প দিনের মধ্যে রামনারায়ণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। বেহার প্রদেশে সিতাব রায়ের প্রাধান্যের এই সূত্রপাত; তিনি এই অবধি বেহারের একজন প্রধান লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

যে সময়ে বাদসাহের পুত্র আলিগোহর বারবার পাটনা আক্রমণ করেন, সে সময়ে সিতাব রায় রামনারায়ণের অবিচলিত বন্ধু ছিলেন এবং সর্ব্বদা ইংরাজদিগের সহায়তা করিতেন তিনি এই গোলযোগের সময় আপনার বাড়ী ও কাছারী রক্ষা করিবার জন্য দুই শত অশ্বারোহী এবং বহু সংখ্যক পদাতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রামনারায়ণের সহিত বাদসাহের যুদ্ধকালে এই সকল লোক তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

এক সময়ে রামনারায়ণ বেহারের অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া অতিকষ্টে পাটনা রক্ষা করিতেছিলেন; পাটনার বাহিরে সমস্ত স্থানই বাদসাহের অধিকৃত হইয়াছিল। এমন সময়ে সহসা সম্বাদ আসিল

পূর্ণিয়ার গবর্ণর কাদিম হোসেন খাঁ। বাদসাহের সহিত যোগ দিয়াছেন এবং পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য লইয়া পুর্ণিয়া হইতে পাটনার অপর পার গাজিপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। রামনারায়ণ একান্ত ভীত হইয়া আমিয়াট সাহেবের কুটীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমিয়াট সাহেব বলিলেন কাপ্তেন নক্সের সহিত তিন দল তেলিঙ্গা ও একদল ইংরাজ সৈন্য আছে, আপনি নগর রক্ষার উপযোগী কয়েক জন মাত্র সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য কাপ্তেনের সহিত প্রেরণ করুন; বাদসাহ হইতে কোন ভয় নাই; তিনি এক্ষণে শীকার খেলিতে মত্ত আছেন। রামনারায়ণ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন; কাপ্তেন নক্স পাঁচশত মাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে কিরূপে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্যর সহিত যুদ্ধ করিবেন। যাহা হউক রামনারায়ণ আপনার প্রধান সেনাপতিকে কাপ্তেন নক্সের সহিত যোগ দিতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি গঙ্গা পার হইলেন, কিন্তু দুই তিন ক্রোশের অন্তরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন যুদ্ধের নামও করিলেন না: তখন কাপ্তেন নক্স রাজা সিতাবরায়কে স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সিতাব তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ করা দূরে থাকুক রাত্রে সিতাবরায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত হইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন আপনি কি বুঝিতেছেন না, রামনারায়ণ আপনাকে ও আমাকে ভালবাসেন না, সেই জন্যই আমাদিগকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতেছেন; কিন্তু সিতাবরায় তাহাতে বিচলিত হন নাই। কাপ্তেন নক্স ও সিতাবরায় দুই প্রহর রাত্রে শত্রুদিগকে আক্রমণের জন্য উদ্‌যোগ করিলেন; কিন্তু তিনটার পূর্ব্বে তাঁহারা শিবির হইতে বহির্গত হইতে পারিলেন না এবং তাঁহারা বহির্গত হইবামাত্রই কাদিম হোসেন তাঁহাদের শিবির লুঠ করিয়া লইলেন এবং এরূপ দক্ষতার সহিত আক্রমণ করিলেন, যে ইংরাজদিগের জিতিবার সম্ভাবনা অতি অল্পই রহিল; এরূপ সহসা আক্রমণ দেখিয়া ইংরাজদিগের কতকগুলি পালকিওয়ালা নদীর তীরে যে কয়েকখানি নৌকা ছিল তাহাতে চড়িয়া পলায়ন করিল; ইংরাজদিগের পলায়নের উপায় রহিল না; পালকিওয়ালারা পাটনায় যাইয়া এই দুর্ঘটনার সম্বাদ দিলে পাটনা শুদ্ধ লোক ভয়ে একান্ত কম্পিত হইয়া উঠিল; মুসলমান ইতিহাস লেখক এই সময় পাটনায় অবস্থিতি করিতেছিলেন।

তিনি পাটনাবাসীদিগের এই সময়ের ভয়ের কথা বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তৎকালে সকলেই ভাবিয়াছিল কাপ্তেন নক্স ও সিতাবরায়ের আর রক্ষা নাই; রাম নারায়ণের এক প্রকার

হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। সহসা দূর হইতে কামানের ধ্বনিশ্রুতিগোচর হইল; সে শব্দে যেন আকাশ ফাটিয়া গেল। সকলেই ভাবিল, যা—এইবার ইংরেজদিগের শেষ হইয়া গেল; কিন্তু উহারই মধ্যে একজন বলিল "যদি আর কামানের শব্দ শুনা যায় তবে জানিব ইংরাজেরা জিতিয়াছে।" বলিতে বলিতে আবার সেইরূপ গগন-ভেদী শব্দ হইল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল; আবার কামানের শব্দ হইল, বারবার কামানের অগ্নি দেখা দিল; কিন্তু সকলেই ভাবিল শত্রুর কামানের আওয়াজ্! এমন সময়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে আমিয়ট্ সাহেবের নামে এক পত্র আসিল। কাপ্তেন নক্স লিখিয়াছেন, "আমরা জয়ী হইয়াছি।" কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘর্ম্ম ও ধূলায় আবৃত হইয়া কাপ্তেন নক্স ও সিতাবরায় পার হইয়া আমিয়ট সাহেবের কুটীতে উপস্থিত হইলেন! নক্স সাহেব বারম্বার বলিতে লাগিলেন "সিতাব রায়ই প্রকৃত নবাব (বীর);" আমি এজন্মে কখন এরূপ বীর দেখি নাই; কিন্তু তখনও রামনারায়ণের বিশ্বাস হইল না যে নক্স সাহেব জিতিয়াছেন; তিনি বলিলেন উহারা পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু তৎপর দিন প্রাতঃকালে সম্বাদ আসিল কাদিম সাহেব পলায়ন করিয়া বেত্তিয়ার রাজার আশ্রয় লইয়াছে; তখন আর সন্দেহ রহিল না; এই অবধি সিতাবরায় একজন বীর বলিয়া গণ্য হইলেন।

তাহার পর বাঙ্গালার কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ইংরাজেরা মিরজাফারকে দূর করিয়া মির কাসিমকে নবাব করিলেন; মির কাসিম ইংরাজদিগকে দূর করিবার জন্য সৈন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন; ইংরাজদিগের আশ্রিত লোকদিগের উপর দারুণ উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। রাজা রামনারায়ণের প্রধান সহায় মুরারি ধরকে কারারুদ্ধ করিয়া ঢাকায় প্রেরণ করা হইল; রাজা রামনারায়ণকে কারারুদ্ধ করিয়া মুরশিদাবাদে লইয়া যাওয়া হইল; তাহার পরই রাজা সিতাবরায়। সিতাবরায়ের উপরও অনেক উৎপীড়ন আরম্ভ হইল; যাহাতে তাঁহার সর্ব্বনাশ হয় তাহারই চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু সিতাবরায় সাহসিক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি কয়েকজন মাত্র বিশ্বস্ত বন্ধুর সহিত বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া নিজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন আমার সম্মান রক্ষার্থ আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিব। এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া নবাব সহসা তাঁহার উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি বাদসাহের নিকট হইতে রোটাসের গবর্ণরি এবং বেহারের দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন এবং সিতাবরায়ের নিকট এই দুই পদের কার্য্যের নিকাশ চাহিলেন। সকলেই বুঝিল এবার আর সিতাবরায়ের

রক্ষা নাই; এই নিকাশের দায়েই মির কাসিম তাঁহার প্রাণ বধ করিবেন। কিন্তু ইংরাজেরা সিতাবরায়ের চির সহায়; কলিকাতার গবর্ণর বান্‌সিটার্ট সাহেব তাঁহার হিসাব নিকাশ লইতে সম্মত হইলেন। সিতাবরায় মেজর কার্ণ্যাকের সহিত কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন; সমস্ত কাগজ পত্র পরীক্ষার পর দেখা গেল, যে সিতাবরায়ের কোন দোষ নাই। তখন ইংরাজেরা তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে "আপনি নবাবের রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া যান।" সিতাব সম্মত হইলেন; ইলিশ ও লবিঙটন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পাটনায় লইয়া গেলেন; তথা হইতে লবিঙটন সাহেব একদল তেলিঙ্গ লইয়া সিতাবরায়কে নিরাপদে বেহারের সীমা পার করিয়া দিয়া আসিলেন।

মির কাসিমের চাকরি ত্যাগ করিয়া সিতাবরায় অযোধ্যায় প্রস্থান করেন, এবং তথায় অল্প দিনের মধ্যে নবাবের সরকারে চাকরি প্রাপ্ত হন এবং নবাবের সর্ব্বাধ্যক্ষ বেণীবাহাদুরের একজন প্রধান প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।

মির কাসিম ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যখন সসৈন্যে অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন সিতাবরায়ের পরামর্শে বেণীবাহাদুর তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এবং মির কাসিমের সহিত সন্ধি করিতে তাঁহার তাদৃশ মত ছিল না। কিছুদিনের পর তিনি মিরজাফার এবং ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে নবাবকে অনুরোধ করেন; তখন নবাব ও বেণীবাহাদুর উভয়ে সিতাবরায়কে মির জাফারের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে খিলাত দেন; মিরজাফার সিতাবরায়কে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করেন।

মেঘদূত।

গতবারের বঙ্গদর্শনে মেঘদূতের সমালোচনায় আমরা কালিদাসের স্বভাববর্ণনা আরম্ভ করিয়াই ছাড়িয়াগিয়াছি। কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে।

হিন্দুগণ স্বভাবকে জীবের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন। তাঁহাদের মতে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক ও উচ্চতর। জড় জগত প্রাণী জগতের তুলনায় অতি তুচ্ছ পদার্থ। তাঁহাদের এই সংস্কার ছিল বলিয়াই সংস্কৃতে বিয়োগান্ত কাব্য জন্মে নাই। পার্থিব ঘটনায় মনুষ্যের ঘোর দুঃখ উপস্থিত হইবে, তাঁহারা একথা সহ্য করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা যেখানে যেখানে দুঃখ ঘটাইয়াছেন, সেই স্থানে সেই স্থানেই আবার

সুখ দেখাইয়া কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। আবার সেই সংস্কারের বশেই তাঁহারা মানুষ জড় জগতের সঙ্গে মিলিয়া—মিশিয়া জড় জগতের শোভা অনুভব করিতেছে, একথা লিখিতে সাহস করেন না। তাঁহারা দেখান, মানুষ উপরে জড় জগত নীচে; মানুষ জড় জগত হইতে ভিন্ন, পৃথক এবং উহার দ্রষ্টা সাক্ষীমাত্র। এরূপ বর্ণনা রঘুবংশে ত্রয়োদশে, শকুন্তলায় সপ্তমে, ভবভূতির মহাবীরচরিতে শেষ অঙ্কে। সংস্কৃতে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ। ভারবি অর্জ্জুনকে জড় জগতের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু শেষে ঊর্দ্ধে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন; এবং সেইখান হইতেই স্বভাবের উৎকৃষ্ট বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুর মনের গতিই এই। এখন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী কবিগণ মনুষ্যকে এইরূপে জড় জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন সাক্ষী স্বরূপ রাখিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। মেঘদূতের স্বভাব বর্ণনাও তাহাই। মেঘ উচ্চ হইতে পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী, বন, উপনগর, নগরী, কিরূপ দেখিবেন তাহাই লইয়া কবি ব্যস্ত হইয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যে এরূপ বর্ণনা কম। তাঁহাদের এককথা আছে "Bird's eye view". কিন্তু সে অতি সামান্য চিত্রমাত্র। একটী পর্ব্বতেরই না হয় 'Bird's eye view' তাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের কবিরা চিরকালই সমস্ত জগতের Bird's eye view লইয়া থাকেন। তাঁহাদের নায়কেরা সমস্ত জগতের উপর চটিয়া মনুষ্য-সমাজে সুখ না পাইয়া জড় জগতের সহিত মিত্রতা করিতে আসেন না। যখন সুখে বা দুঃখে সমস্ত মন ডুবিয়া যায়, যখন কেবল মন একটী মাত্র বাসনায় মগ্ন হয়, সেই সময় আমাদের কবিরা হয় সুখের বৃদ্ধি বা দুঃখের শমতার জন্য জড় জগতকে আনয়ন করেন। Childe Harolde যে চক্ষে জড় জগত দেখিয়াছেন, সে চক্ষে আমাদের কবিরা জড় জগত দেখেন না। যে মনের অবস্থায়—যেরূপ হৃদয়ের উন্মত্ততায় Skylark কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ অবস্থায়ই আমাদের কবিরা জড় জগতের সঙ্গে মানুষের মনের সম্পর্ক বাধাইয়া দেন। তাহাতে স্বভাবের শোভা দ্বিগুণিত হয়, মনুষ্যের অন্তরের শোভাও বর্দ্ধিত হয়।

কালিদাস এইরূপ উন্মত্ত অবস্থাতেই মেঘকে আনিয়া যক্ষের সম্মুখে ধরিলেন। যক্ষের Spirit মেঘের সঙ্গে সঙ্গে চলিল; সমস্ত স্বভাবে তাহার গাঢ় সহানুভূতি হইল; সম্মুখে দেখিতে যক্ষ মেঘকে পথ দেখাইয়া দিতেছেন, কিন্তু যক্ষও সেই পথে যাইতেছেন। মেঘ যেন যক্ষের আত্মা। সে যেন পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া মেঘ হইয়া যাইতেছে; যাইবার সময় মেঘদূত খানি মনে মনে লিখিয়া যাইতেছে। সে যেন দেখিতেছে, দূরে নর্ম্মদা উপলবিষম বিন্ধ্যপাদে

বিশীর্ণ হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু তাহার প্রিয়া কত দূরে। রেবা দেখা যায় কিন্তু যক্ষপ্রিয়া লোচনের অদৃশ্য। এইরূপে ক্রমে দক্ষিণ হইতে উত্তর কৈলাস পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ দেখাইয়া, কালিদাস মেঘকে অলকায় লইয়া গেলেন। অলকা সুখপুরী; সে পুরীর কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাহার পর সেই পুরীর মধ্যে যক্ষের বাড়ী; আর সেই বাড়ীর মধ্যে সেই "তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা" রমণী। সে কি অবস্থায় আছে? যক্ষ বলিতেছেন, "মেঘ তুমি দেখিবে প্রিয়া হয় আমার মঙ্গলের জন্ত পূজা করিতেছে, না হয় বিরহে আমি কত কৃশ হইয়াছি মনে মনে ভাবিয়া আঁকিতেছে; অথবা সারিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে 'সারিকে' তুই তো তাঁহার বড় প্রিয় ছিলি, তাঁর কথা কি তোর মনে হয়?' না হয় মলিন বসনের উপর ক্রোড়ে বীণা ধরিয়া আমার কথায় গান বাঁধিয়া গাইতেছে, আর নয়ন-জলে বীণার তার ভিজিয়া উঠিতেছে; আর অন্যমনে সুর ভুলিয়া যাইতেছে; অথবা ফুল দিয়া বিরহের আর কয় মাস আছে তাহাই গণিতেছে।" আহা! সে যখন কৃশশরীরে সেই দুগ্ধ ফেন-ধবল শয্যায় এক প্রান্তে শুইয়া থাকিবে, তোমার বোধ হইবে যেন পূর্ব্ব আকাশে এককলা মাত্র চন্দ্রের উদয় হইয়াছে।"

এইখানে যক্ষরাজ তাঁহার প্রিয়াকে যে নিজ বিরহের সংবাদ দিয়াছেন, তত কোমল, তত মধুর, তত গভীর ভাব, বোধ হয় আর কখন কোন কবির হাত দিয়া বাহির হয় নাই। উইল্‌সন সাহেব বলিয়াছেন, "We have few specimens either in classical or in modern poetry of a more genuine tenderness or delicate feeling." ইহা পাশ্চাত্য কবির কল্পনার অতীত। যক্ষের সংবাদ এইরূপে আরম্ভ হইতেছে; যক্ষ বলিলেন, "তুমি যখন যাইবে, তখন যদি সে নিদ্রা গিয়া থাকে, তাহাকে জাগাইওনা; কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিও; নিদ্রা হইলে সে নিশ্চয়ই আমার স্বপ্ন দেখিবে, তাহার সে সুখের ব্যাঘাত করিও না। তাহার পর জাগিয়া উঠিলে তাহাকে এই মাত্র বলিও, যে, 'আমি তোমার স্বামীর মিত্র মেঘ; তাঁহার সংবাদ লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। বিরহী প্রবাসিদিগের মন আমি প্রিয়ার জন্য উৎসুক করি; ও ত্বরায় তাহাদিগকে প্রিয়সন্নিধানে প্রেরণ করি।' এই কথা বলিলেই সীতা যেমন এক মনে হনূমানের কথা শুনিয়াছিলেন, সেই রূপ সে তোমার কথা শুনিবে। তাহার পর বলিবে 'সে মরে নাই; সে তোমার কুশল সংবাদের জন্য লালায়িত হইয়াছে; তাহার অঙ্গ ক্ষীণ হইয়াছে; সে কেবল মনে মনে তোমার ক্ষীণ অঙ্গ কল্পনা করিতেছে; আর মনে মনে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে। সাদৃশ্য

দেখিলে মনের তৃপ্তি হয়। সে শ্যামা-মৃগে তোমার শরীরের সাদৃশ্য দেখে; চকিত হরিণী-নয়নে তোমার নয়নের সাদৃশ্য দেখে। কিন্তু হায়! তোমার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য কিছুতেই নাই। প্রতিকৃতি দেখিলে মনের কষ্ট নিবারণ হয়! সে অনুরাগে তোমার ছবি পাথরে আঁকিয়া যেমন তাহার পদতলে পড়িতে যায়, অমনি নয়নের জলে তাহার দৃষ্টি লোপ হয়। তাহার পর স্বপ্নে যদি কখন তোমার সাক্ষাৎ লাভ হয়, সে তোমায় আলিঙ্গন করিবার জন্য স্বপ্নে হস্ত প্রসারণ করে, আর তাই দেখিয়া বনদেবীগণের নয়ন দিয়া জলধারা নির্গত হয়। এইরূপে তোমার বিরহে সে এক প্রকার অশরণ হইয়া পড়িয়াছে।' মেঘ! তুমি তাহাকে বলিও যেন এই কয় মাস কোন রূপে কাতর না হয়, তাহাকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে বলিও, আশা এখনও যায় নাই, একবার মিলন হইলে মনের সুখে অলকায় সুখ সম্ভোগ করিব।"

এইরূপে মেঘকে সমস্ত সংবাদ দিতে বলিয়া যক্ষের মনে হইল, মেঘকে যে দূত করিয়া পাঠাইব, কিন্তু তাহার অভিজ্ঞান কই? আমি যে উহাকে পাঠাইলাম প্রিয়া তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিবে? তখন যক্ষ কি বলিলেন? অঙ্গুরী খুলিয়া দিলেন, না আর কোন চিহ্ন পাঠাইলেন? তাহা নহে। কালিদাস বুঝিয়াছিলেন মেঘদূতে এরূপ অভিজ্ঞান চলিবেনা। রামায়ণে চলিয়াছিল সত্য, কিন্তু এ প্রেমোচ্ছ্বাসে অঙ্গুরীতে হইবে না। তিনি বলিলেন,

> "ভূয়শ্চাহত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
> নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা।
> সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
> দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি॥"

বলেছেন, তব কান্ত একথা আবার :—

> "পূর্ব্বে একদিন তুমি ছিলে ঘুমাইয়া
> মম কণ্ঠে দিয়া কর, সহসা চীৎকার
> করিয়া কি জন্য কাঁদি উঠিলে জাগিয়া,
> হাসি জিজ্ঞাসিলে বহু, কহিলে স্বপনে
> দেখেছি বিহার তব, ধূর্ত্ত, অন্য সনে।"

অর্থাৎ আমার এই দুঃখের আরম্ভ হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে তুমি এক দিন আমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া শয়ন করিয়াছিলে, তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিয়া উঠিলে, আমি কেন কাঁদিলে বারম্বার জিজ্ঞাসা করায় বলিলে "শঠ! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি তুমি আর এক রমণীর সহিত বিহার করিতেছ।" কি গাঢ় প্রণয়!! কি প্রগাঢ় বিশ্বাস!! আবার ইহাই যক্ষ অভিজ্ঞান স্বরূপ বলিয়া দিলেন। এত সুন্দর ও এত কোমলতার আকর যে মেঘদূত তাহাতেও আর দ্বিতীয় নাই—এই জায়গায় বুঝি কালিদাস বাল্মীকির উপর উঠিলেন। হনুমানের অঙ্গুরী অভিজ্ঞানে আর এ অভিজ্ঞানে যত প্রভেদ, বোধ হয় বাল্মীকি আর কালিদাসেও সেই প্রভেদ।

যেমন মধুর গ্রন্থ, মধুর ভাব, সমস্ত মধুময়, উপসংহারে মেঘের প্রতি যক্ষের

আশীর্ব্বাদ ও তেমনি মধুময়। যক্ষ মেঘকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন "মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ।" আমি আশীর্ব্বাদ করি যেন বিদ্যুতের সহিত তোমার এমন বিরহ না হয়। বিরহ সন্তপ্তের মুখে ইহা অপেক্ষা আর কি আশীর্ব্বাদ হইতে পারে?

পঞ্চভূত।

আজ কাল পাশ্চত্য প্রদেশে অনেক পণ্ডিতগণের যত্নে রসায়ন শাস্ত্র অত্যন্ত পরিপুষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা নানা রূপ পরীক্ষা এবং যুক্তি দ্বারা রাসায়ন শাস্ত্রে পঁয়ষট্টি প্রকার ভূতের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু আমাঁদের আর্য্য পণ্ডিতগণ পাঁচ ভূতে মাত্র বিশ্বাস করিতেন। ইহার কারণ কি? এটী কি তাঁহাদিগের ভ্রম? যে দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের এত উন্নতি হইয়াছিল—যে দেশে বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্বও অনেক পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যে দেশে বৈদ্যুতিক নৈসর্গিক ব্যাপার অবিদিত ছিল না—যে দেশে বৈদ্যুতিক চিকিৎসা—মাদুলি ধারণ প্রভৃতি—আধুনিক উন্নত চিকিৎসা তত্ত্বও পরিজ্ঞাত ছিল—যে দেশে মহাদ্রাবক (Sulphuric Acid) প্রভৃতি কঠিন রাসায়নিক দ্রব্য বিশেষের প্রস্তুত প্রকরণ প্রচলিত ছিল, সে দেশে যে রাসায়ন তত্ত্ব এত অসম্পন্ন ছিল তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।

আর দেখিতে গেলে আধিভৌতিক জ্ঞানের প্রথমাবস্থায় সকল বিষয়কেই বিভিন্ন অথবা বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং সে অবস্থায় পরীক্ষা এবং পরিদর্শন রূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রথা পরিজ্ঞাত না থাকিলেও সমস্ত পদার্থ পাঁচটী মাত্র মূল পদার্থ হইতে উৎপন্ন এরূপ বিবেচনা হওয়া সম্ভব নহে। ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে মনুষ্য অসভ্যাবস্থায় পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করিত—অনেক দেবতার কল্পনা করিত। ক্রমে, জ্ঞানের উন্নতি সহকারে একমাত্র জগতের আদিকারণ ঈশ্বর অনুমিত হইয়াছে। রাসায়নিক শাস্ত্রেও প্রথমে কত যৌগিক পদার্থকে মৌলিক পদার্থ মনে করা হইত। ক্রমে তাহাদিগের গুণানুসন্ধান করিয়া সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা এই সমস্ত পদার্থ হইতে পঁয়ষট্টিটী ভূত অর্থাৎ রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। এখনও কত মৌলিক পদার্থকে যৌগিক পদার্থ স্থির করা হইবে তাহা কে বলিতে পারে? পণ্ডিতবর টেট্ সাহেব তাঁহার unseen universe নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন

যে কালে সমস্ত মৌলিক পদার্থ গুলি যৌগিক পদার্থ স্থির হইবে—এবং সকল গুলিই একমাত্র আদি মৌলিক পদার্থের রূপান্তর মাত্র প্রমাণ করা হইবে। এই বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রথমাবস্থায় বিদ্যুৎ উত্তাপ চুম্বক প্রভৃতি কতক গুলি বিভিন্ন শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইয়াছিল—ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত সে শক্তি গুলিকে একমাত্র আদি শক্তির রূপান্তর মাত্র স্থির করা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানের যতই উন্নতি হইতে থাকে ততই বহুত্ব হইতে একত্বের অনুমান হয়। যখন সকল শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে আধিভৌতিক-জ্ঞানে প্রথমে একত্ব অনুমিত হওয়া সম্ভব নহে, তখন আর্য্যঋষিগণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে আলোচনা না করিয়াই যে এরূপ সমস্ত মৌলিক পদার্থকে পাঁচটী মাত্র আদি পদার্থে পরিণত করিয়াছেন ইহা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব হয়ত কেহ মনে করিবেন, যে আর্য্য ঋষিগণ আশ্চর্য্য প্রতিভা বলে মূলানুসন্ধায়ী যুক্তির দ্বারা (*a priori* reasoning) পঞ্চভূতের কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু একথা কত দূর যুক্তি সঙ্গত? এই পঞ্চভূত তত্ত্ব আমাদের অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য।

মনুষ্যদিগের আদিমাবস্থা অন্বেষণ করিলে বুঝা যায় যে জ্ঞানের প্রারম্ভে প্রায় সকল জাতিই, ভূমি, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারিটী ভূতে বিশ্বাস করিয়াছে। রাক্তম গ্রীক ও রোমানেরাও এই কথা বলিয়া গিয়াছে। সভ্য ইউরোপ হইতেও এ বিশ্বাস প্রায় দুই শত বৎসর মাত্র তিরোহিত হইয়াছে। সুতরাং যখন এই বিশ্বাস প্রথমে সর্ব্ব-জাতি-সম্মত ছিল, তখন ইহার মূল কারণ কি—আর তখন ইহার কি অর্থ ছিল?

প্রথম যখন মনুষ্যের মন হইতে অজ্ঞানান্ধকার ক্রমে ক্রমে দূর হইতে লাগিল, তখন আত্মদৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন আমি কে, কিরূপে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, কি করিয়াই বা জীবিত আছি, মরিয়াই বা কোথায় যাইব, আর আমার সহিত অনন্ত অপরিজ্ঞাত জগতের আদিকারণের সহিতই বা কি সম্বন্ধ—এই সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান মনে প্রথমে সঞ্চার হইল। যখন আমাদের শরীর কিসে গঠিত—কিরূপেই বা রক্ষিত হয়—মনে হইল, তখন বাহ্য জগতের দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখিল যে নিশ্বাসই আমাদের জীবন, নিশ্বাস বন্ধ হইলেই মৃত্যু হয়, আর বায়ুদ্বারা আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে পারি—সুতরাং তাহাদের বিশ্বাস হইল যে বায়ু আমাদের জীবনের বড় প্রয়োজনীয়। তাহার পরে দেখিল অন্যান্য প্রাণীরাও বায়ুর দ্বারা জীবন ধারণ করে, আর এই বায়ু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং বায়ুকে তখন একটী ভূত বলিয়া প্রতীতি হইল। জলও আমাদের আর একটী প্রয়োজনীয় পদার্থ। জল ব্যতীত আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না; সুতরাং জলকেও ভূত বলিয়া

স্বীকার করা হইল। এই কারণে অগ্নিও ভূতের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আর ক্ষিতি, ইহার ত কথাই নাই—ইহারই উপর আমরা বাস করি—ইহার দ্বারাই গৃহ-নির্ম্মাণ করি—আবার মরিলেও মাটির শরীর মাটীতে মিশিয়া যায়। সুতরাং ক্ষিতি আর একটী ভূত। ইহা ব্যতীত আর্য্যেরা আর একটী ভূতের কথা বলিয়াছেন। আমি কথা কহিলে তুমি কিরূপে শুনিতে পাও। মধ্যে যদি কোন পদার্থ না থাকে ত কে আমার কথা তোমার কাছে লইয়া যাইবে? কে বজ্রের ভীম নাদ দূরস্থ মেঘের কোল হইতে তোমার কাণে আনিয়া দিবে? যে এক ব্যক্তির নিকট হইতে আর এক ব্যক্তির কাছে কথা লইয়া যায় সে আমাদের পরমোপকারী নহে ত কি? ইহাই আকাশ, ইহাই আমাদের পঞ্চম ভূত। এইরূপে নিজের আবশ্যকমত আদিম জাতিরা একে একে পাঁচটী ভূত কল্পনা করিয়াছিলেন। তখন মানুষ আপনাকেই বুঝিত—আপনাকেই চিনিত স্বার্থপরতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সুতরাং যাহা আমাদের আবশ্যকীয় নহে, যাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই তাহার কথা কেহ ভাবিত না।

এই গেল প্রথমাবস্থা। এ সময়ে পাঁচ ভূতের অর্থ জীবনের পাঁচটী আবশ্যকীয় পদার্থ (Five necessary existences)। ইহার পর আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চ্চার সময় উপস্থিত হইল। আর্য্য ঋষিরাই প্রথমে আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণে রত হন। মনই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জ্ঞেয় পদার্থ। ইহার দ্বারা প্রথমে একত্ব অনুমিতি হয়। এই একত্ব জ্ঞান হইতে ক্রমে ক্রমে বহুত্বের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ কারণ হইতে কার্য্য অনুমিতির ইংরাজি নাম '*a priori* argument.' এইরূপ তত্ত্বানুসন্ধানের দ্বারা প্রথমে আদি কারণ অনুমান করা হয়। এই সময়ে পঞ্চভূত জগতের সমস্ত পদার্থ মধ্যেই আছে—ইহাই সর্ব্বত্র বিরাজ মান—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়—এবং বাস্তবিক অধিকাংশ পদার্থে ইহার অস্তিত্ব দেখিয়া ইহাদিগকে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্র বিরাজমান, পঞ্চভূত (five existences or conditions pervading universe) মনে করা হয়। এ সময়েও পঞ্চভূতকে পাঁচটী মৌলিক পদার্থ বলা হয় নাই। পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের জন্য প্রত্যেক পদার্থেই পাঁচটী ভিন্ন বস্তুর—অথবা ভিন্ন অবস্থার কল্পনা হইয়াছে মাত্র। ইন্দ্রিয়গণের উপযোগিতা প্রমাণের জন্যই—প্রধানতঃ এই পাঁচটী ভূতের অনুমান হইয়াছে মাত্র। পরে এ বিষয় সবিস্তারে উল্লিখিত হইবে।

কিন্তু আর্য্য ঋষিগণের জ্ঞান এই স্থলে সীমাবদ্ধ হয় নাই। তাঁহাদের জ্ঞান চর্চ্চা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের মনেও যে এইরূপ বিশ্বাস বরাবর ছিল একথা বলা যায় না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণের পর ঋষিরা আবার জগতের তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু হইয়া

অধিভৌতিক জ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। বলিয়াছি, পূর্ব্বে যেরূপই ধারণা থাকুক না কেন—আধিভৌতিক জ্ঞান চর্চ্চার সময় প্রথমে বহুত্ব অনুমিতি হয়। ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রসঙ্গত। এই বহুত্ব জ্ঞান ক্রমে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা একত্ব জ্ঞানে পরিণত হয়। আর্য্য ঋষিগণ যখন আত্ম ও ঐশ্বরিক চিন্তা হইতে অপসৃত হইয়া বাহ্য জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—তখন এই নানা পদার্থপূর্ণ জগৎ তাঁহাদের দৃষ্টি গোচর হইল। তখন পঞ্চ ভূতের কথাও মনে পড়িল। তাহার পর তাঁহারা তত্ত্বান্বেষণ করিয়া যাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহার যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় এস্থানে তাহাই উল্লেখ করা উদ্দেশ্য।

আর্য্য ঋষিরা চিন্তার দ্বারা পাঁচ ভূতের অর্থ, স্থূল পদার্থের (matter) পাঁচ প্রকার অস্তিত্ব (Five different conditions of matter) এই বুঝিয়াছিলেন। আধুনিক উরোপীয় পণ্ডিতগণ স্থূল পদার্থের চারি প্রকার অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন। সেগুলি ১ম, কঠিন পদার্থ (solid)
২য়, তরল পদার্থ (liquid)
৩য়, বাষ্পীয় পদার্থ (gas)
৪র্থ, সূক্ষ্ম তর বাষ্পীয় পদার্থ (ether)

আর্য্য ঋষিরাও এই চারি অবস্থা বিশ্বাস করিতেন। সমস্ত কঠিন পদার্থের উপমাস্থল ক্ষিতি, এই জন্য ক্ষিতি অর্থে তাঁহারা কঠিন স্থূলপদার্থ বুঝিলেন। বাস্তবিক মাটি, গাছ, পাথর সবই এক দ্রব্য,—এক বস্তুর রূপান্তর মাত্র একথা তাঁহারা কখনই মনে করেন নাই। আধুনিক বিজ্ঞান ব্যতীত সামান্য কয়লা ও বহুমূল্য হীরক খণ্ড যে এক দ্রব্যের রূপান্তর মাত্র তাহা অনুমান করা সম্ভব নহে। তাঁহারা এ সব দ্রব্যই এক-ক্ষিতি-এ কথা মনে করেন নাই। যাঁহারা স্বর্ণকেও যৌগিক পদার্থ মনে করিতেন এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারা যায় কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এরূপ ভ্রম সম্ভব নহে। সুতরাং ক্ষিতির অর্থ কঠিন পদার্থ (solid) ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। আরও আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে ভাষার প্রথমাবস্থার গুণবাচক শব্দ (abstract terms) ছিল না ; উপমার দ্বারা সে অভাব পূর্ণ করা হইত। সুতরাং কঠিন, এই গুণ যে ক্ষিতির সহিত উপমায় ক্রমে ক্ষিতি এই শব্দ কাঠিন্য বাচক হইয়াছে তাহা আশ্চর্য্য নহে। এইরূপে জল, তরল পদার্থ বাচক হইয়াছে, বায়ু বাষ্পীয় পদার্থবাচক হইয়াছে, এবং ব্যোম, সূক্ষ্মতর বাষ্পীয় পদার্থবাচক হইয়াছে। তাহারপর অগ্নি ; দেখা গেল অগ্নি স্থূল পদার্থের অবস্থান্তর নহে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এ কথা বিশ্বাস করেন না। সুতরাং অগ্নি কি একথা আমাদের মনে প্রথম উদয় হয়। অগ্নি প্রকৃত উত্তাপ

নহে—উত্তাপ এবং অগ্নি স্বতন্ত্র পদার্থ। উত্তাপ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়। কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ উত্তাপ (heat) এবং অগ্নি (combustion) একই পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা মনে করিতেন। উত্তাপ সর্ব্বদাই পদার্থ হইতে বাহির হয় (Newton's Emission theory of light). যখন কেবল অতিশয় বেগে বাহির হয় তখন ইহা আলোক প্রদান করে এবং আমরা দেখিতে পাই। যাহা হউক উত্তাপ পদার্থ মাত্রের অবস্থা পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণের দ্বারা স্থির হইয়াছে যে উত্তাপ এক প্রকার শক্তি—ইহা পদার্থ মাত্রের অভ্যন্তর আণবিক সম্বন্ধ এবং আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন করে। কঠিন পদার্থে উত্তাপ দিলে উহা প্রথমে তরল হয়। কতকগুলি পদার্থ জ্বলিয়া উঠে অগ্নি উদগীরণ করে, কতকগুলি বাষ্প হইয়া যায়—পূর্ব্বেকার পদার্থের আর কিছুই থাকে না। সুতরাং যখন এক বস্তুকেই তরল পদার্থে,অগ্নিময় পদার্থে, বাষ্পময় পদার্থে, এবং হয়ত শব্দময় পদার্থে পরিণত করা যায়, তখন অগ্নি যে স্থূল পদার্থের রূপান্তর মাত্র তাহাই প্রথমে অনুমিত হয়। বিজ্ঞানের এবং রসায়নের উন্নতি না হইলে অগ্নির (combustion) তত্ত্ব স্থির করা সম্ভব নহে। সুতরাং অগ্নিকে পদার্থের রূপান্তর মনে করা বড় আশ্চর্য্যজনক নহে। এই সকল পদার্থের অবস্থাকে যেরূপ শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাতে তাহাদিগকে ক্রমে স্থূল কঠিন অবস্থা হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থাতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ক্ষিতি হইতে জল সূক্ষ্মতর, জল হইতে বায়ু সূক্ষ্মতর, এবং বায়ু হইতে আকাশ আরও সূক্ষ্মতর। এই শ্রেণীর মধ্যে অগ্নিকে জল অপেক্ষা সূক্ষ্মতর—কিন্তু বায়ু অপেক্ষা স্থূলতর বিবেচনা করা হইয়াছে। আর যখন অগ্নি আবির্ভূত হইয়া কোথায় চলিয়া যায় আর দেখা যায় না—এবং তরল পদার্থের ন্যায় সীমাবদ্ধ নহে এবং এক পাত্র মধ্যে রক্ষা করা যায় না, তখন অগ্নি অবশ্য তরল পদার্থ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর—এইরূপই মনে হয়। এরূপ অবস্থায় অগ্নিকে পদার্থের রূপান্তরমাত্র মনে করা যুক্তি বিরুদ্ধ হয় নাই। আর এক শত বৎসর পূর্ব্বেই ইউরোপে অগ্নিসম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস ছিল তাহাও প্রায় এইরূপ। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অগ্নিকে স্বতন্ত্র পদার্থ মনে করিতেন। তাঁহাদের মতে ইহা সকল বস্তুর মধ্যেই প্রবিষ্ট থাকে। উত্তাপ দিলে তাহা বাহির হইয়া যায়। এক শত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে লেবুসির (Lavoisier) এই Phlogiston Theoryর ভ্রম প্রমাণ করেন এবং অগ্নির স্বরূপ স্থির করেন। সুতরাং প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে যে অগ্নি রূপান্তরে নিহিত আছে এবং উত্তাপে তাহা বহির্গত হয় এ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান চর্চ্চার পূর্ব্বে কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

আমাদের গ্রন্থকের এইরূপ অর্থ

মনে করার দ্বিতীয় কারণ এই যে সে সময়ে মৌলিক পদার্থের (elements) অনুমানও সম্ভব নহে। তখন সংযোগ বিয়োগ রূপ রাসায়নিক আবিষ্কার প্রথা পরিজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং তখন কোন পদার্থকেই বিভিন্ন করিয়া তাহা হইতে মৌলিকপদার্থান্বেষণের সম্ভব ছিল না। তখন যত প্রকার বিভিন্ন বস্তু ছিল সকলকেই ভিন্ন ভিন্ন মৌলিকপদার্থ (element) মনে করা হইত। সুতরাং সে সময়ে ভূতের অর্থ মৌলিক পদার্থ হইতে পারে না। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ভূতের অর্থ অস্তিত্ব (existence) পাঁচটী আদি অস্তিত্ব অর্থে পদার্থ সকলের পাঁচ প্রকার অবস্থা (five different essences or five conditions of matter) এই মাত্র।

আমাদের পঞ্চভূতের এইরূপ অর্থ অনুমান করিবার তৃতীয় কারণ এই যে পঞ্চভূত উপলব্ধি করিবার জন্য, আর্য্য ঋষিগণ পঞ্চতন্মাত্রের কল্পনা করিয়াছেন। এই পঞ্চ তন্মাত্রের দ্বারাই পঞ্চভূত আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পাঁচটী তন্মাত্র, অর্থাৎ কেবল এই পাঁচটী গুণের দ্বারাই আমরা এই পঞ্চভূতকে এবং সেই জন্যই এই সমস্ত জগৎকে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় গোচর করিতে পারি এবং সেই জন্যই ইহাদের দ্বারা আমাদের বাহ্য জগতের জ্ঞান হয়। রূপের দ্বারা কঠিন পদার্থ (Solids) আমাদের চক্ষুর গোচর হয়। বাস্তবিক চক্ষু দ্বারাই আমরা পরিদৃশ্যমান জগৎকে একেবারে (Immediate) উপলব্ধি করি। তাহার পর রস ইহার দ্বারা আমরা তরল পদার্থ উপলব্ধিকরি। তরল পদার্থ বর্ণহীন, স্বচ্ছ, সুতরাং তাহা স্বাদ গ্রহণ ব্যতীত সহজে জানা যায় না। যে সকল তরল পদার্থ স্বচ্ছ নহে তাহা বোধ হয় কঠিনদ্রব্য মিশ্রিত। যাঁহারা দর্শনশাস্ত্র সম্মত পঞ্চীকরণ প্রকরণ জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা একথা বেশ বুঝিতে পারিবেন। স্পর্শ দ্বারা আমরা অগ্নি বুঝিতে পারি। এই স্থলেই আমরা অগ্নির স্বরূপ অর্থ বুঝিতে পারি। অগ্নি সাধারণতঃ আলোকের দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয় গোচর হয় না। স্পর্শই (feeling) অগ্নি উপলব্ধি করিবার প্রধান উপায়। সুতরাং অগ্নি ও উত্তাপ এক, আর্য্যগণ ইহাই মনে করিতেন। বায়ু আমরা গন্ধের দ্বারা অনুভব করি—নাসিকাই আমাদের বায়বীয় পদার্থ উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায়। নতুবা বায়ু আমরা দেখিতে পাই না এবং বায়ুর গতি না হইলে আমরা তাহা স্পর্শের দ্বারা অনুমান করিতেও পারি না। এইরূপ শব্দই আকাশ উপলব্ধি করিবার আমাদের একমাত্র উপায়। তখন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানা ছিল না, সুতরাং এখন যেরূপ আলোক ও উত্তাপের গতি স্থির করিয়া আকাশের (Æther) অনুমান করা হইয়াছে এবং পদার্থ মাত্রেরই অবিক

শক্তি বিশেষের দ্বারা আমরা শব্দ উপলব্ধি করি স্থির হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে। এই পঞ্চ তন্মাত্র এবং তাহাদের সহিত পঞ্চ ভূতের সম্বন্ধ আমরা নিম্নে দেখাইতেছি :—

solid. liquid. phlogiston. gas. æther.
ক্ষিতি। অপ্। তেজঃ। মরুত। ব্যোম।
রূপ। রস। স্পর্শ। গন্ধ। শব্দ।
চক্ষু। জিহ্বা। ত্বক্। নাসিকা। কর্ণ।

এইরূপে পঞ্চভূত পঞ্চেন্দ্রিয় গোচর হইলেই তাহা আমরা জানিতে পারি। কিন্তু যদি পঞ্চভূতের অর্থ পাঁচ মৌলিক পদার্থ হইত, তাহা হইলে পঞ্চ তন্মাত্রের দ্বারা তাহার উপলব্ধি সম্ভব হইত না। কারণ মৌলিক পদার্থ কেবল ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি হয় না। রীতিমত পরীক্ষা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রকরণ দ্বারা তাহা বাছিয়া লইতে হয়। আর্য্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, যে সকল বস্তু একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি হয় তাহাতে একাধিক ভূত আছে। ইহারই নাম পঞ্চীকরণ প্রথা। ইহা ভ্রমাত্মক হইলেও আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। যেমন জলেতেই তরল, কঠিন, বায়বীয় এবং সুক্ষ্মতর বায়বীয় পদার্থ আছে। এই পঞ্চ তন্মাত্র সুতরাং আমাদের বিবেচনায় এই পাঁচটী স্থূল পদার্থের অবস্থা জানিবার প্রধান উপায়—অন্য উপায় যে নাই তাহা নহে। সুতরাং আমাদের বোধ হয় যে পঞ্চতন্মাত্রে পদার্থের পাঁচ অবস্থা উপলব্ধি হয়। পাঁচ মৌলিক পদার্থ উপলব্ধি হয় না। অতএব পঞ্চভূত পাঁচটী মৌলিক পদার্থ বোধ হয় না।

পঞ্চভূতকে পদার্থের পাঁচ অবস্থা মনে করার চতুর্থ কারণ এই যে, আমাদের সৃষ্টির বৈদান্তিক তত্ত্ব এই যে প্রথমে পরমাণু সুক্ষ্মাবস্থায় চারিদিকে বিস্তৃত ছিল। তাহার পর বায়ুরূপ—তাহার পর অগ্নিরূপ—তাহার পর জলরূপ—সর্ব্বশেষে ক্ষিতিরূপ হইয়াছে। এই মত পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক এই প্রশস্ত বৈজ্ঞানিক মত লাপ্লেস হইতে স্পেন্সর পর্য্যন্ত পরিপুষ্ট হইয়া সৃষ্টির উৎপত্তি মত (evolution) নামে খ্যাত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে প্রথমে পরমাণু সমষ্টি যথেচ্ছভাবে চারিদিকে বিস্তৃত ছিল (in a chaotic state) এই মত ন্যায় ও বৈশেষিক মীমাংসায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর এই সকল একত্রিত হইতে (Condensation) আরম্ভ হয় এবং বাষ্প রূপের পরে একত্রিত হইয়া উত্তাপ উদ্গীরণ করিয়া অগ্নিময় তরল পদার্থ (molten state) হইয়া থাকে। তাহার পর উত্তাপ কমিয়া তরল পদার্থ ক্রমে কঠিন পৃথিবীর আকারে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে সমস্ত জগতের সৃষ্টি হয়। আমাদের আর্য্য ঋষিগণ অলৌকিক প্রতিভা বলে এই আধুনিক সর্ব্ববাদিসম্মত বৈজ্ঞানিক মত অনুমান করিয়া গিয়াছেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা

যায় যে পঞ্চভূত পাঁচটী মৌলিক পদার্থ নহে। তাহা হইলে একটী রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবে কিরূপে? মৌলিক পদার্থ কখন একটী হইতে আর একটীতে পরিণত হয় না।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পঞ্চভূত পাঁচটী আদি মৌলিক পদার্থ নহে। এগুলি স্থূল পদার্থের (matters) রূপান্তর মাত্র। অতএব পঞ্চভূত পাঁচটী মৌলিক পদার্থ ইহা বিশ্বাস করিয়া প্রাচীন আর্য্যঋষিগণকে দোষ দেওয়া নিতান্ত অন্যায়—এই কথা প্রতিপন্ন করাই আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।



দেবী চৌধুরাণী।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"ও পি—ও পিপি—ও প্রফুল্ল—ও পোড়ারমুখী"।

"যাই মা।"

মা ডাকিল—মেয়ে কাছে আসিল বলিল—

"কেন মা?"

মা বলিল,—"যা না—ঘোষেদের বাড়ী থেকে একটা বেগুণ চেয়ে নিয়ে আয় না।"

প্রফুল্লমুখী বলিল, "আমি পারিব না। আমার চাইতে লজ্জা করে।"

মা। তবে খাবি কি? আজ যে ঘরে কিছু নেই।

প্র। তা শুধু ভাত খাব। রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন গা?

মা। যেমন অদৃষ্ট ক'রে এসেছিলি? কাঙ্গাল গরিবের চাইতে লজ্জা কি?

প্রফুল্ল কথা কহিল না। মা বলিল, "তুই তবে, ভাত চড়াইয়া দে, আমি কিছু তরকারির চেষ্টায় যাই।"

প্রফুল্ল বলিল, "আমার মাথা খাও আর চাইতে যাইও না। ঘরে চাল আছে, নুন আছে, গাছে কাঁচা লঙ্কা আছে—মেয়েমানুষের তাই ঢের।"

অগত্যা প্রফুল্লের মাতা সম্মত হইল।

ভাতের জল চড়াইয়া ছিল, মা চাল ধুইতে গেল। চাল ধুইবার জন্য ধুচুনি হাতে করিয়া মাতা গালে হাত দিল। বলিল, "চাল কই?" প্রফুল্লকে দেখাইল আধ-মুঠা চাউল আছে মাত্র—তাহা এক-জনেরও আধ পেটা হইবে না।

মা, ধুচুনি হাতে করিয়া বাহির হইল। প্রফুল্ল বলিল, "কোথা যাও?"

মা। চাল ধার করিয়া আনি—নহিলে সুধু ভাতই কপালে যোটে কই?

প্র। আমরা লোকের কত চাল ধারি—শোধ দিতে পারি না—তুমি আর চাউল ধার করিও না।

মা। আবাগীর মেয়ে খাবি কি? ঘরে যে একটি পয়সা নাই।

প্র। উপস করিব।

মা। উপস করিয়া কয় দিন বাঁচিবি।

প্র। না হয় মরিব।

মা। আমি মরিলে যা হয় করিস; তুই উপস করিয়া মরিবি আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না। যেমন করিয়া পারি ভিক্ষা করিয়া তোকে খাওয়াইব।

প্র। ভিক্ষাই বা কেন করিতে হইবে? একদিনের উপবাসে মানুষ মরে না। এসোনা মায়ে ঝিএ আজ পৈতা তুলি। কাল বেচিয়া কড়ি করিব।

মা। সুতা কই?

প্র। কেন চরকা আছে।

মা। পাঁজ কই?

তখন প্রফুল্ল মুখ অধোবদনে রোদন করিতে লাগিল। মা, ধুচুনী হাতে আবার চাউল ধার করিয়া আনিতে চলিল তখন প্রফুল্ল মার হাত হইতে ধুচুনী লইয়া যে কয়টা চাউল ছিল—তাহা ফেলিয়া দিল। মা অবাক্ হইল—বলিল,

"সে কি? যে কয়টা ছিল তাও ফেলিয়া দিলি?"

প্রফুল্ল বলিল, "মা—আমি কেন চেয়ে ধার ক'রে খাব—আমার ত সব আছে?"

মা চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "সবই ত আছে মা—কপালে ঘটিল কৈ?"

প্র। কেন ঘটে না মা—আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, শ্বশুরের অন্ন থাকিতে আমি খাইতে পাইব না?

মা। এই অভাগীর পেটে হয়েছিলে এই অপরাধ—আর তোমার কপাল। নহিলে তোর অন্নখায় কে?

প্র। শোন, মা, আমি আজ মন ঠিক করিয়াছি—শ্বশুরের অন্ন কপালে যোটে তবে খাইব—নহিলে আর খাইব না। তুমি চেয়ে চিন্তে, যে প্রকারে পার, আনিয়া খাও। খাইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া আমার শ্বশুর বাড়ী রাখিয়া আইস।

মা। সে কি মা! তাও কি হয়?

প্র। কেন হয় না মা?

মা। না নিতে এলে কি শ্বশুরবাড়ী যেতে আছে?

প্র। পরের বাড়ী চেয়ে খেতে

আছে, আর না নিতে এলে আপনার শ্বশুর বাড়ী যেতে নেই?

মা। তারা যে কখনও তোর নাম করে না।

প্র। না করুক—তাতে আমার অপমান নাই। যাহাদের উপর আমার ভরণপোষণের ভার, তাহাদের কাছে অন্নের ভিক্ষা করিতে আমার অপমান নাই। আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইব—তাহাতে আমার লজ্জা কি?

মা চুপ করিয়া, কাঁদিতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিল, "তোমাকে একা রাখিয়া আমি যাইতে চাহিতাম না—কিন্তু আমার দুঃখ ঘুচিলে তোমারও দুঃখ ঘুচিবে এই ভরসায় যাইতে চাহিতেছি।"

মাতে মেয়েতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। মা বুঝিল যে মেয়ের পরামর্শই ঠিক। তখন মা, কিছু চাল ধার করিয়া আনিয়া রাঁধিল। কিন্তু প্রফুল্ল কিছুতেই খাইল না। কাজেই তাহার মাতাও খাইল না। তখন প্রফুল্ল বলিল, "তবে আর বেলা কাটাইয়া কি হইবে? অনেক পথ।"

তাহার মাতা বলিল, "আয়, তোর চুলটা বাঁধিয়া দিই।"

প্রফুল্ল বলিল, "না। থাক। কি অবস্থায় আমাকে রাখিয়াছে তা তাহারা দেখুক।"

তখন দুই জনে, মলিন বেশে, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ নামে গ্রাম; সেই খানে প্রফুল্লমুখীর শ্বশুরালয়। প্রফুল্লের দশা যেমন হউক, তাহার শ্বশুর হরবল্লভ বাবু খুব বড় মানুষ লোক। তাঁহার অনেক জমিদারী আছে, দোতালা বৈঠকখানা, ঠাকুরবাড়ী, নাটমন্দির, দপ্তরখানা, খিড়কীতে বাগান পুকুর, প্রাচীরে বেড়া। সে স্থান প্রফুল্লমুখীর পিত্রালয় হইতে ছয় ক্রোশ। ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া, মাতা ও কন্যা অনশনে, বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে সেই ধনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ কালে, প্রফুল্লের মার পা উঠে না। প্রফুল্ল কাঙ্গালের মেয়ে বলিয়া যে হরবল্লভ বাবু তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন, তাহা নহে। বিবাহের পরে একটা গোল হইয়াছিল। হরবল্লভ কাঙ্গাল দেখিয়া ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন। মেয়েটি পরমা সুন্দরী, তেমন মেয়ে আর কোথাও পাইলেন না, তাই সেখানে বিবাহ দিয়াছিলেন। এ দিগে, প্রফুল্লের মা, কন্যা বড় মানুষের ঘরে পড়িল, এই উৎসাহে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই বিবাহতেই—তাঁর যাহা কিছু ছিল ভস্ম হইয়া গেল। সেই অবধি এই অন্নের কাঙ্গাল। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সে সাধের বিবাহে বিপরীত ফল ফলিল। সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও—সর্ব্বস্বই তার কত টাকা?—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও সে বিধবা স্ত্রীলোক সকল দিগ কুলান

করিতে পারিল না। বরযাত্রীদিগের লুচি মণ্ডার দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, উত্তম ফলাহার করাইল। কিন্তু কন্যা যাত্রীগণের কেবল চিঁড়া দই। ইহাতে প্রতিবাসী কন্যা যাত্রীরা অপমান মনে করিলেন। তাঁহারা খাইলেন না—উঠিয়া গেলেন। ইহাতে প্রফুল্লের মার সঙ্গে তাহাদের কোন্দল বাঁধিল। প্রফুল্লের মা বড় গালি দিল। প্রতিবাসীরা, একটা বড় রকম শোধ লইল।

পাকস্পর্শের দিন হরবল্লভ বেহাইনের প্রতিবাসী সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা কেহ গেলনা—একজন লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে সে কুলটা জাতিভ্রষ্টা, তাহার সঙ্গে হরবল্লভ বাবুর কুটুম্বতা করিতে হয় করুন,—বড় মানুষের সব শোভা পায়—কিন্তু আমরা কাঙ্গাল গরিব, জাতিই আমাদের সম্বল—আমরা জাতিভ্রষ্টার কন্যার পাকস্পর্শে জল গ্রহণ করিব না। সমবেত সভা মধ্যে এই কথা প্রচার হইল। হরবল্লভের মুখ শুকাইল। প্রফুল্লের মা একা বিধবা মেয়েটি লইয়া ঘরে থাকে—তখন বয়সও যায় নাই—কথা অসম্ভব বোধ হইল না। বিশেষ, হরবল্লভের মনে হইল, যে বিবাহের রাত্রে প্রতিবাসীরা বিবাহ বাড়ীতে খায় নাই। প্রতিবাসীরা মিথ্যা বলিবে কেন? হরবল্লভ বিশ্বাস করিলেন। সভার সকলেই বিশ্বাস করিল। নিমন্ত্রিত সকলেই ভোজন করিল বটে—কিন্তু কেহই নববধূর স্পৃষ্ট ভোজ্য খাইল না। পর দিন হরবল্লভ বধূকে মাত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি প্রফুল্ল ও তাহার মাতা তাঁহার পরিত্যাজ্য হইল। সেই অবধি আর কখনও তাহাদের সম্বাদ লইলেন না; পুত্রকেও লইতে দিলেন না। পুত্রের অন্য বিবাহ দিলেন। প্রফুল্লের মা দুই এক বার কিছু সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়াছিল, হরবল্লভ তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাই আজ, সে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে প্রফুল্লের মার পা কাঁপিতেছিল।

কিন্তু যখন আসা হইয়াছে, তখন আর ফেরা যায় না। কন্যা ও মাতা সাহসে ভর করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন কর্ত্তা অন্তঃপুর মধ্যে আপরাহ্নিক নিদ্রার সুখে অভিভূত। গৃহিণী—অর্থাৎ প্রফুল্লের শাশুড়ী, পা ছড়াইয়া পাকা চুল তুলাইতেছিলেন। এমন সময়ে সেখানে, প্রফুল্ল ও তাহার মা উপস্থিত হইল। প্রফুল্ল মুখে আধ হাত ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। তাহার বয়স এখন আঠার বৎসর।

গিন্নী ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা কে গা?"

প্রফুল্লের মা, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কি বলিয়াই বা পরিচয় দিব?"

গিন্নী। কেন—পরিচয় আবার কি বলিয়া লোকে দেয়?

প্রফুল্লের মা। আমরা কুটুম্ব।

গিন্নী। কুটুম্ব ? কে কুটুম্ব গা ?

সেখানে তারার মা বলিয়া একজন চাকরাণী কাজ করিতেছিল। সে দুই একবার প্রফুল্লদিগের বাড়ী গিয়াছিল—প্রথম বিবাহের পরেই। সে বলিল, "ওগো চিনেছি গো! ওগো চিনেছি! কে বেহান ?"

(সে কালে পরিচারিকারা গৃহিণীর সম্বন্ধ ধরিত)

গিন্নী। বেহান ? কোন্ বেহান ?

তারার মা। দুর্গাপুরের বেহান গো—তোমার বড় ছেলের বড় শাশুড়ী। গিন্নী বুঝিলেন। মুখটা অপ্রসন্ন হইল। বলিলেন, "বসো।"

বেহান বসিল—প্রফুল্ল দাঁড়াইয়া রহিল। গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি কে গা ?"

প্রফুল্লের মা, বলিল, "তোমার বড় বউ ?"

গিন্নী বিমর্ষ হইয়া কিছু কাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "তোমরা কোথায় এসেছিলে ?"

প্রফুল্লের মা। তোমার বাড়ীতেই এসেছি ?

গিন্নী। কেন গা ?

প্র, মা। কেন, আমার মেয়েকে কি শ্বশুর বাড়ী আসিতে নাই ?

গিন্নী। আসিতে থাকিবে না কেন ? শ্বশুর শাশুড়ী যখন আনিবে, তখন আসিবে। ভাল মানুষের মেয়ে ছেলে কি গায়ে প'ড়ে আসে।

প্র, মা। শ্বশুর শাশুড়ী যদি সাত জন্মে নাম না করে ?

গিন্নী। নামই যদি না করে—তবে আসা কেন ?

প্র, মা। খাওয়ায় কে ? আমি বিধবা অনাথিনী, তোমার বেটার বউকে আমি খাওয়াই কোথা থেকে ?

গিন্নী। যদি খাওয়াইতেই পারিবে না, তবে পেটে ধরেছিলে কেন ?

প্র, মা। তুমি কি খাওয়া পরা হিসাব করিয়া বেটা পেটে ধরেছিলে ? তা হলে সেই সঙ্গে বেটার বউয়ের খোরাক পোষাক টা ধরিয়া নিতে পার নাই ?

গিন্নী। আ মলো! মাগী বাড়ী ব'য়ে কোঁদল করতে এসেছে দেখি যে ?

প্র, মা। না—কোঁদল করতে আসি নাই। তোমার বউ একা আসিতে পারে না, তাই রাখিতে সঙ্গে আসিয়াছি। এখন, তোমার বউ পৌঁছিয়াছে, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া প্রফুল্লের মা বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অভাগীর তখনও আহার হয় নাই।

মা গেল, কিন্তু প্রফুল্ল গেল না। যেমন ঘোমটা দেওয়া ছিল, তেমনই ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিল, "তোমার মা গেল, তুমিও যাও।"

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। নড় না যে ?

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। কি জ্বালা ? আবার কি

তোমার সঙ্গে একটা লোক দিতে হবে না কি?

এবার প্রফুল্ল মুখের ঘোমটা খুলিল, চাঁদ পানা মুখ চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে। শাশুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! এমন চাঁদ পানা বৌ নিয়ে ঘর করতে পেলেম না।" মন একটু নরম হলো।

প্রফুল্ল অতি অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি যাইব বলিয়া আসি নাই।"

গিন্নী। তা কি করিব মা—আমার কি অসাধ যে তোমায় নিয়ে ঘর করি, লোকে পাঁচ কথা বলে—এক ঘরে করবে বলে কাজেই তোমায় ত্যাগ করতে হয়েছে।

প্রফুল্ল। মা, এক ঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে? আমি কি তোমার সন্তান নই?

শাশুড়ীর মন আরও নরম হলো। বলিলেন,

"কি করব মা, জেতের ভয়।"

প্রফুল্ল পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে বলিল, হলেম যেন আমি অজাতি—কত শূদ্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করতে দোষ কি?

গিন্নী আর বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তা মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে। তা যাই দেখি কর্ত্তার কাছে তিনি কি বলেন। তুমি এই খানে বসো মা, বসো।

প্রফুল্ল তখন চাপিয়া বসিল। সেই সময়ে, একটি কপাটের আড়াল হইতে একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা—সেও সুন্দরী, মুখে আড় ঘোমটা—সে প্রফুল্লকে হাত ছানি দিয়া ডাকিল। প্রফুল্ল ভাবিল এ আবার কি? উঠিয়া বালিকার কাছে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যখন গৃহিণী ঠাকুরাণী হেলিতে দুলিতে, হাতের বাউটির খিল খুঁটিতে খুঁটিতে কর্ত্তা মহাশয়ের নিকেতনে সমুপস্থিতা, তখন কর্ত্তা মহাশয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; হাতে মুখে জল দেওয়া হইয়াছে—হাত মুখ মোছা হইতেছে। দেখিয়া কর্ত্তার মনটা কাদা করিয়া ছানিয়া লইবার জন্য গৃহিণী ঠাকুরাণী বলিলেন "কে ঘুম ভাঙ্গাইল? আমি এত ক'রে বারণ করি তবু কেও শোনে না।"

কর্ত্তা মহাশয় মনে মনে বলিলেন,—"ঘুম ভাঙ্গাইবার আঁধি তুমি নিজে—আজ বুঝি কি দরকার আছে?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "কেউ ঘুম ভাঙ্গায় নাই। বেশ ঘুমিয়াছি—কথা টা কি?"

গিন্নী মুখ খানা হাসি ভরাভরা করিয়া বলিলেন "আজ একটা কাণ্ড হয়েছে। তাই বলতে এসেছি।"

এইরূপ ভূমিকা করিয়া এবং একটু একটু নথ ও বাউটি নাড়া দিয়া—কেননা বয়স এখনও পঁয়তাল্লিশ বৎসর মাত্র—

গৃহিণী প্রফুল্ল ও তার মাতার আগমন ও কথোপকথন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিলেন। বধূর চাঁদপানা মুখ ও মিষ্ট কথা গুলি মনে করিয়া, প্রফুল্লের দিকে অনেক টানিয়া বলিলেন। কিন্তু মন্ত্র তন্ত্র কিছুই খাটিল না। কর্ত্তার মুখ বৈশাখের মেঘের মত অন্ধকার হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—

"এত বড় স্পর্দ্ধা! সেই বাগদী বেটি আমার বাড়ীতে ঢোকে? এখনই ঝাঁটা মেরে বিদায় কর!"

গিন্নী বলিলেন, "ছি! ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে—হাজার হোক বৌ'র বউ—আর বাগদীর মেয়ে বা কিরূপে হলো? লোকে বল্‌লেই কি হয়?"

গিন্নী ঠাকুরুণ, হার কাত নিয়ে খেলতে বসেছেন—কাজে কাজেই এই রকম বন্দ রঙ্গ চালাইতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছুই হইল না। "বাগদী বেটিকে ঝাঁটা মেরে বিদায় কর।" এই হুকুমই বাহাল রহিল।

গিন্নী শেষে রাগ করিয়া বলিলেন, "ঝাঁটামারিতে হয় তুমি মার; আমি আর তোমার ঘর কন্নার কথা কিছু জানি না।" এই বলিয়া গিন্নী রাগে গর গর করিয়া বাহিরে আসিলেন। যেখানে প্রফুল্লকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া দেখিলেন, প্রফুল্ল সেখানে নাই।

প্রফুল্ল কোথায় গিয়াছে, তাহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। এক খানা কপাটের আড়াল হইতে ঘোমটা দিয়ে একটি চোদ্দ বছরের মেয়ে তাকে হাত ছিনি দিয়া ডাকিয়াছিল। প্রফুল্ল সেখানে গেল। প্রফুল্ল সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবা মাত্র বালিকা দ্বার রুদ্ধ করিল।

প্রফুল্ল বলিল, "দ্বার দিলে কেন?"

মেয়েটি বলিল, "কেউ না আসে। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কব ভাই।"

প্রফুল্ল বলিল, "তোমার নাম কি ভাই।"

সে বলিল, "আমার নাম সাগর ভাই।"

প্র। তুমি কে ভাই?

সা। আমি ভাই তোমার সতীন।

প্র। তুমি আমায় চেন নাকি?

সা। এই যে আমি কপাটের আড়াল থেকে সব শুনিলাম?

প্র। তবে তুমিই ঘরণী গৃহিণী—

সা। দূর তা কেন? পোড়া কপাল আর কি—আমি কেন সে হতে গেলেম? আমার কি তেমনি দাঁত উঁচু না আমি তত কালো?

প্র। সে কি—কার দাঁত উঁচু?

সা। কেন? যে ঘরণী গৃহিণী।

প্র। সে আবার কে?

সা। জান না? তুমি কেমন ক'রেই বা জানিবে? কখন ত এসোনি। আমাদের আর এক সতীন আছে জান না?

প্র। আমি ত আমি ছাড়া আর এক বিয়ের কথাই জানি—আমি মনে করিয়াছিলাম সেই তুমি।

বাছা—তা কি করব ? তোমার শ্বশুর কিছুতেই মত করেন না।

প্রফুল্লের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু কাঁদিল না—চুপ করিয়া রহিল। শাশুড়ীর বড় দয়া হইল। গিন্নী মনে মনে কল্পনা করিলেন—আর একবার নথ নাড়া দিয়া দেখিব। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিলেন না,—কেবল বলিলেন, "আজ আর কোথায় যাইবে ? আজ এইখানে থাক। কাল সকালে যেও।"

প্রফুল্ল মাথা তুলিয়া বলিল, "তা থাকিব—একটা কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিও। আমার মা চরকা কাটিয়া খায়, তাহাতে একজন মানুষের এক বেলা আহার কুলায় না। জিজ্ঞাসা করিও—আমি কি করিয়া খাইব ? আমি বাগ্‌দীই হই—মুচিই হই—তাঁহার পুত্রবধূ। তাঁহার পুত্রবধূ কি করিয়া দিনপাত করিবে ?"

শাশুড়ী বলিল, "অবশ্য বলিব।"

তার পর প্রফুল্ল উঠিয়া গেল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বঙ্গদর্শন।

সংখ্যা। ১০০।

দেবী চৌধুরাণী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর, সেই ঘরে সাগর ও প্রফুল্ল, দুইজনে দ্বার বন্ধ করিয়া চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া কপাটে ঘা দিল। সাগর জিজ্ঞাসা করিল,

"কে গো?"

"আমি গো।"

সাগর, প্রফুল্লের গা টিপিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "কথা কস্‌নে; সেই কালপেঁচা টা এয়েছে।"

প্র। "সতীন?"

সা। হাঁ—চুপ!

যে আসিয়াছিল সে বলিল "কেগা ঘরে, কথা কস্‌নে কেন? যেন সাগর বৌউয়ের গলা শুনিলাম না?"

সা। তুমি কেগা—যেন নাপিত বৌউয়ের কথা শুনিলাম—না?"

"আঃ মরণ আর কি! আমি কি নাপিত বৌউয়ের মতন?"

সা। কে তবে তুমি?

"তোর সতীন! সতীন! সতীন! নাম "নয়ান বৌ।"

(বউটির নাম—নয়নতারা—লোকে তাহাকে "নয়ান বৌ" বলিত—সাগরকে সাগর বৌ বলিত।)

সাগর তখন কৃত্রিম ব্যস্ততার সহিত বলিল,—"কে? দিদি? বালাই তুমি কেন নাপিত বৌয়ের মতন হতে যাবে? সে যে একটু ফরসা।"

নয়ান। মরণ আর কি—আমি কি তার চেয়েও কালো? তা সতীন এমনই বটে—তবু যদি চৌদ্দ বছরের না হতিস্।

সা। তা, চৌদ্দ বছর হলো ত কি-

হতো—তুমি সতের—তোমার চেয়ে আমার রূপও আছে, যৌবনও আছে।

ন। রূপ যৌবন নিয়ে বাপের বাড়ীতে বসে বসে ধুয়ে খাস্। আমার যেমন মরণ নাই তাই তোর কাছে কথা জিজ্ঞাসা করতে এলেম।

সা। কি কথা দিদি?

ন। তুই দোরই খুল্‌লিনে, তার কথা কব কি? সন্ধ্যা রাত্রে দোর দিয়েছিস কেন্ লা?

সা। আমি তাই লুকিয়ে দুটো সন্দেশ খাচ্চি। তুমি কি খাও না?

ন। তা, খা [illegible]। (নয়ান নিজে সন্দেশ বড় ভাল বাসিত) বলি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম কি, আবার একজন এয়েছে না কি?

সা। আবার একজন কি? স্বামী?

ন। মরণ আর কি? তাও কি হয়?

সা। হলে ভাল হতো—দুইজনে ভাগ করিয়া নিতাম। তোমার ভাগে নূতনটা দিতাম।

ন। ছি! ছি! ও সব কথা কি মুখে আনে?

সা। মনে?

ন। তুই আমার যা ইচ্ছা তাই বলিবি কেন?

সা। তা তাই কি জিজ্ঞাসা করবে, না বুঝাইয়া বলিলে কেমন করিয়া উত্তর দিই?

ন। বলি গিন্নির নাকি আর একটি বউ এয়েছে?

সা। কে বউ?

ন। সেই মুচি বউ।

সা। মুচি? কই শুনি নে ত।

ন। মুচি না হয় বাগ্‌দী?

সা। তাও শুনিনে।

ন। শোননি—আমাদের একজন বাগ্‌দী সতীন আছে।

সা। কই না।

ন। তুই বড় দুষ্ট। সেই যে, প্রথম যে বিয়ে।

সা। সে ত বামনের মেয়ে।

ন। হাঁাঃ বামনের মেয়ে? তা হলে আর নিয়ে ঘর করে না?

সা। কাল যদি তোমায় বিদায় দিয়ে, আমায় নিয়ে ঘর করে, তুমি কি বাগ্‌দীর মেয়ে হবে?

ন। তুই আমায় গাল দিবি কেন্ লা পোড়ার মুখী?

সা। তুই আর একজনকে গাল দিচ্ছিস্ কেন্‌লা পোড়ার মুখী?

ন। মরুগে যা—আমি ঠাকুরুণকে গিয়া বলিয়া দিই, তুই বড় মানুষের মেয়ে ব'লে আমার যা ইচ্ছে তাই বলিস্।

এই বলিয়া নয়নতারা ওরফে কাল-পেঁচা ঝমর ঝমর করিয়া ফিরিয়া যায়—তখন সাগর দেখিল প্রমাদ! ডাকিল, "না দিদি ফের! ফের! ঘাট হয়েছে, দিদি ফের! এই দোর খুলিতেছি!"

নয়নতারা রাগিয়া ছিল—ফিরিল না। কিন্তু ঘরের ভিতর যায় দিয়া সাগর কত সন্দেশ খাইতেছে ইহা দেখিবার একটু

ইচ্ছা ছিল তাই ফিরিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল—সন্দেশ নহে—আর একজন লোক আছে। জিজ্ঞাসা করিল—"এ আবার কে ?"

সা। প্রফুল্ল।

ন। সে আবার কে ?

সা। মুচি বৌ।

ন। এই সুন্দর ?

সা। তোমার চেয়ে নয়।

ন। নে আর আলাসনে। তোর চেয়ে ত নয়।

তখন প্রফুল্লমুখী ও নয়নতারার চারি চক্ষে দেখাদেখি হইল। যেমন ব্যাঘ্র ও শীকারী দুইজনে পরস্পরে চাহে—কে কাহার প্রাণবধ করিবে—সেইরূপ দুই-জনে পরস্পরের প্রতি চাহিল। দুই-জনেই বুঝিল, "এই আমার পরম শত্রু।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এদিগে কর্ত্তা মহাশয় এক প্রহর রাত্রে গৃহমধ্যে ভোজনার্থ আসিলেন। গৃহিণী ব্যজন হস্তে ভোজন পাত্রের নিকট শোভমানা—তাতে মাছি নাই—তবু নারী ধর্ম্মের পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে। হায়! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় ধর্ম্ম লোপ করিতেছে? গৃহিণীর দশজন দাসী আছে—কিন্তু স্বামী সেবা—আর কার সাধ্য করিতে আসে! যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্ম্মের লোপ করিতেছে, হে আকাশ! তাহাদের মাথার জন্ত কি তোমার বজ্র নাই?

কর্ত্তা আহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাগ্‌দী বেটি গিয়াছে কি ?"

গৃহিণী, মাছি তাড়াইয়া, নথ নাড়িয়া বলিলেন, "রাত্রে আবার সে কোথা যাবে? রাত্রে একটা অতিথি এলে তুমি তাড়াও না—আর আমি বউটোকে রাত্রে তাড়িয়ে দেব?

কর্ত্তা। অতিথ হয় অতিথশালায় থাক্‌না? এখানে কেন?

গিন্নী। আমি তাড়াতে পারব না আমি ত বলেছি। তাড়াতে হয় তুমি তাড়াও। বড় সুন্দর বউ কিন্তু—

কর্ত্তা। বাগ্‌দীর ঘরে অমন দুটো একটা সুন্দর হয়। তা আমিই তাড়াচ্চি। ব্রজ কে ডাক্ ত রে!"

ব্রজ, কর্ত্তার ছেলের নাম। একজন চাকরাণী ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল। ব্রজেশ্বরের বয়স একুশ বাইশ; অনিন্দ্য সুন্দর পুরুষ,—পিতার কাছে বিনীতভাবে আসিয়া দাঁড়াইল—কথা কহিতে সাহস নাই।

দেখিয়া হরবল্লভ বলিলেন, "বাপু—তোমার তিন সংসার—মনে আছে?"

ব্রজ চুপ করিয়া রহিল।

"প্রথম বিবাহ মনে হয়—সে একটা বাগ্‌দীর মেয়ে।"

ব্রজ নীরব—বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে—হিরায় ধায় হইলেও সেকালে কথা কহিত না—এখন যত

বড় মূর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা শীচ ঝাড়ে।

কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন, "সে বাগ্‌দী বেটি—আজ এখানে এয়েছে—জোর ক'রে থাকিবে, তা তোমার গর্ত্ত-ধারিণীকে বল্‌লেম যে ঝাঁটা মেরে তাড়াও। মেয়ে মানুষ, মেয়ে মানুষের গায়ে হাত কি দিতে পারে? এ তোমার কাজ। তোমারই অধিকার—আর কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি আজ রাত্রে তাকে ঝাঁটামেরে তাড়াইয়া দিবে। নহিলে আমার ঘুম হইবে না।

গিন্নী বলিলেন, "ছি! বাবা মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুল না। ওঁর কথা রাখিতেই হইবে, আমার কথা কিছু চল্‌বে না। তা যা কর, ভাল কথায় বিদায় করিও।"

ব্রজ বাপের কথায় উত্তর দিল, "যে আজ্ঞা।" মার কথায় উত্তর দিল, "ভাল।"

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর, একটু দাঁড়াইল। সেই অবকাশে গৃহিণী কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি যে বৌকে তাড়াবে—বৌ খাবে কি করিয়া।"

কর্ত্তা বলিলেন—"যা খুসি করুক—চুরি করুক ডাকাতি করুক—ভিক্ষা করুক।"

গৃহিনী ব্রজেশ্বরকে বলিয়া দিলেন, "তাড়াইবার সময়ে বৌমাকে এই কথা বলিও। সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।"

ব্রজেশ্বর পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর নিকুঞ্জে গিয়া দর্শন দিলেন। দেখিলেন ব্রহ্ম ঠাকুরাণী তদ্‌গদচিত্তে মালা জপ করিতেছেন আর মশা তাড়াইতেছেন। ব্রজেশ্বর বলিলেন, "ঠাকুর মা।"

ব্রহ্ম। কেন ভাই?

ব্রজ। আজ নাকি নূতন খবর?

ব্রহ্ম। কি নূতন? সাগর আমার চরকা টা ভেঙ্গে দিয়েছে তাই? তা ছেলে মানুষ দিয়েছে দিয়েছে। চরকা কাটতে তার সাধ গিয়েছিল—

ব্রজ। তা নয় তা নয়—বলি আজ নাকি—

ব্রহ্ম। সাগরকে কিছু বলিও না। তোমরা বেঁচে থাক আমার কত চরকা হবে। তবে বুড়ো মানুষ—

ব্রজ। বলি আমার কথাটা শুনবে?

ব্রহ্ম। বুড়ো মানুষ কবে আছি কবে নেই, দুটা পৈতে তুলে বামুনকে দিই এই বৈত নয়। তা যাক্‌গে—

ব্রজ। আমার কথাটা শোন, নহিলে তোমার যত চরকা হবে সব আমিই ভেঙ্গে দেব।

ব্রহ্ম। কি বলছ? চরকার কথা নয়?

ব্রজ। তা নয়—আমার দুইটী ব্রাহ্মণী আছে জান ত?

ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণী? মা মা মা! যেমন ব্রাহ্মণী নয়ান বৌ, তেমনি ব্রাহ্মণী সাগর বৌ—আমার হাড়টা খেলে—কেবল রূপকথা বল—রূপকথা বল—

রূপকথা বল! ভাই আমি এত রূপকথা পাব কোথা?

ব্রজ। রূপকথা থাক—

ব্রহ্ম। তুমি যেন বল্‌লে থাক, তারা ছাড়ে কই? শেষে সেই বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা বলিলাম। বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা জান? বলি শোন। এক বনে, বড় একটা শিমুল গাছে এক বিহঙ্গম বিহঙ্গমী থাকে।

ব্রজ। সর্ব্বনাশ! ঠাকুর মা কর কি! এখন রূপকথা! আমার কথা শোন।

ব্রহ্ম। তোমার আবার কথা কি? আমি বলি রূপ কথা শুনতেই এয়েছ—তোমাদের ত আর কাজ নেই?

ব্রজেশ্বর মনে মনে ভাবিল, "কবে বুড়ীদের ৺ প্রাপ্তি হবে।" প্রকাশ্যে বলিল:—

"আমার দুইটি ব্রাহ্মণী—আর একটি বাগ্‌দীনী। বাগ্‌দীনীটি নাকি আজ এয়েছে?"

ব্রহ্ম। বালাই বালাই—বাগদীনী কেন? সে বামনের মেয়ে।

ব্রজ। এয়েছে?

ব্রহ্ম। হাঁ।

ব্রজ। কোথায়? একবার দেখা হয় না?

ব্রহ্ম। হাঁ! আমি দেখা করিয়ে দিয়ে তোমার বাপ মার দু চক্ষের বিষ হই! তার চেয়ে বিহঙ্গম বিহঙ্গমার কথা শোন।

ব্রজ। ভয় নাই—বাপ মা আমাকে ডাকিয়া বলিয়াছেন—তাকে তাড়াইয়া দাও। তা দেখা না পেলে, তাড়াইয়া দিব কি প্রকারে? তুমি ঠাকুরমা, তোমার কাছে সন্ধানের জন্য আসিয়াছি।

ব্রহ্ম। ভাই, আমি বুড়ো মানুষ—কৃষ্ণনাম জপ করি, আর আলো চাল খাই। রূপকথা শোন ত বল্‌তে পারি। বাগদীর কথাতেও নই বামনের কথাতেও নই।

ব্রজ। হায়! বুড়ো বয়সে কবে তুমি ডাকাতের হাতে পড়িবে।

ব্রহ্ম। অমন কথা বলিসনে—বড় ডাকাতের ভয়! কি, দেখা করবি?

ব্রজ। তা নহিলে কি তোমার মালা জপ দেখ্‌তে এয়েছি?

ব্রহ্ম। সাগর বৌয়ের কাছে যা।

ব্রজ। সতীনে কি সতীনকে দেখায়?

ব্রহ্ম। তুই যানা। সাগর তোকে ডেকেছে, ঘরে গিয়ে বসে আছে। অমন মেয়ে আর হয় না।

ব্রজ। চরকা ভেঙ্গেছে বলে? নয়ানকে ব'লে দেব—সে যেন একটা চরকা ভেঙ্গে দেয়।

ব্রহ্ম। হাঁ—সাগরে, আর নয়ানে? যা! যা!

ব্রজ। গেলে বাগদীনী দেখ্‌তে পাব?

ব্রহ্ম। বুড়ীর কথাটাই শোন্ না, কি জ্বালাতেই পড়লেম গা? আমার

মালা জপ হলো না। তোর ঠাকুর দাদার তেষট্টিটা বিয়ে ছিল—কিন্তু চৌদ্দ বছরই হোক্—আর চুয়াত্তর বছরই হোক—কই কেউ ডাকলে ত কখন না বলিত না।

ব্রজ। ঠাকুর দাদার অক্ষয় স্বর্গ হৌক—আমি চোদ্দ বছরের সন্ধানে চল্‌লেম। ফিরিয়া আসিয়া চুয়াত্তর বছরের সন্ধান লইব কি?

ব্রহ্ম। যা যা যা! আমার মালা জপা ঘুরে গেল। রঃ নয়নতারাকে বলে দিব তুই বড় চেঙ্গড়া হয়েছিস।

ব্রজ। ব'লে দিও। খুসী হ'য়ে দুটো ছোলাভাজা পাঠিয়ে দেবে।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর—সাগরের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সাগর শ্বশুরবাড়ী আসিয়া দুইটি ঘর পাইয়াছিল, একটি নীচে, একটি উপরে। নীচের ঘরে বসিয়া সাগর পান সাজিত, সমবয়স্কাদিগের সঙ্গে খেলা করিত, কি গল্প করিত। উপরের ঘরে রাত্রে শুইত; দিনমানে সোয়া হইলে সেই ঘরে গিয়া দ্বার দিত। অতএব ব্রজেশ্বর, ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর উপকথার জ্বালা এড়াইয়া সেই উপরের ঘরে গেলেন।

সেখানে সাগর নাই—কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আর একজন কে আছে। অনুভবে বুঝিলেন, এই সেই প্রথম স্ত্রী।

বড় গোল বাধিল। দুইজনে সম্বন্ধ বড় নিকট—স্ত্রী-পুরুষ—পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু কখনও দেখা নাই। কখন কথা নাই। কি বলিয়া কথা আরম্ভ হইবে? কে আগে কথা কহিবে? বিশেষ একজন তাড়াইতে আসিয়াছে আর একজন তাড়া খাইতে আসিয়াছে। আমরা প্রাচীনা পাঠিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কথাটা কি রকমে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল?

উচিত যাই হৌক—উচিত মত কিছুই হইল না। প্রথমে দুই জনের একজনও অনেক ক্ষণ কথা কহিল না। শেষ প্রফুল্ল, অল্প, অল্পমাত্র হাসিয়া, গলায় কাপড় দিয়া ব্রজেশ্বরের পায়ের গোড়ায় আসিয়া টিপ করিয়া এক প্রণাম করিল।

ব্রজেশ্বর বাপের মত নহে। প্রণাম গ্রহণ করিয়া অপ্রতিভ হইয়া, বাহু ধরিয়া প্রফুল্লকে উঠাইয়া পালঙ্কে বসাইল। বসাইয়া আপনি কাছে বসিল।

প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমটা ছিল—সেকালের মেয়েরা একালের মেয়েদের মত নহে—ধিক্ এ কাল? তা সে ঘোমটাটুকু, প্রফুল্লকে ধরিয়া বসাইবার সময়ে সরিয়া গেল—ব্রজেশ্বর, দেখিল যে প্রফুল্ল কাঁদিতেছে। ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া—আ ছি! ছি! ছি! বাইশ বছর বয়সেই ধিক! ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া, না ভাবিয়া চিন্তিয়া, যেখানে বড় ভবভবে চোখের নীচে দিয়া এক

ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল—সেই স্থানে—আ ছি ছি! ব্রজেশ্বর হঠাৎ চুম্বিত করিলেন। গ্রন্থকার প্রাচীন—লিখিতে লজ্জা নাই—কিন্তু ভরসা করি মার্জ্জিত রুচি নবীন পাঠক এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন।

যখন ব্রজেশ্বর এই ঘোরতর অশ্লীলতা দোষে নিজে দূষিত হইতেছিলেন, এবং গ্রন্থকারকে সেই দোষে দূষিত করিবার কারণ হইতেছিলেন—যখন নির্ব্বোধ প্রফুল্ল মনে মনে করিতেছিল যে বুঝি এই মুখচুম্বনের মত পবিত্র পুণ্যময় কর্ম্ম ইহ জগতে কখনও কেহ করে নাই, সেই সময়ে দ্বারে কে মুখ বাড়াইল। মুখ খানা বুঝি অল্প একটু হাসিয়াছিল—কি যার মুখ তার হাতের গহনার বুঝি একটু শব্দ হইয়াছিল—তাই ব্রজেশ্বরের কাণ সেদিগে গেল। ব্রজেশ্বর সেদিগে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, মুখখানা, বড় সুন্দর। কালো কুচকুচে কোঁকড়া কোঁকড়া ঝাপটায় বেড়া—তখন মেয়েরা ঝাপটা রাখিত—তার উপর একটু ঘোমটা টানা—ঘোমটার ভিতর দুইটা পদ্ম পলাশ চক্ষু ও দুইখানা পাতলা রাঙ্গা ঠোঁট মিঠে মিঠে হাঁসিতেছে। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, মুখখানা সাগরের। সাগর, স্বামীকে একটা চাবি ও কুলুপ দেখাইল। সাগর ছেলে মানুষ; স্বামির সঙ্গে জিয়াদা কথা কয় না। ব্রজ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু বুঝিতে বড় বিলম্বও হইল না। সাগর বাহির হইতে কপাট টানিয়া দিয়া, শিকল লাগাইয়া কুলুপে চাবি ফিরাইয়া বন্ধ করিয়া ছুড় ছুড় করিয়া ছুটিয়া পলাইল। ব্রজেশ্বর, কুলুপ পড়িল শুনিতে পাইয়া, "কি কর সাগর! কি কর সাগর!" বলিয়া চেঁচাইল। সাগর কিছুতে কাণ না দিয়া ছুড় ছুড় ঝম্ ঝম্ করিয়া ছুটিয়া একেবারে ব্রহ্মঠাকুরাণীর বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

ব্রহ্ম ঠাকুরাণী বলিলেন, "কি লা সাগর বৌ? কি হয়েছে? এখানে এসে শুলি যে?"

সাগর কথা কয় না।

ব্রহ্ম। তোকে ব্রজ তাড়িয়ে দিয়েছে না কি?

সা। তা নইলে আর তোমার আশ্রয়ে আসি? আজ তোমার কাছে শোব।

ব্রহ্ম। তা শো শো! এখনই আবার ডাক্‌বে এখন! আহা! তোর ঠাকুর দাদা এমন বারো মাস ত্রিশ দিন আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আবার তখনই ডেকেছে—আমি আরও রাগ করে যেতেম না—তা মেয়ে মানুষের প্রাণ ভাই! থাক্‌তে ও পারতেম না। এক দিন হলো কি—

সা। ঠান্‌দিদি—একটা রূপকথা বল না।

ব্র। কোন্‌টা বল্‌বো, বিহঙ্গম বিহঙ্গমার কথা বলিব? তা একেলা শুন্‌বি, নূতন বৌটা কোথায়, তাকে ডাকনা—দুজনে শুনবি।

সা। সে কোথা আমি এখন খুঁজতে পারি না। আমি একাই শুনবো। তুমি বল।

ব্রহ্ম ঠাকুরাণী তখন সাগরের কাছে শুইয়া বিহঙ্গমের গল্প আরম্ভ করিল। সাগর তাহার আরম্ভ হইতে না হইতেই ঘুমাইয়া পড়িল। ব্রহ্ম ঠাকুরাণী সে সম্বাদ অনবগত, দুই চারি দণ্ড গল্প চালাইলেন, পরে যখন জানিতে পারিলেন শ্রোত্রী নিদ্রামগ্না, তখন দুঃখিত চিত্তে মাঝ খানেই গল্প সমাপ্ত করিলেন।

এখন নয়নতারা জানে যে স্বামী সাগরের ঘরে; তাকে একবার আড়ি পাতিতেই হইবে। সে যখন আসিয়া জুটিয়াছিল—তখন সাগর দ্বারে কুলুপ দিয়া পলাইয়াছে। নয়নতারা আড়ি পাতিয়া বুঝিয়া গেল যে বাগদী বউ ঘরে আছে। রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে মনে মনে বলিল—"সাগরি বাঁদরী—অধঃপাতে যাও—উনুনমুখী—চুলোমুখী—আপনি শুতে যায়গা পায় না শঙ্করাকে ডাকে।" তখন নয়নতারা, একজন দাসীকে শিখাইয়া পড়াইয়া শ্বশুরের কাছে পাঠাইলেন। সে কোন কাজের ছলে কর্ত্তার কাছে গিয়া, কথায় কথায় বলিয়া আসিল, যে মুচী বৌ—প্রফুল্ল বাগদী ঘুচিয়া ক্রমে মুচিতে দাড়াইতেছিল—মুচি বৌ ব্রজেশ্বরের ঘরে শয়ন করিয়াছে। তখন কর্ত্তার হুকুম হইল, যে কালই প্রাতে নয়ান বৌমা স্বহস্তে তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া বিদায় করিবেন। ব্রজেশ্বরের ভাগ্যে, কর্ত্তা মহাশয় এক কাঁড়ি তিরস্কার জমা করিয়া রাখিলেন।

এদিগে প্রভাত হইতে না হইতেই সাগর আসিয়া, ঘরের কুলুপ খুলিয়া দিয়া গেল। তার পর কাহাকে কিছু না বলিয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর ভাঙ্গা চরকা লইয়া সেই নিদ্রামগ্না বর্ষীয়সীর কাণের কাছে ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিল।

"কটাশ—ঝনাৎ" করিয়া কুলুপ শিকল খোলার শব্দ হইল—প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বর তাহা শুনিল। প্রফুল্ল বসিয়াছিল—উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—

"সাগর শিকল খুলিয়াছে। আমি চলিলাম। যে যে কথা হইয়াছে, তাহা তোমার মনে থাকিবে কি?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "ভুলিবার কথা কোন্‌টা?"

প্র। সবই ভুলিবার কথা—কেন না আমিই যে ভুলিবার বস্তু। কিন্তু কথাটা চিরদিনের জন্য মনে রাখ, তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা। বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি না হয় ভাল করিয়া আবার তোমায় জিজ্ঞাসা করি। প্রথম কথা, তুমি আমায় ত্যাগ করিলে বটে?

ব্র। এমন কথা কেন বল? তোমায় আমি কখন ত্যাগ করিব না—যে স্ত্রী ত্যাগ করে সে মহাপাতকী। তবে যত দিন আমার বাপ বর্ত্তমান আছেন, তত দিন তোমার আমার দেখা সাক্ষাৎ

হইবে না। পিতার অবাধ্য কোন মতেই হইতে পারিব না—অবাধ্য হইবার আমার সাধ্য কি? কিন্তু পিতার অবর্ত্তমানে—

প্র। অর্থাৎ তোমার আর আমার প্রাচীন বয়সে, তুমি আমায় গ্রহণ করিবে। ভালই। তত দিন আমি খাইব কি? আমার শ্বশুর একথায় যে উত্তর দিয়াছেন তাহা ত তোমারই মুখে শুনিলাম। তোমারও কি সেই মত? চুরি, ডাকাতি, ভিক্ষা, করিয়া খাইব, তোমারও কি সেই মত?

ব্রজেশ্বর অধোবদন হইল। কিছু পরে বলিল, "আমার নিজের কিছু নাই কিন্তু যেমন করিয়া হৌক আমি কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"

প্র। সংগ্রহ করিয়া—অর্থাৎ বাপের টাকা হইতে কোনমতে কিছু লইয়া। তাহা আমি লইব না—তোমার বাপের এক পয়সা আমি খাইব না। তুমি নিজে উপার্জ্জন করিয়া আমায় খাওয়াইতে পার না?

ব্র। আমি বাপের অধীন—ঘরের বাহির হইতে পাই না—নহিলে উপার্জ্জনে আমি অক্ষম নহি। সে চেষ্টা এখন করা বৃথা।

প্র। তবে তোমার কিছু দিয়া কাজ নাই। আমি পারি, চুরি ডাকাতি ভিক্ষা করিয়াই খাইব। না পারি মরিয়া যাইব।

ব্র। অমন সকল কথা মুখে আনিও না। আমার একটি আঙ্গটি আছে—অনেক টাকা দাম—ঐটি লইয়া যাও—এখন কিছু দিন চলিবে—তার পর—

প্র। আঙ্গটি লইয়া আমি কোন্ বাজারে বেচিতে যাব? তবু আঙ্গটিটি দাও। তোমার সঙ্গে এক রাত্রের জন্য যে সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাতেই আমার জন্ম সার্থক হইয়াছে; মধ্যে মধ্যে আঙ্গটি দেখিয়া এ স্মরণ করিব। কিন্তু এ আঙ্গটি আমার কাছে দেখিলে কেহ চোর বলিয়া ধরিবে না ত? কিম্বা আরও কি———

ব্র। এ আঙ্গটিতে আমার নাম খোদা আছে। নিতে কোন ভয় করিও না।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর আঙ্গটি আনিয়া দেখাইলেন, তাহার ভিতর পিঠে তাঁহার নাম ফারসী অক্ষরে খোদিত আছে। প্রফুল্ল আঙ্গটি লইল।

ব্র। এখন কোথায় কি প্রকারে তোমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া দাও।

প্র। সে ভার তোমার উপর—আমার যত দূর সাধ্য তাহা করিয়াছি। এখানে ত আর আমার আসা হইতে পারে না। তুমি আমাদের বাড়ী যাইবে?

ব্রজেশ্বর আবার অধোবদন হইল—বলিল "শক্রয়া জাতি মারিবে।"

প্র। তবে দেখা সাক্ষাৎ এই

পর্য্যন্ত। যদি আর একবার কথনও কোন গতিকে সাক্ষাৎ হয়——

ব্র। যদি কোন গতিকে সাক্ষাৎ হয়—তবে কি? চুপ করিলে কেন?

প্র। তখন তুমি আমায় চিনিতে পারিবে কি? এ বয়স ত থাকিবে না।

ব্র। আমি ভুলিব না।

প্র। ভুলিবে।

এই বলিয়া প্রফুল্ল এক হাতের পিত-লের বালা খুলিয়া জোর করিয়া তাহা দুইখানা করিয়া ভাঙ্গিল। বলিল,

"আধখানা বালা তোমার কাছে থাক। আধখানা আমার কাছে রহিল। আধখানায় আর আধখানা মিলাইলে, তুমিও চিনিবে, আমিও চিনিব। এখন চলিলাম। মনে থাকে যেন—আমায় বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলে।

এই বলিয়া প্রফুল্ল দ্বার খুলিয়া বাহির হইল—ব্রজেশ্বর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বার খুলিয়া প্রফুল্ল দেখিল, দ্বার পার্শ্বে নয়নতারা ঝাঁটা হাতে দাঁড়াইয়া আছে। প্রফুল্লকে দেখিয়াই নয়নতারা বলিল, "বেরন্ত মাগী, ঝাঁটা মেরে তোর বিষ ঝেড়ে দিই।"

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, "তুমি কি বাড়ীর ঝাড়ুওয়ালা নাকি?"

নয়নতারা জ্বলিয়া অঙ্গারের মত হইল। মারিবার জন্য ঝাঁটা তুলিল। প্রফুল্ল নড়িল না। ব্রজেশ্বর ঘরের ভিতর হইতে এসব দেখিতে পাইল—ঝাঁটা প্রফুল্লের ঘাড়ে পড়ে পড়ে এমন সময়ে ব্রজেশ্বর নয়নতারার হাত হইতে ঝাঁটা কাড়িয়া লইল। প্রফুল্ল আবার হাসিয়া নয়নতারাকে বলিল—"তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হইওনা দিদি—ও ঝাঁটা মারাই হই-য়াছে। ইহজন্মে আমি তাই ভাবিব। মনে থাকে যেন—তুমি আমাকে ঝাঁটা মারিয়া এবাড়ী হইতে বিদায় করিলে।"

প্রফুল্ল আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিল না। একেবারে বাহিরে খিড়কী দ্বার পার হইল। দেখিল সেখানে সাগর ঘেরা বাগানে ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর পূজার ফুল তুলিতেছে। প্রফুল্ল বাগানের কাছে গিয়া বলিল, "আমি ভাই আজ চলি-লাম। এবাড়ীতে আর আসিব না। তুমি বাপের বাড়ী গেলে সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ী চেন?

প্র। না চিনি, চিনিয়া যাইব।

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ী যাবে?

প্র। আমার আর লজ্জা কি? আমি আর কুলের কুলবধূ নই। সে নাম আমার ঘুচিয়াছে।

সা। ছি, অমন কথা বলিওনা। তোমার মা, তোমার সঙ্গে দেখা করি-বেন বলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বাগানের দ্বারের কাছে যথার্থ প্রফু-ল্লের মা দাঁড়াইয়া ছিল। সাগর দেখা-ইয়া দিল। প্রফুল্ল মার কাছে গেল।

ব্রহ্মঠাকুরাণীর গুণে প্রফুল্লের মার উপবাস ও নিরাশ্রয় দুঃখ সহিতে হয় নাই। এখন মায়ে ঝিয়ে সাক্ষাৎ হইলে পরস্পরের সম্বাদ পরস্পরের কাছে শুনিল। প্রফুল্লের মা বলিল, "এখন সাধ মিটিল। চল ঘরে যাই।"



কাঞ্চন মালা।

দ্বাদশ খণ্ড।

১।

স্বামী বন্দী হওয়ার সম্বাদ পাইয়া অবধি কাঞ্চনের মনের স্ফূর্ত্তি ছিল না। তাঁহার যাহা নিত্যকর্ম্ম ছিল, তাহা তিনি করিতেন,——কেবল মাত্র অভ্যাসের গুণে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বড় একটা উৎসাহ ছিল না। নিত্য সজ্ঘ-ভোজন করাইতেন, নিত্য দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন-বস্ত্র দিতেন, নিত্য রোগীদের সেবা করিতেন, নিত্য ঔষধ বিতরণ করিতেন, সমস্ত কেবল অভ্যাসের গুণে। ক্রমে দেখিলেন তাহাতে তাঁহার কাজ ভাল হয় না। এক দিন সজ্ঘ-ভোজনে পরিবেশন করিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে পায়স দিয়া ফেলিলেন; একদিন একজন রোগীকে ঔষধ সেবন করাইয়া আসিলেন, পরদিন পথ্য দিতে হইবে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে পথ্যের কথা তাঁহার মনে পড়িল না। মনে পড়িলেই দৌড়িয়া গেলেন, গিয়া দেখেন রোগী অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়াছে। অতি কষ্টে তাঁহার কথা বাহির হইতেছে। একদিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের জন্য কিছু খাবার লইয়া যাইতে যাইতে একটী পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন; মনে হইল একদিন কুণাল ও তিনি এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন; আবার সেই পূর্ব্ব কাহিনী মনে পড়িয়া গেল, গয়াশীর্ষ পর্ব্বতের বাঘ শীকার হইতে সকল কথা মনে পড়িল। দাঁড়াইয়া এক মনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন—আত্ম-চিন্তায় মগ্ন হইয়া উঠিলেন, খাবার গুলি চিলে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

কাঞ্চন দেখিলেন, এরূপ মনে গৃহে বাস আর সঙ্গত নয়। যে কাজে উৎসাহ নাই সে কাজ করিতে নাই। যেখানে থাকিলে মনের স্ফূর্ত্তি হয় না সে খানে থাকিতে নাই। সাত পাঁচ ভাবিয়া কাঞ্চন গৃহত্যাগ করিলেন। এক দিন ঘোরা দ্বি-প্রহরা নিবিড়-গাঢ় তমস্বিনী রাত্রিতে পতি-অন্বেষিণী কাঞ্চন-মালা আপন কুটীরে বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিলেন; শাক্য ভিক্ষুকী সাজিলেন। রক্তবস্ত্র পরিধান করিলেন, স্বহস্তে আপাদ লুলিত কেশ রাশি ছেদন করিলেন। কত গুলা ধুলা কাদা মাখিয়া সে তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভ

বর্ণের হীনতা সম্পাদন করিলেন। ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধকে প্রণাম করিলেন; ধীরে ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন; করিয়া অনন্ত পিচ্ছিল অন্ধকার সমুদ্রে একাকিনী ঝাঁপ দিলেন।

২

পাটলী পুত্র হইতে তক্ষশীলা যে অনেক দূর। একখানি চিটী আসিতে এক মাস লাগে; একা কাঞ্চন এতদূর কিরূপে যাইবে? কিন্তু কাঞ্চন ঋষিকন্যা; পর্ব্বত তাহার জন্মভূমি সে রাজপুরীর সুখকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে। রাজ-পুরীতে বসিয়া থাকিতে হয়। রাজপুরীতে পাখীরা প্রাণ খুলিয়া গান গাইতে পারে না। যে বায়ু পর্ব্বত-শীর্ষে প্রাণ প্রফুল্ল করিয়া দেয়, সে বায়ু রাজ-বাড়ীতে পাওয়া যায় না। রাজ-বাড়ীতে প্রাণ খুলিয়া কথাই কহার যো নাই; সুতরাং কাঞ্চনের পক্ষে রাজ-বাড়ীই কষ্টকর; পথশ্রম তাহার পক্ষে কষ্টকর নহে। কিন্তু এবার পথ চলিতে গিয়া কাঞ্চন বুঝিতে পারিল, যে সেকালের পথ চলায় আর একালের পথ চলায় অনেক তফাৎ। এখন ভাবনার ভারে মন পীড়িত, পথ যেন বড় লম্বা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পা যেন উঠিতেছে না বোধ হইতে লাগিল। তিনি অন্য লোক অপেক্ষা অনেক দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার মন উঠিল না। পাছে রাজ-পথে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে তিনি সে পথে গেলেন না। রাজপথ বাঁকিয়া গিয়াছে, মগধ সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত প্রধান নগর গুলি ঐ একটী রাস্তার ধারে, সুতরাং সে পথে যাইতে গেলে অনেক দেরি হইবে ভাবিয়া কাঞ্চন গ্রাম্য পথ আশ্রয় করিলেন। কখন মাঠের উপর দিয়া, কখন বনের মধ্য দিয়া, কখন গ্রামের ভিতর দিয়া, কখন বড় বড় নদী সন্তরণ করিয়া, পতিগতপ্রাণা পতির অন্বেষণে গমন করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে পতির রূপ অঙ্কিত, পতির ভাবনায় পথের ক্লেশ অনুভব হইল না। এক দিন সরযূতীরে বহু সংখ্যক লোক সংগ্রহ হইল, দেখিল, মধ্যাহ্ণ সূর্য্য-কিরণে দীপ্যমান মূর্ত্তি দেবতা বা গন্ধর্ব্ব বা বিদ্যাধর সকলের সম্মুখে সরযূ জলে ঝাঁপ দিল; সরযূ তখন উত্তাল তরঙ্গ-মালা পরিপ্লুত মৃত্যুর দন্তাবলীর মত বন্ধুর। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িল, কেহ কেহ নৌকা লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ যাইবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু সে দেব না মানুষ হাত তুলিয়া বারণ করিল এবং "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি," "সংঘং শরণং গচ্ছামি," "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বলিতে বলিতে বক্ষোভরে উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া অবিরল ঘূর্ণ্যমাণ হস্তদ্বয়ের দ্বারা নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া অল্প ক্ষণেই নদীর অপর পারে পঁহুছিল। তাহার পর সেই আর্দ্র-বস্ত্রে পুনরায় ভ্রমণ করিতে লাগিল।

৩

এক দিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় অহিচ্ছত্রের লোক সহসা জাগরিত হইয়া

শুনিল স্বরলহরীতে আকাশ পাতাল পরিপূর্ণ করিয়া গাথা গান করিতে করিতে কে রাজপথের মধ্য দিয়া যাইতেছে। কেহ বলিল নগরের অধিষ্ঠাত্রী, কেহ বলিল বিদ্যাধরী।

আর এক দিন সন্ধ্যার সময় মদ্রিপুরার লোকে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর চারিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মহা কোলাহল করিতেছে, একটী বালক জলে ডুবিয়া গিয়াছে কেহ তুলিতে পারিতেছে না। তাহার পিতামাতা হাত পা আছাড়াইয়া কাঁদিতেছে; কেহ সান্ত্বনা করিতেছে, কেহ ক্রন্দন করিতেছে কেহ ডুবরি ডাকিতে যাইতেছে। এমন সময়ে সহসা আশ্চর্য্য হইয়া তাহারা দেখিল, জয়-ধর্ম্ম জয়-সঙ্ঘ জয়বুদ্ধ ধ্বনি করিয়া এক রক্তাম্বরীদেবী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কাহাকে কোন কথা বলিলেন না, জলমধ্যে ঝাঁপ দিলেন, ডুবিলেন কিয়ৎ পরে জল যেমন ছিল তেমনি হইল। তাহার গর্ভে যে দুইটা মানুষ আছে তাহার কোন চিহ্ন রহিল না। সকলে ভাবিল কোন যক্ষ বালককে লইয়া পাতালপুরী প্রবেশ করিল। ওমা !! অল্প ক্ষণে বালক কোলে দেবী জলোপরি ভাসমান হইলেন, বালক মূর্চ্ছিত অচেতন। তাহার বাপ মা দৌড়িয়া বালক কোলে লইতে আসিল। দেবী দুই পা ধরিয়া বালককে ঘুরাইতে লাগিলেন, লোকে বিস্মিত হইল; পিতা মাতা ব্যাকুল হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিতে গেল; কিন্তু মানুষের সাধ্য কি দেবীর বল রোধ করিতে পারে? কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দেবী মাতার ক্রোড়ে সন্তান দিলেন। সন্তান মাতৃ-ক্রোড়ে হাসিতে লাগিল। সকল লোকে ছেলের মা বাপের জন্য আহ্লাদ করিতে লাগিল। এ দিকে দেবীও অন্তর্হিতা হইলেন।

৪

ক্রমে কাঞ্চনমালা মানিক্যালা আসিয়া পৌঁছিলেন। মানিক্যালা পার হইয়াই বিদ্রোহী দেশ। কাঞ্চন মানিক্যালার প্রধান মঠে একরাত্রি অবস্থান করিলেন। সমস্ত দেব মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। এবং প্রাতঃকালে ধর্ম্ম সঙ্ঘ ও বুদ্ধের নাম স্মরণ করিয়া নির্ভীক চিত্তে বিদ্রোহী রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই তিন দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে শতদ্রু নদী পার হইয়া তিন চারি ক্রোশ যাইয়া তিনি দেখিলেন এক স্থানে বহু সংখ্যক সেনা সমবেত হইয়াছে। কাঞ্চনমালা সৈন্য দেখিয়া অন্য পথে যাইবার উৎযোগ করিলেন, কিয়ৎ দূর গিয়া ক্রমে শাল বনে প্রবেশ করিল। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, দেখিলেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল গাছ যাহার মধ্যে সূর্য্য রশ্মি কখন প্রবেশ করিতে পায় না। সেই নিবিড় অন্ধকার মধ্যে দেখিলেন কোথাও কতক গুলা কম্বল পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও কতক গুলা ভাঙ্গা চাল পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও কতক গুলা ভাঙ্গা হাঁড়ি রহিয়াছে,

কোথাও কতকগুলা কাঠ রাশি করা রহিয়াছে; কিন্তু সব ঝোপের মধ্যে লুকান। কোথায়ও একটী মনুষ্য নাই চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন কোথাও একটী মনুষ্য নাই। পশ্চাৎ ভাগে অনেক দূরে বোধ হইল একটা কি আসিতেছে, ঠিক স্থির করিয়া বুঝিতে পারিলেন না মানুষ কি জানোয়ার। তিনি সত্বর পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিয়ৎ দূর গেলেই একটা বিকট ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখেন কএক জন প্রকাণ্ডাকার অশ্বারোহী কতক গুলি গুনে গোরু বেড়িয়া আসিতেছে, দেখিতে পাইয়াই তিনি বৃক্ষান্তরাল দিয়া যাইতে লাগিলেন। আবার সমস্ত বন ভূমি কম্পিত করিয়া ভীষণ সিংহ নাদ হইল; আর প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে দুইটী ১টী, ৩টী করিয়া বহু সংখ্যক লোকে কানন ব্যাপ্ত হইল। কাঞ্চন যে দিকে চাহেন, দেখেন রণবেশ। ব্রাহ্মণ সেনা, প্রকাণ্ড বলবান, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান, অপরিষ্কার শরীর কাহার যজ্ঞপবীত আছে কাহার নাই। বৃক্ষ হইতে ভূমিতে পড়িয়া সকলে অশ্বারোহীদিগের প্রতি ধাবিত হইল, বোধ হয় অশ্বারোহীগণ ইহাদেরি জন্য খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল। দেখিয়া কাঞ্চন রক্তাম্বর খানি বিলক্ষণ রূপে মুড়ি দিয়া একটী বৃক্ষের দুইটী শিকড়ের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু বহু সংখ্যক দুষ্ট স্বভাব সৈনিক বৃক্ষের উপর হইতে অসামান্য রূপ লাবণ্য-বতী একটী রমণীকে কানন মধ্যে একাকী দেখিয়াছিল। দেখিয়া অনেকের মনে অনেক প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু কিকরে অশ্বারোহীগণ প্রত্যাবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবার নিষেধ ছিল। সুতরাং এতক্ষণ তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই। এক্ষণে তাহারা সুন্দরী কোথায় গেল, খোঁজ করিতে আরম্ভ করিতে লাগিল। অধিক ক্ষণ খুঁজিতে হইল না। সন্ধান করিয়া, সন্ধান করিয়া, বৃক্ষমূলে রক্তাম্বর দেখিয়া তদভিমুখে ৭।৮ জন ধাবিত হইল। যখন কাঞ্চন দেখিলেন, লুকান আর থাকা গেল না, তখন তিনি সত্বর বৃক্ষারোহণ করিলেন। বৃক্ষের শাখায় দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সৈনিকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি পতি অন্বেষণে বহুদূর হইতে আসিতেছি, আমার পতি তক্ষশিলায় বন্দী আছেন, আমি তথায় যাইব, আমার বাধা দিও না।

একজন সৈনিক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিল, তত দূর যাইতে হইবে না এই খানেই পতি লাভ করিবে; আর একজন বলিল পতির অন্বেষণে না উপপতির? দুই, তিনজন সত্বর বৃক্ষ আরোহণ করিতে লাগিল; কাঞ্চন বলিল, বৃক্ষে উঠিও না এক পদাঘাতে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিব। সকলে হাস্য করিয়া উঠিল, কিন্তু যে সর্ব্বাপেক্ষা উঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, তিনি উঁহাকে এমন দারুণ পদা-

ঘাত করিলেন যে সে রক্ত বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। তখন সকলে ভয়ে অভিভূত হইয়া সত্বর বৃক্ষ হইতে নামিয়া পড়িল। বহু সংখ্যক লোক বৃক্ষতলে সমবেত হইল। তখন সকলে কি করা যায় পরামর্শ করিতে লাগিল, আর কাহার সাহস হইল না যে বৃক্ষে আরোহণ করে। কেহ বলিতে লাগিল প্রেতিনী, কেহ বলিল দেবী, কেহ বলিল উহাকে ছাড়িয়া দাও, কেহ বলিল ও পতি অন্বেষণে আসিয়াছে উহাকে দুই একটা পতি দিয়া দিতে হইবে। এইরূপ কথপোকথন হইতেছে, এমন সময়ে দৃষ্ট হইল দূরে সংগৃহীত কাষ্ঠ কম্বলাদি জ্বলিয়া উঠিল, অগ্নি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া যেন বনরাশিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। হঠাৎ অগাধ ধূমরাশিতে কাননাভ্যন্তর গাঢ়তর অন্ধকার হইয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে যে স্থানে অশ্বারোহীগণ সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর খাদ্যরাশি সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার সন্নিকটে প্রচণ্ড পাবক রাশি পরিদৃশ্যমান হইল। সেনাপতি বারম্বার তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিলেন ; বোধ হইতে লাগিল যেন অগ্নিদেব, সৈনিকদিগের প্রাণভূত অন্নরাশি গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। তখন বৃক্ষ তলস্থ সকলেই আহার্য্য দ্রব্য রাশি রক্ষা করিবার নিমিত্ত তদভিমুখে ধাবিত হইল। কেবল কাঞ্চন যাহাকে পদাঘাত করিয়াছিল, সে ও আর একজন বিকটাকৃতি লোক বৃক্ষতলে বসিয়া রহিল, এবং ঘন ঘন বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাদের কি অভিসন্ধি ছিল বলিতে পারি না ; কিন্তু যতদূর অনুমান করা যায় অভিসন্ধি ভাল ছিল না। কাঞ্চন একবার মনে করিলেন নামি, আবার ভাবিলেন, এরূপ দুর্দ্দান্ত লোকের হাতে পড়া ভাল নয়, ভাবিয়া তিনি বৃক্ষের উপরি ভাগে আরোহণ করিতে লাগিলেন, এবং ইহাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার কিছু উপায় আছে কিনা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাঞ্চনের উপায় ভগবান আপনি করিয়া দিলেন, কাঞ্চন বৃক্ষোপরি উঠিয়া দেখিলেন, অরণ্যানী পরিবেষ্টন করিয়া বহু সংখ্যক অশ্বারোহী প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হইতেছে, সূর্য্য কিরণে তাহাদের বর্ম্ম, উষ্ণীষ, কবচাদি জ্বলিতেছে ; তীক্ষ্ণধার বর্ষার অগ্রে অপরাহ্ন সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত, শীর্ণ, বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছ, দেখিতে দেখিতে তাহারা ঘুরিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল এবং কাঞ্চন যে বৃক্ষে আছেন তাহার নিকট দিয়া ব্রাহ্মণ সেনার পশ্চাৎ ভাগে আক্রমণ করিল। যাইবার সময়ে একজন বৃক্ষতলস্থ যোধবেশী ব্রাহ্মণ সৈন্য দ্বয়ের পৃষ্ঠে বর্ষাঘাত করিল, তাহারা উভয়েই তরবারি নিষ্কাশন করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল ; কিন্তু তিন চারিটি বর্ষার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া উভয়েই ধরাশায়ী হইল। ও দিকে ব্রাহ্মণসৈন্যগণ সম্মুখে প্রচণ্ড অগ্নি পশ্চাতে

প্রচণ্ড অশ্বারোহী সৈন্য দেখিয়া কিয়ৎ-ক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। কিন্তু তাহারা ধীর—যুদ্ধে পরাজিত হইবার লোক নয়—অগ্নিদেবকে ঋক্ মন্ত্র পাঠ করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক সকলে সম্মুখ ফিরিয়া অশ্বারোহীদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। তখন অশ্বে অশ্বে, অশ্বে পদাতিকে, প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইতে লাগিল। কাঞ্চন উপর হইতে দেখিতেছিলেন। গাঢ় ধূমান্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু শুনিতে লাগিলেন হ্রেষারব করিয়া—অশ্ব পড়িতেছে, বিকট হুঙ্কার করিয়া—মনুষ্য মরিতেছে, অগ্নি মধ্যে মনুষ্যদেহ অশ্বদেহ পুড়িতেছে—কেহই পলাইতেছে না।

কাঞ্চন এদৃশ্য অধিকক্ষণ দেখিতে পারিলেন না। তিনি চক্ষু ফিরাইলেন; দেখিলেন যে দুই জন লোকের ভরে—তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে পারেন নাই, তাহারা ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ হইল। তিনি সত্বর বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। আসিয়া দেখেন উভয়েই মুমূর্ষু; দেখিলেন বর্ষাফলক তাহার বক্ষদেশে বিদ্ধ, পৃষ্ঠদেশ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার সামান্য মাত্র জ্ঞান আছে। কাঞ্চন নিকটবর্ত্তী হইলে, সে কষ্টে ক্ষীণ হস্ত যোড় করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল—দেবী ক্ষমা—তাহার আর কথা কহিতে হইল না। কাঞ্চন একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন যে প্রাণ পক্ষী দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ের নিকট আসিয়া দেখিলেন, তাহার গাত্র হইতে বর্ষাফলক তুলিয়া লইলে সে বাঁচিতে পারে। তৎক্ষণাৎ কাঞ্চন ধীরে ধীরে বর্ষাফলক উত্তোলন করিলেন, প্রবল বেগে রক্ত-স্রোত ছুটিতে লাগিল। কাঞ্চন নিজ রক্তাম্বরের অঞ্চল ছিন্ন করিয়া ক্ষত মুখে অর্পণ করিলেন, সম্মুখে জল ছিল না ক্ষত মুখে ধূলি মুষ্টি প্রদান করিলেন। এবং নিকটে যে সকল লতা পাতা ছিল তাহার রস নিঙ্গড়াইয়া ক্ষত মুখে দিবার উৎদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অশ্বতর আরোহণ করিয়া এবং উষ্ট্র ও গর্দ্দভের পৃষ্ঠে কি কতক গুলা বোঝাই দিয়া কতক গুলা লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে এক জন আকার প্রকারে বোধ হইল দলাধিপতি দেখিলেন দুইটা মানব মৃত-প্রায়; দেখিয়া দলস্থগণকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়া তথায় উপস্থিত রহিলেন। তখন কাঞ্চন কতকগুলা লতাপাতা সংগ্রহ করিয়া তাহার রস ক্ষতস্থানে দিতেছেন, সেও অশ্বতর হইতে অবতীর্ণ লইয়া গাধার বোঝা নামাইল এবং তাহার মধ্য হইতে কি কএকটী ঔষধ লইয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে দিল। তখন রোগীর চৈতন্য হইল, সে সম্মুখে কাঞ্চন মালাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি" আগন্তুক কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসা করিল, ইনি তোমার কে হন? রোগী অমনি

বলিয়া উঠিল,"আমি উহাঁর পরম শত্রু"। আগন্তুক আবার কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসা করিল "শত্রুর সেবা করিতেছ কেন?" কাঞ্চন বলিল "উহার যন্ত্রণা দেখিয়া সে সব কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম।" এই কথা শুনিয়া আগন্তুক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দুইবার বলিয়া উঠিল "গুরুদেব! গুরুদেব!" কাঞ্চন বলিল তোমার গুরুদেব কে?" সে বলিল "জানিনা তিনি কে।" আমি পূর্ব্বে চণ্ডাল ছিলাম; তক্ষশীলা নগরে জল্লাদের কর্ম্ম করিতাম। একদিন শাসনকর্ত্তা আমাকে ও আর একজন জল্লাদকে এক নির্জ্জন ভূগর্ভস্থ ঘরে লইয়া গিয়া এক জন ঋষির চক্ষু উৎপাটন করিতে বলিলেন। আমার সঙ্গী চক্ষু উৎপাটন করিল। কিন্তু আমি দেখিলাম ঋষি চক্ষু উৎপাটনে কিছু মাত্র কষ্ট অনুভব করিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন আজি আবার তোমার মুখে সেই কথা শুনিয়া তাঁহার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার পর কতবার তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু দুষ্ট ব্রাহ্মণেরা কোথায় যে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে খুঁজিয়া পাই নাই। তদবধি আমি আমার ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা করিয়া বেড়াই। এই যে কয়েক জন লোক আসিয়াছিল ইহারা সকলেই চণ্ডাল, সকলেই আমার মতাবলম্বী হইয়াছে।

কাঞ্চন যতক্ষণ চণ্ডালের কথা শুনিতেছিলেন তাঁহার মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছিল। এক একবার সেই দিনের স্বপ্নের কথা মনে হইতেছিল। তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইতেছিল যে এ কুণাল ভিন্ন আর কেহ নহে। চণ্ডালের কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন "মহোত্তর! তোমার গুরুদেবকে একবার দেখাইতে পার?" সে বলিল "দেখিতে পাইলে আমিই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতাম।"

কাঞ্চন বলিল"তুমি আমার দুঃখে কাতর হইলে তাই তোমায় বলিতেছি আমার স্বামী এই যুদ্ধে বন্দী হইয়াছেন। তিনি মহারাণীর সেনাপতি ছিলেন। তোমার গুরুদেবকে পাইলে আমার স্বামীর অন্ততঃ সন্ধান পাওয়া যায়। তোমার কথায় বোধ হইতেছে তিনিও পাটলীপুত্র হইতে আসিয়াছিলেন।" এই সময়ে রোগী চীৎকার করিয়া বলিল, তোমরা দুই জনে আমার প্রাণ দিয়াছ তোমাদের একটা কথা বলি আমায় এক দিন (পার্শ্বে দেখাইয়া দিয়া) এই মৃত চণ্ডাল দুইটী চক্ষু দিয়া বাসুকীশীল পাঠাইয়াছিল। আমি আর কিছু জানি না। এই সকল জানি।

তখন বৌদ্ধ চণ্ডাল হিন্দু চণ্ডালের কাছে গিয়া বলিল হাঁ, হাঁ, এই সেই, এই চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিল। বলিয়াই সে চণ্ডালের গাত্র বস্ত্র মধ্যে হস্ত পূরিয়া দিল; দিয়া কিছুই পাইল না: কেবল

এক সঙ্কেতের মোহর পাইল। সে কাঞ্চনকে বলিল 'চল গুরুদেবের সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিয়া দিব। কারাগৃহে যাইবার উপায় করিয়াছি সেই কারায় তিনি নিশ্চয়ই আছেন।"

ত্রয়োদশ খণ্ড।

মোহর পাইয়া বৌদ্ধ চণ্ডাল যুদ্ধস্থলে গেল। তথায় স্বদলবলের উপর আহত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সৈন্যের শুশ্রূষার ভার দিয়া সে কাঞ্চনকে সঙ্গে লইয়া তক্ষশীলায় গমন করিল।

তক্ষশীলার অবস্থা এখন বড় শোচনীয়। অশোকের রাজ্য অনেক দিন লোপ হইয়াছে। বার বার যুদ্ধে নগরের বড় বড় পরিবার বিধবার পুরী হইয়া উঠিয়াছে। রাজ বাড়ীতে লোক অতি অল্প। সমস্ত বিদ্রোহী পল্টন অশোক সেনাপতি হইয়া আসিতেছেন শুনিয়া, সীমাপ্রদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছে। নগর রক্ষী সেনাও কেহ যুদ্ধের জন্য, কেহ লুঠের জন্য নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে তাহাদের উৎপাতে নগরবাসীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে। নগরের বড় লোকে ছোট লোকের উপর উৎপাত করিতেছে। ছোট লোকে এক যোট হইয়া বড় লোকের বাড়ী লুট করিতেছে, কোথাও শৃঙ্খলা নাই।

তাঁহারা দুই জনে অতি কষ্টে কারাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যদিও বিদ্রোহিদিগের জন্য কারাগৃহ, তথাপি তাহাতে অধিক পাহারা নাই। যাহাও দুই চারি জন আছে, তাহারা দ্বারের পার্শ্বে একটা ছোট ঘরে কি একটা গোলযোগ করিতেছে, বোধ হইল। কি যেন একটা ভাগ লইয়া গণ্ডগোল করিতেছে। বৌদ্ধ চণ্ডাল পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণ চণ্ডালের বেশ ধরিয়া গিয়াছে। গিয়া মোহর দেখাইল। এক জন বাহিরে আসিয়া বলিল "কি চাও?" "রাজার হুকুম তামিল করিতে চাই।" "আজ কয় জন?" "তিন জন" "সব কটা একেবারে সারনা।" "রাজার হুকুম।" তখন ভিতর হইতে এক জন বলিল "কিহে বাহিরে গোল করিতেছ, এখানকার কাজটা সারিয়া যাও না।"

"দাঁড়াও হে, সরকারী কাজ।"

"আর পাঁচ সাত দিনেই সরকারী কাজ বাহির হইবে। এই যোগে কিছু করে লও।" তখন পাহারাওয়ালা এক থোলো চাবি লইয়া বলিল আমরা আর ভিতরে যাইতে পারি না। তুমিও ত সরকারী চাকর—যাও চাবিটা আমাদের দিয়া যাইও।"

স্বচ্ছন্দে একজন অপরিচিত লোককে চাবি দিয়া শাস্ত্রীরা লুঠের টাকা ভাগ করিতে বসিল। উহার সঙ্গে যে কাঞ্চনমালাও গেল তাহা দেখিলও না। উহারা দুইজনে প্রবেশ করিলে, কাঞ্চনমালা শিহরিয়া উঠিলেন—দেখিলেন

ঘোর অন্ধকার—ছুঁচা ইঁদুর ও চামচিকার আড্ডা—দুই হাত অন্তরে বস্তু দেখা যায় না। পথ দেখা যায় না। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দ্বার দেখিতে লাগিলেন। দ্বার দেখিয়াই চাবি খুঁজিয়া দ্বার খুলিলেন, দেখেন ঘরটী অতি ছোট। একজন কষ্টে থাকিতে পারে, তাহার মধ্যে একটী লোক। ঘরে বিছানা নাই, খাবার জল নাই। কেবল কয়েদীর লোটাটী মাত্র রহিয়াছে। যাইবামাত্র কয়েদী বলিল আমায় মারিয়া ফেল; জলতৃষ্ণায় প্রাণ যায় একটু জল পর্য্যন্ত পাই না। যদি খুন করিতে হয় একেবারে কর না কেন? দগ্ধাও কেন? কাঞ্চন বৌদ্ধ চণ্ডালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারাগারে এত কষ্ট?"

কাঞ্চনের স্বরে কয়েদী একটু উন্মনা হইল। চণ্ডাল বলিল, "কয়েদী ভাই! আমরা তোমাদের শত্রু নহি; তোমাদের বন্ধু, আমরা বৌদ্ধ। সত্বর তোমাদের উদ্ধার করিব। বলিতে পার কুণাল নামে রাজপুত্র কোথায়?

"কুণাল কোথায়? সর্ব্বপ্রথম তাহাকে বন্দী করিয়াছে। কোথায় রাখিয়াছে জানি না, তিনি আছেন কি না তাহাও জানি না।"

"এখানে তোমরা কে কে আছ?"

"কেমন করিয়া জানিব? আমি এই ঘরে আছি এইমাত্র জানি। যখন বড় কষ্ট হয় এক একবার চীৎকার করি, পাশের ঘর হইতেও কে চীৎকার করে—ভাঙ্গায় কি জবাব দেয় জানি না। মানুষের মুখ দেখিতে পাই না।—মানুষের কথা শুনিতে পাই না—প্রাণ যায় যায় হইয়াছে।"

"তোমরা খাও কি?"

আগে শাস্ত্রীরা খাবার দিত, এখন ৭।৮ দিন দেয় না। ঐ উচ্চে ছোট গবাক্ষটী দেখিতেছ, ঐখান দিয়া কে দুইখানি করিয়া রুটী দেয়, কখন দিনে দেয় কখন রাত্রে দেয় তাই খাই। জল পাই না, কখন ঘাম খাই, কখন কখন প্রস্রাব খাইতে যাই, কিন্তু সে দুর্গন্ধে প্রাণ বাহির হয়।

কাঞ্চন কহিল, তবে ইহাদের একটু জল আনিয়া দিই।

চণ্ডাল বলিল, মা! এমন কর্ম্ম করিবেন না। আমিই ইহাদের উদ্ধার করিব।

কয়েদী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আপনি স্ত্রীলোক? আপনি কে? মনে হয় পাটলীপুত্রে আমার পীড়ার সময় শিয়রে বসিয়া দুগ্ধ পান করাইতেন, স্বরে বোধ হয় আপনি সেই।"

"আমিও তোমার মত বিপদ্গ্রস্ত।"

বুঝিয়াছি—কুণালের কথা জিজ্ঞাসা করায়ই বুঝিয়াছি, যখন আপনি আসিয়াছেন আমাদের নিশ্চয়ই উদ্ধার হইবে।

চণ্ডাল তখন আপনি জল আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। যদি আসিতে না দেয়। বিশেষ একটুকু টের পাইলে ইহারা নিশ্চয় কাটিয়া ফেলিবে। কয়েদী-

কে বলিলেন, কেমন হে গায়ে জোর আছে, আমাদের সাহায্য করিতে পারিবে?

জোর কি সবে ৭।৮ দিনে যায় এখনও উদ্ধারের ভরসা পাইলে দশ হস্তীর বল ধরিতে পারি। কি করিতে হবে বল।

কারাগারের সব ঘরের দরজা খুলিয়া দিতে হইবে।

এখনি—"বলিয়াই কয়েদী হর্ষে জয়ধ্বনি করিল। অমনি পার্শ্বস্থ তিন চারিটী ঘর হইতে শব্দ হইল "জয়"।

শাস্ত্রীরা বলিয়া উঠিল শালারা আচ্ছা গোল করে। বলিয়া আবার লুটের টাকা গণিতে বসিল।

২

একজনকে উদ্ধার করিয়া তিনজন হইল। আর একজনকে উদ্ধার করিয়া চারিজন হইল। ক্রমে পাঁচ ছয় সাত আট জন হইল। তখন চাবির থোলো ছিড়িয়া সকলের হাতে দেওয়া হইল যে, যে ঘর পাও খুলিয়া দাও। ক্রমে সেই গাঢ় অন্ধকার গৃহ সমূহ হইতে ১৫০ জন বৌদ্ধবীর বহির্গত হইল। তখন সমবেত কয়েদীগণ, কাঞ্চনমালা দেবী তাহাদের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন জানিয়া আহ্লাদে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

শাস্ত্রীরা এখনও কি করিতেছিল, এবারকার জয়ধ্বনিতে তাহাদের বড় ভয় হইল। তাহারা বাহিরে আসিল, আসিয়া দেখিল সমস্ত কয়েদীরা ঘর খুলিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে দ্বারের দিকে আসিতেছে। তখন তাহারা প্রমাদগণিয়া যাহা সম্মুখে পাইল লইয়া পলায়ন করিল। কতক ভাগ হইয়াছিল, কতক হয় নাই, কতক লইতে পারিল, কতক পড়িয়া রহিল, শাস্ত্রীরা পলায়ন করিল। তখন কাঞ্চন কয়েদীদিগকে আহার ও জল দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। সকলে শাস্ত্রীদিগের ভাণ্ডার হইতে আহারীয় সংগ্রহ করিল। কাঞ্চন পাক করিয়া স্বহস্তে সমস্ত লোকদিগকে খাওয়াইলেন।

আহারান্তে তাহারা বিশ্রাম করিলে কাঞ্চন তাহাদের নিকট হইতে কুণালের সংবাদ সংগ্রহ করিতে গেলেন। কেহই সংবাদ বলিতে পারিল না। "কুণালকে কুঞ্জরকর্ণ রাণীর গুপ্ত আদেশ জানাইবার জন্য লইয়া গেল তাহার পর আর তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কুণালের সংবাদ না পাওয়া গেলে সৈন্যেরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তখন নানা কৌশলে অসন্তুষ্ট সেনাপতিদিগকে কারারুদ্ধ করিল কাহাকেও বলিল মহারাণীর আদেশ; কাহাকেও রাজসভা হইতে কারাগারে পাঠাইল। কাহাকেও যুদ্ধে জয় করিয়া কারারুদ্ধ করিল। এইরূপে কতক মারিয়া ফেলিয়াছে; অবশিষ্ট এই কারাগারে ছিল কাঞ্চন দেবী উদ্ধার করিলেন।"

কাঞ্চন স্বামীর কোন সন্ধান পাইলেন না। তিনি তখন কয়েদীদিগের মধ্য হইতে একজন উপযুক্ত লোকের

হাতে উহাদিগের ভার দিলেন। বলিলেন আমি এই খানেই স্বামীর অন্বেষণের জন্য রহিলাম। তোমরা যেরূপে পার আত্মরক্ষা কর।

তখন চণ্ডালের আদেশমত সকলে এক পরামর্শ করিল; তাহারা বলিল এখানে বসিয়া আত্ম রক্ষা অসম্ভব; আইস আমরা আত্মরক্ষা না করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করি। কারাগার রাজবাটীর অতি সন্নিকট। তাহারা সকলে একত্রে একরাত্রের মধ্যে কারাগার হইতে রাজবাটী পর্য্যন্ত একটী প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ কাটিল। পরদিন প্রাতঃকালে ৫০ জন সুড়ঙ্গপথে রাজবাড়ীর উঠানে গিয়া উঠিল এবং আর ৫০ জন রাজবাড়ীর দ্বারদেশ আক্রমণ করিল। রক্ষী অধিক ছিল না, ত্বরায় রাজবাটী দখল হইয়া গেল, তখন কারাগার ত্যাগ করিয়া উহারা রাজবাটীতে বাস করিল। রাজবাটীর ভাণ্ডার উহাদের হস্তগত হইল। উহারা অশোকের নামে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। যাহারা চিরদিন গোলযোগে বড় বিরক্ত হইয়াছিল, তাহারা উহাদের সঙ্গে যোগ দিল।

অশোকের সৈন্যের মধ্যে যাহারা আশে পাশে লুটিয়া খাইতেছিল, তাহারা যোগ দিল। উহাদের অনেক লোক সহায় হইল। অল্প দিনের মধ্যে সংবাদ আসিল, অশোক কুঞ্জরকর্ণকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। সে কোথায় পলায়ন করিয়াছে তাহার অন্বেষণে অশোক রাজা একদল সৈন্য পাঠাইয়াছেন। বিদ্রোহীরা সেনাপতি শূন্য হইয়া পলাইয়া তক্ষশীলায় আসিতেছিল, দেখিল রাজবাটীতে ও দুর্গে অশোকের পতাকা দুলিতেছে। তাহারা নিরুপায় হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল। বিদ্রোহ নিবৃত্ত হইল।

বৌদ্ধ যে যেখানে ছিল, আসিয়া একত্রিত হইল। কেবল দুই জনের সন্ধান পাওয়া গেল না। কুণাল কোথায়, কেহ বলিতে পারিল না। আর যে প্রত্যহ কারাগারে রুটী ফেলিয়া যাইত তাহারও সন্ধান পাওয়া গেল না। কাঞ্চন হাসিতে হাসিতে একদিন বলিলেন যে এ বৌদ্ধ চণ্ডালের কর্ম্ম।

সে বার বার বলিল এরূপ কাজ করা আমার স্বপ্নের অগোচর।

সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইল। অশোক সসৈন্যে শীঘ্র তক্ষশীলা আসিবেন শুনা গেল। কিন্তু কাঞ্চনের মনের শান্তি হইল না। স্বামীর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। তিনি নানা উপায়ে যে সকল গোপন স্থানে বন্দীভাবে থাকিবার সম্ভাবনা, তাহার এক তালিকা লইলেন এবং চণ্ডালকে সঙ্গে করিয়া নিজে সমস্ত স্থানে যাইতে আরম্ভ করিলেন। দুইএক জন প্রধান বৌদ্ধকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু কোথাও স্বামীর সন্ধান পাইলেন না।

এক দিন সন্ধ্যার সময়ে চণ্ডালের সহিত এক খণ্ড নিবিড় বনভূমির মধ্য

দিয়া আসিতেছেন,চণ্ডালের সঙ্গে অনেক কথা বার্ত্তা কহিতেছেন, তাহাকে অনেক ইতিহাস, অনেক ধর্ম্মের কথা বলিতেছেন। এমনসময়ে সহসা কাঞ্চন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। কাণ দুটী খাড়া করিয়া যেন এক মনে কি শুনিতে লাগিলেন। চণ্ডাল জিজ্ঞাসা করিল "কিও?" কাঞ্চন হাত দিয়া সঙ্কেত করিয়া বলিলেন "থাম।" সে আশ্চর্য্য হইয়া কাঞ্চনের মুখ পানে চাহিয়া অনেকক্ষণ রহিল। আধ ঘণ্টার পর কাঞ্চন বলিলেন "কুণাল এই খানে আছে।"

চণ্ডাল বলিল কেমন করিয়া জানিলে?

কাঞ্চন কহিলেন শুনিতেছ না সেই স্বর—ও যে আমি বেশ চিনি।"

"কই স্বর।"

"শুনিতেছ না? আমার কর্ণ ভরিয়া যাইতেছে ও স্বর আমার বেশ জানা আছে এখনও শুনিতেছ না? আমার শরীর শিথিল হইয়া আসিতেছে আমি আর দাঁড়াইব না।"

তবে আইস বলিয়া কাঞ্চনমালা স্বরলক্ষ্য করিয়া দ্রুতগতি ধাবমান হইলেন। লতা রাজি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, কণ্টকরাশির মস্তক চূর্ণ করিয়া, সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুর ভয় তৃণ তুল্য জ্ঞান করিয়া, কাঞ্চন বায়ুবেগে ধাবমান হইয়া এক কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং "এই আসিয়াছি-নাথ! বলিয়া লাফ দিয়া সেই কূপে পড়িলেন।

চণ্ডাল ও আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কূপের নিকটে গিয়া শুনিল "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি," "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,""সংঘং শরণং গচ্ছামি," শব্দ বাহির হইতেছে।

সে দেখিল কুণাল সর্ব্ব-ধর্ম্ম-মমতা-বিপশ্চিৎ নামক সমাধি বলে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া রহিয়াছেন। কাঞ্চনও কূপতলে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া মূর্চ্ছিতবৎ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া রহিলেন।

৫

তখন চণ্ডাল উভয়কে স্কন্ধে করিয়া কূপ হইতে উত্তোলন করিলেন। উভয়েই বাহ্যজ্ঞান শূন্য। অনেক ক্ষণ পরে কাঞ্চনের চৈতন্য হইল। কুণালের চৈতন্য হইল না। তিনি সমস্ত রাত্রি সেই অবস্থায় রহিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কেবল ধর্ম্ম সংঘ ও বুদ্ধের নাম বাহির হইতে লাগিল; প্রভাতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান জন্মিল। তিনি কাঞ্চনের স্পর্শ অনুভব করিলেন। বলিলেন "কাঞ্চন! তুমি এত দূর কিরূপে আসিলে?

কাঞ্চন উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি চাহিয়া দেখেন কুণালের চক্ষুর বিবরে চক্ষু নাই। তিনি বলিলেন "একি?"

"কাঞ্চন, চক্ষু না থাকায়ই আমি সমাধি করিতে পারিয়াছি। নহিলে পারিতাম না।"

চণ্ডাল কাঞ্চন কে জিজ্ঞাসা করিল, নগরে গেলে হইত না? তাহাতে

কুণাল বলিলেন আর নগরে কাজ কি? আমি এইখানেই অবস্থান করিব। তাহাতে সমাধির বিঘ্ন হইবে না।”

তখন চণ্ডাল চারিদিগে চাহিয়া দেখিল, লতা পাতায় কূপ ও তাহার চারিদিকে অতি সুন্দর স্থান হইয়াছে, কে যেন একখানি চন্দ্রাতপ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া সে আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

চণ্ডাল তখন নগর মধ্যে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য প্রস্থান করিল, কুণাল ও কাঞ্চন নানা কথায় সময় কাটাইতে লাগিলেন।

৬

ক্রমে দুইটী একটী করিয়া লোক সংগ্রহ হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত বৌদ্ধগণ আসিয়া জুটিল। অশোক রাজা রাত্রিতে তক্ষশীলায় আসিয়া পুত্রবধূর গুণে দেশে শান্তির আবির্ভাব দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আজি পুত্রের সমাধি সফল হইয়াছে শুনিয়া সমস্ত লোক জন সঙ্গে বন মধ্যে উপস্থিত হইলেন। কুণাল তখন উপদেশ দিতে লাগিলেন। ভগবান বুদ্ধের অবদান সমূহের কথা বলিয়া সমবেত লোকসঙ্ঘ মোহিনীমুগ্ধবৎ করিতে লাগিলেন।

রাজা অশোক অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে এই সুধাময় কথা শুনিতেছিলেন। পরে আর আনন্দ রাখিতে স্থান না পাইয়া বক্তৃতার সময়েই পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। কুণাল সাষ্টাঙ্গে পিতাকে নমস্কার করিলেন। বহুকালের পর মিলনে উভয়েই কাঁদিতে লাগিলেন। তখন অশোক টের পাইলেন যে কুণালের চক্ষু নাই।

অশোক জিজ্ঞাসা করিলেন, কুণাল, তোমার এ দশা কে করিল?

কুণাল কোন কথা বলিলেন না। কেবল বলিলেন, চক্ষু থাকিলে সমাধি হইত না।

বনমধ্যে সকলে এইভাবে আছেন, এমন সময়ে কুঞ্জরকর্ণকে ধরিয়া কতকগুলি সৈন্য সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহারা অশোক রাজা এইখানে আছেন, শুনিয়া উঁহাকে লইয়া অশোক রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। হস্তে ও পদে শৃঙ্খলবদ্ধ চারিজন সৈনিক উঁহাকে লইয়া অশোকের নিকট উপস্থিত করিল।

তিষ্যরক্ষা যে চক্ষু মর্দ্দন করিয়াছিল, তদবধি রাজার মনটা অত্যন্ত সন্দেহাকুল ছিল। কাহার চক্ষু কে পাঠাইল ইত্যাদি। আজি তাঁহার চক্ষু ফুটিল, তিনি কুঞ্জরকর্ণকে রোষভরে বলিলেন, নরাধম! তুই আমার পুত্রের চক্ষু উপড়াইয়াছিস্?

তখন কুঞ্জরকর্ণ মিষ্ট মিষ্ট করিয়া রাজাকে বলিতে লাগিলেন। সেনাপতি অশোক! আমি তোমার হাতে আর দয়া প্রার্থনা করি না। তুমি যত দিন স্বধর্ম্মে ছিলে, আমি তোমার ভৃত্য

ছিলাম। তুমি ধর্ম্মত্যাগ করিলে আমি তোমার শত্রু হইয়াছি। বিধিমতে তোমার শত্রুতা করিয়াছি। কখন বৌদ্ধদের সঙ্গে একটী সত্য কথা বলি নাই। আজি আমার শেষ দিন, আজি তোমার সঙ্গে সত্য কথা বলিব। ধর্ম্মের ভয়ে বলিব তাহা নহে; বিধর্ম্মীর কাছে মিথ্যা বলিব তাহাতে আবার অধর্ম্ম কি? আমি সত্য বলিব, কারণ তাহাতে তোমার কষ্ট হইবে। যাহাকে তুমি এত ভাল-বাস, যাহাকে তুমি রাজেশ্বরী করিয়াছ, সে ভ্রষ্টা, সেই তোমার পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করাইয়াছে, সে বৌদ্ধ নহে সে হিন্দু। তোমার দীক্ষার সময়ে যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে সেই আমায় উদ্ধার করে, সেই আমায় বিদ্রোহী হইতে বলে, আমি কুণালের সঙ্গে বন্দী হইলে সেই বন্দিত্ব মোচন করিয়া আমায় রাজত্ব প্রদান করে। এখনও সে রাজেশ্বরী; এখনও তোমার উপর হুকুম আনাইতে পারি, যে তুমি আমার শৃঙ্খল মোচন করিয়া তক্ষশীলায় রাজা করিবে, কিন্তু তাহার আর জ্ঞান নাই। সে এখন পাগল হইয়াছে, তাই পারি নাই। আমার লোক ফিরিয়া আসিয়াছে, নহিলে তুমি আমায় ধরিতেও পারিতে না। আমি এইখান হইতে গিয়া তোমার পাটলীপুত্রে যাওয়া বন্ধ করিতাম।'

এই সকল কথা শুনিয়া রাজা অবাক হইয়া রহিলেন, তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

কুঞ্জরকর্ণ তখন বলিল, "আমার প্রতি কি শাস্তি দিবে?"

"যত দিন তিষ্যরক্ষার অধিকার না হয়, তত দিন তোমায় ঐভাবে থাকিতে হইবে।"

"তবেই তুমি রাখিয়াছ অদ্য তৃতীয় প্রহরে এ দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া যাইবে।"

বলিয়া সে রক্ষিদিগকে বলিল, "চল" তাহারাও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহাকে লইয়া গিয়া এক গাছতলায় দাঁড় করাইল। তথায় ইষ্টদেবের নাম করিতে করিতে কুঞ্জরকর্ণ দেহত্যাগ করিল।

চতুর্দ্দশ খণ্ড।

সেই বন হইতেই অশোক রাজা ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে অদ্য হইতে আমি নিজ রাজ্যভার গ্রহণ করিলাম। পরে তিনি কুণাল ও কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে করিয়া তক্ষশীলায় আসিলেন। কুণাল আর সংসারে প্রবেশ করিতে রাজী নহেন। রাজা বলিলেন "ভগবন্ বোধি-সত্ত্ব আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন ও সুভদ্রাঙ্গীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করুন।" কুণাল সম্মত হইলেন। তখন তক্ষশীলা শাসন ও রক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজা কতিপয় মাত্র বিশ্বস্ত সৈন্য ও কুণাল এবং কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া পাটলীপুত্রে প্রস্থান করিলেন।

২

পাটলীপুত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমেই তিষ্যরক্ষাকে বিচারালয়ে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বেই তিষ্যরক্ষা তথায় উপস্থিত হইলেন। আর সে বেশের পরিপাটী নাই, মাথায় এককালে চুল হইয়াছে, ছিন্নবস্ত্র মাত্র পরিধান। আসিয়াই রাজাকে বলিল "তুমি আমার আসনে বসিও না।"

রাজা বলিলেন "দূর হ পাপিষ্ঠা" তখন সে ঘুসা উঁচাইয়া রাজাকে মারিতে গেল। রাজা প্রহরীদিগকে ধরিতে বলিলেন; তাহারা সাহস করিয়া ধরিতে পারিল না। তখন কাঞ্চন উঠিয়া তাহাকে ধরিলেন; সে কাঞ্চনের মুখের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া বলিল "মা! নমস্কার, তুমি আমার সংসার কেন ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? আমি তোমায় কত খুঁজিয়াছি? কোথায় গিয়াছিলে?" বলিয়া কাঞ্চনের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

আবার সেখান হইতে সরিয়া "আমি ভ্রষ্টা না হইলে তুমিই বা রাজা হইতে কিরূপে? আর আমিই বা তোমায় ঠকাইয়া রাজেশ্বরী হইতাম কি করিয়া?" আমি কুঞ্জরকর্ণকে বলিয়াছিলাম তুই বিদ্রোহী হ আমি তোকে টাকা দিব। পারিস ত এই কাছাখোলা বেটাদের তাড়াইয়া ব্রাহ্মণদের ধর্ম্ম বজায় করিব।

রাজা বলিলেন আর শুনিতে চাহিনা। পাপীয়সি! ভণ্ডতপস্বি! তুই ক্রমাগত আমায় ঠকাইয়াছিস, তুই না আগে ভাগে বৌদ্ধ হইয়া ছিলি; তাহার পর তুই আমার প্রিয় পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিস? তোর মতলব কি জানি না। কিন্তু তোর মতলব বদ ভিন্ন ভাল হইতে পারেনা, তোরে কুকুর দিয়া খাওয়াইব, দূর হ আমার সম্মুখ থেকে।

"আহা মরি মরি কি গানই গাইছ। আবার গাও। আমি রাজসিংহাসন তোমায় দিয়া যাইব।" কুণালের কাছে গেল। কুণালের চিবুক ধরিয়া তুলিল। কই বাবা তোমার সে মণি দুটী কই?

কে নিল নয়ন মণি
কহ কহ লো সজনি

বড় যে আমায় দেখ্‌লেই চোখ্‌ লুকুতে? খুব হয়েছে।

এমনি করে—এমনি করে—

এমনি করে—এমনি করে—পায়ে পিষে ফেলেছি। কেমন এখন একবার চাওত সোণার চাঁদ? বলিয়া আবার কুণালের চক্ষে আঙুল পূরিয়া দিতে গেল। সকলে যেমন ধরিতে আসিল, অমনি কুণালের গায়ে হাতে বুলাইতে লাগিল।

রাজা উহাকে ডাকিয়া বলিলেন "নাপিতানি! কুঞ্জরকর্ণকে কি হুকুম দিয়াছিলে।

"নাপিতানি? আমি রাজরাজেশ্বরী। আমি ত রাজ্যশুদ্ধ সব কলু করিয়া ফেলিয়াছিলাম আমায় বলেন নাপিতানি।"

"না তুমি সাবিত্রী অতি ধন্যা।"

"আমি সাবিত্রী নহি, আমি ভ্রষ্টা।"

কাঞ্চনমালা রাজাকে বলিলেন, পিতঃ! ইনি এখন উন্মাদ পাগল। আপনি ইহাঁকে কেন তিরস্কার করিতেছেন? ইহাঁকে শাস্তি দিলে কিছুই ফল হইবে না। আমার এক ভিক্ষা আছে; আপনি উহাকে আমার হাতে দিউন। আমি উহার উন্মাদ উপশম করিব ও ধর্ম্মপথে উহার মতি লওয়াইব।

রাজা বলিলেন "তুমি পারিবে না।" কাঞ্চন বলিলেন, "সে ভার আমার, আমি উহার উদ্ধারের পথ করিব। না পারি আপনি রাজা আছেন।"

রাজা বলিলেন সেই ভাল, উন্মাদ উপশম হইলে আমি উহার প্রাণদণ্ড করিব।

"না মহারাজ এ যাত্রা উহাকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

"এরূপ পাপিষ্ঠাকে ক্ষমা করিলে, শাস্তি কাহাকে দিব?" তিষ্যরক্ষা নৃত্য করিতে করিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "নিজে গলায় দড়ি দিয়া মর।"

কাঞ্চন বলিল, "সে যাহা হউক মহারাজ, আমার স্বামীর চক্ষু ইনি উৎপাটন করিয়াছেন, আমার স্বামী বোধিসত্ত্ব তিনি নালিশ করেন নাই। আমারই আবার অনুরোধ আপনি উহাকে ক্ষমা করুন। ধর্ম্ম থাকেন আমার স্বামী আবার চক্ষু পাইবেন।"

রাজা বলিলেন, "তবে তুমি নিতান্ত ছাড়িবে না, তবে লও ও তোমার দাসী হইয়া থাকুক।" রাজা এই কথা বলিলে কাঞ্চন তিষ্যরক্ষার হাত ধরিলেন, সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উহার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

৩

তিষ্যরক্ষা বলিয়া গেলে, রাজা উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, বাসুকিশীল হইতে বিজ্ঞানবিৎ আসিয়াছে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে আসিতে অনুমতি দিলেন। সে আসিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন আসিয়াছ?

আপনি বলিয়াছিলেন অশোক রাজা হইলে আসিও। অনেক টাকা পাইবে, আমি সেই জন্য আসিয়াছি। আপনি আমার এক লক্ষ টাকা দিন।

এত টাকা তুমি কি করিবে?

"কিছু লইয়া মরা মানুষ ফিরাইয়া আনার চেষ্টা করিব। আর কিছুতে স্ত্রীর গহনা গড়াইব।"

"আচ্ছা আমি তোমায় এক লক্ষ টাকা দিব, আর তুমি যে আমায় আতাস্ক বলিয়া চৈতন্য দিয়াছিলে, তাহার জন্য তোমায় আমি আর এক লক্ষ টাকা দিব, আর তোমায় জিজ্ঞাসা করিব তুমি যে অন্ধত্ব বিমোচন করিবার জন্য পরীক্ষা করিতেছিলে, তাহা সফল হইয়াছে?"

"আমি একের চক্ষু অন্যের চক্ষে লাগাইয়া দিতে পারি। এখনও চক্ষু তৈয়ার করিতে পারি না।"

"আচ্ছা আর কাহারও চক্ষু লইয়া ঐ অন্ধের চক্ষুতে বসাইয়া দেও দেখি।"

কেহই আপন চক্ষু দিতে সম্মত হইল না। শেষ বৌদ্ধচণ্ডাল আপন গুরুর জন্য আপন চক্ষু উপড়াইয়া দিল। কুণাল বারণ করিলেন সে শুনিল না। বিজ্ঞানবিৎও সেই চক্ষু কুণালের চক্ষুকোটরে বসাইয়া দিলেন। কুণালের যেমন চক্ষু ছিল, আবার তেমনি চক্ষু হইল।

তিষ্যরক্ষা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "এই যে বাছার চক্ষু হইয়াছে—" বলিয়াই বেগে প্রস্থান—সকলে দেখিল তিষ্যরক্ষা শাক্য ভিক্ষুকী হইয়াছে।

কুণাল চক্ষু পাইয়াই চণ্ডালকে ডাকিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে চক্ষুদান করিলে তোমার কোনরূপ কষ্ট হয় নাই ত ?"

তখন চণ্ডাল আনুপূর্ব্বিক আপন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। রাজা শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শেষ সে বলিল, যিনি আমার জ্ঞানচক্ষু দিয়াছেন, তাঁহার জন্য চর্ম্মচক্ষু ত্যাগ করিতে কষ্ট হইলে, আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ আর নাই।

এই সত্যকথা কহায় চণ্ডালের যেরূপ চক্ষু ছিল আবার সেইরূপ হইল।

স্বামীর চক্ষু হইয়াছে শুনিয়া কাঞ্চন দেখিতে আসিলেন। রাজা বলিলেন, "কাঞ্চন! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে," কাঞ্চন লজ্জানম্র মুখে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

৪

তখন রাজা কুণালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুণাল! তুমি বোধিসত্ব; তোমার উপকার আমার দ্বারা সম্ভবে না। তথাপি যদি তোমার কোন অভীষ্ট আমার দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে, বল আমি এখনই করিব।

কুণাল বলিলেন, মহারাজ! আপনি তাড়াইয়া দিলেও পুনরায় যে কার্য্যের জন্য এ রাজসংসারে আসা সেই কার্য্যটী করিয়া দেন।

রাজা বলিলেন, বল আমি এখনই করিব।

কুণাল বলিলেন, তবে ঘোষণা করিয়া দিন, যে বিশাল মগধ সাম্রাজ্যে অদ্যাবধি বৌদ্ধ ধর্ম্মই প্রচলিত হইবে এবং সাম্রাজ্যের বাহিরেও যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তক্ষশিলায় সদ্ধর্ম্ম প্রচার হয় নাই। আর আমায় তক্ষশিলার ধর্ম্মাধ্যক্ষ করিয়া দেন। রাজা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করিয়া দিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম মগধ সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম হইবে।

রাজা আপন পুত্রদিগকে, কাহাকেও সিংহলে, কাহাকেও পারস্যে ধর্ম্ম প্রচারার্থ পাঠাইয়া দিলেন।

কুণালকে বলিলেন, তোমায় পঞ্চনদের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও শাসনকর্ত্তা হইতে হইবে।

কুণাল বলিলেন, শাসনকর্ত্তৃত্ব আর কাহাকেও দেন।

রাজা বলিলেন, তবে কাঞ্চনের উপর সে ভার থাকুক, কাঞ্চন এবার তক্ষীশক্ষা জয় করিয়াছে।

কুণাল বলিলেন, কাঞ্চনও সাংসারিক কার্য্য ভালবাসে না। বলিয়া তিনি চণ্ডালের দিকে মুখ ফিরাইলেন, সে বলিল, প্রভু! আমি নীচ জাতি আমি গুরুর পদসেবা করিব, শাসনকার্য্য আমার জন্য নহে দয়াময়!

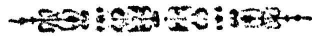
রাজা তখন শাসনকার্য্যের ভার অন্য লোকের হস্তে প্রদান করিলেন।

৫

এই দিবস যে কার্য্য হইল, তাহার বলে এক হাজার বৎসর ভারত বৌদ্ধ ছিল। সমস্ত এসিয়া এই দিনের কার্য্য-বলে বৌদ্ধধর্ম্ম আশ্রয় করে।

৬

শুনা গিয়াছে, তিষ্যরক্ষা কাঞ্চনের অনুগ্রহে আপনার ঋদ্ধিমতী নাম সার্থক করিয়াছিল।



হিন্দু-পত্নী।

হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা মনুষ্যজীবনকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম; দ্বিতীয়, গৃহস্থাশ্রম; তৃতীয়, বানপ্রস্থাশ্রম; চতুর্থ, সন্ন্যাসাশ্রম। এই চারিটি আশ্রমের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমকে তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান মনু বলিয়াছেন:—

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য
বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য
বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥ (৩অ-৭৭)

যেমন বায়ু আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণী জীবিত থাকে, তেমনি গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া আর সকল আশ্রম জীবিত থাকে।

যস্মাত্ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো
জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে
তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥ (৩অ-৭৮)

যেহেতু অপর তিন আশ্রম অহরহ এই গৃহস্থকেই আশ্রয় করিয়া রক্ষিত হয়, অতএব গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন
স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং
যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥ (৩অ-৭৯)

যিনি অক্ষয় স্বর্গ এবং নিত্যসুখ কামনা করেন, তাঁহার পরম যত্নে এই গৃহস্থাশ্রম পালন করা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কদাচ ইহার পালনে সমর্থ হন না।

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা
ভূতান্যতিথয়স্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্য
স্তেভ্যঃকার্য্যং বিজানতা ॥ (৩অ-৮০)

ঋষিগণ, পিতৃলোক, দেবলোক, অতিথি, এবং অন্যান্য প্রাণীগণ পুত্রাদি পরিবেষ্টিত গৃহীর নিকট আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধির আশা করিয়া থাকেন। অতএব জ্ঞানী গৃহস্থ ঐ সকলের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

এখানে দুইটি সার তথ্য পাওয়া যাইতেছে। প্রথম তথ্যটি এই যে, গৃহস্থাশ্রম অপর তিনটি আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ; কেননা অপর তিনটি আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয়াধীন। গৃহস্থাশ্রম অপর সমস্ত আশ্রমের প্রাণস্বরূপ বলিয়া সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। অপর সমস্ত আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের দ্বারা উপকৃত হয় বলিয়া গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বপ্রধান আশ্রম। পরোপকারের নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রমের ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান। পরোপকার গৃহস্থাশ্রমের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম, সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম, সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। দ্বিতীয় তথ্যটি এই যে, গৃহস্থাশ্রমের মূলভিত্তি ইন্দ্রিয় সংযমন। গৃহস্থাশ্রম আত্মসুখের জন্য নয়, ভোগবিলাসের জন্য নয়, যশ গৌরবের জন্য নয়। গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মচর্য্যার জন্য—পরোপকারের জন্য। অতএব শাস্ত্রকার যথার্থই বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়সংযমন গৃহস্থাশ্রমের মূলভিত্তি। কিন্তু এই যে আশ্রমপ্রধান গৃহস্থাশ্রম, এই যে আত্মসংযম-মূলক গৃহস্থাশ্রম, দার পরিগ্রহ ভিন্ন ইহাতে প্রবেশ করা যায় না—ভার্য্যা ব্যতিরেকে এই পরম পরোপকার ব্রতে ব্রতী হওয়া যায় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে গৃহস্থ ব্যক্তির জন্য ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, অতিথিসেবা প্রভৃতি কতকগুলি প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে। যে গৃহস্থ সাধ্যানুসারে সেই সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে ত্রুটি করেন, তিনি মনুষ্য মধ্যে এতই অধম যে জীবন সত্ত্বেও তিনি মৃত বলিয়া গণ্য। যথা ভগবান মনুঃ—

দেবতাতিথিভৃত্যানাং
পিতৄনামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানা
মুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি ॥ (৩অ—৭২)

যিনি দেবতাগণের, পিতৃলোকের, ভৃত্যগণের, অতিথি এবং আত্মার সন্তোষ সাধন না করেন, তিনি শ্বাস প্রশ্বাস সত্ত্বেও জীবিত নন।

কিন্তু যে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলে মনুষ্যের জীবন সার্থক হয়, মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়, বিবাহ ব্যতিরেকে—ভার্য্যা ব্যতিরেকে সে কর্ত্তব্য পালন করা যায় না।

মনু বলেন—

বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্ব্বীত
গৃহ্যং কর্ম্ম যথাবিধি।
পঞ্চযজ্ঞ বিধানঞ্চ পক্তিঞ্চা
ন্বাহিকীং গৃহী ॥ (৩অ-৬৭)

গৃহস্থ ব্যক্তি দৈনিক হোমকার্য্য, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং দৈনিক পাকক্রিয়া

বৈবাহিক অগ্নিতেই সম্পাদন করিবে।

এবং মহামুনি কাশ্যপ বলিয়াছেন—

দারাধীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা
ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
দারান্ সর্ব্বপ্রযত্নেন
বিশুদ্ধানুদ্বহেত্ততঃ॥

গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ জাতির। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে নির্দ্দোষা কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে।*

বুঝা যাইতেছে যে হিন্দু বিবাহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারণ এবং উদ্দেশ্য, ধর্ম্মচর্য্যা এবং পরোপকার। হিন্দু-বিবাহ ধর্ম্মের জন্য এবং সমাজের জন্য। ভার্য্যা ব্যতিরেকে ধর্ম্মচর্য্যা হয় না এবং সমাজ সেবা হয় না। বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রে একথা বলে না। বোধ হয় হিন্দু ভিন্ন জগতে আর কেহই ধর্ম্মচর্য্যা, সমাজসেবা ও পরোপকারের জন্য দারপরিগ্রহ করে নাই ও করে না। আর কেহ যাহা করে নাই, একা হিন্দু তাহা কেন করে, সে কথা এস্থলে বুঝাইবার আবশ্যক নাই। এস্থলে এই পর্য্যন্ত বলিলেই চলিবে, যে বিবাহের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকার-দিগের মত যে কতদূর পাকা তাহা এত দিনের পর ইউরোপে কেবল কোম্‌তের শিষ্যেরা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। কোম্‌ৎ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এবং হৃদয়ের গুণ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ এবং সেই জন্য স্ত্রীর সাহায্য ব্যতিরেকে পুরুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র-কারদিগের মতের দার্শনিক ভিত্তি যাহাই হউক, সে মতটি কি এস্থলে কেবল তাহাই জানা আবশ্যক। জানা গেল যে হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম-চর্য্যা ও পরোপকার। জানা গেল যে পবিত্র পরোপকার ব্রত পালন করিবার জন্য, সমগ্র সমাজের সেবা করিবার জন্য, পবিত্র পিতৃপুরুষগণের আত্মার যথাবিহিত পূজার জন্য, জগতে মনুষ্য বল, পশু বল, পক্ষী বল, সকল প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য, হিন্দু পুরুষ হিন্দু রমণীর সহিত মিলিত হইয়া থাকেন।

যে বিবাহের উদ্দেশ্য এত মহৎ, এত পবিত্র, এত প্রশস্ত, সেই বিবাহে পত্নী অথবা ভার্য্যা কি বস্তু তাহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। কিন্তু অগ্রে আর একটি কথার সংক্ষেপে নিষ্পত্তি করিব। সকল দেশেই বিবাহের অগ্রে কন্যা নির্ব্বাচন করিতে হয়। নির্ব্বাচন প্রণালী সকল দেশে এক নয়। এ দেশে পিতামাতা পুত্রের নিমিত্ত কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন এবং যে সকল দোষগুণ বিবেচনা করিয়া কন্যা নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য, শাস্ত্রকারেরা

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তক, ১৭২ পৃষ্ঠা।

তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। আমাদের আধুনিক কৃতবিদ্য যুবকগণের মধ্যে অনেকেই এই প্রণালীর বিরোধী; এবং ইংরাজি courtship প্রণালীর পক্ষপাতী। দুইটি প্রণালীর মধ্যে কোন্‌টি ভাল, তাহা মীমাংসা করা কঠিন কি সহজ বলিতে পারি না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্মচর্য্যা ও সমাজ সেবা, সে বিবাহের নিমিত্ত কন্যা নির্ব্বাচন করিতে হইলে, যে যৌবনমদমত্ত যুবক বিবাহ করিবেন তিনি না করিয়া, কোন বিজ্ঞ, বর্ষীয়ান, প্রশান্তচিত্ত, ধর্ম্মশীল, সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি করিলেই ভাল হয়। যে ভার্য্যাকে প্রধানতঃ পতির নিমিত্ত নয়, সমাজের নিমিত্ত সংসারে থাকিতে হইবে, সে ভার্য্যা স্বয়ং পতির দ্বারা নির্ব্বাচিত না হইলেই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। ধর্ম্মচর্য্যা ও সমাজ সেবার জন্য কন্যা নির্ব্বাচন করিতে হইলে যতগুলি বিষয় এবং যে সকল বিষয় স্থিরচিত্তে এবং বহুদর্শিতাসহকারে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, বিবাহার্থী যুবক স্বয়ং কন্যা নির্ব্বাচন করিতে বসিলে ততগুলি বিষয় এবং সেই সকল বিষয় কখনই স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন না। তিনি নিজের ভাবনা যত ভাবিবেন, ধর্ম্ম বা সমাজের ভাবনা কখনই তত ভাবিবেন না। এবং সেই নিমিত্তই দেখিতে পাওয়া যায়, যে দেশে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মসেবা এবং আত্মতুষ্টি সে দেশে বিবাহার্থী ব্যক্তি স্বয়ং কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। অতএব বিবাহের উদ্দেশ্য ভেদে কন্যানির্ব্বাচন প্রণালী ভেদ। আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা যদি প্রধানতঃ নিজের উদ্দেশে, নিজের সুখের জন্য বিবাহ করা মহত্ত্ব মনে করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই বলিব যে ইংরাজি courtship প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কন্যা নির্ব্বাচন প্রণালী তাঁহারা কোথাও পাইবেন না। কিন্তু যদি তাঁহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত, পরোপকারের নিমিত্ত, সমাজ সেবার নিমিত্ত দার পরিগ্রহ করা তদপেক্ষা মহত্ত্ব মনে করেন, তাহা হইলে যেন একটু লোভ সম্বরণ করিয়া প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী বয়োজ্যেষ্ঠদিগের হাত হইতে কন্যা নির্ব্বাচনের ভারটি কাড়িয়া না লয়েন। মনুই ত বলিয়াছেন যে সংযতেন্দ্রিয় না হইলে সুচারুরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না। দুইটি উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট এবং কোন্‌টি নিকৃষ্ট, বোধ হয় তাহা মীমাংসা করিবার প্রয়োজন নাই। আত্ম তুষ্টি অপেক্ষা পরোপকার যে অনেক ভাল কাজ বোধ হয় তাহা হিন্দুকে বুঝাইতে হইবে না। তবে যাঁহারা আত্মোদ্দেশ-মূলক বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে একটি কথা বলা আবশ্যক। যেখানে স্ত্রীপুরুষ প্রধানতঃ আত্মোদ্দেশে বিবাহ করে, অর্থাৎ স্ত্রী এই মনে করিয়া

বিবাহ করে যে পুরুষ সর্ব্বরকমে আমার মনের মত হইয়া চলিবে, এবং পুরুষ এই মনে করিয়া বিবাহ করে, যে স্ত্রী সর্ব্বরকমে আমার মনের মত হইয়া চলিবে, সেখানে স্ত্রীপুরুষ প্রধানতঃ পরস্পরের হাবভাব আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কাল যাপন করে। সেই জন্য তাহারা অপরের ভাবনা ভাবিতে অনেকাংশে অপারগ এবং অনিচ্ছুক হয়। এবং পরস্পরের প্রতিবেশী লক্ষ্য রাখে বলিয়া পরস্পরের সম্বন্ধে অত্যন্ত ছিদ্রান্বেষী হইয়া সর্ব্বদাই কলহ করে এবং যার পর নাই অসুখী হইয়া পড়ে। মূর্খতা, ক্রোধাধিক্য অথবা সাংসারিক অপ্রতুলতা বশতঃ অন্য দেশেও যেমন এ দেশেও তেমনি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কলহ থাকিতে পারে। কিন্তু বোধ হয় যে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রকৃত বা কল্পিত তাচ্ছীল্য লইয়া অথবা মনোযোগের কড়া ক্রান্তি কম হইয়াছে, অথবা তদনুরূপ অপর কোন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ত্রুটি ঘটিয়াছে বলিয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যত কলহ হয়, এ দেশে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। অপর পক্ষে, যেখানে বিবাহ আপনার উদ্দেশে না হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজের উদ্দেশে হইয়া থাকে, সেখানে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে তাহাদের প্রবৃত্তিও হয় না, সেখানে আত্মবিশ্লিষ্ট মহৎ উদ্দেশ্য ভাবিয়া স্ত্রীপুরুষ দুইজনে এক হইয়া এক মনে এক প্রাণে সেই উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান্ হয়। যদি তাহাতে কাহারো ত্রুটি হয়, তবেই তাহাদের মধ্যে অসুখ বা কলহের হেতু উপস্থিত হয়, নতুবা নয়। অতএব, বোধ হয় যে, আপনার উদ্দেশে যে বিবাহ তাহা আপন এবং পর উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গলজনক; এবং ধর্ম্মচর্য্যা এবং সমাজসেবার জন্য যে বিবাহ তাহা আপন এবং পর উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক। যদি তাহাই হয়, তবে বিবাহার্থ স্বয়ং কন্যানির্ব্বাচন না করাই ভাল। স্বয়ং কন্যানির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিলে, বিবাহের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও ক্রমশঃ তাহা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়াই সম্ভব।

হিন্দু বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ উপযুক্ত প্রণালীতে কন্যা নির্ব্বাচিত হইলে পর বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। দেখা যাউক সেই বিবাহ ক্রিয়া অনুসারে হিন্দু ভার্য্যা কি বস্তু হইয়া দাঁড়ান। ইংরাজি প্রভৃতি বিবাহ প্রণালীতে, বিবাহ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কেবল একটি চুক্তি বই আর কিছুই নয়; অতএব সেই সকল প্রণালীতে স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পরের তুল্য, কেহ কাহার বড় নয়, কেহ কাহার ছোট নয়; স্বামী ও যত বড় এক জন, স্ত্রী ও তত বড় এক জন। হিন্দুপত্নী ও কি হিন্দু পতির সম্বন্ধে তাই? দেখা যাউক।

হিন্দু বিবাহরূপ যে কার্য্য সেটি চুক্তি অথবা Contract নয়। ইংরাজি বিবাহ

যেমন পুরুষ স্ত্রীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলে এবং স্ত্রী পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলে সম্পন্ন হইয়া যায়, হিন্দু বিবাহ তেমন করিয়া সম্পন্ন হয় না। মোটামুটি বলিতে গেলে হিন্দু বিবাহের প্রথম কার্য্য—দান ও গ্রহণ। কন্যাকর্ত্তা কন্যাটিকে বরকে দান করেন। কিন্তু সে দানের গুণে, কন্যা বরের ভার্য্যা হন না। বরের সম্পত্তি হন মাত্র। মনু বলিয়াছেনঃ——

সকৃদংশোনি পততি
সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি
ত্রীণ্যেতানিসতাং সকৃৎ॥ (৯অ—৪৭)

অংশ একবার, কন্যাদান একবার, দানবাক্য একবার—সাধুদিগের এই তিন কার্য্য একবার।

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমন বস্তুও যেমন একবারের বেশী দুইবার দান করা যায় না, কন্যাও তেমনি একবারের বেশী দুইবার দান করা যায় না। অতএব সম্পত্তি দান করার অর্থও যা, কন্যা দান করার অর্থও তাই। এবং প্রদত্ত সম্পত্তির উপর দানগ্রহীতার যেরূপ স্বামিত্ব জন্মে, প্রদত্ত কন্যার উপর কন্যাগ্রহীতার সেইরূপ স্বামিত্বই জন্মিয়া থাকে। আর এক স্থলে মনু একথা আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং
যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু
প্রদানং স্বাম্যকারণং॥ (৫অ ১৫২)

বিবাহ কালে যে স্বস্ত্যয়ন ও প্রজাপতির উদ্দেশে যাগানুষ্ঠান করা হইয়া থাকে তাহা কেবল মঙ্গলের নিমিত্তই বলিতে হইবে। ফলতঃ বাগ্দানই স্বামীর স্ত্রীর প্রতি স্বামিত্বের কারণ।

এখানে স্বাম্য অর্থে অধিকার অথবা প্রভুত্ব বই আর কিছুই নয়। অতএব সম্প্রদানরূপ কার্য্যের গুণে কন্যা ভার্য্যাত্ব লাভ করেন না, পতির সম্পত্তি হয়েন মাত্র। ঘটি, বাটি যেমন সম্পত্তি, তেমনি সম্পত্তি হয়েন মাত্র। বড় লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু কথাটার একটু মানে আছে। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা একা পুরুষকে একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি অথবা পুরুষ বলিয়া গণ্য করেন না। স্ত্রীর সহিত মিলিত যে পুরুষ তাহাকেই তাঁহারা পুরুষ বলেন। যথা ভগবান মনুঃ—

এতাবানেব পুরুষো
যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্‌যো
ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥ (৯অ ৪৫)

পুরুষ বলিলে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে—জায়া, আত্মা ও অপত্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা এই দুইয়ের নামই পুরুষ।

এই চমৎকার কথায় যে কি গূঢ় তাৎপর্য্য তাহা এস্থলে বুঝাইবার আব-

শ্যক নাই। জানা গেল যে হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের মতে, ভার্য্যাহীন পুরুষ একটি অসম্পূর্ণ ব্যক্তি; ভার্য্যা ব্যতিরেকে পুরুষ পূর্ণতা লাভ করে না, পুরুষ পুরুষ হইতে পারে না। অতএব যিনি ভার্য্যা হইবেন তাঁহাকে পুরুষের সম্পত্তি হওয়া চাই, নহিলে পুরুষ কি প্রকারে তাঁহাকে নিজস্ব করিয়া তাঁহার দ্বারা তাঁহার আপনার অভাব পূরণ করিবেন? দাসখত ব্যতীত চুক্তির দ্বারা মানুষকে নিজস্ব করা যায় না। প্রভু ও ক্রীতদাস ছাড়া আর যাহাদের সম্পর্ক চুক্তিমূলক, তাহাদের মধ্যে কেহ কাহার নিজস্ব হইতে পারে না। তাই হিন্দুশাস্ত্রকার সম্প্রদানরূপ কার্য্যের দ্বারা কন্যাকে পুরুষের নিজস্ব করিয়া দিলেন। পুরুষের উপকারার্থ স্ত্রীকে ক্ষুদ্র এবং ক্ষতিগ্রস্ত করিলেন। স্ত্রীর পক্ষ হইতে বলিতে গেলে এটা কি সামান্য গৌরব ও মহত্ত্বের কথা? পতির উদ্দেশে এত আত্মত্যাগ হিন্দু রমণী বই আর কে কোথায় করিয়াছে বা করিতে পারে? কিন্তু গৌরবের কথা হইলেও, ঘটি বাটির মতন সামান্য সম্পত্তি স্বরূপ হইয়া থাকা স্ত্রীর পক্ষে বড় একটা হিতকর বা সম্মানসূচক অবস্থা নয়। তাই দান গ্রহণে কেবল মাত্র সম্পত্তি সৃষ্টি হয়, ভার্য্যাত্ব জন্মে না। যাহাতে ভার্য্যাত্ব জন্মে তাহা এই :—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা
নিয়তং দারলক্ষণং।
তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া
বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥ (৮অ-২২৭)

পাণিগ্রহণের যে মন্ত্র তাহাই প্রকৃত দারলক্ষণ। সপ্তপদী গমনে সেই মন্ত্রের পরিসমাপ্তি হয়—বিজ্ঞেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

সপ্তপদীগমনরূপ যে একটি প্রক্রিয়া আছে মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে সেইটি যতক্ষণ না সম্পন্ন হয়, ততক্ষণ ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয় না। এই কথার প্রকৃত অর্থ রঘুনন্দন বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেনঃ—

ভার্য্যাশব্দোযূপাহবনীয়াদিবদ-
লৌকিকাগসংস্কারালৌকিক-
সংস্কারযুক্তো স্ত্রীবচনঃ। (উদ্বাহতত্ত্ব)।

যেমন যূপ বলিলে যে সে পশুবন্ধন কাষ্ঠ বুঝায় না, যেমন আহবনীয় বলিলে যে সে অগ্নিকে বুঝায় না, কোন অলৌকিক সংস্কারসম্পন্ন কাষ্ঠ বা অগ্নিকে বুঝায়, তেমনি ভার্য্যা বলিলে যে সে স্ত্রী বুঝায় না, কেবল সেই অলৌকিক সংস্কারসম্পন্ন স্ত্রীকে বুঝায়।

পশু বাঁধিবার কাষ্ঠ এবং অগ্নি দুই ই অতি সামান্য জিনিস—পথের ধুলা যেমন সামান্য জিনিস, তেমনি সামান্য জিনিস-কাহারো কোন মাহাত্ম্য নাই, কাহারো কোন পবিত্রতা নাই। কিন্তু ধর্ম্মযাজক যখন সেই কাষ্ঠ অথবা অগ্নির সহিত কোন একটি অলৌকিক সংস্কার সংযোগ করেন তখন সেটি আর পথের ধুলার ন্যায় সামান্য পদার্থ থাকে না, তখন সেটি দেবতা অথবা দেবত্বের ন্যায় একটি

অলৌকিক পদার্থ হইয়া পড়ে। অলৌকিক পদার্থ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ মনুষ্য বুদ্ধিতে যাহা বুঝিতে পারা যায় না এমন পদার্থ হইয়া পড়ে; মনুষ্য বুদ্ধির কাছে রহস্যবৎ, এমন অপার্থিব পদার্থ হইয়া পড়ে; মনুষ্যবুদ্ধি ও শক্তিদ্বারা যাহা কিছু সম্পন্ন করা যাইতে পারে, সে সকল অপেক্ষা উচ্চ ও পবিত্র পদার্থ হইয়া পড়ে। হিন্দু ভার্য্যাও তাই। দানগ্রহণের গুণে যে স্ত্রী পথের ধূলার ন্যায় সামান্য জিনিস বই আর কিছুই নয়, সপ্তপদীগমন প্রভৃতি অলৌকিক সংস্কারের অলৌকিক গুণে সেই স্ত্রী অলৌকিক সংস্কারপ্রাপ্ত অগ্নি এবং পশুবন্ধনকাষ্ঠের ন্যায় একটি পবিত্র, দেবতুল্য, অলৌকিক পদার্থ। হিন্দুপত্নী পতির সম্পত্তি বটে কিন্তু পতির সম্বন্ধে একটি অতি উচ্চ, অতি পবিত্র, অতি অলৌকিক, অতি দেবতুল্য বস্তু। সে বস্তুর গৌরবের, সে বস্তুর মর্য্যাদার, সে বস্তুর পবিত্রতার, সে বস্তুর দেবত্বের কি সীমা আছে? ভগবান মনু শিক্ষাগুরুকে পিতামাতা অপেক্ষাও বড় বলিয়াছেন বলিয়া সেই শিক্ষাগুরুকে আহবানীয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন। (২অ—২৩১)। আবার রঘুনন্দন বলিলেন, আহবনীয়ও যা, হিন্দুভার্য্যাও তাই। একবার হিন্দুর জ্ঞানচক্ষে চাহিয়া দেখ, হিন্দু-ভার্য্যার কি পদ, কি মহিমা! যজ্ঞের যূপকাষ্ঠ যাঁহার আরাধ্য দেবতা, যজ্ঞের আহবনীয় যাঁহার আরাধ্য দেবতা, তিনিই বলিতেছেন যে যজ্ঞের যূপকাষ্ঠও যা, যজ্ঞের আহবনীয়ও যা, ভার্য্যাও তাই! আবার বলি হিন্দুর চক্ষে দেখ বুঝিতে পরিবে, যে হিন্দুভার্য্যা পুণ্য বল, পবিত্রতা বল, অলৌকিকতা বল, দেবতা বল, মুক্তিবল, সবই! হিন্দুর ধর্ম্মভাবে ভোর হইয়া দেখ বুঝিতে পারিবে যে হিন্দুভার্য্যা দেবাসনে উপবিষ্টা, দেবীপদে প্রতিষ্ঠিতা, দেবীমাহাত্ম্যে মণ্ডিতা! যতদূর পার, হিন্দুর অলৌকিক শব্দের অলৌকিক অর্থ ভাবিয়া দেখ, চিত্ত এই ভাবে ভরিয়া উঠিবে, যে মানুষ যত দিন মানুষ অপেক্ষা বড় না হইবে, ততদিন হিন্দু ভার্য্যার ভার্য্যাত্ব যে কি অননুভবনীয় কল্পনাতীত পদার্থ, তাহা বুঝিতে পারিবে না। এখন বলি—হিন্দু ভার্য্যা হিন্দু পতির সম্পত্তি, এ কথায় লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। কেননা মনুষ্যের দেবতার ন্যায় সম্পত্তি আর কি আছে? মানুষ যদি দেবতাকে নিজের সম্পত্তি মনে না করেন, তবে কেমন করিয়া বলিব যে মানুষে দেবত্ব আছে? হিন্দুশাস্ত্রকার ভার্য্যাকে পতির দেবতা করিবেন বলিয়াই তাঁহাকে পতির সম্পত্তি করিয়াছেন। এখন বোধ হয় বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দুর ভার্য্যাগ্রহণের উদ্দেশ্য ও যেমন মহৎ হইতে মহত্তর এবং পবিত্র হইতে পবিত্রতর, তাঁহার ভার্য্যা ও তেমনি মহৎ হইতে মহত্তর এবং পবিত্র হইতে পবিত্রতর। ধর্ম্মচর্য্যা এবং পরোপকারের জন্য ভার্য্যা। যেমন যজ্ঞ তেমনি

তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সংসারধর্ম্মরূপ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হইলে যথার্থই দেবতার প্রয়োজন হয়। যে যেখানে মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছে, সেই দেবশক্তির সাহায্যে সম্পন্ন করিয়াছে। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, হোমর, সেক্সপীয়র প্রভৃতি কবিরূপধারী মহাযাজ্ঞিকগণের মধ্যে প্রত্যেকেরই এক একটি দেবতা ছিল। সেই দেবতার পবিত্র প্রেমে পরিপ্লুত হইয়া, সেই দেবতার অলৌকিক উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, সেই দেবতার অপরিমেয় বলে বলীয়ান্ হইয়া প্রত্যেকেই এক একখানি মহাকাব্য রূপ এক একটি মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ফরাসি রাজ বিপ্লবোন্মত্ত মহাপুরুষেরা মাদাম রোলা-রূপী মহাদেবীর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া একটি মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র সীতাদেবীর মুখ চাহিয়া, পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণার কোলে মাথা রাখিয়া, ভীষণ বনবাস রূপ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সকল যজ্ঞ অপেক্ষা সংসারধর্ম্মরূপ যজ্ঞ কঠিন ও কষ্টসাধ্য। সেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও কষ্টসাধ্য যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে যে অপরিমেয় দয়া, ধর্ম্ম, শক্তি এবং সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহাই সংগ্রহ করণার্থ প্রাচীন হিন্দুরা গৃহস্থাশ্রমের ভিত্তি স্বরূপ ভার্য্যারূপা মহাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুভার্য্যার এই অর্থ। হিন্দুভার্য্যা কি সামান্য জিনিস।

এখন সময়োপযোগী দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ইংরাজেরা বলিয়া থাকেন যে খ্রীষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে লোকে স্ত্রীজাতীকে অতি নিকৃষ্ট ও হেয় মনে করিত এবং ঐ ধর্ম্মই প্রথম স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সমান করিয়া তুলিয়াছিল। আমার বোধ হয় যে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস না জানা হেতু এই মিথ্যা কথাটি শুধু ইউরোপে কেন, আজ কাল এদেশেও অনেকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। আমি হিন্দু বিবাহ প্রণালীর যদি প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিয়া থাকি, তবে অবশ্যই মানিতে হইবে যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে ভারতে হিন্দুজাতি স্ত্রীজাতিকে অতি উৎকৃষ্ট ও মাননীয় বলিয়া বুঝিয়াছিল এবং অপর দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম স্ত্রীজাতিকে যত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছিল, ভারতের হিন্দু ভারতের স্ত্রীকে তদপেক্ষা অনেক উচ্চ আসনে বসাইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করিয়াছিল; হিন্দুধর্ম্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করে নাই, পুরুষের দেবতা করিয়াছিল। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" —যে খানে নারী পূজিতা হয়েন সে খানে দেবতারা সন্তুষ্ট থাকেন। (মনু-৩অ, ৫৬)

এ কথা যদি ঠিক হয় তবে ভাবিয়া দেখ, অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ইংরাজি সাম্রাবাদে অন্ধ হইয়া রাজা

লীর স্ত্রী এটি পাবে না কেন, ওটি পাবে না কেন, বলিয়া যে গোলযোগ করিয়া থাকেন, তাহা ভাল কি মন্দ, সঙ্গত কি অসঙ্গত। বাঙ্গালীর স্ত্রী দেবতা, অতএব তাঁহাকে অদেয়, এমন ভাল জিনিস কিছুই নাই। যদি বল বিদ্যা, "স্বাধীনতা" প্রভৃতি অনেক ভাল জিনিস তাঁহাকে দেওয়া হয় না। তাহার উত্তরে আমি এই কথা বলি, যে যাহা ভাল জিনিস বলিয়া উক্ত হয়, তাহা যদি সত্যই ভাল জিনিস হয়, তবে লোকে যখন বুঝিবে যে তাহা ভাল, এবং স্ত্রী দেবতা, তখন অবশ্যই তাহারা সে জিনিস স্ত্রীকে দিবে। এই প্রসঙ্গে আমি আমার কৃতবিদ্য স্বদেশীয়গণকে বলি, যে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ইংরাজি সাম্যবাদ প্রয়োগ করিও না। স্ত্রী এবং পুরুষকে সমান জ্ঞান করা যুক্তিসঙ্গত কি না, এখন তাহার মীমাংসা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু একথা অকুতোভয়ে বলিতেছি, যে স্ত্রীকে পুরুষের দেবতা মনে করিয়া স্ত্রীর প্রতি বিহিতাচরণ করিলে স্ত্রীর যত লাভ হইবে, তাঁহাকে পুরুষের সমান মনে করিয়া সমানের প্রতি যেরূপ আচরণ কর্ত্তব্য সেই রূপ করিলে, তাঁহার তদপেক্ষা অনেক কম লাভ হইবে। জাতির কথা ছাড়িয়া ব্যক্তি বিশেষে কথা ধরিয়া বলা যাইতে পারে যে কি ভারতে, কি ইংলণ্ডে, কি ফ্রান্সে, যে খানেই স্বামী স্ত্রীকে যথার্থ মনের সহিত কোন কিছু দিয়াছে, সেই খানেই স্ত্রীকে হয় দেবী নয় দেবতুল্য ভাবিয়া দিয়াছে, পুরুষের সমান অথবা সমস্বত্বাধিকারিণী ভাবিয়া দেয় নাই। স্ত্রীকে দেবতা মনে করিয়া দেবতার ন্যায় ব্যবহার করিলে, এবং দেবতার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখিলে, তাঁহার যত বিশুদ্ধ সুখ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে, তাঁহাকে সমান মনে করিয়া সমানের ন্যায় ব্যবহার করিলে কখনই তত সুখ এবং উন্নতি হইবে না। সাম্যবাদের বিরোধী আছে—দেবতার বিরোধী নাই। সাম্যবাদে তর্ক আছে, যুদ্ধ আছে—দেবসেবায় তর্ক নাই, যুদ্ধ নাই, সমস্তই প্রীতির আহুতি। সাম্যবাদের ফল সীমাবদ্ধ, সমান সমান, বেশী নয়—দেবতাকে যত ইচ্ছা দাও, দেবতাকে দিয়া সাধ মিটে না, দেবোপহারের সীমা নাই। অতএব এ দেশে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ইউরোপীয় সাম্যবাদ অবলম্বন করিলে আমাদের যে উর্দ্ধে আরোহণ করা হইবে তা নয়, নীম্নে অবতরণ করা হইবে; এবং আমাদের স্ত্রীদিগকে দেবী মণ্ডপ হইতে নামাইয়া রসাতলে নিক্ষেপ করা হইবে। এক্ষণে বাঙ্গালীর স্ত্রীর যে কোন দুঃখ নাই, এমন কথা বলি না। দুঃখ অনেক আছে। কিন্তু দেশের লোক যত শিক্ষা লাভ করিবে এবং হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে হিন্দু স্ত্রী কি পদার্থ তাহা যত বুঝিবে, ততই তাহারা স্ত্রীজাতির অবস্থা ভাল করিতে যত্নবান

হইবে। বোধ হয় যে, এ দেশে বৃদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুর ঘরে স্ত্রীর যে সুখ, সম্মান, পূজা, গুণ এবং মহত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, কৃতবিদ্য সাম্যবাদী বঙ্গীয় যুবকের ঘরে তাহার শতাংশের একাংশও নাই।

আর এক কথা। ইংরাজের সাম্যবাদ এ দেশের লোক জানে না, কখন বুঝে নাই, এবং বোধ হয় যে সহজে বুঝিবেও না। স্ত্রী পুরুষের সমান—এ কথা এ দেশের লোক কখন শুনে নাই—শুনিলে নিশ্চয়ই কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। স্ত্রী গৃহের দেবতা—এ কথা এ দেশের লোক ভাল করিয়া না হউক এক রকম করিয়া বহুকাল হইতে জানে এবং বুঝিয়া আসিতেছে। অতএব হিন্দু স্ত্রীর উপকারার্থ যদি কিছু করিতে হয়, তবে হিন্দু স্ত্রী দেবতা এই বলিয়া তাহা করিতে চেষ্টা করিলে, এ দেশে সিদ্ধি লাভ সম্ভব। অতএব ইংরাজি ধূয়া ছাড়িয়া, দেশীয় পদ্ধতি অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। সকল লোক এবং সকল জাতি এক ছাঁচে ঢালা নয়। অধিকন্তু স্ত্রীকে পুরুষের সমান বলিয়া বুঝিলে পুরুষের যত লাভ হইতে পারে, স্ত্রীকে পুরুষের দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারিলে পুরুষের তদপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হইবে। স্ত্রীকে পুরুষের সমান মনে করা মানুষের কাজ। কিন্তু স্ত্রীকে পুরুষের দেবতা মনে করা দেবতার কাজ। প্রকৃত দেবতা ভিন্ন জগতে কেহ কখন প্রকৃত দেবতা গড়িতে পারে নাই। যিনি সীতা গড়িয়াছেন তিনি বাল্মীকি; যিনি শকুন্তলা গড়িয়াছেন তিনি কালিদাস; যিনি দিস্‌দেমোনা গড়িয়াছেন তিনি সেক্ষপীয়র; যিনি থেক্‌লা গড়িয়াছেন তিনি শিলর। অতএব আমাদের রমণীদিগকে দেবতা বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে বোধ হয় আমরাও কিঞ্চিৎ দেবত্ব লাভ করিব। তাহার বেশী লাভ আর আমাদের কি হইতে পারে? যদি সে লাভ হয়, তাহা আমাদের পিতৃপুরুষগণের পুণ্যবলে এবং হিন্দু নারীর ভাগ্যবলেই ঘটিবে।*



* এই প্রবন্ধ বাবু চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সাবিত্রি লাইব্রেরির সাম্বৎসরিক উৎসবে পঠিত হইয়াছিল।

হনুমদ্বাবু সংবাদ।

একদা প্রাতঃসূর্য্য কিরণোদ্ভাসিত কদলীকুঞ্জে, শ্রীমান্ হনুমান বায়ু সেবনার্থ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার পরম রমণীয় লাঙ্গুলবল্লী চক্রে চক্রে কুণ্ডলীকৃত হইয়া, কখন পৃষ্ঠে, কখন স্কন্ধে, কখন বৃক্ষ শাখায় শোভিত হইতেছিল। চারিপাশে মর্ত্তমান, চাঁপা, কাঁঠালি প্রভৃতি নানা জাতীয় সুপক্ক এবং অপক্ক রম্ভা বৃক্ষ হইতে থরে থরে কাঁদিতে কাঁদিতে শোভা পাইয়া সুগন্ধে দিক্ আমোদিত করিয়াছিল। বীরবর, কখন কোন গাছ হইতে এক আধটা পাড়িয়া, কখন আঘ্রাণ, কখন চুম্বন, কখন লেহন এবং কদাচিৎ চর্ব্বণ করিয়া কদলী জাতীয় ফল মাত্রের অনন্ত মাধুর্য্য সম্বন্ধে বহুতর মানসিক প্রশংসা করিতেছেন। এমত সময়ে দৈবযোগে সেই খানে বুট, কোট পেণ্টালন, চেন, চসমা, চুরট, চাবুকধারী টুপ্যাবৃতমস্তক এক নব্য বাবু তথায় উপস্থিত। হনুমানচন্দ্র দূর হইতে এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "কে এ? আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, নিশ্চয় কিষ্কিন্ধ্যা হইতে এ আসিতেছে। এরূপ পরানুকৃত বেশ, গমন, চাহনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব। এ আমার স্বদেশী ও স্বজাতি, অতএব ইহাকে আমি অবশ্য আদর করিব।"

এই ভাবিয়া, মহাত্মা পবনাত্মজ এক সরস চম্পককদলী বৃক্ষ হইতে উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ এক গুচ্ছ সুপক্ক কদলী উন্মোচন করিয়া আঘ্রাণ করিলেন। এবং তাহার ঘ্রাণে পরিতুষ্ট হইয়া অতিথিসৎকারে তৎপ্রয়োগ মনে মনে স্থির করিলেন। ইত্যবসরে সেই টুপি কোটপরিবৃত মোহন মূর্ত্তি বীরবরের সম্মুখাগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিল। বলিল—

"Good morning Mr. Hanuman! how do you do? So glad to see you! Ah! I see you are at break-fast already.

হনুমান কহিলেন, "কিমিদং? কিং বদসি?"

বাবু। What's that? I suppose that is the Kish-kinda patois? It is a glorious country—is it not? "There is a land of every land the pride."—and so on, as you know.

হনু। "কস্ত্বং! কস্মাজ্জনপদাৎ আগতোসি?"

বাবু। (জনান্তিকে) It seems most barbarous gibberish—that precious lingo of his; but I suppose I must put up with it. (প্রকাশ্যে) My dear Mr. Monkey, I am ashamed to confess that

I am not quite familiar with your beautiful vernacular. I dare say it is a very polished language. I presume you can talk a little English.

তখন সেই মহাবীর পবননন্দন সহসা মহাচক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া বৃহৎ লাঙ্গুল পাশ বিস্তারণ পূর্ব্বক তাহা বাবুজি মহাশয়ের গলদেশে অর্পিত করিলেন। এবং কুণ্ডলী করিয়া জড়াইতে লাগিলেন। তখন বাবু মহাশয় ভয়ে হাঁ করিয়া ফেলিলেন, মুখের চুরট পড়িয়া গেল। বলিলেন—

"I say—this seems somewhat—"

লেজের আর এক পেঁচ।

"Somewhat unmannerly—to say the least—

আর এক পেঁচ।

"Dear Mr. Hanuman—you will hurt me."

আর এক পেঁচ।

"Kind—good Mr. Hanueman.

হনুমান তখন বাবু মহাশয়কে লেজে করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া ফেলিলেন, বাবুর টুপি, চসমা, এবং চাবুক পড়িয়া গেল; কোট পকেট হইতে ঘড়ি বাহির হইয়া চেনে ঝুলিতে লাগিল। তখন বাবুর মুখ শুকাইল—ডাকিলেন, "ও হনুমান্ মহাশয় ঘাট হয়েছে ছাড়! ছাড়! ছাড়! রক্ষা কর! গরিবের প্রাণ যায়।"

তখন হনুমান, বাবুর প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে ভূতলে স্থাপন পূর্ব্বক লাঙ্গুলপাশ হইতে তাহাকে বিমুক্ত করিলেন। অবসর পাইয়া বাবু টুপি, চসমা, চাবুক কুড়াইয়া পরিলেন। হনুমান বলিলেন, "মহাশয়! দুঃখিত হইবেন না। আপনার বুলি ইংরেজি, বেশ কিস্কিন্ধ্যা, এবং মূর্খতা পাহাড়ে রকম দেখিয়া আপনার জাতি নিরূপণার্থ আপনাকে এতটা কষ্ট দিয়াছি। এক্ষণে—

বাবু। এক্ষণে কি?

হনু। এক্ষণে বুঝিয়াছি যে আপনার জন্ম বঙ্গদেশীয় কোন মহিলার গর্ভে। এখন আপনি ক্লান্ত আছেন—একটা কদলী ভোজন করিবেন?

এখন বাবুজির যেরূপ জিব শুকাইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে একটু সরস কদলী ভোজন অতিশয় আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল—তিনি তখন প্রীত হইয়া উত্তর করিলেন—"With the greatest pleasure."

হনু। আপনার যে দেশে জন্ম, কদলী এবং বার্ত্তাকু অনুসন্ধানে আমি মধ্যে মধ্যে সে দেশে গমন করিয়া থাকি; এবং তদ্দেশীয়া সুন্দরীগণ বড়ি নামে যে সুস্বাদু ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাও কদাপি বিনানুমতিতে রামানুচর-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছি। অতএব আমি বাঙ্গালা উত্তম বুঝি। অতএব মাতৃভাষাতেই আমার সঙ্গে বাক্যালাপ কর।

বাবু। "তার আশ্চর্য্য কি? আপনি কলা দিতে চাহিতেছেন? আমি অতিশয় আহ্লাদের সহিত আপনার কদলী ভক্ষণ করিব।"

হনুমান তখন বাবু মহাশয়কে এক ছড়া কলা ফেলিয়া দিলেন। সে দেবদুর্ল্লভ কদলী খাইয়া বাবু অতিশয় প্রীত হইলেন। হনুমান জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কলা?"

বাবু। "অতি মিষ্ট—delicious!"

হনু। হে টুপ্যাবৃত মহাপুরুষ! মাতৃভাষায় কথা কও।

বাবু। ওটা আমার ভুল হইয়াছে, এইবার আমাকে Excuse করুন—"

হনু। তাই বা কাকে বলে?

বাবু। আমাকে মাপ করুন—আমি বড়—কি বলব?—ইংরেজি কথাটা forgetful—তার বাঙ্গালা কি?

হনু। বৎস! তোমার কথোপকথনে আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি আরও কলা খাইতে পার। যত ইচ্ছা তত খাইতে পার। গাছে আছে পাড়িয়া দিতেছি। আর আমা হইতে তোমার যদি কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তবে তাহাও আমাকে বল আমি তৎসাধনে তৎপর হইব।

বাবু। ধন্যবাদ, হে আমার প্রিয় বানর মহাশয়! এক্ষণে আপনার প্রতি আমি অতিশয় বাধ্য বোধ করিব, আপনি যদি দয়ালুরূপে আমাকে একটী বিষয় বুঝাইয়া দেন।

হনু। কি বিষয়, হে বিদ্বন্?

বাবু। সেই বিষয়, হনুমন্, যাহার অনুরোধে আপনার এখানে আসিয়াছি। আপনি রামরাজ্য দেখিয়াছেন। রামরাজ্যের মত রাজ্য না কি কখন হয় নাই—কেহ কেহ বলেন সে সকল গল্প মাত্র. fable—

হনু। (চক্ষু আরক্ত, এবং দংষ্ট্রা বিমুক্ত) রামরাজ্য গল্প! বেটা, তবে আমিও গল্প? তবে আমার এই লাঙ্গুলও একটা গল্প? দেখ্, তবে কেমন গল্প!

এই বলিয়া মহাক্রোধে হনুমান সেই অনন্ত কুণ্ডলীকৃত মহা লাঙ্গুল আবার বাবু বেচারার স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। তখন বাবু বিশুষ্কবদনে, বলিলেন, "থাম থাম, হে মহালাঙ্গুল, তুমিও গল্প নও—তোমার লাঙ্গুলও গল্প নহেই—সে বিষয়ে আমি শপথ করিতে পারি। কাজে কাজেই তোমার রামরাজ্যও গল্প নহে—The proof of the pudding is in the eating thereof—কথাটা কি, তুমি রামের দাস—আমি ইংরেজের দাস। তোমার রাম বড়, কি আমার ইংরেজ বড়? আমার ইংরেজ রাজ্যে একটা নূতন জিনিস হইতেছে—তোমার রামরাজ্যে তা ছিল কি?

হনু। জিনিসটা কি? সুপক্ব কদলী?

বাবু। তা না। Local self-government,

হনু। সে কি?

বাবু। স্থানীয় আত্মশাসন। ছিল তোমাদের ?

হনু। ছিল না ত কি ? স্থানীয় আত্মশাসন ত স্থান বিশেষে আত্মশাসন ? তাহা আমরা সর্ব্বদাই করিতাম। আমার আত্মশাসন ছিল লাঙ্গুলে। লাঙ্গুলে আমি আত্মশাসন না করিলে ত্রেতাযুগের অর্দ্ধেক লোক সমুদ্রে চুবুনি খেয়ে মরিত। যখনই আমার লেজ সড় সড় করিত, ইচ্ছা হইত অমুকের গলায় দিই, তখনই আমি লাঙ্গুল স্থানে আত্মশাসন করিতাম—লেজটাকে পদদ্বয় মধ্যে লুক্কায়িত করিতাম। এমন কি, যেদিন স্বয়ং রামচন্দ্র সীতা দেবীকে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে বলেন, সেদিন আমার এই স্থানীয় আত্মশাসন না থাকিলে—এই লাঙ্গুল রামচন্দ্রের গলাতেই যাইত—আমার স্থানীয় আত্মশাসনগুণে লেজ পদদ্বয় মধ্যে বিন্যস্ত হইল। আরও, আমরা যখন লঙ্কা অবরুদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম, তখন আহারাভাবে আমাদের সকলেরই আত্মশাসন উদরে নিহিত হইয়া সে অঞ্চলে স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

বাবু। মহাশয়ের বুঝিবার ভুল হইতেছে—সেরূপ আত্মশাসনের কথা বলিতেছি না।

হনু। শোনই না, স্থানীয়আত্মশাসন বড় ভাল। যথা—স্ত্রীলোকের আত্মশাসন রসনায় হইলে উত্তম স্থানীয় আত্মশাসন হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আত্মশাসন শুনিয়াছি না কি ছানা সন্দেশের হাঁড়িতে স্থানীয় হইলেই বড় ভাল হয়। তোমাদের আত্মশাসন——

বাবু। কোথায় ? পৃষ্ঠে ?

হনু। না। তোমাদের পৃষ্ঠ শাসনান্তরের ক্ষেত্র বটে—কিন্তু তোমাদের আত্মশাসনের যথার্থ ক্ষেত্র তোমাদের চক্ষু দুইটী।

বাবু। সে কি রকম ?

হনু। তোমাদের কান্না পাইলেও তোমরা কাঁদ না। সে ভাল। রাত্রিদিন ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান করিলে প্রভুগণ জ্বালাতন হইবার সম্ভাবনা।

বাবু। সে যাহাই হউক, আমি সে অর্থে স্থানীয় আত্মশাসনের কথা বলিতেছিলাম না।

হনু। তবে কি অর্থে ?

বাবু। শাসন কাহাকে বলে, জানেন ত ?

হনু। অবশ্য। তোমাকে এক চড় মারিলে তুমি শাসিত হইলে। এইত শাসন ?

বাবু। তা নয়, রাজশাসন জানেন না ?

হনু। তা জানি। কিন্তু সে অর্থে, তুমি নিজে, রাজা না হইলে আত্মশাসন করিবে কি প্রকারে ?

বাবু। (স্বগত) একেই বলে বাঁদুরে বুদ্ধি ! (প্রকাশ্যে) যদি রাজা দয়া করিয়া আপনার কাজ আমাদের কিছু ছাড়িয়া দেন ?

হনু। তা হলে সে রাজারই লাভ। তিনি আপনার কাজ পরের ঘাড়ে দিয়া পাটরাণী নিয়ে রঙ্গ করুন, আর আমরা তাঁর খাটুনি খেটে মরি! এই বুঝি তোমাদের রাম রাজ্য? হা রাম!

বাবু। কথাটা এখনও আপনার বোঝা হয় নাই। Freedom—liberty কাহাকে বলে জানেন?

হনু। কিষ্কিন্ধ্যার কলেজে ওসব শেখায় না।

বাবু। Freedom বলে স্বাধীনতা কে। স্বাধীনতা কাহাকে বলে জানেন ত?

হনু। আমি বনের পশু, আমি স্বাধীনতা জানি না ত কি তুমি জান?

বাবু। ভাল। তা যে পরিমাণে মনুষ্য স্বাধীন হইবে, সেই পরিমাণে মনুষ্য সুখী।

হনু। অর্থাৎ যে পরিমাণে মনুষ্য পশুভাব প্রাপ্ত হইবে সেই পরিমাণে মনুষ্য সুখী।

বাবু। মহাশয়! রাগ করিবেন না। কিন্তু এ কথাগুলা নিতান্ত হনুমানের মত হইতেছে।

হনু। আমি ত তাহাই, বাবুর মত কথাগুলি কি শুনি।

বাবু। স্বাধীনতা শূন্য মনুষ্য জন্মই পশু জন্ম। পরাধীনেরা গো মহিষাদির ন্যায় রজ্জুবদ্ধ হইয়া তাড়িত হয়। সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের রাজ পুরুষেরা আজন্ম স্বাধীন—free-born.

হনু। আমাদের মত।

বাবু। আত্মশাসন সেই স্বাধীনের লক্ষণ।

হনু। আমরাও সেই লক্ষণ বিশিষ্ট। আমাদের মধ্যে আত্মশাসন ভিন্ন রাজশাসন নাই। আমরা পৃথিবী মধ্যে স্বাধীন জাতি। তোমরা কি আমাদের মত হইতে চাও?

বাবু। ছি! ছি! বুঝিলাম বাঁদরে আত্মশাসন বুঝিতে পারে না।

হনু। ঠিক কথা ভাই! আইস দুই জনে কদলী ভোজন করি।



সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

শরীর রক্ষণ। ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির কৃত। কলিকাতা, ক্যানিং প্রেস।

স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক এই গ্রন্থখানি বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী করিবার নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে যে প্রণালীতে লেখা উচিত, আমাদের বোধ হয় সে প্রণালীতে ইহা লেখা হয় নাই। যে সকল মত বা ব্যবস্থা সর্ব্ববাদী সম্মত, বালক-

দের পাঠ্য গ্রন্থে কেবল তাহাই সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। সেরূপ গ্রন্থের ভাষা সরল ও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক,এবং সর্ব্বাগ্রে তাহার ছাপা ভাল হওয়া চাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কোন অংশে "শরীর রক্ষ-ণের" দোষ আছে। কিন্তু তাহা থাকি-লেও অনেক বৃদ্ধও ইহা পাঠে বিশেষ ফল পাইবেন। ইহাতে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত প্রয়ো-জনীয়। বলা বাহুল্য যে, অন্নদাবাবু যেরূপ দক্ষ চিকিৎসক, সেইরূপ দক্ষতা সহকারেই পুস্তক খানি লিখিয়াছেন।

কুসুম-কানন। শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলি-কাতা। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গের নিকট অধরলালবাবু অপরিচিত নহেন। কয়েক বৎসর হইল, তাঁহার প্রণীত "নলিনী" বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হই-য়াছিল। অধর লাল বাবু গীতি কাব্য লিখিতে যে বিশেষ দক্ষ, এবং সুললিত ছন্দবিন্যাসেও সুপটু, তাহার পরিচয় তৎকালে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যদি "নলিনী" প্রকাশের পরে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, কবির প্রতিভার উত্তরোত্তর বিকাশ না হইয়া বরং যেন কথঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে। কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে, আমরা এ পুস্তকের নিন্দা করিতেছি। সচরাচর যে সকল কবিতা উত্তম বলিয়া পঠিত হয়, ইহার কবিতা-গুলি তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল। "উপহার" "কোথা থাকে সুধাকর", "যাইলাম সেই খানে," "বিসর্জ্জন" প্রভৃতি কবিতা গুলি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। তবে "আলোর (আলেয়ার) সঙ্গীত", "The Empress of India," প্রভৃতি কবিতা এই গ্রন্থে স্থান না পাইলেই ভাল হইত।

এই পুস্তকের কোন কোন অংশ ইংরাজী কবিতা বিশেষের অবিকল অনু-বাদ বা অনুকরণ। উদাহরণস্বরূপ পুস্তক হইতে একটি কবিতা নিম্নে আমরা উদ্ধৃত করিলাম; তাহাতে লেখকের রচনা শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"কোথা থাকে সুধাকর, হাসে কুমুদিনী
পুলকিতমনে,
কোথা থাকে দিনকর, দোলে কমলিনী
সহাসবদনে,
কোথা থাকে জলধর, হাসে চাতকিনী
প্রেমের পরশে,
প্রেমের তরঙ্গে চলে' পড়ে লো তরঙ্গিনী
সাগর-উরসে;
নাহি দূর, নাহি কাল, সবে ভাল বাসে রে
মরতভুবনে,
তবে কেন আমি ভাল বাসিব না তোমারে,
লো বিধুবদনে?

গগন চুম্বন করে প্রেমে গিরিবর
উন্নতহৃদয়,
কুসুমনিকর প্রেমে চুমে মধুকর
মধুর নিলয়,

লহরী চুম্বন করে দেখ শশধর
সুধার আকর,
বিজলী করিয়ে বুকে চুমে লো কাদম্বিনী
উল্লাস-অন্তর,
কি কাজ বল লো তবে এ সকল চুম্বনে
মরতভুবনে,
যদি তুমি না চুম্বিলে আমার অধর, লো
ত্রিলোক-শোভনে?

ত্রিদিবে বাজনা বাজে, জননীর কোলে
হাসে শিশুগণ,
রসের বাজনা বাজে কবির বদনে
মনোবিনোদন,
সমর-বাজনা বাজে, প্রফুল্লিত হয়
বীরের হৃদয়,
বিজনে সঙ্গীত ধ্বনি করে লো প্রতিধ্বনি
নিশীথ সময়,
কোমল-কুসুম-সম ও চারু-হৃদয়,
নহে ত পাষাণ,

সঞ্জীবনী সুধা, যেই বিষাদ-তাপিত রে
জুড়াও তাহারে,
সকলে বাসিল যদি তোমারে, লো স্বজনি
বিমোহিত মনে,
তবে কেন আমি ভাল বাসিব না তোমারে,
লো বিধুবদনে?"

এখন Shelley-বিরচিত নিম্নলিখিত কবিতাটির সহিত উপরোদ্ধৃত কবিতার প্রথমাংশের স্থানে স্থানে তুলনা করিয়া দেখিলেই আমাদের কথা ঠিক বুঝা যাইবে।

The fountains mingle with the
river,
And the rivers with the ocean,
* * *
Nothing in the world is single ;
All things by a law divine
In one another's being mingle—
Why not I with thine?
See the mountains kiss high
heaven,
And the waves clasp one another.
* * * *
And the sun light clasp the earth,
And the moonbeams kiss the sea
What are all these kissings
worth ;
If thou kiss not me.

এই গ্রন্থকার Shelley, Swinburne, প্রভৃতির অনুকরণ-প্রিয়।

হৃদয়-প্রতিধ্বনি। শ্রীপুলিন বিহারী দত্ত বিরচিত। কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

ইহাও একখানি কাব্য গ্রন্থ; ইহার স্থানে স্থানে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। তবে গ্রন্থকারের অনুকরণ রোগটা বড় প্রবল। Montgomeryর "Night" নামক কবিতা অবলম্বনে "বিভাবরী," Mooreএর "Light of other Days" অনুকরণে "অতীত জীবনালোক," এবং Wordsworthএর "To Sleep"

কবিতাদৃষ্টে "শয্যাকণ্টক" রচিত হইয়াছে। এগুলি অনুবাদ বলিলেও বলা যায়। কিন্তু গ্রন্থকার স্বনামে ধন্য হইবার জন্য এ সকল বিষয় পাঠককে বলিয়া দেন নাই। সে যাহা হউক, আমরা গ্রন্থকারকে এ প্রকার "নকল নবীশ" হইতে নিষেধ করি। তাঁহার কিছু ক্ষমতা আছে, তিনি তাহারই যথারীতি পরিচালনা করিলে ভাল হয়।

তৃণ-পুঞ্জ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বিরচিত। কলিকাতা; নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

বোধ হয়, জ্ঞানেন্দ্র বাবুর এই প্রথম উদ্যম। তাহাই তিনি সভয়ে, কতকটা বা নম্রতার অনুরোধে, তাঁহার গ্রন্থখানিকে তৃণ পুঞ্জ বলিয়াছেন। কিন্তু ঠিক বলিতে হইলে ইহার কবিতাগুলি তৃণ অপেক্ষা অনেক উচ্চ দরের। কবিতাগুলি কষ্ট-কল্পিত হইলেও গ্রন্থ-খানি নিতান্ত মন্দ হয় নাই। জ্ঞানেন্দ্র বাবুর অপরাপর ছন্দগুলি উত্তম, কিন্তু তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ কিছুই নহে। এই গ্রন্থেও অনুকরণের অভাব নাই—তবে অনেক কম। উদাহরণ:—

Southey লিখিয়াছেন,

"From heaven it came to
heaven returneth

গ্রন্থকার ইহারই অনুকরণ করিতে গিয়া লিখিলেন:——

"স্বর্গ হতে ভালবাসা ধরাতলে নাবে লো।
ধরা ছেড়ে ভালবাসা স্বর্গে চলে যাবে লো॥",

এইরূপ "ফুলমালা ও গীতি" কবিতাটী Longfellowর অনুকরণে রচিত।

"আমার প্রণয়গীতে কেন না মজিবে লো
তোমার পরাণ?
ত্রিদিব-কুসুম তুমি সোণার কমল,
ফুটেছ মরতে,
অলকা রতন তুমি কুবেরের মণি,
উজ্জ্বল জগতে,
সম্মোহন বাণ তুমি, ভুলে' যায় সবে
যে দেখে তোমারে"

পদ্য-ব্যাকরণ। হুগলী, বুধোদয় যন্ত্র।

সংস্কৃতের প্রাদুর্ভাব-কালে প্রায় সকল গ্রন্থই পদ্যে রচিত হইত। চিকিৎসা শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, যাহা পদ্যে বুঝান বড় কঠিন, তৎ সমুদয়ও অধিকাংশই ছন্দোবন্দে লিখিত হইত। এই প্রকার পদ্যে পুস্তক লেখার এক গুণ আছে। যে সকল বিষয় মনে রাখা কর্ত্তব্য, সে সকল বিষয় পদ্যে লিখিত হইলে সহজে কণ্ঠস্থ হইয়া যায়; বিশেষতঃ বালকদিগের পাঠ্য গ্রন্থাদি পদ্যে লিখিলে বালকেরা বেশ মনে রাখিতে পারে, এবং পদ্য পড়িতে এবং আবৃত্তি করিতে তাহাদের আমোদও বোধ হয়। এমন স্থলে ব্যাকরণের ন্যায় নীরস গ্রন্থ পদ্যে লিখিত হইলে বালকদিগের পাঠের সুবিধা হয়। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থ প্রণেতা এই অভাবটি দূর করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থখানি

বাঙ্গালা ব্যাকরণের কতিপয় অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ লইয়া রচিত; পাঠশালা মাত্রেই ও স্কুলসমূহের নিম্ন-শ্রেণীতে ইহা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য।

কবিতা-কল্প-লতিকা। শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। কলিকাতা, রাজকীয় যন্ত্র।

পুস্তকখানি কতিপয় কবিতার সংগ্রহ। খুলিয়াই দেখি—এক রাশি সার্টিফিকেট্! কলিকাতা মহানগরের কয়েক জন মহোদয় সার্টিফিকেট-প্রদাতা। কিন্তু আমরা সহসা ইহাঁদের চিনিয়া উঠিতে পারি নাই, ইহারাও বোধ হয় মনে মনে জানিতেন লোকে বড় চিনিবে না, তাহাই ইহাঁদের মধ্যে দুই একজন অনুগ্রহপূর্ব্বক স্ব স্ব পরিচয়-দানে বাধিত করিয়াছেন। আমরা পাঠকদিগকে এক খানি সার্টিফিকেটের নমুনা দেখাইতে ইচ্ছা করি, নতুবা তাহার মহিমা বুঝা যাইবে না। কাব্যের সার্টিফিকেট্ অবশ্য কবিতাতেই দেওয়া চাই, সুতরাং সার্টিফিকেট্ প্রদাতা নিম্নোদ্ধৃত সার্টিফিকেট্ খানি যথারীতি কবিতাতেই লিখিয়া প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নামটি সার্টিফিকেট্ হইতে বাদ দিয়া তাহা প্রকাশ করিলাম। সার্টিফিকেট খানি এই:———

মানাবিধ কাব্যরসজ্ঞ কল্যাণীয়
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ দত্তমহাশয়
দীর্ঘজীবেষু—

মহাশয় আপনার,
সুললিত কবিতার,
শুনি রস এ মানস হয়েছে সরস।
উচিত বর্ণিতে নারে ভাবেতে অবশ।
অন্তরে যাহা উদিল,
ত্বরা তাই প্রকাশিল,
হেন কাব্য রস নব্য না হয় শ্রবণ!
জানিবে ভারত ভাবে হয়ে নিমগন!
পূর্ব্বতন গ্রন্থকার,
বিহনে এবে আন্ধার,
হয়েছিল এ ভারত বলে যত জন;
নব্য আর কবিতার কোথা আস্বাদন,
এখন আসুন তারা,
কেমন সুধার ধারা,
'কবিতা-কল্প-লতিকা' কি ভাবে লিখন!
নব কবি নব ছবি আঁকিছে কেমন!

কলিকাতা } শুভার্থি
২ ভাদ্র ১২৮৬ } শ্রী ✱ ✱ ন্যায়রত্নস্য।

যদি এই গ্রন্থে "ন্যায়রত্নী" সার্টিফিকেট্ না থাকিত,তাহা হইলে অনেকে গ্রন্থকারের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তাঁহার রচনা পাঠ করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রন্থকার সার্টিফিকেট ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছেন বলিয়া তাঁহার কবিতার প্রতি যেন পাঠকদের অশ্রদ্ধা না হয়; রাজকৃষ্ণ বাবুর কল্পনা শক্তি উত্তম, তাঁহার কবিত্বও আছে।

ফুলের সাজি। শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কর প্রেস, কলিকাতা।

এই গ্রন্থখানি আমরা অনেক দিন পাইয়াছি; কিন্তু অনবধানতাবশতঃ ইহার সমালোচনা করিতে পারি নাই। ভরসা করি, গ্রন্থকার আমাদের এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

কুঞ্জবাবু "নিবেদন" পত্রের এক-স্থানে লিখিয়াছেন:———

কবিতা লিখিতে জানি,—এ কথা আমি বলিতে পারি না। এ বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ ভঞ্জন করা যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক মধ্যে তিনি প্রবেশ করুন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে।"

তবেই কুঞ্জবাবু নিজেই এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি কবিতা

লিখিতে পারেন ; সুতরাং আমরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার গর্ব্বটুকুর লাঘব করিতে চাই না। কারণ গর্ব্ব-প্রিয়তা সম্বন্ধে তিনি "ঘড়ী" নামক গদ্য-প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :——

"হাঁগা, তোমরা পাঁচ জন ভদ্রলোক কি আমার আত্মগরিমা শুনে রাগ ক'চ্চ? কি কোর্ব্ব বল, আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে হৃদয়মধ্যে গর্ব্বকে স্থান দেয় না, সে অসার।"

পুনশ্চ স্থানান্তরে,

"গর্ব্ব বিহীন হৃদয় পশুর হৃদয়বৎ"।

তাহার পর গ্রন্থকার "নিবেদন" পত্রের এক স্থানে লিখিয়াছেন :——

বর্ত্তমান লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কোন পুস্তকে লিখিয়াছেন যে অনেক স্থলে পদ্য অপেক্ষা গদ্য কবিতার উপযোগী। ইহা আমারও দৃঢ় বিশ্বাস বলিয়া ঘড়ী নামে একটী গদ্য কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইল।"

এই কয় পংক্তি পাঠ করিবার পর আমরা দেখিলাম, যে সমালোচ্য গ্রন্থখানি কতকাংশে "কবিতা পুস্তকের" এক প্রকার নকল বলিলেও বলা যায়। "কবিতা পুস্তকে" "অধঃপতন সঙ্গীত" আছে, ইহাতেও "অবনতি" নামক কবিতা সেই ছাঁচে ঢালিয়া লিখিত হইয়াছে ; ইহার "রাসলীলা" আর "কবিতা পুস্তকের" "আকবর সাহের খোষরোজ" ছন্দে পর্য্যন্তও এক, কেবলমাত্র বিষয় বিভিন্ন। পাঠক দেখুন :——

"ফুলের তোরণ, ফুল আবরণ,
ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা।
ফুলের দোকান, ফুলের নিশান,
ফুলের বিচানা ফুলের ডালা॥"

উপরের লাইন গুলি "খোসরোজ" হইতে উদ্ধৃত। কুঞ্জবাবু ইহারই অনুকরণ করিয়া "রাসলীলায়" দশসহস্র ফুলঘটিত শব্দ যোজনাপূর্ব্বক মাথা ধরাইয়াছেন :—

"ফুল ছড়াইয়ে, ফুল বিছাইয়ে,
নাচিছে যতেক গোপিনীকুল।
ফুলের বাতাস, ফুলের সুবাস,
ফুলের খোঁপায় গোলাপ ফুল॥
ফুলের যমুনা, ফুলের বিছানা,
ফুলের বালিস ফুলের ডালা।
ফুলের বাসর, ফুলের চামর,
ফুলের বাগানে ফুলের মালা॥
ফুলের কলিকা, ফুলের মালিকা,
ফুলের যুথিকা গোপের নারী।
ফুলের বাসেতে, ফুলের রাসেতে,
নাচিছে কেমন ফুলের ঝারি॥"

"কবিতা পুস্তকের" শেষভাগে "মেঘ" "বৃষ্টি" "খদ্যোত" এই গদ্য কবিতাত্রয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, কুঞ্জ বাবুও "ঘড়ী" নামক একটী গদ্য রচনা তাঁহার পদ্যাংশের শেষভাগে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমরা দুঃখিত চিত্তে লিখিতেছি, গ্রন্থকার তাঁহার যে প্রবন্ধটিকে গদ্যকবিতা বলিয়াছেন, আমরা তাহাকে কবিতা বলিতে কোন মতেই প্রস্তুত নহি। আমরা পাঠকবর্গকে কুঞ্জ বাবুর গদ্যকবিতার রসাস্বাদন করাইতে চাই, তাহাই তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ঘড়ী বলিতেছে :——

"সকল জাতির নানাবিধ দেবতা। আমি সকল জাতিরই দেবতা। আমার অসীম ক্ষমতা! আমার মুখ সহজে বন্ধ হয় না। আমার মত ক্ষমতা ত্রিভুবনে কাহারও নাই। হপ্তায় হপ্তায় আমার ভোগ দিও। আমি ডাক্তারের পুঁজী। আমি থাকলে তাঁদের অন্ন মারে কে? কিন্তু আমি না থাকলে তাঁদের কপালে আগুন! ছ মাস অন্তর ডাক্তার বাবুরা যেন আমায় একটু একটু "মিষ্ট তৈল" খাওয়ান! মাঝে মাঝে আমার পেট খোলসা থাকলে শরীর ঠিক থাকবে।"

বঙ্গদর্শন।

১০১ সংখ্যা।

দেবী চৌধুরাণী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। যাতায়াতে বড় শারীরিক কষ্ট গিয়াছে—মানসিক কষ্ট ততোধিক। সকল সময় সব সয় না। ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লের মা জ্বরে পড়িল। প্রথমে জ্বর অল্প, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, বামণের ঘরের মেয়ে—তাতে বিধবা, প্রফুল্লের মা জ্বরকে জ্বর বলিয়া মানিল না। তারই উপর দুই বেলা স্নান—জুটিলে আহার, পূর্ব্বমত চলিল। ক্রমে জ্বর অতিশয় বৃদ্ধি পাইল—শেষ প্রফুল্লের মা শয্যাগতা হইল। সেকালে, সেই সকল গ্রাম্য প্রদেশে, চিকিৎসা পত্র বড় ছিল না—বিধবারা প্রায়ই ঔষধ খাইত না—বিশেষ প্রফুল্লের এমন উপায় নাই যে, কবিরাজ ডাকে। কবিরাজও দেশে না থাকারই মধ্যে। জ্বর বাড়িল—বিকার প্রাপ্ত হইল। শেষ প্রফুল্লের মা সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেন।

পাড়ার পাঁচ জন, যাহারা তাহার অমূলক কলঙ্ক রটাইয়াছিল, তাহারাই আসিয়া প্রফুল্লের মার সৎকার করিল। বাঙ্গালীরা, এ সময় আর শত্রুতা রাখে না। বাঙ্গালী জাতির সে গুণ আছে।

প্রফুল্ল একা—পাড়ার পাঁচ জন আসিয়া বলিল—"তোমাকে চতুর্থের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।" প্রফুল্ল বলিল "ইচ্ছা, পিণ্ডদান করি—কিন্তু কোথায় কি পাইব?" পাড়ার পাঁচজন বলিল, "তোমার কিছু করিতে হইবে না—আমরা সব করিয়া লইতেছি।" কেহ কিছু নগদ দিল, কেহ কিছু সামগ্রী

দিল। এইরূপ করিয়া শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ভোজনের উদ্যোগ হইল। প্রতিবাসীরা আপনারাই সকল উদ্যোগ করিয়া লইল।

প্রফুল্ল বলিল, "একটা কথা মনে হইতেছে। আমার মার শ্রাদ্ধে আমার শ্বশুরকে নিমন্ত্রণ করা উচিত কি না?"

প্রতিবাসীরা বলিল "অবশ্য করিতে হইবে।"

প্রফুল্ল বলিল, "কে নিমন্ত্রণ করিতে যাইবে?"

দুইজন পাড়ার মাতব্বর লোক অগ্রসর হইল। সকল কাজে তাহারাই আগু হয়—তাদের সেই রোগ। প্রফুল্ল বলিল, "তোমরাই ত আমাদের কলঙ্ক রটাইয়া সে ঘর ঘুচাইয়াছ।"

তাহারা বলিল, "সে কথা আর মনে করিও না। আমরা সে কথা সারিয়া লইব। তুমি এখন অনাথা বালিকা—তোমার সঙ্গে আর আমাদের কোন বিবাদ নাই।"

প্রফুল্ল সম্মত হইল। দুই জন হরবল্লভকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। হরবল্লভ বলিলেন, "কি ঠাকুর! তোমরাই বিহাইনকে জাতিভ্রষ্টা বলিয়া তাকে এক ঘ'রে ক'রেছিলে—আবার তোমাদের মুখে এই কথা।"

ব্রাহ্মণেরা বলিল, "সে কি জানেন—অমন পাড়াপড়সীতে গোলযোগ হয়—সেটা কোন কাজের কথা নয়।"

হরবল্লভ বিষয়ী লোক—ভাবিলেন "এসব জুয়াচুরি। এ বেটারা বাগ্‌দী বেটীর কাছে টাকা খাইয়াছে। ভাল, বাগ্‌দী বেটী টাকা পাইল কোথা? নিশ্চিত তাহার চরিত্র মন্দ।" অতএব হরবল্লভ নিমন্ত্রণের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহার মন প্রফুল্লের প্রতি বরং আরও নিষ্ঠুর ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

প্রতিবাসীরা নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রফুল্ল যথারীতি মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়া প্রতিবাসীদিগের সাহায্যে ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পন্ন করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ফুলমণি নাপিতানীর বাস, প্রফুল্লের বাসের নিকট। মাতৃহীন হইয়া অবধি প্রফুল্ল একা গৃহে বাস করে। প্রফুল্ল সুন্দরী যুবতী, রাত্রে একা বাস করে, ভয়ও আছে, কলঙ্কও আছে। কাছে শুইবার জন্য রাত্রে এক জন স্ত্রীলোক চাই। ফুলমণিকে এজন্য প্রফুল্ল অনুরোধ করিয়াছিল। ফুলমণির বাড়ী, প্রফুল্লের বাড়ীর নিকট, সে বিধবা; তার এক বিধবা ভগিনী ভিন্ন কেহ নাই। আর তারা দুই ব'নেই প্রফুল্লের মার অনুগত ছিল। এই জন্য প্রফুল্ল ফুলমণিকে অনু-

রোধ করে, আর ফুলমণিও সহজে স্বীকার করে। অতএব যে দিন প্রফুল্লের মা মরিয়াছিল, সেই দিন অবধি প্রফুল্লের বাড়ীতে ফুলমণি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আসিয়া শোয়।

তবে ফুলমণি কি চরিত্রের লোক, তাহা ছেলেমানুষ প্রফুল্ল সবিশেষ জানিত না। ফুলমণি প্রফুল্লের অপেক্ষা বয়সে দশ বছরের বড়। দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, বেশভূষার একটু পারিপাট্য রাখিত। একে ইতর জাতির মেয়ে, তাতে বালবিধবা; চরিত্রটা বড় সে খাঁটি রাখিতে পারে নাই। গ্রামের জমিদার পরাণ চৌধুরী। তাঁর বাড়ী সেখান হইতে প্রায় আট ক্রোশ। তাঁহার এক জন গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্ত্তী ঐ গ্রামে আসিয়া মধ্যে মধ্যে কাছারি করিত। লোকে বলিত, ফুলমণি দুর্লভের বিশেষ অনুগৃহীতা—অথবা দুর্লভ তাহার অনুগৃহীত। এ সকল কথা প্রফুল্ল একেবারে যে কখন শুনে নাই—তা নয়। কিন্তু কি করে—আর কেহ আপনার ঘর দ্বার ফেলিয়া প্রফুল্লের কাছে আসিয়া শুইতে চাহে না। বিশেষ প্রফুল্ল মনে করিল, "সে মন্দ হোক—আমি না মন্দ হইলে আমায় কে মন্দ করিবে?"

অতএব ফুলমণি দুই চারি দিন আসিয়া প্রফুল্লের ঘরে শুইল। শ্রাদ্ধের পর দিন ফুলমণি একটু দেরি করিয়া আসিতেছিল। পথে একটা আম গাছের তলায়, একটা বন আছে, আসিবার সময় ফুলমণি সেই বনে প্রবেশ করিল। সে বনের ভিতর এক জন পুরুষ মানুষ দাঁড়াইয়া ছিল। বলা বাহুল্য যে, সে সেই দুর্লভচন্দ্র।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কৃতাভিসারা, তাম্বুলরাগরক্তাধরা, রাঙ্গাপেড়ে সাড়ী পরা, হাসিতে মুখভরা ফুলমণিকে দেখিয়া বলিলেন;—

"কেমন, আজ?"

ফুলমণি বলিলেন," হাঁ আজই বেশ। তুমি রাত্রি দুপরের সময়ে পাল্‌কী নিয়ে এসো—দুয়ারে টোকা মেরো। আমি দুয়ার খুলিয়া দিব। কিন্তু দেখো গোল না হয়।

দুর্লভ। তার ভয় নাই। কিন্তু সে ত গোল করবে না?

ফুলমণি। তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমি আস্তে আস্তে দোরটি খুল্‌ব, তুমি আস্তে আস্তে সে ঘুমিয়ে থাকতে থাক্‌তে তার মুখটি কাপড় দিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। তার পর চেঁ চায়,কার বাপের সাধ্য!

দুর্লভ। তা, অমন জোর ক'রে নিয়ে গেলে কয় দিন থাকবে?

ফুল। একবার নিয়ে যেতে পার্‌লেই হলো। যার তিন কুলে কেউ নেই, যে অন্নের কাঙ্গাল, সে খেতে পাবে, কাপড় পাবে, গয়না পাবে, টাকা পাবে, সোহাগ পাবে—সে আবার থাকবে না? সে ভার আমার—আমি যেন গয়না টাকার ভাগ পাই।

এই রূপ কথাবার্ত্তা সমাপ্ত হইলে, দুর্লভ স্বস্থানে গেল—ফুলমণি প্রফুল্লের কাছে গেল। প্রফুল্ল এ সর্ব্বনাশের কথা কিছুই জানিতে পারে নাই। সে মার কথা ভাবিতে ভাবিতে শয়ন করিল। মার জন্য যেমন রোজ কাঁদে, তেমনি কাঁদিল; কাঁদিয়া যেমন রোজ ঘুমায়, তেমনি ঘুমাইল। দুই প্রহরে দুর্লভ আসিয়া দ্বারে টোকা মারিল। ফুলমণি দ্বার খুলিল। দুর্লভ প্রফুল্লের মুখ বাঁধিয়া ধরাধরি করিয়া পাল্‌কীতে তুলিল। বাহকেরা নিঃশব্দে তাহাকে পরাণ বাবু জমীদারের বিহার-মন্দিরে লইয়া চলিল। বলা বাহুল্য, ফুলমণি সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

বাহকেরা নিঃশব্দে চলিল বলিয়াছি; কেহ মনে না করেন—এটা ভ্রমপ্রমাদ! বাহকের প্রকৃতি শব্দ করা। কিন্তু এবার শব্দ করার পক্ষে তাহাদের প্রতি নিষেধ ছিল। শব্দ করিলে গোলযোগ হইবে, তা ছাড়া আর একটা কথা ছিল। ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর মুখে শুনা গিয়াছে বড় ডাকাতের ভয়। বাস্তবিক এরূপ ভয়ানক দস্যুভীতি কখনও কোন দেশে হইয়াছিল কি না সন্দেহ। তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার, বছরকত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তার পর, আবার দেবী সিংহের ইজারা। পৃথিবীর ওপারে ওয়েষ্টমিনষ্টর হলে দাঁড়াইয়া এড্‌মন্দ বর্ক সেই দেবী সিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। পর্ব্বতোদ্গীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বর্ক, দেবী সিংহের দুর্ব্বিসহ অত্যাচার অনন্ত কালসমীপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নিজমুখে সে দৈববাণী তুল্য বাক্যপরম্পরা শুনিয়া শোকে অনেক স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল—আজিও শত বৎসর পরে সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর লোমাঞ্চিত এবং হৃদয় উন্মত্ত হয়। সেই ভয়ানক অত্যাচার, বরেন্দ্রভূম ডুবাইয়া গিয়াছিল। অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পর্য্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের খাইবার নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই, এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত। কাহার সাধ্য শাসন করে। গুডল্যাড সাহেব রঙ্গপুরের প্রথক কালেক্টর। ফৌজদারী তাঁহারই জিম্মা। তিনি দলে দলে সিপাহী, ডাকাত ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন। সিপাহীরা কিছু করিতে পারিল না।

অতএব দুর্লভের ভয়, তিনি ডাকাতি করিয়া প্রফুল্লকে লইয়া যাইতেছেন, আবার তাঁর উপর ডাকাতে না ডাকাতি করে। পাল্‌কী দেখিয়া ডাকাতেরা আসা সম্ভব। সেই ভয়ে বেহারারা নিঃশব্দ। গোলমাল হইবে বলিয়া সঙ্গে আর অপর লোকজনও নাই, কেবল দুর্লভ নিজে আর ফুলমণি। এই রূপে তাহারা ভয়ে ভয়ে চারি ক্রোশ ছাড়াইল।

তার পর বড় ভারি জঙ্গল আরম্ভ হইল। বেহারারা সভয়ে দেখিল, দুই জন মানুষ সম্মুখে আসিতেছে। রাত্রিকাল—কেবল নক্ষত্রালোকে পথ দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাহাদের অবয়ব অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বেহারারা দেখিল, যেন কালা স্তক যমের মত দুই মূর্ত্তি আসিতেছে। এক জন বেহারা অপরদিগকে বলিল;—

"মানুষ দুটোকে সন্দেহ হয়।" অপর আর একজন বলিল, "রাত্রে যখন বেড়াচ্চে, তখন কি আর ভাল মানুষ।"

তৃতীয় বাহক বলিল, "মানুষ দুটো ভারি জোয়ান।"

৪র্থ। হাতে লাঠি দেখ্‌ছি না।

৫ম। চক্রবর্ত্তী মশাই কি বলেন। আর ত এগোনা যায় না—ডাকাতের হাতে প্রাণটা যাবে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "তাই ত, বড় বিপদ দেখি যে! যা ভেবেছিলেম, তাই হলো!"

এমন সময়ে, যে দুই ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহারা পথে লোক দেখিয়া হাঁকিল।—

"কোন হ্যায় রে!"

বেহারারা অমনি পাল্‌কী মাটীতে ফেলিয়া দিয়া "বাবা গো!" শব্দ করিয়া একেবারে জঙ্গলের ভিতর পলাইল। দেখিয়া দুর্লভ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও সেই পথাবলম্বী হইলেন। তখন ফুলমণি "আমায় ফেলে কোথা যাও?" বলিয়া তাঁহার পাছু পাছু ছুটিল।

যে দুইজন আসিতেছিল—যাহারা এই দশজন মনুষ্যের ভয়ের কারণ—তাহারা পথিক মাত্র। দুই জন হিন্দুস্থানী দিনাজপুরের রাজ-সরকারে চাকরীর চেষ্টায় যাইতেছে। রাত্র প্রভাত নিকট দেখিয়া সকালে সকালে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেহারা পলাইল দেখিয়া, তাহারা একবার খুব হাসিল, তার পর আপনাদের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। কিন্তু বেহারারা, আর ফুলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না।

প্রফুল্ল পাল্‌কীতে উঠিয়াই মুখের বাঁধন স্বহস্তে খুলিয়া ফেলিয়াছিল। রাত্র দুই প্রহরে চীৎকার করিয়া কি হইবে বলিয়া চীৎকার করে নাই; চীৎকার শুনিতে পাইলেই বা কে ডাকাতের সম্মুখে আসিবে। প্রথমে ভয়েও প্রফুল্ল কিছু আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। কিন্তু এখন প্রফুল্ল স্পষ্ট বুঝিল যে, সাহস না করিলে মুক্তির কোন উপায় নাই। যখন বেহারারা পাল্‌কী ফেলিয়া পলাইল, তখন প্রফুল্ল বুঝিল—আর একটা কি নূতন বিপদ। ধীরে ধীরে পাল্‌কীর কপাট খুলিল। অল্প মুখ বাড়াইয়া দেখিল দুইজন মনুষ্য আসিতেছে। তখন প্রফুল্ল ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিল; যে অল্প ফাঁক রহিল; তাহা দিয়া প্রফুল্ল দেখিল মনুষ্য দুইজন চলিয়া গেল। তখন প্রফুল্ল পাল্‌কী হইতে বাহির হইল—দেখিল কেহ কোথাও নাই।

প্রফুল্ল ভাবিল, যাহারা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহারা অবশ্য ফিরিবে। অতএব যদি পথ ধরিয়া যাই, তবে ধরা পড়িতে পারি। তার চেয়ে এখন জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া থাকি। তার পর, দিন হইলে যা হয় করিব।

এই ভাবিয়া প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। ভাগ্যক্রমে যে দিকে বেহারারা পলাইয়াছিল, সে দিকে যায় নাই। সুতরাং কাহারও সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল না। প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই প্রভাত হইল।

প্রভাত হইলে প্রফুল্ল বনের ভিতর এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিল। পথে বাহির হইতে এখনও সাহস হয় না। দেখিল এক জায়গায় একটা পথের অস্পষ্ট রেখা বনের ভিতরের দিকে গিয়াছে। যখন পথের রেখা এদিকে গিয়াছে, তখন অবশ্য এদিকে মানুষের বাস আছে। প্রফুল্ল সেই পথে চলিল। বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ভয়, পাছে বাড়ী হইতে আবার তাকে ডাকাইতে ধরিয়া আনে। বাঘ ভালুকে খায়, সেও ভাল, আর ডাকাতের হাতে না পড়িতে হয়।

পথের রেখা ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দূর গেল—বেলা দশ দণ্ড হইল, তবু গ্রাম পাইল না। শেষে পথের রেখা বিলুপ্ত হইল—আর পথ পায় না। কিন্তু দুই এক খানা পুরাতন ইট দেখিতে পাইল। ভরসা পাইল। মনে করিল যদি ইট আছে, তবে অবশ্য নিকটে মনুষ্যালয়ও আছে।

যাইতে যাইতে ইটের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল! জঙ্গল দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিল। শেষ প্রফুল্ল দেখিল, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। প্রফুল্ল ইষ্টক-স্তূপের উপর আরোহণ করিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিল।

দেখিল এখনও দুই চারিটা ঘর অভগ্ন আছে। মনে করিল, এখানে মানুষ থাকিলে থাকিতে পারে। প্রফুল্ল সেই সকল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে গেল। দেখিল সকল ঘরের দ্বার খোলা—মনুষ্য নাই। অথচ মনুষ্য-বাসের চিহ্নও কিছু কিছু আছে। ক্ষণপরে প্রফুল্ল কোন বুড়া মানুষের কাতরানি শুনিতে পাইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্ল এক কুঠরিমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল সেখানে এক বুড়া শুইয়া কাতরাইতেছে। বুড়ার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক ওষ্ঠ, চক্ষুঃ কোটরগত, ঘন শ্বাস। প্রফুল্ল বুঝিল, ইহার মৃত্যু নিকট। প্রফুল্ল তাহার শয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বুড়া প্রায় শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "মা তুমি কে? তুমি কি কোন দেবতা, মৃত্যুকালে আমার উদ্ধারের জন্য আসিলে?"

প্রফুল্ল বলিল, "আমি অনাথা। পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি। তুমিও দেখিতেছি অনাথ—তোমার কোন উপকার করিতে পারি?"

বুড়া বলিল, "অনেক উপকার এ সময়ে করিতে পার। জয় জগদীশ্বর! এ সময়ে মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইলাম। পিপাসায় প্রাণ যায়—একটু জল দাও।"

প্রফুল্ল দেখিল, বুড়ার ঘরে জল-কলসী আছে, কলসীতে জল আছে, জলপাত্র আছে। কেবল দিবার লোক নাই। প্রফুল্ল জল আনিয়া বুড়াকে খাওয়াইল।

বুড়া জলপান করিয়া কিছু সুস্থির হইল। প্রফুল্ল এই অরণ্যমধ্যে মুমূর্ষু বৃদ্ধকে একাকী এই অবস্থায় দেখিয়া বড় কৌতূহলী হইল। কিন্তু বুড়া তখন অধিক কথা কহিতে পারে না। প্রফুল্ল সুতরাং তাহার সবিশেষ পরিচয় পাইল না। বুড়া যে কয়টি কথা বলিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই।

বুড়া বৈষ্ণব। তাহার কেহ নাই, কেবল এক বৈষ্ণবী ছিল। বৈষ্ণব বুড়াকে মুমূর্ষু দেখিয়া তাহার দ্রব্য-সামগ্রী যাহা ছিল, তাহা লইয়া পলাইয়াছে। বুড়া বৈষ্ণব—তাহার দাহ হইবে না। বুড়ার কবর হয়—এই ইচ্ছা। বুড়ার কথা মত, বৈষ্ণবী বাড়ীর উঠানে তাহার একটি কবর কাটিয়া রাখিয়া গিয়াছে। হয় ত, সাবল কোদালি সেইখানে পড়িয়া আছে। বুড়া এখন প্রফুল্লের কাছে এই ভিক্ষা চাহিল যে, আমি মরিলে সেই কবরে আমাকে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া মাটী চাপা দিও॥"

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। তার পর বুড়া বলিতে লাগিল, আমার কিছু টাকা পোতা আছে। বৈষ্ণবী সে সন্ধান জানিত না—তাহা হইলে না লইয়া পলাইত না। সে টাকা গুলি কাহাকে না দিয়া গেলে আমার প্রাণ বাহির হইবে না। যদি কাহাকে না দিয়া মরি, তবে যক্ষ হইয়া টাকার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইব—আমার গতি হইবে না। বৈষ্ণবীকে সেই টাকা দিব মনে করিয়া-ছিলাম, কিন্তু সে ত পলাইয়াছে। আর কোন মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাইব? তাই তোমাকেই সেই টাকা গুলি দিয়া যাই-তেছি। আমার বিছানার নীচে এক খানি চৌকা তক্তা পাতা আছে। সেই তক্তা খানি তুলিবে। একটা সুরঙ্গ দেখিতে পাইবে। বরাবর সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া নামিবে—ভয় নাই—আলো লইয়া যাইবে। নীচে মাটির ভিতর এমনি একটা ঘর দেখিবে। সেই ঘরের বায়ু কোণে খুঁজিও—টাকা পাইবে।

প্রফুল্ল বুড়ার শুশ্রূষায় নিযুক্তা রহিল। বুড়া বলিল, এই বাড়ীতে গোহাল আছে—গোহালে গোরু আছে। গোহাল হইতে যদি দুধ দুইয়া আনিতে পার, তবে একটু আনিয়া আমাকে দাও—একটু আপনি খাও।"

প্রফুল্ল তাহাই করিল—দুধ আনি-বার সময়ে দেখিয়া আসিল—কবর কাটা—সেখানে কোদালি সাবল পড়িয়া আছে।

অপরাহ্নে বুড়ার প্রাণ বিয়োগ হইল। প্রফুল্ল তাহাকে তুলিল—বুড়া শীর্ণকায়; সুতরাং লঘু; প্রফুল্লের বল যথেষ্ট। প্রফুল্ল তাহাকে লইয়া গিয়া, কবরে শুয়াইয়া মাটী চাপা দিল। পরে নিকটস্থ কূপে স্নান করিয়া, ভিজা কাপড় আধ খানা করিয়া রৌদ্রে শুকাইল। তার পরে কোদালি সাবল লইয়া বুড়ার টাকার সন্ধানে চলিল। বুড়া তাহাকে টাকা দিয়া গিয়াছে—সুতরাং লইতে কোন বাধা আছে, মনে করিল না। প্রফুল্ল দীন-দুঃখিনী।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্ল বুড়াকে সমাধি-মন্দিরে প্রোথিত করিবার পূর্ব্বেই তাহার শয্যা তুলিয়া বনে ফেলিয়া দিয়াছিল—দেখিয়াছিল যে, শয্যার নীচে যথার্থই একখানি চৌকা তক্তা, দীর্ঘ প্রস্থে তিন হাত হইবে, মেঝেতে বসান আছে। এখন সাবল আনিয়া, তাহার চাড়ে তক্তা উঠাইল—অন্ধকার গহ্বর দেখা দিল। ক্রমে অন্ধকারে প্রফুল্ল দেখিল, নামিবার একটা সিঁড়ি আছে বটে।

জঙ্গলে কাঠের অভাব নাই। বরং কিছু কাঠের চেলা উঠানে পড়িয়াছিল, প্রফুল্ল তাহা বহিয়া আনিয়া কতকগুলা গহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর অনুসন্ধান করিতে লাগিল—চকমকি দিয়াশালাই আছে কি না। বুড়া মানুষ—অবশ্য তামাকু খাইত। সর-ওয়াল্টর রালের আবিষ্ক্রিয়ার পর, কোন বুড়া তামাকু ব্যতীত এ ছার, এ নশ্বর, এ নীরস, এ দুর্ব্বিসহ জীবন শেষ করিতে পারিয়াছে?—আমি গ্রন্থকার মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, যদি এমন বুড়া কেহ ছিল, তবে তাহার মরা ভাল হয় নাই—তার আর কিছু দিন থাকিয়া এই পৃথিবীর দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করাই উচিত ছিল। খুঁজিতে খুঁজিতে প্রফুল্ল চকমকি, সোলা, দিয়াশালাই সব পাইল। তখন প্রফুল্ল গোহাল উঁচাইয়া বিচালি লইয়া আসিল। চকমকির আগুনে বিচালি জ্বালিয়া সেই সরু সিঁড়িতে পাতালে নামিল। সাবল কোদালি আগে নীচে ফেলিয়া দিয়াছিল। দেখিল, দিব্য একটি ঘর। বায়ু কোণ—বায়ুকোণ আগে ঠিক করিল। তার পর যে সব কাঠ ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা বিচালির আগুনে জ্বালিল। উপরের মুক্ত পথ দিয়া ধুঁয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। ঘর আলো হইল। সেই খানে প্রফুল্ল খুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

খুঁড়িতে খুঁড়িতে "ঠং" করিয়া শব্দ হইল। প্রফুল্লের শরীর রোমাঞ্চিত হইল—বুঝিল ঘটি কি ঘড়ার গায়ে সাবল

ঠেকিয়াছে। ঘড়া কি ঘটি? একটা চুমকি ঘটি বাহির হইলেও প্রফুল্ল খুসী—পৃথিবীতে প্রফুল্লের কিছুই নাই—এক খানি বস্ত্র মাত্র।

প্রফুল্ল খুঁড়িতে লাগিল—ঠং ঠং করিয়া সাবল বাজিতে লাগিল—না এ বাটীঘটি নয়, বড় একটা লোটা হবে। খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাত্রের আকার দেখা গেল—কি সর্ব্বনাশ! এ যে ঘড়া বোধ হইতেছে! এক ঘড়া টাকা! প্রফুল্লের বিশ্বাস হইল না—এত অর্থ তাহার কপালে ঘটিবে না।

ক্রমে ঘড়াটা সব বাহির হইল—মুখে খুরি আঁটা। প্রফুল্ল সেটাকে তুলিবার চেষ্টা করিল—কিছুতেই পারিল না—বড় ভারি। তখন প্রফুল্ল, অগত্যা তাহার মুখের খুরি খুলিয়া ফেলিল। দেখিয়া প্রফুল্লের মাথা ঘুরিয়া গেল। টাকা নহে—এক ঘড়া মোহর!! এত অর্থ লইয়া প্রফুল্ল পৃথিবীতে কি করিবে?

প্রফুল্ল ঘড়া তুলিতে না পারিয়া আঁজলা আঁজলা করিয়া মোহর তুলিয়া মাটিতে রাখিতে লাগিল—ইচ্ছা গণিবে কত মোহর। কিন্তু অঙ্ক বিদ্যায় তত দখল নাই—গণিয়া সংখ্যা করিতে পারিল না। কেবল কাঁড়ি করিয়া সাজাইল। কিন্তু তুলিতে তুলিতে মোহর ফুরাইল—হরি! হরি! এ আবার কি উঠে। যাহা উঠিল,তাহা কুঁদোর আগুনের প্রতিফলনে লক্ষ অগ্নি বিকসিত করিল—প্রফুল্ল চিনিল—হীরা, পান্না, চুনি! অঞ্জলি-পূর্ণ হীরা, পান্না, চুনি উঠিতে লাগিল।

প্রফুল্ল শত সহস্র বার মনে মনে জননীকে স্মরণ করিল। ভাবিল, "হায় মা! তুমি বাঁচিয়া থাকিতে এ টাকা পাইলাম না! আমি যদি এ টাকা রাখিতে পারি, রাজরাণীর মত কাটাইব! কিন্তু তুমি, মা! না খাইয়া মরিয়াছ!"

প্রফুল্ল আবার মনে মনে ভাবিল, "পৃথিবীতে এত ধন আছে, তাহা আমি জানিতাম না? যাই হউক, এখন পুতিয়াই রাখি। এই ভাবিয়া, প্রফুল্ল কেবল পঞ্চাশৎ স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া লইয়া, আবার ঘড়া পুঁতিয়া রাখিল, তখন প্রফুল্ল অতিশয় সহর্ষচিত্তে সিঁড়িতে উঠিতে চলিল। যাইতে যাইতে হঠাৎ মনে হইল—"আরও যদি থাকে? আর থাকে ত লইয়া কি করিব? যা পাইয়াছি, আমার যাবজ্জীবনের পক্ষে অনন্ত ঐশ্বর্য্য।" এই ভাবিয়া প্রফুল্ল সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল। অর্দ্ধেক উঠিয়া, কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিল না। ভাবিল—"ভাল, দেখিই না কেন, আর আছে কি না।" আবার সাবল লইয়া বসিল। যেখানে ঘড়া পাইয়াছিল, তাহার চারি পাশে খুঁড়িতে লাগিল। খুঁড়িতে খুঁড়িতে—ঠং! আবার সাবলে বাজিল। আবার ঘড়া! আবার কেবল মোহর! নীচে আবার তেমনি হীরা, পান্না চুনি পাইল। প্রফুল্ল ভাবিল "আজ নিশ্চয় আমি

মরিয়া যাইব—এত ধন মনুষ্যের ভোগে কখন হয় না।

"ভাল দেখিই না কেন কুবেরের কত ধন আছে?" এই বলিয়া প্রফুল্ল আবার খুঁড়িতে লাগিল। আবার ঠং! —আবার সেইরূপ ঘড়া—আবার উপরে মোহর, নীচে হীরা, পান্না, চুনি।

প্রফুল্ল বেশ করিয়া সব পুঁতিল। মনে ভাবিল, "আরও যদি থাকে, তা আমি চাই না। আমি যা পাইয়াছি, রাখিতে পারিলে দিনাজপুরের রাণীর সঙ্গে টক্কর দিতে পারিব।" প্রফুল্ল সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল।

বড় পরিশ্রম হইয়াছিল। প্রফুল্ল গোহালে গিয়া আবার গরু দুইয়া দুধ খাইল। তার পরে খড়ের শয্যা রচনা করিয়া শুইল। একা সেই জঙ্গলের ভিতর ভগ্ন অট্টালিকায় শয়ন করিতে বড় ভয় করিতে লাগিল। প্রফুল্লের বড় সাহস—তাহার পরিচয় আমরা যথেষ্ট দিয়াছি; তথাপি ভয় করিতে লাগিল। বিশেষ সেই ঘরে সেই দিন মানুষ মরিয়াছে—প্রফুল্ল আলো নহিলে শুইতে পারিল না, তেল খুঁজিতে লাগিল। তেল পাইল না—কিন্তু খুঁজিতে খুঁজিতে দুইটা মোম বাতি পাইল। তাই জ্বালিয়া, খড়ের বিছানা করিয়া প্রফুল্ল শয়ন করিল। শয়ন করিয়া প্রফুল্লের ঘুম হইল না। আরও ঘড়া আছে কি? না আর ধন পৃথিবীতে থাকিতে পারে না। থাকিলই বা? আর লইয়া কি হইবে? তবু দেখিলে ক্ষতি কি? না—দেখিব না। না দেখিলেও ঘুম হয় না। ঘুম হইল না—কাজে কাজেই প্রফুল্ল আবার বাতি জ্বালিয়া সুরঙ্গে নামিল। আবার সাবল লইয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল—আবার ঠং করিয়া সাবল ঘড়ায় বাজিল। আবার—এক ঘড়া ধন বাহির হইল।

এইরূপে প্রফুল্ল বার ঘড়া ধন পাইল।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে পর প্রফুল্ল হাত পা ধুইয়া আবার আসিয়া শয়ন করিল। এবার বোধ হয় পরিশ্রমের ফলে একটু নিদ্রা আসিল। কিন্তু অকস্মাৎ ভয়ানক কোলাহলে প্রফুল্লের নিদ্রাভঙ্গ হইল। যেন একশত লোক মার মার! কাট কাট! শব্দ করিতেছে। প্রফুল্ল থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে তৃণশয্যা হইতে উঠিল। বেশ করিয়া মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক শব্দ শুনিতে লাগিল। শব্দ তাহার দ্বারে। মার মার! কাট কাট শব্দ নহে, তবু অনেক লোকের কোলাহল ধ্বনি বটে। সর্ব্বনাশ এ-জঙ্গলে এত লোকের শব্দ—এ নিশ্চিত ভূত। নিতান্ত তা না হয় তবে ডাকাত।

রে রে হৈ হৈ শব্দ মধ্যে প্রফুল্ল, একটা শব্দ বেশ বুঝিতে পারিল। প্রফুল্ল ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়াছিল, সেই দ্বারে যেন সহস্র লোকে ঠেলাইতেছে। দ্বার ভাঙ্গিয়া যায়—আর থাকে না। প্রফুল্ল তখন মনে মনে সকল দেবতাকে ডাকিল। একবার ভাবিল যে তক্তা তুলিয়া সুরঙ্গে নামিয়া গিয়া লুকাইত

থাকি। তার পরে ভাবিল যে নীচেয় গেলে, তক্তার উপর ত বিছানা করিয়া তক্তা লুকাইতে পারিব না—যাহারা দ্বার ভাঙ্গিতেছে, তাহারা দেখিতে পাইয়া তক্তা তুলিয়া নীচেয় গিয়া ধরিবে। তখন প্রফুল্ল বুঝিল, যে সাহস ভিন্ন রক্ষার অন্য উপায় নাই। একে স্বভাবতঃ প্রফুল্লের অনেক সাহস—তাতে কয় দিন ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দুঃখ যন্ত্রণা পাইয়াছে—অনেক বিপদে পড়িয়া উদ্ধার পাইয়াছে—অনেক সাহস করিয়াছে। অতএব সাহসে ভর করিয়া, প্রফুল্ল গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তখন মম বাত্তি জ্বলিতেছিল।

দ্বার খুলিবা মাত্র, হুড় হুড় করিয়া জনকুড়ি পঁচিশ কালান্তক যমের ন্যায় জোয়ান ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

কোথা রাখি প্রাণ।

"যোগ মগন হর, তাপস যত দিন
তত দিন না ছিল ক্লেশ।"

দশমহাবিদ্যা।

১

প্রকৃতি! কোথায় আজ রাখিব এ প্রাণ
বিশাল এ ধরাতলে—
অনন্ত ও নভস্তলে—
অতল এ বক্ষে মম—মিলে না যে স্থান,
কোথায়—কোথায়—আজ রাখি এই প্রাণ!

২

কোথা তুমি রাখ তারে—প্রলয়ে যখন—
ওই গ্রহ তারা টুটে
শূন্য পথে ধায় ছুটে,
কোথা সে অনাথ গ্রহে কর স্থান দান!
আমার এ প্রাণ তথা পায় নাকি স্থান?

৩

জলধি! তোমার গর্ভে—সে স্থান কোথায়
বক্ষচ্যুত অনাশ্রয়
ক্ষুদ্র রেণু নিরাশায়—
অকূল প্রবাহে পড়ি' যবে ভেসে যায়—
কোথা সেই স্থান যথা রাখ তুমি তায়?

৪

বসুন্ধরে!
যে ব্যথার নাহি স্থান বিপুল সংসারে
মর্ম্মেও না স্থান পে'য়ে
অশ্রুধারে পড়ে বেয়ে
হৃদয় পাতিয়া তুমি স্থান দেহ তারে—
কোথা রাখ সেই অশ্রু দেখাও আমারে!

৫

তুমি হে সমীর! তুমি দেহ দেখাইয়া
ছিন্ন প্রাণ-পাদপের—

দগ্ধ-প্রাণ-মানবের—
কাতর নিশ্বাস যথা লহ মিশাইয়া—
সেই স্থান আজ মোরে দেহ দেখাইয়া!

৬

বনরাজি! তব অঙ্কে সে স্থান কোথায়—
যথা রাখ পাপিয়ার
সকরুণ সে চীৎকার
যবে সে অস্থির প্রাণে গভীর নিশায়
তোমার নির্জ্জন অঙ্কে কাঁদিয়া বেড়ায়?

৭

হিমাচল!
বিপুল অন্তরে তব গোপনে যেখানে—
রাখি' প্রাণ আপনার
না পাও যন্ত্রণা আর—
সেই খানে বিন্দুমাত্র মিলিবে কি স্থান?
রাখিতে আমার এই নিরাশ্রয় প্রাণ!

৮

শর্ব্বরি! তোমার বক্ষে আতস* যখন
ছুটি ভীম যাতনায়
কাঁদিয়া ফাটিয়া যায়
লুকাও হৃদয়ে তায় করিয়া যতন
এ প্রাণ রাখিতে কেন সঙ্কুচিত মন!

৯

স্রোতস্বতি!
তোমার উভয় তীর-বাসি প্রাণিগণ—
ধূলি, কুটা, মলা, ছাই
যা কিছু ঘৃণার, তাই—
দেয় ফেলি তব নীরে—সবে দেও স্থান
তা'হ'তে যে ঘৃণ্য বলি' ফেলেছে এ প্রাণ!

১০

সংসার হে! তুমি আজ দেখাও আমারে
তিলার্দ্ধ এমন স্থান—
যথা আজ রাখি প্রাণ!
জগদীশ! অনাথের তুমিই আশ্রয়—
তুমি বল! আজ প্রাণ রাখিব কোথায়?

১১

অথবা কেন রে বৃথা ডাকি ত্রিসংসারে
এ জগৎ খুলে প্রাণ
যদি আজ দেয় স্থান—
এ প্রাণ তথায় আজ রহিতে না পারে!
তবে কেন অকারণ সুধাই সবারে!

১২

আর তুমি!—
ইহ জীবনের তুমি অনন্য, অমরি!
না জানি সে কি যে স্থান—
যাহা ক'রেছিলে দান!
জগতে যে সমতুল তার নাহি হেরি
অনাথ করিলে সেই স্থান-চ্যুত করি!

১৩

বারেক নয়ন খুলে দেখ তুমি হায়!—
কোথায় তুলিয়া ছিলে!—
কোথায়—ফেলিলে ঠেলে!
স্বর্গাধিক স্বর্গ-সে যে—তুলিলে যথায়
ফেলিলে এ প্রাণে আজ দেখহ কোথায়!

১৪

কি ভীষণ এ পতন দেখ একবার—
সূচী-মুখ মাত্র স্থান
তুমি করেছিলে দান
উঠিল এ প্রাণ—সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড উঠিল!
খসিল এ প্রাণ—সঙ্গে কেহ না টুটিল!

১৫

সেই স্বর্গচ্যুত প্রাণ একাকী আমার

* হাউই।

ক্ষিপ্ত উল্কালতা প্রায়
কেবলি কাঁদিয়া ধায়
জগতে তাহার স্থান কোথাও না মিলে
কি করি তুলিলে দেবি!--কি করি ফেলিলে!

১৬

কিন্তু তুমি নহ দোষী—আমি দুরাশয়!
সামান্য সাধনা করি'
স্বর্গের কামনা ধরি
আমার গভীর সেই নাহি স্বার্থ দান—
প্রতিদান যার তব অপার্থিব প্রাণ!

১৭

মুছে ফেল অশ্রুজল পরাণ আমার
আপন অদৃষ্ট ফলে
আপনি অনাথ হ'লে
কর নাই সে তপস্যা পুণ্য-বলে যার
সে স্বরগ রাজ্যে তব হ'বে অধিকার!

১৮

নহে সেই সাধনার ওরূপ আচার
নিরাকারে পূজে যেই,
প্রণয় কি, বুঝে সেই;
সাধ সেই মহাযোগ প্রাণ এইবার
ধ্যায়ে নিত্যং এবে শুধু পরমাত্মা তাঁর।

১৯

আইস দেখাই প্রাণ সে যোগ-পদ্ধতি—
এ তুচ্ছ যন্ত্রণা ভুলি
সংসারের ঢাকা খুলি—
বিপুল ব্রহ্মাণ্ড যুড়ি সৃজিয়া মন্দির
কর পূজা আত্মাময়ী প্রেমদা দেবীর।

২০

অণু পরমাণু ধোরে—শূন্য ধরাতলে
গন্ধ পুষ্প উপাদান
সংগ্রহ করহ প্রাণ,
নিরাকার মূর্ত্তি পদে গঠি পীঠ স্থান
প্রথমে সে ঘোর স্বার্থ দেহ বলিদান

২১

হৃদয়ে মথিলে প্রাণ উঠিবে চন্দন
ওই গন্ধ পুষ্প সনে
মিশাইয়া সে চন্দনে
"যে দেবীর ছায়া সর্ব্বভূতে বিদ্যমান
সেই দেবী পদে" বলি' কর তাহা দান;

২২

জগৎ! ফিরায়ে দাও প্রতিবিম্ব তাঁর—
প্রকৃতি!—তোমার বক্ষে
রাখিয়াছি কক্ষে কক্ষে—
তাঁহার আত্মার ছায়া করি স্তুপাকার—
দেহ আজ গঠি তাঁর মূর্ত্তি নিরাকার!

২৩

চন্দ্রমে!
শারদী পুর্ণিমা রাতে তোমার কিরণে
যে মধুর হাসি তাঁর
শিখায়েছি অনিবার
আঁধারি জগৎ তাহা কর প্রত্যর্পণ
প্রাণের মন্দিরে দেবী করিব সৃজন।

২৪

মলয়! তোমারে নিত্য নীরব নিশায়
নিশ্বাস প্রশ্বাস তাঁর
শিখায়েছি অনিবার
রোধি ব্রহ্মাণ্ডের শ্বাস দেহ তাহা ফিরে
নির্ম্মাইব দেবী আমি প্রাণের মন্দিরে।

২৫

জাহ্নবি! তোমার বক্ষে নির্ম্মলতা তাঁর
ঢালিয়াছি অবিরল

স্নিগ্ধ করি তব জল
শুকায়ে প্রকৃতি কণ্ঠ দেহ তাহা ফিরে!
প্রাণের মন্দিরে আজ স্থজিব দেবীরে।

২৬

অবনি! তোমার বক্ষে যে মমতা তাঁর
তরু লতা সরোবরে
ঢালিয়াছি যত্ন ক'রে,—
ফিরাইয়া দেও তাহা কাঁদায়ে সংসার—
প্রাণের মন্দিরে দেবী স্থজিব আমার!

২৭

হে প্রসূন!
তোমার ও দলে দলে এত দিন ধরি,
যেই পবিত্রতা তাঁর,
ঢালিয়াছি অনিবার,
কাঁদায়ে দেবতাকুল দেহ তাহা ফিরে—
নির্ম্মাইব দেবী আমি প্রাণের মন্দিরে!

২৮

লজ্জাবতী নাম তব কানন বল্লরি!
ঢালিয়া সরম তাঁর
দিয়াছি আমি তোমার—
দেহ সে সরম তুমি আজ আমারে ফিরি—
স্থজিব এ প্রাণে আমি প্রাণের ঈশ্বরী।

২৯

কবিতে!
এই দীর্ঘ কাল ধরে তোমার ভাণ্ডারে
যে মধুর ভাষা তাঁর
ঢালিয়াছি অনিবার
শুধু সে মাধুরী দেহ ফিরায়ে আমারে—
প্রাণময়ী রূপে তাঁর রাখিব তাহারে

৩০

নমি তব আত্মারূপে প্রাণের ঈশ্বরী—
লহ স্বার্থ বলিদান—
নাহি চাহি প্রতিদান!
যেরূপে ব্রহ্মাণ্ডময় তুমি বিদ্যমান
সেই রূপে প্রাণে মম হও অধিষ্ঠান।

হুগলী জাহ্নবী-তীর } ঈশান—
শুক্লপক্ষ নিশি }

মেঘদূত।

আমরা এতক্ষণ যে রূপে মেঘদূতের সমালোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে উহার গল্পমাত্র সমালোচিত হইয়াছে। কিন্তু গল্পের সমালোচনা মেঘদূতের সমালোচনা নহে। নাটক, নভেল, ও মহাকাব্যের সমালোচনায় গল্পের সমালোচনা বিশেষ আবশ্যক। মেঘদূতের সমালোচনায় উহার তাদৃশ প্রয়োজন নাই। কিন্তু তথাপি মেঘদূতের গল্প, ঘটনা, রচনা-প্রণালী কত সুন্দর তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা এতক্ষণ লিখিতেছিলাম।

মেঘদূত গীতিকাব্য। যে অর্থে জয়দেবের গীতগোবিন্দ গীতিকাব্য সে অর্থে মেঘদূত গীতিকাব্য নহে। গীত গোবিন্দ গানময়, মেঘদূত ছন্দোময়। যে ছন্দে মেঘদূত লিখিত হইয়াছে, তাহা গীত হইতে পারে সত্য, এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দঃ গীত হইলে সহৃদয়গণের হৃদয় উন্মত্ত করিতে পারে, তাহাও সত্য, কিন্তু তথাপি ইহাতে গান নাই বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে গীতিকাব্য বলিবেন না। না বলুন, আমরা ইহাকেই গীতিকাব্য বলি। কাব্যের বাহ্য আকারের প্রতি আমাদের তাদৃশ দৃষ্টি নাই।

যে স্থলে কোন একটী ভাব হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া, হৃদয়কে অধিকার করিয়া, পরিপূর্ণ করিয়া, আপ্লুত করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া অথবা উচ্ছলিত করিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, সেই ভাব-প্রকাশক কাব্যের নাম গীতিকাব্য। যে গানময় কাব্যে এই ভাবের প্রকাশ নাই আমরা তাহাকে গীতিকাব্য বলি না। যদি পদ্যেও এই প্রকার গভীর ভাব প্রকাশ থাকে, তাহাকেও আমরা গীতিকাব্য বলিতে সঙ্কুচিত হই না।

অন্যে যাহাই বলুক, মেঘদূত আমাদের মতে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। যক্ষের বিরহ, প্রথম দিন হইতেই অতি তীব্র হইয়াছিল। রামগিরিতে আসিয়া রাম ও সীতার মিলন-সুখ-সাক্ষী বৃক্ষ, পর্ব্বত ও প্রস্রবণাদি দর্শনে ক্রমেই তাহা তীব্রতর হইতেছিল। কিন্তু এত দিন তাহা মনেই ছিল, আজি আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে যক্ষের হৃদয় সে তীব্র যন্ত্রণাময় ভাব-প্রবাহ আর ধারণ করিতে পারিল না। সে ভাব-প্রবাহ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইল।—গরিব যক্ষ পাগল হইল। মেঘকে সচেতন বোধে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার নিকট আপনার দুঃখ-কাহিনী বলিয়া নিজের যন্ত্রণা নিবারণের চেষ্টা করিল এবং পরিশেষে সে উত্তর দিকে যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে আপনার দূত-পদে বরণ করিল। যক্ষের সেই প্রবল স্থায়ী বিরহ-ভাবের সহিত অন্য অন্য সঞ্চারী ভাব মিশ্রিত হইয়া, জড়িত হইয়া, উহাকে যেরূপ পল্লবিত ও সুশোভিত করিয়াছে, তাহার, সমালোচনা মেঘদূতের প্রকৃত সমালোচনা।

কালিদাস প্রথম চারিটী কবিতায় যক্ষের পূর্ব্ব ইতিহাস বর্ণনা করিলেন, বিরহে তাহার শরীর কৃশ হইয়াছে, কনক বলয় খুলিয়া পড়িতেছে, সে মেঘ দেখিবা মাত্র কিয়ৎক্ষণ মেঘের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া উন্মনা হইয়া রহিল। আপনার অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা মনে মনে তুলনা করিয়া কান্দিতে লাগিল। প্রথম শ্লোকেই বলিল, আমার প্রিয়া দূরে, তাই আমি তোমার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। দ্বিতীয় শ্লোকে বলিল, তুমি সন্তপ্তদিগের শরণ, তাই তুমি আমার সংবাদ লইয়া আমার প্রিয়াকে দেও। এরূপ গভীর প্রণয়

স্থলে যেরূপ ঘটা স্বাভাবিক, যক্ষেরও তাহাই ঘটিয়াছে। যক্ষ আপনার প্রিয়ার জন্য যত কাতর, নিজের জন্য তত নহে। সেই প্রিয়ার সন্তাপ নিবারণের জন্য মেঘকে দূত করিতে চায়। সমস্ত মেঘদূতে বরাবর প্রিয়ার জন্য এই কাতরতা পরিদৃষ্ট হয়। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্য বিরহিণীদিগের জন্যও তাহার কাতরতা দেখিতে পাওয়া যায়। সে নিজ বাক্যে তৃতীয় শ্লোকে বলিতেছে, "মেঘ! তুমি আকাশে উঠিলে পথিকদিগের বনিতাগণ আশ্বাস প্রাপ্ত হইবে"। আর এক স্থানে মেঘকে বলিতেছে, "যখন সূচিভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে অভিসারিকাগণ কান্ত-ভবনে গমন করিতে অসমর্থ হইবে, তখন তুমি তাহাদিগকে স্থির সৌদামিনী বিস্তার করতঃ পথ দেখাইয়া দিও।" "সূর্য্যদেব যখন সমস্ত রাত্রি অন্যত্র অতিবাহিত করিয়া বিরহিণী নলিনীর নয়নাশ্রু নিবারণের জন্য প্রাতঃকালে উদিত হইবেন, তখন যেন তুমি তাঁহার কররোধ করিও না।" "যখন বিরহশীর্ণা, কোন নদী তোমাকে দেখিয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবে, তখন প্রচুর জলদানে তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া যাইও" "যখন মহাদেব পার্ব্বতীর সঙ্গে পর্ব্বতে আরোহণ করিবেন, তখন তুমি সেই পর্ব্বতে মিশিয়া তাঁহাদের কোমল সোপান হইও"। এই রূপে যক্ষের নিজের উন্মাদাবস্থাতেও পরের প্রণয়-সুখে তাহার সুখ এবং পরের দুঃখে তাহার গাঢ় দুঃখ প্রতিপদে প্রকাশ হইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবের, মনুষ্যের, এবং মনুষ্য-হৃদয়ের সৌন্দর্য্যে তাহার প্রগাঢ় সহানুভূতি মিশ্রিত হইয়া মেঘদূত কাব্যকে জগতে অতুল করিয়া তুলিয়াছে।

তাহার প্রথম সহানুভূতি স্বভাব সৌন্দর্য্যে। রামগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই সুদূরবিস্তীর্ণ পথে যেখানে যে বস্তু সুন্দর, কালিদাস যক্ষ-মুখে সেই সমস্তই বর্ণনা করিয়াছেন। পর্ব্বত-পাদমূলে নিরন্তর প্রবাহিনী নদী, সুপক্ব জম্বুফল ও প্রস্ফুটিত ফুলে সুশোভিত কাননমালা, কাননাবৃত পর্ব্বতের অভ্রভেদী উচ্চতা, উজ্জয়িনী নগরে রমণীয় অট্টালিকাশ্রেণী, মহাকাল মন্দিরের সায়ংকালীন আরতি, ষড়ানন মন্দিরে মেঘধ্বনি শ্রবণে ময়ূরদিগের উল্লসিত নৃত্যলীলা, ব্রহ্মাবর্ত্ত জনপদ অতিক্রম করিয়া ভীষণ ক্ষত্রিয় যুদ্ধ-ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা, হরিদ্বার সমীপে হিমালয় পর্ব্বত হইতে গঙ্গার অবতরণ, তদনন্তর তুষারধবল কৈলাস পর্ব্বত, তন্মধ্যে নগর-শিরোমণি-ভূত কুবের রাজধানী অলকা, অলকার কুবেরের অত্যাশ্চর্য্য সমাজ-শাসন-প্রণালী, যক্ষদিগের স্বর্গসুখ, প্রভৃতি স্বভাবে, শিল্পে, পুরাণে, যাহা কিছু সুন্দর আছে, যাহা দেখিলে হৃদয় গভীর ভাবে পরিপূর্ণ হয়, কালিদাস সে সমস্তই দেখাইলেন। ক্রমে ভৌতিক সৌন্দর্য্য পরিহার করিয়া তিনি মনুষ্য-সৌন্দর্য্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া রমণী-সৌন্দর্য্য দ্বারা তাহার উপসংহার করিলেন। দেখাইলেন রমণী-সৌন্দর্য্য স্বভাব সৌন্দর্য্য হইতে উচ্চতর; উহাই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা। যে অনুপম রূপবতীর রূপ পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, কবি দেখাইলেন সেই রমণীকুলললাম-ভূতা যক্ষপত্নী করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া অনবরত ক্রন্দন করিতেছে, অনবরত অশ্রুপ্রবাহে তাহার নয়ন স্ফীত হইয়াছে। সেই মুখের উপরে তৈলশূন্য রুক্ষ অলকাবলী বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন, কৃষ্ণবর্ণ ক্ষীণ মেঘান্তরালে চন্দ্রমণ্ডল ঈষৎ দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। কবি তাহাতেও তৃপ্ত হইলেন না। তিনি সেই পরমরূপ-বতী পরমগুণবতী পতিপ্রাণা রমণীর চিত্ত মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ভূতভৌতিক পরিহার করিয়া চিত্তচৈত্তিক জগতে অবগাহন করিলেন। পরম-পবিত্র প্রণয়ীর বিরহে পতিপ্রাণা প্রণয়িনীর হৃদয়ের ভাবগুলি বাছিয়া বাছিয়া লইয়া আমাদিগকে উপহার দিলেন। তিনি দেখাইলেন, যক্ষ-পত্নী কখন স্বামীর মঙ্গল কামনায় দেবতাদের পূজা করিতেছেন, শারিকার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সখি তুমি ত তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিলে, তাঁহার কথা কি তোমার মনে হয়?" কখন বা তাঁহার প্রাণনাথ-বিরহে কিরূপ কৃশ হইয়াছেন, মনে মনে তাহাই ধ্যান করিয়া চিত্রপটে তাহাই চিত্রিত করিতেছেন। কখন বা স্বামীর নাম দিয়া বিরহ-গান রচনা করতঃ বীণা-যোগে তাহা গান করিতে যাইতেছেন। প্রতি বারই নয়নজলে বীণা-তন্ত্রী ভিজিয়া যাইতেছে। আর তিনি গানের তানলয় ভুলিয়া যাইতেছেন। কখন বা দ্বারদেশে রক্ষিত পুষ্পগুলি গণিয়া দেখিতেছেন বিরহের আর কত দিন বাকী আছে। এই কোমলতার প্রতিকৃতি সমস্ত দিন বরং নানাবিধ মঙ্গল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, কিন্তু রাত্রে একাকিনী সেই সুখভবনে, সেই সুখশয়নে তাঁহার আর যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না, ক্রমাগত পূর্ব্ব কথা মনে পড়ে, ক্রমেই হৃদয়ের সন্তাপ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যেমন যক্ষ-পত্নী কোমলা, তাঁহার প্রণয়ী যক্ষও তেমন কোমল-হৃদয়। তিনি মেঘকে বলিয়া দিতেছেন, "ভাই রে! যদি সে তখন ঘুমাইয়া থাকে, তাহাকে জাগাস্ না, যদি কোনরূপে একটু নিদ্রা গিয়া থাকে, নিশ্চয়ই সে স্বপ্নে আমাকে পাইবে। তাহাকে জাগাইয়া বিরহের উপর আবার বিরহ দিস্ না।"

যে দৌত্যের জন্য এত আড়ম্বর, যে দৌত্যের জন্য জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের সংগ্রহ, যে দৌত্যের জন্য নর্ম্মদার দক্ষিণ হইতে মেঘকে অলকায় প্রেরণ, সে দৌত্যের প্রধান কথা এই "তুমি কেমন আছ?"

"তুমি কেমন আছ?" এ কথা আমরা যখন তখন যার তার সহিত সাক্ষাৎ

হইলে বলিয়া থাকি। সুতরাং এ কথাটীতে অনেক পাঠক কোন নূতনত্ব দেখিবেন না। কিন্তু যে প্রণয়ী, যে কখনও পরের জন্য ভাবিয়াছে, পরের সহিত বিচ্ছেদ সময়ে যাহার হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়িয়াছে, সেই জানে 'তুমি ভাল আছ?' এই কথার মর্ম্ম কত গভীর। যক্ষ কতবার ভাবিয়াছে সে বুঝি নাই; কতবার ভাবিয়াছে, এক বৎসরের দারুণ বিরহে সে কোমল কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়াছে। তাই সে আজি "তুমি কেমন আছ?" জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

যক্ষের মনে তাহার স্ত্রীর চরিত্রসম্বন্ধে কোন রূপ অবিশ্বাস নাই, বরং সম্পূর্ণ গাঢ়তর বিশ্বাস আছে। তাই সে বলিয়াছে——

"বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষন্তে নিখিলমচিরাৎ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ।"

কিন্তু এ অবিশ্বাসের কথা লইয়া মেঘদূত সমালোচনায় আন্দোলন করিবার প্রয়োজন নাই। এই অকৃত্রিম বিশ্বাসের চিহ্ন স্বরূপ দৌত্যের দ্বিতীয় কথাটী বলিলেই যথেষ্ট হইবে। সে কথাটীর মর্ম্ম এই "এই দারুণ সময়ে তোমারও অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, আমারও তাই। তোমার শরীর যেরূপ কৃশ হইয়াছে, আমারও সেরূপ হইয়াছে। তোমার যেরূপ দারুণ মনস্তাপ, আমারও তেমনি। যদিও বিধাতা আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তথাপি আমরা যেন সহানুভূতি-বলে একই অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি।" যক্ষ-পত্নী যে বিরহে কষ্ট পাইতেছে, তাহার শরীর যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে, সে বিষয়ে যক্ষের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সে যেন সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছে।

দৌত্যের তৃতীয় প্রধান কথা এই "তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিও। আমি ত নানা উপায়ে আমার চিত্ত সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিতেছি, কোথাও তোমার অঙ্গশোভা দেখিতেছি, কোথাও তোমার নয়ন-মাধুরী দেখিতেছি, কিন্তু আমার সাধ মিটিতেছে না।"

আমি কখন কখন উত্তর দিক হইতে যে বায়ু আসিতেছে, তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছি। ভাবিতেছি, "এই বায়ু অবশ্যই তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে। পরক্ষণেই আবার আপনার মূর্খতার কথা ভাবিয়া একান্ত অসহায়, অশরণ ও হতাশ হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু, প্রিয়ে! তুমি আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দিও।"

দৌত্যের চতুর্থ কথা—আশা। যে আশা না থাকিলে নিশ্চয়ই প্রণয়ীর হৃদয়-কুসুম বৃন্তচ্যুত হইত, সেই আশা। যে আশা আর কিছু নয়, আর চারি মাস বিরহের অবশিষ্ট আছে; এই চারি মাসের শেষে শরৎ কালের পূর্ণিমা রাত্রিতে আবার তোমার সহিত মিলিব, আর মনের সাধে এক বৎসর মনে মনে যত

সাধ পুরিয়া রাখিয়াছি, মিটাইব। কে বলিয়াছে বিরহে প্রণয়ের ধ্বংস হয়? আমি ত দেখিতেছি বিরহে ভোগ হয় না, মনের নানা সাধ জমিয়া জমিয়া রাশীকৃত হইয়া থাকে, এই আশ্বাসই দৌত্যের শেষ কথা।

আমরা এই যে নদ নদী, পর্ব্বত কন্দর, বন উপবন, নগরনগরী প্রভৃতি সঙ্কুল পৃথিবী, কল্পনার পরাকাষ্ঠাসম্ভূত কৈলাস-পর্ব্বত-শিখরোপরিস্থিতা অলকা-পুরী, তন্মধ্যে যক্ষের প্রাসাদ, তন্মধ্যে কোমলতার প্রতিকৃতি যক্ষের পত্নী, বিরহে তাহার ম্রিয়মাণ অবস্থা, এই যে নানা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ সন্দর্শন করিলাম, এই যে পৃথিবী হইতে স্বর্গ, স্বর্গ হইতে বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলাম; ভৌতিক রাজ্য ত্যাগ করিয়া মানস রাজ্যে প্রবেশ করিলাম, উভয় রাজ্যের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া লইলাম, এ সমস্তই এক সুরে বাঁধা। যক্ষের মনোভাব ইহার সকলেই মাখান। সমস্তটুকু যেন যক্ষ গাইতেছে, আর আমরা শুনিতেছি, শুনিতেছি আর তন্ময় হইয়া যাইতেছি। আমাদেরও যেন প্রাণ ফাটিয়া ঐ দুঃখলহরী বাহির হই-তেছে। তাই আমরা প্রথমে বলিয়া-ছিলাম যে, মেঘদূত গীতে রচিত না হইলেও ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গীতিকাব্য—ভুবনে অতুল।

BRANSONISM.

জন ডিক্‌সন সাহেবকে ফৌজদারী আদালতে ধরিয়া আনিয়াছে। সাহেব বড় কালো, তা হলে হয় কি, সাহেব ত বটে—পাড়াগেঁয়ে কাছারিতে বিচার দেখিতে অনেক রঙ্গদার লোক জুটিয়া গেল। বিচার একটা দেশী ডিপুটির কাছে হইবে। তাহাতে সাহেবের কিছু কষ্ট; তবে মনে মনে ভরসা আছে যে, বাঙ্গালীটা ভয়ে আমাকে ছাড়িয়া দিবে। ডিপুটি মহাশয়ের রকম দেখিয়াও তাই

বোধ হয়, একটা তেকেলে বুড়ো—নিরীহ রকম ভাল মানুষ; জড় সড় হইয়া বসিয়া আছে।

এদিকে কনষ্টেবল মহাশয়েরা কতকটা ভয়ে ভয়ে সাহেব মহাশয়কে ডকস্থ করিলেন। সাহেব ডকস্থ হইয়াই একটু গরম হইয়া হাকিমের পানে চাহিয়া চোখ ঘুরাইয়া একটু বাঁকা বাঁকা বুলিতে বলিলেন,

"সে হামাকে টোমরা হেথানে কেন আনিলো?"

হাকিম বলিল, "কি জানি, সাহেব! কেন আনিলো—তুমি কি করেছ?"

সাহেব। যা করে না কেন, টোমার সাতে হামার কোন বাট হোবে না।

হাকিম। কেন সাহেব?

সাহেব। টুমি কালা বাঙ্গালি আছে।

হাকিম। তার পর?

সাহেব। হামি সাহেব আছে।

হাকিম। তা ত দেখ্‌ছি—তাতে কি হলো?

সাহেব। তোমার—কি বলে? সেটা নেই।

হাকিম্। তবু ভাল—মাতৃভাষা ধরেছ, এতক্ষণ বাঁকা বাঁকা বুলি ধরেছিলে কেন? কি নেই?

সাহেব। সেই যাতে মোকদ্দমা করে—সে তুমি জানে না?

হাকিম। সাহেব—আমি ভাল মানুষ—তোমায় এখনও কিছু বলি নাই—কিন্তু আর "তুমি" "তুমি" করিও না—জরিমানা করিব।

সাহেব। টুমি মোর জরিমান করিতে পারে না—হামি সাহেব আছে—তোমার সেই সেটা—কি বলে—সেটা নেই।

হাকিম। কি নেই সাহেব?—

সাহেব। সেই যে—জুষ্টিকেশন।

হাকিম। ওহো—Jurisdiction? বটে। তুমি কি বিলাতী সাহেব?

সা। হামি সাহেব আছে।

হা। রংটা এত কাল কেন?

সা। মুই কোয়লার কাম করেছিল।

হা। তোমার বাপের নাম কি?

সা। বাপের নামে কোর্টের কি কাম আছে?

হা। বলি সেটা জানা আছে কি?

সা। হামার বাপ বড় আদমি ছেলো—লেকেন নামটা এখন মনে পড়ছে না।

হাকিম। মনে কর না হয়। তোমার নামটা কি?

সাহেব। আমার নাম জান সাহেব—জান ডিক্‌সন্।

হা। বাপের নাম ডিক্‌সন্ নয়?

সা। হোবে—ডিক্‌সন্ হোতে পারে—লেকেন—

বাদীর মোক্তার এই সময়ে বলিল, "হুজুর, ওর বাপের নাম গোবর্দ্ধন সাহেব।"

সাহেব রাগ করিয়া বলিল, "গোবর্দ্ধন হইলো ত কি হইলো—তোমার বাপের

নাম যে রামকান্ত—তোমার বাপ চূড়া বেচিত—আমার বাপ বড় আদমি ছেলো।"

হাকিম। তোমার বাপ কি করিত ?

সাহেব। বড় লোকের সাদি দিত।

হাকিম। সে আবার কি? ঘটকালি করিত না কি ?

মোক্তার। আজ্ঞে না—বিবাহের বাজনার জয় ঢাক ঘাড়ে করিত।

অনেকে হাসিল। হাকিম জুরিস্‌ডিক্‌সনের আপত্তি নামঞ্জুর করিয়া, বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরিয়াদীকে তলব করায় রূপার পৈছা হাতে নথর কালো কোলো একজন স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল। তাহাকে যেরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, আর সে সেরূপ উত্তর দিল, নিয়ে কিছু লিখিতেছি :—

প্রশ্ন। তোমার নাম কি ?

উত্তর। রঙ্গিণী জেলেনী।

প্রশ্ন। তুমি কি কর ?

উত্তর। বিল খালে মাছ ধরে বেচি।

আসামী সাহেব কহিল, "ঝুটা বাত। ও সুঁটকি মাছ বেচে।"

জেলেনী বলিল, "তাও বেচি। তাইতেই ত তুমি মরেছ।"

প্রশ্ন। তোমার কিসের নালিশ ?

উত্তর। চুরির নালিশ।

প্রশ্ন। কে চুরি করেছে ?

উত্তর। (সাহেবকে দেখাইয়া) এই বাগ্‌দীর ছেলে।

সাহেব। মুই সাহেব আছে—মুই বাগ্‌দী নাই।

প্রশ্ন। কি চুরি করেছে ?

উত্তর। এই ত বলিলাম—এক মুঠা সুঁটকি মাছ।

প্রশ্ন। কি রকমে চুরি করিল ?

উত্তর। আমি ডালা পাতিয়া তাতে সুঁটকি মাছ সাজাইয়া বেচিতেছিলাম—একজন খদ্দের এলো—তা তার পানে ফিরে কথা কইতেছিলাম—এমন সময়ে সাহেব ডালা থেকে এক মুঠা মাছ তুলে নিয়ে পাকেটে পূরিল।

প্রশ্ন। তার পর, তুমি টের পেলে কেমন ক'রে ?

উত্তর। পাকেটের যে আধ খানা বৈ ছিল না—তা সাহেবের মনে ছিল না। সুঁটকি মাছ সব ফুটো দিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

এই কথা শুনিয়া সাহেব রাগ করিয়া বলিল "না বাবুজি! ওর চুপড়িটাই ফুটো; তাই মাছ বেরুইয়ে পড়েছিল।"

জেলেনী বলিল, "ওর পাকেটে দুই চারিটা মাছ পাওয়া গিয়াছিল।"

সাহেব বলিল, "সে মুই দাম দেবে ব'লে নিয়েছেলো।"

সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইল যে, ডিক্‌সন সাহেব সুঁটকি মাছ চুরি করিয়াছেন। তখন হাকিম, সাহেবের জবাব লিখিতে বসিলেন। সাহেব জবাবে কেবল এই কথা বলিলেন যে, কালা বাঙ্গালীর আমার উপর "জুষ্টিকেশন লেই।" সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া হাকিম তাহাকে এক হপ্তা কয়েদের হুকুম দিলেন। দুই

চারি দিন পরে এই কথাটা কলিকাতার এক খানা ইংরেজি দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কাণে গেল। পর দিন প্রভাতে সেই পত্রের সম্পাদকীয় উক্তি মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত লীডর দেখা গেল।

"THE WISDOM OF A NATIVE MAGISTRATE.—A story of lamentable failure of justice and race antipathy has reached us from the Mofussil. John Dickson, an English gentleman of good birth though at present rather in straightened circumstances had fallen under the displeasure of a clique of designing natives headed by one Rungini Jeliani, a person, as we are assured on good authority, of great wealth, and considerable influences in native society. He was hauled up before a native Magistrate on a charge of some petty larceny which, if the trial had taken place before a European magistrate, would have been at once thrown out as preposterous, when preferred against a European of Mr. Dickson's position and character. But Baboo Jaladhar Gangooly, the ebony-coloured Dan iel before whose awful tribunal, Mr. Dickson had the misfortune to be dragged, was incapable of understanding that petty larcenies, however congenial to sharp intellects of his own country, have never been known to be perpetrated by men born and bred on English soil, and the poor man was convicted on evidence the trumpery character of which, was probably as well known to the magistrate as to the prosecutors themselves. The poor man pleaded his birth, and his rights as a European British subject, to be tried by a magistrate of his own race, but the plea was negatived for reasons we neither know nor are able to conjecture. Possibly the Babu was under the impression that Lord Ripon's cruel nefarious Government had already passed into Law the Bill which is to authorize every man with a dark skin lawfully to murder and hang every man with a white one. May that day be distant yet! Meanwhile we leave our readers to conjecture from a study of the name *Jaladhar* and of *Jaliani* the whether tie of kindred which obviously exist between

prosecutor and magistrate has had no influence in producing this extraordinary decision."

এই লীডর বাহির হইলে পর, উহা পড়িয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব জলধর বাবুকে চাপরাশি পাঠাইয়া তলব করিয়া আনিলেন। গরিব ব্রাহ্মণ নবমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে হুজুরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সেলাম না করিতে করিতে, সাহেব গরম হইয়া বলিলেন,

"What do you mean, Babu, by convicting a European British subject ?"

ডিপুটী। What European British subject, Sir ?

মাজিষ্ট্রেট। Read here, I suppose you can do that. I am going to report you to the Government for this piece of folly.

এই বলিয়া সাহেব কাগজ খানা বাবুর কাছে ফেলিয়া দিলেন, বাবু কুড়াইয়া লইয়া পড়িলেন। সাহেব বলিলেন, "Do you now understand ?"

Deputy. Yes, Sir, but this man was not a European British subject.

Magistrate. How do you know that ?

Deputy. He was very dark.

Magistrate. Do you find it laid down in the Law that a fair skin is the only evidence by which a man shall be adjudged to be a European subject ?

Deputy. No Sir.

Magistrate. Well what other evidence did you take ?

এখন ডিপুটি বাবুটি বহুকালের ডিপুটি—জানিতেন যে তর্কে তাঁহার জিত নিশ্চিত, কিন্তু তর্কে জিতিলেই বিপদ। অতএব সুচতুর দেশী চাকুরের যাহা কর্ত্তব্য,—তাহা করিলেন, তর্ক ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন,

"I do not presume to discuss the matter with you, Sir, I see I was wrong, and I am very sorry for it."

এখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিতান্ত বোকা নহেন, ভিতরে ভিতরে একটু রঙ্গদার। এই কথা শুনিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"Very sorry for what ?"

Deputy. For convicting a European British subject.

Magistrate. Why so ?

Deputy. Because it is very wrong for a native to convict a European British subject.

Magistrate. Why very wrong ?

ডিপুটিটি, সাহেবকে একহাটে কিনিতে আর এক হাটে বেচিতে পারে। অমনি উত্তর দিল,

"Very wrong, because a European British subject cannot commit a crime and a native can not judge honestly."

Magistrate. Do you admit that ?

Deputy. I do not see why I should not. I try to do my duty to the best of my ability, but I speak of my countrymen generally.

Magistrate. You don't think your countrymen ought to try Europeans ?

Deputy. Most certainly they should not. The glorious British Empire will come to an end if they do.

Magistrate. Well, Babu, I am glad to see you are so sensible. I wish all your countrymen were equally so; at least that all native magistrates were like you.

Deputy. Oh Sir ! how can you expect it, when there are men at the top of our service who think differently.

Magistrate. Are you not yourself near the top ? you must have served long.

Deputy. Unfortunately my claims to promotion have always been overlooked. I thought of speaking to you, Sir, on the subject.

Magistrate. You certainly deserve promotion. I will write to the Commissioner and see what can be done for you.

ডিপুটি তখন দুই হাতে সেলাম করিয়া উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে জয়েণ্ট সাহেব, বড় সাহেবের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডিপুটি বাহির হইয়া গেল জয়েণ্ট দেখিলেন। জয়েণ্ট, বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"What could you have been saying to this fellow ?"

Magtstrate. Oh ! He is very amusing.

Joint. How so ?

Magistrate. He is both fool and knave. He thinks of pleasing me by traducing his own countrymen.

Joint. And did you tell him your mind ?

Magistrate. O no ! I promised him promotion, which I will try to get for him. He has at least the merit of not being conceited. A conceited native is perfectly

useless as a subordinate, and I prefer encouraging men to make a moderate estimate of their own merits.

এ দিকে, ডিপুটি ফিরিয়া আসিলে পর, আর এক ডিপুটি বাবুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দোশরা ডিপুটি জলধরকে বলিলেন,

'সাহেবের কাছে গিয়াছিলেন না কি?''

জলধর। হাঁ। কি পাপে পড়েছি?

২রা ডিপুটি। কেন?

জলধর। কালকার সেই বাগ্‌দী বেটাকে কয়েদ দিয়াছিলাম বলিয়া, সাহেব বলে গবর্ণমেণ্টে আমার নামে রিপোর্ট করিবে।

২রা ডিপুটি। তার পর?

জলধর। তার পর আর কি? প্রমোশনের রিপোর্ট করিয়ে এলেম।

২রা ডিপুটি। সে কি? কি মন্ত্রে?

জলধর। মন্ত্র আর কি? দুটো মন রাখা কথা।

যাত্রার ইতিবৃত্ত।

কিছু দিন হইল বাঙ্গালার যাত্রা নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমরা পাইয়াছিলাম। গ্রন্থ খানি বিলাতে বসিয়া বিলাতি ভাষায় লিখিত হয় এবং বিলাতেই তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য দুই সিলিং। লেখক বাঙ্গালি, আমাদের সুপ্রসিদ্ধ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়। সেই জন্ত আমরা বিশেষ আহ্লাদ পূর্ব্বক ইহা পাঠ করিয়াছি।

ইদানী ঢাকা অঞ্চলে "স্বপ্ন-বিলাস" প্রভৃতি তিন খানি যাত্রা রচিত হইয়াছে। তথাকার বিস্তর লোক এই যাত্রার পক্ষপাতী। নিশিকান্ত বাবু সেই যাত্রা উপলক্ষ করিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন; কিন্তু নাম পড়িয়া আমরা তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, মনে করিয়াছিলাম প্রধানতঃ বাঙ্গালার সাধারণ যাত্রার কথা এই গ্রন্থে আছে।

ইউরোপের যে অবস্থায় মিষ্টরিজ (Mysteries) আরম্ভ হইয়াছিল, বাঙ্গালায় সেই অবস্থায় যাত্রা আরম্ভ হয়। সে কতদিনের কথা, তাহা আমরা এক্ষণে নিশ্চয় করিয়া বলিতে প্রস্তুত নহি। শুনিতে পাওয়া যায়, চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যাত্রা ছিল, সে যাত্রা কেবল শক্তিবিষয়ক, কৃষ্ণযাত্রা তখন একেবারে হইত না। চৈতন্য দেবের পর যখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় জাঁকিয়া উঠিল, তখন

কৃষ্ণলীলার যাত্রা আরম্ভ করিবার ইচ্ছা অনেকের হয়। এই সময় একজন বৈষ্ণব এক নূতন পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক এক পুষ্করিণীর উপর কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় করে। পুষ্করিণীটী বড় সুন্দর সাজান হইয়াছিল। তাহার নাম কালীয়-হ্রদ দেওয়া হইয়াছিল। মধ্যস্থলে এক অজগর কালীয় সর্প, জল হইতে ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, সেই ফণার উপর শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া বেণু বাজাইতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে "নয়ন ঢোলাইয়া" নৃত্য করিতেছেন। নৃত্যপীড়নে কালীয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে। চারি পার্শ্বে তাহার স্ত্রীগণ জল হইতে অর্দ্ধাঙ্গ তুলিয়া যোড় করে কৃষ্ণকে মিনতি করিতেছে—কখন তাহা কথায়, কখন বা গীতে। নিকটে এক মাচার উপর মৃদঙ্গ, করতাল, খরতাল বাজিতেছে, তথায় বসিয়া যাত্রাওয়ালারা "দোয়ার্কি" করিতেছে। অন্য সময়ে এই যাত্রা হইতে নাটক উৎপন্ন হইত, কিন্তু তখন শাক্ত বৈষ্ণবে বড় দলাদলি, সুতরাং নাটকের রস কেহ লক্ষ করে নাই, শক্তিযাত্রার স্থলে কৃষ্ণযাত্রা হইল, লোকে এই মাত্র বুঝিয়াছিল। শক্তিযাত্রার স্বতন্ত্র নাম ছিল না। অন্য কোন যাত্রা না থাকায়, বোধ হয়, স্বতন্ত্র নামের প্রয়োজন হয় নাই। পরে যখন কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ হইল, তখন সে প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। কালীয় দমন যাত্রায় সাধারণতঃ লোকের মনোরঞ্জন হইয়াছিল, সে নাম লোকের অভ্যাস পাইয়াছিল, সুতরাং লোকে কৃষ্ণ যাত্রাকে সেই নামে অভিহিত করিল। তাহার পর যখন কালীয়দমন ছাড়িয়া কৃষ্ণযাত্রার অন্য পালা আরম্ভ হইল, লোকে তখনও সেই কালীয়দমন নাম ব্যবহার করিতে লাগিল। কালীয়দমন কৃষ্ণযাত্রা, সুতরাং তাহারা বুঝিল কৃষ্ণযাত্রা মাত্রেই কালীয়দমন। দান হোক, মান হোক, মাথুর হোক, যে পালাই হোক, লোকে সকল পালাকেই কালীয় দমন বলিতে লাগিল। অদ্যাপি অনেকেই এই নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হইতে চলিল, কালীয়দমন যাত্রা এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। চৈতন্য দেবের পর ইহার জন্ম, রাজা রামমোহন রায়ের পর ইহার মৃত্যু। ইহার আদিতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম, অন্তে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। তাৎপর্য্য ভাল বুঝা যায় না। ভাগীরথী মনে আইসে। আদিতে বিষ্ণুপাদপদ্ম, শেষে সাগর। কিন্তু ভাগীরথীর ন্যায় কালীয়দমন কৃতকার্য্য হইয়াছে। সগরবংশ উদ্ধার না করুক, অনেক মরু ভূমিতে রস সেচন করিয়াছে। ইহার আমূপূর্ব্বিক পরিচয় লেখা কঠিন। কালীয়দমন প্রায় চারি শত বৎসর জীবিত ছিল, এ জীবনী লিখিতে পারিলে ফল আছে। কিন্তু আমাদের তাহা অসাধ্য। কেবল শেষ অবস্থার কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে, চেষ্টা মাত্র।

প্রায় দেড় শত বৎসর হইতে চলিল, শ্রীদাম সুবল নামে দুই সহোদর

কালীয়দমন যাত্রা করিত। এখন অনেকেই বলেন, ইহারা যাত্রাওয়ালাদের আদি ছিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাহারা উভয়ে বড় গুণবান ছিল, তাহই কালে তাহাদের এই রূপ খ্যাতি জন্মিয়াছে। বিশেষতঃ যে সময় শ্রীদাম সুবল যাত্রা করিত, সে সময় বাঙ্গালার অবস্থান্তর আরম্ভ হইয়াছিল, চারিদিকে একটু ধুমধাম পড়িয়াছিল। সেই সময় বর্গীরা দেশ ছাড়ে, মুসলমানদের রাজ্য যায়, কোম্পানির ব্যবসা জাঁকে। বাঙ্গালার রেসম, বাঙ্গালার কার্পাস, বাঙ্গালার থান, বাঙ্গালার কোরা, বিদেশীদের শিরোভূষণ হয়। সেই সময় কবি, কীর্ত্তন শিল্প, সাহিত্য, সকলই জাঁকিয়াছিল। সে রূপ জাঁক তাহার পর আর হয় নাই। তখন ভারতচন্দ্র লেখক ;কবিওয়ালা লালু নন্দলাল, কীর্ত্তনওয়ালা বাঙ্গারাম বৈরাগী, পুরাণ বক্তা (কথক) গদাধর শিরোমণি ; যাত্রাওয়ালা শ্রীদাম সুবল।

ইহারা প্রত্যেকেই কবি ছিলেন, এই জন্য ইহারা প্রত্যেকেই বাঙ্গালীর গুরু হইতে পারিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের কথা স্বতন্ত্র ; অন্য কয় জনের কবিত্বে স্নেহ প্রণয় বড় বাড়িয়াছিল, সেই স্নেহের তরঙ্গ বাঙ্গালির অন্তরে অদ্যাপি বহিতেছে। বৈষ্ণবতা সতত স্নেহ প্রণয়ের সঙ্গী। সুতরাং সেই সঙ্গে বৈষ্ণবতাও বিলক্ষণ পুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

শ্রীদাম সুবলের পর, তাহাদের মধ্যে একজনের পুত্র যাত্রা করিয়াছিল, কিন্তু অল্প কালের মধ্যে তাহার মৃত্যু হওয়ায় সে দল নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীদাম সুবলের পর প্রধান যাত্রাওয়ালা হুগলি জেলার তাবানিবাসী পরমানন্দ দাস। বালক কালে শ্রীদাম সুবলের দলে এই ব্যক্তি সখী সাজিত, সেই দলেই ইহার শিক্ষা, সুতরাং ইহার যাত্রার প্রণালী পদ্ধতি অনেকটা শ্রীদাম সুবলের মত ছিল। তাহার বেশ ভূষার কোন পরিপাট্য ছিল না, যেখানে যাত্রা করিতে যাইত, সেখান হইতে দুই খানি সাটী চাইয়া পরিত, পরমা বড় স্থূলকায় ছিল, এক খানি সাটীতে তাহার কুলান হইত না। নাসায় একটী বেসর পরিত, যেখানে যেরূপ যুটিত, সেই রূপ হস্তে অলঙ্কার পরিত ; নিজে কোন অলঙ্কার সঙ্গে রাখিত না। তখন বাটপাড়ের ভয় বড় ছিল, পঞ্চাশ জন একত্রে পথ চলিলেও বিপদ আশঙ্কা করিত। সুতরাং যাত্রাওয়ালারা অলঙ্কার বেশভূষা কিছুই সঙ্গে রাখিত না, কেবল খোল করতাল লইয়া যাত্রা করিতে যাইত। তেলের চোঙ্গা অবশ্য সঙ্গে থাকিত। রাঢ় অঞ্চলের লোক তাহা ভুলিয়া কখন এক পদ চলিতে পারিত না।

পরমা দূতী সাজিত, প্রায় একাই যাত্রা করিত, কৃষ্ণ, রাধা এবং আর আর সকলে উপলক্ষ মাত্র থাকিত। কিন্তু যে নিজে কবি, সে একা হইলেও এক সহস্র। দূতী কৃষ্ণের সহিত কথা কউন, অথবা রাধার সহিত কথা কউন, অভিসার সম্বন্ধে

কথা কউন, অথবা বাসর সজ্জা সম্বন্ধে কথা কউন, যখন যে বিষয়ে কথা কহিতেন, চারিদিকে যেন ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতেন, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া থাকিত।

যিনিই পরমার যাত্রা শুনিয়াছেন, তিনিই বুঝিতেন যে, আসরে আসিয়া পরমা "নব, নিতুই নব" প্রেমপূর্ণ দুইটী হৃদয় লইয়া যেন ক্রীড়া করিত। দুইটীকে কখন পরস্পরের নিকটে রাখিত, কখন দূরে ধরিত, আর তাহাদের অন্তর চাঞ্চল্য দেখাইত। বিশেষতঃ মানের পালায় তাহার এই ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। মান বাঙ্গালা ভাষায় এক মাত্র drama; এবং বোধ হয় মান বাঙ্গালার প্রথম drama। drama বলিয়াই বুঝি মান লোকের এত মিষ্ট লাগিত। গীতের ভাগ পরমার যাত্রায় নিতান্ত অধিক ছিল না, কাব্যরস ঘটাইবার নিমিত্ত পরমা কথা বার্ত্তাই অধিক কহিত। সেই কথার যে যে অংশে গীত ছিল, তাহা প্রায়ই পয়ারের ছন্দে রচিত, এবং তাহা প্রায়ই পয়ারের সুরে গাওয়া হইত; কিন্তু তাহার শেষ ছত্রটীতে একটু করিয়া অমৃত থাকিত, শ্রোতার কর্ণে সেই টুকু ঢালিয়া দিবার নিমিত্ত কীর্ত্তনের সুরে সেই ছত্রটী গাওয়া হইত। লোকে একেবারে যেন আর্দ্র হইয়া যাইত। এই প্রণালীকে তখন তুক্কো বলিত। অনেকে তর্ক করেন, পরমার তুক্কোর ন্যায় সুশ্রাব্য আর কিছুই বাঙ্গালায় হয় নাই। এই স্থলে দুই একটী তুক্কো উদ্ধৃত করা গেল। এই তুক্কো হয় ত এখনও বৈরাগী ভিক্ষুক যাত্রাওয়ালা] কেহ কেহ গাইয়া থাকে, কিন্তু সুরের অভাবে তাহার মোহিনী শক্তি অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়।

"সারা বন বুলে বুলে,
বন ফুল আনলাম তুলে,
তার বোঁটা গুলি দিলাম ফেলে,
কিনা তোমার শ্যামাঙ্গে বাজিবে
বলে॥"

আর একটি—

"বঁধু যেতে যেতে, প্রাণের বঁধু
যেতে যেতে,
রথে হতে কি কথাটি বল্‌তে
ছিল।
বল্‌তে বল্‌তে অমনি বঁধুর
মুখের কথা মুখে রৈল।
নয়ন জলে ভেসে গেল॥"

পরমার সম্বন্ধে আর একটা কথা এই ছিল যে, তাহার যাত্রা আদ্যন্ত শুনিতে হইত, তাহা না শুনিলে সম্পূর্ণ রসগ্রহ হইত না। তাহার যাত্রা শুনিতে গিয়া একটী কি দুইটী গীত শুনিয়া আসিলে রসের কিছুই অনুভব হইত না। একটী কি দুইটী তুলি দেখিয়া সেই তুলির চিত্রিত পট অনুভব করা যে রূপ অসম্ভব ও অসঙ্গত, সেই রূপ হইত। চিত্রকর যেমন পটের রং ফলাইবার নিমিত্ত প্রথমে মোটা তুলি ধরিয়া খড়ি মাখায়,

তাহার পর সে তুলি ফেলিয়া আর এক তুলি ধরে এবং কোন বাক্সে রং মাখাইয়া জমি করে, যাত্রায় পরমা ঠিক সেই রূপ করিত, শ্রোতার অন্তরে ক্রমে ক্রমে "জমি" করিত; তাহার পর রং ফলাইত। কেবল পরমা নহে, সে সময় আর যত যাত্রাওয়ালা ছিল, সকলেই এই রূপ জমি করিতে চেষ্টা করিত; সকলেরই উদ্দেশ্য কাব্য রসের স্থষ্টি করা। কিন্তু একটী কি ছুইটী গীতে সে স্থষ্টি হয় না; স্থতরাং তাহাদের যাত্রা আদ্যোপান্ত শুনিতে হইত। যদি কোন যাত্রাওয়ালা যাত্রা করিতে করিতে বুঝিত, শ্রোতাদের অন্তরে কিছু ধরিতেছে না, তাহাদের হৃদয়-পটে "জমি" হইতেছে না, সে তৎক্ষণাৎ সং আনিয়া গোলমাল করিয়া দিত। যে টুকু তুলি ঘসিয়াছিল, এই রূপে তাহা মুছিয়া ফেলিত। তাহার পর আবার নুতন পরিশ্রম করিত। সং এই জন্ত ছিল। সে আবশ্যকতা এখনকার যাত্রাওয়ালারা আর মনে করে না। তাহাদের আর "জমি" করিতে হয় না। শ্রোতা বারইয়ারিতলায় দাঁড়াইয়া একটী কি ছুইটী গীত শুনিয়া চলিয়া যাইবে, এই মনে করিয়া তাহারা এখন যাত্রা করে।

পরমানন্দ দাসের সময় আর একজন প্রধান যাত্রাওয়ালা ছিল। তাহার নাম প্রেমচাঁদ। লোকে সচরাচর তাহাকে খরকাটা প্রেমা বলিত। এ ব্যক্তির "তুক্কো" ছিল না, চৌপদীই সমুদয়। তাহা ভিন্ন সে কীর্ত্তন যাহা গাইত, তাহা একটু মাজিয়া ঘসিয়া লইত। খাঁটী মহাজনী পদ "পত্তন" দিয়া গাইলে সামান্য লোকে বড় বুঝিত না। এই জন্ত প্রেমচাঁদ মহাজনী পদ হাল্‌কা করিয়া সেই পদের পুরাতন ভাষার সঙ্গে প্রচলিত ভাষা মিশাইয়া, ঘোষা পদ মাজিয়া ঘসিয়া, যাত্রা করিত। সামান্য লোকে একেবারে মাতিয়া উঠিত। সেই অবধি স্ত্রী লোকের কীর্ত্তন ব্যবসা করিবার পথ পরিষ্কার হয়। স্ত্রীলোকের মুখে কীর্ত্তন শুনিতে পূর্ব্বে নিষেধ ছিল।

প্রেমচাঁদ অধিকারীর ছোকরা বদন। এবং পরমানন্দ দাসের ছোকরা গোবিন্দ অধিকারী। প্রেমচাঁদ ও পরমানন্দের পর বদন ও গোবিন্দ প্রধান যাত্রাওয়ালা হইল। কিছুকাল ধরিয়া গোবিন্দ আপনার ওস্তাদের পদ্ধতি অনুসারে যাত্রা করিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাহাকে নূতন স্রোতে ঘেরিতে লাগিল। দাশরথীর অনুপ্রাসে ঈশ্বরগুপ্ত পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া তাহার অনুকরণ করিতেন। যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ দাস সেই পথ কেনই অনুসরণ না করিবে? ক্রমে ক্রমে পরমানন্দের প্রণালী ছাড়িয়া গোবিন্দ ইদানীর যাত্রাওয়ালা হইয়া উঠিল। কিন্তু বদন অধিকারীকে কোন স্রোতে কোন দিকে ফিরাইতে পারে নাই, তাহার মৃত্যুপর্য্যন্ত সে সাবেক প্রণালীতে যাত্রা করিয়াছিল। তাহাই বলিতেছিলাম যে, প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল কালীয়দমন লোপ

পাইয়াছে। বদনের পর আর কালীয়দমন হয় নাই। যাহা আছে, তাহা নাম মাত্র। বদনের "ছোকরা" ব্রজনাথ দাস কএকটা বদনের ও থরকাটা প্রেমচাঁদের পদ্ধতি রক্ষা করিয়াছিল ; কিন্তু সে ব্যক্তি অধিক দিন যাত্রা করে নাই।

এখন বাঙ্গালায় বক্তা অধিক, পূর্ব্ব কালে শ্রোতা অধিক ছিল। মহাজনদের গীত শুনিতে তখন বিস্তর লোক একত্র হইত। পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর হইতে শ্রোতা ছুটিত। এক এক স্থানে দশ বার হাজার লোক বসিয়া কীর্ত্তন, যাত্রা, কবি, কথকতা শুনিত। প্রায়ই কোন বাটীতে এত শ্রোতার স্থান হইত না, বোধ হয় তাহাই বারইয়ারি আরম্ভ হয়। যেখানে সকল শ্রোতার স্থান হইতে পারে, এরূপ পরিসর স্থানে যাত্রাদি দিবার নিমিত্ত বারইয়ারির সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

যেখানে দশ হাজার শ্রোতা একত্রে, সেখানে "ভাদ্রের ভরা" নদীর ন্যায় একটা কল্লোল ধ্বনি উঠে। শ্রোতারা নিঃশব্দ নিস্পন্দ থাকিলেও সে কলরবের অভাব হয় না, যেন কোথা হইতে উঠিয়া আকাশ ব্যাপিতে থাকে, সুতরাং সেই কলরবের উপর সুর চড়াইতে না পারিলে যাত্রা জগ্য হয় না, তাহাই সে কালে খোল, ঢোল, জোড়ঘাই প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। ঢোলক তবলার প্রাণ অল্প, দশ জন ঘেরিলে স্ত্রীলোকের সুরের ন্যায় সে সকল যন্ত্রের স্বর ডুবিয়া যায়। এখন শ্রোতা অল্প, তাহাই ঢোলক তবলা চলিতেছে। অদ্যাপি কোন কোন যাত্রার দলে এবং কীর্ত্তনে খোল অর্থাৎ মৃদঙ্গ ব্যবহার হয় সত্য, কিন্তু তাহা এক খানি বা দুই খানির অধিক নহে। অল্প শ্রোতার স্থলে দুই খানিই অতিরিক্ত, বরং লোকের তাহাও অসহ্য হয়। কিন্তু পূর্ব্বে বাঞ্ছারাম বৈরাগীর দলে বার খানা, রূপ বাউলের দলে চৌদ্দ খানা, রামসুন্দর অধিকারীর দলে দশ খানা খোল বাজিত। লোকের তাহা মধুর বলিয়া বোধ হইত।

যেখানে আট দশ হাজার শ্রোতার গোল, দশ বার খানা খোল, তাহার উপর সেই মত আবার করতাল, সেখানে গীত শুনিতে পাইবার সম্ভাবনা অল্প, অন্ততঃ এখনকার যাত্রা শুনিয়া আমাদের এই মত বোধ হয়। কিন্তু কার্য্যে তাহা নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় দশ হাজার শ্রোতার মধ্যে দাঁড়াইয়া দূতী একা কথা কহিতেছে, সকলেই তাহা শুনিতে পাইতেছে, এবং বুঝিতে পারিতেছে। এখন যে যাত্রায় দুই শত শ্রোতা যুটে, সে যাত্রায়ও কোন গীত বুঝা যায় না, প্রায়ই সুরের গোলে কথা অস্পষ্ট হইয়া যায়। এখনকার যাত্রাওয়ালারা মনে করে চীৎকার করিয়া গাইলে সর্ব্বত্র শুনা যায়। পূর্ব্বে গীতে চীৎকার ছিল না, অথচ সকলে তাহা স্পষ্ট শুনিত ও বুঝিত। পূর্ব্বের যাত্রাওয়ালাদের সুর এখনকার যাত্রাওয়ালারা হারাইয়াছে। সে সুর অতি তীব্র ছিল না, অথচ তাহা সকল

কলরব ছাড়াইয়া উঠিত। আমরা দেখিতে পাই যে, অতি চীৎকার যে দূর পর্য্যন্ত না যায়, কোন কোন মৃদু স্বর সে দূর পর্য্যন্ত যায়। বন্দুকের শব্দ যে দূর পর্য্যন্ত না যায়, কোন কোন গলার স্বর সে দূর পর্য্যন্ত যায়। পূর্ব্বকার ডাকাতের "কুক" এবং চৌকিদারের "হাঁক" অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, সে "কুক" সে "হাঁক" মৃদু নহে, কিন্তু বন্দুকের শব্দের তুলনায় অতি উচ্চ কি তীব্রও নহে, অথচ সে হাঁক চারি ক্রোশ হইতে শুনা যাইত। বন্দুকের শব্দ বোধ হয়, তাহার অর্দ্ধেক দূর হইতে শুনা যায় না। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে, যে কথা অতি চীৎকার করিয়া বলিলে কোন বধির শুনিতে পায় না, সেই কথা মৃদু স্বরে, বলিলে বধির অনায়াসে শুনিতে পায়। মৃদু স্বর হইলেই বধিরে যে শুনিতে পাইবে এ কথা বলিতেছি না। যে স্বরে কথা কহিলে বধিরেরা শুনিতে পায়, সে স্বর মৃদু হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাহার গ্রাম স্বতন্ত্র। ব্যবসায়ীরা বলেন, স্বরের তিন গ্রাম। স্বর সম্বন্ধে যে গুণের কথা আমরা বলিতেছি, সে গুণ হয় ত ঐ তিন গ্রামের মধ্যে কোন বিশেষ গ্রামে আছে অথবা প্রচলিত তিন গ্রামের অতিরিক্ত অন্য কোন গ্রামে আছে, পূর্ব্বকার যাত্রাওয়ালারা তাহা জানিত, এখনকার যাত্রাওয়ালারা তাহা জানে না। কেহ কেহ বলেন, সেই গ্রামের অনুরোধে সাবেক যাত্রাওয়ালারা কথাবার্ত্তা সুরে কহিত এবং সুরের নিমিত্ত কথা একটু টানিয়া কহিত। ইটালিয়ান অপেরাওয়ালারা হয় ত সেই জন্য সুরে কথা কহে।

সাবেক যাত্রাওয়ালাদের সুর সম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। তাহাদের লোক বিশেষের স্বর স্বতন্ত্র ছিল। বাসদেবের স্বর পিতল পাত্রের ন্যায় বাজিত। তাহার প্রতিধ্বনি শুনিলে বোধ হইত যেন রাত্রিও বাজিতেছে। কণ্ঠস্বর সেরূপ না হইলে কেহ বাসদেব সাজিতে পাইত না। বিরহিণীদের আর এক প্রকার সুর ছিল, সে সুরে বৃক্ষের পক্ষী জাগিয়া উঠিত, স্বজাতি কণ্ঠ ভাবিয়া ডাকের উপর ডাকিত, সুরের উপর সুর চড়াইত।

এই সকল সুর এখন গিয়াছে; যাইবারও অনেক হেতু আছে। প্রধান হেতু কলিকাতার বাণিজ্যের উন্নতি, ও পশ্চিম দেশী লোকদের কলিকাতায় গতায়াত। মুসলমানদের সময় পশ্চিমদেশীয়দের সহিত আমাদের সংস্রব অতি অল্পই ছিল; সে দেশের লোক বাঙ্গালায় বড় আসিত না, আমরাও বড় যাইতাম না। যদি কোন বাঙ্গালি যাইত, তাহা প্রায়ই শেষ দশায় তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে। যদি তথাকার কেহ কখন আসিতেন, তাহা প্রায়ই রাজকর্ম্ম উপলক্ষে, তাঁহারা প্রায়ই রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যেই থাকিতেন। সাধারণের সহিত তাঁহারা প্রায়ই মিশিতেন না। কিন্তু কলিকাতার উন্নতি আরম্ভ হইলে অর্থ উপার্জ্জন

উপলক্ষে বিস্তর হিন্দুস্থানী আসিয়া সাধারণের সঙ্গে মিশিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে মাড়য়ারি বনিক আর মারাহাট্টা বাই আমাদের বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করিল। এখানকার ধনাকাঙ্ক্ষীরা মাড়ওয়ারিদের অনুগত হইল, ধনসম্পন্নেরা মারাহাট্টা বাইদের সেবা করিতে লাগিল। এই বাইজিরা বাঙ্গালীর সঙ্গীতের সর্ব্বনাশ করে।

বাঙ্গালা দেশে গায়কী প্রায় ছিল না। কীর্ত্তন পুরুষেরা গাইত, যাত্রাও পুরুষেরা করিত। নট নামে এক নীচ জাতির যুবতীরা খোল সঙ্গে লইয়া পথে ঘাটে নাচিয়া গাইয়া উপার্জ্জন করিত, অদ্যাপিও তাহা করে। কিন্তু তাহারা বাঙ্গালি নহে, দেখিতে অতি কুৎসিত। বিশেষত তাহাদের বেশভূষা অতি জঘন্য, কথাবার্ত্তা আরও কদর্য্য ছিল বলিয়া তাহারা কখন ভদ্র লোকের নিকটে যাইতে সাহস করিত না। এই অবস্থায় মহারাষ্ট্রীয় সুবেশী সুন্দরীরা আসিল। তাহাদের উপর আমার রাগ আছে, এইজন্য শপথ করিয়া বলিতে পারি তাহারা অতি মন্দ অভিসন্ধিতে আসিয়াছিল। অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, কিছু দিন পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় পুরুষেরা বর্গীরূপে বাঙ্গালায় আসিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। গৃহস্থের ধন ধান্য সকলই লুট করিয়া পলাইত, অদ্য ভক্ষ্য কিছুই রাখিয়া যাইত না, কিন্তু তাহারা ধনীদের বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিত না, ধনীরা প্রায়ই পলাইয়া ধন রক্ষা করিতেন। বর্দ্ধমানের রাজা শ্যামনগরে একটী গুপ্তগড় প্রস্তুত রাখিয়া ছিলেন, বর্গী আসিতেছে শুনিলেই তিনি গঙ্গাপার হইয়া সপরিবারে সেই গড়ে লুকাইতেন। অন্যান্য ধনীরাও সেইরূপ একটা না একটা উপায় অবলম্বন করিত। সুতরাং বর্গীরূপী মহারাষ্ট্রীয় পুরুষেরা কিছু করিতে পারিল না দেখিয়া তাহাদের যুবতীরা বাইরূপে বঙ্গপ্রবেশ করিল। আর রক্ষা হইল না। তাহারা আসিবামাত্র ধনীরা ধরা দিল, কেহ পলাইল না, কেহ আর ধন রক্ষা করিতে চাহিল না।

বাঙ্গালার কেবল যে, টাকা কড়ি গেল, এমত নহে; বাঙ্গালার সঙ্গীতবিদ্যা সেই অবধি হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইল। বহুকালাবধি এই বিদ্যা বাঙ্গালায় নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিল, বিদেশী বিদ্যার তাহাতে কোন সাহায্য বা সংস্রব ছিল না। নূতন সুর আবিষ্কার হইয়াছিল, নূতন পদ্ধতি বাঁধিয়াছিল। কিঞ্চিৎ রূপান্তর হইয়া বাঙ্গালি কীর্ত্তনের সুর পঞ্জাব পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সেই সুরের অদ্যাপি অনেক স্থানে ব্যবহার আছে। বাইজিদের আগমনে আমাদের সেই সুর নষ্ট হইতে লাগিল। তবলার টীমটীমি বোল বাবুদের ভাল লাগিয়াছিল, খোল করতালের গোলমাল আর তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না। টপ্পার সুরে তাঁহাদের প্রাণ "মজিয়াছিল," সুতরাং রেনেটী মনোহর সাহির

সুর আর তাঁহারা শুনিতে পারিলেন না। দেশী সঙ্গীতব্যবসায়ীদের উপার্জ্জন ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল, তাহারা দেখিল টপ্পার সুর ও তবলার সঙ্গত ভিন্ন আর যাত্রা ভাল লাগিবে না। অতএব সেইমত পরামর্শ করিতে লাগিল। এই সময়ে এক জন ধনী "সখ" করিয়া আপনার ব্যয়ে সময়োচিত একটী যাত্রা প্রস্তুত করিলেন। মহাজনী পদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন গীত তিনি নিজে রচনা করিলেন, অথবা কোন রসিক আমলা দ্বারা তাহা করাইলেন। ক্রমে সেই গীতের অনুরোধে পশ্চিম দেশী টপ্পার সুর চূর্ণীকৃত হইল. খোলের পরিবর্ত্তে তবলা বাজিল, নূপুরের পরিবর্ত্তে ঘুমুর চলিল। সুতরাং এই নূতন যাত্রা বড় রঙ্গদার হইল। সকলের মন তাহাতে ভুলিল। তাহার পর যখন যাত্রাওয়ালারা "হা, হা, হায়" বলিয়া একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন আর কাহার জ্ঞান থাকিল না। সকলে প্রেমরসে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

যিনি এই যাত্রা প্রথম প্রস্তুত করেন, তিনি অর্থকামনায় করেন নাই, "সখ" করিয়া দল করিয়াছিলেন, এই জন্য লোকে এই দলকে "সখের" দল বলিত। তাহার পর যখন অন্য লোকে অর্থ লোভে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে লাগিল, তখন সেই নাম থাকিয়া গেল। লোকে বুঝিল, যাহাতে ঢোলক তবলা আছে, তাহা সখের দল; আর যাহাতে খোল করতাল আছে, তাহা কালীয়-দমন।

সখের দল ও কালীয় দমনের মধ্যে আর একটু প্রভেদ আছে। দেবতার প্রসঙ্গ ভিন্ন কালীয় দমন যাত্রা হইতে পারিত না, কিন্তু সখের যাত্রায় তাহা নিষেধ ছিল না, মনুষ্যের ঘটনা লইয়া এ যাত্রা হইত, যথা বিদ্যাসুন্দর, নলদময়ন্তী। ইদানী কালীয় দমন ও সখের যাত্রা বলিয়া কোন উল্লেখ শুনিতে পাওয়া যায় না, তাহার কারণ কালীয় দমন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

প্রায় ষাট বৎসর হইতে চলিল, এই সখের যাত্রা প্রথম আরম্ভ হয়। সখের দ-লের মধ্যে পূর্ব্বে বেলতলার ও আঁড়িয়াদ-হের যাত্রা বড় খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে গোপালে উড়ের নাম বিশেষ পরিচিত। তাহার বিদ্যা-সুন্দরের যাত্রা অদ্যাপি লোকে আদর করিয়া শুনিয়া থাকে। নলদময়ন্তীর যাত্রা আরও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সে যাত্রার পর বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হয়।

কয়েক বৎসর হইল, আর এক পদ্ধ-তির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাকে কেহ কেহ অপেরা বলে, কেহ বা উপ-হাস করিয়া "অপেয়েরা" বলে। ইহাতে, সামলা আছে, পেন্টুলেন আছে, কোট আছে, তরবারি আছে, সাধুভাষা আছে, বক্তৃতা আছে, চীৎকার আছে, পতন আছে, উত্থান আছে। ইহাতে দেখিবার

জিনিস যথেষ্ট। পূর্ব্বে লোকে যাত্রা শুনিত, এখন লোকে যাত্রা দেখে। তাহাই এই নূতন যাত্রায় বেশ ভূষার এত জাঁক; সঙ্গীত ও কাব্য রসের এত অভাব।

পালামৌ।

বহু কালের পর পালামৌ সম্বন্ধে দুইটা কথা লিখিতে বসিয়াছি। লিখিবার একটা ওজর আছে। এক সময়ে একজন বধির ব্রাহ্মণ আমাদের প্রতিবাসী ছিলেন, অনবরত গল্প করা তাঁহার রোগ ছিল। যেখানে কেহ একা আছে দেখিতেন, সেই খানে গিয়া গল্প আরম্ভ করিতেন; কেহ তাঁহার গল্প শুনিত না, শুনিবারও কিছু তাহাতে থাকিত না। অথচ তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, সকলেই তাঁহার গল্প শুনিতে আগ্রহ করে। একবার একজন শ্রোতা রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আর তোমার গল্প ভাল লাগে না, তুমি চুপ কর।" কালা ঠাকুর উত্তর করিয়াছিলেন "তা কেমন করিয়া হবে, এখনও যে এ গল্পের অনেক বাকি।" আমারও সেই ওজর। যদি কেহ পালামৌ পড়িতে অনিচ্ছু হন, আমি বলিব যে "তা কেমন করে হবে, এখনও যে পালামৌর অনেক কথা বাকি।

পালামৌর প্রধান আওলাত মৌয়া গাছ। সাধুভাষায় বুঝি ইহাকে মধুক্রম বলিতে হয়। সাধুদের তৃপ্তির নিমিত্ত সকল কথাই সাধুভাষায় লেখা উচিত। আমারও তাহা একান্ত যত্ন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বড় গোলে পড়িতে হয় অন্যকেও গোলে ফেলিতে হয় এই জন্য এক এক বার ইতস্তত করি। সাধুসঙ্গ আমার অল্প, এই জন্য তাঁহাদের ভাষায় আমার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে নাই। যাঁহাদের সাধুসঙ্গ যথেষ্ট অথবা যাঁহারা অভিধান পড়িয়া নিজে সাধু হইয়াছেন, তাঁহারাও একটু একটু গোলে পড়েন। এই যে এইমাত্র মধুক্রম লিখিত হইল, অনেক সাধু ইহার অর্থে অশোক বৃক্ষ বুঝিবেন। অনেক সাধু জীবন্তীবৃক্ষ বুঝিবেন। আবার, যে সকল সাধুর গৃহে অভিধান নাই তাঁহারা হয় ত কিছুই বুঝিবেন না; সাধুদের গৃহিণীরা নাকি সাধু ভাষা ব্যবহার করেন না। তাঁহারা বলেন, সাধুভাষা অতি অসম্পন্ন, এই ভাষায় গালি চলে না, ঝগড়া চলে না, মনের

অনেক কথা বলা হয় না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে তাঁহারা সচ্ছন্দে বলুন, সাধুভাষা গোল্লায় যাক।

মৌয়ার ফুল পালামৌ অঞ্চলে উপাদেয় খাদ্য বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানীয়েরা কেহ কেহ সখ করিয়া চাল ভাজার সঙ্গে এই ফুল খাইয়া থাকেন। শুখাইয়া রাখিলে এই ফুল অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। বর্ষাকালে কোলেরা কেবল এই ফুল খাইয়া দুই তিন মাস কাটায়। পয়সার পরিবর্ত্তে এই ফুল পাইলেই তাহাদের মজুরি শোধ হয়। মৌয়ার এত আদর, অথচ তথায় ইহার বাগান নাই।

মৌয়ার ফুল সেফালিকার মত ঝরিয়া পড়ে, প্রাতে বৃক্ষতল একেবারে বিছাইয়া থাকে। সেখানে সহস্র সহস্র মাছি, মৌমাছি, ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কোলাহলে বন পুরিয়া যায়। বোধ হয়, দূরে কোথায় একটা হাট বসিয়াছে। এক দিন ভোরে নিদ্রা ভঙ্গে সেই শব্দে যেন স্বপ্নবৎ কি একটা অস্পষ্ট সুখ আমার স্মরণ হইতে হইতে আর হইল না। কোন্ বয়সের কোন্ সুখের স্মৃতি তাহা প্রথমে কিছুই অনুভব হয় নাই, সে দিকে মনও যায় নাই। পরে তাহা স্পষ্ট স্মরণ হইয়াছিল। অনেকের এইরূপ স্মৃতি-বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। কোন একটি দ্রব্য দেখিয়া বা কোন একটি সুর শুনিয়া অনেকের মনে হঠাৎ একটা সুখের আলোক আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন মন যেন আহ্লাদে কাঁপিয়া উঠে অথচ কি জন্য এই আহ্লাদ, তাহা বুঝা যায় না। বৃদ্ধেরা বলেন, ইহা জন্মান্তরীণ সুখ-স্মৃতি। তাহা হইলে হইতে পারে; যাঁহাদের পূর্ব্ব জন্ম ছিল, তাঁহাদের সকলই সম্ভব। কিন্তু আমার নিজ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলাম, তাহা ইহজন্মের স্মৃতি। বাল্যকাল আমি যে পল্লীগ্রামে অতিবাহিত করিয়াছি, তথায় নিত্য প্রাতে বিস্তর ফুল ফুটিত, সুতরাং নিত্য প্রাতে বিস্তর মৌমাছি আসিয়া গোল বাধাইত। সেই সঙ্গে ঘরে বাহিরে, ঘাটে পথে হরিনাম—অস্ফুটস্বরে, নানা বয়সের নানা কণ্ঠে, গুন্ গুন্ শব্দে হরিনাম মিশিয়া কেমন একটা গম্ভীর সুর নিত্য প্রাতে জমিত, তাহা তখন ভাল লাগিত কি না স্মরণ নাই, এখনও ভাল লাগে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সেই সুর আমার অন্তরের অন্তরে কোথায় লুকান ছিল, তাহা যেন হঠাৎ বাজিয়া উঠিল। কেবল সুর নহে, লতাপল্লব-শোভিত সেই পল্লীগ্রাম, নিজের সেই অল্প বয়স, সেই সময়ের সঙ্গিগণ, সেই প্রাতঃকাল, কুসুমসুবাসিত সেই প্রাতর্বায়ু, তাহার সেই ধীর সঞ্চরণ সকলগুলি একত্রে উপস্থিত হইল। সকলগুলি একত্র বলিয়া এই সুখ, নতুবা কেবল মৌমাছির শব্দে সুখ নহে।

অদ্য যাহা ভাল লাগিতেছে না, দশ বৎসর পরে তাহার স্মৃতি ভাল লাগিবে। অদ্য যাহা সুখ বলিয়া স্বীকার করিলাম

না, কলা আর তাহা জুটিবে না। যুবার যাহা অগ্রাহ্য বৃদ্ধের তাহা দুষ্প্রাপ্য। দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা আপনিই আসিয়া জুটিয়াছিল, তখন হয় ত আদর পায় নাই, এখন আর তাহা জুটে না, সেই জন্য তাহার স্মৃতিই সুখদ।

নিত্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এক একখানি নূতন পট আমাদের অন্তরে ফোটোগ্রাফ হইতেছে এবং তথায় তাহা থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে যাহা কিছু আছে,যাহা কিছু আমরা ভালবাসি, তাহা সমুদয় অবিকল সেই পটে থাকিতেছে। সচরাচর পটে কেবল রূপ অঙ্কিত হয়, কিন্তু যে পটের কথা বলিতেছি, তাহাতে গন্ধ স্পর্শ সকলই থাকে, ইহা বুঝাইবার নহে সুতরাং সে কথা থাক।

প্রত্যেক পটের এক একটী করিয়া বন্ধনী থাকে, সেই বন্ধনী স্পর্শ মাত্রেই পটখানি এলাইয়া পড়ে, বহুকালের বিস্মৃত বিলুপ্ত সুখ যেন নূতন হইয়া দেখা দেয়। যে পটখানি আমার স্মৃতিপথে আসিয়াছিল বলিতেছিলাম, বোধ হয় মৌমাছির সুর তাহার পটবন্ধনী।

কোন পটের বন্ধনী কি, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন; যিনি তাহা করিতে পারেন, তিনিই কবি। তিনিই কেবল একটি কথা বলিয়া পটের সকল অংশ দেখাইতে পারেন, রূপ গন্ধ স্পর্শ সকল অনুভব করাইতে পারেন। অন্য সকলে অক্ষম, তাহারা শত কথা বলিয়াও পটের শতাংশ দেখাইতে পারে না।

মৌয়া ফুলে মদ্য প্রস্তুত হয়, সেই মদ্যই এই অঞ্চলে সচরাচর ব্যবহার। ইহার মাদকতাশক্তি কতদূর জানি না, কিন্তু বোধ হয়, সে বিষয়ে ইহার বড় নিন্দা নাই, কেননা আমার একজন পরিচারক এক দিন এই মদ্য পান করিয়া বিস্তর কান্না কাঁদিয়াছিল, বিস্তর বমি করিয়াছিল। তাহার প্রাণও যথেষ্ট খুলিয়াছিল, যেরূপে আমার যত টাকা সে চুরি করিয়াছিল, সেই দিন তাহা সমুদয় বলিয়াছিল। বিলাতি মদের সহিত তুলনায় এ মদের দোষ কি, তাহা স্থির করা কঠিন। বিলাতি মদে নেশা আর লিবর দুই থাকে। মৌয়ার মদে কেবল একটী থাকে, নেশা—লিবর থাকে না; তাহাই এ মদের এত নিন্দা, এ মদ এত সস্তা। আমাদের ধেনোরও সেই দোষ।

দেশী মদের আর একটা দোষ, ইহার নেশায় হাত পা দুইয়ের একটীও ভাল চলে না। কিন্তু বিলাতি মদে পা চলুক বা না চলুক, হাত বিলক্ষণ চলে, বিবিরা তাহার প্রমাণ দিতে পারেন। বুঝি আজ কাল আমাদের দেশেরও দুই চারি ঘরের গৃহিণীরা ইহার স্বপক্ষে কথা বলিলেও বলিতে পারেন।

বিলাতি পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত করিতে পারিলে মৌয়ার ব্রাণ্ডি হইতে পারে, কিন্তু অর্থসাপেক্ষ। একজন পাদরি আমাদের দেশী জাম হইতে শ্যামপেন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তিনি তাহা প্রচলিত করিতে পারেন নাই।

আমাদের দেশী মদ একবার বিলাতে পাঠাইতে পারিলে জন্ম স্বার্থক হয়, অনেক অন্তর জ্বালা নিবারণ হয়।

প্রঃ নঃ বঃ।

পরলোক কোথায়

পরলোক কোথায় কেহ কখন দেখে নাই, কেহ কখন দেখিয়া আসিয়া বলে নাই, কেহ কোন পরলোকবাসীর মুখে শুনিয়া মানুষকে জানায় নাই। যে পরলোক পরলোক করিয়া মানুষ চিরকাল উন্মত্ত, চিরকাল ইহলোক-বিস্মৃত, সে পরলোক মানুষ কখন দেখিতে পাইল না অথবা কোন পরলোকবাসীর মুখে তাহার কোন সম্বাদ শুনিল না! যেমন চিন্তাশীল চিন্তাকুল হ্যামলেটের পক্ষে, তেমনি সমস্ত মানবজাতির পক্ষে পরলোক চিরকাল একটি—

"Undiscover'd country, from
whose bourn
No traveller returns."

ইহা কি মানুষের দুরদৃষ্ট না শুভাদৃষ্ট? এ কথার মীমাংসা পরে হইবে। কিন্তু দুরদৃষ্টই হউক, আর শুভাদৃষ্টই হউক পরলোক কখন প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই—বোধ হয় হইবেও না।

কিন্তু না দেখিয়াও মানুষ চিরকাল পরলোক দেখিয়া আসিতেছে—পরলোকের ছবি মানুষের সাম্‌নে চিরকাল উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। নিতান্ত অসভ্য অবস্থার কথা বলিব না। ইংরাজি গ্রন্থে অসভ্যের পরলোক সম্বন্ধে অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে কথা গুলি যে ঠিক, তদ্বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত ঠিক বলিয়া বোধ হয় যে, অসভ্যের মধ্যে অনেকের পরলোক জ্ঞান নাই, অনেকের আছে। যাহাদের পরলোক জ্ঞান আছে, তাহাদের পরলোক স্বর্গ ও নরকের ন্যায় দুইটি নির্দ্দিষ্ট স্থান, কিন্তু ইহলোকের পাপপুণ্যের ফলভোগের নিমিত্ত সে স্থান সৃজিত বা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।* অসভ্য

* Sir John Lubbock সাহেবের Origin of Civilisation নামক গ্রন্থের ৩০৪ এবং ৩০৫ পৃষ্ঠা।

অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানুষ বহুকাল এইরূপ বুঝিতেছে যে, ইহলোকের পর একটি নির্দ্দিষ্ট পরলোক আছে। ইহলোকের পাপপুণ্যের ফল স্বরূপ সেই পরলোকে বাস করিতে হয়। প্রাচীন মিসরবাসীরা এইরূপ বিশ্বাস করিত যে, পৃথিবীর নিম্নে একটি ভয়ানক অন্ধকারময় বিভীষিকাপূর্ণ স্থান আছে; মানুষ মরিয়া প্রথম সেই খানে যায়, এবং পাপপুণ্যের বিচারে দণ্ডিত হইলে সেইখানেই বিষম যন্ত্রণাভোগ করে এবং মুক্তিলাভ করিলে কোন একটি আলোকময় পুরীতে গমন করে। প্রাচীন পেরুনিবাসীরা বুঝিত যে, পাপীলোক পৃথিবীর গর্ভমধ্যস্থিত একটি যন্ত্রণাপূর্ণ স্থানে যন্ত্রণাভোগ করে এবং পুণ্যাত্মারা একটি অতি রমণীয় স্থানে বিপুল বিলাসের অধিকারী হইয়া অপূর্ব্ব সুখে এবং স্বচ্ছন্দে বাস করে। মহাকবি হোমরের নরকের চিত্র সকলেই দেখিয়াছেন। সে চিত্রে নরক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং সে স্থান একটি নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিবিশিষ্ট। সেখানে পাপ পুণ্যের বিচার হয়। মুসলমানেরও নির্দ্দিষ্ট স্বর্গ এবং নরক আছে। সে স্বর্গ পৃথিবীর উপরে, সে নরক পৃথিবীর নীচে। সে স্বর্গে পুণ্যাত্মা পরম সুখে মাতিয়া থাকে, সে নরকে পাপাত্মা ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর। মুসলমানের ন্যায় খ্রীষ্টানেরও নির্দ্দিষ্ট স্বর্গ ও নরক আছে। সে স্বর্গও পৃথিবীর উপরে, সে নরকও পৃথিবীর নীচে। সে স্বর্গে খ্রীষ্টপ্রসাদানুগৃহীতেরা পরম সুখে—পরম উল্লাসে ঈশ্বরের স্তুতি গান করিয়া থাকে, সে নরকে যাহারা খ্রীষ্টপ্রসাদে বঞ্চিত, তাহারা অসীম অপার অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে। সে স্বর্গ এবং সে নরকের ছবি দাঁতে এবং মিল্টন উভয়েই আঁকিয়াছেন। খ্রীষ্টান এবং মুসলমানের ন্যায় হিন্দুরও পৃথিবীর উপরে স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ এবং পৃথিবীর নীচে নরক আছে। সে বৈকুণ্ঠ এবং সে নরকও পাপপুণ্যের ফল। কিন্তু সে বৈকুণ্ঠ এবং নরক ছাড়া, হিন্দুর আরো একটি পরলোক আছে। সে পরলোক এই পৃথিবী। এক জন্মের কর্ম্ম গুণে এই পৃথিবীতেই অপর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। এইরূপে বহুজন্ম পরিগ্রহের পর, হয় উপরে বৈকুণ্ঠে, নয় নীচে নরকে গমন করিতে হয়। কর্ম্মগুণে জন্মান্তরের কথা বৌদ্ধেরাও মানিয়া থাকে, সুতরাং এই পৃথিবীই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পরলোক। হিন্দুর এই কর্ম্মফলমূলক পরলোকবাদে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনমূলক পরলোকবাদের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক আধুনিক জর্ম্মাণ দার্শনিক বলিয়া থাকেন যে, ইহজন্মে আত্মার যে প্রকার শিক্ষা হইয়া থাকে, অর্থাৎ উন্নতি বা অবনতি হয়, সেই অনুসারে মৃত্যুর পর আত্মা এই পৃথিবীতেই উর্দ্ধগতি বা অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। এ বীজ হিন্দু ভিন্ন অপর কোন জাতির পরলোকবাদে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বীজ দুইটি পদার্থে নির্ম্মিত। প্রথমটি এই

যে, পরলোক ঠিক পাপপুণ্যের ফলময়, মানসিক প্রকৃতির ফল। দ্বিতীয়টি এই যে, পরলোক অপরের অনুমতি, অনুগ্রহ বা ব্যবস্থার ফল নয়, নিজের কর্ম্মের ফল, সুতরাং নিজের চেষ্টাধীন। আধুনিক উন্নত জর্ম্মাণি এই বীজটি অমূল্য বলিয়া কুড়াইয়া লইয়াছেন এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে ইহাকে অঙ্কুরিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পরলোকবাদের প্রকৃত তথ্য এই বীজেতেই আছে। আজ জর্ম্মণি যেমন এই পরম তথ্যবিশিষ্ট বীজটি অঙ্কুরিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কাল হউক, পরশ্ব হউক, পৃথিবীর অপর সমস্ত সভ্য এবং শিক্ষিত জাতিকে তেমনি চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য থাকিলেও একটি তথ্য এ বীজে নাই। দেখিলাম যে, এ পর্য্যন্ত মানুষ পরলোক অর্থে এক বা একাধিক নির্দ্দিষ্ট স্থান বুঝিয়াছে। হিন্দুও তাহাই বুঝিয়াছে। হিন্দুর পরলোক ও নির্দ্দিষ্ট পরলোক,—হয় পৃথিবী, নয় নরক, নয় বৈকুণ্ঠ। কিন্তু আমি ওই নির্দ্দিষ্ট পরলোকের অর্থ বুঝিতে পারি না। মানুষ মরিয়া কেন যে পৃথিবীতেই থাকিবে, অথবা নরকেই থাকিবে, অথবা বৈকুণ্ঠেই থাকিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। মৃত্যুর পর পাপ পুণ্যের বিচার হইয়া একস্থানে একভাবে বিশ্রাম বা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এ কথা আমাকে নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয়। জগতে যাহা দেখিতেছি, তাহাতে নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, একাবস্থায় অবস্থান জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি বস্তু মাত্রেরই নিত্য নিয়মিত ধর্ম্ম। জগতে চির কারাবাসী বা চির পেন্সন ভোগীর স্থান নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, মানুষ মরিয়া হয় চিরকাল নরকে থাকিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিবে, নয় স্বর্গে থাকিয়া সুখভোগ করিবে? মিসরবাসী, পেরুনিবাসী, খ্রীষ্টান, মুসলমান, সকলেই এই কথা বলে। বলে বলুক। আমার পবিত্র পিতৃপুরুষ এ কথা বলেন না। খ্রীষ্টান মুসলমান অপেক্ষা তিনি বিশ্ব-রহস্য বেশী বুঝিতেন। অতএব তিনি বলেন যে, মানুষের জন্মের পর জন্ম, তারপর আবার জন্ম, এইরূপ অসংখ্য জন্ম—অবস্থার পর অবস্থা, তার পর অপর অবস্থা, এইরূপ অসংখ্য অবস্থা। কিন্তু এই অসংখ্য জন্ম, এই অসংখ্য অবস্থা এই পৃথিবী-সম্বদ্ধ কেন? এটিত হিন্দুর মতন কথা হয় নাই। মানুষ পৃথিবীতে থাকে বলিয়া মরিলে কি অপর কোন গ্রহ, উপগ্রহ বা নক্ষত্রে বাস করিতে পারে না? মানুষের সহিত কি অপর কোন গ্রহ, উপগ্রহ বা নক্ষত্রের সম্পর্ক নাই? কেন, হিন্দুই ত বলিয়াছেন, আছে? তিনিইত ফলিত জ্যোতিষের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনিই ত বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবীতে থাকিয়া কোন মানুষ মঙ্গলের দ্বারা শাসিত, কোন মানুষ বৃহস্পতির দ্বারা শাসিত, কোন মানুষ শনির দ্বারা শাসিত। যদি পৃথিবীতে আমার ধাতু, আমার প্রকৃতি মঙ্গ-

লের দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মরিয়া পৃথিবীতে না জন্মিয়া আমার মঙ্গলে জন্ম হওয়াই ত সম্ভব। যদি পৃথিবীতে তোমার ধাতু, তোমার প্রকৃতি বৃহস্পতির দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে, তবে মরিয়া পৃথিবীতে না জন্মিয়া তোমার বৃহস্পতিতে জন্ম হওয়াই ত সম্ভব। এখানে ত দেখিতে পাই, যে যাহার দ্বারা শাসিত হয়, তাহাকে লইয়া অথবা তাহার কাছে থাকাই তাহার স্বভাবমূলক প্রকৃতি। শস্য জলের দ্বারা শাসিত হয়। জলকে লইয়া না থাকিতে পাইলে শস্য থাকে না, মরিয়া যায়। এ নিয়ম কি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে খাটে না? দূরতা হেতু কি এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে? দূরতা হেতু মাধ্যাকর্ষণিক নিয়মের ত কোন ব্যত্যয় ঘটে না। তবে কেন এ নিয়মের ঘটিবে? তুমি বলিবে, আমি ফলিতজ্যোতিষ মানি না। আচ্ছা, নাই মান। আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, আছে তা ত মান। তবে, ঠিক করিয়া বল দেখি, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র দেখিয়া মানুষ মানুষ হইয়াছে কি না? মানুষ মাথা তুলিয়া আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র দেখিতে পায় বলিয়া পশু অপেক্ষা বড় হইয়াছে কি না, বল দেখি? অন্ধকার রাত্রে নক্ষত্র-খচিত আকাশ দেখিয়া মানুষ দেবভাবে ভোর হয় কি না, বল দেখি? তবে কেমন করিয়া বলিবে যে, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র দ্বারা তুমি শাসিত নও? চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র তোমার মানসিক জগতের অপরিহার্য্য অংশ নয়? যদি তাহাই হয়, তবে ত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মরিলে পর চন্দ্র বল, সূর্য্য বল, নক্ষত্র বল, যেখানে বল, সেই খানে যাওয়াই সম্ভব। জগতে আকর্ষণই অস্তিত্বের কারণ। যদি আকর্ষণে আকর্ষিত না হও, তবে বাঁচিবে কি প্রকারে?

পৃথিবীর লোকের পুনঃজন্ম, পৃথিবীতে বই আর কোথাও হইতে পারে না, এ কথা কে বলিল? এ কথার কোন অর্থই দেখিতে পাই না। অনন্ত আকাশে যত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, আছে, পৃথিবী তাহাদের মধ্যে একটি; কিন্তু পৃথিবী কি অপর সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র? পৃথিবীর কি অপর গ্রহ নক্ষত্রের সহিত কোন সম্পর্ক নাই? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা পারা যায় যে, অনন্ত আকাশে যত গ্রহ নক্ষত্র আছে, সকল গুলিই পরস্পরের সহিত সুগভীর, সুদৃঢ়, সুমিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ। সকল গুলিই যেন পরস্পরের পরম আত্মীয়। সকল গুলিই যেন ভাই ভাই। সকল গুলির যেন এক প্রাণ, এক আত্মা, এক শিরা, এক ধমনী। সকল গুলি একত্রিত হইয়া যেন একটি অপূর্ব্ব গীতিধ্বনি। সকল গুলি মিলিয়া যেন একটি মহা মোহকর মন্ত্র। তাই কমলাকান্ত একবার আফিঙ্গের নেশায় ভোর হইয়া শুনিয়াছিলেন—"বৃহৎগ্রহ, উপগ্রহকে ডাকিতেছে 'এসো এসো বঁধু এসো', সৌর পিণ্ড বৃহৎগ্রহকে

ডাকিতেছে 'এসো এসো বঁধু এসো।' জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে 'এসো এসো বঁধু এসো।" অনন্ত আকাশে গ্রহ নক্ষত্রগণের মধ্যে যে মহাশূন্য দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক তাহা মহাশূন্য নয়, গ্রহ নক্ষত্রও যেমন—সেই মহাশূন্যও তেমনি দৃষ্টির অগোচর কল্পনার বহির্ভূত মহাশক্তির মহাপ্রাণের আবাসভূমি। সেই মহাপ্রাণ সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রকে অনুপ্রাণিত করিয়া একটি মহাপিণ্ডবৎ করিয়া রাখিয়াছে। সেই মহাপিণ্ডের নাম বিশ্বমণ্ডল। তবে পৃথিবী নামে পৃথক্ গ্রহ কোথায়? বিশ্বমণ্ডলে যত গ্রহ নক্ষত্র আছে, তন্মধ্যে কোনটিকে পৃথক্ করিয়া ভাবা যায় না।

কেহ কেহ বলেন যে, সকল গ্রহ নক্ষত্র এক একটি সম্পূর্ণ পদার্থ। অতএব এক গ্রহ নক্ষত্রের পদার্থ অপর গ্রহ নক্ষত্রে যাইতে পারে না। ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক এ কথা স্বীকার করিতে পারেন। কেন না, তিনি জড়স্বরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু মহাদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক এ কথা মানেন না। তিনি ধ্যানবলে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া অসীম বিশ্বরাজ্য ছাড়াইয়া গিয়া দেখিতে পান যে, প্রকৃত সম্পূর্ণতা সমস্ত বিশ্বমণ্ডল লইয়া—সমস্ত বিশ্বমণ্ডলই প্রকৃত *whole*। যেমন প্রত্যেক পরমাণু সম্পূর্ণতাবিশিষ্ট, তেমনি প্রত্যেক গ্রহ নক্ষত্রও সম্পূর্ণতাবিশিষ্ট। কিন্তু দার্শনিকের চক্ষে গ্রহ নক্ষত্রের সম্পূর্ণতা একটি বিশালতর সম্পূর্ণতার অন্তর্গত ও অন্তর্ভূত। সেই বিশালতর সম্পূর্ণতা সমস্ত বিশ্বমণ্ডলের সম্পূর্ণতা। সেই বিশালতম সম্পূর্ণতার উপরে বা সম্মুখে দাঁড়াইলে পৃথক্ গ্রহ, পৃথক নক্ষত্র, পৃথক পৃথিবী—কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন বোধ হয় যেন, সমস্ত গ্রহ, সমস্ত নক্ষত্র, সমস্ত পৃথিবী সেই অসীম অপূর্ব্ব সম্পূর্ণতায়, সেই প্রকৃত একে মিশিয়া রহিয়াছে।

তবে বলি, যদি সম্পূর্ণতাই মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষার চরম লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আবদ্ধ থাকিয়া মানুষ কেমন করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিবে? না,—সম্পূর্ণ হইতে হইলে মানুষকে সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের অসীম সম্পূর্ণতার সাহায্য লইতে হইবে। মানুষ মরিয়া যে আবার এই পৃথিবীতেই জন্ম গ্রহণ করিবে, এমন কোন কথা নাই। মানুষ মরিয়া কোন্ গ্রহে, কোন্ নক্ষত্রে, কোন্ সৌরজগতে যাইবে তাহার ঠিকানা নাই। মিল্টনের স্বর্গ বড়ই সুন্দর, বড়ই উচ্চ স্থান। কিন্তু এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডলে মিল্টনের স্বর্গ অপেক্ষা, দাঁতের স্বর্গ অপেক্ষা, মোহম্মদের স্বর্গ অপেক্ষা কত বেশী সুন্দর, পবিত্র এবং উচ্চ স্থান আছে কে বলিতে পারে? মানুষ মরিয়া ক্রমান্বয়ে কত উন্নত এবং পবিত্র গ্রহ নক্ষত্রে উঠিতে থাকিবে, কল্পনাও তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতার, পবিত্রতার, সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই। ধর্ম্মযাজকের, ধর্ম্ম

প্রবর্ত্তকের এবং ধর্ম্মসংস্কারকের স্বর্গ অতি ক্ষুদ্র পদার্থ। ইউরোপে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সে স্বর্গের জন্য ইহজন্মে এত কষ্ট করিয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু কল্পনাতীত ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধে এ কথা বলিবার যো নাই। তুমি যতই কেন উন্নতি এবং পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষী হও না, অনন্ত বিশ্বমণ্ডল তোমার আশা মিটাইতে পারিবে না, এ কথা তুমি মনেও আনিতে পারিবে না।

আবার ভাবিয়া দেখ, যিনি নির্দ্দিষ্ট স্বর্গের অভিলাষী তাঁহার ধর্ম্মচর্য্যাও নির্দ্দিষ্ট, তাঁহার চেষ্টার সীমা আছে। কিন্তু অসীম, অনির্দ্দিষ্ট, কল্পনাতীত বিশ্বমণ্ডল যাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্য, তাহার ধর্ম্মচর্য্যার সীমা নাই, তাহার ধর্ম্ম-পথের শেষ নাই, তাহার উর্দ্ধগতি অনন্ত, তাহার নৈতিক চেষ্টা বিপুলতম অপেক্ষা বিপুল। যাহার পরলোক অনির্দ্দিষ্ট তাহার উন্নতির নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব ক্ষুদ্র স্বর্গের কথা ছাড়িয়া বিশাল বিশ্ব-মণ্ডলের কথা মনে কর। মরিয়া এমন গ্রহ নক্ষত্রে যাইতে পার, যেখানকার প্রেম, পবিত্রতা এবং উন্নতি পৃথিবীর প্রেম, পবিত্রতা এবং উন্নতি অপেক্ষা এত বেশী যে, কল্পনায়ও তাহার ধারণা হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে কত প্রেমিক, কত পবিত্র এবং কত উন্নত হইলে তবে সেই কল্পনাতীত স্থানের উপযুক্ত হইবে? অতএব দেবাসুরের সম্মিলিত বল ও নিষ্ঠা লইয়া শিক্ষালাভ, ধর্ম্মচর্য্যা এবং জগতের প্রীতির কার্য্য কর। সেই কার্য্যে আজ যত বল ও নিষ্ঠা প্রয়োগ করিলে, কাল তাহার দ্বিগুণ বল ও নিষ্ঠা প্রয়োগ কর, পরশ্ব তাহার চতুর্গুণ প্রয়োগ কর। এই-রূপ দিন দিন বল ও নিষ্ঠা বাড়াইয়া যাও, তবে সিদ্ধ হইবে। তবে কল্পনা-তীত বিশ্বমণ্ডলের কল্পনাতীত উন্নতি-সোপানে পদার্পণ করিতে স্বত্ববান হইবে। আজ পৃথিবীতে বিপুল চেষ্টায় বিপুল উন্নতি লাভ করিয়া বৃহস্পতি গ্রহে চলিয়া গেলে, কাল বৃহস্পতি গ্রহে আরো বিপুল চেষ্টায় আরো উন্নতি লাভ করিয়া বুধগ্রহে চলিয়া গেলে। এইরূপ উঠিতে উঠিতে এবং বাড়িতে বাড়িতে কোথায় চলিয়া গেলে এবং কি হইয়া গেলে আমি মর্ত্ত্যবাসী কেমন করিয়া তাহার ঠিকানা করিব? বুঝি বা সেই প্রাচীন অদ্বৈতবাদী মহাযোগীর ন্যায় শেষে সেই মহাশক্তির মহাপ্রাণে মিশিয়া অসীম শক্তি ধরিয়া অনন্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে! আমার পর-লোকবাদ আমার পূর্ব্বপুরুষকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিল না। আমার পূর্ব্বপুরু-ষের পবিত্র পদে কোটি কোটি প্রণাম!

এখন আর একবার জিজ্ঞাসা করি, পরলোক যে কেহ কখন দেখিল না, তাহা কি মানুষের দুরদৃষ্ট না শুভাদৃষ্ট? উপরে যেরূপ লেখা হইয়াছে, তাহাতেই এ কথার মীমাংসা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট পরলোকের সহিত অনির্দ্দিষ্ট পরলোকের তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নির্দ্দিষ্ট পরলোক অপেক্ষা অনির্দ্দিষ্ট পরলোক

মনুষ্য জাতির উন্নতির অনুকূল। এবং মনুষ্য জাতির ইতিহাস এবং প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেও এই মহাতথ্যটি পাওয়া যায় যে, যাহা প্রত্যক্ষীভূত নয়, অথবা প্রত্যক্ষীভূতের ন্যায় প্রতীয়মান নয়, অথবা যাহা কল্পনার সহিত বেশী মিশ্ খায়, তাহার দ্বারা মনুষ্য জাতির যত উন্নতি হইয়াছে এবং হইতে পারে, যাহা প্রত্যক্ষীভূত অথবা প্রত্যক্ষীভূতের ন্যায় প্রতীয়মান অথবা যাহা কল্পনার সহিত মিশ খায় না, তাহার দ্বারা তত উন্নতি হয় নাই এবং হইতে পারে না। স্থপতি-কার্য্য (Architecture) অপেক্ষা ভাস্কর-কার্য্যে (Sculpture এ) কল্পনার বেশী সংযোগ হয় অর্থাৎ বেশী ideality থাকে। সেই জন্য স্থপতি কার্য্য অপেক্ষা ভাস্কর কার্য্যের প্রভুত্ব মনের উপর বেশী। চিত্র অপেক্ষা কাব্যে ideality বেশী থাকে। সেই জন্য মনের উপর চিত্র অপেক্ষা কাব্যের বেশী প্রভুত্ব। অনেক বাঙ্গালির ঘরে দেবোপমা স্ত্রী রত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালির মেয়ে সে সকল স্ত্রীর চরিত্র অনুসরণ না করিয়া, কল্পনাসম্ভূত কল্পনাময়ী সীতা সাবিত্রীর অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে। মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেবতা অপেক্ষা মূর্ত্তিহীন দেবতার পূজা করিয়া মানুষের বেশী উন্নতি হইয়াছে। কোলাহলপূর্ণ সমৃদ্ধি-শালী জীবন্ত রাজধানী অপেক্ষা মানুষ কালের কালিমা মিশ্রিত নিস্তব্ধ ভগ্নাব-শেষে বেশী সুখ, সম্পদ, গৌরব ও মহত্ত্ব দেখিয়া থাকে। বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা অতীত কাল মানুষের মনকে বেশী মুগ্ধ করে। দৃষ্টি অপেক্ষা স্মৃতি মানুষের বেশী গুরুতর মন্ত্র। জীবন্ত সেক্সপীয়রকে কেহই জানিত না, কেহই মানিত না। কালগর্ভ-শায়ী সেক্সপীয়র মানসিক জগতের মহা-দেব। মনুষ্যের উন্নতিশাস্ত্রের এই একটি প্রধান সূত্র। যাহাতে ideality নাই, তাহা মানুষের উন্নতির কম অনুকূল। যাহাতে ideality আছে তাহা মানুষের উন্নতির বিশেষ অনুকূল *। কেন এরূপ হয় এ প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার স্থান নয়। এ স্থানে কেবল মাত্র তথ্যটি মনে করা আবশ্যক। এবং মনে করিয়া বুঝা আবশ্যক যে, আমি যে পরলোকবাদ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে যত ideality আছে, পূর্ব্বকাল হইতে যে সকল পরলোকবাদ সাধারণভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে তাহার শতাংশের একাংশও ideality

* এখানে ideality এবং মনুষ্য জাতির উন্নতির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তৎসম্বন্ধে এত গুলি কথা বলিবার একটু বিশেষ কারণ আছে। শুনিয়াছি একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালি গ্রন্থকার কাব্যে এবং উপন্যাসে ideal character-এর আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন না। আরো অনেকের সেই মত। তাঁহারা আমার কথা গুলি পড়িয়া সে আবশ্যকতা বুঝুন আর নাই বুঝুন, আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম।

নাই। যদি মানব-প্রকৃতি এবং মনুষ্যের উন্নতি-পদ্ধতি কিছুমাত্র বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে বোধ হয়, সাহস করিয়া পাঠককে আমার পরলোকবাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে পারি।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বিনোদমালা। গীতিকাব্য। কলিকাতা, চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্র।

প্রণয় গীতিকাব্যের একমাত্র উপাদান না হউক, একটি প্রধান উপাদান বটে। কিন্তু বাঙ্গালার কাব্যনবীশগণ আজিকালি যে প্রণয় লইয়া মাতিয়াছেন, তাহা প্রণয়ই নহে। যে ভালবাসায় উন্মত্ত হইয়া এক জন ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন,

"Devotion wafts the mind above
But heaven itself descends in love."

কয়জন কবি প্রণয়কে সেই চক্ষে দেখিয়া থাকেন? আজিকালি গীতিকাব্যে প্রণয়ের যে চিত্র দেখা যায়, তাহা সচরাচর রূপতৃষ্ণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সে তৃষ্ণা কেবল চক্ষের, অন্তরের নহে। সুতরাং অনতিবিলম্বেই তাহা অন্তর্হিত হয়। ভারতচন্দ্র এবং Reynold প্রভৃতি তাহার প্রণয়ী। Petrarch একজন যথার্থ প্রণয়ী ছিলেন; Laurar জন্য তাঁহার মর্ম্মভেদী রোদন এখনও সমস্ত ইতালিকে কাঁদাইতেছে; রাধাও যথার্থ প্রণয়িনী ছিলেন; তাঁহার প্রতি কথায় বাঙ্গালা এখনও নিঃশব্দে রোদন করিতেছে; যথার্থ প্রণয়ে রূপতৃষ্ণা আছে বটে, কিন্তু তাহা ভিন্ন প্রকারের; তাহাতে নারকী-ভাব কিছুই নাই, রাধার রূপতৃষ্ণা কিরূপ দেখুন:—

"জনম অবধি হম, রূপ নেহারিনু.
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

পুনশ্চ:—

"নবরে নব, নিতুই নব,
যখনই হেরি তখনই নব।"

আবার কৃষ্ণের রূপ-লালসা রাধিকার দ্বারা তাঁহার সখীর নিকট এইরূপে ব্যক্ত হইতেছে:—

"সাজায়ে কাচায়ে, বসন পরায়ে,
আদরে লইয়া কোরে।
দীপ লয়ে হাতে, মুখ নিরখিতে,
ভিতিল নয়ন লোরে॥"

এই প্রকার রূপলালসা সমুদ্রবিশেষ। ইহার একেবারে অন্ত নাই। যতই দেখি, ততই তৃষ্ণার যুগপৎ বৃদ্ধি হয়। দেখাতেই আশা দেখাতেই, ভোগ, দেখাতেই যা কিছু সব, তার অধিক প্রণয়-জগতে কিছুই নাই ; কিন্তু এখনকার কাব্যে প্রণয়ের এ পবিত্র চিত্র প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই যে, এখনকার বাঙ্গালা কবিদিগের অন্তর্জগতে দৃষ্টি কম ; তাঁহাদের কবিতা অনেক পরিমাণে বাহ্যপ্রকৃতিগত; সুতরাং তাহাতে প্রণয়ের গাঢ়তা ও পবিত্রতা অল্প থাকে। এই কারণে বিনোদমালায় প্রণয়ের চিত্র স্থানে স্থানে নরকবৎ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রণেতা শব্দবিন্যাস-কুশলী বটেন, তাঁহার ছন্দেরও কতকটা পারিপাট্য আছে, এবং তাঁহার কিছু ক্ষমতাও আছে। তিনি বিশুদ্ধ ও প্রীতিপ্রদ কবিতা লিখিলে সকলে আহ্লাদের সহিত পাঠ করিতে পারে।

বনফুল। কাব্য। কলিকাতা আলবার্ট প্রেস।

ইহার উৎসর্গ-পত্র ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছে, বিজ্ঞাপনও তাহাই। গ্রন্থকার অবশ্যই বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালায় পুস্তক লিখিয়াছেন, তবে এ সকল ইংরেজীতে লেখার প্রয়োজন কি? আমাদের ইচ্ছা ছিল, সমগ্র বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করি ; কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ পারিলাম না।

গ্রন্থকর্তা বিজ্ঞাপনের একস্থানে এইরূপ লিখিতেছেন :—They (his poems) have been invariably remarked to be harsher than a crow's song and to be as full of sentiments as the discourse of a boor turned mad." কিন্তু তথাপি গ্রন্থকার পুস্তক খানি প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তিনি দশ জনের কথায় কাণ না দিয়া ভাল করেন নাই। পুস্তক হইতে আমরা নিম্নে একটী কবিতা সমগ্র উদ্ধৃত করিলাম।

"হের।—হের প্রভু, হের প্রভু! আসিছে
সে দূরে!
হেম।—দেবগণ, গ্রহগণ রক্ষা কর মোরে!
ব্রহ্মদৈত্য হও কিম্বা পিশাচ দুর্ম্মতি ;
স্বর্গের মলয় আন, নরকের বায়ু ;
মঙ্গল ঘটাও কিম্বা বিপদ প্রচুর ;
আসিতেছ তুমি হেন জিজ্ঞাস্য আকারে,
আলাপিব তোমা আমি; সম্বোধিব নামে—
হেম, মহারাজ, আর্য্য, রাজনীয়, দেন,
উত্তর ওআমার ও ও ; দিও না সংশয়ে
বিদরিতে হৃদি মম ; কিন্তু বল কেন,
প্রেতকৃত মন্ত্রপূত মৃত দেহ তব
ভেঙ্গেছে পিঞ্জর তার ; কেন সে কবর,
যথায় তোমাকে মোরা সুখে নিবেশিত
দেখিলাম ; খুলিয়াছে প্রস্তর-অধর,
দূর অপস্থপ্য ; তোমা উদ্গারিতে পুনঃ?
কি অর্থ ইহার? এ যে বাসি মৃত তুমি,
পুনরায় পূর্ণ-বর্ম্মে ভ্রম এইরূপে
চন্দ্রমার বিকিরণ ; ভীতিয়া রজনী?"

কাব্যামোদী ব্যক্তি মাত্রকেই বলিতে হইবে না যে, ইহা Hamlet হইতে অনুবাদিত। কিন্তু গ্রন্থকার তাহা বলিয়া দেন নাই। অনুবাদ যে কত সুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। ইহাতে Hamlet এর সে করুণ ভাব একটুকুও নাই—যেন তাহার ভেঙ্গান। "জিজ্ঞাস্য আকারে" কি, তাহা পাঠকেরা অবশ্যই বুঝিয়াছেন; ইহা questionable shapeএর বাঙ্গালা !!! "দেন, উত্তরও আমায় ও ও" ইহা "O! answer me" কথা কয়টির অনুবাদ! ইত্যাদি, ইত্যাদি।

Hamletএর এই করুণ-রসের পর একণে একটু বীররস হউক। শিবজীর উত্তেজনা বাক্য শুনুন :—

"আমাদের পানে, চাহি শিবাগণে
মৃদু মৃদু করে হাস।
আরক্ত লোচনে, করে ক্ষণে ক্ষণে
প্রভুতার পরকাশ॥
চরণে দলন, করিছে কখন,
হায় আর কি বলিব।
একটা গর্জ্জনে, যত আছে বনে
চল আজি তাড়াইব॥"

এই বার দুই চারি ছত্র হিয়ালী হউক; হিয়ালী—কারণ আমরা শিবজীর নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অর্থ গ্রহণে কিছুমাত্র সমর্থ হই নাই :—

"মৃণাল পেলব যুনীর গৌরব
অবস যুবা শরীর।
কুচভরে নত হয় নারী যত
গিরিঘাতে বীর স্থির॥
বামা বিলোচনে সুধা বরিষণে
প্রণয়ের জড়তায়।
বিপক্ষে বিজনে চন্দ্রমণিগণে
চন্দ্রিমা হেন গলায়॥
বীরখর দৃষ্টি, করি অগ্নিবৃষ্টি
সংগ্রামে বৈরির দেহে।"
আতঙ্কে তাহায় আতসি মালায়
মার্ত্তণ্ডের প্রায় দহে॥"

যাদবনন্দিনী কাব্য। গ্রন্থকারের নাম নাই; ইহার বিষয় মহাভারতীয় "সুভদ্রাহরণ"। এই কাব্যঘটিত আখ্যায়িকা বর্ণনে গ্রন্থকার সফলকাম হন নাই। তিনি চরিত্রচিত্রনেও ভাল পটু নহেন—সকল স্থানে চরিত্রের সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন না। তাঁহার গ্রন্থের পাত্র ও পাত্রীগণ মহাভারতের। কিন্তু তিনি তাহাদের মহাভারতের আদর্শে ঠিক চিত্রিত না করিয়া যে যে স্থানে একটু নূতন বর্ণ ফলাইতে গিয়াছেন, সেই সেই স্থানই কুচিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার বলরামের চরিত্রে বিস্তর বালকত্ব আছে; আবার বলদেব মধুপানাসক্ত বলিয়া দ্বারকার সেই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে গ্রন্থকার অনেকটা আধুনিক মাতাল করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি নেশার ঝোঁকে ভার্য্যার নিকট মাথামুণ্ড কি গাহিতেছেন :—

"প্রণয়িনি এ অধীনে পান কর দুনয়নে,
পিয়ে ওই মুখ-শশী তুষিব এ জীবনে।

কি প্রেমালাপ! "প্রিয়ে তুমি

আমায় খেয়ে ফেল," অথবা "আমি তোমায় খেয়ে ফেলি" বলিলে পরস্পরের প্রণয়ের গভীরতা ব্যক্ত হওয়া দূরে থাকুক, ভয়েই প্রাণ উড়িয়া যায়। গ্রন্থকার Ben Jonsonএর রচনা হইতে উপরের কবিতাটি অনুবাদ করিয়াছেন; সে ইংরাজী অংশটুকু এই :—

"Drink to me only with thine eyes
And I will pledge wtih mine,"

"Drink to me with thine eyes," বলিলে ইংরেজীতে যাহা বুঝায়, বাঙ্গালায় "পান কর দুনয়নে" বলিলে কি সেই ভাব ব্যক্ত হইল? এই প্রকার ফিরিঙ্গী বাঙ্গালায় অনুবাদ করা আজিকালি অনুবাদ-নবীশদিগের এক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইঁহাদের মাতৃভাষা ও বৈদেশিক ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা এই প্রকার অর্থহীন অনুবাদের একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। অনুবাদ কাহাকে বলে, কেমন করিয়া অনুবাদ করিতে হয়, এ সকল ভাল বুঝিয়া এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত। অনুবাদ করিতে হইলে ভাষা এবং অনুবাদ্য বিষয়ে সম্যকরূপ জ্ঞান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। অনুবাদ যত সোজা কাজ বলিয়া অনেকে মনে করেন, তাহা তত সোজা নহে।

পুস্তকখানির গুণের মধ্যে এই যে ইহার ভাষাটি অতিশয় প্রাঞ্জল; তদ্ভিন্ন ভস্মাচ্ছাদিত হীরকবৎ ইহার স্থানে স্থানে কবিত্বেরও বিকাশ আছে।

সুখধাম বিনাশ। কাব্য। প্রথম খণ্ড। মহাকবি জন্ মিল্টন্ কৃত Paradise Lostএর অনুবাদ। শ্রীমহিমচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ময়মনসিংহ, ভারতমিহির যন্ত্র।

অনুবাদ কেমন হইয়াছে, তাহা পাঠকদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত আমরা আরম্ভ হইতেই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম :—

"কিরূপে প্রথমে পাপ করিল মানব,
আস্বাদিল বৃক্ষফল—নিবারিত, তাঁরা,
সাংঘাতিক রস যার আনিল জগতে
মৃত্যু, দুঃখ রাশি রাশি, সুখ-ধাম-নাশ
সহ গাও দেবি! গাও ত্রিদিব-বাসিনী।
তদবধি, যবে পুনঃ মহাত্মা মানব
তারিবে মানবে, মিলাইবে স্বর্গ ভূমি—
চির সুখময়;—"

পদ্য-কুসুমাবলী। বালকদিগের সৌকর্য্যার্থে ইংরাজী পদ্যসমূহের অনুবাদ। প্রথম খণ্ড। ভবানীপুর সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন যে, বালকেরা বিদ্যালয়ে ইংরাজী গ্রন্থে যে সকল কবিতা পড়ে, তাহার সরল বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ তৎসহ পড়িলে ইংরাজী কবিতাগুলির অর্থ তাহাদের সহজে বোধগম্য হয়, তদ্ব্যতীত বাঙ্গালা পদ্য পাঠেরও ফল হয়। এই সুবিধার জন্য সমালোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থে তিন জন ইংরাজ কবির রচনার (প্রত্যেকের এক একটি করিয়া) তিনটী

অনুবাদ আছে। আমরা এ তিনটি অনুবাদেরই একটু একটু নমুনা নিম্নে দেখাইতেছি।

Goldsmithএর Deserted Village হইতে :—

"তার মনে অন্য আশা কখন ছিল না,
ক্ষমতা অনিচ্ছু হীনে উদ্ধার কল্পনা।
ইতরে তাঁহার বার্ত্তা সকলে জানিত,
নিবারিত দুষ্প্রবৃত্তি, কষ্টে উদ্ধারিত।"

Greyর Elegy হইতে :—

"তথাচ অখ্যাতি হ'তে, শবে সদা নিবারিতে
অস্থায়ি স্মারক তারা করিত নির্ম্মাণ,
কোথাও পদ্য রচনা, কোথা বা প্রস্তর খানা
দুঃখ নীরে ভাসাইত পথিকের মন।"

Cowper লিখিত Alexander Selkirk সম্বন্ধীয় কবিতা হইতে :—

"ঈশ্বর প্রসাদ সব স্থানে বিরাজিত
উৎসাহ বর্দ্ধিত আশা তাহার কৃপায়।
অতি দুঃখে সুখ-চন্দ্র হয় যে উদিত
সকলের ভাগ্যমত সন্তোষ জন্মায়।"

পাঠকগণ দেখিবেন, অনুবাদের বাঙ্গালা কিছুই বুঝা গেল না। বালকদিগের সুবিধার জন্য বই খানি লেখা হইয়াছে, কিন্তু বুড়োরাও ইহার অনেক বুঝিতে পারিবেন না।

দুখ-সঙ্গিনী। গীতিকাব্য। কলিকাতা, ভারতযন্ত্র।

এই গ্রন্থের একটি বিশেষ গুণ এই কি বোধ হয় এখনকার অনেক সুকবি অপেক্ষা দুখ-সঙ্গিনী-লেখক মধুর শব্দ যোজনায় সমধিক সুনিপুণ। কিন্তু গীতি কাব্যের যাহা প্রাণ—অন্তঃপ্রকৃতি বা বাহ্যপ্রকৃতির নিগূঢ় ভাব বর্ণন—তাহা ইহাতে আশানুরূপ নাই। ইহা পাঠ করিয়া আমাদের এরূপ বিশ্বাস হইয়াছে যে, লেখক যদি কেবল শব্দ-বিন্যাস ও গ্রন্থের অন্যান্য পারিপাট্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া প্রকৃতিগত গূঢ়ভাবগুলি লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে একজন সুকবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তবে লেখক ভবিষ্যতে প্রণয়ের বিশুদ্ধতার প্রতি অপেক্ষাকৃত একটু দৃষ্টি রাখিবেন। আমরা এই পুস্তক হইতে দুই এক স্থান নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"জীবন সরসে তুই কেন আজি নলিনী—
ফুটিলে ছুটালে প্রাণে দুঃখের লহরি
মলিন বসন খানি
সেই সুকোমল পানি
আবার পড়িল মনে নয়ন সফরী।"

"সখিরে!
ভুলিতে কি পারি আর—
আমার অদৃষ্ট কেরে, চির অন্ধকার ঘরে
প্রশান্ত শীতল জ্যোতি অয়স্কান্ত মণি,
সেই ভাল বাসা প্রাণ অমৃতের খনি।"

"এই কিরে প্রেমময়ি ছিল মম কপালে,
প্রণয়ের পারাবার, উচ্ছ্বসিত অনিবার,
কেন প্রাণ বিনোদিনি! শুকাইলে অকালে
কেমনে নিদয় বিধি, হরিয়া হৃদয় নিধি,
হরিয়া অমূল্য রাশি অভাগারে কাঁদালে?

বঙ্গদর্শন।

১০২ সংখ্যা।

রত্নালঙ্কার।

পূর্ব্বকালে যে সকল রত্নালঙ্কার ব্যবহৃত হইত, তত্তাবতের একটী সবিবরণ তালিকা প্রদত্ত হইতেছে। অমরবিবেক, মানসোল্লাস * হেমকোষ ও তট্টীকা হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ রমণীদিগের শিরোভূষণ বা মস্তকাভরণগুলির বর্ণনা করা যাইতেছে।

শিরোলঙ্কার।

[গর্ভক—ললামক—বালপাশ্য—পারিতথ্য—হংসতিলক—দণ্ডক—চূড়ামণ্ডন—চূড়িকা ও লম্বন]

গর্ভক বা প্রভ্রষ্টক "গর্ভকঃ কেশমধ্যগম্।" বন্ধন দৃঢ় রাখিবার জন্য কেশের মধ্যে এক প্রকার কাঁটা প্রবেশ করাইয়া থাকে, তাহার নাম গর্ভক।

ললামক—"শিখালম্বিপুরোন্যস্তং ললামকম্।" চুল বাঁধিয়া তাহার মূলদেশে আবদ্ধ অথচ সম্মুখভাগে বিন্যস্ত অর্থাৎ ঝুলিতে থাকে, এরূপ অলঙ্কারকে ললামক বলা বলা যায়।

বালপাশ্য—"প্রথমং বালবন্ধনং" চুলে যে পাশাকৃতি রত্নালঙ্কার জড়ান হয়, তাহার নাম বালপাশ্য।

পারিতথ্য—

"সীমন্তভূষণং তদ্বৎ পারিতথ্যমুদাহৃতম্।"

তদ্রূপ প্রকারের সীমন্তভূষণের নাম পারিতথ্য। ইহার ভাষা নাম "শিঁথি"।

* এই মানসোল্লাস গ্রন্থ চালুক্যবংশীয় রাজা সোমেশ্বর কৃত। এই সোমরাজ কোন্ সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুস্তক দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু ভোজরাজ স্বকৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে "প্রোক্তং সোম মহীভূতা" বলিয়া এক সোম রাজের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সোম আর মানসোল্লাস গ্রন্থকার সোম যদি এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে মানসোল্লাস গ্রন্থকার ভোজরাজের সমকালিক বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকালবর্ত্তী। ভোজরাজ আনুমানিক খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

হংসতিলক—

"অশ্বত্থপত্রসংকাশং সুবর্ণেন বিনির্ম্মিতম্।
মাণিক্যবজ্রখচিতমায়তৈর্মৌক্তিকৈর্যুতম্॥
তত্র মুক্তাফলৈঃ পার্শ্বেঃ..... বিরাজিতম্।
তাভ্যাং বহির্মরাগাভং নানারত্নৈঃ প্রকল্পয়েৎ॥
তদূর্দ্ধং বজ্রমাণিক্য মৌক্তিকৈঃ কৃতবন্ধনম্।
তদিদং হংসতিলকং যোষিৎসীমন্তভূষণম্॥"

অশ্বত্থপত্রাকৃতি, মণিমুক্তাখচিত, সুবর্ণনির্ম্মিত শিরোভূষণের নাম হংসতিলক।

দণ্ডক—

"কণৎকাঞ্চনপট্টেন পিনদ্ধং বলয়াকৃতি।
মুক্তাজালস্তদূর্দ্ধে চ কৃতং দণ্ডকমুচ্যতে॥"

শব্দায়মান স্বর্ণপত্রে পিনদ্ধ অর্থাৎ (গাঁথা), ঊর্দ্ধভাগে মুক্তাজালে বিজড়িত, এরূপ বলয়াকৃতি শিরোভূষণকে দণ্ডক নাম দেওয়া হয়। (অদ্যাপি হিন্দুস্থানে ইহার ব্যবহার আছে, পরন্তু তাহার তদ্দেশীয় ভাষা নাম জ্ঞাত নহি)।

চূড়ামণ্ডন—

"ক্রমশোবর্দ্ধমানং তৎ চূড়ামণ্ডনমুত্তমম্।
কেতকীদলসংকাশং কণৎকাঞ্চনকল্পিতম্।
দণ্ডকস্যোর্দ্ধভাগস্থ ভূষণং তদুদাহৃতম্॥"

সেই দণ্ডকের উপরিভাগের শোভার্থ চূড়ামণ্ডন নামক অত্যুত্তম অলঙ্কার কল্পিত হইয়া থাকে। উহা সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত এবং ইহার আকার কেতকীপুষ্পের দলের ন্যায়।

চূড়িকা—

"সৌবর্ণৈঃ কল্পিতং পদ্মং নানারত্নবিরাজিতম্।
চূড়িকা পুরভাগস্থ ভূষণং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

সুবর্ণের দ্বারা পদ্ম বা তৎসদৃশ পুষ্প নির্ম্মাণ করিয়া নানা প্রকার রত্নের দ্বারা খচিত করিলে তাহা চূড়িকা নাম প্রাপ্ত হয়। এই চূড়িকা মস্তকের পরভাগের ভূষণ।

লম্বন—

"সৌবর্ণৈঃ কুসুমৈঃ কৢপ্তং মুক্তাসরসমন্বিতম্।
বৃহন্মাণিক্যনীলৈশ্চ লম্বনং চূড়িভূষণম্॥"

ছোট ছোট সোনার ফুল, তাহাতে ছোট ছোট মুক্তাহার আবদ্ধ, এবং মধ্য স্থানটী মাণিক্য বা ইন্দ্রনীলযুক্ত। ইহার নাম লম্বন (ঝুলিতে থাকে বলিয়া লম্বন) এবং ইহা পূর্ব্বোক্ত চূড়িকার ভূষণ অর্থাৎ ইহা চূড়িকায় ঝুলান থাকে।

পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা এই সাত প্রকার শিরোভূষণ ধারণ করিত। এক্ষণে ইহা অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হয় নাই, কেবল আকার প্রকারে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

কর্ণাভরণ।

[মুক্তাকণ্টক—দ্বিরাজিক—ত্রিরাজিক—স্বর্ণমধ্য—বজ্রগর্ভ—ভূরিমণ্ডন—কুণ্ডল—কর্ণপূর,—কর্ণিকা—শৃঙ্খল—কর্ণেন্দু]

মুক্তাকণ্টক—

"কেবলৈর্মৌক্তিকৈরেব তুল্য পংক্তিনিবেশিতম্।
মুক্তাকণ্টকসংজ্ঞস্তৎ কর্ণভূষণমুত্তমম্॥"

কেবল মুক্তার দ্বারা মুক্তাকণ্টক নামক উত্তম কর্ণাভরণ প্রস্তুত হয়। উহা ঠিক্ সমান মুক্তার পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ মাত্র।

দ্বিরাজিক—

"বলয়দ্বয়বিন্যস্তমুক্তাফলবিরাজিতম্।
মধ্যে নীলেন সংযুক্তং দ্বিরাজিক মুদাহৃতম্॥"

স্বর্ণনির্ম্মিত বলয়াকৃতি দুই বেষ্টনের দুই পার্শ্বে মুক্তার মধ্যে নীলমণি। এরূপ কর্ণভূষার নাম দ্বিরাজিক। (এক্ষণে ইহা হিন্দুস্থানে "বীর বউলী" নামে খ্যাত)।

ত্রিরাজিক—

"এবং ত্রিরাজিকং প্রোক্তং পূর্ণমধ্যঞ্চ মৌক্তিকৈঃ।"

তদ্রূপ কর্ণাভরণের মধ্যভাগ মুক্তাপূর্ণ হইলে তাহা ত্রিরাজিক নামে উক্ত হয়।

স্বর্ণমধ্য—

"তৎ স্বর্ণমধ্যমাখ্যাতং মুক্তাফলবিভূষণম্।"

সেই কর্ণাভরণ যদি স্বর্ণমধ্য হয়, তবে তাহার নাম স্বর্ণমধ্য।

বজ্রগর্ভ—

"মৌক্তিকানি বহিঃ পঙ্‌ক্ত্যোস্তদন্তর্নলকং ততঃ।
বজ্রানি চ ততোপান্ত-বজ্রগর্ভমিতীরিতম্॥"

দুই পাশে দুই দুই মুক্তা পঙ্‌ক্তি, মধ্যস্থলে হীরক, তাহাতে রত্নলোলক ঝুলান, এরূপ কর্ণাভরণের নাম বজ্রগর্ভ। ইহার পরিবর্ত্তে এক্ষণে "চৌদানী" ব্যবহার হইতেছে।

ভূরিমণ্ডন—

"এবং বহিঃস্থ মুক্তং যৎ মধ্যং বজ্রৈশ্চ পূরিতম্।"
মধ্যে মাণিক্যসংযুক্তং ভূরিমণ্ডনমুচ্যতে।"

পার্শ্বে মুক্তা, মধ্যে হীরক, তন্মধ্যে মাণিক্য অর্থাৎ পান্না এরূপ কর্ণাভরণের নাম ভূরিমণ্ডন।

কুণ্ডল—

"সোপানক্রমবিন্যস্তং বজ্রপঙ্‌ক্তিবিরাজিতম্।
ষড়ষ্টনেমিভিঃ কান্তং কুণ্ডলং তৎ প্রচক্ষ্যতে॥"

সোপান পরিপাটীর অনুরূপ ক্রমে গঠিত, হীরকের পঙ্‌ক্তির দ্বারা খচিত, ৬ কি ৮ নেমি অর্থাৎ চক্রপ্রান্তাকার দ্বারা সুদৃশ্য, এরূপ কর্ণাভরণকে আলঙ্কারিকেরা কুণ্ডল বলিয়া থাকেন।

কর্ণপূর—

"পুষ্পাকৃতিঃ কর্ণভূষা
কর্ণপূরং প্রচক্ষ্যতে।"

পুষ্পাকৃতি কর্ণাভরণের নাম কর্ণপূর। "চাঁপা" "ঝুম্‌কা" প্রভৃতি কর্ণাভরণ অদ্যাপি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

কর্ণিকা—

"কর্ণিকা তাড়পত্রস্যাৎ।"

তাড়পত্র নামক কর্ণভূষণ আর কর্ণিকা একই পদার্থ, হিন্দুস্থানে। "তানবড়্" নামে প্রসিদ্ধ।

শৃঙ্খল—

"শোধিতেন সুবর্ণেন
রুচিরেনাতিকান্তিনা।
শৃঙ্খলাঃ বিবিধাঃ কার্য্যা
স্তাটঙ্ককটকানি চ॥"

অতি বিশুদ্ধ সুকান্তি সুবর্ণের দ্বারা নানবিধ শৃঙ্খল, তাড়ঙ্ক ও কটক প্রস্তুত করিবেক।

কর্ণেন্দু—

"কর্ণেন্দুঃ কর্ণপৃষ্ঠগা।"

কর্ণের পৃষ্ঠদিকে যাহা স্থাপিত করিতে হয়, তাহার নাম কর্ণেন্দু ও বালিকা।

ললাটভূষণ।

ললাটিকা—

"পত্রপাশ্যা ললাটিকা।"

পত্রপাশ্যা ও ললাটিকা এই দুই সাধারণ নাম। ফল, নানাপ্রকার ললাট ভূষণ হইয়া থাকে।

কণ্ঠভূষণ।*

[ললন্তিকা,—প্রালম্বিকা—উরঃসূত্রিকা-মুক্তাবলী—দেবচ্ছন্দ—গুচ্ছ— গুচ্ছার্দ্ধ—গোস্তন—অর্দ্ধহার—মানবক—একাবলী-নক্ষত্রমালা— সরিকা—বজ্রসঙ্কলিকা]

ললন্তিকা—

"আনাভিলম্বিতা ভূষা লম্বনঞ্চ ললন্তিকা।"

নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত সাধারণ কণ্ঠভূষার নাম লম্বন ও ললন্তিকা।

প্রালম্বিকা—

"স্বর্ণৈঃ প্রালম্বিকা—"

তাদৃশ সোণার হার প্রালম্বিকা নামে উক্ত হয়।

উরঃসূত্রিকা—

"উরঃসূত্রিকা মৌক্তিকৈঃ কৃতা।"

উক্ত ললন্তিকা যদি মুক্তা ব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে উরঃসূত্রিকা বলা যায়।

মুক্তাবলী—ইহা মুক্তাহারের সাধারণ নাম। পরন্তু রচনা বিশেষে বিশেষ বিশেষ নাম আছে। যথা—

দেবচ্ছন্দ—

"দেবচ্ছন্দোঽসৌ শতযষ্টিকা।"

শতলতার মুক্তাহারের নাম দেবচ্ছন্দ। (লতা অর্থাৎ লহর)।

গুচ্ছ—

"দ্বাত্রিংশৎ যষ্টিকো গুচ্ছঃ।"

৩২ লহর মুক্তাহারের নাম গুচ্ছ।

গুচ্ছার্দ্ধ—

"চতুর্ব্বিংশতিযষ্টিকো গুচ্ছার্দ্ধঃ।"

২৪ লহর মুক্তাহার গুচ্ছার্দ্ধ নামে খ্যাত।

গোস্তন—

"চতুর্যষ্টিকো গোস্তনঃ।"

৪ লহর মুক্তাহার গোস্তন নামধেয়।

অর্দ্ধহার—

"দ্বাদশযষ্টিকোঽর্দ্ধহারঃ।"

১২ লহর মুক্তাহার অর্দ্ধহার নামে খ্যাত।

মানবক—

"বিংশতি যষ্টিকো মানবকঃ।"

২০ লহর মুক্তাহারের নাম মানবক।

একাবলী—

"একাবল্যেকযষ্টিকা।"

* মানসোল্লাস প্রভৃতি গ্রন্থে সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কারের বর্ণনা আছে, কিন্তু নাসিকাভরণের উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হয় সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এতদ্দেশে নাসিকাভরণ ব্যবহারের প্রথা ছিল না, থাকিলে অবশ্যই কোন না কোন প্রকার উল্লেখ থাকিত।

১ লহরমুক্তাহারের নাম একাবলী।

নক্ষত্রমালা—

"সৈব নক্ষত্রমালাস্যাৎ
সপ্তবিংশতি মৌক্তিকৈঃ।"

ঐ একাবলী মালা যদি ২৭টী স্থূল মুক্তার দ্বারা রচিত হয়, (কণ্ঠ আঁটা হয়), তবে তাহার নাম নক্ষত্রমালা।

মানোসোল্লাস গ্রন্থে মুক্তাহার রচনা সম্বন্ধে কিছু বিশেষ নিয়ম আছে। যথা—

"স্থূলমুক্তাফলৈঃ কার্য্যা-
কণ্ঠেহেকাবলী বরা।
মধ্যে মুক্তাফলৈঃ কুর্য্যাৎ
ভ্রামরং সুবিচক্ষণম্॥"

বড় বড় মুক্তার দ্বারা উৎকৃষ্ট একাবলী মালা প্রস্তুত করিবেক এবং মধ্যমাকার মুক্তার দ্বারা ভ্রমর নামক কণ্ঠী প্রস্তুত করিবেক।

"তথা পঞ্চসরং কুর্য্যাৎ
নবসপ্তসরং তথা।
উপান্তে নীলমাণিক্য
মিশ্রিতং সুমনোহরম্॥
কাঞ্চনীভির্ম্মৃণালাভিঃ
পংক্তিস্থাভিঃ সুশোভিতান্।
ক্রমেশো হীয়মানাংশ্চ
সরান্ কুর্য্যান্মনোরমান্॥
গুটিকৃত মৃণালাভি
র্হারে সর্ব্বান্ সমান্ সমান্।
নীলমাণিক্যসংযুক্তান্
পূর্ব্বং হি পরিকল্পয়েৎ॥
নীলৈর্ম্মুক্তা স্তথা মুক্তা
মধ্যে সিদ্ধান্তিকাযুতাঃ।
নীললবনিকা খ্যাতা
হরিন্মাণিক্যজাস্তথা॥
নীলমাণিক্যসংযুক্তা,
মুক্তাঃ পূর্ব্বং ক্রমেণ চ।
কৃতা বর্ণসরো নাম
দর্শনীয়ো মনোহরঃ॥
এত এব সরাহীনা
মৃণালাভিঃ সুসংহিতা॥
আনাভি লম্বিতা ভূষা
ব্রহ্মসূত্র মিতীরিতা॥"

একাবলীর ন্যায় ৫। ৭ ও ৯ সংখ্যক সর অর্থাৎ লহর বা লতা গ্রন্থন করিবেক। তাহার উপান্তা স্থানে মনোহর নীলমাণিক্য সংযুক্ত করিবেক। পংক্তিগুলি সুবর্ণময় মৃণালিকা দ্বারা সুশোভিত করিবেক। সর বা লহরগুলি ক্রমে ছোট ও সুদৃশ্য করা আবশ্যক। ইহার যতগুলি সর অর্থাৎ লহর থাকিবেক, সমস্তগুলিতে গুটিকাকৃতি মৃণালিকা ও নীলম্ সকল সংযুক্ত বা গ্রথিত করিবেক। মধ্যে সিদ্ধান্তিকা অর্থাৎ "ধুক্‌ধুকী" যোগ করিবেক। এরূপ কণ্ঠভূষার নাম নীললবনিকা।

হরিণ্মণি ও নীলমণির সংযোগে পূর্ব্বোক্ত পরিপাটী ক্রমে বর্ণসর নামক কণ্ঠভূষা কৃত হইয়া থাকে। এই বর্ণসর বা কণ্ঠী দেখিতে অতীব মনোহর। পূর্ব্বোক্ত নীললবনিকার লহর না করিয়া যদি কেবল মৃণালিকার দ্বারা সংহত অর্থাৎ "লপেট্ গাঁথা" হয়, তবে তাহা বর্ণসর নাম প্রাপ্ত হয়। যে কোন কণ্ঠ-

ভূষা হউক, নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত হইলে তাহা ব্রহ্মসূত্র নামে খ্যাত হয়।

সরিকা—

"নবভির্দশভির্ব্বাপি
স্থূলমুক্তাফলৈঃ কৃতা।
কণ্ঠপ্রমাণরচিতা
সরিকাগলভূষণম্॥"

৯ কি ১০টী বৃহৎ মুক্তার দ্বারা কণ্ঠপরিমাণ অর্থাৎ গলায় আঁটিয়া থাকে এরূপ পরিমাণের মুক্তাহার সরিকা নামে খ্যাত।

বজ্রসংকলিকা—

"তস্যা বহিশ্চ সংলগ্না
লম্বনী নীলনির্ম্মিতা।
... ... বজ্রসংকলিকা শুভা।"

সেই সরিকার বহির্ভাগে নীলকান্ত নির্ম্মিত লম্বনী অর্থাৎ "থোপ্না" সংযোজিত থাকিলে তাহাকে বজ্রসংকলিকা বলা যায়।

উরোভূষণ।

[পদক ও বন্ধুক।]

পদক—

"সুবর্ণোপরিবিন্যস্ত-
রত্নরাজিসমন্বিতম্।
হরিন্মাণিক্য নীলেন॥
... ...
মধ্যদেশ নিবিষ্টেন
মণিনা পরিশোভিতম্।
পদকং রুচিরং রম্যং
বক্ষঃস্থলবিভূষণম্॥"

সুবর্ণের পত্রাকৃতি আকৃতি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নানা রত্নের কারুকার্য্য করিবেক। হরিদ্বর্ণ, রক্তবর্ণ ও নীলবর্ণ মণির দ্বারা প্রান্ত ভাগ সমস্ত চিত্রিত করিবেক এবং মধ্যে কোন এক উজ্জ্বল মণি সন্নিবিষ্ট করিবেক। এরূপ বক্ষঃস্থল ভূষণের নাম পদক এবং উহা দেখিতে রমণীয়।

বন্ধুক—

"নানারত্নবিচিত্রঞ্চ
মধ্যনায়কসংযুতম্।
সূত্রস্বৈর্ল'ম্বিতং রম্যং
পদকং বন্ধুরং বিদুঃ॥"

উক্ত পদক যদি লম্বিত অর্থাৎ রত্তন রজ্জুর দ্বারা বক্ষে ঝুলাইবার উপযুক্ত হয়, তবে তাহার নাম বন্ধুক। এই দুই প্রকার পদক প্রায় স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতির ধারণীয়।

বাহুভূষণ।

[কেয়ূর—অঙ্গদ—পঙ্কা—কটক—বলয়—কঙ্কণ]

কেয়ূর—

"সিংহবক্ত্রসমাকারং
নানারত্নবিচিত্রিতম্।
সূত্রস্বৈর্লম্বনৈর্যুক্তং
কেয়ূরং বাহুভূষণম্॥"

রত্নবিচিত্রিত সিংহমুখাকৃতি লম্বনযুক্ত বাহুভূষণের নাম কেয়ূর। কফুয়ের উপরিভাগে যে "তাবিজ" ও "বাজু" পরিধান করে, তাহাই পূর্ব্বকালের কেয়ূর। ইহার হিন্দুস্থানী নাম "বাহু

খট” ও “বাজুবন্দ”। “থোপ্‌না” থাকিলে তাহা অঙ্গদ নামে উক্ত হয়। এই অঙ্গদ আর এখনকার “বাঘ্‌মুখো” অনন্ত প্রায় সমান। পূর্ব্বে ইহার গাত্রে মুক্তা জড়িত করা হইত। যথা—

“সুবর্ণমণিবিন্যস্ত
মুক্তাজালকমঙ্গদম্।”

পঞ্চকা—

“পঞ্চকা গ্রন্থি সংযুক্তং
বাহুসন্ধিবিভূষণম্।”

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটী রত্ন বা গুলিকা সংযুক্ত করিয়া গাঁথিলে তাহা পঞ্চকা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইহা বাহু-সন্ধি বা করসন্ধির আভরণ। ইহার হিন্দুস্থানীয় নাম “পৌচী” আর বাঙ্গালা নাম “পোঁইচা”।

কটক—

“সুবর্ণোপরি বিন্যস্ত
নানারত্নবিরাজিতম্।
হস্তস্য কটকং রম্যং
স্বপ্রভাপরিশোভিতম্॥”

সুবর্ণময় মৃণালাকৃতির উপর নানা রত্ন খচিত করিলে তাহা কটক নামে উক্ত হয়। ইহা অতি সুরম্য ও প্রভা পরি-শোভিত অর্থাৎ “ঝক্‌ঝকে”। এইরূপ অলঙ্কার এক্ষণে “ডায়মন্ কাটা” বলয় নামে ব্যবহৃত হইতেছে।

অঙ্গদ ও বলয়—

“সিংহবক্ত্রসমাকারৌ
স্বর্ণরত্নবিনির্ম্মিতৌ।
মুক্তাস্তম্ভকসংযুক্তৌ
নীলমাণিক্যলম্বনৌ॥
কঞ্চুকৌ কীলকৌ কার্য্যৌ
ভুজভূষণকৌ বরৌ।
নামতো বাহুবলয়ৌ
পুংসিতা বঙ্গদাভিধৌ॥”

সোণার “বাঘ্‌মুখো” বলয়, তদ্গাত্রে মুক্তা জড়িত, নীলমের লম্বন এবং কীলিত অর্থাৎ “খিল্‌ওয়ালা” এই শ্রেষ্ঠ বহুভূষণ স্ত্রীহস্তে বলয়, আর পুরুষের হস্তে অঙ্গদ নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চূড়—

“কাঞ্চনীভিঃ শলাকাভিঃ
সুসূক্ষ্মাভির্বিনির্ম্মিতৌ।
মণিবন্ধমিতাদূর্দ্ধং
বলয়ৈর্বহিতঃ ক্রমাৎ॥
প্রাদেশমা একং দৈর্ঘ্যং
বিস্তারে বাহুবেধনম্।
দ্বিধা বিভজ্য কর্ত্তব্যং
গ্রথিতং কীলকেন তু॥
অতীব রমণীয়ং তৎ
চূড়মিত্যভিধীয়তে॥”

সূক্ষ্ম-স্বর্ণ-শলাকার দ্বারা নির্ম্মিত, প্রাদেশ পরিমাণ দীর্ঘ, বাহুর পরিমাণ বিস্তার, দুই থাকে বিভক্ত, কীলক দ্বারা গ্রথিত অর্থাৎ আবদ্ধ, এই সুন্দর বাহু-ভূষণের নাম চূড় এবং ইহা বলয়ের উপরে পরিতে হয়। এই চূড় এক্ষণে অনেক প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অর্দ্ধচূড়—

“অনেনৈব প্রকারেণ
তদর্দ্ধেন বিনির্ম্মিতম্।

অর্দ্ধচূড়মিতি খ্যাতং
স্ত্রীণাং প্রিয়তমং সদা ॥"

ঐ প্রকার সোণার তারের দ্বারা উহার অর্দ্ধেক পরিমাণে নির্ম্মিত হইলে তাহা অর্দ্ধচূড় নামে খ্যাত হয় এবং ইহা স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই ভাল বাসে। এতদ্ভিন্ন কঙ্কণ, বলয়, পারিহাস্য ও আবাপ নামক কর-ভূষণ ছিল। এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রকার কর-ভূষণের সৃষ্টি হইয়াছে।

অঙ্গুরীয় বা অঙ্গুলী-ভূষণ।

[দ্বিহীরক—বজ্র—রবিমণ্ডল—নন্দ্যাবর্ত্ত—নবরত্ন, রত্নবেষ্টিত—ত্রিহীরক—শুক্তি-মুদ্রিকা—অঙ্গুলী-মুদ্রিকা—মুদ্রা—মুদ্রিকা]

দ্বিহীরক—

"বজ্র দ্বিতীয় মধ্যস্থং
হরিন্মাণিক্য নীলকম্।
দ্বিহীরকমিতি খ্যাত
মঙ্গুলীয়কমুত্তমম্ ॥"

অনেক প্রকার অঙ্গুরীয় আছে, তন্মধ্যে দ্বিহীরক নামক অঙ্গুরীয়ের লক্ষণ এই যে, দুই দিকে দুই খানি হীরা, মধ্যে হরিণ্মণি বা নীলমণি। এই দ্বিহীরক অঙ্গুরীয়ক অতি উত্তম।

বজ্র—

"ত্রিকোণবিনিবিষ্টৈশ্চ
পবিভিঃ পরিশোভিতম্।
মধ্যে রত্নসমাযুক্তং
অস্তে বজ্রমিতীরিতম্ ॥"

ত্রিকোণাকার, মধ্যভাগে হীরক, পার্শ্বত্রয়ে অন্যান্য রত্ন। এইরূপ অঙ্গুরীয়ের নাম বজ্র।

রবিমণ্ডল—

"বৃত্তাকারৈর্বিনিবিষ্টৈঃ
কুলিশৈরপিবেষ্টিতম্।
মধ্যে চ মণিনা যুক্তং
রবিমণ্ডলমীরিতম্ ॥"

গোলাকার, চারিদিকে হীরকখণ্ডে খচিত, মধ্যভাগে মণি,—এরূপ অঙ্গুরীয়ের নাম রবিমণ্ডল।

নন্দ্যাবর্ত্ত—

"ঋজ্বায়তচতুষ্কোণ
ক্রমোন্নত নিবেশিভিঃ।
বজ্রমধ্যগমাণিক্যং
নন্দ্যাবর্ত্তাঙ্গুলীয়কম্ ॥"

সরল, দীর্ঘ অথচ ক্রমোন্নত। এরূপ চতুষ্কোণাকার গঠনের মধ্যে বৃহৎ হীরক বা মাণিক্য থাকিলে তাহা নন্দ্যাবর্ত্ত নামে খ্যাত হয়।

নবগ্রহ বা নবরত্ন—

"মাণিক্যেন সুরঙ্গেন
মৌক্তিকেন সুশোভিনা।
প্রবালেনাপি রম্যেন
তথা মরকতেন চ ॥
পুষ্পরাগেন বজ্রেণ
নীলেন পরিশোভিনা।
গোমেদকেন রত্নেন
বৈদূর্য্যেনাতিনির্ম্মিতম্ ॥
রত্নৈর্নবগ্রহাকারৈর্নবভিঃ
পরিকল্পিতম্।

নবগ্রহমিতি খ্যাত-
মঙ্গুলীয়কমুত্তমম্ ॥”

সুরাগ মাণিক্য, সুন্দর মুক্তা, রমণীয় প্রবাল, সুন্দর মরকত, শোভান্বিত পুষ্পরাগ, হীরক, ইন্দ্রনীল ও বৈদুর্য্য—নবগ্রহের এই নবরত্নের দ্বারা মনোহররূপে নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক নবগ্রহ নামে খ্যাত। এই অঙ্গুরীয়ক অতি উত্তম।

বজ্রবেষ্টিত।—

“অঙ্গুলিবেষ্টকং বজ্রৈ-
র্বেষ্টিতং বজ্রবেষ্টিতম্।
অন্য রত্নৈশ্চ যদ্যেব
তদ্বদ্বেষ্টক মুচ্যতে ॥”

হীরকের বেষ্টিত বেষ্টক (বেড়) বজ্রবেষ্টক এবং অন্য রত্নের দ্বারা বেষ্টিত হইলে সেই সেই রত্নের নামানুরূপ বেষ্টিত নাম প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ মুক্তাবেষ্টিত, পদ্মরাগবেষ্টিত ইত্যাদি।

ত্রিহীরক—

“হীরয়োরুভয়োর্মধ্যে
কালিতং হীরমুত্তমম্।
ত্রিহীরকমিতি খ্যাত-
মঙ্গুলীয়কমুত্তমম্।”

দুই পার্শ্বে দুখানি ছোট হীরা ও মধ্যে একখানি উত্তম বড় হীরা যদি কালিত করিয়া অর্থাৎ তারের দ্বারা বন্ধন করিয়া অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করা হয়, তবে তাহার নাম ত্রিহীরক। ইহা অতি উত্তম।

শুক্তি মুদ্রিকা—

“যত্তু নাগফণাকারং
বহুরত্নবিভূষিতম্।
অঙ্গুলীবলয়ে বজ্রৈ-
র্বেষ্টিতে শুক্তি-মুদ্রিকা ॥”

যাহা ফণিফণার আকারে গঠিত ও বহুরত্নে বিভূষিত এবং যাহার বলয়ভাগ হীরকে বেষ্টিত, তাদৃশ অঙ্গুরীয়ের নাম শুক্তি-মুদ্রিকা।

মুদ্রা, মুদ্রিকা, অঙ্গুলিমুদ্রা—

“সাক্ষরাঽঙ্গুলিমুদ্রাস্যাৎ।”

সেই সেই প্রকারের অঙ্গুরী যদি অক্ষরযুক্ত অর্থাৎ নামখোদিত হয়, তবে তাহার তিন নাম। মুদ্রা, মুদ্রিকা ও অঙ্গুলি মুদ্রা।

“অন্যৈশ্চ বিবিধৈরত্নৈঃ
সন্নিবেশ বিশেষতঃ।
নানারূপাভিধানৈশ্চ কল্পিতা
মুদ্রিকাঃ শুভাঃ ॥”

অন্যান্য বিবিধ রত্নের দ্বারা বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজান বা গঠনের দ্বারা নানা প্রকারের ও নানা নামের মুদ্রিকা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

কটিভূষণ।

[কাঞ্চী—মেখলা—রসনা—কলাপ—কাঞ্চীদাম—শৃঙ্খল]

কাঞ্চী—

“একযষ্টি ভবেৎকাঞ্চী—।”

এক “লহর” হারাকৃতি অথবা রজ্জুর আকৃতি কটিভূষণের নাম কাঞ্চী। এক্ষণে ইহা “গোট” নামে খ্যাত।

মেখলা—

“মেখলাত্বষ্ট যষ্টিকা।”

আট লহর কাঞ্চীর নাম মেখলা। এখনকার "চন্দ্রহার" আর পূর্ব্বকালের "মেখলা" প্রায় একাকার।

রসনা—

"রসনা ষোড়শ জ্ঞেয়া।"

১৬ লহর হইলে তাহার নাম রসনা।

কলাপ—

"কলাপঃ পঞ্চবিংশকঃ।"

২৫ লহর হইলে কলাপ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ২৫ লহরের চন্দ্রহার ব্যবহার করা এক্ষণকার রমণীর দুঃসাধ্য।

কাঞ্চীদাম—

"চতুরঙ্গুলবিস্তারং জঘনাভোগবেষ্টিতম্।
সৌবর্ণরত্নরচিত * * লম্বনৈর্যুতম্॥
হেমঘর্ঘরঘণ্টাভির্নির্ম্মিতং রবসংযুতম্।
কাঞ্চীদামেতি বিখ্যাতং কটিভূষণমুত্তমম্॥"

৪ অঙ্গুল বিস্তৃত, স্বর্ণ ও অন্যান্য রত্নের দ্বারা নির্ম্মিত, লম্বনযুক্ত, স্বর্ণ ঘণ্টিকাযুক্ত, শব্দায়মান ও জঘনদ্বয়ের বেষ্টনকারী, এরূপ কটিভূষণের নাম কাঞ্চীদাম। ইহা এক্ষণে বালক বালিকার ব্যবহার্য্য "কোমরপাট্টা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

শৃঙ্খল—

"পুংস্কট্যাং শৃঙ্খলং——"

পুরুষের কটিভূষণের নাম শৃঙ্খল। ইহার গঠনও প্রায় শৃঙ্খল অর্থাৎ "শিকলীর" ন্যায়।

পাদভূষণ।

পাদচূড়—

"হস্তচূড়কবৎ * *
জঙ্ঘাকাণ্ডপ্রমাণকৌ।
নানারত্নৈশ্চ রচিতৌ
বিখ্যাতৌ পাদচূড়কৌ॥"

হস্তচূড়ের ন্যায় কাঞ্চনী শলাকার দ্বারা নির্ম্মিত, জঙ্ঘাদণ্ডের পরিমাণানুরূপ পরিমাণবিশিষ্ট, নানারত্নে খচিত,—এরূপ পদভূষণ পাদচূড় নামে খ্যাত।

পাদকটক—

"সুবর্ণরচিতৌ কার্য্যৌ
ত্রিভাগৌ কৃতখণ্ডনৌ।
সন্ধিদেশেষু সংশ্লিষ্টৌ
কীলকেন চ কীলিতৌ॥
চতুরস্রৌ ষড়স্রৌ বা
তথাষ্টাস্রৌ চ কারয়েৎ।
সৌবর্ণৈর্বুদ্বুদৈরথবাঃ
পঙ্ক্তিভির্বা বিরাজিতৌ॥
শ্লক্ষ্ণৌ বা কুঙ্কিসংযুক্তৌ
নাদবন্তাবথাপি বা।
রত্নৈর্ব্বা বিবিধৈর্যুক্তৌ
কটকৌ পাদভূষণৌ॥"

সুবর্ণরচিত, ভাগত্রয়যুক্ত অর্থাৎ "তে—থাকা" অথচ খণ্ডিত। সন্ধিস্থান কীলক দ্বারা আবদ্ধ, চতুষ্কোণ ষট্‌কোণ অথবা আট্‌কোণ, অর্থাৎ "আট্‌পোলে" অথবা সুবর্ণ বুদ্বুদের পঙ্ক্তি সমূহ দ্বারা সুশোভিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দকারী সুন্দর সুদৃশ্য কুঙ্কিকাযুক্ত,—এরূপ পাদাভরণের নাম

পাদকটক। হিন্দুস্থানে ইহা "পৈজন্" ও বঙ্গদেশে "পাইজোর" নামে বিখ্যাত।

পাদপদ্ম—

"ত্রিপঞ্চশৃঙ্খলাযুক্তৌ
নানারত্নশতৈঃ কৃতৌ।
কীলকা ইব সন্ধিতৌ
পাদপদ্মাবিতীরিতৌ॥"

৩।৫টী শৃঙ্খলযুক্ত (অঙ্গুলিতে বাঁধিবার জন্য) বহুবিধ বহুরত্নের দ্বারা গঠিত, কীলকের ন্যায় সন্ধিত—এরূপ পদভূষণের নাম পাদপদ্ম। ইহা এক্ষণে "চরণচাপ" ও "চরণপদ্ম" নামে বিখ্যাত।

কিঙ্কিণী—

"কিঙ্কিণ্যঃ স্বর্ণরচিতা-
গুণাগুম্ফিতবিগ্রহাঃ।
নাদবত্যঃ সুরম্যাস্তাঃ
পাদঘর্ঘরিকাভিধাঃ॥"

স্বর্ণের ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সকল সূত্রের দ্বারা গ্রথিত, এরূপ শব্দায়মান পদালঙ্কারের নাম কিঙ্কিণী ও পাদঘর্ঘরিকা অর্থাৎ পায়ের "ঘাঘ্‌রা" ও "ঘুংঘুর" নামে খ্যাত।

পাদকণ্টক—

"তাদৃগ্রূপসমাকারা
নানারত্নৈর্বিনির্ম্মিতাঃ।
ধ্বনিহীনাঃ সুশোভাঢ্যাঃ
কণ্টকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

ঠিক সেইরূপ আকারের রত্ননির্ম্মিত ঘুংঘুর যদি ধ্বনিবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পাদকণ্টক বলা যায়।

মুদ্রিকা—

"আয়তাশ্চ সুরক্তাশ্চ
কণ্টকা রত্ননির্ম্মিতাঃ।
স্থূলাশ্চ ধ্বনিসংযুক্তাঃ
কথিতা মুদ্রিকা বরাঃ॥"

আয়ত ও সুরক্ত রত্ননির্ম্মিত কণ্টক যদি মোটা ও শব্দকারী হয়, তবে তাহাকে মুদ্রিকা নাম দেওয়া যায়। এক্ষণকার "কড়াইদার মল" আর এই মুদ্রিকা প্রায় তুল্য কার্য্যকারী।*

এই সকল অলঙ্কারের মধ্যে প্রায় সমস্তই স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য্য বটে ; কিন্তু হিন্দুস্থানী পুরুষদিগকেও এই সকলের কোন কোনটীকে কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া ধারণ করিতে দেখা যায়। পুরুষের জন্য শেখর, মুকুল, শিরবেষ্টন, (শির পেঁচ) এবং কিরীট ও মুকুট—এই কএক প্রকার শিরোভূষণ নির্দ্দিষ্ট আছে মাত্র।

শ্রীরামদাস সেন।

* পদে স্বর্ণ কি অন্য কোন রত্ন ধারণ করিতে নাই, এ সংস্কার কেবল দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের নাই। অদ্যাপি মাড়বারিরা নির্ভয়ে স্বর্ণনির্ম্মিত পাদভূষণ ধারণ করিয়া থাকে এবং তাহাতে হীরকাদি বিন্যস্ত করিতে সংকুচিত হয় না। এই মানোল্লাস রচয়িতা সোমরাজ একজন দাক্ষিণাত্যবাসী রাজা। সেই জন্যই তিনি স্বর্ণরত্নাদির পদাভরণ রচনা করিতে বলিয়াছেন।

দেবী চৌধুরাণী।

দশম পরিচ্ছেদ।

যে বুড়া মরিয়াছে, তাহার পরিচয় প্রফুল্ল কিছুই পায় নাই, সুতরাং প্রফুল্ল কিছুই বুঝিতে পারে নাই যে, সে এত ধন কোথায় পাইল। কিন্তু আমরা তাহার পরিচয় জানি। এস্থলে সে বুড়ার কিছু পরিচয় দিতে হইল।

বুড়ার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। কৃষ্ণগোবিন্দ কায়স্থের সন্তান। সে সচ্ছন্দে দিনপাত করিত, কিন্তু অনেক বয়সে একটা সুন্দরী বৈষ্ণবীর হাতে পড়িয়া, রসকলি ও খঞ্জনীতে চিত্ত বিক্রীত করিয়া, ভেক লইয়া বৈষ্ণবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন প্রয়াণ করিল। এখন শ্রীবৃন্দাবন গিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী, সেখানকার বৈষ্ণবদিগের মধুর জয়দেব গীতি, শ্রীমদ্ভাগবতে পাণ্ডিত্য, আর নধর গড়ন দেখিয়া তৎপাদপদ্মনিকর সেবন পূর্ব্বক পুণ্য সঞ্চয়ে মন দিল।—দেখিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবী লইয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ তখন গরিব; বিষয় কর্ম্মের অন্বেষণে মুর্শিদাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণগোবিন্দের চাকরি যুটিল। কিন্তু তাঁহার বৈষ্ণবী যে বড় সুন্দরী, নবাব মহলে সে সম্বাদ পৌঁছিল। একজন হাবসী খোজা বৈষ্ণবীকে বেগম করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকেতনে যাতায়াত করিতে লাগিল। বৈষ্ণবী লোভে পড়িয়া রাজি হইল। আবার বেগোছ দেখিয়া, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবাজি, বৈষ্ণবী লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু কোথায় যান্? কৃষ্ণগোবিন্দ মনে করিলেন, এ অমূল্য ধন লইয়া লোকালয়ে বাস অনুচিত। কে কোন্ দিনে কাড়িয়া লইবে। তখন বাবাজি বৈষ্ণবীকে পদ্মাপার লইয়া আসিয়া একটা নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পর্য্যটন করিতে করিতে এই ভগ্ন অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, লোকের চক্ষু হইতে তাঁর অমূল্য রত্ন লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে। এখানে যম ভিন্ন আর কাহারও সন্ধান রাখিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাহারা সেইখানে রহিল। বাবাজি সপ্তাহে সপ্তাহে, হাটে গিয়া বাজার করিয়া আনেন। বৈষ্ণবীকে কোথাও বাহির হইতে দেন না।

একদিন কৃষ্ণগোবিন্দ একটা নীচের

ঘরে চুলা কাটিতেছিল—মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা সেকেলে—তখনকার পক্ষেও সেকেলে, মোহর পাওয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দ সেখানে আরও খুঁড়িল। এক ভাঁড় টাকা পাইল।

এই টাকাগুলি না পাইলে কৃষ্ণগোবিন্দের দিন চলা ভার হইত। এক্ষণে সচ্ছন্দে দিনপাত হইতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দের এক নূতন জ্বালা হইল। টাকা পাইয়া তাহার স্মরণ হইল যে, এই রকম পুরাতন বাড়ীতে অনেকে অনেক ধন মাটির ভিতর পাইয়াছে। কৃষ্ণগোবিন্দের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এখানে আরও টাকা আছে। সেই অবধি কৃষ্ণগোবিন্দ অনুদিন প্রোথিত ধনের সন্ধান করিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে অনেক সুরঙ্গ, মাটির নীচে অনেক চোরকুঠারি বাহির হইল। কৃষ্ণগোবিন্দ বাতিকগ্রস্তের ন্যায় সেই সকল স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কিছু পাইল না। এক বৎসর এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ কিছু শান্ত হইল। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে নীচের চোরকুঠারিতে গিয়া সন্ধান করিত। একদিন দেখিল এক অন্ধকার ঘরে, এক কোণে একটা কি চকচক করিতেছে। দৌড়িয়া গিয়া তাহা তুলিল—দেখিল মোহর! ইঁদুরে মাটি তুলিয়াছিল, সেই মাটির সঙ্গে উহা উঠিয়াছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ তখন কিছু করিল না, হাটবারের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এবার হাটবারে বৈষ্ণবীকে বলিল যে, আমার বড় অসুখ করিয়াছে, তুমি হাট করিতে যাও। বৈষ্ণবী সকালে হাট করিতে গেল। বাবাজি বুঝিলেন, বৈষ্ণবী এক দিন ছুটি পাইয়াছে, শীঘ্র ফিরিবে না। কৃষ্ণগোবিন্দ সেই অবকাশে সেই কোণ খুঁড়িত লাগিল। সেখানে বার ঘড়া ধন বাহির হইল।

পূর্ব্বকালে উত্তরবাঙ্গালায়, নীলধ্বজবংশীয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণ রাজ্য করিতেন। সে বংশের শেষ রাজা নীলাম্বর দেব। নীলাম্বরের অনেক রাজধানী ছিল—অনেক নগরে অনেক রাজভবন ছিল। এই একটি রাজভবন। এখানে বৎসরে দুই এক সপ্তাহ বাস করিতেন। গৌড়ের বাদশাহ একদা উত্তর বাঙ্গালা জয় করিবার ইচ্ছায় নীলাম্বরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর বিবেচনা করিলেন যে, কি জানি যদি পাঠানেরা রাজধানী আক্রমণ করিয়া অধিকার করে, তবে পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত ধনরাশি তাহাদের হস্তগত হইবে। আগে সাবধান হওয়া ভাল। এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে নীলাম্বর অতি সঙ্গোপনে রাজভাণ্ডার হইতে ধন সকল এই থানে আনিলেন। স্বহস্তে তাহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলেন। আর কেহ জানিল না যে কোথায় ধন রহিল। যুদ্ধে নীলাম্বর বন্দী হইলেন। পাঠানসেনাপতি তাঁহাকে গৌড়ে চালান করিল। তার পর আর তাঁহাকে মনুষ্য

লোকে কেহ দেখে নাই। তাঁহার শেষ কি হইল কেহ জানে না। তিনি আর কখন দেশে ফেরেন নাই। সেই অবধি তাহার ধনরাশি সেই খানে পোঁতা রহিল। সেই ধনরাশি কৃষ্ণগোবিন্দ পাইল, তার পর প্রফুল্ল পাইল। কার ধন কে খায়!

কৃষ্ণগোবিন্দ ঘড়াগুলি সাবধানে পুঁতিয়া রাখিল। বৈষ্ণবীকে একদিনের তরে এ ধনের কথা কিছু জানিতে দিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ অতিশয় কৃপণ, ইহা হইতে একটি মোহর লইয়াও কখনও খরচ করিল না। এ ধন গায়ের রক্তের মত বোধ করিত। সেই ভাঁড়ের টাকাতেই কায়ক্লেশে দিন চালাইতে লাগিল।

তার পর, বড় ডাকাইতের ভয় হইল। বাবাজী হাট হইতে নিত্য ডাকাতের গল্প শুনিয়া আসিত; আরও দেখিত যে, এই বনে ডাকাতের মত লোক সর্ব্বক্ষণ যায়; বোধ হয় এ বনে ডাকতদের একটা আড্ডা থাকিবে। সে কথা বাস্তবিক সত্য। ডাকাতেরাও দেখিত যে, বৈরাগী সপ্তাহে সপ্তাহে বন হইতে হাটে যায়, হাট করিয়া বনে প্রবেশ করে। ডাকাতেরা সন্ধান লইতে লাগিল। ভাঙ্গা বাড়ী দেখিয়া গেল। জানিল যে, এই খানে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বাস করে, কিছু কাজ কর্ম্ম করে না, অথচ সচ্ছন্দে দিনপাত করে। বুঝিল ইহাদের কিছু আছে।

অতএব এক দিন তাহারা জন কত্‌ক জুটিয়া সেখানে ডাকাইতি করিতে আসিল। ভাঁড়ের টাকা গুলি লুটিয়া লইল। তার পর "আর কি আছে দে," বলিয়া কৃষ্ণগোবিন্দকে বাঁধিয়া মশাল দিয়া পোড়াইতে লাগিল। কৃষ্ণগোবিন্দ কিছুই দিল না বরং অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল, "আমার আর কিছুই নাই। মারিয়া ফেল,—ফেল, কিন্তু আর কিছু পাইবে না! বরং আমায় ছাড়িয়া দিলে কিছু পাইবে। আমার টাকা আছে সত্য, কিন্তু টাকা এখানে নাই। আমি মুর্শিদাবাদে চাকরি করিতাম, শেঠের বাড়ী আমার টাকা গচ্ছিত আছে। বছর বছর সেখানে গিয়া আমি সুদ নিয়া আসি। আমি স্বীকার করিতেছি যে, যখন আমি সুদ আনিব, তোমরা আসিলে তোমাদের কিছু দিব। সব দিব না। সব যদি নাও, তবে আমি এ দেশ থেকে পালাইব; আর পাইবে না। আর যা ইচ্ছাক্রমে দিব, তাহা যদি লইয়া সন্তুষ্ট হও, তবে বছর বছর আসিও, বছর বছর দিব।"

ডাকাতেরা দেখিল এ বন্দবস্ত মন্দ নয়। আপাততঃ আর কিছু ত পাওয়া যায় না—তাহারা স্বীকৃত হইয়া বুড়াকে ছাড়িয়া দিল। বুড়া একটা দিন অবধারিত করিয়া দিল। ডাকাইতেরা চলিয়া গেল।

বুড়া, দুই চারি দিন কায়ক্লেশে

কাটাইয়া শেষে ঘড়া হইতে কিছু মোহর বাহির করিয়া একটা ভাঙ্গা হাঁড়িতে পূরিয়া তাহাতে কাদা মাখাইয়া বৈষ্ণবীকে দেখাইল, বলিল, "কৃষ্ণ দয়া করিয়াছেন, আবার কিছু পাইয়াছি।" তাহা খরচ করিয়া দিন চালাইতে লাগিল। ডাকাতেরা অবধারিত তারিখে আসিলে তাহাদের কিছু দিল।

এরূপে দুই চারি বৎসর গেল। ডাকাতেরা তাহাকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। সেও ডাকাতদিগকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। এমন কি কোন ডাকাতের ঘরে খাবার না থাকিলে, সে আসিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের কাছে টাকাটা সিকেটা ধার লইয়া যাইত। ডাকাতেরা সাধ্য হইলেই ঋণ পরিশোধ করিত—কেন না নহিলে আবার চাহিলে পাইবে না। এইরূপ করিতে করিতে কৃষ্ণগোবিন্দ তাহাদের দলের মহাজন দাঁড়াইয়া গেল। শেষে সে দলমধ্যে একজন গণ্য হইল। তাহাকে কোন ডাকাইতিতে যাইতে হইত না; সে কেবল অসময়ে টাকা যোগাইত। তাহার আসল ফেরৎ পাইত, কিন্তু সুদ পাইত না। কিন্তু তৎ পরিবর্ত্তে সকল ডাকাইতির লাভের এক অংশ পাইত। তাহাতেই তাহার দিনপাত হইতে লাগিল; রাজা নীলাম্বরের ধন আর ছুঁইতে হইল না। সেই ডাকাতের দল—আজ প্রফুল্লের সম্মুখে উপস্থিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ডাকাইতেরা প্রফুল্লকে দেখিয়া বলিল "আ মোলো! এটা কে? তুই এখানে কেন? বুড়ো কোথায়?"

প্রফুল্ল সকল সাহস জমা করিয়া বলিল, "তিনি মরিয়াছেন।"

"আঁঃ এমন বুড়ো মরেছে, কে মার্‌লে? আমরা থাক্‌তে বুড়ো মরে?

প্র। তিনি জ্বরবিকারে মরেছেন।

ডা। কবে জ্বর হলো? মিছে কথা! তুই তাকে ধরিয়া দিয়েছিস্।

প্র। উঠনে তাঁকে গোর দিয়াছি—গিয়া একজন না হয় দেখিয়া আইস।

দুই চারি জন ডাকাত দেখিতে ছুটিল। অপরেরা প্রফুল্লকে ধমক চমক করিতে লাগিল।

ডাকাইতেরা বলিতে লাগিল "তার বৈষ্ণবী কোথায়? তুই কে?"

প্র। বৈষ্ণবী, তাঁর যা কিছু ছিল, তাহা লইয়া পলাইয়াছে।

ডা। আ মোলো! এত বড় স্পর্দ্ধা!

কোথা পালিয়েছে বল্ ত ?

প্র। তা জানি না।

ডা। তুই কে? তুই এখানে কেন ?

প্র। আমি বাবাজির পুষিা মেয়ে।

ডা। পুষ্যি মেয়ে! কই বাবাজির ত পুষ্যি মুষ্যি ছিল না—কখন শুনি নাই।

প্র। বৈষ্ণবীর ভয়ে তিনি প্রকাশ করিতেন না। আমাকে একঘর কুটুম্বের বাড়ী লুকিয়া রেখেছিলেন ?

ডা। তা এখন বুঝি টাকা লুট্‌তে এসেছিস ?

প্র। ব্যামো শুনে এসেছি।

ডা। তুই আবার ব্যামো শুন্‌লি কার কাছে ?

প্র। বৈষ্ণবী হাটে গল্প করেছিল তাইতে শুনেছি।

ডা। বটে ? তুই এসে পেলি কি ?

প্র। কিছু না। সব বৈষ্ণবী নিয়ে গেছে বলেছি ত।

ডা। কেন, মুর্শিদাবাদের টাকা ? সে কে পাবে ?

প্র। সে সব মিছা কথা।

প্রফুল্ল জানে না কোন্ টাকার কথা হইতেছে, সুতরাং আন্দাজি আন্দাজি উত্তর দিতে লাগিল। কিন্তু বড় বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সাহস।

ডাকাইতেরা বলিল "মিছে কথা"! তুই কি আমাদের ফাঁকি দিতে চাস্? আমরা যে কত বার টাকা ধার নিয়ে গিয়েছি।"

প্র।. সে নিয়ে গিয়েছে ঘরের টাকা।

ডা। সে কি? বুড়া আমাদের ফাঁকি দিত? তা, ঘরের টাকা সব বৈষ্ণবী মাগী নিয়ে গিয়েছে। আমরা আর ধার পাব না?

প্র। পাবে না কেন?

ডা। কোথা পাইব ? কে দিবে ?

প্র। আমি দিব।

ডা। তুই ? তুই কোথায় পাবি? তবে তুই বুড়ার টাকা পেয়েছিস্।

প্র। না, টাকা কিছু পাই নাই। কিন্তু বুড়োর টাকাও বড় ছিল না। তাঁর বিদ্যা ছিল, আমি সেই বিদ্যা পেয়েছি।

ডা। বিদ্যাটা কি ?

প্র। তা তোমাদের বলবো কেন ?

ডা। বল্‌বিনে ? কেটে ফেলব।

প্র। ফেল, ফেল। আমি যাব, কিন্তু তোমাদের টাকা ধার দিবে কে ?

ডা। আচ্ছা, নাই কাট্‌লেম। বিদ্যাটা কি, শুন্‌বার ক্ষতি কি ?

প্র। তোমরা কারও সাক্ষাতে বলবে না ?

ডা। না—বল।

প্র। তিনি সোণা তৈয়ার করিতে জান্‌তেন। আমাকে তাই শিখিয়া গিয়াছেন। তোমাদের তাই তৈয়ার করিয়া দিতেন।

ডা। হাঁ হাঁ বটে! বাবাজি বাজারে মোহর ভাঙ্গাইত শুনিয়াছি। তা বিদ্যাটা তুমি শিখিয়াছ বা ?

প্র। এক রকম শিখিয়াছি। আজ আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি;

আমার হাতে সোণা হয়। '

ডা। আমাদের শিখাইবে ?

প্র। তা যদি শেখ, তা আমার কাছে যেমন শিখিবে, আমাকে অমনি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এ বিদ্যা পরকে দিয়া আর বাঁচিতে নাই। তাও না হয়, আমি রাজি হইলাম ; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কাকে শিখাইব ? এ বিদ্যা ছয় কাণ হইলে ফলে না। তাই এক জনকে বৈ আর শিখাইতে পারিব না—কাকে শিখাইব ?

ডাকাইতেরা সকলেই বলিল "আমাকে! আমাকে! আমাকে! আমকে!" ডাকাইত মহলে বড় গোল বাধিয়া গেল। ঝগড়া হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম হইল।

প্রফুল্ল বলিল, "বিবাদ বিষম্বাদে কাজ নাই। এ মন্ত্র সকলের কোষ্ঠিতে ফলে না। বাবাজি বৈষ্ণবীকে এ বিদ্যা শিখাইতেন, কিন্তু তার কোষ্ঠিতে মিলিল না। তাকে এ বিদ্যা না দেওয়াতেই সে রাগ করিয়া টাকা কড়ি চুরি করিয়া পালাইয়া গেল। কাল তোমাদিগের কোষ্ঠী লইয়া আসিবে,আর একজন দৈবজ্ঞ লইয়া আসিবে। আমি তাহাকে দিয়া বাছাই করাইব।

ডাকাতেরা মুখ চাওয়া চায়ি করিতে লাগিল ; কোষ্ঠী ত কারও নাই। প্রফুল্ল বলিল, "কোষ্ঠী নহিলে হইবে না। আমারও মৃত্যু হইবে, তোমাদের হাতেও ফলিবে না।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া ডাকাতেরা বলিল, "তা, মা, তোমার বিদ্যা তোমাতেই থাক্। আমাদের টাকা পাইলেই হইল। আমাদের বার্ষিক টা দেবে ত ?"

প্র। দেব।

ডা। আর সময়ে অসময়ে ধার ধোর ?

প্র। দেব।

ডা। তোমার মালের ভাগ তোমাকে ঠিক আনিয়া দিব।

প্র। আমি ভাগ চাই না। আমার কুলাইবে। বাবাজির সাহস ছিল না। এতে ভূত প্রেতের দৌরাত্ম্য আছে, তাই তিনি কম সোণা করিতেন। আমার সে ভয় নাই, আমি বেশী করিয়া সোণা করিব। আমি ভাগ নিব না।

ডাকাতেরা : (সকলে একত্রে) জয় হউক মায়ি! জয় হউক! সুদ নেবে না ?

প্র। না।

ডাকাইতেরা। জয় হউক মায়ি। আজ পরীক্ষা করিয়াছিলে ?

হাঁ। যা করিয়াছি, তাহা তোমরা লইয়া যাও। এই বলিয়া প্রফুল্ল যে শত স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা ডাকাইতদের দিলেন।

পাইয়া ডাকাতেরা আহ্লাদে উন্মত্ত হইল। কেহ প্রফুল্লকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, কেহ "মার জয় হউক" বলিয়া নাচিতে লাগিল। কেহ বলিল, "আজ হইতে তুমি আমাদের মা, আমরা তোমার ছেলে।" সকলেই প্রফুল্লের

স্তব স্তুতি করিতে লাগিল। তার পর যে দস্যু কথোপকথনের প্রধান ভার লইয়াছিল, সে বলিল, "মা! তুমি কোথায় থাকিবে? কোথায় তোমার দেখা পাইব?"

প্র। আমি এইখানেই থাকিব।

ডা। তুমি ছেলে মানুষ, একা এ বনের ভিতর ভাঙ্গা বাড়ীতে থাকিবে?

প্র। তোমরা থাকিতে আমার ভয় কি?

ডা। তা নিশ্চিন্ত থেকো মা! আমরা বেঁচে থাকিতে তোমার পায়ে কাঁটাও ফুট্‌বে না।

প্র। আমার কোন ভয় নাই। আমি অনেক মন্ত্র তন্ত্র জানি।

ডা। তা বেশ মা। আর আমাদের যা হুকুম করবে তাই করবো।

প্র। তা করতে হবে। তা নইলে এখানে আমার থাকা হবে না।

ডা। তা কি করবো এখন, আজ্ঞা কর।

প্র। কাল আমার চারি জন দাসী এনে দেবে, আর আট জন পুরুষ মানুষ চাকর দেবে। তারা জল তুলিবে, কাঠ কাট্‌বে, বাজার কর্‌বে, আর আর কাজ কর্‌বে। তোমাদের বিশ্বাস হয়, এমন লোক এনো। আমি মনের মত মাহিয়ানা দিব।

ডা। তা সব কাল দিব। আমাদেরই ঘরের মেয়েছেলে পাঠাইয়া দিব। তোমার চাকরি কর্‌বে তার ক্ষতি কি?

প্র। আর চারিজন দরওয়ান।

ডা। অন্য দরওয়ানে কাজ নাই মা! আমরাই তোমার দরওয়ানী কর্‌ব, আমাদের কিছু কিছু দিও। আর কি চাই?

প্র। আর আর আমার বাজার হাট, বাসন কোষণ, কাপড় চোপড়, ঘর কন্নার জিনিষ সব কিনিয়া দিতে হবে। এই বাড়ী মেরামত করে দিতে হবে।

ডা। সে সব আমরা পারব না। তার জন্য পাঠক ঠাকুরকে পাঠিয়ে দেব।

প্র। পাঠক ঠাকুর কে?

ডা। জান না? আমাদের দলপতি।

প্র। হাঁ হাঁ, বাবাজির কাছে তার নাম শুনেছি। তা পাঠিয়ে দিও।

ডাকাতেরা প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। প্রফুল্ল দ্বার বন্ধ করিয়া আবার শুইল। কিন্তু আর নিদ্রা হইল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন, বেলা এক প্রহরের মধ্যে ভবানী পাঠক প্রফুল্লের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার কথা বলিবার আগে ফুলমণি নাপিতানী মহাশয়ার কথাটা বলিয়া রাখি। তাঁহার ন্যায় সাধুচরিত্রা সুন্দরীর হঠাৎ অবমাননা করিতে পারি না।

ফুলমণি নাপিতানী হরিণীর ন্যায়, বাছিয়া বাছিয়া দ্রুতপদ জীবে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল। ডাকাতের ভয়ে দুর্লভচন্দ্র আগে আগে পালাইলেন, ফুলমণি পাছু পাছু ছুটিয়া গেল। কিন্তু দুর্লভের এমনই পালাইবার রোখ্ যে, তিনি পশ্চাদ্ধাবিতা প্রণয়িণীর কাছে নিতান্ত দুর্লভ হইলেন। ফুলমণি যত ডাকে "ওগো দাঁড়াও গো! আমায় ফেলে যেও না গো!" দুর্লভচন্দ্র তত ডাকে, "ও বাবা গো! ঐ এলো গো!" কাঁটা বনের ভিতর দিয়া, পগার লাফাইয়া, কাদা ভাঙ্গিয়া, উৰ্দ্ধশ্বাসে দুর্লভ ছোটে—হায়! কাছা খুলিয়া গিয়াছে, এক পায়ের নাগরা জুতা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, চাদর খানা একটা কাঁটা বনে বিঁধিয়া তাঁহার বীরত্বের নিশান স্বরূপ বাতাসে উড়িতেছে। তখন ফুলমণি সুন্দরী হাঁকিল, "ও অধঃপেতে মিন্‌সে—ওরে মেয়ে মানুষকে ভুলিয়ে এনে—এমনি ক'রে কি ডাকাতের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে হয় রে মিন্‌সে!" শুনিয়া দুর্লভ চন্দ্র ভাবিলেন, তবে নিশ্চিত ইহাকে ডাকাতে ধরিয়াছে। অতএব দুর্লভ চন্দ্র বিনাবাক্যব্যয়ে আরো বেগে ধাবমান হইলেন। ফুলমণি ডাকিল "ও অধঃপেতে—ও পোড়ার মুখো—ও আঁটকুড়ির পুত,—ও হাবাতে—ও ড্যাক্‌রা—ও বিটলে!"—ততক্ষণ দুর্লভ অদৃশ্য হইল। কাজেই ফুলমণিও গলাবাজি ক্ষান্ত দিয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রোদন কালে দুর্লভের বংশাবলীর প্রতি নানাবিধ দোষারোপ করিতে লাগিল।

এদিকে ফুলমণি দেখিল, কই ডাকাতেরা ত কেহ আসিল না? কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল—কান্না বন্ধ করিল। শেষ দেখিল, না ডাকাত আসে—না দুর্লভচন্দ্র দেখা দেয়। তখন জঙ্গল হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। তাহার ন্যায় চতুরার পক্ষে পথ পাওয়া বড় কঠিন হইল না। সহজেই বাহির হইয়া সে রাজপথে উপস্থিত হইল। কোথাও কেহ নাই দেখিয়া, সে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দুর্লভের উপর তখন বড় রাগ।

অনেক বেলা হইলে ফুলমণি ঘরে পৌছিল। দেখিল, তাহার ভগিনী অলকমণি ঘরে নাই, স্নানে গিয়াছে। ফুলমণি কাহাকে কিছু না বলিয়া কপাট ভেজাইয়া শয়ন করিল। রাত্রে নিদ্রা হয় নাই—ফুলমণি শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার দিদি আসিয়া তাহাকে উঠাইল—জিজ্ঞাসা করিল, "কি লো—তুই এখন্ এলি ?"

ফুলমণি বলিল, "কেন, আমি কোথায় গিয়াছিলাম ?"

অলকমণি। কোথায় আর যাবি ? বামুনদের বাড়ী শুতে গিয়েছিলি, তা এত বেলা অবধি এলি না, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

ফুলী। তুই চোকের মাতা খেয়েছিস্ তার কি হবে ? ভোরের বেলা তোর সমুখ দিয়ে এসে শুলেম—দেখিসনে ?"

অলকমণি বলিল, "সে কি বোন্ ? আমি তোর বেলা দেখে তিনবার বামুনদের বাড়ী গিয়ে তোকে খুঁজে এলাম। তা তোকেও দেখলাম না—কাকেও দেখলাম না। হাঁ লা—প্রফুল্ল আজ কোথা গেছে লা ?

ফুল। (শিহরিয়া) চুপ্ কর ! দিদি চুপ ! ও কথা মুখে আনিস্ না।"

অল। (সভয়ে) কেন কি হয়েছে ?

ফুল। সে কথা বল্‌তে নেই।

অল। কেন লো ?

ফুল। আমরা ছোট লোক—আমাদের দেবতা বামুনের কথায় কাজ কি, বোন্ ?

অল। সে কি ? প্রফুল্ল কি করেছে?

ফুল। প্রফুল্ল কি আর আছে !

অল। (পুনশ্চ সভয়ে) সে কি ? কি বলিস্ ?

ফুল। (অতি অস্ফুটস্বরে) কারও সাক্ষাতে বলিস্‌নে—কাল তার মা এসে তাকে নিয়ে গেছে।

ভগিনী। অ্যাঁ !

অলকমনির গা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ফুলমণি তখন এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিল। ফুলমণি প্রফুল্লের বিছানায়, রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময়ে তার মাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। ক্ষণ পরেই ঘরের ভিতর একটা ভারি ঝড় উঠিল—তার পর আর কেহ কোথাও নাই ! ফুলমণি মূর্চ্ছিতা হইয়া, দাঁত কপাটি লাগিয়া পড়িয়া রহিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। ফুলমণি উপন্যাসের উপসংহার কালে দিদিকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল, "এ সকল কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিস্ না—দেখিস্ আমার মাথা খাস্।"

দিদি বলিলেন, "নাগো ! একথা কি বলা যায় ?" কিন্তু কথিতা দিদি মহাশয়া তখনই চাল ধুইবার ছলে ধুচুনী হাতে পল্লী পরিভ্রমণে নিক্রান্ত হইলেন। এবং ঘরে ঘরে উপন্যাসটি সালঙ্কার ব্যাখ্যা করিয়া, সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, দেখ একথা প্রচার না হয়। কাজেই ইহা শীঘ্র প্রচারিত হইয়া প্রফুল্লের শ্বশুর শাশুড়ীর কানে পর্য্যন্ত গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রহরেকের মধ্যে ভবানী পাঠক, প্রফুল্লের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রফুল্ল দেখিবার প্রত্যাশা করিতেছিলেন —চৌগোঁপ্পাওয়ালা শির-উঠা পাকান-শরীর ডাকাতের সর্দ্দার; এলো কি না গোঁপ-কামান ফোঁটাকাটা নধরশরীর ভট্‌চায্যি বামুন। প্রফুল্ল কিছু বিস্মিত হইল। পরিচয় পাইয়া বলিল,

"আপনি কি মনে করিয়া আসিয়াছেন?"

ভবানী। তুমি ডাকিতেছিলে না?

প্রফুল্ল। কাল রাত্রে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল, তাহাদিগের দলপতিকে পাঠাইয়া দিবে—কিন্তু আপনি কে?

ভবানী। আমিই ডাকাতের দলপতি—তোমার কি প্রয়োজন আছে বল?

প্রফুল্ল কিছুই বলিতে পারিল না। গত রাত্রের ভীষণ ব্যাপারে সে বহুসংখ্যক দস্যু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াও তাহাদের চীৎকারেও চুপ করে নাই—সাহস করিয়া কথা কহিয়াছিল, কিন্তু ইহার সম্মুখে পারিল না। দুর্দ্দশা দেখিয়া ভবানী বলিল,

"তোমার ঘর বাড়ী, জিনিষ পত্র, দাস দাসী চাই?"

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ভবানী বলিল,

"তোমার এ সকল চাই আমি শুনিয়াছি। কিন্তু কেন? তোমার টাকা আছে বুঝিয়াছি, সে টাকা কয়দিন থাকিবে?

প্র। এমন কথা কেন বলিতেছেন?

ভ। বনবাসীদিগকে দেখিয়াছ ত? তাহারা তোমার টাকা কয়দিন রাখিবে?

প্র। আমার টাকা এখানে নাই।

ভ। এ কথা আমার কাছে বলা বৃথা—আমি তোমার দেওয়া পুরাণ মোহরগুলি দেখিয়াছি। বোধ হয়, তুমি এই পুরাণ বাড়ীতেই টাকা পাইয়াছ—এই খানে টাকা আছে।

প্র। যদি এখানে আমার টাকা থাকে—তোমরা কি তাহা কাড়িয়া লইবে?

(প্রফুল্লের মুখ বিষন্ন।)

ভ। আমি কাড়িয়া লইব না। কে লইবে তাও আমি জানি না।—কিন্তু তুমি নিঃসহায় বালিকা—এ বনের ভিতর, টাকা দূরে থাক, জাতিকুল কিছুই রাখিতে পারিবে না।

প্রফুল্ল প্রায় কাঁদিয়া ফেলে, কিন্তু যে সাহসের গুণে এত বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছিল, সেই সাহসের উপর ভর করিয়া কহিল, "নিঃসহায় কিসে? আপনাকে আমি সহায় ধরিয়াছি।"

ভ। আমি তোমার সহায় হইলে তোমার সে সকল ভয় নাই বটে, কিন্তু

তুমি আমার কথা না শুনিলে আমি কি প্রকারে তোমার সাহায্য করিব?

প্র। আপনার কি কথা শুনিতে হইবে?

(প্রফুল্ল বড় ভীত হইয়াছে।)

ভ। আমি যাহা বলিব, তাহাই শুনিতে হইবে। আমি শপথ করিতেছি, আমি তোমাকে কখন অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিব না। যদি কখন কোন অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিই, তুমি আমার কথা শুনিও না। তাহা ভিন্ন আর যাহা বলিব, শুনিতে হইবে।

প্রফুল্ল কাঁদিতে লাগিল। ভবানী পাঠক বলিল,

"কাঁদ কেন মা?"

প্রফুল্ল চোখের জল মুছিল। বলিল, "আপনি আমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছেন,—আপনি যাহা বলিবেন, তাহা করিব।"

ভ। উভয়ে শপথ করিতে হইবে। কিন্তু সে পরে হইবে। আগে তোমার মঙ্গলার্থ, তোমাকে সৎপরামর্শ দেওয়া আমার উচিত। তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি—এ ধন তুমি গ্রহণ করিও না।

প্র। কেন?

ভ। তুমি অনাথা—এ ধন রক্ষা করিবে কি প্রকারে? ধনের জন্য সর্ব্বস্ব খোয়াইবে?

প্র। সেই জন্য আপনাদের সাহায্য খুঁজিতেছি। বৈরাগী এত দিন রক্ষা করিয়াছিল কি প্রকারে?

ভ। বৈরাগীর কথা স্বতন্ত্র। তুমি সুন্দরী যুবতী অনাথা—তুমি এ ধন লইয়া হয় বিপদে পড়িবে, নয়, পাপাচরণ করিয়া নরকে যাইবে।

প্র। ধনে পাপ?

ভ। হাঁ—যদি যথার্থ শ্রীকৃষ্ণে না অর্পণ কর।

প্র। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে?

ভ। সর্ব্বস্ব। যদি এ ধন গ্রহণ কর, তবে সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর।

প্র। সর্ব্বস্বই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিব—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কে? কোথায়? তিনি কি প্রকারে আমার এ ধন গ্রহণ করিবেন?

ভ। তুমি লেখাপড়া জান?

প্র। না।

ভ। তবে আজি তুমি লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ কর।

প্র। কে শিখাইবে?

ভ। আমি।

প্র। লেখা পড়া শিখিব কেন?

ভ। আমি তোমাকে দুই এক খানা গ্রন্থ পড়াইব?

প্র। তাহাতে কি হইবে?

ভ। শ্রীকৃষ্ণের ধন কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে দিতে হয় তাহা শিখিবে।

প্র। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণকে দিব—আমার ত কিছু নাই, আমি খাইব কি?

ভ। আমার বাড়ী দেখাইয়া দিব, প্রত্যহ তুমি সেখানে গিয়া ভিক্ষা করিও যাহা ভিক্ষা পাইবে, তাহাই খাইবে।

প্র। আপনার ধন থাকিতে ভিক্ষা করিয়া খাইব?

ভ। প্রফুল্ল মনে তুমি যদি এই ধন শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ না কর, তবে তিনি গ্রহণ করিবেন না। তিনি গ্রহণ না করিলে আমার দলের ডাকাইতেরা উহা বেবাক গ্রহণ করিবে।

প্র। শ্রীকৃষ্ণ কে? ঠাকুর ত মন্দিরে দেখি—তিনি ধন গ্রহণ করিবেন কি প্রকারে? তাঁর কি কিছু নাই?

ভ। তিনি জগদীশ্বর—সব তাঁর।

প্র। তবে তাঁর আমার ধনে প্রয়োজন কি?

ভ। লেখাপড়া শেখ—বুঝাইব। এখন কেবল এইমাত্র মনে থাকে যেন তুমি আমার মা। আমি তোমার ছেলে। আমি তোমাকে ভাল পরামর্শ বৈ মন্দ পরামর্শ দিব না।

প্র। আপনি কি সত্যসত্য ডাকাতি করিয়া থাকেন?

ভ। সত্যসত্যই। কিন্তু সে সকল কথা পরে হইবে।

প্র। কবে সে কথা বলিবেন?

ভ। যে দিন তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হইবে।

সিরাজ উদ্দৌলা।



বঙ্গরাজ্য কেন মুসলমানদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল ইহা যথাসাধ্য বুঝাইবার জন্য আমরা সিরাজ উদ্দৌলাকে উপলক্ষ্য করিয়াছি। তিনি তৎকালে কেবল নবাব ছিলেন বলিয়া যে, তাঁহার পরিচয় দিতেছি এমত নহে, তাঁহার পরিচয়ে আর সকল মুসলমানের পরিচয় হইবে ভাবিয়া আমরা তাঁহার কথা উত্থাপন করিতেছি। অন্য সকল মুসলমান প্রায় প্রত্যেকেই এক একটী সিরাজ উদ্দৌলা ছিলেন। যে সকল দোষ সিরাজ-উদ্দৌলায় ছিল, অন্য মুসলমানদেরও সেই সকল দোষ ছিল। অন্য মুসলমানেরা অন্যরূপ হইলে রাজ্য কখন যাইত না। সাধারণের চরিত্রগুণে রাজ্য হয়; সাধারণের চরিত্রদোষে রাজ্য যায়। রাজারা উপলক্ষমাত্র। ওয়াসিংটন সাহেব মারকিন দেশ স্বাধীন করিতে যে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার মূল হেতু তৎকালে মার্কিনেরা সকলেই এক

একটী ওয়াসিংটন ছিলেন। শিবজী মহারাষ্ট্র স্থাপন করিতে যে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহারও হেতু সেই। তিনি আধুনিক উড়িয়াদের ন্যায় কোন জাতি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া কখন মহারাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারিতেন না।

সিরাজ উদ্দৌলার দোষে রাজ্য যায় নাই। মুসলমানদের চরিত্র দোষে গিয়াছিল। সে সময়ে সর্ব্বগুণসম্পন্ন অন্য কেহ নবাব থাকিলেও সাধারণের চরিত্রদোষে রাজ্য যাইত। সাধারণচরিত্রের দোষগুণ সমাজ হইতে উদ্ভূত হয়। সমাজ যখন যেরূপ থাকে, লোকের চরিত্র তখন সেইরূপ হয়। সমাজ আমাদের প্রকৃত শিক্ষক। পাঠশালায় বা কালেজে আমরা যাহা শিখি, তাহাতে আমাদের দর্শন বৃদ্ধি হইতে পারে, বুদ্ধি মার্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে চরিত্র পরিশোধিত এবং পরিস্ফুটিত হইতে পারে কি না সন্দেহ। আমাদের দেশে এখন বিস্তর লোক কালেজের উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কল কৌশল অনেক বুঝিয়াছেন, দ্রব্যগুণ পদার্থগুণ বিলক্ষণ শিখিয়াছেন; কিন্তু স্বভাব সম্বন্ধে চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহারা অন্যাপেক্ষা যে, বিশেষ উন্নত হইয়াছেন, এরূপ ত বোধ হয় না। যে সকল ভদ্র সন্তান কখন কালেজে যান নাই, চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহারা যেরূপ, কালেজের এম. এ., বি. এরা সেইরূপ; প্রভেদ ত বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

না বলিয়া না কহিয়া সমাজ সকলকেই শিক্ষা দেয়। সকলেই তাহা অজানত গ্রহণ করে। কালেজের শিক্ষা কেহ পায়, কেহ পায় না। কিন্তু সমাজের শিক্ষায় কেহ বঞ্চিত হয় না। সকলকেই তাহা গ্রহণ করিতে হয়, ইচ্ছা করিলেও কেহ সে শিক্ষা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। যেখানে না বলিয়া শিক্ষাদান, আর, না জানিয়া শিক্ষাগ্রহণ, সেখানে অব্যাহতি কোথায়?

আর এক কথা। সমাজের শিক্ষা সকলেই সমান অংশে পাইয়া থাকেন; তাহাই তাহাদের চরিত্র একইপ্রকার হইয়া পড়ে, তবে প্রকৃতি অনুসারে কিছু ইতর বিশেষ হয় মাত্র, নতুবা মোটের উপর সমান। পাঞ্জাবিরা রণপ্রিয়, মারওয়ারিরা ধনপ্রিয়, অমুকদেশীরা সত্যপ্রিয় ইত্যাদি যে প্রবাদ আমরা নিত্য শুনি, তাহার এই কারণ।

এই সমান শিক্ষা এক পক্ষে বড় মঙ্গলদায়ক। ইহাদ্বারা জাতিবন্ধন দৃঢ় হয়। যত দিন ইউরোপে সমান শিক্ষা ছিল, তত দিন তথায় বিশেষ একতা দৃষ্ট হইত। এখন ইংলণ্ড বল, জার্ম্মণি বল, যে দেশ বল, আর কোন দেশে পূর্ব্বমত জাতিবন্ধন নাই। কালেজি শিক্ষায় তাহার অন্যথা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশেও তাহাই ঘটিয়াছে। কালেজি শিক্ষার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সমান শিক্ষা ছিল; জমিদার ও প্রজা, প্রভু ও ভৃত্য; ধনী ও দরিদ্র সকলের একরূপ

প্রকৃতি, একরূপ প্রবৃত্তি, একরূপ রুচি, একরূপ জ্ঞান, একরূপ সমস্ত ছিল। তাহাই তাঁহাদের সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ, আনন্দ, উৎসব একই কারণে জন্মিত। তখন বাঙ্গালিরা কেবল সমাজের শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেন। এখন বাঙ্গালায় কালেজি শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে কার্য্যকে সকলে দোষিতেন, বা যে উৎসবে সকলে মাতিতেন, কালেজি শিক্ষিতেরা হয়ত এখন সে দোষ অগ্রাহ্য করেন, সে উৎসবে উদাসীন থাকেন, এরূপ বৈষম্য এখন সকল দেশেই আরম্ভ হইয়াছে, এক সময় জর্ম্মণি দেশে ইহা অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সমাজ হইতে লোকের শিক্ষা, লোক হইতে সমাজের শিক্ষা। জল হইতে মেঘ, মেঘ হইতে আবার জল, বীজাঙ্কুরবৎ, বীজ না হইলে অঙ্কুর হয় না ; অঙ্কুর না হইলে বীজ হয় না।

সমাজ ভাল হইলে লোক যেমন ভাল হয়. সেইরূপ আবার লোক ভাল হইলে সমাজও ক্রমে ভাল হয়। কিন্তু লোক মন্দ হইলে সমাজ কোনক্রমে ভাল হয় না। লোক হইতে সমাজ। সুতরাং যেরূপ লোক, সেইরূপ সমাজ। কতকগুলি পয়সা একত্রিত হইলে, তাহা গোল স্তম্ভাকারে বা চক্রাকারে থাকিবে, ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণবিশিষ্ট স্তূপাকারে কখন থাকিবে না, কেহ চেষ্টা করিয়া তাহাদের সেরূপ আকারে সাজাইতে পারিবেন না। পয়সার কোণ নাই সুতরাং তাহার স্তূপ কোণবিশিষ্ট হইবে না ; যাহাতে যে গুণ নাই, তাহার সমষ্টিতে সে গুণ জন্মিতে পারে না। লোকেতে যে গুণ নাই, তাহাদের সমাজে সে গুণ কোথা হইতে আসিবে ?

আর এক কথা। প্রকৃতি সতত প্রবর্দ্ধক। এ জগতে যাহা কিছু আরম্ভ হয়, তাহাই বৃদ্ধি পায়। যখন পীড়া একবার আরম্ভ হয়, তখন তাহা ক্রমেই বাড়িতে থাকে ; যখন পীড়া আবার একটু হ্রাস পায়, তখন সেই হ্রাসই বৃদ্ধি পায়। যখন কোন দেহ জন্মে, তখন তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি হয়। যখন সেই দেহ জীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়, তখন সেই জীর্ণতাই বাড়িতে থাকে। সকল বিষয়েই বৃদ্ধিই নিয়ম, সুতরাং সমাজসম্বন্ধেও সেই নিয়ম। যখন সমাজ একবার উন্নত হইতে আরম্ভ হয়, তখন ক্রমে সেই উন্নতি বৃদ্ধি পায়। যখন সমাজ আবার অবনত হইতে আরম্ভ করে, তখন সেই অবনতি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বহু পূর্ব্ব হইতে মুসলমান সমাজের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল, সুতরাং ক্রমে তাহা বাড়িয়া আসিতেছিল।

আমরা বলিয়াছি যে, সমান শিক্ষা এক পক্ষে বড় মঙ্গলদায়ক ; তৎকালে বলা হয় নাই যে, সমান শিক্ষা আর এক পক্ষে বড় অনিষ্টকারক। যখন সমাজ মন্দ হইয়া পড়ে, তখন তাহার শিক্ষাও মন্দ হয়। সেই মন্দ শিক্ষা সকলে সমান অংশে পাইলে সমাজ অধঃপাতে যায়।

সিরাজউদ্দৌলার সময়ে তাহাই ঘটিয়াছিল।

বঙ্গরাজ্য কেন মুসলমানদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল বুঝিতে গেলে এই সকল সমাজের নিয়ম মোটামুটি স্মরণ রাখা আবশ্যক,তাহাই এই গুলির উল্লেখ করিলাম। আর গুটিকতকের উল্লেখ পরে আবশ্যকমত করিব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুর্সিদকুলি খাঁ যখন বাঙ্গালায় নবাব, এবং তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা, তখন দীনহীন একজন বৃদ্ধ মুসলমান দিল্লী হইতে কটকে আসিয়া সুজার অনুগ্রহপ্রার্থী হইলেন। পরিচয় লইয়া সুজা জানিলেন যে, বৃদ্ধ তাঁহার দূরসম্বন্ধী। অতএব তাঁহাকে যত্ন করিয়া আশ্রয় দিলেন। বৃদ্ধের দুই পুত্র ছিল, কনিষ্ঠ মহম্মদ আলি—তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, সুজাউদ্দীন অনুগ্রহ করিয়া সেই কনিষ্ঠ পুত্রকে একশত টাকা বেতনের একটী চাকুরী দিলেন।

কিছু দিন পরে মহম্মদ আলি আপনার জ্যেষ্ঠ হাজি আহাম্মদকে সপরিবারে কটকে আনাইলেন এবং চেষ্টা করিয়া ৫০ টাকা বেতনের এক চাকুরী তাঁহাকে দেওয়াইলেন। হাজি আহাম্মদের তিন পুত্র ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাদেরও এক একটী চাকুরী জুটিল। জ্যেষ্ঠ নওয়াজস মহম্মদের ৩০ টাকা, মধ্যম সইয়াদ আহাম্মদের ২০ টাকা,এবং কনিষ্ঠ জইনদ্দীনের ১৫ টাকা বেতন ধার্য্য হইল। কষ্ট ঘুচিল।

মহম্মদ আলি নানা কৌশলে প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। প্রভুও ক্রমে বিশেষ সদয় হইলেন। মহম্মদ আলির পরামর্শ অনুসারে তিনি সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময় মুরসিদকুলি খাঁর সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইল। সুজার পুত্র সরফরাজ খাঁ তাঁহার একমাত্র দৌহিত্র, সুতরাং সরফরাজ নবাব হইবেন স্থির হইল। কিন্তু সুজা তাহাতে আহ্লাদিত হইতে পারিলেন না, তিনি থাকিতে তাঁহার পুত্র নবাব হইবে ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। সুজা অবিলম্বে দিল্লীর দরবারে লোক পাঠাইলেন, এবং সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপঢৌকন দিলেন। পুত্র নবাবী না পায়, তাহা তিনি নিজে পান, এই তাঁহার প্রার্থনা। দিল্লীর বাদসা যাঁহাকে নবাবী সনদ দিতেন, তাঁহার দাবী লোকের নিকট ন্যায্য বোধ হইত; এই জন্য সুজা পূর্ব্বাহ্নে তথাকার সনদ আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। নতুবা যাহার সামর্থ্য ও সাহস আছে, তাহার এ সনদের প্রয়োজন হইত না। "জোর যার মুলুক তার" এই তখন সাধারণ নীতি ছিল।

মুরসিদকুলি খাঁর পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুতরাং সুজা আর

অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি সসৈন্যে মুরসিদাবাদ যাত্রা করিলেন। তথায় আসিয়া শুনিলেন মুরসিদকুলি-খাঁর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে, কাজেই তিনি চেহল সেতুন নামক রাজপুরী প্রবেশ করিয়া একায়েক সিংহাসনে বসিলেন, কেহ কোন আপত্তি করিল না। তাঁহার পুত্র সরফরাজ পিতাকে ভাঁড়াইবার নিমিত্ত যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গর্ব্ভধারিণী তাঁহাকে নিরস্ত করেন। এই ঘটনা বাঙ্গালা ১১৩১ সালে ঘটে।

সুজাউদ্দীন নবাব হইয়া পুত্রের উপর কোন অত্যাচার করেন নাই, এই তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা। মুসলমানদের মধ্যে যিনি যখন পিতা কিম্বা পুত্রের নবাবী বা বাদসাহী কাড়িয়া লইয়াছেন, তিনি তাহাকে হত্যা বা কারাবদ্ধ করিয়াছেন। সুজাউদ্দীনের আরও এইরূপ অনেক প্রশংসা আছে, তাহার এস্থলে উল্লেখ অনাবশ্যক।

তিনি নবাবী গ্রহণ করিলে পর দিল্লী হইতে সংবাদ আসিল যে আলি দৌরান —তথাকার উজির—আপনার নামে বাঙ্গালার নবাবী রাখিয়াছেন এবং সুজাউদ্দীনকে তাঁহার নায়েব স্বরূপ নবাবী কার্য্যের ভার দিয়াছেন। সুজা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া পত্র লিখিলেন। তদুত্তরে তাঁহার সনদ আসিল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার প্রিয়পাত্র মির্জা আলি মহাম্মদের নিমিত্ত খিলাত অর্থাৎ নূতন বস্ত্র এবং নূতন একটী নাম পৌছিল। নামটী আলিবর্দ্দি খাঁ। এই নামে মির্জ্জামহম্মদ আলি সাধারণতঃ পরিচিত। মুসলমানেরা নূতন বস্ত্র পাইলে বড় সন্তুষ্ট হইতেন, প্রায় সকলেই আপনাকে তাহাতে সম্মানিত মনে করিতেন। এক্ষণকার প্রথা স্বতন্ত্র হইয়াছে, বস্ত্র বক্‌সিস লইতে এখন সকলেই অপমানিত মনে করেন। তবে যাঁহারা রাজা মহারাজা হইবার প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; সাবেক প্রথা রক্ষার্থে রাজপ্রসাদ স্বরূপে নূতন বস্ত্র তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হয়।

আলিবর্দ্দির পুত্রসন্তান হয় নাই, কেবল মাত্র তিন কন্যা জন্মিয়াছিল। আবার এদিকে তাঁহার ভ্রাতা হাজির তিনটী পুত্র জন্মিয়াছিল। খোদা যেন কেবল ইহাদের বিবাহের নিমিত্ত এইরূপ একপক্ষে পুত্র একপক্ষে কন্যা বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। নবাব সুজাউদ্দীন এই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাহাদের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বিবাহও শীঘ্র সুসম্পন্ন হইয়া গেল। আলিবর্দ্দি ও হাজি আহাম্মদ পরস্পর সহোদর ছিলেন, এবার আবার বৈবাহিক হইলেন। সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইল। মুসলমানদের মধ্যে এরূপ বাঁধনের উপর বাঁধন আবশ্যক হইত।

চারি পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১১৩৬ সালে, বেহারের গবর্ণরি খালি হইল। সুজাউদ্দীনের স্ত্রী জিন্নৎ বেগম পরামর্শ

দিলেন যে, আলিবর্দ্দিকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়। সুজা আপনার সভাসদের মত গ্রহণ করিয়া আলিবর্দ্দিকেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

এই সম্বাদ দিল্লীতে প্রেরিত হইলে বাদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া আলিবর্দ্দি খাঁর নিমিত্ত আবার নূতন বস্ত্র ও আবার আর একটী নূতন নাম পাঠাইয়া দিলেন। আলিবর্দ্দির এ দুইয়ের কোনটীর অসংস্থান ছিল না, বস্ত্র নিশ্চয়ই তাঁহার যথেষ্ট ছিল এবং নামও তাঁহার দুই তিনটী জমিয়াছিল তথাপি এ সকল আবার পাইয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। ইহার উপর আবার আর এক সম্মান তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। তাঁহার পশ্চাতে নাগরা পিটাইবার হুকুম হইয়াছিল। পশ্চাতে কি অগ্রে নাগরা পিটাইলে মুসলমানদের তখন সম্মান বৃদ্ধি হইত।

এইরূপ নানা সম্মানে সম্মানিত হইয়া আলিবর্দ্দি খাঁ পাটনায় পৌঁছিলেন। সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যা ও জামাতা গেলেন। কিছু দিন পরে সেই কনিষ্ঠ কন্যা একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। আলিবর্দ্দির এই প্রথম দৌহিত্র জন্মিল, সুতরাং তাঁহার আহ্লাদের আর সীমা থাকিল না, তিনি আপনার অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন যে, সন্তানটী অবশ্য ভাগ্যধর হইবে। গণকেরাও তাহাই বলিল। আলিবর্দ্দি আরও আহ্লাদিত হইলেন। তিনি মনে বুঝিলেন যে, এই ভাগ্যধর ব্যক্তি তাঁহার "গরিব খানায়" জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া খোদা তাঁহাকে প্রদেশপতি করিয়াছেন। সুতরাং তিনি শিশুটীকে বড় যত্ন করিতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দি মনে মনে জানিতেন যে, তিনি নিজে বড় ভাগ্যবান্ এবং হয়ত ভাবিতেন যে, তাঁহার এই সৌভাগ্য মহম্মদ নামের গুণে হইয়াছে। অতএব শিশুটীর নাম মহাম্মদ রাখিলেন। তাঁহার নিজের নাম মহম্মদ আলি ছিল, শিশুরও নাম মহম্মদ আলি হইল। এই নাম করণেই লোকে কতকটা বুঝিল যে আলিবর্দ্দির ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন হইয়া গেল। এক দিন আলিবর্দ্দি স্বয়ং সকলকে বলিলেন যে, এই দৌহিত্রকে তিনি পোষ্য পুত্র লইবেন এবং ভবিষ্যতে ইহাকে তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়া যাইবেন। সুতরাং শিশুর প্রতি দুই এক জনের ঈর্ষ্যা জন্মিল। আলিবর্দ্দির জ্যেষ্ঠা কন্যা ভাবিলেন আমি থাকিতে আমার কনিষ্ঠা একা ভাগ্যধরী হইল—তাঁহার পুত্র সর্ব্বস্ব পাইবে, আর আমার পুত্র হইলে সে কিছুই পাইবে না; মধ্যমা কন্যা সেইরূপ ভাবিয়া মনে মনে বালকটীর অশুভাকাঙ্ক্ষিণী হইলেন। শিশুর শত্রু সচরাচর জুটে না, কিন্তু এই অভাগার জন্মমাত্রেই তাহা জুটিয়াছিল। অনেকে বুঝিয়া থাকিবেন এই অভাগাই সিরাজ উদ্দৌলা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যাঁহারা মনে করেন সদ্‌গ্রন্থ পড়াইয়া বালককে সচ্চরিত্রতা শিখাইবেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। গ্রন্থে যতই সদুপদেশ থাকুক বালকের তাহা অগ্রাহ্য। তাহারা সচ্চরিত্রের প্রশংসা করিবে, সদুপদেশ মুখস্থ রাখিবে। কিন্তু কার্য্যে তাহা একেবারে বিস্মৃত হইবে। বালকেরা চরিত্র দেখিয়া চরিত্র শিখে—পড়িয়া নহে, শুনিয়াও নহে। যাহাকে সর্ব্বদা দেখে, যাহাকে ভাল বাসে, বালকেরা তাহার অনুকরণ করে—আচারে ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকারে তাহার অনুকরণ করে। অনুকরণ আমাদের প্রথম শিক্ষা। বালকেরা সর্ব্বাগ্রে মাতা পিতাকে নিকটে পায়, অতএব সর্ব্বাগ্রে তাহাদের অনুকরণ করে। অনুকরণপ্রবৃত্তি বালকদের না থাকিলেও আর এক কারণে চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদের ন্যায় তাহাদের স্বভাব হইয়া পড়ে। বালকেরা যে সকল মনোবৃত্তির পরিচালনা সর্ব্বদা দেখে, সেই সকল বৃত্তি তাহাদের মনে আপনা আপনি উদ্দীপ্ত হয়। যেমন দেহ সম্বন্ধে অনেকে বলেন, হাই দেখিলে হাই আইসে, হাসি দেখিলে হাসি আইসে, সেইরূপ আবার মনসম্বন্ধেও আছে। শোক দেখিলে শোক আইসে, স্নেহ দেখিলে স্নেহ আইসে, রাগ দেখিলে রাগ আইসে। যে গুলি সর্ব্বদা বালকদের সম্মুখে পরিচালিত হয়, সেই গুলি বালকের অন্তরে সুতরাং সর্ব্বদা আইসে, যে বৃত্তি সর্ব্বদা পরিচালিত হয় সে বৃত্তি ক্রমেই পরিপুষ্টতা লাভ করে। এই জন্য নিষ্ঠুরপরিবেষ্টিত বালক নিষ্ঠুর হয়, প্রেমিকপরিবেষ্টিত বালক প্রেমিক হয়। এই জন্য আত্মীয়দের চরিত্র অনুসারে বালকের চরিত্র হয় এবং এইরূপে সমাজের চরিত্র অনুসারে লোকের চরিত্র হয়।

বুদ্ধিমানেরা বালকদের সম্মুখে অতি সাবধানে চলেন। গুরুজনের সম্মুখে লোকে যেমন দুষ্কার্য্য পরিহার করে, বুদ্ধিমানেরা সেইরূপ বালকের সম্মুখে দুষ্কার্য্য ও দুষ্প্রবৃত্তি দমনকরিতে চেষ্টা করেন। নির্ব্বোধেরা বালকদিগকে অগ্রাহ্য করে, তাহাদের সাক্ষাতে অনায়াসে আপন আপন দুষ্প্রবৃত্তি দর্শায়। তাহার পর, পরিণামে সন্তানের দুষ্প্রবৃত্তি দেখিলে তাহারা কেবল সন্তানের দোষ দেয়, সন্তান শাসন করিতে চেষ্টা করে। তাহারা বুঝে না যে, প্রথমে আপনাদের শাসন আবশ্যক ছিল। যে সকল দুষ্কার্য্য বালকেরা পিতাকে বা অন্য আত্মীয়কে করিতে দেখে নাই, কেবল মাত্র করিতে শুনিয়াছে, সে সকল দুষ্কার্য্যও তাহাদের চরিত্র গঠনের সহায়তা করে।

সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র বুঝিতে গেলে তিনি কি কি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহার আত্মীয়দের চরিত্র কিরূপ ছিল তাহার অনুসন্ধান করা উচিত। সিরাজউদ্দৌলাকে আলিবর্দ্দি প্রতিপালন করিয়া-

ছিলেন, সুতরাং সিরাজ উদ্দৌলার চরিত্র কিরূপ হওয়া সম্ভব, তাহা অনুভব করিতে গেলে প্রথমে সেই আলিবর্দ্দির চরিত্র আলোচনা করা আবশ্যক।

আলিবর্দ্দি যখন বেহারের গবর্ণর হন, তখন বিত্তিয়া, ভোজপুর, ও অন্যান্য স্থানের রাজারা এক প্রকার স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা নবাবকে কর দিতেন না। কর চাহিলে তাঁহারা যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইতেন। তাঁহাদের সৈন্যেরা বলিষ্ঠ ছিল এবং তাঁহারা স্বয়ংও যোদ্ধা-ছিলেন, সুতরাং আলিবর্দ্দি ইহা দেখিয়া একটু ব্যস্ত হইলেন। শেষ আবদুল করিম নামে একজন সুদক্ষ আফগান সৈনিককে পাইয়া আলিবর্দ্দির ব্যস্ততা গেল। অনেক কথা বার্ত্তা ও পরামর্শের পর, আবদুল করিম খাঁ বিদ্রোহী রাজাদের শাসন করিবার ভার গ্রহণ করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে কৃতকার্য্য হইয়া পাটনায় ফিরিয়া আসিলেন। আনন্দে আলিবর্দ্দি তাঁহাকে ক্রোড় দিয়া পুনঃ পুনঃ আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। তাহার পর একদিন কোন বিশেষ পরামর্শের ছলে আবদুল করিমকে আপনার গৃহের এক নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেলেন। মুসলমানের কেহ কাহাকে আপনার নির্জ্জন ঘরে লইয়া যাইতে পারিত না, লইয়া যাইতে চাহিলে বিপদ আশঙ্কা হইত। কিন্তু আবদুল করিম সে আশঙ্কা কিছু না করিয়া আলিবর্দ্দির সঙ্গে গেলেন। তথায় যাইবামাত্র তাঁহার পৃষ্ঠে তরবারির দুই তিন চোট পড়িল। আঘাত মাত্রেই আবদুল করিম পড়িয়া গেলেন, তৎক্ষণাৎ উঠিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু স্থূল দেহ প্রযুক্ত তাহা হঠাৎ পারিলেন না। এই অবসরে আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহাকে হত্যা করিলেন। আলিবর্দ্দি বলেন যে আবদুল করিম বড় বিয়াদব হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে হত্যা না করিলে আর চলিল না। কিন্তু প্রকৃত কারণ স্বার্থপরতা। আলিবর্দ্দি বুঝিয়াছিলেন যে, আবদুল করিম বড় উপযুক্ত, ইহার সন্ধান পাইলে নবাব যত্নপূর্ব্বক ইহাকে আপনার নিকটে রাখিবেন সকল কার্য্য ইহার দ্বারা পাইবেন তাহা হইলে আলিবর্দ্দির যে প্রতিপত্তি ছিল তাহা আর না থাকিবার সম্ভাবনা। সুতরাং সে সম্ভাবনা পূর্ব্বাহ্নে রহিত নিমিত্ত আবদুলকে হত্যা করা হইয়াছিল।

আর একটা ঘটনা বলি। ১১৪৫ সালে (1739) নবাব সুজা উদ্দীনের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র সরফারাজ খাঁ সিংহাসনে বসিলেন। সুজা উদ্দীনের সময় যে ব্যক্তি যে পদস্থ ছিলেন, সরফরাজ খাঁ তাঁহাদের প্রত্যেককে সেই পদে রাখিলেন, কাহাকেও বরখাস্ত বা বদলি করিলেন না। তাঁহার মোসাহেবেরা সুতরাং বড় ক্ষুণ্ণ হইল। কেহ কোন চাকরি পাইল না দেখিয়া তাহারা নবাবকে ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সরফরাজ খাঁ যখন দেখিলেন যে কেবল অর্থ বা আদরে তাহাদের আর

রাখা যায় না, তখন তিনি একে একে পূর্ব্ব কর্ম্মচারীদের পদচ্যুত করিয়া আপনার ইয়ারদের সেই সকল পদ দিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে আলিবর্দ্দির জ্যেষ্ঠ হাজি আহাম্মদের কার্য্য গেল। সরফরাজ খাঁ মনে করিয়াছিলেন তাঁহার পিতার নিকট হাজি আহাম্মদ নানা বিষয়ে ঋণী ছিলেন। সুতরাং কস্মিন-কালে তিনি কৃতঘ্ন হইতে পারিবেন না। কিন্তু পদচ্যুত হইবা মাত্র হাজি আহাম্মদ সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে গোপনে দল বাঁধিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সরফরাজ খাঁর তাহা কিছুই সন্দেহ না করিয়া আপনার নবাবী উপভোগ করিতে লাগিলেন। সুখের নিমিত্ত নবাবী। অতএব যাহাতে সুখ হয়, সরফরাজ খাঁ তাহাই করিতে লাগিলেন। কখন যুবাপরিবেষ্টিত হইয়া যুবতীর নৃত্য দেখেন, কখন সুন্দরীর সঙ্গীতে উন্মত্ত হইয়া "পেয়ালা পেয়ালা" সরাব খান। হাজি আহাম্মদ এই সময় আলিবর্দ্দিকে পত্র লিখিলেন যে, সরফরাজ খাঁ "আয়েস" লইয়া মাতিয়াছেন, রাজকার্য্যে তাঁহার মনযোগ নাই অতএব এই এক সময়। আলিবর্দ্দি পূর্ব্বেই ইহা বুঝিয়াছিলেন, সরফরাজ খাঁকে হত্যা করিয়া আপনি নবাব হইবেন, এ সাধ তাঁহার মনে মনে ছিল; কেবল সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন। দিল্লীর দরবারে লোক পাঠাইয়াছিলেন। বেহার অঞ্চলের দুই এক জন রাজাকে শাসন করিবার ছলে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন, এমত সময়ে হাজি আহাম্মদের পত্র আসিল, কিন্তু আলিবর্দ্দি তাহার কোন উত্তর দিলেন না। হাজি আহাম্মদ আর এক সুর ধরিলেন। তিনি আলিবর্দ্দিকে আবার লিখিলেন যে সে দিবস জগৎ শেটের পুত্রবধূকে সরফরাজ খাঁ আপনার অন্দরে লইয়া গিয়াছিলেন, এবার আমাদের পরিবারের উপর হস্ত বাড়াইবার উপক্রম করিয়াছেন; সম্প্রতি ধরিয়াছেন যে আমাদের ভাগিনেয়ীর সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিবেন। তিনি বিলক্ষণ জানেন যে আমাদের ভাগিনেয়ীর সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। জানিয়া শুনিয়া এ চেষ্টা কেবল আমাদের কুলে কলঙ্ক ঘটাইবার নিমিত্ত।

এবার আলিবর্দ্দি আক্ষেপপূর্ণ এক পত্র সরফরাজকে লিখিলেন। তদুত্তরে সরফরাজ জানাইলেন যে "আমার কোন দোষ নাই, তোমাদের সহিত আত্মীয়তা দীর্ঘস্থায়ী করিবার আকাঙ্ক্ষায় আমি এই বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কন্যাটী যে বাক্‌দত্তা তাহা আমি জানিতাম না।"

আলিবর্দ্দি এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি একবার ওজর পাইয়াছেন আর তাহা ছাড়িতে পারিলেন না। অতএব সসৈন্যে মুরসিদাবাদ যাত্রা করিলেন। সরফরাজ খাঁ এ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইলেন।

পথিমধ্যে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। আলিবর্দ্দি দূতের দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সরফরাজ খাঁ সকল অপরাধ ভুলিয়া গেলেন, আত্মীয়তার অনুরোধে আলিবর্দ্দিকে রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। আলিবর্দ্দি নিমন্ত্রণ আহ্লাদ পূর্ব্বক স্বীকার করিলেন। সরফরাজ খাঁর শিবিরে এখানে সেখানে আহারের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র মহোৎসব পড়িয়া গেল। সকলে অন্যমনস্কে আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল, এমত সময় আলিবর্দ্দি সসৈন্যে অন্ধকারে হঠাৎ আসিয়া শিবির আক্রমণ করিল, ভয়ে সকলে কে কোথায় পলাইতে লাগিল। সরফরাজখাঁ একা যুদ্ধে বাহির হইলেন, এক হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বেগে বিশ্বাসঘাতকের দিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু আলিবর্দ্দি পূর্ব্বাহ্নে ষড়যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। সরফরাজখাঁকে হত্যা করিবার জন্য আর যুদ্ধের প্রয়োজন হইল না। একটী গুলিতে তিনি হস্তিপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন।

সরফারাজ খাঁকে হত্যা করিয়া আলিবর্দ্দি নবাব হইলেন, কেহ তাহাতে আপত্তি করিল না, কেহ তাঁহাকে অশ্রদ্ধাও করিল না। তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা মুসলমানের চক্ষে দোষ বলিয়া গণ্য হইল না। তখন মুসলমানেরা সকলেই স্বার্থপর; যে গতিকে হউক তাহারা আপন আপন ইষ্টসাধন করিতে পারিলেই প্রশংসাভাজন হইতেন। আলিবর্দ্দি দীনহীন অবস্থা হইতে ক্রমে নবাব হইলেন সুতরাং স্বার্থপর দলে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা হইল। তিনি অদ্বিতীয় লোক বলিয়া সকলে তাঁহাকে ভক্তি ও ভয় করিতে লাগিল।

সরফরাজ খাঁর গৃহ লুঠ করিয়া আলিবর্দ্দি বিস্তর অর্থ পাইলেন। তাহার মধ্যে এক কোটী সত্তর লক্ষ টাকা তিনি দিল্লীর বাদসাকে নজর পাঠাইলেন। বাদসা সেই টাকা পাইয়া আলিবর্দ্দিকে সনদ দিলেন কিন্তু বলিলেন "আরও টাকা পাঠাইবে, সরফরাজ খাঁর বিস্তর টাকা ছিল, মুর্শিদকুলি খাঁ বহুকালাবধি দৌহিত্রের নিমিত্ত টাকা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছিল।" আলিবর্দ্দি আবার টাকা পাঠাইলেন। তাহার পর আলিবর্দ্দি আপনার নবাবী গৌরব দেখাইবার নিমিত্ত এবং তাহা দেখাইয়া নিজে সুখ উপভোগ করিবার নিমিত্ত সুজা উদ্দীনের কন্যাকে আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যার দাসী * করিয়া দিলেন।

* ওই একজন ইতিহাসলেখক বলেন যে সুজার কন্যা দাসীভাবে রক্ষিতা হন নাই; তিনি সংসারের কর্ত্রীস্বরূপা ছিলেন। বৃথা কথা। আলিবর্দ্দির জামাতা সুজার কন্যাটীকে দাসী মনে করিতেন না সত্য, কিন্তু তাহা কেবল সেই

আলিবর্দ্দীর নীচ প্রকৃতি ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে আর একটী পরিচয় দিই, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। আলিবর্দী যখন নবাব তখন বর্গিদের বড় দৌরাত্ম্য হয়। তাহারা চৌথ চাহে, আলিবর্দী তাহা দিতে অসম্মত হন এই জন্য বিবাদ। বিরাটপতি রঘুজি আপনার সৈন্যাধ্যক্ষ ভাস্কর পণ্ডিতকে এই জন্য পাঠান। ভাস্কর পণ্ডিত এক একবার অল্পসংখ্যক সেনা আনিয়া আলিবর্দীকে নানা স্থানে পরাভব করেন, নানা প্রদেশ দখল করেন। একবার বিংশতি সহস্র সেনা লইয়া ভাস্কর পণ্ডিত কাটওয়ার নিকট শিবির স্থাপন করিলেন। আলিবর্দী ভাবিলেন এবার বিশ্বাসঘাতকতা ভিন্ন আর উপায় নাই, অতএব আপনার কর্ম্মচারিদের সহিত পরামর্শ করিয়া ভাস্কর পণ্ডিতের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি চৌট দিতে প্রস্তুত আছেন; তবে কত দিতে হইবে, কি প্রকারে দিতে হইবে তাহা সাক্ষাৎ ভিন্ন মীমাংসা হইবে না। ভাস্কর পণ্ডিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকার করিলেন এবং পর দিবস প্রাতে পাঁচ সাতজন প্রধান কর্ম্মচারি সমভিব্যাহারে আলিবর্দ্দীর শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আলিবর্দী অগ্রসর হইয়া মহা সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেলেন, তথায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহার নাম ভাস্কর পণ্ডিত? সে বীর পুরুষকে দেখিয়া আমি চক্ষু সার্থক করি" এই কথায় ভয়ঙ্কর পণ্ডিতকে একজন দেখাইয়া দিল। অমনি ইঙ্গিতমাত্র পটের পার্শ্ব হইতে শত শত অস্ত্রধারী নিমেষ মধ্যে বহির্গত হইয়া ভাস্কর পণ্ডিতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

এই বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দ্দীর চরিত্র দেখিয়া সিরাজ উদ্দৌলার চরিত্র গঠন হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

বিবাহের বয়স এবং উদ্দেশ্য।

এখন যেমন এ দেশে প্রায় দশ হইতে কুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যে পুরুষের বিবাহ হইয়া যায়, বোধ হয় প্রাচীন ভারতে সেরূপ হইত না। পূর্ব্বকালে উপনয়নের পর সুদীর্ঘকাল গুরুগৃহে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পত্নীগ্রহণ করত গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবার রীতি ছিল। মনুর ব্যবস্থা এই :—

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং
গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা
গ্রহণান্তিকমেব বা॥

বেদানধীত্য বেদৌ বা
বেদং বাপি যথাক্রমং।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো
গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ ॥ (৩অ ১৩২)

ব্রহ্মচারী তিন বেদ শিক্ষার নিমিত্ত গুরুকুলে ছত্রিশ বৎসর এবং আবশ্যক হইলে ততোধিক কাল, অথবা তাহার অর্দ্ধকাল কিম্বা তাহার এক-চতুর্থাংশ কাল বাস করিবে। এইরূপে নিজ বেদ-শাখা শিক্ষা করিয়া, তিনটি, দুইটি বা একটি ভিন্ন বেদশাখা শিক্ষা করিবে। অনন্তর ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

অতি উত্তম ব্যবস্থা। ব্রতাবলম্বীর ন্যায় নিষ্ঠাবান্ হইয়া বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি উন্নত শাস্ত্র সকলের মর্ম্মগ্রহণ করত জ্ঞানবান্ ও বিদ্যানুরাগী হইয়া বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ করিবার আগে ধন সঞ্চয় কর আর নাই কর, জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, এ নিয়ম এখন প্রচলিত নাই; সুতরাং এখন দশ বল, এগার বল, বার বল, সকল বয়সেই পুরুষের বিবাহ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে তাহা হইতে পারিত না। এখনকার ন্যায় তখন বিবাহ সখের খেলা ছিল না, মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী ছিল। কাজেই শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া বিবাহ করিতে বয়স বেশী হইত। মনু বলেন :—

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং
হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা
ধর্ম্মে সীদতি সত্বর ॥ (৯অ-৯৪)

ত্রিশ বৎসরের পুরুষ মধুরদর্শনা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। চব্বিশ বৎসরের পুরুষ আট বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে। ইহা সামান্যতঃ উদাহরণ মাত্র। ফলে, পুরুষের বয়স কন্যার বয়সাপেক্ষা প্রায় তিন গুণ হওয়া চাই। তবে যদি গৃহস্থাশ্রমের হানি হয়, তাহা হইলে আরো সত্বর বিবাহ করিতে পারিবে।

পুরুষ অধিক বয়সে বিবাহ করিবে, কিন্তু স্ত্রীর বিবাহ শৈশবাবস্থাতেই সম্পন্ন হওয়া চাই। প্রথম ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ না হইলে কন্যার পিতৃকুলের উপরনীচে চৌদ্দ পুরুষ নরক-গামী হইবে—শাস্ত্রকারদিগের এমনি কঠিন শাসন। কি জন্য তাঁহারা পুরুষের বিবাহের নিমিত্ত অধিক বয়স এবং কন্যার বিবাহের নিমিত্ত অল্প বয়স ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রায় যে একেবারে বুঝিতে পারা যায় না এমন নয়। শাস্ত্রে এমন অনেক কথা আছে, যাহা একটু বুঝিয়া দেখিলে এইরূপ ব্যবস্থার তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়। সে তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পারিবারিক প্রণালী এখানকার পারিবারিক প্রণালীর মত নয়। এখানে যাহাকে একান্ন-

বর্ত্তী পরিবার বলে, ইংলণ্ডে তাহা নাই। ইংলণ্ডে শুধু পতিপত্নী লইয়া পরিবার। এখানে পিতা, মাতা, খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত, ভাই, ভগিনী, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, প্রভৃতি লইয়া পরিবার। কাজেই ইংলণ্ডে পত্নীর একমাত্র সম্বন্ধ, পতির সহিত। এখানে যতগুলি লোক লইয়া পরিবার, পত্নীর ততগুলি সম্বন্ধ, বা ততগুলি লোকের সহিত সম্বন্ধ। যাহার একটি লোকের সহিত সম্বন্ধ তাহার কার্য্য এবং কর্ত্তব্যের সংখ্যা অল্প; যাহার অনেক লোকের সহিত সম্বন্ধ তাহার কার্য্য এবং কর্ত্তব্যের সংখ্যা অধিক। অতএব যাহার একটি লোকের সহিত সম্বন্ধ, তাহার শিক্ষার বিষয় কম এবং যাহার অধিক লোকের সহিত সম্বন্ধ, তাহার শিক্ষার বিষয় বেশী। এই দুইটি শিক্ষার প্রকৃতিও এক নয়। যাহার শুধু পতির সহিত সম্বন্ধ, সে প্রেমের বলে অনেক কর্ত্তব্য সহজেই শিখে ও সম্পন্ন করে। যাহার অপরের সহিত সম্বন্ধ সে প্রেমের সহায়তা পায় না, তাহাকে কেবল পারিবারিক প্রণালীর অনুরোধে অনেক কর্ত্তব্য কষ্ট করিয়া শিখিতে এবং সম্পন্ন করিতে হয়। অল্প বয়স হইতে পতির পরিবারে থাকিয়া এই শিক্ষা লাভ না করিলে, এ শিক্ষা প্রায়ই লাভ করা যায় না। এ শিক্ষা লাভ না করিয়া অধিক বয়সে পতির পরিবারে আগমন করিলে, বয়োধর্ম্ম বশতঃ শুধু পতির প্রতি স্ত্রীর এতই অনুরাগ হয় যে, অপরের প্রতি পারিবারিক নিয়মানুসারে কর্ত্তব্য সাধন করিতে সে নিতান্তই অক্ষম হইয়া পড়ে। আরো এক কথা। যাহার শুধু পতির সহিত সম্বন্ধ, সে শুধু পতির মনের মত হইলেই চলে। কিন্তু যাহার অপরের সহিত সম্বন্ধ, তাহাকে অনেকের মনের মত হওয়া চাই। কিঞ্চিৎ রূপ, কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্য, কিঞ্চিৎ হাবভাব থাকিলে পত্নী পতির মনের মত হইতে পারে; কিন্তু অপরের মনের মত হইতে হইলে, সে সব গুণ কার্য্যকর হয় না, অপরের দ্বারা গঠিত বা শিক্ষিত হইলেই ভাল হয়। সে রকম শিক্ষা অল্প বয়সে যত কার্য্যকর হয়, বেশী বয়সে তত হওয়া অসম্ভব। ফল কথা, যাহাকে অনেকের মনের মত হইতে হইবে, অনেকের তাহাকে মনের মত করিয়া লওয়াই প্রকৃত পদ্ধতি। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির সহিত পত্নীর কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বুঝিতেন এবং বুঝিয়া সেই সম্বন্ধ যাহাতে সুখের সম্বন্ধ হয়, এইরূপ কামনা করিতেন। বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটি দেখিতে পাওয়া যায়:—

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব
সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব
ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞী ভব
সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।

বর কন্যাকে বলিতেছেন;—শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূজনে সম্রাজ্ঞী হও,

ননন্দার সম্রাজ্ঞী হও, দেবর সকলে সম্রাজ্ঞী হও।

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, সম্রাজ্ঞী যেমন প্রজাবর্গের সেবা করিয়া তাহাদিগকে সুখে রাখেন, কন্যা তেমনি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ননন্দা, দেবর প্রভৃতির সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে সুখে রাখুন।

বিবাহ প্রক্রিয়ায় ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে যে, বর নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র পড়াইয়া কন্যাকে ধ্রুব নক্ষত্র দেখাইবে ;—

"ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং
পতিকুলোভূয়াসম্।

হে ধ্রুবনক্ষত্র! তুমি যেমন অচল, আমি যেন তেমনি পতিকুলে অচলা হই।

উভয় মন্ত্রেরই তাৎপর্য্য এই যে, পত্নীর পতির পরিবারে সকলের সহিত সুখ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কেন না, তাহা না হইলে তিনি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর প্রভৃতি কাহারো প্রীতিপ্রদায়িনী এবং পতিকুলে অচলা হইতে পারেন না।

ইংরাজপত্নীর যেমন একটি মাত্র সম্বন্ধ, হিন্দুপত্নীর তেমন নয়। হিন্দুপত্নীর বহুবিধ সম্বন্ধ। দেখা গেল যে, হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুপত্নীকে সেই বহুবিধ সম্বন্ধের উপযোগী করিতে উৎসুক। অতএব এক রকম নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পতিকুলের জটিল এবং বহুবিধ সম্বন্ধ ভাবিয়া হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুস্ত্রীর শৈশববিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে কেমন করিয়া শৈশব বিবাহের নিন্দা করি?

হিন্দুপত্নীর যে সকল সম্বন্ধের কথা বলিলাম, তাহা ছাড়া তাহার আর একটি সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ পত্নী মাত্রেরই আছে ; কেন না তাহা পতির সহিত সম্বন্ধ। কিন্তু বোধ হয় যে, পতির সহিত হিন্দুপত্নীর সম্বন্ধ যে প্রকৃতির, অন্য কোন দেশীয় পত্নীর সে প্রকৃতির নয়। অন্যদেশে পত্নী পতির সমান। সেই সমানত্বে যতই কেন নৈকট্যের ভাব থাকুক না, তাহাতে পার্থক্যের ভাব এক কালীন বিলুপ্ত নয়। ফলতঃ পার্থক্য ব্যতীত সমানত্ব অসম্ভব। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে লোক সাধারণ এবং পণ্ডিতমণ্ডলী উভয়েই পতি এবং পত্নীর সমানত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের পার্থক্যমূলক পৃথক পৃথক স্বত্ব কল্পনা করিতে ও সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতেই বিশেষ উৎসুক ও যত্নবান হইয়া থাকেন। ইংরাজ পতি এবং পত্নীর প্রত্যেক কার্য্যে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। মিল প্রভৃতি দার্শনিকদিগের গ্রন্থে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং মহাকবি শেলির *Revolt of Islam* নামক কাব্যে এবং কতিপয় গদ্যে রচিত প্রবন্ধে এই কথার সর্ব্বাপেক্ষা জাজ্জল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এ দেশের লোকের সংস্কার সে রকম নয়। এ দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী পতি এবং পত্নীকে একটি ব্যক্তি মনে করেন। তাঁহাদের মতে বিবাহের উদ্দেশ্য এই যে, অসম্পূর্ণ পুরুষ, স্ত্রীর সহিত মিলিত

হইয়া একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি হইবেন। মনু বলেন ;—

এতাবানেব পুরুষো
যজ্জায়াত্মা প্রজেতিহ
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্‌যো
ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥ (৯ অ ৪৫)

পুরুষ বলিলে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে—জায়া, আত্মা ও অপত্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে, ভর্ত্তা ও ভার্য্যা এই দুয়ের নামই পুরুষ।

হিন্দু-বিবাহ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যও সেই একত্ব সাধন। যথা—

ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ
সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা
সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥

বর কন্যাকে বলিতেছেন:—বিশ্বদেবগণ আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন। জল সকল, প্রাণবায়ু,* প্রজাপতি, উপদেষ্ট্রী দেবতা, ইহাঁরা আমাদের উভয়ের হৃদয় একীভাবে সংযুক্ত করুন।

আর একটি মন্ত্রে বর কন্যাকে বলিতেছেন :—

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনু চিত্তং তেঽস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব প্রজাপতি নিযুনক্তু মহ্যম্।

তুমি আমার কার্য্যে হৃদয় সমর্পণ কর, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামী হউক, একতান মনে আমার বাক্য সেবা কর, প্রজাপতি তোমাকে আমার নিমিত্তই নিযুক্ত করুন।

বর বিবাহ সমাপনে অন্ন ভোজনকালে বধূকে কহিতেছেন :—

ওঁ অন্নপাশেন মণিনা
প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা।
বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা
মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে॥

অর্থাৎ—যাহা মহারত্ন আত্মা স্বরূপ, যাহা প্রাণের বন্ধনস্বরূপ, সত্য যাহার গ্রন্থি স্বরূপ, সেই স্বর্গীয় অন্নরূপ পাশে তোমার চিত্ত, বুদ্ধি ও অন্তরাত্মাকে বন্ধন করিলাম।

আর একটি মন্ত্রে বর কন্যাকে বলিতেছেন ;—

ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব
তদস্তু হৃদয়ং মম,
যদিদং হৃদয়ং মম
তদস্তু হৃদয়ং তব।

এই যে তোমার হৃদয় তাহা আমার হৃদয় হউক, এই যে আমার হৃদয়, ইহা তোমার হৃদয় হউক।

কিন্তু শাস্ত্রকারেরা শুধু হৃদয়ের মিশ্রণে পরিতৃপ্ত নন। তাঁহারা সম্পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন মিশ্রণের অভিলাষী। সেই জন্য বর কন্যাকে বলিতেছেন ;—

প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্।

প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে মাংসে মাংসে এবং চর্ম্মে চর্ম্মে এক হউক।

* ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব নামক গ্রন্থে হলায়ুধ মাতরিশ্বা শব্দের প্রাণবায়ু অর্থ করিয়াছেন।

সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, পতি পত্নীর এরূপ মিশ্রণ, এরূপ একীকরণ পৃথিবীতে আর কোন জাতি কল্পনা করে নাই। হিন্দু-বিবাহে স্ত্রী এবং পুরুষের পার্থক্য বিনষ্ট হইয়া একত্ব সম্পাদিত হয়—স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পরে মিশিয়া যায়। সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, তখন আমরা দুইটি ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করি। সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়, তখন কেবল একটি ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, বায়ু যেমন বায়ুতে মিশিয়া যায়, দেহ দগ্ধ হইলে যেমন পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, অগ্নিশিখা যেমন অগ্নিশিখাতে মিশিয়া যায়, আত্মা যেমন পরমাত্মায় মিশিয়া যায়, তখন পুরুষ তেমনি স্ত্রীতে এবং স্ত্রী তেমনি পুরুষে মিশিয়া গিয়াছে। এমনি মিশিয়া গিয়াছে যে ২, আর ২ নাই—১ হইয়া গিয়াছে। যে ১, ২ হইয়াছিল, সেই ২ আবার ১ হইয়া পড়িয়াছে। স্বয়ম্ভু নিজ দেহ যে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই দুইখণ্ড মিলিয়া এবং মিশিয়া আবার সেই এক স্বয়ম্ভু প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে*। হিন্দুধর্ম্মে স্বয়ম্ভু ও যা, মুক্তিও তা। হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্যও মুক্তি। তাই হিন্দু বিবাহে স্ত্রী এবং পুরুষ মিশিয়া একটি মুক্তি অথবা স্বয়ম্ভুর সৃষ্টি হয়। স্ত্রী এবং পুরুষের মুক্তি অথবা পারলৌকিক সদ্গতি লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও এই বিবাহ-নিষ্পন্ন অপূর্ব্ব একত্বমূলক। তাঁহারা বলেন, "স্বামীর সুকৃতিতে স্ত্রী স্বর্গগামিনী হয়েন এবং স্ত্রীও স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস করেন†।" পত্নীর ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন ;—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্‌যজ্ঞোন
ব্রতং নাপ্যুপোষিতঃ।
পতিং শুশ্রূষতে যেন
তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥ (৫অ-১৫৫)

স্ত্রীদিগের পৃথক যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস নাই ; স্ত্রী কেবল পতি-শুশ্রূষা করিয়াই সুরলোকধন্যা হয়েন।

এবং পতির ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে ;—

(১) পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু।

অর্থাৎ, ভার্য্যা ধর্ম্মকার্য্যে পতির পিতা অর্থাৎ মহাগুরু।

(২) দারাঃ পরা গতিঃ।

অর্থাৎ, ভার্য্যা পতির পরম গতি।

(৩) এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্
পাণিগ্রহণমিষ্যতে।
যদাপ্নোতি পতির্ভার্য্যা
মিহলোকে পরত্র চ ॥

* "নারায়ণ বা ব্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবাহের পর আবার সেই দুই শরীর এক হইয়া যায়"—হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতমহিলা নামক পুস্তকের ৩৯ পৃষ্ঠা।

† ঐ পুস্তকের ঐ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ, ভার্যা শুধু ইহকালের জন্য নয়, ইহকাল ও পরকালের জন্য ; এই কারণেই বিবাহের বিধি হইয়াছে।

(৪) রতিং প্রীতিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ
তাস্বায়ত্ত মবেক্ষ্য হি।

অর্থাৎ মনুষ্যের রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম ভার্য্যারই আয়ত্ত।

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দুশাস্ত্র মতে পতি এবং পত্নী, উভয়ে মিলিয়া একটি ব্যক্তি—উভয়ের এক দেহ, এক চিত্ত, এক হৃদয়, এক উদ্দেশ্য, এক কর্ম্ম, এক স্বর্গ, এক নরক। আবার বলি, পতি পত্নীর এমন সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গীন একত্ব আর কোন জাতি কল্পনাও করে নাই। একত্বের ন্যায় অপূর্ব্ব কবিত্ব জগতে কমই আছে। সঙ্গীতময় বিশ্বমণ্ডল যেমন কবিত্ব এও তেমনি কবিত্ব। ভারতে বলিয়া এ কবিত্ব মানুষের জীবন প্রণালীতে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দেশে কদাচিৎ কখন কোন ক্ষণজন্মা কবির কেবল মাত্র আকাঙ্ক্ষায় থাকে, যথা শেলি :—

"We shall become the same, we shall be one
Spirit within two frames, oh! wherefore two?
One passion in twin-hearts, which grows and grew,
Till like two meteors of expanding flame,
Those spheres instinct with it become the same.
Touch, mingle, are transfigured; ever still
Burning, yet ever inconsumable:
In one another's substance finding food,
Like flames too pure and light and unimbued
To nourish their bright lives with baser prey.
Which point to Heaven and cannot pass away:
One hope within two wills, one will beneath
Two overshadowing minds, one life, one death,
One Heaven, one Hell, one immortality,
And one annihilation."

(Epipsychidion)

এ খুব চমৎকার একত্ব বটে। কিন্তু হিন্দু-দম্পতির একত্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কবির একত্ব শুধু হৃদয়ের, হিন্দু-দম্পতির একত্ব হৃদয়ের এবং কর্ম্মের। কবির একত্ব শুধু অন্তর্জগৎ লইয়া, হিন্দু দম্পতির একত্ব অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ দুই লইয়া। কবির একত্বের সঙ্গীত নির্জ্জন নীরব স্থানে ভিন্ন শুনিতে পাওয়া যায় না, গোলমালে সে সঙ্গীত ভাসিয়া যায়। হিন্দু-দম্পতির একত্বের সঙ্গীত

পৃথিবীর সুপ্রশস্ত কোলাহলময় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যকে একতানে বাঁধিয়া ফেলে। কবির একত্ব poetic; হিন্দু দম্পতির একত্ব cosmic। কবির একত্ব lyric; হিন্দু দম্পতির একত্ব dramatic। নাটকে গীত থাকে, কিন্তু গীতে নাটক থাকে না। হিন্দু দম্পতির একত্বই উৎকৃষ্ট একত্ব।

কিন্তু পত্নীকে পতিতে এত মিশাইয়া দিতে হইলে পতির পত্নীকে গড়িয়া লওয়া আবশ্যক। পতি নিজে যেমন, তাঁহার পত্নীকে তেমনি করিয়া লওয়া চাই। তিনি নিজে যে প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহেন, তাঁহার পত্নীকে সেই প্রণালীর পক্ষপাতী করিয়া তোলা চাই। পত্নী পতি-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হওয়া চাই। কিন্তু সৃষ্টিকার্য্য গোড়ায় ভিন্ন হয় না। পরকে সর্ব্ব রকমে আপনার করিতে হইলে, পরের সর্ব্বস্ব আপনার হাতে রাখা চাই, পরের দেহ বল, মন বল, হৃদয় বল, আত্মা বল, সকলই আপনার হাতে রাখা চাই। কিন্তু পরের বয়োধিকা হইলে তাহার সর্ব্বস্ব আপনার হাতে পাওয়া যায় না। সন্তানকে আপনার মনের মত করিতে হইলে, তাহার শৈশবাবস্থা হইতেই পিতা তাহার শিক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। মনের মত চেলা করিতে হইলে, মহান্ত বালক দেখিয়া চেলা নিযুক্ত করেন। পশুশাবক যেমন পোষ মানে, বড় পশু তেমন পোষ মানে না। রাম সীতাকে বনে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়া ভাবিতেছেন :—

> শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াম্
> সৌহৃদাদপৃথগাশয়ামিমাম্।
> ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে
> সৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব॥
>
> (উত্তরচরিত)

বাল্যকাল হইতে প্রিয়াকে পোষণ করিয়াছি; এমনি প্রণয় যে আমার হৃদয়ের যে ভাব, তাঁহার হৃদয়েরও সেই ভাব, কোন ভেদ নাই। তাঁহাকে আজ কি না ছল করিয়া মৃত্যুর হস্তে দিতেছি, যেন কসাই হইয়া গৃহপালিতা পক্ষিণীটিকে বধ করিতেছি।

ফলতঃ যাহাকে আপনাতে মিশাইতে হইবে, যাহার কিছুই আপনা হইতে পৃথক থাকিবে না, তাহাকে গোড়া হইতেই আপনাতে মিশাইতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য, তাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত আশা এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষা আপনার অভিলাষানুযায়ী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যাহাকে এই কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে তাহার জ্ঞানবান, বিদ্যাবান এবং পরিণতবয়স্ক হওয়া চাই, এবং যাহাকে এই রকম হাতে হাতে মিশিতে হইবে, তাহার শিশু হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতে পুরুষের বিবাহের বয়স বেশী, স্ত্রীর বিবাহের বয়স কম। হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের

ব্যবস্থা কি অমূলক, অর্থহীন, না অনিষ্টকর? ব্যবস্থা যে অমূলক বা অর্থহীন নয়, তাহা এক রকম বুঝাইলাম। অনিষ্টকর কি না, তাহাই এখন বুঝাইব।

স্ত্রী এবং পুরুষকে মিশিয়া যদি চিরকালের জন্য একটি ব্যক্তি হইতে হয়, তাহা হইলে শৈশবাবস্থা হইতে স্ত্রীকে পুরুষের শিক্ষাধীন থাকিতে হইবে, এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। অতএব বিবাহের বয়স সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা অনিষ্টকর কি না, এ প্রশ্নের প্রকৃত অর্থ এই যে, বিবাহের দ্বারা স্ত্রীপুরুষের যে একত্ব সম্পাদিত হয়, তাহা ভাল কি মন্দ? দুইটি ব্যক্তিকে যদি একটি কর্ম্ম করিতে হয়, তবে তাহারা এক-মন এক-প্রাণ হইলেই কর্ম্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক জনের কম অনুরাগ বা কম যত্ন হইলে কর্ম্মটিও সুসম্পন্ন হয় না এবং দুই জনের মধ্যে কেহই কর্ম্ম করিয়া সুখ বা তৃপ্তি লাভ করে না। অতএব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যদি বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে পতি এবং পত্নীর এক-মন এক-প্রাণ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই কর্ত্তব্য। অধিকন্তু, স্ত্রী এবং পুরুষ, এই দুই লইয়া মনুষ্য। স্ত্রী ঋক্, পুরুষ সাম; স্ত্রী পৃথিবী, পুরুষ স্বর্গ*। পৃথিবী এবং স্বর্গ একত্র হইলে তবে একটি পূর্ণজগৎ হয়। অতএব স্ত্রী এবং পুরুষের সঙ্গীতময় মিলন না হইলে মনুষ্য হয় না। স্ত্রী, পুরুষের প্রয়োজনীয় এবং পুরুষ, স্ত্রীর প্রয়োজনীয়। কাজেই পুরুষ ব্যতীত স্ত্রী অসম্পূর্ণ এবং স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ অসম্পূর্ণ। যদি দুই জনকে সম্পূর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে দুইজনে মিশিয়া এক হওয়া আবশ্যক। মিশ্রণে যেমন অভাব মোচন হয়, আর কিছুতে তেমন হয় না। অমিষ্ট দ্রব্যকে সুমিষ্ট করিতে হইলে অমিষ্ট দ্রব্যের সহিত মিষ্ট দ্রব্য মিশাইয়া ফেলিতে হয়। মিষ্ট দ্রব্য যত কম মিশান হয়, অমিষ্ট দ্রব্য তত কম মিষ্ট হয়। অতএব স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পূর্ণ মিশ্রণ, মনুষ্যত্ব-সাধক। তাই বলি যদি ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা জীবন পবিত্র করিতে হয়, তবে স্ত্রীপুরুষে মিশিয়া ধর্ম্মচর্য্যা না করিলে ধর্ম্মচর্য্যা অঙ্গহীন এবং এক রকম অসম্ভব হয়। দুইটি হৃদয়রূপ দুইটি নদী মিলিয়া একটি ধারায় অনন্তে মিশিতে না পারিলে মানুষের জীবনরূপ আহুতি সুন্দর, সম্পূর্ণ এবং সঙ্গীতময় হয় না। যুক্তহস্তে পুষ্পাঞ্জলি না দিলে দেবার্চ্চনা করিয়া কি আশ্ মিটে? হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য এই মিশ্রণ এবং একীকরণ। সে উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ এবং গূঢ়-তথ্যমূলক, তাহা কি অস্বীকার করা যায়?

যাঁহারা ইংরাজি বিদ্যা এবং ইংরাজি সমাজনীতির পক্ষপাতী, তাঁহারা বোধ হয় বলিবেন যে, স্ত্রী এবং পুরুষকে মিশাইয়া এক করিলে, দুই জনের যে সকল পৃথক্ পৃথক্ মনোবৃত্তি এবং রুচি আছে,

* সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং।

তাহার স্বাধীন এবং সম্যক স্ফূর্ত্তি হয় না। এ কথার প্রথম উত্তর এই যে, যদি তাহা না হয়, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? রুচি এবং মনোবৃত্তি কিসের জন্য? শুধু স্বাধীন স্ফূর্ত্তির জন্য না জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য? যদি স্বাধীন স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে গেলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করা না যায়, তাহা হইলে শুধু স্বাধীন স্ফূর্ত্তি লইয়া কি হইবে? যদি জীবনের উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্বাধীনতা এবং স্ফূর্ত্তির পরিমাণ কম করিতে হয়, তাহাও কি করা উচিত নয়? এবং মানুষ কি তাহা করে না? সামাজিক জীবনের অর্থই ত তাই। দশজনে মিলিয়া একটি উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে কেহই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না, সকলকেই কিয়ৎপরিমাণে আপন আপন স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হয়। অপরের সাহায্যে আপনার কর্ম্ম সাধন করিতে হইলে, অপরের কাছে আপনার কিয়দংশ বলি দেওয়া নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, স্ত্রী ও পুরুষ মিশিয়া এক হইলে দুই জনের যে সকল পৃথক পৃথক রুচি ও মনোবৃত্তি আছে তাহার স্বাধীন ও সম্যক স্ফূর্ত্তি হয় না, এ কথার কোন অর্থ নাই। প্রগাঢ় প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া পতি এবং পত্নী একই উদ্দেশ্য সাধনার্থ একই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। কিন্তু যিনি সেই কার্য্যটি যে রকমে করিতে সক্ষম, তাঁহার তাহা সেই রকমে করিবার কোন বাধা নাই। পতি এবং পত্নী উভয়েই অতিথি সেবায় নিযুক্ত। কিন্তু পতি কেবল অর্থোপার্জ্জন করিয়া অতিথি সেবার জন্য দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিয়া দিতেছেন। পত্নী স্বহস্তে সেই সকল দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সন্তানকে যেমন যত্ন করিয়া স্বয়ং ভোজন করাইয়া থাকেন, অতিথিকে তেমনি স্বয়ং ভোজন করাইতেছেন। একই কর্ম্ম দুই জনে দুই রকমে করিতেছেন। শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থাও তাই। পতি প্রাত্যহিক যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, পত্নী সেই যজ্ঞের নিমিত্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিবেন। তৃতীয় উত্তর এই যে, একমনে একপ্রাণে এক উদ্দেশ্যের অনুবর্ত্তী হইলে কি পতি, কি পত্নী, কাহারো পৃথক্‌ভাবে কার্য্য করিবার বেশী অভিরুচি হয় না। যতটুকু অভিরুচি হয়, প্রগাঢ় প্রণয়স্থলে সে টুকু যেমন অবিবাদে এবং প্রীতিকর প্রণালীতে চরিতার্থ করা যায়, প্রণয়ের অন্য অবস্থায় তেমন করা যায় না।

যাঁহারা ইংরাজি সমাজনীতির পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আরো দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রথম কথা এই যে হিন্দু পত্নীকে পতিতে এবং পতির কুলেতে চিরকালের জন্য অচলভাবে আবদ্ধ রাখিতে যত্নবান। বিবাহকালে বর কন্যাকে এই মন্ত্র পড়াইয়া অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইয়া থাকেন;—

ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি।

হে অরুন্ধতি! আমি যেন তোমার

ন্যায় অবরুদ্ধ অর্থাৎ পতিতে লগ্ন হইয়া থাকি।

তাহার পর বর কন্যাকে দর্শন এবং বারংবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন :—

ওঁ ধ্রুবাদ্যৌঃ, ধ্রুবা পৃথিবী,
ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ,
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতাইমে,
ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্।

আকাশ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলই ধ্রুব, পর্ব্বত সকল ধ্রুব, এই স্ত্রীও পতিকুলে ধ্রুব।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হিন্দুশাস্ত্রকার পত্নীকে পতিতে এবং পতিকুলেতে বাঁধিয়া রাখিতে চান, এবং সেই জন্য তিনি পতিপত্নীর যোগকে চিরস্থায়ী যোগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজদিগের ঠিক সে মত এবং সে চেষ্টা নয়। তাঁহারা যে পতিপত্নীর সম্বন্ধ স্থায়ী করিতে অনিচ্ছুক, তা নয়। কিন্তু পতি এবং পত্নীর স্বাধীনতার দিকে এবং পৃথক পৃথক আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ এবং অভিরুচির দিকে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি, এবং সেই জন্য তাঁহারা পতি এবং পত্নীর বিবাহগ্রন্থি যাহাতে সহজে খোলা যায়, সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। হিন্দু বলেন, পতি এবং পত্নীর মধ্যে আজ যদি কোন অপ্রণয়ের কারণ থাকে, কাল তাহা অদৃশ্য হউক, কাল যদি কোন অপ্রণয়ের কারণ হয়, পরশ্ব তাহা অদৃশ্য হউক, মোট কথা, পতি এবং পত্নীর মধ্যে সমস্ত অপ্রণয়ের কারণ বিনষ্ট হইয়া ক্রমেই তাঁহারা পরস্পরে মিশিয়া যাউন। * ইংরাজ বলেন,—পতি এবং পত্নী আজ পরস্পরের প্রণয়ে ভাসিতেছেন, কিন্তু কাল তাঁহাদের মধ্যে অপ্রণয়ের কারণ জন্মিতে পারে, এবং যদি তাহাই হয়, তবে পরশ্বই তাঁহারা যাহাতে দাম্পত্য-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, আইনে এরূপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। হিন্দু, পতিপত্নীর বিরোধ ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের দাম্পত্যগ্রন্থি আঁটিয়া দিতে চান। ইংরাজ পতিপত্নীর বিরোধ বাড়াইয়া তাঁহাদের দাম্পত্যগ্রন্থি খুলিয়া দিতে চান। হিন্দু সৃষ্টি এবং পালনের পক্ষপাতী, ইংরাজ প্রলয়ের পক্ষপাতী। হিন্দু এবং ইংরাজের মধ্যে এই প্রভেদটি অতি গুরুতর এবং ইহার তাৎপর্য্যও অতি গভীর। ইহার দুইটি

* বিবাহান্তে বর, অগ্নি ও সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিবে :—

(১) ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যে নাশয় স্বাহা।

হে সর্ব্বদোষহর অগ্নি! তুমি দেবলোকের দোষ বিনষ্ট করিয়া থাক, এই জন্য আমি শরণার্থী তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম, ইহাঁর (এই কন্যার) পতি-বিরোধক অঙ্গ বিনষ্ট কর।

(২) ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি। যাস্যৈ গৃহঘ্নী তনূস্তামস্যে নাশয় স্বাহা।

হে সর্ব্বদোষহর সূর্য্য। তুমি দেবলোকের দোষ বিনষ্ট করিয়া থাক, এই জন্য আমি শরণার্থী তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম, ইহাঁর (এই কন্যার) গৃহধর্ম্ম-বিরোধক অঙ্গ বিনষ্টকর।

তাৎপর্য্য আছে। একটি তাৎপর্য্য এই যে, হিন্দু এমন বয়সে কন্যার বিবাহ দেন যে, তখন তাঁহার পতি তাঁহাকে শিক্ষা দ্বারা আপনার মনের মত করিয়া লইতে পারেন, এবং সেই জন্য যত দিন যায়, ততই তিনি পতিতে মিশিতে থাকেন। কিন্তু ইংরাজ রমণীর এমন বয়সে বিবাহ হয় যে, তখন তিনি নূতন শিক্ষা লাভ করিতে অক্ষম, এবং সেই জন্য তাঁহার পতির সহিত অপ্রণয়ের কোন কারণ তাঁহাতে থাকিলে, পতি তাহা নষ্ট করিতে অক্ষম হন; এবং যত দিন যায়, কারণটি কাজেই তত প্রবল হইয়া উঠে। দুইটি জাতির মধ্যে কন্যার বিবাহের বয়সের প্রভেদ বশতঃ তাহাদিগের দাম্পত্য নীতি ও প্রণালীর এত আকাশ-পাতাল প্রভেদ ঘটিয়াছে। আর একটি তাৎপর্য্য এই। অধিক বয়সে রমণীর বিবাহ হয় বলিয়া তিনি পতি কর্ত্তৃক প্রয়োজন মত শিক্ষিত হইতে পারেন না, ইংরাজ এ কথা বুঝেন। কিন্তু বুঝিয়াও কেন তাহার প্রতিবিধান করেন না—অল্প বয়সে রমণীর বিবাহের ব্যবস্থা কেন করেন না? এ প্রশ্নের মীমাংসা বড় সহজ নয়। আমি যেরূপ বুঝি তাহা বলিতেছি। অনেক কারণে ইংরাজ অল্প বয়সে স্ত্রীর বিবাহ দেন না। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ এই যে, অল্প বয়স হইতে স্ত্রী যদি পতির নিকট থাকে, তাহা হইলে সে অবশ্যই পতির মানসিক শাসনের অধীন হইয়া পড়িবে। যদি তাহা হয়, তবে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। সংসারধর্ম্ম সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে, সুরুচি এবং কুরুচি সম্বন্ধে এবং অন্য অন্য বিষয় সম্বন্ধে তাহার যেরূপ স্বাধীন শিক্ষা লাভ হওয়া উচিত তাহা হয় না। সে যেন প্রভুর দাস হইয়া পড়ে। কিন্তু সেটি হওয়া উচিত নয়। সেটি হইলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব থাকে না, স্বাধীন মনুষ্যের স্বাধীনতা থাকে না। এ কথার অর্থ এই যে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য স্ত্রী এবং পুরুষ যখন মিলিত হইবে তখন তাহারা পরস্পরে স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় স্বাধীনভাবে থাকিবে বলিয়া মিলিত হইবে। কোন একটি কার্য্য বা উদ্দেশ্যকে প্রধান ভাবিয়া মিলিত হইবে না। আপনিই প্রধান এই ভাবিয়া মিলিত হইবে। আত্মপ্রিয়তা ইংরাজি বিবাহ প্রণালীর মূল সূত্র। তাই ইংরাজ, বিবাহের গ্রন্থি খুলিয়া দিতে এত যত্নবান। হিন্দুর বিবাহ মহৎ উদ্দেশ্য মূলক বলিয়া, হিন্দু বিবাহ-গ্রন্থি আঁটিয়া রাখিতে চান; ইংরাজের বিবাহ মহৎ উদ্দেশ্য-হীন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মূলক বলিয়া, ইংরাজ বিবাহ-গ্রন্থি খুলিয়া দিতে এত তৎপর। কিন্তু বুঝিয়া দেখা উচিত যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যদি কোন অর্থ থাকে, তবে সেই স্বাধীনতাকে বড় করা ভাল, না জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য স্থির করিয়া সেইটিকে বড় করা ভাল? যদি তোমার স্বাধীনতা থাকে

তবে এমন হইতে পারে যে, তোমারই সুখ হইল, আর কাহারো কিছু হইল না। কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া যদি পরোপকারী হইতে পার, তবে তুমিও সুখী হইবে এবং অপরেও সুখী হইবে। এ জগতে একলা থাকিবার যো নাই ; পশু একলা থাকিতে পারে, মানুষ পারে না। যদি পাঁচ জনকে লইয়া থাকিতে হইল তবে জীবনটা পাঁচ জনের সেবায় উৎসর্গ করিতে পারিলেই, এ জগতে এ জীবনের কার্য্যটা এক রকম করা হইল না ? কিন্তু সেই মহৎ কার্য্য সাধনার্থ যদি স্ত্রী পুরুষের মিলন আবশ্যক হয়, তবে নিজ স্বাধীনতাকে বড় না ভাবিয়া সেই মহৎ কার্য্যটিকে বড় ভাবিয়া স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইলেই ভাল হয় না ? যদি বল যে স্ত্রীপুরুষে মিলিত হয় হউক ; কিন্তু যে মহৎ কার্য্যের উল্লেখ করা হইল, সেই জন্যই যে তাহারা মিলিত হইবে এমন কি কথা আছে ? ইহার উত্তর এই যে, যদি স্ত্রী এবং পুরুষকে মিলিতেই হয়, তবে সেই মহৎ কার্য্যোদ্দেশে মিলিলে মিলনটা যত মহৎ এবং মনুষ্যত্ব সূচক হয়, অন্য কোন উদ্দেশে মিলিলে তত হয় না। একথা যদি ঠিক হয়, তবে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে বিবাহের দ্বারা জীবনের মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইলে যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে বা বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে যে মানুষ হইবে তাহার তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইংরাজ আত্মপ্রিয় বলিয়া তাহার বিবাহের প্রকৃতপক্ষে মহৎ উদ্দেশ্য নাই। মহৎ উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই তাহার বিবাহ, বিবাহই নয়। মহৎ উদ্দেশ্য থাকিলেই মানুষের সহিত মানুষের প্রকৃত বিবাহ হয়। যেমন হারমোদিয়াসের সহিত এরিষ্টজিটনের বিবাহ ; বিশুখৃষ্টের সহিত সেণ্টপলের বিবাহ ; চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ ; রামের সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ।

আরো এক কথা। ইংরাজের স্বাধীনতার ধূয়া কি জন্য ? না, অপরের দ্বারা স্বাধীনতা অপহৃত হয় বলিয়া, অপরে অত্যাচার করিয়া বা স্বার্থসাধনার্থ স্বাধীনতা বিনষ্ট করে বলিয়া। কিন্তু জগতের এবং মনুষ্যজীবনের মহৎকার্য্য সাধনার্থ স্ত্রীপুরুষের যে মিলন এবং মিশ্রণ হয়, তাহাতে অত্যাচারই বা কোথায়, স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ই বা কোথায় ? তাহাতে যদি স্বাধীনতার বিলোপ হয়, সে ত স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই মহৎকার্য্য সাধনার্থ হইবে। অতএব সে স্বাধীনতা বিলোপের বিরুদ্ধে কাহারো কোন কথা কহিবার যো নাই। মহৎকার্য্যের নিমিত্ত যাহা দেও তাহা ত দূষণীয় দান নয়, তাহা মহৎ মনের মহৎ ও পবিত্র আহুতি। ইংরাজ সে মহৎ ও পবিত্র আহুতি দিবার নিমিত্ত বিবাহ করেন না, হিন্দু করেন। ইংরাজ আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত, হিন্দু জগৎকে লইয়াই ব্যস্ত। ইংরাজ আপনার জন্য সমাজে থাকেন, হিন্দু সমাজের জন্য

সমাজে থাকেন। বল দেখি ইংরাজ-মানুষ বেশী মানুষ, না হিন্দু-মানুষ বেশী মানুষ? বল দেখি ইংরাজ হইবে না হিন্দু হইবে? বল দেখি ইংরাজের মতে বিবাহ করিবে না হিন্দুর মতে বিবাহ করিবে।

এখন বোধ হয় বুঝা গেল যে ইংরাজি প্রভৃতি বিবাহ প্রণালীতে দাম্পত্যগ্রন্থি খুলিয়া দিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা ভাল নয়, এবং হিন্দু বিবাহে স্ত্রীপুরুষের যে মিশ্রণ বা একীকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়, তাহা অতি উত্তম এবং অতি প্রয়োজনীয়। জগৎকে একই চক্ষে দেখিয়া যাহাদিগকে জগতের মঙ্গল সাধন করিতে হইবে, তাহাদের মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। পতি এবং পত্নীর হৃদয়-রূপ দুইটি সুর মিলিয়া একতানে না বাজিলে জগৎ কেমন করিয়া সঙ্গীত সুধা পান করত শোকতাপ ভুলিয়া যাইবে! কিন্তু যদি দুইটি হৃদয়কে মিশাইয়া ফেলিতে হয়, তাহা হইলে একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়কে আপনার ভিতর মিশাইয়া না লইলে কেমন করিয়া সেই অপূর্ব্ব মিশ্রণ ঘটিয়া উঠিবে? তবেই ত বোধ হয় যে হিন্দুশাস্ত্রে পুরুষের বেশী বয়সে এবং স্ত্রীর শৈশব কালে বিবাহ হওয়ার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা অতি উত্তম এবং উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

তুমি বলিবে যে, এ পূর্ব্বকালের ব্যবস্থা, এখন চলিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করি, কেন চলিবে না? উপরে বুঝাইয়াছি যে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অনুরোধে কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ আবশ্যক। কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবার ত এখন ও এদেশে আছে। তবে কেন সেই সকল পরিবারে কন্যার বিবাহ এখনও অল্পবয়সে হইবে না? আর, যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া একলা একলা থাকেন বা থাকিতে ভাল বাসেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও বলি যে, অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ আবশ্যক এবং বিশেষ উপকারী। একান্নবর্ত্তী পরিবারে পতি অনেক সময় পত্নীকে আপনার ইচ্ছামত শিক্ষা দিতে পারেন না। এবং অনেক সময় পরিবারস্থ লোকে পত্নীকে পতির শিক্ষার বিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়া তাঁহার চেষ্টা অনেক অংশে বিফল করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহাকে পাঁচ রকমের পাঁচ জনকে লইয়া থাকিতে হয় না, তিনি নির্ব্বিরোধে এবং অপেক্ষাকৃত অনায়াসে পত্নীকে নিজের মনের মতন করিয়া তুলিতে পারেন। যাহাকে লইয়া জীবনের সুখ দুঃখ সকলি, যাহাকে লইয়া জীবনের অর্থ, যাহাকে লইয়া জগতে মুক্তি, তাহাকে গড়িবার মতন পুরুষের মহৎ, প্রীতিকর, এবং অবশ্যকর্ত্তব্য কায আর কি আছে! এবং তাহাকে গড়িবার পক্ষে শত সহস্র বিঘ্ন থাকিলেও তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করা মহা পাপ!

বোধ হয় কেহ কেহ বলিবেন যে, শৈশবাবস্থায় কন্যা বিবাহিত এবং পতি-হস্তে সমর্পিত হইলে অপরিণত বয়সে

সন্তানোৎপাদন করিয়া তিনি স্বয়ং স্বাস্থ্য হারাইবেন এবং সন্তানগুলিকেও রুগ্ন করিয়া ফেলিবেন। এ কথার অর্থ এই যে, পতি শিশুপত্নীর সহিত অযথা ব্যবহার করিবেন। আজ কাল এই সকল কথা অনেকের মুখে শুনা যায় এবং অনেকেই বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা নিবারণ করিবার আশায়, কিছু বেশী বয়সে, কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু চরক শুশ্রুতের মত উল্লেখ করিয়াই বলুন, আর সর বেনজমিন ব্রোডির মত উল্লেখ করিয়াই বলুন, যিনি যেমন করিয়াই বলুন, বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা যে প্রধানতঃ বাল্য বিবাহের ফল, তাহা সপ্রমাণিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। দ্বিতীয় কথা এই যে, শারীরিক প্রয়োজনে যে বিবাহ করে, বালিকা-পত্নী তাহার জন্য নয়। সে পশু, বালিকা-রূপ পবিত্র কুসুম তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। আধ্যাত্মিক উদ্দেশে, যে রকম উদ্দেশে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বিবাহ করিতেন, সেই রকম পবিত্র উদ্দেশে যে বিবাহ করে, বালিকা-পত্নী তাহারই প্রাপ্য। যিনি জ্ঞানবান, বিদ্যাবান, পরিণতবয়স্ক, উন্নতমনাঃ মহৎ আশয়ে মহিমান্বিত, তাঁহার পত্নী চিরকালই সৌষ্ঠব এবং সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, তাঁহার সন্তান সন্ততি সকল সময়েই সুপ্রস্ফুটিত পুষ্প। তাই বলি, যদি বিবাহের অপব্যবহার নিবারণ করিতে হয়, তাহা হইলে পুত্রকে বিদ্যা দান করিয়া বেশী বয়সে তাহার বিবাহ দিও, কিন্তু অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে আপত্তি করিও না। নীচ প্রকৃতির প্রকৃত শাসন বাহ্যশাসনে নাই। চোর বার বার জেলে যায়, তবু চুরি করিতে ছাড়ে না। নীচপ্রকৃতির প্রকৃত শাসন আধ্যাত্মিক উন্নতি। এখন এ দেশে আধ্যাত্মিকতা নাই বলিয়াই বাল্য বিবাহের অপব্যবহার হয়। এখন এদেশে বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই, বিবাহের সহিত ধর্ম্মের অর্থাৎ বিশ্বের সম্বন্ধ নাই বলিয়াই বিবাহের ফল কদর্য্য হইতেছে এবং সংসারধর্ম্ম প্রকৃত সৌন্দর্য্যহীন। নৈতিক উন্নতি কর, জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য স্থির কর, করিয়া লক্ষ্মীরূপা নারীর হৃদয়ে মিশিয়া থাক, দেখিবে এদেশ আর এদেশ নাই, দেশ ধর্ম্মবলে অমিত বল প্রাপ্ত হইয়াছে, হিন্দুর ঘরে জগতের সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে, সপত্নীক হিন্দু পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া বীরপুরুষ হইয়াছে এবং জগতের সৌন্দর্য্যের ছটায় ডুবিয়া রহিয়াছে, দেশে রোগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, হীনতা নাই—সকলই উন্নত, সকলই পবিত্র, সকলই বীরোচিত, সকলই সঙ্গীতময়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রাজস্থান। রাজপুতজাতির ইতিবৃত্ত। শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত। শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ বরাট কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৯২ নং বহু-বাজার ষ্ট্রীট বরাট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য প্রতি সংখ্যার চারি আনা মাত্র।

টড্ সাহেব এই ইতিহাস ইংরাজিতে সংগ্রহ করিয়া রাজপুতদের অসাধারণ বীরত্বের কথঞ্চিৎ পরিচয় দেন। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, "there is not a petty state in Rajasthan that has not had its Thermopyli and scarcely a city that has not produced its Leonidas.

দাম্ভিক ইংরেজরা এই ইতিহাস পড়িয়া বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদের দাম্ভিকতা সর্ব্বত্র খাটে না। ভারতবর্ষীয়ের বীরত্ব এখন হ্রাস পাইয়াছে, আবার এক দিন উদ্দীপ্ত হইতে পারে। ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই এখন এই ইতিহাস পাঠ করা উচিত। অঘোর বাবু সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সুবিধা করিয়াছেন। বাঙ্গালির ঘরে ঘরে এই ইতিহাস পাঠাইবার নিমিত্ত তিনি অতি অল্প মূল্য ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থের অনুবাদও সুন্দর হইতেছে। আমরা মূল গ্রন্থের সহিত স্থানে স্থানে মিলাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, গ্রন্থখানি অনুবাদিত বলিয়া জানিতে পারা যায় না; যেন কোন মূল গ্রন্থ পাঠ [illegible] বোধ হয়। এই জন্য আমরা এক প্রকার সাহস করিয়া বলিতে পারি যে অনুবাদিত অন্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থ বঙ্গ ভাষা হইতে শীঘ্র লোপ পাইবে না। আমরা আশীর্ব্বাদ করি অঘোর বাবুর মনস্কাম সিদ্ধ হউক—বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ পঠিত হউক।

গ্রন্থাবলী। গদ্য ও পদ্য শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। ৯৭ নং কালেজ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আনা।

রাজকৃষ্ণ বাবু কবি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে অনেকেরই আগ্রহ। তাঁহার সমুদয় গ্রন্থ একত্রে মুদ্রিত হওয়ায় অনেকেই আহ্লাদিত হইবেন সন্দেহ নাই। বিশেষ অল্প মূল্যে পাঠের এত অধিক সামগ্রী আর কখন বঙ্গ ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

ইয়ুরোপে তিন বৎসর। অর্থাৎ ইউরোপ বাসিদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় ও নানা দেশ বর্ণন বিষয়ক কতক গুলি পত্রের সারাংশ। ইংরাজি হইতে অনুবাদিত। শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত সি. এস, প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র। এবার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য পরিপাটি হইয়াছে প্রকাশক বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন।